বুদ্ধের সম্বোধিলাভ
সাঁচি স্তূপের পূর্ব্ব তোরণের "রিলিফ"

সাঁচি স্তূপ

[ফোটো—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ গুপ্ত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড } কার্ত্তিক, ১৩৬৩ { ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শারদীয়া

আনন্দের পূজা আগতপ্রায়। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আজ যে দুর্দ্দৈবের অভিশাপ পড়িয়াছে তাহাতে আনন্দও যেন বিষাদমিশ্রিত, অবসাদপূর্ণ। একে ত দেশের লোক সম্বিৎহীন ও অবসন্ন-হৃদয়, উপরন্তু এই বিষম বিপদ। লক্ষ লক্ষ নরনারী আশ্রয়হীন, আর্ত্ত, ভয়বিহ্বল। এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

তবুও আমাদের শক্তির আবাহনে মনে বল আনিতে হইবে, যাহাতে বিপদের সম্মুখে আমরা হতচৈতন্য না হইয়া পড়ি। দৃঢ় চিত্তে মনে রাখিতে হইবে এই বাঙালীর অগ্নিপরীক্ষা। মনে রাখিতে হইবে এই পূজায় আর্ত্তের সেবা ও দরিদ্রনারায়ণের পূজাই হইবে চরম আরতি ও আহুতি।

প্রতি বৎসর এই সময়ে দুঃখ-দ্বন্দ্ব, ভয়-ক্লেশ সবকিছু ভুলিয়া আমরা বিমল আনন্দ উপভোগ করি। এবার লক্ষ লক্ষ গৃহহারা দুর্ভাগার পক্ষে কোনই উপায় নাই, যদি না আমরা নিজের আনন্দের অংশ মুক্তহস্তে তাহাদের দিয়া পূজা সার্থক করি।

আর্ত্তের পরিত্রাণে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার তাঁহাদের কর্ত্তব্য অবশ্য পালন করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি আমরা পাইয়াছি, কিন্তু যেরূপ ব্যাপকভাবে বন্যার প্রকোপে দেশ বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহাতে শুধু সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। এবারকার পূজায় সকলেরই উচিত নিজেদের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া আর্ত্তত্রাণে সাহায্যদান। এ বিষয়ে কলিকাতার নাগরিকগণ ইতি-মধ্যেই অনুরোধ পাইয়াছেন, অন্যত্রও এই আবেদন প্রচারিত হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন।

বহুদিন পূর্ব্বে, যখন দেশ স্বাধীন ছিল না তখন, উত্তরবঙ্গের প্লাবনের ধ্বংসলীলা হইতে সেই অঞ্চলের লোককে পরিত্রাণ করার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উদ্যোগী হইয়া এক কমিটি সংগঠন করেন। দীর্ঘদিন সেই সমিতির স্মৃতি লুপ্ত হইয়াছে। এখন প্রয়োজন সেইরূপ বহু সমিতির।

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

রাজ্য পুনর্গঠনের ত শেষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। আর যে ঐ ভাবে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহা মনে হয় না। এখন আমাদের উচিত একটা হিসাব-নিকাশ করার, যে, আমরা কোথায় দাঁড়াইয়া আছি। সম্মুখেই ত নির্ব্বাচন, সে সময় প্রত্যেক নির্ব্বাচনপ্রার্থীই দেশ ও দশকে স্বর্গে তুলিবার প্রতিশ্রুতি দিবেন। কিন্তু নির্ব্বাচন শেষ হইলেই ত পাঁচ বৎসরের মত নিশ্চিন্ত। তখন কে কাহার খোঁজ রাখে? অথচ উপযুক্ত প্রতিনিধির অভাবে এই বিভক্ত ও অভিশপ্ত বাংলা যেরূপে প্রতিপদে বঞ্চিত হইয়াছে এরূপ আর কোনও প্রদেশ হয় নাই।

আমাদের চিন্তা করার শক্তি যদি এখনও থাকে তবে আমাদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমরা সমষ্টিগতভাবে অনুন্নত জাতির পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িব। আমাদের ছিল শিক্ষা ও বুদ্ধির গৌরব। শিক্ষায় যে কিরূপ দুরবস্থা তাহা আমরা এই সংখ্যাতেই অন্যত্র দেখাইয়াছি।

দেশের চাষীর কিছু উন্নতি হইয়াছিল ধান-চালের মূল্যবৃদ্ধিতে এবং চাষের উন্নতিতে। তাও ত আজ লক্ষ লক্ষ চাষী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল বন্যায়। দেশের শ্রমিক ত প্রায় সবই অবাঙালী এবং দেশের শ্রমিক নেতাদিগের কার্য্যকলাপে দেশে নূতন কোনও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা দুষ্কর, পুরনো যাহা ছিল তাহাও ত ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। কোন পথে এই অবস্থা হইতে দেশকে ফিরাইতে পারা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ কি আমাদের নাই? মিলিয়া পরামর্শ করায় আপত্তি নাই নিশ্চয়। মনে হয় আজও আমরা ফিরাইয়া আনিতে পারি প্রাচীন গৌরব, বাঙালীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহার স্বস্থ আসনে, যদি শুধু ভাবোচ্ছ্বাসে বিভ্রান্ত না হইয়া আমরা ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কারে দেহ-মন নিয়োগ করি। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, পথিকৃৎ যদি কেহ ডাক দেয়, তবে দেশের লোক সাড়া দিবে, কেননা গালভরা স্লোগানে ও উদ্দাম উচ্ছ্বাসে দেশকে যে কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা এখন সকলেরই চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশই আক্ষেপ ও বিলাপে সে চিন্তা হইতে অব্যাহতি চাহেন, কিন্তু কিছু লোক পথও খুঁজিতেছেন। তাঁহাদের দলে যদি আমরা সকলে যোগদান করি, পথ পাওয়া যাইবেই।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন

ভারতীয় পার্লামেণ্টে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমালোচনাকালে পণ্ডিত নেহেরু বলেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা হইতে আরও ৪০ শতাংশ অধিক উৎপাদন করা প্রয়োজন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৬'১৬ কোটি টন; সেই তুলনায় উৎপাদন হইয়াছে ৬'৫৮ কোটি টন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইতেছে এবং এ বৎসর দেশব্যাপী বন্যার প্রকোপে ঘাটতি আরও অধিক পরিমাণে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন-লক্ষ্য ৭'৫ কোটি টনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রধানতঃ শিল্পের পরিকল্পনা এবং কৃষি তথা শস্য উৎপাদন উপেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচের জন্য মোট খরচ হইবে ১,০৮৩ কোটি টাকা। ইহা মোট খরচের ২২'৫ শতাংশ। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচের জন্য মোট খরচ হইয়াছে ৮৫৮ কোটি টাকা এবং মোট খরচের ইহা ছিল ৩৪'৪ শতাংশ। মোট অর্থের পরিমাণে দেখা যায় যে, প্রথম পরিকল্পনা হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২২৫ কোটি টাকা অধিক খরচ করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপারেও অধিক পরিমাণে খরচ ধার্য্য করা হইয়াছে। যথা, বন্যা নিবারণের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় মাত্র ১৭ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার জন্য ১০৫ কোটি টাকা খরচ করা হইবে। সুতরাং কৃষির দিকে যথোপযুক্ত নজর রাখিয়া যদি শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে সরকার অধিকতর মনোযোগ দেন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর্ব্বপ্রকার কৃষি-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ১৫ শতাংশ, তৈলবীজ ২৭ শতাংশ, ইক্ষু ২২ শতাংশ, তুলা ৩১ শতাংশ এবং পাট ২৫ শতাংশ। সম্প্রতি কতকগুলি কারণে প্ল্যানিং কমিশন মনে করেন যে, খাদ্যশস্য উৎপাদনের নির্দ্ধারিত লক্ষ্য যথেষ্ট নহে; কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭'৫ কোটি টনে বৃদ্ধি পাইলেও দৈনিক গড়ে প্রতি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ১৮'৩ আউন্স করিয়া খাদ্য পাইতে পারিবে। ইহা প্রায় আড়াই পোয়ার সামিল। যদিও বর্ত্তমানের পরিমাণ হইতে এই পরিমাণ অধিক তথাপি ইহা অনুমান করা হইতেছে যে, ভবিষ্যতে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইলে এই পরিমাণ খাদ্যশস্য কম হইবে। সেই কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, ঘাটতি ব্যয়ের খরচ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই অবস্থায় বস্ত্র ও খাদ্যশস্যের সরবরাহে প্রাচুর্য্য না থাকিলে কালোবাজারী কাটকা বিস্তার লাভ করিবে। তৃতীয়তঃ, খাদ্যশস্যের উৎপাদন অধিক হইলে ইহার রপ্তানী দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পক্ষে সুবিধা হইবে।

এই সকল চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি মুসৌরীতে প্রাদেশিক কৃষিমন্ত্রীদের একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশন জাতীয় অর্থনৈতিক দিক হইতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই অধিবেশনের আলোচনা ইত্যাদি সরকার জনসাধারণের গোচরের জন্য কিছুই প্রকাশ করেন নাই, যদিও তাঁহারা জনসহযোগিতা পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে আগ্রহ ও উৎসাহ দেখান। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাপার জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সম্বন্ধে সকলেরই জানিবার অধিকার আছে। এই অধিবেশনে একটি কার্য্যকরী কমিটি নিযুক্ত হয় কৃষিদ্রব্য উৎপাদনের নূতন লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য। এই কমিটি প্রস্তাব করেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নির্দ্ধারিত লক্ষ্যগুলি প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইবে; সেই কারণে কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন নিম্নলিখিতভাবে বর্দ্ধিত হারে হওয়া প্রয়োজন: খাদ্যশস্য ৭'৫ কোটি টন হইতে ৮'১৫ কোটি টন হওয়া প্রয়োজন, ইহা বর্ত্তমান উৎপাদন হইতে ১'৬৫ কোটি টন অধিক। তুলার উৎপাদন ৫৫ লক্ষ গাঁইট হইতে ৫৮ লক্ষ গাঁইটে বৃদ্ধি পাইবে। কাঁচাপাটের উৎপাদন ৫০ লক্ষ গাঁইট হইতে ৫৫ লক্ষ গাঁইটে উন্নীত হইবে এবং তৈলবীজ ৭১ লক্ষ টন হইতে ৭৮ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা হইবে। প্রথম সংখ্যাগুলি দ্বিতীয় পরিকল্পনার নির্দ্ধারিত লক্ষ্য। মুসৌরী অধিবেশন নূতন প্রস্তাবিত লক্ষ্যগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। খাদ্যশস্য উৎপাদনের নূতন নির্দ্ধারিত লক্ষ্য বর্ত্তমান উৎপাদন হইতে ২৫ শতাংশ অধিক হইবে। সুতরাং পণ্ডিত নেহেরুর প্রস্তাবিত ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি গৃহীত হয় নাই, হওয়া উচিত ছিল, কারণ বাস্তবতার দিক হইতে ইহা যথার্থ হইত। পণ্ডিত নেহেরুর অভিমতে আদর্শ কৃষি-খামারগুলিতে ৪০ শতাংশ শস্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং এই পরিমাণে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর। কৃষি-অভিজ্ঞেরা বলেন যে, আদর্শ কৃষিক্ষেত্রই দেশের সকল কৃষিক্ষেত্র নহে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা ক্ষেত্রে এবং জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য্যাবলী ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ কেবলমাত্র ২০ হইতে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদর্শ কৃষি-ব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে। আদর্শ কৃষি-ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় প্রয়োজনীয় সেচব্যবস্থা, সারসরবরাহ, ঋণপ্রদান ব্যবস্থা এবং উচ্চতর কৃষিকার্য্যের জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। এইগুলির অভাব ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবেই আছে, সেই জন্যই কর্ত্তৃপক্ষ পরিকল্পনার লক্ষ্য আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে চান।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের কৃষিভূমির পরিমাণ সর্ব্বাধিক। অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রেজিলের মোট ভূমির মাত্র ২'৫ শতাংশ ভূমি কৃষিযোগ্য; কানাডার ৪ শতাংশ ভূমি কৃষিযোগ্য; চীন ও রাশিয়ার মোট ভূমির ১১ শতাংশ কৃষিযোগ্য এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ শতাংশ জমিতে কৃষি সম্ভবপর। সেই তুলনায় দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের মোট জমির ৪৫ শতাংশ কৃষিযোগ্য। আবার মোট কৃষিভূমির পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। সোভিয়েট রাশিয়ার

কৃষিভূমির মোট পরিমাণ ৫৫·৬ কোটি একর, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭·৮ কোটি একর এবং ভারতবর্ষের ৩৬·৬ কোটি একর। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতবর্ষের জমির উৎপাদিকা-শক্তি অত্যল্প। ১৯৪৯ সন হইতে ১৯৫১ সনে ভারতবর্ষে একরপ্রতি গড়ে ৫৮৭ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সময়ে দেখা যায় যে, রাশিয়ার একরপ্রতি গড়ে উৎপাদনের হার ৮৩০ পাউণ্ড। চীনদেশে ৮৭৪ পাউণ্ড এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৯৪৯ পাউণ্ড। ১৯৫৩ সনে ভারতবর্ষে একরপ্রতি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইয়া ৬৩০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।

সুতরাং দেখা যায় যে, আধুনিক উপাদান দ্বারা জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভবপর এবং সেই কারণে মুসৌরী অধিবেশনে নির্দ্ধারিত উৎপাদনের উচ্চতর লক্ষ্যগুলিকে কার্য্যকরী করার সম্ভাবনা আছে, যদি অবশ্য কৃষিব্যবস্থার কতকগুলি উন্নতিসাধন করা হয়। কৃষি-ঋণের ব্যাপক প্রচলন হওয়া অতীব প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন পরিবহন-ব্যবস্থার বিস্তৃতি। কিন্তু মানবীয় সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলেও ভারতীয় কৃষিকে একটি অনিশ্চিত সম্ভাবনার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হয় এবং ইহা হইতেছে মৌসুমী বায়ুর খামখেয়াল। দেখা গেল যে, মৌসুমী বায়ুর বিরুদ্ধে এখনও পর্য্যন্ত মানুষের কোনও বুদ্ধিই কার্য্যকরী হয় নাই। প্রকৃতির উপর বিজয়-গৌরবের আশা লইয়া বহু-বিঘোষিত নদী-পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইহাদের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু দিন দিনই যেন বন্যার প্রকোপ বাড়িয়া চলিয়াছে, আর এ বৎসর তো কথাই নাই। এখন বাংলা ও বিহারবাসী ভাবিতেছে, হায় দামোদর, তুমি ও তোমার পরিকল্পনাগুলি কোথায় গেল। দামোদর উত্তর দিতে পারিলে বলিত—টাকাগুলি অবশ্য বন্যার জলের মত ভাসিয়া গিয়াছে, তবে সমুদ্রে যায় নাই।

উৎপাদন-বৃদ্ধির আর একটি বড় প্রতিবন্ধ হইল ভারতের ভূমি-বণ্টনের অব্যবস্থা। ভূদান দ্বারা যাঁহারা এই সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারা বর্ত্তমানে নিশ্চয়ই নিরুৎসাহ হইয়াছেন। আর সরকারী ভূমিবণ্টন-ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে, অন্ততঃ বাংলাদেশে। জমিদারী-প্রথা বিলোপের পূর্ব্বে কৃষিজীবীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ছিল ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক এবং এই সংখ্যা ভবিষ্যতেও থাকিয়া যাইবে। আইনের ফাঁক রাখিয়া ভূমিহীন কৃষকের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্ত্তৃপক্ষ করিয়া দিয়াছেন। আইন করা হইয়াছে যে, প্রত্যেকে মাথাপিছু ২৫ একর করিয়া জমি রাখিতে পারিবে; ফলে জমিদারেরা ভাই, বোন, খুড়ী, মাসতুতো ভাই প্রভৃতির নামে ২৫ একর জমি দেখাইয়া সমস্ত জমিটাই নিজেদের আয়ত্তে রাখিয়া দিতেছেন। পুরাতন কাঠামোই নূতন আকারে চালু করা হইল। ইহাতে বেকার কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎপাদন ব্যাহত হইবে।

কয়লার অভাব

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আসানি কয়লার অভাব হইতেছে; সম্প্রতি জুলাই মাস হইতে টনপ্রতি কয়লার মূল্য যৎসামান্য বৃদ্ধি হওয়ার ফলে কয়লার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। বাংলা-বিহার কয়লাখনিগুলিতে ভারতের ৮০ শতাংশ কয়লা উৎপাদিত হয়। এই এলাকায় কয়লার মূল্য টনপ্রতি (প্রায় সাড়ে সাতাশ মণ) ৩্ টাকা করিয়া ভারত সরকার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, কারণ কয়লাখনির মালিকেরা তাঁহাদের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে খুচরা বিক্রেতারা মণপ্রতি চারি আনা করিয়া মূল্যবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, কি হিসাবে তাহা অবশ্য তাঁহারা বলেন নাই। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়লা সরবরাহে অভাব পড়িতেছে, অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় কয়লা পাওয়া যাইতেছে না।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৯৬০টি কয়লার খনি আছে এবং ৪৭৫টি যৌথ কোম্পানী ইহাদের মালিক। কয়লা-শিল্পের মোট মূলধন ২২·৪২ কোটি টাকা এবং দৈনিক ৩,৪০,০০০ শ্রমিক কার্য্য করে। ১৯৫৫ সনে ৩·৮২ কোটি টন কয়লা উৎপাদিত হইয়াছে। কলিকাতায় অবস্থিত কোল কমিশনারের হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে চাহিদার তুলনায় কয়লা উৎপাদনে ঘাটতি আছে। কোল কমিশনারের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল:

(কোটি টন হিসাবে)

বৎসর	উৎপাদন	চাহিদা	বরাদ্দ	প্রেরণ (Despatches)
১৯৫০	৩·২৩	৩·৪৭	৩·৪৩	২·৭১
১৯৫১	৩·৪৪	৩·৭১	৩·৫০	২·৯২
১৯৫২	৩·৬৩	৩·৯০	৩·৪৭	৩·১১
১৯৫৩	৩·৫৯	৩·৭৫	৩·৬৩	৩·০৭
১৯৫৪	৩·৬৮	৩·৯৪	৩·৯০	৩·১৯

সর্ব্বভারতীয় শিল্প আদালত (কয়লার খনি বিবাদসংক্রান্ত) বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষে কয়লার আভ্যন্তরিক প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনে ঘাটতি হয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, আভ্যন্তরিক প্রয়োজনের পরিমাণ কি উপায়ে হিসাব করা হইল? এই পরিসংখ্যান তথ্যের ভিত্তি খানিকটা কাল্পনিক হইতে বাধ্য। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি আভ্যন্তরিক সরবরাহে ঘাটতি পড়ে তাহা হইলে ভারতবর্ষ হইতে কয়লা রপ্তানী করিতে দেওয়া হয় কেন? ১৯৫২ সনে ভারতবর্ষ ২৫ লক্ষ টন কয়লা রপ্তানী করিয়াছে, অর্থাৎ ঐ বৎসরের উৎপাদনের প্রায় সাত শতাংশ আভ্যন্তরিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়াছিল, ঐ বৎসর কয়লার মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩·৬৩ কোটি টন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বৎসরে গড়ে ভারতের আভ্যন্তরিক কয়লার প্রয়োজন প্রায় ৩·৪০ কোটি টন। ১৯৫৩, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সনে প্রতি বৎসর প্রায় ১৩ লক্ষ টন করিয়া কয়লা রপ্তানী করা হইয়াছে।

এই কয় বৎসর কয়লার কোন অভাব হয় নাই ; হঠাৎ ১৯৫৬ সনের শেষের দিকে কয়লার অভাব হইতেছে কেন।

এই "কেন"র কারণ দেখা যায় যে, পরিবহন ব্যবস্থার অযোগ্যতা এবং অসামর্থ্য। ভারতীয় রেলপথসমূহের আঞ্চলিক বিভাগ ব্যবস্থার পর হইতেই কয়লা পরিবহন ব্যবস্থায় রেলপথের উদাসীনতা ও অযোগ্যতা প্রতীয়মান হইয়া আসিতেছে। উপরের তালিকা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, যে পরিমাণে কয়লা উৎপাদন হয় তাহার সমস্তটাই ব্যবহারের জন্য খনি হইতে চালান দেওয়া হয় না। যুদ্ধের সময় হইতেই মালগাড়ীর সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে এবং ইদানীং সেই নিয়ন্ত্রণে প্রায় অরাজকতা সুরু হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যদিও নিয়ন্ত্রণের কাঠামো এখনও বজায় রাখা হইয়াছে। ১৯৫৫ সনের শেষে কয়লাখনিগুলিতে (pit-head) প্রায় ৩৬ লক্ষ টন কয়লা জমায়েত ছিল। ১৯৫৬ সনের মে মাসে কয়লাখনির মুখগুলিতে ৩৮'৩৪ লক্ষ টন কয়লা উদ্বৃত্ত ছিল।

সুতরাং বর্ত্তমান কয়লার অভাবের কারণ কম উৎপাদন নহে, এই ব্যাপারে সরকারী কৈফিয়ৎ সম্পূর্ণরূপে ভুল। কয়লার অভাবের জন্য দায়ী রেল পরিবহন ব্যবস্থার অযোগ্যতা। পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জাপান ভারতবর্ষের চেয়েও ছোট দেশ ; কিন্তু তাহাদের কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ভারতবর্ষের চেয়ে অধিক। পোল্যাণ্ডের কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ৯ কোটি টন ; ফ্রান্সের ৫ কোটি টন এবং জাপানের ৪ কোটি টন।

সংখ্যাতথ্য সংগ্রহ

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নির্ভুল সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের গুরুত্ব অনেক। কমনওয়েলথ দেশগুলির পরিসংখ্যানবিদগণ সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনার জন্য এবং তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের নিমিত্ত সম্প্রতি লণ্ডনে এক সম্মেলনে মিলিত হন। সম্মেলনের অধিবেশন চলে ১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত। সম্মেলনে কমনওয়েলথের সকল দেশের প্রতিনিধি এবং এই প্রথম, ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিরও প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন। ইহা ছাড়া আইরিশ প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিসংখ্যান-দপ্তর এবং কমনওয়েলথ অর্থনৈতিক কমিটি হইতে পর্য্যবেক্ষকগণও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার উদ্যোগে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইহা কমনওয়েলথ পরিসংখ্যানবিদদের চতুর্থ সম্মেলন—প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২০ সনে লণ্ডনে, দ্বিতীয় সম্মেলন হয় ১৯৩৫ সনে অটোয়াতে এবং তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সনে ক্যানবেরাতে।

এই সম্মেলন উপলক্ষে ব্রিটেনের সংখ্যাতথ্য গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে "জন কিংসলী" লিখিতেছেন : "ব্রিটেনে পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য দুইটি প্রধান গোষ্ঠী কাজ করিয়া থাকে একটি সরকারী ও একটি বেসরকারী। গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আছে যে, বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয় তাহাও সরকারী পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

"কিন্তু শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা না পাইলে পরিসংখ্যান সংগ্রহ ব্যবস্থার এতটা উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইত না। ব্রিটিশ শ্রমশিল্প ফেডারেশন ও অন্যান্য শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান যে কাজ করেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লৌহ ও ইস্পাত ফেডারেশনের মাসিক বুলেটিন ও অন্যান্য অনুরূপ বিশেষ ধরনের সাময়িক পত্রী সরকারী পত্রিকাদির পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জাহাজ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 'লয়েডস রেজিষ্টার' ও ব্রিটিশ চেম্বার অব শিপিং-এর সঙ্কলনসমূহ বিশ্বের সর্ব্বদেশে ব্যবহৃত হয়।"

অবশ্য প্রচলিত পরিসংখ্যানের অধিকাংশই সংগৃহীত হয় সরকারী প্রচেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারা। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরখানা হইতে সংগৃহীত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর। এই দপ্তর 'মান্থলী ডাইজেষ্ট অব ষ্ট্যাটিষ্টিক্স', 'ইকনমিক ট্রেণ্ড' এবং 'এন্যুয়াল অ্যাবষ্ট্রাক্ট অব ষ্টাটিষ্টিক্স' এই তিনটি প্রধান পত্রিকা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত করে। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হইল জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা ও জাতীয় আয়-ব্যয় সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের সংক্ষিপ্তসার এবং শ্রমশিল্প উৎপাদনের মাসিক হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করা।

মিঃ কিংসলী লিখিতেছেন : "মার্চ্চ মাসে বাজেটের প্রারম্ভে জাতীয় আয়ের প্রাথমিক হিসাব এবং আগষ্ট মাসে বার্ষিক বিবরণীতে জাতীয় আয়ের বিশদ হিসাব প্রকাশিত হয়। এই হিসাবগুলি বর্ত্তমানে বহু সমস্যা বুঝিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে, কারণ লভ্য সম্পদ ও তাহার ব্যবহার সম্পর্কিত বিবরণাদি ইহার মধ্যেই পাওয়া যায়।"

যদিও ব্রিটেনের পরিসংখ্যান গ্রহণের পদ্ধতি কোন দেশ অপেক্ষাই নিম্নতর মানের নহে তথাপি উহার ক্রমোন্নতির জন্য অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর 'ন্যাশনাল ইনকাম ষ্টাটিষ্টিক্স—সোর্সেস এণ্ড মেথডস' নামক যে পুস্তিকাটি প্রকাশ করিয়াছে তাহা হইতে ব্রিটেনের পরিসংখ্যান সংগ্রহ বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ হইবে।

মিঃ কিংসলী লিখিতেছেন : "সম্প্রতি ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় আয়ের ত্রৈমাসিক হিসাব প্রকাশিত হইবে এবং লগ্নী ও মজুত সম্পর্কে এবং গার্হস্থ্য বাজেট সম্পর্কে আরও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জানেন যে নীতি-নির্দ্ধারণের ব্যাপারে পরিসংখ্যানকে কাজে লাগাইতে হইলে উহাকে কেবল ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্য করিলেই চলিবে না, সহজলভ্যও করিতে হইবে।"

রাজ্য পুনর্গঠনের ফল

"আনন্দবাজার পত্রিকা" নূতন ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। আমরা নীচে তাহা দিলাম:

রাজ্য পুনর্গঠন আইন এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ভূমি হস্তান্তর আইন অনুসারে আগামী ১লা নবেম্বর হইতে ভারতীয় রাজ্যসমূহের সীমানা পুনর্নির্দ্ধারিত হইবে। এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ—এই ১৪টি রাজ্য লইয়া ভারত রাষ্ট্র গঠিত হইবে। ইহা ব্যতীত ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলও থাকিবে। সেগুলি হইল—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, লাক্ষা দ্বীপ ও আমীন দ্বীপপুঞ্জ, মণিপুর এবং ত্রিপুরা।

'ক', 'খ', ও 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির পার্থক্য লোপ পাইবে এবং রাজপ্রমুখের পদ তুলিয়া দেওয়া হইবে।

নিম্নে রাজ্যসমূহের সীমানা ও জনসংখ্যা দেওয়া হইল:

রাজ্য	সীমানা (বর্গমাইল হিসাবে)	জনসংখ্যা (কোটি হিসাবে)
পশ্চিমবঙ্গ	৩৩,২৭৯ (আনুমানিক)	২ কোটি ৬১ লক্ষ ৬০ হাজার
অন্ধ্রপ্রদেশ	১,১০,২৫০	৩ কোটি ২২ লক্ষ
আসাম	৮৪,৯২৪	৩ কোটি ৯০ লক্ষ
বিহার	৬৮,৮৩০ (আনুমানিক)	৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩০ হাজার
বোম্বাই	১,৮৮,২৪০	৪ কোটি ৭৮ লক্ষ
জম্মু ও কাশ্মীর	৯২,৭৮০	৪৪ লক্ষ
কেরালা	১৪,৯৮০	১ কোটি ৩৬ লক্ষ
মধ্যপ্রদেশ	১,৭১,২০০	২ কোটি ৬১ লক্ষ
মাদ্রাজ	৫০,১১০	৩ কোটি
মহীশূর	৭২,৭৩০	১ কোটি ৯০ লক্ষ
উড়িষ্যা	৬০,১৪০	১ কোটি ৪৬ লক্ষ
পঞ্জাব	৪৬,৬১৬	১ কোটি ৬০ লক্ষ
রাজস্থান	১,৩২,৩০০	১ কোটি ৬০ লক্ষ
উত্তরপ্রদেশ	১,১৩,৪১০	৬ কোটি ৩২ লক্ষ

ট্রামকর্ম্মীর হঠকারিতা

কয়দিন পূর্ব্বে বিনা নোটিশে, অতিশয় অন্যায় ও অযৌক্তিক ভাবে ট্রামের যে ধর্ম্মঘট হয়, সে সম্বন্ধে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র মন্তব্য আমরা আংশিকভাবে নীচে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রমিক-নেতা এম-পি, মহোদয়ের মনস্তত্ত্ব বোঝার সম্বন্ধে "আনন্দবাজার পত্রিকা" তারিফ করিয়াছেন। কিন্তু এম-পি মহাশয় ত সাধারণ শ্রমিক-নেতা মাত্রেই যে কথা বলেন ও যেভাবে দলীয় স্বার্থ ও নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের লোকের ক্ষতি করিতে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করেন না, তাহার বাহিরে কিছু বলেন নাই।

দেশের লোক যদি জড়ভরত হয় ও দেশের শাসনতন্ত্র যদি শিথিল হয় ত অন্য আর কি হইবে?

"সমগ্র শহরের পক্ষে উৎপীড়নমূলক অকারণ ধর্ম্মঘট হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য ট্রামকর্ম্মীদিগকে সকল দিক হইতে অনুরোধ জানানো হইয়াছিল, তাহার উত্তরে কর্ম্মীরা জানাইয়াছেন যে, ধর্ম্মঘট তাঁহারা চালাইয়াই যাইবেন। একেবারে মনুমেণ্টের তলায় সভা করিয়াই তাঁহারা এ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন; সংশয়ের কোনও হেতু নাই। সুতরাং অসহায়ভাবে দুর্ভোগ ভুগিতে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া শহরবাসীদের আর কোনও গত্যন্তর নাই।

"এ অবস্থায় আমাদের একটা প্রস্তাব আছে। কলিকাতা শহর হইতে ট্রাম চলাচল একেবারে উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। পালাজ্বরের মত মধ্যে মধ্যেই ট্রাম ধর্ম্মঘটের ক্লেশভোগ করা অপেক্ষা ট্রাম চলাচল একেবারে না থাকা অনেক ভাল। লোকে জানিবে ট্রাম নাই; তাহারা তদনুযায়ী আপনাদের কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া লইবে, আর ট্রাম না থাকিলে অন্যান্য উপযুক্ত যানবাহনও তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। শহরে যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা হয় লোকের সুবিধার জন্য, লোককে বিপাকে ফেলিবার জন্য নহে। ট্রামকর্ম্মীরা যেরূপ নিত্য নিত্য ধর্ম্মঘটে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে শহরে ট্রাম চলাচল-ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে লোকের বিপাকের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ট্রাম চলিবে এই সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া লোকে জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্মে অগ্রসর হয় ও অকস্মাৎ একেবারে অথৈ জলে পড়িয়া যায়।

"পনর লক্ষাধিক লোকের যাতায়াত-ব্যবস্থা এইভাবে খেয়ালমাফিক বিপর্য্যস্ত করিয়া এবং লোককে অসহ্য দুর্গতির মধ্যে ফেলিয়া মনুমেণ্ট-তলার সভায় নিতান্ত নির্লজ্জভাবে এই ধর্ম্মঘটের সমর্থনে জনসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করা হইয়াছে। আরও নির্লজ্জের মত বলা হইয়াছে যে, "দেশের সম্মান"রক্ষার জন্য এই ধর্ম্মঘট করা হইয়াছে। "দেশের সম্মান" বস্তুটা নিতান্তই সস্তা হইয়া পড়িল দেখিতেছি। ট্রাম কর্ম্মচারীরা যে কয় দলে বিভক্ত তাঁহাদের মধ্যে "কর্ম্মী সঙ্ঘে"র প্রতিনিধি উক্ত সভায় বলেন যে, এই সময়ে ধর্ম্মঘট করা উচিত নহে। তাঁহাকে শ্লেষ ও উপহাস করিয়াই বসাইয়া দেওয়া হয়। ইহার উপর একজন অতি বুদ্ধিমান এম-পি নেতা ধর্ম্মঘটীদিগকে ভরসা দিয়াছেন যে, কলিকাতার লোকেরা তাহাদের পশ্চাতে আছে, কারণ ব্রিটিশ কোম্পানীই ত এই ধর্ম্মঘট ঘটাইয়াছে! এম-পি নেতা মহাশয়ের মনস্তত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতার তারিফ করিতেছি, কিন্তু তিনি হয়ত জানেন না, বেলগাছিয়ার যে কর্ম্মচারীকে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম্মঘটের উদ্ভব তিনি বিলাতী নহেন, খাস দেশী।

"ট্রামকর্ম্মীরা যখন আপনাদের খেয়ালমাফিক এই যথেচ্ছ আচরণ করিয়া চলিয়াছেন তখন শহরের পনর লক্ষাধিক লোক এবং

বাহিরের আরও কয়েক লক্ষ লোক তাঁহাদের সেই খেয়ালের বিপত্তি ভোগ করিতেছে। নিত্যকার জীবনের যাতায়াতের প্রয়োজন ত রহিয়াছেই, তাহার উপর একদিকে বন্যা, অপরদিকে বাংলার ও বাঙালীর প্রধান জাতীয় উৎসব—পূজা। উভয় কারণেই যাতায়াতের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। এক বন্যার দরুনই প্রায় গোটা শহরের লোককেই উদ্বাস্ত হইয়া কত ছুটাছুটি করিতে হইতেছে। কোন না কোন প্রকারে প্রায় প্রত্যেকই এই দারুণ দুর্বিপাকের সহিত জড়িত। সংবাদ চাই, সাহায্য চাই, আরও কত প্রয়োজন। এই অবস্থায় ট্রাম ধর্ম্মঘটের দ্বারা স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত করা হইয়াছে। এ যেন জনসাধারণের উপর দণ্ড উদ্যত করিয়া বলা হইতেছে, 'আমাদের দাবি আদায় করিয়া দাও না হইলে এই দুর্ভোগ ভোগ কর।'

"কিন্তু অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া এই দুর্ভোগ ভুগিতে আমরা আর সম্মত নহি। এ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত ইতঃপূর্ব্বেই আমরা একাধিকবার বলিয়াছি। সমাজের সকল কাজ সকলে না লইতে পারে, কিন্তু কতকগুলি কাজ এমন আছে যেগুলি লইলে খুশিমত ধর্ম্মঘটের অধিকার থাকিবে না বা আদৌ ধর্ম্মঘটের অধিকার থাকিবে না। লোকের যাতায়াত-ব্যবস্থা সেইরূপ একটি কাজ। সমাজের পক্ষে নিত্য ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় এই ব্যবস্থার মধ্যে যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কাজ লইবেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতে জানিয়াই লইতে হইবে যে, খুশী হইলেই তাঁহারা ধর্ম্মঘট করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান ধর্ম্মঘটের ক্ষেত্রে ধর্ম্মঘটের সাধারণ নিয়ম পর্যন্ত পালিত হয় নাই। এ ধর্ম্মঘট কেবল লোকবিরুদ্ধ নহে, আইনবিরুদ্ধও বটে।"

বারো মাসে ছাব্বিশ হরতাল

পশ্চিম বাংলার একটি গুণ আছে। যদি কেহ কার্য্য বন্ধ করার প্রস্তাব দেয়, কারণ যাহাই হউক, তবে হাজার হাজার স্বেচ্ছাচারী "সেবক" মহানন্দে পরের কার্য্য পণ্ড নামিয়া পড়ে। কিছুদিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমরা লিখিয়াছিলাম।

বিগত হরতাল সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। "নিজের নাক কাটিয়া যাত্রাভঙ্গ" ব্যাপারে যাঁহারা উদ্যোগী তাঁহাদের বিষয় আর কি লিখিব? দেশ ও দেশবাসীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাঙালীর আক্কেল হইবে না।

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, শ্রী এইচ. সি. কর সহ ২১ জন সলিসিটর ও এডভোকেট শ্রীমিহির ধর গুপ্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ তেওয়ারী সহ ৩৯ জন শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শ্রীসতীশচন্দ্র শা, শ্রীমনোহর গাঙ্গুলী সহ ৯ জন ব্যবসায়ী নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন:

"কতকগুলি প্রতিষ্ঠান নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৫শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছেন। প্রত্যেক দায়িত্ববোধসম্পন্ন নাগরিকই মনে করেন যে মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করা উচিত এবং তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সঙ্গত।

এই ধর্ম্মঘটের উদ্যোক্তারা যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে বিপরীত ফল হইবে। এই ধর্ম্মঘট সফল হইলে কাজকর্ম্ম বন্ধ হইবে এবং উহার ফলে উৎপাদন হ্রাস পাইবে। এই উৎপাদন হ্রাসের ফলে আরও ঘাটতি হইবে এবং মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইবে।

কর্ম্মীদের মজুরির ক্ষতি হইবে ও উহার ফলে তাহাদের কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই ধর্ম্মঘটের ফলে জনসাধারণের অসুবিধা ত হইবেই, তাহা ছাড়া ক্রেতা ও শ্রমিকদের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইবে। ঘন ঘন ধর্ম্মঘটের ফলে জনগণের মনে নিরাপত্তার ভাব নষ্ট হইবে ও অস্থিরতা দেখা দিবে, উহা আর্থিক ক্ষেত্রে কার্য্যসম্প্রসারণের বিরোধী। এই শ্রেণীর ধর্ম্মঘটের ফলে যদি পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে না ও উহার ফলে জনগণের দুর্দ্দশা ঘনীভূত হইবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ ও জনগণের ভবিষ্যতের দিক হইতে এই প্রকার ঘন ঘন বাধ্যতামূলক কর্ম্মবিরতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।"

অন্নাভাবের একটি কারণ

পশ্চিম বাংলা হইতে পাকিস্থানে চোরাই চালান এক বৃহৎ ব্যাপার। খাদ্যশস্য ত যাইতেছেই, উপরন্তু কাপড় ঔষধ চোরাই গহণাপত্র ধাতু ও ধাতব দ্রব্যাদি ত প্রতিদিন যায়। যাঁহারা এই চালান ব্যাপারে 'পালের গোদা' তাঁহাদের অধিকাংশেরই গায়ে মোটা কংগ্রেসী ছাপও আছে। পুলিস ত এই ব্যাপারে বিলক্ষণ দু'পয়সা পায়। সুতরাং "বিশিষ্ট কংগ্রেস এম-এল-এ", অরণ্যে রোদন করিয়া কি করিবেন? নিম্নের সংবাদ একটি নমুনা মাত্র:

"নদীয়া জেলার ভারত-পাক সীমান্তে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া কিছুকাল যাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যে চোরাই চালান চলিতেছে, তাহা এখনও অনেক স্থানে পুরাপুরি অব্যাহত আছে বলিয়া বিশ্বস্ত-সূত্রে জানা গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, এখনও রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া বহু পরিমাণ চাউল প্রত্যহ পাকিস্থানে পাচার হইতেছে।

আরও প্রকাশ, এক শ্রেণীর পুলিসের সহিত যোগসাজশ করিয়া একদল অসাধু ব্যবসায়ী এমন পটুতার সহিত এই জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী বেআইনী চোরাই কারবার চালাইতেছে যে, উহা বন্ধ করিতে বিধানসভার স্থানীয় সদস্যগণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে।

প্রকাশ, নদীয়া সীমান্তের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস এম-এল-এ সম্প্রতি চাউলের ঐরূপ চোরাই চালানের প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই চোরাকারবার এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।"

বন্যাপীড়িত পশ্চিমবঙ্গ

সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দুই-তিন দিনব্যাপী প্রবল বারিপাতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশ বন্যাপ্লাবিত

হইয়াছে। এই বন্যার প্রকোপ অভূতপূর্ব। বন্যার ফলে প্রায় দশ লক্ষেরও অধিক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে নদীয়া, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী প্লাবনে, জীবন ও সম্পত্তির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বিশেষ ভয়াবহ। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। ফলে, জল কমিবার পরও তাহাদের দুর্দ্দশার কোন উপশম হয় নাই। সর্বত্রই অন্নাভাব, জলাভাব এবং বাসস্থানের অভাব বিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরই স্বাভাবিক নিয়মে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন স্বচক্ষে এই ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

এই প্রচণ্ড প্লাবনে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দ্দশার এক চিত্র আঁকিয়া আড়াই কলমব্যাপী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ২১শে আশ্বিন কলিকাতার "যুগান্তর" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, বন্যার প্রত্যক্ষ ক্ষতি ছাড়াও পরোক্ষ ক্ষতির পরিমাণও কোন অংশে কম নহে। "...জল নামিয়া যাওয়ার পরে দুর্দ্দশা ও দুর্গতি অধিকতর ভয়াবহ ও বিপৎসঙ্কুল। ময়লা জল প্রবেশের ফলে পানীয় জলের কূপ ও পুকুরগুলি দূষিত হইয়া গিয়াছে; ক্ষেতে, পথে-মাঠে-ঘাটে মৃত পশুদেহগুলি পচিয়া দুর্গন্ধ ও বিভিন্ন মারাত্মক রোগের বীজাণু ছড়াইতেছে। মশা ও মাছির উপদ্রব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, খাদ্যের অভাবে রোগ-বীজাণুর সঙ্গে যুঝিবার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে. যানবাহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। আর ব্যাপক দুর্দ্দশার ও ক্লেশের সুযোগ লইয়া মওকা লুটিবার জন্য ব্যবসায়ীরা পূর্ব্ব হইতে মজুত মালের দর চড়াইয়া দিয়াছে। এরূপ কার্য্যকলাপ এদেশে নিত্যনৈমিত্তিক হইলেও ইহা দ্বারা জাতীয় চরিত্রের কি শোচনীয় অধঃপতনই না সূচিত হইতেছে। এই বিপর্যয় হইতে সঞ্জাত জটিল উপসর্গগুলি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ছড়াইয়া পড়িবে। মাত্র এক মাস পূর্ব্বে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও বন্যার জন্য মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়াবহ ক্ষতি হইয়াছিল। এখন পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ অংশে অন্যান্য জেলাগুলিও বিপন্ন হওয়ায় স্বাভাবিক ফলনের তুলনায় আগামী অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে অনেক কম আমন ফসল উঠিবে। গত বৎসরও এই রাজ্যে কম ফসল হইয়াছিল। সেজন্য গৃহস্থের ঘরে আদৌ কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আগামী বৎসর খাদ্যের ঘাটতি অবশ্যম্ভাবী, সে সুযোগে দর চড়াইবার জন্যও চেষ্টার কসুর হইবে না। এ সম্পর্কে এখন-হইতেই সরকারী তরফের সতর্কতা আবশ্যক। নতুবা আগামী বৎসর খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থায় বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।"

খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এবং দুর্নীতি দমন সরকারের সম্মুখে এই দুইটি প্রধান আশু কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তবে কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় যে এই বিরাট সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে, "যুগান্তর" তাহাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। জাতির এই গভীর দুর্দিনে সকলকেই অগ্রসর হইতে হইবে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য।

দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীকুলনপ্রসাদ বর্ম্মা একটি বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্গত বাঁধগুলি না থাকিলে পশ্চিমবঙ্গে বন্যার ক্ষতির পরিমাণ আরও অধিকতর ভয়াবহ হইত। অপরপক্ষে জনসাধারণের এক অংশ এই অভূতপূর্ব্ব বন্যা দেখিয়া নদী-পরিকল্পনাগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। "যুগান্তর" লিখিয়াছেন, "আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, ইহার মধ্যে কোন পক্ষই সাম্প্রতিক বন্যার কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন নাই। প্রথমে শ্রীবর্ম্মার অভিমতই আলোচনা করা যাউক। ডি. ভি. সি'র বাঁধগুলি নির্ম্মিত হইতেছে পশ্চিম বাংলা সীমান্ত পার হইয়া বিহারের এলাকায়। ময়ূরাক্ষীর কানাডা বাঁধও তথৈবচ—বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলার সীমান্তে। বিহার-রাজ্যের রাঁচি, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা কিংবা পালামৌ জেলার পাহাড় অঞ্চলে বৃষ্টি হইলে মাত্র সে জলটাই ঐ সকল বাঁধের মধ্যে আটক করা সম্ভব। কিন্তু আবহাওয়ার রিপোর্টে দেখা যায়, সাম্প্রতিক বন্যার পূর্ব্বে ঐ সকল অঞ্চলে বৃষ্টির আদৌ প্রাচুর্য্য ছিল না। অতিবৃষ্টি হইয়াছিল পশ্চিম বাংলার জেলাগুলিতে, বাঁকুড়া-বীরভূম হইতে আরম্ভ করিয়া মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও কলিকাতার দক্ষিণাংশ পর্যন্ত। সে জল বিহারের এলাকায় বিভিন্ন বাঁধে আটক করার কোন সম্ভাবনা ছিল না, আর সেরূপ দাবিও হাস্যকর। মাত্র আসানসোল মহকুমায় ও দুর্গাপুরের পশ্চিমদিকে ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রায় সাড়ে সাত ইঞ্চি পরিমাণ অতিবৃষ্টির কতকটা জল দুর্গাপুরে নীচু বাঁধের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল—কিন্তু ডি. ভি. সি'র পক্ষে তাহাও সম্পূর্ণ আটক করা সম্ভব হয় নাই। ডি. ভি. সি'র উঁচু বাঁধগুলিতে অতিবর্ষণের জল মজুত না হইলেও যে সকল প্রচারবিশারদ এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে ডি. ভি. সি পরিকল্পনার সার্থকতা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের উৎকট কল্পনাশক্তিকে তারিফ না করিয়া উপায় নাই! আর এই ব্যাপারে সবার উপরে টেক্কা দিয়াছেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান! তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, বন্যার জল আটক করার জন্যই বহু কোটি টাকা ব্যয়ে ঐ বাঁধগুলি তৈয়ারি করা হইয়াছে কিনা? আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেই কি তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রমাণিত হইত? তাহা হইলে এই উপলক্ষে একটা ভুয়া কৃতিত্বের দাবি তুলিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশের কারণ কি? অন্যদিকে, যাঁহারা এই বিপর্য্যয়ের মূলে ডি, ভি, সি'র বাঁধগুলির ব্যর্থতা অনুমান করিতেছেন—তাঁহারাও সুবিচার করেন নাই। কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পশ্চিম বাংলায় অতিবর্ষণের জলটা ঐ সকল বাঁধের মধ্যে আটক করা দুঃসাধ্য। অতএব বাঁধ দিয়া এই বন্যা রোধ করা সম্ভব ছিল না। বন্যা রোধ করাও বাঁধের উদ্দেশ্য নয়। বাঁধ দিয়া মাত্র বন্যার প্রচণ্ডতা হ্রাস করা যায়, কিন্তু উহা বন্ধ করা যায় না।"

সেই জন্য নদীগুলির সংস্কারসাধন করিয়া জলনিকাশীর সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। উপসংহারে "যুগান্তর" লিখিতেছেন:

"বাঁধ তৈয়ারীর ও কৃষিক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থা-উন্নয়নের জন্য শত শত কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে—কিন্তু অতিরিক্ত জল হইলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথে সেটা নামাইয়া দেওয়ার উপযোগী ব্যবস্থাদির জন্য সে তুলনায় এক শতাংশ অর্থও ব্যয় হয় নাই, এমনকি এসম্পর্কে কোন পরিকল্পনাও নাই। ফলে, শুধু পশ্চিম বাংলা কেন—বিহার, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, বোম্বাই, অন্ধ্র, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক অঞ্চলেই নদীগুলির গর্ভ ক্রমশঃ উঁচু হইয়া উঠিতেছে। আর প্রতি বৎসরেই কোন না কোন স্থানে ভয়াবহ বন্যা হইতেছে। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে উড়িষ্যার প্রচণ্ড বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি পরিদর্শনকালে পণ্ডিত নেহরু এই বিষয়টির গুরুত্ব উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু তার পর কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি নিজেও কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম বাংলায় সাম্প্রতিক বিপর্য্যয়ের দ্বারা জলনিকাশের জরুরী প্রয়োজনই প্রকৃতি আর এক বার স্মরণ করাইয়া দিল। এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করিলে ভবিষ্যতে আরও গুরুতর বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। কর্তৃপক্ষ এখনও সতর্ক হউন।"

উত্তরবঙ্গে শিক্ষার উন্নতিসাধন

উত্তরবঙ্গে শিক্ষার উন্নতিসাধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি স্থাপনের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া ১৫ই আশ্বিন "জনমত" পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে: "উত্তরবঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা মাত্র শতকরা ২।০ বা ৩ জন। সুতরাং পশ্চিম বাংলার এই অনুন্নত অংশের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার যে ব্যাপক প্রচলন প্রয়োজন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উচ্চ শিক্ষা লইতে হইলে উত্তরবঙ্গবাসীকে কলিকাতায় ছুটিতে হয়। ব্যয়সাপেক্ষ এই শিক্ষার জন্য তাই উত্তরবঙ্গের সাধারণের আগ্রহ কম। কাজেই উচ্চশিক্ষার সকল সুযোগ যদি উত্তরবঙ্গে করিয়া দেওয়া যায় তবে জনসাধারণের আগ্রহ তাহাতে বাড়িবে এবং দ্রুত হারে উচ্চশিক্ষা সাধারণ লোক গ্রহণ করিবে।"

উত্তরবঙ্গের কোন স্থানে প্রস্তাবিত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হইলে উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা হইতে পারে সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "জনমত" লিখিতেছেন যে, সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া জলপাইগুড়িতেই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমীচীন। উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অপর উপযুক্ত স্থান দার্জ্জিলিং—কিন্তু ব্যয়বহুল, দুর্গম এবং সকলের স্বাস্থ্যানুগ না হওয়ায় ঐ স্থানটি নির্ব্বাচন যুক্তিযুক্ত হইবে না। জলপাইগুড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমর্থনে যুক্তি দিয়া "জনমত" লিখিতেছেন: "উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় জলপাইগুড়ির সহিত বিভিন্ন স্থানের সংযোগ সহজ ও সুবিধাজনক। শহরটি উত্তরবঙ্গের মোটামুটি কেন্দ্রে অবস্থিত। এখানে স্থানলাভ সহজ হইবে, বর্ত্তমানে এখানে বাড়ী-লাভও সম্ভব হইবে। আর শিক্ষার যে পরিবেশ এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তাহা বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। শিক্ষায় অনগ্রসর স্থানেই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি আর্থিক সাহায্য ও সহায়তা জলপাইগুড়ি হইতে বিপুলভাবে পাওয়া সম্ভব। চা-শিল্প সরকারকে যে কর দিয়া থাকে তাহার একাংশ হইতেই সমগ্র উত্তরবঙ্গের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা যায়। জলপাইগুড়ির চা-করগণ এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন।

বাংলার ছাত্র-ছাত্রী

পশ্চিম-বাংলার আশা-ভরসার আধার আমাদের সন্তান-সন্ততি। তাহাদের মধ্যে কিছুকাল যাবৎ যে মানসিক বিকার দেখা দিয়াছে তাহার একটি তদন্ত বিশেষ প্রয়োজন। আংশিকভাবে সে কাজ শিক্ষা বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মী যাহা করিয়াছেন তাহার বিবরণ নীচে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত হইল।

তদন্তে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা গভীর নৈরাশ্যজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কারণ নির্ণয় সম্যক্‌ভাবে হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। শুধু মাত্র অনুযোগ অভিযোগ বা উপদেশে কোনও ফল হইবে না, কেননা রোগ বহু দূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রয়োজন অতি দৃঢ়ভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিরূপণ ও পরিচালন। নহিলে জাতির ধ্বংস আর রোধ করা যাইবে না।

বিশেষজ্ঞদের এই কাজে লাগাইয়া, বিজ্ঞ লোকের ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদিগের সাক্ষ্য, এবং প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে তাঁহাদের মন্তব্য ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন:

আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাধারণভাবে শিক্ষার প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্য, নিয়ম না মানা উচ্ছৃঙ্খলতা এবং শিক্ষকদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার অভাব, জীবনের গুরু এবং গভীর দিক অপেক্ষা চটুল ও হালকা বিষয়ের প্রতি ছাত্রসমাজের ঝুঁকিয়া পড়ার প্রবণতা প্রভৃতির ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ ও রাষ্ট্রনেতা—এক কথায় সমাজের সকল স্তরের জন-সাধারণের মনে নিরতিশয় উদ্বেগ ও গভীর হতাশার সঞ্চার হইয়াছে।

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব গবেষণা সংস্থা সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ হইতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'আচরণ-সমস্যা' সম্পর্কে যে নমুনা তদন্ত পরিচালনা করেন, উহার ফলাফলে ঐ সমস্যার মৌলিক দিকটা উদ্‌ঘাটিত হইয়া উঠিয়াছে।

ঐ তদন্তকালে দেখা যায় যে, তদন্তের আওতাভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শতকরা ১৪টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীই "শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর" এবং তাহাদের মধ্যে পড়াশুনায় অমনোযোগ ও ঔদাসীন্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ইহা ছাড়া

গড়ে শতকরা ৮০টি ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেই আলস্য এবং দায়িত্বজ্ঞানের অভাবের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলে ২৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঐ তদন্ত পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে ৩০টি বালিকা বিদ্যালয়। ৫০০ জন শিক্ষক এবং ১৪০ জন শিক্ষয়িত্রী তদন্তকার্য্যে অংশ গ্রহণ করেন।

তদন্তের পর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই উহার ফলাফল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহাতে লক্ষ্য করা যায় যে, উল্লিখিত সমস্যাগুলি ছাড়াও গালমন্দ করা, অশ্লীল কথা বলা অথবা লেখা, স্কুল পালানো, কুসঙ্গ, যৌন অপরাধ-প্রবণতা, অপরের উপর দোষারোপের প্রবৃত্তি, বিনা কারণে ক্লাসের সহপাঠীদের বিরক্ত করা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মেয়েদের অপেক্ষা ছেলেদের মধ্যেই অধিকতর সক্রিয়। ছাত্রীদের মধ্যে ধূমপান এবং জুয়াখেলার প্রবৃত্তি দেখা যায় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরাই সাধারণ নৈতিক এবং চারিত্রিক মান বজায় রাখিতে অধিকতর আগ্রহশীল।

কিন্তু ছাত্রীদের মধ্যে যে সকল প্রবণতার আধিক্য লক্ষিত হয় তন্মধ্যে ঔদ্ধত্য, অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইবার আকাঙ্ক্ষা, অহঙ্কার, বিবাদপ্রবণতা, অপরের কুৎসা রটনা, অবাধ্যতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে এইরূপ মনে হয় যে, কোন কোন শ্রেণীর ছাত্রীদের আচরণও সমস্যামূলক হইতে চলিয়াছে। অভদ্র অথবা কর্কশ আচরণ, দায়িত্বজ্ঞানের অভাব, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, কোপন স্বভাব, আলস্য, হীনম্মন্যতা, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি ত্রুটিবিচ্যুতি ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

উল্লিখিত প্রবণতাগুলি ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষার সময় নকল করা, শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, সিনেমায় আসক্তি প্রভৃতি প্রবণতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ছাত্রদের মধ্যে যেমন শৃঙ্খলার অভাব, স্কুলের কাগজপত্র নষ্ট করা এবং গুজবের প্রতি প্রীতি অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়, ছাত্রীদের মধ্যেও তেমনি বাচালতা এবং গল্পগুজব করার আসক্তি ব্যাপকভাবে দেখা গিয়াছে।

উল্লিখিত তদন্তে দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণের অধিকাংশই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় অমনোযোগ ও ঔদাসীন্য, শিক্ষাগত অনগ্রসরতা, আলস্য এবং দায়িত্বজ্ঞানের অভাবের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঐ চারিটি সমস্যাই সাধারণ এবং উহাদের ব্যাপকতাই সর্বাধিক। কুসঙ্গ, যৌন অপরাধপ্রবণতা, যৌন বিষয়ে জ্ঞানলাভের অত্যধিক আগ্রহ, প্রতারণা, চৌর্য্য, স্কুল পালানো প্রভৃতি বৃত্তিগুলি যদিও গুরুতর তবুও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মতে ঐ সকল প্রবণতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায়শঃ লক্ষিত হয় না। যে সকল সমস্যা ছাত্রছাত্রীর ভাবাবেগ এবং সামাজিক সমস্যার সহিত সম্পর্কযুক্ত—যেমন বিনা কারণে সহপাঠীদের বিরক্ত করা, কোপন স্বভাব, অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা, দিবাস্বপ্ন, লজ্জাপ্রবণতা, ঔদ্ধত্য, অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইবার উদগ্র আগ্রহ প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে খুব কমসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীই গুরুত্ব দিয়াছেন। পক্ষান্তরে শতকরা ৬৬ জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীই শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, পড়াশুনায় অমনোযোগ, আলস্য, দায়িত্বশীলতার অভাব, কুসঙ্গ এবং যৌন অপরাধপ্রবণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, স্কুল পালানো, প্রতারণা, যৌন বিষয়ে জ্ঞানলাভের অত্যধিক আগ্রহ প্রভৃতি সমস্যার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীগণ অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধপ্রবণতার উপর শিক্ষয়িত্রীদের তুলনায় শিক্ষকগণ বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন।

উপরের বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, শিক্ষকগণ, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও পড়াশুনার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। যে সকল সমস্যার সহিত সামাজিক ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব জড়িত, সেই সকল সমস্যা স্বীকার করিয়া লইলেও অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীই উহাদের উপর তেমন গুরুত্ব দেন নাই।

শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব গবেষণা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রী কে, পি, চৌধুরীর নির্দ্দেশে উহার জনৈকা গবেষণা-কর্মী শ্রীমতী নীলিমা দাস ঐ তদন্ত পরিচালনা করেন।

"ধর্ম্মগুরু" পুস্তক ও পাকিস্থান সরকার

ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং মার্কিন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত বিশ্বের ধর্ম্মগুরুদের জীবনীসম্বলিত একটি পুস্তকে হজরত মহম্মদ সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে ভারত ও পাকিস্থানের একশ্রেণীর মুসলমান নিতান্ত অশোভন আচরণ করে। পাকিস্থানের আন্দোলনের বিশৃঙ্খলতা সরকার (অন্ততঃ পূর্ব্বপাকিস্থানে) দৃঢ় হস্তেই দমন করেন। ইহাতে তাঁহারা সকলেরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাহার পরই পূর্ব্ব পাকিস্থান বিধানসভায় ভারতে "ধর্ম্মগুরু" পুস্তকটি প্রকাশের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকার ভারত সরকারের নিকট এই সম্পর্কে একটি প্রতিবাদ-লিপিও প্রেরণ করিয়াছেন। পাকিস্থান সরকারের এই আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংবাদটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ।

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "জনশক্তি" পত্রিকার ৩রা আশ্বিন সংখ্যায় "আগুন লইয়া খেলা" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ধর্ম্মগুরু" পুস্তক লইয়া সাম্প্রদায়িক উস্কানিদানের নিন্দা করিবার পর বলা হইয়াছে :

"পূর্ব্বপাকিস্থান গবর্ণমেন্ট কিছুকাল যাবৎ আমেরিকার প্রকাশন কোম্পানীর সাহায্যে তথা হইতে এই প্রদেশের জন্য স্কুল পাঠ্যপুস্তক ছাপাইয়া আনিতেছিলেন। প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট কয়েকখানা পুস্তকে হজরত মহম্মদের ছবি থাকার ফলে

উহা মুসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাসবিরোধী বলিয়া ঐ পাঠ্যপুস্তকগুলির প্রচলন বন্ধ করিতে হইয়াছে। ডেভিসের লিখিত পুস্তকে হজরত মহম্মদের সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি ছিল। ঐ পুস্তক যথারীতি পূর্ব্বপাকিস্থানের শিক্ষা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারেই স্কুলপাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ছাত্রদের পড়াইতে গিয়া শিক্ষক মহাশয়গণের দৃষ্টিতে ঐ সকল অবমাননাকর উক্তি ধরা পড়িল। তাঁহারা শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া ঐ পুস্তকখানা পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত করাইলেন। পাকিস্থান মুসলিম রাষ্ট্র—শিক্ষা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই মুসলমান—তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া কি করিয়া এই পুস্তক এই দেশেই চলিয়া গেল—তাহার কোন কৈফিয়ত এই সকল সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট কেহ চাহিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই।"

এই সম্পর্কে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকুই বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতার জনৈক প্রকাশকের পুস্তকে হজরত মহম্মদের একটি প্রতিকৃতি থাকার দরুন প্রকাশককে ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্থানে"র সুসন্তান ইসলামিক কর্ণধারগণ যখন হজরত মহম্মদের প্রতিকৃতিসম্বলিত পুস্তক "ইসলামিক" ঐতিহ্যপূর্ণ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন তখন ইসলামের ধ্বজাধারী কেহ তাহাতে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করাও প্রয়োজন মনে করে না। হয় ত পুস্তকের লেখক এবং প্রকাশক শ্বেতকায় মার্কিনী বলিয়াই কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই। যাহাই হউক তাহারা ত ভারতীয় নহে, অথবা হিন্দুও নহে—কাজেই তাহাদের আচরণে এবং বক্তব্যে হজরত মহম্মদের অবমাননা হইলেও তাহাতে ইসলাম ধর্ম্ম কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

খাদ্যাভাবে মৃত্যু

"বারাসাত বার্ত্তা" ৮ই আশ্বিন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন: "ইংরেজ আমলে বিগত দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যাভাবে মানুষ পথের উপর মরিয়াছে, তাহাদের মৃতদেহ আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই দেখেন নাই—তাঁহারা তখন কারান্তরালে বন্দী ছিলেন। খাদ্যাভাবে মানুষ কেমন করিয়া পথের উপর মরে এবং তাহাদের মৃতদেহ দেখিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্যই বোধ করি গত শুক্রবার (২১.৯.৫৬) বারাসাত রেল ষ্টেশনের পার্শ্বে উন্মুক্ত পথের উপর অজ্ঞাতনামা জনৈক ২৮।৩০ বৎসরের তরুণ মরিয়া পড়িয়া ছিল। মনুষ্যদেহের যে স্থানে খাদ্য থাকে তাহার পেট বলিয়া চিনিবার মত কোন বস্তু ছিল না। হাত পাগুলি শুকাইয়া গিয়াছে, সমস্ত হাড়গুলি চর্ম্মসার দেহের বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। মানুষ মরণশীল, কিন্তু মানুষের মরণেরও একটি শালীনতা আছে; আত্মীয়-পরিজনের অশ্রুপাত বিলাপের সম্মুখে মানুষের মৃত্যু শুধু স্বাভাবিক নহে, মানুষ মাত্রেরই কাম্য। উহার বাহিরে যাহা ঘটে তাহা নেহাত দুর্ঘটনা। কিন্তু প্রকাশ্য পথের উপর চলনশক্তিরহিত ক্ষীণ মানুষ, কুকুর-বিড়ালের মত মরে—আজিকার এই নজির আমাদের সভ্যসমাজ ও জাতীয় জীবনে কলঙ্কপাত করিল।"

পত্রিকাটি বারাসাত মহকুমার খাদ্যাভাবের পূর্ব্বপ্রকাশিত সংবাদ প্রকাশের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বুভুক্ষু লোকেরা খাদ্যের দাবিতে ১৯শে সেপ্টেম্বর মহকুমা-শাসকের নিকট উপস্থিত হয়। তিনি তাহাদের দাবিগুলি বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী চাউলের দাম কমিয়াছে বলিয়া যে বিবৃতি দেন সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "বারাসাত বার্ত্তা" লিখিতেছেন: "তাঁহার আত্মপ্রসাদে আমরা বিঘ্ন ঘটাইতে চাহি না। তবে সবিনয়ে বলিতে ইচ্ছা করি—যেখানে কাজের অভাবে মানুষ বেকার বসিয়া আছে সেখানে নামতি দরের চাউলের মূল্যের সংখ্যাতত্ত্ব পরিবেশন বুভুক্ষু জনতার অদৃষ্টের পরিহাস মাত্র। সেই চাউল কে কিনিবে? যদি অনাহারে মৃত হতভাগ্য তরুণ উহা কিনিতে পারিত তবে তাহাকে ঘর, আত্মীয়-পরিজন ফেলিয়া পথের কুকুরের মত মরিতে হইত না এবং এইরূপ নরকদৃশ্যও বারাসাতবাসীকে দেখিতে হইত না। বারাসাতের ক্ষুধার্ত্ত মানুষ সরকারের খয়রাতি সাহায্য চাহিয়াছে—উহার কতখানি দেওয়া হইয়াছে? হাবড়ার নারী-শিশুর আর্ত্ত ক্রন্দন কি থামিয়াছে? দেগঙ্গার বিপন্ন কৃষক-সমাজের আর্ত্তনাদ কি থামিয়াছে? ক্ষুধার্ত্ত মানুষের মুখে দুই মুষ্টি অন্ন তুলিয়া দিতে কি বারাসাতে স্বল্পমূল্যের খাদ্যসামগ্রীর দোকান খোলা হইয়াছে?"

বারাসাত মহকুমার খাদ্যসঙ্কটে জননেতাদের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করিবার পর উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যের উপসংহারে বলা হইয়াছে: "আমরা অনাহারে মৃত হতভাগ্য তরুণের মৃত্যুতে লজ্জায়, ঘৃণায় ও পরিতাপে দগ্ধ হইতেছি, দেশের মানুষ যদি এইভাবে পশুর মত পথে-ঘাটে মরে তবে ভারতবর্ষের আজিকার গৌরব দাঁড়াইবে কোথায় এবং ভবিষ্যৎ জাতির নিকট উহার কি জবাব থাকিবে। আমরা পুনরায় জাতীয় সরকারের নিকট মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বারাসাতের ভুখা সমাজের প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করিতেছি।"

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমন ও ভারত সরকার

সম্প্রতি লোকসভায় এক বিবৃতিতে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ত্রিপুরায় যে উদ্বাস্তু আসিয়াছে তাহার পর ত্রিপুরায় আর নূতন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উল্লিখিত বিবৃতির সমালোচনা করিয়া "সেবক" পত্রিকা ৭ই আশ্বিন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার দরুন তাহাদিগকে ভারতের অপরাপর রাজ্যে, এমনকি সুদূর আন্দামান দ্বীপে পর্য্যন্ত প্রেরণ করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোন সুরাহাই কেন্দ্রীয় সরকার করিতে পারেন নাই। এমতাবস্থায় ত্রিপুরায় উদ্বাস্তুদের আগমন নিষিদ্ধ করা নিতান্তই বিস্ময়কর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

"সেবক" লিখিতেছেন যে, ত্রিপুরা সরকার হইতে প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁহার বিবৃতি দিয়াছেন:

"দেশ বিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমনে ত্রিপুরার উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইলে এক বিরাটসংখ্যক উদ্বাস্তুর ভরণপোষণের ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু কি ত্রিপুরা সরকার, কি কেন্দ্রীয় সরকার সেই দিকে নজর না দিয়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্বন্ধীয় ব্যাপারটিকে এমন ভাবে ঘোলা করিয়াছেন যে, আজ তাহাদিগকে বলিতে হইতেছে ত্রিপুরায় আর নূতন উদ্বাস্তুর স্থান নাই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে নিজেদের অক্ষমতার স্বীকারোক্তি বলিয়া আমরা মনে করি।"

কিন্তু উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ব্যাপারে কেবলমাত্র ভূমির মাধ্যমে সমস্যার প্রতিকারের চিন্তা না করিয়া সরকার যদি ত্রিপুরার অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সুপরিকল্পিত পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিতেন তবে, "সেবকে"র অভিমতে, "ত্রিপুরায় যে পরিমাণ উদ্বাস্তু আসিয়াছে তাহার সমপরিমাণ উদ্বাস্তু গ্রহণ করা ত্রিপুরার পক্ষে অবাস্তব বলিয়া মনে করা যায় না।"

রিক্সাচালক

মানুষ কর্ত্তৃক রিক্সাটানা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য সম্প্রতি যে প্রচেষ্টা চলিতেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে রিক্সাচালকদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ১লা আশ্বিন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন,"বড়লোকেরা গরীব মানুষের দারিদ্র্যের সুবিধা লইয়া তাহাদেরকে দিয়া গরু-মহিষের মত ভার বহনের কাজ করাইয়া লইবে, ইহা খুবই অন্যায়—ইহা প্রত্যেকের মনুষ্যত্ববোধে আঘাত করে। সবই স্বীকার করি কিন্তু একটা কথাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, পেটের দায়ে ও বিকল্প কাজ পায় না বলিয়া লোকে রিক্সা টানিতে বাধ্য হয়। আজ সারা ভারতে কয়েক লক্ষ লোক রিক্সা টানিয়া রুজি-রোজগার করে। মনুষ্যত্বের নামে রিক্সা-টানা বন্ধ করিলে ইহারা দাঁড়াইবে কোথায়?..." একমাত্র বহরমপুর শহরেই প্রায় এক হাজার রিক্সাচালক রহিয়াছে—রিক্সাটানা বন্ধ হইলে ইহাদের রুজি-রোজগারের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে হঠাৎ রিক্সাটানা বন্ধ করিয়া দেওয়া তাই ঠিক হইবে না বলিয়া পত্রিকাটি অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যেন রিক্সাচালকদের আর্থিক ক্ষতি না হয় অথচ সেই সঙ্গে তাহাদের স্বাস্থ্য ও অপরাপর স্বার্থও রক্ষিত হয়।"

বর্দ্ধমানের রাস্তাঘাট

"বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকায় ৮ই আশ্বিন সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, বর্দ্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা-সমেত বহুসংখ্যক রাস্তা চলাচলের প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অযোগ্য। "রাস্তাগুলির ব্যাপক সংস্কার ত দূরের কথা, সাধারণভাবে রাস্তা-গুলির উপর কাজচলা গোছের মেরামতেরও কোন ব্যবস্থা নাই।"

দুর্দ্দশাগ্রস্ত রাস্তার দৃষ্টান্ত দিয়া বলা হইয়াছে যে, বর্দ্ধমান-কলিগ্রাম এবং কাটোয়া-দাঁইহাট রাস্তা দুইটি পাকা হইলে, সংস্কারের অভাবে এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে যে বহুদিন যাবৎ বাস চলাচল বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।

উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, যে সকল অঞ্চলে দ্রুত উন্নয়নের জন্য কম্যুনিটি প্রোজেক্ট এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক গঠিত হইয়াছে সেখানেও রাস্তাঘাটের কোন উন্নতি হয় নাই। রাস্তাগুলি ভাঙ্গিয়া না পড়া পর্য্যন্ত সেগুলি মেরামতের কথা কাহারও মনেও আসে না। সময়মত যথারীতি রাস্তাগুলির সংস্কারসাধন না করিয়া ঐগুলি প্রায় অগম্য হইয়া উঠিলেও সংস্কার করিলে অধিকতর সরকারী অর্থ ব্যয় হয় এবং সরকারী অর্থ যত অধিক পরিমাণে ব্যয়িত হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অর্থাগমের সুযোগও তত বৃদ্ধি পায় বলা হইয়াছে। প্রকাশ যে, সংশ্লিষ্ট "সরকারী বিভিন্ন বিভাগ এবং জেলাবোর্ডের ইঞ্জিনীয়র, ওভারসিয়র, সাব-ওভারসিয়র প্রভৃতি শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ হয় রাস্তাগুলি তদারক করেন না—আর না হয় সময়ে কাজে হাত দেওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হাত দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়া থাকেন। রাস্তা, সাঁকো, নর্দ্দমা প্রভৃতি সংস্কারের জন্য সাধারণের পক্ষ হইতে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে, 'পেব্লিক'দের কথায় কর্ণপাত করা কর্ত্তাব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অবশ্য সাধারণের পক্ষ হইতে অনেক সময় যথোচিত সহযোগিতা করা হয় না, তাহাও আমরা স্বীকার করি।"

বর্দ্ধমান হাসপাতালে মেট্রনের দৌরাত্ম্য

বর্দ্ধমান শহরের বিজয়চাঁদ হাসপাতাল সম্পর্কে জেলার প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্রেই নানারূপ অভিযোগ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল অভিযোগ প্রতিকারের কোন প্রকৃত চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। হাসপাতালের বিরুদ্ধে সর্ব্বশেষ অভিযোগ মেট্রন শ্রীমতী সুষমা নিয়োগীর (ভূতপূর্ব্ব মিস টমাস) বিরুদ্ধে। ১৪ই সেপ্টেম্বর "দামোদর" পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে:

"বর্দ্ধমান ১৩ই সেপ্টেম্বর, বিজয়চাঁদ হাসপাতালের নার্সদের অবহেলার ফলে প্রায় আরোগ্যপ্রাপ্ত একটি যুবক গত ১০ই সেপ্টেম্বর বৈকাল ৪টায় মারা গিয়াছে। রোগীটির গ্যাসটিক আলসার হয়, অপারেশন হইবার পর সপ্তাহকাল সুস্থ অবস্থায় থাকে। চিকিৎসকের নির্দ্দেশমত পথ্য না দিয়া একসঙ্গে সমস্ত দিনের খাবার খাওয়াইয়া দিবার ফলে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া যায়।"

সংবাদে আরও প্রকাশ যে, পূর্ব্বে এই ধরনের কঠিন রোগীর পথ্য পৃথকভাবে রান্নার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান মেট্রনের আদেশে নাকি পূর্ব্ব-অনুসৃত ব্যবস্থা বাতিল করা হইয়াছে। রোগীটিকে হাসপাতালের সাধারণ রান্না মাছ, ডিমসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ ও দুধ একসঙ্গে বেশী পরিমাণ খাওয়ানো হইলে রোগীর পেটে যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং অচিরেই প্রাণত্যাগ করে।

অপর একটি ঘটনার সংবাদে প্রকাশ যে, কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক পার্লামেণ্টের সদস্যের স্ত্রীসহ তিন জন মহিলা হাসপাতালে ভর্ত্তি হইলে শিক্ষানবিশী নার্সদের দ্বারা তাঁহাদের ইন্‌জেকশন দেওয়ানো হয়। তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের ইন্‌জেকশনের স্থান পাকিয়া উঠে। এম-পি মহাশয়ের চেষ্টায় অস্থায়ী সিভিল সার্জ্জন এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করিতে আসেন এবং ষ্টাফ নার্স দিয়া ইন্‌জেকশন দিবার নির্দ্দেশ দিয়া যান। "দামোদর" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, "সিভিল সার্জ্জনের এই আদেশে মেট্রন অসন্তুষ্ট হন এবং অজ্ঞাত কারণে শনিবার রাত্রি হইতে রবিবার সমস্ত দিন সারা হাসপাতালের রোগীদের ইন্‌জেকশন দেওয়া বন্ধ হয়। সিষ্টার বিশ্বাস রবিবার সকালে হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে আসিয়া এ বিষয়ে সিভিল সার্জ্জনকে রিপোর্ট করেন নাই। রবিবার বৈকালে সিষ্টার দে কেবিনের রোগিণীদের পরিদর্শন করিতে আসিয়া নির্ব্বাক হইয়া চলিয়া যান। নার্সগণ রোগীদের সহিত নির্দ্দয় ও অসহযোগমূলক আচরণ করেন। রবিবার রাত্রে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়। রবিবার সন্ধ্যায় ডিউটি থাকা সত্ত্বেও সিষ্টার দে'কে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।"

২৯শে ভাদ্র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই ঘটনা দুইটির উল্লেখ করিয়া "দামোদর" লিখিতেছেন, "হাসপাতালে আগত আর্ত্তদের প্রতি সেবাব্রতচারিণী ভারতীয় মহিলাদের এই হৃদয়হীন অবহেলার বিবরণ দেখিয়া লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হইতেছে। হাসপাতালের চিকিৎসকের নির্দ্দেশ সেবিকা মানিবে না। এমনকি সিভিল সার্জ্জনের আদেশও মেট্রনের ইঙ্গিতে পালিত হইবে না, উপরন্তু হাসপাতালের সমস্ত রোগীদের ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার কি কৈফিয়ত দিবেন তাহাই চিন্তা করিতেছি।"

মেট্রন শ্রীসুষমা নিয়োগীর আচরণের সমালোচনা করিয়া "দামোদর" লিখিতেছেন :—

"শুনিয়াছি, তিনি অসাধ্যসাধন করিতে পারেন বলিয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। সিভিল সার্জ্জন হইতে বড় বড় চিকিৎসক পর্য্যন্ত নাকি তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র। সুদীর্ঘ আট বৎসর তিনি এই হাসপাতালে চিরস্থায়ী স্বত্ব বহাল করিয়া বাঙালী ভদ্রঘরের কন্যা নার্সদের প্রতি চরম দুর্ব্ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার যথেচ্ছাচারের নিকট বশ্যতা স্বীকার না করিলে তাঁহার শালীনতা রক্ষা করাও দুঃসাধ্য বলিয়া আমাদের জানা আছে। আমরা ইহার পূর্ব্বে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিয়াছি এবং সসম্মানে তাঁহাকে বর্দ্ধমান হইতে অন্যত্র গ্রহণ করিতে সরকারকে পরামর্শও দিয়াছি। কিন্তু তিনি এমনই অঘটনঘটনপটীয়সী যে, সকল বাণই তাঁহার নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়। বর্দ্ধমান তাঁহার লীলাক্ষেত্র। এখানেই তিনি মালয়ালী হইতে বাঙালী বধূ হইয়াছেন, কিন্তু 'বুক ভরা মধু—বঙ্গের বধূ' হইতে পারিলেন না। আমাদের পক্ষে ইহা নিতান্তই আক্ষেপের কথা।"

"বর্দ্ধমান বাণী" পত্রিকাতেও ২৯শে ভাদ্র ও ৫ই আশ্বিন সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিজয়চাঁদ হাসপাতালের মেট্রনের অপসারণের দাবি জানানো হইয়াছে।

করিমগঞ্জে ভেজাল দুগ্ধের দৌরাত্ম্য

"ভেজাল দুগ্ধের দৌরাত্ম্য" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "যুগশক্তি" (৫ই আশ্বিন) লিখিতেছেন :

"বর্ত্তমানে করিমগঞ্জ শহরে খাঁটি দুগ্ধ সংগ্রহ করা এক কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নেহাত প্রয়োজনের খাতিরে (মুখ্যতঃ শিশুদের জন্য) শহরবাসী অনেকেই দুগ্ধ বলিয়া যে পদার্থ অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই Condemned Milk Powder এবং নদী-নালার জলের মিশ্রণ মাত্র। শহরবাসী নাগরিকদের অধিকাংশই শিক্ষিত এবং সমাজচেতনাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই শোচনীয় অবস্থার গুরুত্ব তাঁহারা উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। সরকার এবং পৌর কর্ত্তৃপক্ষও এই ব্যাপারে সমভাবে উদাসীনতা প্রকাশ করিতেছেন।"

উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন যে, শহরে যে পরিমাণ দুগ্ধ সরবরাহ করা হয় তাহার অধিকাংশই ভেজালপূর্ণ। চতুর বিক্রেতারা নানা অজুহাতে দুগ্ধ পরীক্ষা ব্যবস্থা এড়াইয়া যায়। যে কয়েকটি ক্ষেত্রে দুগ্ধ পরীক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটিতেই ভেজাল ধরা পড়িয়াছে। "কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভেজাল দুগ্ধ বিক্রেতাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইলে বিচারকরা তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াও যে কারণেই হউক তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া অল্প জরিমানা করিয়াই রেহাই দেন। এইরূপ জঘন্য অপরাধের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর হওয়াই বাঞ্ছনীয় নহে কি?..."

উপসংহারে পত্রিকাটি লিখিতেছেন :

"আমরা আশা করি সরকার, পৌর কর্ত্তৃপক্ষ এবং নেতৃস্থানীয় নাগরিকগণ এই গুরুতর সমস্যা সমাধানে আশু মনোযোগী হইবেন, দুষ্কৃতকারীদের কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা হওয়া যেমন একদিকে প্রয়োজন, অন্য দিকে তেমনি খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত হওয়া অত্যাবশ্যক।

উপযুক্ত পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধের অভাব ভারতের নাগরিক জীবনের একটি প্রধান সমস্যা। ভারতের প্রায় প্রত্যেক নগরী ও শহরগুলিতে বর্ত্তমানে এই সমস্যা বিশেষ তীব্রতা লইয়া দেখা দিয়াছে। লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও বুঝা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র কঠোর শাস্তি প্রদান (অপরাধীদের কঠোর শাস্তি বিধান অবশ্যই করিতে হইবে) দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। চাহিদার অনুপাতে দুগ্ধসরবরাহের পরিমাণ যত দিন কম থাকিবে তত দিন দুগ্ধে ভেজাল মিশাইবার ঝোঁক থাকিবেই। সে ক্ষেত্রে স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ সমাধানের পথ হিসাবে পৌর প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারকে এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তবে সরকার

অথবা পৌর প্রতিষ্ঠানকে যদি এই দায়িত্ব সুচারুরূপে প্রতিপালন করিতে হয় তবে সর্ব্ব স্তরে প্রশাসনিক সততার পুনঃপ্রবর্ত্তনকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

পাকিস্থানে মাল আটক

৭ই আশ্বিন সাপ্তাহিক "সেবক" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"আগরতলা, ২০শে সেপ্টেম্বর—"স্থানীয় ব্যবসায়ীমহলের সংবাদে প্রকাশ, আগরতলায় আনয়নের জন্য কলিকাতা হইতে প্রেরিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য—কয়লা, টিন, সিমেন্ট, সরকারী চাউল ইত্যাদি বহুবিধ দুই কোটি টাকা মূল্যের মাল বিগত ২৮শে আগষ্ট হইতে আখাউড়া রেল ষ্টেশনে পাক মুদ্রায় রেলভাড়া দেওয়া সংক্রান্ত এক আইনগত প্রশ্নে আটক পড়িয়া আছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ৯ বৎসর যাবৎ স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ পাক মুদ্রায় রেলভাড়া দিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এ যাবৎ পাক সরকার কোন সময়ে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই এবং পাক রেলওয়ে প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুই কোটি টাকা রেলভাড়া ত্রিপুরা হইতে মালভাড়া বাবদ পাইয়াছেন।

"তিন সপ্তাহ কাল যাবৎ কোন মাল আখাউড়া হইতে না পৌঁছায় এখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি পড়িয়াছে এবং সমস্ত দ্রব্যের মূল্য শতকরা ২৫ হইতে ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এইরূপ অচল অবস্থায় পড়িয়া ব্যবসায়ী মহল ত্রিপুরায় অগৌণে রেল লাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন।

"সংবাদে প্রকাশ, পাক রেল কর্ত্তৃপক্ষ পাক মুদ্রার প্রশ্ন তুলিয়া মাল আটক করেন নাই। সীমান্ত এলাকায় কর্ম্মরত জনৈক মিলিটারী সুবেদারের কারসাজিতে উপরোক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

"মাল আটক পড়ায় মালের উপর প্রত্যহ ডেমারেজ চার্জ্জ লাগিতেছে। প্রকাশ, ডেমারেজ চার্জ্জ প্রায় দশ হাজার টাকা দিতে হইবে।"

ঢাকাস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের চেষ্টায় অবশেষে নাকি সরকারী চাউলের ওয়াগনগুলি খালাস করা সম্ভব হয় এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে আগরতলায় কিছু কিছু মাল পৌঁছিতে থাকে।

১৪ই আশ্বিন এই বিষয়ে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "সেবক" পত্রিকা পাকিস্থানের মধ্য দিয়া মাল সরবরাহ ব্যবস্থার এইরূপ অনিশ্চয়তাজনিত জনসাধারণের দুর্দ্দশা এবং জাতীয় অর্থের অপচয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আগরতলা-আসাম সড়কটির নির্ম্মাণ-কার্য্য দ্রুততররূপে সম্পন্ন করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী অকর্ম্মণ্যতার সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন :

"যে আসাম-আগরতলা রাস্তার স্বপ্ন আমাদিগকে দেখান হইতেছে তাহার কার্য্য কোনকালেও সম্পন্ন হইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। এই সড়ক গত নয় বৎসর যাবৎ নির্ম্মিত হইতেছে। অথচ নয় বৎসর পরেও আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হয় যে, চলিত বর্ষায় এই রাস্তা দিয়া সর্ব্বমোট এক মাসও গাড়ী চলাচল করিতে পারে নাই। কেন গাড়ী চলাচল করিতে পারে নাই কিংবা কেন সড়কের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হয় না তাহা আমরা জিজ্ঞাসা করিব না। আমরা ইহাই জিজ্ঞাসা করিব, লক্ষ লক্ষ নরনারীর জন্য পরিবহন-ব্যবস্থার সুরাহা করার মিথ্যা প্রলোভন দেওয়ার অধিকার ভারতীয় সংবিধানে কোন গণতান্ত্রিক সরকারকে দেওয়া হইয়াছে কিনা? ৪,০০০ বর্গমাইল একটি রাজ্যের পরিবহন-ব্যবস্থা সুদীর্ঘ নয় বৎসরেও সম্পন্ন করা যায় না—ইহার চেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।"

বেআইনি মদ চোলাই

দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার মূলে যে নীতিজ্ঞান তাহা যদি দেশের লোকে হারাইয়া ফেলে তবে যে অবস্থা হয় তাহার পূর্ণ উপলব্ধি আমরা আজ করিতেছি। উপরন্তু এক শ্রেণীর লোক এখন কলিকাতায় আসা-যাওয়া করে যাহাদের উদ্দেশ্যই আইনভঙ্গ করিয়া নিজ স্বার্থপূরণ। তাহারই একটি দৃষ্টান্ত আমরা "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে নীচে তুলিয়া দিলাম :

"শনিবার পুলিস বেলেঘাটা অঞ্চলে একটি মসজিদের ভিতর হইতে বেআইনী মদ চোলাইয়ের একটি গুপ্ত কারখানা আবিষ্কার করে এবং এক শত মণের অধিক গাঁজানো মদ ও সাত গ্যালন চোলাই করা মদ উদ্ধার করে। দুপুর দেড়টা নাগাদ মসজিদের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে নিভৃত নির্জ্জনে চোলাইরত দুই ব্যক্তিকেও পুলিস হাতেনাতে ধরিয়া ফেলে। এই ব্যাপারে জড়িত আরও কয়েকজন নাকি পলাইয়াছে। ধৃত এবং পলায়িত ব্যক্তিরা উদ্বাস্তু বলিয়া পুলিসের ধারণা।

বেলেঘাটা মেন রোডের উপর সরকার বাজারের পাশেই একটি সরু গলির ভিতর এই মসজিদ—বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত। এখন সেইখানে নমাজও হয় না, আজানের ডাকও শোনা যায় না। তবে ইতঃপূর্ব্বে গত দাঙ্গার সময় আজানের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে যখন ঘন ঘন 'আল্লা হো আকবর' আওয়াজ শোনা যাইত তখন নাকি এই মসজিদের অভ্যন্তরে নানাপ্রকার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রও বোঝাই থাকিত, স্থানীয় লোকজন সেই অভিযোগই করে।

এখন সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র নাই। কিন্তু সম্প্রতি সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছে এই মদ চোলাইয়ের কারখানা। মসজিদের সম্মুখভাগে চতুষ্কোণ চত্বরের নীচে ৪০ ফুট লম্বা একটি বিরাট সুড়ঙ্গ। ইহার ভিতর ৭০-৮০ মণ মদ ধরার মত বিরাটাকার চৌবাচ্চা,

অগণিত বিপুলাকৃতি হাঁড়ি, ফুটবল ব্লাডার, জল সরবরাহের পাইপ, জল ইত্যাদি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের বিরাট ব্যবস্থা।

জঙ্গলাকীর্ণ মসজিদের বাইরে পূতিগন্ধময় জরাজীর্ণ অবস্থা: ভিতরে রহস্যময় পাতালপুরী। আর এই পাতালপুরীর সুড়ঙ্গ-পথ দিয়াই মাসিক হাজার হাজার টাকার আসা-যাওয়া। পুলিস অতর্কিত অভিযানে এই রহস্যময় পাতালপুরীর সন্ধান পায় এবং দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিদ্বয় উভয়েই উদ্বাস্তু। মসজিদের পাশেই কয়েক ঘর উদ্বাস্তুর বাস।

পুলিস এই সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান চালাইতেছে।"

পররাষ্ট্র দপ্তরের দলিল চুরি

সম্প্রতি সংবাদপত্রে নিম্নস্থ সংবাদটি প্রকাশিত হয়। পরে পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র এই খবরের অধিকাংশই সাফাই গাহিয়া পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃত তথ্য যে কি তাহা আমরা সকলেই জানি, সুতরাং দেশে যে অন্তর্ঘাতী গুপ্তচর ও শত্রুর পঞ্চমবাহিনী রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। হইতে পারে যে, আসামীর স্বীকারোক্তি কিছু অতিরঞ্জিত। কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তর যে সজাগ নহে তাহার প্রমাণ ত এই দলিল চুরিই :

"নয়াদিল্লী, ২২শে সেপ্টেম্বর—আজ নয়াদিল্লীর অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরাজেন্দ্র সিং-এর নিকট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্ম্মচারী সাদিলাল কাপুর যে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস হইয়াছে। ভারত সরকারের অতিশয় গোপনীয় কতকগুলি দলিল ও নথিপত্র অপহরণের দায়ে সাদিলাল অভিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রকাশ, আসামী তাঁহার স্বীকারোক্তিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন অফিসারকেও জড়াইয়াছেন। পুলিসের ধারণা, আসামীর স্বীকারোক্তিমূলে অনুসন্ধান চালাইলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের পিছনে একটি আন্তর্জাতিক গুপ্তচর-চক্রের অস্তিত্ব আছে বলিয়া পুলিস সন্দেহ করিতেছে।

দিল্লীর পুলিস কর্তৃপক্ষ বলেন যে, অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপ দ্বারা দেশে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টির জন্য একটি গুপ্তচর-দল ক্রিয়াশীল রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা সন্দেহ করেন। তাঁহারা আশা করেন যে, আসামীর স্বীকারোক্তির ফলে তাঁহারা এই গুপ্তচর-চক্র নির্মূল করিতে কৃতকার্য্য হইবেন। মামলা দেখিবার জন্য আদালত-কক্ষে বহু দর্শক সমাগম হইয়াছিল। একজন মাত্র পুলিস কর্ম্মচারী সাদিলালকে আদালত-কক্ষে লইয়া আসে এবং কয়েকজন নারী-পুলিস তাঁহার সঙ্গে স্ত্রীকে লইয়া আসে। তাঁহার স্ত্রীর কোলে এক বৎসরের একটি শিশু ছিল।

প্রকাশ যে, সাদিলাল পূর্ব্বে অপর একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি গোপনীয় দলিলপত্র ও ফাইল একজন বিদেশী চরের হস্তে দিয়াছিলেন।

যে বিদেশী চরের নিকট ফাইলের কাগজপত্র দেওয়া হইয়াছিল, সে ভারত ছাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। দুই জন বিদেশী কূটনীতিবিশারদও হঠাৎ ভারত হইতে চলিয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, ফাইলসমূহ সুয়েজ সমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি রাজনৈতিক প্রশ্ন-সংক্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণ মেননের কায়রো যাত্রার প্রাক্কালে দেখা যায় যে, ফাইলসমূহ উধাও হইয়াছে।"

সমাজ উন্নয়ন

পণ্ডিত নেহরু যাহা বলিয়াছেন তাহা আশার বাণী। কিন্তু কবে সুদিন আসিবে তাহার কোনও চাক্ষুষ লক্ষণ ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ত শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয়ও চালু হইয়াছে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ কি এখনও হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইয়াছে?

"নয়াদিল্লী, ৩০শে সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সমাজ-উন্নয়ন কর্ম্মসূচীকে 'গ্রামীণ ভারতের মনোমুগ্ধকর উপকথার এক নূতন অধ্যায়' বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "আমাদের ব্যাপক কর্ম্মক্ষেত্র এবং অসংখ্য গ্রামে এক নূতন নাটকের অভিনয় হইতেছে। শত সহস্র গ্রাম্য কর্ম্মী ও সংগঠনকারী প্রভৃতি এই নাটকের অভিনেতা। প্রত্যেক নরনারী ও এমনকি শিশু পর্য্যন্ত উহাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিধেয়।"

ভারতে সমাজ উন্নয়ন কর্ম্মসূচী উদ্বোধনের বার্ষিকী উপলক্ষে সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মুখপত্র 'কুরুক্ষেত্র' প্রদত্ত এক বিশেষ বাণীতে প্রধানমন্ত্রী উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

শ্রীনেহরু বলেন, "সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এক্ষণে নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। ভারত সরকারের একটি নূতন মন্ত্রণালয় এই নামে গঠিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ একমাত্র আমাদের দেশেই এজাতীয় একটি দপ্তর আছে। ইহাতে শুধু সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সেবাসম্প্রসারণ ব্যবস্থার ক্রমবিবর্ত্তনই প্রমাণিত হয় না, ইহার গুরুত্বেরও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর দায়িত্বও অর্পিত হইয়াছে। গত চার বছরে শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দের নেতৃত্বে এই কাজ যতটা আগাইয়াছে, তাহাতে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এই নূতন মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে।

দ্রুত খাদ্যোৎপাদন বাড়িতেছে। সমস্ত গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতি গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও আমি সম্প্রতি বার বার উল্লেখ করিয়াছি। উহাদের উপরই বৈষয়িক উন্নতি মূলতঃ নির্ভরশীল। তবে মানুষ গড়িয়া তোলাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য।

জনসাধারণের নিকট আশার বাণী বহন করা, তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা জাগাইয়া তোলা এবং কঠোর ও সহযোগিতামূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যবস্থা করাই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার আসল কাজ।"

বন্যায় সরকারী সাহায্য

"কাল্‌নি, ৭ই অক্টোবর—সরকার যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্ত্তদের জন্ম ব্যাপকভাবে সাহায্যকার্য্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গকে তাহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্ম সর্ব্বপ্রকার সাহায্যদানের আশ্বাস দেওয়ায় রাজ্য সরকার এখন সাহায্যদানের উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন। সাহায্যকার্য্যের জন্ম ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

আজ এখানে ডাক বাংলোতে অনুষ্ঠিত বন্যার্ত্তদের এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধক্রমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরবর্ত্তী তিন মাসের জন্ম প্রতি মাসে পাঁচ লক্ষ মণ চাউল প্রেরণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রী জৈন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু উদ্বেগ সহকারে পশ্চিমবঙ্গে বন্যার অবস্থা লক্ষ্য করিতেছেন।

দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ ও ক্রমাগত বন্যার ফলে গত ২০ বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গ যে চরম দুর্দ্দশাভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রী জৈন বলেন, "আজ আপনাদের দুর্গতি সমগ্র ভারতের দুর্গতি। আপনারা যে চরম দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছেন তাহাতে আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি।"

সংস্কৃত কমিশন

ভারত সরকার ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ম একটি সংস্কৃত কমিশন গঠন করিয়াছেন। ৫ই অক্টোবর এই কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হয়। বিখ্যাত ভাষা-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ড. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই কমিশনে অধ্যাপক এস. কে. দে সহ আরও আট জন সদস্য রহিয়াছেন। পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ আর. এন. দণ্ডেকার এই কমিশনের সদস্য-সম্পাদক।

কমিশনের সম্মুখে কাজ হইল মুখ্যতঃ দুইটি—প্রথমতঃ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করা এবং সংস্কৃত পঠন-পাঠন ও গবেষণার উন্নতিসাধনের পরামর্শ দেওয়া; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত পঠন-পাঠনের প্রচলিত পদ্ধতি আলোচনা করিয়া দেখা এবং তাহার কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা।

কমিশন যাহাতে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি সংগ্রহ করিতে পারেন সেইজন্ম যথাযোগ্য ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হইয়াছে। ছয় মাসের মধ্যেই কমিশন রিপোর্ট পেশ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ৭ই অক্টোবর ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নয়াদিল্লীতে কমিশনের প্রথম আনুষ্ঠানিক অধিবেশন বসে।

একটি সংস্কৃত কমিশন নিয়োগের জন্ম বহুদিন হইতেই আন্দোলন চলিতেছিল। সুতরাং এই কমিশন গঠন সময়োচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কোন জাতিই তাহার ঐতিহ্যকে বিস্মৃত থাকিয়া মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না! মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙালীকে একটি আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতের পক্ষে এই কথাটি বোধ হয় আরও বেশী করিয়াই প্রযোজ্য হইতে পারে। বহু বৎসরের পরাধীনতায় ভারতবাসী সত্যই আপনাকে ভুলিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় লালিত ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতের (এবং এশিয়ার) সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান-লাভের কোন সুযোগই নাই। এইরূপ বক্তব্যের অর্থ এই নহে যে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কোনই মূল্য নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যথেষ্টই মূল্য রহিয়াছে এবং সে শিক্ষা আমাদিগকে পূর্ণমাত্রাতেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির উপযোগী করিয়া গড়িতে হইবে। ভারতীয় জীবনবোধ এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন নব-সৃষ্ট ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সুষ্ঠু বিকাশের জন্ম অবশ্যপ্রয়োজন—কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহা এখনও সম্ভব হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমরা যাহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছি তাহারা কেহই দেশের ঐতিহ্যকে অনুধাবন করিবার শিক্ষাও পাই নাই, চেষ্টাও করি নাই (অবশ্য এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম রহিয়াছে)। অপর দিকে যাহারা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহারা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে পরাঙ্মুখ থাকায় তাঁহাদের অতীত-মুখী দৃষ্টিভঙ্গী আমাদিগকে কোনই সাহায্য করিতে পারে নাই। এই অবস্থায় আধুনিক শিক্ষাতালিকার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সুপরিকল্পিত সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভারতে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের একটি সুসঙ্গত রীতি প্রবর্ত্তন করা যায় কিনা তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আত্মহত্যার প্রাদুর্ভাব

বোম্বাই রাজ্যে আত্মহত্যার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। ইউ-নাইটেড প্রেস নিম্নলিখিত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন :—

"বোম্বাই ৬ই অক্টোবর—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ বোম্বাই বিধানসভায় বলিয়াছেন যে, ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সনে বোম্বাই রাজ্যে মোট ৩,৮২৪টি আত্মহত্যা ঘটে। উহার মধ্যে ১,৯৪১জন পুরুষ ও ১,৯৮৩ জন স্ত্রীলোক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, ঘরোয়া ঝগড়া, দীর্ঘকাল যাবৎ রোগভোগ, মস্তিষ্কবিকৃতি, দুর্ব্যবহার, প্রণয়ে নৈরাশ্য প্রভৃতি এই সকল আত্মহত্যার কারণ। দারিদ্র্য, বেকার ও দেউলিয়া অবস্থার দরুনও অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যা ঘটিয়াছে।"

আইনানুযায়ী আত্মহত্যার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রই পুলিশের গোচরে আসিবার কথা। সেই দিক হইতে বিচার করিলে বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত পরিসংখ্যানটি সঠিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

মাত্র একটি রাজ্যে (মোট লোকসংখ্যা ৩,৫৯,৫৬,৩৫০) দুই বৎসরে ৩,৮২৪ জন আত্মহত্যা করিয়া জীবনত্যাগ করিয়াছে—খবরটি সত্যই উদ্বেগজনক। মুখ্যমন্ত্রী আত্মহত্যার যে কারণগুলি

বলিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় মুখ্যতঃ সেগুলি সবই সামাজিক। সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারিলে এই প্রকার আত্মহত্যাও নিরোধ করা যাইতে পারে। সম্পদের উৎপাদন এবং তাহার বিতরণ-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যই এই সকল সামাজিক ক্ষত-সৃষ্টির জন্য দায়ী। জাতীয় ধনবৈষম্য দূর করা ভারতের জাতীয় পরিকল্পনাগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্য ক্রমাগতই অন্তরালে থাকিয়া যাইতেছে।

পাকিস্থানী রাজনীতি

সম্প্রতি পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে চলিয়াছে। নূতন সংবিধান অনুযায়ী শীঘ্রই যে জাতীয় নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী থাকিবে, না একটি সংযুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলী (যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ভোটাধিকারী হইবেন) জাতীয় সভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির প্রতিনিধিবর্গকে নির্ব্বাচিত করিবেন সেই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য পাকিস্থানের জাতীয় সভা ৮ই অক্টোবর হইতে ঢাকা নগরীতে আলোচনারত রহিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানে পাকিস্থানের জাতীয় সভায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন।

পশ্চিম-পাকিস্থানের বিধানসভা সংযুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলী গ্রহণের বিরোধিতা করিয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের বিধানসভা প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমেই সংযুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে ভোট দিয়াছে। এখন জাতীয় সভা এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তবে সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম-পাকিস্থানের রিপাবলিকান দলের সদস্যগণ আপন আপন মতামত অনুযায়ী ভোট দিতে পারিবেন। জাতীয় সভার অধিবেশনের স্থান, সরকারী মনোভাব এবং পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সাধারণ আচরণ হইতে মনে হয় যে, জাতীয় সভা সংযুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর পক্ষেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

ধর্ম্মের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপকীর্ত্তি এবং ভারতে তাহাতে ইন্ধন যোগায় একদল অন্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদী—যাহাদের নেতৃত্বে ছিল মুসলিম লীগ। এই রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ হইয়াছে পাকিস্থানের রাজনৈতিক পটভূমিকা হইতে মুসলিম লীগের (প্রকৃতপক্ষে) সম্পূর্ণ অপসারণের মধ্য দিয়া। হিন্দু মুসলমান দুই জাতি এই "মূল্যবান" তত্ত্ব আজ পাকিস্থানের কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা বলেন না। এই সুস্থ পরিবর্ত্তনেরই অপর পদক্ষেপ হইল স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিলোপসাধন। অবশ্য সংখ্যাগুরু মুসলমানদের পক্ষে এখন যৌথ নির্ব্বাচকমণ্ডলীই অধিকতর সুবিধাজনক। তথাপি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসারতা বুঝিতে পারিয়া পাকিস্থানের সংখ্যালঘু হিন্দুগণ যে যৌথ নির্ব্বাচনব্যবস্থাকে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় মিলে।

বিশ্ব আণবিক সংস্থা

বিশ্বের একাশীটি দেশের প্রতিনিধি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে একটি বিশ্ব আণবিক সংস্থার খসড়া সংবিধান আলোচনার জন্য সম্মিলিত হন। সর্ব্বসমেত সাতাশীটি রাষ্ট্রকে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়। তন্মধ্যে ৮১টি রাষ্ট্র সম্মেলনে যোগদান করে। ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে ঐ সম্মেলনের কার্য্য সুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রমুখ বারটি দেশ এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। এই কয়টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গই প্রস্তাবিত বিশ্ব আণবিক সংস্থার খসড়া সংবিধানটি রচনা করে।

আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রসংঘের পরিচালনাধীনে একটি বিশ্ব আণবিক সংস্থা গঠনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সম্মুখে ১৯৫৩ সনের ৮ই ডিসেম্বর প্রদত্ত এক বক্তৃতায় সর্ব্বপ্রথম একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার পর বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উপরোক্ত বারোটি রাষ্ট্র একটি বিশ্ব আণবিক সংস্থা গঠনের জন্য বাস্তব কার্য্যক্রম গ্রহণ করে। এই বারোটি রাষ্ট্র ১৯৫৬ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮ই এপ্রিল এই সময়ের মধ্যে ওয়াশিংটনে একটি সম্মেলনে মিলিত হইয়া প্রস্তাবিত সংস্থাটির জন্য একটি খসড়া সংবিধান রচনা করে। বর্ত্তমান সম্মেলনে ঐ খসড়াটি আলোচনার পর গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রাষ্ট্রসংঘের সদস্য ৭৬টি রাষ্ট্র ব্যতীত আরও যাহাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় সেই সকল রাষ্ট্র হইল: পশ্চিম জার্ম্মানী, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মোনাকো, মরক্কো, সান মারিণো, সুদান, সুইজারল্যাণ্ড, টিউনিসিয়া, ভ্যাটিকান সিটি এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। কিন্তু চীনা সাধারণতন্ত্রকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য কোন আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই। কার্য্যতঃ ৮১টি দেশ সম্মেলনে উপস্থিত থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত ইহাই বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

এই সম্মেলন সম্পর্কে যে সংবাদ এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত বিশ্ব আণবিক সংস্থার গঠন ও কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গুরুতর মতভেদ রহিয়া গিয়াছে। প্রস্তাবিত সংস্থা হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আণবিক সাহায্য দানের যে সকল সর্ত্ত আরোপ করার প্রচেষ্টা হইতেছে, ভারতপ্রমুখ কয়েকটি রাষ্ট্র তাহার বিশেষ বিরোধিতা করিয়াছে।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় আগামী ২৫শে আশ্বিন ১৩৬৩ (১১ই অক্টোবর ১৯৫৬) হইতে ৭ই কার্ত্তিক ১৩৬৩ (২৪শে অক্টোবর ১৯৫৬) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপিস খুলিবার পর হইবে। এই সূত্রে জানানো যাইতেছে যে, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, প্রবাসী-অপ্রাপ্তি—এতদ্বিষয়ক চিঠিপত্র "ম্যানেজার প্রবাসী" এই নামে প্রেরিতব্য। কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী।

রীতি ও বৃত্তি

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

'স্টাইল' কথাটা আজকাল শোনা যায় লোকের মুখে মুখে। লেখা এবং খেলা, উভয়ত্রই এসে পড়ে স্টাইলের প্রসঙ্গ। কিন্তু বস্তুটা আসলে নিরাকার ব্রহ্মের মতই অনির্বাচ্য। এর সম্বন্ধে একটা আবছা-গোছের ধারণা হয় ত আছে আমাদের মনের মধ্যে; কিন্তু বিষয়টা এমনই যে বুঝিয়ে বলতে গেলেই সেটা আরও অস্পষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া, ধারণার ব্যাপারেও ঐকমত্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই বিদগ্ধজনের দরবারে একটু কুণ্ঠিত কণ্ঠেই পেশ করতে হয় নিজের বক্তব্যটি। সুবিধা বা অসুবিধার কথা এই যে, এই প্রসঙ্গ নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত, এদেশে এবং বিদেশে, আলোচনা নেহাত কম হয় নি। সুবিধা এই যে, পূর্বসূরিদের পথ ধরে প্রধান প্রধান মতবাদগুলির পর্যালোচনা করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়ত সম্ভব হতে পারে। অসুবিধার কথা, বাঁশবনে ডোমকানা হওয়ার আশঙ্কাও আছে যথেষ্টই। যা হোক, বিষয়টা খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে, লাভ না থাকুক, ক্ষতি অন্ততঃ কিছু নেই।

একদল আলঙ্কারিক ছিলেন এ দেশে যাঁরা কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে রচনা-রীতির উপরই জোর দিয়েছেন বিশেষ করে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, কাব্যের আত্মাই হ'ল রীতি। রীতির অর্থ করেছেন এঁরা 'বিশিষ্টা পদ-রচনা'। চমৎকৃতি-বাদী হরিপ্রসাদ কাব্যকে চিহ্নিত করেছেন, 'বিশিষ্ট শব্দরূপ' এই লক্ষণে। প্রত্যেক পদবন্ধ বা বাক্যের মধ্যেই থাকে তিনটি জিনিষ—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা এবং আসত্তি। যোগ্যতার অর্থ পদার্থসমূহের পরস্পর সম্বন্ধে বাধা না থাকা; 'রোদে ভিজছে' কিংবা 'জলে পুড়ছে' বললে বাক্যত্বের হানি হয়। আকাঙ্ক্ষা বলতে এঁরা বুঝেছেন, 'প্রতীতি-পর্যবসান-বিরহ' অর্থাৎ বাক্যে পদার্থের নিরপেক্ষতার অভাব। 'গো-অশ্ব-নর-বানর' ইত্যাদি পদোচ্চয় বাক্য নয়, কারণ গো-শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয় শ্রোতার অন্তরে, তার উত্তর নেই অশ্বাদি-শব্দের মধ্যে। কাজেই এই নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ অন্যোন্য-নিরপেক্ষ পদোচ্চয়কে বাক্য বলা যায় না। আর আসত্তি হ'ল দুই বা তদধিক সন্নিহিত পদের অবিচ্ছিন্ন অন্বয়। কিন্তু এ তো গেল সাধারণ পদ-রচনার কেউ বলেন শব্দ-সৌষ্ঠবে, কেউ বলেন অলঙ্কার-সংযোগে,* কেউ বা বলেন অর্থের রমণীয়তা-প্রতিপাদনে;† চমৎকার-সৃষ্টির কথাও বলেন কেউ কেউ। সে যা হোক্, অভিধা-মূলক বাক্য যে কাব্যের রসত্ব-সাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন এক বাক্যে; নতুবা অর্থকে 'রমণীয়'-বিশেষণে বিশেষিত করা হ'ত না, কিংবা চমৎকার-সৃষ্টির প্রসঙ্গও উঠত না। বাক্য 'রমণীয় অর্থ' অর্থাৎ লোকোত্তর আহ্লাদ উৎপাদন করে, কিংবা 'চমৎকার' অর্থাৎ বিদ্বজ্জনের চিত্ত-বিস্তার সাধন করে তখনই যখন সে বাচ্যকে অতিক্রম করে লক্ষ্যে এবং লক্ষ্য থেকে ব্যঙ্গ্যে গিয়ে পৌঁছয়।

অতএব ব্যঞ্জনার দিক থেকে শব্দ-সৌষ্ঠবের দান এবং স্থান কতটুকু সেই আলোচনাই করা যাক প্রথমে। 'সুষ্ঠু' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ,—অর্থ ও ধ্বনির দিক থেকে যা একান্ত সঙ্গত, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যা আমাদের শ্রুতিকে তৃপ্ত করে মনের ভিতর মহলে চলে যায় এবং বাচ্যকে অতিক্রম করে এক অচিন্তিতপূর্ব অর্থের দ্যোতনা করে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় কাব্য-চিন্তায় কৈশিকী, ভারতী, সাত্বতী, আরভটী প্রভৃতি বৃত্তির কল্পনা করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে রসই আমাদের মুখ্য লক্ষ্য; কাজেই কেবলমাত্র রস-সাধক বাক্যকেই 'সুষ্ঠু' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রসের পরিপোষের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই সব বৃত্তি* অর্থাৎ পদ-বিন্যাস-পদ্ধতির পরিকল্পনা করা হয়েছে। কৈশিকীর মধ্যে পাওয়া যায় দুটি বড় গুণ, প্রসাদ ও মাধুর্য; যে গুণ থাকলে বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থটি প্রতিভাত হয় বাক্যটি শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই, পদ-প্রবন্ধের সেই স্বচ্ছ সৌকুমার্যের নামই প্রসাদ-গুণ; মাধুর্য নির্ভর করে অনেকটা কল্পনার কম্রতা ও অনন্যতন্ত্রতার উপর। পূর্বাচার্যগণের মতে এই বৃত্তি বা স্টাইল শৃঙ্গার-রসের পক্ষে খুবই উপযোগী। বীর ও রৌদ্র-রসের সহায়ক আরভটী, কারণ এর মধ্যে আছে ওজোগুণ, আছে শব্দ ও সমাসের সমারোহ; গৌড়ী রীতির সঙ্গেই এর সমধর্মিতা। 'মেঘনাদ-বধে'র মেঘমন্দ্র প্রবন্ধগুলি এই বৃত্তির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

---

* কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ। (কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি)

† রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্। রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদজনক-জ্ঞান-গোচরতা। (রসগঙ্গাধর)

অনিবার্যক্রমেই আর একটা ব্যাপার এসে পড়ছে এর থেকে। কোন্ ভাব কোন্ বৃত্তির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হতে পারে সুষ্ঠু-ভাবে, সে কথা ভেবে নিতে হবে গোড়াতেই। বস্তুতঃ, রসোচিত রূপটি কবি-মানসে উদ্ভাসিত হয় অনায়াসে। এই সূক্ষ্ম শিল্প-দৃষ্টি—এই 'কবিত্ব-বীজ' নিহিত থাকে প্রত্যেক রূপদক্ষের অন্তরে। তবুও শাস্ত্র-পরিশীলন ও রচনা-চর্চারও প্রয়োজন আছে। কারণ কবিত্বই ত কাব্যত্বের একমাত্র হেতু নয়; কাব্য-মাধুরীর অনেকটাই নির্ভর করে কলা-চাতুরীর উপর। নিরন্তর কাব্য-চর্চার ফলে চিত্ত পরিমার্জিত হয় এবং ঔচিত্য-বোধ অর্থাৎ রুচি গড়ে ওঠে। এই কারণেই কাব্য-সম্পদের কারণ-নির্দেশ-প্রসঙ্গে আচার্য দণ্ডী নৈসর্গিক প্রতিভার সঙ্গে সংশয়রহিত বিদ্যা ও অবিরত অভ্যাসের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, 'অভিযোগ' ও অনুশীলনের গুণে পূর্ব-বাসনা জাগ্রত হয় এবং কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা আসে। কতকটা এই ভাবেরই আভাস পাই ভাসের উদ্ধৃত উক্তিতে—'মথ্যমান অরণি থেকে যেমন অগ্নি উদ্গত হয়, খন্যমান ভূমি থেকে যেমন নীর নির্গত হয়, তেমনি রচনা-প্রযত্নের ফলে কাব্য-রসের উৎসেকও অসম্ভব নয়।' বাস্তবিক, রচনার রুচিরতা নির্ভর করে উচিততার উপর—সৌষম্যের উপর নির্ভর করে সুষমা।* ঔচিত্যবোধের অভাবে রচনা হয়ে পড়ে অসদৃশ ও অরুচিকর এবং রসোৎপত্তি হয় ব্যাহত।

স্টাইল-অর্থে রীতি এবং বৃত্তি দু'টি শব্দই প্রচলিত আছে অলঙ্কার-শাস্ত্রে। তবে রীতির শ্রেণীকরণ করা হয়েছে প্রধানতঃ ভৌগোলিক পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা-রীতির গুণাগুণ অবধারণ করেই কল্পিত হয়েছে বৈদর্ভী গৌড়ী, পাঞ্চালী, প্রভৃতি রীতি-বিভাগগুলি। অপর পক্ষে, বৃত্তি-ব্যবস্থাটি পরিকল্পিত হয়েছে রস-সৃষ্টির সাধকরূপে। রস-সাধনের যোগ্যতা আছে এমন সব শব্দের সমাবেশই শুধু করা চলে কাব্যে। বিশ্রুত কবি ও সমালোচক এলিয়ট 'auditory imagination' অর্থাৎ শ্রুতিমূলা কল্পনার কথা বলেছেন তাঁর কোন এক নিবন্ধে। এই কল্পনার বলে শব্দ ও ছন্দের ধ্বনিগত তাৎপর্যটি স্বতই প্রতিভাত হয় শিল্পীর অন্তরে এবং সেই সব শব্দই বেছে নেন তিনি, যেগুলি আমাদের চেতনার বহিস্তর দিয়ে অনুস্রুত হয়ে অন্তরের অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছয়। ভারতীয় অলঙ্কারেও আর্থী ও শাব্দী উভয়বিধ বৃত্তি ও ব্যঞ্জনাই স্বীকার করা হয়েছে। কৈশিকাদি অর্থ-বৃত্তির অন্তর্ভূত ওজঃ-প্রসাদ-মাধুর্য প্রভৃতি গুণগুলিও পরিবাহিত হয় ভাবগর্ভ শব্দ-সন্দোহের মাধ্যমেই। এইগুলি ছাড়া গ্রাম্যা (কোমলা), উপনাগরিকা, পরুষা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ-বৃত্তিও ব্যবস্থিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। 'গ্রাম্যা' সরলা পল্লী-ললনার মতই কোমলা, সুকুমার-অনুভূতি-প্রকাশের অনুকূল; উপনাগরিকার মধ্যে পাই বিদগ্ধ-নাগরিকার মার্জিত রুচি, হাস্যশৃংগারাদি রস-সৃষ্টির সহায়ক এটি; পরুষার প্রকৃতি একটু রুক্ষ—রৌদ্রাদি রসের ক্ষেত্রেই এর উপযোগিতা। 'লোচন'-কারের মতে বৃত্তিগুলিই কাব্যের জননী—'বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ'। সুতরাং বৃত্তি-ব্যবহারে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন, নতুবা অনুচিত শব্দ ও অর্থের সন্নিবেশে রস-সিদ্ধি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ভৌগোলিক রীতি-বিভাগ কতকটা কৃত্রিম ও কাল্পনিক, কারণ একই অঞ্চলের কবি ও লেখকদের ভাষা-শৈলী ঠিক একই প্রকার হয় না, কিংবা হতেও পারে না। বৈদর্ভীর প্রশংসা এবং গৌড়ীর নিন্দার মধ্যে অসূয়ার গন্ধই পাওয়া যায়।

কথা উঠতে পারে, বাক্ এবং অর্থ এরা ত পার্বতী-পরমেশ্বরের মতই পরস্পর-সম্পৃক্ত, এদের পৃথক করে দেখা সম্ভব হয় কি করে? পৃথক করে দেখা হয়ও না আসলে; প্রবৃত্তিগত পক্ষপাতের জন্যেই কেউ অর্থগত, কেউ বা শব্দগত বৃত্তির উপর জোর দেন এইমাত্র। শব্দ বললেই আসে অর্থের কথা, আর অর্থ বললেই এসে যায় শব্দের প্রসঙ্গ, কারণ অর্থবদ্ধ, বিবিক্ত ধ্বনির নামই 'শব্দ'। অনুগুণ-শব্দ-সংযোগের মাধ্যমেই অভিরূপ অর্থের উদ্বোধন সম্ভব হয়। বাক্যে কাব্যত্ব-সঞ্চারের জন্য প্রয়োজন শব্দার্থের সুচিন্তিত ও পরিমিত প্রয়োগ। ঔচিত্য-বোধ না থাকলে সন্দর্ভ কিছুতেই রসানুরূপ হতে পারে না। কিন্তু শব্দার্থকে যুক্তির কষ্টি-পাথরে যাচাই করে নেবার যোগ্যতা আছে ক'জনের? কাজেই পদ-বন্ধ-সম্বন্ধে একটা শিথিল মনোভাব দেখা যাচ্ছে আজকাল চারিদিকে। আমাদের শব্দ-ভাণ্ডারে রজনীও আছে, শর্বরীও আছে; নারীও আছে, রমণীও আছে; সৌদামিনীও আছে, ক্ষণপ্রভাও আছে;—এক একটি শব্দের কত না পর্যায়-শব্দ ভাষায় প্রচলিত; কিন্তু কোন্ শব্দটি কোথায় ব্যবহার করলে তা রুচিসঙ্গত ও রস-সম্মিত হবে তা বুঝব কি করে, যদি না শব্দার্থ সম্বন্ধে আমার প্রত্যয় হয় সুপ্রতিষ্ঠিত? শব্দের জন্যই শব্দ-ব্যবহারের অথবা শব্দের অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক সাহিত্যে আদৌ বিরল নয়। 'যমুনা-পুলিনের তটে তটে' কিংবা 'বিনীত বিনয়ে', 'গীতির ছন্দোময়ী রূপ' প্রভৃতি শিথিল প্রয়োগ আধুনিক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় যত্র-তত্র। উপাদান অর্থে 'অবদান,' পেশীবহুল অর্থে 'পেশল' শব্দের সাক্ষাৎও না পাওয়া যায়

* উচিতং প্রাহুরাচার্যাঃ সদৃশং কিল যস্য যৎ। (ক্ষেমেন্দ্র)

এমন নয়। এর জন্তে দায়ী আমাদের শব্দ-শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। বিদ্যার্থীদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন এ বিষয়ে হন আর একটু অবহিত এবং অলঙ্কার-প্রয়োগ-সম্বন্ধেও হন আর একটু সংযত। তরুণ মনের ধর্মই হ'ল অহেতুক উচ্ছ্বাস—ফেনিল ভাষার মুকুরে ভাবের মুখ-দেখা। কিন্তু বয়স একটু বাড়লেই বোঝা যায় কত বড় ফাঁকি লুকিয়ে আছে এর তলায়। বস্তুতঃ, ঔচিত্যই হ'ল কাব্যস্যূপের লবণ—মাত্রার তারতম্য হলেই বিপদ, সব লাবণ্য মাটি। ঔচিত্যবোধের সঙ্গেই সংসক্ত আছে প্রসাদাদি যাবতীয় গুণ; রীতি বা বৃত্তি, যত গুণ-গুম্ফিতই হোক না, রসোচিত না হলে তা বন্ধ্যা।

অলঙ্কার-কল্পনার ব্যাপারেও মিতাচার ও উচিতত্তার অভাব দেখা যায় অনেক সময়। কণ্ঠে মেখলা কিংবা কটি-তটে হারের আরোপ, প্রণতের প্রতি শৌর্য কিংবা শত্রুর প্রতি করুণা-প্রদর্শন, ইত্যাদি অনুচিত আচরণ রুচির অভাবই সূচিত করে। ঔচিত্য থেকে বিচ্যুত অলঙ্কারও গুণ না হয়ে হয় দোষেরই আস্পদ; 'বিষায়ন্তে গুণগ্রামাঃ ঔচিত্যপরিবর্জিতাঃ'। অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গীর, ভাবের সঙ্গে ভঙ্গীর সংসক্তিরই অন্ত নাম ঔচিত্য; ক্ষেমেন্দ্র একে বলেছেন কাব্যের জীবন, আর রস তার আত্মা।* বামন যে রীতি অথবা বিশিষ্ট পদ-রচনাকে কাব্যের আত্মা বলেছেন তার কারণ এই যে, একমাত্র অনুরূপ পদ-বন্ধেই রসাপত্তি সিদ্ধ হয়।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি প্রখ্যাত উক্তি স্মরণীয় এই প্রসঙ্গে। তাঁর মতে কাব্যের জন্তে প্রচলিত বাগ্‌রীতিই যথেষ্ট। অকৃত্রিম আবেগ-প্রকাশের জন্ত কৃত্রিম বাক্‌-শৈলী অনাবশ্যক। ভাবের সঞ্চারই যদি তাৎপর্য হয় কাব্যের, তা হলে অলঙ্কার-সম্ভার যে ভার হয়ে থাকে তার দেহে তাতে সন্দেহ নাই। পরে অবশ্য তিনি তাঁর মত একটু বদলে বলেছিলেন, দৈনন্দিন ভাষা কাব্য-রূপায়ণের পক্ষে পর্যাপ্ত হলেও প্রয়োগ-পদ্ধতির নির্বাচন সময় সময় প্রয়োজন হতে পারে। কোলরিজ মোটামুটি এই মত মেনে নিলেও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে পারেন নি; কাব্যে অলঙ্কারের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যয় শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। যাকে বলা যায় 'দীপ্তির দীপ্তি' 'splendour of diction' ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাকেই বলেছেন, 'প্রাণশূন্ত প্রগল্ভ বাগ্‌-জাল' 'gaudy, inane phraseology'। অলঙ্কারের অতিরেক দোষের সন্দেহ নাই, কিন্তু অলঙ্কার-রিক্ততা গুণ কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে। [illegible] সাহিত্যের ধর্ম নয়; বার্তা-সাহিত্য ভারতে নিন্দিতই হয়েছে প্রাচীনকালে, যদিও বাস্তবতার নামে কিছু ইজ্জত পাচ্ছে এ যুগে। তবুও 'লজ্জতে'র কথাটাও একেবারে ভুললে চলবে না; ব্যঞ্জনার আগে আছে রঞ্জনা। মনের দ্বারী হ'ল শ্রুতি; তাকে খুশী করতে না পারলে ভাবের রঙমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র মিলবে না। কাব্যকলার ক্ষেত্রে উচিত মিলে থাকে ললিতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে—এদের বিচ্ছেদে কাব্য-শরীরের অঙ্গহানি ঘটে। কাজেই অলঙ্কারকে একেবারে বহিষ্কার করা যায় কেমন করে? আধুনিক কাব্যে প্রায়ই লক্ষিত হয় ভাষা ও ভূষার মধ্যে এই সঙ্গতির অভাব, যেন রিক্ততা ও অতিরিক্ততার মধ্যে কোন মধ্য-পন্থাই নেই। অলঙ্কার-শাস্ত্রে স্বভাবোক্তির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে বিস্তৃতভাবে; এর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে এই-রূপে—'চারু যথাবদ্ বস্তু-বর্ণনম্'। যথাযথ বস্তু-বর্ণনার আদিতে 'চারু' বিশেষণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বস্তুর প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রেখে এবং কোনরূপ অঙ্গহারের সাহায্য না নিয়ে চারুতা সম্পাদন করতে হবে। অবশ্য চারুতা বলতে তাঁরা বুঝেছেন অগ্রাম্যতা। গ্রাম্যতার সপক্ষে ওকালতি করেও চারুতার কথা শেষ পর্যন্ত চিন্তা করতে হয়েছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে। এ দেশে কিন্তু আভরণকে আবরণ বলে মানা হয় নি কোন দিনই, যদিও তার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বীকার করা হয়েছে। বাহ্য, আভ্যন্তর ও বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে নিরূপিত হয়েছে এর ত্রিবিধ রূপ। বস্ত্র-মাল্য-মণ্ডন প্রভৃতি বাহ্য, দন্তপরিকর্ম অলক-কল্পনা প্রভৃতি আভ্যন্তর, স্নান-ধূপ-বিলেপন প্রভৃতি বাহ্যাভ্যন্তর; অন্ত কথায় শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার এবং শব্দার্থ-অলঙ্কার। কিন্তু শরীরীকৃত না হলে হার ভার হয়ে চেপে থাকে অঙ্গে। 'সঙ্গত' যখন ছাপিয়ে ওঠে সঙ্গীতকে, সঙ্গতির অভাব ঘটে তখনই। সত্যকার অনুভূতি ও আবেগ অভিরূপ চিত্র-কল্পনার মধ্য দিয়েই মূর্ত করে আপনাকে। 'রসাক্ষিপ্ত' অনুভূতিগুলি অভিব্যক্তির আমুখে একযোগে রূপ নিয়েই ফুটে ওঠে, কাজেই প্রকাশ-রূপ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্কেতগুলির একটি বিশেষ সাঙ্কেতিক তাৎপর্য আছে এবং অন্তরের গূঢ়তম অনুভূতিগুলি শুধু সঙ্কেতময় রূপকের ভাষাতেই প্রকাশিত হতে পারে। আত্মাকে যেমন দেহসত্তা থেকে পৃথক করা যায় না, ঠিক তেমনি রসকেও তার প্রকাশ-শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়; বিশ্বনাথের কথায় 'প্রকাশ-শরীরাদ্ অনন্য এব হি রসঃ'। অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করতে হয় যে বচনের মধ্য দিয়ে তা কখনই উপমা-নিরপেক্ষ হতে পারে না। 'পূর্ব [illegible], চন্দ্রের উদয় হয়েছে আকাশে, পাখীরা সব ছন্দে

---

* [illegible] (ক্ষেমেন্দ্র)

দলে চলেছে কুলায়ের দিকে' ; এই বার্তা বা স্বভাবোক্তিকে কাব্য বলা চলে কি ? বাক্যকে কাব্য-প্রপানকে পরিণত করতে হলে উপমা-রূপকাদির সংযোগে তাকে বিশিষ্ট করে তুলতেই হবে। তবে বচন-রচনার যে বিশিষ্টতা আসে ব্যক্তিগত উৎকেন্দ্রিকতা থেকে তার মধ্যে প্রশংসার কিছু নেই ; মুদ্রাদোষ বিশিষ্ট হলেও তা দোষই। লেখাটা 'অমুকে'র বলে চেনা গেলেই তার মূল্য বেড়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি বিশিষ্ট তাঁদের কল্পনার মৌলিকতা তথা কলা-কর্মের অনন্যতায়। এঁদের বাগভঙ্গীর প্রস্মতা এসেছে দৃগ্‌ভঙ্গীর সূক্ষ্মতা থেকে। স্টাইলের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে মনীষী বাফোঁ বলেছেন, 'Style is the man himself'—স্রষ্টা মানুষটি তার সৃষ্টি থেকে অভিন্ন—প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তার অন্তরতম সত্তাটি উদ্‌ভাসিত হয়। ফ্লোবেয়ার স্টাইলকে বলেছেন, 'স্বকীয় ভঙ্গীতে জীবনের আস্বাদ'। জীবন দর্শনের এই স্বতন্ত্রতাই সাহিত্য ও শিল্প-কলার উদ্ভব-ভূমি।' শেকভ বলেছিলেন গোর্কিকে, 'তুমি রূপদক্ষ, তোমার সংবেদনা গভীর ও গঠনশীল ; তোমার বর্ণনাগুলিতে রয়েছে তোমার নিজের হাতের সুস্পষ্ট স্পর্শ। এই ত চাই।' কথাচ্ছলে-বলা তাঁর এই মন্তব্যটি থেকে যে জিনিষটি পাই সেটি হ'ল ভাব ও রূপের অব্যবহিততা ও অনিবার্যতা। জগৎ ও জীবনকে নিজের চোখে দেখা এবং অনুভূত সত্যটি মনের ছাঁচে যে রূপে ধরা দেয় ঠিক সেই-রূপেই তাকে তুলে ধরা রস-লক্ষ্যে পৌঁছবার একমাত্র পথ। সজীব ও উজ্জ্বল অনুভূতিই সাহিত্য-সৌন্দর্যের আকর, কারণ, এই অনুভূতি একান্ত বিশিষ্ট। বিশিষ্টতা-প্রসঙ্গে কবি-গুরু গ্যেটে বলেছেন, সামান্য বা অবিশেষকে নিয়েই কবির কারবার, কিন্তু এই সামান্যকে অসামান্য বা বিশেষ করে তোলার মধ্যেই নিহিত আছে শিল্পের শক্তি, এবং এই বিশেষ দৃষ্টির উপরই শিল্পের প্রতিষ্ঠা। উদ্‌ভিদ্যমান প্রত্যেকটি ভাব অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে পরিণত হয় ভাব-মূর্তিতে। কবির কাজ, মনোলীন সেই ভাবরূপটিকে অপরের আস্বাদ্য রস-রূপ দেওয়া ; এর জন্যই প্রয়োজন হয় শিল্প-কৌশলের। একটি অনুচ্ছেদকে কাটকুট করে অভীষ্ট-গঠনটি দিতে ফ্লোবেয়ারের মত কথা-কোবিদেরও দিনের পর দিন চলে যেত। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁদের রচনায় কাটকুট বড় কম করেন নি। দূর থেকে দেখে যে কাব্য-বিগ্রহটিকে অনায়াস-প্রসূত বলে মনে হয় তার পিছনে যে কি প্রয়াস লুকিয়ে আছে বাইরের লোকে তা জানতেও পারে না। আসল কথা, মনের নিভৃত ভাবচ্ছবিটিকে সহৃদয় সামাজিকের আস্বাদযোগ্য করে তুলতে হলে রূপ-স্থাপনায় বিন্যাস-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে ; প্রতি রূপটি অভিরূপ না হলে রসাপত্তিতে ব্যাঘাত ঘটে।

সেক্সপীয়রের রচনা প্রতিরূপ-কল্পনায় বিশিষ্ট ; কালি-দাসের উপমা ত অনুপমা, আর উপমার যাদুকর রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই উপমা-সম্ভারের জন্যে এঁদের সৃষ্টি রসভ্রষ্ট হয়েছে কি ? বিশ্ব-জীবনের সঙ্গে আত্মজীবনের অন্তরঙ্গতাই এঁদের অনুপম কারু-সৃষ্টির নিভৃত উৎস। ভামহ বলেন, সাহিত্যের আয়তক্ষেত্র অলঙ্কারের অঙ্গহারে পরিব্যাপ্ত। গূঢ় গভীর অনুভূতিগুলির যথাবৎ বর্ণনা সম্ভব নয় ; কাজেই আশ্রয় নিতে হয় বক্রোক্তির। বাক্যের বাচ্যার্থ প্রসারিত হয় এই বক্রোক্তির সাহায্যেই এবং স্ফুরিত হতে থাকে সহৃদয় শ্রোতার অন্তরে ; বাক্য সমাপ্ত হয়ে গেলেও তার অনুরণন থামে না। এক অর্থে বক্রোক্তিমাত্রই অলঙ্কার, স্বাদহীন সাদা কথাও অপূর্ব হয়ে ওঠে ভাষণ-ভঙ্গীতে। বামনের মতে চারু যা, সুন্দর যা তাই অলঙ্কার।*

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : 'মাষ্টারমশাই মাঝে মাঝে আমাদের পাঠমরুস্থলীর মধ্যে ছাপান বহির বাহিরের দক্ষিণ হাওয়া আনিবার চেষ্টা করিতেন।' এই বাক্যটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বক্রোক্তির সাহায্যে যে অনন্যতা ও অপূর্বতার স্বাদ এনে দিয়েছেন, স্বভাবোক্তির দ্বারা তা কখনই সম্ভব হ'ত না। যদি বলা যেত 'মাষ্টারমশাই আমাদের পড়ার বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের বইও পড়তে দিতেন ; তা হলে তথ্যের দিকে থেকে হয়ত তা ত্রুটিহীন হ'ত, কিন্তু তার আস্বাদ হয়ে যেত অনেক ফিকা। মোট কথা, সোজা সাদা কথার বদলে কাকু বা শ্লেষ দিয়ে ঘুরিয়ে বলতে পারলে তার ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি বেড়ে যায় অনেকখানি, আর এই ধ্বনি থেকেই হয় রসের উৎপত্তি—মনের রসনায় লেগে থাকে তার স্বাদটুকু। আবার দেখুন : 'চেনাশোনার সাঁঝ-বেলাতে' অথবা 'ফিরেছিলে আপন মনের গোপন অলিগলি'—উক্তি দুটির মধ্যে অলঙ্কারগুলি এমন একাত্ম হয়ে মিশে আছে ভাবের সঙ্গে, যে তাদের অলঙ্কার বলে আর চেনাই যায় না ; অভিনব গুপ্ত একেই বলেছেন, রসবদ্ অলঙ্কার। বক্রোক্তির উপযোগ ভিন্ন এদের অর্থের রমণীয়তাটুকু আসত কি ? আর চলতি কথাতেই কি আমরা অজ্ঞাতসারে কম অলঙ্কার ব্যবহার করি ? একটা উদ্বেগ কেটে গেলে আমরা কি বলে উঠি না, 'বাঁচা গেল ; কি ভাবনা যে হয়েছিল ; ঘাম দিয়ে এখন জ্বর ছাড়ল।' আমরা 'জলের মত টাকা খরচ করি', 'বাদুড়-ঝোলা হয়ে ট্রামে বাসে যাওয়া-আসা করি,' 'হাটের

---

* 'বাবস্তো হৃদয়াবর্জকা অর্থপ্রকারাস্তাবস্তোঽলঙ্কারাঃ'

মাঝে হাঁড়িও ভাঙি।' খুঁটিয়ে তালিকা দিতে গেলে 'মহাভারত' হয়ে পড়বে। ফল-কথা, আবেগের ভাষাই হ'ল বক্রোক্তি, এ ছাড়া অন্য পথ নেই। ভূষণ দূষণ হয়, মধু বিষ হয়ে ওঠে তখনই যখন হয় তার অপচার। যাথাতথ্য সাহিত্যের ধর্ম নয়; জীবনের উজ্জীবন, লৌকিকের অলৌকিকে উদ্‌গতিই তার প্রাণ। ব্যঙ্গ্যার্থের অভিব্যঞ্জনের শক্তি নেই যে ভাষার সে ভাষা সাহিত্যে অচল। বক্রোক্তি-প্রসঙ্গে আচার্য মম্মট বিশেষ করে কাকু এবং শ্লেষের উল্লেখ করলেও রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদক অথবা রসোদ্বোধক প্রত্যেকটি অলঙ্কারই এর আওতায় পড়ে। বিশ্ববিশ্রুত মনীষী এরিস্টটল-এর অভিমতটি এই প্রসঙ্গে প্রাণধানযোগ্য—'প্রকৃত বাস্তবতা প্রাকৃত বাস্তবতা থেকে স্বতন্ত্র। বস্তু সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি ভাব-কল্পনার দ্বারা অনুবিদ্ধ না হলে তা সৃষ্টি হয়ে ওঠে না।' অমূর্ত 'সত্য' রস-মূর্তিতে আরোপিত হলে তবেই হয় 'সুন্দর'। সাকারের উপাসক কবি—সুন্দরের সাধক; অরূপকে অপরূপ অর্থাৎ বিশিষ্ট বাণীরূপ দেওয়াই তাঁর ধর্ম। বাগ্‌-ধেনু থেকেই ক্ষরিত হয় রসদুগ্ধ; যে রীতি বা বৃত্তি রস-রূপায়ণের যত অনুকূল সেই রীতি বা বৃত্তিই সাহিত্যের পক্ষে তত উপযোগী। শিল্পজীবী ও শিল্পীর মধ্যে ভেদরেখা টেনে দেয় ঔচিত্য-বুদ্ধি।

ঋতু-বাসর

শ্রীকৃষ্ণধন দে

গ্রীষ্ম

বুক-ফাটা মাটি যেথা এক ফোঁটা জল চায়
দুপুরের ঝলসানো আকাশের প্রান্তে,
রং-হারা পাকা পাতা টুপ্‌টাপ্‌ ঝরে' যায়
কখন যে সেটা কেউ পারে নাক' জানতে।
হিস্ হিস্ লাগল যে কা'রা ছুরি শানাতে,
আগুনের হল্‌কায় দুই চোখ বাঁধল,
পুকুরের কাদাজল ভরে পচা পানাতে,
জিরজিরে গরুগুলো কা'রা গোঁজে বাঁধল।
ঘাস সব জ্বলে যায়, খাঁ-খাঁ করে সারা মাঠ,
হা-হা করে মেঠো ঝড় বুক-ফাটা হাসিতে,
উলুখড় শুয়ে যায়, বাঁশঝাড় নুয়ে যায়,
তালগাছ ছুঁয়ে যায় ওড়া-ধূলিরাশিতে।
এক ফোঁটা নীল নেই, পুড়ে যেন যায় চোখ,
আকাশ দেউলে হ'ল সব নীল হারিয়ে,
নেই "বউ-কথা-কও," নেই আজ "খোকা-হোক,"
পাতা-ঝরা গাছগুলো কাঁপে ঠায় দাঁড়িয়ে।

বর্ষা

ব্যাংদের ঘ্যাং-ঘ্যাং, আকাশের গুর্-গুর্,
স্যাঁত-সেঁতে পথঘাট উদাসীন সাজল,
ডোবা-খানাখন্দ-নালা জলে টই-টুম্বুর,
বৃষ্টির ঝুম্-ঝুম্ চারদিকে বাজল।
বকগুলো গাছ ছেড়ে বিলে এসে করে ভিড়,
ঝাপ্‌টায় সাদা ডানা এলোমেলো বাতাসে,
রূপের দেমাকে কেয়া ফেটে হ'ল চৌচির,
ছেয়ে গেল নদীতীর ভিজে বন-কাপাসে।
মেঘে মেঘে বাড়ে বেলা আঁধারের দেশে যে,
কালো মাঠে ঝড় বুঝি অভিমানে ফুলছে,
বীজধান-চারাগুলো সবুজেতে গা মেজে
পুবের হাওয়ার তালে মাথা নেড়ে দুলছে।
মনে হয় এ পৃথিবী রাত-দিন কাঁদে বুঝি,
চাঁদ আর সূর্যিকে ফেলেছে সে হারিয়ে,
সান্ত্বনা পেতে তাই লয় বিদ্যুতে খুঁজি,
মেঘে মেঘে সেও দেয় হাতখানি বাড়িয়ে।

শরৎ

নীল ও সবুজে আজ বাঁধে মিতালির ডোর,
আলোছায়া লুকোচুরি খেলে মাঠে দুপুরে,
কামরাঙা-ডালে বসে ঘুঘু ডাকে দিনভোর,
মাছরাঙা উড়ে উড়ে ডুব দেয় পুকুরে।
নীচে সাদা কাশফুল সাদা মেঘে ডাকে—"আয়,"
হাসে আজ ফুলে-ফুলে-আলো-করা বন যে,
আকাশের বুক চিরে বক-সারি উড়ে যায়,
বোঁটা-রাঙা শিউলিরা চাঙ্গা করে মন যে!

বহুদিন পরে আজ দল বেঁধে প্রজাপতি
বন-সেঁজুতির ডালে ভিড় করে বসল,
ফড়িং-এর ছোঁয়া পেয়ে শিহরে "লজ্জাবতী",
জড়সড় হতে গিয়ে নীলফুল খসল।
কে যেন ছড়ায়ে গেছে মাঠে খৈ মুঠো মুঠো,
সাদা সাদা ঘাস-ফুল দোল খায় হাওয়াতে,
সাঁওতাল ছেলে ভাবে আকাশের নেই ফুটো,
জলঝরা থেমে গেছে দেওতার দয়াতে।

হেমন্ত

ধানে ধানে ভরা মাঠ, ঝলমলে পথঘাট,
রোদ-যে পরশমণি দেয় সোনা ছড়িয়ে;
কলমিলতার ফুল বাতাসে দোদুল-দুল
পুকুরের বুকে দেয় সাতনরী ছড়িয়ে!
শিশিরভেজানো মাটি, ফুটেছে আলতাপাটী,
ফুটেছে শাপলা ফুল ডোবা বিলখানাতে,
পুঁই-মাচা আলোকরা মেটুলিতে রংধরা,
রোদ্ করে ঝিক্‌মিক্ শালিকের ডানাতে!
সুর ওঠে সারাদিন পাকাধানে ঝিন্-ঝিন্,
লক্ষ্মী এলেন যেন বাজায়ে নূপুর,
শঙ্খচিলের ডাকে টুনটুনি বসে থাকে
পাতার আড়ালে ভয়ে সারাটি দুপুর।
পেয়েছে হিমের ছোঁয়া নেমেছে কুয়াশা ধোঁয়া,
খেজুর রসের বাসে মাতে সমীরণ,
রাতের নূতন হিমে গাছভরা কচি সিমে
শিশির বাঁধিতে চায় চাঁদের কিরণ।

শীত

উত্তুরে বাতাসের সপাসপ বেত খেয়ে
গাছ থেকে টপাটপ পাকা পাতা ঝরল,
রাশি রাশি কাটা ধান পড়ে আছে ক্ষেত ছেয়ে
গন্ধ-উতলা মাঠ কোন্ মায়া ধরল!

বাষ্পের আবছায়ে আকাশে সূর্য্যি ওঠে
বাধা আর নাই তার পানে চোখ মেলিতে,
শীতে হয়ে জড়সড় বুড়োরা রৌদ্রে জোটে,
ছেলেরা-যে ভুলে যায় পথে-ঘাটে খেলিতে।
সাঁঝ কি সকালে আর নদী বা দীঘির কূলে
ওঠে না মধুর ধ্বনি কাঁকনে ও কলসে,
উত্তুরে হাওয়া আসে সাম্যের ধ্বজা তুলে,
নাহি আজ ভেদাভেদ শ্রমী আর অলসে।
হিমময়ী রাত্রি কি সেজেছে তপস্বিনী,
কুয়াসার ছাই মেখে যোগাসনে বসল?
রুক্ষ তরুর শাখা যেন জটা-লম্বিনী,
ধরণীর শ্যাম-স্নেহ-বন্ধন খসল?

বসন্ত

বসন্ত দিল রং মনে বনে ছড়ায়ে,
আকাশে বাতাসে নামে পুলকের বন্যা,
মঞ্জুল কুসুমের উত্তরী উড়ায়ে
বনানী যে দেবদাসী নর্ত্তনধন্যা।
আম্র-মুকুল-ঝরা গন্ধ-উতলা পথে
মন যেন হতে চায় সুদূরের যাত্রী,
তৃষ্ণা-বিধুরা দিবা আসে কল্পনারথে,
মঞ্জু-স্বপনে আসে বিহ্বলা রাত্রি।
চম্পার অভিসার কনক-প্রদীপ জ্বালি';
বকুলের সৌরভে বনবীথি উতলা,
কুঙ্কুমরঙা ফুলে পলাশ ভরেছে ডালি
কৃষ্ণচূড়ায় কার দোলে পীত-মেখলা!
আকাশ দিয়েছে ডাক সাজি' বরসজ্জায়,
গোধূলির মেঘে-আঁকা স্বপনের পুরীতে,
"কথা কও"—ডাকে পাখী, ধরণী যে লজ্জায়
রাঙা হ'ল কিংশুক-অশোকের কুঁড়িতে।

দ্বন্দ্ব

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ব্রজেশের পত্র পড়ে আকাশ থেকে পড়লেন সুষমা। এর আগেও ত অনেকগুলি পত্র এসেছে—এমন তাৎপর্য্যহীন বেসুরো কোনটাই নয়। বিয়েটা ওদের নতুন হয় নি, অভিভাবকদের বাচাই-পছন্দেও শুভকাজ সুসম্পন্ন হয় নি। রীতিমত না হোক, পূর্ব্বরাগের সামান্য ছোঁয়াও যেন ছিল। এই পত্র পড়ে মনে হয়—কিন্তু কেন এমন পত্র লিখল ব্রজেশ?

পত্রখানি আর একবার তুলে ধরলেন চোখের সামনে। এইবার নিয়ে চার বার পড়া হবে। লেখা স্পষ্ট, অর্থ কিন্তু স্পষ্ট নয়।

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

মা, আশা করি আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল। আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলটা যদি এই সঙ্গে জানাতে পারতাম। অবশ্য দেহের দিক দিয়ে স্বাস্থ্য আমাদের ভালই, সর্ব্বাঙ্গীণ বলতে পারছি না—মনটা জড়িয়ে আছে বলে। কেন এমন ঘটল—জানি না। মিতা কিছু দিন থেকে কি যেন ভাবছিল। প্রায় লক্ষ্য করছিলাম—মোটর-ভ্রমণে ওর স্পৃহা কমে গেছে, আলাপে উচ্ছ্বসিত হয় না, আহারেও কেমন বিতৃষ্ণা।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, শরীর খারাপ?

একটু হেসে বলল, না।

ভাবলাম শহরের একঘেয়েমিতে অমন হয়েছে। বললাম দেশে যাবে?

ও খুশী হয়ে উঠল। বলল, যাব। কবে যাবে?

বললাম, কালও যেতে পারি।

বেশ—কালই চল।

ওর আগ্রহ দেখে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি এখানে।

জানেনই ত কয়েকটা মৌজা নিয়ে এখানে একটা তালুক আছে আমাদের। এখানকার কাছারীবাড়ীটা ঠিক নদীর ধারে। তার পিছনে—একেবারে নদীর উপরেই একটা ইমারত তুলেছিলেন বাবা। বিঘাকতক জমি পাঁচিল ঘিরে—নানা ফলফুলের গাছ বসিয়ে মাঝখানে বাংলো প্যাটার্ণের একখানা দোতলা বাড়ী। সেই বাড়ীর বারান্দা থেকে চাইলে সামনে পিছনে—সব জিনিসই পটে আঁকা ছবির মত দেখায়। মিতা খুশী হয়ে উঠল—আঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

রহস্য করে বললাম, শহরের ধুলা আর ধোঁয়ার বুঝি হাঁপ ধরে-ছিল?

না—ধুলা শহরে নেই। [illegible] না। [illegible] ওদের [illegible]

চেহারা—দেখলেই মনে হয় তেরশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ বুঝি আবার ফিরে এল।

তা ওদের এত ভয় কেন তোমার? ওরা তোমার গা ঘেঁষে দাঁড়ায় না। বললাম।

না হোক, ওদের সহ্য করতে পারি না। কেমন তোমাদের সরকার—এদের বিলিবন্দেজ করতে পারে না।

বললাম, সরকার ত চেষ্টা করছেন প্রাণপণে—

ও উত্তেজিত হয়ে উঠল, ছাই চেষ্টা! তা হলে দিন দিন ওদের সংখ্যা বাড়ত না।

বললাম, জান, ভারত ভাগ হয়ে উদ্বাস্তুর সংখ্যা কত বেড়েছে? সরকার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন এ সব সামলাতে।

এমন ভাগ করা দেশ নেওয়া কেন? যাই বল বাপু—শহরটা আর বাসের যোগ্য রইল না।

বললাম, তোমার কথাগুলো আর কেউ শুনলে ভাববে—তুমি ওদের ঘৃণা কর।

এই কথায় ওর চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। ভিজে গলায় বলল ও, সত্যি না। ঘেন্না ওদের একটুও করি না। দেখে কষ্ট হয়, মায়া হয়, সহ্য করতে পারি না।

জানি না কেন ওর এই ভয়? এই ছবির মত জায়গায় যদি ওর মন সুস্থ হয়—যদি ভয় ঘোচে—জানব এখানে আসা সার্থক হ'ল।

কয়েকটা জিনিস আমায় জানাবেন কি? ওর খুব ছেলেবেলা-কার মনের ভাব। মানে সেই সময়ের খেয়াল-খুশি আবদার রাগ কিংবা আনন্দ কোন্ কোন্ ব্যাপারে বেশী করে ফুটে উঠত। অবশ্য এত কাল পরে সে সব মনে আনাও শক্ত। তবু একটু চেষ্টা করে যে ঘটনাগুলো বিশেষ ভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল—সেইগুলি যদি জানান। জানতে চাইছি এই জন্যে—একজন মনোবিদ্ ডাক্তার-বন্ধু আমাকে এই সব তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছেন। এলোমেলো ঘটনার সূত্রোগুলো এক করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান তিনি। তিনি বলেন, এটা অবহেলার বস্তু নয়। এই মনের ভাবকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

আপনার চিঠি পেতে দেরি হলেও ক্ষতি নাই। ঘটনাগুলো এক সঙ্গে মনে না পড়ে—একটু একটু করে জানাবেন। আমি সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে নেব। ঘটনার পাশে ওর বয়সটা উল্লেখ করবেন। সম্ভব হলে সালটিও। আর কিছু না।

চিঠি পড়ে নতুন করে ভাবতে বসলেন সুষমা। পৃথিবীতে নানা [illegible] মানুষ, [illegible] হয়। একজন যা জানবেন

—অন্যের তাতে বিরাগ। একই বস্তুতে আসক্তি বা উপেক্ষা রুচি অনুযায়ী ঘটে। এর মধ্যে বিপদটা কোথায় তিনি বুঝতে পারেন না। কিন্তু ব্রজেশ যা লিখেছে—ভয়ের ব্যাপারই। এমন দু'একটি দৃষ্টান্ত তাঁর মনে পড়ল। পাড়াতেই দেখেছেন। বসু-গৃহিণী তাঁর সমবয়সী। বউ হয়ে দু'জনে প্রায় এক সময়ে এই পাড়াতেই আসেন। প্রথম থেকেই জয়া (বসু-গৃহিণী) ফিটফাট থাকত। অগোছাল ঘর দেখলে ও দু'দণ্ড সেখানে বসত না। কাউকে সকাল বিকেল একই কাপড় পরে থাকতে দেখলে মন্তব্য করত—স্বাস্থ্যের পক্ষে ওই অভ্যাস মোটেই ভাল নয়। সেই জয়া গৃহিণী হয়ে বাড়ীটা আয়নার মত ঝক্‌ঝক্ করে রেখেছিল। ওর ঘরে একটি জিনিসও অগোছাল পড়ে থাকত না, সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যেত। তার পর? সেই জয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে হয়েছে এক শুচি-বায়ুগ্রস্তা রমণী। উচ্ছিষ্ট অনাচার নিয়ে খুঁতখুঁতুনি নয়—খুঁতখুঁতুনি ঘর ধোয়ামোছা সাজানো গোছানো ফিটফাট রাখা নিয়ে। দিনরাত ধোয়ামোছা করে হাতে পায়ে হাজা পাঁকুই চিরস্থায়ী বাসা নিয়েছে। ডাক্তার বলেন, এ রোগ সারবার নয়।

সেন-কর্ত্তার ছিল আর এক বাই। রাত্রিতে তিন চারবার উঠে পরীক্ষা করতেন শোবার ঘরের দরজায় ভাল করে খিল আঁটা হয়েছে কিনা। তার আগে সদর অন্দর সব দরজায় লাগাতেন চাবি। এত করেও তাঁর সন্দেহ ঘুচত না। ক্রমে সন্দেহ গেল বেড়ে—যার ফলে সারা রাত খিল দেওয়ার আর খিল খোলার শব্দ শুনত পাড়ার লোক। তার পরে···রাঁচিতে দু'বছর আছেন, কোন উন্নতিই নাকি হয় নি।

না, এ সব ভাবলেও মনটা কেমন করে ওঠে। মনঃসমীক্ষা নিয়ে ডাক্তাররা যেন বাড়াবাড়ি সুরু করেছেন। সুমিতার কথা ভাল করে ভেবে দেখবেন। মেয়েটি চিরদিনই আদুরে। বেশী বয়সের সন্তান—আর একমাত্র সন্তান। শুধু তাই নয়—ওর জন্মের বৎসরে মিঃ মুখার্জ্জীর পদোন্নতি হয়—মোটা একটা লিফট পান। আরও দু'বছর পরে একশো বিঘে ধান-জমি কেনেন—তৈরি করেন প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ। ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের পদস্থ ব্যক্তি—কন্‌ট্রাক্টাররা ত সর্ব্বদাই শ্রীচরণকমলেষু। এই সম্মান-বৈভব সুমিতা না এলে কি ঘটত? সুমিতা যখন আট বছরের মেয়ে—তখন একটা ব্যাপার ঘটে। ঠিক কথা—এটা লিখে জানাবার মত।

কাগজ কলম টেনে নিয়ে সুষমা লিখলেন :—

১৯৪২ এর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। বিকেলে গাড়ী বার করতে বলেছেন মিঃ মুখার্জ্জী—আমরাও পোশাক বদলে নেমে আসছি—হঠাৎ সুমিতা বলল, মা—সেই লোকটা আজ এসেছিল কেন?

কোন্ লোকটা? শুধোলাম।

যাকে বাবা একমাস আগে টাকা দিয়ে বললেন, এই নিয়ে ব্যবসা করগে—এমন করে কারও কাছে হাত পাততে না। সে দিন ত টাকা দিলেন বাবা, তবে আবার ও এল কেন?

ও বলছে—সে টাকা খরচ হয়ে গেছে।

তবে বাবা আজ টাকা দিলেন না কেন?

রোজ রোজই কি টাকা দেওয়া যায়? বললাম।

কেন—বাবা ত মেলাই টাকা উপার্জ্জন করেন—তার থেকে ত দেওয়া যায়।

রাগ হ'ল মেয়ের অবুঝপনায়। বললাম, আছে বলেই দিতে হবে তার মানে কি? যখন চাকরি থাকবে না—কোত্থেকে তখন টাকা আসবে? সব দিয়ে থুয়ে শেষ পরে ওর মত কি ভিক্ষে করবেন?

ব্যস, যেমন বলা—মেয়ে গুম্ হয়ে গেল। আর কোন কথা না বলে নেমে এল, মোটরে বসল। সারাটা পথ প্রায় চুপ করেই রইল। উনি বললেন, বেবি, চুপ করে আছিস যে?—এমনি। তার পর বাড়ী ফিরে অবশ্য অনেক কথা বলল। কিন্তু আসল কথাটা যে ভোলে নি—সে বুঝলাম শোবার সময়। বলল, মা দিলেই বুঝি জিনিস ফুরিয়ে যায়?

বললাম, যায়, আবার যায়ও না।

ও বলল, কি জিনিস ফুরায় না।

কেন—বিদ্যা। পড়িস নি—যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

ও বলল, ও হ'ল আলাদা জিনিস। কিন্তু টাকা? ফুরায় ত?

ফুরোয়। এখন ঘুমো। এই ত সামান্য ঘটনা—এর থেকে তোমার মনঃসমীক্ষক কি তথ্য খুঁজে পাবেন বলতে পার?

উত্তর এল দিন কয়েক পরে :

এমনি ছোটখাটো ঘটনা, কিংবা এর চেয়েও তুচ্ছ ব্যাপার, যা 'কিছু না' বলে শুনবার পরমুহূর্ত্তে ঠেলে দিই বিস্মৃতির অতলে—অবশ্যই জানাবেন। আমার বন্ধু নোট রাখছেন এবং এর থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন—আশা করি।

তা হলে আরও ছোটবেলা থেকে আরম্ভ করব কি? ভাবলেন সুষমা। যে বয়সে আকাশের চাঁদ ধরে দেবার বায়না ধরে ছেলে-মেয়েরা—আর না পেলে কাঁদে, সেই বয়স থেকে—না রাজপুত্র রাজকন্যার গল্পে পক্ষীরাজ ঘোড়া আর সাত সমুদ্র তের নদীর কথা জানতে চাওয়ার ক্ষণে—অর্থাৎ আধজ্ঞানের সময় থেকে শেষ ঘটনাগুলি? হাঁ—মনে পড়ছে একটি কথা। মেয়েটি যে পরের দুঃখ দেখতে পারে না—তেমন ঘটনা একটি মনে পড়ছে।

সুষমা লিখলেন :

বেবীর বয়স তখন পাঁচই হবে—একটা জিনিস হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একদিন। জান ত—বাংলা দেশে একতারা বা খঞ্জনী বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে ভিখারী বৈরাগীরা। বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছে—জয় রাধে কৃষ্ণ বলে সাড়া জাগিয়ে গোপীযন্ত্রে সুর তোলে

সখী-সংলাপ

দম্পতি [ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

মজুর রমণী

চাষী

[ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

এবা ; এরা ঘুম ভাঙলেই—যেখানে থাক—ছুটে আসত সদর দুয়ারে। এমনকি আমার কোলেও ছুটত। ভিখারীরা ওকে আদর করে ডাকত—রাজরাণী। কেউ বা বলত—শুধু রাণী। আমি হয় ত ছোট রেকাবীতে করে চাল নিয়ে আসছি—ও আমার হাত থেকে সেটা টেনে নিতে চাইত। বুঝতাম—নিজের হাতে ভিক্ষে দিতে চায়। ওর হাত দিয়েই দেওয়াতাম ভিক্ষে। ভিখারীরা খুশী হয়ে বলত—রাজরাণী হও মা। আনন্দে ওর মুখখানা ঝক্‌ঝক্ করে উঠত। আর একটু বড় হলে নিজেই সাজিয়ে আনত রেকাবি। চালের সঙ্গে একটা আলু—কখনও একটি পয়সা—কখনও বা দু একখানা বাতাসা।

এক এক দিন বলত, আচ্ছা মা, ওরা যা বলে সত্যি হয়?

মেয়েকে খুশী করবার জন্য বলতাম, একমনে প্রার্থনা করলে কেন হবে না। দেখিস তুই রাজরাণী হবি।"

আর একখানা পত্রে লিখলেন :

কিন্তু বাবা—মেয়ে জেদীও ছিল ভীষণ। যেটি চাইত—না পেলেই এমন করত। অবশ্য কান্নাকাটি রাগ গোসা এসব কিছুই না। মনেই হ'ত না—চাওয়া জিনিষ না পেয়ে ওর দুঃখ হয়েছে। সে সম্বন্ধে পরে কোন উচ্চবাচ্য না করাতে বরং মনে হ'ত—ওর চাওয়াটা সাময়িক খেয়াল মাত্র। অবশ্য চাওয়ার অবকাশও মিঃ মুখার্জী দিতেন না। ছেলেরা যা চায়—সে সব অমনিই আসত, যা চায় না—তাও নিজের পছন্দমত কিনে আনতেন।

একদিন ও বলল, মা, তোমরা নিয়ম করে দিয়েছ—ভিখারীরা শুধু রবিবারে আসবে। অন্য দিন এলে ভিক্ষে দাও না কেন?

বললাম, ছুটির দিন হাতে সময় থাকে—ভিক্ষে দেবার সুবিধা, তাই

কেন, আমার ত কাজ নেই, আমি ওদের ভিক্ষে দেব।

দিলেও ভিক্ষে।

সে মাসে হিসেব হ'ল এক মণ চাল বেশী খরচ হয়েছে। মুখার্জি কিছু বললেন না—আমি বুঝলাম—এভাবে ভিক্ষে দিলে চলবে না। শুধু ভিখারীই বাড়ছে না সংখ্যায়—ভিক্ষা-বস্তুর পরিমাণও বাড়ছে। ছোট রেকাবি ভর্তি না হলে ওর মনের খুঁত-খুঁতুনি যায় না। মেয়েকে আকে-প্রকারে বললাম, শুনে মানল না।

বললাম [illegible] [illegible] রোজ দাঁড়িয়ে থাকতে। রবিবার ছাড়া ভিখারী এলেই ও যেন তাড়িয়ে দেয়।

পরের দিন ভিখারী এলো না। মেয়ের কি আকুলতা! হাঁ মা—আর কেউ এলো না কেন? সবাই কি অসুখ করেছে? বললাম, [illegible] [illegible] [illegible] গেছে। মেয়ের মুখের হাসি দূর হ'ল। পরের দিন [illegible] বললাম, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মেলায়। [illegible]

[illegible] [illegible]

পাঁচ দিনের দিন মেয়ে বলল, আর? বললাম, হয়ত কোন মেলায় গেছে। সপ্তদিন দিন ধরে মেলা চলে কিনা। এই কথায় মেয়ের মুখের ছায়া দূর হ'ল না। হয়ত ভাবল—না জানি ওরা কতদিনে আসবে।

ওরা রবিবারেই এলো। সেদিন নিষেধের বেড়া দেওয়ার দরকার হয় নি। চাকরটা বাজারে গিয়েছিল। ভিখারী আসতেই মেয়ের সে কি আনন্দ। ভিক্ষে দিতে ছুটল। বলল, হাঁ গা—তোমরা এ ক'দিন আস নি কেন? নেমন্তন্ন কেমন খেলে? কোথায় মেলা দেখলে?

দোতলার বারান্দা থেকে ওর প্রতিটি কথা শুনতে পেলাম।

কিন্তু তখন হাতের চিল ছুটে গেছে, হাত-পথ নাই। মেয়ে ফিরে এলো, মুখ থমথমে। আড়চোখে দেখলাম, কিছু বললাম না। দেখি না কি অভিযোগ করে। কোন অভিযোগই করল না। ক্রমে ওর মুখের ছায়া কেটে গেল। বিকেলে দেখলাম—সম্পূর্ণ সুস্থ মেয়ে।

পুনশ্চঃ

আসল কথা—এই ঘটনা যখন ঘটে—তখন ওর বয়স সাত।

পরের রবিবার ভিখারীর সাড়া পেয়েও ও ভিক্ষে দিতে গেল না। আশ্চর্য হলাম। বললাম, কিরে, ভিক্ষে দিবি না? না—শরীরটা ভাল লাগছে না। সে কি রে? গায়ে হাত দিয়ে দেখি—গা ঠাণ্ডা। আশ্বস্ত হলাম। ভিক্ষে দিয়ে ফিরে আসতে বলল, আমার শরীর খারাপ—ভিক্ষে দিলে যে।

ষাট-ষাট। বলে ওকে কোলে তুলে নিলাম।

পরের পত্রে লিখলেন :

তিন বছর পরে ওর ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হয়। ভুগেছিল পনেরো দিন। যেদিন পথ্য করল—আমায় হেসে বলল, মা, মাঝে মাঝে জ্বর হওয়া ভাল—ডাক্তাররা বলেন, নয়?

কি জানি বাপু।

আর সংসারের পক্ষেও ভাল। একটু থেমে বলল।

কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

এই যত না কেন—বাড়তি খরচগুলো বেঁচে যায়। আর খাবার আসে না বাড়ীতে—ভিক্ষে দিতে হয় না।

দশ বছরের মেয়ের মুখে এই কথা! এর থেকে কি অনুমান করবেন—[illegible] [illegible]? তিন বছর আগে সেই ভিখারী [illegible] [illegible] শিশুমনে কোন সময়ই পাকাপাকি ভাবে লাগে না। [illegible] [illegible] হাসি [illegible] অভিলাষের আলোছায়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। যাই হোক, আমি লক্ষ করেছি—[illegible] [illegible] [illegible] ওর চোখ [illegible] উঠত—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এমন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

[illegible]

ওর রুচি প্রবল। কাজেই দুঃখীর দুঃখ-মোচন চিন্তায় ওর মনে অশান্তি থাকতে পারে এ কল্পনা আমরা কেউ করি নি। আজও করি না।

তার পর একখানি দীর্ঘ চিঠিতে লিখলেন :

কাল চিঠিখানা ডাকে দেওয়ার পর একটা ঘটনা মনে পড়ল। সেটা ঘটেছিল আরও পাঁচ বছর পরে—তখন ওর বয়স ষোল ছাড়িয়েছে। সেইবারই ও ম্যাট্রিক দিয়েছে এবং জল্পনা-কল্পনা চলছে কোন্ ডিভিশনে পাস করে কোন কলেজে ভর্তি হবে। সায়ান্স নেবে—না আর্টসে থাকবে সে আলোচনাও চলছে। গ্রীষ্মের বন্ধে ও বলল, পাড়াগাঁ দেখব মা।

পাড়াগাঁয়ে থাকেন এমন আত্মীয়ের নাম মনে পড়ল না—কোন রকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে নিরস্ত করলাম।

দু'দিন পরে সেই কথা, মা—চল না কোথাও।

বললাম, বাংলার বাইরে যাবি ?

না, বাংলার পাড়াগাঁ দেখব। পানাপুকুর, নদীনালা, বন-বাদাড়, মাঠক্ষেত এই সব দেখব।

বুঝলাম, কোন বই পড়ে ছবিটা মনে উজ্জ্বল হয়েছে। বললাম মিঃ মুখার্জ্জিকে।

মিঃ মুখার্জ্জি বললেন, বেশ ত, চল সবাই মিলে যাওয়া যাক।

কোথায় ? কেন আমার পিসীমা এখনও শ্বশুর-ভিটে আগলাচ্ছেন। বিরাট বাড়ী ; শুনেছি পুকুর বাগানও সে দেশে যথেষ্ট। কম শুধু মানুষ। ভয় হয়—যদি ম্যালেরিয়া ধরে ? তা দু'টো দিন ডাবের জল খেয়ে মশারি টাঙিয়ে অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

সেই গ্রামেই এলাম। এত বন দেখব ভাবি নি, এমন প্রকাণ্ড পুরীও কল্পনা করি নি। সদর অন্দর নিয়ে তিনটে মহল। বাড়ীর উঠোনেও গাছপালা—ইমারতের গায়ে বট-অশ্বত্থের চারা ; দালানে বাদুড় চামচিকা আর পায়রা বাসিন্দা। কোনকালে পলস্তারা পড়েছিল দেওয়ালের গায়ে, এখন জরতী নারীর মত পাতলা ইটের পাঁজর বার করে প্রকাণ্ড ইমারত কালের পদধ্বনি শুনছে আর ঝিমুচ্ছে।

এসব দেখে কিন্তু মেয়ের ভারি আনন্দ। এ-ঘর ও-ঘর, সিঁড়ি ছাদ, উঠোন পুকুরঘাট···চঞ্চল পায়ের আর বিরাম নাই।

সন্ধ্যাবেলায় পিসীমাকে বলল, দিদিমা,এগুলো সারাও না কেন ?

পিসীমা হেসে বললেন, নাতনী, পেরে উঠি না যে।

কেন, রাজমজুর ডাকিয়ে আনা কি এমন শক্ত কাজ।

পিসীমা বললেন, আজ ডাকলে ওরা আজই আসবে। কাজ না পেয়ে ওদের অবস্থাও ত ভাল নয়। কিন্তু নাতনী এ ত এক আধ টাকার খেলা নয়, কোথায় পাব টাকা ?

আর কিছু বলল না মিতা—আমাকে রাত্রিতে শুধোল, মাগো, দিদিমার অবস্থা বুঝি তেমন নয় ?

দেখতেই তো পাচ্ছিস। বিষয়-সম্পত্তি সবই খুইয়েছেন। এই ভিটে আর দুটো নারকেলগাছ মাত্র ভরসা। অথচ একদিন ছিল যখন ওঁর দুয়োরে হাতী বাঁধা থাকত।

বল না মা সেই গল্প।

গল্প শেষ করে বললাম, চিরদিন সমান যায় না। কখনও নৌকোর ওপর গাড়ী—কখনও গাড়ীর ওপর নৌকো। অথচ ওঁদের দানধ্যান ছিল অনেক। সেই পথ দিয়েই মা-লক্ষ্মী চলে গেলেন।

খুব দান-ধ্যান করলে এমন হয় বুঝি ? ও শুধোল।

হয় না ? কথায় বলে কলসীর জল ঢালতে ঢালতে ফুরিয়ে যায়। এও তাই। পিসেমশাই মারা যাবার পর পিসীমা সর্ব্বস্বান্ত হলেন।

মেয়ে বলল, দিদিমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।

উনি ভিটে ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

আচ্ছা আমি বলব, দেখি নড়েন কিনা।

বৃথা চেষ্টা। পিসীমা বললেন, যে ক'টা দিন আছি এমনি শান্তিতে যেন থাকি। অনেক সুখ ভোগ করেছি, আর নয়।

ভেবেছিলাম এক সপ্তাহ থাকব, মেয়ে জিদ ধরল, থাকব না।

বললাম, তোদের আসতেও যতক্ষণ—যেতেও ততক্ষণ। বুড়ো বয়সে ভাল লাগে না ঘোড়দৌড়।

এখানে থাকলে আমি অসুখে পড়ব কিন্তু।

মেয়ে নিয়ে এক রকম পালিয়েই এলাম।

ব্রজেশ লিখল : তার পর আর কিছু মনে পড়ে না ?

লিখলেন সুরমা : তার পর কলেজে পড়তে ও হোষ্টেলে চলে গেল, কোনমতেই বাড়ী থাকতে চাইল না। দু' বছরে আই-এ পাস করে ফিরে এলো। তার পর বিয়ের হাঙ্গামা। তা ছাড়া ছেলেমেয়ে বড় হলে তাদের মনে নতুন জগৎ গড়ে ওঠে। সব কথা মা বাপের কাছে খুলে বলে না ত।

কিছু দিন পরে একখানা প্রশ্ন সম্বলিত কাগজ পাঠিয়ে ব্রজেশ লিখল : আমার বন্ধু এই উত্তরগুলি চেয়েছেন—আপনার কাছে। যদি আপত্তি না থাকে—ঘরগুলি পূরণ করে দেবেন।

প্রশ্নাবলী দেখে বিস্মিত হলেন, বিরক্ত হলেন সুরমা। কে এই অদ্ভুত মনঃসমীক্ষক ? মেয়ের রোগনির্ণয় করতে বসে গর্ভধারিণীকে কয়েকটি উদ্ভট প্রশ্ন করেছেন। মনঃসমীক্ষকের নিজের মনের খবর ভাল করে জানা আছে কি ? এই কি প্রশ্নের ধরণ ?

প্রথম প্রশ্ন : ধন ঐশ্বর্য্য আপনার ভাল লাগে কি ?

এ যুগে কে এমন বুদ্ধিহীন মানুষ আছে যে, দ্বিধাহীন ভাবে উত্তর দেবে। না, ভাল লাগে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নও এমনি অবান্তর। অর্থ, অলঙ্কার অথবা সম্পত্তি নষ্ট হলে আপনার খুব কষ্ট হয় কি ?

এ প্রশ্ন সংসারী মানুষকে কোন সংসারী মানুষ করে না। বৈরাগী সন্ন্যাসীকেও কেউ করে না।

সবচেয়ে অদ্ভুত প্রশ্ন পেয়েছি : পৃথিবীতে আপনার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোনটি? অর্থ-সম্পত্তি, স্বামী, কন্যা, কোন বই অথবা আপনি নিজে?

সূক্ষ্ম বিদ্রূপময় হাসি সুরমার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল। আমাকে আমি ভালবাসতে পারি কি? স্বামী নয়, সন্তান নয়, ধন-সম্পত্তি নয়, ধর্ম নয়, লেখা নয়—শুধু নিজেকে নিয়ে থাকা! অহোরাত্র আত্মচিন্তা? যখন প্রেমে ভরপুর—তখনও, যখন স্নেহে বিগলিত—তখনও? সম্পদ গৌরবে পরিপূর্ণ হয়েও—ঈশ্বরকে দিনান্তে স্মরণ করবার সময়েও?

লিখলেন : নিজেকে কে না ভালবাসে? অর্থে কোন সংসারী বীতস্পৃহ? সম্পত্তি নষ্ট হলে কার মন বা অক্ষুব্ধ থাকে? এ সব প্রশ্ন কোন কারণেই সঙ্গত নয়। এর উত্তর ইচ্ছে করেই দিলাম না। আশা করি তোমার মনঃসমীক্ষক এমন উদ্ভট প্রশ্ন আর করবেন না।

কিছুদিন পরে উত্তর এল ব্রজেশের : মা, মনঃসমীক্ষক বলেছেন—মিতার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। বয়স আর একটু বাড়লে ওর মনের দ্বন্দ্ব ঘুচবে। এখন কাঁচা মন আর পাকা মনে বুঝাপড়া চলছে বলেই এত হাঙ্গামা। ও যখন স্বাভাবিক ভাবে ভিক্ষে দিতে পারবে ভিখারীকে, নিজের ছেলেমেয়েদের সাজিয়ে-গুজিয়ে নিজে নিখুঁত প্রসাধন করতে পারবে, আমি তালুক না কিনি ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে পারব প্রচুর এবং ছেঁড়া কাপড়, ময়লা জামা, ভাঙ্গা দেওয়াল, ফুটো চালা, নোংরা বস্তী, হাড্ডিজিরজিরে উলঙ্গ শিশুর মিছিল ভেদ করে আমাদের মোটর চলবে অনায়াস গতিতে—আর সেই গাড়ীতে বসলে দু'ধারের দৃশ্য আমাদের মনে কোন রেখাপাত করবে না—তখনই নাকি আমরা—মানে মিতা আর আমি হব পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্থ মানুষ। এটা আমার কাছেও পরমাশ্চর্য্য মনস্তত্ত্ব, অথচ এইটাই নাকি সাম্প্রতিক কালের পরম সত্য।

এর পরের পত্রে লিখলে ব্রজেশ : কাল লক্ষ্য করলাম—এক জন দুঃস্থ আত্মীয় এসে দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। মিতা তাঁকে একটি টাকা দিয়ে বলল, আর হাতে নেই, থাকলে দিতাম।

আত্মীয় চলে গেলে বললাম, সত্যিই টাকা নেই?

মিতা হেসে বলল, আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। এখানে মিথ্যা এমন ভয়ানক কিছু নয়।

ওর কথা শুনে ভাবলাম কিছুক্ষণ। কথাটা হঠাৎ শুনলে কেমন লাগে। এক কালের আদর্শ বা নীতিতে অল্প ধাক্কা দিয়ে যায়। কিন্তু সে ধাক্কা সামান্যই।

সব কথা বললাম ডাক্তারকে।

ডাক্তার বললেন, অসুখের বড় ধাক্কা সামলেছে মিতা, সামান্য একটু দুর্ব্বলতা আছে শুধু।

আপনি কি বলেন?

রাখালের বেণু

শ্রীকালিদাস রায়

রাখাল, তোমার বেণু আজো বাজে অনুখন,
যে শোনে শিহরি উঠে তার সারা তনুমন।
কালিন্দী উজান চলে
কঠিন পাষাণ গলে
চঞ্চল হয়ে উঠে ভুবনের অনুক্ষণ।

শিহরিয়া উঠে তরু তাই ফুটে কলিফুল,
বেণুতান শুনে ফুলে তাই জুটে অলিকুল।
নদীরে সিন্ধু টানে
ধায় সে বন্ধু পানে,
গৃহী ত্যজে সংসার মোরা তায় বলি ভুল।

সেই বেণুতান শুনে আজো চলে অভিসারে
পাগলিনী কত রাধা কোন বাধা না বিচারে।
যায় তব বেণুরবে
[illegible]
[illegible] বেণু বাজে অমর [illegible]।

তব বেণু বেজে চলে শুনিতে কি সুখে চায়?
যদি শোনে গৃহকোণে মন বসে তবে তার?
পাছে পাছে বেণুতান
[illegible]
[illegible] যায়?

আল্‌-বীরুণীর ভারতীয় ভূগোল

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

১

আহমদের পুত্র আবুরৈহান মহম্মদ আল্‌-বীরুণী নামে খ্যাত। তিনি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল এবং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। গজনীর মামুদের সহিত তিনি ভারতে আগমন করেন। তাঁহার রচিত "তহ্‌কিক্‌ মা লিল হিন্দ" সম্ভবতঃ ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ হইতে আমরা ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভূগোল, জ্যোতিবিজ্ঞান, আচার-ব্যবহার ও আইন-কানুনের বিস্তৃত বিবরণ পাই। রেবার্টির মতে আল্‌-বীরুণীর গ্রন্থের নাম তারিখ-ই-হিন্দ নহে। ডাঃ সাচাউ কর্তৃক আল-বীরুণীর 'ভারত' গ্রন্থখানি বিষয়-সূচি ও ব্যাখ্যাসহ সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আলোচনা-গুলি অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। সুবিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ বিবরণ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ হইলেই আমাদিগের বিশেষ কার্য্যে আসিবে। তাঁহার ভারতীয় ভূগোলের জ্ঞান মনে হয় খুব বেশী ছিল না। তিনি যে মৎস্য, আদিত্য ও বায়ু পুরাণের অংশবিশেষ মাত্র পড়িয়া-ছিলেন, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। চারিটি দিক অনুযায়ী বায়ুপুরাণ হইতে এবং নয় দিক অনুসারে বরাহমিহির-সংহিতা হইতে দেশগুলির নাম তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কূর্মের অবস্থিতি অনুযায়ী ভারতের দেশ এবং জাতিদিগের বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত 'Geographical Essays' গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণের কূর্মবিভাগ বা কূর্মনিবাস অংশে ভারতের দেশের ও জাতির একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই সকল দেশ ও জাতি-সমূহের অধিকাংশ মার্কণ্ডেয় পুরাণের নবখণ্ড অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশ দেশ ও জাতির নাম ঠিকমত নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। আল্‌-বীরুণীও এই মত পোষণ করেন।

আল্‌-বীরুণীর মতে ভালেশ্বর, লোহরাণী, কচ্ছ, বাগ, বারোই, সোমনাথ, কম্বায়ৎ (কাম্বে), তান, লায়ান, বল্লভ, কাঞ্চী বা কাঞ্চী এবং দর্বদ উপকূল স্থান বলিয়া পরিচিত। কচ্ছ ও সোমনাথের জলদস্যুরা সমুদ্রে জাহাজগুলিতে ডাকাতি করিত। দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চীপুর একটি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ বলিয়া খ্যাত ছিল। এই কাঞ্চীপুর দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। নগরের পশ্চিমে শিবকাঞ্চী অবস্থিত। বিষ্ণুকাঞ্চী শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত। শিবকাঞ্চীর মন্দিরটি সবচেয়ে প্রাচীন আর বিষ্ণুকাঞ্চীতে মন্দিরটি পরে নির্মিত হয়। কাহারও কাহারও মতে কাঞ্চী বা কঞ্জিবরম তিনটি ভাগে বিভক্ত—(১) বৃহৎ কাঞ্চী, (২) ক্ষুদ্র কাঞ্চী, (৩) পিলেয়ার কোলিয়াম। এই প্রাচীন নগরটির উপর শৈব, বৌদ্ধ এবং জৈন এই তিনটি ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। কঞ্জি-বরমের কামাক্ষী মন্দির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কৈলাসনাথের মন্দিরে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি আছে। কচ্ছপেশ্বর মন্দিরে কূর্মরূপী বিষ্ণু শিবকে পূজা করিতেছেন দেখা যায়। নগরের পশ্চিমে বিষ্ণুকঞ্জিবরমে বৈকুণ্ঠ-পেরুমল মন্দিরে বিষ্ণুর বহু প্রকার মূর্তি প্রস্তরে খোদিত আছে।

আল্‌-বীরুণীর মতে চীন দেশের নিকটে পূর্ব দ্বীপগুলিকে জাবাজের দ্বীপ বলা হইয়াছে। হিন্দুগণের নিকট ইহারা সুবর্ণ-দ্বীপ নামে পরিচিত। আল-বীরুণী লঙ্কার বিপরীত দিকে অবস্থিত রামেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইতে ২ ফারসাক দূরে অবস্থিত (এক ফারসাক চার মাইল)। দশরথের পুত্র রাম এই বাঁধ নির্মাণ করেন। বর্ত্তমানে ইহা কতকগুলি পৃথক পর্বত মালার সমষ্টি এবং ইহার মধ্যে সমুদ্র প্রবাহিত। আল্‌-বীরুণী লঙ্কাকে পৃথিবীর শিখর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সরণদীব বা সিংগলদীব বা সংগলদীব বা সিংহল দ্বীপ লংকা হইতে অভিন্ন এবং ইহা একটি উপসাগরে অবস্থিত। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং অপর তিন দিকে সুবৃহৎ পর্বত দ্বারা বেষ্টিত আছে।

হিন্দুদের মতে পৃথিবী গোলাকার ও সমুদ্রবেষ্টিত; গলবেষ্টনীর ন্যায় পৃথিবী সমুদ্রে অবস্থিত এবং গলবেষ্টনীর ন্যায় একটি গোলাকার সমুদ্র পৃথিবীতে অবস্থিত। শুষ্ক গলবেষ্টনীর সংখ্যা (যাহাকে দ্বীপ বলা হয়) সাতটি এবং সমুদ্রের সংখ্যা তদ্রূপ। দ্বীপগুলি এবং সমুদ্রগুলি এরূপ ভাবে অবস্থিত যে প্রত্যেক দ্বীপ পূর্ববর্তী দ্বীপের দ্বিগুণ এবং প্রত্যেক সমুদ্র পূর্ববর্তী সমুদ্রের দ্বিগুণ বলিয়া আল-বীরুণী বর্ণনা করিয়াছেন। মৎস্য এবং বিষ্ণু পুরাণদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া সাতটি দ্বীপের বর্ণনা তিনি দিয়াছেন। মধ্যবর্তী দ্বীপের নাম জম্বুদ্বীপ। জম্বুবৃক্ষ হইতে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে। ইহার আকৃতি একটি শকটের ন্যায়। দক্ষিণদিকে ইহার সম্মুখভাগ দেখা যায়। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, দক্ষিণ ও উত্তর দিক হইতে ইহাকে একটি ধনুকের ন্যায় দেখায়। ইহার রজ্জু টানিলে ধনুষ্কোটি বা রামেশ্বরে একটি শিখরের সৃষ্টি হয়। ভারতের আকৃতি সম্বন্ধে বৌদ্ধেরা বলেন ভারতবর্ষ উত্তরে সুবিস্তৃত দক্ষিণে একটি শকটের সম্মুখভাগের ন্যায় দেখায় এবং ইহা সাতটি সমান ভাগে বিভক্ত। ভারতের প্রকৃত আকৃতির বর্ণনা এইরূপ। চৈনিক গ্রন্থকার ফা-কাই-লি-টো এরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। শাকদ্বীপে সাতটি বৃহৎ নদী আছে। ইহাদের মধ্যে একটি গঙ্গার ন্যায় পবিত্র। ইহার অধিবাসীরা ধার্মিক ও দীর্ঘায়ু। মৎস্যপুরাণের মতে কুশদ্বীপে সাতটি পর্বত আছে। নদীর মধ্যে যমুনা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। বিষ্ণু পুরাণের মতে অধিবাসীরা শব এবং পাপবর্জিত। ক্রৌঞ্চদ্বীপে

পর্বত, নদী এবং রাজ্য আছে। এখানকার লোকেরা ধার্মিক ও সৎ। শাল্মলী বা শাল্মলদ্বীপে পর্বত ও নদী দেখা যায়। ইহার অধিবাসীরা পবিত্র, দীর্ঘায়ু, ক্রোধবর্জিত এবং অমায়িক। শীতে কিংবা গ্রীষ্মে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা যায় না। গোমেদ-দ্বীপে দুইটি বৃহৎ পর্বত এবং দুইটি রাজ্য আছে। বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় যে, ইহার অধিবাসীরা ধর্মভীরু। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর দ্বীপ। ন্যগ্রোধবৃক্ষ হইতে পুষ্কর দ্বীপের নামকরণ করা হইয়াছে। এখানকার লোকেরা দীর্ঘজীবী ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষাশূন্য। আল্-বীরূণী বলেন ভারতবর্ষ কেবল যে ভারতকে বুঝায় তাহা নহে। কোন একটি মহাসাগর ভারতকে অতিক্রম করে নাই। কেবলমাত্র একটি অংশ অপর অংশ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। এই সাতটি দ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ এবং ভারতবর্ষ সাধারণতঃ অভিন্ন।

বৌদ্ধেরা বলেন, পৃথিবীতে যে সকল দ্বীপ আছে, জম্বুদ্বীপ তাহাদের মধ্যে একটি। ইহাদের মতে দ্বীপের সংখ্যা আটটি; সাতটি নহে এবং কতকগুলি সমুদ্রের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। জৈনদের মতে কতকগুলি দ্বীপ ও সমুদ্রের নূতন নাম পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয়, মৎস্য এবং বায়ুপুরাণ এবং মহাভারতের মতে ভারত নয় ভাগে বিভক্ত। নয়টি দ্বীপের মধ্যে আটটি দ্বীপ প্রকৃত ভারতের নহে, বৃহৎ ভারতের অন্তর্গত, এবং ইহারাই ভারতীয় উপদ্বীপ-বেষ্টিত দ্বীপ এবং দেশ নামে পরিচিত। আল্-বীরূণী এবং আবুল ফজল বহুদিন পূর্বে এই কথাই বলিয়াছেন। ভারতীয় উপদ্বীপ নবমদ্বীপ বলিয়া পরিচিত; ইহা সাগরবেষ্টিত এবং কুমার দ্বীপ নামে খ্যাত। দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিক পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ইহা এক হাজার যোজন বিস্তৃত। ভারতের এইরূপ বর্ণনা বৌদ্ধদিগের নিকট অবিদিত।

আল্-বীরূণী বলেন যে, কনোজের (কান্যকুব্জ) চতুষ্পার্শ্ব দেশ ভারতের মধ্যদেশ বলিয়া পরিচিত। ইহা একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র, কারণ পুরাকালে এখানে সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি এবং বীরের আবাসস্থান ছিল। কান্যকুব্জের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হয়। অতএব আল্-বীরূণীর মত সঠিক নহে। বস্তুতঃ ইহার পূর্বদিকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত, দক্ষিণে শরাবতী অথবা সললবতী পর্য্যন্ত, পশ্চিমে থুন এবং উপথুন পর্যন্ত এবং উত্তরে উশীরগিরি বা উশীরধ্বজ পর্বত পর্যন্ত মধ্যদেশ বিস্তৃত। ব্রাহ্মণগ্রাম, থুন এবং স্থাণীশ্বর অথবা থানেশ্বর অভিন্ন। হরিদ্বারের নিকটস্থ কংখলের উত্তরদিকে অবস্থিত উশীর গিরি পর্বত এবং উশীরধ্বজ অভিন্ন। কাহারও কাহারও মতে সিওয়ালিক পর্বতমালা এবং উশীর গিরি অভিন্ন। কোন একটি পরবর্তী বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হিমালয় ও পারিপাত্র পর্বতের মধ্যে মধ্যদেশ অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন—কজঙ্গল নগরের পূর্বদিকে, সললবতী নদীর দক্ষিণ-পূর্বদিকে, শতকর্ণিক নগরের দক্ষিণে, ব্রাহ্মণগ্রাম থুনের পশ্চিমে এবং উশীরধ্বজ পর্বতের উত্তরে মধ্যদেশ অবস্থিত ছিল।

আল্-বীরূণী ষোলটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কনোজ, মাহুর (মথুরা), অনহিলবার (পত্তন), মালবের অন্তর্গত ধার, মুসলমান কর্তৃক পুরাতন রাজধানী জয় করিবার পর কান্যকুব্জের অস্থায়ী রাজধানী বারী এবং বজান হইতে ভ্রমণ আরম্ভ হয়। ষোলটি ভ্রমণ বৃত্তান্তের তালিকা এইরূপ—(১) কান্যকুব্জ হইতে এলাহাবাদ এবং তার পর ভারতের পূর্ব উপকূল দিয়া কাঞ্চী পর্যন্ত এবং আরও দক্ষিণ দিকে; (২) কনোজ অথবা বারী হইতে বারাণসী পর্যন্ত এবং তার পর গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত; (৩) কনোজ হইতে পূর্বদিকে কামরূপ (কামরু) পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে নেপাল এবং তিব্বত সীমানা পর্যন্ত; (৪) কনোজ হইতে দক্ষিণে দক্ষিণ উপকূলস্থ বনবাসী পর্যন্ত; (৫) কনোজ হইতে বজান অথবা গুজরাটের তৎকালীন রাজধানী নারায়ণ পর্যন্ত; (৬) মথুরা হইতে মালব রাজধানী ধার পর্যন্ত; (৭) বজান হইতে ধার এবং উজ্জয়িনী পর্যন্ত; (৮) মালবের অন্তর্গত ধার হইতে গোদাবরীর দিকে; (৯) ধার হইতে ভারত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত তান পর্যন্ত; (১০) বজান হইতে কাথিয়াড়ের দক্ষিণ উপকূলে স্থিত সোমনাথ পর্যন্ত; (১১) অনহিলবার বা বর্তমান পত্তন হইতে বোম্বাইয়ের উত্তরে পশ্চিম উপকূলস্থিত তান পর্যন্ত; (১২) বজান হইতে ভাটী হইয়া সিন্ধুনদের মোহনায় অবস্থিত লোহরাণী পর্যন্ত; (১৩) কনোজ হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত; (১৪) কনোজ হইতে পানিপট, এটক, কাবুল এবং গজনা পর্যন্ত; (১৫) বরহ্মান হইতে কাশ্মীরের রাজধানী অদিষ্ঠান পর্যন্ত; (১৬) মাক্রানের অন্তর্গত তিজ হইতে উপকূল ধরিয়া সেতুবন্ধ (সিংহলের বিপরীত দিকে আদমের সেতু) পর্যন্ত।

আল্-বীরূণীর মতে খুরাসান, পারস্য, ইরাক, মোসুল এবং সিরিয়ার সীমানা পর্যন্ত দেশ বৌদ্ধদেশ বলিয়া বিদিত ছিল। বারাণসী এবং কাশ্মীর হিন্দু বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। সোমনাথের নিকট দৈহকদুর্গ রসায়নগ্রন্থপ্রণেতা নাগার্জুনের বাসভূমি ছিল। ধার মালবদিগের রাজধানী বলিয়া পরিচিত এবং ভোজদেব এখানে রাজত্ব করিতেন। বল্লভ বল্লভী নগরের শাসক ছিলেন। ভিনসেন্ট এ. স্মিথের মতে বল্লভী দেশ (ওয়ালা) পূর্ব কাথিয়াড়ে অবস্থিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে ওয়ালা গুজরাটের উপদ্বীপভাগে অবস্থিত। কান্যকুব্জের পশ্চিমে সিন্ধুদেশ। সুবৃহৎ কনোজ শহর গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত। গঙ্গার পূর্বদিকে বারী শহরকে রাজধানী করিবার পর কনোজ শহরের অধিকাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। মথুরা (মহুর) যমুনা নদীর পূর্বদিকে বিদ্যমান ছিল। মথুরা হইতে যৌন এবং কনোজ ২৮ ফারসক দূরে অবস্থিত। কনোজ ও মথুরার উত্তরে দুই নদীর মধ্যে থানেশ্বর (তানেশর) বিদ্যমান। কনোজ হইতে প্রায় ৮০ ফারসক ও মথুরা হইতে প্রায় ৫০ ফারসক দূরে ইহা অবস্থিত। আল্-বীরূণীর মতে থানেশ্বর বা স্থাণীশ্বর বা তানেশ্বর শব্দটি স্থাণু ও ঈশ্বর এই দুই শব্দের সংযোগে গঠিত। আল্-বীরূণীর মতে [illegible] ছিল। ইহা

বৃহৎ এবং প্রতিপত্তিশালী রাজ্য ছিল। কাশীর রাজারা কোশল রাজাদের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিল। আবার কখনও কখনও কোশল কাশী রাজ্য জয় করে। বুদ্ধের সময় হইতে কাশীর রাজনৈতিক ক্ষমতা লোপ পায়। কিছুকালের জন্য ইহা কোশল ও মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সর্বশেষে দেখা যায় যে, কাশী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কাশীর রাজধানী ছিল বারাণসী। এইখানে বুদ্ধদেব তাঁহার সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচার করেন।

কুরু ও পঞ্চালের পূর্বদিকে এবং বিদেহের পশ্চিমে কোশল অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে নেপালের পর্বতমালার মধ্যে কোশলের উত্তর সীমানা। গণ্ডগা নদী ইহার দক্ষিণ সীমানা এবং কপিলাবস্তুর পূর্বদিকে ইহার পূর্ব সীমানা ছিল। ম্যাকডোনেল এবং কিথের মতে গঙগার উত্তর পূর্বদিকে কোশল অবস্থিত। ইহা আধুনিক আউধ রাজ্য হইতে অভিন্ন। কোশলের দুইটি ভাগ ছিল —উত্তর এবং দক্ষিণ। উত্তর ভাগের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী এবং দক্ষিণ ভাগের রাজধানী সাকেত। রামায়ণ ও মহাভারত এবং কয়েকটি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, অযোধ্যা সর্বপ্রথম রাজধানী ছিল বলিয়া মনে হয় এবং পরবর্তী রাজধানী সাকেত। বুদ্ধদেবের সময়ে অযোধ্যা একটি নগণ্য নগরে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের ছয়টি বৃহৎ শহরের মধ্যে সাকেত এবং শ্রাবস্তী দুইটি। কেহ কেহ মনে করেন যে, সাকেত এবং অযোধ্যা অভিন্ন। কিন্তু রিজ ডেভিডস বলেন, এই দুইটি নগর বুদ্ধের সময়ে বর্তমান ছিল। শ্রাবস্তী আউধে অবস্থিত। যুক্তপ্রদেশের গণ্ডাক এবং বারৈক জেলার সীমানায় অবস্থিত রাপ্তী নদীর দক্ষিণ তীরস্থ সাহেট-মাহেট নামে সুবৃহৎ নগরস্তূপ হইতে শ্রাবস্তী অভিন্ন।

মগধ বলিতে বিহারের বর্তমান পাটনা এবং গয়া জেলাকে বুঝায়। ইহার সর্বপ্রথম রাজধানী ছিল গিরিব্রজ বা পুরাতন রাজগৃহ। বৌদ্ধধর্মের ইহা একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। অশোকের সময়ে ইহার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। প্রাচীন বৌদ্ধযুগে ইহা একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক এবং বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। উত্তর প্রতিবেশীর সহিত এবং গন্ধারের পশ্চিমরাজ্যের সহিত বিবাহ ও অপর কোন সূত্রে মগধেরা বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়াছিল।

প্রাগজ্যোতিষ একটি অনার্য জাতি বলিয়া পরিচিত। রামায়ণ ও মহাভারতে ইহা একটি অসুর-দানব রাজ্য বলিয়া বর্ণিত আছে। মহাভারতের মতে ইহা উত্তরদিকে অবস্থিত কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে জানা যায়, ইহা পূর্বদিকে। প্রাগজ্যোতিষপুর কামরূপের রাজধানী। কামাখ্যা অথবা গৌহাটী হইতে ইহা অভিন্ন। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাগজ্যোতিষ এবং কামরূপ একই দেশ। প্রাগজ্যোতিষ বলিতে আমরা সমগ্র আসাম, উত্তর বাংলা, রংপুর এবং কুচবিহারকে বুঝি।

বর্তমান তমলুক, তাম্রলিপ্তিক বা তাম্রলিপ্ত অভিন্ন। রূপনারায়ণ নদীর পশ্চিমতীরে ইহা অবস্থিত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা প্রাচীন সুহ্ম রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং মৌর্যশাসিত মগধ রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল।

প্রাচীনকালে বঙ্গ বলিতে আধুনিক বাংলার একাংশকে বুঝাইত। প্রাচীন বঙ্গের প্রধান বিভাগগুলির মধ্যে সমতট (বর্তমান ফরিদপুর) এবং তাম্রলিপ্তের (বর্তমান তমলুক) উল্লেখ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ বলিতে পূর্ব বাংলাকে বুঝাইত। বর্তমান ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ পূর্ববাংলার অন্তর্গত।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বর্তমান মাদুরার বৃহত্তর অংশ এবং তিনেভেলি জেলা ও দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুর পাণ্ড্য রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তাম্রপর্ণী নদীতীরস্থ কোলকাই ইহার সর্বপ্রথম রাজধানী এবং ইহার পরবর্তী রাজধানী মদুরা (দক্ষিণ মথুরা)। কেহ কেহ বলেন যে, পাণ্ড্যদেশ বলিতে মদুরা, রামনাদ, তিনেভেলি জেলাগুলি এবং সম্ভবতঃ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দক্ষিণ অংশকে বুঝাইত। ইহা তাম্রপর্ণী ও কৃতমালা অথবা বেগাই নদীর জলে ধৌত হইত।

কেরল বা চের কূপক কিংবা সত্যদেশের দক্ষিণে একটি দেশ। ইহা মধ্য ত্রিবাঙ্কুরের কয়েটি পর্যন্ত বিস্তৃত। কাহারও কাহারও মতে ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এবং মালাবার জেলা লইয়া কেরল বা চেরদেশ গঠিত। কোয়েমবাটোর জেলা এবং সালেম জেলার দক্ষিণাংশ কংগু দেশ নামে পরিচিত ছিল। কেরল বা চের দেশ পেরিয়ার নদীর জলে ধৌত হইত। এই নদীর তীরে কোচিনের নিকটে ইহার রাজধানী বঞ্জি অবস্থিত ছিল।

বনবাসী রাজ্য ঐতিহাসিক যুগে উত্তর কানাড়ার একটি সুবিখ্যাত দক্ষিণদিকের অঞ্চল ছিল।

বামন পুরাণের মতে মারাঠা বা মহারাষ্ট্র দেশ উত্তর গোদাবরীর জলে বিধৌত হইত। ইহা গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী স্থান। অশোক এই দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মহাধর্মরক্ষিতকে প্রেরণ করেন।

কপিশা নদী (মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান কাসাই) হইতে দূরে বংগের দক্ষিণে কলিঙ্গ দেশ বিদ্যমান ছিল। ইহা দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। বৈতরণী নদীর দক্ষিণস্থ বর্তমান উড়িষ্যা এবং ভিজাগাপত্তম্ পর্যন্ত দক্ষিণে বিস্তৃত সমুদ্র উপকূল প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত। কূর্ম পুরাণের মতে অমরকণ্টক পর্বত ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাতিগুম্ফা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, খারবেলের রাজত্বকালে কলিঙ্গনগর কলিঙ্গের রাজধানী ছিল। মাদ্রাজ প্রদেশে গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত সংলগ্ন-স্তূপগুলি এবং বংশধারার তীরে অবস্থিত মুখলিঙগম্ ও কলিঙ্গনগর অভিন্ন।

সুরপারক একটি সমুদ্র বন্দর এবং ইহা বোম্বাইয়ের সাঁইত্রিশ মাইল উত্তরে থানাজেলার অন্তর্গত সুপারা বা সোপারা হইতে অভিন্ন। ইহা বেসিনের প্রায় চার মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

মহাভারতের সভাপর্বে দেখা যায় যে, ভারতের পশ্চিমভাগে আভীরগণ বাস করিত। পরবর্তী পুরাতত্ত্ববিদগণ বলেন, আভীরেরা পশ্চিমদিকে বাস করিত কিন্তু পুরাণের মতে আভীরা উত্তরকে

অধিবাসী ছিল বলিয়া মনে হয়। আল-বীরুণী তাহাদিগকে ভুল করিয়া দক্ষিণের অধিবাসী বলিয়াছেন। মহাভারতের মতে ইহারা পশ্চিম রাজপুতনার অধিবাসী ছিল।

সুরাষ্ট্র বলিতে বর্তমান কাথিয়াওয়াড় এবং গুজরাটের অপর অংশগুলিকে বুঝায়। শতোদিকা নদী সুরাষ্ট্র দেশের সীমানা দিয়া প্রবাহিত হইত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙের মতে এই দেশ সু-র-ছ নামে বিদিত। টলেমির মতে সৈরাষ্ট্রেনে এবং সুরাষ্ট্র অভিন্ন। আল-বীরুণী ভুল করিয়া সুরাষ্ট্রকে দক্ষিণ দিকে স্থান দিয়াছেন।

ভোজগণ দক্ষিণ দেশের লোক। তাহারা প্রাচীনকালে মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে বাস করিত। কথিত আছে, তাহারা কুরু পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ যযাতির পুত্র দ্রুহ্যুর বংশসম্ভূত ছিল। ইহারা শূরসেনদিগের রাজধানী মথুরা নগরে বাস করিত। আল-বীরুণী ভুলক্রমে ভোজগণকে পশ্চিমে স্থান দিয়াছেন।

মালবেরা সর্বপ্রথম পঞ্জাবে বাস করিত। ক্রমশঃ তাহারা উত্তর ভারতের অনেক স্থানে বাস করিয়াছিল। রাজপুতানা, মধ্যভারত যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং প্রাচীন লাটদেশে (ব্রোচ, কচ্ছ, বড় নগর, আমেদাবাদ) সর্বশেষে ইহারা বর্তমান মালবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। ইহারা পাণিনির যুগ হইতে সমুদ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত নিজেদের জাতীয় সংঘ ভালভাবে রক্ষা করিয়াছিল।

মেকল দেশের অধিবাসীরা বর্তমান অমরকণ্টক পর্বতে এবং ইহার চতুর্দিকস্থ দেশগুলিতে বাস করিত। প্রাচীনকালে অমরকণ্টক পর্বতমালা মেকল নামেই পরিচিত। এই পর্বতমালা হইতে নর্মদা উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহা মেকলসুতা, মেকলকন্যা ও মেকলা নামে পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে আনর্ত বা আনর্ত্ত দ্বারকার চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশ এবং কেহ কেহ বলেন যে ইহা বড় নগরের চতুপার্শ্বস্থ জেলা।

পুরাণের মতে ভোগবর্দ্ধন দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটি দেশ। মনে হয়, ইহা গোদাবরী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। মার্কেণ্ডয় পুরাণের মতে ভোগবর্দ্ধন, মৌলিক, অশ্মক ও কুন্তলদিগের সহিত দক্ষিণ দিকে বাস করিত। বায়ু, মৎস্য এবং মার্কেণ্ডয় পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, বৈদর্ভগণ দক্ষিণ দেশে বাস করিত। চৌল্য বা চালুক্য উত্তর দিকস্থ রাজপুত জাতি। ইহারা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দিগকে শাসন করিত। কিরাতগণ ছিল অনার্য পার্বত্য জাতি; ইহারা উত্তরাপথবাসী।

ত্রিগর্ত্তের লোকেরা একটি ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া পরিচিত। ইহারা গণতন্ত্রভুক্ত। মহাভারতের মতে ইহারা পঞ্জাবের একটি জাতি। বর্ত্তমান জলন্ধর ও প্রাচীন ত্রিগর্ত্তদেশ অভিন্ন। কানিংহাম সাহেব বলেন যে, ত্রিগর্ত্তদেশ ও কাংগ্রা অভিন্ন। আল-বীরুণী ভুল করিয়া উত্তর দিকে অপরান্তের স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। অপরান্ত পশ্চিম অঞ্চলে স্থিত। ইহাই উত্তরকোঙ্কণ নামে পরিচিত। বাহ্লিক দেশ উত্তর দিকে অবস্থিত। চন্দ্রের মেহরৌলি স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে, বাহ্লিকগণ সিন্ধুর অপর দিকে বাস করিত। টলেমির সময়ে ইহারা ও বাকট্রিওই অভিন্ন ছিল।

আর্য্য-সভ্যতার সর্ব্বপ্রাচীন যুগ হইতে গন্ধার ভারতের একটি অংশ ছিল। গন্ধার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। কিন্তু ইহার স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বর্ত্তমান পেশোয়ার ও রাওয়লপিণ্ডি জেলা গন্ধারের অন্তর্গত। রিস-ডেভিডস-এর মতে গন্ধার (বর্ত্তমান কান্দাহার) পূর্ব আফগানিস্থানের জেলা-বিশেষ। ভিনসেণ্ট এ. স্মিথও এই মত পোষণ করেন। কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব্ব-আফগানিস্থান লইয়া গন্ধার রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। পুষ্কলাবতী (পুষ্করাবতী) এবং তক্ষশীলা (তক্ষসিলা) গন্ধারের প্রাচীন রাজধানী ছিল।

পারজিটার সাহেবের মতে চর্ম্মখণ্ডিক সমরকন্দ হইতে অভিন্ন। মৎস্যপুরাণে দশেরকের উল্লেখ আছে। দশেরক দেশের লোকেরা কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে লম্পাকগণ উত্তর দিকে বাস করিত। কানিংহাম সাহেবের মতে লম্পাকদেশ বর্ত্তমান লমঘন হইতে অভিন্ন। লসেন সাহেবও এই মত পোষণ করেন।

যোন বা যবনগণ গ্রীকদিগের বংশসম্ভূত ছিল। ইহারা আইয়োনিয়ন নামে পরিচিত। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহাদের বিশিষ্ট স্থান ছিল। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, কম্বোজ, গন্ধার, কিরাত এবং বর্ব্বরের ন্যায় ইহারা উত্তর ভারতে বাস করিত।

পুরাণগুলিতে সিন্ধু এবং সৌবীরদিগকে যুক্তভাবে দেখা যায়; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ইহাদের পৃথকভাবে উল্লেখ আছে। মার্কেণ্ডেয়-পুরাণের মতে ইহারা উত্তর দিকে বাস করিত। বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় হূন এবং মদ্রদিগের সহিত ইহারা পশ্চিম দিকে বাস করিত। আল-বীরুণী বলেন যে, সৌবীর, মুলতান এবং জারাওয়ার একই দেশ; কিন্তু হৈমকোষের মতে সৌবীর দেশ এবং কুণালব অভিন্ন।

জীবন বন্দনা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জীবন সবার বড়, এই কথা জেনো শুধু প্রিয় !
কেন অশ্রু ? সুখদুঃখে নহে নহে পরিমাপ তার,
নূতন বিস্ময় সেথা, নিত্য সেথা নব আবিষ্কার,
জীবন পরম সত্য, সে মহান্, অনির্ব্বচনীয় ।

জানি জানি প্রেমে এই জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা,
দুঃখভরা ধরাতলে—জানি প্রেমে স্বর্গ আসে নামি,
তবুও তবুও জানি প্রেমে শুধু তুমি আর আমি,
বিশ্ব বিস্মরণ হয়—আসে যবে প্রেমের বারতা ।

মাধুর্য্যে মণ্ডিত প্রেম, তার চেয়ে বড় এ জীবন ।
কত স্মৃতি, অনুভূতি, কি বিস্মৃতি, কত অভিজ্ঞতা,
কি অতৃপ্তি, কি বাসনা, কি আনন্দ, কি গভীর ব্যথা !
জীবনের বেদনার—সব নিয়ে—সেই নিবেদন ।

শুধু সুন্দরের মাঝে কেন খুঁজি নিয়ত সান্ত্বনা ?
একেলা সৌন্দর্য্য শুধু জীবনের নহে উপাদান,
সুন্দরে ও অসুন্দরে সেথা বুঝি নাহি ব্যবধান,
জীবনের পথে নিত্য ভয়ঙ্কর করে আনাগোনা ।

জীবন বিচিত্র আর কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার !
হৃদয় কাঁদিয়া মরে, তারা চায় অকুণ্ঠ প্রকাশ ।
পূর্ণ অভিব্যক্তি ? তার এ জীবনে কোথা অবকাশ ?
চিত্রে গানে কাব্যে তাই সে বিচিত্রে হেরি বার বার ।

জীবন পড়ে না ধরা, সে চঞ্চল, সে যে শুধু চলে,
আমরা আঁকিতে পারি শুধু এক মুহূর্ত্তের ছবি,
সেখানে সার্থক মোরা, সেইখানে আমরা যে কবি,
বর্ণের যোজনা করি আমাদেরি তপ্ত অশ্রুজলে ।

বার বার প্রশ্ন করি, সে প্রশ্নের মেলে না উত্তর,
প্রতীক্ষায় দিন কাটে, অনন্ত এ জীবন-জিজ্ঞাসা,
সমাধান পাব তার একদিন, আছে তবু আশা ।
সত্যে খুঁজি ? সত্য সে যে কল্পনার নিত্য সহচর ।

দ্বার খোল, রহস্যের চিররুদ্ধ দ্বার খোল দ্বারী !
স্বপ্ন ও বাস্তবে গড়া এ জীবন, তাহার স্বরূপ
কে জেনেছে ? পরিচয় কে পেয়েছে ? সে যে অপরূপ !
জীবনের গান গাই আমি কবি জীবন-পূজারী ।

কাঞ্চনজঙ্ঘায়

শ্রীউমা দেবী

মনে হয়—মনে হয়—একটি ইচ্ছার মেঘ হয়ে
আরক্ত চুনির মত একটি তৃষ্ণাকে বুকে বয়ে
ভেসে যাই—দূর থেকে দূরান্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘায়
পৃথিবীর শেষ হলে আকাশের নীল সীমানায় ।
সেখানে রহস্যভরা নিশীথের নীলকান্তময় সিংহদ্বার
মুক্ত হলে—ফুলবন লাল নীল সাদা আর সোনালি তারার
শোনায় সঙ্গীত তার ভ্রমর পাখায়
যখন স্বপ্নের রেণু ঝরে গিয়ে দক্ষিণ হাওয়ায়
কুয়াশার মতন ঘনায়—
আমার প্রাণের কাছে এসে
ভালোবেসে
কি যেন সে চায় দিতে—চায় !

আমি তো ইচ্ছার মেঘ—তাও ক্রমে বাষ্প হয়ে যাই
নীলাভ সুরভি ভীরু ধূপের শরীর নিয়ে তাই—
হৃদয়ের দেশে এসে এমনি মিলাই—
যত ঘুম-নামা চোখে জ্বলে যাওয়া প্রাণেদের
পুড়ে যাওয়া বাসনার ছাই !
তাই মনে সাধ জাগে দুরন্ত—ভরন্ত এক ইচ্ছার
প্রবল মেঘ হয়ে
আরক্ত চুনির মত বিদ্যুতের মত দীপ্ত একটি
তৃষ্ণাকে বুকে বয়ে
ভেসে যাই দূর থেকে দূরান্তরে যেখানে—যেখানে—মন চায়
হয়তো বা বাসনার সোনার বসনে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘায় !

ঐ তুষারের দেশে—তুষারের কোলে এসে ঘুমাবে না মন ?
ভাঙা ভাঙা মেঘ-বনে একটি ফুলের মত হারাবে না
রক্তরাঙা সন্ধ্যার মতন ?
একটি রঙীন তৃষ্ণা তুষার-স্নানের শেষে
হতে পারে শান্ত ও শীতল,
ভরন্ত প্রাণের এক ইচ্ছার প্রবল মেঘ
হতে পারে কুয়াশার মত সুকোমল—
ঐ দূরান্তরে হিম কাঞ্চনজঙ্ঘায়
যেখানে পৃথিবী এসে শেষ হয় আকাশের নীল সীমানায়
হৃদয়ের নীলাভ ছায়ায়—
...কাঞ্চনজঙ্ঘায়—দূর কাঞ্চনজঙ্ঘায়—

কেশবচন্দ্র সেন ঃ প্রথম জীবন

(১৮৩৮-১৮৫৯)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পূর্ব্বাভাষ

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্র সেনকে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম দুই জন ব্রাহ্মণের মধ্যে অন্যতর বলিয়া 'ধর্ম্মতত্ত্বে' উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ উক্তি দ্বারা এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণের যেসব লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই কেশবচন্দ্রে বিদ্যমান ছিল। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মনেতা, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির একান্ত সেবক। কিন্তু এ সকলের উপরে ছিলেন তিনি সত্যিকার দরদী মানুষ। মানুষের তথা স্বদেশবাসীর উন্নতি ছিল তাঁহার লক্ষ্য। এই উন্নতির মূলাধার যে ধর্ম্মবোধ তাহা জানিয়া তিনি মনুষ্যসমাজকে ধর্ম্ম বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন। আর এই কারণেই তাঁহাতে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবে এত আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল।

কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজী-বাংলা একটি বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বড় ছোট কয়েকখানি জীবনী-গ্রন্থও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেশবচন্দ্র ছেচল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি ভারতীয় জীবনের নানা দিকের উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রয়াস সমাজজীবনে এমন এক আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল যাহার তুলনা আধুনিক কালে খুব কমই মেলে। কেশব-সাহিত্যে, কেশব-জীবনী-গ্রন্থে এই সকলের ছাপ নিশ্চয়ই পড়িয়াছে। কিন্তু কেশব-জীবনের সব কথা ইহাতে ধৃত হয় নাই, হয়ত তাহা সম্ভবও ছিল না। কেশব-জীবন সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, শিক্ষা ও অন্তবিষয়ক রিপোর্ট এবং পুস্তক-পুস্তিকাদির সাহায্যও আমাদের লইতে হয়। প্রচলিত কেশব-সাহিত্য এবং এই সকল নূতন আকর হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে কেশব-জীবনী নূতন করিয়া আলোচনার সময় আসিয়াছে। কেশবচন্দ্রের বহুমুখী কর্ম্মপ্রয়াস জাতীয় জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে ইহা হইতে তাহা আমাদের নিকট সম্যক প্রতিভাত হইবে।

বংশ-পরিচয় : জন্ম

কলুটোলার সেন-পরিবারে কেশবচন্দ্রের জন্ম। সেন পরিবারের কথা বলিতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয় আমাদের স্বতঃই মনে পড়ে। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামকমল সেন* নব-বঙ্গেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃত, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রসাধনা নানা বিষয়েই তিনি উৎসাহী কর্ম্মী ও নেতা ছিলেন। ধর্ম্ম এবং সামাজিক

রামকমল সেন

ব্যাপারে রামকমল ছিলেন রক্ষণশীল, তথাপি জাতির উন্নতিমূলক যতকিছু প্রচেষ্টা, সমুদয়েই তাঁহার ঐকান্তিক সংযোগ লক্ষ্য করি। রামকমল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, ধনে মানে কলিকাতা-সমাজের একজন প্রধান হইয়াও তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-যাপন-প্রণালী ছিল অতি সাদাসিধা ; তিনি 'হরি' নাম জপে আনন্দ পাইতেন, স্বপাকে রান্না করিয়া যৎসামান্য আহার করিতেন। নিয়ম-সংযমে রামকমল ঐ সময়ে এক জন আদর্শ হিন্দু বলিয়া গণ্য হন।

রামকমল সেনের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরিমোহন সেযুগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহকর্ম্মীরূপে খ্রীষ্টানবিরোধী আন্দোলনে একান্ত ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ে'র তিনি ছিলেন অন্যতর সম্পাদক। অন্যান্য দেশকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান, যেমন—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশুন, হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও সূচনা অবধি যুক্ত ছিলেন। রামকমল সেন

---

* 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্গত "রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়" পুস্তকে রামকমল সেন সম্বন্ধে নির্ভর-যোগ্য এবং তথ্যবহুল বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হিন্দু কলেজের সঙ্গে মিলিত হন; জীবনের শেষ বৎসর (১৮৪৪) পর্য্যন্ত তিনি ইহার একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ হিন্দু কলেজের ছাত্র। জ্যেষ্ঠ হরিমোহন (জন্ম ১৮১২) কলেজের প্রথম যুগের একজন কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেন (১৮১৪-৪৮) কেশবচন্দ্রের পিতা। তিনিও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। জ্যেষ্ঠ হরিমোহন রামকমলের জনকল্যাণ প্রচেষ্টাসমূহের ধারক ও বাহক ছিলেন। মধ্যম পুত্র প্যারীমোহন পিতৃদেবের ভগবদ্‌ভক্তি,

প্যারীমোহন সেন

নিষ্ঠা ও সংযমের অধিকারী হইলেন। কলেজের পাঠ সমাপনান্তে প্যারীমোহন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি বোগ সাহেবের হাউসের মুৎসুদ্দী ছিলেন। এই হাউসের পতনে তিনি ঋণগ্রস্ত হন। পিতা রামকমল সেন একই কালে দুইটি কর্ম্ম করিতেন— বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী ও টাকশালের দেওয়ানী। রামকমলের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ হরিমোহন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন, টাকশালের কাজ পাইলেন প্যারীমোহন। তিনি এই পদ লাভ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হন। তাঁহার সুদিন ফিরিয়া আসে। সেকালের নিয়ম অনুসারে অল্প বয়সেই প্যারীমোহনের বিবাহ হয়। স্বগ্রাম গৌরীভা (ডাকনাম, গরিফা)-নিবাসী গৌরহরি দাসের কন্যা সারদাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে। ১৮৪৮ সনে পূজার ছুটির পর প্যারীমোহন অকালে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে মারা গেলেন। প্যারীমোহন মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া যান। পুত্রদের নাম—নবীনচন্দ্র সেন, কেশবচন্দ্র সেন এবং কৃষ্ণবিহারী সেন। নবীনচন্দ্র বিশেষ সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। সমাজের কল্যাণে তাঁহার সার্থক প্রয়াস ভারতবাসী মাত্রেই আজ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে। তিনি 'হিন্দু ফেমিলি এন্যুয়িটি ফণ্ডে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে তিনি ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগী। কনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী মধ্যমাগ্রজ কেশবচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এলবার্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ রূপে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেন। পালি তথা বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সুধীমাত্রকেই বিস্মিত করিত। অগ্রজদের মত তিনিও স্বল্পায়ু ছিলেন (১৮৪৮-৯৫)।

কেশবচন্দ্র ১৮৩৮ সনের ১৯শে নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। এই সনে আরও দুই জন মনীষী আবির্ভূত হইয়াছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণদাস পাল। ধর্ম্মপ্রাণ রামকমল নবজাত

সারদাসুন্দরী দেবী

পৌত্রের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। মাতা সারদাসুন্দরী লিখিয়াছেন, "আমার শ্বশুর মহাশয় কথায় কথায় 'পর্য্যন্ত' বলিতেন, কেশবের জন্মের পর বলিয়াছিলেন (কেশবকে লক্ষ্য করিয়া), 'এই পর্য্যন্ত আমার মতন হইবে। ইহাকে দিয়া তোমার খু সুখ হইবে।"* রামকমল কেশবচন্দ্রকে 'বিশু' বলিয়া ডাকিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুত্র প্যারীমোহনকে বলেন, "Peary ! your son Bisu is destined to be a great man—a religious reformer",† অর্থাৎ 'প্যারী, তোমার পুত্র বিশু একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে—একজন ধর্ম্ম-সংস্কারক হইবে।' রামকমলের পৌত্রপৌত্রীদের মধ্যে কেশবচন্দ্র তাঁহার বিশেষ স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রামকমল প্রত্যহ নিয়ত 'হরি' নাম জপ করিতেন; পরিবারের পুত্র, কন্যা এবং পুত্রবধূদেরও তিনি 'হরি' নাম জপ করিতে উপদেশ দিতেন। পিতা প্যারী-মোহনের মাধ্যমে কেশবচন্দ্র এই নাম পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী

* কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পৃ. ৭

† *Life of Dewan Ramcomul Sen*—Peary Chand Mitra, 1880, p. 88.

কালে ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণবোচিত ভক্তিমূলক সাধন-প্রণালী প্রবর্ত্তনে কেশবচন্দ্র যে উৎসুক হইয়াছিলেন তাহার মূল পাই তাঁহার পারিবারিক ঈশ্বর-আরাধনার মধ্যে।

ছাত্রজীবন

প্রথম পর্ব্ব—বাল্য ও কৈশোর : কেশবচন্দ্র ধনী পরিবারের সন্তান; তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ, আলাপ-ব্যবহার যে তদনুযুক্ত হইবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংরেজী কেশব-জীবনীতে কেশবচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। প্রতাপচন্দ্র গৌরীভার অধিবাসী, সেন-পরিবারের আত্মীয়। সেন-পরিবারের লোকেরা পূজার ছুটিতে যখন স্বগ্রামে যাইতেন তখন ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁহাদের আচার-আচরণে বিস্মিত হইতেন। প্রায় সমবয়সী এবং আত্মীয় হইলেও ঐ সময় কেশবের সঙ্গে প্রতাপচন্দ্র তেমন মিশিতে পারিতেন না। কলিকাতায় আসিবার পর হইতেই তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হইবার সুযোগ পান। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে কেশব-সম্পর্কিত পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ উক্ত ইংরেজী জীবনী-গ্রন্থে প্রতাপচন্দ্র অনবদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা ইহা হইতে বহু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাইতে পারিবেন।

শৈশবে গৃহে বসিয়া 'গুরু'র নিকটে কেশবচন্দ্রের পাঠাভ্যাস সুরু হয়। তিনি ১৮৪৫ সনে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্র তখন কলেজের ছাত্র। সে সময়ে হিন্দু কলেজে ধনী-পরিবারের ছেলেরা বেশীর ভাগ অধ্যয়ন করিতেন। সেন-পরিবারের সন্তানেরাও বংশপরম্পরায় এখানে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইঁহারা অন্যান্য ধনীর দুলালদের মত ছিলেন না। রামকমল স্বয়ং সাহিত্যসেবী, এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অন্যান্য শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁহার প্রগাঢ় যোগ—এসব কারণে তাঁহার পরিবারে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চ্চার একটি মহনীয় পরিবেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। অন্যান্য সন্তানদের মত কেশবচন্দ্রও শৈশব হইতেই পাঠে সবিশেষ মনোযোগী হন। তিনি সুদর্শন, অমিয়কান্তি, মিষ্টালাপী, আর সেই শৈশব হইতেই মানব-দরদী। কলেজের শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িতে বিলম্ব হইল না। জুনিয়র বিভাগের প্রতি শ্রেণীতেই তিনি পাঠোৎকর্ষ দেখাইয়া পুস্তকাদি পুরস্কার পান। হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের তৃতীয় শিক্ষক টি. ষ্টারজন (T, Sturgeon) তাঁহার উদ্দেশে ১৮৫০ সনে বলিয়াছিলেন, 'the little boy with a big head'। কেশবচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র দ্বাদশ বৎসর। ইংরেজী ও পাটীগণিতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। এ কথা হয়ত অনেকে জানেন না যে, এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চায়ও কেশবচন্দ্র বিশেষ অগ্রসর হন। ১৮৫১-৫২ সনের সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টে 'হিন্দু কলেজ' অধ্যায়ে স্কুল-বিভাগের সার্টিফিকেট এবং পুরস্কার প্রাপ্ত সিনিয়র ও জুনিয়র ছাত্রদের একটি ফিরিস্তি আছে। ইহাতে কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এই তথ্যটি আমরা পাই :

SENIOR SCHOOL DEPARTMENT
Second Class
Keshub Chunder Sen . . . Vernacular.

এই তালিকায় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্তিরও উল্লেখ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র এবং প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস) কেশবচন্দ্রের সময়েই কলেজে অধ্যয়ন করেন, এবং তাঁহার সঙ্গে কেশবের পরিচয় ও হৃদ্যতা জন্মে। তিনিও পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন। গভীর অভিনিবেশ এবং কঠোর পরিশ্রম সহকারে

কেশবচন্দ্র সেন (উনিশ বৎসর বয়সে)

কেশবচন্দ্র এই সময়েই বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নে রত হন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন :

"Keshub prepared his lessons industriously, and added patient labour to natural genius. This habit of hard work and systematic industry equally distinguished him at all times of life."*

অর্থাৎ, কেশবচন্দ্র কঠোর পরিশ্রম সহকারে পড়া তৈরি করিতেন। এই প্রতিভার শ্রমশক্তি সঙ্গে একত্র হওয়ায় তিনি জীবনে এতখানি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কেশব-পত্নী জগন্মোহিনী দেবী

কীর্তন, কথকতা, যাত্রা, বিশেষতঃ রামযাত্রা শৈশবে কেশবচন্দ্রের বড়ই প্রিয় ছিল। শৈশব হইতেই এই সকল শ্রবণ করিয়া কেশবচন্দ্র ভারতীয় ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞান আহরণ করিতে থাকেন। তিনি সমবয়সীদের লইয়া রামযাত্রা অভিনয় করিয়াছিলেন। গিলবার্ট নামক এক সাহেব হিন্দু কলেজের ছাত্রদের একবার ম্যাজিক দেখান। কেশবচন্দ্র গৃহে গিয়া সমবয়সীদের সম্মুখে প্রায় হুবহু উহা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন এবং সকলকে আনন্দ দান করেন। তিনি কোন বিষয় দেখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, নিজে তাহা করিয়া তবে নিরস্ত হইতেন।

দ্বিতীয় পর্ব্ব, যৌবন : কেশবচন্দ্র ১৮৫৩ সন নাগাদ স্কুল বিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হন। কিন্তু এই বৎসরের প্রথমেই হিন্দু কলেজ লইয়া কলিকাতায় ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। কলেজ এই সময় সরকারী আওতায় আসে; কলেজের অধ্যক্ষ-সভার কর্তৃত্ব তখন খুবই হ্রাস পায়। সভার প্রতিবাদ সরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করিলে, হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন ১৮৫৩, ২রা মে তারিখে। কলেজের নাম হইল—হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ। এবারে এই কলেজ-প্রতিষ্ঠা'য় প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন কলিকাতা—ওয়েলিংটনের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারস্থ রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়। কলুটোলা সেন-পরিবারের অধ্যক্ষ হরিমোহন সেন এই প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন এবং পরিবারের সন্তানদের হিন্দু কলেজ ছাড়াইয়া এই নূতন কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কেশবচন্দ্রও হিন্দু কলেজ হইতে এখানে আসিয়া অধ্যয়ন সুরু করিলেন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেন, হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকে এই নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হয় এবং ইহার ফলে তাহাদের পাঠে অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে। কেশবচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। হিন্দু কলেজে যে সব বিষয় তিন বৎসর পরে পড়িতে হইত, এই সময়েই তাঁহাকে তাহা অধ্যয়ন করিতে হয়। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি এসকল আয়ত্ত করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হইল। তিনি এই অভাব আর কখনও পূরণ করিতে পারেন নাই। সেক্সপীয়র, মিল্টন, বেকন প্রভৃতি ভাবগর্ভ গ্রন্থাদি পড়িয়া ইংরেজী সাহিত্যের সবিশেষ চর্চ্চা করিতেন। বিখ্যাত সেক্সপীয়রবিদ্ ডি. এল. রিচার্ডসন প্রথম হইতেই হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়াছিলেন। অন্যান্য বহু বাঙালী মনীষীর মত কেশবচন্দ্রের সেক্সপীয়র-প্রীতি রিচার্ডসনের আশ্চর্য্য শিক্ষারই ফল। সেক্সপীয়র কৃত নাটকের অভিনয়-স্পৃহা এই সময়ে তাঁহার মনে উজ্জীবিত হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক, বৎসরখানেক পরে, ১৮৫৪ সনে, কেশবচন্দ্র হিন্দু কলেজে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতাপচন্দ্র বলেন, হিন্দু কলেজে তিনি আর পূর্ব্বের মত পাঠে উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই। কলেজে অধ্যয়ন সম্বন্ধে প্রতাপচন্দ্র লেখেন :

"Henceforth his educational career was not at all brilliant. He toiled at it with all his might; he was more than passable in English; he did tolerably well in history; he had a liking for chemistry, and spent a lot of money in buying a set of apparatus; he did very well indeed in mental and moral philosophy, but he was at desperate odds in trigonometry and conic sections"*

* *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, Second Edition, p. 55.

ইংরেজী, ইতিহাস, পাশ্চাত্ত্য দর্শন, রসায়নশাস্ত্র, বিশেষতঃ শেষোক্ত বিষয়ে কেশবচন্দ্র বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেন; কিন্তু ত্রিকোণমিতি এবং কনিক সেকশ্যন, বা এককথায় অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাঁহার মন একেবারে বিরূপ হইয়া উঠিল। অঙ্কনের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল বটে, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছুতে তাঁহার মন বসিত না। একারণ জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্রের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াও, তিনি আর শোধরাইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে ১৮৫৪-৫৫ সনে হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুলে বিভক্ত হইল। কেশবচন্দ্র কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

কেশবচন্দ্র ১৮৫৮ সনে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করেন। এখানে স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও কেশবের সমসময়ে, ১৮৫৬ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগে গিয়া ভর্ত্তি হন। উভয়ের মধ্যে এই সময় আলাপ পরিচয় হওয়া বিচিত্র নয়। ১৮৫৬-৫৮, এই দুই বৎসর কেশবচন্দ্র কলেজের পাঠ্যাতিরিক্ত দর্শনশাস্ত্র (Mental and Moral Philosophy) অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন—তাঁহারা প্রায়ই কেশবচন্দ্রকে কলেজ-লাইব্রেরীতে এই বিষয়ক পুস্তকাদি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে দেখিতেন। কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রিচার্ড জোনসের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন কেশবচন্দ্র। প্রতাপচন্দ্র লিখিতেছেন :

"He (Keshub) was exceedingly attached to Mr. Jones, the professor of philosophy, who took a great deal of interest in his progress and gave special attention to his training, for all which Keshub was looked upon by students in general as a sort of youthful philosopher."

কেশবচন্দ্র এই সময়ে অধ্যয়ন ও অনুধ্যানে কিরূপ তৎপর ছিলেন, প্রতাপচন্দ্র সে সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে কিছু কিছু লিখিয়াছেন। কেশবচন্দ্র প্রতিদিন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী—মেটকাফ হলে সকাল ১১টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শনের গ্রন্থাদি তাঁহার বিশেষ পাঠ্য বিষয়; তন্মধ্যে দর্শনের ইতিহাস পাঠে তিনি যত আনন্দ পাইতেন এমন আর কিছুতেই নয়। তিনি মিল্টন, ইয়ং-এর কবিতাও পাঠ করিতেন, সেক্সপীয়রের তো তিনি ছিলেন একান্ত অনুরাগী। তবে তিনি উপন্যাস আদৌ পছন্দ করিতেন না। সর্ উইলিয়ম হ্যামিলটনের প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরিত না। ভিক্টর কুঁজোর গ্রন্থাবলী তিনি অহরহ পাঠ করিতেন। জে. ই. ডি. মোরেল, ম্যাকোষ, থিয়োডোর পার্কার, মিস কবের রচনাবলীও তাঁহার সজাগ দৃষ্টি এড়াইত না। এমার্সনের প্রতি তাঁহার অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার মত ঐরূপ বিভিন্ন বিষয়ের নিয়মিত পাঠক তখন কচিৎ দেখা যাইত।* প্রতাপচন্দ্র আরও বলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোন কিছু জানিবার পূর্ব্বেই কেশবচন্দ্র এই সকল গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্মবিষয়ক প্রাথমিক তথ্যগুলি সম্বন্ধে একটি ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন।

মেটকাফ হলে কেশব কর্ত্তৃক এইরূপ অধ্যয়ন কলেজ-ত্যাগের পরেই বেশীর ভাগ চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের শেষ দুই বৎসরের মধ্যে কেশব-জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় ব্যাপার ঘটে। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে কেশবচন্দ্র সেই তরুণ বয়সেই আত্মোন্নতিমূলক ও সমাজ-কল্যাণকর কার্য্যে

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

* *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen,* p. 61.

"From eleven o'clock in the morning till about six o'clock in the evening, he read regularly everyday in Metcalfe Hall, which is the only large public library we have in Calcutta. He read theological and metaphysical works mostly, the history of philosophy being his delight. He read some poetry such as Milton and Young, he gloried in Shakespeare at all times, but he hated novels of all kinds. He was an intense admirer of Sir William Hamilton, and poured over the works of Victor Cousin. He read J. E. D. Morell and M'Cosh; loved the works of Theodore Parker, Miss Cobbe and praised Emerson. He was a versatile and vorations reader in those days.

"His mind has already formed the conception of religion before he knew anything of the Brahmo Somaj."—*The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen.*—By P. C. Mozoomdar, p. 69.

হস্তক্ষেপ করেন। এই সময়ে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মমতের বিবর্ত্তন সুরু হয় এই সময় হইতে। এসব বিষয় এখন সংক্ষেপে বলিব।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি

প্রতাপচন্দ্রের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, বিভিন্ন সদগুণবশতঃ, বিশেষতঃ নিয়ত অধ্যয়ন ও অনুধ্যান হেতু, কেশবচন্দ্র কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠেন। ডিরোজিও-যুগের 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'-এর মত এসময়েও কলেজের যুব-ছাত্রগণ সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত ১৮৫৭ সনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সভার সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর এইচ. হেলিউর (১৮৫৬-৬২)।

বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্র এই সোসাইটির ছাত্র-উদ্যোগীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র বলেন, কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই সমবয়স্ক এবং বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধুদের লইয়া ছোটখাটো ক্লাব, সংঘ ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেখানে সাহিত্য ও পাঠ্য বিষয়াদি সম্বন্ধে আলোচনা হইত। প্রতাপচন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্দেশ্য স্বল্প কথায় এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—"The culture of literature and science", অর্থাৎ, সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলন। প্রতি মাসে সভার একটি করিয়া সাধারণ অধিবেশন হইত। এই সভায় ছাত্র, অধ্যাপক ব্যতীত ঐ সময়কার বিখ্যাত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় যোগদান করিতেন। প্রতাপচন্দ্র বলেন, ইউনিটেরিয়ান পাদ্রী সি. এইচ. এ. ড্যাল এবং চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটির পাদ্রী জেম্‌স লঙের মধ্যে বাদবিতণ্ডা যুব-সভ্যদের নিকট বিশেষ উপভোগ্য অথচ শিক্ষাপ্রদ হইত।* মধ্যে মধ্যে বাহির হইতে শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষানুরাগী বক্তাদের দ্বারা সোসাইটির অধিবেশনে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা হইত।

সোসাইটির একটি অধিবেশনের বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে† পাইয়াছি। এই অধিবেশন হয় ২০শে আগষ্ট ১৮৫৭ দিবসে। প্রধান বক্তা ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ মিঃ কাকপেট্রিক। সভার আরম্ভেই সভাপতি হেলিউর এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, এমন একটি হিতকারী সভার প্রতি যেমন সংবাদপত্র তেমনি জনসাধারণ সমান উদাসীন। এই সভায় কুড়ি বৎসরের নিম্নবয়স্ক আশী-নব্বই জন ছাত্র, পাদ্রী ড্যাল এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কাকপেট্রকের বক্তব্য বিষয় ছিল—"On the Duties of Man", বা মানুষের কর্ত্তব্য সম্পর্কে। বক্তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষণের পরে সভাপতি অধ্যাপক হেলিউর রসায়নশাস্ত্রের, বিশেষতঃ কৃষি-রসায়নের চর্চ্চার জন্য যুবকগণকে উপদেশ দেন। কেননা এই বিষয়ের চর্চ্চায় সমাজের আশু কল্যাণ সম্ভব। পাদ্রী ড্যাল আলোচনায় যোগদান করিয়া একটি উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ সংবাদপত্রে যেরূপ বাহির হইয়াছিল সেইরূপই এখানে উদ্ধৃত হইল :

"He (Dall) strongly reminded his hearers that they should never forget this valuable axiom 'Truth helps Truth,' and that every new discovery should have, and did have, for its object, an amelioration in the social condition of mankind. They should reflect that man was made of power, of wisdom, of justice, of love, and such being the cases it ought to be one of their main and principal endeavours in this world to render themselves useful, useful to themselves, useful to their friends, useful to their neighbours, and to the rest of the world."

ড্যাল সাহেব বলেন, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত মানব-জাতির কল্যাণ। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর প্রত্যেককেই শক্তি, জ্ঞান, ধর্ম্মবুদ্ধি, প্রেম দিয়াছেন। একারণ আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য নিজেদের, বন্ধুদের, প্রতিবেশীদের এবং জগদ্বাসীর হিতসাধন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বৎসরখানেকের মধ্যেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিখ্যাত বেথুন সোসাইটির ১৮৫৭ সনের বার্ষিক বিবরণে এই সোসাইটি সম্বন্ধে নিম্নরূপ উল্লেখ আছে :

"The (Bethune) Society has much pleasure in recording that its example has been followed by some of the distinguished students of the Presidency College, who have established an Association for the purpose of discussing literary and scientific subjects, and it is sincerely hoped it may live long and increase in usefulness."*

সোসাইটি যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বেথুন সোসাইটি উহাকে অভিনন্দিত করেন।

কলুটোলা ইভনিং স্কুল

কলুটোলা ইভনিং স্কুল বা সান্ধ্য বিদ্যালয় আর একটি প্রতিষ্ঠান যাহার সঙ্গে কেশবচন্দ্র ছাত্রাবস্থায়ই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়িলেন। কলুটোলা সেন-পরিবারের যুবকগণ কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্রের নেতৃত্বে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিনব শিক্ষায়তনটি স্থাপন করেন। এরূপ বিদ্যালয় এতদঞ্চলে ছিল না। প্রতিবেশী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছাত্রদের এবং যাহারা দিনমানে কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, তাহাদের নিমিত্ত এই সান্ধ্য বিদ্যালয়টির সূচনা। কেশবচন্দ্রের ইংরেজী জীবনী-গ্রন্থে প্রতাপচন্দ্র এ বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।† সেন-পরিবারের যুবকগণ নব্যশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ। ইংরেজী সাহিত্য, কাব্য, নাটকের আলোচনায়

* ঐ, পৃঃ ৬৫।

† *The Englishman*, 22nd August, 1857.

* *The Bengal Hurkaru*, January 22, 1858.

† *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, pp. 66-7.

তাঁহারা মশগুল। সেক্সপীয়র অধ্যয়ন তখন নব্যশিক্ষিতদের একটা ফ্যাশনে দাঁড়াইয়াছিল। কলুটোলার সেন-পরিবারের যুবকগণও ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা নিজেরা জ্ঞানলাভেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, অর্জ্জিত জ্ঞান সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেও অগ্রণী হইলেন।

কলুটোলার সান্ধ্য বিদ্যালয়ে কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন নিয়মিত ভাবে পড়াইতেন। শিক্ষাদান ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনে কেশবচন্দ্রের বিশেষ কর্তৃত্ব ছিল। "Lex" নামে এক পত্রপ্রেরক ১৮৫৭, ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলুটোলা ইভনিং স্কুলের একটি বিবরণ দিয়া সংবাদপত্রে* একখানি পত্র লেখেন। পত্রশেষে বিদ্যালয় পরিচালনে কেশবচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :

"In conclusion we cannot be so thankless as to refrain from acknowledging the warmth of heart, the highness of spirit, the honesty of purpose and the amiableness of disposition of Babu Keshub Chunder Sen, who has all along taken and still takes a very active part in the instruction of the students and the management of the school."

কেশব-চরিত্রের সুন্দর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণে এবং ছাত্রদের শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব সম্পর্কে সুষ্ঠু উল্লেখ আমরা এখানে পাই।

বিদ্যালয়টির তখন দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছিল। মুখ্যতঃ কেশবচন্দ্রের পরিচালনায় ইহা কতটা উন্নতিলাভ করে—তাহারও বিবরণ এই পত্রে পাওয়া যাইতেছে। বিদ্যালয়ে তখন ষাট জন ছাত্র অবেতনে অধ্যয়ন করিতেছিল। বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় মাত্র পঁচিশ টাকা। সেন-পরিবারের যুবক ও আত্মীয়েরা স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে ছাত্রদের পড়াইতেন। উক্ত পরিমাণ টাকা চাঁদা দ্বারা আদায় হইত। প্রথম বৎসরে সাড়ম্বরে ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষা দেশী-বিদেশী বিদগ্ধ জনের সম্মুখে গৃহীত হয়। সেযুগে স্কুল কলেজের বার্ষিক পরীক্ষাগুলি একটি উৎসবের পর্য্যায়ে গিয়া পড়িত। বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সনের জানুয়ারী মাসে, এবং ইহাতে সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত বাগ্মী ভারতহিতৈষী জর্জ্জ টমসন। তিনি এই সময় দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বৎসরের আরম্ভেই ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া সত্তর জনে দাঁড়ায় এবং তাহাদের শিক্ষার মান বিবেচনা করিয়া সাতটি শ্রেণী খোলা হয়। প্রথম বৎসরে শিক্ষকগণ কেহই বেতন লইতেন না, দ্বিতীয় বৎসরে ছাত্র-বৃদ্ধি হেতু বেতন দিয়া কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। পল্লীর মুসলমানগণও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। তাহাদের জন্য বিদ্যালয়ের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী খোলা হইয়াছিল। উক্ত পত্রে কলুটোলার সেন-পরিবারের যুবকদের ত্যাগপূত সেবাব্রতের বিশেষ প্রশংসা আছে। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করা হয় তাহা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। দুই বৎসর যাবৎ বিদ্যালয়টি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালিত হইল। ১৮৫৮, ২১শে জানুয়ারী "হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সেন-পরিবারের যুবকদের, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের সেবাব্রত যে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, 'পেট্রিয়টে'র উক্তি তাহাই প্রমাণ করিতেছে। 'পেট্রিয়ট' 'The Colootollah Evening School' শিরোনামায় অংশতঃ লেখেন :

"Some well-meaning gentlemen belonging to the family of Baboo Hurrymohun Sen have founded this benevolent institution of boys of the poor and the working classes, the days, hours of whose life are occupied in anxieties and labours for the acquisition of their daily bread. It has stood the trial and vicissitudes of existence for two years, and bids fair to continue and prosper. . . . If there is any heterogeneous population of Calcutta whose faculties should be developed and feelings cultivated by the improving and humanising influence of education, it is the working and industrial classes of the city. Much of the intensity and violence of the struggle that is now going on between principle and prejudice will lessen, Indian Society will take a refreshing and encouraging tone, and the work of progress and reform will become comparatively easy. The blessings of consolation and happiness will be diffused among the poor, and health will mark the cheerful faces of labourers and mechanics. The evening school is a novelty in India. . . . We would like to see a net-work of such useful and benevolent institutions spread over Calcutta and rear a body of industrious and intelligent men, an honour to themselves and a pride to their countrymen."

'পেট্রিয়ট' বিলাতের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের কথাও এই প্রসঙ্গে বলেন। কলুটোলার বিদ্যালয়টি যাহাতে স্থায়িত্বলাভ করে সে সম্বন্ধে তিনি কলিকাতার দেশী-বিদেশী প্রধানগণকে সজাগ ও সচেষ্ট থাকিবার নিমিত্ত আবেদন জানান। এহেন বিদ্যালয়টিও কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হইল না। প্রতাপচন্দ্র বলেন, ইহা তিন কি চারি বৎসরকাল চলিয়াছিল। বিদ্যালয়টি পরিচালনা-কালেই ১৮৫৭ সনে কেশবচন্দ্র আর একটি সভা বা সম্প্রদায় গঠন করেন এবং ক্রমে তাহার জন্যই নিজের সমস্ত শক্তি তিনি নিয়োজিত করেন। একটু পরে তাহা বলিতেছি।

বিবাহ

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে, আঠারো বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন তাঁহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করেন। ১৮৫৬ সনের ২৭শে এপ্রিল কলিকাতা হইতে ছয় মাইল দূরে বালীগ্রাম-নিবাসী চন্দ্রনাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠা

* *Hindu Intelligenceer*, March 2, 1857.

কন্যা জগন্মোহিনী দেবীর সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিবাহ হইল। ঐ দিন খুব ঝঞ্ঝাবাত হয় এবং গঙ্গা-পারাপারে কষ্টের অবধি ছিল না। কেশবচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার জননী সারদাসুন্দরী দেবী অনেক কথা লিখিয়াছেন।* এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বিবাহের পরের কথা তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :

"বিয়ের পর বৌ এক বৎসর বাপের বাড়ী ছিলেন, নয় বৎসর বয়সে আমি তাঁহাকে লইয়া আসি, সেই পর্যন্ত আমারই নিকট ছিলেন। আমার ও আমার বড় মেয়ে ফুলেশ্বরীর যত্নে বৌ ক্রমে ক্রমে সুশ্রী ও সুস্থ হইতে লাগিলেন, এবং শেষে অতি সুন্দরী হইলেন : ধর্ম্মভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌ-এর শ্রী ও সৌন্দর্য্য আরও বাড়িতে লাগিল।"

বিবাহের অব্যবহিত পরে কেশবচন্দ্রের মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা তিনি এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি তখনও স্বীয় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু সংযম-নিয়মাদি অভ্যাস দ্বারা কৃচ্ছ্র সাধনে রত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"যাহাতে কষ্ট হয়, গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হয়, কুচিন্তার দিকে মন না যায়, এমন সকল বিষয়েই নিযুক্ত হইতাম। এই সকল হইল কখন? আঠার, উনিশ, কুড়ি বৎসরে। যখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিব, সংসারের বাড়ী যেখানে করিব, দেখি, এই জায়গাই ত শ্মশান। সংসারের বিষয় বিশেষ বুঝিতাম না, কিন্তু সংসারের ভয় জানিতাম। স্ত্রী আসিতেছেন, সংসার আরম্ভ করিতে হইবে।...আমি ভাবিলাম, উচ্চ পদার্থ জীবাত্মা, একে আমি স্ত্রীর অধীন করিব? সংসারের অধীন করিব? প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ জীবনে স্ত্রৈণ হইব না; কেননা স্ত্রীর অধীন হইয়াই অনেককে মরিতে দেখিয়াছি।"‡ ইত্যাদি ইত্যাদি।

"গুড উইল ফ্র্যাটার্নিটি"

কেশবচন্দ্র ধনীর সন্তান, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত; কিন্তু নিয়ত অধ্যয়ন অনুশীলনের ফলে তাঁহার মনে এক ধরনের নীতিবোধ ইতিমধ্যেই জাগ্রত হইয়াছিল। তিনি আমিষ আহার পরিত্যাগ করিলেন, নিয়ম-সংযমে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন। নিয়ম-সংযমের মধ্যেই তাঁহার বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইল। ত্যাগপূত সেবাধর্ম্মে তাঁহার নিয়ম-সংযমের প্রথম অভিব্যক্তি; দ্বিতীয় অভিব্যক্তি এই 'গুড উইল ফ্র্যাটার্নিটি' প্রতিষ্ঠায়। কেশব-ভক্ত এবং কেশব-সহযোগী প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন, এই সংস্থাটি মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ একটি ধর্ম্মীয় সংস্থা। সেন-ভবনের এক কক্ষে কেশবের নেতৃত্বে কয়েকজন বন্ধু ও সহযোগী মিলিত হইতেন এবং ব্যক্তিগত মনের ভাব ও চিন্তাগুলি সকলের সম্মুখে ব্যক্ত করিতেন। কেশবচন্দ্র বিভিন্ন উচ্চভাবপূর্ণ গ্রন্থাদি হইতে কিয়দংশ পাঠ করিতেন, এবং অন্যেরা তাহা মনোযোগের সহিত শুনিতেন। ড. চামার্স-এর "Enthusiasm" শীর্ষক রচনা এবং থিওডোর পার্কারের "Inspiration" বিষয়ক উপদেশ কেশব-কর্ত্তৃক সাগ্রহে এবং সোৎসাহে পঠিত হইত। এই সভাটি ১৮৫৭ সনে স্থাপিত হয় এবং দুই বৎসর যাবৎ জীবিত থাকে। সভার অধিবেশনে উক্ত গ্রন্থাদি হইতে পাঠ ব্যতীত কেশবচন্দ্র প্রায়ই উপস্থিতমতে ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতাদের প্রাণে সেই সময়েই এক অভূতপূর্ব্ব আবেশ এবং অননুভূতপূর্ব্ব প্রেরণার সঞ্চার হইত। এ সম্পর্কে প্রতাপচন্দ্রের কথাগুলিই এখানে উল্লেখ করি :

"At the Goodwill Fraternity which continued its activity for full two years, Keshub often preached extempore in English with great enthusiasm. Nay, all his intelligence, energy, and moral earnestness became ignited with an ascetic glow that burned fiercely in him. Every young man who heard him became similarly excited. He drew men chiefly by his enthusiasm. He spoke loud and long, poured forth a torrent of words and feelings, becoming often hoarse and exhausted at the end of his discourse."*

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। এই উদ্ধৃতি হইতে জানা যাইতেছে, 'গুড উইল ফ্র্যাটার্নিটি'র অধিবেশনে বক্তৃতা-দানের ফলে ক্রমশঃ কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতাশক্তিরও স্ফুরণ হইতে থাকে। সভার নেতৃবৃন্দ মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের আহ্বান করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘ দুই বৎসর পরে ১৮৫৮ সনের ১৯শে নবেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এ সময় তিনি আহূত হইয়া সেন-ভবনের এই ফ্র্যাটার্নিটির সভায় আগমন করেন। তাঁহাকে আনয়ন ব্যাপারে কেশবচন্দ্র অগ্রণী হইয়াছিলেন। প্রতাপচন্দ্র প্রমুখ কেশবচন্দ্রের সহযোগিগণ দেবেন্দ্রনাথ-দর্শনে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাও তিনি (প্রতাপচন্দ্র) উক্ত কেশব-জীবনীতে বিবৃত করিয়াছেন।

ধর্ম্মমত বিবর্ত্তন

'গুড উইল ফ্র্যাটার্নিটি' স্থাপনের সময় হইতেই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম-মত একটি অপূর্ব্ব রূপ পরিগ্রহ করে। কলুটোলা সেন-পরিবার বৈষ্ণব। ঈশ্বরে ভক্তি এবং জীবে প্রেম তাঁহাদের মজ্জাগত। পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে কেশবচন্দ্রের মনে এক প্রকার নীতিবোধ এবং ধর্ম্মভাব পুষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার মন পরিপূর্ণ সায় পাইল না। কলুটোলায় এক বাংলা শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। ঐ সময়ে কেশবচন্দ্রের অপূর্ব্ব ধর্ম্মবোধ দেখিয়া তিনি এই সমাজের কিছু কাগজপত্র তাঁহাকে দিলেন। ইহার মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর বিখ্যাত বক্তৃতা "ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ"ও ছিল। কেশবচন্দ্র এই

* কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা', পৃ. ৪১-৪।

‡ জীবনবেদ, সপ্তম সংস্করণ, পৃ. ২৮।

* *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, pp. 67-9.

* ঐ, পৃ. ৬৮।

বক্তৃতা পাঠে ব্রাহ্মধর্ম্মমুখী হইলেন।* তিনি প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করণান্তর সঙ্গোপনে ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃপক্ষের নিকট উহা প্রেরণ করিলেন। ইহা ১৮৫৭ সনের কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন প্রবাসে।

ইহার বৎসরখানেকের মধ্যে কেশবচন্দ্রের জীবনে এক গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন কুলগুরুর নিকট অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের দীক্ষার দিন ধার্য্য করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই সময় কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন-কালে কেশবচন্দ্রের বন্ধুতা হয়। তাঁহাকে ধরিয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ যাচ্ঞা করিলেন। মহর্ষি মৌখিক কোন পরামর্শ দেন নাই। কেশবচন্দ্র নিজেই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। দীক্ষাগ্রহণের দিন প্রত্যুষে তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। এই ব্যাপারে হরিমোহন খুবই অসন্তুষ্ট হন। কেশব ছাড়াই অন্যদের দীক্ষা গ্রহণকার্য্য সমাধা হইল। কেশব-জননী লিখিয়াছেন :

"ভাশুরপো মোহিন, যোগীন, ও কেশবের দীক্ষা হইবে সব ঠিক্, গুরু আসিয়াছেন, মহা ঘটা, লোক খাবে। ওমা, সকালে উঠিয়া দেখি, কেশব নাই, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী পলাইয়া গিয়াছেন। কেশব সমস্ত দিন এলেন না। আমি মনে করিলাম বুঝি খ্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন। আমি অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। রাত্রি দুপুরের সময়ে কেশব বাড়ীতে ফিরে এলেন, আমার জামাই যাদবের নিকট আমার অবস্থার বিষয় শুনিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর আস্তে আস্তে আমার কাছে আসিয়া একখানি বই ও কাগজ আমার কোলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমি পড়িতে লাগিলাম, প্রথমেই,

তুমি কার কে তোমার
তুমি কারে বল রে আপন
মিছে মায়ার নিদ্রাবশে
দেখেছ স্বপন।

এই কবিতাটি পড়িবার পর আমার মন একেবারে জল হইয়া গেল।"†

দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের মধ্যে একজন দৃঢ়সংকল্প, শক্তিমান, ধর্মপ্রাণ যুবকের সন্ধান পাইলেন। কেশবচন্দ্রও শতবিধ অসুবিধা এবং নির্যাতন-নিপীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একান্ত ভাবে যোগ দিলেন।

* রাজনারায়ণ বসু লেখেন : "কেশবচন্দ্র আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন।"—রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ. ৭৮।

† কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পৃঃ ৬২।

নাটক-অভিনয়

সেকসপীয়রের প্রতি সে সময়কার শিক্ষিত জনের অনুরাগ, এবং কেশবচন্দ্রের সেকসপীয়র-প্রীতির কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার এই প্রীতি সেকসপীয়রের কোন কোন নাটকের অভিনয় দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে অনুক্রামিত করিতে তিনি যত্নপর হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৮ সন নাগাদ হ্যামলেটের অভিনয়ের আয়োজন করেন। এই অভিনয়ে হ্যামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করেন কেশবচন্দ্র স্বয়ং। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'লিয়ারটেজ' এবং নরেন্দ্রনাথ সেন 'ওফেলিয়া'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া একটি রীতিমত রঙ্গমঞ্চ তৈরি করা হয়। তাঁহাদের এই কার্য্যে সেন-পরিবারের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।*

সেন-পরিবারের যুবকগণ মুরলীধর সেন ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে আর একটি অভিনয়ের আয়োজন করেন ১৮৫৯ সনের প্রথম দিকে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ প্রচেষ্টার অনুকূলে উমেশচন্দ্র মিত্র 'বিধবা-বিবাহ নাটক' লেখেন। সেন-পরিবারের যুবকগণ ইহার অভিনয় করিতে উদ্যোগী হন। রঙ্গমঞ্চের নাম দেওয়া হয় 'মেট্রোপলিটান থিয়েটার।' বড়বাজার সিন্দুরিয়াপটীর বিখ্যাত রামগোপাল মল্লিকের ভবনে—যেখানে পূর্ব্বে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল, এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। নাট্যশালার দৃশ্যপটগুলি মিঃ হলবাইন আঁকিয়া দেন। এই রঙ্গমঞ্চে বিধবা-বিবাহ নাটকখানি দুই বার—২৩শে এপ্রিল ও ৭ই মে (১৮৫৯) সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অভিনয় দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। 'সংবাদ প্রভাকর' (১৪ মে ১৮৫৯) এই অভিনয়ের একটি বিবরণ প্রকাশিত করেন। ইহাতে পাই :

"...সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীধর সেন স্বীয় বন্ধুবর্গ সহযোগে পূর্ব্বতন মেট্রোপলিটান কলেজ বাটীতে এক সুরম্য রঙ্গভূমি স্থাপিত করিয়া কয়েক বার যেরূপ শ্রবণ-মনোহর ও গোচর-সুখকর অভিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয়, বাঙ্গলাভাষায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আর কুত্রাপি হয় নাই। সুদক্ষ কুশীলব মহাশয়েরা অতি সুচারুরূপে অভিনয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কুশীলবের অভিনয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। আর ঘটনাস্থলের প্রতিকৃতির অধিকাংশই এরূপ চিত্তচমৎকারিণী ও মনোহারিণী হইয়াছে যে তাহা দেখিলে স্বরূপ ঘটনাস্থলই বোধ হয়, রঙ্গস্থলের কাল্পনিক কাব্য বোধহয় না। অধিক কি কহিব,...দর্শকমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে এই অভিনয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রশংসা করিয়াছেন...।"

'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয়ে কেশবচন্দ্র রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন। অভিনয় দ্বারা সমাজ-কল্যাণ সাধন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।‡

* প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরেজী কেশব-জীবনীতে (পৃ. ৬৯) এ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

‡ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সং, পৃ. ৫১-২।

রাখী-পূর্ণিমা

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

একজন অবিবাহিত রিসার্চ স্কলারের কাছে যে মেয়েলি হাতের ঠিকানা লেখা রঙিন ফিতায় বাঁধা ছোট একটি পার্শেল আসতে পারে একথা দিল্লী ইউনিভারসিটি হোষ্টেলের ছাত্রদের কল্পনায়ই আসে নি। তাই সেটার বিষয়ে তাদের অসাধারণ কৌতূহল। কয়েকটি বন্ধু আমার ঘরে এসে দেখতে চাইল পার্শেলটার ভেতরে কি আছে। সেটা খুললে তার থেকে বেরুল রূপালি ঝালর-দেওয়া, দু'দিকে সুতো বাঁধা প্রাচীন কালের সৈন্যদের বাহুতে বাঁধবার রক্ষাকবচের মত একটা জিনিস, তবে খুব হাল্কা। তার সঙ্গে ছোট্ট একটি চিঠি। বন্ধুদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বললাম, সেটা রাখী। শ্রাবণের পূর্ণিমাতে উত্তর ও মধ্যভারতের বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখী বেঁধে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে থাকে। ভাই দূরে থাকলে রাখীটা ডাকে পাঠিয়ে দেয়।

সেটা আমার বোন পাঠিয়েছে কি না, তারা জিজ্ঞাসা করলে। আমি বললাম, আমার বোন নেই।

তবে সে কে?

সে আমার পাতানো বোন।

পাতানো বোন? সে আবার কেমন?

যথাসম্ভব বুঝিয়ে বলা হ'ল।

বন্ধুরা চলে গেলে ছোট চিঠিখানা খুলে পড়লাম। বহু কথা মনে পড়ল,—পাঁচ বৎসর আগেকার।

তখন আমি ইন্দোরে পড়ি। রমেশ আমার কলেজের সহপাঠী এবং হোষ্টেলের গৃহসঙ্গী ছিল। দু'জনার মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। একবার তাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলাম, তার পর থেকে সে প্রায়ই বলত, আমাকে তাদের বাড়ী নিয়ে যাবে। কিন্তু বড় ছুটিতে আমি নিজ বাড়ীতে চলে যাই, তার সঙ্গে যাওয়া হয়ে উঠে না। সেবার একদিন প্রাতে সে একখানা চিঠি নিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললে, "এবার আমি বাড়ী চললাম, রাজেশকুমার! তোমায়ও আমার সঙ্গে আসতে হবে।" চিঠিখানা তার বোন লিখেছে। রমেশ পড়ে শোনালে, "দাদা, অনেকদিন তোমাকে নিজ হাতে রাখী বাঁধতে পারি নি, এবার বাড়ী আসতেই হবে, অবশ্য, অবশ্য।"

রমেশ ও গৌরীরাণী বাপমায়ের দুটি মাত্র সন্তান। ভাই বি-এ পড়ে, বোনটি ম্যাট্রিক পাস করে বাড়ী থেকেই আই-এ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে। বাপ গরীব, মিডিল স্কুলের মাষ্টার, ছেলের পড়ার সাহায্য করাই তাঁর পক্ষে কঠিন। রমেশ কতকটা পিতার কষ্টার্জ্জিত অর্থে, কতক নিজে প্রাইভেট টিউশন করে, পড়ার খরচ চালায়।

রমেশ বললে, "তোমাকে নিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন সপ্তাহখানেক থেকে আসব। আর কয়েকদিন আগে থেকেই যাব।" আমি সম্মত হলাম।

কলেজ কামাই করে শ'খানেক মাইল রেল-ভ্রমণের ব্যবস্থা হ'ল। বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করে, নর্ম্মদা নদী পেরিয়ে, একটা জংশনে ঘণ্টা আটেক বসে আর একটা গাড়ী ধরে ইন্দোর ছাড়বার প্রায় আঠারো ঘণ্টা পরে রমেশদের বাড়ী পৌঁছতে হবে। রমেশ সকাল থেকে বোনের জন্যে রাখীবন্ধনের উপহার কিনতে লাগল।

গাড়ীতে যখন উঠলাম তখন দেখা গেল তার চোখ লাল, গায়ে জ্বর। সে বললে, ওটা কিছু নয়, বাড়ী গেলেই সেরে যাবে। জংশনে যখন পৌঁছলাম তখন দেখলাম তার জ্বরটা বেড়ে গেছে, সে একটু দুর্ব্বলও হয়ে পড়েছে। থার্ড ক্লাসের টিকিটখানা সেকেণ্ড ক্লাসে পরিবর্ত্তিত করে ওয়েটিং রুমে তাকে শুইয়ে দিলাম। কিন্তু সে যে-পর্য্যন্ত নিজের পকেট থেকে টিকিটের অতিরিক্ত পয়সাটা না দিয়েছে সে-পর্য্যন্ত তার মনে শান্তি নেই। রমেশ গরীব বলে টাকাপয়সা বিষয়ে তার অতিরিক্ত সতর্কতা।

মধ্যরাতে গাড়ী এল। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যখন উঠতে যাব তখন দেখি তা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ঠেলাঠেলিতেও কেউ দরজা খুললে না। এদিকে শ্রাবণের আকাশ থেকে ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। গার্ডকে ডাকলাম, কিন্তু তাঁর পক্ষেও কিছু করা সম্ভব হ'ল না। গার্ড বলে গেলেন ও-কামরায় বাঙ্ক খালি আছে। গাড়ীর থামবার সময় ফুরিয়ে এল। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর একজন লোক ভেতর থেকে বললেন, দরজা সকাল ছ'টায় খোলা হবে। রমেশকে নিয়ে কোনরকমে পাশের ইণ্টার ক্লাসের কামরায় ঢুকলাম। জ্বরের ঘোরে রমেশ প্রলাপ বকতে লাগল, "আমি চিনি ওসব নবাবের বেটাদের! বোম্বাই শহরে থেকে থেকে মনে করে দুনিয়ার আইন-কানুন শুধু তাদের আরামের জন্য, অন্যের কোন অধিকার নেই।" সে উত্তেজিত ভাবে বললে, সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে জায়গা থাকতে সে ইণ্টার ক্লাসে বসবে না, চেন টেনে গাড়ী থামাবে। অনেক কষ্টে তাকে নিরস্ত করা গেল। তার জ্বর জেনে একজন ভদ্রলোক নিজের বিছানাটা গুটিয়ে তার জন্যে জায়গা করে দিলেন। আমি রমেশকে আস্তে আস্তে বললাম, "বোম্বাইয়ের সবলোকই একরকম নয়।" রমেশ শুয়ে পড়ল, কিন্তু কাশির জন্য ঘুমুতে পারল না। এ কাশিটা নতুন উপসর্গ।

গন্তব্য ষ্টেশনে যখন নামলাম, তখন দূরের আকাশে সোনালি আভা দেখা দিয়েছে। প্রভাতের মিঠে বাতাসে রমেশও কতকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল। টাঙ্গায় চড়ে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে

রমেশদের বাড়ীর দিকে চললাম। স্থানটিকে শহর না বলে বড় গ্রাম বলতে হয়।

একটি সুন্দর খাপরার ছাউনির ছোট বাড়ীর সামনে টাঙ্গা থামল। সুমুখে বাগান, ফুলে ভরা। বাগানের ফটক খুলে ঢুকতে যাব এমন সময় ভেতর থেকে রমেশের বৃদ্ধ পিতা বেরিয়ে এলেন। তাঁর গায়ের চামড়া লোল হয়ে এসেছে, কিন্তু আগুনের মত রং, আর সরল উন্নত দেহ। আমরা তাঁকে প্রণাম করতেই পেছন থেকে এল রমেশের বোন গৌরীরাণী। মেয়ে বাপের রং ও চেহারা পেয়েছে। গৌরী বাস্তবিকই গৌরী। অতি ফর্সা রং, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, সারা দেহটি প্রথম তারুণ্যের প্রভায় উজ্জ্বল। কালো চুলের দুটি বেণী দু'দিকে ঝুলে পড়েছে, মুখে নির্ম্মল হাসি। শুধু 'গৌরী' নামটিই যে তার সার্থক তা নয়, যে-কোন 'রাণী' তার রূপ ও সুন্দর চোখ দুটি পেলে নিজেকে ধন্য মনে করত।

তখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন রমেশের মা। মনে হ'ল তিনি অসুস্থ, দেহ কতকটা ভেঙে পড়েছে।

বৃদ্ধা বললেন, "গৌরী ভোর চারটা থেকে উঠে বসে আছে।" গৌরী বললে, "কাল কখন গাড়ীতে উঠেছিলে, দাদা?" মায়ের চোখে রমেশের অসুখ ধরা পড়ল। তিনি বললেন, "বাবা, তোমার শরীরটা ত ভাল দেখা যাচ্ছে না। কি হয়েছে?"

রমেশ বললে, "কিছু না, শুধু পথের ক্লান্তি, বিশ্রামে সেরে যাবে।" কিন্তু মায়ের মনে প্রত্যয় হ'ল না। তিনি তার কপালে হাত দিয়ে বললেন, "তোর ত জ্বর রমেশ!" আমি তার অসুখের বিষয় খুলে বললাম। রমেশকে ঘরে নিয়ে মেঝেয় বিছানা পেতে শুইয়ে দেওয়া হ'ল।

আমি তার পিতার সঙ্গে ডাক্তার ডাকতে চললাম। যাবার পূর্ব্বে গৌরী আমাদের চা খাইয়ে দিলে। পথ চলতে চলতে বৃদ্ধ বললেন গৌরীই এই সংসারটা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই ভোর পাঁচটাতে উঠে, বাসন মাজা ঘর নিকানো থেকে আরম্ভ করে চা, জল-খাবার তৈরি, রান্নাবান্না, কাপড় ধোয়া সবই সে করে। আবার সব কাজের মাঝে নিজের পরীক্ষার পড়া পড়ে। স্কুলে ও খুব ভাল ছাত্রী ছিল। শুধু পড়ায় নয়, গানে, নাচে, খেলায়, সবটাতেই সবার প্রথম।

বৃদ্ধ দুঃখ করে বললেন, দারিদ্র্যের জন্য এ পর্য্যন্ত মেয়েটিকে সৎপাত্রস্থ৷ করতে পারেন নি। তবে আশায় আছেন, রমেশ বি-এ পাস করলে একসঙ্গে দু'জনারই বিয়ে দেবেন।

ডাক্তার এসে রোগী দেখলেন। বললেন, "নিমোনিয়া সন্দেহ হচ্ছে, তবে এখনও ঠিক বলা যায় না।" ডাক্তারখানায় গিয়ে দেখলাম, ডাক্তারের জ্ঞান বড়, তাঁর ডিসপেন্সারীতে ঔষধের ব্যবস্থা সে অনুযায়ী নেই। ডাক্তারখানা থেকে ফিরতে ফিরতে মনে হ'ল, যদি রমেশের নিমোনিয়া হয়ে থাকে তবে তার জন্য দায়ী হবে সেই সেকেণ্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জাররা, যারা ভেতরে বাঙ্ক খালি থাকা সত্ত্বেও দরজা খুলে দেয় নি।

বাড়ীতে বসে বসে লক্ষ্য করলাম, গৌরীরাণী পরম উল্লাসে গৃহের নানা কাজ করে যাচ্ছে। এক একবার মনে হচ্ছিল সে যেন হাঁটছে না, মাটিতে ঈষৎ পা ফেলে হাওয়ার উপর দিয়ে চলছে। মুখে হাসি লেগেই আছে। ভাইকে পেয়ে সে বাস্তবিকই খুশী হয়েছে। কিন্তু আমার সামনে এলে তার চোখ নীচু হয়ে যায়, সে লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়ে। সেটা যে শুধু আমি অপরিচিত বলে, তা মনে হ'ল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কারণ বুঝতে পারলাম। রমেশ একমাত্রা ঔষধ খেয়েই ভেবেছে অসুখ সেরে গেছে। প্রফুল্ল মুখে মায়ের সঙ্গে বহু কথা পেড়েছে। আমি শুনলাম, মায়ের কাছে উচ্ছ্বসিত ভাবে আমার কথা বলছে। মা বললেন, "তোমার বন্ধু বড়লোকের ছেলে, নইলে তার সঙ্গে আমাদের গৌরীর বিয়ের আলাপ করতাম।" রমেশ বাধা দিয়ে বললে, "ওসব কথা তুলো না মা। সে কি মনে করবে?" মা বললেন, "কেন, সে যদি গৌরীকে পছন্দ করে?" "ওসব কথা থাক্ মা," বলে রমেশ কথাটা চাপা দিলে।

ঘরে রমেশকে একা পেয়ে বললাম, "মায়ের সঙ্গে কি সব আলাপ হচ্ছিল, রমেশ?"

সে একটু বিব্রত ভাবে বললে, "কিছু মনে করো না, রাজেশ-কুমার! মা বুড়ো মানুষ, আমাদের স্বজাতের ছেলে দেখলেই মেয়ের বিয়ের কথা ভাবেন।" একটু মুচকি হেসে বললে, "তোমার ত মিস গুপ্তাই রয়েছে।" মিস গুপ্তা আমাদের সহপাঠিনী, তার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা চলে, রমেশের কাছে আমি তার প্রশংসা করেছি। কিন্তু এখন বললাম, "ও সব বাজে বকো না, রমেশ!" সে আমার স্বরের কটুতায় অবাক হ'ল। মায়ের সঙ্গে দাদার এসব আলোচনা গৌরী অবশ্য শুনেছে। এখন বুঝতে পারলাম কেন আমার সামনে জলখাবার রাখবার সময় তার সুকৃষ্ণ পক্ষ্মরাজি কপোলের উপর বিস্তৃত হয়েছিল, চোখের পাতা নুয়ে পড়েছিল, উজ্জ্বল দৃষ্টিটি ঢেকে গিয়েছিল।

একা বসে বসে ভাবতে লাগলাম, রমেশের মায়ের কথাটি—"সে যদি গৌরীকে পছন্দ করে?" রমেশ ভেবেছে তা অসম্ভব, কারণ আমার ত মিস গুপ্তাই রয়েছে। "মিস গুপ্তা আমার কে, আমি বা মিস গুপ্তার কে?" গৌরীকে পছন্দ! হাঁ, জগতে যদি কোন দিন কোন মেয়েকে পছন্দ করি তবে সে গৌরী। ভাবলাম, যদি আমি ভীষ্মের চিরকৌমার্য্যের ব্রতও ধারণ করতাম, আর আমাকে বলা হ'ত, গৌরীরাণী তোমার হাতে মঙ্গলসূত্র পরতে প্রস্তুত, তুমি তা পরাতে প্রস্তুত আছ?—তবে আমি সে ব্রত ভঙ্গ করে প্রস্তুত হতাম।

বিকালের দিকে ডাক্তার এসে রমেশকে দেখে বললেন, নিমোনিয়া সন্দেহ নেই। ডাক্তার আমার কাছে দুঃখ করলেন, চিকিৎসার আধুনিক ঔষধ তাঁর কাছে নেই, তা শুধু বড় শহরে

পাওয়া যেতে পারে। আমি ইন্দোর গিয়ে সে ঔষধ আনব বললাম। সেদিন সন্ধ্যায়ই রওনা হব স্থির হ'ল।

বৃদ্ধ এদিক-ওদিক ঘুরে এসে আমায় বললেন, "একটি দিন দেরি করে যাও বাবা। জানলাম ঔষধের দাম বেশী, আমি কাল পর্য্যন্ত টাকা যোগাড় করে দেব।" আমি বললাম, "টাকা চাই নে, আমি সব ব্যবস্থা করব।" বৃদ্ধের মুখের শুষ্ক ভাব দেখে বললাম, "আমি রমেশের বন্ধু, তার জন্যে কিছু করা আমার কর্ত্তব্য নয় কি?

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৌরী আমার জন্য রাত্রির আহার তৈরি করে রেখেছিল। সে তা পরিবেশন করতে করতে দাদার অসুখের কথা আলোচনা করতে লাগল। সে অসুখের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম। "বললাম ইন্দোরে যে প্রসিদ্ধ বাঙালী ডাক্তার আছেন আমি তাঁর পরামর্শ নেব এবং দরকার হলে তাঁকে এখানেও আনবার ব্যবস্থা করব। গৌরী আশ্বস্ত হ'ল। আমি যখন ষ্টেশনে যাবার টাঙ্গায় উঠতে যাব তখন গৌরী একটা ছোট থলে এনে বললে, এর মধ্যে সকালের জলখাবার রয়েছে, আমি যেন খাই। আমাকে দিয়ে ব্যাগটা খুলিয়ে থলেটা তার ভিতর রাখল। আমি তাকে কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। শুধু বললাম, "রমেশের প্রতি দৃষ্টি রেখ, তাকে বেশী নড়াচড়া করতে দিও না।"

পথে যেতে যেতে ভাবলাম, কি আশ্চর্য্য মেয়েদের মন! ভাইয়ের জন্য এত উৎকণ্ঠা, অথচ অতিথির খাবার-দাবার ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র ত্রুটি নাই।

গাড়ীতে বসে শুধু গৌরীর কথাই মনে হতে লাগল। এই একটি মেয়ে সমস্ত পরিবারটির প্রাণস্বরূপ। তার কি অক্লান্ত পরিশ্রম, কি উৎসাহ, সর্ব্ববিষয়ে কি তৎপরতা! অথচ কচি বয়স, আঠারোর বেশী নয়! এক একবার ভেসে উঠতে লাগল তার কোমল মুখ, নির্ম্মল স্নিগ্ধ দৃষ্টি, শুচিসুন্দর দেহের কান্তি!

বসে বসে বাইরের দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইলাম। বহুদূর পর্য্যন্ত দু'দিকে বন, সবুজ পাতার উপর শুভ্র জ্যোৎস্না ঝলসে উঠছে। জানি না মনের ভিতর কি অপূর্ব্ব যাদু আছে যার প্রভাবে ঐ জ্যোৎস্নাস্নাত সবুজ বনানীর সঙ্গে গৌরীরাণীর দেহের রূপচ্ছটা মিলে আসতে লাগল! যেদিকে তাকাই সেদিকেই যেন দেখি পেছনে ফেলে-আসা ক্ষুদ্র গৃহকোণের কর্ম্মক্লান্ত তরুণ মুখখানির অপূর্ব্ব সুষমা সর্ব্বত্র রূপায়িত হয়ে উঠছে!

প্রভাতে যখন গৌরীরাণীর দেওয়া থলেটি খুললাম, তখন অবাক হয়ে দেখলাম, খাবার জিনিষগুলোর নীচে একটা ছোট মেয়েলি রুমালে কি বাঁধা। খুলে দেখলাম, সোনার হার। মনে হ'ল গৌরীর গলায় তা দেখেছি। আসবার সময় সেটা যে গলায় ছিল না, তা লক্ষ্য করি নি। সঙ্গে একটি ছোট চিঠি।

"দাদার ওষুধ নাকি খুব দামী। এ সঙ্গে আমার হারটা দিলাম। আমার একান্ত অনুরোধ, এটা বিক্রি করে ওষুধ কিনবেন অবশ্য, অবশ্য। গৌরীরাণী।"

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আমি নির্ব্বাক হয়ে চিঠিখানা হাতে নিয়ে বসে রইলাম। তার পর মনে হ'ল শেষ কথা দুটো কোথায় শুনেছি। হাঁ রমেশের কাছে যে চিঠি দিয়েছিল তারও শেষটা ছিল, "অবশ্য, অবশ্য।"

জানি না সহযাত্রীরা আমার চোখের আকস্মিক সজল ভাব লক্ষ্য করেছিল কি না।

ইন্দোরে মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট না করে আমি ঔষধ সংগ্রহের কাজে লেগে গেলাম। প্রসিদ্ধ বাঙালী ডাক্তারের অন্তরের যে পরিচয় পেলাম, তা লোকের মুখের বর্ণনার চাইতেও বেশী। তিনি নিজে ঔষধের ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন, দরকার হলে যেন তাঁকে টেলিফোনে 'ট্রাঙ্ককল' দি', তিনি ট্রেনে আসবেন।

ফিরে বাড়ীর কাছে আসতে দেখলাম ফটকে দাঁড়িয়ে গৌরীরাণী আমার টাঙ্গাটা লক্ষ্য করছে। থামতেই বললে, "ঔষধ পেয়েছেন?" মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন। আমি নামতেই আমার হাত থেকে ঔষধের বাণ্ডিলটা নিলে। তার পর সলজ্জভাবে বললে, "আমার উপর তো রাগ করেন নি?"

"তুমি তোমার হার দিয়েছিলে বলে?"

সে তার ঠোঁটের উপর হাতের আঙুল রেখে আমাকে জানালে, কথা যেন না বলি। পেছনে তার বাবা আসছিলেন।

ডাক্তার ডেকে ইনজেকশনের ব্যবস্থা করা হ'ল। ডাক্তার বললেন ফুসফুসের দুটো দিকই ধরে গেছে। রোগীর বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

রাত্রিতে রোগীর শুশ্রূষার জন্য ডাক্তার একজন কম্পাউণ্ডার পাঠালেন, পাড়ার লোকও এল। আমি বরফ এনেছিলাম, তা আইসব্যাগে ভরে মাথার উপর রাখা হ'ল। মধ্যরাত্রে অন্যদের বিশ্রাম দিয়ে আমি গিয়ে বসলাম। রমেশ অসাড়ের মত পড়ে ছিল, চাপা কাসি, কঠিন নিঃশ্বাস। অবস্থাটা ভাল মনে হ'ল না।

প্রথম রাত্রে গৌরী একবার দেখে গিয়েছিল, বলেছিল খানিক ঘুমিয়ে আবার আসবে। মধ্যরাত্রের পরে এল, আলুথালু চুল—মনে হ'ল হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে এসেছে। বললে, আপনি গিয়ে ঘুমুন আমি বসছি। বললাম, "তুমি বড় ক্লান্ত গৌরী, ঘুমোও গে।"

"আপনি ত সারাদিন ধরে ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন।" বলে সে একটা হাতপাখা নিয়ে ভাইয়ের বিছানার পাশে বসল এবং তার মাথায় পাখা করতে লাগল। আমি আইসব্যাগ সরিয়ে বসলাম। দেখে খুশী হলাম গৌরী আমাকে আপনজন বলেই মনে করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মাথা ঢুলতে লাগল, হাত থেকে পাখাটা খসে গেল। ধীরে ধীরে, নিজের অজ্ঞাতে, সে ভাইয়ের বালিশে মাথা রেখে পাশে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল এবং দেখতে দেখতে ঘুমে অচেতন হয়ে গেল। তার একটা হাত অজ্ঞাতে এসে আমার গায়ে ঠেকল, কয়েকটা চুলের গুচ্ছ আমার উপর ছড়িয়ে রইল।

আমি কয়েক মুহূর্ত্ত অবাক হয়ে সম্মুখে শয়ান ভাইবোনের

দিকে চেয়ে রইলাম। দু'জনার মুখের একই আদল, কিন্তু একটি মুখ ম্লান, মৃত্যুর ছায়ায় পাণ্ডুর; রুক্ষ; অপরটি উজ্জ্বল, রক্তিম, ফুলের মত কোমল। একদিকে পুরুষের দেহ, রোগের প্রকোপে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে, অপরদিকে সুকুমার নারী-দেহ সুষুপ্তির ক্রোড়ে তরুণ জীবনের অপূর্ব্ব গরিমায় লীলায়িত, মেখায়িত হয়ে পড়েছে। তার কেশগুচ্ছের ক্ষীণ স্পর্শ, তার শুভ্র হাতটির মৃদু চাপ আমার স্পর্শেন্দ্রিয় অতিক্রম করে যেন মনের কোন অতল গভীরে গিয়ে পৌঁছেছিল।

হঠাৎ আমার মনে একটা খেয়াল চাপল। ধীরে ধীরে উঠে আমার ঘরে এলাম, গৌরীর হারটা বের করলাম। ভাবলাম সেটা আস্তে আস্তে ঘুমন্ত অবস্থায় তার গলায় পরিয়ে দেবো। পরদিন সকালে যখন সে সেটা তার গলায় দেখবে তখন ভারি মজা হবে। কিন্তু রোগীর ঘরে এসে মনে খটকা বাধল। ভাবলাম হার পরিয়ে দেবার সময় যদি গৌরীর মা কিংবা বাবা, অথবা আমার ঘরে যে ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারটি ঘুমিয়ে আছে সে সেখানে আসে আর তা দেখতে পায়, আর ভাবে, আমি হার পরাচ্ছি না, গলা থেকে হার খুলে নিচ্ছি—তবে? অথবা, যদি গৌরী হার পরাবার সঙ্গে জেগে যায়, তখন—আমি যে হার পরাচ্ছি তা তো আর জানবে না—সে কি মনে করবে? অনেক অসাধারণ কাজই পূর্ব্বাপর বিবেচনায় বাধা পায়, আমারও তাই হ'ল। যদি ওসব বিবেচনা না করে হার পরিয়ে দিতাম, আর যেমন ভেবেছিলাম, গৌরীকে বলতাম সেটা আমার 'আশীর্ব্বাদ', তবে হয়ত ভবিষ্যৎ অন্য রূপে গড়ে উঠত।...

যাহোক আমি আবার বেরিয়ে এলাম। আমার আসা-যাওয়ার শব্দে রমেশের পিতার ঘুম ভেঙেছিল, অথবা হয়ত উনি জেগেই ছিলেন; বললেন, কি বিষয়?—আমি বললাম, গৌরী রোগীকে পাখা করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।—তখন গৌরীর মা বেরিয়ে এসে রমেশের ঘরে গেলেন এবং পাখাটা তুলে নিজ হাতে রমেশের মাথায় বাতাস করতে লাগলেন। মেয়েকে ধাক্কা দিলেন, কিন্তু তার ঘুম ভাঙল না। তখন তিনি ঘুমন্ত কন্যার মাথাটা রোগীর বালিশ থেকে সরিয়ে নিজ কোলের উপর রাখলেন। আমি নীরবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, জগতের বড় বড় চিত্রকররা শিশুকোলে তরুণী মাতার চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু কেউ তরুণী কন্যা কোলে বৃদ্ধা মায়ের ছবি এঁকেছেন কি? আমি চিত্রকর হলে আঁকতাম।

গৌরী জেগে উঠে বসল, অবস্থাটা বুঝে লজ্জা পেল। আর মায়ের মুখের পানে অবাক হয়ে চাইল। তার পর মা-মেয়েকে তাদের ঘরে পাঠিয়ে আমি রোগীর কাছে গেলাম। তার অবস্থাটা বড়ই খারাপ বোধ হচ্ছিল।

প্রভাতে উঠে ইস্কুলের ডাক্তারকে টেলিফোন করতে গেলাম। ঘণ্টাচারেক সময় লাগল। এসে দেখি বন্ধুর জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। কিছুক্ষণের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল।

গৌরী শুধু কেঁদে আকুল হ'ল তাই নয়। সে ভাইয়ের মৃত্যুটা স্বীকারই করবে না। শব নেবার সময় সহসা সে সমস্ত ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলল। ভাইকে আঁকড়ে ধরে রইল, নিতে দেবে না। গৌরী তার আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে কাকেও মরতে দেখে নি, মৃত্যুর নির্ম্মমতার সঙ্গে তার এই প্রথম পরিচয়।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে কে সান্ত্বনা দেবে? গৌরীকে কে বুঝাবে। এ পরিবারের একমাত্র ভরসাস্থল রমেশ অকালে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে, পরিবারটি অকূলে ভেসেছে। আত্মীয়বান্ধব প্রতি-বেশীরা আসেন, চুপ করে বসে থাকেন। তার পর চলে যান। আমিও তিন দিন পর্য্যন্ত নীরবেই বসে রইলাম। শুধু দেখলাম, গৌরী নিজেকে সামলে নিয়ে গৃহকার্য্যে লেগে গেছে, মুখ বুজে চোখের জল মুছে নিজ কর্ত্তব্য করে যাচ্ছে।

আমি মনে মনে স্থির করলাম নিজ স্থানে গিয়ে আমার এক জন আত্মীয়কে দিয়ে রমেশের পিতার নিকট চিঠি লেখাব—বিয়ের আলাপ করে। বলব, আমি তার পুত্রের স্থান পূরণ করব। সঙ্কল্প করলাম, তাঁদের দুশ্চিন্তার অবসান করাব, যদিও শোকের অবসান হবে না।

চতুর্থ দিনে কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ লোক এলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি বললেন, "ভাই, শোক করে কি হবে, সবই ভগবানের ইচ্ছা। এবার ধৈর্য্য ধর।"

রমেশের পিতা আর্ত্ত কণ্ঠে বললেন, "কি করে ধৈর্য্য ধরি, দাদা! সর্ব্বস্ব পণ করে রমেশকে মানুষ করছিলাম, ভগবান তাকে নিয়ে গেলেন। তার বিহনে আজ আমরা নিরাশ্রয়, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

অপর ভদ্রলোকটি বললেন, "এবার নিজের কর্ত্তব্য কর, তোমার মেয়ের বিয়ে দাও।"

"মেয়ের বিয়ে? আমার মত নিঃস্ব লোকের মেয়ে কে নেবে দাদা?"

"তোমার মেয়ে সুন্দরী, শিক্ষিতা। তার বিয়ে হওয়া কঠিন হবে না। বিয়ে হয়ে গেলে তোমরা দু'জনে কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেবে।"

গৌরী হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে এসে থমকে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে এগিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠের সামনে পেয়ালাটি রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পিতার দিকে চেয়ে বললে, "বাবা, আপনি ওভাবে মন খারাপ করবেন না। ভাবুন আমি আপনার মেয়ে নই, ছেলে। আমি আপনাদের নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলে নিজে আশ্রয় নিতে রাজী হব না।" তার পর স্বর একটু চড়িয়ে বললে, "আজ সর্ব্ব সমক্ষে শপথ করছি, আমি বিয়ে করব না, আমার নিজের সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে উপার্জ্জন করব, মা বাবার ভার নেব, তাঁদের আজীবন ভরণপোষণ করব।"

সকলে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। গৌরীরাণীর সুন্দর কোমল চোখ দুটি থেকে যেন আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছিল।

বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটি বললেন, "সাবাস মা। কিন্তু তুমি মেয়ে-ছেলে হয়ে পুরুষের মাথার বোঝা কেমন করে নেবে, মা?"

গৌরী ধীরে ধীরে বললে, "আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি, এবার আই-এ পরীক্ষা দেব, পাস করে স্কুলে চাকরি করব। তাতে আমি অনায়াসে এ পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারব। তা ছাড়া, আমি আরও পড়ব, বি-এ, এম-এ পাস করব—আমার দাদা যা করত আমিও তাই করব।"

সবাই চুপ। গৌরী ধীরে ধীরে চলে গেল।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেদিন গৌরীর বৃদ্ধ মামা এসে পরিবারের দেখাশোনা করতে লাগলেন। আমি এবার যেতে চাইলাম। গৌরী বললে, আজ, না, কালকের দিন থেকে যান।"

জানলাম, পরদিন রাখী-পূর্ণিমা। গৌরী ভোরে উঠে, ঘর নিকিয়ে, স্নান করে, ভাইটির ঘরের মেঝেয় একটা পিঁড়ি পেতে সামনে বড় থালাতে ফুল, চাল, গমের অঙ্কুর, চন্দন, এ সব সাজাল। তার পর নিজ ঘরে গিয়ে ভাল একটি শাড়ী পরল, কানে ফুল লাগাল আর হাতে সোনার চুড়ি। তার পর ধীরপদে আমার ঘরে এসে বললে, "আজ রাখী-পূর্ণিমা। দাদাকে রাখী পরাব বলে ডেকে এনেছিলাম। আজ দাদা নেই। আপনি তার বন্ধু। আপনিই দাদার হয়ে আমার রাখী নিন্।"

আমি স্নান করে ধুতি জামা পরে তার ঘরে গেলাম। সে আমার কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, তার উপর চাল মাখিয়ে দিলে। কানে গমের অঙ্কুর ছোঁয়ালে। আর আমার ডান হাতে একটি সুন্দর রুপালি রাখী বেঁধে দিলে।···এখনও আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠে তার সে স্নেহশীতল স্পর্শ, তার সরল সুন্দর চোখ দুটি, তার শুভ্র কপোলের উপর অশ্রুবিন্দু, আর তার তপস্যাশুচি কোমল ঠোঁট দুটির অপূর্ব্ব দৃঢ়তা।

পেছন থেকে তার মা আমার হাতে রমেশের-আনা উপহারগুলি তুলে দিলেন। আমি একে একে সেগুলি তাকে দিয়ে মনে মনে শুভেচ্ছা জানালাম। অবশেষে আমার পকেট থেকে তার সোনার হারটি বের করলাম। সেটার সঙ্গে ইন্দোর থেকে দামী পাথর বসানো একটি পেণ্ডেণ্ট কিনে লাগিয়েছিলাম। হারটি তুলে তার গলায় পরিয়ে দিলাম।

গৌরী আমার সামনে মিষ্টির থালা রেখে শান্ত ভাবে বললে, "আপনি যখন যেখানে থাকেন, শ্রাবণের প্রথমে আমার কাছে ঠিকানা পাঠাবেন। আমি প্রতি শ্রাবণী পূর্ণিমায় আপনাকে রাখী পাঠাব। আজ থেকে আমি আপনার ধর্ম্মের বোন।"···

সেই শ্রাবণ-পূর্ণিমার রাতে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মধ্যে মাইলের পর মাইল ট্রেনে অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। সারাটি রাত সে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে কেটেছিল। পরের বৎসর ছুটিতে গৌরীদের দেখতে গিয়েছিলাম। গৌরী আই-এ পাশ করে মেয়েদের স্কুলে মাষ্টারি করছিল। এখন আর হাওয়ার ওপর দিয়ে চলে না, তবে মনে অদম্য উৎসাহ। উনিশ অতিক্রম করে দেহের তারুণ্য আরও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

একজন প্রতিবেশী গৌরীর বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব তুললেন। গৌরী আমাকে একান্তে বললে, "শুনেছি ঈজিপ্টের রাজ-বংশে ভাই-বোনে বিয়ে হ'ত। ভারতবর্ষে সেটা হয় না।"···

গৌরীরাণীর চিঠিখানা বার বার পড়লাম। সে এবার প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বি এ পাস করেছে। তা এক বৎসর পূর্ব্বেই হবে, তবে মায়ের অসুখের জন্যে পরীক্ষা দিতে পারে নি। এখন ঘরেই এম-এ পড়া আরম্ভ করেছে। আগামী বৎসরে যদি মায়ের শরীর ভাল থাকে তবে বি-টি পড়তে বড় শহরে যাবে।

দিল্লী ইউনিভারসিটির ছাত্রাবাসে প্রেসিডেণ্টের ইলেকশন চলেছে, এক এক বার তরুণকণ্ঠের কলধ্বনিতে সারা বাড়ীখানা মুখরিত হয়ে ওঠে। তারই মধ্যে আমি গৌরীরাণীর চিঠিখানার সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখলাম, তার জন্য ছোট একটি উপহার পাঠাবার বন্দোবস্ত করলাম—বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মনশ্চক্ষুর সামনে ভেসে উঠল, গৌরীরাণী,—জ্যোৎস্নারাতের অপরূপ রূপস্বপ্নের মত! তার পর, তাকে সরিয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল, দীপ্ত-মুখ, উন্নত-শির গৌরীরাণী, চোখে তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, কণ্ঠে অটল শপথ-বাণী! ভেসে উঠল, গৌরীরাণী, আমার ধর্ম্মের বোন!

চিঠিখানার শেষে লিখলাম, "গৌরীরাণী, যদি এতকাল আমি তোমাকে ভাইয়ের মত স্নেহ না করে থেকে থাকি, তবে আমায় ক্ষমা কর, বোন্। আর ঈশ্বরের কাছে বল আমি যেন তোমার উপযুক্ত ভাই হতে পারি।"

সসম্ভ্রমে তার রাখীটি হাতে বাঁধলাম।

মিশ্র ডায়েরী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ঘুরে ফিরে যখন গঙ্গার ধারটিতে এসে বসলাম তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আমার পেছনে পড়ে রয়েছে ডায়মণ্ডহারবার শহরটা। রাস্তাটাই হচ্ছে বাঁধ। উত্তরে একটু এগিয়ে গেলে এই বাঁধের নীচে বাঁদিকে পড়বে থানা আর আদালতের বাড়িগুলা। ডান দিকে সারি সারি দোকান। আরও এগিয়ে বড় খালটা। পুল পেরিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে নূতন বসতি, সম্ভ্রান্ত পল্লী; ডায়মণ্ডহারবারের বালিগঞ্জ। একমুঠি শহর ডায়মণ্ডহারবার শেষ হয়ে গেল।

বেশ লাগে কিন্তু। যখনই আসি, দেখি কিছু-না-কিছু বেড়েছে। কলকাতাও বাড়ছে। বেড়ে হচ্ছে বিকৃত, শ্রীহীন; ডায়মণ্ডহারবারের বৃদ্ধিটা শ্রীবৃদ্ধি; এই জন্যে ওখানে হাঁপিয়ে উঠলে এখানে আসি ছুটে মাঝে মাঝে কয়েক ঘণ্টার জন্য; রেলে এসে বাসে ফিরে যাওয়া। জায়গাটাকে ভালবাসি বলে এখানে রাত কাটাতে চাই না, বাসা বাঁধতে চাই না। কে জানে, অতিপরিচয়ে আবার কি গ্লানি বেরিয়ে আসবে। ডায়মণ্ডহারবারের এইটুকু বাস্তবেই আমি সন্তুষ্ট; বাকিটুকু আমার স্বপ্নে থাকে অম্লান অক্ষয় হয়ে।

ছবিটুকু মনের মধ্যে সঞ্চয় করে নিয়ে গঙ্গার ধারটিতে এসে বসেছি। আমার শেষ বাস আটটায়; এখনও দেরি আছে।

ঘুরে ফিরে এসে এই জায়গাটিতে বসবার আমার সময়ও এই। এইখানে ডায়মণ্ডহারবারের বাস্তব আর স্বপ্ন মিলেছে সবচেয়ে নিবিড় হয়ে, যেমন নিবিড় হয়ে মিলেছে দিনের বাস্তবের সঙ্গে সন্ধ্যার স্বপ্ন। এখানে এসে আমি বসি স্থান আর কালের ত্রিবেণী সঙ্গমে। চতুর্বেণী বলাই ঠিক, ত্রিবেণী কথাটা ব্যবহার করলাম চালু বলে, যুগযুগান্তের ট্রাডিশন-পূত বলে।

আমার বাঁদিকে এই প্রশান্ত বাঁধের রাস্তা সোজা চলে গেছে কাকদ্বীপ, আর মানে নিবিড় সুন্দরবন আর অনন্ত সমুদ্রের যাত্রী। সামনে আমার বিরাট বিস্তৃত নদী, নিতান্তই একটি ক্ষীণ বনরেখা তাকে অনন্ত আকাশের সঙ্গে করেছে পৃথক্, সন্ধ্যা আর একটু গাঢ় হয়ে এলেই সে পার্থক্যটুকু যাবে ঘুচে।

অনন্তের সঙ্গে আরও একটা যোগ অনুভব করি যখন এখানটিতে এসে বসি—আমার বাঁয়ে [illegible],

সামনেও প্রসারিত থাকে তারই সোদর—অস্তরাগ-লাঞ্ছিত পশ্চিম।

সন্ধ্যার ছায়া আরও গাঢ় হয়ে আসতে ওপারের নীল তটরেখা মুছে গিয়ে নদীর ওদিকটা হয়ে উঠল সীমাহীন। আকাশে যা একটু মলিন লালচে আভা লেগে ছিল সেটুকুও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল; সন্ধ্যাতারাটা হয়ে উঠল দীপ্ত। অদূরে খেয়াঘাট থেকে একটি নৌকা বোধ হয় সন্ধ্যার ট্রেনের যাত্রী নিয়ে ওপারের দিকে পাড়ি জমাল। আরও কেউ যাবে নাকি?—পাল তুলে দিয়েও জড়ানো আওয়াজে গোটা-কতক ডাক দিল মাঝি—বোধ হয় ওপারেরই কয়েকটা জায়গার নাম করে। আজ হাওয়া একটু জোরই, আকাশে কয়েক খণ্ড মেঘও রয়েছে, বোধ হয় এই শেষ খেয়া।... একটি যাত্রীবাহী নৌকা ঢেউয়ের দোলা খেতে খেতে এগিয়ে আসছিল—মাঝগঙ্গায় একটি ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে হতে; সেটিও এসে খেয়াঘাটের নৌকার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনন্তের দু'দিক থেকে এই যে যাওয়া-আসার নিত্যলীলা এর কথা ভাবতে ভাবতে অনেকখানি আত্মবিস্মৃতই হয়ে পড়েছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক আমার বেঞ্চিটার পাশটিতে এসে বসলেন।

বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে, সুপুরুষই এবং সু-স্বাস্থ্য। এ-দিকে ভাবটা যেন একটু বিষণ্ণ, কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে যেন একটু অন্যমনস্ক রয়েছেন, এবং মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে একটু অধৈর্য্যও।

গায়ে পড়ে আলাপ করা আমার অভ্যাস নয়, তবে প্রায় জনহীন জায়গায় পাশাপাশি দুটি লোক একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকাটা অস্বস্তিকর, তা ভিন্ন ভদ্রলোক এমন মনমরা হয়ে বসে আছেন, মনে হ'ল দুটো কথা কয়ে একটু অন্যমনস্ক করে দিলে বোধ হয় সেটা ভালোই হয়। একটা আলাপের সূত্র বয়তে যাচ্ছিলাম। উনিই হঠাৎ একটু মুখটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি এখানকারই লোক?"

বললাম—"না, আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি এখানে; এসেছি।"

কথাটা মিথ্যা, একেবারে [illegible]; কেননা যাব

মূলেই স্ত্রী নেই তার কন্যা থাকতে পারে না, এবং যার কন্যা নেই তার কন্যার শ্বশুরবাড়ি থাকতে পারে না। কিন্তু কোন কাজ নেই, ডায়মণ্ডহারবারের মত একটা অকিঞ্চিৎকর জায়গায় শুধু ঘণ্টা দু'তিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি, এ ধরনের সত্যভাষণে শ্রোতার কৌতূহল উদ্রেক করে এমন অবস্থায় পড়তে হয় যে, শেষে হাজারটা মিথ্যা না এনে ফেললে আর সামলে উঠতে পারা যায় না। অনেক অভিজ্ঞতার পর দেখেছি গোড়াতেই এ ধরনের একটি নির্জলা মিথ্যায় বেশ কাজ হয়।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—"আপনার নিজের মেয়ে ?"

বেশ একটু সচকিত হয়েই ফিরে চাইলাম মুখের দিকে। হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্ন ? আমি যে অকৃতদার এটা জানলেন কি করে ? দৈবজ্ঞ নাকি ? একটু বেশ অপ্রতিভও হয়ে পড়েছি। তবে সে ভাবটা চেপে হেসে বললাম—"পরের মেয়েকে নিজের বলে চালাতে অন্য কোথাও সাহস হলেও তার শ্বশুরবাড়িতেও চালাতে গেলে..."

ভদ্রলোকই এবার অপ্রতিভ হয়ে গেলেন, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন—"না, না, সে কথা বলছি না...মানে—মানে..."

বারদুই এইরকম আমতা আমতা করে হঠাৎ আগের মত বিষণ্ণ-গম্ভীর হয়ে বললেন—"একটা ব্যাপার হয়েছে...বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি তাইতে..."

"কি ব্যাপার !"—আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করলাম।

"আমার একটি মেয়ে আসবে ওপারে সুহৃৎগঞ্জে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে..."

আমি বাধা দিয়ে বললাম—"কিন্তু আর কখন আসবে ?"

"আসবেই ; আসতেই হবে তাকে, আর সেইটেই হয়েছে ভাবনার কথা। দেখে এলাম, এইমাত্র যে নৌকোটা এল তাতে আসে নি। এর পরে আসা মানে...অবিশ্যি পাড়ি এখানে রাত করেও জমায়, কিন্তু আজ যে রকম আকাশের অবস্থা .."

কথাটাকে স্পষ্ট করতে ভয় পেয়েই যেন দু'বার থেমে থেমে গেলেন। একটু চুপচাপ যে গেল তার মধ্যে পকেট থেকে একটা ছোট্ট ডিবে বের করে বাঁ হাতে একটু নস্য ঢেলে নাকে চালান দিলেন। তার পর সামনে একটু মুখটা বাড়িয়ে সন্ধ্যার ছায়ার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিটাকে ঠেলে আমায় প্রশ্ন করলেন—"দেখুন ত দূরে নৌকোর মতন কি কিছু নজরে ঠেকছে ? আমার দৃষ্টি এখন আর বেশীদূর যায় না।"

বললাম—"না, কিছুই নেই।...ঢেউগুলোর জন্যে মনে হচ্ছে ও রকম। আপনি কিন্তু নিশ্চিন্দি থাকুন। এরকম আকাশ দেখে কোন মাঝিই নৌকো ছাড়বে না। বিশেষ করে মেয়েছেলে নিয়ে।"

"কিন্তু ছাড়তেই হবে, ঐ মেয়েছেলে রয়েছে বলেই।"

আমায় মূঢ়ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলেন—"আপনি নিয়তি বলে জিনিসটাকে বিশ্বাস করেন না ?"

একটু যেন কেমন কেমন ঠেকছে। আমি উত্তর করলাম—"করি। কিন্তু তার চেয়ে বেশী করি মানুষের বিচার-শক্তিকে।...আপনি অযথাই বড় বেশী ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন যেন ; এটা ঠিক নয় ত।"

ভদ্রলোক আমার যুক্তি থেকে কিছু সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছেন কিনা বুঝতে পারলাম না, তবে একটু চুপ করে রইলেন ; তার পর হঠাৎ কতকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বললেন—"আমি রেবাকে ঠিক এইখানটিতে একদিন এই রকম সন্ধ্যায় কুড়িয়ে পাই ; সেদিনও নদী এই রকম...এখুনি সে রকম হয়ে উঠবে আর কি..."

আশ্চর্য্য নিয়তি বন্দী ত। আমি কথাটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম—"আপনার নিজের মেয়ে নয় তা হলে ?"

ভদ্রলোক বললেন—"মাপ করবেন। আমি অকৃতদার। নিজের মেয়ে নয় বলেই তখন আমি ওরকম ভাবে একটু অভদ্র ভাবেই প্রশ্নটা করে বসি আপনাকে। এর জন্যেও ক্ষমা চাইছি। এটা একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে আমার,—কারুর মেয়ের কথা শুনলেই ফস্ করে যেন আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে যায়—আপনার নিজের মেয়ে ? বড় লজ্জায় পড়ে যাই, আপনার কাছে ত তবু ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাওয়া গেল একটা, সব ক্ষেত্রে ত পাওয়াও যায় না..."

হেসে বললাম—"ক্ষমা চাইবার আর কি হয়েছে এতে ?..."

ভদ্রলোক ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি ঠেলে একটা উদ্বিগ্ন নিশ্বাস মোচন করে বললেন—"না, ঢেউই।"

আমার কথাটা বোধ হয় কানে যায় নি। ডিবেটা বের করে এক টিপ নস্য নিলেন—বেশী বিচলিত হলে ওটা বোধ হয় ওর অজ্ঞাতসারেই হয়ে যায়—তার পর নিজের কথার জের ধরেই বলে চললেন—"নিজের মেয়ে কি জিনিস জানি না বলেই কথাটা বেরিয়ে যায় আমার মুখ দিয়ে। আমি রেবাটাকে সত্যিই বড় ভালবাসি মশাই। আমি নিজে সংসার করি নি—এর পরে আর করবার সাহসও নেই। কিন্তু ঢেউয়ের দয়ায়—দয়াই বলুন বা নিষ্ঠুরতাই বলুন—কুড়িয়ে-পাওয়া এই মেয়েটাকে নিয়ে আমার এতই ভালবাসার একটা অশান্তি যে আমার মনে সর্বদাই একটা প্রশ্ন লেগে থাকে—তা হলে যাদের নিজের মেয়ে আছে, তাদের কি

করে দিন কাটে। আচ্ছা আপনার পুত্রসন্তান আছে ?"

মিথ্যাটা যথাসম্ভব ছোট করেই বললাম—"আছে... একটি।"

"মেয়ে ?"

"দুটি।"—মনে হ'ল সবই একটি বলতে গেলে মিথ্যাটা যেন ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কোথায়।

"তিনটির মধ্যে ছেলে মাত্র একটি, তা হলে ত আপনি আরও ঠিক করে বলতে পারবেন—আচ্ছা, আপনারা কি ছেলের চেয়ে মেয়েকে বেশি ভালবাসেন ?"

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় পরোক্ষ যুক্তির আশ্রয় নিলাম, বললাম—"দেখেছি মেয়ের উপর টানটা যতদিন থাকে ততদিন ছেলের চেয়ে বেশীই থাকে, অর্থাৎ যতদিন না শ্বশুরবাড়ি গিয়ে চোখের আড়াল হচ্ছে, তারপর স্বভাবতঃই কমে আসবার কথা ত ?"

"তাই আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু কৈ ? বিয়ে দেওয়ার পর এ যে আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে। পরের মেয়ে নিয়ে এ কি জ্বালা বলুন ত ? চোখের আড়াল হয়েছে, কোথায় নিশ্চিন্দি হব, না আরও অষ্টপ্রহর অশান্তি।"

প্রশ্ন করলাম—"কি ধরনের অশান্তি ?"

ভাবলাম, মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, দেখি যদি কোন চিকিৎসা বাতলাতে পারা যায়।

উত্তর হ'ল—"মনে হয় হারাব। যেমন কোথা থেকে কে হাতে তুলে দিয়ে গেল, তেমনি কোথা থেকে কে এসে নিয়ে যাবে..."

ভদ্রলোক চঞ্চল হয়ে এক টিপ নস্য নিলেন। তন্ময়-করা আমাদের অদ্ভুত আলোচনার মধ্যে ইতিমধ্যে আকাশের খণ্ড মেঘপুঞ্জ স্থানে স্থানে যুক্ত হয়ে উঠেছে। হাওয়াটা একটু বেড়েছে, বাঁধের পাকা শানের গায়ে ঢেউয়ের আছড়ানি গেছে বেড়ে। নদীর অর্দ্ধেকটাও আর দেখা যায় না।

বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক। হাতটা ঝেড়ে বললেন—"অন্য কেউ নয়—এই ঢেউ। এই ঢেউই সেদিন যেমন তুলে দিয়েছিল হাতে, তেমনি কেড়ে নেবে..."

মুশকিলে পড়া গেল। এ দৃশ্য থেকেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার ভদ্রলোককে। বললাম—"বড় বেশী ভাল-বাসেন মেয়েটিকে, তাই আপনার ও রকম মনে হচ্ছে। চলুন ওঠা যাক। আজ আর কখনও আসে ?"

"আসবেই...আমাকে হারাতেও হবে আজ..."

চোখ দুটো অন্ধকারেও দীপ্ত হয়ে উঠেছে। কাঁপছেন একটু একটু। আমি পিঠে হাত রেখে আশ্বাস দিয়ে বললাম —"এত অন্ধের মতন নিয়তিকে মেনে নিতে আছে ?—এ যুগে যখন প্রত্যেক ব্যাপারেরই একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণ..."

"তা যদি না হবে ত তাকে এই নদীর ওপারেই বিয়ে দিতে গেলাম কেন ? না দিয়েই পারা গেল না কেন ? এ নদীকে, এ জায়গাটাকে আমার এত ভয় করা সত্ত্বেও ?.. বলুন।"

নাকে নস্য টিপে ধরলেন।

বিমূঢ় হয়ে গেছি, এ বাতুলতার কি উত্তর দিই ?...তার পরেই পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিউরে উঠলাম। নদীর যেটুকু দেখা যাচ্ছে তার ওদিকে অন্ধকারের গহ্বর থেকে একটা করুণ আর্ত্তনাদ—"বাবা!..."

ঝড়ের দোলায় দোল খাওয়া, টানা, দীর্ঘ ; আর নিঃসংশয় ভাবে স্পষ্ট !

উঠে দাঁড়িয়েছেন ভদ্রলোক। ডান হাতটা আওয়াজ লক্ষ্য করে গঙ্গার দিকে বাড়িয়ে বললেন—"ঐ শুনুন, শুনছেন ?...ডাকছে!..কি হ'ল ?..কি ওটা দেখুন ত! ...নৌকো নয় ?...ঐ যে সাদা পাল উলটে পড়ল, ঐ!... ঐ!..."

নৌকার পাল নয়। যেখান থেকে অন্ধকারে লুপ্ত তার ঠিক এদিকে সংঘর্ষ লেগে দুটো ঢেউ ভেঙে পড়ল। বললাম। বলতে বলতেই উঠে পড়েছি কিন্তু, এগিয়ে সামনে ঝুঁকে চোখ দুটো ঠেলে দিয়েছি। নৌকা নয়, কিন্তু শব্দটা স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট যেন—"বাবা!...বাবা!...বাবা!...গেলুম!..."

শেষ আকুতি ঝড়ের শব্দটাকে যেন ঠেলে উঠেছে। তার পরেই সমস্ত শরীরটা আবার নূতন করে ঝমঝম করে উঠল—কানের পাশেই "যাই মা!—আসছি!..."

আমি ঘুরে শক্ত করে ওঁর একটা হাত ধরে ফেললাম, একটু রুক্ষভাবেই প্রশ্ন করলাম—"কোথায় যাবেন ?"

অদ্ভুত এক বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্য সে উগ্র উৎকণ্ঠার ভাবটা একেবারেই নেই আর, সে কম্পন নেই, বাঁ হাতে নস্যের ডিবেটাও শিথিল ভাবে ধৃত। একটু চেয়ে থেকে ফিরলেন, একটু হাসি ঠোঁটে করে বললেন—"না, ও ত যাবেই—কি হবে গিয়ে আর ?"

সমস্ত শরীরটা আলগা হয়ে গিয়ে বেঞ্চে বসে পড়লেন।

ওঁর হতাশ নিষ্ক্রিয়তাই আমার হঠাৎ আবার সাড়া এনে দিলে শরীরে ; যথাসাধ্য ত করতে হবে, মৃত্যুর সামনে জীবনের প্রতি জীবনের শেষ কর্ত্তব্য, বৃথা জেনেও। খেয়া-ঘাটের দিকে পা বাড়ালাম।

এবার উনি উঠে আমার ফেললেন ধরে।

"কোথায় যান ?"

বললাম—"দেখি যদি দু'একটা নৌকো বের করে দিতে পারি।"

"আমার কথা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ?…বেশ, দেখুন" বলে নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে হাতটা আলগা করে দিয়ে বসে পড়লেন।

ছুটেছি। সঙ্গে সেই আর্ত কণ্ঠ। কয়েকটা লাফেই খেয়া-ঘাটে নেমে পড়লাম, কি রকম হয়ে গেছি একেবারে।

"ওগো, তোমরা নৌকো খুলে দেবে না ? শুনতে পাচ্ছ না ডাক ?"

কয়েকটা নৌকার মাল্লা ছৈয়ের মধ্যে থেকে একটু ত্রস্ত-ভাবেই গলুইয়ে এসে দাঁড়াল।

"কৈ বাবু ?…ও ত বাতাসের শব্দ…তুফান উঠবে এখুনি।"

আমি স্পষ্ট শুনছি—"বাবা !…বাবা !…গেলুম !" সেই শব্দটাই যেন আকাশ বাতাস ছেয়ে রয়েছে।

"কি আশ্চর্য !…শুনতে পাচ্ছ না তোমরা ! কারুর কানে যাচ্ছে না—বাবা !—বাবা !…গেলুম" · ঐ ত…,"

"কৈ বাবু ? ··ও ত হাওয়া।…মানষের আওয়াজ চিনব না ?"

"তোমরা যাবে না।· তোমরা ভীতু ! তোমরা মানুষ নয়।…"

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে বকেই চলেছি যা মুখে আসছে। জড়া-জড়ি করে কি সব হালকা মন্তব্য করতে করতে ওরা যে যার কাজে চলে গেল।

যাবে না। একটা অসহ্য অবস্থা, লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম একটা নৌকায়, জোর করে কিছু একটা করতেই হবে, কিন্তু পা বাড়িয়েই হঠাৎ মনটা আবার ঘুরে গেল। যে হাতে আছে এখনও, তাকে ছেড়ে দিয়ে যে সত্যই নিয়তি-কবলিত তার দিকে হাত বাড়িয়ে একি ভুল করতে বসেছি !

কিন্তু তখন ভুলের যা হবার হয়ে গেছে। এসে দেখি বেঞ্চিটা শূন্য, কেউ নেই, শুধু ছড়িগাছটা বেঞ্চিতে আগের মতই ঠেস দিয়ে রাখা রয়েছে।

ক'দিন থেকেই মনটা বড় খারাপ রয়েছে, কিছুই ভাল লাগছে না।

এইরকম কিছু না ভালো লাগার অবস্থায় বাইরে থেকে একটু বেড়িয়ে আসি ; বেশীর ভাগ ডায়মণ্ডহারবারের ওদিক থেকে।

ডায়মণ্ডহারবার কিন্তু বোধ হয় চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল আমার কাছে। জাহাজ, খাল, প্রশস্ত গঙ্গা, গঙ্গার ধারের বিস্তীর্ণ রাজপথ—কিছুই আজ টানে না ; মনে পড়ে যায় মাঝ-গঙ্গা থেকে সেই করুণ আহ্বান, আর সেই শূন্য বেঞ্চি।

এবার ফিরে যাব ঠিক করেছি। বসুধা আপিসে একটা কাজ ছিল, ভাবলাম আজ গিয়ে সেরে ফেলি ওটা। আমি আর আমার এক বন্ধু পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে আছি। সামনে সম্পাদক ; টেবিলে বাঁদিকে রয়েছেন লালকুঠির রাজা শিকার-পোশাকে। শিকারের গল্প হচ্ছে।

ডান দিকের ভদ্রলোকটিকে আমি চিনি না, কিন্তু মনটা যেন বড় আকর্ষণ করছেন। বেশ গোলগাল চেহারাটি, সাহেবী সুট পরা, বয়স চল্লিশের ভেতর। আমাদের মত গল্পই শুনছেন, মাঝে মাঝে এক-আধটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

সম্পাদক জিজ্ঞেস করলেন, ওঁকেই—"কৈ, আইসেন-হাওয়ারের সঙ্গে ট্রাঙ্ক-কনেকশানটা পেলেন ?"

"না, এখনও…"

সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিং-ং-ং করে টেলিফোনের ট্রাঙ্ক কলের টানা ঝনঝনানি। "এই যে, এসে গেছে"—বলে ভদ্রলোক এগিয়ে মাউথপীসটা তুলে নিলেন।

"Hallo ! Is that the President ?" (হ্যালো ! ইজ দ্যাট দি প্রেসিডেণ্ট ?)

সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে আমেরিকার রাষ্ট্র-পতির কণ্ঠস্বরও ভেসে এল, অতি ক্ষীণ, কিন্তু স্পষ্ট—

"Speaking" (স্পীকিং)।

"This is Sorkar. Arranging a tour of the U.S.A. Could you help ?" (দিস ইজ সোরকার। অ্যারেঞ্জিং এ টুর অফ দি ইউ-এস-এ। কুড্ ইউ হেল্প ?)

"Sure" (শ্যুওর)।

"Thanks" (থ্যাঙ্কস)।

'No mention" (নো মেনশ্যান)।

রিসিভারটা রেখে দিয়ে গম্ভীরভাবে আবার চেয়ারটাতে বসে পড়লেন। অতি চমৎকার কাটা কাটা ইংরেজী। একে-বারে নিখুঁত স্টাইল।

মনে হ'ল আর সবাই-ই চেনেন, তেমন কোন বিস্ময়ের ভাব নেই। অস্বীকার করব না, আমি শুধু বিস্মিতই নয়, বেশ একটু অভিভূত হয়ে পড়েছি। এত দূরের ট্রাঙ্ক-টেলিফোন কখনও শোনা নেই, তার উপর একেবারে প্রেসি-ডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে।…এমন অবস্থা হয়েছে যে, অসঙ্গতিটুকু ধরবার ক্ষমতাও সাময়িক ভাবে হারিয়ে বসে আছি।

সম্পাদক আমার বিমূঢ় ভাবটা বেশীক্ষণ থাকতে দিলেন

না, পরিচয় করিয়ে দিলেন—বিশ্বখ্যাত যাদুসম্রাটের ভাই।”

বিমূঢ় ভাবটা কিন্তু অত শীঘ্র ত যাওয়ায় নয়, আমি ওঁকেই প্রশ্ন করলাম - “কবে যাচ্ছেন আপনি আমেরিকায় তা হলে ?”

যাদুকর শুধু একটু ঠোঁট চেপে হাসলেন। আরও সবাই। সম্পাদক আবার একটু হেসে বললেন—“কথাটা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হয় নি, ওদিকেও ইনি, এদিকেও উনি।”

“মানে ?...”

সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটাও নিজের কাছেই পেয়ে গেছি, নস্য নেওয়ার অজুহাতে মুখের কাছে হাত নিয়ে যাওয়ার রহস্যও। প্রশ্ন করলাম—“ভেন্‌ট্রোলোকিজম ?”

যাদুকরের দিকেই চেয়ে প্রশ্নটা করেছি। উনি একটু হাসলেন। এত নিখুঁত হরবোলার অভিনয় আগে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। ঘন্টিটা পর্যন্ত ওরই। মুখের দিকে দৃষ্টিটা কয়েকবারই ঘুরে ফিরে গিয়ে পড়তে লাগল। তার পরে একটা ব্যাপার হ'ল। প্রশংসার দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল —দেখা মুখ নয় ?

আমার বিমূঢ় ভাবটার জন্যে টেবিল-মজলিসের কথাবার্তা একটু চেপে গিয়েছিল, আবার চালু হ'ল। বন্ধু বললেন—“এবার কিছু খেলা দেখান্; ইনি নতুন লোক...”

তাসের খেলা, রুমালের খেলা, টাকা ওড়ানো, সঙ্গে সঙ্গে রহস্যও পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছেন যাদুকর। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পেশার সম্বন্ধে মন্তব্যও করে যাচ্ছেন—অন্য সাধনার মতই সর্বদাই নিয়ে পড়ে থাকতে হয়—যখন যেটার সুবিধা সেই অনুযায়ী—নয় ত হাত নষ্ট হয়ে যায়, গলা নষ্ট হয়ে যায় ...বোলচালের, সিচুয়েশন সৃষ্টির ক্ষমা যায় কমে।

মাঝে মাঝে কানে যাচ্ছে মন্তব্যগুলো, একটানা নয়; কেননা আমি ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। সমস্ত মনটাকে জড়ো করেছি আমার স্মৃতির গোড়ায়।...একটু একটু যেন আলো এসে পড়ছে কোথা থেকে। আমার চোখ আর কান একেবারে উদগ্র হয়ে উঠেছে—কণ্ঠস্বরের প্রত্যেকটি পর্দা, বলার প্রত্যেকটি ভঙ্গী...দেখেছি—দেখেছি—হয় ত এত স্পষ্ট নয়, হয় ত আধা-আলোয়, কিন্তু দেখেছি ঠিক।...করবই বের। ভদ্রলোক যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ছেন আমার মনোনিবেশে, যেন—কি বলব ?—লুকাতে চান ?

“ভেন্‌ট্রোলোকিজমের রহস্য হচ্ছে...”

কি বলতে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, আমি আস্তে আস্তে ডান হাতটা বাড়িয়ে ওর বাঁ হাতের উপর রাখলাম, একটু গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলাম—“আচ্ছা, গত রবিবার সন্ধ্যায় ...আপনি ডায়মণ্ডহারবারে গিয়েছিলেন ?”

যাদুকর ধরা পড়ে যাওয়ার ভাবে একটু লজ্জিত হয়ে হেসে মাথা দোলালেন।

আমার সমস্ত চৈতন্য যেন একটি চিন্তায় এসে জড়ো হয়েছে। প্রশ্ন করে চললাম—“সেই খেয়াঘাটের কাছে—মাঝগঙ্গায় সেই শব্দে—আপনার ডুবন্ত মেয়ের—আপনার পালিত কন্যার...”

সবাই কুতুহলী হয়ে মুখ বাড়িয়ে এসেছেন। বাইরে থেকে একজন কর্মচারী এসে বললেন—“মেয়েরা সবাই এসে গেছেন, ডাকছেন।”

পাশের ঘরেই বাড়ির মেয়েরা এসেছেন। যাদুকর একটা বৈঠকী অভিনয় দেবেন; হাতের খেলা, হরবুলি...

উঠে পড়ে আমার পিঠে একটা হাত দিয়ে আবার একটু হাসলেন। বললেন - “প্র্যাক্‌টিশ।...কিন্তু বড় শক্ দিয়ে ফেলেছিলাম আপনাকে সেদিন, মাফ করবেন।”

বার-দুই মুখটা ঘুরিয়ে হাসতে হাসতেই বেরিয়ে গেলেন।

পরমাণবিক শক্তি

শ্রীশরদিন্দু চৌধুরী

আজ হতে প্রায় এগার বছর আগে দ্বিতীয় মহাসমরের পরিসমাপ্তি ঘটলেও আজও বিশ্ববাসীর মনে পূর্ণ শান্তি ফিরে আসে নি। গত কয় বছর পৃথিবীর বড় বড় শক্তিগুলিকে আমরা যেমন শান্তির বাণী আওড়াতে শুনেছি, তেমনি আবার পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তারা বিশ্ববাসীকে স্ব স্ব ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন রেখেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত বিকিনি এটল দ্বীপে আমেরিকা কর্তৃক পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ বহুবার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। রাশিয়া কর্তৃক ঠিক কতগুলি পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, তার সঠিক বিবরণ না পাওয়া গেলেও, তারা সাইবেরিয়ার মরুপ্রদেশে এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে জানা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রিটিশও অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের অনতিদূরে মন্টিবেলোর দ্বীপে একটা পরমাণবিক বোমা ফাটিয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করে ফেলেছে। অথচ এই বোমা ফাটাবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে পূর্ণ শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা, নিরস্ত্রীকরণ ও মানব-কল্যাণকর সলাপরামর্শ সমান গতিতেই চলেছে। যে সব শক্তি এ সকল পরমাণবিক বিস্ফোরণের জন্যে দায়ী তাঁরাই আবার একবাক্যে স্বীকার করেছেন, "পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করা মানব-স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত অকল্যাণকর। ইহা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।" নিজেদের দেশ থেকে বহু দূরে পরমাণবিক বোমা ফাটিয়ে এসে তাঁরা নিশ্চিন্তে মানবহিতৈষণার ভান করছেন। নিজেদের দেশে এখনও কোন ক্ষতি হয় নি মনে করে, তারা এখনও নিশ্চিন্ত।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর নানা দেশে ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গিয়েছে, তাই পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের কুফল সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই জাপানের অন্তর্গত হিরোশিমা ও নাগাসিকির বিপর্য্যয়ের কথা আমাদের মনে হয়। বিগত মহাসমরের শেষ ভাগে আমেরিকানগণ এখানে পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করে। যারা বিস্ফোরণের অতি নিকটে ছিল, তারা পরমাণবিক শক্তির তেজে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুড়ে মরে যায়। যারা একটু দূরে ছিল, তাদের সকলের মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে না ঘটলেও, এই বিস্ফোরণের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে অতিরিক্ত পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সৃষ্টি হয়, তার ফলে এই সব লোকের রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যা অসম্ভব রকম কমে যায়। ফলতঃ কিছুদিনের মধ্যে এরা মারাত্মকভাবে রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। তা ছাড়া তাদের অন্যান্য তেজস্ক্রিয়তাজনিত রোগ হয়। অনেকের ভীষণ জ্বরের সঙ্গে কঠিন রক্তাল্পতা দেখা দেয়। বহু লোকের মাথার চুল উঠে গেল। অনেকের পুনঃ পুনঃ বেশীমাত্রায় রক্তপাত হতে থাকে। মনে হয়, রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা চলে যাওয়াতেই এরূপ রক্তপাত হতে থাকে। বাইরের রক্ত শরীরে সঞ্চালিত করে এবং পেনিসিলিন ইত্যাদি এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে এই তেজস্ক্রিয়তাজনিত রোগের উপশম করা সম্ভব হয়েছে বটে, তবে চিকিৎসকগণ আশঙ্কা করেন—এই সব রোগীদের সন্তানগণও এই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবমুক্ত হতে পারবে না।

দীর্ঘ দিন সামান্য মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তা (radio-activity) সেবনের কুফল সম্বন্ধে এবার কিছু বলা দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে, যেসব শ্রমিক রেডিয়ামঘটিত লবণ নিয়ে কাজ করতেন তাদের প্রায়ই হাড়ে কর্কট রোগ (bone cancer) হ'ত। তাঁরা এই লবণ দিয়ে রাতে দৃষ্টিগোচর হয় এমন ঘড়ির ডায়াল ও বাড়ীর নম্বর-প্লেট ইত্যাদি তৈরি করতেন। এই কাজে প্রায়ই তাঁদের রং লাগাবার তুলি জিভ দিয়ে চাটতে হ'ত, তাই তাদের এই রোগ হ'ত বলে চিকিৎসকগণ মনে করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত জোয়াকিমসথলের ইউরেনিয়াম খনিতে কর্ম্মরত শ্রমিকদের প্রায়ই ফুসফুসের কর্কট রোগে ভুগতে দেখা যেত। এই সব তেজস্ক্রিয় উপাদান হতে নির্গত তেজ ও নিউট্রনসমূহ দেহের গ্রন্থিগুলিকে (tissues) তড়িৎশক্তি-প্রভাবে ভেঙে ফেলে (ionise)। ফলে দেহগ্রন্থির অণুগুলির মধ্যেও একটা ভাঙন ধরে। তার সঙ্গে জনন-কোষেও (genes and chromosomes) ভাঙন ধরে। রক্তের জলীয় অংশ ভেঙে উদ্‌যান এবং অম্ল-উদ্‌যান সৃষ্টি করে। তার পর পাচক-গ্রন্থির ক্রিয়াও ব্যাহত হয়। কোষের আমিষ অংশও (protein) ভেঙে যায়। সাধারণতঃ বিভাজক কোষসমূহের উপর (dividing cells) তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

কতটুকু পর্য্যন্ত তেজস্ক্রিয়তা শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না, তা নিয়ে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করেছেন। ইঁদুর, খরগোশ ইত্যাদি প্রাণীর উপর গবেষণা করে দেখা গিয়েছে, তেজস্ক্রিয়তা সেবনের মাত্রার উপরই কেবল তার কুফল নির্ভর করে না, কুফল পরীক্ষা করতে হলে শরীরের বিভিন্ন অংশের গ্রন্থির উপর বিভিন্ন মাত্রার তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব কতটুকু তাও দেখতে হবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, ৫০০ শক্তির রঞ্জন' রশ্মি (500 unit roentgen units) একটি মানুষের সারা দেহে চালনা করলে সে মরে যাবে, অথচ এই তেজের দ্বিগুণ তেজ মানুষটির বাহুর চামড়ার উপরিভাগে প্রয়োগ করলে বিশেষ ক্ষতি হবে না। চামড়ায় একটু জ্বালা করবে মাত্র। দেখা গিয়েছে,একটি পিঁপিড়াকে মারতে যতটা তেজ দরকার, একটা ইঁদুরকে মারতে তার চেয়ে বেশী তেজ দরকার

হয়। একটা খরগোশকে মারতে আরও একটু বেশী তেজ লাগে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রাণীর উপর এবং তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের উপরে তেজস্ক্রিয়তার কুফল বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। সেই জন্ত তেজস্ক্রিয়তার কুফল সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে নানা দেশের জীবজন্তুর উপরও তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আজ পর্য্যন্ত গবেষণাকার্য্য যতদূর এগিয়েছে, তাতে মনে হয়, প্রতিদিন ০'৫ রঞ্জন তেজ সেবন করলে মানুষের স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হবে না। তবে আরও কয়েক বছর অতিবাহিত না হলে এ কথার সত্যতা যাচাই করে দেখা যাবে না।

গত কয়েক বৎসরে পরীক্ষাচ্ছলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে কয়টি পরমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হ'ল, মানব ও অন্ত প্রাণীর স্বাস্থ্যের উপর তার কতটা কুফল হয়েছে, এবার তা নিয়ে একটু আলোচনা করব। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন মাত্র কয়েক দিন আগে পৃথিবীর ক্ষমতাপিপাসু শক্তিগুলিকে যেভাবে তেজস্ক্রিয়তার কুফল সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন, তাতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। তিনি ব্রিটিশ এবং আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকদের অভিমত থেকেই প্রমাণ করে দেন, তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব কত ভয়াবহ। ব্রিটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের একটি বিবরণে বলা হয়েছে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের কপালে কি আছে বলা যায় না। আমেরিকার ন্তাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স একটি রিপোর্টে বলেছেন যে, এভাবে পরমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটতে থাকলে ১৯৬২ সনের মধ্যে বিশ্বের প্রত্যেকটি লোক সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার কবলে পতিত হবে। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বিকিনিতে প্রথম পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের তের মাস পরে তেজস্ক্রিয় জল এই মহাসাগরের দশ লক্ষ বর্গমাইল ব্যেপে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীযুক্ত মেনন, ঐ সময় আরও বলেন, আগুন যেমন নিভে যায়, তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব তেমন নিভে যায় না, বরং এর প্রভাব বহুদিন থাকে। জাপানের ফলমূল তেজস্ক্রিয় হয়ে গেছে, এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে—ইতিমধ্যেই কলিকাতার বৈজ্ঞানিকগণ এখানকার কতগুলি খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল ও শাকসজী পরীক্ষা করে তাতে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেছেন। ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের শতকরা দুই জনের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। মেনন আরও বলেছেন, রেডিও ষ্ট্রনশিয়াম পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট একটি মারাত্মক পদার্থ। এটি হাড়ের গ্রন্থি আক্রমণ করে টিউমার সৃষ্টি করে। শাকসজীর মধ্য দিয়ে ইহা গরুর পেটে যায়, তার পর সেই গরুর দুধ খেয়ে মানুষও সেই ষ্ট্রনশিয়াম আহরণ করে। মেননের উক্তিতে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবের যে ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠেছিল সকলেই তা স্বীকার করেন।

মন্টিবেলোয়ে ব্রিটিশ কর্তৃক পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরই আমরা খবর পেয়েছি, অষ্ট্রেলিয়ায় তেজস্ক্রিয় বারি বর্ষিত হয়েছে। কলিকাতায়ও বৃষ্টির জলে তেজস্ক্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু তা স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর হবে সে সম্বন্ধে এখনও জানা যায় নি। ইংলণ্ডের ধারে কাছে পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় নি, অথচ সেখানকার শিশুদের মধ্যে তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রনশিয়াম পাওয়া গিয়েছে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংসদের (World Health Organisation) একটি বিবরণ থেকে জানা যায়, অধিকাংশ প্রগতিশীল দেশেই হৃদযন্ত্রের রোগের পর কর্কট রোগই (cancer) সবচেয়ে বেশী প্রাণহানির কারণ হয়েছে। এই সংসদের (Epidemiological and Vital statistics Report") থেকে জানা যায় যে, এই শতাব্দীর প্রথম থেকে প্রায় ২৬টি দেশে জনসাধারণের পরিপাক-শক্তির দুরারোগ্য রোগ দেখা গিয়েছে। কেবল ১৯৫৩ সনে জাপানের যতগুলি লোক কর্কট রোগে মারা যায়, তাদের শতকরা ৭৩'৩ জন পেটের কর্কট রোগে মরে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে বিশ্বে ক্যান্সার রোগে মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছে। কলিকাতায় ক্যান্সার রোগ বেড়েছে কিনা এবং বেড়ে থাকলে তার কারণ কি, সে সম্বন্ধে এখন থেকে খুব সূক্ষ্ম গবেষণা করা দরকার।

এখন যেমন অধিকাংশ দেশই একবাক্যে স্বীকার করে যে, পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো মানবের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনই প্রায় অধিকাংশই কল্যাণকর কার্য্যে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারের খুবই পক্ষপাতী। শান্তি-কার্য্যে পরমাণবিক শক্তি মানুষের খুব উপকার করবে এরূপ উচ্চাশা আজ অধিকাংশ ব্যক্তিই পোষণ করেন। শান্তির সময় পরমাণবিক শক্তিকে কি কি কাজে প্রয়োগ করা হবে তা নিয়ে নিত্য নূতন চমকপ্রদ জল্পনা-কল্পনা শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশ শান্তির জন্ত পরমাণবিক শক্তি সৃজন-কেন্দ্র স্থাপনের জন্ত খুবই আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং ইতিমধ্যেই অনেক জায়গায় কাজও সুরু হয়ে গেছে। শোনা যায়, আমাদের ভবিষ্যৎ রেলগাড়ী, জাহাজ ও কলকারখানা ইত্যাদি পরমাণবিক শক্তিতে চলবে। ইংলণ্ডের ক্যালডার হলে যে নতুন পরমাণবিক শক্তি সৃজন-কেন্দ্রটি স্থাপিত হচ্ছে তাতে নাকি একটি ছোট শহরে যতটা যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োজন তা সৃষ্ট হবে, চিকিৎসাশাস্ত্রেও পরমাণবিক শক্তি খুব ফলপ্রদ হবে, এরূপও অনেক চিকিৎসক মনে করেন।

এবার আমাদের স্থির মনে যাচাই করে দেখতে হবে যে, শান্তির সময়ে পরমাণবিক শক্তি দ্বারা আমাদের যতটা উপকার সাধিত হবে তার তুলনায় ক্ষতি হবে কতটুকু। পরমাণবিক শক্তিকে যান্ত্রিক শিল্পে প্রয়োগের পিছনে দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমতঃ, অতিরিক্ত উৎসাহের আতিশয্য। দ্বিতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, যে ভাবে যান্ত্রিক শিল্পে কয়লা ও তৈল ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে একদিন কয়লা ও খনিজ তৈল ফুরিয়ে যাবে—তা দু'শ বছর পরই হোক আর তিন শ' বছর পরেই হোক। তখন যান্ত্রিক শিল্পে মানুষকে এক অচল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। তাই আগে থাকতে পরমাণবিক শক্তিকে যান্ত্রিক শিল্পে প্রয়োগ করতে পারলে, দু শ' বছর পরের একটি বিপর্য্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এখন কথা হচ্ছে, পরমাণবিক শক্তি সৃজন-যন্ত্র (atomic reactor) থেকে যে পরমাণবিক শক্তি পাওয়া যাবে, তার তেজ সেই কারখানায় কর্ম্মনিরত শ্রমিক ও নিকটস্থ অন্যান্য অধিবাসীদের শরীরে প্রবেশ করবে কিনা এবং করলেও তা কতটা ক্ষতিকর হবে। বৈজ্ঞানিকগণ আশ্বাস দিচ্ছেন যে, এরূপ একটি যন্ত্রে এরূপ সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, যাতে শ্রমিকদের শরীরে ক্ষতিকর পরিমাণে তেজ প্রবেশ করতে না পারে। এজন্য দু'প্রকার সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথমতঃ, পরমাণবিক শক্তি সৃজন যন্ত্রগুলি পুরু কংক্রীটের বা সীসার পাত দিয়ে আবৃত রাখা হবে যাতে করে তার ভেতর থেকে তেজ না বের হতে পারে। যন্ত্রে সৃষ্ট শক্তির পরিমাণ অনুসারে সৃজন-যন্ত্রের আবরণ কতটা পুরু হবে তা ঠিক করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা হচ্ছে—লেবরেটরিতে এমন একটি করে যন্ত্র থাকবে যার সাহায্যে লেবরেটরির তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করে দেখা যায়। এই যন্ত্র-সাহায্যে লেবরেটরির বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র এবং এমনকি কর্ম্মীদের শরীরে তেজস্ক্রিয়তা প্রবেশ করেছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখা যায়।

তবে দীর্ঘদিন পরমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে কাজ করলে শ্রমিকের তেজস্ক্রিয়তাজনিত রোগ যে হবে না, তাই বা এখন কে হলফ করে বলতে পারে? কারণ—বৈজ্ঞানিকদেরও ত এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অল্পদিনের। আবার এও ত হতে পারে, একটি স্থানে বহুদিন পরমাণবিক শক্তি সৃজন যন্ত্র (atomic reactor) চালু থাকতে থাকতে, হয় ত কোনদিন তেজস্ক্রিয়তা আবরণ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এসে আবহাওয়া তেজস্ক্রিয় করে দিতে পারে। আবার দুর্ঘটনা যে হবে না, তাও ত কেউ হলফ করে বলতে পারে না। তবে এ দুর্ঘটনা ঘটলে ফল অতি ভয়াবহ হবে—বোধ হয় নাগাসিকি ও হিরোশিমার বিপর্যয়ের থেকে কোন অংশে কম হবে না। অনেকে হয় ত বলবেন, পৃথিবীর সব কয়টি আবিষ্কারের ইতিহাস ঘাটলেই দেখা যাবে, একদল লোক মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করে যে আবিষ্কার করে যায়, পরবর্ত্তী যুগের মানুষ তার ফল ভোগ করে। কিন্তু পরমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে সে কথা খাটবে না। কারণ ইতঃ-পূর্ব্বে পৃথিবীতে যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাধিত হয়েছে, তাতে জীবনহানি হলেও মুষ্টিমেয় লোকের হয়েছে। ডিনামাইট এক সময় সবচেয়ে মারাত্মক মারণাস্ত্র বলে লোকে মনে করেছিল, তাতে স্থান-বিশেষের লোকেরই প্রাণহানি হয়েছিল। জেপলিন আবিষ্কারের সময় কয়েক জনের প্রাণহানি ঘটেছিল। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের দুর্ঘটনায়ও লোক মারা যায়। তাদের সংখ্যা হয় অল্প। কিন্তু পরমাণবিক শক্তি অল্পমাত্রায় সেবন করতে করতে ধীরে ধীরে তুষের আগুনের মত মানুষের জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। কেবল মানুষবিশেষের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা বংশানুক্রমিক বিস্তৃত হবে। যেদিন বৈজ্ঞানিকগণ এর কোন প্রতিষেধক আবিষ্কারে সমর্থ হবেন, তার আগেই বহু মানুষের যা ক্ষতি হবে তা হবে অপূরণীয়। শৃঙ্খলমুক্ত দানবের মত এই তেজস্ক্রিয়তা সারা পৃথিবীতে দীর্ঘমেয়াদী সংহার কার্য্য সুরু করে দেবে। পরমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের আর একটি মহা অসুবিধা হচ্ছে—এই সব কারখানা থেকে যে সব ছাই ও আবর্জ্জনা ইত্যাদি বেরুবে তারাও তেজস্ক্রিয়। সুতরাং এগুলি ফেলাও মহা সমস্যার ব্যাপার। সমুদ্রে ফেললে জল তেজস্ক্রিয় হবে, মাটিতে ফেললে গাছপালা জীবজন্তু তেজস্ক্রিয়তার কবলে পড়বে। সুতরাং এটিও একটি বিপৎসঙ্কুল সমস্যা।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পরমাণবিক শক্তির এত কুফল থাকা-সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ আজ নিজেদের রাজ্যে পরমাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। রাশিয়ার সহযোগিতায় মিশর তাদের দেশে একটি বিরাট পরমাণবিক কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই পরমাণবিক শক্তি-কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সুরু হয়ে গেছে। বোম্বাইয়ে এই কারখানা হবে। প্রস্তাবিত কারখানার জন্য লোক নেওয়া ও তাদের যথারীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নতুন শক্তিগর্ব্বে গর্ব্বিত মানব আজ আর আণবিক শক্তির ভয়াবহতার কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

সারা পৃথিবী জুড়ে এমন ভাবে পরমাণবিক শক্তি-সৃজন কারখানা স্থাপিত হতে থাকলে, মানবের বৃহত্তর স্বার্থের প্রভূত ক্ষতি হবে, তা পূর্ব্বেই বলেছি। স্বাস্থ্যের চেয়ে বড় মানুষের আর কোন সম্পদ নেই। স্বাস্থ্যই যদি নষ্ট হ'ল, তবে পরমাণবিক শক্তি নিয়ে আমরা কি করব? সেজন্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের আজ সমস্বরে বলা উচিত—কেবল পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে পরমাণবিক শক্তি-সৃজন কারখানা স্থাপনের পরি-কল্পনাও পরিত্যাগ করতে হবে। এ দাবির পেছনে কোন রাজ-নৈতিক দলাদলি থাকা উচিত নয়। মানব-কল্যাণের জন্য সকল দেশে আজ পরমাণবিক শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। কয়লা ও পেট্রোলের স্থলে পরমাণবিক শক্তি ছাড়া অন্য কোন জ্বালানি ব্যবহার করা চলে কিনা, সে সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য আমাদের বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদিগকে এখন থেকে অনুরোধ জানাতে হবে। বিস্তৃত ভাবে সকল দেশে পরমাণবিক শক্তি উৎ-পাদনের সময় এখনও হয় নি। এই শক্তি নিয়ে খেলা করবার আগে, আটঘাট বেঁধে নিয়েই খেলায় নামা ভাল। কারণ এ খেলার বিপদ শুধু খেলোয়াড়ের নয়—সকল মানবজাতির। পরমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও মানব-স্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে বহু দিনের নিশ্চিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করে ব্যাপক ভাবে পরমাণবিক শক্তি-সৃজন কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত নয়। মনে হয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে লোকালয় হতে বহু দূরে কোন স্থানে এরূপ গবেষণার জন্য একটি পরীক্ষামূলক পরমাণবিক শক্তি-কেন্দ্র স্থাপন করলে ভাল হয়। সেখানে অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর গবেষণা ও তার সুফল এবং কুফল সম্বন্ধে নিশ্চিত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হবে। তার পর বৈজ্ঞানিকগণ উপদেশ দিতে পারেন, এরূপ পরমাণবিক কারখানা ব্যাপক ভাবে স্থাপন করা যায় কিনা। সামান্য কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে পরমাণবিক শক্তি-কেন্দ্র স্থাপন করা মানুষের পক্ষে খুবই দুঃসাহসের কার্য্য হবে।

মেয়ে যখন মা হয়

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য্য

জাতির মৌলিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উপর। শিশুই ভবিষ্যৎ জাতির ধারক ও বাহক। আবার মাতাই শিশুর গর্ভধারিণী, প্রসূতি ও প্রতিপালিকা। সুতরাং মাতৃকল্যাণ ও শিশুস্বাস্থ্যের জন্য বৈপ্লবিক-দৃষ্টিসম্পন্ন কোন ব্যাপক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা একান্তই প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকার ও আন্তর্জ্জাতিক জরুরী শিশুকল্যাণ সংস্থা (UNICEF) এবং ভারতের নবগঠিত সমাজ-কল্যাণ পর্ষৎ কতকগুলি কার্য্যসূচী গ্রহণ করেছেন। প্রসূতিসদন, শিশুভবন প্রভৃতি উক্ত কার্য্যসূচীর বহিরঙ্গ। কিন্তু আসল প্রস্তুতি আরও বিরাট। আমরা জানি—বহু অঞ্চলে শিক্ষণপ্রাপ্তা স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকাগণ তাদের এলাকায় ঘুরে ঘুরে কাজ করে বেড়ান। দেশের সর্ব্বত্র এরূপ পরিকল্পনা এখনও বিস্তৃত হয় নি সত্য; কিন্তু কাজ যখন আরম্ভ হয়েছে তখন প্রতি পল্লীতেই মাতৃকল্যাণের সূচনা অদূর ভবিষ্যতে রূপ পরিগ্রহ করবে। নারীর মাতৃত্বের প্রারম্ভ থেকে শিশু-জন্মের পর কয়েক বৎসর ধরে স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকাদের দৃষ্টি রাখতে হয়। ফলে ক্রমে ক্রমে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে এবং প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়। দেশের যে যে অঞ্চলে উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হয়েছে, সেখানে এর বাস্তব কার্য্যকারিতা অভূতপূর্ব্বভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এবং জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থনও পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু পরিকল্পনা শুধুমাত্র মৌখিক সমর্থন লাভ করলে দেশের ও সমাজের আসল কর্ত্তব্য বাকি থেকে যাবে। কল্যাণের মঙ্গলদীপ প্রতিগৃহে প্রজ্জলিত করতে হবে, প্রত্যেক পরিবারের বিধি পালন করতে হবে। প্রত্যেক গৃহস্থ যখন এদিকে ব্যক্তিগত ভাবে নূতন করে দৃষ্টি দেবে, তখন সত্যই মঙ্গলদীপের আলোকে সমগ্র জাতির অঙ্গন আলোকিত হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে শাস্ত্রের অনুশাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রসূতি ও শিশুকল্যানের যে ভাবগম্ভীর ও শুচিশুদ্ধ বিধি প্রচলিত ছিল, তাও প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। এই প্রসঙ্গে সেই সব কথা আলোচনা নিশ্চয়ই অবান্তর হবে না।

মেয়ে যখন কুমারী থাকে, তখন তাকে পূজা করার বিধি দেখতে পাই। পুরহিতরা যথারীতি কুমারী মেয়েদের দেবীজ্ঞানে অর্চ্চনা করেন। পূজাপ্রাপ্তা কুমারীর মনে তখন যে ভাবের উদয় হয়, তার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। মেয়ে যে একটি সামান্য মেয়েই নয়, শুধু কুমারী নয়, সে যে ভাবী বধূ, গৃহিণী ও মাতা—এই বোধ তার মনে সঞ্চারিত হয়। ভবিষ্যতে মা হবার জন্য তার এই প্রস্তুতি মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। মাতৃত্বেই যে নারীর সার্থক পরিণতি—এই মধুর সম্ভাবনার ছবি কুমারী-পূজার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হতে সাহায্য করে। মেয়ে কিশোর বয়সে পদার্পণ করলে প্রকৃতি তার দেহে মনে নব বসন্তের পত্রপুষ্পসম্ভার সাজাতে আরম্ভ করে, ভূমি যেন নববর্ষার স্নেহাশিস লাভ করে ধন্যা হয়। কুমারী মেয়ে সীমন্তে সিন্দুর দিয়ে গৃহলক্ষ্মীরূপে স্বামীর অঙ্গনে পদপাত করে। সেই মেয়ে যখন মাতৃত্বের সম্ভাবনার লাজরক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠে, তখন তাকে কেন্দ্র করে পরিবারে শুভ উৎসবের মাঙ্গলিক চিহ্নিত হয়। এ যেন প্রস্ফুটিত অজস্র পুষ্পের মহোৎসব, যেন ভাবী মাতৃত্বের আগমনীর অগ্রিম অভিনন্দন।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।' অর্থাৎ মানুষ জন্মের সময় শূদ্র হয়ে পৃথিবীতে আসে, সংস্কার পালন দ্বারা সে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। জন্মের সময় জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সব মানুষই গুণগত ভাবে সমান থাকে। পরে বুদ্ধি ও বিদ্যার সাধনা এবং শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া অনুশীলন দ্বারা ব্রাহ্মণোপযোগী সত্ত্বগুণ অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়। ভারতে নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনকে নিছক জৈব কামনার অভিব্যক্তিরূপে না দেখে ধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে দেখা হয়েছে। জনক-জননীর মন যাতে পশুভাবে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হওয়ার পরিবর্ত্তে শুদ্ধ ও সাত্ত্বিকভাবে প্রণোদিত হয়, সেজন্যই শাস্ত্রানুমোদিত নানারূপ সংস্কার-কার্য্যের বিধান দেওয়া আছে। চিত্রকর স্থূলভাবে চিত্রের অঙ্কন সুরু করে বার বার তুলিকা লেপন দ্বারা চিত্রের পূর্ণতা আনেন। তেমনি মানবদেহে সত্ত্বগুণের পূর্ণতা ঘটে সংস্কার-মার্জ্জনার দ্বারা।

স্বামী-স্ত্রীর প্রথম মিলনের দিন যে সংস্কারবিধি পালনের প্রথা আছে, তাকে বলা হয় গর্ভাধান। বর্ষার জলসিক্ত উর্ব্বরা ভূমিতে সুপুষ্ট বীজ বপন ও তৎপরবর্ত্তী নানারূপ তত্ত্বাবধান দ্বারা প্রয়োজনানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা থাকে। সন্তানকামী নরনারীর পক্ষেও একই কথা প্রযোজ্য। এই সংস্কারের উদ্দেশ্য হ'ল—অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পত্নীর মনে পবিত্র ভাব উৎপাদন করে স্বামী শুদ্ধ মনে তার সহিত মিলিত হবেন। উভয়ের মনে শান্তি ও মাধুর্য্য সৃষ্টির জন্য বৈদিকমন্ত্র

ও সুগন্ধী পুষ্পমাল্য পরিধান করাও শাস্ত্রের বিধি। জৈব আবেদনকে কামনার ঊর্দ্ধে উন্নয়নের এই প্রচেষ্টা অতীব নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

শাস্ত্রমতে পরবর্ত্তী সংস্কারের নাম পুংসবন। সাধারণতঃ তিন থেকে চার মাসের মধ্যে নানাভাবে ভ্রূণ নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে। ইহা ব্যতীত, তিন মাসের মধ্যে প্রসূতির গর্ভস্পন্দন হয়, অর্থাৎ ভ্রূণে জীবনীশক্তি অনুভূত হয়। সেজন্য তৃতীয় মাসের দশ দিনের মধ্যেই পুংসবন সংস্কার সম্পাদনের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। পুংসবন অর্থে পুত্র সন্তানের উৎপাদক সংস্কার। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তান লাভ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। সেজন্য এই অনুষ্ঠান দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণকে স্পন্দনের ঠিক পূর্ব্বেই পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়। তবে প্রথম গর্ভের সময়েই এই সংস্কার পালনের কথা। তথাপি পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানের পক্ষে এবং সাধারণ ভাবেও গর্ভস্পন্দনের সময়কে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তায় ইহা প্রতিবারেই প্রযোজ্য হতে পারে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রসূতির মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তার দ্বারা গর্ভাবস্থায় আলস্য, ভয়, বমনেচ্ছা, অবসাদ প্রভৃতি বিদূরিত হয় এবং শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। অনুষ্ঠানের সময় পরিষ্কার শিলার উপর সম্ভব হলে শিশিরজলে মুকুলিত বটপত্রগুচ্ছ পেষণ করে তার রস বধূর নাসায় দিতে হয়। এই প্রথার উপকার সম্ভাবনা রয়েছে।

তৃতীয় সংস্কারকে সীমন্তোন্নয়ন বলা হয়। গর্ভগ্রহণের সূচনার পরও স্বামী অনেক সময় স্ত্রীর সহিত মিলিত হন। কিন্তু পুংসবন সংস্কারের পর অর্থাৎ গর্ভস্পন্দনের পর, মিলনে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি—এমনকি, মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে পারে। সেজন্য পুংসবন সংস্কারের পর চতুর্থ মাসে সীমন্তোন্নয়নের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। আমাদের দেশের মেয়েদের সীমন্তে সিন্দুর লেপন করার অর্থ বিবাহ ও শাস্ত্রানুসারে নারী-পুরুষ মিলনের আইনানুগ অনুমোদন। গর্ভের চতুর্থ মাসে সীমন্তোন্নয়ন অর্থাৎ সীমন্ত থেকে সিন্দুর তুলে দেওয়ার অর্থ স্ত্রীর পক্ষে পতিগমনের উপর নিষেধাজ্ঞা। এই সংস্কার-সাধনের পর স্ত্রী প্রসবকাল পর্য্যন্ত কোনভাবে অনুলিপ্তা, প্রসাধিতা ও শৃঙ্গারবেশিনী হতে পারবে না।

পঞ্চম মাসে গর্ভিণীকে পঞ্চামৃত দেওয়ার একটি প্রথা প্রচলিত আছে। নারী তার দেহের অভ্যন্তরে প্রাণকোষের মাধুরী দিয়ে একটি অঙ্কুরিত প্রাণে যে রস ও রক্তের সঞ্চারে মগ্ন থাকে, তার পরিবর্দ্ধনের জন্য পরিপোষকতা প্রয়োজন। তাই সারবান্ খাদ্যবস্তুর সাহায্যে ভাবী মাতার দেহের পুষ্টিসাধন করার বিধি আছে। দুগ্ধ চিনি, ঘৃত, মধু ও দধি—এই পঞ্চামৃত মঙ্গলানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভাবী মাতাকে সেবন করাতে হয়। গৃহিণীরা গর্ভিণীকে যে সাধ-ভক্ষণ করান, তার মূলেও প্রায় একই ব্যাপার।

নারী যখন আসন্নপ্রসবা হন, তখন স্বভবতঃই তাঁর মনে ভাবী সন্তানের জন্মকালীন শুভাশুভ অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ ও ভয়ের আবির্ভাব ঘটে। সেই সময় প্রসূতির মনে শক্তি ও সাহস সঞ্চারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আসন্নপ্রসব-কালে পতির পক্ষে সোষ্যন্তীকর্ম্ম নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করার বিধি আছে। এই সংস্কারসাধন দ্বারা প্রসূতির মনে প্রসবকালীন সঞ্চারিত ভয় দূর হয়ে সাহসের সঞ্চার হয়।

অতঃপর সন্তান-প্রসবের পর জাতকর্ম্ম। সন্তান জন্ম-গ্রহণ করার পর পরিষ্কার শিলায় পেষিত যবচূর্ণের দ্বারা তার জিহ্বা মার্জ্জনা এবং স্বর্ণ দ্বারা ঘৃতপ্রাশন করাতে হয়। স্বর্ণপিষ্ট ঘৃতের গুণ বহু প্রকার, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে একথার উল্লেখ আছে। স্বর্ণ দ্বারা বায়ুদোষ নাশ হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় এবং প্রসব যন্ত্রণার দরুন শিশুর রক্তে সম্ভাব্য ঊর্দ্ধগতি দোষও বিনষ্ট হয়। ঘৃত দ্বারা মল পরিষ্কার হয়, বলাধান হয় এবং শরীরের তাপবৃদ্ধি হয়। সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে এই প্রথা যে উপকারী, তাতে সন্দেহ নেই। জাতকর্ম্মের পরই ধাত্রী নাড়ী ছেদন করবে। শিশুর নাড়ী ছেদন করার জন্য শাস্ত্রোক্ত নিয়ম রয়েছে।

আমাদের দেশের শাস্ত্রোক্ত সংস্কারবিধি আলোচনা করে দেখা যায় যে, গর্ভিণী এবং গর্ভস্থিত শিশুর দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের জন্য যথেষ্ট বিধি রচিত হয়েছে। শিশু ও প্রসূতি-কল্যাণ যে জাতির সর্ব্বজনীন স্বাস্থ্যের ভিত্তিস্বরূপ, একথা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকার ও মনীষিগণ উপলব্ধি করতেন। আমরা চর্চ্চার অভাবে ও দীর্ঘকালীন পরাধীনতার চাপে অনেক কিছুর মত স্বাস্থ্যের দিকে অবহেলা করে এসেছি। নূতন করে স্বাস্থ্যবিধি পালন শিখবার দিনে প্রাচীন প্রথা স্মরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। অবশ্য বর্ত্তমান বিংশ শতকের বহুপ্রকার পরিবর্ত্তনের যুগে শাস্ত্রোক্ত প্রথা যথাযথ ভাবে পালন করা সকলের পক্ষে ও সকল সময়ে সম্ভব নাও হতে পারে। আমাদের আধুনিক বিশেষজ্ঞগণও প্রসূতি এবং শিশুরক্ষার জন্য বহুবিধ নূতন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার বিধান দিয়েছেন। সকলের স্বাস্থ্য রক্ষা ও বর্দ্ধনের জন্য এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতে এক সবল ও শক্তিশালী মানবসমাজ গড়ে তোলার দিকে প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারী সচেতন হবেন এবং অনগ্রসর ব্যক্তিদের নিজেদের স্তরে টেনে তুলবেন—স্বাধীন দেশের এ এক বিরাট আশা।

কল্পলোক

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

অরুণের স্ত্রী করুণা। দু'জনের বয়স প্রায় এক—সাতাশ কি আটাশ। অরুণের অবস্থা মাঝামাঝি, ছোট ভাড়াটে ফ্ল্যাটে বাস করে।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি, অনেক রাত, আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ, খোলা জানালার ভিতর দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছে জ্যোৎস্না। ঘুমিয়ে আছে পাশাপাশি অরুণ আর করুণা। একটি হাতের উপর মাথা রেখে অরুণ কাত হয়ে শুয়ে আছে, মুখের একটা দিকে আলো, আর একটা দিক অন্ধকার। করুণার খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে মুখের উপর, ঠোঁট দুটি হাসি-হাসি।

অনেক দূরে ঢং ঢং করে ঘড়ি বাজে। বাতাসে জানালার পর্দা দুলতে দুলতে হঠাৎ তা খুলে যায়, প্রকাণ্ড একটা সাদা পাখীর মত ডানা মেলে দূর হতে দূরে গিয়ে মিলিয়ে যায়। জানালাটা বড় হতে থাকে, আস্তে আস্তে দেয়ালগুলো কাগজের টুকরোর মত আলগা হয়ে খসে পড়ে। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে, সেই শুভ্র আলোয় ধীরে ধীরে ঘর দ্বার, বিছানা, অরুণ করুণা সব মিলিয়ে যায়। একটু পরে আবছায়া একটা ছবি ফুটে উঠে, ক্রমে তা ফুটতর হয়—দেখা যায় একটা নতুন দেশ, পথের দুধারে গাছের শ্রেণী, একপাশে বাগান, ফুল ফুটে আছে অফুরন্ত, তারই আড়াল দিয়ে দেখা যাচ্ছে একখানা ছোট অথচ ছবির মত সুন্দর মাটির ঘর। পথ চলে গেছে এঁকে বেঁকে দূরে একটা শহরের দিকে। সেই পথ ধরে আসে এক যুবক, মুখ দেখা যায় না, চাদর বাতাসে উড়ে, হাতে তার একগাদা বই আর খাতা। হঠাৎ ঝড়ের মত বেগে মস্ত বড় একখানা দামী মোটর আসে, অন্যমনস্ক যুবক সেদিকে খেয়াল করে না—ঘ্যাচ করে মোটরখানা তার এক ইঞ্চি দূরে থেমে যায়, চমকে উঠে যুবক, বইখাতা ছিটকে পড়ে চারিদিকে। একজন মহিলা মোটর থেকে মাথা বার করেন।

মহিলা। (ভুরু বাঁকিয়ে) ছেলেমানুষ নন অথচ পথ চলতে জানেন না।

(যুবক সেকথায় কান দেয় না, চাদর সামলে বইপত্র সংগ্রহ করে)

মহিলা। (বিরক্তির সঙ্গে) এসব লোকের পথে বেরুনো উচিত নয়।

যুবক। (বই কুড়োতে কুড়োতে) উচিত হচ্ছে এক শ্রেণীর মেয়েদের মোটর দিয়ে পথে ছেড়ে দেওয়া।

মহিলা। এক শ্রেণীর মানে?

যুবক। (না তাকিয়ে) এক বিশেষ শ্রেণীর—

মহিলা। (কঠিন ভাবে) বিশেষ শ্রেণীর মানে?

যুবক। (না ফিরে) যে শ্রেণীতে পড়ে যাবতীয় জীব যারা পথচারীর—

মহিলা। (বিরক্ত ভাবে) জীব! সরে যান পথ থেকে।

যুবক। (না ফিরে) কি করছি আশা করি দেখতে পাচ্ছেন।

মহিলা। (অসহিষ্ণু ভাবে) তাড়াতাড়ি করুন।

যুবক। (ধীরে সুস্থে বই তুলে চাদর দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে) কি বস্তু ধুলোয় পড়েছে তা যদি জানতেন।

মহিলা। (বিদ্রূপের স্বরে) কি বস্তু!

যুবক। কাব্য।

মহিলা। (খিলখিল করে হেসে উঠে) সরে যান, আমার সময় নষ্ট করবেন না।

যুবক। (এতক্ষণে এগিয়ে এসে) আহা, কেন নষ্ট হবে, আসুন কাব্য আলোচনা করা যাক।

মহিলা। (যুবককে দেখে চমকে উঠে) কে! অরুণ!

অরুণ। (মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে) এ কি করুণা! তুমি এখানে?

করুণা। তোমাকে এখানে এমন ভাবে দেখব এ আমি কল্পনাও করি নি।

অরুণ। আমিই কি কল্পনা করতে পেরেছি যে তোমাকে এই অবস্থায় এখানে দেখব?

করুণা। (মোটর থেকে নেমে এসে) ভারি আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে। এখানে কি করছ।

অরুণ। কিছু না, মাঝে মাঝে আসি এখানে।

করুণা। মাঝে মাঝে! তা হলে বল সর্ব্বদাই আসা যাওয়া কর। কেন বল ত?

অরুণ। কোন বিশেষ কারণ নেই।

করুণা। সত্যি বলছ?

অরুণ। বললাম ত বিশেষ কোন কারণ নেই, তবে এখানে একখানা বাড়ী করেছি।

করুণা। আমাকে গোপন করে এত কাণ্ড করেছ!

অরুণ। (বিব্রত ভাবে) তোমাকে বলি বলি করেও বলা হয় নি। ভাল কথা—তুমি এখানে কেন?

করুণা। বিশেষ কোন কারণ নেই।

অরুণ। সত্যি বলছ?

করুণা। (হেসে উঠে) আমিও এখানে একখানা বাড়ী করেছি।

অরুণ। মোটরও কিনেছ দেখছি।

করুণা। বহুদিনের সখ ছিল।

অরুণ। তোমার বাড়ীটা কোথায়।

করুণা। শহরের পূবদিকটাতে, দেখেছ বোধ হয় যেদিকে বড় বড় বাড়ী আছে। সবচেয়ে বড় বাড়ীখানা আমার।

অরুণ। ওদিকে আমার যাতায়াত নেই।

করুণা। তোমার বাড়ীটা কোন দিকে?

অরুণ। এই যে সামনেই, এ ফুলবাগান আমারই। এস ভিতরে—দেখবে।

(অরুণ আগে যায়, অনুসরণ করে করুণা। কাঠের ছোট্ট ফটকটা ঠেলে তারা বাগানে ঢোকে, একটু এগিয়ে গিয়ে একটা কদমগাছের নীচে দাঁড়ায়।)

অরুণ। কেমন দেখছ আমার মালঞ্চ! এখানে বসা যাক।

(দু'জনে বসে)

করুণা। (চারিদিকে তাকিয়ে) মালঞ্চ কোথায়? এ ত দেখছি আগাছা-ভর্ত্তি জঙ্গল।

অরুণ। জঙ্গল! এত ফুল, এত শ্যামলতা, এত পারিপাট্য, একে জঙ্গল বলছ!

করুণা। জঙ্গল নয় ত কি? লাল সুরকির বড় বড় পথ কোথায়? অর্কিড, পাম, ক্রোটন কোথায়? ম্যাগনোলিয়া, ক্লেরোডেনড্রন, লাজেরষ্ট্রোমিয়া কোথায়? এ ত দেখছি যতসব চেনা ঘরোয়া গাছ; শিউলি, বকুল, চাঁপা, কদম, বেলি, চামেলি আর টগর।

অরুণ। ঘরোয়া বলেই ভাল লাগে, গন্ধ পেয়েই ফুল চিনে ফেলি, বোটানির বই খুলতে হয় না। আহা, দেখেছ নদীর ধারে ঝাউগাছ বাতাসে কেমন দুলছে।

করুণা। (সভয়ে) কত বড় নদী! কি নদী ওটা? এদেশে তো নদী নেই!

অরুণ। (সোৎসাহে) আছে বৈ কি। নদী না হলে আমি থাকতে পারি নাই, আমার ঘরের পাশে চাই মস্তবড় কূলে কূলে ভরা নদী, রাতদিন শুনব তার কলকল ছলছল গান। ওর কোন নাম ছিল না, আমি নাম দিয়েছি পদ্মা। জানই ত আমার জন্ম পদ্মানদীর পারে।

করুণা। নদী দেখলে আমার ভয় করে।

অরুণ। তোমার জন্ম শহরে কিনা তাই। দেখছ, ওপারের গাছপালা, খেয়াঘাটের ছোট্ট ঘর, কলসী কাঁখে গাঁয়ের মেয়ে দুটি, বাঁকের মাথায় পালতোলা নৌকো, আহা, ছবির মত সুন্দর দেখাচ্ছে। সারাদিন ঘরের দাওয়ায় বসে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি।

করুণা। (আশ্চর্য্য হয়ে) ঘর কোথায়?

অরুণ। ঐ যে চাঁপাগাছের আড়ালে দেখা যাচ্ছে।

করুণা। ছোট ঐ মাটির ঘরখানা! ওটা তো মালীর ঘর।

অরুণ। (হেসে) মালীর নয়, মালিকের। ঐটাই আমার ঘর। ছোট বটে, কিন্তু ভারি সুন্দর, দেয়ালে দিয়েছি আলপনা, চালে তুলে দিয়েছি মাধবীলতা।

করুণা। দেখতে যদি আমার বাড়ী, সে একটা প্রাসাদ। তোমার কোলকাতার ফ্ল্যাটের তিনটে ঘর যত বড় তার চেয়েও বড় এক একখানা ঘর। মেঝে সব মার্ব্বেল। হালকা, পলকা সস্তা জিনিষ সেখানে নেই, ঘরে বসলে মনে হয় ঘরে বসেছি।

অরুণ। ঘরে বসলে আমার ঘরের কথা মনেই হয় না। গৃহটা ত আসল নয়—আসল হচ্ছে গৃহিণী।

করুণা। ভাল বাড়ী দেখতে বললেই তুমি ঐ কথা বল। ওটা যুক্তিই নয়।

অরুণ। সত্যিই বলছি, আসবাব দিয়ে ঠাসা, বাড়ীর কথা ভাবতে গেলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

করুণা। দম বন্ধ হয় তোমার ছোট ঘরে; হাত পা ছড়িয়ে বসবারও স্থান নাই।

অরুণ। মন কিন্তু ছড়িয়ে যায়। কবিতার বই নিয়ে যখন বসি তখন কাব্যের সঙ্গে বাস্তব মিলে যায়।

করুণা। কাব্যই তোমাকে অকেজো করেছে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করতে বললেই তুমি ভয় পাও। চোখের সামনে কতজন শেয়ার বাজারে ঢুকে বড়লোক হয়ে গেল, তুমি যেমন ছিলে এখনও তেমন।

অরুণ। কিন্তু যাই বল আনন্দে আছি।

করুণা। (হেসে) ওটা ফাঁকা আনন্দ। ভারী জিনিষ, ভাল আর দামী জিনিষ ছুঁয়ে, ধরেই তো আনন্দ।

অরুণ। তাই ত দেখছি অনেক ভাল ভারী আর দামী জিনিষ দেহে ধারণ করেছ। গয়নাগুলো অবশ্যই গিলটি নয়, পাথরগুলোও আসল হীরে!

করুণা। (হেসে) গিলটিও নয়, নকলও নয়, খাঁটি ও আসল। আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল ত?

অরুণ। (বিব্রত ভাবে) হ্যাঁ, তা মন্দ নয়, বেশ সুন্দর বৈ কি।

[মোটরের হর্ণ বেজে ওঠে]

অরুণ। তোমার গাড়ীর হর্ণ বাজছে যে! কোন দুষ্টু ছেলে নয় ত?

করুণা। আমাকে ডাকছে।

অরুণ। (আশ্চর্য্য হয়ে) তোমাকে ডাকছে! কে?

করুণা। দেখতে পাও নি, গাড়ীতে আমার পাশে বসে ছিল।

অরুণ। (অবাক হয়ে) না, দেখি নি—কে সে?

করুণা। আমার বন্ধু।

অরুণ। তোমার বন্ধু আবার কে? নাম বল না।

করুণা। আমার এ দেশের বন্ধু, নাম জানলেও চিনতে পারবে না।

অরুণ। তা হলে একটি বন্ধু চয়ন করেছ।

করুণা। (লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করে থাকে)

অরুণ। (স্নেহের সঙ্গে) বোধ হয় আদর্শ পুরুষ।

করুণা। আদর্শ না হলেও বুদ্ধিমান পুরুষ, হালকা কাব্য নিয়ে সময় নষ্ট করে না, শেয়ার বাজারে মাথা খাটিয়ে পয়সা উপার্জন করে।

[বাগানের পথ দিয়ে আসে একটি মেয়ে, খোঁপায় ফুল গোঁজা, গলায় ফুলের মালা]

করুণা। (আশ্চর্য্য হয়ে) ইনি কে ?

অরুণ। এই, একটি মেয়ে।

করুণা। চেন না বুঝি।

অরুণ। চিনি বৈ কি।

করুণা। পরিচয় বলতে আপত্তি আছে ?

অরুণ। না, ইনি হচ্ছেন আমার বান্ধবী।

করুণা। তা হলে একটি বান্ধবী চয়ন করেছ !

অরুণ। (জবাব দেয় না)

করুণা। (স্নেহের সঙ্গে) বোধ হয় আদর্শ নারী।

অরুণ। আদর্শ না হলেও সৌন্দর্য্যবোধ আছে। ওর সঙ্গে কাব্য আলোচনা করে খুবই আনন্দ পাই।

[মেয়েটি কাছে আসে]

করুণা। আপনাদের মালঞ্চে হঠাৎ এসে পড়েছি, অপরাধ নেবেন না।

নবাগতা। বেশ করেছেন, আপনি নিশ্চয়ই অরুণের খুবই পরিচিত কেউ !

করুণা। (হেসে) অনেক দিনের আলাপ। আমার নাম করুণা, আপনার নাম কি ?

নবাগতা। আমার নাম চকিতা।

করুণা। চকিতা ! নামটা যেন আগে শুনেছি বলে মনে হচ্ছে ! ওহো, সেই যে তুমি একটা গল্প লিখেছিলে, একটি কবিতা-পাগলা মেয়ের কথা, নাম দিয়েছিলে চকিতা। তাই না ?

অরুণ। হ্যাঁ, লিখেছিলাম।

করুণা। চেহারাটাও যেন দেখা মনে হচ্ছে !

চকিতা। অসম্ভব, আপনাকে আমি আগে কখনো দেখি নি।

করুণা। বসুন।

(চকিতা করুণার পাশে বসে)

করুণা। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে কিন্তু কালিদাসের কালের 'মনোহারিকার' মত দেখাচ্ছে।

"কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পারো করবী"

(অরুণকে লক্ষ্য করে) তোমার মুখে শুনে শুনে আমারও মুখস্থ হয়ে গেছে।

অরুণ। বর্ষায় চকিতা অমনভাবে সাজতে ভালবাসে।

করুণা। (হেসে উঠে) বর্ষা ! পৌষের মাঝামাঝি, এখন বর্ষা কোথায় ?

অরুণ। পৌষের মাঝামাঝি ! কি যে বলছ তুমি—এ ত আষাঢ়ের মাঝামাঝি।

করুণা। (আবার হেসে ওঠে)

(গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠে, একটা দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায়, কদমের রেণু ঝরে পড়ে)

অরুণ। (উল্লসিত হয়ে) ঐ শোনো। শুনছ, মেঘ ডাকছে। দেখ পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তারই পটভূমিতে সাদা বকের সারি উড়ে চলেছে। দেখ, নদীর ওপারে বিষ্টি নামল।

করুণা। (অবাক হয়ে) ব্যাপার কি বল ত ?

অরুণ। আমি যে বর্ষা ভালবাসি তাই এদেশে বারমাস বর্ষা। দু' চার দিন শরৎ, দুচার দিন শিউলি ফোটে। শীত গ্রীষ্ম এ-দেশে নাই।

করুণা। আমি কিন্তু ভালবাসি শীত, মিঠে রোদ আর পরিষ্কার আকাশ। আমার ওদিকটায় তাই ঝরঝরে খটখটে পৃথিবী। আমার বাগানে চমৎকার কারনেশন, ক্রিশেনথেমাম, ডালিয়া আর সুইট পি ফুটেছে, একদিন গিয়ে দেখে এস।

অরুণ। আর আমার বাগানে ফুটেছে কেয়া, কদম, করবী। আজ একটা কবিতা লিখেছি শোন। (পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে)

করুণা। (আশ্চর্য্য হয়ে) তুমি কবিতা লেখ ? অবাক কাণ্ড, শুনি নি ত কখনও !

চকিতা। সুন্দর কবিতা লেখে অরুণ।

অরুণ। এখানে এলে কবিত্বের যেন উৎসমুখ খুলে যায়—ভাব, ভাষা, ছন্দ স্রোতের মত বেরিয়ে আসে।

চকিতা। অরুণ মস্ত বড় কবি, মস্ত বড় বলাও ভুল হ'ল, আমার মতে ও শ্রেষ্ঠ কবি। কি গভীর ভাব, কি অপূর্ব্ব ভাষা—কবিতা যেন ছবি হয়ে ফুটে ওঠে।

করুণা। এসব কিন্তু নূতন খবর।

অরুণ। শোন কি লিখেছি (কাগজ তুলে নেয়)

করুণা। (হেসে) পড়বে কেমন করে ! চশমা কোথায়, হারিয়েছ বুঝি ?

অরুণ। চশমা ! ভেঙে গুড়ো করে নর্দমায় ফেলে দিয়েছি।

করুণা। চশমা না হলে যে তুমি অন্ধ ! চশমা আর তুমি ত অবিচ্ছেদ্য !

অরুণ। ঐ জন্যেই ত ওটার উপর আক্রোশ, ঐ জন্যেই ত ফেলে দিয়ে মুক্তিলাভ করেছি। শোন, পড়ছি—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে রে।
হৃদয় নাচে রে।
শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্ত দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরী ডাকিছে সঘনে
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।

চকিতা। (উচ্ছ্বসিত ভাবে) কি সুন্দর, কি চমৎকার।

করুণা। (আশ্চর্য্য হয়ে) এ ত রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা, বহুবার তোমাকে পড়তে শুনেছি!

অরুণ। না, এ আমার।

চকিতা। রবীন্দ্রনাথ এত ভাল কবিতা লিখতে পারেন না।

অরুণ। এ কবিতা আমার কেননা আমি এর প্রাণদান করেছি। একদা রবীন্দ্রনাথ এর কাঠামো তৈরি করেছিলেন, কিন্তু আমি কত মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে, কত নিঝুম দুপুরে, কত বাদল-সন্ধ্যায় কত অন্ধকার শ্রাবণ-রাত্রিতে অনুভব দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে একটু একটু করে জীবন্ত করে তুলেছি—এ আমারই কবিতা।

চকিতা। এ অরুণেরই সৃষ্টি।

করুণা। (হাই তুলে) তা হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই।

অরুণ। আরও আছে শোন।

করুণা। (বাধা দিয়ে) থাক—থাক।

(বাগানের ফটক খুলে হালফ্যাশানের স্যুট-পরা একটি যুবক এগিয়ে আসে)

অরুণ। ইনিই বুঝি তোমার বন্ধু!

করুণা। হ্যাঁ।

অরুণ। আসুন, আসুন, (চাপা গলায়) নামটা কি?

করুণা। অশোক।

অরুণ। আসুন অশোকবাবু, স্বাগত। আপনার পরিচয় ইতিমধ্যেই পেয়েছি।

অশোক। আমার সৌভাগ্য। হঠাৎ এসে পড়ে আপনাদের আলোচনা ব্যাহত করলাম ত?

অরুণ। আরে না না। বরং আলোচনায় যোগ দিতে এলেন বলে খুশী হলাম। কাব্য সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

অশোক। কাব্য! হ্যাঁ, তা আজকাল বইয়ের বাজারে কাব্যের চাহিদা কিছু বেড়েছে। কবিতার লাইনগুলো যদি পিরামিড প্যাটার্ণ অথবা ষ্টেয়ার কেস প্যাটার্ণে ছেপে মলাটটা জমকালো করে বার করা যায়, তাহলে বুঝলেন, প্রেজেণ্টেশনের বাজারে বেশ বিক্রি আছে।

অরুণ। (বিব্রত ভাবে) আমি ঠিক ওকথা বলছি না, আমি বলছি কি, সৃষ্টির দিক থেকে এই দুটো লাইন:

"ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্ত দুলে দুলে সারা—

অশোক। (হেসে) চমৎকার হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যসৃষ্টির দিকটায় বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে; সেই হিসেবে কৃষিসংক্রান্ত বিষয় কবিতায় লেখা হলে চাষীদের মধ্যে প্রচারের বিশেষ সুবিধে হবে। ঠিক লিখেছেন—'ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা, নবীন ধান্ত দুলে দুলে সারা', অর্থাৎ বর্ষা হওয়া চাই ও ধানগাছের চারা বাতাসে দোলা চাই, তা হলেই সে গাছ জোরালো হবে এবং ফলন বেশী হবে। এইটাই ত জাপানী পদ্ধতি! ধরুন ফলন যদি দেড়া হয় আর ধানের বাজারদর যদি মণপ্রতি ৫৮৫/১৫ থাকে তা হলে—

অরুণ। (দুটি হাত উঁচু করে বাধা দিয়ে) একটু থামুন, দয়া করে একটু থামুন—

অশোক। (থেমে গিয়ে) কি বলছেন?

অরুণ। বলছিলাম কি আপনার রসবোধ ভারি সূক্ষ্ম। আপনাকে দেখে আমার একটি বন্ধুর কথা মনে হচ্ছে, শেয়ার-বাজারে কারবার করে অনেক টাকা করেছে। ঠিক আপনার মত মহা বিজ্ঞ লোক, দেখতেও অনেকটা আপনার মত—

করুণা। কার কথা বলছ—পরেশবাবুর কথা?

অরুণ। হ্যাঁ, দেখেছ কথা বলবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত এক!

অশোক। (হাসতে থাকে)

অরুণ। হাসিটিও মিলে যায়।

[গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে ওঠে]

চকিতা। (গুন গুন করে গান গায়) আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে—

করুণা। এইবার মনে পড়েছে, এতক্ষণ ভাবছিলাম এত চেনা মনে হচ্ছে কেন? গান শুনে মনে পড়ে গেল, পাশের বাড়ীর মালতী সারা বর্ষাটা ঐ গান গায়। তার সঙ্গে চকিতার চেহারারও আশ্চর্য্য মিল—চেয়ে দেখ!

চকিতা। (হাসতে থাকে)

করুণা। দেখ, দেখ, হাসিটি পর্য্যন্ত মিলে যাচ্ছে, সেই মাথাটি একটু কাত করে হাসা।

[গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে ওঠে, দমকা হাওয়া আসে]

চকিতা। (উচ্ছ্বসিত হয়ে) নদীতে ঢেউ উঠেছে, কি সুন্দর! নৌকোতে পাল তুলে দিয়ে মাঝ-নদীতে যাবার কথা ছিল, যাবে না?

অরুণ। তুমি যাও—আমি যাচ্ছি।

[চকিতা গান গাইতে গাইতে চলে যায়]

অশোক। (ঘড়ি দেখে) বেলা তো অনেক হ'ল, এখন তা হলে—

করুণা। তুমি গাড়ীতে গিয়ে বসো, আমি আসছি।

[অশোক বাগানের ফটক খুলে পথে বেরিয়ে যায়]

অরুণ। অশোকবাবুকে দেখে আমার ভারি ভাল লেগেছে। তোমার সব মত উনি মেনে নেন ?

করুণা। সর্ব্বান্তকরণে মেনে নেন।

অরুণ। সব কথা শোনেন ?

করুণা। অবশ্যই।

অরুণ। কখনো রাগ করেন না ?

করুণা। কথখনো না।

অরুণ। সব সময় শেয়ারবাজারের কথা বলেন ?

করুণা। সব সময়।

অরুণ। (গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে) ঠিক চকিতার মত, সব মত মেনে নেয়, সব কথা শোনে, কখনো রাগ করে না, সব সময় মুখে কবিতা।

করুণা। (অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে) ভাল লাগে ?

অরুণ। (ভেবে চিন্তে) লাগে।

করুণা। সত্যি করে বলো।

অরুণ। (গম্ভীর ভাবে) মাঝে মাঝে ভাল লাগে না।

করুণা। মাঝে মাঝে আমারও ভাল লাগে না।

অরুণ। (আস্তে করুণার হাতখানি ধরে) সত্যি বলছ ?

করুণা। সত্যিই বলছি।

[হঠাৎ আকাশে মেঘ ঘনতর হয়, বকুলতলায় অন্ধকার নেমে আসে, অরুণ আর করুণাকে দেখা যায় না, মালঞ্চ মিলিয়ে যায়। একটু পরে অন্ধকার হালকা হয়ে আসে, ফুটে ওঠে অরুণ-করুণার শোবার ঘর। পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে দু'জনে, করুণার হাতটি অরুণের হাতের মধ্যে। ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, রোদ এসে পড়েছে বিছানায়।]

পল্লীগীতি—কাজরী গান

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভারতের মধ্যপ্রদেশ উত্তর-প্রদেশ, গুজরাট, রাজপুতানা ইত্যাদি স্থানে শ্রাবণ মাস নারীদের অতি আনন্দের দিন। সারা শ্রাবণ মাস নারীরা উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে দোলনায় দোলে আর কাজরী গান গায়। শ্রাবণের শেষ পূর্ণিমায় রাখীবন্ধন উৎসবের অনুষ্ঠান করে নারীরা কাজরী গান ও ঝুলায় দোলাপর্ব্ব সমাপ্ত করে।

কাজরী গানে সাধারণতঃ পতিবিরহকাতরা নারীর প্রাণের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়। শ্রাবণের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, থেকে থেকে বিজলী চমকাচ্ছে, দেখতে দেখতে রিমঝিম্ করে বারিবিন্দু পড়তে সুরু হ'ল। নিশীথরাতে শূন্য শয্যায় বিরহিণীর হৃদয় উতলা হয়ে উঠল। পাগলা হাওয়ার সঙ্গে মন ছুটে গেল দূরে—সুদূরে, যেখানে তার প্রিয় এমনি ব্যাকুল হয়ে তার কথা ভাবছে। তরুণী বিরহিণী দোলনায় দুলতে দুলতে কাজরী গাইছে, আর সে গানে প্রিয়তমের জন্ত অধীর উৎকণ্ঠা সুললিত ভাষায় ফুটে উঠেছে—

বীতী ঔধি আবন কী, লালসন ভাবন কী
ডগ ভই বাবন কী, সাবন কী রতিয়াঁ।

"আমার প্রিয়তমের আসবার দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, মন ভাবনায় ভরে উঠেছে; শ্রাবণের রাত সুদীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছে।"

আর এক রাতে স্বপ্ন দেখে বিরহিণী হৃদয়ের বলছে—

শ্যাম ঘরে নহী, ঘেরি আয়ে বদ্‌রা
শোওতি রহেউঁ সপন ইক দেখিউঁ রামা
খুলি গয়ে নৈন, ঢরিক গয়ে কজরা।

"শ্যাম ঘরে নেই, বাদল ঘিরে এসেছে, হে রাম! শুয়ে এক স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম। ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখের কাজল ধুয়ে গেল অশ্রুজলে।"

মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাটের উৎসব-ভরা শ্রাবণ রাত নারীদের কাজরী গানে মুখরিত হয়ে উঠে। গ্রাম্য নারীরা তাদের হৃদয়ের সুখ-দুঃখ মান-অভিমান কাজরী গানের ভিতর দিয়ে সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছে। সে গানের মিষ্টি সুর আর পদাবলী হৃদয় স্পর্শ করে।

পতি প্রিয়তমা পত্নীকে নানা বসন-ভূষণে সাজাবে তাই বিদেশে চলে গেছে রত্নালঙ্কার আনতে, ঘরে বিরহিণী পত্নী উদাস মনে গাইছে—

"নথিয়া কে কারণ হরি মোরে উতরি গইলে পার
রতিয়া সেজিয়া হো-অকেলী, দিনয়েঁ। বতিয়েঁ। ন সোইতে
এক তো রাতি হো বড়ী ভার, দুসরে স'ইয়া বিছুড়ী
তীসরে সাবন-কে মহিনওঁা, ঝমঝম্‌কাতে বদরী।"

"আমার প্রিয়তম আমার জন্ত নথ আনতে নদীর ওপারে চলে গেছে, রাতে শয্যায় আমি একাকিনী, দিনে : [illegible] বাক্যালাপও সহ্য হয় না। একেতো সুদীর্ঘ রাত কাটে না,

তায় প্রিয় আমাকে ছেড়ে বিদেশে চলে গেছে, তৃতীয়তঃ শ্রাবণ মাস ঝম্‌ঝম্‌ করে বারি ঝরছে, আমার প্রিয় কি করে আসবে।"

রাজস্থানের এক পল্লীগীতিতে আছে—

ভু-ভীনী ঘোড়া ভল্লা ডাবা উপড়িয়াহ
মিরগা-নৈনী মাঁগবা খগ বাবা খড়িয়াহ।

বর্ষার বারিপাতে পৃথিবী ভিজে যাচ্ছে, ভিজে মাটির সুগন্ধে চারদিক ছেয়ে গেছে, এমনি দিনে এক যুবক সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, দেখে এক মৃগনয়নী আপনমনে প্রশ্ন করছে, এমন দুর্যোগের দিনে ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যাচ্ছে সে কে? হয় ত সে তার প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এই দুর্যোগ তুচ্ছ করে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, নয় ত সে রণক্ষেত্রে তলোয়ার চালিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, নইলে শ্রাবণের এই বর্ষণমুখর দিনে ঘর ছেড়ে কে বাইরে যাবে?

সাধারণতঃ গ্রামের পুরুষরা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে দূর-দেশবাসী হয়, শ্রাবণ মাসে তারা নিজ গ্রামে ফেরে তাদের প্রিয়তমা পত্নী ও সন্তানের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। যে নারীদের পতিরা কোন কারণে স্বদেশে ফিরতে অপারগ হয় তাদের বিরহিণী পত্নীদের মনোবেদনা কাজরী গানে ব্যক্ত করা হয়—

সৈয়াঁ যোগী হোগেয়ে মোরে মহারাজ—
সাবণ কী হ্যায় রৈণ আঁধেরী, রিমঝিম্‌ বরসৈ মেহরে
হোগয়ে মোরে মহারাজ সৈয়াঁ যোগী হোগয়ে।

"আমার প্রিয় যোগী হয়ে গেছে, শ্রাবণের আঁধার রাত, রিমঝিম্‌ করে মেঘ ঝরছে, আমার প্রিয় যোগী হয়ে চলে গেছে।"

"কাহে কো বরসত কালী বদরিয়া
হমারে পিয়া পরদেশ নিধারে—
বিজলী চমকে জৈসে লাগে কটরিয়া।
সভরী সখিয়াঁ ঝুলে হিডোঁলা
আঠে আঠে রং সুরগ-চুনরীয়া—
নহ্নী-নহ্নী বুন্দিয়ন মেহরা বরসে
প্রিয়াবিন তড়পত জৈসে মছরীয়া
সখী কৃষ্ণ কী পেয়ারী রাধিকা
বেগ মিলে তোঁহে আন সবরিয়া।

"হে কালো মেঘ, কেন বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ছ? আমার প্রিয় পরদেশ চলে গেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর মনে হচ্ছে কে যেন ছুরির আঘাতে আমার দেহ জর্জ্জরিত করে দিচ্ছে। রামধনু রঙের সুন্দর ওড়না দুলিয়ে সব সখীরা দোলনায় দুলছে। মেঘ গলে ছোট ছোট বারিবিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে। জল বিনা মাছ যেমন ধড়ফড় করছে তেমনি আমিও প্রিয় বিনা ছটফট করছি। সখী, আমি কৃষ্ণের প্রিয়তমা রাধিকা, তোমরা শীঘ্র প্রিয়কে নিয়ে এস।"

শ্রাবণের নাগপঞ্চমী দিন ঘরে ঘরে কন্যাদের "গুড়িয়া উৎসব", মানে পুতুলের উৎসব হয়। নাগপঞ্চমী দিন বধূ ও কন্যারা ভোরে স্নান করে সুন্দর বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়। গৃহবধূ ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়ে কালো নাগের চিত্র অঙ্কিত করে। দুধ দিয়ে পায়েস রেঁধে নাগদেবতার ভোগ দেয় ও যথারীতি পূজো করে। রাত্রে বয়স্কা গৃহিণীরা বাড়ীর জল-নির্গমনের রাস্তায় এক বাটি দুধ ও কলা রেখে দেয়, তাদের বিশ্বাস নাগদেবতা নিশ্চয়ই দুধ পান করে যাবে নীরবে এসে।

গুড়িয়া উৎসব বেশ উপভোগ্য। সারা বছর ধরে ধনীর কন্যাই হোক আর গরীবের কন্যাই হোক সবাই পুতুল খেলে এবং নাগপঞ্চমী দিন সে সব পুতুলকে বিসর্জ্জন দেয় বেশ সমারোহ করে। নব-বিবাহিতা বধূরা, কুমারী কন্যারা পুরানো কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরি করে। পুতুলগুলি সাধারণতঃ এক-হাত আধ-হাত, লম্বা হয়। মেয়েরা পুতুল-গুলিকে নিপুণভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করে। পুতুলের খোঁপা বাঁধে কালো সুতো দিয়ে, সুন্দর করে ছোট ছোট সেলাইয়ের ফোঁড় দিয়ে চোখ ভুরু, নাকের রেখা টানে, লাল সুতো দিয়ে ঠোঁট আঁকে। ছেঁড়া শাড়ী আর রংবেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে সুন্দরভাবে শাড়ী ব্লাউজ; ঘাঘরা ইত্যাদি সেলাই করে পুতুলকে সাজায়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুতুল অন্যের চেয়ে সুন্দর করবার জন্য চেষ্টা করে। প্রতি-যোগিতা থাকাতে প্রায় প্রত্যেকটি পুতুলই দেখতে বেশ সুন্দর হয়। নাগপঞ্চমীর অপরাহ্ণে তরুণী বধূরা, কিশোরী কন্যারা এবং বালিকারা বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা হয়ে নূপুরের শিঞ্জন তুলে দল বেঁধে চলে কোন জলাশয়ের তীরে। হাতে তাদের সাধের পুতুল, আর শাড়ীর আঁচলে মটর ও চানাচুর ভাজা। বাড়ীর বয়স্কা গৃহিণীরাও এই উৎসবে সানন্দে যোগ দেয়। মেয়েদের নিজের ভাইয়েরা বা সম্পর্কিত ভাইয়েরা চলে সঙ্গে সঙ্গে লাঠি নিয়ে। ভাইদের লাঠিগুলিতেও বৈচিত্র্য আছে। তারা কুলের ডাল, অভাবপক্ষে অন্য গাছের ডাল কেটে তার সমস্ত বাকল চেঁচে ফেলে দেয়, শুধু লাঠির আগাতে কিছু কিছু বাকল বুঁটির মত রেখে দেয় এবং কালো রং দিয়ে লাঠিটাকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করে। তারপর মাল-কোঁচা দিয়ে ধুতি পরে গায়ে কোর্ত্তা আর কাঁধে বিচিত্র লাঠি নিয়ে ভাইয়ের দল চলে বোনদের পেছনে পেছনে।

শোভাযাত্রা বের হয়ে কোন হ্রদ বা পুকুরের তীরে গিয়ে দাঁড়ায়। বোনেরা যে যার পুতুল ঝুপঝাপ করে জলাশয়ের তীরে জলের একটু উপরে ছুঁড়ে ফেলে, আর ভাইয়েরা অমনি লাঠিগুলি দিয়ে পুতুলদের খুব পিটতে থাকে, বোনদের

সাধের পুতুলগুলি মার খেয়ে খেয়ে চেপ্টা হয়ে যায়, নারীরা আর কন্যারা এই দৃশ্য দেখে হেসে কুটিকুটি হয়। মারের পর্ব্ব শেষ হলে বোনেরা সবার হাতে চানাচুর আর মটর-ভাজা বেঁটে দেয়, তা সবাই মিলে পরমানন্দে খায়। খাওয়ার পর ভাইয়েরা তাদের লাঠিগুলোকে মাঝখানে খানিকটা ভেঙে দেয় ও তার মধ্যভাগে যে যার পুতুলটাকে আটকে নেয়, তারপর বাড়ীতে এসে সেই লাঠি গোয়ালে বা ঘরের কোণে পুঁতে রাখে। রাত্রে লুচি ও ক্ষীর (পায়েস) সহযোগে ভোজনপর্ব্ব সমাপ্ত করে।

কনৌজের নারীরা বড় পর্দ্দানশীন, বধূদের গৃহের বাইরে চলাফেরা করবার অধিকার নেই। শ্রাবণের ঝুলায় কন্যারা দোলে কাজরী গান গেয়ে, আর যে বধূরা পিতৃগৃহে 'নাইহর' যেতে পারে নি, তারা অশ্রুসজল নয়নে ননদীদের ঝুলায় দোলা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নাগপঞ্চমীর দিন রাত্রের আহার সমাপ্ত হলে পর যখন গৃহের পুরুষেরা ও প্রতিবেশী পুরুষেরা নিদ্রা যায়, গৃহে গৃহে আলোকশিখা নির্ব্বাপিত হয় তখন সে রাতের মত শাশুড়ীরা বধূদের অনুমতি দেয় ঝোলায় ঝুলতে। রাত্রি বারটার পর বধূরা সেজেগুজে রাত চারটা পাঁচটা অবধি ঝুলায় দোলে, ননদ-ভাজের কাজরী গান সে নিশীথ রাত্রে সুরের জাল বুনে যায়।

এর পর আসে রাখী-বন্ধন উৎসব। ঝুলন পূর্ণিমা উপলক্ষে পিতামাতা নিজ নিজ কন্যাদের যথাযোগ্য বসন-ভূষণে সজ্জিত করে, পতিগৃহবাসিনী কন্যাদের বস্ত্রালঙ্কার উপহার পাঠায়। শ্রাবণে অতিদরিদ্রা নারীও নিজকন্যাকে সামান্য কিছু সৌখীন জিনিষ বা মিষ্টির জন্য একটি মুদ্রা হলেও যে ভাবেই হোক সংগ্রহ করে দেবে, কারণ শ্রাবণ হ'ল কন্যাদের উৎসবের মাস। কন্যারা, বধূরা তরুণীরা মেহেদী দিয়ে হাত রাঙায়, পায়ে আলতা পরে জমকালো ঘাঘরা ওড়না চোলীতে সুসজ্জিতা হয়, গলায় চন্দ্রহার, সাত-'নহরী', হাতে জসম পটি, বাজুবন্ধ, কাঁকন, কানে বড় বড় ঝুমকা, কপালে চাঁদের মত সোনার বিন্দি শোভা পায়। অলক্তকরঞ্জিত পায়ে পায়েল বাজিয়ে, কাজলটানা আঁখির উল্লাসভরা দৃষ্টি মেলে, বধূরা কন্যারা দল বেঁধে চলে মাঠে কাজরী গান গেয়ে দোলনায় দুলতে।

শ্বশুরালয়ে তরুণী বধূরা পিত্রালয়ে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, কখন তাদের সহোদররা এসে তাদের নিয়ে যাবে আজন্মের নীড়ে। প্রতীক্ষমাণা কন্যাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে উৎসবমুখর পিতৃগৃহ। শ্রাবণের ঝুলা আর কাজরী গানের করুণ সুর তাদের হৃদয় উতলা করে তোলে। বিশেষতঃ যে বধূরা পিতৃমাতৃহীনা, তারা উৎসবভরা শ্রাবণে নিজেদের বড় অভাগিনী মনে করে। ওদিকে মায়েরাও সদ্য-বিবাহিতা কন্যাদের বিরহে অস্থির হয়ে উঠে। কাজরীর এই গানটি মায়েদের অন্তরের ব্যাকুলতা ফুটিয়ে তুলেছে।

সাবণ নিয়রে আয়ে হো বেটা
তোমারি বহিন পরদেশে হো রাজা
সবহী বহনিয়া খেলে কজরিয়া হো বেটা
তিহারী বিসুরে পরদেশ হো
জাও বেটা, লিবা লায়ো বহনিয়া
তুমহারী বহিন পরদেশ হো।

"শ্রাবণ এসেছে, বাছা তোমার বোন পরদেশে পথ চেয়ে বসে আছে। সব মেয়েরা বোনেরা কজরিয়া খেলছে, আর সুদূর বিদেশে তোমার বোন ব্যাকুল হয়ে পথ চেয়ে আছে। যাও বাছা, তোমার বোনকে নিয়ে এস, বোন তোমার পথ চেয়ে বসে আছে।"

শ্রাবণের শেষ পূর্ণিমায় রাখী-বন্ধন উৎসব হয়, এটা হ'ল বোনদের সব চেয়ে বড় উৎসব। আজিকার দিনে বোনেরা তাদের পরম স্নেহের ভাইয়ের হাতে রাখী বেঁধে দেয় প্রাণ-ভরা ভালবাসা আর শুভকামনা নিয়ে, নিজের হাতে নানারূপ মিষ্টান্ন আর সুখাদ্য তৈরি করে সাজিয়ে আ.ন ভাই-এর জন্য। ভাইয়েরাও যথাযোগ্য উপহার বোনকে এনে দেয়। যদি কোন কারণে ভাই-বোন রাখী-বন্ধনের সময় একত্র না হতে পারে তবে বোন ডাকযোগে ভাইয়ের হাতের সুদৃশ্য রাখী ও মিষ্টির জন্য টাকা পাঠিয়ে দেয়, আর তার পরিবর্ত্তে ভাইয়ের কাছ থেকে সুদৃশ্য শাড়ী ব্লাউজ অথবা টাকা উপহার পায়।

রাখী-বন্ধন উৎসবের চার-পাঁচ দিন পূর্ব্বে বোনেরা একটি মাটির পাত্রে কিছু গম ভিজিয়ে রাখে। তার পর সেই গম জল থেকে তুলে ঢেকে রাখে। শীঘ্রই তাতে অঙ্কুর বের হয়, ও গমগুলি কয়েক দিনের ভিতরেই ছোট চারাতে পরিণত হয়। ভাইদের হাতে রাখী বেঁধে দেবার পর বোনেরা এই সবুজ গমের দু'চার গাছা ভাইয়ের কানে গুঁজে দেয়, এবং পরে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাইকার হাতে দু'চার গাছা করে গমের চারা দিয়ে শুভকামনা জানায়। উত্তর-প্রদেশে ও মধ্য-প্রদেশে এই সবুজ গমের চারাকে কোথাও ভুজরিয়া বলে, কোথাও বা কাজরিয়া বলে। খুব সম্ভব এই সবুজ চারা দীর্ঘ জীবনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যুগ যুগ ধরে এই সব দেশের ঘরে ঘরে, ভাই-বোনের নির্ম্মল স্নেহ ভাল-বাসার নিদর্শন রাখী-বন্ধন উৎসব পরম নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এ উৎসব বড় সুন্দর, বড় মধুর। শ্রাবণী উৎসব শেষ হয়ে যায়, তার আনন্দের রেশ থেকে যায় মনে বহু দিন।

শ্রাবণের কাজরীয়া উৎসব ও গানের ভিতর দিয়ে শুধু সমাজচিত্রই পরিস্ফুট হয়ে উঠে না, কাজরী গান আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে পিতৃগৃহের জন্য নববিবাহিতার ব্যাকুলতা-ভরা অন্তর, কন্যা বিচ্ছেদ-কাতরা মায়ের অসীম স্নেহ-ভরা উৎকণ্ঠিত হৃদয়, প্রিয়র অদর্শনে পত্নী বা প্রেমিকার কাজল-টানা অশ্রুসজল আঁখি আর অভিমান-ভরা ব্যথাতুর হৃদয়।

নষ্ট চাঁদ

শ্রীকালীপদ ঘটক

মনটি আমার ঘরছাড়া যে
করলে তুমি প্রিয়,
কেমন করে রাখব তারে বেঁধে।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে যারে
করলে বরণীয়,
পথের ধারে সে কেন মরে কেঁদে।

সেই যে দেখা একটি ক্ষণের তরে,
মুখের পানে ঈষৎ হেসে চাওয়া ;
একটুখানি আমায় ছুঁয়েছিলে,
সেই যে আমার অনেকখানি পাওয়া।

নাই-বা দিলে দু'একটি ফুল গুঁজে
শূন্য এ মোর শিথিল কবরীতে,
শাঁখ বাজায়ে লাল চেলীতে ঢেকে
নাই-বা এলে বরণ করে নিতে।

বরণ ? ছি ছি মরণ কালামুখী,
এমন কথা বলতে কভু আছে !
শুনলে দেবে ঘরের লোকে খোঁটা,
বাইরে কেহ রটায় কিছু পাছে।

বয়স যবে বারোই বুঝি হবে,—
কপালগুণে সিঁদুর গেছে মুছে,
টিপ পরা আর আরশিতে মুখ দেখা
ওসব আপদ বালাই গেছে ঘুচে।

পাড়ায় বলে ভাগ্যটা যে পোড়া,
শাস্ত্র বলে উপোস করে থাক,
সমাজ বলে পানটা খেতে মানা,
থান কাপড়ে লজ্জা ঢেকে রাখ।

যৌবনে কি ঠেকান দেওয়া যায়,
কেমন করে রাখব তারে চেপে ;
এল যখন ভাদ্রে ভরা নদী,
অজ ভরে দু'কূল দিল ছেপে।

এও যেন সে আমার অপরাধ—
দেহের সাথে রূপের মেশামেশি ;
রূপটা যেন নষ্ট চাঁদের আলো,
আলোর চেয়ে কালোর ভয়ই বেশী।

সানাই কাঁসি মাঙ্গলিকে ডেকে
পড়শীরা কেউ কথাও বলে নাকো,
ভাবটা যেন শুনছ ওগো মেয়ে—
একটুখানি দূরে দূরেই থাকো।

আমি যে এক অমঙ্গলের ছায়া,
ওদের বল দুষব কেমন করে ;
ছাঁদনাতলা এয়ো আচার থেকে
ছুঁৎ বাঁচিয়ে নিজেই থাকি সরে।

বয়স হ'ল এই ত সবে বাইশ,
জীবন থেকে ফুরিয়ে গেছি কবে ;
লোকের মুখে সতীর কথা শুনি,
মরলে নাকি সেটা প্রমাণ হবে।

তাই ত ভাবি মুক্তি কত দূরে—
বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা থেকে ;
সুনাম রেখে মরাই বুঝি ভাল,
কাজ কি বল মনের কালি মেখে।

পাড়ায় ঘরে একবয়সী যারা,
ছিল আমার সঙ্গীসাথী যত ;
সীমন্তিনী ভাগ্যবতী তারা,
আমায় দেখে দুঃখ করে কত।

মনের কথা খুলেই বলে আজো—
ঘরের কথা, বরের খুঁটিনাটি ;
জীবন কত সুখ সোহাগে ভরা,
সবটি যেন নিখুঁত পরিপাটি।

অবাক হয়ে নীরবে দেখি চেয়ে
কারো বা কোলে সোনার খোকা হাসে,
জননী তারে শতেক চুমা দিয়ে
কত না ছাঁদে জড়ায় বাহুপাশে।

আহা রে বাছা বালাই নিয়ে মরি,
মুখ দেখে তোর বুক যে উঠে ভরে ;
আর যে কথা স্বপ্ন হয়ে জাগে—
মুখ ফুটে তা বলি কেমন করে।

চুপ চুপ চুপ, আস্তে কড় ই রাঁড়ী,
মা হতে তোর এতও জাগে সাধ ;
আঁস্তাকুড়ে ফুল কখনও ফোটে,
মনের এ পাপ চরম অপরাধ।

এমনতর চপল মতিগতি—
এর যদি কেউ গন্ধটুকু পায়,
পরের কথা না হয় হবে পরে—
ঘরে যে তোর টেকাই হবে দায়।

দাদা ও দিদি বৌদিদিরা সবে
ভালই বাসে, খোরাকটা ত জোটে ;
একাদশী নির্জলা হয় হোক,
হবিষ্যান্নে অভাবটা নেই মোটে।

জেঠামশায় পৃথক অন্ন হলেও
দানধ্যানে তাঁর নাই কোন বিচ্যুতি,
বস্ত্র আমার তিনিই যোগান নিজে
পূজোর সময় একজোড়া থান ধুতি।

অভাব কিসের! জ্যেঠাইমাটাও ভাল,
তৃতীয়া তাই বয়স কিছু কাঁচা;
আমার চেয়ে ছোটই কিছু হবে,
হলে কি হয়—মানুষটা খুব সাঁচা।

কতদিন যে গন্ধতেলের শিশি
এগিয়ে দিয়ে বলেন—তুলে রাখ,
হেজলিনটা দিই না গালে ঘষে—
মাখ না বাছা, একটুখানি মাখ।

হেসেই বলি জেঠাইমা আর কেন—
আশিস্ কর পায়ের ধুলো দিয়ে,
স্নো হেজলিন মাখতে যেন পারি
তাড়াতাড়ি যমের বাড়ী গিয়ে।

ভালই আছি—দুঃখ কিছু নাই ;
সুখেই আছি এদের ভালবেসে ;
বাপের বাড়ী আঁকড়ে আছি পড়ে,
যাইনি ত আর বানের জলে ভেসে।

এরা আমায় পর ভাবে না কেউ,
আমার দিকে লক্ষ্য আছে খর ;
লক্ষ্য মানে চোখে চোখেই রাখে,
বয়সটা যে আজো কেমনতর।

সেদিক থেকে ধাতটা এদের কড়া,
সয় না কোন অসংযমের ত্রুটি ;
একটুখানি হোঁচট যদি খাই—
রক্ষা নাই আর, এখান থেকে ছুটি।

শাস্ত্র আচার সমাজবিধির বেড়া—
এদের কাছে মানুষ চেয়ে দামী ;
সাতপুরুষে নাইকো ব্যতিক্রম,
পারবে না কেউ দিতে এ বদনামী।

একটা কথা নজির দিয়েই বলি,
আজ থেকে ঠিক বছর পাঁচেক আগে—
মেজদিদির এক ঠাকুরজামাই এলেন,
মস্ত উকিল, থাকেন আরামবাগে।

সম্মানী লোক, এম-এ, বি-এল, পাস,
এই বাড়ীতে খাতির ছিল ঢের ;
এবার যেন খরল কিছু চিড়,
ঘটিয়ে গেলেন কিছুটা হেরফের।

কোন্‌কালে সেই বিদ্যাসাগর নাকি
দিয়ে গেছেন কিসের যেন বিধান
শাস্ত্রমতেই সিদ্ধ নাকি ওটা,
শুনিয়ে দিলেন আরো কতই নিদান।

হঠাৎ একি অসঙ্গত প্রলাপ—
প্রসঙ্গটা আমারি নাম ধরে,
কে জানে ছাই ওঁদের সে মজলিশে
আমার কথা উঠল কেমন করে।

বলেন তিনি—বিধবাদের বিয়ে
বয়সকালে দেওয়াই সমীচীন;
এই মেয়ে কি দগধে মারা চলে
পাত্র দেখে আবার বিয়ে দিন।

জেঠামশাই শুনেই হতবাক,
বড়দা দেখি ঈষৎ ম্রিয়মাণ;
আর যাঁরা সব আশেপাশেই ছিলেন
অন্তরালে এ ওর দিকে চান।

বলেন কি এ ভদ্রমহোদয়,
এই বাড়ীতে চলবে ওসব নীতি!
সমাজ থেকে একঘরে ত বটেই;
বংশে কালি, কুলের দফা ইতি।

একে একে সরে পড়লেন সবাই
ভদ্রলোককে একলা ঘরে রেখে,—
অবাক হলেন ঠাকুরজামাইবাবু
কুটুম্বদের কাণ্ডখানা দেখে।

নিজের হাতে সুটকেসটা বয়ে
তাঁকেও হঠাৎ বেরিয়ে যেতে হ'ল,
হুকুম দিলেন রিক্শাগাড়ী চড়ে—
জল্‌দি হাঁকো, ইষ্টিশানে চল।

ভদ্রলোককে তাড়িয়ে দিলে এরা,
নয় কি এটা নেহাত বাড়াবাড়ি!
সেজদিদিরা খবর পেল পরে,
তখন থেকে কুটুম ছাড়াছাড়ি।

বিয়ে আমার নাই-বা দিলি তোরা—
তাই বলে কি ভদ্র হতে নেই।
দেখে শুনে অবাক মেরে গেছি,
দোষ দিই শুধু নিজের ভাগ্যকেই।

খাঁচার পাখী খাঁচায় আছি পড়ে,
আকাশটাকে দূরের থেকে দেখি;
পাখনা মিলে উড়তে সেথা মানা,
খাঁটি যে আমি—হতে কি পারি মেকি।

তবুও দেখি আমার পানে চেয়ে
কলঙ্কী চাঁদ হাসে মেঘের ফাঁকে;
বাতাসে কার নির্লজ্জ বাঁশী বাজে,
নিশির ডাকে আমায় যেন ডাকে।

এই যে হেথা সারা ভুবন জুড়ে
দিক্‌বিদিকে চলছে প্রাণের খেলা,—
সেথায় আমার নাই কি কোন ঠাঁই,
জীবন নিয়ে কেন এ হেলাফেলা।

মন বলে এ মিথ্যে দিয়ে গড়া
লোকভুলানো প্রবঞ্চনার ফানুস,
বিশ্বস্রষ্টা চায় নি যেটা নিজে
শাস্ত্র গড়ে তাই চেয়েছে মানুষ।

সয়েই গেছি, এই যে ভরা দেহ—
ইচ্ছে করেই তাকাই নে তার দিকে,
যৌবনের এ ব্যর্থ হাহাকার
কি আর হবে দিনলিপিতে লিখে।

ভুলেই ছিলাম, ভাবতে পারিনিকো
ভবিষ্যতে আর কোনদিন কেউ,—
জীবনের এই ভাঙ্গা নদীর বাঁকে
কূল ছাপিয়ে জাগিয়ে যাবে ঢেউ।

হঠাৎ কেন পড়ল তোমার ছায়া—
নদীর জলে, এই মনের আরশিতে;
ঘুম ভাঙিয়ে আমায় কেন ডাকা,
ফুল কেন গো আমার সমাধিতে।

তোমায় আমি রাখব কোথা বল,
ঢাকব তোমায় কিসের আড়াল দিয়ে!
যেদিন আমায় আর পাবে না খুঁজে—
সেদিন যেন আমায় যেয়ো নিয়ে।

আজকে শুধু এইটুখানি বলি—
যা দিয়েছ ভুলব না তা কভু ;
যা চেয়েছ পারি নি যে তা দিতে,
না পাওয়ায় সে ক্ষোভ রেখো না তবু।

মান দিয়েছ, দান দিয়েছ যেচে,
কণ্ঠে আমার গান দিলে যে তুমি ;
এ কোন্ রঙে রাঙিয়ে দিয়ে গেলে,
শ্যামল করি উষর মনোভূমি।

বাইরে তোমায় চিনবে না ত কেউ,
হয় ত আমায় বলবে কলঙ্কিনী ;
শুনলে তুমি দুঃখ পাবে শুধু,
নাই-বা হ'ল বাইরে চেনাচিনি।

অন্তরে যে তুমিই আছ জেগে,
পরশ দিয়ে জাগিয়ে গেছ কবে ;
সেই কথাটি কালের বুকে লেখা
চিরন্তন সত্য হয়ে রবে।

ভুল করি নি তোমায় ভালবেসে,
ভালবাসা ত নয় সে অপরাধ,
'অহিক' জনে শুনবে না তা জানি,
জটলা করে রটাবে অপবাদ।

আমায় ওরা যা খুশি বলে বলুক—
তোমায় পাছে মন্দ বলে কেউ ;
সে দুঃখ আর সইবে না এ বুকে,
তার চেয়ে যে মরণ ভাল সেও।

মিলন-রাখী দিয়েছ বেঁধে হাতে,
বিরহে জানি ভয়ত কিছু নাই ;
ওপার ছেয়ে রয়েছ তুমি মোর,
এপার থেকে আমি যে সাড়া পাই।

মাঝখানে যে বহে বিরহ-নদী,
এপার থেকে তোমায় র'ব ছুঁয়ে ;
ওপারে এসে দাঁড়াও যদি কূলে,
আঁজলা ভরে পা দু'টি দিব ধুয়ে।

এপারে থেকে চোখের জলে গেঁথে
ঢেউয়ের বুকে ভাসিয়ে দিব মালা,
ওপার থেকে নিয়ো গো তুলে নিয়ো—
মালার সাথে বুকের কিছু জ্বালা।

শেষ করি এ ছোট্ট ইতিকথ',
জানে ত সবে চির অভাগী আমি ;
একটা কথা কথা জানে না শুধু ওরা—
স্বপনে পাওয়া তুমি আমার স্বামী।

কেদারনাথের পথে

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

গিরিরাজ হিমালয় পবিত্রতার চির প্রতীক। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ উত্তর সীমানা বেষ্টন করিয়া উন্নতমস্তকে অনাদিকাল হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়। ইহার পবিত্র কোল তপস্যার অনুকূল ক্ষেত্র; কত ঋষি, যোগী, সিদ্ধ মহাপুরুষ স্মরণাতীত কাল হইতে এই পবিত্র ভূমিতে কত কঠোর তপস্যায় কালাতিপাত করিয়াছেন এবং আজও করিতেছেন, কে তাহার পরিমাপ করিতে পারে?

রুদ্রপ্রয়াগ

এই হিমগিরির অন্তর্দেশে হিন্দুদের কয়েকটি তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত; কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ বা বদরিকাশ্রম, তাহাদের মধ্যে মুখ্য ও প্রাচীন। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই তীর্থদ্বয় আপন মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া সগৌরবে আজও বিরাজিত রহিয়াছেন। মহাভারতে উক্ত আছে, পাণ্ডবেরা এই পথেই মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন; তাই প্রতি ভারতবাসীর নিকট এ পথের প্রতিটি ধূলিকণা চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে!

প্রতি বৎসর শত শত পুণ্যার্থী ভারতবাসী নানারূপ বাধাবিপত্তি, শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া বাহির হয় এই দুইটি প্রাচীন তীর্থ দর্শন করিতে। দুইটি তীর্থক্ষেত্রই হিম-উপত্যকার ভিতরে অবস্থিত, এবং বৎসরের ছয় মাস তুষারাবৃত থাকে। অক্ষয়তৃতীয়া তিথি হইতে শ্যামাপূজা পর্য্যন্ত মন্দিরদ্বার খোলা থাকে। শ্রাবণ-ভাদ্রে যদিও মন্দিরদ্বার খোলাই থাকে, তথাপি বর্ষার প্রাচুর্য্যের জন্য যাত্রীসমাগম কমই হইয়া থাকে; গ্রীষ্ম ও শরৎকালেই যাত্রীসমাগম হয় অধিক।

আগেকার দিনের তুলনায় আজকাল পথের কষ্ট বহুলাংশে লাঘব হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবুও যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার না করিলে আজও এই দুইটি তীর্থধামে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। আজকাল বহুদূর পর্যন্ত মোটর বাসেই যাওয়া চলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলিতে হয় পায়ে হাঁটিয়া কঠিন বন্ধুর পার্বত্য পথে। ক্রমাগত উঠানামা, চড়াই-উৎরাই করিয়া পথের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া চলিতে হয় দিনের পর দিন।

কেদারনাথের পথে হৃষীকেশ হইতে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত বাসেই আসা চলে; তাহার পর আরও প্রায় পঞ্চাশ মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া চলিতে হয়। আর এই পথটুকু অতিক্রম করাই সমতলবাসী যাত্রীদের পক্ষে প্রায়ই একটা দুরূহ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। বদরিকাশ্রমের পথে রুদ্রপ্রয়াগ হইতে আরও অগ্রসর হইয়া পিপুলকুঠি পর্যন্ত বাসে যাওয়া চলে। পিপুলকুঠি হইতে বদরিকাশ্রমের দূরত্ব আটত্রিশ মাইল। এই পথটুকু হাঁটিয়া চলিতে হয়, তবে শীঘ্রই যোশীমঠ পর্যন্ত বাস চলিতে আরম্ভ করিবে; তখন মাত্র আঠারো মাইল হাঁটাপথ থাকিবে।

আমরা যাত্রা সুরু করিলাম হৃষীকেশ হইতে বাসে। লছমনঝোলা ছাড়াইয়া আরও প্রায় দু'তিন মাইল অগ্রসর হইয়া পার্বত্যপথে আসিয়া পড়িলাম। পাহাড়ের গা কাটিয়া মোটর চলিবার রাস্তা বাহির করা হইয়াছে। আমাদের প্রথম দিনের গন্তব্য স্থান দেবপ্রয়াগ। পথ গঙ্গার অববাহিকা ধরিয়াই চলিয়াছে। পথের বহু নিম্নে প্রবল স্রোতস্বিনী গঙ্গা। পরপারে রেখার মত পায়ে চলা পথ দেখা যাইতেছে; বাসের রাস্তা হইবার পূর্বে যাত্রীদের ঐ পথেই চলিতে হইত। বিপৎসঙ্কুল বন্ধুর পার্বত্য পথে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে আমাদের মোটরবাস দেবপ্রয়াগের উদ্দেশ্য। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টায় বিয়াল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা আন্দাজ এগারটায় আমরা পৌঁছিলাম দেবপ্রয়াগে। অনেক দূর হইতেই ছোট্ট শহরটি ছবির মত চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে; মনে হয় পাহাড়ের স্তরে স্তরে ছোট ছোট বাড়ীগুলি কেহ যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে। দেবপ্রয়াগ—গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমভূমি। গঙ্গোত্তরী হইতে আসিয়াছেন গঙ্গা বা ভাগীরথী, আর বদরিকাশ্রমের উপর হইতে আসিয়াছেন অলকানন্দা। এই সঙ্গমঘাটই এস্থানের প্রধান আকর্ষণ। হিন্দুশাস্ত্রের মতে সাতটি প্রয়াগতীর্থ আছে, তার ভিতর একটিমাত্র মর্ত্যে ও বাকি ছয়টি ভূস্বর্গে। প্রয়াগ বলিতে সাধারণতঃ আমরা এলাহাবাদকেই বুঝিয়া

থাকি, কারণ সমতলভূমিতে সাতটি প্রয়াগের ভিতর মাত্র এই একটিই অবস্থিত; বাকি ছয়টি হিমালয়ের ক্রোড়ে। দ্বিতীয়, গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থান—হৃষীকেশ; জাহ্নবী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থান—দিব্য বা দেবপ্রয়াগ—তৃতীয়; অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থান রুদ্রপ্রয়াগ—চতুর্থ। আরও তিনটি প্রয়াগ যথা, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ এবং বিষ্ণু-প্রয়াগও হিমালয়ের অন্তর্দেশে অবস্থিত।

সঙ্গমঘাট, রুদ্রপ্রয়াগ

দেবপ্রয়াগ ছাড়িয়া আমরা রওনা হইলাম রুদ্রপ্রয়াগের দিকে, এখান হইতে আরও প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। গঙ্গাকে আমরা এখানেই ছাড়িয়া আসিলাম, এ পথে আর তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিবে না; ফিরিবার সময় আবার এখানেই মিলিবে তাঁহার প্রথম দর্শন। তাই যাত্রীরা মা গঙ্গার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানায়, "মা, বাবা কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের দর্শন অভিলাষে চলিয়াছি, এ যাত্রা যেন শুভ ও সফল হয়; ফিরি-বার পথে আবার তোমাকে বলিয়া যাইব।" গঙ্গার সেতু পার হইয়া এবার গাড়ী ছুটিয়া চলিল অলকানন্দার গতিপথ ধরিয়া। যতদূর দৃষ্টি যায় অগণিত পাহাড়ের শ্রেণী, কোথাও সমতল ক্ষেত্রের চিহ্নমাত্র নাই। একটি প্রবাদ শোনা যায়, লক্ষ পাহাড় অতিক্রম না করিলে কেদারনাথ বদরীনাথ দর্শন হয় না, কথাটা একেবারে অলীক নহে বলিয়াই ধারণা হইল।

বাসের গোলযোগে সেদিন আর রুদ্রপ্রয়াগ পৌছানো সম্ভব হইল না; পথে গাড়োয়াল জেলার শ্রেষ্ঠ শহর শ্রীনগরে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন বিকালে পৌছিলাম রুদ্রপ্রয়াগ। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রুদ্রপ্রয়াগ অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমভূমি। সঙ্গমঘাটের ঠিক উপরে রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে সোপানশ্রেণী খাড়া নামিয়া আসিয়াছে যেন পাতালপুরীতে, সঙ্গমঘাটে। মাঝে দেবীর মন্দির। দুর্বার গতিতে দুই স্রোতস্বিনী আত্মহারা হইয়া আসিয়া মহা আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়াছে এই সঙ্গমক্ষেত্রে। এক সন্ধিহীন সংগ্রাম চলিয়াছে অবিরাম গতিতে অনাদিকাল ব্যাপিয়া; আর মিলন-মুহূর্তের মহারবে দিগদিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিতেছে, রুদ্রেশ্বরের রুদ্রবীণার ঝঙ্কার যেন উত্থিত হইয়া চলিয়াছে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া।

কাণ্ডী

মন্দিরপ্রাঙ্গণেই আমাদের ধর্মশালা, অতি মনোরম স্থান। এখান হইতেই কেদারনাথ ও বদরীনাথের পথ ভিন্ন হইয়া গিয়াছে; অলকানন্দার গতিপথে চলিয়াছে বদরীনাথের পথ, আর মন্দাকিনীর কোলে কোলে কেদারনাথের পথ। এখান হইতেই পায়ে হাঁটিয়া আমাদের যাত্রা সুরু হইবে। যাহারা হাঁটিতে অসমর্থ কিংবা অনিচ্ছুক তাহারা এখান হইতেই, ডাণ্ডী, কাণ্ডী বা ঘোড়া ভাড়া করিয়া লইবে। দুই রাত্রি এখানে কাটাইয়া, তৃতীয় দিবসে আমরা এখান হইতে পদব্রজে রওনা হইয়া ক্রমাগত দুই দিন চলিয়া পৌছিলাম গুপ্তকাশী তীর্থক্ষেত্রে।

গুপ্তকাশী পৌছিবার প্রায় দুই মাইল পূর্ব হইতেই চলার গতি আমাদের শিথিল হইয়া আসিল। এই দুই মাইল ক্রমাগত উপরে উঠিতে হইবে, প্রাণান্তকর চড়াই। পিপীলিকার মত মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল যাত্রী-দল। সামান্য পথ চলিলেই বুকে ব্যথা ধরিয়া যায়, গলা শুকাইয়া উঠে, কিন্তু পথ আর শেষ হয় না। যত উপরে উঠিতে লাগিলাম, তুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা প্রথম দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। পাহাড়ের পাদদেশে, বহু নিম্নে মন্দাকিনী প্রবাহিতা। মন্দাকিনীর পরপারে আর এক পাহাড়ের

শিখরদেশে বহুদূরে উখীমঠের বাড়ীগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। অপরূপ নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, অথচ উপলব্ধি করিতে হইতেছে কল্পনাতীত ক্লান্ত দেহমন লইয়া। স্থানমাধুর্য্যে হৃত শক্তি পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল এই দুরধিগম্য পথের সহিত ক্রমান্বয়ে সংগ্রাম চালাইয়া যখন গুপ্তকাশীতে উপনীত হইলাম তখন দিবা দ্বিপ্রহর।

ডাণ্ডী

পঞ্চকাশীর অন্যতম শিবক্ষেত্র এই গুপ্তকাশী। এখানে বিশ্বেশ্বর ও অৰ্দ্ধনারীশ্বরের মন্দির আছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে ঠিক বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের মূলদ্বারের সম্মুখেই পতিত হইতেছে গোমুখীধারা মণিকর্ণিকা কুণ্ডে। যাত্রীরা এই কুণ্ডে স্নানান্তে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়।

প্রথম হিম অনুভব করিলাম এখানেই, আর যত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম, ঠাণ্ডা ততই বাড়িতে লাগিল।

গুপ্তকাশী হইতে বাহির হইয়া, পরদিন সকালে আমরা এক মাইল পথ অগ্রসর হইয়া, নালাচটী অতিক্রম করিয়া চলিলাম ফাটাচটীর অভিমুখে। কেদারনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে নালাচটী পর্যন্ত একই পথে আসিয়া বাঁ দিকের উৎরাই পথে মন্দাকিনী সেতু পার হইয়া চলিতে হয়, বদ্রীনাথের পথে। তৃতীয় দিবসে পৌছিলাম গৌরীকুণ্ডে। স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে, উমা মহেশ্বরী এখানে একটি কুণ্ডে ঋতুস্নান করেন বলিয়াই এই পুণ্যক্ষেত্রের নাম গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ডের পাশেই তপ্তকুণ্ড, ইহার জল অত্যুষ্ণ; তপ্ত-কুণ্ডের পার্শ্বস্থ মন্দাকিনীর জল নিরতিশয় শীতল। এই হিম রাজ্যে তপ্তকুণ্ডে স্নান দেহের ক্লান্তি দূর করিয়া দেয়। অতি অপরূপ ও মনোহর স্থান এই গৌরীকুণ্ড। চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে উচ্চ পাহাড়শ্রেণী। এক স্থানে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া মন্দাকিনী প্রবল বেগে নামিয়া আসিয়াছে। প্রস্রবণ দুইটি—গৌরীকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড। গৌরীকুণ্ডের জল হিমশীতল, তপ্তকুণ্ডের জল অত্যুষ্ণ, গৌরীকুণ্ড সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ছয় হাজার ফুট উপরে আর কেদারনাথ ১১,৭৫০ ফুট, মধ্যে ব্যবধান মাত্র সাত মাইল।

সেদিন আহার ও বিশ্রামান্তে দ্বিপ্রহরের পর আমরা আবার সুরু করিলাম পথচলা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কন্‌কনে হাওয়া বহিতেছে। পূর্ব হইতে যাত্রীদের সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যেন খুব সাবধানে ও ধীর পদবিক্ষেপে বাকি সাত মাইল পথ সকলে অগ্রসর হয়। কারণ আমরা তুষার-রাজ্যের দ্বারদেশে আসিয়া পৌছিয়াছি, আর এখান হইতেই পর্বতারোহণ প্রকৃত পক্ষে সুরু হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাটাও উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিবে। পথ চলিতেছি আর চোখে পড়িতেছে নানা বর্ণের বিচিত্র পার্বত্য পুষ্প চারিদিককার পাহাড়ের গায়ে গায়ে। আরও প্রায় তিন মাইল পর্যন্ত দেখা গেল পাহাড়ের উপর গাছপালা ও ঘন জঙ্গল। তাহার পর হইতেই বৃক্ষলতার শ্রেণী ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ করিল। সেদিন আমরা মাত্র সাড়ে তিন মাইল চলিয়া রামওয়ারা বা ভীমগোড়া চটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কেদারনাথের পথে এইটিই শেষ চটী। কথিত আছে, স্বর্গারোহণকালে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের এইখানেই পতন ঘটে।

আপাদমস্তক গরম জামা-কাপড়ে আবৃত করিয়া পরদিন প্রাতে আবার যাত্রা সুরু হইল। চলিবার সময় মনে হয় যেন স্বর্গারোহণ করিতেছি। কি দুর্গম দুরারোহ চড়াই, সামান্য পথ অতিক্রম করিতেই বুক বেদনায় টন টন করিতে থাকে। কণ্ঠ ও তালু শুকাইয়া কাঠ হইয়া যায়। কিন্তু এত শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও যাত্রীদল আজ সকলেই চলিয়াছে পূর্ণ উদ্যমে, যাত্রাসমাপ্তির পথে। আর মাত্র সামান্য পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত কেদারনাথের দর্শন মিলিবে। পাহাড়ের গায়ে আর গাছপালা জঙ্গল কিছুই নাই, লতাগুল্মবিহীন বিরাট মরুভূমি যেন ধূ ধূ করিতেছে চারিদিকে। সামনেই চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা, আর রজত-গিরির কেন্দ্রস্থলে কেদারনাথের মন্দির। শুভ্র শৈলশ্রেণী অশ্বক্ষুরাকারে মন্দির বেষ্টন করিয়া বিরাজিত। অদৃষ্টপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নের পূর্বেই কেদার-পুরীতে প্রবেশ করিলাম। মন্দাকিনীর সেতু অতিক্রম করিয়া পুরীতে প্রবেশ করিতে হয়। চটীতে পৌছিয়া নির্দ্ধারিত স্থানে মালপত্র রাখিয়া কেদারনাথের দর্শনমানসে মন্দিরের উদ্দেশ্যে চলিলাম। পথের দুই ধারে সারি সারি দোকান। প্রয়োজন-মত জিনিসপত্র ও পূজার সামগ্রী এখান হইতে সংগ্রহ করা চলে।

উচ্চ মন্দির-প্রাঙ্গণ ও দ্বারদেশে প্রস্তরনির্মিত বৃষমূর্তি। মন্দির অভ্যন্তর দুই ভাগে বিভক্ত, মূল মন্দির ও

নাটমন্দির। নাটমন্দিরে বহু দেবদেবীর মূর্তির ভিতর পঞ্চপাণ্ডবের প্রস্তরমূর্তিও রহিয়াছে। মূল মন্দিরের দরজার সম্মুখে কেদারনাথের দিকে মুখ করিয়া গণেশমূর্তি। মন্দিরে প্রবেশ করিতে একপার্শ্বে পার্বতী দেবী। কেদারনাথ শিবলিঙ্গ নহেন বা কোন বিশেষ মূর্তিও নহেন। বৃহদাকার অসমতল প্রস্তরশিলায় গঠিত; অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া বিরাজমান। বহু ভক্ত এবং করুণাপ্রার্থী একই সময়ে স্পর্শ

গুপ্তকাশী মন্দির

ও আলিঙ্গন করিতে পারে। শোনা যায়, কেদারনাথের শ্রেষ্ঠ পূজাই হইতেছে আলিঙ্গন। কথিত আছে, সন্নিহিত রজতগিরির প্রভাদর্শনে একদা কেদারনাথ উল্লাসভরে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় মধ্যম পাণ্ডব ভীম তাঁহার অঙ্গপ্রভা দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হন। ভীমসেনকে এই ভাবে ধাবিত হইতে দেখিয়া কেদারনাথ শিলার ভিতর অন্তর্ধান করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইবার পূর্বেই বাহু ও বক্ষ বিস্তার করিয়া ভীমসেন তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেন। ভীমের বীরত্বে প্রীত হইয়া কেদারনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আলিঙ্গনই আজ হইতে তাঁহার প্রকৃষ্ট পূজা বলিয়া প্রচলিত থাকিবে। নানা উপচারে মানুষের পূজা কেদারনাথের শ্রীচরণে সমর্পিত হইতেছেই, তাহা ছাড়া প্রকৃতিদেবীও কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, তুষার ও রৌদ্র

কেদার মন্দির

এই পঞ্চ উপচারেও সদাসর্বদাই কেদারনাথের পাদপদ্মে অর্ঘ্য দান করিতেছেন। বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিনের শেষ পর্যন্ত মন্দিরদ্বার যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। হেমন্তের প্রথমেই মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রধান পূজারী রওয়াল সাহেব ও অন্যান্য পাণ্ডা নীচে নামিয়া যান। দ্বার বন্ধ করিবার পূর্বে একটি বৃহৎ তাম্রপাত্রে ঘৃতপ্রদীপ জ্বালাইয়া অভ্যন্তরে রাখিয়া আসিবার রীতি আছে। শোনা যায়, এই শীতের ছয় মাস সূক্ষ্ম দেহধারী দেবতাগণ কেদারনাথের অর্চনা করিয়া থাকেন। উখীমঠে তখন প্রতিনিধি-লিঙ্গের পূজা হইয়া থাকে এবং সেখান হইতেই কেদারনাথের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করা হয়।

পূজার ছুটি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটির প্রারম্ভে ছুটিতে বিদ্যার্থী যুবকগণ গৃহে (পল্লী অঞ্চলে) প্রত্যাগত হইয়া পল্লীর উন্নতি বিধানে কি ভাবে নিজেদের নিয়োজিত করিতে পারেন সে সম্বন্ধে "প্রবাসী"তে আলোচনা করিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার আলোচনা ও উপদেশ খুবই মূল্যবান ছিল, এবং অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি বহু যুবক তাঁহার আলোচনা ও উপদেশ দ্বারা উৎসাহিত হইয়া পল্লী অঞ্চলের নানাবিধ উন্নতিমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করিতেন। আজ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমি পূজার ছুটিতে যুবকগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি। আমি ইহার নূতনত্বের কোন দাবি করি না। তবে এ সব কথা বর্ত্তমানে আমাদের তরুণ-তরুণীদের আরও বেশী করিয়া অবধান করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

অদ্যাপি পল্লী অঞ্চলে আমরা বহু সমস্যার সম্মুখীন হইয়া রহিয়াছি। এমন অনেক সমস্যা আছে যাহার সমাধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে ; কিন্তু এমন অনেক ছোট-খাটো সমস্যা আছে যেগুলির সমাধান আমরা সমবেত চেষ্টার দ্বারা করিতে পারি। পল্লী অঞ্চলে মানুষের অপ্রতুলতা আছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু নেতৃত্বের যথেষ্ট অভাব আছে —পথপ্রদর্শকের অভাব আছে। মালমশলা সবই সেখানে বিদ্যমান, কিন্তু নিপুণ কারিগর বা মিস্ত্রী নাই। জড়তা, আলস্য—সর্ব্বোপরি দলাদলি পল্লী অঞ্চলের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। এই কয়টি অন্তরায় বিদূরিত হইলে পল্লী অঞ্চলের উন্নতির পথ অনেকটা সুগম হইতে পারে। দেশের যুবকগণই ভবিষ্যতের নেতা ও পথপ্রদর্শক। সুতরাং এই ভার এখন হইতেই তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের ন্যায় বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ আর কি করিতে পারেন ? তাই এখানে যে কয়েকটি কথা বলিতেছি, যুবকগণের উদ্দেশেই নিবেদন করিব।

২

একটু আগেই বলিয়াছি, পল্লী অঞ্চলের সমস্যা অনেক। বিশেষতঃ আজকার দিনে খাদ্য-সমস্যাই প্রবল। অবশ্য খাদ্য-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে। তবে পল্লী অঞ্চলের প্রত্যেক গৃহস্থ নিজের চেষ্টার দ্বারা হয় ত এই সমস্যার আংশিক সমাধান করিতে পারেন —যদি হাতেকলমে তাঁহাকে কেহ পথ দেখাইয়া দেন। এই কাজেই যুবকেরাই অগ্রণী হইতে পারেন।

পল্লী অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের আশপাশ নানাবিধ জঙ্গলে আবৃত—ডোবা, খানার দ্বারা বেষ্টিত। অনেকের মুখে শুনিয়াছি, "আবরু" ও নিরাপত্তার জন্য ইহা দরকার। এই যুক্তি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকটাও ভাবিতে হইবে। গৃহের আশপাশে এইরূপ অপ্রয়োজনীয় জঙ্গল বা ডোবা খানা কি স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল নহে ? ইহার দ্বারা কি গৃহের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, শোভা বর্দ্ধিত হয় ? সেই জন্য বলিতেছি—জঙ্গল, ডোবা, খানা প্রভৃতির সংস্কার করিলে হয়ত কিছু অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু তাহার তুলনায় সুবিধা অনেক বেশী বলিয়া মনে হয়।

৩

শীতকালীন শাকসবজীর চাষের মরশুম আগতপ্রায়। এই সময় হইতেই ইহার দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। যে সকল যুবক পূজার ছুটিতে পল্লী অঞ্চলে নিজেদের গৃহে গমন করিবেন তাঁহারা এই বিষয়ে অগ্রণী হইলে পল্লীর স্বাস্থ্য, শ্রী, সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে। গৃহ-সংলগ্ন জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থই জমির আয়তন এবং পরিবারবর্গের প্রয়োজন অনুসারে একটি শাকসবজির বাগান অর্থাৎ কিচেন-গার্ডেনিং রচনা করিতে পারেন। যদি পরিবারভুক্ত বালকবালিকা, যুবকযুবতীর সাহায্যে এই বাগান রচনা করা যায় তাহা হইলে ইহাতে খরচ খুব বেশী হইবে না, তবে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিতে হইবে। খরচ ও পরিশ্রমের তুলনায় লাভ বৈ লোকসান হইবে না।

এই কাজের মাধ্যমে বালকবালিকা, যুবকযুবতীগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, নিজহস্তে উৎপন্ন তরিতরকারী দেখিয়া তাঁহারা প্রচুর আনন্দ লাভ করিবে, পরস্পরের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইবে—কে কত উৎকৃষ্ট ও কত রকমের শাকসবজী উৎপাদন করিয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে সংসারের প্রয়োজনের জন্য অনেক রকম শাকসবজী আর বাজার হইতে ক্রয় করিতে হইবে না। ইহার ফলে দৈনন্দিন ব্যয় অনেক হ্রাস পাইবে। টাটকা শাকসবজীর গুণও বেশী, আস্বাদও ভাল। আমার একজন প্রবীণ বন্ধু বলেন—"আমরা পাড়া-

গাঁয়ের লোক—আমরা 'অমৃত' খাই, আর আপনারা শহরের লোক—আপনারা 'মৃত' খান—অর্থাৎ টাটকা জিনিস খেতে পান না। কথাটা খুবই সত্য।

৪

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এবং হাতেকলমে পরীক্ষার দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, একটি "প্ল্যান" অনুসারে মোটামুটি ছয়-সাত কাঠা জমি চাষ করিলে প্রতি দিন দুই সের নানাবিধ শাকসবজী উৎপন্ন করা যায়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যেক দিন অন্ততঃ পাঁচ ছটাক টাটকা শাকসবজী গ্রহণ করা উচিত, তবে ইহার সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীও থাকিবে। সুতরাং ছয় জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত একটি পরিবারের জন্য ছয়-সাত কাঠা জমিতে শাকসবজীর চাষ করিলে উক্ত পরিবারের শাকসবজীর প্রয়োজন মিটিতে পারে। অবিভক্ত বাংলার পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কার্য্যে লেখক যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন এইরূপ প্ল্যানসহ শাকসবজীর বাগান সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং সরকার-কর্ত্তৃক উহা বহুলপরিমাণে বিতরিতও হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সৈন্য-বিভাগ উক্ত পুস্তিকা ও প্ল্যান অনুযায়ী বাগান রচনা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং উহার হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

শীতকালীন শাকসবজীর মধ্যে এইগুলি প্রধান—বেগুন, লাল, কুমড়া, বরবটী, উচ্ছে, মূলা, পটল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি। চলতি কথায় ইহাদিগকে "দেশী শাকসবজী" বলে। ইহা ছাড়া শীতকালীন প্রধান শাকসবজী হইতেছে —বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, বীট, গাজর, শালগম, বিলাতী মূলা, বিলাতী পেঁয়াজ, লেটুস, বিলাতী সীম, বিলাতী বেগুণ, মটরশুটি ইত্যাদি। ইহাদিগকে "বিলাতী শাক সবজী" বলে। স্থানীয় আবহাওয়া ও মৃত্তিকার উপরেই ইহাদের চাষ প্রধানতঃ নির্ভর করে। তবে পশ্চিম বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদের চাষ করা চলে। একটু যত্ন ও পরিশ্রম দরকার। আজকাল পল্লী অঞ্চলে এই সব শাক-সবজী চাষের খুবই বিস্তৃতি হইতেছে এবং অনেকেই ইহাদের চাষের প্রণালী জানেন। প্রত্যেক ইউনিয়নে এক জন কৃষি-বিভাগের কৃষি-সহকারী নিযুক্ত আছেন, এই বিষয়ে ইঁহাদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা যায়। ইহা ছাড়া কৃষি-বিভাগ হইতে এই সকল শাকসবজীর চাষের পুস্তিকা বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

৫

আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে যুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সারের জন্য যে ভাবে গোবর রাখা উচিত, সাধারণতঃ ঠিক সেই ভাবে গোবর রাখা হয় না। ফাঁকা জায়গায় গাদা করিয়া কিম্বা একটা নীচু জায়গায় বা গর্ত্তে গোবর ফেলিয়া রাখা হয়, ইহাতে গোবরের মধ্যে যে সারপদার্থ থাকে তাহার প্রায় সব অংশই রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যায় এবং এইরূপ গোবর জমিতে প্রয়োগ করিলে ফসল উৎপাদনের বিশেষ কিছু তারতম্য হয় না।

সারের জন্য গোবর ফাঁকা জায়গায় ফেলিয়া না রাখিয়া একটি গর্ত্ত করিয়া এবং তাহার উপর একটি চালা দিয়া, সেই গর্ত্তে গোবর রাখা একান্ত দরকার। গর্ত্তটি যেন সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু জায়গায় করা হয়, যাহাতে বর্ষাকালে গর্ত্তের মধ্যে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে না পারে। ইহা খুব গভীর করিলে চলিবে না, তাহাতে মাটির ভিতর হইতে জল উঠিয়া সার নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। গর্ত্তের উপরে খুব বেশী খরচ করিয়া শক্ত ও মজবুত চালা দিবার প্রয়োজন নাই। খানকতক বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া তাহার উপর খড়, উলু বা ছন এমন কি তাল-পাতা দিয়াও চালা করা যাইতে পারে। ইহাতে বিশেষ কিছুই খরচ হয় না, প্রত্যেকেই অবসর সময়ে নিজে একটু পরিশ্রম করিয়া এই রকম চালা অনায়াসে প্রস্তুত করিতে পারেন। গোবর সংরক্ষণের জন্য গর্ত্ত খুঁড়িবার যদি অবসর না হয় তবে উহা খুব উঁচু জায়গায় গাদা করিয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু সেই গাদার উপর চালা দেওয়া একান্ত আবশ্যক। যুবকবৃন্দ প্রচারকার্য্যের সাহায্যে এই বিষয়ে সকলকেই শিক্ষা দিতে পারেন।

৬

আর একটি বিষয় হইতেছে 'কম্পোস্ট সার প্রস্তুতি'। এই সার গোবর সার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথচ ইহা প্রস্তুত করিতে খুব বেশী খরচ হয় না, তবে খানিকটা পরিশ্রম করিতে হয়। ক্ষেত-নিড়ানো সকল প্রকার আগাছা, আখের ছাড়ানো পাতা, ক্ষেত-খামারের জঞ্জাল, জঙ্গল, গাছের পাতা, তরিতরকারীর খোসা, সকলপ্রকার আবর্জ্জনা, কচুরীপানা, ইহার মত জলীয় অন্যান্য আগাছা প্রভৃতি পচাইয়া কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা সকল রকমের মাটি ও শস্যের পক্ষে উপযুক্ত।

জমিতে কম্পোস্ট সার প্রয়োগে খরচ ও পরিশ্রমের অনুপাতে শস্যের ফলন খুবই বাড়ে। ইহার প্রস্তুতপ্রণালীও কঠিন নহে। ইহার প্রচলনের জন্য কৃষি-বিভাগ ব্যাপক ভাবে প্রচারকার্য্য করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীরা এখনও ইহাকে

তেমন মনোযোগের সহিত গ্রহণ করেন নাই। কৃষি বিভাগ হইতে কম্পোস্ট সার প্রস্তুতপ্রণালী বিষয়ক পত্রিকা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। ইউনিয়ন কৃষি-সহকারীও এই বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন। যুবকবৃন্দের নেতৃত্বে ইহার প্রচলন বাড়িতে পারে।

৭

আর একটি কারণে আমাদের শস্যের খুবই ক্ষতি হয়। সেই কারণটি হইতেছে—ছাড়া গরু, বাছুর, ছাগল। বাস্তবিক ইহাদের অত্যাচার ও আক্রমণে ফসলের যে কত পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অথচ সকলের সমবেত চেষ্টায় এই ক্ষতি অতি সহজেই নিবারণ করা যায়। পল্লী অঞ্চলে এমন এক জনও নাই যিনি বলিতে পারেন ছাড়া গরু, বাছুর, ছাগলের দ্বারা তাঁহার শস্যের, শাকসবজীর বা ফলমূলের কোন দিন কোন ক্ষতি হয় নাই। প্রায় প্রত্যেকেই এই বিষয়ে ভুক্তভোগী। ফসলের ক্ষতি ছাড়া ইহার জন্য পরস্পরের মধ্যে কত মনোমালিন্য, ঝগড়াঝাঁটি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। অথচ পরস্পরের সহযোগিতায় ও চেষ্টায় ফসলের প্রভূত পরিমাণ ক্ষতি দূর করা যায় এবং অনর্থক মনোমালিন্য, বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতির অবসান ঘটে। একটি গল্প (সত্য কাহিনী) বলিতেছি :

একজনের শাকসবজীর বাগানে প্রতিবেশীর শাক সব্জীর ছাড়া গরু, বাছুর, ছাগল প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া খুবই ক্ষতি করিত—তাঁহার প্রতিবেশীরও শাকসব্জীর বাগান ছিল। ভদ্রলোক নিজের গরু বাছুর সম্বন্ধে খুবই সাবধান ছিলেন, যেন উহারা অন্যের ক্ষেতখামারে, বাগানে না যায়। কিন্তু তিনি তাঁহার ক্ষতির পরিমাণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের গরু বাছুর ছাড়িয়া দিলেন, উহারা তাঁহার প্রতিবেশীর বাগানে প্রবেশ করিয়া শাকসবজীর খুবই ক্ষতি করিতে লাগিল। ইহার ফলে তাঁহার প্রতিবেশীও গরু, বাছুর সম্বন্ধে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করিলেন, এবং উভয়ের বাগান গরু বাছুরের আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইল—পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদেরও অবসান ঘটিল। এমনকি, পরস্পরের মধ্যে শাকসবজীর আদান-প্রদানও চলিল। যাহা হউক, আমরা প্রত্যেকেই যখন এই বিষয়ে ভুক্তভোগী তখন ইহার মীমাংসা আমাদের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। চাই কেবল বিষয়টি উপলব্ধি করা এবং তদনুসারে সমবেতভাবে কাজ করা। এই দিকে যুবকগণ মনোযোগ দিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

৮

এইরূপ ছোটখাটো কাজের দ্বারা পল্লী অঞ্চলের অনেকটা উন্নতি বিধান করা সম্ভব। বিশেষতঃ, ইহার ফলে স্থানীয় কৃষির উন্নতি হইবেই হইবে—তবে সমবেত ভাবে এই সকল কাজ করিতে অগ্রসর হওয়া চাই। পূজার ছুটিতে যে সকল যুবক-যুবতী পল্লী অঞ্চলে অবস্থান করিবেন তাঁহারা যদি তাঁহাদের কতকটা সময় উপরোক্ত বিষয়ে নিয়োজিত করেন, এবং একটা সাড়া জাগাইতে সক্ষম হন—তাহা হইলে তাঁহাদের কাজ নিষ্ফল হইবে না। তাঁহারা তাঁহাদের আরব্ধ কাজ চালাইবার জন্য স্থানীয় যুবক সঙ্ঘ গঠিত করিতে পারেন এবং এইরূপ যুবক-সঙ্ঘের নেতৃত্বেই উপরোক্ত সহজ সহজ কৃষিপ্রণালীসমূহের বিস্তৃতি ঘটিবে। ইহার মধ্যে কোন ভেদাভেদ, কোন দলাদলি, কোন রাজনীতি ঢুকিলেই সব বানচাল হইয়া যাইবে।

স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক নাগরিককে এই শপথ গ্রহণ করিতে হইবে যে, প্রত্যেকের শক্তি, সামর্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি অনুযায়ী কিছু-না-কিছু গঠনমূলক কাজ করিতে হইবে—সমাজ-কল্যাণকর সব কাজই যতদূর সম্ভব দলাদলির ঊর্দ্ধে থাকিবে। একজন মহাজন বলিয়াছিলেন যে, যিনি একটি তৃণের স্থানে দুইটি তৃণ উৎপন্নে সাহায্য করেন তিনিই দেশের পরম মিত্র। সেই জন্য যুবকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ জানাইতেছি—তাঁহারা যেন এই ছুটিতে একটি তৃণের স্থানে দুইটি তৃণ উৎপাদনে সাহায্য করেন। এই ধরনের জনহিতকর কার্য্যে তাঁহারা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই লাভ করিবেন।

সাঁচি

শ্রীনিখিল মৈত্র

মৌর্য্য সম্রাট অশোকের সময় থেকে উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি পর্যন্ত এক হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে সাঁচির স্তূপ-নগরীতে নির্মাণ-কার্য চলেছিল। শ্রমণ-ভিক্ষু পুণ্যার্থী সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের সমাগমে সাঁচির পথ-প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠত। আদি বৌদ্ধযুগের প্রখ্যাত পবিত্র স্থান কপিলাবস্তু, লুম্বিনী উদ্যান, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনার, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী প্রভৃতি। এই তালিকায় কিন্তু সাঁচির নাম নেই। অথচ সে যুগের স্থাপত্য ও শিল্পকলার এত বড় নিদর্শন ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। সারা পৃথিবীতে বৌদ্ধযুগের আদিকালের স্থাপত্য-ভাস্কর্য শিল্পের সব চেয়ে ব্যাপক স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় সিংহলের পবিত্র নগরী অনুরাধাপুরে। থুপরাম এবং স্বর্ণকণা রুয়ানওয়েলি দাগোবা, মহাবিহার অভয়গিরি বিহার, মহামেঘবন উদ্যান এবং ভগবান তথাগতের স্পর্শপূত জয়শ্রী মহাবোধি বংশ অনুরাধাপুরকে পরম এক পবিত্রতা দিয়েছে যার সঙ্গের অন্য নগরীর তুলনা অসম্ভব। অনুরাধাপুরের পরই বৌদ্ধযুগের আদিকালের বিস্ময়কর কীর্ত্তিকলাপের সাক্ষ্য বহন করে আছে সাঁচি।

বুদ্ধদেবের পর্যটনে পরিচিত স্থানের মধ্যেও সাঁচি পড়ে না। পালিধর্ম গ্রন্থেও এ নগরীর বিশেষ কোনও উল্লেখ নেই। এমনকি বহু তীর্থ ও দেশ ভ্রমণকারী চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হুয়েনসাংও এই ঐতিহাসিক নগরীর বর্ণনা দেন নি।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সাঁচির সর্বপ্রাচীন স্তূপ ও স্থাপত্যশিল্পের সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল মৌর্য্য সম্রাট অশোকের সময় থেকে। অতীত কালে সাঁচির নাম ছিল কাকনাড়, অনেক পণ্ডিতের মতে মহাবংশে বর্ণিত চেতিয়াগিরিই বর্তমানে সাঁচি বলে পরিচিত। যুবরাজ অশোক উজ্জয়িনীর রাজ্যপাল ছিলেন। সিংহলী রাজকাহিনীতে বর্ণনা আছে যে, যুবরাজ পাটলিপুত্র থেকে উজ্জয়িনী যাত্রাপথে চেতিয়াগিরিতে কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম করেন। সেইখানে শ্রেষ্ঠীকন্যা দেবীর সঙ্গে রাজকুমারের পরিচয় হয় এবং পরে প্রেম ও বিবাহ হয়। অশোকের দুই পুত্র উজ্জেনীয় ও মহেন্দ্র এবং এক কন্যা সঙ্ঘমিত্রা জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান তথাগতের অমৃতবাণী নিয়ে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে যান। সাগরপারে যাবার আগে ভিক্ষু মহেন্দ্র দেবী মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে চেতিয়াগিরিতে আসেন। সেখানে রাজমহিষী-নির্মিত বিরাট এক বিহারে ভিক্ষু মহেন্দ্র অবস্থান করেন। মহাবংশের কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু, এইখানে দেবানাম্‌ প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক এক শিলালিপি স্থাপনা করেছিলেন এবং তাতে মালওয়ার মহামাত্যকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, স্তূপের প্রবেশপথ যেন সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত করা হয়।

সাঁচি স্তূপ

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এ অঞ্চলে সুঙ্গবংশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাঁচির দুইটি স্তূপ এবং সর্ববৃহৎ স্তূপের প্রস্তরাবরণ সুঙ্গ রাজাদের সময়ে নির্মিত হয়। বিরাট স্তূপের মূল অংশ মৌর্য যুগের ইঁটের তৈরি, স্বভাবতঃই তখন স্তূপের আয়তন অনেক কম ছিল। সে যুগের ভাস্কর্যশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা দেখে মনে হয় যে, শিল্পী অতীতের

কাশ্যপদের নিকট বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার
(পূর্ব্বদিকের তোরণের একটি 'প্যানেল')

ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও নূতন আঙ্গিকের সাহায্য নিচ্ছেন। নির্মাণশৈলী তখনও অপরিণত। মূর্তির গভীরতাও অনেক কম এবং বিভিন্ন প্রস্তরখোদিত চিত্রও অসংলগ্ন।

সাঁচিস্তূপ নির্মাণে এবং ভাস্কর্য-শিল্পীর সৃষ্টিতে সুঙ্গযুগের শিল্পধারা অন্ধ্র নৃপতি শতবাহনের রাজত্বকালে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। বিরাট স্তূপের চারটি মনোরম প্রবেশদ্বার এবং তৃতীয় স্তূপের প্রবেশপথ এই সময় তৈরী হয়েছিল। প্রবেশ-তোরণে জাতকের কাহিনী ভাস্কর্য-শিল্পীরা অপরূপ মূর্তির মাধ্যমে লিখে রেখে গিয়েছেন। ভগবান তথাগতের মানবরূপ অঙ্কিত করা তখনও নিষিদ্ধ। বোধিদ্রুম পাদুকা, হস্তী প্রভৃতি চিহ্ন মাধ্যমে বুদ্ধদেবের স্থিতিকে শিল্পী প্রকাশ করেছেন। অন্ধ্রের শতবাহন রাজাদের আমলের বিস্ময়কর শিল্পসৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় অমরাবতী নগরীর ধ্বংসস্তূপে। কালের ও মানুষের ধ্বংসলীলায় অমরাবতীর অধিকাংশ শিল্পসৃষ্টিই আজ অবলুপ্ত।

সাঁচির দক্ষিণে প্রবেশদ্বারে প্রস্তরগাত্রে নির্মাতা ও দাতার নাম দেখতে পাওয়া যায়। শতবাহন নৃপতি শাতকর্ণির শিল্প-পরিচালক আনন্দদ্বারের এক অংশ দান করেছেন। জাতক কাহিনীর রূপায়ণে সুঙ্গযুগের শিল্পীদের যে জড়তা ছিল, শতবাহনের আমলের স্থপতি ও মূর্তি শিল্পকার সে বাধা অতিক্রম করে সাবলীল স্বচ্ছভঙ্গীতে নিজের অনুভূতিকে প্রস্তর-মাধ্যমে জীবনদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ক্ষত্রপ রাজাদের সময়ে নির্মিত কয়েকটি মূর্তিও সাঁচিতে পাওয়া গিয়েছে। এই যুগের শিল্পকলার উপর মথুরা-শৈলীর প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

গুপ্তযুগে ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং শিল্পকলা সৃজনীশক্তির বলিষ্ঠতায়, লালিত্যে ও বৈচিত্র্যে স্বর্ণযুগের প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ভারতের গৌরবময় যুগের শিল্পীরা সাঁচিস্তূপপাদমূলেও সাধনা করেছিলেন। গুপ্ত সংবতের ৯৩ সনে গুপ্তরাজ্যের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ আম্রকারাভ ঈশ্বরবাসক নামে এক গ্রাম এবং অর্থ কাকনাড়বোট বিহারে আর্যসঙ্ঘের ভিক্ষু-ভোজন এবং বিহারে দীপমালা জ্বালাবার জন্যে দান করেন। সে যুগের শিলালেখ থেকে এ সংবাদ আমরা জানতে পারি।

তার পরে, ভাস্কর্যশিল্পে সাঁচির সৃজনীশক্তি স্তিমিত হয়ে আসে। শিল্প-সাধনা নব নব সৃষ্টির পথে না গিয়ে গতানুগতিক রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে। সে যুগে একমাত্র চিত্রকলায় শিল্পীর সৃজনীপ্রতিভা সব চেয়ে প্রাণবন্ত, চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ অজন্তার গুহাগাত্রে আজও পাওয়া যায়। সাঁচির বিহার-প্রাচীরেও চিত্রের সে বর্ণচ্ছটা একদা প্রকাশ পেত, আজ অবশ্য তার কোনও চিহ্নই নেই।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর সাঁচিতে আর কোনও উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধশিল্প সৃষ্টি হয় নি। এর একশত বৎসরের মধ্যে মধ্যভারত থেকেও বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যায়। সাঁচিও তার বৈভব, শ্রী-সম্পদ হারিয়ে ফেলে। ঐতিহাসিক রাজপথ থেকে সাঁচির স্থিতি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। বনদেবতা পবিত্র স্তূপ, মন্দির বিহারের উপর আপন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

সাঁচি স্তূপের উত্তর দিকের তোরণ

সাঁচির অনতিদূরে পূর্বমালওয়ার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজধানী বিদিশা, বেস ও বেতওয়া (বেত্রবতী) নদীর সঙ্গমস্থলে এই নগরী মধ্য ভারতের প্রাণচঞ্চল কর্মকেন্দ্র ছিল। কর্মব্যস্ত নগরীর আশেপাশে টিলা। সেইখানে বৌদ্ধ শ্রমণ ভিক্ষুরা নিজেদের আরাধনা, ধর্ম-আলোচনা, পূজা-পাঠের জন্য বিহার স্তূপ গড়ে তোলেন। এমনি করেই সাঁচি স্তূপ নগরীর সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্পীর স্তূপ, মন্দির, মূর্তি নির্মাণের উপাদানও বিন্ধ্যশৈলশ্রেণীর গোত্রজ এই টিলার বালু-প্রস্তর থেকে এসেছে।

মুসলমান রাজাদের সময়ে সাঁচির পাঁচ মাইল দূরে ভইলস্বামিন নগর বহু বার আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু, সাঁচির বিরুদ্ধে কোনও অভিযান পরিচালিত হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জেনারেল টেলার যখন পাহাড়-জঙ্গলের আবরণ ভেদ করে সাঁচির স্তূপ ও অন্যান্য কীর্তিচিহ্নের কাহিনী সারা জগৎকে জানালেন, তখনও অধিকাংশ শিল্পসৃষ্টিই কালের ধ্বংসলীলাকে উপেক্ষা করে অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল।*

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফটোগুলি শ্রীদেবেন গুপ্ত কর্তৃক গৃহীত।

হৈমন্তী

শ্রীকরুণাময় বসু

রোদের যেন রঙ ফিরেছে, নদীর জল শুভ্র,
মৌমাছিরা ফুলে ফুলে উড়ছে নিঃশঙ্ক;
হংসমিথুন গগন 'পরে ছড়িয়ে দেছে পক্ষ,
তারায় আলোর পথ চিনে কি মানসকূল লক্ষ্য?

মেঘেরা সব হঠাৎ হাওয়ায় দোলে আকাশপ্রান্তে,
চিকণ সোনার অক্ষরেতে লিখছে কে একান্তে?
শিরীষ বনে রঙ দিলো সে, পারুল ফুলে গন্ধ,
স্রোত হারানো নদীর জলে এলো প্রাণের ছন্দ।

ঘাসের শীষে রক্তরাঙা ফুল ফুটেছে হঠাৎ যে,
পাতার ভেঁপু দূর মাঠেতে আপন মনে বাজায় কে?
ক্ষেপা হাওয়ায় ফুলের লতা দীঘির পাড়ে দুললো,
ভ্রমর আসে গুনগুনিয়ে, সেই জানে তার মূল্য।

কাশের বন ম্লান হয়েছে, শিউলি-শাখা রিক্ত,
সোনা রোদের ঝলকানিতে দোয়েল করে নৃত্য;
নদীর পাড়ে চড়ুই পাখী নাচায় তুলে পুচ্ছ,
ফসল-ক্ষেতে উচ্ছ্বসিত পাকা ধানের গুচ্ছ।

মহাত্মা গান্ধী

শুভ জন্মদিনে

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

আজ ২রা অক্টোবর, গান্ধীজীর শুভ জন্মদিন। ৮১ বৎসর আগে আজকের এই শুভদিনে গুজরাটের সুদামপুরী বা পোরবন্দরে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন তিনি মায়ের কোল আলো করেছিলেন। আজ তাঁর আলোয় ভারত আলো, জগৎ আলো। এস আমরা আজ তাঁর জয়গান করি—আজ গান্ধী জয়ন্তীর পুণ্যদিন।

গান্ধীজী সমস্ত হৃদয় দিয়ে মানুষকে ভালবেসেছিলেন, সমস্ত হৃদয় দিয়ে মানুষের দুঃখ-বেদনা অনুভব করতে পেরেছিলেন, সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিয়ে সেই বেদনা দূর করবার প্রয়াস করেছিলেন। তাঁর নাম স্মরণ মাত্রই অতি দুঃখীরও মুখখানি উজ্জ্বল হয়, হৃদয়ে তাঁর আশার সঞ্চার হয়, পুণ্যের স্পর্শে তার অন্তর দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাই গান্ধী স্মরণ-মঙ্গল। এস, ভারতবাসী আমরা তাঁর শুভ জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করি, তাঁর পুণ্য কথা কীর্ত্তন করি, তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রেম নিবেদন করি, তাঁকে প্রণাম করি, তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি, তাঁর কাছে অভয় প্রার্থনা করি এবং তাঁর কর্ম্মযোগে দীক্ষা গ্রহণ করি।

জয় হোক গান্ধীর। গান্ধীর জয়ে ধর্ম্মের জয়, গান্ধীর জয়ে সত্যের জয়, গান্ধীর জয়ে প্রেম ও অহিংসার জয়, গান্ধীর জয়ে মানবাত্মার জয়, গান্ধীর জয়ে শোষণমুক্ত, পুণ্যদীপ্ত, নব মানব-সমাজের জয়।

স্বাধীন ভারতে নব জাতির জনক তিনি। আজ জাতিগঠনের পথে ভারতবর্ষ যেন ত্যাগের দ্বারা, সেবার দ্বারা, তপস্যা দ্বারা তাঁর পতাকা বহন করবার শক্তি অর্জ্জন করতে পারে। গান্ধীজীর জীবনকথা ত মহাভারতের মত। সে কথা যত গভীর তত ব্যাপক, যত করুণ তত কঠোর। সে কথা অমৃত সমান। সে পুণ্য কাহিনীর স্বল্পমাত্র অনুসরণ করে আজকের দিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

পোরবন্দরে গান্ধীজীর জন্ম—পোরবন্দর ও রাজকোটে তাঁর ছেলেবেলা কাটে। তাঁর পিতা কাবা গান্ধী ছিলেন পর পর এই দুই জায়গায় দেওয়ান। কাবা ছিলেন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ ও ধার্ম্মিক। গান্ধীজীর মায়ের নাম পুতলীবাঈ। পুতলীবাঈ ভক্তিমতী সাধ্বী, ব্রতনিয়ম নিয়ে থাকতেন আর দেবদর্শন, প্রতিদিন রামমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে যেতেন। বালক মোহনদাস মায়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে যেতেন, ভক্তিভরে ঠাকুর নমস্কার করতেন, মায়ের কঠোর উপবাস ও নিয়ম পালন দেখে তিনি অবাক হতেন। এমনি করেই বালক মোহনদাস ধর্ম্মের পথ দেখতে পায়, উপবাসে তার অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। ভবিষ্যতে ধর্ম্মই হয় তাঁর সকল কর্ম্মের উৎস। ধর্ম্মের অভিষেকে তিনি রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করেন। আর সত্যের স্পর্শ দিয়ে পলিটিক্সের ঘোর কুটিল পন্থার ঋজুতা সম্পাদন করেন। আর তাঁর উপবাসের কথা আজ কে না জানে! তাঁর এক-একটি উপবাসে দেবতার আসন টলেছে, ভারতের জনসমুদ্রে ঢেউ উঠেছে, প্রতিকারহীন কঠিন নিষ্ঠুর সমস্যার সমাধানের পথ খুলে গেছে।

বালক মোহনদাস ভীতু ছিলেন। তাঁর দাসী তাকে বলেছিল, অন্ধকারে ভয় পেলে রাম নাম করবে। সেই থেকেই বালক মোহনদাসের মুখে রাম নাম। রাম নামের অভয় বাণী নিয়ে তাঁর সেই বিস্ময়কর মহাজীবনে কত না অন্ধকারের সাগর তিনি পাড়ি দিয়েছেন।

ছেলেবেলায় মোহনদাস একটি যাত্রা শুনেছিল, যাত্রার পালা ছিল হরিশ্চন্দ্র। যাত্রা শুনতে শুনতে বালক কত চোখের জলই না ফেলেছিল। সত্য রক্ষার জন্য রাজা হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্ব গেল, রাজ্য গেল, স্ত্রী গেল, পুত্র গেল, নিজে শ্মশানঘাটে চণ্ডালের চাকর হলেন, তবু রাজা সত্যকে ছাড়লেন না। যেমন শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্ব-ত্যাগ করেছিলেন, তবু সত্যকে ছাড়েন নি। প্রহ্লাদের কাহিনীও মোহনদাসের খুব ভাল লাগে। ভগবানের নাম নিয়ে বালক প্রহ্লাদ সকল বিপদ পার হয়ে গেল—আগুন তাকে দগ্ধ করল না, সমুদ্র তাকে গ্রাস করল না, মত্ত হস্তী তাকে পদতলে মথিত না করে আদরে মাথায় তুলে নিল, পর্ব্বতশিখর হতে নিক্ষিপ্ত হতেই মা বসুন্ধরা স্নেহ-পুত্তলীর মত তাকে বুকে তুলে নিলেন। দৈত্যপুরে প্রহ্লাদের যে পরীক্ষা, জীবনে গান্ধীজীর পরীক্ষা তার চেয়ে বড় কম নয়। তাঁর সঙ্গে সমস্ত জাতি মত্ত রাজশক্তির নিষ্ঠুর পীড়ন হাসিমুখে সহ্য করেছে। তাঁর সত্য ও অহিংসার স্পর্শ পেয়ে তারা বিপদের তরঙ্গে তরঙ্গে আলোড়িত হয়ে শেষে স্বাধীনতার কূল পেয়ে বেঁচেছে। জড়পিশাচের জগদ্দল পাষাণভার তাদের বুক থেকে নেমে গেছে।

মোহনদাস দুষ্ট সঙ্গীর পাল্লায় পড়েছিলেন। দুই-একটা বদ অভ্যাস তাঁর হচ্ছিল। কিন্তু লুকিয়ে মন্দ কাজ করা বেশী দিন তাঁর ধাতে সইল না। মিথ্যার ভারে তাঁর সরল মন হাঁপিয়ে উঠল। শেষে পিতার নিকট অপরাধ স্বীকার করে তাঁর মন হাল্কা হ'ল। পিতা ক্ষমা করলেন, মোহনদাস সত্যের সহজ পথে ফিরে এসে বেঁচে গেল।

লেখাপড়ায় মোহনদাসের মন ছিল। যত্ন করে পড়াশুনা করতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ভালমানুষ ও লাজুক। ছাত্র হিসাবে তাই তাঁর তেমন কোন জৌলুস ছিল না। ফাঁকি দেওয়া বা

প্রতারণা করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। অন্যায় করলে তা স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে তিনি মন হাল্কা করতেন। অঙ্ক ও জ্যামিতি নিয়ে বালক মোহনদাস খুব ঠেকেছিলেন, কিন্তু চেষ্টা করে বুদ্ধি করে বিষয় বুঝে নেবার পর তাঁকে আর অসুবিধায় পড়তে হয় নি। সংস্কৃত তাঁর বড় শক্ত ঠেকত। সংস্কৃত ছেড়ে দিয়ে তার বদলে ফারসী পড়বেন ঠিক করলেন। তখন সংস্কৃতের পণ্ডিত মহাশয় স্নেহ করে তাঁকে উৎসাহ দিলেন, সঙ্গে একটু লজ্জাও দিলেন। বললেন, মোহন, সংস্কৃত ছেড়ে দেবে—এত সহজে হার মানবে? মোহনদাস হার স্বীকার করলেন না, সংস্কৃতে মন দিলেন। এই সংস্কৃত শিক্ষা নিয়ে তিনি পরে কত বার কত উপলক্ষে কত কথা বলেছেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের মনের কথা জানতে হলে সংস্কৃত জানা চাই। ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তের সাধনা কি তা বুঝতে হলে সংস্কৃত জানা চাই। ছাত্রদের তিনি গীতা নিত্য পাঠ করার উপদেশ দিতেন। সুমধুর ভাবময় সংস্কৃত স্তোত্রগুলি আমাদের অক্ষয়সম্পদ বলে তিনি মনে করতেন।

খুব ছেলেবেলায় কস্তুরবাঈ-এর সঙ্গে মোহনদাসের বিবাহ হয়। তখন তাঁদের বয়স তের বৎসর মাত্র। বাল্য-বিবাহের প্রথাকে তিনি কখনও ভাল বলেন নি। কস্তুরবাঈ ছিলেন খাঁটি ভারতীয় মেয়ে। সীতা-সাবিত্রীর দেশের মেয়ে, স্বামীসেবাই জীবনের সার বলে বুঝতেন। জীবনভোর ছায়ার মত তিনি ছিলেন স্বামীর অনুগামিনী। সুখে-দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সংগ্রামে শান্তিতে, ঘরে বাহিরে, আর্ত্তসেবায় অতিথিসেবায়, গৃহস্থালি গঠনে ও বিঘঠনে, আশ্রম গড়ায় ও ভাঙ্গায়, পথে প্রবাসে বন্দীশালায়, সর্ব্বত্র সর্ব্ব কর্ম্মে তিনি ছিলেন মোহনদাসের চিরসঙ্গিনী। কস্তুরবা লেখাপড়া জানতেন না, গান্ধীজী তাঁকে মোটামুটি শিখিয়ে নিয়েছিলেন। মোহনদাস ধীরে ধীরে কেমন করে মহাত্মা গান্ধী হয়ে উঠলেন, মহাত্মা গান্ধী কেমন করে সত্য ও অহিংসার পথে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনা করলেন—সে কথা ত আধুনিক ভারত-ইতিহাসের মর্ম্মকথা। এত বড় লোকের, এই মহামানবের ধর্ম্মপত্নী হয়ে ওঠা কি সোজা কথা! সেই সাধনায় জীবনের সকল সাধ-মান ভাসিয়ে দেওয়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করা, গৃহী হয়ে গৃহহীন হয়ে থাকা—কস্তুর বাঈ-এর পতিপ্রেম কি কঠোর, কি মধুর, কি মহিমায় পূর্ণ। গান্ধীজীর দুশ্চর তপস্যার ভাগিনী হওয়া কি কথার কথা! গান্ধীজী বার বার জাতিটাকে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড় করিয়েছেন, এক বিপদ থেকে আর এক বিপদের মধ্যে পরিচালিত করেছেন, নির্য্যাতন বুক পেতে নিতে শিখিয়েছেন। তারই তরঙ্গে তরঙ্গে উঠা-নামা করে কস্তুরবা হয়েছেন তপস্বিনী, ব্রতধারিণী, সৌম্যা, রুদ্রা জননী! পার্ব্বতীর তপস্যায় কাছেই মহাদেব ধরা দিয়েছিলেন। কস্তুরবার তপস্যা ত পার্ব্বতীরই অনুরূপ!

ক্রমে মোহনদাস এণ্ট্রান্স পাস করে কলেজে ভর্ত্তি হলেন। কথা উঠল, মোহনদাস বিলেতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে আসুক। কিন্তু বাড়ীতে পয়সার স্বাচ্ছল্য নেই—বিলাত যাওয়া হয় কি করে? শেষে ভাই টাকার দায় ঘাড়ে নিলেন। কিন্তু মা পুতলীবাঈ আপত্তি করে বসলেন, বললেন বিলাত গেলে প্রলোভনে পড়ে ছেলে মাটী হয়ে যাবে। পুতলী বাঈ ছেলেকে বিশ্বাস করতেন। তাই মোহনদাস যখন মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল—কোন দিন মদ ছোঁবে না, মাংস খাবে না, পরস্ত্রীকে নিজের মা-বোনের মত দেখবে, তখন ছেলের বিলেত যাত্রায় পুতলীবাঈ সম্মতি দিলেন।

প্রায় তিন বৎসর পরে মোহনদাস ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে এলেন। অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে করতে শেষে এক সওদাগরের মামলা উপলক্ষে ১৮৯৩ সনে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হয়ে গেলেন। তিনি কি তখন বুঝেছিলেন, সেই দূরদেশে তাঁর জীবন-দেবতা তাঁর হাতে সত্যাগ্রহের অস্ত্র তুলে দেবেন—যে-অস্ত্রে অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করতে হয়, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে, যে-অস্ত্র ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে হবে সবচেয়ে বড় অস্ত্র?

দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে মোহনদাস কি দেখলেন? তিনি দেখলেন, সহস্র সহস্র গরীব ভারতীয় কুলী সেখানে নানা রকম কাজ করে। তারা পরিশ্রমী, মিতচারী, কিন্তু তাদের জীবন দুর্ব্বহ। শ্বেতাঙ্গ শাসকরা তাদের পথে-ঘাটে যত্র-তত্র নিত্য অপমান ও নির্য্যাতন করে। গান্ধীজীও বাদ গেলেন না, সেখানে তাঁর নাম হ'ল কুলী-ব্যারিষ্টার। সেখানকার রাজপথে, রেলগাড়ীতে তাঁকেও কতবার শ্বেতাঙ্গরা প্রহার ও অপমান করেছে। ভারতীয়দের এই ঘোর দুরবস্থা দেখে মোহনদাস তার প্রতিকারের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে গেলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নির্য্যাতনের দুই-একটা নমুনা দিই। সেখানে একবার আইন হ'ল ভারতীয়দের মাথা পিছু ২৫ পাউণ্ড কর দিতে হবে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয়গণ এই নিয়ে খুব আন্দোলন করল। শেষে রফা হ'ল, আচ্ছা ২৫ পাউণ্ডের স্থলে ৩ পাউণ্ড কর দিলেই চলবে। আর একটা আইন হ'ল—সেই আইনে প্রত্যেক ভারতীয়কে সরকারী দপ্তরে নাম রেজেষ্টারী করতে হবে, আর দশ আঙুলের ছাপ দিতে হবে। ভারতীয়রা যেন সকলেই দাগী আসামী, তাই তাদের সকলকে দশ আঙুলের ছাপ দিতে হবে। তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয়গণ এই পাশবিক আইন অমান্য করতে লাগল। দলে দলে তারা জেলে গেল, স্ত্রী-পুরুষ কেউ বাদ পড়ল না। তার পর শাসনকর্ত্তা জেনারেল স্মাটস নাম রেজেষ্টারী নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, তাদের গবর্ণমেণ্ট পরক্ষণেই সেই চুক্তি মানতে রাজী হ'ল না। শুধু তাই নয়, আবার একটা নূতন আইন পাশ করে তারা ভারতীয়দের ট্রান্সভালে প্রবেশ নিষেধ করে দিল। গান্ধীজী তখন পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। আবার সত্যাগ্রহ সুরু হ'ল। এবার ট্রান্সভাল অভিযান। দলে দলে ভারতীয়গণ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, চাষী মজুর, ঝাড়ুদার ফেরিওয়ালা, কেরাণী ব্যবসায়ী, ধনী নির্ধন, হিন্দু, মুসলমান সকলে ট্রান্সভাল অভিযানে যোগ দিল। অন্তরে ভগবানের নাম নিয়ে, সাহসে বুক বেঁধে তারা অত্যাচারের মুখে

ঝাপিয়ে পড়ল। আঘাত তারা বুক পেতে নিল, কিন্তু কাকেও আঘাত করল না। সহস্রে সহস্রে জেলে গেল। গান্ধীজী কস্তুরবা সকলেই কয়েদী হলেন। কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল, কিন্তু অন্যায়ের সামনে মাথা হেঁট কেউ করল না। শেষে সত্যাগ্রহের জয় হ'ল। নিঃসহায় নিঃসম্বল ভারতীয়দের দৃঢ়তা, সাহস, ঐক্যবদ্ধতা, সর্ব্বোপরি তাদের অহিংসা ও সত্যানুরাগ দেখে শত্রুর বুক কেঁপে উঠল! তারা পাশবিক আইনগুলো রদ করে দিল।

অর্জ্জুন অরণ্যবাসী হয়ে দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার পর মহাদেবের নিকট হতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছিলেন। গান্ধীজী সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্ব্বাসনে কঠোর তপস্যার দ্বারা নব পাশুপত অস্ত্র লাভ করলেন। সেই অস্ত্র সত্যাগ্রহের অস্ত্র। পাশুপত অস্ত্রে পশুর সঙ্গে পশুপতির লড়াই, অসুর শক্তির সঙ্গে দৈবী শক্তির সংগ্রাম। তারপর প্রায় ২০ বৎসর পরে ১৯১৪ সনে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। হাতে তাঁর সত্যাগ্রহের অস্ত্র, আর হৃদয়ে ভগবান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেল।

স্বাধীন দেশে আজ নবজীবনের প্রাতে, এস আমরা জাতির জনক সেই বিজয়ী বীরকে প্রণাম করি।

(অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে। গত ২রা অক্টোবর তারিখে কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত।)

যে গল্পের শেষ নেই

লিওনাদ আন্দ্রিফ্

শ্রীশ্যামাদাস সেনগুপ্ত

বিছানায় শুয়ে পড়ি।

দিনটা আমার কাছে বিশেষ ভাল বলে মনে হচ্ছিল না।

দিনটা অস্থিরতায় পূর্ণ।

আকস্মিক ভাবে পত্নী আমাকে জাগিয়ে দিল। তার হাতে মোমবাতি। মোমবাতিটা জ্বলছে, অন্ধকার মধ্যরাতে মোমবাতিটা সূর্য্যের মত ভাস্বর দীপ্তিতে উজ্জ্বল। দীপবর্ত্তিকার পিছনে তার অধর স্ফুরিত, আয়ত চোখ দুটো স্থির।

—তুমি কি জান রাস্তায় ওরা কোলাহল করছে, সে বললে।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই। শান্ত পরিবেশেও আমার মুখ বিবর্ণ। প্রাণশক্তি আমার স্তিমিত। পরক্ষণে আবার প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয় আমার মধ্যে। হৃৎপিণ্ডটা ধুক্‌ধুক্ করে আবার স্পন্দিত হচ্ছে। শান্ত পরিবেশেও আলোকের শিখাটি চঞ্চল। শিখাটি ছোট্ট কিন্তু বাঁকা তলোয়ারের মত ঝলকিত।

—তুমি কি ভয় পেয়েছ? আমি প্রশ্ন করি। বিবর্ণ ওষ্ঠ তার আবার কেঁপে উঠল। তার চোখ দুটি শান্ত ও স্থির। চোখে তার অজানা ভাষা। ভয়চকিত তার চাহনি।

গত দশ বছর ধরে সেই চোখের ভাষা আমি দেখে আসছি। আজকে তার চোখের ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক। তার সেই দৃষ্টিকে অস্বীকার করতে পারিলাম না। সেই চাহনিকে গর্ব্বদীপ্ত চাহনিও বলা যেতে পারে। তবু সে চাহনির মাঝে একটা ছায়াচ্ছন্নতা, একটা অজানা রহস্য ঠিকরে পড়ছিল। ছুঁয়ে দেখি তার হাত ঠাণ্ডা। সে আমার হাত জড়িয়ে ধরে, তার বাহুবন্ধন দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। একটা নতুন কিছু অনুভব করি তার দেহের স্পর্শে। এর আগেও সে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আজ সে আকস্মিক ও অভাবিতরূপে আমার সামনে ধরা পড়ল।

—কতক্ষণ হ'ল—আবার প্রশ্ন করি তাকে।

—প্রায় এক ঘণ্টা হবে। তোমার ভাই চলে গেছে। সেই এই ভেবে ভয় পেয়েছিল—এই অন্ধকার রাতে তাকে তুমি যেতে দেবে না। তাই একা সে গোপনে চলে গেল, আমিও তাকে চলে যেতে দেখেছি।

সে সত্যি কথাই বলল। বিছানা ছেড়ে আমি মুখ, হাত ও পা ধুলাম, এই আমার অভ্যাস, সেই সময়ে আমার পত্নী সাধারণতঃ বাতি ধরে আর আমি মুখ, হাত ও পা ধুই।

বাতি নিভিয়ে জানলার ধারে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। মে মাসের বসন্তকাল। ইতিপূর্ব্বে এই পুরাতন নগরে হাওয়ার এত উচ্ছাস আমি দেখি নি। নগরের কারখানা ও অলিগলি অলস হয়ে শুয়ে আছে। বাতাসে ধোঁয়া নাই। প্রান্তরের সুবাস আর কুঞ্জবনের নির্য্যাস বাতাসে। হাওয়াতে আর্দ্র শিশিরকণাও ছিল। বসন্তের এই গন্ধভরা প্রাণময় বাতাস আমি গভীর ভাবে বুকে শ্বাস নিয়ে টেনে নিলাম। নগরের রাজপথে কোলাহল নাই। শহরে শান্ত গ্রাম্য পরিবেশ!

অদূরে একটা কুকুর ডাকছিল। ইতিপূর্ব্বে এ শহরে কুকুরের ডাক আমি শুনি নি। একটা অনুভূতির তরঙ্গ আমি দেহে অনুভব করি।

পত্নী আমাকে আলিঙ্গন করে বলে, কুকুরটা কোনো কোণ থেকে ডাকছে নাকি?

জানলার ধারে ঝুঁকে সেই প্রায়ান্ধকারে আমরা একটা নড়ন-চড়নের রহস্যময়তা অনুভব করি। সেটি সজীব স্পন্দন, ছায়ার মত চঞ্চল। অশরীরী একটা কিছু ঘুরছে। একটা হাতুড়ি বা সেই ধরনের একটা ভারী জিনিষের শব্দ আমরা শুনতে পাই। শব্দটা খুব শ্রুতিমধুর। সুরের একটা সুসমঞ্জস প্রবাহ। বনের মধ্যে যেমন শব্দ শোনা যায়—সেই রকম শব্দ অনুরণিত, এইখানে। জলের উপর প্রবাহিত নৌকা অথবা বাঁধের বন্ধনে উচ্ছল জলতরঙ্গের উত্থিত শব্দ সেটি, সেই শব্দ শুনে পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন করে জড়িয়ে ধরি। আমার পত্নী অন্তগামী চাঁদ আর বাড়ীর ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সুন্দর চাঁদ। পূর্ণ যুবতীর মতনই সেই চাঁদ সীমাহীন আকাশে অতীন্দ্রিয় স্বপ্নবাসরের স্বপ্ন দেখছে, কুণ্ঠিত লাজনম্রার মত সীমাহীন আকাশের এক কোণে বিরাজ করছে।

--কবে পূর্ণিমা আসবে।

—কবে পূর্ণিমা আসবে? এ প্রশ্ন করো না—একথা শুনতেও আমার ভয় লাগছে—আমার কাছে এস।

ঘরে অন্ধকার। আমরা পরস্পর কারও প্রতি না তাকিয়ে ঘরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করে বসে রইলাম। সেই একই চিন্তা করছি। কথা বলতে চেষ্টা করতেই মনে হ'ল অপর কেউ যেন আমার মধ্য থেকে কথা বলবার চেষ্টা করছে। আমি ভয় পেলাম না। অপরের একটা কর্কশ গলার শব্দ শুনতে পেলাম, সেই গলার স্বরে তৃষ্ণায় অধীর হয়ে ছটফট করছে।

—এ স্বরটা কিসের?

সে সব গলার স্বর—

—তুমি এদের মধ্যে বিরাজ করবে। আমি থাকতে পারছি না আর। আমি কে? আমি কি থাকতে পারি এখানে? তোমাকে পেলে তারা অনেক কিছুই পাবে।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পত্নী সে স্থান থেকে একচুলও সরে নি। আমি বুঝতে পারছি সে চলে যাচ্ছে দূরে···বহু দূরে। সে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার খুব শীত লাগছে। আমি বাহুযুগল এগিয়ে দিতে পত্নী সে আলিঙ্গন উপেক্ষা করল।

—এক শ' বছর পর মানুষ এই রকম অবাধ স্বাধীনতা পায়। তুমি আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করছ কেন? সে বলল।

—সেখানে তোমাকে তারা মেরে ফেলতে পারে। আমাদের ছেলেমেয়েরা তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

—জীবন করুণায় পূর্ণ হবে, প্রেমে ভরে উঠবে—যদি—যদি তারা মরে।

এই অসম্ভব কথা পত্নী বললে যার সঙ্গে আমি দীর্ঘ দশ বছর বাস করছি। সন্তান সন্তান ছাড়া অন্য কোন চিন্তা তার দেখি নি। ছেলেমেয়ে ছাড়া বাইরে অন্য কোন জগৎ আছে কি না তা সে কিছুদিন আগেও জানত না। চোখের আড়ালে তাদের এক মিনিটও রাখত না। গত দিনে ভবিষ্যতের কুটিল ইঙ্গিত পেয়ে সে চমকে উঠেছিল। আজ তার কি হ'ল?

গত দিন তার কি হয়েছিল? হায়! সেদিনের কাহিনী আমি আমি আজ ভুলে গেছি। গত দিনে কি হয়েছিল? আমার মনে নেই।

—তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

—রাগ করো না। সে ভাবল আমি রাগ করেছি, ভীত হয়েছি। আবার পত্নী বলে।

—আজও রাতে যখন তারা দরজায় করাঘাত করছিল তখন তুমি ঘুমিয়েছিলে। আমি বুঝতে পারলাম সব কিছুই ক্ষণিকের। তোমাকে আমি গভীর ভাবে ভালবাসি।—সে আমাকে জড়িয়ে প্রবল বেগে নাড়া দেয়। তার পর আমাকে বলে: তুমি শুনছ, কি ভীষণ ভাবে তারা দরজায় করাঘাত করছে। করাঘাত করছে তারা, কোন-কিছুর পতনের শব্দ তুমি পাচ্ছ না? মনে হচ্ছে পাথরের দেয়াল-গুলি পড়ে যাচ্ছে। এখনও সকাল হয়ে নি তবু মনে হচ্ছে আকাশে সূর্য্য কিরণ দিচ্ছে। আমার বয়স ত্রিশ হ'ল, তোমারও বয়স হয়েছে। তবু আমার কি মনে হচ্ছে জান? আমার মনে হচ্ছে আমি সতেরো বছরের যুবতী। আমার প্রথম প্রেমের কোন সমাপ্তি ছিল না; কাউকে সে প্রেম দিয়ে ভালবেসেছি। পত্নী থামল।

উঃ কি রাত! মনে হচ্ছে নগরীর শেষ হয়ে গেছে, তুমি ঠিকই বলেছ, আমার বয়স কত।

তারা দরজায় আঘাত করছে। সে শব্দ আমার কাছে সঙ্গীত-মূর্চ্ছনার মত বাজছে। আমার মনে হচ্ছে সঙ্গীতের এই সুর সারা জীবন আমি শুনেছি। আমার অসীম প্রেম দিয়ে কাকে ভাল-বেসেছি তা আমি বলতে পারব না। তবু বুঝছি সেই প্রেম আমাকে আবিষ্ট করেছে, সে প্রেম আমার চোখের জল ঝরাচ্ছে, গান গাওয়াচ্ছে। এ অসীম প্রেমে স্বাধীনতা আছে, দোহাই তুমি আমার স্বাধীনতা কেড়ে নিও না।

—আমাকে শান্তিতে মরতে দাও, সে দেশে যেতে দাও যেখানে ওরা ভবিষ্যৎকে অন্তরে আহ্বান করছে এবং অতীতকে কবর থেকে ছিনিয়ে আনছে।

—এ রকম সময় কোন কালে ছিল না—নেই।

—তার মানে তুমি কি বলতে চাও?

—সময় বলে কোন কালে কোন কিছু ছিল না। তুমি কে? আমি তোমাকে জানি না—তুমি কি মানবী?

পত্নী উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ে। সে সত্যিই যেন সতেরো বছরের অনভিজ্ঞা যুবতী।

—আমি তোমাকে আমাকে কাউকে জানি না। তুমি কি মানুষ—মানুষ কি অদ্ভুত বিচিত্র জীব।···

এ সমস্ত কাহিনী অনেকদিন আগে ঘটেছিল। সেসব বিস্মৃতপ্রায়। বিবর্ণ ধূসর জীবনে সে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন না পেয়ে সে কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না। অতীতে সময় বলে কিছু ছিল না। সূর্য্য উঠেছিল তার পর ডুবেছিল। অদৃশ্য হাতটা তাদের পাশে ঘুরছিল। সময়ের

অস্তিত্ব বলে কিছু ছিল না। সে অনাদি অতীতে নানা আজব ব্যাপার ঘটেছিল।

—যারা ধূসর জীবনের ক্লান্ত ছায়ায় ঘুমোচ্ছে এবং মৃত হয়ে জীবনে ফিরে আসে নি—তারা এ সব বিশ্বাস করবে না।

—অবশ্যই আমি ফিরে যাব—আমি বললাম।

—বেশ ভাল কথা। তুমি আজ কিছু খাও নি, কিছু খেয়ে নাও। আমার জ্ঞান কেমন টনটনে। আগামীকাল আমি রওনা হব, আমি ছেলেমেয়েদের সেখানে দিয়ে দেব আর তোমাকে খুঁজে বার করব।

—বন্ধু। আমি পত্নীকে বললাম।

—বল প্রিয়তম বন্ধু।

জানালার মধ্য দিয়ে প্রান্তরের বিস্তৃতি দেখা যায়। মাঠে নীরবতা, মধ্যে মধ্যে কুঠারের রহস্যময় আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রাচীরের দিকে তাকাতে সেগুলো আমার কাছে ফাঁকা ও স্বচ্ছ বলে মনে হয়, আরও মনে হ'ল সেই প্রাচীরের থামগুলি অনন্তকে আলিঙ্গন করেছে একটা মধুর দৃষ্টি দিয়ে। কেমন করে এইসব দেয়াল তৈরী হয়েছিল—কেমন করে এগুলির ধ্বংস হয়েছিল, কেমন করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং কেমন করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে—সব যেন আজ দেখতে পেলাম। সবকিছু চলে যাবে। আমি কিন্তু পড়ে থাকব। সমস্ত কিছু আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। টেবিল এবং টেবিলের উপর রক্ষিত আহার্য্য সব কিছুই আমার কাছে বিসদৃশ বলে মনে হয়। একটা স্বচ্ছ আলোর দ্যুতি ক্ষণিকের জন্য শুধু বিরাজ করে।

পত্নী প্রশ্ন করে : তুমি এখনও যাও নি কেন?

আমি হাসলাম।

পত্নী রুটির দিকে তাকায়। রুটির শক্ত আবরণের দিকে তাকিয়ে তার মন দুঃখে ভরে যায়। সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়। ছেলেরা ঘুমোচ্ছে। তাদের পানে সে তাকাল।

—তুমি কি এদের জন্য দুঃখ অনুভব কর না? আমি প্রশ্ন করলাম। রুটির দিক হতে দৃষ্টি না সরিয়ে সে সম্মতি জানাল।

—না—আমি আমার পূর্ব্বজীবনের কথা ভাবছি।

কি অবিশ্বাস্য! ঘুম থেকে উঠে সদ্য-জাগরিত ব্যক্তির মত ঘরের সমস্ত কিছু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে পত্নী অনুভব করে সব কিছু মানুষের অনুভূতির বাইরে। এই কি সেই স্থান, যেখানে অনন্ত বসবাস করছে।

—তুমি আমার পত্নী।

—ওখানে আমাদের ছেলেরা ঘুমিয়ে আছে।

—দেওয়ালের পাশের কবরে তোমার বাবা চিরনিদ্রায়।

—হ্যাঁ তিনি মারা গেছেন। মরণের পর পুনর্জীবন পান নি।

—আমাদের কোলের শিশুপুত্র ডুকরে কেঁদে ওঠে। সে ভয় পেয়েছে। শিশুর কান্না কিছু যেন দাবি করছে। অশরীরী দেয়ালের কাছে সে কিছু প্রার্থনা করছে। দূরে রাজপথে লোকেরা কাঁটাতার দিয়ে কি যেন করছে। শিশু কেঁদে উঠে। কোলে আসতে চায় সে, সামান্য আদর আর সোহাগ আমাদের কাছে দাবি করছে।

—বেশ তা হলে যাও—ফিস ফিস করে পত্নী বলে।

—ছেলেমেয়েকে চুমু দিতে আমার ইচ্ছে করছে।

—তা হলে তারা জেগে উঠবে।

—না, না, তারা জাগবে না, আলতো ভাবে চুমু দেব।

আমাদের বড় ছেলে জেগে উঠেছে। ন'-বছরের ছেলে সে। সব কিছু সে বুঝতে পেরেছে। আমার প্রতি তার কঠোর দৃষ্টি। আগ্রহের সুরে বলে, তোমার বন্দুক নেবে না বাবা?

—হ্যাঁ, অবশ্যই নেব।

—ওই তো বন্দুক ষ্টোভের পিছনে।

—তা তুমি কি করে জানলে। বেশ, বাছা আমাকে একটা চুমু দাও—আমাকে মনে রাখবে তুমি চুমু খেলে।

বিছানায় সে এতক্ষণ শুয়ে ছিল। বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে। শরীর তার বেশ গরম। বাহু দুটো তার নরম, তুলতুল করছে। আমাকে সে জড়িয়ে ধরায় তাকে স্নেহের চুমু খেলাম। চুলগুলো মাথার পিছন দিকে সরিয়ে দিলাম।

—তারা কি তোমায় মেরে ফেলবে বাবা—ফিস ফিস করে আমার কানের কাছে বলে।

—মারলেও আমি ফিরে আসবে।

ছেলে আমার কাঁদল না। এর আগে বাড়ীর বাইরে আমি গেলে সে কাঁদত। অনন্তের রহস্য তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। হয়ত অনেক রহস্য অতীতে ঘটে গেছে, তার পূর্ব্বজীবনে। দেয়ালের পাশে রক্ষিত রুটি আর টেবিলের দিকে আমি তাকালাম। শেষ প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের শেষ শিখাটা আমি দেখছি। এই আলোকশিখা পত্নী সেই কখন ঘরে এনেছিল।

—বেশ, তা হলে আমরা আবার মিলিত হব?

—হ্যাঁ মিলন আমাদের হবেই।

শেষ কথা এই আমাদের। জানলার কাছে গভীর অন্ধকার। সেই অন্ধকার প্লাবিত আবেষ্টনী আর পাষাণ-সিঁড়ির রহস্যময়তা আরও এক রহস্যচ্ছলে নূতন আনন্দ আমার হৃদয়কে প্লাবিত করে।

আনন্দের দেশে আমি যাত্রা সুরু করেছি।

পাণিপথ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

রাতের পান্থ, নগ্ন নিভৃতে বারে বারে তব রথ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কতবার এই পৃথিবীর পাণিপথ!
বিশ্বের সীমা তবুও আজকে রয়েছে ভৌগোলিক,
রক্তিম আভা সে নিয়েছে তবু হয় নি ত গৈরিক!
সন্ধানী আলো ফেলে গেছে দূত ইস্পাত চক্ষের,
মন্বন্তরে তারা পরাশরী বিদ্রোহী পক্ষের,
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে তারাই হয়েছে কখনো কর্ণধার,
ক্রমাবর্তনবাদের সত্যে নিষ্ঠুর দুর্বার।
লণ্ঠন হাতে এ মহাশ্মশানে শবদেহ পার হয়ে
কেউ ফিরেছিল সন্ধান করে কয়টি চালের দানা,
রাতের পান্থ তোমার স্বীকৃতি ছিল না ত তার হয়ে,
রেখে দিয়েছিলে বারুদেতে লিখে প্রখ্যাত পরোয়ানা!
অনেক ভাঙা ও গড়ায় তৈরি হয়েছিল জনমত,
তারই চেতনায় পান্না হয়েছে আজকের পাণিপথ!

'র‍্যাফেলের ম্যাডোনা'

শ্রীসুধীর গুপ্ত

শুভ্র শোভা, শান্ত হাসি, করুণা-কোমল
স্নেহ-সমুজ্জ্বল দিঠি চির শান্তি-ভরা;
মৃত্তিকা-মালিন্য-মসী-ব্যথা-বিঘ্ন-হরা
মাতৃ-মূর্ত্তি মুগ্ধ করে রুক্ষ ভূমণ্ডল।
মরু-বক্ষে ঢেলে দিয়ে স্বর্গ-গঙ্গাজল
দূর করে জরাতুর জীবনের জরা;
অমৃত-পীযূষে বুঝি সর্ব্ব-সত্তা গড়া;—
ক্রুশ-বিদ্ধ জীবনের ছায়া সুশীতল!
'র‍্যাফেলে'র শিল্প-স্বপ্ন চির নিরুপমা,—
'ম্যাডোনা'র মাতৃ-ভাব বিহ্বল-বিবশ;—
সুন্দরের স্বপ্ন যেন শুভ্রা তিলোত্তমা;
বক্ষ-লগ্ন যীশু বুঝি মাতৃত্বেরই রস!
একাধারে এ ধরার প্রীতি আর ক্ষমা;—
শিল্প-শোভা ঈশ্বরেরও পেলো কি পরশ!

উত্থানের ডাক

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নর্মপথে বাজত যাদের বংশী কর্মরথে উঠত বেজে শঙ্খ,
ধর্মে যাদের মর্মে বাঁধা বর্ম, চলবে যে রে বাজিয়ে তারা ডঙ্ক।
গীতায় যেথা কৃষ্ণ দিলেন মন্ত্র দাবির লাগি করতে হবে যুদ্ধ,
বার্তা দিলেন আত্মা অবিনশ্বর অহিংসারি মন্ত্র দিলেন বুদ্ধ।
পুরুষরা যার ব্রহ্মতেজে দীপ্ত অঙ্গনারা সতীত্বেরি বিদ্যুৎ,
জনসাধারণ সবাই ছিল তৃপ্ত শক্তি তেজে সবাই ছিল শিবদূত।
দুঃখে কেন আজকে তারা দগ্ধ সর্বমানব দুর্দশাতে জলছে,
কল্যাণীরা পায়ের তলায় পিষ্ট জীবন্মৃতের মতন সবাই চলছে।
দুঃখ এবং দৈন্যেরি নাই শেষ যে, পাপের বিষে
আজ যে সবাই পূর্ণ,
দুর্দিনে এর উপায় পাওয়া মুক্তির পাপের বিনাশ চাই
করা আজ তূর্ণ।
এমনি করেই করতে হবে শুদ্ধি অগ্নিতে আজ
করতে হবে স্নান রে,
উর্দ্ধমুখী করতে হবে মনপ্রাণ পরার্থেতে স্বার্থ বলিদান রে।
পবিত্র আর না হও যদি নির্ভীক বজ্রাতে যে
পড়বি ভেঙ্গে ঝন্‌ঝন্‌;
নিষ্পাপ হলে দুর্দশারি ধ্বংসে যুগের চাকা ঘুরিয়ে দিবি বনবন।
আজ হওয়া চাই পবিত্র আর নির্ভীক আত্মতেজের
শৌর্য্যেতে হও দুর্বার,
তোমরা যে ভাই অমৃতেরি পুত্র যে দেশ ছিল
লীলার ভূমি দুর্গার,—
সেই দেশেরই বাসিন্দা যে তোমরা দুর্নীতদের বইলে
পাপের অংশ,
দুর্নীতেরা হবেই জেনো খান-খান তাদের সাথে
তোরাও হবি ধ্বংস।
আজও যে রে সময় আছে ফিরবার আত্মতেজের
তোলরে জেলে অগ্নি,
তোমরা আবার শৌর্য্যদেবের গোত্রে সর্বজয়ী
হও গো ভ্রাতাভগ্নি!
বিশ্বে আবার শ্রেষ্ঠ হয়ে তোমরা দুর্নীতি পাপ
দাও করে সব খান-খান,
তোমরা আবার হও জগতের বিস্ময় সবাই
বলুক অমৃতেরি সন্তান।

বিংশ শতকের বিজ্ঞান-সাধনা

শ্রীশশাঙ্কশেখর মিত্র
(মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়)

সমসাময়িক কালে বিজ্ঞান ঔপপত্তিক তথা ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই, বেশ অগ্রসর হয়েছে। বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আমাদের জ্ঞানের প্রসার যেমন বিরাট তেমনই ব্যাপক। কয়েকটি মূলতত্ত্বের আবিষ্কারে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি যেমন ত্বরান্বিত হয়েছে তেমনই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে নব নব গবেষণার দ্বার; সামগ্রিকরূপেও উন্নতি অল্প হয় নি। ১৯০৫ এবং ১৯১৬ সনে আবিষ্কৃত, আইনষ্টাইনের বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এইরূপ একটি যুগান্তকারী মূল সিদ্ধান্ত। দেশ ও কালের মধ্যে অনাবিষ্কৃত রহস্যময় সম্বন্ধের স্বরূপ নির্ণয় করেই এর উপযোগিতা শেষ হ'ল না, বলবিদ্যা ও তড়িচ্চুম্বকিবাদের প্রচলিত নীতির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত প্রায়োগিক-গণিত ও পদার্থবিদ্যার পূর্ণাবয়বে নাড়া দিতে সমর্থ হ'ল। এরই সঙ্গে সঙ্গে পরমাণবিক ও কণিকা জগতের নানা তথ্যের সন্ধান পেয়ে আমাদের সম্মুখে এক নূতন ও পরমাশ্চর্য্য বিশ্বের রহস্যাবগুণ্ঠন আজ অপসারিত। মানুষের স্থূল দৃষ্টি যে জগৎ অবলোকনে অভ্যস্ত তাই প্রকৃতির চরম সত্য নয় আর এক সূক্ষ্ম ও জটিল বিশ্বের পরোক্ষ স্বীকৃতি পাওয়া গেল মূল কণিকাগুলির সক্রিয়তায়, যেখানে বিরতি ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে প্রকৃতি প্রাণবন্ত। সে জগতে বস্তুই শুধু পরম সূক্ষ্মতায় পরা ও অপরা তড়িৎ কণিকায় বিশ্লেষিত নয়, আলোক-তরঙ্গ ও সজ্জাকারে, কণারূপী প্রকৃতির মূল কণিকার তালিকা ইলেক্ট্রন, প্রোটিন-ফোটিনেই সীমিত নয়, নিয়ত বর্দ্ধিষ্ণু কলেবরে যুক্ত হয়েছে নিউট্রন, পজিট্রন ও অজস্র মেসন।

কৃষ্ণ পদার্থ বিকিরণের বিষয়ে অনুসন্ধানের অবসরে প্ল্যাঙ্ক আবিষ্কার করলেন আলোকের পরিমাণবাদ। এই বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্তের সাহায্যে নিলস্‌বোর পরমাণুর একটি যুক্তিসঙ্গত চিত্ররূপ প্রস্তুতিতে সমর্থ হলেন। এরই উপর ভিত্তি করে অথচ একে যথেষ্ট পরিমার্জ্জিত করে গড়ে উঠল তরঙ্গ ও পরিমাণ বলবিদ্যা। ইতিমধ্যে পদার্থের দ্বৈতবাদও আবিষ্কৃত হয়েছে—অর্থাৎ, বস্তু একই সঙ্গে কণিকা-সমষ্টি ও তরঙ্গগুচ্ছ এবং তার প্রায়োগিক স্বীকৃতি এসেছে ইলেকট্রন বিচ্ছুরণের গবেষণায়। আদি নৈশ্চিত্যবাদের (যা রক্ষণশীল বিজ্ঞানীদের একটি অভ্যাস বিশেষ) আস্থার ভিত্তিমূলে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করল সম্ভাবনাবাদ ও অনিশ্চিয়তাবাদের তর্ক কণ্টকিত ধারণা। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-সাধনায় নানা উপপ্লবের মধ্য দিয়ে এক বিচিত্র বিপ্লবরূপ পরিগ্রহ করল।

পরমাণু-অন্তরের কেন্দ্রীণও কম রহস্যের আকর নয়। অজস্র আলোড়ন-বিলোড়ন, আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণের প্রাচুর্য্যে পরমাণু কেন্দ্রীণের গঠন আপাতদৃষ্টিতে দুর্ব্বোধ্য। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি মৌলের তেজস্ক্রিয়তা। পরমাণু নাভিকের অঙ্গবিন্যাসের দুরূহতার প্রথম পরিচয় বহন করে আনল এবং এই অনুসন্ধানের পরবর্তী অধ্যায়ে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা, কেন্দ্রীণ বিভাজন ও এক মৌলের অন্য মৌলে রূপান্তরিত হবার উপায়ও আবিষ্কৃত হ'ল। নানারূপ কেন্দ্রীণ বিকিরণ ও বিশ্বরশ্মির অশ্রান্ত স্নেহসম্পাত এই রহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। কেন্দ্রীণ পদার্থবিদ্যা প্রতি নিয়তই নাভিক-অভ্যন্তরের নব নব ঘটনা-পরম্পরার আবিষ্কারে রত। আজ কেন্দ্রীণের গঠন ও স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা করা সম্ভবপর হয়েছে। এই শিশু-বিজ্ঞানের নিত্য নূতন প্রয়াস এর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করছে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের পর এই বোধ হয় প্রথম এত ব্যাপক ও বিরাট প্রায়োগিক উন্নতির সূচনা হ'ল: এ যুগের আলাদীনের প্রদীপ আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ (ফটো ইলেকট্রিক সেল) ও তাপ আয়নিক বর্ত্তিকা (থার্ম্মায়নিক ভাল্‌ভ) দৈনন্দিন জীবনে ও শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে বহু অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। বেতার, দূরেক্ষণ (টেলিভিশন) ও রাডার বিলাস তথা প্রয়োজনের বিশিষ্ট অঙ্গরূপে আমাদের কর্ম্মজীবনে এক অপরিহার্য্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই বিদ্যুৎ ও বেতার যান্ত্রিকতার দিনে বিজ্ঞানের প্রয়োগধর্ম্মিতা প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হয়। কেন্দ্রীণ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও এক নব দিগন্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পরমাণবিক ও হাইড্রোজেন অস্ত্রের ব্যাপক মারণ-ক্ষমতাই শুধু এর দান নয়, আজ শান্তির দিনে শিল্পক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে এক বিপুল সম্ভাবনা। এর দৌলতে অদূরভবিষ্যতে সভ্যতা ও সমাজের রূপ বদলে যাবে। শান্তিকামী মানুষের করায়ত্ত অপরিসীম ক্ষমতা ইতিহাসকে দেবে অভিনব গতিবেগ।

কেন্দ্রীণ রসায়ণের চরম উন্নতির দিনে তেজ-সরবরাহের জন্য জ্বালানির সন্ধানে খনির অন্ধকার গহ্বরে আর নামতে হবে না। তাপ-নাভিকীয় প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন তেজের চাহিদা মিটবে একান্তভাবে। খনিজ পদার্থের উপর নির্ভর করে থাকার হাত হতে হয়ত মানুষ অচিরেই মুক্তি পাবে, কিন্তু মনে হয় উদ্ভিদ জগতের মুখাপেক্ষী হয়ে এখনও তাকে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। বনস্পতি জগতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ প্রধানতঃ খাদ্য-খাদকের। দৈনন্দিন খাদ্যের তিনটি প্রধান অঙ্গ—শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থ। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ উপায়ে এই তিনটিই আসে তরুরাজি হতে। কিন্তু বনজগতের উৎপাদন-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ অথচ পৃথিবীর লোকসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। ভেষজ বিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি এবং রসায়ণসম্মত স্বাস্থ্যবিধি পালনে মৃত্যুহার আজ হ্রাসপ্রাপ্ত, ওদিকে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এই ভাবে জন্মহার বৃদ্ধি পেতে থাকলে আশা করা যায় আগামী সত্তর বৎসরে লোক-

সংখ্যা দ্বিগুণিত হবে। এই ক্রমবর্দ্ধমান বিপুল জনসমষ্টির খাদ্য কেবলমাত্র বনস্পতি জগতের নিকট পাওয়া সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করা। সংশ্লেষণের দ্বারা শর্করা প্রস্তুতের গবেষণা আরম্ভ হয়ে গেছে। এই অনুসন্ধানের ধারা প্রধানতঃ দুইটি : প্রকৃতির অনুকরণে পর্ণশ্যামের অনুরূপ কোন অনুঘটকের সাহায্যে আলোক সংশ্লেষণের দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের সংমিশ্রণ ঘটন। এই প্রণালী অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মের মতই ধীর গতিসম্পন্ন এবং এর উৎপাদন-ক্ষমতাতে সীমাবদ্ধ। অন্য উপায় সরাসরি কঠিন ও জলের সংশ্লেষণ—উচ্চ তাপ ও চাপের দ্বারা এর গতিও নিয়ন্ত্রিত করা চলে। দুই প্রণালীতেই গবেষণা চলছে। এমিল ফিসারের কৃত্রিম উপায়ে শর্করা সংশ্লেষণ এদিকে একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। আশা করা যায়, শর্করা অণুর একত্রীকরণের দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে শ্বেতসার প্রস্তুতও সম্ভব হবে। প্রোটিন সংশ্লেষণও আজ শুষ্ক জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্র অতিক্রম করে ব্যবহারিক জীবনে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় রত। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বস্তুসমূহের সুবিধা সাধারণতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন, দ্বিতীয়তঃ অনুরূপ প্রাকৃতিক বস্তুগুলি অপেক্ষা এদের ব্যবহারও ব্যাপকতর। উদাহরণস্বরূপ কৃত্রিম নীল অথবা রবারের নাম করা চলে। অবিসংবাদিত রূপে এরা প্রাকৃতিক দ্রব্যগুলি হতে অধিকতর উপযোগী। এ বিষয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার সাংশ্লেষিক পেট্রল। বিবিধ গন্ধসার, প্লাষ্টিক ও বহু কৃত্রিম তন্তুময় ও রেশমী বস্ত্র সাংশ্লেষিক উপায়ে প্রস্তুত করা এই ব্যাপক কর্ম্মসূচীরই অঙ্গবিশেষ।

পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও ফলিত বিজ্ঞানের চমকপ্রদ উন্নতির দিনে জীববিদ্যাও পিছনে পড়ে নেই। জীব রহস্যেরও অতলান্ত সমস্যা সমাধানে তার ক্লান্তিহীন প্রয়াস। আমরা জানলাম প্রত্যেক জীবিত পদার্থের একক যে কোষ তাও আর অবিভাজ্য নয়। বিভিন্ন ক্রোমোসোমের দ্বারা গড়ে উঠেছে তার নাভিক। ভিন্ন ভিন্ন জীবে এই ক্রোমোসোম সংখ্যার তারতম্য। মানব জাতির প্রত্যেক কোষে এর সংখ্যা আটচল্লিশ। কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে বিভাজনের দ্বারা। প্রত্যেক অপত্য কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা অপরিবর্ত্তিতই থাকে। কিন্তু ক্রোমোসোমগুলিও শেষ কথা নয়, এরা গঠিত হয় প্রাণকণা বা জিন নামক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রসায়নিক বস্তুপিণ্ডের দ্বারা। এই জিনই বহন করে কুল-স্মৃতি, জীবের অভিব্যক্তিও ঘটে এই জিনের মাধ্যমে। সময় সময় পরিব্যাপ্তির (মুটেশন) দ্বারা প্রাণকণিকার মৌলিক পরিবর্ত্তনও সাধিত হয়। পরিব্যাপ্তির কারণ নিয়ে বাদানুবাদের শেষ এখনও হয় নি। এক দল বৈজ্ঞানিকের মতে পরিবেশের প্রভাবে প্রাণপঙ্কের নিরন্তর উন্নতি অভীপ্সাই এর কারণ, অপর দলের মতে এ সম্পূর্ণরূপে দুর্ঘটনাপ্রসূত, আকস্মিক। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর মতানুসারে—জীবন সত্তার অমেয় আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্তির দুর্দ্দম্য শক্তিতে প্রেরণা সঞ্চারকারী। মনে হয়, প্রগতিশীল জীববিদ্গণ এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হন নি। নব-ডারউইনবাদ এখনও নিখুঁত যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় ; তবে আশা করা যায়, অচিরে বিবর্ত্তন ও পরিব্যাপ্তির জটিল পন্থার সুষ্ঠু ব্যাখ্যায় এ সক্ষম হবে। আর এক বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশ ও বংশগতির তুলনামূলক প্রভাব নিয়ে। রুশ বৈজ্ঞানিক মহামতি লাইসেনকোর আবিষ্কার, বিবর্ত্তনের বংশগত ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত, সংকীর্ণমনা পণ্ডিতদের বিরূপ করে তুলেছে। লাইসেনকোর মতে সুষ্ঠু পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা অপত্য-বংশের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব এবং বংশগতির ধারণা এখানে একান্তই অপ্রয়োজনীয়। আবিষ্কার ধনতন্ত্রী সমাজের মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছে এবং কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণকল্পে আজ বহু জ্ঞানী ব্যক্তিও সত্যকে স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ। জ্ঞানানুশীলনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখি, প্রতি যুগেই বহু বৃহৎ আবিষ্কারকে ব্যক্তিগত অথবা সংকীর্ণ সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই বিরোধী শক্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিবাদের জয়যাত্রাকে সাময়িকরূপে ব্যাহত করে সন্দেহ নেই। মোটের উপর জীবন যে বস্তুরই এক বিশিষ্ট প্রকাশ এ বিষয়ে রাসায়নিকগণ একমত হলেও প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে জীববিদ্যা বা ভ্রূণবিদ্যা এখনও পর্য্যন্ত তেমন সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হতে সমর্থ হয় নি।

বিজ্ঞানের অবিশ্রান্ত অগ্রগতির ফলে একদিকে আমরা যেমন পেলাম বেতার, দূরেক্ষণ (টেলিভিশন), বিমানপোত, রকেট, পরমাণবিক শক্তির নানা ব্যবহার, খাদ্যপ্রাণ, পেনিসিলিন, হর্ম্মোন, জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায়, অন্যদিকে আমাদের ভাবনা-কল্পনা চিন্তনেও এল আমূল পরিবর্ত্তন। নানা বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এর অবয়ব, গতিশীলতাই এর অন্তরের গূঢ় সত্য, বিজ্ঞান তাই বিপ্লবাত্মক। নিত্য নূতন কৌশল অভিনব তত্ত্ব ও ফলিত-ক্ষেত্রে তার নূতন ব্যবহার, নূতন সমস্যা ও তার নবতর সমাধান—বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও প্রয়োগশালার অবিরাম কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে বিরাট এক সম্ভাবনার বীজ উপ্ত। আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিতে বিজ্ঞানের অপরিসীম প্রভাবের কথা বিস্মৃত হওয়া সমীচীন নয়। সমসাময়িক শিল্পপ্রচেষ্টার মধ্যে অনায়াসেই এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

নিউটন-উত্তর যুগের বিজ্ঞান সাধকদের নিকট কার্য্যকারণবাদ প্রায় একটি প্রকল্পরূপে গৃহীত হয়েছিল। প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার প্রকাশ-প্রবণতার যান্ত্রিক ব্যাখ্যার প্রয়াস ও তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বের যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে জন্মলাভ করেছিল এই বোধ। পরবর্তী যুগের সমস্ত সৃষ্টিধর্ম্মী ভাবনা-কল্পনায় দেখি এর সমগ্র প্রভাব। বিজ্ঞান শুধুমাত্র ভৌতিক ঘটনাবলীর উৎস সন্ধান নয়, দর্শন, অধ্যাত্মবিদ্যা, সমাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার জ্ঞানের প্রায় প্রত্যেক শাখাতেই এর পরোক্ষ প্রভাব। যদিচ সমকালীন পদার্থবিদ্যার কয়েকটি যুগান্তকারী অনুসন্ধান এই প্রকল্পের বিপক্ষে কিছু সন্দেহের উদ্রেক করেছে, তবুও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়েছে

বলে মনে হয় না। অনিশ্চিত্যবাদ আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্ভুলতার সূক্ষ্ম সীমা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে তাই বলে বহিঃপ্রকৃতির বিরাট স্পন্দন-প্রাচুর্য্যের কার্য্যকারণগত সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি করে নি।

এই সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয়—বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান কিরূপ দ্রুতগতিতে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের এই যাত্রাপথ কিন্তু নিতান্ত মসৃণ নয়। প্রায় প্রতি যুগেই সমাজের রক্ষণশীল মনোবৃত্তি নানারূপ কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে, শুধু শৃঙ্খলাবদ্ধ ধী-শক্তির উন্মেষেই নয়, দেশকালাতীত এক সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টিও বিজ্ঞানের অন্যতম দান। এর বিচার ও পরীক্ষালব্ধ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি জ্ঞান-চিন্তা-মনন-ক্রিয়ায় নিয়মানুবর্ত্তিতার অভ্যাস প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের সমাধান ও মহাজগতের চরম তত্ত্বসন্ধানের দিন হয়ত এখনও আসে নি, কিন্তু সত্যানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ঋদ্ধ প্রজ্ঞালোকে উন্নীত করেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উপযোগিতা—অর্থ নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে এর অপরিসীম ক্ষমতার পরিচয়ে আজ আমরা বিস্মিত। হয়ত সময় সময় ক্ষয় ও ধ্বংসের সহযোগিতায় বিজ্ঞানের বিকৃত ভূমিকা আমাদের ব্যথিত করছে কিন্তু তা সাময়িক; পরে শান্তির দিনে, তার কল্যাণময়ী মূর্ত্তি নব-দিগন্তের বাণী বহন করে এনেছে। সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্ত্তনের অবিসংবাদিত আধিপত্য প্রচুর গতিবেগ ও অনুপ্রেরণার সমাবেশ ঘটিয়ে এক শুভ ও সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার ইঙ্গিত প্রদান করছে।

মায়ের সোহাগে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

দুঃখ কষ্ট অনেক সহেছি, তবুও সুখের অন্ত নাই,
মায়ের সোহাগে সহনীয় হ'ল, তীব্র অনেক যন্ত্রণাই।
কূটবুদ্ধি কি কোন বুদ্ধিই, দেয় নি মা মোর মস্তকে,
কোন কাজে নয়—মুখের কাছেই ঘুরিতে দেখি এ হস্তকে।
যশ পাই নাই, যশ চাই নাই, পেয়েছি অলস সুস্থ মন,
রাজ্যবিহীন রাজা হয়ে আছি—লভিয়া মাটির সিংহাসন।
সব ধুলা 'মা'র চরণধুলা যে, ধূসর হয়েছি তাই মেখে,—
সবাই আপন, সবেই তৃপ্তি, করুণা তাঁহার পাই ডেকে।

২

জানলায় মোর কপাট নাহিক, মোড়া তা খড়ের কিঙ্খাপে,
পৌষে ও মাঘে ডরি যে মায়ের-বাপের-বাড়ীর হিমটা কে।
বাড়ীতে হয় না চুরি কি ডাকাতি, সুখ্যাতি মোর দেশময়ই,
জানে—দিনে যেথা অর্থ মিলে না, রাতে মিলিবে না নিশ্চয়ই।
বাড়ী পাকা নয়, কেন করি নাক'?
লোকে বলে,যাহা শুনছি তো,
অপরের ভয়ে বিশাল সৌধ রূপায়িত হতে কুণ্ঠিত।
রূপার অভাব জেনেও বলে না—গৃহে ঠাঁই যদি নাই থাকে,
সদয় অজয় নিজে দোষ লয়ে—নিতি গরীবের মান রাখে।

৩

অতিথি আসেন, তাঁরা দেবময়—প্রচুর না হউক খাদ্যাদি,
আদর এবং পানীয় জলের কতই করেন সুখ্যাতি।
আমি—আত্মীয় বন্ধুগণের গৃহে গেলে ভয় পায় না কো,
অভিক্ষুক যে লোকটা তা জানে—
কাহাকেও কিছু চায় না কো।
জ্ঞানী, গুণী, ধনী কিছুই তো নহি—তবু বসে থাকি বিজ্ঞবৎ—
যেতে হয় নাক কোনো দরবারে, দিতে হয় নাক' কৈফিয়ৎ।
প্রজ্ঞা লভিতে, পুস্তক পড়ি—খাই নাক বটে গঞ্জিকা,—
লেখা 'আড়া' জল-বিন্দু সলিল মিলে না নিঙাড়ি পঞ্জিকা।

৪

বুড়া হইয়াছি বুঝিতে দেয় না—বুঝি যাই যবে গ্রাম ছেড়ে,
গ্রামেতে এখনো শিশু হয়ে আছি—আরামে কাটিছে দিন বেড়ে।
ছোট ছেলে-মেয়ে ঘিরে রয় মোরে—ভেঙ্গে
আসে যেন গ্রাম গোটা,
বাধা মানে নাক', ষষ্ঠী দেবীর দধি হলুদের দেয় ফোঁটা।
প্রাচীন অশথ নূতন পত্রে সুশোভিত হয়ে প্রান্তরে—
হেসে যেন বলে, 'দেখিছ বন্ধু বেশ কাঁচা আছি অন্তরে'।
কোকিল শুধায়,'কেমন আছ হে?' বক বলে,'উড়ে যাচ্ছি ভাই'
'ভাল আছ—আর ভাল থেকো যেন'—সবাকার
মুখে এক কথাই।

৫

কৃষ্ণচূড়াটি চূড়া বেঁধে দেয়, টোপর পরাতে বট চাহে—
বংশ বংশী লয়ে কাছে আসে—তবুও লাগে যে খটকা হে।
বুড়া আকন্দ ফুলে ফুলে ভরা বলে কই দেখা পাইনে আর?
ফিরিবার পথে দেখা হ'ল আজ—ঘনায়ে আসিছে অন্ধকার।
ফুল চেয়ে বেশী কাঁটা পেয়ে থাকি কাহারো উপরে নাইক' রাগ,
সুবোধ বালক 'গোপাল' ছিলাম, 'বেণী' করিয়াছে
'মা'র সোহাগ।
ক্ষীর কই? কই মিঠাই কোথায়? যোগাইতে হয় আজ তাঁরে,
জগজ্জননী ঝালাপালা হন—অকৃতী সুতের আবদারে।

ইটালীর যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন-প্রচেষ্টা

বিচিত্র দেশ ইটালী। এখানকার পথে-প্রান্তরে প্রকৃতি যেন সৌন্দর্য্যের হাট খুলিয়া বসিয়াছে—ইটালী বাস্তবিকই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন। আল্পস উপত্যকার নিরুপম শোভা এবং মৌন প্রশান্তিতে আকৃষ্ট হইয়া প্রতি বৎসর দেশদেশান্তর হইতে অগণিত পর্য্যটক আসিয়া উপস্থিত হয় এই রমণীয় ভূমিতে—সেস্তো উপত্যকার পাইনবনের ওপারে পর্ব্বতশৃঙ্গদ্বয়ের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃশ্য তাদের হৃদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করে। প্রকৃতির এই অনুপম রূপ ইটালীর অধিবাসীদের অন্তরে যে কি গভীর সৌন্দর্য্যবোধের সঞ্চার করিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় এদেশের সর্ব্বত্র-ছড়ানো অগণিত শিল্পকর্ম্মের নিদর্শনসমূহ হইতে। এগুলি দর্শকের নয়নের পরিতৃপ্তিসাধন করে।

সাম্প্রতিক কালে ইটালীতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন-প্রচেষ্টামূলক কার্য্যাবলী যেরূপ সাফল্যের সহিত অনুসৃত হইতেছে তাহার দরুন এই রমণীয় দেশটির প্রতি সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এখানকার উন্নয়নমূলক কার্য্যসমূহের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয়লাভের মানসে বিদেশাগত পর্য্যটকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে।

দক্ষিণ ইটালীর পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য রাষ্ট্র "সাউদার্ণ ইটালী ফণ্ড" নামে একটি ধনভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ফণ্ডের সাহায্যে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে, পরিকল্পিত কণ্ট্রাক্টের কাজের জন্য মোট ব্যয় দাঁড়াইয়াছে ৪১১,২০০ লিরার, তন্মধ্যে রাস্তানির্ম্মাণ বাবদ খরচ হইয়াছে ৬২,৫০০ লিরা।

"সাউদার্ণ ইটালী ফণ্ডে"র অর্থে জলসেচের খাল কাটানো, বাঁধ-নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্য পরিসমাপ্ত হওয়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলসেচের সুবিধা হইয়াছে। কৃষিসংক্রান্ত অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথে ইহাকে বলা যাইতে পারে প্রাথমিক অপরিহার্য্য ব্যবস্থা। কাম্পানিয়ার ভলতুরনো নদীর উপরকার বাঁধের দৌলতে যে পরিমাণ জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা দ্বারা হাজার হাজার হেক্টেয়ার জমি উর্ব্বরা হইবে।

গত কয় বৎসরের মধ্যে ইটালীতে যন্ত্রশিল্পের যেরূপ উৎকর্ষ-সাধন হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয় ইটালীর ইলেক্ট্রো-মেকানিক শিল্পের কথা। আধুনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে সমগ্র লৌহ এবং ইস্পাত সেক্টারের পুনর্গঠন ইটালীকে ইস্পাত-উৎপাদক দেশসমূহের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আজিকার দিনে ২৮০টি ওয়ার্কশপ-সমন্বিত যন্ত্রশিল্প দেশের বাজারের সামগ্রিক চাহিদা মিটাইয়া বিদেশেও রপ্তানি করিতে পারে।

ইটালীর কৃত্রিম রেশম ইত্যাদি বয়নশিল্প উপযোগিতা, মূল্যের স্বল্পতা ইত্যাদির জন্য দুনিয়ার বাজার জিতিয়া লইয়াছে। দেশের বাজারকে খুশী করিবার জন্য ইটালী যেমন তাহার উৎপাদন বাড়াইয়াছে তেমনি বিদেশের চাহিদা মিটানোর নিমিত্ত রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি করিয়াছে। সম্প্রতি ইটালী বয়নশিল্প রপ্তানিকারক দেশসমূহের পুরোভাগে আসন গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৫৫ সনে রপ্তানি হইয়াছিল ৩০,০০০ টনের অধিক বোনা বস্ত্র, দশ হাজার টন কাপড় ও ৩১,০০০ টন সুতা এবং অপচিত (waste) জিনিষ।

যুদ্ধের পরে ইটালী তাহার বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বাড়াইয়া এমন স্তরে লইয়া আসিয়াছে যে, তাহা দ্বারা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে যাবতীয় ভোগ-ব্যবহারের (consumption) প্রয়োজন মিটিয়া থাকে। এই উৎপাদন-বৃদ্ধির মূলে সর্ব্বোপরি রহিয়াছে উৎপাদক যন্ত্রপাতির (produotion apparatus) উন্নতিবিধান। ১৯৫৫ সালে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৭,৮০০,০০০,০০০ কিলোওয়াট।

ম্যাগিওর হ্রদের দক্ষিণে তিসিনো বাঁধের উপরে অনমনীয় দৃঢ়তায়, সমুন্নত শিরে দাঁড়াইয়া আছে বৃহৎ ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল জেনারেটিং প্ল্যাণ্টসমূহের অন্যতম পোর্তো দেল্লা তোরি। প্রতি বৎসর ইহাতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে ৬১,০০০,০০০ কিলোওয়াট এবং সেই সঙ্গে ইহা উত্তর নোভারা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এলেনা সেচ-খালের জল-সরবরাহের কাজকেও সহজসাধ্য করিবে।

যুদ্ধোত্তর কালে যান্ত্রিক সভ্যতার জয়রথ ইটালীর বুকের উপর দিয়া চলিয়াছে অব্যাহত ভাবে—দিকে দিকে উড্ডীন হইয়াছে যন্ত্র-

দক্ষিণ তাইরোলের সেস্তো উপত্যকায় দৃশ্য

আদ্রিজেস্তোর প্লাভানি নদীর উপর নির্মিত সেতু

কাম্প্যানিয়ার ভলতুর্ণোর উপর বাঁধ
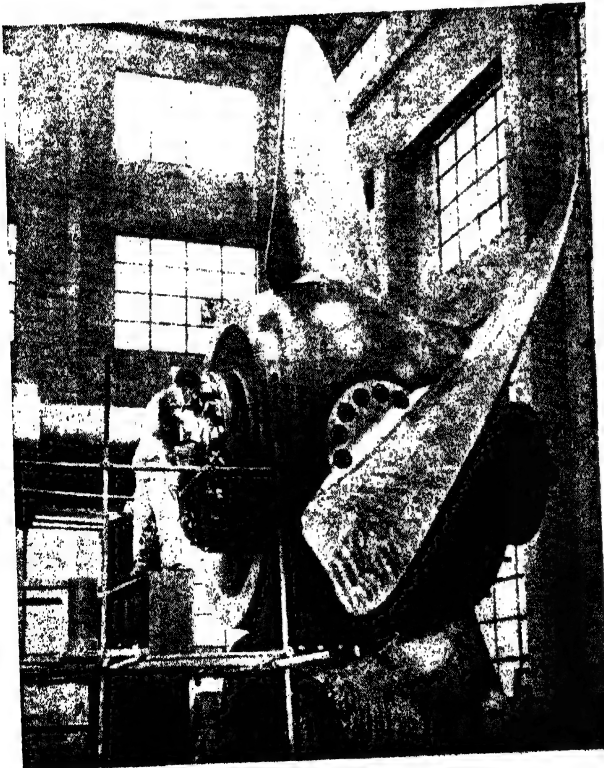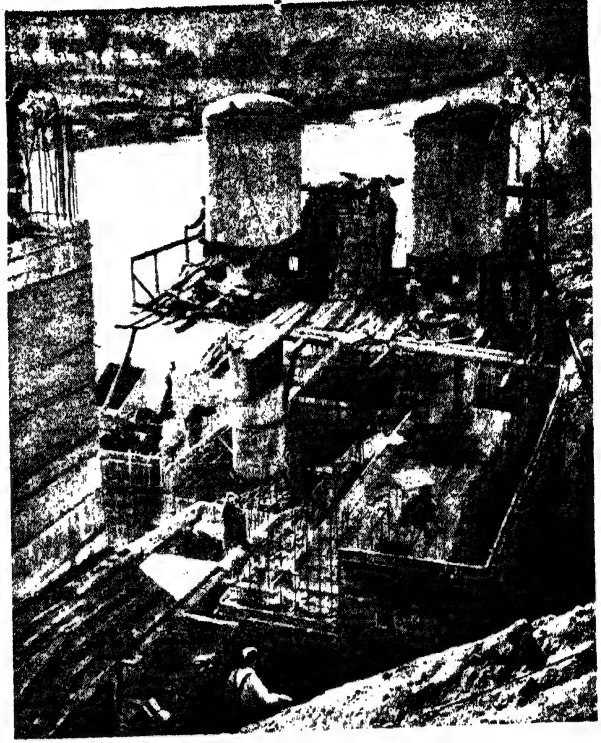
(৪) রিভারোলোর (তুরিন) আনসালদো-সান জিওরজিও ওয়ার্কশপে একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের অংশ—ইহা সুইডেনের একটি হাইড্রো-ইলেকটিক পাওয়ার ষ্টেশনে রপ্তানি করা হয়।

প্রেমাদিও (সন্দ্রিওতে) একটি হাইড্রো-
ইলেক্‌ট্রিক প্ল্যাণ্টের অংশবিশেষ স্থাপন

আসিসির একটি বিখ্যাত মৃৎপাত্রের বিপণি

যাজের বিজয়-কেতন। যন্ত্রশিল্পের এই অগ্রগতি কিন্তু এদেশের কারু-শিল্পের ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। বরং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন-প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রকার কারু-শিল্প ও কারিগরি কাজের পুনরুজ্জীবন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সুপ্রাচীন কাল হইতেই কাদা মাটি দিয়া ছাঁচে ফেলিয়া নানা জিনিষ তৈরি করায় ইটালীর নৈপুণ্যের কথা প্রচারিত আছে। বহু শতাব্দী-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দৌলতে ইটালী আজ অলঙ্করণ এবং গার্হস্থ্য কর্মে ব্যবহারোপযোগী এমন ব্যাপক ও বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করে যেগুলির গঠন-সৌষ্ঠবে এবং সুক্ষ্ম কারুকার্য্যে চমৎকৃত হইতে হয়। দেরুতার অন্তর্গত আব্রিয়া, ওরভিয়েতো, গুব্বিও, আসিসি এবং গুয়ালদো তাদিনো প্রভৃত কারিগরি কাজের বিখ্যাত কেন্দ্রসমূহ হইতে এগুলি দূরদূরান্তের গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়ে।

ইটালী একথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, বর্ত্তমান যুগে কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও যন্ত্রের সহায়তাকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না—এই দেশের সেরা কারিগরবাও আজ যুগোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। মৃৎপাত্র পোড়ানোর জন্য হাপরের সাহায্যে উত্তপ্ত চুল্লীর পরিবর্ত্তে তাহারা আজ বৈদ্যুতিক বিশুষ্ককারী যন্ত্র (Electric drier) ব্যবহার করে—ইহার সাহায্যে দ্রুত এবং নিখুঁত ভাবে কাজ সম্পন্ন হয়। তৎসত্ত্বেও মৃৎপাত্রাদির বাহ্য চাকচিক্য বিধানের (glazing) নিয়ম এবং পদ্ধতিসমূহ কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া গিয়াছে।

আসিসির রাস্তায় বেড়াইতে হঠাৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি রমণীর বিপণিতে সুসজ্জিত, উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট "ম্যাজোলিকা" এবং অন্যান্য মৃন্ময় পাত্রসমূহ। শত তাড়া থাকিলেও বিদেশী পর্য্যটক দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া এগুলির নিরুপম কারুকার্য্য নিরীক্ষণ না করিয়া পারেন না। এখানে নিশ্চিতই এমন কিছু দেখিতে পান যাহাকে তিনি ইটালীর স্মারকচিহ্নরূপে মনের মণিকোঠায় বহিয়া লইয়া যাইতে পারেন। এমনি ভাবে ইটালীতে সাম্প্রতিক কালে যন্ত্রশিল্পের পাশাপাশি কারুশিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের পরিচয় পাইয়া তাঁহার দৃষ্টির সমক্ষে জাতীয় উন্নয়ন ও পুনর্গঠন-প্রচেষ্টার এক নূতন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হয়।

ন. ভ.

ক্ষুদ্র-শিল্প ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেন

স্মরণ থাকতে পারে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বছরে ছোট ছোট কারখানাগুলিকে তিন কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হবে। অবশ্য কারখানাগুলিকে সরাসরিভাবে এই টাকা দেওয়া হবে না। জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের মারফত কারখানাগুলির মধ্যে টাকাটা বণ্টন করার ব্যবস্থা হয়েছে। কেবলমাত্র আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করবার জন্য কর্পোরেশন টাকা বণ্টন করবেন। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটে যে-সব ছোট ছোট কারখানা স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে সে-সব কারখানার উন্নতির ব্যাপারে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। এখানে উল্লেখ করা দরকার, মূলতঃ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের পরিকল্পনাটি উত্থাপিত হয়েছে বিগত ১৯৩০-৩২ সনে। সেটা পৃথিবী জুড়ে যে মন্দা দেখা গিয়েছিল তখন সে মন্দার অবসান হয়ে এসেছিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিশেষ করে ইউরোপ এবং আমেরিকায় বেকার-সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, শিল্পের দিক থেকে ইউরোপ এবং আমেরিকা অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু সে-সব এলাকায় কলকারখানার শ্রমিকরা যখন কর্মচ্যুত হলেন তখন এঁদের আর্থিক দুর্গতির সীমা রইল না। কর্মসংস্থানের অভাবে শিল্পোন্নত দেশগুলির বহু এলাকায় খুব শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হ'ল।

এই আর্থিক দুরবস্থা দূর করার জন্য শেষ পর্য্যন্ত এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল যে, দেশে যে-সব ছোট এবং মাঝারি আকারের শিল্প আছে সে-সব শিল্পকে গড়ে তুলতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে দেশের সরকারের পক্ষে, সাহায্য করা দরকার। পরবর্ত্তী কয়েক বছরের মধ্যে প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করার জন্য চেষ্টাও করা হয়েছে। যে-সব শিল্পোন্নত দেশ এই ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছে সে সব দেশের মধ্যে ব্রিটেন, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এই সব দেশে কেবলমাত্র সরকারী সাহায্যে ছোট এবং মাঝারি আকারের শিল্প গড়ে ওঠে নি। আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ এবং আর্থিক সাহায্যও এই শিল্প স্থাপিত হবার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট বলতে আমরা কি বুঝি, এবং কেনই বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট গঠন করতে হলে একটা সুনির্ব্বাচিত এবং সুনির্দ্দিষ্ট জায়গায় এমন কতকগুলি কারখানা-বাড়ী তৈরি হওয়া দরকার যেগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র আকারের শিল্প স্থাপন করা। তা ছাড়া নির্ম্মিত কারখানা-বাড়ীগুলি ভাড়া দিতে হবে কিংবা এমন ভাবে বিক্রী করতে হবে যার ফলে কিস্তীবন্দী হারে মূল্য আদায় করা সম্ভবপর হবে। কারখানা-বাড়ী

তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে ভাল পথঘাট এবং কারখানার কর্ম্মীদের বসবাসেরও সুবন্দোবস্ত করা দরকার।

বিগত ১৯৩৪ সনে ব্রিটেনে উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ সম্বন্ধীয় একটা বিশেষ অঞ্চল-আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষ আইনের ধারা অনুযায়ী সেখানে প্রথম ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট গঠিত হয়েছে। এষ্টেটটি ব্রিটেনের উত্তর-পূর্ব্ব এলাকার অন্তর্ভুক্ত টিম উপত্যকায় অবস্থিত এবং এটা গঠিত হবার সময় হ'ল বিগত ১৯৩৬ সন। এখানে উল্লেখ করা দরকার, এষ্টেটটির মূলধন এসেছে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে, যদিও এটা যৌথ আইন অনুযায়ী রেজেষ্ট্রি করা হয়েছে। এই এষ্টেটের পরিকল্পনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কতকগুলো কারখানা-বাড়ী নির্ম্মাণ করে ভাড়া দেবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, অবস্থা অনুযায়ী সেগুলিকে থোক কিংবা কিস্তিবন্দী হারে দাম নিয়ে বিক্রী করে দেবার কথাও বলা হয়েছে। কারখানা-বাড়ীর জন্য ব্যবহৃত জমির মূল্য পরিশোধ করার জন্য সরকারই দায়ী। এ ছাড়া এষ্টেটের স্কুল, বাজার, পথঘাট ইত্যাদি সম্বন্ধীয় খরচও সরকারের বহন করার কথা। ক্রমে ক্রমে টিম উপত্যকায় গঠিত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের মত ব্রিটেনের অনেক জায়গায় আরও এষ্টেট গঠনের কাজ সুরু হয়ে গেল এবং এষ্টেটের কার্য্যাবলীর পরিধিও বেড়ে যেতে লাগল। যদি ভারতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের পরিকল্পনা ব্যাপক এবং সার্থকভাবে কার্য্যকরী করা হয় তা হলে একদিকে যে রকম জনসাধারণের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে যাবে অন্যদিকে তেমনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হবার আশা আছে।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটে স্থাপিত শিল্প-কারখানায় নূতন নূতন কাজ সৃষ্টি হবার ফলে বহু লোক জীবিকা অর্জ্জনের পথ খুঁজে পাবেন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, টাকা রোজগার করতে পারলে মানুষ নিজের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চেষ্টা করে থাকে। কাজেই কারখানায় নিযুক্ত লোকের অর্থব্যয় করার ক্ষমতা যখন বাড়বে তখন অন্যান্য শ্রেণীর লোক কারখানায় নিযুক্ত না হয়েও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় এবং ছোটখাটো শিল্পের সাহায্য নিয়ে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। তা ছাড়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটে স্থাপিত শিল্প-কারখানায় যে সব জিনিষ দরকার সে সব জিনিষের অনেকগুলি বাইরে থেকে না কিনে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে ক্রয় করা যেতে পারে। যে এলাকায় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট গঠিত হবে সে এলাকায় একদিকে যে রকম পথঘাটের সুবন্দোবস্ত হবে, সে রকম অন্যদিকে শিক্ষার প্রসার এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

ব্রিটেন, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্পের প্রয়োজন অনুসারে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের উদ্দেশ্যও ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। প্রথম যখন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তখন কেবলমাত্র কারখানা-বাড়ী তৈরি করার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল, কেবলমাত্র কারখানা-বাড়ী তৈরি করে ভাড়া দিলে কিংবা বিক্রী করলে চলবে না। এর কারণ হ'ল এই যে, সুষ্ঠুভাবে শিল্প পরিচালনার জন্য যে অর্থ দরকার সে অর্থের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। অর্থাৎ, আমরা যে কথাটি বলতে চাইছি তা হ'ল এই যে, যদিও শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা হয়ত নেহাত কম ছিল না, তথাপি যেহেতু এঁদের অনেকের পক্ষে কার্য্যকরী মূলধন এবং যন্ত্রপাতির মূল্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হ'ত না সেহেতু এঁরা সুষ্ঠুভাবে শিল্প পরিচালনা করতে পারেন নি। তাই এঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় করে ভাড়া দেবার আয়োজন করা হ'ল। যাঁরা যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাঁরা কিস্তিবন্দী হারে মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ লাভ করলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও শিল্প তেমন প্রসারিত হয় নি। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এমন আরও কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'ল যেগুলির ফলে শিল্পের পরিচালকেরা কম দামে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করতে এবং ন্যায্য মূল্যে তৈরী মাল বিক্রী করতে সমর্থ হলেন। তা ছাড়া এষ্টেটের ভিতরেই স্থাপিত বারোয়ারী কারখানায় এঁদের পক্ষে যন্ত্রপাতি মেরামত করাও সুবিধাজনক হ'ল।

প্রচারিত খবরে প্রকাশ, ভারতে এগারটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট গঠনের জন্য ইতিমধ্যে আয়োজন করা হয়েছে। বর্ত্তমানে যে-সব জায়গায় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট গঠন করা হবে বলে জানা গিয়েছে সে-সব জায়গার নাম হ'ল—রাজকোট, বিরুধনগর, গুইণ্ডি, কল্যাণী, ওখলা, পালঘাট-মালমপুঝা, কুইলোন, মহীশূর, আগ্রা, কানপুর এবং এলাহাবাদ। রাজকোট সৌরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। বিরুধনগর এবং গুইণ্ডি অবস্থিত মাদ্রাজে। কল্যাণী হচ্ছে পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত। ওখলা দিল্লীতে, পালঘাট-মালমপুঝা মালাবারে এবং কুইলোন ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে অবস্থিত। অনুমান করা হয়েছে, এগারটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের জন্য যে টাকা ব্যয় করা প্রয়োজনীয় হবে, সে টাকার মোট পরিমাণ পাঁচ কোটির কম হবে না। প্রশ্ন হ'ল, অত টাকা কোথা থেকে পাওয়া যাবে। আপাততঃ এই সব এষ্টেট গঠনের জন্য মোট যা খরচ পড়বে তার সবটাই কেন্দ্রীয় সরবরাহ করতে রাজী আছেন। তবে টাকাটা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে না ততদিন পর্য্যন্ত যে-সব রাজ্যে এষ্টেট গঠিত হবে সে-সব রাজ্যের সরকার এষ্টেট পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবেন। শোনা যাচ্ছে, অদূরভবিষ্যতে এমন কতকগুলি স্বায়ত্তকর্তৃত্বসম্পন্ন কর্পোরেশন গঠিত হতে পারে যেগুলির হাতে এষ্টেট পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে।

এত দিন পর্য্যন্ত আমরা দেখে এসেছি, আমাদের দেশে যাঁদের কারিগরী বিদ্যা অর্জ্জন করার সুযোগ হয়েছে তাঁদের বেশীর ভাগের পক্ষে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করা সম্ভবপর হয় নি। অর্থাৎ এঁরা চাকুরি করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আজ যদি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল

এষ্টেটের পরিকল্পনা সার্থকভাবে কার্য্যকরী করা হয় তা হলে এদের পক্ষে ছোট ছোট শিল্প-কারখানা—খোলা সহজ হবে এবং চাকুরি আর প্রধানতম অবলম্বন বলে বিবেচিত হবে না। তা ছাড়া ছোট ছোট কারখানার পরিচালকেরা যাতে দেশের সরকারী এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী মাল সরবরাহ করার সুযোগ পান সেজন্যও চেষ্টা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে আবার এদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার জন্য জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। বলা হয়েছে, জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি দপ্তর গঠন করবেন এবং এই দপ্তর শিল্প-কারখানার পরিচালকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন। এ ছাড়া প্রত্যেকটি এষ্টেটে যন্ত্রপাতি মেরামত করার জন্য একটি সাধারণ মেরামতি কারখানা খোলা হবে বলে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রসারিত করা দরকার। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সমস্যা শিল্পের প্রসারকে ক্রমাগত ব্যাহত করে চলেছে। তাই সরকার শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি বহুমুখী কার্য্যসূচী গ্রহণ করেছেন যেটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট গঠন করা। সরকার আশা করছেন, শহর এবং শহরবহির্ভূত এলাকার ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের পথে যে-সব বাধা বিদ্যমান, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট স্থাপিত হলে সে-সব বাধা দূর হয়ে যাবে।

ভূমি-বণ্টন ও বেকার-সমস্যা

শ্রীঅজিতকুমার বসু

চাষীকে তার পরিবারের ভরণপোষণের উপযোগী জমি বিলি করার প্রয়োজনীয়তা দল ও মত নির্ব্বিশেষে সর্ব্ববাদিসম্মত। নিছক কোন ভাববিলাস বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বা করুণার বশবর্ত্তী হয়ে এ প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় নি। অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য, প্রশাসনিক ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা, মানবতা, সব দিক দিয়েই এ কথা বহু পূর্ব্বেই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে এ কথা স্বীকৃত হচ্ছে দেশের ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য বলেই। জীবিকার উন্নতি, নাগরিক জীবনের সর্ব্বমুখী বিকাশ, জনশক্তি তথা গণতন্ত্রের উন্মেষ, শান্তিময় পরিবেশ, জাতীয় শক্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি, স্বাবলম্ব, আত্মবিশ্বাস, অটল দেশাত্মবোধ, এ সবেরই জন্য আশু চাষীর হাতে জমি বিলির অপরিহার্য্যতা যতদিন যাচ্ছে ততই বেশী করে প্রমাণিত হচ্ছে।

কেন যে একথা স্বীকৃত, একটু হিসাব নিয়ে ভূমি তথা চাষী সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেই তা বোঝা যাবে। ১৯৫১ সনের গণনার হিসাব অনুসারে পশ্চিম বাংলায় মোটামুটি ৮'লক্ষ পরিবার (প্রতি পাঁচ জনে একটি পরিবার) ভূমিহীন ক্ষেত মজুর। তা ছাড়া, কৃষিজীবীদের মধ্যে ১২ লক্ষ ৯৫ হাজার পরিবার আছে, যাদের হাতে পরিবার প্রতি এক-আধ থেকে পাঁচ একরের মধ্যে (তিন বিঘায় এক একর) এবং সর্ব্বসমেত ২৮ লক্ষ ১১ হাজার ২৬০ একর চাষের জমি আছে। অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন (পরিবার প্রতি পাঁচ একর) প্রয়োজনের ৫৬ শতাংশ কম। রাজস্বমন্ত্রী একথা স্বীকার করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে এদের সংখ্যা সাড়ে ১২ লক্ষ। এই দুই শ্রেণীর ক্ষেত মজুর ও গরীব চাষী—মোট সংখ্যা প্রায় ১৯ লক্ষ পরিবার।

যেসব এলাকায় ধান ছাড়া অন্যান্য ফসল ও দো-ফসলা অল্পবিস্তর চাষ হয়, সেসব স্থানে মজুরী দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা বেশী। তা সত্ত্বেও বছরে এদের আর পাঁচ মাস কোন কাজ থাকে না। অন্যান্য এলাকায় এদের বছরে তিন চার মাসের বেশী কাজ থাকে কিনা সন্দেহ। চাষ ছাড়া অন্যান্য কাজেও মজুরী করে এরা কিছু কিছু আয় করে। কৃষি-মজুরদের আয় ও বেকার সম্বন্ধে যে সরকারী তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে—এরা তিন মাসের অধিককাল বেকার থাকে এবং মাসাধিক কাল নিজের ঘরের কাজে নিযুক্ত থাকে। ঘরের কাজে বিশেষ কোন আয় হয় না বলে উক্ত তথ্যে স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ, চার মাসের অধিককাল বেকার থাকে। কাজের সময়েই এরা যা মজুরী পায় (সরকারী তথ্য অনুসারে দৈনিক গড়ে মোট এক টাকা) তাতে এক দিনেরই সঙ্কুলান হয় না। ভাগে চাষ করে যা ফসল পায় তাতেও ছ' মাসের অন্ন সংস্থান হয় না। হাজা শুকোর দরুন ফসল নষ্ট হলে বা চাষ না হলে তো কথাই নেই, এবং চার-পাঁচ বছরের মধ্যে এক বছর এইভাবে অজন্মা হয়েই থাকে। এদের মধ্যে আবার যারা কৃষিকার্য্যে ও অন্য কায়িক পরিশ্রমে অক্ষম তাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন। এদের কথা ছেড়ে দিলেও অন্ততঃ আট লক্ষ পরিবারের কর্ম্মক্ষমতা সারা বছর অকেজো থাকে। অর্থাৎ, এদের কোন ক্রয়-ক্ষমতাই নেই।

এ ছাড়া এক-আধ থেকে দশ একর জমি যাদের আছে, তাদের মধ্যে যারা নিজ হাতে চাষ না করে ভাগে করায় তাদের সংখ্যা হ'ল আনুমানিক ৩,৮১,৭৮২ পরিবার। এদের হাতে জমি আছে ১৪.৯০ লক্ষ একর। তে-ভাগার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্। বিভিন্ন ধারার কারসাজিতে বর্গাদার-আইন কাজে লাগে নি। কাজেই আধা ভাগ হিসাবে এদের হাতে পরিবার প্রতি অন্ততঃ দশ একর জমি থাকা দরকার। এদেরও গড়ে শতকরা ৩১ ভাগ জমি কম আছে। প্রস্তাবিত ৩ ও ২ ভাগের হিসাবে আরও

কম হবে। শতকরা উনষাট ভাগ ভরণপোষণের সর্ব্বনিম্ন মান বা ক্রয়-ক্ষমতার অনেক নীচে আছে। এদের মধ্যে আনুমানিক আধা-আধি লোকের জমি ছাড়া অন্য অবলম্বন নেই। সংখ্যায় এরা ২·৩৩ থেকে ২·৬৩ লক্ষ পরিবার।

আবার, উৎপাদনমূলক ও সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজে শ্রম বা শক্তি নিয়োগ না করে উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করার অধিকার যদি স্বীকার না করা হয়, তা হলে এই সব অ-চাষী ভূস্বামীরা অধিকাংশই বেকার।

এর উপর আছে যারা "কৃষিজীবী" নয়। এদের সংখ্যা গ্রামে ৪৪ লক্ষাধিক এবং শহরে ৬২ লক্ষাধিক, একত্রে ১০৬ লক্ষাধিক লোক বা ২১ লক্ষ ২০ হাজার পরিবার।

বেকার-সংখ্যা সম্বন্ধে যে সরকারী তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে জানা যায়, কেবল কলকাতাতেই ৫ লক্ষ ১৪ হাজার পরিবারের মধ্যে চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৮ হাজার। এদের মধ্যে ভারতীয় ও সম্পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ২ লক্ষাধিক। এর উপর ৫০ হাজারের বেশী আছে যাদের স্বচ্ছল অবস্থা নয় বা পুরা কাজ নেই। কাজেই নিম্নতম ভরণপোষণ বা ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে এদের মধ্যে অন্ততঃ ২০ হাজার লোকের কর্ম্মক্ষমতা অকেজো থাকে। কলকাতার কর্ম্মপ্রার্থীদের মধ্যে লক্ষাধিক লোক বাইরের। এদের বাদ দিয়ে কলকাতার হারে হিসাব করলে বাকি অ-কৃষিজীবী ১৬ লক্ষাধিক পরিবারের মধ্যে অন্ততঃ সাড়ে তিন লক্ষাধিক সম্পূর্ণ বেকার। গ্রাম অঞ্চলে এদের হার আরও বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

সুতরাং সারা বাংলায় সর্ব্বসমেত বেকারের বা কর্ম্মহীনের সংখ্যা অন্ততঃ ১৩ লক্ষ ১৬ হাজার বা সমগ্র পরিবারের ২৮ শতাংশ। এদের মধ্যে বাঙালী বেকারের সংখ্যা ১৩ লক্ষাধিক বা ২৬ শতাংশ। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, বাংলার বেকারের সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক। সারা ভারতের অবস্থা এ থেকে সহজেই অনুমেয়—অন্ততঃ ২৫ শতাংশ যে বেকার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের সংখ্যা ৯ কোটি লোক বা ১ কোটি ৮০ লক্ষ পরিবার। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হারে সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে তা বাড়বে বছর বছর—সারা ভারতে ৫০ লক্ষাধিক এবং বাংলার সাড়ে তিন লক্ষ। এ ছাড়া এমন পরিবার আছে, যাদের আয় আছে কিন্তু পোষ্য কম। আবার এমন রোজগারী লোক আছে যার পোষ্যই নেই। তা ধরলে বেকার পরিবারের সংখ্যা বাড়বে।

কিছুদিন আগে গ্রামের লোকের জীবিকার মান নির্ণয়ের জন্য যে হিসাব নেওয়া হয়েছিল তা থেকে জানা যায়, ভারতে গ্রামের পরিবার প্রতি বছরে সাংসারিক ব্যয় ১,১৪৩৲ টাকা। উপরোক্ত ১৪ লক্ষ সম্পূর্ণ বেকারদের বা ২৪ লক্ষাধিক আধা-সিকি বেকারদের ব্যয় যে এই অনুপাতে কত হবে তা সহজেই অনুমেয়। এদের আয়ই নেই তো ব্যয় হবে কোথা থেকে!

জাতীয় আয়ের মাথা প্রতি গড় হিসাব ধরলেও এই সব গরীব ও বেকারদের অবস্থা অনুরূপ ভয়াবহ ব্যতীত আর কিছুই প্রমাণিত হবে না। আবার যদি কৃষি-নির্ভর গ্রামবাসীদের জাতীয় আয়ের হিসাব ধরা হয়, তা হলে অবস্থা আরও ভয়াবহ বলেই প্রতিপন্ন হবে। সমগ্র জাতীয় আয়ের অর্দ্ধেকেরও কম আসে কৃষি থেকে। অথচ, কৃষি-নির্ভর গ্রামবাসীর সংখ্যা অন্যান্যের প্রায় দ্বিগুণ।

এই বিপুলসংখ্যক বেকার তথা ক্রয়-শক্তিহীন লোকের কর্ম্ম-সংস্থান যে কি দুরূহ, তা সকলেই বুঝছেন। এদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ভারতের মত গরীব, পরমুখাপেক্ষী ও কৃষিপ্রধান দেশের প্রকৃত কোন উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, বর্ত্তমান অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হবে না; সব ভেঙে পড়বে। এ সমস্যার সমাধান কি করে হবে সে আলোচনা এখানে নয়। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, কলকারখানা উন্নয়নমূলক কাজ বাড়িয়ে এদের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ পর্য্যায় এসেছে। কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে যে বিপুল ও সাধ্যাতীত ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে তা খরচ হয়েছে বা হচ্ছে। তবুও বেকার-সমস্যার কোনরূপ উন্নতি না হয়ে ক্রমশঃ তা খারাপের দিকে নেমেই এসেছে। এ কথা সরকারও স্বীকার করছেন। শিল্পপতিরা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য যে খসড়া অভিমত দাখিল করেছেন, তাতেও তা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হয়েছে। এ কথাও স্বীকৃত হচ্ছে যে, কৃষিজাত দ্রব্যের দাম নামতে থাকায় কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতারও যে ক্রমাবনতি ঘটছে তা উদ্বেগজনক। সুতরাং কলকারখানার সম্প্রসারণের সুযোগ কমে আসছে বৈ বাড়ছে না। তা ছাড়া, কতই বা কল-কারখানা বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় বাড়ান যাবে! তার পুঁজিই বা মিলবে কি করে! কল, কারখানা, খনি প্রভৃতি শিল্পে বর্ত্তমানে যত লোক নিযুক্ত আছে, তাদের প্রায় দেড় গুণ লোক বছর বছর বাড়ছে বা কাজের উপযোগী হচ্ছে। তার উপর এখনই বেকার হয়ে বসে আছে তাদের প্রায় পাঁচ গুণ লোক। সেই জন্যই সকলে একমত হয়েছেন যে, দেশের লোকের ক্রয়-ক্ষমতা বা ভোগ-শক্তি বাড়াতে হবে। বস্তুতঃ শিল্পপতিরা এবার এই ভোগ-শক্তি বাড়ানোর দাবিই বিশেষ জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। চাষীর হাতে জমি বিলির দ্বারাই তা বহুলাংশে সম্ভব। তাই জমি বিলির নীতি গৃহীত বা ঘোষিত হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের পরিবর্তনশীল রূপ

২৫শে এপ্রিলের ভোরবেলা। সবেমাত্র আঠারোটি গ্রাম-সমন্বিত এলাহাবাদ কল্যাণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে সুরু হয়েছে। গ্রামপ্রান্তে অবস্থিত খেরওয়াই কেন্দ্রের গৃহটি ভর্ত্তি হয়ে গেছে চার থেকে আট বৎসর বয়সের শিশুদের দ্বারা। শিশুদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ জন আছে সেখানে এবং ভারপ্রাপ্ত গ্রামসেবিকা—যিনি একজন অভিজ্ঞা শিক্ষিকাও বটেন—শিশুরা এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিন-চার জন স্ত্রীলোকও অপেক্ষা করছে সেখানে, কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ধাত্রীদের দ্বারা কতকগুলো সামান্য অসুখের চিকিৎসা করানোর জন্য।

শিশুদের ধুইয়ে-মুছিয়ে পরিষ্কার করানো হ'ল, তার পর প্রত্যেককে তিন থেকে চার আউন্স হিসেবে দুগ্ধ বিতরণ করা হ'ল। তারপর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাদের লেখাপড়া শিক্ষাদান করা হয়। অল্পবয়স সত্ত্বেও বেশীর ভাগ শিশুই লিখতে এবং পড়তে পারে, কেউ কেউ আবার পড়তে পারে প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক পর্য্যন্ত। শব্দার্থদ্যোতক যথোচিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে সমবেত সঙ্গীত করতেও তারা সমর্থ।

ধাত্রী হচ্ছেন একজন শিক্ষাপ্রাপ্তা এবং যোগ্য কর্ম্মী। কিন্তু যতগুলি রোগীর পরিচর্য্যা করা অথবা সন্তান-জন্মের পূর্ব্বে এবং পরে যতগুলি প্রসূতির চিকিৎসা করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত, ততগুলি তিনি পান না। দৈনিক গড়পড়তা এদের সংখ্যা হচ্ছে দুই অথবা তিন। কেন্দ্রে যে সকল স্ত্রীলোক আসে, তাদের জন্যে তিনি যথোচিত চিকিৎসার বিধান দেন এবং সন্তান-জন্মের পূর্ব্বাবস্থায় গর্ভিণী স্ত্রীলোকদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের পরিচর্য্যা করেন। পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতির আহ্বায়িকা শ্রীমতী এস. বর্ম্মা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকেন। গ্রামসেবিকাদের তিনি বিতরণ করেন কতকগুলো খাদির কাপড়ের টুকরো—সেগুলি দিয়ে তৈরি করতে হয় শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ। এই সমস্ত পোশাক তৈরি হলে, সকাল-বেলাকার ধোয়ামোছার পালার অব্যবহিত পরেই শিশুরা সেগুলো পরবে, তা ছাড়া যখন তারা কেন্দ্রে লেখাপড়া শেখে অথবা খেলাধুলো করে তখনও এগুলো তাদের পরতে হয়।

এখন বেলা দশটা—পয়গম্বরপুর কেন্দ্রে এসে পৌঁছেছি আমরা—ওখানেও শিশুদের সম্পর্কিত কর্ম্মপ্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে উন্নতির পথে। কেন্দ্রে নিয়মিত ভাবে হাজির হয় প্রায় চল্লিশটি শিশু, সেখানে তাদের লেখাপড়া এবং ছোট ছোট খেলনা ও পুতুল তৈরি করা শেখানো হয়। এই কেন্দ্রে মাতৃনীতি-সহায়ক কোন ব্যবস্থা নেই, কিন্তু একজন দাই গর্ভিণীদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের পরিদর্শন এবং পরিচর্য্যা করে।

কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত গ্রামসেবিকা পরিণতবয়স্কা স্ত্রীলোক-দের এবং বয়স্থা বালিকাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে এবং কোন একটি কারুশিল্প বিষয়ে তাদের উপদেশদানের নিমিত্ত নিয়মিত ভাবে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ পরিদর্শন করে থাকেন।

মারহুয়া কেন্দ্রে এগিয়ে গিয়ে আমরা দেখি যে, ওখানকার ভারপ্রাপ্তা গ্রামসেবিকা হচ্ছেন এমন একজন অভিজ্ঞ এবং বর্ষীয়সী নারী যিনি স্থানীয় জন-সমাজের আস্থাভাজন এবং সকলেই তাঁকে সমর্থন করে—শিশুদের অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা-দানের (Literacy) ক্লাসটি পরিচালনা করছেন তিনি। পরিকল্পনা-কেন্দ্রে সমবেত হয়েছে প্রায় পঞ্চাশটি শিশু, দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের উজ্জ্বল এবং বুদ্ধিদীপ্ত আনন, সকলেই তারা উৎসুক তাদের লেখাপড়ার জ্ঞান, চরকা চালানোর কৌশল এবং সঙ্গীত-নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে। একদিকে যেমন ছোট ছেলেদের অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ক্লাস এগিয়ে চলেছে উন্নতির পথে, অন্য দিকে তেমনি অধিকবয়স্কা বালিকারা—তাদের সংখ্যা হবে প্রায় কুড়ি জন—পাখা তৈরি এবং সুতাকাটায় তাদের নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে।

গ্রাম পরিদর্শন

এলাহাবাদ উন্নয়ন-পরিকল্পনার অন্তর্গত তিনটি কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয় কতকগুলো চরকা। কেন্দ্রের অধীন গ্রামসমূহের বয়স্থা বালিকারা এগুলোর সাহায্যে সুতো

কাটতে শেখে। গ্রামসেবিকারা অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্লাস পরিচালনা এবং স্ত্রীলোকদের সেলাই, সুতাকাটা অথবা অন্য কোন কারুশিল্প শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সপ্তাহে দুই কিংবা তিন দিন সন্ধ্যাকালে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ পরিদর্শন করেন। অচিরেই কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ করা হবে বালওয়াদির সাজ-সরঞ্জাম, তখন শিশুরা তাদের শারীরিক শক্তিরও বিকাশ-সাধনের পথ খুঁজে পাবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রামগুলিতে মাতৃনীতিবিষয়ক সাহায্যের অভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু যেটুকু-বা চিকিৎসাবিষয়ক পরামর্শ এবং ধাত্রীদের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তার সুযোগ-গ্রহণেও গ্রামবাসীরা প্রতিনিবৃত্ত হয় নিজেদের ঐতিহ্যগত কু সংস্কারবশতঃ। গ্রামীণ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক শিক্ষিতা ধাত্রী পাওয়া বাস্তবিকই কঠিন, কিন্তু যখন তাদের পাওয়া যায় তখন গ্রামের মেয়েরা যাতে তাদের পরামর্শ এবং সাহায্যের সুযোগ গ্রহণ করে তদনুযায়ী শিক্ষা তাদের দিতে হবে। এলাহাবাদস্থিত পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতি, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত ৫০০০৲ টাকা আর্থিক সাহায্য দ্বারা কমলা নেহরু হাসপাতাল কর্তৃক ক্রীত 'মেডিক্যাল ভ্যানে'র মাধ্যমে চিকিৎসাবিষয়ক সাহায্যকে গ্রামবাসীদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছে।

নারীদের অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদান

গ্রামীণ স্ত্রীলোকদের নিমিত্ত অনুষ্ঠেয় কল্যাণকর্ম্মের প্রথম দফা হচ্ছে তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। প্ররোচনা দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু কেন্দ্রসমূহের অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা-দানের ক্লাসগুলিতে অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোক পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য অংশতঃ দায়ী পরম্পরাগত পর্দ্দা-প্রথা এবং গৃহের গণ্ডীর বাইরে আসতে নারীদের অনিচ্ছা। "কন্যাদের আমরা পাঠাব লেখাপড়া শেখবার জন্যে, কিন্তু আমরা নিজেরা চাই এর হাত থেকে রেহাই পেতে"— অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদানের কোর্স সংগঠনের চেষ্টা করতে গিয়ে গ্রামসেবিকাদের প্রায়শঃই এ ধরনের যুক্তির সম্মুখীন হতে হয়।

গ্রামকল্যাণ-কর্ম্ম সুনির্দ্দিষ্ট রূপ লাভ করবে তখনই যখন অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মী পাওয়া যাবে। উত্তরপ্রদেশের অনেকগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রে যে সকল গ্রামসেবিকা কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তারা শিক্ষাপ্রাপ্তা নন—যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে তাঁদের কথা, এলাহাবাদের তিনটি প্রোজেক্টে যাঁদের কর্ম্মে নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষণ-কেন্দ্রসমূহ থেকে যেমন যেমন এবং যখন শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীরা বেরিয়ে আসবেন তখনই অশিক্ষিতদের জায়গায় তাঁদের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে আর প্রথমোক্তদের হয় শিক্ষণের জন্য কেন্দ্রে পাঠানো হবে, নতুবা বিদায় দেওয়া হবে।

চটপটে শিশু

উল্লিখিত উন্নয়ন-পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-সূচী এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টাসমূহ দিনের পর দিন সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে। এর ফল পরিলক্ষিত হতে পারে শিশুদের উজ্জ্বল এবং উৎসাহদীপ্ত আননে। সাক্ষরতার পথে শিশুদের উন্নতির জন্য তাদের পিতামাতারা যে গর্ব্ববোধ করে তাও এই সকল প্রচেষ্টার সাফল্যের দ্যোতক। এই বিষয়টির মত উৎসাহপ্রদ আর কিছুই নয় যে, কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা-সমূহের কর্ম্মপ্রচেষ্টা বর্ত্তমান 'পুরুষে'র গ্রামীণ শিশুদের মনে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা বেড়ে উঠছে—ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্যবিধি, লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা ও কোন কারুশিল্পে আত্মনিয়োগ করে নিজেদের অবসর সময়ের সর্ব্বাধিক সদ্ব্যবহার—এসকল বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। গ্রামগুলিতে এই প্রীতিকর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে কল্যাণ প্রোজেক্টের কর্ম্মপদ্ধতি দ্বারা এবং এখন আর পশ্চাদ্-বর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা নেই।

অপর একটি বিষয়ও কম উৎসাহপ্রদ নয় যে, গ্রামবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহের জন্য ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড ও গৃহ এবং কেন্দ্রের গৃহনির্ম্মাণকল্পে শ্রমদান করছে। এলাহাবাদ প্রোজেক্টের যে তিনটি কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে পয়গম্বরপুর এবং মারহুয়া কেন্দ্রে গ্রামবাসীরা বিনামূল্যে ভূদান করেছে ; পক্ষান্তরে খেরওয়াই কেন্দ্রে, ঠিক গ্রামের বাইরে খোলা মাঠের মধ্যে যে রমণীয় গৃহে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত, সেই গৃহটি নামমাত্র ভাড়ায় প্রোজেক্ট কমিটির দখলে রাখা হয়েছে।

গ্রামীণ লোকেরা গ্রামসেবিকাকে এখন যে সকল গ্রাম নিয়ে কেন্দ্রটি গঠিত সেগুলোর অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মেনে নিয়েছে। গ্রামবাসীরা এই কর্ম্মীর জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তৎপরতার সঙ্গে, অন্যথায় তাকে ভেসে বেড়াতে হ'ত। গ্রামের লোকেরা এটা প্রত্যাশা করে যে, হয় ত তাঁর যোগ্যতা যতটুকু তার চেয়েও বেশী কাজ তিনি গ্রামের নারী এবং শিশুদের জন্যে করবেন। তিনি কেবল সাধারণ কল্যাণ-কর্ম্মে নিয়োজিত গ্রামীণ কর্ম্মী নন, একজন কারুশিল্প শিক্ষা-দাত্রী এবং শিক্ষিকাও বটেন।

পার্ব্বত্য গ্রামকেন্দ্র

শ্রীরতনপ্রভা রায়

টিহরি গাড়োয়ালের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে প্রসারিত হিমালয় পর্ব্বতমালার পাদদেশস্থ পাহাড়গুলোতে এমন কয়েকটি ভগ্ন-জীর্ণ খড়ো-ছাওয়া চালাঘর আছে, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পার্ব্বত্য দৃশ্যের সঙ্গে যেগুলোর বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সেগুলোকে কুঁড়ে-ঘর, আস্তাবল এমনকি বাসযোগ্য আস্তানার সঙ্গে ন্যূনতম সাদৃশ্যযুক্ত কোন কিছুরও সমপর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না।

এক শতের কিছু বেশী লোকসংখ্যাবিশিষ্ট, জীর্ণদশাপ্রাপ্ত কতকগুলি কুটীর নিয়ে এই চুপরাইলি নামক পল্লী। এখানেই আকস্মিকভাবে আমি দেখতে পাই—টিহরি গাড়োয়ালস্থ আমাদের প্রথম কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা-কেন্দ্রটিকে। নরেন্দ্রনগর থেকে চম্বাগামী চক্রাকার পথে চক্কর দেওয়ার কালে আমি যে "জেলা কল্যাণকেন্দ্র, চুরপাইলি"—এই সাইনবোর্ডটি দেখতে পাব সে ছিল সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত। এই অঞ্চলে এখানেই প্রথম চেষ্টা চলছে—শিশু, নারী এবং পুরুষদের বুনিয়াদী শিক্ষাদান, অবসরবিনোদের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসাবিষয়ক সাহায্য দেওয়ার। একটি আস্তাবলের এক তলায়—যার কোন অংশ সাধারণ একটি কাঠের 'দিভানে'র ভারে ধ্বসে যেতে পারে, আমাদের গ্রামসেবিকার একটি অন্ধকার নোংরা ঘরে আমাদের কেন্দ্রের ঔষধালয়টি অবস্থিত। এই ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়টি উপযুক্ত আস্তানার অভাবে গত আট মাসের মধ্যে প্রায় আধ ডজন স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু এতে চুপরাইলি এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামসমূহ থেকে আগত শিশুদের সংখ্যা আশাপ্রদ। বিদ্যালয়ে শিশুদের পাঠাতে গ্রামবাসীদের যে ঔদাসীন্য বিদ্যমান সেকথা বিবেচনা করলে এটা বেশ উৎসাহজনক বলেই মনে হয় যে, এর 'বালওয়াদি'র রেজিষ্টারী বইয়ে প্রায় ত্রিশটি শিশুর নাম আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আসে এই কেন্দ্র থেকে দুই-তিন মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ থেকে। ১৯৫৬ সনের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত চার মাসের মধ্যে এই কেন্দ্র থেকে প্রায় ছয় শত লোককে চিকিৎসা-বিষয়ক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া আমাদের গ্রাম-সেবিকারা প্রসূতিদের পরিচর্য্যাও করেছেন।

চুপারাইলি কেন্দ্রকে কোন দিক দিয়েই আদর্শ কেন্দ্র বলা যেতে পারে না। কিন্তু এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে কর্ম্মীকে যে সকল দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো এবং বিশেষভাবে, টিহরি গাড়োয়ালের অনুন্নত অঞ্চলসমূহের জীবনযাত্রার মান ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল আছেন, তারা জানেন যে, এখানে যে কোন ধরনের কল্যাণ-কর্ম্মের সংগঠনই নিরতিশয় দুরূহ ব্যাপার। এখানে কল্যাণ-কর্ম্মানুষ্ঠান নিঃসন্দিগ্ধরূপের হতে পারে একজন কর্ম্মীর ত [illegible]গ্যতা, অধ্যবসায় এবং কর্ম্মে আন্তরিকতার কষ্টিপাথর-স্বরূ যেপ। এখানকার পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতা এবং আনুষঙ্গিক অসুবিধাসমূহের কথা কল্পনা করাও ।কঠিন কোন কোন স্থানে এক বালতি জলের জন্যে আমাদেরগ্রাম-র সেবিকাদের দিতে হয় দুই আনা থেকে চার আনা পর্য্যন্ত, তাও আবার সকল সময় আনতে হয় প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী, নীচেকার পাহাড়ের পাদদেশ থেকে। সেখানে আবার মাছিরও প্রাচুর্য্য এবং প্রায়শঃই একথা ভেবে অবাক হতে হয় যে, সরবরাহ-করা সমগ্র পরিমাণ ডি.ডি.টি. অথবা অন্য কোন কীটপতঙ্গ-বিনাশক দ্রব্য তাদের সংখ্যা কমাতে সক্ষম হবে কিনা।

এটা মানতেই হবে যে, দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা প্রতিফলিত হয় জীবনযাত্রার মানের উপর এবং অজ্ঞানতা, অশিক্ষা এবং কুসংস্কার এই তিনটির প্রতি-বন্ধকতার দরুন জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নও সম্ভবপর হয় না, কেননা এগুলো আমাদের যাবতীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে করে ব্যাহত। ভারতের জনসমষ্টির এমন কোন অংশকে যদি আমি দেখে থাকি যাদের পরনের ন্যাকড়াটুকু পর্য্যন্ত জোটে না তো তা দেখেছি আমি এই টিহরি গাড়োয়ালে। আমার মানসলোকে তারা প্রতিভাত হ'ল দীর্ঘকাল যাবৎ টিহরি গাড়োয়ালে বসতি-স্থাপনকারী এক রাজপুত বংশের লোক-রূপে, এদের সমাজে পুরুষদের নির্দ্ধারিত কাজ হচ্ছে, অল্প-স্বল্প চাষবাস করা। দিনের বাকী সময়টুকু এরা কাটিয়ে দেয় গল্পগাছা ও ধূমপান করে আর উদয়াস্ত অবিশ্রান্ত খেটে যাওয়া হচ্ছে এদের মেয়েদের অদৃষ্টলিপি।

সাধারণ এক পাহাড়ী মেয়ের দিনের কাজ সুরু হয় কাস্তে হাতে ধানক্ষেতের অভিমুখে দ্রুত ধাবনের ভেতর দিয়ে। বিকেলবেলা সে ঘরে ফিরে আসে, পরিবারের জন্য রান্নাবান্না করে, আবার ফিরে যায় মাঠে, গরু মহিষের করে তদারক, ঘাস কাটে, নিয়ে আসে পরিবারের প্রয়োজনীয় জল, তারপর মন দেয় শিশুদের পরিচর্য্যায়। সন্ধ্যাবেলা তাকে বসতেই হবে দিবসের সংগৃহীত শস্যের তুষ-ঝাড়া এবং ওবেলার খাবারের জন্যে সেগুলোকে যাঁতার সাহায্যে চূর্ণ করার কাজে। কৃষিই এদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন এবং ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন শস্য দ্বারা গড়পড়তা একটি পরিবারের বৎসরে কায়ক্লেশে ছয় মাসেরও যে ভরণ-পোষণ হয় না সেকথা বিবচনা করলেই এই সকল লোকের দারিদ্র্য যে কত কঠোর তা উত্তমরূপেই কল্পনা করা যেতে পারে। হয় ত এর থেকেই

বুঝতে পারা যাবে কেন এই এলাকার বিপুলসংখ্যক লোক জীবিকার সন্ধানে চলে যায় সমতল অঞ্চলে। বহু বিবাহ এদের সমাজে অতি সাধারণ ব্যাপার, কেননা পরিবারে কোন বাড়তি স্ত্রীলোকের স্থানলাভ মানেই ক্ষেতে এবং গৃহে হাড়-ভাঙা খাটুনির জন্যে একজন অতিরিক্ত সাহায্যকারিণী লাভ। কিন্তু যে বিষয়টি হৃদয়বিদারক তা হচ্ছে এই যে, কোন বালিকার বয়স যখন পাঁচ বছরের কাছাকাছি তখন তাকে করতে হয় একজন পূর্ণবয়স্কা নারীর করণীয় যাবতীয় কাজ। পাঁচ বৎসরবয়স্কা লক্ষ্মী—যাকে বলা যেতে পারে আমাদের বালওয়াদির একমাত্র চটপটে মেয়ে—বিদ্যালয়ে আসা থেকে বিরত হ'ল, কেননা ফসল কাটার জন্য তৎপর হওয়া হয়ে দাঁড়াল তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ঠিক যখন আমি ঐ স্থান পরিত্যাগ করবার উপক্রম করছি তখন সে ফিরে এল মাঠ থেকে—মাথায় সযত্নে সংস্থাপিত সারা দিনের সংগৃহীত শস্যের বোঝা নিয়ে, কপাল বেয়ে তার ঝরে পড়ছিল মুক্তামালার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম।

সুতরাং আমাদের বালওয়াদিতে মেয়েদের উপস্থিতির সংখ্যা স্বভাবতঃই কম।

কেবলমাত্র যখন ঔষধের প্রয়োজন হয় সেই সময় ছাড়া স্ত্রীলোকেরা আদৌ আমাদের কেন্দ্রে আসে না, এমনকি সেই উদ্দেশ্যেও তারা তখনই আসে যখন অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত মারাত্মক। অতি সাম্প্রতিককালে মাত্র ডিস্‌পেন্‌সারির উপর গ্রামবাসীদের কিয়ৎপরিমাণ আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রোগাক্রান্ত এবং ব্যাধিক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের মনে এ ধারণা জন্মাতে আমাদের গ্রামসেবিকাদের বেশ দীর্ঘ সময় লেগেছিল যে, আমাদের কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্তব্য ঔষধাবলী তাদের তাবিজ-কবজ এবং স্থানীয় গাছ-গাছড়া ও টোট্‌কার মতই কার্য্যকরী হতে পারে। এ অঞ্চলে শিশুমৃত্যু এবং সন্তান-জন্মের সময় প্রসূতিমৃত্যুর হার এত উচ্চ যে, তা রীতিমত ভীতিপ্রদ। কোন প্রসূতির বেলায় যে সকল জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে তৎসম্বন্ধে স্থানীয় লোকেদের মধ্যে একটা সাধারণ ঔদাসীন্য বিদ্যমান। এ সমস্ত 'কেস' যে পর্য্যন্ত না এরূপ খারাপ হয়ে দাঁড়ায় যে, তার দরুন মাতা অথবা শিশুর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠে সে পর্য্যন্ত কেন্দ্র কিংবা হাসপাতালের গোচরে আনা হয় না। প্রায়শঃই আমাদের গ্রামসেবিকারা নিজেদের অত্যন্ত অসহায় বলে বোধ করেন, কেননা আংশিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্না বুড়ী দাই, কিংবা গ্রামের পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক কেউই তাদের উপদেশে কর্ণপাত করে না। এই সকল অঞ্চলে বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের গর্ভজাত জারজ সন্তানের সংখ্যা প্রচুর। পুরুষ-সমাজ থাকে একাদি-ক্রমে কয়েক বৎসর বাইরে সমতল অঞ্চলে এবং তার দরুন স্বতঃই সৃষ্টি হয় এই ধরনের জটিল সমস্যার।

কোটস্থিত আমাদের কেন্দ্রের অবস্থান কতকটা উৎকৃষ্টতর এই দিক দিয়ে দেখলে যে, এখানকার লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানকার জনসমষ্টির এক দল হচ্ছে প্রাক্তন সৈন্যবাহিনীর লোক—যারা সৈনিক-জীবন থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গ্রামের অবস্থার উন্নয়নকল্পে প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা করছে। আমাদের প্রচেষ্টাসমূহে তারা সাড়া দেয় অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে, আমাদের কর্ম্মসূচীগুলিকে তারা করে অভিনন্দিত। আমাদের এখানকার কেন্দ্রে মেয়েদের অনুপস্থিতি এক লক্ষণীয় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। কোট কেন্দ্রের বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র মেয়েদের উপস্থিতির কারণ এই যে, এখানে ইতিপূর্ব্বেই স্থানীয় কোন বিভাগ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছেলেদের একটি স্কুল আছে। এখানে বিশেষ ভাবে ছোট-খাটো কতকগুলি কারিগরি কাজ সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছিল। আমাদের কেন্দ্রে যারা আসে তাদের মধ্যে কনিষ্ঠতমা, তিন বৎসর বয়স্কা ঝুমলার প্রতি আমি বরং আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম —কবিতা আবৃত্তি, বর্ণমালার পুনরাবৃত্তি, এমনকি এরূপ কিছু তৈরি করার সার্থক চেষ্টা যা দেখতে খেলনার মত— এই সকল বিষয়েও সে তার সমবয়স্কা, শহরে প্রতিপালিতা যে-কোন শিশুর সমকক্ষ।

যদিও এই সকল অতি সামান্য সূচনা বলে প্রতীয়মান হতে পারে, তথাপি কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনাসমূহের প্রবর্ত্তন এবং যে ভারতীয় রেড ক্রশ এই অঞ্চলসমূহে বিস্তর ক্ষেত্রপ্রস্তুতি কর্ম্ম (Spade work) করেছে তার কার্য্যাবলী মনে এই আশারই সঞ্চার করে যে, অশ্রান্ত চেষ্টা এবং অধ্যবসায় দ্বারা অর্জ্জিত হতে পারে অনেক কিছুই। সাফল্যের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে সেই সকল শিশুকে দেখে যারা আমাদের কেন্দ্রে নিয়মিত ভাবে হাজির হয়। যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে অন্য যে-কোন সুস্থ এবং স্বাভাবিক যুবতী মেয়ের মত, পাহাড়ী তরুণীরও যে বুদ্ধিবৃত্তি এবং নূতন ভাবধারা গ্রহণ-ক্ষমতার বিকাশ হতে পারে তা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় রামেশ্বরী এবং পরমেশ্বরীর দৃষ্টান্ত থেকে—চম্বা রেডক্রশে যারা এসেছিল গীতা পাঠ শেখবার জন্যে। আজ তারা সেলাইয়ের কলে কাজ করতে পারে, সুতা কাটতে পারে, তারা পড়ছে পঞ্চম শ্রেণীতে এবং স্বাধীনভাবে অন্য যে-কোন স্থানে অনুরূপ কর্ম্ম সংগঠিত করতে পারে। এটা বেশ উৎসাহপ্রদ ব্যাপার যে, অপর একটি কেন্দ্র থেকে সেবামূলক কর্ম্মের জন্য তাদের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছে। আমরা আশা করি, শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন এই সকল পাহাড়ের সন্তানগণ একত্রিত হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের নিজস্ব রমণীয় পার্ব্বত্যভূমির উন্নয়নকল্পে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবে।

হিমাচলের কয়েকটি কল্যাণকর্ম্মকেন্দ্রে

ফ্রেদা বেদী

আমাদের পর্ষদের প্রত্যেক চেয়ারম্যানই কি বয়সের দাবির কথা ভুলে গিয়ে টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে সেখানে চলে যেতে পারেন না যাকে বলা হয়েছে 'পরিচিত পৃথিবীর একেবারে বাইরের সেই বিরাট অঞ্চল'। হিমাচল প্রদেশে, আঁকাবাঁকা পার্ব্বত্য পাকদণ্ডি পথে সিমলা থেকে আশী মাইল অতিক্রম করে আমরা এসে পৌছলাম রামপুরে। ছোট বাজার এবং জেলা শহর হলেও চিনি উপজাতীয় লোকদের শীতকালীন কেন্দ্র এবং যে পর্ব্বতমালা তিব্বত সীমান্তে চিনিদের স্বদেশাভিমুখে প্রসারিত তার পাদদেশে অবস্থিত বলে রামপুরের একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। রামপুর থেকে উপরের দিকে উঠে আমরা শেষ জীপটিকে দেখতে পেলাম এবং সেখান থেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে মোটর রোডের প্রান্তসংলগ্ন পাহাড়ের পার্শ্বদেশস্থ আঁকাবাঁকা পথে এগোতে লাগলাম।

প্রথম আমাদের থামতে হ'ল শিঙ্গলায় এসে। এখানকার প্রবেশপথটি উত্তমরূপে প্রস্তুত একটি রাস্তার উপরে। পঞ্চায়েত সভ্যেরা যখন এটির সঙ্গে আমাদের পরিচয়সাধন করিয়ে দিচ্ছিল তখন উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাদের আনন। তারা বলতে লাগল—"দেখুন শ্রমদান দ্বারা আমরা কি করেছি।" তাদের এই চেষ্টা নিশ্চিতই প্রশংসনীয়। রাস্তার উপরিভাগের দৃঢ়তা সম্পাদন করা হয়েছে চতুষ্পার্শ্বের ক্যাকটাস গাছগুলিকে ভূপাতিত করে এবং কর্দ্দমাবরণের নীচে তাদের স্তরে স্তরে স্থাপন করে। এটা হ'ল চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক মধুর ভাবে শাসানোর হাতেকলমে প্রত্যুত্তর। চেয়ারম্যান তাদের এই বলে শাসিয়েছিলেন যে, রাস্তার যদি উন্নতিবিধান না হয় তা হলে তিনি কেন্দ্রটিকে এখান থেকে সরিয়ে নেবেন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তিনি আমাকে বললেন যে, রাস্তার এই উৎকর্ষের জন্য ইদানীং অর্দ্ধেক কষ্টের লাঘব হয়েছে এবং ঘোড়ায় চড়ে আসতেও আগেকার চেয়ে অর্দ্ধেক সময় লাগে।

শিঙ্গলা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়িকা একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত হিমাচলী গ্রামসেবিকা। এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সুষ্ঠুভাবে। বালওয়াদিতে ছিল সতেরটি প্রাণচঞ্চল শিশু এবং পঁচিশ জন তরুণী ও বয়স্কা স্ত্রীলোক। "তারা আমাকে দুই-এক দিনের ছুটি পর্য্যন্ত নিতে দেয় না।" গ্রামসেবিকা অনুযোগ করলেন—"পাছে আমি আর ফিরে না আসি! আমি তাদের বলি যে, আমি ত এখানে সারা জীবন কাটাতে আসি নি। তখন তাদের চোখের কোলে দেখা দেয় অশ্রুরেখা। শেষ পর্য্যন্ত আমরা এই সব হেসে উড়িয়ে দিই এবং কাজ চালিয়ে যাই।" পাহাড়ী সুন্দরীরা মৃদুভাবে হাসল, শিশুরা করে উঠল উচ্চহাস্য—বেশ একটি হাসিখুশী-ভরা পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল। যদিও এই কেন্দ্রের চিকিৎসাবিষয়ক দিকটির বিকাশসাধন হয় নি তথাপি হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় অশিক্ষিত সহকারী বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছে এবং অনেকগুলি অসুস্থ শিশুর প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। যখন আপনি একথা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন যে, হাসপাতালটি পাহাড়ের চড়াই উতরাই পথে পাঁচ মাইলেরও বেশী দূরে এবং সেখানে যেতে হয় টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে তখন এটা আপনার নিকট খারাপ 'রেকর্ড' বলে প্রতীয়মান হবে না। অন্যান্য কেন্দ্রের ন্যায় এখানেও হিমাচলের গ্রাম্য লোকে অধীর আগ্রহে আমাদের প্রথম ধাত্রী এবং শিক্ষাপ্রাপ্তা দাইয়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে এবং তারা যখন আসবে তখন তারা হবে গ্রামবাসীদের পক্ষে বিধাতার পরম আশীর্ব্বাদস্বরূপ। মিসেস আমিনচাঁদ কর্ত্তৃক একটি নূতন গৃহ নির্ম্মাণকল্পে অর্থসাহায্যের আবেদনের পরে অপরাহ্ণের অবসান হ'ল। পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান—অর্থসংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত-সদস্য কর্ত্তৃক বিনামূল্যে একটি ছোট নাটকের অভিনয়। জনৈক গ্রামবাসীকে যখন একটিমাত্র টাকা দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করা হ'ল তখন তা এড়াবার জন্যে সে কি কৌশল অবলম্বন করেছিল—দ্রুত মূক অভিনয়ের মাধ্যমে তাই দেখালেন তিনি। যাদের চাঁদা বাকি রয়ে গেছে তাদের নামের একটি কৌতূহলোদ্দীপক তালিকা পঠিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, গৃহমধ্যে নিরাপদে তালাবন্ধ টাকার থলিটি নিয়ে আসবার জন্যে তার ছেলেকে পাঠালে। সেটি আনীত হলে পর অকুস্থলেই তার দেনা মিটিয়ে ফেলবার জন্যে সাড়ম্বরে সেটি সে খুলে ফেলল। আমরা অভিভূত হলাম এবং সে যখন নৈতিক উপদেশ চালিয়ে যাচ্ছিল আর কড়াকড়িভাবে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে "পরিবার পিছু প্রতি মাসে চার আনা" চাঁদার জন্য আবেদন জানাচ্ছিল তখন আমরা সে স্থান পরিত্যাগ করলাম।

বাতালি কেন্দ্রের বিদ্যালয়-গৃহটি আমাদের মনে জাগিয়ে

তুলল পুলক-শিহরণ—একদল রাজমিস্ত্রী, করাত এবং তক্তা নিয়ে কর্ম্মরত ছুতোর এবং সাধারণ সাহায্যকারিগণ—তাদের মধ্যে কারুর হাত সক্রিয় আবার কেউ বা দিচ্ছে মৌখিক উপদেশ—এদের সকলের সমবেত চেষ্টায় এটি গড়ে উঠেছে। ঔষধালয় এবং বালওয়াদি বিদ্যাভবনের নিমিত্ত দুটি চমৎকার ছোট ঘরের দেয়াল ও ফ্রেম ইতিমধ্যেই দাঁড় করানো হয়েছে—একতলায় হবে কর্ম্মচারীদের থাকবার জায়গার ব্যবস্থা। এর সবটুকুই সম্পন্ন হয়েছে "শ্রমদান" বা স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত শ্রমের দৌলতে। বোর্ডের নিকট প্রত্যাশী হয়েছিল তারা শুধু ছাদের কাঠামোর জন্যে দস্তার চাদরের মূল্যের নিমিত্ত। "জিঙ্ক শীট"কে তারা "চাদর" এই সুন্দর নামটিই দিয়েছে।

এখানকার শিশুরা হৃদয়কে কি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে! হিমাচল যে লোকনৃত্যে সর্ব্বভারতীয় পুরস্কার লাভ করেছিল তার মূলে সঙ্গত কারণ রয়ে গেছে। এখানকার ক্ষুদে কিণ্ডার-গার্টেন শিক্ষার্থীদের রক্তের সঙ্গে মেশানো রয়েছে পরিচ্ছন্ন পাদকর্ম্ম এবং চিত্তোন্মাদক সূক্ষ্ম ছন্দোমাধুর্য্যের ঐতিহ্য। ছেলেরা মেয়েদের চেয়েও অধিকতর নৃত্যনিপুণ। আমার বিশেষভাবে ভাল লেগেছিল একটি ছোট বাচ্চাকে, মাথায় ছিল তার একটি মখমলে মোড়া টুপী—টুপীটির এক কোণে শোভা পাচ্ছিল প্রকাণ্ড একটি কাগজের ফুল। যদিও দুপুর-বেলার গরমে শরীর ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছিল তথাপি তার গায়ে ছিল হাতে-কাটা পুত্ত দিয়ে তৈরি একটি বড় কোর্ত্তা—এক বা দুই বছরের শিশুর পক্ষে সেটিকে যথেষ্ট বড় বলতে হবে। কিন্তু তখন ওখানে "পরিদর্শক" (আপনাদের সম্পাদিকা) আসছেন যে, এবং শিশুর কৃতিত্বে গর্ব্বিতা মাতা ভাবছিল, কে জানে হয় ত সেখান থেকে তার ছেলের নাম গিয়ে পৌঁছতে পারে বাইরের জগতে। কিন্তু শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ছেলেটির নামটা আমি মনে করতে পারছি না, কিন্তু এখনও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাই, শিশুটি নৃত্যচ্ছন্দে বৃত্তাকারে পদক্ষেপ করছে সুগভীর আত্ম-প্রত্যয় সহকারে এবং নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে চলেছে তার সুললিত সঙ্গীত।

ওখানকার ধাত্রী ছিলেন চিনি থেকে আগত জনৈকা বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী। একটি হাসপাতালে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার বিরাট 'এডভেঞ্চারে'র আনন্দ উপভোগ করবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর, হাসপাতালের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন তিনি, এবং তাঁর সঙ্গে ছিল চৌদ্দ বৎসর-বয়স্কা একটি ভাইঝি। আমার উপর আস্থা স্থাপন করে তিনি আমাকে বললেন—"আমি একে লিখতে এবং পড়তে শেখাচ্ছি, একে গড়ে তুলতে চাই একজন নার্সরূপে। মুমূর্ষুকে সাহায্য দান নিশ্চয়ই উত্তম 'সেবা'।" "গ্রামবাসীরা কিরূপ সমাদরে আপনাকে গ্রহণ করেছিল?"—আমি জিজ্ঞেস করলাম। "যে পর্য্যন্ত না সন্তান-জন্মকালে তাদের একজন স্ত্রীলোকের প্রাণবিয়োগের উপক্রম হয় সেই পর্য্যন্ত আমার সমস্ত প্ররোচনা সত্ত্বেও তারা আমার কাছে ঘেঁষে নি। কোন-না-কোন উপায়ে জীবন্ত অবস্থায় শিশুটির প্রসবকার্য্য সম্পন্ন করাতে আমি সমর্থ হই—মায়েরও জীবন রক্ষা পায়। আর শিশুটি ছিল একটি পুত্রসন্তান। আরও তিনবার বিপজ্জনক 'কেস'গুলোর বেলায় আমাকে ওরা ডাকিয়েছে এবং ভগবানের কৃপায় তাদের সকলকেই বাঁচাতে আমি সক্ষম হয়েছি। এখন তারা আমাকে সদ্ভাবে, যথোচিত সমাদরেই গ্রহণ করেছে, এবং আর কোন অসুবিধা নেই।"

খুব অধিকসংখ্যক শিশুর মেলা এখানে—সবাই চটপটে এবং বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমি এটা উপলব্ধি করি যে, এই কেন্দ্রে শিশুদের সমক্ষে অন্ততঃ একটি নবজীবনের সম্ভাবনা বিদ্যমান।

দানশীল টেক সিং, তাঁর নিজের গ্রামে যাতে বিদ্যালয় এবং পুরা কর্ম্মীসংসদসমন্বিত একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে জমি এবং সে স্থানেই একটি একতলা গৃহ দান করেন। সাময়িক হেড কোয়ার্টার্সের জন্য তিনি দুইটি উৎকৃষ্ট নূতন পাহাড়িয়া কুটীর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করেছিলেন।

শ্রীমতী আমিনচাঁদ কাজের জন্য প্রস্তুত এবং আগমন প্রতীক্ষা-রত কর্ম্মী পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, স্থানীয় এম. পি. (শ্রীবর্ম্মা) সামাজিক কর্ত্তব্যসমূহ সম্বন্ধে সচেতন স্থানীয় কর্ম্মচারী এবং উৎকৃষ্ট স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্ম্মীদল এই তিনের সম্মিলনকেই বলা যেতে পারে "দ্রুত কর্ম্ম সম্পাদনকল্পে" আদর্শ সম্মিলন এবং নিসরু-গ্রাম তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। শ্রীটেক সিং বাল-ওয়াদির কর্ম্মপ্রচেষ্টাসমূহকেও সাফল্যের পথে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা দেখলাম যে, ঠিক বয়সের ছোট একুশটি শিশু—যাদের বলা যেতে পারে পৌত্রস্থানীয়—তাঁর আছে এবং আশীর্ব্বাদ জানালেন তিনি চিত্তজয়ী হাসি হেসে।

আর একটি শেষ আশা আছে। প্রতি বৎসর দশ হাজারের কাছাকাছি উপজাতীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা চিনি থেকে নেমে আসে নিম্নে অবস্থিত রামপুর শহরের অপেক্ষাকৃত অধিকতর আরামদায়ক জীবনধারার মধ্যে। দুর্ভেদ্য তুষার-প্রাচীরের পেছনে রেখে আসে তারা তাদের স্ত্রী,

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং বহু শিশুকে ছাদ ও প্রাচীর থেকে লম্বা হাতলওয়ালা একপ্রকার কোদালি দ্বারা তুষারস্তূপ অপসারিত করবার জন্তে—তাদের এলাকায় এই তুষার-অবরোধ স্থায়ী হয় অন্ততঃ চার কি পাঁচ মাস। সঙ্গে করে নিয়ে যায় তারা গো-মহিষ, ভেড়া এবং খচ্চরের পাল এবং অল্পবয়স্ক বালকদের। শতকরা পঁচিশ জন চরায় গরু-বাছুর। বাদবাকিরা ক্ষেতে এবং জঙ্গলে বাড়তি কাজ করে। দৈবাৎ তাদের আশ্রয় জোটে গুহায়, তাঁবুতে, ধরমশালাগুলিতে এবং রাস্তার উপরে। চালাঘর নির্ম্মাণ অথবা মানুষ ও গরু-মহিষের জন্য কোন আস্তানা তৈরি এ দুটিই হচ্ছে উক্ত অঞ্চলে দুইটি একান্ত প্রয়োজনীয় সমাজ-কল্যাণকর্ম্ম। এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান অবশ্য নির্ভর করে চিনির উন্নয়নের উপর—যার দরুন ওখানকার অধিবাসীদের আর প্রয়োজন হবে না দেশত্যাগ করে স্থানান্তরে যাবার।

অল্পবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতা এবং পরিবার-পরিকল্পনা

শ্রীলক্ষ্মণপ্রসাদ ও শ্রীলতিকা ঘোষ

'পরিবার পরিকল্পনা' বিষয়টির প্রতি সাম্প্রতিককালে সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং আমাদের সরকার-কর্তৃকও ইহার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। পরিবার পরিকল্পনার ভাব-ধারণা ভারতের নিকট নূতন নহে। প্রায় শতাব্দীর এক পাদ যাবৎ এদেশে এই আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া আছে—স্বেচ্ছামূলক সংগঠন এবং সংস্থাসমূহ, কিন্তু আর্থিক অনটন এবং এই ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীর অভাবের দরুন এগুলির দ্বারা যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক নহে। ভারতে পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলন এখনও রহিয়াছে শৈশবাবস্থায় এবং স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। গ্রামীণ এবং নাগরিক উভয় সমাজেই সামাজিক অর্থনীতি এবং মনস্তাত্ত্বিক এই দ্বিবিধ বহু সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে যদি না জনসংখ্যার অবাধ বৃদ্ধি প্রতিরোধ কল্পে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এই বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি প্রতিরোধকল্পে তিন কোটি টাকা ব্যয় করিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বৃহৎ পরিবার এবং অল্পবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতার মধ্যে যে সুস্পষ্ট পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান, বর্ত্তমান প্রবন্ধে একদিকে যেমন তাহা দেখানোর চেষ্টা করা যাইবে অন্য দিকে তেমনি অল্পবয়স্ক শিশুদের অপরাধমূলক আচরণ নিরোধে পরিবার পরিকল্পনার নির্দ্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইবে। এই দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্কের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে ইহা পরিষ্কার ভাবে বুঝানো প্রয়োজন যে, অপরাধপ্রবণ বলিতে কাহাকে বুঝায়। অপরাধপ্রবণ সেই ব্যক্তিকেই বলা যায়, যে সামাজিক নীতিসমূহের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে না, অর্থাৎ—যে একগুঁয়ে; অসংশোধনীয় এবং অবাধ্যতা যার স্বভাবসিদ্ধ; চোর, অপরাধী এবং পাপাসক্ত লোকেদের সঙ্গে যার মেলামেশা এবং যে দুর্নীতিপরায়ণ, অশিষ্ট আর স্বভাবতঃ বখাটে।

ই. ম্নুয়েক ইহারও প্রমাণ পাইয়াছেন যে, অপরাধপ্রবণ বালকেরা আসিয়া থাকে কতকটা বৃহৎ পরিবারসমূহ হইতে, এই শিশুদের গড়পড়তা সংখ্যা হইতেছে ৬'৮। ভারতীয়দের পরিবার সাধারণতঃ বৃহৎ বলিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের পরিবারবিশিষ্ট ইউরোপীয় দেশসমূহের তুলনায় এদেশে পরিবারস্থ লোকেদের সামাজিক অপরাধপ্রবণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে অধিকতর।

দরিদ্র পরিবারগুলিতে অধিকসংখ্যক লোকের অবস্থানের জন্য অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যখন স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকল বয়সের লোকেরা একই ঘরে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করিয়া বাস করে তখন শালীনতা বজায় রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে দারিদ্র্য, ঘরে অতিরিক্ত লোকের সমাবেশ এই সমস্তের দরুন শিশুর গার্হস্থ্য পরিবেশ অপরাধের সূতিকাগার হইয়া দাঁড়ায়।

প্রায়ই একথা বলা হয় যে, শারীরিক কষ্ট এবং ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হইয়া শিশু অনেক সময় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং ভিক্ষাবৃত্তি অথবা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে। অপরাধমূলক আচরণের আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় অবাঞ্ছিত শিশুদের মধ্যে। দম্পতি যখন চাওয়ার অতিরিক্ত সন্তান লাভ করেন, তখন অবাঞ্ছিত সন্তানেরা বঞ্চিত হয় ভালবাসা হইতে, তাহাদের ঠিকমত দেখাশুনা করা হয় না। তাহাদের পিতামাতারাও তাহাদের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে তেমন মনোযোগ দিতে পারেন না। এই ধরনের শিশুরা প্রায়ই পিতামাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং সমাজ-বিরোধী কর্ম্মে লিপ্ত হয়।

এই সকল অল্পবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতার প্রতিকার

করিতে হইলে পরিবার পরিকল্পনার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র পরিবার সকলের জন্যই যথেষ্ট অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে। সুপরিকল্পিত এবং সীমাবদ্ধ পরিবার উপভোগ করে বিধাতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ শান্তি, সুখ ও সন্তোষ।

এই সমস্যার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিলে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত চেষ্টা করা হইয়াছে সেগুলিকে সমুদ্রে গোষ্পদ বলিতে হয় এবং যে পর্য্যন্ত না ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক অপরাধপ্রবণ শিশুকে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং অধিকাংশ পরিবারকে "ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রামে"র অন্তর্ভুক্ত করা হইবে সে পর্য্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ বাস্তব ভাবে ফলপ্রদ হইবে না।

হিমাচল প্রদেশে পুলিস-বিভাগ কর্তৃক শিশুদের শিক্ষাদান

শ্রীআনন্দস্বরূপ গুপ্ত

অনেক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন-কার্য্য এবং সমাজ-কল্যাণ কর্ম্মে ব্যাপৃত আছে। কিন্তু হিমাচল প্রদেশের পুলিস কর্ম্মচারীরাই প্রথম ইহা উপলব্ধি করেন যে, পুলিসের লোকেরাও এই ধরনের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এই লক্ষ্যে পৌছিবার উপায়-স্বরূপ যতগুলি সম্ভব রিজার্ভ লাইন, পুলিস ষ্টেশন এবং পুলিস ফাঁড়িতে পুলিস কর্ম্মচারীদের পরিচালনাধীনে শিশুদের ক্লাব সংগঠিত করা স্থিরীকৃত হয়। পুলিস কর্ম্মচারীদের স্বেচ্ছামূলক আনুকূল্যে সাত হইতে সতের বৎসর-বয়স্ক শিশু এবং কিশোরদের জন্য আমোদ-প্রমোদ, শারীর শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা অক্ষরজ্ঞান এবং নেতৃত্বের শিক্ষাদানের মধ্যে বর্ত্তমানে এই সকল ক্লাবের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ। সকল জাতি এবং যাবতীয় বৃত্তি-অবলম্বনকারী পিতামাতাকেই তাহাদের শিশুদিগকে ঐ সকল ক্লাবে পাঠাইবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। বাসস্থান, সাজসরঞ্জাম এবং আর্থিক সংস্থানের কথা বিবেচনা করিয়া ক্লাবের সভ্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

এই রাজ্যে এ পর্য্যন্ত এই ধরনের শিশুদের ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উনত্রিশটি। ক্লাবগুলির সভ্যসংখ্যা ত্রিশ হইতে ষাটের মধ্যে। পুলিস লাইন, পুলিস ষ্টেশন এবং পুলিস ফাঁড়ির গৃহে সুবিধাজনক কক্ষসমূহে ক্লাবগুলি স্থাপিত হইয়াছে। এ সকলের সন্নিহিত খোলা জায়গা খেলাধুলা এবং বাহিরের অন্যান্য কর্ম্মপ্রচেষ্টার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সমস্ত ক্লাবের প্রত্যেকটিতে প্রতি সভ্যের নিকট হইতে মাসে নামমাত্র দুই আনা করিয়া চাঁদা আদায় করা হয়। এই চাঁদার উদ্দেশ্য—শিশুদের মনে এই বোধ জন্মাইয়া দেওয়া যে, তাহারা ক্লাবে যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে তাহাদের নিজেদেরই অর্থে। বাকি খরচের জন্য ক্লাবগুলিকে নির্ভর করিতে হয়, সাধারণের স্বেচ্ছামূলক দান, বেসরকারী পুলিস ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত অর্থসাহায্য ও ঋণ এবং ক্লাবের সভ্যদের উদ্যোগে সংগঠিত প্রমোদানুষ্ঠান দ্বারা লব্ধ অর্থের উপর। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই রাজ্যে, পুলিস কর্ম্মচারীদের তরফ হইতে কোন প্রকার চাপ বা তাহাদের প্রভাব ব্যতিরেকে নিছক স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় ক্লাব সাধারণের নিকট হইতে মোটা রকমের অর্থসাহায্য পাইয়াছে। আশা করা যায়, যথাসময়ে সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ হইতেও এই সকল ক্লাবের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা হইবে। এই সমস্ত ক্লাবের প্রত্যেকটির জন্য গৃহাভ্যন্তরের (indoor) এবং ঘরের বাহিরের (outdoor) শিক্ষা এবং অবসরবিনোদনের সহায়ক কতকগুলি সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—"কম্যুনিটি লিসেনিং স্কিম" অনুযায়ী বেতার-যন্ত্র পাইবার জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। সভ্যদের সাধারণ শিক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক ক্লাবে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বই, পুস্তিকা, মানচিত্র এবং চার্ট রাখিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে।

খেলাধুলা, শারীর শিক্ষা, সাধারণ বক্তৃতামালা, আবৃত্তি এবং নাট্যাভিনয় ছাড়া, সভ্যদের শক্তি ও রুচি এবং পরিচালন-ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট পুলিস কর্ম্মচারীদের বিশেষ গুণ অনুযায়ী প্রত্যেক ক্লাবে একটি খেয়াল-খুশীর (nobby) কেন্দ্র খুলিবারও উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

পুলিস লাইন, পুলিস ষ্টেশন এবং পুলিস ফাঁড়ির ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা পদাধিকার বলে ক্লাবসমূহের 'এক্স-অফিসিও প্রেসিডেণ্ট' পদবী লাভ করিয়াছেন। হিসাবরক্ষকের কাজ করিবার জন্য প্রয়োজন একজন সাক্ষর (literate) কনেষ্টবলের। একজন সেক্রেটারী এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কতিপয় সভ্য নির্ব্বাচিত হয় ক্লাবগুলির সভ্যদের ভিতর হইতে। এমনই ভাবে শিশুদের সংগঠন এবং দায়িত্ব-পালন সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। প্রত্যেক ক্লাবকে উপস্থিতি, আয়-ব্যয়, সভ্যদের ব্যক্তিগত উন্নতি ইত্যাদির বিশদ বিবরণী, ক্লাবের সম্পত্তির ষ্টক বহি এবং সভার কার্য্য-বিবরণীর জন্য একটি 'মিনিট' বহি রাখিতে হয়।

জনসাধারণ এই পরিকল্পনাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত যে সকল ক্লাব সংগঠিত হইয়াছে সেগুলির সভ্যদের মধ্যে ঐকান্তিক উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে।

আলোচনা

"ম্যাডাম কামা"

ডক্টর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিগত শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীআরতি সেন লিখিত "ম্যাডাম কামা" শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটি ভ্রম-ত্রুটি নজরে পড়িল। সেগুলি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

৪৮২ পৃঃ, ২য় স্তবকে ইণ্ডিয়ান হোমরুল লীগ প্রসঙ্গে লেখিকা বলিতেছেন :

"১৯০৬ সনে বীর সাভারকর ও কৃষ্ণ বর্ম্মার সঙ্গে ম্যাডাম কামার পরিচয় হয়। এই দু'জনের অনুপ্রেরণাতেই ম্যাডাম কামা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবার সুযোগ পান ...... ম্যাডাম কামা যখন প্যারিসে ইনিও তখন প্যারিসে। এই সময়ে এঁরা ও আরও কয়েকজন মিলে চুপে চুপে "ইণ্ডিয়ান হোমরুল লীগ" প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল কি করে ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যায়? ম্যাডাম কামা ছিলেন এই গুপ্তদলের একজন বিশেষ উৎসাহী কর্ম্মী।"

উদ্ধৃত অংশের তথ্যগুলি ভ্রান্ত। বীর সাভারকরের লণ্ডনে পৌঁছার দুই বৎসর পূর্ব্বেই ম্যাডাম কামা শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্ম্মা ও শ্রীসর্দ্দার সিং রাওজী রাণা বি-এ, ব্যার-এট-ল, এই দুই উগ্রপন্থী নেতার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। "ইণ্ডিয়ান হোমরুল লীগ" নামে কখনও কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় নাই। ১৯০৫ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ৬৫ ক্রমওয়েল এভিনিউ, হাইগেইট, লণ্ডনে শ্যামাজীর খরিদ করা বাটীতে (ইহাই পরে "ইণ্ডিয়া হাউস" নামে বিখ্যাত হইয়াছিল)। "ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা গুপ্ত সমিতি ছিল না, প্রকাশ্যে গঠিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল (১) ভারতের জন্য হোমরুল আদায় করা (to secure); (২) তাহা লাভ করার জন্য সর্ব্বপ্রকারে গ্রেট ব্রিটেনে প্রচারকার্য্য চালানো; (৩) স্বাধীনতা এবং জাতীয় ঐক্যের সুবিধা (advantage) সম্পর্কে ভারতবাসীর মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করা।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মা সভাপতি, শ্রীসর্দ্দার সিং রাওজী রাণা, ডক্টর আবদুল্লা সুহ্‌রাওয়ার্দ্দি, মিঃ কে. এম, পারিখ, মিঃ গডরেজ এবং অন্য কয়েকজন সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ম্যাডাম কামা একজন উৎসাহী সদস্যা ছিলেন।

মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জী অনারারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

১৯০৫ সনের ১০ই মে শ্যামাজীর উদ্যোগে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম স্মৃতিবার্ষিকী লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। ম্যাডাম কামাই এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসনে বৃত হন

অপর স্থলে (৪৮২ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ৪র্থ স্তবকে) আছে "...... ১৯০৫ সনে প্যারিসে তিনি "বন্দেমাতরম্" নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। কাগজখানি প্রায় আট-নয় বৎসর চলেছিল।"

এই তথ্যে ভুল আছে। ১৯০৫ নহে, ১৯০৯ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর "বন্দেমাতরম"-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহা সাপ্তাহিক ছিল না, মাসিক ছিল। ইহার উপরে লিখিত থাকিত। "A monthly organ of Indian Independence." ইউরোপে ভারতীয়গণের দ্বারা কখনও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হয় নাই।

"বন্দেমাতরম", কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক "বন্দেমাতরম" বন্ধ হইয়া যাওয়ার পরে জেনেভা হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রচারিত হইত প্যারিস হইতে।

প্রথম সংখ্যায় ছিল "We issue this Journal with the object of carrying the high mission and proud tradition of "the Bandemataram" that has been suppressed in Bengal."

পূর্ব্বোক্ত ৪৮২ পৃঃ ২য় স্তম্ভের 'ষষ্ঠ স্তবকে' দেখিতেছি— "১৯০৭ সনে স্যর উইলিয়াম কার্জ্জন ওয়াইলির হত্যা ব্যাপারে ম্যাডাম কামা, বর্ম্মা, রাণাজী এবং সাভারকরকে বন্দী করবার কথা হয়। কিন্তু একমাত্র সাভারকর ছাড়া আর সকলেই সেই সময়ে ফ্রান্সে অবস্থান করাতে ইংরেজ তাঁদের কিছুই করতে পারে নি। সাভারকর সে সময়ে ইংলণ্ডে থাকাতে একমাত্র তাঁকেই তারা আইনতঃ বন্দী করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাঁকে বিচারের জন্য জাহাজে করে ভারতবর্ষে আনবার সময় তিনি জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন...।"

লেখিকা ইতিহাস-খ্যাত ঘটনাগুলি সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। স্যর উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলির হত্যাকাণ্ড ১৯০৭ সনে নহে, ১৯০৯ সনের ১লা জুলাই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। সাভারকর তৎপর লণ্ডনে থাকিয়া আসামী মদনলাল ধিংড়ার মামলার যথাযথ তদ্বির করেন। পরবর্তী জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে তিনি বন্ধু ও সহকর্মিগণ কর্তৃক স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য প্যারিসে নীত হন, কিন্তু সহসা বন্ধুগণের বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি লণ্ডন যাত্রা করেন। ১৩ই মার্চ্চ, রবিবার, ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে ট্রেন হইতে অবতরণ করামাত্রই তিনি বন্দী হইলেন। পরে জানা যায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের এক রুল মাফিক ওয়ারেণ্টের (ফেব্রুয়ারী ২২, ১৯১০) বলে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। সমরায়োজন, যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য, সম্রাটকে ভারতবর্ষের অধিকার-বিচ্যুত করা, অস্ত্র সংগ্রহ করা, ভারত সম্রাটকে রাজ্যচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ভাবী অভিযোগ এবং তৎসঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটি অতিরিক্ত অভিযোগ ছিল তাঁহার বিরুদ্ধে।

লণ্ডনের বো ষ্ট্রীট কোর্টে তাঁহার প্রাথমিক বিচার হয়, তিনি ইহার বিরুদ্ধে আপীল করেন, হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস দরখাস্ত করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১লা জুলাই এস. এস. মোরিয়া জাহাজে তুলিয়া তাঁহাকে ভারত অভিমুখে প্রেরণ করা হয় এবং পথে "মার্সাইয়ে" তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। ওয়াইলী হত্যার আসামী হইলে তাঁহাকে বোম্বাইয়ে না পাঠাইয়া লণ্ডনেই রাখা হইত এবং লণ্ডনে তাঁহার বিচার হইত। নাসিকের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন হত্যার সাহায্যকারী হিসাবে তাঁহাকে আসামীশ্রেণীভুক্ত করা হয়।

অপর স্থলে (পৃঃ ৪৮৩, ১ম স্তম্ভ, ২য় স্তবক) লেখিকা উল্লেখ করিয়াছেন যে, অন্তরীণ হইতে "মুক্তি পেয়েই ম্যাডাম কামার প্রধান কাজ হ'ল রাশিয়ান বিপ্লবী খুঁজে বের করা, যারা ভারতীয় কয়েকজন বিপ্লবীকে বোমা তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে পারে।" এই তথ্য সম্পূর্ণ অলীক। ১৯০৭ সনেই ম্যাডাম কামার সহকর্ম্মী শ্রীরাণা, আলীপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী হেমচন্দ্র দাসকে রাশিয়ান বিপ্লবীগণ প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে বোমা প্রস্তুত ও প্রয়োগ শিক্ষা দিয়েছিলেন। ম্যাডাম কামা ১৯১৯ সনে অন্তরীণ হইতে মুক্তির পর রাজনৈতিক বা বৈপ্লবিক কোনও প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন নাই, হইবার মত স্বাস্থ্য এবং সুযোগও তাঁহার ছিল না।

ম্যাডাম কামার প্রসঙ্গে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯০১ সনে তিনি লণ্ডন গমন করেন এবং প্রথমতঃ দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যে মনোযোগী হন। পরে সম্ভবই কাথিওয়াড়ের দুই বিপ্লববাদী শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা ও শ্রীসর্দ্দার সিংজী রাওজী রাণার কার্য্যে সহযোগিতা করেন।

শোভা সেন
সর্বদা ব্যবহার করে থাকেন
লাক্স
টয়লেট
সাবান
"একমাত্র বিশুদ্ধ সাবানই
এত শুভ্র হতে পারে"
তিনি বলে থাকেন
লাক্স টয়লেট সাবান বিশুদ্ধ। এই সাবানটীর দুধের মত শুভ্রতাই আপাত দৃষ্টিতে এর বিশুদ্ধতার পরিচায়ক। এই শুভ্র বিশুদ্ধ সাবানটী নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি দেখবেন সরের মত মোলায়েম, সুগন্ধী এই ফেণা কি ভাবে আপনার ত্বকের যত্ন নেয়··· কি ভাবে ত্বককে সুন্দর করে তোলে! সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে এবং খরচ সাশ্রয়ের জন্যে বড় সাইজের সাবান ব্যবহার করুন।
LUX
TOILET SOAP
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
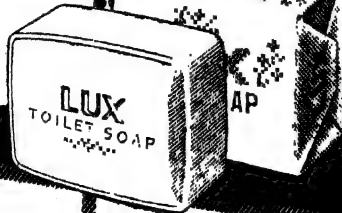
বনমল্লিকা—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। বাসন্তী বুক ষ্টল। ১৫৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

কোন একটা ইংরেজী বইয়ে এক বার আসামের এক কথায় একটি সুন্দর বর্ণনা পড়েছিলাম—Assam is at the back of Beyond, অর্থাৎ আসাম পরিচিত বিশ্বের একেবারে বাইরে। বাস্তবিকই, ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা থেকে নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ এই যে পার্ব্বত্যভূমি চীন ও থাইল্যাণ্ডের দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে, রহস্যের দিক থেকে এ বোধ হয় মূল হিমালয়কেও অতিক্রান্ত করে যায়। এবং সেই হেতুই কৌতূহলকে করে আরও উদ্রিক্ত।

কিন্তু এই কৌতূহল নিরোধ করবার উপকরণ আমরা পাই না। আমাদের দৌড় কামরূপ কামাখ্যা পর্য্যন্ত। কামরূপ নিজেই রহস্যভূমি, আমাদের অনুসন্ধিৎসা ঐখানেই যেন একটা বাধা পেয়ে আবর্ত্তিত হতে থাকে, তার ওদিকে সভ্যতার প্রত্যন্ত দেশে যে গভীরতর রহস্য রয়েছে তা অজানাই থেকে যায় আমাদের কাছে।

কচিৎ কারও দুরাভিযাত্রী মন একটু এগিয়ে গেছে, এই রহস্যলোকে কিছু আলোকসম্পাত করেছে, যেন স্বল্প চকিত আলোকেই আমরা একটা অপরূপ সুন্দর জগতের সন্ধান পেয়েছি, বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি। এ সম্পর্কে সর্ব্বাগ্রেই নাম মনে পড়ে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের। এর আগে তিনি "বিচিত্র মণিপুর" ও "আদিবাসীদের বিচিত্র কথা" প্রভৃতি নানা বই দিয়ে বাংলা-সাহিত্যের এদিককার অভাব খানিকটা পূরণ করেছেন। অবশ্য এসবের বেশীর ভাগ তাঁর ব্যক্তিগত অভিযান-লব্ধ নয়, তবে তার জন্য বাংলা পাঠক যে কম লাভবান একথা বলার উপায় নেই।

এর পরে আমরা পেলাম এই "বনমল্লিকা"

'বনমল্লিকা' তথ্যমূলক বই নয়; যদিও তথ্যমূলক বইও যে কত রসঘন হতে পারে তার পরিচয় পূর্ব্বের বইগুলিতে দিয়েছেন নলিনীবাবু। 'বনমল্লিকা' সাতটি গল্পের সমষ্টি। সাতটিই প্রেমের। গল্পগুলি লেখকের স্বকল্পিত নয়। তিনি ভূমিকাতে বলেছেন, সুদূর অতীত কাল থেকে আসামের আদিবাসীদের মধ্যে যে সমস্ত প্রণয়কাহিনী প্রচলিত, মিলস্, গর্ডন প্রভৃতি জাতিতত্ত্ববিদ্দের পুস্তক থেকে সঞ্চয়ন করে তাদের মধ্যে থেকে কয়েকটি বেছে নিয়ে তিনি গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছেন।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বইখানির আসল মূল্য এইখানে। কল্পনার সাহায্যে আদিবাসী চরিত্র নিয়েও উৎকৃষ্ট কাহিনী রচনা করা যেত, কিন্তু তাতে তাদের সত্য রূপটি পাওয়া যেত না। এ যা হয়েছে তাতে আদিম আরণ্য জগতের একটি পরম বিস্ময়কর চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যুগযুগাগত বন্য-প্রথার মধ্যে জীবনের অলিগলি হয়ে প্রেমের বিজয়-অভিযান সত্যই অপরূপ। আদিম পার্ব্বত্য জীবন সমাজ-বন্ধনে অনেকখানি শিথিল এবং সেই জন্য ভালোবাসা যে সভ্য-জগতের চেয়ে খানিকটা বেশী মুক্তি এবং প্রসার পায় তাতে প্রণয়লীলার অনেকখানি বৈচিত্র্য এনে দেয় সভ্য-সমাজের তুলনায়। আবার, যত মুক্তই হোক, প্রণয়ে আছে সংঘাত, প্রণয়কে এখানেও দিতে হয় পরীক্ষা, যেমন দিতে হয় সভ্য-জগতেও। সেক্ষেত্রেও আদিম মানুষ অগ্নিপরীক্ষায় বিশুদ্ধ হয়ে উঠে প্রেমের স্পর্শে কেমন করে পূর্ণবিকশিত হয়ে ওঠে—দেখলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

এটা গেল কাহিনীগুলির প্লট বা গল্পাংশের কথা। কিন্তু শুধু প্লট নিয়েই কাহিনী দাঁড়ায় না, এবং এইখানে এসে পড়েছে লেখকের কৃতিত্ব। তিনি যে অনুপম ভাষা দিয়ে মণ্ডিত করেছেন গল্পগুলি, যে-ভাবে সমাবেশ সৃষ্টি করেছেন এবং যে সুক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টি দিয়ে চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতেই সমস্ত কাহিনীগুলি স্বমহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রণয়-কাহিনীর অভাব বাংলায় নেই; বস্তুতঃ বোধ হয় আমাদের কথাসাহিত্যের পনেরো আনাই প্রণয়-কাহিনী। তার মধ্যে এই কাহিনীগুলি নিজের স্বকীয়তায় যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা লেখকের হাতের গুণেই। ভাষারই দুইটি নিদর্শন তুলে দিই—

"ক্ষণকাল পরে তারা দেখলে, একটি অলোকসুন্দরী তরুণী গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামছে; তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হবামাত্রই হকচকিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলে। অবলীলাক্রমে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে সে গুহামুখে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তার পর বিদ্যুল্লেখা যেমন করে চকিতের মত তীব্র রশ্মিচ্ছটায় চোখ ঝলসে কালো মেঘের বুকে বিলীন হয়ে যায়, তেমনিভাবে এক লহমায় গুহাভ্যন্তরস্থ নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করলে।" (পৃ. ২৫)

"বাড়ী থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ধানক্ষেতের অভিমুখে রওনা হ'ল শাংকক। ক্ষেতভূমিতে গিয়ে যখন পৌছল, তখন দুর দিগন্তলীন পাতকোই

DALDA

পাহাড়শ্রেণীর ওপর দিয়ে প্রভাতসূর্য আকাশে উঠেছে। বিচিত্রবর্ণানুরঞ্জিত আকাশের পটভূমিকায় নীল পাহাড়ের চূড়াসমূহ চালচিত্রের মত শোভমান। পাহাড়ের পশ্চিম দিককার গড়ানে অংশ এখনও ছায়ায় ঢাকা। নিচেকার উপত্যকাভূমি অজস্র হিমকণায় সমাচ্ছন্ন—কে যেন রহস্যময়ী প্রকৃতির সুপ্ত মুখের 'পরে শুভ্র, সূক্ষ্ম কৌষেয় অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছে। সূর্য্যের সোনালী রশ্মিপাতে প্রকৃতির সেই মুখাবরণখানি ঝলমল করছে।"

ভাষার এরকম উদাত্ত সুর, এরকম ধ্বনি-সম্পদ না থাকলে আদিম মানুষের বিচরণভূমি এই বন্য প্রকৃতির পূর্ণ রূপটি ফোটানো যেত না; তার উদ্দাম প্রণয়লীলাকে রূপ দেওয়া যেত না।

আর একটি জিনিস যা লেখকের প্রতি পাঠকের মনকে শ্রদ্ধান্বিত করবে তা তাঁর সংযম। এত বিচিত্র প্রণয়কাহিনী, তার ওপর আদিবাসীদের সমাজ-প্রথায় এত শৈথিল্য কিন্তু একটি পংক্তিতে, এমনকি একটি শব্দেও কোনখানে লেখক তাঁর কাহিনীর শুচিতা নষ্ট করেন নি। অপ্রয়োজনে, অপ্রাসঙ্গিকভাবে যে যুগের সাহিত্যে কথায়-কথায় লালসার ক্লেদ এনে ফেলা একটা সাধারণ রেওয়াজ হয়ে পড়েছে, যে যুগে সুযোগ পেয়েও তার অপব্যবহার না করার সংযমের জন্য লেখককে অভিনন্দিত করতে হয়।

আমাদের যতদূর জানা আছে আসামের এই অঞ্চলের আদিবাসীদের কাহিনী নিয়ে বাংলায় গ্রন্থ এই প্রথম, প্রণয়কাহিনী নিয়ে তো বটেই। সেদিক দিয়েও লেখক বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদার্হ।

সার্থকনামা একখানি বই। মাত্র সাতটি কাহিনী, কিন্তু তাইতেই বনমল্লিকার মদির সৌরভে আগাগোড়া পাঠকের মনকে মাতিয়ে রাখে। রসিকসমাজে বইখানি উপযুক্ত সমাদর হবে বলেই আমরা আশা করি। এবং তার সঙ্গে এও আশা করি যে, লেখক আমাদের মনে যে রসতৃষ্ণা জাগালেন তাকে পূর্ণতর করে পরিতৃপ্ত করতে প্রয়াসী হবেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আরাবল্লীর আড়ালে—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য দেড় টাকা।

বাংলা-সাহিত্যে রাজোয়ারার শৌর্য্য-বীর্য্য, গুণগরিমা, দেশাত্মবোধ ও সতীধর্ম্ম পালনের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সে ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। সেখানে রাজকীয় জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য্য-বিলাসের নেপথ্যে—নিরাবরণ নরনারীকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। লেখিকা আলোচ্য গ্রন্থে এই কঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করিয়াছেন, সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালব্ধ একটি রাজ-অন্তঃপুর ও তাহার অভ্যন্তরচারী নরনারীকে গল্পের আসরে হাজির করিয়াছেন। মোগল হারেমের মত সুরক্ষিত এই অন্তঃপুর—খোজা প্রহরী ও নানা নিয়মকানুনের গণ্ডী দিয়া ঘেরা। বাহিরের সাধারণ নরনারীর চোখে—এই ঐশ্বর্য্য মায়া-আলিম্পন আঁকে—মনকে মোহলুব্ধ করে। আরাবল্লী-বৃত্তের সাধারণ ঘরের কন্যারা সুখভোগের আশায় অন্তঃপুরচারিণী হয়। কেহ আসে রাণীদের সঙ্গে উপঢৌকন স্বরূপ কাহাকেও কিনিয়া বা চাহিয়া আনা হয়, কোন কোন দরিদ্র বাপ-মা স্বেচ্ছায় মেয়েকে রাজ অন্তঃপুরচারিণী করিয়া দেন। প্রথমে মেয়েরা আসে পাত্রী হইয়া রাজানুগ্রহলাভের

L. 259-X52 BG

ভারতে প্রস্তুত

আশায়। রাজানুগ্রহ লাভ করিতে ইহারা নৃত্য-গীত, বাদ্য-যন্ত্র বাদন শিক্ষা করে, অনুগ্রহ লাভ করিয়া 'পর্দায়েৎ' হয়—'পাশোয়ান' হয়। অর্থাৎ, রাণীর মত সম্পদ-সম্মান ও ক্ষমতা লাভ করে। ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদার লোভে পুরুষ আসে অন্তঃপুরে—খুশ্‌নজরজী অর্থাৎ খোজা সর্দ্দার হইয়া। পাশোয়ান-গর্ভজাত লালজী সাহেবদের অন্তঃপুর-বিচরণের অধিকার আছে, কিন্তু রাজপুত্রের মর্য্যাদা ইহারা পায় না। প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের নীচের স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীতে ইহাদের স্থান। এ ছাড়া অন্তঃপুরে আছেন মাজী সাহেব (রাজমাতা), শ্রেষ্ঠ পত্নী, বড়ারণজী (প্রধানা সখী) ও সাধারণ সখী ও দাসী প্রভৃতি। গল্প ইহাদেরই লইয়া। প্রাসাদ-সীমানায় খণ্ডিত হইলেও—এই সব জীবনের জাঁকজমক আছে, চমক আছে, স্নেহ, প্রেম, ঈর্ষা, দ্বন্দ্বে সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠে। অন্তঃপুরের নাটমঞ্চের একমাত্র নায়ক রাজাকে ঘিরিয়া ইহাদের উৎসব-নাট্য-লীলা অবিরাম বহিয়া চলে। এ নাটক বাহ্যতঃ মিলনান্তক—যদিও যবনিকার অন্তরালে একটি সকরুণ সুরের মূর্চ্ছনা ও শূন্যতার বেদনা ফল্গুস্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে। প্রাসাদ-বৃত্তলীন জীবন বন্দী-জীবনের দুঃসহ জ্বালায় কোন কোন সময়ে জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। প্রতিটি কাহিনী শেষ হইলে বেদনার রেশটি মনের মাঝেই রহিয়া যায়।

শুধু বাস্তবনিষ্ঠা দ্বারা নহে—লিপিকুশলতার গুণেও গল্পগুলি অনবদ্য হইয়াছে। বাংলা কথা-সাহিত্যে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।

মন্ত্রী থেকে মিনিয়েল—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নব চেতনা, ৩৯, ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া। মূল্য ২॥০ টাকা।

নিম্নপদের পিওন হইতে পদমর্য্যাদা-ভারাক্রান্ত মন্ত্রী প্রভৃতিদের লইয়া গল্প। গল্পের ক্ষেত্র অবশ্য সরকারী দপ্তরে সীমাবদ্ধ। সেখানকার আদব-কায়দা, অফিসনীতি বা রাজনীতির খেলা, পদমর্য্যাদা, প্রমোশন, বৃত্তলগ্ন জীবনের সুখ-দুঃখ-ঈর্ষা-সংঘাত, স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শ, একটু বা চটুল প্রেম-বিলাসের অভিনয়—সব জড়াইয়া নানা স্তরের পরিচয়। 'কপাট' স্তবকে একটি বৃত্তের ক্রম-উর্দ্ধায়িত কর্ম্মজীবনের ছবি। ছবিগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা-বর্জ্জিত নহে। কোন কোন স্তবকে গল্প জমিয়াছে, কোন কোনটিতে উপন্যাসের ছায়াপাত হইয়াছে। যুগধর্ম্ম-প্রভাবিত সমাজ, পরিবেশ ও জীবন সম্বন্ধে লেখক সচেতন, প্রকাশভঙ্গী প্রশংসার্হ।

বাস্তু পেল বাস্তুহারা—পেই ওয়েই। অনুবাদক—শ্রীঅমল সরকার। ফার্ম্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ৬/১ এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য ২, টাকা।

উপন্যাসখানি চীনা লেখক পেই ওয়েই কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। দেশ-গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া একটি বাস্তুহারা কৃষক-পরিবার কেমন করিয়া সুস্থ ও সুখী নাগরিকে পরিণত হইল—তাহারই চিত্র আছে গল্পটিতে। গল্পটি বাস্তব অভিজ্ঞতাপুষ্ট। একই সমস্যাপীড়িত দেশে—অনুবাদটি সময়োচিত হইয়াছে; অনুবাদকের ভাষাও সাবলীল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দেখুন!
অর্দ্ধেকটী
সান্‌লাইট্‌
সাবানেই এ সব
কাচা হয়েছে !
সান্‌লাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারণ!
SUNLIGHT
SOAP
সান্‌লাইট্‌
সাবান
দিয়ে কাচলে কাপড়জামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।
ভারতে প্রস্তুত

শ্লোকসংগ্রহ—নববিধান গ্রন্থপ্রকাশক সমিতি। ৯৫, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পৃ. ৪৬৮।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন নব্বই বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক যে ক্ষুদ্র শ্লোকসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া এখন মনোজ্ঞ বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ইহা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইহুদী, খ্রীষ্টীয়, মুসলমান, পারসিক ও চৈনিক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত এবং হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ-সম্বলিত। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক হইলেও অনেক সাধারণ পাঠকের এবং ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির কৌতূহল নিবৃত্ত করিবে। এ-জাতীয় বহুভাষানিবদ্ধ নানা ধর্ম্মীয় বাণীসংগ্রহ অত্যন্ত বিরল।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। দুঃখের বিষয়, এই প্রধান অংশের মুদ্রণে কতিপয় ত্রুটি লক্ষিত হইল, যাহা অনায়াসে সংশোধিত হইতে পারিত। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের স্মৃতিপূত গ্রন্থ বিশুদ্ধাকারে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা দুই-একটি ত্রুটি দেখাইয়া দিতেছি। পৃ. ৩ হইতে সংযুক্ত শিরোনামায় "বেদ-উপনিষদ্" না হইয়া শুধু "বেদ" (১৫ পৃ. পর্য্যন্ত) এবং শুধু "উপনিষদ্" (পৃ. ১৭-৫৭) হওয়া উচিত। পরেও অনুরূপ সংশোধন আবশ্যক—ভাগবতের শ্লোকসমূহ (পৃ ২৩৩-৬৩) "বিষ্ণুপুরাণ" শিরোনামে মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেক অশুদ্ধ পাঠ লক্ষিত হয়—২৯ শ্লোকে কস্যম্বিদ্ধনম্, ৩০৫ শ্লোকে তথা, হিংসা পরমো (পরো হইবে) দমঃ ইত্যাদি। মুদ্রাকরপ্রমাদের সংখ্যাও কম নহে—৭৫ শ্লোকে ভূয় স্থলে ভয়, ২৪৯ শ্লোকে গীতার স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে স্থলে—মুনি—ইত্যাদি।

স্তোত্রমালা—উত্তমাশ্রম। পোঃ ডুমুরদহ, হুগলী। পৃ. ৩১২। মূল্য সোয়া দুই টাকা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে চিত্তশুদ্ধির সর্ব্বজনসুলভ উপায়স্বরূপ স্তোত্রাদি পাঠের প্রথা প্রচলিত আছে। এইরূপ স্তোত্রের সংখ্যা অগণিত এবং তন্মধ্য হইতে নিত্যপাঠ্য উৎকৃষ্ট কতিপয় নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কঠিন কার্য্য। উত্তমাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী একটি সংগ্রহ অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করাইয়াছিলেন—তন্মধ্যে তাঁহার স্বরচিত গান সন্নিবিষ্ট ছিল। পরে তাহা শ্রীমৎ ধ্রুবানন্দ স্বামী দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। বর্ত্তমান সংস্করণটি অধুনা-বিখ্যাত উত্তমাশ্রমের পর পর তিন জন মহাপুরুষের পবিত্র সংস্পর্শে গৌরবান্বিত এবং তাঁহাদের চিত্র দ্বারা পরিশোভিত হইয়া মনোজ্ঞ আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রমের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইলেও ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে—কারণ, এ-জাতীয় গ্রন্থ বাজারে বহু পাওয়া গেলেও এইরূপ পবিত্র সমাবেশ অন্য কোন স্তোত্রসংগ্রহে পাওয়া কঠিন।

শাস্ত্র-সংশয়-নিরসন—শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার। ১০৯।১১-এ, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬। পৃ. ৪৮+৪২৫। মূল্য পাঁচ টাকা।

উপনিষদের একটি বচন আছে—পৌরুষ দ্বিবিধ, 'উচ্ছাস্ত্র' (যাহা অনর্থ ঘটায়) এবং 'শাস্ত্রিত' (যাহা পরমার্থজনক)। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র উচ্ছাস্ত্র পৌরুষ প্রসারলাভ করিয়া মানবজাতির অনর্থ ঘটাইতেছে। গ্রন্থকার ইঞ্জিনীয়ার অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানের ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু গুরুকৃপায় তাঁহার শাস্ত্রে বিশ্বাস বিন্দুমাত্র স্খলিত হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রের যে সকল বিষয়ে অশ্রদ্ধার বীজ নিহিত আছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এইরূপ ২৯টি প্রশ্নের উত্তর এই বিরাট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরলোক, জাতিভেদ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সমাজঘটিত এবং রাসলীলা, গুরুতত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মঘটিত বিষয়ের আলোচনায় ও বিশ্লেষণে গ্রন্থকার গভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি স্বভাবতঃই শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতসম্প্রদায়ের অনুসরণমাত্র নহে—পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও সদ্গুরুর বাণী এমন এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে তাঁহার বিচারবুদ্ধিকে অভিষিক্ত করিয়াছে যে, ঘোর অবিশ্বাসীও মুগ্ধ না হইয়া পারে না। গ্রন্থকারের পরম গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বহু অলৌকিক ঘটনা ও অসংশয়িত উপদেশ এবং নির্দ্দেশ গ্রন্থটিকে পবিত্র করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থকারের ভাবপ্রবণতা ও ভাষার লালিত্য উপভোগ্য। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক শিক্ষিত লোকের শাস্ত্রবিশ্বাস দৃঢ় হইবে এবং দীক্ষাগ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মিবে বলিয়া আমাদের ধারণা। নাস্তিকতার প্রবল আকর্ষণের মধ্যে অমৃতের সন্ধান বহন করিয়া আনিয়া গ্রন্থকার প্রকৃত সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার শেষ নিবেদন এই সেবাব্রতের পরিণতি এবং একান্ত মর্ম্মস্পর্শী।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গান্ধী ও মার্কস—কিশোরলাল মশরুওয়ালা। অনুবাদক—শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩৲। পৃষ্ঠা ১৩৪।

কিশোরলাল ভাই ১৮৯০ সনের ৬ই অক্টোবর এক সম্ভ্রান্ত গুজরাটী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। চরিত্রমাধুর্য্যে তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়। ১৯১৭ সনে তিনি প্রথম গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসেন এবং গভীর পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব কর্ম্মনিষ্ঠা, বিনয় ও নম্র স্বভাবের জন্য শীঘ্রই মহাত্মাজীর প্রিয়পাত্র হন। বহুদিন তিনি গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত 'হরিজন' পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সনে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনার্থ মহাত্মাজীর নোয়াখালি পরিক্রমায় সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ১৯৫২ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছিল।

মার্কসবাদকে কিশোরলালজী সংস্কারমুক্ত হইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতে মার্কসবাদ এবং গান্ধীবাদের তুলনামূলক বিচার ও আলোচনা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট খুবই চিত্তাকর্ষক।

মহাত্মা গান্ধী ও কার্ল মার্কস উভয়েই ছিলেন শ্রেষ্ঠ মনীষী। অনেকের ধারণা উভয়ের আদর্শ এক, কেবল আদর্শে উপনীত হইবার পন্থা বিভিন্ন। এক জনের পথ অহিংসা, অপরের পথ হিংসার মধ্য দিয়া। কিন্তু আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই মতবাদ দুইটি পরস্পর হইতে কেবল বিভিন্ন নহে, পরস্পর-বিরোধীও বটে। গান্ধী ও মার্কস উভয়কেই একতত্ত্ববাদী বলা চলে। এই একতত্ত্ব কিন্তু উভয়ের নিকট বিভিন্ন। গান্ধীজীর মূলতত্ত্ব 'চৈতন্য', মার্কসের মূলতত্ত্ব 'জড়' এইজন্য গান্ধীজী 'আস্তিক' আর মার্কস 'নাস্তিক'। এইজন্য

গান্ধীদর্শন বলে—জড়ের অস্তিত্ব চৈতন্যের ভিত্তিতে, আর মার্কস-দর্শন বলে জড় হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি। ইহা হইতেই মার্কসদর্শনের 'নিয়তিবাদ' আসিয়াছে।

গান্ধীজী ও মার্কসের লক্ষ্যের মধ্যেও প্রভেদ বর্তমান—রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ইঁহাদের বিচারধারা পৃথক। মার্কসের মতে শ্রেণী-সংগ্রাম, সর্ব্বহারার একনায়কত্ব দ্বারা শ্রেণী-বৈষম্যের অবলুপ্তিসাধন ও ভূমি, খনি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কর্তৃত্বস্থাপন, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, শ্রমশিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও কার্য্যকলাপের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত হইতেছে—বর্ণধর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ত্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হইয়া শিল্পসমূহের অনুশীলন), সত্যাগ্রহ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, বিকেন্দ্রীকরণ, অহিংবাদ ও সামাজিক জীবনে যথাসম্ভব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

গান্ধীজী জোর দিতেন নৈতিক ও মানসিক পরিবর্ত্তনের উপর—মার্কস-কথিত পথে—শ্রেণীহীন (হত্যা প্রভৃতি দ্বারা তথাকথিত "বিপ্লব") সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। গান্ধীজীর আসল লক্ষ্য ছিল কিসে মানুষের চারিত্রিক উন্নতি হয়—আর সকলই গৌণমাত্র। তিনি রাজনৈতিক বা আর্থিক কাঠামোর বাহ্য স্বরূপের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। অথচ মার্কসবাদ মনে করে "মানুষের বিবেক-বুদ্ধি পরিবেশ রচনা করে না। পক্ষান্তরে মানুষের সামাজিক অবস্থা বিবেক নির্ম্মাণ করে।" গান্ধীজীর অহিংবাদ মার্কসের একনায়কত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং বিভিন্ন সমস্যার প্রতি গান্ধীজী ও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্যও বিদ্যমান।

গান্ধীবাদ হইতেছে এক নিশ্চিত আদর্শের প্রতি অগ্রসর হইবার বিশেষ পদ্ধতি। তাঁহার মতে সত্য ও অহিংসা, সমাজে সমমর্য্যাদা, আত্মোন্নতির সমান সুযোগ, ধন এবং জীবনধারণোপযোগী উপকরণসমূহের সমবণ্টন, রাষ্ট্রীয়-নিয়ন্ত্রণ-পাশ হইতে মুক্তি, বিকেন্দ্রীকরণ, অসাম্প্রদায়িকতা, শান্তি, সদ্ভাব, মৈত্রী, যুদ্ধের আতঙ্কমুক্তি, আইনকানুনের নিগড় হইতে রেহাই পাওয়া, সর্ব্বাধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যযুক্ত অথচ সুব্যবস্থিত সমাজ ইত্যাদি বিষয় এই আদর্শ জীবনের বিভিন্ন অঙ্গ।

অথচ গান্ধীবাদ বলিয়া কিছু গান্ধীজী নিজেই স্বীকার করেন নাই। "আমি তো শুধু নিজস্ব পদ্ধতিতে শাশ্বত সত্যকে দৈনন্দিন জীবন ও সমস্যা-বলীতে যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি"—ইহা গান্ধীজীর নিজের কথা।

গান্ধী ও মার্কসের মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের দেশের অশিক্ষিত কিং অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ত বটেই, অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তির ধারণাও অস্পষ্ট। এইজন্যই তরুণ-সমাজ আদর্শ-নির্ণয়ে এবং কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে স্বতঃই বিপথগামী হইতেছেন। 'মার্কসবাদের গতিপ্রকৃতি' শীর্ষক একটি অধ্যায় মূল গ্রন্থে না থাকিলেও উহা এই পুস্তকে সংযোজিত করিয়া অনুবাদক ভাল করিয়াছেন। মহাত্মাজীর উত্তরসাধক আচার্য্য বিনোবা ভাবে এই গ্রন্থের ভূমিকায় গান্ধীদর্শনের যে মনোরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সুস্পষ্ট হইয়াছে।

এইরূপ সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচার খুবই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কৃষ্ণকলি—শ্রীতারাপদ রাহা। কথা ভবন। ২৭।২।৩, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য দুই টাকা।

গল্পসংগ্রহ। কৃষ্ণকলি, মাটি আর মানুষ, শিবশঙ্কর, পাশের বাড়ীর বৌ, বাঁশী, নিঃসঙ্গ, সমাপ্তির পূর্ব্বপরিচ্ছেদ ও অনাবশ্যক—এই আটটি গল্প পুস্তকখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। ছোটগল্প লেখায় তারাপদ বাবুর হাত আছে। তিনি মিষ্টি করিয়া বলিতে জানেন—অল্প কথায় গুছাইয়া বলিবার শক্তি ও তাঁহার আছে।

কৃষ্ণকলি, মাটি আর মানুষ, পাশের বাড়ীর বৌ ও নিঃসঙ্গ এই চারিটি গল্প বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। অন্যান্য গল্পগুলিও মন্দ নয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ধূমকেতু—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র। মেসার্স গোকুলচন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং ষ্টেশনার্স এণ্ড প্রিণ্টার্স। ৯-এ, ডালহৌসী স্কোয়ার ঈষ্ট, কলিকাতা-১। মূল্য আড়াই টাকা।

ধূমকেতু সম্পর্কে লেখক প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আধুনিক বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত গগন-পর্য্যবেক্ষণের বাস্তব জ্ঞানের সমন্বয়ে তিনি ধূমকেতু সম্পর্কিত এই তথ্যমূলক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া আমাদের মাতৃভাষার একটি অভাব পূরণ করিলেন। গ্রন্থকার পল্লীবাসী, পল্লীর শান্ত পরিবেশে অবস্থান করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি চর্ম্মচক্ষুর দূরদৃষ্টি দ্বারা গগন-পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন। গগন পর্য্য-বেক্ষণে কৃতকার্য্যতালাভের দরুন তিনি আমেরিকা হইতে একটি মূল্যবান দূরবীক্ষণ যন্ত্র উপহার পান। তাঁহার দীর্ঘজীবনের গগন পর্য্যবেক্ষণের সার্থক সাধনার ফল এই ধূমকেতু নামক গ্রন্থখানি। জীবনসায়াহ্নে ইহা প্রকাশ করিয়া লেখক অনুসন্ধিৎসু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মহৎ উপকার করিলেন। এই গ্রন্থে পুরাণ ও জ্যোতিষসংহিতায় বর্ণিত ধূমকেতুর পরিচয় এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞানে বর্ণিত ধূমকেতু-পরিবারের অবস্থান, তাহাদের আবির্ভাব ও তিরোধানের সময়নির্ণয় ও ধূমকেতুসমূহের চিত্র, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকগণের জীবন-কথা ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির ভিতরে ধূমকেতুর আবির্ভাব ও তিরোধানের সঙ্গে জড়িত এক অহেতুক অমঙ্গলের আশঙ্কা বহু শতাব্দী যাবৎ চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে 'ধূমকেতুর' গতিবিধি, ইত্যাদি পরীক্ষার পরে দেখা যাইতেছে যে, ধূমকেতু সৌর পরিবারের সকল জ্যোতিষ্কের তুলনায় অতি দুর্ব্বল এবং নিঃস্ব। ধূমকেতুর ভাগ্যে প্রায়শঃই সূর্য্যরশ্মির কৃপালাভ হয় না। ধূমকেতু আকাশপথে অতি নিরীহ জীবের ন্যায় ভয়ে ভয়ে বিচরণ করে; কারণ গ্রহসংঘর্ষে তাহার কক্ষচ্যুত হইবার সম্ভাবনা আছে। গ্রন্থকার প্রাচীন শাস্ত্র ও বর্ত্তমান বিজ্ঞান এবং প্রাচীন কুসংস্কার সম্পর্কে সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন। এক কথায় ধূমকেতু গ্রন্থ-খানি ছাত্র, অধ্যাপক এবং মানমন্দিরের গগন-পর্য্যবেক্ষকগণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল

এখন রেক্সোনায় *নতুন* একটা কিছু আছে !

দেশ-বিদেশের কথা

সাহিত্যিকের সম্মান

প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর দিল্লীর "সাহিত্য আকাদমি" কর্তৃক "আরোগ্য-নিকেতন" শীর্ষক উপন্যাসের জন্য পুরস্কৃত হইয়াছেন। এই পুস্তকখানি লিখিয়া তিনি ১৯৫৪-৫৫ সনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি চীন-রাষ্ট্রের আহ্বানে তারাশঙ্করবাবু ভারত-সরকারের প্রতিনিধিরূপে চীন-যাত্রা করিতেছেন। সেখানে লু-সিন নামক খ্যাত চীনা সাহিত্যিকের বিংশতি মৃত্যু-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। লু-সিন আধুনিক চীনা সাহিত্যের স্রষ্টা বলিয়া চীন দেশে স্বীকৃত। তারাশঙ্করবাবু তাঁহার মৃত্যু-বার্ষিকী উৎসবে যোগদান করিবেন। এই উৎসবে যোগদানের নিমিত্ত তিনি আহূত হইয়াছেন।

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার

১৯৫৫ সনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

১৯৫৫ সনে দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনে ১৬টি নূতন শয্যা প্রতিষ্ঠা করা হয়—তন্মধ্যে ১৪টি শয্যা জাতিধর্ম্ম-উপজীবিকা-নির্ব্বিশেষে যে কোন যক্ষ্মা রোগীর জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহার্য্য। অবশিষ্ট দুইটি শয্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম্মচারীদিগের জন্য সংরক্ষিত। ইহা লইয়া সেবায়তনে মোট শয্যার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ত্রিশটি—তন্মধ্যে অর্দ্ধেক পুরুষ ও অর্দ্ধেক নারীদিগের জন্য; এবং ২৮টি ভাণ্ডারের নিজস্ব অর্থে পরিচালিত সম্পূর্ণ 'ফ্রি বেড'। আলোচ্য বৎসরে ৫৯ জন নূতন রোগীকে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল, আর বর্ষারম্ভে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৩ জন। সর্ব্বসাকুল্যে ৭২ জন রোগীর মধ্যে ৪৩ জন বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই রোগমুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। অবশিষ্ট ২৯ জন বর্ষশেষেও হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছিল।

বুকের রোগ চিকিৎসার জন্য বহির্বিভাগ দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার চেষ্ট ক্লিনিকে ১২,৮৯৩ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৯৫৭ জন নবাগত। রোগীদিগের বাড়ীতে ডাক্তার ও তত্ত্বাবধায়ক পাঠাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা অনুসারে আলোচ্য বৎসরে ১৪৫ জন নূতন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়। তন্মধ্যে ৪০ জন অল্প কয়েকদিন পরেই চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দেয় এবং অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ৬৪ জনকে নিয়মিত বহির্বিভাগে গিয়া চিকিৎসা করাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ৪১ জন বর্ষশেষেও বাড়ীতে থাকিয়া ভাণ্ডারের ডাক্তার ও কর্ম্মীদিগের দ্বারা সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করাইবার সুযোগ পাইতেছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে মূল্যবান ইঞ্জেকশন, ঔষধ, এ-পি ও পি-পি এবং দুধও সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে রোগীদিগকে সরবরাহ করা হয়।

সাধারণ রোগ চিকিৎসার জন্য চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয়ের দুইটি শাখায় আলোচ্য বৎসরে ৯২,৫২০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৬,৯১৪ জন নবাগত। এই বিভাগে প্রতিটি রোগীর জন্য গড় দৈনিক খরচের পরিমাণ তিন আনা পাঁচ পাই।

সেবা-বিভাগের ভাণ্ডারের তরুণ কর্ম্মীরা আলোচ্য বৎসরের যে মাস হইতে পুনরায় মুষ্টিভিক্ষা তুলিতে আরম্ভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, মুষ্টিভিক্ষা সম্বল করিয়াই ১৯২২ সনে ভাণ্ডারের যাত্রা সুরু হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের শেষ আট মাসে মুষ্টিভিক্ষার দান একত্র করিয়া মোট ৭৩/৫ সের চাউল

পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫৬৯৬ সের চাউল বর্ষমধ্যেই দুঃস্থ গৃহস্থ-দিগকে বিতরণ করা হয়। ইহা ছাড়া নগদ ১,৪১২৮৬ পাই সাহায্য হিসাবে বিতরণ করা হয়।

কাঁকুড়গাছীতে প্রস্তাবিত প্রসূতিসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের জন্য দ্বিতল গৃহের নির্ম্মাণ-কার্য্য আলোচ্য বৎসরে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখানে নার্সিং এবং ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিবে। বাড়ী তৈয়ারীর জন্য আলোচ্য বৎসরে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ দশ হাজার টাকা দান করেন; মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ভক্ত এবং শিষ্যদিগের নিকট হইতেও দশ হাজার টাকা পাওয়া যায়। ১৬টি শয্যা লইয়া প্রসূতিসদনের কাজ আরম্ভ করার আয়োজন চলিতেছে। ইহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিলে মানিকতলা অঞ্চলে প্রসূতি হাসপাতালের অভাব দূর হইবে।

আলোচ্য বৎসরে ভাণ্ডারের বিভিন্ন বিভাগের জন্য দেড় লক্ষ টাকারও বেশী ব্যয় হইয়াছিল। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তহবিল, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ, কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা পুলিশের দাতব্য তহবিল, আই-এফ.-এ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অর্থসাহায্য, ব্যক্তিগত চাঁদা ও দান এবং বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ভক্ত ও শিষ্যদিগের নিকট হইতে দান ও সাহায্যের দ্বারা ব্যয়নির্ব্বাহ হয়। কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের অভাবও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি বিভাগেই সাহায্যপ্রার্থীর তুলনায় স্থানাভাব, সেজন্য অবিলম্বে বিভাগগুলি সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। প্রসূতিসদনের বাড়ী তৈয়ারী শেষ হইলেও সাজসরঞ্জামের অভাবে কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই। এই উদ্দেশ্যে প্রভূত অর্থ প্রয়োজন। মাত্র মুষ্টিভিক্ষার দান সম্বল করিয়া ভাণ্ডারের সূচনা, তার পর দীর্ঘ ৩৪ বৎসরের সাধনায় ইহা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রথম শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সাহায্যই ইহার সম্বল। প্রতিষ্ঠানটি আরও প্রসারিত করিবার জন্য তাঁহারাই অগ্রণী হউন।

ঝাড়গ্রাম কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র প্রথম বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব

গত ২১শে সেপ্টেম্বর ঝাড়গ্রাম কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রথম বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে শিক্ষাকেন্দ্র প্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ও সভার আয়োজন করা হয়। ঝাড়গ্রামের রাজা বাহাদুর শ্রীনরসিংহ মল্লদেব এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই সমাবর্ত্তন উৎসবে শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র ও শিক্ষকগণ বাদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বিভাগের উপ-অধিনায়ক শ্রীদেবীদাস মজুমদার, স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ ও ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভার আরম্ভে সভাপতি ও প্রধান অতিথি শিক্ষাকেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। শিক্ষার্থীদিগের কার্যাকলাপ ও প্রস্তুত বিবিধ সামগ্রী পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিভাগ পরিদর্শনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভায় প্রথমে শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীহিমাদ্রিশেখর দে তাঁহার বিবরণীতে এই শিক্ষাকেন্দ্রের শিল্প-

শিক্ষার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় উক্ত কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষা সমাপনান্তে স্ব স্ব পল্লীতে গিয়া স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে প্রধান অতিথি মহাশয় তাঁহার ভাষণে উপদেশ দেন। তিনি এই শিক্ষাকেন্দ্রের কার্য্যপদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত জে. সি. গুপ্ত, এম-এল-এ, বর্ত্তমান কুটিরশিল্পকে সমবায়ের ভিত্তিতে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে সম্বন্ধে কিছু বলেন। শ্রীনলিনীমোহন মজুমদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এই অনগ্রসর অঞ্চলটিতে উন্নতি সূচিত হইতেছে বলিয়া মন্তব্য করেন।

মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রীক বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীমহেন্দ্র মাহাত, এম-এল-এ, কারিগরি শিক্ষায় যোগদানের জন্য এই অঞ্চলের যুবকদের উক্ত কেন্দ্রের শিল্প-শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে কারিগরি শিক্ষার সার্থকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরও বলেন যে, এই শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এ অঞ্চলের অধিবাসিগণের কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে।

পরলোকে সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী ৫৩ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন উচুদরের প্রাবন্ধিক এবং চট্টগ্রাম কলেজে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। সৈয়দ মোতাহের হোসেনের পিতৃভূমি নোয়াখালি, কিন্তু তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়াছেন কুমিল্লা শহরে, তাঁর মাতুলালয়ে। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। তার পর এম-এ পাস করিয়া ইসলামিয়া কলেজে বাংলার লেকচারার হন দেশ বিভাগের অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে। দেশ বিভাগের পর তিনি চট্টগ্রামে যান। সৈয়দ মোতাহের হোসেন অল্প বয়সে সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতা, যুক্তিবাদী মন ও মানবিকতা-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

জিতেন্দ্রমোহন সেন

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জিতেন্দ্রমোহন সেন মহাশয় গত ৩০শে আগষ্ট (১৯৫৬) তারিখে অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন। তিনি ২৫শে এপ্রিল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষাব্রতী এবং সম্পাদকরূপে কেশব একাডেমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। জিতেন্দ্রবাবু বিলাতের লীডস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এড, ডিগ্রী লাভ করেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে ইন্সপেক্টর অব স্কুলস ও সহকারী ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশান্ নিযুক্ত হন। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষরূপে খুব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৯৪৮ সনে অবসর গ্রহণ করেন। পরে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং বিভাগের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্ম্মপ্রতিভা বহু দিকে বিস্তৃত ছিল। তিনি কর্পোরেশনের শিক্ষা পরিচালনা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এশিয়াটিক্ সোসাইটির অবৈতনিক সেক্রেটারিরূপে কর্ম্ম করেন ও ন্যাশানাল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ সায়ান্সেস পত্রিকার সম্পাদনা করেন।
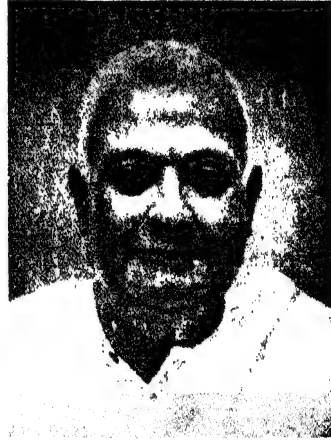
জিতেন্দ্রমোহন সেন

জিতেন্দ্রমোহন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সম্পাদকরূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত উপকার সাধন করেন। কলিকাতা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের সহিত প্রথম হইতে, তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে কয়েকটি শিক্ষামূলক গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন। গত বৎসর হইতে তিনি ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের পরীক্ষা বিভাগের ভার গ্রহণ করেন।

জীবনের কোন বিপদ-আপদে বা কোন কঠিন কর্ম্মের সম্মুখীন হইয়া তিনি অবসাদগ্রস্ত হন নাই। সুদীর্ঘকাল তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবাসী বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব

শ্রীঅমেয় বসু নাগর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৫৬ সনে বি-এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন ও ইতিহাসে ডিসটিংশ্যন লাভ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রই ইতিহাসে ডিসটিংশ্যন পায় নাই এবং এই সর্ব্বপ্রথম একজন বাঙালী ছাত্র বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। শ্রীঅমেয় বসু মধ্যপ্রদেশের চিরিমিরি লাহিড়ী কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসুর পুত্র। তাঁহার মাতা শ্রীমতী অমিতা কুমারী বসু একজন সুলেখিকা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"প্রদীপ ধরিয়া হেরিল সাধুর নবীন গৌরকান্তি"

শ্রীজয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

সৈন্যবাহিনীর লোকদের দ্বারা যমুনা নদীর বন্যাপ্লাবিত গ্রামবাসীদের উদ্ধার

ইডেন গার্ডেন [ফটো— শ্রীঝরণা গঙ্গোপাধ্যায়

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতায় এ. আই. সি. সি.

বিগত ২৫শে কার্ত্তিক কলিকাতায় নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনে নানা কথার অবতারণা হইয়াছিল, নানা প্রশ্ন লইয়া বিচার ও বিতর্ক হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। কিন্তু দেশের লোকের মনের উপর—এমনকি কলিকাতার জনসাধারণের উপর—যে এই অধিবেশন কোনও ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাহা ত মনে হয় না।

অবশ্য কলিকাতা এখন প্রাণহীন পান্থশালা। বিদেশী ও ভিন্ন রাজ্যের লোক সেখানে বাস করে এবং নগরীর সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান তাহাদেরই অধিকারে। তাহারা ধনোপার্জ্জন ও জীবিকা অর্জ্জন যাহা করিবার তাহা করিয়া, পান্থশালায় পায়ের ধুলা ঝাড়িয়া, স্ব-দেশে ফিরিয়া যায়, নূতন আগন্তুক তাহার পরিত্যক্ত আসন দখল করে। দেশের সন্তান যাহারা তাহারা ত প্রায় অসহায় সম্বিৎহীন অনাথের অবস্থায় আছে। পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সম্পত্তিতে তাহাদের কোনই অধিকার নাই। সুতরাং এখানে কাহার মনে কে সাড়া জাগাইবে? যে আহরণে, লুণ্ঠনে ও অধিকার অর্জ্জনে ব্যস্ত তাহার সময় কোথায় শুনিবার? যে হৃতসর্ব্বস্ব পথের ভিখারী হইতে চলিয়াছে তাহাকে কোন আশার বাণী শুনাইয়াছেন কংগ্রেসের অধিকারীবর্গ যে সে সাড়া দিবে?

বলিতে কি, এই অধিবেশনে প্রাণময় বাস্তবের পরিচয় আমরা কিছুই পাই নাই। পাইয়াছি শুধু পণ্ডিত নেহরুর চিন্তার এবং [illegible]র প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছায়া। তাহাতে নূতনত্বই বা কি, উদ্বুদ্ধ [illegible]র তূর্য্যনাদই বা কোথায়? পণ্ডিত নেহরু হাঙ্গেরী লইয়া বিব্রত [illegible]ন—বিশেষতঃ শ্রীমেননের কার্য্যকলাপে—এই অধিবেশনে তিনি তাঁহার মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার অবসর পাইলেন। ইহা ভিন্ন আর কোন কাজ হইল এই অধিবেশনে?

অধিবেশনের সূচনাই হয় বর্ত্তমানে বিশ্বজগৎ যে শঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লইয়া। প্রস্তাবের ভাষা ছিল অতিশয় তীব্র, এবং আলোচনায় আরও স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজ, ফরাসী ও রাশিয়ার কার্য্যকলাপের নিন্দাবাদ হয়। রবিবারের অধিবেশনে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের বিবরণীর আলোচনা আরম্ভ হয়, কিন্তু ইন্দোনেশীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রোমিজয়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য-ইউরোপের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর আলোচনা পুনরায় চলে। পরে মূল প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি হয় এবং গতানুগতিক সমাজতন্ত্রবাদের বুলি আওড়াইয়া এগার শত শব্দের প্রস্তাবটি সমর্থিত ও গৃহীত হয়। শুধু শ্রীগাডগিল উহার প্রতিবাদে বলেন যে, দূর ভবিষ্যতে দেশে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখানো হইতেছে, তত দিন দেশের লোক বাঁচিবে কি করিয়া সে সম্বন্ধে অধিকারীবর্গ কি বলেন? বলা বাহুল্য, এই সমালোচনার কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই, অবশ্য শ্রীগুলজারীলাল নন্দ প্রত্যুত্তরে কিছু বাঁধিগতের আবৃত্তি করেন।

আসলে এই অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থরক্ষা। অর্থাৎ, যাঁহারা বর্ত্তমানে অধিকারী হইয়া নিজেদের দলের স্বার্থে কংগ্রেসকে ডুবাইতেছেন এবং দেশকে বিভ্রান্ত ও সম্বিৎহীন করিতেছেন, এই অধিবেশন হইয়াছিল তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য। এক কথায় আগামী নির্ব্বাচনে যাহাতে তাঁহাদের অন্তঃসারহীন চাটুকারমণ্ডলীর স্বার্থহানি না হয় তাহার চিন্তাই ছিল উপস্থিত মহাশয়গণের শতকরা ৯০ জনের দেহমন ব্যস্ত করিয়া। সুতরাং এই অধিবেশন যে বাহিরের লোকের কাছে অবাস্তব ঠেকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচনী ইস্তাহার স্থির হইল না। কেন হইল না সে তো বুঝাই যায়।

দেশে প্লাবনের ফলে ব্যাপক ক্ষতি সম্পর্কে উদ্বেগ জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তাহাতেও কোন নূতন আশা-ভরসার কথা ছিল না, কেন ছিল না তাহা বলি।

প্লাবন সম্পর্কে পশ্চিম বাংলায় গ্রামাঞ্চল পুনর্গঠন কারণে যে সকল সরকারী ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার মধ্যে দেশী পাঁজায় ইট পুড়াইবার জন্য যে কয়লার ব্যবস্থা হইতেছে, এখানে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করি। আমরা একজন বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ কয়লাখনির মালিকের নিকট হইতে এক বিবৃতি পাইয়াছি। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাংলা সরকার যে শ্রেণীর কয়লা তিন লক্ষ টন চাহিয়াছেন ঐ দেশী পাঁজায় ইট পোড়াইবার জন্য, তাহাতে ঐ কাজ আদৌ হইবে না; হইবে শুধু কালো বাজারে চড়া দামে ঐ কয়লা বিক্রী। ক্রেতা হইবে বিদেশী প্রথায় প্রতিষ্ঠিত ইটখোলার মালিক।

পশ্চিম এশিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ

সম্প্রতি পশ্চিম এশিয়ার ঘটনাবলী পার্ল হারবারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৯৪১ সনে ওয়াশিংটনে যখন জাপানী রাষ্ট্রদূত মার্কিন সরকারের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিলেন তখন কোন সতর্কবাণী ব্যতিরেকেই জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত পার্ল হারবার বন্দরে মার্কিন রণপোতগুলির উপর আক্রমণ আরম্ভ করে এবং এই ভাবেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে "দ্বিতীয় ফ্রণ্ট" প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফ্রণ্টের উদ্বোধন হয়। মিশরের উপর ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ করা হইয়াছে পুরাপুরি "জাপানী" কায়দায়। হুমকি প্রদর্শন বন্ধ করিয়া সুয়েজ খাল জাতীয়করণ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি যখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স শান্তিপূর্ণ ভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় সম্মত বলিয়া মিশরের সহিত আলাপ-আলোচনার ভান করিতেছিল ঠিক সেই সময়েই তাহারা মিশর আক্রমণের শেষ বন্দোবস্তটি সম্পূর্ণ করিতেছিল। জুলাই মাসের শেষ দিক হইতে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিকবাহিনী এবং রসদ যোগানো যখন তাহারা সম্পন্ন হইয়াছে মনে করিল তখনই ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী সরকার ইস্রায়েলকে উস্কাইয়া দিল মিশর আক্রমণ করিবার জন্য। ইস্রায়েল তাহার অতীত ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া (ইস্রায়েল রাষ্ট্রগঠনে ব্রিটেন সর্ব্বপ্রকারে বাধা দিয়াছে) সাম্রাজ্যবাদের চররূপে ৩০শে অক্টোবর মিশর আক্রমণ করিল। আক্রান্ত মিশর স্বভাবতঃই আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। অপর দিকে ৩০শে অক্টোবর এক সতর্কবাণীতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সর এণ্টনী ইডেন ঘোষণা করিলেন যে, যদি অবিলম্বে মিশর এবং ইস্রায়েল সকল প্রকার সংঘর্ষ না বন্ধ করে তবে ফ্রান্স ও ব্রিটেন হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইবে। সর এণ্টনী আরও বলেন যে, যাহাতে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া সকল দেশের জাহাজ অবাধ গতিতে চলাচল করিতে পারে সেজন্য মিশর সরকারকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে যেন মিশর সরকার পোর্ট সৈয়দ, ইসমাইলিয়া এবং সুয়েজ বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সাময়িক ভাবে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য মোতায়েনে সম্মত হন।

বলা বাহুল্য, মিশর এই সকল সর্ত্ত মানিয়া লইবে আশা করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী সরকার সর্ত্তগুলি আরোপ করেন নাই—বরং যাহাতে মিশর সর্ত্তগুলি গ্রহণের কোন উপায় না পায় সেজন্য সর্ত্তগুলি যথেষ্ট সতর্কতার সহিত যথাসম্ভব রূঢ় করিবারই চেষ্টা হইয়াছে। জাতীয় সার্ব্বভৌমত্বের প্রতিভূ মিশর সরকার ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কোন সর্ত্তই মানিতে রাজী হন না। কাজে কাজেই "নিরুপায়" ব্রিটেন ও ফ্রান্স "নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও" কেবলমাত্র "গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতি রক্ষার্থে" নিরপরাধ, নিরস্ত্র মিশরবাসীদের উপর তাহাদের মারণাস্ত্রগুলি প্রয়োগ করিতে "বাধ্য" হয়—ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বক্তৃতাতে অন্ততঃ এইরূপই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিশরে বলপ্রয়োগে অথবা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন হইতে বিরত থাকিবার জন্য শক্তিবর্গকে অনুরোধ জানাইয়া যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করে তাহা ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের 'ভেটো' প্রয়োগের ফলে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তাবটি সমর্থন করে। প্রস্তাবটির পক্ষে সাতটি ভোট এবং বিপক্ষে দুইটি (ব্রিটেন ও ফ্রান্স) ভোট পড়ে। দুইটি রাষ্ট্র (অষ্ট্রেলিয়া ও বেলজিয়ম) ভোটদানে বিরত থাকে। প্রসঙ্গতঃ নিরাপত্তা পরিষদে ইহাই সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিশ ভেটো।

সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবে ইস্রায়েল এবং মিশরকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানায় এবং বলে যে, ইস্রায়েল যেন পূর্ব্বনির্দ্ধারিত যুদ্ধবিরতি সীমারেখার পশ্চাতে তাহার সৈন্য সরাইয়া লয়। ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের ভেটোর ফলে এই প্রস্তাবটিও অগ্রাহ্য হয়। প্রস্তাবটির পক্ষে সাতটি ভোট এবং বিরুদ্ধে দুইটি ভোট (ব্রিটেন ও ফ্রান্স) পড়ে। দুইটি রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ম ভোটদানে বিরত থাকে।

সারারাত উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার পর ২রা নবেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদ এক জরুরি অধিবেশনে ৬৪-৫ ভোটে অবিলম্বে মিশরে যুদ্ধ করিবার জন্য একটি মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করে। যে পাঁচটি শক্তি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছে তাহারা অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইস্রায়েল, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। তুরস্ক, নেদারল্যাণ্ডস, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়ম, কানাডা, লাওস এবং পর্তুগাল ভোটদানে বিরত থাকে। প্রস্তাবে সুয়েজ খাল অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি ও ঐ এলাকায় সৈন্য এবং সমরাস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করার দাবি জানাইয়া সকল পক্ষকে ১৯৪৮ সনে নির্দ্ধারিত আরব-ইস্রায়েলী যুদ্ধবিরতি সীমারেখার পিছনে সরিয়া যাইবার, যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করিয়া আক্রমণ না চালাইবার এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির সর্ত্তাবলী নিষ্ঠার সহিত পালনের জন্য দাবি জানানো হয়।

৩রা নবেম্বর এক যুক্ত বিবৃতিতে ইঙ্গ-ফরাসী সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এক বিবৃতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ইডেন বলেন যে, মিশর ও ইস্রায়েলের মধ্যে শান্তিরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি সৈন্য মোতায়েন করেন, তবেই ব্রিটেন স্বেচ্ছায় মিশরে তাহাদের সামরিক অভিযান বন্ধ করিতে পারে। ইহার অন্যতম সর্ত্ত হিসাবে মিশর ও ইস্রায়েল উভয়কেই শান্তিরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যদলকে মানিয়া লইতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্য গঠিত না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যদিগকে মিশরে থাকিতে দিতে হইবে।

৩রা নবেম্বর পার্লামেণ্টে বিবৃতিদান প্রসঙ্গে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিঃ এণ্টনী হেড বলেন যে, মিশরে তখনও ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য অবতরণ করে নাই। ৪ঠা নবেম্বর মিশরে সৈন্য অবতরণের সংবাদ স্বীকার করা হয়। ৫ই নবেম্বর ব্রিটিশ সৈন্য পোর্ট সৈয়দ অধিকার করে।

৪ঠা নবেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ অধিবেশনে মিশরে যুদ্ধবিরতি তদারক ও ব্যবস্থাকল্পে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে জরুরি আন্তর্জাতিক

বাহিনী গঠনের প্রস্তাব ৫৭-০ ভোটে গৃহীত হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ উনিশটি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। প্রস্তাবে সেক্রেটারী-জেনারেলকে অনুরোধ করা হয় যেন তিনি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মিশরে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা এবং তদারকী করিবার উপযোগী একটি জরুরি রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা পেশ করেন। ৫ই নবেম্বর এক বিবৃতিতে মিশর সরকার আন্তর্জ্জাতিক পুলিসবাহিনী গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ঐ একই দিনে সোভিয়েট সরকার ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নিকট একটি 'নোটে' শক্তিদ্বয়কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যদের সহিত রাশিয়া "মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণ ব্যাহত ও পুনরায় শান্তিপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর।" ইস্রায়েলকেও অপর এক পত্রে অনুরূপ ভাবে আক্রমণ বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। মার্শাল বুলগানিন-প্রেরিত সতর্কবাণীতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট প্রশ্ন করা হয় যে, তাহারা যদি "সর্বপ্রকার আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত অধিকতর শক্তিশালী কোন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কি অবস্থা হইবে।" মার্শাল বুলগানিন আরও বলেন, "এই সকল মারণাস্ত্র নৌ ও বিমানবহর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হয় না; রকেটের সাহায্যে উহা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।" নিরস্ত্র মিশরের উপর ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপর রকেট আক্রমণের পার্থক্য কোথায়—বুলগানিন প্রশ্ন করেন। বুলগানিন বলেন, "মিশরের যুদ্ধ অন্য দেশেও ছড়াইয়া পড়িতে পারে এবং উহা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে।"

মার্শাল বুলগানিন বলেন, "আমরা বলপ্রয়োগের দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণ ব্যাহত এবং পুনরায় শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর। আমরা আশা করি যে, এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে আপনারা (ইডেন ও মোলেত) যথাযোগ্য বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিবেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।"

মার্শাল বুলগানিন শ্রীনেহরুকে এক পত্রে এই সতর্কবাণী প্রেরণের কথা জানান।

৬ই নবেম্বর (অর্থাৎ পরদিন) সকালে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার মিশরে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।

৬ই নবেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী গঠন সম্পর্কে মিঃ হ্যামারশিল্ড তাঁহার চূড়ান্ত রিপোর্ট সাধারণ পরিষদের নিকট উপস্থিত করেন। ৭ই নবেম্বর সাধারণ পরিষদ দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। একটিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ পুলিসবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় অপরটিতে মিশর হইতে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইস্রায়েলকে সকল সৈন্য সরাইয়া লইবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনাবাহিনী নিয়োগের প্রস্তাবটি বিনা বাধায় ৬৪-০ ভোটে গৃহীত হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রজোট, মিশর, ইস্রায়েল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি ১২টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। মিশর হইতে ইঙ্গ-ফরাসী এবং ইস্রায়েল-বাহিনীকে অপসারণের নির্দ্দেশ দিয়া যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাহার পক্ষে ৬৫টি ভোট এবং বিপক্ষে একটি (ইস্রায়েল) ভোট পড়ে। ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, লাওস, লুক্সেমবুর্গ নেদারল্যাণ্ডস পর্তুগাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি ১০টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। ভারত ও কানাডাসহ তেরোটি রাষ্ট্র আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী গঠনে সহায়তা করিয়াছেন। ১৩ই নবেম্বর এই আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীর অগ্রগামী দল মিশরের মাটিতে পদার্পণ করে। শ্রী মেনন ৭ই নবেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘে বক্তৃতায় বলেন, আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী গঠনের অর্থ এই নহে যে, আক্রমণকারীদের সমর্থন করা হইবে।

এই প্রসঙ্গ লেখা শেষ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত মিশর হইতে ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইস্রায়েলী সৈন্য সরাইয়া লইবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তদনুযায়ী কার্য্য করিবার কোন লক্ষণ ব্রিটেন বা ফ্রান্সের তরফ হইতে পরিলক্ষিত হয় না।

ইঙ্গ-ফরাসী সরকার "গণতন্ত্র ও আন্তর্জ্জাতিক আইনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার" জন্যই মিশরে "পুলিসবাহিনী" প্রেরণ করিয়াছিলেন (সরকারী মতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স নাকি মিশরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত নহে—যদিও অবশ্য মিশর সরকার এবং অন্যান্য অনেকেই মনে করেন যে একটি যুদ্ধই চলিতেছে)—যখন বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই বলিল যে, ইঙ্গ-ফরাসী আচরণ নির্লজ্জ আক্রমণ ব্যতীত আর কিছুই নহে তখন ব্রিটিশ সরকার বলিলেন "আমরা কিছুতেই ভুল স্বীকার করিব না।"—অর্থাৎ পরিষ্কার ভাষায় পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের নিকট আন্তর্জ্জাতিক আইন, গণতন্ত্র প্রভৃতির একটিমাত্র অর্থই আছে আর সেই অর্থ হইল বিশ্বে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব এবং শোষণ বজায় রাখিবার জন্য যাহা কিছু করা হইবে তাহাই ন্যায় ও আইনসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে লইবে। তাহা না হইলেই তাঁহারা বলিবেন "রণং দেহি"।

মিশরের উপর ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের সুদূরপ্রসারী আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব রহিয়াছে। এই সময় এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন ছিল—অতীব দুঃখের বিষয় তাহা নাই। বিশেষতঃ পাকিস্থান যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে একটি নূতন প্রবোচনার বিপদ দেখা দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। আত্মঘাতী কলহেই এশিয়ার দেশগুলি স্বাধীনতা হারাইয়াছিল—দেশবিশেষের জাতীয় স্বাধীনতার উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আক্রমণের এই চরম বিপদের দিনেও যদি অতীত ইতিহাসের শিক্ষা কাজে লাগাইতে এশিয়ার জাতিগুলি অপারগ হয় তবে ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে অন্ধকার।

হাঙ্গেরীর ঘটনাবলী

হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের ঘটনাবলী বিশ্বের দৃষ্টি পূর্ব্ব-ইউরোপের উপর নিবদ্ধ করিয়াছে। পূর্ব্ব-ইউরোপের ঘটনাবলী যেরূপ দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহার সহিত তাল রাখা কঠিন। উপলব্ধ সংবাদগুলি এরূপ পরস্পরবিরোধী যে তাহা হইতে কোন পরিষ্কার ধারণা করা বিশেষ সহজ নহে। তবে কয়েকটি ব্যাপার

সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে মন্তব্য করা চলিতে পারে। প্রথমতঃ কম্যুনিষ্ট শাসনে পূর্ব্ব-ইউরোপের জনসাধারণের দুর্গতি এবং ব্যাপক বিক্ষোভ ; দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েট জবরদস্তি। ইহার সহিত অবশ্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্ররোচনামূলক কার্য্যেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সংক্ষেপে পূর্ব্ব-ইউরোপের সাম্প্রতিক ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ এইরূপ : ২০শে অক্টোবর সংবাদ প্রকাশিত হইল যে, পোল্যাণ্ডের কমিউনিষ্ট পার্টি পোল্যাণ্ডের জনসাধারণের দাবি আংশিক মানিয়া লইয়া রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র প্রসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সোভিয়েট ইউনিয়ন নাকি তাহাতে অসম্মত হয়। যাহাতে পোলিশ কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ "বিপথে" না যান সেজন্য সোভিয়েট ট্যাঙ্ক এবং সৈন্যবাহিনী ও রণপোত পোল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ পোল্যাণ্ডের উপর হইতে তাহাদের সামরিক হুমকি তুলিয়া লন এবং পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রবিরোধী কার্য্যকলাপের যে অভিযোগ সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র, "প্রাভদা" প্রথমে করিয়াছিলেন সেই অভিযোগও প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয় ('প্রাভদা' পত্রিকার জীবনে সম্ভবতঃ এই সর্ব্বপ্রথম এত শীঘ্র এইরূপ "ভুলের" "সংশোধন" হইল)। প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় যে, সোভিয়েট এবং পোলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোটামুটিভাবে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অমীমাংসিত প্রশ্নগুলি মস্কোতে কয়েকদিন পর আলোচিত হইবে। পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে অনেক রদবদল হইবার ফলে পদচ্যুত প্রাক্তন সেক্রেটারী-জেনারেল গোমুলকা পুনরায় নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হন। সোভিয়েট জেনারেল রকোসোভস্কি পোল্যাণ্ডের পার্টির পলিট ব্যুরো হইতে অপসৃত হন এবং পরে তিনি মস্কো যাইয়া পোল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির পদেও ইস্তফা দেন।

পোল্যাণ্ডের উত্তেজনা মিলাইতে না মিলাইতেই হাঙ্গেরীতে বিপ্লব দেখা দিল। ২৩শে অক্টোবর হাঙ্গেরীর ছাত্রগণ একটি শান্তি-পূর্ণ শোভাযাত্রা করিয়া সরকার ও হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টির ভ্রান্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পঞ্চাশ হাজার লোকের এই শোভাযাত্রায় আটশত সামরিক অফিসারও ছিলেন। কম্যুনিষ্ট রাজত্বে জনসাধারণের কোনই অধিকার নাই ; সুতরাং হাঙ্গেরীয় কম্যুনিষ্ট সরকার "বিশুদ্ধ কম্যুনিষ্ট" উপায়ে জনসাধারণকে স্তব্ধ করিতে চাহিলেন—কিন্তু দেখা গেল দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির মুষ্টিমেয় নেতা (তাঁহারাও আবার সকলে নহেন) ব্যতীত সরকারী দলে আর কেহই নাই। এমনকি হাঙ্গেরীর সশস্ত্র বাহিনী পর্য্যন্ত জন-সাধারণের উপর বন্দুক চালাইতে অসম্মত। জনসাধারণের এইরূপ "ধৃষ্টতা" সহ্য করা শ্রমিকদরদী এবং বিশ্বজনের গণতন্ত্র ও মুক্তিকামী কম্যুনিষ্টদের চিন্তাতেও অসহ্য—অতএব হাঙ্গেরীয় "সরকারের অনুরোধে" সোভিয়েট ট্যাঙ্কবাহিনী নিরস্ত্র জনসাধারণকে ("প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তকারীদিগকে") শিক্ষা দিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও পরি-বর্ত্তন ঘটিল। হাঙ্গেরীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাক্তন নেতা—যিনি হাঙ্গেরীতে কম্যুনিষ্ট শাসন কায়েম করিবার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন, কিন্তু সকল ব্যাপারে মস্কোর নিকট দাসখত লিখাইয়া দিতে অসম্মত হইবার অপরাধে প্রধানমন্ত্রীর পদ এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য-পদ হইতে অপসৃত হন—সেই ইমরে নাজ পুনরায় হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। খাঁটি কম্যুনিষ্টদের মত গদীতে আসীন হইয়াই তিনি ঘোষণা করিলেন, আর আন্দোলন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু জনসাধারণ দাবি তুলিল, হাঙ্গেরীয় ভূমি হইতে সোভিয়েট সৈন্য অপসারণ না করা পর্য্যন্ত আন্দোলন থামিতে পারে না। ২৬শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নাজ জনসাধারণের এই দাবি মানিয়া লইয়া বলেন যে, ১৯৫৭ সনের ১লা জানুয়ারীর মধ্যেই হাঙ্গেরী হইতে সোভিয়েট সৈন্য অপসারণ সম্পূর্ণ করিতে হইবে। ২৫শে অক্টোবর (জুলাই মাসে নিযুক্ত) কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এরণো গেরোকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে জানস্ কাডারকে পার্টির নূতন সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইল, কাডারকে পূর্ব্বে "বিপথগামী" হিসাবে পদচ্যুত করা হইয়াছিল।

কিন্তু সোভিয়েট ট্যাঙ্ক প্রয়োগ অথবা নূতন প্রধানমন্ত্রী এবং নূতন সেক্রেটারী নিয়োগ করিয়াও জনসাধারণের বিক্ষোভ শান্ত করা গেল না। ২৭শে অক্টোবর নাজ তাঁহার সরকার পুনর্গঠন করেন, নূতন মন্ত্রীসভা হইতে ১৫জন পুরাতন মন্ত্রীকে বাদ দেওয়া হইল। মন্ত্রীসভায় কৃষক পার্টির নেতা বেলা কোভাক্সকে লওয়া হইল। পরদিন নূতন সরকার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিলেন। ইমরে নাজ ঘোষণা করিলেন যে, জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী অবিলম্বেই সোভিয়েট সৈন্য রাজধানী বুদাপেস্ত হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে। ইতিমধ্যে ছয়দিনে সংঘর্ষে ২৫০ জন নিহত এবং ৩,৫০০-এরও অধিক লোক আহত হয়।

ঘোষণা অনুযায়ী সোভিয়েট সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইতে থাকে। ৩০শে অক্টোবর হাঙ্গেরীয় সরকার ঘোষণা করেন যে, "গণতান্ত্রিক দলগুলি"কে পুনরায় রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের সুযোগ দেওয়া হইবে এবং শীঘ্রই পশ্চিমী প্রথায় নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান করা হইবে। হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা কাডার ঘোষণা করেন যে, যুক্ত নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "সর্ব্বসম্মতভাবে" গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দিনের ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী ইমরে নাজ আরও বলেন যে, সোভিয়েট সৈন্যগণকে বিক্ষোভ দমনের জন্য তিনি আহ্বান করেন নাই ; সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধানমন্ত্রী এনড্রাস হেজিডুস এবং এরণো জেরো। তিনি আরও বলেন যে, নূতন সরকার আসিয়াই সোভিয়েট সৈন্য সরাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ জানান। ইহা ব্যতীত সরকারী গুদামে শস্য-বিক্রয়ের কড়াকড়ি হ্রাস করিয়া সরকারের একটি সিদ্ধান্তও ঘোষিত হয়। সরকারী ঘোষণায় সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত শান্তি এবং সহযোগিতার কথাও উল্লিখিত হয়।

৩১শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নাজ বুদাপেস্তে এক ঘোষণায় কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পাদিত ওয়ারস চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। সোভিয়েট সরকারও ৩০শে অক্টোবরের এক ঘোষণায় হাঙ্গেরী হইতে সোভিয়েট সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত জানান। তবে সোভিয়েট ঘোষণায় বলা হয় যে, অন্যান্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সহিত পরামর্শ না করিয়া 'ওয়ারস' চুক্তি বাতিল করা সম্পর্কে তাঁহারা কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। সোভিয়েট ঘোষণায় অতীত ভুলের কথা স্বীকার করিয়া বলা হয় যে, অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে আর সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনীয়ার এবং বিশেষজ্ঞ থাকিবেন কিনা তাহা পুনর্বিবেচনার সময় হইয়াছে।

১লা নবেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেল হ্যামারশিল্ডের নিকট লিখিত এক পত্রে হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী ইমরে নাজ জানান যে, হাঙ্গেরী 'ওয়ারস চুক্তি' অস্বীকার করিয়াছে। তিনি বৃহৎ চতুঃশক্তির (ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন) নিকট আবেদন জানান তাঁহারা যেন হাঙ্গেরীর নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া চলেন। ২রা নবেম্বর রুশ সৈন্য হাঙ্গেরী আক্রমণ আরম্ভ করে এবং চতুর্দিক হইতে রাজধানী বুদাপেস্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

৩রা নবেম্বর হাঙ্গেরীয় সরকার তৃতীয় বার পুনর্গঠিত হয় এবং ইমরে নাজের নেতৃত্বে একটি আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ৪ঠা নবেম্বর রুশবাহিনী বুদাপেস্ত আক্রমণ আরম্ভ করে। মস্কো রেডিও ঘোষণা করে যে, জানস কাডারের নেতৃত্বে হাঙ্গেরীতে একটি নূতন সরকার গঠন করা হইয়াছে এবং হাঙ্গেরীতে "প্রতিবিপ্লব" সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে। মস্কো রেডিও হইতে ঘোষিত সংবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপুঞ্জে হাঙ্গেরীর সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য মিঃ ইমরে নাজ যে আবেদন করিয়াছিলেন কাডার সরকার মিঃ হ্যামারশিল্ডের নিকট লিখিত এক পত্রে সেই অনুরোধ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। মস্কো রেডিওর বিবৃতি অনুযায়ী নূতন প্রধানমন্ত্রী কাডার বলেন, "আমরা প্রতিবিপ্লব দমনে সাহায্য, শান্তি এবং শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট সৈন্যদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।"

১১ই নবেম্বর পর্যন্ত সোভিয়েট আক্রমণের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীর প্রতিরোধ সক্রিয় থাকে। তাহার পরই প্রতিরোধ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ১১ই নবেম্বর মস্কো রেডিও হইতে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, যতদিন উত্তর আটলান্টিক চুক্তিসংস্থা থাকিবে ততদিন পর্যন্ত 'ওয়ারস চুক্তি'ও থাকিবে—অর্থাৎ রাশিয়া পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলি হইতে তাহার প্রভুত্ব হ্রাস পাইতে দিবে না (মাত্র ১১ দিন পূর্ব্বেই রাশিয়া ওয়ারস চুক্তি বাতিল করিবার যৌক্তিকতা বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল)।

বুদাপেস্ত হইতে ১৩ই নবেম্বর প্রেরিত রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, মস্কো-রক্ষিত "শ্রমিক" সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকগণ কার্য্যে যোগদানে অনিচ্ছুক। শ্রমিকগণ পাঁচ দফা দাবি জানাইয়াছে—সত্যনিষ্ঠ কম্যুনিষ্ট বেতার তাহা প্রকাশ করে নাই, তবে হাঙ্গেরী হইতে সোভিয়েট সৈন্য অপসারণ, অবাধ নির্ব্বাচন, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ ও হাঙ্গেরীতে মানবিক অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা—এইগুলিই শ্রমিকদের দাবি বলিয়া মনে হয়।

এই প্রসঙ্গ লেখা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই।

হাঙ্গেরীতে কম্যুনিষ্ট-মানবতা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কেবলমাত্র বুদাপেস্তেই কুড়ি হাজার লোক নিহত এবং আশী হাজার লোক আহত হইয়াছে শুনা যায়।

হাঙ্গেরীয় জনসাধারণের ব্যাপক অংশের জাতীয় স্বাধীনতার এই বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনকে কম্যুনিষ্টগণ খাঁটি কম্যুনিষ্ট পদ্ধতিতে "সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—এইরূপ সচেতন ভাবে নির্জ্জলা মিথ্যা প্রচারের দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানকালে বিরল। এখন সোভিয়েট ট্যাঙ্ক এবং সৈন্যবাহিনী সমগ্র হাঙ্গেরী দখল করিয়া বসিয়া আছে—কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত একটি হাঙ্গেরীয় শ্রমিকও কার্য্যে যোগদান করে নাই। শ্রমিকগণ কারখানায় যায়, কিন্তু কাজ করে না। এইরূপ দৃঢ় এবং শান্ত বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। যদি কম্যুনিষ্টদের কথাই সত্য হয় এবং যদি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তই এইরূপ ভাবে হাঙ্গেরীর অধিকাংশ শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে এইরূপ আত্মত্যাগের মহিমা সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে তবে সাম্রাজ্যবাদ অত্যাচারী এবং পররাজ্যগ্রাসী বলিয়া এত দিন আমরা যে চিন্তা করিয়া আসিয়াছি তাহা বদলানো প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন এবং জনমন জয়ের অপরিজ্ঞাত শক্তির কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সেই কারণেই বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদী চরদের প্ররোচনায় ব্যাপক ভাবে জনসাধারণের মনে এইরূপ দৃঢ় সংকল্প, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া কোন যুক্তিবাদী মন স্বীকার করিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের সেই ক্ষমতা থাকিলে মিশরে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ ঘটিত না বা সাইপ্রাসের মত ক্ষুদ্র দ্বীপকে দখলে রাখিতে সমগ্র ব্রিটিশবাহিনীকে নিযুক্ত করিতে হইত না। মিশরে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ঘটায় মিশরীয় জনগণ আনন্দ প্রকাশ করেন নাই—সেখানে সাম্রাজ্যবাদ একটিও সমর্থক পায় নাই। কিন্তু হাঙ্গেরীতে কি দেখা গেল? হাঙ্গেরীয় সরকারের সমর্থক দেশে কেহ নাই—সামরিক-বাহিনীও সরকারের বিরোধী। সোভিয়েট বাহিনীর অবস্থা মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও অন্যরূপ ছিল না—অন্ততঃ জনসাধারণের সহিত সম্পর্কের দিক হইতে। ইহা কে অস্বীকার করিবে?

রূঢ় সত্য হইল হাঙ্গেরী এত দিন সোভিয়েট অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণে নিষ্পেষিত হইত। যে মুহূর্ত্তে শাসকশ্রেণীর মধ্যে বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা দেখা গেল সেই মুহূর্ত্তেই

হাঙ্গেরীর বীর জনসাধারণ জাতীয় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করিলেন। সেই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং সর্বসমর্থনপুষ্ট। হাঙ্গেরীর জনগণের দুর্ভাগ্য, একদিক হইতে ইহা বিশ্বমানবেরও দুর্ভাগ্য—তাঁহাদের সেই জীবনপণ প্রয়াস পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের স্বার্থসন্ধানী প্রচার এবং সোভিয়েট ট্যাঙ্কের ঘর্ষণের তলায় এখনকার মত চাপা পড়িয়া গেল।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং ব্রিটেন হাঙ্গেরী সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারত তাহার বিরোধিতা করিয়াছে—যে কারণে ভারত বিরোধিতা করিয়াছে তাহা সমুচিতই হইয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ বর্ত্তমানে যে ভাবে গঠিত তাহাতে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে উহার হস্তক্ষেপের নীতি স্বীকার করিয়া লইলে সকল দেশেরই জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা বিশেষ বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে। সেই দিক হইতে রাষ্ট্রপুঞ্জের খবরদারীতে হাঙ্গেরীতে নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে আনীত পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া ভারত সরকার কোন নীতিবিগর্হিত কাজ করেন নাই।

রাষ্ট্রপুঞ্জের একাদশ বৎসর

২৪শে অক্টোবর সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। "উত্তরবংশীয়গণকে যুদ্ধের উৎপাত হইতে রক্ষা" এবং "সামাজিক প্রগতি ও বৃহত্তর স্বাধীনতায় সুন্দরতর জীবনযাত্রায় সাহায্য" করিবার উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানকালে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সৃষ্টি হয়। সংস্থাটির কার্য্যারম্ভের সময়—১৯৪৫ সনের ২৪শে অক্টোবর। সদস্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ, বর্ত্তমানে উনআশী।

রাষ্ট্রপুঞ্জের এগার বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনৈতিক স্বার্থের সহিত জড়িত নহে এইরূপ প্রশ্নের সমাধানে রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশেষ কৃতিত্ব সহকারেই কর্ত্তব্যপালন করিয়াছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের "বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানগুলি"র (specialised agencies) ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা, ইউনেস্কো, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ বন্ধ করিবার যে মৌলিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সৃষ্টি সেই প্রধান কর্ত্তব্যে সংস্থাটির প্রচেষ্টা কোন ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী হয় নাই। ইস্রায়েল, কাশ্মীর, কোরিয়া, গ্রীস, সাইপ্রাস, দক্ষিণ-আফ্রিকার জাতি-বৈষম্য নীতি এবং সর্ব্বশেষে পশ্চিম এশিয়াতে নির্লজ্জ ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ—রাষ্ট্রপুঞ্জ কোন সমস্যারই কার্য্যকরী সমাধান করিতে পারে নাই।

ইহার কারণ কি? সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ যখন গঠিত হয় তখন প্রতিষ্ঠানের সংগঠকদের মনে পাশ্চাত্ত্য জগতের কথাই ছিল। যুদ্ধজয়ে এশিয়ার জনগণের সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক জনসাধারণের জাতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে দুই-একটি ভাল ভাল কথা বলা হয় বটে, কিন্তু লীগ অব নেশন্‌স কর্ত্তৃক প্রেসিডেন্ট উইলসনের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি গ্রহণের মত—এক্ষেত্রেও কাহারও তাহা কার্য্যকরী করিবার কোন অভিপ্রায় ছিল না। বৃহৎ শক্তিগুলির গত এগার বৎসরের কার্য্যকলাপ তাহা সুস্পষ্ট করিয়া দেয়। কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করিলেই তাহা স্পষ্ট হইবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফরাসীরা ইউরোপে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, ভিয়েৎনামে অবস্থিত ফরাসী সরকার কিন্তু জাপানীদের সহিত সহযোগিতা করিতে থাকে—অবশ্য জাপান শেষ পর্য্যন্ত ভিয়েৎনামকে সম্পূর্ণরূপেই কুক্ষিগত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্বভাবতঃই ভিয়েৎনামের জনসাধারণ স্বাধীনতার দাবি জানায় (যুদ্ধের সময়েও তাহারা জাপানীদের বিরোধিতা করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম অক্ষুণ্ণ রাখে)। জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী ভিয়েৎনামবাসীদের স্বাধীনতা পাওয়ারই কথা। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য বৃহৎ শক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসী সরকার নয় বৎসর যাবৎ সেখানে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালাইয়া জনসাধারণের স্বাধীনতার দাবিকে স্তব্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, এবং পরে যখন সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপেই হৃতবল হইয়া পড়ে তখন ১৯৫৪ সনে তাহারা কোনক্রমে সেখান হইতে সরিয়া পড়ে। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজী সাম্রাজ্যবাদও প্রায় অনুরূপ আচরণই করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্ত্য বৃহৎ শক্তিগুলি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিকেই সমর্থন করে। দক্ষিণ-আফ্রিকার জাতীয় বৈষম্যনীতি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্পর্কিত নীতির সম্পর্কেও পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ (ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম প্রভৃতি) দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বৈষম্যমূলক নীতিরই সমর্থন করে। কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কেও ঠিক সেই কারণেই আজও পর্য্যন্ত কোন সমাধান সম্ভব হয় নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের ক্ষমতার লড়াইয়ের একটি ক্ষেত্র হিসাবেই সৃষ্টি হইয়াছিল। সোভিয়েট ইউনিয়ন সেখানে পুরাপুরি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাতেই ব্যস্ত থাকে—সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভিটোর সংখ্যা দেখিলেই তাহা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ক্ষমতার লড়াইয়ে প্রবৃত্ত পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ যুদ্ধপরবর্ত্তী যুগের ঘটনাবলী পুরাপুরি আঁচ করিতে পারে নাই। যুদ্ধের পরে আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের মৃত্যুপণ আন্দোলনের সম্মুখে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিকে পশ্চাতে হটিতে হয়, ফলে নবজাগ্রত এশিয়া এবং আফ্রিকাও বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রভাবশালী অংশ দাবি করে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শক্তিগোষ্ঠী এই দাবি এখনও সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইতে সম্মত নহে—তাহা কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেয়ালীপনার জন্য পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ (চীনরাষ্ট্র) এখনও রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

এশিয়া-আফ্রিকার এই নূতন শক্তিকেন্দ্র গঠিত হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য শক্তিকেন্দ্রের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সেই কারণেই আজ পশ্চিমী জোট মরীয়া হইয়া উঠিয়া মিশরের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ চালাইয়াছে।

মিশরে আক্রমণের প্রশ্নেও মৌখিক সহানুভূতি ব্যতীত রাষ্ট্রপুঞ্জ কোন ফলপ্রসূ ব্যবস্থাই এ যাবৎ অবলম্বন করিতে পারে নাই। মিশরে যাহারা আক্রমণ চালাইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা করা হয় নাই। মৌখিক যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হইলেও এখনও ইঙ্গ-ফরাসী দখলকারী ফৌজ মিশরের মাটি অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

এরূপ অবস্থায় খোলাখুলি ভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল। যাহারা এখনও জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে শান্তিরক্ষার কথা চিন্তা করেন তাঁহাদের পুনর্বিবেচনার সময় আসিয়াছে। যদি বর্তমান প্রতিষ্ঠানটিকে ফলপ্রসূ করিতে হয় তবে তাহার নীতি এবং সংগঠনের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আজ যে সকল নূতন শক্তিকেন্দ্র সৃষ্টি হইয়াছে, জাতি-পুঞ্জের সকল স্তরে আজ তাহাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন নিরাপত্তা-পরিষদকে ভাঙ্গিয়া নূতন ভাবে উহার পুনর্গঠন করা। নিরাপত্তা-পরিষদে ফ্রান্সের স্থায়ী পদ পাওয়ার কোন যোগ্যতা রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভেও ছিল না—এখন ত নাই-ই। উপরন্তু নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদে এশীয় ও আফ্রিকান প্রতিনিধিত্ব আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উপরন্তু প্রয়োজন ভিটো ব্যবস্থার বিলোপসাধন করা।

রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের সংশোধনের কথা উঠিলেই এক ধরনের যুক্তি দেখানো হয় যে, বৃহৎ শক্তিগুলির ঐকমত্য ব্যতীত উহা কার্য্যকরী হইতে পারে না—সুতরাং ভিটো ব্যবস্থার পরিবর্তন বা সাধারণ ভাবে সনদেরও সংশোধনের কোন প্রয়োজন নাই। যদি বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসের কোন মূল্য থাকে, তবে দেখা যাইতেছে যে, "বৃহৎ" শক্তিগুলি কোন ক্ষেত্রেই একমত হইতে পারিতেছে না। সে ক্ষেত্রে এমন একটি সংগঠন দাঁড় করানো প্রয়োজন যাহা বিপজ্জনক ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলির উপর ঐকমত্য চাপাইয়া দিতে পারে। রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্তমান সনদের আওতায় ভিটো প্রথার যে মূল্যই থাকুক না কেন, বর্দ্ধিত এশীয় আফ্রিকান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জ ভিটো ব্যতিরেকেই তাহার কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিবে। যদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে—এবং যে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত প্রকাশ পায় নাই—তবে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ রাষ্ট্রপুঞ্জকে তাহাদের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবে—ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে কোন সমস্যারই সমাধানের আশা নাই—কার্য্যতঃ কোন সমস্যার সমাধান হয়ও নাই।

ইউনেস্কোর নবম সাধারণ সম্মেলন

গত ৫ই নভেম্বর হইতে দিল্লীর নবনির্ম্মিত বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্র-পুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি সংস্থার নবম সাধারণ সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছে, এই সম্মেলন এক মাস কাল চলিবে। ১৯৪৬ সনের ৪ঠা নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি সংস্থার সৃষ্টি হয়—ঐ বৎসরেই ১৪ই ডিসেম্বর সংস্থাটিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থারূপে গণ্য করিয়া উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইউনেস্কোর মূল লক্ষ্য বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির পারস্পরিক পরিচয়ের মধ্য দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে বোঝাপড়ার ভাব বৃদ্ধি করা। সংস্থাটির সংবিধানের মুখবন্ধে বলা হইয়াছে, "যেহেতু মানুষের মনেই যুদ্ধের সূচনা হয়, সেহেতু মানুষের অন্তরেই শান্তির প্রতিরক্ষা গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

ইউনেস্কো কোন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট নহে। উহার কার্য্য সংস্কৃতির প্রচার ও বিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি করা। ১৯৪৫ সনের নবেম্বর হইতে এ পর্য্যন্ত সংস্থার সদস্যদের আটটি সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে—এই সকল সম্মেলন—হয় সংস্থাটির কেন্দ্রীয়আলয় প্যারিস অথবা সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আমন্ত্রণে অন্য কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমে প্রতি বৎসরই একটি করিয়া সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু ১৯৫২ সনের প্যারিস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহার পর হইতে দুই বৎসর পর পর একটি করিয়া সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে।

ইউনেস্কোর কার্য্যভার পরিচালনা করেন সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্য হইতে ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত ২২ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্য্যকরী বোর্ড। ঐ বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান ভারতের ড. এ. লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়র। ইউনেস্কোর কর্ম্মনীতি নির্ব্বাচনের ভার এই বোর্ডেরই হাতে। সংস্থাটির কার্য্যপরিচালনা দেখাশুনা করেন একটি সেক্রেটারিয়েট—যাহার শীর্ষে রহিয়াছেন ডিরেক্টর-জেনারেল। ডিরেক্টর-জেনারেল ছয় বৎসরের জন্য নিয়োজিত হন। বর্তমান ডিরেক্টর-জেনারেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ডঃ লুথার ইভান্স ১৯৫২ সনে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

ইউনেস্কোর গত দশ বৎসরের কার্য্যাবলী হইতে সংস্থাটির বিশেষ কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইউনেস্কোর কার্য্যের প্রকৃতি এইরূপ যে, তাহার ফল প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করা যায় না—অধিকাংশ কার্য্যই ফলপ্রসূ হইতে দীর্ঘ সময় লাগে। শিক্ষা ব্যাপারে ইউনেস্কো একটি প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হইয়াছে: মৌলিক শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন। এই কেন্দ্র দুই প্রকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক। মেক্সিকো এবং মিশরে দুইটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র আছে। বিভিন্ন দেশে বিদ্যালয়-প্রথা এবং তাহার উন্নতিসাধনেও ইউনেস্কো সচেষ্ট রহিয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের—উন্নত এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সহযোগিতাবৃদ্ধিতে ইউনেস্কো সাহায্য করে। এই উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ল্যাটিন আমেরিকাতে বিজ্ঞান-সহযোগিতা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার জন্য ইউনেস্কোর প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় সুইজারল্যাণ্ডে

একটি গবেষণা ভবন স্থাপিত হইয়াছে। আরও যে একটি বিষয়ে ইউনেস্কো বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহা হইল শুষ্ক অঞ্চলের উন্নয়নসাধন।

সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইউনেস্কোর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতি এবং জাতি সম্পর্ক বিষয়ে ইউনেস্কো কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল বিশ্ব কপিরাইট কনভেনশন কার্য্যকরী করা। সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষা সম্পর্কিত কনভেনশনটি কার্য্যকরী করা ইউনেস্কোর আর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

ইহা ভিন্ন কারিগরি সাহায্য এবং অন্যান্য ব্যাপারেও ইউনেস্কো বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছে।

নয়াদিল্লীতে ইউনেস্কোর নবম সাধারণ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু। সম্মেলনের ঠিক প্রাক্কালেই মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ এবং হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট আক্রমণ সংঘটিত হওয়ায় সম্মেলনের আবহাওয়া ভারী হইয়া উঠে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণেও তাহারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তিনি মিশর ও হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন, "এখন দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চশীলের মহান্ আদর্শ কেবল কতকগুলি দেশের নিকট নিছক কথার কথা। এই দেশগুলি সমস্যার সমাধানে তাহাদের অধিকতর বলপ্রয়োগের ক্ষমতাই খাটাইবার দাবি করে। অতীতের তিক্ত স্মৃতি এখনও আমাদের মনে রহিয়াছে। অতীতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির অগ্রগতি রোধ করা হইয়াছে এবং সেই তিক্ত অতীতের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি আমরা ঘটিতে দিতে পারি না।"

তিনি বলেন, "ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ কতকগুলি দিক হইতে ভাগ্যবান, কারণ তাহাদের অবস্থা কতকটা ভাল হইয়াছে, কিন্তু আমরা—এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীরা জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য সর্বপ্রথম যুদ্ধ ও হিংসা আমাদের বর্জ্জন করিতে হইবে। এই সংস্থার মত বিশ্ব-সংস্থায় যদি বিরাট মানব-সমষ্টি, বিশেষ করিয়া চীনের মত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে এই সংস্থা যথাযথ ভাবে সক্রিয় হইতে পারে না।"

শ্রীনেহরু আশা প্রকাশ করেন যে, সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ অনগ্রসর দেশগুলির প্রয়োজন সম্বন্ধেই বিশেষভাবে অবহিত হইবেন, "কারণ এই দেশগুলি কেবল খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যেরই কাঙাল নয়—সর্ব্বোপরি ইহাদের সকলেই স্বাধীনতাপ্রিয় এবং কোন কিছুর বিনিময়েই সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে ইহারা রাজী নয়।"

সম্মেলনে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন; ব্রেজিল, ইকুয়াডর, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্ম্মানী, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, লাইবেরিয়া, পাকিস্থান, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদিগের মধ্য হইতে দশ জন সহ-সভাপতিও নির্ব্বাচিত হন। সম্মেলনে ৭৭টি দেশ অংশগ্রহণ করিবার কথা—কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় প্রথম দিন ষোলটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে কুয়োমিণ্টাং-শাসিত ফরমোজার প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে গণতন্ত্রী চীনের প্রতিনিধিকে ইউনেস্কোর সদস্যপদ দানের জন্য ভারত, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কতিপয় দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ যে প্রস্তাব আনয়ন করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরোধিতায় সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরিবর্ত্তে ৩১-১৬ ভোটে সম্মেলনে চীন রাষ্ট্রকে সদস্যপদ-দান সংক্রান্ত প্রস্তাবটি মুলতুবী রাখিবার জন্য আনীত মার্কিন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এগারটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে এবং সতেরটি দেশের প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকেন।

সাইপ্রাসে ব্রিটিশ শিক্ষানীতির সমালোচনা করিয়া গ্রীস একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ২১-১৪ ভোটে তাহা বাতিল হইয়া যায়।

১৩ই নবেম্বর অধিবেশনে বাজেট লইয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সহিত অনুন্নত দেশগুলির পুনরায় মতবিরোধ প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থার ১৯৫৭-৫৮ সনের বাজেট দশ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারত, ব্রেজিল, ফ্রান্স এবং স্পেন যে প্রস্তাব আনয়ন করে তাহা ২৭-২০ ভোটে পাস হয়; ১৯টি রাষ্ট্র অবশ্য ভোট দানে বিরত থাকে। ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটির বিপক্ষে ভোট দেয়; সোভিয়েট ইউনিয়ন ভোটদানে বিরত থাকে। ১৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ অনুপস্থিত থাকেন।

ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের নেতা সার বেন বাওয়েন টমাস ভোটের ফলাফলে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলেন যে, উক্ত প্রস্তাবটি পাস করিয়া সম্মেলন "ছেলেমানুষি" (adolescent) প্রকাশ করিয়াছে।

ব্রিটিশ প্রতিনিধির এই অশোভন উক্তির উত্তরে ভারতের প্রতিনিধি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলেন, "ব্রিটিশ প্রতিনিধির বক্তৃতায় আমি বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। বিস্ময়ের আরও বেশী কারণ এই যে, তিনি যে দেশের প্রতিনিধি সেই দেশে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্য সব দেশের অপেক্ষা অধিক দিন চালু আছে। সমস্ত গণতন্ত্রেই মতভেদ হইতে বাধ্য, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্ব্বসময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ২৭ ও ২০ ভোটের মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্য নয়।"

১৩ই নবেম্বর ইউনেস্কোর কার্য্যকরী সমিতির শূন্য পদগুলিতে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, কার্য্যকরী সমিতিতে এশীয়-আফ্রিকান প্রতিনিধির সংখ্যা নয় হইতে কমিয়া সাতে দাঁড়াইয়াছে। ডাঃ কৃষ্ণস্বামী মুদালিয়রের স্থলে ডঃ জাকীর হোসেন ভারতের প্রতিনিধি মনোনীত হন।

এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন

এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন নগরীতে—১৯৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে। প্রথম সম্মেলনে ব্রহ্ম, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইস্রায়েল, জাপান, লেবানন, নেপাল এবং পাকিস্থানের সমাজতান্ত্রিক দলগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। ইহা ভিন্ন আফ্রিকার জাতীয়তা আন্দোলনের প্রতিনিধিবৃন্দও প্রথম সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন। ইউরোপ হইতে যুগোশ্লাভিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সংস্থাও প্রথম এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। প্রথম সম্মেলনের অধিকাংশ সময়ই সাংগঠনিক ও আনুষ্ঠানিক বিধিব্যবস্থা নিরূপণেই ব্যয়িত হয়। এশীয় সম্মেলনের সদস্য-সংখ্যা এতদিন পর্য্যন্ত ছিল আট যথা: ভারত, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, ইস্রায়েল, জাপান, লেবানন, মালয় এবং পাকিস্থান। দ্বিতীয় সম্মেলনে নেপাল, সিংহল ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে সদস্যভুক্ত করিয়া লওয়ায় বর্ত্তমান সদস্যসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে এগার।

প্রথম সম্মেলনে গৃহীত সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রধানত: (১) এশিয়ার বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করা; (২) পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে দলগুলির রাজনৈতিক মনোভাবের সমন্বয়সাধন; (৩) এশিয়ার বহির্ভূত সমাজতান্ত্রিক দলগুলির সহিত সংযোগস্থাপন; (৪) সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত সংযোগস্থাপন; (৫) ঔপনিবেশিক ও নির্যাতিত জনসাধারণের দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন এবং গণতান্ত্রিক জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনগুলিকে নেতৃত্বদান করা; এবং (৬) বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সহযোগিতা করা।

১লা হইতে ১০ই নভেম্বর পর্য্যন্ত দশ দিন যাবৎ বোম্বাই নগরীতে এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের সংবিধান অনুযায়ী দুই বৎসর অন্তর সম্মেলনের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হইবার কথা। কার্য্যতঃ প্রায় চার বৎসর পর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয় এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে সদস্য এগারটি দল ব্যতীত এশিয়া ও আফ্রিকার তেইশটি সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধিগণ পর্য্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তদ্ব্যতীত সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক, সমাজতন্ত্রবাদী আন্তর্জাতিক যুব সংস্থা, যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট লীগ এবং ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা আন্দোলন সংস্থা হইতে প্রেরিত সৌভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধিবৃন্দও দ্বিতীয় সম্মেলনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসী চক্রের অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ফলে কেবলমাত্র মিশরের প্রতিনিধিবর্গ সম্মেলনে যোগদানে অসমর্থ হন। ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ বা-সোয়ে দ্বিতীয় এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

দ্বিতীয় এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের আলোচ্য সূচীতে ছিল (১) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি; (২) পরমাণবিক অস্ত্র (৩) নিরস্ত্রীকরণ; (৪) এশীয় শান্তি ঘোষণা; (৫) এশিয়াতে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি; (৬) রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের সংশোধন এবং (৭) ঔপনিবেশিক স্বাধীনতার জন্য কর্ম্মপন্থা গ্রহণ। পাকিস্থানের প্রতিনিধি কাশ্মীর সমস্যাটিকে আলোচ্য সূচীতে একটি স্বতন্ত্র বিষয় রূপে অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াস পান, পরে অবশ্য তিনি সেই প্রয়াস পরিত্যাগ করেন। আর একটি বিষয় পরে আলোচনা-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়—তাহা হইল "কমিউনিষ্ট বিশ্বের ঘটনাবলীর তাৎপর্য্য নিরূপণ"।

পশ্চিম এশিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার জন্য সম্মেলন রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট আবেদন জানান। হাঙ্গেরী হইতে সমস্ত সোভিয়েট সৈন্য অপসারণের দাবি জানাইয়াও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট সকল প্রকার পরীক্ষামূলক আণবিক বোমার বিস্ফোরণ এবং পরমাণবিক ও তদনুরূপ অস্ত্রাদির ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য আবেদন জানানো হয়।

ইস্রায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোশে শারেট চীন, জাপান এবং অন্যান্য রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ দানের দাবি জানাইয়া যে প্রস্তাব আনয়ন করেন, সম্মেলন তাহাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন। উক্ত প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদের আসনটি চীনকে দিবার জন্যও দাবি জানানো হইয়াছে। হংকং হইতে আগত প্রতিনিধি এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিলে তাহার উত্তরে শারেট বলেন যে, চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইলে বিশ্ব কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, বরং তাহাতে সকলেরই উপকার হইবে। বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন—যদি রাষ্ট্রপুঞ্জকে ফলপ্রসূ করিতে চাওয়া হয় তবে চীনকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য-সম্প্রসারণের উপর জোর দিয়া সম্মেলনের অর্থনৈতিক কমিটির রিপোর্টে উক্ত অঞ্চলে উৎপাদনবৃদ্ধির উপর সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধ অপসারণের দাবি জানানো হয়। উক্ত রিপোর্টে ধাপে ধাপে জাতীয়করণের একটি প্রস্তাবও করা হয়। সম্মেলন অর্থনৈতিক কমিটির রিপোর্টটিও গ্রহণ করেন।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু ও ভারত সরকার

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগকে লইয়া বর্ত্তমানে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত সরকারের এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, বহুসংখ্যক উদ্বাস্তুই নাকি "জাল মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট" লইয়া ভারতে প্রবেশ করিতেছে। "জাল মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটে"র রহস্য যাহাই থাকুক না কেন, উদ্বাস্তু-সমস্যার আরও কয়েকটি বিশেষ দিক রহিয়াছে—যাহার সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা খুবই কম।

আসামের করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" পত্রিকার ২৩শে কার্ত্তিক সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উদ্বাস্তু আগমন-সমস্যা সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত করা হইয়াছে।

যাঁহারা উদ্বাস্তুরূপে ভারতে আগমন করেন তাঁহাদের দুর্গতি ত্রিবিধ—প্রথমতঃ পাকিস্থানে সরকারী, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিগ্রহ; দ্বিতীয়তঃ পাকিস্থানে অবস্থিত ভারতীয় হাই-কমিশনার আপিসে; এবং তৃতীয়তঃ ভারতে অবস্থিত পাকিস্থানী হাই-কমিশনার আপিসে।

পাকিস্থানে সরকারী এবং বেসরকারী নিগ্রহ সম্পর্কে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। সুতরাং শেষোক্ত দুইটি দিক সম্পর্কেই বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। "যুগশক্তি" লিখিতেছেন যে, পাকিস্থানে অবস্থিত ভারতীয় হাই-কমিশনার আপিস মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দিতে বিশেষ কড়াকড়ি করায় ভারতে আগমনেচ্ছু হিন্দুগণ অনেক সময়ই বলিতে বাধ্য হন যে, ভারতে গিয়া তাঁহারা কোন সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না। ফলে অধুনা সকল উদ্বাস্তুদিগের সার্টিফিকেটের উপরই লেখা থাকিতেছে, "উদ্বাস্তু হিসাবে কোন সুবিধা দিবার প্রয়োজন নাই।" দ্বিতীয়তঃ, "আইনানুযায়ী পাসপোর্ট ও ভিসাসহ ভারতে প্রবেশ করিয়া পরে কোন ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে ভারতে বসবাসের ইচ্ছাজ্ঞাপক এফিডেবিট করিয়া উহার নকলসহ ঐ পাসপোর্ট ভারতস্থিত পাকিস্থানী হাই কমিশনারের আপিসে জমা দিলে ভারতীয় নাগরিক হওয়া যায় এবং তাহার রসিদ লইয়া উহা উদ্বাস্তু বিভাগে জমা দিলে উদ্বাস্তু হিসাবে যাবতীয় সুবিধা পাওয়ার কথা। কিন্তু পাকিস্থান সরকার ইতঃপূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা এরূপভাবে জমা লইয়া রসিদ দিতে 'বাধ্য' নহেন। ফলে হিন্দুগণ সহজে রসিদ পান না; অথচ প্রকাশ যে, মুসলমানগণ অতি সহজেই তাহা পাইয়া থাকেন। আর এই রসিদ না পাইলে উদ্বাস্তু হিসাবে গণ্য হওয়া ত দূরের কথা, ভারতীয় নাগরিক হওয়াই বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ফলে দেখা যাইতেছে যে, আইনতঃ পাকিস্থান হইতে হিন্দুদের ভারতে আগমনের বহু পথ খোলা থাকিলেও কার্য্যতঃ এখন সকল পথই বন্ধ হইয়া যাইতেছে।"

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগকে এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে কিন্তু পাকিস্থান হইতে বেআইনীভাবে আগত মুসলমানগণকে এই সকল অসুবিধার কোনটিই সহ্য করিতে হয় না। দুই-এক দিন জেল খাটার পর তাহারা ভারতেই থাকিয়া যায়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে পাকিস্থানের সীমান্ত পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইতে বাধ্য নহেন—কারণ উহারা যে পাকিস্থানেরই নাগরিক সে সম্পর্কে কোন লিখিত প্রমাণ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে থাকে না। "আর বেআইনী আগন্তুক মুসলমানদের কয়জনই বা ধরা পড়ে? শতকরা ৯০ ভাগই বোধ হয় ধরা পড়ে না। তার পরে সংখ্যালঘুদের সুবিধা আদায়ও খুব কঠিন ব্যাপার নহে।" অপরদিকে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগের সহিত জালই হউক বা আসলই হউক ফটোযুক্ত মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট থাকে—যে সার্টিফিকেটে পাকিস্থানী চেকপোষ্টের সহি থাকে—সে অবস্থায় হিন্দুদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া খুবই সহজ।

পরিকল্পনার গোলযোগ

পশ্চিমবঙ্গে আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইল। উত্তম কথা, কেননা বাঙালীর সর্ব্বস্ব গিয়াছে বা যাইতে চলিয়াছে, এখন ভরসা একমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ উচ্চমানের সাধারণ শিক্ষা ও বিস্তৃত কার্য্যকরী শিক্ষা। কিন্তু অন্য অনেক সমস্যা যাহা আছে তাহার ব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গের আশু সমস্যা উদ্বাস্তুর পুনর্বসতি, ইহার পর আছে চিকিৎসার প্রয়োজন ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি। পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তি যক্ষ্মায় মারা যায়, ইহাদের মধ্যে হাসপাতালে মাত্র কয়েক হাজারের চিকিৎসা হয়। অধিকাংশ রোগীই গরীব এবং নিজেরা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে পারেন না বলিয়া বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। ইহাদের জন্য বাংলাদেশের প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপন করা অতি অবশ্য প্রয়োজন।

বেকার-সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ত্তব্য শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া চাকুরীর সংস্থান করা। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প কিংবা জাহাজ-শিল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, ভারতবর্ষের প্রায় ৪,০০০ মাইল সমুদ্রোপকূল; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের জাহাজের পরিমাণ এক শতাংশও নয়। একদিন কলিকাতায় নির্ম্মিত জাহাজ ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত? কিন্তু এই সব ব্যাপারে চিন্তা করিবার সময় কোথায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশের সমস্যার চেয়ে চীন, রাশিয়ার সমস্যা লইয়া অধিক চিন্তিত। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সকল ব্যাপারে চিন্তা করিবার প্রয়াস পান বলিয়া কোন ব্যাপারেই চিন্তা করা হয় না। ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু ছয় বৎসরে এবিষয়ে সরকার কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন?

অর্থবিহীন উপদেশ

সম্প্রতি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমরা কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। অধ্যাপক কবীর বলিয়াছেন যে, বাঙালীর চিন্তা বর্ত্তমানে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, কারণ তাহারা সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে চিন্তা করিতেছে না। কোন অবাঙালী এই কথা বলিলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতাম না। বাঙালী কোন বিষয়ে অভারতীয় চিন্তা করিতেছে সে-কথা অধ্যাপক কবীর বলেন নাই। দ্বিধাবিভক্ত বাঙালী নিজের সমস্যা লইয়া এত বিব্রত যে, অন্য চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার

এখন নাই। আর অধ্যাপক কবীর বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির রেনেশাঁস বাঙালীর অবদান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দুইটি বিষয়ে বর্ত্তমানে বাংলা দেশ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করিতেছে—হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করিবার বিরুদ্ধে বাংলা প্রতিবাদ করিয়াছে ও করিতেছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন বিষয়েও বাঙালীর আপত্তি আছে। মাধ্যমিক শিক্ষার পুনগঠন ব্যবস্থার পরিকল্পনা অধ্যাপক কবীরের একটি অপকীর্ত্তি; ইহাকে চালু করিবার বিরুদ্ধে সবচেয়ে আপত্তি করিয়াছে বাংলা দেশ, কারণ বাঙালীর চিন্তাশীলতার পিছনে যুক্তি আছে। অধ্যাপক কবীরের উপদেশ এই দুইটি বিষয়কেই ইঙ্গিত করিয়াছে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে শুধু বাংলা দেশ কেন, অন্যান্য অনেক প্রদেশ আপত্তি জানাইয়াছে। মাঝে মাঝে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পর্য্যন্ত প্রকারান্তরে তাঁহার আপত্তি জানাইয়া দেন। আর যদি কোন প্রদেশ আপত্তি নাও করে, তথাপি হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার অন্যায় জিদের বিরুদ্ধে বাংলা দেশ আপত্তি করিবে, কারণ যা অন্যায় ও অযৌক্তিক তাহার বিরুদ্ধে বাঙালীর চিন্তা চিরকালই আপত্তি জানাইয়া আসিয়াছে।

আর মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে বাঙালীর আপত্তির কারণ এই যে, এই ব্যবস্থার পিছনে রাজনৈতিক চিন্তাধারাই অধিকতর বলবতী। শিক্ষার মান পরিবর্ত্তনকল্পে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার করিয়া টাকা ব্যয় করিতে হইবে। অর্থাৎ ইহার জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ হইবে। সব বিদ্যালয়ে অধ্যাপক রাখিতে হইবে এবং সকল বিদ্যালয়ের পক্ষে পুনর্গঠন ব্যবস্থা সম্ভবপর হইবে না। ইহার ফলে কতকগুলি বিদ্যালয়ের মান উন্নীত হইবে এবং কতকগুলির হইবে না। তিন বৎসরে বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্ধারিত হইলে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হ্রাস পাইতে বাধ্য, এবং সরকারও ইহা চান, কারণ উচ্চশিক্ষা বৃদ্ধি পায় ইহা তাঁহাদের কাম্য নয়। উচ্চশিক্ষার ফলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং সরকারী অকর্ম্মণ্যতা ও অপকীর্ত্তি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকতরভাবে ধরা পড়ে। অধ্যাপক কবীর বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বাংলাদেশে যত অবাঙালী আছে, ভারতের অন্যান্য কোন প্রদেশে তত বাঙালী নাই। ইহা কি বাঙালীর সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক, না সর্ব্বজনীনতার পরিচায়ক? আর বর্ত্তমানে বাঙালী যদি কিছু পরিমাণে সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হারাইয়া ফেলিয়া থাকে, তবে তজ্জন্য দায়ী বাঙালী নয়, দায়ী সারা ভারতবাসী যাহারা গণ্ডী টানিয়া নিজদিগকে তাহার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালীর বিরুদ্ধে দ্বার আজ সর্ব্বত্রই রুদ্ধ, সুতরাং বাঙালী আজ নিজের ঘরের মধ্যে, নিজের মনের মধ্যে যদি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়া থাকে, তাহার জন্য অনুযোগ করিবার কিছুই নাই—প্রয়োজন সহানুভূতির।

দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী

ভারতের পাঁচ লক্ষাধিক গ্রাম ও নগরে প্রায় বত্রিশ হাজার পাঠাগার রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ পাঠাগারই পাঠাগার রূপে অভিহিত হইবার উপযুক্ত নহে। জাতীয় এবং শিক্ষাজীবনে পাঠাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সরকার এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে অল্পকাল মাত্র। ভারতে সাম্প্রতিককালে যে কয়েকটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগার নিঃসন্দেহে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। উহাকে এশিয়ার মধ্যে "সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মব্যস্ত এবং সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক গ্রন্থাগার" বলা হয়।

গ্রন্থাগারটি ভারত সরকার এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি (ইউনেস্কো) সংস্থার যুক্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সনের ২৭শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন করেন।

পাঠাগারটি প্রত্যহ বারো ঘণ্টা খোলা থাকে। কোন পাঠকের নিকট হইতেই কোন জমা বা চাঁদা লওয়া হয় না। পুস্তকের জন্য কোন জমা না রাখা হইলেও গ্রন্থাগারের পুস্তক বিশেষ খোয়া যায় নাই—জনসাধারণ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের অবমাননা করেন নাই। গত পাঁচ বৎসরে গ্রন্থাগার হইতে ষোল লক্ষ বই 'ইস্যু' করা হয়—তন্মধ্যে মাত্র ৭৫০টি ব্যতীত আর সকল বই-ই ফেরত পাওয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগারের রেকর্ডের সহিত তুলনামূলক বিচারে দিল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগারের রেকর্ড কোন অংশেই ন্যূন নহে।

সাধারণ গ্রন্থাগারটির আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। গ্রন্থাগারটি একটি সামাজিক কেন্দ্র হিসাবে জনসাধারণের সাংস্কৃতিক চাহিদা মিটায়। ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়ের জন্য পাঠাগারে একটি পৃথক বিভাগও রহিয়াছে। গ্রন্থাগারের সামাজিক শিক্ষা বিভাগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পাঠকগণ যাহাতে সুপরিকল্পিত ভাবে তাহাদের অধ্যয়ন-কার্য্য চালাইতে পারেন তজ্জন্য একটি পরামর্শ-দান ব্যবস্থা রহিয়াছে। গ্রন্থাগারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগে সকল প্রকার বিষয়ে রেফারেন্স সংগ্রহে সাহায্যদানের ব্যবস্থা আছে।

গ্রন্থাগারের সাফল্য সম্পর্কে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ১৯৫৫ সনে ব্যাপক অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন যে, গ্রন্থাগারটি অবিসংবাদিতরূপে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতায় এইরূপ একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন যাবৎই অনুভূত হইতেছে এবং সেই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পত্রপত্রিকা এবং আলোচনা-সভায় বহুবার উল্লেখও করা হইয়াছে। কলিকাতার মত নগরীতে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার না থাকা নিতান্তই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। বেলভিডিয়ারে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারটি ঠিক সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ইহা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার—উহা ছাত্রদেরই প্রয়োজন মিটাইতে পারিতেছে না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি অপর কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগার রহিয়াছে বটে, তবে তাহাদিগকেও ঠিক সাধারণ গ্রন্থাগারের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট যে কয়েকটি গ্রন্থাগার রহিয়াছে তাহাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় তাহারা জনসাধারণের সাংস্কৃতিক চাহিদা মিটাইতেছে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহাদের শক্তি এরূপ সীমাবদ্ধ যে জনসাধারণের সাংস্কৃতিক চাহিদার বেশীর ভাগই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর সে সম্পর্কে আর কিছুই শোনা যায় নাই। আমরা আশা করি, কলিকাতায় একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপনে আর অযথা বিলম্ব করা হইবে না।

ভারতে খনিজ তৈল

ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি ক্রমশঃ বৃদ্ধির মুখে, ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খরচ সঙ্কুলান হইয়া উঠিবে না। তাঁহারা আমদানী খরচ বাঁচাইবার জন্য সচেষ্ট, কারণ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যন্ত্রপাতী ব্যতীত তৈল আমদানীতে ভারতের বহু বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ বৎসরে ৭৫ কোটি টাকার খনিজ তৈল আমদানী করে। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতে পেট্রোলিয়ামের প্রয়োজন দাঁড়াইবে ৭০ লক্ষ টনে এবং ইহার আমদানীর জন্য ১২০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হইবে। ভারতে তৈল অনুসন্ধানের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকার অন্যূনপক্ষে ত্রিশ কোটি টাকা খরচ করিবেন। কেন্দ্রীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকেশব মালবীয় সম্প্রতি কানাডায় গিয়াছিলেন তৈল নিষ্কাষণ ব্যাপারে ঐ দেশ হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশায়। কানাডা ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং খনিজ তৈল অনুসন্ধান ব্যাপারে ভারতবর্ষকে সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছে, শীঘ্রই এই উদ্দেশ্যে তাহারা এ দেশে লোক পাঠাইবে। তৈল অনুসন্ধান ব্যাপারে কানাডার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান খুবই উন্নত।

আসাম তৈল কোম্পানীর ভূতত্ত্ববিদ মিঃ মেত্রে সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তাঁহার মতে আসামের নাহোরকাটিয়া এলাকায় তৈল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা আছে। ইহাতে বৎসরে প্রায় ২৫ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হইবে। ইহার সঙ্গে ৪·৫ কোটি টন কিউবিক ফুট গ্যাসও পাওয়া যাইবে, এবং এই পরিমাণ গ্যাস প্রায় ৬ লক্ষ টন পেট্রোলিয়ামের সামিল। আসামের শিল্পোন্নতিতে এই গ্যাস খুব প্রয়োজনে আসিবে। ডিগবয় তৈলখনির উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান, ইহাতে বৎসরে গড়ে তিন লক্ষ টন তৈল উৎপাদিত হয়। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষ টন অপরিশ্রুত তৈলের প্রয়োজন হয়, এখন ইহার ৮ শতাংশ মাত্র এদেশে উৎপাদিত হয়, আগামী কয়েক বৎসরে এই উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫৬ শতাংশে দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

আসাম উপত্যকার অন্যান্য স্থানেও তৈল আছে বলিয়া প্রাথমিক অনুসন্ধানে ধরা পড়িয়াছে। এখানকার মোরান এলাকায় তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মোট ৪৩ লক্ষ টন তৈল খরচ হয়। ১৯৬০-৬১ সন নাগাদ ইহার পরিমাণ হইবে ৭০ লক্ষ টন। শুধু আসামেই যাহাতে ৪০ লক্ষ টন তৈল উৎপাদিত হয় তাহার জন্য ভারত সরকার সর্ব্বতোপায় অবলম্বন করিতেছেন। পঞ্জাবের জাওলামুখ। এলাকায় তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাংলা, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রেও তৈল আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দ্রুত অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। গাঙ্গেয় উপত্যকার আরও অন্যান্য স্থানে তৈলের অবস্থান স্বাভাবিক।

মুদ্রাস্ফীতি, না মন্দার বাজার ?

ভারতে টাকার বাজার বর্ত্তমানে দুইটি বিপরীত গতির সম্মুখীন —একদিকে মুদ্রাস্ফীতি, অন্যদিকে মন্দা। কয়েকদিন আগে ভারতের অর্থমন্ত্রী টাকার বাজারে মন্দা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মে মাসে ও সেপ্টেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধকল্পে ব্যাঙ্কগুলির উপর কিছু কিছু বাধানিষেধ আরোপ করে। খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেখা যায় যে, ব্যাঙ্ক দাদনের সাহায্যে আড়তদারেরা এই দ্রব্যগুলিকে ধরিয়া রাখিতেছে, সেই কারণে বাজারে ইহাদের সরবরাহ কম হওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্কগুলি টাকার বাজার মন্দা বলিয়া ধুয়া তুলিল এবং অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী তাহাদের সমর্থন করিলেন। ফলে ব্যাঙ্কগুলির উপর হইতে উক্ত বাধানিষেধগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তুলিয়া লইতে বাধ্য হয়।

কিন্তু টাকার বাজার কি সত্যই মন্দা ? অবশ্যই নয় ; ব্যাঙ্কগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে টাকা খাটাইয়াছে, তাহাতেই টাকার বাজারে টান পড়িয়াছে। জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কগুলিকে সময় হুণ্ডীর বিরুদ্ধে (usance bills) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩৩০ কোটি টাকা লগ্নী দিয়াছে। ভারতবর্ষে মে মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত টাকার বাজার মন্দা থাকে ; কিন্তু সেই সময়েই এত অধিক পরিমাণ ঋণ ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। অন্যান্য বৎসরে এই সময়ে ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ঋণ লয় নাই ; ফসল উঠার সময় টাকার বাজার তেজী থাকে (নবেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত)। টাকার বাজার তেজী হওয়ার প্রারম্ভেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হুণ্ডীর বিরুদ্ধে সুদের হার শতকরা সোয়া তিন হইতে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি অত্যধিক পরিমাণে দাদন দিয়াছে, ইহাতে ফাটকার বাজারে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে

এবং মূল্যমান উপরের দিকে উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের আমানতের ৭০ শতাংশ ইতিপূর্ব্বেই লগ্নী দিয়া বসিয়াছে ; টাকার বাজারে তেজী অবস্থা সবেমাত্র সুরু। আন্তর্ব্যাঙ্ক স্বল্পমেয়াদী ঋণের হার সোয়া তিন শতাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। মূল্যমানকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচিত ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধি করা ও লগ্নীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা (credit rationing)।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের পুনর্নির্বাচন

জেনারেল ডুইট আইসেনহাওয়ার দ্বিতীয় বারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আইসেন-হাওয়ারের এই জয় তাঁহার ব্যক্তিগত জয়। মার্কিন জনসাধারণ রিপাবলিকান দলের মনোনীত প্রার্থী আইসেনহাওয়ারকে প্রেসি-ডেণ্টরূপে ভোট দিয়াছেন, কিন্তু রিপাবলিকান দল কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের জনপ্রিয়তা এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ১৯৫২ সনের নির্ব্বাচনে তিনি যে-সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন এবারে তিনি তদপেক্ষা অনেক বেশী ভোট পাইয়াছেন। আইসেন-হাওয়ার ৪২টি রাষ্ট্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এডলাই ষ্টীভেনসন অপেক্ষা বেশী ভোট পাইয়াছেন, মাত্র ছয়টি রাষ্ট্রে ষ্টীভেনসন আইসেন-হাওয়ার অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছেন। ১৯৫২ সনে আইসেনহাওয়ার ৩৯টি রাষ্ট্রে এবং ষ্টীভেনসন নয়টি রাষ্ট্রে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করেন। প্রায় ৫৬ বৎসর পর এই এক জন রিপাবলিকান প্রেসিডেণ্ট পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৯০০ সনে পুনর্নির্ব্বাচনের অত্যল্পকাল পরেই রিপাবলিকান প্রেসিডেণ্ট ম্যাককিনলে আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হইবার পর আজ পর্য্যন্ত আর কোনও রিপাবলিকান প্রেসিডেণ্টই পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। মিঃ রিচার্ড নিক্সন পুনরায় উপরাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মার্কিন কংগ্রেসের উভয় ক্ষেত্রেই ডেমোক্র্যাটিক দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ১৮৪৮ সনের পর এই সর্ব্বপ্রথম এক-জন প্রেসিডেণ্ট বিরোধী কংগ্রেসের সম্মুখীন হইয়াছেন।

আইসেনহাওয়ারের নির্ব্বাচনী প্রচারে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পুনর্নির্ব্বাচিত হইলে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিপ্ত হইবে না। এডলাই ষ্টীভেনসন আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু আইসেনহাওয়ার তাহার বিরোধী। আইসেনহাওয়ারের পুনর্নির্ব্বাচনে মার্কিন বৈদেশিক নীতির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

মিঃ আইসেনহাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদে পুনর্নির্ব্বাচিত হওয়ার খবর নিম্নরূপে আসে।

"নিউইয়র্ক, ৭ই নবেম্বর—মিঃ ডুইট ডি, আইসেনহাওয়ার (রিপাব্লিকান পার্টি) পুনরায় চার বৎসরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মিঃ এডলাই ষ্টিভেনসন (ডেমোক্রাট) বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হইয়াছেন।

ডেমোক্রাটিক দলের প্রার্থী মিঃ ষ্টিভেনসন নির্ব্বাচনে পরাজয় স্বীকার করার অল্প কিছুক্ষণ পরেই বিজয়ী প্রেসিডেণ্ট তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল সমর্থকগণকে বলেন—মঙ্গলময় ভগবান আমাকে যতটুকু ধীশক্তি দান করিয়াছেন এবং আমার ভিতরে যতটুকু শক্তি আছে তাহা লইয়া আমি এবং আমার সহকর্ম্মিগণ একটিমাত্র কাজ করিব। সে কাজ হইল স্বদেশে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ আমেরিকাবাসীর মঙ্গলসাধন এবং জগতে শান্তি স্থাপন ;

মিঃ আইসেনহাওয়ার রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসাবে পুনরায় প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে তাঁহার দল জয়ী হইতে পারে নাই। কংগ্রেসের উভয় পরিষদেই—সিনেটে এবং প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রাটদল প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কংগ্রেসে বিরোধী দলের সংখ্যাধিক্য সহ এই শতাব্দীতে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

অদ্য প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের নিকট প্রেরিত এক তার-বার্ত্তায় মিঃ এডলাই ষ্টিভেনসন বলিয়াছেন, "আপনি কেবল নির্ব্বাচনেই জয়লাভ করেন নাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের গভীর আস্থা অর্জ্জন করিয়াছেন।

অদ্য রাত্রে আমরা রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রাট নহি, আমরা আমেরিকান। আমি আপনাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

দেশের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে যে সব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, আমরা তাহা উপলব্ধি করিতেছি। আমেরিকান হিসাবে আমরা আপনার শাসনকালের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।"

মৌলানা ভাসানী-নুন সংবাদ

মালিক ফিরোজখাঁ নুন কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত সম্পর্কে বিষোদ্গার করেন। উহা অবশ্য তাঁহার মস্তিষ্কের অবস্থার পরিচায়ক। সে সম্পর্কে মৌলানা ভাসানীর মন্তব্য নীচে দেওয়া হইল :

"ঢাকা, ২৬শে অক্টোবর—পূর্ব্ববঙ্গে শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ব-পাকিস্থান আওয়ামী লীগের সভাপতি মৌলানা আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানী এখানে ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীর সমস্যা ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কে ক্ষতস্বরূপ হইয়া থাকা সত্ত্বেও পাকিস্থানী জনগণ 'ভারতকে তাহাদের শত্রু বলিয়া মনে করে না এবং করিতে পারে না।'

পাকিস্থানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নুন সম্প্রতি রাওয়ালপিণ্ডিতে ও অন্যত্র যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, মৌলানা ভাসানী তৎসমুদয়ের সমালোচনা করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। আওয়ামী লীগের সদর দপ্তর হইতে গত রাত্রিতে এই বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রচারিত হইয়াছে।

মৌলানা ভাসানী তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে, বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক কাশ্মীর সমস্যা ও অন্যান্য কতকগুলি সমস্যার শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করিতে হইবে এবং তাহার জন্যই রাষ্ট্রপুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন, 'আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে, পাকিস্থান ও ভারতের এবং সর্ব্বোপরি কাশ্মীরের জনগণের সন্তোষজনকরূপে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান পাকিস্থান ও ভারতের জনগণের উদ্ভাবনী শক্তির অতীত নহে।'

রাওয়ালপিণ্ডিতে এবং অন্যত্র পাকিস্থানের প্রতিরক্ষা ও বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত অন্যান্য চুক্তি সম্পর্কে মালিক নুন যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন, তৎসমুদয় মৌলানা ভাসানীকে 'রূঢ়ভাবে বিস্ময়াহত' করিয়াছে—ইহা ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন যে, অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা বলাই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু পাকিস্থানের জনগণ আশা করে যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে তাঁহার বিচারবুদ্ধির পরিচয় দানে তাঁহার সতর্ক হওয়া উচিত। যাঁহারা কিছুকাল ধরিয়া মালিক নুনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ইহাতে বিচলিত হইবেন না। অতি সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন যে, পাকিস্থান পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রজোটের নিকট হইতে যথেষ্ট সমর্থন ও সাহায্য না পাইলে রুশীয় রাষ্ট্রজোটের সহিত হাত মিলাইবে।

মৌলানা ভাসানী বলেন যে, আলোচনা, অনুমোদন বা অনুরূপ ব্যবস্থার জন্য দেশ একবাক্যে বরাবরই সমস্ত বৈদেশিক চুক্তি পার্লামেণ্টে পেশের দাবী জানাইয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ সেই দাবীর উত্তরেই সরকার সেদিন ঢাকার জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৈদেশিক চুক্তিসমূহ সম্পর্কে শীঘ্রই এক শ্বেতপত্র প্রচারিত হইবে। কিন্তু মালিক ফিরোজ খাঁ নুন অকস্মাৎ বলিয়া বসিলেন যে, সরকার বৈদেশিক চুক্তিসমূহ জাতীয় পরিষদে পেশ করিতে চাহেন নাই। কারণ সরকার রাষ্ট্রের কার্য্যনির্ব্বাহক প্রধানরূপে যে-কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত যে-কোনরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারেন এবং সেই সমস্ত চুক্তি তাঁহারা জাতীয় পরিষদে অনুমোদন করাইয়া লইতে বাধ্য নহেন। মালিক নুন আরও বলিয়াছেন যে. বৈদেশিক চুক্তিসমূহে গোপন ধারাসমূহ আছে বলিয়া সেই সমস্ত চুক্তি আলোচনার্থ জাতীয় পরিষদে পেশ করিয়া তৎসমুদয়ের বিষয়বস্তু ফাঁস করিয়া দেওয়া জনস্বার্থের অনুকূল হইবে না।

মৌলানা ভাসানী বলেন যে, দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এইরূপ উক্তি কেবল যে 'বিস্ময়কর' এবং তাঁহার রাজনীতির প্রাথমিক জ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক তাহাই নহে, অধিকন্তু মালিক নুন যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহা দ্বারা পাকিস্থানের জনগণের দেশপ্রেমের উপরও সরাসরি আঘাত হানা হইয়াছে।

মৌলানা ভাসানী বলেন, 'পাকিস্থানের জনগণই পাকিস্থান সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার সংহতি ও স্বাধীনতাও তাহারাই রক্ষা করিবে। যে সমস্ত মন্ত্রী পূর্ব্বে ছিলেন এবং এখন যে সমস্ত মন্ত্রী শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদের অনেকেরই পাকিস্থান গঠনে কোনরূপ অবদান নাই। মন্ত্রীরা নিযুক্ত হইবেন এবং বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ জনগণ চিরকালই থাকিবে।'"

ভারত-তিব্বত যোগাযোগ

তিব্বত নিষিদ্ধ দেশ ছিল। বহু আয়াস-প্রয়াসের ফলে সেখানে বাহিরের লোক যাইত। শুধু পথেরই বিপদ ও কষ্ট অতি ভয়ানক ছিল, কেননা পথ বলিতে পায়ে-চলা পাহাড়ী পথ এবং তাহাও ছিল অতি উচ্চ তুষারময় গিরিসঙ্কটের পরপারে। নীচের সংবাদে জানা যায় যে, বিমান পথে ঐ দুর্গম যাত্রাপথ সুগম ও সরল করার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। যদিও অন্য বাধাবিঘ্ন এখনও আছে :

"নয়াদিল্লী, ২৪শে অক্টোবর—আজ ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি ইলুসিন পরিবহন বিমান হিমালয়ের উপর দিয়া সাফল্যের সহিত উড়িয়া গিয়া ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বিমান যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে ১৯৫৪ সনে প্রথম একটি ডাকোটা বিমান এইভাবে হিমালয় অতিক্রম করিয়া গ্যানৎসির নিকট কিছু ঔষধপত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল।

ইলুসিন বিমানটির নাম দেওয়া হইয়াছে "মেঘদূত"। ইহা আজ ভারত ও তিব্বতের মধ্যে অনিয়মিত আকাশপথ ধরিয়া পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রা আরম্ভ করে। হিমালয়ের উপর দিয়া যাইবার সময় ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪,০০০ ফুটেরও উঁচু কয়েকটি শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া যায়। এই শৃঙ্গগুলিতে এখনও মানুষের পদার্পণ হয় নাই।

মেঘদূত আজ সকাল সাতটায় জোড়হাট হইতে যাত্রা করিয়া সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে লাসা ছাড়াইয়া টাংসুং (ডনসুন)-এ অবতরণ করে। বিমানের সহিত যোগাযোগ রক্ষার এবং উহাকে আবহাওয়ার সংবাদ জানাইবার জন্য পূর্ব্বেই জোড়হাট ঘাটি ও টাংসুং (ডনসুন) বিমান ক্ষেত্রের মধ্যে বেতার-সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছিল।"

কাশ্মীর ও ভারত

নিম্নস্থ সংবাদটি পাকিস্থানের এক দলকে বিশেষ বিচলিত করিয়াছে। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, যত দিন যাইতেছে ততই কাশ্মীরের জনমত দানা বাঁধিতেছে এবং ততই ভারত ও কাশ্মীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইতেছে :

"শ্রীনগর, ২৯শে অক্টোবর—আজ কাশ্মীর গণপরিষদে এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য 'ভারতীয় ইউনিয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।' উপরোক্ত বিধি খসড়া সংবিধানের তিন নম্বর খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

উহা দীর্ঘস্থায়ী উল্লাসধ্বনির মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

পরিষদে রাজ্যের সীমানা নিম্নোক্তরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—'১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট যে সব অঞ্চল রাজ্যের অধিপতির সার্ব্বভৌম অধিকার অথবা কর্তৃত্বে ছিল তাহা।' ইহার অর্থ এই যে, এক্ষণে পাকিস্থানের অধিকৃত গিল্‌গিট ও চিত্রলসহ সমস্ত এলাকা কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত।

অপর একটি খণ্ডে রাজ্যের প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতা বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের উল্লিখিত বিধানাবলী অনুযায়ী 'যে সব বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার আছে, তাহা ছাড়া সকল বিষয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক ও আইনগত অধিকার থাকিবে।'

শ্রীনেহরুর সমাজতন্ত্রবাদ

এলাহাবাদে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার কল্পিত সমাজতন্ত্রের যে চিত্র দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নস্থ সংবাদে দেওয়া হইল।

মূলতঃ পণ্ডিত নেহরুর মতের সহিত আমাদের মিল আছে। কিন্তু প্রভেদ আছে তাঁহার বাস্তব সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্পর্কে। তিনি মনে করেন, রাশিয়া ও চীনের তুলনায় এ দেশে অনেক কম ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া আমরা প্রকৃত সমাজতন্ত্রের আদর্শে পৌঁছিব। যদি শুধু রক্তপাতই একমাত্র দুঃখকষ্টের প্রতীক হয় তবে তাহা সত্য। কিন্তু যদি বিনা রক্তপাতে একটি জাতি তথা ভারতীয় জনসাধারণের একটি প্রগতিশীল স্তর অভাবে ও অবহেলার ফলে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তবে কি তাহা দুঃখকষ্ট বিনাই হইয়াছে ধরা যাইবে? বাঙালী জাতি ও সমগ্র ভারতের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ আজ ধ্বংসের পথে, এ কথা কি নেহরুই জানে না?

"এলাহাবাদ, ২৭শে অক্টোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য বলেন, ভারত যাহাতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমবায়মূলক কমনওয়েলথরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে সেজন্য চেষ্টা করিতেছে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এখানে সকলে সমানাধিকার ভোগ করিবে।

অদ্য সন্ধ্যায় কে.পি.আই. কলেজ ময়দানে সমবেত ৬০ হাজার ব্যক্তির সম্মুখে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনসাধারণ অনেক সময়ে সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝে না। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে সমাজতন্ত্রবাদ কথাটির জন্ম। মুখ্যতঃ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বণ্টনই ইহার কাজ। ধনীর ধন ধনীর নিকট হইতে আনিয়া দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করাকেই যাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদ মনে করেন, তাঁহারা ভুল করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে ভারী শিল্প জাতীয়করণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বীমা কোম্পানীসমূহ রাষ্ট্রীকরণ হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নাম এখন ষ্টেট ব্যাঙ্ক। কিন্তু বেপরোয়াভাবে রাষ্ট্রীকরণের ফল ভাল হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। ইহাতে দেশের প্রগতির পথ রুদ্ধ হইবে এবং কল্যাণ ব্যাহত হইবে।

শ্রীনেহরু বলেন, বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চীনদেশেও ইহাই হইয়াছে। ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ও আরও ১০।১৫ বৎসর লাগিবে।

কৃষি সমবায় সৃষ্টি দ্বারা কৃষকের কষ্ট লাঘব করা যাইতে পারে; ইহা কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। চাষীদের অবস্থার উন্নতি না হইলে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে কি পরিমাণ লৌহ ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় উহা দ্বারাই দেশের প্রগতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত তুলনায় ভারতে লৌহের উৎপাদন খুবই সামান্য। প্রভূত ব্যয়ে বিদেশ হইতে লৌহ আমদানী করিতে হয়। এইজন্য বিপুল ব্যয়ে এখানে ইস্পাত উৎপাদনের যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে।

'ধর্ম্মীয় নেতা' গ্রন্থ লইয়া বিভিন্ন রাজ্যে যে উত্তেজনা ও হাঙ্গামা সৃষ্টি হইয়াছে প্রধানমন্ত্রী উহার নিন্দা করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িকতা সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে, তাহা না হইলে দেশ ধ্বংস হইবে। যে দেশের জনসাধারণ গুণ্ডামি করে এবং একে অন্যের মাথা ভাঙে সে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।

শ্রীনেহরু বলেন, প্রকৃতিকে মানবের সেবায় লাগাইতে হইবে। ইহাই শিল্প-বিপ্লব। এই বিপ্লবের পরিণতির উপর সমাজতন্ত্র নির্ভর করে।"

শিয়ালদহ ষ্টেশন সরান

আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার সম্প্রতি নিম্নের সংবাদটি দিয়াছেন। যদি উহা সত্য হয় তবে বলিতে হইবে এত দিনে কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতার নানা সমস্যার একটি পূরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অবশ্য আমাদের যেরূপ অবস্থা তাহাতে "না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই।"

যদি ঐ প্রস্তাব যথার্থই হইয়া থাকে তবে রেল সরাইলে যে বিরাট ভূমিখণ্ড শহরের সাধারণের ব্যবহারে আসিবে, রাজ্যসরকার তাহার কি ব্যবস্থা করিবেন সে কথা এখনই জানান উচিত। নহিলে কোনও উদ্ভট ব্যবস্থা হইলে জনসাধারণের কষ্ট লাঘব কিছুই হইবে না, সমস্যা যাহা রহিয়াছে তাহা বাড়িবে বৈ কমিবে না।

প্রথমতঃ পথ সরল ও প্রশস্ত করা প্রয়োজন। এখন শহরের উত্তর ও দক্ষিণের যোগাযোগ যে সকল রাজপথে আছে তাহার মধ্যে একমাত্র চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সম্পূর্ণভাবে সুগম। চিৎপুর, কর্ণওয়ালিস ও কলেজ ষ্ট্রীট ইত্যাদি সঙ্কীর্ণ ও বিষম যাত্রীবহুল। সারকুলার রোড স্থলে স্থলে এত সঙ্কীর্ণ যে মাঝে মাঝে মোটর গাড়ী-যাত্রী এই সব ভিড়ের চাপে অচল হইয়া পড়ে। এইটি শ্যামবাজার হইতে বরাবর সমানভাবে আরও ৩০।৪০ ফুট চওড়া হওয়া প্রয়োজন। রাজাবাজার হইতে ধর্ম্মতলার মোড় পর্য্যন্ত অন্ততঃ আরও ৬০।৭০ ফুট চওড়া হওয়া দরকার।

দ্বিতীয়তঃ মধ্যবিত্ত লোকের বাসের জন্য অন্ততঃ ছোট বড় এক হাজার হইতে দুই হাজার ফ্লাট ঐ অঞ্চলে হওয়া দরকার। কলিকাতা হইতে বাঙালী তো উচ্ছেদ হইতে চলিল। তাহাদের বাসস্থান, ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় ইত্যাদি এই অঞ্চলে হইলে তাহারা বাঁচিবার ও নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় :

"কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনটিকে শিয়ালদহের পূর্ব্ব প্রান্তে অনুমান অর্দ্ধমাইল দূরে নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলে সরাইয়া লওয়ার প্রস্তাবে রাজ্য সরকার সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, কেন্দ্রীয় রেল ও পরিবহন দপ্তর এই পরিকল্পনা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের মতামত চাহিলে রাজ্য সরকার ঐ প্রস্তাব অনুমোদনের সিদ্ধান্ত করেন।

শিয়ালদহ ষ্টেশন এবং কলিকাতা নগরীর অস্বাভাবিক ভিড় হ্রাস করার ও ট্রেন চলাচলের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় রেল বিভাগ শিয়ালদহ ষ্টেশনটিকে শিয়ালদহের পূর্ব্ব প্রান্তে অপসারণের সিদ্ধান্ত করেন। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের মতামতেরও প্রয়োজন বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মত চাহিয়া পাঠান। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভায় এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা হয় এবং মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব অনুমোদনের সিদ্ধান্ত করেন বলিয়া প্রকাশ।

রেল ষ্টেশনটি অপসারিত হইলে বর্ত্তমান ষ্টেশন এলাকার ভূমিখণ্ড রাজ্য সরকারের অধীনে আসিবে। ঐ জমির মালিক এক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকার। নূতন রেল ষ্টেশন নির্ম্মাণের জন্য রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে আবশ্যক পরিমাণ জমি দিবেন এবং ঐ জমি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকিবে। জমির বিলি-ব্যবস্থার পর রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ভূমিমূল্য বাবদ আনুমানিক দুই কোটি টাকা পাইতে পারেন বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। সম্ভবতঃ ষ্টেশন নির্ম্মাণের জন্য যে সব জমি দখল করিতে হইবে সেই সব জমির ক্ষতিপূরণ ঐ অর্থ হইতে মিটান হইবে।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণ করিতে প্রথমেই শিয়ালদহ ষ্টেশনের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত খালটিকে বুজাইতে হইবে। রাজ্যসরকারের সেচ বিভাগ উহা বুজাইয়া দিবেন।"

রেলে দুর্ঘটনা

রেলে যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কাজে অবহেলার নিদর্শন নিম্নস্থ সংবাদে পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে মিস্ত্রী ও ইন্‌সপেশন অফিসার দুইয়েরই দোষ আছে :

"শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্ম্মের গায়ে মঙ্গলবার অপরাহ্নে একখানি লোকাল ট্রেন ধাক্কা মারায় প্ল্যাটফর্ম্মে অবস্থিত একটি জলাধার সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে বসবাসকারী তিন জন উদ্বাস্তু আহত হয়। ইহারা ঐ সময় জলাধারটি হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিতেছিল বলিয়া প্রকাশ।

আহত ব্যক্তিদের দুই জনকে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এক জনের পা ভাঙিয়া যাওয়ায় তাহাকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

যে ট্রেনখানি এই দুর্ঘটনার হেতু উহা রাণাঘাট লোকাল (এস ৩৫৬ ডাউন)। উহা বিকাল ২-১৫ মিনিটে শিয়ালদহের (নর্থ ষ্টেশনের) ৩নং প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছায়। কিন্তু প্রকাশ, ইঞ্জিনের ভ্যাকুয়াম ব্রেকটি সাময়িকভাবে বিকল হইয়া পড়ায় গাড়ীর গতি রোধ হয় না এবং জোরের সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম্ম সংলগ্ন বাফার দুইটির গায়ে এমনভাবে আসিয়া পড়ে যে, বাফার দুইটি প্ল্যাটফর্ম্মের ভিত্তির ভিতরে একেবারে ঢুকিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের সম্মুখভাগের খানিকটা প্ল্যাটফর্ম্মের উপরে উঠিয়া পড়ে। উহারই ধাক্কায় সেই স্থানে অবস্থিত জলাধারটির ইটের গাঁথুনি ধ্বসিয়া পড়ে। যাত্রিগণের পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই জলাধার ২নং ও ৩নং প্ল্যাটফর্ম্মের মাঝখানে লাইনের একেবারে ধার ঘেঁষিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।"

পাটনায় শহীদ-স্মারক

পাঠকদিগের মনে থাকিতে পারে যে, পূর্ব্বের এক সংখ্যায় প্রবাসীতে শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর রূপায়িত এই স্মারকের চিত্র দেওয়া হইয়াছিল। নিম্নে তাহার প্রতিষ্ঠার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল :

"পাটনা, ২৪শে অক্টোবর—রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ অদ্য এখানে বলেন যে, দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে বিসর্জ্জিত-প্রাণ শহীদগণের স্মৃতি মনে জাগরূক রাখা এবং তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য।

১৯৪২ সনের ১১ই আগষ্ট তারিখে পাটনা সেক্রেটারিয়েট ভবনশীর্ষে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করিতে গিয়া যে সাত জন যুবক সেক্রেটারিয়েট ভবনের সম্মুখে পুলিসের গুলিতে নিহত হন, তাঁহাদের স্মরণার্থ উক্ত ভবনের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত শহীদ-স্মারকের আবরণ উন্মোচনকালে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

প্রসিদ্ধ ভারতীয় চিত্রকর ও ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ব্রোঞ্জনির্ম্মিত এই শহীদ স্মারকের রূপদান করিয়াছেন। ঐ শহীদ-স্মারকে শিল্পী যে দৃশ্যটি রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা হইতেছে এই যে, পূর্ণাবয়ব সাত জন যুবক অবিচল সঙ্কল্প লইয়া ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে সেক্রেটারিয়েট ভবনের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন এবং এই দলের নেতা জাতীয় পতাকা উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া আছেন। শহীদ-স্মারকে দেখান হইয়াছে যে, বুলেট-বিদ্ধ হইয়া এক জন যুবক পড়িয়া গিয়াছেন এবং অপর এক জন পতনোন্মুখ হইয়াছেন, কিন্তু যুবকদ্বয় তাঁহাদের সঙ্গীদের সহায়তায় সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত শহীদ-স্মারকের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিতে ২২ মাস সময় লাগিয়াছে। কয়েকটি মনুষ্যমূর্ত্তির সমবায়ে গঠিত এই স্মারকটি এশিয়ার মধ্যে এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যেও বৃহত্তম। সাতটি মূর্ত্তির একত্রে ওজন ২০ টন এবং মূর্ত্তিগুলি ২০ ফুট উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত।"
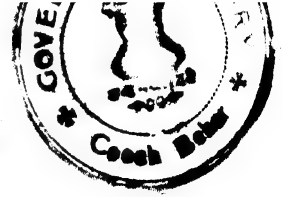
দর্শনশাস্ত্রের পঠন-পাঠন

শ্রীকুমার সুর

ভারতবর্ষ দর্শনের দেশ। এখানে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ রচিত হয়েছে। সাংখ্য যোগ ন্যায় বৈশেষিক আপন আপন সূক্ষ্ম চিন্তার বিস্ময়কর বিস্তারে পৃথিবীর বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কি তার বিশ্লেষণাত্মক সুনিপুণ চিন্তা-ধারা, কি তার যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত! পূর্বপক্ষে বর্ণিত অপরাপর মত খণ্ডন এবং উত্তরপক্ষে আপন সিদ্ধান্তের অনুধাবন ও ব্যাখ্যা বিস্ময়কর। এই সূক্ষ্ম চিন্তা এমন এক তুরীয়মার্গে সঞ্চরমাণ যে পশ্চিম দেশের পণ্ডিতেরা ভারতীয় দর্শন-চিন্তাকে জীবন-বহির্ভূত বলে অভিহিত করেছেন। এ কথা অসংশয়ে বলা যায় যে, বিভিন্ন কালের পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা ভারতবর্ষের জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে যেসব অর্বাচীন উক্তি করেছেন, উপরোক্ত মত তাদেরই অন্যতম। আমরা জানি ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে মহামতি ম্যাক্সমূলারের মত গ্রাহ্য নয়। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে দার্শনিক হেগেলের উক্তির অযৌক্তিকতা ও অসারতা আমাদের বিস্মিত করে। ভারতীয় দর্শনকে জীবনের সঙ্গে অসম্পৃক্ত বললে ভারতীয় জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। ভারতীয়ের জীবন-জিজ্ঞাসাই ত তার ষড়দর্শন সৃষ্টি করেছে— এ কথার উল্লেখ করেছেন দার্শনিকপ্রবর ডক্টর রাধাকৃষ্ণন।

ভারতীয় জীবনে দর্শনের প্রভাব সুপরিস্ফুট; আমাদের দেশের আউল-বাউলের দল যে গান গায়, যেভাবে কথা বলে তা যেমন দর্শনচিন্তায় ভরপুর, ঠিক তেমনিই আমাদের দেশের চাষাভুষো গরীব গৃহস্থের জীবনে এই দর্শন-চিন্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সম্যক্‌চিন্তা এ দেশের মানুষের মজ্জাগত। দার্শনিক-প্রবর স্পিনোজা যে দর্শন-ভঙ্গীকে 'Sub specie acterintretis' আখ্যা দিয়েছেন তা আমাদের কাছে অলভ্য নয়। আমরা সমস্ত দুঃখের মধ্যে, সকল দুর্যোগের মধ্যেও বিধাতার কল্যাণ-স্পর্শকে খুঁজে পাই। হৃদয়ের দুঃখ, অনাচার লাঞ্ছনাকে ভগবানের দান বলে মেনে নিয়েছি। পরম দুঃখের দিনেও আমরা অদৃশ্য ভগবানকে উদ্দেশ করে আকাশের দিকে চোখ তুলে বলেছি:

> 'তোমারই ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
> আমার জীবন মাঝে।'

এই সুগভীর দর্শনচিন্তার প্রভাব শিথিল হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। নূতন শিক্ষার মাধ্যমে নূতন দর্শন এসেছে। পশ্চিমী প্রত্যক্ষবাদ ধীরে ধীরে অনুসৃত হয়েছে এ দেশের মানুষের মনের গভীরে। মার্কস, এঙ্গেলস্ এবং তাঁদের চেলাচামুণ্ডারা কিন্তু কাজ করেছেন চুপিসাড়ে। আবার ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের ঢেউ এসে লেগেছিল নারিকেল-কুঞ্জ-বেষ্টিত ভারত মহাসাগরের উপকূলে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, তার জীবনদর্শন উচ্চতর জীবনমানকে আশ্রয় করল, তারা বুঝল ধনবৈষম্যের জন্য ভগবান দায়ী নন। মানুষের অসম বণ্টন-ব্যবস্থাই প্রধানতঃ এই অবিচার ঘটাচ্ছে। এই নূতন বোধ, এই অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় জীবনে বিপর্যয় ঘটাল। দুঃখের নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল, প্রতিবাদ উঠল সর্বত্র। ভারতবর্ষের মানুষ পুরানো জীবন-দর্শনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল আর এক নূতন জীবনের সন্ধানে, যেখানে পশ্চিমের কার্যকারণবাদ ও নব্য যুক্তিবাদ অব্যাহত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র আজ আর পঠিত হচ্ছে না। পশ্চিমী কেতাবী দর্শনের প্রতিও পড়ুয়াদের সমান অবহেলা। সমৃদ্ধিময় জীবনের সম্ভাবনা যেখানে সেখানেই আজ মানুষের ভিড়। তাই ত দর্শনশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে।

আজকের দিনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দর্শন-শাস্ত্রের ক্লাসে ছেলেরা সংখ্যালঘু। দর্শনের প্রধান পড়ুয়ারা প্রায় সকলেই নারী। যাঁদের একদিন বেদপাঠে অধিকার-মাত্র ছিল না, তাঁরাই আজ বেদান্তের নূতন ভাষ্য রচনা করছেন। প্রথম শ্রেণীর পড়ুয়াদের মধ্যে ছেলে নেই বললেই চলে। এ কথা জিজ্ঞাসার অবকাশ আছে যে এমনটা কেন হ'ল? ছাত্রীদের একাধিপত্য কেন ঘটল জ্ঞান-সাধনার তীর্থপথে? উত্তরটা নিহিত রয়েছে কোন অতিমানবীয় আদর্শবাদ বা আদর্শবোধের মধ্যে নয়। সাদাসিধে রুজি-রোজগার ও পেটের চিন্তাই এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে। ভাল ছেলেরা দর্শন পড়ে না, তারা বিজ্ঞান পড়ে। মেয়েদের রোজগার করার প্রয়োজনটা ছেলেদের চেয়ে বহুলাংশে কম বলে তারাই আজ এই অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞানের পাদপীঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। মেয়েরা যে মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করছেন, আগামী যুগের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথা স্মরণ করবেন। মেয়েরা আজ যে ভূমিকা গ্রহণ করছেন তার পিছনে রয়েছে জাতির ঐতিহাসিক, সামাজিক

ও অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়াশীলতা। রুজিরোজগারের প্রয়োজনের আপেক্ষিক ন্যূনতা ছাড়াও বোধ হয় নারীর স্বভাবসুলভ বিজ্ঞানবিমুখতা তাঁদের দর্শনশাস্ত্রে অনুরাগের অন্যতম কারণ। সেখানেও খণ্ডসত্যের অনস্তিত্ব প্রমাণ করা দুরূহ।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই মান্ধাতার আমলে পাঠ্য-তালিকা রচনা করেছিলেন। তার আর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয় নি। মাঝে মাঝে কর্তাদের টনক নড়ে। এখানে ওখানে চুণকাম করা হয়, কিন্তু খোল নলচে বদলে এই পাঠ্যতালিকা যুগোপযোগী করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন কিছুই করা হয় নি। কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের আহ্বানে এক বিশেষজ্ঞের দল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ করার জন্য দিল্লীতে সমবেত হন। সেই বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে যে সব সুপারিশ করা হয়েছিল তা আজও কার্যকরী হ'ল না। প্রখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এই বিশেষজ্ঞ সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। তবু জানি না কেন আজও দর্শনশাস্ত্রের পাঠ্য-তালিকার আমূল পরিবর্তন হ'ল না। এই পাঠ্যতালিকার প্রাচীনতা ও অনুপযোগিতা দর্শনশাস্ত্রের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের বীতরাগ করে রেখেছে। আমাদের দেশের ন্যায়শাস্ত্রের উৎকর্ষ এরিষ্টটলীয় ন্যায়শাস্ত্রের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও কেন পাঠ্যতালিকায় ওদেশের লজিক এত বড় জায়গা জুড়ে থাকবে? আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনচিন্তা অধ্যয়নের জন্য যদি দুই শত নম্বর ধরা থাকে ত পাশ্চাত্য দর্শনের উপর ছয় শত নম্বর দেওয়া হয়। ইংরেজ আমলে কর্তৃপক্ষ যেমন বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করেছেন আমাদের দর্শনবিজ্ঞানের সঙ্গে, আজও ঠিক সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। জানি না সময় এবং সুযোগের অভাব অথবা বহুকালপোষিত হীনতাভাব এই বিষম অবস্থার জন্য দায়ী কি না?

দর্শনশাস্ত্রের অর্থকরী শক্তির অভাব ও পাঠ্যতালিকার প্রাচীনতা দর্শনশাস্ত্রকে জনপ্রিয় হতে দিচ্ছে না। আরো সমস্যা আছে। শিক্ষাদপ্তরের কর্তৃপক্ষের আর্থিক কার্পণ্য অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাদানকার্যকে ব্যাহত করছে। বেসরকারী মফস্বল কলেজে অধ্যাপকদের বেতন নিয়মিত দেওয়া হয় না। তাই বছরের অধিকাংশ সময় সেখানে বিনা অধ্যাপকে কাজ চলে। এ কথা সরকারী এবং বেসরকারী উভয়বিধ কলেজ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অধ্যাপকেরা নিরুপায় হয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার জন্য এই সব কলেজে যোগদান করেন। সুযোগ-সুবিধা পেলেই তাঁরা অন্যত্র চলে যান ভাল কাজ নিয়ে। কর্তৃপক্ষ আবার অধ্যাপক খোঁজার কাজে লেগে যান, লোকও পাওয়া যায়। বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য! তবে শিক্ষায়তনে অধ্যাপকদের নিরন্তর স্থানান্তরী-করণের ফলে শিক্ষাদানকার্য ব্যাহত হয়। ছাত্রেরা আবেদন নিবেদন করে কর্তৃপক্ষের কাছে তাড়াতাড়ি অধ্যাপক নিয়োগ করার জন্য। যখন সে আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয় তখন তারা ধর্মঘটের ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ে। সেদিন উত্তরবঙ্গের একটি রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রেরা দীর্ঘদিন অধ্যাপক না থাকার জন্য ধর্মঘট করে। রাষ্ট্রীয় মহা-বিদ্যালয়গুলির পরিচালন-ব্যবস্থায় এই শৈথিল্য পীড়াদায়ক। রাষ্ট্রের ত অর্থাভাব ঘটে নি। উচ্চতর বেতন দিয়ে অধ্যাপকদের নিযুক্ত করে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার সময় এসেছে। বেসরকারী কলেজগুলিতে আবার সময়মত মাহিনা দেওয়া হয় না। বহু জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপক যে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে আজও জ্ঞান-সাধনায় রত তাঁদের কথা ভাবা দরকার। আজও মৃতপ্রায় টোলগুলিতে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বহু মনীষী আত্মগোপন করে রয়েছেন। তাঁদের আর্থিক অনটন ভয়াবহ।

আবার অধ্যাপকেরা বিষয়ভেদে নানারকম হারে বেতন পান। ইংরেজী, অর্থশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপকেরা এক হারে মাহিনা পান, আবার দর্শনশাস্ত্র, সংস্কৃতশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষকেরা ভিন্ন হারে বেতন লাভ করেন। প্রয়োজনের তাগিদে, চাহিদার অনুপাতে শিক্ষকদের কাঞ্চনমূল্য নির্ণীত হয়। আজ বুঝি বেনিয়াবৃত্তি বাংলা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও আধিপত্য বিস্তার করেছে। তাই একজন স্নাতক ইঞ্জিনীয়ারকে সরকার বাহাদুর ২৫০৲-৮৫০৲ টাকা গ্রেডে বহাল করলেও একজন প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীকে ২০০৲-৪৫০৲ গ্রেডে বেতন দিতে তাদের বিবেকে বাধে না। এই স্বেচ্ছাকৃত বৈষম্য যতদিন চলবে ততদিন শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আসতে পারে না। সরকারী কলেজে অবশ্য নিয়মিত বেতন দেওয়া হয় এবং বেতন কিছু কিছু বাড়েও। বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ে বেতন আবার কমে। কলকাতার কোন এক সুবৃহৎ কলেজের কথা জানি। সেখানের জনৈক অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন যে, দশ বছর কাজ করার পর অবস্থা-বিপর্যয়ে তাঁর চৌদ্দ টাকা মাহিনা কমেছিল। এই ধরণের অদৃষ্টের পরিহাস অনেক অধ্যাপককেই সইতে হয়। নিরুপায় তাঁরা। এই ধরণের সহানুভূতিহীন ব্যবহারের জন্য বেসরকারী কলেজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের হয়ত ক্ষমা করা যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কাপড়ের, পাটের অথবা

সিনেমার ব্যবসায়ে, অথবা কেউ কেউ চোরাকারবারে উদর স্ফীত করে কলেজের পরিচালকমণ্ডলীতে আসন গ্রহণ করবার যোগ্যতা লাভ করেন। শিক্ষাদীক্ষার বালাই তাদের অনেকেরই নেই। কিন্তু যখন দেখি রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিভাগ বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন যে, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নেওয়া হবে নির্ধারিত হারের ন্যূনতম বেতনে এবং পদার্থ বা রসায়নবিদ্যার অধ্যাপকদের নির্ধারিত হারের মধ্যে উচ্চতর বেতনে নিয়োগ করা যেতে পারে তখন কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যদ্দৃষ্টির অস্বচ্ছতার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। এই বৈষম্যমূলক নীতির ফলে ক্রমেই দর্শনশাস্ত্র পঠনেচ্ছু ভাল ছেলেমেয়েরা অন্যান্য বিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়বে। কল্পনা-শক্তিহীন এই সব শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ যে ক্ষতি করছেন দর্শনশাস্ত্র পঠন-পাঠনের, জানি না কবে কেমন করে সে ক্ষয়-ক্ষতি নিবারিত হবে।

এবার শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদার কথা বলি। এখানে বিষয়ভেদে অধ্যাপকদের মর্যাদা বা অমর্যাদার তারতম্য ঘটে না। বড় বড় কর্তারা বক্তৃতামঞ্চের পাদ-প্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন যে, শিক্ষককে সম্মান দিতে হবে। অথচ কার্যতঃ তাদের কোন কথারই মূল্য থাকে না। উদাহরণ দিই। ১৯৫১ সনের ১৫ই আগষ্ট থেকে সরকারী কলেজের লেকচারারদের গেজেটেড অফিসারের পদমর্যাদা দেওয়া হবে বলে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত করেন। সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হ'ল ১৯৫৫ সনের নবেম্বর মাসে অনেক টালবাহানার পর। লালফিতার দৌরাত্ম্য আজও সব সরকারী বিভাগেই অব্যাহত আছে। তার উপর আছে বিভাগীয় কর্তাদের অনুদার নিষ্ক্রিয়তা ও অপরিসীম ঔদাসীন্য। এ ত গেল শিক্ষাবিভাগের কর্তাদের কথা। অন্য বিভাগীয় কর্তাদের কথা একটু বলি। নয়াদিল্লীতে ২৬শে নবেম্বরের উৎসব। সাধারণ করদাতাদের অর্থে যে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেখানে অফিসার মহোদয়েরা থাকেন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় থাকেন; কারা থাকেন না জানেন? যাঁরা আজীবন পুঁথি পড়ে ডিগ্রীর বোঝা বাড়ান আর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর করেন আর এই সব অর্থশালী দোকানদার এবং দোর্দণ্ড প্রতাপশালী অফিসারদের অপোগণ্ড ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করেন সেই শিক্ষাব্রতীর দল। এ ধরনের আরও হাজারো উদাহরণ আছে। দার্জিলিঙে সেবার নেহরু এসেছেন। রাজভবনের বিরাট প্রমোদ উদ্যানে প্রধানমন্ত্রীর সম্মানার্থে চা-পান সভার আয়োজন করেছেন বাংলা দেশের শাসকগোষ্ঠীর অধিকর্তা। সুদৃশ্য নিমন্ত্রণলিপি প্রেরিত হয়েছে চারিদিকে। স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁদের কপালে 'গেজেটেড' লেবেল আঁটা ছিল তাঁরা পত্র পেলেন। আর সরকারী কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপক এবং বেসরকারী কলেজদ্বয়ের প্রায় সব অধ্যাপকই বাদ পড়লেন। দূর থেকে তাঁরা এই রংচঙে উৎসবের আনন্দের মধুস্বাদ গ্রহণ করলেন আর পরের দিন বড় বড় মণিহারী দোকানে জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে দোকানের মালিক বা ম্যানেজারের কাছ থেকে প্রধান-মন্ত্রীর চা-পান সভায় তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শুনে ধন্য হলেন। সকলেই শিক্ষকদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন এবং তাঁদের জন্য একটা কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে। তার পরেই কা কস্য পরিদেবনা। পাদপ্রদীপ নিভলেই অন্ধকারের প্রশান্তির মধ্যে তাঁদের প্রতিশ্রুতিও সমাহিত হয়। বঞ্চনার দুর্ভাগ্য বিভিন্ন শাস্ত্রের অধ্যাপকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

প্লেটো দার্শনিকদের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেবার সুপারিশ করেছিলেন। সে সুপারিশ আজ মূল্যহীন। শাসক ত দূরের কথা, সওদাগরী আপিসের নিম্নতম কেরানী হতে হলে আপনাকে দর্শনেতর বিষয়ে স্নাতক হতে হবে। দর্শনের স্থান আজ কোথাও নেই। দর্শন যে মানসিক নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে সমগ্র মানবীয় চিন্তাধারাকে বিধৃত করে দেয় তার মূল্য এ যুগের মানুষ প্রায় বিস্মৃত হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্রের পরিবর্তে অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরাই বাণিজ্যিক ভূগোল অথবা বাণিজ্যগণিত পাঠ করে। এতে যুব-সমাজের মানসিকতার যথাযথ অনুশীলন হচ্ছে না। এরাই যখন আবার 'কর্তাব্যক্তি' হয়ে বসে তখন শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা থাকে না। রাষ্ট্র-পরিচালনায় কল্পনা ও সুষ্ঠু চিন্তার অভাব লক্ষিত হয়। জাতির কর্মে ও মননসাধনার ক্ষেত্রে নৈরাশ্য আসে। এ যুগের শিক্ষাবিদদের এদিকে দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে। ন্যায়শাস্ত্রকে অবশ্য-পাঠ্য বিষয় করতে হবে স্নাতকপূর্ব সকল পাঠ্যতালিকায়। উচ্চতর শিক্ষায় দর্শনশাস্ত্রকেও স্বীকৃতি দিতে হবে অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হিসাবে। যে অপরিণামদর্শী ছাত্রছাত্রীরা ন্যায়-শাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রকে সযত্নে পরিহার করে চলছে তাদের আমি দোষ দিই না। দোষ দিই তাদের অভিভাবকদের এবং শিক্ষাকর্তাদের। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এ যুগের ছেলেমেয়েদের ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রবিমুখতার কথা উল্লেখ করে দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন যে, এযুগের ছাত্রছাত্রীরা লজঞ্জুস খায়, সুপারি চিবানোর কষ্ট তাদের সয় না। ন্যায়-শাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্র অধিগত করতে হলে মনের যে দার্ঢ্য এবং শক্তি দরকার তা এযুগে দুর্লভ। আজ দেখছি তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। আজ অধিকাংশ মহাবিদ্যালয়েই ন্যায়শাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্র পঠনেচ্ছু

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। কলেজের পড়ুয়ার সংখ্যা প্রতি বৎসরই স্ফীত হচ্ছে, কিন্তু দর্শনের ক্লাসের বেঞ্চগুলোতে ধুলোর গুরুভার ক্রমেই বর্ধিত হচ্ছে। দর্শনশাস্ত্রের পঠন-পাঠনে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার আশু সমাধান না হলে সম্যক্ চিন্তার, বিরাট চিন্তার কথা অদূর ভবিষ্যতের বংশধরদের কাছে চিরকালই অলভ্য থেকে যাবে।

এ যুগে দর্শনশাস্ত্রের উপযুক্ত অধ্যাপকেরও অভাব ঘটছে। ভাল ছেলেরা নিষ্ঠার সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র না পড়লে ভাল অধ্যাপক কেমন করে তৈরী হবে? নূতন নূতন কলেজ খোলা হচ্ছে সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায়। যাঁরা অধ্যাপক হয়ে যাচ্ছেন তাঁদের অনেকেরই না আছে অধ্যাপক হবার যোগ্যতা, না আছে মননিষ্ঠা। তাই দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা ও ক্রমেই পঙ্গু হয়ে পড়ছে। সরকারও এ সম্বন্ধে উদাসীন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন বেসরকারী কলেজে গবেষণায় যে উৎসাহ দেওয়া হয় সেটুকু উৎসাহ ও সরকারী কলেজে দেওয়া হয় বলে মনে হয় না। প্রায় অধিকাংশ বেসরকারী কলেজে এবং বাংলা দেশের বাইরে সরকারী ও বেসরকারী সব কলেজেই কোন অধ্যাপক গবেষণা করে কোন ডিগ্রী লাভ করলে কাঞ্চনমূল্যে তার যথোচিত মর্যাদা দেন বিভাগীয় কর্তারা। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য গবেষণায় উৎসাহ দেয়। একথা অনস্বীকার্য যে, কতকটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে গবেষণায় উৎকর্ষলাভ করা সহজসাধ্য হয় না। প্রাচুর্য্যের মধ্যেই সভ্যতার সর্বসুন্দর শতদলগুলি বিকশিত হয়, এমনিধারা কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। দর্শনশাস্ত্রীদের আর্থিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর না হলে দর্শনশাস্ত্র পঠনেচ্ছু উপযুক্ত ছাত্র মেলা দুষ্কর হবে এবং আগামীকালে উপযুক্ত শিক্ষকেরও একান্ত অভাব ঘটবে। বর্তমানে উপযুক্ত যাঁরা তাঁরাও শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবার জন্য আগ্রহশীল। সরকার তাঁদের অভাব-অভিযোগ দূর করে শিক্ষাবিভাগে স্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থা না করে হুকুম জারী করলেন যে, শিক্ষাবিভাগ থেকে অতঃপর কোন অধ্যাপকের আবেদনপত্র অন্যত্র প্রেরণ করা হবে না। কাজেই এই অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য শিক্ষকদের নানান অশিক্ষকোচিত কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হয়।

দর্শন এবং তর্কশাস্ত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। নীতি হিসাবে সেটা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্য বাংলায় দর্শনশাস্ত্রের যোগ্য পরিভাষার প্রয়োজন। আজও সে পরিভাষা রচিত হয় নি, কারণ কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। তাই দেখি বাংলা ভাষায় লিখিত দর্শনশাস্ত্রের পুস্তকে লেখকের ভাষা ব্যবহারে অপটুতা। ফলে দর্শনশাস্ত্র পঠন-পাঠন এবং আলোচনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। ইচ্ছামত শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করা দোষাবহ। দার্শনিক কাণ্টকে উত্তরকালের সমালোচকেরা দোষ দিয়েছিলেন তাঁর 'Critique of Judgment' গ্রন্থে এই ধরণের শব্দ-প্রয়োগের জন্য। আমাদের দেশের দর্শনের প্রায় অধিকাংশ লেখক সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। তা ছাড়া যে কয়খানি দর্শনের বই বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। অনেক কাজ বাকী আছে। স্নাতকোত্তর বিভাগেও দর্শন-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন মাতৃ ভাষার মাধ্যমে করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন সুলিখিত গ্রন্থাবলীর। বাংলা দেশের দর্শনশাস্ত্রীদের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে আর আসতে হবে দেশের জনশিক্ষার নায়কদের। এই নূতন গ্রন্থ-প্রণেতাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, গ্রন্থ প্রণয়নে এমন ভাষা ব্যবহার করা দরকার যে ভাষা এ কালের মানুষের ভাষার সমধর্মী হবে। এ যুগের মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং রুচিগ্রাহ্য করে প্রাচীন ভারতীয় ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রের ভাষার আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

আমরা অন্যত্র ভারতীয় দর্শন ও ন্যায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসাবে গণ্য করার জন্য মত প্রকাশ করেছি। সে পরিকল্পনা সার্থক হবে যদি আমরা ঐ প্রাচীন জ্ঞানের গভীর তত্ত্বগুলিকে আধুনিক যুগের গ্রহণযোগ্য ভাষায় পরিবেশন করতে পারি। তবেই দর্শন-শাস্ত্র পঠিত হবে, সমাদৃত হবে বিস্তৃততর পাঠকসমাজের কাছে। উন্নাসিক পণ্ডিত হয়ত বলবেন যে, ভারতীয় সাধনার গোড়ার কথা হ'ল অধিকারভেদ। দর্শনশাস্ত্র সকলের জন্য নয়। তাই তাকে মনোজ্ঞ ভাষায় সর্বজনবোধ্য ও সর্বজনস্ববেদ্য করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা বলব অধিকারভেদ সুবিধাবাদীর কথা। অর্জনের দ্বারা ত অধিকার সৃষ্টি হতে পারে। যে সাধনায় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজ লাভ করেন, যে সাধনায় দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার অধিকারী হন, সে সাধনার ক্ষেত্র ত অর্গলিত হয় নি। সাধারণ মানুষ পরিশ্রমের দ্বারা, মননের দ্বারা, একাগ্র সাধনার দ্বারা কেনই বা জ্ঞানের নিগূঢ়তম প্রদেশে স্বচ্ছন্দ বিচরণের অধিকারটুকু লাভ করবে না? সে অধিকার দিতে হলে অগ্রগামীদের যে বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হবে সেটুকু তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে করলেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পুণ্যতোয়া জ্ঞানস্রোতস্বতী আপন কূল প্লাবিত করে ছড়িয়ে পড়বে দেশদেশান্তরে। দেশের আপামর সাধারণ সেই মহৎ জ্ঞানের আলোকে যে নূতন জীবনদর্শন রচনা করবে তার স্বাক্ষর থাকবে এ যুগের মানুষের জীবনবেদে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

প্রথম পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে, দেশের প্রতিটি পুরুষ ও নারীর জীবন উন্নততর,সমৃদ্ধতর ও অধিকতর সুখী করিয়া গঠন করাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। এ কথা সত্য যে, আমাদের সামর্থ্য ও সঙ্গতি সীমাবদ্ধ। তাহার উপর যুদ্ধ এবং দেশ-বিভাগের ফলে ভারতকে অ‍্বর্ণনীয় ক্ষতি বহন করিতে হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনা রচনার প্রাক্‌কালে যুদ্ধের সঙ্কটজনক অবস্থায় প্রবর্ত্তিত কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বর্ত্তমান ছিল। খাদ্যদ্রব্য, ভোগ্যবস্তু ও অন্যান্য শিল্পোৎপাদিত ভারী বস্তুর অপ্রাচুর্য্য এবং অনটন পদেপদেই উপলব্ধি হইতেছিল। সেইরূপ অবস্থায় প্রথম পরিকল্পনার চেষ্টা ছিল—দেশকে যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় ফিরাইয়া আনা এবং দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে লগ্নির হার ক্ষুদ্র করা ও পরিকল্পনার আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ না করা। পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি শ্রীজবাহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, "অর্থনৈতিক উন্নতির যূপকাষ্ঠে গণতান্ত্রিক কোনও প্রতিষ্ঠানকে বলি দেওয়া চলিবে না।" অর্থাৎ কোনও পরিকল্পনা ক্ষমতাবলে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। সুতরাং দেশবাসীর পরিকল্পনা গ্রহণের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া এবং "সম্ভবপর সকল শ্রেণীর নাগরিকের মত গ্রহণ করিয়া" পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইয়াছে।

পরিকল্পনা রচনার প্রারম্ভে নেতৃবৃন্দ এই কথা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আমাদের দেশে কোনও উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্রুত কার্য্যকরী করিতে হইলে সেই সঙ্গে সমাজ-উন্নয়নের ব্যবস্থাও না করিলে উহা প্রতি পদে ব্যাহত হইবে। দেশের সামগ্রিক দ্রুত উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে দেশের সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার উপর। সেইজন্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সামাজিক উন্নয়নের কথাও তাঁহাদের স্মরণ রাখিতে হইয়াছে। সেই আদর্শের অংশ হিসাবে সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা ও অসাম্য এবং অসামঞ্জস্যের বিলোপসাধন কর্ম্মসূচীতে স্থান পাইয়াছে। অর্থাৎ, ধনী ও দরিদ্র, নগরবাসী এবং পল্লীবাসীর মধ্যে অত্যধিক অসাম্য ও অসামঞ্জস্য দূর করিয়া অধিকতর সুষ্ঠু সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থাও এমন ধীরভাবে করিতে হইবে যেন সঞ্চয় ও লগ্নির হার ব্যাহত না হয়। এই কারণে সরকারী ও বেসরকারী লগ্নির অংশ (State and Private Sector) পৃথকভাবে ধরা হইয়াছে এবং দুইটিকেই বজায় রাখিতে হইয়াছে। জমির বণ্টন অধিকতর সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠার জন্য জমি-বণ্টন ব্যবস্থার পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে অনেক রাজ্যে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষ সর্ব্বাধিক কতখানি জমির মালিক হইতে পারিবে তাহারও একটি উচ্চতম সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার কথা বিচার করিলে এই কথা উপলব্ধি করা যায় যে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশকে (১) যুদ্ধপূর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অবস্থায় ফিরাইয়া আনা ও (২) পরবর্ত্তী পরিকল্পনার ভিত্তি প্রস্তুত করা। ইহাতেই বরাদ্দের পরিমাণ হইয়াছিল ২০৬৯ কোটি টাকা (পরবর্ত্তী হিসাবে মোট ব্যয়ের পরিমাণ মোটামুটি ৩১০০ কোটি)। ব্যয় বরাদ্দের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পায়ন ব্যবস্থা ছিল গৌণ—অর্থাৎ মোট বরাদ্দের ৮·৪ শতাংশ, অপরদিকে কৃষি প্রভৃতি বাবদ বরাদ্দ ছিল ১৭·৪ শতাংশ। সেচ ও আনুষঙ্গিক বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে ২১·০ (৮·১+১২·৯)। পরিবহন ও যোগাযোগে ২৪·০ শতাংশ। সেচ-পরিকল্পনা কৃষি-পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ধরিলে মোট ব্যয়ের ৩৮ শতাংশ কৃষি উন্নয়নে নিয়োজিত ধরা যাইতে পারে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকে জাতীয় আয়ের প্রায় সাত শতাংশ নিয়োজিত করা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে এই পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। ইংলণ্ডে জাতীয় আয়ের ১৫ শতাংশ উন্নয়নে লগ্নি করা হইয়াছে; যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ শতাংশ হইতে ১৬ শতাংশ পর্য্যন্ত লগ্নি হইয়াছে। আমাদের দেশের তুলনায় এই সব দেশ যথেষ্ট উন্নত তথাপি উন্নয়নকল্পে তাহাদের লগ্নির পরিমাণ অনেক বেশী। অপরদিকে রুশিয়ার প্রথম পরিকল্পনার সময় জাতীয় আয়ের ২৫ শতাংশ হইতে ৩৩ শতাংশ পর্য্যন্ত উন্নয়নকার্য্যে লগ্নি করা হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে—অনুন্নত দেশে দ্রুত উন্নয়নকল্পে লগ্নির পরিমাণ অধিক না হইলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থায় তাহা সম্ভবপর হয় নাই। প্রথম পঞ্চবর্ষে মাথাপিছু বরাদ্দ প্রায় ৫৭ টাকা মাত্র। কাজেই এই সামান্য ব্যয়ে ৩৬ কোটির অধিক অধিবাসীর ও ১২ লক্ষ ২৫ হাজার বর্গমাইল আয়তনের একটি দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা করা অতি কঠিন ও কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই। আমাদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সঞ্চয় অতি সামান্য। তাহা ছাড়া এত বৃহৎ একটি পরিকল্পনা দ্রুত কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে দেশবাসীর যেরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন, শিক্ষার অভাবে সম্ভবতঃ সেইরূপ পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করা সর্ব্বক্ষেত্রে সম্ভব হইবে না। ভারতবর্ষের ষষ্ঠ-পঞ্চমাংশ অধিবাসী অদ্যাবধি নিরক্ষর। সুতরাং কৃষিশিল্প প্রভৃতির উন্নয়নের সহিত সমাজসেবার পরিকল্পনাও কার্য্যে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গৃহ-নির্ম্মাণ, শ্রমিক-কল্যাণ প্রভৃতির জন্য বরাদ্দের ১৬·৪ শতাংশ নিয়োজিত হইয়াছে। দেশবিভাগের ফলে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা

একটি বৃহৎ সমস্যা রূপে দেখা দিয়াছে। পুনর্ব্বাসনকল্পে ৪'১ শতাংশ নিয়োগ করা হইয়াছে; ইহা ভিন্ন বিবিধ খাতে ২'৫ শতাংশ নিয়োজিত হইয়াছে। এখন স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, প্রয়োজনের তুলনায় পরিকল্পনার বরাদ্দ অতি সামান্য।

সুতরাং প্রথম পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই, অর্থাৎ, পঞ্চবর্ষে যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় দেশকে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয় নাই। ইহা সত্য যে, পরিসংখ্যান অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু জনসংখ্যাও বাড়িয়াছে এবং অন্যান্য সমস্যারও উদ্ভব হইয়াছে। ভোগ্যদ্রব্যের উপর মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু অভাব মিটিয়াছে অথবা যুদ্ধপূর্ব্ব স্বচ্ছন্দ অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে কিছুই বলা চলে না। ইহাও সত্য যে, জাতীয় আয় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি জীবনধারণের মানের উন্নয়ন হইয়াছে সেকথা কোনও প্রকারেই বলা চলে না। যে আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ব্যবহারিক অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি মাত্র, ক্রয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি নহে অথবা দ্রব্যমূল্যের অনুপাতেও বাড়তি নহে। তবে ১৯৪৮-৪৯ সনের তুলনায় অনেক সচ্ছলতা বাড়িয়াছে এবং মূল্যের অনেক সমতা ফিরিয়া আসিয়াছে। আরও একটি সুফল মনে হয় যে, বণ্টন-ব্যবস্থায় সামান্য উন্নতির জন্য সম্ভবতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক অধিবাসী জাতীয় আয় বৃদ্ধির অংশ লাভে সমর্থ হইয়াছে। তথাপি যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থা হইতে আমরা অদ্যাবধি বহু দূরে। দ্রব্যমূল্য যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থা হইতে যে হারে বাড়তির পথে চলিয়াছে, আয় কিন্তু সেই হারে বৃদ্ধি পায় নাই, অথবা দ্রব্যমূল্য সেই হারে হ্রাসও পায় নাই। সুতরাং জীবনধারণের মান বৃদ্ধির প্রশ্ন আসিবার সময় এখনও হয় নাই। অর্থাৎ, প্রাণ রক্ষা হইলে বিলাস-দ্রব্য ব্যবহারের কথা ভাবিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে। তবে প্রথম পরিকল্পনার ফলে ভিত্তি অনেকখানি প্রস্তুত হইয়াছে বলা চলে এবং গঠনকার্য্য আরম্ভ করিবার কতকটা সুযোগ আসিয়াছে। এক কথায় প্রথম পরিকল্পনায় আমাদের কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতা উভয়ের দ্বারাই আমরা কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি।

সেই হিসাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে (১৯৫৬-৬১) উন্নয়নের প্রথম সোপান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ৬২০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন খাতে মোট বরাদ্দ হইয়াছে ৪,৮০০ কোটি টাকা; বেসরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন খাতে মোট ২,৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োজিত হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। হিসাব হইতে দেখা যায় প্রথম পরিকল্পনায় (১৯৫১-৫৬) জাতীয় আয়ের সাত শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে (১৯৫৬-৬১) ১১ শতাংশ পর্য্যন্ত উন্নয়নকল্পে নিয়োজিত হইবে। ইহার অর্থ-নৈতিক দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ফলে জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ প্রতি বৎসর ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া পঞ্চবর্ষান্তে ২৫ শতাংশ বাড়িবে। এই পরিকল্পনায় অর্থবিনিয়োগের পরিমাণ ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় আরব্ধ উন্নয়নের ধারাই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বজায় রাখা হইয়াছে। তবে আকার ও প্রকারে এবং অগ্রাধিকারের ব্যাপারে কিছু পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আকার বৃহত্তর এবং প্রকারেও ইহা ব্যাপকতর। পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—

(১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজের উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত প্রসারণের জন্য "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে" সমাজের পুনর্গঠন করা এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা করা;

(২) অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে মৌলিক শিল্পের সম্প্রসারণ ও উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করা;

(৩) কুটির ও হস্তচালিত শিল্পের দ্বারা ভোগ্যদ্রব্যের উৎ-পাদন বৃদ্ধি করা এবং উহার ব্যবহার সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা করা;

(৪) ফ্যাক্টরিজাত ভোগ্যদ্রব্যের যতদূর সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করা; কিন্তু উহাকে কুটির ও হস্তচালিত শিল্পোৎপাদনে বিঘ্নকর না করা অর্থাৎ প্রতিযোগী না করা;

(৫) কৃষি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা এবং জমির পুনর্গঠন ব্যবস্থার দ্বারা বণ্টন-ব্যবস্থা এইরূপ সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তোলা যাহাতে গ্রামাঞ্চলের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়;

(৬) উৎকৃষ্টতর গৃহ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-দানের অধিকতর সুযোগের ব্যবস্থা, বিশেষ ভাবে দরিদ্র জনগণের মধ্যে;

(৭) আগামী দশবৎসরের মধ্যে পূর্ণ কর্ম্ম-নিয়োগ ব্যবস্থার দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধান করা;

(৮) পরিকল্পনাকালের মধ্যে জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা;

এই সকল উদ্দেশ্যে যে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বরাদ্দের প্রায় অর্দ্ধাংশ শিল্প ও খনি এবং আনুষঙ্গিক পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে নিয়োজিত হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, শিল্পোন্নয়নের উপর, বিশেষতঃ মৌলিক শিল্পগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। খনি ও শিল্প খাতে মোট বরাদ্দ (১৯ শতাংশ) ৮৯০ কোটি টাকার মধ্যে ৬৯০ কোটি টাকা বৃহদায়তন শিল্প ও খনি খাতে এবং ২০০ কোটি টাকা গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতে নিয়োজিত। পরিবহন ও যোগাযোগ বাবদ ১৩৮৫ কোটি টাকা (২৮'৯ শতাংশ); ইহার মধ্যে রেলওয়েসমূহের উন্নয়নের জন্য ৯০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ৪৮৫ কোটি টাকা নিয়োগ করা হইবে। সেচ ও বিদ্যুৎখাতে মোট বরাদ্দ ৯১৩ কোটি (১৯ শতাংশ): ইহার মধ্যে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে ৪৮৬ কোটি এবং বিদ্যুৎ বাবদ ৪২৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। সমাজসেবায় ৯৪৫ কোটি টাকা (১৯'৭ শতাংশ)। অবশিষ্ট বিবিধ খাতে ৯৯ কোটি টাকা (২'১ শতাংশ) নিয়োজিত হইবে।

এখন দেখা যাইতেছে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনার দ্বিগুণের অধিক বরাদ্দ করা হইয়াছে।

উন্নয়ন-কার্য্যে অনুন্নত দেশসমূহে কতগুলি বিশেষ সমস্যা দেখা যায়। আমাদের দেশেও সেই সকল সমস্যার অনেকগুলি বিদ্যমান।

(১) অর্থনৈতিক সমস্যা ও সামাজিক অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। একটির পরিবর্ত্তন ভিন্ন অপরটির পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নয়;

(২) উন্নত দেশের ন্যায় অনুন্নত দেশের সকল ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেন ইত্যাদি মুদ্রা অথবা মুদ্রামানের বিনিময়ে চলে না। উন্নত দেশে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধন করা চলে। উপরন্তু যে সব দেশ সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা দেশের সকল সম্পদ করায়ত্ত করিয়া সমুদয় সম্পত্তি ও সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারে, তাহারাও ক্ষমতাবলে সমগ্র জাতীয় সঙ্গতি এবং সম্পদ উন্নয়নকার্য্যে বিনিয়োগপূর্ব্বক দ্রুত দেশের উন্নতি বিধান করিতে পারে। কিন্তু ভারতকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নহে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রেও, মধ্যপথ বাছিয়া লইতে হইয়াছে এবং কেবলমাত্র "গণতান্ত্রিক পথেই" তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে;

(৩) উন্নত দেশের বেকার-সমস্যা ও আমাদের দেশের বেকার-সমস্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। উন্নত দেশে উদ্বৃত্ত মূলধন ও জাতীয় সঞ্চয়ের পূর্ণ ব্যবহার ও নিয়োগের অর্থ ই বলিতে গেলে এক প্রকার বেকার-সমস্যার সমাধান। আমাদের জাতীয় সঞ্চয় ও সঙ্গতি এত সামান্য যে, তাহার পূর্ণতম সদ্ব্যবহার করিলেও আমাদের সমস্যার অতি সামান্য অংশের সমাধান হইতে পারে মাত্র;

(৪) উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের ইতিহাসে দেখা যায় সেই সব দেশে প্রথমে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ধীরে ধীরে লভ্যাংশের সঞ্চয় ও উদ্বৃত্ত দ্বারা তাহাদের ভারী ও বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে দেশের দ্রুত উন্নয়নে ঐ ধীর পথ অচল। অর্থাৎ, বৃহদায়তন মৌলিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব নহে। অপর দিকে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন প্রয়োজনানুসারে বৃদ্ধি না হইলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, যদি না সর্ব্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের পথে আমরা যাই। প্রধানমন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশন সর্ব্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের পথ এড়াইয়া যাইতে চাহেন এবং দেশবাসীও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে;

(৫) আমাদের দেশের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও সামাজিক জীবনযাত্রার নিম্নমান ও দৈন্য কেবলমাত্র শিল্পোন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই দূরীভূত হইবে না। উপরন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির দ্বারাই শিল্পোন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি স্থায়ী হইবে। আমাদের সামান্য সঙ্গতির মধ্যেই সামাজিক সকল বিষয়ের উন্নয়ন চিন্তা করিতে হইবে;

(৬) প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, উৎপাদন ইহা অপেক্ষা উচ্চহারে না বাড়াইলে শত পরিকল্পনা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান চিরদিন অপূর্ণ থাকিবে। এই সকল সমস্যার বিষয় চিন্তা করিলে পরিকল্পনা প্রণয়নের জটিলতা ও বিঘ্ন উপলব্ধি হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেইজন্য জাতির দ্রুততর উন্নতির কথা প্রথমেই চিন্তা করা হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যেই দ্রুত শিল্পায়নের চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে পূর্ণতর কর্ম্ম-নিয়োগের ব্যবস্থার কথাও চিন্তা করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা গিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লগ্নির জন্য অর্থবরাদ্দের পরিমাণ বেশী কি কম সেই তর্কের অবতারণা না করিয়াও বলা চলে যে, আমাদের সঙ্গতি যতখানি সেই অনুপাতে তাহা অসঙ্গত হয় নাই। সুতরাং যে পরিমাণ ঋণ এবং ঘাটতির দায়িত্ব ও ঝুঁকি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা অমার্জ্জনীয় ও অত্যধিক বলা চলে না। তাহা ভিন্ন আমাদের আদর্শ গণতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়া ও দেশবাসীর সম্মতিক্রমে বরাদ্দ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সুতরাং অত্যধিক বরাদ্দ করা সম্ভবপর নহে। এই পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের ১১ শতাংশ পর্য্যন্ত লগ্নি হইবে। এই লগ্নির পরিমাণ পরবর্ত্তী পরিকল্পনাসমূহে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া ১৬-১৭ শতাংশ পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে ১৯৬৭-৬৮ সনের মধ্যে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইবে এবং ১৯৭৩।৭৪ সনের মধ্যে জনপ্রতি আয়ও বাড়িয়া দ্বিগুণ হইবে।

বিগত অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা করা হইয়াছে (ক) জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় বিশেষভাবে বাড়ানো প্রয়োজন, ও (খ) সেই উদ্দেশ্যেই দ্রুত শিল্পায়ন, বিশেষভাবে মূল ও বৃহৎ শিল্পগুলির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে (গ) অধিকতর কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও দরকার; ইহা ভিন্ন (ঘ) ধনবৈষম্য হ্রাস ও অধিকতর অর্থ নৈতিক সামঞ্জস্য-বিধানের আদর্শের কথাও ব্যক্ত করা হইয়াছে।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, জাতীয় ও ব্যক্তিগত আয় কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে জীবনধারণের মান উন্নয়নের প্রশ্ন আসিতে পারে? জাতীয় ও ব্যক্তিগত আয় যে পরিমাণ বাড়িয়াছে, যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থা হইতে দ্রব্যমূল্য তাহার বহুগুণ অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং জাতীয় ও ব্যক্তিগত গড় আয় দ্বিগুণ হইলেও জীবনধারণের মান-উন্নয়ন অধিক পরিমাণে সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। জনগণের নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটিলে তাহারা উদ্বৃত্ত আয় দ্বারা অধিক পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবে। জনগণ অনেক সময় লোভবশতঃ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যবহার না করিয়াও অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে, এমনকি পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য পরিহার করিয়া পর্য্যন্ত অন্যবিধ ভোগ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। ইহা অনেক সময় জাতির নৈতিক অবনতির কারণ হইয়া

উঠিতে পারে এবং অবশেষে রাষ্ট্রের পতনও ঘটাইতে পারে। সুতরাং জীবন ধারণের মান উন্নয়নকে আপেক্ষিক বলা চলে। বৈদেশিক দৃষ্টান্ত সর্ব্বক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। দেশবাসীর সহযোগিতা ও ত্যাগ পরিকল্পনা রূপায়ণে সর্ব্বপ্রকারেই কাম্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ত্যাগের একটি সীমা আছে। যাহার সঙ্গতি আছে সেই দান করিতে পারে। কিন্তু যে ভিক্ষাজীবী, সহযোগিতা ভিন্ন তাহার কি দান করিবার থাকিতে পারে? এই দেশে বহু অধিবাসী আছে যাহারা ব্যয়সঙ্কোচের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাহাদের পক্ষে অধিকতর ব্যয়সঙ্কোচের অর্থ অনাহার ও মৃত্যু। সুতরাং যাহাদের সঙ্গতি আছে তাহাদের অপচয় নিবারণই লক্ষ্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্রুত শিল্পায়নের। বর্ত্তমান জগতে নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা বিংশ শতাব্দীর মানুষ অস্বীকার করিতে পারে না। শ্রীসম্পদে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের সমকক্ষ হইতে হইলে শিল্পোন্নয়ন ভিন্ন উপায় নাই। প্রথম অবস্থায় ইহা দ্বারা বহু দেশবাসীর কর্ম্মসংস্থান হইবে, অধিকন্তু দেশের আর্থিক উন্নতিও হইবে। কিন্তু অপর দিকে যন্ত্রশিল্প প্রসারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্ম্মসংস্থান সীমাবদ্ধ হইয়া, ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার আশঙ্কাও আছে কিনা দেখিতে হইবে। জনসংখ্যার অনুপাতে উৎপাদনের হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে কর্ম্ম-নিয়োগের হার বজায় রাখাও প্রয়োজন। এই সম্পর্কে দুইটি মত উল্লেখযোগ্য একটি মতে কুটির ও হস্তচালিত শিল্পের প্রসার ও ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা; অপর মতে কুটীর এবং হস্তচালিত শিল্পোৎপাদিত দ্রব্য নিকৃষ্ট ও উচ্চতর মূল্যের হইবে। সুতরাং জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিবে না—উৎকৃষ্ট ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের একমাত্র উপায় যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণতম ব্যবহার। তবে এই দ্বিতীয় মতে কৃষি ও কুটীর-শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা থাকিলেও সংরক্ষণের উপায় সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। প্রথম মত ব্যাপক কর্ম্মসংস্থানের উপায় সম্বন্ধে সুদূরপ্রসারী অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দেয়। কুটিরশিল্প প্রভৃতি সংরক্ষিত হইলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে যন্ত্রায়িত করিয়া আধুনিক ও প্রাচীন পন্থার সমন্বয়সাধন সম্ভব হইবে। বহু দেশে কোনও কোনও সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য কুটিরশিল্পজাত। বৃহৎ ও মূল যন্ত্রায়িত শিল্প প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতানৈক্য নাই।

কৃষি, কুটীর ও অন্যান্য বিবিধ শিল্প (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) এবং বহুবিধ প্রতিষ্ঠান সমবেত ভাবে দেশবাসীর একটি বৃহৎ অংশের কর্ম্মসংস্থান করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু যে হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে, ভবিষ্যতে সেই হারে কর্ম্ম-নিয়োগও বৃদ্ধি পাইবে কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়। ভারতবর্ষে কর্ম্মক্ষম অধিবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যা আনুমানিক ২২ কোটির অধিক। তাহার মধ্যে প্রায় ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ কৃষি ও অনুরূপ কার্য্যে নিয়োজিত এবং চার কোটির অধিক অধিবাসী ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদন, খনি, চাকুরী প্রভৃতিতে নিয়োজিত। বর্ত্তমানে মোট নিয়োজিত জনসংখ্যা আনুমানিক ১৪ কোটি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আনুমানিক ১ কোটি ২০ লক্ষ অতিরিক্ত অধিবাসীর কর্ম্মসংস্থান হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। পরিসংখ্যান অনুসারে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ লক্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে একদিকে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে অন্য দিকে তেমনই ভবিষ্যতে যন্ত্রশিল্পের প্রসার কর্ম্মসংস্থান কিছু পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে পারে। যদিও বর্ত্তমান পরিকল্পনায় কর্ম্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ও অন্যান্য বহুবিধ বিষয় হইতে ইহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তথাপি ভবিষ্যতে কর্ম্মসংস্থান সঙ্কোচনের বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এখন হইতেই তাহার রক্ষাকবচ রচনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ধনবৈষম্য হ্রাস ও অধিকতর অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টা হইবে। ব্যক্তি অথবা শ্রেণী বা গোষ্ঠীর একাধিপত্য ও প্রতিযোগিতার অবসান দ্বারা সাধারণের কল্যাণের জন্য সমষ্টির সকলের সমান অধিকার—ইহা মানিয়া লইয়া সমাজে অধিকতর সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থার দ্বারা "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে" সমাজ গঠন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক উপায়েই ইহা সাধন করা হইবে। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যেরূপ "মধ্যপথের" নীতির কথা ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাকেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের "মধ্যপথ" নীতি বলা চলে। এই সমন্বয় প্রচেষ্টা স্থায়ী হইবে অথবা সাময়িক তাহার বিচার করার সময় এখনও আসে নাই।

পরিকল্পনা রচনার ভিত্তি মূলতঃ এই পঞ্চ বিষয়বস্তুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত—(১) কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন, (২) সেচ ও বিদ্যুৎ, (৩) শিল্প ও খনি, (৪) পরিবহন ও যোগাযোগ এবং (৫) সমাজকল্যাণ। অর্থাৎ এই পঞ্চ ব্যবস্থার দ্বারাই আমাদের দেশের শ্রীসম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে।

১। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেও কৃষি উন্নয়নের ব্যাপক আয়োজন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে লক্ষ্য হইবে বিবিধ কৃষি উৎপাদন, কৃষিক্ষেত্রের সর্ব্বোত্তম ব্যবহার এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি ও বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন হার বৃদ্ধি। ভারতবর্ষের একপঞ্চমাংশেরও কম জমিতে সেচ-ব্যবস্থা বর্ত্তমান ছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে এক কোটি সত্তর লক্ষ একর (প্রায় ছাব্বিশ হাজার পাঁচ শত বর্গমাইল) জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দুই কোটি দশ লক্ষ একর (প্রায় বত্রিশ হাজার আট শত বর্গমাইল) অতিরিক্ত জমিতে সেচের ব্যবস্থার আয়োজন করা হইয়াছে। দেশের অবশিষ্ট জমির কৃষিকার্য্য বৃষ্টি ও বর্ষার জলধারার উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় অপর্য্যাপ্ত বর্ষা দুর্ভিক্ষের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনান্তে ভারতের বার লক্ষ পঁচিশ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে তিন লক্ষ বর্গমাইলের সেচ-

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এমোনিয়াম সালফেট এবং অন্যান্য সারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা হইতেছে। কৃষি উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ ভূমি সংস্কার ও ভূমি-বণ্টন ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হইতেছে। কৃষি-ব্যবস্থার আর্থিক সংস্থানের জন্য পল্লী সমবায় সমিতিগুলির পুনর্গঠন ও প্রসারের ব্যবস্থা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে সমবায় সমিতির সাহায্যার্থে একটি জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী) তহবিল ও একটি জাতীয় কৃষিঋণ (স্থায়িত্ববিধান) তহবিল গঠন করা হইয়াছে। কৃষি-পরিকল্পনা, ভূমিসংস্কার ও ভূমিব্যবস্থা পরিচালনায় পঞ্চায়েতের উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে।

২। সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়নে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অনেকখানি সম্ভব হইবে। সেচ উন্নয়ন পরিকল্পনার সহায়তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে।

দেশের সর্বত্র ক্রমশঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে বৃহৎ শিল্প ভিন্ন কুটীর ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পেরও প্রসার হইবে। নিকৃষ্ট কয়লার ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইবে। জলপ্রবাহ উৎপাদিত বিদ্যুৎ ভিন্নও তাপোৎপাদিত বিদ্যুৎ উৎপাদনও বাড়ানো হইবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জ্বালানি তেল প্রভৃতির ব্যয়ও অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

৩। বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদক শিল্পগুলির সহায়ক হইবে এবং জাতীয় সম্পদ অধিকতর দ্রুত হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। পূর্ব্বে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ও মৌলিক দ্রব্যের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। শিল্পায়নের পরবর্তীকালে এই অবস্থার অবসান হইবে। ইহা ভিন্ন শিল্পায়নের দৌলতে উৎপাদন হারও বহু গুণে বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতের খনিগুলি বৃহৎ শিল্পসমূহের ভিত্তি। খনিজ দ্রব্যের মারফত বিদেশ হইতে শিল্পসম্প্রসারণের উপযোগী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই জন্য খনিসমূহের উৎপাদন হার বৃদ্ধি করার আয়োজন হইয়াছে। বর্ত্তমানে বৎসরে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা ছয় কোটি টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। লৌহ উৎপাদন ১৯৫৪ সনের ৪৩ লক্ষ টন হইতে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টন পর্য্যন্ত বাড়ানোর প্রচেষ্টা হইবে। অন্যান্য খনিজদ্রব্য, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, সীসা প্রভৃতির উৎপাদনও বৃদ্ধি করা হইবে।

৪। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রেলপথ, রাজপথ, জাহাজ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুলাংশে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হইয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার ও খনির উৎপাদন বৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে পরিবহন ব্যবস্থার উপর। বার লক্ষ পঁচিশ হাজার বর্গমাইলে ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য মাত্র ৩৫ হাজার মাইল। যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় মোট যাত্রীবাহী গাড়ীর সংখ্যা (১৯৩৮-৩৯ সনে) ছিল ১৮,৭৬৩ এবং মোট যাত্রীসংখ্যা ছিল ৫৩ কোটি। ১৯৫৪-৫৫ সনে যাত্রীগাড়ীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৬,২৩৬টি (অর্থাৎ ১৪ শতাংশ কম) এবং যাত্রীসংখ্যা হইয়াছে ১২৬ কোটি অর্থাৎ আড়াই গুণ অধিক। ভারত সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের যুগ্মসম্পাদক ডাঃ এম. এস. কৃষ্ণান সম্প্রতি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রেল পরিবহন ব্যবস্থার বর্ত্তমান অবস্থাই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে একটি প্রধান অন্তরায়। পরিকল্পনা-কালের মধ্যে চিত্তরঞ্জন কারখানায় বৎসরে ৩০০টি ইঞ্জিন নির্ম্মাণ সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পেরাম্বুরে যাত্রীগাড়ী নির্ম্মাণ কারখানায় বৎসরে ৩৫০টি হাল্কা ইস্পাতের যাত্রীগাড়ী নির্ম্মাণ সম্ভব হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বেসরকারী কারখানাগুলির উপর মালবাহী যান (ওয়াগন) নির্ম্মাণের ভার অর্পিত আছে। প্রথম পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ৩০ হাজার মালগাড়ীর স্থানে প্রায় ৪১ হাজার নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে। এরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও যান-বাহন-ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতিবিধান প্রয়োজন। বহির্বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বন্দর-ব্যবস্থারও উন্নতি সাধিত হইবে। সাধারণ ও রাজপথ পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নয়নের আয়োজন হইয়াছে।

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সমাজসেবায় গৃহনির্ম্মাণ, পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি অসম্পূর্ণ হইলেও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান পরিকল্পনায় শিক্ষা-প্রসার-ব্যবস্থার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আশা করা যায়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষার দ্রুত এবং ব্যাপক সম্প্রসারণের উপর পরিকল্পনার দ্রুত রূপায়ণ ও স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার বৃহৎ পরিকল্পনা থাকিলেও বর্ত্তমানে খুব ব্যাপক নহে। সমাজ-সেবার পরিকল্পনা দেশের উন্নয়নে অনেকখানি সাহায্য করিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

এখন যদি ধরিয়া লওয়া যায় ১৯৭৬-৭৭ সনে হউক বা না হউক, বিংশ শতাব্দীর অবসানে, অথবা তাহারও পরবর্ত্তী কোনও এক সময় আমরা লক্ষ্যস্থলের সন্নিকটে পৌঁছিলাম, দেশের সম্পদ ও সঙ্গতি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, যন্ত্রায়িত শিল্পের দ্বারা উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উৎপাদনও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, নিরক্ষরতার অবসান হইল এবং দেশের অধিকাংশ অধি-বাসীর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইল। কিন্তু তাহার পর?

পাশ্চাত্ত্য জগতে শিল্পবিপ্লবের ফলে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছিল আমাদের দেশেও তাহা সম্প্রসারিত হইতে পারে কি? অথবা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া প্রতি-যোগিতার নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিবে?

আদি যুগের আত্মরক্ষা ও দৈহিক ক্ষুধার বিবাদ, মধ্যযুগের ধর্ম্ম-যুদ্ধ ও পরবর্ত্তী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হইতে এখন আমরা অর্থনৈতিক আদর্শবাদের সঙ্ঘর্ষের আবর্ত্তে আসিয়া পৌঁছিতে পারি কিনা? সঙ্গতি ও সম্পদের চরম বৃদ্ধিতে এবং দৈহিক স্বাস্থ্যের পূর্ণ বিকাশে, অর্থনৈতিক সকল চাহিদার পূরণ সম্ভব হইল ও দৈহিক সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারিলাম। কিন্তু মানুষ পূর্ণ

তৃপ্তি ও শান্তিলাভ করিবে কিনা ? ইহা দার্শনিক অথবা ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন নহে, ইহা মানবীয় বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন।

এই প্রশ্ন হইতেই উদ্ভব হইয়াছে জবাহরলাল নেহরুর পঞ্চশীলের। সংঘাত ও সংঘর্ষ অতীতেও হইয়াছে, বর্তমানেও ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিতে পারে। বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন আদর্শ এবং মতবাদ সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। আধুনিক অর্থনৈতিক যুগের অর্দ্ধস্বপ্নায়িত মানুষের পক্ষে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি ভিন্ন মুক্তির উপায় নাই। বিভিন্ন মতবাদ হইতে উদ্ভূত ভবিষ্যতের যুদ্ধের পরিণতি হইবে ধ্বংস। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে আমরা ততই নূতনতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে পারি। সেইজন্য কোনও বিশেষ মতবাদনিরপেক্ষ গণ-তান্ত্রিক নীতিই শ্রেষ্ঠ। যে-কোনও রাষ্ট্রের অথবা যে-কোনও মতবাদের শ্রেষ্ঠ কর্মপদ্ধতি গ্রহণে আমাদের আপত্তি থাকিতে পারে না। আমরা যাহার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাই গ্রহণ করিতে পারি, যদি সেই পদ্ধতি আমাদের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হয়। পরিকল্পনার রূপায়ণে সেইজন্য সহ-অবস্থিতি নীতি আপেক্ষিক, অর্থাৎ বিশ্বরাষ্ট্রের সৌহার্দ্য মতবাদের ভিন্নতা দ্বারা ব্যাহত হইবে না।

পঞ্চশীলের মূল কথা :

১। পরস্পরের রাজ্যসীমানার ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা মান্য করা।

২। অনাক্রমণ।

৩। পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকা।

৪। পরস্পরের সাম্য ও কল্যাণ।

৫। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি।

এই পঞ্চশীল পরিকল্পনার রূপায়ণ সার্থক ও স্থায়ী করিবে। অর্থাৎ পঞ্চশীল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাণস্বরূপ। যন্ত্র-সভ্যতার পরিণামে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে গণতান্ত্রিক মধ্য পথই শ্রেষ্ঠ পথ।

ভুবনেশ্বর

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

বন্দী হয়ে গেল আঁখি পাষাণ-মন্দিরে,
আকণ্ঠ করিল পান বাণীময় ভাস্কর্য্যের রূপ ফিরে ফিরে।
পাষাণের অঙ্গে অঙ্গে স্বপ্ন-সুধা মাখা,
আরক্তিম কামনারা আঁকা।
উচ্ছলিত যৌবনের লীলাপদ্ম হাতে
সুন্দরের শোভাযাত্রা চলিয়াছে রসঢল বর্ণ-সুষমাতে।
সৌন্দর্য্যের লক্ষ দীপ জ্বালি
হস্তে লয়ে প্রেম অর্ঘ্য-থালি
আনন্দ-মন্দিরে সবে চলিয়াছে করিতে আরতি,
পঞ্চশরে জানাইতে অকপটে নতি।
সার্দ্ধসপ্তশত বর্ষ আগে
ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুরাগে
যযাতি কেশরী আর ললাটেন্দু কেশরী নৃপতি,
সমবেত করি যত সার্থক স্থপতি,
রচেছিল সপ্তশত দেবতা দেউল।
সাধারণে বুঝাইতে ধর্মে কৃচ্ছ্রসাধনের ভুল।

রূপগন্ধময় ধরা
বক্ষ তার রসোচ্ছ্বাসে ভরা
তবে কেন এ আত্মনিগ্রহ, রুদ্ধ করা ইন্দ্রিয়-দুয়ার ?
বনচ্ছায়ে শিলা-শৈলে উপবাসে বাসনা সংহার।

বৌদ্ধ-জৈন মতবাদ খণ্ডনের তরে
রুষ্ট ব্রাহ্মণের দল রাজবংশে ক্রীড়নক-করে।
মন্দিরের অরূপণ স্থাপত্য-বৈভবে
লক্ষ লক্ষ লুব্ধ আঁখি বন্দী হ'ল সবে।
ভ্রষ্ট হ'ল উদয়-গিরির যোগাসন।
জৈন-বৌদ্ধ যতি দল লভে নির্ব্বাসন।
কলিঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তুলে উচে শির।
জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠে লিঙ্গরাজ শিবের মন্দির।

একটি দুঃসাহসিক অভিযান

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দুষ্কর্ম্মার মত প্রুফ দেখা শেষ করে সবে ক্লান্ত দেহটাকে চেয়ারের পিঠে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজেছি—জুতোর আওয়াজ তুলে কে যেন সামনে এসে দাঁড়াল।

চোখ না চেয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, কে ?

আমি—রবীন মিত্র।

ওঃ, বসুন।

চেয়ার টানার শব্দে বুঝলাম রবীন মিত্র আসন গ্রহণ করলেন।

চোখ না চেয়েই ওঁর চেহারাটা আন্দাজ করে নিতে পারি। লম্বা রোগা মত শ্যামবর্ণের এক বৃদ্ধ—হাঁ—বৃদ্ধই ত, ষাট বছরের এক মাসও কম নয় ওঁর বয়স। মাথায় গুটিকয়েক কালো চুল শাদার সমুদ্রে দু'একটি কালো বয়ার মত ভাসছে, প্রায় সবক'টি দাঁত পড়ে গাল ভেঙ্গে গেছে, গলার মাংস হয়েছে পাতলা, নাকটাও কিছু বেঁকেছে আর চক্ষু দু'টি তন্দ্রাতুর; সারা মুখে অসচ্ছলতার বলি-চিহ্ন। অথচ ইনিই বিপ্লবী বাংলার এক কালের দুর্দ্দান্ত যুবক রবীন মিত্র—চিরকুমার, চরিত্রবান। মাস কয়েক হ'ল ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। সেকালের অনেক গল্প শুনেছি ওঁর মুখে।

বেশ গল্প বলেন রবীন মিত্র। সনতারিখ-হারা কতকগুলি লোমহর্ষক ঘটনাকে জুড়ে জুড়ে চিত্তাকর্ষক এক একটি কাহিনী বলে যান।

একদিন বলেছিলামও, যা যা বলছেন—গুছিয়ে লিখে ফেলুন ত। অবশ্য সন, তারিখ, লোকের নাম, জায়গার নাম এগুলি থাকবে। এ সব যদি ঠিক ঠিক হয় ত সে যুগের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ হবে।

মিত্র একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, আমরা ত ইতিহাস লিখব বলে জীবন পণ করে কাজে নামিনি। তখনকার দিনে এমনই নিয়ম ছিল—কেউ কোন বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করবে না। শুধু কাজ করতে হবে, শুধু মারতে হবে, কিম্বা মরতে হবে। নাম, গোত্র, পরিচয় জানব কেমন করে! এক একটা ছদ্ম নাম অবিশ্যি সকলের ছিল। তাতেই কাজ চলে যেত।

বলেছিলাম, তা হলে শুধু গল্প শুনে কি লাভ! বিপ্লবী বাংলার ইতিহাসে ওসব কাহিনীর ত স্থান নেই!

রবীনের বলিরেখা-আকীর্ণ মুখখানা অদ্ভুত হাসিতে ভরে উঠেছিল একথা শুনে। বলেছিলেন, না—লাভ কিছু নেই। নিজেদের বীরত্ব শুনিয়ে রাজ সরকারে একটা ভাল চাকরি পেয়ে যাব এ আশা ত করি না। লাভের আশা সেদিনও অবশ্য করি নি। ব্যক্তিগত লাভের কথা বলছি। তবে জাতিগত লাভের লোভ ছিল ত। না হলে…

চোখ চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তার পর, কি মনে করে ?

পকেটে হাত পুরে একখানা মাঝারি সাইজের এক্সারসাইজ বুক বার করে একটু কুণ্ঠিত হাস্য করলেন রবীন মিত্র।

ব্যাপার কি ?

একটা লেখা। ততোধিক কুণ্ঠিত স্বরে বললেন।

লেখা? কার? সবিনয়ে প্রশ্ন করলাম।

আমারই। মুখখানি নামিয়ে বললেন।

আপনি—আপনি লিখতে পারেন? বিস্ময় বাড়ল আমার।

না, ভাল পারি না। এক সময়ে চেষ্টা করেছিলাম। তখন বয়স কম ছিল—সেন্টিমেণ্টাল ছিলাম—মনে কল্পনা ছিল। কবিতা লিখেছি দু'চারটি, আর এই গল্পটি লিখেছিলাম।

গল্প!

গল্পই ত। সন তারিখ নেই, কারুর নাম নেই, ঘটনার ছায়া ছায়া ধারণা নিয়ে লিখেছিলাম এটা। এটা ইতিহাস হয় নি, হয় ত গল্পও হয় নি—ছাপাও হয় নি কোন কাগজে। যদিও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম দু'একখানা কাগজে।

খাতাটা হাতে নিয়ে দেখি—একটি কোণে নীল পেন্সিলে 'অ' অক্ষরটি লেখা। অর্থাৎ অমনোনীত।

দেখছি কেউ ছাপেন নি—

ছাপতে সাহস করেন নি।

মানে ?

তখনকার দিনে আইন ছিল কড়া—দেশ স্বাধীন ছিল না ত। তার পরও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফল হই নি। দু'একজন সম্পাদক বলেছেন, এ চলবে না। এতে আছে শুধু ঘটনা, মনস্তত্ত্ব নেই।

তা হলে আমরাই বা কি করে—

ছাপতে বলছি না ত, শুধু পড়ে দেখবেন। সন, তারিখ, দেশ আর মানুষের নামগুলি যদি আন্দাজ করে নিতে পারেন—চাই কি ইতিহাসের মালমশলাও পেয়ে যেতে পারেন। রোজই বলেন, সে যুগের কথাগুলি লিখে ফেলুন ত, কিন্তু লিখি কি করে। কল্পনার মূলধন যে খুইয়েছি—ভাবের বাষ্পবিন্দুও মনে নেই। লিখতে পারি না একছত্রও। অথচ এক সময়ে ছিল…একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সেই সময়ের সামান্য পরিচয় এতে রয়েছে। অমনোনীত হলেও এটি যত্ন করে রেখে দিয়েছি—অতীতের স্মৃতি মূল্যবান বলে। বলে ম্লান হাসলেন।

খাতাটি হাতে নিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে যেতে লাগলাম—পাতাগুলি উল্টে। লেখাটা টানল মনকে। যেমন মা ঠাকুরমার

মুখে-শোনা পুরাতন দিনের গল্প টানে শিশুর মনকে। সামান্য পরিমার্জ্জনা করে এটাকে ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থাই করেছি শেষ পর্য্যন্ত। মনস্তাত্ত্বিকেরা যাই বলুন—আমার মত কৌতূহলী শিশু-মন যাঁদের—তাঁদের এটা ভালই লাগবে আশা করি।

শহর থেকে বেশ একটু দূরে ফাঁকা মাঠে এসে জমল সবাই।

আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমেছে, শরৎ কালের শেষ প্রহর—ঈষৎ শীতের আমেজ হাওয়ায়। ঘরের মধ্যে পাতলা একটা কামিজ গায়ে দিয়ে বেশ আরাম পাওয়া যায়, কিন্তু মাঠে যারা জমায়েৎ হয়েছে—তারা আরাম প্রয়াসী নয় মোটেই। দেহ ও মনের সব রকম বিলাস দূরে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এসেছে—জনসংশ্রব শূন্য বিজন মাঠে। ওরা আরও এগিয়ে যেতে চায়। বুকে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প, রেখা-কঠিন মুখে প্রতিজ্ঞা পালনের দৃঢ়তা এবং চিত্ত ভয়লেশহীন। আঠার থেকে পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে—এগিয়ে ওরা যাবেই। সংখ্যাতেও ওরা আঠারোর বেশী হবে না। পৃথিবী ওদের কাছে অসীম সম্ভাবনায় ভরা, নেপোলিয়নের মত 'আল্‌প্‌স'-এর বাধাকে ওরা বাধা বলেই গ্রাহ্য করে না। কেন এগিয়ে যাবে না ওরা?

মাঠের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসল একজন পঁচিশ বছরের যুবক। আর সকলে তার তিন দিক ঘিরে দাঁড়াল। যুবক পিঠ-ঝুলি থেকে বার করল একটা পিস্তল। মাউজার পিস্তল। টোটা-ভরা থলিটা রাখল পাশে। তার পর দেখাতে লাগল, কেমন করে পিস্তলের ট্রিগার টিপতে হয়, কেমন করে গুলি ভরতে ও গুলি ছুড়তে হয়, একটা গুলি ছুটে গেলে আর একটা কত দ্রুত চেম্বারে আশ্রয় নেয় এবং শেষ টোটা কেমন করে বার করতে হয়। সমস্ত কৌশল শেখাতে শেখাতে বলল, সাবধান, শেষ গুলিটা বার না হওয়া পর্য্যন্ত—নতুন করে গুলি ভরতে যেয়ো না যেন। বড় দূর পাল্লার অস্ত্র। দু'তিন মাইল রেঞ্জ, কাছে ছুটলে লোহার পাত ভেদ করে দেয় অনায়াসে। এই দেখ—

ওদের শেখাতে গিয়ে নিজেই কখন অসাবধান হয়েছে, শেষ গুলিটার হিসাব না রেখে—ট্রিগার টিপেছে এবং তার ফলে প্রমাণিত হয়েছে—ছুটন্ত গুলি উরুদেশ ভেদ করে—পাশে রাখা লোহার পাতটা ফুটো করে আরও খানিকটা দূরে ছিটকে পড়তে পারে কি অসামান্য বেগ নিয়ে।

ভাগ্যিস শহর থেকে দূরে ছিল ফাঁকা মাঠ এবং সন্ধ্যায় এ পথে মানুষজন চলে না। শব্দটা দূর থেকে শোনা গেলেও—পটকা ফাটানোর বেশী বলে মনে হবে না।

দলের আঠার জনের মধ্যে এগার জন ছিল আনাড়ী। বন্দুক ছোড়া ত দূরের কথা, ছোরাখানা ভাল করে বাগিয়ে ধরতে পারে না। অথচ ওদেরও চাই। মাত্র সাত জন নিয়ে এত বড় একটা দুঃসাহসিক অভিযান চালানো যায় না। অভিযান না চালিয়ে উপায় কি? টাকা চাই-ই। দু'দশ টাকা নয়, হাজার হাজার টাকা। স্ব-ইচ্ছায় হাতের মুঠো আলগা করে কি মানুষ? দুর্ভিক্ষ বলে চাঁদা চাইলেও নয়, হাসপাতাল কি জলাশয় প্রতিষ্ঠার দোহাই দিলেও নয়, কিম্বা বিদ্যার্জ্জন করার ব্যবস্থা করব এই আশ্বাসেও নয়। বরং রং তামাসা দেখিয়ে কিছু আদায় করা যায় বটে, সে-ও ত হামেশা করা সম্ভব নয়। সে সুযোগই বা এরা পাবে কেমন করে! দেশের স্বাধীনতা আনা শুনলে ত আঁতকে উঠবে সবাই। রাজ রোষ কি সহজ কথা! অচেতন দেশকে সচেতন বলে প্রমাণ করা এবং তার প্রতি ভক্তি প্রীতি জাগানো এক রকম অসাধ্যই। দেশের শাসকেরা এদের পরিচয়ে কালি ছিটিয়েছে ঘন করে, দেশের সাধারণ মানুষ এদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝতে পারে না। তাই আলোর সঙ্গে সম্পর্ক মাত্র না রেখে—নর চক্ষুর অন্তরালে—এদের ক্রিয়া-কর্ম্ম চলে। সংগোপন বলেই সংশয়। হয়ত বা এই কারণেই সহানুভূতির অভাব।

যাই হোক, আহতকে নিরাপদ জায়গায় গচ্ছিত রাখতে হবে। নতুবা সকলের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। ওর চিকিৎসা চাই। রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করতে হবে সম্পূর্ণরূপে। কাপড়ে পটি বেঁধে—একটু আয়োডিন ঢেলে নিশ্চিন্ত হওয়ার কাজ নয়।…আহতকে কাঁধে করে রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে ওরা শহরে পৌঁছল।

আহত সুস্থ হয়ে উঠার অপেক্ষা করলে চলবে না—আগামী কালই পৌঁছাতে হবে নদীর অপর পারে মীরপুরে। হোক অপরিচিত গ্রাম, অজানা পথ—পৌঁছতেই হবে। তারিখ, ক্ষণ, ঘণ্টা, মিনিট সমস্ত হিসাব করা। একটু এদিক-ওদিক হলেই—কার্য্য হানি—জীবন হানিও। আহত শুধু জানত—কোন্ পথ দিয়ে কত সহজে পৌঁছাতে পারা যায় গ্রামে এবং নিষ্ক্রমণের নিরাপদ পথই বা ক'টা আছে। ওদিকের ছেলে বলে—পথ ঘাট বন জঙ্গল থানা ফাঁড়ি সব ছিল ওর নখদর্পণে। আর সবাই শুনেছে পথের কথা, গ্রামের নাম। ছোট কাগজে রেখা টেনে নির্দ্দেশটা মোটা-মুটি বুঝে নিয়েছে। নক্ষত্রের নিশানায় দিক্ নির্ণয় করে—নদীর নিশানায় গ্রামে পৌঁছাবার কথা। তার পর গ্রামের সবচেয়ে সমৃদ্ধ মানুষের বাড়ীটা চিনে নেওয়া কঠিন নয়। কাজটা কিন্তু কঠিনই। যাওয়া এবং আসায় অন্ততঃ বিশ মাইল পথ। কাগজের আঁকিবুকি দেখে ও কানে শুনে নিরাপদে কার্য্যোদ্ধার করা সহজ নয়। কিন্তু উপায় কি?

নদীর কূলে কূলে নৌকা চলল। অল্প অল্প মেঘ আকাশে, বাতাস বইছে কি বইছে না। গুমোট ভাব। খাকির ইউনি-ফর্মে অস্বস্তি লাগছে। নৌকা চালাতে ত রীতিমত গলদঘর্ম্ম অবস্থা! ভাগ্যিস ওদিককার ছেলেরা ছিল দলে ভারি। হাল ধরতে, দাঁড় টানতে এরা পাকা মাঝিরই সগোত্রীয়। গলা ছেড়ে গান গেয়ে যদি দাঁড় টানা যায় ঝপাঝপ করে—কষ্ট দেহেই পৌঁছয় না। কিন্তু এ ত ফূর্ত্তি করে বাচ খেলা নয়। নিঃশব্দ প্রকৃতির মাঝে নিঃশব্দেই চলতে হবে। গলায় শব্দ ত হবেই না, দাঁড়ের

শব্দও যথাসম্ভব কম। যা কথাবার্ত্তা আগেই শেষ হয়েছে, কার কি কর্ত্তব্য—তাও ছকা। রাত দুপুরে কাজ শেষ করে ভোরের আলো ফুটবার আগেই ফিরে আসা। জোয়ারে এগিয়ে—ভাটায় ভাটায় ফিরে আসা। ঘণ্টা মিনিটের হিসাবে নির্ভুল না হলে চলে?

কাজটা প্রায় নিখুঁত ভাবেই হ'ল। দু'জনকে নৌকা পাহারায় রেখে পনের জন পাড় ভেঙ্গে গ্রামের মাঠে উঠল। একখানিই মাঠ—এক মাইল লম্বা। বন নেই, কাদা নেই, আলে আলে পথ। খেয়া ঘাট কাছেই। গ্রামে পৌঁছাবার রাস্তাটা হাত পঞ্চাশেক গেলেই পাওয়া যায়। আলের পথ কিন্তু সুগম নয়, স্পষ্ট নয়। আশ্বিনের শেষে সতেজ আমন ধানের চারায় ঢাকা, তা ছাড়া সাপের ভয়। রাত্রিতে খেয়াঘাট নিস্তব্ধ। বাথারির পাটাতনে দু'খানা ডিঙ্গি নৌকা বাঁধা—একখানা খেয়া নৌকাও রয়েছে। জলের ছোট ছোট ঢেউ ভাঙছে ওদের গায়ে। ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ হচ্ছে—কাঁপছে একটু বা। মাঝি মাল্লারা বাড়ী চলে গেছে। ঘুণি জাল পেতে জেলেরাও নিশ্চিন্তে গেছে ঘুমোতে। চারিদিক নিস্তব্ধ।

বাড়ী খুঁজে নিতে বেশী দেরী হ'ল না, কাজ হাঁসিল করতেও নয়। কিন্তু টাকাকড়ি গুছিয়ে নিতে একটু গোলমাল হয়ে গেল। কারা লাঠি বাগিয়ে রুখতে এসেছিল—পিস্তলের গুলির আওয়াজ শুনে পিছিয়ে গেল। পিছিয়ে গেল, পালাল না। দূর থেকে শোর তুলল প্রচুর। উৎসাহী কয়েকজন থানার দিকে ছুটল। মাঝ রাতে জেগে উঠল গ্রাম। ডাকাত—ডাকাত—চীৎকার উঠল।

পুলিন চালনা করছিল দলটিকে। বলল, খবরদার, ফায়ার করবে না কেউ। আমরা মানুষ মারতে আসিনি,মানুষ মারব না শুধু শুধু। নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন—তাই করব। পাছু হটে এস, বেড়ার রাস্তা নয়, আল পথে চল।

ওরা নৌকায় পৌঁছল। কালবিলম্ব না করে নৌকা দিল ছেড়ে।

ততক্ষণে সারা গ্রাম জেগেছে, পুলিস এসেছে। বড় বড় মশাল জ্বলে উঠেছে—নদীর দিকে সুরু হয়েছে মানুষের অভিযান। হৈ হল্লা এগিয়ে আসছে নদীর দিকে—মশালের আলো এসে পড়ল নদীর জলে।

পুলিন বলল, জোরে বইঠা বাও। স্রোতের উজানে নয়, স্রোতের সঙ্গে চল বেয়ে।

একজন বৈঠা বাইতে বাইতে বলল, তাহলে অন্যদিকে গিয়ে পড়ব যে।

হোক, শীগগির পালাতে হবে। ওরা নদীর ধারে পৌঁছবার আগে—নৌকা সরিয়ে ফেলতে হবে।

এত আর মোটর নয় যে ফুলস্পীডে যাবে। আর একজন বলল। পাড় দিয়ে ওরা দৌড়চ্ছে, পারব কেন ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। তা ছাড়া, নদীও তেমন চওড়া নয়।

ও-পারে লাগাও তবে।

এ-পারের কোলাহল ও-পারেও পৌঁচচ্ছে, ও-পারেও গ্রাম জাগছে। দু'একটা লণ্ঠনের আলো দৌড়চ্ছে মাঠে। এ-পারের চীৎকার ও-পারেও প্রতিধ্বনি তুলছে, ডাকাত, ডাকাত।

তা হলে?

মাঝ নদী দিয়ে নৌকা চালান হবে না, দু'দিক থেকে মার খেতে হবে। ও-পারে কম লোক, ও-পার ঘেঁষেই চলুক নৌকা।

এ দিকের পাড় দেড় তলা সমান উঁচু। সেই উঁচু পাড়ে একে দুয়ে মানুষ জমছে—সৃষ্টি হচ্ছে জনতা। নদীতে যেমন জলের স্রোত, পাড়েও তেমনি জনতা। নৌকার গতিমুখে গতিবেগ মিশিয়েছে। আকাশের পানে চাইল পুলিন। সপ্তর্ষি দিকপ্রান্তে অবশ্য হয়ে গেছে, সন্ধ্যা তারাটি পূবের আকাশে দপ দপ করে কাঁপছে। পিঙ্গল ছোপ ধরেছে আকাশে। সর্ব্বনাশ, রাত্রি কি শেষ হয়ে এল!

জোরসে চালাও নৌকা, দু'খানা দাঁড়ে যত শক্তি আছে জল কেটে এগিয়ে চল। স্রোত-মন্থর নদী, হোক, তবু ত অনুকূল স্রোতে চলেছে নৌকা। হাওয়া থাকলে পাল তুলে দেওয়া যেত। কিন্তু আলো ফুটবার আগেই জনতার নাগাল থেকে দূরে যেতেই হবে। সব শক্তি প্রয়োগ কর।

নদীর উঁচু পাড়ে ক্ষেতখামার আসছে, লতা-গুল্মের ঝোপ মাথা তুলছে, শ্মশান ঘাট জাগছে, কুঁড়ে ঘরও পড়ছে। সবচেয়ে বেশী মাঠের প্রসার। বন্ধ্যা মাঠ—এবং শস্য শ্যামল ক্ষেত। ভোরের মিষ্ট হাওয়া নদীর জল ছুঁয়ে শরীরে এসে লাগছে। কোন্ ঝোপে উঠছে নাম-না-জানা পাখীর কাকলি। এত জোরে দাঁড় টেনেও জনতাকে অতিক্রম করা গেল না! জনতা ঘন হয়েছে; উঁচু পাড় থেকে বড় বড় মাটির ঢেলা নৌকা লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে। ছোড়া হচ্ছে লাঠি, বল্লম। ধনরত্ন লুঠ করে ডাকাতের দল পালাচ্ছে নৌকা করে, ওদের যেন-তেন-প্রকারে ঘায়েল করা চাই। জীবিত অথবা মৃত যেমন করে হোক—ধরতেই হবে। মার শড়কি, বল্লম, মাটির ঢেলা, জখম কর—খুন কর।

পালান ও ধরার খেলা জমে উঠতেই অন্ধকার পাতলা হয়ে এল। আলো ফুটল।

পুলিন দেখল, পাড়ের উপরে রথ যাত্রার ভীড়। চাষী, মজুর থেকে সম্ভ্রান্ত জমিদার—সবাই অংশ নিয়েছে মিছিলে।

পুলিন পিস্তল উঁচিয়ে বলল, থাম বলছি, না হলে গুলি করব।

দলের অন্যান্য ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বলছে পুলিনকে, হুকুম দাও, গুলি ছুড়ি। ওদের হটাতে না পারলে ধরা পড়ব আমরা।

না, অপেক্ষা কর। ওরা আমাদের ভাই, ওরা নির্ব্বোধ। জানে না, কি সর্ব্বনাশ করছে ওরা। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

বোঝাতে সুরু করল পুলিন, ভাই সব, আমরা লুঠেরা নই, ডাকাত নই। যে ডাকাত শুধু শুধু ঘরে আগুন দেয়, ধনরত্ন লুঠ করে, মানুষকে ঠেঙ্গিয়ে মারে—

ডাকাত—ডাকাত। মার ওদের। শতকণ্ঠে চীৎকার উঠল।

এখনও বলছি নৌকা থামাও, না হলে ফায়ার করব। বলিষ্ঠ

অভিজাত বংশের এক যুবক বন্দুক নিশানা করে চীৎকার করে উঠলেন।

পুলিন-দা, হুকুম দাও। নৌকার আরোহীরা গর্জ্জন করে উঠল।

থাম ভাই। ওদের শান্ত করি। পুলিনও পাড়ের পানে পিস্তল লক্ষ্য করল। শোন তোমরা, যদি বাঁচতে চাও, সরে পড়, নইলে—

সট্‌ করে একটা বর্শা নৌকার পাটাতনে বেঁধে গেল।

হুকুম দাও, গুলি চালাই। ষোলটি কণ্ঠ গর্জ্জন করে উঠল।

তার আগেই গুড়ুম গুড়ুম শব্দ হ'ল দু'বার। অভিজাত বংশের যুবকটি গুলি ছুড়ছে।

পুলিন শুয়ে পড়ল পাটাতনের উপর। মাথার উপর দিয়ে গুলি দুটো বার হয়ে গেল।

না, তীরের লোকেরা মরীয়া হয়ে উঠেছে, কোন কথা শুনবে না ওরা।

রক্তস্বাদ পাগল বাঘের মতই ওরা ভয়ঙ্কর। ওদের বিবেক কিম্বা বিচারবুদ্ধি মোহগ্রস্ত। অর্থলুণ্ঠনের সোজা অর্থটি স্পষ্ট হয়েছে ওদের কাছে। ওরা শত্রুপক্ষীয়।

আবার বন্দুক তুলেছে সম্ভ্রান্ত যুবকটি। বার বার কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে?

ফায়ার। হুকুম দিল পুলিন।

দুম্—দুম্—দুম্। দশ বারটা পিস্তল গর্জ্জন করে উঠল। সম্ভ্রান্ত যুবক ত জমি নিলই—আরও জন কয়েক আহত হ'ল। ব্যস, চোখের পলকে ফাঁকা হয়ে গেল নদীর তীর। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। হাত নাড়তে লাগল। ওরা ভয় পেয়েছে, উত্তেজনা কমে নি।

পুলিন বলল, দিনের বেলায় নৌকা নিয়ে এগুনো যাবে না। পায়ে হাঁটতে হবে, ছুটতে হবে—তবে যদি বাঁচতে পারি। নৌকা ডুবিয়ে দাও। যা কিছু আছে ঝোলায় পুরে ডাঙ্গা পথ ধরি—চল।

লোহার একটা ভারি মুষল ছিল, তাই দিয়ে দমাদ্দম ঘা মেরে মেরে ওরা নৌকার তলাটা ফাসিয়ে দিল। জল উঠতে লাগল কল কল শব্দে। পিঠে ঝোলা, হাতে পিস্তল—সবাই লাফিয়ে পড়ল ডাঙ্গায়।

ওদের দেখে জনতা আরও পিছিয়ে গেল।

পুলিন চীৎকার করে বলল, ভাই সব, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই, তোমাদের গায়ে হাত তুলব না, তোমরা শুধু সরে যাও। আমাদের চলে যেতে দাও।

গ্রামবাসীরা বহু দূর থেকে ওদের অনুসরণ করতে লাগল। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে গেছে।

ঐ—ঐ—পালাচ্ছে ডাকাতরা, ধর।

ফায়ার।

পুলিনরা তখন আল বাঁধা জমির ও-পিঠে। একটা মরা খালের খাদ ওদের পিছনে।

পিছু হটো, শুয়ে পড়, গুলি চালাও।

গ্রামের দিক থেকে গুলির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এল। আরও ক'টা লোক পড়েছে হয় ত। ওরা পালিয়েছে।

ওরা কিন্তু পালায় নি। অবার ছুটে আসছে। গুলি চালাচ্ছে—চীৎকার করছে—পাকড়ো—পাকড়ো।

কোন ক্রমে মরা খালের খাদ পেরিয়ে ওরা ঝোপ-জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। বিজন অরণ্য নয়, সামান্য লতা-গুল্মের আড়াল—আধ মাইলটাক জুড়ে একটা পড়ো ভূমিতে ঘন হয়েছে। তার পর ফাঁকা মাঠ, এক মাইল গেলে তবে নদী—ভাগীরথী। নদী পার হতে পারলে ও-পারে বন জঙ্গল পাওয়া যাবে অনেকখানি। পূর্ব্বস্থলীর জঙ্গল। ভাল মত পথ চেনে না কেউ। দূর থেকে দেখাচ্ছে ধোঁয়ার মত—জঙ্গলের আভাস। সন্ধ্যা এসে গেলে সেই জঙ্গলে নিরাপদ আশ্রয়।

কিন্তু এত লোক এক সঙ্গে গেলে বিপদ। ঝোপের মধ্যে এসে পুলিন বলল, আমরা সাত জন টাকাকড়ি নিয়ে বারাসাত যাব, বাকী দশ জন নদী পার হয়ে যাবে নবদ্বীপ। পার হয়ে যত শীঘ্র পারবে—পোষাক বদল করে নেবে। তার পর কেষ্টনগরে গিয়ে হুকুমের অপেক্ষা করবে।

ফাঁকা জমিতে পড়ে আবার দৌড়। এক মাইল মাঠ, তার পর নদী। সবাই পরিশ্রান্ত। দু'দিন ধরে চলেছে উত্তেজনা, ছুটোছুটি, রাত্রি জাগরণ, অর্দ্ধাহারও বটে। কিন্তু এ সকলের চেয়ে জীবন অনেক বড়, জীবনের চেয়ে বড় দেশ। যেমন করে হোক—বাঁচতেই হবে।

পিছন থেকে দুটো গুলি এসে মাটির ঢেলা ভাঙ্গল। ওরা ফিরে দাঁড়িয়ে এক পশলা গুলি বৃষ্টি করল। পিছনের পাতলা ঝোপ দুলতে লাগল ঘন ঘন। অনুসরণকারীরা পালাচ্ছে। ফাঁকা জমিতে দাঁড়াবার সাহস নেই ওদের।

পথ শেষ হ'ল, শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত। সূর্য্য কখন মাথার উপরে উঠেছে—কখন পশ্চিমে হেলেছে। দুপুর গড়িয়ে গেছে বিকেলের দিকে। ওরা নদীর ধারে এসে বসল। হাত মুখ ধুয়ে আঁজলা ভরে জল পান করল। পিছনে পাহারা রইল দু'জন।

নৌকার সন্ধান করতে লাগল সবাই। কোথায় নৌকা? ফাঁকা নদী। যদিও এটি পারঘাটা নয়, তবু দিন রাত মাল বোঝাই ভড় চলে, দেখা যায় দুই একখানা জেলে ডিঙ্গী, পাড়ে বাঁধা থাকে দূরগামী যাত্রী-নৌকা, পাকশাক সেরে নেয় মাঝিরা।

অনেক খুঁজে বাঁকের মুখে পাওয়া গেল একখানা নৌকা। লগি পুঁতে বেঁধে রেখেছে কেউ। ঢেউয়ে ভাসছে, দুলছে—মাঝি-মাল্লা নাই।

দু'একবার ডাক দিয়েও সাড়া পাওয়া গেল না।

কাছে এসে পুলিন দেখল, নৌকার গলুইয়ে গুড়ি মেরে চুপচাপ

বসে আছে দু'জন লোক। কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। সম্ভবতঃ ডাকাতের কথা শুনেছে। ওদের কাছে ধনরত্ন নাই, শুধু নাম মাহাত্ম্যে কাঁপুনি থামছে না।

এই শোন, বেরিয়ে এস তোমরা। কোন ভয় নেই। আমরা ও-পারে যেতে চাই—পার করে দাও। টাকা পাবে।

অভয় পেয়েও ওদের জড়তা ঘুচল না।

দোহাই বাবু, টাকা চাইনে। পার করতে পারব না।

কেন?

দারোগা সায়েব শাইসে (শাসিয়ে) গেল, খবরদার নৌকো রাখবি নে ঘাটে। কাক্যেও পার করবি নে। যদি পার কর কাউকে—

হু। তাই বুঝি সবাই নৌকা নিয়ে পালিয়েছে?

পাইলেছে ত। ওনারা বলল—জানে বাঁচতে চাস ত—

আমাদেরও সেই কথা। জান আমাদের বাঁচাতেই হবে। আঘাটায় পার করে দাও। না হলে তোমাদের জানও—

দোহাই হুজুর, গোঁসা করো না। ওনারা যদি জানতে পারে—

কোন ভয় নেই, সে ব্যবস্থা আমরা করে যাব। তোমাদের হাত পা বেঁধে রেখে যাব নৌকায়। ওরা সন্দেহ করবে না। ধর এই দশটা টাকা—

না বাবু, টাকা লুবো না। আপনারা যে কি দরের ডাকাত—জানলাম যদি···দোহাই বাবু—টাকা লুবো না।

টাকা ওরা নিলে না। পার করে দেবার আগে প্রণাম করলে প্রত্যেককে। বলল, শালার পুলিশ দারোগাকে জব্দ করতে সাধ হয় না কি বাবু? হয়। কিন্তুক সুমুদ্দিরা যে দলে ভারি—হাল হাতিয়ার মেলাই। ইস্ত্রি পরিবার না থাকলে—কত ধানে কত চাল বুইজে দিতাম না?

নির্ব্বিঘ্নে পার হয়ে ওপারে পৌঁছল ওরা। দু'দল চলল দু'দিকে।

একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলে আর পারে। নদী এখানে বেশ খানিকটা চওড়া। দেখলে, ওপারে লাল পাগড়ীর দল ছুটোছুটি করছে পার হবার জন্য। কিন্তু নৌকা কোথায়? ওদেরই হুকুমে গঙ্গাবক্ষ তরণীশূন্য হয়েছে।

দশ জন গেল নদীয়ার দিকে, খালি হাতে। দু'জনকে নিয়ে পুলিন চলল পূর্ব্বস্থলীর দিকে।

একটু নিশ্চিন্ত হতেই ক্ষুধার আগুন জ্বলে উঠল। সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। মুখে কেউ কিছু বলল না বটে—সবাই বুঝল সে চাহনির ভাষা। দেহধর্ম্মের তাড়না উত্তেজনা দিয়ে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়।

পথের পাশে ছোট্ট একটি গ্রাম। বনের পথ থেকে একটু ঘুরে যেতে হয়। তা হোক, খাদ্য সঞ্চয় করে ছুনো বল ফিরে পেলে—অবশিষ্ট পথ অনায়াসে পাড়ি দেওয়া সহজ হবে।

বাঁ দিকের পথ ধরল ওরা। ওদের খাকির পোষাক, উস্কোখুস্কো চুল, পিঠের বোঝা, হাতের লাঠি, কালিপড়া মুখ আর কোটর গত চোখ—বিভীষিকা জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। তা ছাড়া ডাকাতির কথাটা মুখে মুখে রটে গিয়েছিল। দূর থেকে ওদের দেখে গ্রামের মানুষ যে যেদিকে পারল—ছুট দিল। এরা পৌঁছে দেখলে জন-হীন গ্রাম, শুধু গরু ছাগল হাঁস মুরগীগুলি নিরুদ্বিগ্নে চলাফেরা করছে, আর উনুন থেকে ধোঁয়া উঠছে। একখানা চালাঘরের দাওয়ায় পড়ে এক অথর্ব্ব বুড়ী কাতরাচ্ছে।

দোহাই বাবা ডাকাত, মোর জান নিসনে। দোহাই বাবা—

একটানা চীৎকার—বার বার অভয় দিয়েও থামান গেল না।

তখন সবাই মিলে খুঁজতে লাগল—কোথায় কি খাবার আছে। কাঁচা আনাজপাতি, শুকনো চাল কি কাজে লাগবে! চাষার ঘরে মোণ্ডা মেঠাই ত থাকে না, একটা কলসীতে পাওয়া গেল শুকনো চিঁড়ে। পাওয়া গেল খানিকটা গুড়। তাই পরম লাভ! সেই শুকনো চিঁড়ে ঢেলে নিলে পিঠ-ঝুলিতে। সামান্য গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে পুরলে মুখে। দাওয়ায় রেখে গেল গোটা পাঁচেক টাকা, চিঁড়ে গুড়ের দাম। জলখাবার সময় নেই, পিছনে পুলিশ আসছে না?

সন্ধ্যা হয় হয়—জঙ্গলে ঢুকল ওরা। আর একবার চেয়ে দেখল পিছনে। একদল লোক যেন এই দিকেই আসছে।

পুলিন বলল, এখনই অন্ধকার হবে, ভয় পেলে চলবে না। বনের মাঝ বরাবর গিয়ে আর একটা ফাইট দিতে হবে। মোটা গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে গুলি চালাব।

কথা মত তৈরী হয়ে দাঁড়াল গুঁড়ির আড়ালে। বনের মধ্যে ঘন অন্ধকার। ঝিঁঝি পোকার একটানা ডাক, খড়্‌খড়্—সরসর কি সব চলে বেড়াচ্ছে। সাপ কি? অনুসরণকারী মানুষের চেয়ে ওরা বেশী খল কি? বেশী হিংস্র?

একটু পরে ভারি ভারি বুটের আওয়াজ, শুকনো পাতা মাড়ানোর মচ মচ শব্দ। অন্ধকার ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসছে শব্দ। এক একবার টর্চ্চের আলো জ্বলছে। মানুষের গলার চাপা ধ্বনি। চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল নির্ব্বাক অরণ্যে।

ফায়ার।

দুম্—দুম্—দুম্। গুলির শব্দ, পাতাভাঙার শব্দ, জুতার শব্দ—কাতরানি গোঙানি সব মিলিয়ে অন্ধকার অরণ্যেরই বীভৎস আর্ত্তনাদ। সেই শব্দের সঙ্গে শাখাশ্রয়ী কয়েকটা কাক পাখা ঝাপটে চীৎকার সুরু করে দিলে—কা-কা-কা।

পাঁচ মিনিট পরে পূর্ব্বেকার শান্ত নিস্তব্ধ অরণ্য। গাছের আড়াল থেকে বার হয়ে পরস্পরের হাত চেপে ধরল ওরা, পারে পারে এগিয়ে গেল খানিকটা। ক্ষীণ একটু আলোর রেখা পড়ল বনভূমিতে। টর্চ্চটা জ্বলছে বটে, ব্যাটারীর আয়ু নিঃশেষিতপ্রায়। জ্বলছে মুমূর্ষু আলোয় হাতখানেক মাত্র পথ আবছা দেখা যায়। তাই যথেষ্ট। যতক্ষণ পারা যায় চলতে হবে, বনের অপর পারে পৌঁছতে হবে। জীবন মূল্যবান, তার চেয়েও মূল্যবান দেশ।

কড়া রোদ মুখে এসে পড়তেই পুলিনের ঘুম ভেঙে গেল। নরম বিছানার উপর শুয়ে কোন্ সংসারের স্বপ্ন দেখছে সে। স্বপ্নই ত। উপরে শরতের নীল আকাশ রৌদ্রে ঝলমল করছে, কয়েকটা চিল পাক্ খাচ্ছে তার তলায়। তারও নীচেয় বট-অশ্বত্থ-আম-জামের ঘন সবুজ পাতা রোদে মাখামাখি হয়ে ঝালর দোলাচ্ছে। বর্ষার অমৃত ধারা পান করে ওরা প্রচুর স্বাস্থ্য সঞ্চয় করছে, মুক্ত আকাশের তলায় ওদের খুসীর সীমা-পরিসীমা নাই, ওরা স্বাধীন।

স্বাধীন! বিদ্যুতের কষা দিয়ে কে যেন আঘাত করল পুলিনকে। স্বপ্ন জগৎ ফুরিয়ে গেল। চাইল পাশে, সঙ্গীরা অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ওদের পিঠ-ঝুলিগুলি পাশে এলিয়ে পড়েছে, শিথিল হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে পিস্তল। কিন্তু এ কোথায় এসেছে ওরা? চারিদিকে শুধু বিচালীর স্তূপ। একটা খামার বাড়ীই হবে হয়ত। মাঝখানের একটা বিচালী স্তূপে একরকম আত্মগোপন করেই রাত্রিতে পেতেছে শয্যা। এখানে কেমন করে এসেছে? বনের মাঝখানে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ মনে পড়ল। পুলিসরা পাছু হটে বন ছেড়ে গেল, ওরাও আয়ুক্ষীণ টর্চ জ্বালিয়ে বিপরীত দিকের বনসীমায় পৌঁছবার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ ধরে চলল ওরা। মাথার উপরে গাছের শাখাপত্রের জাল—আকাশ দেখা যাচ্ছিল না। কত রাত, কে জানে! সঙ্গে ঘড়ি ছিল না তো। বনের মধ্যে চুপ করে বসে থাকাও চলে না—চলতে চলতে যেখানে হোক পৌঁছতে হবে। না হয় সারারাতই চলবে। চলতে যে হবেই। থামা মানেই আত্মসমর্পণ, মৃত্যু। মৃত্যুর চেয়ে বেশী ব্রতচ্যুতি, কলঙ্ক, অপযশ। সুতরাং পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছিল সবাই। চলতে চলতে এক সময়ে মাথার উপর তারা ঝলমলে আকাশ দেখা গেল, দেখা গেল সপ্তর্ষির নীচেয় ম্লানজ্যোতি ধ্রুবতারাকে। দিকের নিশানা মিলল। কিন্তু দিক্ নির্ণয় করেই বা কি হবে এই রাত্রিতে! একটু বিশ্রাম চাই।

বন শেষ হ'ল, মাঠ পড়ল। লোকালয় দূরে। ভালই হ'ল। একটু চলে পাওয়া গেল এই বাঁশের বেড়াঘেরা খামার-বাড়ীটা। আউশ ধান মাড়াই হয়ে এক ধারে সারি সারি মরাইয়ে জমা হচ্ছে। অন্য ধারে স্তূপীভূত হয়েছে বিচালী। চমৎকার আশ্রয়—রাজকীয় শয্যা। এমন আরাম করে শোওয়া কতদিন যে ঘটে নি! ব্যস, শয়ন, নিদ্রা এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃতি।

ধড়মড় করে উঠে বসল পুলিন—সঙ্গীদের ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিল। বেশ খানিকটা বেলাই হয়েছে, পথে বার হওয়া মুশকিল। বিশেষ করে এই বেশে—যা সরল গ্রামবাসীদেরও সন্দেহাকুল করে তুলবে। এ বেশ ত্যাগ করতে না পারলে নিস্তার নাই।

গ্রামের মধ্যে না ঢুকে ঝোপের পাশে পাশে চলতে লাগল। সৌভাগ্যক্রমে সামনেই পড়ল এক ধোপা বাড়ী। কাপড়ের প্রকাণ্ড দুটো গাঁঠরি সবে গাধার পিঠে চাপিয়েছে রজক—ওরা এসে সামনে দাঁড়াল।

চমকে উঠল রজক, কে তোমরা?

কাপড় দাও, জামা দাও।

খবরদার, টুঁ-শব্দ করেছ কি—পিস্তল উঁচিয়ে ধরল পুলিন।

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল রজক। রজক-পত্নীও বাঙনিষ্পত্তি করল না। ছোট ছেলেমেয়েগুলো দাওয়ায় বসে পাথরের খোরায় করে পান্তাভাত খাচ্ছিল, ওরাও চুপ করে রইল।

যে যার গায়ের মাপে জামা বেছে নিল। বেছে নিল ধুতি। ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী আর শান্তিপুরী জরি-পাড় এক শ' সুতোর মিহি ধুতি। খাকির পোশাক পুরলে পিঠ-ঝুলিতে, ঝুলি হ'ল তুণ্ডিল তনু শ্রীবিনায়ক।

এক জন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে পান্তাভাত ভর্ত্তি খোরাটার পানে চেয়ে দেখল। কিন্তু কচি ছেলের মুখের গ্রাস···এগিয়ে গেল ওরা—দশ টাকার দশখানা নোট কাপড়ের গাঁঠরির উপর রেখে।

পোশাক তো বদলানো হ'ল, এবার খাবার চেষ্টা দেখলে হয় না? এক জন বলল।

এ গ্রামে নয়, পাশের গ্রামে চল। ধোপা কি আর ভালো মানুষের মত চুপ করে থাকবে?

পাশের গ্রামে এক ময়রার দোকানের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল সাত জনে। কি আছে মিষ্টি আন তো দোকানী ভাই।

ওদের মুখের পানে চেয়ে দোকানীর মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, কাল এক খোলা রসগোল্লা তৈরি করেছি, যত ইচ্ছে খেয়ে নাও বাবুরা।

যত ইচ্ছে খাবই তো। দামটা—

দোহাই বাবু, ওইটি বলো না। দাম আমি নেব না।

কেন দোকানী ভাই? তোমার লোকসান—

লোকসান! আপনাদের বুঝি লোকসান হয় নি কিছু? আপনারা যে—

জান তুমি—আমরা কে?

দোকানীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, পরমুহূর্ত্তে কালো মেঘে ঢাকা গেল। বলল, না, না, কিছুই জানি না। খাবে তো তাড়াতাড়ি কর। মুখ তোমাদের শুকিয়ে গেছে—

পুলিন চুপি চুপি বলল সঙ্গীদের, খেয়েই নেয়া যাক। পোশাক বদলেও পরিচয় বদলানো যাচ্ছে না। কথায় বলে—কাকের মুখে বার্ত্তা রটে, এও তাই।

আহার-পর্ব্ব মাঝ বরাবর পৌঁছেছে—সরকারী তক্‌মাধারী লগুড়পানি এক কালো মূর্ত্তির আবির্ভাব।

শুনছেন বাবুরা, বড়বাবু এত্তেলা পেটিয়েছে, আস্তেজ্ঞে হোক।

কে তোমার বড়বাবু?

থানার দারোগা বাবু। চলেন।

কেন, আমরা কি তার হুকুমের চাকর? যা তোর বড়বাবুকে আসতে বল এখানে।

লাঠি ঠুকে চৌকিদার বলল, তকরার করবা না বাবু, লক্ষ্মী ছেলের মত আমার সঙ্গে এস। নাইলে—, বলে আর এক বার

পিকিঙে ভারতীয় পার্লামেণ্টারি মিশনের সদস্যদের অভ্যর্থনারত চীনা প্রজাতন্ত্রের 'নেশন্যাল পিপলস কংগ্রেস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি'র চেয়ারম্যান লিউ শাও-চি

নিউ দিল্লীতে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যদের সহিত ড, যোস মাজা (ডানদিক হইতে তৃতীয়)

পুণা 'নেশন্যাল কেমিক্যাল লেবরেটারি'তে ইথিওপিয়ার সমাট হাইলে সেলাসি

কাঠমাণ্ডুর সিং দরবারে প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক অভিনন্দনপত্র গ্রহণ

লাঠি ঠুকলে। যা—যা—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে কোথাকার!

কি! রুখে দাঁড়াল চৌকিদার। কিন্তু পরমুহূর্তেই ল্যাজ-গুটানো কুকুরের মত ছুটে পালাল। পুলিনের হাতে ফণা-উঁচু সাপের মত পিস্তলটা চক্‌চক্ করছে।

থানা কতদূর এখান থেকে?

দোকানী বলল, তা আজ্ঞে—কোশটাক হবে।

বেশ। তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করে জল পান করল ওরা। একখানা নোট বার করতেই দোকানী হাত জোড় করে কাঁদ-কাঁদ মুখে বলল, ছি-চরণে অপরাধী করবেন না বাবু, এমনিতে তো পাপের শেষ নেই।

আচ্ছা, জমা রইল এটা। যদি কোন দিন সুযোগ আসে—কথা শেষ না করে ওরা পথ ধরল।

চলতে লাগল গ্রাম বাঁচিয়ে, মাঠের আল ধরে, ঝোপঝাড়ের কোল ঘেঁষে—মানুষ-জনের সংস্রব এড়িয়ে। বেশ বুঝেছে—অপরিচিত মানুষ দলভারি হয়ে অজানা গাঁয়ে ঢুকলেই সন্দেহ আর কৌতূহল বাড়ায় মানুষের। সাত জন মানুষ—দলটা ভারীই তো।

দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। একটা বিলের ধারে পৌঁছল ওরা। বিলে দু'চারখানা ডিঙ্গি-নৌকা বাঁধা রয়েছে, ছইওয়ালা পারাণি নৌকাও রয়েছে একখানা। বাঁশের লগি পুঁতে—তাতে নৌকো বেঁধে মাঝিরা গেছে ঘরে—এখনই ফিরে আসবে খাওয়া-দাওয়া সেরে। একটু দূরে হিস হিস শব্দ করে কাঠের পাটায় কাপড় আছড়াচ্ছে ধোপারা। মাথায় ওদের চাদরের ফেটি বাঁধা। ধোপানী ক্ষার-সিদ্ধ হাঁড়িটায় কাপড় ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে একটা বাখারি দিয়ে। ঢালু জমিতে চোরকাঁটার উপর মেলে দেওয়া রয়েছে রঙ-বেরঙের শাড়ী, ধুতি জামা, পা-জামা, লুঙ্গি। খালের ধারে একটা শাখাঘন অশ্বত্থ গাছকে ঘিরে খানিকটা ঝোপের সৃষ্টি হয়েছে—আসশ্যাওড়া, কালকাসুন্দা, ভাঁট, নোনা-আতার ঝোপ। তারই আড়ালে বসে ওরা চারদিক দেখছিল। ভরা পেট, শীতল ছায়া, ঝিরঝিরে হাওয়া—কখন তন্দ্রার আবেশ এসেছে, কে জানে।

তন্দ্রা ভাঙলে দেখলে—ছায়া গাঢ় হয়েছে, সন্ধ্যা হয় হয়।

ওই ছইওলা নৌকোখানা চাই। খাল নিশ্চয় গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। এদিকে গঙ্গা ছাড়া ত কোন নদী নেই। আমরা উত্তর দিকে পাড়ি দেব, বারাসাত পৌঁছব ঐ দিক ধরে গেলে। পুলিন বলল।

নৌকখানা চুরি করবেন? একটি ছেলে বলল।

উপায় কি? চোর বদনাম নতুন হবে না। দেশের লোকের কাছে—বিদেশী প্রভুদের কাছে আমরা খুনে, ডাকাত, লুঠেরা। নৌকখানাও না হয় কর্জ্জের খাতে জমা থাকবে।

বেশ, তবে দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা করা যাক।

না, নিশুতি হোক রাত—ঘুমিয়ে পড়ুক পৃথিবী। রাত-জাগা পাখীদের সঙ্গে আমরা পাল্লা দিয়ে ছুটব।

তাই হ'ল। সন্ধ্যায় একটানা ঝিঁঝির ডাক থামল, দুই প্রহরের শেয়ালরা ডেকে গেল, বিলের কাছে দূরে দুই একটি আলো চলাচল করছিল—তাও মিলিয়ে গেল ক্রমশঃ। অন্ধকার অবশ্য ততটা গাঢ় হয় নি, খোলামেলা মাঠে তারাভরা আকাশের নীচের খানিকটা তরল হয়েই থাকে ত।

ওরা উঠল। জলের কিনারায় এল। পায়ের তলায় চক্ চক্ করছে কালো জল—তার উপর তারার চুমকি-বসান ঝিক্‌মিকে একখানি পাতলা ওড়না পেতে কোন নেপথ্যচারিণী অভিসারিকা অপেক্ষা করছে—কে জানে। সে পথে না গিয়ে উপায় কি?

সকাল হ'ল। অজানা জায়গা। চওড়া নদী, গঙ্গাতে পড়েছে নৌকা। এক পাড়ে উঁচু জমি, অপর পারে ঢালু ক্ষেত। প্রাতঃ-স্নানার্থী কোমরজলে দাঁড়িয়ে স্তোত্র পাঠ করছে; লাঙ্গল কাঁধে হেঁট হেঁট শব্দে বলদ তাড়িয়ে মাঠে চলেছে চাষা; কোন চাষা-বউ মাটির কলসীতে জল ভরছে, কেউ বা কাঠের পাটায় করে এনেছে ক্ষারে সিদ্ধ কাপড় কাঁথার রাশি; উলঙ্গ ছেলে-মেয়েরা চরভূমিতে ছুটছে—লাফাচ্ছে—খেলা করছে। সুস্থ সহজ জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে নদীর দু'পাশে। নদীতেও শান্ত একটি প্রবাহ, মিষ্টি একটি সুর।

কিন্তু নৌকার জীবন এত স্বচ্ছন্দ নয়। দাঁড়ি আর মাঝি ছাড়া অন্য সকলে ছইয়ের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে। অন্তঃপুরের মর্য্যাদা সৃষ্টি করে ছইয়ের মুখে টাঙিয়ে দিয়েছে একখানি কাপড়।

এমনি করে একদিন কাটল নির্ব্বিঘ্নে, কাটল আরও একটা রাত্রি। শুধু জল আর দু' এক মুঠো চিঁড়ে খেয়ে কাটল পুরা একটা দিন আর রাত্রি। গ্রামে ঢুকে আহার্য্য সংগ্রহের চেষ্টা করলে না কেউ।

দ্বিতীয় দিনও হয় ত এমনি কাটত, কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে আসা হয়েছে, আর নদীর এধারে গ্রামও বেশ খানিকটা দূরে। ততটা বিপদের ভয় নেই।

ওরা ঠিক করল—চাল ডাল যোগাড় করে নদীর ধারেই পাকাদি করবে। আরও দু' তিন দিন হয় ত কাটবে নৌকায়—নদীর কিনারে পড়বে গ্রাম—পাকশাকের সুবিধা হবে না।

নৌকা কূলে ভিড়িয়ে একজন স্নানার্থীকে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ গ্রাম এটা?

শান্তিপুর।

যাক—অনেকখানি পথ আসা গেছে তা হলে। কোথায় খড়ে নদী ধরে অনেক এগিয়ে বেথুয়া ডাহারির কাছে মীরপুর গ্রামে ঘটনা ঘটল, আর কোথায় গঙ্গানদীর তীরে শান্তিপুর। অনেকখানি পথ—পাকশাক করে—এ বেলাটি পুরো বিশ্রাম নেওয়া যাবে।

দু'জন মাইলখানেক মাঠ ভেঙে গ্রামে গেল—চাল ডাল হাঁড়ি আর আনাজপাতি আনবে—আর সবাই মিলে তৈরি করল উনুন, যোগাড় করল কাঠ, যথা সময়ে উনুন ধরিয়ে ডাল চাপিয়ে দিল। ডাল নামিয়ে চাপাল ভাত। ক্রমে টগবগ করে ভাত ফুটতে লাগল

সোদা সোদা মিষ্টি গন্ধ বার হতে লাগল, নাড়ীতে নাড়ীতে পাক দিয়ে ক্ষুধাকে করল তীব্র।

শীগগির একটা ডুব দিয়ে নেয়ে নিই চল।

ভাত বোধ হয় হয়ে গেছে, হাঁড়িটা নামাও।

আর একফুট হবে—এখনও মাঝ রয়েছে। কাঠি দিয়ে দু' চারটি ভাত তুলে টিপে দেখল একটি ছেলে।

মানে—আরও আধ ঘণ্টা ত? অধৈর্য্য কণ্ঠের স্বর।

না, না, বড়জোর দশ মিনিট।

ডালটা কিন্তু তোফা হয়েছে!

এই পেটুক—চাখছ ত?

সত্যি বলছি—মাত্র একটুখানি—

হঠাৎ ঝুপ করে একটা শব্দ হ'ল। দু'জন লোক হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল নৌকায়।

সবাই খাড়া হয়ে দাঁড়াল। কি ব্যাপার? স্নানঘাট থেকে খানিকটা তফাতে একটা বাঁকের মুখে ছিল নৌকাখানা, সেইখানেই যেন গোলমাল। সবাই ছুটল।

তার পর আর কেউ ফিরে এল না। হাঁড়িতে টগবগ করে ফুটতে লাগল ভাত, সরা ঢাকা ডাল তেমনি পড়ে রইল—কতকগুলো কাক এসে জমল সেখানে। নৌকা তখন কূল ছেড়ে মাঝ-গঙ্গায় ভেসে চলেছে।

আরও এগিয়ে গেল নৌকা। স্নানঘাট ছেড়ে অনেক দূরে—প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। একটা মর্ম্মভেদী চীৎকার উঠল, ঝপাং করে জলে ভারী দ্রব্য পতনের শব্দ হ'ল। সে শব্দ কারও কানে পৌঁছল না। মাথার উপরে অপরাহ্ণ আকাশে কতকগুলি চিল পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছিল—তারাই যা শুনল—যা দেখল।

নৌকার উপর আর একজনের কাকুতি আর অশ্রু তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

দোহাই বাবুরা—আমাকে মারবেন না। আমি আপনাদের স্বজাত, বাঙালী। আমার ছেলেমেয়ে আছে, বউ আছে। সংসারে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই উপার্জ্জনের। কি করব, পুলিশের চাকরি—হেড কনেষ্টবলের হুকুম, তাই আপনাদের নৌকোয় লাফিয়ে পড়েছিলাম।

কি করে জানলি যে আমরা ডাকাত?

থানায় খবর পৌঁছেছিল পরশু। আপনারা হাঁড়ি কিনছিলেন, চাল-ডাল আনাজ কিনছিলেন—হেড কনেষ্টবল রাম ভরোসে বলল, দিনকাল খারাপ—লোক দুটোর ওপর নজর রাখতে হবে। মীরপুরে একটি জবর ডাকাতি হয়েছে, অনেক মানুষ খুন করে ডাকাতরা গায়েব হয়েছে—যদি ধরতে পারি তা হলে একটি প্রমোশন নির্ঘাত পেয়ে যাব। চল, ওদের ফলো করি। তার আগে থানায় একটা খবর পাঠিয়ে দিই। থানায় খবর পাঠিয়ে ও বাবুদের পিছু পিছু এল।

হু, দেখলে ত হেড কনেষ্টবল প্রমোশন নিয়ে কোন উর্দ্ধ-লোকে গেল। তোমাকেও—

রক্তমাখা ছোরাখানা রোদে ঝলসে উঠল।

দোহাই বাবু, জানে মারবেন না। পা জড়িয়ে ধরল লোকটা।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা। অবশেষে পুলিন বলল, তোমাকে বাঁচাতে পারি এক সর্ত্তে।

যা বলবেন, তাই করব বাবু।

আমরা নদীর পথ চিনি না, কলকাতার দিকে যাব, পথ দেখিয়ে দিতে হবে।

দেখ বাবু। যা বলবেন—তাই করব, আমি আপনাদের গোলাম।

ব্যস, ব্যস, চুপ করে বস।

নৌকা তখন বয়রা ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা এগিয়েছে। আর খানিকটা গেলেই বলাগড়ের ষ্টীমারঘাট।

কনেষ্টবল বলল, এদিক দিয়েও যাওয়া যায়, একটু ঘুর হবে, আর একটা পথ আছে সোজা—খানিকটা উজিয়ে যেতে হবে।

নৌকার মুখ ঘুরল।

তখন অন্ধকার হয়ে আসছে—জল স্থল অন্ধকারে মুছে যাচ্ছে। দিক সম্বন্ধে কারও কোন জ্ঞান ছিল না। উজান গঙ্গার স্রোত ঠেলে গেলে যে বারাসতে পৌঁছানো যাবে না—সেটা কুড়ি-পঁচিশ বছরের ছেলেদের জানা ছিল না। বইয়ের মারফত রাঢ় বঙ্গের সঙ্গে যদি বা কিঞ্চিৎ পরিচয় ওদের ছিল, নদীর গতি-প্রকৃতি ও গ্রাম শহরের রীতিনীতি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে ওরা ছিল নিতান্তই অনভিজ্ঞ।

অনেকক্ষণ চলার পর হঠাৎ তীর-ভূমিতে অনেকগুলি আলো দেখা গেল। কোন্ গ্রাম এটা? শহর কি? এদিকে নদীর উপরেই তেমন শহরের কথা তো জানা ছিল না। বাঁশবেড়ে, ত্রিবেণী, হুগলীর যে সব জায়গার ধারে ধারে কলকারখানা বা গঞ্জ বাজার রয়েছে, তারাই সন্ধ্যায় উজ্জ্বল আলোর মালা গলায় ঝুলিয়ে এমনি করে হেসে ওঠে। সেগুলি ত অনেক দূরে। এ কোথায় এলাম আমরা?

কনেষ্টবল বলল, একটা গঞ্জ। এখান থেকে গাড়ী করেও কলকাতায় যেতে পারবেন।

কোন্ গঞ্জ, কি নাম?

আজ্ঞে এই গিয়ে নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।

ওকে আমতা আমতা করতে দেখে ওদের সন্দেহ হ'ল। পুলিন বলল, এদিকে ত একটিই গঞ্জ আছে—কালনার গঞ্জ। সেটা গঙ্গার উপরেই, আসবার সময় দেখেছি। সেই দিকেই চলেছি কি?

কালনার গঞ্জ! শুকনো গলায় বিস্ময় ফুটল কনেষ্টবলের।

নাম শোন নি, নয়? বিদ্রূপে শাণিত হয়ে উঠল পুলিনের কণ্ঠ। আচ্ছা শোনাচ্ছি।

পুলিন শক্ত করে চেপে ধরল ওর হাত। বলল, নৌকা ফেরাও।

অপর পার ঘেঁষে চলল নৌকা। একটা চাপা চীৎকার-ধ্বনি উঠতে-না-উঠতে মিলিয়ে গেল।

পুলিন বলল, টর্চ জ্বাল তো। এক টুকরো কাগজ নিয়ে লেখ বড় বড় হরপে, 'বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি'। কি দিয়ে লিখবে? ছুরি দিয়ে হাত চিরে রক্ত বার করে কাঠি দিয়ে লেখ। কালনায় পৌঁছলে সবটুকু রক্তই তো খরচ হয়ে যেত—পুলিশের বড় ঘাটি যে ওটা।

আরও খানিকটা উজিয়ে নৌকা এসে ঠেকল পাড়ে। তীরের গায়ে ঘন জঙ্গল। প্রথম রাতের মেটে জ্যোৎস্নায় যেটুকু দেখা গেল তাতে বিস্তৃত অরণ্যের রূপই ফুটে উঠল।

সবাই নেমে পড়ল। পিঠ-ঝুলি, লাঠি, মালপত্তর আর কনেষ্ট-বলকে নিয়ে। লোকটার মুখ বাঁধা, চীৎকারের ক্ষমতা নাই।

নৌকো থাকবে এখানে? লগিতে বাঁধব কি?

না। এদিকে ফিরে আসব না আমরা। আর জলপথ নয়—ডাঙ্গা পথে যে করে হোক পৌঁছবই। নৌকো থেকে বর্শিটা খুলে নাও।

বন শেষ হ'ল—রাত্রিও তখন শেষ হয়েছে। ওরা একটা পাড়াগাঁয়ের কাছাকাছি এসেছে। একটা চত্বর-বাঁধানো ঝাকড়া বকুলতলায় বসেছে। বকুলগাছটা গ্রামেরই প্রান্তে। ওরা শুয়ে পড়ল চত্বরে। এখনও ঘোর লেগে রয়েছে আকাশে, সামান্যক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া চলবে।

বেশীক্ষণ বিশ্রাম নেয় নি ওরা—সকাল হতেই আবার চলতে সুরু করেছে। অনেকক্ষণ চলে চলে একটা চায়ের দোকান পেল। দোকানীর কাছে শুনলে, এটা নেহাত অজ পাড়াগাঁ নয়—মফস্বলের শহরের গোত্রে ফেলা যায় একে। শহরের অনেক সুখ-সুবিধা এখানে রয়েছে। ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়—অদূরে মফস্বল শহরে কোর্ট খোলা থাকলে মোটর বাসও যাতায়াত করে। তার পর জংশন-ষ্টেশনে রেলগাড়ী···কেমন করে বারাসাত পৌঁছেছিল ওরা সে কাহিনী কেউ জানে না, কেমন করে আন্দামানে পৌঁছেছিল সে খবর পৃথিবীময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল।

আন্দামানে কেটেছিল বারো বছর।

তার পর? ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে—ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির প্রশ্নটা আজ তুচ্ছ হয়ে গেছে।*

* বাংলার বিপ্লবী-যুগের একটি সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে।

ভুলে গেছি তোমা ভগবান

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ভুলে গেছি তোমা ভগবান!
চাতকচিত্ত চাহিছে নিত্য অর্থবিত্ত যশ-মান।
কাঞ্চন বলি' মাথে নিই তুলি'
ভুল করি' প্রভু, ছাই আর ধূলি,
সংসার-সুখ—মৃগতৃষ্ণিকা—
তাই পেতে শুধু কাঁদে প্রাণ।

ধরণীর কলকোলাহল,—
তারি মাঝে হিয়া মরিছে ধুঁকিয়া দিবস রজনী অবিরল।
কোথায় শান্তি, স্নিগ্ধ নিভৃতি,
পরম তৃপ্তি, স্তব্ধ বিরতি?
জীবনমরণ সাথী তুমি কোথা
ধ্রুবতারাসম অচপল।

ভুলে আছি তোমা দয়াময়!
হাসিছ কি তুমি জীবনযুদ্ধে হেরিয়া আমার পরাজয়?
গগনচুম্বী মোর অহমিকা
মেলি' দিবারাতি লেলিহান শিখা
ধায় গ্রাসিবারে,—ওগো তুমি কই?
দাও প্রসন্ন বরাভয়!

দক্ষিণ দেশে

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

উত্তরের মানুষ আমরা দক্ষিণ দেশের গল্প যা শুনেছি, যা পড়েছি তার সঙ্গে সেখানে দেখেছি যা তার অধিকাংশই মেলে নি। তবে সেজন্যে মনে আপশোষ জাগে নি, আনন্দেরই উদয় হয়েছিল। কোন দেশের যে চিত্র চলার পথে পথিকের মানসপটে আঁকা হয়ে যায় তার সবটুকু ভাষায় রূপ দেওয়া যায় না। সেজন্যে দক্ষিণ দিকে যত এগিয়েছি ততই মনে হয়েছে, আসা সার্থক হ'ল। আমার দেশের কেবল উত্তরাঞ্চলই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত নয় দক্ষিণের অরণ্যে ও শৈলে, প্রান্তরে ও ক্ষেত্রে, নদী ও সমুদ্রে অশেষ সৌন্দর্য্য ঢালা রয়েছে যার তুলনা উত্তরের কোথাও নেই। এ সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে দক্ষিণের মানুষগুলির অতিথিবৎসলতা, সৌজন্য ও শৃঙ্খলা-বোধ। এদিকে না এলে উপলব্ধি করা যায় না, আমার দেশ কত মহান্‌, কত বিচিত্র, কত গৌরবের!

তখন ভরা পৌষ। শীতের কনকনে হাওয়ায় উত্তরের মানুষ জড়সড়। আমরাও শীতবস্ত্র জড়িয়ে এক দিন সন্ধ্যায় রওনা হলাম দক্ষিণ দেশে, কেবল ভ্রমণোদ্দেশ্যে নয়। তা হলে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে প্রথম শ্রেণীর আরামে মাদ্রাজ অবধি যাওয়া সম্ভব হ'ত না। মাদ্রাজে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। তাই প্রথম গন্তব্যস্থল ছিল মাদ্রাজ। একে শীত, তার উপর অন্ধকার রাত্রি ও ইঞ্জিনের কয়লার গুঁড়ো, তাই কামরার জানালা সন্ধ্যায় সেই যে বন্ধ করা হ'ল তা সারা রাত্রির মধ্যে একবারও খোলা হ'ল না। কেবল সঙ্গীদের পরস্পরের প্রতি এই অনুরোধ রইল যে, চিল্কা হ্রদের তীর দিয়ে গাড়ি যখন যাবে তখন ঘুমিয়ে পড়লেও যেন ডেকে দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকেই পরস্পরকে আশ্বাস দিলাম, "নিশ্চয়ই। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ভোগের আনন্দে অংশীদার থাকলে তা আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। অতএব দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সকলে এক সঙ্গে চিল্কার জ্যোৎস্না-মাখা সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যাবে।" এত আগ্রহের কারণ, আমরা কেউই চিল্কা দেখি নি। এতদিন দৌড় ছিল খুরদারোডের পথ ধরে পুরী পর্যন্ত। তারপর গল্পে গল্পে দীর্ঘ পথ পার হয়ে যেতে লাগলাম। রাত্রিও বেশ গভীর হতে লাগল। সকলেই জেগে আছি চিল্কার আশায় এবং একে একে সকলেই শুয়ে পড়তে লাগলাম নিদ্রার উদ্দেশ্যে নয়, শরীরটাকে মাত্র একটুখানির জন্যে আরাম দিতে। তার পর ক্লান্তি দূর করে যথাসময়ে আবার উঠে বসে সার্সির মাঝ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি রাত্রির অন্ধকার সরিয়ে দিনের আলো ফুটছে! গোটা উড়িষ্যার সীমানা ছাড়িয়ে আমরা অন্ধ্রের পথ ধরে হু হু করে চলেছি। চিল্কা পড়ে আছে পিছনে, অনেক দূরে। বুঝলাম, সকলেই মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। না হলে চিল্কার তীর দিয়ে যাবার কালে কারও ঘুম ভাঙল না কেন?

কিন্তু সঙ্গীদের এক জন বললেন, "আমি চিল্কা দেখেছি"।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে কিছুটা উত্তেজনার সঙ্গে প্রশ্ন হ'ল, "কথা ছিল কি? যা হোক সকালবেলা তর্কাতর্কির দরকার নেই। কি রকম দেখলে বল। কান দিয়েই দেখা যাক।"

"দেখতে ঠিক পাই নি। তবে শব্দ শুনেছি।"

"কি রকম?" সকলেই কৌতূহলী হয়ে উঠল।

"পার হবার সময় একটা ঝম ঝম শব্দ হ'ল। ঐটুকুই যা টের পেলাম। বাকি কিছুই তেমন চোখে পড়ল না। আচ্ছা চিল্কার উপর ত ব্রিজ আছে, না?"

অতঃপর মনের খেদ ঘুচে গিয়ে আমাদের দিন আরম্ভ হ'ল হাস্যরোলের মধ্য দিয়ে। দেখতে দেখতে পূবে শৈলশিরে তরল সোনা ছড়িয়ে গেল। আর সেই আলোয় উত্তরের স্বপ্ন সহসা হ'ল অদৃশ্য, চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'ল এক নূতন দেশ। উত্তরের সেই গাছপালা, সেই গ্রাম, সেই ক্ষেত-প্রান্তর, সেই নদী-জলাশয় যতদূর চোখ যায় কোথাও নেই। সে শীতও সঙ্গে আসতে আসতে পথের কোথায় থমকে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে শীতবস্ত্রের প্রয়োজনীয়তাও গেছে ফুরিয়ে। তার পর থেকে যত অগ্রসর হই ততই শীতবস্ত্রগুলি গা থেকে একে একে খুলতে খুলতে কেবল ধুতি ও লংক্লথের পাঞ্জাবীতে এসে ঠেকল। শেষে এক সময়ে চৈতন্য হ'ল যে, আমরা ত চলেছি পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের দিকে যেখানে রবিকর প্রখর, উদ্ভিদ্‌জগৎও উত্তরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে উত্তর-ভারতের মত জলভরা গভীর নদী নেই, নেই সেই গগনচুম্বী তুষার-কিরীটী পর্ব্বতমালা, কোন অঞ্চল মরুময়ও নয়, প্রাণীজগতেও আছে পার্থক্য। মানুষগুলির সঙ্গেও পোশাকে, খাদ্যে, আচার-ব্যবহারে, ভাষা ও বর্ণমালায় আমাদের উত্তরের মানুষদের মিল নেই এবং থাকা সম্ভবও নয়।

না থাক ক্ষতি নেই বরং লাভই হয়েছে। মিল থাকলে কি দেখতে পেতাম আমাদের পথের দুটি পাশ জুড়ে এমন মনোরম বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য? দেখতে পেলাম, তাল-নারিকেলের গাঢ় সবুজ বন, বনের পর বন। তার ফাঁকে ফাঁকে ধানক্ষেতের জমাট হরিৎ রঙ ঢালা। সেই বনরাজি ও ক্ষেতের সীমান্তে দক্ষিণে ও বামে পূর্ব্বঘাট শৈলমালার বিচিত্রাকার অন্তহীন প্রাচীর। শৈলগুলি উত্তরের মত নিবিড় জঙ্গলময় নয়। কোন কোন শৈলশিরে কতকগুলি তালগাছ এমন ভাবে হেলে রয়েছে যেন দুর্গপ্রাকারের উপর দিয়ে ছুটছে এক দল অশ্বারোহী।

আবার কোন কোন শৈলশিরে এক একটি তালবৃক্ষ প্রহরীর মত খাড়া হয়ে যেন দূর দিগন্তে তাকিয়ে আছে। স্থানে স্থানে নিবিড় ঝাউবন। স্পষ্টতঃই বোঝা যেতে লাগল, সেগুলি পরিকল্পনামত রোপিত হয়েছে। ঐ সঙ্গে আমাদের চিরপরিচিত বাবলা ও বাবলা-জাতীয় একরকমের কাঁটাওয়ালা গাছও দেখা যেতে লাগল প্রচুর। দক্ষিণে কয়লার খনি নেই। লোকে ঝাউ ও ঐ সকল গাছই জ্বালানিরূপে ব্যবহার করে। "রামেশ্বরম" অঞ্চলে এই কাঁটাগাছ-গুলোকে লোকে বলে "তার"। ঐ অঞ্চলে বালির রাজ্যে এই গাছের ঘন অরণ্য বিস্তৃত।

পথের দু'পাশে খুঁজতে লাগলাম ছায়াশীতল গ্রাম, বাঁশবন, পদ্ম বা শালুকভরা পুষ্করিণী ও দীঘি যেগুলি আমাদের বাংলাদেশে রেলপথের দু'পাশের নয়নভোলানো কোমল শোভা এবং উত্তর-দেশেও নিতান্ত বিরল নয়। কিন্তু তার চিহ্নও চোখে পড়ল না। নারিকেল বা তালপাতার ছাওয়া চূড়াকার চাল ও মাটির পুরু দেয়াল দেওয়া যে দু-একখানি কুঁড়ে চোখে পড়েই বেগে পিছনে সরে যেতে লাগল, সেগুলিকে মনে হ'ল পরিত্যক্ত। কোথাও মানুষজন দেখি না। দেখি কেবল ক্ষেত, ক্ষেতের পর ক্ষেত। সেগুলিকে কোথাও কোথাও বেষ্টন করে রয়েছে তাল-নারিকেলের ঘনসন্নিবিষ্ট সারি। কোথাও তরঙ্গময় হ্রদসদৃশ সুবিশাল জলাশয়। তার কূলে জলচর পাখী। এই দৃশ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রখর রৌদ্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া যেতে লাগল কৃষাণ-কৃষাণীর।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পৌষ মাসেই চলন্ত গাড়িতে উদয় হ'ল গ্রীষ্মের সঙ্গী ঘর্মের, তবে ললাটে নয়। এবার থেকে বিশেষ করে মাঝারিগোছের রেল ষ্টেশনের কাছাকাছি দেখি কলকারখানা। তার একধারে তালপাতায় ছাওয়া, সুপরিচিত, অপরিচ্ছন্ন শ্রমিক-বস্তি, বড় বড় বিচালির পালা। কোথাও বা ধানম ড়াই হচ্ছে, রাস্তা-পথে চলেছে বড় বড় চাকা লাগানো কাঠের ছোট ছোট গোযান। গরুগুলির শিঙের বড় বাহার—দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই এই রকম দেখেছি। শিং কতকটা হরিণের শিঙের মত দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণাগ্র। অগ্রভাগে পিতলের আংটা বসানো। কয়োটিও অনেকটা হরিণের মত দীর্ঘাকার।

অবশেষে বেলা সাড়ে দশটার পর পৌঁছলাম দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেল-পথের শেষ ষ্টেশন সমুদ্রতীরের বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস, শৈলসঙ্কুল ওয়ালটেয়ারে। স্থানীয় মানুষগুলির বর্ণ, পোশাক ও ভাষায় বোঝা যেতে লাগল আমরা দক্ষিণ দেশে পৌঁছেছি। রেলষ্টেশন, তার উপর বড় রেলষ্টেশন বলে স্থানীয় লোকেরা অর্থার্জ্জনের প্রয়োজনে সামান্য হিন্দী ও ইংরেজী শিখে রেখেছে। আমাদের বাংলা ভাষা দক্ষিণে অধম না হলেও একেবারে অচল। আমরা হিন্দী ও ইংরেজীর মাধ্যমে কাজ চালাতে লাগলাম। সে কাজও দৈহিক ও আহার্য্য সংক্রান্ত। উত্তরের আটা-ময়দা ও সরিষার তেল আমাদের চাল ও নারিকেল তেলের কৃপায় পরিত্যাগ করে অদৃশ্য। সে রকমারি ডালও নেই। আছে কলাইয়ের প্রাধান্য। সন্দেশ-রসগোল্লা ও নিমকি-সিঙাড়াদি কোন্ রাজ্যে রয়ে গেছে। এখান থেকে সুরু হয়ে গেল, বড্ডা, ইডলি, ধোসা ও উপমার রাজত্ব। তার সঙ্গে দেখা দিল শাদম্, সম্বরম ও রসম। আর এল পসারীর মাথায় ও ঠেলাগাড়িতে চড়ে সুপক্ব কদলী, কাজুবাদাম, মুসম্মি ও কমলালেবু আদি। পানীয় এল, কাফি ও 'চায়'। এত যখন এল তখন আমাদের অতিপরিচিত পাঁউরুটি, মাখন, টফি ও টোবাকুও পিছিয়ে রইল না। তারাও এসে আমাদের সমুখ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগল। অনেকে ছুটলেন স্নানঘরের দিকে দক্ষিণের বড় বড় ষ্টেশনে যার চমৎকার বন্দোবস্ত। সেই ব্যস্ততা, জনতা, কিঞ্চিৎ ঠেলাঠেলি ও খাদ্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল ম্লানমুখ, জীর্ণমলিন-কটিবাস, শীর্ণদেহ, কৃষ্ণাঙ্গ শিশু, কিশোর ও প্রৌঢ়। তাদের কণ্ঠে ক্ষুধার কান্না, রিক্ত হাত দুটি আহার্য্য-প্রার্থনায় প্রসারিত। পুলিসের ভয়ে প্ল্যাটফরমের বাইরে গাড়ির কোলে কোলে ঘুরতে লাগল এক দল বুভুক্ষু। গাড়ির কামরাতেই আমাদের ক'জনের আহার্য্য সরবরাহ করে গেল। অমনি বিপরীত দিকের জানালায় দেখা দিল কয়েকটি কিশোরের ক্লিষ্ট মুখ। চোখে তাদের কাতরতা। তারা বার বার বলতে লাগল, "শেঠ, উচ্ছিষ্ট অন্নম্।" কিসে যে তাদের ধারণা হ'ল আমরা শেঠগোষ্ঠী তা আজও বুঝে উঠতে পারি নি। কেবল সেখানেই নয়, দূর দক্ষিণেও সর্ব্বত্রই আমাদের প্রতি ছিল ঐ সম্মানিত সম্বোধন। স্বআমরা "শেঠ" বনে গিয়েছিলাম।

যথাসময়ে গাড়ি আবার চলা সুরু করল, কিন্তু উল্টো দিকে অর্থাৎ যেদিক থেকে এসেছিলাম সেই দিকে। তাই নিয়ে আমাদের জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। রেলপথের মানচিত্রখানি স্মরণ করে বুঝলাম এখানে প্রথম কয়েক মাইল এই রকমই হবে। তার পর থেকে রেলপথ গেছে ঘুরে সোজা দক্ষিণে। পথের দু' ধারে পুরুষ ও বিশেষ করে মেয়েদের পোশাকে পরিবর্ত্তন চোখে পড়তে লাগল। ক্ষেতে, পথে, গ্রাম্য কুটীরদ্বারে মেয়েদের পরনে অন্ধ্র ও মাদ্রাজের বৈশিষ্ট্য বড় আঁজলা-দেওয়া রঙিন শাড়ি। রঙের মধ্যে আধিক্য লাল, সবুজ ও নীলের। তারও মধ্যে লাল অধিক। দুটি নাকে নাক-ছাবি; মাথায় দোদুল বেণী। বেণীমূলে ফুল—চন্দ্রমল্লিকা। দক্ষিণের পুরুষদের পোশাকের বাহার ও প্রাচুর্য্য নেই কিন্তু পরিচ্ছন্নতা আছে। গাড়ি এক একটা বড় ষ্টেশনে থামে আর রঙিন চন্দ্রমল্লিকা ও রক্তগোলাপের লাল পসরা মাথায় পসারী এবং পসারিণী জানালার সমুখে ঘোরাফেরা করে। অন্ধ্র ও মাদ্রাজ চন্দ্রমল্লিকা ও রক্ত গোলাপের দেশ। ঐ ফুল দুটিই বোধ হয় সহজলভ্য। তাই কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রতি মন্দিরেই দেখেছি বিগ্রহের গলায় রক্ত-গোলাপের মালা, গোলাপেই বিগ্রহসজ্জা।

দক্ষিণ দিকে যত এগোই ততই পথের ধারে দেখি বিশাল হ্রদ-সদৃশ জলাশয়। হ্রদগুলি কৃত্রিম। কারণ, মাদ্রাজ সুজলা নয়। হ্রদের কূলে গৃহপালিত হাঁসের মেলা, ও মাঠে পাল পাল মেষ। তারা আকারে বেশ বড়, কিন্তু প্রায় লোমশূন্য। সেজন্যে কদাকার।

সূর্য্য যখন শৈলশিরে নেমেছে তখন পার হলাম সুবিস্তীর্ণ গোদাবরী, আমাদের প্রাচীন কাব্য-কাহিনীতে যা স্বপ্নলোক প্রবাহিণী। দক্ষিণের হিন্দু অধিবাসিগণের কাছে উত্তরের গঙ্গার মতই তা পুণ্যতোয়া। দেখলাম, তার যত বিস্তার তত জল নেই, রয়েছে বক্ষভরা শুষ্ক বালু। কিন্তু এই রিক্ত রূপই সব নয়, এক এক সময়ে নদীটি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরে গ্রাম-প্রান্তরে প্লাবন আনে। তার পর সন্ধ্যার

মাদ্রাজের বিখ্যাত রাজাজী হলের সোপানে কয়েকজন প্রতিনিধি—লেখক কর্তৃক গৃহীত আলোক-চিত্র।

তরল অন্ধকারে দেখলাম কৃষ্ণাকে—পূর্ব্বঘাট শৈলমালার বাধা ভেদ করে অপরূপ সৌন্দর্য্যে বয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। তার দুটি তীরে আলোকের মালা, শৈলোপরিও আলোকসজ্জা। কৃষ্ণার নিকষকালো জলে দুলছে তার দাগ। তার সেতুটি পার হতে হতে সকলেই মুগ্ধ চোখে প্রাচীন কাব্যের উপেক্ষিতা এই সুন্দরী নদীটির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

কৃষ্ণার তীরে যে আলোকময়ী শৈলবেষ্টিতা নগরীটি দেখা গেল সেটি বেজওয়াড়া। এখানে আমাদের সুভাষচন্দ্রের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। নগরীটি একটি বড় রেল এবং শিল্পকেন্দ্রও। কিন্তু কলকাতা থেকে এ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ পথের কোথাও স্থানীয় কারও সঙ্গে আলাপের বা কোন একটি বিশেষ দৃশ্যের অথবা স্থানের আলোকচিত্র তোলার সুযোগ পেলাম না।

পরদিন একটু বেলা উঠতে পৌঁছলাম আমাদের প্রথম গন্তব্য-স্থল মাদ্রাজে। যেমন আমাদের কলকাতার তেমনি মাদ্রাজেরও দেখবার জায়গা অনেক। কিন্তু সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধি আমরা, থাকবার ব্যবস্থাও মাত্র তিন দিনের জন্যে। তাই সব কিছু দেখার সুযোগ ঘটল না। সকাল, বিকেল ও সন্ধ্যার পরও কয়েক ঘণ্টা সম্মেলনে যোগ দিয়ে নৃত্য-গীতবাদ্যে কুমারী কমলার অনুপম "ভরতনাট্যমে"র ও গোপীনাথের "কথাকলি" নৃত্য দেখে, রবিশঙ্করের সরোদ বাজনা এবং শুভলক্ষ্মীর গান শুনে কাটাতে হ'ল। সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল বিখ্যাত "রাজাজী" হলে, নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা করা হয় বঙ্গোপসাগর-কূলে, প্রস্তরগঠিত সুদৃশ্য "সেনেট হাউসে।" আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে, এমনকি এই কলকাতা শহরের রাজপথেও ভিখারীদের শূন্যগর্ভ মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে গান গাইতে দেখেছি। টেবিল, বাঁধানো বইখাতা, এমনকি পৃষ্ঠদেশ ও শূন্য জঠরও কেউ কেউ গানের সঙ্গে বাজিয়ে সঙ্গত করে। এসব যেমন কৌতুককর তেমনি হাস্যোদ্রেক করে থাকে। কিন্তু যখন দেখলাম ভারত-বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে চন্দনচর্চ্চিতললাট, কৃষ্ণাঙ্গ চশমাধারী এক প্রৌঢ় একটি দশ সেরা মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে মৃদঙ্গবাদকের পাশে বসে সমানে সঙ্গত করছেন তখন তাজ্জব বনে গেলাম। উত্তরে বঙ্গদেশে যা নিকৃষ্ট ও অবজ্ঞাত, দূর দক্ষিণে মাদ্রাজে তাই-ই উৎকৃষ্ট ও সম্মানিত! শূন্যগর্ভ মাটির হাঁড়ি বাণী ও কমলা উভয়েরই কর্ম্মে প্রয়োজন? আবার জলসা অন্তে সেই প্রৌঢ়কে অন্যান্যের সঙ্গে মাল্যভূষিত করবার কালে, বিশেষ করে আমাদের উত্তরের শ্রোতাদের উল্লাসধ্বনি ও করতালি-ধ্বনি সেই বিশাল কক্ষটিকে যখন ভরে তুলল তখন দেখলাম তিনি অবিচলিত। ক্ষিপ্র হাতে এমন ভাবে মালাটি গলা থেকে খুলে ফেললেন, যেন বলতে চান,"এর যোগ্য নই। এ আমায় সাজে না।" তাঁর আঙুলের সেই স্পষ্ট বোলগুলি আজও আমার কানে বাজে!

সকাল থেকে প্রথম রাত্রি অবধি শহর দেখার অবসর ছিল না। একদিন রাত্রে আহারের পর রাত্রি তখন এগারটা হবে আমাদের মধ্যে কয়েকজন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে চললেন। আমরাও তাঁদের অনুসরণের উদ্যোগ করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অগ্রগামী দল ফিরে এসে বললেন, "পুলিশ যেতে দিল না। বললে, সমুদ্রের ধারে বদমায়েশের আড্ডা। বিপদে পড়বে। একটু পরেই শহরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হবে।" মাদ্রাজ শহরে রাত্রি বারটায় পথের বিজলীবাতিগুলি নিবিয়ে দেওয়া হয়, সম্ভবতঃ বিদ্যুতের খরচ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে।

শুনে ক্ষুব্ধ হলাম। মাদ্রাজের বৈশিষ্ট্য সুন্দর সমুদ্রোপকূল। তাও কর্ম্মঠ শান্তিরক্ষকেরা থাকতেও নিরাপদ নয়! যা হোক পর দিন একটু অন্ধকার থাকতেই কয়েকজন মিলে চললাম সমুদ্রতীরে। পথ জনহীন। আকাশ গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন। মেঘের কূলে কূলে ভোরের আলোর একটু স্পর্শ লেগেছে মাত্র। সমুদ্রকূলে পৌঁছে দেখি, সমুদ্রের জল বিক্ষোভে ফুলে উঠছে, কূলে সশব্দে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের দিক থেকে আসছে ঝড়ের হাওয়া। ধীবরেরা অনেক আগেই ক্যাটামারন ও বড় বড় নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেছে; কয়েকখানি তখনও যাবার উদ্যোগ করছে। কিন্তু ঢেউয়ের প্রবল আঘাতে কূলে এসে পড়ছে। এই সব ক্যাটামারনের ও নৌকার মালিক কিন্তু তারা নয়। এগুলির মালিক মহাজন। তারা

এগুলি ধীবরদের ভাড়া দেয়। সমুদ্রোপকূলবাসী ধীবরগণ নিঃস্ব। দুটি মাঝবয়সী ধীবর সমুদ্রে বিশাল জাল ফেলে তার এক প্রান্তের মোটা কাছি ধরে প্রাণপণে টানছিল। জালের অপর প্রান্ত ছিল সমুদ্রমধ্যস্থ একখানি বড় নৌকার আরোহীদের হাতে। কিন্তু জলের প্রবল টানে ডাঙার ধীবর দুটি জালখানি ধরে রাখতে পারছিল না। আমাদের দলের প্রায় সকলেই সোৎসাহে কাছি ধরে টানতে টানতে হাত ত্রিশেক জাল তুলে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। জালখানি তখনও অতলে তলিয়ে রইল। ধীবর দুটির মধ্যে প্রবীণ যেটি সে

পুরনো কাঞ্চীর বৃষমূর্তি—লেখক কর্তৃক গৃহীত ছবি।

কাতর ভাবে হাত বাড়িয়ে পয়সা চাইলে। তাই দেখে একজন পরিহাস করে বললেন, "উপকারের মূল্য নাকি? এ দেশের লোকের উপকার করলে পয়সা চায়?"

কিন্তু তার প্রার্থনার কারণটি আমরা সকলেই জানতাম। দুর্ভাগ্য যে, কারও কাছেই খয়রাৎ করবার মত খুচরা তখন ছিল না। তাই একজন তাকে কড়া তামাকের পাকান সিগারেট উপহার দিলেন। লোকটি তাই পেয়েই খুশী হ'ল।

সেদিনই কিছু বেলায় গেলাম শহরের দক্ষিণাংশে কাপালেশ্বরের প্রাচীন মন্দির, প্রস্তরবেষ্টিত বিশাল সরোবরটি দেখতে মাইলাপুরে। ছিলাম পরিচ্ছন্ন, সরকারী মহল্লায় সুদৃশ্য ভবনে। চললাম সেটা ছাড়িয়ে স্থানীয় অধিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়ে। স্থির করলাম, পথের এক জায়গা থেকে বাস ধরব। মোটর স্কুটারও পাওয়া যায়। তাতে দু'জন মাত্র যাত্রী চড়তে পারে। কিন্তু বিদেশী দেখলে যেমন সকল শহরেরই যানচালক সরকারী নিয়ম পকেটে পুরে দাঁও মারবার চেষ্টা করে, তাদের দ্বারাও তেমনি আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় সে আশা পরিত্যাগ করে প্রথম দিকে পদব্রজে চলতে লাগলাম। শুনেছিলাম, স্কুটারওয়ালাদের মত ট্যাক্সীওয়ালারাও শিকারী। একই দূরত্বের ভাড়া দু'খানি ট্যাক্সীর মিটারে দু'রকম ওঠে। আমাদের এখানেও যে তা না দেখা যায় তা নয়। উভয় দেশেই সে রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

বিষ্ণুকাঞ্চীর গোপুরম—লেখক কর্তৃক গৃহীত ছবি

যা হোক, স্থানীয় সাধারণ অধিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলকে আমাদের উত্তর কলকাতার কতকগুলি অঞ্চলের চেয়ে একটুও পরিচ্ছন্ন দেখলাম না। পথের দু'পাশের গৃহগুলিতে সেই চিরপরিচিত দারিদ্র্যের চিহ্ন; পথেও ভিক্ষুক। তবে একটা জিনিস দেখা গেল, যা আমাদের বাংলায় নেই। দেখলাম, কোন কোন গৃহের সম্মুখে ছেঁচ থেকে শিকের ঝুলছে বেশ বড়সড় চালকুমড়ো। কালি বা ভুষো দিয়ে কুমড়োর নাক-মুখ-চোখ-গোঁফ এমন করে আঁকা যেন একটি অতিকায় মানুষের বা রাক্ষসের মুখ। কোন কোন গৃহের সম্মুখে ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী মানুষের প্রমাণসই মূর্তি। কেমন একটা ধারণা হ'ল, ওগুলিকে রাখা হয়েছে গৃহ ও গৃহস্থের অকল্যাণ দূর করতে —ভূত-প্রেত তাড়াবার উদ্দেশ্যে। পরে আমাদের বাংলার

একটি মেয়ে যিনি বর্ত্তমানে একজন নামকরা মাদ্রাজী ব্যারিষ্টারের পত্নী তাঁর সঙ্গে আলাপে জানতে পারলাম আমার অনুমানই ঠিক। বললেন, "এখানকার লোকেরা নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন।" বললাম, "আমরাই বা কমটা কি ? আর, জাতের বাড়াবাড়ি ?" বললেন, "আগের চেয়ে অনেক কমেছে।" তার প্রমাণও আরও দক্ষিণে অনেক পেয়েছি।

শিবকাঞ্চীর গোপুরম্, বিতান ও সরোবর—লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ছবি
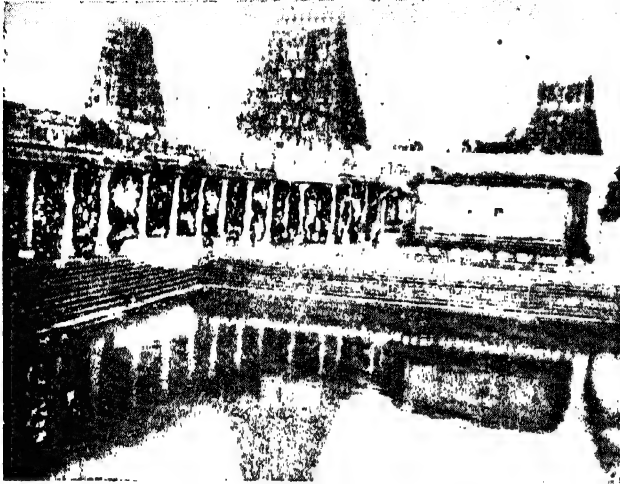
পথে এগোই আর স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞেস করি, "মাইলাপুরে কাপালেশ্বরের মন্দিরে যাবার বাস কোথায় পাওয়া যাবে ?" প্রত্যেকেই উত্তর দিলেন, "আইসহাউসের সামনে থেকে। আইস-হাউস এক ফার্‌লং দূরে।" মাদ্রাজ রাজ্যের সর্ব্বত্রই সাধারণ লোকেও পথের দূরত্ব পরিমাপ করে থাকে ফার্‌লংএ। কিন্তু আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে "ডালভাঙা" ক্রোশের মত মাদ্রাজের ফার্‌লংও যে "হাঁটুভাঙা" হয় তা বুঝতে পারলাম, সেদিন আইসহাউসে পৌঁছতে গিয়ে।

খানিক দূর যাবার পর জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক হঠাৎ এসে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ, আপনারা কে ?"

বললাম, "নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধি।"

"বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন মাদ্রাজে কেন ?"

"বাঙালী অনেক আছেন এখানে। তার পর, এই সম্মেলন ভারতের সকল প্রদেশের সাহিত্যের সঙ্গে যোগ ও সম্পর্ক রাখবার উদ্দেশ্যে এক এক বছর ভারতের এক এক জায়গায় করা হয়।"

"তোমাদের সম্মেলনের কথা খবরের কাগজে পড়েছি বটে। আচ্ছা, মিঃ পিয়ারসন তোমাদের সঙ্গে এসেছেন কি ?"

"না। কিন্তু তিনি কে ?"

"আসেন নি, তাই ত!" বলে ভদ্রলোক চিন্তিত ভাবে চলে গেলেন।

অতঃপর অপরিচিত মিঃ পিয়ারসনের কথা সকৌতুকে ভাবতে ভাবতে আমরা আইসহাউসের সম্মুখে পৌঁছে বাসে চড়ে চললাম মাইলাপুরম্।

মাদ্রাজের বাসগুলি সরকারী। কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন, যাত্রী-সাধারণও শৃঙ্খলাপরায়ণ। বাস ছাড়বার আগেই ভাড়া দিতে হয়। তবে আমরা বিদেশী বলে আমাদের বেলায় ব্যতিক্রম ছিল। মাদ্রাজের সুদূর গ্রামাঞ্চলেও দেখেছি বাসগুলি শহরের মতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যাত্রীসাধারণ শৃঙ্খলাপরায়ণ ও ভদ্র। কোথাও গুরুভার বা বৃহদাকার মালপত্র নিয়ে কাউকেই বাসে চড়তে দেখি নি।

কিছুক্ষণ পরেই কাপালেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছলাম। বিশাল মন্দিরটি কত কালের তা জানবার সুযোগ হ'ল না। দেখলাম, সবই পাথরে তৈরী। সু-উন্নত গোপুরমের (ফটকের) গায়ে চূড়া পর্য্যন্ত গোটা রামায়ণের কাহিনী মূর্ত্তির সাহায্যে রূপায়িত। কাপালেশ্বর আছেন মূল মন্দিরের ভিতর দিকে অন্ধকারে। গোপুরমের চূড়ায় উঠলে বহু ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দক্ষিণের সমস্ত মন্দিরই সুদৃঢ় দুর্গের মত, ভিতরে কুয়া ও সরোবর, চারধারে পাথরের সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর। হাজার কয়েক লোক সেখানে মাসকয়েক অবরুদ্ধ হয়েও নিরাপদে থাকতে পারে। মনে হ'ল মন্দিরটি যেন দুর্গের কাজ করত। বিষ্ণুকাঞ্চীতে প্রত্নতত্ত্বের জনৈক মাদ্রাজী ছাত্রের মুখেও আমার এই অনুমানের প্রতিধ্বনি পরে শুনেছিলাম। তবে এখানকার সরোবরটি রয়েছে সম্মুখে মন্দিরের বাইরে এবং ভিতরেও জল সরবরাহের তেমন ব্যবস্থা চোখে পড়ল না। পাণ্ডাদের অত্যাচার ও দর্শনপ্রার্থীর ঠেলাঠেলি নেই। কেবল এখানেই নয় মাদ্রাজের কোন মন্দিরেই তা দেখা যায় না। দর্শনার্থীরা যান, ইচ্ছামত দান করেন। না দান করলেও কেউ আদায়ের কৌশল-জাল বিস্তার করে না। সেজন্যে সর্ব্বত্রই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়, মন একটুও পীড়িত হয় না। ভিতরে-বাইরে কিছুক্ষণ ঘুরে আবার বাসে চড়ে ফিরলাম আমাদের আস্তানায়।

পরদিন দিনের আলো তখনও দেখা দেয় নি, চললাম কাঞ্চীপুরম্।

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি নির্দ্ধারিত চাঁদা নিয়ে বাসে চড়িয়ে আমাদের নিয়ে চললেন, কাঞ্চীপুরম্, পক্ষীতীর্থম ও মহাবলীপুরম্ দেখাতে। এগুলি দেখে মাদ্রাজে যখন ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা সাতটা। বিষুবরেখার কাছাকাছি বলে আমাদের উত্তরের মত শীত-

কালেও সাড়ে পাঁচটায় ওখানে সন্ধ্যা হয় না এবং রাত্রেও শীতে হাড় কাঁপে না। আমরা বাসযাত্রীরা যখন ফিরলাম তখন সকলেরই অঙ্গে এবং মস্তকে পথ ও তীর্থরেণু। তবে যাঁরা সুদৃশ্য মোটর গাড়িতে চড়বার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাদের কথা জানি না। রামপ্রসাদ মাত্র একটি চরণে গয়া থেকে কাঞ্চী পর্যান্ত ঘুরেছেন, আমরাও এক ঘণ্টায় তিন কাঞ্চী—পুরানো, শিব ও বিষ্ণুকাঞ্চী ঘুরেছিলাম। কাঞ্চীতে যাবার কালে পথের দু'পাশে খুঁজেছিলাম আমবাগান ও তেঁতুলগাছ। শোনা ছিল মাদ্রাজে বার মাসই আম ফলে এবং তেঁতুলগোলা জল, যার নাম রসম্, ওদেশে প্রিয় ব্যঞ্জনের মত প্রধান খাদ্যের সঙ্গী। তখনও রসমের স্বাদ লাভ করার সুযোগ হয় নি। কিন্তু সে পথে ও দুটি গাছের একটিরও প্রাচুর্য্য দেখি নি, বড় বড় গ্রাম বা গঞ্জও চোখে পড়ে নি। ক্ষেত ছিল, উদ্ভিদও ছিল কিন্তু শ্যামলতার সমারোহে ও ঐশ্বর্য্যে তা কোথাও স্নিগ্ধ হয়ে নেই।

প্রথমে পৌঁছলাম পুরনো কাঞ্চীতে। পুরনো কাঞ্চী মাঝারি গোছের একখানি গ্রাম মাত্র। পাথরের মন্দিরটির সারা গায়ে বয়সের ছাপ। সম্মুখে ছয় শ' বছরের একটি পাথরের বৃষ। সেটিও মন্দিরের মতই প্রাচীনত্বের ছাপ নিয়ে স্থির হয়ে রৌদ্র-বৃষ্টি সয়ে বসে বসে কাল গুনছে। বৃষটি একখানি পাথরে তৈরী। মন্দিরের একটি দুঃখময় ইতিহাস আছে। এখন মন্দিরটি প্রায় পরিত্যক্ত। তবে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই সুন্দর ভাস্কর্য্যমণ্ডিত স্থাপত্য শিল্পটিকে রক্ষা করছেন। ইচ্ছা সত্ত্বেও এখানে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হ'ল না, দুখানি আলোকচিত্র তুলে নিয়ে বাসে চড়ে বসলাম।

এখান থেকে চললাম, শিবকাঞ্চী। কাঞ্চীপুরম্ ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনপদ। এখানকার রেশমী বস্ত্রের খুব খ্যাতি। পথের দু'ধারে জনপদবাসীদের কাঁচা ঘর-বাড়ী। মাঝে মাঝে তন্তুবায়-গণের গৃহ-প্রাঙ্গণে বা গৃহপাশে উন্মুক্ত চত্বরে রঙিন সুতার ফেটি সার সার শুকানো হচ্ছে। প্রতি গৃহের সম্মুখে ও পথের মোড়ে মোড়ে কৌতূহলী নারীপুরুষ ও বালক-বালিকার ছোটখাটো জনতা। অনুমানে বুঝলাম, তাদের কৌতূহলের সামগ্রী আমরা। এক এক জায়গায় জনতা এত বড় ও এমন পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল যে, মনে হতে লাগল, আমরা হাটের মধ্য দিয়ে চলেছি অথবা তারা আমাদের বাসগুলি আটকানোর উদ্দেশ্যেই জমায়েৎ হয়েছে। অনেক গৃহসম্মুখে পথের উপরেই চালের গুঁড়ো দিয়ে বড় বড় আলপনা দেওয়া। সেগুলির মাঝখানে চারটি গোময়-গুলি। প্রত্যেকটি গুলিতে একটি করে কুমড়োর ফুল বসানো। এই সজ্জার কারণ কি বুঝলাম না। পাশের এক জন জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে এই মাঙ্গলিকের আয়োজন নাকি?"

বললাম, "হলে আনন্দের কথা ছিল বটে, কিন্তু জনতার চোখে ত অভ্যর্থনার ভাষা ফুটছে না, কণ্ঠও নীরব। হয় ত ওটা ভূত-প্রেত তাড়াবার ব্যবস্থা।"

পরে রামেশ্বরমে গিয়ে এ সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছিলাম, তা পরে বলছি। অতঃপর শিবকাঞ্চীর গোপুরমের সামনে গিয়ে বাস-গুলি থামল। সেখানে জুতো খুলে সকলে ছুটলাম ভিতরে মন্দিরের দিকে। সুবিশাল ভূমিখণ্ডকে সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীরে ঘিরে তার মধ্যে পাথরে গড়া সুদৃশ্য বিতান, মণ্ডপ, মন্দির, পিতলের সুদীর্ঘ দীপদান তৈরী ও সরোবর খনন করা হয়েছে। সেই পরিধির মধ্যে অন্ততঃ দশ হাজার লোক স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। শিবকাঞ্চী মন্দিরের একেবারে ভিতর দিকে অন্ধকারে রয়েছেন কৈলাসনাথের বিগ্রহটি। বিতানের ছাদ এমন কৌশলে তৈরী যে, তার ঠিক তলায় কয়েকটি ফোকর দিয়ে বৎসরের এক সময়ে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে মন্দিরাভ্যন্তরের

মহাবলীপুরম্—দূরে সমুদ্র—লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ছবি।

বিগ্রহটিকে আলোকিত করে। তখন এখানে উৎসব হয়। গোপুরম, স্তম্ভ, মন্দিরগাত্র—সকলই অনুপম শিল্পকাজে সুন্দর। তবে এক তাঞ্জোর ছাড়া আর সবেরই মন্দির-মণ্ডপ বহুদূর থেকে দেখা যায় না, দেখা যায় গোপুরম্।

এখান থেকে কিছু তফাতে বিষ্ণুকাঞ্চী। তার মন্দিরাভ্যন্তরে রয়েছে কষ্টিপাথরের সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি। সকল জায়গাতেই শিব ও বিষ্ণুমূর্ত্তি, পার্ব্বতী ও কমলা। দক্ষিণের সকল মন্দিরাভ্যন্তরই অপরিসর ও অন্ধকার। ঘৃত-প্রদীপের আলোয় ও কর্পূর জ্বালিয়ে তার আলোকে ক্ষণিকের জন্যে বিগ্রহ দেখানোর ব্যবস্থা। তবে স্বল্পকালের সেই দেখাই স্মৃতিপটে দীর্ঘকাল থাকে এবং হীরক ও স্বর্ণাভরণের উজ্জ্বলতা বহুদিন মনে ঝলমল করে। দক্ষিণের বিখ্যাত মন্দিরগুলির ধন-সম্পদ বহুকাল থেকে সঞ্চিত হতে হতে বর্ত্তমানে কোটি কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

এই দুই স্থানেও আমাদের বেশীক্ষণ থাকার সুযোগ ও সময়

হ'ল না। দু'খানি আলোকচিত্র তুলে নিয়ে চললাম পক্ষীতীর্থম ও সমুদ্রতটে মহাবলীপুরমের পথে।

দাক্ষিণের মন্দির-স্থাপত্য ও শিল্পের আরম্ভ প্রায় চৌদ্দ শ' বৎসর পূর্ব্বে পল্লব-রাজাদের রাজত্বকালে। তার পর থেকে এই শিল্প অন্যান্য রাজবংশের রাজত্বকালে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করে। পল্লবগণের পর চোল রাজাদের রাজত্বকালে, বিশেষ করে তামিল দেশ সাহিত্য-শিল্প, সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক শাসন প্রভৃতিতে এমন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে, এই সময়টাকে বলা হয়, দক্ষিণ ভারতের স্বর্ণযুগ। কিন্তু পল্লবরাজগণের ইতিহাস বিশেষভাবে জানা যায় না। এদের রাজধানী ছিল কাঞ্চীপুরমে এবং বন্দর ছিল সেখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে নারিকেল ও তালিকুঞ্জ আচ্ছাদিত বঙ্গোপসাগরতটে মহাবলীপুরমে। এই দুইয়ের মাঝে পাহাড়ের চূড়ায় পক্ষীতীর্থম।

ক্রমশঃ

কার্ত্তিক

শ্রীকালিদাস রায়

উমার কুমার তোমারে আমার নমস্কার
হরগৌরীর প্রণয়ের তুমি দেবাবতার।
শিবেরে এড়ায়ে দেবতারা করে স্বর্গভোগ,
ভোগীদের সাথে যোগীশ্বরের রচিলে যোগ।
রুদ্রের রোষ-অনলে মদন নিধন লভে,
পুনঃ অনঙ্গ নবীন অঙ্গ লভিল কবে ?
পুরাণের ছেলেভুলানো কাহিনী আমি না মানি,
লভিল সে স্মর নব কলেবর তোমাতে জানি।
ত্রিভুবনে জিনি ভুবনেশ্বরে বিজয় করি,
উমার কোলে সে জনমিল নবরূপটি ধরি।
ভবজিৎ ছাড়া দানবে জিনিবে কে আর ভাবি,
দেবসৈন্যের সেনানীর পদে কাহার দাবি ?
চির তারুণ্য স্থির লাবণ্য হেরি তোমার,
চিনিতে নারিল তোমারে স্কন্দ পুরাণকার ?
জানিয়া তোমার ভুবনবিজয়ী পরাক্রম
অসীম শৌর্য্য, গেল না তাহার মতিভ্রম ?
স্বর্গে ছিল না গজতুরগের অভাব কভু,
ময়ূর তোমার কেন বা বাহন হইল তবু ?
উমার কুমার তোমারে আমার নমস্কার,
অনলদগ্ধ মদনেরই তুমি নবাবতার।

হেমন্তে

শ্রীকালিদাস রায়

উষা তোমার আনন কেন শিশির ছলছল ?
জাগরণের অরুণরাগে নয়ন জ্বল জ্বল।
মুখে তোমার নেইক ভাষা,
মিটে নি বোন কোন্ পিপাসা ?
আমি তোমার দরদী বোন আমায় বল' বল।
বাসক-শয়ন সাজায়ে কি কুঞ্জবনে জাগি
শিউলি ফুলের মাল্য গেঁথেছিলে বঁধুর লাগি ?
জ্বালি চাঁদের সুধায় বাতি
যাপিলে কি দীর্ঘ রাতি
উচ্চকিত কর্ণে বহি হৃদয় টলমল ?
চপল বঁধু এলোনাক' বিফল হ'ল নিশা,
ছিঁড়ল তনুর সকল ভূষা রইল বুকের তৃষা।
মধুপর্ক ফেললে ছুঁড়ে,
তাই কি অত মধুপ ঘুরে ?
সেই ব্যথা কি সায়রে নীলকমল ঢলঢল।
হাঁকিছে কাক, দিচ্ছে বুঝি বঁধুরে ধিক্কার,
হিমেল বায়ু জানায় ব্যথা তোমার প্রতীক্ষার।
নিরাশ নিরাভরণ রূপে
উদিলে আজ চুপে চুপে,
তোমার ক্ষোভের ভৈরবী কি নদীর কলকল।

মধুসূদন গুপ্ত

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মধুসূদন গুপ্তের কৃতি আমাদের স্মরণীয়। একটি কৃতির কথা শিক্ষিত-জন কমবেশী জানেন। কিন্তু তাঁহার জীবন-কথা এখনও রহস্যাবৃত। কোথায় তাঁহার বাড়ী, পিতৃকুল বা মাতৃকুলের কি পরিচয়—এসবের খোঁজখবরই হয়ত আমরা রাখি না। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের পূর্ব্ব দিকে খানিকটা ভিতরে গিয়া 'মধু গুপ্ত লেন' নামে একটি সরু গলি আছে। প্রতীতি হয়, মধুসূদন গুপ্তের নামে রাস্তাটির এই নামকরণ হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী ভারতবর্ষের, শুধু ভারতবর্ষের কেন সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে একটি গৌরবময় যুগ। তবে ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা বলা যায় বিশেষ করিয়া। কেননা পরাধীন অবস্থায়ও আমরা নূতনকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইতে খুব প্রয়াসী হই। শল্যবিদ্যা ভারতের এক প্রাচীন বিদ্যা। মৃত নরদেহে অস্ত্রোপচার করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ পরীক্ষা না করিলে শল্য বিদ্যা নিরর্থক। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যার মত শল্যবিদ্যাও আমরা চর্চ্চার অভাবে ভুলিতে বসি। শুধু ভুলিয়া গেলে ক্ষতি ছিল না, যত ক্ষতি মৃত নরদেহে অস্ত্রোপচারে 'পাপবোধ' জন্মানোয়।

এই পাপবোধের মূলে কুঠারাঘাত, সে কি সামান্য কথা? আজ হয়ত একথা শুনিয়া আমরা হাসিব; কিন্তু সোয়া শ' বৎসর পূর্ব্বে এমনটি ছিল না। তখন শবব্যবচ্ছেদের, অর্থাৎ, মৃত মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার বা কাটাকুটি একটি ভীষণ পাপের ব্যাপার ছিল! ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এই মধুসূদন গুপ্ত। তিনি অগ্রণী হইয়া শবব্যবচ্ছেদ করিলেন; তখন আমাদের একটি বহুকালপোষিত কুসংস্কারে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল. আর ইহার ফলে আমাদের সম্মুখে এক নূতন জগৎ খুলিয়া যাইবার পথ পাইল। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপযোগিতা এবং উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া দেশবাসী এক অভিনব পথে প্রবেশ করিল। মধুসূদনের এই যুগান্তকারী কৃতিকে সরকারী ভাবে স্বীকৃতি দান করা হয় ১৮৪৯ সনে, প্রথম শবব্যবচ্ছেদ-কার্য্যের ঠিক তের বৎসর পরে। শিক্ষা-সমাজের ("Council of Education") সভাপতি, বড়লাটের আইন-সচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে মধুসূদন গুপ্তের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার সময়ে আবেগপূর্ণ সুললিত ভাষায় এই কৃতির বিষয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন:

"I have had the scene described to me. It had needed some time, some exercise of the persuasive art, before Modusuden could bend up his mind to the attempt; but having once taken the resolution, he never flinched or swerved from it. At the appointed hour, scalpel in hand, he followed Dr. Goodeve into the godown where the body lay ready. The other students, deeply interested in what was going forward but strangely agitated with mingled feelings of curiosity and alarm,

মধুসূদন গুপ্ত

crowded after them, but durst not enter the building where this fearful deed was to be perpetrated; they clustered round the door; they peeped through the jilmils, resolved at least to have ocular proof of its accomplishment. And when Modusuden's knife, held with a strong and steady hand, made a long and deep incirsion in the breast, the lookers-on drew a long gasping breath, like men relieved from the weight of some intolerable suspense."*

* *Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, from 1835 to 1851*. By J. Kerr. Part II, 1853. Pp. 210, foot-note.

এই উক্তিতে বেথুন মধুসূদন গুপ্তের সর্বপ্রথম শবদেহে অস্ত্রোপচারের কথা বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যেও ঐ সময় চারি জন শবব্যবচ্ছেদে অগ্রসর হন। একথা একটু পরে আমরা জানিতে পারিব।

২

গত শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এদেশে উচ্চতন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। কলিকাতায় 'স্কুল ফর নেটিব ডক্টরস' নামে একটি স্কুল ছিল। সেখানে হিন্দুস্থানী ভাষায় পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত। বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রদের 'এপথিকারী' বলা হইত, ইহারা এখনকার 'কম্পাউণ্ডারে'র সমগোত্রীয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেসব ইংরেজ ডাক্তার ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া এই সকল এপথিকারী চিকিৎসা-কার্য্যে সহায়তা করিত। অবশ্য তাহারা সকলেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইত। পরে, কলিকাতা মাদ্রাসায় মেডিক্যাল ক্লাস এবং সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণী খোলা হয় (ডিসেম্বর, ১৮২৬)। এখানে ইংরেজীতে লিখিত চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তক যথাক্রমে আরবী ও সংস্কৃতে অনূদিত হইত এবং ছাত্রেরা এই সকল অনুবাদ-গ্রন্থের মাধ্যমে চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হইতেন। সংস্কৃত কলেজ-সন্নিহিত এক বাটীতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক শিক্ষালাভার্থ একটি হাসপাতাল খোলা হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে। সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন প্রথমাবধি পণ্ডিত খুদিরাম বিশারদ। এখানকার মেডিক্যাল লেকচারার ছিলেন ডাঃ জন গ্রাণ্ট। উক্ত হাসপাতালে গিয়া ছাত্রেরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেন।

মধুসূদন গুপ্ত সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর একজন প্রখ্যাত ছাত্র। তিনি বৈদ্যক বা চিকিৎসাশাস্ত্রে অনন্যতুল্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অধ্যাপক খুদিরাম বিশারদ ১৮২৯ সনের প্রায় মাঝামাঝি হইতে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ছাত্রদের পড়ায় ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে। ইতিপূর্ব্বেই বৈদ্যক শ্রেণীর প্রধান ছাত্র মধুসূদন গুপ্তের পাঠোৎকর্ষ কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহারা মধুসূদনকে ১৮৩০, মে মাস হইতে মাসিক ষাট টাকা বেতনে বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক-পদে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার এই পদে নিয়োগ হেতু ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সংবাদপত্রের স্তম্ভেও এই বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে।* কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, মধুসূদন স্বীয় পদে বহাল রহিলেন। তাঁহার নিয়োগে যে শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষ ভুল করেন নাই, মধুসূদনের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল।

মধুসূদন ১৮৩৫ সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এই পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানদ্বয়—কলিকাতা মাদ্রাসা ও গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যথাক্রমে আরবী ও সংস্কৃতের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন ইংরেজী গ্রন্থাদি হইতে এই দুই ভাষায় অনুবাদের রেওয়াজ। অতি অল্প-সংখ্যক ছাত্রই এই অনূদিত গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া পাঠ করিত। সব বই-ই গুদামজাত হইয়া অকেজো অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। ১৮৩৪ সনে চার্লস সি. ট্রেভেলিয়ান হিসাব করিয়া দেখান যে, সরকারের শিক্ষাখাতের কয়েক লক্ষ টাকা এইরূপে আটক পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ অন্য কাহিনী। বৈদ্যক শ্রেণীতে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন-সৌকর্য্যার্থে মধুসূদনকেও ইংরেজী বৈদ্যক-গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিতে । তিনি হুপারের "Anatomist Vade-mecum" সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। এই পুস্তকখানি ১৮৩৫ সনের জানুয়ারী নাগাদ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল। মধুসূদন এই পুস্তক লিখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সহস্র টাকা পুরস্কার পান।*

৩

স্কুল ফর নেটিব ডক্টরস, কলিকাতা মাদ্রাসার মেডিক্যাল ক্লাস কিংবা সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণী—কোন স্থলেই উন্নততর চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদানের সুযোগ ছিল না, অথচ তখন এদেশীয়দের পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইবার আবশ্যকতা সরকার নিজ প্রয়োজনেই বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিলেন। বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ জন গ্রাণ্ট, জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড, সি. সি. ট্রেভেলিয়ন, ডাঃ মণ্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি এবং দেওয়ান রামকমল সেন—এই পাঁচ জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন; উদ্দেশ্য—তাৎকালিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুসন্ধান এবং উন্নততর শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উপায়-নির্ণয়। কমিটি কিছুকাল অনুসন্ধানান্তর এই মর্ম্মে রিপোর্ট দিলেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদানের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া একটি কলেজ স্থাপনের দিকে যেন সরকার অবিলম্বে মনোযোগী হন। বড়লাট বেণ্টিঙ্ক এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ১৮৩৫, ২৮শে জানুয়ারী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন। পরবর্ত্তী ১লা মার্চ্চ হইতে অধ্যাপক নিয়োগ, ছাত্র-সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য সুরু হইল। ডাঃ ব্রামলি অধ্যক্ষ, ডাঃ হেনরি হারি গুডিব শারীরবিদ্যা (Anatomy) ও শল্যবিদ্যার (Surgery) অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। মধুসূদন গুপ্ত ১৭ই মার্চ্চ ১৮৩৫ হইতে এক শত টাকা মাসিক বেতনে উক্ত বিষয়দ্বয়ের 'ডিমনষ্ট্রেটর'-এর পদ লাভ করিলেন।

১৮৩৫, ১লা জুন ডাঃ ব্রামলি একটি প্রারম্ভিক বক্তৃতায় দ্বারা

---

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩য় সং, পৃ. ৬-৭।

* কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ, ৩৬। ১৩৫৫ সাল।

কলেজের পাঠনা আরম্ভ করেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর পুনরায় কলেজের অধ্যাপনা সুরু হয় পরবর্তী ২৮শে অক্টোবর। বিভিন্ন বিভাগেই পঠন-পাঠন চলিতে লাগিল। শবব্যবচ্ছেদ সুরু হইতে আরও এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। পূর্ব্বে মৃত পশু-দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া ছেলেদের শারীরবিদ্যা বা এনাটমি শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ইহাতে নরদেহের সমস্ত তথ্য জানা সম্ভবপর নয়। শবব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে এদেশীয়দের মনে তখন ঘোরতর কুসংস্কার বিদ্যমান। কিরূপে এই কুসংস্কার বিদূরণে শারীরবিদ্যার সহ-অধ্যাপক অগ্রণী হইয়াছিলেন, বেথুন তাহার চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন; এবং ইতিপূর্ব্বেই তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মেডিক্যাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রামলিও ২৮শে অক্টোবর ১৮৩৬ তারিখের এই প্রথম শবব্যবচ্ছেদের একটি সুন্দর তথ্যপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মধুসূদন গুপ্তের নামোল্লেখ করেন নাই বটে, তবে তাহাতে তাঁহার প্রথম শবব্যবচ্ছেদের গৌরবের এতটুকুও অপহৃব হয় না। ডাঃ ব্রামলি-প্রদত্ত বিবরণের কিয়দংশ এখানে দিলাম:

"On that day (28th October, 1836), which may be regarded as an eventful era in the annals of the Medical College, four of the most intelligent and respectable pupils, at their own solicitation, undertook the dissection of the human subject, and in the presence of all the professors of the College and of fourteen of their brother-pupils, demonstrated with accuracy and nicety, several of the most interesting parts of the body, and thus was accomplished, through the admirable example of these four native youths, the greatest step in the progress towards true civilization which education has as yet effected. At the first attempt, all their companions present assisted, and it was delightful to witness the emulation amongst them, in displaying their willingness to recognise the importance of, and adopt a mode of study hitherto contemplated with such honour by their own countrymen . . ."*

ডাঃ ব্রামলির এই উক্তির সঙ্গে বেথুনের কথাগুলি এখানে কতকটা যাচাই করিয়া লওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেথুন মধুসূদন গুপ্তকে প্রথম শবব্যবচ্ছেদের সম্মান দিয়াছেন। ডাঃ ব্রামলি উপরের উদ্ধৃতিতে মধুসূদনের নাম উল্লেখ করেন নাই সম্ভবতঃ এই কারণে যে, তিনি শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন, এবং মধুসূদনের পক্ষে শবব্যবচ্ছেদ অত্যন্ত স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু বেথুনের এবং ব্রামলির বিবরণ-দুইটির মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। বেথুন বলেন, ডাঃ গুডিব-সমভিব্যাহারে মধুসূদন গুদামে গিয়া শবব্যবচ্ছেদ করেন, ছাত্রগণ অবাক্ বিস্ময়ে দরজা-জানালার ফাঁক দিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু ডাঃ ব্রামলি পরিষ্কার বলিতেছেন যে, কলেজের চারিজন উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান ছাত্র অন্য ছাত্রদের সহযোগিতায় অধ্যাপকগণের সম্মুখে সর্ব্বপ্রথম অতি নিপুণতার সহিত শব-ব্যবচ্ছেদ করে। এই কার্য্য সম্পাদিত হয় ১৮৩৬ সনের ২৮শে অক্টোবর। ইহার অল্পকাল পরে শিক্ষাবিষয়ক জেনারাল কমিটিকে কলেজ-সংক্রান্ত কার্য্যাবলীর বিবরণ দান প্রসঙ্গে ডাঃ ব্রামলি উক্ত চারি জন ছাত্রের কৃত কর্ম্মের কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। মধুসূদন বাদে বেথুনের অপেক্ষা ব্রামলির অন্য সব কথাই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া মনে করি।

একটি কথা উঠিতে পারে, দুই তারিখে দুইটি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কিনা। কিন্তু এরূপ ধারণা করিবার কারণ দেখি না। দুই দিনে দুইটি কার্য্য সম্পাদিত হইলে—এবং ইহা যুগান্তকারী বলিয়া ব্রামলি ও বেথুন দুই জনেই উল্লেখ করিয়াছেন—ব্রামলি প্রদত্ত বিবরণে নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ থাকিত। অধিকন্তু হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ জে. কার তাঁহার ইংরেজী পুস্তকের* 'মেডিক্যাল কলেজ' অধ্যায়ে উক্ত এক তারিখের কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকখানি ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত। তিনি উক্ত অধ্যায়ে ১৮৫০-৫১ সন পর্য্যন্ত মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। সে যাহা হউক, মধুসূদনের কৃতি সম্পর্কে ডাঃ ব্রামলি উল্লেখ না করিলেও আমরা এখানে বেথুনের কথাকেই মান্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কার-ও নিজ গ্রন্থে ডাঃ ব্রামলির উক্তিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বেথুনের কথাও পাদটীকায় দিয়াছেন; তিনি এ বিষয়ে কোন আলোচনা বা মন্তব্য করেন নাই। ডাঃ ব্রামলির বিবরণে উক্ত চারি জন ছাত্র যথাক্রমে—উমাচরণ শেঠ, রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং নবীনচন্দ্র মিত্র।†

৪

মধুসূদন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। মধুসূদনের উৎসাহ ও ধৈর্য্য ছিল অপরিসীম। কলেজে শিক্ষকতা কালে তিনি অন্য ছাত্রদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় রীতিমত অধ্যয়ন করেন। ১৮৪০, ১৮ই ডিসেম্বর কলেজের উচ্চতম শ্রেণীর যে শেষ পরীক্ষা হয় তাহাতে

* *Report of the General Committee of Public Instruction of the Presidency of Fort William in Bengal for the year 1836*. Pp. 54-5.

* *Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, from 1835 to 1851.*

† "Early Years of the Calcutta Medical College" —*The Modern Review* for September and October, 1947, দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধে বর্তমান লেখক কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম দিককার ইতিহাস সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র দৃষ্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মধুসূদন উপস্থিত হইয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। জেনারাল কমিটির রিপোর্ট হইতে মধুসূদনের বিষয় এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

Anatomy and Physiology

* * *

Modhusudun Goopto (Teacher) Qualified.

Theory and Practice of Surgery

Modhusudun Goopto (Having commenced English late in life had some difficulty in expressing himself, but his answers were correct. Qualified).

Theory and Practice of Physic

Modhusudun Goopto Qualified.

Medical Chemistry, Botany, Materia Medica and Pharmacy

Modhusudun Goopto Qualified.

Practical and Surgical Anatomy. Demonstration with Dead Bodies

Modhusudun Goopto Qualified.*

১৮৪০-৪১ সন নাগাদ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে কি কি বিষয় অধীত হইত, এই ফিরিস্তি হইতে তাহা জানা যাইতেছে। মধুসূদন গুপ্ত সকল বিষয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরীক্ষকগণের উপরের মন্তব্য হইতে জানা যায়, তিনি অধিক বয়সে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন বলিয়া এ ভাষায় তেমন ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন নাই, তথাপি উত্তরপত্র যথাযথ হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া ধরিয়া লন।

সে যুগের বিখ্যাত চিকিৎসকগণকে লইয়া কলেজের পরীক্ষক বোর্ড গঠিত হইত। পরীক্ষান্তে ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফলের কথা জানাইয়া বোর্ড জেনারাল কমিটিকে একটি বিবরণ পাঠাইতেন। কমিটি ইহার উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রদের ডিপ্লোমা দিতেন, সরকারকেও অনুরোধ জানাইতেন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের যথাযথ পুরস্কৃত করিতে। এবারের রিপোর্টে (১৮৪০-৪১, পৃ. ৮২) জেনারাল কমিটি লিখিলেন :

"The General Committee of Public Instruction confirmed the Report of the Examiners and Assessors of the Medical College, and College Diplomas were given to the seven students named in the margin. Modhusudun Goopto and Nava Krishna Goopto and the five other youngmen retained their situations in the Medical College, were reported to the Medical Board, and to the Government, as being available for the public service as sub-assistant surgeons."

জেনারাল কমিটি রিপোর্টে বলেন যে, উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে মধুসূদন গুপ্ত প্রমুখ সাত জন তখনও মেডিক্যাল কলেজের কর্ম্মে লিপ্ত। তাঁহারা মেডিক্যাল বোর্ড এবং গবর্ণমেণ্টকে জানান যে, এই কর্ম্মীদের তাঁহারা সাব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রূপে সব সময়েই পাইতে পারেন। মধুসূদন এই পদে উন্নীত হইলেও কখনও কর্ম্ম-ব্যপদেশে অন্যত্র যান নাই; আমৃত্যু মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম শিক্ষক-কর্ম্মীই তিনি রহিয়া গেলেন।

৫

ইংরেজ অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন ব্রিটিশ সৈন্যঘাটির সংখ্যা বাড়াইতে হইল, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ প্রজার চিকিৎসাদিরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইল। এই দুই কারণেই মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে ১৮৩৯ সনে একটি হিন্দুস্থানী ক্লাস বা শ্রেণী খোলা হইল যেখানে চিকিৎসা বিদ্যার বিষয়সমূহ ছাত্রদের মোটামুটি শিখাইয়া দেওয়া হইত। কর্তৃপক্ষ এই শ্রেণীর কার্য্যের উৎকর্ষ বিধানে মনোযোগী হইয়া ১৮৪৩-৪৪ সনে ইহা পুনর্গঠিত করেন, এবং মধুসূদন গুপ্তের উপর ইহার তত্ত্বাবধানের ভার দেন। মধুসূদন মেডিক্যাল কলেজের 'ডিমনষ্ট্রেটর অফ এনাটমি এণ্ড সার্জ্জারি' পদে পূর্ব্ববৎ বহাল রহিলেন। ইহার সঙ্গে তিনি এই বিভাগ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার এই নূতন পদের নাম হইল 'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ দি সেকেণ্ডারী (বা, হিন্দুস্থানী) ক্লাস।" মধুসূদনের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে অস্ত্রোপচার তথা শবব্যবচ্ছেদাদিও এই শ্রেণীর ছাত্রগণ এ সময় হইতে প্রথম আরম্ভ করিল। মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র অধ্যাপক এলান ওয়েব এই শ্রেণীর 'ভিজিটর' বা পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন।*

মধুসূদন 'লণ্ডন ফার্ম্মাকোপিয়া' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৪৪-৪৫ সনের শিক্ষা-সমাজের ('জেনারেল কমিটি' ইত্যাদির পরিবর্তে ১৮৪২ সন হইতে ইহা 'Council of Education' বা বাংলা 'শিক্ষা-সমাজ' এই নামেই পরিচিত হয়) বার্ষিক রিপোর্টে এই বিষয়টির এইরূপ উল্লেখ পাই :

"There are at present in the press . . . as well as the Bengalee translation of the London Pharmacopœa prepared by Pundit Modhusudun Goopto . . ."†

[এই গ্রন্থখানি ১৮৪৯ সনে প্রকাশিত হয়।]

মধুসূদনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও অধ্যাপনায় এবং 'পরিদর্শক' ওয়েবের চেষ্টা-যত্নে হিন্দুস্থানী শ্রেণীর ছাত্রগণ অধীত বিষয়ে দ্রুত উন্নতি করিতে লাগিল। দুই বৎসরের মধ্যে ইহার বিশেষ পরিচয়ও পাওয়া গেল। শিক্ষা-সমাজ ১৮৪৫-৪৬ সনে এই শ্রেণীর পরি-

* *Report of the General Committee of Public Instruction, etc.,* for 1840-41. Pp. 79.

* *Report of the General Committee of Public Instruction,* etc., for 1943-44. Pp. 67.

† ঐ, পৃ. ২০

চালনায় অধ্যাপক ওয়েব এবং পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তের কৃতির কথা এইরূপ উল্লেখ করেন :

"The conduct, character, attendance, and attainments of the military class have been most satisfactory and much credit is due to Professor Webb and Pundit Modhusudun Goopto for the proficiency of the pupils in the important branch of study taught by them."

এই শ্রেণীর 'ভিজিটর' অধ্যাপক এলান ওয়েব ১৯শে জানুয়ারী ১৮৪৬ তারিখে ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণান্তর উচ্চতন কর্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে তিনি মধুসূদনের কৃতিত্বের কথা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করেন। এখানে ওয়েবের মন্তব্য হুবহু উদ্ধৃত হইল :

"They (the students) answered very satisfactorily upon the whole, and in a manner which reflects the highest credit upon their excellent teacher of Anatomy and Physiology, Baboo Modhusudun Gooptu; indeed it gave me sincere pleasure to observe in my daily visit at this dissections, that the zeal and exertions of the Baboo are quite as successful here in this first attempt to carry out regular dissections by the military class, (chiefly Mahommedans) as amongst the Hindoo students of the English class."*

এই হিন্দুস্থানী ('মিলিটারী ক্লাস'ও বলা হইত) শ্রেণীর ছাত্রেরা ছিল অধিকাংশই মুসলমান। তাহাদের মধ্যেও শবব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। অধ্যাপক ওয়েব শুধু মধুসূদনের অধ্যাপনা-নৈপুণ্যেরই প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, হিন্দু ছাত্রদের মত মুসলমান ছাত্রদেরও যে তিনি শবব্যবচ্ছেদে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এ কারণেও তিনি ওয়েবের নিকট হইতে সুখ্যাতি লাভ করিলেন। শিক্ষা-সমাজ পরবর্তী বার্ষিক রিপোর্টগুলির কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ অধ্যায়ে হিন্দুস্থানী শ্রেণীর ছাত্রদের কৃতিত্বের কথা বলিতে গিয়া প্রতি বারেই পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তের অধ্যাপনা, শবব্যবচ্ছেদ-পারিপাট্য এবং সুষ্ঠু পরিচালনার প্রশস্তি করিয়াছেন। ১৮৪৬-৪৭ সনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ছাত্রই মধুসূদন গুপ্ত-প্রদত্ত উর্দু নোটগুলির উপর নির্ভর করিয়া ব্যবচ্ছেদ-কার্য্য করিয়া যাইত।† মধুসূদনের অধ্যাপনা-গুণে তাহারা শারীরবিদ্যা বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

৬

কর্তৃপক্ষ যে মধুসূদনের গুণপনায় মুগ্ধ ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা তাঁহাকে ১৮৪৮ সন নাগাদ প্রথম শ্রেণীর সাব-এসিষ্টান্ট সার্জ্জন পদে উন্নীত করিলেন।‡ ইহার পর বৎসর, ১৮৪৯ সনে মধুসূদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ এই প্রবন্ধের গোড়াতেই করিয়াছি। ঐ সময়ের বিখ্যাত শিল্পী মিসেস বেলনস মধুসূদনের একখানি তৈলচিত্র আঁকিয়া দেন। বেথুন সাহেব মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে ঐ বৎসরে এই তৈলচিত্রখানি উন্মোচন করেন, এই সময়ে তিনি মধুসূদনের উচ্ছসিত প্রশংসাও করিয়াছিলেন—এ সব কথা আমরা আগেই পাইয়াছি।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্ভুক্ত হিন্দুস্থানী ক্লাস বা শ্রেণীর মত একটি বাংলা শ্রেণী বা বিভাগ খোলার আবশ্যকতাও ক্রমে বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে। এ বিষয়ে ১৮৪৩ সনেই দেওয়ান রামকমল সেনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারী এবং মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ডাঃ এফ. জে. মৌএট একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসর পরে ১৮৫২ সনের প্রথমে কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন। তখন বাংলা দেশের বিভিন্ন সরকারী কেন্দ্রে, জেলা-শহরে, এমনকি অভ্যন্তর ভাগে গ্রামাঞ্চলেও চিকিৎসকদের প্রয়োজন নিতান্তই অনুভূত হইতেছিল। ১৮৫২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি বাংলা শ্রেণী বা বিভাগ খোলা হইল। হিন্দুস্থানী বিভাগের ন্যায় বাংলা বিভাগেরও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন মধুসূদন গুপ্ত। মেটিরিয়া মেডিকা বা ভৈষজ্য-সংহিতার অধ্যাপক হইলেন শিবচন্দ্র কর্ম্মকার; মেডিসিন বা ভেষজতত্ত্ব অধ্যাপনার ভার পড়িল প্রসন্নকুমার মিত্রের উপর। মধুসূদন স্বয়ং শারীরবিদ্যা বা এনাটমি এবং শল্যবিদ্যা শিক্ষার ভার লইলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ (বাং ১২৫৯) মধুসূদনের 'এনাটমি বা শারীর বিদ্যা' শীর্ষক বাংলা পুস্তক বাহির হয়।

হিন্দুস্থানী বিভাগের মত বাংলা বিভাগেরও উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, ভেষজবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা অনুবাদ ও সংকলন-গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইল। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ যেমন ঐ যুগে বিজ্ঞান-চর্চ্চার এক উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হইয়া উঠে, সেইরূপ কলেজের বাংলা বিভাগও বঙ্গভাষায় লিখিত সাধারণ বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক রচনায় নানাভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়। বাংলা বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রেরা মফস্বল অঞ্চলে চিকিৎসক হইয়া যাইতেন; স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট তাঁহারা 'নেটিব ডাক্তার' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাংলা বিভাগ পরিচালনায় মধুসূদনের কৃতিত্বও আমরা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

৭

মধুসূদনের কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান ঘটে ১৫ই নবেম্বর ১৮৫৬ দিবসে। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (২০শে

* ঐ, ১৮৪৫-৪৬, পৃ. ১১৮।

† ঐ, ১৮৪৬-৪৭, পৃ. ৯২

‡ ঐ, ১৮৪৮-৪৯, পৃ. ১১৯

নবেম্বর, ১৮৫৬) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্ত সংবাদ প্রদান-কালে মধুসূদনের উদ্দেশ্যে একটি পংক্তিমাত্র লেখেন : "উক্ত কলেজের বাঙ্গালা ক্লাসের ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার বক্তৃতাকারক বাবু মধুসূদন গুপ্ত পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।" পরবর্তী ২২শে নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' মধুসূদন গুপ্ত সম্পর্কে সবিস্তারে নিম্নরূপ লিপিয়াছেন :

"উক্ত গুপ্ত বাবুর মৃত্যু হইয়াছে ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, মধুসূদনবাবু এতদ্দেশীয় ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ব্যবসায়ীগণের আদি-পুরুষ ছিলেন, এতদ্দেশীয়েরা বিশেষত হিন্দু জাতিরা মৃতদেহ স্পর্শ করিবেন দূরে থাকুক পিতামাতাদি আত্মীয় লোকের মৃত্যু হইলে যে স্থানে শব রাখে গোময় জলে সেস্থান পর্য্যন্ত ধৌত করেন, শব লইয়া গেলে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গোময় জলের ছিটা দেন, মৃত দেহের বিষয়ে অদ্যাপিও যে জাতির ঘৃণা ও পাপবোধ রহিয়াছে মধুসূদন বাবু সেই জাতির মধ্যে এক উত্তম কুলে জন্মিয়াছিলেন তথাচ মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দু জাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হন, তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যান্য হিন্দুরা মৃতদেহ কাটাকুটি কার্য্যে সুপটু হইয়াছেন। ঐ বাবুই তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন, মধুসূদন গুপ্ত স্বজাতীর বৈদ্যক বিদ্যায় এবং ইংরেজী চিকিৎসা বিদ্যায় সুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যু সমাচারে ইংরেজ বাঙ্গালী সাধারণ বহু লোক আক্ষেপ করিবেন।"

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে মধুসূদনের সংস্রব ইহার প্রতিষ্ঠা হইতে। দীর্ঘ বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত সাতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ জ্ঞানবুদ্ধি মত তিনি ছাত্রদের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ডাঃ টি. ডব্লিউ. উইলসন কলেজের ১৮৫৬-৫৭ সনের বার্ষিক বিবরণ দান প্রসঙ্গে মধুসূদনের মৃত্যু সম্পর্কেও তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্ত্তাকে (Director of Public Instruction) লিখিলেন :

"Baboo Mudoosoodun Gooptu, Lecturer on Anatomy to the Bengali and Hindustani Students, after twenty-two years' service in the college died on the 15th November, 1856. To him a debt of gratitude is due by his countrymen. He was pioneer who cleared a space in the jungle of prejudice, into which others have successfully pressed, and it is hoped that his countrymen appreciating his example will erect some monument to perpetuate the memory of the victory gained by Muddoosoodun Gooptu over public prejudice, and from which so many of his countrymen now reap the advantage."*

মধুসূদনের মৃত্যুর পর ঠিক এক শতাব্দী অতীত হইল। আজকাল কত শতবর্ষ-জয়ন্তী ঘটা করিয়া উদ্‌যাপিত হইতেছে। 'সাধারণের মধ্যে অসাধারণ' এই মানুষটির কথা কি আমরা একেবারে ভুলিয়া যাইব? অথবা, তিনি হয়ত আমাদের এতই আপন হইয়া গিয়াছেন যে, আলাদা করিয়া তাঁহার কথা স্মরণ-মননের আর আবশ্যক নাই।

১৫ই নবেম্বর ১৯৫৬

* *Report of the Director of Public Instruction* for the year 1956-57, p. 200.

আদর্শ মানুষ—দেবেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বাঙ্গলা দেশের নমস্য ব্যক্তিদের তালিকায় শিক্ষকদের নাম এককালে খুব সম্মানের সহিত গৃহীত হইত এবং বাঙ্গলার অনেক মহাপুরুষ শিক্ষকগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এরূপ দেখা যায় ইঁহাদের অনেকেই কেবলমাত্র শিক্ষকতা করিয়া জীবনের কর্তব্য শেষ করেন নাই, বাঙ্গলার নানা ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেদের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, রামতনু, নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ), সুরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, শিবনাথ, উমেশচন্দ্র, কৃষ্ণকমল, রামেন্দ্রসুন্দর, জানকীনাথ অরবিন্দ, হরপ্রসাদ, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র, গৌরী-শঙ্কর, যাদবচন্দ্র, ললিতমোহন, কালীকৃষ্ণ, সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ এমনকি সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীবৃন্দকে শিক্ষক-রূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ তালিকা একান্তই অসম্পূর্ণ।

ইঁহাদের অনেকেই শিক্ষকতার দ্বারা বা মানবজীবনের কল্যাণ-কর বৃহত্তর ক্ষেত্রে মহান্ কার্যদ্বারা চিরযশস্বী হইয়া গিয়াছেন। আবার অনেকে আছেন যাঁহারা নিজ ছাত্রমণ্ডলী এবং আপনার ক্ষুদ্র পরিবেশের মধ্যে চরিত্রবত্তা, জ্ঞানপিপাসা, সত্যানুরাগ ও দুঃস্থের সেবাকার্য প্রভৃতি মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং অপরকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। এইরূপ শ্রেণীর মধ্যে আমরা দেবেন্দ্রনাথ বসুকে দেখিতে পাই

পিতৃমাতৃ পরিচয়

দেবেন্দ্রনাথের পিতৃপরিচয় দিতে গেলে বলিতে হয়, তাঁহার পিতা হরনাথ, জানকীনাথের পিতা, নেতাজী সুভাষ ও স্বনামধন্য শরৎচন্দ্রের পিতামহ। দেবেন্দ্রনাথ, হরনাথের প্রথমা স্ত্রী মনোমোহিনীর একমাত্র সন্তান।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে মাতা ও মাতুলদের প্রভাব অধিক মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। পারিবারিক অবস্থার সংঘাতে যাহা ঘটিয়া-ছিল তাহারই পরিচয় দিয়া দেবেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা যাইতে পারে।

কলিকাতা ইটালীর প্রাচীন অধিবাসী গোবিন্দ ঘোষের দুই পুত্র গোপালচন্দ্র ও যদুনাথ এবং পাঁচ কন্যা ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয়া কন্যার সহিত ইটালীর লোকপ্রিয় জমিদার দেব-নারায়ণ দেব-এর সহিত বিবাহ হয়। তৃতীয়া কন্যা বালবিধবা হইয়া পিতা ও ভ্রাতার সংসারে জীবনাতিপাত করেন। কনিষ্ঠা কন্যা বিবাহ হইবার কয়েক বৎসর পরে একটি কন্যা-সন্তান রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। তাহার কিছুদিন পরেই তাঁহার স্বামী তাঁহার অনুগমন করিলে পিতৃমাতৃহীনা শিশু-কন্যা মাতামহ গোবিন্দ ঘোষের গৃহে লালিতপালিত হইতে লাগিল। এই শিশুর নাম মনোমোহিনী এবং ইনিই দেবেন্দ্রনাথের জননী।

দেবেন্দ্রনাথ বসু

দশ বৎসর বয়সে কোদালিয়া-নিবাসী হরনাথের সহিত মনো-মোহিনীর বিবাহ হয়। বালিকা বধূ শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় বড়ই কান্নাকাটি করিতেন। একবার হরনাথের পিতা প্রাণমোহন পুত্র-বধূকে লইতে আসিয়া যথারীতি বালিকার রোদনের বিষয় শুনিলেন। কিন্তু সেবার তিনি পুত্রবধূকে লইয়া যাইবেন বলিয়া জিদ ধরিলেন। বালিকার পক্ষ হইতে কয়েক দিন বাদে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব তিনি ক্রোধভরে অগ্রাহ্য করিলেন। সেই দিনই গ্রামে ফিরিয়া পুত্রের আবার বিবাহ দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন এবং এই ঘটনা হইতে সামান্য কয়েক মাসের ব্যবধানে পাশের গ্রাম হরি-নাভিতে রাধাকৃষ্ণ দত্তের কন্যা সত্যভামা ওরফে কামিনীর সহিত পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। কামিনী নেতাজীর পিতামহী।

মনোমোহিনী মাতুলালয়ে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহাকে কোদালিয়ায় লইয়া যাওয়া হয়। হর-নাথের অভাবের সংসার, সেখানে দুই সপত্নী কোনরূপে একত্রে সংসার করিতে থাকেন। ইত্যবসরে কামিনীর দুই পুত্র যদুনাথ ও

কেদারনাথ জন্মগ্রহণ করেন। মনোমোহিনীর দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে একমাত্র পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৫ সনে মহালয়ার দিন ইটালীতে ভূমিষ্ঠ হন। মনোমোহিনী অধিকাংশ সময়ই মাতুলালয়ে থাকিতেন। দেবেন্দ্রনাথের জন্মের পর সামাজিক ক্রিয়াকর্ম বাদে কোদালিয়া শ্বশুরালয়ে যাতায়াত প্রায়ই আর ঘটিয়া উঠিত না। দেবেন্দ্রনাথ মাতামহের আলয়ে অত্যন্ত আদরে ছিলেন। সংসারে বিশেষ অস্বচ্ছলতা নাই, তাহার উপর গোবিন্দ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ উভয়ের মিলিয়া বৃহৎ পরিবারের মধ্যে আবাল্য প্রতিপালিত মনোমোহিনী দেবেন্দ্রনাথকে লইয়া সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গেলেন।

বাল্যকাল ও শিক্ষাব্যবস্থা

দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিবার পর মনোমোহিনীর মাতুলালয় বাসের আরও কারণ আছে। সওদাগরী আপিসে সামান্য উপার্জ্জন, তাহার উপর পুত্র কন্যাসহ সপত্নী বর্ত্তমান। এদিকে দেবেন্দ্রনাথ ইটালীতে সযত্নে প্রতিপালিত হইতেছেন। তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের প্রশ্নও আলোচিত হইতেছে। ইটালীতে মনোমোহিনীর মাতুলালয়ে বিদ্যালাভের একটা আবহাওয়া রহিয়াছে। ভ্রাতা যদুনাথ জুনিয়ার ও সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "সিনিয়র" পরীক্ষা পাস করিয়া পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন; সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বি-এ পাস করেন। সে যুগে ইহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং যদুনাথের নিকট থাকিয়া শিক্ষালাভের সুবিধা থাকায় দেবেন্দ্রনাথ ইটালীতে আরম্ভ করিয়া তথা হইতে শিক্ষা সমাপন করেন।

তদানীন্তন প্রথা অনুযায়ী দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে এক পাঠশালায় ভর্ত্তি হন এবং অচিরকালে সহপাঠীদের মধ্যে মেধাবী ও বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচয় লাভ করেন। তথা হইতে অধুনালুপ্ত বহুবাজার ভার্ণাকুলার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পাঠ আরম্ভ করেন এবং মধ্য প্রাইমারী (Middle Vernacular Examination) পরীক্ষা দেন এবং বৃত্তিলাভ করেন। দেবেন্দ্রনাথের মাতাঠাকুরাণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিশোর দেবেন্দ্রনাথ নিজ "উপার্জ্জনে" শিক্ষার ব্যয় বহন করিবে ইহা ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের নিকট পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করিতে লাগিলেন।

যথাকালে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুস্কুলে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। হিন্দুস্কুল তখনকার দিনে উচ্চ শিক্ষাভিলাষী ছাত্রদের প্রায় একমাত্র বিদ্যায়তন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি পাঠে আগ্রহ, বিনয় ও সদালাপে অচিরে শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। শিক্ষকমণ্ডলীর যত্নে ও নিজ অধ্যবসায়ে তিনি সতীর্থদের মধ্যে যশস্বী হইয়া উঠিলেন এবং ১৮৭১ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৪৲ টাকা বৃত্তিলাভ করিলেন। মাতার আর আনন্দের সীমা নাই; পিতা হরনাথ পুত্রগৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁহার মধ্যম পুত্র কেদারনাথ ১৮৬৮ সালে হরিনাভি স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তৃতীয় পুত্র দেবেন্দ্রনাথ "জলপানি" পাইয়াছেন। সে দিনে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে দুই পুত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতকার্য্য দেখিবার সৌভাগ্য খুব অল্প পিতার ভাগ্যে ঘটিতে দেখা যাইত।

উচ্চশিক্ষা

দেবেন্দ্রনাথ তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। পাঠে শিথিলতা নাই; যৌবনসুলভ ক্রীড়া-আমোদে রুচি নাই। সহপাঠীদিগের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি থাকিলেও পরীক্ষার ক্ষেত্রে মনে মনে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ত্তমান। দেবেন্দ্রনাথের মানসিক বৃত্তির যে অনুশীলন হইতেছিল, তাহারই বিপরীত অনুপাতে স্বাস্থ্যের দিকে অমনোযোগিতা আসিয়া দেখা দিতেছিল। সুতরাং তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা কতক পরিমাণে হীন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ১৮৭৩ সালে এফ-এ বা ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তিলাভ করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজেই তিনি বি-এ পাঠ আরম্ভ করেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স লন। ইত্যবসরে তাঁহার স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হইয়াছে এবং বহু চেষ্টাতেও তাহার প্রতিরোধ করা সম্ভব হইতেছে না। পরীক্ষায় পূর্ব্ব সুনাম রক্ষা করিতে হইবে, বৃত্তি না পাইলে শিক্ষালাভ বন্ধ করিতে হইবে, সুতরাং তিনি স্বাস্থ্য উপেক্ষা করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইহার অভিশাপ তিনি সারা জীবনই বহন করিয়াছেন; তখন তাঁহার স্বাস্থ্যের এমন অবস্থা যে আর ঔষধের শিশি সঙ্গে না করিয়া তাঁহার পরীক্ষার কথা চিন্তা করা চলে না। বি-এ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্য আরও হীন হইয়া পড়ে। তৎসত্ত্বেও বি-এ পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন ও রৌপ্যপদক ও মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৭৬ সালে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স পাশ করেন এবং ১৮৭৭ সালে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে নীলকান্ত মজুমদার প্রথম ও দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং যথারীতি পুরস্কার লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর।

বিবাহ

ফার্ষ্ট আর্টস (এফ-এ) পরীক্ষা পাশ করিলে আর অন্নসংস্থানের অসুবিধা হয় না। সংসার ও পরিণীতা স্ত্রীর ভার গ্রহণে উপযুক্ত বিবেচনা করা অভিভাবকদিগের মধ্যে একটা সাধারণ প্রচলিত ধারণা ছিল। সুতরাং যখন বি-এ পরীক্ষার পূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসে তখন তাহাতে আর কোনও আপত্তিই চলে না।

ফার্ষ্ট আর্টস পাঠকালে কলিকাতা সিমুলিয়ায় ঘোষেদের বাড়ী তাঁহার বিবাহ হয়। চণ্ডীদাস ঘোষ তাঁহার সহপাঠী ও বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি এ বন্ধুত্ব স্থায়ী করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সহোদরা সুখদা মোহিনীর বিবাহের "ঘটকালি" করেন এবং উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মতে পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই

উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। চণ্ডীদাস উত্তরকালে শিয়ালদহ কোর্টের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

কার্য্যারম্ভ

এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই তাঁহার অধ্যাপক টনি 'সাহেবে'র সুপারিশে তিন মাসের জন্য কটক কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের অস্থায়ী পদ প্রাপ্ত হন। কটক যাত্রা লইয়া তিনি বিশেষ চিন্তায় পড়িলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানিয়া আত্মীয়-স্বজনও চিন্তিত। তদুপরি বিমাতা কামিনীর মৃত্যুতে এখন তাঁহার অশৌচ চলিতেছে। এরূপ অবস্থায় আত্মীয় পরিজনের বাহিরে দূর দেশে যাওয়ায় সাধারণভাবে আপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। অশৌচের জন্য তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে এবং অন্য পরিবারে অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিধানমতে তাঁহার জুতা ব্যবহারে এবং আমিষ ভোজনে কোনও আপত্তি হয় নাই। সে দিনের কটক যাত্রা এ দিনের মত সুগম ছিল না। হয়, গোযানের সাহায্যে বিপদসঙ্কুল স্থলপথে নানা ক্লেশ সহ্য করিতে হইত। পথ সরল নয়, তাহা ছাড়া অত্যন্ত অসমতল। হিংস্র পশু ছাড়া দুর্বৃত্তের উপদ্রবের অন্ত ছিল না। আর না হয়, জলপথে জাহাজে করিয়া চাঁদবালি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া খালের মধ্যে নৌকা সাহায্যে কটক পৌঁছিতে হইত। তখন অবশ্য কটক সংযুক্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা "বঙ্গ প্রেসিডেন্সী"র অন্তর্গত ছিল এবং সেখানে বাঙালীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। কোনও কোনও বাঙালী তখনকার যুগে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রায় বাহাদুর হরিবল্লভ বসু অন্যতম। ইনিই পরে কটকে জানকীনাথের ব্যবহারজীব জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

নূতন পরিবেশ ও গিরীশচন্দ্র

নূতন স্থানের আবহাওয়া যুবক দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে উপযোগী হইবে কিনা, তাহাও একটা চিন্তার কারণ ছিল। কটক স্কুলে নিয়োগপত্র পাইবার পূর্ব্বেই তিনি সেখানে কোনও বাঙালীর সাহায্য লাভ করিতে পারেন কিনা তাহা অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন উত্তরকালে বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয় সে সময় র‍্যাভেন্‌স কলেজের অধ্যাপক। গিরীশচন্দ্র ১৮৭৬ সালে হুগলী কলেজ হইতে উদ্ভিদ বিদ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ঐ সালেই বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়া র‍্যাভেন্‌স কলেজে যোগদান করেন। যখন দেবেন্দ্রনাথের কটক যাওয়া স্থির হইয়া গেল তিনি গিরীশচন্দ্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। বাহাতে কটকে গিয়া অহেতুক কষ্ট ভোগ করিতে না হয় সে জন্য আইদাস বাজারে নিজ বাসা-বাটীতে স্থান গ্রহণ করিবার জন্য গিরীশচন্দ্র অনুরোধ জানাইলেন। বলা বাহুল্য, সে অনুরোধ উপেক্ষা করা দেবেন্দ্রনাথের সাধ্যাতীত ছিল। তৎপূর্ব্বেই গিরীশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও সুমধুর ব্যবহার সহকর্ম্মী ও ছাত্রমহলে তাঁহাকে তখন জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার নিকট অবস্থান করিলেন, তখন নিজ চরিত্রমাধুর্য্যের সহিত গিরীশচন্দ্রের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা যুক্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে কটকবাসের প্রথম অবস্থা বিশেষ সুখকর হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তিনি ছাত্রদের সহিত ব্যবহার, ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর বাহিরে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করেন।

গুরু ও বন্ধু

গিরীশচন্দ্রের সহিত প্রথম জীবনে অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হইবার সুযোগ দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর হইয়াছিল। বলা-বাহুল্য, গিরীশচন্দ্রের আদর্শ তাঁহার নিকট চির জাগরূক ছিল। অচিরকালের মধ্যে তাঁহাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। দুই পণ্ডিত ও সজ্জনের প্রেম অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত মধুর হইয়া উঠিল। আমরণ দুইজন পরস্পরে ভ্রাতার ন্যায় আচরণ করিয়াছেন এবং দুই পরিবারের মধ্যে সকল ব্যবধান দূর হইয়া নিকটতম হইয়া উঠিয়াছে। গিরীশচন্দ্রের পুত্র-কন্যারা দেবেন্দ্রনাথকে "কাকাবাবু" এবং তাঁহার পত্নীকে "সই মাসিমা" বলিয়া ডাকিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ গিরীশচন্দ্রকে আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরের স্থান দিয়াছিলেন এবং চিরকাল সমস্ত বিপদে আপদে গিরীশচন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছেন ও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কটকবাসের তিন মাস দেবেন্দ্রনাথ গিরীশচন্দ্রের নিকট যাপন করিয়াছিলেন। তিনি কোনও দিন মনে করিতে পারেন নাই যে, তিনি আত্মীয় পরিজন হইতে দূরে পড়িয়া আছেন।

দ্বিতীয়বার কটক যাত্রা

কটক স্কুলের প্রধান শিক্ষকতার তিন মাস গত হইলে দেবেন্দ্রনাথ চলিয়া আসেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ সনের জুলাই মাসে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার কটক যাত্রা করেন। এখন তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কটক কলেজে যোগদান করিলেন। গিরীশচন্দ্রের আবাস তাঁহার জন্য অবারিত। সঙ্গে পিতা, মাতা, স্ত্রী, কন্যা ইন্দুবালা ও ভ্রাতা জানকীনাথ। সংখ্যায় এতগুলি হওয়া সত্ত্বেও গিরীশচন্দ্র পরম সমাদরে তাঁহাদের গ্রহণ করিলেন। সেখানে সপ্তাহাধিককাল থাকিবার পর গিরীশচন্দ্র নিকটেই বাসা স্থির করিয়া দিলে দেবেন্দ্রনাথ সপরিবারে তথায় গমন করেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ

কটকে দুই বৎসরাধিকাল অতিবাহিত হইলে তিনি ১৮৮২ সনের মার্চ্চ মাসে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক হইয়া চলিয়া আসেন। ১৮৯২ সনে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলি হইলে কৃষ্ণনগরবাসীর আর দুঃখের সীমা ছিল না। কলেজে সতীর্থ ও ছাত্রমহলে দুঃখের ছায়া পড়িয়া গেল। এ বিচ্ছেদ তাঁহাদের বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। মাত্র আট মাস পরে

তিনি পুনরায় কৃষ্ণনগর কলেজে যান এবং সকলেই মনে করিলেন যে "ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছে।"

১৮৯৩ সনে তাঁহাকে হুগলী কলেজে যাইবার নির্দ্দেশ আসে। সেখানে মাত্র মাস দুই অবস্থান করিবার পর তিনি গুরুতর ভাবে পীড়িত হন এবং তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠে। এইবার আবার পুরাতন বন্ধুত্বের গভীরতা ও প্রেমের নূতন করিয়া পরিচয় লাভ ঘটে। এরূপ পীড়িত অবস্থায় তিনি কলিকাতায় গিরীশচন্দ্রের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গিরীশচন্দ্রই পরমাত্মীয়, তিনি অন্য কোথাও উঠিবার কথা মনে করিতে পারেন নাই। সেবার অতি কষ্টে তিনি মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইলেন এবং সুস্থ হইবার মধ্যেই তাঁহার কৃষ্ণনগর যাইবার অনুমতি আসিলে যোগান্তে কৃষ্ণনগর কলেজে ফিরিয়া যান। কৃষ্ণনগরের সহিত তথাকার ছাত্র ও বন্ধুজনের সহিত বিচ্ছেদ তিনি যেন সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন সকলেরই পরম আনন্দের কারণ স্বরূপ হয় এবং কৃষ্ণনগরে যেন উৎসবে মাতিয়া উঠে। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবশিষ্টকাল অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২৭।২৮ বৎসর আর কোথাও যাইতে হয় নাই। গেলেও দীর্ঘ ২৭ বৎসর কাল কৃষ্ণনগর কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া গিয়াছেন। ১৯০৯ সনে তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। জীবনের অবশিষ্ট কালের অধিকাংশই তিনি দেওঘরে কাটাইতেন। তথায় বাসকালে তিনি প্রায় সকল সেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছেন; সাধুসজ্জন বিদ্যামণ্ডলীর শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আনন্দে কালযাপন করিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি আরও ক্ষুণ্ণ হয় এবং শরীর দুর্ব্বল হইতে থাকে। ১৯৩১ সনের ১৫ই জানুয়ারী (১লা মাঘ ১৩৩৭) তিনি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া মরধাম পরিত্যাগ করেন।

গুরু-শিষ্য

দেবেন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণনগর কলেজ, দুইটি নাম যেন সংযুক্ত হইয়াছিল। শিক্ষকরূপেই তাঁহার প্রধান খ্যাতি। ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও জ্ঞান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক চরিত্র যাহাতে বলিষ্ঠ হয়, তাহাই ছিল দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য। কেবল শিক্ষায়তনে নয়, তিনি ছাত্রদের সহিত সকল সময় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। তিনি গাম্ভীর্য্যের সহিত যে সরস হাস্যালাপ করিতে পারিতেন তাহাতেই তিনি ছাত্রদের নিকট আরও প্রিয় হইয়া উঠেন।

সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় "সেকালের স্মৃতি" (বসুমতী, ১৩৪০ শ্রাবণ, পৃঃ ৫৭৫) প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, দেবেন্দ্রনাথ বসু আমাদিগকে গদ্যপাঠ শিক্ষা দিতেন; তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন; (অধ্যক্ষ) হিল (এস সি) সাহেব ও দেবেন্দ্রবাবু চমৎকার পড়াইতেন এবং আমাদের সহিত বন্ধুবৎ আচরণ করিতেন। দেবেন্দ্র বাবুর প্রকৃতি গম্ভীর ছিল, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে এমন সরস রসিকতা করিতেন যে, আমরা সকলেই হাসির চোটে চক্ষু সজল করিতাম। আমাদের হাস্যোচ্ছ্বাসে কৌতুকপ্রিয় গম্ভীর অধ্যাপকের কালো গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত দন্তশ্রেণী দেখিতে পাইতাম। তিনি সময়ে সময়ে বাংলা সাহিত্যেরও আলোচনা করিতেন; তিনি হেমবাবুর 'দশমহাবিদ্যা'র অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন এবং তাহার অধিকাংশস্থল মধুরকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে শুনাইতেন।

ছাত্রদের নিন্দা করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার তাঁহার এক পুরাতন ছাত্র সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া পদধূলি গ্রহণান্তর বসিয়া গল্প আরম্ভ হইলে পুরাতন দিনে গুরু-শিষ্য সম্পর্কেও আলোচনা উঠিয়া পড়ে; ছাত্রদের আচরণ নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছে, শিক্ষকদিগের প্রতি আর পুরাতন সম্মান প্রকাশ করেন না। দেবেন্দ্রনাথ স্মিতহাস্যে বলিলেন, দোষ এক পক্ষের নয়, আগে গুরু-শিষ্য যে সম্পর্কে বাঁধা ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে গুরু ছাত্রদের নিকট বিদ্যা স্নেহ, সহানুভূতি ও দৈনন্দিন আচরণ যে সকল শ্রদ্ধা আকর্ষণযোগ্য গুণে বিভূষিত ছিলেন, এখন তাহা নিতান্ত হ্রাস পাইয়াছে; সুতরাং একটা নূতন সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার কথা।

পারিবারিক জীবন

দেবেন্দ্রনাথের এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করেন; কন্যা তাঁহার মাতার সহচরী সঙ্গী হইয়া শিক্ষা লাভ করেন এবং বিবাহান্তে পতিগৃহে গমন করেন। কলেজের ছাত্রদের লইয়া দেবেন্দ্রনাথ পুত্রশোক বা পুত্রের অভাব বোধ করিতেন না। দুঃস্থ, আর্ত্ত, বিপন্ন ছাত্রদের উপর তাঁহার সহৃদয় দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত। অভাবগ্রস্ত হইয়া যাহাতে কাহারও বিদ্যালাভে অসুবিধা না হয় তাহার জন্য তিনি সামর্থ্যের অধিক দান করিতেন। কাহারও পীড়ার সংবাদ পাইলে তিনি রোগীর বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসিতেন এবং আত্মীয়স্বজনকে সাহস, সাহায্য ও সান্ত্বনাদানে মুগ্ধ করিতেন।

পিতার সংসার হইতে দূরে পালিত হইলেও দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ভ্রাতাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ছিল। সাধারণতঃ "বৈমাত্র" শব্দের সহিত ভ্রাতাদের যে অর্থ জড়িত তাহার পূর্ণ ব্যতিক্রম দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। জানকীনাথ তাঁহার তৃতীয় বৈমাত্র ভ্রাতা। গ্রামে তাঁহার পাঠের অসুবিধা হইতেছে জানিয়া তিনি তাঁহাকে ইটালীতে মাতামহের বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে পাঠের ব্যবস্থা করায় জানকীনাথ কৃতিত্বের সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কলেজে পাঠকালে জানকীনাথের কলিকাতায় অবস্থান ও পাঠের ব্যয় সম্বন্ধে অসুবিধা ঘটে। দেবেন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়াই জানকী-

নাথকে তাঁহার নিকট কটকে লইয়া গিয়াছেন এবং পাঠের সুব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বৃত্তিলাভ করিয়া জানকীনাথ র‍্যাভেনস কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উত্তরকালে জানকীনাথ কটকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যশস্বী হইয়াছেন; তাঁহার মূলে দেবেন্দ্রনাথ ও পরে (রায়বাহাদুর) হরিবল্লভ বসু। অসুস্থতা বা বার্দ্ধক্য-জনিত ক্লান্তির জন্য হরনাথ বহুদিন পরিত্যক্ত স্ত্রীর মাতুলালয়ে বাস করিয়াছেন, তাঁহার অপর দুই পুত্র যদুনাথ ও কেদারনাথ প্রয়োজনানুরোধে সেখানে অবস্থান করিয়াছেন এবং এই সহায়তা হইতে কোনও সময় বঞ্চিত হইতে না হয় বলিয়া কেদারনাথ ইটালীতে বাসা করিয়া অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বাস করিয়াছেন।

যখন দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় তখন নিতান্ত প্রেম করিবার মত স্ত্রীর বয়স নয়। তিনি তখন আপনার পাঠ লইয়া 'মশগুল' এবং বালিকাবধূ সকলের নিকট বালিকার আদর লইয়া আনন্দে দিনাতিপাত করে। ক্রমে যখন সুখদাময়ীকে সহকর্ম্মিনীরূপে পাইতে চান তখন দেখেন যে, তাঁহার বিদ্যার একান্ত অভাব। সুতরাং তিনি কর্ম্মের অবসরে পত্নীকে শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন। তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লোকের মনোযোগ নাই, "রোজগার করে স্বামীর সংসার খরচ চালাতে সাহায্য করবার" প্রয়োজন ছিল না। তাহা ছাড়া স্বামীর নিকট পড়াশুনা আরম্ভ করিলে সঙ্গিনী ও শ্বশুরালয়ের বর্ষীয়সীদের বিদ্রূপের সম্ভাবনা বুঝিয়া বালিকা কোনও উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্র নহেন। তিনি অনেক বুঝাইলেন, ফল হইল না। পরে এক শীতকালের গভীর রাত্রিতে দেবেন্দ্রনাথের মাতা ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন যে, পুত্রবধূ নীরবে ক্রন্দন করিতেছে। কারণ জানিয়া লইয়া পুত্রকে দ্বার মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন এবং যথেষ্ট ভৎ সনা করিলেন। পর দিন হইতে তিনি বধূকে পড়ায় উৎসাহ দিতে লাগিলেন। উত্তর কালে সেই পত্নী সর্ব্বরকমে পণ্ডিত স্বামীর উপযুক্তা হইয়াছেন, বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অধ্যাপকদিগের "পাস-করা" মহিলাদের নিকটও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

দেশপ্রেম

সরকারী চাকুরি করিয়া মনেপ্রাণে স্বাদেশিকতার ভাব বজায় রাখিয়া চলা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। দেবেন্দ্রনাথ তাহার কিছু ব্যতিক্রম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাব প্রকাশ করিত। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। ইংরেজীতে অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার সামাজিক পারিবারিক পত্রের মধ্যে একটিও ইংরেজী শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না; বাংলায় কথা বলিবার সময় একটিও ইংরেজী শব্দের নামগন্ধও ছিল না। জানকীনাথ প্রতিষ্ঠিত কোদালিয়া দাতব্য কামিনী ঔষধালয়ের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসবের সময়, তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ছোক্‌রা সম্পাদক বলিয়াছিল যে, "average-এ প্রতিদিন ৫০।৫০ জন রোগী আসে।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে একান্তে লইয়া গিয়া স্নেহপূর্ণ বচনে বলেন, "বাবা, average-এর কি বাংলা নেই?"

যে সকল ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনা মতামত প্রকাশ করিলে সত্যই সাধারণের মনে দেশপ্রেম উদ্‌বুদ্ধ হয়, সেখানে তিনি অমায়িক ব্যবহারের সহিত সরল ভাষায় মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতেন। বিদেশীর চালচলন বেশভূষার অনুকরণ তিনি অন্তর দিয়া ঘৃণা করিতেন; কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কাহারও মনে ব্যথা দিয়া আপনার মত ব্যক্ত করিতেন না।

দেশের কল্যাণে তিনি নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে আপন মনে কাজ করিয়া যাইতেন। দেশের শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া না উঠিলে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। তখনকার দিনে স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর লোকের কোনও আস্থা ছিল না। সুতরাং তাহাতে মূলধন নিয়োগ করা ত্যাগের পর্য্যায়ে গিয়া পড়িত। সে সময়ে কোনও স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা শেয়ার বিক্রয় দ্বারা অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাইলে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার শক্তিমত সেই সকল শেয়ার ক্রয় করিতেন। বৎসরের পর বৎসর তিনি এই কাজ করিয়াছেন। দেশী কারবারের শেয়ার সকল সময় বাক্সে জমা হইয়া থাকিত। কোম্পানী "ফেল" পড়িবার সংবাদ পাইবার পর তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া জঞ্জাল দূর করিতেন। তিনি জানিতেন এ অর্থের কোনও প্রতিদান নাই, তথাপি ইহাতে তাঁহার বিরাম ছিল না। তাঁহার এ কার্য্যের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন একমাত্র তাঁহার সহধর্ম্মিণী; তাহা ছাড়া অপর কাহারও জানিবার সুযোগ হইত না। স্ত্রী যদি কখনও এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন তিনি বলিতেন ঐরূপ অর্থনাশে কোনও দোষ নাই। লাভের লোভে নয়, এই ভাবে অর্থ সাহায্য না করিতে পারিলে বিশেষতঃ যাঁহাদের সঙ্গতি আছে তাহারাও যদি না করেন, তাহা হইলে দেশের বৃহত্তর আর্থিক কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। তিনি পত্নীকে বলিতেন, "তোমাদের যেমন ইষ্টদেবতা, আমার তেমনই দেশ; এখানে মতামত চালাতে চেষ্টা না করাই শুভ।"

মাতৃভাষার উপর তাঁহার যে অকৃত্রিম প্রেম ছিল তাহা অনেকেরই জানা নাই। তাহাতে অবশ্য কাহারও কোনও অপরাধ নাই, কারণ দেবেন্দ্রনাথের মনের কোণে যাহা সঞ্চিত হইত তাহা অন্তরঙ্গ ছাড়া অপর কাহারও নিকট প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেন না।

সত্যের প্রতি অনুরাগ

তাঁহার কালে সত্যের প্রতি অনুরাগ একটা সংস্কারের মত দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। যাঁহারাই কোনও ক্ষেত্রে নেতৃত্বের স্থান গ্রহণ করিতেন তাঁহাদের নিকট হইতে অসত্য আশা করা যাইত না। (কালের গতিতে অবশ্য ইহার ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে।) এ সকলের মধ্যে আবার দেবেন্দ্রনাথের স্থান একটু স্বতন্ত্র ছিল। এখন সে কথা শুনিলে পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে

তাঁহাকে "পাগল" বলিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার আচরণ হইতে যদি কেহ মনে করেন যে, তিনি বঞ্চনার আশ্রয় লইয়াছেন, ইহাও এই সকল মহাপুরুষের নিকট অসহ্য ছিল। তাঁহার নিকট একটি অচল দুয়ানি আসিয়া জোটে। তাহাকে স্বতন্ত্রে রাখিয়া দিবার পূর্ব্বেই একবার খেয়া পার হইবার সময় পাটনীকে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভুলক্রমে সেই দুয়ানিটি দিয়া আসেন। বাসায় আসিয়াই সে ভুল ধরা পড়িলে, অবিলম্বে খেয়াঘাটে উপস্থিত হইয়া পাটনীকে পান না। পর পর কয়দিন খোঁজ করিয়া জানিতে পারেন যে এক সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোক একটি দু-আনি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অচল নয়, কেহ লইতে আপত্তি করে নাই; করিলে তাহার নিশ্চয় মনে থাকিত। ইহা জানিয়া দেবেন্দ্রনাথ কয়দিন যে দারুণ অস্বস্তি বোধ করিয়াছেন তাহা হইতে মুক্তি পাইলেন।

আত্মসম্মান

দেবেন্দ্রনাথের আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল এবং যেখানে তাহা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে তিনি ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আপনার মতামত ব্যক্ত করিতেন। এ সকল ব্যাপারে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা লোককে বিস্ময়াভিভূত করিত। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন এক বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি আসিয়া বলেন যে, তিনি পরম্পরায় শুনিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট হয় কলেজ উঠাইয়া দিবেন আর না হয় তাহার মান খর্ব্ব করিয়া ছাড়িবেন। সেই ভদ্রলোক বলেন যে, তিনি গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন যে, কলেজে একজন ইংরেজ অধ্যক্ষ নিযুক্ত না করিলে কলেজের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। ভদ্রলোক দেবেন্দ্রনাথের পোষাক-পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহার হইতে দেবেন্দ্রনাথকে ভুল বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা ও পদমর্য্যাদা হইতে মনে করিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ চাকুরির ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহার তোষামোদ করিবেন। ফল বিপরীত হইল। দেবেন্দ্রনাথ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কলেজের উন্নতি সম্পর্কে তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন কিনা। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে দেবেন্দ্রনাথের বলিবার কিছু নাই; কারণ সরল বিশ্বাসের সহিত তর্ক নাই। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলেও তাঁহার এ উক্তি বিচার করিয়া দেখিবার তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। দেবেন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও রোষ সেই স্তরে পৌঁছিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, যদি তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষ মহলকে তুষ্ট করিবার জন্য এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আচরণ নিতান্ত ঘৃণ্য, এত হেয় যে ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। দেবেন্দ্রনাথের এ মন্তব্যে আগন্তুক ভদ্রলোক অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। সেদিন তিনি বুঝিলেন বাহিরের সেই সৌম্য মূর্ত্তি, বিনয়বচন যাহার নিত্য-সহচর তাহা অগ্নিগর্ভ, কারণ ঘটিলে তাহা বজ্রনিঃস্বনে ফাটিয়া পড়িতে পারে।

"জলেতে যে অগ্নি থাকে মিথ্যা কভু নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।"

কবির এই উক্তি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। যেখানে আত্মসম্মান ও দেশের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা সেখানে তিনি বজ্র কঠিন মূর্ত্তি ধারণ করিতেন।

ন্যায়নিষ্ঠা

সমাজে নানাবিধ কাজে জড়িত থাকিলে সকলের সুখ্যাতি অর্জ্জন করা সম্ভব নয়; জগতে কখনও তাহা হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা নিজের বিবেকের কাছে দোষী নয়, অনুশোচনা যাঁহাকে বিব্রত করে না সেরূপ লোকের সংখ্যা বিরল। বিবেকের নির্দ্দেশে চলিতে গিয়া অনেক সময় আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের বিরাগভাজনও হইতে হয়, কিন্তু ন্যায়ের পথ যিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাকে ইহা উপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই। একবার এক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পূর্ব্বে তিনি স্থানীয় কোনও অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রের পরীক্ষায় বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। এক প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পুত্র প্রায় এক পর্য্যায়ভুক্ত ছিল; মোট বিচারে প্রথমোক্ত ছাত্রটী প্রথম স্থান অধিকার এবং বৃত্তিলাভের উপযোগী বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ মনে করেন। ফলাফল প্রকাশের প্রাক্কালে তিনি উক্ত পরীক্ষার ফল, সহকর্ম্মী ও স্থানীয় বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করেন। যখন দুজনেই প্রায় সমান হইয়াছে তখন বহুলোকে ব্রাহ্মণ সন্তানকে বৃত্তি দিবার জন্য অনুরোধ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে কেবল বিস্মিত হন নাই, যথেষ্ট দুঃখিত হন এবং অন্তরঙ্গমহলে তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

দৃঢ়তা

চরিত্রের নানা গুণের একত্র সমাবেশ হওয়ায় এবং নিজের মধ্যে দুর্ব্বলতার বিশেষ অভাব থাকায়, দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহারে ন্যায়ের প্রতি আসক্তি যে রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা সময় সময় কঠোর বা রূঢ় বলিয়া মনে হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি অপরের ন্যায্য যুক্তি গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না এবং ত্রুটি সংশোধন করিয়া নিজের ভুল স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এ বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই অপরের পরামর্শ গ্রহণে আগ্রহান্বিত ছিলেন।

কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন অনেক সময় তাঁহাকে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অপরের কাজের বিচার করিতে হইয়াছে। এখানে তাঁহার মধ্যে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ছিল না। ছাত্র, শিক্ষক, কর্ম্মচারী এমনকি কলেজের মালী পর্য্যন্ত পদমর্য্যাদাসম্পন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। ন্যায়নিষ্ঠায় তিনি অনেক কটাক্ষ সহ্য করিয়াছেন।

বাল্য ও বিধবাবিবাহ

সামাজিক মতবাদে তিনি অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিলেন এবং বিধবাবিবাহ সমর্থন করিতেন। স্ত্রী-শিক্ষাকে তিনি সমাজকল্যাণে খুব উচ্চ স্থান দিতেন এবং তিনি আপন পরিবারের মধ্যেও ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত প্রয়োগ করিতেন। বাল্যবিবাহে তাঁহার ঘোর আপত্তি ছিল এবং নিজ কন্যার বিবাহ, গুরুজনদিগের বিশেষ

অনুরোধ বিরক্তি সত্ত্বেও চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে দিবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প ছিলেন।

মাতৃভক্তি

দেবেন্দ্রনাথের মাতৃভক্তির তুলনা খুবই বিরল। জ্ঞান হইবার সঙ্গে দেখিলেন পিতার সংসারে মাতার বিশেষ স্থান নাই; মাতুলালয়ে তিনি দিনযাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ আপনার স্নেহ দিয়া, আচরণ দিয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া মাতার বেদনা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শিক্ষিত, বিনয়ী, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রে সাধারণতঃ যাহা করে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার উ॰র যাহা করিয়াছেন তাহা দেবীর আরাধনা বলিয়া উল্লেখ করা চলিতে পারে। বৃদ্ধ-কালে, আশী বৎসর বয়সে, মাতাঠাকুরাণী কঠিন রোগে আক্রান্তা হন। পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা "হরিনাম আর গঙ্গাজল" ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে বহু ব্যয়ে ইংরাজ ডাক্তার প্রভৃতি আনা এবং চিকিৎসার বিফলতা প্রকাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ সে পরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই। মাতার মৃত্যুতে তিনি বৃষোৎসর্গ দানসাগর শ্রাদ্ধ করিবেন না তাহা নিশ্চিত, কিন্তু মা যতক্ষণ বাঁচিয়া আছেন ততক্ষণ তিনি "মা", গেলে অভাব হইবেই তাহা ছাড়া শ্বাস যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ চিকিৎসা ব্যবস্থা করাই মানুষের ধর্ম্ম, তিনি তাহাই পালন করিতেন।

দরিদ্রনারায়ণ

বিত্তহীন, সহায়সম্বলহীনের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অগাধ প্রেম ছিল। সাধ্যমত তিনি উহাদের সাহায্য করিয়াছেন। সময় ও শৃঙ্খলানুযায়ী কাজ করা তাঁহার রীতি ছিল। যাঁহারা তাঁহার অর্থিক সাহায্য পাইতেন, তাঁহারা যাহাতে "পথ চাহিয়া" না থাকেন, সেই জন্য তিনি কলেজের বেতন পাইলে, স্থানীয় সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিয়া দিতেন; আর পরদিন সকালে সমস্ত মনিঅর্ডার নিজে লিখিয়া ডাক ঘরে প্রেরণ করিতেন। পোষ্ট আপিসে মনিঅর্ডার বিভাগের কর্ম্মিগণ এ ব্যবস্থার সহিত সুপরিচিত ছিলেন, আরও ছিলেন, যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথকে চিনিতেন।

পূজা বা কোনও উৎসব উপলক্ষে তিনি অতিরিক্ত অর্থ ও বস্ত্রাদি দান করিতেন। এগুলি তাঁহার বাঁধা নিয়মে চলিত। তাহা ছাড়া কেহ দায়গ্রস্থ হইলে গোয়াড়ী (কৃষ্ণনগর) উত্তরকালে ও দেওঘরের লোকে জানিত দেবেন্দ্রনাথ কাহাকেও নিরাশ করিবেন না। তাঁহার নির্দ্দেশে তাঁহার পত্নী বেতনের শতকরা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতেন; সে অর্থে দরিদ্র ও সাহায্যপ্রার্থী ছাড়া কাহারও অধিকার ছিল না।

কর্ম্মপদ্ধতি

দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মপদ্ধতি তখনকার দিনে আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত ছিল। যে সময়ের যে কাজ তাহা তিনি এমন ভাবে নিত্য নিয়মিত পালন করিতেন যে, তাহা দৃষ্টে লোকে ঘড়ির সময় ঠিক করিতে পারিত। প্রাতঃকালে তাঁহার ভ্রমণে বহির্গমন ও প্রত্যাগমন দ্বারা বহুলোক বিনা ঘড়ির সাহায্যে আপনার কার্য্যসূচী নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইত।

এককথা বলিলে যথেষ্ট হইবে, জানকীনাথ তাঁহার মহৎগুণের জন্য যত লোকের নিকট ঋণী, তাঁহার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জীবনদর্শন

কর্ম্মবহুল জীবনে নিজ কর্ত্তব্য পালনে দেবেন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে নানা প্রবল প্রতিপক্ষের বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইয়াছে। গুরু-দায়িত্বের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু এ সকলের পিছনে তাঁহার নিজস্ব ধর্ম্ম, শান্তিময় জীবনের কথা কখনও ভুলিতেন না। প্রতিদিন কলেজের দায়িত্ব, সামাজিক কাজ প্রভৃতি চুকাইতে পারিলে তিনি মাতা, পত্নী, কন্যা, পরিজন লইয়া আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করিতেন। কলিকাতার কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য দেওঘরে বাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেখানে তাঁহার লক্ষ্য ছিল শান্তি ও শান্ত জীবন। কোনও দলাদলি বিতণ্ডা, ঐহিক পারত্রিক যুক্তিতর্ক ত্যাগ করা ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহার জীবনের নীতি ছিল, "Anything for quiet life" এবং তিনি তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রাচীন কাশ্মীরের অধিবাসী

শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থায় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কাশ্মীর একটি অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। একান্তভাবে ভারতবর্ষের অংশ হলেও একদিকে তিব্বত, অন্যদিকে চীন, পশ্চিমে আফগানিস্থান আর তার উত্তরে বহুজাতি সমাগমে প্রাণচঞ্চল মধ্য-এশিয়া এই হিমালয় রমণীয় ভূখণ্ডটির উপর মানব ইতিহাসের প্রায় আদিপর্ব্ব থেকেই এক বিচিত্র মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। আবার সে প্রভাবও বাধাবন্ধনহীন হয়ে সমস্ত উপত্যকার উপর ছড়িয়ে পড়তে পারে নি—পার্ব্বত্য দুর্গমতার জন্য, যা কাশ্মীরকে আংশিকভাবে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির এই পরিমিত প্রভাব, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্য সেই প্রভাবেই একান্তভাবে বিবর্ত্তিত হবার সুযোগ, হিমালয়ের শীত-জর্জ্জর জলবায়ু আর তার আনুসঙ্গিক সুখ-সুবিধা প্রাচীন কাশ্মীরের অধিবাসিগণের জীবনযাত্রাকে একটি অভিনব রূপ দান করেছে। কালহরণের ইতিহাস-মন্দ্রিত কাব্যে, ক্ষেমেন্দ্রের বিদ্রূপ জর্জ্জরিত পরিহাস লেখনীতে, বিদেশী পথিকের রোজনামচায় আর পুরাতত্ত্ব কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষে—এই বিচিত্র জীবনধারার রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। সে জীবনধারা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একটি সমগ্রতার দিকে প্রবাহিত, উত্থান ও পতন, মাধুর্য্য ও তিক্ততা, মহত্ত্ব ও শঠতায় কখনও বা উজ্জ্বল, কখনও বা ম্লান। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—এ জীবন বিশেষ ভাবে কাশ্মীরেরই।

১। জনতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় ভারতবর্ষকে তীর্থ বলেছেন—যেখানে বহু দেশ হতে বহু মানবের ধারা এসে মিশেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কবির এই যে কল্পনা, ভারতের উত্তর সীমার কাশ্মীররাজ্য সম্বন্ধেও তা সমভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। স্মরণাতীত কাল হতে কত বিদেশীর ধারা যে এখানের পার্ব্বত্য ভূমিতে নেমে এসেছে তার ঠিক নেই। বস্তুতঃ আজ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্য-স্থলে এসে সেই সব সুদূর অতীতের বহুবিচিত্র জাতির বহুতর নর-গোষ্ঠীর সমাবেশের পরিপূর্ণ হিসাব-নিকাশ নেওয়া একরকম অসম্ভব বললেই চলে। তবু এই আগমন আবির্ভাবের সমস্ত চিহ্ন আজকের দিনেও একেবারে ধুয়েমুছে যায় নি। 'রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে' যারা একদিন কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল তাদের স্মৃতি আজকের মানুষের শোণিতে শোণিতে মিশে আছে। আর শুধু জীবদেহেই নয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেশের ভাষায়, প্রতি-দিনের কথাবার্ত্তায়, বর্ত্তমান দিনের সংস্কৃতি জীবনেও সেই 'ভেদি মরুপথ গিরিপর্ব্বত যারা এসেছিল' তাদের অস্তিত্ব কতকটা অন্ততঃ অনুভব করা যায়।

লিখিত ইতিহাসের চৌহদ্দির মধ্যে যে সকল নরগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে তাদের পরিচয় পাওয়া ততটা শক্ত নয়। গ্রীক আর শকগণ অস্থায়ী ভাবে কাশ্মীরের অংশ বিশেষের উপর শাসনকার্য্য চালালেও জন-জীবনকে তেমন কিছু প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু কুষাণদের সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা চলে না। কলহণ ত কাশ্মীরের উপর দীর্ঘস্থায়ী কুষাণ রাজত্বের কথা বলেই গেছেন। কুষাণগণ মধ্য এশিয়ার য়ুয়েচি জাতির অন্যতর শাখা। শ্রীনগরের অদূরবর্ত্তী হারওয়ানে আনুমানিক তিন শত খ্রীষ্টাব্দের মাটির কারুকার্য্যখচিত টালি পাওয়া গেছে। এগুলিতে যে-সব মনুষ্যচিত্র উৎকীর্ণ হয়েছে, দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাদের মধ্য এশিয়ার অধিবাসী বলেই মনে হয়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীর হূণ কবলিত হয়। হিউয়েন সাঙ আর কলহণ—দুজনেই কাশ্মীরের হূণ রাজা মিহিরকুলের নিষ্ঠুর কার্য্যকলাপের কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। রাজতরঙ্গিণীতে অনেক হূণ নামও দেখতে পাওয়া যায়। হূণের পরে আসে গুর্জ্জর, সম্ভবতঃ হূণ গোষ্ঠীরই এক শাখা। তিব্বত হতে প্রাচীনকাল থেকে যে কিছু কিছু লোক এসে কাশ্মীরে বসবাস করেছে, সে খবরও কলহণ দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের সমতল ভূমি হতেও বহুলোক কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে। অশোকের সময় কাশ্মীর মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে-সময় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা হতে কিছু কিছু লোক খুব সম্ভব সেখানে গিয়ে থাকবে। অশোকের পরবর্ত্তীকালে কি পরিমাণ লোক যে ভারতবর্ষের নিম্নভূমি হতে কাশ্মীরে গিয়েছিল তার কোনও হিসাব না থাকলেও কাশ্মীরের সংস্কৃত সাহিত্য আর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব এ রাজ্যে ভারতবাসীর সমাগমের পরিচয় দেয়। বিখ্যাত পণ্ডিত অভিনবগুপ্ত ও কবি কলহণের পূর্ব্ব-পুরুষগণ উত্তর-প্রদেশ হতে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। অভিনন্দের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ছিলেন বাংলা দেশের অধিবাসী।

অশোকের সময় থেকে যে-সব বিচিত্র জাতির নরগোষ্ঠী কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে তার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তারও আগে যারা বাইরে থেকে কাশ্মীরে এসেছে, তাদের কথা লিখিত ইতিহাসে নেই। শ্রীনগরের অদূরবর্ত্তী বুরজাহোমে মাটি খুঁড়ে নব্যপ্রস্তরযুগের কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেলেও সে যুগের অধিবাসী-দের পরিচয় তা থেকে পাওয়া যায় না।

এ পরিচয় লাভের জন্য অন্য কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে কাশ্মীরের ভাষাকে, সে ভাষার শাখাপ্রশাখাকে বিশ্লেষণ

করে দেখা যেতে পারে যে, ভাষার বৈচিত্র্যের মধ্যেই ভাষাভাষীদের জাতিগত রূপ লুকিয়ে আছে কিনা। কাশ্মীরী ভাষায় অনেক সংস্কৃত কথা আছে বটে, কিন্তু কাশ্মীরী সংস্কৃতানুগ ভাষা নয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে এ রাজ্যের দীর্ঘকালের সংযোগের ফলেই এসব কথা এখানকার ভাষায় এসে পড়েছে। কাশ্মীরী ভাষা দর্দ্দিভাষার একটি শাখা। দর্দ্দিভাষা সংস্কৃত না হলেও আর্য্যভাষারই অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত সাহিত্যে এর নাম পৈশাচী। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ পৈশাচীকে অন্যতম প্রাকৃত ভাষা বলে ব্যাখ্যা করলেও আসলে এটি একটি খুবই প্রাচীন ভাষা, যে ভাষা পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষে সংস্কৃত নামে খ্যাতি লাভ করে, পৈশাচী সে ভাষার সহোদরা—দুহিতা নয়। সাধারণতঃ হিন্দুকুশ ও ভারত সীমান্তের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে এ ভাষা কথিত হ'ত।

আচার্য্য গ্রীয়ারসন দেখিয়েছেন যে, পৈশাচী ভাষা আর্য্যভাষা হতে উদ্ভূত হলেও একে ইন্দো-এরিয়ান বা ইরাণীয় কোনটিরই অন্তর্গত বলা চলে না। দর্দ্দি তথা কাশ্মীরীভাষার কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। ইন্দো-এরিয়ান ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে যেমন তাদের কিছু মিল আছে, তেমনি ইরাণীয় ভাষার সঙ্গেও কতকটা সাদৃশ্য তাদের আছে। অথচ উপরোক্ত কোন ভাষাটিরই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার পূর্ণ সৌসাদৃশ্য নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয় আর্য্যভাষা যখন মূল আর্য্যভাষা হতে বিচ্ছিন্ন হয় তার পরে, কিন্তু আর্য্যভাষা ইরাণীয় ভাষায় পরিণত হবার কিছু পূর্ব্বে দর্দ্দিভাষা মূল আর্য্যভাষা হতে আলাদা হয়ে যায়। গ্রীয়ারসনের একটি ডায়াগ্রামের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়টিকে স্পষ্টতর করা যেতে পারে।

আর্য্য……………………ইরাণীয়
|　　　　　　　|
ইন্দো-এরিয়ান　　　　|
(ভারতীয় আর্য্য)　　　দর্দ্দি

ইতিহাসের কোন্ পর্ব্বের কোন্ অধ্যায়ে দর্দ্দিভাষীরা মূল আর্য্যভাষীদের হতে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেয়, তা আমাদের অজ্ঞাত। তবে মনে হয় ইন্দো-এরিয়ানগণের ভারত প্রবেশের অল্পকাল পরেই এই দ্বিতীয় বিচ্ছেদ ঘটে। ইন্দো-এরিয়ানগণ কাবুল নদীর উপত্যকায় প্রথমে প্রবেশ করে, তারপর সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ইরাণীয়ভাষীদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ পশ্চিমে মাড, পারস্য ও বেলুচিস্থানে প্রবেশ করে। আর্য্যগণের আর একটি শাখা পূর্ব্বে পামীর উপত্যকায় আশ্রয় নেয়। পামীর উপত্যকার ভাষা ঘলচা। দর্দ্দিভাষায় ইরাণীয় ভাষার যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, ঘলচা ভাষায়ও সেগুলি বর্ত্তমান। আবার এই ইরাণীয় ঘলচা ভাষায় এমন অনেকগুলি বিশেষত্ব আছে যেগুলির সঙ্গে ইরাণীয় ভাষাপ্রকৃতির কোনও মিল নেই, অথচ ইন্দো-এরিয়ান ভাষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সেগুলি মেলে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, দর্দ্দিভাষীদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ প্রথমে পামীর উপত্যকায় বাস করলেও পরে পামীরের ঠিক নীচেই তাদের বর্ত্তমান বাসস্থান চিত্রল ও গিলগিটে প্রবেশ করে। চিত্রল ও গিলগিটের অধিবাসিগণ পরে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে। দর্দ্দিভাষাসমূহের অন্যতম, কাশ্মীরী, এদেরই ভাষা।

কিন্তু দর্দ্দিভাষী জনগণই কি কাশ্মীরের আদিম অধিবাসী? না কি তার আগেও কাশ্মীরে কোনও জনগোষ্ঠী বসবাস করত? ভাষার বিশ্লেষণ করে এ প্রশ্নেরও উত্তর দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ভাষাতাত্ত্বিকগণ অনেক সময় দেখেছেন যে, একটি শক্তিশালী ভাষা কোনও স্থানে প্রচলিত থাকলেও জনসাধারণের অংশবিশেষ অন্য একটি দ্বিতীয় ও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ভাষাকে আঁকড়ে পড়ে আছে। যদি দেখা যায় এই শক্তিশালী ভাষাটি পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের প্রচলিত ভাষাগুলিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা হলে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, স্বল্পসংখ্যক জনগোষ্ঠী ভাষিত দুর্ব্বল ভাষাটিই ঐ স্থানের আদিম ভাষা এবং ঐ ভাষাই ওখানকার প্রাচীনতম অধিবাসীদের পরিচয় বহন করছে। দর্দ্দি তথা কাশ্মীরী ভাষা সম্বন্ধে এই কথা সম্পূর্ণ খাটে। যে অঞ্চলে দর্দ্দিভাষাসমূহ প্রচলিত তার উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণে পুস্তু, ঘালচা প্রভৃতি ইরাণীয় ভাষা প্রচলিত, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে বিভিন্ন ইন্দো-এরিয়ান ভাষা কথিত হয়ে থাকে, পূর্ব্বে বিভিন্ন তিব্বতী ভাষাভাষী অঞ্চল অবস্থিত এবং উত্তর-পূর্ব্বে যে ভাষার চল সেটি একটি অনার্য্যভাষা, হুনজা নগরের বুরুষাস্কি। এই সব ভাষাগুলির মধ্যে বুরুষাস্কির প্রভাবই দর্দ্দি-ভাষায় বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়, অন্যগুলির প্রভাব খুবই সামান্য। বস্তুতঃ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, সমগ্র দর্দ্দিস্থানের ভাষার নিম্ন-স্তরে বুরুষাস্কি ভাষার অস্তিত্ব বিদ্যমান। কাশ্মীরী ভাষাতেও বহু বুরুষাস্কি বাক্য ও পদ অন্তর্লীন। বর্ত্তমানে যে অঞ্চলে বুরুষাস্কি কথিত ভাষা সে স্থান কাশ্মীর হতে বহু দূরে। স্বভাবতঃই অনুমান করা যায় যে, দর্দ্দিভাষী কাশ্মীরীদের পূর্ব্বে হুনজানগরের অধি-বাসীরাই কাশ্মীরে বসবাস করত।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন হলে শারীরতত্ত্বের আপেক্ষিক পরীক্ষা না করা পর্য্যন্ত জাতিতত্ত্বের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। বস্তুতঃ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীর বিজ্ঞানানুগ দেহপরীক্ষার ফলে নির্দ্ধারিত সংখ্যাতত্ত্ব দ্বারাই কেবলমাত্র অনুমান করা সম্ভব ইতিহাসের প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ নরগোষ্ঠীর কতদূর ও কি প্রকৃতির সংমিশ্রণ কাশ্মীরের পার্ব্বত্য-ভূমিতে ঘটেছে। দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত এমন কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় নি। অধিকাংশ কাশ্মীরীরই গায়ের রং দেখা যায় পাতলা বাদামী, শরীরের গড়ন মাঝারি থেকে লম্বা ধরণের। সাধারণতঃ তারা লম্বামুণ্ড। তাদের কপাল বেশ চওড়া, মুখ লম্বাটে, মুখশ্রী সুন্দর, নাক ছোট হলেও বেশ উন্নত ও পাতলা। এই রকম দৈহিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অধিবাসী আফ-গানীস্থান, চিত্রল, বালটিস্থান ও উত্তর পাঞ্জাবে যথেষ্ট দেখা যায়।

এই জাতীয় নরগোষ্ঠীর আসল বাসস্থান হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্ব্বতের অন্তর্বর্ত্তী স্থানে। সেখান থেকে তারা উত্তর ভারত ও অন্যান্য স্থানে প্রবেশ করেছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা হতেও আমরা ঠিক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি। খ্যাতনামা নৃতাত্ত্বিক হ্যাভেল এই নরগোষ্ঠীকে ইন্দো-আফগান বলেছেন।

এই ইন্দো-আফগানগণ যারা এক সময় গিলগিট ও চিত্রল হতে কাশ্মীরে এসে প্রবেশ করে,তারাই দর্দি পৈশাচী ভাষীদের পূর্ব্ব-পুরুষ। বর্ত্তমান কাশ্মীরীদের অধিকাংশই এদের বংশধর। আফগানীস্থান হ'তে পঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকমের। এই নরগোষ্ঠীর সঙ্গে বাইরের অন্য নরগোষ্ঠীর খুব বেশী রকম সংমিশ্রণ হয় নি।

ইতিহাস অবশ্য ইন্দো-আফগান ব্যতীত আরও বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর কাশ্মীর আগমনের সাক্ষ্য বহন করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল রাজ্য আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে নি। কিন্তু অনেকে বসবাস করেছে ও তৎকালীন অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণও ঘটেছে। এই সকল নরগোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই নিজস্ব দৈহিক বৈশিষ্ট্য আছে। শকজাতির মুণ্ড মাঝারি, কপাল নীচু, চোখ সরল, নাক লম্বা ও সুগঠিত, চিবুক বহির্মুখী। শকজাতী সুরুতে স্তেপ অঞ্চলবাসী প্রাক্‌নর্ডিক গোষ্ঠী-ভুক্ত হলেও কাশ্মীরে প্রবেশ করবার আগেই অন্যান্য জাতির সংমিশ্রণে আসে। য়ুয়েচিগণ তুর্কি জাতিভুক্ত। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক হতে এরা ক্ষুদ্রমুণ্ড, এদের মুখ লম্বা ও ডিমের মত, চিবুক চওড়া, নাক লম্বা, চোখ মোঙ্গোলদের মত কালো, ঠোঁট পুরু, চুল কালো, গায়ের রং হলদে থেকে তামাটে বাদামী, দৈহিক গড়ন মাঝামাঝি রকমের। হূণগণ তুর্কি ও তুঙ্গাস গোষ্ঠীর মিশ্রণোদ্ভূত। তাদের শরীর অনেকটা য়ুয়েচিদেরই মত। তিব্বতীদের মুণ্ড মধ্যমাকৃতি, গায়ের রং হলদে ও গড়ন মাঝারি। ভারতবর্ষ হতে যে-সব নরগোষ্ঠীর আগমন কাশ্মীরে ঘটেছে তাদের দৈহিক আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও যথাযথ ধারণা করা সম্ভব নয়। কারণ ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতেই নানা জাতির সঙ্গে তারা মিশে গেছে।

এই 'শত মানুষের ধারা'র সংমিশ্রণেই কাশ্মীরের 'মহামানব' বিবর্ত্তিত হয়েছে। এই বিবর্ত্তনের কতকটা গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করা গেলেও অনেকখানি ইতিহাসই অগোচর রয়ে গেছে! আর যতদিন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর দৈহিক ও শারীর-তাত্ত্বিক পরীক্ষা গ্রহণ না করা হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কাশ্মীরী জাতীর উপর এই সকল বিচিত্র নরগোষ্ঠীর প্রভাব কতটা সুদূর-প্রসারী সে সম্বন্ধে কোনও সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

২। বর্ণভেদ ও বৃত্তি বিভাগ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—শাস্ত্রসংজ্ঞা অনুযায়ী প্রাচীন ভারতের জনসমাজ এই চারটি ভাগে বিভক্ত। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে কোনও কালে এই চারটি বর্ণভেদের মধ্যে জনসমাজ সীমায়িত ছিল কিনা সন্দেহ। প্রাচীন ভারতের যে কোনও রাষ্ট্রের দিকে একটু অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি নিয়ে তাকালেই দেখা যাবে সেখানে ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্য্যন্ত কত না স্তরভেদ। এর মধ্যে আছে অসংখ্য বর্ণ, সমাজে উচ্চতর হতে নিম্নতর নানাবিধ স্থান এদের: এরা যেন সমাজ সোপানের সিঁড়ি, একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধাপে ধাপে নেমে গেছে! প্রাচীন কাশ্মীরের বর্ণভেদ প্রথা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এখানে একদিকে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ গর্ব্বোন্নত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর অন্য প্রান্তে একেবারে অন্ত্যজ কয়েকটি গোষ্ঠী। আর এই দুই সীমা মিলিয়ে দেবার মত মধ্যবর্ত্তী বর্ণ কেউই নেই।

ব্রাহ্মণগণ যে প্রাচীন কাশ্মীরী সমাজে মহামান্য ছিলেন ও সেই হেতু আনুপাতিক সুখ সুবিধা ভোগ করতেন—দামোদরগুপ্ত, ক্ষেমেন্দ্র আর কলহণের নানা লেখার মধ্যে তা বেশ পরিস্ফুট। কাশ্মীরে এই বর্ণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কোনও তথ্য না পাওয়া গেলেও এটুকু জানা যায় যে, অনেক ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গা হতে এখানে এসে বসবাস করেছে। ব্রাহ্মণদের উপার্জ্জনের পথ ছিল বহু রকমের। রাজমন্ত্রী, সেনাপতি, রাজসরকারের বড় বড় চাকরী হতে আরম্ভ করে পূজা-পর্ব্বে পৌরোহিত্যে, মন্দিরে পাণ্ডাগিরি ও আরও নানা প্রকার বৃত্তি ব্যবসায়।

নিম্নবর্ণের মধ্যে কলহণ নিষাদগণের উল্লেখ করেছেন। এরা ছিল কাশ্মীরের আদিবাসী। সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে জন্তু-জানোয়ার শিকার যারা বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে তাদের নিষাদ বলা হয়। প্রাচীন কাশ্মীরে মাঝিমাল্লার কাজে এ বর্ণের লোককে নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়। আর একটি নিম্নবর্ণ কিরাত—বনে-জঙ্গলে বাস করত এবং জন্তু জানোয়ার ধরে বা মেরে জীবিকা-নির্ব্বাহ করত। জনতত্ত্বের দিক হতে প্রাচীন সাহিত্যে কিরাত বলতে ব্রহ্ম-তিব্বতীয় নরগোষ্ঠীকেই বোঝায়। রাজতরঙ্গিণীর অনেক জায়গায় ডোম্ব বলে আর একটি নিম্নবর্ণ উল্লিখিত হয়েছে। ডোম্বদের জীবিকা যে কি ছিল, তা ঠিক বোঝা যায় না। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল শিকারী। আবার অনেকে নাচ গান করে জীবন-যাপন করত। অলবেরুণী তাঁর ভারত বৃত্তান্তে উত্তর ভারতের তদানীন্তন বিভিন্ন বর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বংশীবাদক ও গায়ক ডোমদের উল্লেখ করেছেন। অলবেরুণীর ডোম কাশ্মীরের ডোম্ব হতে অভিন্ন কিনা বলা যায় না। রাজতরঙ্গিণীর পাতায় পাতায় সমাজে অন্ত্যজ ডোম্বদের প্রতি উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠেছে।

আর একটি নিম্নবর্ণ চণ্ডাল। এরা ছিল যোদ্ধা, অনেকেই খুব ক্রুর প্রকৃতির। দেহরক্ষী বা পাহারাদার কিংবা জল্লাদের কাজ ছিল এদের প্রধান বৃত্তি। ফাহিয়েনের ভারত বিবরণীতে আছে যে, চণ্ডাল সমাজে অস্পৃশ্য, শহরের বাইরে তাদের বাস। ঠিক এতটা না হলেও, প্রাচীন কাশ্মীরেও উচ্চবর্ণের অবিমিশ্র ঘৃণাই এদের ভাগ্যে জুটেছে।

এ ত গেল বর্ণভেদের কথা। এ ছাড়া আরও একটি শ্রেণী-বিভাগ ছিল অধিবাসীদের মধ্যে—সেটা জীবিকার বৃত্তি অনুসারে।

প্রাচীন কাশ্মীরে সম্পত্তির উপর ব্যক্তির অধিকার স্বীকার করে নিয়েই সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যারা সমাজের ধনোৎপাদন করত, তারাই যে কেবল উৎপন্ন ধনের ভোগাধিকারী ছিল এমন নয়। বণ্টন-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করত—সমাজে কোন্ শ্রেণীর হাতে কতটা উৎপন্ন ধন গিয়ে পড়বে। ভূমিকর্ষণ, শিল্প ও বাণিজ্য—এই তিন পথেই প্রধানতঃ ধনোৎপাদন হ'ত। যদিও কৃষক ভূমি-কর্ষণ করে ফসল ফলাত, রাজশক্তি ও সামন্ত শক্তি—জমির যারা ছিল মালিক, তাদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করত সে ফসল কে কতটা পাবে। তেমনি শিল্প ও বাণিজ্য ছিল ব্যবসায়ীদের হাতে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তারাও ছিল স্বাধীন। বণ্টন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রবিশেষ কোনও হস্তক্ষেপ করত না।

স্বভাবতঃই ধনোৎপাদনের এই তিনটি পথকে কেন্দ্র করে সমাজে নানা বৃত্তি ব্যবসায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ধনোৎপাদন ও বণ্টনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক যুক্ত নয়, এমন অনেক বৃত্তিধারীও সমাজে ছিল—যেমন সৈনিক, রাজকর্ম্মচারী, শিক্ষক, পুরোহিত বা চাকর-বাকর শ্রেণী। এই সব নানা বৃত্তিধারী বিভিন্ন শ্রেণী যে একই সঙ্গে উদ্বর্ত্তিত হয়েছিল এমন নয়। সমাজের পরিবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব নানা বৃত্তি-ব্যবসায় তাদের শাখা-প্রশাখাসহ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল।

কাশ্মীরের প্রাচীন সাহিত্যে জমির মালিক ভূম্যধিকারী ডামরগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী এই শ্রেণীর উদ্ভবকাল। পরবর্ত্তী সময়ে এরা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য (৮ম শতাব্দী) তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে উত্তরাধিকারীদের উপদেশ দিয়েছেন যে, কোনও কৃষককে তার ভরণ-পোষণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার বেশী জমি যেন না দেওয়া হয়। কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি যদি তার থাকে, তা হলে এক বৎসরও কাটতে না কাটতেই সে শক্তিশালী ডামর হয়ে উঠবে আর তখন সে কাশ্মীররাজের পরোয়া করবে না। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী নাগাদ ডামরগণ এমনই শক্তিশালী একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে উঠে যে, রাজশক্তিকে শুধু উপেক্ষা করাই নয়, রাজার সিংহাসন পাওয়া-না-পাওয়াও নির্ভর করতে থাকে তাদেরই মর্জ্জির উপর। কোনও কোনও শক্তিমান ও কূটবুদ্ধি নৃপতি ডামরগণকে দমন করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় ডামরগণ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সামন্ত গোষ্ঠীতে পরিণত, তাদের ধনসম্পত্তির সীমা নেই। বিশাল সৈন্যদল তাদের অধীনে। সারা কাশ্মীরে পরিব্যাপ্ত তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। কাশ্মীরের রাজা তাদের ভয়ে সর্ব্বদা কম্পমান। ডামরগণের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের পছন্দমত ব্যক্তিকে রাজসিংহাসনে দেবার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত। কাশ্মীররাজ তাদের হাতে পুতুলমাত্র।

ধনলাভের সঙ্গে সঙ্গে ডামরগণের সামাজিক মানমর্য্যাদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও কহ্লণ তাদের 'কবন্ধ-ডাকাত' বা 'অস্ত্র হাতে চাষা' বলে বিদ্রূপ করেছেন, তথাপি হিন্দুরাজত্বের শেষভাগে দেখতে পাই রাজ পরিবারের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক আদান-প্রদান চলছে। ক্ষেমেন্দ্রের সময়মাতৃকা গ্রন্থে সমর সিংহ নামে একটি সম্ভ্রান্ত ও বিদগ্ধ ডামর চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়।

একদিকে কাশ্মীররাজ অন্যদিকে কৃষকগণের সঙ্গে ডামরগণের ভূমিসংক্রান্ত সম্বন্ধ যে কি রকম ছিল, তা জানা যায় না। প্রজাদের কাছ হতে পাওয়া খাজানা, অর্থমূল্যে বা শস্যরূপে, যাই-ই হোক না কেন, ডামরগণের প্রধান আয় ছিল। কোনও কোনও ডামর ব্যবসাবাণিজ্যও করত।

যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ফলে ডামর সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটে, সেটি একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। অনেক সময় বলা হয় কাশ্মীরের সিংহাসনলাভের জন্য রাজার মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে প্রায়শঃই যে মারামারি চলত, তারই ফলে ডামরগণের উর্দ্ধতন হয় ও রাজশক্তির দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা অসীম শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ বিশ্লেষণ আংশিক ভাবে সত্য। কিন্তু সর্ব্বথা সত্য নয়। অবন্তীবর্ম্মা ও রাণী দিদ্দার মত শক্তিশালী শাসক ডামরগণ যথেষ্ট শক্তিসঞ্চার করবার পূর্ব্বেই তাদের সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করতে চেষ্টার কসুর করেন নি। আরও পরে, অনন্ত, কলস ও হর্ষের মত খ্যাতিমান রাজারাও প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এই সামন্ত গোষ্ঠীকে বিনষ্ট করতে। কিন্তু কেউই যে সফল হতে পারেন নি তার কারণ কতকগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজে ডামরগণের অবস্থিতির পক্ষে কাজ করে চলেছিল। কুষাণ রাজত্বকালে কাশ্মীর ছিল মধ্য এশিয়া ও ভারতের বাণিজ্য চলাচলের পথে একটি প্রধান ঘাঁটি। কিন্তু হূণ আক্রমণে মধ্য এশিয়ার পণ্যবাহী পথঘাট যখন বন্ধ হয়ে গেল, কাশ্মীরের বাণিজ্যিক চরিত্রও তখন বদলাল।

অতঃপর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাশ্মীর প্রধানতঃ কৃষির উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হ'ল। কৃষির উপর একদিক থেকে জোর পড়তে লাগল, অন্যদিকে প্রচলিত জমিদারী ব্যবস্থানুসারে কৃষক অর্থাৎ যে জমি স্বহস্তে চাষ করবে, সে ছিল ভূম্যধিকারীর প্রজা। এই দুই অবস্থা স্বভাবতঃই একটি ভূমিনির্ভর সামন্তগোষ্ঠীর উদ্ভবে সাহায্য করল। তারপর হূণ আক্রমণের কিছুকাল পর হতে যে সামান্য বাণিজ্যটুকুও পুনরায় চলছিল, মধ্য-এশিয়ার পথ দিয়ে, বন্ধ হয়ে গেল সম্পূর্ণভাবে, মুসলমান শক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। ধনোৎপাদনের একমাত্র অবলম্বন হ'ল ভূমি। সমাজে বর্দ্ধমান জনসংখ্যা কর্ষণযোগ্য ভূমির অভাব আর ব্যবসায়-বাণিজ্যে লোক নিয়োগের কোনও সম্ভাবনা না থাকা, পরিশেষে দেশে যে পরিমিত কর্ষণযোগ্য ভূমি ছিল, তার উপরই সমগ্র দেশের উদ্বৃত্তজনসমাজকে ঠেলে আনল। জমির রাজস্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল, আর সে

জমি যাদের হাতে এল, স্বভাবতঃই তারা ধনশালী দুর্দ্ধর্ষ এক সামন্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হ'ল।

কৃষিকার্য্যই ছিল কাশ্মীরের বৃহত্তর জনসমাজের ভরণ-পোষণের একমাত্র পথ। কৃষকগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে দুঃখের বিষয়, তেমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। তাদের নিজস্ব জমি ছিল কিনা, না থাকলে তারা ভূম্যধিকারীর জমিতে চাষ করত কিনা, তার বদলে কি তারা পেত, ডামরগণের অধীনে যে-সব জমি ছিল না, যে-সব জমির রাজস্ব রাজকর্ম্মচারী আদায় করে রাজ-সরকারে জমা দিত, সেই কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি ছিল —এ সব প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া শক্ত। তবে কৃষকগণ যে অতি-কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করত এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাদের হাতেই প্রধানতঃ দেশের ধনোৎপাদন ঘটত, কিন্তু সে ধন সম্ভোগে অধিকার তাদের ছিল না। এক দিকে ডামর অন্য দিকে রাজকর্ম্মচারী কায়স্থগণের শোষণ চলত অবিচ্ছিন্নভাবে তাদের উপর। ক্ষেমেন্দ্র বলছেন যে, শরৎকালে যখন পাকা ধানে মাঠ ভরে যেত, তখনই ছিল রাজাকে রাজস্ব দেবার সময় আর এই রাজস্ব আদায় উপলক্ষ্য করে কায়স্থগণ বেশ দু'পয়সা করে নিত। কোনও কোনও রাজা আবার এমন অত্যাচারী ছিলেন যে, কৃষকদের জন্য উদ্বৃত্ত কিছু না রেখেই মাঠভরা শস্য রাজভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে তুলতেন, বছরের উপর বছর। কলহণ বর্ণনা দিয়েছেন যে, যখন সুস্বাদু মাংস ও শীতল সুগন্ধ মদ্যসহযোগে রাজপারিষদগণের ভোজন-পর্ব্ব চলত, তখন গ্রাম্য কৃষকগণের ভাগ্যে জুটত আকাঁড়া চালের ভাত, শুকনো যবের রুটি আর তিতকুটে শাক। জমিদার ও রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচারের ফলে সামান্য কৃষকের জীবন এতই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, যে, যখনই দেশে কোনও অন্তর্বিদ্রোহ ঘটত, চাষবাস ছেড়ে তলোয়ার হাতে তখনই সে ছুটত সেই বিদ্রোহে অংশ নিতে।

জনসাধারণের একটি অংশ নানাপ্রকার কারুশিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জন করত। শিল্প-সংক্রান্ত যে-সব বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে—তাঁতি, স্যাকরা, কামার, পাথর-খোদাইওয়ালা ভাস্কর, কুমোর, চামার ইত্যাদি।

সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্প বয়নের জন্য কাশ্মীরের খ্যাতি আজকের নয়। শ্রীনগরের অদূরবর্ত্তী হারওয়ানের ধ্বংসাবশেষে স্বচ্ছ আবরণে সজ্জিত যে নারীমূর্ত্তি দেখা যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর কাশ্মীরে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নকারীর অভাব ছিল না। শীতপ্রধান দেশ হওয়ায় পশমী বস্ত্র বয়নের দিকেই নজর ছিল বেশী। ক্ষেমেন্দ্র ও কলহণের লেখায় স্থূল কম্বল, লোহিত কম্বল, কুথা, প্রাবার প্রভৃতি পশমী বস্ত্রের নাম দেখতে পাওয়া যায়। কামার ত সভ্য সমাজের একটি অপরিহার্য্য সম্প্রদায়। জমি চষবার যন্ত্রপাতি থেকে গৃহস্থ জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় খন্তি সাঁড়াশী পর্য্যন্ত সব কিছুই কামারের গড়া। ছোরা, তলোয়ার, তীর, বর্শা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রও কামারেরই তৈরি। পাথরের যে-সব মূর্ত্তি প্রাচীন পুরাকীর্ত্তির মধ্যে পাওয়া গেছে, তা থেকে মনে হয় পাথরে-খোদাই জনসমাজের একটি অংশ বৃত্তি হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। রাজপরিবারের ও উচ্চকোটির জীবনযাত্রার যে বর্ণনা কাশ্মীরের প্রাচীন সাহিত্যে আছে, তা থেকে সমাজে স্বর্ণকার ও মণিকারগণের উপস্থিতি অনুমান করা যায়। অনেক প্রাচীন মূর্ত্তিও বিশদ অলঙ্কৃত আর সে-সব অলঙ্কার যে বাস্তব জীবনেও ব্যবহার করা হ'ত, সে বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ কি আছে! প্রাচীনকালের মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি পাওয়া গেছে কাশ্মীরের কয়েকটি জায়গায় পুরাতাত্ত্বিক খনন কাজের সময়। কলহণের কাব্যে কুমোরণীর নাম পাওয়া যায়। চামার, ছুতোর, খনির শ্রমিক প্রভৃতি আরও কয়েকটি শিল্প কেন্দ্রিক বৃত্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ রাজতরঙ্গিণীতে আছে।

বিদেশের সঙ্গে কাশ্মীরের বাণিজ্য কুষাণযুগে ত বটেই, হয়ত তার কিছু আগে থেকেই চলছিল। ব্যবসা বাণিজ্য চলার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সমাজে বণিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেকার কাশ্মীরের বণিক-সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, কলহণের বক্তব্য অনুসারে বণিকগণ কাশ্মীরী সমাজে সংখ্যায়ও যেমন বহুল, তেমনি সমৃদ্ধও। বণিকের অট্টালিকার ঐশ্বর্য্যের কাছে রাজার প্রাসাদও ম্লান। দামোদরগুপ্তের কুট্টনীমত গ্রন্থেও (অষ্টম নবম শতাব্দী) বণিক ও শ্রেষ্ঠী সমাজের ধন-গৌরবের বিবরণ আছে। সপ্তম হতে নবম শতাব্দী—কাশ্মীরের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধির যুগ। কাশ্মীরের রাজগণ এই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে, এমনকি উত্তর-ভারতের কোনও কোনও অংশে বিজয় অভিযান চালিয়ে একটি বৃহত্তর কাশ্মীর সাম্রাজ্য গঠনে প্রয়াস পান। বিজিত অঞ্চলসমূহে এবং সমসাময়িক অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সংযোগ সাধিত হওয়ায় সেই সব দেশে বাণিজ্য বিস্তারেরও সুযোগ ঘটে। বণিক-সমাজের সমসাময়িক সমৃদ্ধি তারই ফল।

দশম শতাব্দীর পর থেকে বাণিজ্যিক ব্যবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বণিকসম্প্রদায়েরও পতন ঘটে। সমাজে আর্থিক শ্রেষ্ঠত্ব হেতু বণিকের যে স্থান ছিল, সে স্থান ভূমি কেন্দ্রিক ডামরের অধিকারে আসে। বণিকগণ প্রধানতঃ টাকা লেন-দেন করে জীবিকা নির্ব্বাহে তৎপর। বৈদেশিক বাণিজ্যের কথা আর বিশেষ শোনা যায় না। শুধু তাই নয়, কলহণের বিদ্রূপাত্মক বাণী "ব্যবসায়ী সম্প্রদায় স্বভাবতঃই জোচ্চোর", "তহবিলতছরুপকারী বণিক ধর্ম্মকথা শুনতে সদাই উৎসুক" ইত্যাদি থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, অসৎ-প্রবৃত্তি বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সময়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার ফলে এবং অন্তর্বাণিজ্যের বিশেষ কোনও সুযোগ না থাকায় টাকা লেন-দেনই এ যুগের বণিকগণের প্রধান উপজীব্য। আর টাকা লেনদেনের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সদুপায়ে যথেষ্ঠ অর্থ লাভের, যা বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সহজেই ঘটতে পারত, সুযোগ কোথায়! তাই রাতারাতি লাভের লোভে লুব্ধ দশম শতাব্দী-উত্তর বণিক-সমাজে এত অসত্য ও বঞ্চনায় দেখা মিলছে, এমন মনে করা অন্যায় হবে না।

ধনোৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় এমন সব জীবিকার মধ্যে উল্লেখ করা যায় শিক্ষক, গণক, চিকিৎসক, নাপিত, পুরোহিত, সেনাদলের সাধারণ সৈন্য প্রভৃতি। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও আবার অর্থ ও শিক্ষা-দীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্তরভেদ ছিল।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন শ্রেণী ব্যতীত আর একটি উল্লেখযোগ্য বৃত্তি-ধারী সম্প্রদায় ছিল জনসমাজের মধ্যে। রাজকার্যে নিযুক্ত কর্মচারী। রাজকর্মচারীদের মধ্যেও অসংখ্য স্তরভেদ ছিল। সর্বাধিকারী বা প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, কম্পনেশ বা সৈন্যাধ্যক্ষ, মণ্ডলেশ বা প্রদেশপাল, সামন্ত নৃপতি, রাজসভার পণ্ডিত ও কবি, রাজার আত্মীয়বর্গ এ সব নিয়ে একটি উচ্চতর রাজপুরুষ সম্প্রদায় ছিল। এদের নীচে ছিল আমলা সম্প্রদায়, যাকে কাশ্মীরের প্রাচীন সাহিত্যে কায়স্থ বলা হয়েছে। কায়স্থগণের মধ্যে গৃহকৃত্য-মহত্তম, পরিপালক, মার্গেশ, গঞ্জাধীপ, নগরাধীপ, শৌল্কিক, নিয়োগী, গ্রামদিবির, গঞ্জদিবির, নগরদিবির, অধিকরণ-লেখক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর দেখা মেলে।

প্রাচীন কাশ্মীরে কায়স্থ অর্থে কোনও বর্ণভিত্তিক সম্প্রদায় বোঝায় না। সকল শ্রেণীর রাজকর্মচারীর প্রতি কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। কলহণ বলছেন যে, একজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ হতে পারে। কায়স্থগণের মধ্যে পদভেদে নানা শ্রেণী ছিল। একজন নিম্নপদাধিকারী কর্মচারী কালক্রমে উচ্চ পদ পেতে পারত। সবচেয়ে বড় পদ ছিল গৃহকৃত্য মহত্তমের।

কায়স্থগণের অসং প্রকৃতি সম্বন্ধে কাশ্মীরের প্রাচীন লেখকদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই। ক্ষেমেন্দ্র খল, নীচ, কুটিল, শঠ প্রভৃতি নানা বিভূষণে তাদের ভূষিত করেছেন। বস্তুতঃ অসদুপায়ে অর্থ-সঞ্চয়ে প্রাচীন কাশ্মীরের কায়স্থ সম্প্রদায়ের জোড়া নেই। রাজ-শক্তির স্থিতিস্থাপকতার অভাব, রাজার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারীরও অদল-বদল, কারণে অকারণে নিম্নপদস্থ কর্মচারীর পদচ্যুতি—এক কথায় নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাই কায়স্থগণের অসৎ পথ গ্রহণ করার প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তিনটি তরঙ্গে কায়স্থগণের কোনও উল্লেখ নেই। চতুর্থ তরঙ্গ হতে কায়স্থগণের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং প্রতি তরঙ্গে নূতন নূতন বহুবিধ পদের উল্লেখ থেকে রাষ্ট্রে কায়স্থগণের ক্রমবৃদ্ধি বেশ বোঝা যায়। খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে আমলাতন্ত্র অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরেছে সমস্ত সমাজ-জীবনকে। ভূমিই যখন সমাজের ধন উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে আর সেইহেতু রাজস্ব লাভের প্রধান স্থল, তখন ভূমি হতে আমলা-বর্গের সাহায্যে যতদূর সম্ভব রাজস্ব আদায় করা ছাড়া রাজশক্তির অর্থসংগ্রহের অন্য কোন উপায়ও ছিল না। এক কথায় ভূমি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক জীবনই কায়স্থ সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমানতার মূল কারণ।

নারীর অবস্থা

নারী-জীবনের শৈশবকাল পিতৃগৃহেই কাটত। মেয়েদের লেখা-পড়া শেখানো হ'ত। নবম শতাব্দীর সাহিত্যিক দামোদরগুপ্ত মেয়েদের অধীত বিষয়সমূহের মধ্যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র, বাৎস্যায়ন, বিটপুত্র, দত্তক ও রাজপুত্রের কামশাস্ত্র, বিশাখিলের কলাশাস্ত্র, দত্তিল রচিত সঙ্গীতশাস্ত্র, বৃক্ষায়ুর্বেদ, অঙ্কনবিদ্যা, সূচীশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, ধাতু-শিল্প, রন্ধন-প্রণালী, মৃত্তিকা পুত্তলি-নির্মাণ ও নৃত্যগীতের উল্লেখ করেছেন। দামোদরগুপ্ত অবশ্য গণিকা সম্প্রদায়ের শিক্ষাপ্রণালীর কথা আলোচনা করতে গিয়ে এই সব তথ্য প্রদান করেছেন, তবু সাধারণ গৃহস্থ জীবনেও যে মেয়েদের অনুরূপ পঠন-পাঠনই চলত, এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না। কলহণ কাশ্মীরী রমণীগণের গুণগান করতে গিয়ে বলছেন যে, তাঁরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুই ভাষাতেই ব্যুৎপন্না ছিলেন। সম্ভবতঃ রাজপরিবারের মেয়েদের শাসনকার্য পরিচালনা সম্বন্ধেও কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হ'ত। রাণী সুগন্ধা ও রাণী দিদ্দা যে রকম কৃতিত্বের সঙ্গে শাসনকার্য চালিয়ে ছিলেন, তা থেকে মনে হয় সিংহাসনে আসবার পূর্বেই এ বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

মেয়েদের ঠিক কত বছর বয়সে সাধারণতঃ বিয়ে হ'ত, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে রাজতরঙ্গিণী পড়লে মনে হয় যে, ঋতুমতী হওয়ার পূর্বে মেয়েদের সম্ভবতঃ বিয়ে হ'ত না। ক্ষেমেন্দ্রের দেশোপদেশেও এমন দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ আছে যা থেকে মেয়েদের একটু বেশী বয়সেই বিয়ে হ'ত বলে মনে হয়।

উচ্চকোটি জীবনে পুরুষের বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। মেয়েদের এক স্বামী বর্তমানে অন্য স্বামী গ্রহণের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ বিধবাগণ বিলাসবর্জিত কঠোর জীবনই যাপন করতেন।

সতীদাহ প্রথার বহুল প্রচলন ছিল কাশ্মীরে; একাদশ শতাব্দীতে রচিত কথাসরিৎসাগরে সতীদাহ ঘটনার অনেক উল্লেখ আছে। কলহণের রাজতরঙ্গিণীতে রাজা বা রাজপুরুষের মৃত্যুর পর পত্নীগণ তাঁদের মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাচ্ছেন এমন বহু কাহিনী বিবৃত হয়েছে, কিন্তু শুধু পত্নীই নয়, প্রিয়জন—মা, বোন, সহচর বা সহচরীও অনেক সময় মৃতব্যক্তির অনুগমন করেছেন—এমন দৃষ্টান্তও কলহণ দিয়েছেন।

দেবদাসী প্রথা অতি প্রাচীনকাল হতেই কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল। এই প্রথার মাধ্যমে, দেবতার কাছে নারীর আত্মসমর্পণের মুখোশের অন্তরালে কামলীলার যে উদ্দাম প্রবাহ চলত, কাশ্মীরের প্রাচীন লেখকগণ তার বর্ণনা দিতে ভুলেন নি। দেবতার সেবার জন্য নয়, মানুষের ভোগের জন্যই যে মন্দিরে দেবদাসী রাখা হ'ত, সে সম্বন্ধে কলহণ একটি চমৎকার গল্প বলেছেন। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী; ললিতাদিত্যের পিতা দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্য তখন কাশ্মীরের রাজ-সিংহাসনে। তিনি কয়েকদিনের জন্য এক ধনী বণিকের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে বণিক পত্নী নরেন্দ্র-প্রভার অপরূপ রূপ লাবণ্যে তিনি মুগ্ধ হন। রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেও বণিক-পত্নীর মোহ আর তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন না। সুন্দরী পরস্ত্রীকে অঙ্কশায়িনী করবার দুর্বার বাসনায় একদিকে তিনি

যেমন আকুল হয়ে উঠলেন, অন্যদিকে লোকনিন্দার ভয়ে জোর করে তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসতেও দ্বিধা বোধ করতে লাগলেন। এমন সময়ে সেই বণিক রাজার মনোগত ইচ্ছা জানতে পেরে অনুরোধ জানালেন তাঁকে, নরেন্দ্রপ্রভাকে রাজরাণী রূপে গ্রহণ করতে। আর তাতেও যদি রাজার কোনও আপত্তি থাকে তা হলে তিনি প্রস্তাব করলেন যে, স্বীয় পত্নীকে তিনি কোনও মন্দিরে দেবদাসীরূপে রেখে যাবেন। কারণ দেবদাসীকে রাজা সম্ভোগ করতে পারেন নিঃসঙ্কোচে। কোনও লোকনিন্দার ভয় আর তখন থাকে না।

দামোদরগুপ্ত, ক্ষেমেন্দ্র, কলহণ প্রভৃতির রচনায় রাজপরিবার, রাজপুরুষ বা অভিজাতবর্গের জীবনযাত্রার যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—তা থেকে দেখা যায় যে, অন্ততঃ উচ্চকোটি জীবনে নৈতিক মান মোটেই উঁচুদরের ছিল না। সমাজে পতিতাবৃত্তির বহুল প্রচলন ছিল।

মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত দু-একটি ঘটনা থেকে অনুমিত হয় যে, মেয়েরা ভূসম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারতেন। রাজসিংহাসনে নারীর অধিকার অবশ্যই স্বীকৃত হ'ত।

৪। দৈনন্দিন জীবন

একটি মহৎ সাহিত্য রচনা বা কয়েকটি ললিত শিল্প সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে কোনও জাতির সংস্কৃতির পূর্ণ পরিমাপ করা যায় না। জাতির সংস্কৃতি ছড়িয়ে আছে তার প্রতিদিনের জীবনধারায়, অশনে-বসনে, আচার-ব্যবহারে, ক্রিয়া-কলাপে। কোনও জাতির মানস-সংস্কৃতি তার সমগ্র জীবনচর্চার মধ্যে বিধৃত।

প্রাচীন কাশ্মীরীর প্রধান খাদ্য ছিল ডাল ও ভাত। প্রাচীন কাশ্মীরী সাহিত্যে শালি ধান ও মুদ্গ, কুলত্থ, চর্ণ ও মসুর ডালের উল্লেখ আছে। চাল থেকে যে-সব খাদ্যবস্তু তৈরি হ'ত, তার মধ্যে পিঠে, চিনি দিয়ে পাক করা ভাত, আখের রসে ফোটানো ভাত ও চালের গুঁড়ির খাবার দেখতে পাই। যবের রুটি ও যব থেকে তৈরী পিঠেও লোকে খেত। উৎসব অনুষ্ঠানে চাল ডাল মিশিয়ে খিচুড়ি রাধা হ'ত। কাশ্মীর ফলের জন্য চিরকালই বিখ্যাত। হিউয়েন সাঙ এই পার্ব্বত্য উপত্যকায় উৎপন্ন ফলের মধ্যে নাসপাতি, পিচফল, এপ্রিকট ও আঙ্গুরের নাম করেছেন। কলহণ এখানকার সুমিষ্ট দ্রাক্ষার প্রশংসায় ত পঞ্চমুখ।

দুধ ছিল একটি প্রধান খাদ্য। গরুর দুধ ও মোষের দুধ—দুয়েরই চল ছিল। দুধ থেকে উৎপন্ন হ'ত ঘি, মাখন, ক্ষীর ও দই। মাক্ষিক বা মধু ও শর্করা বা চিনি খাদ্যবস্তুতে মিষ্টান্নের যোগান দিত।

নুন সহজে মিলত না। ক্ষেমেন্দ্রের রচনা থেকে মনে হয় কেবল ধনী ব্যক্তিরাই যথেচ্ছ লবণ ব্যবহার করতে পারতেন। তরকারীর মশলার মধ্যে মরিচ, আদা ও হিং-এর নাম দেখতে পাওয়া যায়। পেঁয়াজ ও রসুন সহযোগে রান্না খাবার বিশেষ পুষ্টিকর বলে মনে করা হ'ত।

কাশ্মীরের অধিবাসী মাছ-মাংসের ভক্ত ছিল। মৎস্যযূষ বা মৎস্যসূপ দৈহিক শক্তি সঞ্চারের জন্য বিশেষভাবে আদৃত হ'ত। নীলমত পুরাণে বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে মাংস খাওয়ার বিধান আছে। নানারকমের পাখী, মুরগী ও ভেড়ার মাংসের উল্লেখ ত সাহিত্যের পাতায় মেলে। এ ছাড়া ছাগ-মাংসও সম্ভবতঃ খাওয়া হ'ত। কলহণের বিবরণ থেকে মনে হয় একাদশ শতাব্দীতে একশ্রেণীর লোকের মধ্যে শূকর মাংস খাওয়াটা একটা ফ্যাশন হয়ে উঠেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর্য্যটক মার্কোপোলো বলে গেছেন যে, কাশ্মীরের জনসাধারণ চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য মাংস সহযোগে গ্রহণ করত।

মদ্যপান খুবই জনপ্রিয় ছিল। রাজতরঙ্গিণীতে মদ্যাসক্ত অসংখ্য চরিত্রের দেখা মেলে। নীলমত পুরাণে বিশেষ বিশেষ পুণ্যাহে মদ্যপান আবশ্যিক বলে বিধান দেওয়া আছে। দ্রাক্ষারস ও ইক্ষু-রস থেকে মদ তৈরী হ'ত।

প্রাচীন কাশ্মীরীর বসনভূষণ সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও পুরাতাত্ত্বিক উভয় প্রকারেরই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পুরুষের বসন তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—নিম্নাঙ্গে অধরাংশুক,তার উপরে অঙ্গরক্ষক এবং মাথায় শিরঃশাট। হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে যখন এখানে এসে-ছিলেন তখন অধিবাসীদের চামড়া ও লিনেনের জামাকাপড় পরতে দেখেছিলেন। শীতপ্রধান দেশে পশমী জামাকাপড় স্বভাবতঃই ব্যবহৃত হ'ত। কলহণ এক রকমের পশমী কাঁথা (কুথা) ও জামার (প্রাবার) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলতে ভোলেন নি যে, ভাল যা-কিছু কাপড় জামা তা কেবল বড়লোকেরাই ব্যবহার করতে পেত। গরীবের ভাগ্যে জুটত জন্তুর ছাল বা মোটা শক্ত কম্বল।

বিলাসী ব্যক্তিবর্গের মাথায় লম্বা চুল রাখার রীতি ছিল। অনেকে আবার তাতে চিরুণী গুঁজত। মাথায় পাগড়ী বাঁধার প্রচলন ছিল। ধনী ব্যক্তিরা রেশমের নানারকম শিরোপা ব্যবহার করত। পুরুষগণ মেয়েদের মতই গহনা পরত। আংটি, হার, কুণ্ডল ও বলয় পুরুষের অলঙ্কারের মধ্যে দেখতে পাই। চর্ম্ম-পাদুকার চল ছিল। অনেক সময় জুতার বাইরে নানারকম পুষ্পালঙ্কারের কাজ থাকত। তলায় থাকত লোহার পাত পেটা। ক্ষেমেন্দ্র ময়ূরোপানৎ নামক একপ্রকার মনোরঞ্জন পাদুকার কথা বলেছেন। কাষ্ঠ-পাদুকারও ব্যবহার ছিল।

মেয়েদের পোশাক প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল—শাড়ী ও জামা। কাশ্মীররাজ হর্ষের রাজত্বকালে অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েদের জামার হাতা কনুইয়ের তলায় নামত না। নিম্নাঙ্গের বসন মাটি ঘেঁটিয়ে চলত। কখনও কখনও মেয়েরা মুখ ঢাকা দেবার জন্য ভেল ব্যবহার করত। অলঙ্কারের মোহ থেকে কাশ্মীরী রমণী মুক্ত ছিল না। হার, কঙ্কন, কেয়ূর, পাশিহার্য্য ও কুণ্ডল ত

ছিলই। এ ছাড়া রাজা হর্ষের সময়ে ফ্যাশনপ্রিয় মহিলাগণ মাথায় পরবার জন্য স্বর্ণ-শেতকপত্রাঙ্ক, কপালে তিলক ও বেণীর নীচে ঝোলাবার জন্য কেশান্তবদ্ধ হেমোপবীতকের আমদানী করেন। প্রসাধনের ক্ষেত্রে কর্পূর, চন্দন, জাফরাণ, আলতা ও কাজলের ব্যবহার ছিল। মেয়েরা লম্বা বেণী অথবা খোঁপা বাঁধত ও ফুল দিয়ে তা সাজাত।

শাড়ী ছাড়া পাজামারও প্রচলন ছিল, অঙ্গবাস হিসেবে মেয়েদের মধ্যে। হারওয়ানের মৃন্মূর্তি সে সাক্ষ্য বহন করছে। উসকুরে যে-সব মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে তার গায়ে হার, বালা প্রভৃতি অলঙ্কার আছে। পাণ্ড্রেথান বা পুরাণাধিষ্ঠানে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তির মাথায় ত্রিকোণ মুকুট আছে। অনুরূপ মুকুট যে কাশ্মীরের রাজগণও ব্যবহার করতেন, কহ্লণের লেখায় সে তথ্য পাই।

খেলাধূলার মধ্যে দাবা ও পাশা বেশ জনপ্রিয় ছিল। জুয়াখেলাও খুব চলত। দামোদরগুপ্ত কন্দুক ক্রীড়ার কথা বলেছেন। শিকার ছিল অত্যন্ত প্রিয় ব্যসন, বিশেষ করে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। হারওয়ানের একটি মাটির টালিতে হরিণ-শিকারে উদ্যত অশ্বারোহীর মূর্তি খোদিত হয়েছে। কহ্লণ রাজা ও রাজপুরুষগণের শিকার কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষ করে শৃগাল শিকারের কথা বলেছেন।

নৃত্যগীতের খুবই আদর ছিল প্রাচীন কাশ্মীরী সমাজে। আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর হারওয়ান টালিতে বাদ্যরতা গায়িকা ও নৃত্যচঞ্চল পুরুষের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। নীলমত পুরাণে উৎসবে পূজায় নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অনুষ্ঠান অবশ্যকরণীয় বলে লিখিত হয়েছে। বিলহণ তাঁর স্বদেশের রমণীর অভিনয় পটুতায় প্রশংসা করেছেন। কহ্লণ বর্ণনা দিয়েছেন নিত্য নৃত্য-গীত অভিনয়-মুখরিত আলোকোজ্জ্বল রাজ-প্রমোদসভার। প্রাচীন কাশ্মীরে ভরতের নাট্যশাস্ত্র পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বইখানার উল্লেখ করেছেন সেখানকার প্রাচীন লেখকগণ।

দামোদরগুপ্তের সাক্ষ্য অনুসারে তাঁর দেশে আরামপ্রদ প্রেক্ষাগৃহের অভাব ছিল না। সে প্রেক্ষাগৃহের বসবার আসনগুলি ছিল চামড়ার গদী দিয়ে বাঁধান। দর্শকদের মধ্যে ধনবান শ্রেষ্ঠীপুত্রের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে এই সুসমৃদ্ধ প্রেক্ষাগৃহগুলি কেবলমাত্র বড়লোকদের জন্যই ছিল, এমন মনে করলে অন্যায় হবে না। কহ্লণের একটি বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সাধারণ লোক খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখত। তার পর হঠাৎ যখন বৃষ্টি নামত তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হ'ত। দারিদ্র্যের সত্যই অনেক দোষ।

রিক্তা বন্যা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

আসে নি গ্রামের ইতিহাসে কভু, এমন বৃহৎ বান
প্রণাম করিনু, করিনু তাহার প্রলয়-সলিলে স্নান।
    সমভূমি করে দিয়ে গেছে গ্রাম সারা,
    পল্লীবাসীরা সকলেই গৃহহারা,
বরুণের জয়যাত্রা করেছে বেশী কিছু হয়রান।

২

ভাঙিয়া ভাসিয়া গেছে ঘর বাড়ী তাতে দুখী না মন,
বিস্ময়ে হেরি সুনীল জলের ভয়াল আস্ফালন।
    এ তো অজয়ের নহে রাঙা জল নহে,
    তাহাতে দয়া ও দরদের কণা রহে,
এ যে বিদ্রোহ রুদ্ধ জলের, ক্রুদ্ধ এই প্লাবন।

৩

বিষাক্ত বারি প্রচারে প্রসারে চলে গেল দুর্বার,
আকৃতি তাহার জানিতে দিলে না পরিধি সে হিংসার।
    যেন নীল মেঘ সুপ্ত অশনি ভরা—
    ক্রুর মানবের কুষ্টিতে এ কি গড়া?
উর্বরতার 'পলি' নাই এতে, লভিল না কিছু ধরা।

৪

অতি প্রবলের সংগ্রাম যেন—অর্থ পাইনে খুঁজে,
দর্পীর থাকে যুক্তি কি কভু? দম্ভে সে যায় যুঝে।
    স্ফীত শক্তির ব্যয়েই তাহার সুখ,
    সে তো বুঝিবে না, বুঝে না কাহারো দুখ,
ঢক্কানিনাদে বলি দেয়—আর মাৎসর্যকে পূজে।

৫

হেরিনু বিপুল অকুল পাথার, লয়ের নিদর্শন,
এঁকে দিয়ে গেল চক্রবালের চক্ষে নীলাঞ্জন।
    ভীম 'সগরায়' উঠিল ঝঞ্ঝা ঝড়,—
    ডুবিল সপ্তডিঙ্গা সহ মধুকর,
অভাগার কই 'কমলে কামিনী' হ'ল না তো দর্শন।

৬

কাঠুরিয়া সাথে করিলাম বাস, ক্লিষ্ট চিন্তা সনে,
ভাগ্য হ'ল না সুরভি মাতার স্তন্য আস্বাদনে।
    ঘোর অমানিশি শবসাধনায় গেল,
    কোথা শিবানীর খণ্ড চন্দ্র আলো?
অমৃতের কোনো খপর নাইকো এ সাগর মন্থনে।

দ্বিরাগমন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

জামাই এসেছে রায়বাড়ীতে।

রায়বাড়ীতে জামাই আসা এমন কিছু নূতন ঘটনা নয়। দু' মেয়ের বিয়ে হয়েছে, কলকাতাতেই শ্বশুরবাড়ী। স্বামী-পুত্রসহ প্রায়ই তারা আসে, দু'চার দিন থাকেও। কিন্তু গোবিন্দর আসাটা অভাবনীয়। সত্য বলতে কি তার কথা ভুলেই গিয়েছিল সবাই। তাই ছ' বছর পরে যখন গোবিন্দ দ্বিতীয়বার রায়বাড়ীর দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল, রায়গিন্নীর মুখে তখন শুধু বিস্ময়ই ফুটে উঠল না, গোবিন্দকে চিনে নিতে তাঁদের একটু বেগও পেতে হ'ল।

গোবিন্দ সেজন্যে প্রস্তুত ছিল। অবসরপ্রাপ্ত জজ রায়মশাই যে বিশেষ ধনী নন ঘটক সেকথা তাদের কাছে গোপন করে নি সম্বন্ধ করবার সময়। কিন্তু তিনি যে এতটা গরীব গোবিন্দ তা জানত না। বরবেশী গোবিন্দ প্রথম রায়বাড়ীতে এসে একটু বিস্মিতই হয়েছিল। রাস্তায় দুটো চারটে গাড়ীর প্রত্যাশা অবশ্য সে করে নি, কিন্তু সদর দরজায় যে একটা বাতি পর্য্যন্ত নেই। আর বাড়ীর ভিতরে বাইরে কোথাও নেই এতটুকু কোলাহলও। বরকে নিয়ে রায়মশাইয়ের সাদা গাড়ীখানা দরজায় দাড়িয়ে রইল মিনিট পাঁচেক। অবশেষে শঙ্খ হাতে করে এগিয়ে এল গুটি তিন চারটি মেয়ে। তাদের চেহারা বা পোশাক কোনটাই রায়বাড়ীর উপযুক্ত নয়। গোবিন্দ পরে জেনেছিল তারা বিমলার বান্ধবী, থাকে ঐ টিনের বাড়ীটায়।

তার পর গোবিন্দ একে একে আবিষ্কার করল অনেক কিছুই। দেখল আট দশজন বরযাত্রী আর বিমলার পাঁচ ছ' জন বান্ধবী ছাড়া নিমন্ত্রিত আর বিশেষ নেই। জানতে পারল দোতলার বারান্দা থেকে যে দুটি তরুণী অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বিয়ে দেখছে তারা হ'ল রায়বাড়ীর বড় দুই মেয়ে—সীতা আর গীতা—বিমলার বড়দি আর মেজদি, দু'জনেই এম, এ, পড়ে। আরও জানল চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে ফাঁকে যে তরুণটি গোবিন্দর মেসোর সঙ্গে কথা বলছে ঠোঁট বেঁকিয়ে, সে হ'ল বাড়ীর বড় ছেলে অরুণ রায়—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। আর সোনার চশমা পরিহিতা বধূটি হ'ল তারই স্ত্রী—বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা।

বরযাত্রীরাও বুঝতে পেরেছিল। বৈঠকখানা ঘরে তারা বসেছিল আড়ষ্ট ভাবে, অন্দরমহলে এসে তারা যেন জড়ীভূত হয়ে পড়ল। মালাবদলের সময় কেউ এতটুকু চপলতা প্রদর্শন করল না, কনের বান্ধবীদের নিয়ে সামান্য পরিহাসও করল না, এমনকি বরের উদ্দেশ্যে দু'একটা হাল্কা ইঙ্গিতও ছুঁড়ে দিল না। রায়বাড়ীতে পা দেবার এক ঘণ্টার মধ্যে তাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল, আরও এক ঘণ্টার মধ্যে তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। চলে গেল বরকর্তা—গোবিন্দর মেসো। অরুণের উদ্দেশ্যে তার শেষ কথাটা গোবিন্দ শুনতে পেল—তা হলে স্যার, ছেলেটাকে পরশুদিনই পাঠাচ্ছি।

তিন ঘণ্টার মধ্যে বিয়ে শেষ হয়ে গেল। বিমলার বন্ধুরা বিদায় নিল একে একে। উপর থেকে সীতা গীতার দরজা বন্ধ করার আওয়াজ ভেসে এল। রায়মশাই আগেই শুয়ে পড়েছেন, গিন্নী একবার ছাঁদনাতলাটা দেখে তেতলায় উঠে গেলেন। দরোয়ান বারান্দার আর সিঁড়ির আলোগুলো নিভিয়ে দিল। সারা বাড়ী নিস্তব্ধ। বাসর জাগবে বলে কেউ আড়ি পাততে এল না; দরজা খোলাই রইল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। গোবিন্দ পালঙ্কের পাশে চেয়ারে বসে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছিল বাইরের দিকে। এবার বিমলার দিকে ফিরে তাকাল। বিমলার ঘোমটা গলা পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ গোবিন্দর মনে হ'ল বিমলাও কি রায়বাড়ীর মেয়ে নয়? চকিতে নববধূর ঘোমটাটা তুলে ফেলল। ষোল বছরের কিশোরীর ডাগর চোখ দুটি কোন স্বপ্নে-দেখা রাজপুত্রের সন্ধান পেয়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে টলমল করছে। বুক থেকে একটা প্রকাণ্ড বোঝা নেমে গেল গোবিন্দর। না, বিমলা জজবাড়ীর মেয়ে নয়।

অবশ্য বিমলা যে রায়বাড়ীর কেউ নয় তাও ঘটক গোপন রাখে নি। বিমলার মা রায়গিন্নীর দূর সম্পর্কের বোন। স্বামী মারা যাওয়ার পর সে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে রায়বাড়ীতে এসে উঠেছিল। আত্মীয়তার দাবি নিয়ে নয়, নিজেকে সে কোনদিন রাঁধুনীর পর্য্যায়ের উপরে উঠতে দেয় নি। নিজের মেয়ে বিমলাকেও সর্ব্বদা আগলে রাখত যাতে সে দিদির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতে না পারে। কয়েক বছর রায়বাড়ীতে থাকার পর তার সকল চিন্তার অবসান হ'ল। বিমলার তখন দশ বছর বয়স। সেই

বয়সেই বিমলা টুকিটাকি কাজে বেশ চতুর হয়ে উঠেছিল।

আর গোবিন্দ? রাণীগঞ্জের এক কয়লাখনির আপিসে সে রেকর্ড সাপ্লায়ার, মাইনে ষাট। বাবার সামান্ত মুদিখানার দোকান থেকে ভাল ভাবে তাদের পেট চলত না, স্কুলের পড়া শেষ না করেই গোবিন্দ চাকরিতে ঢুকেছিল পিওন হিসাবে। পাঁচ বছর পর প্রমোশন পেয়ে গত ছ' বছর ধরে সে রেকর্ড সাপ্লায়ারের কাজ করছে। বরযাত্রী হয়ে যারা তার সঙ্গে এসেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে গণ্যমান্ত হ'ল তার মেসো—আলিপুরের দেওয়ানি আদালতের কোন উকিলের যেন মুহুরি। গোবিন্দর বন্ধুরা কেউ দপ্তরি, কেউ রেকর্ড-সাপ্লায়ার কেউ বা পিওন।

সকালে শয্যা তুলবার জন্তে গোবিন্দর কাছ থেকে টাকার দাবি করল না কোন তরুণী বা বধূ। ডেপুটি ছেলে আপিসে গেল, মেয়েরা আর পুত্রবধূ কলেজে। বিকেলের দিকে গোবিন্দর মেসো আবার এল। সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এসেছে। একটা ট্রাঙ্ক একটা বিছানা আর একটি বালিকাকে নিয়ে গোবিন্দ মেসোর সঙ্গে যাত্রা করল ষ্টেশনের দিকে। বিদায় নেবার সময় বিমলা আকুল হয়ে কাঁদল। কাঁদল সবার জন্তেই। এত কাঁদতে দেখে রায়গিন্নী অপ্রসন্ন মুখে বললেন, অত কাঁদিস নে বাছা, অমঙ্গল হবে। গোবিন্দরও খুব ভাল লাগল না। এত কান্না কিসের? রায়বাড়ী থেকে বেরুতে পেরে বিমলার ভিতরটা কি আনন্দে ফেটে পড়ছে না?

একটু ভুল বুঝেছিল গোবিন্দ। শ্বশুরবাড়ী গিয়েই বিমলা দিন গুনতে আরম্ভ করল—কবে দশমঙ্গল আসবে। গোবিন্দ বিস্মিত—বিমলা কি জানে না তার মাসী দ্বিরাগমনের কথাটা বলে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন? মার পরামর্শে গোবিন্দ ব্যাপারটা বিমলাকে জানতে দিল না। আগের দিন আপিস থেকে ফিরে এসে জানাল ছুটি পাওয়া গেল না।

তারপর গোবিন্দ একদিন আবিষ্কার করল বিমলা চিঠি লিখছে মাসীমাকে। দিদিদের আর দাদা-বউদিকেও লিখতে দেখল মাঝে মাঝে। জবাব? হ্যাঁ, তাও আসে বই কি বিজয়া-নববর্ষে।

বিমলার চেহারায় পরিবর্তন এসেছে। ব্যবহারে একটা সলজ্জ নম্র ভাব। শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "ক'দিন ধরে মাসীর কথা মনে পড়ছে। কিন্তু এখন যাওয়া মানে ত ওঁদের ব্যস্ত করা, নইলে একবার ঘুরে এলে হ'ত।"

শাশুড়ী নিরুত্তর রইলেন। গোবিন্দকেও না জানিয়ে একখানা চিঠি লিখলেন বেয়ানকে। সে চিঠির জবাব এল না।

বিমলার ছেলে হ'ল। সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। ছেলের মাস ছয়েকের সময় একদিন বিমলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "খালি বন্ধন আর বন্ধন। আর একটু বড় না হলে কি করে বেরুই?"

আর একদিন ছেলেকে কাজল পরাতে পরাতে বলল, "মাসী কিন্তু খুব খুশী হতেন খোকনকে দেখলে।"

কি কারণে গোবিন্দর মেজাজটা অপ্রসন্ন ছিল। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি কি কিছু বোঝ না?"

বিমলা চমকে উঠল। তার পর ম্লান হেসে বলল, "এককালে সত্যিই বুঝতাম না, এখন বুঝি অনেক কিছুই। কিন্তু কলকাতার কথাটা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারি না কেন বল ত?"

রুক্ষতর কণ্ঠে গোবিন্দ জবাব দিল, "পারবে, যেদিন জজবাড়ী থেকে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে।" আরও অনেক কিছু বলে গেল গোবিন্দ। মনের সমস্ত উত্তাপ নিঃশেষে ঢেলে দিল।

বিমলা চুপ করে রইল।

রাত্রিবেলা গোবিন্দ ছাদে শুয়ে রয়েছে মাদুর পেতে। অকস্মাৎ অতখানি উষ্মা প্রদর্শন করে ফেলে স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশীল গোবিন্দ নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত। বিমলার সেটা চোখ এড়ায় নি। শিয়রের কাছে বসে বলল, "কথাটা যখন উঠেছে খুলে বলাই ভাল। আমার একবার কলকাতায় যাবার ভারি ইচ্ছে করে। সত্যিই কিন্তু মাসীরা লোক খারাপ নন। আমাদের ত উপকার ছাড়া অপকার ওঁরা করেন নি। বিপদের সময় মাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, মা মারা যাবার পর যোগ্য পাত্রের হাতে আমাকে তুলে দিয়েছেন। মাসী যদি নাই বা বলেন যেতে, আমার কি একটা কর্ত্তব্য নেই? হয়ত ওঁরাও ভাবছেন বিয়ে হয়ে যাবার পর একবার খোঁজও নিলাম না। তা ছাড়া..." গলা ভারী হয়ে এল বিমলার।

"তা ছাড়া কি?"

"জ্ঞান হতেই আমি ও বাড়ীতে মানুষ। ছেলেবেলায় জানতাম শুধু মাকে। মা মারা যাবার পর দেখলাম মাসীকে। মায়ের স্নেহ নয়, তবু সে বাড়ীতেই যে আমি বড় হয়ে উঠেছি। মাকে মাসীর ভিতর খুঁজে পাই নি সত্যি কিন্তু ওঁকে দেখলেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। সমস্ত বাড়ীতে ছড়ানো রয়েছে মায়ের স্মৃতি। বড় বড় দুটো উনুনের কাছে বসে মা রাঁধতেন, মাসী দু' একবার এসে কি বলে যেতেন। আমি বাইরে চৌকাঠের কোণে বসে

থাকতাম একটা পিঁড়েতে। বিকেলে বারান্দায় বসে মাসীমার সঙ্গে গল্প করতে করতে মা আমার চুল বেঁধে দিতেন। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর ছোট ঘরটায় শুয়ে পড়তাম, মা আসতেন কত দেরি করে। আমার ভয় করত—"

বিমলা চুপ করল। দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার চিবুক বেয়ে। মনটা ভিজে উঠল গোবিন্দরও। বিমলার হাতখানা ধরে কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল দোতলার বারান্দায় অলস ভাবে দাঁড়ানো সীতা-গীতার মূর্ত্তি, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অরুণ রায়ের ঠোঁট বেঁকিয়ে কথা বলা। বিমলার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, "তুমি যেতে পার কিন্তু আমার যাওয়া অসম্ভব।"

বিয়ের অল্পদিন পরেই গোবিন্দ রেকর্ড সাপ্লায়ারের কাজে ইস্তফা দিয়ে হাতিয়ার ধরেছিল সাধারণ মজুর হিসাবে। একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে সে লেগে রয়েছিল নিজের কাজে। পুরস্কারও পেয়েছিল। ধাপে ধাপে উপরে উঠে এখন সে এসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান। আরও আশা রাখে গোবিন্দ।

প্রোডাকশন ম্যানেজারের সঙ্গে গোবিন্দ কলকাতায় যাবে। কিছুদিন থাকতে হবে। বিমলা এসে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করে বলল, "প্রতিবারই ত তুমি বলে যাও ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসবে। একবার গিয়েই দেখ না হালচালটা।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে কি ভাবল গোবিন্দ। তার পর বলল, "বেশ তাই হবে। এবার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়েই উঠব।"

খবর পেয়ে অরুণ নিচে নেমে এল। কে? বিমলার বর?

অধ্যাপিকা অনেকক্ষণ ধরে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল আশ্চর্য হয়ে। সেই বিমলার বর এসেছে?

আপিস না থাকলেও রায়মশাই আপিস টাইমে খেয়ে নেন। গোবিন্দও সকাল সকাল বেরুবে। খাওয়া আরম্ভ করে হঠাৎ রায়মশাইয়ের হুঁস হ'ল টেবিলে পুত্রবধূ অনুপস্থিত। বললেন, "বউমা কোথায়?"

রায়গিন্নী পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছিলেন। বললেন, "একটু পরে খাবে।"

"কেন? কলেজ নেই?"

"আছে। একটু পরেই যাবে আজকে।"

"কেন?"

"এমনিই।"

কি জানি যেন গোবিন্দ একটু অস্বস্তি অনুভব করল। অরুণ ভুলে গিয়েছিল গোবিন্দ কি করে। প্রশ্ন করল, "আপিসের খবর-টবর কি? আগের জায়গাতেই আছ ত? কিসের যেন ছিল কার্য্যটা?"

"আজ্ঞে কোল মাইনের আপিস। সেখানেই আছি", জবাব দিল গোবিন্দ।

"চাকরি বেশ ভাল লাগছে ত?"

একটু হাসল গোবিন্দ: "আমাদের আবার ভাল লাগা-লাগি কি? তবে আপিসের কাজ ছেড়ে এখন ফিল্ডওয়ার্ক ধরেছি। গায়ের খাটুনি।"

অরুণ একটু আশ্চর্য হয়ে তাকাল, "ফিল্ডওয়ার্ক? খনির ভিতরে নামতে হয়? খুব পরিশ্রমের কাজ তা হলে?"

"আমাদের মত লোকেদের পরিশ্রম না করে উপায় কি দাদা! এই দেখুন না শাবল চালিয়ে চালিয়ে হাতে কি রকম কড়া পড়ে গেছে।"

রায়গিন্নী কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে এলেন। বললেন, "নিজের হাতে কয়লা খুঁড়তে হয়?"

"তা হয় মাসীমা। আমরা কুলি-মজুর মানুষ, নইলে খাব কি?"

রায়গিন্নীর মুখ থেকে সহানুভূতিসূচক একটা শব্দ বেরুল।

কর্ত্তা বললেন, "বাট আই লাইক ম্যানুয়েল লেবার। অন্ততঃ কেরাণীগিরির চেয়ে গতরের কাজ ভাল। কি বল গোবিন্দ?"

"আজ্ঞে যা বলেছেন। কেরাণীগিরিতে থাকলেও একটা কথা ছিল। করতাম ত রেকর্ড-সাপ্লায়ারের কাজ।" জবাব দিল গোবিন্দ।

রায়মশাই চুপ করে গেলেন। আর কোন কথা হ'ল না টেবিলে।

একতলার একখানা ঘর নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে গোবিন্দর জন্যে। বিকেলে বাড়ী ফিরে গোবিন্দ জামাটা খুলে রেখে পত্রিকা নিয়ে বসেছে। বাইরে গাড়ীর শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল। গাড়ী থেকে যে তরুণীটি নামল, বহুদিন পরে দেখেও গোবিন্দ তাকে চিনতে পারল—বড় মেয়ে সীতা। ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সীতা একবার ভিতরে তাকাল, গোবিন্দকে চিনতে পারল বলে মনে হ'ল না। এখুনি হয়ত উপর থেকে গোবিন্দর ডাক আসবে বা যাবার সময় সীতা দেখা করে যাবে এই ভেবে গোবিন্দ জামাটা গায়ে চড়াল। ঘণ্টাখানেক পরে সীতা চলে গেল। এবার গোবিন্দর ঘরের দিকে তাকালও না।

ন'টার সময় ঠাকুর এসে জিজ্ঞেস করল। "এখন ভাত নিয়ে আসব বাবু?"

গোবিন্দ প্রথমটায় একটু বিস্মিত হ'ল। তবে কি

নিচেই টেবিল পাতা হয়েছে ? ভাল করে না বুঝেই বলল, "আনতে পারেন।"

গোবিন্দর ঘরেই চাকর আসন পেতে দিল। কথায় কথায় গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, "গিন্নীমা কি করছেন ?"

"আজ্ঞে মা রেডিও শুনছেন।" জবাব দিল পাচক।

পরদিন গোবিন্দকে আটটার সময় স্নানের ঘরে ঢুকতে দেখে ভৃত্য পরমেশ্বর বলল, "আপনি কি তাড়াতাড়ি বেরুবেন দাদাবাবু ?"

"হ্যাঁ—না, আপিস টাইমেই।"

পাচক ব্রাহ্মণ যথাসময়ে ভাত দিয়ে গেল গোবিন্দর ঘরে। পরমেশ্বর দাঁড়িয়ে রইল কাছে।

আপিস-টাইমেই বেরিয়ে যায় গোবিন্দ। ফিরে কোনদিন দুপুরে, কোনদিন বিকেলে, কোনদিন বা রাত্রে। ফিরে এসে পত্রিকা পড়ে, নয় এক আধটা মাসিকের উপর চোখ বুলোয়। রায়মশাই বাইরে বেরুবার মুখে বা ফেরার সময় দু' একটি কথা বলে যান। গিন্নী একতলায় বড় একটা নামেন না, কাজেই দেখাও হয় না রোজ। অরুণের ফেরার কোন ঠিক নেই, তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি গোবিন্দর।

রায়বাড়ীতে গোবিন্দর পঞ্চম দিবস। সকালে ভাত খাবার সময় গোবিন্দ ঠাকুরকে বলল, "আজ রাত্রে আমার জন্যে ভাত নেবেন না, সন্ধ্যের গাড়ীতেই যাচ্ছি।"

দুপুরেই ফিরল গোবিন্দ। জিনিষপত্র গোছাচ্ছে এমন সময় রায়গিন্নী এলেন। বললেন, আজই যেতে হবে ?

"আজ্ঞে হ্যাঁ মাসীমা।"

"ছুটি আর নেই বুঝি ?"

"ছুটি ত ঠিক নয়, কাজেই এসেছিলাম। শেষ হয়ে গেল কাজ।"

বিছানাটা বাঁধতে অসুবিধা হচ্ছে দেখে গিন্নী ডাকলেন, "পরমেশ্বর একটু এসে গোবিন্দকে সাহায্য কর না।"

পরমেশ্বর এল। বিছানাটা বেঁধে সুটকেসটা গুছিয়ে দিল সুন্দর ভাবে। এবার ট্রাঙ্ক। উপরের জামা কাপড় দু'একটা নামাতেই গোবিন্দ চমকে উঠল, "এই যাঃ একেবারে ভুলে গেছি !"

গিন্নী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

তাড়াতাড়ি করে উপরের জিনিসগুলো মাটিতে ফেলে বিমর্ষভাবে গোবিন্দ বলল, "আপনার মেয়ে কয়েকটা জিনিস পাঠিয়েছিল, সেকথা একেবারে ভুলে গেছলাম।"

ট্রাঙ্কের তলা থেকে কতগুলো প্যাকেট বের করে খুলতে খুলতে বলল, "আপনার জন্যে একজোড়া বিষ্ণুপুরী গরদের শাড়ি আর মেসোমশাইয়ের জন্যে সিল্কের থান। বৌদিকে এই মুর্শিদাবাদীটা দিতে বলেছে আর দাদাকে শান্তিপুরী। দাদার ছেলেকে শার্ক স্কিনের এই থানটি দিয়ে স্যুট বানিয়ে দেবেন। সাদা অর্গ্যাণ্ডিটা ওঁর মেয়েদের মানাবে ত ? সীতাদি গীতাদির বিয়ের সময় ও আসতে পারে নি—এই দু'গাছা নেকলেস পাঠিয়েছে, আর জামাইবাবুদের জন্যে আংটি। এই ধুতিটা পরমেশ্বরের আর এটা শৈলর শাড়ি। ড্রাইভারের কোটের কাপড়···দরোয়ানের জন্য একজোড়া পাগড়ির···"

দরোয়ান এসে সংবাদ দিল গাড়ী প্রস্তুত।

দ্রুত হস্তে গোবিন্দ নিজের জিনিসগুলো ভরে ফেলল কোন মতে। পরমেশ্বরকে তাড়া দিয়ে বলল, একটু শীগ্‌গির পরমেশদা।"

দরোয়ান আর চাকর ধরাধরি করে বিছানা বাক্স গাড়ীতে তুলে দিল। রায়গিন্নী প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে। গোবিন্দ তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেলে আত্মস্থ হলেন। বললেন, "কিন্তু বাবা আর ক'টা দিন থেকে গেলে বড় খুশী হতাম।"

একটু হাসল গোবিন্দ, "উপায় নেই মাসীমা।"

"তা-তা বিমলাকে কবে নিয়ে আসছ ? কতদিন দেখি নি মেয়েটাকে।"

"সেকথা আমারও মনে হয় মাসীমা। আর আপনার মেয়ে ত সব সময়ই বলছে। কিন্তু কি করি বলুন ! আমি বাঁধা রয়েছি পরের গোলামির শেকলে আর আপনার মেয়ে বাঁধা পড়েছে নিজের বাঁধনে। বুড়ো শাশুড়ীকে ফেলে একদিনের জন্যেও কোথাও নড়বে না আবার এদিকে কান্নাকাটি করবে আপনাদের জন্যে। একেবারে পাকা গিন্নীটি।"

তার পর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গোবিন্দ বলল, "ও, চারটে বেজে গেছে। আর ত সময় নেই মাসীমা। মেসো-মশাই আর দাদা—বৌদির সঙ্গে ত দেখা হ'ল না—আমার প্রণাম জানাবেন ওঁদের।"

রায়গিন্নী আকুল স্বরে বললেন, "কিন্তু বিমলা—"

গোবিন্দ ততক্ষণে চৌকাঠের বাইরে চলে গেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল প্রদেশে ভারতীয় শ্রমিক আমদানী সুরু হয়। ১৯১১ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিক পাঠানো হইত। ভারতীয় শ্রমিক আমদানীর পর ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও নাটালে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে ভারতীয়েরা ট্রান্সভালে যাইয়া ব্যবসা করিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অল্পদিনের মধ্যেই বেশ সঙ্গতিশালী হইয়া উঠিল। ভারতীয়গণের এই শ্রীবৃদ্ধিতে ট্রান্সভালের শ্বেতাঙ্গ বুয়রগণের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। নাটালের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের শ্রীবৃদ্ধিও নাটালের ইংরেজ শাসকগণ সুদৃষ্টিতে দেখেন নাই। ফলে উনবিংশ শতকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষের সূচনা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধের (১৮৯৯-১৯০১) পর ট্রান্সভালে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ ট্রান্সভালে বুয়র সরকারের ভারতীয় বিদ্বেষ নীতি এবং কার্য্যকলাপকে বুয়র যুদ্ধের অন্যতম কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ সনের ৩ আইনের (Law III, 1885) বলে ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের জমি কিনিবার অধিকার বিশেষভাবে সঙ্কুচিত করা হয়। কোন রাজনৈতিক অধিকারও তাহাদের ছিল না। মোট কথা, ট্রান্সভালের বুয়র শাসকগণ ভারতীয়দিগকে অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয় মনে করিতেন। তাহারা রেলের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে পারিত না। প্রত্যেক ভারতীয়কে ট্রান্সভালে বাস করিবার সরকারী পাস অর্থাৎ অনুমতিপত্র সঙ্গে রাখিতে হইত। পুলিশ দেখিতে চাহিলে এই পাস দেখাইতে হইত। রাত্রি নয়টার পর কোন ভারতীয় রাস্তায় বাহির হইতে পারিত না।

১৯০১ সনে ইংরেজ শাসন চালু হইবার পর ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতীয়গণের উপর নূতন নূতন বিধি-নিষেধ আরোপ করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। এই সময় মহাত্মা গান্ধী জোহানেসবার্গে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন (১৯০৩ সন)।

যুদ্ধের সময় ট্রান্সভালের বুয়রগণ নিজেদের ঘর সামলাইতেই ব্যস্ত ছিল। ফলে ভারতীয় বিদ্বেষও সাময়িক ভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরই ভারতীয় বিদ্বেষ আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। ১৯০৭ সনের জানুয়ারী মাসে ট্রান্সভাল স্বায়ত্ত শাসন লাভ করে। নূতন ব্যবস্থায় বুয়রগণই ট্রান্সভালের শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিল। মার্চ মাসে ট্রান্সভালের আইনসভা একটি আইন পাস করিয়া ঘোষণা করিল যে, ট্রান্সভাল প্রবাসী প্রত্যেক ভারতীয়কে সে দেশে থাকিবার জন্য নূতন অনুমতিপত্র বা পাস লইতে হইবে। ভারতীয়গণ সকলেই সরকারী অনুমতি লইয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়াছিল। উল্লিখিত আইনে কেবল নূতন অনুমতিপত্র গ্রহণের কথাই বলা হইল না, প্রত্যেককে নিজ নিজ অনুমতিপত্রে হাতের দশ আঙ্গুলের ছাপ দিতে আদেশ করা হইল। এই আইন 'এশিয়াটিক ল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট' বা ১৯০৭ সনের দুই আইন নামে পরিচিত। গান্ধীজী এই আইনকে 'খুনে আইন' নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ভারতীয়েরা এই আইন অমান্য করিবার সঙ্কল্প করিল। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রাম পরিচালনার জন্য 'সিভিল রেসিষ্ট্যান্স এসোসিয়েশন' গঠিত হইল। এই 'খুনে আইনে'র বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেই সত্যাগ্রহের আদর্শের সূচনা এবং বিকাশ হয়। ইতিহাসের অন্তহীন ঘটনা-স্রোতের মধ্যে লক্ষ্য করিলে অনেক ক্ষেত্রেই পারম্পর্য্য, কার্য্য-কারণ সম্পর্ক এবং আদান-প্রদানের সম্বন্ধ চোখে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট মনীষী এবং রাজনৈতিক নেতা পরলোকগত জে. এন. হফমেরের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য :

> "Often there is justice in the working of history. India, though not of its own volition, had given to South Africa one of its most difficult problems (the Indian problem). South Africa, in its turn, likewise not of its own volition, gave to India the idea of civil disobedience."—*Mahatma Gandhi*—Edited by Dr. S. Radhakrishnan, p. 121.

'খুনে আইনে'র বিরুদ্ধে সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ সরকারী রেজিষ্ট্রী আপিসে পিকেটিং আরম্ভ করিল। ভারতীয়গণ প্রায় সকলেই আঙ্গুলের ছাপ দিয়া অনুমতিপত্র লইতে অস্বীকার করিল। যাহারা ইহার বিরোধী ছিল, প্রধানতঃ এই পিকেটিঙের জন্যই তাহারাও এই অনুমতিপত্র লইতে পারিল না। ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ট্রান্সভালের বুয়র প্রধানমন্ত্রী জেনারেল বোথাকে

জানানো হইল যে, আইনের জোরে আঙ্গুলের ছাপ লইয়া অনুমতিপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা তুলিয়া দিলে ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় আঙ্গুলের ছাপ দিয়া সরকারী অনুমতিপত্র লইবে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে 'খুনে আইন' বাতিল করিয়া দিতে হইবে। বোথা সরকার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

এদিকে ১৯০৭ সনেই ট্রান্সভাল সরকার 'ইমিগ্রেশান রেষ্ট্রিক্‌শন এক্ট' বা '১৯০৭ সনের পনের আইন' নামে আর একটি আইন পাস করিলেন। ফলে যুদ্ধের সময় যে সমস্ত ভারতীয় ট্রান্সভাল হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের পক্ষে সেদেশে ফিরিয়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। যাহাদের বিরুদ্ধে এই আইন, তাহারা কিন্তু একটুও দমিল না।

সরকার দমননীতির পথ ধরিলেন। প্রথমতঃ অজ্ঞাত, অখ্যাত জনকয়েক প্রবাসী ভারতীয়কে নির্দ্দিষ্ট তারিখের (৩১শে জুলাই) মধ্যে অনুমতিপত্র না লইবার অপরাধে 'নিষিদ্ধ আগন্তুক' (Prohibited Immigrant) বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইহাদিগকে ট্রান্সভাল ত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। ইহারা কিন্তু এই আদেশ অমান্য করিল। ফলে ইহাদের প্রত্যেকেই অল্পদিনের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

ইহার পর মহাত্মা গান্ধী এবং নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ভারতীয়কে অনুমতিপত্র না লইবার অপরাধে আদালতে হাজির হইবার আদেশ দেওয়া হইল। হাকিম আদেশ করিলেন যে, আঙ্গুলের ছাপ দিয়া অনুমতিপত্র সংগ্রহ না করিলে তাঁহারা যেন ট্রান্সভাল হইতে চলিয়া যান। তাঁহারা কেহই অনুমতিপত্রও লইলেন না; ট্রান্সভাল ত্যাগও করিলেন না। ১৯০৮ সনের ১০ই জানুয়ারী ইহাদের বিচার হয়। সকলেই অপরাধ স্বীকার করিলেন। কেহই আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন না। গান্ধীজী দুই মাস অ-শ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অপরাপর নেতাদেরও কারাদণ্ডের আদেশ হইল। নেতৃবৃন্দের কারাদণ্ডেও জনসাধারণ ভয় পাইল না, তাহাদের উৎসাহও কমিল না। তাহারা আন্দোলন চালাইয়া যাইতে লাগিল। ১৯০৪ সনে গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' সাপ্তাহিক এই সময় ভারতীয় জনমত গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

সরকার কিন্তু হাল ছাড়িলেন না। আইন অমান্যকারীদিগকে প্রথম প্রথম সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইত না; সকলকেই অ-শ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। পরে প্রত্যেককেই সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হইতে লাগিল। নারী সত্যাগ্রহীদিগকেও অব্যাহতি দেওয়া হইত না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভারতীয়গণ ভয় পাইল না। এই সময় ট্রান্সভালের ভারতীয় বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় ১০,০০০। তাহার মধ্যে শতকরা ৫ জন অর্থাৎ ৫০০ জনও 'খুনে আইন' (১৯০৭ সনের দুই আইন) অনুসারে আঙ্গুলের ছাপ দিয়া ট্রান্সভালে থাকিবার অনুমতিপত্র লইয়াছিল কিনা সন্দেহ। প্রায় ১৫০ ভারতীয় (মতান্তরে ১২০) আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করে। জেলকর্তৃপক্ষ ভারতীয় বন্দীদিগের সহিত অতিশয় দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে নিকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হইত। জেলে থাকিবার ব্যবস্থাও অতিশয় জঘন্য ছিল। নিগ্রো কয়েদীদের পোশাকই ভারতীয়দিগকেও পরিতে দেওয়া হইত। দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে নিগ্রো কয়েদীদিগকে যে টুপি পরিতে দেওয়া হয় এবং যে টুপি দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে গান্ধীজী নিজে পরিতেন, আজিকার সুপরিচিত গান্ধী টুপি তাহারই পরিবর্ত্তিত রূপ।

আন্দোলনের তীব্রতা এবং প্রসার সরকারকে ভাবাইয়া তুলিল। বোথা সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব জেনারেল স্মাট্‌সের অনুমতি লইয়া 'ট্রান্সভাল টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আলবার্ট কার্টরাইট গান্ধীজীর সহিত জেলে দেখা করিলেন। গান্ধীজীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় ভারতীয় জেলের বাহিরে ছিলেন, মিঃ কার্টরাইট তাঁহাদের সঙ্গেও দেখা. করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই জানাইয়াছিলেন যে, গান্ধীজীর সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন না। সেই জন্যই তিনি গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে চাহিলে জেনারেল স্মাট্‌স্ আপত্তি করেন নাই। কার্টরাইটের মধ্যস্থতায় সরকার এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা রফা হইল। ভারতীয়গণ ট্রান্সভালে থাকিবার সরকারী অনুমতিপত্রে স্বেচ্ছায় হাতের আঙ্গুলের ছাপ দিলে সরকার ১৯০৭ সনের দুই আইন প্রত্যাহার করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

১৯০৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী প্রিটোরিয়ায় গান্ধীজী এবং জেনারেল স্মাট্‌সের মধ্যে এক সাক্ষাৎকারের পর—এই ইঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎকার—সেই দিনই গান্ধীজী এবং সমস্ত ভারতীয় সত্যাগ্রহী কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হইল। ঐ দিনই রাত্রিতে জোহানেসবার্গ মসজিদের প্রাঙ্গণে ভারতীয়গণের এক সাধারণ সভায় গান্ধী-কার্টরাইট রফার সর্ত্তগুলি অনুমোদিত হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারী অনুমতিপত্র লইবার জন্য রেজিষ্ট্রি আপিসে যাওয়ার পথে মীর আলম নামে গান্ধীজীর এক পাঠান মক্কেলের নেতৃত্বে কয়েকজন পাঠান তাঁহাকে বেদম প্রহার করে। শ্বেতাঙ্গ পথচারীরা বাধা না দিলে তাহারা হয়ত গান্ধীজীকে মারিয়াই ফেলিত। সকলে ধরাধরি করিয়া

তাঁহাকে কাছেই এক ইংরেজ বন্ধুর আপিসে লইয়া গেল। তিনি তখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। জ্ঞানলাভের পর তাঁহাকে ইংরেজ পাদ্রী রেভারেণ্ড জোসেফ জে, ডোকের গৃহে স্থানান্তরিত করা হইল। রেভারেণ্ড ডোকের বাড়ীতে সেই দিনই গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে রেজিষ্ট্রি বিভাগের বড়কর্তা তাঁহার নাম রেজিষ্ট্রি করিয়া তাঁহাকে সরকারী অনুমতিপত্র দিলেন। গান্ধীজী এই অনুমতিপত্রে নিজের দশ আঙ্গুলের ছাপ দিয়াছিলেন। গান্ধীজীর নিষেধসত্ত্বেও মীর আলম এবং পাঠান আততায়ীদিগকে মার-পিটের অপরাধে ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ডোক দম্পতীর নিপুণ সেবা-শুশ্রূষায় গান্ধীজী অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলেন। ইহার পর তিনি নাটালে যান। কয়জন পাঠান ডারবানের এক জনসভায় আবার তাঁহাকে প্রহার করিবার চেষ্টা করে। কয়েকজন বন্ধুর জন্য সে যাত্রা তিনি বাঁচিয়া যান। গান্ধীজীর নাটালে অবস্থানকালে ট্রান্সভাল-প্রবাসী ভারতীয়দিগের প্রায় সকলেই নিজ নিজ নাম রেজিষ্ট্রি করিয়া আঙ্গুলের ছাপ দিয়া সরকারী অনুমতিপত্র লইয়াছিল।

সকলেই আশা করিল যে, এইবার 'খুনে আইন' বাতিল করা হইবে। বোথা সরকার এ আইন রদ ত করিলেনই না বরং ইহারই সমধর্ম্মী এবং পরিপোষক একটি নূতন আইন পাস করিলেন। এই শেষোক্ত আইনটি 'এশিয়াটিক রেজিষ্ট্রেশন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট' বা ১৯০৮ সনের ৩৬শ আইন নামে পরিচিত। ট্রান্সভাল বিধান সভায় এই আইন সম্বন্ধে আলোচনা কালে ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সরকারকে পরিষ্কার জানাইয়া দেওয়া হইল যে, 'খুনে আইন' রদ না করিলে আবার সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ করা হইবে।

সরকার কিন্তু ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। ১৯০৮ সনের ১০ই আগষ্ট জোহানেসবার্গে ভারতীয়গণের এক সাধারণ সভায় আবার সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যে সমস্ত ভারতীয় স্বেচ্ছায় আঙ্গুলের ছাপ দিয়া অনুমতিপত্র লইয়াছিল, তাহাদের অনেকের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া সভাস্থলে এক বিরাট বহ্ন্যুৎসব করা হইল। সভায় উপস্থিত জনৈক সাংবাদিক এ ঘটনাকে ১৭৭৩ সনের 'বোষ্টন টি পার্টি'র* সহিত তুলনা করিয়াছেন।*

* ১৭৬৭ সনে ইংরেজ সরকার আমেরিকায় আমদানী চায়ের উপর শুল্ক ধার্য্য করিলে আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশগুলি এই শুল্ক দিতে অসম্মত হয়। ১৭৭৩ সনে বোষ্টনের কয়েকজন নাগরিক রেড-ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে বোষ্টন বন্দরে নোঙ্গর করা চা-বোঝাই কয়খানা বিলাতী জাহাজ হইতে ৩৪২ পেটি চা জলে ফেলিয়া দেয়। 'বোষ্টন টি-পার্টি নামে পরিচিত এই ঘটনাই আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণ।

এইবার সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্য্যায় সুরু হইল। সংগ্রামের এই পর্ব্বে আহমদ মোহাম্মদ কাছালিয়া ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। দলে দলে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের ধরিয়া জেলে পাঠানো হইতে লাগিল। প্রায় সকলকেই সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। জেল কর্তৃপক্ষ সত্যাগ্রহী কয়েদীদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের ত্রুটি করিলেন না। অবিচল ধৈর্য্যের সহিত সমস্ত অত্যাচার তাহারা সহ্য করিল। সরকার তখন ভারতীয়দিগকে জব্দ করিবার জন্য নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন। আইন অমান্যকারীদিগকে জাহাজবন্দী করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। ট্রান্সভাল সুপ্রীম কোর্ট ইহাকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কে শোনে সে কথা?

ক্রমে সত্যাগ্রহে ভাটার টান ধরিল। নেতৃবৃন্দ শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার সঙ্কল্পে অটল থাকিলেও কর্ম্মীদের দৃঢ়তা এবং মনোবল ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে লাগিল। অনেকেই আন্দোলন হইতে সরিয়া পড়িলেন। যাঁহারা সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না—তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে—তাঁহারাই বার বার আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের নিজেদের এবং ইঁহাদের আশ্রিত পরিজনবর্গের বাস এবং ভরণ-পোষণের ব্যবস্থার জন্য গান্ধীজী টলষ্টয় ফার্ম্ম স্থাপন করেন। জোহানেসবার্গ হইতে একুশ মাইল দূরে গান্ধীজীর অনুরাগী বন্ধু জার্ম্মান স্থপতি কালেন বাকের প্রায় ১,১০০ বিঘার একটি জোত ছিল। তিনি এই জোত গান্ধীকে দান করিলেন।

১৯১১ সনে সত্যাগ্রহ সংগ্রামের তীব্রতা খুবই হ্রাস পাইল। ১৯১২ সনে গান্ধীজীর অনুরোধে গোপালকৃষ্ণ গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। ভারতীয় সম্প্রদায় রাজোচিত সম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ ও বুয়র পত্রিকাগুলি কিন্তু তাঁহাকে 'কুলিরাজ' আখ্যায় অভিহিত করিল। সরকারের পক্ষ হইতে অবশ্য গোখলের সহিত খুবই ভদ্র ব্যবহার করা হয়। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল বোথা, স্বরাষ্ট্রসচিব জেনারেল স্মাটস্ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীর সহিত এক বৈঠকে তিনি প্রবাসী ভারতীয়গণের সমস্যা এবং অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রিটোরিয়ায় এই বৈঠক বসিয়াছিল। গান্ধীজী ইচ্ছা করিয়াই এই বৈঠকে যোগদান করেন নাই। আলাপ আলোচনা শেষ হইবার পর গোখলে গান্ধীজীকে জানাইলেন যে, সরকার ভারতীয়দিগের সমস্ত দাবিই মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছেন, ১৯০৭ সনের দুই আইন বাতিল করা হইবে। নাটালের ভারতীয় শ্রমিক এবং তাহাদের পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষের নিকট হইতে মাথাপিছু

বার্ষিক তিন পাউণ্ড হিসাবে কর আদায়ের আইন রদ করা হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আগন্তুকদিগের প্রতি প্রযোজ্য বর্ণবৈষম্যমূলক আইন প্রত্যাহার করা হইবে। গান্ধীজী সরকারী প্রতিশ্রুতির সততা এবং আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিলে গোখলে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

গান্ধীজীর আশঙ্কা যে অমূলক নহে কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। সরকার তিন পাউণ্ড করের আইন রদ করিতে রাজী হইলেন না। ফলে নাটালেও সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সূচনা হইল। এত দিন ট্রান্সভাল প্রবাসী পুরুষ ব্যতীত কাহাকেও সত্যাগ্রহ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। এই বার দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী কোন ভারতীয়েরই আন্দোলনে যোগ দিবার বাধা রহিল না।

১৯১৩ সনে ইউনিয়ন পার্লামেন্টের একটি আইনের বলে স্বরাষ্ট্রসচিব নিজের খুশিমত যে-কোন ভারতীয়কে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'নিষিদ্ধ আগন্তুক' (prohibited immigrant) বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার লাভ করিলেন। ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশে অবাধে যাতায়াতের অধিকারও এই আইনে হরণ করা হইল। সুযোগ পাইয়া স্বরাষ্ট্রসচিব দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ সমস্ত ভারতীয়কেই 'নিষিদ্ধ আগন্তুক' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ফলে ভারতীয়গণ অতিশয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকগণ এই সময় সাধারণ ধর্ম্মঘটের নোটিশ দিয়াছিল। গান্ধীজী কোন দিনই প্রতিপক্ষের বিপদের সুযোগে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিরুদ্ধ পক্ষের বিপদের সুযোগ গ্রহণ করা সত্যাগ্রহের নীতি এবং আদর্শের বিরোধী। সুতরাং সাময়িক ভাবে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইল।

ঠিক এই সময়েই দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রীম কোর্টের একটি রায়ে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত সমস্ত বিবাহকে আইনতঃ অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এই রায়ের ফলে ভারতীয় নারী সম্প্রদায়ের মর্য্যাদায় আঘাত লাগিল। ভারতীয়গণের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেও ঘোরতর বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিল। গান্ধীজী এতদিন আইন অমান্য আন্দোলনে নারীদের যোগদানের সমর্থন দূরের কথা, বরং তাহার বিরোধিতাই করিয়াছেন। এইবার তাঁহার মত বদলাইল, তিনি নারীদিগকে পুরুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে আহ্বান করিলেন। নারীসমাজও তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল। 'টলষ্টয় ফার্ম্ম'বাসিনী ষোল জন এবং ১৮৯৪ সনের শেষভাগে গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত ফিনিক্স আশ্রমবাসিনী চার জন ভারতীয় নারী সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ফিনিক্স আশ্রমবাসিনী সত্যাগ্রহী নারীদিগের মধ্যে গান্ধী-জায়া কস্তুরবাঈ গান্ধীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

'টলষ্টয় ফার্ম্ম'বাসিনী সত্যাগ্রহকারিণীদিগের কেহ কেহ সরকারের অনুমতি না লইয়া নাটাল সীমান্তে প্রবেশ করিলেন। পক্ষান্তরে ফিনিক্স আশ্রমবাসিনীদিগের কেহ কেহ বিনা অনুমতিতে নাটাল সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ট্রান্সভালে উপনীত হইলেন। সরকার ইঁহাদিগের কার্য্যে বাধা দিলেন না। তখন ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সরকারী লাইসেন্স না লইয়াই রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করিতে আরম্ভ করিলেন। পুলিস তথাপি নিষ্ক্রিয় রহিল। নারী-সত্যাগ্রহীরা তখন নাটালের কয়লার খনিগুলির কেন্দ্র নিউক্যাসলের দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা খনির ভারতীয় মজুরদিগকে ধর্ম্মঘট করিতে উৎসাহিত করিলেন। ফলে কয়লার খনিগুলিতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইল। জনপ্রতি বার্ষিক তিন পাউণ্ড করের প্রতিবাদেই শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র খনি অঞ্চলে ধর্ম্মঘট ছড়াইয়া পড়িল। সরকারী পুলিস সক্রিয় হইয়া উঠিল। নারী সত্যাগ্রহীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল। বিচারে ইঁহাদের প্রত্যেকের তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯১৩)। এইবার ভাল রকমেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। গান্ধীজী নিজে আন্দোলন চালাইবার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। নিউক্যাসল তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হইল। হাজার হাজার ধর্ম্মঘটকারী ভারতীয় মজুর নিউক্যাসলে জড়ো হইয়াছিল। ইহাদের অনেকেরই পরিবারবর্গও সঙ্গে ছিল। এত লোকের খাওয়া থাকা এবং তাহাদের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা বড় সহজ কথা নহে। নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবর্ত্তক এবং পরিচালক গান্ধীজীর উপর এই ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল। সুষ্ঠু ভাবেই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অকৃপণ সাহায্যে তাঁহার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছিল। গান্ধীজী ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদিগকে লইয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। পথে যদি ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়—ভাল। না হইলে সকলে পায়ে হাঁটিয়া 'টলষ্টয় ফার্ম্মে' যাইবে এবং সরকারের সহিত একটা মিটমাট না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানেই থাকিবে। এদিকে খনির মালিকগণ ধর্ম্মঘটের সাফল্য এবং প্রসারে ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা গান্ধীজীকে ডারবানে তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে আহ্বান করিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদের সহিত দেখাও করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোনও ফলই হইল না।

১৯১৩ সনের ২৮শে অক্টোবর ধর্ম্মঘটকারীদের যাত্রা শুরু হইল। দুই দিন পর তাহারা পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে চার্লস্‌টাউনে উপস্থিত হইল। চার্লস্‌টাউনের পরেই ট্রান্সভালের এলাকা আরম্ভ। ট্রান্সভাল এলাকায় প্রবেশের পূর্ব্বে গান্ধীজী

আবার সরকারের সহিত মিটমাটের চেষ্টা করিলেন। চার্লস্ টাউন হইতে তিনি স্বরাষ্ট্রসচিব জেনারেল স্মাটসের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে টেলিফোনে জানাইলেন যে, ধর্ম্মঘটকারীরা ট্রান্সভালে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু জেনারেল স্মাটস বার্ষিক মাথাপিছু তিন পাউণ্ড কর তুলিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি (গান্ধীজী) তাহাদিগকে নিরস্ত করিবেন। সঙ্গে সঙ্গেই এই মর্ম্মে জবাব আসিল—"জেনারেল স্মাটস আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে চান না। আপনি যাহা খুশি করিতে পারেন।"

৬ই নবেম্বর (১৯১৩) চার্লস্‌টাউন হইতে সত্য ও অহিংসার "দুর্গম এবং সঙ্কীর্ণ পথে"("Narrow and difficult path") ধর্ম্মঘটকারীদের অভিযান সুরু হইল। ইহাদের দলে মোট ২,০৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন নারী এবং ৫৭ জন শিশু ছিল। ট্রান্সভালের এলাকায় পড়িবার পর দুই জায়গায় গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু দুই বারই বিচারের সাপক্ষে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশেষে ধর্ম্মঘটকারীরা যখন জোহানেসবার্গের কয়েক মাইল দূরে হেডেলবার্গে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হইল। আদালতের বিচারে তিনি নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী পাওয়া যায় নাই, কেবলমাত্র তাঁহার সাক্ষ্য এবং স্বীকারোক্তির বলেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। ইহার পর আর একটি মামলায় গান্ধীজীর তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁহার দুই জন শ্বেতাঙ্গ সহকর্ম্মী এবং অনুরাগী বন্ধু মিঃ পোলক এবং মিঃ কালেনবাকও এই শেষোক্ত মামলার আসামী ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। গান্ধীজীর কারাদণ্ডের পর বহু ভারতীয় নাটাল হইতে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিল। ইহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের পর জেলে পাঠানো হইল। যে সমস্ত ধর্ম্মঘটকারী গান্ধীজীর সহিত চার্লস্ টাউন হইতে ট্রান্সভাল অভিযান করিয়াছিল তাহাদের সকলকে হেডেলবার্গে গ্রেপ্তার করিয়া ডারবানে ফিরাইয়া আনা হয়। তাহাদের সকলকেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। এইবার সরকার এক অভিনব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেন। নাটালের জেলগুলিতে সত্যাগ্রহীদিগের স্থান সঙ্কুলান হইল না। সরকার ধর্ম্মঘটকারী কয়েদীদিগকে কয়লার খনিগুলিতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদিগকে জোর করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা করা হইল। তাহারা কাজ করিতে রাজী হইল না। ফলে, তাহাদের উপর নির্ম্মম নির্যাতন এবং নৃশংস অত্যাচার করা হইল।

এই অত্যাচারের ফলে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া যাওয়া দূরের কথা, নাটালের সমস্ত ভারতীয় শ্রমিক একযোগে ধর্ম্মঘট করিল। নাটালের কয়লার খনি, আখের ক্ষেত এবং কলকারখানা প্রভৃতিতে এই সময় প্রায় ষাট হাজার ভারতীয় শ্রমিক কাজ করিত। তাহারা প্রায় সকলেই কাজ ছাড়িয়া দিল। গান্ধীজীর কারাদণ্ড এবং সত্যাগ্রহীদিগের উৎপীড়নের সংবাদে তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। নাটালের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘোরতর সঙ্কটের আশঙ্কা দেখা দিল। সরকার কঠোর হস্তে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মঘটকারীদিগকে জোর করিয়া নিজের নিজের কাজের জায়গায় পাঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইল। অনেকেই কাজে ফিরিয়া যাইতে অসম্মত হইল। প্রায় দু'হাজার ধর্ম্মঘটকারীকে জোর করিয়া কাজে লাগাইয়া দেওয়া হইল। জায়গায় জায়গায় পুলিস এবং ধর্ম্মঘটকারীদিগের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ হইয়া গেল। পুলিস দু'জায়গায় গুলি চালাইল। নয় জন ধর্ম্মঘটকারী পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারাইল। পঁচিশ জন জখম হইল। অত্যাচার ধর্ম্মঘটকারীদের মনোবল দৃঢ়তর করিল।

এই অত্যাচারের কাহিনী যথাকালে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডে পৌঁছিল। উভয় দেশের জনমতই দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। বিলাতী খবরের কাগজগুলি ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিল। লণ্ডনের 'টাইম্‌স্' পত্রিকা মন্তব্য করিল যে, ভারতীয় শ্রমিকদিগের অভিযান নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য একটি দৃষ্টান্তরূপে ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে।* ভারত সরকার ভারতীয়গণের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কমিশন নিয়োগের দাবি করিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সময় ভারতবর্ষের বড়লাট। তিনি প্রকাশ্যভাবেই ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।**

বোথা সরকার, বিশেষতঃ স্বরাষ্ট্রসচিব জেনারেল স্মাটসের তখন উভয়সঙ্কট। গান্ধীজীর কথায় স্মাটস্ সাহেবের তখন সাপের ইঁদুর গিলিবার অবস্থা। তিনি ইউরোপীয়দিগকে

---

* ". . . the march of the Indian labourers must live in memory as one of the most remarkable manifestations in history of the spirit of passive resistance."

** "Your compatriots in South Africa have taken matters in their own hands by organising what is called passive resistance to laws which they consider invidious and unjust. They have the sympathy of India—deep and burning—and not only of India, but all those who like myself, without being Indians themselves, have feelings for the people of this country."

আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, সরকার কিছুতেই তিন পাউণ্ড কর তুলিয়া দিবেন না বা ভারতীয় বিরোধী আইনের রদ-বদল করিবেন না। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল যে এই জিদ ছাড়িতে হইবে।

বোথা সরকার স্যর উইলিয়ম সলোমনের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করিলেন। এই কমিশনের অপর দু'জন সদস্য কর্ণেল ওয়াইলি এবং মিঃ এসেলেন কুখ্যাত ভারতীয় বিদ্বেষী। যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় প্রবাসী ভারতীয় জেলের বাহিরে ছিলেন তাঁহারা জানাইলেন যে, সমস্ত সত্যাগ্রহীকে অবিলম্বে কারামুক্ত না করিলে এবং তদন্ত কমিশনে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ না করিলে ভারতীয় সম্প্রদায় কমিশনের সহিত কোনপ্রকার সহযোগিতা করিবে না। জেনারেল স্মাটস্ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

এদিকে সলোমন কমিশন প্রথমেই গান্ধী, পোলক এবং কালেনবাককে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিবার সুপারিশ করিলেন। ১৯১৩ সনের ১৪ই বা ১৮ই ডিসেম্বর ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ২১শে ডিসেম্বর তাঁহারা একযোগে জেনারেল স্মাটসের নিকট এক পত্র লেখেন। এই পত্রে জানানো হইল যে:

১। স্যর জন রোজ ইনস্ এবং ডব্লু. পি. শ্রাইনার নামে নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ এবং জনসেবায় তৎপর দু'জন ইউরোপীয়কে সলোমন কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করিতে হইবে;

২। সমস্ত সত্যাগ্রহী কয়েদীকে অবিলম্বে ছাড়িয়া দিতে হইবে

এবং

৩। কয়লার খনি, আখের ক্ষেত, কারখানা প্রভৃতি যে সমস্ত জায়গায় ভারতীয় শ্রমিক কাজ করে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে সেই সমস্ত জায়গায় যাওয়ার অনুমতি না দিলে কোন ভারতীয় সলোমন কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিবে না।

পত্রের উপসংহারে বলা হইল যে, এই সমস্ত দাবি না মানিলে আবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইবে। ২৪শে ডিসেম্বর জেনারেল স্মাটসের উত্তর আসিল। তিনি সলোমন কমিশনে নূতন সদস্য গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। ভারতীয়গণ ১৯১৪ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে আবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

কিন্তু নূতন করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সরকার এবং ভারতীয়গণের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেল। ভারত সরকারের প্রতিনিধি মিঃ রবার্টসন এবং গোখলে কর্ত্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ভারতীয়দিগের বক্তব্য জেনারেল স্মাটস্ এবং সলোমন কমিশনের নিকট পেশ করিলেন। গান্ধী ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ইঁহাদিগকে সাহায্য করিলেন। এইভাবে সাপও মরিল, অথচ লাঠিও ভাঙ্গিল না। অর্থাৎ, ভারতীয়গণ কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিল না, কিন্তু তাহাদের যাহা বলিবার সমস্তই কমিশনকে জানানো হইল।

সলোমন কমিশন সত্যাগ্রহীদিগের সমস্ত দাবি মানিয়া লইবার সুপারিশ করিলেন। ১৯১৪ সনের 'ইণ্ডিয়ান রিলিফ এক্ট' এই সুপারিশেরই ফল। এই আইনে হিন্দু এবং ইসলামী মতে অনুষ্ঠিত বিবাহের বৈধতা স্বীকার করা হইল। তিন পাউণ্ড কর তুলিয়া দেওয়া হইল। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইল।

এই আইন পাস হইবার পর মহাত্মা গান্ধী এবং জেনারেল স্মাটসের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান হয়। গান্ধীজীর পত্রের উত্তরে স্মাটসের সেক্রেটারী মিঃ গর্গেস স্মাটসের পক্ষ হইতে গান্ধীজীকে জানাইলেন যে, নূতন আইনে ভারতীয়দের যে সমস্ত অভিযোগের উল্লেখ করা হয় নাই, সেগুলিও যথাসম্ভব দূর করা হইবে। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশাধিকার, তাঁহাদের দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কেপ প্রদেশে প্রবেশের অধিকার, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী যে সমস্ত ভারতীয়ের একাধিক ধর্ম্মপত্নী বিদ্যমান, তাঁহাদের পত্নীদিগের স্বামীর সহিত মিলিত হইবার অধিকার উল্লেখযোগ্য। পত্রের উপসংহারে মিঃ গর্গেস জানাইলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচলিত আইনগুলি ন্যায়সঙ্গত ভাবে এবং বিনিযুক্ত স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রয়োগ করা হইবে। মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক জেনারেল স্মাটসের নিকট লিখিত পত্র এবং জেনারেল স্মাটসের তরফ হইতে তাঁহার সেক্রেটারীর জবাব 'স্মাটস্-গান্ধী চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তির পর আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইল। গান্ধীজী ১৯১৪ সনের 'ইণ্ডিয়ান রিলিফ এক্ট' এবং 'স্মাটস-গান্ধী চুক্তিকে' দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের 'ম্যাগনা কার্টা' বা মহাসনদ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সুন্দরবন বদ্বীপের জমির পুনরুদ্ধার

শ্রীকুমুদভূষণ রায়

অবিভক্ত বাঙ্গলায়, কলিকাতা ও বরিশাল শহরের দক্ষিণে, সুন্দরবন বদ্বীপের আয়তন ৮০০০ বর্গমাইল (চিত্র নং ১)। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন ৩০০০ বর্গমাইল। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই অঞ্চলে ঘন বসতি ছিল এবং প্রচুর ফসল হইত। বহু প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন ইহার প্রমাণ-স্বরূপ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাসের (জন্ম নবদ্বীপ ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ) চৈতন্য ভাগবত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের (১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত চণ্ডী এবং নিমতার কৃষ্ণরামের (জন্ম ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) রায়মঙ্গল হইতে জানা যায় যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও সুন্দরবন সমৃদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, মুসলমান শাসন হইতে ইংরাজ শাসন পরিবর্ত্তনের সময় বিশৃঙ্খল অবস্থায়, পর্ত্তুগীজ ও মগ জলদস্যুর অত্যাচারে সুন্দরবন জনশূন্য হইয়া পড়ে। সংরক্ষণ এবং সংস্কার অভাবে বাঁধ ভাঙিয়া লোণা জলে বহু অঞ্চল প্লাবিত হয়।

ইংরাজ শাসনের সময়, জমির পুনরুদ্ধার কাজ আবার আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে ২২০১ মাইল লম্বা বাঁধের সাহায্যে ৭৫০০০০ একর বা ১১৭২ বর্গমাইল জমি আবাদে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি জমিদারী-প্রথা লোপ হইবার আগে পর্য্যন্ত প্রত্যেক জমিদারের উপর নিজ নিজ এলাকার বাঁধের তত্ত্বাবধান করিবার দায়িত্ব ছিল। প্রায়ই বহু স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিত। রন্ধ্রপথে লোণা জল ঢুকিয়া, অতর্কিতে জমি ও গ্রাম প্লাবিত করিত। গৃহস্থের মেটে ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িত। জমির ফসল ও ভাণ্ডারে সঞ্চিত শস্য নষ্ট হইত। পশুখাদ্য ও ঘাসের অভাবে, গৃহস্থ গৃহপালিত পশু বিক্রয় করিত। কাজকর্ম্মের অভাবে অধিবাসীরা প্লাবিত অঞ্চল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। চাষের অভাবে কেহ মৎস্য ধরিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, কিন্তু তাহার সামান্য আয় হইতে গ্রাসাচ্ছাদন কুলাইত না। প্লাবিত অঞ্চলের অধিবাসীরা দারিদ্র্যগ্রস্ত হইয়া পড়িত।

অনেকের মতে, জমিদারী প্রথা লোপের পর, সুন্দরবনের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। যদিও গত বৎসর ৩৮ লক্ষ ব্যয়িত এবং বর্ত্তমান বৎসর ৩৭ লক্ষ টাকা বাঁধ মেরামত প্রভৃতি কাজের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে, তবুও সরকারের জমিদার হিসাবে করণীয় কার্য্য সম্পাদনে উন্নতি লক্ষিত হয় নাই, এরূপ মত আরোপ করিতেছেন।

"Some of the landlord's duties, such as maintaining bunds, are alleged to have been little better served by the Government, though Rs. 38 lakhs were devoted to this purpase last year and Rs. 37 lakhs budgeted this year."—*Statesman,* August 30, 1956.

ভূমি রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী, ক্যানিং অঞ্চলের ১২ মাইল বাঁধ গত আগষ্ট মাসে পরিদর্শন করেন। রাজকোষে অর্থাভাব, সুন্দরবনের উন্নতির অন্যতম বাধা। এই অঞ্চলের বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা এবং বাঁধ সংরক্ষণের ব্যয় ১ কোটি টাকা (ষ্টেটসম্যান, আগষ্ট ২৫, ১৯৫৬)।

সুন্দরবনের ১৮২৮ বর্গমাইল বাঁধহীন প্লাবিত অঞ্চল

বাঁধ রক্ষিত সুন্দরবনের বর্ত্তমান অধিবাসী প্রায় সকলেই দারিদ্র্যগ্রস্ত। সুতরাং সুন্দরবনে, পূর্ব্ববঙ্গ আগত আশ্রয়-প্রার্থীর স্থান হইতে পারে না, এ বিশ্বাস স্বাভাবিক।

বহু স্থানে বাঁধ ভাঙিয়া যাওয়ায়, বাঁধ রক্ষিত ৭৫০০০০ একর জমির বিরাট অংশ লোণা জলে প্লাবিত। ভাঙা বাঁধগুলির মেরামত হইলে এবং বাঁধ সুচারুরূপে সংরক্ষিত হইলে, সম্পূর্ণ ৭৫০০০০ একর জমিতে আবাদ হইয়া বৎসরে ১৬ কোটি টাকা মূল্যের ফসল হইতে পারে। সুতরাং অধিবাসীদের উন্নতি সম্ভব।

সুন্দরবনের ৩০০০ বর্গমাইলের মধ্যে, ২২০১ মাইল লম্বা বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া ৭৫০০০০ একর বা ১১৭২ বর্গমাইল জমি সংরক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং এখনও ১৮২৮ বর্গমাইল অঞ্চল অরক্ষিত অবস্থায় আছে, যেখানে বাঁধ নির্ম্মাণ দ্বারা প্লাবিত অঞ্চলের উদ্ধার করিয়া, আবাদ হইতে পারে। অরক্ষিত অঞ্চলে জমি পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা স্থির করিবার পূর্ব্বে সুন্দরবন বদ্বীপ গঠন সম্পর্কিত তথ্য মনোযোগের সহিত বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সিন্ধু প্রভৃতি নদীপথে স্যাঙপো জলপ্রবাহ

তিব্বত ও ভারতবর্ষে, নদীপথের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিব্বতের মানচিত্রে দেখা যায়, স্যাঙপো নদীর অনেকগুলি শাখার (কী চু, যাহার তীরে লাসা নগর, নীয়াঙ চু, যাহার তীরে গীয়ানসে নগর, শ্যাঙ চু, সাক্যট্র্যাম চু, প্রভৃতির) প্রবাহ মূলনদীপ্রবাহের বিপরীতমুখী। এই অসাধারণ বিশেষত্বের জন্য একটি ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বপাকিস্থান ও হল্যাণ্ড
মাইল ১০ ০ ১০ ২০ ৩০ ৪০ মাইল
চিত্র নং ১
পশ্চিমবঙ্গের
সুন্দরবন
কলিকাতা
ক্যানিং
রূপনারায়ন
হুগলী
বঙ্গোপসাগর
পূর্ব পাকিস্থান
চিত্র নং ২
হল্যাণ্ড
উত্তর
সাগর
রাইন
লেক
রাইন
মিউজ
মিউজ
হল্যাণ্ড
চিত্র নং ৩। কুলগাছির প্লাবিত অঞ্চল
জনার্দ্দনপুর
নজরনগর
চণ্ডীহাট
হরিপুর
২০ বর্গ মাইল প্লাবিত অঞ্চল
কুলগাছি
উত্তর
কাশিপুর
মেহেরপুর
কুলগাছি
ভাঙ্গাবাঁধ
বাঁধ
বাঁধ
হারোয়া নদী
চিত্র নং ৪
নদীতে বাঁধাল
ভাঙন পাড়
শীতকালে
নদী গর্ভে
বালুচর
কক, খখ,
জোড়াজোড়া
বাঁধাল
চর
চর
ভাঙন পাড়
চিত্র নং ৫। অন্তঃপ্রবেশ্য চাল্নী
চিত্র নং ৬
বাঁধের ভাঙ্গামুখ বন্ধ
করণ-অন্তঃপ্রবেশ্য চাল্নী
হারোয়া নদী

যে, অনতিকাল পূর্ব্বে স্যাঙপো নদী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল।

বারার্ড ও হেডেন তাঁহাদের পুস্তকে—হিমালয় পর্ব্বত এবং তিব্বতের ভূগোল ও ভূবিদ্যা—লিখিয়াছেন যে, স্যাঙপোর জল কোন পথে হিমালয় অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত ছিল, তাহা বলা সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের বিবেচনায় স্যাঙপোর জল, সিন্ধু, শতদ্রু, গোগ্রা বা গণ্ডক নদীপথে সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল।

ভারতবর্ষ বা তিব্বতে, আধুনিক পদ্ধতিতে লিখিত ইতিহাস নাই। বহু প্রাচীন পুস্তকে, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদির উল্লেখ আছে, যাহাতে তৎকালীন প্রথানুসারে পৌরাণিক কাহিনীও মিশিয়া গিয়াছে।

তিব্বতীয় পুস্তকে—"পাগ-সাম জোন-জাঙ্গ" (Pag-sam-jon-zang, edited by Sarat Chandra Das)—তিব্বতের কতক অংশ জলপ্লাবিত ছিল, এরূপ উল্লেখ আছে। মানি-কুম-বুম বা মহিমান্বিত রাজার কাহিনীতে (Mani-Kum-Bum or the Grand King's Legend) উল্লেখ আছে যে, যেখানে লাসা শহর অবস্থিত, সেই অঞ্চল জলপ্লাবিত ছিল। কাঙ্গুর বা কাঞ্জুর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পদ্মসম্ভব মহাপ্রভুর ধর্ম্ম তিব্বতে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, ঐ অঞ্চল জলপ্লাবিত ছিল।

কামরূপের প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে—কালিকা পুরাণ—উল্লেখ আছে যে, তিব্বতে সমুদ্রসদৃশ হ্রদ ছিল যাহার নাম শান্তনুপুত্র কুণ্ড বা ব্রহ্মপুত্র কুণ্ড।

অতএব, প্রাচীন তিব্বতীয় ও ভারতীয় পুস্তক হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তিব্বতের অংশ বিশেষে সমুদ্রসদৃশ হ্রদ ছিল। মনে হয়, পশ্চিমে মানস সরোবর ও রাক্ষস হ্রদ হইতে পূর্ব্ব হিমালয়ের প্রান্ত পর্য্যন্ত এই হ্রদ বিস্তৃত এবং ইহার উত্তরে কৈলাশ ও নিয়েনচিন্তাঙ্গলা পর্ব্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণে লডক পর্ব্বতশ্রেণী ছিল।

নাঙ্গা পর্ব্বত শৃঙ্গের উত্তরে বুঞ্জি শহরের নিকটে, সিন্ধুনদ ১৭০০০ ফুট গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বারার্ড ও হেডেনের অভিমত, যে মাত্র সিন্ধুনদের পরিবাহ-ক্ষেত্র হইতে জলপ্রবাহ এরূপ গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করিতে পারিত না। তাঁহাদের আরও অভিমত শতদ্রু, কর্ণালী ও কালী গণ্ডক নদীর হিমালয়ের অপর পারে যে পরিবাহ ক্ষেত্র আছে, মাত্র তাহার জলপ্রবাহ দ্বারায় হিমালয়ের মধ্যে বিরাট এই সব গিরিখাত সৃষ্টি সম্ভব হইত না।

সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৈদিক যুগের প্রথমাবস্থায় স্যাঙপো হ্রদের জল সিন্ধুনদ পথে প্রবাহিত হইয়া আরব সাগরে পড়িত। স্যাঙপো হ্রদ ও সিন্ধু পরিবাহ-ক্ষেত্রের মিলিত জলপ্রবাহে সিন্ধুনদকে সমুদ্রবৎ দেখাইত, এজন্য বৈদিক কবিপ্রদত্ত সিন্ধু বা সমুদ্র নাম সার্থক হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের বর্ণনায় সরস্বতীকে বিরাট, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সীমাহীন জলপ্লাবক, পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত, এরূপ উল্লেখ আছে। সুতরাং খুবই সম্ভব, বৈদিক যুগের শেষভাগে স্যাঙপোর জল সরস্বতী নদীপথে আরব উপসাগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল।

পরবর্ত্তী যুগে কর্ণালী-গোগরা নদী দিয়া স্যাঙপোর জল গোগরা-গঙ্গা নদীপথে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হয়। পরে গণ্ডক-গঙ্গা নদীপথে স্যাঙপোর জল বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে, স্যাঙপোর জল ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী দিয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত আছে।

সুন্দরবন বদ্বীপ

বৈদিক যুগে স্যাঙপোর জল আরব উপসাগরে প্রবাহিত ছিল। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীপথে জল প্রবাহের পরিমাণ কম ছিল বলিয়া পলির পরিমাণও কম ছিল এবং সেজন্য গঙ্গা-মেঘনার মোহানায় বদ্বীপ গঠনও কম হইত। গঙ্গা নদীপথে স্যাঙপোর জল প্রবাহিত হইবার পর, পলির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ভাগীরথী ও তাহার শাখানদীর মোহানায় বঙ্গোপসাগরে বদ্বীপ গঠন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পশ্চিম সুন্দরবন অঞ্চল, বঙ্গোপসাগরে দক্ষিণ দিকে বহুদূর অগ্রসর হইতে থাকে। মনে হয়, সপ্তম শতাব্দী হইতে স্যাঙপোর জল ব্রহ্মপুত্র দিয়া মেঘনা নদীপথে বঙ্গোপসাগরে পড়ায়, পশ্চিম সুন্দরবন বদ্বীপ গঠনের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব সুন্দরবন বদ্বীপ গঠন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বদ্বীপ স্থলভাগের ক্রমশঃ অধোগমন

ভূজীবনের তৃতীয়ক যুগে সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলা হয়। প্রাকৃতিক শক্তি পর্ব্বতশ্রেণীকে চূর্ণ করে এবং ভগ্ন পাষাণ স্তূপ নদীর জলে পলিতে পরিণত হইয়া সমুদ্রে পড়ে। সুন্দরবনের বদ্বীপ এই প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইউরোপ মহাদেশে আলপস্ পর্ব্বতশ্রেণীও ভূজীবনের তৃতীয়ক যুগে সৃষ্টি হইয়াছিল, সেজন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া পরিগণিত হয়। আলপস্ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে ভগ্ন পাষাণ স্তূপ নদীর জলে পলিতে পরিণত হইয়া উত্তর সমুদ্রে নদীর মোহানায় পতিত হয়। এই পদ্ধতিতে হল্যাণ্ডের বদ্বীপের গঠন হইয়াছে ও হইতেছে।

পর্ব্বত হইতে ভগ্ন পাষাণস্তূপ নদীপথে অপসারিত হওয়ায়, পর্ব্বত ও অধিত্যকার নীচের ভূত্বকের উপরে ওজন ক্রমশঃ কমিতে থাকে। নদীর মোহানায় পলি জমা হইতে থাকায়, সমুদ্রতলে ভূত্বকের উপর ওজন ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। "আইসোস্ট্যাসি"র মূল সূত্র অনুসারে, ভার সমতা বজায় রাখিবার জন্য, পর্ব্বত ও অধিত্যকার উচ্চতা ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং বদ্বীপ ক্রমশঃ অধোগমন করিতেছে।

"Under the principle of isostasy or compensation, there is a slow movement of elevation in the hills and uplands, together with a slow movement of subsidence in the deltas."

হল্যাণ্ডে জলাজমি উদ্ধার

এল ডাডলি স্ট্যাম্পল প্রণীত 'বিশ্বজগৎ' পুস্তকের ৪৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে :

হল্যাণ্ড উড়িষ্যা হইতেও ক্ষুদ্র দেশ। রাইন ও মিউজ নদীর বদ্বীপ এবং উত্তরে সমুদ্রতীরবর্ত্তী জলাজমি ইহার প্রধান অংশ।

"Holland is a tiny country, smaller even than Orissa. It consists entirely of the *delta* of the Rhine and Meuse, with low coastlands to the north."

হল্যাণ্ডের ১২৮৫০ বর্গমাইল জমির এক-পঞ্চমাংশ সাগরাঙ্কের নীচে অবস্থিত। সমুদ্রতীরে বা নদীর পাড়ে বালিয়াড়ি কিংবা বাঁধ না থাকিলে, দেশের অর্দ্ধাংশ বা ৬৬০৩ বর্গমাইল, ঝড়ঝঞ্ঝার সময়, বন্যাপ্লাবিত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে হল্যাণ্ডে জলাজমি উদ্ধার ও জল নিকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ২২০০ বর্গমাইল জলাজমি উদ্ধার করা হইয়াছে। নিপুণভাবে উদ্ভাবিত পূর্ত্ত-কার্য্য দ্বারা এবং চলজ্জল বিজ্ঞানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া দেশের বিস্তৃত অঞ্চল আবাদ ও বাসোপযোগী হইয়াছে। ছয় শত বৎসর ধরিয়া বদ্বীপের নীচু ও জলাজমি উদ্ধার সত্ত্বেও হল্যাণ্ডের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি হ্রাস পায় নাই। নদীগুলির অবস্থা ভালই আছে এবং সমুদ্রগামী জাহাজ বহু শত মাইল নদীপথে যাতায়াত করিতেছে।

বদ্বীপ জলাজমি উদ্ধার-বিরুদ্ধ মনোভাব

বদ্বীপ জলাভূমি উদ্ধার-বিরুদ্ধ মনোভাব বাংলা দেশে এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমান। কোন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস গঙ্গা-বদ্বীপ-বিশেষজ্ঞ একমত হইয়া উপদেশ দিয়াছেন যে, সুন্দরবন বদ্বীপ জলাজমি উদ্ধারে বাধা বিঘ্ন আছে এবং ইহার ফলে সমস্ত দেশে ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা।

"Specialists on the Ganga Delta have unanimously advised against reclamation of land in the Sundarbans on grounds of limitations and the serious repercussion it would have on the future of the country as a whole."—*Statesman*, August 26, 1956.

সুতরাং স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে যে, এই মনোভাবের জন্যই কি বাঁধ ভাঙিয়া বহু জমি ও গ্রাম জলমগ্ন হইলেও বাঁধ মেরামতের কাজে উপেক্ষা প্রকাশ পায় এবং দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত অধিবাসীদের বহুকালব্যাপী কোলাহল এবং আন্দোলনের পর বাঁধ মেরামত করা হয়।

বাঁধ মেরামতের বিরাট খরচ

বিরাট খরচ, বাঁধ মেরামতে বিলম্বের অন্যতম কারণ। সুন্দরবন অঞ্চলের পূর্ত্তকার্য্য বিভাগীয় কর্ম্মচারী, বেষ্টনী বাঁধ নির্ম্মাণ, শাল বা বাঁশের খোঁটা মাটিতে পোঁতা, মাটি ভর্ত্তি চটের বস্তা বা ইট ভর্ত্তি লোহতারের জালের গোলক, ভাঙা বাঁধের নালায় ফেলা, এবং কখনও কখনও বোঝাই নৌকা ডোবানো, প্রভৃতি প্রচলিত যথাশাস্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ : ২৭শে আগষ্ট ১৯৫৩ তারিখে, হারোয়া নদীতে, কলিকাতার প্রায় ৩০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত কুল-গাছিতে, বাঁধ ভাঙিয়া ২০ মাইল জমি প্লাবিত হয় (চিত্র নং ৩)। পূর্ত্তকার্য্যবিভাগ সেপ্টেম্বর মাসে কাজ সুরু করেন। শালের খোঁটা পোঁতা হয় এবং মাটি-ভর্ত্তি চটের বস্তা ফেলা হয়। কোন ফল হয় না। তখন তিন মাইল লম্বা একটি বেষ্টনী বাঁধ এবং ভাঙা বাঁধের কাছাকাছি আর একটি ছোট বেষ্টনী বাঁধ করা হয়। মাটি-ভর্ত্তি চটের বস্তা বোঝাই সাতটি বড় নৌকা, ভাঙা বাঁধের নালার মধ্যে ডোবানো হয়। ভাঙা বাঁধের নালা বন্ধ হয়। কিন্তু কাজ শেষ করিবার পূর্ব্বেই, উঁচু জোয়ারের জল আসায়, আবার বাঁধ ভাঙিয়া যায়। ইহাতে লক্ষ টাকার উপর খরচ হয়। ১৯৫৪ সন নবেম্বর মাসে পুনরায় ভাঙা মেরামতের কাজ সুরু হয়। শাল ও বাঁশের খোঁটা আবার পোঁতা হয়, মাটি ভরতি চটের বস্তা আবার ফেলা হয়, এবং বেষ্টনী বাঁধ আবার তৈয়ার হয়। ২রা মার্চ্চ, ১৯৫৫ তারিখে বাঁধ মেরামত শেষ হয়। এবার বাঁধ মেরামতের খরচ হয় ৭ লক্ষ টাকা।

একটি মাত্র বাঁধ ভাঙা মেরামতে ৭ লক্ষ টাকার বেশী খরচ হইলে, সুন্দরবন বাঁধ সংরক্ষণের খরচ ১ কোটি টাকা লাগিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এ অঞ্চলের রাজস্ব বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং রাজকোষে অর্থাভাব স্বাভাবিক।

নদীর মহান্ শক্তির ব্যবহার

প্রশ্ন উঠিতে পারে, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগীয় কর্ম্মচারী, খোঁটা পোঁতা, মাটি-ভর্ত্তি চটের বস্তা ফেলা, বেষ্টনী বাঁধ তৈয়ার করা, ইত্যাদি প্রচলিত যথাশাস্ত্র পদ্ধতি, কেন বাঁধ ভাঙা মেরামতের জন্য ব্যবহার করেন? অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহারে কি অন্তরায় আছে?

বিভিন্ন পূর্ত্তকার্য্য বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে নিজ নিজ সংস্কারে আসক্তি, অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রধান প্রতিবন্ধক।

ভারতের বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে, সিবিল ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্র প্রায় একই রকমের শিক্ষা পাইয়া থাকেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেচ বিভাগ, রেল বিভাগ বা অন্য কোন বিভাগে শিক্ষান্তে তিনি যোগ দেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি নিজ নিজ বিভাগ অনুযায়ী যেন ভিন্ন ভিন্ন জাতিভুক্ত হইয়া পড়েন; যেমন উপনয়নের পর ব্রাহ্মণ দ্বিজাতিভুক্ত হইয়া থাকেন। দ্বিজাতিভুক্ত হইলেও, বেদ হয়ত তিনি কখনও পাঠ করেন নাই। তথাপিও তিনি নিজেকে শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে, সংস্কৃত হইতে বাংলার ঋগ্বেদ অনুবাদকারী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ব্রাহ্মণ নহেন। সেচ বিভাগীয় পূর্ত্তকর্ম্মচারী হয়ত নদী নিয়ন্ত্রণের কোন কাজ করিবার সুযোগ কখনও পান নাই; তবুও, রেলের সেতুর নিকট নদী নিয়ন্ত্রণ বা রেল-ষ্টীমার যান পরিবর্ত্তন ঘাট স্টেশনে নদী পর্য্যবেক্ষণে যাঁহার সমস্ত কর্ম্মজীবন কাটিয়াছে, এরূপ রেল ইঞ্জিনীয়ার অপেক্ষা, সেচ ইঞ্জিনীয়ার নদী নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নিজেকে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান করিয়া থাকেন। জল নিকাশ বা সেচ ও নদী নিয়ন্ত্রণ কি একই বিষয়বস্তু বা বিজ্ঞান?

জলস্রোতবেগ নদীকে মহান্ শক্তির অধিকারী করিয়াছে—ইহা রেল ইঞ্জিনীয়ারের অভিজ্ঞতা। জলস্রোতবেগের সামান্য বৃদ্ধিতে, নদীর পাড় ও নদীগর্ভের মাটি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গভীর নালার সৃষ্টি করে; আবার জলস্রোতবেগ সামান্য হ্রাস পাইলে, পলি পড়িয়া নদীর গভীর নালা মজিয়া যায়।

বাঁধাল

ষ্টীমার কোম্পানী, বাঁধাল দ্বারা নদীকে, তাহার মহান্ জলস্রোতবেগ শক্তিকে ব্যবহার করিতে সাহায্য করিয়া থাকেন। বাঁধালে মূলতঃ ধারাপরম্পরায়, জোড়ায় জোড়ায়, কেন্দ্রাভিসারী সরল রেখায়, খাড়া বাঁশ থাকে। (চিত্র নং ৪)

"Bandals consist essentially of a series of pairs of lines of vertical bamboos, each pair converging downstream."

প্রত্যেকটি বাঁশ নদীগর্ভে তিন-চার ফুট পোঁতা হয়। জলস্রোতবেগ মৃদু হইলে, চাটাই প্রভৃতি খাড়া বাঁশের সঙ্গে বাঁধা হয়। প্রতি জোড়া বাঁধালের মধ্য দিয়া জলস্রোতবেগ সামান্য বৃদ্ধি পায়; বাঁধাল ও নদীর পাড়ের মধ্য দিয়া জলস্রোতবেগ সামান্য হ্রাস পায়। জলস্রোতবেগ হ্রাস পাওয়ায়, বাঁধাল ও পাড়ের মধ্যে পলি পড়িয়া নদীগর্ভ ক্রমশঃ উঁচু হইতে থাকে এবং এই অংশের জলপ্রবাহের পরিমাণ কমিতে থাকায়, প্রতি জোড়া বাঁধালের মধ্য দিয়া জলপ্রবাহের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। ইহার ফলে জলস্রোতবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং জোড়া জোড়া বাঁধালের মধ্যের নদীগর্ভ ক্ষয়প্রাপ্ত ও জল গভীর হয়। এই পদ্ধতিতে চওড়া ও অগভীর নদীতে, গভীর নালা বজায় থাকে এবং ষ্টীমার চলাচলে বাধা থাকে না।

অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনি

নদীর জল বাড়িলে জলস্রোতবেগ বৃদ্ধি পায় এবং নদীগর্ভ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া খাড়া বাঁশের ভিত্তি অপসারিত করে, সুতরাং বাঁশগুলি পড়িয়া যায় এবং বাঁধাল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এজন্য বাঁধালের উন্নতিসাধনের প্রয়োজন হয়। অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনি জাতীয় বাঁধালের সুবিধা এই যে, নদীর জল ও জলস্রোতবেগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, চালুনি নদীগর্ভে স্থায়ী হইয়া থাকে। অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনি এক একটি দেখিতে কীলকাকৃতি, ইহার ভিত্তিভূমি চওড়া সমকোণী চতুর্ভুজ, দুই প্রান্ত ত্রিভুজ সামনে ও পিছনে সমান্তরাল চতুর্ভুজ। (চিত্র নং ৫)

"Each unit of 'Permeable Screen' consists of a wedge shaped structure, with a wide rectangular parallelogram base, the ends being triangles, while the front and back are parallelograms."

অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনি বাঁধালের ন্যায় নদীতে কাজ করে।

ভাঙা বাঁধের মেরামত

যেখানে বাঁধ ভাঙিয়াছে, সেখানে নদীর পাড়ের কিনারা দিয়া, অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনির একটি সারি, নদীগর্ভে যথাযোগ্য বিশিষ্ট রেখায় (properly laid alignment wilh straights joined by transition curves) বসান হইলে চালুনির সারি ও পাড়ের মধ্যে জলস্রোতবেগ হ্রাস পাইতে থাকে। জলস্রোতবেগ হ্রাসের ফলে নদীগর্ভে পলি পড়িয়া নূতন নদীর পাড় সৃষ্টি হইয়া বাঁধের ভাঙা মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে (চিত্র নং ৬)। ক্রমশঃ এই পলির উচ্চতা জলের উচ্চতার প্রায় সমান হইবে। এই নূতন পাড়ের উপরে মাটি ভরিয়া দিলে, ভাঙা বাঁধ মেরামত হইবে।

অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনির সারি নদীগর্ভে বসান এবং এক বৎসর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভাঙ্গা বাঁধ মেরামতের খরচ, প্রচলিত যথাশাস্ত্র খোঁটা পোঁতা বেষ্টনী বাঁধ—প্রভৃতি পদ্ধতির প্রচণ্ড খরচের তুলনায় অতি সামান্য। উদাহরণস্বরূপ কুলগাছির ভাঙ্গা বাঁধের জন্য ১৯৫৩-৫৫ সনের ৭ লক্ষ টাকা খরচের পরিবর্ত্তে, অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনিতে ১ লক্ষ টাকার বেশী খরচ হইত না।

অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনির ব্যবহারে, নদীকে তাহার জলস্রোত-বেগের মহান্ শক্তি ব্যবহারে সাহায্য করিলে, বাঁধ ভাঙ্গা মেরামত ও সংরক্ষণের খরচ, ১ কোটি টাকার পরিবর্ত্তে ১৪ লক্ষ টাকার মধ্যেই কুলাইবে। সুতরাং সুন্দরবনের বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্বেই বাঁধসংরক্ষণ সম্ভব হইবে। রাজ-কোষে অর্থাভাব হইবে না।

জোয়ার-ভাটার উচ্চতা বৃদ্ধি

নদীর প্রণালী ক্রমশঃ চওড়া ও অগভীর হওয়ার জন্য, সুন্দরবনের নদীতে জোয়ার-ভাটা জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ধাপার ৫ মাইল নিম্নে বামনঘাটায় বিদ্যাধরীর প্রণালী ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১৫০-২৫০ ফুট চওড়া ছিল; ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে চওড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫০ ফুট হয়। বামন-ঘাটার নিকট নদীর বাঁকে নদীগর্ভ সাগরাঙ্কের ৫৯ ফুট নীচে ছিল। অথচ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে পলি পড়িয়া নদীগর্ভ মজিয়া ৪৭ ফুট উঁচু হয় এবং সাগরাঙ্কের মাত্র ১২ ফুট নীচে থাকে। ক্যানিং-এর নিকট মাতলা নদীতে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জোয়ার জলের উচ্চতা সাগরাঙ্কের ৬·২৮ ফুট উপরে ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জোয়ার জলের উচ্চতা আরও ৬ ফুট বৃদ্ধি পায়।

সুন্দরবনের চওড়া ও অগভীর নদীতে ধারাপরম্পরায়, জোড়ায় জোড়ায় অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনির ব্যবহারে সংকীর্ণ ও গভীর, খালের মত, স্থায়ী নালার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পাইলে জোয়ার-ভাটার জলের উচ্চতাও কমিবে এবং বহু জলাজমির উদ্ধার হইবে। গভীর নদীতে সারা বৎসর নৌকাযোগে যাতায়াত সম্ভব হওয়ায় সুন্দরবনের অধিবাসীরা তাঁহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হয় এরূপ বাজারে অল্প খরচে ও সহজে লইয়া যাইতে পারিবেন। উপযুক্ত লাভ থাকিলে খাদ্য ফসল ফলনের বৃদ্ধি হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গাগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের পুনর্ব্বাসন

বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ৩০০০ বর্গমাইল সুন্দরবনে মাত্র ৭৫০০০০ বা ১১৭২ বর্গমাইল জমি ২২০১ মাইল বাঁধের সাহায্যে সংরক্ষিত হইয়াছে। বহু স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এবং বাঁধের ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণের জন্য, ৭৫০০০০ একর জমির বহু অংশে প্লাবিত অবস্থার হেতু ফসল হয় না। সুষ্ঠু পূর্ত্তকার্য্য এবং চলজ্জল বিজ্ঞানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে, সম্পূর্ণ ১১৭২ বর্গমাইল জমিতে বাৎসরিক ১৬ কোটি টাকার ফসলের ফলন হইয়া, সুন্দরবনের বর্ত্তমান অধিবাসীদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি হইবে।

সুন্দরবনের অবশিষ্ট ১৮২৮ বর্গমাইল জমি, যেখানে এখনও বাঁধ নির্ম্মাণ বা জমির পুনরুদ্ধারকার্য্য হয় নাই, সেখানে অল্পায়াসেই অন্ততঃ ১০০০ বর্গমাইল বা ৬৪০০০০ একর জলাজমি উদ্ধার করিয়া চাষ-আবাদ হইতে পারে। প্রত্যেক পরিবারকে যদি ৫ একর জমি বণ্টন করা হয়, তবে পূর্ব্ববঙ্গাগত ১২৮০০০ পরিবার, বা ৫০০০০০ আশ্রয়-প্রার্থীর পুনর্ব্বাসন বর্ত্তমান অব্যবহার্য্য সুন্দরবনের বাঁধবিহীন লবণাক্ত জলাজমিতে সম্ভব। এই ৫০০০০০ আশ্রয় প্রার্থী-দিগের পুনর্ব্বাসন সত্ত্বেও বর্ত্তমানে ১১৭২ বর্গমাইল বাঁধ-রক্ষিত সুন্দরবন অঞ্চলে যে অধিবাসীরা আছেন, তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইবে না।

শ্রীপঞ্চমী

শ্রীঅজিতকুমার বসুমল্লিক

নিতাই মাঝি লেখাপড়া শিখে নাই বটে, কিন্তু সারা জেলায় তাহার নামডাক, জেলার বাহিরেও সে সম্প্রতি দুই-চারি স্থান হইতে তাহার প্রতিভার স্বীকৃতি পাইয়াছে। মাঝি নিতাই, পটুয়ানিতাই হইয়াছিল, এখন মৃৎশিল্পী হইয়াছে। নিতাই শুধু ডোমপাড়ারই গর্ব্ব নহে, সারা মরাইতলা গ্রামের গর্ব্বস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রামের নাম মরাইতলা। সারা গ্রাম নাকি এককালে ধানের মরাইয়ে ভর্ত্তি থাকিত—সেই জন্যই গ্রামের এই নাম। গ্রাম বড়, বহু পাড়ায় বিভক্ত, গ্রামবাসী সকলেই প্রায় অল্প-বিস্তর সঙ্গতিপন্ন। এখনও গ্রামে পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ীতে বাড়ীতে সারবন্দী মরাই দেখা যায়। বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যস্থলে বহুদিনের পুরাতন গ্রাম মরাইতলা। আগে বাহিরের জগতের সহিত তাহার যোগাযোগ রক্ষা হইত কৌশিকী নদীর দ্বারা। কৌশিকীতে তখন জোয়ার-ভাটা খেলিত, পাল তুলিয়া বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিত জাহানাবাদে আর ত্রিবেণীতে। এখন নদী বুজিয়া খাল হইয়াছে, মরা সোঁতা বর্ষায় ভরিয়া উঠে, গ্রীষ্মে শুকাইয়া যায়। এখন বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে জেলাবোর্ডের মাটির রাস্তা, শীত-গ্রীষ্মে পথ ধুলায় অন্ধকার, বর্ষায় আর শরতে হয় কর্দ্দমাক্ত, পিচ্ছিল—অগম্য।

তবু গ্রামের উন্নতি হইয়াছে, সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে, দোলে ও রক্ষাকালী পূজায় মেলা বসে, স্কুল হইয়াছে, পোষ্ট আপিস বসিয়াছে, ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তারা ছোটখাটো একটা হাসপাতাল খুলিবারও চেষ্টা করিতেছেন। এই গ্রামেরই দক্ষিণ উপান্তবর্ত্তী ডোমপাড়ার বাসিন্দা স্বভাব-শিল্পী নিতাই মাঝি। গ্রামের ছোট বড় সকলেই নিতাইকে ভালবাসে, তাহার প্রশংসাও করে, তাহার মর্য্যাদা সম্পর্কে এখন সকলেই সজাগ—বৃদ্ধেরা সগর্ব্বে বলেন, "আমাদের নিতাই কারিগর," শিক্ষিত সম্প্রদায় বলে," মৃৎশিল্পী নিতাই মাঝি"—মেয়েমহলে বলে, "নিতাই পোটো"। এমনকি বিশ্বনিন্দুক হরি আচার্য্যও তাহার কোন কুৎসা করিতে না পারিয়া মনের দুঃখে বলে, "আরে দুর দুর, নিতাইটা কি মানুষ! হাসতে পর্য্যন্ত জানে না—খালি বসে বসে ভাবে আর কাদা চটকায়।"

কথাটা সত্য, নিতাই ভাবে আর কাদা চটকায়, আর সেই চটকানো কাদার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে অপূর্ব্ব মূর্ত্তিসমূহ, জীবজন্তু পাখী ফলফুল—আরও কত কি, সার্থক শিল্পসৃষ্টির নিত্য নূতন পরিচয়!

আগে পাইকাররা আসিয়া নিতাইয়ের তৈরী খেলনা বড় বড় ঝোড়ায় সাজাইয়া লইয়া যাইত নামমাত্র মূল্যে। এখন গদাই নাপিতকে দিয়া নিতাই গ্রামের ও আশপাশের মেলায় দোকান খোলায়—মাটির বদলে টাকা আসে, কিন্তু নিতাইয়ের মুখে হাসি আসে না।...

স্বদেশীবাবুরা যেদিন নিতাইয়ের তৈরী কয়েকটি মূর্ত্তি ও খেলনা লইয়া যান সেদিন মরাইতলার কেহ কল্পনাও করে নাই যে, নিতাইয়ের তৈরী 'গৌরনিতাই' মূর্ত্তি জেলা শহরের প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করিবে, সোনার মেডেল নিতাইয়ের গলায় স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবই ঝুলাইয়া দিবেন, খবরের কাগজে নিতাই মাঝির ফটো বাহির হইবে! কিন্তু নিতাইয়ের মনে সুখ নাই। নিতাই মাঝির সমস্ত সৃষ্টির, তাহার সমস্ত কলানৈপুণ্যের উৎস অন্তরের অন্তঃস্থলের এক সুগভীর বেদনার মধ্যে নিহিত, তাই তাহার অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে না।

নিতাই মাঝি পুতুল গড়ে, খেলনা গড়ে, পট আঁকে, সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি প্রস্তুত করে, কিন্তু কখনও প্রতিমা তৈরি করে নাই। প্রতিমা তৈরির প্রধান অন্তরায় তাহার জাতি, ডোমের তৈরী প্রতিমা পূজা করিবে কে! নিতাই মাঝি তাহা জানে আর জানে বলিয়াই সে কখনও প্রতিমা তৈরির স্পর্দ্ধা দেখায় নাই। সে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি গড়িয়াছে, কালীয়-দমন, নাড়ুগোপাল, গৌরনিতাই—কত মূর্ত্তি তৈরি করিয়াছে এমনকি মহাদেব, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, হরপার্ব্বতী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি গড়িয়াছে, লোকে কিনিয়াছে, ঘর সাজাইয়াছে সেই মূর্ত্তি দিয়া, বহু বাড়ীতেই কাঁচের ঝকঝকে আলমারিতে নিতাইয়ের হাতে-গড়া ঝকঝকে প্রাণবন্ত মূর্ত্তিসমূহ শোভা পায়, কিন্তু তা বলিয়া ডোমের হাতের তৈরী প্রতিমা কিছুতেই ত পূজা করা যায় না। অথচ সরস্বতী পূজার কয়েকদিন আগে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

গ্রামে টি টি পড়িয়া গেল যে নিতাই সরস্বতী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়াছে এবং হাইস্কুলে শ্রীপঞ্চমীর দিন ঐ প্রতিমার পূজা হইবে। গ্রামের সকলেই শুনিল, কিন্তু কথাটা বিশ্বাস-যোগ্য নহে বলিয়া অনেকে মাথা ঘামাইল না। কিন্তু

সামান্য বিষয় লইয়াও যাহারা ঘোঁট পাকাইতে পারিলে আর কিছু চাহে না সেই অতি-উৎসাহীর দল কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা প্রথমে ছাত্রমহল হইতে সংবাদ লইল, পরে গদাই নাপিতের নিকট হইতে পাকা খবর সংগ্রহ করিয়া একটা হৈ চৈ সুরু করিয়া দিল। গ্রামের প্রায় বারো আনা লোকই একমত হইল, ডোমের তৈরী প্রতিমা কিছুতেই পূজা হইতে পারে না; এ অনাচার বন্ধ করার জন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট গ্রামের দুই চারি জন মুরুব্বি পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় ব্রাহ্মণ-সন্তান, ইংরেজিতে এম এ পাস করিলেও শিখা এবং উপবীত ধারণ করেন, ত্রিসন্ধ্যা করেন, স্বপাক আহার করেন, কাহারও দান গ্রহণ করেন না—এক কথায় ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণই তাঁহাতে বর্তমান, সুতরাং তিনি যে এইরূপ একটা অনাচার কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না এ বিশ্বাস সকলের মনেই ছিল। মুরুব্বিদের বক্তব্য ধীর ভাবে শুনিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—প্রতিমা মাটির, মাটি কখনও অশুচি হয় না আর তাহা ছাড়া নিতাই প্রতিমা হিসাবে বিক্রয় করার জন্য গড়ে নাই. শিল্পী আপন মনের খেয়ালে তাহার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি উজাড় করিয়া দিয়া, তাহার সকল কলানৈপুণ্যকে নিঃশেষে বিকশিত করিয়া চতুঃষষ্ঠীকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়াছে, শাস্ত্রোক্ত দেবীর ধ্যানের সহিত প্রতিমার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য-বিধান করিয়াছে—ঐ প্রতিমা নিপুণ শিল্পীর তৈরী প্রতিমা মাত্র নহে, উহা ভক্ত সাধকের ধ্যানলব্ধ ধন।

গ্রামবাসীরা ছাত্রদের মুখে শুনিল প্রতিমাটি দেখিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় নিজেই উহা নিতাইয়ের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আসিয়াছেন, অর্থের বিনিময়ে নিতাই দিতে চাহে নাই, কিন্তু ভক্ত ও শিল্প-রসজ্ঞের আগ্রহ দেখিয়া সে তাঁহাকে বিমুখ করিতে পারে নাই। তখন তাহারা প্রায় সকলেই চুপ করিয়া গেল।

শ্রীপঞ্চমী। প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং পূজা করিয়াছেন। গ্রামের সমস্ত পল্লী হইতেই প্রায় সকল বাড়ীরই লোক আসিয়াছে। প্রসাদ বিতরণের সময় দেখা গেল নিতাই মাঝি আসে নাই। প্রতিমা লইয়া যে গোলযোগ হইয়াছিল তাহা সম্ভবতঃ তাহার কানে গিয়া থাকিবে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় কাহাকেও কিছু না বলিয়া ফলমূলাদি প্রসাদ লইয়া নিজেই নিতাইয়ের দোকানে চলিলেন। বেশীদূর যাইতে হইল না, দোকানের বাহিরে পথের পাশেই রোদ পোহাইতে পোহাইতেই প্রৌঢ় নিতাই মাঝি একটা পুতুলে রং করিতেছিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে দেখিয়া আভূমি আনত প্রণাম করিয়া বলিল, "মাষ্টার মশাই, আপনি এ-দিকে?" পূজার দিনে ডোমপাড়ায় মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া সে রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে মাটির সরাখানি নিতাইয়ের নিকট নামাইয়া দিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "তোমার জন্য মায়ের প্রসাদ এনেছি নিতাই"। নিতাই হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গেল, নিজের মনেই বার তিন-চার প্রসাদ কথাটা আওড়াইয়া লইল, তার পর অত্যন্ত কাতর স্বরে বলিল, "মায়ের প্রসাদ আর এ জন্মে পেলুম না মাষ্টার মশাই, দুটো কালির আঁচড়ও চিনতে পারলুম না"। নিরক্ষর নিতাই মাঝির সমস্ত বুকখানা যেন তীব্র বেদনায় সঙ্কুচিত করিয়া দিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

স্মিত হাস্যের সহিত মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "ভুল করো না নিতাই, কালির আঁচড়ের চেয়েও তুলির টান অনেক—অনেক বড়, মা অকৃপণ হাতেই তাই তোমাকে দিয়েছেন, তুমি মায়ের বরপুত্র নিতাই।"—নিতাই মাথা নীচু করিয়া প্রসাদের সরাটা হাতে লইয়া মাথায় ঠেকাইল।...

নিতাই সারা দিন ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। "বরপুত্র" কথাটা তাহাকে বার বার বহু দিনের পুরাতন, অনেক কথাই আজ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আপনার মনেই নিতাই নিম্ন কণ্ঠে 'বরপুত্র' কথাটা ইতিমধ্যে কয়েকবার আবৃত্তি করিয়াছে।...

তখন তাহার বাবা-মা জীবিত ছিলেন। বুড়া বয়সের ছেলে বলিয়া নিতাইয়ের আদরের অন্ত ছিল না। অথচ নিতাইয়ের জন্যই তাঁহাদের কত না লাঞ্ছনা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছে!

লাঞ্ছনার সুরু এমনই এক শীতের সকালে।...

"ঠাকুর মশাই"—ডাক দিয়া গোপাল মাঝি একটু থামিল। দূরে রাস্তার উপর হইতে বাড়ীর ভিতরে সে ডাক পৌঁছিল কিনা সন্দেহ। আবার ডাকিল, "ঠাকুর মশাই, বাড়ী আছেন?" এবারেও সঙ্কোচে তাহার গলাটা কাঁপিয়া উঠিল। চৌদ্দ পনের বছরের ছেলে নিতাই ততক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, বাবার হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়া বলিল, "জোরে ডাকবি তো!" ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া গোপাল অবাক হইয়া গেল, তাহার সারা মুখ যেন খুশিতে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, এ নিতাই যেন সে নিতাই নয়, আধঘুমন্ত টানা টানা চোখ দুটি যেন এক অপূর্ব্ব দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করিতেছে। গোপাল মাঝি এত বুঝিল কি না জানি না, কিন্তু ছেলের চেহারার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি তাহার চোখ এড়াইল না। গোপাল কেমন যেন হত-

স্তব্ধ হইয়া গেল; তাহার সম্বিৎ ফিরিল নিতাইয়ের অধীর কণ্ঠস্বরে, "বলি ডাকবি না হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবি!"

গোপাল বার দুই কাসিয়া গলাটা সাফ করিয়া লয়, তাহার পর গলাটা একটু চড়াইয়াই ডাক দেয়, "ঠাকুর মশাই, অ ঠাকুর মশাই, বলি বাড়ী আছেন"। অপ্রত্যাশিত ভাবেই সাড়া মিলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে সশরীরে বাহির হইয়া আসিলেন, হাতে নারায়ণশিলা।

রাস্তার উপরই লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া গোপাল সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানায়, বাবার দেখাদেখি ছেলেও সটান শুইয়া পড়ে। এই রকম একটা ব্যাপারের জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। গোপাল মাঝিকে গ্রামের সকলেই ভালবাসে, স্নেহ করে। ঐ রকম সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী নম্র ও সাধু প্রকৃতির লোক মাঝিপাড়ায় কেন সারা গ্রামে আছে কিনা সন্দেহ। খোদ জমিদার শান্তশিব চৌধুরী পর্য্যন্ত বলেন, 'ও শাপভ্রষ্ট, নইলে কি ডোমের ঘরে অমন ছেলে জন্মায়!' গোপাল মাঝিকে সাধারণ ডোম হিসাবে কেহ দেখে না, প্রশ্রয় সে অল্প-বিস্তর সকলের কাছেই পায়, কিন্তু তা বলিয়া সে বামুনপাড়ায় ঢুকিয়া একেবারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিবে এ শুধু ধারণার বাহিরে নয়, বিশ্বাসেরও বাহিরে। বাঁ হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় চোখ দুইটা একটু রগড়াইলেন। ততক্ষণ বাপ-ব্যাটা দু'জনেই প্রণাম সারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যতদূর সম্ভব রাগটা চাপিয়া রাখিয়া স্বাভাবিক ভাবেই বলিলেন, "কি রে সক্কালবেলায় একেবারে বামুনপাড়ার মাঝখানে এসে হানা দিয়েছিস বাপ-ব্যাটায়, ব্যাপার কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কণ্ঠস্বরের রুক্ষতা কিন্তু গোপালের কানে ধরা পড়িল, নিতাই বুঝিল কিনা বুঝা গেল না। গোপাল একেবারে কেঁচো হইয়া গেল। কথাটা বলি বলি করিয়াও তাহার মুখ ফোটে না। নিতাই বাপকে ধাক্কা দিয়া বলিল, "বল না!" ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার নিতাইয়ের দিকে তাকাইলেন, স্নান করিয়া একটি লালপেড়ে কোরা কাপড় পরিয়া আসিয়াছে, সদ্যভেজা চুলগুলি মাথার উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে, বাল্য ও কৈশোরের সন্ধি-স্থলে দাঁড়াইয়া শ্যামশ্রীতে উদ্ভাসিত এই ঋজুদেহ ছেলেটিকে কিছুতেই গোপালের ছেলে বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না—যেন কায়েত-বামুনের ঘরের ছেলে!

গোপালের কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চিন্তাধারায় ছেদ পড়িল। "নিতাই বলে নেকাপড়া শিকবে, বছরখানেক ধরে খালি এক কথা, তাই সবাই বললে তবে যা ভটচার্য্যি মশাইকে—" গোপালের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল, "কি লেখাপড়া শিখবে, এ্যাঁ।" যুগপৎ ক্রোধ ও বিস্ময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফাটিয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আকস্মিক চীৎকারে এবার শুধু গোপাল নহে নিতাইও ভড়কাইয়া গেল।

"দুর্গা, দুর্গা—সকাল বেলায় উঠেই মুখ দেখতে হ'ল, না জানি কি আছে বরাতে," এতক্ষণে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রচ্ছন্ন উষ্মা স্পষ্ট ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিল।

শীতের সকাল, তখনও রৌদ্র গ্রামের পথে সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই, গাছের মাথায় মাথায়, পাতায় পাতায় সবে সোনালি সূর্য্যকিরণ কেবল ঝিকমিক করিতে সুরু করিয়াছে। পথে লোকজনও ছিল না, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চীৎকারে দুই-চারিটি কৌতুহলী মুখ দেখা গেল এবং ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যস্থলে ডোম দেখিয়া তাঁহারা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন।

গোপাল আর লাঞ্ছনা না বাড়াইয়া নিতাইয়ের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বামুনপাড়া হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। সারা পথ বাপ-ব্যাটা দু'জনের কেহই কথা বলে নাই। তাহার পর বহুদিন ধরিয়া গোপালকে ও গোপালের স্ত্রীকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ শুনিতে হইয়াছে। কত রকমের কত কথা কত লোকেই না বলিয়াছে, সে সব নিতাই ভুলিয়া গিয়াছে, শুধু মনে আছে হাটে ঝুড়ি কিনিতে গিয়া নিতাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া গোপালকে হারু ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এ্যাঁ এই বুঝি তোর ছেলে, ডোমের ছেলে লেখা পড়া শিখবে, মা সরস্বতীর বরপুত্তুর হবে, বলি আস্পা মন্দ নয়!" তাহার পর কি নির্য্যাতনই না সুরু হইল, গোপালকে আর নিতাইকে দেখাইয়া সে কি হাসাহাসি। গোপাল সে হাটে আর ঝুড়ি চুবড়ি বিক্রয় করিতে পারিল না। বাড়ী ফেরার পথে বহুদূর পর্য্যন্ত কয়েকটা ছেলে "বরপুত্তুর, বরপুত্তুর" বলিয়া তাহাদের পিছনে হাততালি দিয়া চীৎকার করিয়াছিল। আজ মাষ্টার মহাশয়ের মুখে 'বরপুত্র' শব্দ অতীতের সেই বিষাদমলিন দিনকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।

নিতাইয়ের সম্বিৎ ফিরিল কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে গ্রামের ভিতর হইতে সন্ধ্যারতির বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে। নিতাই দুই হাত কপালে ছোঁয়াইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল—আকাশে শ্রীপঞ্চমীর চাঁদ হাসিতেছে।

কেদারনাথ হইতে বদ্রীনাথ

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

এবার বদ্রীনাথ দর্শন এবং কেদার হইতে বদ্রীযাত্রার পথের কথা উল্লেখ করিব। হিমালয়ের এই কঠিন পার্বত্য পথে তীর্থদর্শন-মানসে যাহারা বাহির হয়, তাহারা প্রায় সকলেই কেদারনাথ দর্শনান্তে বদ্রীনাথ দর্শন করিয়া এই পরিক্রমা শেষ করে। অবশ্য যাহাদের আরও শারীরিক কষ্ট সহ্য করা এবং আরও অধিক সময় ব্যয় করা সম্ভব হয় এই সঙ্গে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী তীর্থদ্বয় দেখিয়া তাহারা উত্তরাখণ্ডের তীর্থপরিক্রমা সম্পূর্ণ করে। কেদার ও বদ্রীনাথ পরিক্রমার পথে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, ত্রিযুগীনারায়ণ, গৌরীকুণ্ড, উখীমঠ, তুঙ্গনাথ, গোপেশ্বর, গরুড়গঙ্গা, যোশীমঠ, বিষ্ণুপ্রয়াগ পাণ্ডুকেশ্বর প্রভৃতি হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত তীর্থগুলিও এই সঙ্গে দেখা হয়।

কেদারনাথ পর্বতশিখর হইতে বদ্রীনাথের দূরত্ব সোজাসুজি খুব বেশী নয়; কেহ কেহ বলে মাত্র ছয় মাইল; আর পূর্বে একই পূজারী প্রত্যহ কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের পূজা করিত, কিন্তু সেই সোজা পথ আর না থাকায় এখন একশ' এক মাইল পথ ঘুরিয়া কেদার হইতে বদ্রীনাথ যাইতে হয়।

কেদার হইতে পূর্বোক্ত পথে আমরা গৌরীকুণ্ডে ফিরিয়া আসিলাম। পথ একটানা নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। উৎরাই পথে সাত মাইল অতিক্রম করিতে মাত্র দুই ঘণ্টার মত সময় লাগিল। তবে নামিবার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়, কারণ গড়ানে পথ দিয়া আস্তে হাঁটিয়া চলা সম্ভব হয় না, প্রায় দৌড়াইয়াই চলিতে হয়। চড়াই পথের তুলনায় উৎরাই পথে চলিবার ক্লান্তি অবশ্য অনেকাংশে কম, কিন্তু নামিবার সময় শরীরে অস্বাভাবিক ঝাঁকুনি লাগে আর একটু অসতর্ক হইলে পায়ে আঘাত লাগিবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

গৌরীকুণ্ড ও রামপুরচটীর মাঝে মূল পথ ছাড়িয়া তিন মাইল দূরে একটা পাহাড়ের উপর ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির অবস্থিত। গৌরীকুণ্ড হইতে উৎরাই পথে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ডান হাতের চড়াই পথ ধরিয়া আমরা ত্রিযুগীনারায়ণের দিকে চলিতে লাগিলাম। চড়াই পথে দুই মাইল চলিয়া শাকম্ভরী দেবীর মন্দির দর্শন হইল। কথিত আছে, দেবী এই স্থানে শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিয়াছিলেন। শাকম্ভরী মন্দির হইতে আরও প্রায় এক মাইল পথ চলিয়া আমরা যখন ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে পৌঁছিলাম তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মন্দিরে ধাতুনির্মিত নারায়ণ-মূর্তি দর্শন করিলাম। মন্দিরদ্বারের সম্মুখে একটি ধুনি প্রজ্বলিত রহিয়াছে দেখিলাম। প্রবাদ, এই ধুনি শিব-পার্বতীর বিবাহের ধুনি, ত্রিকাল ধরিয়া জ্বলিতেছে। যাত্রীরা ধুনি প্রদক্ষিণকালে এক এক খণ্ড কাষ্ঠ অগ্নিতে প্রদান করে। গঙ্গোত্রী যাইবার পথ এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।
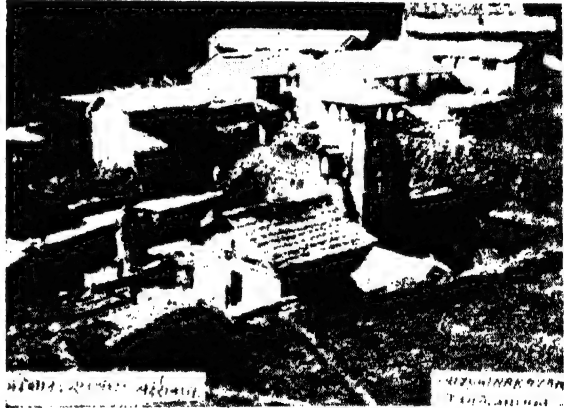
ত্রিযুগীনারায়ণ

ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শনান্তে আমরা আবার মূল পথে ফিরিয়া আসিলাম। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, গুপ্তকাশীর পর এক মাইল পথ আসিয়া নালাচটী অতিক্রম করিয়া আমরা কেদারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলাম। কেদারনাথ দর্শনান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া নালাচটী পর্যন্ত একই পথে আসিলাম। নালাচটী পার হইয়া বাম দিকের উৎরাই পথে মন্দাকিনীর সেতু অতিক্রম করিয়া এবার আমরা বদ্রীনাথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সেতু পার হইয়া চড়াই পথে

আরও প্রায় দুই মাইল চলিয়া সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা যে স্থানে পৌঁছিলাম তাহার নাম উখীমঠ।

বাসুদেব-পৌত্র অনিরুদ্ধ কর্তৃক বাণাসুর রাজকন্যা উষা হরণের যে কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, কথিত আছে, এই স্থানেই তাহা সংঘটিত হইয়াছিল। উষার নামানুসারে এই ক্ষেত্রের নাম হইয়াছে উষা বা উখীমঠ। শীতের ছয় মাস এখান হইতে কেদারনাথের পূজা নিবেদন করা হয়।

একরাত্রি উখীমঠে বাস করিয়া আমরা তুঙ্গনাথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তুঙ্গনাথ এই স্থান হইতে বার মাইল দূরে অবস্থিত আর এই বার মাইল পথের ভিতর আট মাইলই প্রাণান্তকর চড়াই। মাঝে কিঞ্চিদধিক ছয় মাইল পথ ঘন জঙ্গলে আবৃত। তিন বেলা হাঁটিয়া পরদিন বেলা আন্দাজ এগারটায় আমরা তুঙ্গনাথ পৌঁছিলাম। এখানে তুঙ্গনাথ মহাদেবের শিবলিঙ্গমূর্তি বিরাজমান। পর্বতচূড়ায় অবস্থিত এই মন্দির; উচ্চতা ১২,০০০ ফুটের উপর। কেদার-বদ্রী পরিক্রমায় তুঙ্গনাথই সর্বোচ্চ স্থান। স্থানটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা তবে তুষারাবৃত নহে। মন্দির-প্রাঙ্গণের নীচে একটা স্নানের কুণ্ড আছে, নাম আকাশগঙ্গা; কুণ্ডের জল হিমশীতল। তুঙ্গনাথ মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ পর্বতশ্রেণী একত্রে দৃষ্টিগোচর হয় আর এ নয়নাভিরাম দৃশ্য তুঙ্গনাথ ভিন্ন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

তুঙ্গনাথ

তুঙ্গনাথ হইতে অবতরণ করিয়া সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে মণ্ডলচটী নামে একটি ছোট চটীতে রাত্রিবাসের জন্য আমরা আশ্রয় লইলাম। অবতরণকালে প্রায় সম্পূর্ণ পথই গভীর বনের ভিতর দিয়া অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে। এইরূপ গভীর অরণ্য এই পরিক্রমায় আর আমরা পাই নাই।

মণ্ডলচটী ছাড়িয়া পাইলাম গোপেশ্বর। এখানে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। আর মন্দির-প্রাঙ্গণে একটা বিরাট-আকার ত্রিশূল আছে, তাহাতে দ্বাদশ শতাব্দীর রাজা অনেকমল্লের বিজয়-গৌরব বার্তা খোদিত-আছে।

গোপেশ্বর পার হইয়া বদ্রীনাথ গমনের মূল পথের সংযোগ-স্থল চামোলি আসিয়া পৌঁছিলাম। শ্রীনগর হইতে রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া পিপুলকুঠী পর্যন্ত যে বাস একটানা চলাচল করে তাহা এই পথ দিয়া যায়। পিপুলকুঠীর দূরত্ব এখান হইতে মাত্র এগার মাইল; আর এই পথটুকু বাসেই চলা সম্ভব হয়; অনাবশ্যক আর পায়ে চলিবার প্রয়োজন হয় না। বহু দিনের পথশ্রমের পর আজ আবার খানিকটা পথ বাসে চলা সম্ভব হইবে জানিতে পারিয়া যার পর নাই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, কিন্তু বাসের সংখ্যাল্পতা ও স্থানাভাবের জন্য আমাদের ভাগ্যে আর বাসে চড়া সম্ভব হইল না; শেষ পর্যন্ত হাঁটা-পথেই অগ্রসর হইতে হইল।

কেদারনাথের পথে রুদ্রপ্রয়াগে আমরা অলকানন্দাকে ছাড়িয়া মন্দাকিনীর অববাহিকা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিলাম; চামোলি পৌঁছিয়া আবার আমরা অলকানন্দার সহিত মিলিত হইলাম; আর বদ্রীনাথ পর্যন্ত অলকানন্দার অববাহিকা ধরিয়াই বরাবর চলিতে হইবে।

পিপুলকুঠীর পর আসিলাম গরুড়গঙ্গায়। বিষ্ণুর উদ্দেশে গরুড় এই স্থানে তপস্যা করেন, এখানে গরুড়েশ বিষ্ণুর মন্দির আছে। গরুড়গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিবার প্রথা আছে; শোনা যায় গরুড়গঙ্গায় একডুবে যদি কেহ নুড়ি-পাথর তুলিয়া আনিয়া ঘরে রাখিয়া দেয় তবে তাহার আর সর্পভয় থাকে না।

গরুড়গঙ্গার বার-তের মাইল পর আসিলাম যোশীমঠে। ভগবান শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্মঠ এই স্থানে অবস্থিত। মঠ প্রাঙ্গণে জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেব আছেন। এই কারণে এই স্থানকেও জ্যোতির্মঠ বলা হয়।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ বা বিদ্যা ও সাধন-কেন্দ্র স্থাপন করেন। পশ্চিমে দ্বারকায় সারদামঠ, পূর্বে পুরীধামে গোবর্ধন মঠ, দক্ষিণে রামেশ্বর তীর্থে শৃঙ্গেরী মঠ আর উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের ক্রোড়ে এই জ্যোতির্মঠ। এই চারি মঠের সন্ন্যাসিগণকেও তিনি চারিটি

ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন। শঙ্করাচার্যের এই বিধানানুসারে ভারতের দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় চারি মঠের সহিত সংযুক্ত হইল এবং মঠ অনুসারে তাঁহাদের উপাধিও ভিন্ন ভিন্ন হইল। যথা সারদামঠের সন্ন্যাসীদের উপাধি হইল তীর্থ ও আশ্রম, গোবর্ধন মঠের উপাধি বন ও অরণ্য, শৃঙ্গেরী মঠের অধীন সরস্বতী, ভারতী ও পুরী সম্প্রদায় আর জ্যোতির্মঠের অধীন গিরি, পর্বত ও সাগর সম্প্রদায়। ব্রহ্মচারীদের উপাধিও ভিন্ন ভিন্ন মঠের বিভিন্ন হইল, যথা সারদামঠে স্বরূপ, গোবধনমঠে প্রকাশ, শৃঙ্গেরীমঠে চৈতন্য ও জ্যোতির্মঠে আনন্দ; আচার্যের এই নামাকরণ অদ্যাবধি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভিতর প্রচলিত রহিয়াছে।

আচার্য আরও বিধান দিলেন যে, চারি বেদ এই চারি মঠে এক এক অংশে প্রাধান্য লাভ করিবে—সারদামঠে সামবেদ, গোবর্ধন মঠে ঋক্‌বেদ, শৃঙ্গেরী মঠে যজুর্বেদ ও জ্যোতির্মঠে অথর্ববেদ। সুতরাং "তত্ত্বমসি" "প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" এবং "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই চারি মহাবাক্য যথাক্রমে চারি মঠের অবলম্বন হইল।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবসানে সনাতন বেদান্ত ধর্ম প্রচারকালে শঙ্করাচার্য এই জ্যোতির্মঠ প্রতিষ্ঠা করেন ও এই স্থানে বহুদিন অবস্থান এবং তপস্যা করেন। বস্তুতঃ উত্তরাখণ্ডের সমস্ত তীর্থক্ষেত্র তিনি পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি ভারতে বেদান্ত-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। জ্যোতির্মঠ ছাড়া এখানে নৃসিংহ মন্দির ও দুর্গার মন্দির আছে। শীতের ছয় মাস এ স্থানেই বদ্রীনাথের পূজা হয়।

যোশীমঠের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম; দূরে চিরতুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী এখান হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। আর শীতের প্রথম স্পর্শ এ পথে এখানেই অনুভূত হয়। যোশীমঠ অতিক্রম করিয়া প্রায় দুই মাইল উৎরাই পথে আসিয়া পাইলাম বিষ্ণুপ্রয়াগ। অলকানন্দা ও ধবলীগঙ্গার সঙ্গমক্ষেত্র। সঙ্গম ঘাটের উপর বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। জনপ্রবাদ এই—বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া নারদমুনি এইস্থানে সর্বজ্ঞ হইবার বর লাভ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপ্রয়াগে অপেক্ষা না করিয়া আমরা যোশীমঠের পর আসিলাম পাণ্ডুকেশ্বরে। এখান হইতে বদ্রীনাথ আর এক দিনের পথ।

মৃগরূপী শাপগ্রস্ত পাণ্ডুরাজা এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন তাই এই ক্ষেত্রের নাম পাণ্ডুকেশ্বর। এখানে যোগবদরীর মন্দির আছে। শোনা যায়, স্বর্গারোহণকালে পঞ্চপাণ্ডব এই স্থানে একটা পাহাড়ে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

পাণ্ডুকেশ্বরে এক রাত্রি যাপন করিয়া আমরা আমাদের মুখ্য ও শেষ গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে বাহির হইলাম। মধ্যাহ্নে পথের শেষ আশ্রয়স্থল হনুমানচটী অতিক্রম করিয়া চড়াই পথে বদরিকাশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হনুমানচটী হইতে বদ্রীনাথের দূরত্ব যদিও মাত্র পাঁচ মাইল, কিন্তু এ পথটুকু সম্পূর্ণই চড়াই। আজ আবার তুষাররাজ্যের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলাম। পথও চলিয়াছে একটানা উপরের দিকে। পাহাড়ের গা বাহিয়া বরফ আসিয়া স্থানে স্থানে চলার পথ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। নীচে তুষারাচ্ছন্ন অলকানন্দা। স্থানে স্থানে নদীবক্ষ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে আর তাহার তলদেশ দিয়া প্রবল স্রোত চলিয়াছে। আকাশ ঘন তমসাবৃত হইয়া রহিয়াছে, কনকনে হাওয়া বহিতেছে আর মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভিতর দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে ও অস্বাভাবিক শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা বহু আকাঙ্ক্ষিত বদ্রীনাথ পুরীতে প্রবেশ করিলাম। পুরীতে প্রবেশ করিতে যখন আর মাত্র সামান্য পথ বাকি তখন একটা পাহাড়ের বাঁক ঘুরিতেই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল বদরিকাশ্রমের ক্ষুদ্র শহর ও মন্দিরচূড়া। বদ্রীনারায়ণের পুণ্যপীঠ, ভূবৈকুণ্ঠ নয়নগোচর হইতেই যাত্রীদল আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। আজ তাহাদের সমস্ত কষ্টের অবসান হইল; যাত্রা সার্থক হইল, মহাপুণ্য ফলে বদ্রীনারায়ণের শ্রীচরণপ্রান্তে আজ উপনীত,
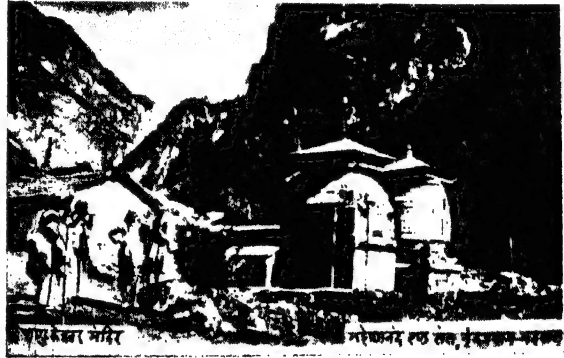
পাণ্ডুকেশ্বর মন্দির

সকল যাত্রীর মনেই আজ এই ভাব। ক্রমে আমরা আরও নিকটে আসিয়া পড়িলাম ; একটা কাঠের সেতু অতিক্রম করিয়া পুণ্যভূমি স্পর্শ করিলাম।

বদ্রীনাথধাম

পৌঁছিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া বদ্রীনাথ দর্শন-মানসে মন্দিরের উদ্দেশে চলিলাম। সোজা পথ চলিয়াছে মন্দিরদ্বার পর্যন্ত। পথের দুই ধারে সারি সারি নানা দ্রব্যের দোকান। শহরটি ছোট কিন্তু সুরক্ষিত ; উচ্চ পর্বত চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশে আধুনিক সভ্যতার প্রথম নিদর্শন হিসাবে পথের দুই ধারে সারি সারি বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে।

পথ হইতে মন্দির-প্রাঙ্গণ অনেকটা উচ্চভূমিতে অবস্থিত, অনেকগুলি সোপান উঠিয়া সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে পৌঁছিলাম। কেদার-মন্দিরের ন্যায় এ মন্দিরও দুই ভাগে বিভক্ত, মূল মন্দির ও নাটমন্দির। মন্দির অভ্যন্তরে নারায়ণের ধ্যানমূর্তি ; তাঁহার দুই পাশে অন্যান্য দেবতাগণ, যেন সভা করিয়া বিরাজমান।

মন্দির অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক আলো নাই ; একটি ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। শ্রীঅঙ্গ নানা বেশভূষায় আবৃত, শুধু মুখ-মণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয়। মূর্তিটি কৃষ্ণবর্ণ ও বহু প্রাচীন। কথিত আছে, উত্তরাখণ্ডের তীর্থপর্যটনকালে শঙ্করাচার্য যখন বদ্রীনাথ মন্দিরে দেবদর্শন মানসে শুভাগমন করেন তখন তিনি দেখিলেন মন্দিরে বিগ্রহ নাই, তৎপরিবর্তে শালগ্রাম শিলা অর্চনা হইতেছে। স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে প্রশ্ন করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন—চীন দেশ হইতে অভি-যানের ভয়ে তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা অদূরে কোন এক কুণ্ড-মধ্যে বিগ্রহটি রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে কেহ আর তাহা উদ্ধার করিতে পারে নাই। এই কথা শ্রবণান্তে শঙ্করাচার্য স্বয়ং নারদকুণ্ডে অবতরণ করিয়া প্রস্তর-ফলকে পদ্মাসনবদ্ধ চতুর্বাহু বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করেন ও স্বয়ং স্কন্ধে করিয়া মন্দির মধ্যে আনয়ন করণান্তর বদ্রীনাথজীর পূজা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির-নিম্নেই অলকানন্দা প্রবাহিত ; ইহার পুণ্য তটে ব্রহ্মকপাল, যাত্রীরা এই স্থানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড দান করে। অলকানন্দা ও মন্দির-প্রাঙ্গণের মাঝে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ থাকায় এই হিমরাজ্যে যাত্রীদের স্নান করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। বদরিকা-শ্রমের উচ্চতা ১০,৫০০ ফুট ; ঠাণ্ডাও কেদার অপেক্ষা অনেক কম।

বহু সময় মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থান করিয়া অধিক রাত্রে চটীতে ফিরিয়া আসিলাম। ক্লান্ত যাত্রী দল সন্ধ্যা সমাগমেই চটীতে ফিরিয়া বিশ্রাম
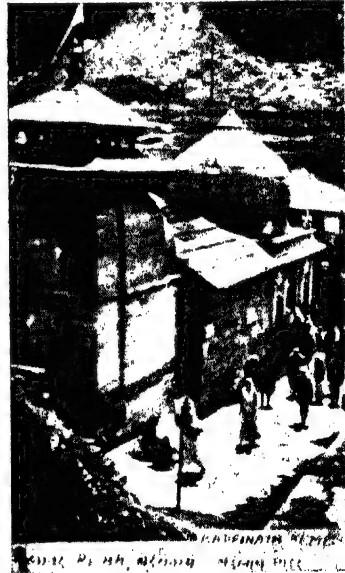
বদ্রীনাথ মন্দির

করিতেছে। নৈশ ভোজনান্তে আমিও শয্যাগ্রহণ করিলাম ; সুদীর্ঘ পথশ্রমে দেহমন আজ অবসন্ন। গভীর রাত্রিতে ঠাণ্ডাটা অধিক অনুভূত হওয়াতে নিদ্রা ভাঙিয়া গেল ; একবার ঘরের বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম—কি অপূর্ব দৃশ্য! চন্দ্রালোকে দিগন্ত উদ্ভাসিত,

চিরতুষারাবৃত পর্বতশিখর অপরূপ রূপলাবণ্যে মণ্ডিত। একটা বিরাট নিস্তব্ধতা দিগন্ত ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে আর নিম্নে স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিতা ধাবমানা অলকানন্দার নিরবচ্ছিন্ন গর্জন। সত্যই কি আজ কবিকল্পিত স্বপ্নপুরীতে আসিয়া উপনীত হইলাম!

কত যুগযুগান্তরের চিরপবিত্র এই তীর্থ, মহাভারতের যুগে পাণ্ডবেরা এই মহাতীর্থ অতিক্রম করিয়া মহাপ্রস্থানের পথে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর কত যুগ গত হইয়াছে, কে তাহার সঠিক পরিমাপ করিবে; কিন্তু এই ব্যবধান আজ সব মুছিয়া যাইতেছে। সেই পুণ্যভূমি, চিরনবীন। স্ব-মহিমায় আজিও মহিমান্বিত এই বদরিকাশ্রম, কত ঋষি যোগী মহাত্মার পূত পাদস্পর্শে ইহার ধূলিকণা চিরপবিত্র। কি অপূর্ব আকর্ষণ সৃষ্টি করিতেছে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষের অন্তরে এই তীর্থরাজ "বদরিকাশ্রম"।

ভূমি-বণ্টন ও জাতির উন্নতি

শ্রীঅজিতকুমার বসু

২

চাষীর হাতে জমি বিলির নীতি গৃহীত বা ঘোষিত হয়েছে বটে, কিন্তু সেই নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলার উপযোগী কার্য্যক্রম গৃহীত হয় নি। শুধু কার্য্যক্রম স্থির হয় নি, তা-ই নয়, বহু অন্তরায়ও সৃষ্টি করা হচ্ছে।

প্রথমতঃ, আজকাল একটা রব উঠেছে। সকলেই বলতে আরম্ভ করেছেন, বাংলায় জমি কৈ যে বিলি করা হবে? দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্ব যাঁদের হাতে অর্পিত হয়েছে, তাঁরাই একথা তুলেছেন। সম্প্রতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন, পরিবারপ্রতি যে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমি ধার্য্য করা হয়েছে, তা বাদে মাত্র চার লক্ষ একর, বা, সমস্ত জমির মাত্র তিন শতাংশ, বিলি করার জন্য বাড়তি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, বাকী ৯৭ ভাগ, তাঁদের মতে প্রায় সুষম ভাগে চাষীদের হাতেই বন্টিত হয়ে আছে— বাংলায় মুষ্টিমেয় অকৃষকদের হাতে বহু জমি পুঞ্জীভূত হয়ে নেই।

কিন্তু ১৯৫১ সনের গণনায় হিসাব তা বলে না। এই হিসাব অনুসারে 'কৃষিজীবী'দের শতকরা ৭০'৭ ভাগ বা মোট ১২,৮৯,৭৬৪টি "কৃষক" ও ২,৬৫,৬২২টি "অকৃষক" পরিবারের হাতে সমগ্র জমির শতকরা মাত্র ২৬'৮ ভাগ বা মোট ৩৪,৩০,০৮৯ একর এবং পরিবারপ্রতি এক-আধ বিঘা থেকে ১৫ বিঘা বা পাঁচ একর পর্য্যন্ত জমি আছে। পাঁচ একরের বেশী ও দশ একরের মধ্যে এবং গড়ে মোট ৩৩,৫০,৭৬৭ একর শতকরা ২৬ ভাগ জমি আছে ২০'৩ শতাংশ কৃষিজীবী বা ১,১৬,১৬০টি "অকৃষক"ও ৩,৩০,৬০১টি "কৃষক" পরিবারের হাতে। দশ একরের বেশী ও পনর একরের মধ্যে এবং গড়ে মোট ১০,৪৫,৩৮৭ একর শতকরা আট ভাগ কৃষিজীবী বা ২৫,৯২৬টি "অকৃষক" ও ৫৭,৭০৫টি "কৃষক" পরিবারের হাতে। পনের একরের বেশী এবং কুড়ি একরের মধ্যে এবং গড়ে মোট ৮,৪৭,৩১৫ একর (প্রায় শতকরা সাত ভাগ) শতকরা ২'২ ভাগ কৃষিজীবী বা মোট ১৭,৪৩১টি "অকৃষক" ও ৩০,৯৮৭টি "কৃষক" পরিবারের হাতে আছে। শতকরা ১'২ ভাগের বা মোট ১০,৮২৮টি "অকৃষক" ১৫,৫৮১টি "কৃষক" পরিবারের হাতে আছে কুড়ি একরের বেশী ও পঁচিশ একরের মধ্যে এবং মোট গড়ে ৫,৯৪,২০২ একর বা শতকরা ৪'৬ ভাগ জমি। শতকরা ১'৮ ভাগ বা মোট ২২,৭৭৮টি "অকৃষক" ও ১৬,৮৩৬টি "কৃষক" পরিবারের হাতে আছে পঁচিশ একরের বেশী এবং মোট শতকরা ২৮ ভাগ বা ৩৫,৯২,২৪০ একর জমি। কাজেই মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বহু জমি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

দ্বিতীয় বাধা "কৃষক", "কৃষিজীবী", "কৃষিনির্ভর" প্রভৃতির সংজ্ঞা। প্রস্তাবিত ভূমি-সংস্কার আইনের সংজ্ঞায় যারা "প্রকৃত কৃষক" (Bonafide cultivator), তাদের জন্য কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা হয় নি; যত খুশি জমি রাখার অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে। সরকারের মতে এদেরই হাতে বাকী উদ্বৃত্ত জমি আছে। ৩৩ একর সর্ব্বোচ্চ ধরেও বার লক্ষ একর যদি শেষোক্ত এই অকৃষকদের হাতে থাকে, তা হলে, তাদের মোট আছে বড়জোর দশ কি এগার লক্ষ একর। তা হলে অন্ততঃ পঁচিশ লক্ষ একর আছে শেষোক্ত প্রকৃত কৃষকদের হাতে। অর্থাৎ, পরিবারপ্রতি ১৪৮ একর। একথা ঠিক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ "প্রকৃত কৃষক"দের হাতে কম জমি আছে এবং "অকৃষক"দের হাতেই আছে বেশী জমি। আর, তা ঠিক হলেও, এত অধিক জমি এক হাতে রাখা ন্যায়সঙ্গত নয় বলেই স্বীকৃত হয়েছে।

চাষীর হাতে জমি দেওয়ার কথা যে পরিপ্রেক্ষিতে উঠেছে, সে ক্ষেত্রে চাষী বলতে নিজ হাতে লাঙ্গল কোদাল চালিয়ে এবং উৎপাদনের বিভিন্ন কাজে সরাসরি শারীর-শ্রম নিয়োগ করে যারা ফসল ফলায় তাদেরই বোঝায়। কেননা, এদের সংখ্যাও যেমন অনেক বেশী, আর্থিক অবস্থাও তেমনই অতি নিদারুণ। এদেরই জীবিকার

মান উন্নত করার জন্যই জমি বিলির অপরিহার্য্যতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনের সংজ্ঞায় এই মূল উদ্দেশ্যটাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ প্রস্তাবে যে যত বড় ধনী এবং প্রবল, সে-ই তত বড় চাষী, এমনকি রাজা, মহারাজারাও, বড় চাকরে বড় ব্যবসায়ীরাও। লাঙলে হাত দিলে যারা সমাজে পতিত হয়, তারাও সরকারী সংজ্ঞায় প্রকৃত কৃষক। এদেরই যত খুশি জমি রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে। নিজ হাতে চাষ যারা করে সেই সব চাষীরাও সরকারের মতে প্রকৃত কৃষক বটে। কিন্তু এদের মোট সংখ্যার শতকরা আশী ভাগই, বা সমস্ত "কৃষিনির্ভর" পরিবারের শতকরা ৬৮ ভাগ, হয় ভূমিহীন, নয় ত সামান্য জমির অধিকারী। সুতরাং, "প্রকৃত কৃষকে"র আখ্যায় এদের ভূষিত করা হলেও, কার্য্যতঃ আইনের সমস্ত সুযোগ পাবার অধিকারী হ'ল তারাই, যারা চাষী নয়, যারা কৃষির কাজে শ্রম-নিয়োগে বিমুখ ও অক্ষম।

শুধু তাই নয়। প্রস্তাবিত আইন বলবৎ হবার পরও শারীর-শ্রমে অক্ষম ও বিমুখ এই সব লোকদের মধ্যে যাদের একশত বিঘার কম আছে, বা থাকবে তারা একশত বিঘা পর্য্যন্ত জমি বাড়াতে পারবে। প্রকৃত চাষীদের সে অধিকার থাকলেও কার্য্যতঃ তারা তা পারবে না। কেননা, তাদের ৮০ ভাগ লোকই ত এমন অবস্থায় আছে বা থাকবে যে, তাদের জমি কেনা ত দূরের কথা, বিক্রিই করতে হবে, যেমন আবহমানকাল ধরে হয়ে আসছে। তা ছাড়া, প্রকৃত চাষীরা ততটুকু জমিই সাধারণতঃ রাখে যতটুকুতে নিজেরা গায়ে-গতরে খেটে ফসল ফলাতে পারে। আইন বলবৎ হবার পর হালচাষী ও কৃষি-শ্রমিক ছাড়া আর কেউই জমি কিনতে পারবে না, অন্ততঃ এইটুকু যদি বিধিবদ্ধ হ'ত, তা হলেও মন্দের ভাল হ'ত। তা হলে জমির দাম কম হ'ত এবং চাষীরা কিছু কিছু কিনতেও হয়ত বা পারত। আবার এই সব গরীব চাষীদের ভরণপোষণযোগ্য পাঁচ একর পুরিয়ে দিতে যেখানে দরকার ৩৬,৩৭,৫৬০ একর, (রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন ৩০ লক্ষ একর) সেখানে বলা হচ্ছে—পাওয়া যাবে মাত্র চার লক্ষ একর। তাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কারণ, বর্ত্তমান আইন মালিকদের সপক্ষে। বর্ত্তমান জরীপে তারা সবাই নির্ব্বিঘ্নে নিজেদের "কৃষক" বলে লিপিবদ্ধ করাচ্ছে। আর, উপরোক্ত পরিমাণ জমি পাওয়া গেলেও তা কি ভাবে এবং কাদের বিলি করা হবে, তার কোন ব্যবস্থাই হয় নি। হতভাগ্য ক্ষেত-মজুররা ত এ আইনের আওতাতেই পড়ে না—তাদের জন্য কিছুই করা হবে না। সুতরাং, ধনীকে আরও ধনী, অচাষীকে চাষী এবং ভূম্যধিকারী এবং চাষী-মালিককে ভূমিহীন ও ভাগ-চাষী এবং গরীবকে আরও গরীব করার নীতি ও পদ্ধতি সমভাবেই বলবৎ থাকবে। এ ব্যবস্থায় আর যাই হোক এবং যত মহৎ উদ্দেশ্যই এতে নিহিত থাকুক, "সমাজতান্ত্রিক ধরনের" ব্যবস্থা যে এ নয়, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। এ ত গেল কৃষকের সংজ্ঞা সম্পর্কিত ত্রুটি। এ ত্রুটি মূলগত। এই ত্রুটির ফলেই যত গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া আরও ত্রুটি আছে অনেক।

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী "সমাজতান্ত্রিক ধরনের" কৃষি-ব্যবস্থায় ইমারতের উপরতলার নক্সা নিয়ে সবার আগে পাকা ছাদ ঢালাইয়ের তোড়জোড় শেষ করে ফেলেছেন। তার ফলেই বনিয়াদ কিন্তু ফাঁকা রয়ে গেছে—চাষীর ভাগ্যে কিছুই জুটছে না। সমস্যা যখন গুরুতর এবং দেশ ও জাতির স্বার্থেই যখন তার সমাধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত, তখন চাষী ও ভূমিহীনদের দরকারমতই সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ধার্য্য করা দরকার। তা হলে কৃষকদের সংজ্ঞায় গোলযোগ থাকলেও সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য হ'ত না।

জমি নেই, একথা ঠিক নয়। আর তা ঠিক হলে বনিয়াদটাই ত আরও আগেই ঠিক করতে হবে। জমি বেশী থাকলে না হয় আপাততঃ উপরের পরিমাণ বেশী রাখলেও ক্ষতি ছিল না। আবার, যদি ভূমিহীন ও গরীব চাষীর সংখ্যা কম হ'ত এবং মালিকদের সংখ্যা বেশী হ'ত, তা হলেও না হয় অবস্থার খাতিরে আপাততঃ ভূমিবণ্টনের কথা চেপে গেলেও সামগ্রিকভাবে কোন বিশেষ ক্ষতি হ'ত না। আর তা হলে চাষী ও ক্ষেত-মজুরদের অবস্থা এত শোচনীয়ও হ'ত না; তাদের কদর থাকত। কিন্তু তাও যে নয়, সে হিসাব আগেই দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, "ইকনমিক হোল্ডিং"-এর মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গীর গলদ আছে এবং "পরিবারপ্রতি" পরিমাণ ধার্য্য করার ফলে (মাথাপ্রতি ধরলে হিসাবে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়) হাঁড়ি ভাগ করে হিসাবে ফাঁকি দেওয়া যাবে বা যাচ্ছে।

স্বেচ্ছামূলক শ্রম-দানের দ্বারাই যে এই গরীব দেশের উন্নয়ন-কার্য্য দ্রুততর ও সুষ্ঠু হতে পারে, একথা সকলেই স্বীকার করেছেন। গরীব চাষী আর ক্ষেত-মজুররাই সে শ্রম-দান করতে পারে, আর কেউ নয়। ভরণপোষণযোগ্য পরিমাণ আপাততঃ না হলেও তাদের চলবে। "ইকনমিক হোল্ডিং" তাদের কাছে বড় কথা নয়। বড় হ'ল তাদের আস্থা আর ভবিষ্যতের স্বপ্নসৌধ রচনার বাস্তব অবলম্বন। যে স্বপ্ন তাকে কর্ম্মসমুদ্রে, গড়ার কাজে ঝাঁপ দেবার অপার সাহস দেবে। দেখা দরকার কত বেশী লোককে সন্তুষ্ট করা যায়। হিসাব করলেই বোঝা যাবে তা দুঃসাধ্য নয়। তাদের জন্য আপাততঃ যাদের কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, তাদের সংখ্যাও অতি নগণ্য।

সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ২০ একর ধার্য্য করলে ২৮,৬৫,৯৮২ একর জমি পাওয়া যাবে। ৬ লক্ষ ভূমিহীনদের ২ একর করে এবং ২ একরের কম জমির মালিক গরীব ৬,৩৭,৮০০ চাষীদের ২ একর পুরিয়ে দিতে মোট লাগবে ১৮,১০,৯৯৪ একর। সুতরাং আরও ১০,৫৪,৯৮৮ একর জমি অবশিষ্ট গরীব চাষীদের (৬,৫১,৯৬৪টি পরিবার) পরিবারপ্রতি দেড় একরেরও বেশী দেওয়া যাবে।

আবার, যদি সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ১৫ একর ধার্য্য করা হয়, তা হলে উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে ৩৩,১৭,১৪২ একর। ভূমিহীনদের তিন একর ও তিন একরের কম জমির মালিক চাষীদের তিন একর পুরিয়ে দিতে লাগবে ৩১,৯০,২১৯ একর। এক্ষেত্রেও বাকী গরীব

চাষীদের প্রায় দেড় বিঘা করে দেওয়া যাবে। ১০ একর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ধার্য্য করলে তো কথাই নেই।

উচ্চতম পরিমাণ কম করে ধার্য্য করা কেন হবে না? প্রথমতঃ এতে তুষ্ট হবে প্রায় ১৯ লক্ষ পরিবার এবং এমন পরিবার যাদের শ্রম ও উৎসাহের উপরই দেশের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করছে। ক্ষতি হবে মাত্র ৬৬ হাজার থেকে ২ লক্ষ পরিবারের। বস্তুতঃ সর্ব্বনিম্ন পরিমাণের তিন গুণের বেশী জমি কাউকে রাখতে দেওয়া উচিত হবে না।

তা ছাড়া, উর্দ্ধতম পরিমাণ ধার্য্য করার সময় কেবল জমির পরিমাণ দেখলেই বা চলবে কেন? এক একটি পরিবারের সামগ্রিক আয় দেখতে হবে। অধিক জমির মালিকদের অধিকাংশেরই অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের বহু পথ আছে—চাকরি, দোকানদারী, ব্যবসা, ডাক্তারি, ওকালতী প্রভৃতি। অনেকে প্রচুর রোজগারও করে থাকেন ঐ সকল বৃত্তি এবং ব্যবসায়ের দ্বারা। এ ছাড়া যে দশ-বার লক্ষ বাগান, পুকুর বা জলাশয়াদি আছে, সেগুলির অধিকাংশেরই মালিক এই সব শ্রেণীর লোকেরাই। এসব থেকে আয়ও হয় প্রচুর। এগুলিই বা ধরা হবে না কেন?

এমন ব্যবস্থা করা উচিত যে, এক একটি পরিবারের সর্ব্বসমেত আয় বাৎসরিক তিন হতে পাঁচ হাজার টাকা ধার্য্য করে তার বেশী আয়ের লোকদের জমি রাখার অধিকার দেওয়া হবে না। যার আয় তার চেয়ে কম হবে, তার যদি জমি থাকে তা হলে তাকে সেইটুকু জমিই রাখতে দেওয়া হবে যাতে তার সর্ব্বসমেত আয় ঐ সর্ব্বোচ্চ আয়ের বেশী না হয়। তা হলে জমি আরও অনেক বেশীই পাওয়া যাবে। জমির যখন অভাব এবং অধিকসংখ্যক লোক, বিশেষ করে যারা ফসল ফলায় তারা যখন অর্থাভাবে ক্লিষ্ট তখন তো নিঃসঙ্কোচে অবিলম্বে এই নীতি অবলম্বন করা দরকার।

আসলে জমির অভাব নেই। অভাব আছে নীতির স্বচ্ছতার এবং কার্য্যক্রমের সবলতার। আশা করা যায় কর্ত্তৃপক্ষ সে অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবেন।

৩

চাষীর হাতে জমি বিলি করলে দেশের ও জাতির পক্ষে তা কত দূর সুফলদায়ক হবে?

কৃষির দরুন বাংলার (জাতীয় আয় কমিটির রিপোর্ট অনুসারে) আয় কিছু বেশী হবে বলেই মনে হয়। এখানে অর্থকরী চাষ বেশী এবং সেচ-ব্যবস্থা ও দোফসলার চাষ অন্য কোন কোন প্রদেশের চেয়ে অধিক। তা ছাড়া, চাষ কতকটা সহজসাধ্যও বটে। এই হিসাবে বাংলায় কৃষি-আয় আনুমানিক ২২৫ কোটি টাকা। যারা মজুর দিয়ে চাষ করায় তাদের একরপ্রতি আয় আনুমানিক ১৩০৲ এবং প্রধানতঃ যারা নিজ হাতে চাষ করে তাদের আয় একরপ্রতি আনুমানিক ১৬০৲ টাকা। এই হিসাবে ৩৩ একরের অধিক জমির মালিক ১৯,৮০৭টি পরিবারের ভাগে এবং নিজ চাষে ৩০,১৭,৮৩৭ একর জমিতে আনুমানিক ৩০,৭৭,৫৩,২১০ টাকা আয় হয়। পরিবার-প্রতি বাৎসরিক ৩০০০৲ হিসাবে সংসার চালানোর জন্য খরচ করেও এদের উদ্বৃত্ত হয় আনুমানিক ২৪,৮৩,৩২,২১০ টাকা। ২৫ থেকে ৩৩ একরের মালিক ১৯,৮০৭টি পরিবারের ৫,৭৪.৪০৩ একর জমিতে আয় ৫,৭৭,২৭,৬৯০৲ এবং বাৎসরিক ২৫০০ টাকা সংসার-খরচ করে উদ্বৃত্ত হয় ৮২,১০,১৯০ টাকা। এর পর, ২০-২৫, ১৫-২০ এবং ১০-১৫ একর, এই তিন স্তরের মালিকদের, যথাক্রমে ২০০০৲, ১৫০০৲ ও ১২০০৲ সংসার-খরচ করে, মোট উদ্বৃত্ত হয় আনুমানিক ৫,৩৮,৫৭,৯৭২৲। ৫-১০ একরের মালিকদের আয় গড়ে ৩৯,২০,৩৯,৭১০৲ এবং ব্যয় সমপরিমাণ। তবে এই শ্রেণীর মালিকদের চাষের ফসল বেশী এবং গড় আয়ও বেশী। কেননা, জমির প্রতি এদের যত্ন অধিকতর। এর পর আসে গরীব মালিক ও ক্ষেতমজুরদের কথা। এদের মোট আয়, মজুরিতে এবং ভাগ ও নিজ, চাষে ১৪৪ কোটির কিছু বেশী। অর্থাৎ, এদের পরিবারপ্রতি আয় ৬৬৮ টাকা। এদেরও মধ্যে গরীব চাষী-মালিক ও ক্ষেত-মজুর ১৮,৮৯,৭৬৪টি পরিবারের নিজ জমির, ভাগের এবং মজুরির মোট আয় আনুমানিক ১৩৯ কোটি টাকা এবং পরিবারপ্রতি ৭৩৫৲ মাত্র। ভূমিহীনদের আয় আরও কম—মোট আনুমানিক ৩৩ কোটি টাকা এবং পরিবারপ্রতি ৫৫০৲ মাত্র। সরকারী তথ্য অনুসারে এদের, গরীব চাষী ও মজুরদের আয় ৬২২৲ টাকা মাত্র।

পনর একর বা মাথাপ্রতি তিন একর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ধার্য্য করে উদ্বৃত্ত ৩৩,১৭,১৪২ একর জমি বিলি করলে ভূমিহীন ও গরীব চাষীদের আয় বাড়বে (এই জমির দরুন ভাগে ও মজুরিতে যে আয় হয়, তা বাদে) সাড়ে ২৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এই বৃদ্ধি—বাংলার কৃষিজাত জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা দশ ভাগ এবং বেশী জমির মালিকদের উদ্বৃত্ত আয়ের শতকরা ৭৯ ভাগ।

এ ছাড়া আরও বহু দিক দিয়েই আয় বাড়বে। গরীব বলে এদের অনেকেরই ছেলেমেয়েরাও মজুর খাটে। পুরুষের পুরা শ্রম-ক্ষমতার অনুপাতে ছেলে মেয়ের নিয়োজিত শ্রম, সমগ্র নিয়োজিত শ্রমশক্তির শতকরা ৩৫ ভাগ। চাষীদের হাতে জমি দিলে এবং তাদের আয় বাড়লে ছেলে মেয়েরা মজুরি খাটা ছেড়ে দেবে। তার ফলে মজুরের চাহিদা ও মজুরি বাড়বে। এই কারণে চাষের খরচ বাড়বে বলেও বটে, উপরন্তু মালিকদের জমির পরিমাণ কম হওয়ার দরুনও বটে, মালিকেরা জমির ও চাষের উন্নতি ও দোফসলা চাষের বৃদ্ধি করে আয় বাড়াবার চেষ্টা করবেই। সেজন্যও মজুরের চাহিদা ও মজুরি বাড়বে। এক হাতে জমি পুঞ্জীভূত এবং অ-চাষীদের হাতেও অনেক জমি থাকার ফলে বর্ত্তমানে চাষের প্রতি অবহেলা চরমে উঠেছে। কৃষিকার্য্যে প্রয়োজনীয় মজুর পর্য্যন্ত নিয়োগ করা হয় না, অন্যান্য বিষয়ে যত্ন নেওয়া ত দূরের কথা। বর্ত্তমানে একরপ্রতি মাত্র ২৬ জন মজুর বা বিঘা-প্রতি ৯ জন মজুর কাজে লাগানো হয়। চাষীদের আয় বাড়বে বলে তারাও চাষেও যেমন কিছু কিছু মজুর লাগাবে, তেমনই ঘরবাড়ী তৈরি করা প্রভৃতি অন্যান্য কাজেও মজুর নিয়োগ

করবে। ফলে মজুরিতে আয় বাড়বে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ হিসাবে ১৫ কোটি টাকা।

কৃষি-মজুরি বৃদ্ধির এবং মজুরদের কাজের নিশ্চয়তার প্রয়োজনীয়তা সকলেই গভীরভাবে অনুভব করছেন। তার জন্য প্রাথমিক আয়োজনও চলছে। কিন্তু আইন করে তা হবে না। খাটবার লোক বেশী হলে এবং চাষের উন্নতির চেষ্টা না হলে বা ঢিমে তালে চললে শ্রমিকেরা কম মজুরি নিতে বাধ্য হবে। অজ্ঞ চাষী মজুর ত দূরের কথা, কোন কোন শিক্ষিত মহলেই এ প্রথা বলবৎ আছে। তা ছাড়া, দু'-চার আনার জন্য আদালতের শরণাপন্ন ত হওয়া যায় না, অজ্ঞ ও গরীবদের পক্ষে ত তা সম্ভবই নয়। মালিকদের দাপটে এবং পুলিস ও মালিকদের ষড়যন্ত্রে এরা আইনমত ভাগের ফসলই নিতে পারছে না বা ভাগ-চাষী বলে জরীপে লেখাতেও পারছে না।

জমির ফলন ও গড় আয় বাড়বে অন্ততঃ শতকরা দশ ভাগ—বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, সামান্য যত্ন নিলেই ফলন বাড়ে শতকরা ৫।৭।১০ ভাগ। জমির উন্নতি, তার তদারক এবং সার প্রয়োগ করলে গড় ফলনের দু' তিন গুণ ফলনবৃদ্ধি হয়ই। এও দেখা যায় যে, সাধারণতঃ কম জমির মালিক এবং বিশেষ করে কৃষির উপর একান্ত নির্ভরশীল মালিক ও চাষীদের জমিতে ফলনও বেশী, একাধিক ফসলের চাষও বেশী। সুতরাং ফলনবৃদ্ধি বাবদ আয় বাড়বে অন্ততঃ ২৫ কোটি টাকা এবং ক্রমশঃ তা দাঁড়াবে অন্ততঃ ৫০।৬০ কোটিতে। অচাষীদের মধ্যে যারা আয় বাড়াতে পারবে না, তারা জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে অথবা তারাই চাষী হয়ে উঠবে। এর ফলেও মধ্যবিত্তদের বেকার-সমস্যা কমবে এবং চাষীরাও কিছু কিছু জমি বাড়াবার সুযোগ পাবে, অবশ্য যদি চাষী ছাড়া আর কারও জমি কেনার অধিকার না থাকে।

কৃষিজাত দ্রব্যের দাম যে উদ্বেগজনক ভাবে নিম্নগামী হয়েছে এবং বাজারের অবস্থা যে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, তারও মোড় ঘুরবে সুষ্ঠু ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার দৌলতে। এই বিপুলসংখ্যক লোকের আয় বাড়ার ফলে ফসলের দাম বাড়বে এবং বাজারে নিশ্চয়তা ও স্থিতি আসবে। এ ছাড়া, চাষীদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার দিকে যাবে এবং বয়স্কা মেয়েরা অবসর ও সুযোগ-সুবিধামত নানা গৃহশিল্পে মন দেবে। এর ফলে, আয়বৃদ্ধি এবং কুটীরশিল্পের প্রসারের পথখুলবে।

অর্থাৎ, এক কাজেই কয়েকটা প্রধান, গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কাজ হয়ে যাবে—শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, জমির ও চাষের এবং ফলনের উন্নতি, গ্রামের ও চাষীদের বেকার-সমস্যা হ্রাস, ফসলের মূল্যবৃদ্ধি, বাজারের নিশ্চয়তা, শিক্ষার বিস্তার, কুটীরশিল্পের প্রসার প্রভৃতি এবং চাষীদের আয়বৃদ্ধি তথা ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি অন্ততঃ ৫০ কোটি টাকা। সরকার শত শত কোটি টাকা খরচ করে এবং নানা দিক দিয়ে মাথা ঘামিয়েও যেখানে কূলকিনারা পাচ্ছেন না, সেখানে প্রায় বিনা খরচে এতগুলি জরুরি কাজ হয়ে যাবে এবং দেশের প্রাণকেন্দ্র গ্রামগুলিতে জনসাধারণের কর্মোদ্যোগ ও প্রচেষ্টা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বহুমুখীভাবে ছড়িয়ে পড়বে। গ্রামে নব জীবনের সূত্রপাত হবে, গতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে, "ফলন বৃদ্ধি" (গ্রো মোর ফুড) আন্দোলনে, ছোট বড় সেচের খাল কাটাতে, বাঁধ বাঁধতে, নিকাশী-নালা কাটতে, সার দিতে, এবং কৃষির উন্নতিসংক্রান্ত আরও অন্যান্য কাজ করতে ক' হাজার কোটি টাকা যে খরচ করা হয়েছে (বড় বড় সেচ-পরিকল্পনা বাদে), তার ইয়ত্তা নেই! তবুও শতকরা পাঁচ ভাগ উন্নতি হয়েছে কিনা সন্দেহ। গত দু'বছর খাদ্যাবস্থার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তার অনেকটাই হয়েছে বৃষ্টি ভাল হয়েছে বলেই। একথা সরকারও স্বীকার করেছেন। ১৯৫৩-৫৪ সনে যে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টন বা ৩০'১৮ কোটি মণ খাদ্য-শস্য বেশী ফলেছে বলা হচ্ছে, তার মধ্যে ৭০ লক্ষ টন বা ১৮'৯০ কোটি মণ ভাল বৃষ্টির দরুনই ফলেছে, একথা পরিকল্পনার কর্তারাই বলেছেন। সুতরাং বৃষ্টির অবস্থা খারাপ হলে সব বানচাল হয়ে যাবে। তখন পরিকল্পনা ফেলে সাহায্যের ঝুলি নিয়ে সরকারকে ছোটাছুটি করতে হবে একদিকে এবং অপরদিকে বাজারের মন্দায় সরকারের আয়ও কমবে। তা না হলেও সমগ্র দেশের সমস্যার তুলনায় এ কতটুকুই বা! অথচ এইটুকুর জন্যেই ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে।

খরচের বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার বরাদ্দমত টাকাই এখনও খরচ করা সম্ভব হয় নি। এরই জন্য জনসাধারণকে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝা বহন করতে হচ্ছে তা তাদের ক্ষমতার সীমা পার হয়ে গেছে। কর বাড়িয়ে বাড়তি বরাদ্দের টাকা উশুল হবে না। সুতরাং পরিকল্পনা ও উন্নতি যতই হোক্, সমস্যার তুলনায় তা নগণ্য। তা ছাড়া, গ্রামের রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি অতি জরুরি কাজ যা হয়েছে বা হবে, তা প্রয়োজনের তুলনায় আরও নগণ্য। অথচ দ্রুত উন্নতি না হলেও নানা দিক দিয়ে বিপদ। তাই স্বেচ্ছামূলক শ্রম-দানের কথা সকলেই বলছেন। গ্রামে নবজীবনের সূত্রপাত হলে, জনসাধারণের মধ্যে কর্মোদ্যোম ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রেরণা এলেই সেই শ্রমদানও আসবে। নিজের জমির উন্নতি, নিজের আয়বৃদ্ধির জন্য খাল কাটতে তারা অগ্রণী হবে। আয়বৃদ্ধির দরুন তারা যে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পাবে এবং জমি প্রাপ্তির জন্য তাদের মনে যে বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা আসবে, তার ফলেই জনসাধারণ রাস্তাঘাট তৈরি, স্কুল হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি নিজেদের উন্নতিবিধায়ক কাজেও শ্রম-দানে অগ্রণী হবে। সুতরাং আজ যে পাঁচ টাকার কাজ সরকারকে ২৫ টাকায় করতে হচ্ছে, তার অধিকাংশই হবে বিনা খরচে। সুতরাং জমি বিলির প্রয়োজনীয়তা জরুরি এবং অপরিহার্য।

এক টুকরা জমি যে চাষীর কাছে, গ্রামবাসীর কাছে কি মহামূল্য

তা বর্ণনা করা যায় না ! এই একটুকরা জমির জন্য সে যুগ যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে লালায়িত। এরই আশায় চাষী দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বয়ে আসছে। এইটুকুর স্বপ্নেই তার মনে কত না ভাঙ্গাগড়ার তরঙ্গ ! সেই জমি পেলে তার বিশ্বাসহীনতা, অবসাদ ও নিক্রিয়তার অবসান হয়ে আসবে ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা আর সেই ভবিষ্যৎ গড়ার অদম্য প্রেরণা। আজ ভবিষ্যৎ বলতে তার কিছু নেই. কোন রকমে দিন গুজরাণই তার আজকের একমাত্র চেষ্টা। জনসাধারণের তথা শ্রমজীবীর হতাশা, অবিশ্বাস, অবসাদ ও নিক্রিয়তা এবং আত্মগ্লানিই দেশের চরম অভিশাপ। তা যদি দূর হয়ে যায় ত আর বাধা থাকবে কি ! তা হলে দেশ গড়ে উঠবে হাতে-কোদালে। হ'লই বা দেশ গরীব। জনবল ত আছে অফুরন্ত। সবার আগে কাজে লাগাতে হবে এই জনশক্তিকে। জমি বিলিই তার প্রকৃষ্ট পন্থা।

শেষবর্ষণ

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

কামিখ্যে কবরেজকে সবাই পরোক্ষে 'বোকবেজ' বলে ডাকত—সেটা লোকদের বাড়াবাড়ি। আসলে কামিখ্যে কবরেজ হিসাবে দক্ষ। নৈলে অত বড় বাড়ী, গরু, গাড়ী আর শহরজোড়া বিষয়সম্পত্তি—এ সব হয় কি করে ?

আমাদের কথা তাকে নিয়ে নয়। সে কবে মরে হেজে চুকে-বুকে গেছে। আছে তার ছেলেদের দকায় দকায় সাইনবোর্ড "আসল কামিখ্যে কবিরাজের ঔষধালয়"। কামাখ্যা কবিরাজ মারা গেছে একবার। ছেলেরা তাকে মেরে রেখেছে দকায় দকায়।

ওদেরই একজন শুষছিল সালফা-ড্রাগসের তাড়ায়। আগে রোগী আসত। ওদের রামবাণ, যোগরাজ গুগগুল, বসন্ত কুসুমাকর, আর পঞ্চামৃত রসের জন্ত মাড়োয়াড়ীপাড়া থেকে রোগীর কামাই ছিল না। কিন্তু কি যে ছাই এল ষ্টেপ-টোমাইসিন, পেনিসিলিন্—মানুষকে যেন ভূতে পেল। রোগী থাকে না হাতে। কপ কপ খায়, প্যাট প্যাট কোটায়, আর চটপট বুক চিতিয়ে বেড়ায়।

প্রথম প্রথম কামাখ্যা কবিরাজের ছেলে তারক কবিরাজ ঐ সালফা ড্রাগস আর পেটেণ্টগুলো গুঁড়ো করে, লেবেল বদলে "নব-রসান্তক", "হিমান্তক", "স্বর্ণকর্পূর", ইত্যাদি নাম দিয়ে চালাত। পরে রোগীরাও চালাক হয়ে গেল। আর চলে না। অথচ তারকের জাঁক সে বাপের আমলের কুলোপানা চক্করটুকু রাখবেই ; তাতে বিষদাঁত ভাঙে, পরোয়া নেই।

বাড়ীতে তখনকার দিনে দোলে দুর্গোৎসবে, পুজা-পার্ব্বণে অবারিত দ্বার ছিল। তিরেন বসত বছরে দু'বার। পাঁঠা থেকে লেডিকেনী চলত মেথর থেকে পণ্ডিতের পেটে সার বেঁধে। মানা ছিল না। এখন পাঁঠা দাঁড়িয়েছে কচুতে, লেডিকেনী প্যাড়ায়, মেথর এবং পণ্ডিতের দল শুকিয়ে গিয়ে খিতিয়েছে নেহাত চোখাচোখির বিষজিহ্ব আত্মীয়দের ডজনখানেকের কোঠায়। তবু ত কুলোপানা চক্কর, "আসল কামাখ্যা কবিরাজের আদিম ঔষধালয়"।

কেউ বললে বলে, "তোমরা পার। ইংরেজী পড়েছ। বুকের পাটা আছে। সংস্কার, সমাজ, রীতি, আচার-ব্যবহার তোমাদের বুড়ো আঙুলের নাচের পাল্লার ভেতরে। আমাদের রোজ গঙ্গাস্নান করতে হয়, শালগ্রামে জল ঢালতে হয়। মস্ত করে টিকি রেখে ফুল গুঁজতে হয়। বাপের তর্পণ, বংশের নাম, পারিবারিক রীতি, প্রথা, ডাক, যশ—সব কিছুর পরোয়া করতে হয়। বড়ি টিপে খাই, গজের চাল, দাবার চাল আর দিতে পেলাম কৈ ?"

তা বলেন কবিরাজ মশাই। একবার বলতে আরম্ভ করলে থামতে চান না। আর কথায় এমন একটা চাপা দম্ভের সঙ্গে মেশানো শাসালো আত্মপ্রত্যয়ের সুর থাকে, শুনতে খিয়েটারী হলেও বেশ লাগে।

লোকটি ঢ্যাঙা, শক্ত হাড়ের কাঠামোতে চড়ান চর্ব্বিহীন মাংসের উপর চকচকে চামড়ার বুনুনি। তীক্ষ্ণ নাসা, পাতলা ঠোঁট। নাকের পাশ দিয়ে গভীর খাঁজ দু'গালের মধ্য দিয়ে চিরে চলে গেছে। পাতলা টিকি, চোখে চশমা, ভবঘুরে দৃষ্টি, ফর্সা রং। মটকা বা গরদের খুব লম্বা পাঞ্জাবীর ওপর গরদের বা শালের চাদর। গায়ে গোলাপ বা খশের আতর। মুখে পানের সঙ্গে কিমাম। হাতে ছড়ি, পায়ে জুতা ; গাড়ী চেপে রোগী দেখতে যান। ঠাটটা দিব্যি বজায় রেখেছেন আসল কামাখ্যা কবিরাজের আদিম ছেলে।

আমি বহুদিন বাদে ফিরেছি কাশী। রাস্তায় দেখে গাড়ী থামিয়ে হাঁক পাড়লেন, "কবে এলেন মশায় ; দিল্লীর লাড্ড পেয়ে যে ডুব মারলেন দেখছি। আসবেন না একবার গরীবের ওখানে।"

"বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, এই ত সবে এসেছি। যাব বৈকি।" বলে লজ্জিত হবার অভিনয় করলাম।

এবার একটু নরম গলায় বললেন, "কিন্তু আসবেন ঠিক সন্ধ্যার সময়, চুপিসাড়ে। দিনেও নয়, রাতেও নয়।" কণ্ঠস্বরে যেন ভীতি ও ত্রাস।

বললাম, "কেন? নৃসিংহ অবতার হতে হবে নাকি?"

গাড়ী হাঁকিয়ে দিয়ে বললেন—"নারসিংহী বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা।"

কিছুই বুঝি নি সে রসিকতার।

জিজ্ঞাসা করলাম—"নারসিংহীটা কি মশায়।"

কবিরাজ যেন ভয়ে চকচকিয়ে গেল।

"ভার বাজে বকেন আপনি। নিন্ নিন্ তামাক খান। ওরে ননকু ১ ছ রদকে ক'ড়র্ব দা হুকোটা দিয়ে যা।"

হুকা লাভ করে কৃতার্থ হয়ে বসে রইলাম। সন্ধ্যা লাগল। কবিরাজবাড়ীর শাঁখ বাজল। কবিরাজ ভক্তিভরে প্রণাম করল। আমিও হুকার ডাটিটা কপালে ঠেকালাম, ওপরে কল্কের আগুন বাঁচিয়ে।

কবিরাজ উঠে গরদের জামায় আতর ঘষতে লাগল। আমায় বললে, "আসুন। সরলাকে বলে রেখেছি আপনার কথা। ওপরে চলুন।"

"ব্যাপারটা আগে বলুন—কি ব্যাপার।"

"যাবেন ত চলুন, নৈলে যান্ যে কাজে যাবার। আচ্ছা মশায়, যে কথা বলবার নয়, বলা যায় না, সেকথা বলি কি করে? চলুন।"

অগত্যা উঠি। বালক-বয়স থেকে এদের বাড়ীর ওপরে এসেছি।

এই কবিরাজ তারক আমার স্নানের সঙ্গী ছিল, আড্ডা দিতাম ছেলেবেলায়। ও বরাবর আপনি বলেছে; আমিও তাই। তবু ওদের বাড়ী থিয়েটারের রিহার্সাল দিতে গেছি। উপরতলায় গেছি বহুবার। তা ছাড়া ঐ সরলা। সরলা আমাদের বাড়ীর পাশে থাকত খুব চিনি সরলার বিয়ের পরই যেন বেশী করে ধরল তারক কবিরাজ। আমি ওপরে যেতেই বলল, "বসে থাকুন এই চৌকোণায়। সন্ধ্যের আরতি সেরে সরলা এসেই এইখানে আমায় প্রণাম করে। আজ আপনি বসুন। দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, "আরে ছি ছি! এ কি রহস্যের জিনিষ? সরলার কতখানি প্রত্যয় ঐ প্রণামটিতে। ওকে নিয়ে রহস্য করতে নেই।"

"জানি নেই। হয়ে উঠেছে রহস্য—ফার্স! কথায় কথায় কলহ রাগ। আজ দু' দিন কথা কয় নি আমার সঙ্গে।"

"তবে বললেন, প্রণাম!"

"নাঃ এটা করে যায়। ব্যস—তার পর কাঁচকলা।"

"কারণ?"

"কিছু নয়! তুচ্ছ! চেয়েছিল জবাকুসুম একশিশি। আমি অন্যমনস্ক হয়ে মার হাতে দিয়েছি। মাকে ত জানেনই। গন্ধ তেলটেল দেখতে পারেন না। জেরার পর জেরা। আমি ত অপ্রস্তুত। ওরও বোধ হয় একটু বাক্যযন্ত্রণা সইতে হয়েছিল। কিন্তু করব কি! ভুল ইজ ভুল ফার্ষ্ট এ্যাণ্ড লাষ্ট ভুলই ত!"

"তা ত বটেই!"

"কিন্তু মানবে না। নো কম্প্রমাইজ—চলছে ত চলছেই। আর আমায় জানেন ত। আমি সব পারি কেবল ওর গোমড়া মুখ সইতে পারি না।"

বলা বাহুল্য, সরলা অপরূপ সুন্দরী ছিল। অপরূপ। সাজাবার মত ওর রূপ। পেয়েও ছিল আদরে-ভরা স্বামী।

সরলা এসেই প্রথম আমায় প্রণাম করল, তার পর তারক কবিরাজকে। নিশ্চিন্তে, নিঃসঙ্কোচে। জিজ্ঞাসা করল, "দাদা কবে এলেন?"

"পরশু। তোমরা ভাল আছ ত সরলা।"

সরলার বড় ছেলের তখন বিশ বছর বয়স। যৌবন পার হয়ে গেছে বহুকাল। তা ছাড়া আটটি সন্তান হয়েছে ওর। রূপ থাকার কথা নয়। তবু যেন পলিমটী রেখে যায় ওর দেহে প্রতিবারের জীবনের বন্যা, বয়স যেন রেখে যায় ঋতু-বিবর্ত্তনের চিরন্তন নবীনতা। নিটোল স্বাস্থ্য, ঝকঝকে রং, সারা দেহে সুবলিত তরঙ্গের লীলা, রেখা নেই বটে, আবর্ত্ত আছে। রেশমী শাড়ীতে, হাতভরা চুড়িতে, কপালের সিন্দুরে, চিবুকের নীচের মেদের ভাঁজে ওর মধ্যে যেন পূর্ণ মাতৃত্বের ঐশ্বর্য্যময় রূপটি দেখতে পেলাম।

কবিরাজকে প্রণাম সেরে বলল, "ভাল বৈকি, খাচ্ছি, পরছি, উঠতে বসতে আদর আপ্যায়ন—গেরস্তর বৌ আর এর চেয়ে ভাল কি চায়।"

কবিরাজ বলল, "শুনলেন ত, কি কথার কি উত্তর! বয়স হচ্ছে না মশায়; না খুকিটি আছেন এখনও। এখন এসব কথা—"

সরলা বললে, "মানায় না জানি। বলি, সেটা অভ্যেস। তাতে কার কি যায় আসে।"

আমি বললাম, "ছি সরলা, এত রাগ করতে নেই। তারকবাবু আমায় একটু আগে বলেছিলেন যে তুমি ওঁকে ভুল বুঝেছ। ভুল করে যে ব্যক্তি লাজ্জিত, আর তোমার জন্যে লজ্জা, তাকে যদি তুমি না বোঝ, লোকটা দাঁড়ায় কোথায়?"

"ওঃ ওকালতি করতে এসেছেন। বসুন তবে। কী নিয়ে আসি।"

জলখাবার আনতে গেল সরলা।

কবিরাজ বললে, "বেড়ে বলেছেন ভাই। মিটে যাবে আজই—কি বলেন? কি বোধ হয় আপনার?"

আমি কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললাম, "আচ্ছা মিনিমুখ পুরুষ ত আপনি। করেছে রাগ করেছে। যেন আপসে মরে যাচ্ছেন। এ কি নতুন বিয়ে?"

দু'চোখে জল এনে কবিরাজ বললে, "নতুনই ভাই, নতুনই। ওকে যেন নতুন করে পাই রোজ রোজ। কি যে ও আমার—"

যাক ওদের মিটে গিয়েছিল সেদিন।

সে কথা হচ্ছে না।

কথা হচ্ছে সটান পাঁচ বছর পরে। এ কয় বছরে কাশীর উপর দিয়ে বেরিবেরিতে একটা খণ্ড প্রলয় বয়ে গেছে। পাড়াকে পাড়া হয় মরে সাফ হয়ে গেছে, নয় অন্ধ হয়ে মরার বাড়া হয়ে আছে। তাজা তাজা ছেলেমেয়ে বৌগুলো দৃষ্টি হারিয়ে বসে আছে। গলিতে গলিতে দেখা যায় টলটলে চোখ, তাকিয়ে আছে দৃষ্টি নেই। অমন করুণ দৃশ্য আর নেই।

শুনেছিলাম তারক কবিরাজের চোখ গেছে। একেবারে দৃষ্টি নেই। ওর আশা দৃষ্টি ফিরবে—একবার ফিরবেই।

একদিন বলেছে আমায়, "আর কিছু নয় ভাই। একটিবার দেখতে চাই সরলাকে মরবার আগে।"

কিন্তু সে পরের কথা।

আগের কথা আগে সেরে নেওয়া যাক।

ছেলেগুলি অপোগণ্ড। বাপের বিষয় নিয়ে তাল ঠুকে বেড়ায়। কাজকর্ম নেই। দুটি মেয়ের বিয়ে বাকী। বড়টি চাকরি করে, যুদ্ধের বাজারের চাকরি। কবিরাজের আয় বন্ধ। অবস্থা চরম। কবিরাজের মা মারা গেছেন। সরলা এখন পরিপূর্ণ গৃহিণী। কিন্তু তার ভাণ্ডার তখন শূন্য।

মেজ ছেলে কবিরাজী করে। সবে আরম্ভ। কিছু হয় না।

আমি ভেবে চিন্তে সরলার কাছে গেলাম। কবিরাজ তখন স্নানে গেছে গঙ্গায় ছেলের হাত ধরে।

সরলার রূপ ছিল ওর চোখে, প্রসন্নতায়। ওর আর সব ঠিক আছে; কেবল নেই চোখে সেই ছটা এবং মুখে সেই শান্তি। প্রণাম করে বললে, "ভারি অশান্তিতে আছি দাদা।"

"সে তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।" বলতে বলতেই সরলার চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। "মলিন হয়ে গেছ। রোগা যত না হয়েছ তার চেয়ে রোগা দেখাচ্ছে।"

"না, যা ভাবছ সে অশান্তি নয়। গয়না পরি না, শাড়ী পরি না, সাজি না। দেখবে কে দাদা? ইচ্ছে করে আর সাজতে? গান্ধারী চোখে ঠুলি দিয়েছিলেন দাদা। বুঝি না কেন। ঠুলি দিতে হয় না। সারা মন ঠুলি পরে থাকে। ছেলেরা আর করে, বাড়ীঘর জমাজমি যা আছে দুঃখ হওয়ার আমার কথা নয়। দুঃখ তবু হয়। চোখ গেছে সেও আমার দুঃখ নয়, দুঃখ আরও গভীর, আরও মর্মান্তিক।"

সকাল সকাল দুঃখের কথা শুনতে আর কার ভাল লাগে!

তা নয়। দুঃখেরও সুর আছে, জ্যোতি আছে; দুঃখও সুখের মত বুকের স্রোতে প্রবাহ তোলে, চাপা বেদনা জাগায়।

তাতে সরলায় দুঃখ! ওকে যেন নবতর রূপে দেখলায়।

চিরদিনের সুখী ও। চিরপূর্ণিমার আকাশে তৃতীয়ার ক্ষীণতা। চমক লাগায় বৈ কি।

"কবিরাজের খবর ত শুনলাম। এখনই ত তোমার কাছ থেকে সুদ খাবার সময় ওর। এতকাল খাঁটি আসল যা দিয়েছে, আজ ওর দুদ্দিনে সেই খাঁটির সুদই ত উপজীব্য। এখন তোমার চোখ, তোমার আনন্দে ওর চোখ ওর আনন্দ ভরে দাও।"

সরলা কিন্তু ঝর ঝর করে কাঁদছিল।

কাঁদতে দেখি নি সরলাকে।

এমন সময়ে ওর বড় ছেলে এল। বললে, "পূবের পাঁচিল ভাঙতে সুরু করেছে দেখে এলাম। তবু কিছু বলতে পারব না মা?"

সরলা বলল, "হ্যাঁরে আমার বুকের পাঁচিলের চেয়েও কি তা দামী?"

রেগে গিয়ে ছেলে বললে, "হ্যাঁ দামী। কান্নাকাটি নিয়ে বিষয় আশয় চলে না।" বলে সে চলে গেল।

সরলা বললে, "দেখলে সুখ আমার? কর্তা ছেলেদের তিল দিয়ে বিশ্বাস করবেন না। চোখ গিয়ে অবধি ভয় ঢুকেছে যে বৃদ্ধ বয়সে ওঁকে সবাই হেলাফেলা করবে। তাই অমন আমার স্বামী আজ পদে পদে সন্ত্রস্ত, পদে পদে সন্দেহ—কাউকে এতটুকু বিশ্বাস করতে পারছেন না। এ কি আমার কম জ্বালা?"

"হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেছে কি না। তাই অমনটা হয়ে গেছেন। এই সময়ে একটু ধীর শান্ত হয়ে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আজ পনের দিন হ'ল বাড়ীতে খান না।"

"সে কি? কেন?"

"ঐ যে শুনলে পাঁচিল। সম্পত্তিই আমার কাল। বাগানের পূব ধারের পাঁচিল। তার ওধারে ত বিশ্বাসদের একটা হাতা আছে। সেখানে নাকি ওরা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে।"

"করবে করুক, তাতে তোমাদের কি?"

"আমাদের কপাল। কোথায় তৈরী মন্দির পাওয়া গেছে। সেই পাথরের গাড়ী ওদের হাতায় নিয়ে যেতে হবে। এখন ঘুরিয়ে গলি দিয়ে নিয়ে যেতে খুব খরচ। যদি গাড়ী করে আমাদের বাগান দিয়ে নিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি হয় আর ভাল ভাবে নিরাপদে জিনিষটা পৌঁছয়।"

"তোমাদের পাঁচিল ভেঙে সেই গাড়ী যাবে? এই মতলব?"

"হ্যাঁ।"

চমকে বললাম, "সে কি! এমন কথা কে কবে শুনেছে। পাঁচিল ভাঙা মানেই ত মামলা। বিশ্বাসরা যা লোক! তাতে ওঁর এখন এই অবস্থা।"

"এই কথাই ত ছেলেরা বলেছিল। ওরা নাকি ফটোগ্রাফার নিয়ে রেখেছে। পাঁচিল ওরা ভাঙবে, ওরাই গড়ে দেবে বলে ওঁকে বুঝিয়েছে। কিন্তু ছেলেরা বলছে যে, ওদের মতলব ভাল নয়।

এই কথা নিয়ে তুমুল। এখন পনের দিন খাওয়া বন্ধ। আমি যতক্ষণ বাড়ী থাকব ততক্ষণ উনি বাড়ীতে খাবেন না।"

"উনি কি বলেন ?"

"ওঁর ধারণা বিশ্বাসরা ওঁকে ধোকা দেবে না। ছেলেরা গোলমাল করে ওঁর শত্রুবৃদ্ধি করতে চায়।"

"বেশ তা নয় হ'ল। এতে তোমার কি অপরাধ ?"

"গভীর। অমন সব ছেলে গর্ভে ধরা এবং ছেলেদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে অন্ধ স্বামীকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা।"

বলছিল আর ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল।

সর্পাঘাত করলেও সরলার এত বাধতে পারে না, তারক কবিরাজের কাছে এই আক্ষেপ শুনলে যত বাধে। আমি ত জানতাম ওদের ভিতরকার ব্যাপার।

ভাবলাম আজ এর নিষ্পত্তি করব।

ঠিক সেই সময় সরলা বলল, "আজ তুমি থেকে ওকে খাইয়ে যাও না দাদা।"

"এমনি কোথায় খান ?"

"বেশী দিন বাড়ীতে চিড়ে দই; নইলে পাশের বাড়ী গোপালের মার ওখানে টাকা দিয়ে।...আমিই রান্না করে ভাত বেড়ে গোপালের মার বাড়ী থালা নামিয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু কথা কই না। গোপালের মাই কথা বলে খাওয়ান। গোপালের মাকে একটা করে টাকা দিয়ে আসেন। আমায় গোপালের মা সেটি দিয়ে দেন।"

দুঃখেও হেসে বললাম, "তোমার তবে লাভ হচ্ছে বল।"

"হ্যাঁ, তা বলতে! খুব লাভ। ভাত বেচছি আর অপমান কিনছি। এখন তাও খান না।"

"কেন ?"

"দিনতিনেক আগে চিংড়ি পেলাম। লাউ-চিংড়ি নারকোল দিয়ে রাঁধলাম। উনি লাউ-চিংড়িতে ধনেপাতা ভালবাসেন। গোপালদের বাড়ী ধনেপাতা ঢোকে না, মনে হয় নি। স্বামীর কথা মনে করে রেঁধেছি, মন আমার তাতেই ছিল। অকপটে নিবেদন করেছি।...লাউ-চিংড়ি মুখে দিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'গোপালের মা এ রান্না তোমার ? বল তোমার ?' আমি ত তখনও বসে। সে যে কি গলা। আমিই তখন বললাম, "না আমার। কি অপরাধ আমি করেছি যে আমায় সাজা দিচ্ছ ?' কোন কথা না বলে পাত ছেড়ে উঠে গেলেন। মেয়েছেলের সে যে কি মর্মান্তিক সাজা তোমরা বুঝবে না। সেই থেকে এই তিন দিন।"

আমি বললাম, "আচ্ছা আজ খাইয়ে যাব।"

এমন সময় কবিরাজ এসে হাজির।

অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে চেহারা। যেন সে লোকই নয়।

আমি বললাম, "কেমন আছেন কবিরাজ মশাই ?"

তারক বললে, "কে ম ঠাকুরদা নাকি ? কবে এলেন ? বসুন বসুন অনেক কথা আছে। পূজা করতে বেশী সময় লাগবে না আমার। ততক্ষণ এদের সঙ্গে বার্তালাপ করুন। তার পর অনেক কথা। অন্ধ বলে হেলা করবেন না কথাটা।"

বললাম, "সময় নেই। দুটোর গাড়ীতে এলাহাবাদ যাব।"

"বেশ ত, যান না। এখানেই খেয়ে যাবেন। সমীরকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিন। আরে খেয়েছেন ত কোনদিন এ অভাগার ক্ষুদকুঁড়ো।"

আমি তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে গেলাম।

তার পর খাবার সময় এল। সরলাকে শুনিয়ে বললাম, "এ কি একটা ঠাঁই কেন ? কবিরাজের জায়গা কৈ ?"

হন্তদন্ত হয়ে কবিরাজ বলল, "আমার নয় ভাই, আমার নয়। আমি এখন খাব না। আমার দেরি আছে। গোপালের মার বাড়ী আমার নেমন্তন্ন।"

এর মধ্যে কবিরাজ আমায় সব কথা বলেছিল, ছেলেমেয়েদের দুর্ব্যবহার, সরলার পুত্রপ্রীতি ও অবহেলা সব। "জানেন মশায়, অন্ধ হয়ে গেছি বলে আর আমায় গণ্য করে না। সৌখীন মানুষ কিন্তু জিদ করে সাজগোজ সব ছেড়েছে। একখানা গয়না গায়ে নেই। সব তুলছে। কবে মরে যাই, তাই সম্পত্তি গোছাচ্ছে।"

যত বাধা দিতে গিয়েছি কেবল আহত হয়ে ফিরেছি। কবিরাজের মনে যেন ভীমরুল কামড়েছে। দেখতে বিকৃত, স্পর্শে সবেদন।

আমি হার না মেনে বললাম, "বেশ ত। গোপালের মা ত আমার অজানা নয়। গিয়ে বলছি উনি থালা এখানেই এনে দেবেন।"

সরলার মুখে চোখে খুশি।

কবিরাজ বললেন, "না ভাই সে হবে না।"

আমি বললাম, "কেন ?"

বলতে ইতস্তত: করছে কবিরাজ।

দুর্বল মুহূর্ত দেখে আমি বললাম, "সরলার ওপর রাগ করে খাবেন না, এই ত! কিন্তু কেন রাগ ? ও ত কেঁদে কেঁদে গেল! অন্ধ কি ওকেও করতে চান ?" এই সময়ে সরলা ডুকরে কেঁদে উঠল।

ঘরে তখন আমি, সরলা আর কবিরাজ। আস্তে আস্তে উঠে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম আরও নিভৃতে এই দৃশ্য পরিচালনা করার আশায়।

সরলার কান্নার শব্দে কবিরাজ যেন চমকে উঠল। মুখখানা ওর এতটুকু হয়ে গেল। ওর প্রভাহীন চোখ দুটোর মধ্যেও যেন একটা বিহ্বল ঝলক দেখা দিল।

বলল, "এখন কাঁদছ সরলা, কিন্তু কি অপমান অবহেলাই করছ আমায় দিনের পর দিন।"

"কি অবহেলা ?"

"অবহেলা নয় ? বার বার ছেলেরা বলে যথারীত খাইছে খেতে—সব চুলোয় দিয়ে এ-বাড়ী ও-বাড়ী, এ-পাড়া ও-পাড়া

বেড়িয়ে বেড়াও ? ময়লা জামাকাপড়, স্নানের সময় তেল নেই—এই নিয়ে রোজ ছেলেদের কিচিমিচি, তোমার এক জবাব "আর করব কি দিয়ে ? টাকা কৈ, আনবে কে।" কেন আমার টাকায় ত সব করতে। এখন ছেলেদের টাকার বেলাতেই তোমার টান ? এমনি করে থাকা আমার অপদার্থতার মাথায় লাথিঝাঁটা মারা নয় ? আমিই না অন্ধ হয়েছি, তুমি ত হও নি। ক'দিন তোমায় বলেছি একটু কাছে এসো, বসো, সারা দিনে রাতে একবার কি তোমার সময় হয় না ? অবহেলা নয় ?"

"না নয়। তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। সরলা তোমায় অবহেলা করতে পারে না। কার জন্যে আমি সাজব আজ ? কার জন্য এ রূপ সাজাব ? সময়ে নাইব, খাব, সব সাধ করব, কে আমায় দেখবে বলো ? বোঝ না ? মনে নেই গন্ধ-তেল মাখতাম। মা রাগ করতেন বলে লুকিয়ে এনে হাতে দিতে ? মনে নেই বিকেলের ডাকে বেরুবার আগে আমায় না দেখে বেরুতে না। মনে নেই রোগী দিয়েছে বলে রোজ মালা এনে দিতে ? তখন আমার দিন ছিল। আজ তুমি আমার সব দিন কেড়ে নিয়েছ। তুমি আমার সব সাধ নিবিয়ে দিয়েছ।"

আমি সরলার মাথায় এই প্রথম হাত রেখে বললাম—"ছিঃ সরলা, থেমে যাও। পাগল হয়ে যাবে যে।"

কবিরাজ মাথা নীচু করে বসে আছে।

"না দাদা না। আজ বলতে না পারলেই আমি পাগল হয়ে যাব। বলতে দাও। দিনরাত আসি না। আমি জানি এলে তুমি খুশী হও, শান্ত থাকো। কিন্তু শুধু দেহ নিয়ে বিলাস করা যাদের জীবনে কোন দিন হ'ল না, আজ অজগরের মুখে হরিণের মত ঢুকতে কি তার সাধ যায় না সাহস হয় ? যদি চোখে চোখে রাখতে মানুষই থাকতে তুমি। এখন তুমি অন্ধ মানুষ। ভয়ে আসি না, ভয়ে।"

কবিরাজ বললে, "থাক, থাক—খেয়ে নিচ্ছি আমি। খাবার আন।"

আমিও বললাম, "আসুন খাবার।"

কবিরাজ দেখতে পেলে না। কবিরাজের ছেলের বৌ খাবারের থালা নামিয়ে দিয়ে গেল। সরলা আর আসতে পারে নি।

আমি কথাটা ফাঁস না করে বসে যাচ্ছি। কিন্তু কবিরাজ টের পেয়েছে। পাবে জানা কথা। সাপের কান নেই অথচ এমন শোনে যে সারা-গাটাই কান। কবিরাজের চোখ নেই, তাই ওর নিঃশ্বাসেও দৃষ্টি।

হঠাৎ বললে, "আর এল না বুঝি ?"

আমি বললাম, "পারে আসতে ? যে কষ্টটা রইল। এত দিনের আদরিণী আপনার ; কতটা অবহেলা পেয়েছিল। আজ বলে করে খানিকটা হালকা হয়েছে।"

খেতে লাগল কবিরাজ। বৌ এসে খাবার পর পর দিয়ে যাচ্ছে। বুঝলুম যে বৌ বেরিয়ে গেছে। তখন বলল, "কেউ নেই ত ঘরে।...অ-ছ' বলতে পারেন সত্যিই ওর ব্যবহার এমন তিরিক্ষে কেন হয়ে গেল ? আমায় যেন মানতেই চায় না। ছেলে ছেলে আর সম্পত্তি সম্পত্তি করেই মোল।"

আমি বললাম, "আপনি পণ্ডিত। আপনাকে কি বোঝাব আমি ?—যদি ভীমার্জ্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধি কামুকৌ।

> পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈঃ মহারথৈঃ।
> পঞ্চ চৈব মহাবীর্য্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন।
> অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ।"

কবিরাজ বললে, "মনে পড়ছে না প্রস্তাবটা।"

মনে করিয়ে দিতে বলতে হ'ল—"জানেন ত কৃষ্ণ চললেন পাণ্ডবদের দূত হয়ে কৌরবদের কাছে। প্রস্তাব সন্ধি। যাবার মুখে হঠাৎ কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর মত কি ? কৃষ্ণা বললেন, 'ভায়ে ভায়ে মিল হয়ে যাবে ; কৃষ্ণার বেণী আর বন্ধন হবে না। তাতে কার কি ?' তখন অভিমন্যু এসে মাকে জড়িয়ে বললে—'আমি যুদ্ধ করব মা। রাজ্য চাই না আমার, স্বজন চাই না। মা চাই। মায়ের অপমান সহ্য করব না।' আজ আপনার এই অবস্থায় ছেলের ওপর ওর ভরসা। সেও ত আপনার ছেলে বলেই। এতদিন আপনি ওদের চালিয়েছেন, সংসার চালিয়েছেন, এখন ওদের কত বড় দায়িত্ব আপনাকে নিশ্চিন্ত করার। সেই দায়িত্বকে আপনি স্বার্থ বলে সন্দেহ করে ওদের, বিশেষতঃ সরলাকে বড়ই আঘাত করেছেন।"

বিহ্বল চোখ দুটো আলোর দিকে মেলে উদাস কণ্ঠে কবিরাজ বললে, "কোথা দিয়ে এল এই সন্দেহ, এই অনাস্থা। যাবেই বা কোথা দিয়ে। কিন্তু সরলাকে হারাব ? সে যে চোখের চেয়েও দামী দাদা।"

সরলা পানের ডিবে হাতে নিয়ে এসে বসেছে তখন।

কবিরাজ বলে চলল, "আমি একেবারে গেছি ভাই। সরলাকে বলে দিও, বুঝিয়ে বলো যে, আমার পাগলী, আমি ওকে ছাড়তে পারি না। ছেলেদেরই ভয়। যদি ওকে হেনস্থা করে। সেই ভয় থেকেই আমার যত সন্দেহ। নইলে—"

আমি বিব্রত হয়ে উঠেছি, এমন সময় সরলা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বাড়ী ফেরার পথে সিঁড়ির মুখে সরলা আমায় হেঁট হয়ে প্রণাম করল।

আমি বললাম, "কি হ'ল ?"

সরলা বললে, "ফসল কাটা হয়ে গেলে ক্ষেতের আর বাকি থাকে কি দাদা ?"

আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে বললাম, "থাকে সম্ভাবনায় পূর্ণ রিক্ত মাটি, তার দৃষ্টি গোয়ালের বলদ আর লাঙলের দিকে, দুর্বলতম চাষীর মুঠোর পানে, আর তার মন জুড়ে থাকে আষাঢ়ের ঘনকাজল, গভীর মেঘ।"

"তার পর ?" বলল সরলা।

"তার পর—সে নতুন ঋতুকে ভার দিয়ে যায় নতুন কিশলয়কে জাগিয়ে তোলার জন্য। চাষী বুড়ো হয়, মাটির তেজ নিভে আসে। তবু আকাশের বাণী নিত্য নতুন জীবন আনে। বর্ষা নিয়মিত আকাশে দেখা দেয়।"

"ভাল লাগে না তোমার হেঁয়ালী। বল দাদা স্বামী আমার ফিরে পাব কি না ?"

"গেছে কবে ? স্বামী তোমার সীমন্ত জুড়ে জ্বল জ্বল করছে। কালকের তুমিও নেই, কালকের স্বামীও নেই। আগামী দিনের তোমাকে নিয়ে যাও স্বামীর কাছে। নইলে—"

"নইলে কি ?"

"নইলে কবিরাজ বিরহে উন্মাদ হয়ে যাবে।"

"কি করব ?"

না বলে পারলাম না। "আবার বৌ সাজো। ফুলশয্যার নায়িকা। কবিরাজ চায় তোমায় আবার বিয়ে করে।"

এর পর আর কিছু বলা চলে না।

পরের বার কাশী ফিরে দেখি নতুন পালঙ্ক হয়েছে কবিরাজের। সরলা কবিরাজের সামনে বললে, "কয়ালাম পালঙ্কখানা, আগেরখানা বড্ড বড় বোধ হচ্ছিল। এখন ছোট একখানাতেই বেশ হয়ে যায়।" কবিরাজ হাসতে হাসতে বললে, "দেখবার মত জিনিষ হয়েছে বটে। সরলার, যাই বল, সখটা পুরোপুরিই আছে।"

আনন্দে আমার চোখ দুটো ছোট হয়ে এল।

অপরিচিতাকে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

তোমার রূপের দীপ্তি যখন আঁখির পলকে ঝলকি ওঠে,
আমার মনের পশুটা তখন পায়ের তলায় পড়িয়া লোটে।
জেনো এ সত্য, মিছে নয় কিছু ; অন্তরে আমি মানুষ ভালো
শুধু বাহিরের মুখোশটা বদ ; ভিতরটা নয় মোটেই কালো।

অপলক চোখে চেয়ে মুখপানে মনে হয় তুমি ভোরের তারা
তোমায় করেছি অপমান ভেবে অনুতাপে হই আত্মহারা!
তোমাকে দেখেছি—তারই মুখ-স্মৃতি যদি পারিতাম
রাখিতে ধরে,
যদি এ ক্ষণিক বিবেক আমাকে একা ফেলে হায়
না যেত সরে—

জাগে মনে মোর স্বপ্নের মতো,—সুখের জীবন পারিত হোতে
যদি যৌবনে ভেসে না যেতাম অলীক নেশায় সুরার স্রোতে,
ক্ষণিক সুখের প্রলোভন ত্যজি রিপুগুলো যদি থাকিত বশে
জীবন আমার ভরে যেত আজ সার্থকতার পুলক-রসে।

যাত্রাপথের কোন বাঁকে কবে পথশ্রান্ত পথিক আমি,
তোমার চরণচিহ্ন হারায়ে হয়েছি এমন বিপথগামী ;
আজ রজনীতে না জানি কখন তোমার রূপের দিব্য ভাতি
আমার আঁধার হৃদয়ে জ্বেলেছে কামনা-বিহীন পূজার বাতি ;

আমার দেহের ভস্মবেদিতে সুপ্ত আছেন দেবতা যিনি
হয়ত তোমার ইঙ্গিতে কবে উঠিবেন জেগে সহসা তিনি।
তোমার রূপের অসামান্যতা নিয়ে যায় যেন অসীমে টেনে
নতজানু হয়ে সমুখে তোমার দিতে চাই পায়ে পৃথিবী এনে।

জীবনের এই অবেলায় আজ তোমার উদয় অপরিচিতা,
এনে দিল একি অনুশোচনার তীব্র অনল—শুচিস্মিতা ?
আজ হতে আমি চলি যদি পুনঃ মহামানবের সাগরতীরে
নূতন আকাশ নূতন পৃথিবী জীবনে কি পুনঃ পাব না ফিরে ?

আমার মানস-সরসীর তীরে তোমার রূপের বলাকাগুলি,
উদয়শিখরে আষাঢ় মেঘের অবগুণ্ঠন দেবে না খুলি ?
মুক্ত হবে না আমার তরে কি তোমার ঘরের প্রবেশদ্বার
অপরিচিতা কি হবে না আমার চিরপরিচিতা মতা আপনার।

প্রবাসে শারদীয়া

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বছরের একটা সময় আসে যখন মেঘেরা ধোপদুরস্ত হয়ে আকাশময় ঘু'র বেড়'য় হাওয়'র ডানায় ভর করে। সীমাহীন নীলিমার কোন্ এক কোণ থেকে নীল পরীরা ডাক দিয়েছে—তাই এই দুরন্ত অভিসার!

চাঁদের আলো সারা বর্ষার জলে ধুয়ে মুছে ঝকুঝকে রূপালী রং ধরেছে। রাতের হাওয়ায় শিশিরের আমেজ।

কোণে-কোণে, এখানে-ওখানে, ছড়িয়ে পড়ে আছে অজস্র শিউলী ফুল—লাল বোঁটার উপর শুভ্র দেহলতা বিস্তার করে। তার গন্ধ লেগেছে হাওয়ার কোলে কোলে, দিকে দিগন্তে, মাঠের প্রায় নেমে-যাওয়া জলের বুকে দোলা দিয়ে, পাকা ধানের শীষে পুলক জাগায়ে।

বর্ষামুখর রাতের বিরহী হৃদয় আজ মিলনের আশায় পুলকিত হয়ে ওঠে। চারিদিকে সাজ সাজ রব। বাংলার আকাশ-বাতাস শরতের মিঠা সুরে মুখরিত। বাঙালীর ঘরে ঘরে জননী লিপি পাঠিয়েছেন—মনে আর আনন্দ ধরে না। মায়ের আগমনী বার্তা বাংলার সীমানায় এসে থমকে যায় না। ছুটে চলে দেশে বিদেশে, যেখানে একটিও বাঙালী আছে, যত দূরেই থাক না কেন, সেও ত মায়ের সন্তান।

যার কর্মে সাময়িক অবসর জোটবার সম্ভাবনা তার আর আনন্দের সীমা নেই। যাদের জুটল না, বা পকেট যাদের ভরল না, তারাও দমবার পাত্র নয়। বাঙালীর কাছে প্রবাসী হলেও মা ত আর পর নয়, সবাই সবার মুখের দিকে তাকায়। শেষ পর্যন্ত একটা সভার আয়োজন হয়। পূজা হবে, এটা সবাই একবাক্যে মেনে নেয়। কিন্তু মেনে নেওয়াই শেষ কথা নয়, এর পেছনে চাই মোটা টাকার জোর, সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, আর একটা বিরাট কর্মী-গোষ্ঠী। অনেক বাদানুবাদ আর প্রস্তাব চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত একটা কার্য্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

পরিচালনায় দায়িত্ব যাদের উপর পড়ল তারা ছাড়াও কর্তৃত্ব-লোভী লোকের অভাব নেই। যেখানে বাঙালীর সংখ্যা বেশী আর প্রতিপক্ষের পকেটও মোটামুটি ভারী সে ক্ষেত্রে তারা তাদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য আলাদা পূজোর ব্যবস্থা করে। মুশকিলে পড়ে তারা যারা কোন দলেই নেই, দুই পক্ষই চাঁদার খাতায় মোটা অঙ্ক লেখাবার চেষ্টায় থাকে। আলাদা পূজোর বিরুদ্ধে যুক্তি তুলতে গিয়ে চাঁদাদানকারী থেমে যায় শেষ পর্যন্ত। দুই পক্ষেরই যুক্তি একেবারে অকাট্য। তাই, খাতায় যা হউক একটা অঙ্ক লিখে দিয়ে নিস্তার পায়।

কর্মী নির্বাচন একটা প্রস্তাবনা মাত্র। সত্যিকারের উদ্যোগ-পর্ব্ব সুরু হয় তারপর। একটা রবিবার কিংবা ছুটির দিন সকালবেলা আসর বসে সভাপতির বাড়ী, সভার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে গৃহস্বামিনীর নীরব আয়োজন-সভার পরিবেশকে এক সময় হাস্যমুখর করে তুলতে।

পূজামণ্ডপে প্রসাদ-প্রার্থীর দল

সব চাইতে যে প্রশ্নটি সকলের মনে বিশেষ করে দোলা দেয়, তা হচ্ছে প্রতিমা গড়া। স্থানীয় কুমোর যে পাওয়া যায় না তা নয়; কিন্তু ওদের উপর ভরসা করে কাজে হাত দিলে শেষ পর্যন্ত বেদীর পাশে বড় বড় হরফে লিখে রাখতে হবে কিসের প্রতিমা। তবে এত কি চাঁদা উঠবে যার জোরে একেবারে বাংলা দেশ থেকে কারিগর এনে ঠাকুর গড়াতে পারবে! অনেক ক্ষেত্রেই আর তা হয়ে উঠে না, তবে কি ঘট পূজো করতে হবে নাকি? নৈব নৈব চ।

শুধু মেয়েদের দ্বারা অভিনীত শরৎ চন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' নাটকের একটি দৃশ্য

কাছ থেকে তাদের মতামত (অর্থাৎ তারিফ) শোনবার জন্য। কেউ বলে চমৎকার, কেউ সান্ত্বনা জানায়, 'আরে মশাই, এত হাঙ্গামার মধ্যে যা করে তুলেছেন এই ঢের।' ভাবখানা এই যে তেমন একটা কিছু হয় নি। কেউ বলে, 'ওবার বড্ড ভাল হয়েছিল।'

দ্বিতীয় প্রশ্ন চাঁদা। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়, অন্যান্যবারের মত আমরা মোটেই জোর জুলুম করব না লোকের উপর, কিন্তু আদায় করব সকল বারের চাইতে বেশী। চাঁদার হার নির্দ্দিষ্ট করবার একটা চেষ্টা হয়, কিন্তু অসম্ভব বলে শেষ পর্য্যন্ত সে আশা পরিত্যাগ করতে হয় বাড়ী বাড়ী ঘুরে, নানান যুক্তি দেখিয়ে, দশ রকমের কথা শুনে।
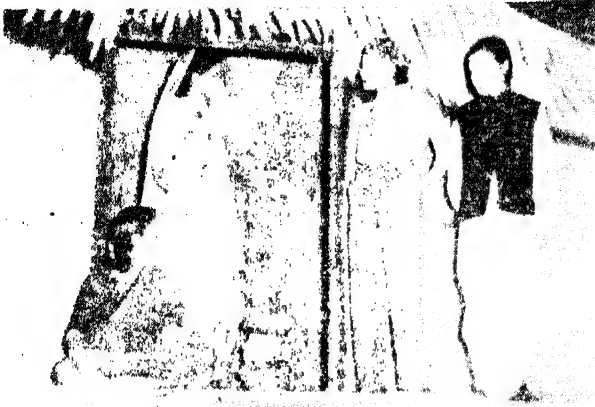
দুই-চারজন গুণী লোক বেরিয়ে পড়ে যাদের হাতের কাজ মন্দ নয়। তারা জানায়, 'সবার সহানুভূতি পেলে আর কিছুই পরোয়া করে না।' অন্য পক্ষেও দুই-চারজন গুণীর সন্ধান আছে, তাদের কাছেও অনুরোধ জানানো হয়, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় না।

কিন্তু কাজ যারা সুরু করেছে তাদেরও আর এত সহজে দমলে চলে না। উৎসাহ আর জেদ এ দুটিকে সম্বল করে শেষ পর্য্যন্ত তারা কাজে নেমে যায়। কাঠ-খড় পোড়াতে না হলেও, যোগাড় করতে বেগ পেতে হয় প্রচুর। দশভুজার একটি ছবি সামনে রেখে দুর্গা বলে কাজ সুরু হয়ে যায়। যারা মনে করেছিল তাদের সহায়তা ভিন্ন এ কাজ একান্ত অসম্ভব, তারা কাজের ছলে পাশ দিয়ে ঘুরে যায়, মনে মনে হাসে—'এবার যা হবে তা···'। কিন্তু কাজে যারা হাত দিয়েছে তারাও হাল ছাড়বার পাত্র নয়। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও বাড়ী ফিরে কোনও রকমে চায়ে চুমুক দিয়ে চলে যায় কালকের ফেলে-আসা কাজ আরও একটু এগিয়ে দিতে। এমনি করেই বেনা বাঁধা শেষ করে মাটি গায়ে লাগে। মাটির পর্ব্বও একদিন শেষ হয়।

মাথাগুলি কিন্তু আসে সুদূর কলকাতা থেকেই। রং দেওয়ার পালা সুরু হলেই খোঁজ পড়ে যায় অতসী ফুলের—মায়ের রঙের সঠিক অনুমান করবার জন্য। কোথাও কোন ব্যতিক্রম ঘটবার উপায় নেই—তা হলে আর রক্ষা থাকবে না। ষষ্ঠী পূজোর শুভলগ্ন এসে যায়। পুরোহিত ঠাকুর তার বরণডালা নিয়ে এসে বেদীর কাছে দাঁড়ান। শিল্পীরা তখনও ব্যস্ত, ঘন ঘন তুলির টান পড়ছে আর ঘাড় বাঁকিয়ে দেখছে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করতে ভুলছে না আশ্বাস-বাণী—'এই ত হয়ে গেল বলে।'

আর থাকা চলে না। শিল্পীরা নেমে আসে বেদীর নীচে, শেষবারের মত একবার দেখে নেয় তেমন কোন মারত্মক ত্রুটি থেকে গেল কিনা। তার পর তাকায় এর ওর মুখের দিকে, দর্শকদের

তার পর বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের অঙ্ক নির্দ্দেশের পালা। রূপসজ্জা আর আমোদ-প্রমোদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে একটা মোটা অঙ্ক। কেননা, কেবল পূজোতে আছে ভক্তের আত্মপ্রসাদ, চিত্তের প্রসন্নতা, কিন্তু এমন অনেক আছে যারা চায় এ উপলক্ষে গত এক বছরের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্যের আস্বাদ লাভ করতে। ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্য্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান একেবারে নিরবচ্ছিন্ন, তাই একদিকে যেমন চলতে থাকে পূজোমণ্ডপের আয়োজন সবার গোচরে তেমনি নাচ, গান, আর অভিনয়ের তোড়জোড় চলতে থাকে নেপথ্যে।

নাটক নির্ব্বাচন একটা বড় পর্ব্ব। কারুর মত ঐতিহাসিক ছাড়া আবার থিয়েটার কি! কেউ বলে, 'ও হচ্ছে গিয়ে সেকেলে রুচি, আজকাল সামাজিকই চালু।' কেউ কেউ এ দুয়ের একটিতেও সম্মতি দিতে পারে না। তারা চায় হাসির খোরাক যোগাবার মত বই। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় সবারই কথা বজায় থেকে যায়। কেননা, অভিনেতার অভাব নেই, বাহুল্য বললেই হয়—তা ছাড়া তিন দিন ব্যাপী আয়োজন চাই। নাটকের বিষয় নির্ব্বাচনই শেষ কথা নয়, বই নির্ব্বাচন তার চেয়ে কম শক্ত নয়। পাত্রপাত্রী (অবশ্য পুরুষেরাই নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়)—আজকাল মেয়েরা এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে পুরুষের সমান তালে পা ফেলে বড় বড় বই মঞ্চস্থ করতে পিছপা হয় না। নির্ব্বাচন ততোধিক গুরুতর ব্যাপার। সবারই চাই চটকদার ভূমিকা একান্তই যদি নায়ক কিংবা নায়িকা না হওয়া গেল। যা হউক প্রাথমিক একটা নির্ব্বাচন হয় বৈ কি? অনেকেরই মন এ নির্ব্বাচনে সায় দেয় না। টের পাওয়া যায় রিহার্সালের সুরুর দিন, পাত্র-পাত্রীদের অনেকেই অনুপস্থিত। পরিচালক (কোথাও স্বয়ংসিদ্ধ, কোথাও বা মেনে নেওয়া) মহোদয়ের প্রায় কন্যাদায়ের মত ব্যাপার। খোঁজ, খোঁজ, যারা উপস্থিত, তাদের মধ্যে যারা আসল ব্যাপার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল

তারা জানায় গলদ কোথায়। বলতে গিয়ে কৌশলে তারা নিজেদের অভিযোগ পেশ করতেও কসুর করে না। পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন অনেক ওলট-পালট করতে হয়।

এমনি করেই ভাঙা-গড়ার পালা বেশ কিছুদিন চলতে থাকে। ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা উত্যক্ত হয়ে উঠেন। মনে মনে, কখন বা প্রকাশ্যেও, প্রতিজ্ঞা করেন—'যথেষ্ট হয়েছে মশাই, ঘেন্না ধরে গেছে আ'সছে বছর থেকে কে এর মধ্যে থাকে।' কিন্তু বছর ঘুরলেই আবার মনটা কেমন যেন চনচনে হয়ে ওঠে।

অনেক রকম ওলটপালট করেও কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সবাইকে খুশী করা যায় না। নিরুপায় হয়ে প্রায় সবাই মেনে নেয় এবারকার মত। তবে এখানেই এর শেষ নয়। যাদের সংগঠন-শক্তি আছে তেমনি তরুণের দল বিদ্রোহ জানায় অমুক নাট্য সমিতি,তমুক অভিনেতৃ-সঙ্ঘ গঠন করে। বয়স যাদের বিদ্রোহে সায় দেবার পরিপন্থী তারা সমালোচনা করেই তৃপ্ত হয়, কিংবা ওদের দলে মিশে যায়। বড়র দল—অর্থাৎ যারা তারকা (পুং)—হাসে—'সেদিনের ছোকরা ওরা আবার করবে প্লে!' বড়রা যাই বলুন না কেন—বিদ্রোহীরাও দমবার পাত্র নয়। চটকদার অভিনয়ে বাজিমাৎ করে আসর জমাবার সঙ্কল্প নানান সূত্রে কানাঘুষায় প্রচারিত হতে থাকে। রিহার্সাল যদিও নিয়ম করে রোজই হয় তবু একমাত্র ষ্টেজ রিহার্সাল ভিন্ন অধিকাংশ দিনই অনেক পাত্র-পাত্রী অনুপস্থিত থাকেন। ষ্টেজে মেরে দেওয়ার দলে তারা।

প্রথম দিন কোন্ বই মঞ্চস্থ হবে তা স্থির করতে বেশ বেগ পেতে হয়। সে দিন ষ্টেজ বাঁধার কাজ শেষ হতে অনেক দেরী হয় বলে অভিনেতাদেরই হাত দিতে হয়। কাজেই কোন দলই প্রথম দিন অভিনয় করতে স্বীকার হতে চায় না সহজে। শেষ পর্য্যন্ত যে দলই প্রথম দিন অভিনয় করুক না কেন তারা দোষত্রুটী ঢেকে দেয়, মন্তব্য করে—'আরে মশাই, ষ্টেজ বেঁধে পার্ট করা চাট্টি কথা নয়, বসে বসে বলতে সবাই পারে।'

সন্ধ্যে হতে না হতেই অভিনেতারা জড় হতে থাকেন—ষ্টার প্লেয়াররা অবশ্য একটু দেরীতেই এসে থাকেন। গ্রীনরুমটি দেখবার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সবাই নিজের মনের মত পোষাক আর মেক-আপের জন্য পেণ্টার কিংবা একটা বড় আয়নার সামনে ভিড় করতে থাকে। ঘোষিত সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, ঘন ঘন মাইকে বলতে হয়—'অনিবার্য্য কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ানুযায়ী অভিনয় সুরু করতে না পেরে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আর মাত্র কয়েক মিনিট দেরী!' শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য ঢুব-র-র-র বাঁশী বাজে আর ড্রপসিন ওঠে।

দর্শক প্যালারীতে—অর্থাৎ ত্রিপল কিংবা সতরঞ্চ-বিছান আসনে প্রথম পঙক্তিগুলি আলো করেন মহিলাবৃন্দ, পেছনে বসে আর

স্বর্গ থেকে ভেসে আসা

দাঁড়ায় ছেলেরা। কয়েকখানা চেয়ার অবশ্য থাকে বহিরাগত সম্মানিত অতিথিদের জন্য।

অভিনয় চলতে থাকে। বিশেষ একটা দিনে হয়ত কোন সরল-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মুগ্ধ দর্শক অভিনেতাকে পুরস্কৃত করতে চায়। কিন্তু দেবার মত সঙ্গে নেই কিছু। শেষ পর্য্যন্ত মেডেল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে দেন কর্ত্তৃপক্ষ দর্শকমশায়ের তরফ থেকে। ব্যস, তার পর আর দেখতে হয় না। একের পর এক প্রতিশ্রুতির বন্যা নেমে আসে। বন্ধু মহল যার সঙ্কীর্ণ সে হতভাগ্য ভিন্ন আর সবারই নাম বানের জলে ভাসতে থাকে।

প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দর্শকরা থাকেন নীরব। কিন্তু এমনিতর আসরে সেটি ঘটবার উপায় নেই। এক বছর পর ওটা হয়ে দাঁড়ায় একটা মিলন-কেন্দ্র। সুখ দুঃখের দু'চারটা কথা তাই বিনিময় না হয়ে পারে না। অনেককেই আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—তারা মাঝে মাঝে রসভঙ্গ করে। চারদিক থেকে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠতে থাকে। মায়েরা শাসন করেন ঐ শিশুদের—'বছরে একটা দিন তাও যদি একটু…'

নাট্যাভিনয় ছাড়া বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করতে হয়। কেননা যারা অভিনয় করতে পারে না অথচ প্রাণে সখ আছে প্রচুর তারা কি তবে কিছুই করবে না। কর্ত্তৃপক্ষ বেশ কিছুদিন আগেই একটা নোটীশ বার করেন আর্টিষ্টদের নাম পেশ করবার জন্য। কা কস্য পরিদেবনা! সখ যাদের বেশী শুধু তারাই এ নোটীশের জবাব দেয়। তার পর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী ঘোরাঘুরি আর ধরাধরি করে আরও কয়েকটা নাম যোগাড় করে একটা অনুষ্ঠান-সূচী খাড়া করেন। কিন্তু অনুষ্ঠান সুরু হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় অনুরোধের পালা। চক্ষুলজ্জার খাতিরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুরোধ মেনে নিতে হয়। অনেক সময় এমনি অনুরোধ সময়াভাবে কিংবা অনিবার্য্য অন্য কোন কারণে প্রত্যাখ্যান করতে হয়।

বিসর্জ্জনের পথে

মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হয়। স্থানীয় অধিকাংশ লোকই স্ব স্ব প্রচেষ্টায় ঘর ভরে দ্রষ্টব্য ছড়িয়ে দেন। গুণাগুণের ক্রম নির্ণয়ের জন্য যাঁরা বিচারক নির্ব্বাচিত হন তাঁরা বন্ধ ঘরে বসে স্থির করেন পুরস্কারের যোগ্য নামের তালিকা।

উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার অবসান করে জননী পদার্পণ করেন সন্তানের অঙ্গনে। শাখের বদলে মাইকে মাইকে ঘোষিত হয় তাঁর মঙ্গল-গান। দলে দলে আসতে থাকে পূজামণ্ডপে—বালক বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নানান বেশে নানান ঢঙে।

গৃহিণীরা শুচিবাস পরিধান করে মাতৃভোগের আয়োজন পূর্ণ করে তুলতে থাকেন। ভারী কাজগুলি থাকে ছেলেদের জন্য। কলহাস্য-মুখরিত অঙ্গন, শুদ্ধোচ্চারিত দেবীমন্ত্রের গম্ভীর নিনাদ, মনকে নিয়ে যায় এক স্বপ্নলোকের দেশে—বছরের বাকী দিনগুলি যেখানে আসে না ভিড় করে হাসি-কান্নার পাড়ি জমাতে।

আস্তে আস্তে অঞ্জলির জন্য ভিড় বাড়তে থাকে। দলে দলে গন্ধ পুষ্প হাতে লয়ে নিবেদন করে মায়ের চরণতলে স্ব স্ব কামনা—মাতা পিতা সন্তানের মঙ্গল, স্বামী স্ত্রী উভয়ের দীর্ঘ জীবন, ছাত্র-ছাত্রী আগতপ্রায় পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল।

কাড়াকাড়ি পড়ে যায় প্রসাদের জন্য। শেষ পর্য্যন্ত একটা লাইন করতে হয় সবাইকে। বহিরাগত অতিথিদের জন্য থাকে আলাদা ব্যবস্থা। হাসিমুখ আর স্বাগত সম্ভাষণে তাদের মন খুশীতে ভরে ওঠে।

সারাটা দিন এমনি হৈ-চৈয়ের মধ্যে কেটে যায়। সন্ধ্যায় বেজে ওঠে আরতির ঘণ্টা। বাংলার বাইরে ঢাক-ঢোলের জমক বাঁধান মুশকিল। বড়জোর মাঝারিগোছের একটা ঢোলক স্থানীয় কোন আনাড়ীর হাতে পড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে। তাল-বেতালের কথা কারুর খেয়ালই হয় না।

ধূপ ধূনার গন্ধে আমোদিত পূজার অঙ্গন এক দিকে যেমন শঙ্খ-ঘণ্টার আওয়াজে মুখরিত হতে থাকে, অন্য দিকে তেমনি সবার চোখের আড়ালে চলতে থাকে অভিনেতাদের প্রস্তুতির পালা। আরতি শেষ হতে না হতেই দলে দলে লোক ছুটে চলে ঘরের দিকে পেটের তাগিদ মিটিয়ে অভিনয় কিংবা বিচিত্রানুষ্ঠানের দর্শক হতে। যাদের ঘরের টান নেই, কিংবা পেটের তাগিদ যাদের তেমন প্রবল নয় তারা আর কালবিলম্ব না করে বসে যান প্রথম পঙ্ক্তি অধিকার করে। ক্রমেই ভিড় বেড়ে উঠতে থাকে—বাঙালী-অবাঙালী হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। অনুষ্ঠানের মর্ম্ম বোঝার দায় অনেকেরই হয়ত নেই। তবুও এরা এসে ভিড় জমায় একটা পরিবর্ত্তনের লোভে, নিত্যকার বৈচিত্র্যহীনতায় ফিরিয়ে আনতে সহজ সুর। অনুষ্ঠান গভীর রাত পর্য্যন্ত চলতে থাকে। শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে কিংবা বাপের কাঁধে। যবনিকাপাত হলে সবাই গা ঝাড়া দিয়ে ওঠেন। ভাললাগা না লাগার সমালোচনা করতে করতে ফিরে যান নিজ নিজ গৃহে। কর্ত্তৃপক্ষের কাউকে কাউকে কিন্তু থেকে যেতে হয় মণ্ডপে। অনেক চেয়েচিন্তে-আনা কিংবা ভাড়া-করা মূল্যবান সামগ্রী প্রহরা দিতে হয়।

এমন করেই আনন্দোচ্ছ্বাসে আর রোমাঞ্চকর পেশার মধ্য দিয়ে তিনটি দিন কেটে যায়। দিনগুলি যেন বড্ড তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। চতুর্থ দিনে বিসর্জ্জনের বাজনা বিরহ-ব্যথা জাগিয়ে তোলে। গৃহিণীরা বরণডালা নিয়ে মায়ের সিঁথিতে সিন্দুর পরিয়ে দিয়ে কামনা করেন যে, তাঁর নিজের সিন্দুর যেন অক্ষয় হয়।

বেদীমূল শূন্য করে এক সময় প্রতিমা লরীবোঝাই হয়ে যায়। শূন্য বেদীর দিকে তাকিয়ে মনটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। শিশুরা ভিড় জমায় লরীর মধ্যে। অনেক সাধ্য সাধনা করে ওদেরকে নামিয়ে দিতে হয়—কলের চাকা ঘুরতে ঘুরতে সবাইকে শেষ বারের মত মাতৃদর্শন করিয়ে ছুটে চলে যায় বিসর্জ্জনের জায়গায়।

ফিরে এসে সবাই আবার জড় হয় মণ্ডপে শূন্যবেদীমূল প্রান্তে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে শান্তিবারি ছিটিয়ে দেন সবার মাথার ওপরে, মুখে উচ্চারণ করেন—ওং শান্তি, ওং শান্তি। তার পর চলতে থাকে প্রাণভরা কোলাকুলি। বিভেদের শেষ দাগটুকুও মুছে যায় সন্ত মাতৃবিরহকাতর মানুষের মন থেকে।*

---

* প্রবন্ধের ফটোগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত

কালিদাস-সাহিত্যে অ-ভারতীয়দের কথা

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবির সাহিত্যের স্থানে স্থানে ভারতের বাহিরের কয়েকটি দেশের বিবরণ পাওয়া যায়, এবং ভারতের ভিতরেও অ-ভারতীয়দের কথাও কিছু কিছু পাওয়া যায়; এখানে সেগুলি দেখানো যাইতেছে।

প্রথমে পারস্য দেশের কথা লইয়া আলোচনা করা যাক। 'রঘুবংশ' কাব্যে—রঘুর দিগ্বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন—

'পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা ॥'-রঘু—৪।৬০

অর্থাৎ, সেখান হইতে তিনি পারসীক দেশ জয় করার জন্য স্থলপথ ধরিয়া চলিলেন। তাঁহার টীকাকার মল্লিনাথ বলেন যে পারসীক দেশ জলপথেও যাওয়া চলিত, তবে 'সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ' থাকায় রঘুকে স্থলপথ দিয়া চলিতে হইয়াছিল।

পারসীক দেশে যাইয়া রঘু কি দেখিলেন? মহাকবি তাহার বিবরণ দিতেছেন—

'যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।

বালাতপমিবাজ্জানামকালজলদোদয়ঃ ॥ রঘু-৪।৬১

'অকালে' মেঘ (বর্ষার নয় শরতের) যেমন পদ্মের অরুণ আভা সহ্য করিতে পারে না, রঘুও তেমনি যবননারীদের পদ্মের মত (সুন্দর সুন্দর) মুখগুলির মদ্যপানজনিত রক্তিম আভা সহ্য হইল না।

পারসীকেরা ভারতের লোক নহেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বলা হইত যবন, ও তাঁহাদের স্ত্রীলোকদিগকে বলা হইত যবনী—যাঁহারা দিনের বেলাতেই মদ্যপানান্তে মুখগুলি লাল করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রঘুসৈন্যগণকে তাঁহাদের দেশে প্রবেশ করিতে দেখিতেছিলেন।

তার পর কি হইল, মহাকবি তাহা জানাইয়া দিতেছেন:

'সংগ্রামস্তুমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ।

শার্ঙ্গকূজিতবিজ্ঞেয়প্রতিযোধে রজস্যভূৎ ॥'-রঘু ৪।৬২

পাশ্চাত্য দেশীয়দিগের অশ্বসৈন্যগণের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ বাধিল এবং রণক্ষেত্রে এমন ধূলি উড়িতে লাগিল যে, কেবলমাত্র ধনুকের টঙ্কারের শব্দে প্রতিপক্ষের যোদ্ধাদিগকে চিনিতে পারা যাইতেছিল।

এখনকার দিনে পাশ্চাত্যদেশীয় বলিতে বুঝায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপীয়দিগকে, আর তখনকার দিনে পাশ্চাত্য শব্দে বুঝাইত পারসীকদিগকে।

সে তুমুল যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন:

'ভল্লাপবর্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্।

তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌদ্রপটলৈরিব ॥' রঘু ৪।৬৩

তিনি বর্শা লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদের (যবনদের) মধুমক্ষিকা-পরিব্যাপ্ত মৌচাকের মত দাড়িওয়ালা মুখগুলি কাটিয়া রণক্ষেত্র ভরাইয়া দিলেন।

পারসীকদের যে তখনকার দিনেও মুখে প্রচুর গোঁফ-দাড়ি থাকিত, সেকথা কালিদাসের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা গেল।

সে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কি হইল মহাকবি তাহা বলিতেছেন:

'অপনীতশিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ।

প্রণিপাতপ্রতীকারঃ সংরম্ভো হি মহাত্মনাম্ ॥' রঘু ৪।৬৪

অবশিষ্ট যবনগণ প্রাণে যাঁহারা বাঁচিয়া রহিলেন, মস্তক হইতে তাঁহারা শিরস্ত্রাণ খুলিয়া রাখিয়া রঘুর শরণাপন্ন হইলেন, মহৎ লোকের ক্রোধ প্রণতি পাইলে শান্ত হইয়া যায়।

মাথা খালি করাটা যে এখনকার মত তখনকার দিনেও পাশ্চাত্য দেশীয়দের সম্মান নিবেদন করার প্রথা ছিল, এখানে তাহাই দেখা যাইতেছে।

যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, পারসীকেরা পরাজয় স্বীকার করিয়া লইলেন, তার পর কি হইল? মহাকবি সেকথা বলিতেছেন:

'বিনয়ন্তে স্ম তদ্যোধা মধুভির্বিজয়শ্রমম্।

আস্তীর্ণাজিনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়ভূমিষু ॥'-রঘু ৪।৬৫

রঘুর যোদ্ধারা যুদ্ধের ক্লান্তি অপনোদন করার জন্য সে দেশের দ্রাক্ষালতা পরিবেষ্টিত ক্ষেত্রে অত্যুৎকৃষ্ট চর্মাসন (কার্পেট) পাতিয়া তাহার উপর সকলে মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

পারস্য দেশে যে আঙুর খুব বেশী পরিমাণে জন্মায়, আঙুরের মদ যে সেখানকার এক লোভনীয় বস্তু, ও সেদেশে যে অতি মনোহর কার্পেট পাওয়া যায়, মহাকবি সে তথ্যগুলি ভালভাবে জানিতেন, নহিলে সেদেশের বিবরণ এমন সুন্দর ভাবে দিতে পারিতেন না।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের পঞ্চম অঙ্কেও 'যবন' ও তাহাদের অশ্বারোহী সৈন্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাকবি

সেখানে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই—বিদিশার রাজা পুষ্পমিত্র পুত্র অগ্নিমিত্রের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া অশ্বমেধযজ্ঞে ব্রতী হইয়া রাজধানীর বাহিরে গিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব যখন সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে বিচরণ করিতেছিল, সে সময় একদল অশ্বারোহী যবনসৈন্য তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, এবং এই যবন সৈন্যদলকে পরাজিত করিতে পুষ্পমিত্রের পৌত্র বসুমিত্রকে রীতিমত বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, যবনেরা সে সময় ভারতের সীমানার মধ্যে সিন্ধুনদের দক্ষিণ ভাগে আধিপত্য লাভের চেষ্টা করিতেছিল। এখানে মনে হয় যেন যবন বলিতে মহাকবি পারসীকদিগকে বুঝাইতেছেন।

'বিক্রমোর্বশী' নাটকে যবনী পরিচারিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা পুরূরবার প্রাসাদে যবনীরা কার্যে নিযুক্ত হইত। রাজা তাহাদের একজনকে ধনুর্বাণ আনিতে আদেশ করিতেছেন, নাটকে এরূপ নির্দেশ পাওয়া যায়। অবশ্য এই যবনীরা পারস্যদেশীয়া না গ্রীকজাতীয়া তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই।

মহাকবির 'নলোদয়' কাব্যে আরবদেশের মরুস্থলের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্লোকটি দেওয়া গেল ঃ

'ইতিকৃতসামারবতঃ সুরলোকাত্তন্মুখেন সামারবতঃ।
ন বিরংসামারবতঃ স্থলাদিব নশ্যৎকমানসামারবতঃ॥'
নল-১।৪১

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করার পূর্বে কিছু পূর্বাংশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। দময়ন্তীর স্বয়ংবর, দেবতারা তাঁহার অসামান্য রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করার বাসনায় সে সভায় আসিয়াছেন, কিন্তু সেখানে নলকে দেখিয়া তাঁহার মত অমন সুদর্শন তরুণ রাজাকে ছাড়িয়া দময়ন্তী যে তাঁহাদের কাহারও কণ্ঠে বরণমালা পরাইবেন এমন ভরসা দেবরাজ ইন্দ্রের রহিল না, তিনি তাই নলকে ডাকিয়া তাঁহাকেই দূত করিয়া দময়ন্তীর কাছে গিয়া বলিতে বলিলেন যে, দেবতারা তাঁহাকে ভালবাসেন ও তিনি যেন তাঁহাদের মধ্যে একজনকে বরণ করেন। ব্যাখ্যাটি এই ঃ

নলের মুখ দেবতাদের সান্ত্বনা-বাণী (প্রেমনিবেদন-বার্তা) শুনিয়াও হংস যেমন জলজ পদার্থে (পদ্ম ইত্যাদিতে) আসক্ত থাকিলে (জল ছাড়িয়া) আরবের মরুময়স্থলে যাইতে চাহে না, তেমনি দময়ন্তীরও মন নলের প্রতি আসক্ত থাকাতে দেবতাদের কাহাকেও বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাঁহার আসিল না।

এখানে 'আরবতঃ মারবতঃ স্থলাৎ' অর্থে আরবের মরুময় ভূমি না করিয়া টীকাকারেরা কেবল 'মারবতঃ স্থলাৎ' অর্থে মরুময় ভূমি করিয়া আরবতঃ শব্দটিকে সুরলোকাৎ শব্দটির বিশেষণ করেন, কিন্তু আরবতঃ কথার অর্থ তাঁহারা শব্দায়মান (চেঁচাইয়া) করেন বলিয়া, মনে হয়, দেবতারা যেখানে নলকে অতি গোপনে দময়ন্তীর কাছে পাঠাইতেছেন সেখানে তাঁহারা চেঁচাইতে যাইবেন কেন? ইহা অতি বিসদৃশ ব্যাপার—সুতরাং 'আরবতঃ' শব্দটিকে 'মারবতঃ স্থলাৎ' শব্দগুলির সহিত যুক্ত করিলে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, অতশত বৎসর পূর্বে কালিদাসের মত ভারতের একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ আরবের মরুভূমির নাম শুনিলেন কিরূপে যে কাব্যে তাহার উপমা দিলেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যিনি রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে পারস্য দেশের বর্ণনা নিখুঁত ভাবে দিয়া গিয়াছেন, তিনি যে পারস্য দেশের পাশের দেশ আরব ও আরবের মরুভূমির নাম কখনও শুনেন নাই, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা হইতে পারে? তিনি যে আরব, পারস্য, চীন, কাম্বোজ প্রভৃতি বহির্ভারতের দেশগুলির নাম ভালরূপে জানিতেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকে চীনদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম অঙ্কের শেষে মহাকবি লিখিতেছেন ঃ

'চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতনিয়মানস্যঃ।'

কোনও পতাকাকে যদি প্রতিকূল বাতাসের দিকে লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে তাহার (পতাকার দণ্ডের উপরিস্থিত) চীনদেশীয় রেশমবস্ত্রের খণ্ড যেমন পশ্চাৎ দিকে উড়িতে থাকে (দুষ্মন্তের মনও তেমনি পিছন দিকে শকুন্তলার কাছে পড়িয়া রহিল, তিনি যদিও সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন)।

টীকাকার মল্লিনাথ 'চীনাংশুক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন ঃ 'চীনদেশোদ্ভূত বস্ত্র' অর্থাৎ, যে বস্ত্র চীনদেশে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং মল্লিনাথও যে চীনদেশের নাম জানিতেন, তাহা তাঁহার লেখা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

'কুমারসম্ভবের' সপ্তম সর্গেও চীনাংশুক শব্দটি পাওয়া যায়। সেখানে মহাকবি বলিতেছেন যে, পার্বতীর বিবাহ উপলক্ষে হিমালয়ের প্রাসাদ পুষ্প প্রভৃতির মত চীনদেশীয় বস্ত্রে সজ্জিত করা হইয়াছিল (কু ৭।৩)।

রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে মহাকবি হুণদেশের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, হুণেরা সে সময় ভারতের উত্তর দিকে পার্বত্য প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইয়াছিল। রঘু সিন্ধুনদের তীর ধরিয়া কুঙ্কুম অর্থাৎ জাফরাণ-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া হিমালয়ের উত্তরে হুণদেশ আক্রমণ করেন। হুণেরা ভারতীয় ছিলেন না, তাঁহারা মধ্য

এশিয়ার এক জাতি। হূণদেশ জয়ের বৃত্তান্ত মহাকবি এই-ভাবে দিয়াছেন ঃ

'তত্র হূণাবরোধানাং ভর্তৃষু ব্যক্ত বিক্রমম্।
কপোল পাটলাদেশে বভুব রঘুবেষ্টিতম্॥'-রঘু-৪।৬৮

অর্থাৎ, সেখানে রঘুর পরাক্রম হূণনারীদের স্বামীদের প্রতি প্রদর্শিত হইয়াছিল, যাহার জন্য নারীদের ক্রন্দনের সহিত কপোলে করাঘাতের ফলে তাঁহাদের গণ্ডস্থল পাটলবর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

হূণরমণীরা যে ক্রন্দনের সময় নিজ নিজ কপোলে করাঘাত করিতেন, মহাকবি এ তথ্যটুকু জানিতেন বলিয়াই একথা লিখিয়াছেন।

হূণদেশ পার হইয়া কাম্বোজে যাইতে হয়, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কাম্বোজীদের দেশ ছিল ভারতের সীমানা হইতে বেশ খানিকটা দূরে। মহাকবি বলেন ঃ

'কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্যমনীশ্বরাঃ।
গজানান পরিক্লিষ্ট রাক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ॥'-রঘু-৪।৬৯

কাম্বোজীরা যুদ্ধে রঘুর বিক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার গজবন্ধনে আনত আখরোট বৃক্ষের মত বিজেতার নিকট নত হইতে বাধ্য হইলেন।

কাম্বোজ দেশে যে প্রচুর আখরোট বৃক্ষ জন্মে কালিদাস এ খবর রাখিয়াছিলেন।

'বিক্রমোর্বশী' নাটকে মহাকবি গন্ধর্বদেশের এক অভিবাদন-প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ যখন তাঁহার ভারতীয় বন্ধু পুরূরবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন প্রথমে উভয়ে উভয়ের হস্ত স্পর্শ করিয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপ করমর্দন করিয়া অভিবাদন করার প্রথা যে সম্পূর্ণরূপে অ-ভারতীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারত ও মহাভারত

শ্রীসুবোধ রায়

অধিরথ সূতপুত্র কর্ণ যেই ক্ষণে
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভার অঙ্গনে
ঘোষিল অকুণ্ঠ কণ্ঠে এই মহাবাণী—
'দৈবায়ত্ত মম জন্ম, কুল নাহি জানি।
জানি মোর অধিকার পৌরুষ পরম
জানি এই—মানুষের ধর্ম্ম সে চরম।'

স্মরণ-অতীত এই সেই যুগক্ষণ হ'তে,
এই মহাবাণী-সত্য মহাকালস্রোতে
ভেসে এলো আমাদের জীবনের তীরে,
জিজ্ঞাসে সে—'তোমাদের হৃদয়-মন্দিরে
কোন দেবতার তরে সাজায়েছ ডালি?
কার উপায়নে রচ তব অর্ঘ্যথালি?
ভীরু যারা, মিথ্যাচারী, সংযমবিহীন,
ক্লিন্ন জীবনের গ্লানি বাহ' নিশিদিন

মানুষের নাম যারা করে কলঙ্কিত,
জাতিগর্ব্বে তারা যদি হইয়া গর্ব্বিত
সমাজের মাঝে আনে অসংখ্য বিভেদ,
তাদের জীবনযজ্ঞ—হীন নরমেধ।
'দূর কর এই হীন মিথ্যা অনাচার,
উচ্চার অকুণ্ঠ কণ্ঠে শুভ সমাচার
মহাভারতের, সেই সনাতন বাণী—
জাতি কুল-বর্ণভেদ কিছু নাহি মানি।
জানি আমি এক জাতি—সে জাতি মানুষ,
জানি আমি এক ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম পৌরুষ;—
যে-পৌরুষ সত্য স্নিগ্ধ, সাধনা ভাস্বর,
যাহার আলোক-স্পর্শে মানব-অন্তর
হয় চিরদীপ্তিমান, জ্যোতির্লোকসম।
মর্ত্তভূমে মানুষ সে মৃত্যুপারঙ্গম
তখনি হইতে পারে—জীবন তাহার
হয় নিত্য আনন্দের অক্ষয় ভাণ্ডার।

ভারতে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের একাদশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ডক্টর মাজা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের একাদশ সভাপতি ডক্টর যোস মাজা নয় দিনের জন্য ভারত সফরে আসিয়া দুই দিন কলিকাতায় ছিলেন। ৭ই অক্টোবর তিনি ইণ্ডিয়ান ফরেন এফেয়ার্স এসোসিয়েশনের এক অভ্যর্থনা-সভায় বলেন যে, পৃথিবীর আদিকাল হইতে যুদ্ধ জিনিষটা মানব-সমাজে রহিয়াছে, বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাকে একেবারে দূর করা যায় নাই। যদি কেহ মনে করেন সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সকল জাতির মনকে এরূপ করিয়া পরিবর্ত্তিত করিবে যে, কোন জাতিই আর যুদ্ধ চাহিবে না তাহা হইলে তিনি একটা অসম্ভব জিনিষ কামনা করিবেন মাত্র। যদি মানুষের আধ্যাত্মিক ও যান্ত্রিক উন্নতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তবে যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব। দুঃখের বিষয় যান্ত্রিক উন্নতির দিকেই মানুষের ঝোঁক বেশী। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই আবার সকল দেশের সমান আর্থিক উন্নতি আবশ্যক। এজন্য সকল অনুন্নত দেশের নিজেদের মধ্যে খুবই সহযোগিতা দরকার। ডক্টর মাজা এই প্রসঙ্গে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ কি করিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ইহা সাংস্কৃতিক, আর্থিক এবং সমাজ-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য্যে বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিতেছে। জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির উপরই বিশ্বশান্তি নির্ভর করে। এক দিনে বিশ্বশান্তি সম্ভব নহে। ভ্রান্ত জ্ঞানের এবং পরস্পর সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা হইতেই যুদ্ধের জন্ম হয়। যে পর্য্যন্ত না লাটিন আমেরিকা ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের আর্থিক উন্নতি হইতেছে ততদিন পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি সম্ভব নহে। ডক্টর যোস মাজা যখন কালীঘাট মন্দিরে নগ্নপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া তাঁহার ললাট চন্দনচর্চ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'চন্দন' শান্তির প্রতীক। ডক্টর যোস এসোসিয়েশনের সভ্যগণকে বলেন, চন্দন চিহ্ন যদি শান্তির প্রতীক হয় তবে তিনি চন্দন-তিলক ধারণ করিয়া পৃথিবীর দেশে দেশে ভ্রমণ করিবেন।
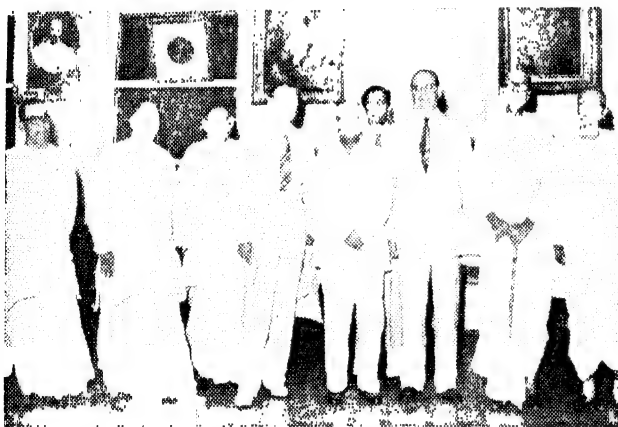
(বাম হইতে) শ্রীসুবর্ণচন্দ্র দাস, শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন মিঃ মিগুয়েল সেরানো, ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীঅনিল গুপ্ত, ডক্টর যোস মাজা, শ্রীসতীনাথ রায় এবং শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত [ক্লিন্যান্স-এর সৌজন্যে

ঐ দিনই এসিয়াটিক সোসাইটির হলে, সোসাইটির এবং কলিকাতা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক তিনি অভিনন্দিত হন। সোসাইটির মূল্যবান গ্রন্থাগার এবং পুরাতন ঐতিহাসিক পুঁথি-পত্রাদি দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। সোসাইটির সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীসতীনাথ রায়ের অভ্যর্থনার উত্তরে ডক্টর মাজা বলেন যে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। পৃথিবীর লোকে ভারতের মহৎ বাণী এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরমতসহিষ্ণুতার কথা জানে। ডক্টর মাজা স্পেনীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতা মিষ্টার মিগুয়েল সেরানো—চিলির চার্জ দ্য এফেয়ার—ইংরেজীতে শ্রোতাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

চিলির ব্যবহারজীবী এবং রাজনৈতিক নেতা ডক্টর যোস মাজা ১৮৮৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা হয়। তিনি ১৯২৫ সনে চিলি পার্লামেণ্টের সেনেটের নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৫ সনে তিনি পার্লামেণ্টের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিক্ষা ও বিচার মন্ত্রী এবং প্রধান মন্ত্রীর পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। চিলির নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র তাঁহার রচিত। তিনি উরুগয়ে, ব্রেজিল, ডোমিনিকান রিপাব্লিক, হেইটি, পানামা এবং পেরুদেশে রাষ্ট্রদূতের কার্য্য করিয়াছিলেন। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ স্থাপিত হইবার উদ্দেশ্যে সানফ্রান্সিস্কো সহরে যে বিশ্বসম্মেলন হয় তাহাতে তিনি চিলির প্রতিনিধি রূপে যোগ দিয়াছিলেন এবং বিশ্ব-সনদ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

সমাজকল্যাণের এদেশীয় কর্ম্মনীতি

ডাঃ জাল ফিরোজ বুলসারা

এশিয়ার সরকারসমূহ এবং জনগণ যুদ্ধোত্তর কালে নিরতিশয় সমাজকল্যাণ-সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অনিবার্য্য কেননা, স্বাধীনতা লোকের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করায় তাহাদের অদৃষ্টের প্রতি এবং মানবের অদৃষ্টকে আলগা ভাবে হইলেও যথাযথ রূপেই কল্যাণলাভরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। কল্যাণ বলিতে বুঝায় সামগ্রিক ভাবে সমাজের শারীরিক, মানসিক, এবং নৈতিক কল্যাণ। এবং যে সকল উপাদানে সমাজ গঠিত—অর্থাৎ ব্যষ্টি এবং পরিবারসমূহ—তাহাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ব্যতিরেকে কোন শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। সামাজিক ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষকদের নিকট ইহা সুপরিস্ফুট হইবে যে, আমাদের সামাজিক কলুষ এবং সমস্যাসমূহের অধিকসংখ্যকেরই উদ্ভব হয় অর্থনৈতিক অভাব হইতে। অনুন্নত দেশসমূহের সমাজকল্যাণ বলিতে তাই মুখ্যতঃ বুঝাইবে উন্নয়নের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর জোর দেওয়া। ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে মাথাপিছু উৎপাদনবৃদ্ধি, উচ্চতর পারিবারিক আয় এবং জাতীয় ধন-সম্পদের সমবণ্টন।

অনুন্নত দেশসমূহে সামাজিক কলুষের অর্থনৈতিক ভিত্তি

কাজেই যে ক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নত শিল্পায়িত দেশসমূহে সমাজকল্যাণ বলিতে অধিকতররূপে বুঝায় এখানে সেখানে উদ্ভূত বেকার-সমস্যার উপশম এবং তদানুষঙ্গিক সামাজিক কলুষের লাঘব, সেক্ষেত্রে অনুন্নত দেশসমূহে সাহায্য এবং পুনর্ব্বাসনকে ব্যাপকভাবে মিশ্রিত করিতে হইবে আর্থিক সাহায্যের সহিত। শিল্পায়িত পাশ্চাত্য দেশগুলি অভাব অনটনের সমস্যা অথবা জীবনধারণের মূলগত প্রয়োজনসমূহের অল্পবিস্তর সমাধান করিয়াছে এবং আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়া সার্ব্বিক সামাজিক নিরাপত্তার সুষ্ঠু স্তরে পৌঁছিয়াছে। অধিকন্তু শিল্পায়িত পাশ্চাত্য সমাজসমূহের জনগণের শতকরা ৫০ হইতে ৮০ ভাগ নাগরিক সেক্ষেত্রে অনুন্নত দেশগুলির জনগণের মধ্যে শতকরা ৮০ হইতে ৯০ জন কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভর করিয়া এবং অধিকতর গ্রাম্য অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করে।

সামাজিক সমস্যাসমূহের উপর বহুমুখী অভিযান একান্ত আবশ্যক

কাজেই সমাজকল্যাণের এ-দেশীয় কর্ম্মনীতি স্বভাবতঃই শিল্পায়িত পাশ্চাত্য সমাজসমূহের উপযোগী কর্ম্মপন্থা হইতে মূলতঃ কতকটা ভিন্ন ধরনের হইবে। প্রথমতঃ কৃষিনির্ভর সমাজে সমাজকল্যাণ-সমস্যা ঢের বেশী ব্যাপক এবং অধিকতর জটিল। কাজেই চড়াও করিতে হইবে বিভিন্ন মুখ হইতে। অর্থাৎ কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞান এবং যন্ত্রের প্রয়োগ, যন্ত্র-বিদ্যা সম্পর্কিত কিসে কি হয় ক্রমে ক্রমে সেই জ্ঞানের প্রবর্ত্তন, শিল্পায়নের বৃদ্ধি, জনগণের মনোভাব এবং আদিম ধরনের জীবনযাপন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তন—এসকল উদ্দেশ্যে মূল-গত এবং সামাজিক শিক্ষা এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের ও জীবন-চর্য্যার অভ্যাসের উন্নয়ন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিকল্পিত সরকারী সাহায্যে স্বেচ্ছামূলক সামাজিক প্রচেষ্টাসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা

প্রতিকারমূলক এবং উন্নতিবিধায়ক ব্যবস্থাসমূহের প্রয়োগ এমন বিস্তৃত পটভূমিকার উপর করিতে হইবে যে, স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টাগুলিকে পরিপূরণ করা হইবে আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক একটি সুপরিকল্পিত সরকারী প্রোগ্রামের দ্বারা। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার যে-যে উত্তাল তরঙ্গ এক বা অন্যরূপে আফ্রিকা-এশিয়া এবং ওসিয়ানিয়ার মহাদেশসমূহকে প্লাবিত করিতেছে তাহা কেবলমাত্র আকস্মিক ঘটনা নয়, দেশীয় কর্ম্মসূচীসমূহও তাই কেবল পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি কর্ম্মকৌশল এবং রূপের অন্ধ অনুকরণমাত্র হইতে পারে না। মূলতঃ তাহার উদ্ভূত হইয়াছে খাঁটি এদেশীয় প্রয়োজনে এবং দেশীয় পটভূমিকাতেই

তাহাদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইয়াছে। স্থানীয় মানবিক এবং আর্থিক সম্পদের সহায়ে তাহাদিগকে চালু রাখিতে হইবে এবং এগুলি স্বভাবতঃই সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হইবে যখন স্থানীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা মনে রাখা যাইবে আর সুচিন্তিতভাবে জাতীয় উদ্দেশ্যসমূহের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইবে।

অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত বৃহৎ পরিবারসমূহ এবং দৈহিক ত্রুটিযুক্ত লোকেদের সমস্যা

অনুন্নত দেশসমূহে যে সমস্যাটি মাথা ঘামানোর কারণ তাহা হইতেছে একদিকে জন্মহারের বিপুল বৃদ্ধি, অন্যদিকে দ্রুত হ্রাসমান মৃত্যুহার এবং ক্রমবর্দ্ধমান পুষ্টিহীনতা। শিল্পায়িত সমাজসমূহ অন্ধ, মূক-বধির, মৃগী এবং যক্ষ্মারোগী, নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ প্রভৃতি তাহাদের সমাজের বিভিন্ন প্রকার দৈহিক অপটুতা-গ্রস্ত জনসমষ্টির পুনর্ব্বাসনের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিশেষ ধরনের এবং কতকটা ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। অনুন্নত সমাজসমূহের শারীরিক, সামাজিক এবং মানসিক দিক দিয়া অপটুতাগ্রস্তদের সমস্যা কিন্তু এত ব্যাপক এবং শিক্ষিত কর্ম্মী ও প্রাপ্তব্য আর্থিক সংস্থানের পরিমাণ এত কম যে, আপাততঃ তাহাদিগকে কেবলমাত্র ভাসা ভাসা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তাহাদিগকে ব্যাপক আকারের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকার্য্য এবং শিক্ষামূলক কাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে এই আশায় যে, এক বা দুই পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়া অপটুতাগ্রস্তদের সংখ্যা এমন ভাবে কমিয়া আসিবে যে, আগামী কালের সরকার অধিকতর সম্যক্ ভাবে এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিতে উৎসাহিত হইবেন।

স্বাস্থ্যোন্নয়ন কর্ম্ম এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা

অনুরূপ ভাবে যথোচিত স্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক কর্ম্মের ব্যবস্থাও করিতে হইবে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার অনুকরণ করিয়া নয়। কেননা ওদেশে লোকসংখ্যার অনুপাতে রোগীর শয্যাদির যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা দরিদ্র সমাজসমূহের ক্ষমতার বাহিরে। এদেশে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভাবে জোর দিতে হইবে, বিদ্যালয়, ফ্যাক্টরি, বয়স্ক ক্লাস, সিনেমা, রেডিও এবং সংবাদপত্র, ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী, বাজার এবং মেলায় প্রচারকার্য্য ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারসাধনের উপর।

ব্যষ্টিগত কর্ম্ম এবং সমষ্টিগত কর্ম্ম মূলতঃ পৃথক নয়

আমরা একথা বলিতেছি না যে, শিল্পায়িত সমাজগুলিতে যে সকল পদ্ধতি আঙ্গিক এবং কর্ম্মনীতি পরীক্ষিত ও সাফল্যমণ্ডিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেগুলি হইতে অনুন্নত দেশসমূহের সমাজকর্ম্মীদের কিছুই শিক্ষণীয় নাই। বস্তুতঃ তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষণের অনেকখানিই প্রদান করিতে হইবে অনুরূপ পদ্ধতিতে আর পরীক্ষিত ও সাফল্যমণ্ডিত আঙ্গিকসমূহ এবং কর্ম্মনীতির প্রণালী শিখিতে হইবে যদিও কার্য্যতঃ তাহাদের প্রয়োগকে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইবার প্রয়োজন হইতে পারে।

সামাজিক কর্ম্মনীতির উপর জাতীয় সমাজদর্শনের প্রভাব

সমাজসমূহ তাহাদের অতীতের অভিজ্ঞতা, ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাহাদের দ্বারা গৃহীত সাধারণ জীবন-দর্শন দ্বারাও প্রভাবিত হয়। কাজেই আমাদের সমাজ-কল্যাণমূলক কর্ম্মনীতি আমাদের গণতান্ত্রিক এবং সমাজ-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং আমাদের সংস্থা-সমূহেরও বিকেন্দ্রীকরণ করিতে হইবে। তাহাতে স্থানীয় জনসমাজকে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-গঠনের অধিকতর দায়িত্ব দেওয়া হইবে এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও পরিকল্পনাসমূহের জন্য যাহাতে তাহারা রাজ্য অথবা কেন্দ্র হইতে আর্থিক কিংবা যান্ত্রিক সাহায্য পাইতে পারে সে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের লক্ষ্যবস্তু অনুরূপ

সমাজকল্যাণের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে এক সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের মূলগত কোন পার্থক্য নাই। কেননা, যেমন ক্ষুধা, জ্ঞান, সামাজিক মর্য্যাদা তেমনি বেদনা ব্যাধি এবং দুর্গতির প্রতি পরাঙ্মুখতাও মানব-পরিবারে সমরূপ এবং সার্ব্বজনীন। এইদিক দিয়া মানুষের মন যখন বিচিত্ররূপী তখন তাহার অভিব্যক্তিও বহুমুখী হইতে বাধ্য। মানুষের মন যখন নিজের ছাড়া অপরের এই ভাবাদর্শ গ্রহণক্ষম এবং সংবেদনশীল তখন সামাজিক কলুষের প্রতিকারের এই আঙ্গিক এবং পদ্ধতিসমূহও এক সমাজ হইতে আর এক সমাজে বিচরণ করিতে এবং গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হইতে বাধ্য। মানব-সভ্যতার বিশেষত্ব এই—ইহা একটি বিশ্ব-জনীন উত্তরাধিকার এবং ইতিহাস ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে, ভাব এবং আদর্শসমূহের পাখা আছে, তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় অথবা তাহাদিগকে ধার করা হয়। প্রতিকারমূলক উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রয়োগ-পদ্ধতিতে কিন্তু সংস্কৃতির স্তর, সমসাময়িক পরিস্থিতি, মানবীয় এবং আর্থিক সম্পদ এবং মনোভাব অনুযায়ী এক সমাজের সঙ্গে অপর সমাজের পার্থক্য থাকিতে পারে। এই হইতেছে ঠিক ক্ষেত্র যেখানে শিক্ষিত এবং জ্ঞানী সমাজকর্ম্মী অনুশীলন এবং তথ্যানুসন্ধান করেন এবং নিজেকে আর তাঁর পদ্ধতিসমূহকে জটিল স্থানীয় সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লন।

বোম্বাইয়ে অন্ধদের নব শিল্পনিকেতন

বোম্বাইয়ে শীঘ্রই অন্ধদের জন্য একটি নূতন শিল্প-নিকেতন প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই হোমে গ্রামাঞ্চল হইতে আগত অন্ধদিগকে কৃষিবিষয়ক শিক্ষাও দেওয়া হইবে।

অন্ধদের জন্য শিল্প-নিকেতনের প্রয়োজনীয়তা

সমগ্র ভারতে অন্ধদের জন্য স্থাপিত সত্তরটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ষাটটিই সাধারণ অন্ধ বিদ্যালয়—এগুলিতে আঠারো বৎসরের নিম্নবয়স্ক অন্ধদেরই মাত্র ভর্তি করা হয়। অন্ধদিগকে কৃষিবিষয়ক শিক্ষাদানের কোন সুযোগ সুবিধাই এগুলিতে বিদ্যমান নাই। বিপুলসংখ্যক বয়স্ক অন্ধদিগকে শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধা নিতান্তই অযথেষ্ট। বয়স্ক অন্ধদের জন্য এই ধরণের একটি হোমের প্রয়োজনীতা, কাজেই অপরিহার্য্য।

বোম্বাই রাজ্যে সুযোগ সুবিধা

এমনকি বোম্বাই রাজ্যেও—যেখানে অন্ধের সংখ্যা প্রায় ১,৫০,০০০—অন্ধদের জন্য আমাদের একটি মাত্র শিল্প-নিকেতন আছে। ওরলির এন. এস. ডি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল হোম ফর দি ব্লাইণ্ড নামক প্রতিষ্ঠানটির আবাসিকদের অনুমোদিত সংখ্যা ইতিমধ্যেই সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং যেখানে ১২০ জন অন্ধের স্থান সঙ্কুলান হওয়ার কথা সেখানে ১৫১ জন অবস্থান করিতেছে। গত বৎসর এই হোমের আবাসিকগণ বেতের কাজ, তাঁতবোনা এবং ঐকতান বাদন ইত্যাদি দ্বারা প্রায় ৪০,০০০ টাকা রোজগার করিয়াছে। সমগ্র ভারতে অন্ধদের যে-কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা 'রেকর্ড' বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই অসাধারণ সাফল্যলাভ সম্ভবপর হইয়াছিল এইজন্য যে, বোম্বাই সরকার বোম্বাইয়ের যাবতীয় সরকারী আপিসগুলিকে এই নির্দ্দেশ দিয়া আদেশ জারী করেন যে, যেমন চেয়ারগুলিতে নূতন করিয়া বেত লাগানো তেমনি ছোটখাটো কাঠের মেরামতি কাজও এই হোমকে দিতে হইবে। অনুরূপ ভাবে সরকার তাঁহাদের প্রয়োজনীয় ডাষ্টারগুলিও এই হোম হইতে ক্রয় করেন।

কমিটি

এই নব নিকেতনের কার্য্য পরিচালিত হইবে নেশন্যাল এসোসিয়েশন ফর দি ব্লাইণ্ড নামক সংস্থার উদ্যোগে। বোম্বাই সরকারের শ্রম ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনারেবল শ্রীশান্তিলাল এইচ. শাহকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি প্রভাবশালী ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় সমাজকর্ম্মী শ্রীমতী মিথান জেলাম এই কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছে লেঃ জে. এল. নার্দ্দেকার এবং ক্যাপ্টেইন এইচ জে. এম. দেশাই এঁরা দুজন এই নব নিকেতনের কর্ম্মসচিব।

পঞ্চাশ জন অন্ধের স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা

হোমের কাজের সূচনা হইবে ১৯৫৬ সনের ১৬ই জুলাই হইতে। প্রথম বৎসরে পঞ্চাশ জন বয়স্ক অন্ধকে ভর্ত্তি করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভবপর হইয়াছে পরলোকগত শেঠ কাওয়াসজী মুঞ্চারজি বানাজীর ট্রাষ্টীদের উদার আনুকূল্যের দরুন। অত্যন্ত ঔদার্য্যের সহিত তাঁহারা প্রায় আট হাজার বর্গগজ পরিমিত চতুষ্পার্শ্বস্থ জমি সমন্বিত একটি প্রকাণ্ড বাংলো, বাৎসরিক নামমাত্র এক টাকা ভাড়ায় নেশন্যাল এসোসিয়েশন ফর দি ব্লাইণ্ড নামক সংস্থাটির কর্ত্তৃত্বাধীনে অর্পণ করিয়াছেন—যে পর্য্যন্ত এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক অন্ধদের জন্য একটি শিল্পনিকেতন পরিচালনাকল্পে ঐ সম্পত্তি ব্যবহৃত হইবে ততদিন পর্য্যন্ত উহার কর্ত্তৃত্বভার থাকিবে উক্ত এসোসিয়েশনেরই উপর।

কৃষি ও শিল্প

এই নব নিকেতনে তাঁতবোনা, বেতের কাজ, বাস্কেট এবং ব্রাশ তৈরি, সঙ্গীত এবং ব্রেইল পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হইবে। অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে গ্রামাঞ্চল হইতে আগত অন্ধদিগকে।

পল্লী অঞ্চলে নিজেদের জোতে স্থায়ীভাবে বসবাসের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদিগকে কৃষি, হাঁস-মুরগী পালন এবং এগুলির সহিত সম্বন্ধযুক্ত বৃত্তিসমূহে চরম মাত্রায় শিক্ষাদান করা হইবে।

এই নূতন 'হোম' "দি মুঞ্চারজি, নৌরোজী বানাজী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হোম ফর দি ব্লাইণ্ড" নামে অভিহিত হইবে। পরলোকগত শেঠ কাওয়াসজী মুঞ্চারজী বানাজীর ট্রাষ্টীদের চেয়ারম্যানরূপে যিনি উক্ত অন্ধ শিল্প নকেতনের ব্যবহারার্থে এই উৎকৃষ্ট সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন সেই কুমারী সেরেনবাঈ এম. বানাজী এমন একজন ভদ্রমহিলা যিনি বদান্যতারূপ পুণ্যকৃত্যে তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁর এই দানের জন্য নগরীর অন্ধেরা তাঁহার নিকট বিশেষ

ভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবে। আশা করা যায় যে, তাঁহার আশীর্ব্বাদে এবং আবাসিকদের কৃতজ্ঞতাবোধের কল্যাণে এই প্রতিষ্ঠানটি অন্ধদের পুনর্ব্বাসনের স্থায়ী কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে।

দি নেশন্যাল এসোসিয়েশন ফর দি ব্লাইণ্ড

১৯৫২ সনের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে, বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম নিখিল ভারত অন্ধ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত এই এসোসিয়েশন এরূপ স্বল্প সময়ের মধ্যেই ভাল কাজ করিতে পারিয়াছে। পঞ্চাশ জনের অধিক অন্ধকে বিনিযোগ করা হইয়াছে খোলা শিল্পে। তাহারা দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন কর্ম্মীদের ন্যায় একই ধরণের কাজ করিতেছে এবং সমপরিমাণ মজুরি পাইতেছে। এন. এ. বি. অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য দান করিয়াছে এবং কলেজে অধ্যয়নরত অন্ধদিগকে বৃত্তিও প্রদান করিয়াছে। ইহা ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির সহিত একযোগ যেমন অন্ধতা নিবারণ এবং আরোগ্যবিধান তেমনি অন্ধদের পুনর্ব্বাসন, শিক্ষণ, কর্ম্মে নিয়োগ এবং আরোগ্যোত্তর পরিচর্য্যা ইত্যাদি যাবতীয় দিক সংক্রান্ত কতকগুলি নীতিগত বিষয় নির্দ্ধারণে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

এন. এ. বি-র দৃষ্টান্তেই ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট অন্ধ, মূক এবং দৃষ্টিহীনদের জন্য জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিয়াছেন।

এই ধরনের আরো বহু শিল্প নিকেতনের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা সুস্পষ্ট।

সমাজে অন্ধদের প্রতিষ্ঠা

এ. এইচ. মর্টিমের

অন্ধেরা যাহাতে তাহাদের দৈহিক ত্রুটি অতিক্রম করিয়া স্বাভাবিক মানুষরূপে সমাজে নিজেদের স্থান করিয়া লইতে পারে তাহাই হওয়া উচিত যাবতীয় অন্ধ-কল্যাণকর্ম্মের চরম লক্ষ্য। এই নীতির উপরই দেরাদুনস্থ বয়স্ক অন্ধদের শিক্ষণকেন্দ্রের সমগ্র কর্ম্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। সুস্থ ব্যক্তিরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা বলিতে, অন্ধদের বেলায় কেবলমাত্র নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা অর্জ্জনই বুঝায় না, কিন্তু ইহার চেয়েও যে ঢের বেশী সূক্ষ্ম সমস্যা ইহার অঙ্গীভূত তাহা হইতেছে এই যে, তাহারা নিজেদের এমনভাবে পরিচালিত করিবে যাহাতে সমাজও সর্ব্বতোভাবে তাহাদের দৈহিক ত্রুটির কথা ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগকে স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে গ্রহণ করিবে। আপাতদৃষ্টিতে কার্য্যতঃ ইহা অসম্ভাব্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। তথাপি এমন সব অন্ধ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে যাহাদের অন্ধত্ব তাহাদের স্বাভাবিক আচরণের এত স্বল্প পরিপন্থী যে, সময় সময় তাহাদের সামনে চিঠি এবং কাগজ-পত্র মেলিয়া ধরিয়া বলিয়াছি—"এটা পড় ত" এবং তাহাদের অন্ধত্বের কথা ভুলিয়া যাওয়ার দরুন বরং বোকাই বনিয়া গিয়াছি।

বিভিন্ন কারিগরী কাজে অন্ধদের যথাযথ শিক্ষণের বেলায় কলাকৌশল সংক্রান্ত খুবই স্বল্প পরিমাণ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সরকারী সংস্থা বলিয়া টি. সি. এ. বি. বেসরকারী প্রচেষ্টার পরিচালনাধীন সংস্থাসমূহ হইতে অনেক দিক দিয়াই অপেক্ষাকৃত ভাল, কেননা শেষোক্তগুলির পরিকল্পনাসমূহকে, অর্থসাহায্যের আকারে সাধারণের সহানুভূতি তাহারা যতটুকু আকর্ষণ করিতে পারে সেই গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। টি. সি. এ. বি.কে সরকারী বাজেট হইতে যে ব্যয়বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা বেশ অকৃপণ এবং আমরা কেবল যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম লাভেই সমর্থ হইয়াছি তাহা নয়, যথোচিত কর্ম্মীসংসদ নিয়োগ করিতেও পারিয়াছি। অন্ধদের প্রকৃত শিক্ষণের বেলায় প্রাথমিক প্রধান অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় তাহাদের সম্ভাব্য শক্তি সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে গিয়া। আমরা দেখিয়াছি যে, কর্ম্মীসংসদে বিশেষ ভাবে প্রকৃত শিক্ষণ বিভাগে—উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য অন্ধ ব্যক্তি থাকিলে তাহা বিশেষভাবে সুফলপ্রদ হয়। সে ক্ষেত্রে হাতে-কলমে প্রদর্শন দ্বারা অন্ধদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করাইতে আমরা সমর্থ হইয়াছি যে, আমরা তাহাদিগকে যে সকল কাজ করিতে বলি তাহা তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত নহে। একবার এই অবস্থায় পৌঁছিলে পর অন্ধত্ব ছাড়া বাকি

আর কোনও ত্রুটি না থাকে তাহা হইলে শিক্ষার্থীরা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

যে সকল প্রধান বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলি গ্রামীণ কারিগরী কাজের ধরনের, যেমন—তাঁতবোনা, উলের জিনিষ বোনা, নেওয়ার তৈরি, মোমবাতি এবং ছাঁচে ফেলিয়া প্লাষ্টিকের বিভিন্ন জিনিষ তৈরি করা ইত্যাদি। এগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আছে ব্রেইল এবং টাইপ রাইটিঙের ক্লাস, আর আমাদের সেই পুরনো অবলম্বন সঙ্গীত ত আছেই। আমরা যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি শিখাইয়া থাকি চেয়ারে বেত লাগানো তাহাদের অন্যতম। একদিকে যেমন আমরা এই আশা পোষণ করি যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক লোক এখানে যে সকল বৃত্তি শিক্ষা করে সেগুলি অভ্যাস করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে, অন্যদিকে আমরা খোলা শিল্পে (Open Industry) লাভজনক কর্ম্মে যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব অন্ধদিগকে কাজে লাগাইবার প্রয়োজনীয়তার উপরেও বিশেষভাবে জোর দিয়া থাকি। শিল্পে বিশেষতঃ যেগুলিতে পৌনঃপুনিকতার দরকার সেগুলিতে এমন বহু কাজ আছে যেগুলি অন্ধেরা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ভ্রাতাদের মতই সুষ্ঠুভাবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহাদের চেয়েও উৎকৃষ্টতররূপে সম্পন্ন করিতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে গ্রামীণ কারিগরী কাজ আমরা শিখাই তাহা কিরূপে ঐ সকল লোকের উপযোগী হইতে পারে। ইহার জবাব হইতেছে এই যে, এই সকল সাদাসিধা বৃত্তিশিক্ষার দরুন একবার যদি আত্ম-বিশ্বাস সৃষ্টি এবং হাতের কাজে দক্ষতা অর্জ্জিত হয় তাহা হইলে অন্ধ লোকের পক্ষে এই ধরনের পৌনঃপুনিক কার্য্য আয়ত্ত করিতে খুব স্বল্পপরিমাণ আয়াস স্বীকার করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—যে লোক হস্তচালিত তাঁতে হরেক রঙের নক্সা বুনিতে শিখিয়াছে, সে বাস্তবিকই একটি জটিল ধরনের কার্য্য আয়ত্ত করিয়াছে এবং অনেকগুলি শিল্পকর্ম্ম সম্পাদনে প্রয়োজনীয়, সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত কম জটিল একটি বা দুটি হাত এবং আঙুল চালানোর প্রণালীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে গিয়া তাহাকে কোন প্রকার অসুবিধায়ই পড়িতে হয় না। আবার যে শিক্ষার্থী মেশিনের অংশগুলি খুলিয়া আলাদা আলাদা করিয়া লওয়া এবং তাহা-দিগকে পুনরায় একত্রিত করা এই দুটি প্রণালী শিখিয়াছে তাহাকে যখন কোন শিল্প-সংক্রান্ত কাজে সাধারণ যন্ত্র চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হয় তখন তাহার মনে থাকে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস এবং আপন কাজে যন্ত্রপাতি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে এই চিন্তা তাহার মনে মোটেই ভীতির উদ্রেক করে না।

যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোন উদ্যোগের সূচনা হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন করিতে উহা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে কেবল-মাত্র তাহা দ্বারাই উক্ত উদ্যোগের সাফল্যের পরিমাপ করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে তদনুযায়ী হইতে টি. সি. এ. বি কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছে? একেবারে গোড়া হইতেই ইহা উপলব্ধ হইয়াছিল যে, কর্ম্ম নিয়োগ-কার্য্যকে বাস্তবভাবে ফলপ্রদ করিতে হইলে উহাকে যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে। ইহাও উপলব্ধি করা গিয়াছিল যে, ঐরূপ সংস্থা গড়িয়া তুলিতে কিছু সময় লাগিবে, উপরন্তু ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, একদিকে যেমন অন্ধদের বিনিয়োগ-কার্য্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক কার্য্যক্রম গৃহীত হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি কতকগুলি বিশিষ্ট ধরনের কাজে একজন বা দুইজন যোগ্য অন্ধ ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে—কেবলমাত্র তাহাদের প্রকৃত ক্ষমতার মূল্য নির্দ্ধারণের জন্যই নয়, কিন্তু ইহার চেয়েও যাহা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইতেছে যেমন নিয়োগকারীদের তেমনি তাহাদের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন সহকর্ম্মীদের মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় তাহা লক্ষ্য করা। অচিরেই দেখা গেল, অন্ধদিগকে যে তাঁহাদের সংস্থায় লাভজনক ভাবে কর্ম্মে নিয়োগ করা যাইতে পারে অধিকাংশ মালিকই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, কিন্তু মুষ্টিমেয় যে কয়জন অন্ধদিগকে একটা সুযোগ দিতে তৈরী ছিলেন তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদের নিয়োজিত অন্ধব্যক্তি-দের কৃত কর্ম্মে পুরাপুরিই সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাও দেখা গেল যে, অন্ধদের সঙ্গে পাশাপাশি কর্ম্মরত, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকেরা মোটের উপর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাববিশিষ্ট।

ইতিমধ্যে বোম্বাই এবং কলিকাতার দুই-একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজের নমুনা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান এবং কাজের বিশ্লেষণকল্পে কর্ম্মপন্থা গৃহীত হইয়াছিল। এই সকল তথ্যানু-সন্ধানের ফলে যদিও কলিকাতায় কেবলমাত্র একজন ছাড়া আর কোন অন্ধব্যক্তিকে আশু কর্ম্মে নিয়োগ করা সম্ভবপর হয় নাই, তথাপি এই সকলের দৌলতে আমরা এই আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হই যে, খোলা শিল্পে অন্ধদের সম্ভাব্য বিনিয়োগের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বিদ্যমান। পরে মাদ্রাজ অঞ্চলে কর্ম্মে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ব্যাপকতর অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। এই অনুসন্ধানের ফলে ছয় জন অন্ধ লোককে কাজে লাগানো হয়। এই তথ্যানুসন্ধানের প্রত্যক্ষ ফল-স্বরূপেই মাদ্রাজের টি.সি.এ.বি.'র শাখা হিসাবে একটি কর্ম্মে বিনিয়োগ আপিস প্রতিষ্ঠা করা

স্থিরীকৃত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে এই আপিস প্রতিষ্ঠিত হয় খাঁটি পরীক্ষণমূলক স্বল্পমেয়াদী ভিত্তির উপর। এই ধরনের একটি নূতন উদ্যম সম্বন্ধে যেমনটি আশা করা যায়—কাজটি তেমনটি সহজসাধ্য হয় নাই এবং ফলসমূহও প্রদর্শন-যোগ্য হয় নাই। আমাদের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে এগুলি কিন্তু খুবই উৎসাহপ্রদ হইয়াছে, কেননা এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যখন যথাযথ ভাবে তাহাদের দ্বারস্থ হওয়া যায় শিল্পপতিরা তখন অন্ধদিগকে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করিবার জন্য সুযোগ দিতে তৈরী থাকেন। তদুপরি, নিয়োগকারী এই উদ্যমকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নিজের বাঁধাধরা পথ ছাড়িয়া অগ্রসর হইতেও প্রস্তুত আছেন। মোটের উপর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন সহকর্মীরাও অন্ধদের প্রতি কোন আনুকূল্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেন নাই। এমনটি যে সকল সময়েই ঘটিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু যেখানে অন্ধদের সহিত কর্ম্মরত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকেরা সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে এবং পরিপূর্ণ রূপে সহযোগিতা করে নাই, সেখানে পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে বোধগম্য ভাষায় তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া এবং তাহাদের নিকট সমগ্র পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তনে প্রণোদিত করা সম্ভবপর।

কর্ম্ম-নিয়োগের পরীক্ষণ আরম্ভ হইবার পর হইতে আমরা সবশুদ্ধ ৬৭ জন অন্ধকর্ম্মীকে কাজে নিযুক্ত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। তাহাদিগকে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বা সামরিক দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদির কারখানায় ইনস্পেকশন ডিপার্টমেন্টে কাজে লাগানো হইয়াছে। তা ছাড়া তাহাদিগকে বয়নশিল্পের কারখানায়, দেশলাইয়ের কারখানায়, ভারতীয় টেলিফোন-শিল্পে এবং কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সকলকেই যে শিল্পে নিয়োগ করা হইয়াছে তেমন নহে। কয়েকজনকে পাঠানো হইয়াছে শিক্ষক রূপে অন্ধদের অন্যান্য বিদ্যালয়ে এবং অল্প কয়েকজনকে তাহাদের নিজস্ব তাঁতবোনা অথবা চেয়ারে বেত লাগানো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা হইয়াছে। সরকার এমন একটি বিশেষ ফণ্ড চালু রাখিয়াছেন যাহা হইতে অন্ধদিগকে তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য 'সংস্থাপন সাহায্য' দেওয়া হইয়া থাকে। এই পরিকল্পনার চরম সাফল্য এই বিষয়টি হইতে বিচার করা যাইতে পারে যে, আমরা এখন এমন সব ভাবী শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে অনেকগুলি আবেদনপত্র পাই যাহারা কি ভাবে আমরা অন্ধদের জন্য কর্ম্মের সংস্থান করিয়া থাকি তাহা শুনিয়াছে। টি.সি.এ.বি-তে শিক্ষালাভের এবং তার পর আমাদের ক্ষুদ্র সংস্থাপন সংস্থার মাধ্যমে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে তাহারা উৎসুক।

যাহারা এই ধরনের কাজের ভার গ্রহণ করিতে আগ্রহশীল তাহাদের প্রতি উপদেশমূলক কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথমতঃ ইহা মনে রাখা একান্ত রূপে প্রয়োজনীয় যে, "দরিদ্র নিঃসহায় অন্ধে"র জন্য সাহায্যপ্রার্থী হইয়া নিয়োগকারীর দ্বারস্থ হওয়া সমীচীন হইবে না। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার যথার্থ পন্থা হইতেছে তাহার মনে এই প্রতীতি জন্মানো যে, অন্ধকে কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া তিনি কেবল যে কর্ম্মীকেই সাহায্য করিবেন তেমন নয়, ইহার দরুন তাঁহার নিজের ব্যবসায়েরও সহায়তা করা হইবে। কেননা তিনি এমন একজন ব্যক্তিকে কাজে লাগাইবেন যে তাঁহাকে দিবে উৎকৃষ্ট এবং সৎ কাজ। দ্বিতীয়তঃ ইহাও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, ইতিপূর্ব্বেই কর্ম্মে নিযুক্ত আছে এমন কোন দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিয়া অন্ধকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবে না। তৃতীয়তঃ, ইহা নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ যে, কর্ম্মে নিয়োগ মালিককে অন্ধ কর্ম্মী গ্রহণের প্ররোচনাদানেই শুধু পর্য্যবসিত হইবে না, অন্ধ কর্ম্মী যাহাতে নিজেকে পারি-পার্শ্বিকের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে সেজন্য তাহাকে সাহায্য করা এবং তাহার কর্ম্মে নিযুক্তির পরে যে-কোন সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে তাহার সম্পর্কে তাহাকে সহায়তা করা এই উভয়বিধ কারণে ধৈর্য্যের সহিত কাজ করিয়া আরও আগাইয়া যাওয়া একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া মালিকের মনে এই ধারণাও জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, 'শিশুর তদারকে'র ভার তাঁর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে না। ইহা একটি বড় সমস্যা এবং অন্ধদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের এখনো প্রচুর শিক্ষার প্রয়োজন। আমরা কিন্তু এমন সময়ের জন্য সম্মুখপানে তাকাইয়া থাকিতে পারি যখন এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ-কারী অনেকগুলি সংস্থার উদ্ভব হইবে এবং যখন লাভজনক ভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত অন্ধ ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য এবং আজব চীজ বলিয়া গণ্য হইবে না।

আরোগ্যোত্তর সেবাকর্মের স্বল্প-মেয়াদী শিক্ষণ প্রোগ্রামের সূচনা

নির্দ্ধারিত তালিকা অনুযায়ী ১৯৫৬ সনের ১৮ই জুলাই অপরাহ্ণ ছয়টার সময় আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম দিল্লী সমাজ-কর্ম্ম বিদ্যালয়ে (Delhi School of Social Work)। মিঃ এবং মিসেস গোরে সেখানে ছিলেন অভ্যাগতদের স্বাগত করবার জন্যে। আমরা এগিয়ে গেলাম একটা খোলা জায়গার দিকে যেখানে একটি নূতন কিন্তু সাদাসিধা বাড়ী দ্রুত উপরের দিকে মাথা তুলছে—কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের আরোগ্যোত্তর পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বল্প-মেয়াদী শিক্ষণ প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত অতিরিক্তসংখ্যক ছাত্রদের অবস্থানের ব্যবস্থা করবার নিমিত্ত।

সকল শিক্ষার্থীরা ত সেখানে উপস্থিত ছিলই, তা ছাড়া সমাজ-কল্যাণকর্ম্মে বহু বিশেষজ্ঞ, সমাজ-কল্যাণ সংস্থাসমূহের ডিরেক্টরগণ, বিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ এবং অন্যান্য ছাত্রেরাও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের আপিস থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন—পর্ষদের সেক্রেটারী আর. এস. কৃষ্ণন, শ্রী পি. ডি কুলকর্ণী, ও. এস. ডি-র শ্রী ভি. ভি. শাস্ত্রী এবং কর্ম্মী-সংসদের আরও জনকয়েক সভ্য ব্যবস্থাদি হয়েছিল সমাজকর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ-সম্মত। শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল সাধারণ চেয়ারের আর পুরোভাগে ছিল উক্ত উৎসব-দিনের প্রখ্যাত অতিথি, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বি. এন. দাতারের এবং দিল্লী সমাজ-কর্ম্ম বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের চেয়ার। শ্রীগোরে এবং বিদ্যালয়ের প্রশাসক পর্ষদের (Governing Body) চেয়ারম্যান সমভিব্যাহারে যখন এসে পৌঁছলেন তখন বেলা ছয়টা বেজে ত্রিশ মিনিট।

দিল্লী সমাজ-কর্ম্ম বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী এম এস. গোরে শিক্ষণক্রমের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, "আরোগ্যোত্তর সেবাকর্ম্মের স্বল্প-মেয়াদী শিক্ষণ কর্ম্মসূচী কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক নিযুক্ত, আরোগ্যোত্তর সেবাকর্ম্ম এবং সামাজিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত দুটি উপদেষ্টা সমিতির অনুমোদনসমূহের অনুসারী। এই সমস্ত কর্ম্মীর শিক্ষণ হবে আংশিক ভাবে গৃহাভ্যন্তরে (indoor) এবং অংশতঃ গৃহের বাইরে (outdoor) এবং আরোগ্যোত্তর সেবামূলক কর্ম্মের আওতায় যে সকল লোকের স্থান হবে, তারা হচ্ছে কারাগারের নিঃস্ব-সদন, মানসিক চিকিৎসালয়, সংশোধনাগার প্রভৃতি থেকে খালাস-পাওয়া লোক। স্বভাবতঃই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত এবং এটা খুবই উৎসাহ এবং আনন্দের বিষয় যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং সহযোগিতা করে আসছেন। এই পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যে ব্যয়-বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে সাড়ে দশ কোটি টাকা।

শ্রীগোরে বললেন, "শিক্ষিত কর্ম্মীর প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে সকলের চেয়ে বেশী। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ, দিল্লী সমাজ-কর্ম্ম বিদ্যালয়কে (Delhi School of Social Work) এই নূতন আরোগ্যোত্তর প্রোগ্রামের রূপায়ণকল্পে তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মী সংসদকে (Supervising Staff) এই শিক্ষণ কর্ম্মসূচী গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করেন। বিদ্যালয় তৎপরতার সঙ্গে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

এখানকার শিক্ষণক্রম হবে বক্তৃতামালা, ক্ষেত্রকর্ম্ম (Field-work) এবং সমাজকর্ম্ম বিষয়ে গবেষণার এক মিশ্র কর্ম্মসূচী। শিক্ষণকালে শিক্ষার্থীরা সমাজকর্ম্মের রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবেন, তাদের জন্যে দেশব্যাপী ভ্রমণ এবং সমাজ-কল্যাণকর্ম্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করা হবে।

এই শিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রায় এক মাসের জন্যে তাদের পাঠানো হবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে বাস্তব জ্ঞানলাভ এবং কাজের অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করবার জন্যে—যাতে বাস্তব উপায়ে তারা তাদের অনুসন্ধানের ফলগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। এর দরুন দেশের প্রয়োজন এবং অবস্থা অনুযায়ী এই শিক্ষণের নীতি নির্দ্ধারিত হবে।

প্রারম্ভিক মন্তব্যসমূহ শেষ করে শ্রী এম. এস. গোরে বিদ্যালয়ের গবর্ণর পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমতী ভান্দওয়ারকে, শ্রীদাতারকে বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ করতে বললেন। শ্রীদাতার সুরু করলেন সরস ভঙ্গীতে :

"শ্রীগোরে বললেন, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রণালয় জেল, সংশোধনাগার ইত্যাদি থেকে খালাস-পাওয়া লোকেদের পুনর্ব্বাসনের বিষয়ে খুবই আগ্রহান্বিত। বস্তুতঃ যখন অপর সকল মন্ত্রণালয় কোনও কিছু গ্রহণ করতে নারাজ হয়, তখন তা এসে হাজির হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং একদিক দিয়ে—আইনসঙ্গত শব্দ ব্যবহার করতে গেলে, একে বলা চলে অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধীয় মন্ত্রণালয়।

"এটা আপনাদের বিবেচনা করতেই হবে যে, আপনাদের

কাজ হচ্ছে আত্মোৎসর্গের কাজ—এ এমন একটি সর্ব্বতোমুখী কৃত্য যা জাতির উদ্দেশ্যে আপনার শ্রেষ্ঠতম অন্তর-সত্তার, আপনার আত্মার মহত্তম প্রকাশ যে বিধাতা তাঁরই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। স্ত্রী, পুত্রকন্যা, মাতাপিতা নিয়েই শুধু আপনার পরিবার পর্য্যবসিত হবে না। আপনাকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, আপনার পরিবার গঠিত ভারতের ছত্রিশ কোটি নর-নারীকে নিয়ে।”

আগামী পাঁচ বৎসরের জন্যে আমাদের সম্মুখে এমন এক বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মসূচী রয়েছে যার বাস্তব রূপায়ণ অসম্ভাব্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু এই অসম্ভবকে আপনাদের সম্ভব করে তুলতে হবে। কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সঙ্কোচন আপনাদের কাজ নয়, আপনাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রকৃত পথে এদের পরিচালন।

ভারতবর্ষ এক নূতন পরীক্ষণ চালাচ্ছে—গণতন্ত্রের পরীক্ষণ, জনগণকে সৈন্যদলে ভুক্তি (Regimentation) আমাদের কাজ নয়, কেননা জনগণের জীবনে আমরা ততদুর পর্য্যন্তই প্রবেশ করব, তাদের কল্যাণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন। তদুপরি, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সমাজ-প্রতিষ্ঠার দায়িত্বভার আমরা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছি। কাজেই এটা আমাদের বুঝতে হবে যে, সমাজই হচ্ছে সর্ব্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন এবং সম্পূর্ণভাবে ব্যষ্টিজীবন আমরা যাপন করতে পারি না। এটাও আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, সমাজের সকল অংশকেই সমস্তরে আনতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী নির্দ্ধন নারায়ণকে ভগবানের তুল্য বলে প্রচার করেছিলেন। এই উক্তিটি কখনও বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে না যে, “সাধুসন্তদের অতীত আছে, কিন্তু পাপীদের আছে ভবিষ্যৎ।” আর আপনাদের সম্মুখে রয়েছে এই সকল তথাকথিত পাপীদের পুনর্ব্বাসনের কর্ত্তব্য, যারা হতে পারে আমাদের দেশের ভাবী সাধুসন্ত। এ হচ্ছে একটি মহান্ দায়িত্ব। অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে, কিন্তু নৈতিক শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসন হচ্ছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

সরকারের সম্মুখে যে সমস্যা বিদ্যমান তা কেবলমাত্র স্বাভাবিক নাগরিকদের সমস্যা নয়, কিন্তু যারা হতে পারে আগামীকালের সৎ নাগরিক তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তার রয়েছে—অন্যথায় শেষোক্তরা সমাজের পক্ষে হয়ে উঠতে পারে বিপজ্জনক। এটা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, এখন বিশেষতঃ স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর থেকে সরকার কেবলমাত্র একটি প্রশাসক সংস্থাই নয়। দেশে গত পাঁচ বৎসর যাবৎ যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো থেকে এটা সুপরিস্ফুট হয়, আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র—যার লক্ষ্য জনগণের কল্যাণসাধন। এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এমনিভাবে যে সকল লোকের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন তাদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরিচালনার্থে আমরা নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি।

এটা লক্ষ্য করে আমরা সুখী হয়েছি যে, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ এমন একটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যা ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে আমাদের নিজস্ব। বর্ত্তমানে যে সকল পরিস্থিতি বিদ্যমান সেগুলো পৃথক ধরনের বলে আমাদের কর্ম্মনীতি হওয়া উচিত বাহ্য অবস্থার অনুযায়ী। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে কতকগুলো লোক সামাজিক কলুষের কবলে পড়ে বিপন্ন হয়েছে। তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে। সরকার এই কৃত্যে সহায়তা করবার জন্যে উদ্গ্রীব। একটা বিশেষ ধরনের সাহায্য তাদের প্রয়োজন এবং সেজন্যে আবশ্যক বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজ কর্ম্মীবৃন্দ। এ হচ্ছে একটি মহান্ কৃত্য এবং একটি পবিত্র দায়িত্ব। তরুণ-তরুণীগণ, আমার আকাঙ্ক্ষা যে, আপনারা ব্রতধারীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হোন। এ হচ্ছে সামাজিক পুনরুজ্জীবনের কর্ম্ম। আমি আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে একথা বলতে পারি, যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমরা অংশ গ্রহণ করেছিলাম তার চেয়েও ভারতের পুনর্গঠন এবং জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের বিরাট কর্ত্তব্য মহত্তর। কেননা, আজকের দিনে ব্যাপকতর সামাজিক সমস্যাসমূহ বিদ্যমান এবং এমন সব সমস্যা রয়েছে যা দেশকে নিয়ে যেতে পারে ভ্রান্ত পথে। এই সমস্তেরই সম্মুখীন হতে হবে বাইরের কোনও সংস্থাকে নয়, কিন্তু আপনাদিগকে সরকারকে এবং জনগণকে।

পূজার পর

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত মহাপূজার অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে একজন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার আলোচনা হইতেছিল। এই প্রসঙ্গে সর্ব্বজনীন পূজার কথাও উঠিল। বন্ধু বলিলেন, কলিকাতায় প্রায় ২,০০০ সর্ব্বজনীন পূজা অনুষ্ঠিত হয়, এবং প্রত্যেক পূজাতে গড়ে এক হাজার টাকা খরচ হয় এই হিসাবে ২০০০ পূজাতে কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হইবে। সর্ব্বজনীন পূজাতে এইরূপ অনেক ব্যয় হয় যাহাকে অপচয় ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। এই অপচয় নিবারণ করিয়া যে পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ব্যয় করিলে মহামায়ার পূজা সার্থক হইবে। এই প্রসঙ্গে কোন কোন বন্ধু বলিলেন, প্রত্যেক পূজায় গড়ে ১৫০০৲ টাকা ব্যয় হয়—ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লইতে পারা যায়। তাঁহাদের উক্তির সমর্থনের জন্য তাঁহারা কয়েকটি পূজার মুদ্রিত হিসাব উদ্ধৃত করিলেন। এই হিসাবে সর্ব্বজনীন পূজা উপলক্ষে মোট ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়; এবং পূজার সংখ্যা না কমাইয়া প্রকৃত পূজা করিয়া ১৫ লক্ষ টাকা বাঁচানো যাইতে পারে।

ইহার পর ১৩।১০।৫৬ তারিখের "আনন্দবাজার" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

"সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ পত্রের সহিত অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের পূজার আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইয়া থাকে। এই বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

এবার দক্ষিণ কলিকাতার একটি সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্রের সহিত গত বৎসরের পূজার যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, উহার আয় ও ব্যয়ের কয়েকটি দফা এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল—

আয়ের দিকে দেখা যায়, চাঁদা বাবদ আদায় কিঞ্চিদধিক ৪,৩০০ টাকা, বিজ্ঞাপন বাবদ ৩,০৭৫ টাকা, প্রণামী বাবদ কিঞ্চিদধিক ২৫০ টাকা, জলসা—প্রায় ২,৬০০ টাকা।

এদিকে খরচের দিকে প্রধান প্রধান দফাগুলি এই :

জলসা—প্রায় ৪,৩৫০ টাকা, আলোকসজ্জা—কিঞ্চিদধিক ১,৮২০ টাকা, মণ্ডপসজ্জা—১,৭০০ টাকা, পূজা ও ভোগ—কিঞ্চিদধিক ৬৩০ টাকা, ছাপাই—৬০০ টাকা, বিসর্জ্জন বাবদ ব্যয়—৫৫৬ টাকা, নাটক—প্রায় ৪৭৫ টাকা, প্রতিমা ও সাজসজ্জা—৩৫০ টাকা, মাইক—১৭৫ টাকা, ঢুলী—কিঞ্চিদধিক ৯০ টাকা, লক্ষ্মীপূজা বাবদ ব্যয়—কিঞ্চিদধিক ১১০ টাকা।

লক্ষ্য করিবার বিষয় বিসর্জ্জনের সময় ঢাকী নাকি আনা হইয়াছিল ১০১ জন। ঐ বাবদ ৪ শতের অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। উপরের হিসাবে এই ৪ শত টাকা বিসর্জ্জনের ব্যয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে। ব্যয়ের দিকে প্রীতিভোজ অথবা দরিদ্রনারায়ণ সেবা কিংবা পল্লীর বালকবালিকাগণ ও কর্ম্মীদের খাওয়া বা জলযোগ বাবদ ব্যয়ের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে পূজা-কমিটি দুইটি সদ্ব্যয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল কর্জ্জ পরিশোধ—৫০০ টাকা। এটা বোধ হয় পূর্ব্ব বৎসরের দেনা ছিল। সদ্ব্যয়ের আর একটি পরিচয়—যক্ষ্মা তহবিল ও দুঃস্থ ছাত্র ও পরিবারের সাহায্য বাবদ ৪৫০ টাকা। যক্ষ্মা তহবিল, দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য ও পরিবারসমূহের সাহায্য—এই তিন দফার প্রত্যেক দফায় কত করিয়া ব্যয় হইয়াছে, হিসাবে তাহার উল্লেখ নাই। থাকিলে পূজা কমিটির কর্ত্তাদের দাক্ষিণ্যের হিসাবটা আরও সুস্পষ্ট হইত।

সর্ব্বশেষ কথা : মোট ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১২ হাজার টাকা। যাহা আদায় হইয়াছে, তাহার দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান হয় নাই, প্রায় ১,৭০০ টাকা কর্জ্জ হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, ইহাদের প্রতি মা দুর্গা বাস্তবিকই প্রসন্না—ভাগের মায়ের ব্যাপারেও প্রায় দুই হাজার টাকা কর্জ্জ পাওয়া গিয়াছে।"

উপরোক্ত হিসাব হইতে অপচয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন হইবে না এবং আয়-ব্যয় সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করাও নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সত্য কথা বলিতে হইলে ইহাকে পূজা বলা যায় না, ইহাকে আমোদ-আহ্লাদ এবং "হুল্লোড়" ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, পূজা উপলক্ষ্য মাত্র।

আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের আছে, কিন্তু আমাদের মত লোকের কথা কেই বা শোনে, সরকারী মহলের বা বেসরকারী মহলের কেহই শুনিবেন না, ধৈর্য্য-সহকারে তাঁহাদের শুনিবারও সময় নাই। আর যুবকগণের নিকট আমাদের বক্তব্য পেশ করিবার অধিকারও নাই। পরন্তু তাঁহারা চাঁদার জন্য আসিলেই কোন তর্কবিতর্ক না করিয়া কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার নিরস্তির জন্য চাঁদা দিতেই

কাজ হচ্ছে আত্মোৎসর্গের কাজ—এ এমন একটি সর্ব্বতোমুখী কৃত্য যা জাতির উদ্দেশ্যে আপনার শ্রেষ্ঠতম অন্তর-সত্তার, আপনার আত্মার মহত্তম প্রকাশ যে বিধাতা তাঁরই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। স্ত্রী, পুত্রকন্যা, মাতাপিতা নিয়েই শুধু আপনার পরিবার পর্য্যবসিত হবে না। আপনাকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, আপনার পরিবার গঠিত ভারতের ছত্রিশ কোটি নর-নারীকে নিয়ে।"

আগামী পাঁচ বৎসরের জন্যে আমাদের সম্মুখে এমন এক বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মসূচী রয়েছে যার বাস্তব রূপায়ণ অসম্ভাব্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু এই অসম্ভবকে আপনাদের সম্ভব করে তুলতে হবে। কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সঙ্কোচন আপনাদের কাজ নয়, আপনাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রকৃত পথে এদের পরিচালন।

ভারতবর্ষ এক নূতন পরীক্ষণ চালাচ্ছে—গণতন্ত্রের পরীক্ষণ, জনগণকে সৈন্যদলে ভুক্তি (Regimentation) আমাদের কাজ নয়, কেননা জনগণের জীবনে আমরা ততদূর পর্য্যন্তই প্রবেশ করব, তাদের কল্যাণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন। তদুপরি, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সমাজ-প্রতিষ্ঠার দায়িত্বভার আমরা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছি। কাজেই এটা আমাদের বুঝতে হবে যে, সমাজই হচ্ছে সর্ব্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন এবং সম্পূর্ণভাবে ব্যষ্টিজীবন আমরা যাপন করতে পারি না। এটাও আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, সমাজের সকল অংশকেই সমস্তরে আনতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী নির্দ্ধন নারায়ণকে ভগবানের তুল্য বলে প্রচার করেছিলেন। এই উক্তিটি কখনও বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে না যে, "সাধুসন্তদের অতীত আছে, কিন্তু পাপীদের আছে ভবিষ্যৎ।" আর আপনাদের সম্মুখে রয়েছে এই সকল তথাকথিত পাপীদের পুনর্ব্বাসনের কর্ত্তব্য, যারা হতে পারে আমাদের দেশের ভাবী সাধুসন্ত। এ হচ্ছে একটি মহান্ দায়িত্ব। অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে, কিন্তু নৈতিক শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসন হচ্ছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

সরকারের সম্মুখে যে সমস্যা বিদ্যমান তা কেবলমাত্র স্বাভাবিক নাগরিকদের সমস্যা নয়, কিন্তু যারা হতে পারে আগামীকালের সৎ নাগরিক তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তার রয়েছে—অন্যথায় শেষোক্তরা সমাজের পক্ষে হয়ে উঠতে পারে বিপজ্জনক। এটা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, এখন বিশেষতঃ স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর থেকে সরকার কেবলমাত্র একটি প্রশাসক সংস্থাই নয়। দেশে গত পাঁচ বৎসর যাবৎ যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো থেকে এটা সুপরিস্ফুট হয়, আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র—যার লক্ষ্য জনগণের কল্যাণসাধন। এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এমনিভাবে যে সকল লোকের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন তাদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরিচালনার্থে আমরা নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি।

এটা লক্ষ্য করে আমরা সুখী হয়েছি যে, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ এমন একটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যা ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে আমাদের নিজস্ব। বর্ত্তমানে যে সকল পরিস্থিতি বিদ্যমান সেগুলো পৃথক ধরনের বলে আমাদের কর্ম্মনীতি হওয়া উচিত বাহ্য অবস্থার অনুযায়ী। দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমাদের সমাজে কতকগুলো লোক সামাজিক কলুষের কবলে পড়ে বিপন্ন হয়েছে। তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে। সরকার এই কৃত্যে সহায়তা করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। একটা বিশেষ ধরনের সাহায্য তাদের প্রয়োজন এবং সেজন্যে আবশ্যক বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রাপ্ত সমাজ কর্ম্মীবৃন্দ। এ হচ্ছে একটি মহান্ কৃত্য এবং একটি পবিত্র দায়িত্ব। তরুণ-তরুণীগণ, আমার আকাঙ্ক্ষা যে, আপনারা ব্রতধারীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হোন। এ হচ্ছে সামাজিক পুনরুজ্জীবনের কর্ম্ম। আমি আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে একথা বলতে পারি, যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমরা অংশ গ্রহণ করেছিলাম তার চেয়েও ভারতের পুনর্গঠন এবং জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের বিরাট কর্ত্তব্য মহত্তর। কেননা, আজকের দিনে ব্যাপকতর সামাজিক সমস্যাসমূহ বিদ্যমান এবং এমন সব সমস্যা রয়েছে যা দেশকে নিয়ে যেতে পারে ভ্রান্ত পথে। এই সমস্তেরই সম্মুখীন হতে হবে বাইরের কোনও সংস্থাকে নয়, কিন্তু আপনাদিগকে সরকারকে এবং জনগণকে।

পূজার পর

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত মহাপূজার অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে একজন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার আলোচনা হইতেছিল। এই প্রসঙ্গে সর্ব্বজনীন পূজার কথাও উঠিল। বন্ধু বলিলেন, কলিকাতায় প্রায় ২,০০০ সর্ব্বজনীন পূজা অনুষ্ঠিত হয়, এবং প্রত্যেক পূজাতে গড়ে এক হাজার টাকা খরচ হয় এই হিসাবে ২০০০ পূজাতে কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হইবে। সর্ব্বজনীন পূজাতে এইরূপ অনেক ব্যয় হয় যাহাকে অপচয় ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। এই অপচয় নিবারণ করিয়া যে পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ব্যয় করিলে মহামায়ার পূজা সার্থক হইবে। এই প্রসঙ্গে কোন কোন বন্ধু বলিলেন, প্রত্যেক পূজায় গড়ে ১৫০০৲ টাকা ব্যয় হয়—ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লইতে পারা যায়। তাঁহাদের উক্তির সমর্থনের জন্য তাঁহারা কয়েকটি পূজার মুদ্রিত হিসাব উদ্ধৃত করিলেন। এই হিসাবে সর্ব্বজনীন পূজা উপলক্ষে মোট ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় ; এবং পূজার সংখ্যা না কমাইয়া প্রকৃত পূজা করিয়া ১৫ লক্ষ টাকা বাঁচানো যাইতে পারে।

ইহার পর ১৩।১০।৫৬ তারিখের "আনন্দবাজার" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

"সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ পত্রের সহিত অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের পূজার আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইয়া থাকে। এই বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

এবার দক্ষিণ কলিকাতার একটি সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্রের সহিত গত বৎসরের পূজার যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, উহার আয় ও ব্যয়ের কয়েকটি দফা এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল—

আয়ের দিকে দেখা যায়, চাঁদা বাবদ আদায় কিঞ্চিদধিক ৪,৩০০ টাকা, বিজ্ঞাপন বাবদ ৩,০৭৫ টাকা, প্রণামী বাবদ কিঞ্চিদধিক ২৫০ টাকা, জলসা—প্রায় ২,৬০০ টাকা।

এদিকে খরচের দিকে প্রধান প্রধান দফাগুলি এই :

জলসা—প্রায় ৪,৩৫০ টাকা, আলোকসজ্জা—কিঞ্চিদধিক ১,৮২০ টাকা, মণ্ডপসজ্জা—১,৭০০ টাকা, পূজা ও ভোগ—কিঞ্চিদধিক ৬৩০ টাকা, ছাপাই—৬০০ টাকা, বিসর্জ্জন বাবদ ব্যয়—৫৫৬ টাকা, নাটক—প্রায় ৪৭৫ টাকা, প্রতিমা ও সাজসজ্জা—৩৫০ টাকা, মাইক—১৭৫ টাকা, ঢুলী—কিঞ্চিদধিক ৯০ টাকা, লক্ষ্মীপূজা বাবদ ব্যয়—কিঞ্চিদধিক ১১০ টাকা।

লক্ষ্য করিবার বিষয় বিসর্জ্জনের সময় ঢাকী নাকি আনা হইয়াছিল ১০১ জন। ঐ বাবদ ৪ শতের অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। উপরের হিসাবে এই ৪ শত টাকা বিসর্জ্জনের ব্যয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে। ব্যয়ের দিকে প্রীতিভোজ অথবা দরিদ্রনারায়ণ সেবা কিংবা পল্লীর বালকবালিকাগণ ও কর্ম্মীদের খাওয়া বা জলযোগ বাবদ ব্যয়ের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে পূজা-কমিটি দুইটি সদ্ব্যয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল কর্জ্জ পরিশোধ—৫০০ টাকা। এটা বোধ হয় পূর্ব্ব বৎসরের দেনা ছিল। সদ্ব্যয়ের আর একটি পরিচয়—যক্ষ্মা তহবিল ও দুঃস্থ ছাত্র ও পরিবারের সাহায্য বাবদ ৪৫০ টাকা। যক্ষ্মা তহবিল, দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য ও পরিবারসমূহের সাহায্য—এই তিন দফার প্রত্যেক দফায় কত করিয়া ব্যয় হইয়াছে, হিসাবে তাহার উল্লেখ নাই। থাকিলে পূজা কমিটির কর্ত্তাদের দাক্ষিণ্যের হিসাবটা আরও সুস্পষ্ট হইত।

সর্ব্বশেষ কথা : মোট ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১২ হাজার টাকা। যাহা আদায় হইয়াছে, তাহার দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান হয় নাই, প্রায় ১,৭০০ টাকা কর্জ্জ হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, ইহাদের প্রতি মা দুর্গা বাস্তবিকই প্রসন্না—ভাগের মায়ের ব্যাপারেও প্রায় দুই হাজার টাকা কর্জ্জ পাওয়া গিয়াছে।"

উপরোক্ত হিসাব হইতে অপচয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন হইবে না এবং আয়-ব্যয় সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করাও নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সত্য কথা বলিতে হইলে ইহাকে পূজা বলা যায় না, ইহাকে আমোদ-আহ্লাদ এবং "হুল্লোড়" ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, পূজা উপলক্ষ্য মাত্র।

আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের আছে, কিন্তু আমাদের মত লোকের কথা কেই বা শোনে, সরকারী মহলের বা বেসরকারী মহলের কেহই শুনিবেন না, ধৈর্য্যসহকারে তাঁহাদের শুনিবারও সময় নাই। আর যুবকগণের নিকট আমাদের বক্তব্য পেশ করিবার অধিকারও নাই। পরন্তু তাঁহারা চাঁদার জন্য আসিলেই কোন তর্কবিতর্ক না করিয়া কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার নিবৃত্তির জন্য চাঁদা দিতেই

হয়। আমাদের স্থায় ব্যক্তিগণের এই ত অবস্থা। বলা বাহুল্য, আমাদের মত ব্যক্তিগণের সংখ্যা কম নহে। অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার উদাহরণ দিতে পারি।

এক বন্ধু বলিলেন, দেশে নেতৃত্বের অভাববশতঃই সকল দিকে এইরূপ অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটিতেছে। তিনি বলিলেন, আজ যদি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় কিংবা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় নেতা জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহারা এই বিষয়ে নিশ্চয়ই হস্তক্ষেপ করিতেন এবং সম্পূর্ণ না হইলেও বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতেন। তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য হইত না। আজ যদি কলিকাতাবাসী সকল সম্প্রদায় দলবদ্ধ হইয়া সর্ব্বজনীন পূজার সংখ্যা হ্রাস করিয়া এবং অপচয় নিবারণ করিয়া বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের জনসাধারণের সাহায্যের জন্য একটা মোটা টাকা দিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটা খুব বড় আদর্শ স্থাপন করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহাদের এই আদর্শ ও কার্য্যের দ্বারা বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের জনসাধারণ কেবল যে উপকৃত ও উৎফুল্ল হইত তাহা নহে—এইরূপ সমবেদনা ও সহানুভূতি দ্বারা তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা অনেকটা লাঘব হইত। কথায় আছে, দুঃখের অংশ গ্রহণ করিলে দুঃখের তীব্রতা প্রশমিত হয়।

একজন বন্ধু বলিলেন, বাস্তবিকই কি দেশে নেতার অভাব আছে? এই প্রশ্নের পর তিনি কয়েকজন সরকারী এবং বেসরকারী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম করিলেন। অপর এক বন্ধু বলিলেন, এই সকল ব্যক্তি নিশ্চয়ই নেতৃস্থানীয়, কিন্তু ইহারা সকলেই যে আগামী "ইলেকশনের" প্রার্থী এবং ইহাদের ভোটের প্রয়োজন—আর ভোট সংগ্রহ করিতে হইলে যুবক সম্প্রদায়ের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে সুতরাং যুবক সম্প্রদায়ের মনোমত কার্য্যাবলী ইহাদিগকে সমর্থন করিতেই হইবে, এমনকি সর্ব্বজনীন পূজার তহবিলে মোটা চাঁদা দিতেও হইবে। মোট কথা, যুবক সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট রাখিতেই হইবে। অনেকেই এই উক্তির সমর্থন করিলেন, এবং দু'এক জন এই উক্তির সমর্থনে নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে এমন সব কথা বলিলেন যাহা লিপিবদ্ধ করিলে হয়ত মানহানির অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। সুতরাং সেই সব কথা আর লিখিলাম না। যাহা হউক, ইহা হইতেই দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতির কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, এই বৎসর সর্ব্বজনীন পূজা উপলক্ষে ব্যয় সঙ্কোচ করা হইবে, "হৈ হল্লোড়" কম হইবে, "লাউড স্পীকারের" ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইত্যাদি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইয়াছে কি? নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, অন্ততঃ "লাউড স্পীকারের" ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় নাই; কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মুখেও শুনিয়াছি যে, তাঁহাদেরও একই রকমের অভিজ্ঞতা।

যতদূর স্মরণ হইতেছে ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম কলিকাতায় এবং হাওড়ায় ৪,০০০ পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জানি না, এই ৪,০০০ পূজায় মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, এবং মোট কত টাকা বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।

পল্লী-অঞ্চলেও সর্ব্বজনীন পূজার ঢেউ প্রবেশ করিয়াছে; তবে কলিকাতার মত "হৈ হল্লোড়" সেখানে হয় নাই, ইচ্ছা থাকিলেও সামর্থ্য নাই। পল্লী-অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের অভিভাবকগণের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের সন্তানগণ পূজার ছুটিতে গ্রামে যান নাই—কলিকাতার পূজার আনন্দ তাঁহাদিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আবার কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি তাঁহাদের সন্তানগণ পূজার ছুটিতে পশ্চিমে গিয়াছিলেন।

যাহা হউক যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয়—কি শহর, কি পল্লীগ্রাম—কোন স্থানের পূজাতেই "কাঙালিনী মেয়ের" দিকে কেহই তেমন দৃষ্টি দেন নাই। দিবার হয় ত অবকাশও ছিল না।

পনের বৎসর পূর্ব্বে "Durga Pujah and National Reconstruction" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম:

"A true and faithful worship of the goddess demands of a devotee, not earnest prayer only, but earnest action also, the earnest response to idealism, the earnest pursuit to follow the star, the gleam, and an earnest and arduous devotion to the cause. There can be no greater cause for every thinking man and woman in this country, as long as the appalling backwardness of our country remains, than the uplift of the masses, spiritual, economic and otherwise. And, to this sacred work, on the occasion of this most sacred Durga Pujah let every worshipper of the goddess consecrate himself."

এখন মনে হইতেছে অরণ্যে রোদন করিয়াছিলাম; অবস্থার উন্নতি ত হয় নাই, বরং অবনতি হইয়াছে। এই প্রবন্ধও অরণ্যে রোদন করা ছাড়া কি আর কিছু?

মৃগতৃষ্ণিকা

শ্রীহেনা হালদার

স্বর্ণচম্পার   বর্ণসম্ভারে
দগ্ধ চৈত্রের সন্ধ্যাকাশ—
রক্ত কিংশুক   জ্বালানো যৌবন
নয়নে নেই মৃদু তন্দ্রাভাস।
রাত্রি বুঝি আজ   যাত্রী হ'ল কোন্
নিদ্রাহারা দেশে অকস্মাৎ—
তন্বী চাঁদ তাই   বহ্নি জ্বালিয়েছে
প্রেম-কটাক্ষের পক্ষপাত।
দু' চোখে ঘুম নেই,   কোথাও তুমি নেই
আমার আশা সে-ও অসম্ভব—
আলোর তৃষ্ণাতে   কৃষ্ণা রজনীর
কৃচ্ছ্রসাধনই যে অবাস্তব!
ক্ষুব্ধ এষণার   লুব্ধ প্রেষণায়
দেখায় মরীচিকা ভ্রান্ত প্রাণ—
জীর্ণ সেঁতারের   দীর্ণ এ তারেতে
জাগে কি জীবনের ক্লান্ত গান?
স্বপ্ন-মায়াময়   কল্পকামনায়
নেইক' একতিল তৃপ্তি নেই—
অশেষ শংকার   মিলিত ঝংকারে
কোথাও রাগিণীর দীপ্তি নেই!
হাওয়া হাতে হাতে,   কঠিন কশাঘাতে
আভাসে কানে আসে আর্ত্তি কার?
আমার হৃদয়ের   আকুল কান্না যে
বুঝেও বোঝ না সে প্রার্থী কার?
যা' কিছু চাওয়া যায়: সবই কি পাওয়া যায়?
তবু এ একগুঁয়ে অবুঝ মন—
সাহারা মরুদেশে,   বৃথাই খুঁজেছে সে
বর্ষাজলে ভেজা সবুজ-বন।
সিক্ত উপাধানে   কোথায় সান্ত্বনা?
বরং বেড়ে যায় তিক্ততাই
আর্ত্ত হাহাকারে   ব্যর্থ বেদনাতে
ফোটে যে হৃদয়ের রিক্ততাই।
স্বর্ণচম্পার   বর্ণসম্ভার
দগ্ধ করে দিলে রাত্রিদিন—
রক্ত কিংশুক   জ্বালানো যৌবন
মত্ত অনুমন শান্তিহীন।

শেষের কবিতা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মৃত্যু-হতাশ নয়নের ফাঁকে সজল অশ্রু দোলে
মায়ার ভুবন ছিন্ন করিয়া যেতে হবে বহু দূর।
চারি দিকে যেন শোনা যায় অতি করুণ-কোমল সুর,
শত দিবসের স্মৃতি-গুঞ্জন আকুল করিয়া তোলে।
জীবনে জ্বালাতে হয়েছে অনেক স্নেহের প্রদীপশিখা—
চিকণ অধরে বাসনার রাঙা চিহ্ন যেথায় এ কে'
রূপ গরবিণী হাতছানি দিয়ে যৌবনে গেছে ডেকে;
লীলা-চাপল্য দেখায়ে তুমিও কাছে এলে সাহসিকা!
আশা-নিরাশার আলোক ছায়ায় বয়স-পরিক্রমা,
কামনার ধূপ পুড়ে ছাই হোলো—জানো কি সুরঙ্গমা?

রোগে শোকে শত অভাবের মাঝে রহিনু সবার নীচে,
এ জীবনে ঋণ হ'ল নাক' শোধ, সহিতে হয়েছে শ্লেষ;
বসন ভূষণ অশনের তরে পেতে হ'ল বহু ক্লেশ,
কর্ম্মকঠোর প্রতি দিবসের শ্রমজলে ভিজে ভিজে।

সুখের লাগিয়া ভ্রমিনু বিফলে—সঙ্কোচ-সংশয়
পদে পদে মোরে করে প্রতিহত। পলকে পলকে বাধা,
প্রাণ খুলে আর হ'ল না কখন প্রণয়ের সুর সাধা,
দারিদ্র্য যেথা পেতেছে আসন, সেথা সবি বিষময়!
অন্তিমকালে অন্তর কেন অনুশোচনায় জ্বলে,
কুসুমপেলব কর-পল্লব রাখ মোর করতলে।

আয়ু-সবিতার নামে শেষ রেখা শ্রান্ত পথের মাঝে,
চেনা অচেনার মোহনায় যেন আত্মার অভিসার!
কে যেন আমারে দেখায় অদূরে শান্তির পারাবার!
নিরাশার তীরে এলো কি সন্ধ্যা? কোথায় শঙ্খ বাজে!
প্রাণের খেলায় শেষ কড়িটুকু দিয়ে গেনু তব করে,
শেষের কবিতা ভুলিবে কি তুমি, যদি মোরে মনে পড়ে?

দেশ-বিদেশের কথা

জয়কৃষ্ণ জন্মোৎসব

গত ২৪শে কার্ত্তিক সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ৪৬ ২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে রাজারাও শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সভাপতিত্বে সঙ্গীতশিল্পী শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যালের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিতে গিয়া প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যের কথা বলেন। শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার ভাষণে বলেন, শিল্পী জয়কৃষ্ণ জীবনে অবিনশ্বর খ্যাতি অর্জ্জন করুন এই কামনা করি। শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল শুধু ধ্রুপদ ও ধামারে নয়, খেয়াল, ঠুংরী, ভজন, রাগপ্রধান এবং শ্যামাসঙ্গীতেও সমান কৃতী। তিনি যখন যে বিষয়ে গান করেন, সেই বিষয়েই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি শুধু সঙ্গীত-শিল্পীই নন, সঙ্গীতের প্রচার এবং প্রসারেও তাঁর চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য।

এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীতে, নৃত্যে, মৃদঙ্গ, তবলা ও হারমোনিয়ম (সোলো) বাদনে অংশ গ্রহণ করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

বরদাকান্ত বসু

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা আচার্য্য বরদাকান্ত বসু গত ২১শে অক্টোবর কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন।

যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সমগ্র জীবন ধরিয়া তিনি ইহার উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করিয়া দেশবাসীর সমক্ষে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

শিক্ষকতাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ময়মনসিংহ সিটি স্কুল, ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়, সিটি স্কুল, কলিকাতা প্রভৃতি বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি ছাত্র এবং সহকর্ম্মী সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হন।

ভগবানের মঙ্গলময়ত্বের প্রতি বরদাকান্তের গভীর বিশ্বাস ছিল। মানুষের সেবাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তিনি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বহু অনাত্মীয়কে তিনি প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার মত ভগবদ্ভক্ত, নিরহঙ্কার, অনাড়ম্বর, নিরাসক্ত এবং অজাতশত্রু লোক বর্ত্তমান সমাজে বিরল।

Rexona
Rexona
BLENDED WITH CADYL

আলোচনা

"সর্পদংশন চিকিৎসা"

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়

গত বৎসরও পশ্চিমবঙ্গে ১,৪০০ শত লোক সর্পদংশনে মারা গিয়াছে। দূর গ্রামের লোক ডাক্তার বা "antivenom"-এর সাহায্য পায় না। তাহাদের উপকার হইতে পারে এই ভাবিয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষিত উপায়গুলি লিখিলাম।

শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ মহাশয়ের 'সর্পদংশন চিকিৎসা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রবাসী পত্রিকার ১৩৬৩ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি অনেক তথ্যপূর্ণ এবং ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই প্রবন্ধটি সকলেরই মনোযোগের সহিত পড়া উচিত। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমি কোন কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

ঘোষ মহাশয়ের উল্লিখিত চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমার বক্তব্য নিম্নে লিখিত হইল।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সর্পদংশন চিকিৎসা নামধেয় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখি এবং সে সময়ের Whiteaway Press-এ ছাপাই। তাহার পর উহার আর দুই বার পুনর্মুদ্রণ হইয়াছিল। এখন ঐ পুস্তিকা দুষ্প্রাপ্য। উহাতে চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বর্ণনা আছে। ঐ চিকিৎসা-প্রণালী এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিতেছি :

বিষাক্ত সাপ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী ফণী বা চক্রধর এবং অপর শ্রেণী ফণাহীন বা চক্রহীন। চক্রধর সাপ মাথা তুলিয়া ফণা বিস্তৃত করিয়া দংশন করে। তাহার দংশনে দুইটি ঘামুখ(puncture) হয়।

চক্রহীন সাপের ফণা নাই—অর্থাৎ তাহারা মাথা বিস্তৃত করিতে পারে না এবং তাহারা মাথা তুলিয়া ছোবল মারে না, তাহারা চু-মারার ন্যায় কামড়ায়। চক্রহীন সাপে কামড়াইলে অনেকগুলি দাগ হয় অর্থাৎ ঘামুখ দুইটির অপেক্ষা অনেক বেশী হয় এবং তাহারা গোলাকারে থাকে। চক্রধর সাপে কামড়াইলে সাধারণতঃ দুইটি দাগ হয় এবং দাগ দুইটি সরলরেখাক্রমে অবস্থিত হয়।

চক্রধর সাপে কামড়াইলে তাহার

আসছে! এই ডবল ঢাকনা
দেওয়া নতুন টিন
ডালডাকে সম্পূর্ণ খাঁটী
ও তাজা রাখে

বাইরের ঢাকনা
ভেতরের শীলকরা ঢাকনা

ডালডা আমার পক্ষে ভালো!

চিকিৎসা "বাঁধা এবং কাটা।" চক্রহীন সাপে কামড়াইলে তাহার চিকিৎসা "বাঁধা ও কাটা" নহে। "বাঁধা ও কাটা"র কোন ফললাভের আশা নাই। তাহার চিকিৎসা বিশিষ্টপ্রথায় উত্তাপ দেওয়া (application of radiated heat).

চক্রধর সর্পদংশন-চিকিৎসা

প্রথমেই বলা হইয়াছে, এই সকল সাপে কামড়াইলে দুইটি দাগ হয়। যদি দেখা যায় দুইটি দাগ হইয়াছে তখন প্রশ্ন উঠিবে ঐ দুইটি দাগ চক্রধর সাপের দংশনজনিত কিনা। যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, দাগ দুইটি চক্রধর সর্পদংশনজনিত তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিবে দষ্ট ব্যক্তির রক্ত সর্পবিষে বিষাক্ত হইয়াছে কিনা। প্রথম প্রশ্নটি সমাধান করিতে হইলে দেখিতে হইবে—দাগ দুইটি ভাসাভাসা (superficial) কিংবা গভীর (deep)। যদি ভাসাভাসা হয় তবে চক্রধর সাপে কামড়ায় নাই। আরও দেখিতে হইবে দুইটি দাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব (intervening space)। যদি ঐ দূরত্ব আধ ইঞ্চির কম বা এক ইঞ্চির বেশী হয় তাহা হইলে চক্রধর সাপে কামড়ায় নাই। যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, চক্রধর সাপে কামড়াইয়াছে তখন দেখিতে হইবে রক্ত বিষাক্ত হইয়াছে কিনা। এই প্রশ্নের সমাধানে দেখিতে হইবে যে, ঐ ঘামুখ দুইটি হইতে নীলাভ বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে কিনা। যদি উঠিতে দেখা যায় তাহা হইলে চক্রধরে কামড়াইয়াছে। আর যদি বুদ্‌বুদ্ উঠিতে দেখা না যায় তখন ঐ ঘামুখের কিছু উপর হইতে ছুরি দিয়া চিরিলে যে রক্ত বাহির হইবে তাহাতে যদি নুন (common salt) লাগান যায় তাহা হইলে ঐ রক্তের রঙ হয় পরিবর্ত্তিত হইয়া মেটে সিন্দুরের রঙ হইবে অথবা যেরূপ রঙ পূর্ব্বে ছিল সেইরূপই থাকিবে। যদি রঙ পরিবর্ত্তিত হয় তবে রক্ত বিষাক্ত হয় নাই এবং কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। আর যদি রঙ অপরিবর্ত্তিত থাকে তাহা হইলে রক্ত বিষাক্ত হইয়াছে এবং চিকিৎসা করিতে হইবে।

চিকিৎসা : ঘোষ মহাশয় যেরূপ বাঁধন দিবার কথা লিখিয়াছেন সেইরূপ দুই বা ততোধিক বাঁধন দিতে হইবে।

চক্রধর সাপে কামড়াইলে ঘামুখে কিছুক্ষণ বিষ আবদ্ধ থাকে। যতক্ষণ বিষ ঘামুখে থাকে ততক্ষণ ঐ ঘামুখ হইতে নীলাভ বুদ্‌বুদ্ উঠিতে থাকে। যদি দেখেন এরূপ বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে তবে

দেখুন!
অর্দ্ধেকটা
সানলাইট
সাবানেই এ সব
কাচা হয়েছে!
সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারণ!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট
সাবান
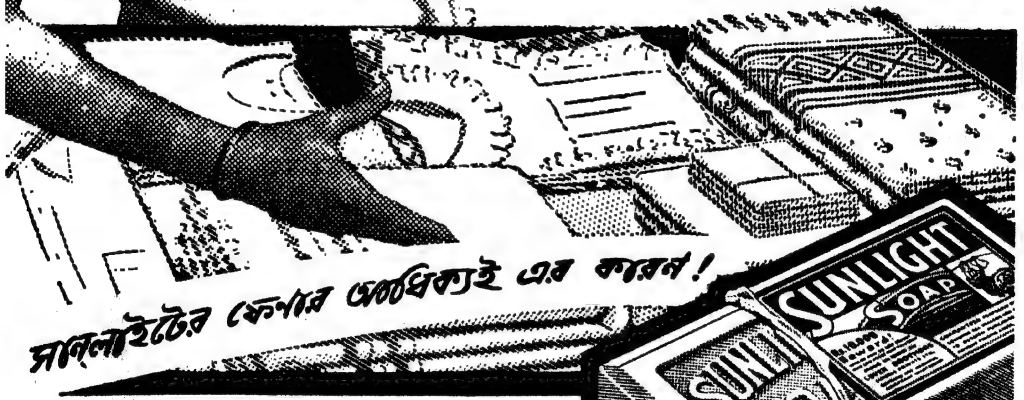
তৎক্ষণাৎ ঐ ঘামুখের কিছু উপর হইতে সুরু করিয়া ঘামুখের উপর দিয়া তাহার নীচে পর্য্যন্ত খুব গভীর করিয়া চিরিয়া দিলে বিষ ত্বরিত বেগে দেহ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া যাইবে। দুই ঘামুখেই ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার পর রোগীর আর কোন বিপদ থাকিবে না এবং আর কাটিবারও দরকার হইবে না। আর যদি দেখেন রক্ত বিষাক্ত হইয়াছে তাহা হইলে নিম্নলিখিত রূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঘামুখে কিছুক্ষণ বিষ আবদ্ধ থাকিবার সময় ঐ স্থলে বিষ একটি ডেলা (clot) প্রস্তুত করে। আর ঐ ডেলা দুই ঘামুখেই একটি করিয়া হয়। ঐ ডেলা ঘামুখের নিকটবর্ত্তী শিরা (vein) দিয়া জোঁকের ন্যায় গতিতে উপরে উঠিতে থাকে। ঐ ডেলা উঠিতে দেখা যাইবে। যেখানে ঐ ডেলা জোঁকের ন্যায় গতিতে উঠিতেছে অর্থাৎ ডেলাটি উঠিতেছে এবং একটু নীচে নামিতেছে দেখিবেন তৎক্ষণাৎ ঐ ডেলার কিছু উপর হইতে উহার মধ্য দিয়া কিছু নীচে অবধি গভীর করিয়া চিরিয়া দিবেন। দুইটি ডেলাই ঐরূপে চিরিতে হইবে। চিরিলে ক্ষিপ্র-গতিতে ডেলা দুইটি বাহির হইয়া পড়িয়া যাইবে এবং রোগী বিষ-মুক্ত হইবে আর চিরিবার বা কাটিবার দরকার হইবে না। যেখ সে সেখানে কাটিলে কোন উপকার হইবে না, কেবল অনর্থক রক্ত মোক্ষণ করিয়া রোগীকে দুর্ব্বল করা হইবে ও তাহাকে অযথা কষ্ট দেওয়া হইবে।

চক্রহীন সর্পদংশন চিকিৎসা

চক্রহীন সাপ নানা প্রকারের আছে, যথা—বোড়া, কানড়, কালাচ, রক্ত কানড়, সর্পরাজ (বা দোমুখো সাপ)। ভিন্ন ভিন্ন সাপের বিষের লক্ষণ বিভিন্ন প্রকার—যেমন বোড়ায় কামড়াইলে যতদূর বিষ উঠিবে ততদূর দেহ ফুলিবে। কানড় সাপে কামড়াইলে শিবনেত্র হইবে। কালাচ সাপে কামড়াইলে যতদূর বিষ উঠিবে ততদূর এত স্পর্শকাতর হইবে যে, একটি মাছি বসিলেও যন্ত্রণা হইবে হইবে। রক্ত কানড়ে কামড়াইলে যত দূর বিষ উঠিবে তত দূর লোমকূপ দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত বাহির হইবে। সর্পরাজে কামড়াইলে কিছুক্ষণ বাদে রক্তবমন হইবে। যে-কোন প্রকারের চক্রহীন সাপে কাটুক না কেন তাহার চিকিৎসা একই প্রকার।

চিকিৎসা—যদি কামড়াইবার অল্পক্ষণ পরেই উপস্থিত হইতে পারেন অর্থাৎ যদি বিষ বেশীদূর না উঠিয়া থাকে তবে ঐ স্থান কচি কলাপাতা দিয়া ঢাকিয়া সরাতে গুলের আগুন করিয়া ঐ স্থানে কলাপাতার উপরে তাপ দিতে থাকিবেন। যখন তাপ দিতে দিতে প্রচুর ঘাম বাহির হইয়া যাইবে তখন আর বিপদ থাকিবে না।

যখন চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হইবেন তখন যদি বিষ অনেক দূর উঠিয়া দেহে ছড়াইয়া গিয়া থাকে ত নিম্নরূপ করিতে হইবে।

রোগীকে শোয়াইয়া তাহার সমস্ত দেহে শুষ্ক ইন্দুরমাটি অর্থাৎ খুব (pulverised) শুষ্ক মাটি দিয়া মালিশ করিয়া তাহার লোমকূপ সকল বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার সমস্ত দেহ কম্বল বা লেপ দিয়া ঢাকিয়া দিবেন। কেবল কপাল খোলা থাকিবে। তাহার পর নূতন হাঁড়ি আগুনে খুব গরম করিয়া বেড়ী দিয়া রোগীর কপালের কিছু দূরে ধরিয়া ক্রমাগত তাপ দিতে থাকিবে। এই তাপ দিবার সময় রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা হইবে ও পালাইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাপ দিতে থাকিবেন এবং দেখিবেন যে, তাহার সমস্ত শরীর হইতে প্রচুর ঘাম বাহির হইতেছে। ঐ ঘাম ঢাকা না খুলিয়া ক্রমাগত মুছাইয়া দিবেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ তাপ দিলে ও প্রচুর পরিমাণ ঘাম নির্গত হইলে রোগীর বিষ বাহির হইয়া যাইবে এবং রোগী যদি চিকিৎসার পূর্ব্বে অজ্ঞান হইয়া থাকে তাহার জ্ঞান হইবে, তাহার খোনা সুর স্বাভাবিক হইবে, চক্ষের দৃষ্টি স্বাভাবিক হইবে এবং সমস্ত বিপদ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

সংক্ষেপে চিকিৎসা-প্রণালী লিখিত হইল।

এস্থলে আর একটি চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে বলিবার আছে—এই প্রণালী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানির "হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা" নামক পুস্তকের (পঞ্চদশ সংস্করণ) ৮০৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—"সাপে কামড়াইলে মুরগীর ছানার মলদ্বার বা তন্নিকটস্থ স্থান একটু চিরিয়া ঐ চেরা অংশটি দষ্ট স্থানে লাগাইলে রোগীর শরীরস্থ বিষ ক্রমে ছানার মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিবে। এইরূপে একটির পর একটি কুক্কুট-শাবক বা মুরগীর ছানা বিষদুষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিষ নিঃশেষ হইয়া না যায় ততক্ষণ ক্রমাগত মুরগীর ছানা লাগাইতে হইবে। বিষ নিঃশেষিত হইলে শেষের ছানাটি জীবিত থাকিবে।"

এই চিকিৎসা-প্রণালী ভ্রমাত্মক। ইহা দ্বারা সর্পদষ্ট রোগী বিষমুক্ত হইবে না এবং যদি তাহার রক্ত বিষদুষ্ট হইয়া থাকে, তবে এইরূপে চিকিৎসা করিলে সে রোগী মরিবে। ঐরূপে মুরগীর ছানা ঘামুখে বসাইলে ছানাটি মরিবে নিশ্চয়ই, কেননা মানুষের রক্ত ও মুরগীর রক্ত ভিন্ন প্রকৃতির। ভিন্ন প্রকৃতির রক্তের সহিত মিলিত হইলে মুরগীর ছানা মরিয়া যায়। শেষের মুরগীর ছানাটি মরিবে না, তাহার কারণ দষ্ট স্থান হইতে রক্ত বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া যায়—এ কারণ ভিন্ন প্রকৃতির রক্তের সহিত সংমিশ্রণ হইতে পারে না ছানাও মরে না।

দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে এই প্রণালী সম্বন্ধে মহেশ ভট্টাচার্য্য কোম্পানির ম্যানেজারকে আমি একাধিক

স্বাস্থ্যবান লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে
চান করে –
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
– এতে দৈনন্দিনের * ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
★ যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।
ভারতে প্রস্তুত

বার পত্র লিখিয়া জানাই যে, প্রণালীটি ভ্রমাত্মক এবং তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যেন নূতন সংস্করণে উহার উল্লেখ না করা হয়। এ সম্বন্ধে আমার চিঠির জবাব দেন।

—

"আচার্য্য যোগেশচন্দ্র"

শ্রীমঞ্জুলা সানা

'প্রবাসী'র গত ভাদ্র সংখ্যায় আচার্য্য যোগেশচন্দ্র সম্পর্কে শ্রীসুখময় সরকারের একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, যোগেশচন্দ্র প্রায় ছত্রিশ বৎসর কটক র‍্যাভেনশ' কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। সুখময়বাবু আরও লিখিয়াছেন—"কেমন করিয়া খণ্ডপড়া রাজ্যে তিনি (যোগেশচন্দ্র) 'পঠানী সাম্ভ'কে (চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত) আবিষ্কার করিলেন, সে কাহিনী বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।"—উড়িষ্যায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিপুল জনপ্রিয়তার কথা শুনিয়াছি। ওড়িয়া সাহিত্যের দিকপাল স্বর্গীয় ফকিরমোহন সেনাপতি ত্রিশ বৎসরেরও পূর্ব্বে যোগেশচন্দ্রকে এই বলিয়া শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়াছেন:

> বনর মালতী পরি পঠানি সামন্তে
> সে'টু খিলে যোগেশ তা চিহ্নিলে কেমন্তে।
> চি'হ্নিণ চিহ্নাই দেলে জগৎ মধ্যর
> জুহার যোগেশ ভাই জুহার জুহার॥

অর্থাৎ, পণ্ডিতপ্রবর পঠানী সামন্ত বন-মালতী কুসুমসম প্রস্ফুটিত ছিলেন, হে যোগেশ তুমি তাহাকে চিনিলে কেমন করিয়া? নিজে তাহার রস আস্বাদন করিলে এবং জগৎকে সেই বিমল পাণ্ডিত্যরসসুধা পান করাইলে, হে ভাই যোগেশ, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।

উড়িষ্যায় যোগেশচন্দ্রের কর্ম্মকীর্ত্তির কথা আলোচিত না হইলে, বাঙালী পাঠকের কাছে তাঁহার পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিবে।

সপ্তপর্ণ—কিরণশঙ্কর রায়। প্রকাশক—কে এল মুখোপাধ্যায় ৬-১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩৲ টাকা।

রাজনীতিজ্ঞ কিরণশঙ্কর রায়কে অনেকে জানেন, সাহিত্যিক কিরণশঙ্কর এ যুগের পাঠকের কাছে একরকম অপরিচিত বলিলেই চলে। সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত এবং একমাত্র গল্পসংগ্রহের বই সপ্তপর্ণে সাহিত্য-কর্মের স্বীকৃতি। নিদর্শন স্বল্পপরিমাণ হইলেও ইহারই মধ্যে লেখকের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে সাহিত্যিক কিরণশঙ্কর অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সপ্তপর্ণের সাতটি গল্পে তাঁহার রচনা-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার মাধুর্য্য, প্রকাশ-সংযমে, প্রচ্ছন্ন ও নির্দোষ ব্যঙ্গরসসৃষ্টিতে কয়েকটি গল্প বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারে। পরিবেশ ও চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের নৈপুণ্য ত রহিয়াছেই, গল্প-পরিবেশন-ভঙ্গিটিও মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। রাজনীতিবিদ্ কিরণ-শঙ্করের ব্যক্তি-মানসের আর একটি পরিচ্ছন্ন দিকের প্রকাশ তাঁহার গল্প-সংগ্রহের একমাত্র বই সপ্তপর্ণ। ইহার সাহিত্যিক মূল্য স্বীকৃতিলাভ করিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতি—ডেভিড কাশম্যান কয়েল। অনুবাদক—শ্রীগৌতম গুপ্ত। পরিচয় পাবলিশার্স, ১৭৫-এ, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৭। মূল্য ২৲, পৃষ্ঠা ১৮২।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলম্বস (১৪৪৬-১৫০৬) আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। স্পেনীয়গণ উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো দেশে আজতেক ও দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশে ইঙ্ক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া-ছিলেন। আজ আর এই সকল সভ্যতা বা জাতির চিহ্নমাত্র নাই বলিলেই চলে। ইহা ছাড়াও অন্য বহু জাতি এই বিরাট ভূখণ্ডে বাস করিত যাহাদিগকে সাধারণ ভাবে রেড ইণ্ডিয়ান বলা হয়। কলম্বসের এই ধারণাই ছিল যে, তিনি ইণ্ডিয়া বা ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তিন শত বৎসরের এই নূতন দেশে উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন জাতি বিশেষভাবে ইংরেজ ও জার্মান প্রোটেষ্টাণ্টগণ নানা কারণে পিতৃপিতামহের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। প্রথমে ইংলণ্ডের উপনিবেশরূপে ইহার পত্তন হইলেও, "স্বাধীনতা-যুদ্ধের" পর (১৭৭৬) স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়। বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্র। ইহার উন্নতি অল্পদিনে হইলেও এই প্রগতির ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক। ১৬০৭ হইতে ১৭৭৬ পর্য্যন্ত যাহা ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ আজ তাহা ৪৮টি রাষ্ট্রের সমবায়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গণতান্ত্রিক দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক গঠন কতকটা ইংলণ্ডের ছাঁচে হইলেও মূলতঃ ইহার প্রভেদ সুস্পষ্ট। একজন্য ইংলণ্ডের শাসন 'পার্লামেণ্টারি' আর যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্সিয়াল'। ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী আর যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীগণ কংগ্রেসের নিকট দায়ী নহেন। তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং তাঁহার নিকট দায়ী। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রের প্রধান জন্মগত অধিকার রাজা বা রাণী, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পার্লামেণ্ট বা প্রধানমন্ত্রী তথা কেবিনেটের হাতে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং জনসাধারণের নিকটই দায়ী এবং তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। কংগ্রেস প্রতিনিধিসভা এবং সেনেট তাঁহার কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির বিচার ও অপসারণের ব্যবস্থা অবশ্য আছে।

বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে ১০টি অধ্যায়ে দলীয় রাজনীতি, দলীয় সংগঠন ও ও কার্য্যধারা, শাসনব্যবস্থা, কংগ্রেস, কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত, রাজ্য (States), স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, সরকার ও ব্যবসায়ী, ব্যক্তির অধিকার, আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গীতে সরকার, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং রাজনীতি ও গণতন্ত্র এই বিষয়গুলি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

একজন আমেরিকান কর্ত্তৃক লিখিত হইলেও পুস্তকখানিতে আলোচ্য বিষয়গুলি খুব নিরপেক্ষভাবে বিচার করা হইয়াছে। নিজ দেশের ও জাতির দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে লেখক অন্ধ নহেন। আমেরিকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এমনকি আদালতও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলমান। ইহাকে মার্কিন জাতির বিশেষত্বও বলা যাইতে পারে। নিগ্রোর প্রতি ব্যবহার মার্কিন জাতির অনুদারতার একটি নমুনা বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিগ্রোকে যে শ্বেতজাতি দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়াছিল, সেই শ্বেতজাতিই তাহাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিয়াছে এবং তাহাকে সমমর্য্যাদা দিবার জন্য সে দেশের প্রতিনিধিগণ চেষ্টা করিতেছেন। যে-কোন জাতির পক্ষে সংস্কার ত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করা খুবই কঠিন। মার্কিন জাতির পক্ষেও ইহা সত্য।

ভারতের সংবিধান রচনায় যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে। আমাদের সরকারের দায়িত্ব পার্লামেণ্টারি হইলেও আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের। অবশ্য ভারতের গঠনতন্ত্র পুরাপুরি কাহারও অনুকরণ নহে। প্রত্যেক সংবিধানেই কিছু না কিছু ত্রুটি দেখা যায়। জাতির প্রতিভা এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি এড়াইয়া চলে। একথা সত্য মার্কিন দেশে রাজনীতির নামে বহু দুর্নীতি চলিতেছে। আমাদের দেশেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই সকলের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতেছে। মার্কিনের ইতিহাস হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। যুক্তরাষ্ট্র নূতন দেশ হইলেও গণতন্ত্রের পরীক্ষা এখানে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া চলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক একথা স্বীকার করিলেও তাহার নিকট হইতে অনেক কিছু ভারতের শিখিবার আছে যদিও কংগ্রেসের আদর্শ ভারতে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশসংগঠন।

এরূপ সুন্দর অনুবাদ-গ্রন্থ দ্বারা বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্য পরিপুষ্ট হইবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত—শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ। প্রকাশক—শ্রীবিমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন, শ্রীরাম-আশ্রম, ডুমুরদহ, হুগলী। মূল্য ৪৲।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহার যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল প্রথমে আকাশ সৃষ্টি হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। সৃষ্টির সময় মহাকাশে যে প্রথম স্পন্দন হইয়াছিল তাহাই প্রণব (ওঁকার) বা নাদ। ইহার অপর নাম শব্দব্রহ্ম। নাদই ব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্তি। ইহা হইতে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হয়। একজন্য বলা হইয়াছে "নাদ এব মহদ্‌ব্রহ্ম"। নাদ বা ওঁকার ব্রহ্মের একটি নাম।

উপনিষদ বলিয়াছেন,

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ
কঠোপনিষদ্ ১।২।১৫

"সমগ্র বেদে যাঁহাকে পাইবার উপায় বলা হইয়াছে, সমগ্র তপস্যা যাঁহার উদ্দেশ্যে করা হয়, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করা হয়, তোমাকে সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি—ইহা হইতেছে ওম্"। ওঁকারের তিন ভাগ—অ-উ-ম। বিশ্বে সর্বদা ওঁকার-ধ্বনি হইতেছে, সাধনা করিলে সেই অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই সাধনায় শ্রেষ্ঠ মন্ত্র "সোহং" বা "হংসঃ"। মূলবর্ণ "হংস"। তাহা হইতে অকার হইতে ক্ষকার পর্যন্ত সকল বর্ণ উৎপন্ন হয়। "হংস" মন্ত্র জপ করিতে হইলে "স"কারের সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়, "হং"কারের সহিত নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। এই মন্ত্র জপ করিয়া সমাধি লাভ করা যায়। সমাধি হইলে "আমি আছি" এ ভাবও থাকে না। বিষয়-আসক্তি ত্যাগ করিয়া, অল্প আহার অভ্যাস করিয়া নির্জনে অবস্থানপূর্বক সাধনা করিতে হয়। গুরুর উপদেশ লইয়া সাধনা না করিলে অনিষ্ট হইতে পারে। যখন বর্ণশিক্ষাতেও গুরুর প্রয়োজন, তখন যোগাভ্যাসে যে গুরু প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ কি? অর্ধরাত্রিকালে হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া নির্জন স্থানে বসিয়া থাকিলে প্রথমে বিবিধ ধ্বনি শোনা যায়, পরে প্রণবধ্বনি শোনা যায়। প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান,—ইহারা যোগের অঙ্গ। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করাকে প্রত্যাহার বলা হয়। শুভ আশ্রয়ে চিত্তস্থাপনের নাম ধারণা। অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের প্রবাহকে ধ্যান বলে। পুস্তকখানিতে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। উপরন্তু কুণ্ডলিনী শক্তি কি, তাহাকে কিভাবে জাগ্রত করিতে হয়, জাগ্রত হইলে তাহার গতি কিরূপ,—এই সকল কথাও আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকখানিতে উপনিষদ, পুরাণ, সংহিতা এবং যোগ সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থ হইতে বহু বাক্য এবং অনেক সাধু, মহাত্মা ও সাধকের বাণী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম্-এ ডি-লিট মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা যোগমার্গে সাধনা সম্বন্ধে তত্ত্বকথা জানিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মিঠে কড়া—মৈনাক। দাশগুপ্ত প্রকাশন ৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ২৸০।

এই গল্পগ্রন্থে বারোটি গল্প স্থানলাভ করিয়াছে। গল্পগুলি মিঠে এবং কড়া দু' রকমেরই। সূতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এবং পরিহাসের ছলে লেখক বর্তমান কালের সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতির পানে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টা কতকটা সফল হইয়াছে।

সৌয়েদান—শ্রীবিনয়রঞ্জন সেনগুপ্ত। প্রকাশিকা—শ্রীমতী পূর্ণিমা সেনগুপ্তা। ৯৩, বেলতলা রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

নূতন আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস। "সৌয়েদান" লেখকের কল্পনা-সৃষ্ট ছোট একটি দ্বীপ। পৃথিবীর মানচিত্রের কোথাও ইহার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু লোক-চক্ষুর অন্তরালে এমনি একটি দ্বীপের অবস্থিতি নিতান্ত অসম্ভব নয়। এই দ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসের নায়ক সাংবাদিক চন্দ্রকমল এমন এক স্বপ্ন-রাজ্য গঠনের কল্পনা করে—যে রাজ্যে চোরা কারবারী থাকিবে না, পেশাদার রাজনৈতিকের ষড়যন্ত্র থাকিবে না। উপন্যাসের সূচনা কিন্তু কলিকাতা শহরে এবং সমাপ্তি "সৌয়েদানের" উদ্দেশে যাত্রা করায়। এই সময়ের মধ্যে চন্দ্রকমলের জীবনে দেখা দিল রতনমণি, নরেন ডাক্তার, মলি, প্রতিমা এবং আরও অনেকে। চন্দ্রকমল মলিকে ভালবাসিল কিন্তু পাইল না—নরেন ডাক্তারের বিষমিশ্রিত পান চন্দ্রকমলের পরিবর্তে হত্যা করিল মলিকে। প্রতিমা মনেপ্রাণে কামনা করিল চন্দ্রকমলকে, কিন্তু ঘটনা-বিপর্যয়ে তাহাকে উন্মাদ হইতে হইল। উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে একসঙ্গে পাশাপাশি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে অসঙ্গতি আছে, আবার মাঝে মাঝে সহজ ভাষার প্রসাদে বর্ণনা জীবন্ত হইয়াও উঠিয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ঘুঁই—শ্রীকুমুদকান্ত চক্রবর্তী। প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। জয়নগর মজিলপুর, ২৪-পরগণা। দাম দু টাকা।

উপন্যাস। প্রধান চরিত্র ঘুঁই। তারই নামানুসারে গ্রন্থখানির নাম-করণ করা হইয়াছে। পটভূমি মাতলা নদীতীরস্থ হাটসর্বস্ব বাসুন্দী গ্রাম। লেখক প্রধান চরিত্র ও তার পটভূমির বিকাশ পাশাপাশি দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হন নি। গ্রন্থখানি পড়তে পড়তে বার বার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, স্থানে স্থানে ঘটনা ও সংলাপ অসংলগ্ন এবং অর্থহীন। ভাষা আড়ষ্ট, তার উপর ছাপার ভুল বিস্তর—তবে কাহিনীটির উপজীব্য ভাল এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীও উদার।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শান্তির বারতা—প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড—স্নেহময় ব্রহ্মচারী সঙ্কলিত এবং বারাণসী স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীটস্থ "অযাচক আশ্রম" হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড দেড় টাকা।

শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস বিখ্যাত কর্মযোগী, তিনি তরুণ বয়স হইতে ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং দেশ ও জাতির দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণার্থ দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে, মহামারীতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অযাচক বৃত্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ বহু নরনারী তাঁহার অনুবর্তী হইয়া ধন্য হইয়াছেন। দেশের বহু স্থানে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম সর্বদা ধর্মের সেবায় ও জনহিতকর কর্মে নিয়োজিত। দেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণকালে যেখানে সেখানে সংবর্ধনা সভায় ও সমবেত উপাসনা-ক্ষেত্রে সংসার দাবদগ্ধ নরনারীর প্রাণে শান্তিবর্ষণকারী ধর্মনীতি ও সমাজ-নীতি প্রভৃতি বিষয়ে এই মহান্ কর্মযোগী এবং তাঁহার শিক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ যেসব মূল্যবান ভাষণ দিয়াছেন, সেসবেরই অধিকাংশ সংগ্রহক্রমে প্রথম খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় এবং তৃতীয় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় প্রায় চারি শত 'বারতা' পরিবেশিত হইয়াছে। পরমার্থ-সঙ্গীত, নামকীর্তন, স্তবাদি, কবিতা এবং কোন কোন স্থানের অভিনন্দনাদিও খণ্ডত্রয়ে স্থান পাইয়াছে। দীক্ষা, নামের মহিমা, সমবেত উপাসনা, নারী-জাগরণ, দাম্পত্যজীবন, জীবনের কর্তব্য, সমাজের পবিত্রতা রক্ষা, প্রণব উপাসনা, ইষ্টনিষ্ঠা, ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভক্তিই পরমপুরুষার্থ, রুদ্রের শক্তি ইত্যাদি বিষয়ক উপদেশাবলী অনুধাবনযোগ্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

তপুর নিষ্কৃতি—শ্রীনরেশচন্দ্র রায়। প্রকাশক—শ্রীনিত্যানন্দ সাহা। ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। পৃ, ৮২; মূল্য দেড় টাকা।

তপুর নিষ্কৃতি ছোটদের একখানি উপন্যাস। তপনকুমার ওরফে তপু আসাম-প্রবাসী বাঙালী ডাক্তারের পুত্র, শৈশবে অতিমাত্রায় কৌতূহলী, যৌবনে জনকল্যাণে উৎসর্গীকৃত জীবন। মহৎ উদ্দেশ্যে সম্পন্ন গৃহস্থের কিছু কিছু জিনিস তাদের অগোচরে সংগ্রহ করা সে অথবা তার দলের কোন ছেলে অন্যায় বলে মনে করে না। চরিত্র-মাহাত্ম্যে এই ত্রুটি তুচ্ছ মনে হয়। আদর্শবাদের মাত্রাধিক্যে কাহিনীর রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

শ্রীতারাপদ রাহা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

তীর্থযাত্রী

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

ইথিওপীয়ার সম্রাট, হাইলে সেলাসী

প্রতিকৃতি

শিল্পী—৺ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস বাগচী

৫৬শ ভাগ ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৬৩ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ

সাধারণ নির্ব্বাচনের দিন ত ঘন হইয়া আসিতেছে। সাধারণ লোকে এই ব্যাপারটার গুরুত্ব গতবারে আদৌ বুঝিতে পারে নাই। কেহ-বা পার্টি হিসাবে, কেহ-বা "সরকার জব্দ হউক" এই ইচ্ছায়, আবার কেহ-বা নিজের অপরিণতবুদ্ধি সন্তান-সন্ততির উদ্দাম প্ররোচনায় ভোট দিয়াছিলেন। আবার অতি বুদ্ধিমান যাঁহারা তাঁহারা কোন ভোটই দেন নাই সকল প্রার্থীকেই বঞ্চিত করার জন্য, এবং তাহাতে নিজেদের যে কি ক্ষতি হইবে সেকথা ভাবিবার চেষ্টাও করেন নাই, দিবানিদ্রা ও বিজ্ঞের মত চটুল মতামত প্রকাশ করিয়া ছুটি উপভোগ করিয়াছিলেন। এই অতি-বুদ্ধিমানদের মূর্খতার ফলে ভোটদান ব্যাপারটা প্রহসনে দাঁড়ায় অনেক স্থলে, যাহার ফল আমরা আজ ভুগিতেছি।

ইংরেজী প্রবাদ আছে যে "দেশের লোকের যোগ্যতা অনুযায়ীই সে দেশের শাসনতন্ত্র গঠিত হয়।" ইহা অতি সত্য এবং ইহাও সত্য যে, শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সাধারণের অধিকার প্রয়োগ ও ব্যবহারের সুযোগ আমরা পাঁচ বৎসরে একবারমাত্র ব্যাপক ভাবে পাই। অর্থাৎ, আজ যাঁহাদের আমরা নির্ব্বাচিত করিব তাঁহারা আগামী পাঁচ বৎসর যদি জীবিত ও চলচ্ছক্তিযুক্ত থাকেন তবে তাঁহাদের সকল কার্য্যকলাপের শুভাশুভ ফলাফল আমাদের পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভোগ করিতেই হইবে। তাঁহাদের দোষে যদি দেশের লোক দুরবস্থা প্রাপ্ত হয় তবে তাহার প্রতিকার অতি জটিল পথে করিতে হইবে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, প্রতিকার-চেষ্টায় আরও বিষময় ফলই ফলিয়াছে।

সুতরাং আমাদের নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, গত নির্ব্বাচনের পর হইতে আমাদের সকলের, অর্থাৎ বাংলার জনসাধারণের—বিশেষে পশ্চিমবঙ্গভূমির সন্তানবর্গের—অবস্থা কোন্ পথে গিয়াছে এবং সে-পথে যাওয়ার কারণ কি?

দোষগুণ বিচারেও আমাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করা উচিত, শুধু গালভরা স্লোগান আওড়াইয়া অর্ব্বাচীনের ন্যায় "যত দোষ নন্দঘোষ" হাঁকিলেই চলিবে না। সরকারের যদি দোষ থাকে তবে সেটা বিচার করিয়া, নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা অবশ্যপ্রয়োজন, কিন্তু গায়ের জ্বালা মিটাইতে গিয়া আরও অযোগ্য লোককে নির্ব্বাচিত হওয়ার সুযোগ দিলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়াই যাইবে, প্রতিকার কিছুমাত্র হইবে না, শুধু খাল কাটিয়া কুমীর আনাই হইবে। এবং এই কাজই আমরা কতকটা করিয়াছিলাম বিগত নির্ব্বাচনে, অযোগ্য সরকারের বিরুদ্ধে অযোগ্যতর প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ব্বাচিত করিয়া। ফলে, আজ যদি বলি সরকারী দলের শতকরা ৯৫ জন অযোগ্য, সেই দল বলিবে প্রতিপক্ষের শতকরা ১০০ জনই অযোগ্যতর।

সেই জন্যই সময় থাকিতে বিচার করা প্রয়োজন যে, নির্ব্বাচনের "বাঘে মহিষের লড়াইয়ে" জনসাধারণরূপী উলুখড়ই ধ্বংসের পথে আরও অগ্রসর না হয়। শুধু টিকেট বা ছাপ দেখিয়াই ভোট দেওয়ায় এই বিপদের আশঙ্কা খুবই আছে। সেই কারণে সাধারণের প্রথমেই জানা দরকার—কোন্ কোন্ দলে কি কি রকম লোক প্রার্থীরূপে পাঠানো হইতেছে। কংগ্রেসের ছাপ থাকিলেই সে লোক যে মহাত্মা গান্ধীর বা পণ্ডিত নেহরুর পথের পথিক হইবে না একথা যেমন সত্য, কংগ্রেস-বিরোধী হইলেই সে যে দধীচিতুল্য স্বার্থহীন আত্মত্যাগী হইবে সেকথাও সমান [illegible] ভীন।

কংগ্রেস যে জাহান্নামে চলিয়াছে সেকথা সবাই জানে ও বলে, কিন্তু সেরূপ হওয়ার কারণ আমাদের নিষ্ক্রিয় জড়-ভরত বৃত্তি অথবা অপোগণ্ড শিশুতুল্য "নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ" করার প্রবৃত্তি।

অনেক বিদগ্ধ চূড়ামণি আছেন যাঁহারা বলিবেন, "ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়" করিয়া লাভ কি? দেশে যোগ্য লোক যদি না থাকে তবে কপালে যে দুঃখ আছে তাহা ঘটিবেই। তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধিবৃত্তি গুণ-দোষ ইত্যাদিতে দেশের লোকের মধ্যে ইতরবিশেষ কি কিছুই নাই? অপেক্ষাকৃত ভাল ত আছে, যদি সর্ব্বগুণযুক্ত সর্ব্বদোষমুক্ত কেহই না থাকে। অন্ততঃপক্ষে দোষ-গুণ বিচার করিতে যদি আমরা অগ্রসর হই তবে দলগুলিতেও কিছু সাড়া পড়িবে ত?

আমাদের বুঝা উচিত আমরা, অর্থাৎ বাঙালী, আজ কোথায় দাঁড়াইয়াছি। কর্ম্মী ও শ্রমিকের ক্ষেত্রে সারা ভারতে বাঙালীর স্থান একমাত্র বোধ হয় আসামের উপর, অন্য সকল প্রদেশের নীচে। বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রেও আমাদের স্থান সপ্তম বা অষ্টম। ব্যবসাবাণিজ্যের কথা বলা বৃথা। আমাদের এই নিদারুণ অবনতি হইয়াছে নানা কারণে, যাহার মধ্যে অন্যতম হইল অযোগ্য লোককে প্রতিনিধি ও দশপাজরূপে নির্ব্বাচন।

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন

১৯৫৭ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে—১৩ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান নির্ব্বাচন কমিশনার শ্রীসুকুমার সেন ঘোষণা করেন। বিভিন্ন রাজ্যের নির্ব্বাচনের সঠিক তারিখ পরে জানানো হইবে। দিল্লীর ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যে একদিনেই নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইবে—অন্যান্য অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার রাজ্যে তিন-চার দিন করিয়া লাগিবে। কেবলমাত্র হিমাচল প্রদেশে নির্ব্বাচন-অনুষ্ঠানে বিলম্ব হইবে—কারণ মার্চ্চ মাসের তুষারপাতের সময় ঐখানে নির্ব্বাচন-অনুষ্ঠান সম্ভব নাও হইতে পারে।

জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য প্রার্থীদিগকে আহ্বান জানানো হইবে। ৩১শে মার্চ্চের মধ্যেই নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল প্রকাশ করা যাইবে বলিয়া শ্রীসেন অভিমত প্রকাশ করেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাহার পূর্ব্বেও ফলাফল ঘোষণা করা যাইতে পারে।

আগামী নির্ব্বাচনের জন্য আঠার কোটি সত্তর লক্ষ নাগরিক ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। প্রথম নির্ব্বাচনে ভোটার তালিকাভুক্ত নাগরিকের সংখ্যা ছিল সতের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ—তন্মধ্যে শতকরা একান্ন জন কার্য্যতঃ ভোট দিয়াছিলেন। নির্ব্বাচনে আটাশ লক্ষ ব্যালট বাক্স ব্যবহৃত হইবে।

রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নির্ব্বাচনের জন্য ২,৫১৮টি নির্ব্বাচন-কেন্দ্র (৫৮৩টি দুই-আসন বিশিষ্ট কেন্দ্রসহ) হইতে ৩,১০২ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। এই আসনগুলির মধ্যে ৪৭০টি আসন তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের জন্য এবং ২২১টি আসন তপশীলভুক্ত উপজাতিদিগের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। এইবার তিন-সদস্য বিশিষ্ট কোন নির্ব্বাচন-কেন্দ্র থাকিবে না।

লোকসভার ৪৮১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে—তন্মধ্যে ৭৪টি আসন তপশীলভুক্ত জাতীর এবং ২৯টি আসন তপশীলভুক্ত উপজাতীয় প্রতিনিধিদিগের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

আগামী নির্ব্বাচনের পর পার্লামেন্টে এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতীয়দের প্রতিনিধিসংখ্যা বর্ত্তমান হইতে বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতীয় অর্থনীতির ধারা

সংযুক্ত বাণিজ্য সমিতির সম্প্রতি যে বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে বিদায়ী সভাপতি ভারতীয় অর্থনীতির বেসরকারী ক্ষেত্রের তরফ হইতে কয়েকটি বিশেষ মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য। মিঃ জেঙ্কিন্সের প্রথম অভিযোগ এই যে, ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত আয়করের হার অত্যধিক এবং ইহার ফলে উৎপাদনশীল মূলধন যথোচিত পরিমাণে সৃষ্ট হইতেছে না। ব্রিটেনে আয়করের হার অত্যধিক হওয়ার দরুন মূলধন ও ব্যক্তিগত প্রতিভা উভয়েই দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষেও আয়করের উচ্চ হার বর্ত্তমান থাকিলে অনুন্নত বিদেশে ভারতীয় মূলধন ও প্রতিভার বহির্মুখী গতি প্রাধান্যলাভ করিবে। ইহার উত্তরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী অবশ্য বলিয়াছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিংবা মূলধনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতেই হইবে এমন কোন নীতির সমর্থক তিনি নহেন। অর্থমন্ত্রীর এই উক্তি অবশ্যই অর্থহীন, কারণ ভারতবর্ষে যখন পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক নীতি গৃহীত হয় নাই এবং মিশ্র অর্থনীতি স্বীকৃত হইয়াছে, তখন সেই অবস্থায় অর্থমন্ত্রীর এই উক্তি নিরর্থক। মূলধনের বিদেশ যাত্রা সম্বন্ধে মিঃ জেঙ্কিন্স যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা অবশ্য বিদেশী মূলধন সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দেশী মূলধনের পক্ষে বিদেশে যাওয়া সম্বন্ধে কিছু কিছু বাধা-নিষেধ আছে। কিন্তু দেশী মূলধনের পক্ষে বিদেশ যাওয়া সম্ভবপর না হইলেও তাহার সামর্থ্য ও প্রয়োগ হ্রাস পাইতে বাধ্য।

বিদেশী মূলধন যাহাতে এদেশে আসে তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বহুপ্রকারে আহ্বান জানাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সরকারী বিধিনিষেধের বেড়াজাল এমন ভীতিপ্রদ ভাবে বিস্তারলাভ করিতেছে যে, বিদেশী মূলধন এই দেশ ছাড়িবার জন্য সচেষ্ট। নূতন বিদেশী মূলধনের এই দেশে আসাও সহজসাধ্য নহে, কারণ এই ব্যাপারেও বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রীয় নূতন কর ধার্য্য দ্বারা যেভাবে যৌথ কোম্পানীগুলির উদ্বৃত্ত আমানতের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে তাহাতে বিদেশী মূলধন আতঙ্কগ্রস্ত হইতে বাধ্য। আর ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধনে দেশী মূলধনও শিল্পোন্নয়ন অপেক্ষা চোরাকারবারের দিকে অধিক মনোযোগী হইবে।

ভারত সরকার অবশ্য নিজ পক্ষ সমর্থনে বলিতে পারেন যে, সম্প্রতি কিছু পরিমাণ বিদেশী মূলধন ভারতবর্ষে আসিয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি নহে—রাজনীতি। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনের কাঠামো বজায় রাখার জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই আগ্রহান্বিত, সুতরাং তাহারা বেসরকারী শিল্প মূলধনকে ভারতে আসার জন্য উদ্বোধিত করে, বিদেশী বেসরকারী শিল্পমূলধনের অভাবে বিদেশী রাষ্ট্রগুলিকে মূলধন সরবরাহ করিতে হয়—যেমন করিতে হইতেছে কলম্বো পরিকল্পনা কিংবা আমেরিকার কারিগরী অর্থসাহায্য-ব্যবস্থায়। সুতরাং বেসরকারী মূলধনের ভারতে আগমনের পিছনে তাহাদের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির উৎসাহদানও নিহিত। এই অবস্থাকে ভারত সরকার অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া যেন তাহার অপব্যবহার না করেন।

ভারত সরকার যদি মনে করেন যে, বিদেশী মূলধনের কোন প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে ইহার আগমন বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও প্রায় আট শত কোটি হইতে বার শত কোটি টাকার মত বিদেশী অর্থসাহায্যের প্রত্যাশা করা হইয়াছে। ভারত সরকারের উচিত

বিদেশের দ্বারে দ্বারে না ঘুরিয়া নিজের অবস্থা অনুসারে পরিকল্পনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তাহা হইলে আর বিদেশী মূলধনের প্রত্যাশায় থাকিতে হয় না। কিন্তু ভারতের নিজের আর্থিক সম্পদের এত অভাব যে, বৈদেশিক সাহায্য ব্যতীত ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রায় অর্দ্ধেকই বাতিল করিয়া দিতে হয়।

মিঃ জেঙ্কিন্সের দ্বিতীয় অভিযোগ—ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার বিস্তৃতির বিরুদ্ধে। সরকারী কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার বৃদ্ধি হইবে তাহা অবশ্যম্ভাবী, যদিও ক্ষমতাশালী ও অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র ধনিকতন্ত্রের সামিল। শ্রীকৃষ্ণমাচারী অবশ্য আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার বৃদ্ধিকে সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু দিন দিন ইহার মধ্যে যে দুরাচার ও অনাচার বৃদ্ধি পাইতেছে সে সম্বন্ধে যথোচিত পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মিঃ জেঙ্কিন্সের তৃতীয় অভিযোগ এই, বর্ত্তমান ভারতবর্ষে সরকারী ও বেসরকারী অর্থনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রকে এমন দ্বিধাবিভক্ত ভাবে দেখা হয় যে তাহাতে এই দুইটি ক্ষেত্রকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা প্রতিযোগী হিসাবে প্রতীয়মান করা হয় এবং ইহার ফলে দুইটি ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধিত হয় না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও এই দুইটি ক্ষেত্র পরস্পরবিরোধী নহে, তথাপি ভারতের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে বাধ্য।

নূতন করধার্য্য

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি কয়েকটি নূতন বিষয়ে করধার্য্য ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মূলধন বৃদ্ধির উপর করস্থাপন ও অতিরিক্ত আয়করের হার বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এই নূতন করধার্য্য সম্বন্ধে ভারতীয় জনমত বিভক্ত এবং তাহা খুবই স্বাভাবিক। বিরোধীপক্ষের মতে বৎসরের মাঝখানে এইপ্রকার করধার্য্য অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অন্যায়, বিশেষতঃ এই করগুলি হইতে মোট আয় যখন হইবে মাত্র ১৬ কোটি টাকা। আর যাহারা সমর্থন করেন তাঁহারা বলেন যে, ১৬ কোটি টাকা আয়কর বৃদ্ধি নেহাত অল্প নহে এবং ইহা পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল। যুদ্ধের সময়ে ও তাহার অব্যবহিত পর হইতেই জমি ও বাড়ী প্রভৃতির মূল্য অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং হস্তান্তর দ্বারা বহুলোক অগাধ সম্পত্তির মালিক হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং ধনবৃদ্ধিকর বহু পূর্ব্বেই ধার্য্য হওয়া প্রয়োজন ছিল। এই কর এত বিলম্বে ধার্য্য করা হইয়াছে যে, স্থাবর সম্পত্তির কেনাবেচায় হিড়িক এখন কমতির দিকে। তাই এই কর সম্বন্ধে অভিযোগ ইহার নির্দ্ধারণের জন্য নহে, ইহা নির্দ্ধারণে বিলম্বের জন্য।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ধনবৃদ্ধিকর ব্যবস্থা আছে, ছিল না ভারতবর্ষে। ধনবৃদ্ধিকর একটি নূতন প্রকার কর ব্যবস্থা নহে, ইহা আয়করের গোষ্ঠীভুক্ত। ধনবৃদ্ধিকে বাদ দিয়া আয়করের যাথার্থ্য নিরূপণ সম্ভব নহে।

নূতন কর স্থাপনের কৈফিয়ত হিসাবে বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট খরচ ৪,৮০০ কোটি টাকা হইতে আরও প্রায় ৫০০ শত কোটি টাকা অধিক হইবে। এই খরচ সঙ্কুলানের জন্য করবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রভাবে শিল্পোন্নয়ন হইয়াছে ও হইতেছে, সমাজে ধনিকশ্রেণীর আয়বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মুনাফার হার বর্দ্ধিত হইতেছে, এই অবস্থায় শিল্পক্ষেত্রে ধনবৃদ্ধিকর আপত্তিজনক হইতে পারে না। জমি এবং বাড়ী সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য জনসাধারণের আয়বৃদ্ধির ফলে বর্দ্ধিত চাহিদার দরুন জমি ও বাড়ীর মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূল্যবৃদ্ধির হার প্রায় সাত-আট গুণ, আবার কোন কোন স্থানে ইহারও অধিক। গ্রামাঞ্চলে বহুমুখী পরিকল্পনার (mu tipurpose projects) ফলে ও নদী-পরিকল্পনার প্রভাবে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় "betterment levy" কিংবা উন্নয়নকর যথার্থভাবেই নির্দ্ধারণযোগ্য; উন্নয়নকর ও ধনবৃদ্ধিকরের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য কিছু নাই বলিলেও চলে।

কলিকাতার টালিগঞ্জ, রিজেন্ট পার্ক, সাদার্ণ এভিনিউ ও কাঁকুলিয়া, ফার্ণ রোড প্রভৃতি এলাকায় আইনসঙ্গত ভাবেই বহু পূর্ব্বে "bettermet levy" ধার্য্য করা উচিত ছিল। মুদ্রাস্ফীতি ও ক্রমিক হারে জীবন-মান উন্নয়নের ফলে সমস্ত প্রকার সম্পদেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধি তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধির জন্য বহুলাংশে দায়ী, সুতরাং এই অবস্থায় রাষ্ট্র যদি বর্দ্ধিত সম্পদমূল্যের কিছু অংশ কর হিসাবে গ্রহণ করেন তাহাতে অযৌক্তিক ও [illegible] কিছু নাই।

১৯৫৬ সনের ১লা এপ্রিলের পর হইতে ধনবৃদ্ধির উপর আয়করের হারে কর স্থাপিত হইয়াছে। সম্পত্তি জাতীয়করণে কিংবা অন্যভাবে হস্তান্তরকরণে যে আয় হইবে, অংশীদারী ব্যবসা বিক্রয়ের ফলে কিংবা বসতবাড়ী অন্ততঃপক্ষে সাত বৎসর অধিকারে রাখার পর যদি বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে এই সকল আয় ধনবৃদ্ধিকরের আওতায় পড়িবে।

বর্ত্তমান আইন অনুসারে ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে ১৫,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত সম্পত্তির মূল্য বিবর্দ্ধন করসাপেক্ষ নহে। নূতন আইনে এই সীমা হ্রাস করিয়া দিয়া ৫,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত করা হইতেছে। অর্থাৎ ইহার অতিরিক্ত মূল্য বিবর্দ্ধনের জন্য কর দিতে হইবে। কিন্তু নিম্ন আয়কারী ব্যক্তিদের জন্য আরও কিছু সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের ক্ষেত্রে ধনবৃদ্ধিসমেত বাৎসরিক মোট আয় যদি ১০,০০০৲ টাকার অধিক না হয় তাহা হইলে ইহাদের ধনবৃদ্ধিকর দিতে হইবে না। প্রস্তাবিত ধনবৃদ্ধিকর সম্বন্ধে শেষকালে কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। বাড়ীর বিক্রয়মূল্য যদি ২৫,০০০৲ টাকার কম হয় তাহা হইলে বিক্রেতাকে কর দিতে হইবে না, অবশ্য যদি তাহার দুইটির অধিক বাড়ী না থাকে।

ধনবৃদ্ধিকরের সুপারিশ করেন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক কালডর। অধ্যাপক কালডর যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন ভারত সরকার তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কি উপায়ে ভারতে করারাজস্ব বৃদ্ধি করা যায় সে সম্বন্ধে অভিমত দেওয়ার জন্য। অধ্যাপক কালডরের মতে ন্যায়বিচারের খাতিরে আয়করের সংজ্ঞা হইতে ধনবৃদ্ধিকরকে বাদ দেওয়া অনুচিত। ইহাতে সমাজে দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং আয়ের নূতন সংজ্ঞায় ধনবৃদ্ধির আয়কেও ধরিতে হইবে। কররাজস্বের একটি প্রান্তিক সীমানা আছে যাহার উপরে গেলে ইহা প্রেরণাশূন্য হয়। বর্তমানে করযোগ্য আয়ের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অস্পষ্টতা আছে। ভারতীয় কর অনুসন্ধান সমিতি ধনবৃদ্ধিকরের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, কারণ ইহাতে কর এড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক, এই প্রকার আয় হঠাৎ ও অনিয়মিত, সুতরাং ইহার সত্যকার পরিমাপ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। ৩৫,০০০ টাকার বাড়ীর জন্য আইনসঙ্গত ভাবে ২৪,০০০ টাকা লইলে এবং বাকী টাকা বে-আইনী ভাবে লইলে (অর্থাৎ গুপ্তভাবে লইলে) কর্তৃপক্ষের টের পাওয়ার কোন উপায় নাই। কিন্তু অধ্যাপক কালডরের মতে ধনবৃদ্ধিকে করের আওতা হইতে বাদ দিলে আয়করকে অধিক পরিমাণে এড়াইয়া যাওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও স্থানীয় জনসাধারণ

দুর্গাপুরে ইস্পাত তৈয়ারী কারখানাটি স্থাপনের সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গবাসী বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু এজন্য তাহাদিগকে যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে তাহাও বিশেষ কম নহে। কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য হাজার হাজার লোককে গৃহচ্যুত হইতে হইবে। সরকার হইতে এই সকল বাস্তুহারাকে পুনর্বসন ঋণ দেওয়া হইলেও ইহারা পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইবে না। অধিকাংশ লোকেরই চাষের জমি নষ্ট হইয়াছে—ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ পাইলেও তাহারা চাষের জমি কেহই পাইবে না। রাজ্যের অন্যত্র যাইয়া নূতন ভাবে বসতি করিয়া চাষবাস করাও এই সকল বাস্তুহারাদের পক্ষে বিশেষ সহজসাধ্য নয়। ক্ষতিপূরণের অর্থ পাইবার পর ইহাদের প্রধান ভরসা ছিল এই যে কারখানার নিকটবর্ত্তী স্থানে কোনক্রমে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, ইস্পাত-কারখানাতে কাজ করিয়াই তাহারা ভবিষ্যতে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

কিন্তু স্পষ্টতঃই তাহাদের সেই আশা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। দুর্গাপুর কারখানা ও স্থানীয় জনসাধারণের সমস্যা সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখের সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমানবাণী" পত্রিকায় শ্রীআবদুস সাত্তার লিখিতেছেন :

"কারখানা স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে কিছু-সংখ্যক লোক নিযুক্ত হইয়াছে। নিযুক্ত ব্যক্তিগণের তালিকা দেখিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের মনে যে আশা-ভরসা ছিল তাহা ভাঙিয়া যাইতেছে। বাহিরের লোক লওয়া হইতেছে, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসিগণকে তেমন কোন সুযোগ দেওয়া হইতেছে না বলিয়া আমাদের নিকট অভিযোগ করা হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা যেখানে হইয়াছে সেটিও বর্দ্ধমান জেলার সীমানাস্থিত। সেখানে গ্রাম ছিল, লোকের বাস ছিল। কারখানার জন্য তাহাদিগকে উদ্বাস্তু হইতে হইয়াছে। কারখানার স্থানীয় অধিবাসীরা যোগ্যতামত সকল প্রকার কাজ পাইবে, তাহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে এইরূপ একটা সঙ্গত আশা তাহারা পোষণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহাদিগকে আশাভঙ্গজনিত দুঃখ-বেদনা ভোগ করিতে হইতেছে। দুর্গাপুরেও যদি ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহা বড় দুঃখ ও লজ্জার কারণ হইবে। অনেক সময় বিশেষ যোগ্যতার দোহাই দেওয়া হয়, কিন্তু এমন অনেক কাজ রহিয়াছে যাহার জন্য কোন বিশেষ যোগ্যতার আবশ্যক নাই এবং যে যোগ্যতার আবশ্যক সে যোগ্যতা স্থানীয় অধিবাসীদেরও আছে।

"লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় দক্ষ কারিগরের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রহিয়াছে এবং কেবলমাত্র স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ কর্ম্মী সংগৃহীত হইতে পারে না তাহাও সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে চেষ্টা করিলে বিশেষ ট্রেনিং দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্য হইতেও কিছুসংখ্যক দক্ষ কারিগর সৃষ্টি করা যায়। অন্যান্যদের সঙ্গে সঙ্গে কারখানার স্থানীয় অধিবাসীরাও কাজ পাইবে ইহাই কাম্য। এই সঙ্গে বর্দ্ধমান জেলার যুবকগণকে সুযোগ দেওয়া হইবে ইহাও সকলেরই আশা।"

"বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন :

"দুর্গাপুরে কারখানা হইলে বর্দ্ধমান জেলার যুবকগণও জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ পাইবে এই আশা আমরা এখনও রাখি। ইহা না হইলে দুর্গাপুরের পরিবর্ত্তে ভীমপুরে এই কারখানা হইলে কি ক্ষতি হইত? এতগুলি লোককে সাতপুরুষের ভিটাছাড়া হইতে হইত না।"

"বর্দ্ধমানবাণী"র মন্তব্য বিশেষ সমীচীন এবং সময়োচিতই হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান স্থান। এই সকল শিল্পের সমৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে অপরিসীম ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে। কারখানার স্থানসঙ্কুলানের জন্য কৃষক তাহার পিতৃপুরুষের ভিটা এবং ধানের জমি হইতে উৎখাত হইয়াছে—প্রতিষ্ঠিত শিল্পাঞ্চলের ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য যোগাইতে গিয়া গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব হওয়াতে বহু লোক অন্নকষ্টে রহিয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণ নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পে ও কারখানায় কাজ পাইলে জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ পাইত এবং তাহাদের সামগ্রিক ক্ষতির আংশিক পূরণ সম্ভব হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোথাও তাহা হয় নাই, সর্ব্বত্রই বহিরাগত শ্রমিকগণই প্রাধান্য পাইয়াছে। শিল্পের মূলধনের সুদ, মুনাফা, মোটা বেতনের চাকুরি, শ্রমিকের মজুরি—সকল দিক হইতেই পশ্চিমবঙ্গবাসী শোষিত হইয়াছে। এই দুরবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের নিজেদের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষাও বড় কথা এই যে, সর্ব্বত্রই বাঙালীকে

ঠেলিয়া রাখিবার একটি অলিখিত নিয়ম চালু করা হইয়াছে। সেই জন্যই রাজ্যের মধ্যেও অধিকাংশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে আজ আর বাঙালী যুবকের চাকুরি মিলে না।

পরিস্থিতি এইরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, রাজ্য-সরকারকে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি পর্যান্ত প্রচার করিতে হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্যে নিজ নিজ রাজ্যের অধিবাসীদিগকে কর্ম্মে নিয়োগ-ব্যাপারে অগ্রাধিকার দানের জন্য বহু পূর্ব্ব হইতেই সরকারী নির্দ্দেশ প্রচলিত ছিল—পশ্চিমবঙ্গে তাহা ছিল না, এখনও নাই। তথাপি নিয়োগকারীদের সঙ্কীর্ণতা আজ সকল শিল্পেই এরূপ প্রকট হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাতে বিচলিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষ ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক

প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট মি ব্ল্যাক যখন ভারতীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট লিখিত চিঠিতে সরকারী অর্থনীতি বিষয়ে কিছু সমালোচনা করেন তখন এদেশে তাঁহার চিঠি সম্বন্ধে বহু বিরুদ্ধ মন্তব্য করা হয়। কিন্তু গত ১৫ই নবেম্বর মিঃ ব্ল্যাক শ্রীকৃষ্ণমাচারীর নিকট যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক সাহায্য করিতে আগ্রহান্বিত। এই চিঠিতে বর্ত্তমানে চারটি পরিকল্পনাকে সাহায্য করিবার জন্য সিদ্ধান্ত জানানো হইয়াছে। এই চারিটি পরিকল্পনার মধ্যে ভারতীয় ইস্পাত শিল্পকে (মার্টিন বার্ন) সম্প্রতি দুই কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে এই কোম্পানীকে সাড়ে তিন কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় ঋণ দেওয়া হইবে রেলপথ উন্নয়নের জন্য; এই কারণে আগামী জানুয়ারী মাসে বিশ্বব্যাঙ্কের একটি কমিশন ভারতীয় রেলপথ পরীক্ষার জন্য আসিবে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য স্থলপথ যানবাহনের উন্নতিকল্পে বিশ্বব্যাঙ্ক ১৯৫৭ সনের এপ্রিল মাসে একটি অনুসন্ধান কমিশন প্রেরণ করিবে, এবং তাহাদের অনুমোদন অনুসারে ঋণ দেওয়া হইবে। চতুর্থ ঋণ দেওয়া হইবে নদী-পরিকল্পনাগুলির জন্য। যথা: কয়না, হিরাকুদ, দামোদর ভ্যালির দুইটি নূতন পরিকল্পনা ও বোম্বাইয়ের ট্রম্বে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতির জন্য।

বিশ্বব্যাঙ্কের ইঞ্জিনীয়ারগণ বর্ত্তমানে বোম্বাইয়ের কয়না জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিতেছেন। ইঁহাদের রিপোর্ট প্রাপ্তির পর বিশ্বব্যাঙ্ক তাহার সিদ্ধান্ত ভারত সরকারকে জানাইবে। যে-সকল পরিকল্পনা বিশ্বব্যাঙ্ক যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিবে কেবলমাত্র তাহাদের জন্যই ঋণ দিবে। আজ পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতবর্ষকে ২২৪·৮ মিলিয়ন ডলার (অর্থাৎ, প্রায় ১১২ কোটি টাকা) ঋণ দিয়াছে কিংবা ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ঋণগুলি যথাক্রমে এইরূপ: রেল-ইঞ্জিন পরিকল্পনা ৩·২৮ কোটি ডলার; ট্রাক্টার ও কৃষিযন্ত্র ক্রয় বাবদ ৭৫ লক্ষ ডলার; বোকারো জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা ১·৮৫ কোটি ডলার; ভারতীয় ইস্পাত শিল্প ৩·১৫ কোটি ডলার; দামোদর পরিকল্পনা ১·৯৫ কোটি ডলার; টাটা ইস্পাত-শিল্প ৭·৫ কোটি ডলার; ভারতীয় ইস্পাত-শিল্প ২ কোটি ডলার; ট্রম্বে জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা ১ কোটি ডলার ও ভারতীয় শিল্পদাদন সমিতিকে ১ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সুদের হার বৎসরে শতকরা চার টাকা, সাড়ে চার টাকা।

পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর বিপদ

দেশে ভোগপণ্য প্রস্তুতির যে সকল প্রতিষ্ঠান বেসরকারী মালিকের হাতে আছে, তাহার কোনটাই দেশের লোকের সেবার জন্য নহে। তাহা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া দেশের জনসাধারণের রিক্ত পকেট আরও হাল্কা করার ব্যবস্থা মাত্র। সুতরাং শ্রীদেশাইয়ের নিম্নস্থ বিবৃতিতে কাহারও আশ্বস্ত হওয়ার কারণ নাই।

"নয়াদিল্লী, ১৮ই নবেম্বর—ভারত সরকারের বাণিজ্য এবং ভোগ্যপণ্য শিল্পমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অদ্য ব্যবসায়ীদিগকে বলেন যে, কোন পণ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিতে পারে বলিয়া লোকের মনে যাহাতে ভয় না জন্মে তাঁহারা যেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখেন। ব্যবসায়িগণ যদি এই কাজ করেন তাহা হইলে দেশের ভিতরে জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা প্রতিরুদ্ধ হইবে।

শ্রীদেশাই রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বলেন যে, "যদি এই কাজ করা যায় তাহা হইলে আমরা আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্যের অবস্থারও উন্নতিসাধন করিতে পারি। গত নয় মাসের রপ্তানি-বাণিজ্যে আমাদের বিশেষ লাভ হয় নাই বলিয়া আমার মনে হয়।

শ্রীদেশাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মুখবন্ধে বলেন, রপ্তানি-বাণিজ্যের সমস্যা সম্পর্কে এখন তিনি কিঞ্চিৎ আস্থা সহকারে তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারেন; কারণ গতকল্য আমদানী উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবার পর তিনি এ বিষয়ে আরও কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের জনসাধারণের কোন-প্রকার অসুবিধা না ঘটাইয়া, আমরা কি ভাবে আমাদের রপ্তানির অবস্থার সবচেয়ে বেশী উন্নতসাধন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করিতে পারি—ইহাই এখন আমাদের প্রধান সমস্যা। আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, কারণ আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ইহা না করিয়া উপায় নাই।

দেশীয় পণ্যের উপর দেশের লোকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্যের মানবৃদ্ধির যে ঝোঁক দেখা যায়, বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রী ডি. পি. কারমারকার রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে তাহা উল্লেখ করেন।

এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, যদি এই চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্য বাহিরের মূল্যের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারে তাহা হইলে এইরূপ আশঙ্কা করা অসঙ্গত নহে যে, রপ্তানি-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য আমরা যে চেষ্টা করিতেছি আমাদের সেই চেষ্টা ব্যাহত হইবে

পারে। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার ভিতরে যে সমস্ত অন্তর্নিহিত অসুবিধা আছে তাহা আমরা কিভাবে দূর করিয়া সর্ব্বাধিক চেষ্টায় আত্মনিয়োগের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারি তাহা চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

অতঃপর শ্রীকারমারকার বলেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্প-সম্প্রসারণের জন্য বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিতে আমাদের যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে, আমাদের বর্ত্তমান আয়ের দ্বারা তাহার সঙ্কুলান করা সম্ভবপর না হইলেও আমাদের সাধ্যানুসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এই বৎসরের প্রথম নয় মাসে আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্যের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ হয় নাই। রপ্তানি-বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের বৈদেশিক মূল্যমান হ্রাস পাওয়াই ইহার জন্য আংশিকভাবে দায়ী বলিয়া মনে হয়।

চৌ-এন-লাই-এর ভারত সফর

ভারত সরকারের আমন্ত্রণক্রমে চীনের প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র-মন্ত্রী চৌ-এন-লাই এবং সহকারী প্রধানমন্ত্রী হো লুঙ ২৮শে নবেম্বর ভারতে আগমন করেন। ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দশ দিন এই দুই চীনদেশীয় রাষ্ট্রবিদ ভারতে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন।

২৮শে নবেম্বর নয়াদিল্লীর পালাম বিমানঘাঁটিতে অবতরণের পর বিমান ঘাঁটিতে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করিয়া চীনের প্রধান-মন্ত্রী চৌ-এন-লাই বলেন যে চীন এবং ভারতের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সংযোগস্থাপন করিয়া এশিয়া এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত ভাবে অধিকতর চেষ্টা করাই তাঁহাদের ভারত আগমনের উদ্দেশ্য। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার ভারত আগমনের ফলে ভারত ও চীনের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি পাইবে।

২৯শে নবেম্বর ভারতীয় পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের এক সম্মিলিত অধিবেশনে ভাষণদান প্রসঙ্গে চৌ-এন-লাই বলেন, ভারতের মত মহান্ রাষ্ট্রকে প্রতিবেশীরূপে পাইয়া চীনের অধিবাসীরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে। ফরমোসা সমস্যার সমাধানের এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের প্রবেশাধিকারের প্রশ্নে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভারত যে দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছে তাহার জন্য ভারতের প্রতি চীনের সরকার ও জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া চৌ-এন-লাই বলেন যে, সার্ব্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক সংহতিরক্ষার সংগ্রামে ভারতকে চীন সরকার এবং চীনের জনসাধারণ সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবে। ওয়াকিবহাল মহলের অভিমতে কাশ্মীরকে ইঙ্গিত করিয়াই চৌ-এন-লাই উক্ত মন্তব্য করেন।

চৌ-এন-লাই বলেন, ভারত ও চীনের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। ভারত ও চীনের পররাষ্ট্র-নীতিও সর্ব্বাঙ্গীণরূপে এক নহে। কিন্তু এই সকল পার্থক্য দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সহযোগিতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। যুদ্ধের আশঙ্কা দূরীকরণের কাজে ভারত ও চীনের ঐক্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া চৌ-এন-লাই বলেন, বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের উপর অপর রাষ্ট্রের ইচ্ছা চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত যে কার্য্যকরী হইবে না, ইতিহাস তাহাই প্রমাণ করিবে।

পঞ্চশীল ও বান্দুঙ মনোভাবের প্রতি তাঁহার সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া চীনা প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, উহা দ্বারা কেবলমাত্র চীন ও ভারতের সমস্যাবলীর সমাধান এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীবৃদ্ধিই নয়, এশিয়া এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধিকতর প্রচেষ্টা সম্ভব হইবে। এইরূপে আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে এবং বিশ্বশান্তি আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারি।

চৌ-এন-লাই আরও বলেন যে, মিশর হইতে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার কার্য্যকরী করা এবং মিশরের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চীন ভারতের সহিত সম্মিলিত ভাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক। ইন্দোচীন এবং কোরিয়া যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি সম্পর্কে পঞ্চশীল প্রণয়ন এবং এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন আহ্বানের ক্ষেত্রে ভারতের অমূল্য-দানের প্রশংসা করিয়া চৌ-এন-লাই বলেন যে, ভারত-চীন চীনের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান।

চৌ-এন-লাই বলেন, ঐক্যই বল, মিশরীয় সঙ্কট প্রমাণ করিয়াছে যে, এশীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অধিকতর ঐক্য প্রয়োজন।

৩০শে নবেম্বর দিল্লীর রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠিত এক নাগরিক সংবর্দ্ধনার উত্তরে চৌ-এন-লাই বলেন, যে সকল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এত দিন অন্যান্য দেশকে পদানত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের চূড়ান্ত অবলুপ্তির পূর্ব্বে নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, এ অবস্থায়ও তাহারা তাহাদের প্রভুত্ব বজায় রাখার প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেছে এবং মরণকামড় দিতে ছাড়িতেছে না। মিশরের ঘটনায় তাহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

৯ই ডিসেম্বর কলিকাতার ময়দানে এক নাগরিক সংবর্দ্ধনার উত্তরে চৌ এন-লাই বলেন, "বহু ক্ষেত্রেই ভারত যে চীন হইতে অনেক অগ্রসর—এই পরিচয় আমরা পাইয়াছি। চীনকে ভারতের নিকট হইতে গভীরভাবে শিক্ষা লইতে হইবে।" তিনি বলেন, "বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে আপনারা আমাদের তুলনায় অধিকতর সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। শিল্পের ক্ষেত্রে আপনাদের অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে। আপনাদের শিল্প-পরিচালনা ব্যবস্থা যথেষ্ট নিপুণ, জনসংরক্ষণ ব্যবস্থা, গৃহনির্ম্মাণ শিল্প, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও দুগ্ধাগার শিল্পে আপনারা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে আপনাদের কীর্ত্তি অসামান্য।"

তাঁহার ভারত সফরের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় চৌ-এন-লাই বলেন, "আমি ও আমার সহকর্মীরা আপনাদের নিকট

হইতে যে মহান্ ও সাদর-সংবর্দ্ধনা পাইয়াছি তাহার জন্য প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতে চাই। চীনের জনসাধারণের পক্ষ হইতে আপনাদের ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাইতেছি। গত ১২ দিনে আমরা যেখানেই গিয়াছি—দিল্লী, পুণা, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, চিত্তরঞ্জন বা সিন্ধ্রি সর্ব্বত্র আমরা ভারতের জনসাধারণের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি। এখন ভারত হইতে বিদায়গ্রহণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আমরা পুনরায় এক বিশাল ও উদ্দীপনাময় সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিলাম। আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। যখনই দেখি যে, ভারত ও চীনের পতাকা উড়াইয়া ও 'হিন্দী চীনা ভাই ভাই' ধ্বনিতে রাজপথ মুখরিত করিয়া হাজার হাজার ভারতবাসী আমাদিগকে স্বাগত অভিনন্দন জানায়, তখনই বুঝিতে পারি যে, ইহা কোনও মতেই কূটনৈতিক সৌজন্য বা নিয়মানুগ ভদ্রতা হইতে পারে না। ইহা এই দুই মহান্ জাতির হৃদয়ের গভীরে নিহিত দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। সেই বন্ধুত্বই আমাদের বিরাট শক্তির উৎস।"

চৌ-এন বলেন, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারত ও চীনের মধ্যে সৌহার্দ্দ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহস্র বৎসর আগে বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হয়েন ও হিউয়েন-সাঙ ভারতের নিকট জ্ঞান ও শিক্ষার অন্বেষণে আপনাদের এই সুন্দরী বঙ্গভূমিতে আসিয়াছিলেন। একই সময়ে বাংলাদেশের বিদ্যানুরাগী বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। যদিও এই দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঔপনিবেশিক আঘাতে একদা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল তথাপি স্বাধীনতার জন্য আমাদের সাধারণ সংগ্রাম আমাদের দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সম্প্রীতিকে দৃঢ়তর করিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার মহান্ দেশপ্রেমিক ও কবি রবীন্দ্রনাথ চীনদেশে এই সহানুভূতি ও সম্প্রীতির বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

"অবশেষে যখন আমরা উপনিবেশিক দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলাম, তখন যে সকল দেশ আমাদের সর্ব্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়াছিলেন, ভারত তাহাদের অন্যতম।"

চৌ-এন ভারত ও চীনের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞানবিনিময়ের উপর বিশেষ জোর দেন, কারণ পারস্পরিক জ্ঞান ব্যতীত পারস্পরিক সম্প্রীতি কখনও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না।

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের নিন্দা করিয়া এবং মিশর হইতে অবিলম্বে সকল আক্রমণকারী সৈন্য অপসারণের দাবি তুলিয়া চৌ-এন বলেন, "মিশরের জনসাধারণের সংগ্রাম-ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার জনসাধারণের সংগ্রামের উচ্চতর স্তর। আমরা মিশরের জনসাধারণের মহান্ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দৃঢ় সমর্থন করি। মিশরের সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষার্থে ভারতের সরকার ও জনসাধারণ অবিচলিত যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। চীনের সরকার এবং জনসাধারণ এই সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানের জন্য ভারতের সঙ্গে হাত মিলাইতে এবং সমস্ত শান্তিকামী দেশগুলির ও জনগণের সহিত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা করিতে প্রস্তুত। ঔপনিবেশিকতাকে পরাভূত করিবার জন্য এবং যুদ্ধের আশঙ্কাকে দূর করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক সংহতি আরও দৃঢ় করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভারত ও চীন এই দুই জাতির মধ্যে যে মহান্ বন্ধুত্ব ও ঐক্য আমরা ভারতবর্ষে দেখিয়াছি তাহা এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাস প্রবলভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছে।"

কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে চৌ-এনকে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া কলিকাতার মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বলেন :

"আপনার শুভাগমনে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী সৌধকিরীটিনী মহানগরী কলিকাতা আজ ধন্য হইল। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ও কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের পক্ষে আমার সশ্রদ্ধ ও সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।"

"পৃথিবীর বৃহত্তম একজাতীয় মানবগোষ্ঠীর প্রতিনিধি আপনি, পৃথিবীর প্রাচীনতম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারকরূপে আমি আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।"

"সুপ্রাচীন কাল হইতে মহা-ভারত ও মহা-চীনের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও প্রেমের সম্পর্ক। আজ আপনাকে উপলক্ষ করিয়া পুনরায় স্মরণ করি দ্বিসহস্র বৎসরের ভারত-চীন মৈত্রীর কথা; খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর সূত্রপাতেই পরিব্রাজক ফা হিয়েনের, সপ্তম শতকের প্রথমার্দ্ধে হিউয়েন সাঙের এবং শেষার্দ্ধে ইৎ সিং-এর ভারত তীর্থাগমনের কথা স্মরণ করি; স্মরণ করি মহাবঙ্গের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাম্রলিপ্তিপত্তনের সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতার কথা এবং স্মরণ করি একাদশ শতকে প্রাচীন বঙ্গের সুসন্তান মহাজ্ঞানী অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের চীন অভিযানের কথা। ব্যবসায়ের পণ্য আদান-প্রদানের সূত্রে বা সামরিক শক্তির প্রসারের দ্বারা নয়, একান্ত শান্তি ও কল্যাণের পথে, এই দুই মহাদেশের মধ্যে পরস্পর জ্ঞান ও ধর্ম্মের যে বিনিময় ও সমন্বয় সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আজিও সমগ্র জগতের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বঙ্গের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সেই প্রাচীন সম্পর্ক পুনঃসংস্থাপিত করেন। তাহার পর আপনার আমন্ত্রণে বিগত পাঁচ বৎসর স্বাধীন ভারতের, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের, বহু বিদ্বজ্জন ও শিল্পী চীন-ভ্রমণের সুযোগ লাভ করিয়া সেই সম্পর্ককে দৃঢ়তর করিয়াছেন। মৈত্রী ও প্রীতির অটুট বন্ধনে আজ উভয় মহাদেশ যে বাঁধা পড়িয়াছে তজ্জন্য, হে মহাভাগ, আপনাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।"

"নবচীনের পুনর্গঠনে আপনার কর্ম্মনিষ্ঠা, এশিয়ার নবজাগরণে আপনার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সমগ্র প্রাচ্যবাসীকে স্ব স্ব দেশগঠনে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ১৯৫৪ সনে আপনি ভারতে আগমন করিয়া আমাদের প্রিয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সহিত যে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তিপত্রে "পঞ্চশীল"-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ-মীমাংসার নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়াছে। সেই চুক্তিপত্রের মাধ্যমে আপনাদের

আশা ছিল যে, পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র এই নীতি ক্রমশঃ গ্রহণ করিবেন। সেই আশা আজ জগতের নানা মতবাদী বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় সফল হইতে চলিয়াছে। বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর শান্তি-প্রতিষ্ঠার মহৎ কাজে অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"

"প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে একদা ভারতের ধর্ম্ম প্রাচীন মহাচীনের সঙ্ঘশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল, আজ নবমহাচীনের অপূর্ব্ব সঙ্ঘশক্তি পরাধীনতার জড়তা হইতে সদ্যজাগ্রত মহা-ভারতকে উদ্‌বুদ্ধ করুক।"

"আপনার অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া আজ আমি চীন-ভারত-মৈত্রীর জয় ঘোষণা করি।"

পাকিস্থান ও ভারত

কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থান যে মিথ্যার ধূলিজাল ফেলিয়াছে তাহাতে এমনকি আমাদের দেশের অনেকের মনে বিভ্রান্তি আসিয়া পড়ে।

পণ্ডিত নেহরু অনেকদিন পরে স্পষ্ট ভাষায় সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নীচে উদ্ধৃত করা হইল :

"নয়াদিল্লী, ৩রা ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী নেহরু আজ রাজ্যসভায় পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিতর্কের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বলেন, কাশ্মীর-সমস্যা আবার নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে, এ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আমরা আদৌ উদ্বিগ্ন হই নাই। সমস্যাটি যদি তোলাই হয়, তবে উহার গোড়া ধরিয়া টান দেওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। সেক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে সমস্যার মূল কথাটি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্যই আমরা পরিষদকে অনুরোধ জানাইব। কাশ্মীর-সমস্যার সবচেয়ে বড় কথা এই যে, পাকিস্থানই সেখানে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে এবং আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে।

ভারত পাকিস্থান আক্রমণ করিতে পারে বলিয়া পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব সুরাবর্দ্দী যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে শ্রীনেহরু বলেন, পাকিস্থানীরাজনীতিকদের বদ্ধমূল সংস্কার বা মনগড়া ধারণা হইতে এ ধরনের আশঙ্কা হয়ত দেখা দিয়াছে। এই বিরাট পৃথিবীতে এমন বাস্তববর্জ্জিত আশঙ্কার কথা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

প্রধান মন্ত্রী বলেন, পশ্চিম এশিয়ার বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে একটা জিনিষ সকলেরই চোখে পড়িবে যে, ইসরাইল ও ইঙ্গ-ফরাসী অভিযানের ফলে সেখানে অনৈক্য ও বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে। ইহা রোধ করিতে হইলে মিশরীয় ভূখণ্ড হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্যের অপসারণ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী হাঙ্গেরীর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে "ভীষণ মর্ম্মান্তিক" বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাঙ্গেরী গবর্ণমেণ্ট যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেলকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেন নাই, ইহা খুবই পরিতাপের কথা। ইহাতে লোকে যদি অনুমান করিয়া লয় যে, হাঙ্গেরী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নির্ব্বাসনে পাঠাইবার যে অভিযোগ করা হইতেছে, তাহা সত্য বা আংশিকভাবে সত্য, তবে তাহা অস্বাভাবিক হইবে না।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন, কাশ্মীর-সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া ভারত মোটেই শঙ্কিত হয় নাই। সত্যই যদি উহা তোলা হয়, তবে আমাদিগকেও বাধ্য হইয়া সমস্যার গোড়া ধরিয়া টান দিতে হইবে। সেক্ষেত্রে আমরা সবার আগে পরিষদকে এই কথাটি বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিব যে, পাকিস্থান প্রথমে কাশ্মীরের উপর হামলা সুরু করিয়াছে কিনা। কাশ্মীরসমস্যার সবচেয়ে বড় কথা হইল, পাকিস্থানই সেখানে আক্রমণকারী এবং এখনও সে আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্থান এখনও অধিকার করিয়া রহিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ এই পররাজ্য আক্রমণের প্রশ্নটি এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যা গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। সমস্যার মাঝখানে ধরিয়া মীমাংসার চেষ্টা করিলে গোড়ায় গলদ থাকিয়া যাইবে এবং তাহাতে মীমাংসাও কোনদিন হইবে না। মিটমাটের জন্য আমরা সব সময়েই রাজী এবং এজন্য কি করণীয় তাহা পূর্ব্বে আমরা বহু বার বলিয়াছি।

শ্রীনেহরু অতঃপর বলেন, সম্প্রতি ভারতকে আক্রমণ করিয়া পাকিস্থানে বিস্তর বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। কাশ্মীর গণপরিষদ একটি সংবিধান গ্রহণ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেটিই কারণ। কাশ্মীর গণপরিষদ গত তিন-চার বৎসর যাবৎ এই সংবিধান রচনার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই কাজ ছাড়া গণপরিষদ, আইনসভা হিসাবে ভূমিস্বত্ব-সংস্কার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি ব্যাপারে আইনপ্রণয়নও করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে তাঁহারা সংবিধানের চূড়ান্ত রূপদান করিয়াছেন এবং সে অধিকার নিশ্চয়ই কাশ্মীরের আছে। ইহা বিচিত্র নয় যে, পাকিস্থানের লোকেরা ইহাতে একটা ধাক্কা খাইয়াছে, কেননা, ঘটনাপ্রবাহের সহিত তাল রাখিয়া তাহারা চলে না। এই বিরাট দুনিয়ায় কোথায় কি ঘটিতেছে, সে খবর তাহারা রাখে না, এতটা পিছনে তাহারা পড়িয়া আছে। তাহাদের জন্য দুঃখপ্রকাশ ছাড়া আর কি করিবার আছে?

তিনি বলেন, পাকিস্থানে এবং মাঝে মাঝে প্রভাবশালী দুই-চারিটি বিদেশী সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে অভিযোগ করা হইতেছে যে, কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত যে সকল কথা দিয়াছিল, তাহা সে খেলাপ করিতেছে। এই ধরনের আরও নানা অভিযোগ করা হইতেছে। গত নয় বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই সব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দায়িত্বশীল কোন লোক বারংবার যে কি ভাবে এ ধরনের অভিযোগ করিতে পারে, তাহা ভাবিলে আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাই।

পাকিস্থানের ব্যাপারে সর্ব্বপ্রথম যে কথাটি মনে রাখা দরকার,

তাহা ইহাই যে, পাকিস্থানই কাশ্মীর আক্রমণকারী (হর্ষধ্বনি)। এই সত্য তাহারা অস্বীকার করিতে পারে? বিষয়টি আমাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইবে। সবচেয়ে বড় কথা হইল পাকিস্থানই সেখানে প্রথম আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং কাশ্মীরের একাংশে এখনও তাহারা আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। গণভোটের কথা যখন হয় তখন কাশ্মীরসংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ কমিশন তাহাদের প্রথম প্রস্তাবে খোলাখুলি ভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জম্মু ও কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী বাহিনীকে সরাইয়া লইতে হইবে। ইহা আট বছর আগের কথা। কিন্তু সে নির্দ্দেশ আজও পালিত হয় নাই। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালনে কে অপারগ হইয়াছে? অন্যান্য বাধ্যবধকতার কথা পরে বিচার্য্য।

পাকিস্থানের সংখ্যালঘু

সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ পাকিস্থানের বর্ত্তমান কর্ণধারবৃন্দ বিষোদ্গারে অতি তৎপর হইয়াছেন। কারণ অবশ্য অন্য কিছুই নয়, নিজেদের অযোগ্যতা চাপা দেওয়া এবং অন্যের উন্নতিতে হিংসা। বিদেশে অন্য একদল নীচমনা হিংসাবাদী ইহাদের সুরে সুর মিলাইয়া এতদিন গাহিতেছিল। সঙ্গে ছিল অজ্ঞ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এখন মার্কিনদলে কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, সুতরাং হিংসাবাদীদিগের দল ওজনে বড়ই কমিয়াছে। কিন্তু আমাদের সরকার এখনও সত্যপ্রচারে সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই দুর্ব্বলতা দেখাইতেছেন।

নিম্নস্থ বিবৃতি পাকিস্থানের দুমুখো নীতির পরিচায়ক। যেমন কাশ্মীরের ব্যাপারে তেমনি সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে পাকিস্থানের চালক বর্গ শুধু অপপ্রচারের জোরে এবং আমাদের প্রচারকার্য্যে অব্যবস্থার সুযোগে সমানে দিনকে রাত করিয়া চালাইতেছে। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের হুঁস হইবে কবে?

"নয়াদিল্লী, ১৪ই ডিসেম্বর—উদ্বাস্তু সম্পত্তি আইন পরিচালন ব্যবস্থা সংশোধনের জন্য উত্থাপিত বিল সম্পর্কে বিতর্কের উদ্বোধন করিয়া পুনর্ব্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না রাজ্যসভায় এক বক্তৃতায় পূর্ব্বপাকিস্থান হইতে বাস্তুত্যাগ করিয়া সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভারতে আগমন এবং এই ব্যাপারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিরক্ষায় পাকিস্থানের পুনঃপুনঃ ব্যর্থতার বিস্তৃত বিবরণ দেন। অবশেষে বিলটি রাজ্য-সভায় গৃহীত হয়।

শ্রীখান্না বলেন, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ভারতে সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে এক পত্র দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া সেই কারণেই তিনি পূর্ব্বপাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের দুর্দ্দশার বর্ণনা দিতেছেন।

তিনি বলেন, ভারতের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তাহাদের সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিটি প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ হইতেছে যে, তাহারা ভারতের সুখী নাগরিক হিসাবেই আছে এবং ভারতের কোন অংশের মুসলমানদেরই পাকিস্থান অথবা অপর কোন দেশে চলিয়া যাইবার কোন অভিপ্রায়ই নাই। কার্য্যতঃ নেহরু লিয়াকৎ চুক্তির পর লক্ষ লক্ষ মুসলমান পাকিস্থান হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া যে পুনরায় বসবাস করিতেছে তাহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রত্যেকের সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ পূর্ব্বপাকিস্থানের হিন্দু সংখ্যালঘুদের অবস্থা হইতেই প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যায়।

শ্রীখান্না বলেন, দেশবিভাগের সময় পূর্ব্ব-পাকিস্থানে এক কোটি বিশ লক্ষ হিন্দু ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সনে দেশবিভাগের পরে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের হিন্দুদের প্রথম বাস্তুত্যাগ আরম্ভ হয়। এই সময় প্রায় দশ লক্ষ হিন্দু ভারতে চলিয়া আসে। ১৯৪৯ সনে কিছু সময়ের জন্য বাস্তুত্যাগ বন্ধ ছিল, কিন্তু ১৯৫০ সনে পুনরায় পূর্ণবেগে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ আরম্ভ হয়।

শ্রী খান্না বলেন, ১৯৫০ সালের বাস্তুত্যাগের ফলে অবস্থা এত সঙ্কটজনক হইয়া পড়ে যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন পাক-প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খানের মধ্যে বিষয়টি আলোচনার প্রয়ো-জন হয়। সেই আলোচনার ফলেই নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পন্ন হয়। উক্ত চুক্তিতে পাকিস্থান প্রতিশ্রুতি দেয় যে, অতঃপর হিন্দুরা যাহাতে নিরাপত্তা ও মর্য্যাদাসহ পূর্ব্বপাকিস্থানে বসবাস করিতে পারে সরকার তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। প্রয়োজন না থাকিলেও ভারত সরকারও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দেন।

শ্রীখান্না বলেন, পাকিস্থান প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সংখ্যা-লঘুদের মনে শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। ১৯৫১ ও ১৯৫২ সনে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে সাত লক্ষাধিক হিন্দু ভারতে চলিয়া আসে।

১৯৫৩ সনে পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে বাস্তুত্যাগের সংখ্যা অপেক্ষা-কৃত কম হইলেও বাস্তুত্যাগের হার ছিল গড়ে মাসে ছয় সহস্রাধিক। খুব অল্পকাল এই অবস্থা ছিল এবং ১৯৫৪ সনে বাস্তুত্যাগের হার বৃদ্ধি পাইয়া মাসিক দশ হাজারে দাঁড়ায়। সেই সময় হইতেই বাস্তুত্যাগ বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে এবং ১৯৫৫ সনে গড়ে মাসিক হার দাঁড়ায় ২০ হাজার এবং ১৯৫৬ সনের প্রথম ৮ মাসে উহা ৩৫ হাজার পর্য্যন্ত উঠে।

তিনি বলেন, দেশবিভাগের পর এযাবৎ ৪০ লক্ষ হিন্দু পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে।

পুনর্ব্বাসনমন্ত্রী অতঃপর পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে গত বৎসর এপ্রিল মাসে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জ্জার সহিত তাঁহার আলোচনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট নানা প্রকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আশ্বাস দেন। সেই সময় এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, পশ্চিম পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে খোকরাপাড়ায় একটি চেক পোষ্ট স্থাপন করা হইবে।

শ্রীখান্না বলেন, আমরা চুক্তি অনুযায়ী কাজ করিয়াছি এবং

চেক পোষ্ট স্থাপন করিয়াছি এবং ভারত হইতে কোন মুসলমান পাকিস্থানে যায় নাই। কিন্তু পাকিস্থান সম্পর্কে বিপরীত অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে সংখ্যালঘুদের আগমন ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে উহা ৫০ হাজার পর্য্যন্ত উঠে।

শ্রীথান্না অতঃপর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাক্-ভারত প্রতিনিধিদের সম্মেলনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, পাকিস্থান হইতে বলা হইয়াছে যে, ভারত হইতে প্ররোচনা পাওয়ায় প্রতিশ্রুত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও হিন্দুরা ভারতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা সত্য নয়। নয় বৎসরের অধিককাল পাকিস্থানের অনুগত নাগরিক হইবার চেষ্টা করিবার পর তাহারা পাকিস্থানে মর্য্যাদা লইয়া বাস করা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছে।

শ্রীথান্না বলেন, অবস্থা এত দূর খারাপ হইয়া পড়িয়াছে যে, সম্প্রতি বাস্তুত্যাগীরা বৈধ মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট লইয়া অথবা জাল সার্টিফিকেট লইয়া ভারতে আসিতেছে তাহাও বিচার করিয়া দেখা হইতেছে।

অতঃপর হিন্দুরা যাহাতে তাহাদের পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি দিবার জন্য তিনি পাক্ প্রেসিডেণ্টকে তাঁহারপ্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দেন এবং ডাঃ খান সাহেবের নিকট আবেদন জানান।

ভারত ও কাশ্মীর

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সংবাদ যাহা ১৮ই নবেম্বর প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"শ্রীনগর, ১৭ই নবেম্বর—অদ্য কাশ্মীর গণ-পরিষদে রাজ্যের সংবিধান গৃহীত হয়। উহাতে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

আগামী ২৬শে জানুয়ারী ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে এই সংবিধান কার্য্যকরী হইবে।

অন্যান্য বিষয় ছাড়াও সংবিধানে দুইটি সভা সংবলিত আইন-সভা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, নির্ব্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও রাজ্যের জন্য একটি সাংস্কৃতিক আকাদামী গঠনের বিধান আছে। ইহাতে কাশ্মীরে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ গঠনেরও পরিকল্পনা আছে।

আগামী ২৬শে জানুয়ারী গণ-পরিষদ বাতিল করার জন্য খসড়া প্রণয়ন কমিটির সেক্রেটারী সৈয়দ মীর কাসিম যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, গণ-পরিষদে তাহাও গৃহীত হয়।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, রাজ্যের জন্য সংবিধান প্রণয়নের ও উহা গ্রহণ করাইবার কাজ শেষ হইয়াছে এবং সেই জন্যই গণ-পরিষদ বাতিল হওয়া উচিত।

অদ্যকার আলোচনায় যে ছয় জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেন তাঁহারা রাজ্যের ভারতভুক্তি-সংবলিত বিধানে আনন্দপ্রকাশ করেন।

মিশরে আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী

৪ঠা নবেম্বর এক জরুরী অধিবেশনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ মিশরে যুদ্ধবিরতি তদারক করিবার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে] নরওয়ে, কানাডা এবং কলম্বিয়া। প্রস্তাবটি ৫৭-০ ভোটে গৃহীত হয়—আঠারটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মিশর, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ।

স্থির হয় যে, আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে এবং বাহিনীর অধ্যক্ষ হইবেন কানাডার মেজর-জেনারেল ই. এল. এম. বার্ণস। "বৃহৎ" পঞ্চশক্তি (নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ) যথা—ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীন (ফরমোসা) হইতে কোন সৈন্য আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীতে থাকিবে না বলিয়া স্থির হয়।

৭ই নবেম্বর গৃহীত দ্বিতীয় একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীটির কার্য্যকাল সাময়িক এবং উহা সুয়েজ অঞ্চল হইতে ১৯৪৯ সনে নির্দ্ধারিত মিশর-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি সীমারেখা পর্য্যন্ত মিশরীয় অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি টহল দিয়া বেড়াইবে। প্রস্তাবটি বিনা প্রতিবাদে ৬৪টি রাষ্ট্রের সমর্থনে গৃহীত হয়; মিশর, ইসরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সোভিয়েট গোষ্ঠীসহ বারটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের উক্ত প্রস্তাবগুলির অনুযায়ী যে আন্তর্জ্জাতিকবাহিনী গঠিত হয় তাহার অগ্রগামী দল ১৩ই নবেম্বর মিশরে সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করে। আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীতে তেইশটি দেশের সৈন্য অংশগ্রহণ করিয়াছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত প্রায় চার হাজারের মত আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীর সৈন্য মিশরে উপস্থিত হয়।

ভারত-সরকার আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীতে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাঠাইয়াছেন এবং তাহা গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যগণও ইতিমধ্যেই মিশরে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

৭ই নবেম্বর একটি প্রস্তাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েলকে মিশর হইতে সৈন্য অপসারণ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেন। প্রস্তাবটি ৬৫-১ ভোটে গৃহীত হয়—দশটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। ৮ই নবেম্বর ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন যে, কোন্ তারিখে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করা হইবে তিনি তাহা বলিতে পারেন না। ১৯শে নবেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেলের নিকট লিখিত একটি স্মারকপত্রে মিশর সরকার অভিযোগ করেন যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েল রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া সৈন্য অপসারণে অযথা বিলম্ব করিতেছে। ২০শে নবেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ হ্যামারশীল্ড ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েলের নিকট সৈন্য অপসারণের বিলম্বের কারণ জানিতে চান। উত্তরে ব্রিটিশ সরকার "সদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ" এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য অপসারণ করিতে স্বীকৃত হন। ২৪শে নবেম্বর

রাষ্ট্রসঙ্ঘ পুনরায় আর একটি প্রস্তাবে মিশর হইতে ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইসরায়েলী বাহিনী অপসারণের দাবি জানায়। প্রস্তাবটি ৬৩-৫ ভোটে গৃহীত হয়; দশটি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে; নিকারাগুয়া অনুপস্থিত ছিল। যে পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে তাহারা হইল ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইসরায়েল, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড। অপর একটি প্রস্তাবে সুয়েজ খাল পরিষ্কার করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য সেক্রেটারী-জেনারেলকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

৩রা ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় পররাষ্ট্রসচিব মিঃ সেল্‌ইন লয়েড বলেন যে, মিশর হইতে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যদল অবিলম্বে সরাইয়া লইতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সরকার সম্মত হইয়াছেন। তিনি জানান যে, মিশরস্থিত বাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ জেনারেল স্যর চার্লস কেটলীকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—তিনি যেন মেজর-জেনারেল বার্ণসের সহিত সৈন্য অপসারণের সময় সম্পর্কে যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মিঃ লয়েড আরও বলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের অভিমতে গাজা অঞ্চল হইতেও ইসরায়েলী সৈন্য সরাইয়া ঐ স্থানে আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী মোতায়েন করা প্রয়োজন।

৬ই ডিসেম্বর প্রথম ব্রিটিশ সৈন্যদল মিশর ত্যাগ করিয়া গৃহ অভিমুখে রওনা হয়।

পণ্ডিত নেহরুর মার্কিন যাত্রা

জগতের এই চরম সঙ্কটের দিনে পণ্ডিত নেহরু চলিয়াছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানের সহিত বিচার ও আলোচনায় পরস্পরের মনের কথা জানিতে ও জানাইতে। তাঁহার কার্য্যসূচী নিম্নে দেওয়া গেল :

"নয়াদিল্লী, ১২ই ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর আট দিনব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফরের কার্য্যসূচী অদ্য রাত্রিতে এখানে ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই কার্য্যসূচী অনুসারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৪ই ডিসেম্বর শুক্রবার প্রাতঃকালে নয়াদিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া শনিবার সন্ধ্যাকালে লণ্ডনে পৌঁছিবেন। লণ্ডনে কয়েক ঘণ্টা অবস্থানের পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর আরম্ভের জন্য রবিবার মধ্যাহ্নে ওয়াশিংটনে পৌঁছিবেন। এই দিন প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত মধ্যাহ্ন-ভোজন করিবেন।

পরদিবস, ১৭ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেণ্টের অতিথি ভবন ব্লেয়ার হাউস হইতে মোটরযোগে গেটিসবার্গস্থিত প্রেসিডেণ্টের খামারবাড়ী পরিদর্শনের জন্য গমন করিবেন। তথায় রাত্রিযাপন করিয়া প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেণ্ট ১৮ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এই দিন রাত্রিতে প্রধানমন্ত্রী মার্কিন বেতার ও টেলিভিশন শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তাঁহার বক্তৃতা প্রচার করিবেন। ১৯শে ডিসেম্বর তিনি ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হইবেন।

অতঃপর শ্রীনেহরু বিমানযোগে নিউইয়র্ক গমন করিয়া তথায় দুই দিনব্যাপী অবস্থানকালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারশেল্ড এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ১১শ অধিবেশনের সভাপতি প্রিন্স ওয়ানের সহিত রাষ্ট্রপুঞ্জ ভবনে সাক্ষাৎ করিবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ২২শে ডিসেম্বর অটোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রিতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ২২শে ডিসেম্বর অটোয়া হইতে বিমানযোগে লণ্ডন যাত্রা করিবেন।

আরিয়ালুর রেল দুর্ঘটনা

২৩শে নবেম্বর মাদ্রাজ হইতে ১৭০ মাইল দূরবর্ত্তী আরিয়ালুর নামক স্থানে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন এবং সাতটি বগি সেতুর বাঁধ ভাঙিয়া মরুদয়ার নদীতে পড়িয়া যাওয়ায় ১৫৫ জন নিহত ও আরও শতাধিক লোক আহত হয়। দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিয়া রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁহার পদত্যাগপত্র পেশ করেন—যথাসময়ে সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়।

২৬শে নবেম্বর পার্লামেণ্টে এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে শ্রীশাস্ত্রী বলেন যে, দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্ত ব্যতীত একটি বিচার-বিভাগীয় তদন্তও করা হইবে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীহিমাংশুকুমার বসু এই তদন্ত পরিচালনা করিবেন।

অনুরূপ দুর্ঘটনা বন্ধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীশাস্ত্রী বলেন, রেলওয়ে বোর্ড ভারতীয় রেলপথসমূহের সকল সেতু, বাঁধ এবং সেতুর ভিতর দিয়া যে সকল প্লাবন চলিয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষা ও প্লাবনের সময় রেলপথ পর্য্যবেক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করার ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রাক্তন নিজাম রেলপথের সেতুগুলি পরীক্ষা করার জন্য তিন জন ইঞ্জিনীয়ার লইয়া যে কমিটি গঠিত হইয়াছে তাঁহাদিগকে সকল সেতুর গঠন-প্রকৃতি এবং সেতুর মধ্য দিয়া কিরূপ জল যায়—তাহার সন্ধান লইতে বলা হইয়াছে। সেতুর সংলগ্ন রেলের বাঁধের অবস্থাও পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী আরও জানান যে, যাঁহারা দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছেন তাঁহাদের চিকিৎসার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং ত্রিচিনাপল্লীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের পরিবারবর্গকে সাহায্যদানের জন্য তহবিল খুলিয়াছেন। মাদ্রাজের সিটি সিভিল কোর্টের বিচারক শ্রী ভি. রত্নম মুদালিয়র ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শীঘ্রই তিনি তাঁহার কার্য্য সুরু করিবেন।

১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে গণনা করিলে আরিয়ালুর দুর্ঘটনা ত্রয়োদশ বৃহৎ রেল দুর্ঘটনা। ইহাদের অনেকগুলির মধ্যেই বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় জনসাধারণের ভিতরে রেল বিভাগের

কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যে উদ্বেগ দেখা দিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। দুর্ঘটনা সম্পর্কে পার্লামেণ্টে বিতর্কের সময় স্বভাবতঃই রেল বিভাগকে বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। কম্যুনিষ্ট, প্রজাসোশ্যালিষ্ট এবং একজন কংগ্রেস সদস্য রেলবিভাগের, বিশেষতঃ রেলওয়ে বোর্ডের কার্য্যাবলীর কড়া সমালোচনা করেন। মিঃ ফ্র্যাঙ্ক এণ্টনী কিন্তু রেল বিভাগের অকর্ম্মণ্যতার জন্য নিম্নতম কর্ম্মচারীদের উচ্ছৃঙ্খলতাকেই দায়ী বলিয়া অভিহিত করেন।

বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী রেল বিভাগের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান রেলওয়ে বোর্ড অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর বোর্ড তিনি চিন্তাও করিতে পারেন না। শ্রীশাস্ত্রী বলেন যে, নিম্নস্তরের কর্ম্মীদের একাংশের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিলেও তাহারা রেলবিভাগের উন্নতিবিধানের জন্য বিশেষ দায়িত্ব বহন করিয়াছে।

রেল বিভাগের সমর্থনে রেলমন্ত্রী যাহা বলেন তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া কঠিন। রেল বিভাগের সকল বিভাগই যদি নির্দ্দোষ তবে এইরূপ ঘন ঘন দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানির জন্য কি কেহই দায়ী নহে? ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে, শ্রীশাস্ত্রী বর্ত্তমান বোর্ড অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোর্ড কল্পনাও করিতে পারেন নাই। শেষ বিচারে রেল বিভাগের সকল কার্য্যের দায়িত্ব রেলওয়ে বোর্ড এবং রেলবিভাগীয় মন্ত্রীর। মাত্র দুইমাস পূর্ব্বে সেপ্টেম্বর মাসে হায়দরাবাদের মহবুবনগরে ঠিক অনুরূপ একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার পরই সম্ভাব্য সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। মহবুবনগর দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে সরকার হইতে জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়া বলা হইয়াছিল যে, দক্ষিণ ভারতের সকল রেলসেতুগুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। কিন্তু তাহা করা হইয়াছিল কি?

প্রকৃতপক্ষে কিছুই করা হয় নাই। সেতুগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বিশেষজ্ঞদের নাম স্থির করিতেই দুই মাস কাটিয়া গেল। রেল বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীআলাগেসন বলিয়াছেন যে, এখন হইতে বর্ষার সময় সেতুগুলি পর্য্যবেক্ষণের জন্য স্থায়ী প্রহরার বন্দোবস্ত করা হইবে। তাঁহার কথায় মনে হয় যে, এটি একটি নূতন ব্যবস্থা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। রেলবিভাগের নির্দ্দেশনামাতেই এই ব্যবস্থার উল্লেখ রহিয়াছেন। যদি এতদিন পর্য্যন্ত এই নির্দ্দেশ কার্য্যতঃ প্রতিপালিত না হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য দায়িত্ব কাহার?

৫ই ডিসেম্বর লোকসভায় রেল বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীআলাগেসন ঘোষণা করেন যে, সেতুর জলনিষ্ক্রমণের পরিমাণ নিরূপণের জন্য শীঘ্রই রেলওয়ে ও সরকারী মন্ত্রণালয়সমূহের প্রতিনিধি লইয়া একটি উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট কমিটি নিয়োগ করা হইবে। ১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাক্তন হায়দরাবাদ রাজ্যের জলগাঁওয়ের ট্রেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে সরকারী রেলওয়ে ইনস্পেক্টর যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহার উপর ৫ই ডিসেম্বর দুই ঘণ্টা স্থায়ী বিতর্কের অবসানে শ্রীআলাগেসান উক্ত ঘোষণা করেন।

প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার সংবাদে প্রকাশ, বিতর্কের সময় লোকসভায় রেলের কার্য্যপরিচালনার তীব্র সমালোচনা করা হয়। উপযুক্তরূপে রেলসেতুসমূহ রক্ষা না করার কথা উল্লেখ করিয়া এই অভিযোগ করা হয় যে, জলগাঁও দুর্ঘটনার পর রেলকর্তৃপক্ষ সচেতন হইলে মহবুবনগর ও আরিয়ালুর দুর্ঘটনা নিবারণ করা সম্ভব হইত।

উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীফিরোজ গান্ধী বলেন, জলগাঁও দুর্ঘটনার প্রধান কারণ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের শৈথিল্য—রেলপথ ঠিকভাবে রক্ষা করা তাঁহাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য। তিনি বলেন যে, ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, সেতুটি বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল, তথাপি সেই সম্পর্কে কোন যত্ন বা সতর্কতা অবলম্বিত হয় নাই।

রেলে দুর্বৃত্তের উৎপাত

নীচের সংবাদটি আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থার কতদূর অবনতি হইলে এইরূপ ঘটনা সম্ভব হয় তাহা ভাবা প্রয়োজন। ইহার প্রতিকার কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে সেকথা জনসাধারণের চিন্তার বিষয়।

"শনিবার সন্ধ্যায় ক্যানিং লাইনের কলিকাতাগামী একটি লোক্যাল ট্রেনের একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় একদল দুর্বৃত্ত মত্ত অবস্থায় প্রবেশ করিয়া একজন মহিলা যাত্রীর উপর অশোভন আচরণ করিতে থাকিলে উক্ত কামরায় ৪৫টি যুবক মহিলাকে দুর্বৃত্তদের হাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া ভীষণ ভাবে প্রহৃত হন। সন্ধ্যা অনুমান ৬ ঘটিকার সময় ঘুটিয়ারিশরীফ ষ্টেশনে এই ঘটনা হয়। দুর্বৃত্তদের ভয়ে ঐ কামরায় অপরাপর যাত্রীরা অন্য কামরায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, তালদি ষ্টেশন হইতে ঐ দুর্বৃত্তদল মত্ত অবস্থায় লাঠি হাতে ঐ কামরায় উঠে। তাহারা একজন মহিলা-যাত্রীর গায়ের উপর গিয়া পড়ায় মহিলাটি প্রতিবাদ করিয়া উঠিলে দুর্বৃত্তগণ তাঁহাকে গালিগালাজ করিতে থাকে এবং তাঁহার সহিত অশোভন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। ঐ কামরার ভ্রমণ-রত গড়িয়ার ৪।৫টি চাউল ব্যবসায়ীর ছেলে দুর্বৃত্তদের এই দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ জানায় এবং মহিলাকে তাহাদের কবল হইতে রক্ষার চেষ্টা করে। দুর্বৃত্তগণ ঐ সময় উহাদের ভীষণ ভাবে প্রহার করে। ভীতিবিহ্বল হইয়া কামরার যাত্রীরা ইতস্ততঃ পলায়ন করে। অভিযোগে প্রকাশ, ঐ ট্রেনে যে সমস্ত প্রহরী ছিল তাহারা নির্ব্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। দুর্বৃত্তদের অত্যাচার হইতে মহিলাকে এবং যুবককয়টিকে রক্ষার কোন চেষ্টাই নাকি উহারা করে নাই।

প্রকাশ, পিয়ালী ষ্টেশনে দুর্বৃত্তদলের কয়েকজন নামিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। চাম্পাহাটি ষ্টেশনে ট্রেনখানি থামিলে কয়েকজন দুর্বৃত্ত চাউল ব্যবসায়ীদের চাউলগুলি ট্রেন হইতে নামাইতে থাকে। কিন্তু ঐ সময় ইউনিফর্ম্মধারী একজন পুলিশ ঐ স্থানে আসিয়া পড়ায় গুণ্ডারা পলায়ন করে।

এই ঘটনার দরুন ট্রেনখানির শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিতে প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্ব হয়।

ক্যানিং লাইনের ট্রেনে সন্ধ্যার পর ভ্রমণ করা বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া শনিবার একজন রেলযাত্রী রেলকর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে ঐ লাইনে উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাইয়া এক বিবৃতিতে বলেন যে, সন্ধ্যার দিকে ইতঃপূর্ব্বে তালদি, ঘুটিয়ারিশরীফ ও পিয়ালীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে চলন্ত ট্রেনে লুঠতরাজ ও রাহাজানির কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে। যাত্রীদের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

কঠোর হস্তে দুর্বৃত্তদের এই দৌরাত্ম্য বন্ধ করা একান্ত দরকার বলিয়া যাত্রীসাধারণ বিশেষ ভাবে মনে করেন।

ভারতে খাদ্যশস্য

"নয়াদিল্লী, ২১শে নবেম্বর—কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন আজ রাজ্যসভায় বলেন যে, খাদ্যশস্যের ব্যাপারে ভারত কবে ও কতখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে তাহা অনুমান করা খুবই শক্ত।

সদস্যবর্গের উপর্য্যুপরি প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী বলেন যে, একদিকে যেমন খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি জনসংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সেই সঙ্গে পুষ্টির মানেরও উন্নতি ঘটিতেছে। মুখ্যতঃ ইহা চাহিদা ও সরবরাহের প্রশ্ন। দেশে আরও বেশী খাদ্য উৎপন্ন হইলেও ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করিতেই হইবে।

খাদ্যমন্ত্রী জানান যে, ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সংরক্ষিত শস্যভাণ্ডারে ২,৩৭,৫৪৩ টন খাদ্যশস্য মজুত ছিল।"

আমাদের প্রশ্ন এই যে তবে প্রথম পাঁচসালা নক্সার ফল হইল কি? নক্সায় কি ভুল ছিল?

প্রেস কাউন্সিল বিল

প্রেস কমিশনের আর একটি প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে চলিয়াছে। নীচের সংবাদে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

"১১ই ডিসেম্বর—দুই দিন বিতর্কের পর মঙ্গলবার রাজ্যসভায় প্রেস কাউন্সিল বিল গৃহীত হয়।

তথ্য এবং বেতারমন্ত্রী ডাঃ কেশকার প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিয়োগ সম্পর্কে ডঃ এইচ. এন. কুঞ্জরুর একটি সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ঐ সংশোধন প্রস্তাব অনুযায়ী রাজ্যসভার চেয়ারম্যান, লোকসভার অধ্যক্ষ এবং ভারতের প্রধান বিচারপতিকে লইয়া গঠিত এক কমিটি প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবেন। মূল বিলে রাষ্ট্রপতির উপর দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল। অদ্য রাজ্যসভায় বিলটির আলোচনাকালে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণসংক্রান্ত তিনটি প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করিয়া ডাঃ কেশকার বলেন যে, প্রেস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রেস কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থার কোনরূপ মৌলিক পরিবর্ত্তনে সরকার সম্মত হইবেন না।

প্রেস কাউন্সিল যাহাতে কোন সাংবাদিককে সংবাদের সূত্র-প্রকাশে বাধ্য করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে বিলে একটি ধারা সন্নিবিষ্ট করার জন্য কংগ্রেসী এবং বিরোধী দলের সদস্যগণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ডাঃ কেশকার বলেন, তিনি ইহা চিন্তা করিতে পারেন না যে, প্রধানতঃ সাংবাদিকদের লইয়া গঠিত কোন সংস্থা কোন সাংবাদিককে সংবাদের সূত্র সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করিতে পারেন, যাহাতে ঐ সাংবাদিক বিব্রত বোধ করিবেন। বিলে এই বিষয় সম্পর্কে কোন ধারা সন্নিবিষ্ট না হইলে সাংবাদিকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।"

রাজ্য পুনর্গঠন

১লা নবেম্বর হইতে ভারতের মানচিত্রের বিপুল আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের রাজ্যগুলি যখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মানচিত্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে। ১লা নবেম্বর হইতে নূতন রাজ্যগুলির সৃষ্টি হওয়ায় ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মানচিত্রের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সূচিত হইল।

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ভারতের প্রশাসনিক ইউনিট ২৯টি হইতে কমিয়া ২০টিতে দাঁড়াইয়াছে। নূতন কুড়িটি রাজ্যের মধ্যে ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এই ছয়টি অঞ্চল ব্যতীত অপরাপর চৌদ্দটি রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক কোন বৈষম্য থাকিবে না। নবগঠিত রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে বোম্বাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং কেরালা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট।

পুনর্গঠনের পর ভারতের রাজ্যগুলির নাম নিম্নরূপ:

(ক)—রাজ্য

	নাম	রাজধানী
১।	মহীশূর	বাঙ্গালোর
২।	রাজস্থান	জয়পুর
৩।	কেরালা	ত্রিবান্দ্রম্
৪।	অন্ধ্র	হায়দরাবাদ
৫।	বোম্বাই	বোম্বাই
৬।	মধ্যপ্রদেশ	ভূপাল
৭।	পঞ্জাব	চণ্ডীগড়
৮।	উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর
৯।	আসাম	শিলং
১০।	পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা
১১।	বিহার	পাটনা
১২।	উত্তর প্রদেশ	লক্ষ্ণৌ
১৩।	মাদ্রাজ	মাদ্রাজ
১৪।	জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর

(খ)—কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

১।	দিল্লী	দিল্লী
২।	হিমাচল প্রদেশ	সিমলা
৩।	ত্রিপুরা	আগরতলা
৪।	মণিপুর	ইম্ফল
৫।	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	পোর্ট ব্লেয়ার
৬।	লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, মিনিকয় এবং আমিন দ্বীপ।	

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার প্রখ্যাত লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ই অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর) কলিকাতা নীলরতন সরকার হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪৬ বৎসর।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯১০ সনে তিনি ডুমকায় জন্মগ্রহণ করেন। মেদিনীপুর হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া তিনি বাঁকুড়াতে আই-এসসি পড়েন। পরে যখন তিনি গণিত বিষয়ে অনার্স লইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন তখন হইতেই সাহিত্যরচনার প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তিনি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছদ্মনামে গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন এবং অচিরেই বাংলার সাহিত্যজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রায় ৫৭ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, ইতিকথার পরের কথা, সহরবাসের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য, সোনার চেয়ে দামী, ভেজাল, বৌ ইত্যাদি গ্রন্থ সবিশেষ পরিচিত।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুবই স্বাতন্ত্র্য ও সাহস দেখাইয়াছেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগও তাঁহার অকৃত্রিম ছিল। বাংলা সাহিত্য-জগতের সেদিক হইতে ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই।

কলিকাতার পথঘাট

কলিকাতায় লরী, ট্যাক্সীচালক ও কতকগুলি অতি দুর্মতি ও দুর্বিনীত যুবক মোটরচালকের উৎপাতে পথে চলা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে লরীচালকদের অধিকাংশই সর্ব্বাপেক্ষা দুরাচার ও নিয়মশৃঙ্খলার অন্তরায়। ইহাদিগকে কঠোর ভাবে শাস্তি না দিলে নিম্নস্থ ঘটনার পুনরাবৃত্তি অনিবার্য্য।

"বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে এক মর্ম্মান্তিক বাস দুর্ঘটনার ফলে শ্রীশরৎচন্দ্র দাস নামক জনৈক শিক্ষক গুরুতর আহত হন এবং নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বাসের দুই জন কণ্ডাক্টার, এক জন দোকানদার এবং এক জন পথচারীও সামান্য আহত হন। বাস-চালককে পুলিস পরে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ৩৬নং রুটের একখানি ফাঁকা বাস বেলা আড়াইটা নাগাদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডের বাঁক ঘুরিয়া বেলিয়াঘাটা মেন রোডে পড়িবার সময় অকস্মাৎ উহার ব্রেক বিকল হইয়া যায় এবং বাসখানি টাল খাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ড্রেনে পড়িয়া যায়। বাসের সম্মুখভাগ ড্রেনের অপর পার্শ্বের একটি পানের দোকানের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ফলে দোকানী আহত হয় এবং দোকানঘরটির বিশেষ ক্ষতি হয়।

জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতাল

সাপ্তাহিক "ভারতী" পত্রিকা ২৯শে কার্ত্তিক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালটি রঘুনাথগঞ্জ শহরে প্রতিষ্ঠার কথা আমরা বহুদিন হইতেই শুনিতেছি। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন, স্থান নির্ব্বাচন, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণের আলাপ-আলোচনা ও স্থান পরিদর্শন এবং শেষ পর্য্যন্ত কমিটি কর্ত্তৃক সরকার নির্দিষ্ট টাকা জমা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য বহু পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে। গত বৎসরের শেষে কিংবা এই বৎসরের প্রথমেই ইহার কার্য্য সুরু করা হইবে এরূপ গুজবও আমরা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত এ সম্পর্কে কোন সাড়াশব্দ আমরা পাইতেছি না।"

"ভারতী" বলিয়াছেন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারী দীর্ঘসূত্রিতা রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু জনসাধারণের প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতেও যে, সকল চেষ্টা করা হইয়াছে এরূপ কথা বলা চলে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উপর অভিভাবকত্ব ছাড়িয়া দিয়া যদি জনসাধারণ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে ত এই শ্রেণীর অভিভাবকদের কর্ম্মে শিথিলতা আসাই স্বাভাবিক—এই কথা স্থানীয় জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিয়া "ভারতী" লিখিতেছেন :

"যখনই আমরা কোন এক গোষ্ঠীর উপর কোন কার্য্যসাধনের ভার দিব তখনই তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্যে কোন ত্রুটি না করেন তৎপ্রতি আমাদের সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—ইহাই চিন্তা করিয়া আজ কমিটির সভ্যগণকে, বিশেষ করিয়া ইহার কর্ম্মকর্ত্তৃগণকে, এই ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী হইবার জন্য যদি আমরা চাপ দিতে না পারি ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও উৎসাহী হইয়া উঠিতে না পারি তবে হয়ত উক্ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপার আরও দীর্ঘ দিন পিছাইয়া যাইতে পারে।"

জঙ্গীপুরে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই একমত। স্থানীয় মহকুমা-শাসক হাসপাতাল কমিটির সভাপতি। তিনি সচেষ্ট হইলে সরকারী বিভাগ অধিকতর সক্রিয় হইতে পারে এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাও ত্বরান্বিত হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ বিচারবিভাগের পৃথক্‌করণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন যে বিচারবিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হইবে। এই সম্পর্কে ১৪ই অগ্রহায়ণ "যুগান্তর" পত্রিকায় যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ

"বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণরূপে শাসনবিভাগ হইতে পৃথক করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্তের ফলে জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকদের হাতে আর কোন বিচার-ক্ষমতা থাকিবে না এবং শাসনবিভাগের প্রভাব-মুক্ত হইয়া বিচারবিভাগ একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করিবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের জন্য ব্রিটিশ আমল হইতেই জাতির নেতৃবৃন্দ আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছেন।

বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র সাংবাদিকদের নিকট এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিয়া বলেন যে, এই সংস্কারের ফলে জনসাধারণকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচারের সুযোগ দেওয়া হইতেছে এবং দীর্ঘকালের একটি আন্দোলন আজ সাফল্যলাভ করিতেছে। তিনি জানান যে, এই সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিবেন।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন, ভারতীয় সংবিধানের একটি ধারায় এই নীতি স্বীকার করা হইয়াছে যে, শাসনকর্ত্তারূপে যিনি কোন মামলার সহিত কোনভাবে জড়িত রহিয়াছেন তাঁহার হাতে বিচারকর্ত্তার ক্ষমতা রাখা ন্যায়সঙ্গত নয়।

রাজ্যসরকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে ফৌজদারী দণ্ড-বিধির ১৪৪ ধারা সংক্রান্ত মামলাগুলিকে শাসনবিভাগের হাতে রাখা হইবে।

বিচার ও শাসন বিভাগকে স্বতন্ত্র করার এইরূপ সিদ্ধান্ত ইতি-পূর্ব্বে উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে কার্য্যকরী হইয়াছে। শাসন-তন্ত্র সম্পর্কে সুবিখ্যাত আইনবিদ্ মেরিডিথের কথার উদ্ধৃতি করিয়া বলা যায় যে, কোন বিচারক মামলার জয়-পরাজয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জড়িত থাকিলে তাঁহার দ্বারা সত্যকার নিরপেক্ষ বিচার হওয়া কখনই সম্ভব নহে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশবিভাগের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন ও শাসন-ব্যবস্থা অটুট রাখা সম্পর্কে তিনি প্রায়ই পুলিশবিভাগীয় কর্ম্মচারীগণের সহিত গোপন সভায় মিলিত হইয়া থাকেন। কাজেই জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কোন বিচারকর্ত্তার যদি পদোন্নতি ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ঘটে, তাহা হইলে সেই বিচারকর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ চাহিয়া বিচারের রায় দিবেন, ইহা অসম্ভব নয়। বিচার ও শাসনবিভাগকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়াই এই দুইটি ক্ষতকে সমাজ-জীবন হইতে অপসারণ করা সম্ভব।

আইনবিদ্ মেরিডিথের এই নীতি সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়াছে ও পশ্চিমবঙ্গে নূতন ব্যবস্থা চালু করিবার পর এই নীতির বাস্তবরূপ পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভার অধিবেশনে অবশ্য স্থির হইয়াছে যে, দেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার সহিত বিশেষভাবে বিজড়িত ফৌজদারীর ১৪৪ ধারায় পূর্ণ দায়িত্ব শাসনবিভাগীয় দপ্তরের হাতে থাকিবে।

বিচারমন্ত্রী আরও জানান যে, নূতন ব্যবস্থা চালু হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের সহিত সদ্য অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অংশের জন্য আরও ৫৬ জন ছোট-বড় বিচারক প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমানের যুক্ত শাসন ও বিচার বিভাগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিচারবিভাগের উপর জেলা-জজ ও হাইকোর্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে এবং ইহা একটি সম্পূর্ণভাবে পৃথক বিভাগে রূপান্তরিত হইবে। শাসনকর্ত্তার উপর শাসন-ব্যবস্থা ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব থাকিবে। মহকুমান্তরের বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থাকেও অনুরূপভাবে বিভক্ত করা হইবে।"

বাংলার আঞ্চলিক বাহিনী

নিম্নে আমরা রাজ্যপালের বক্তৃতার সারাংশ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে তুলিয়া দিলাম।

এই সম্পর্কে আমাদের বলা প্রয়োজন যে, বাংলায় আঞ্চলিক বাহিনী বিষয়ে আজ পাঁচ বৎসর কোনও প্রচার বা সক্রিয় চেষ্টার কথা আমরা শুনি নাই। সুতরাং দেশের যুবকগণের দোষ কোথায়?

—"১৭ই নবেম্বর শনিবার আঞ্চলিক বাহিনী দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু শুক্রবার অপরাহ্নে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত এক বাণীতে ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনীতে আরও অধিক সংখ্যায় যোগদানের আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাব্যূহ এই আঞ্চলিক বাহিনী দেশের প্রতিরক্ষায় সুশৃঙ্খল প্রস্তুতির প্রতীকস্বরূপ। সুতরাং আঞ্চলিক বাহিনীকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা দেশের যুবকদের শিক্ষার একটি মূল্যবান অংশ।

শ্রীমতী নাইডু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, দেশের যুবকগণ এই বাহিনীর গুরুত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়। তিনি গুরুত্ব দিয়া বলেন যে, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে নাগরিক কর্ত্তব্য পালনের ব্যর্থতার ফলে কষ্টার্জিত স্বাধীনতার মূল ভিত্তি বিপন্ন হইয়া পড়িতে পারে।

১৭ই নবেম্বর আঞ্চলিক বাহিনী দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় নিম্নরূপ বাণী দিয়াছেন:

'অদ্য অপরাহ্নে আঞ্চলিক বাহিনীর অষ্টম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হইবে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই উপলক্ষে আমার এই রাজ্যের যুবকবন্ধুদের আমি এই বাহিনীতে ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় যোগ দিতে পুনরায় আহ্বান জানাইতেছি। ইহা নাগরিকদিগেরই বাহিনী; এই বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবকেরা আধুনিক যুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন, যাহাতে প্রয়োজন হইলে মাতৃভূমির রক্ষায় তাঁহারাও স্থায়ী সেনাবাহিনীর ভ্রাতৃবৃন্দের পাশে দাঁড়াইতে পারেন। স্বাধীন দেশের প্রত্যেক নাগরিকের দেশরক্ষায় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে দ্রুত বিরাট বাহিনী গঠন ও শিক্ষণের সময় পাওয়া যায় না। প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলি আজ ক্রমশঃ এত জটিল ও ব্যয়বহুল হইয়া পড়িয়াছে যে, একটি

স্থায়ী বিরাট বাহিনী রাখিতে হইলে সকল দেশের আর্থিক অবস্থার উপরই খুব বেশী চাপ পড়ে। ভারতের ক্ষেত্রে একথা আরও অধিক প্রযোজ্য, কেননা এখানে প্রতিটি উদ্বৃত্ত পাই উন্নয়ন-কার্য্যসূচীর জন্য প্রয়োজন। কিন্তু ইহা দুঃখের বিষয় যে, এই রাজ্যে আঞ্চলিক বাহিনীর ডাকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই, রাজ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং যাহাতে রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া যায় এবং জেলায় জেলায় এই সংস্থা প্রসারিত করার পরিকল্পনাও সফল হয়, তদুদ্দেশ্যে দলে দলে আগাইয়া আসিবার জন্য আমি আমার তরুণ বন্ধুদের প্রতি আবেদন জানাইতেছি। দেশের সেবায় বাংলা কখনও পিছাইয়া থাকে নাই, এখনও থাকিবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

ড. আম্বেদকর

এদেশের অনুন্নত শ্রেণীর নেতা ও নির্ভীক চালকরূপে ডাঃ আম্বেদকর দীর্ঘ দিন এই দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিলেন। তাঁহার মতামতে অনেক সময় ভুল দেখা গিয়াছে, কিন্তু জ্ঞানতঃ অসত্যাচরণ তিনি করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুতে তপশীলী শ্রেণী বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইল। নীচে তাঁহার মৃত্যুসংবাদের বিবৃতি দেওয়া হইল।

"নয়াদিল্লী, ৬ই ডিসেম্বর—তপশীলী সম্প্রদায়ের নেতা এবং ভারতের ভূতপূর্ব্ব আইনমন্ত্রী ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর আজ সকালে এখানে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। বিগত কিছুকাল যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। গত মঙ্গলবার দিন তিনি রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগ দেন। গতকাল মধ্যরাত্রে যখন তিনি শয্যা গ্রহণ করেন তখনও তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু আজ সকালে যখন তাঁহার কক্ষে চা লইয়া যাওয়া হয় তখন তাঁহার জীবনদীপ নিভিয়া গিয়াছে।

তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইবার অব্যবহিত পরই মন্ত্রিসভা এবং সংসদের সদস্যগণ তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার আলীপুর রোডস্থ বাসভবনে গমন করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, সংযোগরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি রাও প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃতের স্মৃতির প্রতি সম্মান নিবেদনকল্পে আজ সংসদের উভয় সভার অধিবেশন প্রশ্নোত্তরের পর স্থগিত রাখা হয়। আজ রাত্রি ৮টায় বিমানযোগে তাঁহার মৃতদেহ বোম্বাইয়ে লইয়া যাওয়া হয়।

ভূতপূর্ব্ব আইনমন্ত্রী ও ভারতের সংবিধানের রচয়িতা ড. আম্বেদকরের মৃত্যু-সংবাদে সংসদের সদস্যগণ মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। গত পরশুও তিনি রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি স্বাভাবিক অবস্থায়ই ছিলেন এবং তাঁহাকে বন্ধুবর্গের সহিত কথা বলিতে ও হাস্যপরিহাস করিতে দেখা গিয়াছিল।

সম্প্রতি দুই লক্ষাধিক অনুগামীসহ তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী ও দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

রাজ্যসভায় ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তাঁহাকে অস্পৃশ্যদের উপর সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলিয়া অভিহিত করেন।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত

বিগত ১৫ই অক্টোবর, উননব্বই বৎসর বয়সে বহু শাস্ত্রবিৎ সুপণ্ডিত দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা নগরীর সিমলা অঞ্চলস্থ তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। ঋষিকল্প মহেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা। তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য ১৮৯৬ সালে মহেন্দ্রনাথ ইংলণ্ড গমন করেন। অগ্রজের নিষেধে সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিতে হইলেও তাঁহার বিলাতযাত্রা নিষ্ফল হয় নাই। লণ্ডনে অবস্থানকালে ব্রিটিশ মিউজিয়মে একাগ্রচিত্তে অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তিনি শিল্প ও স্থাপত্য, ধর্ম্ম ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর্য্যটকরূপে মহেন্দ্রনাথ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানে, বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে পরিভ্রমণ করিয়া ১৯০২ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণকাহিনী তিনি লেখেন নাই। তাঁহার 'ন্যাশনাল ওয়েলথ' নামক পুস্তকে এই ভ্রমণের আভাস পাই। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত সংস্রববশতঃ পুলিশ-কর্ত্তৃক বার বার বাড়ী খানাতল্লাসীর আশঙ্কায় তাঁহাকে তাঁহার অধিকাংশ লেখা এবং কাগজপত্র অগ্নিশিখায় সমর্পণ করিতে হয়। তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা পুস্তকাবলীর মধ্যে 'স্টেটাস অফ টয়লার্স', 'লেকচার্স অন এডুকেশন,' 'ন্যাশনাল ওয়েলথ,' 'নিউ এশিয়া', 'নেশন', 'ন্যাচরাল রিলিজিয়ন', 'প্রিন্সিপল্স অফ আর্কিটেকচার', 'ডিপার্টেসন অন পেন্টিং', 'মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্র', 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ সুপরিচিত। উভয় ভ্রাতার মত মহেন্দ্রনাথ ছিলেন চিরকুমার। তিনি ছিলেন গৈরিক-বিরহিত সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁহার জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব এবং গভীর পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু খ্যাতনামা শিল্পী, সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার ভবনে সমবেত হইতেন এবং তাঁহার আলোচনায় প্রেরণা লাভ করিতেন।

ন্যায়-বৈশেষিক ও বৌদ্ধদর্শন

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য

ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানসমূহের মধ্যে গহনাতিগহন বিচারের সম্যক্ পরিস্ফুরণ প্রধানতঃ ন্যায় ও বৌদ্ধদর্শনের গ্রন্থসমূহে দেখা যায়। সুদূর অতীত হইতে দশম শতক পর্যন্ত প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভারতীয় দর্শনের যে ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে তাহাতে এই দার্শনিকদ্বয়ের স্থান কোন অংশেই ন্যূন নয়। ন্যায়দর্শনের ক্রমবিবর্তনে বৌদ্ধদার্শনিকগণের সূক্ষ্ম বাদবিচার যেরূপ প্রভাবিত করিয়াছে, অপর পক্ষে বৌদ্ধ দার্শনিকগণও স্বীয় প্রস্থানের ক্রমবিকাশে নৈয়ায়িকগণের নিকট যে কিরূপ ঋণী তাহার ইতিহাস আজিকার দিনে বিস্মৃতপ্রায়। সার্ধ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া উভয়পক্ষের এই বাদবিচার দর্শনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়; আর ইহার ফলে বৌদ্ধদর্শনে ব্যুৎপন্ন না হইলে ন্যায়দর্শনের রহস্যজাল ভেদ করা প্রায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ন্যায়সূত্রকার গৌতম তাঁহার গ্রন্থে প্রত্যক্ষতঃ কোন বৌদ্ধমতের উল্লেখ করেন নাই বটে কিন্তু বাৎস্যায়নের ভাষ্য-পাঠে মনে হয়, যেন বহুস্থলে বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের সময় ন্যায়দর্শনের শৈশবাবস্থা। উহার বিচার-শৈলীর সূক্ষ্ম দার্শনিকতা প্রকৃতপক্ষে বার্তিককার উদ্দ্যোতকর (ষষ্ঠ শতক) হইতে সুরু হয়। ন্যায়বিচারের সুবর্ণময় যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'ন্যায়বার্তিক'। উদ্দ্যোতকর তাঁহার উক্ত গ্রন্থ রচনার প্রেরণা লাভ করেন 'কুতার্কিক'গণের নিকট হইতে।[১] কিন্তু কে এই 'কুতার্কিক'? ভারতীয় দর্শনের, আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে প্রায় সকল প্রস্থানের আচার্যগণ বিরোধী মতাবলম্বীদের এই ভাষায় নির্দেশ করিতেন। এই বিরোধী দর্শন-প্রস্থানের নির্দেশনায় উদ্দ্যোতকরের নীরবতা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি পূর্বপক্ষীর মত-উপস্থাপনে সর্বত্রই 'অন্যে', 'অপরে', 'ইত্যাহুঃ' বলিয়া আপন কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন। নবম শতকের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট চার্বাকপন্থীকে প্রধানতঃ এই কুতার্কিক পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। কিন্তু সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্রের মতে দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণ এই 'কুতার্কিক'। বৌদ্ধ ন্যায়-প্রবাহের উৎস এই দিঙ্‌নাগের 'প্রমাণসমুচ্চয়' গ্রন্থ। ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে দিঙ্‌নাগ বাৎস্যায়ন মতের খণ্ডন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের গ্রন্থপাঠে বৌদ্ধমত সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ণাতবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় মিলিলেও তিনি দিঙ্‌নাগের গ্রন্থের সহিত নিবিড় ভাবে পরিচিত ছিলেন কিনা সন্দেহ। ফলে, বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্বক ন্যায়মত সমর্থনে তাঁহার সুবিস্তৃত প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই কারণেই দার্শনিকধুরন্ধর বাচস্পতি মিশ্রকে বাদবিচারের কণ্টকময় পথে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে—একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহার উদ্দ্যোতকরের সহযোগিতা। তিনি নিজেই গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিতেছেন—

"ইচ্ছামি কিমপি পুণ্যং দুস্তরকুনিবন্ধপঙ্কমগ্নানাম্।
উদ্দ্যোতকরগবীনামতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ॥"[২]

অর্থাৎ, "উদ্দ্যোতকররূপ বৃদ্ধ গাভী পূর্বপক্ষীর সমালোচনা-জালরূপ দুস্তর পঙ্কে মগ্ন হইয়াছে—তাঁহাকে ঐ গভীর পঙ্ক হইতে উদ্ধার করাই আমার এই গ্রন্থরচনার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই পুণ্যসঞ্চয়ের আমি প্রয়াসী"। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে, শাস্ত্র রচনার ও পাঠের উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণয়, কিন্তু দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি অর্বাচীন কুতার্কিকগণের বাক্যজালে আচ্ছন্ন শাস্ত্রের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় সম্ভাবিত নহে—এইজন্যই উদ্দ্যোতকরের স্বনিবন্ধ রচনার প্রচেষ্টা।[৩] তাৎপর্যটীকাকার বহু স্থলে দিঙ্‌নাগের কারিকা উদ্ধারপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। অনুমান-বিচার প্রসঙ্গ প্রধানতঃ দিঙ্‌নাগ মতেরই দূষণ। কিন্তু এই বিচারের জটিলতা ও দুরূহতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন আমরা পাই উদ্দ্যোতকরোত্তর ন্যায়-গ্রন্থে ও দিঙ্‌নাগোত্তর বৌদ্ধ-ন্যায়গ্রন্থে। একদিকে বাচস্পতি, জয়ন্ত ভট্ট ও উদয়ন, অন্যদিকে শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি—এই দ্বৈরথ সংগ্রামের ইতিহাস ভারতীয় দর্শন সাহিত্যাকাশে চির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে শোভিত থাকিবে। রত্নকীর্তি (৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার 'অপোহসিদ্ধি' গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ত্রিলোচন, ন্যায়-ভূষণকার, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির মত খণ্ডন করিয়াছেন। 'ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি' গ্রন্থে লেখক জাগতিক বস্তুসমূহের ক্ষণিকত্ব-

---

১। কুতার্কিকজ্ঞাননিবৃত্তিহেতুঃ করিষ্যতে তস্য ময়া নিবন্ধঃ—ন্যায়বার্তিক (মেট্রোপলিটন সং), পৃঃ ১

২। বাচস্পতি মিশ্র—তাৎপর্য টীকা, শ্লোক ৪

৩। দিঙনাগপ্রভৃতিভিরর্বাচীনৈঃ কুহেতুসন্তমসমুত্থাপনেনাচ্ছাদিতং শাস্ত্রং ন তত্ত্বনির্ণয়ায় পর্যাপ্তমিত্যুদ্দ্যোতকরেণ স্বনিবন্ধোদ্দ্যোতেন তদপনীয়ত ইতি—ঐ, পৃঃ ২

দিঙনাগদূষিতান্ কল্পান্ অন্যাংশ্চ বিকল্পান্ দিঙনাগসমর্থিতং চ কল্পযুগলং দূষয়তি—ঐ, পৃঃ ১৩৫

প্রমাণ প্রসঙ্গেও পূর্বোক্ত নৈয়ায়িকগণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। জাগতিক বস্তুর স্থিরত্ব-প্রমাণ প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকগণের অন্যতম প্রধান যুক্তি—প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)। রত্নকীর্তি সেই উদ্দেশ্যেই বিস্তৃত ভাবে প্রত্যভিজ্ঞা খণ্ডন করিয়াছেন। 'স্থিরসিদ্ধিদূষণ' শীর্ষক অপর একটি গ্রন্থও তাঁহার রচিত।৪ নৈয়ায়িকমতের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ত্রিলোচনের মতেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় ত্রিলোচনের গ্রন্থই সেকালে সুপ্রচলিত ছিল—বহুদিন যাবৎ উক্ত গ্রন্থকারের কোন গ্রন্থের নিদর্শন মিলে নাই।* আচার্য উদয়ন প্রধানতঃ এই ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি নিরাকরণের জন্যই "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থ রচনা করেন।

অবয়ব (parts) ও অবয়বী (whole) ন্যায়মতে সম্পূর্ণ পৃথক। অবয়বী অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এই সমবায় সম্বন্ধ (Inference) ন্যায়মতে নিত্য। বৌদ্ধাচার্য পণ্ডিত অশোক (নবম শতক) অবয়বিনিরাকরণ প্রকরণে নিত্য সমবায় সম্বন্ধ যে সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। অবয়বের সমূহাবস্থাই অবয়বী—উহার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই—ইহাই বৌদ্ধমত। পূর্বপক্ষীর মত উপস্থাপনে তিনি নামতঃ কাহারও উল্লেখ করেন নাই, বলিয়াছেন 'কণাদশিষ্যাঃ'। আচার্য উদয়ন "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে পণ্ডিত অশোকের মত খণ্ডনপূর্বক অবয়বীর পৃথক অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

যুগপ্রসারী এই বাদবিচারের ফলে পূর্ববর্তী আচার্যগণের মত বহুস্থলে সংশোধন করিতে হইয়াছে। এই দার্শনিক চিন্তাধারার বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়া ভারতীয় মননের ক্ষেত্র এক অমূল্য সম্পদে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দিঙ্‌নাগ প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিয়াছেন—'কল্পনাপোঢ়ম্'। নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর উহার নিরাস করিলেন। তিনি প্রত্যক্ষলক্ষণে 'অভ্রান্তত্ব' নিবেশ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের অনুবর্তন করিয়া বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তি প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিলেন—প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ম্ নামজাত্যাদ্যসংযুতম্।৫ বার্তিককার উদ্দ্যোতকর বসুবন্ধুর (৪২০-৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) সম্মত—অর্থাজ্ বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্—এই প্রত্যক্ষলক্ষণের নিরাস করিয়াছেন।৬ বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য টীকা গ্রন্থে ধর্মকীর্তির পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ খণ্ডন করিয়াছেন। মনে হয় ধর্মকীর্তি প্রভৃতির মত খণ্ডনে বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার গুরু ত্রিলোচনের রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট যাঁহাকে 'বৃদ্ধ নৈয়ায়িক' রূপে অভিহিত করিয়াছেন—এই ত্রিলোচনই হয় ত সেই নৈয়ায়িক। প্রত্যক্ষলক্ষণে 'ব্যবসায়াত্মক' পদটির যৌক্তিকতা বিচার প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র এই গুরু-ঋণ অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন।৭ বাচস্পতি মিশ্র বৌদ্ধদর্শনে প্রত্যক্ষলক্ষণের ক্রমবিকাশটি একটি বাক্যে সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন—"দিঙ্‌নাগস্যৈব কল্পনাপোঢ়মাত্রং লক্ষণমপি তু তদেবাভ্রান্তত্বসহিতং প্রত্যক্ষলক্ষণং মন্যতে স্ম কীর্তিঃ প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তমিতি।"৮ জয়ন্ত ভট্ট আরও বিস্তৃত রূপে ধর্মকীর্তিসম্মত প্রত্যক্ষলক্ষণ খণ্ডন করিয়াছেন।৯

এই জয়ন্ত ভট্ট নৈয়ায়িককুলের এক অভিনব আবির্ভাব। প্রাচীন ন্যায় ও বৌদ্ধদার্শনিকগণের প্রতিটি মতের তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারশৈলীর দ্বারা যাথার্থ্য অযাথার্থ্য প্রমাণ করিতে প্রযত্ন হইয়াছেন। প্রাচীন নৈয়ায়িকের মত তিনি কোথাও বিনা যুক্তিতে গ্রহণ করেন নাই। বহুস্থলে চিরাগত রীতি হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়াছেন—নূতন মতের উপস্থাপন করিয়াছেন। কাশ্মীরের অন্ধকার পর্বতগুহায় বন্দী অবস্থায় বৌদ্ধমত খণ্ডনে ও স্বমত স্থাপনে যে প্রবল ধীশক্তি, নিষ্ঠা ও সর্বোপরি অননুকরণীয় দার্শনিক প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহা পৃথিবীর মনন-রাজ্যের এক অপূর্ব সম্পদ। বৌদ্ধের দুর্দমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী জয়ন্ত ভট্ট ভারতীয় দর্শনের সকল শাখায় নিষ্ণাত। সুবিস্তৃত ভাবে পূর্বপক্ষীর মতোপস্থাপনের কৃতিত্ব একমাত্র তাঁহারই। একদিকে সূক্ষ্ম দার্শনিকতা অন্যদিকে কবিত্ব—এ দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয় তাঁহার গ্রন্থে প্রকট। চার্বাকপন্থীকে তিনি উপেক্ষণীয় (চার্বাকাস্ত বরাকাঃ) বলিয়া খণ্ডন করিতেই প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু বৌদ্ধকে কোথাও নির্বিচারে গ্রহণ করেন নাই। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মনঃকল্পিত নয়, ইহার বাস্তব সত্তা আছে—ইহার প্রমাণে ও বৌদ্ধ যোগাচার মত খণ্ডনে দুর্ভেদ্য যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন। বৌদ্ধগণকে 'মুণ্ডিতকেশ'রূপে সম্বোধন করিয়া ক্ষণভঙ্গবাদ নিরাস করিয়াছেন। ক্ষণিকবাদী রবি-

৪। "Six Buddhist Nyaya Tracts". ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি, পৃঃ ৬৮

* আনন্দের বিষয় 'মিথিলা রিসার্চ ইনষ্টিটিউট' হইতে ত্রিলোচনের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

৫। প্রমাণসমুচ্চয়, পরিচ্ছেদ ১

যথা সম্যগ জ্ঞানমবিকৃত্য প্রত্যক্ষাদিলক্ষণং কৃতং কীর্তিনা—তাৎপর্যটীকা, পৃঃ ১৩১

৬। ন্যায়বার্তিক (মেট্রোপলিটন সং) ২২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

৭। ত্রিলোচনগুরূন্নীতমার্গানুগমনোন্মুখৈঃ।
যথামানং যথাবস্তু ব্যাখ্যাতমিদমীদৃশম্। তাৎপর্যটীকা, পৃঃ ১১৪

৮। ন্যায়কণিকা, পৃঃ ১৯২

৯। ন্যায়মঞ্জরী পৃঃ ৮৬-৯৩

শুভের মত নিরাস করিয়া উপহাসচ্ছলে কবি-দার্শনিক জয়ন্ত ভট্ট বলিতেছেন—"ওহে ভিক্ষু! ওঠ, ক্ষণভঙ্গবাদ নিরাস করিয়াছি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে।" (উত্তিষ্ঠ ভিক্ষো! ফলিতাস্তবাশাঃ সোঽয়ং সমাপ্তঃ ক্ষণভঙ্গবাদঃ)।

উদ্দ্যোতকরের বহু পরে বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব। ঐ সময়ে মীমাংসকগণের উপর বৌদ্ধমত খণ্ডনের ভার পড়িল। কুমারিলভট্ট, মণ্ডন মিশ্র, প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবৈদান্তিক আচার্য-শঙ্কর, সুরেশ্বরাচার্য ও আনন্দজ্ঞান প্রভৃতি মধ্যযুগীয় দার্শনিক-গণ দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তির মত খণ্ডন করিলেন। নবম শতকে ধর্মোত্তর ধর্মকীর্তির সমর্থনে ব্রতী হইলেন। দশম শতকে বাচস্পতি মিশ্র ধর্মোত্তরের মত খণ্ডন করিলেন। একাদশ শতকে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী উদয়নাচার্যের আবির্ভাব। আত্মতত্ত্ববিবেক (বৌদ্ধধিক্কার) ও কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধমতবাদের উপর চরম আঘাত হানিলেন। একদিকে নিরীশ্বর ও নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধ-দর্শনের যুক্তিজাল খণ্ডন, অন্যদিকে প্রবলযুক্তির উপর ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব স্থাপনের যে প্রয়াস তিনি করিয়াছেন—তাহাতে উদয়নের নাম দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে চির অম্লান থাকিবে। প্রবাদ আছে—পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশপ্রার্থী উদয়ন, কিন্তু মন্দিরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। আত্মাবমাননায় রোষদীপ্ত উদয়ন দেবমূর্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ঐশ্বর্যমদমত্তোঽসি মামবজ্ঞায় বর্তসে।
উপস্থিতেষু বৌদ্ধেষু মদধীনা তব স্থিতিঃ॥"

অর্থাৎ, "ঐশ্বর্যগর্বে স্ফীত ওহে দেবতা! আমাকে অবজ্ঞা করিলে, কিন্তু মনে রেখ, বৌদ্ধদের দ্বারা প্রবল ভাবে আক্রান্ত তোমার অস্তিত্বকে রক্ষা করিবার জন্য আমিই ব্রতী হইয়াছি।" উদয়নের এই উক্তি দম্ভের পরিচয় হইলেও উহা যথার্থ। কল্যাণ রক্ষিতের (৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ) "ঈশ্বরভঙ্গ কারিকা"র খণ্ডন 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থ। উদয়নের ঐ দুর্ভেদ্য যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ-সমূহের প্রচারের ফলেই যে বৌদ্ধদর্শনের অপমৃত্যু ঘটিল—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধদর্শনের অবলুপ্তির ইহাই প্রধান কারণ। এই কারণেই ত্রয়োদশ শতক হইতে কোন বৌদ্ধগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহাও সত্য যে, পরবর্তী কালের আস্তিক দর্শন প্রস্থানের গ্রন্থসমূহের উৎস এই কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ।

পণ্ডিতগণ মনে করেন, নব্যন্যায়ে যে ভাষার সংযম ও অর্থপ্রাচুর্য তাহা বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণের নিকট হইতে গৃহীত।১০ ইহা আপাতমনোরম হইলেও সত্য নহে। নব্য-ন্যায়ের মধ্যে যে ভাষার বিচিত্রশৈলী ও দৃঢ়গ্রন্থন দৃষ্ট হয় তাহা গঙ্গেশের আবির্ভাবের বহুপূর্বে একাদশ শতকে উদয়নের গ্রন্থসমূহের মধ্যেই বিরাজমান। নব্যন্যায়ের সূত্রপাত প্রকৃত পক্ষে উদয়নের সময় হইতে। কিন্তু ভাষার বিশিষ্ট রীতি যাহা নব্যন্যায়ের বৈশিষ্ট্য, তাহা অক্ষপাদ গৌতমের সময় হইতে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। বাচস্পতি মিশ্র গ্রন্থের প্রারম্ভে সূত্রকার গৌতমের উদ্দেশে প্রণাম করিতেছেন—"নমামি ধর্মবিজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্যশালিনে। নিধয়ে বাগবিশুদ্ধীনামক্ষপাদায় তায়িনে"॥১১ বাক্যবিশুদ্ধির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন গোতমের ন্যায় সূত্র।

মহামহোপাধ্যায় সতীশ বিদ্যাভূষণ মহাশয় মনে করেন যে, নব্যন্যায়ের প্রবর্তক প্রকৃতপক্ষে দিঙ্‌নাগ (ষষ্ঠ শতক), গঙ্গেশ নন। গঙ্গেশের সময় হইতে ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে প্রথম কেবলমাত্র প্রমাণ লইয়া আলোচনার সূত্রপাত হইল। প্রমেয় পদার্থের আলোচনা এখানে নিছক গৌণ।১২ ন্যায়-সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে একটিমাত্র পদার্থের উপর এই বিশেষ দৃষ্টির হেতু কি? বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে নব্যন্যায় যে প্রধানতঃ প্রমাণশাস্ত্র রূপে দার্শনিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিল তাহার একমাত্র কারণ বৌদ্ধদার্শনিকের প্রভাব।১৩ নব্যন্যায়ে প্রমাণের আলোচনা মুখ্য হইলেও উহা সর্বতোভাবে প্রমাণশাস্ত্র কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট বিচারের অবকাশ আছে। নব্যন্যায়ের মধ্যেও প্রচুর প্রমেয় পদার্থের আলোচনা আছে। রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থে ন্যায় প্রমেয় পদার্থের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি দেখা যায়। নব্যন্যায়ের বিরুদ্ধে এই মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদনে অধুনা কোন কোন পণ্ডিত প্রযত্ন হইয়াছেন।১৪ প্রাক্-গঙ্গেশ ন্যায়দর্শনের গ্রন্থসমূহও মাত্র প্রমেয়শাস্ত্র নহে। সূত্রকার প্রথম সূত্রের প্রথমেই 'প্রমাণ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন এবং প্রমেয়াদি অপেক্ষা প্রমাণকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়ের মধ্যে প্রমাণেরই প্রাধান্য। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্"।১৫ বার্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিলেন—"প্রমাণস্য প্রাধান্য-প্রদর্শনার্থঞ্চ"১৬ ও "সাধকতমং প্রমাণং ন তু প্রমাতৃ-

10 Th. Stchebatsky, "Buddhist Logic". vol. 1, p.50.

১১ তাৎপর্য টীকা, পৃঃ ১

12 "History of Indian Logic" p. 492.

13 Journal of the Buddhist Text & Anthropological Society pt. 111. 1898. pp 4-5.

14 Cultural Heritage of India vol. 111. (2nd Edn' "Navyanyaya".

১৫ ন্যায়ভাষ্য, পৃঃ ১

১৬ ন্যায়বার্তিক, পৃঃ ১২

প্রমেয়ে"।১৭ প্রমেয়াদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রমাণতত্ত্বজ্ঞানের অধীন।১৮ সমগ্র ন্যায়সূত্র-ভাষ্য-বার্তিক গ্রন্থে চতুর্বিধ প্রমাণের আলোচনাই মুখ্য। গৌণরূপে প্রমেয় আলোচিত হইয়াছে। উহার আলোচনা বৈশেষিক প্রস্থানের বিষয়ীভূত। আত্মা সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনে যে বিস্তৃত আলোচনা আছে তাহা বিরুদ্ধবাদী চার্বাক ও বৌদ্ধমতের নিরাসের উদ্দেশেই। চতুর্বিধ প্রমাণের স্থাপন ও পরীক্ষাতেই গ্রন্থের অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, ভারতীয় দর্শনে বিচাররীতির প্রথম পরিচয় পাই ন্যায়সূত্রে। এই বিচারপদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনায় মনে হয় সে সময়েই ন্যায়ানুমত পদার্থসমূহের প্রতিপাদন করিতে সূত্রকারকে বিশেষ তৎপর হইতে হইয়াছে। তিনি নিশ্চয়ই তৎকালীন বিরুদ্ধ দার্শনিক মতের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। এবং সেই বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে প্রমেয় পদার্থসমূহের আলোচনা করিতে হইয়াছে। ন্যায়সূত্রের এই অলক্ষ্য প্রভাব নব্যন্যায়ে পড়িয়াছে। নব্যনৈয়ায়িকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস কোনক্রমেই বৌদ্ধদার্শনিকগণ হইতে পারেন না। বিশেষতঃ বৌদ্ধ এবং জৈন ন্যায়ের আলোচনা বাংলা দেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। এখানে মীমাংসা, ন্যায় ও ব্যাকরণের আলোচনাই সর্বাধিক। দিঙ্‌নাগের গ্রন্থে সর্বপ্রথম তর্কশাস্ত্র তত্ত্ববিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে আলোচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রমাণসমুচ্চয়, ন্যায়বিন্দু, প্রমাণবার্তিক প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের অনুসৃত রীতি যে নব্য নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক সর্বতোভাবে গৃহীত হয় নাই ইহাও সুনিশ্চিত। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছিলেন :

"From his (Gangesa) time downwards it became customary with the Hindu writers on Nyaya Philosophy to deal only with the topic of Pramana (evidence of knowledge) and nobody cared for the remaining fifteen categories."1

ইহার সমীচীনতা বিবেচ্য। বৈশেষিক পদার্থসমূহকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার প্রয়াসেই গঙ্গেশ তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বর, সামান্য বা জাতি, অভাব প্রভৃতির তত্ত্বসমীক্ষায় যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন স্বাধীন বিচাররীতির যে ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাই পরবর্তী যুগে নৈয়ায়িকধুরন্ধর রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর ভট্টাচার্য, জগদীশ প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ অনুসরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ রঘুনাথ সপ্ত পদার্থের উপরে আরও আটটি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব প্রাচীন ন্যায়ের মতই পদার্থ স্থাপনের জন্যই প্রমাণচর্চার সূত্রপাত। এ রীতি ইহার নিজস্ব। সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বাদবিচারের ইহাই সুপ্রসূ ফল। শাস্ত্র ও জ্ঞানধারার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষার ইহা স্বাভাবিক পরিণতি।

১৭ ঐ পৃঃ ১৮
১৮ তাৎপর্য টীকা, পৃঃ ৩

1 "Journal of the Buddhist Text Society" pt III, 1898. p. 6

আল্-বীরুণীর ভারতীয় ভূগোল

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

২

পর্বতমালা

আল-বীরুণী 'ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ভারতের নদী ও পর্বতের বিবরণ দিয়াছেন। আধুনিক অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া ইহা আলোচিত হইলে ভূগোলবিদ্‌দিগের বহু উপকারে আসিবে।

মৎস্যপুরাণ হইতে আল-বীরুণী প্রাচীন ভারতের কয়েকটি পর্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুরাণের মতে মেরুপর্বতের সাতটি গ্রন্থি (গ্রন্থি=বৃহৎ পর্বত) আছে, যথা—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিয়াত্র বা পারিপাত্র। মেরু পর্বতের চতুষ্পার্শ্ব সম্পর্কে পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, ইহার পূর্ব দিকে মালব পর্বত এবং মহাসাগর ; উত্তরে নীল, সীত, শৃংগাদ্রি এবং মহাসাগর ; পশ্চিমে গন্ধমাদন ও মহাসাগর ; আর দক্ষিণে নিষধ, হেমকূট ও হিমগিরি এবং মহাসাগর রহিয়াছে।

মেরু পর্বতের চতুর্দিকে নিম্নলিখিত বৃহৎ পর্বতগুলি বিদ্যমান—

(১) হিমালয়—সর্বদা বরফের দ্বারা আচ্ছাদিত।

(২) হেমকূট—ইহা একটি সুবর্ণ শিখর, এখানে গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ বাস করিত।

(৩) নিষধ—ইহা নাগদিগের বাসভূমি ছিল।

(৪) নীল—এখানে সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ বাস করিতেন।

(৫) শ্বেত—ইহা দৈত্য ও দানবদিগের বাসস্থান ছিল।

(৬) শৃংগবন্ত—এখানে পরলোকগত পূর্বপুরুষগণ বাস করিতেন।

এই পর্বতসমূহের মধ্যস্থলে সর্বোচ্চ পর্বত ইলাবৃত বিদ্যমান। সমগ্র পর্বতটির নাম পুরুষ পর্বত। হিমবন্ত ও শৃংগবন্তের মধ্যবর্তী স্থানকে কৈলাস বলে। বিষ্ণুপুরাণের মতে শ্রীপর্বত, মলয়, মাল্যবন্ত, বিন্ধ্য, ত্রিকূট, ত্রিপুরান্তিক এবং কৈলাস মধ্য পৃথিবীর পর্বত।

হিমালয় কেবলমাত্র বর্ষপর্বত। ইহা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত। প্রাচীন ভূগোলবিদ্‌দিগের মতে হিমবন্ত, হিমবৎ বা হিমাদ্রি—সুলেমান হইতে পঞ্জাবের পশ্চিম দিক এবং ভারতের সমগ্র উত্তর সীমানা ধরিয়া পূর্বে আসাম এবং আরাকান পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পর্বতমালাকেই বুঝায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণ হইতে জানা যায় যে, হিমবন্ত সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্যন্ত ধনুকের গুণের ন্যায় বিস্তৃত। হিমালয় পর্বত বা টলেমির ইমাওস গঙ্গা, সিন্ধু, কোয়া এবং সোয়াট নদীর উৎপত্তি স্থান। মহেন্দ্র, মালব, সহ্য, শুক্তিমৎ, ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং পারিপাত্র—এই সাতটি কুলাচল নামে খ্যাত, কারণ এই সকল পর্বতের প্রত্যেকটি কোন একটি দেশ বা জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট। গঙ্গাসাগর সঙ্গম এবং সপ্ত গোদাবরীর মধ্যে মহেন্দ্র পর্বত অবস্থিত। গঞ্জামের নিকটে পূর্ব পার্বত্য পথের অংশকে এখনও মহেন্দ্র পর্বত বলা হয়। পারজিটার সাহেব বলেন যে, মহানদী, গোদাবরী ও ওয়েন গঙ্গার মধ্যবর্তী পর্বতমালাগুলি এই নামে বিদিত। গঞ্জাম হইতে বিস্তৃত দক্ষিণে পাণ্ডাদেশ এবং সমগ্র পূর্ব পার্বত্য পথ পর্যন্ত পর্বতমালাকে মহেন্দ্র পর্বত বলিত। উড়িষ্যা হইতে মাদুরা জেলা পর্যন্ত সমগ্র পর্বত মহেন্দ্র পর্বত নামে খ্যাত। ইহা মলয় পর্বতের সহিত যুক্ত ছিল।

পারজিটারের মতে নীলগিরি হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম পার্বত্য পথের অংশ এবং মলয়গিরি অভিন্ন। পশ্চিম পার্বত্যপথের উত্তরাংশ সহ্য পর্বত হইতে অভিন্ন। সহ্য পর্বত তাপ্তী নদী হইতে নীলগিরি পর্যন্ত বিস্তৃত। সহ্য গিরির সহিত কয়েকটি ক্ষুদ্র পর্বতের সংযোগ আছে। ত্রিকূট হইতে ত্রৈকূটকের নামকরণ হইয়াছে। শুক্তিমৎ পর্বত এবং সুলেমান পর্বত অভিন্ন। পারজিটার বলেন, গারো, খাসি ও ত্রিপুরা পর্বত এবং শুক্তিমৎ পর্বতমালা একই। কেহ কেহ বলেন, এই পর্বতমালা হাজারিবাগ জেলার উত্তরে অবস্থিত। আবার কেহ কেহ পশ্চিম ভারতে ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। ঋক্ষ এবং বিন্ধ্য—টলেমির মতে ঔকসেনটন (Ouxenton) এবং ঔনডিয়ন (Ouindion) নামে খ্যাত। বর্তমানে বিন্ধ্যপর্বত বলিতে আমরা ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং পারিপাত্র পর্বতকে বুঝি। টলেমি বলেন যে, ঋক্ষ হইতে টাউনডিস, দোসারণ, আদামস ও ঔনডিয়নের উৎপত্তি হইয়াছে। দোসারণ এবং পুরাণে বর্ণিত দশার্ণ অভিন্ন। নামাদশ ও নামাগাওনা নর্মদা এবং তাপ্তী নামে বিদিত। টলেমি বলেন, নর্মদার উত্তরে বর্তমান বিন্ধ্যপর্বতের মধ্য অঞ্চলকে ঋক্ষ বলিত এবং বিন্ধ্যপর্বতের অংশকে ঔনডিয়ন বলিত। এই স্থানে নর্মদা ও তাপ্তীর উৎপত্তি দেখা যায়।

আর্যাবর্তের দক্ষিণ সীমানা পারিপাত্র নামে পরিচিত। ইহা কুমারীখণ্ডের সর্বশেষ সীমানা। বর্তমান বিন্ধ্যপর্বতমালার অংশ এবং আরাবল্লী পর্বত পারিপাত্র হইতে অভিন্ন। পারিপাত্র বা পারিয়াত্রের সহিত আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র পর্বতমালার সম্বন্ধ আছে।

কৈলাস পর্বত ভূতেশগিরি নামে বিদিত। ইহা নন্দা নদী কর্তৃক বেষ্টিত। নন্দার অপর একটি নাম গঙ্গা। কুমায়ুন ও গাড়োয়াল পর্বতমালা কৈলাস পর্বতমালার অন্তর্গত। মহাভারতের মতে ইহার অপর নাম হেমকুট। জৈনসাহিত্যে ইহা অষ্টাপদ পর্বত নামে পরিচিত। ইহাতে কয়েকটি উচ্চ শিখর আছে। বৈদ্যুত পর্বত হইতে ইহা অভিন্ন। তিব্বতীয়েরা ইহার নাম দিয়াছে কাংগ্রীন পোচে। মানস সরোবর হইতে পঁচিশ মাইল উত্তরে কৈলাস পর্বত অবস্থিত। এই পর্বতোপরি বদরিকাশ্রম বিদ্যমান।

গন্ধমাদন পর্বত রুদ্র হিমালয়ের একটি অংশবিশেষ। রামায়ণ ও মহাভারতের মতে ইহা কৈলাস পর্বতের একটি অংশ। কথিত আছে, ইহা মন্দাকিনীর জলে বিধৌত হয়। বাণভট্ট তাঁহার কাদম্বরী গ্রন্থে ইহাকে হিমালয়ের একটি শিখর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা পুরুরবা উর্বশীসহ এই পর্বতের পাদমূলে দশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ভাগবতপুরাণের মতে এই পর্বতে ব্রহ্মা আগমন করেন। নন্দমূল নামে এই পর্বতের একটি গুহা ছিল। রাজা বেসসন্তর স্ত্রীপুত্রসহ এইখানে বাস করিতেন। বুদ্ধদেব এখানে আসেন। এই পর্বত হইতে অশোকের বৃক্ষটি আনিয়া ঠিক যেখানে বুদ্ধদেব ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন, সেখানে রোপণ করা হয়। তিব্বতের পূর্বদিকে হিমালয়ের মধ্যে শ্বেতপর্বত অবস্থিত। আল-বীরুণীর মতে মেরু এবং নিষধ বা নিষদ হিমালয় পর্বতমালার সহিত যুক্ত ছিল। এই সকল পর্বতমালাকে পুরাণে বর্ষপর্বত বলা হইয়াছে। নিষধ পর্বতের নিকটে বিষ্ণুপদ নামে একটি পুষ্করিণী ছিল। এখান হইতে সরস্বতী নদী উত্থিত হইয়াছে। কৈলাস পর্বতে মন্দ নামে পুষ্করিণী ছিল। ইহা হইতে মন্দাকিনী নদীর উৎপত্তি।

নদী

আল-বীরুণী বলেন, ভারতের নদীসকল উত্তরের শীতল পর্বত হইতে কিংবা পূর্বদিকের পর্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উভয়ই একই পর্বতমালাকে সৃষ্টি করে। আল-বীরুণী ভারতের কয়েকটি নদীর তালিকা দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহাদের আলোচনা করা হইয়াছে।

সিন্ধু নদীর বিভিন্ন শাখাগুলি সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া নিম্নভাগে প্রবাহিত। আল-বীরুণী বলেন, চিনাব বা চন্দ্রভাগার সঙ্গমের উপরিভাগ (বরিদীস) সিন্ধু নামে পরিচিত ছিল। অরোর পর্যন্ত নিম্নভাগে ইহা পঞ্চনাদ নামে বিদিত। অরোর হইতে যেখানে ইহা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে তাহাকে মিরান বলিত। দেরায়ুসের বেহিস্তুন শিলালিপিতে হিন্দু নামে ইহার উল্লেখ আছে। জোরাষ্ট্রিয়ানের ভেনদিদাদে ইহা হেন্দু নামে পরিজ্ঞাত। ইন্দাস্ উত্তর-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নদী। ইহা হইতে ইন্দাস শ্রেণীর নামকরণ করা হইয়াছে। চীনদিগের নিকট ইহা সিণ্টু নামে পরিচিত। ইন্দাস নদী আটক অতিক্রম করিয়া প্রায় দক্ষিণ সুলেমান পর্বতমালার দিকে প্রবাহিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় সৈন্ধবের উল্লেখ আছে। সিন্ধু বা ইন্দাস এবং সৈন্ধব একই নদী। পাণিনি এবং পতঞ্জলির নিকট এই নদীটি জ্ঞাত। অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র এই নদীতীরে যবনদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। সিন্ধুর আর দুইটি নাম ছিল সন্তেদ এবং সঙ্গম। প্লিনির মতে ইন্দাস এবং আরও উনিশটি নদী লইয়া সিন্ধুপুঞ্জ গঠিত হইয়াছে। হাইড্রোয়াটিস, একেসিনিস, হাইপেসিস, হাইদাসপিস, কোফেন, প'রনোস, সপারনোস এবং সাওনাস্—এইগুলি সিন্ধুর নদীর শাখা।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী উত্তর-ভারতের দুইটি ঐতিহাসিক নদী। ইহারা স্বতন্ত্র ভাবে প্রবাহিত। মনুর মতে এই দুইটি পবিত্র নদীর মধ্যে ব্রহ্মাবর্তদেশ বিদ্যমান। সরস্বতী একটি হিমালয়-নদী বলিয়া বর্ণিত আছে। সিমলা এবং শিরমুর দেশের মধ্য দিয়া ইহা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। যে স্থানে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হইয়াছে, মনুর মতে সেই স্থানটি বিনসন নামে পরিচিত। পদ্মপুরাণে গঙ্গোদ্ভেদ তীর্থের উল্লেখ আছে। এইখানে সরস্বতী নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই পবিত্র নদীর তীরে বহু যাগযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল। এই নদী শতদ্রু এবং যমুনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বৈদিক আর্যেরা এই নদীটিকে বিশাল নদী বলিয়া জানিতেন। নদীটি হিমালয় হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহা শিরমুর পর্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়া আম্বালার অন্তর্গত আদবদ্রীর সমতল ভূমিতে মিশিয়াছে। এই নদীর তীরে অম্বিকা বা অম্বিকাবন নামে একটি পবিত্র অরণ্য ছিল। দৃষদ্বতী নদী এবং বর্তমান চিত্রাং অভিন্ন। কেহ কেহ বলেন যে, ঘগর নদী এবং দৃষদ্বতী একই। দৃষদ্বতী এবং কৌশিকীর সঙ্গমস্থান অতীব পবিত্র ছিল। বামনপুরাণের মতে কৌশিকী দৃষদ্বতীর একটি শাখা। গোমতী নদী ঋগ্বেদে উল্লিখিত গোমতী নদী হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ গোমতী বর্তমান গোমল নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে, ইহাই বর্তমান গুমতী। গুমতী নদী

লক্ষৌয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহা সাজাহানপুর জেলা হইতে উত্থিত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

ধুতপাপা নদী এবং গুমতীতীরস্থ ধোপাপ অভিন্ন।

দেবিকা নদী হিমালয় হইতে উত্থিত হইয়াছে। পারজিটারের মতে দেবিকা নদী এবং রাবী নদীর শাখা দিগ নদী একই। অগ্নিপুরাণ মতে দেবিকা নদী সৌবির দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং সেওয়ালিক পর্বতমালার অন্তর্গত মৈনাক পর্বত হইতে উত্থিত। সরযূ নদীর দক্ষিণ ভাগে প্রবাহিত উত্তরাপথের দেবা বা দেবিকা নদী হইতে এই নদী অভিন্ন। কালিকাপুরাণের মতে দেবিকা নদী গোমতী এবং সরযুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ভাগবতপুরাণ হইতে জানা যায় যে, গণ্ডকী নদীর অপর নাম চক্রনদী। ইহা গঙ্গার একটি বৃহৎ শাখা। ইহা দক্ষিণ তিব্বতের পর্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে। নেপালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই নদী বামদিকে চারিটি এবং দক্ষিণে দুইটি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উত্তর শাখার নাম বর্তমান গণ্ডক এবং ইহার নিম্ন শাখার নাম রাপ্তী। সারা জেলার অন্তর্গত শোনপুর এবং মজাফারপুর জেলার অন্তর্গত হাজিপুরের মধ্য দিয়া ইহার প্রধান স্রোত গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

কুহু বা কুভা নদীর উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। সিন্ধু নদীর পশ্চিম শাখার মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাই বর্তমান কাবুল নদী। আরিয়ানের কোফেস এবং প্লিনির কোফেন—পুরাণের কুহু এবং কুভা অভিন্ন। টলেমির মতে ইহার নাম কোয়া। সুলেমান পর্বতমালার মধ্য দিয়া এই নদী একটি উপত্যকাকে বিভক্ত করিয়াছে। এটক বা হাটক-এর যৎকিঞ্চিৎ উপরে প্রবাহিত হইয়া ইহা সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। প্রান্তে ইহা স্বাৎ (আরিয়ানের সোয়াসটস্, সংস্কৃত সুবাস্তু) এবং গৌরি (আরিয়ানের গরোইয়া) নামে দুইটি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে।

মুলতানের পূর্বদিকে বিয়া নদী প্রবাহিত। আল-বীরূণীর মতে বিয়স্ত বা জৈলাম বা ঝেলাম এবং চন্দ্রাহ নদীর সহিত ইহা পরে যুক্ত হইয়াছে।

কানিংহামের মতে পারা বা পরা নদী পার্বতী নামে পরিচিত। ইহা ভূপাল হইতে উত্থিত হইয়া চম্বল নদীতে পতিত হইয়াছে। বিদিশা নদীর সহিত বিদিশা দেশের সম্বন্ধ আছে। বিদিশা দেশ মধ্যভারতের বর্তমান ভিলসা নামে পরিচিত।

কালিদাসের মেঘদূতে শিপ্রা নদীকে একটি ঐতিহাসিক নদী বলা হইয়াছে। ইহার তীরে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর অবস্থিত। গোয়ালিয়র রাজ্যের ইহা একটি নদী। সিতামনের যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে ইহা চম্বল নদীতে পতিত হইয়াছে।

শতদ্রু নদী সাটলেজ নামেও পরিচিত। আল-বীরূণীর মতে ইহার নাম সাটলাদর; ইহা গঙ্গার একটি শাখা। ঋগ্বেদের মতে ইহা পঞ্জাবের পূর্বদিকের নদী। আরিয়ানের সময়ে এই নদী কচ্ছ উপসাগরে স্বতন্ত্র ভাবে পতিত হইয়াছে। টলেমি এই নদীর নাম দিয়াছেন যারাদ্রস এবং প্লিনির মতে ইহা হেসিদ্রুস নামে খ্যাত। মানস-সরোবরের পশ্চিম হ্রদের পশ্চিম প্রান্ত হইতে এই নদীর উৎপত্তি। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে প্রাচীনকালে ইহা সিন্ধু নদীতে স্বতন্ত্র ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। শতদ্রু ও বিপাশার যুক্তস্রোত ঘগ্গর নামে পরিচিত।

নিশ্চিরা নদী নিবীরা, নিঃস্রতা, নিবারা ও নিচিত্রা নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ কৌশিকী নদীর সহিত ইহা যুক্ত ছিল। কেহ কেহ বলেন, এই নদী এবং লীলাযান অভিন্ন। লীলাযান নদী গয়ার নিকট মোহনার সহিত মিলিত হইয়াছে।

চর্মন্বতী বা বর্তমান চম্বল ইন্দোরের উত্তর-পশ্চিম দিকে আরাবল্লী পর্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহা পূর্ব রাজপুতানার মধ্য দিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে। ইহা যমুনার একটি শাখা।

আল-বীরূণী চন্দ্রভাগার নাম দিয়াছেন চন্দ্রাহ। ইহা হিমালয় পর্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহা বর্তমানে চিনাব নামে পরিচিত। জম্মু অতিক্রম করিয়া ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। ঋগ্বেদে উল্লিখিত অসিক্নি, আরিয়ানের একেসিনিস এবং টলেমির সন্দবাগা বা সন্দবাল একই নদী।

বায়ুপুরাণের মতে পর্ণাশা বর্ণাশা নামে পরিচিত। ইহাই বর্তমান বনাশ। ইহা পশ্চিম-ভারতের নদী।

জৈলাম বা ঝিলাম বিতস্তা বা বিতংসা নামে পরিচিত। গ্রীকদিগের বিদাস্পিস বা হাইদাস্পিস্ এবং এই নদী অভিন্ন। ঋগ্বেদের সময়ে আর্যগণের নিকট এই নদী বিতংসা নামে বিদিত ছিল। বৌদ্ধেরাও এই নামে এই নদীকে জানিত। আল-বীরূণী বলেন, এই নদী হারামকট পর্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে।

ইরাবতী বর্তমানে রাবী নামে পরিচিত। গ্রীকদিগের নিকট এই নদী হাইড্রোয়াটিস বা আদ্রিস বা রোয়াডিস নামে পরিজ্ঞাত। কালিকাপুরাণের মতে ই নদীর উৎপত্তিস্থান ইরা হ্রদ। বাংগাহল পর্বত হইতে উত্থিত হইয়া পীরপঞ্জলের দক্ষিণ ঢালু ভূমি এবং ধৌলাধরের উত্তর ঢালু ভূমি বিধৌত করে। কাশ্মীরের অন্তর্গত চাম্বার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইহা সর্বপ্রথমে পরিলক্ষিত হয়। তথা হইতে প্রবাহিত হইয়া

পাহোর অতিক্রম করিয়া এই নদী চিনাবের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীকে পতঞ্জলি জানিতেন।

রংপুর জেলার অন্তর্গত ডোমারের উর্ধ্ব দিকে করতোয়া নদীর উৎপত্তিস্থান। পাবনা জেলায় প্রবেশ করিয়া এই নদী দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে। করতোয়া এবং আত্রাই (আত্রেয়ী) সঙ্গমটি গঙ্গার সহিত যুক্ত হইয়াছে। করতোয়া নদী যমুনার একটি প্রধান শাখা। বাংলা এবং কামরূপ রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে এই নদী এক সময়ে সীমানা নির্দেশ করিয়াছিল।

কৌশিকী নদী বর্তমানে কুশী নামে পরিচিত। বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া ইহা প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। রামায়ণের মতে এই নদী হিমালয় হইতে উত্থিত; ইহা একটি বৃহৎ নদী। পারজিটার সাহেব বলেন, এই নদীর গতি সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা আরিয়ানের কস-সোয়ানস নদী বলিয়া বিদিত। ইহার স্রোত দ্রুত এবং তল্লদেশ অস্বাভাবিক ও বিপজ্জনক।

হিমালয় হইতে সরয়ূ বা সরভূ নদী উত্থিত। এই নদীর তীরে রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সরয়ূ এবং গঙ্গার সঙ্গমটি রাম ও লক্ষ্মণ দেখিয়াছিলেন। ঘাগরা বা গগরা নামে ইহা গঙ্গার একটি শাখা ছিল। ইহার তীরে প্রাচীন অযোধ্যা নগর অবস্থিত। ইহাই টলেমির সারাবস। বিহারের ছাপরা জেলায় ইহা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। বারৈক জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে উত্তর-পূর্ব হইতে প্রবাহিত একটি শাখার সহিত এই নদী মিলিত হইয়াছে। রামায়ণের মতে অযোধ্যা হইতে অর্ধ যোজন দূরে এই নদী অবস্থিত।

পারজিটার সাহেবের মতে বাহুদা নদী বর্তমানে রামগঙ্গা নামে বিদিত। কেহ কেহ বলেন, বাহুদা এবং ধবলা অভিন্ন। বর্তমানে ধবলা ধুমেলা বা বুরহা রাপ্তী নামে বিদিত। বৌদ্ধ-সাহিত্যের মতে বাহুকা ও বাহুদা একই নদী।

বিপাসা নদী বিয়াস নামে পরিচিত। বিপাসিস্ বা হাইপাসিস্ বা হাইফাসিস এবং বিয়াস অভিন্ন। ইহা সাটলেজ নদীর একটি শাখা। সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে ইহা একটি স্বতন্ত্র নদী ছিল। বশিষ্ঠ মুনি পুত্রগণের মৃত্যুতে ভগ্নহৃদয় হইয়া এইখানে আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করেন।

লৌহিত বা লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র সদিয়া হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। আসামের ইহা একটি প্রধান নদী। মানসসরোবরের পূর্ব-অঞ্চলে ইহার উৎপত্তি।

গঙ্গার অপর নাম অলকনন্দা, দ্যুধুনি বা দ্যুনদী। এই নদী ভাগীরথী এবং জাহ্নবী নামে পরিচিত। লুডউইগ্ সাহেবের মতে অথর্ববেদে উল্লিখিত বরণাবতী এবং গঙ্গা অভিন্ন। গঙ্গাকে ত্রিপথগামিনী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গঙ্গা এবং সিন্ধু নদীর সঙ্গম পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। বৌদ্ধসাহিত্যের মতে অনোতত্ত হ্রদের দক্ষিণ দিক হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত গঙ্গোত্রী হইতে ভাগীরথীগঙ্গা নির্গত হইয়াছে। হরিদ্বার হইতে বুলন্দ শহর পর্যন্ত গঙ্গা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। হরিদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গা যমুনার সহিত অনুরূপ ভাবে প্রবাহিত। এলাহাবাদ হইতে রাজমহল পর্যন্ত এই নদী পূর্ব দিকে প্রবাহিত। রাজমহলের নিম্নে বাংলা দেশে এই নদী প্রবেশ করে। গঙ্গা ও যমুনার যুক্ত স্রোত গঙ্গা-সাগরের নিকটে মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। সরস্বতী ও গঙ্গার মোহনার মধ্যে নর্মদা নদীর মোহনা বিদ্যমান।

যমুনা কলিন্দগিরি হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কালিন্দকন্যা বলা হয়। যমুনার তীরে ভরতেরা যুদ্ধে জয় লাভ করে। এই নদীর অপর একটি নাম কালিন্দী। গঙ্গার প্রথম এবং বৃহৎ পশ্চিম শাখা যমুনা নামে বিদিত। যমুনা নদী মথুরা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। দেরাদুন জেলার পশ্চিম দিকে এই নদী দুইটি শাখার সহিত মিলিত হয়। আগ্রা এবং এলা-হাবাদের মধ্যে যমুনা বাম দিকে চারিটি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে। চর্মণবতী (চাম্বাল), কালিসিন্ধ, বেত্রবতী (বেটোয়া), কেন এবং পয়স্বী (পৈসুনী) যমুনার শাখা বলিয়া বিদিত। আল-বীরুণী বলেন, যমুনা (যৌন) কনোজের নিম্নে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। যমুনার তীরে বহু তীর্থস্থান আছে। চীনদের নিকট ইয়েন মোক-ন নামে এই নদী জ্ঞাত। শূরসেন এবং কোশলের মধ্যে যমুনা নদী সীমানা নির্দেশ করিত। কার্সোলি হইতে আট মাইল দূরে যমুনোত্রী যমুনার উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। গ্রীকরা যমুনাকে ইরণ্যবোয়াস (হিরণ্যবাহ বা হিরণ্যবাহু) বলিত। বালুবাহিনী নামে যমুনার একটি শাখার উল্লেখ স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়। গঙ্গা এবং বেলামের (জৈলাম) পশ্চাদ্‌ভাগে মহাচীন অবস্থিত।

ঘোরবন্দ নদী কাবুল (কায়বীশ) রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত পর্বতসমূহ হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি শাখা আছে:

(১) ঘুজক পার্বত্য পথের নদী।

(২) পন্জির গিরিদ্বারের নদী।

(৩) সর্বৎ এবং সাওয়া নদী ক্রেতদুর্গে ঘোরবন্দ নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৪) নুর এবং কীরা নদীদ্বয়।

পূর্শাবির বা পেশোয়ার শহরের সম্মুখে সুবৃহৎ ঘোরবন্দ নদী শাখা দ্বারা যুক্ত হইয়া প্রবাহিত। আল্‌কান্দাহার (গন্ধার) রাজ্যের নিম্নে বীতুর দুর্গের নিকট ঘোরবন্দ নদী সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। সীত নদী হিমালয় হইতে উথিত হইয়া, কতকগুলি দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। চক্ষু নদী চীন, বর্বর এবং পহ্লব প্রভৃতি দেশগুলিকে জল সরবরাহ করে।*

---

* এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য :—

ঋক্‌বেদ, অথর্ববেদ, শতপথ-ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়সংহিতা, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, লাট্যায়নশ্রৌত সূত্র, আশ্বলায়নশ্রৌত সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণু পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ু পুরাণ, কূর্মপুরাণ, কালিকা পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মালবিকাগ্নিমিত্র, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা, কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী, অমরকোষ, অভিধান রত্নমালা, S, Konow-করপূর মঞ্জরী, বাণের কাদম্বরী, দিব্যাবদান, অবদান কল্পলতা।

S. K. Aiyangar, *Indian History and Culture*, I, 1941; E. C. Sachau, *Al-Biruni's India*; Pargiter, *Markandeyapurana*, Tr.; Cunningham, *Ancient Geography of India*, 1924, Ed.; *Aien-i-Akbari*; N. L. Dey, *Geographical Dictionary;* Hultzsch, *South Indian Inscriptions;* S. R. Sende, *How, Whence and When Maharashtra Came into Being* (*Siddhabharati*, Pt. II); *J.B.B.R.A.S.*, Vol. I, Pt. II; Schoff, *The Periplus of the Erythraean Sea; J. A. S. B.* Extra No. 2, 1899; *Indian Antiquary*, 1897; Beal, *Buddhist Records of the Western World*; Legge, *FA-Hien;* Watters, *On Yuan Chwang*; V. A. Smith, *Early History of India*, 4th Ed. and *Asoka*; Mc Crindle, *Ancient India as Described by Ptolemy; Annual Report of the Archaeological Survey of India*, Vol. XX; Rice, *Mysore and Coorg from Inscriptions;* Fleet, *Dynasties of the Kanarese Districts*; *Cambridge History of India*, Vol. I; *Vedic Index*, Vol. I; *Imperial Gazetteers of India*, XIV; Wilson, *Vishnu Purana;* Rhys David, *Buddhist India*; *Archaeological Survey Reports*, VIII, XVII; Maxmuller, *Rigveda Samhita; Calcutta Geographical Review*, December, 1943; McCrindle, *Ancient India;* Law, *Historical Geography of Ancient India; Geography of Early Buddhism; Geographical Essays; Tribes in Ancient India; Indological Studies*, Pt. I; *Geographical Aspect of Kalidasa's Works*, *Al-Biruni's Knowledge of Indian Geography* (*Indo-Iranica*, Vol. VII, No. 4, 1955).

গাভীর ব্যথা

শ্রীকালিদাস রায়

গাভীর ব্যথা কবির প্রাণে গভীর ব্যথা হয়ে
জাগছে রয়ে রয়ে
দুই ধারে ক্ষেত নধর চিকণ ধানের শীষে ভরে,
রাখালেরা যায় নিয়ে তায় মুখটি বেঁধে খড়ে।
দূর ডহরে গেলে তাহার মুখের বাঁধন ঘুচে,
বাছুরটি রয় গোয়ালঘরে ঘাস না মুখে রুচে।
হাম্বা রবে ডাকে,
রাখাল কি আর দেখে ভাবি খুঁজছে গাভী কাকে?
ফসলে মুখ দিলে গাভী পাচনবাড়ি খায়।
ফসল এবং ঘাসের তফাৎ সে কি বোঝে হায়?
ফিরলে গোয়ালঘরে,
বাছুরটি তার ছুটে আসে, রাখাল চেপে ধরে।

দিনের শেষে তাহার বাছার যে দুধ পাওয়ার কথা,
নেয় দুয়ে তা মালিক এসে, হায়রে বৎসলতা!
ভরছে কেঁড়ে, দুগ্ধ তাহার ঝরছে অবিরল,
দোহনধারার সঙ্গে গাভীর চক্ষে ঝরে জল।
দুগ্ধ দিতে না পেরে সে বাছুরটিরে তার,
স্নেহ বিলায় দেহটি তার চেটে বারংবার।
হায়রে বাছুর হায়!
দোহন সেত পায়না মায়ের লেহন শুধু পায়।
অসুর মানুষ এমনি করে পশুর মায়ে সেবি'
বানায় তারে দেবী।
দেবীর ব্যথাই এই কবিরেও মানুষ করে তোলে,
সেও যে অসুর পশুর অধম ক্ষণেক তরে ভোলে।

অকালবর্ষণ

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

স্বপ্ন দেখছিল গোকুল বিশ্বাস। আঃ, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বড় আশার মেঘ এসে জড়ো হয়েছে সারা আকাশ জুড়ে। চেয়ে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল গোকুলের। দিগদিগন্ত ব্যেপে আসন্ন বর্ষণের ঘন সমারোহ। মেঘের গায়ে মাথায় বিসর্পিত রেখা এঁকে চিড় ধরল একটা চকিতের জন্য। চকিত বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে গুরু-গর্জ্জনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল—মাঠে মাঠে, গ্রামে গ্রামে—দিকে দিগন্তরে। মেঘের ডাক 'মাভৈঃ' ধ্বনির মত শোনাল যেন। বৃষ্টি নামল দেখতে দেখতে। ফোঁটায় ফোঁটায়, ধারায় ধারায় বৃষ্টি নামছে। গা, মাথা—গোকুলের সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে তরল আনন্দ ঝরে পড়ছে যেন। তৃষাদীর্ণ মাঠের সে কি তৃপ্তিস্নান! বৃষ্টি নয়—আশীর্ব্বাদের অজস্র ধারা নামছে। বিবর্ণ বিশীর্ণ ধান গাছ-গুলির গায়ে-মাথায় সঞ্জীবনী-সুধা ঝরে পড়ছে যেন।

—এই শুনছ—বলি, ওগো শুনছ—ডাকের সঙ্গে অল্প একটু নাড়া পেতেই ঘুম ভাঙল গোকুলের।

—ইস্, ঘেমে নেয়ে উঠেছ যে একেবারে। দেখ দিকি, মাদুর বালিশ সব ভিজে সপ সপ করছে কি রকম। পাখাটা গেল কোথায় গো? সরে শোও দেখি একটু।

আঁচল দিয়ে পিঠ আর গলার কাছটা সযত্নে মুছিয়ে দিয়ে জোরে জোরে হাতপাখা নাড়তে লাগল বউ। ভাদ্রশেষের রাত। ভোর হয়ে আসছে সবে। গাছপালার পাতা নড়ছে না কোথাও একটিও। শ্বাসপ্রশ্বাস থেমে গেছে যেন বিশ্বপ্রকৃতির। অসহ্য গুমোট গরমের চাপে দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন ঘরের মধ্যে। পাশ ফিরে শোয় গোকুল। জল কোথায়! স্বপ্ন—নিতান্ত স্বপ্নই দেখছিল ও। ঘামে ভিজে প্যাচ প্যাচ করছে ওর সর্ব্বাঙ্গ। দেহ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায়, ধারায় ধারায় ঝরে পড়ছিল—বৃষ্টি নয়—ঘাম।

গোটা ভাদ্র মাসটায় আকাশ বর্ষাল না এবার একটি দিনের জন্যেও। অভাবনীয় ব্যাপার বৈ কি! ক্ষেতে ক্ষেতে মাটির বুকে অসংখ্য ফাটল ধরতে সুরু হয়েছে এবার। শীর্ণ ধানচারাগুলি আতঙ্কে শীর্ণতর হয়ে উঠছে দিন দিন। ধরিত্রীর বক্ষসঞ্চিত শেষ স্নেহবিন্দুটিও বাষ্প হয়ে উবে গেছে যেন। মমতাহীন হয়ে উঠছে ক্রমশঃ মাটির মর্ম্মস্থল। পরমায়ু আগলে রাখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা সুরু হয়েছে শিশু-ধানগাছগুলির মধ্যে। লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোন রকমে গিয়ে গোকুল ক্ষেতটা দেখে এসেছে কাল। নাবী আবাদ এবারের। তা হোক। এই ত সে-দিনও প্রাণ-প্রাচুর্য্যে টলমল করছিল ক্রমবর্দ্ধমান উদ্ভিদ-শিশুগুলি। সত্যি, কচি কচি ধানগাছগুলির দিকে তাকানো যায় না যেন আর। সারা দুপুর ধরে ভাদ্রের তপ্ত রৌদ্র লক্‌লকে জিভ বার করে মাটির স্নেহরস লেহন করে এখন। নিঃশেষিত হয়ে আসছে সে স্নেহরস। নির্ম্মম ভাবে লেহন করতে সুরু করেছে এবার—কচি কচি প্রাণের শেষ অস্তিত্বটুকু। অগণিত উদ্ভিদ-শিশুর অসহায় অন্তিম হাহাকার শুনে এসেছে যেন ও কাল। বৃষ্টি চাই। চাই অজস্র বর্ষণের প্রাণ-স্পর্শ। আজই—এখনই।

তপ্ত নিশ্বাস ফেলে বললে গোকুল, উঃ, বৃষ্টির নামগন্ধ নেই—ধানগাছগুলি টেকবে না বোধ হয় আর। ক্ষেত সব জ্বলতে সুরু হয়েছে—দেখে এলাম কাল। এবারও আকাল হবে বউ—পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কথা শুনে চমকে উঠল বউ। বউ মহামায়া নানা সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখে এখন। কল্পনায় ওর ইন্দ্রধনুর রঙ ধরে। গত মাসে পঞ্চামৃত মুখে দিয়েছে ও। শুধু অপ্রত্যাশিত নয়—নিতান্ত অভাবনীয় ব্যাপার বৈ কি! না হলে—এই সাইত্রিশ বছর বয়সে··· ভাবতেও কেমন যেন লজ্জা লাগে ওর। খোকা, খুকী যা হোক একটা পেটে এসেছে ওর—এই প্রথম। বউ তাই অশুভ কিছু ভাবতে পারে না এখন। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ও এখন অন্ধকারের মধ্যেও আলোর রেখা খোঁজে শুধু। আশ্বাস দিয়ে বউ বললে, না গো না। দু'এক দিনের ভেতরই জল নাববে ঠিক দেখ। ভেবো না অত। ঠাকুর মুখ তুলে চাইবেনই ঠিক। কুড়ুলে কোদালে মেঘ উঠেছিল সেদিন। চাঁদেরও সভা হচ্ছে ক'দিন ধরে। গিন্নীপুকুরের ধারে বেঙ ডেকেছে কাল সারারাত। আজই বৃষ্টি হবে ঠিক—দেখ তুমি।

কোন কথা বললে না আর গোকুল। আজ কাল করে ভাদ্র-মাসের ক'টা দিনই তো কেটে গেল। না—কোন আশাই আর করে না গোকুল। ক্ষেতের যা অবস্থা ও দেখে এসেছে কাল! আশায় আশায় বুক বাঁধুক মেয়েছেলে। স্বপ্ন দেখুক সন্তানসম্ভবা নারী। পুরুষ সে। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে যুঝতে হবে তাকে একা। না—ভরসা করে না সে আর কোন কিছুরই।

সত্যি। বউ মহামায়া দেহে-মনে পাল্টে যাচ্ছে যেন দিন-দিন। অবকাশের মুহূর্ত্তগুলি ওকে এখন স্বপ্ন দেখায় শুধু। স্বর্ণ-সম্ভাবনায় ভরা কত কি স্বপ্ন সব। নীড়ের মায়াও মনকে ওর আচ্ছন্ন করে এখন ক্ষণে ক্ষণে। ঘর, দোর, উঠান—সবকিছুই নতুন করে আবার নিবিড় সম্পর্ক পাতাতে চাইছে যেন। আধ-ভাঙা জীর্ণ ঘরখানা নতুন প্রাণের স্পর্শ চাইছে আবার। সংস্কার চাইছে জীর্ণ অঙ্গের। সত্যি—আড়ার বাঁশক'খানা না পাল্টালে

চলে না আর মোটেই। ওদের একটায় দোলনা ঝুলবে খোকার! হাত পা ছুড়ে—হাসতে হাসতে দোল খাবে যে তার খোকনমণি জোরে বর্ষালে ঘরের মেঝে আর দাওয়ায় স্রোত বয় যেন। 'থল' থাকে না আর কোথাও। যা হয় একটা গতি করতেই হবে চালখানার। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে বেড়াবে কোথায় শুনি সোনামণি ওর। ঘরের গা ঘেঁষেই মুখুজ্যেদের ডোবাটা। এবার আকাশে জল নেই তাই। না হলে এমন দিনে কানায় কানায় ভরে যায় ওটা। উঠানে ওর জল ওঠে। ওদিকটায় বাঁশ-বাখারি দিয়ে বেড়া দেওয়া দরকার ভাল করে। দুষ্টুটা কি কম ছটফটে হবে! উঠোন চুরমুশ করে বেড়াবে নিশ্চয়ই সর্বক্ষণ। চোখ এড়িয়ে ডোবার দিকটায় যেতে কতক্ষণ! গেল বছরে দক্ষিণপাড়ার কামার বউয়ের দামাল ছেলেটা! আহা, এমনি করে চোখ এড়িয়ে গিয়েই ত তলিয়ে গিয়েছিল। না—খারাপ কোন চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিতে ভারি ভয় লাগে ওর আজকাল। ওধারে শাশুড়ীর ঘরখানা পড়ে গেছে কবে। ওই ঢিপির ওপরেই ছোটখাটো একচালা ঘর একখানা তুলতেই হবে যেমন করে হোক। ছেলে কি আর ওর খোকাটি থাকবে চিরকাল! বড়সড় হলে সকাল সকাল বিয়ে দেবে ও ছেলের। এ ঘরদোর ছেড়ে দেবে ছেলে-বউকে। আহা—নূতন সাধ-আহ্লাদ সুরু হবে সবে তখন ওদের। নিজেদের জন্যে মাথা গুঁজবার মত যেমন তেমন ঠাঁই হলেই হ'ল একটু। গোয়ালের চালাটারও ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি। বৃষ্টি নামলে কালিন্দীটা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজে। আহা বেচারী! মুখপুড়ী আবার ওরই সঙ্গে এক-মাস আড়াআড়ি বিয়োবে কিনা। ভালই হবে। হোক আকাশ-কুসুম! শুয়ে শুয়ে মহামায়া আকাশকুসুমেরই মালা গাঁথে এখন।

বৈকালে সেদিন উঠানে বসে টুকুরো টুকুরো করে কঞ্চি কাটছে গোকুল। জ্বালানির ব্যবস্থা করছে। উঠানের কোণ থেকে পড়ন্ত রোদটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। ঘাম মুছে আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে দৃষ্টি মেলে দিলে গোকুল দূর আকাশের পানে। মেঘ একখানা মাথা উচু করে এগিয়ে আসছে বটে। ছুলেপাড়ার ওদিকটায় বাঁশবনের মাথা পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে যেন একটু। কিন্তু নামেই মেঘ ও। কাজলের মত ঘন কালো ছায়া নেমেছে কৈ? ও-মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ জুড়োয় না একটুও, তৃপ্তি হয় না হৃদয়-মনের। বিশেষ করে এমন দিনে। কেমন যেন পাংশুটে ধরনের মমতাহীন মেঘ। বুক-ভরা ওর করুণা-সম্পদ কৈ? আধ ঘণ্টার মধ্যেই দমকা হাওয়া এল খানিকটা। শীতল কোমল স্পর্শ লাগল একটু দেহে মনে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। ফিস ফিস করে মিনিট কয়েক বর্ষণ করেই সে মেঘ উধাও হয়ে গেল দূরে—দিক্-প্রান্তের আকাশে। আরও তৃষাতপ্ত হয়ে উঠল যেন মাটির মর্ম্মস্থল। আশার অঙ্কুরও সব মুষড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ঘর আর দাওয়ার মেঝে ঝাট দিয়ে খড়কুটোগুলি জড়ো করছিল মহামায়া। হাওয়া একটু জোরে বইলেই চালের পচা খড়কুটো সব ঝরে ঝরে পড়ে মেঝের সর্ব্বত্র। বিরক্ত হয় না মহামায়া একজে। কোন অনুযোগও নেই ওর মুখে। ভাবে—এ তার অদৃষ্ট। না হলে—জোয়ান মানুষটার শরীর অমন করে ভাঙবেই বা কেন হঠাৎ। লোহার মত মজবুত গতর। দিব্যি খাটছিল খুটছিল। কোথা থেকে পোড়া উকুস্তম্ভ হয়েই ত কাল করলে। উঃ, ছ'মাস ধরে একনাগাড়ে কি বিপত্তিই গেছে সে বছর। হাসপাতাল-ঘর, যমে-মানুষে টানাটানি। সেই সঙ্গে পয়সার কষ্ট। পায়ে শোষ ধরে গিয়ে শেষটায় সে কি কাণ্ড! পুরা পাটাই বাদ দিতে হ'ত। মা সিদ্ধেশ্বরী—হাঁ মা সিদ্ধেশ্বরীই বাঁচিয়েছেন সে যাত্রায়। সরু হয়ে পা-টা অল্প ছোট হয়ে গেছে—তা হোক। জন্মের মত খোঁড়া হয়ে গেছে বটে—প্রাণটা ত রক্ষা পেয়েছে।

ভাবতে ভাবতে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মহামায়া। স্বামীর দিকে নজর পড়তেই বড় আশা করে বলে ফেলল ফস করে, ছ্যাখ, আড়া ক'খানা পাল্টে যেমন করে হোক ঘরখানাকে ছাইয়ে নিতে হবে কিন্তু। একটু বর্ষালেই মেঝের কি দশা হয় দেখছ ত? অমনি পুরানো বাঁশ-বাখারি দিয়ে ডোবার ধারের ওদিকটায় বেড়া দিয়ে দিও ভাল করে—বুঝলে? রাজ্যের ছাগল-গরু ঢোকে ওদিক দিয়ে।

অপস্রিয়মাণ মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে গোকুলের অন্তরের আকুলতা বেড়েছে তখন অনেকখানি। দৃষ্টি ফেরালে ও। চোখে মুখে বিপুল উৎকণ্ঠা। স্ত্রীর কথাগুলো কানে যেতেই মনমেজাজ বিগড়ে গেল হঠাৎ। খেঁকিয়ে বললে, গা জ্বলে ওঠে তোর কথা শুনলে। সাপের পাঁচ পা দেখিছিস নাকি! মাঠ জ্বলে যাচ্ছে। ঘরে কুটোটি উঠবে না এবার। আমার শরীরেরও এই অবস্থা। রোজ ঘিনঘিনে জ্বর হচ্ছে। পেটে কি দিবি—তাই ভাব এখন বসে বসে। ঘর মেরামতির কথা ভাবিস তখন পরে।

এমন করে আজও আবার খেঁকিয়ে উঠবে যে গোকুল তা ভাবতে পারে নি মহামায়া। মাটির মানুষ বললেই হয় লোকটা। সাত বছর বয়েস থেকে স্বামীর ঘর করছে ও। হাড়মজ্জা—মানুষটার চিনতে আর বাকী নেই কিছু। গায়ে পড়ে ঝগড়া খুনসুটি করেছে ও কত নিজে। বড় হয়ে—যা-নয়-তাই বলেছেও ও কত কি। কিন্তু, কড়া কথা দূরে থাকুক—রা কাড়ে নি একটাও কোন-দিন গোকুল। সেই মানুষ যেন পাল্টে যাচ্ছে দিন দিন। আধ-পেটা খেয়ে, শুকিয়ে শুকিয়ে—ভেবে ভেবে, কেমন যেন হৃদয়হীন হয়ে উঠছে মানুষটা। না হলে, সেদিন রাতে অমন কথা মুখ থেকে বার করলে কি করে—ভাবে তাই মহামায়া!

কি আর এমন অন্যায় কথা বলেছিল ও শুনি। ভাল একটা কাঁসার ঝিনুক—আর মজবুত দেখে বেতের দোলনা একটা—সেই দরকার ত হবেই আর দুদিন বাদে। তাই বলেছিল—কার্ত্তিক মাসে গোপীকান্তপুরে রাসের মেলা বসবে ত। দেখ না—মেলাতলায় খোঁজ করে পাও যদি—ঝিনুক আর দোলনা। দরকারের সময়—হাটে আবার পাওয়া যাবে কিনা—ঠিক আছে কিছু?

কথা শুনে একেবারে জালের কেউটের মত ফোঁস করে উঠেছিল

মানুষটা। শুধু ঝিনুক দোলনা কেন—চূড়ামণি স্যাকরাকে দিয়ে তোর ছেলের পায়ের মল আর কোমরের গোটও গড়িয়ে রাখব এবার।

শুধু রাগের কথা নয়—কথায় যেন বিষ মেশানো। চোখে ওর জল এসে গিয়েছিল সেদিন। সংসারের অবস্থার কথা ও যেন ভাবে না কিছু। সহায়সম্বল বলতে—ঐ ত বিঘেচারেক মাত্র জমি। তাও বাঁধা পড়েছে মুখুয্যে মশায়ের কাছে। গতর খাটালেও সংসার চলে। কিন্তু সেবার শরীরের ঐ রকম হাল হ'ল মানুষটার। তার উপরি-উপরি দুবছর বন্যা হয়ে অজন্মা হয়েছিল। জোতজমি বাঁধা না দিয়ে আর উপায় ছিল নাকি! সুদে আসলে যা দাঁড়িয়েছে এখন—তা শুধতে গেলে জমি ত যাবেই, ভিটেয়ও টান পড়বে। মুখুয্যে মশাই শাসাচ্ছেন রোজ—পোষের আগে টাকা না শুধলে—ভিটেয় ঢোল পেটাবেন তিনি—নিলামে চড়াবেন সব। হাতে পায়ে ধরে কুঞ্জ কয়ালের কাছ থেকে কিছু হাওলাত নিয়ে পেট চলছে এখন কোন রকমে। তাও আসছে মাসের মধ্যে শুধতে না পারলে গাভিন গরুটাকে দিয়ে দিতে হবে কয়াল মশাইকে। একরকম বন্ধকেরই সামিল। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ও সবই। কিন্তু মেয়েছেলে সে। কি করতে পারে শুনি! দিনে রাতে চোখের জল ফেলে ফেলে কত ঠাকুর-দেবতাকে ত ডাকে সে। কত কি মানত করে। মনে মনে বলে—মুখ তুলে চাও ঠাকুর। বৃষ্টি দাও—ধান দাও—মানুষটার শরীরে বল দাও। আরও কত কি প্রার্থনা জানায়। এসব জেনে শুনেও ফস করে বললে কি না সেদিন—পেটের ছেলেটা তোর—অলক্ষুণে অপয়া।

কথার কি ছিরি! মুখে বাধল না একটু কথাটা বলতে। চমকে উঠেছিল মহামায়া কথাটা শুনে। ছলছল চোখে বলেছিল ও—আকাল—অসময় এসব বুঝেই বুঝি শত্তুরটা পেটে এসেছে আমার! ছেলে হলে—ছেলে যেন একা আমারই হবে। কার বংশরক্ষে হবে শুনি? আমার সাতপুরুষ জল পাবে বুঝি?

কিন্তু বর্ষণপ্রতীক্ষাব্যাকুল মানুষটা ভিতরে ভিতরে তপ্ত রুক্ষ হয়ে উঠেছিল অনেকখানি। এক ঝলক অগ্নুদ্গারের মত উত্তর বেরিয়ে এসেছিল সেদিন গোকুলের মুখ দিয়ে—বংশরক্ষে হবে না ছাই হবে। যম আমার ও—খেতে এসেছে আমাকে।

শিউরে উঠেছিল মহামায়া। ঠাকুর, এর চেয়ে মাথায় বাজ পড়ল না কেন? কথায় বলে সন্তান। সাতরাজার ধন মাণিকও তুচ্ছ এর কাছে। পাঁচটা নয়—সাতটা নয়। কতদিনের স্বপ্ন-সাধ ওর। অকালে অপ্রত্যাশিত করুণা নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে। চিরবাঞ্ছিত করুণা এ। এক ফোঁটা অমৃতেরই সামিল।

কথা শুনে ক্ষেপে উঠেছিল যেন মহামায়া। বকেছিল—ছোটলোক কি না—তাই মুখে বলতে তোমার আটকায় না কিছু।

ছোটলোক! হাঁ, ছোটলোকই বটে। স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা—এ-কথা জানার দিন থেকেই গোকুলের মতিগতির অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে যেন। কি এক ধরনের অস্বস্তিকর ভাবনা ভর করেছে ওর দেহে মনে। এ ভাবনা ভবিষ্যতের ভাবনা। দু'টিমাত্র প্রাণীর ছকে বাঁধা সীমায়িত ভবিষ্যৎ নয়। এ ভবিষ্যৎ তার বংশধরের—সেই সঙ্গে বংশধারার। গত সনে ফসল হয় নি ভাল। এ বছরও বর্ষণ নেই এক ফোটা। সামনে আকাল। ভাঙা শরীর ওর। ঋণের বোঝাও বাড়ছে ক্রমশঃ। জমিজমা, ভিটে—সবকিছুই ঘুচবে একে একে। দুর্ব্বিষহ একটা পরিস্থিতি চারদিক থেকে চেপে ধরে নিষ্পিষ্ট করতে চাইছে যেন ওকে। ছোটলোক! হাঁ, মন, মেজাজ, আচরণ—সবকিছুই গোকুলের ছোটলোকের মত হয়ে আসছে যেন। ঠিকই। চোর বদনামও হয়েছে ওর। ছোটলোক না হলে—সামান্য দু' ডাল পুঁইশাক—এ আবার চুরি করতে যায় কেউ। ইদানীং হ্যাংলামিও বেড়েছে যেন বউয়ের। মুখুয্যেদের মাচাভরা পুঁইশাক দেখে দেখে নোলায় জল আসত রোজ মহামায়ার। রাতে সেদিন চুপি চুপি শাক কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছিল গোকুল। মার না খেলেও অপমানের চূড়ান্ত হয়েছে। বউয়ের জন্যেই শুধু চোর বদনামও হয়েছে ওর। ছোটলোক! স্ত্রীর কথাটা কশাঘাতের মতই বেজেছিল সম্ভবতঃ। ক্ষণিকের জন্যে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়েছিল নিশ্চয়ই। না হ'লে—অমন করে সজোরে চড় কষিয়ে দিলে কি করে মানুষটা মহামায়ার গালে! মাথা ঘুরে গিয়ে পড়েছিল মহামায়া মেঝের উপরে। শুধু কি তাই—দাঁতের গোড়া দিয়ে কম রক্তটা বেরিয়েছে সেদিন!

এই স্বামীই কিন্তু ওর অমন ছিল না কোন কালেই। ছেলে-পুলে ভালবাসে লোকটা চিরকালই। পরের ছেলে মেয়ে নিয়ে কোলেপিঠে করে ঘোরা বাতিক ছিল মানুষটার। সত্যি—ছেলে-পুলে হ'ল না বলে কম কাণ্ড করে নি গোকুল। কত ওষুধপালা মাদুলি—এনে দিয়েছে ওকে দূরদূরান্তর থেকে। এই সেদিনও অসুখ হবার আগে—ছেলের জন্যে আবার একটা বিয়ে করবে বলে কত রাগিয়েছে ওকে। তা ছাড়া, ও পঞ্চামৃত মুখে দেয় যেদিন—সেদিনও রাতে—ছেলে হ'লে ঠিক কার মত দেখতে হবে তা নিয়ে কথা উঠতে কত রাগালে ওকে। সেই স্বামী ওর কি যেন হয়ে গেল এই ক'দিনের মধ্যেই। অনাবৃষ্টি। হাঁ, আকাশের কৃপণতাই শুধু দায়ী এর জন্যে। বর্ষণ চায় মানুষটা। অজস্র ধারাবর্ষণ। পর্য্যাপ্ত করুণাবর্ষণ সেই সঙ্গে। বর্ষণের অভাবেই বিবর্ণ বিশীর্ণ ধানগাছগুলোর মতই মানুষটি শুকিয়ে শুকিয়ে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। রং রূপ সব পালটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। নিশ্চিহ্ন হয়ে উবে যাচ্ছে সেই সঙ্গে হৃদয়-মনের সঞ্চিত সম্পদ। বিবেক-চৈতন্যও তাই বিকৃত হয়ে উঠছে লোকটার।

শেষ পৌষের একটি শীতজর্জ্জর সন্ধ্যা। অভাবনীয় কিন্তু এ সন্ধ্যার রূপ। অকালে মেঘে মেঘে ভরে গিয়েছে সারা আকাশ। পুঞ্জমেঘ ঘনতর হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। আসন্ন দুর্য্যোগের আভাস সব দিকে। থম্ থম্ করছে দিগদিগন্ত। ক'মাস ধরে কালাজ্বরে ভুগে-ভুগে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে এসেছে গোকুল। ঘিনঘিনে জ্বর

দেহটাকে অবশ্যম্ভাবী একটা পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে নির্মমভাবে। বেশীদিন ও আর বাঁচবে না হয়ত। সেই ভাল। চিরনিশ্চিতের প্রতীক্ষায় একটি একটি করে দিন গোনে এখন গোকুল। ইতিমধ্যে জমিজমা সব ঘুচেছে জন্মের মত। ভিটেও ছাড়তে হবে দু'এক মাসের মধ্যেই। নিলামে ডেকে নিয়েছেন সবকিছু মুখুয্যেমশায়। এ জায়গাটায় কলমের আমচারা বসাবেন উনি। সখের আমবাগান করবেন একথা বলে বেড়াচ্ছেন সকলকে। সংসারের মায়া-গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছে অনেকটা। অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে ওর মানসপ্রকৃতি। অবসান চায় ও। নিজের অস্তিত্বের অবসান—সেই সঙ্গে নিজের বংশধারারও। নানান ভাবনা ভর করছে গোকুলের মাথায়। অবাঞ্ছিত চিন্তা এসব। হঠাৎ চিন্তায় ওর চিড় ধরল। কানে এল—আহুরীর মার স্নেহার্দ্র কণ্ঠ।—কানা বেটা তোমার কি বল্লেগো—অ বৌমা। এবেলায় আর ব্যথা-ট্যাথা উঠেছিল নাকি? ভরা দশমাস চলছে মহামায়ার। ভোর থেকেই আজ ব্যথা সুরু হয়েছে একটু। ব্যথা বাড়ছে, কমছে, মিশিয়ে যাচ্ছে আবার। কাজ সেরে আহুরীর মা বাড়ী ফিরছে হয়ত। মুখুয্যেবাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে সে। সকালে শুনেছিল হয়ত ব্যথা ওঠার কথা। উঠানে দাঁড়িয়ে খবরটা নিচ্ছে তাই। প্রায়ান্ধকার ঘরের মেঝে থেকে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কণ্ঠ আকুলভাবে চি চি করে করে উঠল একবার। মহামায়ার কণ্ঠ। ক্ষীণ সুরে বললে কোন রকমে দম নিয়ে—আজ রাতেই কিছু হবে হয়ত খুড়ী। জ্বরটাও আজ বেড়েছে তেমনি।

বড় অনুনয়ের সঙ্গে অসহায় কণ্ঠের আর্তিও কানে এল আবার।—পার ত, ভারী রাতে একবার খবর নিও খুড়ী। আমার আর ডাকবার জানাবার কে আছে বল? বাড়ীর মানুষের ত ওই অবস্থা!

জাতে দুলে আহুরীর মা। খালাস টালাস করায় ভাল। নাড়ী কাটে। আশ্বাসভরা আহুরীর মার গলা কানে এল গোকুলের। ছেঁড়া লেপটা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে গোকুল ভাঙা তক্তপোশের উপর। মুখটা বিস্বাদ ঠেকছে আজ বেয়াড়ারকম, গায়ের তাতও আজ বেড়েছে যেন দ্বিগুণ। চিন্তার চিন্তায় স্নায়ুগুলো নিষ্পিষ্ট হয়ে হয়ে অসাড় হয়ে গেছে পুরোপুরি। ভাবনাহীন চেতনাহীন একটা শূন্যতার ভরে উঠছে ক্রমশঃ হৃদয়-মন। আরও কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে—আরও খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গোকুল পাশ ফিরে শুল।

ওদিকে মেঝেয় পড়ে পড়ে—জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে অল্প ব্যথা খেতে খেতে—চিন্তার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ মহামায়া। সারা চিত্ত জুড়ে—সীমাহীন চিন্তাপারাবার। বিক্ষুব্ধ চঞ্চল হয়ে উঠছে অনন্ত চিন্তারাশি। আকুল ভাবে একটা অবলম্বন খুজছে মহামায়া। মাথা তুলতে চাইছে মহামায়া—আলোর আশায়—তীরের আশায়—নীড়ের আশায়। পা রেখে দাঁড়াবার মত ঠাঁই চাই একটা—দু'এক মাসের মধ্যেই। শত্তুর—শত্তুরটা অকালে পেটে এল কেন তার। অকালে কেন এ অপ্রত্যাশিত করুণাবর্ষণ! চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল অনেকখানি। অবলম্বন একটা চাই-ই যে তার। একার জন্যে নয়—আর একটির জন্যে। হাঁ, পেটের ওই শত্তুরটার জন্যেই যত ভাবনা। রক্তের সম্পর্কের কেউ কোথাও বেঁচে নেই যে দুঃখ জানিয়ে উঠবে গিয়ে তাদের আশ্রয়ে। সব ঘুচে গেছে। এক কাকা আছে অবশ্য। আপন কাকা নয়—বাপের খুড়তুতো ভাই। রক্তের সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাক—আপনজন ত! কিন্তু হলে কি হবে। তার চেয়ে পর ভাল। না হলে, বিশ বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে ওর—এর মধ্যে একখানা চিঠি দিয়েও খোঁজখবর নিয়েছে কোনদিন। গুড়ের কারবার তার রায়গঞ্জের হাটে। বড় আড়তদার। লোকমুখে অনেক কথাই শোনে মহামায়া। অমন চশমখোর নাকি দুটি নেই দুনিয়ায়। তিনটি বউকে খেয়েছে। ছেলেপুলে হয় নি কারও। তিন কাল গিয়ে এককালে এসে ঠেকেছে। কিন্তু দানপুণ্যি কি তীর্থধর্ম করা চুলোয় যাক দিনরাত শুধু লাভের কড়ি গোনে আর সুদের হিসেব করে। প্রার্থী ভিখরী এলে—কুকুর-শিয়ালের মত তাড়ায় যেন—এমনি স্বভাব। আজ এই অসময়ে তার কাছে গিয়ে উঠলে আশ্রয় মিলবে নাকি। চোখের জলে ভিজিয়ে চিঠি একখানা লিখিয়েছিল ও সেদিন—সব অবস্থা জানিয়ে। কত আশা করেছিল। কিন্তু উত্তর একটা এল কৈ? মনে অনাবশ্যক অভিমান একটু হয় যেন। অশ্রুধারায় নিঃশেষিত হয়ে ধুয়ে যায় আবার সে অভিমান। পেটের ব্যথাটা যেন কমে আসছে একটু। চিন্তাগুলো ক্রমশঃ ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তন্দ্রা আসছে বোধ হয়। কে জানে—জ্বরে জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে হয়ত স্নায়ুগুলো।

ঘুম আর তন্দ্রা—দুঃস্বপ্ন আর আতঙ্ক—এ সবের ভিতর দিয়ে রাত বেড়েছে কখন। প্রহরের পর প্রহর কেটেছে। প্রতি প্রহরে শিয়াল ডেকেছে। গোকুলের কানে কোন আওয়াজই যায় নি আজ। সম্বিৎ ছিল না আজ আর তার। এমন হয় না বড় একটা। তীব্র নিখাদে ধ্বনি উঠল কয়েকবার। আতঙ্ক-ইঙ্গিতময় ধ্বনি যেন। উঠানের নজনে গাছটায় বসে পেঁচা ডাকল একটা। শেষপ্রহরের ডাক। কিন্তু কি বিশ্রী, বীভৎস ডাক পেঁচাটার! ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের সীমানায় ধক্ করে আর একটা ধ্বনির ধাক্কা লাগল যেন। অব্যক্ত ভাষাহীন একটা আবেদন-ধ্বনি উঠছে থেকে থেকে মেঝের ওদিক থেকে। গোঙানির মত শোনাল যেন। সৃজন-বেদনার দুঃসহ আলোড়ন সুরু হয়েছে। দ্বিধাবিভক্ত হতে চাইছে যেন মহামায়া। ছটফট করছে তাই আকুল ভাবে। ভাষাহীন অব্যক্ত আর্তধ্বনি আবার ওর মর্মে ঘা দিলে। স্নায়ুর মধ্যে হঠাৎ সচলতার প্রেরণা এনে দিল যেন ওই শব্দটা। তক্তপোশ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এল গোকুল। দেশলাইয়ের মধ্যে এখনও কাঠি আছে গোটা দুই। কিন্তু কেরোসিনের ডিবেটা কোথায়? তা ছাড়া তেল কৈ? যুদ্ধের বাজার। কণ্ট্রোল সব, তায় পাড়াগাঁ। সন্ধ্যা আসে—রাত্রি

আসে। আলো জ্বেলে প্রতিটি সন্ধ্যাকে আর অভিনন্দন জানাতে পারে না এ সংসার। বাইরে মেঘে মেঘে চকিত বিদ্যুৎ-স্ফুরণ সুরু হয়েছে মহা আড়ম্বরে। দরজাটা টেনে খুলে ফেললে গোকুল। আকাশে প্রকাণ্ড ফাটল ধরিয়ে বাজের আওয়াজ ফেটে পড়ল বাঁশবনের ওদিকটায়। ছটফট করছে মহামায়া। আদুরীর মাকে ডাকতে হবে এখনি। এখনি একজন না ধরলে ওর অভাবনীয় কিছু ঘটবে হয়ত। দাঁড়িয়ে থাকা চলে না আর। লাঠিটা নিয়ে কোন রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে পড়ল গোকুল। বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে চোখ ধাঁধিয়ে বজ্রপিণ্ড নামল যেন মুখুয্যেদের তালগাছটার মাথা ঘেষে। বৃষ্টি নামল সঙ্গে সঙ্গে—ফোটায় ফোটায়—ধারায় ধারায়। দেখতে দেখতে একেবারে মুষলধারায় আকাশ ভেঙে পড়ল যেন। অকালবর্ষণ। রোগ, চিন্তা, দুর্ব্বলতা—সবকিছু সরে গেছে তখন চৈতন্যের সীমা থেকে। একটা প্রেরণা ভর করেছে যেন—গোকুলের দেহমনের উপর। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে না ঠিক। লাঠির ঠেলা দিয়ে দিয়ে—লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে যেন গোকুল—দুলে-পাড়ার দিকে। বাঁশবাগানের পথটা পেরিয়ে এখনো যেতে হবে অনেকখানি। পায়ের তলা দিয়ে স্রোত বইতে সুরু হয়েছে। কপির ক্ষেত, আলুর ক্ষেত, মূলো কড়াইশুঁটির ক্ষেত। স্রোত নামতে সুরু হয়েছে সব ক্ষেতে ক্ষেতে। পৌষের শেষে অপ্রত্যাশিত এ বৃষ্টি। আকস্মিক এই বর্ষণের ফলে কত শিশু-উদ্ভিদ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরবে হয়ত। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে গোকুল। বাঁচতে চায় ও। বাঁচাতে চায় সে তার অনাগত আত্মজটিকে। নিশ্চিহ্ন হতে চায় না গোকুল। অমর হয়ে থাকতে চায় গোকুল তার বংশধারার মধ্যে। আদিম-অকৃত্রিম প্রবৃত্তি আজ প্রাণপুষ্ট হয়ে উঠেছে ওর মধ্যে। চলার গতির মধ্যে সে প্রবৃত্তির আবেগস্পর্শ লেগেছে যেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল গোকুল। বাইরে দুর্য্যোগঘন পরিবেশ। ভাঙা ঘরের মধ্যেও অভিনব দৃশ্যপট রচিত হয়েছে তখন। সকালের আলোয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে সে ছবি। প্লাবন সুরু হয়েছে ঘরের মধ্যে। স্থল নেই আর কোথাও। স্রোত বইছে যেন মেঝের উপর দিয়ে। এক কোণে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে মহামায়া। ভাঙা চাল ফুঁড়ে অবিশ্রান্ত বর্ষণধারা নেমে দেহটাকে ভিজিয়ে ভিজিয়ে বিপর্য্যস্ত করে এনেছে অনেকখানি। পায়ের কাছে অসহায় ভাবে পড়ে আছে কাদাজলে-মাখা অপরিচ্ছন্ন একটি মানব-শিশু। নিষ্প্রাণ অনড় শিশুর কচি দেহটা ঘিরে স্রোতের আবর্ত্ত রচিত হয়েছে যেন। াপ নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল গোকুল জ্বরে জীর্ণ শরীরটা তার ধারাস্নানে বিধ্বস্ত হয়ে এসেছে যেন। পা দুটো ভেঙে পড়তে চাইছে এখনই। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে সর্ব্বাঙ্গ। বুকের ভেতরের কাঁপন দুর্ব্বার হয়ে উঠছে আরও। মাটিতে পড়ে এখনি শেষ নিশ্বাস ছাড়তে চাইছে যেন দেহটা। চেয়ে চেয়ে আজ হঠাৎ চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবার মত অবস্থা হ'ল গোকুলের। ভাদ্রে এমনি বর্ষণের প্রতীক্ষায় একটি একটি করে দিন গুনেছিল গোকুল—আকুলভাবে। অকালে পৌষ-শেষে সেই প্রতীক্ষমাণ দিনের প্রার্থনা মঞ্জুর করবার জন্যেই কি এই দুর্য্যোগ নেমে এসেছে আজ!—কিন্তু কেন?

অনেক বেলায় দুর্য্যোগ থামল যখন—তখনো সংজ্ঞা ফেরে নি মহামায়ার। বাড়ী থেকে কাঠকুটো এনে আগুন জ্বালিয়ে সেঁক তাপ দিচ্ছে আদুরীর মা। আপনজনও এমন করে না বোধ হয়। রোগজীর্ণ সামর্থ্যহীন দেহটার সব বিক্ষোভ অগ্রাহ্য করে ওষুধ আনতে গিয়েছিল গোকুল। নীলমণি ডাক্তারের কাছ থেকে পুরিয়া পেয়েছে ক'টা। ভাবতে ভাবতে ফিরছে গোকুল। কাল চিঠি এসেছে একখানা। হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। পড়ে দেখবার মত আর সামর্থ্য ছিল না কাল। জ্বরের তাত বেড়েছে তখন। বালিশের তলায় গুঁজে রেখে দিয়েছিল চিঠিটা। কার চিঠি কে জানে! আত্মীয়স্বজন কেউ কোথাও নেই তো কোন চুলোয়। কার চিঠি তবে! ভাবতে ভাবতে ফিরল গোকুল। পুরিয়া একটা জলে গুলে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিলে মহামায়াকে। নিশ্বাস ছেড়ে উঠল গোকুল। ভিজে বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা টেনে বার করলে তাড়াতাড়ি। টানাটানা অক্ষরে লেখা। অল্প ভিজে গিয়ে অক্ষরগুলো ধেবড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। লিখছে নীলাম্বর নিয়োগী। রায়গঞ্জের চিঠি। লিখেছে তা হলে মহামায়ার সেই চশমখোর কাকা। অক্ষর-গুলো যেন গিলতে লাগল গোকুল। অচিন্তনীয় কথা সব। কথা নয়—লেখা নয়। সঞ্জীবনী সুধায়-ভরা করুণাময় কোন মানুষের বুকের ভাষা যেন। বৃন্দাবনবাসী হবে লোকটা। বিষয়-সম্পত্তির সবকিছু বোঝা মহামায়াদেরই দিয়ে যাবে ঠিক করেছে। নিতে আসবে মহামায়াকে দু'একদিনের মধ্যেই। অপ্রত্যাশিত করুণা!

চোখ মেলে এক বার চাইলে মহামায়া। কি যেন খুঁজছে চোখ দুটো। কাকে কাছে চাইছে যেন। চিঠিখানা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল গোকুল মহামায়ার খুব কাছটিতে।

আশাদীপ্ত মন নিয়ে, চিঠিখানা মেলে ধরে গোকুল বললে, "তোর সেই রায়গঞ্জের কাকা চিঠি দিয়েছে, বউ। নিতে আসবে তোকে দু'এক দিনের মধ্যেই। যাবি নাকি সেখানে?"

এ কথার কোনো জবাব দিলে না গোকুলের বউ, শুধু অসহায়, করুণ চোখ দুটি মেলে খোলা চিঠিখানার পানে তাকিয়ে রইল এক-দৃষ্টে—চেতনা যেন তার অসাড় হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

পণ্ডিত রামচন্দ্রজীর শ্রাদ্ধের কাহিনী

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

বাঙালী স্বদেশেই থাকুন আর প্রবাসেই থাকুন তাঁর ঘরে নিজের দেশের আনুষ্ঠানিক পূজা-পার্ব্বণ করা চাই-ই। বছরে চার বার—লক্ষ্মীপূজা, একবার মনসাপূজা, সরস্বতীপূজা একবার এ তো আছেই, তা ছাড়া নানাবিধ ব্রত-পার্ব্বণ, ষষ্ঠীপূজা, জন্মতিথি উৎসব এসকলও তাঁরা করে থাকেন। সেকালের বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে বার-ব্রত আর ষষ্ঠীপূজা, জন্মতিথি, হাতেখড়ি ইত্যাদি অনুষ্ঠান লেগেই থাকত। এই সব পূজা ব্রত পার্ব্বণ ব্রাহ্মণ ছাড়া করানো যায় না; তা যে দেশেই হোক—মাদ্রাজ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, যেখানেই হোক, প্রবাসী বাঙালীরা বাঙালী ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করে নিতেন এবং পূজাও যথারীতি হ'ত।

সুদূর রাজস্থানে তাঁরা একজন বাঙালী ব্রাহ্মণপণ্ডিত যোগাড় করে নিয়েছিলেন। নিত্য ও নৈমিত্তিক সব ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁর ডাক পড়ত সকল বাঙালীর ঘরেই।

প্রবাসের মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, গাঙ্গুলী, ঘোষ, বোস, মিত্তির, সেন রায়, গুপ্ত সকলের ঘরেই তাঁর ডাক পড়ত, আসা যাওয়া করতে হ'ত তাকে তাঁদের নৈমিত্তিক কাজে; এ ছাড়া ছেলেমেয়েদের বর্ণ-পরিচয় পড়ানোর পণ্ডিতমশাই বা মাষ্টারও তিনিই। প্রথম ভাগ থেকে বোধোদয় অবধি বাঙালীর শিশুপাল তাঁর হাতেই থাকত। বেতন, সিধা, টাকাটা-সিকিটা দক্ষিণাদি ভালই পেতেন।

পণ্ডিতমশাই বৃদ্ধ হয়েছিলেন, সহসা একদিন গুরুতররূপে অসুস্থ হলেন, তার পর তাঁর মৃত্যু হ'ল।

শোকে মুহ্যমান যজমানেরা খুব আক্ষেপ করলেন। অপুত্রক—তাঁর শেষকৃত্য এবং শ্রাদ্ধশান্তিও জ্ঞাতি কাকে দিয়ে করলেন যেন। তার পর কিন্তু বাড়ী-বাড়ী মহা ভাবনা। সমস্ত শহরের এতগুলি বাড়ীর পূজার হাল ধরে কে? ভাদ্রমাসেই লক্ষ্মীপূজা, তার পর মনসাপূজা, তার পর মাসে মাসে দু' একটি ষষ্ঠীপূজা সকল ঘরেই আছে, জন্মতিথি আছে; কারুর বা ব্রত আছে—দূর্ব্বাষ্টমী অনন্ত চতুর্দ্দশী—সেকালের সংস্কারযুক্ত মন গৃহিণীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এই সব কাজের ব্রাহ্মণ কোথায় প্রাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণের অভাব অবশ্য সেদেশে ছিল না। কিন্তু তাঁরা তো পুরুত বামুন নন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতও নন, তাঁরা বড় বড় পদস্থ কর্ম্মচারী—অথবা ডাক্তার কিংবা অধ্যাপক। ঘণ্টা নেড়ে পূজা করবেন বাড়ী-বাড়ী, তাঁরা কেমন করে? নিজের বাড়ীতেই পূজা করবেন কি না সন্দেহ। হয়ত সব ভুলেও গেছেন, কিংবা জানেনই না!

অথচ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁরা বাঙালী পরিবারের দেশাচারসম্মত লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মনসা পূজাদি জানেন কি? হিন্দুস্থানীদের বা সেদেশবাসীদের ঘরে পূজা পার্ব্বণ ব্রত নিয়ম অন্য রকম, সেগুলোও বাঙালী গৃহিণীরা কিছু কিছু গ্রহণ করেছেন,—যেমন 'সুমতি' (সোমতি) অমাবস্যা' সোমবারে অমাবস্যাব্রত। কিন্তু বাঙালীর ব্রত পূজা অনুষ্ঠানের সমস্যার সমাধান তাতে হয় না।

এখন গৃহিণীরা ভেবে ভেবে আর কূলকিনারা পান না। অবশেষে এক বাড়ীর গৃহিণী ভৃত্যদের বললেন, 'একজন স্থানীয় ব্রাহ্মণই যোগাড় কর।' একটু দেখিয়ে শুনিয়ে বলে দেবেন গৃহিণীরা। পূজা ত ব্রাহ্মণেতর জাতির দ্বারা চলবে না। না হয় ওদেশীয় মতেই পূজাপাঠ হবে।

দু'এক জন ব্রাহ্মণ দেখা গেল যাঁদের জীবিকা যজন-যাজন পূজা-অর্চনা ও ভিক্ষা। খাঁটি সেকেলে প্রথামত সকলে নিয়মমত কয়েক বাড়ী ভিক্ষা করতে যান, আটা, পয়সা যে যা দেয় এনে গৃহদেবতা শালগ্রাম রামচন্দ্রজী বা রাধাগোবিন্দজীর অর্চনা করেন এবং ভোগ দেন। দাতাকে আশীর্ব্বাদ করে আসেন 'বোলবালা রহে' 'পুত্রপৌত্র বধাই' (বৃদ্ধি) হোক ইত্যাদি।

শেষে লক্ষ্মীপূজা সমাগত, এক জন চাকর তাঁদেরই এক জনকে বাড়ীর গৃহিণীর কাছে এনে উপস্থিত করল।

মলিন, জীর্ণ হাতে বোনা 'রেজী'র (খদ্দর) জামা বা মেরজাই, তাঁতের মোটা ধুতি, মাথায়ও ময়লা জীর্ণ পাগড়ী, হাতে লাঠি, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লোকের দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়িয়ে নানা স্তব পাঠ করে নাম শুনিয়ে যান। সেদিনও এ বাড়ীর দুয়ারে স্তবপাঠ করছিলেন:

> আদ্যাশক্তি দশমহাবিদ্যা একই রূপা মহাকালী।
>
> ... ...
>
> বালা, কালী, ভৈরবী, কমলা, তারা চ দক্ষিণাকালী
> ছিন্না, ধূমা, ভবানী শক্তি (ভুবনেশ্বরী)
> মাতঙ্গী মা, মাতোয়ালী।

তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভৃত্যটি ভিতরে নিয়ে এল, তিনি 'লছমী মাঈ'র পূজা করতে জানেন কিনা। তা হলে পূজা করে দিতে হবে।

অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কানে একটু কম শোনেন। যা হোক দু'বার বলার পর শুনতে পেয়ে বললেন—লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গাদি দেবীর নাম তিনি ভাল করেই জানেন, স্তবও জানেন। পূজা করা এমন আর কি শক্ত কথা। লক্ষ্মী মাঈয়ের পূজা তিনি করে দেবেন। স্নান করে আসছেন।

এলেন পূজার ঘরে। চারিদিকে পূজার উপকরণ। কাঁচা মুগের ডাল ভিজানোর নৈবেদ্য, চিনির নৈবেদ্য, চালের নৈবেদ্য,

মাথায় ক্ষীরের সন্দেশ বা কলাকন্দ শোভিত (ওদেশে সন্দেশ নেই), গায়ে পানের খিলি, আশেপাশে ফল সাজানো। জলপানের থালায় ভিজানো ছোলা মটর ও ফলমূল ক্ষীরের মিষ্টি। দেয়ালের গায়ে একটু জায়গায় গোময় ও মাটি লেপে আলপনা দেওয়া হয়েছে যথারীতি। ভাদ্রমাসের পূজার প্রথামত সেখানে ধান, মান, পান, মরাই, শাঁখ, পেঁচা, গহনা আঁকা। লক্ষ্মী-নারায়ণ-কুবেরের সিন্দুরে-আঁকা ত্রিমূর্তি। আবার মরাইয়ের পাশে কুবের দ্বারীরূপে দণ্ড পাগড়ী ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। জলচৌকীর উপর মা লক্ষ্মী ধানভরা 'রেকে'র (কুনকের) প্রতীকে রেশমের চেলী পরে কুন্‌কেটি ঢেকে ঘোমটা দেওয়া ভাবে বসে আছেন, একটি সোনার নথ (নাকে)—ঘোমটায় আটকানো।

আশেপাশে কোশাকুশী শাঁখ ঘণ্টা ধূপ দীপ প্রদীপ পাণিশঙ্খ বস্ত্র সাজানো। সেদিন মনসাপূজাও হবে, সংক্রান্তি অরন্ধনও। গৃহিণী এবং বধূরা ভক্তিভরে পট্টবস্ত্র পরে বসে আছেন।

ব্রাহ্মণ এলেন, তাঁকে প্রণাম করে কর্ত্রী আসনে বসালেন। পূজার উপকরণের প্রাচুর্যে প্রসন্নচিত্ত সন্তুষ্ট পণ্ডিতজী পূজা করতে বসলেন।

কোশাকুশী নেড়ে, আচমন অঙ্গশুদ্ধি করে যথারীতি পূজা আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোথায় লক্ষ্মীস্তব—"ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি!" কোথায় প্রণামমন্ত্র 'বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি'—গৃহিণীদের শুনে ও বলে মুখস্থ হয়ে আছে—পণ্ডিতজী উঠে ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি করতে আরম্ভ করলেন।

গৃহিণীরা শশব্যস্তে নিষেধ করতে লাগলেন,'ও পণ্ডিতজী, লক্ষ্মী-পূজোয় ঘণ্টা বাজাবেন না, বাজাতে নেই।'

আর পণ্ডিতজী! বধির ব্রাহ্মণ তখন আরম্ভ করেছেন স্তব, তাঁর চিরকালের জানা স্তবমালা :

"আদ্যাশক্তি দশমহাবিদ্যা একই রূপা মহাকালী..."

ওমা! গৃহিণীরা হতবুদ্ধি—পণ্ডিতজী এ যে লক্ষ্মীপুজো, এ ত কালীপুজো, নয়, আদ্যাশক্তি নয়,—বলবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু একে তো পূজার আরতির সময় আর বাধা দেওয়া চলল না, তাতে আবার ব্রাহ্মণ বধির। কিন্তু পণ্ডিতজী মা লক্ষ্মীকে 'আদ্যাশক্তি দশমহাবিদ্যারূপিণী' বলে খুব ভুল করেন নি বোধ হয়। আদ্যাশক্তি কি লক্ষ্মীমাতাও নন!

যাক, গৃহিণীরা বিচলিত ও বিমনা ভাবে পূজা দেখতে লাগলেন। তার পর পণ্ডিতজী সরলভাবে তাঁর বাকি স্তব মনের ঝুলি থেকে বের করলেন, সীতাদেবীর স্তব :

জয় জয় সীতে ব্রহ্মাতীতে,
ভীমা বামা রঘু প্যারী।
রঘুপতি ধ্যান ধরে না তেরো,
তুমহি হো মঙ্গলকারী।

এক কথায় তাঁর জানা নানা স্তবে তিনি লক্ষ্মী ও 'নাগমাতাজীর' পূজা সমাপ্ত করলেন।

'গৃহিণীদের একটু দ্বিধা হলেও ব্রাহ্মণকে দিয়ে পূজা করিয়েছেন তো! নিশ্চিন্ত হলেন।

চালকলার নৈবেদ্যগুলি মিষ্টান্ন, জলপান, সব বেঁধে গুছিয়ে তাঁকে দেওয়া হ'ল। এখন 'দক্ষণা' (দক্ষিণা)?—জিজ্ঞাসা করলেন বৃদ্ধ। শুনতে পান না ভাল, দেশাচারমতে লক্ষ্মীপূজায় দক্ষিণা দেবার রীতি নেই জানেন না। নিরুপায় হয়ে বলা হ'ল—কাল পাঠিয়ে দেব।

তার পর আশ্বিন মাসে বাড়ীতে একটি ষষ্ঠীপূজা করতে হবে।

ষষ্ঠীমাতা? আচ্ছা। চিরজীবী মার্কণ্ডেয় মুনির নাম তিনি জানেন। ষষ্ঠীপূজা? তা করে দেবেন দু জনের নাম করে। যদিও ষষ্ঠী ঠাকুরাণী নামে কোন দেবী ওদেশে নেই। ষষ্ঠীপূজার বিধিমত বটের ডাল, একুশটি খই চুবড়ি, একুশটি ক্ষীরের পুতুল, কাজললতা দিয়ে খোঁড়া দুধ ভরানোর জন্য একুশটি গর্ত্ত মাটির উপর, সব সাজিয়ে গুছিয়ে তাঁকে আসনে বসানো হ'ল। এবারে আবার সব নতুন ধরনের উপকরণ। পণ্ডিতজীকে বলা হ'ল, মার্কণ্ডেয় মুনির মত চিরায়ু হয় যেন শিশু, ভাল করে পুজো করুন। নতুন উপকরণে, নতুন দেবতার পূজা, পণ্ডিতজী উপকরণ-সম্ভারে খুশীমনে দৃষ্টিপাত করলেন। তার পর নিজের মত আচমন ও পূজা করে আরতি আরম্ভ করলেন, এবার শিবের স্তব। মার্কণ্ডেয়-পূজার জন্য।

আক্ (আকন্দ) ধতুরা ভোজন করিহেঁ,
নাগ বরত্ত শটাওয়ে হেঁ (নাগপাশ)
...ঘণ্টালেকর গাল বজায়া
বম্ বম্ বম্ শিব বম্ ভোলা।
সিদ্ধি ঋদ্ধি মে ভর ঝোলা।
কঁহি শীষ (শীর্ষ) কঁহি চরণ কি পূজা,
কঁহি লিঙ্গপূজা বাওয়ে হেঁ (চলেছে)
... ...
ঘণ্টালেকর গাল বজায়া,
বম বম বম শিব বম ভোলা।

তার পর যথারীতি আদ্যাশক্তির স্তব বলে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর অর্চনা আরতি শেষ করলেন।

ক্রমে গৃহিণীদের অভ্যাস হয়ে গেল। পূজা ত হচ্ছে। মন্ত্রতন্ত্র? তা যে দেশে আছেন, 'যস্মিন দেশে যদাচার'! গুটিকতক সংস্কৃত বচন তাঁদের ত অজানা ছিল না।

ব্রাহ্মণ সব নৈমিত্তিক ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্মই করে যান।

সহসা একদিন বিকেলে রাঁধুনী বামুন চাকর সকলে বললে, 'আজ আমরা সকাল সকাল কাজ করে যাব। রাত্রে ফিরতে দেরি হবে, আজ আমাদের নিমন্ত্রণ সকলের।'

এখন রামোয়াভার নিমন্ত্রণ ঠিক আমাদের দেশের মত শুধু ভদ্রলোকদেরই নয়, সেখানে যাঁর বাড়ীতে যে-কোন ক্রিয়া হবে,

তাতে অন্যান্য বাড়ীর কর্তাদের সঙ্গে ভৃত্যদেরও পাঠাবার নিমন্ত্রণ-পত্র দেবার প্রথা আছে। ভৃত্যদের জন্য সে পত্রটি পাতলা হালকা রঙীন কাগজ, তাতে লেখা থাকে "আসামী এক জিবা মে আও" ('একজন লোক নিমন্ত্রণে এস।') গৃহকর্তার ঠিকানা দেওয়া নীচে। এমন পাঁচ-দশ খানা নিমন্ত্রণপত্র সব বাড়ীতে আসত, গৃহকর্তার পদমর্য্যাদা অনুসারে সে সংখ্যা ঠিক হ'ত এবং চাকরেরা ভূরিভোজ খেয়ে আসত। তা বিবাহ উপনয়ন শ্রাদ্ধ সব-কিছুতেই। লাড্ডু কচুরী, দইবড়া, জিলাপী, লুচী, তরকারী, হালুয়া, এই ধরনের খাদ্যের সমাবেশ তাতে থাকে। ঐ পত্রগুলিকে 'টিকিট' বলা হয়। বাড়ীর চাকরদের পালা করে এক এক দলকে পাঠানোর নিয়ম ছিল। এ নিমন্ত্রণ কখনও সব বর্ণনির্ব্বিশেষে, কখনও শ্রাদ্ধাদি হলে শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দ্ধারিত থাকত।

গৃহিণী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে টিকিট এল কোথায় যাবি? আমার কাছে ত কোন নিমন্ত্রণ টিকিট আসে নি? বাবুজী (কর্ত্তা) দিলেন?'

তারা বললে, 'না, পণ্ডিতজীর নুক্তা' (আদ্যশ্রাদ্ধ) আজ। বহু লোক খাওয়াচ্ছেন। ব্রাহ্মণ আর অন্য দু' চার জাতও আছে। আমাদেরও বলেছেন।

গৃহিণী গালে হাত দিলেন, আহা! ব্রাহ্মণ মারা গেলেন! এই ত সেদিন পূজা করে গেলেন পৌষ মাসের লক্ষ্মীপুজোয়। আহা! কি হয়েছিল? বামুন এবং চাকরেরা হাসল, বললে, 'না, না, মাজী পণ্ডিতজী মরবেন কেন? মরেন নি। নিজের শ্রাদ্ধ করে রাখছেন। ওঁর ত কেউ নেই—কে পরে শ্রাদ্ধ করবে, তাই বহুত খরচ করে নিজের নুক্তা করছেন। অনেক লোক নিমন্ত্রণ করেছেন।

গৃহিণীর গালের হাত নামল ত না-ই—আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন কি কাণ্ড ওমা, কি আশ্চর্য্য···। আর হাসতে লাগলেন।

তারা রাত্রে ভূরিভোজ খেয়ে বাড়ী ফিরল। পণ্ডিতজী খুব খাইয়েছেন শ্রাদ্ধের পর। বহু ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সকলেই খুশী হয়েছে পুণ্যাত্মা পণ্ডিতজীর এই 'আগাম শ্রাদ্ধে'র ভোজ খেয়ে। তাদের মতে সত্যিকার বুদ্ধিমান আর পুণ্যবান লোক না হলে এমন করে শেষের দিনের কথা কে ভাবে! পরে ত টাকাকড়িগুলো জমিদার চৌকীদার আর চোরের হাতে পড়ত, বেঁচে থেকে এ একটা ভাল কাজ করলেন। মোটামুটি, তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ হ'ল আর প্রায় পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণ এবং অনেক বন্ধুবান্ধব ভোজ খেলেন। শ্রাদ্ধের শয্যা, বস্ত্র, অন্নজল 'স্থানী' সব তাঁর কোন বন্ধু ব্রাহ্মণ পেলেন।

আসন্ন কাল অবশ্য পণ্ডিতজীর ঘনিয়ে আসে নি। সুতরাং মাঘ মাসের হাড়কাঁপানো পশ্চিমের শীত তুলোর জামা পরে আর বালাপোশ মুড়ি দিয়েই তাঁর কাটল। চৈত্র মাসের লক্ষ্মী-পূজাও এসে করে গেলেন। গৃহিণীরা খুব খুশী। নৈমিত্তিক পূজা, শীতলাষ্টমী, ('শিল আঠে') কারুর বাড়ী ছোটখাটো পূজা তাও করলেন যথারীতি। চৈত্রসংক্রান্তির শক্তু দান, জলদান উৎসর্গ করালেন।

বৈশাখ মাস জলদান পর্ব্বেও মন্দ পেলেন না পূজার দক্ষিণা।

আশ্বিন মাস এল। এই মাসে পণ্ডিতজী নানা পূজা করে গেছেন। দেশে তর্পণশ্রাদ্ধ এসে পড়েছে। ঘরে ঘরে তর্পণ চলছে। তর্পণের বার্ষিকী শ্রাদ্ধকে ওদেশে বলে 'কনাগং'। 'কনাগং' শ্রাদ্ধে খুব সমারোহ করে ব্রাহ্মণ-ভোজন ও লোক খাওয়ানোর প্রথা এখনও রাজস্থানে আছে।

রাত্রে শুয়ে গৃহিণীর মনে পড়ল, 'কনাগং' এসে পড়েছে, ঘরে ঘরে তর্পণ আরম্ভ হয়েছে, এ বাড়ীর কর্ত্তাও তর্পণ করছেন। পণ্ডিতজীকে তিথিশ্রাদ্ধের জন্য ডাকতে হবে।

সহসা মনে পড়ে গেল তাই ত। পণ্ডিতজী যে নিজের শ্রাদ্ধ করে রেখেছেন সেটা আদ্যশ্রাদ্ধ। আর 'কনাগং'ও করবেন বোধ হয়। কি আশ্চর্য্য, ওঁর মনে পড়ে নি এতদিন যে, এই সব দেবকার্য্য, শুভকাজ উনি কি করে পণ্ডিতজীকে দিয়ে করালেন! কেননা, শ্রাদ্ধ যখন হয়ে গেছে তখন লৌকিক হিসাবে উনি তো মৃত। পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ-ভোজন সবই ত যথারীতি হয়েছে, তখন জীবিত বলে ওঁকে মনে করা ত তাঁর উচিত হয় নি। এক কথায় এখন পণ্ডিতজী ত মৃত বা প্রেতের সামিল। মাঙ্গলিক কার্য্যে মৃত কিংবা অশুচি শরীরের কোনও কাজের অধিকার কি থাকে?

কি করা যায়। এখন মনে যখন হয়েছে—তখন ওঁকে দিয়ে আর কোনও কাজই ত করানো যায় না। উচিত কি? নাঃ, খুব অন্যায় ও ভুল হয়েছে তাঁর। এখন হতে তাঁকে দিয়ে পূজা চলবে না—বাড়ীর কল্যাণ-অকল্যাণের কথা ভাবতে হবে। জীবিত হলেও শ্রাদ্ধ যখন হয়ে গেছে তখন উনি মৃত বা মৃতবৎ। অশুচি তা হলে।

গৃহিণী বাড়ীর লোকদের—রাঁধুনি ব্রাহ্মণ ও দু'একজন পুরাতন ভৃত্য এবং বাড়ীর পুরাতন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কথা বললেন।

এমন সমস্যায় ত তারা কখনও কেউ পড়ে নি, কাজেই কে আর কি বলবে। তবে শ্রাদ্ধ যখন হয়ে গেছে, তখন পণ্ডিতজী যে আর বেঁচে নেই—মৃত, এ বিষয়ে সবাই একমত হ'ল এবং এটাও সাব্যস্ত হ'ল যে, দেবকার্য্য চলতে পারে না মৃত বা অশুচি লোকের দ্বারা।

দেখতে দেখতে ভাদ্রসংক্রান্তির লক্ষ্মীপূজা মনসাপূজা গেল। অপরপক্ষ বা পিতৃপক্ষও চলছে—কর্ত্তাদের পিতৃমাতৃ তর্পণ, শ্রাদ্ধের তিথিও এসে পড়ল, পণ্ডিতজীকে কিন্তু আর ডাকা হ'ল না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভৃত্যদের কাছে খবর নিলেন। করে কি পূজা, পিতৃ-গণের ক্রিয়াকর্ম্ম করে জিজ্ঞাসা করেন, কোনও স্পষ্ট জবাব কেউ দেয় না। পূজা কি হয়ে গেছে? কে করলে? অথবা হয় নি, হবে?—জবাব পান না।

অবশেষে বৃদ্ধের এক বন্ধু তাঁকে বলে দিলে, এঁরা বলেছেন, শ্রাদ্ধ করায় তোমার দেহ মৃতের সামিল, কাজেই অশুচি মনে করতে হবে। সুতরাং অশুচি বা মৃত ব্যক্তির দ্বারা পূজা-পার্ব্বণের কাজ কি করে চলতে পারে!

দেওয়ালীর লক্ষ্মীপূজায় খুব ধুম লেগেছে। পণ্ডিতজী বিমনা-ভাবে শুনলেন অন্য ব্রাহ্মণ পূজা করে যাচ্ছে। পূজার কাজ তাঁর অভাবে আটকে থাকে নি। দক্ষিণা, ভোজ্য সব উপকরণের কথাই তাঁর মনে পড়ল। নীরবে ভাবেন বসে বসে। কারুর পরামর্শ চানও না, নেনও না।

অগ্রহায়ণেই শীত এসে পড়ল। পণ্ডিতজী পুরাতন বালাপোশ-খানি জড়িয়ে সারাদিন রৌদ্রে বসে থাকেন, সন্ধ্যায় দু'একখানি শুকনো রুটি খেয়ে খাটিয়াতে শুয়ে পড়েন।

আর ভিক্ষা করতে লোকের বাড়ী যান না, স্তবপাঠ আশীর্ব্বাদও করেন না। যে যা ঠাকুরের সেবায় নিজে থেকে দেয় তাই কোন-ক্রমে রান্না করে নেন। আশীর্ব্বাদ করবেন কি করে, ভাবেন… লোকেরা কৃতশ্রাদ্ধ মৃতের বা মৃতবৎ লোকের আশীর্ব্বাদ কি নেবে?

সহসা শীতশেষের এক দিন সকালে তাঁর চাকররা যজমান-গৃহিনীকে বললে, পণ্ডিতজীর কাল রাত্রে মৃত্যু হয়েছে।

এক বৎসর পূর্ব্বের শ্রাদ্ধভোজী বন্ধুরা সজল চোখে শুধু শবানুগমন করল নীরবে আসল মৃতদেহের। এবার আর শ্রাদ্ধশান্তির কোনও প্রয়োজন নেই। আগেই সব কাজ শেষ করা আছে।

গৃহিনী কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি অসুখ করেছিল পণ্ডিতজীর?"

তারা বললে, কিছু না। তিনি বেঁচে থাকতে শ্রাদ্ধ করার জন্য তাঁকে মৃত মনে করায় যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু চুপ করে ভাবতেন।

সনাতনের সন্ন্যাস

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

"বৃন্দাবনের বিরহ-মথিত—ব্যথিত বাঁশরী ডাকে,
ব্রজের দুলাল তৃষিত নয়নে বারে বারে চেয়ে থাকে ;—
মনে ভেসে ওঠে গাগরী-ভরণ কালিন্দী-কালো জলে,
গোপনাভিসার কুঞ্জে কুঞ্জে—কদম্ব-বনতলে ;
আকুল নয়নে—উচাটন মনে বৃন্দাবনে যে চাই ;—"
কহে সনাতন হুসেন শাহেরে—"রাজ-কাজ ভুলে যাই ;
যে মন লইয়া মন্ত্রী তোমার আছিনু হেথায় হায়
সে মন আমার ব্রজের দুলাল কেড়ে নিয়ে চলে যায় ;
পরকীয়া রসে—রাধা-ভাবে জাগে রসাবেশ হিয়াতলে ;—
এ মানসে আর নাহি অধিকার—হারালো যমুনা-জলে।"

২

"ব্রজের রাজার ডাক আসিয়াছে, কি করে রহি গো রাজা?
প্রেমের দারুণ দহনে পরাণ হয় শুধু ভাজা ভাজা।
রাধার হৃদয়—ঘর-করণা যে কি ভাবে ভাসিয়া যায়,
এতদিন আমি বুঝিয়াও তা যে বুঝিতে পারি নি হায়।
তনু মন-কাড়া বাঁশরী বাজিল , বিষয়-বাসনা ফেলি,
সুরের সোহাগে চলিয়াছে মন সুদূরে যে ডানা মেলি।
এত দিন ধরে তব কাজে রাজা, মাথায় ধরিল পাক ;
এ-পারের কাজ এবার ফুরালো, ও-পারের এলো ডাক।
সনাতন যাহা, পেলো সনাতন এত দিন পরে বুঝি ;
হয় তো মিটিবে জীবনের সাঁঝে জীবনের খোঁজাখুঁজি।"

৩

"বিষয়-নিগড়ে বাঁধিতে চেয়ো না ;—আকাশের পানে চাও,
নব-জলধর-কান্তি সেথায় হেরিতে কি নাহি পাও!
চারিদিকে যত শ্যাম-শোভা দেখো, তা'র মাঝে বারে বারে
ভুবন-ভুলানো সে রূপ-ভাতি কি তব মন নাহি কাড়ে?
নয়ন থেকেও দেখি নি যে রাজা, শুনি নি শ্রবণ থেকে,
ব্রজের কিশোর কতবার বুঝি ব্যথা-ভরে গেছে ডেকে ;
কি দারুণ তৃষা করেছে তাঁহারে অধমেরও অনুরাগী!
এতো যে সহিলো, আমি সহিব না কিছু তাঁর প্রেম লাগি!
রাজ-অধিরাজ ওই ডাকে শোনো বৃন্দাবনের পানে।"—
নয়নের জলে ভাসে সনাতন ;—হুসেন অবাক্ মানে।

শাল-মহুয়ার বনে

শ্রীঅপর্ণা দত্ত

শরতের আলোর বন্যা অবাধ মুক্তির বাণী এনেছে বিশ্বে। প্রতিদিনকার কর্মব্যস্ততার হাত থেকে রেহাই পেতে চায় মানুষের মন, শহরের কৃত্রিম আবেষ্টন আর দিনযাপনের গ্লানির হাত থেকে চাই মুক্তি।

সাঁওতাল কুটীর

অজানার দুর্নিবার আকর্ষণে চঞ্চল হয়েছে মন। তুষার-মৌলি হিমালয়ের ধ্যানমগ্ন রূপ নিরন্তর টানছে যেন। বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি কেটেছে এক মনোরম পার্ব্বত্য পরিবেশে—মণিপুর রাজ্যের সেই মধুর স্মৃতি সারা মন জুড়ে আছে। পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রতি তাই একটা সহজ আকর্ষণ আছে আমার। কিন্তু সাধ অনেক থাকলেও সাধ্য ত নেই তত। ডালহৌসী দেরাদুন বা আলমোড়া নৈনিতালের আশা ছেড়ে দিয়ে তাই পাড়ি জমাতে হয় দার্জিলিঙের উদ্দেশে।

দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে গাড়ী ছাড়ল। দূরের ঐ গাছ-পালার আড়ালে ফুলে ফুলে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে আমার ছোট্ট 'প্রান্তিক'। শান্ত নির্জন সেই গৃহকোণটির মায়া ক্ষণিকের জন্য আমাকে ব্যথাতুর করে তুলল। কিন্তু অজানার আকর্ষণ বুঝি আরও প্রবল। তাই সেই বেদনার রেশ কখন ক্ষীণ হয়ে এল বুঝতে পারি নি।

রামপুরহাট স্টেশনে গাড়ী পৌঁছল নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে। সঙ্গীর ওঠার কথা এখান থেকে, কিন্তু স্টেশনে সন্ধান না পেয়ে চিন্তিত হলাম। প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে নজর পড়ল হঠাৎ। মন্থর গতিতে অগ্রসর একটি মূর্ত্তি—তবে সেই ভদ্রলোকটি নন, তাঁর বদলে উর্দিপরা আর্দালী—দেখে বিস্মিত হলাম! যাত্রা অসমাপ্ত রেখে নেমে পড়তে হ'ল এখানেই। পশ্চিমবঙ্গের অকালপ্লাবন বিপর্যয় ঘটিয়েছে। শুনলাম সরকারী কর্মচারীরা কেউ নাকি নিজ এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না। জনসেবার অনিবার্য প্রয়োজনে তাঁদের থাকতে হবে জেলার ভিতরে।

আশাভঙ্গের এই আকস্মিকতায় মনঃক্ষুণ্ণ হলাম! শেষ পর্য্যন্ত এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম—নাই বা যাওয়া হ'ল দার্জিলিং, এই অবকাশে বীরভূমকে কতকটা দেখে নিলেও ত মন্দ হয় না। এখানে আছে সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময় শান্তি-নিকেতন। আছে নান্নুর, কেন্দুবিল্ব, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর। আধুনিক সভ্যতার জয়যাত্রা দেখতে হলে যেতে হয় মাসেনজোরে—কেউ-বা বলেন মশানজোড়—ময়ূরাক্ষীর বাঁধে।

কুষ্ঠ সেবাশ্রম, সাওতাল পরগণা

বীরভূমের এখানে সেখানে কত বেড়ালাম, দেখলাম কত, মনের অপূর্ণতা কিন্তু ঘুচল না। সুদূরের আকাঙ্ক্ষা মনে জেগেই রইল।

কে জানত বীরভূমের অদূরবর্ত্তী শালপলাশ আর মহুয়াবনের মনোহরণ রূপের আকর্ষণ হয়ে উঠবে এমনি দুর্নিবার। ভাবলাম বাংলার কোল ঘেঁষে সাঁওতাল পরগণার মনমাতানো রূপ দেখে আসা যাক এই সুযোগে। আবার যাত্রা সুরু হ'ল।

কোজাগরী পূর্ণিমার ভোর। সমস্ত পৃথিবী হাসছে আর হাসছে দূর আকাশের চাঁদ। পূর্বদিগন্তে জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাবের সূচনা। চারিদিক স্তব্ধ, নিঝুম। মনে পড়ল গেল বছর ঠিক এই দিনে গিয়েছিলাম 'টাইগার হিলে' সূর্যোদয় দেখতে। বাস চলেছে 'সুরীচোয়া' এরোড্রোমের পাশ দিয়ে। সেদিন হাটবার। মাথায়, বাঁকে, গরুর গাড়ীতে কত জিনিষ নিয়ে হাটের পথে চলেছে লোক।

টিউবওয়েল হইতে জলসংগ্রহ

ছোট ছোট জলস্রোত, রুক্ষ প্রান্তর আর বন্ধ্যা জমি ছাড়িয়ে মুক্ত গতিতে ছুটেছে গাড়ী। একটু সকাল হলে দেখলাম গ্রামের ভেতর এসে পড়েছি। গায়ে চাদর জড়িয়ে ঘুমভাঙা চোখে অসীম কৌতূহল নিয়ে চেয়ে আছে ছোট ছেলে। পাতার আগুনকে ঘিরে বসেছে বুড়োবুড়ীর দল। উঠানের এক পাশে হাঁস মুরগীদের খাবার দিচ্ছে ঘোমটা টানা বৌ। আদরের ছাগলছানার গলায় দড়ি টানতে টানতে চলেছে ছোট মেয়ে, পিচঢালা পথের উপর শালিকের অশ্রান্ত কিচিরমিচির। পাশে জলার ধারে একঝাঁক সাদা বক কি যেন খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। লাল আর সাদা অজস্র শালুক ফুটে আলো করে আছে জলার বুক।

পিচঢালা পথ এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে পড়ে রইল সাঁওতাল পরগণার খ্যাত অখ্যাত কত গ্রাম, শাকসব্জী আর অড়হরের ক্ষেত। ধেনোজমি খুব কম। মনে হ'ল জমি এখানে পাথুরে হলেও উর্বর। পরিপুষ্ট ফসলের প্রাচুর্য এবং ফুলের বর্ণাঢ্যতা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় একথা।

হরিপুর, সারসডাঙা, মোহল পাহাড়ী, শিকারীপাড়া কত কি নাম। যাত্রী ওঠানামার পর আবার চলছে গাড়ী। পথের দু'পাশে আম, জাম, কাঁঠাল আর তেঁতুলগাছের সারি। মাইলের পর মাইল এমনি। শালবনের ভিতর দিয়ে পথ চলে গেছে সোজা। ছোট, বড়, মাঝারি অসংখ্য শাল-গাছ। ভোরের বাতাসে কাঁপছে সতেজ সজীব পাতাগুলি। রূপালি বালুর বিছানায় শুয়ে সোনার স্বপ্ন দেখছে ময়ূরাক্ষী। দূর বনের ফাঁকে ফাঁকে তার হাতছানি।

গ্রাম্য উৎসব

পাথর আর কাঁকরে ভরা এই বিস্তৃত অঞ্চল। মাঝে মাঝে পলাশ আর শাল মহুয়ার বন। ছোট ছোট গ্রামগুলিতে বাস করে সাঁওতালরা। মিশকালো তাদের গায়ের রং। কিন্তু পলাশ আর মহুয়ার উচ্ছলতা এদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। এরা পাথর ভাঙে, মাটি কাটে, কাঠ কাটে আবার পাথুরে জমির বুকে সোনাও ফলায়। অবসর-মুহূর্তে উদ্দাম আনন্দে মেতে উঠে শিকার করে, নাচে, গায় আর আকণ্ঠ পান করে, মহুয়ার চোলাই করা মদ। এদের মেয়েরা গৃহকর্ম করে, জল বয়ে আনে দূর জলাশয় থেকে, পাতা কুড়ায় শাল বনের মাঝে। ফুল গুঁজে দেয় কালো খোঁপায়।

পশ্চিম বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে, বিহারের পার্বত্য বনভূমিতে বাস এই সাঁওতালদের। নিজ নিজ গ্রামসমাজের অধীনে সহজ সরল জীবনযাত্রা এদের। সামাজিক বা রাষ্ট্রিক সব রকম কর্তৃত্বের ভার গ্রামপ্রধান বা মোড়লদের উপর। অন্য সবাই তার নির্দেশ মেনে চলে। সামাজিক অনুশাসনের একটু তারতম্য ঘটলে শাসনের কঠোর হস্ত এদের একঘরে করতে মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করে না। পারিবারিক জীবন অনাড়ম্বর। ব্যক্তির চেয়ে সমাজ-জীবনের প্রাধান্য বেশী। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও এদের মধ্যে ভূতপ্রেত বা উপদেবতার পূজারই প্রাধান্য। বৎসরের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় উপদেবতার পূজাকে কেন্দ্র করে। গ্রামের বাইরে মহুয়াবনের ছায়ায় জড়ো হয় সব মেয়ে-পুরুষ। জীববলি ও মদ উৎসর্গ করা হয়। নানারকম মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতার তুষ্টিসাধনের চেষ্টা চলে। তার পর সকলে আকণ্ঠ মদ্য পান করে—নৃত্যগীতে মেতে উঠে

সারা গ্রাম। 'বাদনা' বা 'সরাই' পরব এদের একটি বিশেষ পর্ব। তা ছাড়া মৃগয়া, বিবাহ, জাতকর্ম প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে আছে আরও কত উৎসব-অনুষ্ঠান। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে, এমনকি সাঁওতাল পরগণার গভীর অরণ্যদেশে বাস করে যে সকল সাঁওতাল তাদের উপরেও বিজাতীয় প্রভাব পড়েছে বেশ কতকটা। ধর্মের দিক থেকে খ্রীষ্টান মিশনরীদের প্রভাব স্পষ্ট। হিন্দুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকার ফলে তাদের রীতিনীতি দ্বারাও এরা প্রভাবিত হয়েছে। সামাজিক আচারে, পোশাক-পরিচ্ছদে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক হিন্দু দেবদেবী ও আচার-অনুষ্ঠানকে এরা নিজের মত করে গ্রহণ করেছে। তা হলেও নিজস্ব মূল সংস্কৃতির ধারাকে এরা অব্যাহত

মাদল বাজানো

রাখতে পেরেছে আজও। নৃত্যগীত, নানা শিল্পকলা, কৃষি, উৎসব-অনুষ্ঠান, মৃগয়া প্রভৃতির ভিতর একটা মৌলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের অনেকেরই নিজস্ব জমি নেই, সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে 'মুনিষ' বা 'ভাগচাষী' খাটা-ই বাংলার অধিকাংশ সাঁওতালের উপ-জীবিকা। অবশ্য বাঁশ, বেত, লতাপাতা, কাঠ প্রভৃতি দ্বারা নানা জিনিস তৈরি করেও তারা অর্থোপার্জন করে। আজকাল অনেকেই আবার অর্থের লোভে দলে দলে শহরে বা বিদেশে চলে যায়, তখন জীবিকার প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়ায় চা-বাগান, খনি বা কলকারখানায় মজুরি করা।

মহুয়াবনের ভিতর দিয়ে চলেছে গাড়ী। শালমহুয়ার নিবিড় জড়াজড়ি এখন। সাঁওতাল পরগণার প্রধান শহর দুমকার কাছাকাছি এসে পড়েছি। মোট ছ'টি মহকুমা নিয়ে এই জেলা। সদর, জামতাড়া, দেওঘর, পাকুড়, রাজমহল ও গোড্ডা। শহর থেকে শহরতলীর সৌন্দর্য বেশী। সেগুন আর শালবনের মাঝখানে ঘুমিয়ে আছে ছোট শহর। রেল-গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ বিদীর্ণ করতে পারে নি এর শান্ত স্তব্ধতা। সভ্য জগতের সঙ্গে এর যা কিছু যোগাযোগ মোটর-বাসের মাধ্যমে। কয়েকটি সাজানো বাড়ী। 'নিরালা' নামটি পড়েই অচেনা বাঙালী-মনের রসচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ফুলের কেয়ারী আর শাল-মহুয়ার নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন বাড়ীটি।

ধান বোনা

শহরের মুখেই পুলিস হেড কোয়ার্টার আত্মগোপন করে আছে সেগুন বনের স্নিগ্ধ ছায়ায়। পোস্ট আপিস ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বাড়ী দুটির আকৃতি এবং গঠনে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট।

পিচঢালা পথের ওপারে বিরাট সীমানা জুড়ে 'সারকিট হাউস', শাল আর সেগুন গাছের স্নেহচ্ছায়ায় ঘেরা। স্কুল ও কলেজ বাড়ীটি সুন্দর। ঝাউ আর সেগুন গাছগুলি মাথা তুলে আছে সজাগ প্রহরীর মত।

নৃত্যানুষ্ঠান

শহর ছাড়িয়ে খ্রীষ্টান মিশন 'মোহরা'। মিশনরীদের কর্মকুশলতা সাঁওতাল পরগণার সর্বত্র লক্ষ্য করবার মত। গীর্জা, স্কুল প্রভৃতি রয়েছে বিরাট সীমানার ভিতর। গাড়ী এসে পৌছল ময়ূরাক্ষীর তীরে। নতুন ব্রিজ তৈরি হচ্ছে,

নীচে উপলাহত জলস্রোতের রুদ্র আক্রোশ ; সেই জলধারা ঠিক যেন ময়ূরের চোখের উপমাই মনে পড়িয়ে দেয়।

গাড়ী দাঁড়াল স্থানীয় এক তীর্থক্ষেত্রে। বাসুকিনাথের মন্দির, অগণিত যাত্রীর ভিড় এখানে। প্রাঙ্গণের চারিপাশে অনেক মন্দির। কালী, তারা, বগলামুখী, দশমহাবিদ্যার সকল দেবীই এখানে অধিষ্ঠিতা। মন্দিরের বাইরে মেলা বসেছে ;
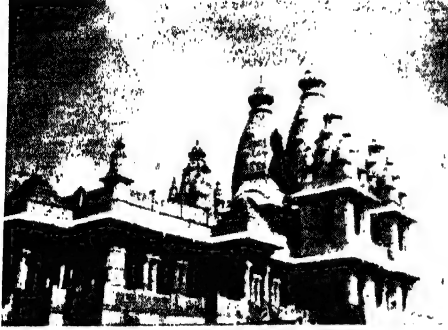
যুগলমন্দির, দেওঘর

দেবদেবীর পট, পূজার উপকরণ, বাঁশবেতের শিল্পদ্রব্য,সৌখিন জিনিস, শাকসব্জী এমনকি টাটকা মাছ পর্যন্ত আছে।

পলাশবনের ভিতর দিয়ে পথ এবার। ছোট, বড়, মাঝারি পলাশগাছের অগণিত বিন্যাস। বসন্তের আগুনরাঙা রক্তিমচ্ছটা নেই এখন, চৈত্রদিনের তপ্তশ্বাসের সঙ্গে পলাশের অগ্নিদাহন সেও ত শেষ বসন্তে! বৈশাখের রিক্ততাও নেই তা বলে। তার বদলে আছে বর্ষাসিক্ত পলাশবনে শ্যামস্নিগ্ধ সরসতা।

জোরমুণ্ডী, জামোয়া সব ছাড়িয়ে গাড়ী ছুটেছে। দূর আকাশের গায়ে ত্রিকূট পাহাড়ের চূড়া স্পষ্ট হ'ল এবার। মেঘ জমে আছে পাহাড়ের গায়ে, মনে হ'ল খুব কাছে, কিন্তু জানা গেল অন্ততঃ ঘণ্টাদেড়েকের পথ হবে। আশ্রম আছে একটি এই পাহাড়ে ; আর এই পাহাড়ের বেলপাতায় নাকি তুষ্ট হন বৈদ্যনাথ। তাই বেলপাতা চয়ন করতে নিত্য সমাগম হয় অগণিত ভক্তের ; তা ছাড়া দর্শনার্থীর ভিড় ত আছেই।

দেওঘরের কাছে এসে পড়েছি। মহুয়াশাখার অকিড-লতার দোলা মনকে চঞ্চল করে তোলে, দূরের দয়ানন্দ আশ্রমের গৈরিক আভা অকারণেই উদাস করে তোলে আবার।

গাড়ী থামল বাজারের কাছে। ত্রিকূট পাহাড়ে বেল-পাতা চয়ন করতে গিয়েছিলেন ভক্ত দু'জন, গুরু ও শিষ্য। এঁদের পাল্লায় পড়লাম। বৈদ্যনাথ-মন্দির দেখাতে নিয়ে চললেন এঁরা। মন্দির-প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক পুণ্যকামীর ভিড়।
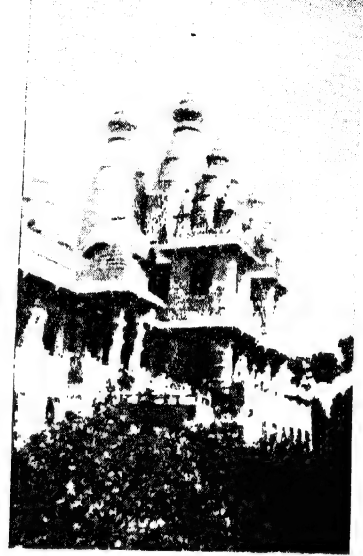
উদ্যানবেষ্টিত যুগলমন্দিরের আর একটি দৃশ্য

মূল মন্দিরের একটি মাত্র প্রবেশ-পথ। সেখানে ঢুকে নিজের হাত নিজেই দেখতে পাচ্ছিলাম না। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় শিবদর্শনই ঘটল না ভাল করে। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে উৎসর্গ করা হ'ল পুষ্পাঞ্জলি। স্পর্শ করা হ'ল কুণ্ডের পূত বারি। পূজা শেষ হবার আগেই প্রবেশ করল এক উদ্দাম জনতা, দেহাতী বিহারী সব। ভিড়ের আকস্মিক ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম একদিকে, একটি মাত্র প্রবেশ-পথ রুদ্ধ হয়ে গেল জনতার চাপে। সীমাহীন অন্ধকার, কেঁপে কেঁপে নিভে গেল প্রদীপশিখা ; হঠাৎ এক অপরিসীম শঙ্কা আমাকে অভিভূত করে ফেলল। শেষে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা গেল। ভিড়ের আর একটা ধাক্কা আমাকে ঠেলে দিল সঙ্কীর্ণ দরজার বাইরে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত মন্দির-চত্বরে।

দেওঘরের দোকান-বাজার অত্যন্ত ঘিঞ্জি আর অপরিচ্ছন্ন, রাস্তাঘাট উঁচুনীচু, দু'ধারে আগাছায় ভরা। সব বাড়ীতে লোকের বাস নেই। পৌর-প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণ উভয়েরই সমান অবহেলার ভাব আছে এই শহরটির উপর।

শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত যুগল মন্দিরে গিয়ে মনে হ'ল বুঝি এ কোন সৌন্দর্যের অমরাবতীতে এসে পড়েছি। উন্মুক্ত উদার প্রাঙ্গণে রং-বেরঙের ফুলের মেলা বসেছে।

অঙ্গনতলে নরম ঘাসের গালিচা বিছানো, একপাশে একটি প্রশস্ত পুকুর। তার স্বচ্ছ মুকুরে সারাদিন ধরে মুখ দেখে তীরের সারিবাঁধা চাঁপা, বকুল আর ইউক্যালিপটাসের গাছ। মন্দিরটির গঠননৈপুণ্য চমৎকার, মনোমুগ্ধকর তার উদ্যান-রচনার কৌশল। লাল সাদা স্থলপদ্মের বর্ণবৈচিত্র্য, মরসুমী ফুলের বিপুল সমারোহ, রজনীগন্ধার সিত আভা আর গোলাপের অজস্র সম্ভার—কাকে ফেলে কাকে দেখব, দিশাহারা হয়ে পড়তে হয়। পায়ের তলার তৃণদল থেকে সুউচ্চ মন্দিরের চূড়াটিতে পর্যন্ত একটি জাগ্রত সৌন্দর্য্যচেতনার সজাগ স্পর্শ রয়েছে। বেলা হয়ে যাওয়ায় এই মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই দেবদর্শন ঘটল না। বিশেষ কোন তথ্যও সংগ্রহ করতে পারলাম না, অপূর্ণ বাসনা নিয়েই ফিরতে হ'ল। মন্দিরের সংলগ্ন আশ্রম আছে আর একটি।

মাদল-বাদক

মুখোমুখি দুটি মন্দির এখানেও। এ পাশের মন্দিরে ঘিয়ের প্রদীপ জলছে দেবীমূর্ত্তির সামনে। তার শান্ত আভায় দীপ্ত হয়েছে দেবীর ললাট। পূজারীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম গায়ত্রী দেবী ইনি। আর ওপাশের মন্দিরে শান্ত সমাহিত মহেশ্বর। দুই মন্দিরের মাঝখানে যুঁই ও মাধবীলতার বিন্যাসে রচিত হয়েছে একটি প্রশস্ত মণ্ডপ। অসংখ্য দর্শনার্থীর নিঃশব্দ পদচারণা, সুবিন্যস্ত উদ্যান, প্রাঙ্গণ, গাছপালা, কর্ম্মব্যস্ত ব্রহ্মচারীদের ধীর শান্ত আনাগোনা—সর্বত্র একটা শ্রদ্ধার ভাব মাখানো। কি অপূর্ব সংহত রূপ! সেই শান্ত স্নিগ্ধ রূপ নিমেষে মনকে ভক্তিরসে সিক্ত করে তোলে। সহজ সরল জীবনযাত্রা, এখানে কর্মচাঞ্চল্য আছে, কিন্তু অকারণ ব্যস্ততা নেই; কি গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করছে চারিদিকে। প্রাচীন ভারতের তপোবনের শান্ত মহিমা হয়ত এমনি করেই মানুষের মনকে আকৃষ্ট করত।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে নিতে বেলা শেষ হয়ে এল। হোটেল ডোমিনিয়ন—ভুলব না ক্ষণিকের এই আশ্রয়টিকে।

"জলকে"

আবার পথচলা। বেলাশেষের রক্তিম আভা অস্তদিগন্তে আর আকাশে নীড়ে ফেরা শ্রান্ত পাখীর ঝাঁক। দূর জলাশয়ে 'জলকে' চলেছে সাঁওতালী মেয়ের দল। ছন্দোময় লীলায়িত গতি তাদের।

দূর আকাশে শরতের চাঁদ হাসছে, আর হাসছে সারা পৃথিবী। শালমহুয়ার বনে আলোছায়ার লুকোচুরি, এ যেন কোন মায়াপুরী। সেই বনময় পথে স্তব্ধতার বুক চিরে ছুটেছে গাড়ী। পিছনে পড়ে রইল হাট থেকে ফেরা শ্রান্ত পথিকের দল, গরুর গাড়ীর সারি আর ছোট ছোট সাঁওতাল গ্রামগুলো।

উৎসবে সমবেত গ্রামবাসিগণ

শারদ জ্যোৎস্নার মনমাতানো রূপ আনন্দের বন্যা এনেছে পৃথিবীতে, মানুষের মনেও ছোঁয়াচ লেগেছে তার। তাই বাঁশিতে সুর জাগিয়েছে সাঁওতাল ছেলে, মাদলে তুলেছে

বোল, নৃত্যের দোলা লেগেছে সাঁওতাল মেয়ের দেহে, নৃত্যের তালে দুলছে যেন শাল-মহুয়ার বন—

আরা উপেল বাহা জনম্ ইনা
ও হায় সিরিজল দা তালারে
সিরিজল চিকাতে তিয়েগা।

অর্থাৎ, জলের মাঝে একটি লাল শালুকফুল ফুটেছে। হায়, কি করে তুলে আনব!

বিশ্বের সৌন্দর্যলীলায় মানুষের আদিম প্রকৃতিগত আকৃতি। তাই লাল শালুকফুলের রূপে মুগ্ধ মানবমন সৃষ্টি করেছে ঐ সঙ্গীত। নৃত্যের মধ্যে তার অপূর্ব্ব বিকাশ।

সেই রমণীয় সন্ধ্যায় মহুয়াবনের মনোরম পরিবেশে সাঁওতালী নৃত্যের মায়া আমার মনকে বিভ্রান্ত করে তুলল। বুঝতে পারলাম, অর্দ্ধসমাপ্ত ভ্রমণের যে ক্ষোভ আর বেদনা জমেছিল মনের অলক্ষ্য গভীরে তা কখন অজান্তে অপসারিত হয়ে গেছে।

স্মৃতির খেয়াল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বুঝিতে পারিনে, বিস্মিত হই,
স্মৃতির খেয়াল দেখে,
কত সমারোহ মুছে ঢেকে দেয়,
ছোটখাটো ছবি রেখে।
কোথা বর্ণের উজ্জ্বল ছটা?
কেন বা এমন ঘটে?
তুচ্ছ ও ক্ষীণ ক্ষণিকের ছবি
অটুট চিত্রপটে।
কারে কি যে দেয় দর
শুকায় সাগর, বড় নদ নদী
বহে যায় নির্ঝর।

২

আষাঢ় গগনে নবঘনঘটা
দেখালো যে মোরে ডাকি,
মুরতি তাহার সে শোভার সাথে
স্মৃতি যে রেখেছে আঁকি।
কতই আষাঢ় এলো গেল পুনঃ
করি নি তাহার খোঁজ,
বিচিত্র যেই চিত্রে দিয়েছে
নূতন রঙের পোঁচ।
ব্যাপার কি অদ্ভুত
দামী হ'ল মোর জীবন আষাঢ়ে
মেঘ চেয়ে মেঘদূত।

৩

মাঠের মাঝারে রেল ষ্টেশন
গাড়ীতে উঠায়ে দিতে
বন্ধু এলেন, ক্ষুদ্র ঘটনা—
অঙ্কিত আছে চিতে।
তিনি নাহি আর, নমি গাড়ী হতে,
দ্রুত চলে যায় ট্রেন,
তীর্থ হয়েছে এখন আমার
সেই যে সৃটেশনে।
স্মৃতি বেছে নিল কিরে?
গোলাপগুচ্ছ, চম্পক ফেলি
ছোট আকন্দটিরে?

৪

গভীর রাত্রে, চলেছে গোগাড়ী,
আঁউচ ফুটেছে কোথা?
এখনো আমার বক্ষে তাহার
গন্ধের মধুরতা।

ভুলেছি জলসা, বাদ্যভাণ্ড,
নৃত্যগীতের জাঁক
শুদূর 'চুনারে' মনে পড়ে শোনা
সাঁঝে শিয়ালের ডাক।
বলেছিল ওগো দেখো—
উহাদের সাড়া বিনা আমাদের
সন্ধ্যা মানায় নাকো।

৫

বাঙালী বাবুটি 'সান্তা'রা কেনে
ফেরিওয়ালাকে ডাকি',
'অম্বালার' এক ভবন-দুয়ারে
সেটা স্মরণীয় না কি?
ক্ষণের আলাপে 'লুণ্ঠি কোটালে'
হাতে দিল মোর হাসি,
দুইটি, আপেল যুবক জনেক
'খাইবার পাস' বাসী।
কোথা বড় বড় দান—
স্মৃতি করিয়াছে সব চেয়ে দেখি
তাহাই মূল্যবান।

৬

মনে পড়ে দূরে ছাদ হতে সেই
রুমাল ওড়ানো কার,
কাঁধে ছোট নাতি মেলা হ'তে ঘরে
ফেরে শিখ-সর্দ্দার,
জালন্ধরের সরিষার ক্ষেতে
জানি নে কেন যে স্মরি?
দাঁড়াইয়া ছিল কৃষক-বালিকা
রঙিন ঘাঘরা পরি'।

ঢেকে আছে মন গোটা—
রামধনুকের সপ্ত রঙের
এই সব ছিঁটে ফোঁটা।

৭

বাঁশী বাজাইয়া ষ্টীমার চলেছে,
শুনিলাম যেতে যেতে,
মণিপুরীদের নৃত্য হইবে,
গ্রামের মণ্ডপেতে।
হেরিনু সাজানো রঙ্গমঞ্চ,
জনগণ উৎসাহে—
আলোক লইয়া করে ছুটাছুটি,
অবিরাম পথ চাহে।
সাবাস স্মৃতির দাবি—
মণিপুরী দল এলো কি না সেথা
এখনো যে আমি ভাবি।

৮

স্মৃতির খেয়ালই রঙিন ঝুলিতে
আহরি' রেখেছে মরি,
সুদীর্ঘ মোর জীবন পথের
এই সব মাধুকরী।
কোথাও সিঁদুর আবীরের দানা
প্রসাদের রেণুকণা,
তীর্থমহিমা মাখানো মধুর
গন্ধের আনাগোনা।
উৎসব গেছে চলি'—
কানে ভেসে আসে আজও ভাঙা ভাঙা
ভজন গানের কলি।

উইলিয়ম ইয়েট্‌স

(১৭৯২-১৮৪৫)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভূমিকা

ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের, বিশেষতঃ গদ্য-সাহিত্যের উন্নতির মূলে খ্রীষ্টান মিশনরীদের কৃতিত্ব অসামান্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম কেরীর নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। মিশনকে কেন্দ্র করিয়া কেরীর নেতৃত্বে আরও অনেকে এই কার্য্যে ব্রতী হন। কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী এবং 'সমাচার-দর্পণ' সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সাহিত্য-সাধনার কথাও অনেকে অল্প-বিস্তর অবগত আছেন। উইলিয়ম কেরীর কিঞ্চিং পরবর্ত্তী অথচ এই সাহিত্যসেবীদের সমতুল আর একজন বিশিষ্ট পাদ্রী বা মিশনরী ছিলেন ড. উইলিয়ম ইয়েটস। শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস তথা কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের জীবনীকার ইয়েটস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"Mr. Yates was an eminent linguist, applied with such diligence to the cultivation of Oriental literature, under the able tuition of Dr. Carey, as to become eventually second only to his master as a translator." *

অর্থাং, ইয়েটস ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ, এবং প্রাচ্য ভাষাসমূহে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদির অনুবাদক হিসাবে তদীয় শিক্ষক ড. কেরীর পরেই তাঁহার স্থান।

জন্ম : শৈশব : শিক্ষা

ইংলণ্ডের লো বরা নামক স্থানে ইয়েটস ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার ঝোঁক দৃষ্ট হইত। জনৈক মহিলা বলিয়াছেন, ইয়েটস তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন। ইয়েটস ইংরেজী ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনবরত কথা বলিতে ভালবাসিতেন। তিনি ভাষার বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ সম্পর্কে এমন ভাবে আলাপ জুড়িয়া দিতেন যে, শ্রোতাদের স্বতঃই মনে হইত, ইয়েটস ধরিয়া লইয়াছেন; তাঁহারা ঐ সব আলোচনায় সমান উৎসাহী!

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইয়েটস স্থানীয় ব্যাপটিষ্ট মিশন চার্চ্চে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রিষ্টল ব্যাপটিষ্ট মিশনরীদের এইটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। দীক্ষা গ্রহণান্তর ইয়েটস এখানে আসিয়া খ্রীষ্টশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা ব্যাপটিষ্ট চার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে রত হইতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেন, বিশেষ করিয়া তাঁহাদিগকে এখানে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। বাইশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইয়েটস ব্যাপটিষ্ট চার্চ্চের ধর্ম্মপ্রচার-ব্রত আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ১৮১৪ সনের ৩১শে আগষ্ট। ব্যাপটিষ্ট চার্চ্চের তিন জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—ইয়েটসের অধ্যাপক ড. রাইল্যাণ্ড, রবার্ট হল এবং এণ্ড্রু ফুলারের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ইহার কিছুকাল পরেই মিশন-কর্ত্তৃপক্ষ ইয়েটসকে ভারতীয় শাখার সাহায্যার্থ এদেশে পাঠাইলেন। ১৮১৫ সনের এপ্রিল মাসে 'ময়রা' জাহাজে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন।

শ্রীরামপুরে অবস্থিতি

শ্রীরামপুর তখন এ অঞ্চলে ব্যাপটিষ্ট মিশনের কেন্দ্রস্থল। ইয়েটস অবিলম্বে শ্রীরামপুরে পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া নিজেকে ঈপ্সিত কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কেরীর নেতৃত্বে শিক্ষানবিশী সুরু করিয়া দেন। বিদ্যাচর্চ্চা, বিশেষ করিয়া প্রাচ্যবিদ্যায় অনুশীলন ছিল এ সময়ে তাঁহার প্রধান কার্য। ১৮১৬ সনের মার্চ্চ মাসে ইয়েটস স্বীয় দৈনন্দিন কার্য সম্বন্ধে বিলাতে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লেখেন :

"The way I spend my time is this: In a morning before breakfast I study Hebrew about an hour and a half. After worship I attend to Bengali, and all the Bengali proofs with Dr. Carey, having before compared them with the Greek. I have got through the Sanskrit roots once, have not yet got through the grammar, but am reading the Ramayan with my Pandit. My afternoons are chiefly taken up with reading or hearing Latin or Greek. I have read ten volumes of Greek since I left England, but not more than three of Latin. In the evening, after worship I generally read English, or look over English proofs."*

ইয়েটস প্রাতরাশের পূর্ব্বে দেড় ঘণ্টাকাল হিব্রু পাঠ করিতেন, উপাসনান্তে বাংলা শিক্ষায় নিবিষ্ট হইতেন। মূল গ্রীকের সঙ্গে মিলাইয়া বাংলা প্রুফ দেখায় কেরীকে তিনি সাহায্য করিতেন। এই সময়ে সংস্কৃত ধাতুগুলি একবার পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যাকরণ পাঠ তখনও শেষ হয় নাই। ইয়েটস পণ্ডিতের সাহায্যে ব্যাকরণ পাঠেও লিপ্ত ছিলেন। তিনি অপরাহ্ণে পাঠ করিতেন গ্রীক ও লাটিন পুস্তক। ইংলণ্ড পরিত্যাগের পর ঐ অল্পকালের মধ্যেই তিনি দশ খণ্ড গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, কিন্তু লাটিন সাহিত্য

---

* *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, Vol. II, p. 88.

* *The Calcutta Christian Observer*, September 1845, p. 582.

পড়িতে সমর্থ হন মাত্র তিন খণ্ড। সান্ধ্য প্রার্থনার পর ইয়েটস সাধারণতঃ ইংরেজী পাঠ করিতেন এবং ইংরেজী প্রুফ দেখিতেন। উক্ত পত্রে তিনি আরও লেখেন যে, প্রাত্যহিক কার্য্য ব্যতিরেকে প্রার্থনাদি ব্যাপারও তাঁহাকে পালাক্রমে পরিচালনা করিতে হয়। সপ্তাহে একবার কি দুইবার দুই মাইল দূরে গঙ্গার ওপারে ব্যারাকপুরে তিনি উপাসনা করিতে যাইতেন। গঙ্গা দিয়া নৌকাযোগে মাসে অন্ততঃ একবার তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হয় এই উদ্দেশ্যে।

ইয়েটস কিন্তু বেশী দিন শ্রীরামপুরে রহিলেন না। শ্রীরামপুর মিশন এবং বিলাতস্থ ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির মধ্যে নানা কারণে মতানৈক্য উপস্থিত হয়। এই মতানৈক্য ১৮১৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিচ্ছেদে পরিণত হইল। উইলিয়ম ইয়েটস প্রমুখ নব্য মিশনরীগণ শ্রীরামপুর ত্যাগ করিয়া ঐ বৎসরে কলিকাতায় আসেন এবং বিলাতস্থ ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির কর্ত্তৃত্বাধীনে এখানে একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠন করেন। ইহার পর হইতেই কলিকাতা হইল ইয়েটসের কর্ম্মক্ষেত্র।

কলিকাতা-বাস : প্রথম যুগ

উইলিয়ম ইয়েটসের কলিকাতা-বাস আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম ভাগ—১৮১৭ হইতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়কার কথা প্রথমে বলা হইবে। কলিকাতায় আগমনের পর ইয়েটস শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হন। কেননা ব্যাপটিষ্ট মিশন হইতে তিনি যে মাসহারা পাইতেন তাহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারেরও ব্যয়সঙ্কুলান কঠিন হইত। শিক্ষকতা এবং মিশনের কার্য্য, দুইটি বিষয়েই তাঁহাকে একই সময়ে মনঃসংযোগ করিতে হইল। এসব সত্ত্বেও তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চা কিন্তু অব্যাহত ছিল। নিয়ত অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের ফলে ইয়েটস ক্রমে বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, হিন্দী ও উর্দ্দু—এ ক'টি ভাষায়ই ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ এবং ইহার আনুকূল্যে বিভিন্ন বিষয়ে তদ্‌রচিত পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ ইত্যাদি বিষয় পরে বলিব। এখানে তাঁহার সংস্কৃত-চর্চ্চা সম্বন্ধে একটু বলিতেছি।

সংস্কৃত ভাষা ইয়েটসের ভাষাতত্ত্ব আলোচনার রসদ যোগায় সবচেয়ে বেশী। ইয়েটস এই ভাষা এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুশীলন করেন যে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিতে সমর্থ হইলেন। সংস্কৃতে একখানি শব্দকোষ ('vocabulary') সঙ্কলন করেন এই সময়ে। হিতোপদেশ, নলোদয় প্রভৃতির অভিনব বিশুদ্ধ সংস্করণও তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে ইয়েটসের পাণ্ডিত্যের কথা বিদগ্ধ সমাজে শীঘ্র প্রচারিত হইল। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Asiatic Researches"-এর বিংশতিতম খণ্ডে, ১ম ও ২য় ভাগে ইয়েটস দুইটি প্রবন্ধ লেখেন—একটি সংস্কৃত অলঙ্কার বিষয়ক, অপরটি কাশ্মীরের শ্রীহর্ষ-রচিত নৈষধ-চরিতের আলোচনা।* শেষোক্ত প্রবন্ধটি ১৮৩৬ সনে সোসাইটি কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

নিজ মাতৃভাষা ইংরেজীতেও ইয়েটস পুস্তক প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্পর্কে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার এবিষয়ক রচনাগুলি "Essays in Reply to Rammohan Ray" নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। "Memoirs of Chamberlain" ইয়েটসের আর একখানি ইংরেজী গ্রন্থ। এ ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম্মমূলক পুস্তকাদিও তিনি লিখিয়াছিলেন। ১৮২৫ সনে তিনি লোয়ার সারকুলার রোড চার্চ্চের কর্ম্মকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত হন। অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু ইয়েটসের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকল্পে তিনি আমেরিকা হইয়া বিলাত গমন করেন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে।

কলিকাতা-বাস : দ্বিতীয় যুগ

কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইয়েটস পুনরায় বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল তাঁহার কলিকাতা-বাসের দ্বিতীয় যুগ। তিনি লোয়ার সারকুলার রোড চার্চ্চের পাদ্রীর পদ পুনরায় গ্রহণ করিলেন। এই সময় অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদে তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। সমগ্র বাইবেল গ্রন্থখানি তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। নিউ টেষ্টামেণ্ট অনুবাদ করিলেন আরও তিনটি ভাষায়—উর্দ্দু, হিন্দী এবং সংস্কৃতে। শেষোক্ত ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেণ্টেরও অর্দ্ধেকটা অনূদিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বানিয়ানের "Pilgrim's Progress" (প্রথম খণ্ড) এবং দুই-একখানি অপর ধর্ম্মমূলক পুস্তকও তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ কার্য্যে ইয়েটসের জীবিতকালে তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন পাদ্রী জে, ওয়েঙ্গার। ওয়েঙ্গারও প্রাচ্যবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পাদ্রী ওয়েঙ্গার ইয়েটসের এবম্বিধ অনুবাদ-কার্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"The remarks which I have to offer on the subject of Dr. Yates's character as a Translator of the Scriptures refer exclusively to his Bengali version of the Bible. . . . .

"Often have I admired the beautiful simplicity, transparent cleanness, or the rich brevity of his renderings . . . .

"He also aimed at a style uniformly free and dignified. He allowed of no vulgar expressions, and excluded with equal firmness of determination all high-flow Sanskrit terms . . . .

"If, however, a finely balanced mind, endowed with splendid talents and enriched by

---

* প্রবন্ধ দুইটির নাম :

1. "Essay on Sanskrit Alliteration."
2. "Review of Naisadha Charita, or Adventures of Nala Rajah of Nisadha, a Sanskrit poem."

solid and extensive erudition, rooted in an ardent love of truth, and chastened by humility unfeigned; if these qualities, accompanied by untiring industry, a tender conscience, fervent prayer, constitute a liberal translator, then such a translator was William Yates."*

ইয়েটস কত উঁচুদরের অনুবাদক ছিলেন, ওয়েঙ্গার স্বল্প কথায় এখানে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইয়েটস বিশুদ্ধ অথচ ভাবগম্ভীর রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। সহজ সরল ভাষায় তিনি সর্ব্বদা ভাবপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, আর ইহাতে তিনি বিশেষ সাফল্যও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মূল এবং অনুবাদের ভাষা—দুইটিতেই তাঁহার প্রগাঢ় এবং ব্যাপক জ্ঞান ছিল। এই সময় খ্রীষ্টান পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকায়ও (১৮৩২, জুন হইতে প্রকাশিত) ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন। কলিকাতা-বাসের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির পক্ষে তিনি পাঠ্য পুস্তকাদি লিখিতে যে বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সময়ে তিনি পাঠ্য পুস্তক বাদে বিরাট হিন্দুস্থানী-ইংরেজী ও সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান এবং পাঠ-সংগ্রহ সমেত একখানি বাংলা ব্যাকরণ সঙ্কলনে সবিশেষ তৎপর হইলেন। জীবিতকালে ইহার কোন কোনটির মুদ্রণ অনেকটা অগ্রসর হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর দুই বৎসরের মধ্যেই এ সমুদয়ও প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে উইলিয়ম ইয়েটসের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। তিনি বহু বৎসর যাবৎ এই সোসাইটির ইউরোপীয় সেক্রেটারী বা সম্পাদক হিসাবে অতীব কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সোসাইটি সম্বন্ধে এখানে দু'চার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এদেশে ইংরেজদের স্বাধীন ভাবে বসবাসে যে সকল বাধানিষেধ ছিল ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দের ফলে তাহা দূরীভূত হয়। কাজেই এই সময়ের পর হইতেই বহু ইংরেজ পাদ্রীও এদেশে আসিতে থাকেন এবং নানা স্থানে স্কুল-পাঠশালা স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। এসব স্কুলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এ কার্য্য সাধনের পক্ষে প্রধান অন্তরায়—উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব। এই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দেশী-বিদেশী প্রধানেরা মিলিয়া কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি স্থাপন করেন। এ সময় হইতে বহু বৎসর যাবৎ সোসাইটি ইংরেজ ও বাঙালী তথা ভারতীয় যোগ্য লেখকদের দ্বারা পাঠ্য পুস্তক লিখাইয়া লইয়া সে সমুদয় প্রকাশ ও প্রচার করিতে তৎপর হন। সংস্কৃত, আরবি ফারসি বাংলা, হিন্দী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজী নানা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচিত হইত। পাদ্রী ইয়েটস বহুভাষাবিদ্ এবং এদেশীয়দের মধ্যে নব্যশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহান্বিত; স্বতঃই এই সোসাইটির কার্য্যে সহযোগিতা করিতে তিনি উদ্বুদ্ধ হইলেন। ১৮২৪-২৫ সনে ইয়েটস স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী বা সম্পাদক পদে বৃত হন।

উইলিয়ম ইয়েটস এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যাবৎ ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। সোসাইটির কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক রচনা, সঙ্কলন ও সম্পাদনে তিনি প্রথমাবধি অগ্রসর হন। সোসাইটির আনুকূল্যে তিনি এগুলি ক্রমশঃ বাহির করিতে থাকেন। মিশনরী জীবনের প্রাত্যহিক করণীয় চার্চের কার্য্য এবং সোসাইটির বিবিধ প্রয়াস—প্রতিটির নিমিত্ত তিনি এতই পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং ১৮২৬ সন নাগাদ বিলাতযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সোসাইটির সপ্তম রিপোর্টে (১৮২৬-১৮২৭) ইয়েটস সম্পর্কে উহার অস্থায়ী সম্পাদক এইরূপ উল্লেখ করেন:

"Your Committee beg to express their high sense of the varied services of their Secretary Mr. Yates, in this department; and their regret that protracted indisposition, in consequence of a sedentary life, and close attention to study, should have rendered his visiting Europe necessary to the recruiting of his constitution. They are happy, however, to report, that during his voyage to and from Europe, he will be engaged in preparing works in prosecution of the Society's plans: and that thus on his return, which they expect will be at the end of the present year, they may anticipate great adantages from his labours." (p. 12).

ইয়েটসের অনুপস্থিতি কালে সোসাইটির অস্থায়ী সম্পাদক হইলেন কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব ইউরোপীয় সম্পাদক ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স। ইয়েটসের কৃতির কথা রিপোর্টে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা হইয়াছে, এবং তাঁহারা ইয়েটসের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার নিকট হইতে যেসব কার্য্য আশা করিয়াছিলেন তাহাও অনেকাংশে পূর্ণ হয়। ইয়েটস ১৮২৮ সনের প্রথমে, মনে হয়, কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৮২৮-২৯ সনের (অষ্টম) রিপোর্টে দেখা যায়, তিনি এদেশে আসিয়া পুনরায় সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা দুইখানি পুস্তক—'জ্যোতির্বিদ্যা' এবং 'সত্য ইতিহাস সার' সঙ্কলিত ও অনূদিত হইয়া মুদ্রণেরও ব্যবস্থা হইতেছিল। সেক্রেটারী রূপে তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত। একারণ ১৮৩০-৩১ সন হইতে সোসাইটির কার্য্য পরিচালনের জন্য একাধিক সেক্রেটারী নিযুক্ত হইতে থাকেন। এই বৎসরে তিনি ছিলেন "Recording Secretary"; ১৮৩২-৩৩ সন হইতে ১৮৪৪ সনে পদত্যাগ পর্য্যন্ত তাঁহার পদের নাম ছিল—'Editorial and Minute Secretary'। সোসাইটির

* *The Calcutta Christian Observer*, Sept., 1845, pp. 594, 596-7.

দ্বাদশ রিপোর্টে (১৮৩৬-১৮৩৯) উল্লিখিত হয় যে, ১৮৩৭ সনেই ইয়েটস অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া উক্ত পদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু সোসাইটির কর্তৃপক্ষের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, যোগ্য লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত, তিনি এই পদে কার্য্য করিতে সম্মত হন। আরও প্রায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, অবশেষে ১৮৪৪ সন নাগাদ তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সোসাইটির অধ্যক্ষ সভা তাঁহার মৃত্যুতে (৩রা জুলাই ১৮৪৫) গভীর শোক প্রকাশ করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা এখানেই উল্লেখ করি :

"That the Committee having received the mournful intelligence of the death of the Rev. W. Yates, D.D., for many years Editorial Secretary to the Society, desire to express their sorrow for so great a loss, and to record their sense of his eminent talents, his solid and extensive learning, his unwaried diligence, and of the important services he has rendered both to the Society and to the cause of Education, throughout India."—*The Thirteenth Report* (1840-44), p. 28.

শিক্ষা-সমাজ : পাঠ্য পুস্তক রচনা

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ এ অভাব মিটাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু নব্যশিক্ষা এবং নূতন পরিবেশে পাঠ্য পুস্তক রচনার ধরন পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িল। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাংলা পাঠশালা স্থাপন করিলেন ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার আদর্শে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী-সভার অধীন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাও এই সনের মাঝামাঝি স্থাপিত হইল। উভয় প্রতিষ্ঠানের নিমিত্ত নূতন ধরনের পাঠ্য পুস্তক রচনার আয়োজনও হইল। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ নানা বিষয়ে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তক রচিত হইতে লাগিল।

গবর্ণমেণ্ট তথা শিক্ষা-সমাজ ("Council of Education") দেখিলেন—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পৃথক পৃথক পাঠ্য পুস্তক রচনায় শিক্ষার উদ্দেশ্য-সাম্য রক্ষিত হইতেছে না। বিশেষতঃ হিন্দু কলেজ বাংলা পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকেই অর্থ যোগাইতে হয়, অথচ পাঠ্য পুস্তক রচনায় তাঁহাদের কর্তৃত্ব রক্ষিত হইতেছে না। সরকার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসর যাবৎই বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক রচনার বিষয় ভাবিতেছিলেন। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি এত দিন এ প্রয়োজন মিটাইলেও, নূতন পরিবেশে নূতন ধরনের পাঠ্যপুস্তকের অভাব তাঁহারাও অনুভব করেন। বাংলা পাঠশালায় জন্য রচিত এবং হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ-সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত পুস্তকসমূহ সম্বন্ধে শিক্ষা-সমাজ বিশেষজ্ঞ হিসাবে উইলিয়ম ইয়েটসের অভিমত চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি অন্ততঃ 'শিশু সেবধি' সম্পর্কে বিরূপ মত দেন।[1] এই সব কারণে শিক্ষা-সমাজ "Section of the Council of Education for the preparation of Vernacular Books" নামে একটি সাব-কমিটি গঠন করিলেন। এই সাব-কমিটি বা 'সেকশুন'-কে পরবর্ত্তী কালের সরকারী টেক্স-বুক কমিটির পূর্ব্বজ বলা যাইতে
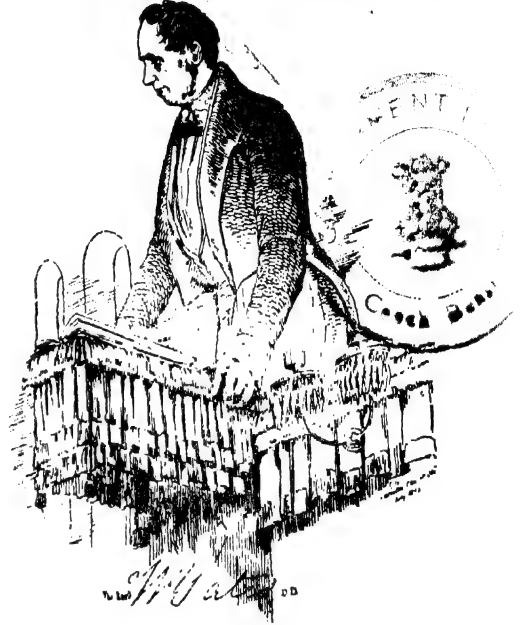
পারে। কি পদ্ধতিতে পাঠ্য পুস্তক রচনা করা যাইবে, সে উদ্দেশ্যে শিক্ষা-সমাজের পক্ষে উক্ত সেকশুন এবারেও কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে ইয়েটসের মতামত চাহিলেন। ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৪২ তারিখে ইয়েটস এইরূপ মত দিলেন :

"I would submit that it is absolutely necessary to the object in view, that the Council of Education should first fix the series of their Class Books in English. As these are prepared they might hand them over to the Section for Vernacular Class Books to be translated into such languages as might be thought desirable, and with such alteration only as the idiom of the language and the usage of the people might require. In this case the object of the Section would be definite and tangible, and I doubt not they would make a steady progress towards its

1 *General Report of the late General Committee of Public Instruction*, for 1840-41 and 1841-42, App. No. VI, pp. xxxvi, xi.

accomplishment, but without this my opinon is, that all the consultations and efforts of the Section will be desultory and unsatisfactory; and the grand desideratum of a regular set of Class Books in the Vernacular languages will never be obtained. In preparing the Series in English the Council might avail themselves of the aid of men of the first talents in England as well as in this country—and that series being prepared, will serve for all the Presidencies ald with some trifling varieties for all the languages of India."*

বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক রচনা ব্যাপারে ইয়েটস দুইটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করিলেন। প্রথমত: পাঠ্য পুস্তকগুলি বিলাতের এবং এখানকার সুযোগ্য গ্রন্থকারদের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে ইংরেজী ভাষায় লিখাইতে হইবে। দ্বিতীয়ত: এই ইংরেজী পুস্তকগুলিই বাংলা এবং অন্যান্য দেশভাষায়, ভাষার স্বকীয় প্রয়োগরীতি এবং স্থানীয় আচার-আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দরকারমত কিছু কিছু বাদ-সাধ দিয়া উপযুক্ত লেখকদের দ্বারা অনুবাদ করাইতে হইবে। আর এই উপায়েই শিক্ষা-সমাজ বিভিন্ন ভাষার ও বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। অন্য যে-কোন উপায়ই অবলম্বন করা যাউক না কেন, তাহা হইবে খাপছাড়া ও অসন্তোষজনক। শিক্ষা-সমাজ ইয়েটসের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া 'সেকশ্যন'কে নিম্নরূপ নির্দ্দেশ দিলেন :

"Ordered. That on the arrival of the expected supply of Chambers' Educational Course, Books be selected from that course for translation and adaptation, and that the Section concurring generally in Dr. Yate's opinion will bear in mind his remarks whenever favourable opportunities occur."

ইয়েটসের অভিমত পুরাপুরি গ্রহণ করিয়া "সেকশ্যন" শিক্ষা-সমাজের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিলাত হইতে 'চেম্বার্স এডুকেশনাল কোর্স'-এর অন্তর্গত পুস্তকাবলী এদেশে আসিয়া পৌঁছিলে উক্তরূপ অনুবাদের ব্যবস্থা করা যাইবে। কিন্তু এই ধরনের প্রথম পুস্তকের জন্য, দেখা যাইতেছে, তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া ডাঃ গ্রান্টের উপর একখানি ইংরেজীতে পাঠ্য পুস্তক রচনার ভার দিলেন। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তৈরী হইলে ইহা হইতে ইয়েটস বাংলায় অনুবাদ করিলেন ; ইহার নাম দেওয়া হইল 'সার-সংগ্রহ'। এখানির পরিচয় আমরা পরে পাইব। তবে সরকার-প্রবর্ত্তিত এই পাঠ্য পুস্তক রচনা-পদ্ধতি যে তেমন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির ত্রয়োদশ রিপোর্টে (১৮৪০-১৮৪৪) সে বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

* *Report of the General Committee of Public Instruction for* 1842-43, p. 26.

সাহিত্য-সাধনা

শ্রীরামপুরে অবস্থান কালে ইয়েটসের সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছি। ১৮১৫-১৮৪৫, মৃত্যুর পূর্ব্বে এদেশ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়ের আভাসও আমরা আগেই পাইয়াছি। ড. কেরী ও ড. মার্শম্যানকে বাদ দিলে, তিনি যে এ বিষয়ে মিশনরীদের মধ্যে অনন্যতুল্য ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাঁহার এই সাহিত্য-সাধনার ফল তিনটি দিকে প্রকটিত হয় : ১ বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা, ২ অভিধান ও ব্যাকরণ সঙ্কলন, এবং ৩ ধর্ম্মগ্রন্থাদির অনুবাদ। ইহা ছাড়া তাঁহার কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তকও আছে। তিনি ইংরেজী সাময়িকপত্রে ভাষাতত্ত্বমূলক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' প্রকাশিত প্রবন্ধের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকায় এই দুইটি ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় : ১ "Theory of the Hindusthani Particle ne ; এবং ২ Theory of the Hebrew verbs"।

সংস্কৃত সাহিত্যে ইয়েটস সাতিশয় ব্যুৎপন্ন হন। তৎসঙ্কলিত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ডাঃ উইলসনের বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের উপরও ইয়েটস বহু নূতন শব্দ যোজনা করিতে সক্ষম হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৪৬ সনে ইহা প্রকাশিত হয়। অভিধানখানির নাম—"A Dictionary in Sanscrit and English, designed for the use of Private Students and of Indian Colleges and Schools"। ইহা ছাড়া হিতোপদেশের বিশুদ্ধ সংস্করণ এবং 'নলোদয়'ও তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণের কথা আগে বলা হইয়াছে। বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের নামে তিনি এই বইখানি উৎসর্গ করেন। সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তকসমূহের এইরূপ উল্লেখ পাই : "A Grammer ; A Vocabulary ; A Reader ; Elements of Natural Philosophy"।*

হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু, হিন্দী এবং আরবি ভাষায়ও তাঁহার বিস্তর পুস্তক রহিয়াছে। সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের মত হিন্দুস্থানী ইংরেজী অভিধানখানিও বেশ বড়। এখানি যে হিন্দুস্থানী ভাষায় পাণ্ডিত্যের দ্যোতক সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। তদ্রচিত হিন্দুস্থানী অন্যান্য পুস্তকের এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় : "An Introduction to the Hindusthani Language ; Selections ; Spelling

* The Calcutta Christian Advocate, 9th August 1845। ১৮৪৫, সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার'-এ উদ্ধৃত। পরবর্ত্তী তালিকাও ইহা হইতে লওয়া হইয়াছে।

Book I & II; Reader I, II and III; Pleasing Tales; Students' Assistant।" তাঁহার হিন্দী বই: "Reader I, II and III; Elements of History"; আরবি বই মাত্র একখানি: "A Reader"। ইহা ব্যতীত ইয়েটস হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় 'নিউ টেষ্টামেন্ট' অনুবাদ করিয়াছিলেন।

উইলিয়ম ইয়েটস বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বিশেষভাবে করিয়াছিলেন। কতকগুলি বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাকে 'পাইওনিয়ার' বা অগ্রদূতের সম্মান দেওয়া চলে। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সংস্পর্শে আসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বহু পুস্তক তিনি বাংলায় অনুবাদ, সঙ্কলন ও সম্পাদন করেন। তিনি এই সকল পুস্তক রচনা, সঙ্কলন ও প্রকাশ সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকায় সমসময়ে এবং পরবর্ত্তীকালে কোন কোন রচনার কৃতিত্ব তাঁহাতেই আরোপিত হইয়াছে। এ কারণে তাঁহার রচিত পুস্তকসমূহ সম্পর্কে পুরাপুরি স্থিরনিশ্চয় হওয়া সম্ভব নয়, যখন সবগুলি এখনও আমরা দেখিতে পারি নাই। তথাপি যে ক'খানি বাংলা পুস্তক দেখিয়াছি, এবং যে সকল পুস্তক সম্বন্ধে কতকটা স্থিরনিশ্চয় হওয়া গিয়াছে এখানে কিছু কিছু মন্তব্য সমেত সেগুলির উল্লেখ করা হইল:

১। পদার্থবিদ্যাসার। অর্থাৎ বালকদিগের পদার্থ শিক্ষার্থে কথোপকথন। ১৮২৫।

এ বইখানির ইংরেজী নাম—"Elements of Natural Philosophy and Natural History in a series of Familiar Dialogues।" কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্টে (৭ম বর্ষ ১৮২৪-২৫, পৃ. ৮) আছে: "One thousand in Bengali and five hundred in Bengali and English have just issued from the press"। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, পুস্তকখানির দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়—একটি শুধু বাংলায় এবং দ্বিতীয়টি বাংলা ও ইংরেজীতে।

২। জ্যোতির্বিদ্যা। ১৮৩০।

ইহার ১৮৩৩-এর সংস্করণ দেখিয়াছি। পুস্তকখানি জেমস ফার্গসন, এফ.আর.এস., রচিত এবং ডেভিড ব্রুষ্টার কর্ত্তৃক সংশোধিত "An Easy Introduction to Astronomy" নামক ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির অষ্টম রিপোর্টে (একাদশ, দ্বাদশ বর্ষ, পৃ ৬) এই মর্ম্মে লিখিত হয় যে, ইয়েটস পুস্তকখানির অনুবাদকার্য্যে দুই জন পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং রাধাকান্ত দেব পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দেন।

৩। সত্য ইতিহাস সার। ১৮৩০।

এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের নাম নাই। ইংরেজী "Celebrated Characters in Ancient History" পুস্তক হইতে অনূদিত। 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান এডভোকেট' ৯ মে ১৮৪৫ সংখ্যায় ইয়েটসের যে গ্রন্থ-তালিকা দিয়াছেন তাহাতে এই পুস্তকখানির উল্লেখ আছে।

৪। প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়। ১৮৩০।

ইংরেজী নাম "An Epitome of Ancient History, containing a Concise Account of the Egyptians, Assyrians, Persians, Grecians, and Romans"। পুস্তকখানির ইংরেজী অংশ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে উইলিয়ম ইয়েটস সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম কুড়ি পৃষ্ঠা হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অনূদিত। অবশিষ্টাংশ চুঁচুড়ার মিঃ পিয়ার্সন অনুবাদ করেন, ইহার বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী এবং দক্ষিণ পৃষ্ঠায় বাংলা দেওয়া হইয়াছে। এখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা মোট ৬২৩।

৫। হিতোপদেশ। বিশুদ্ধ সংস্করণ। ১৮৪১।

পুস্তকখানির ইংরেজীতে এইরূপ উল্লেখ পাইয়াছি—"An Expurgated Edition of Hitopadesh"।

৬। সারসংগ্রহ:। ১৮৪৪

এখানির ইংরেজী নাম—"Vernacular Class Book Reader for the Government Colleges and Schools"। ডাঃ গ্রাণ্ট কৃত ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদ।

৭। পরবর্ত্তী পুস্তক দুই খণ্ডে সমাপ্ত, এবং নাম পুরাপুরি ইংরেজীতে। ইহার আখ্যাপত্র এই—

"Introduction to the Bengali Language./ Vol. I./ By the Late W. Yates, D.D./ in two volumes./ Edited by J. Wenger./ Containing a Grammer, a Reader, and Explanatory Notes,/ with an Index and Vocabulary,/... Calcutta/ 1847./..../;—Vol. II, 1847."

এই ব্যাকরণখানি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে রচিত, পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইয়েটস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কালে, ১৮৪৫ সনের জুন মাসে ইহা তাঁহার সহকর্ম্মী পাদ্রী জে. ওয়েঙ্গারের নিকট রাখিয়া যান। প্রথম খণ্ডের ব্যাকরণ বাদে অন্ত অংশ অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে। ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষে ফিরিয়া ইহা সম্পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। পাদ্রী জে. ওয়েঙ্গার এই মূল্যবান পুস্তক সম্পাদনা ও প্রকাশের ভার লইলেন। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দুইটি ভূমিকা: "Author's Preface" এবং "Editor's Preface"। দ্বিতীয় খণ্ডে একটি "Prefatory Note" সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহারও সম্পাদক জে. ওয়েঙ্গার। পুস্তকের কতটা ইয়েটস রচনা ও সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, এবং কতটাই বা ওয়েঙ্গারের কৃত, "Editor's Preface"-এর নিম্নাংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে:

"He (the Editor) found that the Grammar, the Preface, and the table or contents to the second volume were prepared and he also discovered some materials intended for the Reader, with a few hints respecting their arrangement. It may therefore be said that the author wrote the Grammar, and furnished the plan for the whole whilst the Editor must be responsible for nearly all the rest."

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল অংশ ইয়েটস কর্তৃক সঙ্কলিত। এই অংশে শুধু দেশীয় লেখকদের রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশ ইয়েটস যেরূপ ঠিক করিয়াছিলেন, সম্পাদক ওয়েঙ্গার তাহা অনুরূপ করিয়াছেন। ইয়েটস বাংলা প্রবাদ ও নীতিবচন সঙ্কলন করিয়া পরিশিষ্টে দিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহা সঙ্কলন করিয়া যান নাই। সম্পাদক ইহার পরিবর্ত্তে দেশীয় কবিদের কবিতা এবং সাময়িক সাহিত্যের অংশবিশেষ নমুনাস্বরূপ ইহাতে সংযোজিত করিয়াছেন।

ধর্ম্মগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ : ইয়েটস সমগ্র বাইবেল গ্রন্থ অনুবাদে উদ্যোগী হন। তাঁহার এই অনুবাদকার্য্যে কলিকাতার অন্যান্য ব্যাপটিষ্ট মিশনরীগণ সাহায্য করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কেননা ১৮৫২ সনের পরবর্তী সংস্করণে "Translated by Calcutta Baptist Missionaries" এইরূপ উল্লেখ আছে। তবে ইয়েটস যে মূলতঃ ইহার অনুবাদক সে বিষয়েও সংশয় নাই। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউ টেষ্টামেণ্ট "ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ" এই নামে বাংলায় কিন্তু রোমান অক্ষরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন। তৎকৃত 'ওল্ড টেষ্টামেণ্টে'র অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। এক বৎসর পরে, ১৮৪৫ সনে এই দুইখানি পুস্তক বাংলা অক্ষরে বাহির হয়। ১৮৫২ সনে প্রকাশিত সংস্করণে পুস্তকের আখ্যাপত্রে নাম দেখিতেছি—"ধর্ম্মপুস্তক অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মনিয়ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ"।

মৃত্যু

ইয়েটস ত্রিশ বৎসর কাল (মধ্যে প্রায় দুই বৎসর বাদে) এদেশে কাটান। ধর্ম্মপ্রচার এবং জ্ঞান-অনুশীলন দুই-ই সমানে চলিয়াছিল। তিনি ১৮৪৫ সনের জুন মাসে স্বাস্থ্যলাভার্থ স্বদেশে রওনা হইলেন। কিন্তু জাহাজেই তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। এডেন বন্দর অতিক্রম করিয়া জাহাজ লোহিত সাগরে পড়িলে ১৮৪৫, ৩রা জুলাই তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতল সমুদ্রে তাঁহার শব নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপে একটি কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটিল। ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য এবং ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে উইলিয়ম ইয়েটসের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।*

* আমি "উইলিয়ম ইয়েটস" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সংক্ষিপ্তাকারে প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৫-এ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধটিতে বহু নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।—লেখক
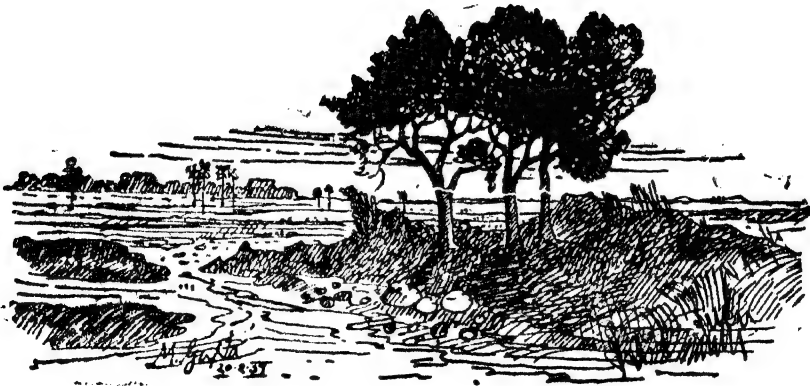
শোক

শ্রীতরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

সারা বাড়ীটায় ছড়িয়ে রয়েছে বিষাদের ছায়া। আজ মহালয়া। আজকের এই উৎসব-দিনটি একটি বিশেষ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। গত বৎসরের বেদনাবিক্ষুব্ধ একটি স্মৃতি। এই দিনেই নন্তু মারা গিয়েছিল—এ বাড়ীর বছরছয়েকের ছেলে। সরমার আর পাঁচটি ছেলেপুলের মধ্যে নন্তু ছিল মেজ। সে মারা গিয়েছিল একেবারে হঠাৎ। কয়েক ঘণ্টার নোটিশে ডিপথিরিয়া রোগে।

স্ত্রীর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখখানা সকাল থেকেই লক্ষ্য করছিল অরুণাংশু। আর দেখছিল ওর একটা এড়িয়ে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা। নিজেরও যে নন্তুকে মনে পড়ে নি তা নয়। বুকটা বার বার মোচড় দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সরমাকে মনে পড়িয়ে দিতে চায় নি। তার কি আর মনে পড়ছে না যে, এই দিনটিতেই সকালে, এতক্ষণে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে এই স্বল্পপরিসর বাড়ীটা। এই একটি মাত্র শোয়ার ঘরে বন্ধুবান্ধব, পাড়া-পড়শীরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আর নন্তুর সেই বিকট কাতরানি—তার পর ডাক্তারের ঘন ঘন আসা-যাওয়া—প্রতি বারের ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দেখে নন্তুর সেই আর্ত চিৎকার। জোর করে প্রতি বার চেপে ধরে রাখতে হয়েছে নন্তুকে। সরমা কোনবারেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি সামনে। ঠিক ঐ সময়টায় টিনের শেড দেওয়া রান্নাঘরের এক কোণে কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। তার-পর সন্ধ্যাবেলার সেই ঘনিয়ে আসা অন্তিম সময়টা। মৃত পাণ্ডুর একটি শিশুর মুখ—সরমার বুকফাটা আর্তনাদ—আর সবার শেষে শক্ত কাঠের মত মন নিয়ে সরমার বুক থেকে নন্তুকে ছিনিয়ে নিয়ে অরুণাংশুর মন্থর গতিতে বেরিয়ে যাওয়া। সবই স্পষ্ট মনে আছে, এতটুকু ম্লান হয়ে যায় নি।

সেদিন আর আজ। দুর্গতিনাশিনীর আগমন-সূচনায় সেদিনও ছিল দিগ্‌বিদিক মুখরিত এবং আজও তাই। কিন্তু এসব আনন্দের ছিটেফোঁটা এ বাড়ীকে স্পর্শ করে নি।

সকালবেলায়ই কখন উঠে গেছে সরমা। অন্য দিন অরুণাংশু ঘুমিয়েই থাকে। তবু যাবার সময় একবার সরমা ঠেলে জাগিয়ে দিয়ে যায় স্বামীকে। আজ কিন্তু আর তেমনটি হয় নি। ছুটির দিন, একটু বেলা করে উঠে, মুখ হাত-পা ধুয়ে খুঁটিনাটি কাজ সারতে বেলা প্রায় আটটা। স্মৃতিটা মনের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছিল। খোঁচাটা আরও তীক্ষ্ণ হ'ল কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ যখন মনে হ'ল, সরমার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয় নি সকাল থেকে। বারকয়েক বোধ হয় কাজ নিয়ে ঘরে এসেছে গেছে, কিন্তু কোন কথা বলে নি। চা পাঠিয়ে দিয়েছে বড় ছেলের হাত দিয়ে। এড়িয়ে এড়িয়ে রয়েছে সরমা। ছেলেদের নিয়ে সেই সকালে রান্নাঘরে ঢুকে কি করছে কে জানে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল অরুণাংশু। ছেলেদের কলরবটা ত আর রান্নাঘরে নেই—পাশের বাড়ীর রোয়াকে শোনা যাচ্ছে। রান্নাঘরেও কোন শব্দ নেই। কোথাও গেছে নাকি সরমা! ভাঙা উঠোন পার হয়ে, কাদা প্যাচপ্যাচে রান্নাঘরের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি মারতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল অরুণাংশু। সরমা একলা বসে কুটনো কুটছে হেঁট মুখে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হ'ল—রক্তজবার মত অশ্রু-ভারাক্রান্ত দুটি চোখ। তুলেই আবার নামিয়ে নিল। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল অরুণাংশু।

এই জন্যেই সরমা এড়িয়ে এড়িয়ে রয়েছে সারা সকাল। দাওয়ার খুঁটি ধরে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল অরুণাংশু। আগের বছরের সেই বিষাদমাখা দিনটি। সেই ভিড়, সবাই ত্রস্ত, ব্যস্ত, মৃত পাণ্ডুর একটি শিশুর মুখ, আর শেষটা নন্তুকে বুকে জড়িয়ে...।

—বাজার যাবে না?

কখন নিঃশব্দে এসে বাজারের থলিটা এগিয়ে ধরেছে সরমা। মুখ চোখ পরিষ্কার করে মোছা—আঁচলের ভিজে দাগগুলি তারই সাক্ষী। বেশ স্পষ্ট ভাবেই এবার তাকিয়েছে। মুখে একটা জোর করে ফুটিয়ে তোলা হাসি-হাসি ভাব। বললে—যাও, বাজারটা করে আন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে—তুমি আবার মন খারাপ করো না—যে গেছে সে কি আর...চোখ দুটি নত করে নিতে হ'ল, দ্রুত চলে যেতে হ'ল সামনে থেকে।

সান্ত্বনা দিতে এসেছিল স্বামীকে সরমা—শোকে সান্ত্বনা। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে বাজারে বেরিয়ে গেল অরুণাংশু।

দুপুরের দিকে বাড়ীর থমথমে আবহাওয়াটা অনেকটা সহজ হয়ে এল। গতানুগতিক কাজের মধ্যে সকালবেলাকার বেদনাক্ষুব্ধ মনটা ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে

উঠল। অনেকটা ভুলে রইল সরমা। সেদিনের সেই শোকটা সহ্য হতে হতে তার তীব্রতা এমনিতেই অনেকখানি কমে এসেছে—চাপা পড়ে গেছে একটু একটু করে—ছেলেপুলে স্বামী সংসার নিয়ে অনেক কাজের মধ্যে ক্রমশঃ তলিয়ে গেছে। তবু আজকের এই বিশেষ দিনটিতে শোকটা আবার একবার নতুন করে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। হয়ত প্রতি মহালয়ার দিনটিতে এমনি হবে—নন্তু একবার নিজেকে মনে পড়িয়ে দেবে আনন্দ-কলরবের মাঝে—আবার এ বাড়ীর অনেক কাজের ভিড়ে তলিয়ে থাকবে সারা বছর।

ছেলেদের হৈ চৈ, তাদের নাওয়ানো-খাওয়ানো ইত্যাদি সারতে সারতে বেলা প্রায় একটা। মেঝেয় মাদুর পেতে চারটি ছেলেকে নিয়ে গল্পে মেতে উঠল সরমা। বেশ সহজ মন নিয়ে ওদের আদর আবদারের কথা শুনল, জবাব দিয়ে গেল। বছরতিনেকের আর চারেকের ছেলে দুটিকে দু'পাশ থেকে আগলে রেখেছে বুকে। সাত বছরের আর পাঁচ বছরের অপর বড় দু'জন ছোট দুটির দু'পাশে আছে শুয়ে। অনর্গল সব বকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সরমা সাবধান করে দিচ্ছে—এই আস্তে, বাবা শুয়ে আছে না খাটে ?

অরুণাংশু উপরে খাটে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে নেই, ঘুমোবার ভান করে পড়ে আছে। আড়াল থেকে মা আর ছেলেদের কথাবার্তা উপভোগ করছে। বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে সরমার মন। নন্তু এখন আর সব ক'টি ছেলেদের মধ্যে তলিয়ে গেছে। একবার মনে হ'ল ওদের আলাপে যোগ দেবে নাকি ? অমন একটা স্নেহস্নিগ্ধ পরিবেশের বাইরে সেই-বা পড়ে থাকবে কেন ?

কথাবার্তার মোড় ঘুরে গেল। আর ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়া গেল না। বড় ছেলেটি জিজ্ঞেস করে বসেছে—এবার আমাদের পুজোর জামাকাপড় হবে না মা ?

—হবে রে, হবে। মা সান্ত্বনা দিল। আর তিনটিও দাদার অনুকরণে একেবারে উঠে বসে হৈ হৈ করে উঠল—আর কবে হবে মা ?

মা বললে—দাঁড়া দাঁড়া—অত ব্যস্ত হোস কেন, তোদের বাবা বোনাসের টাকাটা আগে পাক।

সরমা একবার খাটের উপর চোখ বুলিয়ে নিল। না, ঘুমোচ্ছেই। জেগে থাকলে জিজ্ঞেস করা যেত বোনাসের টাকাটা পেয়েছে কিনা। অন্যান্য বছর ত মহালয়ার আগেই পেয়ে যায়।

অরুণাংশু শুয়ে শুয়ে ভাবল টাকা পঞ্চাশটা কালই পাওয়া গেছে। কথাটা আর বলা হয়ে ওঠে নি সরমাকে। ভাবল এবার উঠে বসবে নাকি! বোনাস প্রাপ্তির খবরটা এখখুনি প্রকাশ করে দিয়ে এদের আরও খুশী করে তুলবে নাকি।

কিন্তু এবারেও ওঠা হ'ল না। বড়টি আবদার তুলেছে—ক্যাম্বিসের জুতো আর নেব না মা—বড় তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়। পাশের বাড়ীর ছেলেরা কেমন সুন্দর চামড়ার জুতো পরে। আর তিনটিও সুরে সুর মিলাল।

সরমা বিশেষ কিছু বলতে পারল না। আচ্ছা সে দেখা যাবে, বলে প্রসঙ্গটা চাপা দিল। ক্যাম্বিসের জুতোগুলি সত্যিই টেকে না। বড়জোর ছ'মাস। তারপর ছেঁড়া জুতোয় তালিতুলি মেরে কোনগতিকে আর ছ'মাস, বাকি মাসকয়েক একরকম খালি পায়েই চালিয়ে নিতে হয়। কিন্তু ক্যাম্বিসের জুতো ছাড়া ত অন্য কিছু কিনে দেবার উপায় নেই। সরমার সব হিসেব নিজের হাতেই কষা আছে। আগের দু'বছর ঐ পঞ্চাশ টাকায় পাঁচটি ছেলের কোন রকমে কুলিয়েছিল। একটা শার্ট চার টাকা, প্যান্ট তিন টাকা, আর ক্যাম্বিসের জুতো আড়াই-তিনের মধ্যে—এই ভাবে পাঁচ জনের গড়পড়তা দশ টাকা ধরে, পঞ্চাশ টাকায় ছেলেদের পুজার বাজার হয়েছিল। গেল দু'বছরে সরমার নিজের জন্যে কিছু হয়ে ওঠে নি। আগে যখন এরা ছোট ছিল, নিদেনপক্ষে একটা তাঁতের শাড়ি ওরই মধ্যে কুলিয়ে যেত। এখন হয় না। অরুণাংশু দু'বারই বিষণ্ণ মুখে বলেছিল—'তোমার কিছু হবে না ?'—'ছেলেরা বড় হয়েছে, মায়ের আর সেজে কাজ নেই।'—এই জবাব দিয়ে পাশ কাটিয়ে সরে গেছে সরমা। অর্থাৎ, যখন কিছু হবার সামর্থ্য নেই, তখন হবে না—এতে দুঃখের কি আছে।...

অরুণাংশুর ঠাকুরদার আমলের দেয়াল-ঘড়িটায় চারটা বাজল। সরমা এবার উঠে পড়ল। আঁচ দিতে হবে, চা করতে হবে—অনেক কাজ। এবার অরুণাংশুকেও উঠতে হ'ল। এদের কথায় যোগ দেব দেব করে দেওয়া হয়ে ওঠে নি। কথা শেষ হয়ে এল প্রায়—তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

—কি এত বকর বকর করছিলি রে তোরা ?

চাবির থোলোশুদ্ধ আঁচলটা পিঠের উপরে ফেলে দিয়ে সরমা বললে—বোনাসের টাকাটা পেয়েছ ?

—ও হ্যাঁ, কালই ত পেয়েছি।

—এদের নিয়ে আজ একটু ঘুরে এস না বাজারে।

—তা বেশ ত, যাব।

—এরা সব বলছে চামড়ার জুতো নেবে।

—দেখি, ওর মধ্যেই ত কুলোতে হবে।

—তা ছাড়া আর উপায় কি।

হাসিমুখে সরমা বেরিয়ে যেতে, ছেলেদের নিয়ে ঘিরে বসল অরুণাংশু—কি কি নিবি সব বল। মনটা বেশ প্রফুল্ল

হয়ে উঠেছে। মা ছেলেদের নিয়ে বেশ আমোদ করে গেল—এবার বাপের পালা।...

জামা প্যাণ্ট কেনা হ'ল বাজার ঘুরে। এবার জুতোর দোকান, সরমা দেখতে বলেছে চামড়ার জুতো। চারটি ছেলে সারি সারি চেয়ারে বসেছে, তাদেরও ঐ আবদার। পকেটের টাকাগুলো ঝেড়ে হিসেব করে নিল অরুণাংশু। আগের বছরের হিসেবমত—জামা চার টাকা, প্যাণ্ট তিন টাকা, চার আর তিনে সাত, চার জনের আটাশ টাকা হওয়া উচিত, খরচ হয়েছে প্রায় ত্রিশ টাকা। বাকি পঞ্চাশের মধ্যে আছে প্রায় কুড়ি টাকা। পাঁচ টাকা করে একজনের জুতো ধরলে চার জনের কুড়ি টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। বাঃ, এই ত বেশ কুলিয়ে যাচ্ছে। খুশীমনে চামড়ার জুতো দেখাবার নির্দ্দেশ দিয়ে, আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল অরুণাংশু। আগের বারে ত কুলোয় নি, এবার কি করে কুলোল। কয়েকটা মুহূর্ত্ত, বেশীক্ষণ লাগল না সূত্রটা ধরে ফেলতে—নস্তুর হিসেবটা মুছে গিয়ে এদের হিসেবে যুক্ত হয়ে গেছে। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অরুণাংশু।...

ছেলেরা সব প্যাকেটগুলো বগলে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ী ঢুকল। রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল সরমা। হাসি-হাসি মুখ। অরুণাংশু এক নিমেষ তার মুখের দিকে চেয়ে ঘরে চলে এল। কেমন একটা সঙ্কোচ, একটা আড়ষ্টতা—স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না—ও ভুলে আছে, ভুলে থাক - যতক্ষণ পারে ভুলে থাক।

ছেলেদের নিয়ে ঘরে ঢুকল সরমা। দেখি, দেখি, তোদের কি সব হ'ল। মেঝেয় বসল সব ক'টিকে নিয়ে। খুব হৈ চৈ, আনন্দে মশগুল সব। অরুণাংশুর টেবিলের উপর কি একটা খোঁজার খুব দরকার পড়ে গেল।

জামাগুলো সব দেখা হ'ল। চামড়ার জুতো দেখে ছেলেদের মত মাও মহা খুশী। সরমা বললে—এই ত বেশ চামড়ার জুতো হয়েছে তোদের।

—আমাকে পরিয়ে দাও, আমায় আগে। তাড়া দিচ্ছে সবাই। এক এক করে পরিয়ে দিয়ে দেখছে সরমা। অরুণাংশুর টেবিলে এখনও খোঁজা শেষ হয় নি।

সরমা তাড়া দিল—কি গো, কি হ'ল তোমার? দেখ না কি রকম হ'ল সব!

পেছন না ফিরেই অরুণাংশু বললে—আমি ত দেখেই কিনেছি। আমি আর কি দেখব—তুমি দেখ।

—বেশ হয়েছে সব, কিন্তু ওরই মধ্যে কুলিয়ে গেল ত?

—হ্যাঁ। উত্তরটা অস্পষ্ট স্বরে দিয়েই সিঁটিয়ে রইল অরুণাংশু। প্রসঙ্গটা কোন রকমে কি এড়ানো যায় না?

—কি করে কুলোল?

আর জবাব দেওয়া গেল না। মিনিটকয়েক চুপচাপ দু'জনেই। হিসেবটা মেলাতে অরুণাংশুর যতটুকু সময় লেগেছিল, সরমারও তাই। তার পরেই একটা ছোট্ট অস্ফুট স্বর—ওঃ।

হিসেব মিলে গেছে সরমার। হেঁট হয়ে ছেলেদের জুতোর ফিতে পরাতে পরাতে চোখ দুটো জ্বালা করে জলে ভরে উঠল।

ছেলেরা তখন মাকে ধরে পড়েছে—কারটা ভাল হয়েছে মা, কারটা?

সব ক'টি ছেলেকে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে টেনে নিয়ে এল কোলের কাছে সরমা। মুখে হাসি, চোখে জল নিয়ে বললে সবাইকারটাই খুব সুন্দর হয়েছে। তার পর হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ দুটি ভাল করে মুছে নিল। এমন একটা সুন্দর মুহূর্ত্তে চোখের জল ফেলতে নেই মাকে—ছেলেদের অকল্যাণ হয়। কথাটা হঠাৎই মনে পড়ে গেছে সরমার।
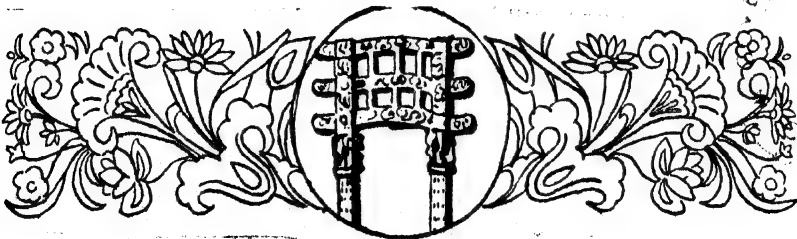
দুঃশীলের শীলগ্রহণ

মারের দীক্ষা

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

মথুরা নগরীর উপকণ্ঠে, এক অরণ্যে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত আশ্রয় নিয়েছেন। অপূর্বচরিত্র দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় এই মহাপুরুষকে দর্শন এবং তাঁর উপদেশ শ্রবণ করবার জন্য প্রতিদিন বহু জনসমাগম হচ্ছে।

একদিন এক বিরাট সভায় উপগুপ্ত ধর্মব্যাখ্যা করছেন। জনতা নীরবে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর উপদেশ শ্রবণ করছে—এমন সময় সহসা আকাশ হতে মুক্তাবর্ষণ হ'ল। জনতা চঞ্চল হয়ে উঠলো। একাধিকবার ঐরূপ মুক্তাবর্ষণ হওয়ায়, উপগুপ্তের ধর্মোপদেশে আর কারও চিত্তই আকৃষ্ট হ'ল না।

উপগুপ্ত বিস্মিত হলেন। হঠাৎ এরূপ মুক্তাবর্ষণ হ'ল কেন? এর কারণ কি? ধ্যানযোগে তিনি অবগত হলেন —ধর্মের বৈরী মারের এই কীর্তি।

পরদিন সভায় অধিকতর জনসমাগম হ'ল। কারণ চতুর্দিকে সংবাদ রটেছিল উপগুপ্ত যখন ধর্মপ্রচার করেন, তখন আকাশ হতে মুক্তাবর্ষণ হয়। সেদিনের সভায় উপগুপ্ত যখন বুদ্ধপ্রচারিত সত্য ব্যাখ্যা করছেন—তখন সহসা সুবর্ণ বর্ষণ শুরু হ'ল। বলা বাহুল্য, জনতা ধর্মের চেয়ে সুবর্ণের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হ'ল।

তৃতীয় দিনের সভায় অভূতপূর্ব জনসমাগম হ'ল। ধর্মোপদেশ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—মার অনতিদূরে নাটক আরম্ভ করেছেন। দিব্যবাদ্য সহযোগে স্বর্গীয় সঙ্গীত এবং সেই ঐক্যতানে পরমাসুন্দরী অপ্সরাগণ নৃত্য করছেন। এই দৃশ্য সমস্ত জনগণের মন হরণ করল। বীতরাগ সাধুগণের পর্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। নিজের সাফল্যে উৎসাহিত মার উপহাসপূর্বক উপগুপ্তের কণ্ঠে মাল্যদান করলেন।

উপগুপ্ত চিন্তিত হলেন। ধর্মের এই পরমশত্রু মারকে তথাগত কেন দমন করলেন না—তাঁর মনে এই প্রশ্ন উদিত হ'ল। যাই হোক, মারকে তিনিই দমন করবেন—এইরূপ সঙ্কল্প করে তিনটি বিভিন্ন জাতীয় কঙ্কাল তিনি সংগ্রহ করলেন। একটি মনুষ্যের, একটি কুক্কুরের ও একটি সর্পের। ঋদ্ধিবলে এই কঙ্কাল তিনটিকে পুষ্পমাল্যে পরিণত করে তিনি মারের দিকে অগ্রসর হলেন। "উপগুপ্তও এই প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়েছেন।"—এই ভেবে মার অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। উপগুপ্ত সেই মাল্য, মারের শীর্ষে ও কণ্ঠে অর্পণ করলেন। মারও নত হয়ে তা গ্রহণ করলেন। এই ভাবে কি ভয়ঙ্কর বিপদ তিনি শিরোধার্য করলেন, হায়! তা যদি তাঁর বোধগম্য হ'ত। উপগুপ্ত বললেন:

"সন্ন্যাসী ভিক্ষুর মাল্যধারণ
জান তুমি বেশ, আছে শাস্ত্রে বারণ!
তথাপি পরায়ে মালা কণ্ঠে আমার
লাঞ্ছনা কর মোরে, গর্বিত মার!
রূপে তব যত প্রীতি
কংকালে তত ভীতি,
হোক তাই কণ্ঠের হার।
পরিয়া হাড়ের মালা
গর্ব তোমার,
কেমন, এবার হলো
খর্ব ত মার?"

পুষ্পমাল্যের পরিবর্তে শীর্ষে ও কণ্ঠে, সেই ভয়ঙ্কর কুৎসিত কঙ্কাল দর্শন করে সন্ত্রস্ত মার সেই কঙ্কালগ্রন্থি ছিন্ন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি কৃতকার্য হলেন না। তখন তিনি আকাশে উত্থিত হয়ে উপগুপ্তকে বললেন:

"খুলিতে না পারি তবু
মনেতে ভেবো না কভু
খুলিবে না এ দৃঢ় বাঁধন।
দেবতা যতেক আছে
ছুটিব সবার কাছে
অসাধ্য করিবে সাধন।"

উপগুপ্ত উত্তর দিলেন:

"ছাড়ি এই তপোভুমি
যেথা খুশি যাও তুমি
যারে খুশি কর আবেদন।
ছুটে যাও অমরায়
দেবতার নম পায়
ইন্দ্রের লও গে শরণ।

কুবের বরুণ যম
হয় যদি অক্ষম
ব্রহ্মার ধর গে চরণ।"

স্বর্গে একে একে পবন, বরুণ, যম, কুবের, ইন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবতার নিকট মার গমন করলেন। কিন্তু কেহই তাঁর ঐ বন্ধন মোচন করতে সক্ষম হলেন না। তখন নিরুপায় মার স্বয়ং ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হলেন।

ব্রহ্মা বললেন :

"শকতি আমার যদিও অনেক তবু
সীমা আছে তার, অসীম নহে সে কভু।
অগ্নি যদিও কম নয় কিছু তেজে
সূর্যের কাছে দাঁড়াতে পারে না সে যে!"

তথাপি মার যখন তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগলেন, তখন ব্রহ্মা বললেন :

"পদ্মের নালের সূত্রে বাঁধি
হিমালয়ে উখাড়িতে চাও?
হয়ত পারিবে কেহ তাও!
বুদ্ধের সেবক-বদ্ধ কংকালের হার
খুলে দেবে, সাধ্য আছে কার?"

বিভীষিকাগ্রস্ত মার করযোড়ে জিজ্ঞেস করলেন—"তবে আমি আর কার শরণ নেব?" ব্রহ্মা উত্তর দিলেন :

"আছাড় খাইয়া, মাটিতে পড়ে যে-কেহ
মাটিরেই ধরি, তুলে সে নিজের দেহ।
হাড়ের এ মালা পরালেন যিনি গলে
খুলিবেন তিনি, পড় গিয়ে পদতলে!"

ব্রহ্মার উত্তর শুনে মার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন :

বুদ্ধের সেবক এক, তাঁরও কাছে ব্রহ্মা মানে হার!
আশ্চর্য ঘটনা হেরি, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'ল মার।
"না জানি কত না শক্তি ধরিতেন বুদ্ধ তথাগত,
কত না লাঞ্ছনা হায়, তাঁরে আমি করেছি নিয়ত!
মুখের আহার তাঁর নিয়েছি কাড়িয়া—আমি মূঢ়মতি!
কন নাই কোন কটু কথা। করেন নি কভু কোন ক্ষতি।
শক্তিগর্বে গর্বিত বালক! বুঝি নাই তাঁর শক্তিলেশ
অবহেলে করিলে প্রয়োগ, দেহ মোর হ'ত ভস্মশেষ!
সয়েচেন শত অত্যাচার, হোক না সে যত ক্লেশকর,
জনকের মত রক্ষা মোরে, করেছেন করুণা-সাগর!"

পূর্ব-আচরিত পাপকর্মে নিতান্ত অনুতপ্ত মার উপগুপ্তের চরণে নিপতিত হয়ে বললেন :

"ক্ষমা কর মোরে, হে বীর তুমি,
এই আমি তব চরণ চুমি।
ধর্মের আজি লইনু শরণ
মুক্ত কর হে কোপ-আভরণ।"

উপগুপ্ত বললেন, "বন্ধন মোচন করেছি, কিন্তু আমার একটি কাজ করতে হবে।"

মার উল্লসিত হয়ে বললেন—"প্রভু, আজ্ঞা করুন।"

উপগুপ্ত বললেন—"তথাগতের পরিনির্বাণের শতবর্ষ পরে আমার জন্ম। তাঁর সেই পরম রূপবান দেহ দর্শন করবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তুমি সর্বপ্রকার রূপ-ধারণে সক্ষম। তথাগতের রূপ ধারণ করে' তুমি তাঁর শূর নামক ভক্তকে মোহিত করেছিলে। আমাকে তাঁর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করাও। আমি কৃতার্থ হই।"

মার বললেন—"তার পূর্বে আপনাকে এক প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

উপগুপ্ত শুধালেন—"কি প্রতিজ্ঞা?"

মার বললেন—"তথাগতের রূপ দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে আপনি আমায় প্রণাম করবেন না :

"স্মরিয়া সুগতে নাথ
কর যদি প্রণিপাত,
ভস্ম হবে এ তনু আমার।
সাধকের শ্রদ্ধাভক্তি
সহ্য করে হেন শক্তি
ধরে নাকো ক্ষুদ্রশক্তি মার।"

উপগুপ্ত বললেন—"প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাকে প্রণাম করব না।"

মার তখন গহন অরণ্যে প্রবেশ করলেন। অতঃপর সুদক্ষ নটের ন্যায় তথাগতের রূপ পরিগ্রহণ করে, তিনি উপগুপ্তের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

সেই অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করে উপগুপ্তের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'ল। বিস্ময়বিমুগ্ধ কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন :

"দাঁড়াল সম্মুখে একি লভিয়া আকার
মম শত জনমের তপস্যার ফল!
স্নিগ্ধ শান্ত মুখখানি তনু-শোভা-সার
মানস-সরসজলে শুভ্র শতদল।
বিকচ নয়ন দুটি সমুজ্জ্বল মণি,
শোভিতেছে সুষমায় জিনি নীলোৎপল।
হেরি দুঃখ ত্রিলোকের দিবসরজনী
করুণার সুধারসে স্নিগ্ধ সমুচ্ছল!
বিন্ধ্য হিমাচল পরাজিত ধীরতায়।

তেজে তিরস্কৃত রবি, গাম্ভীর্যে সাগর।
গতিতে ধিক্কৃত সিংহ অরণ্যে লুকায়
তনুর চম্পকবর্ণে ম্লান চামীকর।
"চন্দ্র সূর্য হয়ে যায় ম্লান
অপূর্ব এ রূপে মূর্চ্ছি তাঁর।

কর্মবলে সৃষ্ট এই রূপ!
সৃষ্ট নহে খেয়ালী ধাতার!
"শত শত জনমের শুভকর্ম যত
প্রেম, সেবা, ক্ষমা, দয়া দানধ্যান আদি ;
তারি বলে হিংসা দ্বেষ করিয়া সংযত
চিত্তের ঐশ্বর্য মাঝে লভিয়া সমাধি
সৃজিলা নিজের রূপ নিজে তথাগত!"

বুদ্ধের স্বরূপ চিন্তায় বিভোর উপগুপ্ত স্থান, কাল, পাত্র, সমস্ত বিস্মৃত হয়ে মারের পদতলে দণ্ডবৎ লুণ্ঠিত হলেন। ভীত, সচকিত মার কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন—"অন্যায়! অন্যায়! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা অন্যায়!"

উপগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন—"কি প্রতিজ্ঞা?"

মার বল্লেন—"প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—আমাকে প্রণাম করবেন না। কিন্তু আপনি আমায় প্রণাম করলেন।"

উপগুপ্ত গদ্‌গদ কণ্ঠে উত্তর দিলেনঃ

"আমি কি জানিনা শতাব্দী আগে তথাগত ভগবান
জলেতে আহত অনলের মত লভেছেন নিরবাণ!
তথাপি যখন কুসুমকোমল অমলকান্তি তাঁর
হেরিনু সমুখে নমিনু চরণে, নমিনি তোমারে মার।"

মার আশ্চর্য হয়ে বল্লেন—"আমি স্বচক্ষে দেখলাম, আপনি আমায় প্রণাম করলেন। এখন বলছেন, 'তোমাকে প্রণাম করিনি'। একি কথা!"

উপগুপ্ত বল্লেন—"শোন!
মাটীর প্রতিমা গড়ি
যবে দেবতার
সমুখে নমিয়া পূজি,
পূজা করি কার?
সুগতের রূপধারী
সমুখে তোমার
প্রণমিনু যাঁরে, সে তো
তুমি নহ মার!"

অতঃপর মার উপগুপ্তকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে' প্রস্থান করলেন।

পরদিন তিনি স্বয়ং মথুরায় ঘণ্টার দ্বারা ঘোষণা করলেনঃ

"হীনতা দীনতা যত
অনর্থের মূল
ধ্বংস করি লভিবে না
ঐশ্বর্য অতুল?
ওঠ, জাগো! তপস্যায়
লভ ইন্দ্রপদ,
অমরায়! লভ মুক্তি
পরমাসম্পদ!
দেখ নাই তথাগতে
দুঃখ তায় কিবা?
নব বুদ্ধ অবতীর্ণ
সমুজ্জ্বল বিভা!
অনির্বাণ দীপজ্যোতিঃ
সদা আছে জ্বলি,
নাশি ঘোর তমোরাশি
ত্রিলোক উজলি।"*

* অশ্বঘোষের "সূত্রালঙ্কার" হইতে গৃহীত

পবন-দূত

অনুবাদক শ্রীরামপ্রসাদ ঠাকুর চক্রবর্ত্তী

প্রস্তাবনা: সংস্কৃত সাহিত্যের আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্য দুই ভাগে বিভক্ত, যথা, দৃশ্য এবং শ্রাব্য। তাহার মধ্যে দৃশ্য—অভিনেয় নাটকাদি এবং শ্রাব্য—কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং কথাকাব্য প্রভৃতি। দূতকাব্যগুলি এই খণ্ডকাব্যেরই অন্তর্গত। সংস্কৃত সাহিত্যে যতগুলি দূতকাব্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে মহাকবি কালিদাস প্রণীত মেঘদূতই প্রথম এবং প্রাচীনতম। সুতরাং এই মেঘদূতেরই অনুসরণ করিয়া বহু প্রাচীন কবি নানা ভাবে পবন-দূত হংস-দূত, উদ্ধব-দূত, পদাঙ্ক-দূত, এবং মনো-দূত প্রভৃতি দূতকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের সহিত আর কোনও দূতকাব্যেরই তুলনা হয় না। তবে অন্যান্য দূতকাব্য অপেক্ষা গুণ-গরিমায়, রচনা-ভঙ্গীতে, গাম্ভীর্য্যে এবং প্রাচীনত্বে পবন-দূত যে মেঘদূতেরই পরে স্থাপনীয় তাহাতেও কোনই সন্দেহ নাই। কারণ পবন-দূতের উপজীব্য বস্তুও অতি সরস এবং কারুণ্যের প্রতীক্।

মলয়-পর্ব্বতবাসিনী গন্ধর্ব্বকন্যা কুবলয়বতী ইহার নায়িকা এবং গৌড়াধিপতি মহারাজ চক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণসেন ইহার নায়ক। দাক্ষিণাত্য বিজয়ের প্রসঙ্গে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ এবং বিরহে অবসন্না কুবলয়বতী, মলয়ানিলকে দূত নিযুক্ত করিয়া মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কবি মলয়-পর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রমার মধ্য দিয়া দূত মলয়ানিলকে গৌড়বঙ্গে আনয়ন করিয়া, কুবলয়বতীর বিরহজনিত চরম অবস্থার কথা দূতমুখে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই ইহার মাধুর্য্য অপরিসীম এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

লক্ষ্মণসেনের রাজসভায়, আচার্য্য হলায়ুধ, আচার্য্য পশুপতি, ভক্তচূড়ামণি জয়দেব, নীতিবিৎ পুরুষোত্তম এবং কবিরাজ-চক্রবর্ত্তী ধোয়ীক, পাণ্ডিত্যে, ব্রাহ্মণ্যে, ভক্তিমার্গে, নীতিশাস্ত্রে এবং কবিত্বে তাৎকালিক গৌড়বঙ্গ উজ্জ্বল করিয়া বর্ত্তমান ছিলেন। মহাকবি ধোয়ীক তাঁহার পবন-দূতের উপসংহারে কবিপ্রশস্তির প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে "কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী" এই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন ভক্তচূড়ামণি জয়দেব গোস্বামীও তাঁহার গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে চতুর্থ শ্লোকের চতুর্থ চরণে লিখিয়াছেন—"ধোয়ী কবিঃক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী।" সুতরাং নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে, কবিরাজ-চক্রবর্ত্তী ধোয়ীক পবন-দূত রচনা করিয়াই গৌড়বঙ্গে তাৎকালিক কবিগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই মহাকবি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া গৌড়ের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু তিনি কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনও পরিচয় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। পবন-দূত রচনা করিয়া তিনি যে কেবল কবিরাজ-চক্রবর্ত্তী এই উপাধিটি লাভ করিয়াছিলেন তাহাই নহে; দন্তিব্যূহ, কনকহার, সুবর্ণচামর এবং স্বর্ণদণ্ড ও রাজ-পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"নিরাশ্রয়া ন শোভন্তে, কবিতা, বনিতা লতা।"

গ্রন্থারম্ভ

১

নিখিল ভুবনে সুন্দর ছিল, চন্দন নামে গিরি;
কনক-নগরী রমণীয় তায়,—দেব-গায়নের বাস।*
হেমময় লীলা-ভবন-শিখরে, অম্বর-তল ঘিরি,
সুর-নগরের শাখা-গণনায়, ধরেছিল—যে বিলাস।

২

কুবলয়বতী নামে তথা সেই, সুতা উপদেবতার;
ভুবন-বিজয়ে লক্ষ্মণসেন, নামে সে ক্ষৌণীপালে।
কুসুমের চেয়ে মৃত্যুঞ্জয়শীল, ধনুকাম-দেবতার,
হেরিয়া সদ্যঃ পড়িল বালিকা, মদনের শর-জালে।

৩

প্রথম বয়সে সখী-পুর-বাসে, কামেরে করিয়া হেলা;
পাণ্ডুরক্ষাম কাতর তনুতে যাপিয়াছে নিশিদিন।
মধুমাসে হায়! দক্ষিণ বায়, বহিলে সন্ধ্যাবেলা;
গাঢ় উদ্বেগে প্রণমি তাহায়, যাতনায় থাকে লীন।

৪

তুমি হে পবন! জীবের জীবন, প্রকৃতিতে মহীয়ান্;
বেগময় তুমি মনের অভিন, নিখিলের প্রাণবলে।
তাই তব পাশে প্রার্থনা আশে, আসিয়াছি কর দান;
তোমা সম জ্ঞানে হয় না বিফল, কখনো ভিক্ষাফলে।

৫

বিরহ-বিধুর শ্রীরামের দশা, নিরখি সে হনুমান;
সাগরের পারে গিয়েছিল এবে, পশিতে লঙ্কাপুরে।
আমারি লাগিয়া যাবে তুমি তার, জনকের গতিমান;
গৌড়ীয় ভূমি মলয়গিরির, পাদ হতে কিছু দূরে।

---

* দেব-গায়েন এবং উপদেবতা, গন্ধর্ব্বজাতীয় দেবতার নাম।

৬

নিশ্চিত তুমি মধুমাসে সেথা, হেরিবে সে নরপালে ;
গাঢ় উপবনে আবৃত গগন, জানিও গৌড়দেশ।
নৃপতির কাছে কহিও আমার, যে দশা হেরিলে ভালে ;
করুণায় তব পরের কারণ, ত্রিভুবনে বিনিবেশ॥

৭

চন্দন-তরু হতে হরি লও, রমণীয় পরিমল ;
দ্রুত চলে যাও ত্যজিয়া কানন, মলয়ের সানুভরা।
মৈথুন-কেলিরত মৎসর, এই যে ভুজগ-দল ;
গণ্ডূষে পান না করে যাবৎ, ভোগচ্ছলে তোমা ত্বরা॥

৮

মলয়-গিরির ত্যজি পরিসর, ক্রোশ দুই সবে দূর ;
ধরণীর শোভা কি যেন আর এক, যাইবে পাণ্ড্য-দেশ ;
ক্রমুক-তরুর বন্ধ যেথায়, ভজিও উরগ-পুর ;
তাম্রপর্ণী তটিনীর তীরে, প্রশান্ত যে বিশেষ॥

* *

১০

লীলা-গিরি যদি, ভুজগ-নগরী—রমণীর মনোরম ;
শৃঙ্খলাদামে জল-বারণের, লম্বিত সেতু যেন।
জানকীর স্নেহে আশ্বাস তরে, জীবনের প্রিয়তম ;
ধরণীর বাহু মনে হয় ওই, একটি লঙ্কা যেন।

* *

১২

লীলা-নিকেতনে অমরাবতীর, গর্ব্ব করিছে চূর ;
দক্ষিণা-পথে ভূষণ যে সেই, কাঞ্চী-নগরে যেও।
নগরজনের প্রহরীর প্রায়, করিতে বিঘ্ন দূর ;
মদন যেথায় ধরি' ফুল্ল-শর, জাগরে রাত্রি সেও॥

১৩

কৌতুক-রসে, জল-কেলি-বশে, শিথিল উত্তরীয় ;
রমণী-হৃদয় হেরিবে তথায়, পাংশুবর্ণে আঁকা।
সুবলা সদ্য তালে সখীপ্রায়, বীচি-করে ফেন শ্বীয় ;
মনে হয় যেন, মেঘে লীলায়িত, অঞ্চলে বুক ঢাকা।

* *

১৫

অবিনীত নারী সেবিত কুঞ্জ,—ত্যজিয়া কাঞ্চীপুরে ;
বিহগ-কুলের কলকল রবে, আকুল কাবেরী যেও।
প্রিয়তমা হতে সুখ-পরশন, চন্দ্রিকা থাকে দূরে ;
এমন স্বচ্ছ অতি লঘু জল, ভিখারীর চেয়ে সে-ও॥

* *

১৭

লীলা-নদী-সম কাবেরীর সেই, গতিবেগে কটি-মিতে ;
দক্ষিণা-পথে তরুণীরা যদি, লীলা-কেলি করে জলে।
লহরী তুলিয়া হারে তাহাদের, স্তন-পরিসরে দিতে ;
কুন্দ-ধবল বিন্দুতে তার, সৃজিও মুক্তা-ফলে॥

১৮

অতিকায় কত পাষাণে রচিত, স্নিগ্ধ শ্যামল গিরি
বর্দ্ধিত যেন ধরা কেশ-জাল, হেরিও মাল্যবানে।
নির্ঝর-জলে আজিও যেথায়, জর্জ্জর দেহ ধরি ;
গম্ভীর-শোকে সূচিছে রামের, বিগত অশ্রুবাণে॥

১৯

সরল-পাদপে ঘেরা উপান্ত, রমণীয় সরোবর ;
মাণ্ডকর্ণি-নির্ম্মিত সেই, ইন্দ্রের তাপহারী।
আজিও যেথায় দেব-তরুণীর, সঙ্গীত মনোহর,
উপগতরাগ মৃগ-দলে করে, উৎকণ্ঠিত ভারি॥

* *

২১

জনপদ-বধূ-স্নানে বিহ্বল, গোদাবরী নদীতীরে ;
ছাড়িয়া অন্ধ্র প্রবেশিবে তুমি, কলিঙ্গের রাজপুর।
সম্ভোগ-শেষে মুকুল-নয়না, বারনারী তরে ধীরে ;
কেলি-বাতায়নে পশিও তথায় করিবারে গ্লানি দূর॥

২২

বীচি-বিক্ষোভে রচিত অনেক, সোপানের শ্রেণীরেখা ;
ফল-ভারে নত পূগ-বনে ঘেরা, জলধির তীরে যাবে।
গীতিকা-মুখর সিদ্ধনারীর, মিলিবে সেখানে দেখা ;
তাল অনুকারী রচিও শব্দ, শ্রুতি-সুখে তারা গাবে॥

* *

২৪

বিন্ধ্যের সানু-প্রণয়ে অধীর, উন্নত তরু-শিরে ;
বিহগ-কাকলি-মুখরিত বন, বিচর রম্য রসে।
অভিমানে ভরা ভিল্ল-রমণী, নির্জ্জনে যথা ধীরে ;
দয়িত-কণ্ঠে করে বাহুদান, বৃংহণে ভীতিবশে॥

২৫

স্বেচ্ছা-লীলায় রসিকা শবরী, কুঞ্জে করিছে স্নান ;
নবশুক-প্রায় শ্যাম-বেণু-বনে, যাইবে সে রেবাতটে।
লৌকিক-ভূমে প্রৌঢ়া নারীর, লীলায়িত অভিমান ;
মনে করে যুবা বুঝি এই ভান, কেলির বিঘ্ন বটে॥

দিল্লীর লালকেল্লায় শ্রী আর. এন. আগরওয়ালার নিকট হইতে ইউনেস্কো কনফারেন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ হাইঞ্জ ফন ট্রুয়েশলারের মানপত্র গ্রহণ

সংবর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দের একাংশ

সখী-সংলাপ

[ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

"কানে কানে"

[ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

২৬

কেরলী-নারীর রতি-লীলা যদি, নয়নে হেরিতে চাও ;
পশিয়া ত্বরায় যযাতির সেই, খ্যাতিময় রাজধানী।
অশ্লেষে ভরা, পূগতরু ঘেরা তাম্বূলী-বনে যাও ;
শিখাইছে তারা বালিকায় যথা, প্রিয়-রঞ্জনখানি ॥

*　　*

*　　*

২৯

গমনে তোমার কৈলাস-পথে, হেরিবে সে হিমাচলে ;
চারু অভিরাম নগর সেথায়, মহেশের প্রিয় ধাম।
ছলে যথাকৃত প্রিয় নখ-লেখা, অঙ্কিত কুচে গলে ;
দয়িতের ভূষা শশিকলা ভুলে, বারনারী বহে কাম ॥

৩০

নমিয়া চলিও ভাগীরথী-তীরে, রঘুকুল গুরুদেবে ;
রমণীর দেহে মিলিত অতুল, অর্দ্ধনারীশ্বর।
রমণের প্রেমে জাত অভিমান, ভুলিয়া যাহারা সেবে ;
হেরিবে তথায় জ্রূলতা-শোভন, প্রেমিকের সমাদর ॥

৩১

মন্দাকিনীর অন্তর-ভরা, রম্য সে ভূমি-ধারে ;
শ্রীবল্লালের কীর্ত্তি সুহৃৎ, সেবিবে বাঁধ সেতুর।
স্বর্গনদীর স্নানে সমাকুল, অগণিত জন-ভারে ;
মনে হয় যেন অমর নগর, দুই ভাগে ভরপুর ॥

৩২

ফেনের গুচ্ছে রচিত মকর, বীচি করে বহি শিরে ;
পরিসর-শোভা মরালের দলে, কর্ণ-ভূষণ করি।
উদ্ধত-বেশে ধরিবারে কেশ, প্রেম-লালসায় ধীরে ;
প্রিয়-জলধিতে ছুটিছে গঙ্গা, সেবিবে তাহারে বরি ॥

৩৩

জল-কেলি-তরে মুগ্ধ-রমণী, সরসে পশিলে তায় ;
স্তন-মৃগ-মদ ক্ষালিত তাদের গঙ্গার বীচি-ঘাতে।
শ্যামলিমা পুনঃ ধরিয়া যমুনা, যে দেশে বহিয়া যায় ;
জগৎ-পাবন যাইবে সে দেশে, ভকতির নতি-পাতে ॥

৩৪

প্রকৃতি-কুটিল গমনে বক্র, প্রবাহে চিত্ররীতি ;
মন্দাকিনীর জঠরে জন্ম, নিরখি যমুনা-জল।
মুক্ত-খোলস কাল-ভুজগীর, শঙ্কায় জাত ভীতি ;
ত্রস্ত কাতর করিছে সকল, কিবা তোমাজনে ফল ॥

৩৫

লীলাবতী নারী মিলিয়া তথায়, কেলি করে সদা জলে ;
লহরী তুলিয়া রচিবে তাদের, বুকের বসনে চ্যুতি।
মাঝে তাহাদের রতি-দরশনে, সদ্য ব্যাকুল দলে ;
লীলা-সুচিকণ হসিত আনিবে, প্রাবরণে অনুভূতি ॥

৩৬

বিজয়-নগর স্কন্ধাবারের, উন্নত রাজধানী ;
ভুবন-বিজয়ী সে মহারাজার, দেখিয়া-চলিবে ধীরে।
তোমা সম সেই চতুর কপট, গঙ্গার বায়ু জানি ;
সম্ভোগ-শেষে পুর-রমণীর, শান্তি বিতরে তীরে ॥

৩৭

কেলি-কুতুহলে পঙ্কজসম, বল্লভ-কর-তটে ;
পরশে তাহারা পুলক-মুকুলা, সুন্দর জ্রূশোভায়।
নির্জনে তার কোনরূপে করে, উন্নীত হৃদপটে ;
সৌধের চূড়া যথা লীন প্রায়, কাঠের পুতুলী গায় ॥

৩৮

পুরনারী যত, প্রাঙ্গণে রোপে, ক্রমুক বৃক্ষকুলে,
স্নিগ্ধ-নিশির রমণ-মণিতে, বাঁধা তার আলবাল।
অযতনে সেথা উপজাত জলে, সিক্ত নিশীথে মূলে ;
পুর-রমণীর সিঞ্চন-লোভে, যাপে না তাহারা কাল ॥

৩৯

ভাগীরথী-রাগে প্রকৃতি বিমল, নৃপকরে প্রপালিত ;
স্বরগ ধরায় উপজাত ভয়ে, যেথা ভীত পুরজন।
প্রণয়-কলহে রূঢ় কোপে ভরা, জ্রূকুটিতে পরিচিত ;
ভীষণবদনা ললনা হইতে, সদা তারা ভীত মন ॥

৪০

কান হতে টানি নয়ন-কাজলে, আঁকিয়া মরমলেখা ;
তালীর পত্রে মৃণাল-সূত্রে, বাঁধিয়া সে লিপিখানি।
যেথা ললনার অধর-কান্তি, সিন্দুরে রুচি-রেখা ;
তাপের শোধন করিলে প্রেরণ, প্রিয়তরে প্রেম মানি ॥

*　　*

৪২

কুঙ্কুম-রাগে রক্ত অধর, কুচ-ভারে নত প্রায় ;
মদনের বাণে তপ্ত হৃদয়, ব্যসনে আন্দোলিত।
কেলি-সুরসিক সুন্দরী যত, নির্জল বাপিকায় ;
মালতীর দামে জ্যোছনা নিশীথে যুবজনে তোষে কত ॥

৪৩

বল্লভ তরে ভ্রমণে ব্যাকুল, নিবিড় অন্ধকারে ;
পুর-ললনার চরণ-গলিত, লাক্ষার রাগ-রেখা ।
রক্তাশোকের স্তবকে ললিত, তপনের দ্যুতি-ভারে ;
রজনী-বিগমে নাহি যায় যেথা, পুর-পথে কভু দেখা ॥

৪৪

মরকত-আর মুকুতা রতন, মিলিয়া ইন্দ্রনীলে,
প্রবালে শঙ্খে রচিত বলয়, যথা যুব-ললনার ।
কুম্ভমুনির গণ্ডূষে প্রায়, নিঃশেষ সে সলিলে ;
রমণীয় রূপ করিয়াছে ম্লান, সুললিত শোভা যায় ॥

৪৫

মুখরতা-হীন মরকত দলে, রচিত কণ্ঠহারে ;
মৃগ-মদে কালো পিচ্ছিল কুচে, যেথানে রমণীদল ।
মদন-অনলে দীপ্ত করিয়া, চিত্ত স্নেহের ভারে ;
ঘন তমসায় চলিছে ছুটিয়া, প্রিয়তম-গৃহতল ॥

৪৬

আয়তলোচনা যতনে বহিয়া, অবিনয় লিপিখানি ;
বাহিরিল যেথা ক্ষালন করিতে, সহসা হৃদয়-ভার ।
চরণে প্রণত দয়িতে হেরিয়া, মিলনে বাসনা মানি ;
কাজলে শ্যামল অশ্রুবিন্দু, ত্যজিছে মানিনী তার ॥

*   *

৪৮

ত্রিদশ-যুবতী-বিজয়ে চতুর, মদনের সেনা যথা ;
আহ্লাদ-ভরে ব্যোম-কান্তারে, শিখিয়া সুপ্রয়াণ ।
মনসিজ-গুরু আগমনে তব, কত মৃগআঁখি তথা ;
উদ্যান-দোলা বিলাস চাতুরী, দেখায় মূর্তিমান ॥

*   *

৫০

কেলি-বিলসিত প্রাসাদ-শিখরে, নিশীথে যুবতী যত ;
প্রণয়-কলহে বহে অভিমান, বৃথা চারু প্রিয় ভাষ ।
শিরের ভূষণ কুবলয় মালা, রোষে প্রহরণে রত ;
চ্যুত মালিকায় ব্যথিত ইন্দু, করে সদা দানে লাস ॥

*   *

*   *

৫৩

যাইবে চলিয়া তুমি তার পর, রমণীয় রাজ-বাসে ;
দেখিবে সেথায় সপ্ত কক্ষে, শোভিত সে রাজপুর ।
পুঞ্জিত-ধরা-সম ভবনের, শিখরে অভ্রিলাসে ;
শ্রান্ত জলদ বিতরে চপলা, পতাকায় ভরপুর ॥

৫৪

দেখিবে পশিয়া স্নিগ্ধ শ্যামল, দ্রাবিত ইন্দ্রনীলে ;
অবনী-নারীর রোমরাজি প্রায়, বিরচিত বাপীশোভে ।
তীরে লীলাগতি অতি যুবতীর, বিহরণে প্রীতি মিলে ;
মনে হয় যেন দীক্ষা তাদের, হংস প্রদানে লোভে ॥

৫৫

মদনের প্রায় রূপের বিভায়, রাজাসনে উপনীত ;
সেবিবে সে দেবে ব্যথিত সময়, চামরের সহবাসে ।
দুর্ব্বার গতি স্নিগ্ধ দীপ্ত, অসি যার চমকিত ;
রণে রিপু বধূ-লোচনে জলের, পরাভব আনে ত্রাসে ॥

*   *

৫৭

সেন-পরিবারে এই সে নৃপতি, হেন ত্রাসে কুতূহলে ;
মৃণাল-লতিকাসম ভুজে রাখি, ফুল্ল কমলানন ।
বঙ্কিম গ্রীবা পুরনারী যত, নেত্র-কমল-দলে ;
অরি নগরীর অবরোধে যায়—দানিছে দৃষ্টি মন ॥

৫৮

ক্রীড়ানিকেতনে অতি পুরাতন, দয়িতের প্রতিকৃতি ;
ধারণ করিয়া চিত্তের প্রায়, বিহগের কলনাদে ।
রুদ্ধবেদন অরাতি নগরী, অপনীত প্রায় প্রীতি ;
সৌধের গায় জাত তৃণছলে, অলক বহিয়া কাঁদে ॥

৫৯

ক্রীড়া-রোষ-বশে শোভনা রমণী, হননীয় প্রিয় জনে ;
ত্যজিয়া পলায় পুলকে মজিয়া, বহিয়া ব্যথিত মন ।
পাহাড়ের পথে ভ্রমিতেছ কেন ! ক্রুর কুশে ভরা বনে ;
অরি নগরীর সারিকারা প্রায়, হেন করে বিলপন ॥

৬০

হেন কালে যদি কখনো সে রাজা, বাসরের সীমামূলে ;
শক্তির চাপে অতিবাহ করে, স্মরিয়া অন্তরায় ।
প্রার্থনা মম তপনো পবন ! বলিবে না তারে ভুলে ;
কার্য্য-ব্যস্ত-হৃদয়ে বিলাস, বিরাম নাহি গো চায় ॥

৬১

শুভ অবসর গনি তার পর, নির্জ্জনে কামীনাথে ;
বিনয়ে চতুর, নম্র শোভন ! কথা তব আরম্ভিবে ।
অবকাশে চির প্রণয়ীজনের, কার্য্য অল্প সাথে ;
সক্ষম যদি লভিতে সিদ্ধি, নাহি কথা পার্থিবে ॥

৬২

চন্দন-গিরি-শিখরে যে বাস, কোন উপদেবতার ;
কুবলয়বতী নামে তথা এক, আছে নারী মনোরম।
মলয় পবন বলিয়া আমায়, জানিও দূতটি তার ;
বিরহ-বিধুর কামী-যুগলের, মিলনে যে অনুপম ॥

৬৩

অতি বেগে দেব ! দক্ষিণা-পথে জিনিয়া নৃপতিকুল,
ফিরিলে হরিয়া চিত্ত তাহার, মলয়ের সানুদেশে।
দূরে গেলে প্রিয় বৃথা পরিবেদ, হেন ব্যথা দৃঢ়মূল ;
বাষ্পীয়-পীড়া দরশন-পথ, রোধিল সহসা এসে ॥

৬৪

কৌতুক-বশে আয়ত-নয়ন, উন্নত গ্রীবা তায় ;
হরষে, আশায় ভূমে নিবেশিয়া, চরণের পুরোভাগ।
সৌধ-শিখরে বসিয়া শোভনা, কি যেন হেরিতে চায় ;
সমীপে তোমার গমনে ব্যগ্র, রোধিয়া অশ্রুরাগ ॥

৬৫

কুবলয়বতী মৃগ-নয়নার, নয়নের পথে যবে ;
পড়ে ছিলে তুমি নয়নানন্দ ! ললনার প্রিয়তম।
জানি আমি সেই হতে সে রমণী, সন্তাপ-পরিভবে ;
রমণীয় রূপ করে না কখনো প্রত্যয়ে মনোরম ॥

৬৬

মুষ্টি পরিধি করি হ'ত বিধি, পড়িয়াছে কটি তায় ;
মনে হয় বালা কুসুম-আয়ুধে, কার্ম্মুক তরে গড়া।
শোন নররাজ ! কঠিন-বিরহে, বহিয়া সে কৃশকায় ;
মৌর্ব্বীর প্রায় এখনি শোভনা, আহা ! কি কালিমা-ভরা ॥

৬৭

বলহে তরলে ! হৃদয়ে তোমার, হেরিছ সতত যাঁরে ;
কেবা সে কান্ত ? যতনে সখীরা, শুধাইছে হেন যত।
নিঃশ্বাসে ত্যজি চিত্রিত কামে, কোনরূপে হেরিবারে ;
রোধিয়া অশ্রুভিত্তি-ফলকে, দৃষ্টি হানিছে কত ॥

৬৮

কর্ণে ভ্রষ্ট তালীর পত্রে হেরি প্রিয় ললনার ;
তোমাতে জড়িত প্রেমলিপি ভ্রম, ধরে সে বালিকা মূল।
বারতা তোমার ক্রীড়াশুকগণে, জিজ্ঞাসে অনিবার ;
গাঢ় অভিভূত অর্থীর ভাব, কোথায় গনে বা কূল ॥

৬৯

নয়নে হেরে না, কর্ণভূষণ, উৎপলে সদা রোষ ;
ক্লান্ত বলিয়া বাহু-লতিকায়, মালিকা নাহি সে পরে।
তাপের দীপন বলিয়া কমলে, উদ্‌বেগে ভাবে দোষ ;
মীলিত নয়নে হৃদয়ে সখীর, পরশনে ভয় করে ॥

৭০

সরস-কুসুম কল্পতরুর, প্রান্তে যামিনী যাপে ;
শুষ্ক পঙ্কে শফরী-লীলার, করে ভয়ে বিনিগম।
নয়ন-নলিনে নলিনীর প্রায়, বহে ধারা সদা তাপে ;
মনে হয় বালা কোন রূপে দিবা, করে পুনঃ অতিগম ॥

৭১

হিমময় জলে শমনীয় নয়, অন্তরে হেন জ্বলে ;
চন্দন-রেণু-প্রবাহে সে তাপ, সাধনীয় কভু নয়।
তোমা হতে বালা লভিয়া এ জ্বালা, নিন্দে মদনে ছলে ;
সুস্থ যদিও সমতা মুগ্ধ, বিরহে কে কবে সয় ॥

৭২

লীলা-বনবাসে পোষে মনে দ্বেষ, চন্দনে বাধা আনে ;
সরস-নলিনী-বৃন্ত-সমীরে, করে সদা অনাদর।
বিরহে তোমার কোন রূপে তাতে, রাখিয়াছে বালা প্রাণে ;
মূর্চ্ছা-বিগমে সখী অভিমত, বিধি-দশা হেন তার।

৭৩

চন্দ্রমা হেরি করে সদা দ্বেষ, কেশে নাহি ধরে করে ;
দূরে ফেলে হার, মলয়জ-রসে, নিন্দনে পরিতোষ।
বলিতে তোমায় দশাটি হে দেব ! কিছু বালা-প্রীতি-তরে ;
উদ্‌বেগ-ভরে বাসর কাটায়, স্মরিয়া কবিতা-কোষ ।

৭৪

প্রথমে তাহার রোধিয়া পক্ষ্ম, ছুটিল অশ্রুরাশি ;
নয়নের পথে উদিল ত্বরায়, চুমিতে গণ্ডদেশ।
ওষ্ঠ অধর পানিয়া কণ্ঠে, ঝরিল সহসা আসি ;
বিরহে তোমার কুচকোলে তার ; শয়নে কি নহে শেষ ।

৭৫

বিরহে তোমার মদন-বহ্নি প্রশ্বাসে প্রদীপিত ;
করে নাই আজো মৃগ-নয়নার, ভস্ম সে দেহখানি।
জানি আমি দেব ! দ্রোণি সম তায়, নয়নে তা প্রভাবিত ;
অথবা সতত মনোগত তব শৈত্য-প্রভাবে মানি ।

৭৬

শান্তির কোলে যামিনী যখন, ঈষৎ মুদিয়া আঁখি ;—
গাঢ় অনুরাগে স্বপনে তোমায়, লভি বালা কোন রূপে।
স্বীয় তনুখানি করে আশ্লেষ, পরে জাগরণে থাকি ;
সখী-মুখপানে লজ্জা-চপল, মুখখানি সে আনে চুপে ॥

৭৭

চাঁদিমা হইতে রমণীয় উপবন-ভূমে, বালা দ্বেষে ;
সখীসনে কভু করে না আলাপ, অধোমুখে সদা রয়।
মদনের বাণে রাখিতে জীবন, নিয়ত সে দীন বেশে ;
হৃদয়ে ধরিছে চিত্র-ফলক, তব প্রতি শোভাময় ॥

৭৮

দুদিনে ভরা চাঁদিমার মত, নয়নে অশ্রু বহে ;
প্রশ্বাসে করে বকুলগন্ধ আঘ্রাণে, কত আশ ।
অলি-গুঞ্জনে শ্রবণে লোলুপ, মূর্চ্ছার বাধা সহে ;
করুণা-কাতর কেন হে তাহার, নিরখি সে দশাবাস ॥

৭৯

চিত্তের ভাব করুণায় ভরা, বিরহে সদা বিরাগ ;
কুসুম-বিশিখে রোষপরবশ, নিয়ত সে নিজে ঘৃণে ;
এইরূপে স্বীয় বশে রহি সেন, আশ্রয়ে ধরি রাগ ,
তোমাতে নিভৃত স্থির নিবেশিতভাবে আনে, দীনা ঋণে ॥

৮০

সখী-জনে ছিল প্রেম-রমণীয়, পুরাতন কথা যত ;
অতি দয়াহীন তোমা সনে দেব ! মিলনের আশা নাই ;
চিন্তা তাহার বিরহ-জনিত, ভুলাইয়া অবিরত ;
মূর্চ্ছা কেবল জীবনের তরে, সতত হেরিতে পাই ॥

* *

৮২

ক্লেশবশে তেঁহ চলে যায় ত্বরা, হিমঋতু তব দূরে ;
সমাগত তায় মলয়-লহরী, করে না সে উপভোগ ।
কোকিলের কেলি-কল-চঞ্চল, মধু-ঋতু হেরি পুরে ;
বলহে শোভন ! কি আছে তাহার, জীবনে রক্ষাযোগ ॥

৮৩

তবু বারে বার প্রবেশিছে মন, নিদারুণ কামানলে ;
অশরীরী ঐ বিরহ-জ্বালায়, জ্বলিছে হৃদয় তার ।
কমলের প্রায় নয়ন-যুগল, ভাসিছে অশ্রু-জলে ;
পাণ্ডুর-ক্ষাম কৃপণ কপোল, বহিছে ভস্ম-ভার ॥

৮৪

ধরা বলয়ের বনিতায় লোভী, শোন শোন নররাজ ;
তোমা হতে হোক্ চারুনয়নার, আশা-জাল প্রেম-জাল ।
কষ্টের চেয়ে কষ্ট তার এই, নয়নে দানিয়া লাজ ;
সঙ্কেতে বহি স্বপনের দূত, নিদ্রা যাপে না কাল ॥

* *

৮৬

সমরিয়া তোমার বদন-কমল, কাতরে ভাসিয়া রসে ;
জ্যোছনা-পরশে চাঁদিমায় করে, ভৎর্সনা অনিবার ।
বিবুধ-বৈদ্যের করে কত দ্বেষ, সুন্দর ! রূপবশে ;
হেন প্রায় হয় মনীষা কাতর, মরণ নিকটে যার ॥

৮৭

বিরাগিতা বশে অসিতনয়না, হেমতালী-দলে ত্যজি ;
স্বভাবে স্বরূপ রমণীয় সেই, কর্ণের ভূষা পরে ।
শরীরে তাহার কি জানি সহসা, দুর্ব্বল ভাবে মজি ;
কার্ম্মুকে গুণ মদনের প্রায়, ভয়ে ভূষা পরিহরে ॥

* *

৮৯

যতনে অশ্রু করি প্রতিরোধ, হেরে লীলা উপবন ;
চন্দনে কায় করিয়া শীতল, জ্যোছনা মাখিতে ধায় ।
সমীরে সেবিতে ক্রীড়াবাপিকায়, ব্যাকুলিত সদা মন ;
দয়িত-বিরহে সাহসে রমণী, কিনা আচরিতে চায় ॥

* *

৯১

ক্ষীণ তাপে প্রায় শরীর শীতল, নয়নে অশ্রু নাই ;
স্তিমিত তাহার অঙ্গের রাগ ক্রমে হেরি কৃশতায় ।
বিরহজনিত রোগরাশি যত, শান্ত এহেন তাই ;
বর্দ্ধিত শ্বাস মৃগনয়নার, সুখের অন্তরায় ॥

৯২

লীলা-নিকেতনে কোকিল-কাকলি, পঞ্চমে তারে পীড়ে ;
কেলি-বাতায়নে মলয়-পবনে, সহে দেহে কত ক্লেশ ।
মিলিত-চরণে কাতর-নয়না, চলিতে পারে না ধীরে,
পীড়িতের প্রীতি-তরে ত্রিভুবনে, নাহি যে সত্যলেশ ॥

* *

৯৪

মদন-অনলে দগ্ধ দেহের, স্তন-পরিসরে তার ;
সদ্য-লিপ্ত চন্দন-রস, দীপ্ত দহনে শোষে ।
বচনে কি কাজ ? দুর্লভ জনে, অনুগত চিত যার ;
কুবলয়-প্রায় নয়নার সেই, জীবন তোমারে তোষে ॥

৯৫

হেন রূপে কথা, সমাপিলে প্রায়-মন্মথ বসুধায় ;
গাঢ় আশ্লেষে প্রণয়ে তোমায়, জানাইবে আবাহন।
স্নিগ্ধ করুণ বচনে যখন, পাষাণো গলিয়া যায় ;
প্রকৃতি-সরস চিত্ত যাঁহার, বাচ্য নহে সে জন ॥

৯৬

বিনয়ে পবন ! অঞ্জলি কিছু, মস্তকে ধরি তবে ;
নির্জ্জনে তুমি বচনে আমার, বলিবে সে নরবরে।
তোমা হতে সেও অবহিত মনে, শুনিবে তা প্রিয় সবে ;
দয়িতার প্রিয় বচনে দয়িতে, সুধার লহরী ঝরে ॥

৯৭

পার্শ্বে অগ্রে পিছনেও দেব ! দেখাইয়া রূপ স্বীয় ;
তুলনীয় তুমি নারায়ণ সনে, জগতের কৃতিমান্।
ভকতি পূরিত চিত্ত আমার, নাহি কেন দয়া প্রিয় !
নারায়ণ ছাড়া কে পারে রচিতে শরীরী মূর্ত্তিমান ॥

* *

৯৯

গিরিতনয়ার পরিণয়কালে, ত্রিপুর-বিজয়ী যবে ;
নব কামরূপে সৃজিয়াছে তোমা, রমণীয় মনোরম।
দূর হতে হোক্ প্রণয়ে মুখর প্রেমের গ্রন্থ তবে ;
কি যেন পুণ্য পরশে তোমার সেবায় হে প্রিয়তম ?

১০০

হৃদয়ে রেখেছে চিরজীবী কোন, বার্ত্তাটি হেন মম ;
তোমাতে রচিত অঙ্গ-লালসে, পুনঃ কিবা প্রয়োজন।
পরহিতে সদা প্রবণ-চিত্ত, মহাজন তোমা সম ;
পারে না সহিতে অশ্রুপূর্ণ, কাতরের নিবেদন ॥

১০১

স্বর্ণ-দণ্ড হেমময়-হার, চামর দন্তী-দলে ;
ভারতীর মহামন্ত্র কাব্য রচিয়া যে প্রমোহন্।
গৌড়ের পতি করে লভিয়াছে, শ্রীধোয়ীক জ্ঞানবলে ;
মহা-কবিরাজ চক্রবর্ত্তী, বরণীয় মহামন ॥

১০২

গঙ্গার শুচিতট-পরিসরে, স্বজনে মিলিত বাস ;
কুলীন-রীতি কবিগণ-মুখে, স্নিগ্ধ ভোগ্য-ভূতি।
সজ্জনে স্নেহ, রাজ্য-সভায় কবিতার প্রবিকাশ ;
লভিয়া বিষ্ণুপদে হোক মম, পরকালে অনুভূতি ॥

১০৩

যে অবধি শিব বহিবেন দেহে, অর্দ্ধনারীশ্বর ;
যে অবধি কাম ধরিবেন করে, কুসুমের জয়ধনু।
কদমের তরু যে অবধি, রাধা-রমণের কেলিধর ;
ততকাল কবি রাজেরকাব্য, বিলাসে বহিবে তনু ॥

১০৪

লভিয়াছি তাই পরম কীর্ত্তি, কোবিদের পরিষদে ;
নৃপতি-প্রিয় অমৃত-বর্ষী, রচিয়া বাক্যজাল।
মন্দাকিনীর তীরে কোথা কোন, শৈলের উপপদে ;
ব্রহ্ম-সাধনে সমাধি রচিয়া, যাপিতে চাহি একাল ॥

সুভাষিত সাহিত্যে সূক্তিমুক্তাবলী

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

সূক্তি, সদুক্তি আর সুভাষিত তিনটিই সমার্থক শব্দ। এর অর্থ উৎকৃষ্ট বচন। জল্‌হণের 'সূক্তিমুক্তাবলী' সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট বচনের সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থের আরম্ভেই আছে—

"যদি কেউ অনায়াসে সাহিত্যবিদ্যার সার আস্বাদন করতে চাও, তবে জল্‌হণ-কৃত সূক্তিমুক্তাবলীর অনুশীলন কর। অঙ্গুরীয়ক, কেয়ুর, কণ্ঠহার বা কঙ্কণ—কোন অলঙ্কারই বিদ্বান্ ব্যক্তির তেমন শোভা বাড়াতে পারে না, যেমন পারে কণ্ঠগতা সূক্তিমুক্তাবলী।

সাহিত্যবিদ্যাহৃদয়ং জ্ঞাতুমিচ্ছসি চেৎ সুখম্।
তৎ পশ্য জল্‌হণকৃতাং সূক্তিমুক্তাবলীমিমাম্॥
নাঙ্গুলীয়ৈর্ন কেয়ূরৈর্ন গ্রৈবেয়ৈর্ন কঙ্কণৈঃ।
তথা ভাতি যথা বিদ্বান্ কণ্ঠসঙ্গতয়ানয়া॥

সত্যই 'সূক্তিমুক্তাবলী' সুভাষিত কবিতার উপাদেয় সঙ্কলন।

দীর্ঘ রত্নহারের সর্বাঙ্গে ইতস্তত বিন্যস্ত হীরকখণ্ডের মত বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের নানা গ্রন্থে শত শত সুভাষিত ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া, বিচ্ছিন্ন অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ সুভাষিতের সংখ্যা সংস্কৃত ভাষায় অগণ্য। অনেক শক্তিমান কবি কোন সুসংবদ্ধ গ্রন্থ রচনা না করেও ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবলম্বনে নানা রসের, নানা ভাবের মনোহর শ্লোক লিখে গেছেন। এগুলি যুগ যুগ ধরে উপদেশপরম্পরায় কাব্যামোদী সহৃদয়গণের মুখে মুখে রক্ষিত হয়ে আসছিল।

সূক্তি-সৌন্দর্যমুগ্ধ কোন্ সাহিত্যরসিক মনীষী সর্বপ্রথম সুভাষিত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হলেন, তা আজ আর জানবার উপায় নেই। যে কখানি সুভাষিত গ্রন্থ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তার কোনখানিই খুব পুরাতন যুগের নয়। এর মধ্যে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' প্রাচীনতম সঙ্কলন বলে গণ্য হয়, কারণ খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পরে রচিত কোন কবিতা এতে সংগৃহীত হয় নি। এর পর কাশ্মীর দেশে বল্লভদেবের 'সুভাষিতাবলী' রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু কালে কালে এ গ্রন্থে পরবর্তী কবিদের রচনাও সংযোজিত হয়েছে। একাদশ শতকের প্রথম দিকে লক্ষ্মণসেনের সময়ে বাঙালী শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে আর একখানি সুভাষিত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। জল্‌হণের 'সূক্তিমুক্তাবলী' আরও পরে ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত হয়।

এ সকল গ্রন্থে আছে বড় বড় কবির রচিত কাব্যের ভাল ভাল শ্লোক, আর আছে অখ্যাত অজ্ঞাত কবিদের স্নিগ্ধমধুর সরস বচন। এ প্রকৃতির সুভাষিতের একনাম উদ্ভট কবিতা। উদ্ভূত শব্দের রূপান্তর উদ্ভট, অর্থ উদ্ধৃত। বিশ্বপ্রকৃতির সমৃদ্ধি বর্ণনে মনুষ্যচরিত্রের বৈচিত্র্য চিত্রণে জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখ উপস্থাপনে এ সব কবিতার হৃদয়গ্রাহিতা অতুলনীয়। কোন কোন কবিতা বক্রোক্তির চাতুর্যে আর ব্যঞ্জনার মাধুর্যে বিদ্বৎসমাজে এতই খ্যাতিলাভ করেছিল যে, সৎকাব্যের উদাহরণ-স্বরূপ একাধিক আলঙ্কারিক আপন আপন গ্রন্থে একই কবিতা সমান আদরে উদ্ধৃত করেছেন।

দূরদর্শী সঙ্কলয়িতারা এসব দুর্লভ কবিতা কালের কবল থেকে রক্ষা করে সংস্কৃত কাব্যের নিভৃত ভাণ্ডারের এক অসামান্য প্রাচুর্যের সন্ধান দিয়েছেন, আর সংস্কৃত সাহিত্যের অতীত ইতিহাসের ক্রোড়বিলীন নানা তথ্যের উদ্‌ঘাটন করেছেন। প্রাচীন কবিদের রচিত সমস্ত সুভাষিতই যে এঁরা সংগ্রহ করতে পেরেছেন, এমন সম্ভব নয়। হয়ত কত সুমধুর উদ্ভট কবিতা সঙ্কলন থেকে বাদ পড়েছে। যা সঙ্কলিত হয়েছে, তাতেও অনেক ক্ষেত্রে কবির নাম পাওয়া যায় নি, কোন ক্ষেত্রে বা একের স্থলে অপরের নাম আরোপিত হয়েছে। একই কবিতার রচয়িতা বিভিন্ন সঙ্কলন গ্রন্থে বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সূক্তিমুক্তাবলীকার জল্‌হণও কোন কোন স্থলে বিভ্রান্তির হাত এড়াতে পারেন নি।

জল্‌হণের সম্পূর্ণ নাম ভগদত্ত জল্‌হণ। কাশ্মীরী কবি কল্‌হণ, বিল্‌হণ, শিল্‌হণের সঙ্গে খানিকটা নামসাম্য থাকলেও জল্‌হণ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী, মহারাষ্ট্র প্রদেশের দেবগিরি রাজ্যে যাদববংশীয় রাজা কৃষ্ণদেবের পদস্থ কর্মচারী। জল্‌হণের পিতৃপিতামহ বংশপরম্পরায় রাজ্যের হস্তিবাহিনীপতির পদ অধিকার করে এসেছেন। পিতা লক্ষ্মদেব মন্ত্রণায় আর নীতিকৌশলে বৃহস্পতির তুল্য ছিলেন। জল্‌হণের উপরও হস্তিবাহিনীর ভার অর্পিত ছিল। তাঁর কর্মকালে রাজা কৃষ্ণদেব আর রাজভ্রাতা মহাদেবের আশ্রয়ে যাদবরাজসভা একটা মহনীয় সংস্কৃতির পরিবেশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বিখ্যাত নিবন্ধকার হেমাদ্রি, মহাপণ্ডিত

বোপদেব প্রভৃতি বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের সমাবেশে দেবগিরি তখন পরম সমৃদ্ধ।

জলহণ যে সূক্তিমুক্তাবলীর গ্রন্থকার সে কথা গ্রন্থের আরম্ভে আর অবসানে স্পষ্ট ভাষায়ই ঘোষিত আছে। তিনি একশত তেত্রিশটি প্রকরণে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন—

হরীশয়োস্ত্রয়াস্ত্রিংশৎপদ্ধতীনামিদং শতম্।
সূক্তিমুক্তাবলী সেয়ং জলহণেন ব্যরচ্যত॥

কিন্তু পদ্যসঙ্কলনের কাজে ভানু নামে একজন কাব্য-নিপুণ বৈদ্য জলহণের সাহচর্য করেছিলেন বলে মনে হয়। সূক্তিমুক্তাবলীতে ভানুকবির প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর রচিত অনেক কবিতা এ গ্রন্থে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এমনকি, গ্রন্থের মধ্যেই এমন কথাও স্থান পেয়েছে যে, কৃষ্ণরাজের শাসনকালে ১১৭৯ শকাব্দের চৈত্র মাসে বৈদ্যজীবী ভানুকবিই জলহণের জন্য সূক্তিমুক্তাবলী সঙ্কলন সম্পূর্ণ করেন।

শাকেহঙ্কাদ্রীশ্বরপরিমিতে বৎসরে পিঙ্গলাখ্যে
চৈত্রে মাসে প্রতিপদি তিথৌ বাসরে সপ্তসপ্তেঃ।
পৃথ্বীং শাসত্যতুলমহসা যাদবে কৃষ্ণরাজে
জলহণস্যার্থে ব্যরচি ভিষজা ভানুনা সেয়মিষ্টা॥

খুব সম্ভব, কর্মান্তরতৎপর জলহণ শ্রমসাধ্য শ্লোকসংগ্রহের কাজে বৈদ্য ভানুর উপরই বেশির ভাগ নির্ভর করেছিলেন। সূক্তিমুক্তাবলীর প্রকৃত গ্রন্থকার যিনিই হন, গ্রন্থখানি জলহণের নামেই পরিচিত।

সূক্তিমুক্তাবলীর সূক্তিগুলি স্তুতি-আশীর্বাদ, সুকবি-কুকবি, সুজন-দুর্জন, কাক-কোকিল, হস্তী-অশ্ব, বৃক্ষ-পর্বত, মরু-সমুদ্র, গ্রীষ্ম-শিশির, সন্ধ্যা-প্রভাত, কুলটা-কুলস্ত্রী, প্রণয়-বিরহ, ঋদ্ধি-দারিদ্র্য, ভোগ-বৈরাগ্য, দৈব-পুরুষকার—এ ধরনের একশ' তেত্রিশটি বিষয় অবলম্বনে এক এক পদ্ধতি বা বিভাগে বিভক্ত। জলহণ প্রত্যেক বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ভিন্ন ভিন্ন রচনা বেছে নিয়েছেন। তাঁর সঙ্কলনে নানা কবির গ্রন্থ থেকে, নানা জনের কণ্ঠ থেকে দু'হাজার সাতশ' নব্বইটি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। কবিতার সঙ্গে প্রায় তিন শত কবির নাম উল্লিখিত আছে। তাঁদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতি, ভারবি-ভর্তৃহরি দণ্ডী-সুবন্ধু, মাঘ-মুরারিও আছেন, আবার একান্ত অপ্রসিদ্ধ বাকুট-বিশল্য, শ্রীধর-শ্রীপাল, নাচিরাজ-কৃষ্ণাপিল্লও আছেন। এ ছাড়া সূক্তিমুক্তাবলীতে রচয়িতার নামহীন রচনা আছে প্রচুর।

কোন কোন সুভাষিত গ্রন্থে কবিতার সংখ্যা আরও বেশী দেখা যায়। কিন্তু সূক্তিমুক্তাবলীর সূক্তির মধ্যে যে সকল বিস্মৃতপ্রায় কবি আর কাব্যের পরিচয় রয়েছে, তাতে এ গ্রন্থের মূল্য অধিক। জলহণই সর্বপ্রথম এসব সাহিত্যিক বিবরণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এজন্য সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর দান অসাধারণ।

সূক্তিমুক্তাবলীর একটি প্রকরণের নাম কবিকাব্য-প্রশংসা পদ্ধতি। এই প্রকরণে সঙ্কলিত শতাধিক পদ্যে বিশেষ বিশেষ কবির নাম উল্লেখের সঙ্গে অল্পবিস্তর বৃত্তান্ত আর তাঁদের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এসব বর্ণনা স্বল্প হলেও স্পষ্ট।

ভাস যে অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন, আর তার মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্ত' নামে একখানি নাটক আপন উৎকর্ষে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল, এই বিস্মৃত-সাহিত্যিক সংবাদ সূক্তিমুক্তাবলীতে সঙ্কলিত রাজশেখরের একটি পদ্য থেকে প্রথম উদ্ধার করা হয়।

ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে সহস্রশঃ।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥

এই একটি পদ্যই আজ পণ্ডিতসমাজে ভাসনাটক সৌধের মূল ভিত্তি বলে গণ্য হয়।

এককালে এদেশের বিদুষী মহিলারা সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন একথা অজ্ঞাত নয়। জলহণ তাঁর গ্রন্থে কয়েক জন মহিলা-কবির কবিতা সংগ্রহ করেছেন। তা ছাড়া বিজ্জাকা, বিজয়াঙ্কা, সুভদ্রা, শীলা ভট্টারিকা, প্রভুদেবী, বিকটনিতম্বা সম্পর্কে রাজশেখরের রচনা থেকে তিনি বহুমূল্য বিবরণ তুলে দিয়েছেন।—

(১) শীলা ভট্টারিকা বাণভট্টের মত শব্দ আর অর্থের উপর সমান দৃষ্টি রেখে কাব্যরচনায় পাঞ্চালী রীতির অনুসরণ করতেন।

(২) বিজয়াঙ্কা ছিলেন কালিদাসের মতই বৈদর্ভী রীতির আবাসস্থল।

(৩) বিকটনিতম্বার বচন ছিল 'মৌগ্ধ্যমধুর'।

(৪) এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন কর্ণাটী কেউ-বা লাটী।

(৫) বিজ্জাকা নাকি দেখতে কালো ছিলেন। মহাকবি দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বিদ্যাদেবতা সরস্বতীকে সর্বশুক্লা বলে বর্ণনা করেছেন। সূক্তিমুক্তাবলীর কবি এই উক্তির উপর কটাক্ষ করে বলেছেন—মূর্ত সরস্বতী বিজ্জাকার কথা জানতেন না বলেই দণ্ডী তাঁর বর্ণনায় ভুল করেছেন। বিদুষী বিজ্জাকা ছিলেন নীলোৎপলদলের মত শ্যামা।

নীলোৎপলদলশ্যামাং বিজ্জাকাং তামজানতা।
বৃথৈব দণ্ডিনা প্রোক্তং সর্বশুক্লা সরস্বতী॥

সূক্তিমুক্তাবলীর আরও অনেক কবিতায় নানারূপ

সাহিত্যিক ও সামাজিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে। দুটি পদ্যের মর্ম এই—

বিদ্যার পবিত্রস্পর্শে যাঁরা ধন্য হয়েছেন, তাঁদের জাতিকুল বিচার্য হয় না। কুম্ভকারজাতীয় দ্রোণ কবি কবিত্বগরিমায় ব্যাসদেবের সমান মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। চণ্ডাল দিবাকর বিদ্যাপ্রভাবে শ্রীহর্ষের রাজসভায় বাণ আর ময়ূর কবির সমান পদ লাভ করেছিলেন।

সরস্বতীপবিত্রাণাং জাতিস্তত্রং ন দেহিনাম্।
ব্যাসস্পর্ধী কুলালোঽভূদ যদ্ দ্রোণো ভারতে কবিঃ॥
অহো প্রভাবো বাগ্‌দেব্যা যচ্চাণ্ডালো দিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণময়ূরয়োঃ॥

সূক্তিমুক্তাবলীর বহু সুভাষিতই পূর্বগামী সংগ্রহকারদের সঙ্কলনেও পাওয়া যায়। বিষয়বিন্যাসেও 'সুভাষিতাবলী'র সঙ্গে সূক্তিমুক্তাবলীর বেশ মিল আছে। তবুও মুক্তাবলীর স্বাতন্ত্র্য অল্প নয়। অন্যত্রদুর্লভ কবিতার সংখ্যা এতে প্রচুর। এসব কবিতা তথ্যবাহুল্যেও যেমন অসামান্য, রচনাকৌশলেও তেমন অপূর্ব।

মুক্তাবলীর এক অজ্ঞাতনামা কবি একজন দীনদরিদ্রের মুখে তাঁর দৈন্যের বর্ণনা দিয়েছেন। দরিদ্রব্যক্তি আক্ষেপ করে বলছে—আমি সব রকমেই রামের দশা লাভ করেছি, কেবল কুশলব-সুতাকে পাই নি, কুশলব-সুতার এক অর্থ কুশ ও লব যাঁর সুত সেই জানকী, আর এক অর্থ প্রচুর সম্পত্তি। কুশল অর্থ প্রচুর, বসু অর্থ ধন। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—

জনস্থানে ভ্রান্তং কনকমৃগতৃষ্ণান্বিতধিয়া
বচো বৈদেহীতি প্রতিপদমুদশ্রু প্রলপিতম্।
কৃতালঙ্কাভর্তুর্বদনপরিপাটীষু রচনা
ময়াপ্তং রামত্বং কুশলবসুতা ন ত্বধিগতা॥

রাম কনকমৃগের লোভে অন্ধবুদ্ধিতে জনস্থান অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, আর দরিদ্র ব্যক্তি কনকরূপ মরীচিকার আশায় ভ্রষ্টবুদ্ধি হয়ে লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়। রাম প্রতিপদে বৈদেহি বৈদেহি বলে উদ্‌গতাশ্রু হয়ে বিলাপ করেছিলেন, আর দরিদ্র প্রত্যেকের পায়ে লুণ্ঠিত হয়ে দেহি দেহি স্বরে সাশ্রুনয়নে কাতরতা জানায়। রাম লঙ্কাধিপের বদন-পঙ্‌ক্তিতে বাণসন্ধান করেছিলেন, আর দরিদ্র দুষ্ট প্রভুর আনন পারিপাট্য সম্পর্কে প্রশস্তি রচনা করে থাকে। কাজেই দরিদ্র সব রকমেই রামের মত। কেবল কুশলব-সুতাই তার নেই।

এরূপ দ্ব্যর্থক সুভাষিতের মাধুর্য অনুভবগ্রাহ্য। সুধীজন একমাত্র স্বানুভবেই এ মধু আস্বাদ করতে পারেন।

সূক্তিমুক্তাবলীর এক কবি যথার্থই বলেছেন—কবিতার আসল সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না, কেবল অন্তরেই তা পরিস্ফুট হয়।

যদেতদ্ বাগর্থব্যতিকরময়ং কিঞ্চিদমৃতং
প্রমোদপ্রস্যন্দৈঃ সহৃদয়মনাংসি স্নপয়তি।
ইদং কাব্যং শ্রাব্যং স্ফুরতি চ যদত্রাণু পরমং
তদন্তর্বেদ্যানাং স্ফুটমথ চ বাচামবিষয়ঃ॥

বাক্যার্থের মিশ্রণের ফলে যে অমৃত রসায়নের উৎপত্তি হয়, তার আনন্দধারা ভাবুকহৃদয় প্লাবিত করে। এই ত কবিতার ধর্ম। আমাদের কানে আসে তার একটা স্থূল রূপ। অতি-গহন নিগূঢ় ভাবটি অন্তর্দৃষ্টির কাছেই ধরা দেয়, বাক্য সেখানে পৌঁছতে পারে না।

সত্যই উৎকৃষ্ট সুভাষিতের মাধুর্য শ্রুতির গ্রাহ্য নয়, হৃদয়ের সংবেদ্য।

আজও সুভাষিত কবিতাবলীর উপযুক্ত বিশ্লেষণ হয় নি। অথচ এরই মধ্য দিয়ে শত শত কবি সেকালের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সিদ্ধি-সংস্কৃতি রূপায়িত করে রেখেছেন। কোন একখানি বিখ্যাত কাব্যের মধ্যে থাকে একজন খ্যাতিমান কবির মনের কথা, আর সুভাষিত-সঙ্কলনের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নানা কবির মন। সুভাষিতের সমধিক অনুশীলন বাঞ্ছনীয়।*

* আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

দক্ষিণ দেশে

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

(২)

কাঞ্চীপুরম্ থেকে পূর্ব্বমুখে চললাম পক্ষীতীর্থের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের দিকে। পথের দৃশ্য-বৈচিত্র্যে মন কিন্তু মুগ্ধ হ'ল না, কেবল বোধ হতে লাগল আমাদের উত্তরের দৃশ্য এরকমটি নয়। বেলা তখন দশটার বেশী। বাসগুলি দ্রুত ছুটছে। শোনা ছিল, প্রত্যহ বেলা এগারোটার পরে একই সময়ে দুটি পাখী একটি পাহাড়ের চূড়ায় এসে বসে। মাদ্রাজের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের যে বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয় আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি চালকগণকে দ্রুত গাড়ি হাঁকাতে নির্দ্দেশ দিলেন, যাতে আমরা যথাসময়ে তীর্থে পৌঁছতে পারি। বললেন, "দেরি হলে পাখী উড়ে চলে যাবে। কথাগুলি তিনি বললেন অবিশ্যি ইংরেজীতেই। পাখী দুটিকে কেন্দ্র করে বহুকাল থেকে কয়েকটি কিম্বদন্তী গড়ে উঠেছে যা বহু লোকেই জানেন। তাদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃ বা কৌতূহলবশে দূর-দূরান্ত থেকে এখানে সারা বৎসরই যাত্রী যাতায়াত করে থাকেন। যাতায়াতে তাঁদের কিছু কষ্ট ভোগ করতে হয়। কারণ, কাছে রেলপথ নেই, আছে যানবাহনের মধ্যে আমাদের সনাতন গোযান বা আধুনিক মোটর-বাস। মনে পড়ছে যেন খান দুই গোযান কার, ঘোড়ার গাড়িও দেখেছিলাম।

অনেক পাহাড় ও পথ ঘুরে, অনেক ধুলো উড়িয়ে আমাদের বাসকয়খানি একটি পাহাড়ের তলায় এক গ্রামে এসে থামল। আমাদের মধ্যে ভাগ্যবানেরা কয়েকখানি অমাণ্ডলিক মোটরে আমাদের আগেই পৌঁছেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন আমাদের বাসের দরজায় এসে বললেন, "যান, যান, দেখে আসুন। পাখী দুটি যুগ যুগ ধরে আসা-যাওয়া করছেন।"

একজন জিজ্ঞেস করলেন, "দাদা, আপনি যাবেন না?"

"আমি? আমি ওঁদের দেখেছি। যান যান"—বলতে বলতে তিনি তৎক্ষণাৎ সরে গেলেন।

আমরাও সকলে বাস থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। প্রায় সকলেই লম্ফে লম্ফে উঠে চললেন এবং মিনিটকয়েকের মধ্যেই আমাকে ছাড়িয়ে গেলেন। তাকিয়ে দেখলাম, আমরা তিনটি মাত্র মানুষ মর্ত্ত থেকে উর্দ্ধলোকে উঠবার ব্যর্থ প্রয়াস করছি। আর, কয়েকটি স্থানীয় লোক খানদুই দোলা বা ঝোলা নিয়ে আমাদের তাতে উঠবার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তারা এক একজনকে নিয়ে উঠবে-নামবে। সেজন্যে যৎসামান্য পারিশ্রমিক নেবে—মাত্র সাতটি করে টাকা। শেঠের কাছে মাণ্ডলটি নিতান্ত অল্প হলেও বললাম, "দু'জনকে যদি নিয়ে যাও তো রাজী।" দর-কষাকষি করতে করতে পর্ব্বতারোহীর দল ততক্ষণে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। পর্ব্বতটির সানু থেকে শিখর অবধি [illegible] সিঁড়ি। অর্দ্ধপথে উঠেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। সহযাত্রী [illegible]লেন, "আর ওঠার দরকার নেই মশাই। এখানেই দাঁড়ানো যাক্। জীবনে অনেক বড় বড় পাহাড়ে উঠেছি। শেষে এটাতে উঠতে গিয়ে কি মরব? আর ওখানে দেখবারই বা কি আছে?"

বললাম, "যুগচারী দুটি পক্ষী-বাবা।"

"বিশ্বাস করেন যে যুগ যুগ ধরে দুটো পাখী আসা-যাওয়া করছে?"

"যুক্তি দিয়ে বিচার না করলেই বিশ্বাস করা যায়। রক্তমাংসের দেহ কতদিনই বা পৃথিবীতে টিকতে পারে? যা হোক, একটা ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে না? তাই তো।"

দু'জনে রেলিঙের ধারে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির দুপাশেই লোহার রেলিঙ, উপরে স্বল্প বনাচ্ছন্ন পর্ব্বতশীর্ষ. পাশে ঘনবনময় পর্ব্বতগাত্র, সানুদেশও বনাচ্ছাদিত। বামে পথের ওপারে এক প্রাচীন পাষাণ-মন্দির। সু-উন্নত তার গোপুরম। আমরা তারও অনেক উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে। তারও ওধারে কয়েকটি পাহাড়। আমাদের আশে-পাশে কয়েকটি স্থানীয় লোক ও ভিখারী। হঠাৎ দেখলাম, নিচে বনের একাংশ থেকে চিলের আকার, বিচিত্র বর্ণের দুটি পাখী শ্বেত-পাখা মেলে চক্রাকারে পর্ব্বতশীর্ষের দিকে উঠতে লাগল। কোন্ একখানি গ্রন্থে ছবি দেখেছিলাম, এই ধরনেরই দুটি পাখী এই পাহাড়টিরই চূড়ায় পুরোহিতের সম্মুখে বসে আছে। সন্দেহ জাগল, সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, "এরা দুটিই কি সেই যুগচারী?"

তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে বটে। হাঁ—হাঁ—ঐ তো চূড়ার দিকে উড়ে গেল।"

অতঃপর তাঁদের দুটিকে আর দেখা গেল না। শুনেছিলাম, পাখী দুটি প্রত্যহ সুদূর বারাণসী বা লঙ্কাদ্বীপের কোন এক অংশ থেকে এখানে ভোগ খেতে উড়ে আসেন। আহারান্তে আবার পূর্ব্ব স্থানে ফিরে যান। আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম, সঙ্গীরা কখন নেমে আসবেন এবং পাখী দুটি সম্বন্ধে কত কি আলোচনা করবেন। আমরা অবাক্-বিস্ময়ে নির্ব্বোধের মত তাকিয়ে শুনব আর মনে মনে নিজেদের ধিক্কার দেব। কিন্তু পাখীর আহার সামান্যই। অল্পক্ষণ পরেই আবার সেই ধরনের দুটি পাখীকে পর্ব্বতশিখরের দিক থেকে তেমনি চক্রাকারে উড়তে উড়তে দূরে একটি বিশাল জলাশয়ের দিকে যেতে দেখলাম। সম্ভবতঃ তাঁরা বারাণসী বা লঙ্কাদ্বীপের পথ ধরে থাকবেন।

তার অল্পকাল পরেই সহযাত্রীর দল স্রোতের মত নেমে আসতে লাগলেন। নিকটবর্তী হতেই দলে মিশে গেলাম। তাঁদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল, পাখী দুটি এবং যাঁরা অসুস্থ শরীরেও উপরে উঠেই শিলালুণ্ঠিত বা অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে। দলে আমার কয়েকজন বন্ধু বা সুদূরের সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা পাখীর কথা বাদ দিয়ে রোগীদের কথাই আলোচনা করছিলেন। আমিও উপরে উঠেছিলাম কিনা সেকথা জানতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না। কিন্তু একজন তরুণ প্রতিনিধি পাশে এসে বললেন, "দাদা, উপরে ওঠেন নি? আপনাকে তো দেখতে পেলাম না।"

সলজ্জ কণ্ঠে বললাম, "অসুস্থ শরীরে উঠতে সাহস হ'ল না, ভাই! প্রাণপাখী মাত্র একটি! উড়ে গেলে খাঁচাটিতে দ্বিতীয় বলতে আর কেউ থাকবে না।"

সে সহাস্যে বললে, "না গিয়ে ভালই করেছেন। দেখবার কিছুই নেই। মন্দিরটাও বিশেষ কিছু নয়। স্রেফ ভাওতা।"

তারই মত কয়েকজনের কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠল, "আরে, ঐ ধরনেরই কয়েকটা পাখী মন্দিরের ফোকরে ছিল দেখলে না? পুরোহিত ওদিকে যেতে দিচ্ছিল না। সব বুজরুকি!"

যে ধিক্কার মনে ঠেলে উঠছিল অতঃপর তা বুদ্বুদের মত লীন হয়ে গেল। সকলে বাসে উঠবার আগে শৈলমূলের জনপদটি যতটুকু পারলাম দেখে নিলাম। এই তীর্থের কারণেই এখানে ছোট জনপদ গড়ে উঠেছে, কিন্তু অধিবাসীর সংখ্যা অল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যও তেমন কিছু হয় না। দোকানপাট এক রকম নেই-ই। বহুকাল থেকে এখানে যাত্রীর আনাগোনা। কিন্তু একটা বড় রেলষ্টেশনে মুসাফিরখানার মতই জায়গাটি হয় ক্ষণে পূর্ণ, ক্ষণে শূন্য।

অঞ্চলটি শৈলময়। তবে শৈলগুলি সর্ব্বত্র পরস্পর সংলগ্ন নয়। মধ্যে মধ্যে সুবিশাল হ্রদসদৃশ জলাশয়। তার তট থেকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত। জলাশয়কূলে জলচর পাখী।

বাস আবার আমাদের নিয়ে ছুটল সমুদ্রতটে মহাবলীপুরমের দিকে। মধ্যে আহারাদির জন্যে কিছুক্ষণ থামবে রেলষ্টেশন চিংলিপাটে এমনি ব্যবস্থা। বাসের জানলা দিয়ে তাকিয়ে বসে আছি। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি জলাশয়ের কূলে তীর্থে দেখা দুটি পাখীর মত একজোড়া পাখী। কিন্তু সেদিকে কারও দৃষ্টি আকর্ষণের সাহস হ'ল না। কারণ তখন সকলেই প্রায় ধ্যানমগ্ন। পরে দূর দক্ষিণে ভারতমহাসাগর-তীরে ধনুষ্কোটির সুদীর্ঘ নির্জ্জন জলায় ও প্রখর-স্রোতা কাবেরী নদীর চরে দেখেছি ঐ ধরনের পাখী। সেদিকে আমার সঙ্গীদের দৃষ্টিও আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ থাকায় চেষ্টা বিফল হয়।

যা হোক, প্রায় বেলা একটায় পৌঁছলাম চিংলিপাট ষ্টেশনে। বড় জংশন। ষ্টেশনের রেস্তোরায় আমাদের আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল। পুরোদস্তুর নিরামিষ মাদ্রাজী খাদ্য—রসম, শাদম, সম্বরম, কাউম আরও 'কিম' মনে পড়ছে না। সেই সঙ্গে পাত্র-কোণে কিঞ্চিৎ উপপু, গেলাসে তাম্নি; পাত্র, কদলীপত্র। ক্ষুধা থাকলে নুন দিয়েও যে খাওয়া যায় তা বোঝা গেল সকলেরই আহারে। আহারান্তে বিটিল অর্থাৎ পান অনেকেই কিনলেন। কিন্তু পানে চুণ-খয়ের ব্যবহারের রেওয়াজ আছে বলে তো মনে হ'ল না। সেলোফেনের ছোট্ট মোড়কে কয়েক কুচি কুচো কাগজের মত সুপুরি ও কয়েক বিন্দু কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ এবং কয়েকটি পাকা পান—এই হ'ল বিটিল। যাঁরা পানাসক্ত ছিলেন তাঁরা তাতেই খুশী হয়ে চর্ব্বণপর্ব্ব শেষ করতে লাগলেন। আমার তখন মনে হতে লাগল, ষ্টেশনের বাইরে পথের ধারে বিশাল বৃক্ষগুলির ছায়ায় ঘাসের উপর খানিকটা গড়াতে পারলে হ'ত। কিন্তু ভাগ্যে সে সুখশয্যা আর লাভ হ'ল না, আবার বাসবন্দী হয়ে যাত্রা করতে হ'ল মহাবলীপুরমের দিকে।

চিংলিপাট থেকে কতক্ষণে মহাবলীপুরমে পৌঁছলাম মনে পড়ে না। তবে পথের দূরত্ব খুব বেশী নয়। আমাদের আগেই অনেক তীর্থযাত্রী নিয়ে কয়েকখানি সরকারী বাস সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল।

বাস থেকে নেমে সকলে উৎসাহে, উল্লাসে উন্নত শিলাভূমিতে উঠতে লাগলাম। ক্রমোন্নত পথটির ধারে একখানি বৃহদাকার শিলা এমন ভাবে ভূমিসংলগ্ন হয়ে আছে যে, তার পাশ দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হতে লাগল, সামান্য ধাক্কায় বা কোন কারণে তৎক্ষণাৎ গড়াতে গড়াতে নিচে নেমে আসবে। সেটি ছাড়িয়েই দু'পাশে কঠিন শিলা ও গুহাগাত্রে অনুপম শিল্পকলা অক্ষয় সৌন্দর্য্যে সুদূর অতীত থেকে ছড়িয়ে রয়েছে। তার কোথাও শিল্পীর সামান্য পরিচয়ও নেই। আর তার বিশেষ প্রয়োজনই বা কি? শিল্পীর আসল পরিচয় তো তাঁর রচিত শিল্পে। তা দেখে যখন মুগ্ধ হই, তার রস উপলব্ধি করি তখনই তো তাঁর অজস্র প্রশংসা না করে, তাঁর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা না জানিয়ে থাকা যায় না। এখানে যাঁরা শিল্প-সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন প্রায় তেরশ' বৎসর আগে। কিন্তু শিল্পগুলি একজনের রচনা নয়, কয়েকজনের। এক জায়গায় কবি ভারবির অমর কাব্য "কিরাতার্জ্জুনীয়ে"র শ্লোকের পর শ্লোক শিল্পীর হাতে অক্ষয় রূপে ফুটে উঠেছে। সেখানে সুকঠোর তপস্যানিরত অর্জ্জুন ও অপরাপর মূর্ত্তিগুলি মৌনতায় যেন মুখর। মহাবলীপুরম্ পল্লবরাজগণের সময়কার (৬০০ খ্রীঃ অঃ—৮৫০ খ্রীঃ অঃ) কীর্ত্তি। পল্লবরাজগণ ছিলেন শিবের ভক্ত। তাই এখানে শিব-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি কিছু বেশী।

পথের শেষ দিকে ছিল মহিষমর্দ্দিনী গুহা। শিল্পী এই গুহা-গাত্রে অনবদ্য সুষমায় ফুটিয়ে তুলেছেন সিংহবাহিনী দুর্গার মহিষাসুর বধের কাহিনী। কিন্তু এই স্থানটির অন্যান্য অংশে আরও যে সকল কাহিনী রূপায়িত হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়ার মত স্থান আমাদের নেই। স্বল্প সময়ে গভীর আকুলতায় যতটুকু দেখা সম্ভব সেখানে দেখলাম মাত্র ততটুকু। দেখলাম, আদি বরাহ মন্দির। এটিও গুহাগাত্র খোদাই করে রচিত। তবে ঐ গুহাটির মত বিখ্যাত নয়। সঙ্গে স্থানীয় এক পাণ্ডা জুটে গেল। সে হিন্দী ও ইংরেজী

মিশিয়ে উভয়ের দক্ষিণী উচ্চারণে এক নূতন ভাষাজাল রচনা করে আমাদের বুঝিয়ে দিলে যে, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটির পিছনেই দ্রৌপদীর স্নানঘর। ছাদহীন ঘরটির অবস্থা, আকার ও সজ্জা দেখে ধারণা হ'ল, স্নানঘর না হোক সেখানে এক সময়ে যেন জলের বন্দোবস্ত ছিল। তবে দ্রৌপদী ছিলেন, ভারতের মহাকাব্যের যুগে—পল্লব-রাজগণের বহু পূর্ব্বে। এই মহাবলীপুরমেই আছে পাঁচটি শিলাখণ্ড কেটে তৈরী পাঁচখানি রথ যেগুলিকে বলা হয়, পঞ্চ পাণ্ডবের রথ। রথগুলি আছে গ্রামের মধ্যে। স্নানঘরের বাইরে জনকয়েক প্রতিনিধিকে দাঁড় করিয়ে তাঁদের ও পিছনের শিলাশিল্পের একখানি ছবি তুলে নিলাম। সেখানে দাঁড়ালে নিবিড় নারিকেলকুঞ্জপারে সমুদ্র চোখে পড়ে—নীল উদ্বেল, শুভ্র ফেনময়। সেখান থেকে কিছুদূরে নবনির্ম্মিত উন্নত বাতিঘর। উপকূলপথে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে সেগুলি যাতে মহাবলীপুরমের শৈলসঙ্কুল সমুদ্রে রাত্রিকালে আহত না হয় সেজন্য সেখান থেকে আলো দেখান হয়ে থাকে। অনেকে গিয়ে উঠলেন তার উপর।

মহিষমার্দ্দনী

মহাবলীপুরমের এই অঞ্চলটিকে ১৮ শতকে আবিষ্কার করে-ছিলেন মানুচি নামে জনৈক ইটালীয় পর্য্যটক। ইউরোপীয়গণ গ্রামখানিকে বলতেন, সপ্ত প্যাগোডা। কেন তাঁরা এই নাম দিয়ে-ছিলেন তা অনুমানসাপেক্ষ। সমুদ্রবেলায় তিনটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে। সেগুলির দুটি ভগ্নপ্রায়। এখনও যেটি সমুদ্রের বালু-কণা-ভরা লোনা হাওয়ার এবং জলকণার অবিরাম আঘাত সহ্য করে টিকে আছে সেটিও বালুতলে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটিকে বহু পরিশ্রমে বালুকবল মুক্ত করে একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার পাষাণ-বেষ্টনী দিয়ে রক্ষা করছেন। দশ বৎসর আগেও সমুদ্রতরঙ্গ এসে মন্দিরগাত্রে আঘাত করত। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, সমুদ্রতীরে আরও ছয়টি মন্দির ছিল। কিন্তু সমুদ্র সেগুলিকে গ্রাস করে সপ্ত মন্দিরটিকেও গ্রাসে উদ্যত। তবে এ কথার কোন ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। অবিশ্যি কূল থেকে সমুদ্রমধ্যে কিছুদূরে একটি জায়গায় অবিশ্রান্ত বিক্ষোভ দেখা যেতে লাগল। মনে হ'ল, সেখানে জলতলে কিছু আছে। স্থানটি এত মনোরম যে বসলে আর উঠে আসতে ইচ্ছা হয় না। এই মন্দির কয়টিই দক্ষিণে দ্রাবিড় স্থাপত্যের আদি।

গ্রামের প্রধান পথটির ধারেই গুহাগাত্রে অর্জ্জুনের তপস্যা-কাহিনীটি খোদিত। এটি এখানকার শিল্প-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন। এটিতে শিল্পীর ধ্যান-ধারণা ও নিপুণতা অনবদ্য মহিমায় ফুটে উঠে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের অন্তর স্পর্শ করছে। তখন গুহাটি দিনান্তের ঘনায়মান ছায়ায় ভরে উঠেছিল। তাই চেষ্টা করেও ক্যামেরায় ছবিখানি তুলে আনতে পারলাম না। এত কাছে পেয়েও ধরা গেল না! এখানকার শিল্পগুলির প্রত্যেকটি মাত্র একটি করে শিলাখণ্ডে রচিত।

পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্ম্মণ (খ্রীঃ অঃ ৬৩০-৬৩৮) ছিলেন অসাধারণ সাহসী ও বীর—তাঁকে লোকে তাই বলত, মহামল্ল বা মামল্ল। তাই থেকে এই ছোট গ্রামখানির নাম হয়, মামল্লপুরম। তা আবার কালে কালে হয়ে দাঁড়ায়, মহাবলীপুরম। কিন্তু কেই বা সেই নরসিংহ বর্ম্মণ আর কারাই বা পল্লবরাজ সাধারণ লোকের কে সে সবের খোঁজ রাখে? তাঁদের বদলে লোকে পুরাণোক্ত বলী রাজা ও বিষ্ণুর সেই কাহিনীটি দিব্যি চালিয়ে দিয়েছে। সাধারণের মধ্যে তাই-ই বেশ চলে যাচ্ছে।

মহাবলীপুরম দেখলাম বটে কিন্তু অন্তরে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরতে হ'ল। মাদ্রাজের সম্মেলনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মুখুজ্যেমশাই প্রতি-নিধিগণের তৃষ্ণানিবারণোদ্দেশ্যে দশটি-বিশটি নয়, ছয় শ' ডাবের ব্যবস্থা করেছিলেন। যিনি যতটা পারলেন জল পান করতে লাগলেন। এদিকে নারিকেলবনপারে দূরদিগন্তে শৈলশিরে সূর্য্য পাটে বসল। স্বেচ্ছাসেবক সর্দ্দার বার বার বাঁশী বাজাতে লাগলেন, উষ্মাও প্রকাশ করলেন, কিন্তু প্রতিনিধিগণ তখন শিল্পরসে এমন জীর্ণপ্রায় যে আর যেন দানা বাঁধতে পারছেন না। অবশেষে দুজন-চারজন করে এসে বাসে উঠতে লাগলেন। বাসগুলি ভর্ত্তি হ'ল এবং মাদ্রাজ শহরের পথ ধরল। ভাগ্যবানেরা কোন্ পথে কোন্ বাঁকে যে অদৃশ্য হলেন বুঝতে পারলাম না।

তার পর সূর্য্যের উদয়াস্ত যে বৈচিত্র্যভরা চিত্রস্রোত চোখের সম্মুখ দিয়ে বয়ে গেল সেগুলি মানসপটে আবার দেখতে দেখতে সন্ধ্যার পর ক্লান্ত দেহে ফিরলাম আস্তানায়। সেদিনই আমাদের সেই রঙ্গমঞ্চে "শেষ রজনী"। পর দিনই বেলা দশটার পর সকলকে অন্যত্র নিজ নিজ আহার ও অবস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, এমনই নির্দ্দেশ পাওয়া গেল। কেউ কেউ সেই রাত্রেই দূর দক্ষিণে যাত্রা করলেন।

আমরাও সেজন্যে প্রস্তুত ছিলাম। তাই ভোর হতেই গাঁট-গাঁটরি বাঁধা-ছাঁদা করে, স্নানাদি সেরে ছয় জনে বেলা আটটায় দু'খানি ট্যাক্সিতে রওনা হলাম এগমোর মাদ্রাজ ষ্টেশনের দিকে ধনুষ্কোটির উদ্দেশে। বলা বাহুল্য, ষ্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল, দু'খানি ট্যাক্সির মিটারে একই দূরত্বের দু'রকমের ভাড়া উঠেছে। আমাদের ভাগ্য মন্দ—তাই বেশীই দিতে হ'ল। সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন, শিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তী। বামুনে বরাত মন্দ—এমনি একটা কথা শোনা যায়, কিন্তু শিল্পী বন্ধুটির ভাগ্যে বরাবর বিপরীতটাই ঘটতে দেখছি—এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। নিজ ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিতে দিতে বেশ শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, "আমরা তো আরও অনেকটা ঘুরে এলাম। তোমাদের এত বেশী উঠল কেন?

বললাম, "বোধ হয় খুব জোরে এসেছে বলে।"

এগমোর থেকে প্রায় সারা দক্ষিণ ভারতের রেলপথ, মিটার গেজ। গাড়ির কামরাগুলি সকল বিষয়ে সঙ্কীর্ণ হলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—যাত্রিগণেরও দৃষ্টি পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবার দিকে।

স্থানীয় জনৈক বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলাম, ধনুষ্কোটি প্যাসেঞ্জারে বেশ ভিড় হয়, বিশেষ করে তৃতীয় শ্রেণীতে—কিন্তু কি কারণে জানি না, আমরা এক রকম খালি কামরা পেয়ে গেলাম—বলতে গেলে, প্রায় গোটা কামরাটা আমরাই দখল করে বসলাম। যে দু'একজন স্থানীয় লোক আগেই উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে এক-জন আমাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন। বললেন, "আমরা বেলা চারটের কাছাকাছি ভিল্লুপুরমে নেমে যাব। সেখান দিয়ে পুঁদিচেরী যেতে হয়।" তখন বেলা প্রায় দশটা। তাঁর পুরো নাম তিনি কিছুতেই বললেন না, কেবল বললেন, তাঁর উপাধি রেড্ডি। পরে সেখানে ও চলার পথে অন্যান্য ষ্টেশনে যাঁরা উঠলেন, তাঁরাও আমাদের জায়গা ছেড়ে দেবার জন্যে কোন অনুরোধ বা কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। তাঁদের মধ্যে দু-একটি মহিলাও ছিলেন। আমরা বসতে অনুরোধ করলে যত জনের স্থান সঙ্কুলান হ'ল তত জনও বসলেন না। না বসতে দিলেও যে আমাদের বিরুদ্ধে তাঁদের কোন অভিযোগ ছিল এমন বোঝা গেল না। আমরা বিদেশী,তার উপর বাঙালী, চলেছি দূর দক্ষিণে তাঁদের দেশ দেখতে। সেজন্যে যেন তাঁরা কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। অথচ দক্ষিণের রেলপথে রাত্রিগামী গাড়িতে মধ্যে মধ্যে ডাকাতি হয়। তাই রাত্রিগামী গাড়িতে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন থাকে। আমাদেরও ধনুষ্কোটি পৌঁছতে পরদিন সকাল বেলা সাতটার কাছাকাছি হবে। পাশের কামরাটিতে উঠেছিলেন আরও চারজন সম্মেলন-প্রতিনিধি—তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা। তাঁদেরও গন্তব্য স্থল রামেশ্বরম ও ধনুষ্কোটি। কাজেই বেশ নির্ভয়ে, আনন্দে যাত্রা সুরু হ'ল, তবে পৈটিক ব্যাপারটিতে কিছু ঘাটতি রয়ে গেল। কিন্তু রসনাপরিতৃপ্তি ও ঘাটতি পূরণের আশা গৃহে ফিরে যাওয়া অবধি মুলতুবি রেখে গাঢ় নিদ্রাকেও দিলাম বিদায়।

আসন্ন ইলেকট্রিক ট্রেনের খবরে আজকাল পশ্চিমবঙ্গ মুখরিত ও উত্তেজিত। কিন্তু মাদ্রাজে ও গাড়ী পুরনো। প্রায় প্রতি দশ মিনিট অন্তর আমাদের পাশ দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন হুড় হুড় করে ছুটে যেতে লাগল। কিন্তু দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমাদের কেউ হারাতে পারলে না। ত্রিচিনপল্লীতে আবার দেখেছিলাম, রেলপথ দিয়ে যাত্রীবাহী মোটর বাসও ছুটছে!

মিঃ রেড্ডি আমাদের শিক্ষক হয়ে বসলেন: বললেন, "আপনারা চায়ের বদলে খাবেন কফি। সব ষ্টেশনেই ভাল কফি পাওয়া যায়।" এবং আমাদের অন্ন, জল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের তামিল নাম শিখিয়ে দিতে লাগলেন। সঙ্গে এক ছাত্র-প্রতিনিধি ছিলেন। তিনিও অপর একজন সঙ্গী নামগুলি ডাইরিতে লিখে নিয়ে মুখস্থ করতে লাগলেন। মুখস্থ করলেও আমার কিছুই মনে থাকে না। তাই ও ঝঞ্ঝাটে গেলাম না। কেবল শুনে রাখলাম।

জানলার বাইরে ধরিত্রীর বুকে দক্ষিণের প্রখর রৌদ্রঢালা ক্ষেত প্রান্তর অরণ্য জলা শুষ্ক নদীপথ ছায়াচিত্রের মত চোখের সম্মুখ দিয়ে অবিরাম ছুটে চলেছে। মধ্যে মধ্যে সে স্রোত শহরে শৈলে ছিন্ন হয়। চলার পথে কত গ্রাম দেখি, কত ছোট বড় মন্দিরের গোপুরম চোখে পড়েই দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। দক্ষিণে তামিল দেশের প্রতি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামেই সাধারণতঃ দুটি করে মন্দির। একটি শিবের, অপরটি বিষ্ণুর। তাই একটি তামিল প্রবাদ আছে, "যে গ্রামে মন্দির নেই সে গ্রামে বাস করা উচিত নয়।" আবার আরও দক্ষিণে দেখেছি, বহু বড় বড় গ্রামে গির্জ্জার ক্রুশাগ্র শান্ত আকাশের দিকে যেন অঙ্গুলি তুলে রয়েছে। উত্তরের মত দক্ষিণে মসজিদ ইদগা দরগা চলার পথে বিশেষ চোখে পড়ে নি। তার কারণ, সকলেরই জানা আছে।

আমাদের কামরায় নানা রকমের যাত্রী—ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, শিক্ষিত, নিরক্ষর। চেহারায় তাঁদের অন্ততঃ আমার চোখে, আমাদের থেকে তেমন পৃথক মনে হ'ল না। শিল্পী বন্ধু দুজন খাতা-পেনসিল বার করে তাঁদের কয়েকজনের প্রতিকৃতি আঁকতে লাগলেন। তাই দেখে কামরাসুদ্ধ সকলে চমৎকৃত।

মিঃ রেড্ডি শিক্ষক থেকে হয়ে দাঁড়ালেন—আমাদের কামরা-স্বামী। শিল্পী চক্রবর্ত্তী পথে চলবার কালে পৈটিক বিষয়ে অতি সাবধানী। তাই গাড়িতে উঠবার আগে আমাদের খুব সাবধান করে দিয়েছিলেন, "পথে কিছু কিনে খেও না। আমি তো গাড়িতে যতক্ষণ থাকি দাঁতে কিছুই কাটি না।" এবং তার প্রমাণ দিতে

লাগলেন বড় বড় ষ্টেশনে। পাতায় মোড়া সাড়ে বত্রিশ ভাজা বড্ডা, ইডলি, শেষে উপমায় তা সরবে ঘোষিত হতে লাগল। মিঃ রেড্ডিও ফেরিওয়ালাদের আমাদের কামরার জানালার ধারে ডেকে নিয়ে আসেন এবং আমাদের আহারে যেন তৃপ্ত হন।

শিল্পীবন্ধু এক সময়ে বললেন, "দেখছ, এদের খাবারে তুলসীপাতা দেওয়া।" এবং তার পরই তাঁর খাদ্যভক্তি যেন আরও গভীর হয়ে উঠল।

তাঁর কথায় ধারণা হ'ল, মাদ্রাজীরা ভারি কৌশলী। এরা তুলসী-পাতা খাইয়ে লোককে বৈষ্ণব করে। ধর্মান্তরীকরণের এ এক অভিনব পন্থা বটে! তবু কয়েকটি পাতা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে দেখলাম, সেগুলি তুলসীও নয় ... নয়, তেজপাতার মত মসৃণ এক রকমের সুগন্ধি পাতা যার গাছের চাষ কেবল দক্ষিণেই নানা জায়গায় করা হয়। এদিকে সর্ব্বত্র খাদ্যে—বিশেষ করে ডালের সঙ্গে এই পাতার ব্যবহার আছে।

একটি বড় ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই দেখা গেল, বিপরীত দিকে কয়েকখানি মালগাড়িতে আখ বোঝাই করা হচ্ছে। মিঃ রেড্ডি অমনি নেমে গিয়ে বেশ বড় দেখে একখানি আখ সংগ্রহ করে এনে আমাদের দিলেন। তিনি তো দিলেন কিন্তু ইক্ষুরস কি সহজে পাওয়া যায়? আমাদের পাশে বসেছিলেন এক কৃষাণী। তিনি আমাদের অধিকাংশের অবস্থা দেখে দয়াপরবশে একজনের হাত থেকে একটি খণ্ড টেনে নিয়ে তার একটি প্রান্ত বেঞ্চিতে কয়েকবার ঠুকতেই খোসা আলগা হয়ে গেল। সেটি তখন তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে খেতে ইঙ্গিত করলেন।

বন্ধুটি এই স্নেহস্পর্শে বিগলিত অন্তরে বললেন, "আমার মাতৃস্নেহের কথা মনে পড়ছে। ওঁর আচরণ মায়ের মত।"

মিঃ রেড্ডিকে বললাম, "মিঃ রেড্ডি! আমার বন্ধুটি বলছেন, এই মহিলাটির আচরণ মাতৃবৎ। ওঁকে একথা বুঝিয়ে বলুন।"

মিঃ রেড্ডি আমার কথা কানেই তুললেন না। আমি আবার কথাগুলি বলতে তিনি কিছুটা বিরক্তিভরে বললেন, "ও অজ্ঞ মূর্খ স্ত্রীলোক। এ কথার কি বুঝবে?"

একই মানুষ, একই পরিবেশ, কিন্তু ব্যবহারে কি তারতম্য! নিজ দেশেও একশ্রেণী, আর একশ্রেণীর কাছে মর্য্যাদা পায় না। মিঃ রেড্ডির মন্তব্যে ব্যথিত হলাম। মনের সুর কেটে গেল। তবুও মিঃ রেড্ডির অতিথিবৎসলতা প্রবাস-পথে একটি সুখস্মৃতির মত অন্তরে জেগে আছে। তিনি ভিলুপুরমে বেলা চারটেয় নেমে গেলেন এবং যাবার সময়ে আমাদের একছড়া কলা উপহার দিয়ে বললেন, "আমার ভালবাসার দান।" কৃষাণী-মাতা তাঁর আগেই একটি ষ্টেশনে নেমে গিয়েছিলেন। দুটি কামরায় রইলাম কেবল আমরা দুটি দল।

কলকাতার জনৈক শিল্পী বন্ধু বৃদ্ধাচলম্ দেখবার অনুরোধ করে-ছিলেন। সন্ধ্যার কিছু আগে দেখলামও তার চারটি উচ্চ গোপুরম, দূরে রেলগাড়ির কামরা থেকে। মন্দিরটির স্থাপত্য ও শিল্পকাজ দেখবার যোগ্য বলেই ধারণা হ'ল। কিন্তু আমরা তখন সচল হয়েও সেদিক পানে বৃদ্ধের মতই অচল। তার পর প্রথম রাত্রে
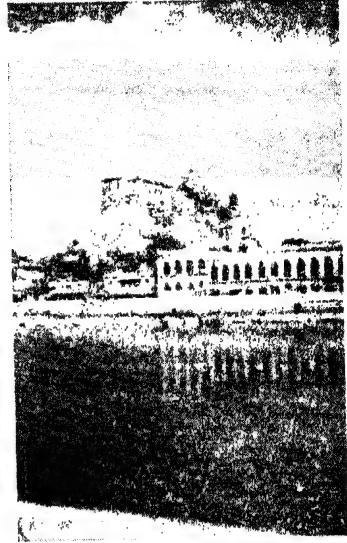
শৈলমন্দির—ত্রিচি

কাবেরীর সেতু পার হতে হতে চোখে পড়ল ত্রিচিনপল্লীর শৈল-মন্দিরের বিজলী আলোকোজ্জ্বল স্বর্ণময় চূড়া আকাশভরা নক্ষত্রতলে স্থির হয়ে আছে। প্রথমে অবিশ্যি কেউই সেটিকে ত্রিচির মন্দির বলে বুঝতে পারলাম না।

গাড়ি এসে বিশাল ত্রিচিনপল্লী ষ্টেশনে থামল। ষ্টেশনটি খুব বড় জংশন। এখানে নেমে অনেকেই কাবেরীপারে শ্রীরঙ্গমেও যান যদিও "শ্রীরঙ্গম" নামে একটি পৃথক ষ্টেশন আছে। সকলেরই জঠর তখন ক্ষুধানলে জ্বলছে অথচ যোগ্য খাদ্য নেই। প্ল্যাটফরমে নেমে যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এমন সময়ে এল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়, রক্তচক্ষু পশ্চিমা পোশাক-পরা মাথায় চাদর চাপানো একটি স্থানীয় লোক। তার সঙ্গীও কিন্তু খর্ব্বকায়। সে এসেই আমায় ভাঙা হিন্দীতে রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় যাবে?"

বললাম, "তোমার সে কথায় কি দরকার?"

সে বললে, "জিজ্ঞেস করায় কি দোষ?"

বললাম, "আমি তো তোমায় জিজ্ঞেস করছি না কিছু।"

তার চোখ দুটি আরও আরক্ত হয়ে উঠল। বললে, "জিজ্ঞেস করেছি তো হয়েছে কি?"

বললাম, "আমি পছন্দ করি না।"

আমাদের মাস কয়েক আগে আমার অনুজা এদিকে তীর্থ-দর্শনে এসে শ্রীরঙ্গমে ডাকাতের হাতে পড়েন এবং ডাকাতদলের

মধ্যে যে নারীটি ছিল সে তাঁদের রক্ষা করে। এও ঐ শ্রীরঙ্গমের এ-পারের ষ্টেশন। তার উপর লোকটির চেহারা ও কথাবার্তা ঈষৎ শিষ্টও নয়। সে তবুও উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, "জিজ্ঞেস করেছি তো কি হয়েছে ?"

আমার সঙ্গীরা ব্যাপারটি দেখলেও তখন খাদ্য নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন, তাই কেউই প্ল্যাটফরমে নেমে এলেন না। আমি লোকটার কথায় আর কোন উত্তর না দিয়ে নিজ মনে আহারকার্য্য শেষ করতে লাগলাম। সেও সমানে চীৎকার করতে লাগল। ঠিক ছিল, ফিরবার পথে ত্রিচির ও শ্রীরঙ্গমের মন্দির মূর্ত্তি দেখব। তাই সেখানে না নেমে সোজা চললাম, ধনুস্কোটির উদ্দেশে।

একটি ছোট দ্বীপের দক্ষিণে ধনুস্কোটি, উত্তরে রামেশ্বরম একথা সেখানে যাবার আগে জানতাম না। ভারতভূমি ও দ্বীপটির মধ্যে পশ্চিমে প্রকাণ্ড সমুদ্রখাড়ি। প্রশস্ত খাড়িটির উপর সেতু। সেতুপথে রেলগাড়ি চলাচল করে। অঞ্চলটির নৈসর্গিক দৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও অবিস্মরণীয়।

উচিপ্পুলি ষ্টেশন থেকে রাত্রির যবনিকাখানি ধীরে উঠে যেতে লাগল আর ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে চোখের সম্মুখে প্রকাশিত হতে লাগল সম্পূর্ণ নূতন এক দেশ। নিবিড় সন্নিবিষ্ট নারিকেল ও বেণুবনের মধ্য দিয়ে গাড়ি কিছু মন্থর গতিতে চলতে লাগল। কারণ বালির উপর রেলপাতা। মাঝে মাঝে পরিচিত বাদাম, ঝাউ, বাবলা ও অপরিচিত কত রকমের গাছ। তার ফাঁকে ফাঁকে কাঁচা ও দু'চারখানি একতলা পাকা বাড়ী। মানুষজন বড় একটা দেখা যায় না। আকাশে উড়ছে সামুদ্রকূলচর পাখী। মানডাপাম ষ্টেশনে এসে গাড়ি থামল। তখন বেশ আলো ফুটেছে। ষ্টেশনটি সমুদ্রের ধারেই। ঘাটে দুখানি জাহাজ—অনেক যাত্রী এখানে নামলেন।

সম্ভবতঃ তাঁরা সিংহলযাত্রী। এখানে সিংহলযাত্রীদের যাত্রার আগে সরকারী আপিসে কিছু কর্ত্তব্য পালন করতে হয় বলে শুনে-ছিলাম। সিংহলগামী জাহাজের ঘাট হচ্ছে ধনুস্কোটি পায়ার ও তালাইমানার পায়ার।

গাড়ী আবার চলতে লাগল। পথের দৃশ্য সেই একই কিন্তু হঠাৎ দেখি, দু'পাশে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলেছে বৃহদাকার প্রজাপতির ঝাঁক। প্রজাপতিগুলির ডানার রঙ কালো, ডানার গায়ে কয়েকটি শাদা চক্র। তারা কোথা থেকে আসছে কোথায় চলেছে কে জানে। কিন্তু সামনে পিছনে কোথাও তাদের শেষ নেই! যেন পতঙ্গজীবনের একটি অন্তহীন ধারা সমুদ্রের দিকে অবিরাম বয়ে চলেছে। তাদের মাঝ দিয়ে ছুটতে ছুটতে গাড়ি গিয়ে উঠল সমুদ্র-খাড়ির সেতুতে। তারাও পাশে পাশে চলল, গাড়িও ঝমঝম শব্দে সেতুপথে এগোতে লাগল। আমাদের নিচে শিলাসঙ্কুল চঞ্চল সমুদ্র, বামে বঙ্গোপসাগরের নীলাভ কালো সংক্ষুব্ধ জলরাশি, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পাংশু, শান্তপ্রায়। দু'পাশেই সাদা পাল উড়িয়ে ধীবরদের নৌকা চলেছে; আর দক্ষিণে দূরে, বহুদূরে দিকচক্র-রেখায় আকাশপটে আঁকা চিত্রের মত একখানি দেশীয় পাল-তোলা জাহাজ স্থির হয়ে আছে। সেতুপারে পৌঁছে গাড়ি দু'পাশে নিবিড় কেয়াবনের মাঝ দিয়ে ছুটতে লাগল। সমুদ্রের ভিজে বাতাসে কেয়াফুলের মৃদু গন্ধ। দু'পাশে বালুময় ভূমি, সুবিশাল জলা। জলায় হাজার হাজার বড় বড় সামুদ্রিক পাখীর মেলা। দূর থেকে মনে হতে লাগল জনসভা বসেছে। জলাশেষে লতা-ছাওয়া ছোট-বড় বালিয়াড়ি, যেন সমুদ্রতীরে অসংখ্য কুটীর। লতাগুলি বেগুনি রঙের বড় বড় ফুলে ফুলময়। সেগুলির উপর দিয়ে সেই প্রজাপতির বিরামহীন স্রোত শত তরঙ্গ তুলে উড়ে চলেছে।

অবশেষে তখনকার মত আমাদের যাত্রা শেষ হ'ল—ধনুস্কোটিতে পৌঁছলাম। কিন্তু প্রজাপতিগুলি উড়ে যেতে লাগল আরও দূরে সমুদ্র-মধ্যে যে দ্বীপরেখা দেখা যাচ্ছিল তার উদ্দেশে। এদিককার রেল-পথেরও এখানেই শেষ। ষ্টেশন থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে সমুদ্র। এখানে স্থায়ী অধিবাসী বিশেষ নেই। রেলের ও সরকারের প্রয়োজনে কতকগুলি গৃহ তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় লোকের কয়েকটি অপরিচ্ছন্ন মক্ষিকা-অধ্যুষিত হোটেল আছে বটে। সেখানে পুরোদস্তর মাদ্রাজী খানা ও তার উপর অসংখ্য মাছি পাওয়া যায়। উত্তরদেশবাসীরা প্রাণরক্ষার্থে সেই খাদ্যই গলাধঃকরণ করেন। আমরাও তা বাদ দিই নি। ষ্টেশনে মালপত্র জমা দিয়ে রৌদ্রতপ্ত বালুপ্রান্তর ভেঙে চললাম সমুদ্রস্নানে। প্রান্তরশেষে সমুদ্রকূলে কয়েকখানি চালা। কিছু দূরে একখানি ঘরে এক বাঙালী সাধু একটি কালীমূর্ত্তি স্থাপন করে সেখানেই বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। সন্ধ্যার পর নির্জ্জন সমুদ্রতীরে, বালুপ্রান্তরে তিনি ছাড়া আর কোন মানুষ থাকে না। যা হোক, সমুদ্রকূলে আমাদের মত আরও অনেক যাত্রীর সমাগম হয়েছিল। ক্লান্ত দেহে, গ্রীষ্মতাপে ছাপ্পড়ের সেই ছায়াটুকুতে বসে সমুদ্রের শীতল হাওয়ার স্পর্শে মনে হতে লাগল, পৃথিবীতে জুড়াবার ঠাঁই বোধ হয় একমাত্র এইখানেই। দূরে সমুদ্রগর্ভে নারিকেলবনরাজিনীল কয়েকটি দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল। সিংহল থেকে যাত্রী নিয়ে শুভ্র রাজহংসের মত নীল জলে ভেসে এল একখানি জাহাজ। সেদিকে তাকিয়ে ছায়াময় বালুশয্যা ছেড়ে উঠতে মন চাইছিল না।

এখানে সমুদ্রের একটি জায়গাকে মনে করা হয়, দুই সমুদ্রের মিলনস্থান। সেই সঙ্গমে স্নান করে পুণ্যকামীরা তর্পণ করেন। সঙ্গীদের মধ্যে চার জনে স্নান সেরে পারলৌকিক ক্রিয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারপর 'ইডলি' কিনে বালক ও নারী ভিখারীদের মধ্যে বিতরণ করে শিল্পীদ্বয় গেলেন সেই কালীবাড়ীর ছেঁচতলার ছায়ায় বসে রঙ-তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে। আর দু'জন গেলেন ছাপ্পড়সারির একেবারে শেষে। আর আমি স্নান সেরে সেই ছায়াতেই এসে বস-লাম। কিন্তু ভিখারী ও সাধু নেই কোন্ তীর্থে ? তারা এসে আমায় ঘিরে ধরল। তাদের সকলকে এড়াতে পারলাম, পারলাম না কেবল একজন তিলকধারী সাধুবেশীকে। সে ভাঙা-হিন্দীতে বললে, "শেঠ,

এত পয়সা খরচ করে, এত দূর থেকে এসেছ, সাধু খিলাবে না ? খিলাও।"

বললাম,"বাবা, বেশ কিছু খরচ করে, অনেক ধকল সয়ে, অনেক দূর থেকে এখানে এসেছি। তুমি আমায় কিছু খিলাও।"

সে বললে, "দেখছি, তুমি যোগী, সাধু, পুণ্যাত্মা। আমায় খিলিয়ে আরও পুণ্য কর।"

বললাম, "বাবাজী, আমাতে এতই যখন দেখলে, তখন খিলানোটা আর বাকি রাখছ কেন ?"

সে বললে, "এ হে হে ! তুমি করছ কি, শেঠ ?"

বললাম, "এ হে হে ! তুমিই বা কি করছ, বাবাজী ?"

যে সঙ্গীটি এতক্ষণ আমার পাশে বসে সব শুনছিলেন ও দেখছিলেন, তিনি আমার প্রতি নিদারুণ বিরক্তিতে উঠে গেলেন। একটু আগে তাঁরা এবং আরও কয়েকজন একে খিলিয়েছিলেন। পরিশেষে তার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করে একাকী চললাম সেই বালুপ্রান্তর ভেঙে ষ্টেশনের দিকে। শিল্পীদ্বয় তখনও রবিকরোজ্জ্বল, উদ্বেল নীলসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাগজে রঙ চড়াচ্ছেন ! আর অন্যেরা তাঁদের পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে অন্তরের ভাবসমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছেন।

অতঃপর একসময়ে সকলে জমায়েৎ হয়ে রেলে উঠতে যাব এমন সময়ে দেখা গেল আমাদের ছাত্র-সঙ্গীটি নেই। সে যে কোথায় কেউ জানে না ! ছেলেটি ভাবুক ও সাহিত্যিক। বুঝলাম, সর্ব্বনাশ হয়েছে ! কোথায় তার ছোট্ট ডাইরিখানি খুলে মনের কথাগুলি টুকে রাখতে বসেছে কে বলবে ? এদিকে গাড়ি যে ছাড়ে ! এ যে প্রাণহীন নির্ম্মম যন্ত্রবাহন। শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক—এসব কিছুই বোঝে না, কোন কালে বুঝবেও না। এদিক-ওদিক সম্ভব অসম্ভব জায়গায় খোঁজা হ'ল—সে নেই ! কুলি বেচারীও আমাদের সেই অবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একবার বললে, "পায়ার ! পায়ার !" এবং ইঙ্গিতে বোঝালে সেদিকেও যেতে পারে। কারণ সিংহলগামী জাহাজখানি তখনও পায়ারেই বাঁধা ছিল। পায়ার ধনুস্কোটি ষ্টেশন থেকে প্রায় মাইল দুই দূরে।

সঙ্গীদের বললাম, "তোমরা যাও। আমি থাকি। ওকে নিয়ে পরের গাড়িতে যাব।" কিন্তু তাঁরা কেউই আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন না অথচ কিসে যে মুশকিলের আসান হবে তাও কেউই বুঝতে পারলাম না। তার পরের গাড়িখানিতে গেলে রামেশ্বরমে পৌঁছতে সন্ধ্যা। ততক্ষণ সেই বালুরাজ্যে ষ্টেশনের লোহা-লক্কড়ের মধ্যে উৎকট গন্ধ শুকতে শুকতে বৃথা বসে থাকাও যায় না। অগত্যা তার মাল-পত্র তুলতেই গাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলল "পায়ারে"। সকলে রেলপথের দু'পাশে নজর রাখতে রাখতে চললাম। কিন্তু সেই তপ্ত বালুরাজ্যে, নীলসমুদ্রকূলে কাউকেই চোখে পড়ল না। তখন সকলেরই অন্তর অশুভ আশঙ্কায় ভরে উঠল। "পায়ারে" পৌঁছেও তাকে দেখতে পেলাম না। যে মানুষটি কিছুক্ষণ আগেও ছিল, সে এমন রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল। পায়ারে কত যাত্রী উঠল। কিন্তু তাদের মধ্যেও সে নেই ! হায়, মানুষের কৌতূহল ও ভাবুকতা। "পায়ার" থেকে আমার আর অগ্রসর হতে ইচ্ছা হ'ল না। সেখানে নেমে তাকে চারধারে খুঁজবার সংকল্প করলাম। এমন সময়ে গাড়ি ছাড়বার সিটি দিল আর সঙ্গীদের মধ্যে একজন জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে আকুলভাবে বলে উঠলেন, "ঐ যে দীপেন ! ঐ—ঐ—।" ছেলেটির নাম দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে ফুটবোর্ডে বেরিয়ে দেখি ছোট্ট মানুষটি বালুর উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। সকলে চীৎকার করে ডাকতে লাগলাম, এবং সে এসে গাড়িতে উঠেই বেঞ্চিতে একেবারে এলিয়ে পড়ল। তার অবস্থা তখন বেশ উদ্বেগজনক। সে অবস্থায় তার দরকার ঠাণ্ডা বাতাস ও জল। কিন্তু বাতাস তখন মন্দীভূত আর জল—তাও দূরে। একজন গাড়িতে ডাব বিক্রি করছিল। ডাব কিনে তার জলে তাকে পরিতৃপ্ত করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাতেও জল ছিল সামান্যই। এদিকে গাড়ি চলতে সুরু করল। কিছু পরে সে কিঞ্চিৎ সুস্থ হলে তার অন্তর্দ্ধানের কাহিনীটি ব্যক্ত করল। বললে, গাড়ি ছাড়বার দেরি দেখে এসেছিল পায়ারে। পায়ার থেকে ধনুস্কোটি ষ্টেশনে ফিরে গিয়ে কুলিটির মুখে আমাদের বার্ত্তা শুনেই গাড়ী ধরবার জন্যে প্রায় দু' মাইল আবার গাড়ির পিছন পিছন ছুটে এসেছে। তরুণের প্রতি বয়স্কগণ চিরদিনই উপদেশ বর্ষণ করে থাকেন। আমরাও পাঁচ জনে সে সুযোগ ছাড়লাম না, যদিও সে উপদেশের কণিকামাত্র আমারও প্রয়োজন ছিল। কারণ গাড়ি ছাড়বার অনির্দ্দিষ্ট সময়-সংবাদ আমিই তাকে দিয়েছিলাম।

মনে পড়ল প্রৌঢ় কুলিটির কথা। সে শত শত বিদেশীকে দেখছে। তাদের চরিত্র সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তারই সাহায্যে বলেছিল—'পায়ার ! "পায়ার !" সে জানতই না যে ছেলেটি এদিকে এসেছে।

ধনুস্কোটি থেকে রামেশ্বরমের দূরত্ব খুব বেশী না হলেও পামবানে গাড়ি বদল করতে হয়। সঙ্গে বেশী মালপত্র থাকলে কিছুটা অসুবিধার। কিন্তু দক্ষিণ দেশের যাত্রীর শয্যা ও পোশাকের বোঝা সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজনই বা কি ? যেটুকু আবশ্যক তা নিজেই কাঁধে বা হাতে ঝুলিয়ে বওয়া চলে। একথা বলছি, আমাদেরই মত সামান্য লোকদের সম্বন্ধে।

যখন রামেশ্বরমে পৌঁছলাম তখন নিবিড় তাল-নারিকেল বন-শিরে সূর্য্য নেমেছে। ষ্টেশনের কাছেই একটি ধর্ম্মশালার সিঁড়ি-পথে উঠতে উঠতে উঠোনের ধার থেকে কানে এল কয়েকটি বাংলা শব্দ। তাতে মন দুলে উঠল। ছ'টি বাঙালী সন্তান এক সঙ্গে পথ চলছি, বাংলা বলছি। তবুও বাংলার জন্যে অন্তরে ব্যাকুলতা ! দ্বিতলের একখানি ঘরে আশ্রয় নিতে নিতে খবর পেলাম, নিচে এক ঘরে আছেন কয়েকজন বাঙালী। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করতে গিয়ে দেখি তাঁরা আমাদের সেই চারজন সহযাত্রী। তাঁরা ধনুস্কোটিতে না গিয়ে প্রথমে সেখানেই এসেছেন এবং সেখান থেকেই কলকাতায়

ফিরবেন। কারণ, তাঁদের মধ্যে কলকাতা কর্পোরেশনের জনৈক পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আপিস তাঁকে টানছে, তিনি আর থাকতে পারেন না। সঙ্গের মহিলাটি তাঁরই পত্নী। আসবার পথে মহিলাটিকে আমরা বলতে শুনেছিলাম, "সামনের বার আর কাজের লোকের সঙ্গে আসব না, একজন বেকারের সঙ্গে আসব।" শেষে সুদূর কলকাতা কর্পোরেশনের আপিসেরই জয় হ'ল!
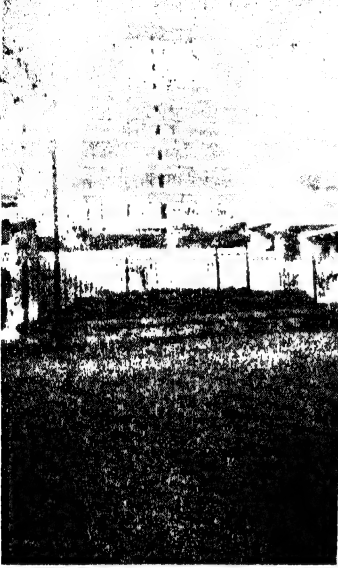
রামেশ্বরম্—গোপুরম্

কিছুক্ষণ পরেই চললাম, মন্দিরে। খানিকটা গিয়ে রাজপথ ছেড়ে চললাম এক বিচিত্র পথ ধরে। সামনে শৈল বা সু-উচ্চ দুর্গপ্রাকারের মত রক্তাভ বালিয়াড়ি—তার পিছনে কোমল নীল আকাশ সমুদ্র বাতাসে সতত সঞ্চরণশীল সিকতায় ঈষৎ রক্তিম। রামেশ্বরমের প্রাকৃতিক দৃশ্যে এই বালিয়াড়িগুলি ও তাদের সানুদেশে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার তালতরুশ্রেণী এমন একখানি চিত্রসৃষ্টি করে রেখেছে যা এক অনাস্বাদিত ভাব ও আনন্দ মনে আনে। পথটি বালুময়—একধারে নিবিড় তালীবন যেন একখানি জমাটি কালো মেঘ মাটিতে নেমেছে। অপর ধারে ছায়াঘন সুবিস্তৃত নারিকেল ও বেণুবন। তার ছায়ায় পল্লীকুটীরগুলি। রামেশ্বরম একখানি অর্দ্ধসুপ্ত গণ্ডগ্রাম। তবে পথে, মন্দিরে, অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে, দোকানে বিজলী আলো জ্বলে। পল্লীকুটীরে জ্বলে না। অবিশ্যি এদেরই সংখ্যা ভারতে বিপুল। শোনা ছিল, রামেশ্বরম ও কন্যাকুমারিকার সমুদ্রতট থেকে সমুদ্রে সূর্য্যের উদয় এবং সূর্য্যের অস্ত দেখা যায় যা ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছে। আমরা সূর্য্যাস্ত দেখবার আশায় তাড়াতাড়ি একটি বালিয়াড়ির উপর উঠতে লাগলাম। সূর্য্যাস্ত দেখতে পেলাম না সত্য কিন্তু বালিয়াড়ি শীর্ষে বাতাস ও বালুতে যে মায়া রচনা করেছে তা দেখে মুগ্ধ হলাম। হাওয়ায় বালিয়াড়ি-শীর্ষের বালুকণারাশি শীর্ষ থেকে মাত্র আধহাত-মত উপরে উড়ছে। তাতে মনে হতে লাগল, সূক্ষ্ম লূতাতন্তুজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে সোনালি আলোয় ঝলমল করছে। এই দৃশ্য আবার সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। পরদিন সঙ্গীদের মধ্যে

রামেশ্বরম্—গোপুরমের আর একটি দৃশ্য

তিন জন রামেশ্বরম গ্রাম থেকে মাইল দুই তফাতে জলবেষ্টিত একটি মন্দির থেকে সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত দেখেন—সেখান থেকে উদয়ও দেখা যায়।

বালিয়াড়ি থেকে নেমে গ্রামের পাশ দিয়ে সমুদ্রকূলের দিকে যেতে যেতে দেখলাম, বালিতে খুব বড় কয়েকটি গর্ত্ত—দুটি গর্ত্তের কিনারে দুটি স্ত্রীলোক বসে অতি দীর্ঘ দুটি হাতায় গর্ত্তের তলা থেকে জল তুলে বিশাল ও বিচিত্রাকার দুটি পিতলের ঘড়ায় ভরছে। বৃষ্টির যে জল বালুরাশি শোষণ করে এ সেই জল এবং পানযোগ্য। এখানে কলের জলও সরবরাহ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ অধি-বাসীই বাড়ীতে তা পায় না।

অর্দ্ধচন্দ্রাকার উপকূল ঘিরে ধীবর ও অন্যান্য শ্রেণীর অধিবাসীদের ঘর-বাড়ী। সেখান থেকে রামেশ্বরম মন্দিরের গোপুরম দেখা যায়—তাল-নারিকেলের মাথা ছাড়িয়ে আকাশপানে উঠেছে। এখান থেকে অনেক যাত্রী সমুদ্রপথে নৌকায় ধনুষ্কোটি গিয়ে থাকেন। তবে আমাদের মধ্যে কারও কারও হাতে সমুদ্রযাত্রার রেখা রয়েছে। তাই কয়েক মাইল সমুদ্র অতিক্রমণে তা মুছে যাবার ভয়ে আমরা ও পথ ধরি নি।

মন্দিরে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা শেষ হয়েছে। রামেশ্বরমের মন্দিরের সুদীর্ঘ অলিন্দ ভারতের স্থাপত্যশিল্পের এক পরম বিস্ময়। গোটা মন্দিরের নির্ম্মাণকৌশল স্থপতিগণের, প্রস্তরস্তম্ভে মূর্ত্তি ও শিল্পকাজ শিল্পীদের গভীর আলোচনার বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোকের অন্তর অলিন্দপথে চলতে চলতে এমন এক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে যা আর কিছুতেই টলাতে পারে না। আমারও হ'ল সেই অবস্থা। মণিকোঠাস্থিত শিববিগ্রহের সম্মুখে মর্ম্মরের বিশাল বৃষমূর্ত্তি, পার্ব্বতীর মহা-সমারোহপূর্ণ আরতি, তাঁর স্বর্ণশিবিকা ও বিবিধ মণি-রত্নালঙ্কার, অলিন্দকোণে নটরাজের অনুপম মূর্ত্তি সে গাম্ভীর্য্যে কোথায় নিমগ্ন হয়ে গেল।

সঙ্গীরা যিনি যে মানস ও মানত নিয়ে এসেছিলেন মূল্য দিয়ে তা সম্পন্ন করতে বসলেন। আমি তো অলিন্দে অলিন্দে ঘুরে সারা। ছাত্রটিও অস্থির হয়ে আনমনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটু রাত্রে একটি হোটেলে খাদ্যের আশায় যেতেই তামিল হোটেল-ওয়ালা বললে, "আসুন! বসুন। কি চাই?" মাদ্রাজে সম্মেলনের শেষ দিনে বক্তৃতায় শ্রীরাজগোপালাচারী বলেছিলেন, "বেঙ্গল নোজ নো বাউণ্ডারি!" হোটেলওয়ালার কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, "বেঙ্গলি নোজ নো বাউণ্ডারি।"

পরদিন সকালে চললাম, আবার মন্দিরের দিকে। শিল্পী দুজন গেলেন সেই বালিয়াড়ির ধারে ছবি আঁকতে। মন্দিরের পথে দেখলাম, দুটি কিশোরী তাদের বাড়ীর সম্মুখে পথের খানিকটা ঝাট দিয়ে পরিষ্কার করে ও জল ছিটিয়ে সেখানে শুকনো চালের গুড়ো দিয়ে মস্ত ও বিচিত্র আলপনা দিচ্ছে। দেখলাম, প্রায় সব বাড়ীর সম্মুখেই পথে আলপনা। কিন্তু সে চিত্রগুলি আমাদের বাংলার আলপনার মত স্নিগ্ধ নয় এবং তার সঙ্গে মিলও নেই। কাঞ্চীপুরমের মতই দেখলাম, কোন কোন বাড়ীর সামনে আলপনার উপর চারটি গোময়ের গুলীতে চারটি কুমড়ার ফুল। স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মিঃ, এর মানে কি?"

তিনি আমাদের পরিচয় নিয়ে বললেন, "এ হ'ল মাঙ্গলিক। দক্ষিণে মাদ্রাজে হিন্দুদের বাড়ীর সামনে পৌষ ভোরই আলপনা দেওয়া ও বাড়ী ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়ে থাকে।" তখন পৌষ মাস।

পথেই দেখা হ'ল সাহিত্য সম্মেলনের চার জন লক্ষ্ণৌয়ের প্রতিনিধির সঙ্গে। তাঁরা লক্ষ্ণৌয়ে তাঁদের বাড়ীর পথ ধরেছিলেন। জানি না কাজের তাড়নায় কিনা। তাঁদেরও সঙ্গে একটি মহিলা ছিলেন। তাঁরা উঠেছিলেন মন্দিরের ধারে রেষ্ট হাউসে।

দুটি কিশোরী তাদের বাড়ীর সামনে রাস্তায় আলপনা দিচ্ছে।
রামেশ্বরম্—প্রভাতকাল

রামেশ্বরমের খ্যাতি যেমন সুদূরবিস্তৃত তার তুলনায় যাত্রি-সমাগম সামান্যই। কাফিখানা বা রেস্তোরা ও হোটেল আছে অনেকগুলি। একটি দোকানে দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি। দক্ষিণে বাঙালীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও সুভাষচন্দ্র। এদেশে বাঙালী যে মর্য্যাদা পায় তা মুখ্যতঃ এঁদেরই জন্যে। তবে আরও দক্ষিণে কন্যাকুমারিকার নয় মাইল উত্তরে মোটরবাসে এক মারাঠী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের সময় কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, "বাংলা ভারতের সব চেয়ে অগ্রসর প্রদেশ।" হয় তো তাই-ই।

যা হোক, সেই দিনই গভীর রাত্রে রামেশ্বরম ছেড়ে সকলে রওনা হলাম মাদুরাইয়ে—তবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নয়।

"ঘুম ভেঙে শুনতে পেলাম—"

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

ঘুম ভেঙে শুন্তে পেলাম বিষ্টি নেমেছে—রাত দুপুর।
তাড়াতাড়ি উঠে আসি,
জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকাই,
অন্ধকারে দেখতে পাইনে কিছু ;
হাত বাড়িয়ে দি বাইরে
বড় বড় জলের ফোঁটা এসে পড়ে হাতে।
আনন্দে শিউরে ওঠে দেহ, এ যে অমৃতের স্পর্শ!
শুক্‌নো প্রাণের আর শুক্‌নো মাটির চাওয়া
বিষ্টি এল এত দিনে।
হাত পেতে দি' ভিক্ষুকের মত, ধীরে ধীরে ভরে ওঠে অঞ্জলি
আকাশের দানে।

পাহাড়ের ঢালু গায়ে,
সাঁওতাল পল্লীর একধারে আমার ছোট মাটির ঘর।
পেছনে গভীর শালবন ধীরে ধীরে উঠে গেছে
পাহাড়ের মাথায়,
সামনে পাথর ছড়ান ঢালু পথ নেমে গেছে নদীতে।
রোজ রাতে শালবনের পথে যাদের পায়ের আওয়াজ
শুন্‌তে পাই,
নদীর ধারে শুন্‌তে পাই গলার আওয়াজ—
রাশভারী বাঘ আর রসিক ভালুক,
চঞ্চল হরিণ আর কদাকার হায়না,
মেঘের ডাক শুনে ফিরে গেছে তারা যে যার আস্তানায়
ভিজে মাটির গন্ধে আমার মত আকুল হয়ে উঠেছে
তাদেরও মন।

হু হু করে হাওয়া আসে
জানালা দিয়ে জলের ঝাপটা ঘরে ঢোকে।
বন্ধও করিনে জানালা, সরেও বসিনে একপাশে,
অন্ধকারে মুখ রাখি জানালার উপর।
চোখে-মুখে স্পর্শ লাগে জলধারার
গুটিকয়েক চেনা আঙুলের স্পর্শের মত।

রাত হয়ে আসে শেষ
আবছায়া অন্ধকারে দেখি দুলছে শাল আর পিয়াশালের দল।
দুলছে যেন ভিজে আঁচল।
পাহাড়ের মাথা থেকে ভেসে আসে বনমোরগ আর
ময়ূরের ডাক।
সে ডাক আজ লাগে বড় মধুর।

মেঘের আড়ালে উঠেছে সূর্য,
আলো হারিয়ে গেছে শ্যামল অন্ধকারে।
ঘুম ভেঙেও যেন ঘুমিয়ে আছে পৃথিবী,
সিক্তশীতল আলিঙ্গন অনুভব করবে চোখ বুঁজে।
অরণ্যের অন্তর হতে ভিজে বাতাসে ভেসে আসছে একটা
মিঠে খোশবায়,
বনকরমচার সঙ্গে মেশান চেলিফুলের গন্ধ।
মেঘ ডাকছে গুড় গুড়, বিষ্টি পড়ছে অবিরাম।
চাকর আসে নি এখনো—চাইবার আগেই ছুটি দিয়েছি তার
চা তৈরি হয় নি—নাইবা হ'ল, দরকার দেখিনে,
ছোটখাটো সাধারণ জিনিষের কথা মনেই পড়ছে না আজ।
আমার মধ্যে নেই যেন আমার মন,
সে মন আকাশে মেঘের বুকে ঘনিয়ে আছে,
বিষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়ছে, অরণ্যের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপছে।

হঠাৎ আসে বিষ্টি,
এ যেন মুহূর্তের বিশ্রাম।
গাছের পাতা থেকে জল ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা,
পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নেমে চলেছে অসংখ্য জলধারা
পাহাড়তলীর ছোট নদীটির দিকে।
কূল ছাপিয়ে, পাথর ডিঙ্গিয়ে ছুটে চলেছে স্রোত
কল কল ছল ছল আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি সকাল থেকে।
মহুয়া গাছের আগডালে ঝটপটিয়ে ডানা ঝাড়ে
একজোড়া চিল,
মাঠের উপর নেমে পড়েছে একঝাঁক শালিক।
সাঁওতাল-পল্লীতে উঠেছে সোরগোল,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি, হাসি আর গান।

মাথায় মাটির কলসী নিয়ে নদীর পথে যায়
গুটিকয় সাঁওতালী মেয়ে।
খাটো আঁচল বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে মাজায় আঁট করে বাঁধা,
গলায় লাল পুঁতির মালা, হাতে কাঁচের সবুজ চুড়ি,
পায়ে তাদের পিতলের বাঁকা মল।
চলার ছন্দটা প্রায় নাচের মতই,
কথার ফাঁকে ফাঁকে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

ছোকরা চাকরটা দরজায় এসে দাঁড়ায়
তরুণ সাঁওতাল, একমাথা ভিজে চুল নেড়ে হাসে।
খুশির নেশায় যেন টলমল করে দেহমন।
এটা ওটা কাজ করে, আর গুন্‌গুন্ করে গান গায়;
ভাষাটা সাঁওতালী কিন্তু ভাবটা বিশ্বের—
সে গায় "শালবনের সরু পথে ফুটলো কাঁটা কোমল পায়
হায় রে, হায় হায়,
সে কাঁটা ফুটলো আমার কলিজায়
হায় রে, হায় হায়।"

ঘড়িতে দেখি বেজেছে ন'টা
টুপ্‌টাপ করে আবার নামে বিষ্টি,
হরেক রকম আওয়াজ, যেন বাজছে অনেক যন্ত্র।
পলাশগাছের বড় বড় পাতায় আওয়াজ হচ্ছে তবলার,
মাঠের ঘাসের উপর আওয়াজ হচ্ছে
পায়ে চলার আওয়াজের মত চাপা,
পথের কাঁকরের উপর আওয়াজ হচ্ছে
অসংখ্য হাইহিলের খুট্ খুট্ খুট্ খুট্।
কোথায় যেন পড়ে আছে একটা ভাঙা টিন,
তার উপর বাজছে জলতরঙ্গ।

হঠাৎ ঝম্‌ঝম্ করে চেপে আসে বিষ্টি,
মুহূর্তে মিলিয়ে যায় টুংটাং যত স্বতন্ত্র আওয়াজ,
বেজে উঠে একটা বিরাট গম্ভীর অরকেষ্ট্রা।
মহুয়াতলায় ছুটে এসে দাঁড়ায় দুটি মেয়ে,
আমি জানি ওদের নাম—সোনিয়া আর সুদন।
পাতার ফাঁকে ফাঁকে ওদের মুখে মাথায় এসে পড়ে জল।
গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে গলাগলি ধরে
ওরা ফিস্‌ফিস্ করে কথা কয়,
থেকে থেকে খিলখিল করে হেসে ওঠে।
গুড় গুড় করে ডেকে ওঠে মেঘ, হাওয়ায় দোলে মহুয়ার ডাল
হঠাৎ দেখি সোনিয়া আর সুদন ধরেছে নাচ,
হাতে হাত ধরে দুলে দুলে এগিয়ে আসে দুজনে,
তালে তালে পা ফেলে পিছিয়ে যায় আবার।
বাতাসে দোল খায় মহুয়ার ডাল,
দোল খায় শাল শিমের ডাল,
অরণ্যের এই দোলা দেখলুম সাঁওতালী মেয়ের দেহে।

দুপুর পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ,
আকাশভরা কালো মেঘ, ফাঁক নাই কোথাও,
কালো চোখ মেলে চেয়ে আছে ধরণীর দিকে।
সেই নিবিড় দৃষ্টির মায়ায় মোহিত হয়েছে অরণ্যানী।
শাল আর শিসমের মত আমিও অরণ্যের অংশ,
আমিও হয়েছি মোহিত।

হরিজন সেবায় অর্থসাহায্য

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

যে সকল প্রতিষ্ঠানকে সমাজসেবার কার্য্য গ্রহণ করিতে হয় তাহাদের পক্ষে আজকাল কঠিন সমস্যা, অর্থ আসিবে কোথা হইতে। আজকাল কেন, বরাবরই এ সমস্যা আছে এবং থাকাও উচিত, কারণ সমাজের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের যোগ আছে, ইহা দেখিবার অন্যতম উপায় হইল, জনসাধারণ অর্থ দিয়া প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে কিনা। ইহাই তো পরীক্ষা, জনসংযোগ কি গণসংযোগ কতখানি হইয়াছে তাহার পরীক্ষা। এই যোগ না থাকিলে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বমূলক কোনও রূপ থাকে না। যদি যথা ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা টাকা পাওয়া যাইত, যদি সে টাকা কি ভাবে ব্যয় হইবে তাহার বিচার করিবার উপায় বা ক্ষমতা সর্ব্বসাধারণের না থাকিত, তাহা হইলে একদিকে অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা বাড়িত, অন্যদিকে সেবা-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি সেবাভাবেরও লাঘব হইত। কথাটা ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিতে হইতেছে। আজকালকার দিনে সেবাপ্রতিষ্ঠানের জন্য দান চাহিতে গেলে শোনা যায়—কেন, আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে, welfare state, কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র—রাষ্ট্র টাকা দিবে, আমাদের কাছে চাওয়া কেন? কিন্তু সরকারের টাকাটা ঠিক সময়ে আসিয়া পৌঁছায় না, পাওয়ার নানাবিধ ধাপ বা গণ্ডীও আছে; সে টাকা পাইলে প্রয়োজনের দাবি হয় তো মিটিতেও পারে, কিন্তু সাধারণের দান না থাকিলে প্রতিষ্ঠান যে জনসাধারণেরই সেবক বা প্রতিনিধি, সেরূপ দাবি করিবারও পথ থাকে না। সুতরাং জনসাধারণের কাজে আর্থিক সাহায্যের জন্য জনসাধারণের নিকটেই প্রত্যাশা করিতে হয়। সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বও যে সাধারণের আছে! সরকারী দানের একটা সর্ত্ত হইল এই যে, সরকারী দান পাইতে হইলে সরকারের অধিকার থাকিবে আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিবার। সেবাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বলিব যে, তাহার আয়-ব্যয় পরীক্ষার ভার রহিয়াছে সর্ব্বসাধারণের উপর। তবে দেখিতে হইবে, তাহাতে প্রতিষ্ঠানের দৈনিক কার্য্যের ব্যাঘাত না ঘটে।

সে যাহা হউক, কোথা হইতে টাকা আসিবে, কর্ম্মীর এ চিন্তা অবশ্যই আছে। সেইখানেই কর্ম্মীর পরীক্ষা, সে হয় ত এমন করিয়া কর্ম্মের গুরুত্ব সাধারণকে বুঝাইতে পারে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, আমি কয়েক বৎসর হইল হরিজন সেবকসঙ্ঘের বঙ্গীয় শাখার কর্ম্মব্যবস্থায় জড়িত আছি। দেখা হইলে লোককে বলি, হিন্দুর জন্ম, অন্নারম্ভ, বিবাহাদি সংস্কারে বর্ণহিন্দুকে সকল হিন্দুর কথা মনে রাখুন, অবর্ণ বা হরিজনদের জন্য হরিজন-সেবক সঙ্ঘের ভাণ্ডারেও কিছু দিন। দশসংস্কারে ব্যয় তো কিছু করিতেই হয়, হরিজনদের জন্যও সামান্য কিছু খরচ করুন না। এ কথায় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেহ কিছু করেন, কেহ বা করেন না। কিন্তু চেষ্টা করি আমাদের কথা সকলকে বলিবার ও বুঝাইবার।

কয়েক বৎসর আগে বন্ধু জীবনময় রায় মহাশয় আসিয়া তিন হাজার টাকা আমার হাতে দিলেন, নিরঞ্জন বৈরাগীর স্মৃতিরক্ষার জন্য লোকের হিতার্থে যেন ব্যয় হয়। প্রথমে তাঁহার ইচ্ছা ছিল, টাকাটা যেন কোথাও লাগাইয়া তাহার সুদ হইতে ব্যয় করা হয়। আমি অবশ্য পরামর্শ দিলাম, সুদের উপর নির্ভর না করিয়া আসলও ব্যয় করিতে। আমাদের প্রয়োজন এখনই; যক্ষ্মা, অনশন, অর্দ্ধাশন, পড়ার খরচ—অর্থের আশু প্রয়োজন এখনই, সাধ্যমত সে প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা না করিয়া, যথাসাধ্য এখনই ব্যয় না করিয়া যদি সুদেরই উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে কতটুকু ব্যয় করিতে পারিব? আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তিনি আমাকে আমার ইচ্ছামত সেবার কর্ম্মে উক্ত টাকা ব্যয় করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। স্থির করিলাম, যেসব কাজের জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট তহবিল নাই, অথবা তহবিল হইতে অর্থ আনা সময়সাপেক্ষ, সেই সব কাজেই টাকাটা খরচ করিতে চেষ্টা করিব। হরিজনদের বই, ফি, বা অন্য সাধারণ খরচ ইহা হইতে করিব না, কারণ এজন্য তাহাদের তো স্বতন্ত্র তহবিল আছে। প্রাপ্ত অর্থ কি ভাবে খরচ করি তাহার নমুনা দিতেছি:

এই ভাণ্ডার হইতে আমি ১৯৫১ সালে সরোজনলিনী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের দুইটি ছাত্রীর জন্য ১০০্ একশত টাকা, দুঃস্থ ছাত্রদের বইয়ের জন্য ১৭।০, একটি অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট ছাত্রের ঔষধ ও পথ্যের জন্য ২১৵০, একটি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর ফি দিবার সময় কম পড়িয়াছিল ৪্—মোট ১৪২৷৵০ খরচ করি।

ঐরূপ ১৯৫২ সালে ২৩১।০ খরচ করি। পূর্ববৎসরের মত সরোজনলিনী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের দুইটি ছাত্রীর জন্য ৫০্ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ১০০্ একশত টাকা, বেথুন কলেজে নিরঞ্জন বৈরাগীর নামে এক বৃত্তি দিই ৬০্, দশম শ্রেণীর ছাত্রের স্কুল-বেতন ৫০্, একটি মেয়ের ভর্ত্তি হওয়ার সময় স্কুল-বেতন ৮।০ এবং বইয়ের জন্য ১৩্—মোট ২৩১।০।

১৯৫৩ সনে বেথুন কলেজে প্রদত্ত নিরঞ্জন বৈরাগী বৃত্তি বাবদ ৩০০্, একটি যক্ষ্মারোগীর ঔষধ ও চিকিৎসা বাবদ ১১৫।০, স্কুলের বেতন বাবদ ৫০্, ছাত্রদের বই কেনা বাবদ ১৯৸০, জনৈক দুঃস্থ ছাত্রকে এককালীন সাহায্য ২৫্, একটি দরিদ্র ছাত্রকে সামান্য কিছু

হারে জলখাবার বাবদ ১৬৲, একটি ছাত্রকে এককালীন সাহায্য বাবদ ৪৲ এবং বিবিধ এককালীন সাহায্য ২০৲—মোট ৫৫০৶০।

বর্ত্তমান বৎসরে এ পর্য্যন্ত খরচ করিয়াছি রোগীর পথ্য ও ঔষধ বাবদ ৯৩৮৶০, ছাত্রটির জলখাবার বাবদ ১০৲, বই বাবদ ১২৸৫, পরীক্ষার ফি বাবদ ৪৫৲, এককালীন দান ইত্যাদি বাবদ ৪০।০, বেথুন কলেজে নিরঞ্জন বৈরাগী বৃত্তি বাবদ ৬০৲—মোট২৬২৵৫।

১৯৫৫ সনে পাতিপুকুর যামিনীভূষণ আয়ুর্ব্বেদ যক্ষ্মা হাসপাতালে নিরঞ্জন বৈরাগীর স্মৃতিরক্ষার্থ ১৫০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ঐ টাকায় উক্ত হাসপাতালের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

জীবনে দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত লোকের যন্ত্রণা নিরঞ্জন বৈরাগীকে বিচলিত করিত। রোগগ্রস্ত অবহেলিত অল্পসংখ্যক জনের কাজে সর্ব্বদা লাগিলেই তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডারের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। এই সঙ্গে যে টাকার হিসাব দিলাম, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, এই সব টাকা আমরা কি ভাবে ব্যয় করি তাহা জানিতে পারিলে অর্থসাহায্য করিতে সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ জন্মিবে এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, হরিজন-সেবার কত অজস্র কাজ অর্থাভাবে অ-কৃত রহিয়াছে।

হরিজন সেবায় যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

পোর্ট সৈয়দ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

জাহাজ দাঁড়ালো ভোর সাতটায়
ঝলমল করে রূপালি রোদ,
সামনে আমার পোর্ট সৈয়দ।
ছুটে ছুটে আসে মোটর-লঞ্চ—
আসে পুলিস,
ইজিপ্‌সিয়ান পতাকা উড়ছে
মাস্তুল থেকে অহর্নিশ।
অনেক দোকান—অনেক বেসাতি—
কি গোলমাল;
লঞ্চগুলি জলে টাল-মাটাল।
চামড়ার ব্যাগ, আইভরি পট, কার্পেট আনে ফেরিওলা—
প্ল্যাটিনাম চুড়ি, মুক্তারও আসে কত মালা—
সে সবে বিছানো স্বপ্নজাল।
স্বপ্নের মতো বাড়ীগুলি যেন
ছোঁয়া দিয়ে যায় মনে মনে,
প্রতিটি জনের মনে-মনে।
গৃহগত প্রাণ—গৃহগত দুটি বিরহী আঁখির—
কোণে-কোণে।

"উলওয়ার্থ"
বাড়ায় হাত।

ঝিপ ঝিপ করে পড়িছে হাল।
নৌকা সাগরে টাল-মাটাল।

শক্ত বয়ায় বাঁধা পড়ে আছে বহু জাহাজ।—
ইংলণ্ড আর আমেরিকার।

নানান দেশের পতাকা সেখানে বাতাসে তুলেছে
কুচকাওয়াজ।

পতাকা তো বড় আমেরিকার
ডলারের হার কণ্ঠে তার।

ফ্রেঞ্চ নাচঘরে এখন সুপ্ত
রাতের কাকলি, সব আওয়াজ।

কায়রো-সুয়েজ-মিশরগ্রন্থি পোর্ট সৈয়দ
আজব নগর পোর্ট সৈয়দ
তারই পরে দেখি সকাল বেলায় নির্বিরোধ
ঝিলমিল করে রূপালি রোদ।

ভারতীয় সাহিত্য প্রদর্শনী

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান কথাটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভিধানে নূতন আমদানী এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ-ব্যবস্থা আরও অর্ব্বাচীন। কিন্তু যাঁরা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস অনুধাবন করেছেন, তাঁরা জানেন একথাটির মর্ম্ম এদেশে মোটেই নূতন নয়। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিভাগ ও পতন-অভ্যুদয়কে উপেক্ষা করে বিশতাধিক ভাষা ও সংস্কৃতি পাশাপাশি নির্ব্বিবাদে সহ-অবস্থান করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। এতগুলি ভাষার একত্রে অবস্থান ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতগুলি ভাষার মধ্যে চতুর্দ্দশটি ভাষা রাষ্ট্র-স্বীকৃতি পেয়েছে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে—অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, কানাড়া, মলায়-য়ালাম, কাশ্মীরী, মরাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলুগু এই বারটি আঞ্চলিক ভাষা এবং দুইটি সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃত ও উর্দ্দু। সিন্ধি এর মধ্যে স্থান পায় নি, বোধ হয় ভাষাভাষীর সংখ্যা যথেষ্ট নয় বলে। সিন্ধি সহ এই পনরটি ভাষা নিয়েই ভারতীয় সাহিত্য এবং এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজী তো আছেই।

ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের সহ-অবস্থানের প্রকৃত রূপটি সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে আরও স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। প্রদর্শনীটির উদ্যোক্তা, সাহিত্য আকাদেমি। উপলক্ষ্য, ইউনেস্কোর নবম সাধারণ অধিবেশন। স্থান—ইণ্ডাষ্ট্রিজ ফেয়ারের পরিত্যক্ত ময়দান, দিল্লী। লক্ষ্য: "Indian literature is one though written in many languages"—"ভারতীয় সাহিত্য এক, যদিও বহু ভাষায় লিখিত"—এই উদ্ধৃত বাণীটির সার্থকতা প্রতিপন্ন করা এবং সেই অবসরে ভারতীয় সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতদূর সমৃদ্ধ তার এক সুস্পষ্ট ছবি জনসমক্ষে তুলে ধরা। নিছক গ্রন্থপ্রদর্শনী নয়, সাহিত্যপ্রদর্শনী বলাই শোভন ও সঙ্গত। কেননা গ্রন্থবিশেষের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় নি, বিভিন্ন সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয়টি স্পষ্ট করে প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই কোন্ বিশেষ গ্রন্থ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে কি পায় নি, সেটা দ্রষ্টব্য নয়, সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাগুলির প্রতিনিধি-মূলক সঙ্কলন ছিল কিনা সেটাই বিবেচ্য। এ বিবেচনায় প্রদর্শনীটি ভাল ভাবেই উৎরেছে—তার প্রমাণ পাওয়া গেছে দর্শকের মন্তব্যের পাতায় পাতায় অজস্র প্রশংসাবাদে। অনেকে বিস্মিত হয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যের বহুমুখিনতায়, অনেকে খুশী হয়েছেন কোন কোন ভাষার বিষয়বিশেষে পূর্ণাঙ্গ কাজ দেখে। যেমন, প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরু সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাংলা বিভাগের অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের অভিধান ও এনসাইক্লোপিডিয়ার কাজ দেখে, মরাঠীর বিভিন্ন কোষগ্রন্থ ও তামিলের লোকগাথার সঙ্কলনে।

প্রদর্শনীতে সিন্ধি, উর্দ্দু, সংস্কৃত ও ইংরেজী সহ ষোলটি ভাষা-কোটর ছিল। ('কোটর' শব্দটি আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত হ'ল)। এ ছাড়া ছিল তিনটি বিশেষ বিভাগ। ইউনিটি অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার, রবীন্দ্রনাথ ও শিশু বিভাগ। ইউনিটি অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার বিভাগের পরিকল্পনাটি অভিনব। রামায়ণ, মহাভারত ও কালিদাস ভারতীয় সাহিত্যে শাশ্বত এবং সর্ব্বগ্রাহী। কেবল ভারতীয় সাহিত্য নয়, বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সংস্কৃতি বহুধা প্রকাশিত, কিন্তু এই নানা বর্ণের ফুলগুলি একটি বিনিসুতোর মালায় গাঁথা—সেই অলক্ষ্য সুতোটি হ'ল রামায়ণ-মহাভারত ও কালিদাস। এদের প্রভাবই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুরটিকে জাগিয়ে রেখেছে। প্রত্যেকটি ভাষায় এদের অনুবাদ, সারানুবাদ, ছায়ানুবাদ ও প্রভাবিত গ্রন্থ পাঠকের কাছে ঐক্যের সুরটি পৌঁছে দিয়েছে। আমরা ভারতের প্রতি প্রান্তের মানুষ নিজের নিজের সাহিত্য নিয়ে কেউ মরাঠী, কেউ গুজরাটী, কেউ বাঙালী—কিন্তু রামায়ণ মহাভারত হাতে নিয়ে আমরা সবাই ভারতীয়—তার ভাষা বাংলাই হোক আর উর্দ্দুই হোক। ইউনিটি অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার বিভাগে বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত ও কালিদাসের অনুবাদ সাজিয়ে রেখে উপরোক্ত তত্ত্বটির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। রবীন্দ্র-বিভাগে ছিল রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসমূহ—তাঁর বাংলা বইয়ের দু'ধারে সাজানো ছিল ভারতীয় এবং বিদেশীয় অনুবাদ। ভারতীয় অনুবাদে একমাত্র কাশ্মীরী ভিন্ন ভারতের সকল মুখ্য ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সংগ্রহ করা হয়েছিল। বিদেশীয় অনুবাদের মধ্যেও ছিল অন্ততঃপক্ষে বারোটি ভাষায় অনুবাদ। এ ভিন্ন বহু অনুবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। বিদেশীয় অনুবাদের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে stray birds-এর সুদৃশ্য ক্ষুদ্র জার্মান সংস্করণ, স্প্যানিশ ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্য সঙ্কলনের রাজসংস্করণ ও সাম্প্রতিক কয়েকটি রাশিয়ান অনুবাদ। ভারতীয় অনুবাদের প্রচ্ছদপট ও প্রকাশ-নৈপুণ্য হতাশ করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। রবীন্দ্র-বিভাগে কয়েকটি প্রথম যুগের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপি উল্লেখ-যোগ্য। এই বিভাগে জাতীয় প্রত্নশালার সৌজন্যে প্রাপ্ত রবীন্দ্র-নাথের 'নাইট' পদত্যাগের মূল পত্রটির বৃহদাকার আলোকচিত্র এবং কবির স্বহস্তলিখিত 'where the mind is without fear' কবিতাটির সুবৃহৎ প্রতিলিপি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—বিশেষ ভাবে নাইট পদত্যাগপত্রের প্রতিলিপি। সজ্জা ও শোভনতার দিক দিয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ছিল শিশুবিভাগ। এ বিভাগে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার শিশু-সাহিত্য একত্রিত করা হয়েছে সুদৃশ্য আসবাবে। শেলফগুলি নানা ধরনের জন্তু-জানোয়ারের

আকৃতিতে করা হয়েছিল—কোথাও পাখীর ডানায়, খরগোশের কানে, কোথাও হাতীর পিঠে, উটের পেটে বই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এই বিভাগের দেওয়ালের গায়ে পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি কাহিনী ও রবীন্দ্রনাথের তোতা কাহিনী চিত্রে বর্ণিত ছিল।

বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থনির্বাচনের মানদণ্ডের থেকে ইংরেজী বিভাগের নির্বাচন-আদর্শ স্বভাবতঃই ভিন্ন ছিল। এখানে দেশী ও বিদেশী লোকের লেখা ভারতবিষয়ক বই স্থান পেয়েছে।

প্রত্যেক ভাষা-বিভাগে প্রদর্শিত পুস্তকের নির্বাচনের আদর্শ এক ধরনের ছিল, যার ফলে সকল ভাষার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের একটা তুলনামূলক ছবিও ধরা পড়েছিল। বিশুদ্ধ সাহিত্য অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক ছাড়া বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থও ছিল। প্রতি ভাষা-কোটরে প্রায় ১ হাজার করে বই ছিল—অর্থাৎ একটি ৬৪ ফুট × ৫১ ফুট কক্ষে প্রায় বিশ হাজার বই প্রদর্শিত হয়েছিল। যার ফলে নিদারুণ স্থানাভাব এবং উপযুক্ত প্রদর্শনের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়েছে। বহুক্ষেত্রে দর্শককে বইয়ের নামগোত্রহীন 'পুট'টুকু দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আর একটি বিশেষ ত্রুটি ছিল গাইডবুকের অবিদ্যমানতা। গ্রন্থপ্রদর্শনীতে গাইডবুকের অভাব অমার্জ্জনীয় ত্রুটি। এর ফলে প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য বহুলাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে সন্দেহ নেই।

প্রতি ভাষা-কোটরে আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল, সেই সাহিত্যের কৃতী সন্তানদের প্রতিকৃতি ও কোন একটি বিশেষ উক্তি। বাংলা বিভাগে ছয়টি প্রতিকৃতি ছিল—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের। উক্তি ছিল চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। প্রতি ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের প্রতিকৃতি ও একটি করে বিখ্যাত উক্তি প্রদর্শনীর পরিবেশটিকে সাহিত্য-তীর্থের মর্য্যাদা দিয়েছিল। ইংরেজী বিভাগে ভারত-বিদ্‌দের ছবির মধ্যে সরোজিনী নাইডুর ছবি কেন স্থান পেয়েছে, এবং উইলিয়াম জোন্সের ছবি কেন বাদ পড়ল বোঝা গেল না।

পুস্তক ছাড়া উদ্যোক্তারা বিস্তর পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করেছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা ও ব্যক্তি বিশেষের সংগ্রহ থেকে, তালপত্রের উপর কয়েকটি উড়িয়া সচিত্র পুথি, তেলুগু ভাষায় ভাগবতের পুথি, সারদা বর্ণমালায় ভূর্জপত্রে লেখা পুথি এবং বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদির পাণ্ডুলিপি ও পত্রের একস্থানে এমন সমাবেশস ত্যই দুর্লভ।

রাজধানীতে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে—৬ই নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই একমাস কাল দিল্লী শহর ইউনেস্কো ও বৌদ্ধ কনফারেন্সের কল্যাণে দেশের ও বিদেশের পণ্ডিতজনের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। সেই কারণে প্রদর্শনীর গুরুত্ব ছিল অসামান্য। ভারতীয় সাহিত্যের এমন বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা অভিনব। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ভাষাগুলির ভিতরে সংযোগস্থাপন ও পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময়। এদিক দিয়ে এ প্রদর্শনী সার্থক হয়েছে। এমন আসরে বাংলা-সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। বিভিন্ন প্রকাশকের সহযোগিতায় সাহিত্য পরিষদ এই দায়িত্ব বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে পালন করে বাঙালী-সমাজের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের বিরাট ঐতিহ্য নিয়ে এই প্রদর্শনীতে যোগ দিতে গিয়েছিলাম সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে, প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি নিয়ে নয়। গিয়েছিলাম অন্য সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবার আছে কিনা জানতে। সেই প্রসঙ্গেই আজ কয়েকটি কথা নিবেদন করব।

বাংলা বিভাগের গৌরবের কথা বাহুল্যবোধে উল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু দর্শকসমাজের কাছে যে সব প্রশ্ন পেয়েছি, গত এক মাসে নিজের মনেও যে সব প্রশ্ন জেগেছে আজ তারই উল্লেখ করব। যে সব গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একান্ত গৌরবের তার অনেকগুলিরই প্রকাশকাল আজ থেকে বিশ বছরেরও পূর্ব্বে। তার ফলে প্রায় সবই অপ্রাপ্য অথবা অসংস্কৃত। অবাঙালীর বাংলা শিক্ষার ভাল বই কোথায়—সুনীতিবাবুর মার্লবোরো সিরিজের বই ভিন্ন? সে বইও তো নিঃশেষিতপ্রায়। বেণীমাধব গাঙ্গুলীর দুষ্প্রাপ্য বাংলা-ইংরেজী অভিধান ভিন্ন এ ধরনের প্রামাণিক অভিধান কোথায়? অবাঙালী ছাত্রের হাতে আজ কোন্ অভিধান তুলে দেব। বাংলা-হিন্দী, বাংলা-উর্দু, বাংলা-ফরাসী, বাংলা-রুশ—এসব অভিধান কি আছে? প্রামাণিক বাংলা অভিধানই বা কোথায় বাজারে? হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' দুর্লভ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান নিঃশেষিত-প্রায়। আর আছে রাজশেখর বাবুর চলন্তিকা। এর মধ্যে অক্সফোর্ডের তুল্য অভিধান কোনটি? বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণের কথা তুলি। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির ব্যাকরণ পাওয়া যাবে না, সুনীতিবাবুর ভাষাপ্রকাশ ব্যাকরণটিও অপ্রাপ্য। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর জন্য তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণটিই কি প্রামাণ্য বাংলা ব্যাকরণ, না সুনীতিবাবুর 'Origin and Development of Bengali Language" বা এণ্ডারসনের "গ্রামার"? কিন্তু দুটিই তো ইংরেজীতে ও অধুনা দুষ্প্রাপ্য। বাংলা সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাস কোনটি? ক্লাসিক সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য বঙ্গানুবাদ কোথায়? বেদব্যাসের অনুবাদ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত এখন আর পাওয়া যায় না। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদের খোঁজ ক'জন রাখেন? বেদ, উপনিষদ, গীতা—এদের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ খুব কমই চোখে পড়ে। তন্ত্রের দেশ বাংলা, কিন্তু তন্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ কোথায়?

এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা যেতে পারে—কিন্তু এটা তার উপযুক্ত স্থান নয়। শুধু লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, অনেক কাজ আজও বাংলায় হয় নি এবং অনেক গ্রন্থ ঘটনাচক্রে আজ অপ্রাপ্য। তাই

আধুনিক পাঠক বড় অসহায়—তার হাতে তুলে দেবার মত অনেককিছুই নেই বাংলার গ্রন্থ-ভাণ্ডারে—এই সত্যটাই বার বার অনুভব করেছি। তাই প্রশ্নাকারে সেই সব আবেদন রেখে গেলাম বাংলার পণ্ডিতসমাজের কাছে।

ভারতীয় সাহিত্য-প্রদর্শনী নানা দিক দিয়ে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন দিগ্‌দর্শন—বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে উদ্যোক্তা সাহিত্য আকাদেমি নানা দিক দিয়ে দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ। তবে তাঁদের কর্ত্তব্য এই সুরু, আরও অনেকদূর এগোতে হবে—সবে গ্রন্থিবন্ধন হয়েছে, এবার সহ-অবস্থান শুধু নয় সক্রিয় সহযোগিতা চাই, আর তার পৌরোহিত্য করতে হবে সাহিত্য আকাদেমিকে, তবেই সার্থক হবে সাহিত্য-প্রদর্শনী।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

শ্রীকালিদাস রায়

নগরে আমার কর্ণ পায় না বিশ্রাম
পথে ছুটে কত যান—ফায়ার ব্রিগেড, ট্রাক, ট্রাম।
শিঙা বাজাইয়া ধায় লরি, বাস, হাজার মোটর।
কোমলতা কোথা? লোহা ইট কাঠে, সকলি কঠোর।
সর্ব্ব বর্ণ দেখি এক শ্যামলতা ছাড়া।
ছুটে লক্ষ লক্ষ লোক পেয়ে যেন রাক্ষসের তাড়া।
চিম্নিতে উঠিছে ধুম, পণ্যভরা দোকান হাজার
সমগ্র শহরে যেন বানায়েছে একটি বাজার।
রণক্ষেত্র বলি হয় ভ্রম,
হেথা মানুষের দেখি দুর্গতি চরম।
কি লিখিব এই সব নিয়ে?
মোর কবিচিত্ত হেথা জাগে না উঠে না সাড়া দিয়ে।

এই পরিমণ্ডলের গণ্ডীপারে সেবি' মুক্ত বায়ু
শান্ত হয় উদ্বেজিত স্নায়ু।
দেখি সেথা চাষী চষে, জেলে ফেলে জাল
তাঁতী তার তাঁত বোনে, মাঝি ধরে হাল।
হাতে তারা কাজ করে সাথে তার মুখে গান গায়;
মাতে তারা পর্ব্বদিনে, রাতে তারা বাতি না জ্বালায়।
মাঠে গোঠে গোরু চরে, ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ফসল,
মার কোলে শিশুসম শাখা হ'তে ঝুলে পাকা ফল।
কলসী খেজুরগাছে, তালগাছে বাবুয়ের বাসা;
শুনি সেথা মক্ষীদের পক্ষীদের কল কণ্ঠে ভাষা।
চাল ফুঁড়ে উঠে ধুম, কাল কারো নয় ঘড়িধরা;
নাই পথে হট্টগোল, নাই কোন ত্বরা।

শ্রমিকের মত যেন কারখানা হতে মুক্তি পেয়ে
এখানে আমার চিত্ত উঠে গান গেয়ে।
মনে হয় গদ্য থেকে যেন সে ফিরিল কবিতায়
গঞ্জ থেকে কুঞ্জে যেন, খাঁচা থেকে যেন নীলিমায়।
যেন সে বিদেশ থেকে ফিরিল ভারতে
কারাগার থেকে যেন মুক্ত হয়ে আসিল সে পথে।
ঝি'র কোল থেকে যেন মার কোলে বাড়াল সে হাত।
এইত স্বদেশ মোর, নগর-ত নকল বিলাত।
এরি পাঠশালে মোর বিদ্যা হ'ল শুরু
এরই গান গাহিবার দীক্ষা মোরে দিল কবিগুরু।
তাই আমি গেয়ে যাব, ঘুচিবে না আমার স্বভাব,
বিজাতির বৈতালিক চারণের হবে না অভাব।
সারা জগতের কবি তারা হ'তে চায়
বাঙলারই কবি হয়ে তাই রয়ে লইব বিদায়।
যে ভাষায় তারা গাবে সে ভাষা এ ভাষা কভু নয়
আমার ভাষার সাথে তাদের রবে না পরিচয়
হয়ত আমার ভাষা গণ্য হবে পালিভাষা সম
বিলুপ্ত ভাষার অন্যতম।
এ ভাষাই শিখালেন পিতা-পিতামহ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে জানি ভয়াবহ।

শেষ পাণ্ডুলিপি

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

সকালের টিউশনি ও দশটা হইতে বেলা চারটা পর্য্যন্ত আপিসে কলম পিষিয়া আসিয়া আমি আর বড় একটা কোথাও বাহির হই না। প্রায় সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া ছাদে খোলা বাতাসে শুইয়া পড়ি। দীনবন্ধু সেনের ভিতর এমন সুন্দর ছাদওয়ালা বাসা যে পাইব তাহা আমার কল্পনাতীত। দোতলায় দুখানি ঘর, একটি রান্নাঘর, আর তাহারই সম্মুখে ছোট্ট ছাদখানি আমার বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। গৃহিণী সেই ছাদে গুটিকয়েক ফুলের টব বসাইয়াছেন। একটি টবে তুলসী গাছ আর কয়েকটি টবে ফুলগাছ। গৃহিণী নিজেই গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেন—গাছে জল দেন। গাছে ফুল ফুটিলে সগর্ব্বে আমায় দেখাইয়া বলেন, ওগো দেখছ, কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে। ওমা—একটা কি সুন্দর প্রজাপতি আবার এসে জুটেছে যে!—সত্যিই একটি সুন্দর প্রজাপতি তাহার নরম পালকের অপরূপ দু'খানি ডানা মেলিয়া সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলটির উপর আসিয়া বসিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এই ইট কাঠ লোহা পাথর ঘেরা কলিকাতার এক নিভৃত ছাদে কি করিয়া রূপপিপাসু প্রজাপতি সন্ধান পাইল যে, এখানে ফুল ফুটিয়াছে। সিগারেটে মৃদু টান দিয়া বলিলাম কাহাকে সন্ধান দিতে হয় নি গো। রূপের আকর্ষণে ওরা ছুটে আসে। এটা ওদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলতে পার। নতুবা দীনবন্ধু সেনের অখ্যাত দোতলা বাড়ীর ছাদে একটা টবে ফুল ফুটেছে এর সন্ধান ওকে কে দিয়েছিল। ফুলের সুগন্ধ কি লুকোনো থাকে? হোক না এ কলকাতা—ইট-পাথর আর লোহার তৈরী। তবুও দেখ, কোথেকে এসে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক জায়গাটির সন্ধান পেয়েছে। যেমন আমি তোমাকে পেয়েছিলাম—

আমার গৃহিণী চারটি সন্তানের জননী, বয়স প্রায় ত্রিশ। কিন্তু আমার কথায় তিনি যেন হঠাৎ নববধূর মত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলেন।

বলিলাম—কেন? বর্দ্ধমানের অখ্যাত বন-জঙ্গলঘেরা চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম কে জানত বল? কে জানত সেখানকার বন জঙ্গল আলো করে তুমি রয়েছ। ঠিক এই প্রজাপতির মতই আমি ত ঠিক সন্ধান করে তোমায় নিয়ে এলাম। গৃহিণীর ত্রিশ বৎসরের দেহে খুশির তরঙ্গ বহিয়া গেল। একটু চাপা গলায় বলিলেন—যাও। থাক্—কি হয়েছে তোমার। ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে খেয়াল নেই বুঝি।—আমি পুবদিকের দিকে চাহিয়া, ভালমানুষের মত সিগারেট টানিতে লাগিলাম।

সেদিন শনিবার। তাহার পূর্ব্বদিনে মাহিনা পাইয়াছি। তাই সকালবেলায় বাজার হইতে সেরখানেক মাংস আনিয়াছি। রাত্রে—আরাম করিয়া মাংস ভাত খাইয়া ছাদে শুইয়া সিগারেট টানিতেছি। আকাশে সুন্দর জ্যোৎস্না—চারিদিক ঠিক দিনের মত থপ থপ করিতেছে। টবের রজনীগন্ধা ফুল ফুটিয়াছে—ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে রজনীগন্ধার মিষ্ট গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিতেছে। আমার দুই চোখ পরম আরামে প্রায় মুদিয়া আসিতেছিল। ছেলেরা খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শুধু গৃহিণী তখনও রান্নাঘরে টুকিটাকি কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন। হঠাৎ ঘুমের আমেজ ছুটিয়া গেল। কে যেন সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—সুরেনদা, ও সুরেনদা—

গৃহিণী বলিলেন, ওগো শুনতে পাচ্ছ। তোমায় কে যেন ডাকছে—কড়া নাড়ছে। লুঙ্গিটা কোনমতে কোমরে জড়াইয়া বলিলাম—রাত দশটার সময় আবার কার কি দরকার পড়ল? ভাল আপদ—চটিজুতাটি পায়ে গলাইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দরজা খুলিয়া বলিলাম, কে? কাকে চান?

লোকটি বলিল, কে সুরেনদা নাকি? আমি নীলকণ্ঠ—

নীলকণ্ঠ? নীলু তুমি এত রাত্রে কোথেকে এলে হে? নীলু তখন তাহার ছোট বিছানার বাণ্ডিল ও বোঁচকাটি লইয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সদর দরজা বন্ধ করিয়া, নীলকণ্ঠকে লইয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। ছাদে আসিয়া বলিলাম, বস হে নীলু। তার পর এত রাত্রে কি ব্যাপার। দেশ থেকে এলে নাকি হে?

নীলকণ্ঠ আমাদের গ্রামের সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মশায়ের ছেলে। এতদিন গ্রামেই ছিল জানিতাম। গাঁয়ে ষষ্ঠীপুজো, অন্নপ্রাশন, বিয়ের পৌরোহিত্য করিত—আর দিনের বাকি সময়, যদু সাহার দোকানে বিড়ি বাঁধিত। জিজ্ঞাসা করিলাম —দেশ থেকেই আসছ ত—

নীলু বলিল, হাঁ। ট্রেনটা অনেক লেট ছিল—তাই হাওড়া পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। বাবা আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন—

বলিলাম, সে কাল দেখব। এখন হাতমুখ ধোও। দেখি

কিছু খাবার-দাবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। দোকানের খাবার খাইয়া নীলু বলিল, বাবা পাঠালেন। দেশে আর সুবিধে হচ্ছিল না। পূজোআর্চ্চা কে করাবে বলুন। গাঁয়ে লোক কৈ, যাদের ক্ষমতা আছে তারা শহরে চলে গিয়েছে। তাই বাবা পাঠালেন যদি কিছু কাজকর্ম জুটিয়ে দেন এই আশায়।—আমার বেশ ঘুম আসিতেছিল। নীলকণ্ঠকে বলিলাম, আচ্ছা, কাল সব কথাবার্ত্তা হবে। রাত হয়েছে এখন ঘুমিয়ে পড়—

সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মশায় আমাদের কুলপুরোহিত। তিনি ভাবিয়াছেন, আমি যখন কলিকাতায় সরকারী আপিসে চাকরি করি, তবে নিশ্চয়ই আমি একটা কেউকেটা ব্যক্তি। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মশায় জানেন না, আমার শক্তি কি সামান্য ও সীমাবদ্ধ। আমি সরকারের একজন নগণ্য চাকর্যে। আমি আমার দুই-একজন বন্ধুকে নীলুর সম্বন্ধে বলিলাম, কিন্তু কেহই নিশ্চয় করিয়া কোন উত্তর দিতে পারিল না। নীলকণ্ঠ গ্রামের স্কুলে পড়িয়াছে এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছে। সে ম্যাট্রিক পাস নহে বা ইংরেজী কিছু জানে না। তাহা নীলকণ্ঠের মুখেই জানিলাম।...

নীলকণ্ঠ আমার বাসাতেই আছে। দুই বেলা বাজার করে, দোকান হইতে এটা-ওটা কিনিয়া আনে। ইহারই মধ্যে সে গৃহিনীকে বেশ আপন করিয়া লইয়াছে। ছেলেমেয়েরা তাহার কাছে পড়াশুনা করে। নীলকণ্ঠ দেখি গৃহিনীকে একবেলা ছুটি দিয়া নিজেই হাতাবেড়ী লইয়া রান্না করিতে লাগিয়াছে।

বলিলাম—কি নীলু রান্না বিদ্যেটাও জানা আছে নাকি?

হাসিয়া নীলকণ্ঠ বলিল,সুরেশদা সবই কিছু কিছু জানি। ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছিলেন তা জানেন ত। তার পর থেকে দুই বেলাতেই রান্নাবান্না, ঘরসংসারের কাজ সবই করতাম। ইচ্ছা ছিল ম্যাট্রিকটা পাস দেব, কিন্তু তা হয়ে উঠল না। এখন আপনি একটু চেষ্টা-চরিত্তির করে যে-কোন একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দিন দাদা। আমাদের অবস্থা জানেন ত সব—

আমি বলিলাম—তা ত জানি। তুমি ত বিয়েও করেছ। ছেলেপুলে ক'টি—

—একটি মাত্র ছেলে। গাঁয়ের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। বাবা বুড়োমানুষ আর পেরে ওঠেন না। গাঁয়ে ঘরে বারব্রত পুজোআর্চ্চা সব কমে গেল। দু' দু'বার অজন্মা হ'ল। বিঘেকয় যা জমি আছে তাতে হ'ল না কিছুই। দোকানে বিড়ি বাঁধতাম, কিন্তু তাতে কি সংসার চলে! তাই মনে করলাম, বাইরে গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করা যাক। তাই চলে এলাম আপনার কাছে। এখন আপনি ভরসা।—আমি নীলকণ্ঠকে বিশেষ ভরসা দিতে পারিলাম না। যে রকম দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে কাহারও চাকরি জোটানো সহজ কথা নয়। তবুও নীলকণ্ঠকে কিছু আশা দিলাম; কিন্তু আজ কাল করিয়া আরও এক মাস চলিয়া গেল। দেশ হইতে নীলকণ্ঠের নামে পত্র আসিয়াছে, একখানি পোস্টকার্ড—তাহাতে তাহার স্ত্রী লিখিয়াছে—"তুমি কোন কাজকর্ম যোগাড় করিতে পারিলে কি? এখানে সংসার অচল। বাবা আর পারিয়া উঠিতেছেন না। শীঘ্র কিছু টাকা পাঠাও।" সেই পোস্টকার্ডের অপর দিকে তাহার পুত্র আঁকাবাঁকা অক্ষরে বাবাকে লিখিয়াছে—"বাবা, তুমি কবে আসবে। আমার খুব মন কেমন করছে। কলকাতা থেকে আমার জন্যে একটা বল এনো।" আমি নীলকণ্ঠের পত্রখানি পড়িয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, নীলু আজ তোমার বাবার নামে পাঁচটা টাকা পাঠিয়ে দাও। আমি মনি অর্ডারের ফরম্ লিখে দিচ্ছি। এই টাকা নাও। নীলু নিঃশব্দে টাকা লইয়া শূন্যপানে চাহিয়া রহিল।

দুপুরে নীলকণ্ঠ ঘরে থাকে না। উপরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়ায়। দেখে কলিকাতাকে—দেখে কলিকাতার ব্যস্ততা, কলিকাতার সমস্ত আবহাওয়ায় জীবন-সংগ্রামের তীব্র প্রতিযোগিতা। নীলু তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে, খালি গায়ে মাথায় গামছা জড়াইয়া হিন্দুস্থানী রিক্সাওয়ালা সোয়ারী লইয়া ছুটিতেছে। মাথায় বিরাট মোট লইয়া মুটেরা হাঁটিতেছে। বড় বড় লরীতে স্তূপাকার মাল বোঝাই দিয়া, শিখ ড্রাইভার লরী চালাইতেছে। সমস্ত কলকাতা কর্ম্মকোলাহলময়। পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকানির্ব্বাহের প্রবল প্রতিযোগিতা। কয়লা ডেকে কাজ দিবে বলিয়া মথুর সর্দ্দার আজ নাকি তাহাকে দেখা করিতে বলিয়াছে। দেখিলাম, নীলকণ্ঠ এক পা এক পা করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে কলিকাতার কোলাহল-ময় ভিড়ে মিশিয়া গেল।

সমস্ত দিন বাহিরে থাকিবার পর রাত প্রায় দশটার সময় নীলু বাসায় ফিরিতেই ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, আরে সমস্ত দিন কোথায় ছিলে বল ত? আমরা ত ভেবে মরি। শেষে গাড়ী ঘোড়া চাপা পড়লে নাকি—

নীলু হাসিয়া বলিল, না দাদা। চাপা পড়লে ত সবই শেষ। তবে আর দুঃখকষ্ট কে ভোগ করবে বলুন? তা নয়—একটা চাকরি যোগাড় করে এলাম—

আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলাম, বল কি? চাকরি যোগাড় করলে কোথায় হে?

নীলু বলিল, সে চাকরির কথা শুনলে হাসবেন। কয়লা

রম্যরচনার দ্বারা সাহিত্য-জগতে স্থায়ী কোন সৃষ্টি সম্ভব হবে, যেমন সম্ভব হয়েছিল মহাকাব্যের পক্ষে। সাধারণতঃ রম্যরচনায় এই শাশ্বত সুর সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না—হয় অতি আত্মকেন্দ্রিকতা,আর না হয় সংবাদ-মানসিকতার জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই আলগা একটা রসের আমেজ পাঠক-মনে সৃষ্টি করে স্রষ্টার কাজ শেষ হয়। গভীর ভাব ও বিষয় পরিবেশনে প্রয়োজন হয় গভীর ও স্থির অন্তর্দৃষ্টির আর না হয় দূর-প্রসারী মননশীলতার। কিন্তু রম্যরচয়িতার মন রম্যরচনা সৃষ্টিকালে থাকে শ্লথ ও এলমেলো—যা গভীর ভাবগ্রাহিতা ও দূর-প্রসারী মননশীলতার পরিপন্থী; ফলে চোখঝলসানো ও ক্ষণদীপ্ত রচনাশৈলীজাত রসসৃষ্টি সম্ভব হয়। এর বেশী আশা করলে রম্যরচনা রচয়িতার মানসিক ভঙ্গীকে ভিন্ন রূপ নিতে হবে—তখন রম্যরচনা আর রম্যরচনা না থেকে হয়ে উঠবে অন্য কোন সাহিত্যকর্ম।

কবিতার মত রম্যরচনাকেও ব্যক্তিক (Subjective) এবং নৈর্ব্যক্তিক (Objective) রচনাতে ভাগ করা যায়। ব্যক্তিক রম্যরচনা অনেকটা গীতিকবিতার মত—এখানে লেখকের আত্মরতি বা আত্মবিকলন মুখ্য হয়ে ওঠে। লেখক হয়ে ওঠেন সম্পূর্ণ ভাবে আত্মকেন্দ্রিক। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে বুদ্ধদেব বসুর "হঠাৎ আলোর ঝলকানি"তে। অতি সাধারণ দৃশ্য বা বস্তু কিংবা ঘটনা কিভাবে লেখকের মনে ভাবপ্লাবন ঘটায়, কিভাবে লেখক আবেগ-প্রবণ হয়ে ওঠেন তার পরিচিতি মেলে উল্লিখিত রচনাসঙ্কলনে। কেমন করে "ক্লাইভ স্ট্রীটে এক ফালি চাঁদ" লেখকের মনে ভাবঘূর্ণি সৃষ্টি করে তারই সন্ধান পাওয়া যায় এই গীতিকবিতাধর্মী গদ্যে। লেখকের উক্ত সঙ্কলনের অনেক রচনারই এমনি গাঁথুনি বা বিন্যাস, এমনি ভাবধর্ম যে, পংক্তিগুলি যদি স্তরে স্তরে সুসম্বদ্ধ ও কিছু অদল-বদল করে সাজানো যায় তা হলে ঐগুলি হয়ে উঠবে এক একটি গদ্য কবিতা। এই ধরনের রচনার এমনি প্রকৃতি যে, তা ছন্দে রূপ নিলে হয় গীতিকাব্য আর গদ্যে রূপ নিলে হয় রম্যরচনা—কেবল মাত্র কর্মের পার্থক্য। কবিতায় মিল ও ছন্দের হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার আকুলতা যেমন জন্ম দিয়েছে গদ্যকবিতার তেমনি গদ্যের ক্ষেত্রে কর্মের নিগড় থেকে লেখকের নিজেকে মুক্ত রাখার আকুতি সৃষ্টি করেছে রম্যরচনা। এইখানে দুই প্রকারের সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে একটি ভাবগত বা সৃষ্টিগত মূল ঐক্য। কর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার প্রয়াস থেকে এই উভয় প্রকৃতির রচনার জন্ম। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, উভয় প্রকৃতির রচনাই কর্মের কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। গদ্যকবিতায় যেমন আছে সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন ছন্দ তেমনি রম্যরচনায় আছে নিজস্ব দু-একটি ধর্ম। যেখানে স্বাধীনতা বেশী সেখানে প্রয়োজন হয় স্বাধীনতাকে সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখা। গদ্যকবিতায় বাহ্যিক ছন্দের ঝলমলানি অল্প বলে প্রয়োজন হয় পাকা কাব্যশিল্পীর দক্ষ হাতের কারুকাজের। রম্যরচনাতেও স্বাধীনতা অপরিসীম থাকায় রম্যরচনাকে সার্থক করে তোলার জন্য দরকার হয় জাতশিল্পীর—যিনি আবেগ ও ভাবোন্মত্ততার রাশ টেনে ধরতে পারেন ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে। শ্রেষ্ঠ শিল্পের অন্তর্নিহিত একটি প্রধান গুণ হবে সংযম, তাই রম্যরচনার ক্ষেত্রে আতিশয্য দেখাবার অবকাশ থাকলেও সংযমের স্বীকৃতি রম্যরচনাকে করে তোলে অধিকতর সার্থক। প্রসঙ্গতঃ যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতে'র সঙ্গে রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা'র তুলনা করা যেতে পারে। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতে'র মধ্যে আছে বুদ্ধির দীপ্তি ও চমকের সঙ্গে সঙ্গে পরিমিতি বোধের পরিচয়। কিন্তু 'শীতে উপেক্ষিতা'র মধ্যে রচনাশক্তির সম্প্রসারণশীলতা পরিমিতির কোঠা ছাড়িয়ে গেছে অনেক স্থানেই। তা ছাড়া নিজেকে বিশেষ একটি ঢঙের সঙ্গে জড়িত করার প্রয়াস মাঝে মাঝে অতিপ্রকট হয়ে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনায় রচয়িতার নিজেকে অতি প্রকাশেচ্ছা রসসৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকারক। উল্লিখিত উভয় রচনাই নৈর্ব্যক্তিক।

প্রসঙ্গক্রমে যখন আমরা নৈর্ব্যক্তিক রচনার কথায় পৌঁছলাম তখন সে সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ব্যক্তিক রম্যরচনায় যেমন ব্যক্তি হয়ে ওঠে প্রধান, নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনায় তেমনি সাংবাদিক মানসিকতার পরিবেশন হয়ে ওঠে মুখ্য। কিন্তু রচয়িতা মানুষ হিসাবে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকেন। অর্থাৎ তাঁর চোখের মধ্য দিয়ে পাঠককে রচনার বিষয়বস্তুর রস আহরণ করতে হয়। লেখক নিজস্ব মনের মাধুরী মিশিয়ে সংবাদ পরিবেশন করেন। তাঁর মনের প্রতিক্রিয়ার রঙ দেখা যায় বিষয়-বস্তুর উপর; অন্যথা রচনাগুলি হয়ে উঠবে নিছক সংবাদ বা তথ্য—যেগুলিকে খবরের কাগজের রিপোর্টের মূল্য দেওয়া ছাড়া অন্য কোন মূল্য দেওয়া যাবে না। নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনাগুলির চরিত্র অনেকটা হয়ে উঠে বর্ণনাধর্মী উপন্যাসের মত। এই প্রকৃতির উপন্যাসে লেখক উত্তম পুরুষ হয়ে বর্ণনা করে যান উপন্যাসের আখ্যান, গতি ও ধারা।

ব্যক্তিক রম্যরচনাকে যদি তুলনা করা যায় গীতিকবিতার সঙ্গে তো নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনাকে তুলনা করা যাবে চিত্রধর্মী গল্প বা উপন্যাসের সঙ্গে। চিত্রধর্মী কথাসাহিত্যে যেমন চরিত্রবিশ্লেষণ এবং আখ্যানপরিবেশন অপেক্ষা বিভিন্ন বস্তুর চিত্রাঙ্কন করাই প্রধান হয়ে উঠে তেমনি ঐ জাতীয় নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনায় বাহ্য-জগতের বাস্তব রূপ খণ্ড খণ্ড ছবির মারফতে পরিবেশিত হয়। এই ধরনের বস্তুগত ঐক্য বা বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে কোন ঐক্যের সন্ধান-প্রয়াস সব সময়ে করা হয় না। একমাত্র ঐক্য হ'ল লেখকের নিজস্ব মনের প্রতিক্রিয়া ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গী কখনও পরিচ্ছন্ন, কখনও বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশমান হয় পাঠকের রস-সন্ধানী মনে।

নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দু'টি মূল উপাদান—সাংবাদিক মানসিকতা বা রসাপ্লুত মনের প্রতিক্রিয়া ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। এই কয়েকটি উপাদানের জন্যই আজকের দিনের চঞ্চল, গতিবাদী ও বাস্তবপন্থী অথচ চিরন্তন রসপিপাসু মন খুঁজে পায় একই সঙ্গে রসপিপাসা ও তথ্য-বুভুক্ষা মেটাবার খোরাক। কিন্তু রম্যরচনার বিকীর্ণদীপ্তি জিজ্ঞাসু মনে ক্ষণস্থায়ী

রম্যরচনার অতি সুন্দর উদাহরণ। লেখক সাংবাদিকের ঢঙে সুরু করেছিলেন লেখনী-চালনা—কিন্তু শেষ হ'ল চটকদার এক সাহিত্য-কর্মে। দিল্লীর কোন সমাজ, কোন শ্রেণী তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। একের পর এক দিল্লীর মানুষ, দিল্লীর সমাজ, পথঘাট ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে লেখকের নিপুণ লেখনীর মুখে। তাই পাঠক স্বাদ নেয় ঐ রচনায় অন্তর্নিহিত সাহিত্যরসের, বাহবা দেয় দিল্লীর উন্নাসিক সমাজের উপরে লেখকের নিছক ব্যঙ্গরসাত্মক কশাঘাতের। কিন্তু লেখক কেবল সাংবাদিক ঢঙ দেখিয়েও ক্ষান্ত হলেন না—নিয়ে এলেন, প্রক্ষেপ করলেন রোমাণ্টিক এক এপিসোড বা আখ্যানভাগ—আধারকারের প্রেমজীবনের ট্রাজেডির কথা—রচনার সাংবাদিকতা ছিন্ন হ'ল এপিসোডের আঘাতে, ছোটগল্প চাপা দিল রম্যরচনাকে। আখ্যানটিতে গল্পত্ব যতটা না থাক, সাংবাদিকতাকে চাপা দিয়ে রোমাণ্টিক ভাব পরিবেশন করার প্রয়াস আছে প্রচুর। সাধারণ পাঠক মুগ্ধ হবে নিশ্চয়ই, জনপ্রিয়তার কারণ হয় ত এখানেই। কিন্তু আখ্যানভাগের এই প্রক্ষেপ নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনার প্রকৃতিকে দিয়েছে বিশেষ এক আঘাত।

দৃষ্টিপাত প্রকাশের পর থেকেই বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের রম্যরচনা পাঠকচিত্ত প্লাবিত করে চলল। দৃষ্টিপাত বইখানি প্রকাশের কিছু পরেই বার হয় রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা'। পাঠক-সমাজ আগ্রহ নিয়ে এই রম্যরচনার আস্বাদগ্রহণ করতে উৎসুক হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ঐ রচনায় 'দৃষ্টিপাতে'র ঢঙের অনুসরণ দেখা গেলেও শেষ পর্য্যন্ত এটি হয়ে ওঠে নি সার্থক শিল্পকর্ম। নৈর্ব্যক্তিক রচনা হিসাবে সংবাদ মানসিকতা পরিবেশনের ঢঙ নিয়ে সুরু হলেও লেখকের ব্যক্তিমানস হয়ে উঠেছে অধিকতর প্রবল। তার পর ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন আখ্যানভাগের সংযোজনা করে এটিকে পর্য্য-বসিত করা হয়েছে উপন্যাসধর্ম্মী রচনায়। ফলে এটি না হয়েছে খাঁটি রম্যরচনা, না হয়েছে কল্পনামূলক সার্থক রসরচনা।

এই দু'খানি আধুনিকতম রম্যরচনার কথা বলতে গিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর রম্যরচনাধর্ম্মী ভ্রমণকাহিনী "দেশেবিদেশে" এবং "পঞ্চতন্ত্র", "ময়ূরকণ্ঠী" প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। দেশেবিদেশে ভ্রমণ-কাহিনীর পর্য্যায়ভুক্ত হলেও এখানি নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনারই জাত। বিশেষ একটি দেশের কথা বলতে গিয়েও লেখক এমন এক বিরাট মানসিক দিকচক্রবাল সৃষ্টি করেছেন যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে লেখকের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসশিল্পীর সূক্ষ্মানুভূতি, রম্য পরি-হাসের সঙ্গে আছে জীবনদর্শনের পরম গাম্ভীর্য্য। রম্যরচনা হিসাবে এখানিও একটি সুসমঞ্জস সৃষ্টি। আঙ্গিকগত কোন কনভেনশন বা প্রথাকে স্বীকার না করে, শব্দচয়নের সম্পূর্ণ মুক্ত মন নিয়ে রস ও তথ্য পরিবেশন করেছেন একই সঙ্গে লেখক। হয়ত অনেক স্থানে অনাবশ্যকভাবে উর্দ্দু, ফার্সী ও ইংরেজী শব্দ লেখক ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার সামগ্রিক প্রভাবের সার্থক দিক বিচার করলে শব্দ-চয়নের এই অতি স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ক্ষমার্হ বলে বিবেচিত হবে। লেখকের রম্যরচনাগুলির বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক। একটি নৈষ্টিক জাতীয়তাবাদী মন নিয়ে লেখক দুনিয়ার মানুষকে দেখেছেন বা দেখতে চেয়েছেন—বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, কিন্তু কোন স্থানে মানুষকে উগ্র জাতীয়তাবাদের মাপকাঠিতে বিচার করতে বসেন নি। তাঁর বিচারবোধ মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই তাঁর রচনা চপল ও চটকদার হালকা ভঙ্গী নিয়েও মানুষের মনের গভীরে স্পর্শ করে। মানুষের প্রতি গভীর দরদবোধ রচনায় এই স্পর্শকাতরতার কারণ।

রম্যরচনার মধ্যে যেমন আছে আঙ্গিকগত শ্লথ বিন্যাস, সম্প্র-সারণশীলতা, ও শিথিল গাঁথুনি, তেমনি এতে ধরা পড়ে অনেক আধুনিক রচয়িতার অতীতমুখীনতা বা তার নিজস্ব ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ও স্থির জীবনদর্শনের অভাব। অবচেতন মনে চলতি জীবনের প্রতি বিক্ষোভ অর্থাৎ অগ্রগতির অনুপন্থী জীবনবেদকে মেনে না নেওয়ায় রচয়িতার দৃষ্টি পড়েছে অনেক স্থানেই অতীতের প্রতি। ফলে কেউ করেন আধ্যাত্মিক ভারতের সন্ধান, কেউ দেখেন জীবনের কল-কোলাহল থেকে পলায়নের স্বপ্ন, অন্ততঃ স্বল্পক্ষণের জন্যেও। রাণী চন্দের রম্যরচনাধর্ম্মী "পূর্ণকুম্ভে"র মধ্যেও ধরা পড়ে এমনই এক পলায়নী মন যা আধুনিক বুদ্ধিসঞ্জাত আবরণ ভেদ করে স্বকীয় রূপ প্রকাশ করে। তাই বিশেষ কোন ধর্ম্মমতকে লেখিকা প্রশ্রয় না দিলেও ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্য থেকে মানসিক ক্ষুধা মেটাবার খোরাক ও মানসিক ভারসাম্য আনবার উপায় তিনি খুজে বেড়ান। তাঁর লেখায় অধ্যাত্ম-ভারতের ছবি আমরা দেখি—যে ছবি দীপ্ত হয়ে উঠেছে, সাবলীল বর্ণনা ও শৈলীর গুণে।

এই রচনাটি সম্বন্ধে আলোচনাকালে কালকূটের "অমৃতকুম্ভের সন্ধানে"র কথাও এসে পড়ে। প্রায় একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে দু'জনের কাহিনী এগিয়েছে। কিন্তু লেখিকার লেখনী যেখানে মাঝে মাঝে ভাবপ্রবণতার ঘূর্ণি সৃষ্টি করে নিজেকে ও পাঠকসমাজকে ভাসি-য়াছে, লেখক সেখানে বিশ্লেষণের রাশ টেনে রচনায় অন্তর্নিহিত ভাবপ্রবণতার প্রতিনিয়ন্ত্রণ করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। তাই লেখকের রচনা নৈর্ব্যক্তিক রচনা হিসাবে সার্থকতর। নৈর্ব্যক্তিক রচনায় লেখকের নিজস্ব মনের রঙের আধিপত্য সার্থক শিল্পকর্ম্মের পরিপন্থী। কালকূটের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীও পলায়নী নয়। ভিড়ের মেলায় কুম্ভের আড়ম্বর ও আতিশয্যের মাঝে তিনি মানুষকে খোঁজার প্রয়াস করেছেন—মানব-বৈচিত্র্যকে আস্বাদ করার জন্য মেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আকুল হয়ে ঘুরেছেন। কিন্তু তিনিও রচনাকে জনপ্রিয় করতে গিয়ে সস্তা করতালি পাওয়ার মোহ ভুলতে পারেন নি। কোন পশ্চিমদেশীয়া তরুণীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে লেখক যে প্রেমোপাখ্যান রচনা করেছেন, তা কি সত্যিকারের নৈর্ব্যক্তিক রচনার ক্ষেত্রে পরিহার্য্য নয়?

রম্যরচনায় রসাত্মক চিত্ররচনাই প্রধান। যেখানে এই রসচিত্র উজ্জ্বল, লেখকের রম্যরচনা সেখানে সার্থক। একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাশৈলীগত ঐক্যই রম্যরচনার অপরিহার্য্য উপাদান। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "দুয়ার থেকে অদূরে" সার্থকতম

সৃষ্টি—জীবনের কলকোলাহল থেকে লেখকের ক্ষণিক পলায়নের আকুতির প্রয়াস সত্ত্বেও। এ রচনাটির মিষ্টতা ও সংবেদনশীলতা সত্যই অনুপম। রচনাশৈলীর মধ্যে সর্ব্বত্র সাবলীলতার পরিচয় না থাকলেও, লেখকের আন্তরিকতা, প্রতিটি ক্ষুদ্র বস্তুকে সর্ব্ব অন্তর দিয়ে স্পর্শ করার ইচ্ছা—তার অন্তর্নিহিত রূপটি পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস সত্যই অপরূপ। লেখক কলকাতার আশে-পাশে নিভৃত পল্লীলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্যের সন্ধান করেছেন; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু, অখ্যাত মানুষের পরিচয় লাভ করে অন্তের মধ্যে অনন্তের মহিমা উপলব্ধি করায় ব্রতী হয়েছেন।

রম্যরচনার অনেক ক্ষেত্রেই থাকে রচয়িতার ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে দর্শনের প্রয়াস। ছোট ছোট বস্তুর পরিচয় কেমন করে লেখকমনে নানা রঙের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, কেমন করে মানসিক দিকচক্রবাল বিস্তৃত হয়, কেমন করে লেখকের স্বকীয় রূপ প্রকাশ করতে প্রেরণা দেয় তার সন্ধান পাওয়া যায় ব্যক্তিক রম্যরচনাগুলিতে আর ইঙ্গিত মেলে নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনায়। কিন্তু রম্যরচনায় এই 'দর্শন' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষণিক আনন্দোপলব্ধির সন্ধান দিয়েই ক্ষান্ত হয়। তবু এর সার্থকতা আছে—যেমন থাকে ধানের শীষের ওপর শিশির-বিন্দুর অস্তিত্বের সার্থকতা। সামান্য আঘাতে শিশির ঝরে যাবে ঠিকই, বেলা গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পায়িত হবে বিন্দুগুলি সূর্য্যের উত্তাপে, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও যে সৌন্দর্য্য সেগুলি বিতরণ করে যাবে মাটির বুকে, পথিকমনে এনে দেবে যে স্নিগ্ধতার আমেজ ও স্পর্শ তার কি কোন মূল্যই নেই?

বাউল গান—২

শ্রীকামিনীকুমার রায়

১

গুরু তোরে কি ধন দিল চিন্‌লে না মনা,
তোরে রাং দিল না সোনা দিল পরখ করে দেখলে না।
গুরুর বাক্য অক্ষয় করে নেও তারে যতন করে,
করে নিশানা,
তোরে রাং দিল না সোনা দিল পরখ করে দেখলে না।
গুরু দিল কাঁচা সোনা রাং বলে তুই জ্ঞান করলে না
(ওরে দিনকানা) তোর সাধনের ধন পরশমণি
অসাবধানে পাবি না।
চণ্ডীদাস রজকিনী তারা হ'ল পরশমণি
রাং বানায় সোনা
তারা এক মরলে দু'জন মরে এমন হয় কয় জনা?

২

গুরু না ভজিয়া সংসারে কি লাভ বাঁচিয়া।
নিত্যি নিত্যি মরণ জীবন ঘুমেতে পড়িয়া,
এহি মত যাইবা তুমি ভাইবন্ধু ছাড়িয়া,
সংসারে কি লাভ বাঁচিয়া গুরু না ভজিয়া।
হিংসা নিন্দা কৈতব ছাড়, ছাড় ভবের মায়া,
চান্* বদনে হরি বল তুই বাহু তুলিয়া,
কি লাভ বাঁচিয়া?
ভেবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
গনা দিন ফুরাইয়া গেল কারবা† রইলা চাইয়া
গুরু না ভজিয়া কি লাভ বাঁচিয়া।

৩

লইলে নারে দেহের খবর
দিন গেল বিফলে;
তোর গুরুর হাতের ছাপা জিনিষ
পরের হাতে সঁপিয়া দিলে।
দেহের আঠার কোঠা
কোঠায় কোঠায় ধন
হীরামণ মাণিক্য সোনা
আছে অগণন।

---

* চাঁদ

† কাহার দিকে

দেহে জ্বলছে বাতি দিবানিশি
সলতা ছাড়া বিনা তৈলে ;
শ্রীনাথ কান্দে মনের দুঃখে দ্বারেতে বসিয়া
তোর ঘরের জিনিষ ঘরে থুইয়া,
ভূতের বেগার খেটে মলে।

৪

তিন বেড়ের এক বাগান আছে,
সেইখানে এক আজব আছে,
চন্দ্র সূর্য্য ফুল ফুইটাছে,
বোঁটা ছাড়া ফুল ঝুলছে গাছে।
বোঁটার মধ্যে আছে কাঁটা,
পাহারা দেয় ঐ ছয় বেটা,
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রে আঁটা,
গুরুর রূপে ঝলক দিছে।
গুরু ব্রহ্মরূপে গিপিট করা,
প্রেমরসে আছে ভরা,
মরা মানুষ গাছে ঝুলে'
রাধাকৃষ্ণ বলতে আছে।

৫

ছল করা বিলাতি তাস খেলাও না মন,
দেশে আদর কম।
স্বদেশী গৌর আফিসে রাধাকৃষ্ণ ছাপা আছে,
খেল তাস মনের উল্লাসে ধর গুরুর শ্রীচরণ।
পঞ্চতত্ত্ব পাঞ্জা মেরে, পাঁচ পাঁচা পঁচিশের ঘরে,
দীক্ষার গুণ কি শিক্ষার ধরে নয়নে হবে মিলন।
ছক্কাতে ছয় গোসাই হবে, সাতাতে রত্ন উঠাবে,
আটাতে মাল বন্ধ রবে, নলাতে দরজা বন্ধ,
দশেতে দশ দেবতা আছে, চিন্তা ল তোর গুরুর কাছে,
মন টাকায় যা করাইতেছে, তাই করতেছে সর্বক্ষণ।
নিত্যানন্দ সাহেব কয়, মেম হবে গদাধর,
তিরিতে ত্রিগুণ ধরে, ছক্কাতে বেদবিধি ছাড়।
সাধন কর ইস্তকবিন্তি, একশ' হাজার ছয়শ' পত্তি।
গণতিতে যার কমতি হবে সে পাবে মানুষ রতন।

৬

হৃদয় পিঞ্জরায় বসে, রাধাকৃষ্ণ বল না।
সে নাম তুমি বল আমি শুনি,
আমি বলি কেহ শুনে না।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে,
আটাশ অক্ষর দাও না ছেড়ে,
চার অক্ষরে রাধাকৃষ্ণ নাম,
সাধু জপে নাম জীবে জানে না।
হরির নাম বলতে বলতে,
আনন্দ বাড়িবে চিত্তে,
কৈতবজ্বালা যাবে দূরে,
নিরানন্দ গন্ধ দেহে রবে না।
ভেবে নিধিরাম বলে,
কেবা বলে, কেবা শুনে,
মনের দুঃখ রইল মনে,
মন মিলে, মনের মানুষ মিলে না।
সে নাম বলরে মন নিষ্কপটে,
পশু আত্মা যাবে কেটে,
মানুষ আত্মা বসবে ঘটে,
স্বভাব যাবে তোর অভাব রবে না।

৭

কি আশায় বসে রইলে মন,
গেল দিন অকারণ
ভজ শ্রীগুরুর চরণ।
তোর গনার দিন হইল আহেরি
বেজে উঠল কালের ঘড়ি
আর দেরি করবে না শমন।
তোমার মুণ্ডে দিয়ে দণ্ডের বাড়ি,
করবে যে বন্ধন।
যত মন করছ দর্প সকলি হইবে খর্ব,
কালসর্পে করতেছে গর্জন।
কোন্‌দিন জানি কালভুজঙ্গে অঙ্গে
করবে যে দংশন।
মন যে কারে বল আমার আমার,
মন তুমি কার কেবা গো তোমার,
অন্ধকার মুদিলে নয়ন।
জেনে শুনে মায়াফাঁসি
গলে লইলে কি কারণ?

৮

মন লওগা গুরুর উপদেশ, জানতে পার সহজে।
তোমায় হৃদয় মাঝে আছে মানুষ, বইসা বিরাজ করে।

পাঁচ মহল্লায় যোগ করে লাগাইল এক আংটা প্যাঁচ,*
ঘরের মারুল জোড়াতাড়া চামড়া ছানি† কাগজের
জানতে পার সহজে।
চন্দ্রসূর্য্য আদি অস্ত সকলি তাহার কাছে,
যমুনার জল কইরে উতল পদ্মপত্রে বইসাছে।
কাঙ্গাল দীনে বলে, রঙ্গেতে মন ভুইলে রইলে,
তোর মায়ার বন্ধন ছুইটে যাবে গুরুর চরণ পরশে,
জানতে পার সহজে।

৯

তোমার সব ভেল্‌কিবাজি
বুঝে উঠা ভার।
(তুমি) কখন মার কখন বাঁচাও,
কাঠের পুতলা কলে নাচাও,
কখন মার কখন বাঁচাও,
আজগুপি তাজ্জব ব্যাপার।
ভোজবাজি আর ভারমতি,
তারা ভেল্‌কি খেলায় দিবানিশি,
মনমোহন কয় পরিপাটি
ধাপ্পাবাজি এ সংসার।
ভেল্‌কি ভাঙা মন্ত্র আছে,
আমি শিখলাম যাইয়া ওঝার কাছে,
সব দেখেছি মিছামিছে,
পাছে না আছে খেলোয়াড়।
খেমটা গাওয়া আরধা চৌতাল,
ঠেস কাওয়ালী তুমরী দামাল,
তাল বাজাইয়া সামাল সামাল
বাহাবাতে দেও চীৎকার।
তুমি কখন রোগী, কখন ওঝা,
কখন বাঁকা কখন সোজা,
যায় না তোমার স্বভাব বোঝা
আত্মারাম সরকার।

১০

গুরু কল্পতরু জড়িয়ে ধর, কইগো আমার ভক্তিলতা?
সাধুর সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে প্রেমতীর্থে মুড়াইয়া মাথা।
চৌদিকেতে সত্যের বেড়া, ঘুরে কত ছাগল ভেড়া
জল ঢাল তার গোড়ায় গোড়ায়,
ফুটবে কলি মেলবে পাতা।
বিশ্বাসেরি আঁকড়া দিয়ে, ধর তারে পাকড়িয়ে
কুবাতাসের ঝাপটা লেগে ভাঙবে যে তার লতাপাতা।
রাধাপদ্ম ফুটলে পরে গুন গুন স্বরে শব্দ করে,
কালো ভ্রমর আসবে উড়ে কালো নয় সে উজ্জল সাদা।
মনমোহন কয়, নিজের মাটি হইল নারে পরিপাটি
মিছামিছি কান্দাকাটি শুক্‌না মাটি হয় না কাদা।

১১

আজব কল তৈরি করেছে রাইকিশোরী,
চাক ডুমাডুম কলের মত,
ঘুরছেরে কল মনের মত,
শিইখাছে কল যার আছে মন শিকারী!
চৌদ্দ পোয়া দেহের মাঝে কতই কল,
আসা কল, যাওয়া কল,
চাক ডুমাডুম্ দিডুম কল,
উজানি ভাইটানি আছে দুইখানা কল।
আরো দুই কল আছে
খোলা শুনতে লাগে কর্ণ তালা
সেই কলেতে মানুষ ধরা কোঠরী।
কি কল কইরাছে রাইকিশোরী
তোরা শিখলে না কেউ আশমানি কল,
কলে উঠা আশমানি জল,
রসিক যে জন দিচ্ছে কলের প্রহরী।

১২

আজ আমার সাধের তরী
আচম্বিতে পইড়ে গেল ঘোর তুফানে
বাণিজ্যের বস্তু নিয়ে দিলাম পাড়ি
ব্যাপার করব আশা মনে।
থাক আমার ব্যাপার করা
মূলে হারা কীর্তিনাশার মধ্যখানে
সে তরীর ন' দরজা আছে সোজা
এক দরজা আটকা কেনে?
সেখানে বস্তু আছে কেউ না জানে
জানে না এর মহাজনে
ফিকির চান ফকির বলে, রূপচানরে,
তুই বসে বসে ভাবছিস কেনে?
এ তুফান হবে ক্ষান্ত হও না শান্ত
হরি বল চান বদনে।

* যে প্যাঁচ সহজে খোলা যায় না।
† ছাউনি, আচ্ছাদন।

রবীন্দ্র-সকাশে

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আমি বাল্যকালেই আসি। তাঁহার সান্নিধ্যে আসার পূর্বে আমি কি সূত্রে কলিকাতায় গিয়াছিলাম এবং কি ভাবে তাঁহার সান্নিধ্য-লাভ করিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস সংক্ষেপে দিতে হয়। আমি পিতৃদেব সংগীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাঁচ বৎসর বয়সে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করি। আমার যখন দশ বৎসর বয়স তখন প্রথম কলিকাতায় যাই।

তৎকালে বিষ্ণুপুরে রেলষ্টেশন ছিল না। বিষ্ণুপুর হইতে পনর ক্রোশ দূরে অবস্থিত পানাগড়ে গিয়া ট্রেনে করিয়া হাওড়া যাইতে হইত। ঐ পনর ক্রোশ গরুর গাড়ীতে করিয়া যাইতে হইত। তখন বিষ্ণুপুরনিবাসী ধ্রুপদী কেশবলাল চক্রবর্ত্তী কলিকাতায় থাকিতেন। কলিকাতায় দানবীর তারকনাথ প্রামাণিকের বাড়ীতে কেশবলাল অবস্থান করিতেন। তাঁর মধ্যম পুত্র রামসুন্দর কলিকাতায় বর্মার এক সাহেবের বাড়ীতে জহুরীর কাজ করিতেন। বর্মার সাহেব মিনার্ভাতে বাড়ী ভাড়া লইয়া, হিন্দুস্থানী ও বর্মার গায়ক এবং বাঈজী আনাইয়া একটি চ্যারিটি শো করিবার জন্য রামসুন্দর বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দিন ধার্য করেন। এই 'চ্যারিটি শো'তে আমাকে গান গাওয়াইবার প্রস্তাব রামসুন্দরবাবু বর্মার সাহেবের নিকট উত্থাপন করেন। সাহেব আগ্রহান্বিত হইয়া ইহাতে অনুমতি দিলেন। ঐ চ্যারিটি শোতে আমি গান করি। আমার গান শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রাজা দুর্গাচরণ লাহা ছিলেন। তিনি গান শুনিয়া খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার বাড়ীতে গিয়া গান শুনাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া গান শুনাই। তিনি আমাকে স্বর্ণপদক দেন; ইহাই আমার প্রথম পদকপ্রাপ্তি। তার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গান শিখিয়াছ ?" আমি তখন আমার পিতৃদেবের নাম করিলাম। এত অল্প বয়সে আমার ঐরূপ সঙ্গীতনৈপুণ্যে শিক্ষাগুরু পিতার তিনি খুব প্রশংসা করিলেন। প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন। মিনার্ভাতে তিনি তখন অধ্যক্ষ ছিলেন। মিনার্ভাতে যেদিন গান হয় সেদিন তিনি আমাকে পার্শ্ববর্তী কক্ষ হইতে ডাকিয়া পাঠান। তিনিও আমাকে আমার শিক্ষাগুরুর নাম জিজ্ঞাসা করায় আমি পিতার নাম করিলাম। তিনি আমার সুরালো কণ্ঠের এবং পিতার শিক্ষাদান প্রণালীরও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মচারী মতিলাল বাবু আমাকে মহর্ষির নিকট লইয়া যাইতে রামসুন্দর চক্রবর্তীকে বলিলেন। রামসুন্দর বাবু আমাকে লইয়া মহর্ষির নিকট যান। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় গান আরম্ভ হয়। প্রসিদ্ধ গায়ক শ্যামসুন্দর মিত্র মহাশয় আমার সহিত পাখোয়াজ সঙ্গত করেন। প্রথম, আমি তানসেনের একটি গান গাহিয়াছিলাম। তার পর সদারঙ্গকৃত একটি খেয়াল গাই।

তার পর মহর্ষি আমাকে শোরীর টপ্পা গাহিতে আদেশ করায় আমি তাহা গান করি। শুনিয়া তিনি খুবই মুগ্ধ হন অতঃপর বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ও বর্দ্ধমানের রঘুনাথ দেওয়ান এবং পিতার রচিত গান গাহিতে আদেশ করায় আমি তাহাও গাই। আমার সমস্ত গান শুনিয়া মহর্ষি পরম প্রীতিলাভ করেন এবং আমাকে একটি স্বর্ণপদক দেন।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই সময়ে আমার গান শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মহারাজের প্রাসাদে আমার গান হয়। তাঁহার দরবারে তের জন বাঁধা ওস্তাদ ছিলেন। সেখানে আমি ইমনের খেয়াল গান করি। মহারাজের তবলাবাদক ষষ্ঠীবাবু তবলা সঙ্গত করেন। তার পর আরও কয়েকটি খেয়াল ও টপ্পা গাহিয়াছিলাম। মহারাজ আমার গান শুনিয়া প্রীত হন এবং বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।

আমি কলিকাতায় গিয়া একমাস কাল থাকি এবং বিভিন্ন স্থলে আমার গান হয় ও উপযুক্ত পুরস্কার পাই। সেখানে প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী সত্য গুপ্ত, গোপাল মল্লিক ও তৎপুত্র বিপিন মল্লিক আমার গানে বিভিন্ন মজলিসে সঙ্গত করিতেন।

ঐ এক মাস কলিকাতায় থাকাকালীন আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিবার আমার একটি উদ্দেশ্য ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাধ্যাপক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখাৎ শুনিয়া নবাবিষ্কৃত গ্রামোফোন রেকর্ড দেখিবার

কৌতূহল আমার জন্মিয়াছিল। ঐ রেকর্ড ও গ্রামোফোন প্রথম ঠাকুরবাড়ীতে আসে। রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে যাইয়া রেকর্ডে রাধিকা গোস্বামীর গান ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কীর্ত্তিচাঁদ গোস্বামীর পাখোয়াজ-সঙ্গত শুনিয়া খুবই আশ্চর্যান্বিত হইলাম। রেকর্ড মোমের তৈরি ছিল। কর্ণে অনেকগুলি নল লইয়া প্রায় সাত-আট জন একসঙ্গে গান শুনিতে পাইত। একটি লম্বা গোলাকার পদার্থ রেকর্ডের সহিত সংযুক্ত ছিল; তাহা ঘুরাইলেই গান শুনিতে পাওয়া যাইত। তখন রবিবাবুর আদেশক্রমে আমি রেকর্ডে দুইখানি গান দিলাম। একটি শোরীকৃত টপ্পা ও অন্যটি বাংলা গান; তখন তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে সেই গান রেকর্ডে শুনাইলেন। ইহাই কবির সহিত আমার আলাপের সূত্রপাত।

কলিকাতায় একমাস থাকার পর পুনরায় বিষ্ণুপুরে আসিলাম। পিতৃদেবের নিকট আরও পাঁচ বৎসর একাদিক্রমে সঙ্গীতশিক্ষা করিলাম। আমার যখন পনর বৎসর বয়স তখন পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। ষোল বৎসর বয়সে আমি কলিকাতায় গিয়া চন্দননগরনিবাসী বিখ্যাত জমিদার হরিপদ মিশ্রের আশ্রয়ে থাকি। তিনি আমার অগ্রজ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

সেখানে থাকাকালীন আমি প্রসিদ্ধ খেয়ালী গুরুপ্রসাদ মিশ্রের নিকট কতকগুলি খেয়াল শিক্ষা করিয়াছিলাম। বিখ্যাত ধ্রুপদী খেয়াল ও টপ্পাগায়ক মুলোগোপালের নিকট কিছু শিক্ষা করি। সতর বৎসর বয়সে আমি বিষ্ণুপুরে আসিয়া বিবাহ করি। তার পর এক বৎসর ধরিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করি। বর্দ্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ মহতাবের সভায় গায়কপদে নিযুক্ত হই। কলিকাতায় 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' নামক সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হই ১৯১৮ সনে। তথায় সপ্তাহে তিন দিন করিয়া সঙ্গীতশিক্ষা দিতে হইত। তখন মধ্যে মধ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে যাইতাম ও রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইত। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গানও শুনাইতাম। তিনি আমার হিন্দী গান শুনিয়া সেই গানগুলির অনুকরণে বহু বাংলা গান রচনা করেন। সঙ্গীতসঙ্ঘে পাঁচ-ছয় বৎসর সঙ্গীত-শিক্ষাদানের পর আমার ছাত্রছাত্রীদের গান শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ আমার শিক্ষাদানপ্রণালীর খুবই প্রশংসা করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, বাল্যাবস্থা হইতে সঙ্গীতশিক্ষা না করিলে গলা বেশ খোলে না। আমি উত্তরে বলিলাম যে, কণ্ঠস্বরও মিষ্ট হওয়া দরকার। তিনি বলিলেন, সুশিক্ষা দানও সঙ্গীতশিক্ষার অনুকূল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিস্তর বাংলা গান বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর হিন্দী গানের অনুকরণে রচনা করিয়াছিলেন; তবে স্বরচিত কতকগুলি গানে স্বীয় ইচ্ছানুসারে সুর দান করেন।

এ সময়ে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এক সভায় আমার গান হয়। তাহাতে বহুলোকের সমাগম হয়। তথায় আমার গানের পর রবীন্দ্রনাথকে কিছু বক্তৃতা দিবার জন্য সকলে অনুরোধ করেন। তখন তিনি রসিকতার সঙ্গে বলিলেন, "গোঁফেশ্বরের হ'ল, এবার দাড়ীশ্বরের হচ্ছে।" সভায় হাসির রোল পড়িয়া গেল।

পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রথমে রবীন্দ্রনাথ যখন ফিরিয়া আসেন, তখন কলিকাতার এলবার্ট হলে তাঁহার এক সংবর্দ্ধনা-সভা হয়। এই সভায় জলধর সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সমাগম হয়। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যখন হিন্দী গানের ভাঙা বাংলা গান প্রথম করেন, তখন হিতবাদী পত্রিকায় (সাপ্তাহিক) তাঁহার বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা বাহির হয়। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাহার প্রথম সমালোচনা করেন। দেখাদেখি অন্যান্য অনেক পত্রিকা তাঁহার গানের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আরও বলেন যে, পশ্চিম হইতে প্রচুর সম্মানলাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসায় "আমার গানের আদর বাড়ে"। তাঁহার বক্তৃতার পর সকলের অনুরোধে আমি খেয়াল ও শোরীর টপ্পা গান করি।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে আর একবার সঙ্গীত-সঙ্ঘের এক উৎসবে রবিবাবু যোগদান করেন। তথায় সরলা দেবী তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন। বহু রাজা জমিদারও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তথায় সঙ্গীতসঙ্ঘের ছাত্রীদের অনেকের খেয়াল, ঠুংরী ইত্যাদি গান হয়। তার পর আমার ধ্রুপদ, খেয়াল হয়। আমার সহিত প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য মহোদয় সঙ্গত করেন। সেই সভায় হিন্দী গান সমাপ্ত করিয়া আমি বাহার রাগের হিন্দী গানের ভাঙা রবিবাবুর একটি বাংলা গান গাই 'আজি মম মন'। রবীন্দ্রনাথ উক্ত গানটি শুনিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন।

আর একবার কলিকাতার আলিপুর বিজয়-মঞ্জিলে রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা-সভায় আমার গান হয়। বর্দ্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহতাব তথায় এই সভা আহ্বান করেন। কবি আমাকে সাহানা রাগের একটি গান গাহিতে বলায় আমি উক্ত রাগের একটি গান করি। আমার গানের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সঙ্গত করেন। গান শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ খুবই সন্তুষ্ট হন।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ একবার রবিবাবুকে তাঁহার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করেন। সেই দিনে আমার গান হয় এবং

দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য মহোদয় পাখোয়াজ সঙ্গত করেন। আমি রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'শ্রী' রাগের একটি গান প্রথম করি। সেই বাংলা গানটি সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'কণ্ঠ-কৌমুদী' পুস্তকে প্রকাশিত হিন্দী গানের ভাঙা। মূল গানটি 'তন মিলন দে পরবার।' কবি 'কার মিলন চাও বিরহী' এই বাংলা গান উহার অনুকরণে রচনা করেন। বহুদিন পূর্ব্বে রচিত এই গানটির কথা তাঁহার স্মরণে ছিল না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রাঁচি হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার সঙ্গীত সঙ্ঘে কিরূপ শিক্ষাদান হইতেছে ইহা প্রতিভা দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি ছাত্রীদের গান শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে সঙ্গীতের এক আসর হয়। তাহাতে ছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে মালতী বসু, মেধা ঠাকুর ও অমিয়া রায় গান করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া খুবই সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হন।

তার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিভা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বর্ত্তমান সঙ্গীতসঙ্ঘে কে সঙ্গীত শিক্ষাদান করিতেছেন। প্রতিভা দেবী তদুত্তরে বলেন, বিশ্বনাথজী সঙ্গীতসঙ্ঘ হইতে অবসরগ্রহণ করায় বর্দ্ধমান মহারাজের সভাগায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সঙ্গীতসঙ্ঘে শিক্ষাদান করিতেছেন। ইহাতে তিনি বলেন যে, গোপেশ্বর বাবুর সঙ্গীতে খুবই অনুরাগ।

রবীন্দ্রনাথের যখন দশ বৎসর বয়স তখন যদুভট্ট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আলয়ে ছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট গান শিক্ষা করেন। রবিবাবু শ্যামসুন্দর মিশ্রের নিকটও কিছু গান সংগ্রহ করেন। একদিন ঠাকুর-বাড়ীতে গিয়া তাঁহার গান শুনিবার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি নায়কী কানাড়ার "বলমা রে চুনরিয়া' এই খেয়ালটি আমাকে শোনান। গান গাওয়ার পর তিনি নিজেই বলিলেন, "সাধনার অভাবে আমার আজকাল গান গাওয়া বেশ সুবিধা হয় না।" তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ ও ভাব আমার খুবই ভাল লাগিল। হিন্দী গানগুলির বাংলা রূপান্তরসাধন নিঃসন্দেহে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র দীনুবাবু প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের নিকট থাকিতেন। একদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে আমি কবির সহিত সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। সেই সময় দীনুবাবু তথায় আসিলেন এবং তাঁহার সহিত জগাবাদ-নিবাসী শশীভূষণ হালদার নামক এক ব্যক্তি কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দীনুবাবু রবীন্দ্রনাথকে বলিলেন, "শশীবাবু বিদ্যানুরাগী ও সঙ্গীতানুরাগী ; ইঁহার কিছু কবিত্বশক্তিও আছে ; আপনার কবিতাপাঠে ইনি মুগ্ধ।" শশীবাবু বলিলেন, "পুত্রের সঙ্গীতে খুবই আস্থা আছে। সেই জন্ত কলিকাতার বিশ্বনাথ ধমারীর নিকট সে কিছুদিন সঙ্গীত শিক্ষা করে। বিশ্বনাথজীর মৃত্যুর পর সে বর্ধমান মহারাজের সভাগায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটও গান শিক্ষা করে।" তখন দীনুবাবু আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই সেই গোপেশ্বর বাবু।" শশিভূষণবাবু তদুত্তরে বলিলেন, "আজ আমার দিনটি খুবই শুভ, কারণ কবিশ্রেষ্ঠ ও গায়কশ্রেষ্ঠ উভয়ের সহিত একই ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হইল।" শশীবাবুর প্রশংসা-প্রসঙ্গে দীনুবাবু বলিলেন যে, শশিবাবু বিবাহের পণদানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে অর্থসাহায্য করিয়া রক্ষা করেন। ইহা শুনিয়া কবি শশীবাবুর খুবই প্রশংসা করিলেন এবং বিবাহে পণগ্রহণের বিরুদ্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে আমি কলিকাতায় ঠাকুরবাড়ীতে আর একবার তাঁহারসহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তখন তিনি আমাকে "খট্"রাগের একটি গান শুনাইতে বলেন। প্রথম আমি উক্ত রাগের একটি ধ্রুপদ "ক্যায়সে যমুনা তট মেঁ জল ভরণ জাঁউ ম্যায়" গানটি গাহিয়াছিলাম। তখন কবি বলিলেন, "গানটি কাহার রচিত"? আমি বলিলাম, গানটি মদীয় পিতৃদেবের রচিত। তিনি গানটি লিখিয়া লইলেন।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার জন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ও দানের কথা বলিয়া বা লিখিয়া বুঝানো যায় না। বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে আমি শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতাধ্যাপক হইয়া গিয়াছিলাম। তথায় রবীন্দ্রনাথের কীর্তিসমুদয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই এবং ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার সম্বন্ধে একটি গান রচনা করি।

গানটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সিন্ধু—ঝাঁপতাল

ধন্ত বিশ্বকবি তুমি, হে রবীন্দ্র গুণাধার।
তোমার অপূর্ব কীর্তি তুলনা নাহিক তার।
শান্তিনিকেতন দেশে রচিলে জনকাদেশে।
সেথা কত শত লোকে শান্তি পায় অনিবার।
তুমি মহাজ্ঞানী-গুণী বুঝিয়াছে সর্বজন।
বহু ভাষাবিদ্‌গণে সুখে শান্তিনিকেতনে,
জীবন কাটান তাঁরা, কোন দুঃখ নাহি আর।
তুমি নররূপী দেব, অমর হইয়া আছ।
মার্গসঙ্গীত ভাঙি কত গীত রচিয়াছ।
গোপেশ্বর ও পীঠস্থানে সুখে আছে তৃপ্ত প্রাণে,
তব কীর্তি হেরি আজি হর্ষে ভাসে হিয়া তার॥

পুষ্পপরী

শ্রীনির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পুষ্পপরী! পুষ্পপরী! স্বপ্নভরে উচ্ছসি'
ললিতা-লতা ছন্দোলীনা সুন্দরী!
ফুলবনেতে ফুলসনেতে কোন ক্ষণেতে উল্লসি'
মাখিলে তুমি গন্ধ ওই কুন্দ'রি?

কুঞ্জোপরি ছন্দ ভরি' নৃত্য করি' তরঙ্গি'
হাসিলে তুমি লাস্যময়ী সুন্দরী!
চিত্ত হরি' হাস্যময়ী ছুটিলে তুমি কুরঙ্গী,
গুঞ্জরিয়া উঠিলে তুমি সুর ধরি!

লহর-রোলে লীলার ছলে ভাসিলে তুমি হিল্লোলি',
কানন শুধু উঠিল দুলে সুন্দরী!
দোদুল-দোলে ফুল-দোলেতে দুলিলে তুমি হিন্দোলি',
লাগিল দোলা কুঞ্জবনে গুঞ্জরি'!

সাগর-নীল নিচোল তব স্বপন-রাগে মূর্চ্ছিত,
নীলা-আঁখিতে চাও চকিতে সুন্দরী!
কপোল তব সুরভি-ভরা চন্দনেতে চর্চিত,
যাপিলে তুমি লীলাতে মধু-শর্বরী!

পুষ্পপরী, পুষ্পভরা বসন্তেতে উচ্ছলি'
পুলক-ভরে উঠিলে ভরি' সুন্দরী!
মদির-হাসি-মাখা-অধর উঠিল তবে উজ্জ্বলি',
কুহক জাল সরিয়া গেল সঞ্চরি!

যৌবনেতে প্রথম লীলা ধরিল রূপ ছন্দিয়া,
মধুর হাসি ফুটল তব সুন্দরী!
কুসুমরাশি লুটায়ে পড়ে আজিকে তোমা' বন্দিয়া,
হিল্লোলিল নবীন-ফুলমঞ্জরী!

কল্লোলিল সাগর-ঢেউ, হিন্দোলিল ফুলদোলা,
জানায়ে দিল যৌবনেরে সুন্দরী!
প্রথম-ফোটা ফুলের মত সুবাস বহে দিক্‌ভোলা:
গন্ধ তার ছড়ায় বুক কুঞ্জ'রি।

ঝর্ণাসম উচ্ছলিত স্রোতের ধারা সুবাক্য,
চপলা তুমি বিজলী সম সুন্দরী!
গরবিণী গো! চটুল আঁখি, বিলোল তব কটাক্ষ,
সুঠাম তব যুগল বাহুবল্লরী!

পুষ্পসম বক্ষ তব উঠিছে শুধু স্পন্দিয়া:
যৌবনেরি লাগিছে আভা, সুন্দরী!
নিশ্বাস মাঝে পুলক-ভরে উঠিছে তাহা ছন্দিয়া,
তুলনা দেয় গোলাপ-ফুলপুঞ্জ'রি!

ধক্কিমাতে চরণ তব নাচিছে যেন সঙ্গীতে,
ফুল ফোটালে চরণ-ঘায়ে সুন্দরী!
মুক্তাহারে কণ্ঠ দোলে নূতন-মধু-ভঙ্গিতে,
কুসুম-শাখা লজ্জালতা মুঞ্জরি'!

শিহরি' উঠে কানন আজি গহন তব নিঃশ্বাসে,
হাওয়ার ভরে নাচিলে তুমি সুন্দরী!
যোমাঞ্চিল বক্ষ তব উতল কোন্ উচ্ছ্বাসে,
গভীর বুকে শুভ্র তব উত্তরী!

হাসিছ তুমি মদিরা-ভরে কাজল-চোখে আনন্দে,
পুষ্পপরী! তুমি গো সখী, সুন্দরী!
পুষ্পপরী! পুষ্পপরী! স্বপ্ন আনো কি ছন্দে?
কাব্যমাঝে ছলনাময়ী অপ্সরী!
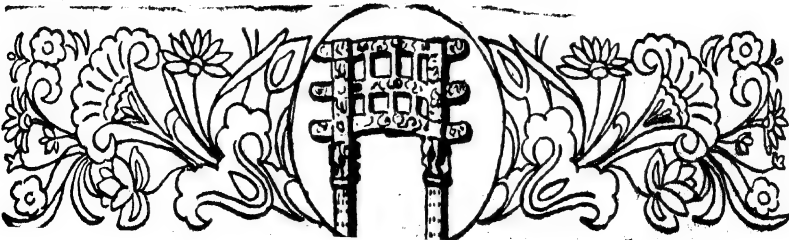
ছোট্ট বীণার কাহিনী

ডাঃ শ্রীডি. আনন্দ

"বীণা"—বাবা তার ছোট্ট মেয়েকে ডাকছেন শুধু এই বিষয়ে নিশ্চিত হবার নিমিত্ত যে, স্কুলে যাবার জন্যে সে তৈরী হয়েছে কিনা? বীণার তরফ থেকে কিন্তু কোন জবাব এল না। তিনি উঠে দেখেন, তার তখন কাঁদকাঁদ অবস্থা।

"কি হয়েছে তোমার? তুমি কি স্কুলে যেতে চাও না?"

"হাঁ, বাবা আমি চাই, কিন্তু আমার ভাই বলছে আজ স্কুলে যেতে পারবে না তুমি।"

যখন তাকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'ল যে সে স্কুলে যাবে তখন বেশ খুশী হয়ে উঠল বীণা।

"বিদ্যালয়ে মেয়েটি কত দিন ধরে যাচ্ছে যে জায়গাটার উপর তার মনে এরূপ অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে?"—বাড়ীতে সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন জানতে চাইলেন।

"ওঃ, মাত্র এক মাস"—জবাব দিলেন বীণার বাবা।

দশ বছর আগে বিদ্যালয়ের প্রতি তিন বছর বয়সের একটি মেয়ের এরূপ অনুরাগের কথা কি কেউ ভাবতেও পারত!

গত দশ বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির যে সকল পরিবর্তন শিশু, গৃহ এবং বিদ্যালয়কে প্রভাবিত করেছে তা পরিস্ফুট হয় শিশুমনের উপর এই প্রতিক্রিয়া থেকে। বীণা ভালবাসে তার বিদ্যালয়কে এবং বন্ধুবান্ধবদের। স্কুলে যে-সকল খেলাধুলো করবার সুযোগ-সুবিধা সে পায় সে-গুলোর প্রতিও আছে তার অনুরাগ। তার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত রাখবার জন্যে সেখানে আছে, গড়ানে বোর্ড এবং সিমেন্ট-লেপা বৃক্ষ। গাছের গোড়ায় জল দিতে তার ভাল লাগে। যখন ঘরের ভেতর বসে খাবার ঘণ্টা বাজে তখন অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলে সে কমলালেবু খায়। কমলালেবু খাওয়া শেষ হলে পর শিশুরা তাদের পাত্রগুলো টেবিলের উপর ফেলে রাখে না। সকল শিশুই নিজ নিজ পাত্র তুলে নেয়, খাবারের উদ্বৃত্তটুকু একটা বাটিতে জমা করে, তার পর সেগুলোকে যথাস্থানে রেখে দেয়। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে এরা বেশ মজা পায় এবং বীণা অন্যান্যদের সঙ্গে মেঝের উপর শুয়ে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করে।

বিদ্যালয়ের প্রতি বীণার যে অনুরাগ তার পিতামাতারাও তার অংশভাগী। তাঁরা উভয়েই নিযুক্ত আছেন সরকারী চাকরিতে এবং এটা তাঁরা অনুভব করেন যে, বিদ্যালয়ে বীণার সময়টা ভালই কাটে। এটা মনে করা কিন্তু ভুল হবে যে, যে-সকল পরিবারে পিতামাতা উভয়েই উপার্জ্জন-শীল, নার্শারি বিদ্যালয়সমূহ কেবলমাত্র সেই সকল পরিবারের পক্ষেই অপরিহার্য্য। যে-কোন প্রগতিশীল সমাজ—যা তার শিশুদের বৃদ্ধি এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ব্যবস্থা করতে চায়, তার পক্ষেই এ ধরনের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। এটা লক্ষ্য করতে দীর্ঘ সময় লাগে না যে, নার্শারি স্কুলে শিশুরা শিক্ষা করে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী—গণতান্ত্রিক জীবন-যাপনের পক্ষে যা অপরিহার্য্য।

শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য যা, অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদের ভেতর দিয়ে নিজেকে বিকশিত করা, শিশুরা ব্যক্তিগত ভাবে সেই বিষয়ে নার্শারি স্কুল থেকে শিক্ষালাভ করে। এবং এসমস্তই করা হয় বই, স্লেট, অথবা পেন্সিলের ব্যবহার ছাড়া।

শিশুদের পকেট-খরচার দরকার আছে কি?

শ্রীশীলা রাম

পিতামাতার সংখ্যা যত শিশুদের পকেট-খরচা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা ও আচরণের পরিমাণও প্রায় তারই অনুরূপ। কেহ কেহ শিশুদিগকে তাহাদের নিজ নিজ ইচ্ছামত খরচ করিবার জন্য কখনও আদৌ টাকা-পয়সা দেন না।

ইহা শিশুর (এখানে শিশু বলিতে বালক বালিকা উভয়কেই বুঝাইবে) অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের এবং বদান্যতা প্রকাশের সুযোগ-সুবিধাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। এই ধরনের কোন শিশু যদি এমন কিছু করিবার নিমিত্ত প্রণোদিত হয়, যাহার জন্য অর্থের প্রয়োজন তাহা হইলে সে তাহা উপার্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে, তাহা সম্ভবপর হইলে চমৎকার সুফলপ্রদ হয়, কিন্তু সাধারণতঃ সে ঘরের এখানে-সেখানে যা কিছু পয়সাকড়ি পড়িয়া থাকে, চুরি করিয়া সেগুলি সংগ্রহ করে।

অপর শ্রেণীর পিতামাতা আকস্মিক উচ্ছ্বাসবশে শিশুদের কিছু অর্থ দিয়া থাকেন। এই সকলের উপলক্ষ হইতেছে—কোন কোন সময় দেওয়ালী অথবা জন্মদিন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তিথিসমূহ। কিন্তু প্রায়শঃই শিশুরা এগুলি আদায় করে অন্য উপায়ে। কখনও হয় ত শিশু পিতামাতার মধ্যে একজনের চতুষ্পার্শ্বে হট্টগোল জুড়িয়া দেয় অথবা ঐ রকম কোন উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া তাহারা কোন রকমের হরতাল করে। শান্তির জন্য পিতামাতা তাদের কোন পুরস্কার বা ঘুষ দিয়ে থাকেন। অতএব প্রায়ই যে শিশুর দাবি বেশী এবং যদিও সে অধিকতর সৎ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয় তথাপি তাহার পকেট থাকে খালি, আর যে শিশু দোষী তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে কোন কোন পিতা আবার সপ্তাহ অথবা মাসের কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে নিয়মিত ভাবে পকেট-খরচা দিয়া থাকেন। পিতামাতার আর্থিক অবস্থা এবং শিশুর বয়ঃক্রম অনুসারে ইহার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ভারতের অধিকাংশ পিতামাতারই—যাঁহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই এই প্রবন্ধ পড়িতে সমর্থ হইবে না—প্রত্যেক শিশুর জন্য প্রতি মাসে সামান্য চারি আনা দিবারও সামর্থ্য নাই। কিন্তু যাঁহারা এই প্রবন্ধ পড়িবেন তাঁহারা হয় ত ইহার বেশীও দিতে পারেন। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইতেছে—সময়মত বেতনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তার অভাব। যাঁহাদের মনে এবিষয়ে সংশয় আছে তাঁহারা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত হালের সকল স্তরের শিক্ষকদের কথা আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্প কয়েক জনই প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ভাবে একটি নির্দ্দিষ্ট দিবসে বেতন পাইয়া থাকেন, ইহার ফল দাঁড়ায় পুষ্টিসম্পর্কিত ত্রুটি অথবা সঞ্চয়ের অভাব। কিন্তু হায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই বিলম্বিত বেতন প্রদানের জন্য এমন কোন লভ্যাংশ বা ডিভিডেণ্টের ব্যবস্থা করেন না যা শিক্ষককে দিতে হয় 'বানিয়া'কে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য।

অনেকে হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "কিসের জন্য শিশুর টাকাপয়সার দরকার হয়, তাহাকে পকেট-খরচা দিবার সার্থকতা কি ?" বর্ত্তমান লেখিকা সামগ্রিক ভাবে এই সকল প্রশ্নের জবাব দিবার চেষ্টা করিতেছেন না, কেননা পাঠক নিশ্চয়ই অন্যান্য বহু সুযুক্তির কথা চিন্তা করিবেন যাহা এখানে উল্লিখিত হয় নাই। এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে উক্ত বিষয়ের প্রতি পিতামাতার মনোযোগ আকৃষ্ট করা যেন তাঁরা এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করেন এবং তাঁহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথাও মনে মনে আলোচনা করেন।

বহু দেশের শিশুদিগকে এবং নিজের দেশের বহু পরিবারের শিশুদের লক্ষ্য করুন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যাহাই তাহাদের হাতে পড়ুক না কেন মিষ্টি খাইয়া খরচ করিয়া ফেলে। একটা সাধারণ নিয়ম হিসাবে ইহা দেখা যাইবে যে, এই সকল শিশু যদিও যথেষ্ট পরিমাণে খাবার খাইয়া থাকে তথাপি তাহাদের বৃদ্ধি এবং শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় যথোচিত পরিমাণে উৎকৃষ্ট প্রোটিন তাহাদিগকে দেওয়া হয় না। এই সকল শিশুকে মটর অথবা গোল আলুর সঙ্গে সিদ্ধ করা কিছু পনীর দিবার চেষ্টা করুন। তাহাদের মধ্যে যদি এই বস্তু প্রচুর পরিমাণে খাইবার ক্ষমতা এবং আভ্যন্তরীণ তাগিদ দেখা যায় তাহা হইলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাইতে পারে যে, তাহারা ঐ জাতীয় খাদ্য-বস্তুর অভাবে ভুগিতেছে। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে কিছু টাটকা ফল খাওয়াইয়া দেখুন। এমন হইতে পারে যে, ভাইটামিন গ-এর স্বল্পতাই ছিল এই তাগিদের কারণ—ভক্ষ্য মিষ্ট ফলের সহিত রহিয়াছে এই ভাইটামিনের সম্পর্ক। তাদের প্রয়োজন ছিল অধিকতর পুষ্টির, অধিকতর শক্তিসঞ্চারক খাদ্যের, কিন্তু তাদের পকেট-খরচা দ্বারা হইতে পারে শুধু মিষ্টির ব্যবস্থা।

কতকগুলি শিশু আবার তাহাদের পয়সা খরচ করে চুলের ফিতা, গন্ধদ্রব্য, কেশতৈল ইত্যাদি ব্যক্তিগত অঙ্গসজ্জা এবং প্রসাধনের জন্য। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তাদের নির্ব্বাচন আর যাই হোক, সৌন্দর্য্যবোধের পরিচায়ক যে নয়, একথা সত্য। কিন্তু প্রায়ই কলাজ্ঞান অথবা সৌন্দর্য্য-বোধের অচরিতার্থতা হইতেই এই তাগিদ উদ্ভূত হইয়া থাকে। যাহারা অত্যধিক তীব্র গন্ধযুক্ত কেশতৈল পছন্দ করে—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়কার এই ধরনের ঘটনার কথা লেখিকার মনে পড়ে, তারা প্রায়শঃই সেই সকল চূড়ান্ত রকমের নোংরা পরিবারের ছেলেমেয়ে যেগুলিতে ফুলের গন্ধ এবং ঝোপঝাড়ের অভাব। কেহ কেহ ঐ সকল দ্রব্য আহরণ করে আত্মপ্রীতিবশতঃ তাহাদের নিজেদের প্রতিই

মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার জন্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এর মূলে রহিয়াছে—নিছক বৃথা আত্মাভিমান, কিন্তু প্রায়শঃই এই আভ্যন্তরীণ তাগিদের ভিত্তি হইতেছে পরিবারে শিশুর অধিকতর অকৃত্রিম স্নেহের প্রয়োজনীয়তা। তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধ উৎকৃষ্টতর রূপে চরিতার্থ হইত যদি পিতামাতা গৃহের দ্রব্যাদি এবং কাপড়চোপড় পছন্দ করায় শিশুকেও তাহার নিজের মত প্রকাশ করিতে দিতেন। শিশুকে নিজের রুচিমাফিক ঐ সকল জিনিষ তৈরি করার শিক্ষাও দিতে হইবে। কাঁচা মালের দাম তৈরী জিনিষের মূল্যের অর্দ্ধেক মাত্র, কাজেই একই পরিমাণ টাকায় উৎকৃষ্টতর জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে যদি তাহা ব্যবহারকারী অথবা পরিধানকারী দ্বারা প্রস্তুত হয়।

আত্মাভিমানী শিশু বিশেষভাবে পিতামাতার দৃষ্টান্ত হইতে ইহা শিখিতে পারে যে, মহার্ঘ্য, জমকালো এবং যেগুলিকে ধোয়া এবং সারানো যায় না সে ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং কাপড়-চোপড় অপেক্ষা, সুসমঞ্জস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সংস্কার-সাধ্য পোশাক লোকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উৎকৃষ্টতর বিকল্প বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পোশাক-পরিচ্ছদ প্রথমতঃ হইবে পরিধানকারীর রুচির উপযোগী এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা হইবে ফ্যাশানের অনুযায়ী। কতকগুলি শিশু স্নেহ হইতে বঞ্চিত ইহা সত্য, কিন্তু ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান নয়—হয়ত অন্যান্য অধিকতর গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়সমূহের নীচে ইহা চাপা পড়িয়া থাকে। অনেক শিশু খাওয়া-দাওয়া অথবা উত্তম বেশভূষা ও অলঙ্কারাদি আহরণের জন্য ভিতরে ভিতরে যে তাগিদ অনুভব করে, তাহার দরুনই তাহারা তাহাদের সমস্ত টাকা-পয়সা নিঃশেষিত করিয়া ফেলে। অতঃপর তাহারা পিতামাতাকে বিশেষ সাবান, ষ্টেশনারি জিনিষ এবং ষ্ট্যাম্প অথবা খেয়াল-খুশির দ্রব্যাদি অধিকতর পরিমাণে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া থাকে।

এমন শিশুও আছে যাহারা তাহাদের পকেট-খরচার টাকাপয়সা উপরোক্ত খেয়ালখুশির কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা কিন্তু বই, উপহারদ্রব্য এবং দাতব্য জিনিষ প্রভৃতি কিনিবার খরচও ইহা-হইতেই কুলাইয়া লয়। এই সকল শিশুর পকেট-খরচা দ্বারাই সকলের চেয়ে সেরা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। প্রত্যেক শিশুকে যদি প্রথম পকেট-খরচা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট হিসাববহি এবং পেন্সিল দেওয়া যায় তাহা হইলে তদ্দ্বারা টাকার কি পরিমাণ অংশ বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যের জন্য ব্যয়িত হয়, দ্রব্যাদির মূল্য কত, এবং কিভাবে বাজেট, আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্দ্ধারণ ইত্যাদি করিতে হয় এ সকল বিষয় বুঝিবার পক্ষে তাহার সাহায্য হইতে পারে। পিতামাতার কিন্তু এই বইয়ের গোপনতার উপর অনধিকারপ্রবেশ করা সমীচীন নয়। অবশ্য শিশু যদি পিতামাতাকে হিসাব-পরীক্ষা, মিতব্যয়িতার পন্থানির্দ্দেশ অথবা উৎকর্ষসাধনের কথা বলে তো সে অন্য বিষয়।

যে শিশু তাহার পকেট-খরচার টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করে, সে বিচক্ষণতার সহিত সওদা করিবার, যাহা ক্রয় করিবে বলিয়া ধার্য্য করিয়াছিল তাহা কিনিবার এবং দ্রব্যাদির প্রকৃত গুণাগুণ, নমুনা এবং মূল্য নিরূপণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে। উপরন্তু চকচকে অনাবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য পয়সা খরচ করিবার আগ্রহ দমন করিবার ক্ষমতাও তাহার অর্জ্জিত হয়। অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুদের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ কিনিতে গিয়া, শৈশবে ওরূপ অভিজ্ঞতার অভাববশতঃ ভিতরে ভিতরে একটি পকেট-বুক কিনিবার আগ্রহ অনুভব করেন—ওদিকে হয় ত তাঁহার ড্রয়ারের মধ্যে ইতিমধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে ছয়-চয়খানা নোট-বুক।

পকেট-খরচা ব্যবহারকারী শিশুর কিন্তু যথার্থ বদান্যতা প্রকাশের উপায়ও আছে—আজিকার দিনে ইহা একটি দুর্ল্লভ গুণ বলিয়া গণ্য হইবে, তা ছাড়া কতকগুলি গঠন-মূলক খেয়ালের সৃষ্টিও তাহার মধ্যে হইতে পারে। বর্ত্তমান লেখিকা এমন একটি ছেলেকে জানিতেন, দৃশ্য-চিত্র অঙ্কনের জন্য যে ভিতরে ভিতরে একটা প্রেরণা অনুভব করিত। অবশ্য এই বিষয়ে সে কখনো চেষ্টা করে নাই। পাছে তাহার প্রথম প্রয়াস তাহাকে হাসির পাত্র করিয়া তুলে এই জন্য অঙ্কনের সাজসরঞ্জামের কথা সে তাহার পিতামাতাকে বলিতে চাহে নাই। নিয়মিত পকেট-খরচা পাইবার সৌভাগ্য যদি তাহার হইত তাহা হইলে অঙ্কনের সাজ-সরঞ্জাম কিনিবার পয়সা সে সঞ্চয় করিত, গোপনে চিত্র-বিদ্যার চর্চ্চা করিত এবং মৌলিক চিত্রকর্ম্ম দ্বারা একদিন সে যে শৈশবেই তাহার হর্ষোৎফুল্ল আত্মীয়স্বজনের তাক লাগাইয়া দিতে পারিত তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল উত্তর-জীবনে তাহার প্রয়াসের দ্বারাই—যখন অধিকতর লাভজনক বৃত্তি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সে চিত্র-বিদ্যার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিল। অধিকতর সৌভাগ্যবতী একটি বালিকার কথা জানি, সাত বছর বয়সে দুই টাকা সম্বল করিয়া যাহার পকেট-খরচার সূচনা হয় এবং ষোল বৎসর বয়সে তাহা বাড়িয়া দাঁড়ায় দশ টাকায়—বালিকাটির বয়স যখন বার বৎসর তখন ঐ পকেট-খরচা হইতে জমানো টাকা দিয়া সে তাহার সেলাইয়ের কাজ এবং প্রসাধনের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ছাড়া "এনসাইক্লোপীডিয়া", "ক্লাসিকস" প্রভৃতি কয়েক খণ্ড উৎকৃষ্ট

গ্রন্থ কিনিতে সমর্থ হইয়াছিল- মধ্যবয়সেও ঐ সকল বই ছিল তাঁহার নিকট বিশেষভাবে উপযোগী। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সে তাহার হাতের তৈরী অনেক জিনিষ দান করিয়াছে, হিসাব এবং বাজেট প্রস্তুতিতেও সে কতকটা পটুতা অর্জ্জন করিয়াছে।

সুতরাং শিশুদিগকে পকেট-খরচা দেওয়া তাহার দেহ-মন ও আত্মার বিকাশসাধনে সহায়তা করার অন্যতম উপায়। বাস্তবিকই ইহা শিক্ষাসহায়ক। প্রায়শঃই ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, গঠনের শিক্ষা (Instruction) বিকাশ-সাধনের শিক্ষার (Education) ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পুষ্প যেমন করিয়া বিকশিত হইয়া উঠে তেমনি ভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধনও প্রকৃত শিক্ষার (Education) অঙ্গীভূত। একটি উপায় হইতেছে উপদেশাত্মক শিক্ষাদান, সুচিন্তিত পাঠাভ্যাস। খাদ্য দ্বারা যেমন দেহের পুষ্টি হয়, ইহাও তেমনি মনের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। আর একটি উপায় শিশুকে অভিজ্ঞতার সুযোগ দেওয়া। পকেট-খরচার অর্থ ব্যয় করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হয় তাহা এক রকমের অভিজ্ঞতা। আমাদিগকে এই পার্থক্যের কথা ক্রমাগত আরও বেশী করিয়া মনে রাখিতে হইবে এই জন্য যে, আমাদের অনেক বক্তা নির্ব্বিচারে "শিক্ষা" কথাটা ব্যবহার করেন, এবং অনেক সার্কুলারেও অনুরূপ ভাবে কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা সকলের মনে প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং বস্তুতঃ কখনো কখনো মনে হয় যেন কোনো মন্ত্রীর বিরোধিতা করিতেছেন তাঁহার সেক্রেটারী। ইহা হিতকর হইলেও কদাচিৎ উপভোগ্য হইয়া থাকে।

মুখ্যতঃ, উপরোক্ত এই সকল কারণেই লেখিকা মনে করেন যে, যেমন প্রত্যেক শিশুর জন্য পিতামাতাকে যথোচিত পুষ্টিকর খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হয় তেমনি ব্যক্তিগত ভাবে যতটা সম্ভব প্রতিটি শিশুকে সম্পূর্ণরূপে নিয়মিত পরিমাণে পকেট-খরচা দেওয়াও তাঁহাদের একান্ত অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

শিশুদের প্রতি পিতামাতার যত্ন

মিথান জে. লাম

শিশু পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং এ বিষয়ে দ্বিমত নাই যে, ইহার জীবনে পিতামাতা এবং পরিবার এই দুইটিরই গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, সুস্থ এবং সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ জীবনযাপনের সহায়তাকল্পে আমরা যাহাই করি না কেন তাহা কেবল পরিবারের এবং ইহার শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুখের উপরেই নয়, পরিণামে জাতির উপরেও প্রতিফলিত হয়।

পারিবারিক বন্ধন আজও পর্য্যন্ত ভারতে খুব দৃঢ় এবং পরিবারকে একটি জোরালো এককরূপে সংরক্ষণ ও বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। যদিও আমাদের বর্ত্তমান ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় স্বতঃই সকল সময়ে আমাদের পরিবারগুলি সেই পুরানো একান্নবর্ত্তী পরিবার হইতে পারে না যাহা অতীতে ইহার যাবতীয় ত্রুটি-সত্ত্বেও পরিবারস্থ সকলকে সামাজিক অসুবিধা এবং সমস্যা-সমূহ উত্তীর্ণ হইতে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিত। এমনকি পাশ্চাত্য দেশসমূহ তাহাদের সামাজিক নিরাপত্তার পরিকল্পনাসমূহ এবং সামাজিকীকৃত সংস্থাসমূহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছে যে, সাফল্যের সঙ্গে সমস্যা-সমূহের—বিশেষ ভাবে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাসমূহের, সমাধান করিতে হইলে পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ়তর করিতে হইবে। শিশুদের প্রতি পিতামাতার ভালবাসা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া শিশুদের যত্ন-আত্তি করার জন্য তাঁহাদের যে উদ্বেগ এতদুভয়কেই যথোচিত মর্য্যাদা দান করিয়াও সুনিপুণ শিশু-পরিচর্য্যার ব্যাপারে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব সম্পর্কে অনেক কথা বলিবার থাকে। শিশুর মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য, তার ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ, অভ্যাসগঠন, দলের মধ্যে নিজেকে ঠিকমত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে চূড়ান্ত মাত্রায় সুযোগ গ্রহণ করিতে তাঁহারা অপারগ হন। কি স্কুলের পাঠ্যতালিকায়, কি কলেজের অধ্যেতব বিষয়ে কোথাও পিতৃমাতৃকৃত্যের প্রস্তুতি-বিষয়ক জ্ঞান স্থানলাভ করিতে পারে নাই। কাজেই শিক্ষিত পিতামাতাও শিশু-পরিচর্য্যা সংক্রান্ত এই জটিলতম এবং দুরূহ কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় কোন-না-কোন প্রকারের শিক্ষণের আবশ্যকতা গুরুতর রূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই অবস্থাই শিশুদের প্রতি অজ্ঞাতে আচরিত অবহেলা-সঞ্জাত বহু ঘটনার জন্য দায়ী যাহা পরিণামে শিশুদিগকে করিয়া তুলে বেমানান, অপরাধপ্রবণ এবং অসুস্থ অথবা ত্রুটি-যুক্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। পিতামাতারা যাহাতে উৎকৃষ্টতর রূপে

শিশুদের যত্ন লইতে পারেন এবং আরও পরিপূর্ণ ভাবে তাহাদের বুঝিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান কল্পে কোন প্রকারের পন্থার উদ্ভাবন একান্ত অপরিহার্য্য।

যে জিনিষটার উপর আমি জোর দিতে চাই তাহা হইতেছে এই যে, শিশুর সঙ্গে এমন আচরণ করা সমীচীন নয়, যেন সে মহাশূন্যের অধিবাসী নিরালম্ব ব্যষ্টিমাত্র, তাহাকে মনে করিতে হইবে পরিবারের এমন একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যাহার রীতিনীতি, অভ্যাস এবং আচরণের গুরুতর প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে পরিবারের চেতনার উপর। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে পারিবারিক চর্য্যার জন্য যতদূর সম্ভব সমস্ত কল্যাণকর্ম্মের সংহতিসাধন এবং অখণ্ডতাবিধান করিতে হইবে।

আমি যতদূর জানি, ভারতে কমবয়সীদের জন্য খুব স্বল্প-পরিমাণ যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কতকগুলি মামুলি "ইহা করিও, ইহা করিও না"—যাহা অধিকাংশ মাতা তাঁহাদের কন্যাদের বলিয়া থাকেন—ছাড়া কোন বালিকা ভবিষ্যৎ জীবনে যে সকল বিষয় তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক তৎসম্বন্ধে খুব স্বল্পপরিমাণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই লাভ করিয়া থাকে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লোকে জীবনের অন্য প্রায় সকল স্তরেই শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু বালিকার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—বিবাহ সম্বন্ধে তাহাকে শিক্ষাদান করা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করে না।

অতীতে স্বামীর পরিবারে বাস করিবার নিমিত্ত মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহার মূলে নিহিত ছিল এক ধরনের দার্শনিকতা। সেখানে সে তাহার ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জ্জন দিত তাহার স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতির ব্যক্তিত্বের নিকট। এখন আমরা ছেলেদের ন্যায় তরুণবয়স্কা মেয়েদেরও অল্পবিস্তর একই ধরনের শিক্ষাদানে আস্থাবান এই জন্য যেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আমরা এমন কোন দার্শনিকতার সৃষ্টি করিতে পারি নাই যাহাতে পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাসমূহ ধর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয়।

শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হইলে—যাহা নিশ্চয়ই খুব ভাল জিনিস—পরবর্ত্তীকালে বিবাহিত জীবনে প্রায়শঃই কোন-না-কোন রকম সংঘর্ষের সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং বিবাহের পথনির্দ্দেশক কোন কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই নির্দ্দেশের প্রয়োজন হইতে পারে বিয়ের আগে কিংবা পরে, কিন্তু ইহাকে আমাদের অবস্থা, পটভূমিকা এবং রীতিনীতিসমূহের উপযোগী হইতেই হইবে। বিবাহের পথনির্দ্দেশ অথবা পরামর্শদানের উদ্দেশ্য হইবে—যে দুইটি পৃথক ব্যষ্টি একত্রে একটি জীবনের পরিকল্পনা করিতেছে সেই তরুণ দম্পতি কিভাবে বিবাহিত জীবনে পরস্পরের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করা, তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধন, যে সকল মন-কষাকষি সাধারণতঃ দেখা দেয় সেগুলি পোষাইয়া লওয়া, যে সকল সম্ভাব্য অথবা বাস্তব সমস্যা বিবাহের ভিত্তিমূলে নাড়া দেয় সেগুলিকে স্বীকার করা এবং ভাবী সমস্যানিচয়কে উদ্ভূত এবং দৃঢ়মূল হইতে না দেওয়া।

কেহ কেহ পরিবার-পরিকল্পনা-কর্ম্মকে এমন কর্ম্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে নারাজ যাহা পিতৃমাতৃকৃত্যের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকর্ম্মসমূহের অন্যতম। পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক পিতামাতা—শিশুর আগমন-প্রতীক্ষায় যাঁহারা তাহাদের আশাপথ চাহিয়া থাকেন—শিশুকে স্বাগত করিবেন আগ্রহভরে—পিতামাতার নিকট হইতে কেবল স্নেহপ্রীতি পাইলেই ত শিশুর চলিবে না, বাপমাকে তাহাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুরা আসিবে আকস্মিক ভাবে নয়, কিন্তু এমন সময়ে যখন পিতামাতা সুষ্ঠুভাবে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিবেন।

যে সকল মায়ের দল যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অধিকারিণী নহে তাহাদের মধ্যে বৃহত্তর সামাজিক জীবনের উন্নয়নকল্পে "মায়েদের সঙ্ঘে"র ধরনের সংস্থার প্রয়োজন রহিয়াছে। সকল শহরে এবং বড় গ্রামগুলিতে মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কতকগুলি পরিকল্পনা আছে, এবং শিশুকল্যাণের ভারতীয় পরিষদ ইহার রাজ্যপরিষদসমূহের মাধ্যমে অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যায় শিশুদের ক্রীড়া-কেন্দ্র এবং শিশুবাগ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিতেছে। এই একই গৃহ এবং স্থানসমূহ মায়েদের সঙ্ঘের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারিত—সেখানে মাসে একবার কিংবা দুইবার অথবা পুনঃপুনঃ তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন, চলচ্চিত্র দেখিতে কিংবা তাঁহাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে পারেন।

পিতামাতার মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ প্রতিষেধই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা। শিশুদের, এমনকি সবে হাঁটিতে শিখিয়াছে এমন বাচ্চাদিগকে পর্য্যন্ত শিশুকল্যাণ-কেন্দ্রে লইয়া আসিবার জন্য মায়েদের প্রণোদিত করিতে হইবে। ছোটখাটো অসুখ এবং ত্রুটি-

সমূহ এই ভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে এবং সময়ে সারানোও যাইতে পারে। যে সকল মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক এই সকল মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ-কেন্দ্র পরিচালিত হয় তাহারা মায়েদের সঙ্ঘ এবং শিশু-ক্লিনিক পরিচালনায় স্বচ্ছন্দে এই সকল স্বেচ্ছামূলক সংস্থার সাহায্য লইতে পারে।

পিতামাতা এবং শিক্ষকদের সমিতি

ইহা একটি স্বীকৃত তথ্য যে, শিশুদিগকে এবং তাহাদের ধরন-ধারন পরিপূর্ণ ভাবে বুঝিতে পারিলে পারিবারিক জীবন উৎকৃষ্টতর এবং সমৃদ্ধতর হয়। শিশু এবং পিতার উত্তম সম্পর্ক কেবল যে ব্যক্তিগত সুখ এবং গৃহে সৌসামঞ্জস্যেরই বিধান করিয়া থাকে তাহা নহে, এগুলিকে সৎ নাগরিকত্বের সোপানস্বরূপও বলা যাইতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে, শিশুর সর্ব্বতোমুখী বিকাশের উপর বিদ্যালয়ের প্রভাবই গভীরতম। বর্ত্তমানে, বৃহৎ শহরে এবং বড় বড় নগরীসমূহে—যেখানকার বড় বড় বিদ্যালয়গুলিতে অতি ক্লান্ত এবং স্বল্প বেতনভোগী শিক্ষকদিগকে বিস্তর শিশু লইয়া কাজ চালাইতে হয়—শিশুর জীবন বস্তুতঃ দুইটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—গৃহ এবং বিদ্যালয়। শিশুর অন্য কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কি ধরনের কাজ চলিতেছে তাহা পিতা কিংবা শিক্ষক কেহই জানেন না অথবা তাহা লইয়া মাথা ঘামান না। "দি. পি. টি. এ." (The Parent Teachers Association) শিশুর এই দুইটি প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রের সংহতিবিধানের প্রয়াস পায়। "পি.টি.এ"-র মুখ্য উদ্দেশ্য পিতামাতার মধ্যে আগ্রহ উদ্দীপ্ত করা, পিতামাতা এবং শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার ভাব সৃষ্টি করা। তা ছাড়া শিশুদের ব্যক্তিগত সমস্যাসমূহের—যাহার সম্মুখীন হইতে হয় প্রত্যেক পিতামাতা এবং শিক্ষককে—আলোচনার মাধ্যমে শিশুশিক্ষার প্রবণতাসমূহ এবং মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন।

যখন কোনো শিশু অসদাচরণ করে তখন পিতামাতার মনে প্রথম যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাহা হইতেছে তাহাকে তিরস্কার করা, এবং যদি এই অসদাচরণ চলিতেই থাকে তাহা হইলে তাহাকে আচ্ছা করিয়া চড় কষাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। শিশুদের সাময়িক অসদাচরণ প্রত্যেক বয়সেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জিনিষ এবং ইহা প্রত্যাশাও করা হয়, কেননা উত্তেজনার চাপে অথবা কোন অসাধারণ পরিস্থিতিতে শিশুদের মধ্যে নিয়ম ভুলিয়া যাইবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কোন স্বাভাবিক শিশু যখন পৌনঃপুনিকভাবে অসদাচরণ করিতে সুরু করে, বিবেচক পিতা-মাতার তখন উচিত, ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্ত্তে—কেন সে এরূপ করিতেছে তাহার হেতু বাহির করিবার চেষ্টা করা। কেননা এইরূপ অসদাচরণ অথবা অন্যায় কিংবা অপ্রীতিকর অভ্যাসের সৃষ্টি ইহাই সূচিত করে যে, শিশু তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছে না—শাস্তি দ্বারা ইহাকে কেবলমাত্র দাবাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে ইহা বিভিন্ন আকারের স্নায়ুরোগ রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। "দি চাইল্ড গাইডেন্স" নামক সংস্থা শিশু-কল্যাণের ক্ষেত্রে সামান্য কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছে—পিতামাতার শিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া, শিশুদের অসদাচরণ নিবারণ এবং ব্যক্তিত্বের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের ব্যাপারে অন্যান্য সংস্থাসমূহের আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়া এবং অন্যবিধ কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া।

বহু জনাকীর্ণ নগরী এবং শহরগুলিতে—যেখানে বস্তি পরিবেশের প্রাবল্য—চূড়ান্ত রকমের সদিচ্ছাসত্ত্বেও পিতা-মাতা ঠিকমত শিশুদের দেখাশুনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ, বাসস্থানের অবস্থা ভয়াবহ, তাহাদের শিশুদের জন্য সেখানে আমোদ-প্রমোদের কোন সুযোগ-সুবিধা নাই, ফলে রাস্তায় শিশুরা খেলা করিয়া বেড়ায় উদ্দেশ্যহীনভাবে অথবা দল বাঁধে অপকর্ম্মের জন্য এবং দুর্গতির মধ্যে গিয়া পড়ে। এমনিতর অবস্থায় তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করা, যেখানে আগে ও-ধরনের কিছু ছিল না সেখানে ছেলে-বুড়া সকলের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা এইগুলি হইতেছে শিশুকে অপরাধপ্রবণতার পিচ্ছিল পথে গা ভাসাইয়া দেওয়ার হাত হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করার চমৎকার পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কয়েকটি। পরবর্ত্তীকালে যখন তাহারা প্রতিষ্ঠানে আসে তখন শোধরাইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা গোড়ার দিকেই ঐ ধরনের কাজ করা বহুল পরিমাণে শ্রেয়ঃ। কেননা, শৈশবে দুর্ব্ব্যবহারের ফলে মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাহা সারাজীবন থাকিয়া যায়, ওদিকে আবার অপরাধপ্রবণদের প্রতিষ্ঠানে থাকার অপবাদের দরুন পরবর্ত্তীকালে তাহাদের পক্ষে কর্ম্ম-প্রাপ্তি কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। "জুভেনাইল সার্ভিস বুরোর" মত অধিকতরসংখ্যক সেবা-সংস্থানসমূহ একান্ত প্রয়োজনীয়, কেননা ভারতে অল্পবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতা ক্রমশঃ বাড়তির পথে। যে সকল বড় প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক শিশুকে স্থান দেওয়া হয় সেগুলিতে টাকা খরচ না করিয়া, শিশুকে তাহার নিজ গৃহ এবং পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে শোধরাইবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ।

যেখানেই সম্ভব সেখানেই পরিবার-কল্যাণ সংস্থাসমূহ (Family welfare Agencies) প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন—

এগুলি যাবতীয় কাজের ভার গ্রহণ করিবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন কল্যাণ সংস্থাসমূহের কর্ম্মপ্রচেষ্টার সংহতিবিধান করিবে।

যে সমস্ত অঞ্চল যথোচিত সুযোগ-সুবিধার অধিকারী নয় সেগুলিতে যদি "প্রতিবেশ সদন" (neighbourhood house) প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহা হইলে ইহা সকল রকমের সামাজিক এবং কল্যাণকর্ম্ম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়ক হইবে। এই ধরনের প্রতিবেশ সদনের হিতকর প্রভাব অচিরেই সমগ্র অঞ্চলে অনুভূত হইতে সুরু হইবে।

জামিয়া মিলিয়ায় তরুণদের গ্রামীণ শিক্ষা

গ্রামাঞ্চলের তরুণদের শক্তির ক্রমিক অপচয়ের দরুন যে দুষ্টচক্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, ভারতে উচ্চ শিক্ষার দশটি গ্রামীণ সংস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাহা ভগ্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এই সকল সংস্থার মধ্যে একটি—দিল্লীতে প্রথম যেটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—উদ্বোধন হয় দিল্লীতে আগষ্ট মাসে এবং ৫৫ জন ছাত্রের প্রথম দলটি—পঞ্জাব, পেপসু, হিমাচল প্রদেশ এবং দিল্লীর ছেলে ও মেয়েরা তাহার অন্তর্ভুক্ত—কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

উচ্চ শিক্ষার চালু অধিকাংশ সংস্থাই নগরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। গ্রামাঞ্চলে সুযোগ-সুবিধাসমূহ সীমাবদ্ধ বলিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে যোগ্যতর লোকেরা শহরমুখী হইয়া সেখানে সরিয়া গেল। নেতৃস্থানীয় এবং যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা গ্রাম হইতে চলিয়া যাওয়ায় গ্রামগুলির অবস্থার আরও অবনতি হইল এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাদি হইয়া পড়িল অধিকতর দুরূহ।

কিন্তু ভারতের বিপুল জনসমষ্টি ৫৫০,০০০টিরও অধিক গ্রামে বাস করে বলিয়া আমাদের উন্নয়ন-পরিকল্পনা ও শিক্ষা-বিষয়ক প্রচেষ্টা গ্রামাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। অতি সাম্প্রতিক কালে কিন্তু এই সমস্যা কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের (University Education Commission) অনুমোদনসমূহের অঙ্গীভূত হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদালিয়ার কমিশন অনুরূপ অনুমোদনসমূহ উপস্থাপিত করেন।

এই অনুমোদনসমূহের সঙ্গে গ্রামীণ শিক্ষা উন্নয়নে বিপুল-সংখ্যক সমাজকর্ম্মী এবং গ্রামকল্যাণ সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদর্শিত ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ সংযুক্ত হওয়াতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। কমিটি চালু প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান ও মূল্য নিরূপণ এবং গ্রামাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার পরীক্ষণে প্রবৃত্ত হন। উক্ত কমিটির মুখ্য অনুমোদন ছিল—দেশের বিভিন্ন অংশে উচ্চতর শিক্ষার জন্ত গ্রামীণ সংস্থা (Rural Institutes) প্রতিষ্ঠা—কাজের সূচনা হইবে এই ধরনের দশটি সংস্থা স্থাপনের দ্বারা।

এই সকল অনুমোদন অনুসারে কাজ আরম্ভ হইল এবং বর্ত্তমান বৎসরে গ্রামাঞ্চলসমূহে একটি উচ্চ শিক্ষার জাতীয় পরিষদের (National Council for Higher Education) উদ্ভব হইল। গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ভারত সরকারকে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত ভারত যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা উপমন্ত্রী হইলেন ইহার চেয়ারম্যান। ১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি নাগাদ দশটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীনিকেতন, উদয়পুর, মাদুরাই, মুজাঃফরপুর, সামাসার, (সৌরাষ্ট্র), কইম্বাটুর, অমরাবতী, কোলহাপুর এবং জামিয়া মিলিয়া (দিল্লী) প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত এই সকল প্রতিষ্ঠান দেশের একটি অতি বিস্তীর্ণ অংশ জুড়িয়া আছে।

পাঠক্রম

তিন বৎসরের পাঠক্রম হইতেছে এই :—

(১) গ্রামীণ কল্যাণকর্ম্মে তিন বৎসরের ডিপ্লোমা,

(২) কৃষি-ইঞ্জিনীয়ারীং বিজ্ঞানসমূহে দ্বিবার্ষিক সার্টিফিকেট ;

(৩) সিভিল ও রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিঙে ত্রৈবার্ষিক সার্টিফিকেট প্রস্তুত এবং অনুমোদিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত গরীব ছাত্রদের জন্য একটি বৃত্তির পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই বিবেচনাধীন রহিয়াছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই একটি পাঠক্রম লইয়া—কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি কোর্সসহ—কাজের সূচনা হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়ঃ জামিয়া মিলিয়ার গ্রামীণ কল্যাণ-কর্ম্মের তিন বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্সের সেসন সুরু হয় গত মাসে। উচ্চ শিক্ষার বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ [illegible]ীয় পাঠ্যতালিকা ছাড়া যে সকল বিষয় ইহার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত তাহা হইতেছেঃ (১) সভ্যতার কাহিনী, (২) গ্রামীণ অর্থনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, কৃষিবিষয়ক, ইঞ্জিনিয়ারীং এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপক্রমণিকা। সমবায়, সমাজকর্ম্ম, সাধারণ প্রশাসন (Public administration), সামাজিক শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, গ্রামীণ শিল্প, সুকুমার-কলা। অধিকাংশ কোর্সের মধ্যে মুখ্যত: জোর দেওয়া হয় ক্ষেত্রকর্ম্মের (Field work) উপর। এই সকল প্রতিষ্ঠানে কৃষি-বিজ্ঞানবিষয়ে যে দ্বি-বার্ষিক সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষা দেওয়া হয়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাহার অন্তর্ভুক্তঃ—

(১) গ্রামীণ শিল্প ; (২) উদ্যান-রচনাবিদ্যা ; (৩) পশুদ্বারা কৃষিকর্ম্ম, গোমহিষাদি রক্ষণ ইত্যাদি। আর একটি কোর্সের—সিবিল এবং রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিঙের ত্রৈবার্ষিক সার্টিফিকেট কোর্সের—অঙ্গীভূত হইতেছে নিম্নলিখিত অধ্যেতব বিষয়সমূহ :—

(১) ফলিত বলবিদ্যা (Applied Mechanics) ; (২) ওয়ার্কশপ বা কারখানা (সূত্রধরের কাজ, কামারশালা ফিটিং) এবং রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ, সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, জলসেচের ব্যবস্থা ইত্যাদির মত গ্রাম সম্প্রসারণ কর্ম্ম (Village Extension)।

ক্ষেত্রকর্ম্মের উপর গুরুত্ব আরোপ

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সংস্কৃতি ও কর্ম্ম, মানবতা ও যান্ত্রিকতা এবং বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যে ব্যবধান বিদ্যমান তাহা ঘুচাইবার জন্যও এই সকল প্রতিষ্ঠান সাহায্য করিয়া থাকে। গ্রামীণ জীবনের প্রকৃত সমস্যাসমূহের কি ভাবে সমাধান করিতে হয়, ছাত্রদিগকে তাহাও শিখিতে হয়।

ইহা কিন্তু কোন দিক দিয়াই সেই "মানস-জীবনের" মূল্যকে ক্ষুণ্ণ করে না—যাহা উচ্চ শিক্ষার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে বিদ্যমান থাকা উচিত। কিন্তু ইহা দ্বারা এ-কথাও বুঝায় যে, মন তাহার সুস্থ বিকাশের জন্য পুষ্টিকর উপাদান গ্রহণ করিবে বহু বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে—উৎপাদনশীল কর্ম্ম এবং উপলব্ধীকৃত সামাজিক অভিজ্ঞতাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

গ্রামীণ সংস্থা দ্বারা অন্যান্য বহুবিধ কৃত্যও সম্পন্ন হয়। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে গবেষণা এবং পরীক্ষণের কাজেও প্রবৃত্ত হইবে এবং "পাইলট প্রোজেক্ট"গুলিকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিবে। লক্ষ্য হইতেছে—গ্রামীণ সংস্থাগুলিকে সমগ্র জনসমাজের উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রে পরিণত করা। এগুলি যে কেবল গ্রামাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়রূপে কাজ করিবে তেমন নয়, সামগ্রিক ভাবে জনসমাজের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে চেতনাসঞ্চার করিবার জন্যও কাজ চালাইয়া যাইবে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম্য জনসমষ্টির জীবনের বোঝা হাল্কা করিবার কাজে সহায়করূপে গণ্য হইবে।

এগুলি সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া কাজ করে যেগুলি এখন সংগঠিত এবং বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে—উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ কর্ম্মের (National Extension Services) কর্ম্মীদের শিক্ষণের জন্য। বস্তুতঃ, এই সকল প্রতিষ্ঠানের হওয়া উচিত —বিভিন্ন স্তরে ঐরূপ শিক্ষণের উপযুক্ত স্থান। এগুলিতে শিক্ষালাভ করিবে গ্রামীণ কর্ম্মিগণ। যুব-নেতৃবৃন্দ, সমাজের নেতৃবর্গ, সোশ্যাল এডুকেশন অফিসার এবং কম্যুনিটি প্রোজেক্ট অফিসারগণ। ব্লক ডেভেলপমেণ্ট এবং কম্যুনিটি প্রোজেক্টের কর্ম্মীবৃন্দ অবশ্যই ইহা উপলব্ধি করিবেন যে, সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে যখনই তাঁহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হইবে তখন তাহার সমাধানের জন্য আছে ঐ প্রতিষ্ঠান—এবং উহা এমন একটি স্বাভাবিক কেন্দ্র যেখানে তাঁহারা নিজেরা যাইতে পারেন অথবা গ্রামবাসীরা যাহাতে নিজেরাই সমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কার করিতে এবং শিখিতে পারে সেজন্য তাহাদিগকেও পাঠাইতে পারেন।
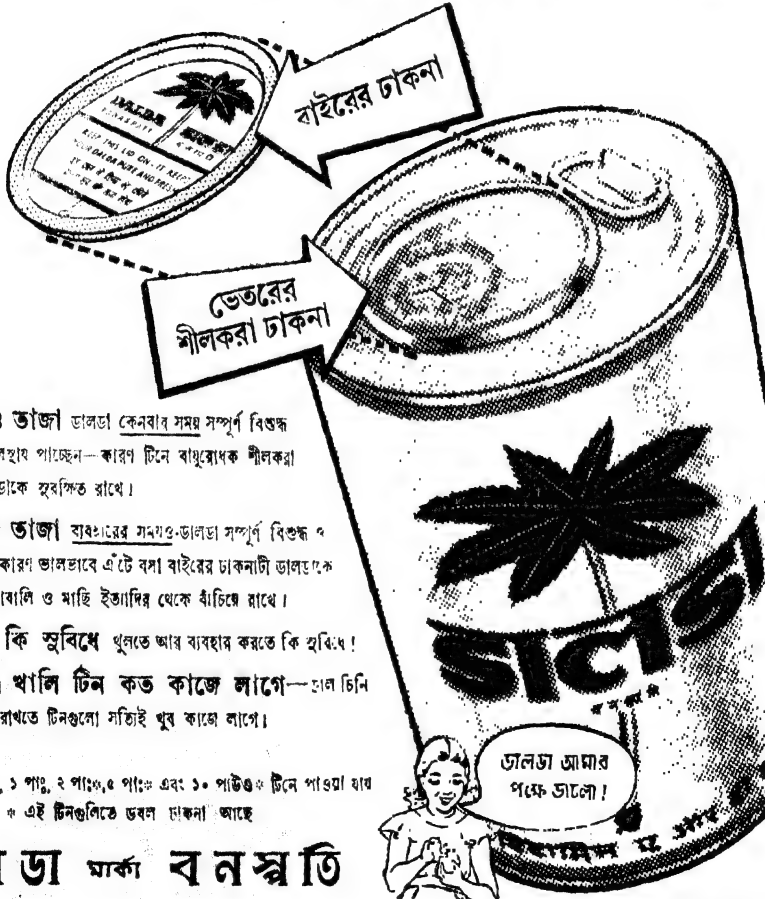
বাইরের ঢাকনা

ভেতরের শীলকরা ঢাকনা

- **বিশুদ্ধ ও তাজা** ডালডা কেনবার সময় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও তাজা অবস্থায় পাচ্ছেন—কারণ টিনে বায়ুরোধক শীলকরা ঢাকনা ডালডাকে সুরক্ষিত রাখে।
- **বিশুদ্ধ ও তাজা** ব্যবহারের সময়ও ডালডা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও তাজা থাকে কারণ ভালভাবে এঁটে বসা বাইরের ঢাকনাটী ডালডাকে সর্বদাই ধুলোবালি ও মাছি ইত্যাদির থেকে বাঁচিয়ে রাখে।
- **খুলতেও কি সুবিধে** খুলতে আর ব্যবহার করতে কি সুবিধে!
- **পুরোনো খালি টিন কত কাজে লাগে**—ডাল চিনি মশলাপাতি রাখতে টিনগুলো সত্যিই খুব কাজে লাগে।

ডালডা ১/২ পাঃ, ১ পাঃ, ২ পাঃ*, ৫ পাঃ* এবং ১০ পাউণ্ড* টিনে পাওয়া যায়
* এই টিনগুলিতে ডবল ঢাকনা আছে

ডালডা মার্কা বনস্পতি

ডালডা আমার পক্ষে ভালো!

দ্বন্দ্ব

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

কাচের মত স্বচ্ছ সবুজ শাড়ির ভেতর দিয়ে জ্যাকেট রাঙা ব্লাউজ স্পষ্ট দেখা যায়। লাল রঙের বাটার চটিজোড়া পড়ে আছে এক পাশে, আর সাদা মসৃণ পা দুটো লেকের জল ছুঁই ছুঁই করছে। নরম সবুজ ঘাসের গদীতে বসে আছে ওরা দু'জন—পাশাপাশি, একটু-বা ঘেঁষাঘেঁষি।

একটা ঘাসের শীষ ছিঁড়ে তাই দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে কমল বলল, "কেন রাজী হচ্ছ না তুমি মলিনা, কিসের বাধা তোমার ?"

সাদা আদ্দির পাঞ্জাবীর একটা কোণ ফুরফুর করে উড়ছে অল্প হাওয়ায়। উড়ছে ওর প্রশস্ত ললাটের ওপর খসে-পড়া দু'তিন-গাছি চুল।

বিদায়-চুম্বনে আবির-রাঙা পশ্চিম আকাশের মায়া কাটিয়ে অজ্ঞ দিগন্তের সন্ধানে ডুব দিয়েছেন সূর্যদেব। বিচ্ছেদের করুণ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চার পাশে।

কালো হয়ে আসা লেকের জলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চুপ করে বসে আছে মলিনা দোলায়মান চিত্তে। কমলের আবেগতপ্ত কণ্ঠস্বরে যেন যাদু আছে—ভুলিয়ে দেয় সমাজ সংসার, বিশ্বভুবন। অন্ধকার রাত্রে বিদ্যুৎ-বিদারণরেখার মতই আবার ওর সাবধানী মন হাতছানি দেয়। সব কিছু ভুলতে গিয়েও ভোলে না মলিনা। উষ্ণ কম্পিত নিঃশ্বাস পড়ে একটা।

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে কমল। মলিনার আনত মুখের দিকে তাকায় একবার। বুঝি বা অনুভব করে ওর চিত্তের গভীর আলোড়ন। আস্তে আস্তে মলিনার বাঁ হাতখানা তুলে নেয় নিজের ডান হাতের মুঠোয়। বলে, "দূর কর তোমার এই দ্বিধা মলিনা। চল আমরা ভেসে পড়ি নামহীন ঠিকানায়, অজানার উদ্দেশে।"

কমলের হাতে-ধরা মলিনার বাঁ হাতখানা থর থর করে কেঁপে ওঠে। চাপা, কাঁপা গলায় বলে, "আমাকে আর একটু সময় দাও কমল, ভাবতে দাও আমাকে আরও একটু···"

ওর গলার স্বর যেন নদী জলে পড়া সূর্যের পলাতক আলো। ঝির'ঝির করে ঝরে-পড়া এক পসলা বৃষ্টির মত ভিজিয়ে দিল কমলের মন তবু নিজকে সংযত করে কমল বলল, "ভাবতে গেলে ভাবনার শেষ খুঁজে পাবে না মলিনা। ভাবনা হ'ল একটা অতলস্পর্শী খাদ। যতই নাম তল খুঁজে পাবে না তার। শুধু তাই নয়, ভাবনাই মনকে করে তোলে দুর্ব্বল। ভেবে ভেবে কেউ কোন দিন মনস্থির করতে পারে নি। ভাবনা'চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়ে ভেসে পড় জীবন-স্রোতে। দেখবে, ঠকবে না তাতে তুমি।"

আবার দুলে ওঠে মলিনার মন। আবেগের বিপুল বন্যায় ভেসে যাবে বুঝি সে। তবু আবার অনির্দেশ্য অনুভূতির স্তরে আটকে যায় তার মন।

ওর মনের অর্দ্ধেকটা প্রথম প্রণয়ের আরক্ত আবেশে বিহ্বল, কিন্তু বাকি অর্দ্ধেক জুড়ে রয়েছে দ্বিধা আর সাবধানতা। বাস্তব-বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোয় উজ্জ্বল সেদিক।

তাই চট করে সায় দিতে পারে না কমলের প্রস্তাবে।

সদ্য ডোবা সূর্য্যের কথা ভাবে সে।

তারই মত যদি ডুব দেয় কমল তার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবন অন্ধকার করে ?

তরল অন্ধকারে হেসে ওঠে কমল। ঝকঝকে দাঁতের অস্পষ্ট ঝিলিক যেন দেখা দেয়। বুঝি ও পড়ে ফেলেছে মলিনার চিন্তার লিপি। বলে, "চেয়ে দেখ ঐ রাস্তার দিকে, এমনি অজস্র আলোর গয়নায় সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে কলকাতা শহর ভুলেছে তার দিবসের সঙ্গীর বিচ্ছেদব্যথা। চেয়ে দেখ, উজ্জ্বল যৌবনে ঝলমল করছে মহানগরী। কিসের এত ভয় তোমার ? কেন একটা দীপশিখার মত জ্বলে ওঠ না তুমি ? নিঃশেষে পুড়েও যদি যাও, তোমার ক্ষণিক অনিন্দ্যদীপ্তি তো পাবে শাশ্বত সৌন্দর্য্যের অধিকার।"

ওর নরম উষ্ণ ঘামে ভেজা হাতে মৃদু চাপ দেয় কমল। একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায় মলিনার সমস্ত শরীরে। বাঁধ-ভাঙা বন্যার বেগে ভেসে যেতে চায় সমস্ত প্রতিরোধ।

চট করে উঠে দাঁড়ায় সে। ছুরির ফলার মত ইস্পাতি দ্যুতি-ভরা চোখ ফিরিয়ে নেয় কমলের কেমন হয়ে যাওয়া মুখের উপর থেকে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একটি মুহূর্ত। তার পর ধীর পদে এগিয়ে যায় রাস্তার দিকে।

কমল আসে পিছু পিছু। উৎসাহহীন অবসাদে ভরে ওঠে ওর মন।

বাসে উঠতে উঠতে কমলের মুখের দিকে একবার তাকায় মলিনা। ব্যথার সকরুণ তার চোখের চাওয়া। মৃদু কণ্ঠে বলে, "আগামী শনিবার···"

ব্যাকুল আগ্রহে কমল কিছু বলবার আগেই ছেড়ে দেয় বাস।

হতাশ মনে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যায় কমল। দুঃসহ জ্বালায় পুড়তে থাকে তার বুকের ভেতরটা।

কালীঘাটের কাছাকাছি একটা সরু অন্ধকার গলিতে ঢোকে মলিনা। অল্প এগিয়ে ডানহাতী একটা বাড়ীতে ঢুকল সে। স্যাঁতসেতে উঠানটুকু পেরিয়ে যে ঘরে ঢুকল, সে ঘরের ব্যবহারে

এখনো আটকে আছে চায় ভাড়াটের বিকেলবেলার উনুন ধরাবার কয়লার ধোঁয়া।

কুঠনের আলোয় চাল বাছছিলেন মলিনার মা। মলিনাকে দেখেই খনখনে গলায় বলে উঠলেন, "দিন দিন তোর হচ্ছে কি বলত মলু, রাত আটটায় বাড়ী ফেরা—"

"একটা কেস ছিল মা,—" শ্রান্ত সুরে কথা কয়টি বলে দড়ির আলনা থেকে আটপৌরে শাড়ি সেমিজ নিয়ে পাশের ছোট্ট কুঠুরিতে ঢুকল মলিনা।

কেসের নামে চুপ করে গেলেন মলিনার মা। লোকান্তরিত স্বামীর কথা মনে পড়ল তাঁর। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে কুলোয় রাখা বাছা-আবাছা চালের দিকে আনমনে চেয়ে রইলেন তিনি। চশমার কাচ দুটি বাষ্পের আর্দ্রতা মেখে অস্বচ্ছ হয়ে গেল।

মা আর মেয়ের সংসার। তবু খরচ বড় কম নয়। বছর-দেড়েক আগে বাবা মারা যাওয়ার সময়ে আই-এ পড়ছিল মলিনা আশুতোষ কলেজে। অনেক স্বপ্নের অঞ্জন লেপেছিল তার চোখে—প্রথম যৌবনের আশা আর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বাস্তব তার প্রথম আঘাতেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল সবকিছু। ওর বাবা ছিলেন কোন এক সওদাগরী আপিসের কেরানী। অবসর সময়ে ইনস্যুরেন্সের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। শেষের দিকে এইটাই তাঁর মুখ্য উপার্জন হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর যখন তিনি মারা গেলেন তখন অর্থের অনটন দেখা দিয়েছে সংসারে। পড়া ছাড়তে হ'ল মলিনাকে। ধরাধরি করে সেই কোম্পানীরই এজেন্সি নিল সে। টুকটাক সে দু'চারটা কেস পায়, তাই দিয়ে কোনমতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে সংসারের চাকা।

মোটা মিলের শাড়ি আর মার্কিনের সেমিজ-পরা মলিনাকে মলিনই দেখাচ্ছে এখন। বারান্দায় গিয়ে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে মুছে ফেলেছে স্বল্প প্রসাধন। সারা দিনের ক্লান্তি হরণ করেছে তার চোখের দীপ্তি।

সুজনী-বিছানো তক্তপোশের এক প্রান্তে বসল সে পা ঝুলিয়ে।

"বিজনবাবু এসেছিল আজ, অনেকক্ষণ বসে ছিল তোর অপেক্ষায়—" মলিনার মুখের দিকে চশমা-পরা চোখ দুটি একবার তুলে তেমনি মাথা নীচু করে চাল বাছতে বাছতে বললেন, মলিনার মা,—"হাঁ বা না পষ্টাপষ্টি জানতে চায় সে।"

চুপ করেই রইল মলিনা। তার মনের সাবধানী অংশ হঠাৎ যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

বিড় বিড় করে বলতে থাকেন মলিনার মা,—"সত্যিই তো। দেরি করা তো আর চলেও না তার, ছেলেমেয়ে ক'টির দিকে আর তাকানো যায় না। অযত্নে অবহেলায় এমনি হয়েছে তারা।"

মলিনার প্রণয়ের আগুনে রাঙা মনের অর্দ্ধাংশের উপরে তার সাবধানী মনের অর্দ্ধেক যেন একটা কালো ছায়া বিস্তার করে চলেছে। তারুণ্যদীপ্ত কমলের মুখখানা যেন মিলিয়ে যাচ্ছে, স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে প্রৌঢ় বিজনের বহু অভিজ্ঞতার চিহ্নভরা মুখ।

নিকটেই দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি থাকে বিজন বোস। বড় ব্যাঙ্কে ভাল মাইনেতে কাজ করে। পঁয়তাল্লিশ ছুঁয়ে ফেলবে সে অনতিবিলম্বে। সম্প্রতি বিপত্নীক হয়ে তিনটি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে ভদ্রলোক। মলিনার বাবার পুরনো মক্কেল সে। সেই সুবাদে জানাশোনা ছিল মলিনাদের সঙ্গে। যাকে এত দিন বাৎসল্য-রসাপ্লুত চক্ষে দেখে এসেছে, তাকেই আবার নতুন করে আবিষ্কার করেছে প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে। পরিণয় পর্যন্ত এগিয়ে যাবার ইচ্ছায় ঘোরাঘুরি করছে মলিনার মায়ের কাছে। মায়েরও অমত নেই। নিঝঞ্ঝাটে গলা থেকে মেয়েটার নেমে যাবার সম্ভাবনায় বেশ একটু খুশীই তিনি।

এখন মলিনা রাজী হলেই—শেষ কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধাটি অপসারিত হয়।

"তা হলে কি বলিস?" আবার প্রশ্ন করেন মলিনার মা,—"কি বলব তাকে?"

চিন্তায় তলিয়ে থাকা মনটা চমকে ওঠে। অসহায় ভাবে চার-দিকের হলদে দাগ-ধরা দেয়ালের দিকে তাকায় মলিনা। দেয়াল-গুলি যেন ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছে তার দিকে একেবারে পিষে ফেলবার জন্য।

চকিতে আবার ভেসে ওঠে কমলের শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। ওর মুখে যেন আছে এই শ্বাসরোধকারী চার দেয়ালের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তির আশ্বাস—বাইরের অফুরন্ত আলো আর সমুদ্রের ঝড়ো বাতাসের সম্ভাবনা।

এম-এ ক্লাসের ছাত্র কমল ব্যানার্জী। ধনী পিতার সন্তান। একটা পলিসির তীর দিয়ে তাকে গাঁথতে গিয়ে কি ভাবে যেন নিজেই গেঁথে গেল মলিনা। গভীরতর হ'ল ওদের পরিচয়। মনের একটা অদ্ভুত অস্থিরতা, আবেগ-কম্পিত শরীরের অসহ্য পুলকানু-ভূতি একেবারেই নতুন মলিনার কাছে! লক্ষ্যহারা ভাবের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল ওরা দু'জনে। হঠাৎ কঠিন তীরভূমি থেকে বিজনের গদ্যময় প্রস্তাবটা এসে মারাত্মক আঘাত হানল ওদের দু'জনার সম্পর্কের উপর।

কমলের সঙ্গে মিলনে রয়েছে দুরতিক্রম বাধা। মলিনা কায়স্থ আর কমল ব্রাহ্মণ। বর্ণের এই বাধার চেয়েও যেন বড় হয়ে দেখা দিল আর একটা কি বাধা কিছুতেই যাকে অতিক্রম করা যায় না।

রূঢ় বাস্তবের এই প্রচণ্ড ধাক্কাতেই মলিনার মনে চিড় দেখা দিল। তার পর কি করে যেন অলক্ষিত ভাবে দু' ভাগ হয়ে গেল ওর মন। এক অংশে সাবধানতার উদ্যত তর্জ্জনী আর অন্য অংশে ভাব-রোমান্সের অন্তহীন কল্পনা। এই দুই মনের অনুক্ষণ সংঘাত-সংঘর্ষে হাঁপিয়ে ওঠে মলিনা।

"চল আমরা পালিয়ে যাই এ কলকাতা ছেড়ে"—আবেগ কম্পিত সুরে বলে কমল। মলিনার হাতখানা শক্ত ভাবে ধরে। "চলে যাব বহু দূরে, অজানা এক জনপদে। সেখানে আমরা বাঁধব বাসা। দিনের উপার্জ্জন নিয়ে সন্ধ্যায় ফিরব ঘরে—সেখানে

দুটি চোখের শান্ত প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকবে তুমি আমার প্রতীক্ষায়। তোমার প্রতীক্ষা-ব্যাকুল চোখের স্নিগ্ধ চাওয়ায় আমার শ্রান্তি যাবে ঘুচে। নাই-বা পেলাম সমাজের আশ্রয়। তোমার আমার সঙ্গ-সুখের আনন্দে দূর হয়ে যাবে অন্য সব অভাববোধ।"

সর্বনাশা এ প্রস্তাবে বুক কাঁপে মলিনার। বিদ্যুৎবহ্নির মত তীব্র আবেগে কেঁপে ওঠে ওর সমস্ত শরীর। দুলে ওঠে ওর সাবধানী মনের অন্তর্দেশ। সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা যায় মুছে। উদ্ভ্রান্ত অশ্রুবাষ্পে অস্পষ্ট হয়ে আসে কমলের কোমল মুখখানা।

তবু মত দিতে গিয়েও দিতে পারে না মলিনা। প্রতিরোধের শেষ সীমানায় এসে মন তার ছুটতে থাকে বিপরীত দিকে। আকর্ষণের পরে আসে বিকর্ষণের পালা।

বিজন বোসের প্রস্তাবটির আকর্ষণ যেন দুর্নিবার। সেখানে আছে নিশ্চয়তার দৃঢ় ভিত্তি। কঠিন তার স্পর্শ। সামাজিক স্বীকৃতি যেন এ প্রস্তাবে ওতপ্রোত হয়ে আছে।

কমলের প্রস্তাব যেন একটা মধুর স্বপ্ন। তাতে আছে অসহ্য সুখের জ্বালা। হালকা মেঘের ভেলায় চেপে পরিণামহীন ঠিকানায় ভেসে যাবার আনন্দ। তবু একটা বৃহৎ সংশয় যেন মুখব্যাদান করে আছে। সে সংশয় অনিশ্চয়তার।

এই দ্বিমুখী স্রোতে ভাসছে মলিনা আজ এক মাস। সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে প্রেমাস্পদের সঙ্গে নিরুদ্দেশযাত্রার রোমাঞ্চকর ভাব-বন্যায় মাঝে মাঝে ভেসে যায় সে। আবার অলক্ষিতে কোন মুহূর্তে পা ঠেকে যায় বিজনের প্রস্তাবের শক্ত মাটিতে। তখন আকাশচারী কল্পনাকে মনে হয় নিতান্তই অবাস্তব।

আজ এসেছে সব সংশয় ছিন্ন করবার দিন। লণ্ঠনের হলদে আলো মায়ের মুখে চোখে পড়েছে। শান্ত সংযত তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে একটা নিবিড় তৃপ্তি।

সম্মুখের দেয়ালে টাঙানো বাবার ছোট্ট বাঁধানো ফটোটার দিকে চোখ গেল মলিনার। বেলফুলের শুকনো মালাটি এঁকে-বেঁকে আছে ফ্রেমের গায়ে।

একদিকে সমাজ-অনুশাসিত শান্ত নীরব গৃহকোণ। মনের তৃপ্তি না থাক সংযম শুচিতায় ঘেরা। অন্যদিকে সমাজদ্রোহের দীপ্ত শিখায় অসহ্য সুখের জ্বালায় পুড়ে মরা।

কোনটি? কোনদিকে বরণ করবে আজ মলিনা?...

প্রায় অস্পষ্ট ফিস ফিস সুরে মায়ের কানে কানে মলিনা বলল, "অমত নেই। বলে দিও বিজন বাবুকে।"

অনেক, অনেক দিন পরে স্বপ্নহীন নিবিড় অতল ঘুমের মাঝে তলিয়ে গেল মলিনা।

সময় নেই

শ্রীবাসন্তী সেনগুপ্তা

সময় নেই, নেই, সময় নেই,
চলিতে একা একা
যদি-বা পথে দেখা,
দু'কথা বলি, তার সময় নেই—
সময় নেই।

হাওয়ায় হা হা শ্বাসে জীবন বয়ে যায়,
গ্রীষ্ম-উত্তাপ তৃষ্ণা রেখে যায়,
শাওনে বারি কোথা শান্ত জীবনের—
মনের শ্রী কই, তৃপ্তি হৃদয়ের,
কেবল ছুটে চলা, কেবল বয়ে যাওয়া,
শুধুই পথচলা, দূরের পথ চাওয়া,
পথিক সুজনের
পরশ হৃদয়ের
যদি-বা লাগে মনে, সময় নেই।

জন্ম এক হ'ল মৃত্যু ঐ কাছে
সেতুর দু'প্রান্তেই রয়েছে কাছে কাছে
উদয় হতে চলা অস্ত গোধূলিতে
প্রাণের ক্ষয় হ'ল এটুকু যেতে যেতে,
জীবন এত ছোট, ক'টা বা গোনা দিন
স্মৃতিতে ভরে রাখি, হৃদয় তাও ক্ষীণ,
কেবল সারাবেলা
সময় নিয়ে খেলা,
সময় এত কই, সময় নেই,
কেবল বসে থাকি, অনেক কথা কই,
সময় এত কই—
সময় নেই।

চাষী-মজুরের ক্রয়শক্তি ও শিল্প-সম্প্রসারণ

শ্রীঅজিতকুমার বসু

ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের তথ্য অনুসারে গ্রামবাসীরা বছরে সংসার-খরচ করে পরিবারপ্রতি ১,৩.০ আনা। এর মধ্যে আমদানী করা বস্ত্রাদি, তেল, চিনি, সাবান, জুতা, দড়ি, গৃহনির্মাণ-সামগ্রী, ওষুধ, বই-কাগজাদি প্রভৃতি শিল্পজাত ও দোকানে ক্রীত নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির জন্য খরচ হয় আনুমানিক গড়ে শতকরা ৩০ ভাগ হিসাবে পরিবারপ্রতি ৩৮২ এবং সর্বসমেত ১২৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যে খরচ হয় আনুমানিক ৮০-৯০ কোটি টাকা। তা ছাড়া, শিক্ষায় ও চিকিৎসায় শতকরা এক ভাগ, আমোদপ্রমোদ ও উৎসবাদিতে শতকরা ৭.৭৫ ভাগ, কর ও খাজনায় শতকরা ৫ ভাগ, ধোপা নাপিত মুচি, দর্জি প্রভৃতির জন্য শতকরা ২ ভাগ গড়ে খরচ হয়ে থাকে।

বাংলার সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ গ্রামবাসী। এদের মধ্যে গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুরের সংখ্যাই সর্বাধিক—গ্রামবাসীদের শতকরা ৫৮ ভাগ এবং সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৪৪ ভাগ। এরা আয়ের শতকরা ৮৫.৪ ভাগই খাদ্যদ্রব্যে খরচ করতে বাধ্য হয়। তাতেও তাদের অন্নের অভাব মেটে কিনা সন্দেহ। বাকী শতকরা ১৫ ভাগ খরচ করে আর সব বাবদ—গৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বস্ত্র, ধোপা, নাপিত, দর্জি মুচি, ইত্যাদি। অর্থাৎ, পরিবারপ্রতি ১১০.০ আনা এবং সর্বসমেত ২১ কোটি টাকা। সুতরাং শিল্পজাত ও দোকান-দারীর জিনিষে আরও অনেক কমই ব্যয় হয়। এতেও এদের বছরে দেনা হয় কিছু কিছু। দেনা হয় তাদেরই, যাদের শোধ করবার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ জমিজমা আছে।

সুতরাং চাষী ও মজুরদের এই যে বাড়তি ৫০ কোটি টাকা আয় হবে, তার সবই বাজারে আসবে। তারা শিল্পজাত ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তু ক্রয়, গৃহনির্মাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি বাবদ খরচ করবে। অর্থাৎ, আজ যেখানে সমস্ত গ্রামবাসীরা—কৃষি-নির্ভর ও অন্যান্য মিলিয়ে, এই বাবদ খরচ করছে ১২৫ কোটি, সেখানে, জমি বিলির পর, খরচ হবে ১৭৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ গ্রামের বাজারে ক্রয়শক্তি বাড়বে অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ। শিল্প ও দোকান-দারীর জিনিষ ধরলে ত দাঁড়াবে ৫৫ থেকে শতকরা ৬২ ভাগ। কৃষিতে যে অন্ততঃ ২৫ কোটি টাকার, বা গ্রামের ক্রয়শক্তির শত-করা ২০ ভাগ, ফসল বাড়বে তাও বহুলাংশে বাজারে বিক্রী হবে। তাতেও বাজারের উন্নতি হবে।

দেশের বণিক সমিতির পক্ষ থেকে সরকারকে পরিকল্পনা সম্পর্কে যে স্মারকলিপি বা মন্তব্য দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে—কল-কারখানা বা শিল্পাদিতে উৎপাদনে নিয়োজিত একজন লোকের পিছনে ৭.৮ জন লোক নিযুক্ত হয়ে আছে কাঁচা মাল যোগানো ও পণ্যদ্রব্য পরিবহণ এবং বিক্রীর কাজে। এ ছাড়া, রেল সরকারী দপ্তর প্রভৃতিতেও এই বাবদ কিছু লোক নিযুক্ত আছে। কিন্তু কথা তাঁরা উল্টো করে ধরেছেন। উপরতলাটাই তাঁরা তুলে ধরেছেন, বনেদটা নয়। বনেদটা হ'ল জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বা ভোগশক্তি। তা না থাকলে উৎপাদন করেই বা কি হবে এবং এখনই বা কি হচ্ছে? অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁরা অচেতন নন মোটেই, বরং খুবই সচেতন। তাই তাঁরা ভোগশক্তি বৃদ্ধির দাবিকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে কি করে যে তা বাড়বে, সে-দিকে বিশেষ মাথা ঘামান নি। এ ব্যাপারেও সেই উপরতলার কথাই বলেছেন। বলেছেন, আয়কর কমাতে হবে। কিন্তু আয়-কর দেয় ক'জন? ৭ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাত্র ৮ লক্ষ লোক বা সংস্থা আয়কর দেবার যোগ্য। তার মধ্যে মাত্র ৫ হাজার লোকই দেয় সমস্ত আয়করের শতকরা ৬৬ ভাগ। সুতরাং আয়কর কমালে ক্রয়শক্তি বাড়বে, এ কথা ঠিক নয়। আয়কর তুলে দিলেও বাড়বে না। আপাত লাভটাই ভারতের শিল্পপতিদের লক্ষ্য; খুব দূরের কথা তারা ভাবতে পারে না। ম্যানেজিং এজেন্সির নিয়মও এই মনোভাবের পোষক। একথা বিলাতের রক্ষণশীল ও পুঁজিবাদী "দি ইকনমিষ্ট" পত্রিকা ভারতের উন্নতি এবং পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলেছে। চাষীর হাতে জমি বিলির দ্বারাই সেই ভোগশক্তি বাড়বে, অন্য পথে নয়। চাষীর হাতে জমি বিলি সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রম নয়। এটা করলেই যে সরকার বা অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক হয়ে পড়ল, তেমন নয়! পুঁজিপতিদের স্বার্থেই জমি বিলি দরকার। "দি ইকনমিষ্ট" পত্রিকাও সেই কথা জোর করেই বলেছে। তাতে বলা হয়েছে, কৃষকের আর্থিক উন্নতির উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তা না হলে ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে বলে পত্রিকাটি মন্তব্য করেছে।

গ্রামের সামগ্রিক ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতে বর্তমানে কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন, ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, সরকারী দপ্তরখানা প্রভৃতিতে এবং ডাক্তার, উকিল, জেলে, কামার, কুমার তাঁতি, নাপিত, ধোপা, মুচি, দর্জি, ডোম, স্যাকরা, বিভিন্ন ছোটখাটো শিল্পকার, কলাবিদ, শিক্ষক, দোকানদার, প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত লোকেদের সংখ্যা—গ্রামের ক্রয়ক্ষমতা শতকরা ৪০ বৃদ্ধি পেলে, (গরীবদেরই যারা এ সব বাবদ খরচ করতে পারে না) এ সকল ক্ষেত্রেই তা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় আয় কমিটির মতে সারা ভারতে এই সব বাবদ কর্মরত

আছে প্রায় ৪ কোটি ৩০ লক্ষাধিক লোক। মৎস্য-চাষে ৫·১৯ লক্ষ, খনিতে ৭·৮ লক্ষ, কলকারখানা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ২৯·৬৯ লক্ষ, ছোট শিল্পে ১১৫·২ লক্ষ, ডাক তার টেলিফোনে ১·৯৫ লক্ষ, রেলে ১১·০৮ লক্ষ, ব্যাঙ্ক বীমায় ১·৪৭ লক্ষ, অন্যান্য ব্যবসা ও পরিবহনে ৯৫·৩৩ লক্ষ, উকিল, ডাক্তার ও শিল্পকলাদিতে ৬৪·২৫ লক্ষ, সরকারী দপ্তরে ৩৮·০৬ লক্ষ, বাড়ীর বা গৃহস্থালির কাজে (চাকরাদি) ২৯·৪৭ লক্ষ, ইত্যাদি। এর মধ্যে কলকারখানা ও খনিতে নিযুক্ত আছে ৩৭·৪৯ লক্ষ এবং বণিক সমিতির মতে এদের সঙ্গে মাথাপ্রতি সাত-আট জন হিসাবে, আরও আড়াই-তিন কোটি লোক কাজ করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহনের বিভিন্ন স্তরে। এর মধ্যে কত জন ভোগ্যবস্তু উৎপাদন ও সরাসরি প্রয়োজন মেটানোর কাজে নিযুক্ত আছে তার ঠিক হিসাব নেই। শতকরা ৬০।৭০ জন ধরে নিলে গ্রামের জন্য অন্ততঃ শতকরা ৩০·৩৫ জন। অর্থাৎ, গ্রামের সমস্ত কেনাবেচা ও সরবরাহের সকল স্তর থেকে কলকারখানার উৎপাদন পর্যন্ত কর্মরত আছে আনুমানিক ৮৯·৯৭ লক্ষ থেকে ১০৫ লক্ষ লোক।

বাংলার গ্রামবাসীর সংখ্যা সারা ভারতের গরীব গ্রামবাসীর শতকরা ৬·৫। বাংলার দরিদ্র গ্রামবাসীর ক্রয়ক্ষমতা সারা ভারতের গরীব গ্রামবাসীদের ক্রয়ক্ষমতার শতকরা ৩৮ বেশী। এই হিসাবে বাংলার গ্রামবাসীর ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতে, এখানে কলকারখানার উৎপাদন থেকে বিভিন্ন স্তরের কেনাবেচায় ও পরিবহনের কাজে নিযুক্ত—অন্ততঃ ৭·৯৮ লক্ষ থেকে ৯·৪১ লক্ষ লোক। শিল্পজাত দ্রব্যের বর্তমান ক্রয়বিক্রয়ের শতকরা ৫৫·৬২ ভাগ বৃদ্ধির সুযোগ যদি জমি বিলির দরুন সৃষ্টি হয়, তা হলে ৪·৩৫ লক্ষ থেকে ৫·৮৩ লক্ষ লোক বাড়তি নিয়োগের বাজার খুলে যাবে।

শুধু কাপড়ের হিসাব নিলেই একটা ধারণা হবে। সরকারী তথ্য অনুসারে কাপড়-চোপড় ও পোশাক-পরিচ্ছদের দরুন গড়ে খরচ হয়, সংসার-খরচের প্রায় শতকরা ১১ হিসাবে, পরিবারপ্রতি ১২৫৲ টাকা এবং উর্দ্ধপক্ষে সর্ব্বসমেত প্রায় ১৯ কোটি টাকা। কিন্তু কৃষি-শ্রমিক সম্পর্কিত তথ্য অনুসারে গরীব গ্রামবাসীরা গড়ে খরচ করে তাদের সংসার-খরচের (সারা ভারতে) শতকরা ৬·৩ এবং বাংলায় শতকরা ৪·৭। অর্থাৎ, বাংলায় মোট ৫·৭ কোটি টাকা। জমি বিলির ফলে পরিবারপ্রতি (বাংলার ১৯ লক্ষ) বর্তমান ৬৬৮ টাকার আয় বেড়ে হবে ১০২৬ টাকা। বস্ত্রের দরুন খরচ বেড়ে শতকরা ১০ হবে বলেই বিশ্বাস। তা হলে পরিবারপ্রতি ১০২ টাকা এবং সর্ব্বসমেত ১৯·৩৮ কোটি টাকার বস্ত্রাদি বিক্রী হবে। অর্থাৎ, বর্তমানের তুলনায় বস্ত্রাদির বাজারে কেনা বেচা দ্বিগুণ হবে। খাদ্যের পরই বস্ত্র। তার অবস্থাই এই। অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অবস্থা আরও শোচনীয় যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাংলায় গ্রামে ও শহরে (কলিকাতা সমেত) অচাষী মধ্যবিত্ত বেকারের সংখ্যা সাড়ে ৪ লক্ষ। একমাত্র জমি বিলির দ্বারাই বর্তমানের এই বেকারদের সমপরিমাণ লোকের কাজের সংস্থানের পথ খুলে যাবে। শুধু তাই নয়, কলকারখানা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এবং পরিবহণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এর দরুন যারা কাজ পাবে, তাদেরও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বলে বাজার আরও তেজী হবে। তাও কম হবে না। শতকরা ২৫ জন যদি কলকারখানা, ইমারতাদিতে নিযুক্ত হয়, তা হলে শতকরা ৭৫ বা ৪৭·৫০ কোটি টাকা এদের হাতে আসবে বাড়তি। এই গরীবদের ঐ বাড়তি ৫০ কোটি টাকার যে আয় হবে, তার অধিকাংশই কয়েকটি হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে সাধারণ ক্রেতাদের হাতেই ঘোরাফেরা করবে। এর ফলে বাজারে স্ফীতির আশঙ্কা আছে। কিন্তু তাই বলে ত হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলে না। জরুরি যা তা করতেই হবে। তার ফলে পরিস্থিতি যেখানে খারাপ হবে সেখানে সামাল দিতে হবে। কলকারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগিয়ে অনেকখানিই সামাল দেওয়া যাবে। তা ছাড়া অধিকসংখ্যক লোক সংষ্ট হয়ে দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হলে সামাল দেবার অসুবিধা হবে না। এ ছাড়া রেল, সরকারী দপ্তর, প্রভৃতিতেও এই বাবদ বহু লোক নিযুক্ত হবে। নানাভাবে এর দরুন সরকারী আয়ও বাড়বে অন্ততঃ ৮১৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ, বর্তমান অচল অবস্থার অবসান হয়ে সব দিকেই সচলতা আসবে এবং দেশ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

বাংলায় বড় জমির মালিকদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকে বৎসরে আনুমানিক ৩১ কোটি টাকা। এই টাকা তারা কোন শিল্পোদ্যোগে নিয়োগ করে না। এরা ব্যাঙ্কেও টাকা রাখে না, বীমাতেও নিয়োগ করে না। সরকারী ঋণে যে টাকা দেবে, তাও করে না এবং উন্নয়নমূলক কাজেও এদের দারুণ ঔদাসীন্য। এদের প্রায় সমস্ত উদ্বৃত্ত টাকাই অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। তারা অহেতুক জমির দাম বাড়াচ্ছে এবং চোরাবাজারকে পুষ্ট করছে। তা ছাড়া ছোট ছোট ব্যবসায়ে ভিড় করে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি-দ্বারা শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় করছে। এরা যদি এই উদ্বৃত্ত অর্থ শিল্প ও উন্নয়ন তহবিলে নিয়োগ করত, বা সমবায় প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করে কেনা বেচা, কৃষি-ঋণ দান, কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন, গ্রাম ও কুটীর শিল্প, প্রভৃতিকে পুষ্ট করতে অগ্রণী হত, তা হলেও না হয় কথা ছিল। তা ছাড়া এদের জীবিকার মান বা ভোগ-স্পৃহা আয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এই সব কারণে এদের হাতে দেশের স্বল্প সম্পদের একটা মোটা অংশ থাকতে দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এতে অকল্যাণ বৈ কল্যাণ নেই। সুতরাং সবদিক দিয়েই জমি বিলির প্রয়োজনীয়তা আশু ও অপরিহার্য। চাষীর প্রতি করুণা বা মালিকদের প্রতি বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে যে জমিবিলির কথা উঠেছে তা নয়। মধ্যবিত্তের কল্যাণের জন্যই, দেশের হিতের জন্যই জমি বিলি দরকার, চাষীর উন্নতি প্রয়োজন।

কিরণাবলী

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

নব্যন্যায়ের অন্যতম আকরগ্রন্থ, উদয়নাচার্য রচিত "কিরণাবলী" বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত বিবৃতি সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।* মনোহর প্রচ্ছদপত্র দেখিয়া সপ্তমবর্ষীয়া দৌহিত্রী প্রশ্ন করিল, "কোন্ সিনেমার বই? ছবি কৈ?" একজন প্রবীণ লেখক নব্যন্যায় সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, ইহার "প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির কোন উপকারই হয় নাই।…উহার দ্বারা বাঙ্গালীর অনিষ্টসাধনই হইয়াছে"! (সাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃ ১৮৩) লঘু সাহিত্যপ্রিয় সমাজের শিশু যে প্রশ্ন করিল তাহার সহিত প্রবীণ লেখকের শিশুজনোচিত মন্তব্যের বিশেষ পার্থক্য নাই—উভয়ই উচ্ছৃঙ্খল অনর্থকারী প্রগতির অগ্রদূত। এই তথাকথিত ক্রমোন্নতিবাদীর স্বর্ণযুগেও একাদশ শতাব্দীতে রচিত অত্যন্ত দুরূহ একটি সংস্কৃত গ্রন্থ আজ যে কেবল বাঙ্গালী পাঠকের জন্যই সম্পাদিত হইল ইহার তাৎপর্য ও সম্ভাবনা সম্যক্ উপলব্ধি করা আবশ্যক।

মননশক্তির তারতম্য হইতেই মনুষ্যজাতির উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হয়। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ হইতেই মননশাস্ত্রের চর্চা অব্যাহত রহিয়াছে। তন্মধ্যে আন্বীক্ষিকী সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়া গঙ্গা-যমুনার ন্যায় যুগলধারায় প্রবাহিত হয়—ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিকদর্শন। মধ্যযুগে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া গৌড়-মিথিলাকে প্লাবিত করিয়া সমগ্র ভারতখণ্ডকে অভিষিক্ত করিয়াছিল। মননশাস্ত্রের এই অনন্যসাধারণ উচ্ছ্বাসের নাম নব্যন্যায়—ইহারই দর্শনশাস্ত্র-ব্যবসায়ীর উপাদেয় স্বর্ণময় শিখরভূমি এবং জড়বুদ্ধির পঙ্কভূমি। পৃথিবীর সারস্বত ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। এই মহামহীরুহের মূল মৈথিল ন্যায়াচার্য উদয়নের গ্রন্থসমূহ। মধ্যযুগে গঙ্গেশের মণিগ্রন্থ ও তদুপরি শিরোমণির দীধিতি অবলম্বন করিয়া নব্যন্যায়ের যে চরম পরিণতি "জগদীশ" প্রণালীতে পর্যবসিত হইয়াছিল, তাহাতে তৎকালে একমাত্র কুসুমাঞ্জলি ব্যতীত উদয়নের সমস্ত গ্রন্থ হতাদর ও লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। প্রায় আশী বৎসর পূর্বে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ বাবুর জীবদ্দশায় দুইজন সাহেব উদয়ন-রচিত "বৌদ্ধাধিকার" গ্রন্থের আলোচনার জন্য উপস্থিত হন—তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক কোন্নগরের দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন স্বয়ং অপারক হইয়া উত্তরপাড়ার জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কারের এক মাদ্রাজী ছাত্রের নিকট সাহেবদ্বয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং সেখানে কৃতকার্য হইয়া তাঁহারা জয়কৃষ্ণবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকগণ তখন গাদাধরী সামান্য নিরুক্তির "চৌদটী"র মধ্যে মণ্ডূক মণ্ডূকের ন্যায় ডুবিয়া থাকিতেন। নবদ্বীপগৌরব গদাধর ভট্টাচার্যের অভ্যুদয়ের দুই শত বৎসর মধ্যে ক্রমশঃ প্রাচীন গ্রন্থের পঠন-পাঠন গৌড়মিথিলায় এই ভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়—একটি হইল—প্রশস্তপাদকৃত বৈশেষিকভাষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা উদয়নাচার্যের সর্বশেষ অসমাপ্ত রচনা আলোচ্য কিরণাবলী গ্রন্থ।

প্রাতঃস্মরণীয় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ গদাধরের ২০০ বৎসর পরে, "বাৎস্যায়নভাষ্য" প্রথম মুদ্রিত করেন। বাঙ্গালীর মনীষা নব্যন্যায়ের চরম পরিণতি হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়া নূতন ভাবে প্রাচীন গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হইল—ইহা তাহারই সূত্রপাত। অন্যূন অর্দ্ধশতাব্দী পরে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বার বৎসরে বৃহৎ পাঁচ খণ্ডে ঐ গ্রন্থের সমুচিত ব্যাখ্যা বাঙ্গলা ভাষায় সমাপ্ত করিলে বঙ্গভাষার "এক অপূর্ব দান" বলিয়া ইহা অভিনন্দিত হইয়াছিল (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৮, পৃ. ৭২৬)।

উক্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রশস্তপাদভাষ্যের সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প পরেই স্বর্গত হন। পরে কাশীর বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ পঁয়ত্রিশ বৎসরে (১৮৮৪-১৯১৯ খ্রী:) কোন প্রকারে কিরণাবলী-সহ ঐ ভাষ্যগ্রন্থ মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৌহাটী হইতে মুদ্রামাণ কিরণাবলী ৪৫ বৎসরেও সম্পূর্ণ হইল না—তন্মধ্যে বর্দ্ধমানের প্রকাশ, তদুপরি রুচিদত্তের বিবৃতি ও বাদীন্দ্রের ক্রোড়টীকা মুদ্রিত হইতেছে। কাশীতে রসসার, গুণপ্রকাশ, গুণদীধিতি ও পদ্মনাভকৃত কিরণাবলীভাস্কর মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু কিরণাবলীর উপর যে বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার বহুলাংশ অদ্যাপি অপ্রকাশিত ও অনধীত রহিয়াছে এবং দ্রব্যদীধিতি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে সুযোগ্য লেখক অপ্রকাশিত দ্রব্যকিরণাবলীমাথুরীর ব্যাখ্যাবচন বহু স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্তমান প্রথম খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থের দশমাংশও প্রকাশিত হয় নাই—গ্রন্থটি এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবৃতি সহ সম্পূর্ণ করিতে পারিলে অধ্যাপক ভট্টাচার্য শাস্ত্রী মহাশয় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে বাঙ্গলার শিক্ষিত-সমাজের আধুনিক রীতি-নীতি অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় একটি সরল সমালোচনা দ্বারা কণাদদর্শনের সেবা করিতে অগ্রসর হন নাই। তিনি উদয়নাচার্যের গভীর রচনার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রত্যেক পদের ও সন্দর্ভের সমস্ত অর্থ সংগ্রহ ও নানা গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়া সূক্ষ্ম বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন। এতদ্বারা গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত হইলেও মননশীল পাঠক শ্রেণীর প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে।

এইরূপ বিস্তৃত বিবৃতি পাঠ করিয়াও স্থানে স্থানে আমাদের মনে হইয়াছে, আলোচনার কোন কোন অংশ পূর্ণাঙ্গ হয় নাই—আরও জিজ্ঞাসা থাকিয়া যাইতেছে। একটি উদাহরণ দিতেছি। কিরণাবলী গ্রন্থের সন্দর্ভ অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক-পরম্পরায় শত শত "ফক্কিকা" উদ্ভূত ও আলোচিত হইত। আরম্ভে মঙ্গলশ্লোকের একটি ফক্কিকা হইল "রাত্রিপক্ষ"—ইহার গোপালভট্টাচার্যাদি বহুতর মহানৈয়ায়িক রচিত নানা সন্দর্ভ পাওয়া যায়। আমরা আশা করি, পরবর্তী খণ্ডে শাস্ত্রী মহাশয় রাত্রিপক্ষের বিশদ আলোচনা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ, মঙ্গলশ্লোকের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা আছে—যাহা বর্দ্ধমানের টীকায় উদ্ধৃত হয় নাই। বর্দ্ধমানের পূর্ববর্তী তাঁহার অন্যতম উপজীব্য দিবাকরোপাধ্যায় "বিদ্যাসন্ধ্যোদয়োদ্রেকাৎ" পদের বিকল্প ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অথবা বিদ্যা আত্মনি শ্রবণমনন-ধ্যানরূপাঃ প্রতিপত্তয়স্তা এব তিস্রঃ সন্ধ্যাঃ" ইত্যাদি। রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির ব্যাখ্যানুসারে "উদেকাদিতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী, রজনীক্ষয়ে ইতি নিমিত্তসপ্তমী।" তবে ইহাও বক্তব্য—এই সকল ব্যাখ্যা প্রায়ই মুদ্রিত হয় নাই এবং পুথি ঘাঁটিয়া বাহির করাও প্রায় অসাধ্য।

৯৩ পৃষ্ঠায় উদয়নাচার্যের "প্রমাদ" প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য হইল—ভাট্টমতের বহুতর গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় নাই, যথা—স্বয়ং কুমারিলের "বৃহট্টীকা" এবং সুচরিত মিশ্রের কাশিকা (সামান্য অংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে)। সুতরাং বৃদ্ধোক্ত নিত্যসুখাভিব্যক্তি কোন ভাট্ট সম্প্রদায়ই স্বীকার করিতেন না, অদ্যাপি এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করা চলে না। আর উদয়নাচার্য বাৎস্যায়নভাষ্য ভাল করিয়া দেখেন নাই এইরূপ কল্পনা করার হেতু নাই।*

---

* কিরণাবলী: প্রথম খণ্ড—শ্রীগৌরীনাথ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী-রচিত। পৃ. ২।০+২৭০। মূল্য দশ টাকা। প্রকাশক—অধ্যাপক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথগুপ্ত, ১০ রঘুনাথ চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

"এর শুভ্রতাই
এর বিশুদ্ধতার
পরিচায়ক"
বলেন অনুভা গুপ্ত
"সেইজন্যেই
আমি সর্ব্বদা
লাক্স টয়লেট
সাবান
ব্যবহার করে
থাকি"
ভারতে প্রস্তুত
LUX
TOILET SOAP
অনুভা গুপ্ত বলেন:
"আপনার ত্বক মসৃণ ও সুন্দর রাখতে হলে ভালভাবে মেখে নিন…"
"লাক্স টয়লেট সাবানের সরের মত ফেনা—কি সৌরভময়"।
"তারপর ধুয়ে মুছে ফেলুন— আপনি এত তাজা অনুভব করবেন।"
"সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে বড় সাইজ ব্যবহার করুন —যা আমি করি।"
চিত্র-তারকাদের বিশুদ্ধ শুভ্র সৌন্দর্য্য সাবান
LTS. 479-X52 BG
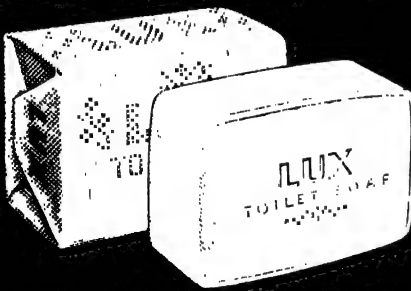
রাতের আকাশের রূপবৈচিত্র্য

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে আকাশের কালো মখমলী পটভূমিকায় গ্রহ, তারা, নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক যে রূপবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে তা আমাদের দৃষ্টিকে বিমুগ্ধ এবং হৃদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করে। কিন্তু নক্ষত্রসমূহের অবস্থানের মধ্যে যে নিয়মশৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা বিদ্যমান তা ধরা পড়ে আকাশ-পর্য্যবেক্ষকের সন্ধানী দৃষ্টিতে।

পেগাসাসে অনুজ্জ্বল নীহারিকা

অনেকেরই ধারণা যে, সবগুলি তারাই আকাশের গায়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু যাঁর নক্ষত্র-পরিচয় কিছুমাত্র হয় নি তিনিও যদি দু' এক রাত ভালো করে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করেন তা হলে দেখবেন যে, স্থানে স্থানে কতকগুলি তারা মিলে এক একটি বিশিষ্ট আকৃতির সৃষ্টি করেছে। জ্যোতিষীরা এগুলোর নাম দিয়েছেন নক্ষত্র বা তারামণ্ডল (constellation)। এই সকল মণ্ডলের মধ্যে কোনটি মনুষ্যাকৃতি, কোনটি ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মত, কোনটি মালার মত, কোনটি ক্রুশ চিহ্নের মত, কোনটি বা মন্দিরের মত আকৃতিবিশিষ্ট। আমরা চন্দ্র-সূর্য্যেরই শুধু উদয় অস্ত দেখতে পাই। কিন্তু নক্ষত্রমণ্ডলসমূহের সঙ্গে পরিচিত হলে দেখা যাবে যে, তাদের মধ্যেও অনেকগুলি যথানিয়মে পূর্ব্বদিগন্তে উদিত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়। সন্ধ্যার সময় যাকে দেখা গেল পূর্ব্বদিগন্তে, মধ্যরাত্রে তাকে দেখা যাবে মাঝ আকাশে আর শেষ রাত্রে সেটি হবে পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত।

আকাশ-পর্য্যবেক্ষণের প্রকৃষ্ট সময় শীতকাল—বিশেষতঃ মাঘ মাস। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসও নক্ষত্র চেনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। অগ্রহায়ণ মাসে আকাশ থাকে নির্ম্মেঘ, উজ্জ্বলতম তারাগুলি আর বিশিষ্ট নক্ষত্রমণ্ডলসমূহ এই সময় দেখা দেয় আকাশের পটে। বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত ছায়াপথ। এই মাসে রাত নয়টা সাড়ে নয়টার সময় মাথার উপরকার আকাশের কাছাকাছি এমন কয়টি বিশিষ্ট নক্ষত্রমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় যাদের চিনে নেওয়া খুব সহজ। কাজেই নক্ষত্রপরিচয় লাভ করতে হলে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অগ্রহায়ণ মাস থেকে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ সুরু করা মন্দ নয়। এই মাসের রাতের আকাশে যে সকল নক্ষত্রমণ্ডল এবং বিশিষ্ট তারা দৃষ্টিগোচর হয় তাদের অনেকগুলিই স্পষ্টতর এবং উজ্জ্বলতররূপে দেখা যায় পৌষ-মাঘ মাসে—তবে তাদের উদয়-অস্তের সময়ের আর অবস্থানের পরিবর্ত্তন হয় বটে। তবে একবার কোনো একটি নক্ষত্রমণ্ডল এবং তারকা চিনে রাখলে আর ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। রাত্রে যে সময়ে যে দিকেই থাকুক না কেন তাকে খুঁজে বের করা কঠিন হয় না।

আধুনিক কালে জ্যোতিষীরা দূরবীক্ষণের সাহায্যে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করেন। সুদূর অতীত কালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কিন্তু খালি চোখেই তারা দেখতেন। কতকগুলি তারা মিলিয়ে তাঁরা এক একটা নক্ষত্রমণ্ডলের রূপকল্পনা করেছিলেন। যেমন ধরা যাক কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলের কথা—এর নাম অনেকেরই জানা আছে। ঋগ্বেদে এই কালপুরুষ নক্ষত্রের কথা আছে। এই কালপুরুষ হচ্ছেন রুদ্রের প্রতীক্—এঁর পৌরাণিক যুগের নাম মৃগনক্ষত্র। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রমুখ মনীষীরা ঋগ্বেদ রচনার কালনির্ণয় করেছেন ছয় হাজার থেকে আট হাজার খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ। এর থেকে বুঝতে পারা যায়—আমাদের দেশে নক্ষত্র চেনবার চেষ্টা কত আগে আরম্ভ হয়েছিল। পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরীয়, চীনা এবং ক্যাল-ডিয়ানরাও যখন নক্ষত্রমণ্ডল-শোভিত আকাশের রূপ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করে তখন নক্ষত্রমণ্ডলগুলির যে-রকম অবস্থান ছিল আজও প্রায় তেমনি আছে এবং আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর

পরেও এর বড় একটা অদল-বদল হবে না একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

নক্ষত্র চেনার পালা প্রথম কোথায় সুরু হয়েছিল—ভারতবর্ষে, না মিশর প্রভৃতি দেশে সে তর্কের মধ্যে না গিয়ে একথা নিঃসন্দিগ্ধরূপেই বলা চলে যে, সুদূর অতীতে খালি চোখে রাতের আকাশ চেনার চেষ্টা সুরু হয়েছিল সেই সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, বৎসরের অধিকাংশ সময় যেখানকার আকাশ থাকে নির্মেঘ—উজ্জ্বল ও পরিষ্কার।
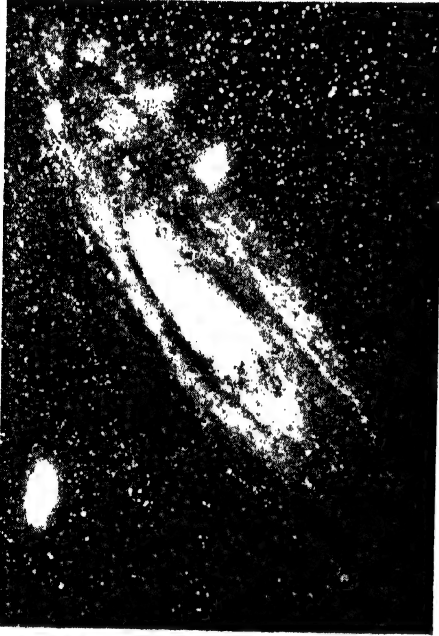
এণ্ড্রোমিডা এম-৩১ মহা-নীহারিকা

আগেকার দিনে যেমন মানুষের ধারণা ছিল যে, সূর্য্য চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারিদিক ঘুরে আসে, তেমনি নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষকেরাও ভুল করে মনে করতেন যে, নক্ষত্রমণ্ডলগুলিও আকাশপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এ ধারণা ভ্রান্ত। আসলে সূর্য্য, তারা এবং নক্ষত্রমণ্ডলসমূহ স্থির। পৃথিবীই নিজের অক্ষদণ্ডের উপর চব্বিশ ঘণ্টায় পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরে আসছে। আমরা কিন্তু দেখছি সূর্য্য এবং নক্ষত্রসমূহ পূব থেকে পশ্চিমে গতিশীল। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে নক্ষত্রগুলি বৃত্ত ঘুরে আসে। কিন্তু এ হচ্ছে মায়া, চোখের ভুল দেখা—সূর্য্য এবং নক্ষত্রদের এ গতি হচ্ছে আপাত (apparent) গতি। যেমন চলন্ত ট্রেনে বসে জানালায় বাইরে তাকালে পরে মনে হয় যে, ট্রেনটা নিশ্চল আর ঘরবাড়ী গাছপালা সব ছুটে চলেছে উল্টোদিকে।*

কিন্তু রাতের আকাশে যে অসংখ্য আলোকবিন্দু আমরা দেখতে পাই তার সবগুলিই কি গতিহীন? মোটেই নয়। তারাগুলি দপ দপ মিট মিট করে জ্বলে, কিন্তু আকাশের গায়ে এমন কতকগুলি আলোকবিন্দু দেখতে পাওয়া যায় যারা স্থির নিশ্চল। এগুলি হচ্ছে গ্রহ। গ্রহ নয়টি: বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনাস (প্রজাপতি), নেপচুন (বরুণ) আর প্লুটো (রুদ্র)। আমাদের পৃথিবীও একটি গ্রহ। কোনো কোনো গ্রহের তাপ থাকতে পারে, কিন্তু এদের নিজস্ব আলো নেই। এরা সূর্য্যের আলোয় আলোকিত হয়। সূর্য্য যে পথে পৃথিবী পরিক্রমা করে বলে মনে হয়, তার নাম দেওয়া হয়েছে ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ। এই ক্রান্তিবৃত্তকে বারো ভাগে ভাগ করে নামকরণ করা হয়েছে রাশিচক্র। এই রাশিচক্রে আছে—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই বারোটি রাশি—সোয়া দুইটি নক্ষত্র নিয়ে গঠিত এক একটি রাশি। গ্রহগুলি এই রাশিচক্রের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করে আর ক্রমাগত ঠিকানা বদলায়। মূল গ্রীক নাম থেকে ইংরেজীতে এদের বলা হয় Planet, যার মানে পর্য্যটক। জেমস জীনস বলেছেন, এরা হচ্ছে আকাশের বেদে।

আকাশে তারকা অগণিত। কিন্তু সারা বৎসরে সমগ্র পৃথিবী থেকে খালি চোখে প্রায় ছয় হাজার মাত্র তারা দেখা যায়। তবে এক সময়ে আমরা আকাশের আধখানা মাত্র দেখতে পাই বলে এক সময়ে এক স্থান থেকে খালি চোখে আড়াই থেকে

---

* অনেকের ধারণা যে, পৃথিবীর গতিশীলতা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূচনা প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৩০০ বৎসর পূর্বে গ্যালিলিওর আবিষ্কারসমূহের সমকাল থেকে। এর বহু আগে যে ভারতীয়গণ জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক এবং ভৌগোলিক নানা তথ্য পরিজ্ঞাত ছিলেন তার প্রমাণ আর্য্যভট্টের আর্য্যসিদ্ধান্ত; (পঞ্চম শতাব্দী) ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গোলাধ্যায়; সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, প্রভৃতি গ্রন্থ। শেষোক্ত পুস্তক দু'খানিতে প্রসঙ্গক্রমে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ, ভূপঞ্জরের স্তর ইত্যাদি সম্পর্কিত ভূবিদ্যাবিষয়ক নানা তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। পৃথিবী যে গতিশীল এবং নক্ষত্রসমূহ স্থির তা লিপিবদ্ধ আছে আর্য্যভট্টের আর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোকে:

"অনুলোম গতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥"

অর্থাৎ, যেমন গতিশীল নৌকার আরোহী তীরবর্ত্তী অচল গাছপালাকে উল্টাদিকে যেতে দেখে, তেমনি (পৃথিবীর গতির জন্যে) স্থির নক্ষত্রদিগকে সমবেগে যেতে দেখা যায় পশ্চিম দিকে।

তিন হাজারের বেশী তারা দেখা যায় না। জ্যোতিষীরা গোটা আকাশটিকে কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর তারা নিয়ে গঠিত মোটামুটি উননব্বইটি মণ্ডলে বিভক্ত করেছেন। বসন্ত-গ্রীষ্ম শরৎ-শীত প্রভৃতি বিভিন্ন ঋতুতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মণ্ডল আকাশে দেখা দেয়। উননব্বইটি বা ততোধিক মণ্ডলে যে অসংখ্য তারা দৃষ্টিগোচর হয় তার মধ্যে বড় কুকুর (Canis Majoris) মণ্ডলের লুব্ধক Sirius), বীণা মণ্ডলের অভিজিৎ (Vega) প্রভৃতি ২০টি তারার উজ্জ্বলতা সব চেয়ে বেশী। এগুলিকে বলা হয় প্রথম-প্রভা (First-magnitude) তারা। উজ্জ্বলতার ক্রম অনুসারে তারাগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে জ্যোতিষীরা (১) আলফা, (২) বিটা, (৩) গামা, (৪) ডেলটা,
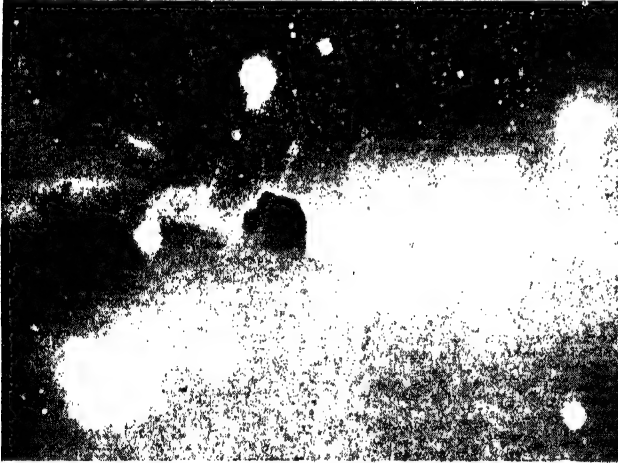
ওরায়েন বা কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলে 'অশ্ব-শির' (Horse's Head) নীহারিকা

(৫) এপিলসন ইত্যাদি গ্রীক বর্ণমালার অক্ষর ব্যবহার করে থাকেন। কাজেই কোন নক্ষত্রমণ্ডলের প্রধান তারাকে—সাধারণতঃ যেটি উজ্জ্বলতমও বটে—উক্ত মণ্ডলের আলফা বলে বর্ণনা করা হয়, এমনি ভাবে দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারাটিকে বিটা, তৃতীয়টিকে গামা বলে নির্দ্দেশ করা হয়। আমরা খালি চোখে যে ক্ষীণতম ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট তারাটি দেখতে পাই তার তুলনায় প্রথম-প্রভা তারকাগুলির উজ্জ্বলতা অন্ততঃ ১০০ গুণ বেশী।

দূরবীক্ষণের সাহায্যে আকাশে দেখা যায় কোটি কোটি তারা। জেমস জীন্স হিসাব করে বলেছেন যে, যদিও তাদের সংখ্যা নির্ভুল ভাবে বলা যায় না তথাপি তা যে দশ হাজার কোটির বেশী হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল। সূর্য্যের আয়তন এত বিশাল যে, তার মধ্যে তের লক্ষ পৃথিবীর জায়গা হতে পারে। সূর্য্যের ব্যাস ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার মাইল। "১১০টি পৃথিবী পাশাপাশি এক সরল রেখায় রাখলে সূর্য্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পারে।" এমন সব মহাকায় নক্ষত্রও আছে যারা সূর্য্যের চেয়ে হাজার গুণ, লক্ষ গুণ বা কোটি—গুণ এমনকি দশ কোটি গুণ বড়। সূর্য্যের দূরত্ব পৃথিবী থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলের কিছু কম। আর নক্ষত্রের দূরত্বে—সে ত ভাবাই যায় না। উত্তর গোলার্দ্ধে যে তারাটি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে এবং উজ্জ্বলতম দেখায় সেটি হ'ল লুব্ধক বা সিরিয়াস। লুব্ধক পৃথিবী থেকে ৫১ লক্ষ কোটি মাইল দূরে। এই নিকটতম তারাটির দূরত্ব থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, মাইল-ক্রোশে তারাদের দূরত্বের হিসাব করা যায় না, তাদের দূরত্বের পরিমাপ করতে হয় আলোর গতি দিয়ে। আলো ছুটে চলে সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে। সূর্য্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে প্রায় আট মিনিট। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী যে নক্ষত্রটি কথা এই মাত্র বলা হ'ল তার থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে চার বছরচার মাস। এক বছরে আলো যতটা পথ—প্রায় পাঁচ লক্ষ অষ্টাশী হাজার কোটি মাইল—অতিক্রম করে আসে তাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন এক আলোক-বর্ষ বা 'লাইট-ইয়ার'। এই আলোকবর্ষ ধরেই নক্ষত্রগুলির দূরত্ব মাপা হয়।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশের এক শোভা নক্ষত্রমণ্ডল আর এক শোভা আকাশে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত আলোক-বলয়ের মত দৃশ্যমান ছায়াপথ বা Milky way.—স্মরণাতীত কাল থেকে এই ছায়াপথ উদ্বুদ্ধ করেছে মানুষের কল্পনাকে। প্রাচীন মেক্সিকোর অধিবাসীরা একে বলত সাতরঙা রামধনুর ছোট বোন। হিন্দুদের বিষ্ণুপুরাণে এই ছায়াপথকে বলা হয়েছে সবিৎগঙ্গা। বায়ুপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে ছায়াপথের উল্লেখ আছে :—

দিবি ছায়াপথো যস্তু অনুনক্ষত্রমণ্ডলম্।
দৃশ্যতে ভাস্বরো রাত্রৌ দেবী ত্রিপথগা তু সা।

অর্থাৎ, "রাত্রে নক্ষত্রমণ্ডলের কাছে স্বর্গে যে ছায়াপথ ভাস্বররূপে দৃশ্যমান হয়, তিনিই ত্রিপথগামিনী দেবী—অর্থাৎ আকাশ-গঙ্গা।" ছায়াপথ দক্ষিণাকাশ থেকে আরম্ভ করে উত্তরাকাশ পথে ধ্রুবতারার প্রায় ২৫°-২৬° ডিগ্রী দূর দিয়ে ঘুরে পুনরায় চলে গেছে দক্ষিণাভি-মুখে। অনেক অনেক দূরে ঐ ছায়াপথে অসংখ্য ছোট ছোট তারা খুব কাছাকাছি জটলা করে আছে। তারাগুলি এত দূরে আছে যে, তাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সমষ্টিগত ভাবে তারা যে আলোক বিকিরণ করছে, তাই প্রতিভাত হচ্ছে আমাদের চোখে। ঐ ছায়া-

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
সুস্থ লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি,
তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের
প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রেই
লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।
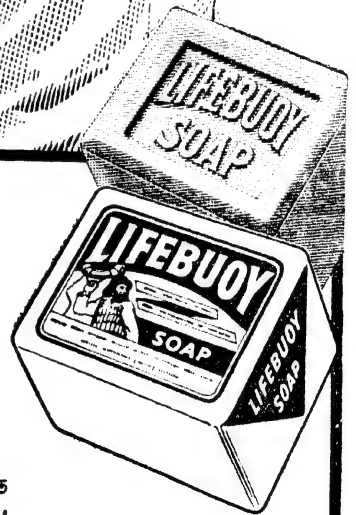
পথের দু'পাশেই তারাদের ভিড়, ছায়াপথ থেকে যতদূরে যাওয়া যায়, তারার সংখ্যা ততই কমে আসে।

রাতের আকাশে যে তিনটি নক্ষত্রমণ্ডল আকাশ-পর্য্যবেক্ষকদের নিকট সুপরিচিত রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে আর যাদের খুঁজে বের করতে

সিগনাস বা হংসপুচ্ছ মণ্ডলের নীহারিকা

বেগ পেতে হয় না তারা হ'ল সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ আর পেগাসাস সপ্তর্ষিমণ্ডল সাতটি তারা নিয়ে গঠিত, উত্তর আকাশের একটি প্রসিদ্ধ নক্ষত্রমণ্ডল। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সাতজন ঋষির নামে নামকরণ করা হয়েছে এই মণ্ডলের। বশিষ্ঠের কাছে আছে খুব ছোট একটি তারা—বশিষ্ঠের সাধ্বী স্ত্রী অরুন্ধতী। এই মণ্ডলটিকে চিনে রাখা খুবই দরকার। কেননা এর সাহায্যে অনায়াসে ধ্রুবতারাকে বের করা যায়। ধ্রুবতারার একদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল আর উল্টাদিকে ক্যাসিওপিয়া—(আমাদের জ্যোতিষে যাকে শতভিষগ বা শত-বৈদ্য এবং কাশ্যপী নক্ষত্রও বলা হয়)। এই দুটি মণ্ডলকে একসঙ্গে আকাশে অবস্থান করতে দেখা যায় না। ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ এই কয় মাস সন্ধ্যার সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল থাকে অদৃশ্য। পৌষের শেষে সন্ধ্যায় একে দেখতে পাওয়া যায় আকাশের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে।

অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার পরে উত্তর আকাশের দিকে তাকালে ক্যাসিওপিয়াকে দেখতে পাওয়া যায়, আর একে চিনে নেওয়াও কঠিন নয়—এর চেহারাটা হচ্ছে ইংরেজী ডব্লু অক্ষরের মত, আর উল্টা দিক থেকে দেখলে 'এম'-এর মত। উত্তর দিকের শীর্ষবিন্দুর তারাটি থেকে এই মণ্ডলটিকে দেখায় একটা চেয়ারের মত। কল্পনা করা হয় যেন রাণী ক্যাসিওপিয়া বসে আছেন চেয়ারের উপরে। ক্যাসিওপিয়া সিফিউস, এন্‌ড্রোমিডা, পার্সিউস, পেগাসাস পরস্পরের কাছাকাছি দৃশ্যমান এই কয়টি মণ্ডল আর দূরে পেগাসাসের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিককার সিটাস নামক একটি মণ্ডলকে গ্রীক পুরাণের একটি কাহিনীর বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কাহিনীটি পরে বলব, আপাততঃ এই মণ্ডলগুলির পরিচয় দিই।

পেগাসাস মণ্ডল অগ্রহায়ণের আকাশকে দেয় একটা বিশিষ্ট রূপ। সন্ধ্যার সময় এই মণ্ডল থাকে ঠিক মাথার উপর, নয়টা সাড়ে নয়টা নাগাদ সরে আসে একটু পশ্চিম দিকে। ঐ সময় মাথার উপরকার মাঝ আকাশের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিকে একটু পশ্চিম দিকে প্রসারিত করলে দেখা যায়—চার কোণায় চারটি তারা একটা প্রকাণ্ড বর্গক্ষেত্রের মত রচনা করেছে। অবশ্য তারাগুলিকে মনে মনে একটা কল্পিত রেখার দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতে হবে। এই বর্গক্ষেত্রটিই হচ্ছে পেগাসাস বা বীর পার্সিউসের সাদা ডানাওয়ালা পক্ষিরাজ ঘোড়া। যে সকল স্থানের আকাশ পরিষ্কার সেগুলিতে এই বর্গক্ষেত্রের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় ১০২টি তারা গুনতে পারা গেছে।

পেগাসাসের উত্তর-পূর্ব্ব দিকের মাঝারি রকমের উজ্জ্বল তারাটির নাম উত্তর ভাদ্রপদ আর এর কোণাকোণি উল্টাদিকে যে তারাটি দেখতে পাওয়া যায় তার নাম পূর্ব্ব ভাদ্রপদ। উত্তর ভাদ্র-পদ হচ্ছে এন্‌ড্রোমিডা নামক আর একটি মণ্ডলের তারা। এখন পেগাসাসকে মনে মনে কল্পনা করা যাক একটি ঘুড়িরূপে। উত্তর-ভাদ্রপদ থেকে সুরু হয়েছে এই ঘুড়ির লেজ। এই লেজটি একটু বাঁকা ভাবে চলে গেছে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। ঘুড়ির লেজের দিকের তারাটি আর দুটি তারা—একই বক্র রেখায় অবস্থিত এই তিনটি তারা নিয়ে এন্‌ড্রোমিডা মণ্ডল।

এন্‌ড্রোমিডা মণ্ডলের দ্বিতীয় তারাটির উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি অনুজ্জ্বল তারা দেখা যায়। এই তারাটি থেকে পশ্চিম দিকে তাকালে খানিকটা জায়গায় 'লেপে দেওয়া আলো'র মত চোখে পড়ে—এটি হচ্ছে এন্‌ড্রোমিডা এম-৩১ নেবুলা (M 31 in Andromeda) বা মহা নীহারিকা। সংস্কৃতে নীহারিকাকে নভস্তুও বলা হয়। 'একস্ট্রা-গ্যালাকটিক নেবুলে' নামে যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নীহারিকাদের একটা সুনির্দ্দিষ্ট আকার আছে এটি তাদের অন্যতম। এই ঘূর্ণমান নীহারিকা থেকে যে আলোক বিকীর্ণ হয় তার প্রকৃতি অনুসারে একে বলা হয় শ্বেত নীহারিকা (White Nebula)। আমাদের নক্ষত্র-জগতের মত এই এন্‌ড্রোমিডা নীহারিকা বহু কোটি

তারকাসমন্বিত আলাদা একটি নক্ষত্র-জগৎ। খালি চোখে এই নীহারিকাটিকে ঝাপসা আলোর মত দেখতে পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিদ মারিয়াস ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে দূরবীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে বর্ণনা করেছিলেন এটিকে দেখায় "শিং-এর ভেতর দিয়ে দৃশ্যমান মোমবাতির আলোর মত"। এই নীহারিকা থেকে আমাদের পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে ৮ লক্ষ বছর আর এটি এত বিরাটায়তন যে, এর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে আলো পৌঁছুতে লাগে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, পেগাসাসকে যদি ঘুড়ি কল্পনা করা হয় তা হলে এন্‌ড্রোমিডা হ'ল ঐ ঘুড়ির লেজ। ঘুড়ির লেজটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে যে উজ্জ্বল তারাটি দেখতে পাওয়া যায় সেটি হ'ল পার্সিউস মণ্ডলের তারা। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানে তিনটি তারা আড়াআড়ি ভাবে যেন এন্‌ড্রোমিডার সীমা নির্দ্দেশ করে অবস্থিত। এটি পার্সিউস মণ্ডল—চেহারা অনেকটা ধনুকের তীরের মত—লক্ষ্য ক্যাসিওপিয়ার দিকে। এই হ'ল ক্যাসিওপিয়ার জামাতা দৈত্যহন্তা বীর পার্সিউস। হাতে তার মেডুসার কাটা মুণ্ড। পার্সিউস মণ্ডলের আলগল বা দৈত্যতারা খুব উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র, কিন্তু দু'দিন একুশ ঘণ্টা অন্তর এর উজ্জ্বলতা অত্যন্ত কমে আসে। আমাদের জ্যোতিষে এই তারাটির নাম মায়াবতী।

গর্ব্বিতা রাণী ক্যাসিওপিয়ার স্বামী সিফিউসকে দেখতে পাওয়া যাবে তাঁরই খুব কাছাকাছি উত্তর-পশ্চিম দিকে। পাঁচটি তারা মিলে মন্দির বা গীর্জ্জার মত আকৃতিবিশিষ্ট একটি মণ্ডলের সৃষ্টি করেছে—এটিই সিফিউস মণ্ডল—এর সব কয়টি তারাই ক্ষীণপ্রভ। পেগাসাস মণ্ডলের পূব দিকের বাহুটিকে দক্ষিণ দিকে বাড়িয়ে দিলে সেটি ইংরেজী V অক্ষরের মত মীন রাশির একটি বাহুকে অতিক্রম করে একটি মাঝারি রকমের উজ্জ্বল তারার কাছ দিয়ে যাবে—এটি হ'ল সিটাস মণ্ডলের তারা। এই সিটাস মণ্ডল বৃহত্তম নক্ষত্রমণ্ডলসমূহের মধ্যে একটি। মাইরা সেটি নামক আশ্চর্য্য তারাটি এই মণ্ডলেই অবস্থিত। ক্রমাগত এর আলোর পরিবর্ত্তন হয় আর এগার মাস পরে এটি অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

সিফিউস, ক্যাসিওপিয়া, এন্‌ড্রোমিডা, পার্সিউস, পেগাসাস পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থিত এই কয়টি আর সিটাস এই সাতটি নক্ষত্রমণ্ডল নিয়ে গ্রীক পুরাণের যে কাহিনীটি রচিত হয়েছে, আরাটাস অব সলি নামক খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের জনৈক গ্রীক কবির বর্ণনা অনুযায়ী সেটি বলছি।

রাণী ক্যাসিওপিয়া ছিলেন অত্যন্ত গর্ব্বিতা, মেয়ে এন্‌ড্রোমিডার রূপের জন্য তাঁর দেমাকের আর অন্ত ছিল না। এতে অপ্সরাদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হ'ল। বরুণদেবতার নিকট গিয়ে তারা তাঁর শাস্তির দাবি করলে। বরুণের আদেশে সিফিউস্ স্বয়ং এন্‌ড্রোমিডাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে গিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখলেন এক পাহাড়ের গায়ে। দূর থেকে ক্যাসিওপিয়া আর সিফিউস দেখছেন—সিটাস নামক সাগর-দৈত্য এগিয়ে আসছে এন্‌ড্রোমিডার দিকে তাকে গিলে খাবার জন্যে। কিন্তু তাঁরা নিরুপায়—কোন প্রতিকার করবার ক্ষমতা নেই তাঁদের। হঠাৎ শোনা যায়, আকাশ-পথে সাদা ডানাওয়ালা পক্ষিরাজ পেগাসাসের পক্ষ-বিধুনন শব্দ। তাতে সওয়ার হয়ে এসেছেন বীর পার্সিউস—এণ্ড্রোমিডার ত্রাণকর্ত্তা। তড়িৎ-গতিতে পেগাসাস থেকে অবতরণ করে তিনি তাঁর করধৃত মেডুসার কাটা মুণ্ডটি দিলেন দৈত্য সিটাসকে। সঙ্গে সঙ্গেই সে রূপান্তরিত হয়ে গেল পাথরে, তার পর শৃঙ্খল মোচন করে এণ্ড্রোমিডাকে উদ্ধার করলেন বীর পার্সিউস।
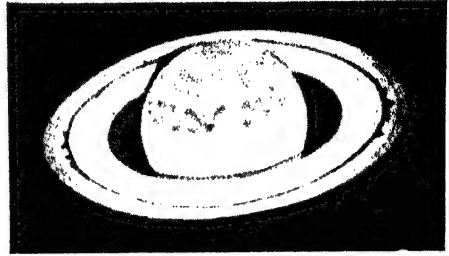
বলয়সমন্বিত শনিগ্রহ
(ইটালীয়ান চিত্রকর মেস্তোর ম্যাজ্জিনি কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি)

অগ্রহায়ণ মাসে আর যে দুটি নক্ষত্রমণ্ডল বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা হ'ল প্রজাপতি বা অরিগা (Aurigae) আর কালপুরুষ বা ওরায়েন (Orion)। অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে রাত নয়টা সাড়ে নয়টা নাগাদ প্রজাপতি উঠে আসে পূর্ব্ব দিগন্তের বহু ঊর্দ্ধে পার্সিউসের কাছাকাছি একটু পূব দিকে তাকালেই প্রজাপতিমণ্ডলকে দেখতে পাওয়া যাবে। ঠিক যেন একটি মহাকায় প্রজাপতি আলোর পাখা মেলে উড়ে চলেছে পূব থেকে পশ্চিম আকাশের পানে—যে কয়টি তারা মিলে অরিগাকে এই সুনির্দিষ্ট আকৃতি দিয়েছে তাদের মধ্যে ছয়টিকে খালি চোখে অনায়াসে দেখতে পাওয়া যায়। ধ্রুবতারা থেকে একটি রেখা কল্পনা করলে এটি চলে যাবে সরাসরি প্রজাপতিমণ্ডলের উপর দিয়ে। এই মণ্ডলের উত্তরদিকে হলদে রঙের ব্রহ্মহৃদয় (Capella) বা (Alpha Aurigae)। তারাটি এরূপ স্বয়ম্প্রকাশ যে, এটিকে আর চিনিয়ে দিতে হয় না, শীতকালের রাতের আকাশকে এই তারাটি দেয় একটা বিশিষ্ট রূপ। আপন প্রভায়ই এটি নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ করে। ক্যাপেলার নিকটে যে তিনটি উজ্জ্বল তারা ছোট অক্ষরের মত আকৃতির সৃষ্টি করে অবস্থান করছে তা দেখেও এই তারাটিকে চেনা যায়। ঐ নক্ষত্রত্রয়কে বলে Haedi, মানে ছাগলছানা, আর 'ক্যাপেলা' হচ্ছে অজা। আকাশের উত্তর গোলার্দ্ধে ব্রহ্মহৃদয় আর বীণামণ্ডলের অভিজিৎ বা 'ভেগা' এ দুটিই হচ্ছে আর সকল তারার চেয়ে উজ্জ্বল—আর গোটা আকাশে ব্রহ্মহৃদয় হচ্ছে পঞ্চম উজ্জ্বলতম তারা—এর দূরত্ব ৫২ আলোকবর্ষ।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের আকাশের আর এক শোভা কৃত্তিকাপুঞ্জ

বা সাতভাই। অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ার দিকে রাত ন'টা সাড়ে ন'টার সময় কৃত্তিকা আকাশের অনেকখানি উপরে উঠে আসে। ঐ সময় খমধ্য বা সুবিন্দুর (Zenith) দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিকে সরাসরি একটু পূব দিকে প্রসারিত করলে যে ছোট একটি আলোর মৌচাকের মত দেখতে পাওয়া যায় ঐ হ'ল কৃত্তিকা। গোটা আকাশে এত ছোট আলোর ফুটকি দিয়ে তৈরী নক্ষত্রপুঞ্জ বা তারাগুচ্ছ আর নেই, কৃত্তিকাকে দেখলেই চেনা যায়। কৃত্তিকা নক্ষত্রে খুব কাছাকাছি ছয়টি তারা গুনতে পারা যায়—যাঁদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর তাঁরা সাতটিও দেখতে পান। 'কৃত্তিকা' শব্দের অর্থ কর্তন করবার অস্ত্র, অর্থাৎ কাটারি। তারাগুলিকে কল্পিত রেখা দ্বারা যোগ করলে একটা ছেদনাস্ত্রের আকৃতি পাওয়া যেতে পারে। কৃত্তিকার গ্রীক নাম—প্লাইয়াডস (Pleiades)। Pleiones—বহু থেকে উৎপন্ন বলে
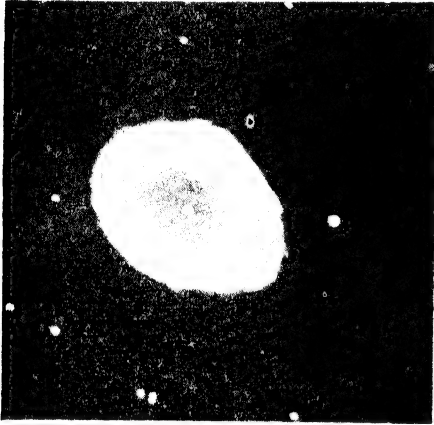
লাইরা বা বীণামণ্ডলের এম-৫৭ ধূম্রবলয় (Smoke-Ring) নীহারিকা

এই নাম। গ্রীক পুরাণে প্লাইয়াডস বা কৃত্তিকাগণ হায়েডস (Hyades) বা রোহিণীর ভগ্নী। এরা সাত জন হলেও—ছয় জন দৃষ্টিগোচর হতেন এবং এক জন থাকতেন অদৃশ্য। এরা সকলেই কুমারী।

কৃত্তিকায় ছয়টি তারা সহজেই দেখা যায় বলে হিন্দুগণ একে বলেন ষষ্ঠীমাতা। কৃত্তিকাকে নিয়ে হিন্দুপুরাণেও একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী আছে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী যে তাঁর নিকটে অবস্থান করছেন সেকথা আগে বলেছি। ঐ মণ্ডলের অপর ছয় জন ঋষির পত্নীরা কিন্তু অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতা ছিলেন না। অগ্নিদেব এই সাত জন ঋষিপত্নীকে দেখে তাঁদের রূপে মুগ্ধ হলেন। দক্ষকন্যা স্বাহা জানতে পারলেন অগ্নির মনোভাব। তিনি সতী অরুন্ধতী ছাড়া ক্রমে ক্রমে আর ছয় ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করে অগ্নিদেবকে ভজনা করেছিলেন। এতে প্রমাণ হ'ল যে, ঐ ছয় জন ঋষিপত্নী স্বামীদের প্রতি নিষ্ঠাবতী নন। এই অপরাধে তাঁরা নিজ নিজ স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র অবস্থান করছেন ছয় জন কৃত্তিকারূপে। এরাই হলেন স্কন্দ বা কার্ত্তিকের মাতা এবং ষষ্ঠীদেবীরূপে হিন্দুরা এদেরই পূজা করে থাকেন।

কৃত্তিকার পূব দিকে রোহিণী। এতে পাঁচটি তারা ত্রিকোণ শকটাকারে সজ্জিত। রুহ ধাতু অর্থাৎ আরোহণ করা থেকে রোহিণী শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে—রোহিণী মানে যাতে আরোহণ করতে পারা যায়। একে প্রাচীনকালে রোহিণী শকট অথবা সংক্ষেপে শকটও বলা হ'ত। রোহিণী অত্যুজ্জ্বল লাল রঙের তারা—এই হ'ল বৃষরাশি।

রোহিণীর পূব দিকে মৃগশিরা—ছোট ছোট তিনটি তারা নিয়ে গঠিত মৃগশিরাকে কল্পনা করা হয় কালপুরুষের মস্তকরূপে। কালপুরুষ শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে ভোর চারটায়, আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রি বারোটায় এবং অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রি আটটায় পূর্ব্বদিকে উদিত হয়—অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত নয়টা সাড়ে নয়টার সময় কালপুরুষ পূর্ব্বদিগন্তের ৪৫° ডিগ্রীরও উপরে উঠে আসে। এই কালপুরুষ বা ওরায়েন (Orion) নক্ষত্রমণ্ডলই তারাভরা আকাশের শ্রেষ্ঠ শোভা—গোটা আকাশে এই নক্ষত্রমণ্ডলের তুলনা মেলে না। মনে মনে কল্পিত রেখা দ্বারা এর ১৩টি তারা যোগ করলে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি পাওয়া যায়। এই কালপুরুষকে না চিনতে পারলে নক্ষত্রখচিত আকাশের শ্রেষ্ঠ রূপ দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। কালপুরুষকে চিনে নেওয়ার একটি সহজ উপায় আছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত আটটার পরে পূব আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় পরস্পরের খুব কাছাকাছি তিনটি তারা তেরছা ভাবে আকাশের গায়ে শোভা পাচ্ছে। পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে একেই বলা হয় ওরায়েন অর্থাৎ শিকারীর কোমরবন্ধ। সমস্ত আকাশে একমাত্র একুইলা মণ্ডলের একই রেখায় অবস্থিত তিনটি তারা ছাড়া কাছাকাছি এই ধরনের অবস্থানে নক্ষত্রত্রয় আর দেখা যায় না। মাঝখানের তারাটি থেকে দুদিকের দুটি তারার দূরত্ব প্রায় সমান। কোমরবন্ধটিকে চিনতে পারলে কালপুরুষের হাত পা ইত্যাদি বের করাও কঠিন হবে না। কোমরবন্ধ থেকে নীচের দিকে ঝোলানো তিনটি তারা ওরায়েনের তলোয়ার। কোমরবন্ধের মাঝের তারাটির সরাসরি নীচেকার তলোয়ারের হাতলে আছে ওরায়েনের মহা নীহারিকা—দূরবীক্ষণের সাহায্যে মহাকাশে যে সকল সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক জিনিষ দেখতে পাওয়া যায় এটি তাদের অন্যতম। নীহারিকাকে দুইটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—একশ্রেণীর নীহারিকার নির্দিষ্ট আকার আছে—এই শ্রেণীর অন্তর্গত মহা নীহারিকা এম—৩১ এণ্ড্রোমিডার কথা পূর্ব্বে বলেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর নীহারিকার কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট আকৃতি নেই। কোনো ঘরে আগুন লাগলে পরে ধোঁয়া যেমন করে শূন্যে ভেসে বেড়ায়, শেষোক্ত শ্রেণীর নীহারিকাকেও মহাকাশে তেমনি সঞ্চরমাণ সাদাকালো ধূম্রপুঞ্জের মত দেখায়। এগুলি হচ্ছে ছায়াপথের সীমানার মধ্যে এক তারা

থেকে অন্য তারায় প্রসারিত জড়কণা বা ধুলোর মেঘ এবং জ্বলন্ত বাষ্পরাশি। সাধারণ অগ্নিকাণ্ডে ধূম এবং অগ্নিশিখার দরুন যেমন আকাশের গায়ে লেপে দেওয়া অন্ধকার ও আলোর সৃষ্টি হয়, তেমনি নীহারিকার এই সকল জ্বলন্ত বাষ্পাদিও আকাশের বুকে আলো-আঁধারির বিচিত্র মায়ার সৃষ্টি করে। ওরায়েনের নীহারিকা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নীহারিকার সগোত্র। দূরবীক্ষণের সাহায্যে এর অন্ধকার অংশে একটি ছায়ামূর্তির মত দৃশ্যমান হয়—সেটি ঠিক যেন একটি অশ্বশিরের মত। এই নীহারিকাকে অশ্ব-শির (Horse-head) নীহারিকা বা কৃষ্ণোপসাগর (Dark Bay) নীহারিকাও বলা হয়। এতে যে Silhouette বা সাদার উপর কালো রঙের চিত্রের আদরা দেখা যায় তার কারণ এই যে, মহাজাগতিক ধূলি-কণার (Cosmic Dust) মেঘপুঞ্জ পটভূমিকার তারাসমূহের আলো-কে ঢেকে রাখে।

ত্রিকোণাকারে অবস্থিত ছোট ছোট তিনটি তারা নিয়ে গঠিত মৃগশিরা বা কালপুরুষের মস্তকের কথা আগেই বলা হয়েছে। কালপুরুষের ডান দিকের বাহুর উপরকার যে লাল তারাটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার নাম আর্দ্রা বা বেটেলজিয়ুস (Betel-geuse)। এর ব্যাস ২০ কোটি মাইল, এর মধ্যে বহু কোটি সূর্যের স্থান হতে পারে। আর্দ্রা কথাটার মানে সিক্ত। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে স্বর্গের নদী ছায়াপথ, কাজেই এ সিক্ত। কাল-পুরুষের বাম বাহুর উপরের তারাটির নাম কার্ত্তিকেয় (Bella-trix)। বাঁ পায়ের উপর যে নীলাভ সাদা তারাটি দেখতে পাওয়া যায়—যাকে একটি এড়ো রেখা দ্বারা আর্দ্রার সঙ্গে যুক্ত করা চলে—ঐ হ'ল বাণরাজা বা রিগেল (Rigel)—উজ্জ্বল্যের ক্রম-অনু-সারে একে বলা হয় 'বিটা ওরায়েনিস' (Beta Orionis)—অর্থাৎ কালপুরুষ মণ্ডলের দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারা। এই বাণরাজা একটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল তারা। এর ক্যাণ্ডেল পাওয়ার সূর্যের চেয়ে পনের হাজার গুণ বেশী।

কালপুরুষের ডান পায়ের তারাটির দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে, ঋক্ষ বা বড় কুকুর মণ্ডলের লুব্ধককে—যার গ্রীক নাম আলফা ক্যানিস ম্যাজোরিস। সমগ্র আকাশে এই লুব্ধকই হচ্ছে উজ্জ্বলতম তারা। এর থেকে যে হরেক রঙের আলোক বিকীর্ণ হয় তা এই নক্ষত্রটিকে দিয়েছে এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। আসলে এটি একটি সাদা তারা, কিন্তু আকাশের গায়ে এটি এরূপ ভাবে ঝিকমিক করে যে, মনে হয় এটি যেন অতি দ্রুত পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন রঙের আলো বিকিরণ করছে। লুব্ধক বা সিরিয়াসকে বলা হয় Monarch of the Skies অর্থাৎ আকাশ-সম্রাট। কয়েকটি অনুজ্জ্বল তারা নিয়ে গঠিত বড় কুকুর মণ্ডলের চারপাশে অনেকখানি

তারকাহীন ফাঁকা জায়গা। এই পরিবেশে স্বকীয় প্রদীপ্ত মহিমায় বিরাজিত এই আকাশ-সম্রাট স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন :—

"I am the monarch of all I survey
My right there is none to dispute."

লুব্ধকের বন্ধ নিয়ে দেখা যায়, Argo Navis নামক বিরাট মণ্ডলকে। এই মণ্ডলটী আকারে এত বৃহৎ যে, এটিকে সাধারণতঃ কোরিণা, Puppis এবং vela এই তিনটী ক্ষুদ্রতর মণ্ডলে বিভক্ত করাই সুবিধাজনক বলে জ্যোতিষীরা মনে করেন। স্নিগ্ধ প্রভা-বিশিষ্ট অগস্ত্য বা canopus কেরিনা মণ্ডলের তারা। ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে লুব্ধকের পরেই এর স্থান। এর দূরত্ব কল্পনাতীত বলেই এটিকে লুব্ধক থেকে ঈষৎ অল্প দ্যুতিমান দেখায়। অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা আছেন স্বামীর নিকট থেকে একটু দূরে ছোট একটি তারার আকারে।

কালপুরুষের পায়ের দিকে বাণরাজা থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলি তারা আঁকা-বাঁকা পথে পশ্চিম দিকে এগিয়ে শেষে মোড় ঘুরে বরাবর দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। এই মণ্ডল আকাশের একটা বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আছে—এ হ'ল এরিডানাস বা স্বর্গনদী—দেখতে ঠিক সর্পিল-গতি নদীর মত—এরিডানাসও আকাশের বৃহত্তম মণ্ডলগুলির অন্যতম। খালি চোখে এই মণ্ডলে দেখতে পাওয়া যায় প্রায় তিনশ'টি তারা—তন্মধ্যে কেবলমাত্র শেষেরটি ছাড়া কোনটিই তৃতীয় শ্রেণীর উজ্জ্বল তারার চেয়ে উজ্জ্বলতর নয়। ঐ তারানদীর শেষ-প্রান্তস্থিত এই নীল রঙের প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল তারাটির নাম আখার্নার (Achernar)।

লাইরা বা বীণামণ্ডল এবং একুইলা (ঈগল) এই সময়ে পশ্চিম আকাশে দৃশ্যমান। বীণা মণ্ডলের পূবদিকে আর একই স্তরে দেখা যায় সিগনাস (Cygnus) বা হংসপুচ্ছকে। এটিকে উত্তর ক্রুশও বলে, আমাদের জ্যোতিষে এর নাম হংসপুচ্ছ। বিরাট ক্রুশচিহ্নের আকারের এই মণ্ডলটিকে চেনা সহজ। ক্রুশের উত্তর প্রান্তের প্রথম-প্রভা নীল রঙের তারাটির নাম দেনেব (Alpha cygni)। হংসের পুচ্ছের উপর এটি শোভা পাচ্ছে। হংসের দীর্ঘ-প্রসারিত গ্রীবার অগ্রভাগে, চঞ্চুর উপর আছে একটি পরম রমণীয় দ্বিতীয়-প্রভা যুগল তারা—Albireo অথবা বিটা সিগনি। হংস এখন উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গায় সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে চলেছে অস্তাচলের পথে। শেলি চিনতেন এই নক্ষত্র-মণ্ডলকে—এর গতিপথের কথাও জানা ছিল তাঁর—একে উড়নশীল মরালরূপে কল্পনা করে তিনি বলেছেন—

"Yonder goes the cygnus-swan
flying southwards."

দেনেবের পশ্চিম দিকে এর একই রেখায় জ্বলছে একটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নীল রঙের তারা—এটির নাম অভিজিৎ বা ভেগা (Vega)। লাইরা (Lyra) বাবীণামণ্ডলের তারা এটি—আকাশের উত্তর গোলার্দ্ধে এটি হ'ল উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ব্রহ্মহৃদয় অপেক্ষা এর উজ্জ্বলতা বেশী। সূর্য্যের চেয়ে এটি পঞ্চাশ গুণ বেশী উজ্জ্বল—এর দূরত্ব ২৬ আলোকবর্ষ। অভিজিৎ নক্ষত্র-শোভিত বীণামণ্ডলের দিব্য সঙ্গীত শ্রবণ করে Lowell বলেছেন :—

"The Lyra whose strings give music
Audible to holy ears."

বীণামণ্ডলের অভিজিৎ এবং একুইলা বা ঈগলের প্রথম শ্রেণীর নীল রঙের তারা শ্রবণাকে (Altair) নবেম্বর মাসে রাত সাড়ে নয়টার সময় দেখা যায় পশ্চিম দিগন্তের কাছে। শ্রবণা, অভিজিৎ এবং দেনেব এই তিনটি তারা মিলে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি করেছে সেটি বিশেষ ভাবে দর্শনীয়। একুইলা মণ্ডলে একই রেখায় অবস্থিত যে তিনটি তারা দেখতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে মাঝখানের প্রথম-প্রভা তারা শ্রবণাই সর্ব্বাপেক্ষা দ্যুতিমান। একুইলার এই লক্ষণীয় নক্ষত্র-রেখাকে অনেকে সময় সময় ভুলক্রমে কালপুরুষের কটিবন্ধ বলে মনে করেন।

ছায়াপথ চলে গেছে একুইলা মণ্ডলের ভিতর দিয়ে। গ্রীক পুরাণের উপাখ্যানে আছে যে, দিব্য ঈগল উড়ে চলেছে Milky-way বা ছায়াপথ নামক সুরনদীর উপর দিয়ে।

পাশ্চাত্ত্য মতে যে মণ্ডলের নাম একুইলা হিন্দু পুরাণমতে সেটি হ'ল বিষ্ণুর বাহন গরুড় পক্ষী। এই বাহনে সমাসীন শ্রবণা (Altair) তারার উভয় দিকে উর্দ্ধে ও নিম্নে তৃতীয়-প্রভা পাশ্চাত্ত্য Tarzed (আমাদের লক্ষ্মীতারা রূপে) ও চতুর্থ-প্রভা Alshain (আমাদের সরস্বতীতারা রূপে) বিরাজিত। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী ও মাকরী সপ্তমীতে উপেন্দ্র (Altair) আদিত্যের অর্চনা হয়। এই সময় এই তারা উত্তর-পূর্ব্বাকাশে ভোর চারটার সময় প্রথম উদিত হয়। আশ্বিন পূর্ণিমায় এই তারার উদয় হয় সান্ধ্য আকাশে—তখন হিন্দুরা লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান করে থাকেন।

উত্তর ক্রুশ আর একুইলার মাঝখানে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাওয়া যায় ডেলফিনাসকে—মণ্ডলটি ছোট কিন্তু দর্শনীয়। ডেলফিনাসের পূর্ব্বদিকে খেঁকশিয়াল (Vulpecula) মণ্ডল। শ্রবণা নক্ষত্রের প্রায় সরাসরি উত্তর দিকে আছে চারিটি অনুজ্জ্বল তারা নিয়ে গঠিত তীরের মত আকৃতিবিশিষ্ট সেজিটা নামক ছোট একটি মণ্ডল।

এবার ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ (ecliptic) ধরে এগিয়ে যাওয়া যাক পশ্চিম থেকে পূব দিকে। সিগনাসের দক্ষিণে—অনেক দূরে একুইলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে আকাশের গায়ে দুলানো যেন একখানি হীরের মালা। দেখলে মনে হয় চোখ দুটি বাস্তবিকই সার্থক হ'ল—ঐ হ'ল মকররাশি। মকর এখন এগিয়ে আসছে পশ্চিম দিগন্তের পানে।

মকরের পূব দিকে কুম্ভরাশি—দেখতে একটি কলসীর মত—আকাশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে এই কুম্ভরাশি। শত-ভিষা মণ্ডল হচ্ছে এই রাশির প্রসিদ্ধ তারামণ্ডল। কুম্ভের ঠিক দক্ষিণ দিকে ক্রান্তিবৃত্তের অনেক নীচে দক্ষিণ মীন (Piscis Australis)। দক্ষিণ মীন কতকগুলি তারা নিয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র মণ্ডল। এই মণ্ডলে একটি মাত্র তারা দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। সেটি

হ'ল একটী নীল রঙের প্রথম-প্রভা উজ্জ্বল তারা—নাম ফোমালো (Fomalhaut)। ফোমালো থেকে এরিডানাস মণ্ডলের আখার্ণার পর্য্যন্ত একটি রেখা কল্পনা করে সেটিকে যদি একই দিকে সমান দূরত্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত করা যায় তা হ'লে গিয়ে পৌঁছানো যায় দ্যুতিমান তারকা অগস্ত্যে—লুব্ধকের পরে সমগ্র আকাশে এটিই যে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র সেকথা আগে বলা হয়েছে।

রবিমার্গ ছেড়ে অনেক দক্ষিণে নেমে আসা গেছে। আবার উত্তরমুখী হয়ে কুম্ভে ফিরে গিয়ে পূব দিকে অগ্রসর হ'লে পৌঁছানো যাবে ইংরেজী V অক্ষরের মত আকৃতিবিশিষ্ট মীনরাশিতে। এর আকৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের কতকটা সাদৃশ্য আছে। মীনের পূব দিকে মেষ রাশি—ক্রান্তিবৃত্তের প্রথম রাশি—বৈশাখ মাসে সূর্য্য এই রাশিতেই গতিশীল বলে প্রতীয়মান হয়। মেষের পূর্ব্ব দিকে বৃষ। বৃষের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে মিথুনরাশি। মিথুনের শিরোভূষণরূপে জ্বল জ্বল করে কমলা রঙের উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয় ক্যাষ্টর (Castor) ও পোলাক্স (Pollux)। আমরা এদের বলি, পুনর্ব্বসু। পুরাণকারেরা এ দুটিকে যম-যমী দুই ভ্রাতা-ভগ্নী বলেছেন, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উৎসব এই দুটি তারকাকে উপলক্ষ করে কল্পিত হয়েছে। উত্তর আকাশে ক্যাষ্টরই সম্ভবতঃ সবচেয়ে সুন্দর যুগ্মতারা (binary star)। ছোট দূরবীক্ষণেও এটিকে পরম রমণীয় দেখায়। এই যুগ্মতারার দূরত্ব প্রায় ৪৩ আলোকবর্ষ। প্রত্যেক ৩০৬ বৎসরে এই যুগ্মতারার মধ্যে একটি অপরটির চতুষ্পার্শ্ব ঘুরে আসে।

আমাদের ক্রান্তিবৃত্ত পরিক্রমা শেষ হ'ল। নক্ষত্রমণ্ডলসমূহ কিন্তু সারা রাত ধরে আকাশ প্রদক্ষিণ করে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে শেষ রাত্রে উঠে যদি আকাশের পানে তাকানো যায় তা হ'লে দেখা যাবে আকাশের রূপ বদলে গেছে। নক্ষত্রমণ্ডলগুলির মধ্যে কোন কোনটি অস্তমিত—অনেকেই স্থান পরিবর্ত্তন করেছে—কালপুরুষ চলে এসেছে পূর্ব্বাকাশ থেকে সরাসরি পশ্চিম আকাশে। ক্যাসিওপিয়া অদৃশ্য আর উত্তর-পূর্ব্বাকাশে ফুটে উঠেছে বিরাট জিজ্ঞাসাচিহ্নের মত আকৃতিবিশিষ্ট সপ্তর্ষিমণ্ডল—প্রশান্ত মৌন মহাকাশের বুকে অগ্নি অক্ষরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে যেন সেই চিরন্তন প্রশ্ন—ততঃ কিম্?*
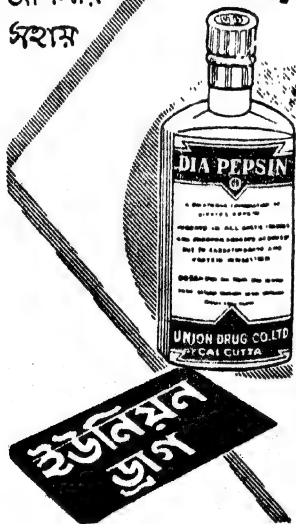
*এই প্রবন্ধরচনায় নিম্নলিখিত পুস্তক এবং পত্রিকা থেকে অল্পবিস্তর সাহায্য পেয়েছি :

(১) The Universe Around us—by Sir James Jeans, (২) The Stars in their Courses—by Sir James Jeans (৩) New Handbook of the Heavens—by H. J. Bernhard, D. A. Bennett, H. S. Rice. (৪) আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, (৫) পৌরাণিক উপাখ্যান—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, (৬) বিশ্বপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (৭) সহজ নক্ষত্র চেনা—শ্রীকামিনীকুমার দে, (৮) ভারতে জ্যোতিষচর্চ্চা ও কোষ্ঠী-বিচারের সূত্রাবলী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল জ্যোতিঃশাস্ত্রী, (৯) আকাশকাহিনী—শ্রীকৃষ্ণলাল সাধু এবং (১০) The Astrological Magazine.

দেশ-বিদেশের কথা

নিবেদিতা বক্তৃতা

১৯৫২ সনে অনুষ্ঠিত নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ভগিনী নিবেদিতার অনুরাগী দেশবাসীর নিকট হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, "নিবেদিতা সুবর্ণ জয়ন্তী পরিষদ" কর্তৃক তাহা হইতে ৫০০০৲ টাকার গ্রি পি. নোটস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "নিবেদিতা বক্তৃতা"র ব্যবস্থার জন্য সিণ্ডিকেটের নিকট জমা করা হয়। বক্তৃতার বিষয় এবং বক্তা নির্ব্বাচনের দায়িত্ব সিণ্ডিকেটের উপরই ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৬ সনে প্রথম বক্তৃতার ব্যবস্থা হইতেছে। আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০শে নভেম্বর "দ্বারভাঙ্গা হলে" অপরাহ্ণ ৩ টার সময় বক্তৃতা হইবে। বক্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন রামকৃষ্ণমিশন বিদ্যামন্দিরের (বেলুড়) অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ। বক্তৃতার বিষয়—ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও কীর্ত্তি।

দেখুন!
অর্দ্ধেকটী
সানলাইট
সাবানেই এ সব
কাচা হয়েছে!
সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারন!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট
সাবান
দিয়ে কাচলে কাপড়জামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।
ভারতে প্রস্তুত

কল্পতরু-শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা—শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত মহেশ লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ সিকা।

হিন্দুর জীবনে গীতার প্রভাব অসামান্য। নানা ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে গীতা শুধু 'সূত্রে মণিগণা ইব' নহে, সাহিত্যেও ইহা প্রেরণা দেয়, ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সমাদৃত। সাম্প্রতিককালে বহু মনীষী গীতাকে সর্ব্বমানবের জীবন-বেদ বলিয়াছেন। এহেন অমূল্য গ্রন্থের বহুবিধ সংস্করণ আছে। অন্বয়, ভাষ্য, ব্যাখ্যা সমন্বিত সুবৃহৎ সংস্করণ হইতে শুধু মূল শ্লোক নিবদ্ধ ক্ষুদ্রকায় সংস্করণ পণ্ডিত কিংবা সাধারণ মানুষ দুইয়ের উপযোগী গীতাই চোখে পড়ে। বাংলা পদ্যছন্দে গীতাও আছে—কিন্তু মূল সংস্কৃত শ্লোক তাহাতে নাই, পক্ষান্তরে শুধু সংস্কৃত শ্লোক আছে—বাংলা ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু পাশাপাশি সংস্কৃত ও বাংলা পদ্যানুবাদ আলোচ্য কল্পতরু গীতাতেই দেখা গেল। শ্লোকগুলি মূলানুযায়ী—ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল, কবিতাগুলিও ভাবমাধুর্য্যভরা; সুলভ মূল্যের এমন একখানি সুন্দর গীতা অবশ্যই সমাদর লাভ করিবে।

মামার দেশ—(একাঙ্ক কৌতুক নাটিকা)। শ্রীঅময়কুমার দত্ত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য বার আনা।

'প্রিণ্টার্স ডেভিল' কথাটির সঙ্গে অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে, কিন্তু তাহারই মাধ্যমে ছাপাখানায় প্রতিদিন যে কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়—তাহার আস্বাদ পাঠকমহল কদাচিৎ পাইয়া থাকেন। সেই জাতীয় একটি ভুলকে কেন্দ্র করিয়া আলোচ্য নাটকখানিতে চমৎকার হাসির ভোজ্যপরিবেশন করিয়াছেন লেখক। ঝুনো ব্যবসায়ী এক প্রেস ম্যানেজার, অল্প বেতনের কর্ম্মচারী লইয়া তাঁহার কারবার। সেখানে তোৎলা হেড কম্পোজিটার, তার দু'জন সহকর্ম্মীর মধ্যে প্রথমটি ট্যারা ও ছিটগ্রস্ত, দ্বিতীয় জন নেশাখোর, একচক্ষু প্রুফরীডার, উগ্র মেজাজের মেশিনম্যান—প্রভৃতির যোগাযোগে কৌতুক-নাটিকাটি জমিয়াছে চমৎকার। এই ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয়ের একটা সুবিধাও আছে—সজ্জাবাহুল্য বা অর্থব্যয়ের কোন প্রশ্নই আসে না। ছোট বা বড় সমস্ত সম্মেলন মঞ্চের সাহায্য না লইয়াও অনায়াসে এটি অভিনয় করিতে পারেন। সম্প্রতি ইণ্টার-কলেজ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র-সংসদ অভিনীত এই নাটিকাটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। নাটিকাটির গ্রন্থন যেমন সুন্দর—কৌতুকরসের ধারাটিও তেমনি স্বচ্ছ এবং সাবলীল, কোথাও কষ্টকল্পনার লেশমাত্র নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রাজা গণেশের আমল—শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। শৈলশ্রী, ১।১।১-এ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই নাতিক্ষুদ্র (পৃ. ১৪২+৷৶০) পুস্তক আমরা বিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইতিহাস ও জীবনীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিরোধী কল্পনাবিলাস যে ভাবে খরতর গতিতে বাংলা সাহিত্যকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে তাহাতে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণা বাংলাদেশে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। উদীয়মান গ্রন্থকার বাংলা ভাষায় এই গবেষণাগ্রন্থ লিখিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন যাঁহারা "বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস" জাতীয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রাজা গণেশকে রূপকথার নায়ক সাজাইয়া তৃপ্তিবোধ করেন—বহু শিক্ষিত বাঙালী অদ্যাপি করিতেছেন—তাঁহারা আলোচ্য গ্রন্থটি একবার পড়িয়া দেখুন। বর্ত্তমানে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে রাজা গণেশের রাজত্বের উপর প্রচুর আলোকপাত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার যাবতীয় উপকরণ বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন-মণ্ডন করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কোন কোন ঘটনার বৈচিত্র্য এতই চিত্তাকর্ষক যে, রূপকথাকেও পরাস্ত করিতে পারে। মিথিলার রাজা শিবসিংহের সহিত রাজা গণেশের প্রামাণিক সহযোগ-বৃত্তান্ত (পৃ. ২২), কৃত্তিবাস ও চৈনিক প্রত্যক্ষদর্শী কর্ত্তৃক তাঁহার "নয় মহল" প্রাসাদবর্ণনা (পৃ. ১২৯-৩০), রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের অভ্যুদয় (পৃ. ৭২-৮৭) প্রভৃতি চিত্র প্রত্যেক বাঙালীর দর্শনীয়। গ্রন্থকার প্রামাণিক কুলপঞ্জীর বৃত্তান্ত সাদরে বিশ্লেষণ করিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা অন্যত্র অপ্রাপ্য। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

চক্রবাক—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। প্রফুল্ল-কুমুদ লাইব্রেরী, ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৪৲।

'শতাব্দী' 'কুরপালা' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া শ্রীরমেশচন্দ্র সেন খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। চক্রবাক এই খ্যাতিমান লেখকেরই রচিত আর একখানি রমণীয় উপন্যাস। ইহার নায়ক সুশান্ত, বিপুল প্রাণশক্তির অধিকারী এক সুশ্রী যুবক। সে একাধারে কবি এবং গায়ক—অভিনয়কলায়ও তার নৈপুণ্য কম নয়। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বাঙালী-সমাজে সে ব্যতিক্রম। কাহিনীর প্রারম্ভে তাহাকে আমরা দেখিতে পাই খয়রাতে গহনাবিক্রেতারূপে। সেখানে সে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিল বন্ধু সন্তোষের গৃহে। বন্ধু-পত্নী মন্দারের অনুপম যৌবনশ্রী এবং অক্লান্ত সেবা তাহাকে মুগ্ধ করিল। খয়রা হইতে সে গেল চন্দ্রিকায়। এই পাহাড়িয়া দেশে দীর্ঘকাল পরে তাহার দেখা হইল বালবিধবা সরযূর সঙ্গে। জীবনে প্রথম সে ভালবাসিয়াছিল এই সরযূকেই, তাহার কবি-মন এই প্রথম প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই রচনা করিয়াছিল এক নিরূপম স্বপ্নলোক—কিন্তু চন্দ্রিকায় আসিয়া বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। সে দেখিল, ব্যাধির আক্রমণে সরযূ হইয়াছে শ্রীহীনা—অকাল বার্দ্ধক্যে নিঃশেষিতপ্রায় তাহার যৌবন-লাবণ্য—কেশে তাহার পাক ধরিয়াছে। সরযূর পরম বেদনার স্থানটিতে সুশান্ত ঘা দিল নির্ম্মম ভাবে। কিন্তু চন্দ্রিকা হইতে ফিরিবার পরেই সুশান্তর জীবনে দেখা দিল নিদারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়। অবশ্য ইহার জন্য দায়ী যে সরযূর অবিমৃষ্যকারিতা তাহা সুশান্ত তখন জানিতেও পারিল না। শেষ পর্য্যন্ত গহনাবিক্রয়ের কাজটি গেল—মেস ছাড়িয়া তাহাকে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইল হাওড়ায় এক বস্তিতে নোংরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে। জীবিকার জন্য তাহাকে ফিরিওয়ালার ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইল।

ইহার পর সুশান্তের জীবনের স্রোত আবর্ত্তিত হইয়া চলিল উদ্দাম গতিতে। ছককাটা বাঁধাধরা জীবন তাহার নয়—সেখানে আছে রোমান্স, আছে অভাবিতের লীলা, পদে পদে নব নব বিস্ময়—অজানাকে আবিষ্কার করিবার বিপুল আনন্দ। মিনতির সঙ্গে তাহার বিবাহও এমনি এক অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক রোমান্স—কিন্তু তাহার পরিণতি হইল শোচনীয় ট্র্যাজেডিতে। সুশান্ত দৈন্যদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিল বটে, কিন্তু মন্দার সরযূ আর মিনতি এই ত্রয়ীর প্রতি প্রেম তাহার জীবনে এমন ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিল যে, পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যের মধ্যেও সে ভাসিয়া চলিল স্রোতোমুখে তৃণের মত। মিনতির অকালমৃত্যু তাহার হৃদয়কে বেদনায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল—তার সেই বেদনাবিদীর্ণ হৃদয়ে তীব্র আঘাত হানিল সরযূ। শেষ পর্য্যন্ত সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া গেল সুশান্ত।

সুশান্ত চরিত্রটি লেখকের সার্থক সৃষ্টি। তাহাকে তিনি হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়া আঁকিয়াছেন। সে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবক হইলেও এবং সামাজিক অনুশাসন না মানিয়া চলিলেও তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা স্বকীয়তা এবং জীবনের প্রতি এমনি একটা বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী আছে যে, তাহার প্রতিভা ও প্রাণশক্তির অপচয় পাঠকের মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। রযূ এবং মন্দারের প্রতি সুশান্তর যে প্রেম তাহা অবৈধ এবং সমাজবিগর্হিত, কিন্তু তাহা ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া—বিশেষতঃ সুশান্তর প্রতি মন্দারের অনতিব্যক্ত অনুরাগের বর্ণনায় লেখক যে সংযমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। চির অভিশপ্তা সরযূর জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের বর্ণনে এবং তাহার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণেও লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাই। ব্রীড়াবনতা অশ্রুমুখী মিনতি অনেকটা আড়ালে থাকিলেও, অকালে পরিসমাপ্ত তাহার ব্যর্থ জীবনের সুগভীর বেদনা কাহিনীর শেষাংশটিকে স্নিগ্ধ কারুণ্যে আর্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে সুশান্তর বন্ধু কাফ্রী যুবক 'জনে'র—যে সার্কাসে 'God's wonderful Creation' আভূমিলম্বিত দাড়িওয়ালা ছাগলটিকে দেখাইত—আচরণ এবং উক্তি মনে বেশ একটা কৌতুকমিশ্র বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

চরিত্রসৃষ্টি ছাড়া লেখক আর একটি বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—সে প্রকৃতি বর্ণনা। অল্প কথায় পল্লীপ্রকৃতির নিখুঁত এবং নিরুপম ছবি তাঁহার নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—মাঝে মাঝে সুষ্ঠু উপমাপ্রয়োগে সেই ছবি একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যেমন—"পথের দুই ধারে আকাশচুম্বী মাঠ, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দু'একটি গাছ। ঘাসগুলি বর্ষার নূতন জল

পাইয়া তাজা ও সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। ঘাসের সাদা ফুলগুলি প্রকৃতির বুকে যেন চন্দনের এক একটি ফোঁটা।"

মোট কথা, চরিত্রসৃষ্টিতে, প্রকৃতিবর্ণনায়, নিরলঙ্কৃত ভাষার অনায়াস মাধুর্য্যে "চক্রবাক" যে পাঠককে মুগ্ধ করিবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। সম্প্রতি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। বি বুক এক্সচেঞ্জ, ২১৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২৲, পৃষ্ঠা ১১৩।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে মোট ব্যয় হইয়াছে প্রায় ২০৫৬ কোটি টাকা—প্রায় বলা হইল এজন্য যে, ইহার পূর্ণ হিসাব এখনও বাহির হয় নাই। এই সময়ে ভারতের জাতীয় আয় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়াছে। তুলা, প্রধান প্রধান তৈলবীজ উৎপাদন, জলসেচের ব্যবস্থা, শিল্পোৎপাদন, সিমেন্ট উৎপাদন বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মসংস্থানের দিক হইতে ইহা সাফল্যলাভ করে নাই বলিলেই চলে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ৪,৮০০ কোটি টাকা—তন্মধ্যে ২,৫৫৯ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের এবং বাকী ২২৪১ কোটি টাকা রাজ্যসরকারসমূহের ব্যয়। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি, শিল্প ও খনি, পরিবহন ও যোগাযোগ, সমাজসেবা ও বিবিধ খাতে যথাক্রমে ৬৫, ১০৫, ৭৪৭, ১২০৩, ৩৯৬ এবং ৪৩ কোটি টাকা খরচ করিবেন এবং রাজ্যসরকারসমূহ ঐ সকল খাতে যথাক্রমে ৫০২, ৮০৮, ১৪৩, ১৮২, ৫৪৯ এবং ৫৬ কোটি টাকা খরচ করিবেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হইতেছে—জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়াইবার জন্য জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, মৌলিক ও ভারী শিল্পগুলির দ্রুত উন্নয়ন, কর্ম্মসংস্থানের সুযোগবৃদ্ধি এবং আয়ের ও ধনসম্পদের অসমতা হ্রাস ও যতদূর সম্ভব আর্থিক সংস্থানের সমবণ্টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মৌলিক শিল্পের উপর জোর দিলেও ভারতের আর্থিক জীবন গ্রাম ও কৃষিকেন্দ্রিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে মোট ১৫০ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। সরকারী মোট ৪৮০০ কোটি বরাদ্দের মধ্যে ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় এবং ৪০০ কোটি টাকা কোন সূত্রে পাওয়া যাইবে তাহা স্থির হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে. আগামী পাঁচ বৎসরে বেকারসমস্যা আরও বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যে বিঘ্ন হইবে সন্দেহ নাই। সমবায় আন্দোলনের প্রসারের জন্য ইতিমধ্যেই ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ককে ষ্টেট ব্যাঙ্কে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয়করণ হইয়াছে। অবশ্য তৎসত্ত্বেও প্ল্যানিং কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক নানা মত উদ্ধৃত করিয়া পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছেন এবং নিজেও আলোচনা-প্রসঙ্গে বিষয়টি অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

এইরূপ সুলিখিত গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

চার্বাকের উক্তি—শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪০-সি, চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ, কলিকাতা-২০। মূল্য দেড় টাকা।

গ্রন্থকার বহুদিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি একরূপ নীরব ছিলেন। তাঁর পরিণত জীবনের কাব্যসাধনার এই ফল রসলিপ্সুর সাধ মেটাবে। কতকগুলি কবিতার ভাবে ও ভাষায় আধুনিকতার স্পর্শ আছে; বোঝা যায়—কবি বয়সে প্রবীণ হলেও তাঁর মন এখনও সক্রিয়, গতিশীল। "যারা দিনের পর দিন খাটে, ভারা বাঁধে, ইঁটের উপর ইট গাঁথে"—তাদের মর্য্যাদা "শ্লথগতি মেদবহুল নরনারী"র চেয়ে তাঁর কাছে অনেক বেশী। কৃত্রিম সভ্যতার কারাগার থেকে মাঝে মাঝে মন উড়ে যেতে চায় আদিম যুগে:

"হে মহানগরী!
আজও গভীর রাত্রে
পাহাড়ের পাগলা হাওয়ায়
আমরা শুনতে পাই
অতীত অরণ্যের সেই অস্থির ক্রন্দন:
আর বেড়েই চলে তোমার ইতিহাস
পাতার পর পাতা জুড়ে।"

শেষ কবিতা 'চার্বাকের উক্তি'—ঐ নামেই বইয়ের নাম। কবির মতে "চার্বাক ছিলেন বহুজন হিতবাদী" এবং সেই জন্যই তিনি তাঁর প্রিয়। বৈরাগ্যবাদ বা পলায়নপর মনোভাবের প্রতি কবি প্রসন্ন নন। 'কয়েকটি চীনা কবিতার ভাবানুবাদ'—সরস ও সাবলীল।

আনন্দ-প্রতিষ্ঠা—শ্রীচিত্তরঞ্জন। দেব এজেন্সি, ২০ আমীর আলি এভেনিউ, কলিকাতা-১৭। মূল্য আট আনা।

অধ্যাত্ম আনন্দলাভের পথনির্দ্দেশ। বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকগণের শিক্ষা থেকে লেখক প্রেরণা পেয়েছেন। "বিদ্যা-অবিদ্যা, সম্ভূতি-বিনাশ, সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ—এই দ্বন্দ্বমূর্ত্তিগুলি যে কেবল একমাত্র আনন্দময় ব্রহ্মের দ্বিবিধ বিকাশ, এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর বাধা চিরতরে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে।" রচনার ভাষা শান্ত গম্ভীর অনুভূতিপূর্ণ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বীণাপাণি

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

'মেঘের ভেলা'' [ফোটো : শ্রীকনক দত্ত

জলপথে ফোটো : শ্রীঅজিতকুমার শ্রীমানী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৬৩

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আসন্ন নির্ব্বাচন

সম্প্রতি দৈনিক সংবাদপত্রে আচার্য্য কৃপালনীর এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি ও শ্রীজয়প্রকাশনারায়ণ কংগ্রেস দলে যোগদান করিবেন না, কারণ তিনি মনে করেন, গণতন্ত্রবাদের পরিচালনায় বিরোধীপক্ষের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

ইহা ধ্রুব সত্য। সবল ও বুদ্ধি-বিচারযুক্ত বিরোধীপক্ষ সর্ব্বদাই শাসনতন্ত্রের অধিকারীদিগের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সজাগ থাকে ও সেরূপ কিছু ঘটিলে যুক্তিতর্কের সাহায্যে তাহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, যাহার ফলে দেশের লোক বুঝিতে পারে শাসন-তন্ত্র কি ভাবে চলিতেছে ও তাহার গতি কোন্ দিকে। কিন্তু বিরোধীপক্ষের যুক্তিতর্কের মাত্রা থাকা উচিত এবং সকল ক্ষেত্রেই ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীত হওয়া দরকার যে, বিপক্ষদল দলীয় স্বার্থের জন্য দেশের ও দশের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিতে চেষ্টিত নহেন। তিলকে তাল করিয়া দেখাইয়া বা বিদেশ হইতে আমদানী মাৎস্যন্যায়ের চালনায় দেশের কাজ-কারবার ও শান্তি-নিরাপত্তা নষ্ট করিয়া, শাসন-তন্ত্রের অধিকার লাভের চেষ্টা যে বিপক্ষদল সময়ে অসময়ে, ক্রমাগত করিয়া চলে তাহার মূল্য গণতন্ত্রে কিছুমাত্র নাই বরঞ্চ সেরূপ বিপক্ষদল দেশের বিপদের হেতু। কারণ তাহাদের কার্য্যক্রম ধ্বংসাত্মক।

বাংলা দেশ হইতে কাজ-কারবার চলিয়া যাইতেছে, নূতন ত কিছুই হইতেছেই না—সরকারী উদ্যোগ ছাড়া—যেগুলি আছে সে সবও ক্রমেই অবনতির পথে চলিতেছে, ইহার কারণ কি তাহা সকলেই জানে এবং কাহাদের প্ররোচনায় উহা ঘটিতেছে তাহাও সকলেই জানে। যে দল বা যে দলগোষ্ঠী ঐরূপ কার্য্যক্রম চালাইতেছে তাহারা যে কোনও দিন দেশের শ্রী ফিরাইতে পারিবে একথা বিশ্বাস করাও বাতুলতা। পূর্ব্ব-ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, যাহারা ঐভাবে শাসনতন্ত্র অচল করিয়া পরে অধিকার করিল, উচ্চতম শক্তির কর্ত্তৃপক্ষ প্রায়ই তাহাদের "ক্রীতদাস" করিয়াছেন বা চিরদিনের মত অকেজো ক্লীব করিয়া রাখিয়াছেন, কেননা ঐরূপ দল ধ্বংসের কাজে প্রবল সহায়তা করিতে পারে কিন্তু রক্ষার ব্যাপারে বা গঠনের ব্যাপারে তাহাদের কোনও মূল্য নাই।

বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেসে ও কংগ্রেস-চালিত সকল শাসনতন্ত্রে যে দুর্নীতি ও কলুষের বন্যা বহিতেছে তাহার একটি কারণ উপযুক্ত বিরোধীপক্ষের অভাব। যাহারা কথায় কথায় বলে, "নেহরুকে ফাঁসী দাও" "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়" ইত্যাদি, যাহাদের কাজে বা কথায় মাত্রাজ্ঞানের কোনও চিহ্ন নাই, তাহাদের বিরোধিতার ওজন ক্রমেই কমিয়া আসে। বিশেষে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দলগত স্বার্থ ভিন্ন যাহাদের অন্য কোনও নীতির বালাই নাই তাহারা কংগ্রেসের দুর্নীতি দূর করার পথ দেখাইবে কিরূপে? সরিষায় ভূতাবেশ হইলে ওঝা কি করিতে পারে। সেকথা আমরা আচার্য্য কৃপালনী ও শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণকে নিবেদন করি। ইহারা দুই জনেই নিষ্কাম ও দেশসেবায় আত্মনিয়োজিত বলিয়া খ্যাতিমান। কিন্তু যে সকল দলগোষ্ঠী এখন নির্ব্বাচনী যুদ্ধে নামিয়াছে তাহাদের সাধারণ প্রার্থী ও কংগ্রেস প্রার্থীর মধ্যে মানুষ হিসাবে যেটুকু প্রভেদ আছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বামপন্থীদিগের অনুকূল নহে। অন্ততঃপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে।

নির্ব্বাচনী ইস্তাহার সকলেই দিয়াছেন বা দিবেন। বলা বাহুল্য, উহার মূল্য কাণাকড়িও নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহাতে প্রভাবিত না হইয়া প্রত্যেকটি প্রার্থীকে যাচাই করিয়া লইবেন। স্লোগান বা আপ্তবাক্যের ছলনায় ঠকিলে পাঁচ বৎসরের মত নিরুপায় এ কথা যেন সকলের মনে থাকে। যদি প্রার্থী মনোমত না হয় তবে সময় থাকিতে উপযুক্ত প্রার্থীর ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের অভাগা দেশে অবশ্য সেটা বোধ হয় সম্ভব হইবে না। এখানে আমরা ভাবের উচ্ছ্বাসে কাজ করিয়া বসি এক মুহূর্ত্তে ও পরে কপাল চাপ-ড়াইয়া কাটাই বৎসরের পর বৎসর।

ইংরেজী প্রবাদে বলে, "দেশের লোক যেমন, সেই মতই শাসন-যন্ত্র হয়।" বিগত পাঁচ বৎসরে সেই প্রবাদের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

আসামে কংগ্রেসী প্রার্থী মনোনয়ন

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে আসামের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। আসামে কংগ্রেস যে সকল প্রার্থীদিগকে মনোনয়ন করিয়াছে, তাহাতে চতুর্দ্দিকে বিশেষ সমালোচনা উঠিয়াছে।

আসামে কংগ্রেসকর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন সম্পর্কে করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" পত্রিকার ৬ই পৌষ ও ১৩ই পৌষ সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে মনোনয়ন ব্যাপারে কংগ্রেসী নীতির প্রশংসা করা যায় না।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন, যে, সাধারণভাবে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, প্রার্থী মনোনয়নকালে কংগ্রেসপ্রার্থীর অতীত ও বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ ও শিক্ষাদীক্ষা এবং অন্যান্য যোগ্যতা সম্পর্কে বিচারবিবেচনা করিয়া দেখিবেন, "কিন্তু কয়েক ক্ষেত্রে তাহার বিন্দুমাত্র পরিচয়ও যেন পাওয়া যাইতেছে না।"

করিমগঞ্জ মহকুমার রাতাবাড়ী পাথরকান্দি সংরক্ষিত আসন, দক্ষিণ করিমগঞ্জ সাধারণ আসন এবং বদরপুর আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার নিমিত্ত কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন যথাক্রমে শ্রীহরমোহন রায়, আবদুল হামিদ চৌধুরী এবং মৌলানা আবদুল জলিল।

যুগশক্তি উপরোক্ত প্রার্থীদের সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া লিখিতেছেন যে, শ্রীরায়কে কখনও কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য হিসাবে দেখা যায় নাই, "বরং কম্যুনিষ্ট পার্টির শ্রীগোপেশ নমঃশূদ্রের সমর্থক হিসাবেই অনেকে তাঁহাকে জানেন। যতদূর মনে পড়ে অল্পদিন পূর্ব্বে ভলু-কালীনগর গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভাপতি নির্ব্বাচনে তিনি কম্যুনিষ্ট সহায়তায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর কাছে ১৯-৩ ভোটে পরাজয় বরণ করেন।...আরও জানা গিয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে ভেজাল দুধ ও ঘি সংক্রান্ত অভিযোগে তিনটি ফৌজদারী মামলা ঝুলিতেছে।"

আবদুল হামিদ চৌধুরী সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "কুখ্যাত রাইস সিণ্ডিকেটের মামলার সঙ্গে তাঁহার পরিবারের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল—রেডক্লিফ-বাগে কমিশনের সময় ইঁহারা করিমগঞ্জকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অর্থদান ও অন্যান্য উপায়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া পাকিস্থান প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়াও অভিযোগ রহিয়াছে।" উপরন্তু মৌলনা আবদুল মুনিম এবং খান বাহাদুর মহম্মদ আলী প্রমুখ আজীবন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ উপেক্ষিত হওয়ায় কংগ্রেসসেবী মুসলমানগণও স্বভাবতঃই হতাশ হইবেন।

আবদুল জলিল বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে পাকিস্থান হইতে আগত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারূপে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বিধান সভায় নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু নির্ব্বাচনপর্ব্ব শেষ হওয়ার পর তাহার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি দুর্গাপূজার শোভাযাত্রায় বাধাদান এবং অন্যান্য প্রকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টির প্রয়াস পান। "এহেন দাম্ভিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিয়া কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আনুপাতিক সদস্যহার রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই মনোনয়ন দ্বারা কংগ্রেস বিঘোষিত আদর্শের সম্পূর্ণ অমর্য্যাদা করা হইয়াছে বলিয়াই সর্ব্বসাধারণের ধারণা।"

"আসামে কংগ্রেস নমিনেশন" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক 'যুগবাণী' ২১শে পৌষ লিখিতেছেন যে, আসামে নমিনেশন দান ব্যাপারে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতাকেই নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে যদিও কংগ্রেসী দলের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার সাধু ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে।

আসামে সেন্সাস গ্রহণের সময় বাঙালীদের সংখ্যা কম করিয়া দেখাইবার জন্য নানা প্রকার জালজুয়াচুরির সাহায্য লওয়া হয়। আসাম ভ্যালীর ছয়টি জেলা (কামরূপ, দরং, নওগাঁ, লখীমপুর, শিবসাগর ও গোয়ালপাড়া)—১৯৩১ সনের সেন্সাসে বাঙালীর সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৮৬ হাজার, আর অসমীয়াদের ১৯ লক্ষ ৭৩ হাজার। ১৯৩১-১৯৫১ এই কুড়ি বৎসরে আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ২১ হারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উক্ত হারে ১৯৫১ সনের সেন্সাসে বাঙালীর সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল মোটামুটি ষোল লক্ষ এবং অসমীয়ার ২৯ লক্ষ। উপরন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর বহু বাঙালী গিয়া আসামে আশ্রয় লওয়ায় বাঙালীর সংখ্যা আরও কয়েক লক্ষ বেশী হওয়া উচিত ছিল। তৎসত্ত্বেও দেখা গেল যে, ১৯৫১ সনের সেন্সাসে বাঙালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ত দূরের কথা, কমিয়া আট লক্ষ চৌদ্দ হাজারে নামিয়াছে এবং অসমীয়ার সংখ্যা বেলুনের মত ফুলিয়া ৪৯ লক্ষ ১৩ হাজারে উঠিয়াছে। অনুরূপ ভাবে কাছাড় জেলায়ও বাঙালীদের সংখ্যা ১৯৫১ সনের সেন্সাসে কম করিয়া দেখান হয়। কিন্তু সেই চেষ্টা সেরূপ ফলবতী হইতে পারে নাই। "যুগবাণী" লিখিতেছেন যে, ১৯৫১ সনের সেন্সাস যথাযথরূপে গৃহীত হইলে আসামে বাঙালীর সংখ্যা হইত ৩২ লক্ষ (আসাম ভ্যালীর ছয়টি জেলায় ষোল লক্ষ+কাছাড়ে এগার লক্ষ+উদ্বাস্তু পাঁচ লক্ষ) —"অর্থাৎ, আসামের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী। এই হিসাবে আসামের বিধানসভায় অন্ততঃ ৩৬টি এবং লোকসভায় পাঁচটি ও রাজ্যসভায় দুইটি আসন বাঙালীদের ন্যায্য প্রাপ্য হয়। কিন্তু কংগ্রেস নমিনেশনে বিধানসভায় বাঙালী পাইয়াছে ১১টি এবং লোকসভায় মাত্র ১টি, তাহাও সিডিউল সীট—যা না দিয়া উপায় নাই।"

'যুগবাণী' আরও দেখাইয়াছেন, এমনকি ১৯৫১ সনের সেন্সাসের 'জলজ্যান্ত মিথ্যা হিসাব'কেও যদি মানিয়া লই তবে বাঙালীদের সংখ্যানুপাতে যে কয়টি আসন পাওয়া উচিত ছিল তাহাদিগকে তাহাও দেওয়া হয় নাই; ১৯৫১ সনের সেন্সাস অনুযায়ী আসামে বাঙালীর সংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ ২৯ হাজার। এই হিসাবে বাঙালীকে

বিধান সভায় ২৩টি এবং লোকসভায় ৩টি আসন দেওয়া উচিত ছিল। "বাঙালীর এই ন্যূনতম দাবি স্বীকার করাও কংগ্রেস কর্ত্তব্য মনে করে নাই। রাজ্যসভার কথা না তোলাই ভাল, গত ৫ বৎসরের মধ্যে কোন বাঙালীকে কংগ্রেস সেখানে পাঠায় নাই।"

যদিও ভাষা-সংখ্যালঘু বাঙালীদের ক্ষেত্রে কংগ্রেস এরূপ অসম আচরণ করিয়াছে, ধর্ম্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে জনসংখ্যার অনুপাতে ১৭টি আসন দিতে কংগ্রেসের বাধে নাই। বাঙালীদের বেলা আটকাইয়াছে, কারণ সেখানে অস্তিত্বের প্রশ্ন, সুতরাং কংগ্রেসী কর্ত্তাদের মতে লিঙ্গুইজম (Linguism)।

"যুগবাণী" লিখিতেছেন—

"সীমা কমিশনের রিপোর্টে এবং রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাস করার সময় কংগ্রেসী কর্ত্তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠীকে নিরাপত্তার যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা কি ভাবে রক্ষা করা হইয়াছে এই হিসাব হইতে বুঝা যাইবে—

বাঙালীকে কংগ্রেস নমিনেশন দেওয়া হইয়াছে :—

জেলা	বাঙালীর সংখ্যা (১৯৫১ সেন্সাসে)	লোকসভায়	বিধানসভায়
কাছাড়	৮,৬০,৭৭২	১ জন সিডিউল	১০ জন
গোয়ালপাড়া	১,৯৩,৩৬৬	একজনও না	একজনও না
কামরূপ	২,২৫,২০৯	,,	,,
দরং	৬৩,৯৮৯	,,	১ জন
নওগাঁ	২,০৭,২৫৪	,,	একজনও না
লখীমপুর	৮৩,৫৮৫	,,	,,
শিবসাগর	৪১,৫৮১	,,	,,
		১ জন সিডিউল	১১ জন

"বিধান সভায় এই ১১ জনের মধ্যে ১০ জনই কাছাড়ের। আসাম ভ্যালীর ১৬ লক্ষ বাঙালীর মধ্যে একজন মাত্র কংগ্রেস নমিনেশন পাইয়াছেন। ধুবড়ীতেও কোন বাঙালী নমিনেশন পান নাই, পাইয়াছেন—কংগ্রেসের জেনারেল-সেক্রেটারী মাধবন নায়ার যাহাকে গোয়ালপাড়ার দাঙ্গাবাজির প্রধান নায়ক বলিয়াছিলেন সেই শরৎ সিংহ ও তাহার মুসলমান সাগরেদটি। ইহাকে প্রাদেশিকতার পুরস্কার ছাড়া আর কি বলা যায়? কাছাড়ের ১৩টি আসনেও অ-বাঙালী এবং পাকিস্থানী আন্দোলনের পাণ্ডাদের আনিয়া ঢুকান হইয়াছে। কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতি যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত সমস্ত জীবন পালন করিয়াছেন তাঁহারা নমিনেশন পান নাই, পূর্ব্বাচল আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকেই অতি সতর্কতার সহিত বাদ দেওয়া হইয়াছে, শুধু যাহারা আসাম কংগ্রেসের হুঁকাবরদার রূপে তাঁবেদারী করিতে পারিবে সেই সব সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানীদের ভাগ্যেই কংগ্রেস নমিনেশন জুটিয়াছে।"

কাছাড় লোকসভার জন্য নমিনেশন দান ব্যাপারে কংগ্রেস বাঙালীদের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া "যুগবাণী" লিখিতেছেন, "সাত লক্ষ বাঙালী ভোটারের মধ্যে কংগ্রেস একজন যোগ্য লোক পায় নাই, খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে মজুর-সর্দ্দার অখ্যাতনামা এক তেওয়ারীকে। ইহা দুরভিসন্ধিমূলক বলিলে কম বলা হয়, ইহার পশ্চাতে প্রাদেশিকতাদুষ্ট আসাম কংগ্রেসের অতি-গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত রহিয়াছে। শিক্ষা দীক্ষায়, জ্ঞানে-ঐতিহ্যে এবং রাজনৈতিক চেতনায় আসামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জেলার পক্ষে ইহার মত অবমাননাকর আর কিছু হইতে পারে না। কাছাড়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানকার কংগ্রেসীরাও ইহা মানিয়া নিতে পারিতেছেন না। কাছাড়ের বাঙালীরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, রাজনৈতিক মতবাদ নির্ব্বিশেষে, এই অপমানের সমুচিত উত্তর দিতে পারেন তবেই দিল্লীর হাইকম্যাণ্ডের চৈতন্যোদয় হইবে।"

ডাকবিভাগের অবহেলা

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "ভারতী" পত্রিকার ৫ই পৌষ সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে ডাকবিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—টেলিগ্রাম প্রেরণে, ভিপি, রেজেষ্ট্রী, মনিঅর্ডার প্রভৃতি প্রেরণে সহরবাসীদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। "বহুকাল হইতেই শহরবাসী এই অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইতিপূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে কয়েক বার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার কোন প্রতিকার হয় নাই।"

ডাকবিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া "ভারতী" একটি কোমল স্থানে আঘাত করিয়াছেন। ডাকবিভাগের খেয়ালীপনার 'বলি' হিসাবে আমাদিগকেও বহু সময় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। ডাকবিভাগের যে সুনাম ছিল এখন তাহা প্রায় আর কিছুই নাই। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ডাকবিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ প্রায়ই প্রকাশিত হয় তাহাই ইহার প্রমাণ।

অনেক ক্ষেত্রেই যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিয়াও ফল হয় না—একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হইতে তাহা প্রতীয়মান হয়। জনৈক বন্ধু চিঠিবিলি সংক্রান্ত গোলমাল সম্পর্কে তাঁহার আঞ্চলিক পোষ্ট মাষ্টারকে জানাইলে, গতানুগতিক অনুসন্ধানের পর পোষ্ট আপিস হইতে তাঁহাকে জানানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট সকলকেই প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং অনুরূপ অভিযোগের কারণ আর থাকিবে না। ইহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পত্রটিতে কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় কাহারও কোন স্বাক্ষর নাই এবং পত্রের উপরে লিখিত ঠিকানাটিও যথাযথ নহে। ইহাতেই ডাকবিভাগের কর্ম্মপদ্ধতির একটি নমুনা পাওয়া যায়। এইরূপ চিঠির পর কেহই আশা করিতে পারেন না যে, অভিযোগের প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা হইতে পারে—কারণ যেখানে বাহিরের লোকের নিকট পত্রে সহি ভুল হইয়া গেলেও কাহারও নজরে পড়ে না সেখানে আভ্যন্তরীণ কর্ম্মে

শৃঙ্খলা আনয়ন কতদূর সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে। বক্তৃতির অভিযোগের কারণ পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। তিনি পুনরায় পোষ্টমাষ্টারের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন —কিন্তু কোন উত্তর পান নাই। তিনি বলিতেছেন যে, তিনি এবার পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলের নিকট লিখিবেন।

ডাকবিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতির নানা কারণ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে কর্ম্মীর অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সমগ্র বিভাগ সম্পর্কে সে-কথা খাটে না। কোন সরকারী বিভাগই কর্ম্মীর অভাবের জন্য যথাযথ কাজ করিয়া উঠিতে পারে না বলিয়া আমরা জানি না। সরকারী আপিসে কর্ম্ম সম্পাদনে ত্রুটিবিচ্যুতির প্রধান কারণ কর্ম্মীদের মধ্যে কর্ম্মবণ্টন ব্যাপারে অসঙ্গতি। যথাযোগ্যভাবে কর্ম্মবণ্টন করা হইলে সরকারী আপিসের কর্ম্মদক্ষতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কেন্দ্রীয় সরকারের বহু আপিসেই অফিসারগণ কার্য্যতঃ দৈনিক দুই-একটি সহি ছাড়া আর কোন কাজই করেন না। তাঁহারা বিভিন্ন বিদেশী এবং দেশী চলচ্চিত্র পত্রিকা পড়িয়াই দৈনন্দিন কর্ম্ম সম্পাদন হইল বলিয়া মনে করেন। ইহারা নিজেরা ত কোন কাজই করেন না, উপরন্তু নিম্নতন কর্ম্মীদের সহিত বিশেষ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় ইহাদের নির্দ্দেশগুলিও সহজে প্রতিপালিত হইতে চায় না। নিম্নতম কর্ম্মীদের মধ্যেও অনেকে উপরওয়ালাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছেন।

কর্ম্মবণ্টনে অসঙ্গতি ব্যতীত সরকারী বিভাগের অকর্ম্মণ্যতার আর একটি প্রধান কারণ উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কল্পনাশক্তির অভাব। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, কোন্ সময়ে কোন্ বিশেষ বিভাগে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাইবে। সেই হিসাবে বিভাগান্তর হইতে কর্ম্মীদিগকে সাময়িক ভাবে কর্ম্মব্যস্ত বিভাগে নিযুক্ত করিলে সহজেই কাজটি সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা করা হয় না। রেডিও লাইসেন্স বণ্টন, রেলের মাসিক টিকিট বিক্রয় ব্যাপারে এইরূপ কল্পনাশক্তির অভাবের জন্য জনসাধারণকে সততই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

মুষ্টিমেয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অফিসার এবং প্রধানতঃ নিম্নতন কর্ম্মীদের সততা এবং পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করিয়াই সরকারী বিভাগগুলি বাঁচিয়া রহিয়াছে। কিন্তু উপরতলার গাফিলতি এখন নীচের তলায়ও আসিয়া পড়িয়াছে—তাই আজ সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা।

পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রভাবে অন্যান্য সকল শিল্প যখন বিস্তার লাভ করিতেছে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই অবস্থায় ভারতীয় পাটশিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে; ১৯৫৬ সনে পাট-শিল্পের পক্ষে দুর্দ্দিন গিয়াছে। পূর্ব্বে ভারতীয় রপ্তানী-বাণিজ্যে পাটজাত দ্রব্য প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু ১৯৫৬ সনে ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পাটশিল্পের প্রধান সমস্যা হইতেছে—প্রতিযোগিতা ও মূল্যবৃদ্ধি। ১৯৫৫ সনে পাটশিল্পে উন্নতি হয়, ঐ বৎসর প্রায় ১০'৩৩ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় হয় এবং ১৯৫৪ সনে হয় ৯'৫৬ লক্ষ টন। ১৯৫৫ সনে উন্নতির ফলে ১৯৫৬ সনে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করিয়া কাজ সুরু করা হয়, পূর্ব্বে হইত সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টা। ১৯৫৫ সন পর্য্যন্ত কাঁচা পাটের অভাবে প্রত্যেক কারখানায় ১২॥ শতাংশ তাঁত বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯৫৫ সনে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী অধিক হওয়ায় ভারতীয় পাটকল সমিতি ১৯৫৬ সনে ৯ই জানুয়ারী হইতে পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ তাঁতের ২॥ শতাংশকে পুনরায় কার্য্যকরী করার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার ফলে মাসে ২,৫০০ হাজার টন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কোরিয়া যুদ্ধের পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত পাটদ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পায় এবং গত বৎসর সোভিয়েট রাশিয়া ভারতীয় পাটদ্রব্য ক্রয় করিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু রাশিয়ার ক্রয় আশানুরূপ হয় নাই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদাও হ্রাস পায়। অধিকন্তু পাকিস্থানী প্রতিযোগিতা রপ্তানী-বাজারে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

ভারতের পাটজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার মানসে ১৯৫৫ সনের আগষ্ট মাসে পাটের থান ও থলির উপর হইতে রপ্তানী কর তুলিয়া লওয়া হয়; কারণ পাকিস্থানী মুদ্রার মূল্যহ্রাসের ফলে পাকিস্থানী পাটের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। ইহার উপর পাকিস্থানী পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়াতে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে পাকিস্থান অধিক পরিমাণে রপ্তানী করিতে সমর্থ হয়। পাকিস্থানে বর্ত্তমানে প্রায় ৭,০০০ হাজার তাঁত চালু আছে, কিন্তু এই তাঁতগুলিতে তিন দফায় কাজ করা হয় এবং ইহার ফলে পাকিস্থান প্রায় ২১,০০০ হাজার তাঁতের সুবিধা পাইতেছে। ১৯৫৫ সনে পাকিস্থান ৮০,০০০ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করে; কিন্তু ১৯৫৬ সনে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ২'৫০ লক্ষ টনে দাঁড়ায় এবং ইহার মধ্যে সে রপ্তানী করে ২ লক্ষ টন; ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের সরবরাহ ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় কারখানায় অতিরিক্ত তাঁত চালু করার ফলেও সরবরাহ কতকাংশে বৃদ্ধি পায়।

সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়াতে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। পাকিস্থান হইতে কাঁচা পাটের আমদানী অল্প হওয়াতে ভারতে কাঁচা পাটের অভাব হয় এবং এই কারণে ১৯৫৬ সনের ১৬ই জুলাই ভারতীয় কারখানাগুলির ২॥ শতাংশ তাঁত আবার বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ইহাতেও কাঁচা পাটের অভাব দূরীভূত হয় না এবং সেই কারণে ১৯৫৬ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর আরও ৫ শতাংশ তাঁতকে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। পাকিস্থানে ক্রমবর্দ্ধমান পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ভারতের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ১৯৬০ সনে পাকিস্থানী পাটশিল্পে তাঁতের সংখ্যা দাঁড়াইবে ১৩,৫০০। বর্ত্তমানে ভারতীয় তাঁতের সংখ্যা প্রায় ৭২ হাজার, তবে ইহার অধিকাংশই পুরানো ধরনের। ভারতে ২১টি পাটকলকে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে তাহাদের

উৎপাদন-ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু সেই অনুপাতে কাঁচা পাট সরবরাহ পাওয়া যাইতেছে না। পাকিস্থানী তাঁতগুলি আধুনিক ধরনের হওয়ায় ও তিন দফায় কাজ করায় উৎপাদন অতিরিক্ত হইতেছে; এই অবস্থায় বর্ত্তমানে ভারতীয় পাটশিল্পকে আত্মরক্ষায় নিয়োজিত থাকিতে হইতেছে। ইউরোপে যে হারে পাটকল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী আরও হ্রাস পাইবে। মিশর, ইরাণ, ইরাক, বর্ম্মা, থাইল্যাণ্ড, চীন, জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশগুলি ছোট ছোট পাটকল প্রতিষ্ঠা করিতেছে এবং ইহাতে ভারতীয় পাটশিল্পের সমূহ ক্ষতি হইবে। সেই কারণে উচিত—কোনও আন্তর্জাতিক বিধি প্রণয়ন করা যাহাতে অন্য কোন নূতন দেশে পাটকল প্রতিষ্ঠিত না হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এই ধরনের একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

ভারতীয় পাটশিল্পের প্রধান অসুবিধা কাঁচা পাটের অভাব। ১৯৫৬ সনে অনুমিত হইয়াছিল যে, পাকিস্থানে ঐ বৎসর ৭০ লক্ষ গাঁইট ও ভারতবর্ষে ৫০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট উৎপাদিত হইবে। কিন্তু বন্যার ফলে পাকিস্থানে ৫৬ লক্ষ গাঁইট ও ভারতবর্ষে ৪১ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতের মিলগুলির প্রয়োজন প্রায় ৬০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কাঁচা পাটের উৎপাদন ৫৫ লক্ষ গাঁইট স্থিরীকৃত হইয়াছে; তবে ভারতে উৎপাদিত পাটের সবটাই মিলে ব্যবহারযোগ্য নহে। আর পাটজাত দ্রব্যের বৎসরে উৎপাদন ১২ লক্ষ টন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ১৯৫৬ সনে ১১ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ টন রপ্তানী করা হয়।

ভারতবর্ষের পাটশিল্পের সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে, কাঁচা পাটের জন্য তাহাকে পাকিস্থানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। গত বৎসর পাকিস্থান হইতে ভারতবর্ষ ১৩ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট আমদানী করিয়াছে এবং পাটশিল্পের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ কাঁচা পাট সরবরাহের ব্যাপারে পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীলতা। ভারতকে কাঁচা পাট সরবরাহের ব্যাপারে পাকিস্থান প্রথম হইতেই বহু প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আসিতেছে এবং ভারতবর্ষ কাঁচা পাট উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইতে না পারিলে পাটশিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আর্জেণ্টিনা ভারতের পাটের থানের বড় খরিদ্দার, কিন্তু ১৯৫৬ সনে এই দুইটি দেশই ভারতবর্ষ হইতে অল্প পরিমাণে পাটের থান আমদানী করিয়াছে। এত দিন পর্য্যন্ত আর্জেণ্টিনার সরকার সরাসরি ভারত হইতে পাটদ্রব্য আমদানী করিতেন, কিন্তু সম্প্রতি বেসরকারী ব্যবসাদারদের পাট আমদানীর অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং এই কারণে ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্যের বৃহৎ পরিমাণে রপ্তানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

১৯৫২-৫৩ সনে ভারতে কাঁচা পাটের উৎপাদন-পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ গাঁইট; তাহার পর দুই বছর উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৩০ লক্ষ গাঁইটে। ১৯৫৬-৫৭ সনে উৎপাদন কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪২ লক্ষ গাঁইটে উঠিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে একরপ্রতি পাটের উৎপাদন হার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫৫ সনে প্রতি একরে ২·৬২ গাঁইট করিয়া পাট উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সনে ইহার পরিমাণ ছিল ২·২৪ গাঁইট। ১৯৫১ এবং ১৯৫২ সনে দুই বৎসরেই ৪৬ লক্ষ গাঁইটের অধিক ছিল কাঁচা পাট উৎপাদনের পরিমাণ। ১৯৫১ সনে মোট ১৯·৫১ লক্ষ একর ও ১৯৫২ সনে ১৮·১৭ লক্ষ একর জমিতে পাট-চাষ হয়। ১৯৫৬ সনেও কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ১৮·৮৩ লক্ষ একর, কিন্তু এই বৎসর একরপ্রতি ফসলের হার কম হইয়াছে। বিহার ও ত্রিপুরায় পাট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যায় উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতীয় ষ্টার্লিং আমানত

ভারত সরকার ও ব্রিটিশ সরকার উভয়েই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, এই বৎসরে ৩০শে জুন ইঙ্গ-ভারতীয় ষ্টার্লিং চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আর নূতন কোন চুক্তি সম্পন্ন করা হইবে না। উভয় দেশই মনে করেন যে, নূতন চুক্তি করার আর প্রয়োজন কিছু নাই, কারণ যে উদ্দেশ্যে এই চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান মেয়াদের মধ্যে সফল হইবে। নূতন চুক্তি না হইলেও ষ্টার্লিং আমানত হইতে খরচ করিবার অধিকার ভারতের অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ভারতে বেসরকারী যে সকল ষ্টার্লিং মূলধন নিয়োজিত আছে, তাহারা তাহাদের উদ্বৃত্ত ভারত হইতে ইংলণ্ডে পাঠাইতে পারিবে এবং ইচ্ছা করিলে মূলধনও উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে। বর্ত্তমান চুক্তির ৭(৩) ধারাতে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই ব্যবস্থা ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতি ও ১৯৪৯ সনে বিদেশী মূলধন সম্বন্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্ত্তৃক বিঘোষিত নীতির দ্বারা সমর্থিত। এই নীতি ভবিষ্যতে অনুসরণ করাও ভারত সরকারের ইচ্ছা আছে। বর্ত্তমানের চালু ষ্টার্লিং চুক্তি ১৯৫৩ সনের জুলাই মাসে গৃহীত হয় এবং ১৯৫১ সনের জুলাই মাস হইতে ইহার কার্য্যকারিতা আছে। গত যুদ্ধের সময়ে ভারতের যে ষ্টার্লিং আমানত সৃষ্টি হয় ১৯৫৩ সনের চুক্তি দ্বারা তাহা খরচ করিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়। ১৯৫৩ সনের চুক্তি অবশ্য নূতন চুক্তি নহে। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট প্রথম ইঙ্গ-ভারত ষ্টার্লিং চুক্তি হয় এবং ১৯৫২ সনে ইহা পুনরায় গৃহীত হয়।

১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসে প্রথম যখন ষ্টার্লিং চুক্তি হয়, তখন ভারতের মোট ১১৬ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং আমানত ছিল। ১৯৪৭ সনের চুক্তি দ্বারা ইহার পরিমাণ হ্রাস পায় ৮০ কোটি পাউণ্ড। ৩৬ কোটি পাউণ্ড খরচ করা হয় পাকিস্থানের অংশ বাবদ, ব্রিটিশ অফিসারদের পেন্সন বাবদ ও ভারতে অবস্থিত ব্রিটেনের সামরিক উপকরণ ক্রয় করা বাবদ। ১৯৫১ সনের ১লা জুলাই (অর্থাৎ বর্ত্তমান চুক্তি যখন হইতে কার্য্যকরী হয়) ভারতের ষ্টার্লিং

আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৪'৩ কোটি পাউণ্ড। ১৯৫৩ সনের চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে ষ্টার্লিং আমানতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—চলতি আমানত ও মেয়াদী আমানত। চলতি আমানতে ৩১'১০ কোটি পাউণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট ইস্যুর বিরুদ্ধে জমা রাখা হইবে এবং ব্রিটিশ সরকারের বিনা অনুমতিতে এই টাকা তোলা যাইবে না। এই চুক্তি অনুসারে ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, মেয়াদী আমানত হইতে প্রতি বৎসর আরও ৩'৫ কোটি পাউণ্ড চলতি আমানতে পরিবর্ত্তিত হইবে। চলতি আমানতে কাগজী মুদ্রার জন্য জমা ৩১'১০ কোটি পাউণ্ড ব্যতীত অতিরিক্ত ৩ কোটি পাউণ্ড অন্ততঃ পক্ষে জমা রাখা হইবে। এই টাকা প্রতি বৎসর ভারতের বহির্বাণিজ্যে ডলার খরচের জন্য ডলারে রূপান্তরিত করা যাইবে। এই ৩'৫ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে যদি কোন উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা পরের বছরের খরচের জন্য পাওয়া যাইবে। এই চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে ভারত সরকার বহির্বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন হইলে আরও ৫ কোটি পাউণ্ড অতিরিক্ত খরচ করিতে পারিবেন এবং ইহার জন্য ব্রিটিশ সরকারের অনুমতির প্রয়োজন নাই।

১৯৫৭ সনের ৩০শে জুনের পর মেয়াদী আমানতে যে মোট উদ্বৃত্ত জমা থাকিবে তাহা চলতি আমানতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, অর্থাৎ এই সময়ের পর সমস্ত ষ্টার্লিং জমা চলতি আমানত হিসাবে থাকিবে। এই চুক্তি অনুসারে গত পাঁচ বছরে ভারতবর্ষ (বছরে ৩'৫ কোটি পাউণ্ড হিসাবে) মোট ২১ কোটি পাউণ্ড খরচ করিতে পারিবে এবং ১৯৫৭ সনের জুন মাসের শেষে ৪৩'৩ কোটি পাউণ্ড মোট ষ্টার্লিং আমানত থাকিবে। গত পাঁচ বছরে ভারতের ষ্টার্লিং খরচ চুক্তি-নির্দ্ধারিত খরচ হইতে অনেক কম পরিমাণে হইয়াছে। ১৯৫৩ সনের এবং তাহার পূর্ব্বোক্ত চুক্তি অনুসারে গত পাঁচ বছরে ভারতবর্ষ মোট ২৬'৫ কোটি পাউণ্ড খরচ করিতে পারিত। কিন্তু তাহার প্রকৃত খরচ হইয়াছে মোট ১৩'১৯ কোটি পাউণ্ড। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হিসাব ধরা হইয়াছিল যে, গত পাঁচ বছরে মোট ২২ কোটি পাউণ্ড (২৯০ কোটি টাকা খরচ করা হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খরচ হইয়াছে ইহার অনেক কম, অর্থাৎ ১০'৫ কোটি পাউণ্ড (১৪০ কোটি টাকা)। এই কম খরচের প্রধান কারণ ভারতে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিশেষতঃ খাদ্যশস্যের পরিমাণ; এবং ইহার জন্য কৃষিদ্রব্যের আমদানী হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী কয়েকটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে পারে নাই এবং সেই কারণে তাহাদের জন্য কোন খরচও হয় নাই।

সম্প্রতি ষ্টার্লিং আমানতের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাইতেছে, তাহার কারণ ভারতের রপ্তানী কম হইতেছে ও আমদানী বেশী হইতেছে। ১৯৫৬ সনের অক্টোবর মাসে ৪৪'৩ কোটি পাউণ্ড (৫৯১ কোটি টাকা) ভারতের ষ্টার্লিং আমানত ছিল। ইহার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংশোধিত আইন অনুসারে ৪০০ কোটি টাকা নোট প্রচলনের জন্য ষ্টার্লিং সিকিউরিটিতে জমা রাখিতে হইবে, অর্থাৎ ইহা বাবদ ভারতের প্রায় ২০০ কোটি টাকার মত ষ্টার্লিং আমানত থাকিবে। ভারতে নোট প্রচলনের জন্য বৈদেশিক সিকিউরিটিতে জমা রাখিবার প্রথা অনর্থক ও অত্যধিক ব্যয় সাপেক্ষ। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এই ব্যবস্থা নাই।

হীরাকুণ্ড বাঁধ

১৩ই জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু হীরাকুণ্ড বাঁধের উদ্বোধন করেন। উড়িষ্যার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য এক শত কোটি টাকা ব্যয়ে যে সর্ব্বার্থসাধক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইতেছে, হীরাকুণ্ড বাঁধের উদ্বোধনে তাহার প্রথম পর্য্যায়ের কার্য্য সূচিত হইল।

মহানদীর উপর ষোল মাইল দীর্ঘ হীরাকুণ্ড বাঁধটি বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধ। ভাকরা বাঁধের চতুর্গুণেরও বড় এবং ২৮৮ বর্গমাইল অঞ্চল-ব্যাপী হীরাকুণ্ড জলাধারটি এশিয়ার বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ। হীরাকুণ্ডের বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রে যে টারবাইন ও জেনারেটর বসান হইয়াছে এইরূপ বৃহৎ ধরনের টারবাইন ও জেনারেটর ভারতে ইতিপূর্ব্বে বসান হয় নাই।

হীরাকুণ্ড বাঁধ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয় ১৯৪৮ সনে—কেন্দ্রীয় জলপথ, সেচ এবং নৌবহন কমিশন এবং উড়িষ্যা সরকার যুক্তভাবে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ভার লন। এই পরিকল্পনার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য: (১) এই পরিকল্পনার ফলে কটক ও পুরী জেলার প্রায় ৮,০০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে বন্যার প্রকোপ বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইবে; (২) অচিরেই ইহা হইতে ২৪ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইবে, ১৯৫৮ সনে এই সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া একলক্ষ ২৩ হাজার কিলোওয়াটে দাঁড়াইবে; এবং (৩) সম্বলপুর ও বোলাঙ্গির জেলার তিন লক্ষ একর জমি অবিলম্বেই সেচের জল পাইবে এবং পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ১৮ লক্ষ একর জমির সেচকার্য্য চলিবার মত জল পাওয়া যাইবে।

পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ের রূপায়ণে ইতিমধ্যেই প্রায় ৭০ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে চিপলিমায় বাঁধে ৭২,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎসরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

বাঁধটির উদ্বোধন করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, বাঁধটি নির্ম্মাণের ফলে উড়িষ্যা রাজ্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। তিনি বলেন, "মন্দিরের ভূমি এই উড়িষ্যা রাজ্য এখন একটি নূতন মন্দির লাভ করিল। এই মন্দিরে রহিয়াছেন সমগ্র দেশের ভগবান।" তিনি বলেন, "তিনি প্রত্যেকটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছাইয়া দিতে চাহেন, ইহা তাহাদিগকে শুধু আলোই দান করিবে না, কর্ম্মেরও সুযোগ দিবে।"

মুর্শিদাবাদ ও রেশম শিল্প

ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রিজের (সেরিকালচার) আপিসটি গত ৪৮ বৎসর যাবৎ বহরমপুর শহরে অবস্থিত ছিল। ১৯০৮ সনে সর্ব্বপ্রথম কীটপোষ বিভাগের আপিসটি বহরমপুর শহরে স্থাপিত

হয়। ১৯২০ সনে উক্ত আপিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীর পদোন্নতি ঘটে এবং তাঁহাকে ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ পদ দেওয়া হয়। সম্প্রতি উক্ত আপিসটি বহরমপুর হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিয়া "মুর্শিদাবাদ সমাচার" ২৮শে পৌষ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আটচল্লিশ বৎসর পরে বহরমপুর হইতে কীটপোষের ডেপুটি ডিরেক্টরের আপিস কলিকাতায় সরাইবার কি কারণ ঘটিল, তাহা আমরা বলিতে পারিব না।"

কেন্দ্রীয় সরকার বহরমপুরে একটি রেশম শিল্প গবেষণামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অথচ রাজ্য সরকার তাহাদের আপিসটি কলিকাতায় সরাইয়া আনিতেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করিয়া "মুর্শিদাবাদ সমাচার" লিখিতেছেন, "রেশম শিল্পের উন্নয়ন সরকারের কাম্য এবং তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করিতেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার সহিত রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার সহযোগিতা এক শত মাইলের ব্যবধানে কি ভাবে চলিবে, তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। বিগত আটচল্লিশ বৎসর বহরমপুরে ডেপুট ডিরেক্টর আপিস থাকায় রেশম শিল্পের উন্নতি যখন ব্যাহত হয় নাই, তখন উক্ত আপিস এখানে (বহরমপুরে) থাকিলে উন্নয়ন ব্যাহত হইত না বলিয়াই আমাদের ধারণা।"

সাম্প্রতিক বন্যা ও চাষের জমি

গত শরৎকালে বর্দ্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় যে ব্যাপক বন্যা হয় তাহাতে প্রায় বিশ লক্ষ লোক নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কাহারও বাড়ী গিয়াছে; কাহারও শস্য গিয়াছে, কাহারও বা সর্ব্বস্বই গিয়াছে। বন্যায় চাষীদের আরও একটি ক্ষতি হইয়াছে—বর্দ্ধমানের অজয় নদের তীরে বহু জমি বালিচাপা পড়িয়াছে। জমিগুলি বালিচাপা পড়িবার ফলে বর্ত্তমান বৎসরের শস্য ত নষ্ট হইয়াছেই, বালি অপসৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জমিগুলিতে ভবিষ্যতেও কোন শস্যোৎপাদন করা সম্ভব হইবে না।

বর্দ্ধমান জেলার তেদিয়া, নূতনহাটা, পালিটা, নারেঙ্গী অঞ্চলে যে সকল জমি অনুরূপ ভাবে বালিচাপা পড়িবার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমান বাণী" ২৮শে অগ্রহায়ণ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন:

"সরকার হইতে বন্যার্ত্তগণের সাহায্য করা হইতেছে, তাহাদিগের পুনর্ব্বাসনের চেষ্টা হইতেছে। বন্যাপীড়িতদের পুনর্ব্বাসনের জন্য এই বালি চাপা জমিগুলির পুনরুদ্ধার আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে যে সব স্থানে অজয়ের বাঁধ ভাঙিয়াছে সেইগুলিরও সংস্কার প্রয়োজন, নতুবা ভবিষ্যতে এই সব অঞ্চলে পুনরায় বন্যা হইবার আশঙ্কা থাকিবে। আমরা এই দুইটি অর্থাৎ বালি-চাপা জমি উদ্ধার ও ভাঙা বাঁধগুলির সংস্কারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

মফস্বলে মোটর দুর্ঘটনা

২৫শে পৌষ সংখ্যা সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, আসানসোলের বেগুনিয়া-বরাকর চৌরাস্তার মোড়ে প্রায়ই মোটর দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি একাধিকবার আকৃষ্ট করা হইলেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই, "কেননা এখনও আমরা ঐ স্থান হইতে যথারীতি মোটর দুর্ঘটনায় লোকের প্রাণহানির সংবাদ পাইতেছি এবং ঐ স্থানের পাহারারত মোতায়েন পুলিশ যথারীতি পানবিড়ি খাইয়া তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছে বলিয়া মনে হয়।"

অপর একটি স্থানেও এক সপ্তাহের মধ্যে মোটর দুর্ঘটনায় একজন মহিলা ও একটি দশ বৎসরবয়স্ক বালকের জীবনহানি ঘটে।

এইরূপ পৌনঃপুনিক মোটর দুর্ঘটনার প্রতি স্থানীয় পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, "একই স্থানে যখন বারবার মোটর দুর্ঘটনা ঘটিতেছে তখন নিশ্চয়ই সেই জায়গার অবস্থা, পরিস্থিতি এবং পারিপার্শ্বিকতার সহিত তাহার কোন যোগাযোগ আছে। একটু চেষ্টা করিলে স্থানীয় পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ইহার প্রতিকার করিতে পারেন। তবে স্বাধীন ভারতের জনসাধারণের জীবনের কোন মূল্য যদি না থাকে সে স্বতন্ত্র কথা। যদি বর্ত্তমান ব্যবস্থার সামান্য কিছু অদলবদল করিলে সেখানে বহু লোকের প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে না তাহা হইলে সেটুকু করারও কার্পণ্য কেন?"

বহরমপুরে কয়লাসঙ্কট

বহরমপুর শহরে এক অভূতপূর্ব্ব কয়লাসঙ্কট দেখা দিয়াছে। কয়লার অভাবে শহরবাসীর চরম দুর্গতি হইয়াছে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কোন সুরাহাই করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বক্তব্য হইল—কয়লা নাই অতএব কয়লা সরবরাহ করা সম্ভব হইবে কিরূপে?

বহরমপুর কয়লাসঙ্কট সম্পর্কে ২৩শে পৌষ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হয় অথচ রাজ্যের অন্যতম জেলা মুর্শিদাবাদের লোকেরা কয়লার অভাবে দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলায় কয়লা সরবরাহ সম্ভব হইলে মুর্শিদাবাদেই বা কেন কয়লা সরবরাহ করা সম্ভব হইতেছে না—সেই সম্পর্কে পত্রিকাটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

"মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন, "কয়লা না পাইলে জনসাধারণকে কাঠ ব্যবহার করিতে হয়; কিন্তু কাঠের মূল্যাধিক্যহেতু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে কাঠ ব্যবহার বিশেষ সহজসাধ্য নহে। উপরন্তু শহরের বাহির হইতে যে পরিমাণ কাঠ বহরমপুরে চালান হইতেছে তাহা শহরের জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত। এতদ্ব্যতীত কাঠ বিক্রয় করিবার লোভে

পল্লী-অঞ্চলের অনেকেই নির্ব্বিচারে বড় বড় গাছ কাটিয়া ফেলিতেছে। ভবিষ্যতে ইহার বিশেষ কুফল দেখা দিতে পারে।

আসানসোল পৌরসভায় দুর্নীতি

বার্ণপুর হইতে প্রকাশিত সপ্তাহিক "জি. টি. রোড" পত্রিকা ১১ই পৌষ এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আসানসোল পৌরসভার দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন, "পৌরসভার কর্ম্মচারীরা এখন পৌরসভার সেবক অপেক্ষা দুর্নীতি চালাইবার যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।"

"জি. টি. রোড" লিখিতেছেন, "এই সকল কর্ম্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরিয়া এইরূপ করিয়া আসিতেছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের বোর্ড এই দুর্নীতির অবসানের কোন চেষ্টা ত করেনই নাই বরং তাঁহারা সযত্নে এই দুর্নীতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে—Death certificate এবং Birth certificate-এর টাকা লওয়া হয় কিন্তু জমা হয় না। একজন সামান্য কেরাণী, পৌরপতির সমর্থন না থাকিলে দীর্ঘদিন এই ধরনের দুর্নীতি চালাইতে পারে না। তেমনি জলকলের জন্য জমা দেওয়ার টাকার হিসাব দেখিলে দেখা যাইবে—যত ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা [জমা] লওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোককে জলকল দেওয়া হইয়াছে—এই অধিকসংখ্যক লোকের জলকলের টাকা কোথায় গেল?...রিক্সা ও অন্যান্য যানের Licence-এর টাকা আদায় হয় কিন্তু পৌরসভায় জমা হয় না। মুন্সীবাজারের বাহিরে যে সকল স্থানে হেটোরা বাস করে তাহার কর আদায় হয় কিন্তু পৌরসভার তহবিলে জমা হয় না। অথচ এই সব হেটোরা পৌরসভার এলাকায় বসিয়াই জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকে।" পৌরসভাসংক্রান্ত এইরূপ আরও নানাবিধ দুর্নীতির দৃষ্টান্ত "জি. টি. রোড" দিয়াছেন।

"জি. টি. রোড" লিখিতেছেন, "এই পৌরসভার অচলায়তন দুর্নীতি সম্বন্ধে স্থানীয় মহকুমা-শাসক, জেলা-শাসক, বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার সকলেই অবহিত আছেন এবং তাঁহারা যাহাতে এই পৌরসভা সরকারের অধীনে আসে সেই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন—কিন্তু তাঁহারা সরকারের নিদ্রা ভাঙ্গাইতে সক্ষম হন নাই। অবশ্য সরকার যদি সত্যই নিদ্রা যাইতেন তবে হয়ত সরকারের ঘুম ভাঙিত কিন্তু তাঁহারা জাগিয়া ঘুমাইতেছেন—কারণ একবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই পৌরসভাকে বাতিল করিয়া সরকার যাহাতে স্বহস্তে গ্রহণ করেন তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু জনাব সাত্তার হইতে শ্রীযোগেন রায় পর্য্যন্ত প্রাণপণে এই ব্যবস্থাকে বাধা দিয়া আসিতেছেন। ডাঃ রায়কে বোঝান হইয়াছে—এই পৌরসভা যদি সরকার গ্রহণ করেন তবে আসানসোলের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান রসাতলে যাইবে ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য।"

কালনা বাজার

কালনা মহকুমায় স্থানীয় সাপ্তাহিক "ভাগীরথী" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কালনার বাজার সম্পর্কিত অব্যবস্থায় আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য বৎসরে বাজারটির ডাক হইত এবং যিনি সর্ব্বোচ্চ দর দিতেন এক বৎসরের জন্য তিনিই বাজারের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ডাক তুলিয়া দিয়া বাজারটি নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন। ইহার ফলে জনসাধারণকে নানাদিক হইতে অসুবিধা ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে।

"ভাগীরথী" লিখিতেছেন, পূর্ব্বে, যখন বাজার সর্ব্বোচ্চ দরে ডাকিয়া লইবার প্রথা ছিল তখন একটি নিয়ম ছিল এই যে, যাহারা জিনিষপত্র কিনিয়া বিক্রয় করে তাহারা বেলা ৯টার পূর্ব্বে কোন জিনিষ কিনিতে পারিবে না। ৯টার পূর্ব্বে এই সকল ফেরিওয়ালা জিনিষ কিনিলে তাহাদের শাস্তি হইত। ফলে সাধারণ ক্রেতা যুক্তিসঙ্গত মূল্যে তাঁহার দৈনিক বাজার করিতে পারিতেন, কিন্তু "বর্ত্তমানে স্থানীয় বাজার মহারাজার পরিচালনাধীনে আসায় পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আসিলেই ফড়িয়াদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতাসাধারণ চাষীর নিকট হইতে কোন জিনিষ ক্রয় করিবার কালেই তাহা ফড়িয়ার হস্তগত হয়—মূল্যও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ শাসনকালে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম (অর্থাৎ নয়টার পূর্ব্বে ফড়িয়ারা কোন জিনিষ কিনিতে পারিবে না) ভঙ্গ করিবার কোন উপায় ছিল না, কারণ তাহা হইলে বিশেষ শাস্তি হইত।

যাহাতে পুনরায় উক্ত নিয়ম চালু হয় এবং বেলা ৯টার পূর্ব্বে বাজার হইতে বা পথ হইতে ফড়িয়ারা যাহাতে কোন দ্রব্য না কিনিতে পারে তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য "ভাগীরথী" স্থানীয় মহকুমা-শাসক ও বর্দ্ধমানের মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

"ভাগীরথী"র সম্পাদকীয় মন্তব্যে যে কয়টি তথ্য উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা সত্য হইলে অবিলম্বেই মহকুমা-শাসকের এ বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমরাও মনে করি।

নাগা পরিস্থিতি ও সরকারী প্রচার

নাগা পাহাড় অঞ্চলে প্রায় তিন বৎসর যাবৎ সংঘর্ষ চলিতেছে। বিদ্রোহী নাগারা ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে গরিলা-সংগ্রাম চালাইতেছে। নাগা পাহাড় অঞ্চলের প্রকৃত পরিস্থিতি কি তাহা বলা বিশেষ কঠিন। তবে বিদ্রোহী নাগাদের দমন সম্পর্কে সরকারী প্রচারপত্রে যে সকল বিবরণ দেওয়া হয় তাহা যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবসম্পর্কশূন্য তাহা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায়।

নাগা পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারী প্রচারের এই বিশেষ

দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" ২৮শে অগ্রহায়ণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, নাগা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বর্ষার পরবর্তী অভিযানের সম্পূর্ণ সাফল্য ঘোষণা করিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে মেজর-জেনারেল কোচারের বিবৃতির অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে নাগা বিদ্রোহীদের নূতনতর প্রচেষ্টার সংবাদ আসিতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে নাগারা নূতন উদ্যমে আক্রমণ চালাইতে থাকে। "ইহাতে কি প্রতীয়মান হয়?" —"যুগশক্তি" প্রশ্ন করিয়াছেন।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন :—

"শিলঙের অন্য এক সংবাদে বলা হয় যে, নাগা গ্রামবাসীরা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতেছে এবং যাহাতে কোন অন্যায় কার্য্য সঙ্ঘটিত না হয় সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতেছে। কিন্তু এই ধরনের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য আছে কি? ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি ঘোষণা করিয়াছেন যে, নাগা পাহাড়ের পরিস্থিতি আয়ত্তে আসিয়াছে, নাগারা শান্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত বক্তৃতাদানের কিছুদিন মধ্যেই আবার বিদ্রোহীরা নানা স্থানে সহিংস আক্রমণ চালাইয়া উপরি-উক্ত ঘোষণা যে অবাস্তব তাহা প্রতিপন্ন করে। ইহাতে জনসাধারণের মনে নাগা পাহাড়ের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নহে।

"আমাদের মনে হয় নাগা পরিস্থিতি সম্পর্কে এই ভাবে বিবৃতি না দিয়া প্রকৃত অবস্থাই জনসাধারণকে জানাইবার এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করাই সমীচীন।"

ডাকমাশুল ও নয়া পয়সা

নয়া পয়সা প্রচলিত হইলে দ্রব্যমূল্যমান যে বৃদ্ধি পাইবে "ডাকমাশুল ও নয়া পয়সা" শীর্ষক পাক্ষিক "হিন্দুবাণী"র ১১ই পৌষ তারিখের মন্তব্য পাঠে তাহা সবিশেষ অনুধাবন করা যায়।

"হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন :

"নয়া পয়সার মাধ্যমে খাম, পোষ্টকার্ড প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া লোকসভা ভারতীয় পোষ্ট আপিস (সংশোধন) আইন, ১৯৫৬, নামে একটি আইন পাস করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছামত দিনে উহা প্রযুক্ত হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। উক্ত সংশোধনে খামের মূল্য ১৩ নয়া পয়সা ও পোষ্টকার্ডের মূল্য ৫ নয়া পয়সা ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং ১ টাকায় ৮ খানির বদলে ৭ খানি খাম বা ২১ খানির বদলে ২০টি পোষ্টকার্ড পাওয়া যাইবে। ফলে জনসাধারণের ডাকব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে। সরকারী হিসাবে ৵০ আনার স্থলে ১২ নয়া পয়সা ধরা হইলেও খামের মূল্যের ক্ষেত্রে উহা ১ নয়া পয়সা বেশী ধরা হইয়াছে।"

ডাকমাশুলসংক্রান্ত এই নূতন আইনটি চালু হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সংবাদপত্রসমূহ। বিশেষ ভাবে সাময়িক পত্রিকাগুলির ডাকব্যয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। বর্ত্তমানে রেজিষ্টার্ড পত্রিকাগুলি ১০ তোলা পর্য্যন্ত এক পয়সায় পাঠাইতে পারে—অর্থাৎ এক টাকায় ৬৪খানি পত্রিকা পাঠানো চলে। সে স্থলে নয়া পয়সা চালু হইলে পাঠানো যাইবে মাত্র পঞ্চাশটি।

উপসংহারে "হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন, "ডাকমাশুলের হার বৃদ্ধি না করিয়া কেবল নয়া পয়সার নামে সরকার মাশুল বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা করিতেছেন সে সম্বন্ধে জনসাধারণ ও পত্রিকাসমূহের সচেতন হওয়া আবশ্যক। নচেৎ উহা চালু করিবার সময় গোলমাল করিয়া লাভ হইবে না।"

পাকিস্থানী জবরদখল

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত দুইটি চর পাকিস্থানীরা বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভারত-সরকার ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং ঐ অঞ্চলে কিছু সৈন্যও মোতায়েন করা হইয়াছে।

সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলগুলি এইরূপ জবরদখল করা পাকিস্থানী রাজনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এইরূপ জবরদখলের ফলে দখলীকৃত অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় নাগরিকদিগের স্বার্থ বিশেষরূপে ব্যাহত হয়। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, বহুদিন পূর্ব্বেই তাহার রোয়েদাদ প্রকাশিত হয় এবং তদনুযায়ী সার্ভের কাজও সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু সীমারেখা চিহ্নিত করিবার কাজ এখনও পর্য্যন্ত সম্পন্ন না হইবার ফলেই এই সকল সীমান্ত বিরোধের সৃষ্টি হইতেছে। এ বিষয়ে ভারত সরকারও যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তাহা মনে হয় না।

ভারতীয় অঞ্চলে পাকিস্থানীদের এইরূপ বলপূর্ব্বক অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ৫ই পৌষ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ভারতী" পত্রিকা লিখিয়াছেন :

"কিছুদিন হইতে রাজসাহী-মুর্শিদাবাদের সীমান্তে পদ্মার চর লইয়া পাকিস্থানীরা এই একই খেলা খেলিতেছে। গত দুই বৎসর পূর্ব্বে এই মহকুমার দয়ারামপুর ইউনিয়নের হরিশ্চন্দ্রপুর, বাখরাসি, শিবপুর, বাজিতপুর, পিরোজপুর প্রভৃতি মৌজাগুলির হাজার হাজার বিঘা জমি এই কৌশলেই পাকিস্থানীরা দখল করিয়া লইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিয়া আসিতেছে। ভারত সরকার যে বিষয়টির উপর কার্য্যতঃ কোন গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। কারণ এতদঞ্চলের ভূস্বামিগণ পুনঃ পুনঃ পাকিস্থানীদের এই অন্যায় আচরণের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছেন এবং উভয় সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত এই চরগুলি সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। অপর পক্ষে এই চরগুলি পাকিস্থানী এলাকা বলিয়া ঘোষিত না হইয়াও পাকিস্থানীরা বেশ নির্ব্বিবাদে ইহার উৎপন্ন ফসলাদি বৎসরের পর বৎসর আত্মসাৎ করিয়া চলিয়াছে। ভারত সরকারের

এই নির্ব্বিকল্প ভূমিকায় উৎসাহিত হইয়া তাহারা হয়ত এ বৎসর আরও দুইটি চর দখল করিয়া লইল এবং ভবিষ্যতে যদি এইভাবে অগ্রসর হইয়া আরও কিছু কিছু ভূখণ্ড দখল করিয়া লয় তাহা হইলেও হয়ত বিস্মিত হইবার কিছু থাকিবে না।"

পূর্ব্ব পাকিস্থানে শিক্ষা কমিশন

পূর্ব্ব পাকিস্থানের শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য পূর্ব্ব পাকিস্থান সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করিয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান কমিশনের চেয়ারম্যান। কমিশনের অন্যান্য সদস্য হইতেছেন ড. মহম্মদ কুদরত এ-খুদা, কুমিল্লা কলেজের অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান, মৌলবীবাজার কলেজের অধ্যক্ষ আবু লাইস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যেই কমিশন সরকারের নিকট তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিবেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ রহিয়াছে, কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য প্রশ্নপত্র রচনা, প্রেরণ এবং প্রাপ্ত উত্তরগুলি বিচার-বিবেচনা করিয়া সেই সম্পর্কে কমিশনের মতামত দান এত অল্প সময়ের মধ্যে সারিয়া উঠা বিশেষ সহজসাধ্য নহে।

শিক্ষা কমিশন নিয়োগ উপলক্ষে ২৫শে পৌষ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "জনশক্তি" পূর্ব্ব পাকিস্থানের শিক্ষা পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্ত্তী যুগে "পূর্ব্ব পাকিস্থানের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস হইয়া পড়িয়াছে।" প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে বলিয়া ১৯৫১ সনে একটি আইন পাস হয়। তাহার বলে প্রদেশের ৩৯৮টি থানার প্রতি থানায় দুইটি ইউনিয়নকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় আনা হইয়াছে বটে, কিন্তু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র প্রদেশে বিস্তারের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

যে কয়টি স্কুল রহিয়াছে তাহাদেরও ঘরগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। স্কুলঘরের অভাবে দুই বেলা করিয়া স্কুল বসিতেছে। প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিতে কর্ম্মরত ৭২ হাজার শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১৫ হাজার ম্যাট্রিক পাস ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত, ত্রিশ হাজার নন্‌ম্যাট্রিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত, বাকী সাতাশ হাজার শিক্ষাদান কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

"গড়পড়তা প্রতি স্কুলে এক জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকও নাই। ফলে শিক্ষার নামে অশিক্ষাই চলিয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়া একশটি ছেলের মধ্যে ৪০ জনই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিবার পূর্ব্বেই পাঠ শেষ করে।"—"জনশক্তি" লিখিতেছেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিও সমান দুর্দ্দশাগ্রস্ত। স্কুলগুলি সরকার হইতে যে সাহায্য পায় তাহা নামমাত্র। ফলে অর্থাভাবে উপযুক্ত বেতন দিতে সক্ষম না হওয়ায় অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলিকেই অনুপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা কার্য্য চালাইতে হইতেছে। পত্রিকাটির ভাষায় "যাঁহারা অন্য কোন দিকে কোন সুবিধা করিতে পারেন না অধিকাংশ স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই সেই শ্রেণী হইতেই গৃহীত হইতেছেন। ফলে, শিক্ষার মান সর্ব্বনিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে।"

শিক্ষকদের দুর্গতি লইয়া কোন জাতির পক্ষেই উন্নতি করা সম্ভব নহে। শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকার গুরুত্ব এবং শিক্ষা-উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির ভূমিকার বিশেষ গুরুত্বের প্রতি নবগঠিত শিক্ষা কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া "জনশক্তি" লিখিতেছেন, "দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করিবার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশে পর্য্যাপ্তসংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করিতে হইবে। শিক্ষাদান কার্য্যকে যাঁহারা একটি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা সমাজ তথা রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতেই হইবে। শিক্ষা কমিশন সর্ব্বাগ্রে এই শিক্ষক তৈরি সম্পর্কেই চিন্তা করিয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন ইহাই আমরা আশা করি। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা এই কয় বৎসরে ধ্বংস হইয়া যাওয়ার মূলে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবই বড় কারণ—এই কথাটা আজও বুঝা দরকার।"

ইডেনের বিদায়গ্রহণ

স্যর এণ্টনী ইডেন প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়াছেন। ৯ই জানুয়ারী রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সহিত বাকিংহাম প্রাসাদে দেখা করিয়া তিনি তাঁহার পদত্যাগপত্র পেশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহা গৃহীত হয়। স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার জন্যই স্যর এণ্টনী পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

রাণী এলিজাবেথ বিভিন্ন রাজনীতিবিদ্‌দিগের সহিত পরামর্শ করিবার পর মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলানকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। ১৪ই জানুয়ারী মিঃ ম্যাকমিলান তাঁহার মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। নূতন মন্ত্রীসভার প্রধান সদস্যদের নাম যথাক্রমে: প্রধানমন্ত্রী—মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, অর্থ-মন্ত্রী—মিঃ পিটার থর্নিক্রফট; পররাষ্ট্রমন্ত্রী—মিঃ সেলুইন লয়েড, কমনওয়েলথ সচিব—আর্ল অব হোম; ঔপনিবেশিক সচিব—মিঃ লেনক্স বয়েড; প্রতিরক্ষা মন্ত্রী—মিঃ ডানকান স্যাণ্ডিস (চার্চ্চিলের জামাতা); স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও লর্ড প্রীভি সীল—মিঃ রিচার্ড বাটলার; প্রেসিডেণ্ট অব দি বোর্ড অব ট্রেড—মিঃ ডেভিড একক্লেস; লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব দি প্রীভি কাউন্সিল—মার্কুয়েস অব স্যালসবারী। লর্ড চ্যান্সেলর (প্রধান বিচারপতি)—ভাইকাউণ্ট কিলমির।

মিঃ ম্যাকমিলানের মন্ত্রীসভায় মোট আঠার জন সদস্য আছেন—স্যর এণ্টনী ইডেনের সময় অপেক্ষা একজন সদস্য কম। স্যর এণ্টনী ইডেনের মন্ত্রীসভার সদস্যদের গড়পড়তা বয়স ছিল ৫৫ বৎসর; বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার ৫৩ বৎসর।

পুরাতন মন্ত্রীসভার যে কয়েকজন সদস্যকে নূতন মন্ত্রীসভা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন—

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ এণ্টনী হেড (সুয়েজ সমস্যার সামরিক দিক সম্পর্কে যাঁহার কার্য্যাবলীতে ব্রিটেনের সংবাদপত্র এবং রক্ষণশীল দলের একাংশের মধ্য হইতে বিশেষ সমালোচনা উঠিয়াছিল); স্যর ওয়াল্টার মনুক্‌টন (যিনি সুয়েজ খাল লইয়া মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের বিরোধী ছিলেন); প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুইলিম লয়েড জর্জ্জ এবং প্রাক্তন পূর্ত্তমন্ত্রী মিঃ প্যাট্রিক বুকান-হেপবার্ণ।

স্যর ওয়াল্টার মনুক্‌টনকে রাণী ভাইকাউণ্ট উপাধি দিয়াছেন। স্যর এণ্টনী ইডেনকেও আর্ল উপাধি দেওয়া হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

স্যর এণ্টনী ইডেনের পদত্যাগ কোন দিক হইতেই অপ্রত্যাশিত নহে। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে যখন ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য মিশর আক্রমণ করে তখনই ইডেন সরকারের জঙ্গীবাদী নীতির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই বিক্ষোভ কেবলমাত্র বিরোধী শ্রমিক দলেরর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; রক্ষণশীল দলের একাংশের মধ্যেও ইডেন সরকারের নীতির বিশেষ সমালোচনা হইতে থাকে। সুয়েজ খাল লইয়া মিশর আক্রমণের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ দু'একজন মন্ত্রী পদত্যাগও করেন। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্যর এণ্টনী ইডেন স্বাস্থ্যের অবনতির অজুহাতে জ্যামাইকা চলিয়া যান এবং মিঃ রিচার্ড বাটলার তাঁহার স্থলে কার্য্য চালাইতে থাকেন। সেই সময়ই অনেকে জল্পনা-কল্পনা করিতে থাকেন যে, স্যর এণ্টনী হয়ত আর মন্ত্রীসভায় যোগদান করিবেন না। কার্য্যতঃ অবশ্য স্যর এণ্টনী ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় যে আসন্ন সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ থাকে না।

স্যর এণ্টনী ইডেনের পদত্যাগে কেহ বিস্মিত না হইলেও নূতন প্রধানমন্ত্রীর নাম দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। ওয়াকিবহাল মহল সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, স্যর এণ্টনীর পদত্যাগের পর মিঃ বাটলারই প্রধানমন্ত্রী হইবেন। কিন্তু বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রী হইলেন মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান—যিনি ম্যাকমিলান পুস্তক কোম্পানীর কর্ণধার এবং ইডেন মন্ত্রীসভায় প্রথমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে অর্থমন্ত্রীরূপে কার্য্য করেন। স্যর উইনষ্টন চার্চ্চিল এবং প্রধানতঃ মার্কুয়েস অব স্যলসবারীর পরামর্শ অনুসারেই রাণী এলিজাবেথ মিঃ ম্যাকমিলানকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন।

নূতন প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন সম্পর্কে ব্রিটেনে এক রাজনৈতিক বিতর্ক চলিয়াছে। শ্রমিক দলের পক্ষ হইতে অভিযোগ করিয়া বলা হইয়াছে যে, রক্ষণশীল দলকর্ত্তৃক কোন নেতা নির্ব্বাচিত হওয়ার পূর্ব্বেই রাণী প্রধানমন্ত্রীরূপে মিঃ ম্যাকমিলানকে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং দলীয় রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অভিমতে রাণী মিঃ ম্যাকমিলানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার ফলে রক্ষণশীল দলের পক্ষে মিঃ ম্যাকমিলানকে নেতা নির্ব্বাচিত করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না, কারণ যদি ম্যাকমিলানকে নেতা না করা হয় তাহা হইলে রাণীকে অমান্য করা হইবে। এইরূপ ভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দেশের উপর চাপাইয়া দেওয়া রাণীর পক্ষে ঠিক হয় নাই বলিয়া তাঁহারা মন্তব্য করেন।

ইডেনের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক দল দেশে একটি সাধারণ নির্ব্বাচনের দাবি জানান। নূতন প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান বলিয়াছেন যে, এখন সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে না।

আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক মহলে স্যর এণ্টনী ইডেনের পদত্যাগ এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। স্যর এণ্টনীর পদত্যাগে ব্রিটেনে পররাষ্ট্রনীতির কি পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার জন্য সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, স্যর এণ্টনীর পদত্যাগে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাঁহারা হতাশ হইয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রধানমন্ত্রী পদে মিঃ ম্যাকমিলানের নিয়োগে এবং পরে পররাষ্ট্রসচিব পদে মিঃ লয়েডের পুনর্নিয়োগে তাঁহাদের সেই আশা ব্যর্থ হইয়াছে।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রমণ্ডলী, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বুলি প্রায়ই আওড়াইয়া থাকে। হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার আক্রমণে ইহারা যে পরিমাণ চোখের জল ফেলিয়াছে তাহা দেখিয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না যে ইহারা নিজেরা কোন নিষ্ঠুর আচরণ করিতে পারে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সোভিয়েট রাষ্ট্রের মতই ইহারাও অপরাপর রাষ্ট্রের আচরণকে যে মানদণ্ড দিয়া বিচার করে, নিজেদের আচরণের বিচারের সময় তাহারা সেই মানদণ্ড ব্যবহার করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট আক্রমণ ও বর্ব্বরতা যে কঠোরভাবে নিন্দনীয় তাহা নিঃসন্দেহ। আমরা বিনা দ্বিধায় তাহার নিন্দা করিয়াছি। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গও সোভিয়েট আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়াছে—তদপেক্ষা বেশী কিছুও করিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই শক্তিবর্গ নিজেরা কি আচরণ করিতেছে? ব্রিটেন ইয়েমেন আক্রমণ করিয়াছে; ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকে বর্ব্বরোচিত উপায়ে দমন করিতেছে, পর্তুগীজ আফ্রিকায় ও ভারতের গোয়াতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ নির্লজ্জ অত্যাচার ও শোষণ চালাইতেছে। হাঙ্গেরীতে যে অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে, এই সব দেশে সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার তদপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। তদুপরি মধ্যপ্রাচ্যে আইসেনহাওয়ার নীতির ফলে নূতন করিয়া সংঘর্ষের বিপদ দেখা দিয়াছে।

পাশ্চাত্য—বিশেষতঃ মার্কিনী গণতন্ত্রের সর্ব্বশেষ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে ওকিনাওয়াতে। ওকিনাওয়া জাপানের অন্তর্গত রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্ববৃহৎ দ্বীপ। ১৯৫১ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তদনুযায়ী রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের কর্ত্তৃত্ব "অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে

জাপান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের আট লক্ষ অধিবাসী সকলেই জাপানী শিক্ষা-দীক্ষায় প্রভাবিত এবং তাহারা সকলেই জাপানের সহিত পুনর্মিলনের জন্য উন্মুখ। কিন্তু মার্কিন সামরিক অধিকারের জন্য রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের স্বাধীনতা লাভের ও স্বজাতির সহিত পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

সম্প্রতি ওকিনাওয়া দ্বীপের রাজধানী নাহা শহরের মেয়র নির্বাচনে মার্কিন-বিরোধী কামেজিরো সেনাগা বিপুল ভোটাধিক্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। মার্কিন সামরিকমণ্ডল প্রকাশ্য ভাবেই সেনাগার নির্বাচনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু এইরূপ সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্ত্বেও সেনাগা ১৬,০০০ ভোট পান। সেনাগা এক জন প্রাক্তন সাংবাদিক। ১৯৫৪ সনে অপরাধীকে আশ্রয়দানের অভিযোগে তাঁহাকে দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। গত এপ্রিল মাসে দেড় বৎসর কারাদণ্ডভোগের পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার বয়স বর্তমানে ৪৯ বৎসর।

যদিও ওকিনাওয়া পিপলস পার্টির নেতা মিঃ কামেজিরো সেনাগা বিপুল ভোটাধিক্যে জনপ্রিয় মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন তথাপি মার্কিনী গণতন্ত্রের এমনই অপার মহিমা যে, তাঁহাকে নাগরিক কার্যের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কোন অর্থই ব্যবহার করিতে দেওয়া হইতেছে না।

আইসেনহাওয়ার-নীতি

প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসী প্রভুত্বই সার্বভৌম ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্রিটেন পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া পড়ায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্রিটেনকে ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। ব্রিটেনের ক্ষমতা হ্রাসের সূচক হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ প্রভুত্বেও ফাটল দেখা দেয় এবং সেই অঞ্চলে মার্কিন অনুপ্রবেশ ঘটিতে থাকে। তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এমনকি তাহার অব্যবহিত পরেও মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনেরই প্রভুত্ব সমধিক ছিল। আইসেনহাওয়ার-নীতি ঘোষণার পর এখন আর তাহার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না বলা চলে।

মধ্যপ্রাচ্যে শূন্যস্থান পূর্ণকরণের আইসেনহাওয়ার-নীতি মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভুত্ব বিস্তারেরই নীতি। যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্টই বলিয়াছে, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সহিত মিলিয়া মধ্যপ্রাচ্যে কোন নীতি কার্যকরী করিতে মার্কিন সরকার বিশেষ আগ্রহান্বিত নহেন।

ইউরোপে মার্কিন প্রভুত্ব স্থাপনের নীতি ছিল ট্রুম্যান-নীতি। ট্রুম্যান-নীতিরও উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিজম প্রতিহত করা। আইসেনহাওয়ার-নীতিরও একটি লক্ষ্য মধ্যপ্রাচ্যে কমিউনিজম প্রতিরোধ করা। ইউরোপে কমিউনিজম কতদূর প্রতিহত হইয়াছে তাহা বলিবার সময় এখনও আসে নাই তবে ইউরোপের রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর উপর মার্কিন প্রভাব যে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মার্কিন প্রভুত্ব বিস্তারে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবিদ্‌দিগের একাংশের উদ্বেগের প্রতিধ্বনি করিয়া লণ্ডনের "টাইম্‌স" পত্রিকা সেইজন্যই ১৯৫১ সনে লিখিয়াছিলেন, পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের বেশী অঞ্চলে মার্কিন সরকারের বিনা অনুমতিতে কোন রাষ্ট্রেরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক কাজ করিবার ক্ষমতা নাই।

ট্রুম্যান-নীতি ঘোষণার পর ইউরোপে 'ঠাণ্ডা লড়াই' দেখা দেয়। আইসেনহাওয়ার-নীতি ঘোষণার পর মধ্যপ্রাচ্যেও তদনুরূপ ঠাণ্ডা লড়াই সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইয়াছে। সোভিয়েট সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সৈন্য প্রেরণ হইলে তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। শূন্যস্থান পূরণের নব মার্কিন নীতিতে মধ্য-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশেষ উদ্বেগ দেখা দিয়াছে। সিরিয়া সরকার প্রকাশ্যেই তাঁহাদের উদ্বেগ ঘোষণা করিয়াছেন। স্বাভাবিক-ভাবে ভারতীয় রাজনৈতিকমহলও এই নূতন নীতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিতেছেন না।

নির্বাচনী-যুদ্ধ

নির্বাচনের মুখে প্রতিটি দল ও উপদল বিপক্ষের 'গুণকীর্তনে' পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। নিজের গলদে সাফাই গাওয়া ও অন্যের দোষ লইয়া পাঁচালী গাওয়া ইহাই পার্টি সিষ্টেমের অবদান। নীচে কিছু নমুনা দেওয়া গেল। বিচক্ষণ পাঠক ক্ষীর ও নীর সম্পর্কে সজাগ থাকুন:

"লক্ষ্মীবাঈনগর, ৫ই জানুয়ারী—আজ কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু বলেন যে, ভারতকে তাহার নিজস্ব সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে। সে-পথ শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথ। ভারত যদি শান্তি ও গণতন্ত্রের পথ পরিহার করে, তবে ভারতভূমি বিরোধ-বিসংবাদের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, শক্তিপ্রয়োগের সাহায্যে জোরজবর-দস্তিতে যাহারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে তাহারা ভুলিয়া যায় যে, ভারতে ৩৭ কোটি লোককে সমাজতন্ত্রের পথে লইয়া যাইতে হইবে। এই বিরাট জনসমষ্টির উপর জোর করিয়া সমাজতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার পরিণাম যে ব্যর্থ হইবেই—তাহা দিনের আলোর মত স্পষ্ট।

ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সরাসরি আক্রমণ করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, পৃথিবীতে দ্রুতবেগে নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে—কিন্তু ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী আজও অনড়-অটল। সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গীকে এখনও ইহারা আঁকড়াইয়া আছেন। হয়ত নূতন যুগের আলোয় আসিয়া দাঁড়াইতে উহাদের আরও এক শত বৎসর লাগিয়া যাইবে।

পণ্ডিত নেহরু স্বীকার করেন যে, ভারতে শ্রেণী-বিরোধ আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার তাগিদও বিদ্যমান। ইউরোপের কম্যুনিষ্টরা শ্রেণী-বিরোধের অবসানকল্পে উহাকে

উস্কাইয়া দিয়া তীব্রতর করিয়া তুলিতে চাহে। শ্রেণী-বিরোধকে তীব্রতর করিয়া শোষক শ্রেণীর পতন ঘটানো ও সর্ব্বহারার এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠাই তাহাদের কাম্য। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই পথ অনুসরণের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এখানকার পরিস্থিতির মধ্যে গুরুতর রকমের নানা জটিলতা আছে এবং ভারতের গত চল্লিশ বৎসরের বিপ্লবী আন্দোলনের ঐতিহ্যও ইহার পরিপন্থী।

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ সমালোচনা করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারীরা মনে করেন যে, সমাজতন্ত্রের মত আদর্শবাদ জোরজবরদস্তিতে জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেওয়াই উচিত। সুতরাং এই দৃষ্টি-ভঙ্গীসম্পন্ন রাজনৈতিক দলকে স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিজেদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে মারাত্মক একটি বিপদও রহিয়াছে। জনসাধারণের বৃহৎ অংশ যদি ইহাতে সাড়া না দেয়—তবে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলেরও অন্তিম ঘনাইয়া আসিবে।

এই সহজ সরল কারণটির জন্যই কংগ্রেসের মত প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই এই পথ গ্রহণ করিতে পারে না।"

গত শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা ময়দানে সম্মিলিত পঞ্চ বামপন্থী দলের কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনী প্রচার সভার উদ্বোধনে সংশ্লিষ্ট প্রধান বামপন্থী দলগুলির মুখপাত্র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আগামী নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমান সরকারের পরিবর্ত্তে বিকল্প সরকার গঠনের ধ্বনি তোলেন।

কমুনিষ্ট পার্টি, প্রজা-সোস্তালিষ্ট, সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল এবং মার্কসিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক এই পাঁচটি দল লইয়া গঠিত সম্মিলিত বামপন্থী নির্ব্বাচনী কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় প্রজা-সোস্তালিষ্ট নেতা ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। বিভিন্ন দলের পতাকা ও ফেষ্টুন লইয়া অনেকগুলি শোভাযাত্রা সভায় আসিয়া মিলিত হয়।

এই সভায় উল্লিখিত বামপন্থী দলগুলির নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানান যে, সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ আয়ের ব্যবধান হ্রাস এবং উহাদের সীমা নির্দ্ধারণ, নির্ব্বাচনের পাঁচ বৎসরের মধ্যে বেকার ভাতা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন, ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকল বালকবালিকার বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদান এবং চিকিৎসা ও অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তাঁহাদের পাঁচটি দলের মধ্যে একটি নূনতম কর্ম্মসূচী প্রণয়নে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ড. ঘোষ পরে সাংবাদিকদিগকে জানান যে, উক্ত নূনতম কর্ম্মসূচীতে আরও কয়েকটি বিষয় যোগ করিবার জন্য আলোচনা চলিতেছে। ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে এই সম্পর্কে ঘোষণার সম্ভাবনা আছে।

ড. ঘোষ ঘোষণা করেন যে, পাঁচটি বামপন্থী দল আলোচনা কালে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিতরূপ নূনতম কর্ম্মসূচী সম্পর্কে একমত হইতে পারিয়াছেন:

(১) বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, (২) নিম্নতম আয় এবং উচ্চতম আয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, (৩) মুষ্টিমেয় লোকের হাতে টাকা কেন্দ্রীভূত হইতে দেওয়া হইবে না, (৪) ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বালকবালিকাদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৫) পাঁচ বৎসরের মধ্যে বেকার-ভাতা, উচু-নীচু আয়ের ভেদ না থাকা, শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন ও বস্ত্র সমস্যা প্রভৃতির সমাধান করিতে হইবে। তাঁহার মতে যে কোন গবর্ণমেণ্টই আসুক না কেন, উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন না করিতে পারিলে সে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কোন দাবি থাকিতে পারে না। ড. ঘোষ বামপন্থী দলের নির্ব্বাচিত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করিতে আহ্বান জানান।

শ্রীজ্যোতি বসু এম্-এল-এ বলেন, বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্যই বেশী, অনৈক্য কম। আজ পাঁচটি বামপন্থী দল নিম্নতম কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। এই ঐক্য সুবিধাবাদী ঐক্য নয় অথবা শুধু আসন ভাগাভাগির জন্য এই ঐক্য নয়। ইহা সাধারণ মানুষের ঐক্য। সাধারণ মানুষ কুশাসন ও দুর্নীতির অবসান চায়। তাহারা দুর্গতির অবসান চায়।

শ্রীবসু অভিযোগ করেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সরকার "গণতন্ত্রবিরোধী" নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। জনসাধারণের আন্দোলন দমনের জন্য বেপরোয়া পুলিসী জুলুম চালান হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুলিসের গুলি চালনায় ৫০০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহা নিশ্চয়ই ভারতের গর্ব্বের বস্তু। কিন্তু এই পরিকল্পনা সফল করিতে যে ২২ হাজার কর্ম্মচারী প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, আজ ছাঁটাইয়ের খড়্গ তাঁহাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষ শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের শেষে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল—এই দুইটি রাজ্যে সম্মিলিত বামপন্থী শক্তিদের এক বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা বিশেষ উজ্জ্বল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। অন্যান্য রাজ্যেও বামপন্থী দলগুলি এই নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে বলিয়াও তিনি দৃঢ় আশা ব্যক্ত করেন। নির্ব্বাচনে তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতেছেন তাহার উল্লেখে শ্রীঘোষ বলেন যে, যেখানেই সম্ভব সেখানেই বিকল্প সরকার গঠন এবং পার্লামেণ্টে ও প্রত্যেক রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে গণতান্ত্রিক বিরোধিতার শক্তি বৃদ্ধি করাই এই সংগ্রামের লক্ষ্য। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রধান প্রধান বামপন্থী দলগুলির মধ্যে একটা মতৈক্য সাধিত হইয়াছে, ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে নির্ব্বাচনে পরাজিত করিয়া একটা গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট

জনসাধারণের প্রয়োজন ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে এবং উহার ফলে সমগ্র দেশের সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করা সম্ভব হইবে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বামপন্থী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হইবার মধ্য দিয়া যে নেতৃত্ব দিয়াছে তাহা সমস্ত রাজ্যের জনগণেরই অভিনন্দন লাভ করিবে।

জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন

লক্ষ্মীবাঈনগরের অধিবেশনে সভাপতি ডেবর যে ভাষণ দিয়াছেন তাহার সারাংশ নীচে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত করা হইল। উহাতে নূতন তথ্য কিছুই ছিল না:

"ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬২তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ এন ডেবর সমবেত কংগ্রেসকর্মীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, মানবেতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আজ আমরা এক সঙ্কটপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন—বর্তমান বিশ্বের ভবিষ্যৎ কি? এই প্রশ্নই আজ আমাদের সকলকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি বলেন, মানবেতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে শান্তি ও শুভেচ্ছা লইয়া অগ্রসর হইলে একদিকে যেমন সর্ব্বাত্মক প্রগতি ও অতুল বৈভব সুনিশ্চিত, তেমনি অন্যদিকে সংগ্রামের পথে মানবজাতির বহু-আয়াসলব্ধ এই সভ্যতার পরিপূর্ণ ধ্বংস অবধারিত। মানবজাতির সম্মুখে আর কখনও এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই। তার একদিকে সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য এবং অন্যদিকে সর্ব্বনাশ ও ধ্বংস। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দেশে বিশ্বনেতৃত্বের এক পরীক্ষা চলিতেছে।

শ্রীডেবর বলেন, বিশ্বের সর্ব্বত্র আজ জাগিয়াছে এক অদম্য স্বাধীনতার স্পৃহা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের অকুণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি জগতে প্রবেশের এক দুর্দ্দমনীয় আবেগ। বৃহত্তম শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র আজ ইহা প্রতিরোধে অক্ষম।

আমরা দেখিয়াছি, ইংরেজ, ফরাসী ও ইস্রায়েলের অস্ত্রাগারের সম্মিলিত অস্ত্র মিশরবাসীকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই এবং সোভিয়েটের নির্ম্মম পেষণ অবাধ্য হাঙ্গেরীকে কম্যুনিজমের বন্ধন গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে নাই।

কংগ্রেস সভাপতি বলেন, যে নীতিতে সমগ্র বিশ্ব চলিতেছে, ভারতও সেই নিয়মেই চলিতেছে। প্রকৃতির লীলা সর্ব্বত্র সমান। গণতন্ত্রের অবিসংবাদিত সত্য আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। সামাজিক অসাম্য, অবিচার, রাজনৈতিক দাসত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতাহীনতা যে ধ্বংসের পথ, ইহা আমাদের অস্বীকার করিলে চলিবে না।"

সামরিক চুক্তি ও বিশ্বযুদ্ধ

বিগত কংগ্রেস অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু সামরিক চুক্তি ও পাকিস্থান সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আমরা জানিতে চাহি যে, ভারত সরকার পাকিস্থানের মতিগতি সম্পর্কে কতটা সজাগ ও ওয়াকিবহাল। মাকিন সরকারের আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে আশা করি এই সোজা কথা আমাদের কর্তৃপক্ষের মাথায় জাগিয়াছে:

"লক্ষ্মীবাঈ নগর, ৬ই জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরু অদ্য কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সামরিক চুক্তির নিন্দা করেন এবং বলেন, ইহার ফলে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার পর শ্রীনেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঐ অভিমত ব্যক্ত করেন।

শ্রীনেহরু বলেন, 'মিশর ও হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীর দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র দেশের বিরুদ্ধেও ঔপনিবেশিক অথবা কম্যুনিষ্ট শক্তির আক্রমণ আরম্ভ করা দুরূহ ব্যাপার। এই ধরনের কাজ এখন অত্যন্ত কঠিন। তবে উহা যে অসম্ভব একথা আমি বলিতে পারি না।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁহার মতে এই সকল ঘটনায় কতকগুলি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং জগতেরও কিছু মঙ্গল হইয়াছে। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় ইহার ফলে লোকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্বসমস্যা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইবে এবং নূতন উপায়ে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হইবে। তবে দুঃখের সহিত আমি বলিতেছি যে, কোন কোন দেশের কয়েক জন সম্মানিত ব্যক্তি এই সকল ঘটনা ঘটার পরও উহা হইতে বাঞ্ছিত শিক্ষালাভ করেন নাই অথবা করিতে চাহেন নাই। ঐ সকল ব্যক্তি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, পুরাতন পথে তাঁহারা লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবেন না।'

পণ্ডিত নেহরু বলেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এখনও কেহ কেহ নূতন পথ অনুসরণ না করিয়া তরবারি আস্ফালন করিতেছে। তবে একথাও সত্য যে, তরবারিকে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। কোন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিই একথা বলিবে না যে, তরবারি ফেলিয়া দেওয়া উচিত। তবে সকল সময় তরবারি আস্ফালন না করিয়া উহা কোষবদ্ধ করিয়া রাখাই উচিত।

পাকিস্থানকে যে সামরিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে আশ্বাস দিয়াছে যে, এই সকল অস্ত্র আক্রমণাত্মক কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে না, কিন্তু একথা সত্য যে, অতি-আধুনিক ধরনের অস্ত্রাদি পাকিস্থানে মজুত করা হইতেছে। ভারত এই প্রকার সামরিক সাহায্যদান ব্যাপারে নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারে না।

এই সকল অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণের নীতি সমর্থনের জন্য পাকিস্থান দুই প্রকার কথা বলিতেছে। একদিকে পাকিস্থান বলিতেছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে এই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিতেছে—আবার অপর দিকে সে সোভিয়েট ইউনিয়নকে বলিতেছে যে, ভারতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য তাহার এই সকল অস্ত্র প্রয়োজন।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, 'প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যখন অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হইতেছে তখন আমরা কিভাবে চোখ বুঁজিয়া থাকিতে পারি? এই সকল অস্ত্র আধুনিক অস্ত্র। পাকিস্থানে কোন কোন লোক প্রকাশ্যেই বলিতেছে যে, এই সকল অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইবে।'

পণ্ডিত নেহরু বলেন, এই সকল অস্ত্রশস্ত্রের অপপ্রয়োগ হইবে না বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে যে আশ্বাস দিয়াছে, তাহা যে সত্য এই বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের সীমান্তে অত্যন্ত মূল্যবান নূতন ধরনের অস্ত্রাদির সমাবেশ করা হইতেছে। অস্ত্র মজুত করার প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ভারতের ইচ্ছা নাই। ভারত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সকল অর্থ ব্যয় করিতে চাহে। কোন দেশ হইতে বিনামূল্যে অস্ত্র লইতেও আমরা অস্বীকার করিয়াছি। দান হিসাবে আমরা কোন অস্ত্র লইব না। আমরা হয়ত নিজে অস্ত্র তৈয়ার করিব অথবা অন্য দেশ হইতে তাহা ক্রয় করিব। প্রকৃত কথা হইতেছে, আমরা অস্ত্রক্রয়ের জন্য অল্প অর্থ ব্যয় করি এবং অন্য কাজে বেশী অর্থ ব্যয় করি। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাকিস্থানে প্রচুর পরিমাণে যে অস্ত্রশস্ত্র আসিতেছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া আমরা পারি না। এই অবস্থায় অবিচলিত থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে এবং কি ঘটিতে পারে তাহা আমাদের চিন্তা করিতে হইবে।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, বুদ্ধিমান লোক লইয়া গঠিত পাকিস্থানের কোন মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। কিন্তু কি ঘটিবে তাহা কেহ বলিতে পারে নাই। সেইজন্য ভারতকেও বাধ্য হইয়া অস্ত্র রাখিতে হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সকল কারণেই ভারত দৃঢ়ভাবে বাগদাদ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি-সংস্থার বিরোধিতা করিয়াছে। এই সকল সামরিক চুক্তি শান্তির পথে এবং যে সকল দেশ শান্তির পথ অনুসরণ করিতেছে তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

প্রসঙ্গক্রমে পণ্ডিত নেহরু বলেন, 'পাকিস্থানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানের অন্যতম শত্রু হইল ভারত। পাকিস্থানের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি এইরূপ উক্তি করিয়া পরিস্থিতি বিষময় করিয়া তোলেন, তবে আমরা কি করিতে পারি। তবে অবস্থা অধিকতর খারাপ হইবার মত কোন কাজ আমরা করিব না, কারণ আমাদের বিশ্বাস, এইরূপ করিলে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে সমস্যা আছে তাহার সমাধান হইবে না।' "

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

পৌষ সংক্রান্তির দিনে কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। নীচে পণ্ডিত নেহরু ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণের সারাংশ দেওয়া হইল। উহা আনন্দবাজার হইতে গৃহীত:

"সোমবার কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে উঠিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু গভীর ভাবসমৃদ্ধ এক ভাষণে পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বের পটভূমিকায় বিজ্ঞানের অপ্রতিহত সাধনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকগণের কর্ত্তব্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি এই বলিয়া এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, বিজ্ঞান যদি ঘৃণা ও হিংসার ভাবধারার সহিত জড়াইয়া পড়ে তবে নিঃসন্দেহে উহা ভ্রান্ত পথে পদক্ষেপের দ্বারা বিশ্বের সমূহ বিপদ ডাকিয়া আনিবে। পণ্ডিত নেহরু তাই বৈজ্ঞানিকগণকে সঙ্কীর্ণতা ও পরমত অসহিষ্ণুতার উর্দ্ধে উঠিয়া বিজ্ঞানের সাধনায় ব্রতী হইবার জন্য আহ্বান জানান। কারণ, তিনি বলেন, বর্ত্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং নূতন অস্ত্রের হুমকি বড় কথা নহে, বড় কথা হইতেছে 'মানুষের ভাবধারা আজ কোন্ পথে চলিয়াছে, মানুষ কি চিন্তা করিতেছে।'

শান্তিময় বিশ্ব গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, ভারত এক্ষণে স্বীয় ভবিষ্যৎ রচনায় ব্যাপৃত আছে। শুধু এই দেশেরই ভবিষ্যৎ গঠন নহে, শান্তি, সহিষ্ণুতা ও করুণার বিশ্ব গড়িয়া তুলিতেও বিজ্ঞানীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সহানুভূতির প্রয়োজন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অধিবেশনের সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান মানুষের কল্যাণে নিয়োগ ও বিজ্ঞানের উন্নয়নকল্পে উপযুক্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

'মানুষের জীবনে এমন অনেক কিছু দেখা যায় যাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য। নানা জটিলতার গ্রন্থি মানুষের জীবনে। মানুষ যতই অগ্রসর হইয়া যাইতে থাকে, ততই নূতন নূতন সমস্যা দেখা দেয়। কাজ যত অগ্রসর হইতে থাকে, জীবন-প্রণালী নূতন নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে।

জীবনের অভিযান চলিয়াছে অব্যাহত গতিতে। আজ যাহা আমাদের আদর্শ, তাহার সাফল্য হয়ত আজ হইতে আরও এক শত বৎসর দূরে। তখন কার যাহা আদর্শ হইবে, তাহাও আবার শত বৎসর দূরে রহিয়াছে।

আমরা যতই অগ্রসর হই নির্দ্ধারিত লক্ষ্য দূরে সরিয়া গিয়া বৃহত্তর ও উন্নততর লক্ষ্য রূপ পরিগ্রহ করে। সময়ের মেঘজাল হয়ত অসংখ্য সমস্যা, পরীক্ষা ও বিপদকে আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে; আবার সময়েই হয়ত বহু অজ্ঞাত সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে, অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করিবে। এই সব সমাধান ও নবলব্ধ জ্ঞানকে মানুষের হিতার্থে কাজে লাগাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।'

সোমবার কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার বহু তথ্যসম্বলিত ও সারগর্ভ অভিভাষণে এই উক্তি করেন।

ডাঃ রায় তাঁহার ভাষণে বলেন, এদেশে আমরা গত প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা করিতেছি, কিন্তু নক্সা, যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনা, নির্ম্মাণ, সংস্থাপন, উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি

ইঞ্জিনিয়ারিং ও যন্ত্রবিজ্ঞানের গবেষণায় বিশেষ অগ্রসর হইতে পারি নাই। ভারতের মত অনুন্নত দেশে আমাদের নিজেদেরই যে যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা নির্ম্মাণ করিতে পারা একান্ত উচিত তাহা নহে, আমাদের হাতে যে সরঞ্জাম ও উপকরণ আছে, তাহার সাহায্যেই কি ভাবে ঐ সব কাজ করা যাইতে পারে তাহাও জানা উচিত। ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা বলিতে শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যার সমাধানে পদার্থবিদ্যার জ্ঞান প্রয়োগই যেন না বুঝায়। ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভব হইয়াছে, সাধারণ মানুষের সমস্যার সহিত জড়িত বলিয়া সেগুলির বিশেষ সামাজিক মূল্য আছে, যেমন জীবতাত্ত্বিক, রাসায়নিক এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ইঞ্জিনিয়ারিং। এই সকল নূতন বিষয়েও আমাদিগকে গবেষণা করিতে হইবে। অন্যান্য দেশে এ সকল বিষয়ে গবেষণা করিয়া অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও আমাদের যেটুকু সম্বল আছে, তাহা লইয়াই ইঞ্জিনিয়ারিঙের এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রগতির জন্য অনতিবিলম্বে আমাদিগকে কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য আমাদিগকে কিছু আর্থিক ঝুঁকি লইতে হইলেও তাহা লওয়া উচিত। মানুষের মন সাধারণতঃ অভ্যস্ত পথেই চলিতে চাহে, নূতন কোন কিছু সহজে গ্রহণ করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা যদি নূতন নূতন গবেষণালব্ধ ফলের সহিত দ্রুত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার ও ঐগুলির সুযোগ গ্রহণের মূল্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে তাঁহারা সমাজের একটি মহৎ উপকার করিবেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বহুসংখ্যক উন্নয়ন কার্য্য ও বিরাট ব্যয়ের উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় বলেন যে, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রবিদ্‌গণ যদি অল্প ব্যয়ে অথচ নিখুঁতভাবে উন্নয়ন কার্য্যগুলি সমাধা করিবার কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন না করিতে পারেন, তবে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে আমাদিগকে বেগ পাইতে হইতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সস্তায় ও প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল উৎপাদন করা সম্ভব। সুতরাং সস্তায় কাঁচা মাল পাইবার জন্য আমাদিগকে বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য লইতে হইবে। এদেশে লোকবল অপর্য্যাপ্ত এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া সামগ্রিক ব্যয় যথেষ্ট লাঘব করা যাইতে পারে। কিন্তু এই লোকবল ব্যবহার করিতে হইলে নির্ম্মাণকার্য্যের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে বিশেষ দক্ষতাহীন সাধারণ লোকেরাও তাহা বুঝিতে পারিয়া নির্ম্মাণকার্য্যে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে।"

কলিকাতায় শান্তি ও নিরাপত্তা

কলিকাতার পথে ঘাটে তো লোক ও যানবাহন চলাচল দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে পুলিস কিছু নজর দিয়াছে, তবে নজর দেওয়ার ফল কি দাঁড়ায় সেটা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে।

অন্যদিকে চুরি, রাহাজানি সমানেই চলিতেছে। চুরি হইলে খবর দিয়া পুলিস তদন্ত করান দুরূহ ব্যাপার। তদন্ত হইলেও কিনারা হয় অতি কম।

সম্প্রতি খুনখারাবি ও লুণ্ঠন বাড়িয়াই চলিতেছে। নীচে দুইটি উদাহরণ দেওয়া গেল :

"কলিকাতায় গত রবিবার রাত্রে উল্টাডাঙ্গা রোডে ইউনাইটেড স্কোওয়ার মিলসের অভ্যন্তরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। কে বা কাহারা ঐ মিলের হেড জমাদার এবং অপর একজন প্রহরারত দ্বারোয়ানকে খুন করিয়া চম্পট দেয়। সোমবার ভোরে এই জোড়া খুনের ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর ঐ অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

রবিবার যথারীতি ঐ ময়দা কলটি বন্ধ ছিল। সোমবার ভোরে উহা খুলিবার প্রাক্কালে মিলের লোকজন আসিয়া হেড জমাদার ও দ্বারোয়ানকে নিহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখে। হেড জমাদারের ঘরের সিন্দুকটি খোলা অবস্থায় ছিল। কিন্তু উহাতে খুব বেশী অর্থ ছিল বলিয়া মনে করা হইতেছে না। তাই এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত অভিসন্ধি সম্বন্ধে মিল-কর্ত্তৃপক্ষ অথবা পুলিস কোন পক্ষই এখনও সঠিক কিছু আঁচ করিতে পারিতেছেন না।

নিহত উভয়েই উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। হেড জমাদারের নাম হরপ্রসাদ সুকুল (৪৫)। তাহার বাড়ী প্রতাপগড় জেলায়। সে বিবাহিত। প্রকাশ, তাহার কোন সন্তানসন্ততি নাই। আর নিহত দ্বারোয়ানের নাম শিউনারায়ণ তেওয়ারী (২৮)। তাহার বাড়ী সুলতানপুর জেলায় পূর্ব্বাভিখপাস্তে গ্রামে। প্রকাশ, সে মাত্র সাত-আট মাস পূর্ব্বে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিল। তাহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত এক কন্যা আছে। বিবাহের পর নবপত্নীকে গৃহে রাখিয়া গত শ্রাবণ মাসে সে কলিকাতায় আসিয়াছিল চাকুরী করিতে। আশা ছিল, আর কয়েক মাসের মধ্যেই আবার সে গৃহে যাইবে। কিন্তু 'একেবারেই চলিয়া গেল', গভীর খেদে বলিল মিলের একজন দ্বারোয়ান। সুকুল ও তেওয়ারী মামা ভাগ্নে সম্পর্কের।"

"সোমবার সন্ধ্যায় মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ছোরা দেখাইয়া জনৈক দারোয়ানের নিকট হইতে নগদ প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা ছিনাইয়া লয়। একটি থলির মধ্যে ঐ টাকা ছিল বলিয়া প্রকাশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী কামতাপ্রসাদ নামে উক্ত দারোয়ান ঐ দিনের আদায় সংগ্রহ করিয়া চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে অবস্থিত আপিসে ফিরিতেছিল। মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট এবং সাহা লেনের মোড়ে সহসা পিছন হইতে একজন থলিটি ধরিয়া টানে। দারোয়ান ফিরিয়া চাহিলে তাহার চারিপাশে ৩।৪ জনকে দেখিতে পায়, তবু বুঝিবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্বৃত্তরা দারোয়ানের থলি ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে ছুরিকাঘাত করে। অবশেষে তাহারা কয়েকটি পটকা ফাটাইয়া চম্পট দেয়। আহত অবস্থায় কামতাপ্রসাদকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।"

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য কত দিনের ?

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ভাষার জন্ম জীবের জন্মের ন্যায় নয়। অমুক সন তারিখে অমুক ভাষার জন্ম হইয়াছে, এরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না। ভাষা নদীপ্রবাহের ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম। যখন একটি ভাষাপ্রবাহের মধ্যে কোনও সময়ের ভাষা তাহার পরবর্ত্তী সময়ের ভাষাভাষীদিগের নিকট নূতন ভাষা বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার নূতন নামকরণ হইয়া থাকে। বাংলা ভাষার পূর্ব্বে যে ভাষা ছিল, আমরা তাহাকে গৌড় অপভ্রংশ বলিতে পারি। প্রাকৃত বৈয়াকরণ মার্কণ্ডেয় সাতাশটি অপভ্রংশের মধ্যে গৌড় অপভ্রংশের নাম করিয়াছেন। কাহ্নের ও সরাহর দোহাকোষে এবং প্রাকৃত পিঙ্গলে গৌড় অপভ্রংশের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। গৌড় অপভ্রংশের পূর্ব্বে ছিল গৌড়ী প্রাকৃত। দণ্ডী (আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়ী প্রাকৃতের (কাব্যাদর্শ ১৩৫) নামোল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ কেহ অপভ্রংশ যুগের আরম্ভ ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ মনে করেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার আরম্ভ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে। দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে (১।৩২) এবং ভামহ (৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে (১।১৬) সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশকে সাহিত্যিক ভাষারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে অপভ্রংশে রচিত কতকগুলি শ্লোক দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত প্রমাণ এই যে, বলভীর রাজা গুহসেন খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে (৫৫৯-৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) এক অনুশাসনে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে গৌড় অপভ্রংশ হইতে সর্ব্বপ্রথম বিহারী উৎপন্ন হইয়া পৃথক হইয়া যায়, তৎপরে উড়িয়া, তৎপরে বঙ্গ-কামরূপী ভাষা। এই বঙ্গ-কামরূপী ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বাঙ্গালা ও অসমীয়াতে পরিণত হইয়াছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে গৌড় অপভ্রংশের কাল্পনিক রূপ নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়। যথাঃ অম্হেহি রোট্টিআ খাই অব্বী (আমি রুটি খাইব); রাহিআ, কহিঁ গইল্লী (রাই কোথায় গেল), গচ্ছকের ফল গচ্ছহু তলে পড়ই (গাছের ফল গাছ হইতে তলায় পড়ে)।

কখন গৌড় অপভ্রংশ হইতে গৌড়ীয় বা বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইল তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। কারণ, একটি ভাষা জন্মিয়াই সাহিত্যে স্থান পায় না। এমনকি সাহিত্যে স্থান পাইলেও তাহার পূর্ব্বস্তরের ভাষা, যাহা পূর্ব্বেই সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছিল, সাহিত্যে প্রচলিত থাকে। অপভ্রংশ হইতে তাহার পরবর্ত্তী স্তরের অর্থাৎ নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার ধ্বনি ও ব্যাকরণগত পার্থক্য আছে। ধ্বনিতত্ত্বে যেখানে অপভ্রংশ স্তরের পদমধ্যে যুগ্ম ব্যঞ্জন, নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় সেখানে ব্যঞ্জনের একীকরণ ও পূর্ব্ব স্বরের দীর্ঘত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থলে আমরা দেখি, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় সত্য, হস্ত, পক্ষী—মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় অর্থাৎ পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে সচ্চ, হত্থ, পক্‌খী আর নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় সাচ, হাথ, পাখী। ব্যাকরণে প্রধানতঃ দ্রষ্টব্য এই যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষায় যেখানে কারক বিভক্তি থাকে, মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় ক্রমশঃ ইহার বিশ্লেষণমূলক (Analytical) বিভক্তি রূপ দেখা যায়। নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় এই বিশ্লেষণ এত দূর অগ্রসর হয় যে, বিভক্তি চিহ্ন অতি অল্পই রক্ষিত থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার 'বুদ্ধস্য' কথ্য প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষায় 'বুদ্ধ কার্য্য', প্রাকৃত ও অপভ্রংশে 'বুদ্ধকের', বাঙ্গালায় 'বুদ্ধের'।

এই সমস্ত লক্ষণদ্বারা আমরা মীননাথের একটি কবিতাকে —যাহা আশ্চর্য্য চর্য্যাচয়ের টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা বলিতে পারি। কবিতাটি এই,

> কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
> কর্ম্মকুরঙ্গ সমাধিক পাট॥
> কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা।
> কমল মধু পিবিবি ধোকই (ধোকে) ন ভমরা॥

ইহার অনুবাদঃ

> কহেন গুরু পরমার্থের বাট,
> কর্ম্মের রঙ্গ, সমাধির পাট।
> কমল বিকসিল কহিও না জোংড়াকে
> (শামুককে)।
> কমল মধু পান করিতে ক্লান্ত হয় না
> (অথবা ভুল করে না) ভমরা॥

এই পদে 'বাট' এবং 'পাট' শব্দ দুইটিতে মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের 'বট্ট', 'পট্ট' স্থানে যুগ্ম ব্যঞ্জনের একীকরণ ও পূর্ব্ব স্বরের দীর্ঘত্ব আমরা দেখিতেছি। 'পরমার্থের' এই পদে ষষ্ঠীর 'এর' বিভক্তি দেখা যাইতেছে। 'কর্ম্মকু' ও 'সমধিক' এই দুই পদের 'কু' এবং 'ক' প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ষষ্ঠী বিভক্তি। 'কমল বিকসিল' এখানে কর্ত্তায় বিভক্তি লোপ এবং অতীতকালে 'ইল', ইহাও বাংলা ভাষার লক্ষণ। 'কহিহন', 'ধোকইন

এই দুই স্থলে ক্রিয়ার পরে নিষেধার্থক 'ন' বাঙ্গালার একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য 'পিবিবি' এই পদে পূর্ব্বস্তর অপভ্রংশের অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি 'ইবি' রক্ষিত হইয়াছে।

কেহ যদি এই পদকে প্রাচীন কামরূপী বলেন তাহা অসঙ্গত হইবে না। বস্তুতঃ এই সময় বঙ্গ ও কামরূপী ভাষার মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কিন্তু আমরা জানি মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ দক্ষিণ বঙ্গের চন্দ্রদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। এইজন্য আমরা এই পদটিকে প্রাচীন বাংলা বলিয়াই গণ্য করিব।

সিলভ্যাঁ লেভীর মতে (দ্রষ্টব্য "Le Nepol," vol I, p. 347) মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে গমন করেন। ইহাতে আমরা আমাদের বর্ত্তমান সাক্ষ্যপ্রমাণে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দকে বাংলা সাহিত্যের আরম্ভকাল বলিয়া ধরিতে পারি। সপ্তম শতকে যে বাঙ্গালা ভাষা ছিল তাহার একটি বাহ্য প্রমাণ আছে। এই সময়ে রচিত একখানি সংস্কৃত চৈনিক অভিধান "আগচ্ছ"-এর প্রতিশব্দ "আইশ" (অইশ) লেখা হইয়াছে। এই "আইশ" শব্দ বাংলা। ইহাতে আরও কয়েকটি প্রাচীন বাংলা শব্দ আছে, যথা লই (লইয়া), ফেড় (দুর করা) পহ্যন (পরা), বৈস (বস), মোট্ট (মোটা)। অষ্টম শতকের একখানি সংস্কৃত চৈনিক অভিধানে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাওয়া যায়: আট (আটা), চোল (চাউল), মুগ, খট (খাট), মস (মাছ), হট (হাট), এহ (এই), মইশ (বইশ, উপবেশন কর) ভতার (স্বামী), মোট্ট (মোটা)। এই দুইখানি অভিধান ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদনা করেন।

মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ যে নাথপন্থার আদিগুরু বা প্রবর্ত্তক এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম লেখক, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সময় সম্বন্ধে ভিন্ন মত আছে। মীননাথের নামান্তর যে মৎস্যেন্দ্রনাথ তাহা বাঙ্গালা নাথ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। তন্ত্রালোকের টীকাতেও এইরূপ আছে:

ভৈরব্যা ভৈরবাৎ প্রাপ্তং যোগং ব্যাপ্য ততঃ প্রিয়ে।
তৎসকাশাৎ তু সিদ্ধেন মীনাখ্যেন বরাননে
কামরূপে মহাপীঠে মচ্ছন্দেন মহাত্মনা (১।২৪)।

ড. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথের সময় খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকের শেষে ("The origin and development of the Bengali Language", vol 1, p. 122)। সুতরাং মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ দ্বাদশ শতকের লোক। সুনীতিবাবু এই সিদ্ধান্ত পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীকন্থপাদ বিরচিত কায়স্থ গয়াকর কর্ত্তৃক গোবিন্দপালদেবের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে (=১১৯৯ খ্রীঃ অঃ) লিখিত হিক্র পঞ্জিকা যোগ রত্নমালার লিপিকাল হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, এই পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকার কাহ্নপাদের সমসাময়িক হইতে পারে (ঐ পৃ. ১২০), কিন্তু এরূপ মনে করার কোনও হেতু নাই। অধিকন্তু কাহ্নপাদ মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য জালন্ধরী পাদের শিষ্য। সুতরাং মৎস্যেন্দ্রনাথ কাহ্নপাদের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি মরাঠী পুস্তক জ্ঞানেশ্বরীর (১২৯০ খ্রীঃ অঃ) জ্ঞানদেবের গুরুপরম্পরা অবলম্বনে মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ তথা কাহ্নের সময় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, জ্ঞানেশ্বরীর ঐতিহ্য ত্রুটিপূর্ণ (ঐ, পৃঃ ১২২)।

সুনীতিবাবু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে একটি চর্য্যাগীতির লেখক লুয়ীপাদকে ১০ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে চর্য্যাপদের প্রাচীনতম লেখক অনুমান করিয়াছেন (ঐ পৃ. ১২০)। এই জন্য তিনি প্রাচীনতম বাংলা রচনার কাল ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (ঐ পৃ. ১২৩)।

অধ্যাপক শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্তের মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ দশম শতাব্দীর শেষে বিদ্যমান ছিলেন। বাংলার বৌদ্ধধর্ম, পৃ. ১০৮, ১৯২)। তাঁহার যুক্তি এই যে, "মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বঙ্গাল দেশের রাজা গোপীচন্দ্রের বা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।" (ঐ পৃ. ১০৮)।

ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লুইপা ও মৎস্যেন্দ্রনাথকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। কিন্তু এই দুই ব্যক্তি যে ভিন্ন তাহা Cordier তাঁহার পুস্তক-তালিকায় তিব্বতী ইতিহাস অনুযায়ী লিখিয়া গিয়াছেন (Catalogue du fonds Tebetain de la Bibliotheque National" Vol II. p, 33)।

এখানে আমি নাথগীতিকার গোপীচাঁদ এবং চর্য্যাপদের লুইপার সময় আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় ৭ম শতকের পরে হইতে পারে না। গোপীচাঁদকে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলে লিপিতে (১০২১ খ্রীঃ) উল্লিখিত বঙ্গাল দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াই বোধ হয় সকলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তারনাথের মতে বঙ্গ, কামরূপ ও তীরভুক্তির রাজা বিমলচন্দ্র রাজা ভর্তৃহরির ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাদের পুত্র ("Schiefuer, Geschiechte des Buddhismas in Iniden" page 195 ff.)। হিন্দী কবিতায় আছে যে, গোপীচাঁদ রাজা ভরথরীর (ভর্তৃহরি) ভাগিনেয় ছিলেন (লক্ষণ দাশ, গোপীচান্দ ভরথরী)। তারনাথের মতে সিদ্ধ জালন্ধরী ভর্তৃহরি ও গোবিন্দচন্দ্রকে দীক্ষা দান করেন।

(A Grunwedel Edelstinmene pp 61, 62)। নাথ-গীতিকায় জালন্ধরী হাড়িপাকে গোপীচাঁদের দীক্ষাগুরু বলা হইয়াছে। ৩৬নং চর্যাগীতিতে কাহ্নু জালন্ধরী পার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নাথগীতিকা মতে জালন্ধরী কানুপার (কাহ্নুপাদের) গুরু। তারনাথের মতে গোবিচন্দ্রের পিতা বিমলচন্দ্র বৌদ্ধপণ্ডিত ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক ছিলেন। (ঐ, পৃ. ১৭২) তারনাথ আরও বলেন যে, ধর্ম্মকীর্ত্তির মৃত্যুর সময় বা কিছুকাল পরে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করেন (A Grunwedel Edelsteinmene", pp 61, 62) I-tsing (৬৭৩ খ্রীঃ অঃ) ধর্ম্মকীর্ত্তিকে তাঁহার ভ্রমণ-সময়ের এক জন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Takakusa : "A Record of Buddhist Religion" p. xxxi)। তাঁহার মতে এক ভর্তৃহরি ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত হন (ঐ p. vii)। আমরা এই ভর্তৃহরিকে গোপীচাঁদের মাতুল মনে করিতে পারি। তারনাথ বলেন যে, গোবিচন্দ্রের পর তাঁহার ভ্রাতা ললিতচন্দ্র কিছুদিন রাজত্ব করেন। ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর দেশে অরাজক হয়। তার পর পালবংশীয় গোপালদেব রাজা হন। আমি গোপালদেবের রাজত্বকাল ৭১৫ হইতে ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ স্থির করিয়াছি। ("Indian Historical quarterly", Vol vii, p 535)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসে গোপীচাঁদের রাজত্বকাল ৭ম শতকের শেষ পাদে হইতে পারে, বলা হইয়াছে ("History of Bengal" Vol. I, p. 186)।

লুইপার 'অভিসময় বিভঙ্গে'র টীকা নবম শতাব্দীর শেষে নৈয়ায়িক রত্নকীর্ত্তি রচনা করেন (শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্ম, পৃ. ১৯২)। সুতরাং তাঁহার কাল নবম শতাব্দীর পরে আনা যায় না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিসময় বিভঙ্গের সম্বন্ধে বলেন যে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই গ্রন্থরচনায় সাহায্য করেন। তিনি ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করেন। অতএব লুই আদি সিদ্ধাচার্য্য ও তাঁহার সময় ৯৫০ হইতে ১০৫০-এর মধ্যে (বৌদ্ধ গান ও দোহা পৃ. ১৫,২৩)। প্রকৃত প্রস্তাবে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান লুইপার এই পুস্তকের একটি টীকা করেন। সুতরাং তাঁহারা সমসাময়িক হইতে পারেন না। Cordier-এর পুস্তক-তালিকায় দেখা যায় যে, কমলাম্বর লুইপাদের শ্রীচক্র সম্বর অভিসময়ের টীকা লেখেন (Cordier ঐ, p. 115)। তারনাথের মতে কম্বল ইন্দ্রভূতি ও জালন্ধরীর গুরু (Edelsteinmene pp. 49-58)। ৮নং চর্য্যাগীতিটি কম্বলাম্বরের রচিত। তারনাথের মতে লুইপার অন্যতম গুরু শবরী (Edelsteinmene, পৃ. ১২০)। বজ্রযোগিনী গুরুপরম্পরামতে ইন্দ্রভূতির গুরু কুক্কুরী পা, তস্য গুরু লুইপা। জার্ম্মান পণ্ডিত Schlagentweit স্থির করিয়াছেন যে, ইন্দ্রভূতির পালিত পুত্র পদ্মসম্ভব ৭২১।৭২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন (Alhandlngender Philosophioch—Philologeschen classeder Koeniglicheh Bayarischen Akademieder wissenschaften, vol. XXII, p.521)। সুতরাং ইন্দ্রভূতির সময় ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পদ্মসম্ভবের গুরু গোরক্ষনাথ, গোরক্ষনাথের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ। গোরক্ষনাথের সমকালীন জালন্ধরী পার শিষ্য কাহ্নুপাদ (কানুপা)। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমরা মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, গোপীচাঁদ, লুইপা কম্বলাম্বর শবরীপা, কুক্কুরীপা, জালন্ধরী—সকলকে সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্থাপন করিতে পারি। ইঁহাদের মধ্যে লুই, কম্বলাম্বর,কুক্কুরী ও শাবরী প্রাচীন বাঙ্গালা চর্য্যাগীতির রচয়িতা এবং শাবরী প্রাচীনতম। মৎস্যেন্দ্রনাথ সকলের আদি।

মৎস্যেন্দ্রনাথ যে দশম বা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার অন্য প্রমাণ আছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের উল্লেখ কৌলজ্ঞান নির্ণয় পুস্তকে পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে নবম শতাব্দীর মধ্যে লেখা, যদিও ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী ইহার লিপিকাল ১০৫০ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সুতরাং মৎস্যেন্দ্রনাথ এই সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। অভিনবগুপ্ত তাঁহার তন্ত্রালোকে (১।২৫) মচ্ছন্দ বিভু বলিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। অভিনবগুপ্তের গুরুপরম্পরা এইরূপ—মচ্ছন্দ—সুমতিনাথ সোমদেব —সম্ভুনাথ– অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্তের জন্ম ৯৫০ হইতে ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে (Abhinavagupta A Historical and Philosophical Study by Dr. Kanti Chandra Pandey pp. 8,82) ইহাতে মৎস্যেন্দ্রনাথ যে দশম শতকের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা প্রমাণিত হয়।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমরা মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে স্থাপন করিতে পারি। ইহাই বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তিকাল। বাংলা ভাষা ইহার অন্ততঃ এক শত বৎসর পূর্ব্বের হইবে। বৌদ্ধগণের ভাষা (শান্তিপাদের রচনা ভিন্ন) প্রাচীন বাঙ্গালা। লেখকগণের মধ্যে প্রাচীনতম শবরী পাদ এবং আধুনিকতম সরহ পাদ ভুসুকু (১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। অতএব আশ্চর্য্য চর্য্যাচয়ে আনুমানিক ৬৫০ হইতে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের ভাষা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ডক্টর সুকুমার সেন আপত্তি করেন যে, ভাষা এতদিন কিরূপে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ইহার সহজ উত্তর এই যে, সাহিত্যিক ভাষার এইরূপ অবিকৃত থাকাই নিয়ম। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ তাহার দৃষ্টান্ত। প্রাচীন বাঙ্গালাও ইহার ব্যতিক্রম নহে।

বিয়োগান্ত

শ্রীসুবোধ বসু

নিতান্ত উৎসাহ সহকারেই প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় আধুনিক নাটকের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বিখ্যাত নাট্যকারের পক্ষেও সব সময় এ রকম সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ হয় না। শহর ও শহরতলীর বহু সভায় তাঁর নিমন্ত্রণ হয় সভা অলঙ্করণের জন্য। সবগুলি যাইবার মত জায়গাও নয়, কিন্তু আপন প্রসিদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে হয়, প্রধান অতিথি সাজিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সভায় একক বক্তা হিসাবে যোগদান করিতে পারিয়া প্রশান্ত নিজেও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছে।

রডন ষ্ট্রীটের এই বাড়ী বর্ম্মার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সুবিনয় চৌধুরীর। চৌধুরী রেঙ্গুনে প্র্যাকটিস করেন, আর তাঁর স্ত্রী থাকেন কলিকাতায় মেয়ে লতিকাকে লইয়া। লতিকা এ বছর ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি-এ পাস করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পড়িতেছে।

আজিকার সাহিত্য-সভা তার উদ্যোগেই ডাকা। অভিজাত-সমাজে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি কতটা, বর্ত্তমান অধিবেশনটিই তার যথেষ্ট পরিচয়। বিখ্যাত পণ্ডিত হইতে সুরু করিয়া শহরের শ্রেষ্ঠ ধনী উপস্থিত হইয়াছেন তার আমন্ত্রণে। এতগুলি খ্যাতিমান লোককে একই সময় এক জায়গায় জড়ো করিতে পারা কম ক্ষমতার কথা নয়। লতিকার প্রতি ইঁহাদের একান্ত স্নেহ না থাকিলে ইহা কদাচ সম্ভব হইত না।

এতগুলি বিশেষ লোকের উপস্থিতিতে একমাত্র বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করিতে পারিয়া প্রশান্ত আত্মতৃপ্তি বোধ করিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। এই পরিতৃপ্তিতে বাধা পড়িল সভার শেষে যখন অধিকাংশ গণ্যমান্য অতিথিই বিদায় লইলেন। লতিকার ছেলে এবং মেয়েবন্ধুরা প্রশান্তকে ঘিরিয়া দেশ বিখ্যাত নাট্যকারের নিকট-সাহচর্য্য ভোগ করিতেছিল। ইতিমধ্যে প্রশান্ত গোটা পঞ্চাশেক অটো-গ্রাফ-খাতা সহি করিয়াছেন এবং নিজের পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবন সম্বন্ধে প্রায় শ'খানেক প্রশ্নের জবাব দিয়া তরুণ ভক্তদের কৌতুহল মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এমন সময় হোমরা-চোমরা অতিথিদের বিদায় দিয়া লতিকা নিজেও সেখানে হাজির হইল।

'এবার আমি উঠতে পারি কি?' লতিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত কহিলেন।

'গাড়ি হরিয়াবাদের বৌরাণীকে পৌঁছে দিতে গেছে। এলেই আপনাকে দিয়ে আসবে।'

'ইতিমধ্যে' লতিকার বন্ধু সুনন্দা কহিল, 'আমরা এঁর নূতন নাটকটা সম্বন্ধে আরও ভেতরের কথা জেনে নিই। "কান্না" দেখেছিস? নাচঘরে চলছে।'

'ওঁর নাটক আমি দেখি না।' লতিকা সংক্ষেপে কহিল।

এবার প্রশান্ত নিজেও একবার আড়চোখে তার দিকে তাকাইলেন।

'কেন?' সবিস্ময়ে সুনন্দা কহিল।

'ওঁর নাটক আমার ভাল লাগে না।'

এক মুহূর্ত্ত একটা সশঙ্ক নীরবতা। উপস্থিত সকলেই যেন অপ্রতিভ বোধ করিতেছে। এই নীরবতা ভাঙিলেন প্রশান্ত নিজে। প্রশ্রয়ের কণ্ঠে কহিলেন, 'এর কারণ'?

'কান্না।' লতিকা নিজের আঙুলের দিকে চাহিয়া কহিল।

'বইটা এতই খারাপ হয়েছে!' একটা কৃত্রিম আতঙ্ক প্রশান্তের কথাবলার ভঙ্গিতে।

'কান্না নামে বইটা নয়। সাধারণ ভাবে আপনার নাটকগুলির মূল পরিণতির কথাই বলছি। সব বিয়োগান্ত, সব কান্না, সব ব্যর্থতা! কি মর্বিড! প্রায় যেন রোগগ্রস্ত চোখে জগৎ এবং জীবনকে দেখা!'

সুবিখ্যাত নাট্যকার প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের লেখার প্রতি এমন প্রত্যক্ষ আক্রমণ পেশাদার সমালোচকেরাও করিতে সাহস পায় না। লতিকার বন্ধুরা লজ্জায় ঘামিয়া উঠিল। নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া মানী লোককে এ যেন ইচ্ছা করিয়া অপমান!

'জীবনটা যদি মিলনের আনন্দে ভর্ত্তি থাকত, রোগ-শোক-দারিদ্র্য না থাকত, হাসিহল্লায় মদের ফেনার মত পূর্ণ থাকত জীবনের পেয়ালা, তবে মন্দ হ'ত না।' প্রশান্ত উদাস-গম্ভীর ভাবে অন্যমনস্কের মত কহিলেন, 'কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, এটাই ত দুঃখ! গ্রীক নাটকে দেখা যেত, পরিণামে পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয়। এটা খুবই ন্যায্য পরিণতি। কিন্তু অনুশোচনার কথা এই যে, জীবনের

গতি অত নিশ্চিত, অত মধুরান্ত নয়। এই রূঢ় উপলব্ধিই বর্ত্তমানের নাটককে এমন বেয়াড়া করে তুলেছে। কিছুতেই নাট্যকার আর মিলন ঘটাতে পারছেন না। নাটক বিয়োগান্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু উপায় কি? এটাই যে বাস্তব, এটাই যে সত্য…'

'কোনটা সত্য?' লতিকারও জেদ চাপিয়া গেছে। 'আনন্দ না বেদনা? মিলন না বিচ্ছেদ? বেদনা-বিচ্ছেদ ক্ষণিক সত্য, আনন্দ পূর্ণ সত্য।'

লতিকা ধনীর জেদী মেয়ে। সাহিত্যে জ্ঞান আছে বলিয়া তার গর্ব্বও কম নয়। খ্যাতিমানকে দেখিয়া ভীত বা শ্রদ্ধায় গদগদ সে হয় না। বন্ধুরা তার মূর্ত্তি দেখিয়া প্রমাদ গণিল।

'নায়ক-নায়িকার মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত মিলন ঘটাতে পারিনে বলেই আপত্তি কি?' প্রশান্ত কহিলেন।

'হবে নাই বা কেন?' লতিকাও না দমিয়া কহিল। 'সুন্দর সুস্থ প্রেমের সৃষ্টি করে আপনি অনাবশ্যক বিচ্ছেদ ঘটান বইয়ের পর বইয়ে। যেন ট্র্যাজিডিয়ান নামে পরিচিত হবার জন্যই আপনার আগ্রহ—বাগী ডাক্তারের মত রোগীর কষ্টে আপনার ভ্রূক্ষেপই নেই। আমি পড়িনে আর আপনার নাটক। জানি, শেষ পর্য্যন্ত নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ হবেই। একবার ভেবে দেখেছেন কি এর বেদনা?'

প্রশান্তের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল অধৈর্য্যে—অর্ব্বাচীন এক মেয়ের ধৃষ্টতার কড়া জবাব দিবার জন্য তিনি প্রায় প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সহসা বুদ্ধিমানের মত আত্ম-সংবরণ করিলেন। কহিলেন, 'আফটার অল, আমার নাটকের আপনি একজন দরদী পাঠিকা দেখছি। সব চরিত্রেরই খোঁজ রাখেন। কিন্তু আজ আর সময় নেই। সুযোগ হলে অন্য একদিন ট্র্যাজেডির ডিগনিটি সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব…'

ইহার পর এক সপ্তাহের উপর কাটিয়াছে। প্রশান্ত ভবানীপুর অঞ্চলে যাইবার বাসের জন্য চৌরঙ্গী ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডের মোড়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ভিড়ের জন্য একাধিক বাস ছাড়িয়া দিতে হইল। অগত্যা চুরুট ধরাইয়া ও ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে দার্শনিকের দৃষ্টিতে চাহিয়া কল্পনায় তিনি পরবর্ত্তী নাটকের নায়ক-নায়িকার সন্ধান সুরু করিলেন।

'প্রশান্তবাবু!'

বারংবার মোটরের হর্ণ যে কাজ করিতে পারে নাই, বারতিনেকের আহ্বানেই সে কাজ হইল। প্রশান্ত চমকাইয়া সম্মুখে তাকাইলেন। দেখিলেন, সামনে প্রকাণ্ড এক মোটরগাড়ী এবং সেই গাড়ির ষ্টিয়ারিং হুইলের কাছে বসিয়া আছে এক তরুণী, যেন তার নাটকেরই কোন নায়িকা।

'দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন? উঠে আসুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।' লতিকা গাড়ীর ভিতর হইতে কহিল।

চিনিতে পারিয়া প্রশান্ত স্মিত মুখে কাছে আগাইয়া গেলেন এবং কয়েক বার আপত্তি জানাইয়া অবশেষে লতিকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

'সামনে আসুন।'

প্রশান্ত পেছনের দরজা খুলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অগত্যা গাড়ীর ষ্টিয়ারিঙের কাছে লতিকার পাশে গিয়া বসিতে হইল। সামান্য একটু দুলিয়া বিরাট সরীসৃপের মত গাড়ী যাত্রা করিল।

'কোথাও একটু আইস-ক্রীম খেয়ে গেলে হয় না? আইস-ক্রীমে আমার বেজায় লোভ।'

'আমার তেমন লোভ নেই। তবে খুব একটা তাড়াও নেই।' প্রশান্ত প্রশ্রয়ের সঙ্গে কহিলেন।

'তবে আসুন।' ফিরপোর রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ী থামাইয়া লতিকা দরজা খুলিল।

প্রশান্ত অনেক নায়িকার কল্পনা করিয়াছেন, বহু নায়িকা সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশের বয়সই লতিকার কাছাকাছি। কিন্তু ইহাদের কারুর সঙ্গেই প্রশান্তের বাস্তব পরিচয় ঘটে নাই। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যারা এই ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছে তাহারা কেহই তার কল্পনার সঙ্গে খাপ খায় নাই। সহসা তার এক ভাবী নাটকের এক সম্ভাব্য নায়িকা যেন একেবারে সশরীরে উপস্থিত হইয়াছে।

'উঁহু। দামটাও আমিই দেব। আমিই আপনাকে নেমন্তন্ন করে এনেছি।' বিল দেখিবামাত্র প্রশান্তকে পকেটে হাত ঢুকাইতে দেখিয়া লতিকা প্রতিবাদ করিল এবং চকিতে নিজের হ্যাণ্ডব্যাগ খুলিয়া একটা দশ টাকার নোট ওয়েটারের প্লেটে রাখিল।

'এটা কি ঠিক হ'ল?' প্রশান্ত কহিলেন। 'ভদ্রতার একটা রীতি আছে; অন্ততঃ সেটুকু আমাকে করতে দিলে হ'ত না?'

'আর একদিন বরঞ্চ ভাল করে খাইয়ে দেবেন।' লতিকা চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। 'ফিরপোতে লাঞ্চ খেয়ে লাইট হাউসে সিনেমা দেখা, এও আমার আর এক সখ।'

'সেটা কবে হবে?'

'আসছে শনিবার ফ্রি আছেন কি?' একটু ভাবিয়া লতিকা কহিল।

'বেশ, তবে তাই ঠিক রইল।' প্রশান্ত কহিলেন।

পর পর এমনি কতকগুলি লাঞ্চ এবং টি হইয়া গেল। একটা অবিশ্বাস্য মোহে পাইয়া বসিয়াছে প্রশান্তকে। নিজে তিনি বহু রোমান্সের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজে কখনও রোমান্স করেন নাই। সহসা অভিজাতঘরের এই মেয়েটি নিজে হইতে আসিয়া অন্তরঙ্গতা সুরু করিল। বয়সের তফাৎটা তার কাছে কোনও প্রশ্নই নয়।

প্রশান্ত বইয়ে পড়িয়াছেন, ভালোবাসা নাকি অন্ধ। লতিকার এই ভালোলাগাটা সেই অন্ধ ভালোবাসা অথবা প্রশান্তের খ্যাতির প্রতি সম্মানপ্রসূত, তাহা প্রশান্ত স্থির করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু ভালোবাসার উত্তাপ তিনি সহজেই উপলব্ধি করিয়াছেন। রোমান্সের মাদকতায় জীবন পূর্ণ হইয়াছে।

ইডেন গার্ডেনের কাছাকাছি ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া প্রশান্ত ও লতিকা হাঁটিয়া চলিলেন। ষ্ট্রাণ্ড রোডে পড়িয়া, বাঁ দিকে মোড় লইয়া গঙ্গার বিপরীত ধার ধরিয়া হাঁটিতে লাগিলেন দু'জনে। সন্ধ্যা পার হইয়াছে। ষ্টীমারের পোর্ট হোল হইতে আলোর শিখাগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঁ-দিকে কেল্লার ওয়ারলেসের পোস্টগুলি আকাশের দিকে আঙুল তুলিয়া নিঃশব্দ ভাষায় আদানপ্রদান করিতেছে। রাস্তা জনবিরল; চলন্ত মোটর গাড়িগুলি তাহাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আগাইয়া যাইতেছে।

'লতা।'

'কি?'

'জীবনে এত আনন্দ এখনও বাকি আছে, আগে তা কল্পনাও করতে পারি নি। অথচ জন্মজন্মান্তরের যোগাযোগ না থাকলে তোমার সঙ্গে আমার এই অপূর্ব্ব মিলন কি সম্ভব হ'ত?'

'কিন্তু মিলন কি করে হবে বলুন? আপনার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে...'

'তোমার চেয়ে তারা কেউ বড় নয়! তাদের সকলের ওপরে তোমার স্থান।'

'কিন্তু সমাজ কি তা স্বীকার করবে? আগে হিন্দুদের সুবিধে ছিল; দশটা স্ত্রী থাকলেও কিছু দোষের হ'ত না। আইন ত আজকাল সে পথও বন্ধ করে দিয়েছে।' লতিকা হালকা এবং ঈষৎ গম্ভীর ভাবে কহিল।

'তুমি আমার সখী, আমার প্রিয়া, আমার মানসী।' প্রশান্ত কহিলেন। 'তোমার সঙ্গে আমার এই সম্পর্কে ক্লেদ নেই, মালিন্য নেই। যদি তোমার পাশে হেঁটে, তোমার হাত দুটো নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে স্বর্গ-সুখ পাই, তবে কার কি ক্ষতি?'

'আপনি কবিমানুষ', লতিকা সহাস্যে কহিল, 'এতে আপনার পেট ভরতে পারে কিন্তু আমি যে পুরোপুরি গদ্য। এতে তো আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনে...'

'তুমি কি চাও?'

'যাকে ভালোবাসি, তাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের করতে চাই। আমার জন্য স্ত্রী-পুত্র ছাড়তে পারবেন? যদি পারেন বলুন। লোকনিন্দার বাইরে—বহু দুরের জায়গায় চলে যাব দু'জনে। কোনও নির্জ্জন পাহাড়ে ছোট করে একটা ঘর বাঁধব, সমাজের কোন শাসনেরই তোয়াক্কা রাখব না...'

'তুমি একবার আদেশ কর।' বলিয়া প্রশান্ত আবেগ-ভরে লতিকার হাত চাপিয়া ধরিলেন।

আরও এক সপ্তাহ পরে। হাওড়া ষ্টেশনের শেডের তলায় দেরাদুন এক্সপ্রেস যাত্রা করিবার জন্য ছটফট্ করিতেছে। গাড়ি ছাড়িতে মিনিটদশেক বাকি। প্ল্যাটফর্ম্ম জনাকীর্ণ।

প্রশান্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবে লোকের ভিড় ঠেলিয়া নিজের রিজার্ভড্ 'কুপে'টার কাছে ছুটিয়া আসিলেন। উহাতে আর কোনও যাত্রী নাই তাহা বুঝিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবার কথা নয়, তবু জানালা দিয়া মাথা গলাইয়া তিনি ভিতরটা ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। তাঁর মুখে উদ্বেগ, বিস্ময় এবং আশঙ্কা ফুটিয়া উঠিল। পাগলের মত আবার তিনি ছুটিলেন প্ল্যাটফর্ম্মের প্রবেশদ্বারের দিকে।

কয়েক জন হিন্দুস্থানী কুলি প্রশান্তের আচরণ পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিয়াছে। তাহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিল: 'বাবুজীকা ক্যা হুয়া?' কেহ যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে বারছয়েক ঠিক একই রকম ভাবে ছুটাছুটি করিতে থাকে, তবে বিস্ময়ের উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রশান্ত যখন বাহিরের দিক হইতে আবার নিজের কামরার কাছে ছুটিয়া আসিলেন, তখন তাঁর চোখে মুখে একটা বিপন্নভাব যেন প্রায় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

'বাবুজী!'

প্রশান্ত চমকাইয়া পিছনে তাকাইলেন।

'আপ্‌কে লিয়ে ইয়ে খত্।'

'আমার! কে পাঠিয়েছে?'

'মিসিবাবা।'

ব্যগ্র আঙুলে প্রশান্ত খাম ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ক্ষণ-কাল চোখে অন্ধকার দেখিলেন, তার পর পড়িলেন: 'ক্ষমা করবেন আপনাকে একলাই মুসৌরী যেতে হবে। একদিন আপনার সঙ্গে তর্ক করেছিলাম, বলেছিলাম আপনার নাটকে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ বড় মর্ম্মান্তিক। আপনিও তর্ক করে বলেছিলেন যে, বিচ্ছেদই বাস্তব, ট্র্যাজেডিই জীবন।

এর মর্ম্মান্তিক বেদনার দিকটা আপনার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করে নাই। আশা করি, বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে এবারও আপনার কষ্ট হবে না। আর যদি সত্যই ব্যথা পান, তবে ভবিষ্যতে হতভাগ্য নায়ক-নায়িকাদের এবং সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের এ রকমের আঘাত করা থেকে বিরত থাকবেন। নমস্কারান্তে—লতিকা।'

ইহার পর কয়েক বছর প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের কোনও নূতন নাটক প্রকাশিত হয় নাই। যখন নূতন নাটক সত্যই বাহির হইল তখন দেখা গেল, নাট্যকার তাঁর চিরাচরিত রীতি ত্যাগ করিয়া বিয়োগান্তের বদলে মিলনান্ত নাটক লিখিয়াছেন।

নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নীড়ভ্রষ্ট, নীর-আশ্রয়, নিরাশ্রয় আজ আমি,
গৃহে ত এমন অনুভূতি নিয়ে কখনো ডাকি নি স্বামী।
অন্তবিহীন নীলাকাশে নাই একটুও আশ্রয়,
তবুও চকোর যাঁর উদ্দেশে উড়িয়া তৃপ্ত হয়,
আশ্রয়হীন গ্রহ তারা লভি যাঁহার আকর্ষণ
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে ঘুরিছে অনুক্ষণ,
তাঁহারি যে টান তাঁহারি পরশ পেতেছি বুকের মাঝ,
দীনবন্ধুকে ডাকার লভেছি যোগ্যতা যেন আজ।

২

প্রতিমার মত গলে গেল আহা সজ্জিত গৃহসারি,
চারিদিকে জল তাতেই মিশিল ক' ফোঁটা নয়নবারি।
নূতন দীক্ষা দিল মোরে আজ ভুবন মজ্জমান,
জীবন-প্লাবন আমাকে নূতন জীবন করিল দান।
আবার দেখিনু আদিম প্রাতের প্রথম সূর্য্যোদয়
মূর্ত্তিমতী সে গায়ত্রী সনে আজ হ'ল পরিচয়।
বাজিতেছে শুধু জল কলরব গভীর অহর্নিশ
অভিভূত হয়ে কাতরে তোমারে ডাকিলাম জগদীশ।

৩

সব আশ্রয় ধুয়ে মুছে গেল—তুমি পরমাশ্রয়
দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তনে রহিলাম নির্ভয়।
ব্যাকুল হইয়া খুঁজিনু কোথায় কমলে কামিনী মা,
বটপত্রেতে ভাসেন কি হরি ? দেখিবার বাসনা।
পাঠ করিলাম প্রলয়পুঁথির ক্ষুদ্র সংস্করণ
জলময়ী এক নূতন পৃথ্বী করিলাম দর্শন।
সহিলাম বহু বিড়ম্বনা ও সহিলাম বহু দুখ,
কখনো পাই নি কিন্তু এমন তোমারে ডাকার সুখ।

৪

নিরাশ্রয় যে হওয়াতেও আছে পরমানন্দ এত,
ভাবিতে পারি নি—নিবেদনে হয় গরল অমৃতমত।
করে নীড়হারা বিহগ যেমন প্রতি তরুতেই বাস,
আমিও যেখানে থাকি—ভাবি গৃহ ফেলি দীর্ঘশ্বাস।
পর্ণ-আবাসও পরম কাম্য তুমি যদি কাছে থাকো,
মাটিকে কেবল উর্দ্ধে তুলিতে আর ভাল লাগে নাকো।
বন্যায় ভিজে গাছগুলি দেখি সতেজ হয়েছে ভারি,
তাদেরি মতন আমিও পেয়েছি তোমার করুণাবারি।

৫

আমার চেয়েও নিরাশ্রয়েরা আমারে ঘিরিয়া আছে
তোমার কাহিনী উল্লাসে আমি কহি তাহাদের কাছে।
সুরভী মায়ের স্তন্যে আমার বক্ষ রয়েছে তাজা,
কিছু নাই মোর, তবু যেন আমি কাঠুরিয়াদের রাজা।
তুমি কত বড় তাদিকে জানাই শুনাই কৃপার কথা,
যা লয়েছ তার দশ গুণ দিতে নাহি তব কৃপণতা।
তাহাদেরি সাথে ব্যাকুল কণ্ঠে পরমানন্দে ডাকি,
চারিদিকে জল তাহারি সঙ্গে জলে ভরে উঠে আঁখি।

৬

সব ভেসে গেছে, ভেঙ্গে চুরে গেছে অন্তর তবু প্রীত
এতদিন পরে প্রাণভরে পান করিনু নামামৃত।
মাটি গলে গিয়া, বাহির করিয়া দিল সে পরশমণি,
সব নিয়ে গেল তবু করে গেল অমূল্য ধনে ধনী।
চারিদিকে করে জল থই থই—অস্থির দেহমন
হঠাৎ তাহাতে জাগিয়া উঠিল হরির পদ্মাসন।
ভয়ের মাঝারে কখনো হই নি এতখানি নির্ভয়,
কোথা জগদীশ রক্ষ আমারে—আমি যে নিরাশ্রয়।

জন ম্যাক

(১৭৯৭-১৮৪৫)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উইলিয়ম ইয়েট্‌সের মত জন ম্যাকও শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের কর্ম্মীরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ম্যাক কথনও এই মিশন হইতে আলাদা হইয়া যান নাই, আমৃত্যু শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া নানা ভাবে মানব-সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বাঙালী যুবকদের বিজ্ঞান-শিক্ষাদানে এবং বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞান-পুস্তক রচনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা কথনও ভুলিবার নয়।

জন ম্যাক ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন সেখানকার একজন সলিসিটর। ম্যাক শৈশবেই প্রতিভার পরিচয় দেন। স্কুল ও কলেজে বিদ্যাবত্তায় সতীর্থদের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। প্রথমে হাই স্কুলে এবং পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তৎকালীন উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। প্রতিটি স্থলেই তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপকদের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইলেন। গ্রীক, লাটিন ক্লাসিক সাহিত্যে তিনি ব্যুৎপন্ন হন। আবার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে, যেমন—অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্রে, তাঁহার বিশেষ দখল জন্মিল। রসায়নশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার ছিল সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ। এই বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র ভাবে বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতাদি শুনিতেন। শল্যবিদ্যা (Surgery) বিষয়েও তিনি কতকগুলি বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। ম্যাকের কৌতূহল এবং জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া শল্যবিদ্যার অধ্যাপক অত্যন্ত বিস্মিত হন।

পাদ্রীরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিতে জন ম্যাক মনস্থ করিলেন। স্থির হয় যে, তিনি চার্চ্চ অফ স্কটলণ্ডের পাদ্রী হইবেন। কিন্তু এই চার্চ্চের কতকগুলি বিধিব্যবস্থা তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির দিকে যৌবনেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তিনি মিশনের মূল কেন্দ্র ব্রিষ্টলে গমন করিলেন—ব্যাপটিষ্ট মিশন-প্রদত্ত বিশিষ্ট শিক্ষা-লাভ ও ধর্ম্মচর্য্যার নিমিত্ত। ম্যাক ইতিপূর্ব্বেই বিভিন্ন বিদ্যায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন, এখানে আসিয়া খ্রীষ্টশাস্ত্র অনুশীলনান্তর তাহাতেও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিলেন। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম ওয়ার্ড বিলাতে গিয়া ম্যাকের বিষয় অবগত হন। শ্রীরামপুর কলেজের জন্য একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপকের প্রয়োজন ছিল। তিনি জন ম্যাককে এই পদ গ্রহণে সম্মত করাইলেন। শ্রীরামপুর কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক-নিয়োগের কথা জানিয়া স্কটলণ্ডনিবাসী জেমস ডগলাস কলেজের বিজ্ঞান গবেষণাগার বা লেবরেটরী গঠনের জন্য পাঁচ শত পাউণ্ড দান করিলেন; ইহা দ্বারা বৈজ্ঞানিক, বিশেষতঃ রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সুবিধা হইল।

ওয়ার্ড ম্যাককে লইয়া ১৮২১ সনের মে মাসে ভারতবর্ষে রওনা হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিস কুকও আসিলেন, ইনি বিবাহের পরে মিসেস উইলসন নামে অধিকতর পরিচিত হন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার কৃতিত্ব অপরিসীম। এই বৎসর নবেম্বর মাসে ওয়ার্ড ও ম্যাক শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। শ্রীরামপুর কলেজ পরিচালনায় ড. জস্যুয়া মার্শম্যান বিশেষ ভাবে লিপ্ত ছিলেন। জন ম্যাক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি কলেজে বিজ্ঞান অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। ওয়ার্ড ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনার ভার লন। ম্যাক বাংলা ভাষা শিক্ষায়ও অবহিত হইলেন। বিভিন্ন বিষয় অধ্যাপনাকালে মানচিত্রের অভাব বড়ই অনুভূত হইত। ম্যাকের নেতৃত্বে মিশনরীগণ ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র বাংলায় সংকলনে মন দেন। ভারতবর্ষের প্রায় এক হাজার শহর ও নদনদীর ইংরেজী ও বাংলা নামসম্বলিত ভারতবর্ষের মানচিত্রের একটি খসড়া তৈরি করিবার পর লণ্ডনে শিল্পী ওয়াকারের নিকট তাহা প্রেরিত হয়। খসড়ার ভিত্তিতে মানচিত্রটি অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইল। এখানি বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের নামে উৎসর্গ করা হয়। ভারতীয় ভাষায় মানচিত্র রচনা এইভাবেই সুরু হয়।

শ্রীরামপুর কলেজে লেবরেটরী বা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইল। ম্যাক এখানে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। রসায়নবিদ্‌রূপে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। কলিকাতায় তখন যে স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁহারাও ম্যাককে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির শেষ সভায়, তাঁহারই প্রস্তাবে সোসাইটি-ভবনে ম্যাকের দ্বারা রসায়নশাস্ত্রের উপরে বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ম্যাক সোসাইটির হল-ঘরে রসায়ন সম্বন্ধে এক প্রস্থ বক্তৃতা দিলেন।

জন ক্লাক মার্শম্যান বলেন, বক্তৃতার দিনগুলিতে আশী হইতে একশত জন পর্য্যন্ত সমঝদার শ্রোতা হাজির থাকিতেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে জনদশেক ছিলেন ভারতীয়। বক্তৃতার দক্ষিণাস্বরূপ ম্যাক সর্ব্বসাকুল্যে এক শত পাঁচ পাউণ্ড প্রাপ্ত হন। তিনি সবটাই মিশন-ভাণ্ডারে দান করেন।*

ম্যাক শ্রীরামপুর মিশনে যোগদানের অল্পকাল পরে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ড মারা গেলেন। মিশনের অন্য প্রতিষ্ঠাতৃদ্বয় উইলিয়াম কেরী ও জশুয়া মার্শম্যানের সঙ্গে তিনি সর্ব্ববিষয়ে একযোগে কার্য্য করিতে লাগিলেন। মিশনের যাবতীয় বিপদ আপদে, সুখে সম্পদে তিনি তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। ম্যাক তাঁহাদের উভয়েরই বয়ঃকনিষ্ঠ; এ কারণেও তিনি তাঁহাদের স্নেহপ্রীতি প্রাপ্ত হন। উপরন্তু ম্যাকের বিদ্যাবত্তা এবং কর্ম্মতৎপরতা তাঁহাদিগকে কম মুগ্ধ করে নাই। কেরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বাংলা ভাষার চর্চ্চায় প্রথম হইতেই অবহিত হইলেন। কলেজে তিনি ক্রমে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায়ই ছাত্রদের রসায়নবিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন। ড. জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সঙ্গে একযোগে একটি বাংলা গ্রন্থমালা প্রকাশে তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন। মার্শম্যান লইয়াছিলেন ইতিহাসমূলক পুস্তকাদির ভার, ম্যাক বিজ্ঞানের পুস্তক লিখিতে অগ্রসর হন। কলেজ এবং মিশনের কার্য্যে ক্রমে অধিকতর ব্যাপৃত হইয়া পড়ায় তিনি একখানির বেশী বই লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু এই একখানি বই লিখিয়াই ম্যাক পাইওনিয়ার বা অগ্রদূতের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির নাম—"কিমিয়া বিদ্যার সার", অর্থাৎ রসায়নবিদ্যার মূল কথা। ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক এবং পত্রিকাদি কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, তবে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকসমূহের মধ্যে এখানিই প্রথম। পুস্তকখানি সম্বন্ধে পরে বলিব।

ম্যাক আর একটি বিষয়েও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের বিশেষ সহায় হন। মার্শম্যান লিখিয়াছেন, তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' প্রথম বাহির করেন, সেই সময় এবং তাহার পরেও ম্যাক সম্পাদকীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া বহু রচনা দ্বারা উক্ত পত্রিকাখানির গুরুত্ব ও সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেন। তাঁহার রচনা ছিল একদিকে যেমন সহজ, স্বচ্ছ, অনাড়ম্বর, অন্যদিকে তেমনি নির্দ্দোষ, তেজঃপূর্ণ ও ঝাঁঝালো; সংবাদপত্রের লেখা যেমন হওয়া উচিত ইহা ছিল ঠিক তেমনই। তাঁহার সংবাদপত্রের রচনাদি সম্বন্ধে সম্পাদক মার্শম্যান লিখিয়াছেন:

জন ম্যাক

"As a public writer, he had few equals among us. His compositions bore the exact impress of his mind, and were remarkable for their purity, clearness and vigour. He cultivated his style with no little assiduity, and was remarkably happy in clothing his thoughts in the strongest and most appropriate expressions. In all he wrote, however, his great object was to discover and exhibit the truth without any undue partiality, either for his own preconceived notions or for the authority of others. He wrote with much deliberation and seldom modified the structure of a sentence, or even change a word. Some of his ablest papers were sent to press without the alteration of more than a phrase or two. That correctness and elegance of diction

The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, etc. Vol. II. Pp. 260 61.

ম্যাকের জীবনকথা সংকলনে এই পুস্তকখানি এবং ১৮৪৫ সনের 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' ও 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

which some men attain only by the most painful and elaborate emendations, was exhibited in the first draft of his compositions."

শ্রীরামপুর ছিল ম্যাকের কর্মস্থল। কেরীর মৃত্যু (১৮৩৪) এবং জশুয়া মার্শম্যানের ভগ্ন স্বাস্থ্য হেতু ম্যাককে প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে হইত যথেষ্ট। ইহার উপর তিনি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার পূর্ব্বাঞ্চল—খাসিয়া পাহাড়, আসাম প্রভৃতি ভ্রমণে গমন করেন। তাঁহার ভ্রমণের কথা শুনিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ ঐসব অঞ্চলের যথাযথ অবস্থা সম্বন্ধে বিবৃতিদানের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ জানান। কারণ, ঐ সময়ের মাত্র দশ বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চল ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ম্যাক-প্রদত্ত বিবরণ সরকারের দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ হইয়াছিল। আসাম পর্য্যটনকালে ম্যাক কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হন। শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিনি এই ব্যাধিমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যলাভার্থ অবিলম্বে বিলাত যাত্রা করিলেন। স্বদেশে অবস্থানকালে তিনি স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। এবারে তাঁহার দায়িত্ব অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। জশুয়া মার্শম্যানের অসুস্থতা, এবং অল্পকালের মধ্যে মৃত্যুতে (১৮৩৭) তাঁহাকে বিলাতের ব্যাপটিষ্ট মিশনের সঙ্গে এক নূতন বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইল। ম্যাক শ্রীরামপুর ব্যতীত, অন্যান্য অঞ্চলের মিশন-পরিচালিত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উহার হস্তে ছাড়িয়া দিলেন।

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া জন ম্যাক ১৮৩৯ সনের প্রারম্ভে এদেশে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীরামপুর কলেজ, মিশনচার্চ, এবং মিশনের অন্যান্য কার্য্যসমুদয়ের পরিচালনাভার তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে শ্রীরামপুর কলেজ একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায়তনে পরিণত হইল। উৎকর্ষের দিক হইতে বেসরকারী কলেজসমূহের মধ্যে ইহা ছিল অদ্বিতীয়। চার্চে বাংলা ভাষায় তাঁহার প্রার্থনা ও উপদেশাবলী শ্রোতাদের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইত। ম্যাক তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি কর্ম্মশক্তি সকলই মিশনের উন্নতিকল্পে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত নিঃসন্দেহ, কিন্তু তিনি কখনও ভ্রূক্ষেপমাত্রও করিতেন না। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে এইরূপ কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটে। তিনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৪৫, ৩০শে এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পাদ্রী ও খ্রীষ্টান-সাধারণ তো বটেই, এমনকি এদেশীয়েরাও বিশেষ দুঃখিত হন। 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অব্‌জার্ভার' (মে ১৮৪৫)-এর শোকসূচক উক্তির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করি:

"We have only time in our present issue to announce the death of one of our oldest and most valued missionary friends and fellow-labourers, the Revd. J. Mack, of Serampore. He was removed by the fatal scourge the Cholera, on Wednesday evening, the 30th April. . . .

"Mr. Mack had been a resident in India upwards of twenty-three years. His age was 48. He was a man of great natural and acquired habits. He was an original and deep thinker, a devoted labourer in the cause of truth, and one whose place will not be readily supplied. As a man of talent, a minister, a leader of youth, and adviser and friend, few equalled our good, honest, cheerful and devoted friend, John Mack of Serampore. He rests from his labours. The Lord enable us to meet him in the skies. . . .

"He possessed extensive natural abilities. He was conspicuous as a student and shone in the midst of such men as Carey, Marshman, Ward, Yeates and Pearce, which is not small praise. To have laboured with such men was an honour. To be in point of talent ranked with such men was to earn a worthy fame, as to be with them now is the most complete felicity."

এখন, জন ম্যাকের "কিমিয়া বিদ্যার সার" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই: PRINCIPLES OF CHEMISTRY./By/JOHN MACK, of Serampore College./Vol. I./কিমিয়া বিদ্যার সার।/শ্রীযুত জন মাক সাহেব কর্তৃক/রচিত হইয়া/গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল।/প্রথম খণ্ড/From the Serampore Press./1834.

পুস্তকখানির ইংরেজী ভূমিকায় ড. কেরীর সহায়তার কথা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। রসায়নের পরিভাষা সম্বন্ধে এই ভূমিকায় তিনি অতি সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা তথা দেশভাষার মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার আয়োজন আজ হউক কাল হউক হইবেই।

এসময়ে এতৎসম্পর্কে জন ম্যাকের সুচিন্তিত অভিমত সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। উচ্চতর বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকাদি রচনায় এই অভিমত আমাদের কাজে লাগিবে নিশ্চয়। ভূমিকা হইতে অতি প্রয়োজনীয় অংশটি এখানে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, 'কিমিয়া বিদ্যার সার' রচনায়ও ম্যাক স্ব-প্রস্তাবিত নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন:

"First, that our European terms have been taken from our ancient languages for the very purpose of preventing the confusion which must arise from as many different names being applied to the same thing as there are languages, in which it is spoken of ;—and secondly, that, it is a mistake to suppose, that any good will be done by accurate translations of scientific names, since as many of them, as far as their derivative import is concerned, are totally misapplied, and the translation of them therefore would only be giving currency to error. Thus the word oxygen might have been very neatly rendered অম্লজান (*umlujan*, the producer of acidity); but the result would have been, that the exploded idea of oxygen being necessary to the production of acidity, would have been embodied in the new word."

গ্রন্থখানি ৩৩৭ পৃষ্ঠা পরিমিত। ইহাতে ইংরেজী-বাংলা দুইটি পাঠই দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পাতার বাম দিকে ইংরেজী এবং দক্ষিণ দিকে বাংলা। পুস্তকের বিষয়ব্যঞ্জক অংশটি—যাহাকে আমরা সচরাচর 'প্রস্তাবনা' বা 'ভূমিকা' বলি—ম্যাক "পরিভাষা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পরিভাষাটি এখানে উদ্ধৃত হইল:

॥১॥ কিমিয়া বিদ্যাদ্বারা এই২ শিক্ষা হয় বিশেষতঃ নানাবিধ বস্তুজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্তু যে২ ব্যবস্থানুসারে পরস্পর সংযুক্ত ও লীন হইলে ঐ বস্তু হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা।

॥২॥ অদ্য পর্য্যন্ত যত বস্তুর তত্ত্ব জানা গিয়াছে সে অল্প অর্থাৎ ৫১ একপঞ্চাশতের অধিক নহে। সে সকলের নাম মূলবস্তু যেহেতুক বোধ হয় যে ঐ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কেবল এক পদার্থ আছে।

॥৩॥ অন্যান্য বস্তুর নাম সঙ্কর বস্তু যেহেতুক সে সকলের মধ্যে দুই কিংবা অধিক পদার্থ আছে। তাহার সংখ্যার প্রায় সীমা নাই।

॥৪॥ যখন মূলবস্তুর পরস্পর লয়েতে সঙ্কর বস্তু উৎপন্ন হয় এবং সেই সঙ্কর বস্তুদ্বয়াদির পরস্পর লয়েতে অধিক সঙ্কর বস্তু উৎপন্ন হয় তখন সে কার্য্য নিশ্চিত ব্যবস্থানুসারেই হয়।

॥৫॥ ইহাতে বোধ হয় যে এ বিদ্যা দুই প্রকার অর্থাৎ বস্তু ও তাহার স্বাভাবিক গুণবিষয়ক এবং সেই২ বস্তুর পরস্পর লয়বিষয়ক।

॥৬॥ কিন্তু এই বিদ্যাজ্ঞানার্থে দ্বিতীয় প্রকরণ প্রথম শিক্ষা করিতে হইবেক যেহেতুক বস্তুসকল যে২ ব্যবস্থানুসারে ও যে২ মতানুসারে সংলীন হয় তাহা না জানিলে মূলবস্তু কিম্বা সঙ্কর বস্তুর গুণ জানা অসাধ্য অতএব সেই ব্যবস্থা প্রথম কথয়িতব্য। কএক নিশ্চিত প্রভাবদ্বারা বস্তুসকল লীন হয় সে প্রভাব নানা প্রকার অতএব এই পুস্তকের দুই ভাগ হইবে। প্রথমতঃ কিমিয়া প্রভাব দ্বিতীয়তঃ বস্তুবিষয়ক।"

পুস্তকখানির ভাষার প্রাঞ্জলতা এই উদ্ধৃতি হইতে লক্ষ্য করা যায়।
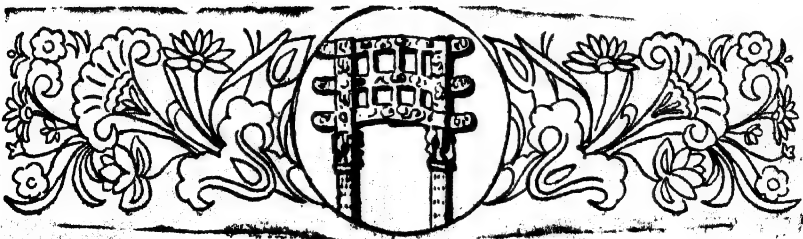
বালুরঘাট

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীষ্মের ছুটিতে একবার বালুরঘাটে যাই। হিলি-বালুরঘাট রোডের যে শোভা দেখিয়াছি এখনও তাহা আমার চিত্তে জাগরূক রহিয়াছে। দুই দিকে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে জনবহুল গ্রাম; দীর্ঘ পথে আম, তাল

বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের একাংশ

ও কাঁঠালের ছায়াঘন বীথি; মাঝে মাঝে পথিপার্শ্বে বিরাট জলাশয়ে লাল পদ্মের বন।

শহরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম নাতিক্ষুদ্র বাজার, আরও অগ্রসর হইলে দক্ষিণ-পশ্চিমে সাহেব-সুবার বাড়ী। উত্তর-

বালুরঘাট ভবন: জেলা কংগ্রেস আপিস

পশ্চিমে খালের পুল অতিক্রম করিলেই বালুরঘাটের অপরার্দ্ধ আত্রেয়ী নদীর তীর ঘেঁষিয়া ইহা অবস্থিত। সেখানে এই মহকুমা-শহরের আদালত ও ফৌজদারী কাছারি, ডাকঘর, ইংরেজী বিদ্যালয়, পাবলিক লাইব্রেরী, থিয়েটার হল, কালীবাড়ী, থানা ও স্যানিটারী বোর্ড।

শহরের নেতৃস্থানীয়েরা তখন শহরটিকে অতি দ্রুত গড়িয়া তুলিতেছেন। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক আন্দোলনে বালুরঘাট তখন সমগ্র বঙ্গদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ছাত্রজীবনের সঙ্গীরা কেহ কেহ উত্তরকালে যশস্বী হইয়াছেন। অভিভাবকেরা ছাত্রদের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। বালুরঘাটের গ্রন্থাগারটি ক্ষুদ্র হইলেও দেশ-

জেলা জজ আদালতে জনসাধারণের বিশ্রামগৃহ

বিদেশের উৎকৃষ্ট গ্রন্থসম্ভারে সমৃদ্ধ ছিল। আমরা এই সব পড়িয়া লাভবান হই। গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ এগুলি সংগ্রহ করিয়া জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিতে তৎপর হইয়াছিলেন।

শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে যৌথ কর্ম্মে, সমাজ-সেবায় বালুরঘাট-বাসীদের তৎপরতা দেখিয়া কর্ম্মীদের প্রতি আমাদের চিত্ত যে শ্রদ্ধায় ভরপুর হইয়াছিল আজিও তাহা অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। অবসর পাইলেই বালুরঘাটে যাইতাম, একটা উন্মুক্ত বলিষ্ঠ, উদার জীবনধারার আস্বাদ পাইয়া নিজেকে উজ্জীবিত করিয়া লইবার জন্য। রাজনৈতিক আন্দোলন, বিশেষ করিয়া মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ
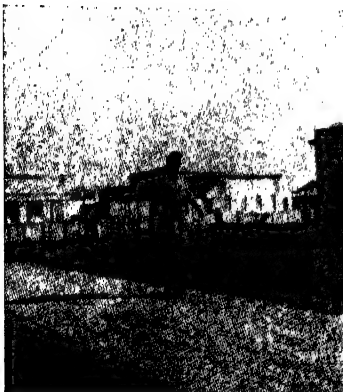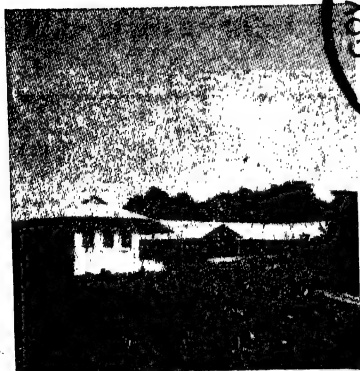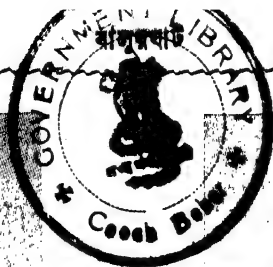
ললিতমোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

বালুরঘাট : প্রাচ্যভারতী ভবন

একটি মসজিদ

জেলা জজকোর্টের একাংশ

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসগৃহ
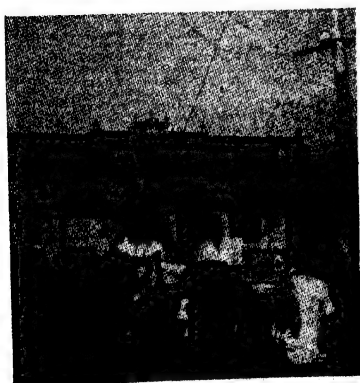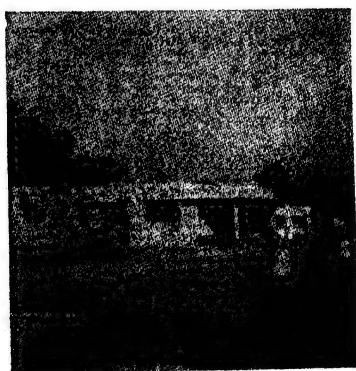
বালুরঘাট—নবনির্মিত শহরে পুলিশ সাহেবের বাংলো

প্রচেষ্টায় বালুরঘাট বাংলা তথা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ওদিকের বারদৌলী, এদিকের বালুরঘাট।

সরকারী পরিকল্পনায় নবনির্ম্মিত স্কুলগৃহের একাংশ

১৯৪২-এর আন্দোলনের শেষে বালুরঘাটের বার-চৌদ্দ জন রাজনৈতিক কর্ম্মীকে নিরুদ্দেশযাত্রা করিতে হয়। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পরে; তখন ভারত স্বাধীন হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন তাঁহাদের বালুরঘাট খণ্ডিত দিনাজপুর জেলার পশ্চিমে অবস্থিত পশ্চিম দিনাজপুর জেলা-শহর রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তখনকার দিনের থানা রাইগঞ্জ অন্যতম মহকুমা-শহরে পরিণত।

নবনির্ম্মিত জেলা লাইব্রেরী

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমগ্র প্রদেশে বিস্তর রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তন্মধ্যে পশ্চিম দিনাজপুরের এই রাস্তাগুলি দৈর্ঘ্যে, গঠনমৈপুণ্যে ও সৌন্দর্য্যে বুঝি-বা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই সব রাস্তায় দ্রুতগামী শত শত বাস যাত্রী ও পণ্য লইয়া জেলা এবং জেলার বাহিরেও যাতায়াত করিয়া সমগ্র প্রদেশের সঙ্গে যোগ রাখিয়া

নবনির্ম্মিত জেলা জজ আদালত

চলিয়াছে। বস্তুতঃ তিন-চার বৎসর আগে যখন মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্নাভাব দেখা দিয়াছিল তখন এই সব রাস্তা দিয়াই বালুরঘাট অঞ্চল হইতে বিপুল পরিমাণ ধান ও চাউল প্রেরিত হইয়া ঐ অঞ্চলবাসীর খাদ্যাভাব দূর করিয়াছিল।

কেবল রাস্তা নির্ম্মাণ নহে; বালুরঘাট যে জেলা-শহর হইয়াছে, ইহা ঘোষণা করিয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার গঠনে গত দশ বৎসর ধরিয়া এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহার ফলে আমার সেই চৌত্রিশ বৎসর
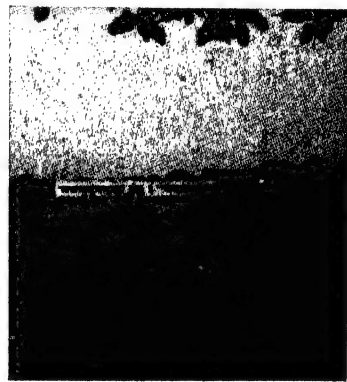
নবনির্ম্মিত শহরে জেলার সদর হাসপাতাল

আগেকার দেখা বালুরঘাট শহরের সঙ্গে বর্ত্তমান বালুরঘাটের অনেক তফাৎ হইয়া গিয়াছে।

বিখ্যাত আত্রেয়ী নদীর তীরে তীরে গড়িয়া উঠিয়াছে

প্রায় ছয় বর্গমাইলব্যাপী এক বিস্তীর্ণ শহর। এই বৃহত্তর শহরে জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। একটি সুন্দর সড়ক শহরের দুই প্রান্তকে যুক্ত করিয়াছে। তাহারই উত্তর-পূর্ব্ব দিকের পুরাতন শহর ও বিমানঘাটির মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ নূতন শহর অবস্থিত। এই অংশের সমৃদ্ধি অতি সহজেই চোখে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় চারি শত বিঘা জমির উপর বিরাট জেলা হাসপাতাল, ডাক্তার ও নার্সদের সিরামগৃহ, জেলা জরিপ আপিস, জেলা পুলিস-সুপার ও ইঞ্জিনীয়ারদের কোয়ার্টার এবং জেলা জজের কোয়ার্টার নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। আর ভারত গবর্নমেণ্টের পঁচিশ লক্ষ টাকায় বিমানঘাটি উন্নততর করা হইয়াছে, মাত্র কুড়ি টাকায় কলিকাতা-বালুরঘাটে যাত্রী যায়।

ওদিকে পুরাতন শহরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে ও স্থানীয় লোকেদের অর্থসাহায্যে এবং চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, সাতটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বিস্তীর্ণ বাজার, জেলা গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি।
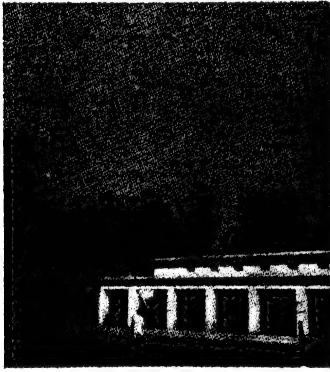
নবনির্ম্মিত প্রথম শ্রেণীর কলেজ

বালুরঘাটের নেতাদের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্রুত সংগঠন-শক্তি দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়।

এইভাবে জেলা-শহর গড়িয়া উঠায় বালুরঘাটে জনবসতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। নানা কারণে এখানে জীবিকা অর্জ্জনের বিভিন্ন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহারই দরুন বালুরঘাট শহরের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় এক লক্ষ উদ্বাস্তু বসতিস্থাপন করিয়া পুনরায় জীবিকা অর্জ্জনে সক্ষম হইতেছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে পনরটি জেলা। ইহার মধ্যে এক বালুরঘাট মহকুমাই এই জনসমষ্টির প্রায় দশ লক্ষের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। বালুরঘাটের কৃতিসমূহের মধ্যে ইহাও একটি বিশেষ আনন্দদায়ক ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বালুরঘাট শহরতলীতে ছয়টি চাউলের কল বসিয়াছে, হিলিতে চৌদ্দটি রহিয়াছে; বাঁধানো পথ ও আত্রেয়ী নদী-

উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবনির্ম্মিত বাড়ীর একাংশ
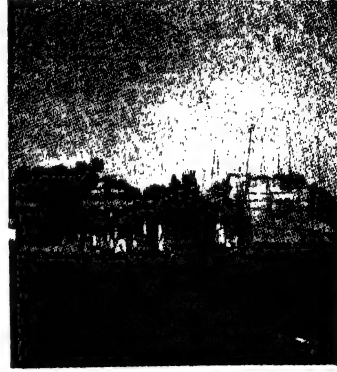
যোগে এই পণ্য ও পাট, সরিষা প্রভৃতি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আত্রেয়ী হইতে পুনর্ভবা, তাহা হইতে মহানন্দা এবং তাহা হইতে মালদহের দক্ষিণে গঙ্গায় পড়িয়া নৌকাবাহিত পণ্য সর্ব্বত্র নীত হইতেছে। এবার কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনকালে ভারত সরকারের পক্ষে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বালুরঘাট ও হিলিকে যুক্ত করিয়া একটি রেল লাইনের আয়োজন বর্ত্তমান পাঁচসালা উন্নয়নের মধ্যেই করা হইবে। চক্ষের উপর বালুরঘাটের এতাদৃশ ক্রমোন্নয়ন আমাদের চিত্তে এই আশার উদ্রেক করি-

উদ্বাস্তু-পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়
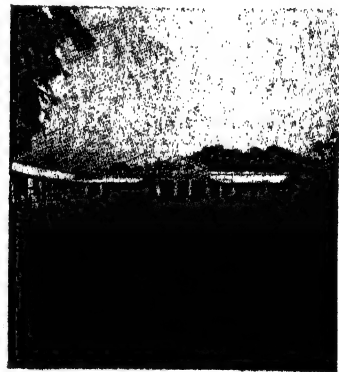
য়াছে যে, বালুরঘাট একদিন অপ্রত্যাশিত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিবে স্থানীয় লোকেদের চেষ্টায় ও সরকারের আনুকূল্যে।

সম্প্রতি কিষেণগঞ্জের কিয়দংশ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার আয়তন আরও বর্দ্ধিত হইল। ঐ অঞ্চলে চা উৎপন্ন হয় এবং অনেক অকর্ষিত ভূমিও আছে। সুতরাং এই জেলার সমৃদ্ধিতে ইহা সহায়ক হইবে নিঃসন্দেহ। কাজেই এই সীমান্ত জেলা-শহর প্রতিষ্ঠায় ভারত সরকার অবশ্যই অবহিত থাকিবেন, যেমন তাঁহারা অবহিত রহিয়াছেন পূর্ব্ব পঞ্জাবের রাজধানী, সীমান্তবর্ত্তী চণ্ডীগড় প্রতিরক্ষায়। এ কারণেও বালুরঘাটের গুরুত্ব বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। মোট কথা, বালুরঘাটের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া অন্তরে যে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার হয় সেকথা বলাই বাহুল্য।

ফোটোগুলি শ্রীরাধামোহন মোহান্ত কর্ত্তৃক গৃহীত

অব্যক্ত

শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক

কবিতায় মিল নাই
পাদুকায় হিল নাই
এই সব আজকাল চলছে।
রাঙা খাম চিঠি নাই
টানা আঁখি দিঠি নাই
এলোমেলো কত কি যে বলছে!
যে হিয়াতে আশ নাই
আকাশে বাতাস নাই
বনফুলে কত রঙ ফলছে
নয়া ছুরি ধার নাই
ঢালা শাড়ী পাড় নাই
বিধি যেন মেকি হয়ে ছলছে।
কত সাধ সাধ্য নাই
নভে চাঁদ রাতি নাই
ক্ষ্যাপা কোন্ ফুলমালা দলছে,
কাঁটা আছে ফুল নাই
দুঃখস্রোতে কূল নাই
ব্যথা-ধূপ তিলে তিলে গলছে।
চোখে যার দেখা নাই
প্রাণে তার রোশনাই
নিশিদিন ধিকি ধিকি জলছে
জালা আছে ভাষ নাই
ব্যথার প্রকাশ নাই
চোখে জল টল টল টলছে।

চেয়ে থাকি

শ্রীভূদেব চট্টোপাধ্যায়

জীবনের পূর্ণ পাত্রে সঞ্চয় করিয়া শুধু জ্বালা
ধূলিরুক্ষ পৃথিবীর কণ্টকিত পথে যারা চলে,
নিত্য যারা করে পান ফেনায়িত বিষের পেয়ালা
ভগ্ন মেরু কান্তিহীন আমি যে গো তাহাদেরই দলে।

হৃদয়-শ্মশানে মোর ছড়ানো যে আশার কঙ্কাল
কামনার শূন্য কুম্ভ ইতস্ততঃ যায় গড়াগড়ি
অনির্বাণ দাহে চিত্ত অনুক্ষণ হয়ে থাকে লাল
বেদনার সিংহদ্বারে আমি রহি বিনিদ্র প্রহরী।

গান মোর কণ্ঠে আসি ক্রন্দনের তোলে রোল শুধু
বঞ্চনার খরতাপে সবুজের স্বপ্ন যায় টুটে
শূন্য শুষ্ক রিক্ত প্রাণ বর্ণহীন নিঃশেষিত মধু
ললাটের লোল চর্ম্মে রেখাঙ্কিত মৃত্যু ফুটে ওঠে।

শতাব্দীর অশ্রুজলে সঞ্জীবিত গাণ্ডীব-টঙ্কার
অধীর আগ্রহ লয়ে শব্দ তার কান পেতে শুনি
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা লাগি অবিচারে করিতে সংহার
ধরণীর মর্ম্মতলে গর্জ্জায়িত রথচক্রধ্বনি!

কম্বুকণ্ঠে ডাক দিয়ে দৃপ্ততেজে পার্থ আসে নাকি?
জলন্ত প্রতীক্ষা লয়ে পথ পানে তাই চেয়ে থাকি।

দুই রাত

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন বারতিনেক অদ্ভুত কর্কশ শব্দে শিস্ দিল। ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ায় কয়লার গুড়োর ভিড়। প্ল্যাটফর্মের এতক্ষণের স্তব্ধতায় যাত্রী আর অযাত্রীদের দুর্ব্বার কলরোল। এদিকের টানা টানা সারি সারি লাইনে ছেঁড়া ছেঁড়া মালগাড়ীর বগী।

যাত্রী-অযাত্রীদের দুরন্ত কলরব শুধু সারাটা প্ল্যাটফর্ম্মেই নয়, এই কামরার দুটো দরজার মুখেও। সেখানে কলরবই শুধু নয়, সেই সঙ্গে বচসা আর পরিণামে ঠেলাঠেলিরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দরজার কাছে এগিয়ে এসে সেখানকার অশোভন ঝঙ্কারে নিজের উপস্থিতির সাড়া দেবার প্রয়োজন বোধ করল না সুপবিত্র। আধখোলা হোলড অলের ওপর আধ-শোয়া শরীরটাকে আরও গুটিয়ে রহস্য পত্রিকার পাতা মুড়ে রাখা পাতাটায় মন দিল আবার।

শেষ কামরার গার্ডের সবুজ আলো চোখে পড়বার কথা নয়। কিন্তু গার্ডের সিটি দেবার শব্দ অন্ততঃ কানে আসা উচিত ছিল। কানে না এলেও নিশ্চল গাড়ীর গতিবেগ নিঃসন্দেহে জানিয়ে দিল, এসব আনুষঙ্গিকগুলো আগেই হয়ে গেছে।

কিন্তু গাড়ী ষ্টেশনের পাথরের প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে আর ওঠানামায় ব্যস্ত যাত্রীদের কোলাহল হারিয়ে দু'পাশের অন্ধকার ফাঁকা মাঠে ঝিরঝিরে হাওয়ায় কিছুটা নামতেই কানে এল—ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনের কর্কশ হুইসিল নয়, পাশ কাটিয়ে হঠাৎ দুরন্ত গতিবেগে বেরিয়ে যাওয়া কোন ডাক-গাড়ীর আচমকা গর্জন নয়, কানে এল ভিজে গলার ছোট্ট একটু মিষ্টি ডাক।

চিনতে পারছেন?

রেল গাড়ীর নানা জাতের অচেনা যাত্রীদের ভিড়ে চেনা কেউ নেই। চেনা কেউ এতক্ষণ ছিলও না। কেউ কাছে এসে চিনিয়ে না দিলে, চেনা মুখ আর চেনা গলার স্মরণ-চিহ্ন নিয়ে কাছে এসে না দাঁড়ালে এই দুস্তর অচেনার ভিড়ে চেনা কাউকে খুঁজে বার করা কঠিনই কাজ। তবু রহস্য-পত্রিকার পাতায় রহস্যের উত্তেজনায় তন্ময় মন হঠাৎ তছনছ হয়ে গেল পরিচিত গলার মিষ্টি ডাকে।

কি, চিনতে পারছেন না?

ঠিক সামনের বেঞ্চেই মুখোমুখি। খানিকটা জায়গা ওখানে খালি ছিল। ওই একটুখানিতেই জায়গা জুড়ে বসেছে অনেক-খুশির একজন। তাকাল সুপবিত্র—ভাল করেই যেন। রহস্য-পত্রিকার রহস্যের আকাশ থেকে মাটির পৃথিবীতে আরও রহস্যময় অবতরণ।

চিনতে পারল সুপবিত্র। চেনা নয়, এ যেন আবিষ্কার। একটুখানি অনেক-কাছে পাওয়া একটি রাতের হারিয়ে-যাওয়া চাঁদ। তারপর অনেক রাতের অন্তহীন অন্ধকারের পর হঠাৎ এই আবিষ্কার। চিনতে পারল বৈকি সুপবিত্র। খুশি আর বিস্ময়ে আটকে রইল অনেকক্ষণ। তাই ত বোবা হয়ে গেল। তাই দেরি হ'ল সাড়া দিতে, একটু বেশীই।

হ্যাঁ। বইটা পাশে নামিয়ে রাখল সুপবিত্র।

মনে ত হচ্ছে না।

মনে না হওয়াটা স্বাভাবিকই। তবে বিশ্বাস করুন চিনতে ঠিকই পেরেছি। তবে সেটা জানাতে দেরি হ'ল একটু, এই যা। সুপবিত্র সহজ থেকে সহজতর হ'ল।—এই যা দোষ।

দোষ আপনার অনেক। হাসি ঠোঁট চিরল চিত্রলেখার।

অনেক? কি কি শুনি?

নাই-বা শুনলেন। মেয়েদের মত অত কৌতূহলী হওয়া ছেলেদের ভালো দেখায় না। আর দোষগুণ নিয়েই তো মানুষ। খালি গুণগুলো নিয়ে ভালো ছেলে হওয়ার চেয়ে একটু দোষ নিয়ে দুষ্টু ছেলে হওয়া ঢের ভালো—তা জানেন?

কি জানি।

তা কেন জানবেন। শুধু ভালো কথা বলে মেয়েদের লোভ দেখাতেই জানেন আপনারা।

বাঃ রে, কাকে আবার কখন লোভ দেখালাম? অবাকই হ'ল সুপবিত্র।

যাক্ গে, ও সব ভাববেন না কিছু, দোহাই। হাসি আরো একটু চিরে দিল নরম গোলাপী ঠোঁট দুটো। মেয়েরা ত আজেবাজে কত কিই বলে। ও সব শুনতে নেই।

বেশ। হাসি ছড়াল সুপবিত্রও।

এই ত কেমন লক্ষ্মী ছেলে। কত সহজেই মেনে নিলেন। অন্য কেউ হলে এক গাদা তর্ক করত।

শুনেছি ত যে তর্ক করতে মেয়েরাই ওস্তাদ।

মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কথাই হয় ত শুনেছেন, আবার অনেক কথাই হয় ত শোনেনও নি। সব ছেলে মেয়েদের সব কথাই কি শুনতে পারে? পারে না। কিন্তু ভাবি আশ্চর্য্য, আবার ট্রেণে আমাদের এমনি করেই দেখা হওয়া।

এমনিই হয়।

হয় না, হাতি। বড় ত বিজ্ঞের মত মন্তব্য করে দিলেন। আপনি অবাক হন নি?

হয়েছি বৈকি। হয় ত আপনার চেয়েও বেশী। তবে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ছেলেদের অনেক কম।

সবই কম ছেলেদের। তবে বেশীটা কি?

যদি বলি দুষ্টুমি।

থাক, তাও জানা আছে। হাওয়ায় উড়ে-আসা চুল-গুলোকে মুখের উপর থেকে সরায় চিত্রলেখা।

কি করে জানলেন? এর আগে অনেক আগের একটা ট্রেণের রাতের ত মাত্র আলাপ।

ছেলেদের জানতে মেয়েদের একটা রাতই যথেষ্ট। একটা রাতও অনেক। এক ঘণ্টাই ঠিক।

তবে ত কিছুই জানেন না।

বেশী জেনে দরকার নেই আমার।—শাড়ীটাকে বুকের উপর ঘুরিয়ে নিল চিত্রলেখা।—আমার শুধু আশ্চর্য্য লাগছে, আজকের এই আবার দেখাটাই তখন থেকে। আশ্চর্য্য শুধু দেখাটাই নয়, আবার রেলগাড়ীতেই আর রাত্তিরেই।

আশ্চর্য্য ত নিশ্চয়ই। হয় ত দুর্ঘটনাই।

যে-কোন ঘটনাকেই ত দুর্ঘটনায় নামানো যায়। হাসল চিত্রলেখা।

এর থেকে প্রমাণ হ'ল যে পৃথিবী গোলাকার। হাসল সুপবিত্রও।

প্রমাণ ত অনেককিছুই হয়। গোলাপী ঠোঁটের হাসি লুকোল না। আচ্ছা বলুন ত, কত দিন বাদে আবার এই দেখা?

কি জানি?

হিসেব করে রাখেন নি?

না ত?

বিশ্বাস হয় না।

হয় না কেন? ওর কালো চোখের অস্থির তারা দুটোর দিকে ইচ্ছে করেই তাকিয়ে থাকে সুপবিত্র।

কারণ ট্রেণের সেই রাত, হঠাৎ পাওয়া একটাই রাত। সে রাতকে ভোলা যে বড়ই শক্ত।

ভোলাই ত ভাল।

ভাল ত পৃথিবীতে অনেককিছুই।—কালো দুটো অস্থির চোখের তারায় হঠাৎ যেন পড়ল মেঘের ছায়া।

ভোলা সত্যিই যায় না। হঠাৎ-পাওয়া একটা রাত। অগোচর অসতর্কে ঝিরঝিরে ভিজে হাওয়ায় রাতের ট্রেণের মিষ্টি সময় অনেকখানি। হয় ত জানত না কেউ। হয় ত চায়নিও দুজনের কেউ। কিন্তু পাবার পর বলতে কেউ পারে নি, বলতে কেউ চায় নি, চাই না।

সে রাতেও এমনই মুখোমুখি চিত্রলেখা, এমনই মুখোমুখি সুপবিত্রও। আজকের মত ডাকবার সাহস ওর হয় নি। সাহস সুপবিত্রেরও হয় নি। দুজনে তাকিয়েছিল শুধু অনেকটা রাস্তা। বোবা বালির বাঁধ স্নিগ্ধ নীল জলের ঝরণায় মুখর হতে একটু সময় ত লাগবে।

অবশ্য তার আগে চিত্রলেখার সঙ্গীদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে সুপবিত্রের। ওর বড় মামা কল্যাণবাবু, মা আর ছোট বোন মিনু। ভিড় ঠেলে ওদের জায়গা করে দিতে সাহায্য করেছে সুপবিত্র। আশ্চর্য্য, ভাব ওদের সঙ্গে শুধু তাড়াতাড়িই নয়, সহজেও হয়।

কল্যাণবাবু বললেন, খাবার বার কর রে চিত্রা, বেশ ক্ষিধেটা পাকিয়ে এসেছে।

চিত্রলেখা হাসল, তোমার বড়মামা খালি খাই খাই।

খাই খাই মানে? সকলেরই ক্ষিধে পেয়েছে। আস্ক মিনু, কি রে পায় নি?

খুব বড়মামা। মিনু ঘাড় নাড়ল।

ওই শোন। এর পর আর দেরি নয়। তার পর কল্যাণবাবু তাকালেন সুপবিত্রর দিকে।—আপনার কি মশাই? হোয়াট এবাউট ইউ? সঙ্গে ত খাবার কিছুই দেখছি না।

আমি পরের স্টেশনে রেষ্টুরেন্ট কারে ঢুকে পড়ব।

সেখানে কি পাবেন ছাইপাশ মশাই।

আর আমাদের কাছে খাবার থাকতে ওখানে যাবেনই বা কেন? আরও আপত্তি ভেসে এল।

রাইট। মাথা দোলালেন কল্যাণবাবু।

ইতিমধ্যে কাঁচের প্লেটে খাবার সাজিয়ে ফেলছে চিত্র-লেখা। প্লেটটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন।

আপনাদের খাবারে ভাগ বসানো ভাল হ'ল না কিন্তু।

নাই-বা হ'ল। মৃদু হাসল চিত্রলেখা। ভাগ বসাতে ভাল লাগছে না বুঝি আপনার?

তা নয়। তবে কি মনে করবেন আপনারা।

কি আবার?

ভাববেন, কি হ্যাংলা ছেলে রে বাবা।

ভাবব কেন, ছেলেরা তা নয় বুঝি? মিষ্টি গলাটাকে

আরও যেন নরম করল চিত্রলেখা। নিন, তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলুন ত।

কিন্তু এ যে অনেক দিয়েছেন।

অনেক আবার কোথায় ? ভারি ত খাবার ?

কম পড়বে না আপনাদের ?

পড়ুক। না হয় সবাই কম করেই খাব। না হয় আমার ভাগ খাবই না। একটুও ক্ষিধে নেই আমার।

বাঃ রে, তা কি হয় নাকি ?

খুব হয়। তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলুন দিকি। আপনার সঙ্গে আর বকতে পারি না। ছেলেদের যে এত সাধতে হয়, আগে জানতাম না।

আগে কি জানতেন ?

জবাব শোনা গেল না চিত্রলেখার। হয় ত শুনতে পায় নি, বা জবাব দিতে চায় নি। ট্রেণ তখন মস্ত একটা নদী পার হচ্ছে।

ঠিক আজকের দিনই আমারও যাবার দিন পড়ল, আর বেছে বেছে ঠিক আপনার কামরাতেই উঠলাম—আশ্চর্য্য যোগাযোগ না ?

আশ্চর্য্যই।

শুধু তাই নয়, আপনাকে খুঁজে বার করার ক্রেডিটও আমার।

এক শ'বার। তবে এ ক্রেডিট আমি নিতে পারলে আরও খুশী হতাম।

পারবেন কি করে ? যে রকম বই পড়ায় মেতেছিলেন। কি বই অত সব ? নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ ?

হু। ঘাড় নাড়ল সুপবিত্র।

ঠিক ধরেছি। সে রাতেও সঙ্গে দেখেছিলাম এক গাদা ডিটেকটিভ বই। আচ্ছা, কি আছে এতে ?

কি নেই বলুন। প্রেম থেকে খুন সব।

ভাল লাগে আপনার ?

খুব। ভারি ইনটারেষ্টিং। আপনি পড়েন না ?

বই পড়তে আমার একটুও ভাল লাগে না।

তবে কি ভাল লাগে ? রাতদিন শুধু বকবক করতে কি ?

তাই। হাসল চিত্রলেখা। আচ্ছা ডিটেকটিভ বইয়ের হিরোরা কি করে ? হিরোইনকে গুণ্ডা-খুনেদের হাত থেকে উদ্ধার করে কি ?

তাই ত করে।

আর সত্যিকারের হিরোরাও কি তাই করে ?

তারাও।

কি জানি। আবার হাসল চিত্রলেখা। কেমন যেন বিবর্ণ মনে হ'ল এবারের হাসি।

খাবার দিতে গিয়ে দুটো কথা। দুটো কথাতেই দুষ্টু মেয়ে চূড়ান্ত দুষ্টুমি দেখাল। রাতের রেলগাড়ীতে মুখোমুখি চঞ্চল তারার স্নিগ্ধ আলোয় শান্ত নয়, প্রাণবন্ত এক দুরন্ত মেয়ে।

রেলের খোলা জানলায় প্রাণবন্ত মেয়ের প্রাণবন্যা উচ্ছল কৌতূহলে বারবার উছলে পড়ছিল।

শুনুন, জানলা দিয়ে অত ঝুঁকবেন না।

কেন, কি হবে ঝুঁকলে ?

কি হবে জানি না। তবে একটা কিছু হবে।

কি এক্সিডেণ্ট ?

তাই।

তবে ত ভালই হবে।

ভাল ঘোড়ার ডিম। হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকবেন। বিয়ে হবে না।

পৃথিবীতে এত কিছু জিনিস থাকতে হঠাৎ বিয়ের কথাটাই কেন আপনার মনে পড়ল শুনি ?

কি জানি। হাসল সুপবিত্র। বেশী মুখ বাড়াবেন না। কয়লার গুঁড়ো পড়বে চোখে।

তখন কথা শুনল না। একটু পরেই মুখ ফেরালো চোখ রগড়াতে রগড়াতে।

কি হ'ল, কয়লা পড়েছে ত চোখে ?

হুঁ। শাড়ীর আঁচলে চোখ ঘষতে ঘষতে মাথা নাড়ল চিত্রলেখা।

কলেজে পড়া মেয়েরা ভারি অবাধ্য হয়।

ক'টা মেয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে শুনি মশাই। রগড়ানো লাল চোখ তুলে তাকাল চিত্রলেখা।

অনেক দিনের পরে দেখা। এবার খবর শোনান আপনার। সুপবিত্র হেসে শুধাল।

ভালই।

ছোট্ট ঐটুকু জবাবে সব কথা শেষ করে দিলেন। ভারি চালাক ত।

জানি ভাল নেই বললে এখুনি একগাদা প্রশ্ন করবেন।

জানেন ত অনেককিছুই। কিন্তু এটা কি জানেন যারা অনেককিছুই জানে আসলে তারা কিছুই জানে না।

হবে হয় ত। কি জানি।

সঙ্গে কাউকে দেখছি না ত। একা এসেছেন নাকি ?

একা আসতে ভয় আমার একটুও নেই। কিন্তু যারা পাঠাবে, ভয় একগাদা তাদেরই।

ভয়টা স্বাভাবিক।

তাই সঙ্গে রয়েছে মণ্টু। আমার ছোট ভাই। এখানে জায়গা হ'ল না তাই পেছনের বেঞ্চে বসেছে।

ট্রেণ থেমে গেল। কোন স্টেশন নয়, এক ঝাঁক কালো অন্ধকারের মধ্যে নিরালা মাঠ। বারদুয়েক সিটি দিয়ে বিরাট ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনটা ধুঁকতে লাগল। সিগন্যালের সবুজ আলো জ্বলে নি বোধ হয়।

সেই রাতের ট্রেণের আপনি আর আজকের রাতের ট্রেণের আপনি খুব বেশী বদলান নি। শুধু—

শুধু কি? মুখটা কাছে আনল চিত্রলেখা।

চুলের মধ্যে ওই লাল দাগটুকু।

কত ছোট করে টেনেছি। তাও আপনার চোখ এড়াল না।

তাই ত দেখছি। কিন্তু অত সরু করে এঁকেছেন কেন। দেখাই ত যায় না।

দেখাতেই হবে নাকি? ফিরে হাসল চিত্রলেখা।

হবে না?

কি জানি?

নতুন জীবনের লাল নিশানাটুকুতে অত কৃপণতা কেন, তা ত বললেন না?

এমনিই।

লাল দাগ টানতে ভাল লাগে না, না?

জানালার বাইরে কালো অন্ধকার। সেদিকেই চেয়ে রইল চিত্রলেখা।

কি, জবাব দিলেন না যে?

বাইরের অন্ধকার থেকে চোখ ফেরাল না চিত্রলেখা। শুধু বলল, সব প্রশ্নেরই কি জবাব থাকে।

গাড়ী থামল। মাঝ রাতের নির্জ্জন রিক্ত স্টেশন। কে জানে, কি নাম। কেউ জানবার চেষ্টাও করল না। গাড়ী আবার এগোল।

সত্যি তা হলে বিয়ে করলেন।

করি নি, হয়ে গেল।

ওই একই।

মুখ ফিরিয়ে তাকাল চিত্রলেখা। সত্যিই এক কি? প্রশ্ন করল, কিন্তু জবাব চাইল না।

আবার বলল সুপবিত্র, বেশ ফাঁকি দিলেন আমায়। দিব্যি লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করে নিলেন।

তাই। ট্রেণে ত কত বার কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। সবাইকেই মনে রাখতে হবে নাকি।

তবু আমার বেলায় অন্ততঃ তাই আশা করেছিলাম।

অমন আশা করা দুরাশা। একটা ডিটেকটিভ বই টেনে পাতা ওলটাতে থাকে চিত্রলেখা। তবু—

তবু কি?

তবু মনে ত রেখেছিলাম।

প্রমাণ পেলাম না।

প্রমাণ করা শক্ত। কিন্তু ঠিকানা জানা সত্ত্বেও আপনিই বা ক'বার এসেছিলেন বা খোঁজখবর করেছিলেন শুনি?

সত্যিই সময় পাই নি।

অথচ বেশ লোক আপনি, দোষ দিচ্ছেন আমাকেই। মেয়েদের পায়ে পায়ে বাধানিষেধের কত শেকল, জানেনই ত।

বিশ্বাস করুন, এ আমার অবহেলা নয়, অক্ষমতা।

বিশ্বাস না করলেও ক্ষতি হবে না আপনার। ট্রেণের শুধু একটা রাতের চেনা, ওর কিই-বা দাম, কিই-বা দাবি।

আগুন লেগেছে লাইনের পাশে বনের মধ্যে।

কেমন হয়েছে বিয়েটা?

ভালই।

মনের মিল হয়েছে ত ভদ্রলোকের সঙ্গে?

একটা রাতেই যদি আপনার সঙ্গে অত মিল হতে পারে —আর ওঁর সঙ্গে ত কতগুলো রাত কাটালাম।

তার পর হঠাৎ বোবা দুজনেই। জানালায় শুধু এলো-মেলো হাওয়া চিত্রলেখার শাড়ীকে টানাটানি করছে। রুক্ষ চুলের গোছাকে বারবার মুখের ওপর আছাড় দিচ্ছে। রেলের লাইনে লাইনে ইস্পাতের বেদনায় কর্কশ কান্নার শুধু একটানা সুর।

কল্যাণবাবুর নাক ডাকছে। মাও শুয়ে পড়েছেন। মিনুকে নিজের জায়গাটুকু ছেড়ে দিয়েছে সুপবিত্র।

আপনার কি হবে? চিত্রলেখা শুধাল।

হয়ে যাবে একটা কিছু।

ঘুমোবেন না?

আপাততঃ নয়। পরে দেখা যাবে।

পরে আর কি দেখবেন? নিজের শোবার জায়গাটুকু ত মিনুকে দিয়ে দিলেন।

হাসল সুপবিত্র। দিয়ে দিই নি, নিয়ে নিল। দুটোর তফাৎ অনেক। কিন্তু আপনি কি করবেন?

ট্রেণে আমার ঘুমই আসে না।

সারারাত জেগে থাকবেন?

তাই থাকব। বেশ লাগে সারাটা রাত ট্রেণে জেগে থাকতে—জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে

তাকিয়ে থাকতে। কোথাও গণ্ডগোল নেই। শুধু বোবা আমি আর বোবা রাত। আপনার ভাল লাগে না?

কি জানি।

কিচ্ছুই জানেন না। খালি গুচ্ছের ডিটেকটিভ বই পড়তে শিখেছেন ট্রেণে বসে। কত কি হচ্ছে, বাইরে কত কি চলে যাচ্ছে কিছুই কি দেখতে ইচ্ছে করে না। কিছুই কি ভাল লাগে না?

না। কিন্তু ট্রেণ জার্নিতে এই প্রথম বই এত কম পড়লাম।

হঠাৎ?

কারণ তোমায় দেখলাম। এর আগে ট্রেণে এমন আর কাউকে দেখি নি। তোমাকে ভাল লাগল। এর আগে এত ভাল ট্রেণে আর কাউকে লাগে নি।

সুরু হয়েছে।

কিসের সুরু?

ছেলেদের দুষ্টুমির।

ঐ যা, তুমি বলে ফেললাম।

যাক, আর শুধরে দরকার নেই। জানালার দিকে মুখ ফেরাল চিত্রলেখা। ঝুঁকে পড়ল চাঁদ উঠেছে কিনা দেখতে।

অত মুখ বাড়িও না, আবার কয়লা পড়বে চোখে।

পড়ুক গে।

এই শোন, কাল ভোরেই কি তোমরা নেমে যাবে?

হুঁ।

তার পর?

তার পর আর কি, হোম সুইট হোম।

আমাকে মনে রাখবে না?

মনে? ফিরে তাকাল চিত্রলেখা। চঞ্চল দুটো কালো তারায় খুশির বুদ্বুদ ফোটাল একটু। 'প্রভাতে কে আর মনে রাখে বল রজনী শেষের চাঁদে'। আচ্ছা মনে কর, ভোর আর যদি নাই হয়। বলে উঠল সুপবিত্র।

তার মানে?

মনে কর যদি রাতের আর শেষ না হয়। অনন্ত কাল ধরে রাতের এই রেশ যদি চলতেই থাকে।

হাসল চিত্রলেখা। পাগল, তাই কি হয়।

হয় না, না?

উঁহু।

আচ্ছা মনে কর, হঠাৎ এখুনি একসিডেন্ট হয়ে গেল এই গাড়ীর। সবাই প্রাণ হারাল, শুধু আমরা দুজন একসঙ্গে অনেক দূর ছিটকে পড়ে বেঁচে রইলাম।

কি সব আজেবাজে বকছ তখন থেকে। মিষ্টি মেয়ের নরম গোলাপী ঠোঁট পাপড়ির মত ফুলে ফুলে কেঁপে উঠল হাসিতে।

তবু বোবা হাওয়ার কান্নার ভিড় ওই মেয়েই ভাঙল কথাতে আবার।

যাই হোক, আজ হঠাৎ আবার এভাবে ট্রেণে আমার আপনার দেখা হয়ে গেল, ভালই হ'ল।

কি জানি।

সত্যিই। আমি বলছি। কারুর মন্দ করার সাধ্য আপনার নেই।

ধন্যবাদ।

দোহাই, ওটা নাই-বা দিলেন। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আজ শ্বশুরবাড়ী ফেরার পথে বার বার এই কথাই মনে হচ্ছিল, আবার যদি হঠাৎ ট্রেণে দেখা হয়ে যায় আপনার সঙ্গে।

অবিশ্বাসের কিছু নেই। আপনি ভাগ্যবতী।

কি জানি।

ভোর হতেই নেমে যাবেন? শুধাল সুপবিত্র।

হুঁ।

তার পর?

তার পর আর কি, সোজা বাড়ী।

হোম সুইট হোম ত?

ফিক করে হেসে ফেলল চিত্রলেখা। সেদিনের জবাব মনে আছে দেখছি।

ভোলা কি যায়। হেসে ফেলল সুপবিত্রও।

আচ্ছা এ কথা কি মনে আছে যে, আপনি বলেছিলেন, ভোর যদি আর কোন দিন না হয়, এ রাতের যদি শেষ না হয়, রাতের এ রেল যদি অনন্ত কাল চলতে থাকে!

নিশ্চয় মনে আছে। আরও বলেছিলাম, হঠাৎ যদি একসিডেন্টে রেলগাড়ী ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, সবাই মরে যায়, বেঁচে থাকি শুধু আমরা দু'জন।

হাঁ, তাও বলেছিলেন।

আর পাগলামি বলে আপনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

হাঁ।

ঠিকই করেছিলেন।

কি জানি। জানালার বাইরে অন্ধকারে তাকাল চিত্রলেখা। তার পর মুখ ফেরাল আবার। আচ্ছা, আপনার সে রাতের সেই প্রশ্নগুলো আজকের রাতে যদি আমি আপনাকে করি, আপনি কি খুবই অবাক হবেন? সেই রাতে আমার মতই আপনি কি আজ পাগলামি বলেই হেসে উড়িয়ে দেবেন সেগুলোকে?

অবাক বিস্ময়ে ফিরে তাকাল সুপবিত্র। জবাব

তখনিই দিতে পারল না। সে রাতে পাগলামিই করেছিল। তবু আজকের চিত্রলেখার মুখে সে রাতের ওর মুখের আজগুবি কথাগুলো—তারা কি পাগলামি নয়? জানালার দিকে মুখ ফিরিয়েছে চিত্রলেখা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চোখের জল লুকোবার জন্যেই অন্ধকারে মুখ ঢাকল কি?

ওর দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু বলতে যাবে সুপবিত্র, হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সঙ্গে বিরাট এক্সপ্রেস ট্রেণ থমকে থেমে গেল। স্টেশন নয়, কে একজন মেয়ে লাইনে কাটা পড়েছে। কে জানে কে, তবু কেন কে জানে মনে হ'ল সুপবিত্রর, আর কেউ নয়—ট্রেণে কাটা পড়েছে চিত্রলেখাই যেন।

দেহাতী গানের দেশে

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

সারেঙ্গী বেজে চলল বিষাদের সুর তুলে। বনস্পতি শাখা আন্দোলিত করে সুর মেলাল সেই সুরে। উদাসী গায়ক তখনও একমনে রচনা করে চলে বিচ্ছেদের আলপনা। এইবার মুখ খোলে। অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে পড়ে কত না মধুমাখা দিনের কথা। সবই ত তার ছিল। কিন্তু আজ সে ভিখারী। কিন্তু কেন?

এই কেনর উত্তর কে দেবে? অলক্ষ্যে যদি কোন দেবতা থেকেই থাক তা হলে বল দেব, আমার এই হৃদয়-মন্দির লুঠ করে তোমার কি লাভ হ'ল? আমার এই হৃদয়-কমলকে হরণ করে নিয়েও কি তোমার এতটুকু লজ্জা হচ্ছে না? এমন যে সম্রাট সাজাহান-পত্নী মমতাজ তিনিও ত আজ মাত্র স্মৃতির গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর মুখ ত গেছে আজ হারিয়ে। আজ আর আমার সংসার বলেই বা কি আছে? কার সঙ্গেই বা হাসি-খেলায় দিন কাটাব বল। তোমাকে শোনাবার জন্য লক্ষ লক্ষ কথা আজ আমার বুকের মাঝে জড়ো হয়ে রয়েছে। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কার কাছেই বা আর সে সব কথা বলব বল?—

"মালিক তুঝে ক্যা মিলা
মেরি দুনিয়াকো লুট কর
ক্যা তুঝে কুছ ভি নেহি আতা হায় লাজ
মেরি খুশীকো ছিন কর
ভগবান নে দিল হায়
মেরা দিলকা তমন্না।

× × ×

এ ক্যায় কর দিয়া তুনে আরে
সংসারকে সিরতাজ
লাখে মুশীবাতে হায়
মেরে জানপর
আব ক্যায়সা বাতা হায় জিয়ে
বিন আপনে সংসাথ,
ভগবান মেরে দিল হায়
মেরা দিলকা তমন্না।"

পূর্ব্ববঙ্গের উদাসী সম্প্রদায় কিংবা উত্তরবঙ্গের বাউদিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা অনায়াসে কল্পনা করে নিতে পারেন বিহারের এই দরবেশ শ্রেণীর লোকদের এই ভাবসম্পদরে কথা। দরবেশরা জাতিতে মুসলমান বটে, কিন্তু এদের ধর্ম্মে কোন গোঁড়ামি নেই। বাঙলার বাউলের মতই তাদের সাধনার ক্ষেত্রও ব্যাপক। বাউলের ভাব-সাধনার সঙ্গে এদের গীতের তুলনা হয় না একথা ঠিক। কিন্তু বিহারের এই দরবেশ, সুফী কি সুরদাস-দের গান স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

সুরদাসেরা জাতিতে অধিকাংশই হিন্দু। কিন্তু এদের গানেও সেই উদার ভাবই লক্ষ্য করা যাবে। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করাই হ'ল এ সম্প্রদায়ের শেষ কথা। কিন্তু সেই ভগবান কোন মূর্ত্তির ভিতর আবদ্ধ নন। তিনি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। তাই ত সুরদাসকে গাইতে শোনা যায়, এই আলো বাতাস, এই সূর্য্য, চন্দ্র, এই যে নীল আকাশ, সবই ত আছে, কিন্তু আমার হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, তাঁর ঘরই বা কোথায়, দেশই বা কোথায়? ধরার বুকে এত সুখশান্তি বিরাজ করছে, কিন্তু আমার মনের শান্তি কোথায়? নববসন্তে পৃথিবী হাসছে নতুন দিনের সাড়া পেয়ে।

কিন্তু আমার হৃদয় কি শুধু শূন্যই থাকবে ? সে কি শুধু ব্যথার মালাই গেঁথে যাবে ?—

"জমি ভি ওহি হ্যায়, আশমান ভি ওহি হ্যায়
মগর আব উ দিলকি দুনিয়া কাঁহা হ্যায়।
ঘরভি ওহি হ্যায়, দরভি ওহি হ্যায়
মগর ও দিলকি খুশীয়া কাঁহা হ্যায়।
সুরজভি ওহি হ্যায়, চাঁদ ভি ওহি হ্যায়
মগর মেরি দিলকি আর সব কাঁহা হ্যায়
× × ×
খুশী আ গেই মেরি সারি দুনিয়া
রহে কি একেলা হাম চুড়ে এ সারি দুনিয়া।"

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে। উদাসী তার সারেঙ্গী থামিয়ে গাছতলায় বসে বিশ্রাম করে। দেশ থেকে দেশান্তরে খুঁজে বেড়ায় তার জীবনধনকে। কিন্তু খুঁজে কি সত্যিই পায় না তার প্রাণের প্রভুকে।

রাতের আঁধার গাঢ় হয়। সীমাহীন আঁধারের মাঝে তারায় ভরা আকাশের দিকে চেয়ে বিরহিণীর মনোমন্দিরে ফুটে ওঠে একখানা অতি পরিচিত মুখের ছবি। ছবিখানা ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে সমস্ত আকাশ, জগৎসংসার জুড়ে। সে যেন আর ধরতে পারে না তাঁকে তার সীমার মধ্যে। থেকে থেকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে মুনিয়া, অঝোর ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করে; তাঁর প্রিয়তমের উদ্দেশে—অতি সন্তর্পণে। যেন কেউ টের না পায়, যেন কারও ঘুম না ভেঙ্গে যায়—দেবতার উদ্দেশে আত্মনিবেদন করবার এই ত উপযুক্ত সময়। এই সময় ছাড়া আর কখন বলা সম্ভব, তুমি ত চলে গেছ বন্ধু, কিন্তু আমার শরীর যে বিকল হয়ে যাচ্ছে তোমার তরে, সে কি শুধু এই যাতনা সহ্য করবার জন্যই ? আমি তোমার সন্ধানে কত জায়গায়ই ত ঘুরলাম। ঘুরে দেখলাম পাহাড়-পর্ব্বত, দেখলাম জগৎ-সংসার। কিন্তু তোমায় ত কোথাও পেলাম না। দু'দিনের জন্য আমার জীবনে কেনই বা আবির্ভূত হলে, আর কেনই বা এত কথা বলে গেলে ? আমার এই ব্যথার মালিকা কার গলায়ই বা পরিয়ে দেব ? কার কাছেই বা প্রকাশ করব আমার মনের গোপন কথা ? বল বন্ধু, বল, আমার কি শুধু কান্নাই সম্বল হ'ল ?—

"তু গেই মেরা দিল জ্বালা
জল গিয়া শরীরা
ম্যায় দুনিয়া মে রহা গিয়া তেরা লাল।
ও জানে আলে তু গেই কাঁহা
তেরি মুনিয়া রো রো রো রো নীর বহাবে
ও জানে আলে তু গেই কাঁহা।
ম্যায় ত চু ডুহ পর্ব্বত নালে
চু ডুহ জগ সংসার,
ধারাত চুকুহ দর দর চুকুহ
কাঁহি ন পায় তেরি বিকাল
ও জানে আলে তু গেই কাঁহা।"

তাই ত বলি ওগো আমার প্রাণবঁধু, তুমি আমার জীবন-তরণীকে ডুবিয়ে দিয়ে কি ফল পেলে বল। কত নির্য্যাতনই ত সহ্য করলাম তোমার জন্যে; হয় ত এই কষ্ট, এই দুঃখ পাওয়াটাই ছিল আমার কপালের লিখন। তুমি আমার আনন্দকে হরণ করেছ, সংসারের সকল সুখ কেড়ে নিয়েছ, আমার বলতে যা কিছু ছিল সবই ত গেছে তোমার সঙ্গে সঙ্গে। তবে কেন এখনও এত যন্ত্রণা দাও :—

"মেরি নৈয়াকো ডুবালে আলে
মেরি নৈয়া ডুবাকে তুঝকো ক্যা মিলা ?
লখি উলফাতে হ্যায় মেরি নৈয়াকো ডুবমে সে
জিন্দগী ভি বরবাদ হ্যায়, ম্যায় ভি বরবাদ হু
মেরি কিসমৎ ভি বরবাদ হ্যায়
মেরি নৈয়াকো ডুবানেয়ালে।"

তামসী রজনীর শেষ হয়। ধীরে ধীরে জগৎসংসারের বুক থেকে মুছে যায় সেই একখানা অতি মধুর ছবি। সূর্য্যকরস্পর্শে মুদিত কমলিনীর মত বুজে আসে তার আঁখি-পাতা। জেগে ওঠে বিশ্বচরাচর। বিরহিণীর কথা চাপা পড়ে যায় সেখানে। জগৎ-সংসার চলে একই ভাবে, কোথাও এতটুকু ছেদ নেই, নেই তার কোন ব্যতিক্রম। দেশের পর দেশ, যোজনের পর যোজন পার হয়ে যায় উদাসী। সারেঙ্গীর সুরে সুর মিলিয়ে, নিজের মনের সবটুকু কথাকে উজাড় করে দিয়ে উদাসী গেয়ে চলে, তার চলার পথে নজরে পড়ে সংসারের কত না বিচিত্র ঘটনা।

সর্ব্বত্রই ত সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। গয়া জেলার এক অতি নগণ্য পল্লীর ভিতরও দেখা যায়—ছোট্ট বৌটি স্বামীর ঘর করতে এসেছে। পতি তার বিদেশে। পতির চিন্তায় হয় ত বা বাহ্যজ্ঞানশূন্যই হয়ে যায় বেচারী। তন্ময় হয়ে দূর পথের উপর চলমান গাড়ীর দিকে চেয়ে ভাবে, হয় ত ঐ রাঙা মাটির পথ ধরেই এগিয়ে আসবে তার 'প্রাণবঁধু'। কিন্তু তার এ স্বপ্নসৌধও ধূলিসাৎ হয়ে যায় যখনই শোনে শ্বশুরশাশুড়ীর গঞ্জনা, সহ্য করতে হয় তাকে দেওর-ননদের অত্যাচার। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করেও দূর-প্রবাসী স্বামীকে মনে মনে সম্বোধন করে বৌটি বলছে, হে আমার প্রাণবল্লভ, তুমি আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। কি যাতনায় যে ভুগছি আমি, তা ত তুমি জান না। যখন পাকা ইঁদারার কাছে জল আনতে যাই, তখন ননদী রাগের মাথায় আমার কলসী ত ফেলে দেয়ই, উপরন্তু ঠোক্‌নাও মারে। দেবরও বড় কম যায় না, বারান্দায় যদি বা কখনও একটু গেছি অমনি সে আমায় বকাবকি সুরু করে। সুতরাং তুমিই বল, এখন আমার উপায় কি ?—

"রাজাজী মেরি সেঁইয়াকো কর দেব বানা।২
যব সে আজনামে যাঁউ

দেওবা মোরে করে ঝাকাঝোরি
ননদ মোহে মারে তানা
রাজাজী মেরি নৈঁয়াকো কর ফের মানা।
পানীয়া ভরণে যাউ পাকাওয়া ইনারাওয়া পর
তাহি সময় ফেরিলে গাগরিয়া
ও রাজাজী মেরে সে ইয়াকো কর ফের মানা ॥"

হায় অভাগিনী! সে ত জানে না, সে যখন তার পতিদেবতার উদ্দেশে এই ভাবে আকুতি জানাচ্ছে, পতি তখন অনেক দূরে। তার কি আর মনে আছে ঘরের এই বালিকা-বধূর কথা। সে হয়ত তখন অন্য কারও সঙ্গে রঙ্গরসে মত্ত।

প্রাণবঁধুর উদ্দেশে দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে বিবাগী, তার বেশ-বাস হয়েছে অপূর্ব্ব। মাথায় রেখেছে দীর্ঘ জটা, গায়ে নেই বাড়তি পোশাক কিছু, সে এসে বসেছে এক গাছতলায় —দেখে মনে হয় মস্ত এক সন্ন্যাসী। লোক-কবি এবার একটু রসিকতা না করে পারলেন না। বললেন, কি বন্ধু, কার ভয়ে তুমি জটা রাখতে গেছ? কি কারণেই বা অনাবশ্যক ভাবে মুটিয়ে চলেছ, বিবাগী হয়ে ঘরসংসার ত্যাগ করে কাশীবাসীই বা হতে গেলে কেন? তুমি ত জান, দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র কি বলেছেন—'এ দুনিয়ায় কেউ বেকার থাকবে না। সুতরাং বন্ধু হে, পার্থিব সুখে ভুলে না থেকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা কর, তা হলেই ত মনে শান্তি পাবে:

"ক্যা ভয় তোম জট রাখায়ে
ক্যা ভয় তোম মোটেসে।
ক্যা ভয়ে কাশীকে বসবে
ক্যা বেণী সে লোটে সে।
ইস জগপর আয়কে গাফিল না রাইয়ে
দশরথওয়ালে ঢোতে সে।
মানত মুরখ ভোলে হাত
পাই মত রামকে সোটে সে।"

উদাসী মুখে কিছু বলে না, উর্দ্ধে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে স্মিত হাস্যে বলে, সবই ত উপরওয়ালার মর্জ্জি। তিনিই ত সবার মালিক। এ সংসারে যদি আমার বিনাশ ঘটাই তাঁর ইচ্ছা হয়ে থাকে ত তাই হোক, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। একদিন জীবনে যিনি সুখ দিয়েছেন, শান্তি দিয়েছেন, বেদনাও তিনিই দিয়েছেন। হাসি, খুশি, সুখ, দুঃখ এ সব ত তাঁরই দান। সুতরাং এ সবই যেন সমান ভাবেই গ্রহণ করতে পারি।

"ও মালিক তেরে সন্সার মে
বরবাদ হু বরবাদ রহেনে দে।
× × ×
একদিন দিয়া খুশী
একদিন দিয়া হাসি
একদিন রোনা হায় মেরি কিসমত মে
রোনে দে।
× × ×
হাসিখুশী, সুখী, দুঃখী
হাসনা রোনা, তুহু বানায়া
তুহি বানায়া এ সন্সার
ও মালিক তেরি সন্সার মে
বরবাদ হু, বরবাদ রহেনে দে…।"

আশ্বাস

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ঘুমায়ে পড়েছে ধরা। আমি একা জাগি'
লিখি আর লিখি শুধু,—কেন? কার লাগি'?
কাঁচমূল্যে চায় যারা কিনিতে কাঞ্চন
ফাঁকি দিয়া,—ওরে মূঢ় কবি অভাজন,—
লিখিস্ তাদেরি তরে! হায়রে কপাল!—
কে দিল আশ্বাস, "আছে নিরবধি কাল।"
দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালি নয়,—প্রাণের এ কথা
অতি সত্য, অতি সোজা—সূর্য্যালোক যথা
সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল! শুধু বাতুল-প্রলাপ
[illegible] —মর্ম্মব্যথা মর্ম্মের আলাপ
লাগিবে কি ভালো কারো? বিশ্বে কদাচন
মিলিবে কি সমধর্ম্মা অন্ততঃ দু'জন?
এ মধুর মায়ারাতি,—তবু আমি জাগি'
কথার মালিকা গাঁথি,—কেন? কার লাগি'?
অন্নহীন দুঃস্থ দেশ;—কবিতা-কূজন—
এ যেন উন্মাদসম অরণ্যে রোদন!
তবু ভাবি—কবিশিল্পী যত সে পাগল
আছে বলি' মরু নহে আজো ধরাতল!

বৈষ্ণব ভাবধারা ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
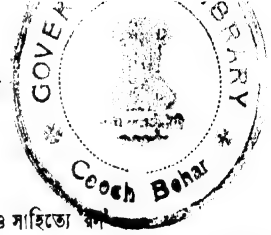
মহাকবির স্বরূপ ও দান

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কবি শব্দের বাচ্য শুধু কাব্য-রচয়িতা হিসাবে নন, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী দরদী মানুষ, ঋষি চেতনায় উদ্ভাসিতদৃষ্টি কবি, ভারতীর মালঞ্চের মালাকর, মানসমুকুল ফুটিয়ে তোলার বাউল, ভাগবত ভাবের বৈষ্ণব, প্রেমপন্থী মরমিয়া সাধক এবং তত্ত্বদর্শী আচার্য্য।

তিনি যুগন্ধর পুরুষ—জনগণমনের পথপ্রদর্শক নেতা, নিয়ন্তা এবং নায়ক।

গতানুগতিক বৈষ্ণবতাকে তার অচলায়তন প্রকোষ্ঠ-পরায়ণতা থেকে মুক্ত করে তিনি বিশ্ব-বৈষ্ণবতার উদার দৃষ্টি দান করে মানবতার মহাজাতির আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন।

ভাব থেকে রূপে, রূপ থেকে অরূপে এবং অরূপ থেকে অপরূপের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর জীবন-দর্শনের বিচিত্র বিস্ময়কর উপলব্ধি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে অনুভব করে সম্রাটের মত এই নিত্যকার দুঃখ-দৈন্য-হিংসা-দ্বেষ-পীড়িত বিশ্বের নরনারীকে দান করে গেছেন মুক্তি, শান্তি এবং প্রেম ও এই দানই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু তাঁর বৈষ্ণব ভাবধারা সম্বন্ধে কিছু বলতে চেষ্টা করব।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব

'বিষ্ণু' শব্দ বৈদিক যুগ হতেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে বিষ্ণু আরাধনার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যথা "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্" ইত্যাদি বিভিন্ন সূক্তে এবং ঋকে।

'বৈষ্ণব' শব্দের বাচ্যার্থ তিনি, যাঁর উপাস্য দেবতা হলেন 'বিষ্ণু'।

'বিষ্ণু' শব্দের ব্যুৎপত্তি নানাবিধ। "বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ"—অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী হয়ে যিনি আছেন। যাঁকে শ্রুতি বলেছেন "বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজঃ বিশ্বপাদাক্ষি নাসিকঃ"। অপর অর্থে "বেষতি (বিষ সেচনে—to sprinkle) সিঞ্চতি আপ্যায়তে বিশ্বম্" অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে নিজের রসে রসায়িত আপ্যায়িত করেন। আর এক অর্থ "বিষ্ণাতি ('বিষ' বিপ্রয়োগে বিযুক্ত বা পৃথক্‌করণে) বিষণক্তি ভক্তান্ মায়াপসারণেন সংসারাদিতি বা" অর্থাৎ মায়া অপসারণ করে সংসার থেকে ভক্তকে যিনি সরিয়ে দেন।

সুতরাং মৌলিক অর্থ ধরলে 'বিষ্ণু' ও 'ব্রহ্ম' সেই এক এবং অদ্বয় তত্ত্বকেই বুঝায়, শ্রীভাগবত যাঁকে উদ্দেশ করে বলেছেন :

> "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

দর্শনে ও সাহিত্যে রস

প্রশ্ন উঠবে এর সঙ্গে সাহিত্যের তথা কাব্যের সম্পর্ক কি? সম্পর্ক সনাতন এবং শাশ্বতিক।

কাব্যের কষ্টিপাথর হ'ল 'রস', কারণ "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। এই 'রস' অনির্ব্বচনীয়। কটু তিক্ত অম্ল মধুরাদি যেমন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, মনবুদ্ধির প্রতীতির বিষয়, কাব্যরস ততোধিক সূক্ষ্ম এবং অনির্ব্বচনীয়।

দেবর্ষি নারদ বলেছেন—"মূকাস্বাদনবৎ"। এই সাহিত্য-কাব্য এবং সঙ্গীতের রস "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ"—শ্রুতি বলেছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে"—"মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম" ইত্যাদি। মহাকবি বলেছেন—"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে, আমার সুরগুলি ছোঁয় চরণ আমি পাইনে তোমারে"—কারণ এই গানের সুর, প্রাণের প্রেম এবং কাব্যের রস এই সকলেরই মূল উৎস সেই 'রস'স্বরূপ।

শ্রুতি বলেছেন—'রসো বৈ সঃ' যে রস লাভ করলে "রসং হেবায়ং লব্ধ্বা নন্দীভবতি স্তব্ধীভবত্যমৃতী ভবতি"—জীব আনন্দিত হয় স্তব্ধ বা অভিভূত হয়, অমৃতত্ব লাভ করে। তিনিই মধুব্রহ্ম অমৃতব্রহ্ম আনন্দব্রহ্ম, তিনিই ভূমানন্দ বা অতিভূমানন্দস্ত (acme of joy), তিনি 'রসানাং রসতমঃ' (বৃহদারণ্যক) রসঘন আনন্দঘন। বৈষ্ণবের অভিধায় তিনি 'হরি'-'কৃষ্ণ'-'রাম'। 'হরি' অর্থাৎ, সকল মলিনতা হরণ করেন। 'কৃষ্ণ' কারণ তিনি সকল চিত্তাকর্ষক—'হরে সবার মন'। 'রাম' যেহেতু তাঁকে—মনোভিরামং বচোভিরামং···সদাভিরামং সততাভিরামম্' বলা হয়। তিনি আত্মারাম।

প্রেমে 'তুমি' ও 'আমি'

ক্রীশ্চান মিষ্টিকদের ভাষায় তিনি Dulce Amore বা Sweet Love—মুসলমান সুফীদের ভাষায় তিনি 'মুক' বা প্রেমাস্পদ, ভক্তকবি 'আসিক' বা প্রেমিক। তাঁর বাঁশী শুনে ব্রজগোপী বলেন—"শ্রীগোপেন্দ্র-সুতঃ স কর্ষতি বলাৎপঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে"। তাঁর আহ্বান শুনে ভক্তকবি বলেন—'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে'? বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী বলেন—'বাইগো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।' মহাকবিও সেই বাঁশী শুনেই বলেন—'সখি ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে না মনমাঝে।' তিনি 'সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকারী লীলা-কল্লোলবারিধিঃ'।

এই প্রেমের পরিণতি কোথায়? Browning বলেন, "All love assimilates the soul to what it loves."

ক্রীশ্চান মিষ্টিক যা বলেন Apotheosis বা Deification বা attainment of Divine Similitude বা Divine assimilation—গীতার 'মম সাধর্ম্ম্যম' আগতি বা প্রাপ্তি।

এই প্রাপ্তির ফলেই মহাকবি ঋষিপদবাচ্য হয়েছেন। তাঁর মধ্যে এবং কবির মধ্যে যেটুকু ব্যবধান সেটুকুর কথা কবির ভাষায় "আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দ পূর্ণিমা।" যখন সে ব্যবধানটুকুও থাকে না তখন—

"তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে"

এই 'তুমি', এই মহান্ 'তুমি', এই মহতো মহীয়ান 'তুমি', ইনি কবির 'আমি'কে চান কেন? কবিই তার উত্তর দিয়েছেন:

"আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে,
······তুমি তাই এসেছ নীচে।"

অবতরণ ও লীলা

এই 'নীচে'-আসাই অবতরণ এবং অবতারবাদের মূল সূত্র। এই প্রেম শুধু দয়া নয়, বরং বলব দয়াই নয়, কারণ দয়ার ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম এক নয়, এই প্রেমই তাঁর লীলা—তাই বেদান্তসূত্রে পাই "লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্" (২.১.৩৩) দয়ার ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যপ্রধান, প্রেমের ধর্ম্ম মাধুর্য্যময়। কবি তাই বলেছেন:

"তাই তো প্রভু হেথায় এলে নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।"

চরিতামৃত বলেন:

'ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান,
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান।'
এবং 'বৃহৎ বস্তু ব্রহ্মে কহি, শ্রীভগবান
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে বলছেন:

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর।

এই প্রেমে আগম আছে নিগম নাই। জীব আত্মনিবেদন করেও তবু লজ্জিত ভীত হয়ে পিছিয়ে আসে—"The self resists the pull······flees from the touch of Eternity and the Eternal seeks it, tracks it ruthlessly down" (—Underhill).

তাই দেখি "অঞ্চল ধরইতে চঞ্চল কান
রাই করল পদ আধ পয়ান।"

'দেবতাকে প্রিয় করা' এবং 'প্রিয়কে দেবতা করা'র কাজে—রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব কবি, বাংলার বাউল কবি, ক্রীশ্চান মিষ্টিক বা মরমিয়া কবি এবং মুসলমান সুফী সাধকেরা সকলেই সগোত্র। 'এক' এবং 'অদ্বৈত' তিনি—"ওয়াহিদাহু লা শরিক্"—বলেন মুসলমান।

শ্রীভগবান উত্তম পুরুষ বা গীতায় বর্ণিত 'পুরুষোত্তম'। কবি তাঁর প্রতীক্ষায়, পথিকবধূর মত, 'ব্রজসুন্দরস্য সখি! নূপুরধ্বনিং—নিশময্য সংভৃত-গভীর-সম্ভ্রমা,—ঈক্ষণোত্তরলা' হয়ে চেয়ে আছেন,

"আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম!
চাই যে বারে বার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।"

কখনও প্রগাঢ় প্রত্যয় বক্ষে আঁকড়ে বসে আছেন, দেখতে না পেলেও—

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।"

'মিষ্টিক' রবীন্দ্রনাথ

তাই যখন এই প্রসঙ্গে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়কে তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকায় বলতে শুনি—"মিষ্টিকের সাধনা ও রবীন্দ্রনাথের সাধনা এ দুয়ের কোথাও মিল নাই"(!) তখন মনে না করে পারি না যে, তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্যের 'ভূমিকা' থেকে ভূমিই সরে যাচ্ছে যেন! চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকারা তার বিচার করবেন, কারণ আমরা কবিগুরুর অন্তরলোকের এই অপরূপ দিকটাই দেখবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছি।

কোন আধুনিক সমালোচক গান্ধীজীর জীবন থেকে তাঁর আস্তিক্য বা ঈশ্বর সম্পর্ক বাদ দিয়ে যেমন গান্ধীজীর জীবন-বেদ দর্শন করতে চেষ্টা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী থেকে তাঁর মিষ্টিক দৃষ্টি, মরমিয়া সাধনা বা বৈষ্ণব ভাবধারা বাদ দিতে গেলেও ঠিক তেমনি হয়—'বিচেষ্টিতং তেহর্ভক চেষ্টিতং যথা'।

কবির পত্র ও জীবনী

বৈষ্ণব কবিতার প্রতি তাঁর অনুরাগ সম্বন্ধে কবি স্বয়ং একখানি পত্রে লিখেছেন, "আমার বয়স যখন তের-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ এবং আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব-পদাবলী পাঠ করেছি; তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করেছিলাম।" (রবীন্দ্র-জীবনী প্রভাত মুখোঃ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১) "আগাগোড়া গীত-গোবিন্দখানি তিনি নকল করিয়া লইয়াছিলেন"···"সংস্কৃতের শব্দলালিত্য রূপকল্পনা ছন্দ-মাধুর্য্য বাল্যবয়স হইতেই তাঁহাকে এই সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে।" (ঐ, পৃঃ ৭০)

তাঁর উড়িষ্যা ভ্রমণের প্রসঙ্গে পাই—"অন্তবার বরাবর আমার সঙ্গে বৈষ্ণব কবি এবং সংস্কৃত বই আনি, এবার আনিনি সে জন্য ঐ দুটোরই প্রয়োজন বেশী অনুভব হচ্ছে।" (ঐ, পৃঃ ২৭৮)

"রবীন্দ্রনাথের মতে যেখানে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিত ভাবে কাজ করে বা এক কথায় যেখানে আদত মানুষ আপনাকে প্রকাশ করে, সেখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়। পর্য্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে আর সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।" (ঐ পৃঃ ২৫২)

'সাধনা' পত্রিকায় চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়তত্ত্বের' প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি-তর্ক বলিষ্ঠভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহকারে বৈষ্ণব-দর্শনকেই প্রতিষ্ঠা করে। তিনি বলেন, "চন্দ্রনাথবাবু সগুণে নির্গুণে এমন একটা খিচুড়ী পাকাইয়া তুলিয়াছেন যাহা অভূতপূর্ব্ব। প্রথম কথা, ক্ষুদ্র অনুরাগ হইতে বৃহৎ অনুরাগ বুঝিতে পারি কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ হইতে নিরনুরাগের ক্রমবাহী যোগ কোথায় বুঝিতে পারি না।' দ্বিতীয় কথা, 'সৃষ্টি-কৌশলে'র মধ্যে 'বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা' দেখিয়া লয়প্রার্থী কি করিয়া ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'লীলা' কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? লীলা কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র প্রকাশ নহে? 'সৃষ্টি-কৌশল' জিনিসটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোনও যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে? সৌন্দর্য্যের একমাত্র কার্য্য...হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার করিয়া দেওয়া। যাঁহারা প্রেম-স্বরূপ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন; সৃষ্টির সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভাল-বাসেন এই সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াই যেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল আমাদিগকে অনেক নিয়মপাশে বাঁধিয়া, আমাদিগকে বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইতে চাহেন তাহা নহে, আমাদের মনোহরণের প্রতিও তাঁহার প্রয়াস আছে। এই বিশেষ সৌন্দর্য্যে তিনি আমাদিগকে বংশীস্বরে আহ্বান করিতেছেন, তিনি জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান।

বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণের রূপক এই বিশ্বসৌন্দর্য্যে এই প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দর্য্য বিরাট লয়প্রার্থীকে যে কি করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে 'মজাইতে' পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"...

"চন্দ্রনাথবাবু প্রমুখ শিক্ষিত সাহিত্যিকগণ ও 'বঙ্গবাসী'র লেখক-গণ বাংলাদেশে স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের প্রবর্ত্তক না হইয়া তাহার বিরোধী হইয়া উঠিতেছিলেন...দেশের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথবাবু উপলক্ষ্য মাত্র।" তিনি (রবীন্দ্রনাথ) একটি প্রবন্ধে বলিলেন, "যে জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে, তাহার বিশ্বাসের বল পাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলি অমূলক বিশ্বাস কিম্বা গোঁড়ামির কথা বলি না, কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি।"...সেই জন্য তিনি যুক্তির উপর জোর দিয়াছেন গুরুবাদের উপর নহে।

'আদিম সম্বল' প্রবন্ধটিতে তিনি বলিলেন যে, মানুষের যুক্তির পথ রুদ্ধ করিয়া, তাহাকে কলের মত চালাইয়া নির্বিরোধে কাজ আদায় করা যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের চরম সম্পদ মনুষ্যত্ব সেখানে লুপ্ত হইয়াছে। 'সেখানে চিন্তা, যুক্তি, আত্ম-কর্তৃত্ব এবং সেই সঙ্গে ভ্রম বিরোধ সংশয় প্রভৃতি মানবের ধর্ম্ম লোপ পাইয়া যাইবে, কেবল কলের ধর্ম্ম কাজ করা তাহাই চলিতে থাকিবে।' (সাধনা ১২৯১, আষাঢ় পৃঃ ১৮০) "কিন্তু নির্ভুল কল এবং ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয় তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনেক সময় সত্যের জন্ম হয়; কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাহির হয় না।" (রবীন্দ্র-জীবনী, পৃঃ ২৫৪-৫)

প্রেম ও প্রেমিক

দার্শনিক প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। আমাদের চোখে বৈষ্ণব কবিদের ভগবৎ প্রেম ক্রীশ্চান মিষ্টিকদের মরমিয়া প্রেম—মুসলমান সুফী প্রেমিকের প্রেম এবং মহাকবির 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যের এবং গীতি কবিতার অঞ্জলিতে গীতিভরা প্রেমের মধ্যে 'অমিল' অল্পই, মিল-ই বেশী। কারণ—

"শশীকো কুমুদন বহুৎ হ্যায়" কিন্তু "কুমুদনকো শশী এক"।

এই শশীকে বৈষ্ণব কবি বলেছেন মহাপ্রভুর মুখে—

"ব্রজেন্দ্রকুলদুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগৎ উজোর"। (চরিতামৃত)

এই 'কৃষ্ণ' কে 'কৃষ্ণ'ই বলুন 'খৃষ্ট'ই বলুন আর বৈজ্ঞানিকের ভাষায় 'X'-ই বলুন তাতে কিছুই আসে যায় না।

দেবর্ষি তাঁর ভক্তিসূত্রে এঁদের সম্বন্ধে বলেছেন:

"নাস্তি তেষু জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদি ভেদঃ"।

প্রেমভক্তিই বৈষ্ণব কবির পাথেয় এবং পথ, উপায় এবং উপেয় সাধনা এবং সিদ্ধির ফল। প্রেম স্বয়ংই ফলরূপ—

"স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ" (নারদ ভক্তিসূত্র)।

এই প্রেমই তাঁদের মোক্ষের পরেও পঞ্চম পুরুষার্থ।

"পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম আনন্দের সিন্ধু,—মোক্ষাদির আনন্দ তার নহে এক বিন্দু"। তাই ভাগবতকার 'প্রোজ্ঝিত কৈতব' বা সকল প্রকার কৈতব (কপটতা) বর্জ্জিত এই প্রেমধর্ম্মের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। 'প্রোজ্ঝিত কৈতব' শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেছেন, "প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি লক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ,—'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ, কেবলমীশ্বরারাধনালক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যত ইতি"।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রেমে 'কেন' 'কি হবে' এ সব প্রশ্ন থাকতেই পারে না, প্রেম আপনাতেই আপনি জবাবদিহি, প্রেম আপনি আপনার লক্ষ্য"। অশ্বিনীকুমার দত্ত ভক্তিযোগে উদ্ধৃত করেছেন সুপরিচিত গানের একটি কলি—"ভালবাসিবে বলে ভাল-বাসি নে...আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে"।

অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার বলেছেন, "আনন্দছন্দধৃত জীবনে

বন্ধন কোথায় যে মুক্তির জন্য হবে তার আস্পৃহা? প্রেম আনন্দ-স্বরূপ⋯বুদ্ধির সীমাকে অতিক্রম করে প্রেমের গতি। এই প্রেমের গতিতে দ্বৈত রূপান্তরিত হয় অদ্বৈতে, অদ্বৈত রূপান্তরিত হয় দ্বৈতে"। ('রবীন্দ্র স্মৃতি' 'পূর্ব্বাশা'-পত্রিকা পৃঃ ২৫)

এই প্রেমকে পাবার জন্য কোনও রহস্যাত্মক নিগ্রহপূর্ণ নৈষ্ঠিক বিধি-বিধানপূর্ণ তপস্যার প্রয়োজন হয় না, ধ্যান ইহার সহজাত তপস্যা। ইহার মূল্য সহজ এবং সুলভ হয়েও দুর্লভ। তাই আচার্য্যেরা বলেন,

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং কল্পকোটিসুকৃতৈ ন লভ্যতে।"

অর্থাৎ পাবার লালসা এবং চাইবার ঐকান্তিকতাই এর মূল্য। এই প্রেম ব্যতীত জীবনের একান্ত ব্যর্থতা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ তাই অনুযোগ করেছেন—

"যদি প্রেম দিলে না প্রাণে—
তবে কেন ভোরের হাওয়া ভরে দিলে গানে।"

আবার প্রাণে যখন প্রেমের স্পর্শ লাভ করলেন, তখন তিনি প্রেমিকার মত অনুযোগ করেছেন—

তবে, পরাণে ভালবাসা কেন বা দিলে রূপ না দিলে যদি বিধি হে
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?
* * যত গোপনে ভালবাসি পরাণভরি, পরাণভরি উঠে শোভাতে
যেমন কালো মেঘে অরুণ আলো লেগে মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।
* * তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহিনে তারে নীরবে থাকে তাই রসনা
মুখে সে চাহে যত নয়ন করি নত গোপনে মরে কত বাসনা।
'গুপ্তপ্রেম'।

প্রেমাস্পদ

ভক্তিসূত্রে নারদ বলেছেন "সা কস্মৈচিৎ পরম-প্রেমরূপা" অর্থাৎ নর বা নরোত্তম নির্ব্বিশেষে কাহারও প্রতি পরম প্রেমভাব। শাণ্ডিল্য বলেছেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। অর্থাৎ, "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা" (পঞ্চরাত্র)

রবীন্দ্রনাথ যেন নারদের সূত্রকে এনে শাণ্ডিল্যসূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন; 'প্রেয়'কে এনে 'শ্রেয়'কে সমর্পণ করেছেন যাতে "তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্ব প্রেমতৃষা"। 'কিম' শব্দের এই অনির্দ্দেশ্য উদ্দেশ রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছেন—বলেছেন:

"কে সে? জানি না কে, চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি তাঁরি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছেন 'অপরূপ' এবং সারাজীবন এই 'অপরূপকে দেখে' গেছেন 'দুটি নয়ন ভরে'। এই অপরূপকে কেউ বলেছেন 'শ্যাম' কেউ বা 'শ্যামা', এই সব ভিন্ন ভিন্ন অভিধা। সকল ভাষা মিলে গিয়েছে সেই এক সমুদ্রে—"সর্ব্বে বেদাযৎ পদমামনন্তি"—(শ্রুতি) কারণ "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" (শ্রুতি)

যদিও তিনি অনির্ব্বচনীয়—'ইদম্'-'এতদ্'-'এতাবৎ'-পদের অবিষয়, তথাপি যিনি কবি তিনি তাঁকে উপলব্ধি করে থাকেন—"তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম।" কৌতূহলী লোকের প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছেন:

কতো জনে এসে মোরে ডেকে কয়
'কে গো সে'—শুধায় তব পরিচয়
'কে গো সে'?
তখন কী কই নাহি আসে বাণী
আমি শুধু বলি 'কী জানি কী জানি'—
তুমি শুনে হাসো তারা দুষে মোরে
কী দোষে।"

তবু 'জানি না' বললেও সত্য বলা হয় না—তাই আবার বলেন:
তাই—'তোমায় 'জানি না চিনি না' একথা বলতো কেমনে বলি
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও খনে খনে যাও ছলি।
কখনো—'আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায় লখিতে'
কখনো—'বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছো চরণ চকিতে'
তাই হাল ছেড়ে দিয়ে কবি বললেন,

কাজ নাই তুমি যা খুসি তা করো
ধরা নাই দাও মোর মন হরো
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন পুলকি।"

কাম ও প্রেম

কাম ভোগাত্মক, প্রেম ত্যাগাত্মক। ভোগাত্মক কামকে যে চিন্তামণির প্রভায় এবং প্রভাবে ত্যাগাত্মক বিষ্ণুপদী-প্রবাহে পরিণত করে তাকে "নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব" (মহিম্ন স্তোত্র) অথবা "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে" (মুণ্ডক) মিলিয়ে দেওয়া যায়—সেই চিন্তামণিই প্রেম।

নরনারীর অন্তর্দ্দাহকারী ভোগতৃষ্ণা বা 'তহ্না'কে "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেমে" পরিণত করা এই প্রেমের মহিমময়ী শক্তি।

নারদ বলেছেন, "তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ং তস্মিন্নেব করণীয়ম্", রবীন্দ্রনাথ এই প্রেম-সূত্রকে নূতন ভাষ্যে উদ্ভাসিত করেছেন তাঁর অপরূপ "বৈষ্ণব কবিতায়":

"দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

এই প্রেমের সুধাধারায় নরনারী অমৃতত্ব লাভ করে।

এই প্রেম যুগপৎ রসায়নের উর্দ্ধপাতন (sublimation) এবং প্রাণিতত্ত্বের metamorphosis বা রূপপরিবর্তন। annihilation বা উচ্ছেদ নয়, transformation বা রূপান্তর —যেমন গুটিপোকা শূকদেহ থেকে প্রজাপতিদেহ লাভ করে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে— এই দেহমন ভূমানন্দময় হবে,—বাসনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে।"—'লয়' হওয়ার অর্থ ছড়িয়ে গিয়ে বিশ্বে এবং বিশ্বাত্মায় লীন হওয়া। অন্তর তখন অন্তরের সুখ-দুঃখে অভিভূত না হয়ে বিশ্বের সুখ-দুঃখ অন্তরে অনুভব করে। নিপীড়িত মানবের বেদনায় তখন কবির অন্তরের সহস্র নাড়ী পাক দিয়ে ওঠে। এই অনুভূতিই আইনষ্টাইনের 'Cosmic religious consciousness'।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

মহাকবির 'দুই পাখী' যেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "দ্বাসুপর্ণা"; সেখানে দেখি একটি পাখী স্বাদু পিপ্পল ফলটি বা বাইবেলের নিষিদ্ধ ফল (forbidden fruit)-টি ভোজন করে আর অপরটি 'অনশ্নন্ অভিচাবশীতি' না খেয়ে শুধু দেখেন সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে চেতা এবং সাক্ষীরূপে।

এখানে দেখি মুক্তাত্মা বনের পাখী ডাকছে দেহের সোনার খাঁচাটিতে আবদ্ধ জীবাত্মাকে। 'দোঁহার ভাষা দুই মত'—খাঁচার পাখী বনের গান জানে না, তাই খাঁচার পাখী বলে "খাঁচাটি পরিপাটি কেমন ঢাকা চারিধার," বনের পাখী বলে "আকাশ ঘন-নীল কোথাও বাধা নাহি তার"।

"এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে তবুও কাছে নাহি পায়
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে নীরবে চোখে চোখে চায়।"

মহাকবি একাধারে ঋষি এবং কবি, যেমন মহাত্মা গান্ধী একাধারে ঋষি এবং যোদ্ধা। উভয়েই কাব্যে এবং যুদ্ধে স্বাধীনতার নব জাগৃতির যুগশঙ্খ ধ্বনিত করেও, মানব অভীপ্সার শাশ্বত লক্ষ্য সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের অনুসরণ মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি। উভয়েরই 'জীবন' এবং 'বাণী'—'লাইফ' এবং 'ম্যাসেজ' কবিতায় মতই মিত্রাক্ষর। 'যা বলি তাই কর—যা করি তা করো না'— এ কথা বলবার অবকাশ নেই উভয়েরই জীবনে।

কবি তাঁর আত্ম-পরিচয়ে বলেছেন—

"আমার রচনার মধ্যে যদি কোনও ধর্ম্মতত্ত্ব থাকে ত সে হচ্ছে এই যে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই সেই ধর্ম্মবোধ। যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর এক-দিকে অদ্বৈত। একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন। এক-দিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে। যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে। যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে মানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।"

কবির উদ্ধৃত বাক্যে ভগবৎ প্রেমের এই যে যুগপৎ দ্বৈতাদ্বৈত উপলব্ধি এ যেন ভগবান শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের আক্ষরিক অনুবাদ—"ভেদং চিন্তয়িতুমশক্যত্বাৎ অভেদঃ—অভেদং চিন্তয়িতুমশক্যত্বাৎ ভেদঃ"। এই তত্ত্ব অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয়। আচার্য্য শঙ্করও স্বীকার করেছেন শ্রুতির উভয়মুখিতা, স্বীকার করেছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"—তবু তাঁর কল্পনার ঘুড়ি এক কানাচে ঝোঁক থাকার জন্য একদিকেই ঢলে পড়েছে। কিন্তু সে কথা এখানে বলবার স্থান নয়।

মহাপ্রভুর মুখে একদিকে পাই "কৃষ্ণ যদি কৃপা করি, কহে মোরে প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী অভিমান।" আর অন্যদিকে শ্রীরামানন্দের গানের সমর্থনে পাই— "না সো রমণ না হাম রমণী, দুহু মন মনোভব পেষল জানি।"

রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে পুরাণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের মুখে ঃ

"মমার্দ্ধাংশ স্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী" (ব্রহ্মবৈ)

অথবা "আত্মাতু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞঃ প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ"

শ্রুতি বলেন—

"স...একাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ, সোঽকাময়ত
জায়া মে স্যাৎ" অতঃপর "স হ এতাবান্ আস যথা
স্ত্রী পুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ, স ইমম্ এব আত্মানং দ্বেধা
অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচ অভবতাম।" (বৃহ ১।৪।৩)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্বটি কবি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন (১৩০২ অগ্রহায়ণ—'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৪৯ দ্রষ্টব্য), এই পত্রে দ্বৈতাদ্বৈত মতকে বৈষ্ণব ধর্ম্মমত বলিয়া প্রকাশ করেন। (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৮)

২

রবীন্দ্রকাব্যে 'তত্ত্ব' ও 'রস'

রবীন্দ্র-রচনা একদিকে যেমন অন্তর্গূঢ় ভাবগম্ভীর অন্যদিকে তেমনি বাক্যের এবং অর্থের সামঞ্জস্য সাধনে প্রতিভান্বিত প্রকাশ-মুখর—বিশ্বতোমুখী।

'হৃদয় যমুনা'য় কবি আহ্বান জানিয়েছেন—"নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ, ঢেকে দিব সব লাজ সুনীল জলে" —কিন্তু জীবনের আশা রেখে এস না—"যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে...স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর নীলনীর স্থির বিরাজে", "যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে, ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে"—কারণ এখানে কাজ নেই, লাজ নেই, ফিরে পাবার কিছু নাই।

এখানে 'look before you leap' নেই—you leap

and be lost for ever, এক মরণে মরে চিরদিনের মত অমর হওয়ার বাণী।

'ব্যর্থ যৌবন' কবিতাটিতে বৃথা অভিসারে এ যমুনা পারে আসার ব্যর্থতার নিঃশ্বাস সুস্পষ্ট।

'রবীন্দ্রজীবনী'কার বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মধ্যে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের বহু চিত্র ও পদাবলীর বহু শব্দ প্রায়শই দেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বহুদিনকার। কিন্তু এ আকর্ষণ তত্ত্বমূলক না রসমূলক, তাহার সুবিচার হওয়া প্রয়োজন।"

আমাদের বক্তব্য এই যে, যে রাজ্যে গিয়ে এই তত্ত্বের কথা এবং 'রসের' কথা উঠেছে সেখানে তত্ত্বই রস এবং রসই তত্ত্ব। সেখানে ভাবের ঘরে সদর মফস্বল নেই, bed-room drawing-room-এর প্রকোষ্ঠ ভাগ নেই; একটি কক্ষ, যবনিকার বালাই নেই, ধর্ম্মের চিহ্নে বা রক্তের সম্পর্কে আত্মীয়তা হয় না, শুধু এক সম্পর্ক "যে জনা গোবিন্দ ভজে সেই আমার প্রাণ রে।" এ ভজনা রসের ভজনা, মরমিয়া ভজনা, ঋজুতা বা আর্জ্জবম্ এর প্রাণ, কিন্তু বাঁকা পথেই এর গতি, তাই রসিক বলেন, "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।"

ভালবাসিবে বলে' ভালবাসি নে—
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত এই প্রেম।

মহাকবির ভাষায় শুনুন—

আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো
তোমা ছাড়া আর এ জীবনে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে আর কিছু নাহি চাই গো।

এ যেন মহাপ্রভুর উক্তির বঙ্গানুবাদ—

"পাদরতাং পিনষ্টু মাং" "মর্ম্মহতাং করোতু বা"
"যথা তথা বা বিদধাতু"—কিন্তু আমার 'তুমি ছাড়া আর কেহ নাই—কিছু নাই—"স এব নাপরঃ"।

গীতায় আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী ভক্তের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলছেন—

"ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী"—অর্থাৎ এই পরা ভক্তিই জ্ঞানের লক্ষণ বা পরিচয়।

প্রেমবিহঙ্গের দুটি ডানা, একটি জ্ঞান অপরটি ভক্তি।

বায়রণ বলেছেন—

"To 'know' her is to 'love' her
And love but her for ever
For Nature made her what she is
And never made another."

রক্ত-মাংসের পুত্তলিকার প্রতি এই আকর্ষণ, চিন্তামণির পায়ে বিল্বমঙ্গলের এই আত্মসমর্পণ, ইহাই পরিণত হয় তাঁর কৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম পংক্তিতে—

"চিন্তামণি র্জয়তি সোমগিরি র্গুরু র্মে।"

চিন্তামণির লৌকিক প্রেম, চিন্তামণির একটি রশ্মি পেয়ে, চিন্তামণির অলৌকিক প্রেমে পরিণত হয়,—তখন সে "নিকষিত হেম—কাম-গন্ধ নাহি তায়।" তখন অন্তরাত্মা আকুল হয়ে বলে—"যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।"

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ'—কিন্তু ঐ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলি ঐরূপ বাঁশীর ডাক শুনেই পরমাত্মা বা অন্তরাত্মার দিকে দৃক্‌পাত করে—বাঁশী শুনে—বাঁকা চোখে চায়—

"শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন নেল।"

রবীন্দ্র-রচনাতেও ঠিক তাই—

"সখি ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
বনমাঝে কি মনমাঝে।"

তাঁর বিরহিণী অন্তরাত্মা আক্ষেপ করে বলে—

"সখি—এত ভালবাসা প্রাণের পিয়াসা কেমনে আছে সে পাসরি
সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী সেথা কি বাজে না বাঁশরী?
হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন সেথা কি পবন বহে না—
সে যে তার কথা মোরে, কহে অনুখন,
মোর কথা তারে কহে না।
আমারে যদি সে ভুলিবে সজনি! আমারে ভুলালে কেন সে?
সারাটি জীবন করিব রোদন এই ছিল তার মানসে?"

দেবতা ও মানুষ

বৈষ্ণব-কবিতায় দেবতা ও মানুষ একান্ত সহজভাবে স্থানবিনিময় করেছে। যশোদা তাঁকে বেঁধেছেন,—রাখালরা—"কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপনা সেবন।" শ্রুতি বলেছেন, প্রিয় বলেই আত্মাকে উপাসনা করবে, কারণ তিনি "প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুষশ্চক্ষুঃ"। গীতায় তাঁকে গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, শরণ, সুহৃৎ প্রভৃতি সকল সম্পর্কে সম্পর্কিত করা হয়েছে। সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করে একমাত্র তাঁর শরণ নিতে বলা হয়েছে—ভক্ত নিত্যকার স্মরণে নিত্যই তাঁকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে থাকেন—"মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়ামি স্বাহা।" তাঁর সাধনার প্রথম কথা তৃণের চেয়ে সুনীচ এবং তরুর চেয়েও সহিষ্ণু হওয়া। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় কবির আত্ম-নিবেদন—

তোমার আসন তলে মাটির পরে লুটিয়ে রব
তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধুসর হব
সবার শেষে বাকী যা রয় তাহাই লব।

এই 'বাকী' গ্রহণ করাই বৈষ্ণবের প্রসাদ পাওয়া—ঈশোপনিষদের 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'।

গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতাতেও পাই এই বৈষ্ণব ভাব, কিন্তু ভাষায় এবং প্রকাশভঙ্গীতে, প্রাক্তন বাংলা ও সংস্কৃত উভয়

পদাবলীকেই তা অতিক্রম করেছে। আমার মাথা তোমার চরণ-ধূলার তলে নত কর; সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডোবাও—নিজেকে মান দিতে গিয়ে আমি নিজেকে কেবলই অপমান করছি, এবং নিজেকে কেন্দ্র করে নিজের চারিদিকেই ঘুরে মরছি। কথা কয়টি সহজ এবং সরল, কিন্তু "সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" এই সহজ কথা কয়টি এমন ভাবে বোধ হয় একমাত্র মহাকবিই প্রকাশ করতে পেরেছেন। তিনি ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা করেছেন, অব্যক্ত হতে ব্যক্তের পথে, তিনি অবলীলাক্রমে নিসর্গের গুপ্ত কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন, তিনি রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপ রতন আহরণ করে তাঁর দয়িতের গলায় মুক্তার মালা পরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আগমনীর জয়ধ্বনি করেছেন—

"ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়—
তিমির-বিদার-উদার অভ্যুদয় তোমারি হউক জয়।"

তাঁর পায়ের ধ্বনি অবিশ্বাসী অন্যমনস্ক আমরা শুনি নি বলে অনুযোগ করেছেন—

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে আসে আসে
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী সে যে আসে আসে আসে
গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে ক্ষ্যাপার মত
সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী।

ক্রীশ্চান মিষ্টিক বলেন,

"Our Lord says to every living soul, I become man for you. If you do not become God for me, you do me wrong."

তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, প্রাণের প্রাণ, চোখের চোখ।

Closer is He than breathing, nearer than our hands and feet.

বৈষ্ণব কবির—"হাতকি দরপণ, মাথকি ফুল আঁথ কি অঞ্জন মুখকি তাম্বুল। শীতের ওড়নি পিয়া, গিরিষির বা বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।"

ভক্ত তাঁর 'আমি'র—শেষ লেশটুকু রাখতে চান তাঁর প্রেম আস্বাদনের জন্য। তাই রামপ্রসাদ বলেছেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি'। রামকৃষ্ণ একে বলেছেন 'দাস' আমি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তোমায় আমায় প্রভু করে রাখি
আমার আমি সেইটুকু থাক বাকী।"

কবি কৃতার্থ হয়েছেন যখন ত্রিভুবনেশ্বর তাঁরই প্রেমের ভিক্ষায় হাত পেতেছেন।

"তাই ত তুমি রাজার রাজা হয়ে, তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছো কত মনোহরণ বেশে, প্রভু নিত্য আছ জাগি
তাই ত প্রভু হেথায় এলে নেমে, তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।"

দৈন্যে তিনি দীনের হতেও দীন হয়েছেন, তিনি জেনেছেন যে, তাঁর ঠাকুর কাঙ্গালের ঠাকুর তাঁর পূজার পীঠস্থান সবহারাদের মাঝে—"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন, সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে, সঙ্গী হয়ে আছ সেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে—

সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।

কবি কামনা করেছেন 'মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে'—তিনি বিশ্বাস করেছেন 'মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি 'সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'।

তিনি এসেছেন, "ধরণীর মহাতীর্থে এখানে সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা।"

চণ্ডিদাসের উপলব্ধিও অনুরূপ—'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

তাই প্রত্যেক পুরাণে এবং মহাভারতে নারায়ণের বন্দনা নর এবং নরোত্তমের বন্দনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ—

'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ'।

নর এবং নরোত্তম বলিতে বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্যে সাধারণ মানুষ এবং পুরুষোত্তম বা 'Best Man'কেই বোঝায়, এই উভয় সীমায় সীমিত মানুষের নারায়ণ। এই সীমা অতিক্রম করেও তিনি আছেন—শ্রুতি যেন মানুষের দীনশক্তিকে পরিহাসের ছলেই বলেছেন,

"যো লোকান্ সকলান্ ব্যাপ্য অত্যাতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্"

সকল লোক সকল সীমা—দেশকাল অতিক্রম করে তিনি দশ আঙুল বেড়ে আছেন। এ যেন "বুঝ জন যে জান সন্ধানে"র হেঁয়ালি। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ'—তাদের চিন্তার বিষয়ীভূত করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা।

কবির পরিচয়

কবি শুধু মানুষের কবি নন—সকলের কাছেই তাঁর এক পরিচয়

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরি লোক—
আর কিছু নয়—এই হোক শেষ পরিচয়।"

কিন্তু কবির পরিচয়ের 'শেষ' পাবার উপায় নেই—সুরু হয় নব নব পরিচয়—

"যে আমি স্বপন মুরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি *
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে?
* * কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে।"

তাঁর ভাষাতেই বলি 'তিনি জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্য্যে আপনাকে নির্ব্বিশেষে সর্ব্বলোকের উপরে বর্ষণ' করছেন। সে বর্ষণে অভিভূত হয়ে আমরা বলি—

"হায়! গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা?

ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি নে সেবা।"
বৈষ্ণবের মতই তিনি হরিনাম গান করেছেন—এবং করিয়েছেন—
'বাঁচান বাঁচি মারেন মরি বল ভাই ধন্য হরি।'
আপনাকে কবি যন্ত্রমাত্র মনে করে সেই যন্ত্রীর হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন—'আমারে কর তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে—।'
বলেছেন—'সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো—

এতদিন যে গেয়েছো গান, আজকে তারি হোক অবসান
এ যন্ত্র যে তোমার যন্ত্র সেই কথাটাই ভোলো—
একটি একটি কোরে তোমার পুরাণ তার খোলো।'

এই নূতন তারে নূতন সুর বেঁধে তোলাই তাঁর রূপান্তর গ্রহণ—মার্কণ্ডেয়ের নব জন্মলাভ—transformation, transmutation বা metamorphosis—আধ্যাত্মিক খোলস ছাড়া বা spiritual ecdysis.

নূতন বাঁধা সেতারে কবি গাইলেন শুধু 'তুমি' আর 'তুমি'—
কবীরের ভাষায়—'তু-তু করতে তু ভয়া তুঝমে রহা সমায়—'
গীতার উক্তি 'ততো মাং, তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।'
কবি গাইলেন—'তুমি আমার আপন তুমি আছ আমার কাছে
আমায় এই কথাটি বলতে দাওহে বলতে দাও—
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে—* *
* * আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।'
হে প্রকাশ স্বরূপ! তুমি নিজের প্রেমে নিজের দাক্ষিণ্যে আপনাকে প্রকাশিত কর—আবির্ভূত হও—'আবিরাবির্ম এধি।'
কবির প্রার্থনাও তাই 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে—
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে।'
সেই দৃষ্টি যখন চোখে লাগল তখন পরিপূর্ণ আনন্দে কবি গেয়ে উঠলেন, 'আলোয় আলোময় করে হে এলে আলোর আলো—'
তখন সকল আঁধার মিলাল, আনন্দে হাসিতে ভরা জগতের—
'যে দিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবই ভালো।'
অমৃতের পুত্র হয়ে লাভ করলেন মধুব্রহ্মের মধু।

প্লেটোর 'Beauty only and alone and separate and eternal' এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিলের 'Hedonism' বা সুখাভিলাষ-বাদ মিলে যায় 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর অনুধ্যানে।

বৈষ্ণবের দৈন্য, বিনয়, আকুতি, অনন্যমনতা-রূপ প্রেম,—হরিনামের জয়ধ্বনি সবই মহাকবির কবিতায় নূতন ভাবে এবং নূতন ভাষায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সে ভাষায় তিনিই স্রষ্টা, প্রবর্ত্তক এবং প্রচারক। সাহিত্যের নব যুগের নব জাতকের ভাষা। তাই বলা চলে যে, তিনি যেন পুকুর কেটে তার পরে তাতে স্নান করেছেন। এই ভাষা তিনি দান করেছেন আমাদের, এই ভাষাই—রেনেসাঁসের ভাষা। এই ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করল কবির কবিতায়—বৈষ্ণবের দিব্য প্রেম। 'যার এক বিন্দু জগৎ ডুবায়'—যার এক বিন্দু ভাষান্তরিত হয়ে পাশ্চাত্ত্য বিদগ্ধমণ্ডলীকে মুগ্ধ করল—কবি লাভ করলেন—

'শুক্ল কেশে বরমাল্য বরমা অম্লোবার'—অর্জ্জন করলেন নোবেল পুরস্কার, স্থাপন করলেন বঙ্গভারতীর সিংহাসন—বিশ্বভারতীর উচ্চতর মঞ্চে!

বিশ্ব-বৈষ্ণবতা

তিনি প্রচার করলেন উদার এবং ব্যাপকভাবে বৈষ্ণবতা। সব ঠাঁই তাঁর ঘর আছে এবং ঘরে ঘরে তাঁর পরমাত্মীয় আছে। 'ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি 'পরে—জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে।' উদার সার্ব্বভৌম প্রীতি এবং জগৎপিতা মহেশ্বরের প্রতীতি—যার ফলে অনুভূত হ'ল—'ভ্রাতরো মানবাঃ সর্ব্বে—স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।' গীতার 'সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।' 'ধুলার আসনে বসি ভুমারে দেখেছি ধ্যানচোখে আলোকের অতীত আলোকে—' সেই আলোকেই দেখেছেন—'One world spiritually aware and psychologically integrated.' শ্রীভাগবতও ঠিক এই কথাই বলেছেন—উত্তম ভক্তের লক্ষণে—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।

'আগুনের পরশমণি'

কাব্যে মিলনের চিত্র অপেক্ষা বিরহের চিত্র অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী। বিরহ ধ্যানগম্ভীর এবং বেদনার অগ্নিসংস্কারে পবিত্র এবং উজ্জ্বল। এই আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠার ছবি বৈষ্ণবকবি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এই অবস্থাকে "উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণঃ।" বিরহিণীর এই অবস্থায় "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন, "যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং শূন্যং মন্যে জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।" কালিদাসের যক্ষবধূর "আশাবন্ধঃ কুসুম সদৃশং" প্রাণটিকে কোনও রূপে দেহে সংলগ্ন করে রেখেছে। জয়দেবের বর্ণনায়—"পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে ···পশ্যতি তব পন্থানম্।"

রবীন্দ্রনাথের ছবি জয়দেবের অনুরূপ হলেও অপরূপ :—

"দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি
তাই চমকিত মন চকিত শ্রবণ তৃষিত আকুল আঁখি।
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, আশা হয় মনে যদি দেখা পাই
কে আসিছে বলে চমকিয়ে চাই কাননে ডাকিলে পাখী।"

কবি 'বৈরাগ্যসাধনের মুক্তি' বর্জ্জন করে অনুরাগকেই বরণ করে নিয়েছেন—

"মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া"

কিন্তু এই অনুরাগই বিরহে পরম বৈরাগ্যের রূপ ধারণ করে, তখন, "যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে" সব নিমেষে অন্তর্হিত হয়। তখন "অদর্শনে তব মনাক কা ধেনবঃ কে বয়ম্
কিং গোষ্ঠং কি মভীষ্টমিত্যচিরতঃ সর্ব্বং বিপর্য্যস্যতি।"

ওয়াশিংটনের ব্লেয়ার হাউসে পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু এবং প্রেসিডেণ্ট আই[illegible]হাওয়ার

ভারতে ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রদূত উ থান আউং কর্তৃক রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধির উপর পুষ্পমাল্য প্রদান

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীপদ্মজা নাইডুর সহিত চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী চো-এন-লাই এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী হো-লুঙ্

পুণা, ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে দলই লামা

ভানুসিংহের পদাবলীতে 'মরণ' কবিতায় বিরহিণী রাধা মৃত্যুকে যখন 'শ্যাম সমান' বলে বিরহিণীকে মৃত্যুরূপ অমৃত দান না করার জন্য তাকেও শ্যামের মত প্রিয় এবং শ্যামের মতই নিষ্ঠুর বলছেন :— তখন কবি তাঁকে বুঝিয়ে বলেছেন—

ভানুসিংহ কহে ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি
মাধব পহু মম পিয় সো মরণ সে
অব তুহু দেখ বিচারি।

কবীর প্রেমের রাজ্যে বিরহকেই সুলতান বা সম্রাট বলেছেন।

বিরহ বিনা তন শূন্য হ্যায় বিরহ হ্যায় সুলতান
যো ঘট বিরহ ন সঞ্চারে সো ঘট জনু মশান।

মহাকবি এই পরম বিরহে প্রশস্তিপাঠ করেছেন অননুকরণীয় ভাষায়—

এই করেছো ভালো নিঠুর এই করেছো ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি না যে
বজ্রে তোলো আগুন করে আমার যত কালো।

আগুনে দগ্ধ হলে যেমন অগ্নিতাপেই কিছু উপশম মেলে—তেমনি আবার কবি তাঁকেই প্রার্থনা করেছেন—

তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ লহ—
এবার তুমি ফিরো না হে হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ।

কত কলুষ কত ফাঁকি, এখনো যে আছে বাকী, মনের গোপনে আমায়—তার লাগি আর ফিরায়ো না, তারে আগুন দিয়ে দহ।— বারংবার দগ্ধ হয়েও কবি এই আগুনকেই আবার বরণ করেছেন— বলেছেন—

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন ধন্য কর এ জীবন পুণ্য কর পরশ দানে—
আমার এই দেহখানি তুলে ধর, তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর
নিশিদিন দহনশিখা জ্বলুক প্রাণে।"

এই অগ্নিসংস্কারই প্রেমের Baptism of Fire.

চরিতামৃতে পাই—

"বাহে বিষজ্বালা হয় অন্তরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত লক্ষণ"
"এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।"
"বিষামৃতে একত্র মিলন।" ইত্যাদি।

মীরা বলেন—

উপল বরষি গরজত তরজত গরজি ডারত কুলিশ কঠোর
চিত্তক চাতক জলদক তেজহি যাওত আনকি ওর?

মেঘ কুলিশ-করকা বর্ষণ করে, তাকে আহত কি নিহত করলেও চিত্তচাতক সেই মেঘ ছাড়া কি আর কাউকে চায়?

'পুরুষোত্তম' ও 'পুরুষ'

ভানুসিংহের পদাবলী মহাকবির বৈষ্ণব-কবিতায় প্রথম হাতে-খড়ি। তখনি তাঁর (গীতার) পুরুষোত্তমের প্রতি বৈষ্ণব ভাবানুরাগের প্রথম সঞ্চার হয়। মনে মনে প্রশ্ন ওঠে—হে অপরিকল্পিতপূর্ব্ব চিত্তচমৎকারকারী মূর্ত্তিমন্ত মাধুর্য্যস্বরূপ তুমি কে? কবির মুখেই শুনুন—

কো তুহু বোলবি মোয়?

হৃদয় মাহ মঝু জাগসি অনুখন আঁখ উপর তুহু রচলহি আসন
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম নিমিখ না অন্তর হোয়।
হৃদয়কমল তব চরণে টলমল, নয়নযুগল মম উছলে ছল ছল
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢল ঢল চাহে মিলাইতে তোয়।
বাঁশরী ধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে, হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে উতল প্রাণ উতরোয়।
গোপবধূ জন বিকশিত যৌবন, পুলকিত যমুনা মুকুলিত উপবন,
নীল নীর পর ধীর সমীরণ পুলকে প্রাণ মন খোয়—
কো তুহু বোলবি মোয়?

ইনি যেই হোন, যুগে যুগে পারঙ্গম ঋষিরা বলে গেছেন—'ইত্থম্ভূত' —রূপগুণবিশিষ্ট পুরুষ একবার অন্তরে প্রবেশ করলে আর অব্যাহতি নাই তার, আর মুক্তি (?) নাই তার সেই দস্যুর কবল থেকে।

মহাপ্রভু বলেছেন—

"কৃষ্ণের সে ডাকাতিয়া বক্ষ
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা সবার মনোবক্ষ
হরিদাসী করিবারে দক্ষ।"

অথবা—

"কৃষ্ণতনু যেন আম্র আঠা
নারীর মনে পশি যায় যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে সিয়াকুলের কাঁটা।"

কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে "কো তুহু", প্রশ্ন করার পরে এই পুরুষকেই তিনি পরিপূর্ণ যৌবনে 'জীবন দেবতা' রূপে দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করেন। তখন তাঁর সহজাত পৌরুষ ঐ পুরুষের সংস্পর্শে এসে আপন সত্তার পরিবর্ত্তন করছে, তাঁর sex sense ক্রমশঃ mystical sense-এ পরিণত হতে চলেছে। F. W. Newman বলেছেন—

"If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness, it must become woman,—yes however manly you may be among men."

এজন্তই নরোত্তমের প্রার্থনা 'ছাড়িয়া পুরুষদেহ কবে বা প্রকৃতি হব'। এই কথাই মীরা বলে পাঠিয়েছিলেন শ্রীরূপ গোস্বামীকে যখন তিনি রমণী বলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। মীরা বলেন,

"বৃন্দাবনে তো এক জনই পুরুষ আছে জানতাম—শ্রীরূপ কি আরও এক জন?" সেই এক পুরুষই পুরুষোত্তম। শ্রুতি তাঁকে বলেছেন, "ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" "দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্" "পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ'—তাঁকে ঘিরে তাঁর রাসমণ্ডল ঘিরে—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।' ইনি দশরথতনয় রাম বা বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ কিনা এ প্রশ্ন, দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে অনর্থক। এঁদের জন্ম-কর্ম দিব্য হলেও এঁরা মাটির দেহ প্রত্যেকেই মাটিতেই রেখে গেছেন। সার্থক কথা এই এবং দিব্য তত্ত্ব এই যে, রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-চৈতন্য না হলে এই পুরুষোত্তমের কোনও রূপ রস তত্ত্ব আমাদের বোধগম্য হ'ত না। তাই এঁরাই আমাদের yard-stick বা unit ধ্যান-ধারণার জন্য—সেই অসীম অনন্ত অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের। সকল রূপই তাঁর রূপ, সব কথাই তাঁর স্তোত্র, কারণ 'কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।'

মুসলমান সুফী সাধকের দৃষ্টিতেও দেখি ভগবান 'মাসুক' বা beloved—ভক্ত 'আসিক' বা lover, এই মধুর রসই শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস। তাই 'শৃঙ্গারঃ সাথ মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি।' পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।' ক্রীশ্চান মিষ্টিক এই সম্পর্কে বলেছেন—

এই প্রেমের আদান-প্রদান between Finite and the Infinite—সসীমের সঙ্গে অসীমের, একেই তাঁরা বলেছেন Divine Osmosis.

বৈষ্ণব কবি বলেছেন—'যদি হয় তার যোগ, না হয় কৈছে বিয়োগ'—নারদ বলেছেন, 'প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানম্' 'অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্'।

'জীবনদেবতা'য় দেখি কবি পূর্ব্বরাগ থেকে প্রিয়সঙ্গ লাভ করে অনুরাগের স্তরে উন্নীত হয়েছেন, সর্ব্বস্ব সমর্পণের পর দয়িতকে প্রশ্ন করছেন,

ওহে অন্তরতম

মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায় পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।*

* কি দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি?

তার পরে আবার নূতন করে আত্মনিবেদন করছেন,

'নূতন করিয়া লহ আর বার চির পুরাতন মোরে
নূতন বিবাহে বাঁধিয়া আমায় নবীন জীবন ডোরে।'

ক্রীশ্চান মিষ্টিকগণ একেই বলেছেন, Betrothal,—এই বিবাহে আত্যন্তিক বিচ্ছেদ নেই, সাময়িক বিরহ আছে। তাই ভক্ত বলেন,

'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না।'

শ্রীভাগবত বলেন,

'শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্।

'ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ।'

'যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া।'

অর্থাৎ, দেহের দূরত্ব বাড়লে মনের দূরত্ব কমবে, ধ্যান বাড়লে ভাব গাঢ় হবে বলে।

সুন্দরের সঙ্গ

বিরহের বেদনার পর প্রিয়সঙ্গ লাভ করে উৎফুল্ল হয়ে কবি বলেছেন,

'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর!
ধন্য হ'ল অঙ্গ মম পূর্ণ হ'ল অন্তর।'

কবি অভিনন্দিত করেছেন তাঁকে,

'আমার নয়ন ভুলানো এলে,
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে!'
'শিউলি তলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে,—

তিনি তাঁর অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে এসেছেন। আলোছায়ার সুষমায় সৌন্দর্যে তাঁর আবির্ভাব, বনদেবীর শঙ্খধ্বনিতে আকাশবীণার তারে বাজে তাঁর আগমনী। তাঁর সোনার নূপুর বেজেছে, তবু কবির সন্দেহ সে বাজনা বুঝি wishful thinking—'বুঝি আমার হিয়ার মাঝে' কিন্তু যখন সন্দেহ দূর হয়েছে, প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছে তখন বলেছেন, সাহস করে

'তোমায় মোরা করব বরণ, মুখের ঢাকা কর হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ দুহাত দিয়ে ফেল ঠেলে।

এই মিলন, এই সুন্দরের সঙ্গলাভ

'মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে অতি সুমধুর'
'মধুরং মধুরং মধুরং' 'মধুরং বা আনন্দং নন্দনাতীতম্।'

শ্রুতি বলেন,

'তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্
এবময়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন
বেদ নান্তরম্।' (বৃহঃ ৪।৩।২০-২১)

বিরহে কবি আবেদন জানিয়েছেন, 'বঁধু হে ফিরে এসো, আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিতে, হে নাথ ফিরে এসো, হে আমার নিতি-সুখ আমার চিরদুখ, হে আমার সব সুখ মন্থন ধন, আমার অন্তরে ফিরেএসো' বলে। তাঁর 'সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে' দিয়ে তাঁর ব্যথার পূজায় বারংবার অর্ঘ্যদান করেছেন।

বর্ষণমুখর শ্রাবণে তাঁর 'ক্ষণিকের অতিথি'র ক্ষণিক আবির্ভাবের পর গাইলেন,

'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।'

স্বপনের মত তাঁর আগমন, যেমন মিলিয়ে যাবার শঙ্কা জাগল, অমনি

'হে একা সখা হে প্রিয়তম রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপন-সম যেও না মোরে হেলায় ঠেলে।'

বলে মিনতি জানালেন। আশার চেয়ে আশঙ্কাই ত বেশী, কারণ তিনি স্বৈরচারী বহুবল্লভ। 'একশ্চরতি ক্ষেত্রেষু 'স্বৈরচারী' যথা সুখম'। সময় অসময়ের হিসাব নাই, তাই শুনি

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার!

যখন সেই স্বৈরচারী বন্ধু আড়াল দিয়ে চলে যান, বৈষ্ণব কবির ভাষায়

'আমারি বঁধুয়া, আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া'

তখন মিনতি করেন কবি,

'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না,
তুমি হৃদয়মাঝে লুকিয়ে বোসো কেউ জানবে না,
কেউ বলবে না।

তবুও যখন তিনি চলে যান, তখন তাঁরই দুঃখে গভীর বেদনায় কবি প্রশ্ন করেন,

'তুমি কাহার সন্ধানে,
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে!
এমন ব্যাকুল করে কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাসো?'

গিরীশচন্দ্রের গান মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে,

'কে বলে হরি রাজা, হরি প্রেমের ভিখারী
প্রেমের ভিক্ষা পায় না বলে চক্ষে বহে প্রেমের বারি।
ভিক্ষের ঝুলি ঝুলিয়ে কাঁধে, দাঁড়িয়ে দ্বারে হরি কাঁদে
হাসিমাখা বদনচাঁদে বিষাদরেখা সারি সারি।
প্রেম না পেলেও কাঁদে পেলেও কাঁদে
প্রেমেই পাগল প্রেমের হরি।'

মহাকবি প্রেমের অগ্নিদাহে গলিত কাঞ্চনের মত পবিত্র এবং উজ্জ্বল হয়েছেন, প্রেমের অমৃত পান করে অমর হয়েছেন, আমাদের যাত্রাপথে বিশ্বাসের পাথেয় দান করে গেছেন। বৈষ্ণব ভাবধারাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নূতন রূপদান করে, তাতে নূতন রসসঞ্চার করে তার শুষ্কপ্রায় শীর্ণ কায়ায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তিনি ধন্য হয়ে আমাদেরও ধন্য করে গেছেন:

'এই জ্যোতিসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই,
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলাম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে
পরশ যারে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই,
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

ব্রহ্মজ্ঞান

শ্রীঅরবিন্দ

অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত সেন

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্। সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।"

"ব্রহ্মবিৎ পরাৎপরকে লাভ করেন। এ বিষয়ে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম অনন্ত। যিনি হৃদয়গুহাতে নিহিত ব্রহ্মকে জানেন, জীবের অন্তরে শ্রেষ্ঠ আকাশে তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু উপভোগ করেন, সর্বজ্ঞানের আধার ব্রহ্মের সাহচর্যে।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ড, ব্রহ্মবল্লীর এই হ'ল প্রথম বাণী, পরম সত্যের বিশদ বর্ণনার আরম্ভ।

কিন্তু ব্রহ্ম কি?

অস্তিত্বের মধ্যে সবস্ত যা আছে, যাকে অবলম্বন করে আর সব বর্তমান থাকতে পারে—সেই ব্রহ্ম। সব অনিত্যের পশ্চাতে যা নিত্য, বাহ্য দৃশ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হলেও সর্বত্র সূচিত হয় যে স্থির সত্য, সব বিকারের আশ্রয় যে অব্যয়ের কোন হ্রাসবৃদ্ধি বিলোপ হয় না, আছে এমন এক অজ্ঞাত বস্তু। আর সেই জন্যই অস্তিত্ব হয় একটা সমস্যা, আমাদের আত্মা হয় রহস্যাবৃত, বিশ্ব হয় একটা হেঁয়ালি। আমাদের স্বভাবী-আত্মজ্ঞানে মনে হয় আমরা যা, আমরা যদি শুদ্ধমাত্র তাই হতাম তা হলে কোন রহস্য থাকত না; ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা এবং তার উপর নির্ভর করে বিচারবুদ্ধির কঠোর বিশ্লেষণের ফলে যা জানা যায় বিশ্ব যদি শুধু তাই হ'ত, তা হলে কোন হেঁয়ালি থাকত না; এখনকার মত জীবনযাপন করা এবং আমাদের অভিজ্ঞতার কাছে যতটা প্রকাশিত হয়েছে তাকেই বিশ্বের স্বরূপ বলে গ্রহণ করাই যদি হ'ত আমাদের জ্ঞান ও কর্মের বিকাশের চরম সীমা, তা হলে কোন সমস্যা থাকত না। আর থাকলেও, সে রহস্য গভীর হ'ত না, সে হেঁয়ালির সমাধান সহজ হ'ত, সে সমস্যা হ'ত বাল্যোচিত। কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু আছে আর সেই হ'ল অনন্তের প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞা, শাশ্বতের গোপন হৃদয়। সে-ই পরাৎপর এবং সেই পরাৎপরই

সর্বময় ; তাঁর উপরেও কেহ নাই, তা থেকে বিবিক্তও কিছু নাই। তাঁকে জানাই হ'ল পরাৎপরকে জানা এবং সেই পরাৎপরের জ্ঞানে বিশ্বকে জানা। কারণ, সবের আদি ও উদ্ভব সেই, আর সবই তার পরিণাম ; সবের আধার ও উপাদান সেই, সুতরাং তার রহস্যের জ্ঞানে অপর সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় ; সবের অন্ত ও সমষ্টি সেই, অতএব তাতেই এবং তার মধ্যে নিজেকে আহুতি দিয়েই প্রত্যেক অস্তিত্ব নিজের সার্থকতা লাভ করে।

এই হ'ল ব্রহ্ম।

এই অজ্ঞাত যদি শুধু নির্বিশেষ অনির্বচনীয়ই হতেন, তাকে যদি কখনই জানা না যেত, পর্দার বাইরে যদি তিনি কখনই পা না দিতেন, সে গোপন তত্ত্ব কখনই যদি আমাদের কাছে প্রকাশিত না হ'ত, তা হলে আমাদের রহস্য চিরকাল রহস্যই থাকত, আমাদের হেঁয়ালির উত্তর কখনই মিলত না, আমাদের সমস্যা গণনার মধ্যে আসত না। আমরা যা হই যা জানি ও যা করি সে সবই তাঁর দ্বারাই নির্ধারিত হয়, সত্য, তথাপি তাঁর অস্তিত্বে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কিছু এসে যেত না। কারণ, তা হলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হ'ত— অন্ধ অসহায় ভাবে তাঁর শাসন মেনে নেওয়া, আর সেই সম্বন্ধই অজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আমাদের আবদ্ধ করে রাখত এবং সেই অজ্ঞানের জন্যই সে সম্বন্ধ স্থায়ী হতে পারত। অপর পক্ষে আবার, কোন উপায়ে তাঁকে জানা গেলেও সে জ্ঞানের একমাত্র ফল যদি হ'ত আমাদের সত্তার অবসান বা বিলয় তা হলে আমাদের সত্তায় তার কোন ক্রিয়া হতে পারত না ; সে-জানার ব্যাপারে ও পরিণতিতেই সাধিত হ'ত এখন আমরা যা তার বিলয় বা অবসান, পূর্ণতা বা সার্থকতা নয়। আমাদের রহস্য, হেঁয়ালি বা সমস্যার সমাধান করা হ'ত না, রহিত করা হ'ত ; কারণ তার কোন উপাত্ত (data) থাকত না, বিচারের পূর্বপক্ষের লোপ হ'ত। ফলতঃ মানতে হ'ত যে, আমরা এখন যা তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিরোধ মীমাংসা করা অসম্ভব—অর্থাৎ, পরম কারণ ও তার কার্য্যের মধ্যে, আদিমূল ও তা থেকে জাত সব পদার্থের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। আর মনে করতে হ'ত যে, ব্রহ্ম যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যাদের আশ্রয় দিচ্ছেন এবং নিজের মধ্যে ফিরিয়ে নিচ্ছেন সে সবই তাঁর সত্তার একান্ত বিরোধী ও বিপরীত, এবং একমাত্র যাঁর অস্তিত্ব আছে স্বরূপে তাঁর সম্পূর্ণ ব্যতিরেকী হয়েও, কোন-না-কোন রকমে সে সবের একটা ভাবাত্মক অস্তিত্ব এসেছে। তা হলে চেতনাতে এ দুইয়ের একত্র অবস্থান সম্ভবপর হ'ত না, তিনি যদি তাঁকে জগৎকে জানতে দিতেন তা হলে জগতের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'ত।

কিন্তু ব্রহ্মকে জানা যায়। সীমার দ্বারা তিনি নিজেকে নিরূপিত করেন যাতে আমরা তাঁকে ধারণায় গ্রহণ করতে পারি, যাতে মানুষ মানুষ থেকেই এই বিশ্বে এবং এই দেহেই ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে।

ব্রহ্মজ্ঞান ক্রিয়াহীন আলোকমাত্র নয় যে শুধু বুদ্ধির কাছেই তার সংবাদ আসবে, কিন্তু ব্যষ্টির আত্মা বা জীবন তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। সে জ্ঞানের স্বরূপ হ'ল শক্তি, ভগবানের একটা নির্বন্ধ, পরিবর্তিত হতে বাধ্য করা। তা থেকে মানবজীবনে এমন একটা কিছু লাভ হয় যা চেতনায় আগে ছিল না। কি সে লাভ ? মানুষ এখন জানে কেবল-মাত্র তার সত্তার নিম্নতর স্তর, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা সে পায় তার উদ্ধতম সত্তাকে।

আর আমাদের সত্তার উর্দ্ধতম রূপ আমরা এখন যা তার ব্যতিরেক, বৈপরীত্য বা বিলোপ নয়। সে হ'ল আমাদের বর্তমান জীবনের যা তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সে সকলের চরম সার্থকতা—তবে সে সবের শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায় অনুসারে এবং চিরন্তন শ্রেয়ের মানদণ্ডে।

আত্মসংবিতের বর্তমান অবস্থাতে আমরা অজ্ঞানের মধ্যে বাস করি, অজ্ঞানে কাজ করি। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে, অজ্ঞান, কারণ এখন অবধি আমরা জানি শুধু আমাদের মধ্যে যা পরিবর্তনশীল, অবিরাম—ক্ষণে ক্ষণে, প্রহরে প্রহরে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, জন্মজন্মান্তরে যার বদল হচ্ছে ; আমাদের মধ্যে যা নিত্য তাকে আমরা জানি না। বিশ্ব সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞান, কারণ ঈশ্বরকে আমরা জানি না, সন্ধান রাখি বাহ্য প্রপঞ্চের সব নিয়মের, প্রকৃত অস্তিত্বের ধর্ম বা সত্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

আমাদের সবচেয়ে বিচক্ষণ বিবেচনায়, সবচেয়ে সূক্ষ্মদর্শী ও নির্ভুল বিজ্ঞানে, বিদ্যার সবচেয়ে বেশী সমর্থ প্রয়োগে অজ্ঞানের আবরণ বড়জোর একটু পাতলা হয়, কিন্তু অজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করা যাবে না—যতদিন আমরা মূল-তত্ত্বের জ্ঞানলাভ না করব এবং সে জ্ঞান যে-চেতনার প্রকৃতি-গত তাতে উপনীত হতে না পারব। বাকী যা তার উপযোগিতা আছে শুধু সাময়িক প্রয়োজনে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সবই নিষ্ফল, কারণ সে সমুদয়ের দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ লাভ করা যায় না বা অস্তিত্বের সমস্যার কোন স্থায়ী সামধান হয় না।

যে অজ্ঞানের মধ্যে আমরা বাস করি তা একেবারেই ভিত্তিহীন বা সর্বাঙ্গীণ মিথ্যা নয়। নিম্নতম অবস্থায় সে হ'ল কোন না কোন সত্যের বিকৃতি আর উর্দ্ধতম অবস্থায় হ'ল ক্ষুদ্রতর—এবং সেই পরিমাণে ভ্রান্তিজনক—পুরুষার্থের প্রয়োজনে বৃহত্তর সত্যকে খণ্ডিতরূপে প্রতিবিম্বিত করা যা

পরিবর্তিত করা। এই জ্ঞান শুধু বাহ্যস্তরেই সীমাবদ্ধ, অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্বের সন্ধান সে দেয় না, অথচ বাহ্যস্তরের সব প্রয়াসের উৎস হ'ল অন্তরে। সে জ্ঞান শুধু সসীম আপাত-দৃশ্যই জানে, কিন্তু সসীম যাঁর প্রতীক, আপাত যাঁর আভাস তাঁর সংবাদ আনে না। সে শুধু অস্তিত্বের নিম্নতর আকারের জ্ঞান, কিন্তু এই নিম্নতর সত্তা ও জীবনের উপরে যিনি আছেন এবং নিজের মহত্তম সম্ভাবনা বাস্তবে সাধন করতে যাঁর অভীপ্সা অন্তরে জাগিয়ে রাখতে হবে, তাঁকে তা পায় না। পরাৎপরের জ্ঞান অন্তরতমের জ্ঞান, অনন্তের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞ নিম্নতর বিশ্বকে দেখেন সেই পরাৎপরের আলোকে, বাহ্য উপরিচর পদার্থকে দেখেন আন্তর স্বরূপ-সত্যের রূপায়ণ বলে, সসীমকে দেখেন অসীমের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। অস্তিত্বকে তিনি দেখতে ও জানতে শেখেন—যেভাবে মননক্ষম প্রাণী দেখে ও জানে সে ভাব ছেড়ে, যেভাবে নিত্য-ব্রহ্ম দেখেন ও জানেন সেই ভাবে। সুতরাং তাঁর সত্তা হয় প্রফুল্ল, সমৃদ্ধ ও সুখোজ্জ্বল, জীবনে তিনি হন আপ্তকাম।

জ্ঞানেই জ্ঞানের শেষ নয়, শুধু জানবার উদ্দেশ্যেই জ্ঞান অনুসন্ধান ও অর্জন করা হয় না। জ্ঞানের উপযোগিতা পূর্ণ হয় যখন সে শুধু জানার চেয়ে বেশী কোন লাভের দিশা দিতে পারে, সত্তার কোন সম্পদ অর্জনের প্রেরণা জাগায়। ব্রহ্মকে জেনেও যদি বর্তমান জীবনধারার স্বভাবগত দুঃখ-বিরোধ-ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বাস করতে হয় তা হলে সে পঙ্গু নিঃস্ব জ্ঞানে লাভ কি ?

বৃহত্তর জ্ঞানে সত্তার বৃহত্তর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয় আর সে জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে অধিগত হলে, সে সব সম্ভাবনা বাস্তবে সিদ্ধ হয়। প্রথম ক্রিয়া হ'ল 'হওয়া', প্রথম ধাতু 'ভূ' ; তার মধ্যেই আর সব ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত—জ্ঞান-কর্ম-সৃষ্টি-উপভোগ সবই হওয়ার পরিপূর্ণতা বৈ নয়। আমাদের হওয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, তাই পুষ্টি আমরা চাই। সব জ্ঞান-কর্ম-সৃষ্টি-উপভোগের মধ্যে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হ'ল—যা আমাদের সত্তার প্রসার ও পুষ্টিবৃদ্ধি করতে এবং আমাদের সত্তাকে অনুভব করতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে।

শুধু থাকাই সত্তার সবটা নয়। সত্তা নিজেকে জানে শক্তি-চেতনা-আনন্দরূপে। মহত্তর সত্তা অর্থে মহত্তর শক্তি-চেতনা-আনন্দ।

মহত্তর সত্তার ফলে যদি আমরা শুধু আরও বেশী দুঃখ-কষ্টের ভাগী হতাম তা হলে সে লাভ নেবার মত হ'ত না। নেবার যোগ্য বললে তার অর্থ হয় যে, সত্তার প্রসার ফলে আত্মসার্থকতার বোধ বৃদ্ধি পায় আর তা থেকেই স্বতঃই অস্তিত্বের শক্তির বেশী তৃপ্তি আসে বলে এই প্রসার-উচ্চতা-শক্তির উপচয়বোধের মূল্য হিসাবে কিছু দুঃখের বৃদ্ধি বা দুঃখের হানি অনুচিত মনে হয় না। তবে সত্তার পরিপূর্ণতার বা আত্মসার্থকতার পরাকাষ্ঠা এ হতেই পারে না, কারণ দুঃখই হ'ল নিম্নতর সংস্থিতির অব্যভিচারী লক্ষণ। অস্তিত্বে প্রসার ও শক্তিতে সমগ্র সংসিদ্ধি লাভ হলে ঊর্দ্ধতম চেতনার সার্থকতা আসে বটে, কিন্তু পরিপূর্ণতার জন্য আনন্দের সমগ্র সংসিদ্ধি চাই।

ব্রহ্মজ্ঞ শুধু যে আলোর আনন্দেই তুষ্ট থাকেন তা নয়, সে জ্ঞানের ফলে তাঁর আর একটা বিরাট লাভ হয়। 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি'।

তিনি যা পান সে হ'ল সবের উপরে, সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ—তিনি লাভ করেন ঊর্দ্ধতম সত্তা ও চেতনা, সত্তার প্রসারের ও শক্তির পরাকাষ্ঠা, চরম আনন্দ। 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং।'

পরম সকল সম্বন্ধের অতীত নন বা নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন না। তিনি শুদ্ধ অনির্বচনীয় নন বা নিজের নির্বিশেষ-কৈবল্যের দ্বারা এমন একান্ত ভাবে সীমাবদ্ধ নন যে, বিচিত্র-রূপে নিজেকে সংজ্ঞা দিতে, সৃষ্টি করতে বা জানতে অপারগ হবেন। আত্মলীন সুষুপ্তি বা সমাধিতেও তিনি চিরকাল নিমগ্ন থাকেন না। পরাৎপরই অনন্তপুরুষ, সর্বময় বিরাট সে আনন্ত্যের অন্তর্ভুক্ত। পরাচেতনাতে যিনি উপনীত হন, তিনি সত্তাতে অনন্ত হন এবং নিজের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ধারণ করেন।

একথা পরিষ্কার বোঝাবার জন্য—উপনিষদে ব্রহ্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সত্য-জ্ঞান-অনন্ত এবং তাঁকে জানবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে অন্তরের গোপনকক্ষে, হৃদয়গুহাতে, আর সেই পরম ব্যোমে ব্রহ্মকে জানবার ফল বলা হয়েছে—ব্যষ্টি জীবের ঊর্দ্ধতম সত্তার উপলব্ধির দ্বারা সকল কামনার পরিতৃপ্তি।

নিত্যতাতে ও আনন্ত্যে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা আমাদের সত্তার ঊর্দ্ধতম অবস্থা ত বটেই, কিন্তু তা ছাড়াও আছে আত্মসংসিদ্ধির আনন্দে ব্রহ্মের সাহচর্য বা সাযুজ্য। 'অশ্নুতে সহ ব্রহ্মণা'—এবং ব্রহ্মের যে তত্ত্ব অবলম্বন করে এ সাযুজ্য সম্ভবপর হয় তা হ'ল তাঁর জ্ঞানের তত্ত্ব—যে প্রজ্ঞার দ্বারা তিনি সর্বলোকের সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে সম্যক্‌রূপে জানেন। 'ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা'।

বহুবিধ কামনার আকারে জীবনে আমরা যা এখন অনুসন্ধান করি সেই সকল অন্নতর পুরুষার্থের পূর্ণসংসিদ্ধির আধার হ'ল সত্তার আনন্দ। সে আনন্দের জন্য কি প্রয়োজন তা জানবার এবং বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণরূপে সে আনন্দ নেবার অনন্ত সামর্থ্য একমাত্র শাশ্বত পরম প্রজ্ঞারই আছে।*

* তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটি বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা।

পল্লীগীতিতে নারীর ব্যথা

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পল্লীগীতি প্রচলিত আছে। এসব পল্লীগীতি নানা বিষয় নিয়ে রচিত, তবে অধিকাংশ পল্লী-গীতিতেই গ্রামের বধূদের দুঃখ ও মর্ম্মবেদনার কাহিনী পাওয়া যায়। পূজাপার্ব্বণ, বিয়ে বা উৎসবে গ্রাম্য নারীরা নিজেদের রচিত এ সকল গীত গেয়ে উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এই সব পল্লীগীতি থেকে আমরা নানা দেশীয় সমাজচিত্র ও নারীদের প্রাণের নিবিড়তম অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হই। অধিকাংশ পল্লীগীতিতে বধূদের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখভরা কোমল হৃদয়ের চিত্র ফুটে উঠে, গীতিগুলির ব্যথা-বেদনাপূর্ণ সরল বাক্যগুলি কোন কোন স্থলে বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হয়।

শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতের সর্ব্বত্রই বধূরা চিরকাল ধরে গঞ্জনা পেয়ে আসছে শাশুড়ী-ননদের কাছ থেকে। পুরা-কালে পিতামাতারা অষ্টম বর্ষে কন্যাকে গৌরীদান করতে পারলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করত। যে যার যথাসাধ্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা কন্যাকে পাত্রস্থ করে বিদায় দিত, শ্বশুরবাড়ীতে---শাশুড়ী, ননদ, পাঁচ কুটুম বাদ্যভাণ্ডের ভিতর দিয়ে সমাদরে বধূবরণ করে নিত নিজগৃহে।

মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজপুতানা গুজরাট ইত্যাদি দেশের প্রথানুযায়ী সেই বালিকা বধূরা পনের ষোল বছরে পদার্পণ না করা পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে আনন্দে দিন কাটাত। "গৌনা" উৎসবের পর বধূরা তাদের শ্বশুরগৃহে সংসার করতে আসত নব উৎসাহে, পেছনে ফেলে আসত তাদের চিন্তাভাবনাহীন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের দিন। পিতামাতা ভাইবোনের বুকভরা ভালবাসায় সুরু হ'ত তাদের কর্ত্তব্যকঠিন দুঃখের জীবন। অবগুণ্ঠনের আড়ালে কঠোর তাড়নায় গঞ্জনায় অর্দ্ধবিকশিত হৃদয়-কমল শুকিয়ে যেত, অভাগিনীদের সুখ দুঃখ মান-অভিমানের দিকে কেউ দৃকপাতও করত না। স্বামীর প্রেমে ব্যথাকাতর হৃদয় সঞ্জীবিত করে তুলতে চাইত, তাও সহ্য হ'ত না, ননদিনীর ঈর্ষাজর্জ্জরিত হৃদয় সেখানে সৃষ্টি করত অনর্থ।

এ সব পল্লীগীতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, শুধু সুরের মাধুর্য্যেই সরল পংক্তিগুলোতে মন দ্রব হয়ে উঠে না, শাশুড়ী-ননদের হস্তে লাঞ্ছিতা বধূরাও যেন সজীব হয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। গীত শুনতে শুনতে দেখতে পাই—একটা কাক উড়ে এসে বধূর খাবারের থালা থেকে এক টুকরা মোটা বাজরার রুটি নিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে, তার পেছনে ছুটেছে রঙীন ঘাঘরা দুলিয়ে ফুলতোলা ওড়নার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে কিশোরী রাজপুত-বধূ, তার কোমল মুখ শুকিয়ে উঠেছে ক্ষুধাতৃষ্ণায়।

আবার দেখি উত্তরদেশীয় বধূ চলেছে গাগ্‌রি নিয়ে নদী থেকে জল আনতে, পায়ের নূপুর বাজছে রিণিঝিনি। গয়না-ভরা কচি হাত দিয়ে ঘড়া জলে ডুবিয়ে জল ভরতে গিয়ে সাপ দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছে, অবগুণ্ঠনের আড়ালে কিশোরী বধূর নয়নদুটি ভয়ার্ত্ত হয়ে উঠেছে, তবু তাকে জল নিতেই হবে নইলে শাশুড়ী-ননদিনীর অত্যাচারের সীমা থাকবে না।

মধ্যপ্রদেশের বধূ ঘাঘরা-ওড়নায় সুসজ্জিতা হয়ে, অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে শাশুড়ীকে বিনয়নম্র বচনে করুণ ভাবে মিনতি করছে, শাশুড়ী যেন আজ্ঞা দেন বধূ দোলনায় দুলবে, কাজরী গাইবে, কিন্তু নির্ম্মম শাশুড়ীর গম্ভীর "না" শব্দটিতে বধূ স্তব্ধ হয়ে রইল, পায়ের পায়েলের রুণুঝুনু থেমে গেল, কাজলটানা আঁখি জলে ভরে উঠল।

অলক্তকরঞ্জিত পায়ে, শাড়ীর লাল পাড়ে কোমল মুখ-খানা ঢেকে, কিশোরী বাঙালী বধূ চলেছে নদীতে জল আনতে, শাঁখাপরা কোমল হাত দু'খানি কাঁখের কলসীটিকে বেষ্টন করে ধরেছে। ধানের ক্ষেতের গা ঘেঁষে নদী ছুটে চলেছে এঁকে বেঁকে দূরে দূরে যেখানে বধূর বাপের গাঁ। পালতোলা নৌকা ছুটে চলেছে, বধূ অবগুণ্ঠন ঈষৎ তুলে চেয়ে দেখছে। কালো আঁখি দুটি সজল হয়ে উঠছে, ধীরে ধীরে অশ্রু ঝরে পড়ছে, কত দিন বধূ তাঁর বাপমাকে দেখতে পায় নি, শাশুড়ী-ননদের অত্যাচারে জর্জ্জরিতা বধূ নির্জ্জনে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল নদীতীরে।

"ও কুটালির বৈরণ, ভাটি গাঙ্গে যাওরে বইঠ্যা বাইয়া,
বড় ভাইরে কইও আমায় নাইহর নিতে আইয়া।"

নিরক্ষর গ্রাম্য কবিরা কি নিপুণ ভাবে নিতান্ত ঘরোয়া কথায় ফুটিয়ে তুলেছে নারীদের এই মর্ম্মবেদনা যার তুলনা নেই। এসব পল্লীগীতি উপেক্ষার বস্তু নয়। রাজস্থানের একটি পল্লীগীতির কাহিনী এই:

বধূকে শাশুড়ী একমন গম এনে দিয়েছে পিষতে, বধূ ত্যক্ত হয়ে সেই গমের থলেটা টেনে এনে জাঁতার উপর ফেলে দেয় যেন পিষবার কাঠটা ভেঙে যায়, তা দেখে

গোয়ালা হাসতে থাকে। বধূর সখীরা সব খেলা করতে চলে যায় বধূরও মন চলে সখীদের সঙ্গে, কিন্তু শাশুড়ী বধূকে রুটি বানাবার জন্য হুকুম দিয়েছে, শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেবর সবার জন্য হবে আটার রুটি আর বধূর জন্য বাজরার রুটি। সব পরিজনদের জন্য বরাদ্দ চার খানা করে আটার রুটি, আর বধূর জন্য বাজরার একটা মোটা রুটি। সবার থালায় পরিবেশন করা হ'ল চিনি, বধূর থালায় নুন। ঘিয়ে চুবিয়ে রুটি পড়ল, সবার থালায় ঘিয়ের বাটি দেওয়া হ'ল; বধূর থালায় দেওয়া হ'ল তেল। কিন্তু বধূর এমনই দুরদৃষ্ট এতখানি পরিশ্রমের পর যাও বা জুটল একখানা বাজরার রুটি, তাও একটা কাক উড়ে এসে নিয়ে গেল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর কিশোরী বধূ ঐ রুটির টুকরার জন্য কাকের পেছনে ছুটতে লাগল, বধূর পায়ে ফুটল করেলের কাঁটা, তখন ক্ষুধায় ও দুঃখে জর্জ্জরিতা বধূ নিরাশ হয়ে কাককে বললে:

"আয়ো আয়ো, মা পীবরিয়ো, রো, এ কাগ,
লেজ্জ্যা লেজ্জ্যা মহারে পীবরিয়ে বারে কাগ
জায় দিখায় মহারি নে জো।"

"ওরে কাক, আয় আয়, তুই এসে আমার মুখের ঐ রুটির টুকরাটা নিয়ে আমার মাকে দেখা আমি কি দশায় আছি।"

এই সরল গাথাটি কত মর্ম্মস্পর্শী, অসহায়া বধূর তীব্র মর্ম্মবেদনা ফুটিয়ে তুলেছে সুন্দর ভাবে, শ্রোতার হৃদয় লাঞ্ছিতা বধূর জন্য সমবেদনায় ভরে উঠে।

আর একটি পঞ্জাবী লোকগীতিতে আছে– বধূ লুচি ভাজবে, লুচিতে ময়ান দেবার জন্য শাশুড়ী ঘি দিয়েছে সামান্য একটু। ঘি কম হয়েছে এই কথা বলাতে শাশুড়ী বধূকে তীব্রভাবে গালি দিতে লাগল—তখন নিরুপায় হয়ে বধূ বলে, ওগো শাশুড়ী ঠাকরুণ আমাকে গালি দিও না, তোমার মহলের পাশে আমার মা দাঁড়িয়ে আছে, তোমার গালি শুনলে আমার মার চোখের জলে বুক ভিজে যাবে। মর্ম্মপীড়িতা বধূ তার মাকে বললে, "মাগো, তুই কাঁদিস নে, বধূজীবন যে বড় দুঃখের।"

"সস জো মৈনু অখিয়াঁ ঘিয়ো বিচ মৈদা গো
ঘিয়ো বিচ মৈদা থোড়া পেয়া
সস মৈনু গালিয়াঁ দে।
ন দে সস গালিয়াঁ, এথে মেরা কৌন সুনে
মহলাঁ হেঠ মেরী মাঁ খড়ী।
সুন সুন নয়না ভরে
নরো অম্বড়ী মেরএং ধীয়াঁ দে দুঃখ বুরে।"

বধূ-জীবন বড় দুঃখের, এ কথাটি ছাড়া মাকে সান্ত্বনা দিবার আর কি আছে অসহায় বধূর?

পিতৃগৃহ হতে বহুদূরে শ্বশুরবাড়ীতে অভাগিনী মাতৃহীনা কন্যা, দুঃখে কষ্টে তার দিন কাটে। তার মনের ব্যথা বুঝবার কেউ নাই, মনের দুঃখকষ্ট কার নিকট ব্যক্ত করবে, তাই সে আকুল হয়ে কাককে ডাকছে, কারণ কাক দেশ-দেশান্তরে উড়ে বেড়ায়। আশা হ'ল, হয়ত কাক তার মনের ব্যথা সুদূরে পিতৃগৃহে উড়ে গিয়ে বলবে:

"উড় উড় কাঁওয়াঁ উয়ে তেরিয়াঁ ছাঁওয়াঁ
মরজান মতইয়াঁ, উয়ে জুগ জীবন মাঁওয়া
মেরে বাবুল দিতিয়ো দূরে—
দূরে দূরে উয়ে সুন ধর্মী মীরা পরদেসিন বেঠী ঝুরে।'

কাক উড়ে যা, উড়ে যা—কন্যাদের মা যেন বহুদিন বেঁচে থাকে। আজ আমার মা নেই, আমার বাবা আমাকে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছে দূরে দূরে—বহুদূরে শ্বশুরগৃহে। আমি পরদেশী হয়ে গেছি। ওরে কাক আয় তুই আয়, তুই উড়ে যা যেখানে আমার ভাই আছে। গাছের ডালে বসে আমার স্নেহের ভাইকে বল—তোমার বোন সুদূরে বসে তোমার জন্যে চোখের জল ফেলছে।

এটি একটি সাধারণ পল্লীগীতি—কত করুণ নিষ্ঠুর সত্য লুকিয়ে আছে এর মাঝে।

নারীর জীবন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের। অধিকাংশ নারীর জীবন কাটে দুঃখ যাতনা অবহেলার ভিতর দিয়ে। পুত্রের জন্মে পরিজন আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে, পুত্রের মাতার ভাগ্যে আদরযত্ন জোটে, আর কন্যার জন্ম দিয়ে মাতা আরো নির্যাতিতা হয় শাশুড়ী-ননদ, এমনকি পতির তীব্র বাক্যবাণে।

সেকেলে সমাজে বন্ধ্যা নারী ও বিধবা নারীদের মর্য্যাদা সধবা ও পুত্রবতী নারীদের চেয়ে বহু নিম্নে ছিল। সন্তান-হীনা নারীদের এমনিতেই সন্তানের অভাবে মনে দুঃখের অন্ত থাকত না, তার উপর শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনা, স্বামীর অবহেলা অভাগিনীদের জীবন বিষময় করে তুলত। শাশুড়ী-ননদ পরিজনদের নিকট সমবেদনার বদলে তারা ব্যঙ্গোক্তি শুনত।

সাসু মোরী কইহৈ বঁঝিনিয়াঁ ননদ
ব্রজবাসিনী হো।
রামা জেকরি ম্যয়বারী বিয়াহী
ও ঘরসে তে নিকারই হো।

—"শাশুড়ী আমাকে বাঁঝা বলে, ননদ বলে ব্রজবাসিনী, যে আমাকে বিয়ে করে এনেছে সেও আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।"

বধূর দুঃখকষ্টের কাহিনীমূলক পল্লীগীতিতে শাশুড়ী-ননদের বধূনির্যাতনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখতে পাই।

আগরে কী গৈল মেঁ দোরাজা ভৈয়া জাত্তে,
ঠাঢ়ে রহিয়ো রাজা ভৈয়া এক সন্দেশো দেত্তে,
সাস ননদ মোয় বড়ো দুঃখ দেত্তী,
সাঁপিন কী কুড়রিন মোপে পনিয়া ভরাউত্তী,
কা কবৈঁ মোরে রাজা ভৈয়া চাঁদকো লেঁ খাত্তে।

অসহায় বালিকা-বধূ শাশুড়ী-ননদের নির্যাতন আর সহ্য করতে পারে না, কি করে মায়ের কাছে, ভাইয়ের কাছে খবর পাঠাবে বুঝতে পারে না, অবশেষে হতাশ হয়ে রাস্তা দিয়ে চলমান এক পথিককে দেখে ডেকে বলছে, "ও আমার রাজা ভাই, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, তুমি আমার হয়ে আমার ভাইয়ের কাছে মায়ের কাছে এক খবর দাও, আমার শাশুড়ী-ননদ আমাকে বড় কষ্ট দিচ্ছে। যেখানে সাপের গর্ত্ত আছে সেখান থেকে আমাকে জল আনতে পাঠায়।"

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে উত্তরপ্রদেশের কাজরী গানের একটি বড় করুণ কাহিনী আছে—

শিবু কোই চাকরী কো জাতু হৈ
মেরী মায় তুম কহো হম দুর জায়।

শিবু চাকরি করতে পরদেশে যাবে, মাকে বলছে—মা তুমি আজ্ঞা দাও আমি দূরদেশে যাই।

মা বলে, "বাবা তুমি যদি চাকরি করতে বিদেশে চলে যাও তবে নিজের স্ত্রীকে কি বুদ্ধি দিয়ে যাবে ?

স্ত্রী সামনে এসে বলে "প্রিয়তম, তুমি চাকরি করতে বিদেশে গেলে আমি কি করে থাকব ?"

উচে সে করিয়ো বৈঠকা মেরী ধনা
মেরী ধনা নীচে নয়ন করি লেউ
পোনী তো করিয়ো সহেলরী
মেরী ধনা চরখা মীত করি লেউ।

স্বামী উত্তর দিচ্ছে "প্রিয়ে ভাল ভাবে চলো, ভাল কাজ করো; নীচে দৃষ্টি রেখো, তুলো আনিয়ে সুতো কেটো—চরকাকে বন্ধু বানিয়ে নিয়ো।"

তখন স্ত্রী বললে, "প্রিয় তুমি চলে গেলে আমি কার সঙ্গে হাসব, কার সঙ্গে কথা বলব ?

"দেয়ালের সঙ্গে কথা বলো, রাস্তা তোমার উত্তর দেবে।"

"তুমি চাকরি করতে বিদেশে গেলে আমি কোথায় যাব ?"

"আমি পরদেশে গেলে ধনি, তুমি বাপের বাড়ী যেও।"

একথায় স্ত্রীর দু'চোখ জলে ভরে উঠল, করুণ স্বরে বলল, "প্রিয়তম আমার মা নেই, বাপ নেই, তুমি চলে গেলে আমি কোথায় যাব ?"

তখন স্বামী সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"প্রিয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের বাপ মা মনে করে নিও, দেওর জাকে নিজের ভাই বোনের মত দেখো।"

উল্টী তো গঙ্গা ন বহে
রাজা পিয়া উল্টে চলন ন হোঁ।

—শাশুড়ী-ননদ কষ্ট দেয়, তাই স্বামীর এ প্রবোধবাক্যে মাতৃপিতৃহীনা বধূর মন ভরে উঠল না, বললে, "প্রিয়, গঙ্গা ত উল্টো বয়ে চলে না, সংসারে এই উল্টো রীতি কি করে হবে ?"

এর পর স্ত্রীকে অনেক প্রবোধ দিয়ে স্বামী বিদেশে যাত্রা করল, কিন্তু যাত্রার সময় নানাবিধ বাধাবিঘ্ন পড়তে লাগল, হাঁচি দিল, সাপ রাস্তা কেটে চলে গেল, কাক ডেকে উঠল—স্বামীর মন একটা অমঙ্গল-আশঙ্কায় কেঁপে উঠল, কিন্তু স্ত্রী ভয় পাবে তাই মুখে কিছু প্রকাশ না করে স্বামী চলে গেল বিদেশে।

দিন কেটে যাচ্ছে, ঝুলনপূর্ণিমা এসেছে, সব সখীরা দোলনায় দুলছে, বধূরও ইচ্ছে হ'ল দোলনায় দুলবে। বধূ শাশুড়ীকে এসে বললে :

ছোটো মো দেবরা লাড়িলো
মেরী সাসু বানে ডরাই পছডোর।

—ওগো শাশুড়ী ঠাকরুণ, আমার ছোট দেওর কোথায় আছে তাকে খুঁজে আনি।

তখন বধূর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে শাশুড়ী বলল :

জো তুম মেরী বহু ঝুলন জাতি হো
মেরী বহু পীসনা পিসে ধরি জাউ
মেরী বহু রসোঈ তপে ধরি জাউ।

"ওগো বধূ, তুমি যদি ঝুলায় ঝুলতে চাও, তবে আটা পিষে রাখ, রান্না তৈরি করে রাখ, তবে দোলনায় দুলতে যেয়ো।"

বধূ উত্তর করলে :

পিসনা পীস চক্কী ধরা
রসোঈ বনাঈ চৌকা ধরী
নীর ভরি ঘিনৌচী ধরি দীনা
মেরী সাসু তুম কহো অবউঁর জায়েঁ।

"জাঁতায় আটা পিষে রেখেছি, রান্নাঘরে রান্না তৈরি করে রেখেছি, মটকা ভরে জল রেখেছি—ও আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ, এবার তুমি আজ্ঞা কর আমি ঝুলায় ঝুলতে যাই।"

বধূর কথায় শাশুড়ী চিন্তা করতে লাগল এখন কি করা যায়, বধূ ত সব গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করে রেখেছে, তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বললে, "যেতে হয় যাও, তবে ছোট ননদকে সঙ্গে নিয়ে যাও আর তোমার ছোট দেবর যদি জানতে

পারে যে, তুমি দোলনায় দুলতে গিয়েছ তবে তোমাকে মেরে ফেলবে।"

বধূকে তখন আর কে পায়, কিশোরী বধূ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ঝুলায় দোলবার জন্য ননদকে নিয়ে চলে গেল।

তার পর অসহায় বধূর কি শোচনীয় পরিণাম! বধূ আর ঘরে ফিরে এল না। শাশুড়ীর কাছে মৃত বধূর আত্মা এসে দেখা দিয়ে বললে :

এক পোথী ঝুলী, দুজী পোথী ঝুলী
মেরী সাসু তীজী কো ডারী হমমারি
খোদি বরিয় তন গাড়িয়ো মেরী সাসু
মেরী সাসু উপর জমি গঙ্গ দুব।

"এক বার ঝোলায় দুলেছি, দু'বার দুলেছি, তিন বার দোলবার সময়ও ওগো শাশুড়ী, দেবর এসে আমাকে মেরে ফেলেছে, বড় গাছের নীচে মাটি খুঁড়ে আমাকে পুতে ফেলেছে, সেই মাটির উপর এখন দুর্ব্বাঘাস গজিয়েছে।"

বধূর আত্মা শাশুড়ীকে দেখা দিয়েই সন্তুষ্ট হ'ল না, তার প্রবাসী স্বামীকে মধ্যরাত্রে স্বপ্নে বললে, "ওগো, প্রিয় তুমি শহরের চাকরি ছেড়ে দাও, তোমার ঘরদুয়ার দেখ, তোমার এক টাকার জন্য লাখ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

স্বপ্ন দেখে স্বামী সচকিত হয়ে জেগে উঠল, এক অমঙ্গল-আশঙ্কায় তার মন ভরে উঠল। ভোরের কিরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, স্বামী মনস্থির করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিজ দেশে ফিরে চলল। বাড়ী পৌছে মা ভাই বোন সবাইকে দেখতে পেল, দেখতে পেল না শুধু তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে। বললে, "মা সবাইকে ত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার স্ত্রীকে কেন দেখা যাচ্ছে না?"

মা মুখ ফিরিয়ে বললে, "তোর বৌ ঝুলায় দুলতে গেছে এখনও ফিরে আসে নি।"

ছেলে বললে, "আমি গাছে ঝুলায়ও দেখে এসেছি, কৈ সে ত নেই মা সেখানে।"

তখন মা আর কি করে, বাধ্য হয়ে সত্য কথা বললে, "তোর বউ দোলনায় দুলতে গিয়েছিল, তোর ছোট ভাই তাকে মেরে গাছের নীচে পুঁতে ফেলেছে, সেখানে এখন দুর্ব্বা গজিয়েছে।"

দুঃখে ক্ষোভে অনুতাপে ছেলের মন ভরে উঠল, মাকে বলল, "মা তুমি কেন আমাকে ছলনা করলে, প্রথমেই কেন একথা বললে মা? আমার কাপড় এনে দাও, লোটা কম্বল এনে দাও, আমি যোগী হয়ে চলে যাব, আমার দুঃখিনী রাণী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আমি আর কি নিয়ে সংসারে থাকব, আমার রঙ্গমহলের চাকরি এখানেই শেষ, আমি আর সংসারে থাকব না।"

ইতনে তো ছলবল তুম করে
মেরী মাঈ তব তেঁ দেতী বতায়।
ল্যাও হমারে কাপড়ে ভৈয়া
ল্যাও পাঁচো হথিয়ার
মেরী মৈয়া জোগী হৈবে রমি জাঁয়
রনিয়া দুখিয়া চল বসী
মৈয়া ছোড় হমারী সঙ্গ
হমউঁর ছোড়ি চলে ঘর বার
ধুঔঁনী হো লেহহেঁ রমায়
রঙ্গমহল কী চাকরী।

এসব কাজরী গীত বহুপূর্ব্বে রচিত, কিন্তু সেগুলি এখনও বছরের পর বছর নারীদের মুখে মুখে গীত হয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। যুগ উল্টে গেছে, সমাজের হাওয়া বদলেছে। আজকাল একান্নবর্ত্তী পরিবার বড় একটা দেখা যায় না, একেবারে বালিকা-বয়সে কন্যাদের বিয়ে কম হয়, সেজন্য বহু সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত হয়েছে। বর্ত্তমান সমাজেও অনেক অন্যায় অত্যাচার আছে, কিন্তু আজকাল কন্যার জন্মে গৃহে বিষাদের ছায়া নামে না, কন্যার জন্ম দিয়ে মাতা লাঞ্ছিতা হয় না, বন্ধ্যা নারী স্বামীপরিত্যক্তা হয় না।

শহরের, এমনকি গ্রামের জীবনধারাও বদলে গেছে। কিন্তু এসব পল্লীগীতি পুরনো হয় নি। এখনও বছরের পর বছর রাজপুতানা, গুজরাট উত্তর হিন্দুস্থান ও মধ্য-প্রদেশের নারীরা এসব করুণ পল্লীগীতি গেয়ে শ্রোতার হৃদয় ব্যথায় ভরে তোলে।

দক্ষিণ দেশে

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

(৩)

রাত্রি শেষ হয়ে বেলা যত বাড়ে কামরায় যাত্রীর ভিড়ও বাড়ে তত, কিন্তু ঠেলাঠেলি বা হট্টগোল নেই। আমরা কেউ কারও ভাষা বুঝি না, কিন্তু উভয় পক্ষেই পরস্পরকে জানবার কৌতূহল। মনে হতে লাগল একটা সার্ব্বজনীন ভাষা যদি থাকত! অনুমানে বুঝতে পারছি, তাদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রমিক, চলেছে শিল্পপ্রধান শহর—মাদুরাইয়ে! মাদুরাই মাদ্রাজ-রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। তারাও বুঝছে, আমরা বিদেশী, কিন্তু কোন্ দেশবাসী আন্দাজ করতে পারছে না। পরিশেষে একজন, ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। ইংরেজ আমাদের দেশ ত্যাগ করেছে, কিন্তু মনের অধিকার এখনও ছাড়ে নি, আমরাও তা হতে দিচ্ছি না! মাদ্রাজ থেকে আসবার পথে অনেক ষ্টেশনের নাম-ফলকে হিন্দী নামের উপর হিন্দী-বিরোধী অভিযানের কলঙ্কচিহ্ন দেখেছিলাম। এ অঞ্চলে নগরে, বিশেষতঃ গ্রামে বহু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর বাস। তার উপর এ হ'ল দাক্ষিণাত্য—যার সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের অপ্রীতি অতি প্রাচীন, কাজেই উত্তরের একটি ভাষার পক্ষে এখানে সার্ব্বজনীন আসন লাভ সহজ নয়। অতঃপর ইংরেজের ভাষার মাধ্যমেই আমাদের মাঝে মাঝে আলাপ চলতে লাগল। মানুষগুলিকে লাগলও বেশ। যেমন সাধারণ তাদের পোশাক, তেমনি সাদাসিধে তাদের আচরণ। অধিকাংশেরই পা খালি এবং শরীর বেশ মজবুত।

বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। দূরে ছোট ছোট পাহাড় ও তার দু'একটির উপর সাদা রঙের বাড়ি-ঘর রৌদ্রে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। যাত্রীদের একজন বললে, "ঐ পাহাড়ের ওধারে মাদুরাই শহর।"

মাসখানেক আগে দক্ষিণের এই সকল অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে যায়। রেলপথের দু'পাশের দৃশ্য তাই করুণ। শস্যক্ষেত, কলাবাগান, তরুশ্রেণী রিক্ত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন। জায়গায় জায়গায় অহেতুক জলাশয়। তবে শীতকালে করমণ্ডল উপকূলে বৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা রৌদ্রে-গ্রীষ্মে ক্লিষ্ট হলেও সে অবধি কোথাও বর্ষণে বিব্রত হই নি।

অবশেষে আমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত মাদুরাইয়ে গাড়ি পৌঁছাল—অনেক বড় ষ্টেশন, অনেকগুলি প্ল্যাটফরম, গাড়িরও অবিরাম যাতায়াত। কোথায় আশ্রয় নেব কিছুই ঠিক ছিল না। কুলিই বললে, "কাছেই মারোয়াড়ী ধর্ম্মশালা।" সঙ্কল্প করেছিলাম, নিজের মোট নিজেই বইব। কারণ, শরীর ও কাজে তেমন পটু না হলেও অর্থ-সামর্থ্যে ছিলাম আরও দুর্ব্বল। তার উপর, রেল ষ্টেশনের কুলি সর্ব্বত্রই সমান। তাদের কবলে যাতে পড়তে না হয় সেজন্যে সতর্কতা অবলম্বন দরকার। কিন্তু ষ্টেশনের বাইরে এসে সম্মুখীন হলাম একদল কিশোর ও প্রৌঢ়ের। তারা কুলিও নয়, ভিখারীও নয়। আমার মোট দুটোর দিকে হাত বাড়িয়ে হিন্দী, ইংরেজী ও তামিলে যা বলতে লাগল তার মোদ্দা কথাটি এই বুঝলাম, "বোঝা আমায় দাও। আর দিও 'টু আনা'।" 'টু আনা' স্বচ্ছন্দে ব্যয়ের ক্ষমতা আমার মত 'শেঠে'রও আছে এবং চলেছিলামও আর এক শেঠের লক্ষ টাকায় গড়া কুঠিতে। তাই বোঝা দুটি এক জনকে দিয়ে হাল্কা হয়ে চললাম। মনে পড়ল, রামেশ্বরমের ষ্টেশনের বাইরেও একজন চেয়েছিল 'টু আনা'। সেদিন রাত্রেও একজন ভারবহনের পারিশ্রমিকস্বরূপ প্রার্থনা করে 'টু আনা'। অতঃপর আরও দক্ষিণে টিনেভেলি ষ্টেশনের বাইরেও শুনি ঐ পরিমাণ মুদ্রার আবেদন। জানি না, ঐটেই এদিকে ন্যূনতম পারিশ্রমিক অথবা একখানি ইডলি বা ধোসার ও সেই সঙ্গে একটু কলাইয়ের দাল কিংবা রসমের মূল্য বলে তারা ঐরূপ প্রার্থনা করেছিল কিনা।

পরিচ্ছন্ন রাজপথের ধারে পরিচ্ছন্ন ধর্ম্মশালাটি। তার একটি লম্বা নামও আছে। কিন্তু স্থানীয় লোকে তা ভুলে গিয়ে কেবল বলে, 'মারোয়াড়ী ধর্ম্মশালা'। আমিও নামটি ভুলে গেছি। সেখানে আমরা ছ'জন মানুষের জন্যে মাত্র দু'জন থাকবার মত একখানি কুঠরি পাওয়া গেল। অপ্রসন্ন মনে ক্লান্ত দেহ সকলে উঠে বারান্দা দিয়ে সেদিকে যেতে যেতে দেখি, কলকাতার এক কলেজের অধ্যাপক—সপরিবারে একখানি বেশ বড় ঘর জুড়ে আছেন তাঁরা। আর, তাঁর পাশের ঘরেই রয়েছেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বস্ত মহাশয়। তিনিও ছিলেন সপরিবারে। তাঁরাও মাদ্রাজের বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধি। তবে কলকাতার অধ্যাপক মহাশয় ফিরছিলেন উত্তরে, আর তিনি যাচ্ছিলেন দক্ষিণে। আসা-যাওয়ার পথে এখানে তাঁদের দেখা। আবার, আমরাও গিয়ে জুটলাম। তবে গুলজারের আর অবসর হ'ল না। স্নান সেরেই চললাম মন্দিরের দিকে। সঙ্গে গাইড জুটল। লোকটি নির্ভয়ে ইংরেজী বলে। হিন্দীও বেশ শিখেছে। আর তামিল ত তার মাতৃভাষা। বললে, 'মিঃ, খাবারের ভাবনা কি? পথের ধারে অনেক কফিখানা আর হোটেল পাবে।" খাবারের ভাবনা আমাদের কোথাও ছিল না। এ বিষয়ে আমরা হয়ে গিয়েছিলাম, তামিলদেশীয়। জানতাম, যতক্ষণ ট্যাকে আছেন চিন্তামণি ততক্ষণ চিনি না হলেও গুড়ের যোগান পাওয়া যাবেই।

মিনিট আট-দশ হাঁটবার পর মীনাক্ষীর সুবিশাল মন্দিরের পশ্চিম গোপুরমে পৌঁছলাম। মন্দিরটির চারদিকে চারটি গোপুরম আকাশের দিকে উঠে গেছে। সেগুলির গায়ে নানা রকমের মূর্ত্তি।

মন্দিরটি ঘিরে পর পর দুটি সু-উচ্চ প্রাচীর। বাইরের ও ভিতরের প্রাচীরের মধ্যে সুপ্রশস্ত চাতাল। সবই পাথরের। প্রাচীরের শীতল ছায়ায় শুয়ে বা বসে ক্লান্তি দূর করছে যাত্রী ও ভিখারীর দল। শোনা ছিল, উত্তর গোপুরমের গায়ে দুটি পাথরের স্তম্ভে আঘাত করলে

মাদুরাই—মীনাক্ষী মন্দিরের পশ্চিম গোপুরম

মধুর ধ্বনি ওঠে। স্তম্ভ দুটি দেখিয়ে গাইড একখানি ছোট পাথর দিয়ে স্তম্ভদুটির গায়ে যে নলাকার, মসৃণ, লোহিতাভ শিরালাগুলি ছিল সেগুলিতে একে একে আঘাত করতে লাগল। আর এক একটি থেকে এক এক রকমের শ্রুতি-মধুর ধ্বনি উঠতে লাগল। শুনতে শুনতে মনে হ'ল স্তম্ভ দুটির ধারে দু'জনে দাঁড়িয়ে যদি ঘন ঘন আঘাত করা যায় তা হলে বোধ হয়, কোন সঙ্গীতের সুর ওঠা সম্ভব।

ভিতর প্রাচীরের মধ্যে রয়েছে শিল্পীর স্বপ্নলোক। স্থপতি ও ভাস্করগণ তাঁদের সারা মনের মাধুরী পাথরের গায়ে অনবদ্য রচনায় ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। প্রতি পদে মূর্ত্ত বিস্ময়। এক জায়গায় শিব-পার্ব্বতীর পাষাণমূর্ত্তি, নৃত্যভঙ্গিমায় স্থির হয়ে আছে। মীনাক্ষী, পার্ব্বতীর মুখে যে নারীসুলভ সলজ্জ ভাব শিল্পী প্রস্ফুটিত করেছেন তা অবর্ণনীয়। তার পর মন্দিরের সরোবরে স্বর্ণকমল, মূল মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া ও আরও কত শিল্পকাজ দেখে দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু মীনাক্ষীর ঐ অনির্ব্বচনীয় মুখচ্ছবি শিল্পদলের মাঝে একটি পূর্ণ কমলের মত আমার মনে রইল ফুটে!

মাদুরাইয়ের তাঁতশিল্পের বড় খ্যাতি। তারই মোহে অনেকে বস্ত্রালয়ে যান সস্তায় সওদা করতে। দোকানীও বিদেশী খরিদ্দারের সামনে দোকান উজাড় করে নানা রকমের বস্ত্রের স্তূপ সাজায়, দামও সস্তা বোধ হয়। কিন্তু দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যা লেখা থাকে তার সঙ্গে আসলের আর মিল খায় না। তবুও লোকে কেনে আর ওরাও বেচে এবং কারবারও চলে জোর।

দুপুরের দিকে আমার সঙ্গী শিল্পী দু'জন মন্দিরে গেলেন ছবি আঁকতে। আঙিনায় একটি জায়গা বেছে নিয়ে দু'জনে রঙ-তুলি-কাগজ সাজিয়ে বসলেন। আর তাঁদের দু'জনকে তিন দিক থেকে ঘিরে ধরল কৌতূহলী জনতা। তাদের বেশভূষা মলিন। তারা যাত্রী নয়, পাণ্ডা নয়, ব্যবসায়ীও নয়। অখণ্ড তাদের অবসর। যখন বেলা-শেষের ছায়া নামল মন্দিরের আঙিনায় তখনও তারা গেল না। কিসে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে, কোথায় রাত্রিযাপন করে তারাই জানে।

সন্ধ্যায় মন্দিরের ধারে ছিট-কাপড়ের একটি ছোট দোকানে সওদা করবার কালে স্থানীয় একটি কলেজের ছাত্রের সঙ্গে আমার সওদার সামগ্রীটি সম্বন্ধে তারই কৌতুককর একটি মন্তব্যে আলাপের সুযোগ হ'ল। সে বললে, 'আপনি যদি ঐ রঙের জোব্বা (পাঞ্জাবী) পরেন তা হলে লোকে বলবে, আপনি কংগ্রেসী। ওরা ঐ রঙেরই জোব্বা পরে।'

বললাম, 'কিসের জোব্বা পরলে লোকে বলবে কম্যুনিষ্ট?'

সে সহাস্যে বললে, 'ওরা সব রঙেরই জামা পরে।'

'আর হিন্দুমহাসভার লোকেরা?'

সে এবার হাসিতে ফেটে পড়ল; বললে, 'তাদেরও কিছু ঠিক নেই।'

'আমি যখন ঐ তিনটির একটিও নই তখন যে রঙের কাপড় কিনছি তার জোব্বা পরতে ক্ষতি কি? কি বল?'

সে প্রচুর হাসতে লাগল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি?'

'আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সদস্য। আপনি এর নাম শুনেছেন?'

'হাঁ।'

'এখানে হিন্দু মহাসভা সম্মেলন হচ্ছে, আপনি যাবেন? আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি সেখানে। আমি তার একজন কর্ম্মী।'

'তার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। পারলে এই শহরটা ঘুরে দেখতাম। কিন্তু পথশ্রমে বড় ক্লান্ত। এসেছিলাম মাদ্রাজে বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে—'

'হাঁ—হাঁ—খবরের কাগজে সে খবর পড়েছি। কিন্তু আপনা-দেরই এক বাঙালী সম্মেলনে আজ বক্তৃতা দেবেন।'

'যত খুশি দিন।'

সে নিজ পরিচয় দিল, জাতিতে সৌরাষ্ট্রীয় (গুজরাটী) ব্রাহ্মণ বলে। সেই শহরে শৈশব থেকে আছে, দেশে কখনও যায় নি। এখন তার দেশ মাদুরাই। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম শহরে মিল আছে পাঁচটি, লোকসংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ হাজার; খ্রীষ্টানের সংখ্যাও তাই। গ্রামাঞ্চলেই খ্রীষ্টানেরা অধিক সংখ্যায় বাস করে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কোন্ রাজনৈতিক দলের প্রতিপত্তি বেশী? কংগ্রেসী না কম্যুনিষ্ট?'

সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'ওরা কি করবে?' অর্থাৎ প্রাধান্ত তাদেরই। কিন্তু আসল ঘটনা অন্যরূপ।
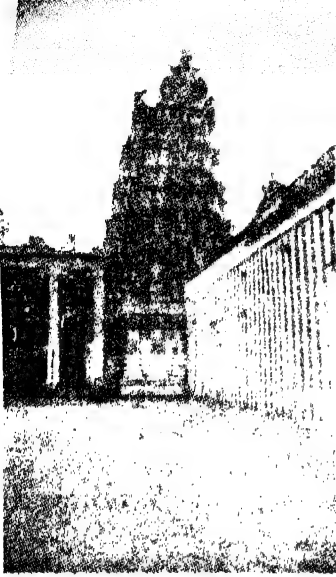
মীনাক্ষী মন্দিরের অভ্যন্তর—দ্বিতীয় প্রাচীর

বললাম, 'তোমরা কংগ্রেসে মিশে যাও না কেন?'

বললে, 'আমরা ত চাই। ওরা যে নেয় না।'

অতঃপর আলাপের আর অবসর হ'ল না। কারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পথ-ক্লান্তিতে বড় পীড়া বোধ করলাম। আসবার সময় বললাম, 'যদি কালও থাকি সন্ধ্যায় এখানেই দেখা হবে। বিদায়।'

সে সহাস্যে বিদায় দিয়ে বললে, 'আচ্ছা।'

পরদিন আর থাকা হ'ল না, একটু বেলায় রওনা হলাম, কন্যাকুমারিকার পথে, টিনেভেল্লির উদ্দেশ্যে। আসবার সময়ে প্রিয়দর্শন, হাসিখুশিভরা ছাত্রটির কথা মনে হতে লাগল। হয়ত সে আজ আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। দোকানটি তারই বন্ধুর। কিন্তু অবিরাম চলার পথে দীর্ঘ আলাপের সুযোগও মেলে না যে!

আরও দক্ষিণে অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে রবিকর প্রখরতর হতে লাগল, বাইরের দৃশ্যও হয়ে উঠতে লাগল উজ্জ্বলতর। রেলপথের সমান্তরালে সুদূর মান্দ্রাজ থেকে একটি সুন্দর রাজপথ চলে গেছে টিনেভেল্লি—তার পর কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত। পথে মাঝে মাঝে যাত্রীবোঝাই বাস ও নানা আকারের ঘরোয়া মোটর ছুটে চলেছে। পথের দুটি পাশে শস্যক্ষেত, কলার বাগান, তাল-নারিকেলের বন, পশ্চিমে দূরদিগন্তে অস্পষ্ট শৈলমালা, ছোট-বড় ষ্টেশনের ধারে ছোট-বড় গ্রাম। কোথাও নদী নেই, সুবিশাল জলাশয়ও চোখে পড়ে না। কিন্তু বড় বড় ইঁদারা এবং তা থেকে জল তোলবার অভিনব যন্ত্র দেখা যেতে লাগল।

যে শৈলমালা প্রথম দিকে ছিল অস্পষ্ট ও মেঘবিলীনপ্রায়, আমাদের চলার পথে তা ক্রমে স্পষ্ট, স্পষ্টতর হয়ে উঠে পশ্চিম দিগন্ত বিচিত্রাকার ধূসর প্রাচীরে আড়াল করে রাখল। এ হ'ল দক্ষিণের সুবিদিত কারডামাম্ শৈলমালা—ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়ে ভারত মহাসাগরে নিমগ্ন।

এ অঞ্চলের প্রধান ফল চীনাবাদাম, নারিকেল ও কলা। অবশ্য প্রত্যেক ষ্টেশনে এগুলি সহজলভ্য বলে আমার ধারণা হ'ল সেই রকমই। আমাদের কামরায় কয়েকটি ছাত্র উঠেছিলেন। ফেরিওয়ালারা ষ্টেশনে সবুজ-রঙের কলা বিক্রয় করছিল। স্থানীয় কয়েকজন ছাত্র-যাত্রী আমাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আলাপ করতে করতে বললেন, "আপনারা সবুজ-রঙের কলা কিনবেন না, হলদে রঙের কিনবেন। সবুজ-রঙের কলাতে পোকা থাকে, খেয়ে লোকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওগুলো পাহাড়ে জন্মে।"

শুনেছি, ঘন ঘন ক্ষুধা পাওয়া রোগের লক্ষণ। আমরা সকলেই তার পর থেকে এই সাংঘাতিক ভারতীয় সাধারণ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বুঝলাম, সবুজ কলা খাওয়ার ফল ফলতে শুরু করেছে এবং রোগটির কিছুতেই উপশম ঘটাতে পারা গেল না। অবশেষে বেলা বারোটার কাছাকাছি পৌঁছলাম টিনেভেল্লি দক্ষিণ রেলপথের অন্যতম প্রান্ত। এখান থেকে প্রায় পঞ্চান্ন মাইল দীর্ঘ সর্পিল মোটর-পথ চলে গেছে তিন-সমুদ্রের মিলন-তট—কন্যাকুমারিকায়।

ভরা পৌষ, কিন্তু মাথার উপর মধ্যদিনের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড। রৌদ্রে সব যেন তৃষিত। আমাদেরও জঠরে নিদারুণ হুতাশন-জ্বালা, কণ্ঠে তৃষ্ণা। পথভরা ধুলো। চারদিকে শুষ্কতা, রুক্ষতা। টিনেভেল্লিকে মনে হতে লাগল টেনে ফেলি। তখন একটু শীতল জল, একটু শীতল ছায়া, দূরদক্ষিণ বাতাসের একটু স্পর্শ আমাদের সকলেরই কাম্য হয়ে উঠল। অথচ স্থানীয় অধিবাসীরা স্বচ্ছন্দে, সহাস্যে চলাফেরা করছে!

ষ্টেশন থেকে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের দূরত্ব সামান্য নয়। তবুও নিজের বোঝা নিজেই কাঁধে-পিঠে তুলে এগিয়ে চললাম সেদিকে এবং খানিকটা এগোতেই পিছন থেকে "টু অ্যানার" কাতর আহ্বান কানে এল। ফিরে দেখি কৃষ্ণবর্ণ অর্দ্ধ-নগ্ন এক কিশোর। সে ভাঙা হিন্দীতে বললে, "শেঠ, বাস-ষ্ট্যাণ্ড দূর আছে। আমায় বোঝা দাও।"

শেঠজী যে পয়সা বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই সেই রৌদ্রজ্বালা সত্ত্বেও বোঝা কাঁধে স্বাবলম্বী সেজেছে তা যদি সে জানত! কিন্তু বাঁচাতে চাইলেও পয়সা বাঁচে না, বাঁচতে পারে না, বাঁচানো যায় না। তার কাঁধে বোঝা চাপিয়ে হাল্কা হয়ে চলতে লাগলাম এবং কয়েক পা যেতে যেতেই দেখি, আমার দুজন সঙ্গী একখানি মোটরে আমার বিপরীত দিক থেকে আসছেন, এবং মোটরখানি ঘরের।

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে কাটতেই তাঁরা সারা পথ ধূলোয় অন্ধকার করে ষ্টেশনের দিকে চলে গেলেন। মনে মনে ভাবলাম, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে। বোধ হয় কোন তামিল ভদ্রলোক সাহিত্যিক ও শিল্পীদের গুণের পরিচয় পেয়ে মোটর চড়িয়ে ওঁদের সমাদর করছেন। এখন ওঁদের সঙ্গে থাকলে সঙ্গী বলে আমিও কি আর মোটর চড়তে পেতাম না? কিন্তু ভাগ্যে আছে ধূলো ভাঙা, পায়ে হাঁটা। যা হোক ষ্ট্যাণ্ডে এসে বাসে উঠে মনোমত আসন বেছে নিয়ে বসলাম। কিশোরটিকে 'টু অ্যানা' দিতে যেতেই সে বললে, 'ফোর অ্যানা।' কারণ পথ অনেকটা, রোদও খুব। অবশেষে তারই দাবি মানতে হ'ল। আলাপ জুড়ে দিলাম তার সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, সে সেই শহরেরই অধিবাসী কিনা।

বললে, 'তারা গ্রামের লোক গ্রামখানি শহর থেকে আট মাইল তফাতে। তার বাবা নেই, দুটি ছোট ভাই আর মা আছে। মা লোকের বাড়ী দাসীর কাজ করে আর সে মোট বয়। এই আয়ে তাদের জীবন চলে। সে লেখাপড়া জানে না এবং ভাইয়েরাও স্কুলে যায় না। তাদেরও যা হোক একটা কাজে লাগাতে হবে।' এ কাহিনীর মধ্যে নূতনত্ব কোথায়? একে অস্বীকার করাও ত পুরাতন ঘটনা। তবুও তার ক্লিষ্ট মুখখানিতে শেষের কথাগুলির সঙ্গে যে বিজ্ঞজনোচিত ভাব ফুটে উঠল তা মর্ম্মস্পর্শী। আসমুদ্র-হিমাচল সাধারণ মানুষের চিন্তা ও বেদনা এই।

এমন সময়ে সেই মোটরারূঢ় হয়ে এলেন আমার সঙ্গীরা। তাঁদের মোট-ঘাট বাসে উঠানো হতে লাগল। তাঁদের সঙ্গে মোটর-স্বামী জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক। তিনি আমার একজন সঙ্গীকে বললেন, 'আপনারা একবার আমার বাড়ী যাবেন না? আমার স্ত্রী আপনাদের আহারের আয়োজন করেছেন। আমরা আশা করে আছি আপনারা আমাদের দেশের লোক, অন্ততঃ একটা দিন আমার বাড়ীতে থাকবেন।'

তা হলে তিনি মাদ্রাজী নন, বাঙালী? যতক্ষণ বাংলা না বলছেন ততক্ষণ কেউই বুঝতে পারবে না যে, তিনি বাঙালী! ভদ্রলোক সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলার বাইরে কর্ম্মসূত্রে আছেন। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। হিন্দী, ওড়িয়া, গুরুমুখী, তামিল ভাষা তিনি লিখতে, পড়তে, বলতে পারেন। আর বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষা ত আয়ত্তে এনেছেনই। জীবন প্রায় শেষ হয়ে এল বিদেশে, তবুও ভুলতে পারেন না সেই 'দুই বিঘা জমি'। তাঁর পত্নীও ঐ ভাষাগুলি জানেন, কিন্তু বাংলা হয়ে আছে তাঁদের মর্ম্মের ভাষা। তবে তাঁদের ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষায় অজ্ঞ।

বললাম, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনাকে এই দূরদেশে পেয়ে এমন আনন্দ বোধ করছি যে কথায় বলতে পারব না।'

তিনি বললেন, 'কিন্তু আপনারা ত আমার বাড়ী গেলেন না। আমরা অনেক আশা করেছিলাম। আপনাদের থাকবার কিছু কষ্ট হ'ত না। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে সম্প্রতি যে আবিষ্কারগুলি করে-ছেন তা আপনাদের মত লোকের দেখা দরকার। দক্ষিণে ভারতের ইতিহাসের নূতন কথা তা থেকে জানা গেছে।'

বললাম, 'আমরা যে আসব তা কি করে জানলেন?'

'কেন, কলকাতার চিঠি পেয়েছি।'
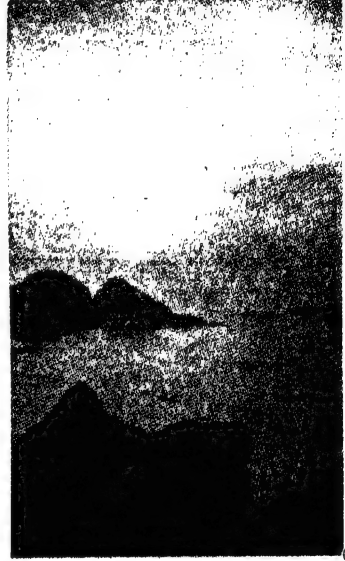
কন্যাকুমারীকা—আরব সাগরে সূর্য্যাস্ত

যিনি চিঠি দিয়েছিলেন তিনি কলকাতায় আমাদের প্রতিবেশী, ওঁর নিকট-আত্মীয়।

বললাম, 'শুনেছিলাম। আপনি তুতিকোরিনে থাকেন।'

তিনি হাসলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, এ শহরে আর বাঙালী আছেন?

'এ শহরে আমি ছাড়া আর কোন বাঙালী নেই। তবে আমার দু'জন বাঙালী প্রতিবেশী আছেন। সব চেয়ে কাছের যিনি তিনি থাকেন বাইশ মাইল তফাতে, আর, দূরের যিনি তিনি থাকেন বিয়াল্লিশ মাইল দূরে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন এখানে কোন্ ঋতু?'

'শীতকাল।'

'গ্রীষ্মকালে কেমন অবস্থা হয়?'

'এখন দিনের সর্ব্বোচ্চ তাপ ১০৮ ডিগ্রী হয়। গ্রীষ্মকালে কত হতে পারে আন্দাজ করুন।'

বললাম, 'সুখের কথা যে শীত থাকতে থাকতেই দেশে ফিরে যাব, গ্রীষ্মকালে থাকব না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, একটু জলের ব্যবস্থা করতে পারেন? শীতেই তৃষ্ণায় গলা কাঠ।'

তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটলেন জলের ব্যবস্থা করতে। এমন সময় রব উঠল বিভ্রান্ত মহাশয়ের পরিচারিকাটিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাকে পথের ধারে গাছতলায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে সে নেই।

সকলেই উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজব? আমাদের মধ্যে একজন বললেন, 'সে হারাতে পারে না। কারণ, কথা বললেই লোকে বুঝবে, সে বাঙালী।'

কন্যাকুমারীকা—ভারত মহাসাগর—বিবেকানন্দ শৈল

'যদি একটিও কথা না কয়ে চুপচাপ পথে পথে ঘুরে বেড়ায়? আর কথা বললেও সে যে বাঙালী তা এরা কি করে বুঝবে? চেহারায় ত এদের সঙ্গে দিব্যি মিল? তবে কাপড় পরার ধরনটা—'

ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক কাঁদি ডাব নিয়ে এলেন এবং দুঃসংবাদটি শুনেই তিনি বিভ্রান্ত মহাশয়কে গাড়িতে তুলে পরিচারিকাটিকে খুঁজতে বেরুলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে পাওয়া গেল।

তার পর বাস যখন ছাড়ে ছাড়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন আবার বললেন, 'আপনারা অভুক্ত অবস্থায় চললেন। কথা দিয়ে যান ফিরবার পথে আমার বাড়িতে আসবেন?'

বললাম, 'ইচ্ছা রইল। আর খাবার কথা যা বলছেন, কিছু খাবার না হয় আমাদের সঙ্গে দিন।'

অতিথিবৎসল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎক্ষণাৎ ছুটলেন মাদ্রাজী হালুইকারের দোকানে এবং মিনিটকয়েকের মধ্যেই আনলেন, দিস্তে-কতক পুরী ও আলুপিঁয়াজের নিরামিষ তরকারী! বোধ হয় হালুইকার আমাদেরই জন্য তৈরি করছিল। নইলে দুটোই গরম থাকে কি করে?

টিনেভেলি শহরের দক্ষিণ সীমায় তাম্রবর্ণী নদী। তার দুটি তীর ও বক্ষের বালুকার রঙ তামাটে। তার মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে শীর্ণকায়া নীলাভ জলধারা। নদীপারে পালামকোটা শহর—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রায় সব বাড়ির রঙ সাদা। রৌদ্রে শহরটিকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। এই শহরেরই পূর্ব্বাংশে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুন্দর বাড়িখানি, ফিরবার পথে দেখেছিলাম।

শহরটি ছাড়িয়েই উন্মুক্ত প্রান্তর। বামে পূর্ব্বদিকে দিগন্তে প্রসারিত হরিৎবর্ণ ধানক্ষেত—দক্ষিণে পশ্চিমদিকে আলোছায়ায় বিচিত্র মেঘমৌলী কারডামাম শৈলমালা। তার সানুদেশ অফুরন্ত তালীবন-সমাচ্ছন্ন। আকাশে স্তূপাকার মেঘ। দূরে কোথায় যেন বৃষ্টি হয়ে গেল। ঠাণ্ডা বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শে বড় আরাম বোধ হতে লাগল। পথ জন ও যান বিরল। কোথাও কৃষকের কুটীর দেখি না, চোখে পড়ে কেবল তাদের অক্লান্ত শ্রমের বিজয়কেতন প্রান্তরে ও বাগানে দক্ষিণ-বাতাসে লীলায়িত। পথের ধারে দু'একখানি ছায়াহীন ছোট গ্রাম; ঘরগুলির দেয়াল মাটির, চালে খড়, তালপাতা বা খোলার ছাউনি। আবহাওয়া উষ্ণ। তাই অধিবাসীদের পোশাকের বেশী প্রয়োজন নেই। রুক্ষ বিহার প্রদেশের গ্রামগুলির সঙ্গে এখানকার গ্রামগুলির কিছু সাদৃশ্য আছে। এক এক সময়ে মনে হতে লাগল আমরা বিহার প্রদেশের মধ্য দিয়ে চলেছি। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে গীর্জ্জা, কোন খ্রীষ্টান সাধু বা সন্ন্যাসিনীর নামে উৎসর্গীকৃত। অবশেষে একখানি গণ্ডগ্রামে বাস পৌঁছল। পথের দুধারে কলা, ডাব, চীনাবাদাম, ছোলা-মটর ও অন্যান্য খাদ্যের দোকান-সারি। সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে মনে হতে লাগল—দোকানে সাজানো বাদাম ও ছোলা-মটর আপনিই ভাজা হয়ে গেছে। দশ-বারটি বালক ও কিশোর বাসে উঠে পড়ল। তাদের হাতে ছোট ছোট থালায় তেল-কাগজে মোড়া দেশী বিস্কুট। উত্তর ভারতের পূর্ব্ব-পশ্চিমের উদ্বাস্তুগণ দক্ষিণে তত দূরে পৌঁছন নি যে বলব, সামাজিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে তারা লেখাপড়া না শিখে ফেরিওয়ালাগিরি করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকেই দুটি-চারটি ইংরেজী শব্দ শিখেছে পৈটিক কারণে।

তাদের এক জনকে বললাম, 'ডাব আনতে পার?'

সে থালার বিস্কুট দেখিয়ে বললে, 'কোকোনাট। ওয়ান অ্যানা টু।'

বললাম, 'কোকোনাট ওয়াটার।'

সে আবার বিস্কুটগুলি দেখিয়ে বললে, 'গুড কোকোনাট। ওয়ান অ্যানা টু।' বলেই হাসতে লাগল। আমাদের গাড়িতে কাউকেই তার 'গুড কোকোনাট' কিনতে দেখলাম না। সকলেরই তখন বিস্কুটে রূপান্তরিত 'কোকোনাট ওয়াটারের' বদলে তরল 'ওয়াটারে'র প্রয়োজন। তারা চলে গেল বিপরীতগামী বাসের দিকে।

কিছুক্ষণ পরেই আবার আমাদের বাস চলতে লাগল। প্রখর রৌদ্রতাপে যাত্রিরা ক্লিষ্ট। বাতাসে আরাম পাওয়া যায় না।

পশ্চিমের পাহাড়গুলি দূরে সরে গেছে, দু'পাশে সমতল ক্ষেত। হঠাৎ অশ্বত্থবীথিকার শীতল ছায়ায় গাড়ি পৌঁছল। দেখি, পথের দু'পাশে অশ্বত্থের সারি, শাখায় শাখায় খিলান রচনা করে ছায়াজালে পথ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মনে পড়ল, সারনাথের পথের ধারের আম্র-বীথি। কিন্তু এটি তার চেয়ে দীর্ঘতর, প্রায় ক্রোশব্যাপী। তার পর থেকে পথ দু'পাশের ধানক্ষেত, বেণুবন, নারিকেল ও তালীকুঞ্জে এমন সংকীর্ণ হয়ে গেল যে, দুখানি গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে না, গাছগুলিও গাড়ি থেকেই যেন হাতে স্পর্শ করা যায়। পথের রঙ লাল। মাঝে মাঝে দু'চারখানি কাঁচা বাড়ি চোখে পড়ে। এ-দিকে সূর্য্যও পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। হঠাৎ আমাদের সঙ্গী-দের মধ্যে একজন বলে উঠলেন—'ঐ—ঐ—'

সামনে তাকিয়ে দেখি তরঙ্গময় সীমাহীন নীল পাথার—তার কূলে আমাদের যাত্রা সেদিনের মত শে· হ'ল।

ধর্ম্মশালায় একটা ঘরে জিনিষপত্রগুলি বন্দী করে রেখে সকলে ছুটলাম আরব সাগরে সূর্য্যাস্ত দেখতে। আমাদের আগে আরও জন-কতক বাঙালী ও আর্য্যাবর্ত্তবাসী এসেছিলেন। তাঁরাও যাচ্ছিলেন।

এখানে স্থলভাগ ক্রমে সংকীর্ণ ঢালু হয়ে সমুদ্রে নেমে গেছে। কূলে ও কূল থেকে তফাতে জলমধ্যে বৃহদাকার শিলাখণ্ড এবং অর্দ্ধমগ্ন শৈল। সেগুলির গায়ে অবিরাম প্রচণ্ড বেগে ঘোর রবে তরঙ্গাঘাত হচ্ছে। জলের রঙে ও অস্থিরতায় বৈচিত্র্য স্পষ্ট। বঙ্গোপসাগরের জল নীলাভকৃষ্ণ ও অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ, ভারত মহাসাগরের জল পাংশু ও কিছুটা শান্ত, আর আরব মহাসাগরের জল রক্তাভ ও ক্ষুদ্র তরঙ্গময়। বালুকার রঙও তিন সাগরকূলে তিন রকমের—নীলাভ-কৃষ্ণ, পাংশু ও রক্তাভ। কন্যাকুমারীর মন্দির এই তিনটি সমুদ্রের মিলনতটে। তার ফটকের এক পাশে একটি লোক অতিকায় শঙ্খ, ঝিনুক ও ঐ তিন রঙের বালু ইত্যাদির বেসাতি সাজিয়ে বসে আছে। পরে তার সঙ্গে আলাপের সুযোগ হ'ল।

আরব সাগর-জলে একটি শিলাখণ্ডে বসে সূর্য্যাস্তের ছবি তুলে নিলাম। পূর্ণিমায় বঙ্গোপসাগরের নীলাভ-কৃষ্ণ জল থেকে চন্দ্রোদয় ও আরব সাগরের রক্তাভ বক্ষে সূর্য্যাস্ত একই সময়ে ঘটে। কিন্তু তখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। এই বিরল দৃশ্য দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটল না বটে, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে দক্ষিণ আকাশে দেখলাম 'সাদারন ক্রশ' নামে নক্ষত্রপুঞ্জ যা দর্শন আমাদের উত্তরাঞ্চলবাসীদের কপালে ঘটে না। সূর্য্যাস্তের পরে সমুদ্রস্নানে সারাদিনের ক্লান্তি ও ক্লেদ দূর করে চললাম কন্যাকুমারীর বিগ্রহ দেখতে।

দেখলাম কন্যার মন্দিরটি বিশালও নয়, শিল্পে স্থাপত্যে অপরূপও নয়। কিন্তু ভিতরে পাষাণ-মণিকোঠায় রক্তগোলাপ ও শ্বেতচন্দনে সজ্জিত মর্ম্মরমূর্ত্তিটি শিল্পীর অতুলনীয় সৃষ্টি। অবর্ণনীয় তার করুণা, হাসি ও জিজ্ঞাসাভরা চোখ দুটির চাহনি। ঘৃতপ্রদীপের স্তিমিত আলোকে তার কপালের হীরকখণ্ডটি সন্ধ্যাতারার মত জ্বলছে। এই হীরকখণ্ডটির একটি ইতিহাস আছে। সেটি এবং কন্যাকুমারী সম্বন্ধে যে লৌকিক ও অলৌকিক দুটি কাহিনী আছে আপাততঃ তা এখানে দেওয়া সম্ভব হ'ল না। তবে লৌকিক কাহিনীটি বড় মর্ম্মস্পর্শী এইটুকু মাত্র বলতে পারি।
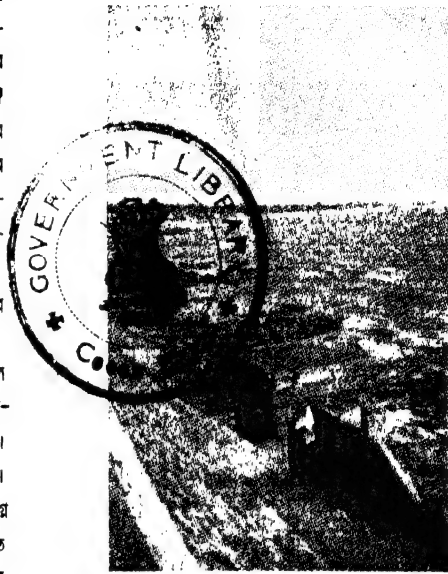
কন্যাকুমারীকার সাগরতটের একাংশ—বঙ্গোপসাগর

বিগ্রহদর্শনের একটি নিয়ম আছে। দর্শনার্থীকে যেতে হয় স্নানান্তে, গায়ে চাদর বা কাপড় জড়িয়ে বিগ্রহের সম্মুখে। অবশ্য আমাদের পুরুষদের তাই-ই করতে হয়েছিল। সেখান থেকে ছয় মাইল উত্তরে সুচিন্দ্রামের শিববিগ্রহ দর্শনের বেলায়ও এই নিয়ম, তবে স্নান করতে হয় না।

অনুপম শিল্পদর্শনে মনে যে ভাবোদয় হয়, তারই গভীর আনন্দভরা অন্তরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মনে হতে লাগল, ভারতের এই দক্ষিণতম প্রান্তে এসে আজকের সন্ধ্যাটি সুন্দর ও সার্থক হ'ল। একটি পরম মুহূর্ত্ত জীবনে এসে দেখা দিয়ে গেল!

ফটকের ধারে যে শঙ্খাদির ব্যবসায়ীটি বসেছিল সে তার বেসাতির প্রতি হিন্দীতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমরা উভয় পক্ষই হিন্দী ভাষায় সমপারদর্শী। কাজেই নির্ভয়ে আলাপ করতে লাগলাম এবং পরস্পরের কথা বুঝতে একটুও কষ্ট হ'ল না।

অতিকায় এবং বিচিত্রাকার শঙ্খ ও ঝিনুকগুলি দেখিয়ে লোকটি বললে, "এগুলো ভারত মহাসাগরের। এই কালো বালি বঙ্গোপ-সাগরের, সাদা বালি ভারত মহাসাগরের আর এই লাল বালি হিন্দু মহাসাগরের।"

জগতে সবই বদলাচ্ছে। তাই "আরব সাগর" "হিন্দু-মহাসাগরে" নামান্তরিত হয়েছে, কিন্তু আগের মতই তার আর্ত্তরোল উঠছে।

সে জিজ্ঞেস করলে, "আপনারা কোন্ দেশী"?

বললাম "বাঙালী"।

সে বললে, "বঙ্গসাগরের জল বড় জোরে ঘা দেয়, ভারত-মহাসাগর তার চেয়ে কম জোরে দেয়, হিন্দুমহাসাগর তার চেয়ে কম জোরে।"
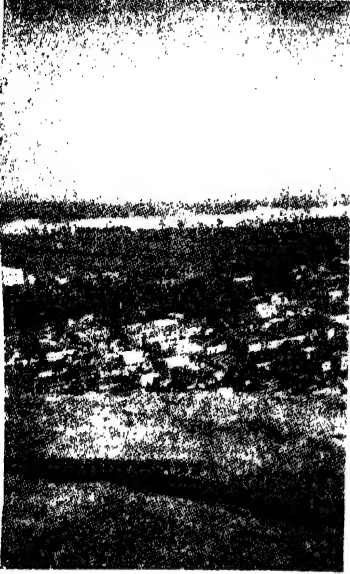
ত্রিচর পাহাড়দুর্গ বা শৈলমন্দির-শীর্ষ থেকে শহরের একাংশ ও কাবেরী নদী

মনে হ'ল যেন বাংলাদেশটা সম্বন্ধে তার ধারণা কিছু উঁচু। সেটা যাতে থাকে সেজন্যে দেশের কথা আর বললাম না যে, বাংলার মাটির মত সাগরের জলও দু' ভাগ হয়ে গেছে, হয় নি কেবল ভাষা। ভাষাও নাকি জাতীয় জীবনে তেমন গুরুতর কিছু নয় এমনি একটা সংশিক্ষা দেবারও চেষ্টা কিছুদিন আগে হয়েছিল।

রাত্রে একটি হোটেলে আহারের সময়ে হোটেলওয়ালা বললে, "বাঙালী জাসতি খাতা নেই।" সম্ভবতঃ লোকটি তেমন বাঙালীর পাল্লায় পড়ে নি, অথবা তার নারকেল তেল ও মশলাবিহীন নিরামিষ ব্যঞ্জনই তাকে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে রক্ষা করে আসছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কোন্ দেশের লোক?"

"আমার বাড়ি মাদুরাই। আমি ত্রিশ বছর এই হোটেল চালাচ্ছি। এখানে বাঙালীই বেশী আসে।" সম্ভবতঃ আর্য্যাবর্ত্ত-বাসীদের মধ্যে বাঙালী যাত্রীর সংখ্যাই বেশী বলে সে ঐ কথা বলে থাকবে।

কূল থেকে কিছু তফাতে সমুদ্রমধ্যে যে শৈলগুলি সিন্ধুর বিরাম-হীন আঘাত সয়ে ভূভাগকে রক্ষা করছে সেগুলির মধ্যে বৃহদাকারটির নাম, "বিবেকানন্দ শৈল।" স্বামীজী নাকি সেটির শীর্ষে বসে ভারতের কল্যাণ-চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছতে গেলে কিছুটা জল ভাঙতে হয়। শৈলটিতে যাবার কালে স্বামীজী অক্টোপাসের আক্রমণে বিপদগ্রস্তও হন। গ্রামখানির রাজপথের ধারে স্বামীজীর নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। বাঙালী যাত্রীরা প্রত্যেকেই তাতে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করে যান।

ফিরবার পথে সকালে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের ধারে বসে থাকতে থাকতে দেখি একদল বালক-বালিকা বই-খাতা-শ্লেট হাতে স্কুলে চলেছে। আমাদের দেশেও যেমন সেখানেও তেমনি তাদের খালি পা, গায়ে আধময়লা জামা ও প্যাণ্ট—শরীর অপুষ্ট। তবুও আনন্দে উল্লাসে কলরব করতে করতে চলেছে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ।

কুমারীকার ছ'মাইল উত্তরে সুচিন্দ্রাম গ্রাম। তার মন্দিরের অঙ্গনের একধারে ছিল প্রকাণ্ড রথ, কারুকার্য্যে সুন্দর। মন্দিরের মধ্যে এক জায়গায় রয়েছে কষ্টিপাথরের বিশাল হনুমানমূর্ত্তি। সালঙ্কার মূর্ত্তির মাত্র মুখখানি ও লেজটি তার জাতির পরিচায়ক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানবীয়। শিল্পী তাকে ভক্তি ও অমিত শক্তির প্রতীকরূপে গঠন করেছেন। তার একখানি ছবি নিতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু স্থানীয় একজন বললেন, "ওর ছবি তুলতে পারবেন না। কেউ এ পর্য্যন্ত পারেন নি। এমনকি"—বলে এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর নামোল্লেখ করলেন—"তিনিও বারো বার চেষ্টা করেও পারেন নি।"

কর্ম্মচারীটির ভারতজোড়া নাম। তাঁর ক্যামেরাও নিশ্চয়ই বহুমূল্য। তিনি যখন বারো বারের চেষ্টায় বারো দশায় পড়েছিলেন তখন একবারের চেষ্টায় আমি সফল হব কি করে? তবে ফটো-গ্রাফার তফাতে দাঁড়াবার মত একটু জায়গা পেলে এই হনুমানটি যুক্ত কর করে এলবাম ও পত্রিকার পাতা আলো করে দাঁড়াতেন!

ফিরতি-পথে নগরকোয়েলে এক মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়ে গেল। আমার সঙ্গীরা তখন আহারে গেছেন, আর আমি মালপত্র আগলাচ্ছি। ভদ্রলোকটি বললেন, "মিঃ, আপনি বাঙালী?"

"হাঁ।"

"আমি তিন বছর কলকাতায় ছিলাম।"

"বটে!"

"আমাদের রান্না আপনার কেমন লাগছে? খেতে কষ্ট হচ্ছে?"

"না। চালাচ্ছি এক রকম।"

তিনি কথাটি শুনে বড় খুশী হলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মুখ বিকৃত করে বললেন, "কিন্তু আপনাদের রান্না আমি অতি কষ্টে খেতাম। তিন বছর খাওয়ার বড় কষ্ট ছিল। তখন থেকে আমার অসুখ হয়েছে।"

শুনে বড় কষ্ট হ'ল। তিনি আবার বললেন, "দেখুন, আমাদের রান্না আপনারা খেতে পারেন, কিন্তু আপনাদের রান্না—!"

ইচ্ছে হ'ল বলি, সবই তেলের গুণে। কিন্তু সঙ্গীরা তখনই

ডকে চাকরি নিলাম। দু'টাকা চার আনা রোজ। ওখানে দিন পনের ধরে ঘুরছি। আজ পাকা হয়ে গেল।

বলিলাম, কয়লা ডকে ? সে যে ভীষণ পরিশ্রমের কাজ ! সে কি পারবে ?

নীলু বলিল, কি আর করি দাদা বলুন। যখন পাস-টাস করি নি, পিছনে কোন সুপারিশ নেই, তখন আপিসের চাকরি আমায় কে দিচ্ছে বলুন। কয়লা ডকের সর্দ্দার বলছিল বটে, এ সব পারবে না। এসব হিম্মৎকা কাম—বিমারে পড়ে যাবে। কিন্তু দাদা, নাই বা পারব কেন ? সুস্থ শরীর নিয়ে তো চুপ করে বসে থাকতে পারি নে। ছেলে, বউ, বাবা না খেয়ে মরবে আর আমি ঠুনকো বংশমর্য্যাদা আর পরিশ্রমের ভয়ে চুপ করে বসে থাকব, তা হয় না। বাবাকে একখানা চিঠি দিয়ে দেবেন —লিখবেন নীলু কাজ করছে, শীগগিরই টাকা পাঠাবে।

পরদিন নীলকণ্ঠ আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। তবে তাহার খবর মাঝে মাঝে পাই বটে।

সন্ধ্যার সময় নীলকণ্ঠ যখন সমস্ত দিনের কাজ সারিয়া তাহার ভুকৈলাস রোডের বস্তিতে ফিরিয়া আসে তখন তাহাকে নাকি আর চেনা যায় না। কালো হাফ প্যাণ্ট আর ছেঁড়া কালিঝুলি মাখা গেঞ্জি, সারা দেহে কয়লা মাখা। শুধু দেখা যায়, সাদা সাদা দাঁত, আর সাদা চোখ।

ডকের শ্রমিকেরা নাকি নীলকণ্ঠকে অনেক উপদেশ দেয়। বলে, আপিসকা কাম দেখো ভাইয়া। এসব কাম বাঙালী পারে নাকি ? তুমি ত বামুনমানুষ—তা এসব কেন ? কিন্তু এই সব উপদেশ নীলু গ্রাহ্য করে না। সে আয়েসী নয়, শক্ত হাতে কোদাল ধরিতে পারে, হাল ধরিতে পারে আর এই কয়লা টানিতে পারিবে না ? নিজের শরীর আর দশটা শক্ত আঙুলের উপর বিশ্বাস রাখে সে।

ভুকৈলাস রোড হইতে মাঝে মাঝে আমার বাসায় আসে নীলু।

আমাকে সে কত কথা বলে। আর কিছুদিন পরেই নাকি দেশ হইতে বাবা, বউ, ছেলেকে লইয়া আসিবে। বস্তীর ভিতর দুখানি ঘর লইয়া সে বাসা বাঁধিবে, খোকাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবে। শোভা আসিবে—শক্তসমর্থ গোলগাল চেহারাতে লালপাড় সাড়ী মানাইবে ভাল। কপালে থাকিবে সিঁদুরের টিপ, সেবাপরায়ণ হাতে দুই দিনেই বস্তির দুইখানি ঘরের জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া প্রতিষ্ঠা করিবে লক্ষ্মীশ্রী। কালি উঠানের এক পাশে থাকিবে তুলসীমঞ্চ। সন্ধ্যাবেলায় শোভা শাঁখ বাজাইবে, তুলসীমঞ্চে মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিবে, স্বামীপুত্রের মঙ্গলকামনা করিবে। সমস্ত দিনের পরিশ্রম শোভার হাসিতে সার্থক হইয়া উঠিবে, আর তাহার পাঁচ বছরের ছেলে বাবলু—সে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে কলিকাতা দেখিবে। এমনি কত স্বপ্ন সে দেখে।

মাঝে মাঝে ছেলেদের জন্য প্লাষ্টিকের খেলনা, এই সব উপহার আনে। আমি অনুযোগ করি, এমনি করে পয়সা নষ্ট করো না নীলু।

নীলু বলে, নষ্ট নয় দাদা। ওরা আনন্দ পাচ্ছে এ কি কম কথা।—নীলু গল্প করে, চা খায়, তাহার কাজের কথা বলে। নীলু বলে, বুঝলেন দাদা, আমাদের ডক ইয়ার্ড ইউনিয়নের সেক্রেটারী বাবুকে ধরেছি। শিশিরবাবু বলেছেন, শীগগির একটা ভাল কাজ জুটিয়ে দেবেন। আমার হাতের লেখা দেখে, বাংলা-সংস্কৃত জানি শুনে খুব খুশী হয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের ইউনিয়ন থেকে একটা কাগজ বের হয়, তাতে আমার লেখা গল্প পড়ে আরও খুশী হয়েছেন।

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, তুমি গল্প-টল্প লেখ নাকি হে ?

নীলু সলজ্জে বলিল, হাঁ দাদা লিখি। গাঁয়ে থাকতে অনেক গল্প কবিতা লিখেছি। সমস্ত একটা বাঁধানো খাতায় লেখা আছে।

বলিলাম, সমস্ত দিন ঐ হাড়ভাঙা খাটুনির পর আবার গল্পটল্প লেখ কখন ?

—কেন রাতে। অনেক রাত ধরে লিখি, যখন সমস্ত শহর নিস্তব্ধ নিঃশব্দ, যখন সবাই ঘুমে অচেতন, তখন লিখি। আর সেই ত সময়—

বলিলাম, তোমার লেখা গল্পটা আমায় পড়িও নীলু। বাঃ তোমার যে এ বিদ্যে আছে তা ত জানি নে !

মৃদু হাসিয়া নীলু বলিল, দাদা, আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন। এখন আমি ত পড়ে থাকি সেই ডকে। আমার বহুকালের ইচ্ছে একখানা বই ছাপিয়ে বের করি। আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ?

বলিলাম কৈ না। আমি দশটা পাঁচটা কলম পিষি। ওসব সাহিত্যের খবর আর রাখবার সময় হয় না। কালে-ভদ্রে দু'একটা বই-টই পড়ি ঐ পর্য্যন্ত, তবে চেষ্টা করব। আজকালকার মস্ত লিখিয়ে বৃন্দাবন বাঁড়ুজ্যের নাম শুনেছ ত। যার বই সিনেমায় হচ্ছে, কত নাটক, কত উপন্যাস লিখেছেন। সেই বৃন্দাবনবাবু আমাদের আপিসেই কাজ করেন, তাঁকে না হয় বলে দেখব'খন।

নীলু অত্যন্ত আগ্রহভরে বলিল, দোহাই দাদা—মনে করে বলবেন। আমি না হয় আমার লেখা খাতাগুলো আপনাকে দিয়ে যাব। তিনি যদি সময় করে পড়ে দেখেন।

বলিলাম, আচ্ছা, আগে তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

নীলু উৎসাহভরে বলিল, বই আমি ছাপাবোই সুরেশদা। কেউ যদি না ছাপে তবে নিজের টাকায়ই ছাপাব।

—নিজের টাকায়? বল কি নীলু, বই ছাপাতে যে অনেক টাকা লাগে। এত টাকা কোথায় পাবে?

নীলু বলিল, এখন থেকে কিছু কিছু জমাচ্ছি যে—

—জমাচ্ছ? বল কি তুমি? সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, রাত জেগে লিখে তার পর ঐ গতর-জল-করা রোজগার থেকে টাকা জমানোর অর্থ কি বোঝ? এ যে আত্মহত্যার সামিল। আমি বলি, যদি বাঁচতে চাও তবে ঐ কাজ ছেড়ে অন্য চেষ্টা কর। ঐ সামান্য পয়সা থেকে বই ছাপবার জন্যে আর জমিয়ো না। শেষে মারা পড়বে যে।

ইহার পর প্রায় দুই মাস আর নীলু আমার বাসায় আসে নাই—আমার সহিত তাহার দেখাও হয় নাই। সে যে কোথায়, কি তার ঠিকানা, বা এখন কি কাজ করিতেছে, তাহাও জানি না। একদিন দেশ হইতে সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন—আমি নীলুর খবর আজ এক মাসের উপর পাই নাই। তাহাকে দুই-তিনখানি চিঠি দিয়াছিলাম, কিন্তু একখানারও উত্তর আসে নাই। বৌমা কাঁদিয়া কাটিয়া পাগলের মত হইয়াছে, ছেলেটি বাবার জন্য খুব অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যহ ডাকঘরে গিয়া খোঁজ লয় যে, তাহার বাবার কোন পত্র আসিয়াছে কিনা। কিন্তু কোন খবর নাই। তাহার জন্য আমরা বড়ই উৎকণ্ঠিত। ইহা ছাড়া এখানে হঠাৎ বন্যায় সমস্ত ধান ফসল ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা নিদারুণ কষ্টে আছি।

চিঠিখানি পড়িয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না।

সেইদিনই আপিস হইতে নীলুর পূর্ব্ব ঠিকানা সেই ডুকৈকলাস রোডে খোঁজ লইতে চলিলাম। বৈকাল হইয়া গিয়াছে—ট্রাম, বাস সমস্ত ভর্ত্তি। রাস্তায়ও অসম্ভব ভিড়। রাস্তার দুই পাশে, অসংখ্য পানের দোকান, আর সস্তা হোটেল। চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ সমস্তই বেজায় নোংরা। সমস্ত রাস্তা প্যাচপেচে, কাদা জল আর পানের পিকে যেন নরক হইয়া উঠিয়াছে। বিড়ি সিগারেটের টুকরো, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, ছেঁড়া কাগজ চতুর্দ্দিক আরও নোংরা হইয়াছে। কলিকাতা শহরের এই আর এক রূপ দেখিয়া, চমকাইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, ইহার চেয়ে যে কোন এঁদো গ্রামও ভাল। সেখানে বাতাস আছে, আলো আছে। কিন্তু এ কি সর্ব্বনাশা পরিবেশ—এ যেন কেহ গলায় দুই হাত দিয়া টিপিয়া দম বন্ধ করিয়া দিতেছে। আমি পকেট হইতে, নীলুর ঠিকানাটা বাহির করিয়া চোখ বুলাইয়া লইলাম। এ গলি—সে গলি করিয়া, অবশেষে বস্তির ভিতর একখানি খোলার ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাকিলাম—নীলকণ্ঠ ও নীলু ঘরে আছ নাকি হে?

—কে? ভেতরে আসুন। আমি কোনমতে মাথা হেঁট করিয়া, সেই জীর্ণ খোলার ঘরে ঢুকিয়া, আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

—কে সুরেশদা!—অস্পষ্ট আলোয় তাকাইয়া এইবার দেখিলাম, একটা ভাঙা খাটিয়ার উপর নীলু শুইয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা হয় নাই তবুও ঘর অন্ধকার। বাতাস আসিবার পথ নাই। একটা স্বল্প-পরিসর ক্ষুদ্র জানালা মাত্র। নীলু একটা মোমবাতি জ্বালাইল। মোমবাতির মৃদু আলোয়, নীলুর চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। এ কি চেহারা হইয়াছে নীলুর। মাথায় বড় বড় চুল—সমস্ত মুখ খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে আচ্ছন্ন। লোহার মত সেই শক্ত শরীর আর নাই, কে যেন ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিয়াছে।

সবিস্ময়ে বলিলাম, এ কি চেহারা হয়েছে হে। কি অসুখ?

নীলু হাসিয়া বলিল, হঠাৎ একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। সেই থেকে জ্বর। আমি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ওর মুখ শীর্ণ নীরক্ত বর্ণহীন। দুই চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, মাথায় রুক্ষ লম্বা লম্বা চুল।

বলিলাম, ভট্টাচার্য্য মশায় চিঠি দিয়েছেন তোমার খোঁজ করতে।

—জানি। বাবার দু'খানা চিঠিই পেয়েছি। কিন্তু কি উত্তর দেব। সুরেশদা আমি হেরে গেলাম। সত্যিই হিম্মতে কুলোল না, পারলাম না বুঝি, কঠিন মাটিতে টিকে থাকতে?

—তখনই ত বলেছিলাম নীলু। ওসব কাজ তোমার-আমার ধাতে সয় না। কিন্তু না নীলু তুমি দেশে ফিরে যাও। তোমার যা শরীরের অবস্থা, তাতে এই আলো-বাতাসহীন নরককুণ্ড থাকলে বাঁচবে না। সেখানে একবেলা খেয়েও, সেখানকার আলো-বাতাসে তবু বাঁচবে কিন্তু এখানে আর না। দেশে ফিরে যাও নীলু সেখানে তোমার বুড়ো বাবা বউ ছেলে পথ চেয়ে রয়েছে।

নীলু আস্তে আস্তে বিছানায় বসিয়া বলিল, আমার ছেলে আমার বাবলু সে চিঠি দিয়েছে এই দেখুন তার হাতের চিঠি। আমি তার জন্যে খেলনা কিনেছি, একটা বল কিনেছি। আমি ফিরেই যাব, ফিরেই যাব।

বলিলাম, শুনেছ বোধ হয় দেশে এবার হঠাৎ বান হয়ে সব ভেসে গেছে।

—হুঁ, তাও শুনছি। শুধু হাতে কি করে সেখানে দাঁড়াব, সুরেশদা। তাই দুদিন দেরি করছি। তিরিশটে

টাকা জমিয়েছি একজনের কাছে জমা আছে। সে আজকালের মধ্যেই দেবে, ঐ টাকা পেলেই চলে যাব। হাঁ দাদা সেটার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন? সেই বই ছাপানোর ব্যাপারটা?—আমায় মিথ্যা কথা বলিতে হইল। একজনকে বলেছি তিনি খুব আশা দিয়েছেন। নীলু উৎসাহিত হইয়া বলিল, দাদা, আমি আমার প্রথম বইটার স্বপ্ন দেখছি। বাইরে আজও তার কোন আকার নেই, কিন্তু আমি দেখছি তার অবয়ব কি সুশ্রী, অক্ষরগুলি কি সুন্দর, ছাপা কি ঝকঝকে আর পাতাগুলো কি মসৃণ। সেই বইয়ে আমার জীবনের এই ত্রিশ বৎসরের প্রতি মুহূর্ত্তের জ্বালা, যন্ত্রণা অভাব, অনটন সবকিছু ফুটে উঠেছে। আমার নিজের দুঃখ আর অভিজ্ঞতা দিয়ে পৃথিবীর অগণিত দুঃখী মানুষের কথা তাতে ফুটিয়েছি। আমার ঐ বই দুঃখী বঞ্চিত মানুষের বেদনার ইতিহাস, তাদের লোনা চোখের জলের ইতিহাস। আমার প্রথম বই বাবলুকে উৎসর্গ করব—সেই মৃদু আলোয় তাকাইয়া দেখিলাম, নীলুর মুখ উদ্দীপ্ত, ললাট প্রসারিত আর তার দুর্ব্বল অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ। রাত হইতেছিল তাই সেদিনের মত চলিয়া আসিলাম।

ইহার পর কয় দিন নানান কাজে আর নীলুর খবর পাই নাই এবং সেও আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। দুই-একদিনের মধ্যেই তাহার দেশে যাইবার কথা অথচ আজকাল করিয়া এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, নীলুর কোন সন্ধান পাইলাম না। তাই সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আবার দুইকেলাস রোডে গিয়া তাহার বস্তির ভিতর ঢুকিলাম। আজ আর খোঁজ করিবার প্রয়োজন হইল না, গতবার আসিয়া তাহার ঘর চিনিয়া গিয়াছি। নীলুর ঘরের দরজা খোলা আর ভিতরটা অন্ধকার। ডাকিলাম, নীলু ও নীলকণ্ঠ কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ নাই। কাহার নিকট খোঁজ লইব, তাহাই ভাবিতেছি। হঠাৎ অন্য ঘরের একজন বাসিন্দা তাহার দরজা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল কে—কাকে চান?

বলিলাম, নীলকণ্ঠ, যে এই ঘরে থাকত, তাকেই চাই।

লোকটি আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিল, ও নীলকণ্ঠ। তা আপনি কি কিছু জানেন না? তিনি ত নেই, মারা গিয়েছেন যে।

প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম, মারা গিয়েছে? নীলু মারা গিয়েছে—কবে?

—এই দিন-দুই হ'ল মশায়। মশাই, সে কি রক্ত। বিছানা বালিশ সব রক্তে একাকার। রাজব্যাধি হয়েছিল মশাই, যাকে বলে কালব্যাধি। ও মরা কি মশাই, কেউ ছুঁতে চায়। শেষে আমরাই না ক'জন মিলে—

বলিলাম, তার জিনিষপত্র ছিল যে, সে সমস্ত কোথায়?

লোকটি অত্যন্ত অশ্রদ্ধায় মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিল, আঃ, জিনিষ তো ভারি, ফুটো ঘটি একটা, টিনের মগ আর এনামেলের থালা। কাগজে জড়ানো ত্রিশটি টাকা ছিল তাই রক্ষে। সে সমস্ত খরচ হয়ে গিয়েছে মশাই। লোকজনকে দিতে হয়েছে, দু-এক বোতলের দামও দিতে হয়েছে নইলে ও মড়া কে ছুঁবে মশাই। আপনি কে হন তার?

একটা আর্ত্ত চীৎকার গলা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। ভিতরের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনকে কোনমতে চাপিয়া বলিলাম, আচ্ছা কতকগুলো লেখা খাতা ছিল সে সব কৈ? সেই সব খাতাগুলো?

লোকটি বলিল, হুঁ, হাঁ, কতকগুলো খাতা ছিল। দোয়াত কলম লেখা খাতাপত্তর সব তার সঙ্গে চিতেয় দিয়েছি। কি হবে ওসব বাজে কাগজ কতকগুলো রেখে বলুন। আর ওতে যে মশাই রাজব্যাধির বীজ, তাই যার জিনিষ তার সঙ্গেই দিয়ে দিলাম।

রাগ সামলাইতে না পারিয়া বলিলাম, বেশ করেছ, খুব করেছ।

লোকটি হঠাৎ আমার রাগের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া গেল। আমি আর তাহার দিকে না চাহিয়া রাস্তায় হাঁটিতে লাগিলাম। গলির মুখে দেখিলাম, এই বস্তিরই একটি ছেলের হাতে একটা প্লাষ্টিকের বাঁশী আর একটি রবারের বল। মনে হইল, এই দুটি খেলনা, বোধ হয় নীলু তাহার ছেলে বাবলুর জন্যই কিনিয়াছিল।

বাংলা 'রম্যরচনা'

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন হতে পারে সাম্প্রতিক কালে বহু-আলোচিত রম্যরচনার স্বরূপ কি? এর রূপ একটি, না বহু? রম্যরচনার গঠনভঙ্গী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এর গঠনের মধ্যে রয়েছে অলস ও এলোমেলো ভঙ্গিমা ও শ্লথভাব, বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণশীলতা। সাহিত্যিক পত্র-রচনাও এই রম্যরচনার অন্তর্গত একই ধরনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য। গঠনভঙ্গীর মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট ফর্মুলা বা পদ্ধতি মেনে না চলার প্রয়াসের জন্য এই সাহিত্যকর্ম একরূপী না হয়ে, হয়ে উঠেছে বহুরূপী। পত্ররচনার প্রাক্কালে মানুষ যেমন নিজেকে বিস্তারিত করে তোলে, করে তোলে সংযমের রূপরেখাগুলির প্রতি উদাসীন—নিজেকে প্রকাশ করে উজাড় করে আত্মরতির প্রেরণায়, রম্যরচনাতেও শিল্পী-মানস তেমনি সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গদ্যরচনার অন্যান্য ক্ষেত্রে পালিত ও পালিতব্য নিয়মকানুন-গুলিকে অস্বীকার করে। শিল্পীর রচনাশৈলী স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে এই সংযমের বাঁধ না মানার জন্য। নাটক ও ছোটগল্পে শিল্পী থাকেন পর্দার অন্তরালে। চরিত্রগুলিকে ও আখ্যানভাগকে পরি-চালনা করেন নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে। উপন্যাসে কখনও কখনও শিল্পী হঠাৎ যবনিকার অন্তরাল বা রঙ্গমঞ্চের পাশ থেকে উঁকি দিয়ে সরে যান রসপিপাসু মনের কৌতূহল জাগিয়ে। কিন্তু রম্যরচনার ক্ষেত্রে লেখক নিজেই পাত্র বা পাত্রী হয়ে পাদপীঠের সামনে হাজির হন। শিল্পী ও শিল্পের বিষয়বস্তু হয়ে যায় এক আত্মিক একযোগ-সূত্রে। ভিন্ন ভিন্ন রম্যরচয়িতার প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন হলেও তাদের নিজেদের প্রকাশ করার আকুলতার মধ্যে দেখা যায় একটি ঐক্য। কোন রচয়িতা চিঠির আকারে, কেউ রোজনামচার মাধ্যমে, কেউ সাংবাদিকতার আচ্ছাদনে, কেউ বা নিছক রসচিত্রের মধ্য দিয়ে, কেউ বা গোলাধুলি মনের এক একটি বিশেষ ভাবকে রসাত্মক গদ্যের আকারে রম্যরচনায় পর্যবসিত করে তোলেন। রম্যরচনার বিষয়বস্তু নিতান্তই গৌণ, রচনাশৈলীই মুখ্য। পৃথিবীর যে-কোন বিষয়বস্তু নিয়ে রম্যরচনা করা চলে, যদি থাকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে লেখকের আত্মিক যোগ যা দেয় শিল্পীর শিল্পে বিশেষ এক শৈলী ও ভঙ্গিমা। এই শৈলী বা ভঙ্গিমা হ'ল রম্যরচনার প্রাণবস্তু। এই প্রাণবস্তু যে লেখকের রচনায় যত বেশী প্রদীপ্ত সেই লেখক হয়ে উঠেন তত বেশী বরণীয়।

অনেকের মতে রম্যরচনা ফরাসী বাক্যাংশ Belles letters-এর দিশী প্রতিচ্ছবি। Belles letters-এর উপযুক্ত ইংরেজী প্রতিশব্দ আছে বলে মনে হয় না, এর থেকে ধরে লওয়া যায় ইউরোপে, ফরাসীদেশে Belles letters রচনার একটা রীতিমত প্রসার ছিল, যেমন ছিল সনেট রচনার বিশেষ আদর ইটালীতে। এক এক দেশে এক এক প্রকার রচনার প্রচলন ও আদর থাকে। এর প্রভাব পড়ে অন্যান্য দেশের উপর এবং এই প্রভাব তীব্র হয়ে দেখা দেয় যুগের আবহাওয়া ও পাঠকসমাজে তাগিদের ফলে।

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গি। সভ্যতার অগ্র-গতি, সমাজের চাহিদা ও সাহিত্য এবং শিল্পের ফর্ম ও টেকনিক পরম্পরের সঙ্গে জড়িত। সভ্যতার এই অগ্রগতির ধারার সঙ্গে সমান তালে চলতে গিয়ে সাহিত্যেরও 'ফর্ম' বদলেছে। প্রাচীন যুগের মহা-কাব্যের স্থান নিয়েছে আজ উপন্যাস—গদ্যরচনার এক বিশেষ ফর্ম। কিন্তু আজকের দ্রুতগতি দুনিয়া সাহিত্যকর্মে আরও এগিয়ে যেতে চায়, তাই চলে নব নব এষণা—কখনও সম্পূর্ণ নূতনকে সৃষ্টি করে, কখনও বা পুরাতনকে নূতনের সাজে সাজিয়ে। আধুনিকতম রম্য-রচনা কিছু পুরানো এমনি এক সাহিত্যকর্মের নবরূপায়ণ। ইহা গতিবাদী পাঠকসমাজের শিল্পক্ষুধা কতখানি মেটাবে তা পূর্ণভাবে বিচার করার দিন এখনও আসে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গুরুগম্ভীর সাহিত্য পাঠের একটা তাগিদ দেখা দিয়েছিল পাঠক-সমাজে। পৃথিবীব্যাপী আদর্শের সংঘাতজাত যুদ্ধ মানুষের মনে এনে-ছিল জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে চিন্তা করার, বিশ্লেষণ করার তাগিদ আর এই তাগিদ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ঐজাতীয় সাহিত্যের চাহিদা। কিন্তু যুদ্ধশান্তির সঙ্গে এই চাহিদা ধীরে ধীরে হ্রাস পেল। পাঠক-সমাজে এল একটি চাপল্য—অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে। গম্ভীর সাহিত্য পাঠের ইচ্ছা—তা প্রবন্ধ মারফতই হোক বা উপন্যাসের মধ্য দিয়েই হোক, স্তিমিত হয়ে এল। অথচ পাঠক, বিশেষতঃ শিক্ষিতসমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছে সাংবাদিক মানসিকতা: ফলে, নূতন ধরনের সাহিত্যকর্মের চাহিদা অনুভব করল পাঠক-সমাজ। নিছক গুরুগম্ভীর রচনা পাঠে মন নেই, অথচ নিছক হাল্কা গল্প ও উপন্যাস পাঠ সংবাদ মানসিকতার ক্ষুধা মেটাতে পারে না। পাঠকসমাজের এই মানসিক ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় হিসাবেই যুদ্ধোত্তর কালে পুনরায় সুরু হ'ল রম্যরচনার রেওয়াজ। রসপিপাসু মন ও সাংবাদিক মানসিকতার মিলনের ফলে এল হ'ল রম্যরচনার যুগ। গভীরতার স্থলে এল চোখঝলসানে [illegible] ছেলে [illegible] হাতের সৃষ্টি।

পূর্বেই বলেছি রম্যরচনার প্রাণবস্তু হ'ল তার [illegible] ও ভঙ্গী। ভাব এবং বিষয়বস্তু এখানে গৌণ। তাই [illegible] সাহিত্যে এক রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র বাদ দিলে এমন [illegible] হয়ে দেখা যায়, যার বিষয় বা ভাববস্তু চিরন্তন কোন [illegible] করে পাঠক-মনকে নাড়া দিতে পেরেছে। যদি কোন [illegible] র মধ্যে এই চিরন্তন সুর বা শাশ্বত কোন বাণী তুলে ধরা সম্ভব হয়, তবেই

ফিরে এলেন এবং আমাকেও ছেদ টেনে খাদ্যের সন্ধানে যেতে হ'ল। কাজেই কথা আর বাড়ল না। তবে ক্ষুধা বাড়ল। কিন্তু, আমার পছন্দমত খাদ্য কোথাও পেলাম না। ফিরে এসে ওঁকে বললাম বলি, "মিঃ, তুমি ত তবু আমার দেশে খেয়েছিলে। কিন্তু আমি যে না খেয়েই তোমার দেশ থেকে চললাম। তবে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। পথের দুঃখ পথেই রেখে গেলাম।"

এখান থেকে বাসে ত্রিবেন্দ্রাম যাওয়া যায়। ইচ্ছাসত্ত্বেও আর্থিক কারণে সে পথ ছেড়ে পূর্ব্বপথেই আমরা ফিরে চললাম এবং তিনেভেলিতে পালামকোটায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুন্দর বাসভবনে মিনিট পনেরোর জন্যে আতিথ্যগ্রহণ করে আফশোষ নিয়ে দেশের পথ ধরলাম।

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে ত্রিচিনপল্লী ও শ্রীরঙ্গমের বেদনাময় কাহিনীটি ভারতবাসীর বিশেষ করে দক্ষিণ দেশবাসীদের, জানা আছে। সেই ত্রিচিনপল্লীতে পৌঁছলাম সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে এবং আশ্রয় নিলাম সিন্ধীদের ধর্ম্মশালায়। পশ্চিম পাকিস্থান থেকে যেসব সিন্ধী ভারতে চলে এসেছেন, তাঁদের এক অংশ আশ্রয় নিয়েছেন এই শহরে। তাঁদেরই একটি বিদ্যালয় এই শহরে স্থাপিত হয়েছে। ছেলেমেয়েরা ত এখানে লেখাপড়া শেখেই, অনেক বয়স্ক ব্যক্তি, বিশেষ করে মহিলারাও, শেখেন সেলাইয়ের কাজ। ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ মহাশয় কেবল ধর্ম্মশালাটির তদারক করেন না, উঁচু ও সাজানো বেদীতে বসে ধর্ম্মশাস্ত্রও পাঠ করেন এবং ধর্ম্মোপদেশও দিয়ে থাকেন। সেটা দেখলাম পরে, কিন্তু তার আগে তাঁর সুমধুর মেজাজের পরিচয় লাভ করে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট পথিক আমরা পরম পুলকিত ও স্নিগ্ধ হলাম। সৌভাগ্য যে, যে সব চার-পাঁচ জায়গায় আমরা ছ'টি দীর্ঘাকার মানুষ বিছানা-পত্র নিয়ে আশ্রয় পেয়েছিলাম, সেখানে ছিলাম অল্পক্ষণই। বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছিল পথে, মন্দিরে ও কাবেরী নদীর তীরে।

ত্রিচিনপল্লীর শৈলমন্দিরে উঠতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতে হয় অনেকগুলি। মন্দিরটি দুর্গবিশেষ, উত্তর দিকে খরস্রোতা কাবেরী, ওপারে শ্রীরঙ্গম, মধ্যে ইংরেজের গড়া সেতু। সেতুপথে যানবাহন ও জনস্রোত চলেছে। এই শৈলদুর্গে ছিল টিপুর বারুদাগার এবং গায়ে এখনও যুদ্ধের চিহ্ন আছে। সঙ্গীরা দেখতে দেখতে উপরে উঠে স্বর্গলোকে অদৃশ্য হলেন। আমি অত তাড়াতাড়ি উঠতে পারলাম না, ধীরে ধীরে সোপান অতিক্রম করতে করতে পিছনে ফিরে দেখি এক সাধু তাড়াতাড়ি উঠে আসছে। তার শীর্ণ ঋজু দেহে ভস্ম, পরণে কৌপীন, মাথায় দীর্ঘ [illegible]কটি কোন্ দেশীয় বুঝতে পারলাম না। সে আমার পাশ দিয়ে কয়েকটি সিঁড়ি উপরে উঠেই [illegible]রে আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো যে, হ'ল [illegible] যেন তারই মত করে উপরে উঠতে ইঙ্গিত [illegible]ছে। অগ[illegible]জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অতি আয়াসে [illegible]কবারে মন্দিরে উঠে গেলাম। শীর্ষদেশের খানিক নীচে একখানি সুবিশাল কক্ষে আছে কষ্টিপাথরের অনেকগুলি মূর্ত্তি এবং প্রত্যেকখানিকেই কাপড় পরিয়ে রাখা হয়েছে। শীর্ষে যে মন্দিরটি আছে তার মধ্যে কে বন্দী বা বন্দিনী হয়ে আছেন জানতে পারি নি। সেখান থেকে ত্রিচিনপল্লী নগর, কাবেরী নদী ও ওপারে নারিকেল-অরণ্যমাঝে শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমন্দিরের সু-উন্নত গোপুরম অতি মনোরম দেখায়। দৃশ্যের একখানি ছবিও নিলাম।

অতঃপর নেমে এসে সকলে বাসে চড়ে চললাম শ্রীরঙ্গম। অপরাপর তীর্থস্থানের মতই এখানেও মন্দির ও বিগ্রহ মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কাল্পনিক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে—রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরে যাবার পথে এখানে 'হলট' করেছিলেন। যাই হোক, শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমূর্ত্তি যে শিল্পীর অনুপম সৃষ্টি এতে আর সন্দেহ নেই। শিল্পীর সুগভীর ধ্যানেই তাঁর মানসলোকে এই অমিয়মাখা মুখখানি প্রস্ফুটিত হয়েছিল। কে জানে এই মুখখানি রচনা করেও তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন কিনা। হয় ত তাঁর অন্তরে বেদনা ছিল যে, যা রচনা করলেন তাঁর অন্তরলোকের সত্যকে তা ঈষৎ স্পর্শও করতে পারল না!

মন্দির দর্শনার্থীরা সকলেই কাবেরীতে স্নান করেন। কলকাতায় কলের জলের স্রোতই কলকাতাবাসীদের অধিকাংশেরই কাছে গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরীর স্রোতোধারা। এই ধারা নিয়ে এক বাড়ির বহু ভাড়াটে ও বস্তিবাসীদের মধ্যে দাঙ্গাফ্যাসাদ বাধে এবং জীবনকে দুর্ব্বিষহ তিক্ত করে তোলে। কর্পোরেশন আবার ধারাটিতে মাঝে মাঝে উচ্চ চাপ, নিম্ন চাপ ও বন্ধ এই তিন রকমের খেলা দেখান। সেই কলকাতার লোক আমরা ইতিহাস-খ্যাত ও কাব্য-কাহিনীতে কথিত কাবেরীর জলে স্নানের লোভ সামলাতে পারলাম না। একালের বাংলার এক বিশিষ্ট কবির একখানি গানের দু'একটি কলিও মনে ছিল। কিন্তু গিয়ে দেখি, জলের স্রোত অতি প্রখর এবং নেমে দেখলাম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দায়। প্রবল স্রোতে পায়ের তলা থেকে বালুরাশি সরে যাচ্ছে। এর কূলে বসে কোন বালিকা 'আনমনে চম্পা-শেফালিকা' ভাসাতে ভাসাতে জলে স্খলিত হয়ে ভেসে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। তখন তার পিতৃ-পিতামহেরও সাধ্য নেই যে তাকে উদ্ধার করে। তার উপর নদীটিতে কুমীরও আছে। কূলে বসে থাকলে কুমীরাক্রান্ত হবারও বিপদ যথেষ্ট। তবে কবির কল্পলোকে সবই সম্ভব। তীরে অনেক বড় বড় অচেনা গাছ দেখলাম, কিন্তু "চম্পা-শেফালিকা"র দেখা পেলাম না। অবশ্য দক্ষিণের কোথাও তাদের দেখা পাই নি। হয় ত নদীটির উজানে বা ভাটিতে কোথাও ফুটে বা ফোটবার অবস্থায় থাকবে।

এপারের ঘাট থেকে ওপারের ত্রিচির শৈলমন্দিরটি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সামনেশে ঈষৎ লোহিত কাবেরী স্রোত, শীর্ষে পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চরণশীল মেঘ, পিছনে নীল আকাশপট, রবিকরে উজ্জ্বল স্বর্ণচূড়া।

সেইদিনই সন্ধ্যায় আমার চার জন সঙ্গী চলে গেলেন তাঞ্জোর। ছাত্র-সঙ্গীটির সঙ্গে আমি প্লাটফরমে বসে রইলাম। রেলগাড়ি তাঁদের নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং আমরা দু'জনও তার

ঘণ্টা কয়েক পরে মাদ্রাজের পথ ধরলাম। তাঁদের আগেই আমাদের মাদ্রাজে পৌঁছবার কথা হলেও তাঁরাই পৌঁছে গিয়েছিলেন আমাদের আগে। রেলগাড়ির, বিশেষ করে জনতার কামরা আগে দখল করার সুবিধা কি তা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীমাত্রেই অবগত এবং বিলম্বে পৌঁছনোর দুর্ভোগের কথাও বোধ করি কারও অবিদিত নয়। সে কথা আর এখানে নাই বললাম।

বেজওয়াড়ায় পৌঁছে হাত-পা ছড়াবার বেশ জায়গা পাওয়া গেল আর পাওয়া গেল ত্রিবেন্দ্রামের এক ক্যানভাসারকে। লোকটি বাঙ্কে বিছানা পেতে তার পথের সঙ্গীটিকে বালিশের তলায় গুঁজে রাখল এবং ঘুমোবার আগে পর্যন্ত সেটিকে মাঝে মাঝে বার করে তার মধুপান করতে লাগল, কিন্তু মাতাল হ'ল না। সে ত্রিবেন্দ্রাম থেকে আরম্ভ করে দাক্ষিণাত্যের কথা পরম দাক্ষিণ্যে বলে গেল।

পরদিন দুপুরের দিকে দেখলাম অদেখা চিল্কাকে—সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। তার নীল জল, বক্ষের বনাচ্ছন্ন বিচ্ছিন্ন শৈলগুলি, ধীবরদের পালতোলা নৌকা, দিগন্তবিলীন একটি অংশ, সব মিলিয়ে যেন ধরণীর বুকে আঁকা একখানি নৈসর্গিক ছবি। এ ছবিতে রঙ লাগানো আজও শেষ হয় নি। কিন্তু আমার কাহিনীটির এখানেই শেষ হ'ল, এবং শেষ কথাটি এই যে, মনোরম দক্ষিণের দেখলাম সামান্যই, তার অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগের অভাবে দেশটিকে জানলামও অল্পই।*

* ছবিগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত।

ওগো মোর ভীরু প্রিয়

শ্রীবীথিকা দেবী

ওগো মোর ভীরু প্রিয়—
সুগোপনতার আড়ালে আমারে ফেলে
চলে যেয়ো নাক' বিস্মৃত অতলতায়
শুধু চুপি চুপি কাছে এসে হেসে খেলে
চলে যেয়ো ফের পাখীর মতন বিহ্বল বনলতায়।

সেদিন আমার জেনো—
ফোটা ফুল হবে যত ছিল মোর আধফোটা কুঁড়িগুলি
দিনের আলোর বিদায় বেলায়, সাঁঝের অন্ধকারে।
ক্ষতি নেই কিছু যদি তুমি নাও সব ফোটা ফুল তুলি
রিক্ত শাখাই ফোটাবে কুসুম আর বার অভিসারে।

কথা যদি নাই বল—
চোখে চোখে রেখে শুধু বসে থেকো আমার বনানীতলে,
ঝিল্লির ডাক থামবে যখন নির্জন বন হতে
নীল আকাশের গলে পড়া নীল আমাদের পদতলে
নীল নদ হয়ে বয়ে যাবে ও যে অন্ধকারের স্রোতে।

মূক হয়ে যদি থাকো—
কোন ক্ষতি নেই স্রোতে দু'জনেই ভেসে যাবো কোন দিকে,
মালতী বনের ফুলের কাঁপনে দখিনের সমীরণে
ওড়কলমীর ধাপে ঠেকে হবে আকাশের রঙ ফিকে;
ক্ষতি নেই কোন, শুধু তুমি আমি, এই কথা রবে মনে।

ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেয়ো মন—
নত যদি হয় বিরহবিধুর সবুজ বনের পাতা
ঝির ঝির করে মৃদু মৃদু কাঁপে ধীরে;
হাতে হাত রেখো, নয়নে নয়ন, তরুতলে রেখো মাথা,
প্রেমগান যত গেয়ে যেয়ো ফিরে ফিরে।

অসম্ভব

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

এ কি রকম হ'ল! মরতে হয় তুই মর, না ওই কচি ছেলেটাকে নিয়ে টানাটানি কেন? আর তাও যদি করলি তবে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলে নিজে আবার ফিরে এলি কোন্ লজ্জার মাথা খেয়ে? মরণ, মরণ, অমন মুখে আগুন!

সমস্ত গ্রামটারই এই মত, বিশেষ করে মেয়েদের এবং তার মধ্যেও আবার মায়েদের। ব্যাপারটা হ'ল, মুখুজ্যেদের ছোট বৌটিকে কাল শেষ রাত্রির দিকে পাশের পুকুরে এক-গলা জলে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ধরেছিল গাঁয়ের চৌকিদার। কোলে তার মরা শিশু একটি, সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। চৌকিদার ভেবেছিল বৌটি মরা ছেলের শোকে পুকুরে আত্মহত্যা করতে এসেছিল, সে তাকে অনেক বুঝিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

ব্যাপারটা এইরকম হওয়াই স্বাভাবিক এবং হলেই ভাল ছিল কিন্তু শাশুড়ী তরঙ্গিণী গণ্ডগোল বাধালেন।

সকাল ভাল করে না হতেই পিল্ পিল্ করে মুখুজ্যে-বাড়ী লোকসমাগম হতে থাকে, গ্রামের বৈচিত্র্যহীন জীবনে এত বড় একটা সংবাদের লোভ সম্বরণ করা কঠিন। সান্ত্বনা —সেই বৌটির নাম—ভিজে কাপড়ে উঠানের এক কোণে লুটিয়ে পড়ে আছে, ছেলেটি নেই, বোধ হয় একটু আগেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তরঙ্গিণী বারান্দার উপরে একটা এলোমেলো ছেঁড়া মাদুরে বসে আছেন, চোখে-মুখে তাঁর নিদ্রার বিঘ্নজনিত বিরক্তির ছাপ পরিস্ফুট। মাঝে মাঝে আড়চোখে সান্ত্বনার দিকে চাইছেন, হয়ত কাল সন্ধ্যেবেলার ঝগড়ার কথাও চিন্তা করছেন।

কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলা প্রবেশ করেই সোজা তরঙ্গিণীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন—বলি ব্যাপারখানা কি মঙ্গলের মা?

তরঙ্গিণী ক্ষিপ্রহস্তে ছেঁড়া মাদুরখানা যতদুর সম্ভব বিছিয়ে দিয়ে বললেন—এস, বস সব। আর বলো না, ব্যাপারটা কি আমিই ছাই বুঝছি না হাজারবার জিজ্ঞেস করলেও ও হতভাগী বলবে!

বর্ষীয়সীরা বিশ্বাস করলেন, তাকিয়েই রইলেন। তাঁরা বনে-জঙ্গলে বাস করেন না, তাঁদেরও ঘর-সংসার আছে। শাশুড়ী হয়ে বৌয়ের খবর রাখে না, অন্ততঃ এমন একটি ব্যাপারে এ অসম্ভব।

অবশ্য তরঙ্গিণীর এটা শুধু জমি প্রস্তুত করে নেওয়া, তার পরই বীজ ফেলতে থাকেন।

—পাগল পাগল বুঝলে দিদি, একেবারে বদ্ধ পাগল, নইলে এ কাজ ভালমানুষ করতে পারে। ভয় হয় ও কবে আমারই গলাটা টিপে দেবে।

বিচিত্র নয়। ছেলেকে যে নিজের হাতে মেরে ফেলতে পারে, সে পারে না সংসারে এমন কাজ নেই। এটা অন্ততঃ কাউকে বোঝাতে হয় না।

একজন প্রাচীনা একটু তফাতে সিঁড়ির উপরে বসে পড়েছিলেন। তাঁর কানে তরঙ্গিণীর কথাগুলো যাচ্ছিল বটে, কিন্তু চোখদুটো ছিল সান্ত্বনার দিকে। অবশ্য দেখা যাচ্ছে কেবল ভিজে কাপড়খানা, কিন্তু তার নীচে আছে দেহ এবং তারও নীচে আছে মন, যেখান থেকে শোকের তরঙ্গ উঠে একেবারে শেষ সীমানায় এসে কাপড়ের তটে এলো-মেলো ভাবে আছড়ে ভেঙ্গে পড়ছে। তিনি অনেকক্ষণ ধরে সেই দিকে চেয়ে নিজের মনে একরকম যেন শুনতে শুনতেই বললেন—না, বো, ঠিক পাগলামি ত মনে হচ্ছে না।

তরঙ্গিণী সঙ্গে সঙ্গে কথাটা লুফে নিয়েই নিজের কপালে করাঘাত করে বললেন—তা হলে ত বাঁচতাম দিদি। কখন যে মাথাটা গোলমাল হয় কেউ বলতে পারে না, তা না হলে এমনিই। বলি, ও বৌ, কাপড়টা ছেড়ে এস যাও নইলে ভুগতে ত হবে শেষকালে এই আমাকেই। আমার যত হয়েছে ভুতের বোঝা আর কি!

সান্ত্বনা তেমনিই পড়ে রইল। কাপড় এমনিতেই শুকিয়ে উঠতে থাকে।

মঙ্গলময় শহরের এক ছোট মণিহারী দোকানের অল্প মাইনের একজন বিক্রেতা। মুখুজ্যেরা আগে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার ছিল, পরে নানাবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে বর্ত্তমান এই পতনদশায় এসে দাঁড়িয়েছে। সংসারটাও আগে ভরাট অবস্থায় ছিল, বাপ কাকা জ্যেঠা নাতি-নাতনী সব নিয়ে সে এক জমজমাট ব্যাপার। কিন্তু সে ছিল জমি-জায়গার কল্যাণে। মাটির সে স্নেহশক্তি আর নেই, সব বিক্রি হয়ে গেছে, তাই এখন জীবিকার খোঁজে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে খোঁজ রাখাই দায়। কেবল মঙ্গলময় এখনও গ্রামে

টিকে আছে, হয়ত ছিটেফোঁটা জমি এখনও আছে কিংবা বাইরে যাওয়ার সুযোগের অভাব, কিংবা হয়ত তরঙ্গিণীর ভিটেমাটির আকর্ষণ এবং সেই সঙ্গে মঙ্গলের মায়ের প্রতি আকর্ষণ। অর্থাৎ এ এমন এলোমেলো ব্যাপার যে সবই হতে পারে, আবার সঠিক কেউই বলতে পারে না।

সম্প্রতি মঙ্গলময় একটু মুশ্‌কিলে পড়েছে। কাল সে জেলার সদরে গিয়েছিল কতকগুলি মাল কিনতে। কলকাতায় যাবার কথা ছিল, কিন্তু কয়েকটি কারণে কিছু সুবিধা পাওয়াতে এই ব্যবস্থা। যাই হোক, আজ সকালে ফিরে এসে মালিকের কাছে মাল ও টাকার হিসাব মিলিয়ে দিতে গিয়ে কি রকম হঠাৎ গোলমাল বেধে গেল, দু'টাকা বারো আনার হিসাব কিছুতেই মিলল না।

মঙ্গলময় ভদ্রবংশের ছেলে, বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। মালিক সহসা কিছুই বললেন না বরং এমন ভাব দেখালেন যে, হারিয়েও ত যেতে পারে। কিন্তু মঙ্গলকে অত্যন্ত বিব্রত মনে হ'ল, কারণ তার যা অভাবের সংসার তাতে হারিয়ে যাওয়াটাই যে কি রকম দেখায়।

এই ভাবে উল্টেপাল্টে নানা ভাবে মিলিয়ে দেখিয়ে পরিশ্রান্ত হৃদয়ে মঙ্গল বাড়ী ফিরছিল। চোখে-মুখে তার যন্ত্রচালিতের মত নির্ব্বিকার চাহনি, কিন্তু তবু যেন মনে হয় কি একটা হিসাব সে তখনও করেই চলেছে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ তার মুখের ভাবটা বদলে গেল, সে একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে ময়লা ছেঁড়া কোটটার পকেটে হাত ভরে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে একটা বড় কৌটোমত জিনিস বার করে ফেলল। ভাল বিলিতী দুধগুঁড়োর কৌটো। মঙ্গল অত্যন্ত আদরে সুদৃশ্য কৌটোটির গায়ে হাত বুলোয় আর হাঁটে। চারিদিক নিঃশব্দ, শুধু তার শতছিন্ন চটিটা যেন একরকম অদ্ভুত প্রতিবাদ করতে করতে ধুলোয় লুটিয়ে পড়তে চায়।

তার পরের দৃশ্য। মঙ্গল মায়ের অদূরে বারান্দায় বসেছে, সান্ত্বনা তেমনিই পড়ে আছে। সংসারের কাজকর্ম্ম কিছুই হয় নি। তরঙ্গিণী বোধ হয় থামে হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছিলেন। মঙ্গলের পদশব্দে সচকিত হয়ে উঠে বসে যা বলার সমস্ত শেষ করে সম্প্রতি আবার হেলান দিয়ে বসেছেন। মঙ্গল হাঁ-না কিছুই বলে নি, কারণ এসব বিষয়ে বলারই বা কি আছে!

অনেকক্ষণ পরে কিছু বলতেই হবে এমনিভাবে সে আস্তে আস্তে বলে—কাল রাগারাগি হয়েছিল বুঝি?

এবারে তরঙ্গিণী ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন, কোলাহল করে বলে উঠেন—হ্যাঁ, আমি ত সংসারে সবাইকে মারধোর করবার জন্যই জন্মেছি। বলি, যাদের ভাত জোটে না তাদের আবার দুধের সখ কিসের? ভাত খেয়ে কি বাঁচত না? অত বড় ছেলেটা দিদি ত শেষকালে জল খাইয়ে মেরে—বলতে বলতে এবার তিনি সত্যিই কেঁদে ফেলে চোখে আঁচল চাপেন।

মঙ্গল হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়ল। কোন কিছু না পেয়ে মিছিমিছি হাত দু'খানা কোটের দুই পকেটে চালান করে দিয়ে ঘাড় সোজা করে উঁচু হয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে হাতে ঠেকল তার দুধের কৌটোটি আর মনে পড়ল তরঙ্গিণীর শেষ কথাটি। যোগাযোগ বটে! তাই ত, ভাত যে খেতে পারে না এবং দুধ যে পায় না, তার জল ছাড়া উপায় কি! সে হঠাৎ কি ভেবে চোখ তুলে তাকাল সান্ত্বনার দিকে, ভাবল, কিন্তু ও ফিরে এল কেন? প্রাণের মায়ায়? হঠাৎ এই খুনী কৌটির জন্য মঙ্গলের কি রকম যেন মমতা হয়, আর হাতটা কেবলই কৌটোর ওপরে ঘামতে থাকে। কলঙ্কের কথা বৈকি! কিন্তু খোকা তাকে অন্ততঃ একটি লজ্জার হাত হতে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। কালই সে দুধের কৌটোর হিসেব মিলিয়ে দিয়ে আসবে।

তরঙ্গিণী কিছুটা সামলে নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন—এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি, বাছা আমার কিছুতেই মরত না, সে তোমরা যাই কর আর যাই বল।

এ কথায় মঙ্গলের কেমন গোলমাল বেধে যায়। সে অল্প-স্বল্প মাথা নাড়ে, কিন্তু কথা দুটো কিছুতেই মেলাতে পারে না—যদি নাই মরবে তবে মরল কেমন করে?

মঙ্গলদা! ও মঙ্গলদা! বাড়ী ফিরেছ নাকি? বাইরে কার ব্যগ্র কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

মঙ্গল চোর-ধরা-পড়ার মত হাতদুটো পকেট হতে বাইরে এনে একটু সামলে নিয়ে সহজ ভাবে বলে—কে, ও?

কণ্ঠস্বর ততক্ষণে একেবারে দোরগোড়ায়, বলে—আমি তিনু, একটু পুকুরের দিকে গেছলাম। প্রসন্নকাকা তোমায় পাঠিয়ে দিতে বললেন, ওখানে পুলিস এসেছে নাকি। তুমি এগোও, আমি এই মাছ দুটো রেখে কাপড়টা বদলে এখুনি আসছি। যাও দেরি করো না—বলতে বলতে সে চলে গেল।

পুলিস! তরঙ্গিণী, মঙ্গল ও সান্ত্বনা একই সঙ্গে চমকে উঠে বসে পরস্পরের পানে চাইল। এবার আর দুধের গুঁড়ো আর চোখের জল নয়, সাক্ষাৎ পুলিস!

সান্ত্বনার চোখদুটো কি লাল, মুখখানা কি বিকৃত এবং এই নতুন বিপদের সম্ভাবনায় তাকে কি পরিমাণ কাতর দেখাচ্ছে। মঙ্গল তাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়েই উঠে পড়ে। চটিটা আলগা হয়ে পড়েছিল, সে দুটোকে পায়ে

ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সমস্ত শরীরটাকে নাড়া দিয়ে যতটুকু পারে ধুলো ঝেড়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধা সঙ্কোচও।

তরঙ্গিণী তার ভাবটা বুঝে চকিতে দাওয়া ছেড়ে প্রায় একলাফে তার সামনে এসে ব্যাকুল ভাবে বলে—তুই যাস নে মঙ্গল, তুই যাস নে। ওখানে গেলে ওরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়ে যাবে। বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর গলার জোর বেড়ে যায়, প্রায় শাসনের ভঙ্গিতে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে—আর কি এমন হয়েছে, এখানে আসুক না একবার, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওঃ ভাত-কাপড়ের ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই! ভারি বাহাদুর!

মঙ্গল একটু ম্লান হেসে বলে—কিন্তু এখানে ত আসবে না মা। বলে সে দরজার দিকে আরও দু'পা এগোয়। কিন্তু মুশকিল হ'ল তার দুধের কৌটোটি নিয়ে। না পারে ওটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে, কারণ কোথায় যেন বাধ-বাধ ঠেকে, আর না পারে মা-বৌয়ের সামনে বার করে রাখতে। সে কেবলি পকেটে হাত ভরতে থাকে আর এদিক-ওদিক তাকায়।

সান্ত্বনা কি বুঝল সেই জানে, কিন্তু সে আর থাকতে পারে না, একদৌড়ে এসে স্বামীর সামনে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে ফেলে বলে—ওগো আমায় সঙ্গে নিয়ে চল, আমি যাব।

মঙ্গল তার মনের ভাব বুঝতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বেদনায় দু'হাত বাড়িয়ে সান্ত্বনাকে উঠিয়ে আস্তে আস্তে বলে—পাগল! কোন ভয় নেই তোমার, আমি সব জানি। মা তুমি একে একটু ধর ত—বলতে বলতে সে ধুলো-কাদামাখা বিভ্রান্ত পত্নীকে মায়ের দিকে একটু এগিয়ে দেয় এবং এবারে সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে দুধের কৌটোটা বার করে তরঙ্গিণীর হাতে দিয়ে বলে—আর এটাও একটু ধর।

কৌটোটা দেখেই শাশুড়ী ও বৌ দু'জনেই চমকে উঠল, কারণ এর চেহারা অতি পরিচিত। মঙ্গল সেটা বুঝেও সহজ ভাবেই বলল—ওটা সাবধানে রেখো, কাল দোকানে নিয়ে যেতে হবে।

প্রকাণ্ড বাড়ী। জমিদার প্রসন্ন গাঙ্গুলী কাছারিবাড়ীর বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন, আশেপাশে কয়েক জন লোক বসে বা দাঁড়িয়ে ছিল। মঙ্গল পুলিসের দিকে নজর রাখতে রাখতে একেবারে তাঁর সামনে এসে পড়ল। প্রসন্নবাবু ওকে দেখে সোজা হয়ে উঠে বসলেন এবং ভারিক্কী সুরে বললেন—হ্যাঁ বল্ ত মঙ্গল, ব্যাপারখানা কি। যা শুনছি তা ত ভাল মনে হচ্ছে না।

মঙ্গল ভাবছিল পুলিসের কথা, চুপি চুপি বলল—বলছি কাকা, কিন্তু পুলিসের লোক কোন দিকটায়?

পুলিস? পুলিস আবার কোথায়। ও হো বুঝেছি। তা বাপু যা ব্যাপার তাতে পুলিস আসতেই বা কতক্ষণ? নে, বল দেখি খুলে এবার। বলে প্রসন্নবাবু আবার আরাম করে চেয়ারে গা ছড়িয়ে দিলেন।

মঙ্গল যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। একটু দম নিয়ে এবার সে সম্পূর্ণ স্পষ্ট কণ্ঠে বলে—ও কিছু নয় কাকা, ছেলেটা পরশু বিকেল হতেই কেমন করছিল। ও যে হবে সে একরকম জানাই ছিল।

তবে যে শুনছি অন্য রকম—বলে প্রসন্নবাবু একটু যেন সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকান। আশ-পাশের লোকেরাও পরস্পর একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করে।

কিন্তু মঙ্গলের দৃষ্টি একটুও কাঁপে না, সে একরকম নিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গেই জবাব দেয়—ওর আর রকম কি আছে কাকা, ওইটুকু ত জান।

তাই ত। প্রসন্নবাবু সহসা আর কিছু বলার খুঁজে পান না। একটু পরে বলেন—যাক না হলেই ভাল। আরে, আমি তখনই বলেছিলাম, এ হতেই পারে না। একি একটা কথা হ'ল, না মানুষে ঐ রকম কখনো করে—বলে তিনি বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে থাকেন।

পৃথিবী প্রসঙ্গ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

আমাদের পৃথিবী সৌরপরিবার-ভুক্ত নবগ্রহের মধ্যে গণনীয়। এই মেদিনী মহাশূন্যে অবস্থান করিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যের আকর্ষণ-শক্তিই পৃথিবীকে দীর্ঘবৃত্তাকার কক্ষপথে চলিতে বাধ্য করিয়াছে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী গড়ে ৯,৩০,০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্যকিরণ পৃথিবীতে পৌঁছিতে আট মিনিট সময় লাগে। সূর্য্যই মধ্যস্থলে স্থির রহিয়াছে আর পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ উহার চারিদিকে বিচরণ করিতেছে—এই সত্য পাশ্চাত্যে সর্ব্বপ্রথম পোল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেন।

এই পৃথিবী যে বিরাট বলের মত গোল তাহা প্রাচীন কালেই খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) বলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন, সূর্য্য ও চন্দ্রের আকৃতি গোল এবং গ্রহণের সময় পৃথিবীর যে ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয় তাহাও বৃত্তাকার—সুতরাং একান্ত স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবী গোলাকার। ভারতবর্ষেও পঞ্চম শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট, ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্য সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া যান যে, ভূমণ্ডলের গঠন গোলকাকার। ইহা ছাড়া, পৃথিবীর আকার সম্পর্কে অন্যান্য অনেক আধুনিক প্রমাণ আছে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ইজিপ্টে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া নগরের বিখ্যাত ভৌগোলিক ও গ্রন্থাগারিক ইরাটস্থিনিস (খ্রীঃ পূঃ ২৭৫-১৯৪) মাপিয়া দেখেন—পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫,০০০ মাইল। ধরিত্রীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ঈষৎ চাপা ও মধ্যস্থল কিঞ্চিৎ স্ফীত। প্রসিদ্ধ পর্তুগীজ নাবিক ফার্ডিনাণ্ড ম্যাগেলান (১৪৭০-১৫২১) ১৫১৯ সনে প্রথম জাহাজে করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

বৈজ্ঞানিকদের হিসাবে বসুন্ধরার ওজন ছেষট্টির পরে কুড়িটি শূন্য বসাইলে যত বড় সংখ্যা হয়, তত টন—এক টন ২৭ মণের সমান। এই ধরণী সর্ব্বদা সমস্ত বস্তু নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। ইহাকেই মাধ্যাকর্ষণ বলে। স্যর আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করেন।

পৃথিবীর গতি প্রধানতঃ দুই প্রকার—দৈনিক ও বাৎসরিক। ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে বা এক দিনে পৃথিবী নিজের চারিদিকে একবার আবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে অবনীর অর্দ্ধেক ভাগ একবার করিয়া সূর্য্যের আলো পায় এবং অপর অর্দ্ধেক ভাগ অন্ধকারে পড়িয়া যায়। যে অংশ যখন সূর্য্যের আলো পায় সে সময় সেখানে দিন এবং অন্য অংশ অন্ধকারে থাকার জন্য সেখানে তখন রাত্রি। দৈনিক গতি ছাড়া পৃথিবীর বাৎসরিক বেগও রহিয়াছে। পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ডে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। এই পরিভ্রমণকাল আমাদের এক বৎসর। এই সময় পৃথিবীর গতিবেগ সেকেণ্ডে সাড়ে আঠার মাইল। সাধারণতঃ ৩৬৫ দিনে এক বৎসর ধরা হয়। চার বৎসর অন্তর অতিরিক্ত পৌনে ছয় ঘণ্টা যখন জড়ো হইয়া এক দিনে পরিণত হয়, তখন উহা ২৮ দিনের ফেব্রুয়ারী মাসে যোগ দিয়া ২৯ দিন করা হয়। এই সব বৎসরকে 'লীপ ইয়ার' বলে।

পৃথিবী সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হয়। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ মেরু-প্রদেশে সূর্য্যকিরণ তির্য্যগ্‌ভাবে পতিত হয়। সেজন্য ধরিত্রীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত হিমশীতল ও চিরতুষারের রাজ্য। তথাপি অনেক বাধাবিপত্তি ও তীব্র শীত উপেক্ষা করিয়াও ১৯০৯ সনে কমাণ্ডার পিয়ারী উত্তর মেরুতে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন আর ১৯১১ সনে এমাণ্ডসেন দক্ষিণ মেরু অভিযান করিয়াছিলেন। পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে বা বিষুবমণ্ডলে সূর্য্যরশ্মি অধিকাংশ সময় সোজাভাবে পড়ে, এজন্য এই প্রদেশ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে। হিমমণ্ডল ও তাপমণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী স্থানকে সমমণ্ডল বলা হয়।

পৃথিবীর অক্ষ সোজা না থাকিয়া সাড়ে তেইশ ডিগ্রী হেলিয়া আছে, ইহার জন্য সূর্য্য-পরিক্রমণকালে ঋতু পরিবর্ত্তন হয়। বৎসরের যে সময় উত্তর গোলার্দ্ধ সূর্য্যের দিকে বেশী ঝুঁকিয়া গিয়া অতিরিক্ত আলোক ও উত্তাপ গ্রহণ করে তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল আর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সেই সময় শীতকাল। আবার অন্য সময় পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগ সূর্য্যের দিকে বেশী হেলিয়া গেলে সেই অঞ্চলে গ্রীষ্মঋতু হয়, আর উত্তর অংশে সেই সময়ে খুব অল্প সৌরতাপালোক পড়ার জন্য শীতঋতু থাকে। আমাদের দেশে এই দুই ব্যাপারকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বলা হয়। শীতকালে দিন ছোট ও রাত্রি বড় হয় আর গরমকালে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়। শরৎ ও বসন্তকালে পৃথিবীর অবস্থান এ রকম থাকে যে, তখন উভয় গোলার্দ্ধে প্রায় সমভাবে সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়। এই সময় দিনরাত্রি অনেকটা সমান থাকে এবং আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ হয়।

পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ, ইহার নাম চন্দ্র। চন্দ্র সাড়ে সাতাশ দিনে পৃথিবীর চারিদিকে এক বার ঘুরিয়া আসে। গগন-পর্য্যটনকালে কখনও কখনও চন্দ্র, পৃথিবী এবং সূর্য্য এক পংক্তিতে আসিয়া যায়, ইহার ফলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর গিয়া পড়ে, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। আবার চন্দ্র চলিতে চলিতে কোন সময় সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্যে আসিয়া পড়ে, চন্দ্র যখন এইরূপে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে তখন আমরা সূর্য্যগ্রহণ দেখি।

পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব সাড়ে পাঁচ অর্থাৎ সম-আয়তন একটি জলের গোলক অপেক্ষা পৃথিবী সাড়ে পাঁচ গুণ ভারী। অথচ পৃথিবীর উপরিভাগে যে সমস্ত শিলারাশি পাওয়া যায় তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব গড়ে মাত্র ২.৭। সেজন্য অনেক বিজ্ঞানীর মত পৃথিবীর অভ্যন্তরে লৌহের মত কোন গুরুভার পদার্থ সঞ্চিত আছে, কারণ লৌহের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.৫। পৃথিবীর ব্যবহার বিরাট চুম্বকের মত, সেজন্য চৌম্বক-শলাকা বা কম্পাস-কাঁটা সদাই উত্তর-দক্ষিণ দিকে অবস্থান করে।

পৃথিবীর উপরে উচ্চ পর্ব্বত ও সমতল ভূমি রহিয়াছে আর নিম্ন-ভাগে জল জমিয়া বিশাল সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীই বায়ুমণ্ডল দিয়া ঘেরা। পৃথিবীর উপরটা তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। স্থলের পরিমাণ ৫,৭৫,১০,০০০ বর্গমাইল আর জলের ব্যাপ্তি ১৩,৯৪,৪০,০০০ বর্গমাইল। সাগর-জল হইতে স্থলভাগের উচ্চতা সাধারণতঃ তিন হাজার ফুট। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বতচূড়া মাউন্ট এভারেষ্টের উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। প্রশান্ত মহাসাগরে এক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা ৩৫,৪০০ ফুট নির্ণীত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন স্থানের ব্যবধান ১২ মাইল।

এখন পাতালের বিষয় আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে উপরিভাগ ৪,০০০ মাইল হইবে। উপরকার ভূপৃষ্ঠ মাত্র ৪০ মাইল পুরু, এই স্তরে আবহাওয়া আক্রান্ত আগ্নেয় প্রস্তর বাসাল্ট ও গ্রানাইট আছে। ধরাপৃষ্ঠের শিলাসমূহ বিশ্লেষণ করিলে সাধারণতঃ এই সকল মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়—অক্সিজেন শতকরা ৪৭ ভাগ, সিলিকন শতকরা ২৮ ভাগ, এলুমিনিয়াম শতকরা ৮ ভাগ, লৌহ শতকরা ৫ ভাগ, ক্যালসিয়াম শতকরা ৩.৫ ভাগ, ম্যাগ্নে-সিয়াম শতকরা ২ ভাগ, সোডিয়াম শতকরা ২.৫ ভাগ, পোটাসিয়াম শতকরা ২.৫ ভাগ, অঙ্গার, ক্লোরিণ ইত্যাদি শতকরা ১.৫ ভাগ। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল খুব সম্ভব লৌহ ও নিকেলে গঠিত তরল এক গোলক, উহার উপর লৌহ ও শিলাসংযুক্ত নমনীয় ও নিরেট এক আবরণ, তাহার উপর কঠিন প্রস্তরের খোলা। মানুষ এ পর্য্যন্ত মাত্র পৌনে দুই মাইল গভীর খনি খুঁড়িতে সক্ষম হইয়াছে।

পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হইলেও ভিতরটা এখনও খুব গরম। আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত উত্তপ্ত ও গলিত শিলাস্রোত এবং ভূগর্ভনির্গত উষ্ণ প্রস্রবণ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের পরিচয় দেয়। বীরভূম ও রাজগীর অঞ্চলে গরম জলের ঝরণা অনেকেই দেখিয়াছেন। আসলে এই সব জায়গায়—উপরকার জল এক দিক দিয়া মাটির খুব নীচে প্রবেশ করে আর সেখান হইতে গরম হইয়া অন্য পথ দিয়া আবার উপরে উঠিয়া আসে। মাটি খুঁড়িয়া নীচে নামিলে কিছুদূর পর্য্যন্ত প্রতি ৬০ ফুট অন্তর এক ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা বাড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সূর্য্যের একাংশ কোনক্রমে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী এক জলন্ত গ্যাসের ঘূর্ণমান পিণ্ড ছিল, ইহা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া প্রথমে তরল পরে কঠিন অবস্থা লাভ করিয়াছে।

সমস্ত পৃথিবী ঘিরিয়া বায়ুর যে আবরণ রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে এই সব গ্যাসের অস্তিত্ব জানা যায়—অক্সিজেন শতকরা ২১ ভাগ, নাইট্রোজেন শতকরা ৭৮ ভাগ, আরগন,কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড, জলবাষ্প প্রভৃতি শতকরা ১ ভাগ। এই বায়ুরাশি সম্ভবতঃ ধরাপৃষ্ঠ হইতে কিঞ্চিদধিক দুই শত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। তাহার পর মহাশূন্য। দক্ষিণ আমেরিকার কণ্ডর নামক শকুনপক্ষী আকাশে চার মাইল উচ্চে উড়িতে পারে, আর কোন জীবই এত উর্দ্ধে যাইতে পারে না। এরোপ্লেনে করিয়া আকাশে উঠিলে কিংবা কোন পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিলে বেশ শীত বোধ হয়। প্রতি হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিলে তিন ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা কমিয়া যায়। এই নিয়ম কিন্তু দশ মাইল অবধি খাটে, তাহার পর কিছু দূর পর্য্যন্ত তাপমান স্থির থাকিয়া আবার কোন অজ্ঞাত কারণে বাড়িতে আরম্ভ করে।

সূর্য্যতাপে ভূমিসংলগ্ন বায়ুরাশি উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে আর অন্য স্থান হইতে শীতল বাতাস আসিয়া শূন্য স্থান পূরণ করে, এই-রূপে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। সাধারণ অবস্থায় বাতাসের গতি ঘণ্টায় পাঁচ মাইল, ঝড়ের সময় বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ষাট-সত্তর মাইল পর্য্যন্ত হইতে পারে। দুই শত মাইল উচ্চ বায়ুর স্তূপ সমতল স্থানের প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের ওজনের চাপ দিতেছে। ব্যারোমিটার নামক যন্ত্রের দ্বারা বায়ুর চাপ মাপা যায়। সাগর-তলে ব্যারোমিটারে পারদের দৈর্ঘ্য ত্রিশ ইঞ্চি থাকে। যত উপরে উঠা যায়, বায়ুর চাপ তত কমিয়া যায়। উর্দ্ধে প্রতি হাজার ফুট অন্তর ব্যারোমিটারের পারা এক ইঞ্চি করিয়া নামিয়া আসে। পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুস্রোত সর্ব্বদা উচ্চচাপ হইতে নিম্নচাপের দিকে ধাবিত হয়, এজন্য প্রবল ঝড়ের আগে বাতাসের চাপ হঠাৎ কমিয়া যায়।

মেঘ-বৃষ্টির কারণও সূর্য্যের উত্তাপ। প্রখর সূর্য্যতাপে সমুদ্রের জলরাশি বাষ্প হইয়া আকাশে গিয়া মেঘে পরিণত হয় এবং তাহাই আবার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়িয়া নদ-নদী দিয়া পুনরায় সাগরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বৃষ্টিজলের কিয়দংশ ছিদ্রময় মৃত্তিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া আরও নীচেকার নিশ্ছিদ্র শিলাশ্রেণীর উপর স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকে, সেজন্য মাটি খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়। আকাশে যে স্তর-মেঘ দেখা যায় তাহার উচ্চতা আধ মাইল কিন্তু স্তূপ-মেঘ এক মাইল উপরে অবস্থান করে, আর অলক-মেঘের অবস্থিতি প্রায় সাত মাইল উর্দ্ধে। ইহার উপরে যে বায়ুস্তর আছে তাহা ঝড়বৃষ্টি-শূন্য ও প্রশান্ত।

প্রায় কুড়ি মাইল উচ্চে উষ্ণ ওজন (Ozone) গ্যাসের যে স্তর আছে, তাহা শব্দতরঙ্গ প্রতিহত করে। আবার ৬০ মাইল উচ্চে হেভি-সাইড-কেনেলী স্তর নামক এক বিদ্যুৎকণাপূর্ণ স্থান আছে, উহার পরে ১৭০ মাইল উর্দ্ধে দ্বিতীয় আর এক বৈদ্যুতিক

স্তর রহিয়াছে, ইহাকে এপল্টন স্তর বলা হয়। উভয় বৈদ্যুতিক স্তরই অল্পাধিক রেডিওতরঙ্গ প্রতিহত করে। খুব উচ্চ পর্ব্বত-চূড়ায় আরোহণ করিলে কিংবা ঊর্দ্ধাকাশে উঠিলে প্রথমে তীব্র শীত-বোধ হয় আর বাতাসের চাপ হ্রাস হওয়ায় ও অক্সিজেনের অংশ কমিয়া যাওয়ায় নিঃশ্বাসের বড় কষ্ট হইতে থাকে। তথাপি ১৯৩৫ সনে ক্যাপ্টেন ষ্টিভেন্স ও এণ্ডার্সন নামক দুই জন অসমসাহসী আমেরিকান বৈমানিক বেলুনে করিয়া প্রায় চৌদ্দ মাইল উপরে উঠিয়াছিলেন।

সমুদ্রে যে বিশাল জলভাণ্ডার আছে তাহার মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস। সাগরজলে শতকরা প্রায় সাড়ে তিন ভাগ বিভিন্ন লবণজাতীয় পদার্থ দ্রব অবস্থায় আছে। বায়ুর সহিত সংঘর্ষের ফলে সমুদ্রের জলে অনবরত ঢেউ হয়। প্রচণ্ড ঝটিকার সময় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উচ্চ এবং প্রায় পাঁচ শত ফুট দীর্ঘ তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাগর-তরঙ্গ বেলাভূমির উপর আছড়াইয়া পড়ে আর শিথিল শিলাসমূহ অপসারিত করে। সমুদ্রের গভীরতা গড়ে বার হাজার ফুট। ১৯৫৪ সনে দুই জন ফরাসী নৌ-বিভাগীয় অফিসার—জর্জ্জ ও পিয়ারী উইলিয়াম, ইস্পাত-নির্ম্মিত গোলকে বসিয়া আটলান্টিক মহাসাগরে আড়াই মাইল নীচে নামিয়া-ছিলেন। সমুদ্রের যত নীচে নামা যায়, জলের চাপ তত বাড়িতে থাকে। দড়ি, কাঠ কিংবা কর্ক গভীর সাগরে নিমজ্জিত করিলে প্রবল চাপের ফলে পিষ্ট ও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ উপর হইতে নীচে দশ গজ অন্তর জলের চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের করিয়া বাড়িতে থাকে। এক মাইল নিম্নে প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে সাতাশ মণ ওজনের জলের চাপ পড়ে। জলমধ্যস্থ মৎস্যাদি প্রাণী এই বিপুল চাপ কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে না, কারণ ইহাদের শরীরের ভিতরকার চাপ বাহিরের জলচাপকে সমানভাবে প্রতিরোধ করে। সমুদ্রের তলায়ও বহুরকম জীব বাস করে।

ঠাণ্ডা জল ঘন হইয়া নীচে নামিয়া যায় আর গরম জল স্ফীত হইয়া উপরে উঠিয়া আসে, তাপের তারতম্যের জন্যই সাগর-স্রোতের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের তলায় জল প্রায় তুষার-শীতল, উপর-কার জলের তাপমাত্রা ৪০°—৮০° ফারেনহাইট থাকে। সূর্য্যের আলোক সাগরের নীচে বেশী দূর যাইতে পারে না। জলের ভিতর সাদা আলোকের গতি সচরাচর এক শত গজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাহার পর অত্যন্ত অন্ধকার আরম্ভ হয়। এই জন্য অনেক সামুদ্রিক জীবের শরীরে জোনাকির মত স্বাভাবিক আলো জ্বলিবার ব্যবস্থা আছে।

চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণের জন্য সাগরজল দিনে দুই বার স্ফীত হইয়া উঠে, ইহাকেই জোয়ার আসা বলে। এক জায়গায় যখন জলোচ্ছ্বাস হয় তখন অন্য স্থানের জল কমিয়া ভাটার সৃষ্টি হয়। এইরূপে জোয়ার ও ভাটা প্রায় ছয় ঘণ্টা অন্তর হইতে থাকে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় চন্দ্র-সূর্য্য ও পৃথিবী অনেকটা এক পংক্তিতে থাকে সেই জন্য তখন উভয়ের সম্মিলিত আকর্ষণের ফলে জোয়ারের জোর বেশী হয়। অপর সময় সপ্তমী বা অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্য সমকোণে থাকিয়া পৃথিবীর জলরাশিকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকর্ষণ করে, সেজন্য সে সময় জলস্ফীতি কম হয়।

পৃথিবীর উপরকার আদিম আগ্নেয় শিলা ঝড়-বৃষ্টি এবং শীত ও সূর্য্যতাপের প্রভাবে ক্রমশঃ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া শেষে মাটিতে পরিণত হয়। মাটির প্রধান উপাদান জলযুক্ত এলুমিনিয়াম সিলিকেট। জল, বায়ু ও শীতোত্তাপের প্রভাবে পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং চূর্ণীকৃত শিলারাশি হয় সেখানেই থাকিয়া যায়, নয় ত জলস্রোতের সহিত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। ইহা ছাড়া ধূলি ও বালুকণা বায়ু-বাহিত হইয়া স্থানান্তরে গমন করে। এক জায়গার ক্ষয়িত শিলা—জল বা বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হইয়া অন্যস্থানে অনবরত সঞ্চিত হইতেছে। পর্ব্বতাগত নদীর জল ঢালু জায়গা দিয়া গড়াইয়া গিয়া সাগর-সমীপবর্ত্তী মোহনায় অবিরাম প্রস্তরচূর্ণ ও মৃত্তিকাকণা নিক্ষেপ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস ও গঠনের কার্য্য যুগপৎ চলিতেছে। হিমালয়ের শিলা ক্ষয় হইয়া গাঙ্গেয় সমভূমি ও বঙ্গদেশ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই সব স্তরে স্তরে সঞ্চিত শিলাচূর্ণকে পাললিক প্রস্তর বলে। আর উত্তপ্ত গলিত অবস্থা হইতে যে শিলা ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া গিয়াছে তাহার নাম আগ্নেয় অশ্ম। চাপ ও তাপের প্রভাবে পাল-লিক শিলা কখনও কখনও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন উহাকে রূপান্তরিত শিলা বলা হয়। যেমন শেল নামক কাদা পাথর পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্লেটে পরিণত হয়। মর্ম্মর-প্রস্তর রূপান্তরিত চুণাপাথর ছাড়া আর কিছু ই নয়।

প্রায় দেড় হাজার বৎসরে পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগ এক ফুট আন্দাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেমন সমগ্র ভূমিভাগ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, তেমনই সমুদ্রের উপকূলে উহার অর্দ্ধেক স্থান জুড়িয়া নদ-নদী হইতে অনবরত পলি পড়িয়া সাড়ে সাত শত বৎসর অন্তর এক ফুট করিয়া নূতন ভূভাগ গঠিত হইতেছে। জলস্রোত, বায়ুপ্রবাহ, শীত, সূর্য্যতাপ, ভূকম্পন, অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিসঙ্কোচের ফলে সারা পৃথিবীময় বিরাট পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। কখন কখন কোথাও কোন ভূভাগ পার্শ্বচাপের ফলে উপরে উঠিয়া যায়, যেমন হিমালয় পর্ব্বত পাঁচ কোটি বৎসর পূর্ব্বে টেথিস নামক সাগরতল হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ হিমালয়-শীর্ষে অনেক-রকম সামুদ্রিক জীবের ছাপ, কঙ্কাল ও প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। আবার কোন কোন সময় হয়ত বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ বেশ খানিকটা নীচে বসিয়া গেল। সুইডেনের দক্ষিণ উপকূলবর্ত্তী সাগরজলে প্রাচীন যুগের ঘরবাড়ী ও রাস্তাঘাট নিমজ্জিত অবস্থায় দেখা যায়। ১৮১৯ সনে ভূমিকম্পের পর কচ্ছ উপসাগরের বেলাভূমি সমুদ্রজলে অনেকখানি নামিয়া যায়।

ভূকম্পন বিভিন্ন কারণে সঙ্ঘটিত হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ

বিকিরণের ফলে শীতল ও সঙ্কুচিত হইলে সেই সঙ্গে উপরকার শিলা-স্তরও বাঁকিয়া দুমড়াইয়া যায়, ইহার জন্য ভূতল কম্পিত হইতে থাকে। আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হইবার সময় আভ্যন্তরিক উষ্ণ বাষ্প-চাপের জন্য বসুন্ধরার উপরিভাগ কাঁপিয়া উঠে। ইহা ছাড়া ভূমিপাত ও স্তরচ্যুতির জন্যও ভূমি আন্দোলিত হইতে পারে। ভূকম্পনের সময় মাটি ফাটিয়া গরম জল বাহির হয় এবং জলপূর্ণ কূপ অকস্মাৎ শুষ্ক ও বালুকাপূর্ণ হইয়া যায়। রাস্তা ও নদীর গতি বাঁকিয়া যায়। কোন স্থান উত্তোলিত ও অন্য স্থান অবনমিত হয়। এক কথায় ব্যাপক বিপর্য্যয় ঘটে।

বসুমতীর বয়স আনুমানিক দুই শত কোটি বৎসর হইবে। প্রায় এক শত কোটি বৎসর আগে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটে, সর্ব্বপ্রথম সাগরজলে বীজাণু, এক-কোষ প্রাণী ও শৈবালের উৎপত্তি হয়। ইহার পঞ্চাশ কোটি বৎসর পরে বিবিধ খোলসধারী জীব, চিংড়ি, কাঁকড়া, বিছা, শামুক এবং জলজ কীট ও উদ্ভিদের জন্ম হয়। প্রায় চল্লিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে মেরুদণ্ডযুক্ত জলচর মৎস্য ও স্থলজ উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। ত্রিশ কোটি বৎসর আগে কীটপতঙ্গ ও উভচর ভেক আবির্ভূত হয়, এবং ফার্ন শৈবাল প্রভৃতি সমস্ত অপুষ্পক গাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, ঘটনাক্রমে মাটির নীচে চাপা পড়িয়া তাপের প্রভাবে এখনকার কয়লায় পরিণত হয়। পনর কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীময় এক শ' ফুট দীর্ঘ টিকটিকি গিরগিটিজাতীয় বিরাটকায় সব সরীসৃপ বিচরণ করিত। মাত্র দশ কোটি বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জন্তু ও বিবিধ প্রকার বায়ু-বিহারী পক্ষী এবং সপুষ্পক বৃক্ষসমূহ আবির্ভূত হইয়াছে। গত দশ লক্ষ বৎসরের মধ্যে ধরাধামে মানুষ আসিয়াছে এবং মাত্র দশ হাজার বৎসরের ভিতর আশ্চর্য্যরকম সভ্যতার বিকাশ এবং শেষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই আদিম জলচর এককোষ জীবের ক্রমবিকাশের ফলেই শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। প্রাথমিক হইতে আধুনিক, সকলপ্রকার জীবের স্বাভাবিক বা শিলীভূত দেহাবশেষ ভূপৃষ্ঠে স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। এই স্তরবিন্যাসের বিষয় উইলিয়াম স্মিথ (১৭৬৯-১৮৩৯) আবিষ্কার করেন আর প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশের কথা ১৮৫৯ সনে ডারুইন (১৮০৯-১৮৮২) প্রকাশ করেন।

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত প্রায় সাত লক্ষ প্রকার প্রাণী এবং তিন লক্ষ রকম গাছপালার বিষয় ভালভাবে জানা গিয়াছে। জগতে পাঁচ লক্ষ প্রকার পতঙ্গ, কুড়ি হাজার রকম মাছ, তিন হাজার বেঙজাতীয় উভচর, পাঁচ হাজার সরীসৃপ, তের হাজার চতুষ্পদ জন্তু এবং আটাশ হাজার রকম পাখী রহিয়াছে। ইহা ছাড়া অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সংখ্যাও অগণিত। মানুষের সংখ্যা প্রায় দুই শত পঞ্চাশ কোটি হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বেকার হিসাবমতে প্রতি মিনিটে এক শ' কুড়ি জন লোক জন্মগ্রহণ করে আর এক শ' জন ইহলোক ত্যাগ করিয়া যায়। সুতরাং মিনিটে কুড়ি জন করিয়া লোক বাড়ে। সাধারণতঃ জনসংখ্যা প্রতি বৎসর শতকরা এক ভাগ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় স্থির ছিল এবং জন্ম-মৃত্যুর হার প্রায় সমান ছিল। আর জীবজগতেও শত্রু এবং সংক্রামক ব্যাধি ও খাদ্যের সীমা সর্ব্বদা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। সেই জন্য ইতরপ্রাণীর কখনও অযথা সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না, জন্ম ও মৃত্যু সাধারণতঃ সাম্যাবস্থায় থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে ক্ষুদ্র প্রাণী সংখ্যায় বেশী থাকে আর বৃহৎ জীব সংখ্যায় কম।

সাধারণ সবরকম গাছ মাটি, জল ও বাতাস হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া দেহ গঠন করে। গাছের সবুজ পাতা দিনের বেলায় সূর্য্যালোকের সাহায্যে বায়ুমধ্যস্থ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইতে কার্ব্বন বা অঙ্গারটুকু আত্মসাৎ করিয়া বাকি অক্সিজেন পরিত্যাগ করে এবং মাটি হইতে শিকড়ের দ্বারা শোষিত জল ও খনিজ লবণ সহযোগে শরীর গঠন করে। নিরামিষাশী জীবজন্তু উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভোজন করিয়া জীবনধারণ করে আর আমিষভোজী প্রাণী তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করে। মানুষ ও আর সব জীবজন্তু নিশ্বাসের সহিত অক্সিজেন, লইয়া উহার সাহায্যে দেহমধ্যস্থ খাদ্যবস্তু দগ্ধ করিয়া জীবনীশক্তি লাভ করে, আর প্রশ্বাসের সহিত কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলবাষ্প বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে কার্ব্বন বা অঙ্গার অণু উদ্ভিদ হইতে প্রাণীদেহে এবং প্রাণী হইতে উদ্ভিদ-শরীরে পুনঃ পুনঃ সঞ্চারিত হইতে থাকে। জীবিত জীবজন্তুর নাইট্রোজেনবহুল মূত্র ও পুরীষ মাটিতে পড়িলে সার হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে আর কোন জীব মরিয়া গেলে তাহার শরীর বিকৃত ও বিগলিত হইয়া পুনর্ব্বার বায়ু এবং মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যায়। সুতরাং উদ্ভিদজাতি পুনরায় শরীরগঠনের সকল উপাদান মাটি ও বাতাস হইতে সহজেই সংগ্রহ করিতে পারে। প্রকৃতির রাজ্যে কোন বস্তু কণামাত্র বিনষ্ট হয় না, রাসায়নিক চক্র অবিরাম আবর্ত্তিত হইতে থাকে।

সবশেষে ভৌগোলিক তথ্যের সমাবেশ করা যাইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম নদী আমেরিকায় মিসিসিপি-মিসৌরির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,০০০ মাইল। বৃহত্তম হ্রদ ক্যাস্পিয়ান সাগরের বিস্তার ১,৬৫,৫২০ বর্গমাইল। সর্ব্বাপেক্ষা বড় দ্বীপ গ্রীনল্যাণ্ড ৮,৪৬,৭৪০ বর্গ-মাইল বিস্তৃত। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা ৩৫,০০,০০০ বর্গমাইল। এখানে বৎসরে দশ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয়। সাহারার উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত লিবিয়াতে আজিজিয়া বলিয়া এক জায়গায় এত গরম যে, সেখানে তাপমাত্রা ১৩৬° ফারেনহাইট পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আবার অন্য দিকে ভারকোয়ানস্ক নামক সাইবিরিয়ার এক গ্রামে শীতকালে এত দারুণ ঠাণ্ডা হয় যে, তাপমাত্রা শূন্য হইতে আরও ৯০° ফারেনহাইট নীচে নামিয়া যায়। আসামের চেরাপুঞ্জীতে বৎসরে প্রায় পাঁচ শত ইঞ্চি বারিপাত হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি মৌনালোয়া হাউই দ্বীপে অবস্থিত, ইহার উচ্চতা ১৩,৭৬০ ফুট, গহ্বরের ব্যাস ১২,৪০০ ফুট। তিব্বতের অন্তর্গত ফারি শহর ১৪,৩০০ ফুট উচ্চে

অবস্থিত। ভেনিজুয়েলার অন্তর্বর্তী এঞ্জেল জলপ্রপাত ৩,২১২ ফুট উচ্চ। পৃথিবীর বৃহত্তম জীব আমেরিকার সিকুইয়া গাছ ৩০০ ফুট উচ্চ, ৩০ ফুট প্রস্থ, ২,০০০ টন ভারী। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দৃশ্যমান আনুবীক্ষণিক জীবাণুর বিস্তার এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ আর ওজন এক গ্রেণের সাত লক্ষ কোটি ভাগ মাত্র।*

* এই প্রবন্ধরচনায় শ্রীকণিকা দাস ও শ্রীদীপালি দাস আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

ব্যবধান

শ্রীকালিদাস রায়

রামধন তাঁতী গামছা বুনিয়া ফেরি করে দ্বার দ্বার
গামছার আছে আকছার দরকার।
হরিধন ভড় বোনে মিহি শাড়ী দেয় তায় জরিপাড়
শহরের সাথে চলে তার কারবার।
হরি ভড় যত বড় কারিগর হোক
পাড়ার লোকের নয় আপনার লোক।
মদন কুমোর হাঁড় সরা গড়ে হাটে করে বিক্রয়
জন্মে তাহার সঙ্গে সবার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।
নরহরি পাল দেবীর প্রতিমা গড়ে,
তারে দরকার দু-চার জনার ঘরে।
প্রতিমা দেখিতে সারা গ্রামখানি জোটে
কে গড়িল তার খোঁজও লয়নাক' মোটে।

কেনারাম মুচি বাজায় ঢোলক ঢাক,
প্রতি পার্বণ পরবেই পড়ে ডাক।
বাবুরাম দাস গড়েছে একটা রসানচৌকি দল
অধিগত তার সানাইবাঁশীতে সব সুরকৌশল।
সভ্য সমাজে তার সমাদর হয়
গাঁয়ের লোকের কাছে বাবুরাম মুচি ছাড়া কিছু নয়।

ক'রে থাকে বেচু লাউ ঝিঙে কচু আলু বেগুনের চাষ
গাঁয়ের লোকের সব তরকারী দরকারী বারোমাস।
মধু মোড়লের বাগানে জন্মে আনারস তরমুজ
দাড়িম্ব খরবুজ।
গাঁয়ের হাটে ত বিকায় না তার মাল,
গঞ্জেরই সাথে চলে তার কারবার।
গাঁয়ে তার বাড়ীঘর
গাঁয়ের কাছে সে তবু চিরদিন পর।

জাতীয় জীবনে সর্বত্রই এই ধারাটিই চলে
এ ভেদবুদ্ধি রুদ্ধ হবে না কভু আইনের বলে।
চটে কার্পেটে, বিড়ি সিগারেটে, কাস্তে ও তরোয়ালে,
মোড়ায় সোফায়, ডুলি চৌদলে, কাঁথা কাশ্মীরী শালে।
রঙ ও রসানে, পানি ও পানায় তফাৎ রয়েছে ভারি,
ইংরাজী ভাষা ভাগ করে থাসা 'নেসেসারি লাক্‌সারি।'
চারুশিল্পীর, কারুশিল্পীর মত নয় নাম যশ
একের আদর করিবে হাজার অন্যের জনদশ।
সুধী জ্ঞানী গুণী শিল্পী করে না ক্ষোভ
বস্তাপচা সে সস্তা লাভের প্রতি নাই তার লোভ।
বীণা ছেড়ে গুণী বাজাবে না ঢাক ঢোল
ধ্রুপদ খেয়াল ছেড়ে সে দেবে না কভু গোলে হরিবোল।

সেই নিশীথে

শ্রীঅরবিন্দ পালিত

পাত্রপাত্রী

শশাঙ্ক মিত্র—অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী
প্রমীলা দেবী—ঐ স্ত্রী
বিশ্বজিৎ মিত্র—ঐ পুত্র, তরুণ যুবক, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার
ক্যাপ্টেন মুখার্জ্জি—শশাঙ্কর বন্ধু, যুদ্ধ-ফেরত ক্যাপ্টেন।
শনি চৌধুরী—বিশ্বজিতের সহকর্ম্মী

[মঞ্চদৃশ্য—মহানগরীর উপকণ্ঠস্থিত একখানি ছোট বাড়ীর একটি ঘর। মঞ্চ কোণাকুনি ভাবে সাজানো। বাঁ দিকে বাড়ীর ভিতরে যাবার দরজা। তার পাশেই একটা র‍্যাক। তার উপরটা টেবিলের মত ব্যবহৃত হয়। উপরে রয়েছে একটা ফুলদানি, তাতে কিছু রজনীগন্ধার ঝাড়; একটা টাইমপীস; আরও কয়েকটি টুকি-টাকি জিনিসপত্র। ডান দিকে একটি আধুনিক ধরনের জানালা। তাতে গরাদ নেই, পরদা লাগানো। তার পাশেই বাইরে যাবার দরজা। ঘরের মাঝখানে বড় টেবিল। তার তিন দিকে তিন খানি চেয়ার, একটি টুল। দেয়ালে একটি এসরাজ টাঙানো।]

প্রথম দৃশ্য

[যবনিকা উঠলে দেখা গেল—প্রমীলা দেবী ডান দিকের টুলে বসে কি একটা বুনছেন। পশমের গোলাটা টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে। টেবিলের উল্টোদিকে বিশ্বজিৎ আর শশাঙ্কবাবু গভীর মনোনিবেশ সহকারে দাবা খেলছেন। প্রমীলা দেবী মাঝে মাঝে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাচ্ছেন। টেবিলের উপর একটা ঘেরাটোপ দেওয়া আলো। দেখেই বোঝা যায় শশাঙ্কবাবু হারছেন; বাঁ হাতটা অনবরত মাথায় চালিয়ে চালিয়ে চুলগুলো বিপর্য্যস্ত, এলোমেলো; চোখমুখ কুঁচকে রয়েছে; চশমাটা কপালের উপর তোলা। বিশ্বজিৎ খুব তৃপ্তির দৃষ্টিতে তার সদ্য-দেওয়া চালটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মাথাটা মৃদু মৃদু দুলছে। শশাঙ্কবাবু একবার বড়েটা টিপছেন, কখনও বা গজটা নিয়ে নাড়ছেন। কিন্তু ভাল চাল একটাও দিয়ে উঠতে পারছেন না। বাইরে যাবার দরজাটা ভাল ভাবে বন্ধ করা। বাইরে ঝড়বৃষ্টির গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; জানালার পরদাটা দমকা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।]

প্রমীলা। [হাতের উল-কাঁটা টেবিলের উপর রেখে] উঃ! কি দুর্য্যোগের রাত। [উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে] রাস্তায় জল যা জমেছে, তাতে এবার নৌকো চালাতে হবে। [জানালা বন্ধ করে দিলেন।]

শশাঙ্ক। [বোর্ডের দিকে তাকিয়ে] নৌকো তলিয়ে গেছে গিন্নী। এবার গজ ছাড়া আর উপায় নেই।

প্রমীলা। [ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসতে বসতে] হুঁ! তুমি আবার খেলবে বিশুর সঙ্গে। তা হলেই হয়েছে।

শশাঙ্ক। [অবশেষে একটা চাল দিয়ে বিজয়ীর মত মুখভঙ্গী করে] এই! এইবার তোমাকে পেয়েছি! দাও ত বিশু, এবার একটা চাল। দেখি তোমার দাবা এবার বাঁচে কি করে।

বিশ্বজিৎ। [কৌতুক করে] ওহো! সত্যি বাবা, আপনি কি অদ্ভুত খেলেন! তাই নয় মা?

প্রমীলা। সে কিরে? শেষকালে তুই হেরে গেলি ওনার কাছে।

বিশ্বজিৎ। হায় ভগবান! বাবা এত বড় বড় চালের কথা ভাবছেন যে, এই ছোট্ট ভুলটা ওঁর নজরে পড়ে নি। [বিশ্বজিৎ একটা চাল দিল।]

শশাঙ্ক। [উত্তেজিত হয়ে] না, না, আমি ওটা দেখেছি। ওকি, ওকি! ও চালটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

বিশ্বজিৎ। বা রে! তা কি করে হয়? খেলার নিয়ম যে তা নয়!

শশাঙ্ক। [বিরক্ত হয়ে] আরে দূর ছাই! রেখে দাও তোমার ঐ সব নিখুঁত নিয়ম-কানুন। আর তুমি যে রকম হালকা ভাবে খেলছ, তাতে কি আর ভেবে চিন্তে কোন চাল দেওয়া যায়। যত সব—

প্রমীলা। বটেই ত। এখন তুমি হারছ কিনা, তাই দোষটা হ'ল ওর। বক বক করাটা থামিয়ে চাল দাও। দেখি, ওকে কি রকম আটকাতে পার।

বিশ্বজিৎ। [হেসে উঠে] বাবা আমাকে আটকাবেন? তা হলেই হয়েছে। কৈ, কি চাল দিলেন?

শশাঙ্ক। [বিশ্বজিৎকে একটু অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করে] ওঃ! বাইরে কি ঝড়ের আওয়াজ!

[এই সময় আবার ঝড়ের গর্জ্জন শোনা গেল; স্কাইলাইট দিয়ে বিদ্যুৎ-চমকানির আলো এসে পড়ল।]

বিশ্বজিৎ। [গভীর মনোযোগে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে।] এ্যা! হ্যাঁ! যা বলেছেন। সত্যিই তো—এই নিন্—কিস্তি—

শশাঙ্ক। [তখনও অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করে] আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন মুখার্জ্জী আজ রাত্তে আর আসতে পারবেন না। কি বিশু, তুমি কি বল?

[শশাঙ্ক একটা চাল দিলেন।]

বিশ্বজিৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি যা বলি তা হ'ল এই—এই—এই মাৎ—

[উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালেন।]

শশাঙ্ক। [বিরক্তিতে ফেটে পড়ে ঘুটিগুলি সব এলোমেলো করে দিয়ে] শহরের বাইরে থাকার এই হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ ফল। এত দূরে কোন বন্ধু-বান্ধব আসতে পারে না। আর তোমার মত ইয়ং ম্যান শুধু বাড়ীতে বসে বসে, এই সমস্ত অলস খেলা নিয়ে মেতে থাকবে।

বিশ্বজিৎ। [শশাঙ্ককে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে] কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বাবা, ক্যাপ্টেন মুখার্জী আজ নিশ্চয় আসবেন! কথা যখন দিয়েছেন—

শশাঙ্ক। [বাধা দিয়ে] আরে রেখে দাও তোমার কথা। এই নোংরা রাস্তা, পথে ঘাটে কাদা, একটু বৃষ্টি পড়লেই একহাঁটু জল, পাণ্ডববর্জ্জিত জায়গা; এখানে কোন ভদ্রলোক আসতে পারে! নাম আবার মনোমোহন এভিনিউ। (হঠাৎ স্ত্রীর দিকে ফিরে রাগত স্বরে) বলতে পার, এখানকার কাউন্সিলারবা ভেবেছে কি? জায়গাটার বাসিন্দা অল্প দু'চার জন লোক বলে কি তারা এ দিকে একবার ফিরেও তাকাবেন না? আমি এক বার জানতে চাই তাদের ব্যাপারখানা।

প্রমীলা। [একটু হেসে] তুমি অত চটে উঠছ কেন? আজ হেরে গেছ বলে কি কালও হারবে? কাল ত জিততেও পার। তবে—

শশাঙ্ক। কি বললে! কাল জিততে পারি! কাল! তার মানে তুমি কি বলতে চাও। ওঃ তো (উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন) ঠিক! তুমি ঠিক ধরেছ গিন্নী, তুমি ঠিক ধরেছ। মনের ভেতরে কি হচ্ছে, তুমি ঠিক ধরেছ দেখছি।

প্রমীলা। তুমি বল কি গো। আজ তিরিশ বছর ধরে তোমার সঙ্গে ঘর-সংসার করলাম, আর তোমার মনের কথা বুঝতে পারব না। এই যে আজকের ঠাণ্ডা রাতটায় তোমার একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে, একি তুমি বলতে তবে বুঝব। [বলতে বলতে তিনি উঠে র‍্যাকের কাছে গেলেন এবং ট্রের ওপর চায়ের সরঞ্জাম গোছাতে লাগলেন।]

বিশ্বজিৎ। [জানলার ধার থেকে সরে এসে] যাই বলুন বাবা। জায়গাটা খুব খারাপ নয়। আর বাড়ীটাও পাওয়া গেছে বেশ ছোট্ট, সাজানো। আপনার ঐ শহরের মাঝখানে, চারিদিক চাপা, আলো-হাওয়া বন্ধ বাড়ীর চেয়ে আমার তো এ-বাড়ীটা খুব ভাল লাগে। কি বল মা। আর আপনার নিশ্চয় ভাল লাগে বাবা; তা না হলে আর পয়সা খরচ করে এ বাড়ী কিনেছিলেন।

শশাঙ্ক। [গজরাতে গজরাতে] হ্যাঁ, তবে আর কি। খুব ভাল কাজ করেছি। এই অখদ্য জায়গায় বাড়ী কিনতে পাঁচ হাজার টাকা ধার করেছি। নিজের গালে নিজেরই চড় মারতে ইচ্ছে করছে।

বিশ্বজিৎ। [চেয়ারের পেছনে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে] টাকাটার জন্ম আপনি একটুও ভাববেন না বাবা। যে প্রমোশনটা কোম্পানী আমাকে দেবে বলেছে, সেটা যদি পেয়ে যাই তা হলে বছর-তিনেকের মধ্যে সব দেনা আমি শুধে দেব।

শশাঙ্ক। তোমাকে আর দেনা শোধ করতে হবে না। তোমার মা যেরকম তোমার বিয়ের জন্ম উঠে পড়ে লেগেছেন, তাতে তোমাকে বিয়ে করিয়ে ঘর সংসার গুছিয়ে দিতে পারলে হয়।

বিশ্বজিৎ। আপনারা সেই আশাতেই থাকুন, আমায় সেরকম ছেলে পেয়েছেন কিনা?

প্রমীলা। তার মানে! তুই বিয়ে করবি না নাকি? বড় হয়েছিস, ভাল চাকরি করছিস, এখন যদি তোকে বিয়ে না করাই, লোকে বলবে কি? (বলতে বলতে ট্রে হাতে নিয়ে টেবিলে এসে রাখলেন।)

বিশ্বজিৎ। তুমি কিছু ভেব না মা। বিয়ের জন্ম সারা জীবনটাই তো পড়ে রইল। এখন আমার বিয়ে করবার সময় কোথায়? পাওয়ার হাউসের ডায়নামোগুলো যা হিংসুটে মা, ওরা আমাকে এক মিনিটের জন্ম ছেড়ে দিতে চায় না।

শশাঙ্ক। [অল্প একটু হেসে] সত্যি। মাঝে মাঝে যখন রাতে ঘুম আসে না, তখন শুয়ে শুয়ে ভাবি—বিশু যদি এখন একটু ঘুমিয়ে পড়ে আর তোমাদের—ঐ কি বলে যে—ঐ ডায়নামোগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় তো ব্যস—সারা কলোনীটা একেবারে অন্ধকার। বেশ মজা না! [বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন।]

বিশ্বজিৎ। মজা! আপনি বলছেন কি বাবা। আমি ঘুমিয়ে পড়ব! গোটা কলোনীটার আলো যে আমার হাতে।

[বাইরে দরজায় করাঘাত]

প্রমীলা। ওগো শুনছ, কে যেন কড়া নাড়ছে।

[আরও জোরে করাঘাত]

শশাঙ্ক। [দরজার দিকে তাকিয়ে] মুখুজ্জেই এল বোধ হয়। মিলিটারীর লোক, কথা যখন দিয়েছে—দেখত বিশু [বলতে বলতে দাবা ঘুঁটি ইত্যাদি গোছাতে লাগলেন।]

বিশ্বজিৎ। [দরজা খুলতে খুলতে] দেখ, আজ আবার উনি ওঁর গল্পের ঝুলি ভরে আমাদের জন্ম কি এনেছেন।

[শশাঙ্ক দাবার বাক্স র‍্যাকের ওপর রাখল]

প্রমীলা। [ব্যস্ত হয়ে কাপ-ডিশগুলো গোছাতে লাগলেন।] দেখিস, দরজা সবটা খুলিস না; বৃষ্টির ঝাপটায় সব ভিজে যাবে।

[বিশু একটা পাল্লা চেপে ধরে দরজাটা একটু খুলল; হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল তার গায়ে। ক্যাপ্টেন মুখার্জী প্রবেশ করলেন—পরনে সামরিক পোশাক। তার উপর রেন-কোট, টুপি, তা থেকে জল ঝরছে। বাঁ হাতটা নেই।]

বিশ্বজিৎ। আসুন, আসুন ক্যাপ্টেন মুখার্জী।

শশাঙ্ক। এস, এস, চট করে ঢুকে পড়। যা জলের ঝাপটা—

মুখার্জী। কি দুর্যোগ! কি দুর্যোগ! (বলতে বলতে বিশুর সাহায্যে কোট টুপি ইত্যাদি খুলে দরজার পাশে হ্যাট র‍্যাকে ঝুলিয়ে দিলেন।) কোথায় তোমাদের বাড়ী, বাবাঃ! শ্মশানের ধার থেকে প্রায় মাইলখানেক। আর কি রাস্তা! একহাঁটু জল-কাদা—তার ওপর ঝড়-বৃষ্টি। মনে হচ্ছিল চুলগুলো পটাপট ছিঁড়ে যাবে।

বিশ্বজিৎ। [চেয়ারটা মুখার্জীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে] এই রে! নিয়েই তো গেছে দেখছি। (বলে তাঁর চকচকে টাকের দিকে তাকাল।)

মুখার্জী। [কপট ক্রোধের ভঙ্গীতে] বটে! আমার সঙ্গে ঠাট্টা! জানিস তোর বাপের চেয়ে আমি ছ'মাসের বড়।

প্রমীলা। আঃ বিশু, কি হচ্ছে। মিঃ মুখার্জী, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। এই দুর্যোগে যে আপনি আসবেন তা ভাবি নি।

[মিঃ মুখার্জী চেয়ারে বসলেন। প্রমীলা ভেতরে গেলেন।]

শশাঙ্ক। তোমার ছড়িটা এবার হাতছাড়া কর দেখি। (ছড়িটা নিয়ে 'হ্যাট র‍্যাকে'র পাশে রেখে দিলেন। প্রমীলা ভেতর থেকে গরম জলের কেটলী আনলেন।)

প্রমীলা। নিশ্চয়, এখন এক কাপ গরম গরম চায়ে আপত্তি হবে না।

মুখার্জী। এমন দুর্যোগের মাঝেও আপনি আতিথ্য ভোলেন নি দেখছি। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ লোভেই তো এলাম এত ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে।

প্রমীলা। [চা তৈরি করতে করতে] সত্যি, এই ঝড়-বৃষ্টিতে এলেন কি করে?

[চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলেন]

মুখার্জী। [চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে] আঃ! এ আর কি? কোহিমার জঙ্গলে কোমর পর্যন্ত কাদা-ভরতি ট্রেঞ্চে, মশা, মাছি, পোকা-মাকড়, ঝড়-বৃষ্টি, তার ওপর আছে শত্রুপক্ষের বুলেট। তার তুলনায়—হু—

[পেয়ালায় চুমুক দিলেন]

প্রমীলা। [শশাঙ্ককে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে] কেন? আপনাদের সঙ্গে ছাতা ছিল না?

মুখার্জী। ছাতা (উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন) যা বলেছেন! শশাঙ্ক, শুনছ, ছাতা: রেনকোট, গলোশ, হট-ওয়াটার বটল—এ্যা বলেছেন বটে। ভাগ্যিস আপনি সৈন্য-জীবনের একটুও আঁচ পান নি।

বিশ্বজিৎ। [একটু আহত হয়ে] মা অবশ্য সে হিসেবে বলেন নি। আপনাদের কষ্টের কথা শুনে—

মুখার্জী। হ্যাঁ রে বাপু হ্যাঁ, তা জানি। বুঝলেন মিসেস মিত্র, কঠোরতা—একমাত্র কঠোরতাই সৈনিক জীবনের সঙ্গে জড়ানো। অনাহার, অর্দ্ধাহার, অসুখ-বিসুখ, বিনা চিকিৎসা, তার পর একদিন গুলি খেয়ে টপ করে মারা যাওয়া। এই হ'ল আমাদের ভাগ্য। আর আমার নিজের বরাতেও অনেকটা সেই রকম হয়েছিল।

প্রমীলা। অবশ্য আপনাকে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না যে আপনি খুব কষ্ট সহ্য করেছেন। শুধু এই হাতটাই যা—

[কাটা হাতটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন]

মুখার্জী। [কোটের বাঁ দিকটা খুলে একটা পদক দেখিয়ে] ঐ জন্যই তো এটা পেলাম। [বিশ্বজিতের দিকে তাকিয়ে—(সে চা খাচ্ছিল না)] কি হে, তুমি চা খাচ্ছ না যে। তুমি কি চা ছাড়লে, না সামাজিকতা ছাড়লে।

বিশ্বজিৎ। [মৃদু হেসে, চেয়ারে বসে] কোনটাই না। তবে এখন চা খেলে রাতে আর ভাল খিদে হয় না। সারারাত কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। আর কাজ করতে করতে একটু অন্যমনস্ক হলেই ব্যস—একেবারে ডায়নামোর ভেতর।

প্রমীলা। [উদ্বিগ্ন ভাবে] না, না বিশু, তোকে এখন আর চা খেতে হবে না।

বিশ্বজিৎ। [একটু হেসে] না, মা, না। তোমাকে অত ভয় পেতে হবে না।

মুখার্জী। সত্যি! তোমরা—ইলেকট্রিসিয়ানরা—আশ্চর্য্য। যাদুকরের মত তোমাদের ক্ষমতা। তোমরা বললে, আলো—অমনি চারিদিক আলোয় ভরে গেল। তোমরা বললে, শক্তি—অমনি ঘরঘর করে ট্রাম, বাস, ট্রেণ চলতে সুরু করল। তোমরা বললে, জ্ঞান—অমনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ল। আমি স্বীকার করি, হিমালয় আর আসামের জঙ্গলে সাধুসন্ন্যাসীদের যেসব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা আমি দেখেছি, তার তুলনায় তোমাদের এই সব ম্যাজিক খুব কম-দরের নয়।

বিশ্বজিৎ। বলেন কি! সেই সব ভণ্ড সাধুসন্ন্যাসীদের চালাকির সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানের তুলনা করছেন।

মুখার্জ্জী। [উত্তেজিত ভাবে] ভণ্ড সন্ন্যাসীদের চালাকি! বটে! আমি নিজের চোখে দেখেছি, তা জান হে ছোকরা!

বিশ্বজিৎ। [শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে] বেশ বলুন ত, কি আপনি দেখেছেন।

মুখার্জ্জী। [সমান উত্তেজিত ভাবে] মণিপুরে একটা ছোট পাহাড়ের তলায় আমি একবার একজন লোককে দেখেছিলাম—লোকটা প্রায় উলঙ্গ—তার হাতে একটা খালি ঝুড়ি ছিল—(প্রমীলার দিকে ফিরে) কি রকম খালি বুঝেছেন—এই—এই যে চায়ের কাপটা দেখছেন ঠিক এই রকম খালি—(চায়ের পেয়ালাটা তুলে দেখালেন)

শশাঙ্ক। ওগো, কাপটা ভরে দাও।

প্রমীলা। [একটু হেসে] কৈ দিন। (কাপটা নিয়ে ভরে দিলেন)।

মুখাজ্জী। আরে না, না, আমি ভয়ে দিতে বলি নি। মানে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলাম—মানে—

বিশ্বজিৎ। হ্যাঁ মানে আপনার সেই সাধুর ঝুড়িও এমনি ভাবে নানারকম জিনিষ দিয়ে ভরে যেত—এই ত! ও ম্যাজিক কি করে দেখাতে হয় তা আমি পড়েছি। শুধু একটু প্র্যাকটিস দরকার—আর ভাল হাত-সাফাই, তা হলে আমিও করতে পারি। এর চেয়েও বেশ একটা কড়া ধরনের ছাড়ুন দেখি।

মুখাজ্জী। আরও কড়া! বটে! টিডিম থেকে প্যালেল যাবার পথে একবার এক ফকিরকে দেখেছিলাম। সে একটা দড়ি নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিত। বুঝলে শূন্যে ছুঁড়ে দিত—আর দড়িটা খাড়া দাঁড়িয়ে থাকত। যেন হুক দিয়ে উপরে বাঁধা—আর তার পর সেই দড়ি ধরে ফকির উপরে উঠত, (হাত নেড়ে নেড়ে দেখাতে লাগলেন) উপরে উঠতে উঠতে সে কোথায় মিলিয়ে যেত; আর তাকে দেখা যেত না।

[সবাই অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন মুখাজ্জীর দিকে তাকিয়ে রইল; বিশ্বজিৎও। একটু পরে বিশ্বজিৎ টেবিলের দিকে ফিরে এক টুকরো কেক্ প্লেটে নিয়ে মুখাজ্জীর দিকে এগিয়ে দিল, অত্যন্ত বিনীত ভাবে।]

মুখাজ্জী। [ডিশটার দিকে তাকিয়ে] এটা কি হবে?

বিশ্বজিৎ। [বিনীত ভাবে] আপনি যে অপূর্ব্ব গল্পটা ছাড়লেন, তার জন্য কিঞ্চিৎ—

[শশাঙ্ক ও প্রমীলা হাসতে লাগল]

মুখাজ্জী। তার মানে তুমি বলতে চাও আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না।

প্রমীলা। না, না, তা নয়। বিশু আপনাকে একটু রাগাতে চাইছে। বিশু কি হচ্ছে তোমার!

শশাঙ্ক। আরে তুমি চটছ কেন? আজকালকার ছেলে-ছোকরা, ওরা জানেই বা কি আর দেখেছেই বা কতটুকু। ওদের কথাবার্ত্তাই ঐ রকম।

[বিশ্বজিৎ কেকের প্লেটটা নামিয়ে রাখল; তার পর চেয়ারটা সরিয়ে প্রমীলার কাছে আনল।]

মুখাজ্জী। ঘটনাটা পুরোপুরিই সত্যি। এ ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা আমি আরও দেখেছি—কিন্তু না, তোমাদের আর সে সমস্ত শোনাব না।

শশাঙ্ক। মাথা খারাপ, মুখাজ্জী। তোমার মাথা খারাপ! (চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে) ছেলেমানুষদের কথায় কান দিতে আছে। [চেয়ারটা মুখাজ্জীর কাছে সরিয়ে এনে] আচ্ছা, সেই যে একদিন বলেছিলে, কি এক আশ্চর্য্য বাঁদরের থাবা—না কিসের গল্প—সেই যে (বিশ্বজিৎকে ইসারা করল)।

বিশ্বজিৎ। প্লীজ ক্যাপ্টেন মুখাজ্জী—গল্পটা বলুন। সত্যি বলছি—আর যাই হোক আপনার গল্পগুলো খুব ইণ্টারেষ্টিং।

মুখাজ্জী। [গম্ভীর ভাবে] না, না, সে কিছু না। সে বাজে গল্প, শোনবার মত নয়।

প্রমীলা। [আশ্চর্য্য হয়ে] বাঁদরের থাবা সে আবার কি—নিশ্চয় খুব আশ্চর্য্যের ব্যাপার, ক্যাপ্টেন মুখাজ্জী।

শশাঙ্ক। আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যে সেদিন, হরিচরণের বাড়ীতে তুমি বলেছিলে—

মুখাজ্জী। [একটু বিরক্ত হয়ে] না, না, ও গল্পটা থাক। (তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা মুখের কাছে তুলে ধরলেন। তারপর কাপটা দেখলেন।) আরে! খালি হয়ে গেছে। যখনই আমার ঐ থাবাটার কথা মনে পড়ে যায়, তখনই আমার সবকিছু কেমন যেন ভুল হয়ে যায়।

শশাঙ্ক। [মুখাজ্জীর কাপটা টেনে নিয়ে চা ভরতি করতে করতে] তুমি যে বল, সেটা তুমি সব সময়ে সঙ্গে নিয়ে বেড়াও।

মুখাজ্জী। তা করি বটে, পাছে একটা অঘটন ঘটে যায়। (কি যেন ভাবতে লাগলেন) পাছে—পাছে—

শশাঙ্ক। [চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে] এই নাও।

প্রমীলা। কিন্তু, বাঁদরের থাবা নিয়ে কি হয়?

মুখাজ্জী। ব্যাপারটা যদি আপনাদের কাছে বলি তবে আপনারা নিশ্চয় বিশ্বাস করতে পারবেন না।

বিশ্বজিৎ। না, না, আমি প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করব। সত্যি বলছি।

মুখাজ্জী। কিন্তু এ প্রায় ম্যাজিকের মতই আশ্চর্য্য, হেসে উড়িয়ে দেবার মত ব্যাপার নয়।

বিশ্বজিৎ। না, না, হাসব না। সত্যি সত্যিই আপনার কাছে আছে নাকি বাঁদরের থাবাটা—

মুখাজ্জী। [গম্ভীর ভাবে] আছে বৈ কি।

বিশ্বজিৎ। [ব্যগ্র ভাবে] কৈ কোথায় আছে? দেখান না জিনিষটা। (মুখাজ্জী এক হাতে চায়ের কাপ নিয়ে পকেটের দিকে তাকাতে লাগলেন। প্রমীলা এগিয়ে এসে ওঁর হাত থেকে কাপটা নিয়ে ট্রের ওপর গুছিয়ে রাখলেন। তিন জনেই উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে মুখাজ্জীর দিকে তাকিয়ে রইলেন; প্রমীলা দাঁড়িয়ে।)

মুখাজ্জী। অবশ্য এটার মধ্যে দেখবার বিশেষ কিছু নেই। (পকেট হাতড়াতে লাগলেন) এমনি একটা সাধারণ বাঁদরের থাবা—ছোট্ট—চামড়াটা শুকিয়ে চিমড়ে পাকানো হয়ে গেছে—

[পকেট থেকে বার করে প্রমীলার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন]—এই যে।

প্রমীলা। [দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন। মৃদু আর্ত্তনাদ করে পিছিয়ে গেলেন] ইস-স, কি বিশ্রী!

বিশ্বজিৎ। কৈ দেখি, দেখি। (মুখাজ্জী শশাঙ্ককে দিলেন। শশাঙ্ক দেখে বিশ্বজিৎকে দিলেন) আরে! এ যে সত্যিই সব শুকিয়ে গেছে।

মুখার্জ্জী। আমি ত তাই বলছিলাম। (বাইরে প্রচণ্ড হাওয়ার গর্জ্জন।)

প্রমীলা। [কেমন যেন শিউরে উঠে] শুনছ, বাইরে কি ঝড়!

[আস্তে আস্তে টুলের ওপরে বসে পড়লেন]

শশাঙ্ক। [বিশ্বজিতের কাছ থেকে থাবাটা নিয়ে] কিন্তু এর মধ্যে আশ্চর্য্যের কি আছে?

মুখার্জ্জী। [দৃঢ় ভাবে] আছে। এই থাবাটার একটা অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি আছে।

শশাঙ্ক। [চমকে উঠে] এ্যা। কি বললে। [চমকে থাবাটা তাড়াতাড়ি মুখার্জ্জীর হাতে দিয়ে দিলেন।]

মুখার্জ্জী। [গম্ভীর ভাবে, থেমে থেমে] হাঁ। এক বুড়ো ফকির এই থাবাটায় সেই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দিয়েছেন। শুনেছি, খুব পুণ্যাত্মা তিনি। একই জায়গায় বসে বসে তিনি পনর বছর সাধনা করেছেন। কত যে তাঁর বয়স কেউ জানত না। বয়সের ভারে বেঁকে দুমড়ে গিয়েছিলেন। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন— মানুষ যত চেষ্টাই করুক না কেন, ভাগ্যই মানুষকে পরিচালিত করে। জন্ম থেকেই মানুষের ভাগ্য ঠিক হয়ে থাকে; কেউ তার বাইরে যেতে পারে না। আর কেউ যদি যাবার চেষ্টা করে তাকে তিক্ত অভিজ্ঞতাই লাভ করতে হবে। [থেমে, একটু ভেবে] তাই তিনি এই জিনিষটার ওপর একটি ঐশ্বরিক ক্ষমতা অর্পণ করেন। অবশ্য তার জন্য এই বাঁদরের থাবাটারই যে দরকার ছিল তা নয়; তবে হাতের কাছে যা পেলেন, সেইটাই নিলেন। হ্যাঁ—যা বলছিলাম—এই থাবাটার এমনই গুণ যে তিন জন লোক (তিন জনের দিকে এক বার তাকালেন)

মুখার্জ্জী। প্রত্যেকে এর কাছ থেকে তিনটি মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে। (শশাঙ্ক, বিশ্বজিৎ হো হো করে হেসে উঠল, প্রমীলা ভীত ভাবে একটু হাসলেন)

প্রমীলা। এই! এই! চুপ—আঃ, আস্তে!

মুখার্জ্জী। (আরও গম্ভীর ভাবে) কিন্তু—(শশাঙ্ক, বিশ্বজিৎ তাকাল) কিন্তু, মনে রেখ যদিও তাদের তিনটে ইচ্ছে পূরণ হবে, তবুও পরে তাদের এই ভেবে অনুতাপ করতে হবে যে, ইচ্ছাগুলো পূর্ণ না হলেই ভাল হ'ত।

শশাঙ্ক। কিন্তু ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হবে কি ভাবে?

মুখার্জ্জী। তা অবশ্য ফকির বলেন নি। তবে সেগুলো খুবই স্বাভাবিক উপায়ে হবে। মনে কর, আজ তুমি একখানা বাড়ী চাইলে। কাল তুমি খবর পেলে যে, তোমার কোন এক আত্মীয় মারা যাবার সময়ে তোমাকে একখানা বাড়ী দিয়ে গেছে। এমনকি এও মনে হতে পারে যে, এর সঙ্গে থাবাটার কোন যোগ নেই।

বিশ্বজিৎ। তা ক্যাপ্টেন মুখার্জ্জী, আপনি নিজে এক বার চেষ্টা করে দেখেন নি কেন?

মুখার্জ্জী। [গম্ভীর ভাবে, একটু থেমে] আমি দেখেছি।

বিশ্বজিৎ। [আগ্রহান্বিত হয়ে] আপনি তিনটে প্রার্থনাই জানিয়েছিলেন।

মুখার্জ্জী। [একই রকম গম্ভীর ভাবে] হ্যাঁ, জানিয়েছিলাম।

প্রমীলা। আপনার ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হয়েছিল?

মুখার্জ্জী। [কিছুক্ষণ ল্যাম্পটার দিকে তাকিয়ে রইলেন] তাও হয়েছিল। (চুপ করে ঐ দিকে তাকিয়ে রইলেন)

শশাঙ্ক। [উদ্বিগ্ন ভাবে] আর কেউ ইচ্ছে করেছিল?

মুখার্জ্জী। হ্যাঁ, করেছিল। প্রথম যার কাছে এটা ছিল, সেও তিনবারই ইচ্ছে করেছিল। (একটু ভেবে) আর তার তিনটা ইচ্ছেই পূর্ণ হয়েছিল। তার প্রথম দুটো ইচ্ছের কথা আমার জানা নেই। কিন্তু (একটু দৃঢ় ভাবে) তার শেষ প্রার্থনা ছিল, মৃত্যু— [সবাই চমকে উঠল] হ্যাঁ, মৃত্যু। এর পর থাবাটা আমার হাতে আসে। [আবার গম্ভীর হয়ে পড়লেন]

শশাঙ্ক। [জিজ্ঞাসু ভাবে] আচ্ছা মুখুজ্জে তোমার যদি তিনটে ইচ্ছে পূর্ণই হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে এটাতে ত তোমার আর প্রয়োজন নেই। তবে তুমি এটাকে আর রেখে দিয়েছ কেন?

মুখার্জ্জী। [হাতে-ধরা থাবাটার দিকে তাকিয়ে] এটা আমার একটা খেয়াল। মাঝে মাঝে ভাবি যে, এটা বেচে দেব, তারপর ভাবি সেটা কি ঠিক হবে? হাজার হোক, জিনিষটা অভিশপ্ত ত। তা ছাড়া আমার মনে হয় কেউ ওটা কিনবে না। কারণ, কেউ ভাববে এ একটা গাঁজাখুরি গল্প। আর কেউ কেউ ভাববে, আগে পরখ করেই দেখা যাক না, তারপর না হয় দাম দেওয়া যাবে।

প্রমীলা। [একটু ভীত ভাবে হেসে উঠলেন] আচ্ছা, আপনার যদি আরও তিনটে ইচ্ছে থাকত, আপনি চাইতেন?

মুখার্জ্জী। [আস্তে আস্তে হাতের তেলোর ওপর বাঁদরের থাবাটার ওজন বুঝতে বুঝতে, ওটার দিকে তাকিয়ে] এ্যা—আমি—আমি না—বোধ হয়—বোধ হয়—কি জানি, ঠিক বলতে পারি না। (হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) ছি, ছি, আমার মত লোভীর মৃত্যুই ভাল। [দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সবাই চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল।]

শশাঙ্ক। [ব্যস্ত ভাবে] আরে আরে তুমি করছ কি?

মুখার্জ্জী। [উত্তেজিত ভাবে] না, না, মানুষের সমাজে এই অভিশপ্ত জিনিষটার কোন প্রয়োজন নেই। একে আমি এখুনি ফেলে দেব। [জানালা খুলতে চেষ্টা করলেন]

শশাঙ্ক। [দৌড়ে এসে ওর হাত ধরে] না, না, তুমি এটা ফেলে দেবে কেন?

প্রমীলা। [শশাঙ্কর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে] আহা! উনি যখন ফেলেই দিচ্ছেন, দিন না। শুনছ, ওটা ফেলেই দাও।

শশাঙ্ক। [মুখার্জ্জীর হাত থেকে থাবাটা কেড়ে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে] না। তোমার যদি দরকার না থাকে, বেশ ত আমাকে দিয়ে দাও। (চেয়ারে এসে বসলেন)

মুখার্জ্জী। [উত্তেজিত ভাবে] না, না, তুমি ওটা নিয়ে কি করবে! ফিরিয়ে দাও আমাকে। [বলতে বলতে হাতটা এগিয়ে দিলেন]

প্রমীলা। [কাতর ভাবে] আঃ! কি করছ! ফিরিয়ে দাও না ওটা।

শশাঙ্ক। [শান্ত ভাবে] তোমার যখন দরকারই নেই এটা, আর বিক্রীও যখন করবে না, তখন আমার কাছে রাখতে দোষ কি?

মুখার্জ্জী। [নিজের চেয়ারের কাছে ফিরে, বসতে বসতে] বেশ! আমার কিন্তু আর দায়িত্ব রইল না। ভবিষ্যতে যদি কিছু অঘটন ঘটে, আমাকে দোষী করো না।

[হঠাৎ কাতর ভাবে] শশাঙ্ক ভাই, কেন এ নিয়ে জেদাজেদি করছ। ফেলেই দাও না। ওটা কি হবে তোমার?

শশাঙ্ক। [দৃঢ় ভাবে] না, এটা আমি রাখব। তুই কি বলিস বিশু?

বিশ্বজিৎ। [তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে] রেখে দিন, আপনার যদি ইচ্ছে হয়—যত সব বাজে ব্যাপার। আপনিও যেমন—

শশাঙ্ক। [থাবাটার দিকে তাকিয়ে চিন্তিত ভাবে] বাজে ব্যাপার। হুঁ! আশ্চর্য্য—(হাল্কা ভাবে) আচ্ছা, আমি ইচ্ছে করি (ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, কি ইচ্ছে করা যায়]

মুখার্জ্জী। [ব্যস্ত হয়ে] আরে, আরে, থাম। মনে রেখ, তুমি কি করতে যাচ্ছ।—কিন্তু—হ্যাঁ—ওরকম ভাবে চাইলে হবে না।

শশাঙ্ক। তা হলে কি রকম ভাবে চাইতে হবে?

প্রমীলা। [একটা গামলার মধ্যে জল ছিল, সেই জলে কাপগুলি ধুতে ধুতে] আচ্ছা, তোমার ঐ নোংরা জিনিষটা নিয়ে ঐসব করবার কি দরকার বল ত?

মুখার্জ্জী। দেখুন, দেখুন, মিসেস মিত্তির! আমি বার বার সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, শশাঙ্ক—ঐ অভিশপ্ত জিনিষটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা আর আগুন নিয়ে খেলা করার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই।

শশাঙ্ক। তা হোক, তুমি বল।

মুখার্জ্জী। বেশ। নিয়ম হচ্ছে, ডান হাতে ওটা ধরতে হবে, তার পর জোরে জোরে তোমার ইচ্ছেটা বলতে হবে। কিন্তু সাবধান, সাবধান শশাঙ্ক!

প্রমীলা। ঠিক যেন আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত। আচ্ছা, আমার আর একজোড়া হাত করে দিন না। দুটো হাতে ত এত কাজ আর পেরে উঠি না।

শশাঙ্ক। [হেসে উঠে] ঠিক বলেছ গিন্নী, ঠিক বলেছ। আচ্ছা—আমি ইচ্ছে করি—

মুখার্জ্জী। [ব্যস্ত ভাবে তার হাতটা ধরে থামিয়ে দিয়ে] আঃ! থাম! চাইতেই যদি হয়, তবে বাস্তব কিছু চাও। আজে বাজে জিনিষ কিছু চেয়ো না। যাক—আমি ভাই আর এখানে থাকতে পারছি না। আমার বড্ড বিশ্রী লাগছে। আমি চললাম। আমার কোটটা কোথায় রাখলে? [বলতে বলতে বাইরে যাবার দরজার পাশে 'হ্যাট র‍্যাকে'র কাছে এসে দাঁড়ালেন।]

বিশ্বজিৎ। [কোটটা ক্যাপ্টেনকে দিয়ে] চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। এক মিনিট অপেক্ষা করবেন? আমি ওপর থেকে দৌড়ে রেনকোটটা নিয়ে আসি। (বলতে বলতে ভেতরে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।]

ক্যাপ্টেন। [কোটটা পরবার চেষ্টা করতে করতে] না, না, আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে পারছি না। বাইরে বেরুতে পারলে বাঁচি। তার পর তোমরা যত খুশি বরপ্রার্থনা কর। দোহাই তোমাদের—আমাকে চলে যেতে দাও। কিন্তু মনে রেখ, আমি তোমাদের সাবধান করে দিয়েছিলাম।

শশাঙ্ক। [তাড়াতাড়ি উঠে র‍্যাকের ওপর থাবাটা রেখে ক্যাপ্টেনকে কোট পরতে সাহায্য করতে লাগলেন।] ঠিক আছে। ঠিক আছে মুখুজ্জে। আমাদের জন্য একটুও ঘাবড়িও না। (পকেট থেকে একটা নোট বার করে) এটা রাখ।

ক্যাপ্টেন। [প্রত্যাখ্যান করে] না, না, ও আমি নিতে পারব না।

শশাঙ্ক। [জোর করে পকেটে গুঁজে দিয়ে] হ্যাঁ, হ্যাঁ নিতে হবে। [দরজাটা খুলে ধরলেন]

ক্যাপ্টেন। [বাইরের দিকে তাকিয়ে] আচ্ছা চলি (শশাঙ্ককে) ওটা উনুনে ফেলে দাও গিয়ে।

সকলে। আচ্ছা, আবার আসবেন।

[ক্যাপ্টেন চলে গেলেন। শশাঙ্ক দরজা বন্ধ করলেন। ভেতরে এসে র‍্যাকের কাছে দাঁড়িয়ে থাবাটা দেখতে লাগলেন। বিশু চট করে ভেতরে গিয়ে রেনকোট নিয়ে এল। প্রমীলা বাসনপত্র ট্রের উপরে গুছিয়ে রাখলেন।]

বিশ্বজিৎ। [শশাঙ্কর পাশে দাঁড়িয়ে থাবাটা দেখতে দেখতে] ক্যাপ্টেন মুখার্জ্জী আজ একটা কড়া ধরনের ছেড়ে গেছেন। আগের গল্পগুলির চেয়ে এটা বেশ কড়া। আমার মনে হয় জিনিষটা একদম বাজে।

প্রমীলা। [বাসনসুদ্ধ 'ট্রে'টা র‍্যাকের ওপর রাখতে রাখতে] হ্যাঁ গো, তুমি কিছু দিলে নাকি ওঁকে।

শশাঙ্ক। সামান্য কিছু। ও নিচ্ছিল না। আমিই জোর করে দিলাম।

প্রমীলা। বাজে বাজে জিনিষের ওপর তুমি বড় টাকা খরচ কর।

শশাঙ্ক। [থাবাটা হাতে করে নিয়ে] সত্যি—আশ্চর্য্য।

বিশ্বজিৎ। কেন? আশ্চর্য্য আবার কি?

শশাঙ্ক। কি আবার থাকতে পারে এটার মধ্যে! দূর, এটা আগুনে ফেলে দিলেই হয়।

বিশ্বজিৎ। [জোরে হেসে উঠে] যা বলেছেন। তা এক কাজ করুন না কেন বাবা—আমরা রাতারাতি যাতে বিরাট একটা বড়লোক কিংবা বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারি—এমন কিছু চেয়ে নিন না।

প্রমীলা। [শশাঙ্কর দিকে চেয়ে] আগুনে ফেলে দেবে? তাই যদি দেবে ত পয়সা নষ্ট করলে কেন? তখনই বারণ করেছিলাম, নিও না। তুমি চিরটাকাল এ রকম বাজে খরচ করে এলে। আর আমি সব দিক সামলে কি করে চালাই তা আমিই জানি—

বিশ্বজিৎ। বাবা, আপনি এক কাজ করুন। সম্রাট হবার বর প্রার্থনা করুন। তা হলে মা আর আপনার ওপর হুকুম চালাতেও পারবে না আর দুটো-চারটে টাকা খরচ করলে মায়ের ধমকও খেতে হবে না।

প্রমীলা। তবে রে মুখপোড়া! [হাতের ঝাড়ন নিয়ে বিশ্বজিৎকে তাড়া করলেন] তোর বড্ড কথা হয়েছে না। [ঝাড়ন দিয়েই মারতে লাগলেন। বিশু হাসতে হাসতে হাত দিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগল।]

শশাঙ্ক। [টেবিলের ধারে এগিয়ে এসে, ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে] সত্যি—কি যে চাই—কিছুই ত ভেবে পাচ্ছি না—মনে হচ্ছে যেন—সবই ত আছে, কি আর চাইব।

বিশ্বজিৎ। [শশাঙ্কর সামনে এসে] আরে! একটা জিনিষ ত রয়েছে। আপনি পাঁচ হাজার টাকা চান না! তা হলেই ত আপনার দেনাটা শোধ হয়ে যায়। ব্যস, তখন আর আমাদের পায় কে।

শশাঙ্ক। হাঁ, হাঁ, এ কথাটা ত মন্দ নয়। কি বল, গিন্নী, তাই না হয় চাওয়া যাক।

প্রমীলা। না, না, দরকার নেই। ওটাকে নিয়ে কিছু করতে হবে না।

বিশ্বজিৎ। হাঁ, তুমি থাম ত মা। নিন—বাবা—আপনি বর প্রার্থনা করুন।

শশাঙ্ক। [একটু লজ্জিত ভাবে, মঞ্চের মধ্যস্থলে এসে, ডান হাতটা বাড়িয়ে] আমি ইচ্ছে করি—আমি যেন পাঁচ হাজার টাকা পাই।

ঝনঝন্ করে একটা আওয়াজ উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই শশাঙ্ক চীৎকার করে উঠলেন। থাবাটা হাত থেকে পড়ে গেল।]

প্রমীলা ও বিশু। কি হ'ল?

শশাঙ্ক। [অত্যন্ত ভীত ভাবে থাবাটার দিকে তাকিয়ে] ওটা নড়ে উঠল! যেই আমি বলেছি, অমনি আমার হাতের মধ্যে ও। ঠিক সাপের মত কিলবিল করে নড়ে উঠল।

বিশ্বজিৎ। [এগিয়ে এসে থাবাটা কুড়িয়ে নিয়ে] কি যে বলেন! কৈ একেবারে হাড়ের মত শক্ত। [র‍্যাকের উপর রেখে দিল]

প্রমীলা। ও তোমার মনের ভুল নিশ্চয়।

বিশ্বজিৎ। [হাসতে হাসতে] কৈ [ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে] কোথায় টাকা। হুঁঃ! এ টাকা আপনি পেয়েছেন।

শশাঙ্ক। [একটু নিশ্চিন্ত ভাবে] যাক! ভগবানকে ধন্যবাদ খারাপ কিছু ঘটে নি। আমি কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।

বিশ্বজিৎ। [ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] ওঃ! অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার আমি বেরিয়ে পড়ি।

[রেনকোটটা পরতে লাগল]

প্রমীলা। সকালে ফিরতে দেরি করিস না।

বিশ্বজিৎ। যেমন ফিরি, তেমনিই ফিরব। এই ন'টা নাগাদ। তবে আমার জন্য অপেক্ষা করো না।

প্রমীলা। তোর বাবা সকালে উঠে চা না খেয়ে অপেক্ষা করবে! তুইও যেমন [শশাঙ্ককে] ওগো এসো, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

[ট্রেটা নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন]

বিশ্বজিৎ। [শশাঙ্ককে চিন্তিত দেখে] কি বাবা, আপনি এখনও ভাবছেন। ভাববেন না!

শশাঙ্ক। [বিশ্বজিতের দিকে তাকিয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে] সত্যি বিশু, ওটা নড়ে উঠেছিল।

বিশ্বজিৎ। [দরজার দিকে যেতে যেতে] হ্যাঁ। আর একটা বাঁদর ল্যাজে ভর দিয়ে খাটের উপর ঝুলছিল, আর দেখছিল, আপনি টাকা গুনছেন।

[শশাঙ্ক ম্লান হেসে বিশুর পেছনে চললেন]

বিশ্বজিৎ। [দরজা খুলে] উঃ কি ঝড়রে বাবা! দরজাটা ভাল ভাবে বন্ধ করে দিন (বেরিয়ে গেল)

[শশাঙ্ক মাথা নাড়তে নাড়তে দরজা বন্ধ করলেন। দরজার কড়ায় তালা লাগালেন। তলায় ছিটকিনি আটকালেন। তার পর উপরের ছিটকিনিটা লাগাতে গিয়ে একটু ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হ'ল, তার পর লাগালেন।

শশাঙ্ক। ছিটকিনিটা বড্ড শক্ত হয়ে গেছে। কাল সকালে বিশুকে বলতে হবে।

[ভিতরে এসে চেয়ারে বসলেন। ল্যাম্পটা কমাতে গিয়ে আলোর শিখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখের ভাব ক্রমশঃ বদলাতে লাগল; কি একটা দেখতে দেখতে যেন তিনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন।]

শশাঙ্ক। [ভীতকণ্ঠে] প্রমীলা! প্রমীলা।

প্রমীলা। (হাতা হাতে নিয়ে দৌড়ে এসে) কি হয়েছে?

শশাঙ্ক। (নিজেকে সংযত করে) এ্যাঁ! ওঃ! না—কিছু না! আমি যেন এই শিখাটার মধ্যে বাঁদরের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম, ক্রুর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

প্রমীলা। (হাতটা ধরে) চল, চল খাবে চল। (হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেলেন। শশাঙ্ক এক বার পেছন ফিরে ভীত ভাবে আলোটার দিকে তাকালেন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্চদৃশ্য—প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। উজ্জ্বল সূর্য্যালোক এসে পড়েছে জানালা দিয়ে। টেবিলের উপর কাপ, ডিশ, কেটলি প্রভৃতি সাজানো রয়েছে। শশাঙ্কবাবু জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রমীলা দেবী একটি পাত্র নিয়ে ভেতরের দরজা দিয়ে ঢুকলেন।]

শশাঙ্ক। আকাশ একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে।

প্রমীলা। উঃ! কাল যা ঝড়বৃষ্টি গেল। সকালেই যে আকাশটা পরিষ্কার হয়ে যাবে একদম ভাবি নি। বাজ পড়ার আওয়াজে আমার ত সারারাত ঘুমই হয় নি।

শশাঙ্ক। যা বলেছ। (একটু থেমে) নদীর ধারে শ্মশানের পাশের রাস্তাটা যা খারাপ। কালকের ঝড়জলে যদি রাস্তায় জল দাঁড়ায় তবে বিশুর ফিরতে দেরি হবে।

প্রমীলা। (টেবিলের ওপর পাত্রটা নামিয়ে) তাও ত বটে। বাজল ক'টা? ওর কি ফেরবার সময় হয় নি? (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) পৌনে আটটা। ওর ছুটি হয়েছে ত সকাল সাড়ে সাতটায়। (চেয়ারগুলো টেনে বার করতে লাগলেন।)

শশাঙ্ক। ওখানে ধরো জামাকাপড় ছাড়তে, হাতমুখ ধুতে আধ ঘণ্টা। তা হলে এতক্ষণে ও শ্মশানের ধারে পৌঁছে গেছে।

প্রমীলা। তা হলে ত মিনিটদশেকের মধ্যে এসে পড়বে।

শশাঙ্ক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনই এসে পড়বে। (টেবিলের ধারে এগিয়ে এসে) আজ কি তৈরি করলে?

প্রমীলা। (র‍্যাকের উপরটা পরিষ্কার করতে করতে) মোহনভোগ। বিশু ক'দিন ধরে বলছিল। (বাঁদরের থাবাটা দেখে) আঃ। এই নোংরা জিনিষটা আবার এর ওপর।

(হাতে নিয়ে একবার দেখে আবার নাকমুখ কুঁচকে রেখে দিল।) বাজে জিনিস। এই নিয়ে কাল রাতে আমরা এত হৈচৈ করেছি যে ভাবলে হাসি পায়।

শশাঙ্ক। (জানালার ধারে যেতে যেতে) হাঁ! যেমন ক্যাপ্টেন আর তেমনি তার গল্প—স্রেফ গাঁজা। আমার মনে হয় যুদ্ধফেরত লোকগুলোই এ রকম।

প্রমীলা। (টেবিলের ধারে এসে) এস। চা হয়ে গেছে। বিশুর জন্য অপেক্ষা করে থাকলে ও আবার রাগ করে। (দু'জনে খেতে আরম্ভ করল)

প্রমীলা। (খেতে খেতে) আচ্ছা, আজকালকার দিনে কখনও এ রকম ভাবে ইচ্ছে পূর্ণ হয়?

শশাঙ্ক। তুমি বোধ হয় সারারাত ধরে এই সব ভেবেছ?

প্রমীলা। আহা, নিজে যেন কত ভাবেন নি। সারারাত শুধু এপাশ-ওপাশ করেছ।

শশাঙ্ক। (একটু হেসে) তা যা বলেছ। সত্যিই কাল ভাল ঘুম হয় নি। হয়ত ঝড়ের জন্যই—

প্রমীলা। (ঝঙ্কার দিয়ে) হাঁ, ঝড়ের জন্য না ছাই!

শশাঙ্ক। কি জানি! সারারাত শুধু আধো-ঘুমে, আধো-তন্দ্রায় অশ্বস্তিতে কাটিয়েছি।

প্রমীলা। আর সারারাত ধরে বোধ হয় ভেবেছ যে, যদি প্রার্থনা পূর্ণই হয়, তা হলে অমঙ্গলটাই বা হয় কি করে! আচ্ছা, সত্যিই যদি পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যেত, তা হলে তার খারাপ ফলটা কিই-বা হ'ত?

শশাঙ্ক। (একটু উদাসীন ভাবে) কে জানে। বোধ হয় টাকার থলিটা ঝপ করে মাথায় পড়ে, মাথাটা ফাটিয়ে দিত। আর ত কিছু মাথায় আসছে না— (প্রমীলা হাসলেন) তবে হাঁ— মুখুজ্জে বলে গেছে কিন্তু—টাকাটা এমন স্বাভাবিক ভাবে পাব যেন মনে হতে পারে, এর সঙ্গে থাবাটার কোন যোগ নেই।

প্রমীলা। যাকগে। টাকা ত পাওয়া যায় নি। আর আমার বিশ্বাস, যাবেও না। মিছিমিছি এসব বাজে ভাবনা।

(বাইরের দরজটা একটু খুলে, 'চিঠি' বলে ডাক দিয়ে পিয়ন ঘরের মেঝেয় একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে গেল।)

প্রমীলা। (চমকে উঠে) কে এল?

শশাঙ্ক। ডাকপিয়ন। একটা চিঠি দিয়ে গেল দেখছি।

প্রমীলা। (একটু উত্তেজিত ভাবে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে) হাঁ, তাই ত চিঠিই ত দিয়ে গেল।

শশাঙ্ক। (হালকা সুরে) কি বিপদ! ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে যাবে না ত কি কয়লা দিয়ে যাবে, না, দুধ দিয়ে যাবে?

প্রমীলা। (অসহিষ্ণু ভাবে) না, না, তা বলছি না। আমি বলছিলাম কি, মনে কর—(ইতস্ততঃ করতে লাগলেন)

শশাঙ্ক। (বিস্মিত হয়ে) কি? কি মনে করব?

প্রমীলা। ধর, একটা পাঁচ হাজার টাকার চেক—কিংবা ঐ রকম কিছু—

শশাঙ্ক। (উত্তেজনা দমন করে) হাঁ তোমার যত সব— কৈ আন না চিঠিটা।

প্রমীলা। (চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে) বেশ মোটা ত। (হাত দিয়ে অনুভব করে) শক্ত মতন কি যেন রয়েছে (শশাঙ্ককে দিলেন)

শশাঙ্ক। (চোখমুখ কুঁচকে পড়বার চেষ্টা করে) কার নামে চিঠিটা?

প্রমীলা। তোমার নামে।

শশাঙ্ক। (চিঠিটা উলটে পালটে দেখতে লাগলেন; উত্তেজনা গোপন করবার চেষ্টা করেও পারছেন না) যত সব আজগুবি ধারণা, কোথাও কিছু নেই পাঁচ হাজার টাকা—ইয়ে, আমার চশমাটা কোথায় গেল?

প্রমীলা। (দ্রুত কণ্ঠে) আমাকে দাও না। আমিই খুলছি।

শশাঙ্ক। (ব্যস্ত হয়ে) না, না হাত দিও না। কি মুশকিল আমার চশমাটা কোথায়? (এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন)

প্রমীলা। কেন আমি খুললে—

শশাঙ্ক। (অধীর ভাবে) আঃ! আমার চশমাটা দেবে?

প্রমীলা। (র‍্যাক থেকে চশমাটা নিয়ে দিল) এই ত চশমা। (শশাঙ্ক চশমা পরে চিঠিটা ছিঁড়তে লাগলেন) দেখ, সাবধান, যেন ছিঁড়ে না যায়।

শশাঙ্ক। ছিঁড়বে?

প্রমীলা। (একটু অপ্রতিভ হয়ে) না ধর ব্যাঙ্কনোট কিংবা চেকটা।

শশাঙ্ক। (খামটা ছিঁড়ে একটা অফিসিয়াল ডকুমেণ্ট বার করলেন, তার সঙ্গে একটা ছোট্ট স্লিপ।) তোমার ভীমরতি ধরেছে মানুষকে এমন নার্ভাস করে দাও। (চিঠিটা পড়লেন) "মহাশয় বাড়ী বন্ধকী খাতে পাঁচ হাজার টাকা হাওলাত বাবদে আপনার প্রদত্ত সুদ পাইয়াছি। ইতি—"দূর"—।

(দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকালেন। শশাঙ্ক বসে পড়ে আহার শেষ করতে লাগলেন। প্রমীলা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন)

প্রমীলা। (উষ্মাভরে) এ তোমার ঐ গাঁজাখোর বন্ধুর কথা শোনার ফল।

শশাঙ্ক। (নিরুৎসুক ভাবে) কেন? কি হয়েছে?

প্রমীলা। এই যে তুমি ভেবেছিলে, এর মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার ড্রাফট আছে।

শশাঙ্ক। (রাগান্বিত ভাবে) আমি বলেছিলাম। আমি বরাবর বলে আসছি—

প্রমীলা। বলে আসছ বৈ কি! দাঁড়াও না বিশু শুনলে যা করবে!

শশাঙ্ক। (একটু রুক্ষভাবে) আচ্ছা থাক। এসব কথা আর বিশুর কানে তুলতে হবে না।

প্রমীলা। না, বলবে না। আমি নিশ্চয় বলব! তার পর সে যা মজা করবে তোমাকে নিয়ে। (জানালা দিয়ে একটু ঝুকে পড়ে বাইরে কি যেন দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে) কাল রাত্রে তুমি যখন বলছিলে থাবাটা নড়ছে, তখন তোমায় যা ঠাট্টা করেছিল।

শশাঙ্ক। ঠাট্টা করলেই হ'ল। নড়েছিলই ত সেটা। আমি শপথ করে বলতে পারি।

প্রমীলা। (বাইরে কিছু একটা দেখতে দেখতে) ও তোমার মনের ভুল।

শশাঙ্ক। আমি বলছি, নড়েছিল। মনের ভুল হতেই পারে না। আমি কি রকম চমকে উঠেছিলাম, দেখেছিলে? (প্রমীলা উত্তর দিলেন না।) কি দেখ নি? কি হ'ল, ওখানে কি এত দেখছ?

প্রমীলা। (ঘরের দিকে ফিরে) না, কিছু না। ও একটা লোক, আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে।

শশাঙ্ক। বিশুকে খুজছে না ত? ওর ত আসবার সময় হয়ে গেছে।

প্রমীলা। (জানালা দিয়ে দেখে) না, লোকটা চলে যাচ্ছে।

শশাঙ্ক। যাক। হ্যাঁ যা বলছিলাম।

প্রমীলা। না গো। লোকটা ফিরে আমাদের বাড়ীর দিকেই তাকাচ্ছে।

শশাঙ্ক। তা হলে বোধ হয় নম্বর খুঁজে পাচ্ছে না।

প্রমীলা। (অল্প উত্তেজিত ভাবে) হ্যাঁ—তা লোকটা ফুল-প্যাণ্ট পরে আছে আর কালো কোট—আমাদের গেটের ছিটকিনিটা খুলছে।

শশাঙ্ক। এই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে অমন চেঁচিও না, লোকটা তা হ'লে আমাদের বাড়ীতেই আসছে?

প্রমীলা। না বোধ হয়, দরজাটা ভেজিয়ে চলে যাচ্ছে। (হঠাৎ দ্রুত কণ্ঠে) না, না, লোকটা সোজা বাড়ীর ভেতরে আসছে। (টেবিলের কাছে ছুটে এসে) দেখ, লোকটাকে ঠিক উকিলের মত দেখতে।

শশাঙ্ক। তাতে কি হয়েছে?

প্রমীলা। মানে—বললেই ত তুমি হাসবে—মানে মনে কর সেই পাঁচ হাজার টাকার ব্যাপারে লোকটা হয় ত আসছে।

শশাঙ্ক। আচ্ছা, থামো দেখি, তুমি একটি আস্ত নির্বোধ। দেখি আবার কে এল।

(বাইরের দরজায় ধাক্কা)

(শশাঙ্ক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রমীলা ইতিমধ্যে টেবিলটা অল্প একটু গোছাবার চেষ্টা করলেন। শাড়ীটা একটু ঠিক করে নিলেন। শশাঙ্ক দরজা খুললেন। ট্রাউজার আর কালো কোট-পরা একটা লোককে দরজায় দেখা গেল।)

আগন্তুক। (বাইরে থেকে) এটাই বোধ হয় শশাঙ্কবাবুর বাড়ী?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ। আপনি ভিতরে আসুন।

(লোকটি ভিতরে এলেন)

আগন্তুক। নমস্কার। আপনিই বোধ হয় শশাঙ্কবাবু?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ। আপনি বসুন। (একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন)

আগন্তুক। (হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে) না, না, ঠিক আছে—ঠিক ধন্যবাদ—আমি মানে—আমি আসছি—(থেমে পড়ল)

শশাঙ্ক। আপনাকে ত ঠিক চিনতে পারলাম না।

আগন্তুক। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমার নাম শনি চৌধুরী, আমি আসছি—

(এদিক-ওদিক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতে লাগল)

শশাঙ্ক। আপনি বোধ হয় বিশ্বজিৎকে খুজছেন?

প্রমীলা। বিশু এখনই এসে পড়বে। ওর আসবার সময় হয়ে গেছে।

শনি। (প্রমীলাকে বাধা দিয়ে) না, না, (একটু থেমে) আমি পাওয়ার-হাউস থেকে আসছি। (শশাঙ্ককে গম্ভীর ভাবে) আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।

প্রমীলা। (উদ্বিগ্ন ভাবে) সে কি। তা হলে তো আপনার বিশুর সঙ্গেই আসা উচিত ছিল।

শশাঙ্ক। (একটু অবাক হয়ে) পাওয়ার-হাউস থেকে আসছেন। কি দরকার, বলুন।

শনি। (প্রমীলাকে দেখিয়ে) ওকে একটু ভেতরে যেতে বলুন। (শশাঙ্ক বিস্মিত দৃষ্টিতে শনির দিকে তাকালেন। তার পর ফিরে প্রমীলার দিকে তাকালেন। প্রমীলা ওঁর মুখের দিকে ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভেতরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।)

শশাঙ্ক। (উত্তেজনা দমন করে) কি ব্যাপার বলুন ত?

শনি। পাওয়ার-হাউসের কর্তৃপক্ষ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমাকেই—

শশাঙ্ক। (বাধা দিয়ে অধীর ভাবে) কি হয়েছে বলুন না। আশা করি, আপনি কোন খারাপ খবর আনেন নি?

শনি। আমাকে এই খবরটা দিতে পাঠানো হয়েছে যে—

শশাঙ্ক। (উত্তেজিত ভাবে) কি খবর? বিশুর খবর? তার কি কিছু হয়েছে? কোন কিছু আঘাত— (থেমে পড়লেন)

(শনি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল)

শশাঙ্ক। বলুন, বলুন।

শনি। হঠাৎ এবং দুর্ঘটনায় বিশ্বজিৎবাবু— (থেমে গেলেন)

শশাঙ্ক। (চীৎকার করে) বিশু, আহত হয়েছে?

(শনি চুপ করে রইল। ভিতরে আর্ত কণ্ঠে চাপা চীৎকার।)

শনি। সাংঘাতিক আহত!

শশাঙ্ক। (ব্যাকুল কণ্ঠে) ওর কি জ্ঞান আছে? খুব কি কষ্ট পাচ্ছে?

শনি। (মুখ তুলে, ধীরে ধীরে) না, আর তার কোন কষ্টই নেই।

শশাঙ্ক। (বুঝতে না পেরে, দ্রুত কণ্ঠে) কোন কষ্টই নেই। (বুঝতে পেরে, স্খলিত কণ্ঠে) এ্যাঁ, তার মানে! সে কি আর— সে কি আর—(ভেতর থেকে আলুথালু বেশে প্রমীলা বেরিয়ে এলেন।)

প্রমীলা। (আর্তস্বরে) বিশু—বিশু—বিশুরে—(শশাঙ্ক প্রমীলাকে এক হাত দিয়ে ধরে ফেললেন। আর এক হাতে শনির হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে জড়িত সুরে বললেন)

শশাঙ্ক। বলুন, বলুন। দোহাই আপনার, চুপ করে থাকবেন না।

শনি। বিশ্বজিৎ কাল রাত্রে আমাদের একটা গল্প বলছিল; কি একটা বাঁদরের থাবা নিয়ে। বোধ হয় কাল রাত্রে গল্পটা এখানে শুনেছিল। খুব হাসতে হাসতে গল্পটা বলছিল। ফলে একটু অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। এমন সময় (একটু থেমে) হঠাৎ একটা মেশিনের মধ্যে হাতটা কিরকম করে যেন—মানে তার পর—(প্রমীলা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। তার পর কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর মুখে যুগপৎ আতঙ্ক ও শোকের চিহ্ন।)

শশাঙ্ক। (শূন্য দৃষ্টিতে, প্রমীলার কাঁধে হাত রেখে) মেশিনের মধ্যে পড়ে গেল—এ্যাঁ, আমাদের একমাত্র সন্তান বিশু, তাকে নিয়ে গেল—এ্যাঁ! ওঃ!

শনি। (বিনীত ভাবে) কোম্পানী আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছে, আপনাদের এই অপূরণীয় ক্ষতিতে—।

শশাঙ্ক। (শূন্য দৃষ্টিতে, থেমে থেমে) আপনাদের অপূরণীয় ক্ষতি—

শনি। আমাকে আরও বলতে বলা হয়েছে যে—মাপ করবেন—আমি কোম্পানীর ভৃত্য মাত্র—

শশাঙ্ক। (ফিস্‌ফিস করে) আমাদের—আমাদের—অপূরণীয় ক্ষতি—

শনি। (টেবিলের ওপর একটা খাম রেখে, এবং দরজার দিকে একটু পিছিয়ে গিয়ে) আমাকে বলতে বলা হয়েছে—কোম্পানী এই দুর্ঘটনার সব দায়িত্ব অস্বীকার করেছে—তবে আপনার ছেলের কর্মকুশলতার কথা স্মরণ করে তারা সামান্য কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দিয়েছেন। (দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।)

শশাঙ্ক। (জড়ানো স্বরে) দায়িত্ব!—ক্ষতি!—ক্ষতিপূরণ!—(সহসা আতঙ্কিত ভাবে) কত?—কত টাকা?

শনি। (দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে) পাঁচ হাজার টাকা। (বেরিয়ে গেল।) (প্রমীলা আর্ত কণ্ঠে চীৎকার করে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে টেবিলের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল। শশাঙ্ক তাঁর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণভাবে একটু হাসলেন; অন্ধের মত হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন। তার পর সেই অবস্থায় শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।)

তৃতীয় দৃশ্য

মঞ্চদৃশ্য—প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ।

[রাত্রি। টেবিলের ওপর একটা অর্দ্ধদগ্ধ মোমবাতি। ঘরের জিনিষপত্র অগোছালো। শশাঙ্ক টেবিলে মাথা দিয়ে বসে আছেন। প্রমীলা জানালার পরদাটা একটু ফাঁক করে বাইরে তাকিয়ে আছেন। শশাঙ্ক হঠাৎ মাথা তুললেন। চারিদিকে তাকালেন।]

শশাঙ্ক। (ভগ্ন স্বরে) ওগো কোথায় গেলে!

প্রমীলা। (জানালা থেকে) এই যে। জানলায়।

শশাঙ্ক। (স্বাভাবিক স্বরে) ওখানে কি করছ ?

প্রমীলা। (উদাসীন ভাবে) দেখছি রাস্তটা।

শশাঙ্ক। (পেছনে হেলে পড়ে) কি লাভ প্রমীলা ! কি লাভ ওতে !

প্রমীলা। (একই ভাবে) আচ্ছা, ঐ ধারটায় শ্মশান, না !

শশাঙ্ক। হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! এক হপ্তা হয়ে গেল। মাত্র এক সপ্তাহ আগেও—এখন ক'টা বেজেছে ?

প্রমীলা। (বিক্ষুব্ধ স্বরে) জানি না।

শশাঙ্ক। (ম্লান হেসে) জান না ? কেন, সময়ের হিসেব কি আর রাখবে না ?

প্রমীলা। সময়ের হিসেব ! কি হবে গো তা রেখে ! সে কি বাড়ী আসবে ? কোন দিন—কোন দিনই ত সে আর বাড়ী আসবে না।

শশাঙ্ক। অত উতলা হয়ো না প্রমীলা ! (একটু থেমে) জানলা থেকে সরে এস, ঠাণ্ডা লাগবে।

প্রমীলা। ঠাণ্ডা লাগবে ! আমার ! সে যে চিরকালের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে গেল !

শশাঙ্ক। হ্যাঁ, প্রমীলা। চিরকালের মতই চলে গেল।

প্রমীলা। আর আমাদের সব আশাও চলে গেল।

শশাঙ্ক। আর আমাদের সব আকাঙ্ক্ষাও—

প্রমীলা। আর আমাদের—এ্যা—আকাঙ্ক্ষা—

(হঠাৎ চীৎকার করে দৌড়ে এলেন। শশাঙ্ক উঠে দাঁড়ালেন)

শশাঙ্ক। প্রমীলা ! প্রমীলা ! দোহাই তোমার ! বল কি হয়েছে ?

প্রমীলা। (মুখ চোখে ভয়ানক উদ্বেগ ফুটিয়ে) হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! আকাঙ্ক্ষা ! থাবা ! সেই বাঁদরের থাবা ?

শশাঙ্ক। (বিহ্বল ভাবে) কেন ? কেন ? কি হবে সেটায় ?

প্রমীলা। (তীব্র স্বরে) চাই ! চাই ! আমার চাই ওটা ! কোথায় রেখেছ সেটাকে ?

শশাঙ্ক। কি জানি। আমি ত আর দেখি নি সেটাকে। কিন্তু কেন ?

প্রমীলা। আমার চাই। বার কর। খুজে বার কর সেটাকে।

শশাঙ্ক। (র‍্যাকের ওপর হাতড়াতে হাতড়াতে) এই যে। এখানে। কি করবে এটা নিয়ে। (র‍্যাকের ওপর রেখে দিলেন)

প্রমীলা। এতক্ষণ আমার মনে পড়ে নি ! আশ্চর্য্য ! তোমারও কি মনে পড়ে নি।

শশাঙ্ক। কি মনে পড়বে ?

প্রমীলা। আরও দুটো ইচ্ছে !

শশাঙ্ক। (আতঙ্কিত ভাবে) কি ?

প্রমীলা। হ্যাঁ। আমরা ত একটা মাত্র চেয়েছি। আরও দুটো আছে—আরও দুটো আছে !

শশাঙ্ক। (ক্লিষ্ট ভাবে) না, না, ও আর নয়। একটাই কি যথেষ্ট হয় নি ?

প্রমীলা। না গো না। আমরা আরও একটা চাইব। (শশাঙ্ক মধ্যস্থলে এগিয়ে এলেন। প্রমীলা থাবাটা নিয়ে পিছু পিছু এলেন) নাও। নাও এটা। আর চাও—

শশাঙ্ক। (থাবাটা না নিয়ে) চাইব কি ?

প্রমীলা। ওগো, বিশু বিশু। তুমি চাও আমাদের বিশু আবার ফিরে আসুক !

শশাঙ্ক। (আঁৎকে উঠে) আঃ ! তুমি কি পাগল হলে !

প্রমীলা। না, না—নাও বলছি। নাও (প্রচণ্ড শোকার্ত্ত হয়ে) ওরে বিশু, বিশুরে—

শশাঙ্ক। চল, শোবে চল। তোমার মাথার ঠিক নেই—কি বলছ বুঝতে পারছ না।

প্রমীলা। (অবুঝ ভাবে) আমাদের প্রথম ইচ্ছে যখন পূর্ণ হয়েছে, কেন—কেন—আমাদের দ্বিতীয় ইচ্ছে পূর্ণ হবে না।

শশাঙ্ক। ওগো, তুমি বুঝছ না। সাত দিন আগে সে মারা গেছে। আর—আর তুমি ভেবে দেখ—আমি তাকে তার কাপড়-চোপড় দেখে চিনতে পেরেছিলাম—তোমাকে তখন দেখতেই দেওয়া হয় নি—এখন তুমি তাকে দেখে সহ্য করবে কি করে।

প্রমীলা। (আকুল স্বরে) না, না, না। আমি পারব। তাকে ফিরিয়ে আন।

শশাঙ্ক। (থাবাটা নিতে গিয়ে, হাতটা সরিয়ে নিয়ে) না, ওটা ছুতে আমার সাহস হয় না।

প্রমীলা। (জোর করে শশাঙ্কর হাতে গুজে দিয়ে) নিশ্চয় পারবে। নাও, এবার চাও—যেমন ভাবে আমার ছেলেকে চিতায় শুইয়ে দিয়ে এসেছ, ঠিক তেমনি ভাবে যেন সে ফিরে আসে।

শশাঙ্ক। (কম্পিত কণ্ঠে) প্রমীলা !

প্রমীলা। (ভীষণ ভাবে) চাও, চাও বলছি—

(হিংস্রভাবে ক্রমাগত বলতে লাগল—চাও, চাও !)

শশাঙ্ক। (হাত এবং কণ্ঠস্বর কম্পিত) আমি—আমি—ইচ্ছে করি—আমার ছেলে—আমার ছেলে ফিরে আসুক।

(আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে টলে চেয়ারে বসে পড়লেন। থাবাটা মেঝেয় পড়ে গেল। হাত লেগে বাতিটা উল্টে গিয়ে নিভে গেল। প্রমীলা দৌড়ে জানালার ধারে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিলেন। চাঁদের আলো এসে পড়ল তাঁর গায়ে। কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত্ত)

প্রমীলা। (হতাশ ভাবে) কিছু নেই।

শশাঙ্ক। আঃ ! ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

প্রমীলা। কেউ নেই। এত বড় রাস্তাটায় একজনও জীবিত

প্রাণী নেই। (পরদাটা বন্ধ করে দিয়ে) নেই, নেই, ওগো কেউ নেই ; আমাদের জীবনে একটু আলো দিতে একজনও রইল না।

শশাঙ্ক। শুধু, আমরা দু'জনে আর বিশুর স্মৃতি।

প্রমীলা। (জানালার কাছ থেকে সরে এসে শশাঙ্কর কাছে দাঁড়ালেন) এই বুড়ো বয়সে যে নতুন করে আর কিছুই করা যায় না ; আমরা যে তার মধ্যেই বেঁচেছিলাম। তাকে ঘিরেই আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার চোখেই আমাদের সব স্বপ্ন—বাতি নিভে গেছে—চারিদিক শূন্য—এই ভয়াবহ শূন্যতা আর অন্ধকারের মাঝেই আমাদের বাকি দিনক'টা কাটাতে হবে। (চেয়ারে বসে পড়লেন।)

শশাঙ্ক। খুব বেশী দিন নয় প্রমীলা। আর এই বাকি দিন ক'টা—

প্রমীলা। প্রতিটি মুহূর্তই যে অনন্ত বলে মনে হচ্ছে!

শশাঙ্ক। (সোজা হয়ে বসে) নাঃ। এ অন্ধকারটা সহ্য হচ্ছে না।

প্রমীলা। উপায় নেই—উপায় নেই—চারিদিক অন্ধকার—

শশাঙ্ক। বাতিটা কোথায়? (টেবিল হাতড়ে হাতড়ে বাতিটা পেলেন) দেশলাইটা? দেশলাইটা কোথায়? (উঠে র‍্যাক খুঁজে দেশলাইটা আনলেন। দেশলাই দিয়ে বাতিটা জ্বালিয়ে টেবিলে বসালেন। জ্বলন্ত কাঠিটা ফেলতে গিয়ে প্রমীলার সামনে ধরলেন ; দেখলেন প্রমীলা চেয়ারের পিঠে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে) ছিঃ। প্রমীলা! এ কি হচ্ছে। চল শোবে চল।

প্রমীলা। (ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠে) ওগো, ঘুমিয়ে পড়লেও কি ভুলতে পারব। ভুলতে কি পারব—আমায় আর মা বলে কেউ ডাকবে না। আমি—(দরজায় মৃদু করাঘাত।)

প্রমীলা। (চমকে উঠে) ও কি!

শশাঙ্ক। (উত্তেজনা দমন করে) না, কিছু নয় ; বোধ হয় ইঁদুর-টিদুর হবে। বাড়ীতে যা ইঁদুর।

(আবার জোরে করাঘাত। প্রমীলা তড়াক্ করে উঠে পড়ল। শশাঙ্ক তার হাতটা ধরে ফেলল।)

শশাঙ্ক। থাম! কোথায় যাচ্ছ তুমি!

প্রমীলা। (প্রচণ্ড আবেগে) ওগো! এসেছে! এসেছে! আমার মনে ছিল না—শ্মশান যে এখান থেকে অনেকটা পথ—ছাড় আমাকে—দরজাটা খুলে দিতে হবে—বিশু, দাঁড়া—

(দরজায় মাঝে মাঝে ধাক্কা)

শশাঙ্ক। (দৃঢ় ভাবে প্রমীলাকে ধরে) প্রমীলা, প্রমীলা—

প্রমীলা। (ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে) আমাকে যেতে দাও।

শশাঙ্ক। দোহাই তোমার, দরজা খুলো না। (হাত ধরে ভেতরের দরজার দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।)

প্রমীলা। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে যেতে দাও।

শশাঙ্ক! ভাবতে পার, তুমি কি দেখবে!

প্রমীলা। (হিংস্রভাবে হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে) তুমি কি ভাব আমার পেটের ছেলেকে আমি ভয় করব। যেতে দাও।

(সহসা হাত ছাড়িয়ে নিল এবং দ্রুত দরজার দিকে যেতে যেতে) বিশু, বিশু! আমি আসছি, দাঁড়া।

শশাঙ্ক। (ভয় পেয়ে ভেতরের দরজার দিকে সরে এসে) ওগো, খুলো না! খুলো না!

(প্রমীলা দরজা খুলতে লাগলেন ; দরজায় ধাক্কা চলছে ; তলার ছিটকিনিটা খুলে ফেললেন। চাবি লাগিয়ে তালা খুলতে লাগলেন।)

শশাঙ্ক। (হঠাৎ) থাবা! কোথায় সেটা! কোথায় সেই বাঁদরের থাবা?

(হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলেন।)

প্রমীলা। (তালা খুলে ফেলে, ওপরের ছিটকিনিটা খুলবার চেষ্টা করে) ওগো, ওপরের ছিটকিনিটা বড্ড এঁটে গেছে। আমি পারছি না। এসো না, খুলে দিয়ে যাও না।

শশাঙ্ক। (উত্তেজিত ভাবে) কোথায়? কোথায় সেটা? এখনও একটা ইচ্ছে বাকি আছে। (দরজায় প্রচণ্ড করাঘাত)

প্রমীলা। শুনতে পাচ্ছ না তুমি? তোমার ছেলে যে দরজা খুলতে বলছে!

শশাঙ্ক। (আতঙ্কিত ভাবে) কোথায়? কোথায় পড়ল সেটা?

প্রমীলা। (প্রাণপণে ছিটকিনিটা ধরে টানতে টানতে) ওগো, খুলে দাও, তোমার ছেলেকে কি বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না?

শশাঙ্ক। পাচ্ছি না। আমি খুঁজে পাচ্ছি না, কে নিল—কে নিল—

(দরজায় ধাক্কা এমন হ'ল যে, মনে হ'ল ছিটকিনি খুলে যাবে)

প্রমীলা। বিশু! বিশু! দাঁড়া, তোর মা দরজা খুলে দিচ্ছে। আঃ, ছিটকিনিটা ভেঙে যাচ্ছে।

শশাঙ্ক। ভগবান! (থাবাটা পেয়ে) এই তো—পেয়েছি—পেয়েছি—

প্রমীলা। (ছিটকিনি টানাটানি করতে করতে) এই তো খুলে গেছে—বিশু—

শশাঙ্ক। (প্রায় সেই মুহূর্তেই টলতে টলতে দাঁড়িয়ে উঠে থাবাটা হাতে নিয়ে) সে মরে যাক। (সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ থামল) সে শান্তিতে চিরনিদ্রায় শুয়ে থাক।

প্রমীলা। (প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিল) বিশু—

(চাঁদের আলো ঘরের ভিতর এসে পড়ল। সব নিস্তব্ধ। শশাঙ্ক চেয়ারের পিঠটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। দরজার কপাটে ভর দিয়ে প্রমীলা বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।)*

যবনিকা

---

* W. W. Jacobs-এর The Monkey's Pow অবলম্বনে

আর এক দিকের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্প্রতি গ্রামে (আটপুর, জাঙ্গীপাড়া থানা, জেলা হুগলী) গিয়াছিলাম। দেশের অবস্থার কথা, উন্নয়নের কথা, বহুমুখী উন্নতিমূলক প্রচেষ্টার কথা সংবাদপত্রে পড়িয়া এবং বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে শুনিয়া মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়; ২।১ দিন পূর্ব্বেও বিলাত হইতে এক বন্ধু লিখিয়াছেন :

"I hope that you won't lose hope and faith in India. It seems to me to be the country with the greatest possibilities in the Far Fast", অর্থাৎ 'আমি আশা করি তুমি ভারতের উপর আশা ও বিশ্বাস হারাইবে না, আমার মনে হয় দূর প্রাচ্যে ভারতের বিরাট সম্ভাবনা আছে।' বন্ধুটি পূর্ব্বে ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিসে এক জন নামজাদা কর্ম্মচারী ছিলেন।

কিন্তু গ্রামে যাইয়া যাহা দেখি, এবারেও যাহা দেখিলাম তাহাতে মন হতাশায় পূর্ণ হইয়া যায়। কোন দিকেই উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং পূর্ব্বের তুলনায় অবনতিই দেখিতে পাই। একটুও অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি না। ২।১টি উদাহরণ দিলে আমার মনোভাব স্পষ্ট হইতে পারে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) আটপুরে ঘোষ-বাটীতে স্বামী প্রেমানন্দের (তখন বাবুরাম ঘোষের) গৃহের প্রাঙ্গণে আট জন সঙ্গীসহ সন্ধ্যার সময় ধুনি জ্বালাইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। রোমা রোঁলা প্রণীত "The Life of Ramkrishna" পুস্তকের ১১৪শ পৃষ্ঠায় Epilogue শীর্ষক অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই পুণ্য দিনটি স্মরণে রাখিবার জন্য গত ছয় বৎসর হইতে প্রত্যেক বৎসর ২৪শে ডিসেম্বর আটপুরে স্বামী প্রেমানন্দের গৃহের প্রাঙ্গণে জনসাধারণের চেষ্টায় একটি পবিত্র ও পুণ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে। স্বামী প্রেমানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিরাম ঘোষ এখনও জীবিত আছেন, বয়স ৯২, বার্দ্ধক্য ও জরাগ্রস্ত—শয্যাশায়ী; তিনি বাগবাজারে "বলরাম মন্দিরে" অবস্থান করেন। গ্রামের প্রতি, পৈতৃক বাটীর প্রতি, পৈতৃক ক্রিয়াকলাপ, পূজা-অর্চনা, বিশেষতঃ এই অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এখনও অটুট আছে। এই বৎসরেও ২৪শে ডিসেম্বর উক্ত পবিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল; দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য জনসাধারণকে সাদর আহ্বান জানান। কলিকাতা হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভক্ত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য উক্ত দিবসে আটপুর গমন করিয়াছিলেন, হুগলী জেলাবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীকানাইলাল দে, হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দের দুই জন ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরেরাম ঘোষ ও শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ অতিথিগণের প্রতি অতিশয় মনোযোগী ছিলেন। পরদিন আটপুর বাজারে প্রধানতঃ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও যুবক সম্প্রদায়ের আগ্রহে ও উৎসাহে ভিক্ষালব্ধ চাউলের দ্বারা এবং আর্থিক সাহায্যে প্রায় দুই হাজার নরনারায়ণের সেবা করা হয়।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের ভাষণ খুবই ভাবগম্ভীর, শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রধানতঃ যাঁহাদের চরিত্র ও আদর্শ গঠনের জন্য এই অনুষ্ঠানের মূল্য অতি অধিক তাঁহারা—অর্থাৎ ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায় অনেকে এই অনুষ্ঠান হইতে নিজেদের দূরে রাখিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। অথচ এই অনুষ্ঠানে সমবেত ভাবে যোগদানের জন্য এবং এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আটপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে আমি বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম। অনুষ্ঠানে ছাত্রগণের উপস্থিতি ছিল না বলিলেই হয়, শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যেও অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। ইহার মধ্যে কোন প্রকারের রাজনীতি ছিল কিনা জানি না। কিন্তু রাজনীতিসত্ত্বেও সার্ব্বজনীন পূজায় এবং এইরূপ কোন অনুষ্ঠানে যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের উপস্থিতি, উদ্দাম-উৎসাহ, কঠিন পরিশ্রম প্রচুর ভাবেই দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানে দেখা গেল না কেন? কোন কোন বন্ধু বলিলেন এই অনুষ্ঠানে "লাউড স্পীকারের" সাহায্যে নানা রকম সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল না, অন্য কোন হালকা আমোদ-প্রমোদের আয়োজন ছিল না—ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের কোন কর্তৃত্ব ছিল না ইত্যাদি কারণ এবং আরও ২।১টি কারণবশতঃ যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করা সম্ভব হয় নাই। মোট কথা, সকলের অভিমত বিশ্লেষণ করিলে ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে যে, এই অনুষ্ঠানে বাহ্যিক কোন আড়ম্বর ছিল না, ইহার মধ্যে কোন প্রকার "হৈ হুল্লোড়" করিবার সুযোগ ছিল না বলিয়াই ইহা যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবার জন্য একজন মন্ত্রী বা এইরূপ হোমরাচোমরা কোন ব্যক্তি যদি আসিতেন তাহা হইলে সভা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। এইরূপ বিশ্লেষণ যদি ঠিক হয় তাহা হইলে দেশের অবস্থা কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা বুঝিতে কঠিন হইবে না। অথচ যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ই ভবিষ্যতের নেতা।

ক্ষুদ্র গ্রামে দলাদলি, রেষারেষি ক্রমশঃই বাড়িতেছে, দেশ যে স্বাধীন হইয়াছে, স্বাধীন দেশের প্রত্যেক নাগরিকের যে দেশের প্রতি একটা মহান কর্ত্তব্য আছে এবং সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে যে দলাদলি, রেষারেষি ভুলিতে হইবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ একটু-আধটু ত্যাগ করিতে হইবে—এ মনোভাব প্রায় কাহারও নাই ! বহু দিনের পরিশ্রমে, বহু জনের স্বার্থত্যাগে গ্রামের যে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকেও ভাঙিতে হইবে—এক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মনোভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। স্বীকার করি, সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক রকমের ত্রুটি দেখা গিয়াছে ; কিন্তু সেই সকল ত্রুটি দূর করিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া অধিকতর উন্নতির পথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা ভাল, না ব্যক্তিগত কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ভাল ? ইহার মূলে ব্যক্তিগত দলাদলি, স্বার্থ, রেষারেষি যথেষ্ট রহিয়াছে এবং সকলেই নেতার আসনে বসিতে চান—যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিয়া সকলেই কাজ হাসিল করিতে চান। এইরূপ মনোভাব দূর করিতে না পারিলে গ্রামাঞ্চলের উন্নতি সুদূরপরাহত।

গ্রামের অর্থ নৈতিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়—বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ব্যবসা, বাণিজ্যের অবস্থা খুবই মন্দা ; ভদ্রশ্রেণীর কয়েকজন যুবক সামান্য মূলধন লইয়া সামান্য ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছিল, তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ বাড়িতেছে।

বর্ত্তমানে ধান-কাটা চলিতেছে—শ্রমিকের পারিশ্রমিক জলখাবার সমেত দৈনিক ১।০ আনা। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের মূল্য এইরূপ :

১।	চাল (নূতন) এক মণ—১৭৷৷৯—২০৲		
২।	মুশুর ডাল	/১	৷৷৵০
৩।	মুগ ডাল	/১	৷৷৵০
৪।	অড়হর ডাল	/১	৷৷০
৫।	ছোলার ডাল	/১	৷০
৬।	সরিষার তৈল	/১	২৷৷/
৭।	হলুদ	/১	৷৷৵০-৸৵০
৮।	সরিষা	/১	৸০
৯।	ধনে	/১	৸০
১০।	লঙ্কা	/১	৩৲
	কাচা লঙ্কা	/১	১৲
১১।	আটা	/১	৷৷০
১২।	ময়দা	/১	৷৷৵০
১৩।	চিনি	/১	৸৵০-৸৶০
১৪।	গুড়	/১	৷৶১০
	ঐ আকের	/১	৷০
	ঐ খেজুরে	/১	৸০
১৫।	মাছ	/১	২৲-২৷০
	চুনো	/১	৸০-১৷০
১৬।	হাঁসের ডিম		/১৫
	মুরগীর ডিম		/৫
১৭।	দুধ	/১	৷০
১৮।	আলু	/১	।৶০
১৯।	বেগুন	/১	।/০
২০।	পেঁয়াজ	/১	।৵০
২১।	শাক	/১	৵০
২২।	মূলা	/১	৵০
২৩।	রাঙালু	/১	৶০

উপরোক্ত হিসাব হইতে অনায়াসেই বুঝা যাইবে—একজন শ্রমিক দৈনিক ১।০ উপার্জ্জন করিয়া পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা কি করিয়া করিতে পারে ? কয়েক জনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম ; কিন্তু ইহা এতই মর্ম্মন্তুদ যে, লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে না। একজন শ্রমিক বলিল—ভাত ও কাঁকড়া (পুকুরের ছোট ছোট) পোড়া খাইয়াছি ; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—একটু তেল ও লঙ্কা দিয়া কাঁকড়া রান্না করিলে না কেন ? সে উত্তর দিল, 'তেলের পয়সা কোথা হইতে আসিবে ?' আর একজন বলিল, 'ভাত ও লাউশাক সিদ্ধ খাইয়াছি।' এই ধরনের উত্তরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাইয়াছি।

গ্রামে সবদিকেই অভাব। একজন ব্রাহ্মণ বিধবা বলিলেন, 'দেশ হইতে বাঁশ উধাও হইয়া যাইতেছে—মরিলে পোড়াইবার মত বাঁশও পাওয়া যাইবে না। কথাটা খুবই সত্য ; মৃতদেহ পোড়াইবার জন্য কাঠের অভাব খুবই দেখা দিয়াছে। মোট কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাসকবর্গের প্রতি অসন্তোষ ও বিদ্বেষ। 'ইলেকশন' আসন্ন, দলীয় বিদ্বেষ, নিন্দা-কুৎসা প্রভৃতি রাস্তা-ঘাটে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু কোন দলেরই কোন গঠনমূলক কাজের আভাস পাওয়া যাইতেছে না।

গ্রামের রাস্তাঘাট-পুকুরের কোন সংস্কার নাই, পানীয়জলের অভাব যথেষ্ট আছে, 'টিউব-ওয়েল' অচল হইলে মিস্ত্রীর অভাবে উহা মেরামত হয় না। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতির হ্রাস হয় নাই ! ছাড়া-গরু, ছাগলের অত্যাচারে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এই বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিলেই উহা কলহে পরিণত হয়। গ্রামে থাকিতে হইলে এইরূপ অনেক প্রকারের অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে নেতার বিশেষ অভাব !

রাবণ ও মন্দোদরী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[রাত্রি শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। চন্দ্র অস্তমিতপ্রায়। পূর্ব্ব গগনে শুকতারা উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে। লঙ্কার রাজপ্রাসাদের একপ্রান্তে রাবণ চিন্তিত মনে একাকী বসিয়া আছেন। দূরে রাম-নির্ম্মিত পাষাণ-সেতু রেখার মত অস্পষ্ট। বাতাসের হু হু শব্দ ও সমুদ্রের গর্জ্জন আর্ত্তনাদের মত শোনা যাইতেছে। মন্দোদরী একাকিনী রাবণ-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

মন্দোদরী

মহারাজ!

রাবণ

মহারাণি, এলে হেথা কি সংবাদ দিতে ?
একান্তে বসিয়া আছি এ অলিন্দে চিন্তাকুল চিতে,
বিনিদ্র নয়নে জাগি'। জানি, তুমি হয়েছ আকুল
অতীত শোকের ভারে। জানি, যত করিয়াছি ভুল,—
তুমি মোর রাজেন্দ্রাণী, ক্ষমিয়াছ সে-সব আমার।
চিরদিন মোর পার্শ্বে রহি', সহি' তীব্র হাহাকার
বিক্ষত মাতৃত্বমাঝে, দিয়াছ উৎসাহ অনুক্ষণ।
আজি যবে চাহি আমি রামসনে সর্ব্বশেষ রণ
আসন্ন প্রত্যুষে, তুমি নিদ্রাহীনা অশ্রুভরা-চোখে
কি সান্ত্বনা মোর পাশে পাবে বলো অনন্ত এ শোকে ?

মন্দোদরী

মহারাজ, কোথা পাব সান্ত্বনা আমার ? তুষানলে
নিত্য দহিতেছে চিত্ত। ভাসি' তাই তপ্ত অশ্রুজলে
তোমারে মিনতি করি, ক্ষান্ত হও এ কালসমরে।

রাবণ

রাত্রিশেষে হবে আজি এ রণের শেষ চিরতরে।
রাবণ অথবা রাম হবে জয়ী। বৃথা তুমি সহ মনস্তাপ,
স্বর্গজয়ী রাবণের জান তুমি দুর্বার প্রতাপ।
সাগরবলয়া লঙ্কা কোনদিন অগৌরব মাঝে
বরিবে না পরাজয়। কোনদিন নতশিরে লাজে
রহিবে না রক্ষকুল। রাবণের বিশ্বজয়ী নাম
অশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গে মহাসিন্ধু গাবে অবিরাম।
যাও রাণি শয্যাগৃহে, কেটে যায় তৃতীয় প্রহর,
দূর কর চিন্তাজাল, জয়লাভ করিব সত্বর।

মন্দোদরী

জানি স্বর্গজয়ী তুমি, তবু মনে হয় বারবার
তুচ্ছ এক নারী লাগি' কেন এনে দিলে হাহাকার
এ শান্ত লঙ্কার বুকে ? কেন তুমি মজি' অগৌরবে
আপন আত্মজগণে দিলে বলি নির্ম্মম আহবে ?
এ প্রলয় স্রষ্টা তুমি।

রাবণ

মহারাণি, সে ত আমি নহি।

মন্দোদরী

তুমি নহ, মহারাজ ? তব নিন্দাস্রোত বুকে বহি'
গর্জ্জে শৃঙ্খলিত সিন্ধু। এ দুর্ভাগ্য তোমারি সৃজন।
ক্ষম মোরে লঙ্কেশ্বর, তুমি লঙ্কা-ধ্বংসের কারণ।

রাবণ

বৃথা দাও অপযশ। এ যাতনা বুঝাব কাহারে!
সত্য কহি মন্দোদরি দাঁড়াইয়া আজি মৃত্যুদ্বারে,
—নহি আমি স্রষ্টা এর। জানে শুধু আমার অন্তর
সেই সুগোপন কথা। যাও রাণি, নিশান্ত প্রহর
দেখা দেয় পূর্ব্বাচলে শুকতারা-ম্লানরশ্মিপথে,
এখনি সাজিতে হবে রণবেশে মোর স্বর্ণরথে।

মন্দোদরী

সংশয় জাগাও কেন ? ভ্রান্ত কর প্রলাপবচনে ?
পরনারী হরি' তুমি, রাখ নি কি অশোককাননে
বন্দিনী করিয়া তারে ? এ যে কত বড় ব্যথা মোর
কেমনে বোঝাব আমি। পতিপ্রেমে হইয়া বিভোর
তুলেছিনু স্বর্গ গড়ি'। তুমি তুচ্ছ ক্ষণিকের ভুলে
ভাঙিলে সে-স্বর্গ মোর। জীবনের শান্ত নদীকূলে
আনিলে প্রলয়-ঝঞ্ঝা। বহি' বুকে নির্ব্বাক সে-জ্বালা
তোমারি চরণপ্রান্তে সাজায়েছি প্রেম-অর্ঘ্য ডালা।
এই অকল্যাণ নাথ, জানি সৃষ্টি তব।

রাবণ

মহারাণি,
আমি নহি অপরাধী।

মন্দোদরী

কেন কহ সান্ত্বনার বাণী।

রাবণ

সান্ত্বনার বাণী নহে, আজি আমি আসি' মৃত্যুদ্বারে
জীবনের শেষ রণে, সত্যবাণী কহি যে তোমারে।

মন্দোদরী

তোমারে বলেছি কত রূঢ় কথা, ক্ষমিও আমায়।
জীবনের শত সাধ একে একে ভেঙ্গে গেছে হায়,
অভিশপ্ত এ সমরে। পুত্রহারা পুত্রবধূহারা,
আত্মীয়স্বজনহারা,— রুধি' তবু তপ্ত অশ্রুধারা
তোমারে করেছি দোষী। জানি আমি এ ধ্বংসের মূলে
শুধু জাগে দম্ভ তব কলঙ্কের মসীধ্বজা তুলে'।

রাবণ

সত্য কহি দোষী নহি আমি প্রিয়ে। আজি ত্রিভুবন
ধিক্কার দিতেছে মোরে,—আমি লঙ্কাধ্বংসের কারণ।
কেহ বুঝিল না আজো কোন্ বহ্নি বুকে বহি' হায়,
জ্বালিলাম চিতানল, আনিলাম প্রলয় লঙ্কায়।
ফিরে যাও মহারাণি, কিবা হবে শুনি' সেই কথা,
রাত্রি হয়ে এল শেষ, স্তব্ধ হোক গোপন-বারতা।

মন্দোদরী

তুমি রাজ-রাজেশ্বর, তবু মোরে বল একবার,
ধ্বংসের এ আর্ত্তনাদ লঙ্কাবুকে সৃজন কাহার ?
কে হয়েছে অপরাধী ? কা'রে দোষী কর তুমি নাথ,
কে দিয়াছে তব প্রাণে অকরুণ নির্ম্মম আঘাত ?

রাবণ

ক্ষান্ত হও প্রশ্নে তব। শয্যাগৃহে যাও তুমি ফিরে।
আমার এ প্রাণ ভরি যাও ভুলি' শেষ রাত্রিটিরে
দাও ভালবাসিবারে। রজনীর অন্ধকারে থাকি'
অতীত স্মৃতির পথে দাও মোরে ফিরিতে একাকী।

মন্দোদরী

সংশয় রেখো না আর। সত্য বল, এ মহা আহবে
কেবা দোষী ? কার নাম জেগে রবে চির অগৌরবে ?

রাবণ

নিতান্ত শুনিতে চাও ? শোন তবে বলি চুপে চুপে
—তুমিই নিমিত্ত এর।

মন্দোদরী

আমি ? কেন নিষ্ঠুর বিদ্রূপে
দগ্ধ কর এ দাসীরে ? কেন মোরে কর প্রবঞ্চনা
দুঃসহ প্রলাপবাক্যে ? সত্য বল এ মহা যাতনা
কেন দাও বক্ষে মোর ? এ দুর্নাম কেন মোর ভালে
আঁকিলে নির্ম্মম করে ? কোন্ রাজনীতি-তর্কজালে
আমারে করিলে দোষী ? অন্তঃপুরে আছি চিরদিন,
কেন মোর ভাগ্যাকাশ করে' দিলে কলঙ্কমলিন ?

রাবণ

রাজনীতি নহে রাজ্ঞি, প্রাণনীতি বঞ্চিত স্বামীর।
সে কথা এখন থাক্। দেখ চেয়ে দূরে উষসীর
রক্তাক্ত অধরে ফোটে ধীরে ধীরে ক্রুর হাস্যরেখা,
আমারি জীবনগ্রন্থে সমাপ্তির রূঢ় চিহ্নলেখা।
এ সময়ে কিবা হবে পূর্ব্বকথা করায়ে স্মরণ ?
অমৃতসাগরে কেন পেতে চাও গরল-প্লাবন
শেষ বিদায়ের ক্ষণে ? তুমি রও চিরমহীয়সী
ভূলোক-বরেণ্যা ধন্য বীরমাতা রাবণ-প্রেয়সী।

মন্দোদরী

তবু শুনিতে চাই কেন দোষী করিয়াছ মোরে
লঙ্কার বিনাশ তরে ? কেন বাঁধি' কলঙ্কের ডোরে
রেখে দিলে চিরদিন ? বল, আজি কোন্ ভ্রান্তিবশে
ভাঙ্গিলে প্রেমের স্বপ্ন দুর্বাক্যের নির্ম্মম পরশে ?

রাবণ

মনে পড়ে বিভীষণে ?

মন্দোদরী

সেই মহাপাতকীর কথা
আর শুনায়ো না কানে। সুবর্ণলঙ্কার স্বাধীনতা
দিতে চায় বৈরীকরে কুলপাংশু বিশ্বাসঘাতক,
তার নাম উচ্চারিয়া বাড়ায়ো না আর এ পাতক।

রাবণ

মনে পড়ে তার প্রতি রাজ্ঞি, তব প্রণয় আভাস ?
কত সু-গোপন কথা, কত মধু হাস্য-পরিহাস
প্রেম-অনুরাগভরে ? নিরালায় কাটাতে প্রহর
নির্জ্জন উদ্যান মাঝে সাথে তার রহি' নিরন্তর
স্নেহ-অভিনয়ছলে। আমি বসি' রাজসভা মাঝে
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক লয়ে রহিতাম লিপ্ত শত কাজে।

যত প্রেম অনুরাগ ডালি দিতে বিভীষণ-করে ;
শুধু সম্রাজ্ঞীর বেশে দেখা দিতে নিশীথ প্রহরে
নিদ্রালু নয়নে প্রিয়ে। মৃদুহাস্যে ভক্তিনত শিরে
আমারে করিতে পূজা। রূপোজ্জ্বল যে যৌবন ঘিরে
জ্বলিত আরতিদীপ, সেথা আমি নিমেষের ভুলে
প্রেমের দেবতা হয়ে' রহি নাই প্রাণ-বেদীমূলে।
যে আবেগ উচ্ছলতা, যে যৌবন-মাধুরী-প্লাবন
ছিল বিভীষণ তরে, তুমি তারে রাখিয়া গোপন
শুষ্ক প্রেম জানাতে আমায়। শুধু দেহ-উপচারে
সাজাতে কর্ত্তব্য-ডালি। কিন্তু কভু স্নিগ্ধ প্রেমধারে
সিক্ত কর নাই চিত্ত। নিদ্রাভঙ্গে কত অর্দ্ধরাতে
দেখিতাম তুমি বাতায়নে, চাহি' প্রেম-দৃষ্টিপাতে
বিভীষণ-কক্ষপানে। মোর ভ্রাতৃবধূ সরমারে
"অতি বড় ভাগ্যবতী" বলি প্রশংসিতে বারে বারে।
কিন্তু তুমি লঙ্কেশ্বরী, অসামান্যা, ক্ষণিকের তরে
বলি নাই কোন কথা। শুধু রহি' বিষাক্ত অন্তরে
লয়েছি তোমার শ্রদ্ধা। প্রেমহীন, আকুলতাহীন
পেয়েছি যৌবনস্পর্শ। অভিশপ্ত চিত্তে প্রতিদিন
সহেছি সে তুষানল। বসন ভূষণ অলঙ্কারে
করিয়াছি রাজেন্দ্রাণী। জীবনের গরল পাথারে
ফুটায়েছি রাজ-পদ্ম সহস্র জনের দৃষ্টিপথে,
দাম্পত্যের প্রেমবন্যা আনিয়াছি নিষ্প্রাণ সৈকতে।

মন্দোদরী

এত বড় অপবাদ কেন বল দিলে মোরে আজ,
কলঙ্কের ডালি দিতে হ'লে তুমি এতই নিলাজ ?

রাবণ

জানি বিভীষণ ভ্রাতা। একই রক্ত দেহে বহে তার।
ঘরের কলঙ্ক লয়ে প্রকাশ্যে কি করিব বিচার ?
বন্দী করি' তারে যদি রাখি আমি দূরে কারাগারে,
কি বুঝাব প্রজাগণে ? কি বলিব বধূ সরমারে ?
ভ্রাতৃবধ ? ভ্রাতা শুধু একা অপরাধী মোর কাছে ?
ইন্ধন ব্যতীত কভু অনলের অস্তিত্ব কি আছে ?
একদিন সভাতলে রামস্তুতি শুনি' মুখে তার,
ভাবিলাম সে সুযোগে তারে আমি করি বহিষ্কার
মোর রাজ্যসীমা হ'তে। সঙ্গে দিয়া বধূ সরমারে
লঙ্কা হ'তে নির্বাসনে পাঠালাম দূরে সিন্ধুপারে।
হায়, কেহ জানিল না, কোন্ ব্যথা বহি' মোর বুকে
দিনু ভ্রাতৃ-নির্বাসন। দেখিলাম সে কী ম্লান মুখে
নিঃশব্দে রহিলে তুমি। রাজ্য জুড়ি' রণ-কোলাহলে
ঈর্ষার সে তীব্র জ্বালা ডুবে গেল কোন্-সে অতলে।

মন্দোদরী

আমারে করেছ দোষী, এ কলঙ্ক মুছিব কেমনে,
তবু কেন হরেছিলে জানকীরে পঞ্চবটী বনে ?

রাবণ

হায় রাজ্ঞি, সীতা তরে কোনদিন ছিল না কামনা,
চিরপুণ্যবতী সীতা, নিশিদিন চেয়েছি মার্জ্জনা
আমার অন্তরতলে। রাখি' তা'রে অশোককাননে
বন্দিনী করেছি শুধু, দেবীজ্ঞানে পূজেছি গোপনে।
তবু দেখেছিনু চোখে পঞ্চবটী বনে একদিন
সাধ্বীর সে আকুলতা, অশ্রুজলে নয়ন মলিন
দুরন্ত স্বামীর লাগি'। সেই বনপথে চেয়ে থাকা,
অনাহার-ক্লিষ্ট মুখে সেই বেদনার ছবি আঁকা,
আজো ভুলি নাই আমি। সেই ফুল্ল রক্তিম অধরে
বেদনার কি কম্পন, কি স্পন্দন নিশ্বাসের ভরে
বিচ্ছেদকাতর বুকে ! উদ্বেলব্যাকুল কণ্ঠে তা'র—
"লও ভিক্ষা যোগীবর"—শুনি মোর চিত্ত বার বার
সতীপদে জানাল প্রণতি। যদি তুমি মন্দোদরী
মোর তরে কোনদিন রহিতে এমনি রূপ ধরি
হোত না এ মহারণ। অভিশপ্ত আমার জীবনে
যে চিত্র দেখি নি কভু, দেখিলাম পঞ্চবটী বনে।
তারপর সাধ হ'ল নিত্য হেরি সতীরূপখানি
বঞ্চিত জীবনে মোর। রাখিলাম তারে হেথা আনি
অশোক-কাননতলে। রাজদম্ভ জাগিল অন্তরে,
এ ঐশ্বর্য্য এ জগতে রাখিব না আর কারো তরে।
আমার আদেশে যবে চেড়ীদল ঘিরিয়া সীতারে
করিত তাড়না, আমি অন্তরালে রহি' একধারে
শ্রদ্ধানত চিত্তে শুধু হেরিতাম সতীর আনন
স্বামীর চিন্তায় মগ্ন। মনে হ'ত যদি মন্দোদরী
মোর লাগি কোনদিন একবিন্দু অশ্রু যেত ঝরি'
তোমার আয়ত চোখ, তৃপ্ত হ'ত দাবদগ্ধ প্রাণ,
ধন্য হ'ত সিংহাসন। অন্তরের ক্ষুব্ধ অভিমান
যাতনার পক্ষ মেলি' উড়ে চলে বিহঙ্গের মত
দূর হতে দূরান্তরে। শুধু রয় নিশ্চল জাগ্রত
একটি ব্যাকুল তৃষ্ণা নিশিদিন মনের দুয়ারে।
আসন্ন প্রত্যুষে হবে শেষ রণ, তবু বারে বারে
তব পাশে ক্ষমা চাই, রূঢ় বাণী শুনালাম কত।
এ নির্জ্জনে কেহ নাই, সবে আছে দূরে নিদ্রাগত

এ স্বর্ণপ্রাসাদ মাঝে। শুকতারা ডুবে যায় ধীরে,
আমার জীবনাকাশে আর কভু আসিবে না ফিরে।

মন্দোদরী

কেন হও হতাশ্বাস ? কেন আন অমঙ্গলে ডাকি' ?
অমিতবিক্রম তুমি, রণজয় করিবে একাকী।
সুবর্ণলঙ্কার মান তুমি ছাড়া কে রাখিবে আর ?
অচিরে আসিবে ফিরে পরি' গলে মহিমার হার
বিজয়তোরণে তব। শুধু মোরে আর কোন দিন
দেখিতে পাবে না তুমি। বিদায়ের পথে ছায়াহীন
নীরবে যাইব চলি। ফিরে এস তুমি মহারাজ
হয়ে রণজয়ী, তব শৌর্য্য হেরি শত্রু পাক লাজ।

রাবণ

কিবা হবে ফিরে আর ? জীবনের দাবদগ্ধ পথে
নবসূর্য্য হেরিব না আর কভু উদয়পর্ব্বতে।
তবু করি আশীর্ব্বাদ, অদৃষ্টের রূঢ় অভিশাপ
মুছে যাক ভালে তব, মোর তরে কোরো না বিলাপ।
জীবনের শত ভ্রান্তি লুপ্ত হোক, শুধু অনির্ব্বাণ
তোমার গৌরবশিখা যুগে যুগে রহুক্ অম্লান।

মন্দোদরী

এ ত নহে আশীর্ব্বাদ। চিরদিন ঘৃণার এ ডালা
কেমনে রহিব আমি ? কণ্ঠে পরি' কলঙ্কের মালা
কেমনে লুকায়ে রব ? দিবানিশি অন্তরের তলে
সকল কামনা মোর দগ্ধ হবে স্মৃতির অনলে।

রাবণ

সব মিথ্যা প্রিয়তমে। রহস্য করেছি শুধু আমি,
মিথ্যারে করেছি বড়, মন মোর জানে অন্তর্যামী।
নিশিদিন "যুদ্ধ, যুদ্ধ" দুঃসহ এ সমর-বারতা
সহিতে না পারি কানে, তাই দুটো রহস্যের কথা
তোমারে বলেছি আজ। ক্ষমা কর মোরে মন্দোদরী।
ওই দেখ নভপ্রান্তে শেষ হয়ে আসিছে শর্ব্বরী।
নীলাভ আঁধারে শুধু জেগে আছে ম্লান শুকতারা
আমার বিদায়পথে। জীবনের সুখস্বপ্নহারা
আজি দাঁড়ায়েছি আমি বজ্রাহত বনস্পতিসম
দাবদগ্ধ বনমাঝে। সাগরকুন্তলা লঙ্কা মম
সমাচ্ছন্ন চিতাধূমে। দীর্ঘশ্বাসে দুরন্ত ঝঞ্ঝায়
ফেরে তার অভিশাপ। রুদ্ধগতি তীব্র যাতনায়
শৃঙ্খলিত ঊর্ম্মিদল দিবানিশি উন্মাদ কল্লোলে
ভাঙিবারে চায় সেতু। মুহুর্মুহু অশ্রান্ত হিন্দোলে
কেঁপে ওঠে বসুন্ধরা। পিতৃগণ রহি শূন্যপথে
ধিক্কার দিতেছে মোরে। প্রতিদিন সপ্তাশ্বের রথে
ব্যঙ্গ-হাসি হাসিছে অরুণ। অভিশপ্ত কোথা পাবে ত্রাণ,
আপনার বধ্যভূমে শুনি কানে মরণ-বিষাণ।

মন্দোদরী

বিদায় দেবে না মোরে ?

রাবণ

বিদায়ের কোথা প্রয়োজন ?
তুমি মোর রাজেন্দ্রাণী, কত মোর আকাঙ্ক্ষার ধন।
তব দেহ, তব মন, তব স্বপ্ন আজো আছে ভরি'
আমার জীবনসত্তা। প্রতিদিন কি সাধনা করি'
তোমারে দিয়েছি অর্ঘ্য কামনার স্বর্ণ-শতদলে।
তব সঙ্গ জীবনের মোহময় প্রতি পলে পলে
আমারে রেখেছে স্বর্গে। সুখে দুঃখে রহি একসাথে
কাটায়েছি দীর্ঘকাল। আজি শুধু নির্ম্মম আঘাতে
ভাঙিব প্রেমের চূড়া ? জীবনের শেষলগ্নে আজি
তোমারে বিদায় দিব ? যে মালায় গাঁথি পুষ্পরাজি
প্রতি মুহূর্ত্তের স্বপ্নে, সে মালা কি আজি ছিন্ন করি'
হেলায় ছড়াব ফুল ছায়াহীন তপ্ত মরু ভরি' ?
জাগে অনুতাপ মোর ব্যথাতুর হেরি তব মুখ,
আমারে করিও ক্ষমা, কৌতুক যে শুধুই কৌতুক।
তবু এ কৌতুক প্রিয়ে, জানিবে না কেহ কোন দিন,
ধরণীর ধূলিতলে সব স্মৃতি হইবে বিলীন।

নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক কে?

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

"নীলদর্পণে"র ইংরেজী অনুবাদক কে?—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আজিকালি অনেকেই বলিবেন—"কেন?—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।" কারণ, প্রমাণ না থাকিলেও অনেক সময়ে কিংবদন্তী বা অমূলক কাহিনী বহু বার শ্রুত হইলে উহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়।

নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদে অনুবাদকের নাম ছিল না, কেবল লিখিত ছিল "By a Native". রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ উহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন "Both the original and translation are *bona fide* Native productions" অর্থাৎ মূল এবং অনুবাদ উভয়ই খাঁটি এতদ্দেশবাসীর প্রণীত। রেভারেণ্ড লঙের বিরুদ্ধে যখন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে সুপ্রীম কোর্টে মানহানির মোকদ্দমা আনীত হয়, তখন লঙ সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন এবং অনুবাদকের নাম প্রকাশ করিতে অস্বীকৃত হন। মোকদ্দমার সময় লেখক ও অনুবাদকের নাম অজ্ঞাতই ছিল।

মধুসূদনের জীবিতকালে কেহই তাঁহাকে নীলদর্পণের অনুবাদক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর সংবাদ-পত্রাদিতে তাঁহার মৃত্যুবিষয়ক যে সকল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও ঐরূপ উল্লেখ নাই।

মাইকেল মধুসূদনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিতে যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মধুসূদনের এই সাহিত্য-কীর্ত্তি সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তাঁহার জীবনচরিতের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ—গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতি।

দেখা যায়, মধুসূদন যাহা কিছু করিয়াছেন, তাঁহার সামান্যতম সাহিত্য-কীর্ত্তিও বন্ধুগণকে জানাইয়াছেন। কিন্তু কোন পত্রে 'নীলদর্পণ' অনুবাদের উল্লেখ নাই। বন্ধুগণের যে বিস্তৃত স্মৃতিকথার উপর যোগীন্দ্রনাথ বসুর প্রামাণিক গ্রন্থের ভিত্তি স্থাপিত সেই স্মৃতি-কথাসমূহে কোথাও মধুসূদনের এই সাহিত্য-কীর্ত্তির উল্লেখ নাই।

মধুসূদনের পরম অনুরক্ত ভক্ত, বর্ত্তমান লেখকের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ৺নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় যখন 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে 'মধুস্মৃতি' প্রকাশিত করেন, তখন তিনি প্রায়ই তাঁহার নিকটে যাইতেন, মধুসূদন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন এবং তাঁহাকে যথাসাধ্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, 'মধুস্মৃতি'র ভূমিকায় বন্ধুবর এই সাহায্য স্বীকার করিয়াছেন।

একদিন তিনি বলেন যে, তারকনাথ ঘোষের বাড়ী হইতে তিনি শুনিয়াছেন যে, একদা উক্ত বাড়ীতে বসিয়া মধুসূদন এক রাত্রির মধ্যে 'নীলদর্পণ' অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে (১৩২৭ ও ১৩৬১) পরে এ বিষয়টি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

মধুসূদন যে নীলদর্পণ অনুবাদ করেন তাহার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আমরা দেখি তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর সহিত সংযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত দীনবন্ধু জীবনীতে। উহার একস্থানে আছে:

'এই গ্রন্থ (নীলদর্পণ) রচনা করিতে করিতে দীনবন্ধু মেঘনায় নৌকাডুবি হইয়া জলমগ্ন হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন—লঙ সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।'

যে মধুসূদনের নাম নীলদর্পণ মোকদ্দমার সময় ঘুণাক্ষরেও উঠে নাই, তাঁহাকে গোপনে তিরস্কৃত করিলেন কে? বঙ্কিমের অনুজ পূর্ণচন্দ্র স্পষ্টতর ভাবে লিখিয়াছেন, 'অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুপ্রীম কোর্ট হইতে লাঞ্ছিত হইলেন।'

মোকদ্দমার সময় যাঁহার নাম প্রকাশ পাইল না, সুপ্রীম কোর্ট কি গোয়েন্দা লাগাইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং বাহির করিয়া প্রকাশ্যে নহে, গোপনে, তিরস্কার করিলেন? বঙ্কিম-চন্দ্রের ন্যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে এরূপ লেখা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমরা দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় নিম্নরেখ অংশটি ছিল না, পরে কোন অজ্ঞাত হস্তে উহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার নিকট পাণ্ডুলিপি ছিল; কিন্তু পরে সন্ধান করিলে বর্ত্তমান লেখক উহা দেখিতে পান নাই। তাঁহার অনুমান উহা বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের দ্বারা সন্নিবেশিত। নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় লিখিয়াছেন:

'সঞ্জীবচন্দ্র স্বহস্তে মধুসূদনের কথা উক্ত গ্রন্থে (দীনবন্ধু-জীবনীতে) লিখিয়া দিয়াছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু-জীবনী প্রকাশের পর অনেকে মাইকেলকে নীলদর্পণের অনুবাদক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু উক্ত সন্নিবেশিত অংশটি একান্তই অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। দীনবন্ধু-জীবনী প্রকাশের বহু বৎসর পরে যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের দ্বারা মধুসূদনের প্রামাণিক জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। ১৩০০ বঙ্গাব্দে উহার প্রথম সংস্করণ, ১৩০১ সনে দ্বিতীয়, ১৩১২ সনে তৃতীয় ও ১৩১৪ সনে চতুর্থ সংস্করণ এবং স্কুল-পাঠ্য সংস্করণাদিও প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের নীলদর্পণ অনুবাদের বৃত্তান্ত প্রমাণসহ নহে বলিয়াই হয়ত যোগীন্দ্রনাথ কুত্রাপি উহা উল্লেখ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক প্রভৃতির নিশ্চয়ই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের স্মৃতিকথায় মধুসূদনের এত বড়

সাহিত্য-কীর্ত্তির উল্লেখ করেন নাই সম্ভবতঃ এই কারণেই। পূর্ব্বে বিস্মৃত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু জীবনী পাঠের পর নিশ্চয়ই এই ঘটনার কথা তাঁহাদের মনে পড়িত। মধুসূদনের জীবিতকালে যদি প্রকাশ পাইত যে, তিনি নীলদর্পণের অনুবাদকর্ত্তা তাহা হইলে যদি-বা তাঁহার কোন ক্ষতি হইত, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে প্রকাশিত জীবনচরিতে উহা প্রকাশ করিতে কোন বাধা ছিল না। কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না থাকাতেই যোগীন্দ্রনাথ এবং মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করি।

নগেন্দ্রনাথ যে লিখিয়াছেন, 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহার 'মধুস্মৃতি' প্রকাশের (ভারতবর্ষ ১৩২১ ২৪, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৭) পূর্ব্বে মধুসূদনের কোন জীবনচরিতে লিখিত হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। উহা hypothesis মাত্র, উহাকে এখন পর্যন্ত সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই।

মধুসূদন সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন তাঁহারা, আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন।

মহিলা সংবাদ

দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীপ্রভাতচন্দ্র নিয়োগীর কন্যা শ্রীমতী স্মিতা নিয়োগী এই বৎসর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রে এম্-এস্‌সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান এবং এম্-এ, এম্-এস্‌সি, এম্-কম্ প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি বি-এস্‌সি অনার্স পরীক্ষাতেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের ছাত্রীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। উত্তর প্রদেশ ইণ্টার বোর্ডে ও আই-এ, আই-এস্‌সি পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যেও তিনি প্রথম হন।

"মধুসূদন গুপ্ত"

(সংযোজন)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মধুসূদন গুপ্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈদ্যবাটীর অধিবাসী। পিতার নাম বলরাম গুপ্ত। মধুসূদনের আর এক ভ্রাতা ছিলেন কাশীনাথ গুপ্ত। মধুসূদন ১৮০০ সনের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পাঠে মনোযোগ তাঁহার একেবারেই ছিল না। এজন্য একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন। তাহাতে তিনি মনের দুঃখে বাড়ী হইতে চলিয়া যান এবং কলিকাতা আসিয়া গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। বাটী হইতে চলিয়া আসিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, মানুষ না হইয়া পুনরায় বাড়ীতে ফিরিবেন না। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণী খোলা হইলে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এই বিদ্যায় তাঁহার কৃতিত্বের কথা মূল প্রবন্ধে (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩) বিশদভাবে বলিয়াছি। মধুসূদন বর্দ্ধমান জেলায় হারোয়া গ্রাম-নিবাসী জমিদার-কন্যা পদ্মাবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—গোপালচন্দ্র গুপ্ত, জয়গোপাল গুপ্ত ও দ্বারকানাথ গুপ্ত।

*

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় (১৮৪০) উত্তীর্ণ হইয়া অন্যান্য ছাত্রদের মত মধুসূদনও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। সার্টিফিকেটখানি ইংরেজী, আরবি এবং বাংলা এই তিনটি ভাষায় পাশাপাশি লেখা। এসেসর, পরীক্ষক এবং কলেজের অধ্যাপক মোট সাতাশ জনের স্বাক্ষর রহিয়াছে এই সার্টিফিকেটখানিতে। বাংলা অংশ এখানে দিলাম:

"আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক সম্যক প্রকারে ইং ১৮৪০ নবেম্বর মাসের ২৬ দিনে বৈদ্যবাটী নিবাসী মধুসূদন গুপ্তের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে প্রশংসাপত্র দিতেছি। ইনি শরীরবিদ্যা, দ্রব্যতত্ত্বজ্ঞান, দ্রব্যগুণ ও কিমিয়া বিদ্যা এই সকল বিষয়েতে বিশেষ নিপুণ এবং ঔষধ প্রস্তুত করণে ও তদ্ব্যবহারে আর অস্ত্রবিদ্যা ও তাচ্চিকিৎসাকর্ম্মে প্রকৃত উপযুক্ত হইয়াছেন ইহাতে ইনি রাজকীয় চিকিৎসক সাধারণের পদপ্রাপ্ত হইতে পারেন এবং সহকার ব্যতিরেকে স্বয়ং তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

উক্ত ব্যক্তির বাঙ্গলাদেশীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নারম্ভাবধি এতকাল পর্য্যন্ত সুশীলতার ও পরিশ্রমেতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

*

মধুসূদনের দ্বিতীয় পুস্তকখানি সম্প্রতি পাইয়াছি। ইহার দুইটি আখ্যাপত্র—ইংরেজী ও বাংলায়। বাংলা আখ্যাপত্রটি এই:

"এনাটোমী। /অর্থাৎ/ শারীরবিদ্যা। /তৎ প্রথম ভাগ/ মেডিকেল কালেজের হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালি ছাত্রদিগের / শারীরবিদ্যার উপদেশক / শ্রীমধুসূদন গুপ্ত প্রণীত। /কলিকাতা/ ১২৫৯ শাল ইং মার্চ্চ ১৮৫৩।" পুস্তকের বিষয়বস্তু নির্দ্দেশক পূর্ব্বাভাষ অংশটি এখানে দেওয়া হইল। জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় বাংলা ভাষায় প্রকাশ তখনই কতটা সম্ভব হইয়াছিল; এই অংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

"এনাটোমীর প্রকৃত অর্থ ছেদবিদ্যা বস্তুতঃ চিকিৎসার্থক শারীরবিদ্যা। "শারীরজ্ঞেরা মানব শারীরবিদ্যাকে শাখাদ্বয়ে বিভক্ত করিয়াছেন প্রথম জেনরেল এনাটোমী অর্থাৎ সামান্য শারীরবিদ্যা এবং দ্বিতীয় ডিস্ক্রিপটিব এনাটোমী অর্থাৎ নির্দ্দেশক শারীরবিদ্যা।

শরীরের নির্ম্মাপক সমবায়ি দ্রব্য সকলের স্বভাব ও সামান্য গুণ সমূহের বিবরণের নাম সামান্য শারীরবিদ্যা।

দেহের নানা ইন্দ্রিয় ও প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং প্রদেশ সকল এবং পৃথক পৃথক অংশের বাহ্য আকৃতি ও আভ্যন্তর নির্ম্মিতি এবং তাহাদিগের যথারূপ পরস্পর অবস্থিতি এবং যোগ এবং ঐ সমস্ত অংশের উৎপত্তির পর যে রূপ উত্তরোত্তরাবস্থা ইত্যাদির বিবরণের নাম নির্দ্দেশক শারীরবিদ্যা।

এই গ্রন্থে কেবল নির্দ্দেশক শারীরবিদ্যার বিষয় লিখিত হইবেক যাহা সাধারণ চিকিৎসকগণের পাঠ্য।

শারীরবিদ্যার অঙ্গ যাহাকে ফিজিয়লজী অর্থাৎ প্রকৃতিবিদ্যা কহে তাহার দ্বারা সুস্থ শরীরের যে যে অবস্থা ও কর্ম্মসকল এবং জীবনের ক্রিয়াবিধি সমুদয়ের জ্ঞান হয়।

শরীর ঘন এবং দ্রববস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। শারীরজ্ঞেরা কেবল ঘন অংশ সকলকেই শরীরের সমবায়ি করিয়া গণ্য করিয়াছেন। রক্ত রস এবং লসীকা এই তিন দ্রবেতে কার্প্‌সল বা ঘনকণা সকল মিলিত থাকাতে উক্ত তিন দ্রব ধাতুকেও ঘন বস্তুর সহিত নিরূপণ করিয়াছেন। শরীরের ঘন বস্তু লিখিত সকলের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।...অস্থি সকল শরীরের প্রধান আধারস্থান এই হেতুক অস্থির বিবরণ প্রথমতঃ কর্ত্তব্য।"*

---

* মধুসূদন গুপ্ত বিষয়ক তথ্যাদি এবং 'এনাটোমী' পুস্তকখানি মধুসূদনের বংশধর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ গুপ্তের সৌজন্যে পাইয়াছি। লেখক।

নিরালা প্রহর

শ্রীউমা দেবী

মনের অতলতলে মাঝে মাঝে ডুবে যাই
মাঝে মাঝে অতলে ঘুমাই !
একান্ত আমারি জন্যে
সুপ্তির গহনারণ্যে রাত্রি সহচর
একাকী অপেক্ষা করে নিটোল নিবিড় এক নিরালা প্রহর।
সেখানে জলের তলে
মুক্তা ও প্রবাল দলে—বিশীর্ণ করুণ
বাসনা মুহূর্তে হয় সহাস অরুণ
—নিরালা প্রহর এক নিরালা প্রহর,
আমি খুঁজি সেই অবসর।

হিম জলতলে ডুবে ধুয়ে যায়—ধুয়ে যায় সব পরিতাপ,
সহসা পৃথিবী লাগে নির্মল নিষ্পাপ।
সব প্রেম শুচি হয়—গ্লানিমুক্ত সমস্ত কামনা,
প্রীত নরনারী চিত্ত, পুণ্য হয় সর্ব আরাধনা
—নিরালা প্রহর এক নিরালা প্রহর
মাঝে মাঝে খুঁজে পাই সেই অবসর।

এখন এসো না প্রেম ! অশ্রুর কলঙ্ক বয়ে নিয়ে
এখন এসো না স্মৃতি বিষাক্ত চেতনা ঢেলে দিয়ে
ফুটে ফুটে ঝরে যাও—সন্ধ্যামালতীর ফুল রঙীন তৃষায়—
নিভে যাও সব তারা মোহাবেশ-শিথিল নিশায়।
এখন গহন এই অতলের নিরালা প্রহরে
আপন আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি ক্ষণ অবসরে।

সেখানে অনেক কথা অশ্রুর সমুদ্র বয়ে এসে
গান হয়ে যায় অবশেষে !
অনেক স্মৃতির চিহ্ন মুছে গিয়ে নীলাকাশপটে
জ্যোৎস্নার শরীর নিয়ে ভেসে ওঠে প্রাণের নিকটে !
আর—প্রেম দুঃখধারাহত নিরন্তর
ভরন্ত দীঘির মত কাঁপে থরথর !
সেখানে আমারি জন্যে
অপার গহনারণ্যে – রাত্রি সহচর
একান্তে অপেক্ষা করে নিটোল নিবিড় এক নিরালা প্রহর
– তুলনাবিহীন অবসর !

সে অতলে ডুবে যাই—
মাঝে মাঝে অতলে ঘুমাই,
অতনু স্বপ্নকে ফের তনুর বাঁধনে ফিরে পাই !
আমাকে ডেকো না কেউ—আমাকে ঘুমাতে শুধু দাও
সেই নীল অতলের সোনালি আবেশ ঢালা সবুজে উধাও !
সেখানে অনেক গান অনেক রঙীন আলো !
অনেক—অনেক রাঙা আশা।
অনেক অচেনা সুখ—চেনা মুখ—অনেক গভীর ভালবাসা !
আপন আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি সেখানে আলাপ
সেখানে পৌঁছলে পরে প্রেম হয়ে শান্ত হয় সব দুঃখতাপ !
—নিরালা প্রহর এক নিরালা প্রহর,
খুঁজে ফিরি সেই অবসর !

পুষ্পাবেন এবং চারি ধর্ম্মযাত্রা

ফ্রেডা বেদী

সংসারে দুই শ্রেণীর লোক আছে—এক শ্রেণীর লোক বেঁচে থাকে আর এক শ্রেণীর লোক বেঁচে থাকার পথ দেখায়। পুষ্পাবেন মেহ্‌তা হচ্ছেন শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিছুকাল আগেও যিনি সৌরাষ্ট্রের রাজ্য সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন সেই পুষ্পাবেনকে—সমগ্র গুজরাটীভাষী অঞ্চলে সকলে আদরের সঙ্গে তাঁকে এই নামেই ডাকে—সত্যই কেবল জনৈক শ্রেষ্ঠ সমাজকর্ম্মীই নন, একজন মহীয়সী মহিলাও তাঁকে বলা যেতে পারে।

গত বৎসর দিল্লী পরিদর্শন করতে যাবার পথে রাস্তায় এক দুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা ভেঙে যায় এবং এর দরুন ব্যাহত হয় তাঁর চারপাশে ছুটাছুটি করবার অসীম ক্ষমতা। সাময়িক ক্রাচ বা বগলে লাগিয়ে চলবার লাঠি, কিন্তু স্তিমিত করতে পারেনি তাঁর আত্মার উজ্জ্বল দীপ্তিকে—যদিও নিজের কোন কোন কাজ তাঁকে হস্তান্তরিত করতে হয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, গিরনারের জঙ্গলে তিনি আর তেমন অনায়াসে ছুটে গিয়ে দেখতে পাবেন না তাঁর আরণ্য অঞ্চলের অধিবাসীদের এবং সেই সকল গোরক্ষক এবং তাদের স্ত্রী ও শিশুসন্তানের যাদের গৃহে এবং গোলাবাড়ীতে স্থিতু করবার জন্যে তিনি প্রয়াস পাচ্ছেন। অবশ্য আগেকারই মত কিন্তু তিনি নারী এবং শিশুদের জন্য তাঁর মুখ্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

গৃহের পরিবেশে

সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছ পরিভ্রমণকালে যখন তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করি তখন তিনি আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন জুনাগড় শহরে "শিশুমঙ্গলে"র সহিত সংশ্লিষ্ট জীর্ণদশাপ্রাপ্ত বাসগৃহ বনামআপিসে। এই "শিশুমঙ্গল" হচ্ছে যাকে বলা যেতে পারে একটি 'আদর্শ পুষ্পাবেন প্রতিষ্ঠান'—সকল শ্রেণীর নিঃস্ব এবং ভাগ্যবিড়ম্বিত অসুখী এবং স্বজনপরিত্যক্ত নারী এবং শিশুদের আস্তানা ও আশ্রয়স্থল এটি। এদের মধ্যে আছে সেই সকল কুমারী মায়েদের শিশু যারা এই প্রতিষ্ঠানে আসে আশ্রয়লাভের নিমিত্ত এবং শেষ পর্য্যন্ত সেখানে রেখে যায় তাদের শিশুদের।

পুষ্পাবেন বসেছিলেন তাঁর দিওয়ানের উপর, পরনে ছিল তার সাদাসিধে কালো খদ্দরের শাড়ী এবং একটি সাদা ব্লাউজ। এই মাঝবয়সী মহিলাটি সুন্দরী এবং গ্রামাঞ্চলের গুজরাটী মেয়েদের মত লম্বা এবং বলিষ্ঠ তাঁর দেহের গড়ন। তাঁর কক্ষের ভিতরে এবং বাইরে ছুটাছুটি করছিল কয়েকটি শিশু, বাগান থেকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা তাদের ক্ষুদ্র সম্পত্ত—হয়তো একটি খেলনা; তাঁর কানে কানে বলছিল তারা কোন গোপন কথা অথবা সমস্যার কথা। তাদের মধ্যে ছিল ছেলে এবং মেয়ে দুই-ই—তিন বছর বয়সের হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে চলতে-শেখা ছোট বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে বয়স্থা বালিকা এবং তরুণী বধূরা পর্য্যন্ত। সেখানে ছিল পুরোপুরি ঘরোয়া পরিবেশ। শিশুরা এখানে অনুভব করে স্ব গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য এবং তারা যে নিজেদের বাড়ীতেই আছে এটা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠল।

বর্ত্তমান মান অনুযায়ী আমি অবশ্য শিশুমঙ্গলকে একটি তৎপর প্রতিষ্ঠান বলব না। এখানকার কর্ম্মী-সংসদের শিক্ষা-লাভ হয়েছিল গৃহে, কয়েকজন হচ্ছেন পুরানো "আবাসিক" কর্ম্মী—প্রতিষ্ঠান স্বয়ং তাদের শিক্ষাদান করে। সাধারণতঃ মৌলিক সাজসরঞ্জামের জন্য—বিশেষতঃ নার্সারি বা শিশুদের খেলাঘর বিভাগের জন্য যথেষ্ট অর্থ ছিল না—যদিও সৌরাষ্ট্রেই এত সস্তায় এবং সুষ্ঠুভাবে যে চমৎকার মন্তেসরি সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত হয় তদ্দ্বারা কিণ্ডারগার্টেন ক্লাস ভালভাবেই খোলা

হয়। উপযুক্ত মানের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুত একপ্রস্ত চিত্রিত কাঠের ব্লক এবং "শিক্ষামূলক" খেলনার মূল্য প্রায় ষাট টাকা। কিন্তু দিনকতক ঐ গৃহে অবস্থান করে আমি দেখতে পেলাম, জীবনের স্রোতে সে সকল অনাথ নিরাশ্রয় বালকবালিকা ভেসে এসেছে তাঁর আরামপ্রদ আবদ্ধ জলে তাদের জন্যে কি-এক বিস্ময়কর কাজ করছেন পুষ্পবেন। প্রত্যেক শিশুই তাঁর নিকট ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। কতকগুলি হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানেই প্রতিপালিত সাধারণ স্বাভাবিক শিশু। অন্যেরা যারা এসেছিল পিতৃমাতৃবিয়োগ, অথবা কোন অসুখের দরুন প্রায় অনশন অথবা পিতামাতার বেকার অবস্থা ইত্যাদির ন্যায় প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার পরে তাদের বিষয় ছিল নিশ্চিতভাবেই মনস্তাত্ত্বিক। তাদের অনেকেই ছিল বিপর্য্যস্ত এবং তাদের অধিকাংশের সঙ্গেই মানিয়ে চলা ছিল কঠিন।

পুষ্পবেনের পরিবার

তারা সকলেই ছিল তার পরিবার—গর্ব্ভের প্রজনন-কার্য্য সম্পন্ন করানো যাদের বৃত্তি তাদের পরিবার থেকে যে সকল বালিকা এসেছিল তাদের থেকে আরম্ভ করে আকস্মিক পিতৃমাতৃবিয়োগের পর ভিক্ষা করে কাটিয়েছিল যারা কয়েকটি ভয়াবহ সপ্তাহ—তাদের সকলেরই ছিল একই অবস্থা। মৃদু হেসে পুষ্পবেন বললেন, "এদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনিতে লাগে প্রায় দুই থেকে তিন বৎসর এবং পরবর্ত্তী কালে তাদের চরিত্রের বিকাশ হয় সুষ্ঠুভাবে। ঐ অবস্থায় পৌছুলে পর তাদের বিকাশ-গৃহগুলির মধ্যে একটি অথবা অপরটিতে পাঠানো হয়—ওগুলিও তাঁরই। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও কথা আমরা পরে বলব। শিশুদের সম্বন্ধে তাঁর যে কর্ম্মনীতি তা হচ্ছে যথার্থ নীতি। তিনি বললেন, তিনি এটা অধিকতর শ্রেয়ঃ মনে করেন যে, শিশুদের এই অবস্থায় পরাতে হবে সাধারণ গ্রাম্য পোশাক। বড় ছেলেদের জন্য একটি সার্ট এবং একটি কাছি আর বয়স্থা মেয়েদের জন্য হয় ঘাঘরা এবং চোলী অথবা সাদাসিধে শাড়ী। তিনি এটা চান না যে, তারা জীবনযাপনের সেই সকল মানে অভ্যস্ত হয় যা পরবর্ত্তী জীবনে উপার্জ্জনক্ষম অথবা বিবাহিত হলে পর তারা বজায় রাখতে সমর্থ হবে না। ঐ কারণেও তিনি, শিশুরা বেড়ে উঠার দরুন তাদের গায়ে লাগে না বলে স্ত্রীলোকেরা যে সকল পুরনো পোশাক পরিচ্ছদ দিতে চায় সেগুলো অথবা নূতন কাপড়-চোপড়—মাত্র কয়েকটি প্রদত্ত হলেও, গ্রহণ করেন না। যদি কোন শিশু বিশেষভাবে চালাক-চতুর এবং চটপটে বলে প্রতিপন্ন হয় তা হলে যথোচিত শিক্ষালাভের জন্য তিনি তাকে প্রেরণ করেন ওয়াধাওয়ানের বিকাশ-বিদ্যালয়ে অথবা রাজকোটস্থিত কান্তশ্রী বিকাশ-ঘরে।

চারি ধর্ম্মযাত্রা

তখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, যে-কয়টি কক্ষ বারান্দা এবং বাগান নিয়ে এর প্রাকৃতিক সীমা নির্দ্ধারিত তার চেয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি কত ব্যাপকতর। হাসতে হাসতে তিনি আমাকে বললেন তাঁর "চারি ধর্ম্মযাত্রা"র কথা:—"আমাদের একটি নয়, কিন্তু চারটি প্রতিষ্ঠান। নারী এবং শিশুদের উদ্ধারের জন্য ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আহমেদাবাদে প্রতিষ্ঠিত জ্যোতি সঙ্ঘে ছিল আমাদের কাজের মূল। এটি একটি উৎকৃষ্ট সংস্থা এবং এখনো এটি উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। মৃদুলা সারাভাই—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ছিন্নমূল এবং ধর্ষিতা নারীদের মধ্যে বিস্ময়কর কল্যাণকর্ম্মের জন্য যিনি সুপরিচিতা ছিলেন—তাঁর একনিষ্ঠ সহকর্ম্মিণী। এই অসমসাহসিকতাপূর্ণ কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের প্রয়োজন ছিল কেবল নিষ্ঠার নয়, উপরন্তু শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সাহসের। তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন সেই সকল কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিদের কঠোর সমালোচনা—এমনকি অত্যাচারের পাত্রী, অনাশ্রিত অবস্থায় পথে ফেলে দেওয়া স্ত্রীলোকদের পাশে এসে দাঁড়াত যারা লাভের আশায়। বাজারে গুণ্ডাদের সম্মুখীন হওয়া এবং নৈতিক দিক দিয়ে বিপন্ন অল্পবয়স্কা মেয়েদের উদ্ধার করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না—অন্যান্যদের নিয়মিতভাবে বিক্রি করা হ'ত পতিতালয়ে এবং অল্পবয়স্ক শিশুদের রেখে দেওয়া হ'ত পতিতালয়ের জুগুপ্সিত জীবনের অন্ধকারজনক পরিবেশে।

গুজরাটে আত্মহত্যার হিড়িক

এর উপর আর একটি সমস্যাও ছিল। বর্ত্তমানে যে অঞ্চলটি সৌরাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যদিও তা বহু দিক দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চল এবং ওখানেই জাত গান্ধীজীর দীর্ঘকালীন সংস্পর্শ এবং জাতীয় আন্দোলন দ্বারা পবিত্রীকৃত, তথাপি সমগ্র ভারতে এখানেই নারীদের আত্মহত্যার হার শোচনীয়রূপে সর্ব্বাধিক বলে এখানকার অবাঞ্ছনীয় খ্যাতি(?) আছে। সম্প্রতি হিসেব করে দেখা গেছে যে, এই হার হচ্ছে প্রতিদিন একটি করে (বৎসরে ৩৬৫)। এই শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবার জন্যে সরকার স্বয়ং সম্প্রতি একটি উচ্চস্তরের কমিটি নিয়োগ করেন এবং যদিও চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি, তথাপি এটা প্রতীয়মান হয় যে, এর মূলগত কারণ হচ্ছে খাঁটি সামাজিক, অর্থনৈতিক নয়।

এক্ষেত্রেও এসে মাথা গলালেন পুষ্পবেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হ'ল আহমেদাবাদের বিখ্যাত বিকাশগৃহ—যাবতীয় দুর্গত নারীদের আশ্রয় দেবার জন্যে। মমতাশূন্য গার্হস্থ্য পরিবেশ এবং স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যাচারের হাত থেকে যাঁদের উদ্ধার করা হয় অথবা স্বজনপরিত্যক্তা হওয়ার দরুন যে সকল নারীকে সকল প্রকার প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয় তাদেরও এই প্রতিষ্ঠানে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল। একটি 'হোম' বা সদন কিন্তু যথেষ্ট বলে মনে হ'ল না। ১৯৪৫ সালে অপর দুটি প্রতিষ্ঠার উপযোগী অর্থ পাওয়া গেল—ওয়াধাওয়ান নগরীর বিকাশ-বিদ্যালয় এবং জালাওয়ার জেলার হালওয়াড়ের 'প্রাগিতি গৃহ'। সর্ব্বশেষে খোলা হ'ল রাজকোটের শ্রীকান্ত বিকাশ-গৃহ—এটি হ'ল চতুর্থ 'সদন'। সবগুলো 'হোম'ই ছিল প্রকাণ্ড কক্ষসমন্বিত, পাকাবাড়ী—অনাড়ম্বরভাবে এগুলির কার্য্য পরিচালিত হয়, কিন্তু এগুলির পরিচালনার মধ্যে আছে পরিচ্ছন্নতা এবং মাধুর্য্য। ভারতের ঐ অঞ্চলের নারী এবং শিশুদের কল্যাণকল্পে অনুষ্ঠিত কাজের সহিত আমি সংশ্লিষ্ট হয়েছি। সবগুলিতে ছিল সেই একই ছাপ—ব্যক্তিগত সংস্পর্শের ছাপ। পুষ্পবেনের স্ব-নির্ব্বাচিতা নারী সমাজকর্ম্মীরা সেই প্রতিষ্ঠানেই অবস্থান ও কাজ করছেন আর প্রতিষ্ঠানকেই করে নিয়েছেন তাঁদের গৃহ। এই জন্যেই রাজকোটে হীরাবেন, হালওয়াড়ে মায়াবেন, ওয়াধাওয়ানে পুষ্পবেনের তরুণী ভাইঝি অরুণাবেনের মত আশ্চর্য্য ক্ষমতাসম্পন্না, শান্ত এবং সমবদার কর্ম্মীদের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে—তাঁরা যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন আজও তা চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতমা অরুণাবেনের—একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠান গঠনের কৃতিত্বের অধিকারিণী যিনি—বয়স এখনো ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয় নি। এই বয়সেই তিনি কর্ম্মের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এগারো বৎসর এমন ভাবে কাজ করেছেন, যা সম্পন্ন করতে একজন বয়স্কা নারীকে অনন্ত ধৈর্য্য এবং কূটনীতির চরম পরীক্ষা দিতে হ'ত। পুষ্পবেনের একমাত্র কন্যা উষাবেন—এখন যিনি মাতৃনীতিকার্য্যে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্না, পরিপূর্ণরূপে শিক্ষিতা একজন চিকিৎসক—আমেদাবাদের বিকাশ-গৃহের মূল কর্ম্মীদের একজন—এই গৃহের কাজকর্ম্মে সরলাদেবী সারাভাইয়েরও সক্রিয় অনুরাগ আছে।

কারাপ্রাচীর নয়

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান—আশ্রয়স্থল নামটিই আমার অধিকতর পছন্দসই—নূতন নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের একান্তভাবে খাপ খাওয়াইয়া একটি ইউনিটের মত কাজ করে। "অনেক ক্ষেত্রে এরূপ হয়" পুষ্পবেন বললেন, "যখন কোন-একটি হোমে উত্তমরূপে যে প্রতিপালিত হচ্ছে এমন কোন বালিকা চায় পরিবর্ত্তন। সে মানুষ তো। কখনো কখনো সে চায় ছুটি। আমি তাকে পাঠিয়ে দিই হীরাবেনের কাছে অথবা অন্যান্যদের মধ্যে কোন একজনের নিকটে। তার পর সে ফিরে আসে চাঙ্গা হয়ে। কোন কোন সময় কোন মেয়ে অসদাচরণ করে এবং খারাপ মেজাজ দেখায়, এবং তার এখানকার বান্ধবীদের চোখে বোকা বলে প্রতীয়মান হয়। আমি তাকে একটু ঠাণ্ডা করবার প্রয়াস পাই, তার পর পাঠিয়ে দিই তাকে একটি নূতন হোমে—যাতে করে নূতন ভাবে সুরু হয় আবার তার এগিয়ে চলা এবং অন্যান্য মেয়েদের কাছ থেকে সে পায় সম্মান।

ওয়াধাওয়ানের বিকাশ-বিদ্যালয়ে—এটিও একটি চমৎকার স্কুল, শান্তিনিকেতনের এক তরুণ শিল্পীর আঁকা ছবি দ্বারা এর প্রাচীরগুলি সমুজ্জ্বল (হায়, এখন সে লোকান্তরিত)—আমি শুনতে পাই সেই একই কাহিনী। এর পরিবেশ ছিল ভারতে যাকে বলা হয় "একটি উত্তম কন্‌ভেণ্ট স্কুল" তার অনুরূপ, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, ধরনধারন এবং রীতি-পদ্ধতিতে এটি ছিল অধিকতর ভারতীয়। সেই একই তৎপরতা, একই যোগ্যতা, সকল শ্রেণীতে ছোট শিশু থেকে সুরু করে প্রায় কলেজে অধ্যয়নের বয়সী মেয়েদের সেই একই ধরনের সুখী মুখগুলি। বহু ক্ষেত্রে শহুরে পরিবার থেকে আগত মেয়েদের এবং অনাথ বালিকাদের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না, প্রায়শঃই এটা দেখে আমি বিস্মিত হতাম যে, অনেক ক্ষেত্রে "হোমের বালিকাদিগকে" তাদের কোন কোন শহুরে সহপাঠিনীগণ অপেক্ষা—কড়াকড়ির বাঁধন যেখানে শিথিল এবং যা প্রীতিকর এমন পরিবারের কন্যা বলে অধিকতররূপে প্রতীয়মান হ'ত। অরুণাবেন সেই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি করলেন, "যখন ছুটির দিন আসে তখন এই সকল বালিকারাও যদি অন্যান্য মেয়েদের মত আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে যেতে অথবা নূতন স্থান পরিদর্শন করতে না পারে তা হলে মনে দুঃখ অনুভব করে। কাজেই অল্পকালের জন্যে আমি তাদের পাঠিয়ে দিই পুষ্পবেন অথবা হীরাবেনের নিকটে। তারা ফিরে আসে সজীব হয়ে। মোটের উপর ছুটি উপভোগ করা খুবই মজার, কিন্তু ঘরে ফিরে আসা যে আরও মজার!

আবার গৃহে

এই বুঝাপড়ার দরুন বালিকারা যে কি অপরিমেয় ভাবে

উপকৃত হয় তা আমি উপলব্ধি করতে পারলাম। তাদের আছে একটি প্রকৃত গৃহ—যেটি হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান যাতে তারা প্রথম ভর্ত্তি হয়। সেখানে আছেন তাদের "মাতা"। তার পর তাদের আছে খুড়ী জেঠী—অন্য চারটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যাঁদের সঙ্গে তারা দেখা করতে পারে। কখনও কখনও তাঁদের নিকট বিরক্তি সহকারে বকবক করেও তারা বেশ মজা পায়। সকলেই এটাকে বেশ প্রসন্নভাবেই গ্রহণ করেন। কখনও কখনও অপর কারুর নিকট 'এটা অথবা ওটা পাই নি' এই বলে, অথবা কোন বাস্তব কিংবা কল্পিত কষ্টের জন্য অনুযোগের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন। সুতরাং এসব শোনা হয় ধৈর্য্য সহকারে; প্রতিকার করা হয়, আবার ভুলেও যাওয়া হয়। এর দ্বারা চরিতার্থ হয় আত্মপ্রকাশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন।

এই চারিটি তীর্থধামেরও প্রত্যেকটির আবার বিশেষ পরিবেশ আছে। একটির বিশেষজ্ঞতা আছে খুব কঠিন 'কেস'সমূহে, একটির কলেজের কাজ এবং ট্রেনিং ক্লাসসমূহের শিক্ষাদান ব্যাপারে; একটির বৈশিষ্ট্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানে, আর একটির বয়স্কা নারী এবং তাদের পরিবারসমূহের তত্ত্বাবধানে। হালওয়াডস্থিত সকলের শেষেরটি হচ্ছে মূলতঃ চলচ্চিত্র জগতের প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ডালসুখ পাঞ্চলী কর্তৃক তাঁর নেতৃস্থানীয় ভ্রাতার স্মৃতিরক্ষার্থে দান। এখানে রাখা হয়েছে দশ অথবা বারোটি পরিবারকে এবং সেখানকার "মাতা"কে দেওয়া হয়েছে তাঁর নিজস্ব রান্নাঘর ও শিশুদের পুরোপুরি তত্ত্বাবধানের ভার। শিক্ষালাভের জন্য রাজকোট-স্থিত "স্কুল" প্রতিষ্ঠানে যাবার মত বয়স যে পর্য্যন্ত না তাদের হয় সে পর্য্যন্ত তাঁকেই তাদের দেখাশুনা করতে হয়। চিকিৎসার দিক দিয়ে দেখলে আমেদাবাদ হোমটিকেই বলতে হয় সকলের সেরা। এই হোম হচ্ছে সেই স্থান যেখানে পাঠানো হয় মেয়েদের যখন একটি উত্তম গৃহ দিতে সমর্থ এবং শীলতাসম্পন্ন তরুণের সঙ্গে তাদের বিয়ের সময় সমাগত হয়। এটি হচ্ছে পুষ্পবেনের পুনর্ব্বাসনকার্য্যের আর একটি দিক এবং এ বিষয় বিশদভাবে বলবার জন্যে প্রয়োজন আর একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের। পুষ্পবেন অথবা তাঁহার সহকর্ম্মিগণ অপেক্ষা অধিকতর প্রযত্নের সঙ্গে চিরা-চরিত ভারতীয় প্রথায় কোন জননীই তাঁর কন্যার জন্য বর-নির্ব্বাচন করতে পারতেন না।

বিয়ের পরও মেয়েরা যে-কোন স্বাভাবিক ভারতীয় মেয়ের মত 'হোমে' বা ঘরে ফিরে আসে। তার শিশুদের নিয়ে সে আসতে পারে এক মাস অথবা এক বছরের জন্যে। অথবা সে আসতে পারে তার সন্তানজন্মের সময়। এটা তাকে কখনও বুঝতে দেওয়া হয় না যে, সে যখন তার নিজের সংসার পাতবার জন্যে এই গৃহ ছেড়ে চলে যায় তখন এটি আর তার গৃহ থাকে না। "বিয়ের মধ্যে কতগুলি সফল ও সার্থক হয়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "প্রায় শত-করা একশ'টি"—এই উৎসাহপ্রদ জবাব শোনা গেল। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আরোগ্যোত্তর কর্ম্মই, বালিকা যে নিরাপত্তা বোধ করে তার অপর একটি কারণ।

বর্ত্তমান যুগে যখন প্রায়শঃই সমাজকর্ম্মকে প্রচারের প্রবল ইচ্ছার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়, তখন হীরাবেনের আত্মবিলোপ এবং রাজ্যের বাইরে এই কৃত্যকে পরিজ্ঞাত করবার সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতা থেকে অনেককিছু শিখিবার আছে। এই পঞ্চ কর্ম্মীগোষ্ঠী এবং তাঁদের চেয়ে যিনি কম যান না সেই বিক্রমভাই—ইনিই হচ্ছেন একমাত্র আঙ্কল বা খুড়ো এবং মহান্ ক্রিয়াশীল ইউনিটের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এতেই সন্তুষ্ট আছেন যে তাঁদের কর্ম্মধারা প্রবাহিত হচ্ছে আপন গতিপথে এবং ছড়িয়ে দিচ্ছে এর স্বকীয় শান্ত আশিস্। কিন্তু সম্পাদক এবং কর্ম্মী উভয়রূপেই কর্ত্তব্য হতে আমি বিচ্যুত হব যদি আমার ভারত ভ্রমণকালে যে উৎকৃষ্টতম সংহত সমাজকর্ম্মের রূপ দেখেছি তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদানে আমি বিরত হই।

"এহ বাহ্য"

কিন্তু "এহ বাহ্য"—এ পর্য্যন্ত যা বলা হ'ল তা-ই পুষ্পবেনের সমুদয় কাহিনী নয়। কিংবা সৌরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত উৎকৃষ্ট সমাজ-কর্ম্মের সমগ্র কাহিনী এর মধ্যেই পর্য্যবসিত নয়—এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে আরও বিশদভাবে। কৃষ্ণ-বসনাচ্ছাদিতা এই মূর্ত্তিটির পিছনে আছে স্বাধীনতার দীর্ঘ পথে বাপুজীর পাশাপাশি জনসেবার এক সমৃদ্ধ পটভূমিকা। ওয়াধাওয়ানে মহাত্মাজীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা পত্রখানি কি এটাই প্রমাণ করে না যে, পুষ্প-বেন এবং মৃদুলাবেন তাঁদের প্রাথমিক সংগ্রামকালে লাভ করেছিলেন তাঁর নৈতিক সমর্থন। মনে পড়ে ১৯৪৭-এর সেই দিনগুলোর কথা যখন জুনাগড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরজি হুকুমত এবং তিনি হয়েছিলেন সাময়িক প্রশাসক পরিষদের (Administrative Council) স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং শরণার্থী মন্ত্রী। সৌরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হওয়ার পর উক্ত অঞ্চলের আড়াই লক্ষ সিন্ধী শরণার্থীর সমস্যা সম্পর্কে তিনি প্রবল আগ্রহ দেখিয়েছেন।.: তাঁরই চেষ্টায় ৪০৭০ জন মাল-দারী রাখালকে ওখানকার জমিতে স্থিতু করা হচ্ছে—অবশ্য

একাজে তিনি তুলনারহিত বিক্রমভাইয়ের সহায়তা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শিখবার অনেককিছু

উপসংহারে এই কথাটিই বলতে চাই যে, আমাদের অনেকেরই অনেককিছু শিখবার আছে এই অঞ্চলটি থেকে—সংক্ষেপে যাকে বলা হয়েছে "ভারতের অনগ্রসর অঞ্চল-সমূহে"র একটি। এই সমস্ত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এরূপ একটি অঞ্চলের শ্রেণীনির্দেশ করা বড়ই কঠিন এবং এবিষয়েও সন্দেহ নেই যে, মহিলামণ্ডলসমূহের এবং সৌরাষ্ট্রের সাধারণ নারীদের ও শিশুদের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীও আদর্শস্বরূপ বলে গণ্য হতে পারে। এ হচ্ছে এমন কৃত্য যা এক বিশেষ ধরনের সম্পূর্ণতা এবং পরিচ্ছন্নতা দ্বারা চিহ্নিত এবং প্রীতিকর পরিবেশটি পুরোপুরি এর নিজস্ব।

আমাদের অন্ধ কবি সুরদাস

সুরদাস ছিলেন অন্ধ—তাঁকে বলা যেতে পারে ভারতের মিল্টন। তিনি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দী সাহিত্যে ব্রজভাষার ভক্তিযুগের শীর্ষস্থানীয় কবি।

তিনি কেমন করে অন্ধ হন সে সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। একটি প্রচলিত ধারণা এই যে, চিন্তামণির সঙ্গে ভোগলালসাপূর্ণ জীবনযাপনের পালা সাঙ্গ করে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান। একদা ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে তিনি এক বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, যে স্ত্রীলোকটি তাঁকে ভিক্ষা দিতে এসেছেন তিনি পরমাসুন্দরী। তিনি রিপুর তাড়না অনুভব করলেন। কোমল এবং শান্ত ভাবে তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে দুটো টেকো নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁর হাত থেকে টেকো দুটো নিলেন এবং এই কথা বলে চোখ দুটো টেনে তুলে ফেললেন—"যে চক্ষুদ্বয় এমন পাপাসক্ত যা আমাকে প্রলুব্ধ করে পার্থিব বিষয়ের প্রতি এবং আমাকে করে তোলে ইন্দ্রিয়ের দাস তাদের আমি আর রাখব না।" এমনি ভাবে অধ্যাত্ম চেতনায় আলোকিত হয়ে, কবি-প্রতিভার চক্ষুতে অপরকে একটা নূতন আলোকরশ্মি দান করবার জন্যে তিনি নিজের দৃষ্টিশক্তিকে বিসর্জন দিলেন। বিখ্যাত গায়ক তানসেন একবার সুরদাস সম্বন্ধে বলেছিলেন—পাপ, প্রলোভন ও আসক্তির যে মেঘজাল এই সমগ্র বিশ্বকে আবৃত করে রেখেছে তা অপসারিত হয়েছিল সুরদাসের দ্বারা—যিনি ভগবানের প্রশস্তিমূলক সুললিত সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন। তাঁর নিকট থেকে নিঃসৃত হয়েছিল ভগবদ্ভক্তির অমৃতবাণী।

যে চোখ তিনি দেখতে পেতেন না তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও সুকুমার সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন তিনি। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত এক গোপিনী তার সখীকে বিশ্রম্ভালাপচ্ছলে বলছে—

প্রভুর খঞ্জন পাখীর মত চোখ দুটির সৌন্দর্য্য এবং
মাধুর্য্য দ্বারা বিমুগ্ধ হয়েছে আমার এ দু'চোখ—
সুখে পরিপূর্ণ, সুন্দর এবং স্বচ্ছ এই নৃত্যপর চক্ষু দুটি
মনে হয় যেন খাঁচায় থাকতে নারাজ
তারা বলে
'এখানে কেন আমরা ?
ওগো সখি, সেই প্রিয়তমের কাছে যাব আমরা
যিনি আমাদের জীবনের জীবন।'

অন্য দিকে নিজের অন্ধত্বের কথাও তার মনে থাকত। পরম দেবতার মহিমা এবং সর্ব্বশক্তিমত্তার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি গেয়েছেন—

তোমার চরণ দুটি আমার চরম আশ্রয়
তাদের উপর আছে আমার গভীর আস্থা—
লক্ষ্মীপতি বল্লভস্বামীর নখচন্দ্রের কিরণ বিনা
সারা জগৎ যে অন্ধকার আমার কাছে।
এই কলিযুগে, এই অন্ধকারের যুগে
এমন আর কোন পথ নেই যা বাঁচাতে
পারে এই গায়ককে।
কি আর বলতে পারে সুরদাস,
সে যে উভয় দিকেই অন্ধ
আমি যে তার বিনা মাহিনার চাকর।

দ্বিতীয় ওয়েলফেয়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরি ঃ হায়দরাবাদ পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত নাগরিক কল্যাণ পরিকল্পনা (Urban Family Welfare Scheme) অনুসারে ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে হায়দরাবাদের নিকটবর্ত্তী আশিফ নগরে একটি দেশলাইয়ের কারখানার প্রতিষ্ঠাকে এই পরিকল্পনার প্রগতির পথে দ্বিতীয় মাইলনির্দ্দেশক স্তম্ভ বলা যাইতে পারে। নয়া দিল্লীর নাজফগড়ে প্রতিষ্ঠিত দেশলাইয়ের কারখানাটি হইতেছে উক্ত পরিকল্পনার প্রথম রূপায়ণ। তার পর হইতে অন্য দুইটি দেশলাই কারখানা প্রোজেক্টের উদ্বোধন হইয়াছে—একটি অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়ায় এবং অপরটি বোম্বাই রাজ্যের 'পুণা' শহরে।

সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্প এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এই সব প্রোজেক্ট। শিল্পায়িত নাগরিক অঞ্চলে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নয়নকল্পে প্রবর্ত্তিত এই সকল পরি-কল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ।

বেকার অবস্থা অথবা এমন কর্ম্মে নিয়োগ যা জীবিকা-নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং জীবনযাপনের ব্যয়ের ক্রমিক বৃদ্ধি প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাক এই শ্রেণীর লোকেদের ঘায়েল করিয়াছে শোচনীয়ভাবে। যেগুলি বিশেষ ভাবে ঘায়েল হইয়াছে সেগুলি হইতেছে সেই সকল পরিবার যাহাদের মাসিক আয় পঞ্চাশ টাকা হইতে দেড়শ' টাকার মধ্যে। ঐ ধরনের পরিবারের নারীদিগকে লাভজনক কর্ম্মে নিয়োগের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার বিষয় কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক বিবেচিত হয়। নারী-কল্যাণ প্রচেষ্টার উন্নয়ন এবং শিল্পবিষয়ক সমবায়মূলক পরিকল্পনাসমূহের প্রোগ্রামের একটি অত্যাবশ্যক দিক লইয়া কাজ আরম্ভ হয়। এতদনুসারে এই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত স্ত্রীলোকদের উপযুক্ত শিল্পে কর্ম্মলাভের সুযোগ দেওয়া হয়, এমনিভাবে তাহাদের দ্বারা পারিবারিক আয়ের পরিপূরণ হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত সুবিধা এই যে, নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী তাহারা কারখানায় অথবা স্ব স্ব গৃহে কাজ চালাইয়া যাইতে পারে।

তিনটি একক (unit)

আশিফ নগরের দেশলাইয়ের কারখানা এরূপ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিসমন্বিত যে, তাহা পাঁচ শত স্ত্রীলোককে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারে, তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকের কাজের ব্যবস্থা হইতে পারে কারখানায় এবং বাকী অর্দ্ধেকের তাহাদের গৃহে। এই ব্যবস্থার দরুন মূল কারখানায় কাজে লাগানো হইয়াছে প্রায় ৩০০ জন স্ত্রীলোককে, তন্মধ্যে প্রায় ১৮০ জন কাজ করে ফ্যাক্টরিতে। আশিফ নগরস্থ মূল ফ্যাক্টরি ছাড়া শিল্প সমবায় সমিতির (Industrial Co-operative Society) দুইটি শাখা একক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে চঞ্চলগুড়া এবং গোল-কুণ্ডায়—প্রথমোক্তটি ১৯৫৬ সনের মে মাসে এবং শেষোক্তটি ঐ বৎসরেরই জুলাই মাসে। ইহা আশা করা যায় যে, তিনটি ইউনিট একত্রে ১৫০০ স্ত্রীলোকের নিয়মিত কর্ম্ম-নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবে এবং দৈনিক ১৫০০ গ্রোস দেশলাইয়ের বাক্স তৈরী হইবে।

১৯৫৫ সনের আগষ্ট মাসে রেজিষ্ট্রীকৃত আশিফ নগর-স্থিত "ম্যাচ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটির উদ্বোধন হয় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ কর্তৃক। এই পরিকল্পনাধীনে আসিতে প্রস্তুত পরিবারসমূহ সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান এবং অন্যান্য তদন্তকার্য্য পরিচালিত হয়, হায়দরাবাদ রাজ্য সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি 'এড্ হক' কমিটির দ্বারা। যে চারি শত পঞ্চাশ জন স্ত্রীলোক সমিতির সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আছে প্রাক্তন সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভরপরায়ণা নারী, যাহাদের মনসবদারী লোপ পাইয়া গিয়াছে সেই সকল মনসবদারদের পরিবারের স্ত্রীলোক এবং কেরাণী, শিক্ষক ও অনুরূপ অন্যান্য সরকারী চাকুরিয়াদের মত নিম্নতর আয়কারী কর্ম্মচারীগোষ্ঠীসমূহের অন্তভুক্ত স্ত্রীলোকগণ। দেশলাই নির্ম্মাণের বিভিন্ন প্রণালী সম্পর্কে প্রায় তিনমাস কাল প্রাথমিক শিক্ষাদানের পর স্ত্রীলোকদের লাগাইয়া দেওয়া হয় দেশলাই উৎপাদন-কার্য্যে।

উৎপাদন বাড়তির পথে

মূল ফ্যাক্টরি দেশলাইয়ের বাক্সের বাণিজ্যিক উৎপাদন সুরু করে ১৯৫৫ সনের ১৮ই ডিসেম্বর। সেই সময় হইতেই উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান উৎপাদনের হার হইতেছে—দৈনিক প্রায় দুই শত গ্রোস দেশলাইয়ের বাক্স। দেশলাইয়ের বাক্স বিক্রয়ের ভার অর্পিত হইয়াছে একটি প্রভাবশালী সেলিং এজেণ্ট বা বিক্রয়কারী সংস্থার উপর এবং বিক্রয় ক্রমশঃ বাড়তির পথে। যে দিবস হইতে ফ্যাক্টরি

উৎপাদন-কার্য্যে ব্রতী হয় সেই দিন হইতে ১৯৫৬ সনের মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত মজুরি রূপে কর্ম্মীদিগকে ৮,৮৬২৲ টাকা এবং শিক্ষার্থীদিগকে বৃত্তি হিসাবে ১৪,০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। দেশলাই প্রস্তুতির বিভিন্ন প্রণালীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন মজুরির হার নির্দ্দিষ্ট আছে। এক গ্রোস দেশলাইয়ের বাক্সের লেবেল লাগানোর জন্য কর্ম্মীরা দৈনিক তিন পয়সা করিয়া পায়—অন্যবিধ কর্ম্মের জন্য প্রত্যহ দেড় টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জিত হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের নাগরিক কল্যাণ পরিকল্পনা অনুযায়ী এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত চারিটি দেশলাইয়ের কারখানা—সেই সকল অনুরূপ প্রোজেক্টসমূহের অগ্রণী, পর্ষদের প্রতিভূস্বে যেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে অন্যান্য রাজ্যে। এগুলি শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পসংক্রান্ত সমবায় প্রতিষ্ঠান। ইহার অধীনে হয় দেশলাই নতুবা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত একটি তালিকা হইতে নির্ব্বাচিত অন্যান্য কোন কোন দ্রব্য উৎপাদক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই সকল প্রোজেক্টের প্রস্তাব বিভিন্ন রাজ্য সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

ভারতে নারীজীবনের নূতন গুরুত্ব

শ্রীদুর্গাবাঈ দেশমুখ

ঘরের জন্য প্রবাসীর মনে যে ধরনের অনুভূতি জাগে, শৈশবের কথা স্মরণ করিলে হয়ত সর্ব্বদাই সে ধরনের অনুভূতিই জাগ্রত হয়। এ এমন একটি অনুভূতি যাহা আমাদেরই একটা কিছু অথচ যেন আমাদের নয়। একটা পৃথক ধরনের সত্তা অথচ যে অনিবার্য্যভাবে ইহার অনুসরণ করিয়াছে তাহার সহিত বিজড়িত। কিন্তু আমার কাছে এবং আমার সমসাময়িক কালে বর্ত্তমান শতকের প্রথম দশকে যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, যে শৈশবকে আমরা জানিতাম তাহা যেন এই জীবিতকালের নহে, অন্য কোন জীবনের এবং এই স্বল্পপরিমিত কালের মধ্যে আমরা একটি নয়, কিন্তু অনেকগুলি জীবন যাপন করিয়াছি।

ভারতে আমাদের জাতীয় জীবনের এই বিকাশের কালে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ছিল এমন একটি নিরাপদ ক্ষুদ্র সংসারে জন্মানো যেখানে নারীর স্থান ছিল চিরাচরিত প্রথা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট এবং ধর্ম্মীয় সংস্কার দ্বারা পবিত্রীকৃত। যে শিশু মেয়ে হইয়া জন্মাইত, বর্ত্তমান জীবনধারার গুরু চাপ কদাচিৎ তাহাকে স্পর্শ করিত; কাজেই, কপাল ভাল হইলে তাহাকে লেখাপড়া শিখানো হইত। এতদ্ব্যতীত তাহাকে পরিবারস্থ পুরুষদের—পিতা এবং ভ্রাতাদের পরিচর্য্যা করিতে হইত, সহায়তা করিতে হইত ঘর-গৃহস্থালির কাজে এবং সেই অতি দ্রুত আগমনশীল দিনটির জন্য নিজেকে তৈরি করিতে হইত যখন পিতামাতার স্নেহনীড় পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইত দীর্ঘ ব্যবধানে অবস্থিত পতিগৃহে। ঐরূপ সমাজে অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং আধুনিক ভাবাপন্ন পরিবারে জাত মেয়েই শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের আশা করিতে পারিত—এ ধরনের মেয়ে ছিল আরও বিরল যারা নিজ নিজ পছন্দসই কোন বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা অর্জ্জনের অনুমতিলাভের প্রত্যাশা করিতে পারিত। কোন অনূঢ়া কন্যার উপার্জ্জিত অর্থ লওয়া পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত; কোন তরুণী পত্নী উপার্জ্জন করিতেছে এই ধারণা স্বামীর উপার্জ্জন-ক্ষমতার অথবা তাহারা উভয়েই যে যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাহার আর্থিক সচ্ছলতার উপর কলঙ্কস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইত।

ইহা হইতেছে অবশ্য একটি সাধারণ চিত্র। উনবিংশ শতাব্দীতেই পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের মত অগ্রণী সমাজকর্ম্মী, তরু দত্তের মত শ্রেষ্ঠ সৃজন-শিল্পী (creative artist) এবং পরবর্ত্তীকালে আমাদের অবিস্মরণীয়া সরোজিনী নাইডুর মত মহীয়সী মহিলারা আবির্ভূত হইলেন—বহিরাবরণের ঠিক নিম্নভাগেই যে শক্তি নিহিত ছিল তা প্রদর্শন করিবার জন্য। কিন্তু যে সাধারণ পরিবারে আমার এবং আমার মত অগণিত মেয়ের জন্ম হইয়াছিল সেগুলিতে এই সকল ছিল সুদুর্ল্লভ ও সুদূরের জিনিষ।

কিন্তু যেমন যেমন বৎসর গড়াইয়া চলিল এবং বালিকারা পরিণত হইল তরুণী বধূতে তেমনি নূতন ভাবাদর্শের

সংঘাতে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল আমাদের মাতৃভূমির সনাতন ভিত্তিভূমি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম—ছেলে এবং মেয়ে যাহারাই ইহার কথা শুনিল তাহাদের সকলকেই করিয়া তুলিল অনুপ্রাণিত। নারী এবং মেয়েদের মধ্যে আসিয়া পড়িল মহাত্মা গান্ধীর আলোক-বিকিরণকারী প্রভাব। পৃথিবীতে এমন লোক খুব কমই আছে যাহারা বাপুর অথবা 'পিতা'র—তাঁহাকে যাহা বলিয় আমরা ডাকিতাম—কথা শুনে নাই—অথবা ভারতের সঙ্গে জড়িত করে না তাঁহার নামকে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, কিংবা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও নয়, সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর উক্তিসমূহের নির্গলিতার্থ কি কয় জন তাহা জানেন, কয় জন একথা অবগত আছেন যে, তাঁহার কৃত ন্যূনতম কাজ এবং সামান্যতম উক্তিও প্রতিধ্বনিত হইত ভারতের চতুষ্পার্শ্বে এবং তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। ভারতের নারীত্বের প্রতি ছিল তাঁহার মহতী ও অবিনাশী শ্রদ্ধা এবং আমাদের যাবতীয় সমস্যা উপলব্ধি করিতেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সমান অধিকার ছিল তাঁহার কাম্য—ইহার চেয়ে ন্যূনতর কিছু তিনি চান নাই। তাঁহার নিকট যাহারা আসিত তাহাদের সকলেরই সহিত তাঁহার স্নেহপূর্ণ অকপট আচরণে যে সরলতা প্রদর্শিত হইত তাহাতে অবিচার অথবা ছলচাতুরীর স্থান ছিল না। সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন সত্যের সেবক। তাঁর সর্ব্বাধিক পরিচিত পুস্তকের নাম—"My Experiments with Truth" বা সত্যের সহিত আমার পরীক্ষা। তাঁহার কত উক্তি এবং বাক্যাংশ আমার মনে উদিত হয়—"এমন ভারতের জন্য আমি কাজ করিতেছি সেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও অনুভব করিবে যে, ইহা তাহাদেরই দেশ, যাহার গঠনে তাহাদের কথাও হইবে কার্য্যকরী···নারীরা যেখানে ভোগ করিবে পুরুষদেরই মত সমান অধিকার—ইহাই আমার স্বপ্নের ভারত।"

ভারতের নারীজাতির উপর কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় যে কয় জন নারী সেই সময়ের মধ্যে শিক্ষিকা অথবা চিকিৎসক হইয়াছিলেন তাঁহাদের উপর নয়, কিন্তু গ্রাম্য নারীদের এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে ও গৃহিণীদের উপর গান্ধীজীর এই আস্থা ছিল বলিয়া নারীসমাজ রক্ষণশীল পরিবারের সঙ্কীর্ণ মানসিক গণ্ডী ছাড়িয়া বাহিরের প্রশস্ততর জগতে পৌঁছিতে উৎসাহিত হইয়াছিল। এই সুযোগ আসিয়াছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় যখন নারীদিগকে সভা এবং সম্মেলনের ব্যবস্থা করিতে হইত, পরিবারের উপার্জ্জনশীল লোক জেলে গেলে পর প্রায়শঃই যখন তাহাদিগকে পারিবারিক কাজকর্ম্ম চালাইয়া যাইতে হইত এবং নিজেদের ভবিষ্যতের প্রতি অনপনেয় আস্থাসঞ্জাত সাহসবশতঃ মাঝে মাঝে যখন তাহাদিগকে কারাগারে পর্য্যন্ত পুরুষজাতির অনুগামিনী হইতে হইত।

যদিও কিছুসংখ্যক এমন স্ত্রীলোকও ছিল—আমার মত সৌভাগ্যের অধিকারিণী যাহাদের বলা চলে না, রক্ষণশীল সামাজিক অনুশাসনে তাহাদের বাহিরে আসা ছিল বারণ, এমনকি তাহাদের রাখা হইত পর্দ্দার আড়ালে। তৎসত্ত্বেও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা যে বাহিরে আসার একটি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল এই বিষয়টি তাহাদের মনোবলের উপর বৈদ্যুতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

কর্ম্মে নিযুক্ত নারীদের অবস্থা

আমরা কিন্তু যখন আজকের দিনে দেশে নারীদের কর্ম্মে নিয়োগের সামগ্রিক অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করি তখন বুঝিতে পারি স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হইতে কি বিপুল দীর্ঘ পদক্ষেপে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে নারীদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক শ'র বেশী নয়, এখন হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃকই কুড়ি হাজারের অধিক স্ত্রীলোক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। ১৯৫১ সনের গত আদমশুমারি হইতে প্রকটিত হইয়াছে যে, ভারতের পঞ্চাশ লক্ষ স্ত্রীলোক স্বাবলম্বিনী, তন্মধ্যে উৎপাদন-শিল্পে নিযুক্ত আছে আট লক্ষ এবং বাণিজ্য বিভাগে পাঁচ লক্ষ।

সরকারী কর্ম্মে নিয়োগের সংখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ে কর্ম্মে নিযুক্ত আছে ৮,৮০০ স্ত্রীলোক, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অধিকার করিয়াছে দ্বিতীয় স্থান—ইহাতে নারীকর্ম্মীর সংখ্যা ৩০০০, উৎপাদন মন্ত্রণালয় তৃতীয় স্থানের অধিকারী—ইহাতে নারীকর্ম্মীর সংখ্যা ১০৭২। বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয় (The External Affairs Ministry) স্থান দিয়াছে ৭০১ জন স্ত্রীলোককে। প্রায় ত্রিশ জন স্ত্রীলোক সেক্রেটারিয়েটে উচ্চতম বেতনের পদে বহাল আছেন—প্ল্যানিং কমিশনে গবেষক কর্ম্মীরূপে এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো সার্ভিসে ও ভারতীয় প্রশাসক সার্ভিসেও (Indian Administrative Service) নারীরা কাজ করিতেছেন।

এই পটভূমিকায়ই আমাদিগকে ভারতীয় শিল্পসঞ্জাত এবং সকল শ্রেণীর নারীদের জীবনচর্য্যায় ইহার তাৎপর্য্য কি তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

(আগামী বারে সমাপ্য)
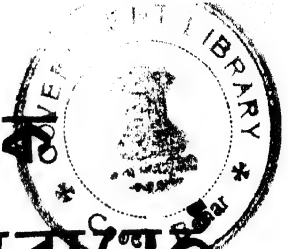
শ্রীকৃষ্ণ ও গীতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

সম্প্রতি প্রবাসীতে (ভাদ্র, ১৩৬৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি পাঠান্তর আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রন্থের, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থের, পাঠান্তর আছে এবং মূল গ্রন্থের সহিত সংযোজনও আছে। থাকিবারই কথা। যে-কালে গ্রন্থ মুখে মুখে চলিত, সে কালে পরিবর্ত্তন ও সংযোজন বেশী হইত। ক্রমে লিপি আসিল। রচনা লিপিবদ্ধ হইলেও পরিবর্ত্তন চলিতে থাকিল। একখানি হাতে-লেখা পুথি হইতে আর একখানি পুথি লিখিয়া লইবার সময় কিছু অজ্ঞাতসারে, কিছু লেখকের ইচ্ছায় পরিবর্ত্তন ঘটে। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে আরও মনে রাখিতে হইবে, এই ভাষার কোন নিজস্ব লিপি নাই। বাংলা, উড়িয়া, হিন্দী, মরাঠী, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থ উহাদের নিজ নিজ লিপিতে লিখিত হইত, এখনও হয়। সংস্কৃতের বেলায় উহা বাংলা দেশে বাংলা অক্ষরে, উড়িষ্যায় উড়িয়া অক্ষরে, গুজরাটে গুজরাটী অক্ষরে লিখিত হইত। এ কারণ এক লিপির পুথি হইতে আর এক লিপির পুথি প্রণয়ন-কালে মূল গ্রন্থের কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইত। এখনও দেখা যায়, প্রাচীন পুথির পাঠোদ্ধার-কালে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও স্থানে স্থানে সন্দেহ থাকিয়া যায়। কারণ—একই ভাষার লিপির পূর্ব্বে যে রূপ ছিল এখন তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রায়শঃ সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা হয়—উহা অত্যন্ত আধুনিক রীতি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন লিপিতে লিখিত গীতার প্রাচীন পুথি মিলাইয়া দেখিতে পারিলে হয় ত আলোচ্য শ্লোকের আদি শব্দটির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিত। গীতার যে সকল ভাষ্য পাওয়া যায় তাহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই প্রাচীনতম। ইহাতে 'তদাত্মানং' পাঠই গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করের পূর্ব্বেও গীতার উপর ভাষ্য রচিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ ভাষ্য আর এখন পাওয়া যায় না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অংশাবতার অথবা পূর্ণ অবতার ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা কোনও শ্লোকের একটি শব্দের পাঠান্তর হইতে নির্ণয় করা যায় না। সমগ্র গীতার আলোচনা করিয়াই তবে উহা বলা যাইতে পারে। তাহাও সমস্যাসঙ্কুল। কেননা পরবর্ত্তী কালে হয় ত ঐ ধারা রক্ষা করিবার জন্য আরও শ্লোক উহাতে যুক্ত হইয়াছে।

গীতার আধুনিক কলেবর আর কিছু না হইলেও পাণিনীর পূর্ব্বের। কেননা ইহাতে অপাণিনীয় (আর্ষ) শব্দের প্রয়োগ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। পাণনীর সময় খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী ধরা হয়। এত প্রাচীন গ্রন্থের মূল রূপ কি ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া জানা সম্ভব নহে। ইহা অতি সাধারণ যুক্তির কথা। একমাত্র ঋগ্বেদ এই যুক্তির ব্যতিক্রম—যাহার মূল রূপের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

শাস্ত্রমতে গীতা মহাভারতের অন্তর্গত। মহাভারতে পাইতেছি, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ৬২০টি শ্লোক বলিয়াছেন, অর্জ্জুন বলিয়াছেন ৫৭টি, সঞ্জয় ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্র ১। মোট—৭৪৫।

ষটশতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ।
অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশং সপ্তষষ্টিং চ সঞ্জয়ঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়াঃ মানমুচ্যতে। (ভীষ্মপর্ব্ব)

প্রচলিত গীতায় শ্লোকসংখ্যা ৭০০। ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ৫৭৫, অর্জ্জুনের ৮৪, সঞ্জয়ের ৪০ এবং ধৃতরাষ্ট্রের ১। শঙ্করাচার্য্য হইতে সকল ভাষ্যকার, টীকাকার, ব্যাখ্যাকারগণ ৭০০ শ্লোকের উপরেই তাঁহাদের ভাষ্য, টীকা ও ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন।

এককালে গীতার শ্লোকসংখ্যা যে সাত শতের অধিক ছিল তাহার ঐতিহাসিক সমর্থনও পাইতেছি। আলবেরুনি নিজে সংস্কৃতবিদ ছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন, গীতার শ্লোক-সংখ্যা সাত শতের অধিক। যে সকল শ্লোক তিনি তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা প্রচলিত গীতায় নাই। আবুল ফজল ও তাঁহার ভ্রাতা ফৈজী-কৃত গীতার দুইটি ফার্সী অনুবাদ আছে। এই দুই গীতার একটিতে আছে—"সম্রাটের আদেশে গীতার ৭৪০ শ্লোকের ফার্সী অনুবাদ সমাপ্ত হইল।"

অভিনবগুপ্তের টীকা-সম্বলিত গীতা, গীতার কাশ্মীরী সংস্করণ। উহার শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫। ৭৪৫ শ্লোকের গীতা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রচলিত। দক্ষিণ ভারতে ঐ গীতার প্রচলন নাই।

গীতা যে মহাভারতের অন্তর্গত, সেই মহাভারতই অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগের নিকট পৌঁছিয়াছে। ব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া পুত্র শুকদেবকে উহা অধ্যয়ন করান। পরে উহা তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে বিতরিত হয়। ইহার বহুদিন পরে মহারাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন উহা কীর্ত্তন করেন—লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যাহা শুনিলেন তাহা আবার বহুদিন পরে শৌনক ঋষির দ্বাদশ বার্ষিকী যজ্ঞে, যজ্ঞকর্ম্মের বিরামকালে উপস্থিত ঋষিমণ্ডলীকে শুনাইতেন। এই সময় হইতে লোকসাধারণের মধ্যে মহাভারত প্রচারিত হইল।

গীতা মহাভারতের অন্তর্গত হইয়াও বহুদিন হইতে ইহা স্বতন্ত্র

গ্রন্থরূপে চলিতেছে। ইহা ব্যাসের রচনা, অথবা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বক্ষণে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাই যথাযথ গ্রথিত হইয়াছে? প্রাচীন উক্তি আছে—

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্।
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণ মুনিনা মধ্যে মহাভারতম্॥

অর্থাৎ, গীতা স্বয়ং ভগবান নারায়ণের দ্বারা (অর্জ্জুনকে) উপদিষ্ট ও প্রাচীন মুনি ব্যাস কর্ত্তৃক মহাভারত মধ্যে গ্রথিত (বা রচিত)।

রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা শুনিয়াছিলেন ব্যাস, তাঁহার দিব্যদৃষ্টি (ও দিব্যশ্রুতি)-বলে, আর শুনিয়াছিলেন সঞ্জয় ব্যাসের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া। সঞ্জয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন অন্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। জনসাধারণ পাইতেছে উগ্রশ্রবাঃর মুখ হইতে মহাভারত কীর্ত্তনকালে।

গীতার, তথা মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, অংশ-ভগবান অথবা একজন মহামানব? দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা অর্জ্জুনও বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতেন না। বিশ্বরূপ দর্শনের পরে জানিতে পারিয়া বলিলেন :

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে তামহমপ্রমেয়ম্॥ ১১।৪১-৪২

সখা ভাবিয়া প্রমাদ বা প্রণয়বশতঃ অবিনয়ে কখনও কৃষ্ণ, কখনও যাদব, কখনও সখা বলিয়া যে সম্বোধন করিয়াছি তাহা তোমার মহিমা জানিতাম না বলিয়াই।

হে অচ্যুত, একসঙ্গে ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদি কালে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে পরিহাসচ্ছলে তোমার যে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছি তাহার জন্ম হে অপ্রমেয়, তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

মানুষ মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন বলিয়াই ক্ষমা চাহিতেছেন। নচেৎ স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিতে পারিলে তাঁহার সহিত অর্জ্জুন ঐরূপ ব্যবহার করিতেন না।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্যরূপেই দেখিতেন। তথাপি পাইতেছি, তিনি বিশ্বরূপ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন, ভয়ও পাইয়াছেন (১১।৪৫)। বলিতেছেন, "তদেব মে দর্শয় দেবরূপম্"—আমাকে সেই পূর্ব্বরূপ দেখাও। সেই পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ—

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টু মহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ১১।৪৬

তোমার সেই কিরীটী—গদা ও চক্রধারী রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্ত্তে, তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর।

পরবর্ত্তী ৫১ শ্লোকেও অর্জ্জুন বলিতেছেন—

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

হে জনার্দ্দন, তোমার সেই সৌম্য মনুষ্যরূপ দেখিয়া এক্ষণে আমি চেতনা ফিরিয়া পাইলাম ও প্রকৃতিস্থ হইলাম।

মনুষ্যরূপ অথচ কিরীট-গদা-চক্রধারী চতুর্ভু[illegible]তার অর্থসম্পাত হয় না। শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী বলেন, [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা চতুর্ভুজরূপে দেখিতেন। মনুষ্যরূপে বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ—চতুর্ভুজ কোথাও পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে তিনি পূর্ণাবতারও নহেন, অংশাবতারও নহেন—স্বয়ং ভগবান (নরদেহে অবতীর্ণ)। শাস্ত্রোক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম অষ্টম অবতার—শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থানার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, যুগে যুগে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্ম যাঁহারা দুষ্কৃতকারী তাহাদিগকে বধ করেন—যাহাতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে ঐ অর্থ নিতান্তই আক্ষরিক অর্থ হইবে। সমাজে, রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে যুগে যুগে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে এবং যুগপ্রবর্ত্তকেরা তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন—ইহা ত ঐতিহাসিক সত্য। এই সকল যুগপ্রবর্ত্তকদিগকে ঐশ্বরিক সত্তা স্বীকার করিতে আপত্তি কি? গীতায়ও আছে—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংঽশসম্ভবম্॥১০।৪১

যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীমান্, প্রভাবান্ বলবান্, তাহা আমারই তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে।

তত্ত্বের দিক দিয়া 'আত্মাংশং' ও 'আত্মানং'-এর মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই—

"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" (বৃহদারণ্যক)

পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে—ভগবানের অংশও ভগবান। গীতার উপসংহারে সঞ্জয়ের উক্তি পাইতেছি—

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্
গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ
সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥

ব্যাসের প্রসাদে (দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলাম বলিয়া) এই পরম গুহ্য যোগ যোগেশ্বর স্বয়ং কৃষ্ণের মুখ হইতে প্রত্যক্ষভাবে শুনিলাম।

পরবর্ত্তী শ্লোকেও আছে "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ…" যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ রহিয়াছেন এবং ধনুর্ধর পার্থ রহিয়াছেন সেই পক্ষেরই শ্রী, বিজয় হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথন শুনিয়া এবং কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও সঞ্জয় তাঁহাকে ঈশ্বর না বলিয়া যোগেশ্বর বলিতেছেন। এই 'যোগ' কি? গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ই 'যোগ' নামে অভিহিত। বিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ ইত্যাদি। এবং 'যোগ' কথাটি গীতায় বহু স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে—কোথাও মুখ্য অর্থে, কোথাও গৌণ অর্থে। 'যোগেশ্বর' অর্থ পরম যোগী বা যোগসমূহের প্রভু ধরিলে মনে হয় অর্জ্জুনের ন্যায় সঞ্জয়ও কৃষ্ণকে মানুষ মনে করিতেন।

ভারত-দর্শন-সার গীতা এমনই একখানি গ্রন্থ যে, উহার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার, অংশাবতার অথবা মহামানব হউন তাহাতে গীতার তত্ত্বগত মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। তবে কেহ হয়ত বলিতে পারেন ইহা যদি ভগবানের নিজের মুখের কথাই না হইল তবে সে গীতার মূল্য কি? ইহা ভক্তের কথা হইতে পারে, যুক্তির কথা নহে।

গীতার ভক্তি-ধর্ম্ম অতীব উদার।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যে যে-ভাবে আমাকে উপাসনা করে, আমি সেই ভাবেই তাহাকে অনুগৃহীত করি। "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (৯।২৩)—যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত ও ভক্তিভাবে অন্য দেবতার পূজা করেন তাঁহারাও আমাকেই পূজা করেন।

ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বলিতে কি বুঝায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আত্মপরিচয়ে অর্জ্জুনের নিকট তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা আত্মার অবিনশ্বরত্বে ও আত্মার সহিত ভগবানের একত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের নিকট তিনি আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব মতে।

গীতায় ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের রহস্য সমস্তই বিবৃত হইয়াছে। ইহা কোনও সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্মগ্রন্থ নহে—একাধারে সকল সম্প্রদায়ের এমনকি সকল চিন্তাধর্ম্মী মানুষের পার্থিব ও পারমার্থিক মঙ্গলের পথনির্দ্দেশক। লৌকিক ও অলৌকিক উভয় উপদেশই অত্যন্ত যুক্তি সহকারে কথিত হইয়াছে এবং এই উভয়ের সমন্বয় করা হইয়াছে—ইহার সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের কথা না হয় নাই ধরিলাম। কেননা মূল সংস্কৃতে না পড়িলে তাহা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করা যায় না। এ কারণ সম্প্রদায়বিশেষের পুস্তক মনে করিয়া পাঠ করিলে গীতার এক অংশই বোঝা যাইবে। এ পর্য্যন্ত গীতার কোন লৌকিক ব্যাখ্যা স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত হয় নাই। ইহাতে লৌকিক যুক্তি দিয়া দিয়া লৌকিক বিষয়েরও যথেষ্ট উপদেশ করা হইয়াছে। হিন্দুরা পার্থিবকে অবহেলা করিয়া পরমার্থেরই সন্ধান করিয়াছেন এরূপ মনে করা ভ্রমাত্মক। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ"—কর্ম্ম করিতে করিতেই ইহলোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। কর্ম্ম না করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ", ত্যাগ-বুদ্ধিদ্বারা ভোগ করিবে। কর্ম্মযোগের প্রসঙ্গে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার যে উপদেশ আছে তাহা যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কেবল 'ইহা করিবে' এবং 'উহা করিবে না' বলিয়া আদেশ প্রদত্ত হয় নাই।

সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বব্যাপী পরম ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও অবিনাশী আত্মার অস্তিত্বে সন্দিগ্ধ লোক চিরকালই ছিল, এখনও আছে। কিন্তু তাঁহাদিগকেও নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই কর্ম্ম-দর্শনের কথা তাঁহাদিগকে গীতায় কর্ম্মযোগের উপদেশ হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে।

যুক্তি-বিচারের দিক দিয়া গীতার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা চলে যে, বহুকাল হইতে বেদের উক্তি, উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব, সাংখ্য-পাতঞ্জল বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে প্রাচীন মনীষিগণের মধ্যে যে চিন্তাধারা চলিতেছিল, ব্যাস তাহারই সমন্বয় করিয়া মহাভারত-মধ্যে গীতা আকারে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকে পটভূমি করিয়া। ইহা সম্পূর্ণ ব্যাসের রচনা অথবা বহু-প্রচলিত প্রাচীন উক্তির অংশতঃ সঙ্কলন, অংশতঃ সংযোজন, তাহা পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়—সাধারণের পক্ষে গীতা বুঝিবার সহায়ক বা প্রতিবন্ধক নহে।

মহাভারতের সহিত গীতার ভাষা ও রচনাপদ্ধতির সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে মনে করেন উহা ব্যাসের রচনা। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সঞ্জয় প্রভৃতির বাক্য ব্যাস স্বকর্ণে যেমন শুনিয়াছেন ঠিক তেমনই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, সাধারণ বুদ্ধিতে তাহা বুঝা যায় না।

উপনিষদের সময়ে তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই প্রধান ছিল। এই জ্ঞান-ধর্ম্মের পরে পুরাণের সময় ভক্তি-ধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা দিল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উপাস্যকে উপলক্ষ করিয়া। কালে ভক্তি-ধর্ম্মের বাহিরের রূপের বিশেষ পরিবর্ত্তন না হইলেও অন্তরের সত্তা ক্ষীণ হইতে থাকে। গীতার ভক্তিবাদেরও এইরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে। হিন্দুসাধারণের এক অংশ গীতাকে ফুল-চন্দন-মন্ত্র সহযোগে পূজা করেন, গীতা নামক গ্রন্থখানিকে ইষ্টদেবতা বা বিগ্রহ মনে করেন। গীতার উপদেশকে ধর্ম্মজীবনে সাধনার বিষয় মনে করেন না। গীতায় একদিকে যেমন আছে :

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥
অথবা
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

LIFEBUOY SOAP
সুস্থ লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি,
তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের
প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রেই
লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
L. 261-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

অন্য দিকে ভক্তের সংজ্ঞা ভক্তিযোগ (১২শ) অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে :

"কাহারও প্রতি যাঁহার বিদ্বেষ নাই, যিনি সকল প্রাণীতে মৈত্রীভাবাপন্ন, করুণাপরায়ণ, মমত্ববুদ্ধিহীন, নিরহঙ্কার, সুখে-দুঃখে যাঁহার সমভাব, যিনি ক্ষমাশীল, সদাসন্তুষ্ট তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত।"

কাজেই প্রকৃত ভক্ত হওয়া দুষ্কর সাধনসাপেক্ষ। মাত্র করজোড়ে প্রণাম করিয়া অথবা গীতা নামক পুস্তকখানির উপর পুষ্প-চন্দন প্রদান করিয়া ভক্তিধন লাভ করা যায় না। জ্ঞানের ধর্ম্মই হউক আর ভক্তির ধর্ম্মই হউক সাধনা না থাকিলে উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না ইহা সহজ কথা।

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গীতা মুখ্যতঃ হিন্দুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ নামেই পরিচিত। তাহার কারণ ইহাতে অবতারবাদ ও জন্মান্তরবাদের কথা আছে, যাহা মাত্র হিন্দুধর্ম্মেরই বিশেষত্ব। ঐটুকু বাদ দিলেই ইহা সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির, এক কথায় সকল চিন্তাধর্ম্মী মানুষেরই কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-দর্শনের গ্রন্থ এবং সাহিত্যের দিক দিয়া সুললিত কাব্য। প্রাচীনেরা সত্যই বলিয়াছেন, "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ" গীতা ভাল করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য, বিস্তর শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন কি ?

দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে বহু শিক্ষিত লোকে বলিয়া থাকেন এখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর বলিয়া কিছু আছেন কি না, মরিবার পর আত্মা বলিয়া কিছু থাকে কি না তাহাই ত সন্দেহের বিষয়। কিন্তু মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কাজ করিতে হইবে :

"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মনঃ" (৩।৮)

(হে অর্জ্জুন) কর্ম্ম না করিলে তোমায় শরীরযাত্রাই নির্ব্বাহ হইবে না।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৩।৫

কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। প্রকৃতি-জাত (সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার) গুণের প্রয়োজন চালিত হইয়া সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। আর এই কর্ম্ম করিতে হইলে কর্ম্ম করিবার কৌশল এবং রহস্যও জানিতে হইবে। এই কর্ম্মদর্শন একমাত্র গীতাতেই সুসংবদ্ধ যুক্তি-সহকারে কথিত হইয়াছে।

গীতা কেবলমাত্র পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের অধ্যয়নের জন্য রচিত হয় নাই। মহাভারত যেমন সর্ব্বসাধারণের গ্রন্থ, মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও তেমনি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান এবং কর্ম্মকে পরম মঙ্গলের পথে চালিত করিবার সুললিত বংশীধ্বনি।

শুধু ভারতবর্ষের নহে, পৃথিবীর সকল প্রধান প্রধান ভাষায়ই গীতার অনুবাদ হইয়াছে। ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্য সকলেরই এই মাত্র সাত-শত শ্লোকের গীতাখানি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াও পড়িয়া দেখার প্রয়োজন আছে। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য অধ্যয়ন করিতে পারিলে ত ভালই হয়—"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে (৪।৩৮)—জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র এই পৃথিবীতে আর কিছু নাই।

হিন্দুধর্ম্মে কয়েকটি 'বাদ' আছে যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে বাদানুবাদের বিষয়।

প্রথম—ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার। সকল ধর্ম্মমতেই ঈশ্বর আছেন। তবুও অনেকে আছেন যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না। ঋগ্বেদে বহু দেবতার উল্লেখ থাকিলেও ঋষিরা বহুর মধ্যে একের কথাও বলিয়াছেন। উপনিষদ্ এবং গীতায় এই এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়—আত্মার অস্তিত্ব ও তাহার অবিনশ্বরত্ব। মৃত্যুর পর মানুষের দেহাতিরিক্ত কিছু থাকে কিনা এ সন্দেহ চিরকালই আছে। গীতায় ও উপনিষদে এই আত্মার সহিত ভগবানের একত্বের কথা উক্ত হইয়াছে। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বীজ, গীতার জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির ভূমি গ্রহণ করিয়া পত্র-পুষ্প-ফলসমন্বিত বেদান্তদর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহা ভারতীয় তত্ত্বচিন্তার চরম পরিণতি।

তৃতীয়—মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে সেই আত্মার অবস্থা মরণান্তর কি হয়? ঋগ্বেদে আছে পুণ্যকর্ম্মাগণের আত্মা অগ্নির প্রসাদে দিব্যদেহ ধারণ করিয়া পিতৃলোকে গমন করেন। তাঁহারা তখন দেবতাই হইয়া যান। যাঁহারা দুষ্কৃতকারী তাঁহাদের আত্মা কোন গতিপ্রাপ্ত হন তাহার কোন উল্লেখ নাই। কাজেই জন্মান্তরবাদ বেদের কালে স্পষ্ট হয় নাই। উপনিষদে দেখা যায়—মৃত্যুর পর মানবাত্মার গমনমার্গ তিন প্রকার। কৃত কর্ম্মের ভাল-মন্দ অনুসারে আত্মা উন্নত অথবা নিকৃষ্ট জীবের শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। অপর কেহ স্বর্গে গিয়া, নানাবিধ স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে নির্দিষ্ট কালান্তে, পৃথিবীতে কোনও সৎ বংশে জন্মগ্রহণ করেন—ইহাই পিতৃযান-মার্গ। আর যাঁহারা ইহলোকে তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা ও জ্ঞান দ্বারা আত্মার অন্বেষণ করেন, তাঁহারা অমৃত, অভয় ও পরমপদ লাভ করেন। তাঁহারা আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন না—ইহা দেবযান-মার্গ। উপনিষদে পুনর্জ্জন্মবাদ সম্বন্ধে যতটুকু আছে, গীতায় তাহা অপেক্ষা আরও বিস্তৃত ভাবে আছে।

চতুর্থ—ঈশ্বরের মনুষ্যাদিরূপে অবতার গ্রহণ। বেদে বা উপনিষদে অবতারের কথা নাই। গীতাকে সকল উপনিষদের সার-সংগ্রহ ও 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' বলা হয়। কাজেই গীতার অবতার-বাদ বেদ ও উপনিষদাতিরিক্ত। অবতারবাদ পুরাণের কথা। পুরাণ-সমূহের রচনা মহাভারত রচনার পরবর্ত্তীকালে হইয়াছে ধরিলে, স্বীকার করিতে হয় যে, মহাভারতের অন্তর্গত মূল গীতার সহিত অবতারের কথা উহাতে পরবর্ত্তীকালে ক্রমে ক্রমে সংযোজিত হইয়া

হার অঙ্গীভূত হইয়াছে, এবং এই কারণেই গীতার মধ্যে স্থানে ানে অসঙ্গতি পাওয়া যায়।

আদি রামায়ণ, আদি মহাভারত, আদি গীতা পাইবার কোনও পায় নাই। পাইলেও তাহা গবেষকের উপজীব্য, আমাদের নিকট পভোগ্য হইবে কিনা সন্দেহ।

ভগবান, আত্মা, জন্মান্তর ও অবতারে বিশ্বাসী হউন আর নাই উন—রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা এই তিনখানি অপূর্ব গ্রন্থ যিনি পাঠ না করিবেন তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এবং ভারত-বাসী হইয়াও তিনি ভারতের প্রাণস্পন্দনের সহিত অপরিচিত রহি-বেন। মূল সংস্কৃতে না পড়িতে পারিলে অনুবাদ পড়িবার বাধা নাই। অবতারবাদ ও ভক্তিধর্ম্মের উদ্ভবে বহুকাল হইতে রামায়ণ ও মহা-ভারত ধর্ম্মগ্রন্থে পরিণত হইয়াছে—যদিও মুখ্যতঃ এই দুখানি সংস্কৃত-সাহিত্যের দুই অভ্রভেদী মহাকাব্য যাহা পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় সাহিত্যরথীদিগকে কাব্য ও নাট্য-রচনার প্রেরণা দিয়াছে ও উপকরণ যোগাইয়াছে।

আগ্রায় সাহিত্য সম্মেলন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা বাজছে। আগ্রার মাথায় অমারাত্রির ঘনান্ধকার। ট্রেনের উপর উৎকণ্ঠ জনতা নিশ্চুপ বসে ভীরু চোখে চেয়ে আছে যমুনার ওপারে তাজমহলের দৃশ্যটি বুকে চেপে। ইতিহাস বুঝি আবার আসছে তার নতুন ভাষ্য নিয়ে।

৩১ অক্টোবর। রজনীর শেষযামে পার হয়ে গেল যমুনা-ব্রীজ। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা এগিয়ে চলেছেন ফোর্ট ষ্টেশনের দিকে। নূতন আলোর ইঙ্গিত ভোরের আকাশে। মানুষ তার ধ্রুবলক্ষ্যে আজও অটল। আজও তাই ইউনেস্কোর অধিবেশন বসছে ভারতে। বঙ্গ-ভারতীর সুর গিয়ে পৌঁছেছে বিশ্ব-ভারতীর মর্ম্মবীণায়। বহু-বিশ্রুত আগ্রা নগরীতে এবার নিখিল-ভারত-বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বাত্রিংশৎ অধিবেশন বসছে নভেম্বরের প্রথম তিন দিনে।

সবাই যে নিছক সাহিত্যিক অভিযানেই চলেছেন এমন মনে করবার হেতু নেই। অনেকের ঘর-সংসার চলেছে সঙ্গে। আগ্রা দেখার সুযোগ অনেকেরই মেলে না সহজে। আর তা ছাড়া, অনেক দেশেই এমন সাহিত্য-মেলার রেওয়াজ আছে। দূরের মানুষ কাছে আসবে, এক প্রান্ত গিয়ে দাঁড়াবে অন্য প্রান্তের গৃহপ্রাঙ্গণে —এমনি করেই জীবন তার মূল বিস্তার করে—একাত্মতায় ক্রমে পৃথিবী সার্ব্বভৌম মানবিকতার আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

দিনের আলো ফুটতে তখনও কিছু বাকি। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে সামান্য কাঁপন লাগছে। ট্রেন থামতে দেখা গেল, কয়েক-জন স্বেচ্ছাসেবক আগে থেকেই অপেক্ষা করছেন সেখানে। গাড়ী তৈরী—ভাড়া ঠিক করা আছে, গিয়ে বসলেই হ'ল। প্রায় মাইল-দেড়েক দূরে হাণ্টলি হোষ্টেলে প্রতিনিধি-শিবির। উঁচু পাদভূমে দাঁড়িয়ে আছে হোষ্টেলবাড়ী—বিস্তৃত প্রাঙ্গণের আশেপাশে বেশ কিছু তাঁবু খাটানো। গাড়ী এসে দাঁড়াল গেট পার হয়ে। দক্ষিণে ভারত-স্বেচ্ছাসেবকদলের শিবির। মাথার ওপর নিশান উড়ছে। সুচারু ব্যবস্থা। এত তাঁবু, এত চেয়ার-টেবিল-খাটের আয়োজন কি করে করলেন অভ্যর্থনা-সমিতির অধিকারীবর্গ, বিস্ময়ের ব্যাপার। অনেক নূতন মুখ দেখা গেল—অনেক পরিচিত মুখ চোখে পড়ল না। আগের আগের বছরের বহু সঙ্গী আবার মিলিত হ'ল বৎসরান্তে।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সময় ছিল অপরাহ্নে। সেই সুযোগে প্রাতরাশ সমাপ্ত করেই অনেকে আবার বেরিয়ে পড়লেন। কেউ কেল্লার দিকে, কেউ বা তাজ কিংবা ইৎমদদৌল্লার পথ লক্ষ্য করে।

টাঙায় বসে বেশ অনুভূত হ'ল এখানকার প্রাণকেন্দ্রে সাড়া জেগেছে। অনেক আপিসের বাবু গাড়ী থামিয়ে চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে। এতগুলি বাঙালী নরনারীর একত্র সমাবেশ বোধ হয় আর কখনও হয় নি। কিন্তু তার চেয়ে বেশী খুশী হয়েছে এখানকার গাড়ীওয়ালার দল। ভাড়া ইতিমধ্যে দ্বিগুণে পৌঁছেছে। তখনও সমানে সুসমাচার পাচার হচ্ছে রাস্তার এক মোড় থেকে অন্য মোড়ে।

আবার একবার এলাম মমতাজমহল তাজসৌধে। তাজমহল অনেকে অনেক চোখে দেখে গেছেন, অনেক ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। আমার দৃষ্টিভঙ্গীও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আমি সচরাচর শেষ রাত্রের ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় তাজ দেখতে অভ্যস্ত। আমার মনে হয়েছে সেই সময়েই যেন মহৎ প্রেমের আত্মা মূর্ত্তি গ্রহণ করে। আবার শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারার ভিতর দিয়ে যে ছায়ামূর্ত্তি অনেকে দেখেছেন, তাঁদেরও বিশিষ্ট দৃষ্টিকে আমি ভালবাসি। কিন্তু এবারে সে রকম কোন সুযোগই পাই নি। দু'একটি ছবি নেওয়া হ'ল বটে—তবে গতানুগতিক।

অনেকটা ছুটাছুটি করে ইৎমদদৌল্লার সমাধিপ্রান্তে এসে একটু বিশ্রাম পাওয়া গেল। ভিড়ও অপেক্ষাকৃত কম। যমুনায় তখনও তেমন জলের অভাব ঘটে নি। কিন্তু যমুনা দেখলেই কেমন যেন বৈষ্ণব ভাবটি প্রবল হয়ে ওঠে। সময় বুঝে সঙ্গের বন্ধুটি কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের একছত্র শুনিয়ে দিলেন, 'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও—'

কিন্তু না, সৌধটির ভিতরে-বাহিরে মোজেক এবং মর্ম্মরের কারু-কার্য্য দেখে কিছুক্ষণ বিস্ময়ে চেয়ে থাকতেই হ'ল। তবু এই সঙ্গে প্রাকার-প্রাচীরের ছায়ায় লালিত দু'একটি ফুলগাছের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যের উল্লেখ না করে পারছি না। সহসা দেখলাম মাধবী-লতার আকারে একটি ছোট গুল্ম, ঘনসবুজ তীক্ষ্ণপ্রান্ত পাতার উর্দ্ধে ছোট ছোট অতসীবর্ণের ফুল। প্রতিটি পুষ্পস্তবকের নীচে উজ্জ্বল বাদামীরঙের গোলপাতার একটি করে রেকাবি সমস্ত দৃষ্টিকে অভি-ভূত করে দেয়। বর্ণাঢ্যতার সমস্ত অহঙ্কার যেন কেবল ঐ একটি মাত্র গোলপাতার রেখায় কেন্দ্রীভূত।

তার পাশের ফুলগুলি দেখলেই, নব-বধূর চন্দনলিপ্ত চারু ললাট-খানি মনে পড়বে। হাস্নাহানার চেয়েও ছোট ফুলের সুসবদ্ধ সাদা স্তবক, প্রতি ফুলে চারটি করে সূক্ষ্ম ত্রিকোণ পাপড়ি। চন্দনে ডুবিয়ে ললাটে এঁকে দিলেই হ'ল। বালিকা-বধূর মতই যেন পাতার আঁচলে লুকিয়ে আছে ভীরু কুসুমগুলি।

তৃতীয় গুল্মের জবারঙের পুষ্পগুচ্ছগুলি রুক্ষ রোদের আতার

বিমল রায়ের "পরিবার" চিত্রের তারকা

সবিতা চ্যাটার্জ্জী

লাক্স টয়লেট সাবান দিয়ে তাঁর ত্বকের লাবণ্য রক্ষা করেন "এই সাবানটী এত আশ্চর্য্যরকম শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!"

আপনার প্রিয় অন্যান্য চিত্রতারকাদের মতই সবিতা চ্যাটার্জ্জী নির্ভর করেন লাক্স টয়লেট সাবানের ওপর। লাক্সের সরের মত ফেণার রাশি তাঁর ত্বককে দেয় লাবণ্যময় মসৃণতা, এর ফুলের মত সৌরভ এঁকে দীর্ঘকাল সুগন্ধউচ্ছল রাখে। এই সৌন্দর্য্য সাবানটীর আশ্চর্য্য শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতার পরিচায়ক—আর সেইজন্যেই এই সাবানটী অনেক সুন্দরী মহিলাদের মধ্যে এত প্রিয়। আপনিও এঁদের অনুসরণ করুন—লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে আপনার ত্বককে মসৃণ ও লাবণ্যময় করে তুলুন।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 495-X52 BG

ধীরে ধীরে কেমন করে গৈরিক বর্ণ ধারণ করছে, দেখলাম চোখের উপর। এ কোন্ বিরহ-সাধনা ভেবে পেলাম না।

'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত দিয়ে সুরু হ'ল প্রথম দিনের সাহিত্য অধিবেশন। স্থান—আগ্রা কলেজের ৺গঙ্গানাথ শাস্ত্রী হল, কাল—অপরাহ্ণ আড়াইটা। মঞ্চের উপর দেখতে পাচ্ছি বসে আছেন সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ সান্যাল, সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ, মাঝে মূল সভাপতি শ্রীহুমায়ুন কবীর। ওপাশে আছেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ড. শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী, সম্পাদক ড. শ্রীতারিণীচরণ বসু চৌধুরী প্রভৃতি। মঞ্চপৃষ্ঠ নানা বর্ণের জ্যামিতিক কারুচিত্রে সুসজ্জিত। প্রেক্ষাগৃহে আসীন ন্যূনাধিক তিন শত নরনারী।

ড. বাগচী তাঁর সরল, প্রাণস্পর্শী ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে উঠেই প্রথমে সম্মেলনের প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে সাদর স্বাগত জানালেন। অতঃপর অগ্রবনের স্থানীয় ইতিহাস, কবি-সমৃদ্ধি এবং হিন্দী-সাহিত্যের উল্লেখ করে বলেন, "ভারতবর্ষ যে সত্যই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মাদ্রাজ-গুজরাট-মারাঠা প্রভৃতির মিলন-ক্ষেত্র এবং হিন্দীকে জাতীয় ভাষায় পরিণত করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে যে অন্য প্রাদেশিক ভাষাকে বিপর্যস্ত করিবার কোন দুরভিসন্ধি নাই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল, এখানকার নব-প্রতিষ্ঠিত 'অখিল-ভারতীয় মহাবিদ্যালয়। বর্তমানে এখানে প্রায় ৬০ জন ছাত্র আসাম, মণিপুর, উড়িষ্যা, কেরল, তামিলনাদ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়া শিক্ষালাভ করিতেছে।'

এই তালিকায় বাংলার নাম না থাকায় বাগচী মহাশয় ক্ষুণ্ণ কিনা জানি না। তবে প্রবাসী বাঙালী হিসাবে তিনি অন্ততঃ জানেন হিন্দীপ্রচারে বাঙালীর কোন নীতিগত বিরোধ নেই। বাঙালীর আশঙ্কা তারা হয়ত প্রবাসে আর নিজেদের মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

ভাষণের একাংশে বাগচী মহাশয় আর একটি সমস্যামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি যদিও মোটামুটি ভাবে আশ্বস্ত যে, 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্য একেবারে অন্ধকারে গিয়া পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা গিয়াছিল, তাহা সৌভাগ্যক্রমে অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে।'...তবে, 'অনেক ভাল ভাল মৌলিক ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া যে বহু বাজে বই ছাপা হইতেছে না তাহা নহে।...কিন্তু আজিকার কর্মব্যস্ত জীবনে ভাল বই বাছিয়া বাহির করিবার অবসর কই?'

সুতরাং বক্তা 'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট'-এর আদর্শে একখানি নিরপেক্ষ সমালোচনাপত্রের জন্য আবেদন জানান। জিজ্ঞাস্য ঐ পত্রিকাখানি কি একান্তই নিরপেক্ষ, না অনুরূপ, একটি পত্রিকা হলেই পাঠকের সকল সমস্যার সমাধান হবে? সাহিত্যের মূল্যায়ন—তাও শেষ পর্যন্ত পাঠকের নিজস্ব বিচারবোধ, পাঠরুচি এবং আগ্রহের উপরই নির্ভরশীল থাকবে। ভাল এবং মন্দ গ্রন্থের বাজার পাঠকই চিরদিন নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন—আসল কথা হ'ল, পড়বার অবসর করে নেওয়া। কিন্তু বক্তা যদি এই বলে আক্ষেপ করেন, "আমরা প্রবাসী বাঙালীরা বাংলা বুঝিও না (সাংঘাতিক কথা!) বাংলা ভাষার জ্ঞানও আমাদের সামান্য"—তা হলে যে সমস্ত আয়োজনই বৃথা! তাঁর কাছে অন্ততঃ এটুকু সংবাদ আশা করতে পারি যে, সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবাসী বাঙালীর দান কম নয়। অতুলপ্রসাদ, গোবিন্দচন্দ্র, কেদারনাথ, শরৎচন্দ্র, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনুরূপা দেবী, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি বহু সার্থকনামা কথাসাহিত্যিক আজীবন প্রায় প্রবাসে বসেই সাহিত্য-সাধনা করেছেন এবং আজও যাঁরা করছেন, তাঁদের সংখ্যাও অকিঞ্চিৎকর নয়। প্রবাসী তরুণ সমাজ শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে আজও যেভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বঙ্গভারতীর সেবা করে যাচ্ছেন, সেইটাই সবার বড় বিস্ময়, সবচেয়ে আশার কথা।

এ অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অভিভাষণ হ'ল শ্রীহুমায়ুন কবীরের। তিনি এক দিকে যেমন সাহিত্যচর্চায় নিঃসঙ্গ একক সাধনার প্রয়োজনের কথা বলেছেন, আবার অন্যদিকে তেমনি বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সংযোগরক্ষার উপকারিতা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, "নব নব শক্তি ও ভাবধারার অভিঘাত সহ্য করে সাহিত্য ও জীবন গড়ে তুলতে পারলে মানুষের জীবনে ও সাহিত্যে যে সার্থকতা লাভ করা যায়, প্রাচীন যুগ থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উদার হৃদয় নিয়ে ও চিন্তাশীলতার সঙ্গে বিচিত্র ও সমৃদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হবে, তার ভিতর দিয়েই বাংলা সাহিত্যের নব যুগের সূচনা হবে এবং তার উন্নতি ঘটবে।"

সত্য কথা। গত কয়েক বৎসর থেকেই লক্ষ্য করছি সম্মেলন ক্রমেই যেন শিবহীন যজ্ঞের মত হয়ে পড়ছে। বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ যোগ দিচ্ছেন না। যে দু'একজন আসেন তাঁরাও যেন 'নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে, পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে' মনোভাব নিয়ে প্রাণ খুলে নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করতে পারছেন না। এর কারণ, সাহিত্যিকগণের ব্যক্তিগত অভিমান ছাড়াও সম্মেলনে বঙ্গ-সাহিত্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে না। সমস্ত আয়োজনের পিছনে কোথায় যেন পরানুগ্রহলাভের একটি প্রচ্ছন্ন মনোবৃত্তি কাজ করছে বলে সন্দেহ জাগে।

অতঃপর উপরাষ্ট্রপতি ড. শ্রীরাধাকৃষ্ণন ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া শুভেচ্ছা-বাণীর কিয়দংশ ড. বসু চৌধুরী পাঠ করে শোনাবার পরে সম্মেলনের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করলেন, সাধারণ সম্পাদক শ্রীষষ্ঠীকুমার মুখোপাধ্যায়।

এলাহাবাদের অধ্যাপক শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ বাংলা প্রবেশিকা পরীক্ষা বোর্ডের সম্পাদকরূপে এ বৎসরের উত্তীর্ণ ১৯ জনের মধ্যে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেন। তাদের সনদ উপহার দেন অধ্যাপক শ্রীহুমায়ুন কবীর। এ বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এলাহাবাদের কুমারী স্বর্ণা চট্টোপাধ্যায়। এঁর কনিষ্ঠা

অপর্ণাও উত্তীর্ণ হয়েছে দ্বিতীয় বিভাগে। কিরণবাবুর ব্যক্তিগত উৎসাহে প্রবাসী ছাত্রছাত্রীকে মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট করবার এ মহৎ প্রয়াসের সকলেই প্রশংসা করবে।

বেলা চারটে নাগাদ 'জনগনমন' জাতীয় সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে প্রথম অধিবেশন শেষ হ'ল। সম্মেলনের দিক থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন অভ্যর্থনা-সমিতির উপ-সভাপতি ড. শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘটক।

সম্মেলন উপলক্ষে হিন্দী ও বাংলা গ্রন্থাবলী এবং উত্তর প্রদেশ ও বাংলার কুটীর-শিল্পেরও একটি করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীকে. পি ভাটনগর। দুর্ভাগ্যবশতঃ সিগনেট প্রেস, শান্তি লাইব্রেরী এবং বিশ্বভারতীর কিছুসংখ্যক গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য প্রকাশনার অনুপস্থিতি চোখে ঠেকল। অথচ হিন্দী শাখায় যে পরিমাণ গ্রন্থ ও আয়োজন ছিল তা শ্লাঘনীয়।

এক ফাঁকে শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের সঙ্গে দুটো কথা হ'ল। শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্যকে দেখবার সুযোগ হ'ল এখানেই। চিত্রশিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তীকে দেখিয়ে দিলেন এক সতীর্থ। আর এক বন্ধু ভিড়ের মধ্যে সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পরে যদিও খবর পেলাম তিনি এসেছেন, কিন্তু আমি আর মীরাটের বন্ধুটিকে আবিষ্কার করতে পারি নি। আমার আশা আগামী অধিবেশনে বাংলার তরুণ সাহিত্যিক-গোষ্ঠী দলে দলে যোগ দিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ দেবেন প্রতিনিধিদের। এতে করে তাঁদেরও দৃষ্টি নিঃসন্দেহে প্রসারলাভ করবে।

ঘুরতে ঘুরতে সহসা এবার লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীদ্বিজেন সান্যালের সামনে এসে পড়লাম। সেই কৌতুকোজ্জ্বল হাসি, বর্তুল শ্যাম আননের মধ্যভাগে একজোড়া গুম্ফ। রসশিল্পী হাস্যরসিক দ্বিজুবাবুর সাহচর্য্য যে না পেল, মেলার আনন্দে তার অনেকখানি ফাঁক পড়বে। কিছু অভিমান ছিল তাঁর উপর। কেননা তিনি তাঁর নিজের ঘর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে অতুলপ্রসাদের গানে বঞ্চিত করেছিলেন। কিন্তু লোভ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন জয়পুরে। কিন্তু এবার তাঁকে দেখে বুঝলাম তাঁর দোষ নেই। জরা ছায়া ফেলেছে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার উৎসমুখে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সঙ্গীত শাখায় আবার তাঁর কণ্ঠে শুনলাম 'ভারতভানু কোথা লুকাল'। নানাভাবে হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টাও করলেন, কিন্তু আনন্দের আর সে স্বতঃস্ফূর্তি নেই, রাত্রে 'পার্থ-সারথি' মঞ্চাভিনয়ে মনে হয়েছিল 'সব্যসাচী' সত্যিই এবার বৃদ্ধ হয়েছেন।

কিন্তু ঐ দিনই বৈকালিক অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্যকালে তাঁর একটি মন্তব্য বড় মনের মত লাগল। সেদিন শিল্পী শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁর অভিভাষণ পাঠ করে শোনানো হ'ল। আলোচনা করতে উঠেই দ্বিজুবাবু বললেন, 'এ রকম সুযোগ ত বড় একটা হয় না। দাদা আসেন নি তাই না বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। তা লাগছে কিন্তু বেশ,—উপর থেকে দাঁড়িয়ে আপনাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নিচের দিকে।" এই সূক্ষ্ম শ্লেষের মধ্যে অনেকখানি সত্য কথন লুকিয়ে ছিল (অবশ্য ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাবে)।

সে যাই হোক, প্রথম দিনের শেষ অধিবেশন বসল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়, হিন্দী সাহিত্য ও কবি-সম্মেলন দিয়ে। কবি বালকৃষ্ণ শর্ম্মা, 'নবীন' মহাশয়ের সভাপতিত্ব করবার কথা। কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তিনি উপস্থিত হতে না পারায়, তাঁর আসন গ্রহণ করলেন প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীগুলাব রায়। দু'জনের অভিভাষণই শুনলাম। দু'জনেই বাংলার সম্পর্ক ও ভারতীয় সাহিত্যে বঙ্গ-ভাষার অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। কিন্তু 'নবীনে'র মত অত স্বচ্ছ চিত্তে পারেন নি শ্রীগুলাব রায়। বরং তাঁর একটি দুটি ইঙ্গিত এখনও কানে বেসুরো লাগছে।—"হিন্দী-ভাষী ক্ষেত্র বঙ্গালকা ঋণী হায়। ঋণ হম্ কৃতজ্ঞতা সে স্বীকার করতে হাঁয়, কিন্তু হম্ ক্ষমা গর্ব্বকে সাথ কহ সকতে হায় কি হম্ উন্ কুশল ব্যাপারীয়োঁ মে সে হাঁয় জিন্‌হোঁনে ঋণ লেকর ধন কো বরবাদ (অপচয়) নহি কিয়া, বরন্ মূল কো কঈ গুণা বঢ়ায়া হায়।"

এই ইঙ্গিতটি গ্রহণ করেছিলেন কবীর সাহেব তাঁর মন্তব্যের সময়। তিনি বলেন, "ভাববিনিময় ব্যতিরেকে কোন সাহিত্যই বাঁচে না, সেইটাই জীবনের লক্ষণ। পৃথিবীর অনুবাদ-সাহিত্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমনকি এত যে প্রাণবন্ত ইংরেজী ভাষা তারও শ্রেষ্ঠ অভিধান 'অক্সফোর্ড ডিক্সনারী'তে প্রতি বছর অন্ততঃ পাঁচশ' নতুন শব্দ সংযোজনের তালিকা প্রকাশ হয়।"

অনুবাদের মাধ্যমে প্রেরণার সুযোগ না থাকলে, রামায়ণ মহাভারতেরও এত প্রচার হ'ত না, এ মূল সত্যটুকু আশা করি বক্তা অস্বীকার করবেন না। বেদ পুরাণ-জাতক প্রভৃতির প্রথম বাংলা অনুবাদ না হলে, অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যকে আরও কতকাল অপেক্ষা করে থাকতে হ'ত সেটিও ভাববার বিষয়। শেষের দিকে এক বক্তা বললেন যে, হিন্দী ভাষার প্রথম অভিধান রচয়িতা বাঙালী নগেন্দ্রনাথ বসু এবং আজও এর সমকক্ষ হিন্দী অভিধান রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং, বঙ্গ-সাহিত্য ঋণদ্বারা নিজেকে অপচিত করে নি, অন্যকেও সমৃদ্ধ করেছে।

রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে ইংরেজী ভাষা বিতাড়নের যুক্তিটি আরও দুর্ব্বল। 'হিন্দী কোনও প্রান্তীয় ভাষাকে তার স্নেহ ও আদরের উচ্চ আসন থেকে স্থানচ্যুত করতে চায় না।···যদি কাউকে পদচ্যুত করতে চায় ত সে ইংরেজী—যে ভাষা দেশের জনগণের কাছে নিতান্ত বিদেশী, দুরূহ আর প্রাক্তন দাসত্বের চিহ্নস্বরূপ।' এমন মন্তব্য অসাহিত্যিক বলেই আমি মনে করি।

কিন্তু 'নবীনে'র বঙ্গপ্রীতির ভিতর ছলনা নেই। শুধু এটুকু উদ্ধৃত করে দিলেই যথেষ্ট হবে: 'বঙ্গদেশে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে তাহাতে স্নান করিয়া সমগ্র ভারত সুন্দরতর হইয়াছে। আমার ইহাই বিশ্বাস যে, বঙ্গ-সাহিত্যের

প্রভাব সমস্ত ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উপর বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের নাম প্রত্যেক শিক্ষিত পরিবারেই অনুপ্রবেশ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনার প্রতীক হইয়াছে।'

অতঃপর হিন্দী ভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: 'আমরা হিন্দী-ভাষীরা ত গুরুদেবের ভাষায় 'নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে', আমরা হিন্দী ভাষাকে বঙ্গভাষা এবং অন্য ভাষার নূপুরধ্বনি মনে করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছি। তবে সময়ে সময়ে আপনাদের ভাষার নূপুরধ্বনিতে দু'একটি সুর সংযোজনার স্বাধীনতা প্রার্থনা করি। ইহার অতিরিক্ত অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই।'

শেষের দিকে দেবনাগরী লিপিকে সর্বভারতীয় লিপিরূপে গ্রহণ করার বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা চলে। কবি বালকৃষ্ণ শর্মার অভিভাষণে ভারতীয় সর্ব-ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে এরূপ একটি আবেদন ছিল। অনেকের মতে বিশুদ্ধ উত্তর-ভারতীয় ভাষা-সমূহ দেবনাগরীতে লিপিবদ্ধ হলে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের কোন বাধা থাকবে না। বিরুদ্ধপক্ষ জোর দেন লিপির ক্রমবিবর্তন এবং ধ্বনির মৌলিক প্রয়োজনের উপর। প্রকৃতপক্ষে, 'মেঘনাদবধ' কিংবা রবীন্দ্রনাথের '[illegible]' লিপিপরিবর্তনের ফলে যদি হিন্দী-অনুবাদের রূপ (দুটি নমুনা শোনানো হয়েছিল) পরিগ্রহ করে, তাতে করে 'কাব্য' ও 'কথা'র দৈন্যই প্রকাশ পাবে।

প্রথম দিনের শেষ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পরে আয়োজিত কবি-সম্মেলনের [illegible] নিয়ে। [illegible] স্থানীয় [illegible] হিন্দী কবি [illegible] ও রবীন্দ্রনাথের [illegible] নিজের নিজের রচনা পাঠ করে আনন্দ দান করেন। কিন্তু হিন্দী কবিতা [illegible] যে স্বাভাবিক কণ্ঠে আবৃত্তি করতে চান না [illegible]।

[illegible] সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল দ্বিতীয় দিনে— সাহিত্য শাখার [illegible] এবং [illegible] সঙ্গীত অধিবেশন। সভার উদ্বোধন করার কথা ছিল কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি [illegible] মুখোপাধ্যায়ের। [illegible] অনিবার্য কারণে অনুপস্থিত থাকায় [illegible] কর্মসচিব [illegible] শ্রীপ্রবোধ-কুমার সান্যালের অভিভাষণ পাঠ দিয়ে। কেউ কেউ বলেন, এমন সাবলীল [illegible] অধিবেশনের পর আর শোনা যায় নি। কি বিষয়-গাম্ভীর্যে, কি ভাব-সম্পদে—তাঁর এ অভিভাষণটির সারমর্ম বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে সাহিত্যকর্মী মাত্রেরই প্রণিধান-যোগ্য।

তাঁর প্রথম কথাগুলি এরূপ: "প্রায় চৌত্রিশ বছর আগে বিশ্বখ্যাত নগরী বারাণসীধামে প্রথম প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারতের সর্বপ্রধান ভাবনায়ক মহাকবি রবীন্দ্র-নাথ।...সেদিন এই সম্মেলন সৃষ্টির দ্বারা যাঁরা বাংলা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বৃহত্তর ভারতের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ জীবিত নেই—অনেকেই অনুপস্থিত—তাঁদের সকলের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।"

সম্মেলনের শুভকামনা করে তিনি বলেন: "আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তঃপুরিকা এবার বৃহত্তর ভারতের প্রসারিত ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে পদচারণা করুক। সেটি তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতারই পরিচায়ক হবে। ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে এবার বাংলা সাহিত্যের সুনিবিড় সংযোগ ঘটুক।'

সমস্যা-কণ্টকিত আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের রূপরেখা বিচার নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। এ বিষয়েও শ্রীসান্যাল তাঁর বলিষ্ঠ জীবনবোধ এবং দার্শনিক তত্ত্বচিন্তাপ্রসূত আশ্বাস দিয়ে বলেন: "১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের কালে বাংলায় বসে মনে হয়েছিল এই অন্ধকার মৃত্যুপুরীর বাইরে আলোক বাঙ্ময় বিশ্বপৃথিবীর অস্তিত্বও বোধ হয় নেই—আশা, আনন্দ ভবিষ্যৎ সবই লোপ পেয়েছে। কিন্তু সেটি সত্যদর্শন নয়—প্রভাতের প্রথম আলোকের আবির্ভাবের পূর্বে সেটি ছিল সুদীর্ঘ রজনীশেষের গাঢ়তম অন্ধকার। ঐ অন্ধকার ইতিহাসের ভিতর থেকেই আবার উঠে এসেছে নবীন জীবন—যে-জীবন পদে পদে আনে বৈচিত্র্য, কথায় কথায় বাধায় বিপ্লব, নিমেষে নিমেষে করে যায় নতুন সৃষ্টি ও সংগঠন।...বাংলা-সাহিত্যে আজ আবার নতুন জোয়ার এসেছে। লেখক-সমাজের মনের উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রেখে গেছে অনেক কলঙ্কের দাগ। অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা—এই ইতিহাস রয়েছে তাদের মনে। এদেরই হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে তারা কলম ধরেছে। জীবনের সর্বব্যাপী অন্ধকারের কাছ থেকে তারা পেয়েছে নতুন একটি চেতনা। তার মধ্যে আজ নবকণ্ঠের কাকলী শুনছি। শুনছি [illegible] পদধ্বনি। তারা আসছে যুগসন্ধিক্ষণে।... ওরা অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে যাত্রা করেছে।...

কিন্তু কোন [illegible] নব্য-সাহিত্যের উদ্বোধন ঘটবে, এটি বলা কঠিন। তবে দারিদ্র্য, নৈরাশ্যবাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসঙ্গতি, এরা বোধ হয় বেশী দিন আর কাঁদবার জায়গা সাহিত্যে পাবে না।"

রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে শ্রীসান্যালের অভিমত: "চৌদ্দটি ভাষার মধ্যে ঐক্য সংহতি স্থাপন করাই হল আজ ভারতের রাষ্ট্রসাধনা। রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দীর ভিতর দিয়ে আমরা ভারতকে আয়ত্ত করতে চেয়েছি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কম-বেশী পনর কোটি লোক হিন্দী বলতে প্রস্তুত হতে পারছে না।...দেড়শ' বছর ধরে ইংরেজীতে ভারত-শাসন চলে এসেছে। কিন্তু আজ মনপ্রাণ বিনিময়ের জন্য যদি তাদেরকে রাতারাতি হিন্দীভাষাভাষী করে তুলতে চাই, তবে তারা কেবলমাত্র আন্তরিক ভালবাসার দায়ে এই আবেদন জানাতে পারে: 'কম-সে-কম বছর পঞ্চাশেক সময় অন্ততঃ দাও, না হলে দেড়শ' বছরের অভ্যাস দেড় দশকে কেমন করে বদলাই? চলুক না ইংরেজী ততদিন'?"

পরিশেষে এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন: "প্রতিভার

মৌলিকতা প্রতি যুগেই একটি আশ্চর্য্য অভিনবত্ব লাভ করে নিজেই সে প্রকাশ করতে থাকে নিজের অনন্যতা, নিজের সুদীর্ঘ পরমায়ু নিজের ভিতর থেকেই সে খুঁজে পায়। ভারতীয় সংস্কৃতির যে ধারাবাহিকতা, সে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছে কল্পে ও কল্পান্তে।···প্রকাশভঙ্গী এবং আঙ্গিকের পরীক্ষা বাংলা-সাহিত্যে নিরন্তর চললেও সাহিত্য কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও বাকচাতুর্য্যের খেলা নয়, হৃদয় ও প্রাণের লীলাই হ'ল সাহিত্যের অন্তঃসার।··· একালের কবি ও সাহিত্যসেবীর বিদগ্ধ মনের মৃত্তিকায় যদি পাশ্চাত্য সাহিত্যরথিগণের উড়ো চিন্তার বীজ এসে পড়ে, তার থেকে সুমধুর কাব্য ও কাহিনী অঙ্কুরিত হতে পারে স্বীকার করি। কিন্তু সেই সকল রচনার যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের ভারতীয় মনের ছাঁচটি যদি সেই রচনা থেকে হারায়, তবে তাঁদের এদেশে-ওদেশে কোথাও ঠাঁই হবে না।···বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠাসন এ জন্য নয় যে, তিনি বার্নার্ড শ' অথবা ওয়েলস প্রভৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁকে ঘিরে ভারতীয় ভাবনার যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, তাতে সভ্যতার ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ শতাব্দী গৌরব লাভ করেছে।"

এর পরে আর কোন আলোচনা সম্ভব ছিল না বলেই সকলে অনুভব করেছিলেন, এমন সময় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহিত্য-প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। শ্রীকুমারবাবু প্রবীণ শিক্ষাব্রতী—বঙ্গ-সাহিত্যের শিক্ষক এবং আলোচক হিসেবে তাঁর মতামত উপেক্ষার নয়। তবু মনে হ'ল, প্রবীণ-মনের সংস্কার তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা রক্ষা করতে পারে নি। আদর্শের একটি অলৌকিক ধারণা সর্ব্বদাই এদের ভাবিয়ে রাখে নবসাহিত্যের পরিণাম নিয়ে। এ আশঙ্কা বক্তার মনেও ছায়া ফেলেছে, বুঝতে অসুবিধে হ'ল না। তা ছাড়া, স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করার পথে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন শ্রীপ্রবোধ সান্যাল, আধুনিক সাহিত্যকে তাঁর সস্নেহ স্বাগত জানিয়ে।

এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর একটি ভবিষ্যদ্বাণী নতুন করে মনে জাগে। প্রায় ৪৩ বছর আগে 'সবুজপত্রে' তিনি লিখেছিলেন, 'বঙ্গ-সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে।···প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নব্য-সাহিত্য রাজধর্ম্ম ত্যাগ করে গণধর্ম্ম অবলম্বন করেছে। বহু শক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্প-শক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে।' এই বোধ হয় বর্ত্তমান শতাব্দীর কথা, বিশ্ব-সাহিত্যের পরিচয়। সুতরাং ব্যাপকতায় সাহিত্য তার সু-উচ্চ ব্যক্তিত্ব হারিয়েছে এমন কথা জোর করে কে বলবে আরও অর্দ্ধ শতাব্দী না গেলে?

শ্রীকুমারবাবুর আলোচনার পরেই প্রাতঃকালীন সাহিত্য-শাখার অধিবেশন সমাপ্ত হ'ল।

'সমাজ ও সংস্কৃতি' শাখার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল বেলা দুটোয়। এ শাখার সভাপতি ছিলেন ড. শ্রীকালিদাস নাগ। তিনিও উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁর অভিভাষণটি পাঠ করলেন অন্য এক জন প্রতিনিধি। ড. নাগ বহু গবেষণামূলক ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে তাঁর অভিভাষণে বাংলার সমন্বয়ী প্রতিভার কথা উল্লেখ করে বলেন: 'কেবল ভারতবর্ষে নয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গেও বাংলার তথা বৃহত্তর বঙ্গের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংযোগ ছিল। মধ্যযুগের বাংলা তাই সুদূর প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যোগ রেখে এসেছে।···বাঙালী দ্রাবিড় সভ্যতায়ও অনুপ্রবেশ করেছিল। আমি স্বকর্ণে শুনে এসেছি সেন রাজাদের সভাকবি জয়দেব গোস্বামীর 'গীত-গোবিন্দ' দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দিরে গীত হয়েছে এবং মলয়ালী ভাষায় তার অনুবাদ কেরল প্রদেশে আদৃত। বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের পূর্ব্ব-পুরুষ কার্ণাটবংশীয় হয়েও কেমন করে বাঙালী হয়েছিলেন?

অভিভাষণ পাঠ চলছিল এমন সময় শ্রীজগনপ্রসাদ রাওয়াত (উত্তরপ্রদেশের উপমন্ত্রী) এলেন। তাঁরই এ শাখা উদ্বোধনের কথা। ঠিক একই সময়ে কিন্তু ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলি দিল্লী থেকে 'তাজ' পরিদর্শনে এসে পড়ায় তাঁকেও উপস্থিত থাকতে হয়েছিল সেখানে। তিনি বিলম্বে আসার দরুন মার্জ্জনা চেয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণে সম্মেলন ও প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বঙ্গভাষার স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রভাষার সপক্ষেও কিছু বলেন। অতঃপর এই অনুষ্ঠানের জন্য চিহ্নিত তিনটি প্রবন্ধ, 'ভক্তকবি সুরদাস' 'প্রবাসে বাঙালীর সমস্যা' এবং 'বৈদিক যুগে নারীর স্থান (?)' পাঠ করে শোনালেন যথাক্রমে এক জন লেখক ও দুই জন লেখিকা। বাচনভঙ্গীর দোষে প্রথমটি তেমন বোঝা গেল না। তবে দ্বিতীয়টি খুবই সময়োপযোগী এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। লেখিকা স্বয়ং প্রবাসী মনে হয়। সুতরাং তিনি যা অনুভব করেছিলেন, প্রত্যেক পরিণামদর্শী বাঙালীই তা সমর্থন করবেন। প্রবাসে আজ কোথাও বাঙালীর সন্তান মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। তারা কি শেষ পর্য্যন্ত বড় হয়ে কেবল একটি বাংলা ভাষার ডিপ্লোমা নিয়েই খুশী থাকবে? দুঃখের বিষয় বিচারপতি শ্রী পি. কে. সরকার শেষকালে এ বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করতে উঠে যদিও অনেক বিষয়ে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মাতৃভাষায় মৌলিক অধিকারের প্রশ্নটি তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন।

সন্ধ্যায় 'কলা ও সঙ্গীত' শাখার সভাপতি শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর উপস্থিত হতে পারেন নি আগেই বলেছি। সুতরাং বিকল্পে শ্রীদ্বিজেন সান্যাল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি একাই দু'টি বিভিন্ন কলার রস-সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আর কোন কলাবিদ উপস্থিত না থাকায় তিনি নিজেও বুঝি মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।

শ্রীখাস্তগীরের ভাষণের মর্ম্ম ছিল এরূপ—বাংলা দেশের বাইরে প্রায় সমস্ত শিল্পকলা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বাংলা দেশ থেকে আগত শিল্পী। এর কারণ নির্দ্ধারণ করা শক্ত নয়। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশেই ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার আরম্ভ

হয়েছিল।···স্বর্গত আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও হ্যাভেল সাহেবের সাহায্যে ভারতীয় চিত্রকলায় পুনরভ্যুদয় ঘটাতেও সমর্থ হন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যর্থ অনুকরণে দুঃখপ্রকাশ করে শ্রীসান্যাল বলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় তাঁর কাছে বসে গান শুনবার ও শিখবার সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম, সেই জন্যই ভাবহীন প্রাণহীন ঢিমে তালে যখন তাঁর গান আধুনিক গায়কদের মুখে শুনি, তখন অত্যন্ত বেদনা বোধ করি।'

এ দিনের শেষ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'ল রাত্রে দ্বিজুবাবুর দল কর্তৃক 'পার্থসারথি' মঞ্চাভিনয়ের দ্বারা।

তৃতীয় ও শেষ দিনের প্রাতঃকালীন আন্তঃরাজ্য সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে দৈবযোগে বাদ পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু অপরাহ্ণে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাকে পাশাপাশি বসতে দেখে সত্য সত্যই গৌরব ও রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলেন সবাই। এমন অভিজ্ঞতা এ দেশে এই প্রথম। সেজন্যে শ্রীদেবেশ দাশ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই ধন্যবাদার্হ। তাঁদেরই চেষ্টায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থার প্রতিনিধিগণকে বিশেষ বিমানযোগে দিল্লী থেকে সম্মেলনে আহ্বান করা সম্ভব হয়েছিল। উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে সুইডেনের মহিলা রাষ্ট্রদূত আলভা মারডাল নিজের ভাষণে ইউরোপীয় সাহিত্যে আদর্শের যে উত্থান-পতন চলেছে তারই রূপরেখা দান করে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, সাহিত্য আবার যেন সর্বব্যাপী কল্যাণের পথ খুঁজে পেয়েছে—বহু অভিজ্ঞতার শেষে আবার তাই ঝুঁকেছে শাশ্বত আদর্শের দিকে।

এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্ম্মানী, ইরাণ, মিশর, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল ও রুশিয়ার প্রতিনিধিগণ সকলেই ভারতীয় আদর্শ ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমোন্নতির শুভ-কামনা করলেন। শুনে আনন্দ হ'ল যে, প্রতিনিধিদের সকলেই রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে পরিচিত। এঁদের মধ্যে ফ্রান্সের প্রতিনিধি বৈজ্ঞানিক মিঃ লেগুই নিজের মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিয়ে জানান যে, কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, কবির নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পর তাঁর ফ্রান্সে আগমন থেকে। তিনি সেইদিন থেকে আজীবন রবীন্দ্রভক্ত। ইরাণী প্রতিনিধিও ইরাণী ভাষায় অভিভাষণ আরম্ভ করে ইংরেজীতে উপসংহার করেন। কিন্তু সকলের বড় বিস্ময় ছিল রুশিয়ার দুই জন প্রতিনিধির মুখে হিন্দী ও বাংলা অভিভাষণ, রুশিয়ার প্রাচ্যবিদ্যা একাডেমির ডিরেক্টর মিঃ শিলিকফ হিন্দীতে এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক মিঃ স্তাণুক গ্যাসিলচাক্ বাঙালীর বাচনভঙ্গীতে পরিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় অভিভাষণ দিলেন। হিন্দী উচ্চারণে বরং অস্পষ্টতা ছিল, কিন্তু বাংলা শব্দ-প্রয়োগে ধরার উপায় ছিল না—কোন বিদেশাগতের মুখে লিখিত ভাষণ শুনছি। ইনি মস্কোর রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচার কমিটির একজন প্রখ্যাত সদস্য এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি উপন্যাস মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছেন। এর কাছে সংবাদ পাওয়া গেল যে, গীতাঞ্জলির প্রথম যে রুশ-সংস্করণ তাঁরা ছাপছেন, ইতিমধ্যে তার লক্ষাধিক কপির অগ্রিম আবেদন তাঁরা পেয়েছেন। এদের পরবর্তী কাজ হ'ল রবীন্দ্রচনাবলী দশ খণ্ডে মুদ্রণ করা; তবে প্রথম চার খণ্ডে যে-যে রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে তারও একটি তালিকা পড়ে শুনালেন। এ ছাড়াও, হিন্দী ও বাংলার আধুনিক সাহিত্যিকগণের রচনাও অনুবাদ করতে তাঁরা মনস্থ করেছেন বলে জানালেন।

এই অধিবেশনের জন্য বিশেষ ভাবে রচিত একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ ইংরেজী নিবন্ধে বাংলা সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক পরিচয় দান করেন অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ তাঁর মুদ্রিত অভিভাষণে বলেন যে, 'রাজনীতির খেলায় বাংলা দেশের সীমা অনেকবার বদলে গেছে। কিন্তু বর্ত্তমানের মত এত সঙ্কুচিত বোধ হয় কখনও হয় নি। আমাদের নদীতে ভরা দেশে নদী যখন দুই কূলই ভেঙে দিয়ে যায়, তখন বন্যার বুকেই আমরা বাসা বাঁধি। এই হচ্ছে শতাব্দীর পর শতাব্দীর জীবনমন্থন করা বিষে নীলকণ্ঠ বাঙালীর অমৃতসাধনা।'

জাতীয় সঙ্গীতের শেষে তিনদিনব্যাপী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কার্য্যসূচী শেষ হ'ল। বাকি ছিল দুটি কাজ। আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের সম্মানার্থে আয়োজিত প্রতিনিধি-শিবিরে একটি প্রীতি-সম্মেলন ও রাত্রে কলকাতার সাংস্কৃতিকী কর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য—চিত্রাঙ্গদা। গীতাংশ চমৎকার, কিন্তু নৃত্যছন্দ মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল।

রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিরা কয়েকটি দৃশ্যমাত্র দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন, কেননা তাঁদের আর অপেক্ষা করার অবসর ছিল না—তখনই দিল্লীতে ফিরতে হবে।

এর মাঝেই ধন্যবাদ দিতে উঠে শ্রীদেবেশ দাশ জানালেন, আগামী অধিবেশনের নিমন্ত্রণ পাওয়া গেছে সুদূর আমেদাবাদ থেকে।
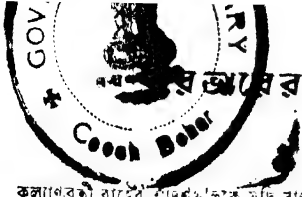
[illegible]রের পরিবর্তন ও অর্থ কমিশনের এক্তিয়ার

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের আদর্শগুলিকে যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় তা হলে সরকারী খরচ বৃদ্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাষ্ট্রের প্রয়োজন দিনের পর দিন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। কাজেই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন অনুযায়ী জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় না করলে সরকারের পক্ষে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয়। অবশ্য কর বৃদ্ধিকে মানুষ সাধারণতঃ প্রীতির চক্ষে দেখে না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অন্যান্য উন্নত দেশের জনসাধারণ যে ভাবে করভার বহন করছেন সে ভাবে করভার বহন করার জন্য ভারতের জনসাধারণ যাতে ক্রমশঃ প্রস্তুত হতে পারেন তার পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে খুব উচ্চ হারে কর আদায় করা হয়ে থাকে। তবে এর পিছনে সমর্থনযোগ্য কারণ বিদ্যমান রয়েছে। জানা গিয়েছে, উন্নত দেশগুলিতে যারা পঙ্গু হয়ে পড়েছেন কিংবা যাদের কর্ম-সংস্থানের কোন ব্যবস্থা হয় নি কিংবা যারা বার্দ্ধক্যের জন্য কাজ করতে অক্ষম তাঁদের জন্য সরকার নিজের খরচে সাপ্তাহিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। তা ছাড়া কোন কোন দেশে সরকার কর্তৃক এমন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে যার ফলে চিকিৎসার জন্য জন-সাধারণকে পয়সা খরচ করতে হয় না। এমনকি বালক-বালিকা-দের বিনা ব্যয়ে ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণী পর্যন্ত পড়বার সুযোগও দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সমস্ত জনহিতকর কাজের ব্যয়ভার সরকারই বহন করে থাকেন। লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্য দেশের সরকার যে টাকা খরচ করেন সে টাকার একটা অংশ সরকার দেশবাসীর কাছ থেকে করের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। প্রশ্ন হতে পারে, জনসাধারণের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানান হয় না কেন। জনসাধারণ বুঝতে পারেন, যে সব ব্যবস্থার জন্য সরকার ব্যয়ভার বহন করেন সে সব ব্যবস্থা একদিকে যেরকম জনহিতকর সেরকম অন্যদিকে প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। কাজেই প্রতিবাদের প্রশ্ন উঠে না।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির বর্তমান অবস্থা এবং আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। আমরা আগেই বলেছি, সে সব দেশের সরকার কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুসারে জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করেন। তবে জন-সাধারণের মধ্যে যেরকম শ্রেণী এবং পর্য্যায়ের পার্থক্য রয়েছে—সে রকম অর্থসামর্থ্যের তারতম্যও বিদ্যমান। ফলে সরকার যে কর আদায় করেন সে করের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ভারতের অবস্থা কিন্তু অন্য ধরনের। এখানে ব্যক্তিগত আয়ের উপর ক্রমশঃ উচ্চতর হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে যেহেতু ব্যক্তি-গত মালিকানায় পরিচালিত কারবারের উপর ব্যক্তিগত খরচের একটি বিরাট অংশ চাপিয়ে দেবার সুযোগ আছে—সে হেতু যাদের কাছ থেকে আয়কর আদায় করা হয় তাঁদের অনেকেই অনায়াসে ব্যক্তিগত আয়ের একটা অংশ থেকে রেহাই পেয়ে সাশ্রয় করতে সমর্থ হন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রচলিত করপ্রথা সম্বন্ধে যাদের ধারণা আছে তাঁরা হয়ত একটা বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছেন। সেখানে আলাদা ভাবে আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় না। যে সব জিনিষ আমদানী করা হয় সে সব জিনিষের উপরও সরকার আলাদা ভাবে শুল্ক আদায় করেন না। অথচ দেশের ভিতরে এবং বাইরে যে সকল পণ্য বিক্রী করা হয় সে সব পণ্যের উপর সোভিয়েট সরকারকে খুব উচ্চহারে কর ধার্য করতে দেখা যায়। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সরকার এই ভাবে প্রচুর টাকা আদায় করেন। অবশ্য এই ধরনের করপ্রথার ফলে পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়। উদা-হরণস্বরূপ বিলাসদ্রব্যের কথা বলা যেতে পারে। রাশিয়ায় বিলাস-দ্রব্যের দাম খুব চড়া। এর চেয়ে অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে বিলাস-দ্রব্যের দাম অনেক কম। তবে এই সব দেশেও বিলাসদ্রব্যের উপর কর ধার্য করে সরকার প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন। আমা-দের দেশেও দেখেছি, কতকগুলি বিলাসদ্রব্যের উপর খুব উচ্চহারে আমদানী শুল্ক ধার্য করা হয়েছে। তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে আমদানী শুল্কজনিত বোঝা তেমন দুর্বহ হয় নি।

কিছুকাল পূর্ব্বে অর্থকমিশনের সভাপতি এবং সভ্যবৃন্দ কলকাতায় এসেছিলেন। চারদিন ধরে এদের বৈঠক চলছিল। শ্রী কে. শান্তনম হলেন অর্থকমিশনের সভাপতি। কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে তিনি একটি সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতে করভার আরও বর্দ্ধিত করা ছাড়া উপায় নেই। কেন করবৃদ্ধি অনিবার্য্য হয়ে পড়বে বলে তিনি মনে করছেন, সে সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সম্ভাব্য কারণের উল্লেখ করেছেন। এসকল কারণের মধ্যে বৈষয়িক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে, করবৃদ্ধির আগে লোভী ব্যবসায়ীরা যে অতি-মুনাফার জন্য সচেষ্ট হন সে মুনাফার বোঝা যাতে জনসাধারণকে বহন করতে না হয় তার জন্য সরকারের পক্ষে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। সরকারী ব্যবস্থা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তা হলে জনসাধারণের অর্থের সাশ্রয় হবে এবং সরকারও এর কিছু অংশ রাজকোষে আদায় করতে পারবেন। যতদিন পর্য্যন্ত সরকার অতি-মুনাফার বোঝা থেকে জনসাধারণকে
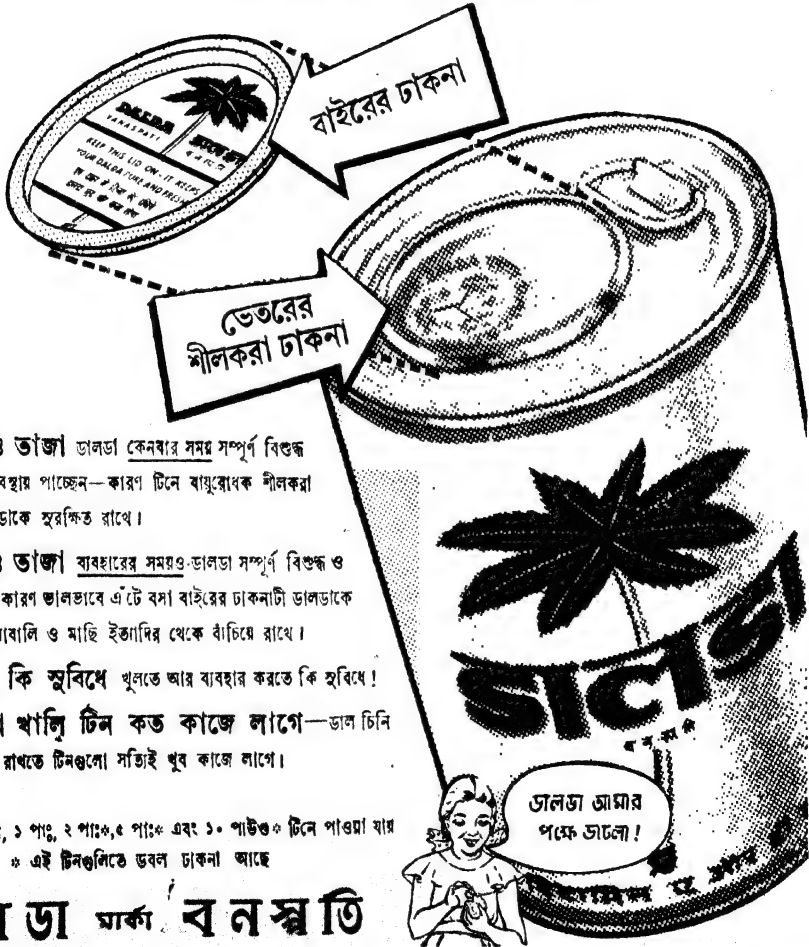
নিষ্কৃতি দিতে পারবেন না ততদিন পর্য্যন্ত সরকারের করভার বৃদ্ধি করবার কোন নৈতিক অধিকার আছে বলে আমরা মনে করি না।

কি নীতি অনুযায়ী এবং কতটা পরিমাণ রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে পাঁচ বছরের জন্ম আইনসঙ্গত ভাবে বণ্টন করা দরকার এবং বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করাই হ'ল অর্থকমিশনের একমাত্র কর্ত্তব্য। অবশ্য এই রাজস্ব কোন একটা বিশেষ দফার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন দফার রাজস্ব বণ্টনের ব্যাপারে অর্থকমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে বর্ত্তমানে প্রচলিত করপ্রথার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় কোন সুপারিশ করার আইনসঙ্গত অধিকার কমিশনের নেই। এমনকি, নূতন কর ধার্য্য করা সম্বন্ধেও কমিশন আইনসঙ্গতভাবে কোন সুপারিশ করতে পারেন না। মোট কথা হ'ল এই যে, করপ্রথা সম্বন্ধীয় গোটা ব্যাপারটি অর্থকমিশনের এক্তিয়ারের বহির্ভূত।

ভবিষ্যতে অনিবার্য্যভাবে করভার বেড়ে যাবে বলে শ্রী কে. শান্তনম্ যে মন্তব্য করেছেন সে মন্তব্যটিকে অর্থকমিশনের হাতে ন্যস্ত দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে যদিও অপ্রাসঙ্গিক বলে প্রতিভাত হবে তথাপি একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তাঁর মন্তব্যটি খুব সময়োপযোগী হয়েছে। যাঁরা ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা ভবিষ্যৎ করবৃদ্ধির সম্ভাবনায় চিন্তিত না হয়ে পারবেন না। অবশ্য কোন দেশের জনসাধারণের কাছে করবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হবে না। তবে সময় থাকতে যদি এই সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয় তা হলে জনসাধারণ হয়ত বর্দ্ধিত করভার বহন করার জন্ম প্রস্তুত হতে পারবেন। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে মনে হয়, ভবিষ্যৎ করবৃদ্ধি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে শ্রী কে. শান্তনম্ মনে হয় অন্যায় কিছুই করেন নি, যদিও অর্থকমিশনের সভাপতি হিসাবে প্রচলিত করভারের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন সুপারিশ করার আইনসঙ্গত অধিকার তাঁর নেই।

ভ্রম-সংশোধন

গত পৌষ মাসের 'প্রবাসী'তে "রাতের আকাশের রূপবৈচিত্র্য" নামক প্রবন্ধে কিছু ভুল হইয়াছে। ৩৭৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে "...ঋক্ষ বা বড় কুকুর মণ্ডলের লুব্ধককে"। কিন্তু ঋক্ষ বলিতে বড় কুকুর মণ্ডল বুঝায় না। ঋক্ষ শব্দের মানে ভল্লুক ও নক্ষত্র। ঋক্ষ শব্দ হইতে গ্রীক Arktos ও পরে লাটিন Ursa হইয়াছে। আমাদের সপ্তর্ষি মণ্ডলকে পাশ্চাত্য জ্যোতিষে Ursa Major বা Great Bear বলা হয়। 'বৈদিক ঋষিরা ঋক্ষগণ বলিতে হয়ত সপ্তর্ষিকে বুঝিতেন'। সুতরাং ঋক্ষমণ্ডল কথাটি সপ্তর্ষিমণ্ডলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে, 'বড় কুকুর মণ্ডল' বা Canis Majoris-এরবদলে নয়।

৩৭০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—"এই কালপুরুষ হচ্ছেন রুদ্রের প্রতীক—এঁর পৌরাণিক যুগের নাম মৃগ নক্ষত্র।" বেদ এবং পুরাণের রচনাকালের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান। কিন্তু বেদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণের যুগেও যে কালপুরুষের নাম ছিল মৃগ বা মৃগব্যাধ, ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি উপাখ্যান হইতে তাহা জানা যায়। কৃত্তিকা সম্বন্ধে (পৃ. ৩৭৬)বলা হইয়াছে—"ইহার গ্রীক নাম Pleiades। Pleiones--বহু থেকে উৎপন্ন বলে এই নাম।" এই উক্তিতেও কিছু ভুল আছে। প্লাইয়াড্‌স কৃত্তিকার গ্রীক নাম নয়—"ইংরেজীতে কৃত্তিকার চলিত নাম প্লাইয়াড্‌স। গ্রীক Pleiones=বহুলা হইতে উৎপন্ন।" আমাদের জ্যোতিষেও "কৃত্তিকার একটি প্রাচীন নাম বহুলা।" (যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ", পৃ. ৪২৮)

ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রকে (পৃ. ৩৭৪) আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে শতভিষগ বা শতবৈদ্য বলা হয় না; কুম্ভরাশিতে দৃষ্ট অনেকগুলি তারাকে মণ্ডলাকারে কল্পনা করিয়া আমাদের জ্যোতিষীরা শতভিষক শতভিষা বা শততারকা নামকরণ করিয়াছিলেন। "শতভিষার অর্থ যাহাতে শতভিষক বা বৈদ্য আছে বা আবশ্যক হয়। শতভিষা নক্ষত্রে চন্দ্র থাকিবার সময় রোগ হইলে নাকি শত বৈদ্যেও তাহার উপশম করিতে পারে না। শত অর্থে বহুসংখ্যক। এই নক্ষত্রে বহুসংখ্যক তারকা আছে বলিয়া নাম শততারকা হইয়াছে।" (ঐ)

হিন্দু জ্যোতিষে ক্যাসিওপিয়ার নাম শুধু কাশ্যপী-ই, আর পার্সিউস হইতেছে 'পুরুষ'। পার্সিউস মণ্ডলের আলগল বা দৈত্যতারা আমাদের পুরাণের শতরূপা বলিয়া আচার্য্য যোগেশচন্দ্র অনুমান করেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্য জ্যোতিষে যে মণ্ডলের নাম একুইলা বা ঈগল পক্ষী, তাকে বিষ্ণুর বাহন গরুড়পক্ষী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ন. ভ.

দেশ-বিদেশের কথা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

গত ২৩শে ডিসেম্বর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সাধারণ সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী যে বার্ষিক কার্য্যবিবরণী আলোচনা করেন, তাহা হইতে জানা যায়, আলোচ্যবর্ষে সাতটি প্রচারক-বাহিনী পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, অন্ধ্র, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে, পরিভ্রমণপূর্ব্বক, জাতিগঠন-মূলক প্রচারকার্য্য করেন। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, পুরী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্রস্থিত সঙ্ঘের তীর্থসংস্কার কেন্দ্রগুলিতে ৫৬,৭৯৭ জন তীর্থযাত্রীকে নিরাপদে আশ্রয় ও আহার্য্য দান করা হইয়াছে।

ঐ বৎসর উত্তরবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসামের প্রবল বন্যায় দুর্গত নরনারীদের ভিতর ব্যাপক সেবাকার্য্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত গয়ায় পিতৃপক্ষ মেলা, কাশীতে অন্নকূট মেলা, গঙ্গাসাগর মেলা, প্রয়াগে মাঘ মেলা, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ মেলায়ও সেবাকার্য্য পরিচালিত হয়।

আলোচ্যবর্ষে সঙ্ঘের শিক্ষা-প্রসার কার্য্যও সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১২টি আবাসিক ছাত্রাবাসে দুই শত ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৈতিক জীবন গঠনের শিক্ষাদান করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গায়েনায় এক শত ছাত্রের বাসোপযোগী একটি ত্রিতল ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হয়। ৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি জুনিয়র হাই স্কুল, আটটি নৈশ বিদ্যালয় সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। সঙ্ঘকর্ত্তৃক গঠিত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র পরীক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী গীতা, রামায়ণ, মহাভারত অধ্যয়ন করে এবং তিনটি পরীক্ষা-কেন্দ্র হইতে পরীক্ষাদান করে।

সঙ্ঘের তিনটি শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র হইতে বেকার গ্রামবাসিগণের কর্ম্মসংস্থানের জন্য বেত, বাঁশ, তাঁত ও পাপোশ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কুটীরশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়।

সঙ্ঘের সমাজ-সংস্কার এবং অনুন্নত ও আদিবাসী উন্নয়ন প্রচেষ্টাও এবার বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তিন শত হিন্দুমিলন-মন্দির (গ্রাম সংগঠন-কেন্দ্র) হইতে গ্রামবাসিগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ-কল্যাণকর বিবিধ গঠনমূলক কার্য্যাদি পরিচালিত হয়।

১২টি কেন্দ্র হইতে আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণের জন্য বিবিধ গঠনমূলক কার্য্য করা হয়। তাহাদের মধ্যে নৈশ বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা, পাঠাগার স্থাপন, এবং বিবিধ ধর্ম্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তন করা হয়। সঙ্ঘ-পরিচালিত ভারতীয় সংস্কৃতি মিশনের অন্যতম সদস্য স্বামী পূর্ণানন্দজীর প্রচেষ্টায় দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গায়েনা ও ত্রিনিদাদে বাইশটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম্মের মহান্ আদর্শ প্রচার করা হয়। এই স্থানে মিশনের স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ২০ একর জমি এবং ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী সংক্রান্ত আলোচনার পর সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক স্বামী যোগানন্দজী ১৩৬১ সালে সঙ্ঘের আয়ব্যয়ের যে পরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপিত করেন তাহা এই—আয় সাধারণ খাতে ৩,৩৯,৯৭৭/১৫, ব্যয় ২,৪৮,৭৮০.৫ এবং সাহায্য খাতে আয়—৯৩,৭৭৪৷৴০, ব্যয় ৪৫,১৯৯৲ টাকা।

হাওড়া জেলা পাঠাগার-সঙ্ঘ

গত ৩০শে ডিসেম্বর, মাজু পাবলিক লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণে হাওড়া জেলা পাঠাগার-সঙ্ঘের উদ্যোগে হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রায় দুই শত কর্ম্মী এবং বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমাজসেবী ও গ্রন্থাগার-প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ড. শ্রীনীহাররঞ্জন রায়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীনন্দীধন সরকার উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মাজু গ্রামের দানের কথা উল্লেখ করেন। সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্ঘের ১৯৫৫-৫৬ সনের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি ড. রায় দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার উপর বিশেষ জোর দেন। সভায় সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীফণীভূষণ রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা—অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ. পি-এচ-ডি। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি খ্যাতনামা প্রবীণ অধ্যাপকের গভীর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। গ্রন্থখানিতে বারোটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় দর্শনের দুরূহতম সমস্যার কত অনায়াস স্বচ্ছন্দ আলোচনা হইতে পারে তাহাব নিদর্শন আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মিলিবে। গ্রন্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন মনীষীর মতবাদের তুলনমূলক আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন বিভিন্ন অধ্যায়ে। 'দর্শনের স্বরূপ' প্রবন্ধে জড়বাদ ও দৃষ্টবাদকে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় দর্শন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের বিভিন্ন মনীষীর মতবাদের উল্লেখ ও সমালোচনা করিয়া যে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়ছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিয়া দিই: "দর্শন ন্যায়সঙ্গত যুক্তির দ্বারা সমর্থিত জ্ঞান বটে, কিন্তু যে কোন যুক্তিযুক্ত জ্ঞানকে দর্শন বলা যায় না। যুক্তি দ্বারা সমর্থিত পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃত দর্শন।" আমরা দর্শনের এই সংজ্ঞা গ্রহণ না করিলেও গ্রন্থকারের যুক্তির বলিষ্ঠতা ও মতের স্বচ্ছতা স্বীকার করিতেছি। 'শ্রীঅরবিন্দ ও মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি চিন্তাকর্ষক ও সুলিখিত। ঋষি অরবিন্দ সম্পর্কে এ যুগে আগ্রহের অভাব নাই। গ্রন্থকার শ্রীঅরবিন্দের মূল দার্শনিক মতবাদ অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে চৈতন্য ও জড়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ, তাঁহার দিব্যজীবনের ধারণা, বিশ্বচেতনার কথা, কর্ম্ম ও মুক্তির ধারণা, এই সকল দুরূহ তত্ত্ব আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্থান পাইয়াছে। "মানুষের জীবনে যে একটি চিরন্তন সমস্যা দেখা যায় তাহার সমাধানে শ্রীঅরবিন্দ কি আলোকপাত করিয়াছেন" ড. চট্টোপাধ্যায় তাহার পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক আলোচনা করিয়াছেন উল্লিখিত প্রবন্ধে। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম ও দর্শন, দার্শনিক প্রমাণ পদ্ধতি, ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে মুক্তির স্বরূপ ও উপায়, হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে দর্শনের স্থান শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে গ্রন্থকারের সুগভীর মননশীলতার নিদর্শন রহিয়াছে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' শীর্ষক প্রবন্ধটিও সুলিখিত ও সুখপাঠ্য। ঠাকুর ছিলেন দেব-মানব ও অবতার। তাঁহার আবির্ভাবের তাৎপর্য্য, তাঁহার মূল শিক্ষার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গলাভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট সর্ব্বশেষ প্রবন্ধটি হইল 'আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের দার্শনিক মতবাদ'। এই প্রবন্ধটি গ্রন্থখানির মূল্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে। আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র এ যুগে আবির্ভূত হইলেও তিনি প্রাচীন মনস্বী চিন্তানায়কদের সমগোত্রীয়। তাঁহার জীবনবাদ এ যুগের মনীষীদের জীবনবেদ। আপন নিভৃত নিলয়ে একাগ্র চিত্তে জ্ঞান-তপস্যায় নিরত এই মনীষীর জীবন-কথা ও দার্শনিক মতবাদের ব্যাপক আলোচনার সময় অসিয়াছে। আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র বিংশ শতকের দার্শনিকদের মধ্যে বিশ্লেষণী চিন্তার অগ্রনায়ক। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ প্রত্যেক দর্শন-অনুরাগীর প্রণিধানের বস্তু। "তাঁহার দার্শনিক চিন্তার গভীরতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বিচারবুদ্ধি এবং দার্শনিক সমস্যা সমাধানের নূতন ও মৌলিক পদ্ধতি দৃষ্টে মনে হয় যে তাঁহার সমতুল্য দার্শনিক এদেশে বা বিদেশে বিরল।" এই জ্ঞানতপস্বীর দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়া ড. চট্টোপাধ্যায় আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়ছেন। দর্শনশাস্ত্রানুরাগী বঙ্গভাষাভিজ্ঞ সকলের এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

কুমারীকন্যা—শ্রীদীপক চৌধুরী। এম, সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য পাঁচ টাকা।

দীপক চৌধুরীর উপন্যাসে ও গল্পে, নানাদিকেই নূতনত্ব থাকে। সাধারণতঃ এই জাতীয় কথাসাহিত্যে যে একটা গতানুগতিক ধারা থাকে, দীপক চৌধুরীর লেখায় ঠিক সেরকম পাওয়া যায় না। লেখার ভাষায় ও বর্ণনায় একটা তীক্ষ্ণ অম্লমধুর রসান দেওয়াই ইহার ধরন, যাহাতে পাঠকের মন কিছুতেই অনুভূতি হারাইয়া ফেলে না। উপন্যাসের আখ্যান-বস্তুর অর্থাৎ প্লটের সজ্জায় ও গতিতে ক্রমাগত রকমফের করে, দৃশ্যপটে আলোছায়ার খেলা দেখানোর মত, আখ্যান-চালনাও ইহার লেখায় পাওয়া যায়। উপরন্তু আছে প্লটে কল্পনা-বৈচিত্র্য।

কুমারীকন্যায় ঐ সবই আছে। ইহার মূল ব্যাপার মনস্তত্ত্বঘটিত। জৈব প্রেমের মধ্যে মানসিক উত্তেজনা ও অবসাদ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, সন্দেহ ও বিশ্বাস কি ভাবে চলিতে থাকে এবং সেইসঙ্গে চেতন ও অবচেতনের প্রেরণায় বাস্তব ও অবাস্তব কি ভাবে দাবার চালের মত হারজিতের খেলা খেলে, তাহাই লেখক উজ্জ্বলভাবে দেখাইয়াছেন তাঁহার নায়িকা ও নায়কদের ভিতর দিয়া। উপন্যাসের অভিনবত্ব আরও জাগিয়াছে এক প্রাধান নায়ক-সনৎ ও অন্যতমা নায়িকা মধুমায়া, যেন ছায়ারূপেই চলিয়া গেছে কাহিনীর ভিতর, তাহাদের বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষভাবে কোথায়ও যেন পাওয়া গেল না। এবং সেই কারণেই আখ্যানের পরিণতিও আশ্চর্য্যজনক ভাবে অপ্রত্যাশিত। লেখার ধরন চিত্তাকর্ষক ও বলিষ্ঠ।

ক. চ.

আকাশ থেকে মহাকাশে—শ্রীঅরুণ রায় ও শ্রীকালিপদ দাস। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম দেড় টাকা।

গ্রন্থখানি সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের জন্য লিখিত এবং জ্যোতিষ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। মহাকাশের দিকে তাকিয়ে, পৃথিবীতে দিন-রাত্রির উদয়াস্তে, হিম ও উষ্ণতার স্পর্শে শৈশবে মনে যে সকল প্রশ্নের স্বতঃই উদয় হয়, এই গ্রন্থে সেই প্রশ্নগুলির অতি সুন্দর ভাবে উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নগুলি যত সোজা তাদের উত্তর তত সোজা নয়। কারণ, বিষয়গুলি জটিল। কিন্তু গ্রন্থকারদ্বয় প্রশংসনীয় দক্ষতার সঙ্গে রচনাটিকে সফল করেছেন। ভাষা এমন সরল ও সুমিষ্ট যে, অপরিণতমন বালক-বালিকারা সানন্দে গ্রন্থখানি পাঠ করবে এবং অধীত বিষয় আপনা হতেই স্মরণে রাখবে। আমাদের জাতীয় জীবনে বর্ত্তমানে নব জাগরণ দেখা দিয়েছে। জাতীয় উন্নতির অন্যতম প্রধান অবলম্বন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। উনবিংশ শতাব্দীতেই আমাদের পূর্ব্বসূরিগণ এ সত্য উপলব্ধি করে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের বিজ্ঞান শিক্ষাদানে সচেষ্ট হন। পৃথিবীর অপরাপর উন্নতিশীল দেশেও বর্ত্তমান কালে আমরা তাই দেখছি। আমাদের দেশেও এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। গ্রন্থকারদ্বয় সেই প্রচেষ্টায় যোগ দিয়ে দেশের কল্যাণকর্ম্মের অংশভাগী হলেন। এজন্য তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র। আলোচ্য গ্রন্থখানি স্বল্পশিক্ষিত বয়স্কগণও পাঠ করলে লাভবান হবেন। এমন গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শিশুরোগের গৃহ-চিকিৎসা—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়। ১১৪।২-বি. ও সি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য দেড় টাকা।

লেখক প্রাকৃতিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী। "যে পদ্ধতিতে প্রকৃতি দেহের এই বিষ দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেহকে রোগমুক্ত রাখে, প্রকৃতির ঠিক সেই পদ্ধতিতে দেহকে দোষমুক্ত করিয়া রোগ-আরোগ্যের যে ব্যবস্থা তাহাকে প্রাকৃতিক চিকিৎসা বলা হয়।" একালের বহু চিকিৎসক কড়া ঔষধ দিয়ে রোগ চাপা দেবার পক্ষপাতী নন। তাঁরা বলেন, এর প্রতিক্রিয়া অনেক সময় আরও ক্ষতিকর। মহাত্মা গান্ধীও প্রাকৃতিক চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন। এ বইয়ে বিভিন্ন শিশু-রোগের প্রাকৃতিক চিকিৎসার উপায় সযত্নে প্রদর্শিত হয়েছে। আশা করি, অনেকে এই সকল উপায় পরীক্ষা করে দেখবেন। ঘরে ঘরে শিশুদের অসুখ-বিসুখ নিয়ে গৃহী ও গৃহিণীদের ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। ঘন ঘন ডাক্তারের শরণাপন্ন না হয়ে যদি তাঁরা তাদের এই পদ্ধতিতে সুস্থ করে তুলতে পারেন তবে টাকা বাঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় চেষ্টার সাফল্যে তাঁরা নিশ্চয় আনন্দ লাভ করবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একলব্য—শ্রীমতিলাল দাশ। প্রকাশিকা: শ্রীপ্রীতিরাণী দাশ। ব্লক কে, প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩। মূল্য এক টাকা।

ছোটদের একাঙ্ক নাটক। ইহাতে মহাভারতের একলব্য চরিত্রটি নাটকীয় সংঘাতের মধ্য দিয়া সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। পুস্তকখানি ছেলেদের শুধু যে আনন্দবিধান করিবে তাহা নয়, তাহাদের চরিত্র-গঠনেরও সহায়ক হইবে।

রাজ্যবর্দ্ধন—শ্রীমতিলাল দাশ। শিব সাহিত্য কুটীর। ব্লক কে, প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩। মূল্য দুই টাকা।

পঞ্চাঙ্ক নাটক। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রাজ্যবর্দ্ধনের অভিযান, দেশকে শত্রুর কবলমুক্ত করিতে প্রাণপণ সংগ্রাম, শত্রুকে আপন চরিত্রমাধুর্য্যে মুগ্ধ করিয়া ভ্রাতৃত্বে বরণ, তাঁর পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি নাটকখানির সংলাপ এবং ঘটনার মাধ্যমে সুষ্ঠ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজপুরোহিত, সেনাপতি এবং তাঁর কন্যার চরিত্রও সুন্দর এবং স্বাভাবিক রূপেই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। নাটক হিসাবে রাজ্যবর্দ্ধন লেখকের সার্থক সৃষ্টি।

স্মৃতির রেখা—মহাদেবী বর্ম্মা। অনুবাদ: শ্রীমলিনা রায়। প্রদীপিকা। কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

গল্পসঙ্কলন। পুস্তকখানিতে সাতটি গল্প স্থানলাভ করিয়াছে; সাধারণ এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ গল্পের পাত্রপাত্রী। মহাদেবী বর্ম্মা হিন্দী সাহিত্যে সুপরিচিতা। যাদের তিনি দেখিয়াছেন তাদেরই হুবহু আঁকিয়াছেন। ভক্তিন, চিনা ফিরিওয়ালা, দুটি পাহাড়ী ছেলে, মন্নর মা, বিবিয়া, ঠাকুরী বাবা ও গুদিয়া এই সাতটি গল্পের ভিতর দিয়া তিনি যে মানুষগুলিকে আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাদের চরিত্র-মাধুর্য্য মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

বিক্রমোর্ব্বশী—শ্রী"কুড়রাম" ভট্টাচার্য্য। ৬।১, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির সহৃদয় হৃদয়বেদ্য রস পরিবেশন করিয়া যাঁহারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, কবি শ্রী"কুড়রাম" ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পূর্ব্ব-প্রকাশিত শকুন্তলার কাব্যানুবাদ শুধু যে পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নয়, তাঁহার কবিখ্যাতিকেও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নানা বিচিত্র ছন্দে রূপায়িত বিক্রমোর্ব্বশীর এই কাব্যানুবাদ তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠাকে সমধিক বর্দ্ধিত করিবে।

বিক্রমোর্ব্বশী কালিদাসের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিসমূহের অন্যতম। স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশী এবং রাজর্ষি পুরূরবার পূর্ব্বরাগ, মিলন-বিরহ মান-অভিমান ইহার উপজীব্য। কুবেরের আলয়ে নৃত্যগীতান্তে নন্দনকাননে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দেববৈরী কেশীর কবল হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করিলেন রাজা পুরূরবা—তার পর ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইল। কিন্তু এই নবানুরাগের মুহূর্ত্তে দেবরথ আসিয়া উর্ব্বশীকে লইয়া গেল স্বর্গলোকে। কিন্তু রাজার প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে তিরস্করণী বিদ্যাদ্বারা আত্মগোপন করিয়া স্বর্গ হইতে উর্ব্বশী আবার নামিয়া আসিলেন মর্ত্ত্যলোকে, ভূর্জ্জপত্রে লেখা লিপিতে অভিব্যক্ত হইল রাজার প্রতি তাঁহার সুগভীর প্রেম। দৈবক্রমে সে পত্র রাজমহিষী ঔশীনরীর হস্তগত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ ও নিদারুণ বেদনায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। শেষ পর্য্যন্ত কাশীরাজ-কন্যা ঔশীনরী স্থির করিলেন, রাজার মনস্কামনা যাহাতে পূর্ণ হয় সেজন্য তিনি নিজের সকল কামনা-বাসনা বিসর্জ্জন দিবেন, উর্ব্বশীকে তিনি সমাদরে গ্রহণ করিবেন সপত্নীরূপে। ওদিকে শাপভ্রষ্টা হইয়া উর্ব্বশীকে আবার আসিতে হইল মর্ত্ত্যভূমিতে। উর্ব্বশী ও পুরূরবার পরিপূর্ণ মিলনের মাঝখানে অকস্মাৎ রচিত হইল বিরহের দুস্তর ব্যবধান—অভিমানিনী উর্ব্বশী মায়াকাননে লতায় পরিণত হইলেন। শেষ পর্য্যন্ত গৌরীচরণরাগসম্ভূত 'সঙ্গম'মণি-স্পর্শে আবার নিজের অনুপম রূপলাবণ্যময় দেহ ফিরিয়া পাইলেন উর্ব্বশী। স্বর্গের অপ্সরা আর রাজার মিলনের ফলে জাত শিশু'আয়ু' পুরূরবার অজান্তে প্রতিপালিত হইল ঋষির আশ্রমে। রাজা যেদিন প্রথম পুত্রমুখ দর্শন করিলেন সেই পরম আনন্দের দিনেই তাঁহাকে অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতম পরিহাসের সম্মুখীন হইতে হইল, উর্ব্বশী স্মরণ করাইয়া দিল যে, দেবরাজের আদেশ—পিতাপুত্রের মিলনের পর তাহাকে চিরতরে চলিয়া যাইতে হইবে স্বর্গলোকে। এই বেদনাময় মুহূর্ত্তে আশাতীত আনন্দের বার্ত্তা লইয়া আসিলেন দেবর্ষি নারদ—দেবরাজ তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। উর্ব্বশীকে আর স্বর্গে যাইতে হইবে

না—তখন প্রণয়ীযুগল বুঝিতে পারিলেন, তাহাদের সকল দুঃখকষ্টের অবসান হইয়াছে, ভাগ্যাকাশ হইয়া উঠিয়াছে সুপ্রসন্ন।

এই রোমাণ্টিক কাহিনীকে কালিদাস যে অনুপম রসশ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন, জগতের সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। বাংলা কাব্যে ইহাকে রূপায়িত করিতে গিয়া গ্রন্থকার যে ছন্দোনৈপুণ্য, ভাষার প্রসাদগুণ এবং কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। কাব্যগ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে ইহাই মনে হয় যে, তিনি কালিদাসের রসসৃষ্টির একেবারে মর্ম্মমূলে প্রবেশ করিয়া ইহার প্রাণসত্তার সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং সেজন্যই তাঁহার নিপুণ তুলিকায় বিক্রমোর্ব্বশীর রোমাণ্টিক কাহিনীটি এমন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। উর্ব্বশী মায়ালতায় রূপান্তরিত হইবার পর পুরূরবা যখন তাহার সন্ধানে বনে প্রবেশ করিলেন তখনকার বর্ণনাটি ধ্বনি-মাধুর্য্যে এবং ভাষার উদাত্ত গাম্ভীর্য্যে মনকে বিচিত্রভাবে আন্দোলিত করে :

উদিল সজল নবমেঘদল
গগনকোণে
খর বারিধারে হানি' শরজাল
বেদনাবিধুর বিরহিমনে।
বিজলী জলদে গরজে মাদল
নৃপতি হৃদয়ে জ্বলে রোষানল,
বিরহোন্মাদ যেন কবিরাজ
বন প্রদেশে—
বীর পুরূরবা পশিলা কাননে
লতাকিশলয়জড়িত বেশে।"

সার্থক রসানুভূতি সৃষ্টির অনুকূল ভাষার এই উদাত্ত গম্ভীর সুরটি বইখানির আগাগোড়া অনুস্যূত। মাঝে মাঝে চটুল ছন্দে শোনা যায় যেন নৃত্যপরা উর্ব্বশীর চরণের মঞ্জীরশিঞ্জন। ভূমিকায় কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় সত্যই বলিয়াছেন, "প্রসাদগুণই তাঁহার রচনার সমাদর লাভের অন্যতম কারণ।

এই কাব্যগ্রন্থখানির প্রচ্ছদপট এবং রূপসজ্জাও অনিন্দ্য। বস্তুতঃ ভাব-সম্পদে ও ভাষার প্রসাধনে যেমন বিক্রমোর্ব্বশী পাঠক চিত্তকে নন্দিত করিবে তেমনি ইহার অঙ্গসৌষ্ঠবও তাহার নয়নের পরিতৃপ্তিসাধন করিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

পাথরের ফুল—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। সাহিত্যায়ন, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা চার আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ গ্রন্থকার কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি যে তাঁহার খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছে—শুধু তাহাই নয়, ইহা কিশোর-সাহিত্যে একটি অভিনব দান বলিয়া তাঁহার খ্যাতি অনেকটা বাড়াইয়া দিয়াছে। একটি নিছক গল্পের মাধ্যমে শিল্পী-জীবনের দুঃখ-বিপদ, ব্যথা-বেদনা, নিষ্ঠা-ত্যাগ অনবদ্য ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। জনৈক ধনী-গৃহিনীর খেয়ালে নিরন্ন শিল্পী অনবরত খাটিয়া যাইতেছেন একটি সুন্দর দ্রব্য তৈরীর নিমিত্ত। শিল্পী তাঁহার পুত্রকেও এই কার্য্যে লাগাইয়াছেন। একটি নারী আসিয়া পুত্রের জীবনকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে—কর্ম্মনিষ্ঠ নায়ক শিল্পীর ত্যাগস্বীকারকেও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। কাহিনীটির বিষয়বস্তু এরূপ রসোত্তীর্ণ হইয়াছে যে, উচ্চতম সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস,প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ধৃতরাষ্ট্রের অরণ্যযাত্রা
শ্রীবীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
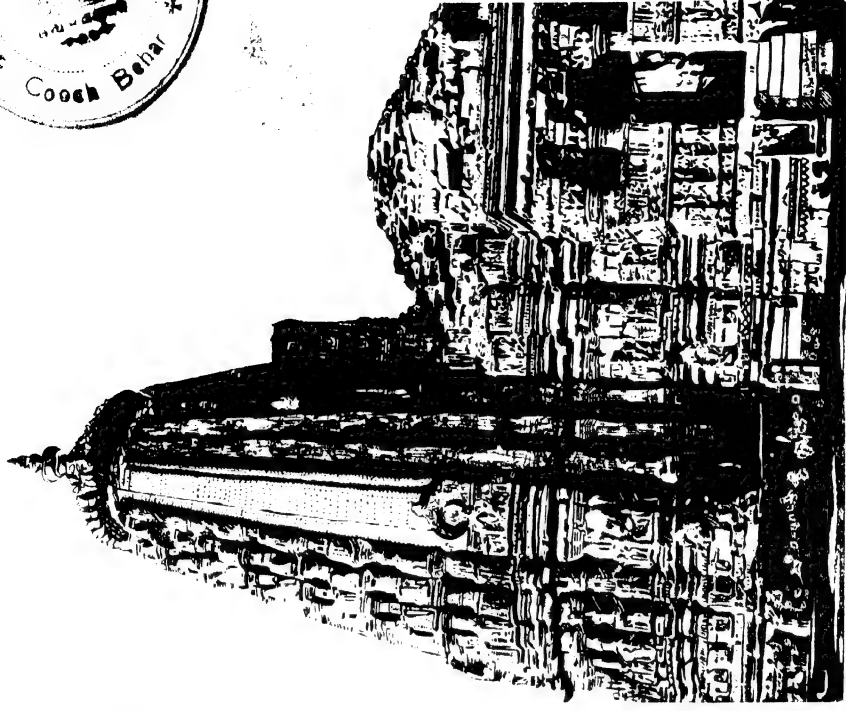
জেলেনী

[ফোটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

মন্দির

[শিল্পী : শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস বাগচী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

৫৬শ ভাগ ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৬৩ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আগামী নির্ব্বাচন

বিগত ২০শে জানুয়ারী পণ্ডিত নেহরু বোম্বাইয়ে নির্ব্বাচনী-বক্তৃতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "কম্যুনিষ্টদের মেহনতি জনগণের একাধিপত্যের কথা অর্থহীন ও বাগাড়ম্বর মাত্র।"

ইহা খুবই সত্য। সম্প্রতি দেশে কর্ম্মী ও শ্রমিক যাঁহারা তাঁহারা একদল অতি অপকৃষ্ট ও নিষ্কর্ম্মা শ্রমিক নেতার উস্কানিতে ভুলিতে বসিয়াছেন যে, তাঁহারাও এদেশের জনসাধারণের অংশ। এদেশের জনসাধারণ বলিতে তাঁহাদিগেরই মা, বোন, বাপ-খুড়া, ভাইদেরই বুঝায়। তাঁহারা ক্রমেই স্বার্থ-সর্ব্বস্ব হইয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন হইয়া পড়িতেছেন, যাহার ফলে দেশের চতুর্দ্দিকের কাজ-কারবারের মধ্যে মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে এবং কার্য্যতঃ দেশের মূল্যমান ও দ্রব্য উৎপাদন দুইয়েরই অবনতি দেখা দিতেছে। দেশের কল-কারখানার ও কুটীরজাত দ্রব্যাদির দাম চড়িতেছে এবং তাহা ক্রমেই নীরস ও বাজে হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাংলা দেশে ত ইহা চরমে গিয়াছে, যাহার ফলে এখানকার কল-কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অধোগতি হইতেছে এবং নূতন উদ্যোগ যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারা পশ্চিম বাংলাকে প্লেগ-আক্রান্ত অঞ্চলের ন্যায় দূরে রাখিয়া চলিতেছেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বেকার-সমস্যা ও দারিদ্র্য, যাহার ফল সকলকেই ভুগিতে হইবে—কি শ্রমিক, কি নিরীহ জনসাধারণ। এই ধ্বংসকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তাঁহাদের হাতে-ধরা ছোট বড় ইউনিয়নগুলি এবং সেই সঙ্গে দেখাইয়াছেন ঐ জাতীয় উৎসাহ আরও কয়েকটি টুকরা দল। ইহারা গঠনমূলক কার্য্য করিতে জানেন না, ও চাহেন না, চাহেন শুধু ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থসিদ্ধি। জানেন শুধু বাঁধি-গতের শেখানো বুলি ও জানেন কংগ্রেসের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইতে। সেই কারণে নির্ব্বাচনে ইঁহাদের জয়লাভ খুব ভরসার বা আশার কথা বলা যায় না।

কিন্তু অন্য দিকেও কথা আছে। কংগ্রেসের মধ্যে ক্রমেই কলুষ বাড়িতেছে। এবং সেই কারণে সমস্ত শাসনতন্ত্র দুর্নীতি ও অনাচার-পূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য এখনও কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে রাহুগ্রস্ত হয় নাই, কিন্তু যে ভাবে তাহার উচ্চতম অধিকারীবর্গ, চাটুকার ও স্বার্থান্বেষী অনুচরগণের প্ররোচনায়, যথেচ্ছাচারী ও সমালোচনাবিমুখ হইয়া উঠিতেছেন তাহাতে ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপূর্ণ নহে। আমলাতন্ত্র ত এখনই "হাতে মাথা কাটা" চালাইতেছেন, তাহাদের অত্যাচার বাড়িয়াই চলিতেছে, জনসাধারণের প্রতিকারের উপায় প্রায় কিছুই নাই। কেননা যদি কোনও লোক অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চ-অধিকারীর কাছে অভিযোগ জানায়, ত হয় তিনি কর্ণপাত করিবেন না কিংবা হয়ত উল্টা তাহাকেই বিপদে ফেলিবেন। আদালতে যাইলে সরকারের সমস্ত শক্তি তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। অবশ্য হয়ত হাইকোর্টে বা সুপ্রীমকোর্টে প্রতিকার হইবে, কিন্তু ততদিনে অভিযোগকারী ধনে প্রাণে শেষ হইবে। এইরূপ অত্যাচার চতুর্দ্দিকে যেরূপ চলিতেছে, তাহার পুরা ফিরিস্তি একটি পূর্ণ সংখ্যায় দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ক্ষমতার অপব্যবহার এখন আমলাতন্ত্রের বিশেষত্বে দাঁড়াইয়াছে।

কংগ্রেস বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে যাঁহাদের ছাড়পত্র দিয়াছেন তাঁহাদের সকলের গুণাবলীর সহিত আমরা পরিচিত নহি। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে যাহা দেখি তাহাতে মনে হয়—নিকৃষ্ট অপাংক্তেয় ভাগ্যান্বেষীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, সাধারণ চাটুকার অনুচরবর্গ ত ছাইয়াই আছে। বলা যায় যে, এবারকার দল পূর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টই, উন্নতির কোনও চিহ্ন ত দেখা যায় না।

তবে দেশের আশা-ভরসা কি? আগে ছিলেন গান্ধীজী। বর্ত্তমানে গান্ধীবাদী "নৈকষ্যকুলীন" যাঁহারা, তাঁহারাও ত প্রায় শতকরা ৯৫ জন অর্থলোলুপ বা ক্ষমতালোলুপ হইয়া নীতিবাদ ও আদর্শবাদকে জলাঞ্জলি দিতেছেন।

একমাত্র উপায় ছিল এই নির্ব্বাচনে সবল ও সক্রিয় বিরোধীপক্ষ গঠিত হইলে। কিন্তু দলগত স্বার্থের খেলায় তাহা সুদূরপরাহত। দেশের সংবাদপত্রও ত প্রায় ক্লীবত্বপ্রাপ্ত বা বিবেচনাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ভোটারগণ সজাগ না হইলে দেশের উদ্ধার নাই।

কাশ্মীর

সম্প্রতি পাকিস্থান কাশ্মীর ব্যাপার লইয়া যে রকম তোড়জোড় করিতেছে তাহার কারণ প্রধানতঃ পাকিস্থানের আভ্যন্তরিক গোলযোগের সমাধান করা। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পাকিস্থানের রাজনৈতিক গগন হইতে মুসলিম লীগ অস্তগমনোন্মুখ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অন্য কোন রাজনৈতিক দল পাকিস্থানে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। রাজনৈতিক অব্যবস্থার মধ্যে আওয়ামী দলের সহযোগিতায় সুরাবর্দী সাহেব গদীতে আসীন হইলেন এবং তিনি এক চালেই পাকিস্থানের দ্বিধাবিভক্ত শাসকশ্রেণী তথা জনসাধারণকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কাশ্মীর ব্যাপারে আজ সমগ্র পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে। ১৯৪৬ সনের কলিকাতার হাঙ্গামার অভিজ্ঞতা সুরাবর্দী সাহেবের আছে এবং তিনি জানেন কেমন করিয়া বিরুদ্ধবাদী জনমতকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে হয়।

আর ভারতবর্ষ? কাশ্মীর ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতবর্ষের পরাজয় সূচিত হয়; এই পরাজয় ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতিরও পরাজয় সূচনা করে। ভারতবর্ষের দিকে আইন আছে অবশ্য এবং সেই আশাতেই ১৯৪৮ সনে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে কাশ্মীরে ডাকিয়া আনিয়া বসানো হইয়াছে, যাহাকে বলে খাল কাটিয়া কুমীর আনা। সেই প্রাথমিক ভুলের জেরের নিষ্পত্তি আজও হয় নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও স্বস্তিপরিষদে কাশ্মীর বিষয় পরিচালনা ব্যাপারে ভারতবর্ষ প্রথম হইতেই সুদৃঢ় পন্থা অনুসরণ করে নাই। স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার এবং স্যার বি. এন. রাও উভয়েই এ বিষয়ে সঠিক ও পরিষ্কার করিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। দুইটি জিনিষ পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত—প্রথমতঃ, ভারতের সহিত কাশ্মীরের সংযুক্তি আইনসঙ্গত এবং দ্বিতীয়তঃ, কাশ্মীরের উপর পাকিস্থানের আইনসঙ্গত কোন দাবি নাই, সে কাশ্মীর আক্রমণকারী মাত্র এবং জোর করিয়া ভারতের অংশকে দখল করিয়া রাখিয়াছে।

কাশ্মীর কমিশনের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, পাকিস্থান অন্যায় করিয়া বলপূর্ব্বক ভারতীয় দেশ দখল করিয়াছে। সুতরাং এই কথা যদি নিরাপত্তা পরিষদ স্বীকার না করে তাহা হইলে রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাশ্মীর ব্যাপারে ভারতবর্ষ কোন অংশ গ্রহণ করিবে না, কিন্তু সে কথা সেদিন স্পষ্ট করিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিরা দাবি করেন নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে ডাকা হইয়াছিল, পাকিস্থানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য, এবং তাহাকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য। কিন্তু এই ব্যাপারের কোন সমাধান না করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ পাকিস্থানের পক্ষসমর্থন করিল এবং কাশ্মীরে গণভোটের দাবি করিয়া বসিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতবর্ষ এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছিল এবং গণভোটের জন্য এডমিরাল নিমিৎসকে নিয়োগের কথাও স্বীকার করিয়াছিল। এত বড় বেচাল ভারতীয় প্রতিনিধিরা কেমন করিয়া করিলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। অবশ্য পণ্ডিত নেহরু তখনও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, এবং কাশ্মীর চাল-বেচালের জন্য তাঁহার দায়িত্বও কম ছিল না। তবে কাশ্মীর ব্যাপারে ভাবিবার তখন তাঁহার সময় ছিল না, কারণ তাঁহার চিন্তার সবটুকু ত চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি দখল করিয়া বসিয়াছে, কাশ্মীর-সমস্যা কিংবা দেশের অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে ভাবিবার তাঁহার সময় ছিল কোথায়? তাই সেদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধিদের ভুলেই তিনি সায় দিয়াছিলেন।

ইহার পর দেখা যায় যে, গ্রেহাম মিশন ও ডিক্সন কমিশনের নিকট অবাস্তর ব্যাপার লইয়া ভারতবর্ষ মাথা ঘামাইয়াছে। গ্রেহাম দাবি করিয়াছিলেন যে, কাশ্মীর বিরোধের নিষ্পত্তি হইবে সালিশী দ্বারা, তখন কিন্তু ভারতবর্ষ সালিশীর প্রস্তাবকে এড়াইয়া গেল—প্রস্তাবিত গণভোটের পুনরায় সমর্থন দ্বারা। ভারতবর্ষের তখন বলা উচিত ছিল যে, আক্রমণকারীর সহিত কোন সালিশী হইতে পারে না। পাকিস্থানের সহিত ভারতবর্ষের কাশ্মীর ব্যাপারে কোন প্রকার আলোচনা করাই উচিত হয় নাই, কিন্তু সেই সময় ডাঃ গ্রেহামের মাধ্যমে ভারতবর্ষ পাকিস্থানের সহিত কাশ্মীর বিষয় লইয়া বার বার আলোচনা করিয়াছে। ইহার দ্বারা বিশ্বদরবারে প্রতীয়মান হয় যে, কাশ্মীর ব্যাপারে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান উভয়েই সমমর্য্যাদাভুক্ত, অন্যায়পূর্ব্বক আক্রমণকারীকে যেন জাতে তোলা হইল। ডিক্সন কমিশনের নিকট ভারতবর্ষ তাহার ভুলের পুনরাবৃত্তি করিল। ডিক্সন কমিশনের নিকট ভারতবর্ষ প্রকারান্তরে গণভোটের কথা স্বীকার করিয়াছিল, এবং আপত্তি উঠিল কাশ্মীরে ভারত ও পাকিস্থানের কি পরিমাণ সৈন্য থাকিবে। ভারতবর্ষ দাবি করিয়াছিল যে, পাকিস্থানের সৈন্যসংখ্যা কম থাকিবে, কিন্তু পাকিস্থান জিদ ধরিয়া বসিল, তাহার সৈন্যসংখ্যা আজাদ-কাশ্মীর এলাকায় অন্ততঃ পনর হাজার থাকিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেহেতু পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণকারী, সেই হেতু একটি সৈন্য রাখার অধিকারও পাকিস্থানের নাই, সেই কথা ভারতবর্ষ একবারও দাবি করে নাই। তাই দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সন হইতে ১৯৫৪ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কাশ্মীর-নীতি বলিষ্ঠ ও সুচিন্তিত ছিল না।

ভারতবর্ষ তাহার কাশ্মীর-নীতি বর্ত্তমানে সংশোধন করিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাহা অতীব বিলম্বে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ দুইটি জিনিষ দাবি করিতেছে—প্রথমতঃ, ১৯৪৭ সনে ভারতের সহিত কাশ্মীরের সংযুক্তি আইনসঙ্গত ভাবে স্বীকৃত ঘটনা; এবং দ্বিতীয়তঃ, গণভোটের ব্যবস্থার পূর্ব্বে আজাদ-কাশ্মীর হইতে সমস্ত পাকিস্থানী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে। এই দুইটি কথা যদি সর্ব্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সর্ত্ত হিসাবে ১৯৪৮ সনে বলা হইত তাহা হইলে কাশ্মীর পরিস্থিতি অন্য রূপ পরিগ্রহ করিত। স্বস্তি-পরিষদে কাশ্মীর ব্যাপারে ভারতের পরাজয় শুধু ভারতের বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা সূচিত করে না, ইহাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের ব্যর্থতা (কিংবা অযোগ্যতা) সূচিত হয়।

শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেননের কার্য্যপন্থা বিগত কয়েক বৎসরে

ভারতের মিত্রের চেয়ে শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতের পঞ্চশীল ও নিরপেক্ষতা ভারতবর্ষকে যেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একঘরে করিয়া দিয়াছে। দেশের ব্যাপারে মাথা না ঘামাইয়া পরের ব্যাপারে অতিরিক্ত মাথা ঘামানোর ফল এই। স্বস্তি-পরিষদে ভারতের কাশ্মীর-নীতির পরাজয়ের প্রধান কারণ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধতা। ইহা যেন সুয়েজ খাল ঘটনার প্রতিশোধ। পৃথিবীর বহু দেশই মিশরের উপর ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের বিরোধিতা করিয়াছে, সোভিয়েট রাশিয়া বিরোধিতা করিয়াছে, তবে মাত্রা রাখিয়া। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর গলাবাজি ও শ্রীকৃষ্ণ মেননের উক্তি দুই-ই যেন মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে মিশরের লাভ হইলেও ভারতের লাভ কিছু হয় নাই। ভারতীয় বৈদেশিক নীতির আর একটি প্রধান দোষ এই যে, অনর্থক সে অন্য দেশের ব্যাপারে নিজের মাথা গলায়, সে কোরিয়া হউক বা টিউনিসিয়া হউক কিংবা ভিয়েৎনাম হউক। পররাষ্ট্র ব্যাপারে ভারতবর্ষ অনর্থক অত্যধিক মাথা গলায়।

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর ব্যাপারে ব্রিটেন ফ্রান্সের সহযোগিতায় যে রকম নির্লজ্জ ভাবে ভারতের বিরোধিতা করিয়াছে, তাহার পর ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথে থাকায় লাভ আছে মনে হয় না। পাকিস্থান ও ভারতবর্ষ উভয়েই কমনওয়েলথের সভ্য-রাষ্ট্র, সে অবস্থায় ব্রিটেনের পক্ষে পাকিস্থানপক্ষ সমর্থন করিয়া ভারতের বিরোধিতা করা অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক কার্য্য হইয়াছে, বিশেষতঃ আইন যখন ভারতবর্ষের দিকে। কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতীয় লোকসভায় পণ্ডিত নেহরু কমনওয়েলথের জয়গান গাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ সকল দেশের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিতে চায়, সেই কারণে সে কমনওয়েলথে আছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কমনওয়েলথের সভ্য না হইলে কি ঐ দেশগুলির সহিত মিত্রতা বজায় থাকে না? কমনওয়েলথের সকল দেশগুলির সহিত কি ভারতের সদ্ভাব আছে? দক্ষিণ-আফ্রিকা ও পাকিস্থানের (যাহারা কমনওয়েলথের সভ্য) সহিত ভারতের যে মিত্রতা নাই তাহা সর্ব্বদেশবিদিত। কমনওয়েলথের বাহিরে পৃথিবীর অগণিত দেশ, তাহাদের সহিত কি ভারতের মিত্রতা বজায় নাই? কমনওয়েলথ একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ইঙ্গ-মার্কিন দলের সমর্থক। এহেন অবস্থায় ভারতবর্ষ তাহার নিরপেক্ষতা নীতির সহিত কমনওয়েলথের সভ্যপদের কি করিয়া সমন্বয় ও সমর্থন করে। সুতরাং কমনওয়েলথে অবস্থান করিবার জন্য যে যুক্তি পণ্ডিত নেহরু দেখাইয়াছেন তাহার সবটাই গোঁজামিলে ভরা। নিরপেক্ষ ভারতবর্ষের কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকা দুরূহ।

পরিকল্পনার পরিস্থিতি

দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যেন মনে হয় সহজ উত্তর, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য সময় ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়াপত্তন সুষ্ঠু ভাবে হয় নাই। সুরু হইতেই দেখা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যমান বৃদ্ধি, বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি, খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি, বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি ইত্যাদি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য পরিকল্পিত অর্থের পরিমাণ যোগাড় করা আরও একটি প্রধান সমস্যা। অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে যতই আশ্বাস দেন না কেন, বহির্বাণিজ্যে যে পরিমাণ ঘাটতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে যন্ত্রপাতি আমদানী ব্যাহত হইতে বাধ্য। আভ্যন্তরিক অর্থসংগ্রহও সহজসাধ্য হইবে না, অন্ততঃ দিল্লীর সরকারী মহলে এই ধারণা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হওয়ার পর হইতে প্রায় ১২৬ কোটি টাকার মত ঘাটতি খরচ হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কের দাদনমুদ্রার পরিমাণও প্রায় ২০০ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমবেত মুদ্রাস্ফীতির ফলে এবং খাদ্যদ্রব্য ঘাটতির ফলে মূল্যমান ক্রমবর্দ্ধমান। অর্থনৈতিক সমস্যা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম প্রধান সমস্যা শিক্ষিত কারিগরের অভাব। প্রয়োজনীয় কারিগরীবিদ্যার অভাবে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিতেছে না। বর্দ্ধিত চাহিদার তুলনায় শিক্ষিত কারিগর পাওয়া যাইতেছে না। সম্প্রতি কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদন-ম্যানেজার, কারিগর, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি চাহিয়া দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আশানুরূপ প্রার্থী পাওয়া যায় নাই। উত্তর-ভারতে একটি কাগজের কলের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কয়েক মাস ধরিয়া কোনও উপযুক্ত উৎপাদন-ম্যানেজার পাওয়া যায় নাই। শুধু নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিই যে এই অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা নহে, বর্ত্তমান শিল্পপ্রতিষ্ঠান যথা: শর্করাশিল্প ও বস্ত্রশিল্পগুলিও শিক্ষিত কারিগরের অভাব বোধ করিতেছে। এই শিল্পগুলির বিস্তৃতি উপযুক্ত কারিগরের অভাবে ব্যাহত হইতেছে। এমনকি উপযুক্ত একাউন্টেণ্ট, কর্ম্মসচিব, ষ্টেনোগ্রাফার প্রভৃতিরও অভাব হইতেছে। এই সকল অসুবিধার প্রধান কারণ স্বাধীন ভারতে ইংরেজী শিক্ষার অবহেলা। শিক্ষাব্যবস্থায় যে সকল রাজনৈতিক খেলা চলিতেছে তাহার ফলে এক দিকে যেমন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাবে শিল্পপ্রসার ব্যাহত হইতেছে, অন্য দিকে তেমনি যুবজনের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পন্ন হইতে পাঁচ বৎসরের অধিক সময় লাগিবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

চাউল উৎপাদন ও দ্রব্য মূল্যমান

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত কমনওয়েলথ ইকনমিক কমিটির "রাইস বুলেটিন" পত্রে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সনে বিশ্বে চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে। কারণ অধিকাংশ দেশেই ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ধান চাষ করা হইয়াছে এবং আবহাওয়াও মোটামুটি উন্নততর ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ভারতে চাউল

উৎপাদন শতকরা ৪'৮ ভাগ বৃদ্ধি হইতে পারে বলা হইয়াছে। সিংহল ও পাকিস্থানেও চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে প্রায় এক কোটি একর ক্ষেত্রে ধান চাষ করা হইয়াছে। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে আর কোনও সময় এরূপ বিস্তৃতক্ষেত্রে ব্রহ্মদেশে ধানের চাষ হয় নাই। চীন, ফিলিপাইন, ফরমোজা, মধ্যপ্রাচ্যের ইরাণ ইরাক প্রভৃতি সকল দেশেই চাউল উৎপাদন ভাল হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

চাউল উৎপাদনের কথা আলোচনায় স্বভাবতঃই কলিকাতার চাউলের বাজারের কথা স্মরণে আসে। বৎসরখানেক পূর্ব্বেও কলিকাতার বাজারে ১৮-১৯ টাকা মণে ভাল চাউল কিনিতে পারা যাইত। কিন্তু যদিও এখন শস্য উঠিবার পর চাউলের দর বিশেষ সস্তা হইবার কথা তথাপি কলিকাতায় মণপ্রতি ২৪-২৫ টাকার কমে চাউল পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। মধ্যে চাউলের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন সরকার যে কয়টি "ন্যায্য মূল্য" দোকান খোলেন তাহার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য এবং সরবরাহের চাউলও অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কলিকাতার বাজারে চাউলের দুর্মূল্যতা—সঙ্গে সঙ্গে আটাও দুর্লভ। অনুরূপ ভাবে সরিষার তৈল প্রভৃতি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকার মূল্যমান বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া রাজ্যের সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে মাসিক দুই টাকা মাগগি ভাতা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই—হইবার কথাও নহে। যেখানে দ্রব্য-মূল্যমান সততই বৃদ্ধি পাইতেছে তথায় মাগগি ভাতা এক টাকা দুই টাকা বৃদ্ধি করিয়া সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। উপরন্তু, সরকার কেবলমাত্র সরকারী কর্ম্মচারীদেরই ভাতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। সরকারী কর্ম্মচারীরা জনসাধারণের ক্ষুদ্র অংশ। (কেন্দ্রীয় সরকার কোন ভাতা বৃদ্ধি করেন নাই।) সুতরাং ভাতা বৃদ্ধিতে সরকারী কর্ম্মচারীদের কিছু সুবিধা হইলেও দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের দুর্দ্দশার তাহাতে কোনই লাঘব হইবে না।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় এইভাবে দেশের জনসাধারণের দুর্গতি বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ ইহা প্রতিরোধ করিবার জন্য কোন দায়িত্বশীল প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন আয়ের ব্যবধান কমানো। কিন্তু আজ সকলেই জানেন যে, উহার বিপরীতই ঘটিতেছে। চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে অথচ চাউলের মূল্য কমিতেছে না—জীবনযাত্রার মূল্যমান ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহা কি মুদ্রাস্ফীতিরই লক্ষণ নহে? ঘাটতি বাজেট-নীতি অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী ফল মুদ্রাস্ফীতি—উহার বিপদ সম্পর্কে সরকার অনেক সাবধানবাণী পাইয়াছেন, কিন্তু উহার কুফল প্রতিরোধ সম্পর্কে তাঁহারা বিশেষ কোন চিন্তা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না।

অন্যান্য দেশে পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা এবং ভারতেও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনবোধে নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের রেশনিং ব্যতীত পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করা যায় না। আমাদের দেশেরও বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌গণ সরকারকে মূল্যনিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং চালু করার পরামর্শ দিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রধান বাধা অবশ্য উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং যোগ্যতার অভাব। কিন্তু সময় থাকিতে সরকার যদি এই বিষয়ে চিন্তা না করেন তবে বিপদ যখন সম্পূর্ণরূপে ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিবে তখন আর কোন উপায়ই থাকিবে না।

চিনি রপ্তানী

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের আভ্যন্তরিক চিনির উৎপাদন দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অত্যল্প হইতেছিল এবং ইহার ফলে ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করিতে হইয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতের চিনির উৎপাদন ১২ হইতে ১৪ লক্ষ টন হইতেছিল তখন আভ্যন্তরিক চাহিদার তুলনায় ইহার ঘাটতি হইতেছিল। কারণ সরকারী হিসাবমতে দেশের চিনির চাহিদা ১৮ হইতে ২০ লক্ষ টনে নির্দ্ধারিত। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৬ সনে ভারতবর্ষে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮'৫৯ লক্ষ টনে; অর্থাৎ এই উৎপাদনের পরিমাণ দেশের প্রয়োজন কোনও রকমে মিটাইতে পারে এবং বিদেশ হইতে আমদানী করিবার প্রয়োজন হইবে না।

কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্তের মর্ম্ম বুঝা ভার: ভারত সরকার ইতিমধ্যেই চিনি রপ্তানির জন্য অনুমতি দিয়াছেন এবং ১০,০০০ মেট্রিক টন চিনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে রপ্তানি করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই আরও চিনি রপ্তানি করা হইবে। পাকিস্থান, ব্রহ্ম, সিংহল এবং আফ্রিকান দেশসমূহ ভারতীয় চিনি সরবরাহের জন্য আদেশ দিতেছে। পাকিস্থানে বর্ত্তমানে চিনির মূল্য প্রতি সের ১৸০ হইতে ১৸৵০ আনা। এত উচ্চ মূল্যের প্রধান কারণ পাকিস্থানের আমদানী-কর। ভারতীয় চিনির মূল্য কিউবা ও জাভার চিনির মূল্য হইতে অধিক, তাহা না হইলে ভারতীয় চিনির চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইত। সুয়েজ খাল বন্ধ থাকার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে ও পাকিস্থানে ভারতীয় চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পায়, সুয়েজ খাল খোলা হইলে ভারতীয় চিনি রপ্তানি এই সকল দেশগুলিতে হ্রাস পাইবে। গত বৎসরের উৎপাদন হইতে ৫০,০০০ টন চিনি রপ্তানি করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই পরিমাণ চিনি রপ্তানির পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনা করা উচিত যে, ইহাতে ভারতের আভ্যন্তরিক প্রয়োজনের পক্ষে ঘাটতি পড়িবে কিনা। গত বৎসর ৮০,০০০ টন চাউল রপ্তানি করিয়া ভারতে চাউলের অভাব হইয়াছিল। চিনির বেলায় যেন সরকারী অবিমৃষ্যকারিতার পুনরাবৃত্তি না হয়।

সাভারকরের সম্পত্তি

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকার বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। স্বাধীনতালাভের পর কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণের অপরাধে (?) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও অর্থ ফেরত দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি হিন্দু মহাসভার নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থকে অনুরোধ করেন যেন ভারত সরকার সাভারকরের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করেন বা সম্পত্তির মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ তাঁহাকে প্রদান করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত সম্পত্তি ইতিমধ্যে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহা ফিরাইয়া দেওয়ার কথা উঠিতে পারে না।

ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া পাক্ষিক "হিন্দুবাণী" লিখিয়াছেন, "বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বা অর্থ স্বাধীনতার পর ফেরত দেওয়া হইয়াছে। বীর সাভারকরের সম্পত্তিও অনুরূপ ভাবে ফেরত দেওয়া হইবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার যে দলের হাতে, তাঁহাদের দলীয় মনোবৃত্তি এত প্রবল যে সঙ্কীর্ণ দলগত রাজনীতির ঊর্দ্ধে থাকিয়া সাভারকরের ন্যায় একজন দেশপ্রেমিকের কথা বিবেচনা করিতে পারেন নাই।" "হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন যে, বীর সাভারকর কংগ্রেসী না হইয়া হিন্দু মহাসভার নেতা বলিয়াই "তাঁহার উপর কংগ্রেস সরকারের এই হীন আচরণ।"

ভারত সরকার কি কারণে সাভারকরের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, প্রকাশিত সংবাদ হইতে তাহা সঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তবে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যাওয়াই যদি একমাত্র বাধা হইয়া থাকে তবে সরকারের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা মোটেই স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। সরকার সম্পত্তির মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ দিতে পারিতেন। এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট সরকারী নীতিগ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তি প্রত্যর্পিত হইবে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা হইবে না—যদি ইহাই সরকারী নীতি হয় তবে তাহাতে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের নজীর অন্যান্য দেশেও রহিয়াছে। আমাদের দেশে সেই নীতি কেন কার্য্যকরী করা যায় না, স্বভাবতঃই জনসাধারণ তাহা জানিতে চাহিবেন।

কম্যুনিষ্টদের নূতন বিশ্বসংস্থা

গত বৎসরের এপ্রিল মাসে কমিনফর্ম ভাঙিয়া দেওয়া হয়। কমিনফর্ম কম্যুনিষ্টদের বিশ্বসংস্থা ছিল না। প্রতিষ্ঠাকালে উহার সদস্য ছিল নয়টি কম্যুনিষ্ট পার্টি—সোভিয়েট, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, ইটালী এবং ফ্রান্সের পার্টিগুলি। ১৯৪৮ সনে যুগোশ্লাভ পার্টির বহিষ্কারের পর সদস্য-সংখ্যা দাঁড়ায় আট; তাহা আর বৃদ্ধি পায় নাই। কমিনফর্মের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল—বিভিন্ন দেশের পার্টির কার্য্যকলাপ সম্পর্কে পারস্পরিক জ্ঞান অর্জ্জন। সেই উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় মুখপত্র প্রকাশ করা হয়। কার্য্যতঃ অবশ্য কমিনফর্ম ষ্ট্যালিনবাদী সোভিয়েট প্রভুত্ব-বিস্তারের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়। কমিনফর্মকে সোভিয়েট মিথ্যাপ্রচারের একটি প্রধান মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা হইতে থাকে। একটি দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা পরিষ্কার হইবে। কমিনফর্মের সংগঠন অনুযায়ী উহার মুখপত্র সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীতে সদস্য নয়টি পার্টির একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবার কথা ছিল; কিন্তু কার্য্যতঃ সোভিয়েট পার্টির মনোনীত সদস্য ইউডিনই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন—ঠিক বলিতে গেলে ষ্ট্যালিনই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ষ্ট্যালিনী চক্র কিরূপ ভাবে একটি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের স্বার্থসন্ধানী যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিত তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় প্রথমে ছিল যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে, পরে রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেষ্টে স্থানান্তরিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবে বেলগ্রেডে অবস্থিত বিভিন্ন পার্টির সদস্য-সম্বলিত সম্পাদকমণ্ডলীরই পত্রিকা পরিচালনা করার কথা। কিন্তু সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং বিশেষভাবে ষ্ট্যালিন নিজেদের প্রভুত্ব হ্রাস সম্পর্কে এরূপ শঙ্কিত ছিলেন যে, তাহারা সে ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেন না। সোভিয়েট পার্টির চাপে অন্যান্য পার্টিকে মানিয়া লইতে হইল যে, সকল প্রবন্ধ প্রভৃতির প্রুফ উঠাইয়া মস্কো পাঠান হইবে সোভিয়েট পার্টির অনুমোদনের জন্য, সেই অনুমোদনলাভ হইলে পরই কেবলমাত্র প্রবন্ধগুলি ছাপা হইবে। বলা বাহুল্য, এই ক্ষমতার সুযোগ লইয়া সোভিয়েট পার্টির কর্ণধারবৃন্দ এবং বিশেষভাবে ষ্ট্যালিন নিজের খেয়ালখুশিমত বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধগুলির যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন। অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের নির্ব্বাক থাকা ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। কমিনফর্ম যত দিন মুদ্রিত হইয়াছে, এই ভাবেই হইয়াছে। একবার ষ্ট্যালিন প্রবন্ধগুলি অনুমোদন করিয়া পাঠানোর পর যখন প্রায় ছয়টি ভাষার পত্রিকাটির মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তখন সহসা তিনি পুনরায় গেলিগুলি চাহিয়া পাঠাইলেন। পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত রাখিয়া সেগুলি পুনরায় ষ্ট্যালিনের নিকট বিমানযোগে প্রেরিত হইল। ষ্ট্যালিন সেগুলি পুনরায় এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করিলেন যে, মুদ্রিত সকল সংখ্যা পোড়াইয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ নূতন করিয়া আবার পত্রিকাটি মুদ্রণ করিতে হইল।

এই ভাবে রুশ প্রভুত্ব বিস্তারের প্রচেষ্টাতেও কোন কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ করে নাই—আদর্শগত দিকে তাহারা এতই মোহগ্রস্ত ছিল। তবে স্বাধীনচেতা যুগোশ্লাভ নেতৃবৃন্দের নিকট এই সোভিয়েট নীতি প্রথম হইতেই বিরোধিতা পাইতে থাকে। কোন রূপ বিরোধিতাই কম্যুনিষ্টদের অসহ্য; সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী দালাল বলিয়া যুগোশ্লাভ পার্টি ও নেতৃবৃন্দকে কমিনফর্ম হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

যদিও অবশ্য কমিনফর্ম আনুষ্ঠানিক ভাবে কম্যুনিষ্টদের বিশ্ব-সংস্থা ছিল না তথাপি উহাকে সকল দেশের কম্যুনিষ্টগণই কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় সংস্থারূপে দেখিত এবং উহার নির্দ্দেশাবলী মানিয়া চলিত। কমিনফর্মের সাপ্তাহিক মুখপত্রে লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি পরিবর্ত্তন ঘোষিত হয়। অনুরূপভাবে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠির ভিত্তিতে জাপানী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব ও নীতি পরিবর্ত্তিত হয়।

কমিনফর্মের ইতিহাস রুশ কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব-বিস্তারের ইতিহাস। অনুরূপ ভাবে কমিনফর্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কম্যুনিষ্ট বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান "কমিনটার্ণও (Communist International) ষ্ট্যালিনী স্বেচ্ছাচারের একটি যন্ত্র ছিল। ষ্ট্যালিনের নির্দ্দেশে এবং কমিনটার্ণের সমর্থনে ১৯৩৮ সনে পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে মস্কোতে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। বলা হইয়াছিল তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদের চর হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। আঠার বৎসর পর সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে প্রমাণ হয় যে, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশের কত কম্যুনিষ্টকে যে কম্যুনিজমের বলি হইতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

সম্প্রতি একটি বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সংস্থা প্রতিষ্ঠার আলোচনা চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। কমিনফর্ম ভাঙিয়া দিবার সময়ও ইঙ্গিত করা হয় যে, কম্যুনিষ্টদের অন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হইতে পারে। ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইটালীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে বক্তৃতাপ্রদান-কালে পামিরো তোগলিয়াত্তিও অনুরূপ ইঙ্গিত করেন। সম্প্রতি ব্রিটিশ শ্রমিকদলের বামপন্থী সদস্য কনিজিলিয়াকাস প্রকাশ করিয়াছেন যে, ক্রুশ্চভ নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন শীঘ্রই একটি আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সংস্থা স্থাপিত হইবে।

সাধারণ ভাবে কম্যুনিষ্টদের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। অপর পক্ষে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপকারিতাও থাকিতে পারে। কম্যুনিষ্ট দেশগুলি হইতে সংবাদ সংগ্রহ নিতান্তই কষ্টসাধ্য। একটি কেন্দ্রীয় মুখপত্রে যদি কম্যুনিষ্ট দুনিয়া সংক্রান্ত সরকারী তথ্যাবলীও প্রকাশিত হয় তাহাতেও উপকার হইতে পারে। কিন্তু অতীতে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি যেরূপ ভাবে একটি বিশেষ রাষ্ট্রের জাতীয় প্রভুত্বসম্প্রসারণের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তদপেক্ষা আরও গুরুতর ব্যাপার—অন্যান্য দেশের খ্যাতিসম্পন্ন কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ সজ্ঞানে তাহাতে যেরূপ নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন তাহার কথা স্মরণ করিলে এই নূতন প্রস্তাবে আশঙ্কার কারণ থাকে বৈকি। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে, কম্যুনিষ্ট দুনিয়াতেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি পোল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুগোস্লাভিয়া, চীন, ইন্দোচীন, ইটালী এবং ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি নূতন সংস্থার নেতৃত্বের অংশীদার থাকে তবে তাহার ক্ষতি করিবার সম্ভাবনা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই লোপ পাইবে। অন্যথায় নূতন বিশ্ব-সংস্থাটি সোভিয়েট ইউনিয়নের আদর্শগত এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব-বিস্তারের আর একটি নূতন অস্ত্র হইবে।

মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা ও ব্রিটেনের অর্থনীতি

মধ্যপ্রাচ্যের বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থা ব্রিটেনের অর্থনীতির উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ চিত্র এখনও পাওয়া যায় নাই। নিম্নোক্ত বিবরণী হইতে তাহার আংশিক রূপ উদ্‌ঘাটিত হইবে।

মধ্যপ্রাচ্যে গোলমালের ফলে এবং সুয়েজ খাল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্য হইতে তৈল সরবরাহ পাইতেছে না—ইহাতে বিশেষ অর্থনৈতিক সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে। তবে সরকারী ভাবে বলা হইয়াছে যে, এই সঙ্কট সাময়িক এবং শীঘ্রই তাহা কাটিয়া যাইবে। এই বিশ্বাসের মূলে দুইটি কারণ রহিয়াছে বলা হইয়াছে : প্রথমতঃ সুয়েজ খাল এবং তৈলবাহী পাইপ লাইনগুলি শীঘ্রই পুনরায় কার্য্যকরী হইবার আশা রহিয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ, মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে অসুবিধা হইবে তাহা কাটাইয়া উঠিতে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক শক্তি অনেকাংশে সাহায্য করিবে। তবে চলতি ঘাটতি মিটাইবার জন্য ব্রিটেনকে সঞ্চিত ডলার ও স্বর্ণ ব্যয় করিতে হইতেছে।

ব্রিটেনের উৎপাদন মোটামুটি ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের স্তরেই রহিয়াছে, তবে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন অপেক্ষা উৎপাদনদ্রব্য উৎপাদনের অধিকতর ঝোঁক দেখা গিয়াছে। প্রকাশ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণও ১৯৫৫ সন হইতে অপেক্ষাকৃত কম।

ষ্টার্লিঙের উপর বিশেষ চাপ পড়িয়াছে। সরকারী ভাবে উহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, বাণিজ্যিক ঘাটতির জন্য এই চাপ পড়ে নাই—উহার মূলে মানসিক কারণ বিদ্যমান। বিদেশী রাষ্ট্রগুলি মনে করিতেছে যে, শীঘ্রই পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের মূল্যমান হ্রাস করা হইবে, সেজন্য সকলেই ষ্টার্লিঙের প্রাপ্য মিটাইতে বিলম্ব করিতেছে এবং ষ্টার্লিং দ্বারা তাহারা অপরাপর মুদ্রা ক্রয় করিতেছে। ইহাতে স্বভাবতঃই ষ্টার্লিঙের হারের অবনতি ঘটিয়াছে এবং এইভাবে ষ্টার্লিং খরচ করিয়া ফেলায় কয়েকটি রাষ্ট্রের সঞ্চিত ষ্টার্লিং ভাণ্ডারে সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ঐ সকল দেশকে শীঘ্রই পুনরায় ষ্টার্লিং কিনিতে হইবে এবং ষ্টার্লিঙের বর্ত্তমান অবনতি আর থাকিবে না। ব্রিটিশ সরকার সর্ব্বপ্রকার উপায়ে পাউণ্ডের বর্ত্তমান হার বজায় রাখিতে দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

তৈল-সঙ্কট কেবল ব্রিটেনকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা নহে, সমগ্র ইউরোপই এই সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। সুয়েজ-যুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপের প্রয়োজনীয় তৈলের প্রায় শতকরা আশী ভাগই আসিত সুয়েজ খাল এবং পাইপ লাইনগুলির মধ্য দিয়া। সুয়েজ খাল ও পাইপ লাইনগুলি হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় স্বভাবতঃই সর্ব্বত্র

তৈলসঙ্কট দেখা দিয়াছে। পশ্চিম গোলার্দ্ধ (অর্থাৎ আমেরিকা) হইতে তৈল আমদানী করিয়া এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। যদি পশ্চিম গোলার্দ্ধ হইতে যথেষ্ট তৈল আমদানী করা সম্ভব হয় তাহাতেও ইউরোপের প্রয়োজনের শতকরা ৬০।৭০ ভাগের বেশী তৈল পাওয়া যাইবে না। পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সকল দেশই সেজন্য তাহাদের তৈল ব্যবহার শতকরা প্রায় কুড়ি ভাগ হ্রাস করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ভাগে ব্যবহার আরও শতকরা পাঁচ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই যদি আমেরিকা হইতে তৈল সরবরাহ না করা যায় তবে ইউরোপের দেশগুলিতে তৈল-সরবরাহ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। বিভিন্ন শিল্পে তৈল সরবরাহ কমাইয়া দিবার ফলে উৎপাদনও হ্রাস পাইয়াছে।

মালয়ের স্বাধীনতা

গত বৎসর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ১৯৫৭ সনের আগষ্ট মাসে মালয়কে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। আসন্ন ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত খুঁটিনাটি আলোচনার জন্য জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুল রহমান এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে এক আলোচনা হয়। এই সম্মেলনে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থির হয় যে, স্বাধীনতালাভের পরও মালয়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকিবে। অপর পক্ষে ব্রিটিশ সরকার মালয়ী সেনাবাহিনীকে গড়িয়া তুলিতে ও ট্রেনিং দিতে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

মালয়ের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনাকালে উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে গভীর মতানৈক্য দেখা দেয়। প্রতিরক্ষা খাতে প্রভূত ব্যয় মিটাইবার জন্য মালয়ের প্রতিনিধিগণ ব্রিটেনের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তবে স্থির হইয়াছে যে, ঋণ এবং দান সাহায্য বাবদ ব্রিটেন মালয় সরকারকে মোট ৪ কোটি পাউণ্ডের মত দিবে। ইহার কিয়দংশ সুদহীন বা অল্প সুদে ঋণ বাবদ দেওয়া হইবে—অধিকাংশই দেওয়া হইবে সাহায্য হিসাবে।

মালয় স্বাধীনতালাভ করিতেছে তাহা সকল দিক হইতেই সুখবর। আশা করা যায়, স্বাধীনতালাভের পর মালয়ের গৃহযুদ্ধের অবসান হইবে। এই গৃহযুদ্ধে ১৯৪৮ সন হইতে প্রতি বৎসর ১৩ কোটি মালয়ী ডলার ব্যয়িত হইয়াছে। এই ব্যয়ের ভারে মালয়ের অর্থনীতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—ইহারই আংশিক পূরণ হিসাবে মালয় ব্রিটেনের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল।

১৯৪৮ সন এবং ১৯৫৭ সনের মধ্যে কতই না প্রভেদ, ১৯৪৯ সনের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বক্তৃতাদানকালে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এটলী বলিয়াছিলেন যে, মালয় ত্যাগ করা বা মালয়কে স্বাধীনতা দেওয়ার অভিপ্রায় ব্রিটেনের নাই, মালয়ে কোন দায়িত্বশীল সরকার গঠনেরও কোন পরিকল্পনা তাহাদের নাই। সাত বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে মালয় পরিত্যাগ করিতে হইতেছে—অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস! ১৯৪৮ সনে মালয়কে স্বায়ত্ত-শাসন দিলে ব্রিটেনের প্রতি মালয়বাসীদের যে সম্প্রীতি থাকিত এখন ব্রিটেন তাহা আশা করিতে পারে কি?

স্বাধীনতার পরও সামরিক ঘাঁটি রাখিতে মালয়কে বাধ্য করিয়া ব্রিটেন কতদূর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেছে, ভবিষ্যৎই তাহা প্রমাণ করিবে। উপনিবেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে সর্ব্বত্রই তাহাদের এইরূপ অনিচ্ছা—কিন্তু পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতার এইরূপ আংশিক স্বীকৃতি দ্বারা ব্রিটেন বিশেষ লাভবান হইতেছে না। সামরিক বলে পৃথিবীশাসনের যুগ চলিয়া গিয়াছে—সুয়েজ যুদ্ধে যদি ব্রিটেন সে কথা বুঝিয়া না থাকে তবে সেই ভুলের জন্য ব্রিটেনকে আরও বহুগুণ বেশী মূল্য দিতে হইবে।

তবে ফ্রান্স, পর্তুগাল প্রভৃতি অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তি অপেক্ষা অধীন দেশগুলি সম্পর্কে ব্রিটেন যে অধিকতর দূরদর্শী নীতি গ্রহণ করিয়াছে সে সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহ নাই (অবশ্য কেনিয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটেনের এই দূরদর্শিতার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই)। এই মার্চ্চ মাসেই গোল্ড কোষ্ট "ঘনা" নূতন নামে নূতন রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের আর একটি রাজ্য নাইজিরিয়াও শীঘ্রই স্বাধীনতা লাভ করিবে।

যুগোশ্লাভিয়ায় কৃষকদের স্বাস্থ্যবীমা

যুগোশ্লাভিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি নূতন প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সেই সম্পর্কে আমাদের দেশে বিশেষ কোন আলোচনাই হয় নাই। সমাজতন্ত্রের তথাকথিত সমর্থক কম্যুনিষ্টরা যুগোশ্লাভিয়ার অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে অল্পকালের জন্য ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণ যুগোশ্লাভিয়া লইয়া খুবই হৈ চৈ করে, কিন্তু যখনই যুগোশ্লাভ নেতৃত্ব ষ্ট্যালিনবাদী রুশ স্বৈরাচারের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে তখন হইতেই ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের দৃষ্টিতে যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্টরা 'পতিত' হইয়া রহিয়াছে। ১৯৫৫ সনে ক্রুশ্চেভ যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি পূর্ব্বকৃত অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার পর হইতে অবশ্য কম্যুনিষ্টরা প্রকাশ্যভাবে যুগোশ্লাভিয়ার নিন্দা করে না, তথাপি যুগোশ্লাভিয়া সম্পর্কে অদ্ভুত নীরবতা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, অথচ যুদ্ধোত্তর যুগে পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে কেবলমাত্র যুগোশ্লাভিয়াতেই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণভাবে ঘটিতে পারিয়াছে। কম্যুনিষ্ট এবং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরোধিতাসত্ত্বেও যুগোশ্লাভিয়া অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যুগোস্লাভিয়া কৃষিপ্রধান দেশ, মোট জনসংখ্যা ১৬,৯২৭,০০০-এর মধ্যে ১১,৩৩৪,০০০ জনই কৃষিজীবী। সুতরাং যুগোস্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা করা কৃষিপ্রধান ভারতের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আশা করা যায়—আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদগণ যুগোস্লাভ অভিজ্ঞতার সমস্যা ও সাফল্য সম্পর্কে অধিকতর আলোচনা করিবেন।

যুগোস্লাভিয়ায় কৃষকদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা ব্যবস্থার প্রচলন করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সনের শেষ দিক পর্যন্ত প্রায় ১৫,৮১,৭৬৫ জন এই স্বাস্থ্যবীমা করিয়াছেন। কৃষকদের মোট সংখ্যার তুলনায় এই জনসংখ্যা নিতান্তই নগণ্য—কেবলমাত্র কৃষকগণের কর্মসমবায় এবং রাষ্ট্রীয় কৃষিভূমির শ্রমিক ও কর্মচারিগণই শুধু স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পনার আওতায় পড়িয়াছেন। তবে কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনাকে ব্যাপকতর জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। অবশ্য প্রত্যেক কৃষককে এই পরিকল্পনার আওতায় আনিতে এখনও অনেক দিন লাগিবে।

প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, সমস্ত কৃষি-উৎপাদক এবং গ্রামাঞ্চলের স্বাধীন কর্মরত ব্যক্তিগণের জন্য সাধারণ ও বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবীমা প্রবর্তন করা হইবে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ হইবে। স্বাস্থ্যবীমা প্রবর্তনের জন্য প্রথম প্রয়োজন উপযুক্তসংখ্যক চিকিৎসক। স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বেসরকারী চিকিৎসকগণ প্রতি বৎসর গড়ে ৪ কোটি রোগী পরীক্ষা করেন। স্বাস্থ্যবীমা প্রসারিত হইলে ইহাদের উপর চাপ আরও বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

যুগোস্লাভ স্বাস্থ্যবীমা আইন অনুযায়ী কৃষি-উৎপাদকগণের স্বাস্থ্যবীমার অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করেন সামাজিক বীমা-সংস্থা এবং বাকী অর্দ্ধেক বহন করেন বীমাকারী নিজে।

"যুগোস্লাভ সংবাদ" লিখিতেছেন :

"বীমার ব্যয়সহ, কৃষকগণ ১৯৫৩ সনে চিকিৎসার জন্য ৭৫,৪২,৪৫০ দিনার ব্যয় করেন। এই ব্যয়ের পরিমাণ ২,৪৭২ মিলিয়ন দিনার বেড়ে যাবে। কাজের সময় দুর্ঘটনা, শিশুজন্ম, সংক্রামক রোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবীমাই যদিও চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় বহন করবেন তবুও প্রস্তাব করা হয়েছে, বীমাকারীরও কিছু ব্যয় বহন করা উচিত। স্বাস্থ্যবীমা প্রবর্তনের ফলে, সামাজিক বীমা-সংস্থার ব্যয় ৬,২৮৩ মিলিয়ন দিনার ও কৃষকগণের ব্যয় ৩,৭৩১ মিলিয়ন দিনারে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

"কৃষিজীবিগণের মোট আয় ধরা হয়েছে প্রায় ২০০ বিলিয়ন দিনার আর ১৯৫৪ সনে আয়করের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৩২ বিলিয়ন। কাজেই কৃষকগণকে মোট ৪২,০১৪ মিলিয়ন দিনার অর্থাৎ তাঁদের মোট আয়ের শতকরা ২১ ভাগ দিতে হবে। তবে এখন কৃষকগণকে যে কর দিতে হয় তা যদি ২,৫৯২ মিলিয়ন দিনার কমিয়ে দেওয়া হয় তা হলে তাঁদের দেয় অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯,৪২২ মিলিয়ন দিনার, অর্থাৎ তাঁদের মোট আয়ের শতকরা ১৯·৭৯ ভাগ। আয়কর বাবদ অর্থ আদায় করে তা থেকেই স্বাস্থ্যরক্ষার কর্মসূচীগুলি চালু রাখা হয়।"

পাকিস্থানের রাজনীতি

পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়াছে। এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থান উভয় অংশই জড়াইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম পাকিস্থানে রিপাবলিকান দলে ভাঙন দেখা দিয়াছে এবং ডাঃ খান সাহেবকে অপসারণের চেষ্টা হইতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্থানের গণতান্ত্রিক দাবিকে প্রতিহত করিয়া পাকিস্থানের পার্লামেণ্টে উভয় অংশের সমান প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু করিবার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্থানের বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে সম্মিলিত করিয়া একটি ইউনিটে পরিণত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্থানের একটি প্রভাবশালী অংশ সকল সময়েই এই এক ইউনিট পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন। এবং সকলেই ইহা জানেন যে, নানারূপ কূটজাল বিস্তার করিয়া পশ্চিম পাকিস্থানের লীগ নেতৃবৃন্দ সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সকল ওজর-আপত্তি উপেক্ষা করিয়াই এক ইউনিট পরিকল্পনা তাহাদের উপর চাপাইয়া দেন। এই কার্য্যে তাঁহারা ডাঃ খান সাহেবের সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে "এক ইউনিট" নেতৃবৃন্দ পুনরায় চিন্তা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। প্রদেশগুলির বিলুপ্তিসাধনে 'ক্ষমতা'র আসন-সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় স্বার্থসন্ধানী রাজনীতিবিদদের অসন্তোষে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ এক ইউনিট গঠনের পিছনেও একচ্ছত্র ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যই প্রবল ছিল।

সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রথম হইতেই এক ইউনিট পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। সিন্ধুর জি. এম. সৈয়দ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গফফর খান এই বিরোধীদলের নেতা ছিলেন। তদুপরি পশ্চিম পাকিস্থান আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পঞ্জাবেরও স্বল্পসংখ্যক নেতা এক ইউনিট পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। সম্প্রতি রিপাবলিকান দলের কয়েকজন নেতা মিঃ সৈয়দ ও খান আবদুল গফফর খানের সহিত আলোচনার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

এদিকে পূর্ব্ব পাকিস্থানে কাগমারীতে আওয়ামী লীগ সম্মেলন লইয়া এক উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। পররাষ্ট্রনীতিতে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী এবং আওয়ামী লীগের নেতা মৌলানা ভাসানীর মধ্যে যে বিরোধিতা এত দিন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল কাগমারী সম্মেলনের পর সেই বিরোধিতা বিশেষ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। সকল প্রকার সামরিক চুক্তি বর্জনের নীতি সমর্থন করিয়া আওয়ামী লীগ যে পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেন, মিঃ সুরাবর্দ্দীর পররাষ্ট্রনীতি কার্য্যতঃ তাহার বিরুদ্ধাচরণই করিয়াছে। কৌশলে মৌলানা ভাসানীকে দিয়া তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি অনুমোদন

করাইয়া লইবার যে চেষ্টা মিঃ সুরাবর্দী করেন, স্পষ্টতঃই তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। দলের নিকট এরূপভাবে পরাজিত হইলে অন্যান্য দেশের প্রধানমন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষমতা-লাভই যাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য সেই সুরাবর্দী সাহেবের নিকট সেরূপ সৌজন্য আশা করা বৃথা।

কাগমারী সম্মেলনে মূলতঃ মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্ব ও নীতির প্রতি দলের পুনরায় আনুগত্য জানানো হয়। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বনসংক্রান্ত দলের নীতি-ভঙ্গকারী যে-কোন সদস্যকে দল হইতে বহিষ্কারের চরম ক্ষমতা মৌলানা ভাসানীর হাতে দেওয়া হয়। সম্মেলনে পূর্ব্ব পাকিস্থানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়াও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কাগমারী সম্মেলন সুরাবর্দী-ভাসানী বিরোধিতা উপলক্ষে একশ্রেণীর পাকিস্থানী রাজনৈতিক নেতা এবং সংবাদপত্র পুনরায় ভারতবিরোধী প্রচারে নামিয়াছে। পাকিস্থানের শাসকশ্রেণী পাকিস্থানের জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তাহারা ক্রমশঃই জনসাধারণের অপ্রীতিভাজন হইতেছেন। পাকিস্থানের প্রকৃত স্বার্থের পরিপন্থী আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতি গৃহীত হওয়ায় পাকিস্থান বহু দিক হইতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সকল শিল্প ও উচ্চতর সরকারী পদগুলি পশ্চিম পাকিস্থানবাসীদের হাতে থাকায় পূর্ব্ব পাকিস্থানের জনগণের উপর শোষণের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় জনসাধারণের দাবিকে সমর্থন করিয়া মৌলানা ভাসানী যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, সহজেই পাকিস্থানের জনসাধারণের মনে তাহাতে সাড়া জাগিয়াছে। ঠিক সেই কারণেই মৌলানা ভাসানীর উপর প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্থানী রাজনীতির বিশেষতঃ, পশ্চিম পাকিস্থানের রাজনীতিবিদদের বিশেষ উষ্মা জাগিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক এবং পাকিস্থানের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ভারত-বিরোধী নীতি পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব এবং বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণের জন্য মৌলানা ভাসানী প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ভারতের চর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "ডন" পত্রিকা তাঁহাকে "লালমোল্লা" আখ্যা দিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্থানের পত্রিকাগুলিতে বলা হইয়াছে যে, হয় মৌলানা ভাসানীকে পরিত্যাগ করা হউক, না হয় তাঁহাকে "খতম" করা হউক।

পাক পার্লামেণ্টের রিপাবলিকান সদস্য খান আলাউদ্দীন খান বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট (ইস্কান্দার মির্জ্জা) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে ভাসানীকে পাকিস্থানের পয়লা নম্বর শত্রু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন; সেই ভবিষ্যদ্বাণী এখন সত্যে পরিণত হইয়াছে। কারণ তাহা না হইলে ভাসানী কি আর কাগমারী সম্মেলনে গান্ধী আর সুভাষ বসুর নামে তোরণ নির্ম্মাণ করিতে সাহস করিতেন।

এদিকে আওয়ামী লীগেরও এক অংশ মৌলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খাঁ এবং দলের সম্পাদক মুজিবর রহমান খাঁ (যিনি পাকিস্থানের বাণিজ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভাসানী-অন্ত প্রাণ ছিলেন) বলেন যে, কাগমারী সম্মেলনে পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্রনীতির কোনরূপ বিরোধিতাই করা হয় নাই—এ সকল ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কারসাজি ও মিথ্যা প্রচারকার্য্য। কিন্তু "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার ঢাকাস্থিত সংবাদদাতা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সাংবাদিকদিগকে প্রদত্ত মৌলানা ভাসানীর স্বহস্ত-লিখিত বিবৃতি অনুযায়ীই তাঁহারা সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক কাগজেও ভাসানীর বিবৃতি অনুরূপ আকারে প্রকাশিত হইয়াছে—অর্থাৎ স্পষ্টতঃই ভারত-বিরোধী কুৎসারটনা দ্বারা পাকিস্থানী রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ নিজেদের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটকে পাকিস্থানের জনসাধারণের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিতে চাহেন।

দৃঢ়চেতা, নির্ভীক এবং নীতিবাদী ভাসানী অবশ্য এ সকল কুৎসার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী কাগমারীতে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাদানকালে মৌলানা ভাসানী বলেন যে, পাকিস্থানের লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুর্গতিমোচনের কল্পনাকে বাস্তবরূপ দানের জন্য তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়া যাইবেন।

মৌলানা ভাসানী বলেন, "দুর্গত জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রামকে যদি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়—তাহা হইলে আমি এরূপ ষড়যন্ত্রের জন্য যে-কোন অবস্থার সম্মুখীন হইতে রাজী আছি।"

তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া মৌলানা ভাসানী বলেন, "জনগণের দাবি সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরাকেই কি ষড়যন্ত্র বলা হয়? গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী এবং অন্যান্য রাজনীতিকবৃন্দের উপস্থিতিতেই আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন হয়। গবর্ণমেণ্ট কিংবা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে বলিয়া কি তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন? জনগণ সম্মিলিত ভাবে তাহাদের ন্যায়-সঙ্গত দাবি তুলিয়া ধরাতেই প্রতিক্রিয়াশীল দল শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দাবি আদায়ের জন্য আমরা শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়া যাইব এবং এজন্য আমি মৃত্যুবরণ করিতেও প্রস্তুত আছি।"

পাকিস্থানে অধ্যক্ষের অপকীর্ত্তি

বরিশাল হইতে প্রকাশিত "বরিশাল হিতৈষী" পত্রিকার ১১ই পৌষ সংখ্যায় একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদে বলা হইয়াছে:

"বরিশাল জেলার চাখার গ্রামে আমাদের বর্ত্তমান রাজ্যপাল মোঃ ফজলুল হক সাহেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চাখার কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এ. এইচ. এম. মহীউদ্দীন এম-এ (আল আজাহার), এম-লিট

(কায়রো), এম. ইড. লেকচারার কায়রো ইউনিভারসিটি, ঢাকা ইউনিভারসিটি, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি, প্রফেসার প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা, এক্স-প্রফেসার রকফেলার ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক ষ্টাডিজ, অফিসিয়েটিং প্রফেসার, ইডেন কলেজ, ঢাকা, এম. সি. গিল ইউনিভারসিটি প্রভৃতি আরও বহু অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে সুদূর নোয়াখালি জেলা হইতে বরিশালের চাখার গ্রামে যেদিন আসিলেন সেদিন চাখার তথা বরিশালবাসী তাহাকে এক অভূতপূর্ব্ব অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিল। তার পর দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইহার ভিতর তাঁহার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ আমাদের নিকট আসিয়াছে কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করিয়া আমরা সে সব অভিযোগ উপেক্ষা করিয়াছি।"

সম্প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক এক অনুসন্ধানের পর প্রকাশ পাইয়াছে যে, ঐ "অধ্যক্ষের" নাকি ম্যাটিক সার্টিফিকেটও নাই।

চন্দ্রলোকে ভ্রমণ

পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোকে গমন করা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশেই জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নেও চন্দ্রে গমনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলিতেছে। মহাশূন্যে ভ্রমণের উপযোগী বিমানের বা রকেটের জ্বালানি সমস্যাই বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা চন্দ্রলোকে একটি বাহকহীন রকেট পাঠাইতেও শত শত টন জ্বালানি লাগিবে। সোভিয়েট অধ্যাপক জেড. চেবোতারিয়েফ অবশ্য হিসাব করিয়াছেন যে, মাত্র ষোল টন জ্বালানি লাগিবে। চেবোতারিয়েফের হিসাব অনুযায়ী কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠ হইতে রকেটটিকে শূন্যে ছাড়িবার প্রাথমিক অবস্থাতেই মাত্র জ্বালানি লাগিবে, পৃথিবীর আবহমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবার পর, রকেটটি পৃথিবীর ও চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণে শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উড়িয়া চলিবে।

ডক্টর চেবোতারিয়েফ বলিতেছেন, "রকেটটি এমন একটি কক্ষপথ ধরিয়া চলিবে যাহার দুই প্রান্ত একই বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে—কক্ষপথটি দেখিতে হইবে অনেকটা একটি চ্যাপটা উপবৃত্তের ন্যায়। পৃথিবী হইতে চন্দ্রে যাত্রা ও প্রত্যাবর্ত্তনের দূরত্বটি ২৩৬ ঘণ্টায়, অথবা প্রায় দশ দিনে, অতিক্রান্ত করা হইবে, এই সময়ের মধ্যে রকেটটি প্রায় দশ লক্ষ কিলোমিটার (১ কিলোমিটার=$\frac{5}{8}$ মাইল) পথ অতিক্রম করিবে। ইহার চেয়ে কম গতিবেগে চলিলে রকেটটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। চাঁদের কাছাকাছি আসিতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে এই গতিবেগ শূন্যে দাঁড়াইবে।"

রকেটটিকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হইলে উহা চন্দ্রের নিকট হইতে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ভূপৃষ্ঠে অবতরণের কালে যাহাতে রকেটটির কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য উহার সহিত একটি বিশেষ ধরনের প্যারাসুট ব্যবস্থা থাকিবে। রকেটটির ওজন হইবে ৫০ হইতে ১০০ কিলোগ্রাম।

উক্ত সোভিয়েট বিজ্ঞানীর অভিমতে, "এই রকেটের অভিযানের দ্বারা আমরা মহাশূন্যের প্রকৃতি ও বিশেষত্বগুলি সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্যাদি লাভ করিতে পারিব, উল্কাগুলির গতিপ্রকৃতি ও মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের লব্ধ তথ্যাদির যাথার্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার এক নূতন সুযোগ পাইব, আবহ তথ্যাদি সম্পর্কে আরও জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইব।"

রকেটটি চন্দ্র হইতে ৩০ হাজার কিলোমিটার দূরে থাকিয়া চন্দ্রের চারিদিকে উড়িবে। ফলে রকেটে রক্ষিত সিনেমা ও ফোটো-ক্যামেরায় তোলা বহুসংখ্যক ছবির সাহায্যে এই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীবাসী চন্দ্রের অপরাপর দিক সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে—(কারণ পৃথিবী হইতে চন্দ্রের মাত্র একটি দিকই দৃশ্যমান হয়)। চন্দ্রের চারিদিকে আবহমণ্ডল নাই বলিয়া পৃথিবীর আবহাওয়ার বিশেষত্বের দরুন আলোকচিত্র গ্রহণে যে সকল বাধা অসুবিধা থাকে, সেখানে সেইরূপ ব্যাঘাতসৃষ্টির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। উপরন্তু অপরিসীম দূরত্ব হইতে গৃহীত পৃথিবীর আলোকচিত্রগুলি হইতে বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবী সম্পর্কেও জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

এখনও পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদিগের জল্পনাকল্পনা চন্দ্রলোক সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, কারণ মঙ্গলগ্রহে পৌঁছিবার অভিযানে সূর্য্যের প্রভাব, এবং খুব সম্ভব শুক্র ও বুধ গ্রহেরও প্রভাবের প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়াইবে।

চন্দ্রলোকে রকেট প্রেরণ করিতে আর কতকাল লাগিবে সেই সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক চেবোতারিয়েফ বলেন যে, রকেট প্রস্তুত হইলেই উহা সম্ভব হইবে, তবে রকেট প্রস্তুত করিতে কতদিন লাগিবে তাহা কেবলমাত্র ইঞ্জিনীয়ারগণই বলিতে পারেন। তবে আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার উন্নতির কথা স্মরণ রাখিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে ঐরূপ রকেট নির্ম্মাণ সম্ভব হইবে সে সম্পর্কে প্রায় নিশ্চয়রূপেই বলা যাইতে পারে।

আসানসোলে নেতাজী শোভাযাত্রার উপর হামলা

১৬ই মাঘ সংখ্যা সাপ্তাহিক "জি. টি. রোড" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

"গত ২৩শে জানুয়ারী সেন-র‍্যালে ফ্যাক্টরীর কম্যুনিষ্ট ইউনিয়নের শ্রমিকরা, কল্যাপুরে শান্তি কমিটি যখন নেতাজীর ছবি লইয়া শোভাযাত্রা করিতেছিলেন, তখন সহসা লাঠি-সোঁটা লইয়া শোভাযাত্রার উপর ঝাপাইয়া পড়ে। শ্রীশশাঙ্ক তেওয়ারী এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅরবিন্দ তেওয়ারী যথাক্রমে পতাকা এবং নেতাজীর ছবি বহন করিতেছিলেন। ইউনিয়ন কর্ম্মীদের যত কিছু রাগ তাঁহাদের উপর এবং পতাকা ও নেতাজীর ছবির উপর পড়ে। তাহারা উভয় ব্যক্তিকেই আঘাত করে, পতাকা ও নেতাজীর ছবি ছিন্নভিন্ন করিয়া পদদলিত করে এবং শ্রীসুধীর মিশ্র প্রভৃতি কয়েক জনকে আঘাত করিয়া আহত করে।..."

পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, পূর্ব্বপরিকল্পিত পদ্ধতিতেই সেনর‍্যালের কম্যুনিষ্ট ইউনিয়ন নেতাজী শোভাযাত্রার উপর হামলা চালায় এবং পরে ঐ অপকর্ম্মের জন্ম অন্যান্যদের প্রতি দোষারোপ করিয়া প্রচারকার্য্য চালাইতে থাকে।

উক্ত একই তারিখের "বঙ্গবাণী" পত্রিকার সম্পাদকীয় আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, কল্যাপুরের উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। নডিহা, কল্যাপুর ও গাঁড়ুই পল্লী-উন্নয়ন সমিতি বলিয়া কথিত একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রচারিত হাণ্ডবিলে কংগ্রেসকে এই দুর্ঘটনার জন্ম দায়ী করা হইয়াছে। অপরপক্ষে কল্যাপুর অঞ্চলের শান্তি কমিটির বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, লালঝাণ্ডা হাতে লইয়া কতকগুলি লোক আসিয়া এই মারপিট করিয়াছে। এই সম্পর্কে দুইটি মামলাও নাকি রুজু হইয়াছে। এই ঘটনা উপলক্ষে মন্তব্য প্রসঙ্গে "বঙ্গবাণী" লিখিয়াছেন :

"হামলা কে করিয়াছে তাহা না জানিলেও একটা ঘটনা যে হইয়াছে এ কথা সত্য এবং তাহাতে কয়েকজন লোক আহত হইয়াছে এ কথাও সত্য। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় যে, নেতাজী জন্মদিবসে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। যাহাদের উপর যাহাদেরই রাগ থাকুক না কেন, নেতাজী জন্মদিবস ছাড়াও অন্য দিনে সে বা তাহারা ত এই রাগ মিটাইতে পারিত।"

ঘটনাটি সম্পর্কে দায়িত্ব কাহার তাহা আদালত ঠিক করিবেন। সুতরাং সে বিষয়ে আমরাও কোন মন্তব্য হইতে বিরত থাকিলাম। তবে সভা শোভাযাত্রার উপর এই ধরনের হামলা আমাদের দেশে বিরল নহে। ইহাও সত্য যে, এই ধরনের হামলা দলমতনির্ব্বিশেষে সুযোগ পাইলে সকলেই করিয়া থাকে। গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে পরমতসহিষ্ণুতা যে অপরিহার্য্য, আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাহা এখনও বুঝিতে পারেন নাই। সেজন্যই আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, বিরোধীপক্ষের বক্তব্যকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিবার চেষ্টা না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইষ্টকবর্ষণেই কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। ইহাতে কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দই অন্যায় হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল দলেই সুস্থ মনোভাবসম্পন্ন সদস্য রহিয়াছেন যাঁহারা এই ধরনের গুণ্ডামি সমর্থন করেন না ; কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহারা সংখ্যালঘু। দলের নেতৃত্ব যাঁহাদের উপর থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলগত স্বার্থসাধনের জন্ম তাঁহারা কোন কাজকেই গর্হিত বলিয়া মনে করেন না। কম্যুনিষ্টরা প্রকাশ্যভাবে এই সুবিধাবাদী নীতিকে একটি দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে খাড়া করিয়াছে—আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় কোন ঘটনা বিচারেই তাহারা যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। তাহাদের মতের সহিত অমিল হইলে যে-কোন লোককেই "দালাল", "চর" প্রভৃতি সম্বোধনে অভিহিত করিতে তাহাদের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। একইভাবে সরকারী দলেও সকলপ্রকার বিরোধিতাকেই "বিভেদকারী", "নাশকতামূলক" প্রভৃতি অপবাদ প্রায়ই দেওয়া হয়। এইরূপ ডিক্টেটরী মনোভাব লইয়া চলিলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত হইবে। জনসাধারণকে সেজন্ম এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

রঘুনাথগঞ্জে বিদ্যুৎ-সরবরাহ

"ভারতী" ৩রা মাঘ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

"রঘুনাথগঞ্জ শহরে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যাপারটা ক্রমেই বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। বৎসরখানেক পূর্ব্বে শহরে যখন তার খাটানো সুরু হয় তখন লোকে মনে করিয়াছিল—দুই-তিন মাসের মধ্যেই শহর আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। খুব দেরি হইলেও অন্ততঃ শারদীয়া উৎসব বিজলীবাতির সাহায্যে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইবে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় মিউনিসিপ্যাল এলাকার এক অংশ জঙ্গীপুরের পারে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যুৎ-সরবরাহ করা সম্ভব হইলেও মিউনিসিপ্যালিটির অপর অংশ রঘুনাথগঞ্জে তাহা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই, যদিও শহরে তার খাটানোর কাজ বহুপূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে।"

আশু বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রাপ্তির আশায় জনসাধারণ এবং বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান তার প্রভৃতি খাটাইতে অনেক টাকা লগ্নী করিয়াছে। কিন্তু সরবরাহে বিলম্বের জন্ম তাহাদের লগ্নীকৃত অর্থ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহাতে তাহাদের আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। এ ব্যাপারে সরকারের কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব না থাকিলেও জনসাধারণের অসুবিধা ও ক্ষতির পরোক্ষ দায়িত্ব যে তাহাদেরই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন গুজব রটিল 'কেব্‌ল'টি ছোট হইয়াছে ও ইহাকে পরিবর্তন না করিলে আর উপায় নাই তখন মানুষ অনেকটা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পরে সরকারী ঘোষণার ফলে যখন জানা গেল যে, এই গুজব ভিত্তিহীন এবং ১লা নবেম্বর এখানে বিদ্যুৎ-সরবরাহ করার কর্মসূচী থাকিলেও নৈসর্গিক কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই তখন শহরের মানুষ ভাবিল খুব দেরি হইলেও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহাদের আশা পূর্ণ হইবে। এই সময় আরও কিছু লোক তাঁহাদের বাড়ীতে তার খাটানোর কাজ শেষ করিলেন। অবশেষে ডিসেম্বরের শেষে বহুপ্রত্যাশিত কেব্‌লটি নদীগর্ভে ফেলা হইল ও বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেল যে, জানুয়ারী মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে নিশ্চয়ই আলো জ্বালা হইবে। স্থানীয় মানুষ আর একবার নূতনভাবে আশান্বিত হইয়া উঠিল ও কর্ম্মচাঞ্চল্য সুরু হইল। কিন্তু কয়েকদিন কাজকর্ম্ম চলার পর পুনরায় সরকারী কার্য্যকলাপ স্তিমিত হইয়া আসিল ও পুনরায় একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইল। এখন আবার গুজবের রাজত্ব সুরু হইয়াছে।"

শহরের একাংশে বিদ্যুৎ-সরবরাহ সম্ভব হইয়াছে অথচ সকল আয়োজন সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মিউনিসিপ্যালিটির অপর অংশে এক বৎসর পরেও বিদ্যুৎ-সরবরাহ করা কেন সম্ভব হইতেছে না সে সম্পর্কে একটি সরকারী বিবৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া

"ভারতী" যে মন্তব্য করিয়াছেন আমরাও তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি।

বিশ্বশিল্প প্রদর্শনী

মানুষের শ্রম এবং শ্রমসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের নিকট কিরূপভাবে প্রতিভাত হইয়াছে বর্তমান বৎসরের জুন মাসে জেনেভা নগরীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে তাহা পরিস্ফুট হইবে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার প্রথম ডিরেক্টর আলবার্ট টমাসের মৃত্যুর পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিকী উপলক্ষে "শিল্প ও শ্রম" সম্পর্কীয় এই পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীটির উদ্যোক্তা হইলেন আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা। ভারতসহ ৭৭টি দেশকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রদর্শনীর পাঁচটি বিভাগ থাকিবে। বিভাগগুলিতে যে যে বিষয়ের উপর শিল্পকার্য্য প্রদর্শিত হইবে সেগুলি হইল: (১) কৃষি; (২) অগ্নিসংশ্লিষ্ট শিল্প অর্থাৎ ধাতুশিল্প, কাচশিল্প ইত্যাদি; (৩) মানসিক শ্রম; (৪) নির্ম্মাণশিল্প (Building) এবং (৫) শ্রমিক সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা।

প্রদর্শনীতে মোট পাঁচ শত হইতে ছয় শতখানি শিল্পকার্য্য দেখান হইবে।

আসামে ডাক বিভাগে ধর্ম্মঘট

১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে আসামের ডাক বিভাগীয় কর্ম্মিগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং নেফা (NEFA) অঞ্চলের প্রায় ছয় হাজার কর্ম্মী এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছেন। "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার শিলংস্থিত সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, কার্য্যতঃ কয়েকজন নূতন কর্ম্মী ব্যতিরেকে সকল কর্ম্মীই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছেন এবং ধর্ম্মঘটের ব্যাপকতার ফলে আসামের ডাক বিভাগের কাজ সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে উত্তর-পূর্ব্ব রেলওয়ের কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘট করিবার কথা ছিল কিন্তু ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রেলওয়ে শ্রমিকসঙ্ঘ প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট পিছাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন।

ডাকবিভাগীয় কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘটের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮ই মাঘ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" লিখিয়াছিলেন:

"ডাক ও তার এবং রেল ধর্ম্মঘট প্রায় এক সঙ্গে সত্যই যদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে জনসাধারণের যে অবর্ণনীয় অসুবিধা এবং ব্যবসায়াদির বিপর্য্যয় সংঘটিত হইবে তাহা ভাবিয়া সকলেই শঙ্কিত হইয়াছেন। কিন্তু নিম্নবেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারীদের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগাদির যথাবিহিত প্রতিকার করিতে কেন পশ্চাৎপদ হইতেছেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বহুবিঘোষিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনই যদি বাস্তবিক কংগ্রেস-নেতাদের কাম্য হয়, তাহা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদের পারিশ্রমিকের আকাশপাতাল বৈষম্য সর্ব্বাগ্রে দূরীভূত করাই সঙ্গত নহে কি?"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশমুখ

গত মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে শ্রীদেশমুখ যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা সুচিন্তিত ও প্রণিধানযোগ্য। আমরা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে তাহা উদ্ধৃত করিলাম:

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশনের সভাপতি সি ডি. দেশমুখ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আলোকপ্রাপ্ত নাগরিকত্বের জন্য প্রস্তুতি মাত্র, এই নাগরিকত্ব সারাজীবনের ব্যাপার।

তিনি আরও বলেন যে, নূতন গ্র্যাজুয়েটগণ এক গতিশীল সমাজে জীবন সংগ্রাম আরম্ভ করিবেন। এই সমাজের উপযুক্ত বিজ্ঞানী, টেকনোলজিষ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির লোক আবশ্যক, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এতদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন এরূপ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, অকপট, সাধু ও পরিশ্রমী লোকের যাঁহারা আধুনিক গণতন্ত্রে তাঁহাদের কাজ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন।

শ্রীদেশমুখ তাঁহার বক্তৃতায় প্রথমে শিক্ষা বিস্তারে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, পণ্ডিত মালবীয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, স্যার আবদুর রহিম, ড. রাসবিহারী ঘোষ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ড. মেঘনাদ সাহা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ড. এস. রাধাকৃষ্ণণ, ড. যদুনাথ সরকার, ড. সি, ভি, রামন ও ড. এস, এন, বসুর নাম উল্লেখ করেন।

শ্রীদেশমুখ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করিবার পর বলেন যে, ছাত্রসংখ্যার প্রভূত চাপে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষকদের যোগ্যতা ও সংখ্যা, স্থান সঙ্কুলান, বিশেষতঃ পরীক্ষাগারে স্থান, সাজসজ্জা, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি সম্পর্কে পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পিছনে পড়িতেছে। এক সময়ে ভারতের পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উহাদের দায়িত্বের সঙ্কুচিত সীমার মধ্যে পৃথিবীর যে কোন স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমান উচ্চ মানবিশিষ্ট ছাত্র সৃষ্টি করিত। সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা সম্ভবতঃ পৃথিবীর সমৃদ্ধতর দেশগুলিতেও মান ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ব্রিটেনের 'ইউনিভারসিটি কোয়ার্টারলি' নামক ত্রৈমাসিক পত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে: "বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকদের মধ্যে মতানৈক্য থাকিলেও তাঁহাদের অধিকাংশই এই মত পোষণ করেন যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণ পূর্ব্বে যেরূপ ভাল ছিল সেইরূপ ভাল আছে, সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ ছাত্রগণ পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ নহে; কিন্তু নিম্নতর স্তরে সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য গড়পড়তা গুণ হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতীয়

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মান সম্বন্ধে এইরূপ এবং সম্ভবতঃ ইহা অপেক্ষা কঠোরতর মন্তব্য প্রযোজ্য। অনুসন্ধান করিলে ইহার তিনটি প্রধান কারণ পাওয়া যাইবে, যথা—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাখাতে অপর্য্যাপ্ত ব্যয়, শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে গোলযোগ এবং বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ প্রথার উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ।

দেশমুখ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সম্বন্ধে বলেন, "বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ৯০ হাজার ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে হয়, এই সংখ্যা ব্রিটেনের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা অপেক্ষাও অধিক। এক সিটি কলেজেই ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৩ হাজারের উপর, অপর পাঁচটি কলেজের প্রত্যেকটিতে গড়ে ৬ হাজার ছাত্র আছে। হুগলী নদীর অপর পারে হাওড়ার কলেজ কয়টিতে ১৮ হাজার ছাত্র আছে, সুতরাং বাংলার মেট্রোপলিটান এলাকায় মোট প্রায় ৬০ হাজার ছাত্র আছে।

আজ যাঁহারা ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট পাইতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ৮৮২২। তাঁহাদের অধিকাংশই নাগরিক জীবন ও উহার সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিবেন। যাঁহারা আরও অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদের প্রতি আমার অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক। আমি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দিত করিতেছি। আমি তাঁহাদিগকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, বিশ্ববিদ্যালের সাহায্য কমিশনের হস্তে যে অর্থ রহিয়াছে তাহা হইতে স্নাতকোত্তর শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক-কিছু করা হইতেছে। তাঁহারা তাঁহাদের মনোনীত কোর্স শেষ করিলে কর্ম্মের কিংবা উপযুক্ত বৃত্তির অভাব তাঁহাদের পক্ষে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তাঁহারা সম্ভবতঃ দেখিবেন যে, তাঁহাদের উপার্জ্জন অন্ততঃ দীর্ঘকাল নৈরাশ্যজনক ভাবে অল্প থাকিবে; কিন্তু ঐ অবস্থা এখনও দেশের অর্থনৈতিক দিক হইতে অনগ্রসর অবস্থার পরিচায়ক।

যাঁহারা বৃত্তি বিষয়ক কিংবা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা পাইতেছেন, আমি আশা করি তাঁহাদের অবস্থা কতকটা ভাল হইবে। কিন্তু গ্র্যাজুয়েটদের অধিকাংশের পক্ষে, বিশেষ করিয়া দেশের এই অংশে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ আশানুরূপ হইবে না।

অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের অধিকতর প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠ শিল্প ও ব্যবসায়-সংক্রান্ত কর্ম্মমুখর হইলেও পল্লী অঞ্চলে আধুনিক অর্থে কোন বড় শহর নাই। ইহার ফলে যুবকগণ কর্ম্মসংস্থানের ও উচ্চ শিক্ষা-লাভের আশায় কলিকাতায় আকৃষ্ট হয়। কলিকাতার বৃহৎ শিল্প এবং ব্যবসায়ের ভিড়ে ক্ষুদ্র শিল্পেও আত্মনিয়োগ অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। ইহার ফলে উচ্চ শিক্ষা লাভরত ব্যক্তিগণকে পেশামূলক কাজ, কেরানীর কাজ কিংবা শাসনসংক্রান্ত চাকুরির উপর অত্যধিক নির্ভর করিতে হয়। মধ্য শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যে মধ্য শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে উহাতে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকদের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলেজে ভর্ত্তি হওয়া ব্যতীত অপর কোন পথ নাই; কারণ অনেক প্রকার কাজের জন্য শিক্ষাগত ন্যূনতম যোগ্যতা নির্দ্ধারিত রহিয়াছে—ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া কিংবা ডিগ্রী থাকা। মফস্বলের বহু কলেজে অনার্স কিংবা বিজ্ঞান পড়ার পুরাপুরি সুব্যবস্থা নাই বলিয়া যুবকগণ কলিকাতায় চলিয়া আসে। বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে অবিরাম উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে কলিকাতা ও হাওড়ার কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা এইরূপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং কলেজ পরিচালক সমিতিসমূহ এই সংস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ও বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশনের উপদেশ এবং সহায়তায় কলিকাতার কলেজগুলিতে ছাত্রদের ভিড় ক্রমশঃ হ্রাস করিবার জন্য কিছু করা সম্ভবপর হইবে।

আমার মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনা সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন কর্ত্তৃক তাঁহাদের রিপোর্টে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা বিষয়ে নির্দ্দেশিত পন্থায় যুবকদিগকে পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করিতে হইবে। কমিশন পরীক্ষামূলক ভাবে যে সমস্ত অগ্রবর্ত্তী পরিকল্পনা সুপারিশ করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের অনেকগুলি বাঙলায় প্রবর্ত্তিত হইবে। উপযুক্ত সাড়া পাওয়া গেলে তাঁহারা ঐ সমুদয়ের জন্য অধিকতর পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করিবেন।

কর্ম্মসংস্থানের আর একটি দিক কর্ম্মপ্রার্থীদের পক্ষে কিছু সান্ত্বনার বিষয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য দেশে উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের দারুণ অভাব রহিয়াছে। দেশে কাজের অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটিতেছে। সুতরাং সহরের শিক্ষিত যুবকদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমি বর্ত্তমান ভারতের যুবকদিগকে শ্রমের মর্য্যাদা সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক মনে করি। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আলোকপ্রাপ্ত নাগরিকত্বের জন্য প্রস্তুতি মাত্র; এইরূপ নাগরিকত্ব একটা সারা জীবনের ব্যাপার ও চ্যালেঞ্জ।"

পণ্ডিত নেহরু ও কাশ্মীরপ্রসঙ্গ

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্থানের অভি-যোগ ও পাশ্চাত্ত্য জগতে তাহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পণ্ডিতজীর অভিমত নীচের সংবাদে পাওয়া যায়:

"এলাহাবাদ, ৬ই ফেব্রুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু অদ্য পুনর্ব্বার এই কথা বলেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতবর্ষ কোন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিশ্রুতি পালনে পশ্চাদপদ হয় নাই, কিংবা ঐরূপ কোন প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে নাই।

অদ্য অপরাহ্নে এই স্থানে এক বিরাট নির্ব্বাচনী সভার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেন, কোন কোন মহলে আমাদের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আমরা কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের প্রতিশ্রুতি পালনে অসম্মত হইয়াছিলাম। গণভোট গ্রহণের

পূর্ব্বে যে সর্ত্ত পূরণ করা একান্ত আবশ্যক, আমাদের বিরুদ্ধে যাঁহারা এই অভিযোগ করেন আমি সেই সর্ত্তের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। সেই সর্ত্তটি হইল এই যে, পাকিস্থান কাশ্মীরের যে অংশ দখল করিয়া আছে, গণভোট গ্রহণের পূর্ব্বে পাকিস্থানকে সেই অংশ হইতে সরিয়া যাইতে হইবে। পাকিস্থান কি এই সর্ত্ত পালন করিয়াছে?

অতঃপর পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতবর্ষের প্রতি গুরুতর অবিচার করা হইয়াছে। পাকিস্থান যে কাশ্মীরে আক্রমণ চালাইয়াছিল—এই মূল সত্যটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে।

কতকগুলি নির্দিষ্ট সর্ত্তে এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ গণভোট গ্রহণে সম্মত হইয়াছিল; ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সর্ত্ত এই ছিল যে, পাকিস্থানী সৈন্যগণকে কাশ্মীর হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে হইবে। নয় বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু পাকিস্থান এই সমস্ত সর্ত্তের একটিও পালন করে নাই। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে এবং এই প্রশ্নটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বলবৎ থাকিতে পারে না। গত চারি বৎসর ধরিয়া কাশ্মীরের সংবিধান প্রণয়ন করা হইতেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত গণপরিষদে এই সংবিধান গৃহীত হইয়াছে। কেহই গণপরিষদকে এই সংবিধান গ্রহণ করিতে বাধা দিতে পারে নাই।

অতঃপর পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, গত নয় বৎসরে কাশ্মীরের বিপুল অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে এবং এখন এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত নহে যাহাতে ঐ রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে।"

পাক্-অধিকৃত কাশ্মীর

সম্প্রতি নিম্নে প্রদত্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে।

"জম্মু, ১১ই ফেব্রুয়ারী—কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী গোলাম মহম্মদ ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলেন, ১৯৪৯ সালে যুদ্ধবিরতির পর প্রায় চারি লক্ষ কাশ্মীরী মুসলমান পাক-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর এলাকা হইতে পলায়ন করিয়া যুদ্ধবিরতি সীমারেখার এই দিকে চলিয়া আসে। সেই সকল মুসলমানের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে আগত মুসলমানদের নিকট হইতেই জানা যায় যে, পাক-অধিকৃত এলাকায় রাজনৈতিক কারণে উৎপীড়ন, অত্যাচার, অরাজকতা এবং শোচনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যই তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে।

বক্সী গোলাম মহম্মদ বলেন, কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি তথাকথিত "আজাদ কাশ্মীর" এলাকার লোকদের নিকট হইতে অনেকগুলি পত্র পাইয়াছেন। সেই সকল পত্রে পাক-অধিকৃত এলাকার লোকদের যুদ্ধবিরতি সীমারেখার এই দিকে আশ্রয়গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। পাছে তাহাদের উপর উৎপীড়ন হয়, এই কারণে তিনি তাহাদের নাম প্রকাশ করিতে চাহেন না।

এক প্রশ্নের উত্তরে বক্সী গোলাম মহম্মদ বলেন, কোন কোন লোক ঐ সময় পাক-অধিকৃত এলাকায় চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভ্রান্তি দূর হওয়ার পর তাহাদের অনেকেই এদিকে ফিরিয়া আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে যাহারা সরকারী চাকুরিতে ছিল, এখানে ফিরিয়া আসিবার পর তাহাদের পুনরায় কর্ম্মে নিয়োগ করা হইয়াছে।"

পাকিস্থানের সামরিক খাতে ব্যয়

পাকিস্থান শুধু যে মার্কিন দেশ হইতে বিরাট যুদ্ধ-সম্ভার লইতেছে তাহা নয়, অন্যদিকেও তাহার প্রস্তুতি চলিতেছে। উদ্দেশ্য কি তাহা বলা বাহুল্য। নিম্নে প্রদত্ত সংবাদে তাহা বুঝা যাইবে।

"করাচী, ৯ই ফেব্রুয়ারী—পাকিস্থান আগামী বৎসর দেশরক্ষা খাতে ১,১১,৬০,০০,০০০্ টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। অদ্য অপরাহ্নে পাকিস্থানের অর্থমন্ত্রী মিঃ আমজাদ আলী জাতীয় পরিষদে ১৯৫৭-৫৮ সনের বাজেট পেশ করেন।

সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দ অনুসারে বর্ত্তমান বৎসরে দেশরক্ষা খাতে ৯৪,৬০,০০,০০০্ ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

১৯৫৭-৫৮ সনের বাজেটে ৭,৮০,০০,০০০্ টাকা ঘাটতি হইবে। নানারূপ নূতন কর ধার্য্য করিয়া এই ঘাটতি পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নূতন কর ধার্য্য করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহার ফলে ৩০,০০,০০০্ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।"

পূর্ব্ব পাকিস্থানে হিন্দু

আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নলিখিত বিবৃতি বিগত ৮ই মাঘ দিয়াছিলেন। আমরা বলি "ফলেন পরিচীয়তে।"

"পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান সোমবার কলিকাতায় বলেন যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের হিন্দুদের মনে আস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। এই দিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের সহিত ৪০ মিনিটকাল আলোচনার পর সাংবাদিকদের নিকট তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্থানের হিন্দুরা সরকারী নির্দ্দেশে তাহাদের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রী করিতে পারিবে না বলিয়া সম্প্রতি যে অভিযোগ উঠিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

জনাব আতাউর রহমান খান সাংবাদিকদের জানান যে, পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিতে এবং তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে তাঁহার সরকার সর্ব্বদাই সচেষ্ট আছেন এবং হিন্দুদের অভাব-অভিযোগের সম্বন্ধে তৎপর হওয়ার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের কড়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, যেহেতু সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকারদানকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই জন্য সরকারকে ইহা সর্ব্বতোভাবে মানিয়া চলিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার প্রতি হিন্দুদের যে আস্থা আছে তাহার সপক্ষে তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি হিন্দুরা হাজারে হাজারে আওয়ামী লীগে যোগদান করিতেছে।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ সম্প্রতি অনেক কমিয়াছে। অবশ্য তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতিও ইহার জন্য কতকটা দায়ী এবং বাস্তুত্যাগ কমিলেও পূর্ব্ব পাকিস্থান সরকারের নিকট বাস্তুত্যাগের আবেদনের সংখ্যা তেমন কমে নাই।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, চার মাস পূর্ব্বে যখন তাঁহারা শাসনভার গ্রহণ করেন তখন দেশে খাদ্যসমস্যা ভীষণ আকার ধারণ করে এবং এই খাদ্যাভাবের জন্যই বাস্তুত্যাগীদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভারতের পথে পা বাড়ায়। জনাব মুজিবর রহমান এই প্রসঙ্গে বলেন যে, 'পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিসভার কার্য্যকলাপের জন্য আমাদের দায়ী করা চলে না।'

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, বর্ত্তমানে উহা সম্পূর্ণ দূর না হইলেও এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে।

স্বাগতম্

আনন্দবাজার পত্রিকা নীচের বিবৃতি দিয়াছেন :

"পুরুলিয়ার লোকসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ নেতা শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত দশ বৎসর ধরিয়া বিহার বিধানসভার সদস্য থাকাকালে বিহারের বাংলা ভাষাভাষী এলাকাগুলি পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং বিহারে বাঙালীদের জন্য বাংলা ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা করার নিমিত্ত ক্রমাগত দাবি জানাইয়া আসিয়াছেন। এই দাবি উত্থাপন এবং এতৎসম্পর্কে আন্দোলন করার জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যাচার ও দুঃখবরণ করিয়াছেন।

পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়ায় পুরুলিয়ার অংশ হইতে নির্ব্বাচিত বিহার বিধানসভার সদস্যগণ এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। পুরুলিয়ার মোট আট জন সদস্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য বলিয়া গণ্য হন এবং সোমবার তাঁহাদের মধ্যে সাত জন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া পূর্ণিয়ার কিষেণগঞ্জের দুই জন সদস্য ঐদিন বিধানসভায় অনুপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিবার পর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি বিধানসভার লোকসেবক সঙ্ঘের দলনেতা শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার মনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, "৪৪ বৎসর পর মায়ের কোলে ফিরে এসেছি। যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমি হয়েছি, মায়ের একজন অধম সন্তানরূপে তা রক্ষার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।"

নেতাজীর নামে শিশুমেধ যজ্ঞ

নেতাজীর নামে যাঁহারা নির্ব্বাচন বাবিধি উত্তীর্ণ হইতে চাহেন তাঁহাদের কার্য্যক্রম কিরূপ তাহার পরিচয় নীচের সংবাদে পাওয়া যাইবে। উহা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত :

"বুধবার রাত্রে নেতাজী জন্মোৎসব উপলক্ষে মশাল-শোভাযাত্রা পরিচালনাকালে মহাজাতি সদনের সম্মুখে শোচনীয় দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে একটি বালক বৃহস্পতিবার সকালে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করে। তাহার নাম শঙ্কর কুণ্ডু, বয়স আট বৎসর, নিবাস ১৪।৫, জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট। প্রকাশ, শঙ্কর ঐ দুর্ঘটনায় পদতলে পিষ্ট হইয়া আহত হয়। আহতদের মধ্যে আরও ৫।৬ জনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলিয়া প্রকাশ। উহাদের মধ্যে কয়েকজন দগ্ধ হইয়া আহত হয়।

ইতিমধ্যে জানা গিয়াছে যে, বালক-বালিকাদের লইয়া ঐ মশাল-শোভাযাত্রা বাহির করিতে যাহারা প্রকৃত দায়ী এবং ঐ দুর্ঘটনাকালে যাহারা ধাক্কাধাক্কি সুরু করিয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয়, পুলিস তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছে। পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, বিনা অনুমতিতে এরূপ মশাল-শোভাযাত্রা বাহির করা, বিশেষতঃ বালক-বালিকাদের লইয়া—শোচনীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, এবার নেতাজী জন্মোৎসব সম্পর্কে পুলিস কোন মশাল-শোভাযাত্রা বাহির করার অনুমতি দেয় নাই।

বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদপত্রে ঐ মর্ম্মান্তিক ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর কলিকাতায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করিয়া জোড়াসাঁকো থানার সন্নিকটে এই ধরনের শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটায় রাইটার্স বিল্ডিংস ও লালবাজারের কর্ত্তৃপক্ষমহলে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। অধিকন্তু বৃহস্পতিবার আহতদের মধ্যে একটি বালকের মৃত্যু হওয়ায় ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ, কর্ত্তৃপক্ষমহল ঐ দুর্ঘটনার আশু সম্বন্ধে জোর তদন্ত করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে অনুরূপ ঘটনা আর না হয় তজ্জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন।"

নেহরু ও কম্যুনিষ্ট পার্টি

"বোম্বাই, ২০শে জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য চৌপট্টিতে এক জনসভায় বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যের উদ্বোধন করিয়া ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আক্রমণ করিয়া বলেন, বর্ত্তমানে উক্ত দল 'চিন্তার ক্ষেত্রে দেউলিয়া' হইয়া গিয়াছে এবং 'দেশে ঘৃণা, অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা' সৃষ্টিই উহার প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কম্যুনিষ্টদের মেহনতী জনগণের একাধিপত্যের কথা অর্থহীন ও বাগাড়ম্বর মাত্র।

তিনি বলেন, আমি কম্যুনিষ্টদের চ্যালেঞ্জ করিতেছি যে, তাহারা মেহনতী জনতার উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় কোথাও তাহা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, ভারতে কম্যুনিষ্টদের অনুগামী খুবই কম এবং তাহারা যদি ক্ষমতা পায় তবে গৃহযুদ্ধ ও জনগণের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দিবে এবং তাহার ফলে দেশ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

পাঁচ লক্ষাধিক লোকের সভায় একশত দশ মিনিট বক্তৃতায়

শ্রীনেহরু বলেন, এই দেশে কম্যুনিষ্টরা গোলযোগ ও বিভেদই চায়। যে-কোন উপায়ে তাহারা ক্ষমতা হস্তগত করিতে চায়।

নয়া পয়সা

নিম্নে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি সকলেরই জানা প্রয়োজন।

"নয়াদিল্লী, ৯ই ফেব্রুয়ারী—আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৫৭) ভারতের সকল ট্রেজারি, সাব-ট্রেজারি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সকল আপিস ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সকল শাখা, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দরাবাদ ও ব্যাঙ্ক অব মহীশূরে প্রচলিত পয়সার পরিবর্তে দশমিক মুদ্রা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

বর্ত্তমানে এক পয়সা, দুই পয়সা, এক আনা ও দুই আনার যে মুদ্রাগুলি বাজারে চালু আছে সেইগুলি আগামী তিন বৎসর পর্য্যন্ত চালু থাকিবে। প্রচলিত মুদ্রাগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার জন্য ট্রেজারিতে বেশী ভিড় করিবার প্রয়োজন কিংবা কোনও ট্রেজারিতে বা ব্যাঙ্কে দশমিক মুদ্রার অভাব দেখিলে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই।

টাকার মূল্য বর্ত্তমানের অনুরূপ থাকিবে, কিন্তু এক টাকায় ৬৪ পয়সা বা ১৯২ পাই না হইয়া ১০০ নয়া পয়সা হইবে। আধুলি ও সিকি অর্দ্ধ টাকা ও সিকি বলিয়া চলিতে থাকিবে এবং সেইগুলির পরিবর্ত্তে যথাক্রমে ৫০ ও ২৫টি নয়া পয়সা পাওয়া যাইবে।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জয়ন্তী

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম জানেন না, বাংলা দেশে এরূপ লোক বিরল। গত শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি আবির্ভূত হন। বাংলা সাহিত্যের চর্চা তখন সবেমাত্র নূতন ভাবে সুরু হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র ইহার সেবায় সেই যুগেই আত্মনিয়োগ করিয়া বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের সাহিত্য-সাধনায় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার গুরুস্থানীয় ছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-চর্চ্চায় ঈশ্বর গুপ্ত দ্বারা যে কতখানি অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হইয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জীবনী ও কবিত্ব' প্রবন্ধে এই ধরনের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র সুবিখ্যাত কুমারহট্টের (বর্ত্তমান হালিশহর) উত্তরাংশে কাঞ্চনপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী শিক্ষালাভার্থে তিনি কলিকাতায় আসেন, কিন্তু এ শিক্ষা তাঁহার বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। তিনি আজীবন বাংলানবিস ছিলেন, এবং বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়াই জীবনপাত করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকরে'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। এই সংবাদপত্রখানির মাধ্যমে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধু ব্যতীত আরও বহু নব্যশিক্ষিতকেও সাহিত্যসেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা দেশের শেষ খাঁটি বাঙালী কবি—বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টি অতি সুন্দর ভাবে তাঁহার উপরি-উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা এবং বাঙালীর যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহা গদ্য-পদ্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধে তাঁহার রচনা ভরপুর ছিল। তিনি আজীবন সংবাদপত্রের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সংবাদ প্রভাকর বাদে আরও কয়েকখানি লঘু-ছন্দের পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। 'হিত প্রভাকর', 'প্রবোধ প্রভাকর', 'বোধেন্দুবিকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। বাংলা সাহিত্যে গবেষণার সূত্রও তিনি প্রথম দর্শান। তিনি রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, রামনিধি গুপ্ত, রাম বসু, হরু ঠাকুর ও অন্যান্য কবি এবং কবিওয়ালা সম্পর্কে বহু অনুসন্ধান করিয়া বিস্তর তথ্য উদ্ঘাটন করেন। নিজ 'সংবাদ প্রভাকরে' এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থলে গমন করিয়া তিনি তথাকার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। এসমুদয়ও ক্রমে প্রভাকরে বাহির হয়। সংবাদপত্রের সেবা মারফত তিনি উচ্চ সাংবাদিক আদর্শও স্থাপন করিয়া যান। জন্মভূমি কাঞ্চনপল্লীতে কবিবরের জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন হইতেছে। এই আয়োজন সর্ব্বপ্রকারে সমীচীন। আমরা এই উৎসবের সাফল্য কামনা করি।

পরলোকে রাজমোহন সেন

গণিতশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত মনীষী রাজমোহন সেন ৯৮ বৎসর বয়সে গড়িয়াহাট রোডে অবস্থিত নিজ বাসভবনে সম্প্রতি পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তিনি ৮৮ বৎসরবয়স্কা পত্নী শ্রীযুক্তা নিশিতারা দেবী, পুত্র অধ্যক্ষ শ্রী বি. এম. সেন আই-ই-এস (অবসরপ্রাপ্ত), পৌত্র শ্রী এম. এম. সেন আই. সি. এস. ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। এইদিন কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

রাজমোহন সেন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৯ সনে জুন মাসে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের আমোদিয়া গ্রামে। সেই গ্রামেই তাঁহার বাল্যশিক্ষার সূচনা হয়। তিনি ১৮৭৮ সনে ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

রাজমোহন ১৮৭৯ সনে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ এবং ১৮৮১ সনে ঐ কলেজ হইতেই ৪০৲ টাকা বৃত্তিসহ বি-এ পাস করেন। ১৮৮২ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঐ বৎসর একই পরীক্ষায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে কে. পি. বসু ও যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এই দুই জনও বিখ্যাত গণিতজ্ঞ।

এম-এ পরীক্ষায় ঐ বৎসরেই রাজমোহন ঢাকা কলেজে গণিতের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। পরবর্ত্তী বৎসর তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বদলী হন। ঐ বৎসরেই তিনি রাজসাহী কলেজের গণিতের প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। একাদিক্রমে দীর্ঘ ৩৬ বৎসর অধ্যাপনার পর ১৯১৯ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

রাজমোহন একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারের ওস্তাদ মীর্জ্জার নিকট হইতে তিনি নিয়মিত সেতারবাদন শিক্ষালাভ করেন।
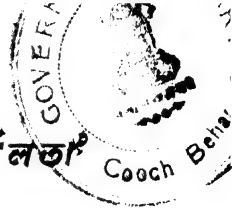
কালিদাস সাহিত্যে 'লতা'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাস তাঁহার কাব্যনাটকগুলির স্থানে স্থানে 'লতা'কে উপমান করিয়া রূপসী নারীদের বর্ণনা দিয়াছেন, এখানে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দেখানো গেল।

'কুমারসম্ভবে'র একটি বর্ণনা—গৌরী আসিয়াছেন শিব-পূজা করিতে, শিবের তপোবন সহসা সেদিন পুষ্পে পুষ্পে ভরিয়া উঠিয়াছিল দেখিয়া তাঁহার সখীরা তাঁহাকে নানারকম পুষ্পের আভরণে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। নানা বর্ণের পুষ্পে সজ্জিতা হইয়া ও নবোদিত রবির বর্ণের মত লাল রঙের বস্ত্র পরিয়া গৌরী যখন বক্ষের ভারে কিঞ্চিৎ আনতা হইয়া চলিতেছিলেন, তখন মহাকবি তাঁহার রূপের বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন ঃ

'পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥' (কু-৩।৫৭)

যেন পুষ্পে পুষ্পে ভরা লালরঙের পল্লবশোভিতা, পুষ্প-স্তবকের ভারে কিঞ্চিৎ আনতা একটি লতা চলিয়া বেড়াই-তেছে।

লতার সহিত রূপসী নারীদের উপমা 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'ও পাওয়া যায়। মহর্ষি কণ্বের তপোবনে বল্কলপরিহিতা শকুন্তলা ও তাঁহার দুই সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদার অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রাজা দুষ্মন্ত মনে মনে বলিতেছেন, "দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ" (শকু-১ম অঙ্ক), এহেন রূপ যাহা রাজাদের অন্তঃপুরেও দুর্লভ, তাহা যদি আশ্রমবাসীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বলিতেই হইবে যে, বনের লতাদের গুণের কাছে উদ্যানলতারাও পরাজিত হইল।

বনের লতাদের যেমন কেহ যত্ন করিতে যায় না, তেমনি শকুন্তলা ও তাঁহার সখীরা মুনির আশ্রমে লালিতাপালিতা হইয়াছিলেন বলিয়া আদর যত্ন পাওয়া তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, কৃত্রিম সাজসজ্জা কি বস্তু তাহাও তাঁহারা জানি-তেন না, তবু তাঁহাদের সে স্বাভাবিক রূপলাবণ্যের যেন তুলনা ছিল না। দুষ্মন্তের মত রাজাকেও স্বীকার করিতে হইল যে, রাজান্তঃপুরেও এ অপরূপ রূপ নয়নগোচর হয় না, রাজান্তঃপুরের নারীরা—যাঁহারা সৌখীন পুরুষের সখের বাগা-নের সযত্নে পালিতা লতাদের মত অতি সমাদরে জীবনযাপন করেন, নানা রকমের বিলাসের ও প্রসাধনের সামগ্রী ব্যবহার করিতে পান, তাঁহাদের রূপও এ স্বাভাবিক রূপের কাছে কিছুই নয় বলিয়া মনে হয়।

মহাকবি কেবল বনলতার সহিত শকুন্তলার দেহসৌন্দর্যের উপমা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পুষ্পিতা লতার সহিত তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও তুলনা অতি সুন্দর ভাবে দিয়াছেন। নিম্ন-লিখিত শ্লোকে তিনি বলিতেছেন ঃ

অধরকিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহু।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥ (শকু-১ম অ)

অধরটিতে নবপল্লবের অরুণিমা, বাহু দুইটি কোমল-শাখার অনুসরণ করিয়া রহিয়াছে। আর সারা অঙ্গে যেন পুষ্পের মত লোভনীয় যৌবন লেপিয়া গিয়াছে।

শকুন্তলার অধরোষ্ঠ ছিল নবপল্লবের মত লাল, বাহু দুইটি লতার কোমল শাখার মত কোমল ও সুন্দর, আর পুষ্পে পুষ্পে ভরিয়া আসিলে লতাকে যেমন অতি মনোহর দেখায়, সারা অঙ্গ নবযৌবনের সুষমায় মণ্ডিত হওয়ায় তাঁহাকেও সেইরূপ মনোহারিণী দেখাইতেছিল।

মহাকবি যেমন 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'র সহিত গৌরীর ও 'বনলতা'র সহিত শকুন্তলার উপমা দিয়াছেন, তেমনি 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' নাটকে উৎকণ্ঠিত-হৃদয়া ও ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণা নায়িকা মালবিকার উপমা দিয়াছেন 'কুন্দলতা'র সহিত। কুন্দলতার যেটুকু বিবরণ দিয়াছেন মহাকবি, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, কুন্দলতার পুষ্প পাণ্ডুবর্ণের ও তাহাতে পুষ্প ফোটে বসন্তের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে, বসন্তের উন্মেষের পর কুন্দলতার পত্রগুলি পরিণতপত্র হইয়া যায় এবং পুষ্পও মাত্র কয়েকটিতে পর্যবসিত হয়।

মালবিকা যাঁহাকে মনে মনে দেহমনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহার সহিত মিলনের আশা অতি ক্ষীণ বুঝিতে পারিয়া দুর্ভাবনায় পাণ্ডুবর্ণা হইয়া যাইতেছিলেন, বেশভূষার পারিপাট্য বা অলঙ্কারধারণের সাধ তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়, এ অবস্থায় মহাকবি বলিতেছেন—"কপোলদেশ পাণ্ডু-বর্ণ, দেহে আভরণ ধারণ করিয়া আছেন অতি সামান্যই, দেখিলে মনে হয় যেন, বসন্তকালের পরিণতপত্রবিশিষ্টা, মাত্র কয়েকটি পুষ্পাবশিষ্টা কুন্দলতা।"

নববসন্তের আগমনেও কুন্দলতা পাণ্ডুবর্ণা, পুষ্পশোভাও অতি ক্ষীণ, সুতরাং নবযৌবনেই পাণ্ডুবর্ণা ও অতি সামান্য

অলঙ্কারধারিণী মালবিকার উপমা কুন্দলতার সহিত দেওয়া অত্যন্ত সমীচীন হইয়াছে বলিতেই হইবে।

কুন্দলতা ছাড়া আরও একটি লতা 'অতিমুক্তা লতা'র সহিত মালবিকার উপমা পাওয়া যায়। মহাকবির টীকাকার মল্লিনাথ অতিমুক্তা লতাকে বলিয়াছেন 'মাধবীলতা'। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের চতুর্থ অঙ্কে অগ্নিমিত্র তাঁহার আকাঙ্ক্ষিতা ও প্রেয়সী মালবিকাকে তাঁহাদের 'সমুদ্রগৃহে'র একটি নির্জন কক্ষে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "আমি আম্রবৃক্ষের মত হইয়াছি, তুমি এবার মাধবীলতার মত আচরণ করিতে থাক।"

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই, মালবিকা যখন দুর্ভাবনায় পাণ্ডুবর্ণা হইয়া গিয়াছিলেন, কালিদাস তাঁহার সে সময়কার রূপবর্ণনায় কুন্দলতার সহিত উপমা দিয়াছিলেন, তারপর যখন তিনি বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার প্রিয়ের ভালবাসা লাভ করিবার সুযোগ পাইলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার বর্ণ আর পাণ্ডুর ছিল না, সৌভাগ্যের পুলকে তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাই মহাকবি এবার কুন্দলতার সহিত তাঁহার উপমা দিলেন না, দিলেন মাধবীলতার সহিত।

'রঘুবংশে' কালিদাস 'অশোকলতা'র সহিত রাজভগিনী ইন্দুমতীর উপমা দিয়াছেন। অশোকলতার পুষ্পগুলি রক্তাভ আর ইন্দুমতীর ছিল দুধ-আলতায় ধোওয়া রং, সুতরাং উভয়ের সাদৃশ্য দেখানো যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে সন্দেহ নাই। মহাকবি বলিতেছেন—

'হস্তেন হস্তং পরিগৃহ্য বধ্বাঃ
স রাজসূনুঃ সুতরাং চকাশে।
অনন্তরাশোকলতা প্রবালং
প্রাপ্যেব চূতঃ প্রতিপল্লবেন ॥' (রঘু-৭,২১)

রাজকুমার (অজ) যখন বধূর হাতখানি নিজের হাত দিয়া ধরিয়া রহিলেন, আমগাছ তাহার পল্লবদ্বারা নিকটস্থ অশোকলতার পল্লব গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহাদের যেরূপ শোভা হয়, তাঁহাকেও সেইরূপ রমণীয় দেখাইতে লাগিল।

মহাকবি যেমন পাণ্ডুবর্ণা তরুণীর কুন্দলতার সহিত, মনোমুগ্ধকর রূপসীর মাধবীলতার সহিত, রক্তাভবর্ণা যুবতীর অশোকলতার সহিত উপমা দিয়াছেন, তেমনি যে নারী শ্যামাঙ্গিনী—গৌরবর্ণা বা গোলাপী আভাযুক্তা নহেন, তাঁহার উপমা দিয়াছেন 'শ্যামা' বা 'প্রিয়ঙ্গুলতা'র সহিত। 'মেঘদূতে'র বিরহী যক্ষের প্রিয়া যে শ্যামাঙ্গিনী ছিলেন, তাহা তাঁহার স্বামী নিজের মুখে বলিয়াছেন, 'তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা' ইত্যাদি বাক্যে। সুতরাং 'উত্তরমেঘে'র ৪৩শ শ্লোকে তিনি যখন বলিলেন, 'শ্যামাস্বঙ্গং' অর্থাৎ 'শ্যামা' লতায় তোমার অঙ্গের সাদৃশ্য দেখিয়া থাকি, তখন বুঝিতে হইবে 'শ্যামা' বা 'প্রিয়ঙ্গুলতা'র বর্ণ কালো বলিয়া যক্ষপত্নীর দেহটি শ্যামবর্ণা ও লতার মতই সুকোমল ছিল। প্রিয়ঙ্গুলতা যে শ্যামবর্ণা তাহা জানিতে পারা যায় 'নবগ্রহের স্তোত্র হইতেও, বুধগ্রহের বর্ণনা দেওয়া আছে 'প্রিয়ঙ্গুকলিকা শ্যামং'—প্রিয়ঙ্গুলতার মত ময়লা রংবিশিষ্ট।

'বিক্রমোর্বশী' নাটকেও মহাকবি লতার সহিত রূপসী নারীদের উপমা দিয়াছেন, দৈত্যদের হাত হইতে অপ্সরা উর্বশীকে উদ্ধার করিয়া পুরূরবা যখন তাঁহাকে নিজের রথে বসাইয়া তাঁহাকে তাঁহার সখীদের নিকট সমর্পণ করিয়া দেওয়ার জন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তখন সারথিকে বলিতেছেন 'সখীভির্যাতি সম্পর্কং লতাভিশ্রীরিবার্ত্তবী' (বিক্রম-১ম অঙ্ক), অর্থাৎ 'বসন্তলক্ষ্মী যেভাবে লতাদের সহিত মিলিতা হন, ইনিও তেমনি সখীদের সহিত মিলিতা হইবেন'। এখানে বসন্তলক্ষ্মীর সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে উর্বশীর আর বসন্তকালের পুষ্পিতা লতাদের সহিত উর্বশীর বান্ধবীদের। তাঁহারাও যে সকলে পুষ্পিতালতার মত কমনীয়া ও সৌন্দর্যশালিনী ছিলেন ইহাই মহাকবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। উর্বশীর তুলনা স্বয়ং বসন্তলক্ষ্মীর সহিত দেওয়াতে তিনি যে তাঁহার সখীদের অপেক্ষা অতুলনীয় রূপে রূপসী ছিলেন, ইহাই বুঝা যাইতেছে।

উমার বিবাহের দিন, যখন তাঁহাকে ক'নে সাজানো হইল, উমার সে অনুপম বধূবেশের বর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবি পুষ্পিতা লতার উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, উমাকে তখন কিরূপ দেখাইতেছিল? মহাকবি বলিতেছেন, যেমন দেখায় লতাকে যখন সে পুষ্পে পুষ্পে ভরিয়া থাকে ('সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব), তারপর আবার বলিতেছেন, যেমন দেখায় উজ্জ্বল নক্ষত্রে ভূষিতা রাত্রিকে (জ্যোতির্ভিরুদ্ভিরিব ত্রিযামা), কিন্তু ইহা বলিয়াও যেন তিনি তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাই আবার বলিলেন, যেমনটি দেখায় নদীকে, যখন তাহার বক্ষে পাখীরা ভাসিয়া থাকে ('সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীয়মানৈঃ')।

মহাকবি বধূবেশিনী উমার রূপ তিনটি উপমা দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু মল্লিনাথের ব্যাখ্যা পড়িলে মনে হয়, তাঁহার মতে পুষ্পিতা লতার উপমা মুখ্য উপমা, অপর দুইটি তাহারই পরিপূরক। 'উজ্জ্বলনক্ষত্রভূষিতা রাত্রি' বলাতে বুঝিতে হইবে অলঙ্কারের মধ্যে নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল মুক্তাবলী, আর পক্ষিযুক্ত স্রোতস্বিনীর পক্ষী অর্থে সোনালী রংবিশিষ্ট চক্রবাক পাখী, সুতরাং তাঁহার মতে এখানে পক্ষিযুক্ত স্রোতস্বিনীর অর্থ বুঝিতে হইবে উমার দেহের স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কারগুলি।

পুষ্পিতা লতার শোভার সহিত মহাকবি যেমন রূপসী নারীদের উপমা দিয়াছেন, তেমনি আবার ঝড়ে উৎপাটিতা

শ্রীহীন লতাকে উপমান করিয়া দুর্দশাগ্রস্তা নারীদেরও বর্ণনা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ যখন রামের আদেশে সীতাকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমের সন্নিকটে লইয়া গিয়া রাম যে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এই কথাগুলি কোনও গতিকে শুনাইয়া দিলেন, তখন রামের সে মর্মঘাতী আদেশ শুনিয়া সীতার কি অবস্থা হইল জানাইবার জন্য মহাকবি বলিতেছেন :

'স্বমূর্তিলাভ প্রকৃতিং ধরিত্রীং
লতেব সীতা সহসা জগাম॥' (রঘু-১৪।৫৪)

এই অপমানরূপ ঝটিকায় অভিহতা হইয়া সীতা সহসা (ঝড়ে উৎপাটিতা) লতার মত তাঁহার জননী বসুন্ধরার বক্ষে লুটাইয়া পড়িলেন, তাঁহার দেহের অলঙ্কারগুলি পুষ্পের মত ছড়াইয়া পড়িল।

এখানে মহাকবি কেবল যে ঝড়ে উৎপাটিতা লতার সহিত অপমানের নিদারুণ বেদনায় মর্মাহতা সীতার ভূমির উপর সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িয়া যাওয়ার উপমা দিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার দেহ হইতে ভ্রষ্ট অলঙ্কারগুলিকেও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া পুষ্পের সহিত উপমা দিয়া 'উপমা কালিদাসস্য' বাক্যটির সার্থকতা রক্ষা করিয়াছেন।

অনেকটা এই ধরনের একটি উপমা 'রঘুবংশে'র চতুর্দশ সর্গেই পাওয়া যায়। চতুর্দশ বৎসর পরে রাম ও লক্ষ্মণ যখন বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের জননী কৌশল্যা এবং সুমিত্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন জননীদের যে শোচনীয় অবস্থা তাঁহারা দেখিলেন, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন, 'ছেদাদিবোপঘ্ন তরো ব্র'তত্যৌ' (রঘু-১৪।১), বৃক্ষকে কাটিয়া ফেলিয়া দিলে তাহার আশ্রিতা লতার যে দশা হয়, স্বামী দশরথের শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁহাদেরও সেইরূপ দশা হইয়াছিল।

দশা তাঁহাদের কিরূপ হইয়াছিল, মহাকবি তাহা স্পষ্ট ভাবে কিছুই বলিলেন না, কিন্তু যে উপমাটি এখানে ব্যবহার করিলেন তাহা দ্বারা জননীদের অবস্থার সবকিছুই বলা হইয়া গেল।

'বিক্রমোর্বশী' নাটকে লতায় রূপান্তরিতা উর্বশীর একটি অতি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায়। তখন বর্ষাকাল উর্বশীর প্রিয়তম পুরূরবা লতার নিকটে গিয়া ভূমির উপর বসিয়া লতাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনে বলিতেছেন :

মেঘের জল পড়ায় শীর্ণা লতাটির পল্লব ভিজিয়া গিয়াছে, দেখিয়া মনে হইতেছে যেন লতারূপী প্রিয়ার অধর অভিমানের অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া রহিয়াছে ; পুষ্প উদ্গমের কাল আর নাই, লতা তাই পুষ্পহীনা, দেখাইতেছে যেন প্রিয়া তাঁহার দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে ; পুষ্প নাই, সুতরাং মধুকরও নাই, তাহাদের গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায় না, মনে হয় প্রিয়া বুঝি চিন্তায় মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, কথা কহিতেছে না ; 'চরণতলে আমি যে পড়িয়া রহিয়াছি রোষভরে প্রিয়া যেন দেখিয়াও দেখিতেছে না।'

(বিক্রম—৪র্থ অঙ্ক)

পুরূরবার মানসচক্ষে উর্বশীর অভিমানিনী রূপটি ভাসিয়া উঠিতেছিল বলিয়া, যে লতায় তিনি পরিণতা হইয়া গিয়াছিলেন তাহার দিকে চাহিয়া সেই ভাবটি তিনি ব্যক্ত করিতেছেন।

মহাকবি লতাকে যে সকল স্থানে উপমান করিয়াছেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে উপমেয়ও করিয়াছেন। 'রঘুবংশে'র নবম সর্গে নর্তকীদের হাত নাড়িয়া নৃত্যকে উপমান করিয়া তিনি লতাদের বায়ুভরে কিশলয়কম্পনের একটি অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন, বসন্ত বর্ণনা করিতে করিতে তিনি বলিতেছেন :

'উপবনান্তলতাঃ পবনাহতৈঃ
কিশলয়ৈঃ সলয়ৈরিব পাণিভিঃ॥' (রঘু-৯।৩৫)

উপবনের সীমানায় লতাগুলির কিশলয় বায়ুর প্রভাবে নড়িতেছে, দেখাইতেছে যেন নর্তকীরা বুঝি লয়ের ছন্দে হাত দোলাইয়া নৃত্য করিতেছে।

আর একটি বর্ণনায় মহাকবি বলিতেছেন :

'অবাকিরন্ বাললতাঃ প্রসূনৈ
রাচার লাজৈরিব পৌরকন্যাঃ॥' রঘু-২।১০

বাতাস লাগিয়া ছোট ছোট লতাগুলির পুষ্প উড়িয়া গিয়া দিলীপ রাজার দেহের উপর পড়িতেছিল, দেখাইতেছিল যেন শহরের মেয়েরা রাজাকে যাইতে দেখিয়া তাঁহার উপর খই নিক্ষেপ করিয়া দেশাচার পালন করিতেছে।

'রঘুবংশে'র ষষ্ঠ সর্গে মহাকবি মলয় পর্বতের বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'পাণলতা' ও 'এলাচলতা'র উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন :

'তাম্বুলবল্লীপরিণদ্ধপুগা
স্বেলালতালিঙ্গিত চন্দনাসু।' (রঘু-৬।৬৪)

সেখানে পাণলতারা সুপারি বৃক্ষগুলিকে জড়াইয়া থাকে, আর এলাচলতারাও চন্দনতরুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে।

শিশুশিক্ষার নব রূপায়ণ

শ্রীচারুশীলা বোলার

শিশু-মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমার কারবার চাকরি ব্যপদেশে। কি শিশু-শিক্ষণের ক্ষেত্রে, কি শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে আমাকে অনেক সময় এমন অনেক সমস্যার কথা ভাবতে হয়েছে যার সমাধান শুধু বই পড়ে করা যায় না। যাঁদের কাছে থেকে আমরা আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করেছি তাঁরা বাস্তবিক কেমন করে সেই সব সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করছেন এবং তাঁদের দেশের সমস্যার সঙ্গে আমাদের এই নূতন স্বাধীনতা-পাওয়া দেশের সন্তানদের সমস্যার তফাৎ কোথায় সেই সব নিজের চোখে দেখে আসবার ইচ্ছা বহুকাল মনে ছিল। তাই গিয়েছিলাম গ্রেট ব্রিটেনের শিশু-প্রতিষ্ঠানগুলি দেখতে। তবু লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশনে ভর্তি হয়েছিলাম তাঁদের সাহায্যে আমার উদ্দেশ্য সফল করা সহজ হবে এই মনে করে। সে সাহায্য তাঁদের কাছ থেকে আমি বহুল পরিমাণেই পেয়েছি এবং তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি। তাই আজ আমাদের দেশের সন্তানদের পিতামাতার কাছে ঐ দেশের শিশুদের লালন ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ মানুষকে গড়ে তোলার আন্তরিক চেষ্টার একটা নক্সা দেবার চেষ্টা করব।

গ্রেট ব্রিটেনে প্রথম নার্সারী স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন; আর আমেরিকায় প্রথম নার্সারী স্কুল স্থাপিত হয় মনস্তত্ত্ব গবেষণার পরিকল্পনায়। আমেরিকায় মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুদের ওপর দিয়ে এই কাজের সুরু হয়। বর্তমানে আমেরিকায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্যেও নার্সারী স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আবার এদিকে ইংলণ্ডে উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুদেরও নার্সারী স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়।

গত কুড়ি বৎসর যাবৎ সমস্ত পৃথিবীতে শিশুশিক্ষা-রূপায়ণের একটা বিরাট আন্দোলন চলছে—বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে। দেশের নারীরা যখন কলকারখানার কাজে ভর্তি হ'ল তখন তাদের শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজন-বোধে বহু 'ক্রেশ', নার্সারী স্কুল এবং শিশুবিদ্যালয় ইত্যাদি খোলা হয়। এই সব বিদ্যালয়ে একটি সুস্থতর পরিবেশে শিশুদের কেবল শিক্ষা নয়—দেহমনের স্বাস্থ্যের জন্যও যত্ন নেওয়া হয়। তা না হলে মজুর পিতামাতার অনুপস্থিতিতে শিশুগুলিকে—অর্থাৎ দেশের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের সব দিক দিয়ে বঞ্চিত হয়ে থাকতে হ'ত।

১৯১৮ সনের 'ফিশার বিল'-এ ২—৫ বৎসরের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সুপরিকল্পিত সুপারিশপত্র পেশ করা হয়। পরামর্শ সমিতি সেগুলির মীমাংসা এই ভাবে করেন: "পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের দায়িত্ব সরকারের নিজে গ্রহণ করা উচিত এবং যথোচিত ব্যবস্থা যথাশীঘ্র করা প্রয়োজন। এর জন্য নার্সারী স্কুল স্থাপন বিশেষ আবশ্যক এবং পরিচালনার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকার প্রয়োজন। কেবল শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি নয়—কিন্তু মানসিক ও অনুভূতিঘটিত বিকাশের জন্যেও বিশেষ যত্নের দরকার। সুতরাং নার্সারী স্কুলের উপযুক্ত বাড়ী, বাগান, সরঞ্জাম, উপকরণ ও স্বাস্থ্যগঠনের উপযুক্ত নীতির আবশ্যক। আরও চাই শিশুর গৃহের সঙ্গে স্কুলের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। কিন্তু এই বয়সের শিশুদের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা ঠিক হবে না।"

এই গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশপত্র ইংলণ্ডের 'জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি'র অত্যাবশ্যক ভিত্তিস্থাপনের পথ নির্দেশ করে এবং জাতীয় জীবনের একতাকে দৃঢ় করে। নানা কারণে সুপারিশপত্রটি দশ বৎসরেও সম্পূর্ণ কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু চিকিৎসকের পরীক্ষায় দেখা গেল—বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় এক-তৃতীয়াংশ শিশু কমবেশী অসুস্থ, যেটা প্রতিরোধ করা সম্ভবপর। আরও দেখা গেল যে, জন-সাধারণের অর্থভাণ্ডার (Public Fund) থেকে কিছু টাকা দিবা-মাতৃকাপীঠের (Day Nursery) এবং অন্যান্য শিশুদের (যাদের মায়েরা সারাদিন বাইরে কাজে থাকে) জন্যে পৃথক্ রাখা প্রয়োজন। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈন্য ভর্তি করার সময় পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, শৈশব অবস্থায় যথোচিত লালন-পালনের অভাবে তারা উপযুক্ত রকমে কষ্টসহিষ্ণু, দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। এ ছাড়া বহু শিক্ষাবিদ ও মনোবিদের গবেষণার ফলে এই বয়সের শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তাবোধ অনেকের মনে জাগে। এ বিষয়ে রেচেল ও মার্গারেট ম্যাকমিলানের দান শিশু-শিক্ষা-ক্ষেত্রে অতুলনীয়। এই দুই বোনের অক্লান্ত পরিশ্রমের

সফলতা আজ শিক্ষাক্ষেত্রে রূপ গ্রহণ করেছে। প্রথম মুক্তবায়ু মাতৃকাপীঠ (Open-air Nursery School) এঁরা স্থাপন করেন। এক্ষেত্রে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টাও স্মরণীয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে নার্সারী স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সর্বসাধারণের মনে সাড়া দেয়। ১৯২৯ সনে কিছু উৎসাহও পাওয়া যায়। ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে চলতে থাকে এই বয়সের শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা। অবশেষে ১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইনের একটি দফায় স্থানীয় অভিভাবকদের উপর নার্সারী স্কুলের ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৩৮ সনে যে সব নার্সারী স্কুল খোলা হয়, ১৯৩৯ সনে যুদ্ধ সুরু হওয়াতে সেগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য ব্যবস্থাগুলিও কার্যকরী হয়ে ওঠা সম্ভবপর হয় নি। যুদ্ধান্তে শিশুদের ভিতর নানারকম সমস্যা দেখা যায়, যার ফলে কেবল সাধারণ নার্সারী স্কুল নয়, কিন্তু শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের নার্সারী স্কুল খোলা হয় এবং শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে কেবল শিক্ষিকার ব্যবস্থা নয়, ডাক্তার, মনোবিদ্‌ প্রভৃতির ওপরেও গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

ইংলণ্ডে ২—৫ বৎসরের শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা মনে হয় বহু দেশ অপেক্ষা অগ্রসর। বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে সরকারী অবৈতনিক মাতৃকাপীঠের সংখ্যা ৪৮৪, যেখানে ২৩,৪৬৯ শিশুর শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে। আরও ২০টি স্কুল সরকার থেকে সরাসরি অর্থসাহায্য পায়, যেখানে ৮১৮টি শিশুর জন্যে ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে আটটি স্কুলকে দক্ষ (efficient) এবং স্বাধীন (independent) বলে স্বীকার করা হয়েছে। সেখানে ২৬৭টি শিশুর ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়াও ১,৯৬৫টি নার্সারী শ্রেণীর ব্যবস্থা আছে যেখানে ৫৫,৬২৭ জন শিশুকে স্থান দেওয়া ও তত্ত্বাবধান করা হয়। এই সংখ্যা পরিবর্তনশীল।

শিশুকে যদি জাতীয় সম্পদ রূপে গণ্য করা হয় তবে জাতিগঠনের প্রয়োজনেই শিশুকে শক্তিশালী বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক করে তোলা দরকার। এ সত্য প্রমাণ করেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা। ইংলণ্ডে ২—৫ বৎসরের শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মাতৃকাপীঠের ব্যবস্থা আছে। রাজ্যসরকার-পরিচালিত স্কুলগুলি খুব উন্নততর। বেসরকারী মাত্র কয়েকটি স্কুল আছে যেখানে বেশী হারে বেতন নেওয়া হয়। কেবল অবস্থাপন্ন পিতামাতার পক্ষেই এই ধরনের স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের পাঠানো সম্ভব।

সরকারী স্কুলগুলির বেশীর ভাগই শহরতলীতে অবস্থিত। বাড়ীগুলি উপযুক্ত প্ল্যানে তৈরী। শিশুসংখ্যা অনুযায়ী ঘরের ব্যবস্থা এবং খেলাধুলার জন্যে প্রশস্ত স্থান আছে। এই স্কুলগুলিতে শিশুসংখ্যা ১৬৫টির বেশী নয়, এবং ৪০টির কম নয়। ১৬৫, ৯০ ও ৬০ সংখ্যার স্কুলকে 'ডাবল ইউনিট স্কুল' এবং ৪০টি শিশুর উপযুক্ত স্কুলকে 'সিঙ্গল ইউনিট স্কুল' বলা হয়। প্রত্যেক স্কুলে শিশুদের জন্যে খেলার ঘর, স্নানের ঘর, কাপড় ছাড়ার ঘর এবং কর্মচারীদের জন্যে প্রয়োজনীয় ঘরের ব্যবস্থা আছে। উপযুক্ত আসবাবপত্র, উপকরণ ও খেলাধুলার সরঞ্জাম দ্বারা ঘরগুলি সুসজ্জিত।

শিশুদের জন্যে খাদ্য ও বিশ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। সরকারের পরিচালিত রান্নাঘর এবং সেখানে সরকার নিযুক্ত পথ্যবিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত রান্নার লোকের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক শিশু দুই-তৃতীয়াংশ পাইণ্ট দুধ, বোতলে কমলা-লেবুর রস এবং কড্‌লিভার অয়েল বিনামূল্যে সরকার থেকে পেয়ে থাকে। কেবল মধ্যাহ্নভোজন বাবদ প্রত্যেক শিশুকে দৈনিক ছয় পেনি করে দিতে হয়। গার্হস্থ্যবিজ্ঞান পাস করা পথ্যবিশারদ রাঁধুনী আছেন তিনিই সাপ্তাহিক খাদ্য-তালিকা রচনা করেন।

শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ভর্তির সময়ে শিশুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়াও বছরে তিনবার প্রয়োজনমত শিশুকে পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়। নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে একদিন করে একজন নার্স আসেন এবং প্রয়োজন হলে যে-কোনও দিন তাঁকে আসতে হয়। সামান্য অসুস্থতার ভার তাঁর উপর।

ধনী-দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের শিশুর জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা একই। বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের উপর এই বয়সের শিশুদের শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। প্রতি ১২টি শিশুর জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রী। প্রতি দিনের কাজের একটি পরিকল্পনা মোটামুটি এঁরা তৈরী করে রাখেন, এবং যতদূর সম্ভব সেই ভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে তা পরিচালনা করেন।

আগেই বলা হয়েছে, সরকারী অবৈতনিক স্কুলগুলির প্রকারভেদ আছে। ফুল টাইম নার্সারী, যেখানে শিশুদের ছয়-সাত ঘণ্টা রাখা হয়, সাধারণতঃ সকাল ন'টা থেকে বিকাল সাড়ে তিনটা-চারটা পর্যন্ত। ২—৫ বৎসরের শিশুরা এখানে আসে। সব এলাকাতেই সরকার স্কুলের উপযুক্ত প্ল্যানে বাড়ী তৈরি করতে পারেন নি। তবুও যতদূর সম্ভব শিক্ষার বাধা সৃষ্টি যাতে না হয় সেই ভাবে বাড়ীগুলিকে স্কুলের উপযোগী করা হয়েছে। বস্তিপাড়ায় (Slum Area) স্থানাভাব, সুতরাং স্বল্পপরিসর জায়গায় সিঙ্গল ইউনিট স্কুল স্থাপন করা হয়েছে এবং সম্ভবমত সব রকমের ব্যবস্থা আছে।

যে সব এলাকায় মধ্যবিত্ত লোকেরা ফ্ল্যাটে বাস করে,স্কুলবাড়ী তৈরি করবার স্থান নেই সেখানে নীচের তলার কয়েকটি ফ্ল্যাট এক সঙ্গে করে স্কুলের উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। আবার এমন পাড়াও আছে যেখানে অবস্থাপন্ন পরিবারের বাসের জন্যে এক-একটি বাড়ী তৈরি করা হয়েছে, স্কুলবাড়ী তৈরি করবার আর স্থান নেই, সেখানে হয় ত ঐ রকম একটি বসতবাটীকেই স্কুলের প্রয়োজনে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। যেগুলিকে লার্জ নার্সারী স্কুল বলা হয় সেগুলি অনেকখানি জায়গা নিয়ে ঠিক নার্সারী স্কুলের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি।

ইংলণ্ডে শহর থেকে অনেক দূরের গ্রামে নার্সারী স্কুলের ব্যবস্থা নেই, কারণ সেখানে বেশীর ভাগ মায়েরাই বাড়ীতে থাকেন। বাড়ীগুলি দূরে দূরে অবস্থিত, সুতরাং নার্সারী স্কুল খোলার সার্থকতা সেখানে নেই। ইনফ্যাণ্ট স্কুলেই নার্সারী ক্লাসে চার বৎসরের শিশুদের ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সরকার গ্রামীণ পরিবেশে আদর্শ নার্সারী স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করছেন। উদ্দেশ্য—সহজ উপায়ে, কম খরচে অথচ শিশুর প্রয়োজনীয় সবকিছু বজায় রেখে বাড়ীটি তৈরি হবে। বার্কশায়ারে কুকৃহাম গ্রাম এই আদর্শে নার্সারী স্কুল স্থাপনে সাফল্য লাভ করেছে বলে মনে হ'ল।

পার্ট টাইম নার্সারী : ইংলণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এখন অনেক উন্নত। খাওয়া-পরার চিন্তা পূর্বের মত আর প্রবল নয়। বেকার-সমস্যাও সামান্য। নারীর চাকরি করার প্রয়োজন তেমন ব্যাপক নয়। সুতরাং বর্তমানে ডাক্তারেরা মনে করেন ২—৫ বৎসরের শিশুর যতটা বেশী সম্ভব মায়ের কাছেই থাকা বাঞ্ছনীয়। মাতৃকাপীঠে এত দীর্ঘ সময় কাটালে শিশুকে বহু দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। পুষ্টিকর খাদ্য, নিয়মিত বিশ্রাম, প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্ন পোশাক এবং উপযুক্ত খেলনা যদি পিতামাতা দিতে পারেন, তবে শুধু বাকী থাকে সমবয়সী খেলার সঙ্গীর—যা শিশুর জীবনে নিতান্ত প্রয়োজন। শেষোক্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্যে আজ তিন বৎসর সরকার লণ্ডনে তিনটি এবং ব্রিস্টলে দুইটি পার্ট টাইম নার্সারী স্কুল স্থাপন করেছেন পরীক্ষামূলক ভাবে। সেখানে দুই 'শিফটে' কাজ চালানো হয়। সকালে ন'টায় এক দল ছেলেমেয়ে স্কুলে আসে এবং বারোটায় চলে যায়। দুধ এবং কমলালেবুর রস বিনামূল্যে সরকার থেকেই দেওয়া হয়। বাড়ী গিয়ে তাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন ও বিশ্রাম হয়। বেলা দেড়টায় অন্য দল আসে—খাওয়া এবং বিশ্রামের পর। দুধ ও কমলালেবুর রস স্কুলেই খায়। সাড়ে চারটায় বাড়ী ফিরে যায়। এই তিন ঘণ্টা সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে দলবদ্ধ ভাবে তাদের খেলার সুযোগ দেওয়া হয়।

ডে নার্সারী : যুদ্ধের সময়ের 'এমারজেন্সি ডে নার্সারী'-গুলি যুদ্ধান্তে ক্রমে ক্রমে 'ফুল টাইম নার্সারী'তে পরিণত করা হয়। তবুও বেশ কিছুসংখ্যক ডে নার্সারী এখনও আছে। এখানে মাত্র কয়েক মাস বয়স থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের রাখা হয়। এই স্কুলগুলি স্বাস্থ্যবিভাগ (Ministry of Health) দ্বারা পরিচালিত। প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে মেট্রন বলা হয় এবং সহকারী শিক্ষয়িত্রীকে সিস্টার বলা হয়। হাসপাতাল ও শিক্ষা-বিভাগের বিশেষ ট্রেনিং এঁদের নিতে হয়। বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরাও সকলে শিক্ষাবিভাগে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তা। সাধারণতঃ ডে নার্সারীগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেই বেশী নজর দেওয়া হয়—শিশুর খেলা-ধুলার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় না। এই স্কুলগুলিতে অভিভাবকের আয় অনুযায়ী শিশুদের বেতনের ব্যবস্থা আছে। কতকগুলি বিনা ব্যয়ের স্থানও আছে। যে সব মায়েরা দীর্ঘ সময়ের জন্য বাইরে কাজ করে তাদেরই ছেলে-মেয়েরা এখানে ভর্তি হয়। সুতরাং প্রায় আট-নয় ঘণ্টা শিশুদের স্কুলে রাখতে হয়। জারজ সন্তান, বিধবার সন্তান, বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে এমন পিতামাতার সন্তান, অথবা যে সব শিশু অল্পপরিসর স্থানে বা অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করে এই রকম সব শিশুদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ভর্তির জন্য।

আবাসিক মাতৃকা পীঠ (Residential Nursery)—বহু ছেলেমেয়ে আছে যাদের লালনপালন করার কেউ নেই। এদের জন্যেই এই আবাসিক মাতৃকাপীঠ। এই স্কুলগুলিও স্বাস্থ্যবিভাগের দ্বারা পরিচালিত। এখানেও প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে মেট্রন এবং সহকারী শিক্ষয়িত্রীকে সিস্টার বলা হয়। কারণ হাসপাতালের শিক্ষাও এঁদের গ্রহণ করতে হয়। এ ছাড়াও শিক্ষাবিভাগে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীও আছেন। কয়েক মাস বয়স থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এখানে রাখা হয়। এদের এক-তৃতীয়াংশ শিশু অস্থায়ী ও দুই-তৃতীয়াংশ স্থায়ী। হয়ত মা অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ; অথবা ছেলেমেয়েকে বাপের কাছে দিয়ে কোন মা চিরদিনের জন্যে চলে গিয়েছে ; কিংবা শিশুর শৈশব অবস্থাতেই মায়ের মৃত্যু ঘটেছে ; অথবা হয় ত বাপ পঙ্গু—মাকে সারাদিন চাকরি করতে হয় ; কিংবা মা বিধবা আয় কম—প্রতিপালন করার ক্ষমতা নেই ;—এই সব পর্যায়ের শিশুদের সাময়িক ভাবে লওয়া হয় অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যেই যে-কোনও সময় অভিভাবক ইচ্ছা করলেই তাদের এসে নিয়ে যেতে পারেন। জারজ ও পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের স্থায়ী আবাসিক করে রাখা হয় এবং এই স্কুলের মেয়াদ শেষ হলে এবং শিশুর পাঁচ বৎসর পূর্ণ হলে স্কুল-

কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হ'ল তাদের অন্য আবাসিক শিশু বিদ্যাপীঠে পাঠানো।

শিশুদের সর্বপ্রযত্নে রক্ষা ও পালন করা হয়—সেখানে কোন ক্রটি যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এই স্কুলগুলি কখনও বন্ধ হয় না। সমস্ত কর্মচারীকে বোর্ডিংএই থাকতে হয়। অন্যান্য নার্সারী স্কুলের মত এখানেও শিশুদের সবরকম খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে এবং যতদুর সম্ভব একটি আপন গৃহের আবহাওয়া ও পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়। স্থায়ী আবাসিক শিশুরা পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত—এই জন্য 'uncle' ও 'aunt'-এর ব্যবস্থার একটা রেওয়াজ আছে। উদারচেতা, স্নেহপ্রবণ দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বহু লোক আছেন যাঁরা এক-একটি শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন,—নিজেদের বাড়ী নিয়ে যান, কখনও-বা বাইরে বেড়াতে নিয়ে যান, এবং প্রয়োজনমত জিনিসপত্রও দিয়ে থাকেন। নিঃসন্তান পিতামাতাও কখনও কখনও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পছন্দমত কোনও শিশুকে লেখাপড়া করে নিয়ে নেন এবং আপন সন্তানের মত প্রতিপালন করেন। কর্তৃপক্ষ এখানেও নিশ্চিন্ত থাকেন না। সরকারের শিশুরক্ষা বিভাগ থেকে কল্যাণকর্মীদের এই সব গৃহে মাঝে মাঝে পাঠানো হয় এটা পরিদর্শনের জন্যে যে, শিশুদের ওপর পালক-পিতামাতারা কোনও রকম অত্যাচার করেন কিনা।

কেবল সুস্থ সবল শিশুদের জন্যে ব্যবস্থা নয়, যে সব শিশুরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত হাসপাতালে থাকে তাদের শিক্ষার জন্যেও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। যে সকল শিশুর হৃদ্‌যন্ত্র খারাপ অথবা যাদের উপর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, অথবা দুর্ঘটনায় যারা জখম হয়েছে; ডাক্তারের চিকিৎসার পর যখন তাদের উঠে বসে কিছু করার ক্ষমতা হয় তখন বয়সোপযোগী তাদের শিক্ষা সুরু হয়। ২—৫ বৎসরের শিশুদের জন্যে উপযুক্ত সব রকম খেলনার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাবিভাগের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীও নিয়োজিত আছেন, তাঁরাই এ কাজ পরিচালনা করেন। নিয়মমত খাওয়া, বিশ্রাম, চিকিৎসা এ সবের নিধারিত সময় ছাড়া বাকী সময়টা শিশুরা খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে। স্কুল থেকে অনুপস্থিতির কারণে যে দীর্ঘ সময়টা শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা এই ভাবে পূরণ করে দেওয়া হয়।

যে সব শিশুর শারীরিক বিকলতা আছে—যেমন মূক, বধির ও অন্ধ, তাদেরও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সাধারণ নার্সারী স্কুলের অনুরূপই সে সব ব্যবস্থা বিদ্যমান। তা ছাড়া বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে।

নানা স্কুলের শিশুদের কর্মসূচী বিবৃত করে তাদের প্রতিদিনের কর্মের ছবিটা দেখানোই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তা ছাড়া আর যে সকল বিষয় বিশেষভাবে এর মধ্যে লক্ষ্য করবার রয়েছে সেইগুলি এখানে উল্লেখ করলাম :

১। প্রত্যেক শিশুর পিতামাতার সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে। (ক) পিতামাতার সঙ্গে শিশুরা স্কুলে আসে, বেশীর ভাগ আসে মায়েদের সঙ্গে। (খ) মায়েরা প্রতিদিন স্কুলের কাজ দেখার সুযোগ পান এবং (গ) শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। (ঘ) প্রয়োজনমত প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শিশুর সম্বন্ধে পিতামাতার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং পরামর্শও দিয়ে থাকেন। (ঙ) ডাক্তারের পরীক্ষার ফলাফল তাদের জানানো হয়। (চ) প্রতিদিনের খাদ্য-তালিকা নোটিশ-বোর্ডে দেওয়া থাকে মায়েদের জানানোর জন্যে। (ছ) স্কুলের প্রত্যেকটি উৎসবে পিতামাতার সাহায্য থাকে।

২। অনেক সময়ে ভাঙা খেলনা সারানো অথবা খেলার ঘর তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব কোনও কোনও পিতা নিয়ে থাকেন।

৩। কখনও কখনও বাপ-মাদের নিয়ে শিশুদের সারা দিনের জন্যে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার ব্যবস্থা প্রধানা শিক্ষয়িত্রী করে থাকেন।

৪। চলচ্চিত্র, বক্তৃতা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা—এগুলির ভিতর দিয়েও পিতামাতার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে।

৫। নার্স প্রয়োজনমত শিশুদের গৃহ পরিদর্শনও করে থাকেন। এই ভাবে স্কুলের এবং শিশুগৃহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা হয়।

ইংলণ্ডের শিশুশিক্ষার এই সুনিপুণ ব্যবস্থা দেখে মনে হয় সত্যিই শিশুকে এঁরা "জাতির সম্পদ" ভাবেন। পাঁচ বৎসর বয়সে স্কুলের শিক্ষারম্ভের পূর্বে শিশুর যে কতখানি প্রস্তুতির দরকার তা এঁরা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা চলছে।

আমাদের দেশের পিতামাতারা এবং শিক্ষাবিদ্‌গণ পরস্পরের সঙ্গে একযোগে শিশুর শিক্ষা তথা ভবিষ্যৎ ভারত সংগঠনে ঐকান্তিকতা নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে আসুন।

হাঁসুলি

শ্রীবিশ্বপ্রাণ গুপ্ত

ঘরে পড়ে থেকে রূপোর চকচকে হাঁসুলিটা কালচে হয়ে গিয়েছিল হরিমতীর। তাই ওটাকে ঘষে মেজে উজ্জ্বল করে দিতে দিনু কর্ম্মকারকে দিয়েছিল হরিমতী। কিন্তু ফেরত আনতে গিয়ে দিনুর কথা শুনে হরিমতী যেন আকাশ থেকে পড়ল, নিয়ে গেল? বলি নিয়ে গেল কি রকম শুনি?

দিনু মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, মাধব জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কি করি বলুন!

জোর করে হাঁসুলি নিয়ে গেল? মাধবের শরীরে এতই তেল! হরিমতীর চোখ জ্বলতে লাগল, চোয়াল দৃঢ় হ'ল—রাগে যেন জ্ঞান হারিয়ে কাঁপতে লাগল হরিমতী।

বৃদ্ধ বয়সের ঝিমিয়ে-পড়া রক্তও যেন আজ আগুন হয়ে উঠেছে হরিমতীর। তার গোলগাল ভারী চেহারায় খুদে খুদে একজোড়া চোখ—সে চোখ যেন বজ্র হয়ে উঠল এখন—আর চ্যাপটা নাকটা ফুলতে থাকল উত্তেজনায়। মাথার ঘোমটা যে খসে পড়ল সে-দিকে আর খেয়াল রইল না হরিমতীর। ঘোমটার আড়ালে চির-কালের পর্দ্দানশীন গ্রামের বিধবা—আজ যেন দিশেহারা হয়ে উঠেছে কি এক প্রচণ্ড ক্রোধে, নিদারুণ এক আক্রোশে।

দিনু কর্ম্মকারের দোকান থেকে নেমে আসবার পথে মাত্র একটি কথাই বললে হরিমতী, ঐ বদমায়েস ছুঁচোটাকে তুমি ছেড়ে দিলে দিনু? জান, তুমি জান ও কি? নিজের বউকে ধরে মারে, মদ খায়, বেলেল্লাপনা করে—পরের ঘরে বউ-ঝি নিয়ে। আর আমার গাইগরুগুলো নিয়েছে, এবার হাঁসুলি নিলে। এবার কর্ম্মকারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল হরিমতী। বললে, আমি জানি না কর্ম্মকার—যেখান থেকে পার হাঁসুলি এনে আমাকে দাও।

জোর করেই ছিনিয়ে নিল, তা আমি কি করি বলুন। দিনু কর্ম্মকার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত জবাব দিলে। একটু শয়তানী ভঙ্গী ওর হাসিতে ছিল, কিন্তু উত্তেজিত হরিমতী তা টের পেলে না। দোকান থেকে নেমে আসবার পথে হরিমতী চলতে চলতে বললে, হাঁসুলি আমি ফেরত চাই—হাঁ। যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক, ও-জিনিস আমি চাই।

বালুরঘাট শহরের উত্তর-পশ্চিমে ফুলবাড়ী গ্রাম। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে মজে-আসা পুকুর, একসার তাল-খেজুরের দীর্ঘ ঋজু-রেখায় উদ্ধত ভঙ্গিমা—আর তারই ছাওয়ায় মাধব বর্ম্মার দোচালা খড়ের ঘর। তারই পাশে কত কালের এই মজে-যাওয়া পুকুর কে জানে। লাল মাটির এই পুকুরে এখন স্বচ্ছ স্ফটিকের মত জলের ঢেউ জাগে না, শুধু পান-মরিচ আর বলকলমীর বুনোলতাপাতার জঙ্গলে ফড়িঙের পাখা কাঁপে, প্রজাপতি ওড়ে।

আজও তাই উড়ছিল। চারিদিকে পড়ন্ত বিকালের স্বল্পায়ু রোদের আক্ষেপ যেন কি এক বিষণ্ণতায় ভরিয়ে দিয়েছিল সারা গ্রাম, সারা মাঠ আর দিগন্ত। আর পুকুর পাড়ে ঢালু জমিতে শেষ রোদ সারা শরীরে মেখে খুটে খুটে ঘাস খাচ্ছিল দুটি ছাই-রঙা গরু আর সাদা সাদা চঞ্চল দুটি বাছুর।

হরিমতী এসে দুটো গরুকেই চিনতে পারল। এ তারই গরু। বয়স হয়েছে বলে গরু দুটোকে আধি দিয়েছিল এক সাওতালকে। হরিমতী আর নিজে ওদের পালতে পারে নি। আর মাধব সেই গরু দুটিকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে দিনসাতেক হ'ল। হরি-মতী থমকে দাঁড়িয়ে ফুলতে লাগল।

উঠানে বসে কুড়ালের ডাট লাগাচ্ছিল মাধব বর্ম্মা। হরিমতীকে হঠাৎ এই সময়ে দেখে কাজ বন্ধ করে ওর দিকে তাকাল। দৃষ্টি-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই হরিমতীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল ক্রোধে, বললে, হাঁসুলি ফেরত দাও—শয়তান, ছুঁচো!

মুখ সামাল করে কথা বল, হাঁ—মাধবের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল যেন।

হরিমতী কিন্তু নিজেকে আর সামলাতে পারল না, চীৎকার করে উঠল, বদমাস, বউকে মারে, গরু চুরি করে, হাঁসুলি চুরি করে—পুকুরপাড়ের একতাল কাদা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মার মাধবকে।

চোখের পলকে বসে পড়ল মাধব, তার পর উঠে দাঁড়িয়ে কুড়ালটা বাগিয়ে ধরল। ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসতে হরিমতীরও সময় লাগল না এক মুহূর্ত্ত। সরে এসেই ভয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল, ওরে কে কোথায় আছিস রে, আমাকে মেরে ফেলল—আমাকে মাধব কুড়াল দিয়ে মেরে ফেলল।

গ্রামের লোক ছুটে এসে দু'জনকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল—হরিমতীর মেয়ের জামাই মাধব। আর সেই হরিমতীর মাথার ওপর মাধবের উদ্যত কুড়াল। গ্রামের লোক মারামারি থামাল। হরিমতী চুপ করে গেল বটে, কিন্তু এবার তার চোখ দিয়ে জল গড়াল। আর মাধব দুরন্ত আক্রোশে সবাইকে সরিয়ে আস্ফালন করে চলল, শালার বুড়ীকে আজ শেষ করব।

ক্রোধে, অপমানে, দুঃখে হরিমতীর চোখে জল এল। এ কান্না থামবার নয় হরিমতীর। সারা জীবনের দুঃখের কান্না—অপমানিত প্রাণের কান্না, দুঃখী জীবনের কান্না। সব কান্নাধারাই আজ যেন এই মুহূর্ত্তে মুক্ত হয়ে গিয়েছে।

গ্রামের মাতব্বর জিতেন দাস। হরিমতীর দূরসম্পর্কের কাকা—

বললে, কাঁদছ কেন হরি ভাস্তি—এখানে বস, ঠাণ্ডা হও, ব্যবস্থা একটা করে দেবই।—জিতেন দাস সব ঘটনা জানে। জানে যে, মাধব তার স্ত্রী সুধনীর ওপর অত্যাচার করত। হরিমতীর মেয়ে সুধনী—মাধবের স্ত্রী। বিধবা হরিমতীর তাই দুঃখের শেষ নাই। সুধনী তখন অন্তঃসত্ত্বা। হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে মাধব একদিন নিষ্ঠুরভাবে মেরেছিল। আর সেই রাত্রেই দাঁত দিয়ে দড়ির বাঁধন কেটে সুধনী পালিয়ে এসেছিল মায়ের কাছে। আর ফেরে নি। এখানেই পরের দিন দারুণ জ্বর এসেছিল—সেই জ্বরেই চিরকালের মত চোখ বুজল সুধনী। মৃত্যুর আগে স্বামীকে একবার দেখতে চেয়েছিল সুধনী, কিন্তু মাধব আসে নি। জিতেন দাস নিজে গিয়ে মাধবকে আসতে বলেছিল। কিন্তু মাতব্বরকে আশ্বাস দিয়ে মাধব চলে গিয়েছিল শহরে—বালুরঘাটে। মদ খেয়ে বে-পাড়ায় পড়েছিল কোন মটর ড্রাইভারের সঙ্গে। মাধব নিজেও মটর ড্রাইভারি করত। গ্রামের ঘর-গৃহস্থালি, জমি-জমা, হাল-গরু কোন কালে ভাল লাগত না মাধবের। চিরকাল সে শহর ভালবাসত—আর ভালবাসত শহর-জীবনের ঐসব কলঙ্কিত রূপোপজীবিনীদের খোপগুলি। সেদিনও মাধবকে ফিরিয়ে এনেছিল জিতেন দাস। এই মাধবের চরিত্র! সে যে হরিমতীকে আঘাত হানতে কুড়ুল তুলবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি—অন্ততঃ জিতেন দাস আশ্চর্য্য হয় নি।

হরিমতীকে অনেক সান্ত্বনা দিলে জিতেন দাস। কিন্তু হরিমতির কান্নার শেষ নেই। নিষ্ঠুরতম আঘাতের পর এ সান্ত্বনা যেন আজ তার সমস্ত কান্নাধারাকে আরও জোরে বইয়ে নিয়ে এল। কেঁদে কেঁদেই হরিমতী বললে, আমার মেয়ের জীবনটাকে নষ্ট করেছে ঐ শয়তান, এবার আমার ওপরও ওর হামলা।—হরিমতীর কান্না থামল না।

জিতেন দাস আবার বললে, কথা দিচ্ছি এর একটা বিহিত আমি করব—যেমন করে হোক করব।

হরিমতী চোখ মুছে বললে, আর কবে করবে গো জিতেন কাকা, কবে করবে? সুধনী মরেছে ওর হাতে, আমিও মরব—তার পর তোমরা বিচার করো, পঞ্চায়েৎ ডেকো, বিধি-ব্যবস্থা করো। দেখিব যে কোন মানে নেই জিতেন কাকা!

পরদিন গ্রামের পঞ্চায়েৎ-সভায় হরিমতী সব কথা বললে। শেষে বললে, জোর-জবরদস্তি করে গরু বাছুর নেওয়ার কথা, হাঁসুলি নেওয়ার কথা, আর সুধনীর ওপর অজস্র অত্যাচারের কাহিনী। শেষে আঁচলে চোখ মুছল হরিমতী, তার পর কাঁদল। পঞ্চায়েতের পাশে বসে কাঁদল।

শুধু পঞ্চায়েতের পাশেই নয়, শহরে উকিল বাবুর বাসাতেও হরিমতীর চোখের জল পড়ল। হরিমতীকে মামলার পরামর্শ দিয়েছে গ্রামের মাতব্বর জিতেন দাস, বলেছে, ও ডাকাতকে এক 'গবমেণ্ট' পারে শায়েস্তা করতে—আমরা কি করব?

আসল কথা হরিমতী জানে না। জিতেনের সঙ্গে মাধবের বন্ধুত্ব। মাধব শহরের উকিল-ডাক্তার-মোক্তার-অফিসারদের সঙ্গে জীতেনের খাতির জমিয়ে দিয়েছে। এতে জীতেন এটা-ওটার লাইসেন্স, রেশনের দোকান, কিংবা ডি-পি এজেন্সির-দালালী, আর রিলিফ আপিসের তত্ত্বাবধারক হয়ে ওঠে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারছে। এ মন্দ রোজগার নয়। এই স্বার্থ—এই স্বার্থেই জিতেন দাস মাধবের কোন শাস্তির ব্যবস্থা পঞ্চায়েৎ মারফত করলে না, নিজের হাতে। হরিমতীকে মামলার পরামর্শ দিলে। আত্মীয়তার চেয়ে, মাতব্বরের কর্ত্তব্যের চেয়ে, স্বার্থ বেশী মনে হ'ল জিতেনের।

পঞ্চাশ বছরের হরিমতী এ যুগের স্বার্থের বেড়াজালের জটিলতা বুঝলে না, বুঝতে পারলে না। মামলা করতেই রাজী হ'ল সে। ঘটি-বাটি বন্ধক রেখেও মামলা করবে হরিমতী। সংসারের সততায় যা পারলে না হরিমতী, আইনের ঘোর-প্যাঁচ চক্রে তারই পরীক্ষা করবে সে। মাধবকে দেখে নেবে। আর ঐ হাঁসুলি আর গরু বাছুরগুলি তার চাই-ই। উকিলবাবুর হাতে ধরেছে হরিমতী, যা চান সব দেব বাবু, কিন্তু মামলায় আমাকে জিতিয়ে দেন। আঁচল থেকে পুরানো নেতিয়ে-পড়া নোংরা পাঁচ টাকার এক একখানা নোট উকিলবাবুর হাতে গুঁজে দিয়েছে হরিমতী। প্রবীণ উকিলবাবু মাথা দুলিয়ে বলেছেন, ব্যস্ত হয়ো না, দেখি কি করতে পারি। আর মনে মনে দীর্ঘ-মেয়াদী মামলা দাঁড় করিয়ে বেশী পয়সার স্বপ্ন দেখেছেন উকিলবাবু।

এমনি করেই মামলা চলেছে। শুনানি চলেছে—জেরা উল্টো জেরা হয়েছে। মামলায় জানা গেল অন্য কথা। এ কথা হরিমতী কখনও কল্পনা করে নি। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে, আর উকিল বাবুর মুখ থেকে যা শুনতে পেয়েছে, তা অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখলে না হরিমতী। হরিমতী শুনেছে, কর্মকার একশত টাকা নিয়ে মাধবকে হাঁসুলি দিয়েছে, মারধোর বা জোর-জবরদস্তি করে হাঁসুলি নেয় নি মাধব। সে যাই হোক, হাঁসুলি এখন মাধবের দখলে, ফিকির-ফন্দি করেই হোক আর ঘুষ-ঘাষ দিয়েই হোক—হাঁসুলি এখন মাধবের হাতে। এ হাঁসুলি হাতছাড়া করতে পারবে না হরিমতী, কখনও কোন কালে।

হাঁসুলি তার চাই-ই। আর চাই মাধবের শাস্তি—কঠিন শাস্তি। তা হলে খুশী হবে হরিমতী। অমন শয়তান মাধব! তাকে শাস্তি না দিলেই নয়। উকিলবাবুর সেরেস্তায় বসে ক্রোধে আর আক্রোশে অস্থির হয়ে ওঠে হরিমতী।

শেষ পর্য্যন্ত মামলার রায় বের হ'ল। হরিমতী মামলায় জিতেছে। ডিক্রী হয়েছে মামলায়। মাধব সব ফেরত দেবে। গরু-বাছুর, আর হাঁসুলিও।

গরু-বাছুর আর হাঁসুলি ফেরত পেল হরিমতী সাত দিন পরে। গরু-বাছুরগুলি অনেক দিন পর তার বাড়ীতে ফিরে এসেছে। কোথায় যে ওদের রাখবে তাই ঠিক করতে পারছিল না হরিমতী। গোয়ালের ঘরটা ভেঙে গিয়েছে, ওখানে রাখা চলবে না। রান্নাঘরের বারান্দায় রাখা চলবে না—বারান্দার 'চাল' জীর্ণ হয়ে গিয়েছে—বৃষ্টি পড়ে। গাছতলাতেও না! শেষ পর্য্যন্ত শোবার ঘরের বারান্দায় ওদের এনে তুলল হরিমতী।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। হরিমতী ওদের প্রদীপ দেখাল, ধূপ

ধুনুচি ঘুরাল—গা-মাথা-গলা আর সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিলে পরম যত্নে—মায়ের মত। হাড়গোড়-পাঁজরাগুলি কেমন ঠেলে এসেছে প্রকট হয়ে। আহা-হা! হরিমতী ওদের আদর করলে। তার পর কানা গরুটার কাছে গিয়ে কাঁদল। এই গরুটা ছিল সুধনীর। বাছুর হওয়ার কালে সুধনী ঢেলা মেরেছিল চোখে—সেই থেকে ডান চোখটা কানা হয়ে গিয়েছে। তখন থেকে গরুটাকে সবাই ডাকে 'কানীগাই।' ওদের জন্য নতুন ভাত বসাল হরিমতী। জল-ভাত-ফ্যান দিলে গামলায় ঢেলে। খাইয়ে দিয়ে পিঠের ওপর চট জড়িয়ে দিলে। এখন বর্ষাকাল। চারিদিকে মশার উৎপাত। এতদিন পর গরুগুলি ঘরে এসেছে। ওদের যত্ন না নিয়ে হরিমতী যেন খুশী হতে পারছিল না।

এইবার দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল হরিমতী। প্রদীপের অস্বচ্ছ আলোয় রহস্যমাখা ঘর। বাইরে রাত্রির প্রথম প্রহর—প্রায় গড়িয়ে গেল। বিছানায় বসে বালিশের নীচে রাখা পুঁটলিটা টেনে নিলে হরিমতী। খোলা জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। চুপচাপ বোবা গাছগুলির মাথায় জলে-ভরা কালো কালো মেঘ—বর্ষণব্যাকুল, অস্থির। হঠাৎ এক ঝলকে বিদ্যুতের ঝলকানি। আলোময় ঘর। আর তখনই হাঁসুলির গায়ে লেখা কতগুলি বড় হরফ ওর চোখে পড়ল। চকচকে হাঁসুলিতে স্বামীর নাম লেখা একদিকে, অপরদিকে হরিমতীর। হরিমতী হরফগুলির ওপর হাত বুলাল। এ হাঁসুলি তার স্বামীই তাকে গড়িয়ে দিয়েছিল। সেই একবার —তাদের যৌবনকালে বিঘেপ্রতি তিন মন বেশী ফসল হয়েছিল। সেইবার—সেইবারই এ হাঁসুলি গড়িয়ে দিয়েছিল স্বামী। সুধনী তখন পেটে বোধ হয়। হ্যাঁ—তাই। হরিমতীর চোখজোড়া ভিজে উঠল।

সেই বছরটা এমনি করেই ঘুরে গেল। এমনি করেই হাসি-কান্নায় অতীত স্মৃতিকে বুকে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিলে হরিমতী। তারপর বর্ষা গেল। শরৎ এল—আকাশে সাদা সাদা আত্ম-ভোলা নিরুদ্দেশ মেঘের দল নিয়ে। হরিমতীর বয়স আরও বাড়ল। হাঁপানি আরও বৃদ্ধি পেল। ঘড় ঘড় কাশি, হাঁপানির টান। সে যে কি কষ্ট! হরিমতী কেমন করে তা বোঝাবে।

গ্রামের মেয়েরা শরৎকালে পূজার সময় গ্রামে এল—শ্বশুরঘর করে। চারিদিকে ঢাকের বাজনা। মা আসছেন। নতুন কাপড়ের গন্ধ—নতুন সুগন্ধি তেলের গন্ধ। মেয়েদের কপালে ডগডগে লাল সিন্দুর। এই এক একটা জীবনে কি সুখী সবাই—কি আনন্দ মুখরিত। মানুষ চিরকাল তাই চায়—সুখ শান্তি আর দিকে দিকে জীবনের সমৃদ্ধি। ঝগড়াবিবাদ চায় না মানুষ—কোন দিন, কোন কালে। ঘরে শুয়ে জানালায় তাকিয়ে কথাটা বার বার ভাবল হরিমতী। চোখ জোড়া ছল ছল করে উঠল। সুধনীর কপালে এ সুখ হয় নি। স্বামীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পেয়েছে সুধনী—ভালবাসা পায় নি।

হরিমতীর চোখে তাই জলের শেষ নেই। সম্পূর্ণ শরৎকালটাই সে অমন করে কেঁদে কাটাল—পাড়ার অন্য বাড়ীর মেয়ে বউদের দেখে আর মাধবকে অভিসম্পাত করলে। শুধু অভিসম্পাত করেই নিবৃত্ত হ'ল না হরিমতী, মাতব্বরকে ডেকে বললে, জিতেন কাকা, মাধবকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দাও—

তার পর একটু থেমে বললে, আমার বয়স হয়েছে, গতর গেছে, না ত ওকে আমি কোঁচ দিয়ে মারতাম—মনে নেই তোমার—সেই যে একবার ডাকাত মেরেছিলাম খোঁচ বিঁধিয়ে।

হ্যাঁ—খুব মনে আছে। জিতেন দাস হরিমতীর পাশে বসে মাথা নাড়ে।

আরও দিন কেটে গেল, কিন্তু হাঁপানির টান কমল না, বরং আরও বাড়ল। শীতকালের প্রায় মাঝামাঝি আর একটা নতুন ব্যাধি এসে জুটল সেই সঙ্গে—চোখে কম দেখা। হরিমতীর দুই চোখেই ছানি পড়েছে। চোখে ঝাপসা দেখে।

আজকাল আর সেই পুরানো বিবাদের ইতিবৃত্তটা খুব বেশী মনে পড়ে না হরিমতীর। মনে পড়ে না তা নয়, তবে আজকাল নিজের কথাই বেশী ভাবে হরিমতী—নিজের সুখ-দুঃখ। তার নিজের হাঁপানির টান—চোখে না দেখার কষ্ট। এই দুই-ই ওকে বেশী করে ভাবিয়ে তুলেছে যেন।

আবারও বর্ষাকাল এল। আকাশে আকাশে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ আর ঝর ঝর আকুল বৃষ্টি। আষাঢ়ের শেষ দিকে হরিমতীর জ্বর এল। ঘোর জ্বর আর ভুল বকা। সেই জ্বরেই হরিমতী শয্যা নিলে। পূর্ণ এক মাসেও সে জ্বর ভাল হ'ল না হরিমতীর। মাতব্বর জিতেন দাস রোজই আসে এখন, একবার করে দেখে যায় হরিমতীকে।

এমনি এক জল-ঝড়-বৃষ্টির সন্ধ্যায় জিতেন দাস এল হরিমতীকে দেখতে। হরিমতী বললে, বস জিতেন কাকা—

একটা ছোট জলচৌকীতে বসল জিতেন দাস।

হরিমতী বললে, একটু জল খাব জিতেন কাকা—ঐ মাটির কলসীতে জল আছে। একটু দাও—বুকটা শুকিয়ে আছে।

ঘরের এক কোণায় মাটির কলসীতে জল ঢাকা। জিতেন বললে, গ্লাস কোথায় হরি ভাস্তি?

গ্লাস নেই জিতেন কাকা—একটাও নাই। সব গেছে—কম্মকারের দোকানে বন্ধক রাখা আছে। টাকা—টাকা—জিতেন কাকা! মামলার খরচ যোগালাম ঐ টাকায়।

জিতেন দাসের বুকটা কেমন নরম হয়ে উঠল, বললে, মাধবের কোন খবর রাখ?

কি খবর?

ও ত আবার বিয়ে করেছে। শুনি এই স্ত্রীকে নাকি মার-ধোর করে না—ভালবাসে।

জানি জিতেন কাকা—সব জানি। মাধব আমাকে যেতে বলেছিল। আমি যাই নি ঐ শয়তানের ঘরে। হরিমতীর চোখের দৃষ্টিতে আবার ঘৃণা ছড়াল।

মানুষ চিরকাল শয়তান থাকে না হরিভাক্তি! সে ভাল হয়, সুন্দরও হয় একদিন। জিতেন দাস দেয়ালের দিকে তাকিয়ে উদাস ভঙ্গিতে বললে—

ভাল হয়? সুন্দরও হয়? হরিমতীর বুকের ভেতর কি এক বোবা ব্যথা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। আহা-হা! সুধনীর কপালে তা জুটল না কোন দিন, কোন কালে। হরিমতীর চোখে আবার জল গড়াল।

বাইরে সারা রাত আষাঢ়ের অবিশ্রাম বর্ষণ। জিতেন দাস ফিরে যেতে পারলে না সে রাত্রে—বসে রইল সারা রাত হরিমতীর পাশে। শুধু সেই দিনই নয়, তারপর আরও অনেক দিন, অনেক রাত্রি। এমনি করেই বর্ষণ-ব্যাকুল আষাঢ়-শ্রাবণ, লঘু-মেঘ-বিহারী উচ্ছলতায় রঙীন ভাদ্র-আশ্বিন, সব দূরে চলে গেল পৃথিবীর ঋতু-পরিক্রমায়।

এখন কার্তিক মাস। শিশির-ভেজা সকালের সিরসিরে হাওয়ায় আসন্ন শীতের কানাকানি। হরিমতীর শেষ অবস্থা। আর একটা রাত্রি কি তারও কম। জিতেন দাস এসেছে হরিমতীকে দেখতে। গত চা'র মাস প্রায় রোজই একবার এসেছে।

হরিমতী কাঁদল জিতেন দাসকে দেখে, আমি আর বাঁচব না জিতেন কাকা!

জিতেন দাস কোন জবাব দিলে না। তার চোখজোড়াও ছল ছল করে উঠল। হরিমতীর কাছে আরও সরে বসে বললে, জোত-জমি আর গাই-গরুগুলির একটা ব্যবস্থা করে দাও।

হরিমতী কোন জবাব দিলে না, কাঁদলে আবার, বললে, আমার মুখে আগুন দেওয়ার কেউ রইল না জিতেন কাকা—বংশে বাতি দেবারও কেউ রইল না।

কেন মাধব ত রইল। ওকেই সব কিছু লিখে পড়ে দাও। এখন শেষকালে আর ঝগড়া-বিবাদ করে কি লাভ?

লাভ-ক্ষতি জানি না জিতেন কাকা—আমার ভিটেয় ঘুঘু চরবে, গাই-গরুগুলি মরে পড়ে থাকবে, তবুও মাধবকে দেব না কিছু। হরিমতীর দুর্বল কণ্ঠও যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল আবার।

হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে উঠল জিতেন দাস—হরিমতীও। তারপর জিতেন দাস যেন মনে মনে বললে, মাধব।

মাধব? চোখ কুঁচকালো হরিমতী। জীতেন দাস জানত, মাধব আসবে। সেই-ই মাধবকে সস্ত্রীক উপস্থিত হতে বলেছিল। জমি-জমা গরু-বাছুরগুলিরও লোভ দেখিয়ে মাধবকে বলেছিল, সময়-মত উপস্থিত থাকিস, কপালে মিলে যেতে পারে কিছু।

মাধব কোন কথা বললে না, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মা! কে যেন ডাকলে।

হরিমতী চমকে উঠল, মা! মা কে ডাকে জিতেন কাকা!

দেখতে এলাম মা—আপনার অসুখের খবরে—

আবারও মা! এ যেন সুধনীর কথা, তার কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ-ভঙ্গী—হরিমতীর বুকটা তোলপাড় করে উঠল। উত্তেজনায় উঠে বসল হরিমতী। চোখ দুটো মিট মিট করে উঠল। কিছু দেখতে পায় না চোখে, দৃষ্টিতে সব ঝাপসা, সব অন্ধকার। হরিমতী কাঁদলে, সুধনীরে—ওরে—মা আমার—

আমি ত আপনার মেয়ের মতই মা। মাধবের স্ত্রী এইবার হরিমতীর পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে। হরিমতীও হাত বুলাল মাধবের স্ত্রীর মাথায়। ঘন কালো এক রাশ চুলে হাত বুলাল। মুখখানা অনুভব করলে হাতড়ে হাতড়ে। কিছু দেখলে না হরিমতী, দেখতে পারলে না। তবুও অন্তর আলোময়, আনন্দে দিশাহারা। যেন সুধনী এসে তার পাশে বসেছে কতকাল পরে। মা বলে ডেকে বুক জুড়িয়েছে।

সুধনী—সুধনীরে—হরিমতী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

এইবার হরিমতী বালিশের নীচেটা হাতড়ে বের করলে—সেই হাঁসুলিটা। রূপোর চক্‌চকে হাঁসুলিটা। হাতড়ে ওর গলায় পরিয়ে দিলে, আর কাঁদল। তারপর ডাকল, জিতেন কাকা!

বল। জিতেন দাস নড়ে বসল।

আমার সুধনী আমাকে দেখতে এসেছে। আমি দেখতে পাই না, তুমি দেখ। তুমি দেখে সুখী হও জিতেন কাকা। জোত-জমি গরু-বাছুর সব ওকে দিলাম।

জিতেন দাস কোন জবাব দিলে না। হরিমতী বললে, একটা গীতা এনে আমার মাথায় রাখ জিতেন কাকা—আর একটা তুলসীর চারা।

জিতেন দাস তাই করলে। এমন সজ্ঞান মৃত্যু আর কখনও দেখে নি সে। তারপর জীতেন দাস বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেখলে মাধব দুই হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে যেন কি ভাবছে গভীর ভাবে। তার স্ত্রী গিয়েছে বাইরে কুয়োয়—একঘটি জল আনতে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে জিতেন দাস বললে, কি মাধব, আসতে বলে ভাল করি নি? জোত-জমিগুলি লাভ হ'ল ত?

হরিমতীর রোগশয্যায় সস্ত্রীক উপস্থিত থাকবার পরামর্শ মাধবকে জিতেন দাসই দিয়েছিল—তা সত্য হলেও খুশী হতে পারছিল না মাধব। বুকের ভেতর একটা কথাই কেবল ঘুরে ঘুরে বাজছিল তার। একটা হাঁসুলি কিম্বা একজোড়া গরু-বাছুরের স্বার্থের বাইরেও মানুষের জীবন আছে। আর সে স্বার্থ ত্যাগ করেও চিরকাল সুখী হতে পারে মানুষ—চিরকাল সুখী হয়েছে। অথচ এ-কথা আর কখনও ভাবে নি মাধব। ছি—ছি—ছি! নিজের একটা জীবনে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কি করল সে? চল্লিশ বছরের দীর্ঘ জীবনে মদ, ব্যভিচার, আর বীভৎস পাপের পঙ্ককুণ্ডে ডুবে থাকা ছাড়া আর কি করল সে?

চারিদিকে অন্ধকার বোবা রাত। সম্মুখে কুয়াশায় ভরা মাঠ। তারপর শতবর্ষের পুরানো বট গাছের নীচে বুড়ি-ডিহির খালের জল—তার পাশে শ্মশান। ঐখানেই সুধনীর চিতা সাজানো হয়েছিল।

সেই সুধনী—অনাস্বাদিত জীবনের বহু নীরব কামনায় পাণ্ডুর মুখশ্রী—মাধব যেন সকরুণ ব্যথায় স্তব্ধ হয়ে বসেই ইল—বারান্দায়। তারপর কি মনে পড়ল মাধবের। প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢুকে হরিমতীর জট-ধরা রুক্ষ চুলে ভরা মাথাটা কোলের উপর তুলে নিলে পরম যত্নে নিবিড় করে।

জিতেন দাস ব্যস্ত হয়ে উঠল, আরে কি কর? কি করছ? জিতেন দাসকে কি বলবে মাধব? কি বুঝবে সে? এ যুগের গ্রামের মাতব্বর জিতেন দাস। অনুভূতিশূন্য, হৃদয়হীন—কতটুকু বুঝবে? তাকে কি বলবে মাধব? সে এসেছিল, হরিমতীর কানে কানে বলতে চেয়েছিল, ক্ষমা কর, সব ভুলে যেয়ো।

হরিমতী শুনল না মাধবের কোন কথা। অনেক আগেই সকলের অগোচরে মুক্ত হয়ে গিয়েছে সে।

স্মৃতির মিছিল

শ্রীকালিদাস রায়

মিছিল বাঁধিয়া চলিয়াছে স্মৃতিগুলি
তুচ্ছ ঘটনা মনে পড়ে শুধু, বড়গুলি যাই ভুলি।
বড়গুলি যেন দাদা মহাশয়, হারায় মেলার ভিড়ে,
ছোটগুলি নাতি ঘাড়ে তাহাদের বাঁশী বাজাইয়া ফিরে।
মনে পড়ে মোর ভাইদ্বিতীয়ায় ঝি-এর হাতের ফোঁটা,
কুলীর কন্যা কাঁদে কুয়াপাড়ে কুয়ায় হারায়ে লোটা।

আজি মোর পড়ে মনে
ছুঁড়িয়া দিলাম দুইটি পয়সা কাটোয়া ইষ্টেশনে
ভিখারী বালকে। ট্রেন ছেড়ে দিল প'ড়ল চাকার নীচে,
ট্রেন চলে গেল, সে কি খুঁজে পেল? সে দান হ'ল
কি মিছে?
একটি বালিকা বলেছিল, 'বাবু পেয়েছে বড়ই খিদে।'
খেয়াপারঘাটে, কাঁটা হয়ে মোরে বিঁধে—
টাকা সিকি ছিল দুয়ানিও ছিল, আনিও ছিল না বলে
ভিক্ষা দিই নি, ম্লানমুখে আহা কেঁদে গিয়েছিল চলে।

মাঠ পার হয়ে বৃদ্ধ খঞ্জ ভারী বোঝা নিয়ে ঘাড়ে
থেমে থেমে ঘেমে চলেছিল হাটে, মনে পড়ে আজ তারে।
বহুদিন পরে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে কাছারি-বারেন্দায়,
প্রণাম করিনু শূদ্রজাতির গুরুমশায়ের পায়।

অবাক হইয়া লোকে,
বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন তিনি অশ্রুতে ভরা চোখে।
বালক তখন, তুলে দিয়ে কাকা আমারে ইষ্টিমারে,
কাঁদিতেছিলেন দাঁড়ায়ে নদীর ধারে;
বহুদূর হতে ঝাপসাই দেখা যায়,
দেখিলাম কাকা চাহিয়া আছেন ঘাটে দাঁড়াইয়া ঠায়!

পড়া হয় নাই, বেত্রহস্তে ছাত্রে করিনু তাড়া
ছাত্র বলিল, পরশু রাত্রে ছোট ভাই গেছে মারা।
ছল ছল চোখ ম্লান মুখখানি তার
দিল মোরে ধিক্কার
একটি ছেলের ছিল বড় মনে সাধ
জন্মতিথিতে লিখে দিই তারে পদ্যে আশীর্বাদ,
বিদায় করিনু বিরক্ত হয়ে একটা লাইন লিখে
বিদায় নিল সে ছল ছল চোখে চাহিয়া আমার দিকে।
একমাস পরে শুনিনু সে নেই আর;
সেই কথা আজ মনে পড়ে বার বার।

পাঁচ বছরের ছোট ছেলে মোর কঠিন দারুণ রোগে
একদা যখন চল্লিশ দিন ভোগে,
'ভাত খাব' বলে কেঁদেছিল কোলে মা'র,
মিথ্যা প্রবোধ দিয়েছিনু তারে—ভাত চড়ে গেছে বলে।
দশ দিন পরে সেই ভাত হ'ল রাঁধা,
কানে বাজে মোর আজ তার সেই কাতর কণ্ঠে কাঁদা।
এমনি কতই ছোট ছোট স্মৃতিগুলি
রক্তনিশান তুলি',
মিছিল বাঁধিয়া আসে মোর মনে আজ,
কেহ দেয় ব্যথা, কেহ দেয় মোরে লাজ।
সুপ্ত হইয়া ছিল এরা মোর মনে
কোথায় কুহর-রন্ধ্রকোটর কোণে
দল বেঁধে আজ করে তারা অভিযান
চূর্ণ করিতে আমার রূঢ়তা ক্রূরতার অভিমান।
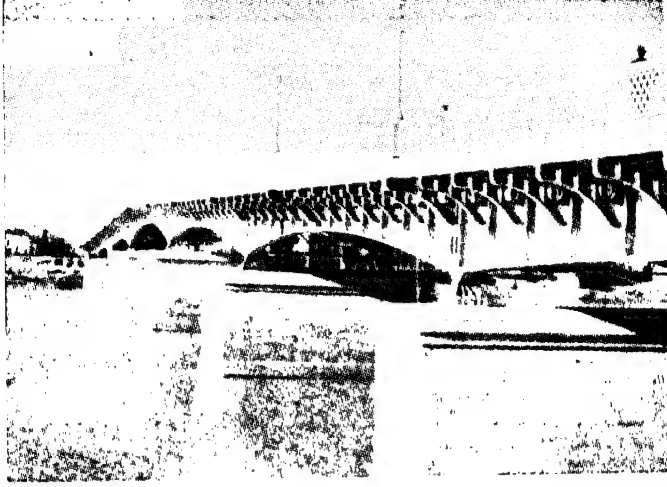
ফয়জল সেতু

ইরাকে

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

হারুণ-অল-রসিদের রোমাঞ্চ ও কল্পনার নগর বাগদাদ—শেষ রাত্রির তিমির ছায়ায় সুপ্ত—তবে বিমান পোতাশ্রয় আলোকিত, আমাদের বিমান এসে নামল। আধ ঘুম, আধ তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলাম। নূতন স্থান—নূতন পরিবেশ—অজানা নগরে কোথায় উঠব—তারই ভাবনা মনকে ব্যাকুল করে তুলল।

১৯৫৫ সনের ১৫ই জানুয়ারী ৪-৩০ মিনিট। এখানে পাস-পোর্ট ও শুল্ক পরীক্ষকেরা খুবই ভদ্র ব্যবহার করল। আরব জাতির আতিথেয়তার ঐতিহ্য স্মরণে জাগে। এসেছিলাম কে. এল. এম কোম্পানীর বিমানে—ওদের বাস নিয়ে চলল ঘুমন্ত শহরের মাঝে।

এখানে ওয়াই-এম-সি-এ'র হোষ্টেলে উঠবার ব্যবস্থা ছিল—তাদের লৌহ-কবাট রুদ্ধ—বাসের লোকেদের ডাকে দারোয়ান দরজা খুলল, কিন্তু আমার বসবার বা থাকবার কোনই ব্যবস্থা করল না—আমি ওদের বড় বারান্দায় একটা বড় বেঞ্চে শুয়ে পড়লাম। আড়াই ঘণ্টা এই ভাবে কাটল।

এরা সবাই ভোরের দিকেই উঠে—তাদের চলাফেরা সুরু হ'ল—কিন্তু কেউ আমায় বিরক্ত করল না—সাতটায় এলেন এখানকার কর্মী শ্রীশান্তিরাম শর্ম্মা। বেশ ভদ্র—আলাপও সৌজন্যপূর্ণ। আমাকে ৪১ নম্বর ঘর দিলেন—ঘরটি এক কোণে। প্রাতরাশ শেষ করে টাইগ্রিস নদীর তীরভূমি দিয়ে চললাম কে. এল. এমের এজেণ্ট ইরাক টুরস আপিসে। বাড়ীর চিঠিপত্র বহুদিন পাই নি—তাই অপরিসীম ব্যাকুলতায় চিঠির সন্ধান করলাম।

না, বাড়ীর চিঠি আসে নি—অন্য চিঠি একখানি মাত্র পেলাম। কারও কোনও সাড়া নেই কেন বুঝি না—ভ্রাম্যমাণ পথিকের চলার সঙ্গে তাল রেখে চিঠি হয়ত চলতে পারে নি—কিন্তু তাতে দুশ্চিন্তার শেষ হয় না। তার পর গেলাম ভারতীয় দূতাবাসে।

প্রেস অফিসার বরকত আহম্মদ বাগদাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তার পর দূত খুব সিংহ

বর্ত্তমান রাজা দ্বিতীয় ফয়জল

পরিচালক। তাঁর সন্ধানে চললাম। একটি ভারতীয় দোকানে গিয়ে তাঁর সন্ধান নিলাম, অপরিচিতকে শুধু ঠিকানাই বলেছিলেন। তাদের নির্দেশমত অনেক কষ্টে খুঁজে বার করলাম।

পণ্ডিতজী খাঁটি মানুষ—নিরহংকার অথচ কাজের লোক। আমাকে অনেক স্থানে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালেন। আমার বক্তৃতার আয়োজন করলেন। সান্ধ্যভোজন শেষে ওয়াই-এম-সি-এ'র পর্যবেক্ষকের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ভারতে ছিলেন—বললেন তিনি ভারতের বিশেষ বন্ধু। ভারতীয় নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হ'ল।

১৪ই জানুয়ারী, শুক্রবার। সকালে আনি দিল বিছানায় চা এবং সামান্য খাবার, এসে তার আগেই উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিয়েছিলাম—কাজেই খেলাম, কিন্তু একেবারে অখাদ্য। বেড়াতে বার হলাম—গাজি ষ্ট্রীট ধরে গেলাম আবদুল কাদির আল গৈলালি মসজিদে—সেখান থেকে বাসে করে পৌঁছি

ফলভারাবনত খর্জ্জুর-বৃক্ষ

মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি আই-সি-এস ছিলেন—নিজ দক্ষতায় দূতের পদ পেয়েছেন।

আমায় তিনি বললেন, "ভারতবর্ষের গৌরব অপরিমেয়, তাই জগৎ বিস্ময়ে ভারতের দিকে চেয়ে আছে।"

তিনি বলেই চললেন—"৫০৬টি দেশীয় রাজ্যকে ভারতবর্ষ এক করে ফেলেছে—কৃষি ও শিল্পে খুবই উন্নতি করেছে। ভারতবর্ষ কারও মুখাপেক্ষী নয়—ধীরে ধীরে সে নিজ শক্তিতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভল্যুশন করুক, তা হলেই সে বড় হবে।"

আমি বললাম, "কিন্তু এই অভ্যুদয়ের কাহিনী যে পুরোপুরি সত্য নয়—"

ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হলেন। আমি যখন বললাম, ভারতবর্ষ বাইরের সহায়তায় আরও তাড়াতাড়ি আরও ভাল ভাবে অগ্রসর হতে পারে।

তিনি বললেন, "না, সবাই ভারতবর্ষকে দ্বেষ করছে—ভারতকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে।"

কথাগুলি ভাববার মত—শ্রীযুক্ত সিংহ চমৎকার দরদ দিয়ে কথা বলেন। তার পর এদের এটর্নি-জেনারেলের ওখানে গেলাম। ভদ্রলোক কফি খাওয়ালেন—ভারতীয় আইন সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হ'ল। বাসায় ফিরে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষে ঘরে বসে খানিক পড়াশোনা করলাম।

এখানে একটি হিন্দুসভা আছে—আর্য্যসমাজের পণ্ডিত শর্ম্মা তার

নর্থ গেটে তার পর চিঠির সন্ধান করে গেলাম দুটি যাদুঘরে 'আরব এণ্টিকুইটিজ' এবং 'ইরাক মিউজিয়ম' এদের নাম। শেষেরটি চমৎকার।

ইরাক নূতন রাজ্য—১৯২১ সনে মাত্র এর জন্ম। খলিফা-বংশজাত ফয়জল এর প্রথম রাজা। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে অতীতের অনেক ইতিহাস। জগতের সংস্কৃতির ইতিহাসে ইরাকের দান অসামান্য। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর কূলে কূলে অনেক সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উত্থান ও পতন হয়েছে। অসুর সভ্যতা, বাবিলনের কৃষ্টি, পার্থিয়ান, সাসানিয়ান প্রভৃতি কত জাতি কত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এখানে লীলাখেলা করেছে।

যাদুঘরে সেই সব অতীতের খণ্ডিত অবশেষ দেখতে দেখতে ইতিহাসের ভাঙ্গা-গড়ার কথা মনে জাগল। এখানে যেসব জিনিষ চোখে বিশেষ আকর্ষণযোগ্য ছিল তাদের মধ্যে এক নম্বর ঘরে সিংহশিকারের ছবি—কালো 'ব্যাসাল্ট' পাথরের উপরে আঁকা—এটা লেখা আছে ছ' হাজার বৎসরের পুরানো। ২নং ঘরে—প্রাচীনতম আইনের একটি সংগ্রহ—হামুরাবিরও ছ'শ বৎসর আগে বিলানামা নামে রাজা এশুনুন্নুয়ার দ্বারা এই আইন প্রচলিত করান। ৩নং ঘরে ওদেশের বিখ্যাত রাজা কেসকালামদুজার আংটি রয়েছে। তা ছাড়া রাণী সুবাদের অলঙ্কাররাজি থরে থরে সাজানো আছে। ৪নং ঘরে প্রাচীন ইরাকীয় ব্যবহারবিদ গুডিয়ার আরবীয় মস্তকাবরণ দেখতে চমৎকার। ৬নং ঘরে রাজার চার অশ্ব-

বাহিত রথের ছবিটি খুবই সুন্দর। এ ছাড়া উর বংশীয়দের যেসব স্বর্ণালঙ্কার উর নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত হয়েছে সেগুলিও মনে বিশেষ ছাপ রাখে। একটি সোনার বীণা আছে—সেটাও অতীতের শিল্পসমৃদ্ধির পরিচায়ক। তার পর হায়দর মসজিদ দেখে হোটেলে ফিরলাম।

খেয়ে-দেয়ে সিনেমায় যাব বলে রওনা হলাম, কিন্তু বেলা সাড়ে চারটায় আরম্ভ হবে জেনে পণ্ডিতজীর ওখানে যাওয়া গেল। সেখানে "Independence and After" বইখানি পড়লাম—খুব ভাল লাগল। স্বাধীনতা পেলেও আমাদের জাতীয় জীবন আশানুরূপ চরিত্রবলদীপ্ত ও কর্মতৎপর হয়ে উঠছে না, এটা খুবই দুঃখের।

ওখান থেকে চিঠির সন্ধান করে বাসায় ফিরলাম। সন্ধ্যা ছ'টায় ভোজনপর্ব্ব শেষ করে পণ্ডিতজীর সঙ্গে বাহাইদের ওখানে গেলাম। বাহাইরা তাঁদের কিছু কিছু বই দিলেন। আমার বক্তৃতায় তাঁরা খুব খুশী দেখলাম—পণ্ডিতজীর মুখ হাসিতে ভরে উঠল। অজ্ঞাত-পরিচয় বন্ধুর জন্য তার লজ্জা পেতে হ'ল না বরং সকলের সাধুবাদ পেলেন।

বাহাইদের ধর্ম্মমতের উদারতা তাঁদের সুশীল করে তোলে। তাই এই অমায়িক বন্ধুদের সঙ্গে সময়টা বেশ কাটল। রাত দশটায় বাসায় ফিরলাম।

শনিবার বেলা নয়টা পর্য্যন্ত হোটেলেই থাকি। তার পর আমি কলেজে গেলাম। একটি আরব তরুণীপথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। মেয়েটি কৃষ্ণা কিন্তু সুশ্রী। এদের 'ডীন' এবং সহকারী ডীনের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁরা বললেন—ওখানে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের বড়ই অভাব—ভারতবর্ষ থেকে লোক নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পান নি। রবিবার চারটায় এদের 'ইংলিশ সোসাইটি' নামক সভায় বক্তৃতা দেব স্থির হ'ল।

ওখান থেকে ডক্টর মহম্মদ ইয়াসিনের সঙ্গে দেখা করলাম। ভাল লোক, আলাপ-কুশল। তিনি ওখানকার প্রচার-অধিকর্ত্তার ("Director of Propaganda") সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তিনি ব্যস্ত থাকায় তাঁর সহকারীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি রেডিও প্রোগ্রামের তদারক করেন। তার কাছে "India and the World" নামে আমার একটি রচনা রেখে এলাম।

এখান থেকে মেয়েদের কলেজে গেলাম। রাণী আলিয়ার নামে কলেজটি সুপরিচালিত—এখানে একটি পার্শী মহিলা অধ্যাপিকা আছেন, তার নাম মিস কামা। ওখান থেকে ফিরলে পণ্ডিতজী এলেন।
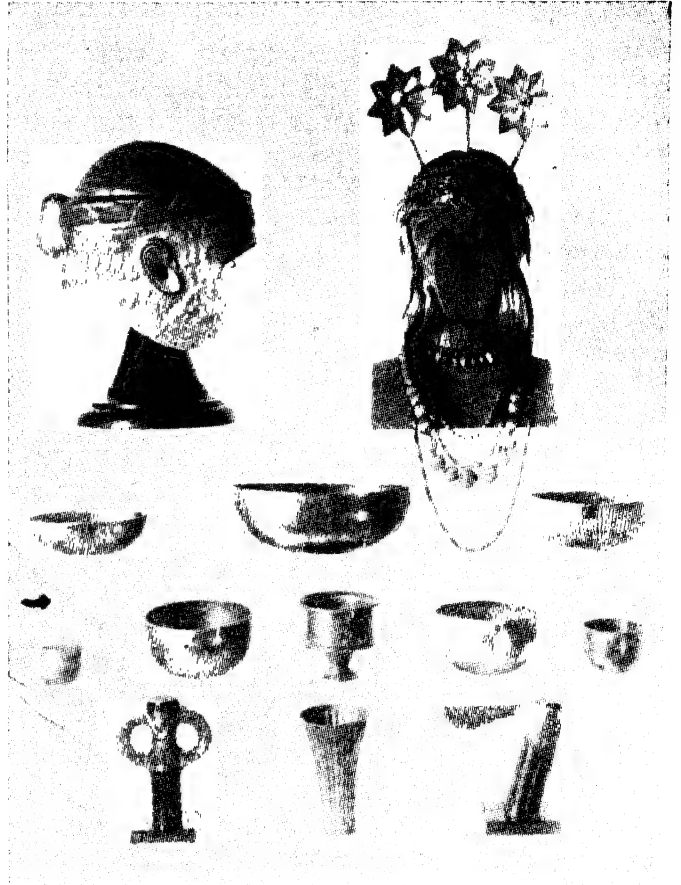
উর সমাধিতে প্রাপ্ত স্বর্ণাভরণ

এখানে আর্য্যসমাজের গৃহরচনার জন্য একখণ্ড ভূমি কিনেছিলেন—তার উপর সমাজগৃহ করবেন এই তাঁর বাসনা। এই জন্য তিনি আর্য্যসমাজের ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট দরবার করতে বললেন। তাঁর সেই অনুরোধ দিল্লীতে আর্য্যসমাজের দু'চার জনকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু কোনও ফল হয়েছে বলে মনে হয় না। ঐ দিনে "The Flame of Calcutta" নামে একটা ছায়াচিত্র দেখলাম। এটি একেবারে বাজে—যারা ছবি তুলেছে তাদের কলিকাতা সম্বন্ধে আদৌ জ্ঞান নেই। ভারতীয় পরিবেশ আদৌ সৃষ্টি হয় নি—একটা জগাখিচুড়ি করে রেখেছে। এই ধরনের ছবি ভারতবর্ষের বিকৃত পরিচয় দিয়ে বিস্তর ক্ষতি করে। রাত্রে ফিরে Lampard-এর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তার কথাবার্ত্তা গোঁড়ামিতে ভরা। এযুগেও তাঁর ধারণা—পৃথিবীর একমাত্র সেরা বই—'বাইবেল'। মানুষের যতকিছু সমস্যা, যতকিছু ভাবনা—তার সমাধান রয়েছে বাইবেলের ভিতর।

রবিবার—পাকিস্থান Chancery-তে গেলাম করাচীর একখানা মানচিত্রের জন্য—অনেক খোঁজাখুঁজির পর আপিসে পৌঁছলাম, কিন্তু পেলাম না মানচিত্র। চৌধুরী বলে একজন বাঙালী আছেন এদের আপিসে। সেখান থেকে এদের Charge-de-affairs' নাজিম হোসেনের বাসায় গেলাম। ভদ্রলোক বেশ আলাপী।

পাকিস্থানের আপিসে একটা চমৎকার বই পড়লাম—ভাল কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহের কৌশল। বইখানি চমৎকার ভাষায় অর্থসংগ্রহের পন্থা নির্দ্দেশ করেছে।

চারটার সময় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে যাওয়ার জন্য বার হলাম। এটি নদীর অপর পারে। টাইগ্রিস নদীর উপর কয়েকটি সুন্দর সুন্দর সেতু আছে, তাদের একটি দিয়ে ওপারে গেলাম।

স্বর্ণ-বীণা
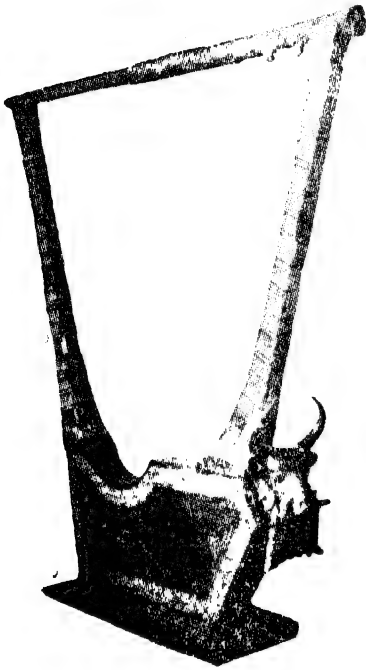
সন্ধ্যা সাতটায় বক্তৃতা আরম্ভ হ'ল। বাগদাদ-প্রবাসী ভারতীয়দের অনেকেই এসেছিলেন। আমি ঘণ্টাদেড়েক বললাম—ওরা খুব খুশী হলেন। বাগদাদে এলাম, কিন্তু খেজুর খাওয়া হ'ল না। এটা সত্যই বড় একটা ভুল হয়ে গেল। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ খেজুরই ইরাক থেকে রপ্তানি হয়। আর এই খেজুরের চাষ ইরাকের প্রাচীনতম শিল্প। এখান থেকে বর্ত্তমানে নূতন পদ্ধতিতে খেজুরকে পরিস্রুত করে বিদেশে পাঠানো হয়।

রাত্রে আহার করে জিনিষপত্র অনেকটা গুছিয়ে নিলাম—আগামীকাল রওনা হতে হবে। সোমবার সকালেই মনের সাধে স্নান করে নিলাম সকলের আগে—একটু একটু শীত করছিল. কিন্তু তাকে আমলই দিলাম না। প্রাতরাশ সেরে শর্ম্মাজীর কাছে গেলাম দক্ষিণা দিতে।

শর্ম্মাজী বললেন—পণ্ডিতজি ফোন করেছেন, কে. এল. এমের বাসের জন্য অপেক্ষা না করে আমি যেন ট্যাক্সি করে বিমান-পোতাশ্রয়ে চলে যাই, পণ্ডিতজী আর হংসরাজ সেখানে গেছেন। যথারীতি বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে ট্যাক্সিতেই গেলাম—পাঁচ শিলিং খরচ হ'ল—পণ্ডিতজী সেটা দিয়ে দিলেন। প্লেন ছাড়বার দেরি ছিল। পণ্ডিতজী, হংসরাজ, গিল ও আমি তৃণাচ্ছাদিত মাঠে চেয়ার পেতে গল্প জুড়লাম।

বাগদাদ বিমান-পোতাশ্রয়

'ইরাণ টাইম্‌স' পত্রিকায় আমার বিষয় কিছু বার হয়েছিল—সম্পাদকের সহিত আমরা আলাপে আমি বলেছিলাম—আজ পৃথিবীতে ঐক্যের দিন এসেছে—এই ঐক্যের পথ মানুষে মানুষে, দেশজাতিনির্ব্বিশেষে একটি আন্তর্জ্জাতিক ভাষার অনুশীলনে সম্ভব। প্রত্যেক জাতি যদি নিজ নিজ মাতৃভাষার সঙ্গে একটি আন্তর্জ্জাতিক ভাষা শেখে—তা হলে খুব ভাল হয়। সম্পাদক মহাশয়কে বলেছিলাম—ইংরেজীর এই আন্তর্জ্জাতিক ভাষা হওয়ার শক্তি আছে।

বিমান ছাড়ল—পণ্ডিতজী আকুল নয়নে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কবে, ইংরেজ আমলে এসেছিলেন ভারত ছেড়ে, সেই থেকে রয়ে গেছেন আজও। বিমান থেকে বাগদাদ শহর চোখে পড়ল।

টাইগ্রিস নদীর দুই কূলে নূতনের জয়ধ্বনি বাজছে। ইরাকীরা নব নব পরিকল্পনায় ব্যাপৃত—নূতন আশায় এরা মেতেছে।

দাগ

শ্রীদীপক চৌধুরী

—'And their blood is the seed of the future harvests.'

মহীতোষের বিবৃতি

আজ শুধু সুতপা রায়ের কথাই মনে পড়ছে। বার বার করে মনে পড়ছে। কলকাতার এই বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে সুতপা রায়ের অস্তিত্বটা বিন্দুর চেয়ে বড় ছিল না বটে, কিন্তু তবু তাকে ভোলা গেল না—দৃষ্টির বাইরে তাকে সরিয়ে দেওয়াও গেল না।

ভুলে যাওয়াই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল। মানুষের স্মৃতি-শক্তির ওপর এত বেশী অত্যাচার এ যুগের মত অন্য কোন যুগেই আর হয় নি। অসংখ্য নামের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ঘটনাও মনে করে রাখতে হচ্ছে। একালের মত এত বেশী প্রাতঃস্মরণীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার সংখ্যা অন্য কোন কালেই ছিল না। খবরের কাগজগুলির বুকে যুগপুরুষদের কি বিরাট মিছিল চলেছে দিনরাত! সুতপা রায়ের মত সাধারণ একটি মেয়ের বুকের ওপর দিয়ে মিছিলটা পার হয়ে গেল, থেৎলে গেল সুতপার গোটা অস্তিত্বটা। অথচ কাগজের গায়ে এক ইঞ্চিও দাগ লাগল না। এক ইঞ্চি কাগজের দাম না কি ষোল টাকারও বেশী।

হয়ত ষোল টাকার চেয়ে অনেক বেশীই হবে। তাই আজকের কাগজে সুতপার কোন খবর বেরোয় নি। এসপ্লানেডে ঘুরে ঘুরে সবগুলি দৈনিক আমি কিনে ফেললাম। আপিসে বসে পড়েও ফেললাম সব। কোথাও সুতপার নামটা আমি খুঁজে পেলাম না।

গতকল্যের ঘটনাটা কি দেশের লোকের জানা উচিত ছিল না? আপিসে বসে ঘটনাটা লিখলাম আমি। সবসুদ্ধ আট লাইন হ'ল। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, "দেখুন ত, এই আট লাইনের খবরটা ছাপাতে কত টাকা লাগবে?"

টেবিলের ওপর উবু হয়ে বসে যুবকটি বিজ্ঞাপন পড়ছিলেন। একটু বাদে যুবকটি হাসতে লাগলেন। হাসির ভঙ্গিতে তাঁর রহস্যের ঢেউ।

জিজ্ঞাসা করলাম, "হাসছেন কেন?"

"না—এমনিই। সুতপা রায় আপনার কে হন?"

বললাম, "আমার কেউ নয়। এক আপিসে কাজ করি।"

"কোন্ আপিসে?" পুনরায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

বললাম, "বণিক আপিসে। উনি হচ্ছেন গিয়ে লাহিড়ী সাহেবের ষ্টেনো।"

"ওঃ—" যুবকটি লাইন গুনতে গুনতে জিজ্ঞাসা করকরলেন, "মিস রায় বুঝি কাল ময়দানে গিয়েছিলেন বক্তৃতা শুনতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁর নাম হচ্ছে মিসেস সুতপা রায়।"

"তবে আপনি পয়সা খরচ করে খবরটা ছাপাচ্ছেন কেন?" যুবকের সুরে ভেসে উঠল হতাশা ও অভদ্রতার ধ্বনি।

পুনরায় সবিনয়ে বললাম, "দেখুন ত, আট লাইনের খবরটা ছাপাতে কত টাকা লাগবে।"

হিসেব করে এবার তিনি বললেন, "ষোল টাকা।"

মাসের প্রথম সপ্তাহ, তাই ষোল টাকা দিতে পারলাম আমি।

আমাদের আপিসে কাজ করে সুতপা রায়। মুখ চেনা ছিল। হয় ত দু'চার দিন দু'একটা কথাও হয়ে থাকবে। কি কথা হয়েছে প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব না। দরকারী কথা কিছু নয়। লিফ্‌টে করে চার তলায় ওঠবার সময় হঠাৎ মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যেত। জড়সড় ভাবে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত লিফ্‌টের কোণায়। বাঁচিয়ে রাখবার মত শরীরের সম্পদ তেমন তার কিছু নেই। তবুও সে সতর্ক থাকত। পাশের জায়গাটা দখল করতে গেলে অন্য পাশে সরে দাঁড়াত সুতপা। 'কেমন আছেন', জিজ্ঞাসা করলে, জবাব দিত চার তলায় উঠে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সুতপা খরচ করতে চায় না। এমন কি দুটোর বেশী তিনটে কথা পর্যন্ত না। আমি ভাবতাম, আর ঠিকই ভাবতাম যে, সঞ্চয় ওর কিছু নেই বলেই খরচের প্রতি ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে পথ চলবার সময় হঠাৎ কোন কোন দিন আমার চোখে পড়েছে ওর দ্বিতীয় অস্তিত্ব। একটা অশরীরী ছায়া সুতপার দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়ে চলতে থাকে ওরই পিছু পিছু। দ্বিতীয়

সুতপা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা যে নকল তা অবশ্য আমি বুঝতে পার নি। বুঝবার জন্যে চেষ্টাও করি নি। গতকল্যের ঘটনাটা আমার চোখে না পড়লে ওর সঙ্গে আমার সত্যিকারের পরিচয় হ'ত না। হলেও ওর গায়ে আমি হাত দিতে পারতাম না। কাল আমি সুতপার গায়ে হাত দিয়েছি।

দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ওর নাকের ডগায় আমি হাত রেখেছিলাম প্রথম। তার পর আঙুল দিয়ে ঠোঁট দুটো ওর চেপে ধরেছিলাম।

মনে আছে আঙুলগুলি আমার কাঁপছিল। পরে বুঝেছিলাম, শুধু আঙুল নয়, সমস্ত শরীরটাই আমার কাঁপছিল। দু'তিন বার চেষ্টা করেও ওকে কোলে তুলতে পারি নি। যখন পারলাম, তখন আমার হাসি পেল। বোধ হয় পঁচিশ কি ত্রিশ সের ওজন হবে। সুতপার ওজন যে এত কম বাইরে থেকে দেখে আমি বুঝতে পারি নি। আমি কেন, আপিসের কেউ কি বুঝতে পেরেছিল? কাল আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, সুতপা রায় দু'জন। একজন লাহিড়ী সাহেবের ষ্টেনো, অন্য জন কাল আমার কোলে চেপে ময়দানটা পার হয়েছে বিনা প্রতিবাদে। একজনকে চোখে দেখলে চেনা যায়, অন্য জনকে বুকের ওপর চেপে অনুভব করতে হয়।

খবরের কাগজের আপিস থেকে বেরিয়ে এসেছি প্রায় আধ ঘণ্টা আগে, বেলা এগারোটায়। লাহিড়ীসাহেব কেন, আপিসের সবাই এতক্ষণ বুঝতে পেরেছেন, সুতপা রায় আজ কাজে আসবে না। সুতপা ছাড়া আরও একজন ষ্টেনো আছে। মাদ্রাজী। তাকে দিয়ে লাহিড়ীসাহেব তাঁর কাজ চালিয়ে নেবেন। সুতপার অনুপস্থিতি কারও চোখেও পড়বে না। চোখে পড়বার মত সুন্দরী সুতপা নয়।

লিফটে চেপে চারতলায় উঠে এলাম। বণিক আপিসের মস্তবড় হল ঘরটায় বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা নেই। মেশিনের নিয়মানুবর্ত্তিতা পাখার হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে ঘরটার চতুর্দ্দিকে। ইশারা করে বড়বাবু ডাকলেন আমায়। জিজ্ঞাসা করলেন, "বাইরে এতক্ষণ কি করছিলেন?" বড়বাবু জানতেন সত্য কথা আমি বলব না। কোন্ মানুষটা সত্য কথা বলে? বড়বাবু পৃথিবীটা দেখছেন অর্দ্ধ শতাব্দীর ওপর। তিনি কি জানেন না যে, স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকলে এখানে কেউ সত্য কথা বলতে চায় না?

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "লাহিড়ীসাহেব আমায় ডাকছিলেন নাকি?"

"না। তিনি এখনও আপিসে আসেন নি।"

বড়বাবুর কথা শুনে খুবই আশ্চর্য বোধ করলাম। কোনদিনই ত তাঁকে লেট হতে দেখি নি। সকাল সাড়ে ন'টায় তিনি আসেন। দশটা পর্যন্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর হেণ্ডারসন সাহেবের কামরায় মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তিনি। দশটার একটু পরে ডেকে পাঠান 'মিসেস সুতপা রায়কে। আজ দেখলাম, নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে।

বড়বাবু বললেন, "বিলেত থেকে আজ আমাদের একজন নতুন সাহেব আসছেন, মিষ্টার হেওয়ার্ড।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। হেণ্ডারসন সাহেব দেশে চললেন। বোধ হয় আর ফিরবেন না।" একটু থেমে বড়বাবুই আবার বললেন, "শুনলাম, ছোকরা সাহেব। বড়কর্ত্তাদের আত্মীয়...জানেন, মিসেস্ রায় অসুস্থ?"

"অসুস্থ নয়, আহত। আপনি খবর পেলেন কি করে? খবরের কাগজে নিউজ বেরিয়েছে নাকি?"

"কি যে বলেন! একটু আগে একটা চিঠি পেলাম। গড়িয়া থেকে কে একজন এসে দারোয়ানের হাতে চিঠিখানা দিয়ে গেছে।...কিন্তু লাহিড়ী সাহেবের আবার কি হ'ল?"

"আর যাই হোক, তিনি নিশ্চয়ই আহত হন নি। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে যাঁরা দু' হাজার টাকা মাইনে পান ... আচ্ছা, আমি এবার চলি বড়বাবু। হাতের কাজ সব শেষ করে দিচ্ছি। এক ঘণ্টা আগে আজ ছুটি চাই।"

"কেন?"

"গড়িয়া যাব।"

হাতের কাজ শেষ করতে পারি নি। কিন্তু আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম চারটের আগেই। সুতপা কাল আমায় অনুরোধ করেছিল, যদি সময় পাই তা হলে ওকে যেন একবার দেখে আসি। পাঁচ বছর একই আপিসে একসঙ্গে কাজ করছি। রবিবার এবং ছুটির দিনগুলি বাদ দিলে ওকে ত প্রত্যেক দিনই দেখেছি। দেখেছি এবং ভুলেও গেছি তপন লাহিড়ীর ষ্টেনো সুতপা রায়কে। আজ যাকে দেখতে যাচ্ছি তার পরিচয় নতুন—হয় ত সারা জীবনেও তাকে ভোলা যাবে না। দ্বিতীয় সুতপার নিঃশ্বাস আমার গায়ে লেগেছে।

ময়দানের জনসভায় কাল আমিও গিয়েছিলাম বক্তৃতা শুনতে। বিরাট জনসভা। আইনের চাবুক মেরে সমাজদেহের গলিত মাংস সব ফেলে দিচ্ছিলেন ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাস হবে। সামাজিক বিপ্লবের জয়পতাকা আমিও দেখতে চেয়েছিলাম। ময়দানের সভায় কাল আমিও তাই উপস্থিত ছিলাম।

সভাশেষে উত্তেজিত জনতা বন্যার জলের মত ছুটে

চলেছে ময়দানের চতুর্দ্দিকে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম এক পাশে। পেছন থেকে গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলাম। একটু দূরেই দেখলাম সুতপা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ময়দানের বুকের ওপর। ওর কাছে গিয়ে পৌঁছতে সময় লাগল আমার। উন্মত্ত জনতা তখন বক্তৃতামঞ্চের দিকে ছুটছে। এরা কেউ বক্তৃতা শুনতে আসে নি। ভারতবর্ষের যাঁরা নেতা তাঁদের মুখ দেখবার জন্যেই এখানে আজ এত ভিড়।

সুতপার কাছে গিয়ে পৌঁছতে বোধ হয় মিনিটপাঁচেক লেগেছিল। কেউ সেখানে আর তখন ছিল না। বিকেলের সূর্য হেলে পড়েছে গঙ্গার পশ্চিম পারে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঈষৎ পূর্বের উত্তাপ সব এরই মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে —ময়দানের বুকে নরম অনুভূতি। কচি কচি সবুজ ঘাসের মাথাগুলি জনতার পায়ের চাপে নুয়ে পড়েছে। তারই ওপর ভেঙে পড়েছে আমাদের আপিসের সুতপা রায়।

নাকের তলায় হাত রাখলাম। নিঃশ্বাসের ভাও দেখলাম এখনও নিঃশেষ হয় নি। কশ বেয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তের রং লাল নয়। তামাটে রঙের বিন্দু দেখলাম ওর ভাঙা চোয়ালের মধ্যে এসে আটকে রয়েছে। সুতপার নষ্ট স্বাস্থ্যের পাঁক আমার হাতে ঠেকল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে গিয়ে অনুভব করলাম রক্তের ফোঁটাগুলি ঠাণ্ডা। —বুঝলাম উষ্ণতার পুঁজি ওর কত কম!

দু'একজন সংবাদদাতা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একটু বাদেই কাছে এগিয়ে এলেন তাঁরা। সুতপার নাম এবং পরিচয় দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম, আগামী কল্যের সংবাদ পত্রে যেন ঘটনাটার উল্লেখ থাকে।

মুহূর্ত পূর্বেও ভাবতে পারি নি যে, সুতপা রায়ের গোটা অস্তিত্বটা বহন করবার শক্তি রাখি আমি। নিজের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা আমার কোন দিনই ছিল না। কিন্তু আলগা করে ওকে যখন আমি তুলে ফেললাম, তখন আমার হাসি পেল। আধ মাইল লম্বা ময়দানটা পার হয়ে গেলাম হাসতে হাসতে।

চৌরঙ্গীর রাস্তায় এসে ট্যাক্সি নিলাম। হাসপাতালে যাওয়ার উদ্দেশ্যই আমার ছিল। হঠাৎ দেখি সুতপা সোজা হয়ে উঠে বসেছে। উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গে শাড়ীর আঁচল দিয়ে দেহটাকে ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করছে। দেহ? বোধ হয় অন্য কিছু হবে। ঢাকবার মত দেহের আকৃতিতে ওর আদিম ঐশ্বর্য নেই। থাকলে, বণিক আপিসের তপন লাহিড়ীকেও আজ আমি এখানে দেখতে পেতাম।

তবুও দেহটাকে ভাল করে ঢাকবার জন্যে সুতপার সে কি চেষ্টা। ট্যাক্সির কোণার দিকে সরে বসলাম আমি। সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "আমি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম, না?"

"বোধ হয় মাটিতে পড়ে যাবার পর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এখন কেমন আছেন আপনি?"

"অনেকটা সুস্থ বোধ করছি।"

"তা হলে কি হাসপাতালে যাবেন না?"

"হাসপাতাল?" চৌরঙ্গীর দিকে চেয়ে সুতপা রায় বলল, "না, কিছু দরকার নেই। মাসীমার ওখানেই যাব। গাড়ী ঘুরিয়ে নিতে বলুন।"

মেট্রো সিনেমার কাছ থেকে গাড়ীটা ঘুরল। ঘুরল উল্টো দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় যেতে হবে?"

"গড়িয়া।"

সামনের দিকে মুখ করে ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল, "করপোরেশন এলাকার বাইরে যেতে পারব না।"

সুতপা রায় সঙ্কুচিত ভাবে বলল, "গড়িয়াহাটের মোড়ে গিয়ে আমরা বাস ধরব। আপনি যখন সঙ্গে আছেন, তখন আর ওকে গড়িয়া পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই।"

বললাম, "আপনি ভাববেন না। বাড়তি পয়সা পেলে ট্যাক্সিওয়ালা ভূ-প্রদক্ষিণ করতেও রাজী হবে।...আপনার কি খুব লেগেছে?"

চুপ করে রইল সুতপা রায়। দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করলাম আমি। এবার সে ধীরে ধীরে বলল, "না তেমন কিছু নয়। শরীরটা ভাল ছিল না। হঠাৎ কেমন দুর্বল বোধ করতে লাগলাম। কখন যে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম মনে নেই। পড়ে যাওয়ার পরে মনে আছে ওরা সব আমার গায়ের উপর পা ফেলে এদিক-ওদিকে ছুটতে লাগল।"

"ওরা? ওরা কারা মিসেস রায়?"

"পুরুষমানুষেরা।"

শেষের কথাটা সুতপার মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল অত্যন্ত ধীরে ধীরে। মনে হ'ল বিদ্বেষের কাদায় প্রতিটি অক্ষর ভারী হয়ে উঠেছে। অক্ষরগুলো আজই হঠাৎ কর্দ্দমাক্ত হয়ে উঠে নি। ওর মনের উপর পায়ের দাগ পড়েছে অনেক দিন আগে।

আমি বললাম, "আপনার নাক এবং মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল।" মুহূর্তের জন্যেও অবাক হ'ল না সুতপা রায়। কোন কিছু জানতেও চাইল না সে। অতএব আমাকেই আবার বলতে হ'ল, "একবার ভাল করে দেখুন ত বুকে পিঠে কোথাও আঘাত লেগেছে কি না।"

এবার সে ওপাশ থেকে মুখটা তার ঘুরিয়ে নিয়ে এল। চোখদুটো তুলে ধরল আমার দিকে। চোখের ভঙ্গিতে ওর আঘাতের গভীরতা দেখতে পেলাম আমি। দু'দশ জন

পুরুষমানুষের পায়ের চাপে এত বেশী আঘাত কেউ পায় না। আমি তাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "খুব বেশী লেগেছে, না ?"

তপন লাহিড়ীর ষ্টেনো সুতপা রায় আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। মুখ নীচু করে চোখের জল ফেলতে লাগল সে।

লোয়ার সারকুলার রোড পার হয়ে এলাম। গুরুসদয় দত্ত রোড পর্যন্ত কোন কথা হ'ল না। এরই মধ্যে বার-কয়েক আমি এসপ্লানেডের আপিসটা ঘুরে এসেছি। পাঁচ বছর আগে যেদিন সুতপা প্রথম এসে আমাদের আপিসে কাজে যোগ দিল সেদিনটাও চোখের উপর ভেসে উঠল আমার। আমরা সবাই সেদিন ভাল জামাকাপড় পরে এসেছিলাম। আমাদের আপিসে মেমসাহেবের সংখ্যা বড় কম নয়। কিন্তু বাঙালী মেয়ে কেউ ছিল না। সুতপা এল প্রথম। এতদিন যেন আমরা ইংরেজ বণিক আপিসে ডাঙার মাছের মত নিঃশ্বাসও নিতে পারছিলাম না। স্বাধীন ভারতবর্ষেও গোলামির মানসিকতা থেকে মুক্তি পাই নি আমরা। সুতপা যেন আমাদের জন্যে প্রথম এই মুক্তির জল নিয়ে এল! বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে বড়বাবুও সেদিন গলা-বন্ধ কোটের ইস্ত্রি বাঁচিয়ে আপিসে এসেছিলেন। বাগবাজার থেকে ট্যাক্সি ধরেছিলেন তিনি।

তার পর সুতপা যখন লিফটে করে চারতলায় উঠে এল তখন দেখলাম বড়বাবুই প্রথম তাঁর গলাবন্ধ কোটের ইস্ত্রির ভাঁজ সব নষ্ট করে ফেললেন। গা থেকে কোটটা খুলে রেখে দিলেন চেয়ারের হাতলের উপর। সুতপার ভাঙা চোয়ালের রুগ্নতা বণিক আপিসের ধুলোর সঙ্গে মিশে রইল। কেউ আর ওর দিকে আগ্রহ নিয়ে চোখও তুলল না। আমিই কেবল সুতপা রায়ের দ্বিতীয় অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছিলাম। ধুলো থেকে তুলে আনবার লোভ আমি তাই কোনদিনই গোপন করতে পারি নি। এখন ত আমি ওর পাশেই বসে আছি। গুরুসদয় দত্ত রোড পার হয়েও এলাম।

গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে বললাম, "একজন ডাক্তার আমার চেনা আছে। তিনি এই অঞ্চলেই থাকেন, চলুন না, একবার তাঁকে দেখিয়ে আসবেন ?"

"কি দেখাব ?"

"ব্যথা—মানে যে জায়গাটায় আঘাত লেগেছে।"

"মাসীমার কাছে গিয়ে পৌছতে পারলে ব্যথা-বেদনা আর কিছু থাকবে না।"

যোধপুর ক্লাব ডানদিকে রেখে ট্যাক্সিটা যাদবপুরের রাস্তা ধরেছে। কয়েক বছর আগে এদিকটায় একবার এসেছিলাম। আজ আমার চোখে গোটা এলাকাটা নতুন নতুন ঠেকতে লাগল। দু'দিকের ফাঁকা মাঠে বড় বড় বাড়ী উঠেছে। ডোবাগুলোও দেখলাম নেই। মাটি দিয়ে ভরাট করে তার উপরও বাড়ী তোলা হয়েছে। এ অঞ্চলের নির্জনতা লুপ্ত। ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত টিন এবং টালির ঘরগুলো দেখে মনে হ'ল, রিফিউজীদের কলোনী তৈরি হয়েছে রাস্তার দু'ধারে। ডানদিকের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল আমার—বাঘা যতীন কলোনী। যাদবপুরের পুরনো মাটিতে নতুন ঘাসের সমারোহ!

ট্যাক্সির মিটারের দিকে চেয়ে বললাম, "দূর ত কম নয়। প্রত্যেক দিন সময়মত আপিসে পৌঁছোন কি করে ?"

"একটু আগে বেরুতে হয়। গড়িয়ার মোড় থেকে পাঁচ নম্বর ধরি। ফেরবার মুখেও আবার সেই পাঁচ নম্বরই ধরতে হয়।" এই বলে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে সুতপা রায়ই আবার বলল, "প্রায় বারো মাইল যেতে, বারো মাইল আসতে।"

"আপিসের কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় থাকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রত্যেকদিন চব্বিশ মাইলের চাবুক পড়ছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়বেন।"

"মাসীমাকে ছেড়ে আসবার ক্ষমতা আমার নেই। তা ছাড়া মেসোমশাইও সেখানে আছেন। তাঁরা আমার আত্মীয় নন। সেই জন্যেই ছাড়তে পারি না।"

জ্ঞান বাড়ছে আমার। বণিক আপিসের সর্বগ্রাসী আধিপত্যের দূষিত আবহাওয়া থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্তি পাচ্ছি আমি। সুতপা রায়কে তপন লাহিড়ীর ষ্টেনো বলে মনে হচ্ছে না আর। ওর ভাঙা চোয়ালে মাংস গজাচ্ছে। শহর কলকাতার বর্বরতা বাঘা যতীন কলোনীর সীমানা পার হতে পারে নি। প্রাক্-সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আলোয় দেখলাম বৈষ্ণবঘাটার মাঠে সবুজের ঢেউ উঠেছে। কচি কচি ধান গাছের শীর্ষদেশে সভ্যতার বিজ্ঞাপন। লোভের কাস্তে খেয়ে এরা এখনও ক্ষতবিক্ষত হয় নি।

জিজ্ঞাসা করলাম, "মেসোমশাই কি করেন ?"

"কি একটা কাজ করতেন। এখন তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন। শুনেছি এক সময়ে তাঁর প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি ছিল। এখন আর কিছু নেই। সরকার-কুঠি নামে পৈতৃক বাড়ীটা শুধু আছে। সরকার-কুঠি পাকা বাড়ী। মাসীমা পেইং-গেষ্ট রাখেন।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "পাড়াগাঁয়ের মধ্যে তিনি হোটেল খুলেছেন বুঝি ?"

"না। হোটেল কিংবা মেসবাড়ী এটা নয়। অবশ্যই থাকা এবং খাওয়ার জন্যে পয়সা দিতে হয়। বাইরে থেকে সরকার-কুঠির বৈশিষ্ট্য কেউ বুঝতে পারে না। এখানে প্রথমে থাকতেই আসে। তার পর সবাই এখানে আশ্রয়

পায়। সরকার-কুঠি হোটেল নয়, এটা হচ্ছে মাসীমার পরিবার, সংসারও বলতে পারেন।" এই বলে সুতপা বাইরের দিকে আঙুল তুলে পুনরায় বলতে লাগল, "ওইটা হচ্ছে গড়িয়ার খাল। আমরা এবার বাঁদিকে ঘুরব। ডানদিকের রাস্তাটাকে বঙ্কিতের মোড় বলে। একটু এগিয়ে গেলেই পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির দেখতে পাবেন। আমার আজ সেখানে পুজো দেবার তারিখ ছিল।"

"আপনি পুজো দেন বুঝি?" বিস্মিত হলাম আমি।

"হাঁ। আজ দিতে পারি নি। বোধ হয় সেই জন্যেই শাস্তি পেলাম। পঞ্চানন ঠাকুরের দুটো পা-কে উপেক্ষা করতে গিয়ে, আপনি নিজেই ত দেখলেন, হাজার লোকের পায়ের দাগ নিয়ে আজ আমি বাড়ী ফিরছি।" সুতপা চোখ বুজল। ভাল করে হেলান দিয়ে বসল ট্যাক্সির পেছনে। আমি ওর দিকে চেয়েছিলাম। হাজার মানুষের পায়ের দাগ দেখবার জন্যে মন আমার একবারও উদগ্রীব হয় নি। আমি দেখবার চেষ্টা করছিলাম শুধু একটা দাগ, যে দাগ কেবল একটা মানুষের পা থেকে উৎসারিত হয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি, শুধু সেই দাগটিই ওর মনের আকাশটাকে কালো করে রেখেছে। হাজার মানুষের নিষ্ঠুরতা হয় ত বা সে এরই মধ্যে দেহ থেকে মুছে ফেলেছে। ডাক্তারের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন বোধ হয় ওর সত্যিই নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ময়দানে গিয়েছিলেন কেন? পঞ্চানন ঠাকুর আপনাকে যা দিতে পারেন, দুনিয়ার অগণিত নেতার ত তা দেবার সাধ্য নেই।"

"মানুষের ত ভুল হবেই মহীতোষবাবু। পঞ্চানন ঠাকুর বক্তৃতা দিতে পারেন না বলেই সম্ভবত আমি বক্তৃতা শুনতে ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে আসবার পরে প্রথমেই আমার কি মনে হয়েছিল জানেন?"

"আপনি বলুন, আমি শুনি।"

সুতপা বলতে লাগল, "ভাগ্যিস্ মন্দিরের তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে একটি দেবতাও বক্তৃতা দেবার ভাষা পান নি!"

আমার সন্দেহ হ'ল, মহিলাটি আমার প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিতে রাজী নয়। ময়দানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা সে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে চাইছে না।

ট্যাক্সি থেকে নামতে হ'ল। সরকার-কুঠি পর্যন্ত গাড়ী যায় না। তা ছাড়া খানিকটা নীচে নামতে হবে, গড়িয়ার খাল পর্যন্ত। দু'পা হাঁটবার পরে সুতপা বলল, "কষ্ট হচ্ছে।"

"কোথায়?" আমার প্রশ্নের প্রত্যক্ষতায় সুতপা একটু বিচলিত বোধ করল। জবাব দিতে দেরি করতে লাগল সে। আঁচলটা আলগা না করে সে আরও বেশী সতর্ক ভাবে আঁচলটাকে গুছোতে লাগল। গুছোতে গুছোতে সে বলল, "ডান পায়ের হাঁটুটা বোধ হয় জখম হয়েছে। হাঁটতে কষ্টই হচ্ছে খুব।"

"হুঁ টবার কি দরকার? ময়দান থেকে চৌরঙ্গীর রাস্তা পর্যন্ত ত হেঁটে আসেন নি।"

"এতটা কাছে কি করে যে এসে গেলেন তাই ভাবছি। আমি যে তপন লাহিড়ীর ষ্টেনো তা বোধ হয় আপনি জানেন মহীতোষবাবু?"

"জীবনের ময়দানটা এত বড় যে, তপন লাহিড়ী তাঁর দৃষ্টি দিয়ে সবটা দেখতে পাচ্ছেন না। মানুষের দৃষ্টি যে সীমাবদ্ধ তা বোধ হয় আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন।"

"জানি। আর এও জানি যে, পঞ্চানন ঠাকুর মানুষকে এই জায়গায় পরাস্ত করেছেন। তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন না বটে, দেখতে পান সবই।"

"তা হলে বিপদ সব কাটল। এবার আসুন, আমার হাতের উপর ভর দিয়ে পথটুকু পার হবেন।"

সুতপা রায় পথ চলতে লাগল আমাকে অবলম্বন করে। ঢালু রাস্তা দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলাম আমরা। গড়িয়ার খালটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মরা খাল। জল যতটা আছে তার চেয়ে কাদার পরিমাণ বেশী। গড়িয়ার এটা ব্যাকওয়াটার। সুতপার জীবনটাও যেন ঠিক এরই মত বলে মনে হ'ল আমার।

সমতল রাস্তায় নেমে জিজ্ঞাসা করলাম, "মিষ্টার রায়, মানে আপনার স্বামীও কি এখানে থাকেন?"

"না।"

"আমারও ঠিক এই রকমই ধারণা হয়েছিল।"

"একথা কেন বলছেন?"

"বলছি আপনি ময়দানে গিয়েছিলেন বলে। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন সম্বন্ধে আপনার এত আগ্রহ কেন?"

"কিন্তু আমি ত বিচ্ছেদ চাই না। তবুও ময়দানে আমি গিয়েছিলাম। মহীতোষবাবু, আমি ভেবেছিলাম, দিল্লীর বড় নেতা আজ ময়দানে বিপ্লবের আগুন জ্বালাবেন। আগুনের তাপ লাগাতে গিয়েছিলাম। নইলে—নইলে আমি যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি!"

পাঁচ বছর ধরে যাকে দেখছি তার পক্ষে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যাকে দেখি নি তার উত্তাপ আমি অনুভব করছি। হাতের আস্তিন আমার গুটনোই ছিল। সুতপা আমার ডান হাতের উপর ভর দিয়ে পথ চলছে। ওর দ্বিতীয় অস্তিত্বটা আমার উপর অবলম্বনশীল

নয়। পঞ্চানন ঠাকুরকে যে মেয়েটি পুজো দিতে যায়, সে আজ ময়দানের সভায় বিপ্লবের আগুন গায়ে লাগাতে যায় নি। সুতপাকে বুঝতে সময় লাগবে। আমি জানি, বিপ্লবের নতুন বিগ্রহ খুঁজে বেড়াচ্ছে সে।

সরকার-কুঠিতে প্রবেশ করবার রাস্তাটা খুব সরু। পল্লীগ্রামের পরিবেশ এখান থেকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। মোটর, বাস কিংবা লরী চলার আওয়াজ উঁচু রাস্তাটা থেকেও শুনতে পেয়েছি। এখানে শুধু নির্জনতার স্থায়ী আয়োজন। রাস্তার দু'ধারে নারকেল আর সুপারী গাছের সারি। ঝিরঝির হাওয়ায় উঁচু মাথাগুলো নড়ছে বটে, কিন্তু নীচের নির্জনতাকে আঘাত করতে পারছে না। গড়িয়ার খালটা বাঁ দিক থেকে বাঁক নিয়েছে। আমরা ডান দিকের ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম।

মাসীমাকে দেখলাম। মেসোমশাই ত কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। একতলার বড় ঘরটাতে ভিড় জমেছে। এটাই বোধ হয় সরকার-কুঠির বসবার ঘর। প্রথম দৃষ্টিতে মাসীমার সংসারের আর্থিক দৈন্য আমার চোখে পড়ল। ক'খানা ভাঙা চেয়ার আর বেঞ্চি পাতা রয়েছে। সবগুলো চেয়ারের হাতল ভাঙা। ঘরের এক কোণায় একটা চৌকি ছিল দেখলাম। সুতপাকে ধরে মাসীমা এই চৌকির উপর শুইয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, 'ষষ্ঠী, যাও তো বাবা একটা বালিশ নিয়ে এস।"

ষষ্ঠী বালিশ আনতে গেল। লোকটি একটু মোটা ধরণের মানুষ। বয়স মনে হ'ল চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ। দিন বারো দাড়ি কামায় নি। কাঁচা-পাকা দাড়িগুলো সজারুর কাঁটার মত ছুঁচলো হয়ে উঠেছে।

আমার দিকে চেয়ে মাসীমা বললেন, "বোস বাবা বোস। বলরাম গেল কোথায়? একটা চেয়ার এগিয়ে দে ত বাবা।"

তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সের একটি ছেলে হাতল-ভাঙা চেয়ারটা আমার কাছে এনে বলল, "আপনি বসুন, আমি ধরে থাকছি।" মাটিতে বসে বলরাম চেয়ারের তলায় নিজের ঘাড় ঠেকিয়ে রাখল। চেয়ারের একটা পা নেই।

বলরামের ঘাড় চেপে বসবার মত দেহের ওজন আমার হাল্কা ছিল না। ওর দিকে চেয়ে আমি বললাম, "মেঝে থেকে উঠে এস ভাই।"

বালিশ নিয়ে ষষ্ঠীবাবু ফিরে এসেছে। সে বলল, 'আপনি ভয় পাবেন না, বসুন। বলরামের ঘাড়েগর্দানে অনেক তাকত।"

মাসীমা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "ওরে, ঐ বেঞ্চিটা একটু এগিয়ে নিয়ে আয় না। চেয়ারগুলি বাবা অনেক দিন থেকে ভেঙে পড়ে আছে। এবার সব মেরামত করাতে হবে।"

বুঝলাম, আমার জামাকাপড়ের পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করে এঁরা সবাই বিব্রত বোধ করছেন। মেসোমশাই ইত্যবসরে একটা বেঞ্চি ঠেলতে ঠেলতে আমার সামনে নিয়ে এসেছেন। ত্রিশ নম্বর হেসিয়ানের মত মোটা সুতোয় বোনা কাপড়ের প্যাণ্ট পরেছেন তিনি। প্রথম তাঁর দিকে চেয়ে সত্যিই আমার মনে হয়েছিল যে, প্যাণ্টের কাপড়টা সাহেব কোম্পানীর চটকলে তৈরী। তাও নতুন নয়। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বস্তার ফাঁকে ফাঁকে যেন গড়িয়া খালের কাদা জমেছে। মেসোমশাই পকেট থেকে রুমাল বার করে বেঞ্চিটা মুছতে মুছতে বললেন, "কাল বোধ হয় বলরাম বেঞ্চির ওপর শুয়ে রাত কাটিয়েছে। ও ত ঠিক আইনমত পেইং গেষ্ট নয়। ফিল্ম কোম্পানীর ষ্টুডিওর সামনে থেকে ষষ্ঠী ওকে তুলে নিয়ে এসেছে।"

প্রতিবাদ করল ষষ্ঠীবাবু, "সামনে থেকে নয়। চায়ের দোকান থেকে। ষ্টুডিওর পশ্চিম দিকটাতে একটা চায়ের দোকান আছে। সেখানে সব ফিল্মের 'এক্সট্রা' পাওয়া যায়। তাগড়া তাগড়া ছেলেগুলো মশাই দিনরাত ধুঁকছে। মরা সৈনিকের পার্ট ত সব সময়ে জোটে না। মাসীমা, তোমার ত ভুতোর কথা মনে আছে? ছোঁড়াটা পাঁচ বছর আগে যখন এসেছিল তখন ওর বয়স ছিল পনর। এখন দেখলে মনে হবে, একশ' পনর।"

"ও বাবা, তোমার কথা ত মিথ্যে হতে পারে না। তুমি হচ্ছ গিয়ে ও লাইনের পুরনো লোক।" মন্তব্য করলেন মাসীমা মেসোমশাই বাকী পরিচয়টুকু শেষ করলেন, "ষষ্ঠী হচ্ছে গিয়ে ফিল্ম কোম্পানীর মেক্-আপ ম্যান। কিন্তু ষষ্ঠীর মুখে আজ এত কথা ফুটছে কি করে? গত দশ বছরের মধ্যে ষষ্ঠী বোধ হয় দশটার বেশী কথা বলে নি।"

"বলরামই বোধ হয় ওকে বকাচ্ছে। হ্যাঁ বাবা, তুমি কি বসবে না?" জিজ্ঞাসা করলেন মাসীমা।

মেসোমশাই সহসা রুমাল দিয়ে পুনরায় বেঞ্চিটা মুছতে লাগলেন। বেঞ্চিটা তাতে আরও বেশী ময়লা হ'ল। নোংরা জমে জমে রুমালটা খাকী রঙের মত তামাটে হয়ে উঠেছে। মেসোমশাই আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন। বললেন তিনি, "একটু নস্যি নেওয়ার অভ্যাস আছে মশাই।"

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও একটু হাসতে বাধ্য হলাম।

বলরাম মেঝে থেকে উঠে পড়েছে। চেয়ারটা দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে সে এসে সামনে দাঁড়াল। মাসীমা ওর দিকে চেয়ে বললেন, "যা ত বাবা গরম জলের ব্যাগটা নিয়ে

আয়। উনোনে জলের কেটলী চাপানোই আছে। সেটাও নিয়ে আসিস।"

বলরাম চলেই যাচ্ছিল, এমন সময় মাসীমা বললেন, "না বাপু, থাক। তুই পারবি নে। হাত-পা পুড়িয়ে ফেলবি। আমি নিজেই যাচ্ছি।" মাসীমা উঠলেন। বলরামকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

অনেকক্ষণ থেকে আমি বলরামকে দেখছিলাম। গায়ে দুটো শার্ট পরেছে। পরনেও দেখলাম দু'খানা ধুতি। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ষষ্ঠীবাবুই আমায় বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, বলরাম হচ্ছে গিয়ে রিফিউজীর বাচ্চা। মা বাপ কেউ নেই। গত দশ বছর থেকে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাক্স পেটরা নেই, অথচ একটা শার্ট আর একটা ধুতি ওর বেশী আছে। কোথায় রাখবে ও দুটো? গায়ে লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়। চায়ের দোকান থেকে সেদিন তুলে নিয়ে এলাম।"

ষবাবু বিদায় নিল। পেছন দিকে চেয়ে দেখি, মেসোমশাইও সেখানে নেই।

সুতপাকে বললাম, "এবার তা হলে আমি যাই। মাসীমার সংসারটা দেখে গেলাম।"

"কিছুই দেখেন নি। সবটা দেখতে সময় লাগবে। কাল একবার আসবেন।"

"আসব। মিষ্টার লাহিড়ীকে কিছু বলতে হবে কি?"

"না।"

এই সময়ে মাসীমা গরম জলের ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সুতপাকে বললেন তিনি, "চল্, তোর ঘরে গিয়ে শুবি। মাঠে-ময়দানে যাওয়ার কি দরকার ছিল তোর? থাক, থাক, আমাকে আর বিপ্লবের গল্প শোনাস নে। ফাঁকা মাঠে যারা চেঁচায় তাদের মুরোদ আমি জানি। বিপ্লব আনবেন পঞ্চানন ঠাকুর, বিপ্লব আসবে মনে। আর কোনদিন ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে ময়দানে যাস নি তপা। হ্যাঁরে, এই বাবুটিকে চা খেতে বললি নে?"

"না, না—এমন অসময়ে আমি আর চা খাব না মাসীমা।" মুখ তুলে আমার দিকে চাইতে গিয়ে সহসা তিনি তাঁর মুখটা নীচু করে ফেললেন। ধীরে ধীরে বললেন তিনি, "লালু বেঁচে থাকলে আজ তার তোমার মতই বয়স হ'ত। তোমার মত জোয়ান ছিল সে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় এক দিন ভোররাত্রে এক হাজার পুলিশ এই বাড়ীটাকে ঘেরাও করে। কি করে যেন ওরা সন্ধান পেয়েছিল, লালু সেই রাত্রে বাড়ী ফিরবে। লালুকে ওরা অনেক দিন থেকে খুঁজছিল। দুমদাম করে সরকার-কুঠির দরজাগুলি ওরা ভেঙে ফেলল। পুলিশসাহেব বিপিন চাটুজ্জের নাম শুনেছ ত? কোন কিছুই বুঝতে না পেরে আমি দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলাম। ওমা, সামনে দেখি পিস্তল হাতে নিয়ে বিপিন দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে এক পাশে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে সে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গেল দোতলার ছাদে। একটু বাদেই শুনি, গুলির আওয়াজ হচ্ছে। চারদিক থেকে আওয়াজ আসছে। দোতলার ছাদ থেকে লালু লাফিয়ে পড়েছিল। বোধ হয় ভেবেছিল পেছন দিকের খালটা সহজেই পার হয়ে যেতে পারবে। মরা খাল। বিপিনের গুলি খেয়ে সে গড়িয়ে গড়িয়ে খালের কিনারা পর্যন্ত গিয়েছিল বটে, কিন্তু পার হতে সে পারে নি। লালু শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোর হ'ল। গুলির আওয়াজ শুনে চড়ুই পাখীগুলি সেদিন কি ভীষণ ভাবে কিচির মিচির করছিল। বিপিনের মত পুলিশ সাহেবকে ওরাও বোধ হয় চিনতে পেরেছিল। পেছন দিকে আমিও ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগে বিপিন সেখানে পৌঁছে গেল। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে সে গুলি ছুঁড়তে ছুড়তে নীচে নামছিল। এই ঘরটার দেওয়ালের পলস্তারা খসে পড়ল দু'চার জায়গায়। সেই থেকে উনি আর ঘর মেরামত করান না। আজ দেখছ, গোটা বাড়ীটার পলস্তারাই খসে পড়েছে। কিন্তু বিপিন কি কাণ্ড করল জান? ক্ষতবিক্ষত লালু বোধ হয় শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগের মুহূর্তে একটু জল খেতে চেয়েছিল। গড়াতে গড়াতে খালের কিনারায় গিয়ে মুখ নীচু করে যেমন জল খেতে যাবে, বিপিন এসে অমনি আবার ওর ঘাড়ের উপর গুলি ছুঁড়ল। 'মাগো' বলে লালু টুপ করে গড়িয়ে পড়ল জলে। গড়িয়ার খালে স্রোত নেই। বিদ্রোহী লালু সরকারের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস এখনও বোধ হয় ঠাণ্ডা হয় নি।...হ্যাঁরে তপা, শুনলাম স্বাধীন ভারতবর্ষে বিপিন চাটুজ্জে নাকি আরও বড় চাকরি পেয়েছে?"

গরম জলের ব্যাগটা দু'হাতে চেপে ধরে মাসীমা চেয়ে রইলেন পুবদিকের দেয়ালে।

পলস্তারা নেই, দুটো বড় বড় গর্ত চোখে পড়ল আমার। মাসীমার বুকের সঙ্গে দেয়ালটার কি অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে!

ক্রমশঃ

দরদী কথাশিল্পী

শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

মহান্ কথাশিল্পী বলে নয়,
গভীর তার প্রাণের পরিচয়।
নিবিড়তম প্রিয়ের মত যারে
পেয়েছিলাম আত্মাসহচর,
বাসর-শেষে যায় সে চলে ঘর ;
দেশের মাটি ডাক দিয়েছে তারে।
গাঁয়ের ডাক, মায়ের ডাক বলেই মনে হয় ;
নেই যে তার প্রয়োজনের সময় অসময়।
শিল্পীমন যদিও গান
গেয়েছে, তারই করেছে ধ্যান,
দূরের থেকে দিয়েছে মান,
চেয়েছে তারই হাতের বরাভয়।
নিবিড় করে পেয়েছি তার প্রাণের পরিচয়।

বড় বলেই দূরেই সে তো নয় ;
গাঢ় আকাশ দূরেই মনে হয়।
মনের নীড়ে আছে যে তার বিপুল পরিসর ;
প্রাণের রসে সজীব ব্যবহারে
টানে সে মন, সকলে ছেড়ে সে যায় চলে ঘর,
দেশের মাটি ডাক দিয়েছে তারে।
গাঁয়ের ডাক, মায়ের ডাক সমান মনে হয় ;
সেখানে তার গূঢ় গভীর প্রাণের পরিচয়।
জীবন ঘিরে দুঃখের বান
ডেকেছে, তবু গেয়েছে গান
শিল্পীমন, পেতেছে কান
সেখানে তার রয়েছে শেষ জয়।
বড় বলেই গাঢ় আকাশ, দূরেই সে তো নয়।

আমরা যারা তাকে আপন ভাবি,
শূন্য মনে ভাবছি তার অভাবই—
সহজ মেলামেশার ফলে কত
এসেছি কাছে, তবু সে যেন নদী
পাই নি যার উৎস খুঁজে, তবু সে নিরবধি
মেটালো স্নানপানের সুখ যত ;
দিনে দিনেই বেড়েছে তবু অবুঝ শত দাবি ;
হয়তো তার অনর্গল মনের মায়াচাবি
পেয়েছি, আর মূঢ় খেলায়
কাটিয়ে দিন অবহেলায়
পড়েছে মনে শেষ বেলায়
হারাই তার বাক্য মধুস্রাবী,
আমরা যারা নিবিড় করে তাকে আপন ভাবি।

বিচ্ছেদের করুণ মেঘস্তর
আড়াল যাকে করলো অতঃপর,
আলো যে তার রইলো কাছে কাছে,
বুকে নিবিড় উষ্ণতার মাপে,
হৃদয় রেখে দূরের সংলাপে ;
পাহাড়-পারে উৎস যেন আছে।
এখনো মনে ফেলবে শ্বাস অনেক খ্যাপা ঝড়,
অকূল জলে দুলবে ডিঙি, খুঁজবে বাতিঘর ;
দুর্যোগের হবেই শেষ,
থাকবে মনে অনির্দেশ
স্মৃতির ইতিবৃত্ত-স্বর—
শহর-জোড়া প্রহর-গোণা-দেশ—
আড়াল করে বিচ্ছেদের করুণ মেঘস্তর।
অঢেল মাঠ, বাবলা-বাঁশবন
কাজলদীঘি করে আমন্ত্রণ।
খেতের রবিশস্য ধান যব,
স্বর্ণশোভা হেমন্তের কাল,
গাছের জাম খেজুর আম কাঁঠাল,
কতই পাখী-শিশুর কলরব
বৃদ্ধ যুবা গ্রামীণ জন আনে নিমন্ত্রণ ;
মায়ের মত গাঁয়ের ডাক উতল করে মন
ফেরাবো তাকে, সাহস নাই,
ছাড়তে গিয়ে বেদনা পাই,
দেশের ডাকে বাজে সানাই,
সেবায় হবে সবই সমর্পণ ;
অঢেল মাঠ, কাজল দীঘি করে আমন্ত্রণ।
তোমাকে সখা, বিদায় দেব নাকো,
জাগবে মনে যতই দূরে থাকো।
তুমিও ভুলে থাকবে না, তা জানি,
আঁকবে ছবি 'আল্পনার রঙ'
উঠানে রোদ, লতার কম্পন,
গাছে পাতায় হাওয়ায় সিরসিরানি।
সারা জীবন স্বর্ণকণা কুড়িয়ে জমা রাখো,
তা দিয়ে বসে গড়বে ঘরে ভাবী কালের সাঁকো।
রাঙা বিকেল হলেই—সারা
আকাশ ভরে উঠলে তারা,
পড়বে মনে তোমার যারা
মনের সাথী, যাদের ভুলে থাকো।
দিলেম প্রিয়, প্রণাম, প্রেম, বিদায় চেয়ো নাকো।*

---

* কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে।

উন্মোচন

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

অঞ্জনপুর গার্লস হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষয়িত্রীর পদে অভিষিক্ত হয়ে এল কুমারী বেলা মল্লিক, বি-এ, বি-টি।

এমন কিছু বড় গ্রাম নয় অঞ্জনপুর। কয়েক শ' পরিবারের বাস। তবু এখানে একটি গার্লস হাই স্কুল চলে এবং ভালভাবেই চলে। সব মিলিয়ে প্রায় তিন শ' ছাত্রী। স্কুলটি শুধু অঞ্জনপুরের অধিবাসীদের উপরেই নির্ভরশীল নয়, আশেপাশের কয়েকখানা গ্রাম থেকেও অনেক ছাত্রী এখানে আসে পড়তে।

ছেলেদের স্কুলও আছে একটি। তার ছাত্রসংখ্যাও চার শ'র কম নয়। উভয় স্কুলেই শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক হোষ্টেল আছে। তাতে আহারাদির ব্যবস্থা নিজেদের করে নিতে হয়।

গ্রামটি বর্দ্ধিষ্ণু। বহু সম্পন্ন এবং শিক্ষিত লোকের বাস বলে শিক্ষার উৎসাহও প্রচুর। গ্রামেই ষ্টেশন, বাজার-হাট, থানা, পোষ্ট আপিস—স্বয়ংসম্পূর্ণ। কলকাতাও এমন কিছু দূরে নয়। এখান থেকে 'ডেইলী প্যাসেঞ্জারী' করেন কলকাতায়, এমন লোকের সংখ্যাও প্রচুর।

মোটামুটি তাই ভালই লাগল বেলা মল্লিকের। শস্যশ্যামল গ্রাম, কিন্তু শহরের চাহিদাও মেটে। পাকা রাস্তাঘাট, বাড়ীগুলিও বেশীর ভাগ একতলা দোতলা। গ্রামের দুই প্রান্তে দুইটি স্কুল। স্কুল ছাড়িয়ে ধু ধু মাঠ—দিগন্তবিস্তৃত। হোষ্টেলের নির্দ্দিষ্ট ঘরে বসে খোলা জানালা দিয়ে ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে বেলা মল্লিক একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মনে হতে লাগল, এমনটিই যেন এতদিন ধরে চাইছিল শুধু।

ফুর ফুর করে হাওয়া ঢুকছে জানালাটা দিয়ে। অসম্বদ্ধ চুলে লাগছে দোলা। আঁচলটা কাঁপছে থর থর করে। বেশ লাগছে। ঘরটি ছোট, একটি মাত্র 'সীট'। একক জীবনটা স্বচ্ছন্দ। পঁচিশ বছরের অনেক অভিজ্ঞতার সঙ্গে আবার এক নতুন সংযোজন। মন্দ কি? কত দিক থেকেই তো দেখা গেল জীবনটাকে। কত রূপে, কত ছন্দে। কত আনন্দ আর উচ্ছ্বাস, কত অশ্রু আর বেদনা। মানুষকে, তার চরিত্রকে জানছে বেলা মল্লিক। নতুন নতুন জীবনে, নব নব পরিবেশে।

দূরের দিকচক্রবালে রঙের সমারোহ। মেঘে মেঘে বিচিত্র বর্ণোচ্ছ্বাস। পাশের কাজল-দীঘির জলেও ছোঁয়াচ লেগেছে সে রঙের। অস্ত যাচ্ছেন সূর্য্যদেব। এইবার অন্ধকার নামবে ধীরে ধীরে—সারা আকাশ কালো করে, সারা গ্রাম আচ্ছন্ন করে। গাছের পাতায় পাতায়, মাঠের ঝোপে ঝোপে ঘনীভূত অন্ধকারে ঝিক্‌মিক্ জ্বলবে জোনাকি। হোষ্টেলের সামনের পথে লোক-চলাচল কমে আসবে। গ্রামের ঘরে ঘরে টিম্ টিম্ লণ্ঠনের ম্লান আলো জ্বলতে থাকবে। শাঁখ বাজবে, তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বলবে, কুলবধূর হুলুধ্বনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে গ্রামের আকাশে-বাতাসে। আর এই নিরবলম্ব হোষ্টেলের ঘরে, অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে হয় তো চুপ করে বসে থাকবে বেলা মল্লিক। প্রসাধন হবে কি হবে না, ঘরে আলো জ্বলবে কি জ্বলবে না, রাত্রির জন্য শয্যা প্রসারিত হবে কি হবে না, সে ভাবনা নয়। অতীতের স্মৃতি হাতড়ে হয় তো দীর্ঘশ্বাস ফেলবে বেলা মল্লিক। বর্ত্তমানকে অভিসম্পাত দেবে। ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনাহীন দিনগুলির কথা ভেবে বিরূপ দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নেবে। হিসাব কষবে, কি পেল জীবনে, আর কি পাবার ছিল।

কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই উঠে পড়ল বেলা মল্লিক। চোখ থেকে গগল্‌সটা খুলে মুছে নিল। তার পর নাকের উপর সেটাকে আবার ভালভাবে বসিয়ে এগিয়ে গেল বন্ধ দরজার দিকে। আলোটা জ্বালতে হবে, কাপড়-জামা বার করতে হবে বাক্স থেকে। হোল্ডঅল্‌টা খুলে বিছানাও পেতে নিতে হবে। কত কাজ। ঘর-খানাকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে তো। জীবনের অভাব পূরণ হোক আর নাই হোক, স্বাচ্ছন্দ্য তো চাই।

সব শেষ করতে রাত ন'টা বাজল। এক কোণে দাঁড়িয়ে সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘরখানাকে পর্য্যবেক্ষণ করল বেলা মল্লিক। এগিয়ে গিয়ে আরও টান করে দিল বেড-কভারটা। চেয়ারটাকে আরও কাছাকাছি করে দিল টেবিলের। অত্যুজ্জ্বল হারিকেনের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব।

রাত শেষ হতেই স্কুল। নতুন চাকরিতে রিপোর্ট করতে হবে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল বেলা মল্লিক। কোন বাঁধাধরা চিন্তা নয়, এলোমেলো চিন্তার জাল যেন জট পাকাতে লাগল মাথায়। অর্থহীন প্রলাপের মত। কোথা থেকে কোথায় ছিটকে এল অবশেষে।

ওপাশের জানালাটা খোলা। সেখানে চোখে পড়ছে আকাশময় ঝিক্‌মিক্ তারা। একফালি বাঁকা চাঁদ জাগছে ক্লান্ত আলো ছড়িয়ে। কাজল-দীঘির পারে পারে নারকেলগাছের পাতায় পাতায় শর্ শর্ শব্দ তুলছে হাওয়া।

খাওয়ার পাট চুকেছে হোষ্টেলের। অন্যান্য আবাসিকদের ঘরের আলো নিভছে একে একে। সারাদিন ছাত্রী পড়িয়ে পড়িয়ে, ছদ্ম-গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে রেখে মেয়েরা ক্লান্ত। ওরা শিক্ষয়িত্রী, ভাবী-কালের নারী-জাতিকে গড়ে তুলবার ভার ওদের উপর। ওদের আদর্শেই নাকি আজকের মেয়েরা গড়ে উঠবে। হাসি পায় বেলা মল্লিকের। আদর্শ! কিসের আদর্শ? পেটের চিন্তায় ওরা পাস করতে না করতেই বেরিয়েছে ঘর ছেড়ে, মানুষ তৈরীর আদর্শ নিয়ে নয়। ওদের চিন্তা টাকা, ভাবনা চাকরি। সেখানে ভাবী-

কালের স্থান কোথায় ? ওদের দিয়ে সমাজ মানুষ তৈরীর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কি পেল এই সব মেয়েরা—যারা প্রাণের দায়ে শিক্ষকতাকেই বৃত্তি বলে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে ? ওদের স্বপ্ন আর কল্পনার দিকে কেউ কখনও তাকিয়েছে সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে ? কি পাওয়া উচিত ওদের, কতখানি পেলে তার কিছু অন্ততঃ দান করতে পারে, তা কি ভেবেছে কেউ কখনও ?

ক্লান্ত মস্তিষ্কটা ঝিম্ ঝিম্ করে। নতুন পরিবেশটা খাপ খাইয়ে নিতে হবে জীবনের সঙ্গে। পেছুটান নেই কোন, সামনেও নেই কোন আলোর নির্দ্দেশ। একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা যেন চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে বেলা মল্লিককে। শুধু বাইরেই নয়, মনের মধ্যেও। সেখানে নেই কোন সান্ত্বনা, নেই কোন আশ্রয়। একটা অতৃপ্তি শুধু খচ খচ করছে নিরন্তর। একটা অবোধ্য জ্বালা। সে অতৃপ্তি আর জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে সারা পারিপার্শ্বিকে। মনটা উঠছে বিমুখ হয়ে। বাইরে থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেয়েছে, কিন্তু শান্তি নেই অন্তরেও। শুধু শূন্যতা, শুধু রিক্ততা।

অতন্দ্র চোখ দুটো বার বার মুছে নিল বেলা মল্লিক। এপাশ ওপাশ করল বার বার। ঘুম আসছে না। টেবিলের উপর ছোট্ট টাইমপিসটা টিক্ টিক্ করে বেজে চলেছে অবিরাম। সারা হোষ্টেল নিস্তব্ধ।

এমনি কত রাত কেটেছে। এমনি করে মনের মাঝে তিক্ত বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে কত বিনিদ্র রাত্রিতে। বঞ্চিত হৃদয়টা গুমরে মরেছে নিরন্তর। শুধু ছটফট করে মরেছে বিক্ষুব্ধ অন্তরে।

কত ছিন্ন স্মৃতি মনে পড়ে যায় এমনি নিঝুম রাত্রির অন্ধকারে। ঘুম নামে না চোখে। জ্বালাময় চোখের সামনে দিয়ে অতীত ভেসে চলে তার সব রিক্ততা আর শূন্যতা নিয়ে। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস শুধু হাহাকার করে ফেরে নিঃসঙ্গ ঘরের কোণে।

এমনি নিদ্রাহীন রাতে, থমথমে প্রকৃতির আশ্চর্য্য নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতুল লাহিড়ীকে মনে পড়ে বেলা মল্লিকের। ওর মনটা দুলতে থাকে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঙ্গে তীব্র বেদনাবোধের মাঝে।

সেই প্রতুল লাহিড়ী। বিছানা ছেড়ে উঠে আসে বেলা মল্লিক। গগল্‌সটা আবার তুলে নেয় চোখে। হারিকেনের শিখা উজ্জ্বলতর করে দিয়ে এসে দাঁড়ায় দেয়াল-আয়নাটার সামনে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হয়, রূপ যৌবন কিছুই তো ক্ষুণ্ণ হয় নি তার। দেহলাবণ্যের বাহ্যিক ঘাটতি তো নেই আজও। শুধু…

মনটা টন্ টন্ করে অব্যক্ত যন্ত্রণায়। একটি মাত্র অভাব ওর জীবনটাকে শূন্য করে দিল চিরদিনের জন্য। এ অভাব কি মেনে নিতে পারত প্রতুল লাহিড়ী ? দেহ-মনের ঐটুকু খুঁতকে অগ্রাহ্য করে বেলা মল্লিককে টেনে নিতে পারত নিজের জীবনে ? কে জানে ! সে পরীক্ষা দেবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে নি বেলা মল্লিক। যদি প্রত্যাখ্যান করে প্রতুল ? যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় ঘৃণায় ? তখন কি নিয়ে বাঁচবে বেলা মল্লিক, কি আশায় মন বাঁধবে ? কোন সান্ত্বনা দেবে নিজের মনকে ? তার চেয়ে এই ভাল। শুধু স্মৃতিটুকু নিয়ে বেঁচে থাকা। কি পেল না, তার হিসাব নয় ; কি পেতে পারত, তার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকা।

তবু মনে হয়, মানুষের মন কি এতই ভঙ্গুর ? প্রেম কি এতই স্বার্থপর—শ্রদ্ধাহীন, সহানুভূতিহীন। বেলা মল্লিক ভাবে, সে তো বিচ্যুত হয় নি তার একনিষ্ঠতা থেকে। তবু শুধু ভয় আর দ্বিধায় তাকে সরে আসতে হয়েছে প্রতুল লাহিড়ীর জীবন থেকে। দেশে যখন ফিরত প্রতুল, কেমন করে গ্রহণ করত তাকে ? দেহ-মন সিথ্ সিথ্ করে। আঘাতটা ওর মনে কেমন করে বাজত, কে বলবে ? কে বলবে—ওর চোখে সহানুভূতির দৃষ্টি উঠত সজল হয়ে, না ঘৃণাই উপচে পড়ত শুধু ? কে জানে ! সেকথা জেনে নেবার মত মনের জোর হারিয়েছে বেলা মল্লিক।

আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল একাগ্র দৃষ্টিতে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছড়ে পড়তে লাগল সর্ব্বাঙ্গে। হারিকেনের আলো মায়াকারী-গগল্‌সের উপর প্রতিফলিত হতে থাকল ঝিক্‌মিক্ করে।…

প্রতুল বলত—"তুমি যতক্ষণ দূরে থাক, মনটা শুধু আকুলি-বিকুলি করে মরে। মনে হয় ছুটে চলে আসি তোমার কাছে। অথচ কাছে এলেই সব শান্ত। মনের মধ্যেকার অন্ধ ছটফটানিটা যে কোথায় লুকোয়, খুঁজেই পাই না। তুমি কি যাদু জান বেলা ?"

শুনে হাসত বেলা মল্লিক। কুন্দশুভ্র দাঁতে নীচের ঠোঁটটি আলতো করে কামড়ে ধরত হাসতে হাসতেই। বলত—"দূরে থাকলে আঁকুপাঁকু, আর কাছে এলেই পালাই পালাই ? তার মানেটা কি, কল্পনা করতে পার প্রতুল ? ভবিষ্যৎটা যে অন্ধকার মনে হচ্ছে—"

—"আমার না তোমার ?" প্রতুলও হাসত, "আমার ভবিষ্যৎ মানে ত তুমি। শুধুই আলো। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ যদি আমি হই, তবে সেটা যে অন্ধকার, সন্দেহ নেই—"

গম্ভীর হয়ে যেত বেলা। একাগ্র দৃষ্টিবিনিময় হ'ত দু'জনের, বেলা বলত—"আমাদের ভবিষ্যৎ ত দু'রকমের নয় প্রতুল ! হতে পারে না যে। হয় দুটোই আলো, না হয় দুটোই অন্ধকার। পথ যে একই—"

একই ছিল হয় ত। থেকেও যেতে পারত একই রকম। বেলা মল্লিক ভাবল, কাকাবাবুকে শেষ পর্য্যন্ত হয় ত আঘাত দিতে হ'তই। আশাহত করতে হ'ত মানসকে। উপায় ছিল না কোন। প্রতুলকে পাবার জন্যে যে-কোন ক্ষতি স্বীকার করতেই ত প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু…কিন্তু…কিছুই করতে হ'ল না ওকে। ফুটনোন্মুখ জীবনটা নিঃশেষে শুকিয়ে গেল, ঝরে গেল পথের ধুলোয়।

জীবনে কিছুই ত পায় নি বেলা মল্লিক। আশৈশব বঞ্চিত জীবনে হাহাকার সঞ্চয় করে করে বড় হয়ে উঠেছে। আপন বলতে ত ছিল না কেউ। আবছা শুধু মনে পড়ে বাবাকে।

টুকরো টুকরো ছিন্ন স্মৃতির মাঝে গাঁথা এক বিশাল পুরুষ। তার পর শুধু চিনেছে কাকাবাবুকে। বাবার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওঁরই কাছে মানুষ। ওঁরই পরিবারে আত্মীয়তার আর ঐকান্তিকতার শিকড় ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেলা মল্লিকের জীবনটা লতায়িত হয়ে উঠেছে যৌবনের খর-মাধুর্যে। স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা ···সব পেয়েছে। সব অভাববোধ মেটাবার চেষ্টা করেছেন অধরবাবু। কিন্তু ও পারে নি তেমন করে মিশে যেতে, তেমন। করে গ্রহণ করতে।

মেয়ে ছিল না অধরবাবুর। বন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর মেয়েকেই কোলে তুলে নিয়েছিলেন অপত্যস্নেহে। মনের নিভৃতে হয়ত সঞ্চারিত হয়েছিল একটি গোপন বাসনা—লালিত হয়েছিল দিনের পর দিন। এ মেয়েকে আর পরের হাতে তুলে দেবেন না অধরবাবু। ছেলে মানস। মেয়ের মতই বেলা। একসঙ্গে মানুষ হয়েছে একই জীবনধারার স্বাদ পেয়ে পেয়ে। ওদের দু'জনকে এক জীবনে গেঁথে দিয়ে যাবেন।

সব মনে পড়ছে আজ। এমনি অতন্দ্র রাত্রির একক মুহূর্তে সব মনে পড়ে বেলা মল্লিকের। মনে পড়ে কাকাবাবুকে। মানসকেও মনে পড়ে। বেচারা! স্বাভাবিক নিয়মেই ওকে ভালবেসেছিল মানস। মানসের জীবনের মাঝে কখন যে সংগোপনে প্রেম উঁকি দিয়েছিল, বলতে পারবে না বেলা। যখন জানল, তখন বেদনায় মনটা সঙ্কুচিত হয়ে গেছে বারংবার। প্রাণভরেই হয়ত বেলাকে চেয়েছিল মানস, কিন্তু বেলা পারে নি সে ভালবাসা গ্রহণ করতে।

অধরবাবুর সঙ্কল্প অজানা ছিল না কারো। বেলারও নয়, মানসেরও নয়। মনে মনে অবিচ্ছিন্ন স্বপ্ন-জাল বুনেছে মানস, আর অবোধ্য ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় ছটফট করেছে বেলা। ওর জীবনে তখন মানস নয়, উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে প্রতুল লাহিড়ী।

মানসের এম-এ পরীক্ষার ফল বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাবটা তোলেন অধরবাবু। সরাসরি বেলা মল্লিকের কাছেই।

দারুণ আতঙ্কে সেদিন ভাষা খুঁজে পায় নি বেলা। কোনক্রমে বলতে পেরেছে, "আর দু'টো বছর অন্ততঃ যেতে দিন কাকাবাবু, বি-এটা পাস করে নিই—"

মুখের উপর অস্বীকার করবার মত মনের জোর পায় নি। পারে নি সর্বশক্তি সঞ্চয় করেও পিতাপুত্রকে এতখানি আঘাত হানতে। শুধু সময় চেয়ে নিয়েছে। চাপা দেবার চেষ্টা করেছে প্রস্তাবটাকে।

শুনে প্রতুল বলেছিল, "দু' বছরই যথেষ্ট। বিলেতের ডিগ্রীটা জুটিয়ে নিতে পারব ততদিনে। বাবা যখন আমাকে ব্যারিষ্টার না করে ছাড়বেন না—"

উৎকণ্ঠিত চিত্তে বেলা বলেছিল, "অপেক্ষা আমি করব প্রতুল। দিন গুনব তোমার আশায়। কিন্তু দু'টো বছর যে অনেকখানি সময়। সে সময় পার হয়ে এসে আমাকে মনে থাকবে ত তোমার? আমার স্বপ্ন সফল হবে ত?"

উত্তরে হো হো করে হেসে উঠেছিল প্রতুল। বেলা মল্লিকের দ্বিধা আর উৎকণ্ঠা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল সে হাসিতে।

চোখে চোখে তাকিয়ে প্রতুল বলেছিল, "প্রতুল লাহিড়ী কখনো কথার খেলাপ করে নি বেলা, তুমি বিশ্বাস রাখতে পার—"

বিশ্বাসে ত ফাটল ধরে নি বেলা মল্লিকের। সে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ আছে আজও। কিন্তু উপায় নেই কোন। প্রতুল হয় ত ফিরে এসেছে ব্যারিষ্টার হয়ে। হয় ত সন্ধানও করেছে ওর। কে জানে। তবু প্রতুল লাহিড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে ওর।

এম-এতে হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেল মানস। তীর্থপতি ইনষ্টিটিউশনে এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টারের চাকরিও পেয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বেলা প্রস্তুত হতে লাগল বি-এ পরীক্ষার জন্যে।

দিন গুনতে লাগল মানস। ওর চোখের সামনে রঙীন স্বপ্ন। দু'বছর পরে বেলাকে পাবে সে। পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বেলাকে সাহায্য করতে করতে ওর চোখে ঝিক্‌মিক্ করত আনন্দোচ্ছলতা। আর বেলার মনটা সারাক্ষণ শুধু মৌন হয়ে থাকত অপরাধীর মত।

ধীরে ধীরে দিন গেল এগিয়ে। মানসের প্রেম উন্মুখ হয়ে উঠল। কাকাবাবুর সঙ্কল্প হ'ল দৃঢ়তর। একটিমাত্র ছেলে ওঁর, তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে যাবেন সংসারে। সুখী, সচ্ছল পরিবারটিতে কল্যাণস্পর্শ লাগবে আবার। বন্ধুর মেয়ে হয়ে আশ্রিতা থাকবে না বেলা, পুত্রবধূর দাবি নিয়ে নিজের আসন স্থায়ী করে নেবে।

বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল। এল তার চেয়েও বড় পরীক্ষা বেলার জীবনে। এতদিনের সেই স্নেহ-মমতা-ভালবাসার দাবিকে অস্বীকার করার প্রশ্ন। জীবনে স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন।

মাঝে মাঝে চিঠি লিখত প্রতুল। উত্তর যেত। ওদিক থেকে আশাপথ চেয়ে দিন গুনত প্রতুল। তার মনের আনন্দের ছোঁয়া এসে লাগত এপারে। আর এদিকের আবেগ আর উচ্ছ্বাসের ঢেউ এয়ার মেলের চিঠি হয়ে গিয়ে পৌঁছত সাত সাগরের পারে।

কিন্তু সকলের উর্দ্ধে, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, বড় সমস্যা, প্রচণ্ডতম আঘাত অপেক্ষা করেছিল বেলা মল্লিকের জীবনে—যা তার জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিল চিরদিনের জন্যে।

কলকাতায় তখন বসন্তের প্রকোপ চলছে। একদিন সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর এল বেলা মল্লিকের। ডাক্তার এল, নার্স এল। অভাব ছিল না অধরবাবুর সংসারে। যতখানি করা সম্ভব ছিল, তিনি তা করলেন। যমে-মানুষে টানাটানি চলল কয়েকটা দিন।

কারও নিষেধ শোনে নি মানস। দিন-রাত্রি বসে থেকেছে মাথার কাছে। ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রয়েছে প্রলাপরত বেলা মল্লিকের রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে। সাহায্য করেছে নার্সকে সেবায়, শুশ্রূষায়—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত—অবিশ্রান্ত।

শেষ পর্যন্ত সেরে উঠল বেলা মল্লিক। না উঠলেই হয় ত

ভাল ছিল। যা হারাল সারা জীবনের বিনিময়েও সে জিনিষকে ফিরে পাওয়া যাবে না। একটি চোখের দৃষ্টি হারাল বেলা। শুধু দৃষ্টি নয়, বীভৎসভাবে ঠেলে বেরিয়ে এল চোখের মণিটা। একটা মাংসপিণ্ডের মাঝে ঘোলাটে চোখের তারাটা উৎকটভাবে জেগে উঠল।

আয়নায় সেদিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠেছিল বেলা মল্লিক। বালিশে মুখ গুজে ভেঙ্গে পড়েছিল কান্নায়।

চোখের জল ধরে রাখতে পারেন নি অধরবাবু। তাঁর সব স্বপ্ন, সব সঙ্কল্প লুটিয়ে পড়েছিল ধুলোয়। বেলার সারা মুখখানা জোড়া সেই বীভৎসদর্শন মাংসপিণ্ডটার দিকে তাকাতে পারতেন না অধরবাবু—মানসও নয়। শুধু বেলাই দৃষ্টি হারায় নি, মানসের সব কল্পনাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে যেন এ দুর্ঘটনা। বেলাকে এড়িয়ে চলত মানস, মুখোমুখি পড়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে নিত। তাকাতে পারত না ঐ বিকৃত মুখের দিকে। ও মুখ যে দিনের পর দিন গভীরভাবে আঁকা হয়ে গেছে মনের গভীরে। নিশ্চিত আশায় স্থায়ী আসন পেতে রেখেছে অন্তরের অন্তস্থলে। এমন বিকৃতি কেমন করে সইবে মানস? বেলার সেই টানা টানা দুটি সজল চোখের কথা ত ভুলবার নয়? ওর সারা হৃদয়টা যেন চৌচির হয়ে যেতে লাগল অসহ্য যন্ত্রণায়।

আঘাতটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল বেলার। ধীরে ধীরে ও বুঝতে পারল, যে আশায় দিন গুনছিল পিতা-পুত্র, তা আর সফল হবার নয়। দুঃখের মধ্যেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বেলা মল্লিক। আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিউরে উঠল প্রতুলের কথাটা মনে করে। যে দৈহিক ক্ষতি আশৈশব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল, এতদিনের তিলে তিলে গড়ে ওঠা স্নেহ, মমতা, প্রেমকে টুকরো টুকরো করে ফেলল ভেঙ্গে, এতদিনের স্নেহপ্রীতিকে টেনে আনল অস্বীকারের অসার্থকতায়, সে ক্ষতি কি সহ্য করতে পারবে প্রতুল লাহিড়ী? ওর প্রেম কি দেহের এ অপূরণীয় ক্ষতিকে অস্বীকার করে গ্রহণ করতে পারবে হৃদয়ভরা প্রেমকে?

রেজাল্ট বেরল বি-এ পরীক্ষার। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস। আর কয়েক দিনের মধ্যেই চিঠি এল প্রতুলের কাছ থেকে, অবিলম্বেই দেশে ফিরছে ও।

অদ্ভুত এক উৎকণ্ঠায় দিন কাটতে লাগল বেলা মল্লিকের। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল মনটা। আশা-নিরাশার সংঘাতে তিক্ত হতে তিক্ততর হতে লাগল ক্রমশঃ। যদি প্রত্যাখ্যান করে প্রতুল? যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় ঘৃণায়? সে আঘাত সহ্য করতে পারবে না বেলা মল্লিক। ভগবানের দেওয়া আঘাত সারা জীবন ধরে ও সহ্য করে যাবে, কিন্তু মানুষের আঘাত সইবার ক্ষমতা নেই আর। মানুষের স্নেহ-মমতা প্রেম ভালবাসাকে চিনতে পারছে বেলা। স্বার্থপর মানুষের চাহিদাকে চিনতে পারছে। মানুষের কাছে আর কিছু পাবার নেই—কিছুই নয়।

চোখটাকে লোকচক্ষুর আড়াল করবার জন্যে একটি মার্কারী গগল্‌স কিনল বেলা। সাইড-শেড-ফ্রেমে ঢাকল তার জীবনের চরম ক্ষতি ও ক্ষতকে। এতদিনে আবার আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে। সবই আছে। সারা শরীরে টলমল যৌবন, গগল্‌স-ঢাকা মুখে পেলব সৌন্দর্য্য। আড়ালেই থাক বীভৎস মাংসপিণ্ডটা। মানুষের চোখকে সে আর আহত করতে চায় না। কিন্তু···কিন্তু প্রতুল? মনকে বাঁধল বেলা মল্লিক। না, প্রতুল ফিরবার আগেই তাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে—অজানার মাঝে। নিজেকে নির্ব্বাসন দিতে হবে পরিচিত পৃথিবী থেকে। সুখী হোক প্রতুল। তার জীবনে অভিশাপ হয়ে বাঁচতে চায় না বেলা। যা পেয়েছে, সেটুকু নিয়েই জীবন চলে যাবে। ঐ স্মৃতির সম্বলটুকু হারাতে রাজী নয় বেলা মল্লিক।

মেদিনীপুরের এক স্কুলে চাকরি পেয়ে গেল একটা। তার পর থেকেই চলছে অজ্ঞাতবাস। বি. টি. পাস করেছে চাকরি করতে করতেই। কোন মানুষের সঙ্গে মেশে নি অন্তরঙ্গ হয়ে। বুঝেছে, যেখানে যত ঘনিষ্ঠতা, সেখানে তত বড় আঘাত। ভুলেও চোখ থেকে খোলে নি গগল্‌স, একক জীবনের দুঃস্বপ্ন নিয়ে শেষ পর্যন্ত নতুন চাকরিতে এসেছে অঞ্জনপুর। আরও চারটে বছর পার করে। কুড়ি বছরের স্বপ্ন আজ পঁচিশে এসেও ধিকি ধিকি জ্বলছে মনে মনে। সে দাহ অস্থির করে তোলে বেলা মল্লিককে। এমনি অতন্দ্র রাত্রির নিস্তব্ধ পরিবেশে অতীত এসে অবিশ্রান্ত আঘাত হানে হৃদয়ের বদ্ধ কপাটে। ভোলা যায় না, ভুলতে পারে না বেলা মল্লিক।

জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকেছে। অবিশ্রান্ত পায়চারি করতে করতে কেটে গেল রাতটা। এমনি কেটেছে কত রাত। আবার এসে দাঁড়াল আয়নার সামনে। অবিন্যস্ত চুলগুলি চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে সমান করে নিল। রাত্রিজাগরণের ছাপটা মুছে নিল নিঃশেষে। এখনও উঠে নি কেউ, দরজা খুলে বেরিয়ে এল বেলা মল্লিক। মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। অতীতকে ভুলবার সাধনা ওর, নতুন জীবনে ভুলে থাকবার প্রাণপণ প্রয়াস। অঞ্জনপুরের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিতে হবে যেমন করে হোক। বাকী জীবনটা কাটাবে এইখানেই।

কাটতে লাগল দিন।

হোষ্টেলের মেয়েরা কেউ কেউ আসত মাঝে মাঝে। লতিকা সেন নতুন এসেছে। চপল মেয়ে, বছর কুড়ি বয়স হবে। ছুটো-ছুটি করে বেড়ায়, কথে বেড়ায় এঘর ওঘর। সবাইকে এড়িয়ে থাকতে পারে বেলা মল্লিক কিন্তু লতিকার কাছে ওর সব গাম্ভীর্য্য খান খান হয়ে যায়।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে একেবারে শুয়ে পড়ে বিছানায়। বলে "আচ্ছা বেলাদি, রাতদিন আপনি এমন গম্ভীর হয়ে থাকেন কেন বলুন ত? কারও সঙ্গে মেশেন না, যান না কারও ঘরে। ভাল লাগে এমন নিরিবিলি থাকতে?"

ঠোঁটের কোণে বিষণ্ণ হাসি খেলে যায় বেলার। মসৃণ গাল দুটোয় টোল পড়ে। বলে, "কোথায় আর যাব, বল? ঘরে বসেই পড়াশুনো করি একটু—"

"রাত্রেও গগলস চোখে রাখেন?" অবাক হয় লতিকা—"আলো লাগে বুঝি চোখে?"

হাসিটি মুছে যায় চোখ থেকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেলা মল্লিক, লতিকা জানে না, ওই গগলসের তলায় কি বীভৎস দৃশ্য লুকানো আছে। বাধ্য হয়েই মিথ্যে করে বলতে হয়—"আলো সহ্য হয় না আমার। দিনে-রাতে সব সময় তাই চোখে রাখতে হয় এটা। ডাক্তারের নির্দেশ।"

চুপ করে থাকতে পারে না লতিকা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে। বলে, "আচ্ছা বেলাদি, ছুটিতে ত কোথাও যান না আপনি! বাড়ী বুঝি অনেক দূর?"

মুখখানা আড়াল করে বলে বেলা, "হ্যাঁ লতিকা।"

স্কুল আর হোষ্টেল। হোষ্টেল আর স্কুল। একঘেয়ে জীবন। বেলা ভেবেছে, এবারে এম-এ পরীক্ষাটাও দিয়ে দেবে। পড়াশুনোয় তবু ভুলে থাকা যায় বৈচিত্র্যহীন জীবনের অবসাদকে। মাইনের যে অংশটা থাকে খরচ-খরচা বাঁচিয়ে, তার কিছু রাখে ব্যাঙ্কে, আর কিছুতে কেনে নানা রকম বই। সারাদিন ডুবে থাকে তাতে।

যখন পড়তেও ভাল লাগে না, তখন হোষ্টেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বেলা মল্লিক। মাঠের আলপথে পথে, অঞ্জন বিলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ায় একাই। লোকজন বড় একটা আসে না এদিকটায়। বিলের জলে অজস্র পদ্ম ফুটেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বেলেহাঁস নামে বিলের জলে। সাদা বক উড়ে চলে সার বেঁধে। দূরের মেঠো পথে গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফেরে রাখালছেলে। আর ঝোপ-ঝাড় এড়িয়ে, পায়ে চলা সরু পথে ঘরে ফেরে বেলা মল্লিক।

মাঝে মাঝে লতিকা সঙ্গ নেয়। কলকাতায় কাটিয়েছে আজন্ম, পাড়াগাঁ দেখে নি এর আগে। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, "আপনি বুঝি এদিকে প্রায়ই আসেন বেলাদি? ডাকেন না কেন আমাকে? কি সুন্দর জায়গা।"

কি হবে ডেকে—বেলা ভাবে, ও যে মানুষের সংসর্গ এড়াতেই চায় শুধু। মনটা যখন হাঁপিয়ে উঠে ঘরের কোণে, তখন শান্তি খুজে ফেরে অঞ্জনপুরের পথেপ্রান্তরে।

তবু বলে, "তুমি ত থাক না সব সময়, একাই আসি তাই। তা ইচ্ছে হলে এস না আমার সঙ্গে।"

লতিকা জিজ্ঞাসা করে, "জানেন বেলাদি, মাঝে মাঝে বড় খারাপ লাগে এখানে পড়ে থাকতে। মনে হয় পালাই এ ছাই চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে। সারাজীবন শুধু মাষ্টারণী হয়েই কাটাব নাকি?"

সারাজীবন? বেলা ভাবে, এই ত সবে জীবনের সুরু ওর। মনে এখনও কত স্বপ্ন কত সাধ, আশা আর আকাঙ্ক্ষা। হয়ত একটি সুখী আর শান্ত গৃহকোণের স্বপ্ন দেখে ও। কল্যাণী গৃহিণী হবার ভরসা রাখে মনে মনে। কিন্তু বেলা মল্লিকের সারা জীবনটাই যে উষর-সফলতার সম্ভাবনাহীন। এমনি করে তাকে কাটিয়ে দিতে হবে জীবনের বাকী দিনগুলি। মনকে বেঁধে রাখতে হবে কঠিন হাতে।

বলে, "তোমার আর কে আছেন লতিকা?"

উৎসাহ পেয়ে মুখর হয়ে উঠে লতিকা, বলে, "বাবা মারা গেছেন বছরখানেক আগে, বড় ভাই নেই কেউ। বাধ্য হয়েই চাকরি নিতে হয়েছে আমাকে। বিয়ে ঠিক হয়ে আছে অনেকদিন আগে থেকে। কিন্তু বিয়ে হয়ে আমি চলে গেলে মা আর ভাই বোন দুটো অথৈ জলে পড়বে, তাই জয়ন্ত রাজী হয়েছে অপেক্ষা করতে। প্রায়ই কলকাতায় যাই, দেখা করি জয়ন্তের সঙ্গে। উৎসাহ দেয় জয়ন্ত। বলে, 'বিয়ে ত আমাদের হয়েই গেছে, কথা ত তা নয় লতু। স্বামীর ঘরের চেয়েও বড় কর্তব্য তোমার সামনে। ওদের পথ তৈরি করে দাও, আমি অপেক্ষা করব তত দিন।'"

লতিকার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনায়। ভাইটা আই-এ পরীক্ষা দেবে এবার। আর দুটি মাত্র বছর। অন্ততঃ গ্রাজুয়েট হউক ও। তার পর পারবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। তখন ছুটি লতিকার। ঘর বাঁধবার কথা তখন। এ দুটো বছর অন্ততঃ চাকরিটা বজায় রাখতেই হবে।

আর বেলা মল্লিকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরনো দিনগুলি। এমনি করে প্রতীক্ষা ত সেও করেছে। কিন্তু সে প্রতীক্ষা কি দিয়েছে তাকে। তার স্বপ্ন ফলপ্রসূ হ'ল না এ জীবনে। সুখী হোক লতিকা, জীবনের এ কঠোর পরীক্ষা পার হয়ে ও সার্থক হয়ে উঠুক।

প্রশ্ন করে, "জয়ন্ত কি করে লতিকা?"

—"কেন, চাকরি?" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় লতিকা, "অবস্থা ত ওদেরও ভাল নয় তেমন। এম-এ পাস করতে পারে নি টাকার অভাবে, চাকরিতে ঢুকেছে—ওর বাবার আপিসে। এক সওদাগরী আপিসের বড়বাবু ছিলেন ওর বাবা, রিটায়ার করেছেন কয়েক বছর হ'ল। ছোট তিনটে বোন, দু'জনের বিয়ে হয়ে গেছে, একটি পড়ছে ফার্ষ্ট ক্লাসে। মোটামুটি চলে যায় দিন—"

টাকার সমস্যা ছিল না বেলার জীবনে। অভাব সে বোধ করে নি কোন দিন। বিখ্যাত আইনজীবীর ছেলে প্রতুল, সেখানেও কোন হেতু ছিল না অর্থচিন্তার। যে সমস্যা ওর জীবনে প্রধান হয়ে উঠেছিল, তাকে আয়ত্তে আনা যেতই। কিন্তু বিধাতাই যে বাদ সাধলেন অবশেষে।

পড়ন্ত সূর্যের আলো ঝিকমিক্ করে বেলা মল্লিকের মাকারী গগলসে। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে আর অপরূপ দেহলাবণ্যে অপূর্ব দেখায় ওকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে লতিকা।

বলে, "আচ্ছা বেলাদি, আপনার ত তেমন কোন অভাব নেই

বলেই মনে হয়। তবে কেন চাকরি করছেন মিছিমিছি? আমার মতন অবস্থা কি আপনারও..."

—"না না," এবারে হাসতে হয় বেলাকে—"সে সব কিছু নয়। ওকথা ভাবি নি এখনও। কারও জন্যে প্রতীক্ষাও নেই। এমনি করেই, স্বাধীনভাবে জীবনটাকে যদি কাটিয়ে দেওয়া যায়, তবে সাধ করে কে আর নিজেকে জড়াতে চায় বল।"

"একে আপনি স্বাধীনতা বলেন?" রীতিমত রেগে যায় লতিকা, "এমনি করে হোষ্টেলের ঠাকুরের রান্না গিলে স্কুলের মেয়ে ঠেঙিয়ে, নীরস, একঘেয়ে জীবন কাটানোকে আপনি শান্তির বলে মনে করেন? আপনার বিচারবোধকে কিন্তু প্রশংসা করতে পারলাম না বেলাদি।"

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে বেলা বলে, 'আদর্শও ত থাকে মানুষের! এতগুলি মেয়ের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে আমাদের হাত দিয়ে—তারা মানুষ হয়ে উঠবে—'

"মানুষ নয় বেলাদি"—লতিকা বলে ঠোঁট বেঁকিয়ে, 'শিক্ষয়িত্রী হবে। কিসের আদর্শ বেলাদি—কিসের আশা যে আপনাকে এমন করে চিন্তা করতে শিখিয়েছে জানি না! কিন্তু বিশ্বাস করুন, শুধু আমি নই, আমার মত আরও যারা আছে এখানে, এ ধরনের জীবনযাপনে সবাই অতিষ্ঠ। কোনক্রমে দিনগত পাপক্ষয় করছে সবাই—'

সেই কি করছে না? বেলা মল্লিক ভাবে, এই জীবন কি সাধ করে বরণ করে নিয়েছে সে? কিন্তু উপায় কি? নিজের দৈন্য জানিয়ে কি লাভ? ওর সামনে ধু ধু মরুভূমি, নিরানন্দ জীবন। মনকে চোখঠারা ছাড়া গতি নেই। আদর্শ বলে মেনে নিলে তবু যদি একঘেয়েমিটা কমে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল। ঘুরে এল বছরের পর বছর।

এম-এ. পরীক্ষার জন্যে এক মাসের ছুটি নিল বেলা মল্লিক। উঠল এসে কলকাতার এক পরিচ্ছন্ন হোটেলে—একটি ঘর নিয়ে।

পরীক্ষার শেষ দিনে ঘটল ঘটনাটা। ইউনির্ভার্সিটি থেকে সবে বেরিয়েছে। ইচ্ছা—ক্লান্ত শরীর আর মনটাকে চাঙ্গা করে নেবে কলেজ স্কোয়ারের উন্মুক্ত হাওয়ায়। পথটা পার হচ্ছে এমন সময়—

কর্কশ একটা শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেল 'ক্রহাম' গাড়ীখানা ঠিক ওর পাশেই। একটি অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর বাজল এসে কানে—'বে-লা'—

বিদ্যুৎ-গতিতে ফিরে দাঁড়াল বেলা মল্লিক। মার্কারী-গগল্‌সে পিছলে পড়তে থাকল দীপ্ত সূর্যের আলো। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল—'প্র-তু-ল!'

কয়েকটি মুহূর্ত। অবাক বিস্ময়ে আর প্রচণ্ড পুলকে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেল বেলা মল্লিক। আর ষ্টীয়ারিংয়ে হাত রেখে নিস্পন্দ হয়ে রইল প্রতুল লাহিড়ী। কয়েকটি অসহ্য মুহূর্ত। তার পর উদ্বেল আনন্দে একটানে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল প্রতুল। পাশে এসে দাঁড়াল। সারা জগৎ তখন মুছে গেছে চোখের সামনে থেকে—প্রখর সূর্যের আলো, লোকজন, যানবাহন, সবকিছু। ওরা পরস্পর চেয়ে রইল চোখে চোখে—জীবনের চরম পরীক্ষার শেষে, ব্যাকুল প্রতীক্ষার অবসানে।

কাটল কিছুক্ষণ।

এক সময় প্রতুল বলল, 'এখানে নয় আর। উঠে এস বেলা, চল—'

মন্ত্রমুগ্ধের মত গাড়ীতে এসে উঠল বেলা মল্লিক। বসল প্রতুলের পাশে। কত দিন পর ওরা আবার কাছাকাছি এল। হৃৎপিণ্ডটা যেন যুগপৎ আনন্দে আর বেদনায় দাপাদাপি সুরু করে দিয়েছে বেলার। ভাগ্য আজ ওকে চরম পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এর শেষে হয় পরম আনন্দ, না হয় দুঃসহ বেদনা। হয় আলোঝলমল জীবন, না হয় চির অন্ধকারাবৃত মৃত্যু। পথ নেই আর।

গাড়ী ছুটছে, তীব্র বেগে। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট আর ধর্মতলা হয়ে চৌরঙ্গী। গড়ের মাঠ পার হয়ে ষ্ট্রাণ্ড রোড। সামনে বিস্তৃত-বক্ষ গঙ্গা। ওরা থামল।

প্রতুল তাকাল চোখে চোখে, এতক্ষণে। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল, 'জীবনে আবার দেখা পাব তোমার একথা ভাবি নি বেলা। এমনি করে, এতদিন পরে ভগবানের কৃপাতেই এ সম্ভব হ'ল। কিন্তু কেন তুমি এমন করলে বেলা—'

রক্তে রক্তে তাণ্ডব চলছে। শিরা-উপশিরা বেয়ে কি একটা তীব্র জ্বালা উঠছে মাথার দিকে। হাতটা আপনা থেকে গিয়ে ঠেকল চোখের উপর মার্কারী গগলসটায়।

বেলার একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিল প্রতুল লাহিড়ী। বলল, 'দেশে ফিরে প্রথমেই গিয়েছিলাম তোমার কাছে। অভিনন্দন কুড়োতে। কিন্তু কি যে আঘাত পেলাম! তোমার কাকাবাবু শুধু জানালেন, তুমি ছেড়ে চলে গেছ তাদের। কি কারণে, বললেন না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস শুধু খুঁজে বেড়িয়েছি তোমাকে। সে কি অসহ্য জ্বালা, তুমি কি বোঝ নি বেলা? কিন্তু পেলাম না তোমাকে। জীবনের উপরেই যেন বিতৃষ্ণা এসে গেল আমার। অথচ কি আশ্চর্য, চেষ্টা না করেও প্র্যাকটিস ঠিকই জমে গেল। শত কাজের মধ্যেও তোমাকে ত ভুলতে পারি নি বেলা। আর ভুলতে পারি নি আমার প্রতিশ্রুতিকে।'

মার্কারী গগল্‌সের তলায় চোখ দুটো আসছে ঝাপসা হয়ে। প্রতুল লাহিড়ীর হাতের মুঠোয় সাতাশ বছরের থর-যৌবন থর থর কাঁপছে। তীব্র কান্নার বেগ কণ্ঠ বেয়ে উঠছে প্রবল গতিতে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে লাগল বেলা মল্লিক।

বলল রুদ্ধ কণ্ঠে,'আমি জানতাম প্রতুল, আমি জানতাম। সবই জানতাম আমি। কিন্তু তবু আমাকে আত্মগোপন করতে হয়েছে—বাধ্য হয়ে। কেন, সে প্রশ্ন আজ বোধ হয় অবান্তর। কোন

লাভ নেই সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে। তুমি শুধু জেনে যাও, সেদিন যা সম্ভব ছিল, আজ আর তা হবার নয়। কোন ভাবেই নয়—'

পরম বিস্ময়ে প্রতুল স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। ভাষা যোগাল না কণ্ঠে। তার পর শক্তি সঞ্চয় করে বলল, 'কেন হবার নয় বেলা? কেন তুমি ভেঙে দিতে চাও আমার এত দিনের স্বপ্নকে? কেন আমার প্রেমকে অস্বীকার করতে চাও তুমি?'

আর নয়, আর নয়। আর পারবে না বেলা মল্লিক। এমন করে দুঃসহ দাহনে দগ্ধ হতে পারবে না আর। তার চেয়ে সেই ভাল। জেনে নিক প্রতুল, দেখে নিক। উন্মোচিত হয়ে যাক ওর জীবনের সর্বনাশা আঘাত। সব সংশয় চুকে যাক আজ।

একটি মুহূর্ত ওর হাতখানা গিয়ে স্থির হয়ে রইল মাকারী গগল্‌সের সাইড-শেড-ফ্রেমে। একটা প্রাণ-সংশয় দ্বিধা, কিন্তু ঐ মুহূর্তকালই। একটানে চোখ থেকে তুলে নিল মাকারী গগল্‌সটা। মণিটা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে স্থিরনিবদ্ধ হয়ে গেল প্রতুল লাহিড়ীর চোখে চোখে।

আর একটা তীব্র আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল প্রতুল লাহিড়ী। আতঙ্কে আর হতাশায় ওর দুটো হাতে চেপে ধরল নিজের দুটো চোখ, ভয়কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, 'এ—কি?'

ঐ একটি মুহূর্তই। মাকারী গগল্‌সটা নাকের উপর বসিয়ে হ্যাঁচকা টানে গাড়ীর দরজাটা খুলে ফেলল বেলা মল্লিক। অশ্রুর বন্যা নেমেছে দু'চোখের কোলে। পরাজিত জীবনটা যেন হাহাকার করে উঠল ওর অশ্রু-ভেজা কণ্ঠে—'এই জন্যেই চাই প্রতুল, এই জন্যে সরে যেতে চাই তোমার জীবন থেকে। দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যে প্রেম, সে ত সইতে পারবে না তার ঈপ্সিত দেহের এই প্রচণ্ড ক্ষতি। তার বিকৃতিতে মন শিউরে উঠবে আতঙ্কে আর ঘৃণায়। তুমি মহৎ, হয় ত সমবেদনা দেখাতে পার তুমি, অনুকম্পায় ভিজে উঠতে পারে তোমার মন। কিন্তু কৃপা নিয়ে কি প্রেম বাঁচে প্রতুল? আমি সে জীবন সহ্য করতে পারতাম না প্রতুল, আজও পারব না। তার চেয়ে···তার চেয়ে এই ভাল। এই-ই ভাল। পথ নেই, পথ নেই—'

পথ ছেড়ে দ্রুত পায়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল বেলা মল্লিক। পা দুটো ভেঙে পড়ছে, তবু থামলে চলবে না। থামা যায় না—

আর গাড়ীর মাঝে দু'হাতে মুখ ঢেকে বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে স্তব্ধ হয়ে রইল প্রতুল লাহিড়ী—তীব্র অবসাদ বুকে নিয়ে।

সারা আকাশে আবীর ছড়িয়ে তখন গঙ্গার অপর পারে অস্ত যাচ্ছেন সূর্য্যদেব। দিনান্ত হ'ল।

জীবনের দাম

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

জীবনের কতটুকু দাম।
ডাকে-আসা ছাপমারা
মুখছেঁড়া খাম—
কতটুকু কাজে লাগে?
বড়জোর রাত্তিরে—
ঘুমোবার আগে—
পিদ্দিমে জেলে নিয়ে
করা চলে শেষ ধূমপান।
অথবা—
অফিসে যেতে
গোটাকতো পান—
মুড়ে নিয়ে যাওয়া চলে;
তারপর—
মুখ ধুয়ে রাস্তার কলে
ফেলে দাও পথের ওপরে,
কুচি কুচি ক'রে।
অথবা—
উল্টে নিয়ে—
শাদা পিঠে তার—
লেখা চলে মুদীর ভাউচার।
অথবা—
টুকরো ক'রে বইয়ের পাতায়—
বুক্‌মার্ক ক'রে রাখা যায়।
প্রয়োজন শেষ হ'লে—
সকলেরই এই পরিণাম।
জীবনের কতটুকু দাম?

পল্লীর দেবদেবী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বাংলা দেশের সভ্যতা গ্রামীণ সভ্যতা। বহু বৎসর, বহু যুগ ধরিয়া ইহা চলিয়া আসিতেছে। ইহার সৃষ্টি, পুষ্টি ও উন্নতির যুগ শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। এক্ষণে ইহার ক্ষয় হইতেছে। এই ক্ষয় ভাল কি মন্দ তাহা আমরা জানি না। আমাদের মনে হয় এই সভ্যতা যুগে যুগে কিরূপ ছিল ও কি ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে সে বিষয়ে আলোচনার সময় আসিয়াছে।

গ্রামীণ সভ্যতার একটি অঙ্গ হইতেছে গ্রামবাসীদের ধর্মভাব ও ধর্ম্ম-চর্চ্চার সুযোগ-সুবিধা। পূর্ব্বে নূতন গ্রাম পত্তন হইলে বা গ্রামের লোকসংখ্যা বাড়িলে গ্রামের জমিদার কিংবা বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিরা মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি করিতেন। এ বিষয়ে হিন্দুরা মন্দির ও মসজিদে প্রভেদ করিতেন না। লেখকের পূর্ব্বপুরুষেরা কলিকাতার পুরাতন বাসিন্দা হইলেও, বাখরগঞ্জ জেলায় (অধুনা খুলনা জেলায়) বলেশ্বর নদের তীরে তাঁহাদের জমিদারীতে একটি নূতন গ্রামের পত্তন করিলে বহু মুসলমান প্রজা চাষবাস করিতে আসে। এই সব প্রজার সুবিধার জন্য ইংরেজী ১৮২০-২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা গ্রামে একটি মসজিদ করিয়া দেন ও মসজিদের জন্য ৩০ বিঘা জমি দেন। ইহা বাংলার রেভিনিউ বোর্ডের কাগজপত্রে উল্লিখিত আছে। মুসলমান জমিদারেরা তাঁহাদের ধর্ম্মে বাধে বলিয়া হিন্দু প্রজাকে মন্দির করিয়া দিতেন না বটে, তবে দেবস্থান প্রভৃতির খাজনা লইতেন না। মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ী হইতে এখনও মুর্শিদাবাদ জেলার বাঘডাঙ্গার দেবালয়ে নিত্য সিধা আসে।

এইরূপ বহু মন্দির, দেবস্থান বা মসজিদ বাংলার বিভিন্ন গ্রামে আছে যাহাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। অনেক মন্দির বা দেবস্থান অথবা দেবদেবী অনাদিকাল হইতে আছে বলিয়া লোকের দৃঢ়বিশ্বাস; কিরূপে ইহা পরিবর্তিত হয় তাহার একটি উদাহরণ দিব। চব্বিশ পরগণার থানা বরাহনগরের অন্তর্গত এঁড়েদহ গ্রাম। শ্মশানঘাটের নিকট ভাগীরথীতীরে পাকা পোস্তার উপর একটি মন্দিরে 'বুড়োশিব' আছেন। কেহ কেহ বলেন ইহার নাম দক্ষিণেশ্বর—লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে নাকি ইহার উল্লেখ আছে; এবং ইঁহারই নাম অনুসারে এককালে ইহার দেবোত্তরভুক্ত দক্ষিণেশ্বর গ্রামের উৎপত্তি। এঁড়েদহ গ্রামের উল্লেখ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম করিয়াছেন—কিন্তু মৌজা হিসাবে এঁড়েদহ এখন কামারহাটির সহিত মিলিত এবং দক্ষিণেশ্বর ছিল একটি আলাহিদা মৌজা। 'বাণ'রাজা "বুড়োশিবের" পোস্তা বাঁধাইয়া দেন। এই বাণরাজার বাড়ীও লোকে দেখিয়া থাকে। বাণরাজার বাড়ীর ভিতরে ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ পাকা ইঁদারা আছে। ইঁদারার ইট ছোট ছোট এবং তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের পরিমাণ এইরূপ যে বাবুরাম মিস্ত্রি বলে—এই রকম ইট নবাবী আমলের আগেকার ইট।

বুড়োশিব নামই সমধিক প্রচলিত। ইনি এবং ইহার নিকটবর্ত্তী মুক্তকেশী কালীই গ্রাম-দেবতা বলিয়া বহুলোকে জানে। মুক্তকেশী কালী কিন্তু বেশীদিনের নহে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লু. সি. বনার্জ্জীর পিতামহ এক মোকদ্দমা জিতিয়া এই কালী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা সোয়া শত বৎসরের কথা। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই 'বুড়োশিব' আছেন।

বাংলার বহু গ্রামে গ্রাম-দেবতা বা গ্রাম্য-দেবী আছেন। কোন কোন গ্রামে গ্রাম্য দেবদেবী ছাড়া ষষ্ঠীতলা, পঞ্চাননতলা প্রভৃতি ও "বাবা ঠাকুরের" স্থান দেখা যায়। বেলঘরিয়া গ্রামে (এঁড়েদহ হইতে ২ মাইল পূর্ব্বে) "বাবা ঠাকুরের" স্থান আছে। শিশুর মাথায় যখন প্রথম ক্ষুর দেওয়া হয় তখন বাবা ঠাকুরের তলায় পূজা দিয়া চুল দিতে হয়। থানা খড়দহের অন্তর্গত সুখচর গ্রামে "সাক্ষহরির" তলা আছে—"সাক্ষহরির" তলায় বাতাসা মানত করিয়া ইহার মাটি খাইলে বন্ধ্যা-নারীর ছেলে হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। নিকটবর্ত্তী পানিহাটি গ্রামে এইরূপ একটি "মনসাতলা" ছিল। মনসাগাছে ফালি দিয়া ঢিল বাঁধিয়া দিলে প্রথম সন্তানবতী সহজেই সন্তান-প্রসব করিতে পারিবে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ঝড়ে মনসাগাছ পড়িয়া গেলে, নূতন মনসাগাছের কোন মাহাত্ম্য নাই বলিয়া এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

এই সকল গ্রাম্য-দেবদেবী ও ষষ্ঠীতলা, পঞ্চাননতলা প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান, ইহাদের ইতিহাস, সংস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়াছে। তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে গ্রামীণ-সভ্যতার কিছু স্বরূপ বুঝা যাইবে। এ বিষয়ে বিশেষ কোন অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়া লেখকের জানা নাই।

গ্রাম্য-দেবদেবীর সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে গ্রাম কাহাকে বলে তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা উচিত। আমরা "ভদ্রলোক" বলিলে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারি যে, ভদ্রলোকের এই এই গুণ আছে বা ইনি এই এই কাজ করিবেন না, কিন্তু "ভদ্রলোকে"র সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নহে। সংজ্ঞা দিবার একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভদ্রলোকের সংজ্ঞা কিরূপ দুরূহ। এইরূপ "মধ্যবিত্ত" বলিলে আমরা একটা ধারণা

পালাম বিমানঘাঁটিতে ব্রহ্মের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উ নু, শ্রীজবাহরলাল নেহরু, ডক্টর এস. রাধাকৃষ্ণন
দলই লামা এবং শ্রীআপ্পা পন্ত
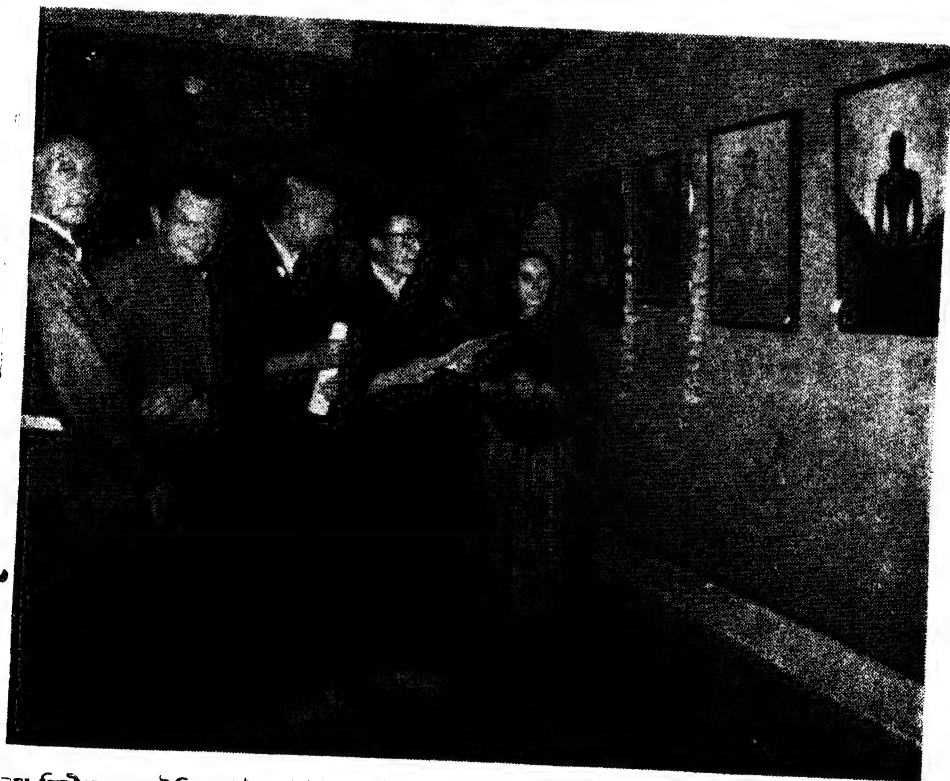
নয়া দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস এণ্ড ক্রাফটস সোসাইটির চিত্রপ্রদর্শনীতে দলই লামা ও পঞ্চেন লামা
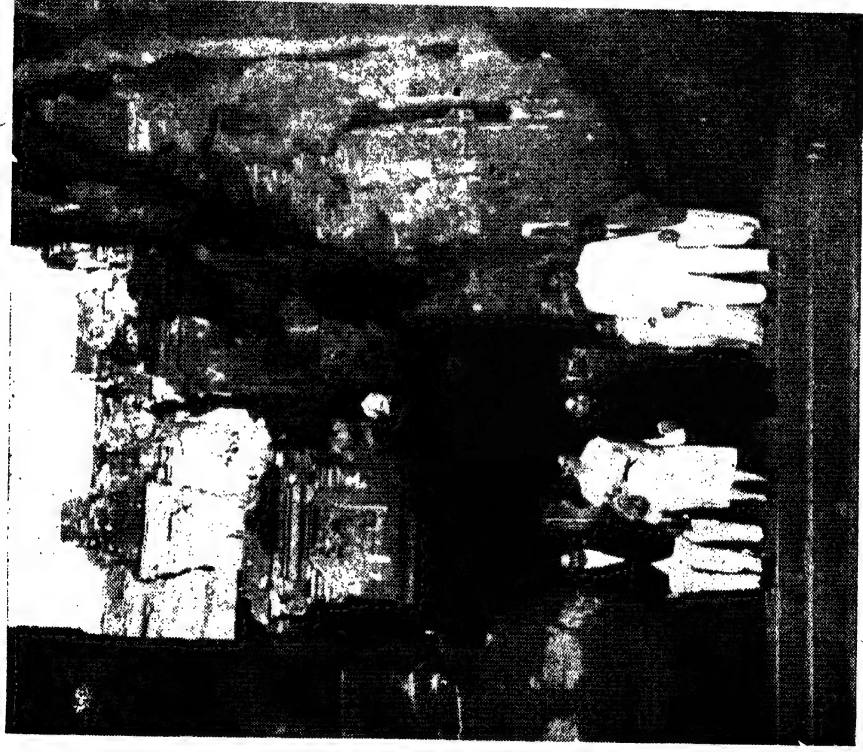
ইলোরার কৈলাস মন্দিরে নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রীটঙ্কপ্রসাদ আচার্য্য
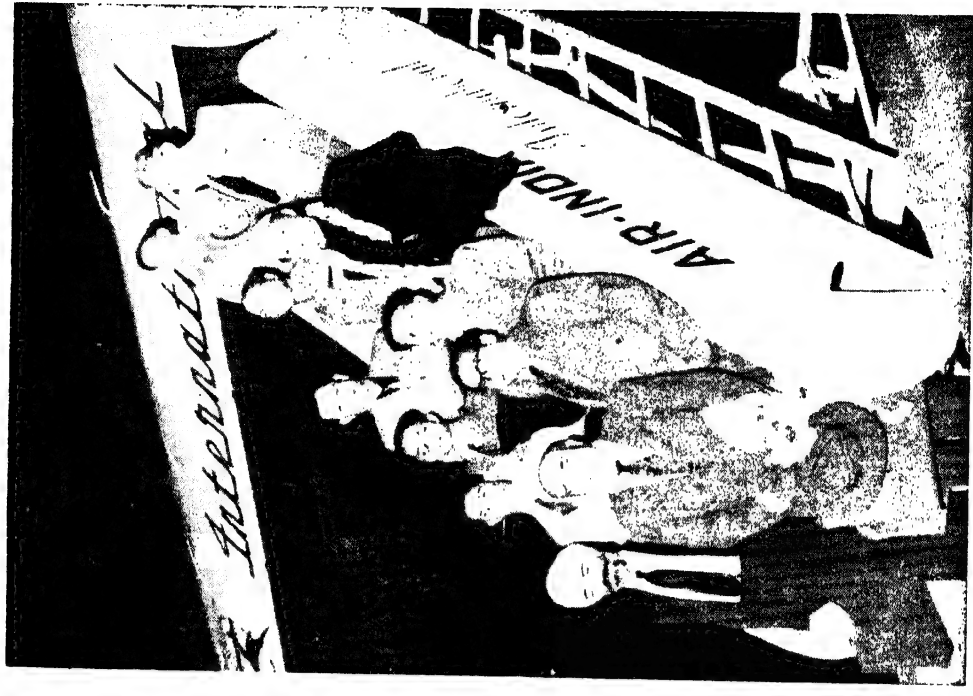
এগারজন ভারতীয় গ্রন্থাগারিকের একডেলিগেশনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা

করিতে পারি; কিন্তু কত টাকা আয় হইলে আমরা ব্যক্তিবিশেষকে মধ্যবিত্ত বলিয়া ধরিব বা কত টাকা আয় বেশী হইলে আমরা তাঁহাকে ধনী-শ্রেণীভুক্ত করিব বলা আদৌ সহজ নহে।

"গ্রাম" বলিলে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারি, গ্রামের মধ্যে 'ঘোষ-পাড়া', 'দাস-পাড়া,' 'বাগ্দী-পাড়া' 'মুসলমান-পাড়াও বুঝিতে পারি, কিন্তু গ্রামের সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ।

সময়ে সময়ে গ্রামের সীমানা নির্দ্দেশ বা গ্রাম কতদূর বিস্তৃত বলা সুকঠিন। সুখচর ও খড়দহের মধ্যে "কুলীনপাড়া।" মৌজা হিসাবে কুলীনপাড়া সুখচরের অন্তর্গত, মিউনিসিপ্যালিটি হিসাবে খড়দহের অন্তর্গত। কুলীনপাড়ার ব্রাহ্মণগণের সামাজিক সম্বন্ধ খড়দহের সহিত; নবশাখ প্রভৃতির সম্বন্ধ সুখচরের সহিত।

বাংলার সরকারী কাগজপত্রে যে village বা গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে রাজস্ব বিভাগীয় মৌজা। মৌজা হয়ত এককালে 'সামাজিক' গ্রাম ছিল—কিন্তু এখন জরিপ জমাবন্দীর কাগজে এক চৌহদ্দিভুক্ত স্থানের নাম মৌজা। কোন কোন স্থানে মৌজা গ্রামের equivalent বা সমপর্য্যায়বাচক হইলেও বহু স্থানে নহে। আবার আমাদের "শহর" মহকুমার সদর হইলেই শহর, মিউনিসিপ্যালিটি হইলেই শহর অনেক ক্ষেত্রে কতকগুলি গ্রামের বা মৌজার সমষ্টি মাত্র। সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে আসিলে বাংলা সরকার তাঁহাদের সম্মুখে যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাহাতে বলেন যে, বাংলার শহর বেশীর ভাগই হইতেছে "overgrown villages"।—বাংলা সরকার অবশ্য village কথাটি social villages বা সামাজিক গ্রাম এই হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, মৌজার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেন নাই। আবার ভাগীরথীর উভয়তীরস্থ গ্রামসমূহে এত ঘন বসতি, এত শিক্ষিত-সজ্জনের বাস, এত ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র যে, তাহাদিগকে শহর বলিয়া ভ্রম হয় এবং তাহাদিগকে শহর বলিয়া ধরিলে খুব অন্যায় হয় না। কলিকাতা তিনখানি গ্রামের সমষ্টি।

পশ্চিম বাংলার ৩৯,১৫১টি মৌজা বা গ্রাম আছে, ইহার মধ্যে ৩,৫৬৯টি মৌজায় কোন লোকবসতি নাই। দেখা যায় সংখ্যা হিসাবে শতকরা ৯টি মৌজায় লোকবসতি নাই। আর বসতিপূর্ণ মৌজার সংখ্যা প্রতি দশকেই কিছু না কিছু কমিতেছে। ইহার বহু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ থাকিলেও একটি বিশেষ কারণ হইতেছে—লোকের গ্রাম ছাড়িয়া শহরের দিকে, পাড়া ছাড়িয়া গণ্ডগ্রামে আসিবার ঝোঁক বা আগ্রহ। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রায় ৪০ বৎসর আগে "গ্রামে ফিরিয়া যাও" ধ্বনি তুলিয়াছিলেন ও বহু যুক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু জনগণের গ্রামে যাইবার মতি হয় নাই। একটু লেখাপড়া শিখিলেই কর্ম্মের সন্ধানে জনগণ শহরমুখো হয়। জমিদারী প্রথা লোপ পাইবার ফলে এই শহরমুখো ভাব বিশেষ প্রবল হইয়াছে। জমীদার, তালুকদার শ্রেণীর গ্রামে থাকিবার যে অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রয়োজন ছিল, তাহা এক্ষণে নাই। এজন্য তাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া টাকার যোগাড়ের জন্য শহরে আসিতেছেন। গ্রামের পূজাপার্ব্বণাদিতে ভাঁটা পড়িয়াছে; অনেকে পৈতৃক পূজা-অর্চনা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। সন ১৩৬১ সালে যেখানে ১০০ দুর্গাপূজা হইত; ১৩৬২ সালে তাহার ৭৮টি উঠিয়া গিয়াছে বা বন্ধ হইয়াছে; ১৩৬৩ সালে ২০.২২টি বন্ধ হইয়াছে। পরেও আরও হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

ইহার একটি ফল হইতেছে—গ্রামীণ সভ্যতার বা কৃষ্টির অঙ্গহানি বা স্থানবিশেষে সম্পূর্ণ লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। যদি কোন গ্রামের—মৌজার নহে, সমস্ত লোক সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দূরে অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই গ্রামের গ্রাম্য-দেবদেবীর নিত্য পূজা ত বন্ধ হইবেই, কালক্রমে সেই সব দেবদেবীর মন্দিরাদি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে ও "আস্তান" অবধি লুপ্ত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু হিন্দু পশ্চিবঙ্গে বা ভারতের অন্যান্য স্থানে চলিয়া আসার ফলে বহু গ্রাম্য-দেবদেবীর নিত্যপূজা ত বন্ধ হইয়াছেই, পাল-পার্ব্বণে যে পূজা হইত, ধুমধাম হইত, মেলা বসিত তাহাও বন্ধ হইয়াছে। বহু স্থানে মুসলমানেরা দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির ভাঙিয়া দিয়াছে ও "আস্তান" অপবিত্র করিয়াছে। নবাবী আমলেও এইরূপ বহু অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার ফলে বহু গ্রাম্য-দেবদেবীর ও "আস্তানে"র বিলুপ্তি হইয়াছে। মন্দিরের ইট লইয়া মসজিদ তৈয়ারি করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

সামাজিক গ্রামের (Social villages) সহিত বর্ত্তমানের মৌজার পার্থক্য কিরূপ তাহা ১৯১১ সনের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার আদাম-শুমারির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওম্যালী সাহেব এইরূপভাবে তথ্য দিয়া দেখাইয়াছেন:—

	বসতিপূর্ণ—	
বিভাগ	মৌজা	গ্রাম
বর্দ্ধমান	২৪,১৩২	২৯,৪৫১
প্রেসিডেন্সী	১৩,৩৮৯	২১,২৩৩
পাটনা	১৩,২৩১	২৩,৫৬৬
ত্রিহুত	১৪,৩৫২	২৯,৬৫৬
ভাগলপুর	১৯,৭১৪	৩২,৩০১
উড়িষ্যা	১৫,৬৭৫	২৩,৩৯১

দেখা যায় সর্ব্বত্রই মৌজা অপেক্ষা সামাজিক গ্রামের সংখ্যাই বেশী। পশ্চিম বাংলার প্রথমোক্ত দুই বিভাগের কালি দিয়া হিসাব করিলে বসতিপূর্ণ গ্রামের গড় কালি এইরূপ দাঁড়ায়:—

বর্দ্ধমান বিভাগ—০'৪৭ বর্গমাইল

প্রেসিডেন্সী ,, —০'৮০ ,, ,,

আমরা যদি সুন্দরবন এলাকার কালি বাদ দিয়া হিসাব করি তাহা হইলে প্রেসিডেন্সী বিভাগের গ্রামের ক্ষেত্রফল বর্দ্ধমান বিভাগের গ্রামের ক্ষেত্রফলের কাছাকাছি যাইবে। গড়ে সাধারণ গ্রামের ক্ষেত্রফল ০'৫ বর্গমাইল ধরিলে গ্রামগুলি যে ছোট ছোট তাহা বুঝা যায়। কোনও গ্রামই গড়ে দৈর্ঘে বা প্রস্থে ০'৭ মাইলের বেশী নহে। গ্রামের মধ্যস্থল হইতে গ্রামের প্রান্ত ০'৪ মাইলের

বেশী নহে। বড় গ্রাম যে নাই তাহা নহে, গড়ে গ্রামগুলি ছোট ছোট।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার অনেক গ্রামে দেখা যায় যে, গ্রাম-দেবতা শক্তিমূর্ত্তি। যেখানে কালীমূর্ত্তি নাই সেখানে অন্য কোন শক্তিমূর্ত্তি, তৎপরেই শিবলিঙ্গের প্রাচুর্য্য। অনেক গ্রামে আবার শক্তিমূর্ত্তি ও শিব দুই-ই আছেন। "উনপঞ্চাশীর" ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন যে, বিখ্যাত বিখ্যাত শিবলিঙ্গের অবস্থান একদিনের হাঁটা-পথের ব্যবধানে। যেমন কালিঘাটে নকুলেশ্বর, বালীতে কল্যাণেশ্বর, চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বর, তারকেশ্বরে তারকেশ্বর ইত্যাদি। পূর্ব্বে হয়ত এই সব স্থানে শৈব মঠ ছিল; শৈব সন্ন্যাসী একস্থান হইতে যাত্রা করিয়া অপর স্থানে আশ্রয় পাইত। কথাটি সমগ্র বাংলার পক্ষে কতদূর সত্য তাহা জানি না, তবে সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

গ্রাম-দেবতা হিসাবে কালিমূর্ত্তির ন্যায় বিষ্ণুমূর্ত্তির তাদৃশ সংখ্যাধিক্য দেখা যায় না। বর্ত্তমানে যেখানে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি প্রায় গাঁয়ের ঠাকুরের পর্য্যায়ে উঠিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তাহার অধিকাংশ স্থলে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, ইঁহারা গ্রাম-দেবতা নহেন। কোনও ব্যক্তিবিশেষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পরে সর্ব্বসাধারণের দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। পঞ্চানন্দ, পঞ্চানন-তলা বা ষষ্ঠীতলাকে গ্রাম্য-দেবতার পদবীতে উন্নীত করা যায় না—এক এক গ্রামে দুই বা ততোধিক পঞ্চানন্দ বা মা ষষ্ঠী আছেন। বহু জায়গায় শীতলামন্দির আছে।

দুই এক স্থানে "জরাসুর" ও "বনদেবতা" দেখিয়াছি। বন-দেবতা দেখিতে কন্ধকাটা মানুষের ন্যায়—প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল পেটের উপর—রং আকাশনীল। শীতকালে ধানকাটার সময় পূজা হয়—অন্য সময়ে হয় না। অনেক গ্রামে আবার নিতাই-গৌরের মূর্ত্তি আছে ও নিত্য পূজা হয়। শুধু যে বৈষ্ণবের "আখড়ায়" হয় তাহা নহে, রীতিমত মন্দিরে পূজা হয়। কোন কোন স্থানে কেবল 'মহাপ্রভু'র (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের) পূজা হয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থলে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ আছে।

এককালে সারা বাংলায় বিশেষ করিয়া রাঢ় অঞ্চলে তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল এবং এখনও বহু স্থানে আছে। এজন্য শক্তিমূর্ত্তি গ্রাম্য-দেবী হিসাবে পূজিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শিব-শক্তির ৫১টি পীঠস্থানের মধ্যে প্রায় ২০টি বাংলার নানা স্থানে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন তন্ত্র-শাস্ত্রের উৎপত্তি বাংলায় হইয়াছিল। এ বিষয়ে একটি প্রাচীন বচনও শুনা যায় যে :

'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা॥'

ভারতে তিনটি তান্ত্রিক সম্প্রদায় আছে। যথা :

'সম্প্রদায় নাথ বাম্ন গৌড় কাশ্মীর কেরলাম॥'

ইহা হইতে বাংলায় তন্ত্র-প্রাধান্য ও তাহার প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।

আচার্য্য শঙ্কর তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই শ্রীবিদ্যার (ত্রিপুরাসুন্দরীর) উপাসনা করিতেন। সকল শঙ্কর মঠে শ্রীযন্ত্র স্থাপিত আছেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ঈশ্বরপুরী হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনিও তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত। অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রমুখ চৈতন্য-পরিকর আচার্য্যগণ তান্ত্রিক উপাসনায় সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দিরে শ্রীবিদ্যার যন্ত্র আছেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ তন্ত্র-মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯৩১ সনের আদমশুমারির সময় বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে কতজন শাক্ত, কতজন বৈষ্ণব, কতজন শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত তাহার সম্বন্ধে একটি তদন্ত হয়। তদন্তের ফলাফল আদমশুমারির রিপোর্টে আছে। আমরা তাহা হইতে পাঠকগণের সুবিধার জন্য তথ্যগুলিকে শতকরা হিসাবে রূপান্তরিত করিয়া নিম্নে দিলাম। যথা :

বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে শতকরা—

স্থান	শৈব	শাক্ত	বৈষ্ণব	যাঁহারা কোন সম্প্রদায় ভুক্ত বলেন নাই
সমগ্র বাংলা	০.১৩	১৪.৮	১৬.০	৬৯.০
বর্দ্ধমান বিভাগ	*	৯.২	৭.১	৮৩.০
প্রেসিডেন্সী ,,	*	৫.৩	৬.৪	৮৬.০
রাজসাহী ,,	*	১২.৪	২০.৬	৬৭.৪
ঢাকা ,,	*	১৭.৫	৩২.৩	৪৮.৮
চট্টগ্রাম ,,	*	৬০.০	৩৯.৯	০.০
(কলিকাতা	*	০.৭৫	০৪.৮	৯৭.৭)

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, বর্ত্তমানের ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেক হিন্দুর ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়াছে। এজন্য নিজেকে শাক্ত বা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত বা অপারগ। যাঁহারা কিঞ্চিৎ গোঁড়া, কেবল তাঁহারাই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতা শহরের তথ্যগুলি বিচার করিলে এই যুক্তির সহায়ক…। কিন্তু "গোঁড়ামি" সম্বন্ধে শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে প্রভেদ আছে। কোনও বৈষ্ণবের নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে ধর্ম্মগত বা সম্প্রদায়গত বাধা কিংবা নিষেধ নাই; অনেকেই নিজেকে দীনহীন বৈষ্ণব দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে শাক্তদের নিজ সম্প্রদায় বলিতে নিষেধ আছে। শাক্তদের সম্বন্ধে এই বিষয়ে একটি উপদেশ বা নিষেধ আছে। যথা :

অন্তঃ কৌলো বহিঃ শৈবো জনমধ্যে তু বৈষ্ণবঃ।
কৌলো সুগোপয়েদ্দেবি নারিকেল ফলাম্বুবৎ॥

(কুলার্ণব তন্ত্র)

---

* অর্থাৎ অতি নগণ্য। কলিকাতার অঙ্ক প্রেসিডেন্সী বিভাগের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

গোঁড়া শাক্তরা নিজের সম্প্রদায় ত বলেনই না, বরং নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার উপদেশ আছে। এমতে যাঁহাদের পরিচয় বৈষ্ণব বলিয়া আদমশুমারির তথ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক শাক্ত আছেন এবং যাঁহারা নিজেদের কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত বলেন নাই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শাক্ত।

যাঁহারা নিজেদের কোনও সম্প্রদায় বলেন নাই, এইরূপ লোকের মধ্যে আমরা যদি অর্দ্ধেক শাক্ত ধরিয়া লই ত খুব অসঙ্গত হইবে না। বাকী অর্দ্ধেক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে সম্প্রদায় বলেন নাই—ইহাদের মধ্যে কিছু শাক্ত, কিছু বৈষ্ণব আছেন।

এমতে সমগ্র বাংলায় শতকরা ৫০ জন শাক্ত ও ১৬ জন বৈষ্ণব। বাকী ৩৪ জনের মধ্যে যদি শাক্ত ও বৈষ্ণবের অনুরূপ ধরি তাহা হইলে শাক্ত ও বৈষ্ণবের অনুপাত এইরূপ দাঁড়াইবে :

শাক্ত : বৈষ্ণব=৬৭ : ৩৩ বা মোটামুটি ২ : ১।

আমাদের উপরোক্ত হিসাবে যতই ভুল থাকুক না কেন শাক্তরা যে বৈষ্ণবদের অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শাক্তরা বৈষ্ণবদের অপেক্ষা ২ গুণ বেশী না ধরিয়া যদি আমরা তাঁহাদের ১॥ গুণ বেশী ধরি তাহা হইলে তাঁহাদের অনুপাত এইরূপ দাঁড়ায় :

শাক্ত : বৈষ্ণব=৩ : ২

শাক্তের উপাস্য হইতেছেন শক্তি। শক্তির সাধারণরূপ দশমহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত তন্ত্রকৌমুদীর পুথিতে ২৭টি মহাবিদ্যার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। হরিদ্বার-কনখলের অভিমন্যুগোত্রীয় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ গৌতম ঋষির সহিত লেখকের এই বিষয়ে কিছু আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, কোন কোন তন্ত্রমতে ত্রয়োদশ মহাবিদ্যা; আবার অপরাপর কোন কোন তন্ত্রমতে ষোড়শ মহাবিদ্যা। এই সব মহাবিদ্যার নামও তিনি করিয়াছিলেন। যথা :

(১) উপরোক্ত দশমহাবিদ্যা+চণ্ডেশ্বরী, লঘুশ্যামা ও ত্রিপুটা ;

(২) ঐ দশমহাবিদ্যা+বনদুর্গা, শূলীনী, অশ্বারূঢ়া, ত্রৈলোক্যবিজয়া, বারাহী ও অন্নপূর্ণা।

এইরূপে আমরা ১৯টি বিভিন্ন মহাবিদ্যার নাম পাইতেছি। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত পুথি হইতে আরও কয়েকটি মহাবিদ্যার নাম করিয়াছেন। যথা : দুর্গা, মহিষমর্দ্দিনী, গৌরী, প্রত্যঙ্গিরা, চামুণ্ডা ও কাত্যায়নী। নিরুত্তর তন্ত্রে শ্রীকুল ও কালীকুলের কয়েকটি মহাবিদ্যার নাম উল্লিখিত আছে। যথা :

কালীতারা ছিন্নমস্তা, ভুবনা মহিষমর্দ্দিনী।
ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা ॥
কালীকুলং সমাখ্যাতং শ্রীকুলঞ্চ ততঃ পরম্।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে।
মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিভাবিতম্ ॥

দশমহাবিদ্যার তৃতীয়া মহাবিদ্যা ষোড়শীর বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যথা : ত্রিপুরাসুন্দরী, ত্রিপুরেশ্বরী, শ্রীবিদ্যা, রাজরাজেশ্বরী ইত্যাদি। তারার তিনটি নাম পাওয়া যায়—উগ্রতারা, ভ্রামরী তারা ও মহানীল সরস্বতী বা একজটা। সকল মহাবিদ্যার সকল নাম আমাদের জানা নাই।

পূর্ব্বোক্ত গৌতম ঋষির পিতা যজ্ঞপুরুষানন্দ (যাঁহার কাছে শুয় জন উড রফ তন্ত্র-অভ্যাস করিয়াছিলেন) একবার আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, কালীর ৮১টি রূপ বা নাম আছে।

চণ্ডীর দেবী-কবচে আমরা নিম্নলিখিত নবদুর্গার নাম পাই।

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্ ॥
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্ ॥
নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

শুধু নাম হইলেই হইবে না ধ্যানও জানা চাই। ধ্যানের সঙ্গে মিলাইলে তবে মূর্ত্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে। ডানকুনি রেল ষ্টেশনের নিকট একটি প্রস্তরনির্ম্মিত চামুণ্ডামূর্ত্তি দেখি। দেবীর নাম জিজ্ঞাসা করায় স্থানীয় অনেকে বলিল ইহা চণ্ডীর মূর্ত্তি, পরে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে, ইহা চামুণ্ডামূর্ত্তি।

ধূমাবতী বিধবা, ইনি ভৈরবকে (শিবকে) খাইয়া ফেলেন। এজন্য গৃহী কাম্যফলাভিলাষ লোকে ইহার পূজা করেন না। লেখক ১৯৩৯ সনে কামাখ্যা পাহাড়ে গিয়াছিলেন—ঐ পাহাড়ে তারাপীঠ ব্যতীত নয়টি মহাবিদ্যার পীঠ আছে। তিনি যখন ধূমাবতীর পীঠ স্পর্শ করিতে উদ্যত তখন স্থানীয় লোকেরা বারণ করেন, বলেন যে, গৃহী লোককে ধূমাবতীর পীঠ স্পর্শ করিতে নাই। এইরূপ ছিন্নমস্তার পূজাও নাকি গৃহীলোককে করিতে নাই। একমাত্র হাজারিবাগ জেলার রাজরোপ্পায় ছিন্নমস্তার মন্দির আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ছিন্নমস্তার মন্দির আছে বলিয়া লেখক অবগত নহেন।

দশমহাবিদ্যার একত্রে পূজা অন্ততঃপক্ষে দুইটি স্থানে হয়। ইহাদেরও সেই সঙ্গে নিত্যপূজা হয়। এই দুইটি স্থান হইতেছে যশোহরে চাঁচড়ার রাজবাটী ও বরাহনগরে কাশীপুর রতনবাবুর শ্মশানঘাটের নিকট। অন্য কোথায়ও হয় কিনা জানা নাই।

ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা রাজনারায়ণ বসুর জন্মস্থান জেলা চব্বিশ পরগণার বোড়াল গ্রামে ও ছত্রভোগে হয়। অন্যত্র হয় বলিয়া শুনি নাই। খড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দিরে ইহার যে যন্ত্র আছে তাহাতেও নিত্যপূজা হয়।

ভুবনেশ্বরীর পূজা চারটি জায়গায় হয় বলিয়া জানা আছে। যশোহরের সেখহাটি গ্রামে প্রস্তরময়ী ভুবনেশ্বরীমূর্ত্তি দেশবিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিত্য ষোড়শোপচারে পূজিত হইত। এখন কি হয় জানা নাই। থানা খড়দহের অন্তর্গত রহড়া গ্রামে, বর্দ্ধমান জেলার মিঠাপুর গ্রামে ও ঐ জেলার কুলীনগ্রামে ভুবনেশ্বরীর পূজা

হয়। ভুবনেশ্বরীর মূর্ত্তির অল্পতার একটি কারণ এইরূপ। কোনও সাধক একাধিক্রমে ৩২ বৎসর ধরিয়া ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ না করিলে তাঁহার ভুবনেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার অধিকার জন্মায় না। এইরূপ সাধকের সংখ্যা খুবই অল্প, সাধক হইলেও সঙ্গতি না থাকার জন্য মূর্ত্তি বা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় না। এজন্য সমগ্র ভারতবর্ষে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের সংখ্যা খুব কম। সম্বলপুরের সম্বলেশ্বরী হইতেছেন ভুবনেশ্বরী। ক্ষত্রিয় পূজারী পূজা করেন। দেবী পূর্ব্বাস্যা। সম্বলপুরে দুর্গাপূজার তিন দিন ভুবনেশ্বরীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া স্থানে স্থানে পূজা হয়। দক্ষিণ ভারতে হাম্পির নিকটে ভুবনেশ্বরীর আর একটি মন্দির আছে। গোওয়ালে আর একটি ভুবনেশ্বরীর মন্দির বিদ্যমান।

বিশালাক্ষী দেবী শক্তিমূর্ত্তি। এককালে বাংলা দেশে বিশালাক্ষীর পূজা বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা যে বেশী ছিল তাহা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে পূজাপদ্ধতি দেওয়াতেই বুঝা যায়। বিশালাক্ষীর ধ্যান হইতেছে :

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদ প্রভাম্
নানালঙ্কার সুভগাং রক্তাম্বরধরাং, শুভাম্
মুণ্ডমালা বলীরম্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্ট দায়িকাম্
সর্ব্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পদং প্রদং স্মরেৎ।

সাধারণতঃ ইনি দ্বিভুজা; কিন্তু কোন কোন স্থলে ইনি চতুর্ভুজা। বহুগ্রামে ইহার মূর্ত্তি বা "আস্থান" আছে ও নিত্যপূজা হয়। যে যে গ্রামে বিশালাক্ষীর পূজা হয়, আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিম্নে দিলাম :

জেলা ২৪ পরগণা

১।	থানা বরাহনগরের অন্তর্গত কামারহাটিতে	প্রস্তরখণ্ড
২।	থানা টিটাগড়ের অন্তর্গত টিটাগড়ে	মূর্ত্তি

জেলা হুগলী

৩।	আরামবাগের বিক্রমপুর গ্রামে	প্রস্তরখণ্ড
৪।	কামারপুকুর (আমুড়)	"আস্থান"
৫।	শিয়াখালা	মূর্ত্তি (উত্তরবাহিনী)
৬।	কলাছড়া	মূর্ত্তি
৭।	হরিপাল থানার ইলাহিপুরে	মূর্ত্তি
৮।	জাঙ্গীপাড়া থানার মথুরাবাটিতে	মূর্ত্তি

জেলা বর্দ্ধমান

৯।	বেতু গ্রামে	মূর্ত্তি (বেহুলা)

জেলা বাঁকুড়া

১০।	নান্নুর গ্রামে	মূর্ত্তি (বাশুলী)

জেলা মেদিনীপুর

১১।	ঘাটাল—চন্দ্রকোণার সন্নিকট বরদা গ্রামে—	মূর্ত্তি

জেলা বীরভূম

১২। নান্নুর—মূর্ত্তি

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় সরস্বতী নদীর উভয়-তীরে ও তাহার সন্নিকটে বিশালাক্ষীর বহু মূর্ত্তি বা 'আস্থান' আছে। ইহা হইতে মনে হয় এই অঞ্চলে এককালে বিশালাক্ষী বহুজনপূজিতা দেবী ছিলেন। ইহার অর্থ এই নহে যে, অন্যান্য স্থানে ইহার পূজা প্রচলিত ছিল না। কোনও মূর্ত্তি ৬০০ শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। শিয়াখালার উত্তরবাহিনী দেবী হুসেন শাহের আমল হইতে পূজিত। ইহার মূর্ত্তি পূর্ব্বে মাটির ছিল—সেজন্য মধ্যে মধ্যে নূতন মূর্ত্তি করিতে হইত। গ্রামবাসীরা ১৩৪০ সালে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে ১২৪৮, ১২৮৬ ও ১৩০৪ সালে মাটির মূর্ত্তি তৈয়ার হইয়াছিল। এই তথ্য হইতে কত বৎসর অন্তর মাটির মূর্ত্তি পাল্টাইতে হয় তাহার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়। গড়ে ৩০.৩১ বৎসর অন্তর মূর্ত্তি পাল্টাইতে হইয়াছে। সুখচর গ্রামের ৺দীননাথ গাঙ্গুলী বলিতেন যে, তিন যুগ (অর্থাৎ ৩৬ বৎসর) অন্তর মূর্ত্তি পাল্টানো উচিত—নচেৎ পূজা ভাল হয় না।

মথুরা বাটীতে—হোসেন শাহার সমসাময়িক পুরন্দর খাঁর অধস্তন তৃতীয় পুরুষ শিয়াখালা গ্রাম হইতে এই গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন এবং উত্তরবাহিনী দেবীর অনুরূপ অষ্ট ধাতুর একটি বিশালাক্ষী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

কামারহাটিতে দেবীর যে 'আস্থান' আছে তাহার উল্লেখ ১১৯৯ সনের জমিদারী চিঠাতে পাওয়া যায়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন (১৭৫৬ খ্রীঃ অঃ) তখন তাঁহার সৈন্য-বাহিনী পুরাতন বাদশাহী সড়ক (অধুনা নীলাগঞ্জ রোড) দিয়া আসিতে আসিতে বিশালাক্ষীর মূর্ত্তি এবং মন্দির অপবিত্র করে ও ভাঙ্গিয়া ফেলে। সেই অবধি কয়েকখণ্ড প্রস্তর ভিন্ন এই 'আস্থানে' আর কিছুই নাই—নিত্যপূজা হয়।

কলাছড়ার বিশালাক্ষী—বর্ত্তমান সেবাইতগণের মাতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এ মতে ২০০ বৎসরের অধিক পুরাতন নহেন।

রঙ্কিণী দেবী এইরূপ একটি শক্তিমূর্ত্তি। কেহ কেহ বলেন, ইনি আসলে অনার্য্য দেবী ছিলেন, কালক্রমে হিন্দু দেবী হইয়াছেন, ইহার নাম পুরাণাদিতে নাই। সে যাহা হউক, বহু কাল হইতে ইনি হিন্দু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শক্তির অন্যতম মূর্ত্তি বা বিকাশরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। আমরা যে কয়টি রঙ্কিণী মূর্ত্তির বিষয় জানিতে পারিয়াছি তাঁহাদের ভৌগোলিক সংস্থান নিম্নে দিলাম। যথা :—

মেদিনীপুর জেলা

১। ব্রজলাল চক্-মাল আউড়ি গ্রামে – দেবীর পীঠস্থান

বর্দ্ধমান জেলা

২।	চক্‌দিঘী—রঙ্কিণী মাহুলা গ্রামে—	মূর্ত্তি
৩।	বরাকর গ্রামের নিকট নদীতীরে—	ঐ

এই মূর্ত্তি কল্যাণেশ্বরী বলিয়া পরিচিত।

বরাকর শিখরভূমের অন্তর্গত। এই মূর্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে—

"ধলেতে রঙ্কিণী তুমি শিখরে কল্যাণী"

সিংভূম জেলা

৪। ধলভূম— মূর্তি

অন্যান্য স্থানে রঙ্কিণী দেবীর মূর্তি বা 'অবস্থান' সম্বন্ধে আমাদের সঠিক জ্ঞান নাই। যতদূর জানা যায় তাহাতে বলা চলে পশ্চিম-বঙ্গের সীমান্তের কাছাকাছি স্থানেই এই দেবীর আবির্ভাব।

বাংলার গ্রামে মহাবিদ্যার প্রকারভেদে দেবীমূর্তি বা দেবীর ঘট বা 'আস্থান' ছাড়া, অন্যান্য বহু প্রকারের শক্তিমূর্তি আছে। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি পৌরাণিক, আবার কতকগুলি লৌকিক। লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে কতকগুলি বহুস্থানে বিস্তৃত; কতকগুলি একটি বা দুইটি গ্রামে সীমাবদ্ধ। আবার ইঁহাদের স্থানীয় নাম এরূপ যে, প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা লৌকিক দেবী বা পৌরাণিক দেবী সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। উদাহরণ স্বরূপ মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার অন্তর্গত পানিয়া গ্রামের পানেশ্বরী দেবীর কথা বলা যাইতে পারে। পৌষসংক্রান্তিতে তথায় একটি বড় মেলা বসে। পানেশ্বরী দেবীর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রবাদ প্রচলিত।—

'পানিয়া গ্রামেতে বন্দ মাতা পানেশ্বরী
যাঁর পেট চিরি নাগা মানিক কৈল চুরি।"

এই পানেশ্বরী লৌকিক কি পৌরাণিক দেবী তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সভ্যতার স্বরূপ জানিবার জন্য আমাদের দরকার তথ্য সংগ্রহ করা। এই তথ্য যত বিস্তৃত হয় ততই সমাজতাত্ত্বিকগণের কাজে আসিবে এবং তাঁহারা কি কি বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে তাহার নির্দেশ দিবেন। আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বশাখা অগ্রণী হইলে ভাল হয়। আমি একটি গ্রামের কয়েকটি শিবমন্দির, কয়েকটি পঞ্চাননতলা, শীতলামন্দির, কালিমন্দির, মহাপ্রভুর মন্দির, রাধাকৃষ্ণের মন্দির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিলাম। মন্দির কবে আন্দাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও বাহির করিলাম। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে গ্রামে ১২টি দুর্গাপূজা, ৫টি কালীপূজা ও ৭টি জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। পরে ক্রমে ক্রমে কমিয়া গিয়াছে; সার্ব্বজনীন পূজা ও সরস্বতীপূজা আরম্ভ হইয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে কাহাকে জানাইব। শুধু আমার সংগৃহীত তথ্য হইতে গ্রামীণ সভ্যতার স্বরূপ বুঝা যাইবে না, বহু তথ্য হইতে একটা খসড়ার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। নির্মল বাবুকে দেখাইলাম, তিনি বলিলেন যে, পূজার তথ্যগুলি যদি পারেন ত সময় হিসাবে সাজাইয়া দিন। আরও চেষ্টা করিয়া এইরূপ দাঁড়াইল :—

পারিবারিক—

বৎসর	দুর্গা পূজা	কালী পূজা	জগদ্ধাত্রী পূজা	কার্ত্তিক পূজা	সরস্বতী পূজা	সর্ব্বজনীন পূজা
১৩১০	১২	৫	৭	—	—	—
১৩২০	১০	৮	৩	১	—	—
১৩৩০	৮	৭	৩	—	১	—
১৩৪০	৫	৫	১	—	২	১
১৩৫০	২	২	—	—	৫	২
১৩৬০	১	১	—	—	১০	৫
১৩৬৩	—	১	—	—	১১	৩

তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে যদি বিশ্ববিদ্যালয় বা সাহিত্য-পরিষদ নির্দ্দেশ দেন—কি কি তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, কি ভাবে করিতে হইবে এবং সংগৃহীত হইলে কাহাকে পাঠাইতে হইবে তাহা হইলে বড় ভাল হয়। পরে তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে সচিত্র প্রশ্নাবলী তৈয়ারি করিয়া আরও সবিশেষ detailed তথ্যসংগ্রহের নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন—এইরূপ মন্দিরকে দো-চালা মন্দির বলে; এইরূপ পাদপীঠকে সর্ব্বতোভদ্র পাদপীঠ বলে ইত্যাদি; শিবলিঙ্গের তিন-ভাগ: রুদ্রভাগ, বিষ্ণুভাগ ও ব্রহ্মভাগ। এইসব ভাগের অনুপাত ২ : ৩ : ৪ বা ৩ : ৪ : ৫ বা ৪ : ৫ : ৬ আছে। যে শিবের সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হইতেছে তাঁহার রুদ্রভাগ প্রভৃতির অনুপাত কিরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি।
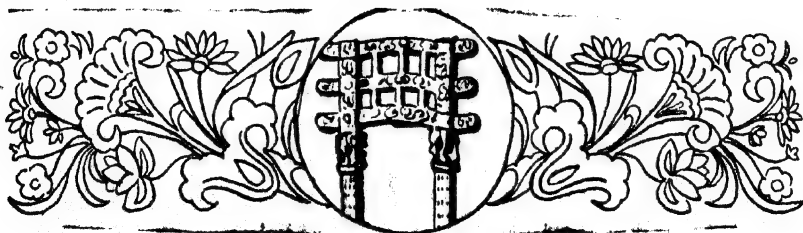
তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয়

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

ভারত ও তিব্বত পরস্পর আত্মিক ও বৈষয়িক উভয় প্রকার সম্বন্ধেই আবদ্ধ। ভারতীয় হিন্দুর কৈলাস, মানসসরোবর ইত্যাদি তিব্বতে। ভারতের শিবশক্তি-সাধনা মূর্ত রহিয়াছে তিব্বতেই। সমগ্র তিব্বত আত্মিক বিশাল ভারত। তেমনই ভারতকে না হইলেও তিব্বতের চলে না। বুদ্ধদেবের জন্ম-মৃত্যু-সাধনস্থান এই ভারত, পদ্মসম্ভবের আদি-স্থান এই ভারত—যে ভারতের ধর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবে তিব্বত একসময়ে প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল আজও তিব্বতের নিকট সেই ভারতের প্রয়োজন রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পূর্বেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সহিত তিব্বতের এই সম্পর্ক চলিয়া আসিতেছে। ভারতে যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিতেছিল তখন কুরুপক্ষীয় এক রাজা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া সামরিক সহচর-সহ তিব্বতে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার নাম ছিল কপতি। দেশবাসীর চিত্ত জয় করিয়া তিনি তিব্বতের একাংশের রাজা হন। তখন তিব্বত ছিল বহু খণ্ডে বিভক্ত রাজ্য।

আচার্য প্রজ্ঞাবর্মণ (সেস্-রব্-গো-ছ) বলেন, কপতির বংশধরগণ বহু বৎসর তিব্বতে রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে এখন কিছুই জানিবার উপায় নাই।

ইহার পর তিব্বতের ইতিহাসে যে নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার নাম ছিল নহ-থি-ৎসন-পো। তিনি নাকি কোশলের রাজা প্রসেনজিতের পঞ্চম পুত্র। তাঁহার বংশধরগণও প্রায় আট-দশ পুরুষ তিব্বতে রাজত্ব করেন। তখন তিব্বতে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহাকে বলিত পোন্ ধর্ম। এই সময়ে ভারতে কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রচলন হইয়াছিল। উপরোক্ত বংশের এক রাজার নাম ছিল ল্হ-থো-থোরি-নন-সন। তিনি ৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধগ্রন্থ 'সুত্রান্তপিটক' পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ কি উপায়ে তিব্বতে প্রবেশ করিল সে খবর এখন আর জানিবার উপায় নাই। কিন্তু উহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে কাটিয়া গেল প্রায় তিন চার পুরুষ। ইহাই ছিল তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বীজ। এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল রাজা স্রোং-ৎসন-গ্যাম্পোর আমলে। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া দেশবাসীর নিকট ঐ ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সময়েই তিব্বতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। দেশবাসী লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করে। সেই সময়ে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় হইয়াছিল। বহু বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সভ্যতার আলো ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তিব্বতের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর ভারতের প্রভাব প্রথম হইতেই লক্ষ্য করা যায়। চীন এবং নেপালের প্রভাবওছিল।

রাজা থি-স্রোন-দে-ৎসন-এর (৭৩০-৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) আমলে ভারত হইতে বহু পণ্ডিত ও সাধক তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং বৌদ্ধগ্রন্থাদি তিব্বতী ভাষায় রচনা করেন। এই সকল সাধকদিগের মধ্যে পদ্মসম্ভবই ছিলেন সর্বপ্রধান। তাঁহার চেষ্টায় তিব্বতের সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। পরবর্তী রাজগণও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে দেশময় বৌদ্ধধর্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের তখন জয়জয়কার।

এদিকে বৌদ্ধবিরোধী দল সংখ্যায় লঘু হইলেও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। ক্রমশঃ তাঁহারা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সিংহাসন হইতে বঞ্চিত রাজভ্রাতা ল্যানদর্ম ছিলেন এই দলের পশ্চাতে। তিনি বৌদ্ধবিরোধীদিগের এই মনোভাব নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাইলেন। ৯০৮-৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও একসময়ে বৌদ্ধবিরোধী দলের সাহায্য লইয়া রাজাকে হত্যা করাইয়া ল্যানদর্ম নিজে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি রাজা হইয়াই বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন এবং বহু বৌদ্ধমন্দির ও বৌদ্ধ গ্রন্থ ধ্বংস করিলেন। তিব্বত হইতে বৌদ্ধধর্ম সমূলে বিনাশ করিবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অত্যাচার চরমে উঠিল। বৌদ্ধ-সাধক ও পণ্ডিতগণ যে যেখানে পারিলেন, দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন।

অত্যাচার যখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল তখন একজন ছদ্মবেশে আসিয়া রাজা ল্যানদর্মকে হত্যা করিল।

ল্যানদর্মের মৃত্যুর পর যে সকল মন্ত্রী রাজ্যশাসনের কাজ চালাইতে লাগিলেন তাঁহারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু ল্যানদর্মের মৃত্যুর প্রায় সত্তর বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের পূর্বাবস্থা আর ফিরিয়া আসিল না।

ল্যানদর্মের রাজত্বে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসের পর বহু বৎসর ভারতীয় পণ্ডিতগণ তিব্বতে যান নাই। অত্যাচারের ফলে যে সকল বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সাধক পলায়ন করিয়া পূর্ব তিব্বতে আম্‌চোতে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁহারাই পুনরায় তিব্বতে ফিরিয়া আসিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় মগধ হইতে তিব্বতে আসিয়াছিলেন পণ্ডিত ধর্মপাল এবং তাঁহার তিন জন শিষ্য, সিদ্ধপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল। তিব্বতের তদানীন্তন রাজা তাঁহাদের সাহায্যে তিব্বতে ধর্ম, কলা ও বিনয়শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ইহার পর লূহদে নামক একজন রাজা ভারত হইতে পণ্ডিত সুভূতি শ্রীশান্তিকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। এই পণ্ডিত সমগ্র সের্‌চিন্ (প্রজ্ঞাপারমিতা) গ্রন্থখানি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয় হয় ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দে। একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ তিব্বতী সম্রাট চাঙ্-ছুব্ ওদ ছিলেন বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আর্যাবর্তের বিক্রমশীলা বিহারের আচার্য অতীশকে তিব্বতে লইয়া আসিবার জন্য তিব্বতের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা অতীশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং কিছুকাল তাঁহার সেবা করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার মত ধর্মগুরু ও পণ্ডিত তিব্বতে না গেলে তথায় বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার আশা নাই। আচার্যের পক্ষে বিহার ছাড়িয়া যাইবার অনেক বাধা ছিল। কিন্তু সকল বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে তিনি তিব্বত যাত্রা করিলেন। কেহ কেহ বলেন ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে ৫৭ বৎসর বয়সে প্রতীশ তিব্বতযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি চৌদ্দ বৎসর তিব্বতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়া-চতুর্থী তিথিতে য়ে-থঙ্ বিহারের তারামন্দিরে ৭৩ বৎসর বয়সে আতীশ দেহরক্ষা করেন। অতীশের ভিক্ষাপাত্র, কমণ্ডলু, খয়ের কাষ্ঠের যষ্টি, ঐ মন্দিরে সুরক্ষিত আছে। তাঁহার প্রণীত ধর্ম ও দর্শনগ্রন্থ পঁয়ত্রিশ খানি, এবং তন্ত্রের বই সত্তরখানিরও অধিক। এই সব মূল গ্রন্থের অভাব হইলেও উহাদের অনুবাদ ও সারমর্ম তিব্বতী ভাষায় এখনও পাওয়া যায়।

১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে শন্‌কর্ লোছভ্, রিভ্ লোছভ্, নন্ লোছভ্, লোদন্ সেরব্ প্রভৃতির মত বিদ্বান্ তিব্বতী অনুবাদকগণ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই সময়েই সাধু মরম, মিল গোন্‌ম প্রভৃতি বহু পণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বিক্রমশীলা বিহার ধ্বংসের পর তদানীন্তন ভারতের বিখ্যাত পণ্ডিত শাক্যশ্রীও তিব্বতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে বিক্রমশীলার অনেক ভিক্ষুও তিব্বতে যাইয়া বাস করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এমনকি তিব্বতীয় লামাগণের সাহায্যেই সুদূর মোঙ্গোলিয়ায়ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

আন্নামালাই অধিবেশন

সুদূর চিদাম্বরম্। এবার দর্শন কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল ওখানে। প্রাচীন সভ্যতার স্পর্শধন্য চিদাম্বরম্ জনপদ। এখানকার নটরাজের সুপ্রাচীন মন্দিরে প্রতি বৎসরই অগণিত ভক্তের সমাগম হয়। দক্ষিণের মাদুরা ও শ্রীরঙ্গমের দেবালয়ের পরেই চিদাম্বরমের এই নটরাজ-দেউল। সু-উচ্চ গম্বুজ, সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, মন্দিরগাত্রে অজস্র চিত্তাকর্ষক কারুকার্য্য এবং খোদিত ভাস্কর্য্য ভক্ত ও কলারসিকের চিত্তে যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মন্দিরাভ্যন্তরে নটরাজের মূর্ত্তি। সেদিন প্রত্যূষের সন্তর্পণ-পাদ-বিলাসী আলোর কার্পণ্যে আলোছায়া মায়া বিস্তার করেছিল মন্দিরের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে। সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দেখেছিলাম নটরাজের ভুবন-ভোলানো রূপ। স্মরণের কষ্টিপাথরে সোনার লিখনে সে ছবি আঁকা রইল। যুগে যুগে অগণিত নরনারী মুক্তিকামনায় এই নটরাজের মহাতীর্থের ধূলিরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করে সর্ব্বত্যাগী হয়েছে। আমরা এলাম সেই মহাতীর্থে।

মাদ্রাজের ১৫১ মাইল দক্ষিণে চিদাম্বরম্—দক্ষিণ-রেলপথের অন্যতম ষ্টেশন। চিদাম্বরমের উত্তরে ভেলোর, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের বিক্ষুব্ধ বীচিমালা, দক্ষিণে কোল্লেরুন এবং পশ্চিমে বীরণম্ হ্রদের প্রশান্ত জলোচ্ছ্বাস। এই চিদাম্বরম্ শহরেই আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা একটি উপনগরী। পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজি, বাগান, পার্ক ও খেলাধুলার জন্য খোলা-মাঠ সবই আছে উপনগরীর নির্ম্মুক্ত অবকাশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত পরিবেশ জ্ঞানসাধনার অনুকূল। শিল্পকলা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার চর্চ্চার জন্য খ্যাত এই শিক্ষাকেন্দ্রটি আজ দেশের জ্ঞানী-গুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যুগিয়েছিল চেট্টিনাদের রাজা স্যার আন্নামালাই চেট্টিয়ারের রাজসুলভ বদান্যতা। লাখো লাখো টাকা দিয়ে তিনি এই বিদ্যায়তনের বনিয়াদকে সুদৃঢ় করে দিয়ে গেছেন। তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এ দেশের আপামর জনসাধারণ।

গত বছরের ১৯শে ডিসেম্বর এখানে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। বিভিন্ন দেশের দর্শনানুরাগীরা এসেছেন দলে দলে। নানান্ রকম ভাষা, ভূষা ও কৃষ্টির প্রতিনিধি এই সব মানুষ এসেছিলেন দর্শন-চিন্তার আদান-প্রদানের জন্য। পাকিস্থান, সিংহল তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। সুদূর আমেরিকা, রাশিয়া, জার্ম্মানী, ইতালী থেকে খ্যাতনামা অধ্যাপকেরা যোগ দিয়েছিলেন আন্নামালাই অধিবেশনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যে নিখুঁত আয়োজন করেছিলেন তার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

এই মনোজ্ঞ, সহজ স্বচ্ছন্দ পরিবেশে চার দিন ধরে পণ্ডিতজনেরা নানান্ প্রসঙ্গের আলাপ করলেন। সে সব আলাপ যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি চিত্তাকর্ষক। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানালেন আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য লেঃ কর্ণেল টি. এন্. নারায়ণস্বামী। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মহীশূরের অধ্যাপক নিকম্ পড়ে শোনালেন দূরস্থিত দার্শনিক, অধ্যাপক ও রাষ্ট্রশাসকদের শুভেচ্ছাবাণী। তার পর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর তাঁর উদ্বোধনী-অভিভাষণ পাঠ করলেন। অনুপম তাঁর বলবার ভঙ্গী। দর্শনশাস্ত্র পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে আজ যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তিনি তার বিশ্লেষণ করলেন। কিছুদিন আগেও দর্শনশাস্ত্র আলোচনায় দেশের সেরা ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসতেন। আজ তার ব্যতিক্রম কেন হ'ল? এই সমস্যা আজ দেশের শিক্ষাবিদ্ তথা সাধারণ মানুষের চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক কবীর তাঁর ভাষণে বললেন: "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দর্শন-শাস্ত্র-পঠন বিমুখতা কেন ঘটল সেকথা ভাববার সময় এসেছে। আমাদের মতে সাধারণ মানুষের জীবনে যে দুর্বিবহ অর্থ নৈতিক চাপ এসে পড়েছে, মূলতঃ তার ফলেই এই অঘটন ঘটেছে। মানুষ বাঁচবার তাগিদে, জীবনধারণের প্রয়োজনে তার সবটুকু শক্তি ও সময় নিয়োগ করে ফেলছে। তাই দর্শন-চিন্তা বা তত্ত্ব-বিজ্ঞানের পুঁথিগত সূক্ষ্ম আলোচনায় কালাতিপাত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আজকের দিনে বেঁচে থাকবার প্রয়াসটা এমন সর্ব্বগ্রাসী হয়ে পড়েছে যে, ব্যক্তি এবং সমষ্টির জীবনে উচ্চ চিন্তার আর কোন অবকাশ নেই। এরিষ্টটলের কথায় বলা যায় যে, এ যুগের মানুষ শুধু জীবনধারণের উপায়ানুসন্ধানের জন্য এমনই ব্যাকুল যে, সে উপায়ের উৎকর্ষসাধন চিন্তায় তাদের কালক্ষেপ করার সময় নেই।" সঙ্কটের কথা তিনি বললেন, তার কারণ বিশ্লেষণ করলেনও নিপুণভাবে। এই সঙ্কটমোচনের পথনির্দ্দেশও তিনি করেছিলেন। অধ্যাপক কবীরের ভাষা দার্শনিক জনোচিত। বিশুদ্ধ উচ্চারণভঙ্গীতে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণের উপসংহারে বললেন: "মানুষের জ্ঞানের অভাবিত বিস্তার এ যুগের অধ্যাত্ম সঙ্কটকে দূরীভূত করতে পারে নি। পরামূল্যের প্রতি আগ্রহের অভাব এই সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যে ঐক্য বিরাজ করছে তাকে আমরা আমাদের মননে ও কর্ম্মে অস্বীকার করেছি। বাঁচবার তাগিদকে আমরা এত বড় করে দেখেছি যে, আমাদের মূল্যবোধ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। অথচ মানুষের এই মূল্যবোধই তার সর্ব্বকর্ম্ম প্রেরণার উৎস। এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে ভারত

বর্ষের ও তার বাইরের দর্শনশাস্ত্রীদের সত্যের স্বরূপ নির্দ্ধারণের এবং তার মূল্যবিচারের মহান্ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সত্যকে বিচার করতে হবে তার সমগ্রতায়। খণ্ড সত্যের বিচারে অস্তিত্বের যথার্থ মূল্যায়ণ হয় না। মূল্যের রহস্যলোকের দ্বারোদ্‌ঘাটন ঘটবে যদি আমরা সত্যের সমগ্র রূপটুকুর যথাযথ বিচার করি।"

অধ্যাপক কবীরের ভাষণের পরে সম্মেলনের মূল সভাপতি ডক্টর রাসবিহারী দাস তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন। গভীর মননিষ্ঠা, সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ তাঁর ভাষণের ছত্রে ছত্রে প্রমূর্ত হয়ে উঠল। তিনি দর্শনের ব্যাখ্যা করলেন ষোল পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ ভাষণে। ডক্টর দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক। অমলনীরের গবেষণা-কেন্দ্রে বহুদিন তিনি কাটিয়েছেন দর্শনের উচ্চতম গবেষণায়। তাঁর ভাষণে আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছিল এ কথা অসংশয়ে বলা যায়। তার পরে বিভিন্ন দিনের অধিবেশনে বিভাগীয় সভাপতিরা তাঁদের অভিভাষণ প্রদান করলেন। নীতি-দর্শন ও সমাজদর্শন বিভাগের নির্ব্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক এস. জি. হুল্যালকার পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি তাঁর 'নীতিদর্শন ও বিজ্ঞান' শীর্ষক ভাষণে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, তার সংহারশক্তি, মানুষের নীতিশক্তির ক্রিয়াশীলতা এবং এই উভয় শক্তির তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করেন। দর্শনেতিহাস বিভাগের সভাপতি ডক্টর এ. কে. সরকার এসেছিলেন সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে তিনি অস্তিত্ববাদের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ধারাবাহিক আলোচনা করেন। মনোবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ডক্টর বি. কুপ্পুস্বামী মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি তাঁর 'ব্যক্তিত্ব ও সমাজ' শীর্ষক ভাষণে ব্যক্তিত্বের গঠন ও ক্রমবর্দ্ধমানতার কথা আলোচনা করেন। সামাজিক শক্তির প্রভাব কেমন করে ব্যক্তিত্বের বনিয়াদকে সুদৃঢ় করে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কোন্ পথে সমাজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ-প্রচেষ্টাকে গতি দেয়, সে গূঢ় তত্ত্বের অবতারণা করেন অধ্যাপক কুপপু স্বামী। তর্কশাস্ত্র ও পরাবিদ্যা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক সি. টি. কে. চারী মাদ্রাজ ক্রিশ্চান মহাবিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি দর্শনের গঠন সম্বন্ধীয় কতিপয় পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত ও অতীন্দ্রিয় দর্শনের উপর বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক চারীর বক্তৃতা বিশেষজ্ঞের গভীর সমীক্ষার দ্বারা চিহ্নিত। তিনি সুধীজনের প্রশংসা অর্জ্জন করেছিলেন।

পূর্ব্ব দেশের আচার্য্য শঙ্কর থেকে পশ্চিম দেশের দার্শনিক মুর পর্য্যন্ত শতাধিক দার্শনিক এবং তাঁদের দর্শন মতবাদের উপর দর্শন কংগ্রেসে যে সব মূল্যবান প্রবন্ধ পঠিত হ'ল তা চিন্তার মৌলিকতায় ও বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় সমাগত সুধীজনের আনন্দ বর্দ্ধন করেছে। এবারকার কংগ্রেসে বাঙালী প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য ছিল, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কল্যাণী মল্লিক, ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী, ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী, অধ্যাপক অমিয় মজুমদার প্রমুখ খ্যাতনামা অধ্যাপকেরা বাংলা দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বিশ্বভারতী থেকে ডক্টর সন্তোষ সেনগুপ্ত, দিল্লী থেকে অধ্যাপক ডক্টর রায়, ডক্টর এ. সি. সেন প্রমুখ পণ্ডিতেরা এসেছিলেন। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছিলেন অধ্যাপক শ্যামাকুমার চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক। তাঁর এবং তাঁর সহকর্মী ডক্টর মিশ্রের প্রবন্ধ গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দক্ষিণ দেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক মহাদেবন্, অধ্যাপক ডামলে ও অধ্যাপক সি. ডি. শ্রীনিবাস মূর্ত্তি তাঁদের মৌলিক চিন্তার জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন। এবারকার কংগ্রেসে দুটি আলোচনা সভার বন্দোবস্ত হয়েছিল; তাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু যে যুগোপযোগী এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। প্রথম আলোচনা হ'ল: ভারতীয় দর্শনের পুনর্গঠনের কোন প্রয়োজন আছে কি না? অমলনীরের অধ্যাপক মালকানি, বোম্বাইয়ের অধ্যাপক চার, তিরুপতির অধ্যাপক কে. সি বরদাচারী ও বাঙলা দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রীর যুক্তিপূর্ণ ভাষণের কথা শ্রোতাদের বহুদিন স্মরণে থাকবে। সভাপতি ডক্টর দাসের কালোচিত নির্দ্দেশনা উপভোগ্য হয়েছিল। যখন আলোচনা জমে উঠেছে, উভয়পক্ষই আপন আপন যুক্তিজাল বিস্তার করে চলেছেন ভারতীয় দর্শনের পুনর্গঠনের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে, তর্ক-বিতর্কের সেই তুমুল কোলাহলে সভাপতি ডক্টর দাস উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন যে, ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র মায়াবাদী শঙ্করের দর্শন নয়, অথবা জড়বাদী চার্ব্বাক পন্থীদের দর্শনও নয়। কাজে কাজেই ভারতীয় দর্শনকে কোন একটি প্রান্তিক দার্শনিক মতবাদের সমার্থক হিসেবে গ্রহণ করে তার পুনর্গঠন দাবী করা যুক্তিযুক্ত নয়। উপরন্তু 'পুনর্গঠন' কথাটিও অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। তার সুসংহত অর্থ নেই। কাজে কাজেই পুনর্গঠনের ধরণধারণটাও সুপরিস্ফুট হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় আলোচনা সভাটিতে সভাপতিত্ব করলেন অধ্যাপক কবীর। আলোচ্য বিষয় ছিল: 'সামাজিক বিপ্লবের দর্শন-পটভূমি।' মূল আলোচক খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মনীষী ডক্টর ডি. এম. দত্ত তাঁর আলোচনায় যে পাণ্ডিত্য ও মনীষার পরিচয় দিলেন তা এযুগে বড় একটা চোখে পড়ে না। তাঁর আলোচনার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তাঁর বাচনভঙ্গীও তেমনি শান্ত ও নিরাসক্ত। অধ্যাপক কৃপালনী ছিলেন এই সভায় অন্যতম বক্তা। তাঁর লিখিত ভাষণ ও স্বচ্ছতার প্রসাদগুণে সমুজ্জ্বল। বৃহস্পতিবার, ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৬-৩০ মিনিটে ইটালীর প্রখ্যাত অধ্যাপক ফ্রাঙ্কো লম্বার্দি বক্তৃতা করলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল: 'হেগেলোত্তর সমাজদর্শন ও দর্শন-চিন্তা।' যে প্রত্যাশা নিয়ে অধ্যাপকপ্রবরের বক্তৃতা শোনার জন্য গিয়েছিলাম, তা পূর্ণ হ'ল না। জনৈক বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধি অধ্যাপক লম্বার্দিকে মার্ক্সীয় জড়বাদী দর্শনের ক্ষেত্রে হেগেলীয় আপেক্ষিক দ্বন্দ্ববাদের অবতারণার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। লম্বার্দি এই প্রশ্নের উত্তরে যা বলেন তা একান্তই শিক্ষানবীশের

কথা। বিশেষজ্ঞের মননশীলতার উৎকর্ষের স্বাক্ষর সেখানে ছিল না। তবে এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাঁর ইংরাজী ভাষায় অধিকার প্রশংসার যোগ্য। এই আলোচনার সূত্রে আলাপ হ'ল নয়াদিল্লীস্থিত জার্মান দূতাবাসের কৃষ্টি বিভাগীয় প্রধান সচিব ডক্টর ফাউটারের সঙ্গে। তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য আমাদের মুগ্ধ করেছিল। আলোচনা সভার বাইরে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বসে এই বিদেশীটির মুখ থেকে যে সুনিপুণ সূক্ষ্ম আলোচনা শুনেছিলাম হেগেলীয় মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদের ওপর তা সহজে ভোলবার নয়। ডাঃ ফাউটার ছাড়াও রাশিয়াগত পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমেরিকান প্রতিনিধিটিও আমাদের আকৃষ্ট করেছিলেন। এঁরা সব এসেছিলেন দেশ-বিদেশ থেকে ভারতীয় দর্শন চিন্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করার জন্য। ভারতীয় দার্শনিকেরা কি বলেন, তাঁদের চিন্তাধারা কোন্ পথে বহমান, এ তত্ত্ব জানবার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আজ যে আগ্রহ দেখা দিয়েছে, এটা খুবই আশার কথা। আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই জাতির প্রাণশক্তির পরীক্ষা হয়। ভারতের চিন্তানায়কদের আজ দেবার সময় এসেছে। গত দু'শত বছর ধরে আমরা কেবল 'আদান' কার্যটি সুষ্ঠুরূপে সমাধা করেছি। আজ 'প্রদানের' সময় এসেছে। মনে রাখতে হবে বাঙালী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সেই ভবিষ্যৎবাণী : এখনও আমাদের কিছু দেবার আছে। সে দেওয়া চিন্তার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, সাধনার ক্ষেত্রে সত্য হোক। নতুন ভারতবর্ষের সেই সাধনা, সেই প্রচেষ্টার প্রস্তুতি বুঝি দেখে এলাম সাগরোর্মিবিধৌত নারিকেল কুঞ্জ বেষ্টিত দক্ষিণ দেশের এক নিভৃত উপনগরীতে।

অধিবেশনের শেষ দিন, ২২শে ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিদের জন্য প্রমোদভ্রমণের বন্দোবস্ত করেছিলেন। এ ত প্রমোদভ্রমণ হ'ল না, এ হ'ল তীর্থযাত্রা। এ যুগের মহাসাধক শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য সাধনক্ষেত্র পণ্ডিচেরী আশ্রমে তীর্থযাত্রা। আশ্রমের ডক্টর ইন্দ্র সেন কংগ্রেসের অন্যতম অধিনেতা। তিনি হলেন আমাদের যাত্রাপথের কাণ্ডারী। বেলা একটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে যাত্রা করার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গদিমোড়া সুদৃশ্য মোটর বাস এসে দাঁড়াল রাণী অম্বিদেবী ছাত্রাবাসের সামনে। দেশী বিদেশী প্রতিনিধিরা একে একে উঠে বসলেন। যাত্রা সুরু হ'ল। আসা-যাওয়ার পথের ধারে দু'চোখ ভরে দেখে নিলাম দক্ষিণ দেশের গ্রামীণ সৌন্দর্য্য। দূরে দূরে বহু দূরে বালুময় মাটির আস্তরণকে ঢেকে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি কাজু বাদামের গাছ; চিকন পাতা তার মেলে দিয়েছে তপ্ত মধ্যাহ্নের আলস্যে। বায়ুহিল্লোলে উপচে পড়া খুশির আমেজ। দূরে কাছে কোথাও বা সবুজ ধানের বাহার। চাষী কোথাও তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে তার ভবিষ্যৎ দিনের স্বর্ণসম্ভারের দিকে। কোথাও বা দেখলাম 'কলসী মাথায় ধরা' গ্রামের মেয়েকে। নিকষকৃষ্ণ কালো চোখে জিজ্ঞাসার বিদ্যুৎ চমকে উঠল। আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল সে অবাক বিস্ময়ে। গাড়ীর ভিতরে গানে, গল্পে, হাস্যপরিহাসে মনোরম পরিবেশ রচিত হয়েছিল। তরুণ দার্শনিক ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে সকলের প্রশংসা পেলেন। সিংহলের ড. সরকারের স্ত্রী শ্রীযুক্তা সরকার ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. রায়ের কন্যা কুমারী রায়ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। তাঁদের কাছেও আমরা সকলে ঋণী। অধ্যাপক লম্বার্কির গাওয়া ইটালীয়ান সঙ্গীত খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। এমনি করে আমরা এসে পৌঁছলাম প্রধান আশ্রমে, যেখানে মহাপুরুষ অরবিন্দ মহানিদ্রায় শায়িত। আশ্রমের শ্রীচারুপদ ভট্টাচার্য্য একান্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাদের আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগ দেখালেন—ড. ইন্দ্র সেনের সৌজন্য ও চারুবাবুর হৃদ্যতা ভোলবার নয়। তাঁদের আনুকূল্যে যে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ড. ইন্দ্র সেন আমাদের নিয়ে গেলেন শ্রীঅরবিন্দের নশ্বর দেহের সমাধি বেদীমূলে। আমরা সকলে নত-মস্তকে এই মহামানবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। মন অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। একটি নমস্কারে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে উজাড় করে দিয়ে মনে মনে বলেছিলাম সেদিন :

'হে মহাজীবন, হে মহামরণ
লইনু শরণ, লইনু শরণ।'

শরণার্থী এ যুগের মানুষ যুগাচার্য্যকে এই প্রার্থনা বার বার জানিয়েছে। সে প্রার্থনা সেদিন আর একবার উচ্চারিত হ'ল পূর্ব্ব দেশের আর একটি মানুষের সমগ্র চেতনায়।

হৃদযন্ত্রের সূচীক্রিয়া

আর্নস্ট ওয়েস

অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

[Pocket Book of German Stories and Tales, Pocket Book Inc, N. Y. হইতে সংগৃহীত।

লেখকের জন্ম ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, মোরাভিয়ায়। তিনি চিকিৎসক হিসাবে প্রথমে শেট-বিভাগে, পরে বার্লিন এবং ১৯৩৩-এর পর প্রাগে গিয়া ব্যবসা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে প্যারিসে পলাইতে হয়। তিনি ইহুদী। ১৯৪০-এর মে মাসে যেদিন জার্মান সৈন্য প্যারিসে প্রবেশ করে, ইনি নিজের স্নান-টবে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন।]

ফ্রায়েডরিক ফন বি—ডাক্তারি পড়ছে। মাথায় বাদামী চুল, গড়নটি ছিপছিপে। উঁচুদরের সার্জারির দিকেই ঝোঁক বেশী। তাই বলে আর কোন দিকে অনুরাগ থাকবে না এমন কথা নেই; হিল্ডেগার্ডের এক তরুণী বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ছিল এতদিন, যদিও সম্পর্কটা আপাততঃ ঠিক আগের মত নেই।

ডিসেম্বরের গোড়ায় ফ্রায়েডরিক গেহাইরাট ও-র সার্জিক্যাল বিভাগে অবৈতনিক সহকারীর কাজ পেল। সার্জেনটির ভারিক্কি চেহারা আর মিলিটারী চালচলন দেখে ছাত্রেরা তাঁর নাম দিয়েছিল জেনারেল, ফ্রায়েডরিকের বাপ আর এই অধ্যাপকটি একই ধর্মসম্প্রদায়ের বলেই বোধ হয় তার পক্ষে এই পদ পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরে গোড়ার দিকে পিতৃবন্ধু তার দিকে তেমন নজর দিতেন না। তবু সামান্য হলেও সে অনেক অপরিহার্য্য ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দিয়েছে। যেমন সংজ্ঞাহীন করা, ঘা ধোয়া, কিংবা ছোটখাটো অস্ত্রোপচার। কাজ না থাকলেও সে দাঁড়িয়ে থেকেছে আদেশের অপেক্ষায়। আবার লেকচারের সময়—পৌনে ন'টা থেকে এগারোটার মধ্যে বিষয় অনুসারে 'কেস' এনে হাজির করেছে সামনে।

এমনি একদিন, - সেদিন ১৭ই জানুয়ারী—অধ্যাপক দুষ্ট অর্বুদ সম্বন্ধে ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিন বা পাঁচ বছর আগে যেগুলির ওপর অস্ত্রোপচার করেছিলেন এবং আজও যেগুলি তাঁর কৃতিত্বের স্থায়ী পরিচয় বহন করছে, সেগুলোর সগর্বে উল্লেখ করলেন। এমনকি অন্যূন সাড়ে সাত বছর আগে—অর্থাৎ কলেজের শিক্ষকতা গ্রহণ এবং শহরে সার্জেন হিসাবে ব্যবসা আরম্ভ করার আগে—যে রোগীকে তিনি নিরাময় করেছিলেন তার কথাও উত্থাপন করে তিনি বললেন, সে আজও অন্যান্যদের মত সুস্থ এবং এ পর্যান্ত আর কোন নতুন উপসর্গও দেখা যায় নি। সব ক'টি অস্ত্রোপচারই গুরুতর রকমের ছিল। তবে তাঁর মতে স্থায়ী উপকার সম্ভব হয়েছে শল্যচিকিৎসায় নিপুণতায় আর রোগ নির্মূলীকরণের দ্রুত ব্যবস্থায়।

পুরনো রোগীদের চিঠি লিখে ক্লিনিকে ডাকা হয়েছিল। মফস্বলে রোগীদের রাহাখরচও পাঠানো হয়েছে। তারা এখন ওদিকের ওয়ার্ড আর এপাশের লেকচার-রুমের মাঝের গলিপথে একটি বেঞ্চির ওপর বসে। পাঁচ জন পুরুষ, তিন জন নারী। চার জন এই শহরের লোক, বাদবাকি এসেছে বাইরে থেকে। প্রধান সহকারী সাবধান করে গিয়েছিলেন, তারা যেন পরস্পরের মধ্যে রোগের আলোচনা না করে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক থেকে তারা এ ছাড়া আর কোন আলাপের বিষয় খুঁজে পায় নি। কয়েকজন ইতিমধ্যে জামা তুলে নিজের নিজের অস্ত্রচিহ্ন দেখিয়েছে, অন্যেরা জামার ওপর থেকেই ইঙ্গিতে সামান্য অতিরঞ্জন করে, ক্ষতচিহ্নের দৈর্ঘ্য দেখিয়ে দিলে। অতঃপর তাড়াতাড়ি পরিচ্ছদ সম্বৃত করে এবার তারা গর্বভরে ছাত্রটির সঙ্গে এসে দাঁড়াল অডিটোরিয়ামে। একটি মহিলা তাড়াতাড়িতে দস্তানার ভিতর হাত ঢুকাতে পারেন নি বলে ঘেমে উঠলেন।

জেনারেল শল্যচিকিৎসার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তিনি এই রোগীদের সঙ্গে তাদের তুলনা করলেন যারা একই রোগে বহুদিন আগে শীতল মৃত্তিকায় আশ্রয় নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এক ভগ্নদেহ প্রৌঢ়ার দুই কাঁধে নিজের বিশাল দুটি হাত রেখে পুতুলের মত তাকে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতে লাগলেন। সহসা তাকে ছেড়ে দিয়ে জেনারেল এবার ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর অস্ত্রোপচারের ছবি এঁকে দেখালেন ছাত্রদের। ডান হাতে খড়িমাটির ডেলা, বাঁ হাতে সহকারীর দেওয়া প্রয়োজনীয় তথ্যের বিবরণী। অতঃপর নিখুঁত ভাষায় অস্ত্রোপচার রীতির উন্নততর বিভিন্ন কলাকৌশল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে সমালোচনা করে প্রত্যেকটি রীতির গুণাগুণ এবং নির্ভুল পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ রীতির আরোগ্য-ক্ষমতারও একটা হিসাব দিলেন। কিন্তু যে আট জনকে নিয়ে আলোচনার

সূত্রপাত তারা যে তখনও অডিটোরিয়ামে—প্রয়োজনবোধে অপারেটিং-রুম হিসাবেও ব্যবহৃত হয় এটি—দাঁড়িয়ে, তাদের কথা একেবারেই ভুলে গেলেন অধ্যাপক। তিনি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে শল্য-চিকিৎসার আলোচনা করে যাচ্ছেন এমন সময়ে এক সহকারী অধ্যাপকই ভিতরে ছুটে এসে তাঁর কানে কানে কিছু বলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সার্জেনের মুখ উত্তেজনায় সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠল। কৈশোরের কতকগুলো ক্ষতচিহ্ন ছিল মুখে, সেগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে 'চেরি'র মত লাল হয়ে উঠেছে। গভীর উদ্বেগে ললাট কুঞ্চিত। এক অবসরে সহকারী আট জন রোগীকেই মুরগী-তাড়ানের মত করে হলের বাইরে খেদিয়ে নিয়ে গেলেন।

অধ্যাপক প্রায় সেই মুহূর্তে নিজের ব্যবহার্য জলাধারের দিকে এগিয়ে, সেকেণ্ডের ওপরকার সময় নির্দেশক আওয়ার-গ্লাসটিকে উল্টে দিলেন। দশ মিনিট ধরে বাদামী বালুকণা ঝরবে। সেই সময়টুকুই তাঁর হাত ধোয়া এবং নিজের নির্বীজীকরণের জন্যে নির্দিষ্ট। ছাত্রটি এসে জেনারেলকে অস্ত্রোপচারের পোশাক পরিয়ে দিতে লাগল। জেনারেল পর্যায়ক্রমে হাত ধুচ্ছেন আর কথা বলে যাচ্ছেন। সেই ফাঁকে প্রকাণ্ড একটি বাদামী-রঙের জলনিরোধক এপ্রন পিতলের শিকল দিয়ে তাঁর চওড়া ঘাড়ের ওপর বেঁধে দেওয়া হ'ল। ঘাড়ের রংও লাল। মুখ না তুলেই তিনি কালো রবারের গাম-বুটের ভিতর পা ঠেলে দিলেন। মুহূর্তের ব্যবধানে কলেজের অধ্যাপক যেন আর এক মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর ভাবভঙ্গী, এমনকি তাঁর দৃষ্টি পর্যন্ত বদলে গেছে। কড়া ব্রুরুশ দিয়ে নখ, হাতের দু'পিঠ আর কনুই পর্যন্ত দুই বাহু রগড়ে ধুচ্ছেন। সক্রিয় সাবান-আধারে পায়ের চাপ দিতেই দুই বাহু তরল সাবানের ফেনায় ভরে উঠল। ফেনা ধুয়ে ফেলতে একবার করে হাতের চামড়ার লাল রং ফুটে বেরুচ্ছে। আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তা ফেনার ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাঁর দেখাদেখি সহ-কারীও তাই করতে লাগল।

জেনারেল এবার মুখ ঘুরিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, "ভালই হ'ল। খুব সুখের না হলেও এ এক অভূতপূর্ব যোগাযোগ। হাসপাতালের কাছেই আত্মহত্যার চেষ্টা। এক কুমারী যুবতী, হার্টের ভেতর কলমের নিব বসিয়ে দিয়েছে। হার্ট সেলাই করতে হবে বলেই অনুমান করছি। অস্ত্রোপচারের কৌশলটি আধুনিক, কিন্তু আঘাতের অস্ত্রটি একেবারে সেকেলে—একটি পুরনো-চালের কলমে সাধারণ একটি লোহার নিব। অফিসে কাজ করে মেয়েটি। একটু আশার কথা, নিবটা নাকি এখনও আটকে আছে, তাই আর রক্তপাতে মারা যায় নি। কিন্তু এমন একটি আদিম-কালের যন্ত্র দিয়ে হার্ট ফোঁড়ায় বাহাদুরি আছে বটে! তবে যে কৌশলটি এখন আপনাদের—ওপরের সারিতে যাঁরা আছেন তাঁরাও শুনুন, আপনাদের প্রত্যেককেই স্থির হয়ে বসতে অনুরোধ করছি, এ সব ক্ষেত্রে ধুলো বড় সাংঘাতিক, অযথা বিপদ ডেকে আনে। হাঁ, যা বলছিলাম, যে রীতিটা আপনাদের দেখাতে যাই সেটি একেবারে নতুন এবং ফ্রাঙ্ক-ফার্টের স্বর্গত অধ্যাপক 'রেণ'-এর বহু অসমসাহসিক কীর্তির একটি।"

"ডাঃ ই—, আপনিই যথারীতি প্রথম সহকারী হবেন, ডাঃ গ্লাইকার দ্বিতীয়, আর তৃতীয় পদ নেবেন ডাঃ শিলার-লিং। এনিসথেসিয়া দেবেন এই যুবকটি—আপনাদেরই সহকর্মী—ভালই দিতে দেখেছি এঁকে। এসব ক্ষেত্রে 'অবেদন' পদার্থটিও ভাল হওয়া চাই। মনে রাখবেন, 'হাইপার-প্রেসার এনিসথেসিয়া', কেননা ব্যাপারটা ঘটেছে বুকের ভেতর।"

"আগেই বলেছি আজ ক'বছর থেকে হার্টের এ ধরনের আঘাতে আমরা আর অসহায় বলে মনে করি না। রেণ-পদ্ধতিতে এখন ফোঁড়-খাওয়া হার্ট, উপায় থাকলে এমনকি গুলি-বেঁধা হার্টও আক্রমণ করতে সক্ষম আমরা। সত্যি বলতে কি, জীবিত অবস্থায় আমাদের টেবিলের ওপর এলে ও ধরনের যে-কোন জখমই সামলাতে পারি। সময়ে অস্ত্রোপচার করতে পারলে পাঁচ জনের ভেতর তিন জনই বেঁচে যাবে। ভাবছি, আজ যদি অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ সারাজেভোয় হার্টে জখম পেয়ে—যাক গে, সে করুণ ইতিহাস না তুললেই ভাল।...হেড নার্স, সোডিয়াম ক্লোরাইড সলুশন গরম করে নাও, এডরেন্যালিন তৈরি রাখ, ১ঃ১০০০ ভাগ, হ্যাঁ। আমি বলতে চাইছিলাম সব রকমের আঘাতেরই প্রতিকার আছে আমাদের হাতে, কেবল ঘাতকের বিরুদ্ধেই কোন ব্যবস্থা সম্ভব হয় নি। আমরা জখম জুড়ে দিই, কিন্তু মর্মাঘাতটুকু মুছতে পারি কি? এনিথেসিস্ট নাড়ী দেখবেন। রিব—ডায়ালেটার আনতে ভুলবেন না—প্রকৃতপক্ষে হাড়ের সব অস্ত্রগুলোই চাই।"

"এসব ক্ষেত্রে নিদান নিয়ে হাঙ্গামা নেই। রোগী পাবার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচার করতে হবে। সবকিছুই নির্ভর করে ক্ষিপ্রতার ওপর। আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা নয়—কৈ, আমাদের রোগীটি কোথায়? সোজা ভেতরে নিয়ে আসুন, আদব কায়দা কিংবা 'লাল-ফিতে'র হাঙ্গামা নিষ্প্রয়োজন রোগীর মত না নিয়েও অপারেশন করি আমি, রোগীর জ্ঞান থাকে নাকি এ অবস্থায়? আর তার আত্মীয়স্বজন—তারাই বা কতটুকু বোঝে ভাল-মন্দের? ও সব প্রশ্নই ওঠে না এ

ক্ষেত্রে। হাতে পেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ুন। তাই বলে নির্বীজী-করণের কোন গাফিলতি চলবে না, কাউকে জিজ্ঞেস করবার নেই, এর যা বাঁধা নিয়ম, তা অবশ্যই পালন করা চাই। স্মরণ রাখতে হবে আমরা দেহের কোমলতম অংশে অস্ত্রোপ-চার করছি। বক্ষগহ্বর আর হৃদাবরক ঝিল্লি, এতে সহজেই পুঁজ এসে যায়।—এই যে, মেয়েটি এসে গেছে! চলে এস, সাবধানে—আস্তে।"

সেই ঢ্যাঙা ছাত্রটি, মাথায় বাদামী চুল, কিছুটা কবি-স্বভাব—ফ্রায়েডরিক ফন বি—আবার সেই হিল্ডেগার্ডির তরুণীটকে দেখলে। একদিন যে তার হৃদয়ের এতখানি অধিকার করেছিল, সেই আজ আত্মঘাতিনী হয়েছে!

কয়েকটি বিজন্মি-চুল্লীতে যন্ত্রপাতি শোধন চলছে। কতকগুলি ছোট কেৎলি থেকে ঘন বাষ্পের মেঘ অপারেশন থিয়েটারে ভেসে বেড়াচ্ছে। দুপুরবেলাতেও ঘরখানি আঁধার বলে মনে হচ্ছে।

জেনারেল হাঁক দিলেন—আলো।

অমনি ছাদের নীচে সারিবদ্ধ বাতিগুলো ফস্‌ফস্‌ করে জ্বলে উঠল। ছায়াশূন্য স্বচ্ছ শ্বেত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অপারেশন টেবিল, অধ্যাপক আর তার সহকারিগণ। অডিটোরিয়ামের শেষ সারি পর্যন্ত আলোকিত হয়ে গেছে। দেয়াল-ঘড়ির অস্পষ্ট কাচের ভিতর দিয়ে দেখা গেল এগারোটা বেজে মাত্র দু' মিনিট। জেনারেল নির্বাক। কোথাও কোন শব্দ নেই। কেবল ফুটন্ত জলের সোঁ সোঁ, গরম জলের ভিতর ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতির ধাতব টুং-টাং আর উপস্থিত ছাত্রবৃন্দের শ্বাসপ্রশ্বাসের চাপা শব্দ কানে আসছে।

মেয়েটি চাপা গলায় কাৎরে উঠল একবার, কিন্তু চেঁচালে না। মনে হয় বুকের সামান্যতম আন্দোলনেও আঘাত পাচ্ছে সে, তাই শ্বাস চেপে রাখবার চেষ্টা করছে। তাদের সামনে নীচের দিকে ছাত্রেরা ছাদের আলোয় উদ্ভাসিত মেয়েটির মুখ দেখতে পেল। মাথার গাঢ় বাদামী চুলগুলি ভিজে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সিক্ত অধরের অনেকখানি ওষ্ঠে ঢাকা; চোখের পাণ্ডুর পল্লব দুটি চেপে বন্ধ করে রেখেছে। অনেক কষ্টে একবার চোখ তুলবার চেষ্টা করতে পাতা দুটি কেঁপে উঠল, মণি দুটো অস্থির ভাবে নড়ে উঠল এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। দেহের উর্দ্ধাংশের পরিচ্ছদ আগেই কেটে ফেলে সুতির পাতলা জালের পর্দায় ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পর্দার একাংশ একটি তীক্ষ্ণ বিন্দুর ওপর উঁচু হয়ে আছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিন্দুটিও ওঠানামা করছে।

চারিদিক থমথম করছে। জেনারেল আর তার সহ-কারীরা ব্রাশ দিয়ে হাত ধুয়ে নীরবে মেয়েটির দিকে চেয়ে আছেন। প্রায় মধ্যরাত্রির স্তব্ধ নীরবতা। ফুটন্ত জলের শব্দ, শোধক-পাত্রের বগবগানি, বাতিগুলোর একটানা কান্না আর প্রতি শ্বাস চলাচলে তরুণীর চাপা গোঙানি, এ ছাড়া আর কিছুই কানে আসে না।

জেনারেল হেড নার্সকে সঙ্কেত করলেন। মহিলা অতি সন্তর্পণে—যাতে মেয়েটির সামান্যতম আঘাত না লাগে এমন ভাবে, শোধিত ফরসেপস দিয়ে জালের পর্দাটি সরিয়ে দিলেন। তরুণীর বাম বক্ষের নীচে সেই কলমটি দেখা গেল। প্রতি হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠছে সেটি। আপনিই একবার করে দেবে যাচ্ছে ভিতরে; আবার বেরিয়ে আসছে ওপরে, এত সূক্ষ্ম তার কম্পন, বুঝি সামান্য একটু চুলের আঘাতও মাপা যায় তার ডগায়।

"সবচেয়ে বড় কথা"—জেনারেল ভাজা চিংড়ির মত লাল বাহু দুটো আর একবার আরও জোরে ব্রাশ দিয়ে রগড়ে বললেন, "সবচেয়ে আশার কথা মেয়েটি এখনও জ্ঞান হারায় নি। কেবল 'শক' ছাড়া, খুবই স্বাভাবিক এক্ষেত্রে। আর, —না রক্তক্ষরণও নেই, বাইরের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। ...সামান্য থাকাই সম্ভব।"

জেনারেল তাঁর পেশীবহুল পালিশ-লোহার মত চকচকে হাত তুলে ফ্রায়েডরিক ফন বিকে রোগিণীর কাছে আসতে ইশারা করলেন।

'ঠিক আছে। এনিসথেসিয়া চালিয়ে যাও।"

ছাত্রটি ইতস্ততঃ করতে লাগল। আতঙ্কে তার সারা দেহ কাঁপছে। প্রতিটি স্নায়ুর সঙ্গে যুদ্ধ করে সে কোনমতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। হাইপার-প্রেসার এনিসথেসিয়ার জন্যে বিশেষ একটি যন্ত্রের প্রয়োজন, সেটি আগেই সেখানে উপস্থিত রাখা উচিত ছিল। সামান্য মেরামতের জন্যে সেটিকে আর এক ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সবাই যখন মুহূর্ত গুনছে ঠিক সেই সময়েই যন্ত্রটিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কারু সাহস হচ্ছে না জেনা-রেলকে জানায় সে কথা।

নার্সেরা তাড়াতাড়ি নিকেল-প্লেটকরা বড় বড় ড্রামের ভিতর থেকে কোট, টুপী, তোয়ালে, রবারের দস্তানা আর ড্রেসিং টেনে বার করল। দু'জনে ধরে সাদা চৌকোণ এক খণ্ড চাদর বিছিয়ে দিলে তরুণীর পিঠের তলায়। হেড নার্স অতি সন্তর্পণে মেয়েটিকে তুলে ধরলে। কোমরের নীচের অংশে আর একখানি চাদর ঢেকে দেওয়া হ'ল, কেবল দেহের উত্তমাংশ খোলা থাকবে। রোগিণীর মুখ প্রতি মুহূর্তে ক্রমে ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। হাত দুটি নীচের দিকে বাঁধা, জানুর ওপর দিয়ে চওড়া ফিতে টানা।

আওয়ার-গ্লাসে ন' মিনিট শেষ হয়ে গেছে। ফুটন্ত জল

থেকে যন্ত্রগুলো নামিয়ে আনা হ'ল। মেঘপ্রমাণ বাষ্প উঠছে। হেড নার্স চাকাওয়ালা ছোট টেবিলের ওপর নিপুণ হাতে হিসেবমত যন্ত্রপাতি সাজিয়ে দিলে। একই প্রকারের যন্ত্র কাছাকাছি রইল। বড়গুলো ডাইনে, ছোটগুলো বাঁয়ে। কাঁচি, সোজা-বাঁকা চার আংটার হুক,বোন ফরসেপস, ক্ল্যাম্প ছোট চিমটে, সূচাধার, সোজা বা কাস্তের আকারের সূচের কৌটা, নানা প্রকারের লাটিমে জড়ানো রেশম বা ক্যাট-গাটের তন্তু। ওপরের গ্লাস থেকে সব বাষ্প ঝরে গেল। ফ্রায়েডরিক অসহায় ভাবে ঘরের চারিদিকে চাইল, এনিস-থেসিয়া যন্ত্রটি তখনও এসে পৌঁছয় নি। সহসা জলের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

"আইয়োডিন"—সার্জ্জেন আবার হাঁকলেন।

প্রায় শেষ মুহূর্তে যন্ত্রটি গড়িয়ে এল ভিতরে। জটিল যন্ত্র একটি। লাল নল-লাগানো আধারে অক্সিজেন—নীল নলওয়ালা আধারে আছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। অবেদক-গ্যাসটি এসে মিশছে সবুজ নলে। শ্বাসক্রিয়া নিরোধের জন্য আছে চকচকে একটি প্রেসার গেজ আর তরল পদার্থে ভরা স্বচ্ছ কাচের সিলিণ্ডার।

সার্জ্জেনকে যখন তাঁর সাদা কোট, টুপি এবং মুখোশ পরান হচ্ছিল, ছাত্রটি তখন লাগাচ্ছে রবারের মুখোশটি অল্পে অল্পে মেয়েটির মুখের ওপর চেপে ধরেছে। বাতাসে মিশে অচেতনকারী দ্রবের মুক্তার মত বড় বড় বুদ্বুদ স্বচ্ছ একটি কাচের নলের ভিতর দিয়ে নেমে যেতে লাগল। ছাত্রটি প্রায় শব্দহীন কণ্ঠে বললে, "জোরে দম নাও, জোরে।"

মেয়েটি নীরবে মাথা নাড়ালে, কিন্তু দৃঢ় ভাবে। ক্ষীণ চেষ্টায় যতটা পারলে মুখের কাছ থেকে মাস্কটিকে ঠেলে দিলে। মাস্কটি তাও মুখের সঙ্গেই লেগে রইল। মেয়েটির পাংশুটে মুখ এবার যেন বিকৃত হয়ে উঠল। সে মুখ ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে। মুখও খুলেছিল, বোধ হয় চেঁচাত, কিংবা গালমন্দ করত। কিন্তু তবু রক্তহীন সেই ফ্যাকাশে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আর কোন শব্দ বার হ'ল না।

রবারের দস্তানা পরতে পরতে জেনারেল পুনরায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "আইয়োডিন!"

পুরু চওড়া একখণ্ড গজের সাহায্যে অস্ত্রোপচারের সমস্ত জায়গায়, দুই স্তনে গলা পর্যন্ত ওপরে, আর নাভি পর্যন্ত নীচে, তামাটে রঙের ছোপ পড়ল। ছোপ দেওয়া চামড়ার ঠিক মাঝখানে তখনও সেই কলমটা ঝেঁকে ঝেঁকে উঠছে। তবে এখন অনেক ক্লান্ত, দ্রুত নিস্তেজ। হৃদযন্ত্রটি অসহায় ভাবে কাঁপছে থর থর করে, শক্তি নিঃশেষিতপ্রায়। শ্বাস-প্রশ্বাস এতক্ষণ স্পষ্ট ছিল, কিন্তু এবার যেন গভীর হয়ে আসছে। বিস্ফারিত দুই চোখ স্পষ্ট অথচ নিরাশ দৃষ্টি নিয়ে শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জেনারেলের মুখে অদ্ভুত এক নিরুদ্বেগ চিত্তত‌ুষ্টির ভাব। মনে হয় ইতিমধ্যে তিনি অস্ত্রোপচারের শেষ খুঁটিনাটি পর্যন্ত, এমনকি সম্ভাব্য জটিলতার প্রশ্নগুলোও বিচার করে ফেলে-ছেন, বাকি শুধু আরম্ভ করা। কিন্তু মেয়েটি জেগে কেন এখনও? দেখা যাচ্ছে মেয়েটির মুখ যেন আগের চেয়েও সুন্দর হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ থেকেই কি খুঁজছিল সে, এবার বুঝি সে তার পূর্ব-দয়িতের চোখ দুটি খুঁজে পেয়েছে।

ছাত্রটি ভাবলে আর এক মুহূর্তও নষ্ট করলে চলবে না। অচেতন তাকে হতেই হবে, এখনই। কিন্তু কি বলবে, কেমন করে বোঝাবে, কি দিয়ে তার সদ্‌বুদ্ধি আসবে? এমন কি আছে যা তাকে স্মরণ করাতে পারে?

কার দোষ—মৃত্যুর দু'মিনিট আগে কে করবে তার প্রায়শ্চিত্ত? এগারোটা বেজে বারো মিনিট।

জেনারেল নাড়ীর অবস্থা জানতে চাইলেন। ফ্রায়েডরিক তরুণীর সুন্দর কোমল কণ্ঠে হাত দিয়ে খুঁজতে লাগল। কণ্ঠের প্রতিটি রেখা তার অনেক দিনের পরিচিত। অতি সন্তর্পণে, তর্জনী আর মধ্যমার সাহায্যে সে তার সিক্ত-উষ্ণ গাত্রত্বক স্পর্শ করলে।

—"ক্যারোটিডে কোন স্পন্দন নেই, কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।"

মেয়েটি তার হাতের স্পর্শ অনুভব করেছে। সে কি আজও ভালবাসে তাকে? আবার কি বাঁচতে চায় সে? অনুশোচনা জেগেছে? সে কি এখনও মাত্র ক'মিনিট আগের সেই মানুষ আছে? সহসা তার চোখের পল্লব বন্ধ হ'ল, পল্লবের দীর্ঘ রোমগুলির পরস্পরসম্মিলিত গাঢ় বাদামী রেখাটি উজ্জল দীপালোকে পীতবর্ণ বলে ভ্রম হয়। অধরোষ্ঠ উন্মুক্ত হয়ে গেল আস্তে আস্তে। ছাত্রটি এক নিমেষের জন্য মাস্ক তুলে দেখলে হালকা প্রবাল-রঙের মাড়ির ওপর জেগে আছে দুগ্ধশুভ্র দাঁতের পাটি।

দ্রুত গভীর টানে ইথারের বায়ু আকর্ষণ করে মেয়েটি তার দিকেই শ্বাস ছাড়ছে। এগারোটা বেজে তেরো মিনিট।

"ঠিক আছে?...এখুনি আরম্ভ করতে হবে আমাদের। ঘুমিয়েছে? এখনও না? তা হোক। জীবন আগে, এনিসথেসিয়া পরে। যুদ্ধ! যুদ্ধ! চালাও হাতিয়ার!... মাথা নীচু, মস্তিষ্কের রক্তশূন্যতা না আসে। বিশেষ করে শ্বাসকেন্দ্রে, মেডুলা ওবলংগেটায় রক্ত থাকা চাই। জখম থেকে রক্ত ঝরে জমে এসে পেরিকার্ডিয়ামে। হৃদ্‌পিণ্ডের

ওপর চাপ পড়ে বাইরে থেকে। আমাদের প্রতিভাবান আর্নস্ট বার্গম্যান একেই বলেছেন, 'হার্ট ট্যাম্পনেড', অর্থাৎ শ্রবণ-রোধক গুঁজি। আর একটু নীচে,...আরও, ঠিক হয়েছে। সক্রিয় বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নিঃশব্দে টেবিল নীচু করে দেওয়া হ'ল। ছাত্রটি অনুভব করলে মেয়েটির কোমল ভিজে চুলসুদ্ধ মাথাটি তার হাঁটুর ওপর এসে পড়েছে। এখনও বেঁচে আছে কি? জাগ্রত, না মৃত?

"রেডি!"

প্রথম সহকারী টলটলে এলকোহল ভরা একটি কাচের পাত্র থেকে মাছের ডানার আকারে নিকেলের একটি বাঁকা স্ক্যালপেল ছুরি তুললে, ওপর দিকে চকচকে নীল ইস্পাতের ফলা।

চিত্রকর যেভাবে তুলি ধরে জেনারেলও তেমনি করে ছুরির আগাটা চেপে ধরলেন। তার পর ডিজাইন আঁকার ভঙ্গীতে একটি বাঁকা চির দিয়ে দুই স্তনের মাঝ দিয়ে বাম স্তনের নীচের দিক ঘুরিয়ে টেনে আনলেন ছুরি। একটি হাল্কা রেখা পড়ল মাত্র, যেন কেউ বাতাস দিয়ে ত্বকের ওপর রেখাটি টেনে দিয়ে গেল। এক ফোঁটাও রক্ত নেই। সহকারীরা ত্বকের দু'প্রান্ত চিমটের সাহায্যে ওপর-নীচ দু' ধার থেকে অনেক দূর পর্যন্ত খুলে ধরলে। মেয়েটি একবার মাত্র কাৎরে উঠে নীরব হয়ে গেল। ছাত্রটি আবার ইথার প্রয়োগ করছে। ইতিমধ্যে সার্জেনের হাত থেকে ছুরিখানি কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে কেউ লক্ষ্য করে নি। এখন তাঁর ডান হাতে পর্যায়ক্রমে বড়-ছোট, তীক্ষ্ণ-স্থূল, কাটবার, সমান করবার কিংবা ছাঁটবার নানা যন্ত্র নৃত্য করছে। সার্জেন ও তাঁর সহকারীদের হাতে অতি সূক্ষ্ম দস্তানা, নখের প্রান্তগুলিও দেখা যায় তার ভিতর থেকে। অস্ত্রোপচারের জায়গায় কেবল জেনারেলের লম্বা আঙুলসমেত বিশাল একখানি হাত ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। হাতের নড়ন-চড়নে মনে হবে বুঝি ঢিলে, ভাসা-ভাসা কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিসাবে তাঁর এতটুকু ভুল হচ্ছে না। অন্য হাতগুলি দিয়ে কেউ-বা ত্বকের প্রান্ত ধরে আছে, কেউ-বা প্রয়োজনমত স্পঞ্জ অথবা যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিচ্ছে। অন্যান্য কাজে জেনারেলকে সাহায্যও করছে কেউ কেউ। জেনারেল বেশীর ভাগ কেবল চোখের ইশারা দিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ প্রয়োজন না হলে কথা বলছেন না। যেটুকু বলছেন, তাও কেবল ছাত্রদের প্রণালীটি বুঝিয়ে দেবার জন্যে।

"আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করছেন তেমন রক্তক্ষরণ নেই। ভাল লক্ষণ নয়। রক্তের চাপ অতি সামান্য। এনিসথেসিয়া সাবধান, গোঙাতে দাও, জেগে না পড়ে তার জন্যে যতটুকু দরকার, তার বেশী নয়। 'শক' এখনও কাজ করছে, সুতরাং ব্যথা পাবে না।"

"চামড়ার নীচে সামান্য বজবজে শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছিন্ন অংশ দিয়ে বাতাস বেরুচ্ছে। ঠিক এখান থেকে আমাদের একটু একটু করে হাড় বার করতে হবে, এখানে এসে পাঁজরাগুলো দুমড়ে দিতে হবে, অর্থাৎ হার্টে পৌঁছনোর একটা রাস্তা চাই। তার মানে দরকারমত দুই, তিন কিংবা চারখানি হাড় সরাতে হবে। তবে অস্থি-আবরক ঝিল্লীর কোন ক্ষতি না হয়, কেননা পরে তাদের আবার এক সঙ্গে জুড়ে যাওয়া চাই। জুড়তে দেরি লাগে না। হাত টানুন, কোন জীবাণু ভেতরে না যায়। এনিসথেসিয়া জোর করুন, নামমাত্র ইথার, প্রচুর অক্সিজেন। এইবার হবে শত্রুর সঙ্গে আমাদের শক্তি পরীক্ষা। বাইরে থেকে ফরসেপ দিয়ে চেপে রাখুন কলমটাকে, হ্যাঁ, অমনি করে। দেখুন, পিছু নিচ্ছি এবার, এই পথেই গিয়েছিল নিবটা। কালির দাগ দেখতে পাচ্ছেন? এবার ঘোরাতে হবে,—একটু বাইরের দিকে দুমড়ে দিন—ঠিক। টানুন...এবার, হাল্কা—জোরে, আরও জোরে,—হয়েছে! বেরিয়ে এসেছে! যান, ওটাকে এবার সংগ্রহালয়ে রেখে আসুন। হয় ত ভাবছেন বেকুবি!—মানুষ মরিয়া হলে হাতের কাছে যা পায় তাই ব্যবহার করে। এবার পাঁজরার ব্যবস্থা। চেয়ে দেখুন। পাঁজরার কাঁচি, হাঁ, রাখুন ওখানে—সাবধানে। প্রথমে নীচে একটি আঙুল দিন, আমি চাপ দিচ্ছি। পরেরটায় এবার। আঙুল নীচে, হাড়সুদ্ধ চামড়ার পর্দাটা সবসুদ্ধ তুলে ধরুন। খুব আস্তে, একেবারে চাপ না লাগে। এক, দুই—আর একটি। এক, দুই, ভাঁজ করে যান, চালান, চালান—সাবধান, পিছলে না যায়। পর্দাটা স্থির করে ধরুন, না হচ্ছে না। আস্তে, আরও আ—স্—তে,—বেশ!"

ছাত্র ফন. বি. মেয়েটির মুখের ওপর হাত রাখলে, শ্বাস পড়ছে কিনা বুঝতে পারা গেল না।

"মাস্ক উঠিও না। হাইপার প্রেসার ঠিক রাখা চাই। ঠিক শ্বাস নিচ্ছে, চিন্তার কারণ নেই। আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, ফুসফুস বাতাস টানছে। এনিসথেসিয়া বন্ধ কর এবার, দরকার হলে দেখা যাবে। এবার ভাল করে দেখুন। এইটে হ'ল হৃদাবরক ঝিল্লী,- পেরিকার্ডিয়াম! ...ঠিক...সামনে। ধারালো ক্ল্যাম্প! ক্ল্যাম্প! বড় একটা, ছোটও। মাঝারি নাও তুমি, হুঁশিয়ার হয়ে বাইরের দিকে ঘোরাও একটু। আর একটা—আরও একটা, চালিয়ে যাও কথা না বলে। পেরিকার্ডিয়ামের ওপর জখমটা এই যে—ধারগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া, করাতের দাঁতের মত আঁকাবাঁকা। অমনি করেই কাটতে কাটতে গেছে ভেতরে। দাগ সোজা

হবে কি করে? প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে পেরিকার্ডিয়াম কুঁচকে সরে যাচ্ছে, চোট খাবার সময়েও তাই হয়েছিল। নালিকাটা প্রোব দাও একটা, ভেতরে যাবে, বেশ খানিকটা নীচে চালাতে হবে।"

নিকেল করা ষ্টীলের আঙুলের মত একটি যন্ত্র, প্রোব। ধারগুলি লম্বা, বসাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানের রক্তাক্ত গভীর কন্দরে পিছলে ঢুকে গেল।

"ঠিক আছে। প্রোবটিকে এবার সাবধানে চেপে রাখুন। ওটির মাথার ওপর কাঁচি ধরুন, সোজা কাঁচিই সবচেয়ে ভাল। হাঁ, কিন্তু নীচের দিকে ঠেকিয়ে,—প্রোবটি যেন ঠিক কাঁচির নীচে থাকে। একটি জায়গায় কাটুন—ঠিক হয়েছে। ভাল করে একবার দেখে নেওয়া যাক। রক্তের ডেলায় ভরে আছে। ওগুলো সরাতে হবে। মুছে ফেলুন, আস্তে—পেরিকার্ডিয়ামে ঘষা না লাগে, ক্ষতি হতে পারে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবার, কিন্তু থাকছে না বেশীক্ষণ। তাড়াতাড়ি জখমটার ব্যবস্থা করতে হবে। রক্ত আসছে কোত্থেকে? বড্ড লাল যে ওখানে?—স্পঞ্জ করে নিন, মাথা তুলে, শুধু আমায় দেখতে দিন, জায়গা ছাড়ুন। স্পঞ্জ করুন—হাত দিয়ে নয়, ফরসেপ দিয়ে স্পঞ্জ করুন। হাল্কা হাতে, চট্‌পট্‌—হালকা করে বললুম যে! আলতো হাতে তাড়াতাড়ি সারতে হয়, রগড়ানো চলবে না। এবার দেখে যান শুধু, চালান। শীঘ্র অন্ধকার কেটে দিনের আলো দেখা যাবে। নাড়ী কেমন? মণিবন্ধে আছে কিছু? নেই? সোডিয়াম ক্লোরাইড সল্যুশন দিন। যতটা যায়। রক্ত পেলেই ভাল হ'ত, ব্লাড ট্রানস্‌ফ্যুশন! কিন্তু বড় সময় নেবে। প্রথমেই ব্লাড-গ্রুপ বাছতে হবে, বড্ড সময় লাগে! তার চেয়ে কনুইয়ের কাছে ক্যুবিটাল শিরায় ফিজিওলজিক্যাল সোডিয়াম ক্লোরাইড সল্যুশন দিন। যতটা নিতে পারে। রক্তের বিকল্প ব্যবস্থা। ল্যাবরেটরিতে এখানে এক ভদ্রলোক ব্লাড-গ্রুপ ঠিক করে দেন। রক্ত দেবার আছে কেউ? ডাঃ বি, আপনি একবার রক্ত দিয়েছিলেন আমাদের, আপনার ব্লাড-গ্রুপ কি? দেখতে থাকুন। ঠিক একশ' সেকেণ্ড! শান্ত!—হার্ট সামনের দিকে টেনে ধরুন। অমন করে লাফাতে থাকলে কিছুই সম্ভব হবে না। স্থির রাখতেই হবে ওটাকে, কোটরের বাইরে আনতে হবে। বাইরে বলছি, ভীতু কোথাকার! সেলাই করতে হাত পৌঁছনো চাই ত? স্থির করে ধরে রাখতেও হবে। এবার, বাঁধবার আগে ঘায়ের ধারগুলো টেনে তুলতে হবে। হ্যাঁ, ঐ সুতোতেই হবে, মিহি রেশম বাঁকা সূচ,—এই সাইজের। আমায় দিন। হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন সবাই? সুতো খুব ছোট না হয়। সূচ ধরবারটা আমায় দিন। তুমি পেরিকার্ডিয়া তুলে ধর, আপনি সুতোর গোড়াটা, ঝুলে না থাকে। দেখে যান, আমি পেরি—আর এপিকার্ডিয়ামের ঝিল্লী ফুঁড়ছি—বাঁয়ের ভেনট্রিকল, এপেক্স ভেতরে গেল। বাইরে আনছি এবার। একটা ফাঁস দিলুম—আপনি ধরুন ত এটা। আর একটা এমনি করে: দেখছেন? সূচ দিয়ে এবার হার্টের পেশী ধরেছি, এবার ফোঁড়,—ভেতরে—বাইরে। সূচ সরিয়ে দিন, সুতোর প্রান্ত দুটো এক করুন, ব্যস হয়ে গেছে। সুতো কুড়িয়ে নিন। হার্টটাকে টেনে বার করুন,—সাবধানে—কোটরের বাইরে। রক্ত ঝরছে, ঝরুক, ঝরেই থাকে। তুলে ধর, তাড়াতাড়ি—আরও ওপরে, আস্তে! আর একটু হলে বোধ হয় ভাল হ'ত! ভয় পেও না! পাশের দিকে—এমনি করে। হার্টের এ পাশটায় কিছু নেই। এদিকেও না। বেশ, এবার উলটো দিকটা। ডান দিকে একটু তুলে ধরুন ত। ধরুন—স্পঞ্জ করে ফেলুন, চাপ না লাগে। থামুন—থামুন।"

"এই যে, পাওয়া গেছে জখমটা। আঙুল দিন—আপনাকে বলছি—আঙুল দিন। ক্ষতের প্রান্ত দুটো এক করুন—খুব সন্তর্পণে। হার্টের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে ঢিল দেবেন একটু। এমনি করে—ঠিক হয়েছে। দেখতেও দিন আমাদের, বেশী চেপে নয়। হয়েছে, আচ্ছা—আচ্ছা, হয়েছে এবার। এবার হার্টের সেলাই! আগের সুতো। প্রথম ফোঁড় আড়াআড়ি, বাঁ প্রান্ত, ডান প্রান্ত—এবার ভেতর দিয়ে টেনে গাঁট দিতে হবে সুতোয়। তার পর ক্লাম্প চেপে সুতোটা দূরে ঠেলে দিন। সাজিয়ে রাখুন—এমনি করে। ওপরের পর্দা ধরেছি। ডাক্তার, সুতোটা ধরে হার্টটা আমার দিকে টেনে ধরো ত! হ'ল না—একটু ডাইনে। আর হার্টের স্পন্দনের সঙ্গে হার্টে ঢিল দিতে ভুলো না।—বেশ। আর একটা ফোঁড় দিতে হবে। আর একটু ভিতর দিয়ে। সাবধানের মার নেই। ভেতরে—বাইরে, গাঁট দিয়ে আস্তে টান দাও। দু'দিক থেকে সমান টান দেবে, তার পর লুকিয়ে দাও সুতোর প্রান্ত দুটো। রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। নাড়ী পাচ্ছেন হাতে, এখনও না?

"শ্বাস কেমন—খারাপ? চিন্তা নেই। হাত সরিয়ে নিন আপনার। এবার তৃতীয় সেলাই। হ'ল? রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। হার্টের ক্ষত জুড়ে গেছে।

কাঁচি, তিনটে সেলাইয়ের সুতোগুলিই কেটে দিন। খুব ছোট হবে না, আবার লেজ বেরিয়েও না থাকে দেখবেন। হয় নি—বেশ।"

"আর একটা সেলাই? না ওতেই হবে। ছেড়ে দিন সবার। সেলাই খুব মজবুত হয়েছে। ব্লাড-প্রেসার বাড়লে

কিংবা রক্তনালী স্বাভাবিক ভাবে ভরে উঠলেও ছেঁড়ার আশঙ্কা নেই। নাড়ী ?—আসে নি ?—আসবে, এখনই পাবেন। হার্ট বেঁচেছে যখন, মানুষও বাঁচবে। দেখতে পাচ্ছেন, এর মধ্যেই হার্টের পেশীগুলো কেমন জোর নিয়েছে ? স্পন্দন ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। বিস্তার আর আকুঞ্চন, দুই-ই স্বাভাবিক হয়ে আসছে। আগের সে কাঁপুনি কিংবা ধড়ফড়ানি আর নেই। বলতেও পারেন, চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। সে যাক, সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে যান হাতের উপশিরায়। কিন্তু দয়া করে ঐ নোংরা জিনিসটা আর আমাদের কাছে আনবেন না। হার্টের সুতোগুলি ঢিল দিন এবার। সুতোগুলি বাইরের দিকে সাজিয়ে দিন সমান করে। দেখুন, দেখুন ! তিন জোড়া বলগায় নতুন ঘোড়ার মত কেমন হেঁচকা টান দিচ্ছে, দেখছেন ! কেমন জোর বাঁধছে চোখের ওপরই দেখতে পাচ্ছেন ! চমৎকার ! নাড়ীর খবর কি ? তেমন বোঝা যাচ্ছে না ? সেও ঠিক সামলে নেব। এবার এডরেন্যালিন এগিয়ে দিন ত—একেবারে হার্টের মধ্যে ফুঁড়ে দেবে ইনজেকশান।—চমৎকার ! দিয়েছেন ?—এবার ? নাড়ী এসেছে মনে হচ্ছে ? আমারও তাই মনে হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস ?''

ছাত্রটি দেখতে পেল এনিসথেসিয়া যন্ত্রের একটি কাঁচের নলের ভিতর দিয়ে শ্বাসবায়ুর চকচকে রূপালি ধারা দ্রুততর বেগে ফুলে উঠছে।

"ঠিক চলেছে।"—ছাত্রটি বললে।

"এবার পেরিকাডিয়াম বন্ধ করতে হবে। তার জন্যে ক্যাটগাট চাই। হার্টে দিতে সাহস পাই নি। তার জন্যে রেশম বেশী নিরাপদ। তা ছাড়া হৃদাবরকের ওপর ত তেমন চাপও পড়ে না। এতেই বেশ হবে। এবার আমরা পাঁজরার হাড়গুলি বসিয়ে দেব আবার, ওপরের ঝিল্লী দু' চারটে ফোঁড় দিলেই বসে যাবে। চামড়ার নীচে কাঁচের নল দাও—এখানে, একেবারে নীচে। পেশী,—ঘায়ের ওপর ঝিল্লীর পর্দা দিয়ে বোজানো, যাকে বলে—'স্কিন সুচার'। মিহি রেশমের সুতো দিয়ে একটি দুটি ফোঁড়, ব্যস। এনিসথেসিয়ার কি করছেন ?"

"কিছুক্ষণ থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে।"

"বেশ করেছেন। এবার শুধু অক্সিজেন। ক্রমে ক্রমে সাড়ে তিন বা চার লিটার। আর সতর্কতার জন্যে কর্পূর। মাথা নীচু রাখবেন। ওয়ার্ডেও ঐ অবস্থায় থাকবে। দরকার বুঝলে ব্লাড ট্রানসফ্যুশন তখন দিলেই চলবে। 'না'র চেয়ে 'হঁ্যা' বললেই ভাল।...ব্লাড গ্রুপ কি—'এ' ? আর মিঃ ফন. বি, তোমার ?"

"আমিও 'এ' স্যর।"

"চমৎকার ! দু'জনেই মেয়েটির কাছে থাকুন। আমরা কখন আরম্ভ করেছিলাম যেন ?''

"এগারোটা বেজে বারোয়—।"

"তা হলে অপারেশনের সময় লাগল সাড়ে সাত মিনিট। একশ' বছর আগে নেপোলিয়নের নিজের সার্জেন একটি পা কাটতে ঐ সময় নিতেন, ব্লাড ষ্টিপিং প্রভৃতি সবসমেত। তবে তাঁরা ছিলেন আর এক ধরনের গুণী। সে যাক পেসেণ্টকে সাবধানে উঠিয়ে বিছানায় শোয়ান এবার, না হয়, আমি শুইয়ে দিই ? হ্যাঁ, অমনি করে।

গরম জলের বোতল তৈরি ? ঢেকে দিন এবার,...ঢাকুন। সব ঠিক ? বাকিটুকু ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিন, আচ্ছা, এবার চললুম আমি। গুডমর্নিং জেণ্টলমেন, গুড মর্নিং—।

রাজবল্লভী দেবীর মন্দির-সংলগ্ন তিনটি শিব মন্দির

রাজবলহাট

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

রাজবলহাট হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। হাওড়া ময়দান হইতে মার্টিন কোম্পানীর হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের আটপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে এই প্রাচীন স্থানটি অবস্থিত। রাজবলহাটের দূরত্ব কলিকাতা হইতে ছাব্বিশ মাইল।

রাজবলহাটের নামকরণ এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীরাজবল্লভীর নামানুসারে হইয়াছে। এই দেবী জাগ্রতা বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি। দেশদেশান্তর হইতে পুণ্যার্থী নরনারী তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার নবমীর দিন দেবীর নিকট পূজা দিবার জন্য এই স্থানে সমবেত হন।

রাজবলহাটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম; ইহার একদিকে দামোদর নদ ও অন্যদিকে রণ নদ গ্রামটিকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া আছে। প্রাচীনকালে এই স্থান ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্যতম নগরী ছিল। এ অঞ্চলের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য তৎকালে নদীপথে সুসম্পন্ন হইত। ভূরিশ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ 'বহু বণিকের বসতি'; ভূরি অর্থাৎ বহু, শ্রেষ্ঠী মানে বণিক (ভূরি+শ্রেষ্ঠী), অর্থাৎ যে স্থানে বহু বণিক বসবাস করেন। মুসলমান রাজত্বকালে ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুট একটি প্রখ্যাত পরগণা ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অধিপতি সদানন্দ রায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দামোদর ও রণ নদের মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিষ্কার করাইয়া একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় একটি বৃহৎ হাট বসান। রাজা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নগর বলিয়া এই স্থান 'রাজপুর' বলিয়া প্রখ্যাত হয়। প্রাচীনকালে হাওড়া ও হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি প্রকাণ্ড অঞ্চল জুড়িয়া এই ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য ও পরগণা অবস্থিত ছিল। 'আইন-ই-আকবরী' হইতে জানা যায় যে, সরকার সোলেমানাবাদের অন্তর্গত একত্রিশটি মহালের মধ্যে এক বসন্ধরী পরগণা ব্যতীত, ভুরশুট পরগণার রাজস্ব ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—প্রায় বিশ লক্ষ 'দাম'।

ভুরশুট রাজবংশের বসন্তপুর শাখার সম্পত্তির বিবরণে দেখা যায় যে, রাজবলহাটে সাত বিঘা ভূমির উপর রাজার গড়বাটি ছিল এবং দেবী রাজবল্লভী ঠাকুরাণীর নামে দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল পাঁচ শত বিঘা। দেবীর প্রভূত ভূসম্পত্তি অধিকাংশই প্রায় বেদখল হইয়া ছিল। অন্যায়ভাবে যাঁহারা দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছিলেন, তাহা উদ্ধার করিবার জন্য ২৬শে বৈশাখ ১৩৪৪ সালে রাজবল্লভী ষ্টেটের জিম্মাদার তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর সভাপতিত্বে মাতার সেবক ও ভক্তগণের সহযোগে 'রাজবল্লভী সেবা সমিতি' গঠিত হয়। বিশ বৎসরের চেষ্টায় সেবা সমিতি দেবোত্তর ষ্টেটের ও সেবা পূজার প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। কেবল বেদখল সম্পত্তি

উদ্ধার নয়, ধ্বংসোম্মুখ জঙ্গলাবৃত মন্দিরগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া সেবা সমিতি সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

রাজবল্লভী দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তী যাহা আছে তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি দেবী রাজবল্লভী ব্রাহ্মণ কন্যার বেশে কোন পরিবারে পরিচারিকার কার্য্য করিতেন। সেই সময় নদীপথে বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত। একদিন এই রূপবতী ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখিয়া এক বণিক তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নিজ বজরায় লইয়া আসার সঙ্কল্প করেন। সেই বণিক সপ্তডিঙা লইয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যাকে হরণ করিয়া যখন তাঁহাকে একটির পর একটি ডিঙা অতিক্রম করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন তাঁহার পদস্পর্শে এক একটি করিয়া ছয়খানি বজরা নদীগর্ভে ডুবিয়া যায়।

যখন সপ্তম ডিঙার, অর্থাৎ বণিকের নিজস্ব ডিঙায় ব্রাহ্মণকন্যাকে তোলা হইবে, সেই সময় এক দৈববাণী শুনিয়া বণিক তাঁহাকে দেবী বলিয়া জানিতে পারেন এবং তাহার কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দেবী তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিমজ্জিত তরীগুলি উঠাইয়া দেন এবং সেই স্থানে রাজবল্লভী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তিনি নির্দ্দেশ দেন।

দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এই যে, ভুরশুটের রাজা "কমলদীঘি" নামক এক পুষ্করিণী খনন করান; তাহার তীরে অবস্থিত ফুলবাগানে মালিনী রাণীর আরাধ্যা গৌরী দেবীর জন্য প্রত্যহ ফুল তুলিত। একদিন ফুল তুলিবার সময় এক ব্রাহ্মণ কন্যা আসিয়া তাহার নিকট হইতে ফুল চায়। কিন্তু মালিনী গৌরী দেবীর পূজার ফুল দিলে রাণী অসন্তুষ্ট হইবেন বলায়, ব্রাহ্মণ কন্যা বলি-লেন যে, তিনি গৌরীর বড় দিদি রাজবল্লভী, তাঁহাকে ফুল দিলে যদি রাণী রাগ করেন তাহা হইলে গৌরীকে সরাইয়া তিনি তাহার স্থানে অধিষ্ঠান করিবেন।

বালিকার কথা শুনিয়া মালিনী ভীত হইয়া চক্ষু বুজিলেন। চক্ষু খুলিয়া দেখেন যে, রাজবল্লভী দেবী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। দেবীর বর্ণ শরৎকালীন জ্যোৎস্নার ন্যায়, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একখানি ছুরিকা, এবং বামহস্তে রুধির পাত্র।

এদিকে রাজাও সেই দিন রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিলেন যে, দেবী রাজবল্লভী তাহাকে বলিতেছেন—তিনি রাজপুরে যাইতেছেন; সেখানে যেন তাঁহাকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নগরের নাম রাজবল্লভীহাট রাখা হয়।

"নিশী পোহাইলে নাম রাখ নগরীর
দেবী রাজবল্লভী আর মহা হাট
এই যুগ্মনাম রাখ রাজবল্লভী হাট।"

শ্রীশ্রী৺রাজবল্লভী মাতা

রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় পরবর্ত্তী কালে ষোড়শ শতাব্দীতে রাজ-বল্লভীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় দেবীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ বৃহৎ মূর্ত্তি সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। বিগ্রহের উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট; দেবীর বাম হস্তে রুধির পাত্র ও দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা। তাঁহার দক্ষিণ পদ মহাকাল ভৈরবের বক্ষে এবং বাম পদ বিরূপাক্ষ মহাদেবের মস্তকে রক্ষিত আছে। এইরূপ মূর্ত্তি বঙ্গদেশে আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না।

এক বার দেবীর মূর্ত্তি পুনর্গঠন করিতে হইয়াছিল, তখন কালী-ঘাট হইতে আদিগঙ্গার মাটি, গঙ্গাজল এবং কুশ; কাপড় ও তার দিয়া উহা তৈয়ারী করা হইয়াছিল। মন্দিরের মধ্যে একখানি প্রস্তরে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে :

"শ্রীশ্রী৺রাজবল্লভী মাতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা*
সন ১৩৪০, ১৬ আষাঢ়
স্বর্গীয় গৌরমোহন দত্তের পুত্র
শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত, সাং রাজবলহাট
(জেলা হুগলী)"
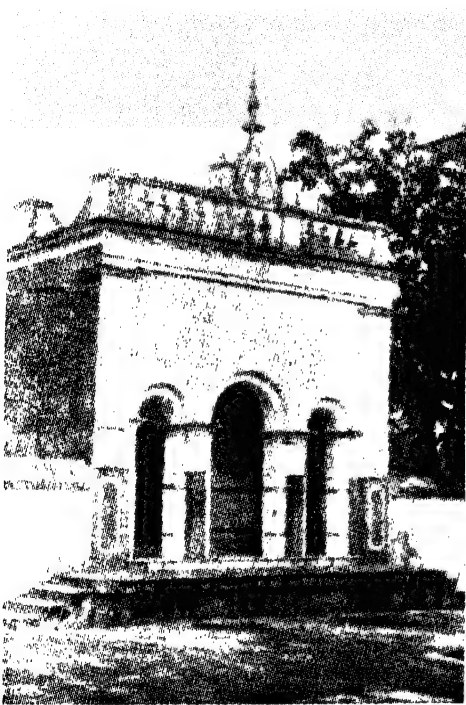
রাজবল্লভীর মন্দির

মন্দির-গাত্রে আর একখানি প্রস্তর ফলকে দেবীর বেদী শ্বেত-প্রস্তর দ্বারা "শ্রীযজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়—গোপিনাথপুর নিবাসী, ১২৭৫ সালে বাঁধাইয়া দিয়াছেন" বলিয়া লেখা আছে। এই কার্য্যের "উদ্যোগী সাহায্যকারক ছিলেন শ্রীরাম-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়"।

১৩৪০ সালের ১১ই আষাঢ় শ্রীফকিরচন্দ্র, মন্মথনাথ ও জহরলাল ভড় মন্দির ভগ্ন হইয়া যাইলে বহু অর্থ ব্যয়ে উহার আমূল সংস্কার করিয়া দেন। ১৩৪৬ সালে তাঁহারা পুনরায় মন্দিরের সম্মুখের বিরাট নাটমন্দিরটি নির্ম্মাণ এবং নহবতখানা, গড়, মায়ের পুকুরের ঘাট, মন্দির-সংলগ্ন চারিটি শিবমন্দির ও রন্ধনশালা সংস্কার করিয়া দেন। নাটমন্দির ১৬ই আষাঢ় ১৩৪৭ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন।

দেবী রাজবল্লভী চণ্ডীরই রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। 'পীঠনির্ণয়' গ্রন্থে রাজবলহাটকে শাক্তপীঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'চণ্ডী' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চণ্ডী প্রাচীনকালে অনার্য্য দেবী ছিলেন; পরে আর্য্য ও অনার্য্যের দীর্ঘ সংঘাতের ফলে তিনি লোকসমাজে পূজ্য হইয়াছেন।

মন্দিরের মধ্যে একটি বাসুদেব নারায়ণের প্রস্তরের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে; ইহার পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বামে সরস্বতী। সম্ভবতঃ অন্য কোন স্থান হইতে এই মূর্ত্তিটি সংগ্রহ করিয়া এই স্থানে সংরক্ষণ করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর অষ্টমী পূজার পূর্ব্বে সাতটি ছোট ছোট ডিঙ্গা তৈয়ার করিয়া মায়ের দীঘিতে ছয়টি ডুবাইয়া দেওয়া হয়, পরে পূজা আরম্ভ হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীটি অদ্যাপি পূজার অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহানবমীর দিন মহিষ বলিদান হয় এবং দেবীর বামদিকের দীপশিখা সেই দিন পূজার পর সোজা হইয়া যায়।

'রাজবল্লভী মাহাত্ম্য' নামক পুস্তকে দেবীর যে বর্ণনা আছে তাহা এইরূপ :

"মন্দিরে শোভিছে মাতা শ্রীরাজবল্লভী
শরৎ জ্যোৎস্না প্রভা বিশালা ভৈরবী।
বিম্বমালা গলে, ছুরি ধৃত ডান হাতে
প্রসারিত বাম হস্ত পাত্র শোভে তাতে।
রণরঙ্গিণীর মূর্ত্তি—ভীমা সুনয়না
বরাভয় প্রদায়িনী, প্রসন্ন আননা।
উজ্জল মুকুট শিরে ত্রিলোক জননী।
শিববক্ষে শব শিরে চরণ ধারিণী।"

রাজবলহাট পূর্ব্বে যে বাণিজ্যপ্রধান নগর ছিল আজও ইহার কর্ম্মমুখরতা দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। হুগলী জেলার সহস্রাধিক গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এইরূপ কর্ম্মমুখর গ্রাম দুইটি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতে তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সম্বন্ধে "Hand book of Hoogly District" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে :

"Rajbalhat—A considerable village famous for handloom cloth on the left bank of the Damoder in thana Jangipara of the Serampur subdivision."

রাজবলহাটের মধ্যে এমন কোন গ্রাম্য পথ নাই, যেখানে তাঁত বুনিবার শব্দ শোনা যায় না। এখনও আদমসুমারির ১৯৫১

* শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত ১৩৪০ সালে "রাজবল্লভী মাতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা" বলিয়া যাহা প্রস্তরে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। বিগ্রহ যথাস্থানে আছে; সুতরাং "পুনঃপ্রতিষ্ঠা" বলিতে কি বুঝায় তাহা জানিতে পারা যায় না।—লেখক

সনের তালিকা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৫২২৫ জনের মধ্যে প্রায় বার শত তাঁতে চার হাজার লোক তাঁতের কাপড় বুনিয়া কালাতিপাত করে। এক কথায় রাজবলহাটকে কুটীর-শিল্পের কেন্দ্রস্থান বলা যায়। কেহ কেহ ইহাকে 'দ্বিতীয় ম্যাঞ্চেষ্টার বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই স্থানের তাঁতীসম্প্রদায়ই যে কেবল তাঁত বুনিবার কার্য্য করে তাহা নয়, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণও এই স্থানে তাঁতের কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁতবোনা শিক্ষার্থী গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাজবল্লভীর নিকট তাঁতবোনা শিক্ষার জন্য কাপড় মানত করে ; তাই দেবী কাপড় উপহার পান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

মায়ের দীঘি

নহবৎখানা ও গড়
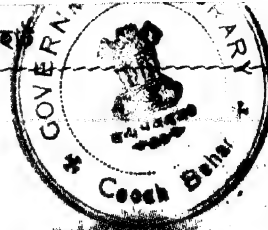
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে যখন বাংলা দেশে ব্যবসা করিতে শুরু করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের কাজের সুবিধার জন্য একজন বরিয়া বড় দালাল রাখিতেন ; তাহার তলায় আবার অনেকগুলি ছোট ছোট দালাল থাকিত। এই দালালটি ইংরেজের হইয়া এ-দেশে বিলাতী মাল কাটাইত এবং এই দেশ হইতে স্থানীয় দ্রব্য-সামগ্রী বিদেশে পাঠাইবার জন্য সংগ্রহ করিয়া দিত। প্রাচীন কাল হইতে অসংখ্য তাঁতী রাজবলহাটে বাস করিত। তাহাদের প্রস্তুত সুন্দর সুন্দর কাপড় বুধবার ও রবিবারের হাটে কেনাবেচা হইত, অনেক কাপড় দেশান্তরে গমনাগমন করিত।

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে দালালদের অত্যাচারের জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ দালালের সহায়তা না লইয়া তাহার স্থলে নিজেদের বেতনভোগী গোমস্তা রাখেন। এই সময় মহম্মদ রেজা খাঁ ইংরেজ-দের নায়েব দেওয়ান হইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়া গেল। কুশাসনের ফলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলা দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক ইহধাম পরিত্যাগ করিল। কোম্পানী রেজা খাঁকে তখন বরখাস্ত করিয়া হেষ্টিংসকে বাংলার গভর্ণর করিয়া পাঠান।

হেষ্টিংস আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। তিনি কোম্পানীর ব্যবসা চালু রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে 'কমার্সিয়াল রেসিডেন্সী' খুলিয়া দিলেন। সেই রেসিডেন্সীতে প্রধান হইয়া বসিতেন একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজবলহাটে একটি কমার্সিয়াল রেসিডেন্সী খোলা হয়। এখানে কাঁচামাল সংগ্রহান্তর নিজেদের কারখানায় চালানী বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া কলিকাতায় পাঠানো হইত। এই স্থানে বহু তাঁতী ছিল বলিয়া ইংরেজ কোম্পানীর রাজবলহাটে আড়ং বা ফ্যাক্টরী ছিল। পূর্ব্বে নীলের চাষের জন্যও এই স্থানটি বিশেষ

খ্যাতিলাভ করে। অদ্যাপি রাজবল্লভীর মন্দিরের নিকট নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রেসিডেন্সী খুলিবার পর হইতে ইংরেজ রেসিডেণ্টই রাজবলহাটের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন ; তিনি এই স্থান হইতে কর্ম্মী ও কারিগর সংগ্রহ করিয়া কাজ চালাইতেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ায় গ্রামবাসীরা কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করেন এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তজ্জন্য রাজবলহাট হইতে রেসিডেন্সী হরিপালে উঠিয়া যায়—
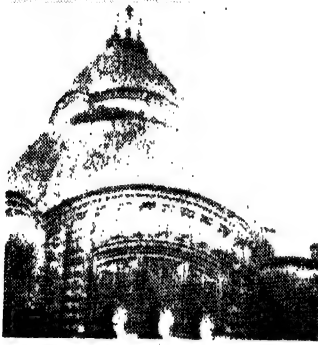
শ্রীধর দামোদরের মন্দির—রাজবলহাট

"In the early British period it was a place of importance, being selected in 1786 for the seat of a Commercial Residency. The Residency was transferred to Haripal about 1790. Rajbaulhat appears in Rennell's Atlas as a police station and the Junction of several roads." (District Handbook, Hooghly—by A. Mitra, I. C. S. p—34.

রাজবলহাটের সুবিন্যস্ত পথ ঘাট, সুরম্য ভবন, সুন্দর পুষ্করিণী ও অসংখ্য দেবালয়ের মধ্যে গ্রামের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রাম সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে :

"চার চক্, চৌদ্দ পাড়া, তিন ঘাট,
এই নিয়ে হয় রাজবলহাট।"

চার চক্ হইতেছে—দক্ষর চক্, সুখর চক্, বৃন্দাবন চক্ আর বড়র চক্ ; চৌদ্দ পাড়া—নন্দী পাড়া, দে পাড়া, মনসাতলা, শীলবাটী, ভড়পাড়া, উত্তর পাড়া, দীঘির ঘাট, কুমোর পাড়া, বাড়ুয্যে পাড়া, দাস পাড়া, কুঁড় পাড়া, নস্কর ডাঙ্গা, সানা পাড়া ও পান পাড়া ; তিন ঘাট : দীঘির ঘাট, মায়ের ঘাট ও বাবুর ঘাট।

রাজবলহাটের মধ্যে শীল পাড়ায় শীলেদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধর দামোদর মন্দির ও রাধাকান্তজীউর মন্দির ভাস্কর্য্যশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। ইটের পোড়ামাটির কারুকার্য্যখচিত অসংখ্য দেবদেবীর চিত্র মন্দিরগাত্রে শোভা পাইতেছে। "শ্রীধর দামোদর মন্দির ১৬৪৬ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত" বলিয়া একটি ফলকে উৎকীর্ণ আছে। এই মন্দির লম্বোদর শীল প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীধর দামোদর মন্দিরের মধ্যে শ্রীধর ও দামোদরের শালগ্রাম শিলা আছে। এইগুলি সুন্দর একটি সিংহাসনের মধ্যে রক্ষিত। সিংহাসনের তলায় লিখিত আছে :

"৺গোবিন্দ শীল ঐ কন্যা
ক্ষিরোদমোহিনী দাসী"

রাধাকান্তজীউর মন্দির ১৬৬৬ শকাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া একটি প্রস্তরে লিখিত আছে। ইটের পোড়া মাটির কারুকলা মন্দিরগাত্রে সর্ব্বত্র শোভা পাইতেছে। বাংলাদেশে দেবালয় স্থাপত্যের এই সকল চিত্রকলা এক অপূর্ব্ব শিল্প-নিদর্শন। সম্প্রতি এই মন্দিরটিও ফকিরচন্দ্র ভড় ও জহরলাল ভড় কর্ত্তৃক সংস্কার করা হইয়াছে দুঃখের বিষয় স্থানে স্থানে চুণকাম করিবার সময় অনেক কারুকার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে মন্দিরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। রাধাকান্তজীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে আরও অনেকগুলি দেবদেউল ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা ভগ্ন স্তূপে পরিণত হইয়াছে। রাধাকান্তদেবের রথ এই অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। মাহেশ, গুপ্তিপাড়ার পরেই এই রথের স্থান। পূর্ব্বে কাঠের রথ ছিল, বর্ত্তমানে গ্রামবাসীদের চেষ্টায় বহু অর্থব্যয়ে একটি সুন্দর লোহার রথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

রাজবলহাটে দাতব্য চিকিৎসালয়, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস আছে। দাতব্য চিকিৎসালয় ভবন গোষ্ঠবিহারী দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে থানা ছিল বলিয়া রেনেলের মানচিত্রে উল্লেখ আছে ; এই গ্রামে দৈনিক বাজার বসে এবং তাহাতে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বহু লোকের সমাগম হয় ; এইরূপ বৃহৎ বাজার এতদঞ্চলে খুব অল্প দেখা যায়।

রাজবলহাট কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মভূমি। তাঁহার জন্মস্থানে স্মৃতিরক্ষার্থে "হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার" ১৩৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজবলহাটের সংলগ্ন গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি ৬ই বৈশাখ ১২৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহের নাম রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। রাজচন্দ্রের একমাত্র কন্যা আনন্দময়ীর সহিত উত্তরপাড়ার কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। রাজচন্দ্রের অবস্থা ভাল ছিল, সুতরাং তিনি জামাতা কৈলাসচন্দ্রকে স্বগৃহে রাখিয়া পুত্রের আদরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

কৈলাসচন্দ্রের চারি পুত্র, হেমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র এবং দুই কন্যা বসন্তকালী ও নৃত্যকালী। হেমচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। হেমচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। হেমচন্দ্রের শৈশব রাজবলহাটে অতিবাহিত হইয়াছিল ; এই স্থানে পাঠশালায় নয় বৎসর পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি দাদামহাশয়ের খিদিরপুরের বাড়ীতে চলিয়া আসেন এবং সেখানে শিক্ষালাভ করেন। কর্ম্মজীবনে তিনি মুন্সেফী ও হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। হেমচন্দ্র বহু কবিতা-গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে

চিন্তাতরঙ্গিণী, বীরবাহু কাব্য, পদ্মের মৃণাল, বৃত্রসংহার, কবিতাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা তিনি বিস্তর রচনা করেন। হেমচন্দ্র ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ সালে দেহরক্ষা করেন।

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র ১৫ই মার্চ্চ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চিত্তমুকুর, বাসন্তী, যোগেশ কাব্য ও চিন্তা নামক কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। ঈশানচন্দ্র প্রথমে হুগলী কালেক্টরীতে ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার উদ্যোগে ও উৎসাহে বাঁশবেড়িয়া হইতে ১৩০০ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'পূর্ণিমা' নামে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। রাজবলহাটের এই কৃতী সন্তানের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইলে তাহা খুব আনন্দের বিষয় হইবে।

শিবমন্দির ও নাটমন্দির

রাজবলহাটের 'অমূল্য প্রত্নশালা' ১৩৪৮ সালে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রত্নশালা দক্ষিণ

হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও অমূল্য প্রত্নশালা ভবন—রাজবলহাট

রাঢ়ের ঐতিহাসিক প্রাচীন দ্রব্যাদি সংরক্ষণের একটি অমূল্য প্রতিষ্ঠান। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এই প্রত্নশালার সম্পাদক। ১৩৫৩ সালে শ্রীফকিরচন্দ্র ভড় ও শ্রীজহরলাল ভড় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নিজস্ব ভবনে অমূল্য প্রত্নশালা স্থানান্তরিত হয়। বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এই ভবনে হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একখানি প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে:

"হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার
ও
অমূল্য প্রত্নশালার জন্য
স্বর্গীয় ভূষণচন্দ্র ভড়
ও তদীয় পত্নী বাছুবিন্দু দাসীর
স্মৃতিকল্পে তদীয় পুত্রগণ
শ্রীফকিরচন্দ্র ভড়
শ্রীজহরলাল ভড়
কর্ত্তৃক এই ভবন নির্ম্মিত হইল
২১শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৩ সাল

বিদ্যাভূষণ মহাশয় রাজবলহাটের সন্তান না হইলেও এই স্থানে হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি যে সহযোগিতা করেন তাহা স্মরণ করিয়া গ্রামবাসিগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাজবলহাটে সর্ব্বত্র দিবারাত্রি তাঁতবোনার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রামে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন এক বিরাট কাপড়ের কলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। এখানকার তাঁতশিল্পই তাহাদের সকলের সচ্ছল অবস্থা আনিয়া দিয়াছে। প্রতি মাসে গড়ে চার লক্ষ টাকার তাঁতের কাপড় এই ছোট গ্রামখানি হইতে কলিকাতা ও হাওড়ায় রপ্তানি হয়।

রাজবলহাটের প্রাণ হইতেছেন শ্রীজহরলাল ভড়; যেমন সিঙ্গুরের ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। ইনি সামান্য অবস্থা হইতে ব্যবসা করিয়া যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমনই গ্রামের কল্যাণের জন্য তাঁহার সদাসর্ব্বদা চিন্তা; পথ-ঘাট নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, পুরাতন মন্দির সংস্কার, বিদ্যালয়, পোষ্ট-আপিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার, প্রত্নশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় লক্ষাধিক টাকার উপর তিনি ব্যয় করিয়াছেন। জহরলাল কলকাতায় বহু সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কেন দেশে থাকেন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি কেবল একটি উত্তর দেন, "রাজবল্লভীর মায়ায় কলিকাতায় থাকিতে পারি না।" শিক্ষিত বাঙালী গ্রামকে এইরূপ দরদ দিয়া কবে ভালবাসিতে শিখবেন?

২৬শে জানুয়ারী

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

২৬শে জানুয়ারী। বিশাল ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীর আজ বড় শুভ দিন। ভারত জুড়ে মহোৎসবের দিন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি ঃ

"পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা-গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশীষ মাগে,
গাহে তব জয় গাথা—

জনগণমন-অধিনায়ক, ভারতভাগ্য-বিধাতা, তোমার জয় হোক্—তোমার জয়েই ভারতবর্ষের জয়। আজ বিধাতার আশীর্ব্বাদ শ্রাবণের ধারার মত ভারতের জনগণের শিরে বর্ষিত হোক্। স্বাধীন ভারত আজ সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করছে। হে জনগণ-মঙ্গলদায়ক, জনগণ-ঐক্যবিধায়ক, জনগণ-পথপরিচায়ক-দুঃখত্রাতা, তোমার জয় হোক—আজ আসমুদ্র হিমাচলে তোমার জয় বিঘোষিত হোক্—তোমার করুণারুণরাগরঞ্জিত হয়ে ভারত আজ জাগ্রত—শুভ ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের জয়যাত্রা সূচিত করছে। জয়যাত্রা ঐক্যের পথে, কর্ম্মের পথে, বিশ্বমানবের সমাজে শান্তির নীড় রচনার পথে। জাগ্রত ভগবান্—আজ আমাদের কোটি মৌন-কণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান—ভারতবর্ষের বাণী আজ যেন সত্যের পথে সার্থক হবার শক্তি পায়। হে সঙ্কটদুঃখত্রাতা, আজ ভারতবর্ষের সকল সঙ্কট দূর করে তার পথযাত্রা সার্থক কর।

২৬শে জানুয়ারী বহু বৎসর ধরে কংগ্রেসের নির্দ্দেশে স্বাধীনতা-দিবস বলে পালিত হয়েছে। স্বাধীনতা তখন অর্জ্জিত হয় নি। মহাত্মা গান্ধীর সার্থক নেতৃত্বে তখন ভারত জুড়ে স্বাধীনতা-অর্জ্জনের বিপুল প্রয়াস জেগে উঠেছে। সেই প্রয়াসকে সংযত ও সংহত করবার জন্যে, এক লক্ষ্যাভিমুখী করে জাতির দেহে নিয়ত বলসঞ্চার করবার জন্যে, জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভেদবিভেদ ঘুচিয়ে, শহর ও গ্রামের বিপুল ব্যবধান ভেঙে দিয়ে, অস্পৃশ্যতা দূর করে, সাম্প্রদায়িক কলহের নিরসন করে, পল্লীশিল্পের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা সাত লক্ষ পল্লীর দারিদ্র্য মোচন করে, যারা উপেক্ষিত, অনুন্নত ও অত্যাচারিত তাদের কোলে টেনে নিয়ে গ্লানি মোচন করে, সত্য ও অহিংসার নূতন পথে স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার জন্যে এই ২৬শে জানুয়ারীর শুভ দিনে ভারতের গ্রামে নগরে লক্ষ লক্ষ কেন্দ্রে স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য পঠিত ও স্বীকৃত হ'ত। আজ স্বাধীনতা অর্জ্জিত হবার পর আট বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। স্বাধীনতা-দিবস, আজ প্রজাতন্ত্র-দিবসের অপূর্ব্ব নবরূপ পেয়ে সার্থক হয়েছে। ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষ নবীন হবার তপস্যা গ্রহণ করেছে। পরাধীনতার জীর্ণ জরা আজ সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার মত বিলীন হয়ে গেছে। আজও আবার নূতন করে সঙ্কল্প গ্রহণের দিন। কিসের সঙ্কল্প ? সেই নবীন হবার সঙ্কল্প। এত দিন সঙ্কল্প ছিল স্বাধীনতা অর্জ্জনের—আজ স্বাধীন ভারতে সেই সঙ্কল্প হবে স্বরাজ গঠনের। প্রজাতন্ত্র দিবসে আজ শ্রদ্ধানত হৃদয়ে স্মরণ করি সেই সব স্বাদেশিকদের যাঁরা স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য আপন তনুমনধন, সকল শক্তি নিয়োগ করে সর্ব্বধন্য হয়ে গেছেন। আজ স্মরণ করি ঋষি বঙ্কিমকে যিনি দেশমাতৃকার পূজার মন্ত্র দিয়েছেন—বন্দে মাতরম্। আসমুদ্র হিমাচল এই মন্ত্র গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। আজ স্মরণ করি বীর সন্ন্যাসী বিপ্লবী বিবেকানন্দকে। আজ স্মরণ করি অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথকে—স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি তাঁরা—সনাতন ভারতবর্ষ তাঁদের ধ্যানে ও তাঁদের কণ্ঠে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। আজ স্মরণ করি ক্ষুদিরাম-কানাই-লালকে যাঁরা বাঙালীর বলিদানের পালা সুরু করে ভারতের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচনার পথ খুলে গেছেন—

"হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে শেষ পূজা পূজিয়াছ তাঁরে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ!"

আজ স্মরণ করি সেই অগ্নিযুগের বীরগোষ্ঠীকে যাঁরা জীবন দিয়ে দেশকে জাগিয়ে গেছেন। আজ স্মরণ করি দাদাভাই নৌরজী ও গোপালকৃষ্ণ গোখেলকে, বজ্রকণ্ঠ সুরেন্দ্রনাথকে, লোকমান্য তিলককে, লালা লাজপৎ রায় ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে যাঁদের নেতৃত্বে নিষ্ফল নিবীর্য্য বহুধা বিভক্ত এই দেশ শক্তি ও ঐক্যের পথ খুঁজে পেয়েছে। আজ স্মরণ করি আমাদের বাংলার চির আদরের নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে। সর্ব্বোপরি স্মরণ করি জাতির জনক মহামানব মহাত্মা গান্ধীকে, আর স্মরণ করি সেই সব শত শত সহস্র সহস্র দেশকর্ম্মীদের যাঁরা নীরবে আপন কর্ম্ম সমাপন করে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন। ২৬শে জানুয়ারী জাতির

অভ্যুদয়ের দিন। এই দিনে সব স্বর্গতদের স্মরণ করাই হ'ল নব যুগের নব আভ্যুদয়িক।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট। তাই নব্যভারতে স্বাধীনতা দিবস আজ ১৫ই আগষ্ট। তার পর ১৯৫০ সনে ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষিত হ'ল। তাই আগেকার স্বাধীনতা-দিবস ২৬শে জানুয়ারী আজ সাধারণতন্ত্র-দিবসের নবগৌরবে মণ্ডিত। স্বাধীনতালাভের পর নবরাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান রচনার পালা। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি ৩২ মাস অর্থাৎ আড়াই বৎসরের অধিককাল ধরে, বৈঠকে দিনের পর দিন সম্যক্ আলোচনা করে, এই সংবিধান বা গঠনতন্ত্র রচনা করেন। এঁদের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন, বহু ত্যাগী দেশসেবক ও দেশনায়ক ছিলেন; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান সম্বন্ধে খুব ভাল করে জেনে বুঝে, তার যে সকল ভাল ভাল সিদ্ধান্ত আমাদের দেশের পক্ষে ভাল করে খাটে, সেই সকল গ্রহণ করে, তাদের একত্র গ্রথিত করে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হ'ল। সংবিধানে জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য ও অধিকার কি তা অতি সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে: ভারত সরকারের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা কি, বিভিন্ন প্রদেশ সরকারের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা কি, ভারত সরকারের সহিত ও পরস্পরের সহিত তাদের সম্পর্ক কি, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অপর প্রধানদের কর্ত্তব্য কি—এই সকল ব্যাপার সংবিধানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্থির করা হয়। ভারতবাসীর মৌলিক অধিকারের কয়েকটা কথা আজিকার শুভ দিনে স্মরণ করা ভাল। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র নিম্নলিখিত মত কার্য্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ—

"ভারতের প্রত্যেক অধিবাসী যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ন্যায়ানুগত ব্যবহার পায়, চিন্তা, কথা, বিশ্বাস, ধর্ম্মমত ও উপাসনার ব্যাপারে প্রত্যেকের যাতে স্বাধীনতা থাকে, প্রত্যেকে যাতে তুল্য সামাজিক মর্য্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করা।"

"ব্যক্তির মানমর্য্যাদা ও জাতির ঐক্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করে অধিবাসিগণের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিকাশে সহায় হওয়া।"

ভারতবর্ষে ছয় কোটি লোক সমাজে অস্পৃশ্য পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। সংবিধানে অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে যারা সমাজে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত ও অবহেলিত ছিল, তারা আজ সংবিধান অনুযায়ী উচ্চবর্ণের যে-কোন নরনারীর সমান মর্য্যাদা লাভ করেছে। এই সকল অধিকার হতে হরিজনদের কেহ বঞ্চিত করলে আজ আইন অনুযায়ী তাকে দণ্ডনীয় হতে হবে। আজ আইনের চোখে স্বাধীন ভারতে সকলেই সমান। হরিজন, আদিবাসী বলে কেহ ব্রাহ্মণ বা উচ্চশিক্ষিতের অপেক্ষা নীচে নয়। আজ বর্ণ, ধর্ম্ম, জাতি, নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী সকলেই সংবিধান অনুযায়ী সম-অধিকারসম্পন্ন। কথা বলবার, আলোচনা করবার, লিখে মত প্রকাশ করবার, দেশে বিভিন্ন স্থানে ইচ্ছামত বাস করবার, ব্যবসাবাণিজ্য করবার অধিকার সকলের সমান—কেবল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করবার জন্য এই অধিকার আইন অনুযায়ী কখনও কিছু খর্ব্ব করা যেতে পারে। দেশে যে সম্প্রদায় সংখ্যালঘু, সংবিধান অনুযায়ী তারা আপন ধর্ম্ম পালন, ভাষা ও কৃষ্টি রক্ষা করবার পূর্ণ অধিকার পেয়েছে। এখন এই সকল অধিকার অনুযায়ী মানুষ যদি আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করে চলে, তবেই রাষ্ট্রের বিকাশ ক্রমেই বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

আজ সংবিধান অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিগণ জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। যে লোক ভাল এবং যোগ্য, যে লোক জনগণের প্রকৃত হিতসাধন করতে পারবে, তাকে নির্ব্বাচন করার হাত এখন সম্পূর্ণ জনগণের। তাই জনগণকে আজ বুঝতে হবে তাদের প্রকৃত হিত কি? তা হলে তাদের কেউ বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

স্বাধীনতালাভ করে স্বরাজ গঠনের পথ এইরূপে দেশে খুলে গেছে। স্বরাজ গঠন তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন দেশের প্রত্যেক লোকের খেয়ে-পরে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকবার, লেখাপড়া শেখবার, রোগে চিকিৎসা ও আর্থিক সচ্ছলতার সুব্যবস্থা হবে। দেশে তাই একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর আর একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, নদীনালা উদ্ধার, সেচের ব্যবস্থা, কৃষির উন্নতি, প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা, হাসপাতাল নির্ম্মাণ, সর্ব্বত্র এই সব কাজের সাড়া পড়ে গেছে এবং কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। ভূমিসংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। সাধু বিনোবাজী আজ ভূদান ও সর্ব্বোদয়ের বাণী নিয়ে ভারত পরিক্রমা করছেন। সকলের অভ্যুদয়ই আজ আমাদের মূলমন্ত্র।

আজ ২৬শে জানুয়ারীর শুভ দিনে এই সকল কথা স্মরণ করে আমরা প্রত্যেকে যেন আমাদের দেশ ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের সঙ্কল্প গ্রহণ করি।*

---

* ২৬-১-৫৬ তারিখে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত এবং রেডিও-কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

মেয়েরা কাঠের ব্লকের সাহায্যে কাপড়ে ছাপার কাজ করিতেছেন

বিহারীলাল কলেজ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

এক এক করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্রগুলি আসিতে লাগিল। কোনটি লাল, কোনটি কালো আবার কোনটি বা সবুজ কালিতে ছাপা, ছোট বড় নানা আকারের কার্ডের উপরে হরেক রকমের ছাপার অক্ষরগুলি যেন ঝলমল করিয়া উঠিল। প্রতিদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-তিনটি উৎসবের দুই-তিনখানি কার্ড আসিয়া হাজির হইতেছে, কখনও বা সেই হুজুকে একই উৎসবের যে দুই-তিনখানি করিয়া কার্ড না আসিতেছে এমন নহে। সকলের শেষে আসিল বিহারীলাল কলেজের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবের কার্ডখানি। স্থির করিয়া ফেলিলাম, ২২শে তারিখের এই উৎসবটিতেই আমি যোগদান করিব।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আলিপুর অঞ্চলে গিয়া হাজির হইলাম। তখনও হাতে যথেষ্ট সময় ছিল। প্রবেশপথে উপনীত হইতে প্রথমেই চোখে পড়িল মিস্ত্রিদের সিঁড়ি লাগাইয়া তখনও কলেজের ছাত্রীরা প্রায় ১০ ফুট উঁচুতে প্রবেশপথের তোরণটিকে মণ্ডিত করিতেছেন। লাল কাগজের উপর আলপনা অঙ্কিত করিয়া উহা দ্বারাই তাঁহারা প্রবেশপথটিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছিলেন। যথাযথ ভাবে যোগদান না করিলেও শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য মণ্ডপ ও প্রবেশপথগুলির সজ্জা যে চোখে পড়ে নাই তাহা নহে। কিন্তু কোনখানেই কোনও রকম বৈচিত্র্য বা রুচির বৈশিষ্ট্য আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই বরঞ্চ সজ্জার গতানুগতিকতায় ও পেশাদারী ছাপে মন বার বার ব্যথিত হইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে। কলেজের কাজে, কলেজের গৃহসজ্জায় মেয়েদের এতখানি তন্ময়তা ও একাগ্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

উঁহাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিয়া আমি এক পাশ দিয়াই আগাইয়া চলিলাম। লাল সুরকী ঢালা প্রায় ২০০ শত ফুট দীর্ঘ একটি পথ। সেই পথের দু'ধারে প্রায় কলেজের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত সার করিয়া মেয়েরা হলুদ রঙের নিশানা উড়াইয়া দিয়াছেন। উহারই মধ্য দিয়া আমি মণ্ডপের দিকে চলিলাম। সেখানেও দেখিলাম বেদীর উপরে প্রায় আঠার ফুট উঁচুতে চারি শত বর্গফুটের চাঁদোয়াখানিও মেয়েদের কল্যাণহস্তের স্পর্শে শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মাত্র তাহাই নহে, উভয় পার্শ্বের কুড়ি ফুট দীর্ঘ দেওয়াল দুইখানিও আলিম্পন সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। ভাবিতে লাগিলাম যে সকল মেয়ে এতখানি পরিশ্রমে লিপ্ত হইতে পারে তাহাদের পক্ষে হয়ত পুরা একটি মণ্ডপ তৈয়ারী করিয়া ফেলাও তেমন কিছু অসম্ভব নয়। নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণাগুলি বদলাইতে লাগিল। আমি ও আমার একটি বাল্যবন্ধু মণ্ডপের দক্ষিণ পার্শ্বের দুইখানি আসন দখল করিয়া বসিলাম। অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার আর বিশেষ বিলম্ব ছিল না—হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে একটি স্নেহাভিজ্ঞ

শুনিতে পাইলাম—পাশেই এক ভদ্রলোক যেন কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন, 'এই কলেজে মেয়েরা বাহির হইতে পান কিনিয়া আনিয়া কি ভাবে কাগজে মুড়িয়া দিতে হইবে উহাই শিক্ষালাভ করিবে আর কিছুই শিখিবে না।' কিছু জবাব দিবার উদ্দেশ্যে পিছন দিকে ফিরিলাম কিন্তু তখনই কানে ভাসিয়া আসিল মেয়েদের স্বরচিত গানের দুটি কথা 'বিহারীলাল তোমায় স্মরণ করি।' সুন্দর পরিচ্ছন্ন সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম। ড. জে. সি. ঘোষ বাংলার শিশুদের কথা, বাংলার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'পশ্চিম বাংলায় ঠিক এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানেরই প্রয়োজন ছিল। এই প্রতিষ্ঠান হইতে মেয়েরা যথাযথ শিক্ষালাভ করিয়া সমাজ উন্নয়নের কাজেও সহযোগিতা করিতে পারিবে। মেয়েদের শিক্ষার একটি বিশিষ্ট দিক বহুদিন হইতেই অবহেলিত হইয়া আসিতেছিল—সেই অভাব, নূতন ধারায় শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া এই প্রতিষ্ঠান পূরণ করিবে।'

সভাশেষে বিহারীলাল কলেজের নূতন বাড়ীটির মধ্যে সকলেই প্রবেশ করিলাম। ঢুকিতে প্রথমেই চোখে পড়িল, স্বর্গত রায়-বাহাদুর বিহারীলাল মিত্রের একখানি বৃহৎ প্রতিকৃতিতে ফুল, মালা ও চন্দন অর্পণ করিয়া মেয়েরা, তাঁহাদের একান্ত কল্যাণকামীর মৃত-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। উহারই সামনে একখণ্ড কালো পাথরের গায়ে শাদা আল্পিনের ছবি যেন পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক হইয়া দেখা দিয়াছে। ঘরের দেওয়ালগুলি সমস্ত শিক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ের নক্সায় ও তারি ফাঁকে ফাঁকে গাছের ডালপালা ও লতাপাতায় সজ্জিত হইয়াছে। দেওয়ালের শাদার উপর প্রকৃতির সবুজ ও তারই মাঝে মাঝে নানান ছবিযুক্ত কালো লেখার নক্সা—সমস্ত মিলিয়া একটি মনোরম আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রায় প্রতি ঘরেই মেয়েরা প্রীতি-মিলনের ছোটখাট আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানেও তাঁহাদের সহজ আদান-প্রদান, দেওয়া-নেওয়ার সুনিয়ন্ত্রিত সুন্দর ব্যবস্থার মধ্য দিয়া একটি গভীর আন্তরিকতার ছাপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, এবং সেই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছিল, কলেজ গঠনের এই বিরাট পরিকল্পনার কাজে, জনসাধারণের নিকট সহানুভূতিসূচক সহযোগিতার জন্য তাঁহাদের বিনীত আহ্বান।

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার বিহারীলালের প্রতিকৃতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম—সত্যই ত, এই মহান্ দাতার কথা বাংলাদেশের মেয়েরা চিরদিনই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করিবে। ১৯৩৩ সনে ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, এমনই একটি দিনে অন্তিম-শয্যায় শয়ন করিয়াও যিনি বাংলাদেশের মেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতির কথা ভাবিয়া বারে বারে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলেন, আজ সেই বাংলাদেশের মেয়েদেরই শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে এই বিশেষ ধরনের কলেজটি সেই মহান প্রাণ ও নামের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইল। মেয়েদের এই কলেজ পরিকল্পনাটি এই মহান দাতার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিশোধ্য ঋণ ও কৃতজ্ঞতার অম্লান স্মারক হইয়া রহিল।

১৯৩৩ সনে রোগ-শয্যায় শুইয়া শুইয়াই রায়বাহাদুর দানপত্রে স্বাক্ষর করিলেন, প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার জমিদারীর স্বত্ব হইতে ৪৮০০০৲ টাকা করিয়া পাইবে এবং এই অর্থ বাংলার মেয়েদের শিক্ষার বিস্তার বা উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিহারীলাল মিত্র

জন্ম : ১৬ই এপ্রিল ১৮৫৯, মৃত্যু : ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুরূপ প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হইয়া রায়-বাহাদুর অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ১৯৩৭ সনে এই দানের তহবিল হইতেই বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্তা জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয় পর্যালোচনা করিবার জন্য প্রথম বিহারীলাল মিত্র ফেলো নিযুক্ত করিলেন। তখন ভারত অবিভক্ত এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে আসীন। ১৯৩৮ সনেই বিশ্ব-বিদ্যালয় মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ক প্রায় ৩০০ শত পৃষ্ঠা সম্বলিত বিহারীলাল ফেলোর রিপোর্টখানি প্রকাশিত করিলেন। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানে বাংলাদেশে মেয়েদের একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার বিষয় ঐ রিপোর্টে প্রথম উল্লিখিত হয়। ১৯৪৪ সনে উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় বিহারীলালের দানের তহবিল হইতেই বর্তমানে হ্যারিসন রোডে অবস্থিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিহারীলাল মিত্র ইন্‌স্টিটিউট, অর্থাৎ গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানে

বিহারীলাল কলেজের নবনির্ম্মিত ভবনের দ্বারপ্রান্তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত সহ প্রাক্তন উপাচার্য্য ড. শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

মেয়েদের এই শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতেই আজ পর্য্যন্ত প্রায় ১২ বৎসর যাবৎ এই বিভাগটি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বহু প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়াও শিক্ষক-শিক্ষণের কাজে নীরবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই বিভাগেই শিক্ষাপ্রাপ্তা প্রায় ৩০০ শতেরও অধিক শিক্ষিকা আজ বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাহিরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও অন্যান্য সমাজ উন্নয়নমূলক কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। এই বিভাগে শিশুর মনস্তত্ত্ব, স্কুল গঠন ও পরিচালন হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিশুর পুষ্টি ও খাদ্যতত্ত্ব, বিভিন্ন গৃহ-শিল্প ও সজ্জা, গৃহ-শুশ্রূষা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত বিষয়বস্তুগুলিই পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত।

নূতন স্থাপিত বিহারীলাল কলেজটিকে এই বিভাগেরই সম্প্রসারণ বলা যাইতে পারে। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের শিক্ষা এতদিন পর্য্যন্ত কেবলমাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বা কলেজে গৃহ-বিজ্ঞান বা তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলির কোনও স্থান ছিল না। অথচ দেখা যায়, শতকরা প্রায় ৯৮ জন ছেলেমেয়েরাই উহাদের নিজস্ব গৃহ বা সংসার রচনা করিয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ২টি বিপরীত প্রকৃতির মানুষের একত্র হইয়া নীড় রচনা করা ও সেই নীড়ে ভবিষ্যৎ সমাজের উপযোগী করিয়া ভবিষ্যৎ মানুষ গড়িয়া তোলা—জীবনের এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যও এইদিক হইতে কিছুমাত্র শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, এ কথা আমাদের দেশে কদাচিৎ অনুভূত হয় মাত্র। যে দেশে মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অজ্ঞতা অশিক্ষা ও কুসংস্কারে যে দেশ অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, যে দেশের মানুষ পুষ্টির অপর্য্যাপ্ততায় বা স্বাস্থ্যের অভাবে ক্রমেই ম্লান নিষ্প্রভ ও মৃতের সামিল হইয়া উঠিতেছে—সে দেশের মানুষেরাই খাদ্যতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব কিংবা সুস্থ গৃহ-রচনায় শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্দিহান! তাঁহাদের নিকট গৃহ-বিজ্ঞানের জ্ঞান 'কলাই ডালের বড়ি তৈয়ারি করা কিংবা মাছের শুক্তানি রন্ধন করার' তথা ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গৃহ-বিজ্ঞান শিশুর শিক্ষা ও পালন, মাতৃত্বের জ্ঞান, খাদ্যতত্ত্ব ও পুষ্টি প্রভৃতি বিষয়গুলি লইয়া আজ গবেষণার অন্ত নাই। যাহাতে জাতি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও গৃহ-সম্পদে আরও সুন্দর ও উন্নততর হইয়া উঠিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও ছেলেমেয়ে উভয়েই এই বিষয়গুলি লইয়া গভীর চর্চ্চা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে আজও লোকে প্রশ্ন করে এই বিষয়গুলির আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা!

বিগত কয়েক বৎসরের প্রচেষ্টার পর, ১৯৫৪ সনে গৃহ-বিজ্ঞান ও গৃহ-শিল্প, সমাজ-বিজ্ঞান, শিশুর শিক্ষা ও পালন প্রভৃতি বিষয়গুলি মেয়েদের জন্য কলেজের পাঠ্য-তালিকায় সন্নিবেশিত হইল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই প্রবেশিকা পরীক্ষায় গৃহ-বিজ্ঞানের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। গৃহ-বিজ্ঞানে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগটি তাঁহারই আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সনে ড. জে. সি. ঘোষ গৃহ-বিজ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কলেজের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিলেন ও ও উহার চর্চ্চার জন্য বিহারীলাল কলেজের পরিকল্পনাটিকে গ্রহণ করিলেন। ১৯৫৫ সনের ১লা আগষ্ট শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন—সেই দিনই বাংলার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিহারীলাল কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিলেন। শ্রীযুত সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ বিহারীলাল কলেজকে পূর্ণতর রূপদানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন।

ইহাই হইল বিহারীলাল কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বসিয়া বসিয়া উহাই চিন্তা করিতেছিলাম—কলেজ ভবনটির নির্ম্মাণকার্য্য হয়ত সমাপ্ত হইল, কিন্তু কলেজ গঠনের কাজ আরম্ভ হইল মাত্র, চূণ সুরকি ঢালিয়া ইটের উপরে ইট সাজাইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়ত সহজ, কিন্তু যথাযথ মাল মশলা যোগাইয়া নূতন সমাজের উপযোগী মন ও মানুষ তৈরী করা একান্ত কঠিন।

আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বিহারীলাল কলেজের প্রথম উদ্দেশ্য, যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষিকা তৈয়ারী করা। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী যদি উপযুক্ত হন তাহা হইলে শিক্ষার মান আপনা হইতেই উন্নততর ও প্রশস্ততর হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে প্রতিনিয়তই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। বিহারীলাল কলেজের উদ্দেশ্য, মেয়েদের জন্য সেইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা যাহাতে মেয়েরা এই সামাজিক বিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, প্রতিনিয়তই উহার নূতন নূতন চাহিদা মিটাইয়া চলিতে পারেন। ছোট ছোট জন্ম

লইয়াই সমাজ, এই ঘরগুলিকে গড়িয়া তুলিবার, এবং জাতির সম্পদ, আমাদের শিশুদের ভবিষ্যতের মানুষ করিয়া তৈয়ারী করার গুরুদায়িত্ব আমাদের মেয়েদের উপরেই ন্যস্ত। সুতরাং নূতন পৃথিবীর নূতন চাহিদার উপযোগী করিয়া আমাদের মেয়েদের তৈয়ারী করিতে হইলে উহাদের মানসিক ও প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য্যের প্রতি উহাদের সুপ্ত অনুভূতি এবং এই দুইটি গুরুদায়িত্বের বিষয় সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিতে হয়।

কলেজের দ্বারোদঘাটন উৎসবে মেয়েদের দ্বারা সুসজ্জিত প্রবেশ-পথ

বস্তুতঃ এই দিক হইতে চিন্তা করিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ আজ সমস্ত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ব্যাপকভাবে গৃহ-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে যথেষ্ট উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাবও একান্ত ভাবে অনুভূত হইতেছে। ১৯৩৩ সনের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলিয়াছেন, "পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সহিত শিক্ষার যদি আরও গভীরতর যোগ সাধন করিতে চাও, শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে আজ যে দুরতিক্রম্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে উহা যদি দূর করিতে চাও, মেয়েদের দিয়া যদি উহাদের পারিবারিক ও সমাজ-জীবনের গুরুদায়িত্বগুলি সুষ্ঠু ভাবে পালন করাইতে চাও—তাহা হইলে আরও ব্যাপক ও উন্নততর উপায়ে গৃহ-বিজ্ঞানে শিক্ষার ব্যবস্থা কর।" কলেজী শিক্ষায় গৃহ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের নূতন সন্নিবেশিত বিষয়বস্তুগুলি ও সেই সঙ্গে বিহারীলাল কলেজের পরিকল্পনাটি দেখিয়া মনে হয়, শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার যে যে

মঞ্চের পিছন দিককার দেয়ালের নক্সাটি মেয়েরা যথাযথভাবে রঙ করিয়া জুড়িয়া দিতেছেন
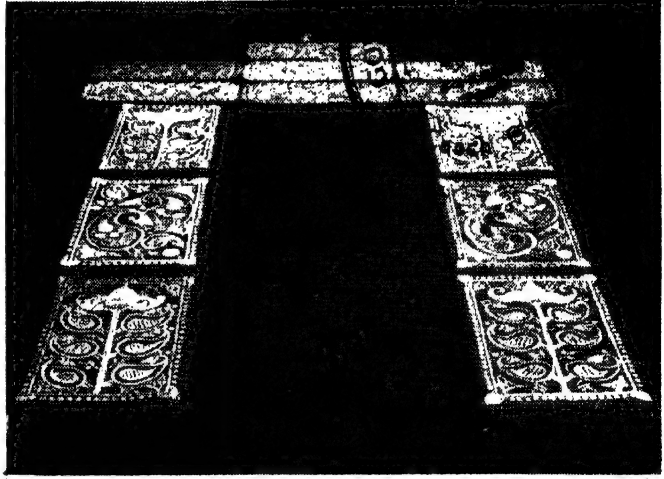
ত্রুটিগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথাযথ ভাবে চালু হইলে এই কলেজ সেই ত্রুটিগুলি দূর করিবার কাজে অনেকখানি সহায়তা করিবে।

বিহারীলাল কলেজের পাঠ্যকাল আপাততঃ সর্ব্বসমেত পাঁচ বৎসর। প্রথম চার বৎসর মেয়েরা যথারীতি ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে। কেবলমাত্র তফাৎ এই, এই কলেজে পড়িতে হইলে ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত আবশ্যিক বিষয়গুলি ঠিক রাখিয়া উহাদের পাঠের অন্যান্য বিশেষ বিষয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন প্রবর্ত্তিত গৃহ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়বস্তু হইতে নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। ডিগ্রী কোর্স সমাপ্ত করিবার পর যাঁহারা গৃহ-বিজ্ঞান বা সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন পঞ্চম বা শেষের বৎসরটি তাঁহারা বিহারীলাল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে অতিবাহিত করিবেন। বিহারীলাল কলেজের এই বিভাগটিতে স্নাতকোত্তর টিচার্স ডিপ্লোমা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বহু আলোচিত তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুমোদিত হয় তাহা হইলে বিহারীলাল কলেজের চার বৎসরের ডিগ্রী কোর্সও যথাক্রমে তিন বৎসরে রূপান্তরিত হইবে।

গৃহ, গৃহ-কর্ম্ম, গৃহের অধিবাসীদিগের প্রতি পারস্পরিক সম্বন্ধ, পরিবারের প্রতিদিনের জীবন ও জীবনধারায় যাহাতে সুরুচি ও সৌন্দর্য্যানুভূতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিহারীলাল কলেজে গৃহকলা বা শিল্পশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ও পরিচালনার প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিবার উদ্দেশ্যেই শিশুর শিক্ষা বিষয়টি পাঠ্যতালিকায় স্থানলাভ করিয়াছে। ব্যক্তিগত ও পারি-

রচিত নক্সাটি মঞ্চের চাঁদোয়ার কাপড়ের সহিত মেয়েরা সেলাই করিয়া দিতেছেন

বস্তুতঃ নূতন গৃহ-রচনার মাধ্যমে নূতন মন ও মানুষ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই আজ বিহারীলাল কলেজ স্থাপিত হইল। ঘুরিতে ঘুরিতে এক জায়গায় দেখিলাম, বিহারীলাল কলেজের আর্থিক প্রয়োজনের দিকটাও ছাত্রীরা চার্টের মাধ্যমেই জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই কলেজটি যে ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে, উহাতে রূপ দিতে হইলে জমির দাম ব্যতীত এককালীন ৮,৫৩,০০০ টাকার প্রয়োজন। তন্মধ্যে বাড়ী তৈয়ারী বাবদে ভারত সরকার ৩,৮৮,৬০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কাজেই আরও ৪,৬৪,০০০ টাকার মত ঘাটতি থাকে। জমির দাম বাবদে তিন লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিহারীলালের দানের তহবিল হইতে দিয়াছেন। গৃহ ও সমাজ-বিজ্ঞানে এই ধরনের কলেজ কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলায়ই যে এই প্রথম তাহা নহে। বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম অঞ্চলেও এই ধরনের কলেজ এখনও স্থাপিত হয় নাই।

বাস্তিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা এবং জাতির শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই খাদ্যপ্রস্তুতি ও পুষ্টি প্রভৃতি গৃহ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি পাঠ্য-সূচীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দেশ ও জাতিকে গড়িবার উদ্দেশ্যেই সেই একই দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজ-বিজ্ঞানেও, সমাজ সেবা, সমাজের সুস্থতা ও গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়গুলি ডিগ্রী কোর্সে নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা করিয়া নূতন প্রতিষ্ঠিত বিহারীলাল কলেজ যে, কেবলমাত্র গৃহ-বিজ্ঞানে অধিক সংখ্যক ও উপযুক্ত শিক্ষিকা তৈয়ারী করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির চাহিদা মিটাইবে তাহা নহে। বরং যাঁহারা শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করিবেন না তাঁহারাও চার বৎসর ধরিয়া উপরের বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিয়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নাগরিক হিসাবে তাঁহাদের গুরু দায়িত্বগুলি অধিকতর দক্ষতার সহিত পালন করিতে সমর্থ হইবেন। পশ্চিম-বাংলার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সেই দিন বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে কি সামাজিক, কি কৃষ্টিগত, কি অর্থনৈতিক জীবনে আমাদের অগ্রসর হইবার পথে প্রধান অন্তরায় হইতেছে, আমাদের ঘরগুলি আজ সত্যিকারের শিশু-শিক্ষার কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। গৃহ-বিজ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত বিষয়গুলিতে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া পিতামাতা উভয়েরই সুন্দর, সুস্থ, গৃহ-জীবন রচনায় একান্ত মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। সুপরিচালিত সুস্থ গৃহ ব্যবস্থায় মানুষ নিজকে উপলব্ধি করে, উহাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ভবিষ্যতের বাংলার জন্য আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান আত্মশক্তিতে দৃঢ় এইরূপ মন ও মানুষেরই একান্ত প্রয়োজন।"

সুতরাং আশা করা যাইতেছে, মেয়েদের এই একান্ত প্রয়োজনীয়, এই অঞ্চলে এই এই ধরনের প্রথম কলেজটির প্রতি বাংলা সরকার বিশেষ ভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন।

এই কলেজ পরিকল্পনার বিষয় অনুধাবন করিতে গিয়া আরও একটি বিষয় আমার বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যাঁহারা এই কলেজের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাঁহারা যে কেবল শহরের মুষ্টিমেয় মেয়েদের জন্যই আই-এ, বি-এ, ডিগ্রীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা নহে। আমাদের শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোক গ্রামাঞ্চলবাসী তাহাদের কথাও ইঁহারা বিস্মৃত হন নাই। বস্তুতঃ গৃহ-বিজ্ঞানে জ্ঞানের প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলে আরও অনেক বেশী অনুভূত হয়। গৃহ-বিজ্ঞানের জ্ঞান যাহাতে শহরের স্বল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ছড়াইয়া পড়িতে পারে বিহারীলাল কলেজ পরিকল্পনায় উহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল মেয়েরা ঘটনাচক্রে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বা কলেজী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, অথচ যাহারা গ্রামাঞ্চলে গিয়া গ্রামোন্নয়ন বা সমাজ-সেবা প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত হইয়া কোনও রকমে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে তাহাদের জন্য 'পল্লী-স্বাস্থ্য ও শিক্ষা', 'পল্লী-গৃহ সংস্কার ও উন্নয়ন', 'শিক্ষা ও কুটীর-শিল্প' প্রভৃতি বিষয়গুলিতে স্বল্প-মেয়াদী ছোটখাট কার্যকরী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ গ্রামাঞ্চলেও বিভিন্ন সেবা বা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং সেই সকল কেন্দ্রের শিক্ষাধারা আঞ্চলিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই রচিত হইবে। যাঁহারা গ্রামোন্নয়ন বা পল্লীসংস্কার প্রভৃতি কাজগুলিতে আত্মনিয়োগ করিবেন না তাঁহারাও যাহাতে বিভিন্ন

ধরনের কুটীর-শিল্পগুলিতে তিন-চার মাসের স্বল্পমেয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সংসারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কিছু পরিমাণে বাড়াইতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। মোটের উপর বিহারীলাল কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই বিহারীলাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগ হিসাবেই বাংলা দেশের মেয়েদের জন্য বিভিন্ন দিকে এই সকল ছোটখাট বিভিন্ন শিক্ষাধারাগুলি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে। এই সকল শিক্ষা ব্যবস্থাগুলিতে রূপ দিবার উদ্দেশ্যেই, দেখিলাম, বিহারীলাল কলেজের পূর্বদিকের জমিটুকুতে কলেজ কর্তৃপক্ষের একটি উৎপাদন-কেন্দ্র (production cantre) স্থাপন করিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে।

কিন্তু যে-কোনও রকম পরিকল্পনাই হউক না কেন, উহাকে কাজে রূপায়িত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়। সুতরাং গ্রামোন্নয়ন ও সমাজসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগগুলি খুলিতে হইলে বিহারীলাল কলেজেরও আরও অর্থের প্রয়োজন হইবে, নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই অর্থ আসিবে কোথা হইতে? ভাবিতে হইল না—সামনের দেয়ালে চোখ পড়িতেই সুচারু নক্সার মধ্যে লিখিত পশ্চিম-বাংলার প্রধানমন্ত্রীর উক্তিটিই আবার চোখে পড়িল—'দেশ ও সমাজের পক্ষে যে কাজ একান্ত কল্যাণকর, কর্ম্মীরাও যেখানে সকল বিষয়েই একান্ত আন্তরিক—সে কাজ কখনও অর্থের অভাবে বন্ধ থাকিতে পারে না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান গৃহ-বিজ্ঞান বিভাগে বিজ্ঞান ক্লাসের একটি অংশ

দেশ গঠনের পথে নূতন স্থাপিত বিহারীলাল কলেজ গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, গ্রামোন্নয়ন ও সমাজসেবার প্রতি ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বিহারীলাল কলেজের মেয়েরা, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি কার্য্যগুলি গ্রহণ করিয়া, উহাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতখানি সম্ভব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সহায়তা করিবে। গ্রামোন্নয়নের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য গ্রামবাসীদের প্রতিদিনকার জীবন ও জীবনধারার পরিবর্ত্তন লইয়া আসা, বৈচিত্র্যহীন নিষ্পেষিত প্রাণে জীবনের আনন্দ ফুটাইয়া তোলা। জীবনের মান ও জীবনের কাজ সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আসাই গ্রামোন্নয়নের মূল কথা। যথাযথ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বিহারীলাল কলেজের মেয়েরা এই গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। গ্রামাঞ্চলের উন্নতিবিধান করা আমরা এত দিন পর্য্যন্ত ছেলেদের কাজ বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছি, কারণ গ্রামোন্নয়ন বলিতে আমরা এতদিন পর্য্যন্ত রাস্তা তৈয়ারী ও কূপ খনন করা প্রভৃতি কাজগুলিকেই বুঝাইয়াছি। বস্তুতঃ, গ্রামোন্নয়নের একমাত্র উপায় ও পথ গ্রামের গৃহ-জীবনগুলিকে সুস্থ ও সুন্দর করিয়া রচনা করা, এ দায়িত্ব প্রধানতঃ মেয়েদের এবং ইহা ধনী ও নির্ধন উভয়েরই আওতার মধ্যে। ইহার জন্য কেবলমাত্র নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। বিহারীলাল কলেজ গ্রামের জীবন ও জীবনধারার সহিত মেয়েদের পরিচিতি ঘটাইয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার দীর্ঘ দিনের অনুভূত অভাব অনেকাংশে পরিপূরণ করিবে নিঃসন্দেহ। শিক্ষা-ব্যবস্থার যে কোনও গঠনমূলক পরিকল্পনাই রচিত হউক না কেন, উহা যদি গ্রামের জীবন ও জীবনধারাকে উন্নত করিবার প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত না হয় তাহা হইলে উহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য।

বহুদিন ধরিয়া বাংলার গৃহ ও গৃহ-জীবনের উপর দিয়া বিপর্য্যয় সুরু হইয়াছে, মানুষের জীবন হইতে শ্রী ও সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বিহারীলাল কলেজের পরিকল্পনা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হইল, এই কলেজের মেয়েরাই হয়ত এক দিন সেই লুপ্ত শ্রী ও সৌন্দর্য্যকে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। নূতন শিক্ষাধারায় দীক্ষিত হইয়া ইঁহারাই হয়ত একদিন মানুষের জীবনে নূতন ভাবে বাঁচিবার ও ঘর বাঁধিবার ইসারা আনিয়া দিবেন।

ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহোদয় তাঁহার ভাষণের মধ্যে একটি অতি

প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই কলেজ পরিচালনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিণ্ডিকেট, ফ্যাকল্টি, একাডেমিক কাউন্সিলের প্রভৃতির কর্তৃত্ব এবং হস্তক্ষেপ যত কম থাকে ততই ভাল। তিনি মনে করেন যে, এই কলেজ পরিচালনার জন্য একটি স্বাতন্ত্র্য-প্রাপ্ত পরিষদ থাকাই বাঞ্ছনীয়, এবং এই পরিষদে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ নারীর সংখ্যাই অধিক থাকা উচিত। আশা করি প্রাক্তন উপাচার্য্য ড. ঘোষের এই উক্তিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হাল্কা ভাবে গ্রহণ করিবেন না।

গৃহ-বিজ্ঞান বিভাগের রান্নার ক্লাসের একটি অংশ

বহু বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও যাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে আজ এই বিহারীলাল কলেজটি গড়িয়া উঠিল তাঁহার সম্বন্ধেও এই প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৯৪৪ সনে সেনেটের সদস্যা শ্রীমতী জ্যোতিঃপ্রভা দাশগুপ্তার বিরাট পরিকল্পনার ক্ষুদ্রতম অংশ হিসাবে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে উহাকে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব শ্রীমতী দাশগুপ্তার উপরেই ন্যস্ত হয়। তখন হইতেই তিনি উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষারূপে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারই অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ে উক্ত বিভাগের সম্প্রসারণ পরিকল্পনাটি আজ বিহারীলাল কলেজে রূপ পাইল। শ্রীমতী দাশগুপ্তা এক দিকে যেমন অবিভক্ত ভারতে প্রতি প্রদেশে মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়াছেন, তেমনি আবার ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধেও যথেষ্ট প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। আমেরিকায় থাকাকালীন সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া হইতে তিনি ফাই বিটা ফেলোসিপ প্রাপ্ত হন, এবং উহারই সাহায্যে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। বিহারীলাল কলেজের পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁহার চিন্তাশীল অভিজ্ঞ মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে দেশের যাহা কিছু ভাল উহারই সমাবেশে যেন তিনি বিহারীলাল কলেজটিকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। উদ্বোধনী ভাষণে ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং সমাপ্তি ভাষণে অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় বিহারীলাল কলেজ গঠনের কাজে শ্রীমতী দাশগুপ্তা ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের পরিশ্রম ও একনিষ্ঠতার কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করিয়া মেয়েদের শিক্ষাকে পূর্ণতর রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন; তাঁহারই রোপিত বীজ আজ বৃক্ষে পরিণত হইতে চলিয়াছে; কিন্তু গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি মৃত্যুর অমোঘ বিধানে সেই মানুষটিই আজ স্বীয় প্রচেষ্টার বাস্তব-রূপ দেখিতে পাইলেন না! স্বর্গীয় বিহারীলাল মিত্রের দান এবং বদান্যতা সার্থক হউক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষগণের উদ্দেশ্য ও অভীপ্সা সাফল্য অর্জ্জন করুক ইহাই প্রার্থনা করি। শ্রীমতী জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তার সাধনা ও পরিশ্রম সার্থকতামণ্ডিত হইয়া ঘরে ঘরে বাংলার মেয়েদের নূতন করিয়া সৃজন করুক ও নূতন কর্ম্মধারায় উহারা দীক্ষিত হইয়া উঠুক—ইহাই একান্ত কামনা করি।

পৰ্ব্বত ও শিলা

শ্রীরেণুকা দেবী
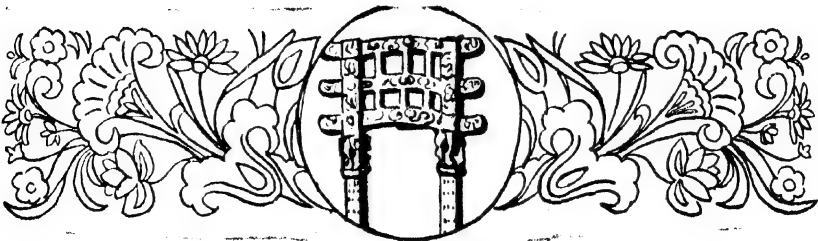
সুপ্রভা দেহ রাখলেন। সন্ধ্যা সাতটা বেজে ন' মিনিটের সময়। সুপ্রভা কলিকাতার প্রাচীন ধনী মিত্র-পরিবারের বধূ। ব্যারিষ্টার স্বর্গত নবেন্দু মিত্রের স্ত্রী। সেইদিনই সকালে, নিত্যকার অভ্যাসমত উষাস্নান সেরে, প্রণাম জানিয়েছেন প্রত্যহের দেবতাকে। তার পর নিজের ঘরে এসে মাথা লুটিয়ে দিয়েছেন জলচৌকির উপর সাজিয়ে-রাখা "নবেন্দু মিত্রের" প্রকাণ্ড ছবিটার সামনে। পূজার ঘরে এসেও প্রতিদিনের মত ঘুরে ঘুরে জোড় করে মাথা নত করেছেন, চারিদিকে টাঙ্গানো দেবদেবীর নানা চিত্রপটের দিকে। দিনের আলোয় ঘর ভরে না যাওয়া পর্য্যন্ত গুরুমন্ত্র জপ করেছেন আসনে বসে। এসব কাজ তাঁর সারা হয়ে যায় বাড়ীর প্রত্যেকটি লোক উঠবার আগে। তার পর গীতাপাঠ, পুরাণপাঠ, ভাগবতপাঠ আছে নিয়মিত কয়েক ছত্র করে। শেষে আছে শ্যামসুন্দরের পূজা। দাসী বকুল এসে সাজ, নৈবেদ্য করে দেয় তখন। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দ্দন আছেন, সে পূজা হয় পালামতে। শ্যামসুন্দর তাঁর নিজস্ব। শান্তি পাওয়ার জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাই শান্ত দেহমন প্রথমেই লুটিয়ে পড়েছিল শ্যামসুন্দরের পায়ের তলে।

কুড়ি বছরের ছেলেকে বিলেতে পাঠাবার আগে তেরো বছরের সুপ্রভাকে ঘরে এনেছিলেন, হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল রামজীবন মিত্র মহাশয়। নরেন্দু যখন ফিরে এলেন, সুপ্রভা তখন পূর্ণ-বিকশিত। এক বছরের মধ্যেই নিজে পিতা হলেন, কিন্তু নিজের পিতাকে হারালেন। তার জন্য দুঃখ নেই, অধিক বয়সের সন্তান, মাতৃহীন পুত্রের জন্যই যেন অপেক্ষা করেছিলেন। পাঁচ ছেলের মধ্যে বিষয়সম্পত্তি ভাগ করে, পুত্রহীনা বিধবা কন্যা মহামায়ার হাতে ছোট ছেলের সাংসারিক ভার দিয়ে কর্ত্তব্য শেষ করেই তিনি গিয়েছেন।

নূতন সংসার, সুন্দরী স্ত্রী, প্রথম পুত্র, প্রাণে আনন্দের বন্যা বইছে নবেন্দুর। অর্থাভাব নেই, তবু অর্থ পাচ্ছেন। পুরানো "অষ্টিন" বদলে "ভক্সল" কিনলেন নতুন। ছুটি পেলেই ছোটার নেশায় পেয়ে বসল তাঁকে। এই নেশাই হ'ল কাল। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মোটর দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারালেন, শিশু শুভেন্দুর তখনও তিন বছরও পূর্ণ হয় নি। আকস্মিক এই আঘাতে বিমূঢ় হয়ে গেলেন সুপ্রভা। সমস্ত অশুভের মূল ভাবলেন শুভেন্দুকে। একান্ত ভাবে আঁকড়ে ধরলেন নির্জ্জন নিঃসঙ্গ জীবনকে। নানা দেবদেবীর মূক মূর্ত্তিচিত্রই হ'ল তার একমাত্র সঙ্গী। সমস্ত আপনজনকে সরিয়ে দিলেন, এমনকি শিশু শুভেন্দুকেও। দাসী নন্দর মা, আর মহামায়া এরাই বড় করে তুললেন তিন বছরের অবোধ শিশুকে।

বালক শুভেন্দুর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল, তিনতলার ঘরের পূজা-আর্চায় দিনযাপন করা মহিলাটির প্রতি। জানে তিনি ওর মা। বিস্ময় আর আগ্রহ নিয়ে বারে বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মার ঘরের দরজায়, অতি পরের মত প্রশ্ন শুনেছে—'খাওয়া হয়েছে? পড়া-শোনা করছ?' কখনও বা নীরবে ইঙ্গিত করেছেন চলে যাওয়ার জন্য। ক্ষুব্ধ অভিমান গুমরে উঠেছে বালক-মনে। কখনও অবাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তবু, কখনও দ্রুত নেমে এসেছে। বার বার না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে মনে মনে। জগতের সবচেয়ে আপন-জনকে মনে করেছে সব চাইতে পর। পনেরো-ষোল বছর বয়ঃক্রম কালে, এর রূপ হ'ল অন্য। মায়ের নিষ্ঠুরতার প্রতি তার বিপরীত নিষ্ঠুরতা। মা, কিসের মা উনি? মায়ের জন্য কোন আগ্রহ, কোন কৌতূহল নেই তার। নিজের খুশীর বেগে চলা, সমস্ত কিছু নিজের মতে করা, মহামায়ার অবাধ্য হওয়া, সবই যেন মাকে কষ্ট দেওয়ার এক সান্ত্বনায় পূর্ণ। দোতলার শুভেন্দু, আর মায়ের তেতলায় ওঠে নি। মহামায়ার আদরের শুভেন্দুর মধ্যে তাই গোপনে ছিল, মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত এক কঠিন শুভেন্দু।

যখন বি-এ পড়তে গেল শুভেন্দু, তখন আর এক রূপ প্রকাশ পেল তার মধ্যে। তখন অষ্টাদশ বৎসরের প্রথম যৌবন, তথাপি মেয়েদের সম্বন্ধে তার কৌতূহল হ'ল অত্যধিক। মেয়েদের সঙ্গে মেশবার আগ্রহ তার অতি প্রবল। কলকাতার আদি কায়স্থ তারা, সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে কত আত্মীয়স্বজন। আর শুভেন্দুর মত ছেলে—তাই মেশবার সুযোগও হয়েছিল খুব। অর্থের খ্যাতি ছাড়া চেহারাটাও কম আকর্ষণযোগ্য ছিল না। আঠারো বছর বয়সেই দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সুদর্শন চেহারার শুভেন্দু, বহু মেয়ের মনেই ভবিষ্যতের কল্পনার সৃষ্টি করাত। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছে যে, কোন মেয়েকেই তার ভাল লাগত না। আবার এই না ভাল লাগাটাই তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত মেয়েদের কাছে কাছে।

বি-এ পড়ার সময়েই আলাপ হয় পদ্মাগের সঙ্গে। বর্দ্ধমান কলেজ থেকে এসেছে ছেলেটি। দেখেই ভাল লাগে শুভেন্দুর। কি বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের একহারা চেহারা। কিন্তু বোঝা যায় যে, ধারালো আর কঠিন স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু সে শুধু দেখেই না, সবকিছু জেনেও নেয়। অল্প কথা বলে, কিন্তু লাজুক নয়। বহু ছেলের মধ্যে থেকেও ওর পৃথক পরিচয়, আলাদা করে বলে দিতে হয় না যেন। শুভেন্দুর পরিহাসসূচক কথা বলার ভঙ্গী, পরিষ্কার মতামত পদ্মাগকেও মুগ্ধ করে। আলাপ আরও ঘনিষ্ঠ হ'ল এম-এ পড়তে এসে। এখানেও বিষয় দু'জনের আলাদা, শুভেন্দু

পড়ে ফিলোসফি, পরাগ পড়ে ইকনমিক্স। তাতে বন্ধুত্ব বা আড্ডা দেওয়ার কোন বাধা হয় নি।

কলেজেও মেয়েদের সঙ্গে শুভেন্দুর এই ব্যবহার লক্ষ্য করেছে পরাগ। কি চমৎকার ভাবে আলাপ জমায় শুভেন্দু, কথার পিঠে কথা বলার কি অপূর্ব্ব ক্ষমতা। প্রায় প্রত্যেক মেয়েকেই মনে করাতে পারে যে, শুভেন্দু তার প্রতিই আকৃষ্ট বেশী। কলেজের বাইরে ও পরিচিত মহলের মধ্যে এই বিষয়ে কিছু কিছু শুনেছে। অবস্থাপন্ন ঘরের একমাত্র ছেলে, ওদের সমাজে হয়ত এসব চল, তাই এই নিয়ে প্রথমে কিছু বলে নি পরাগ। কিন্তু শুভেন্দুকে ভাল করে চেনবার পর তার মনে হয়েছে, আসল মানুষটির সঙ্গে চপলচিত্ত মানুষটির কোথায় যেন যোগসূত্র ছিন্ন আছে। দুটিই যেন পৃথক সত্তা। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এইটুকুই শুধু ধরা পড়েছে, বোধগম্য হয় নি সবটা।

পরাগকে একজন প্রোফেসার কিছু বই দেবেন বলেছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরাগকে সকলেই উৎসাহ দেন। পরাগ থাকে বউবাজারে, প্রোফেসারের বাড়ী টালীগঞ্জের চারু এভিনিউতে। কথা ছিল শুভেন্দু গাড়ীতে পরাগকে সেখানে নিয়ে যাবে।

—আসছিস তো দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে?

—বানার্জ্জির বাড়ী যেতে, না ভাই আজ হবে না, কাল আসব। উনি তো যে-কোন দিন বলেছেন, আজ বিশেষ জরুরি কাজ আছে।

—এক দিনে আমার অবশ্য কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু কি তোর জরুরি কাজ শুনি?

শুভেন্দু বুঝতে পারে, পরাগ কিছু অনুমান করেই বলেছে, তাই তার সহজ পরিহাসের ভঙ্গীতে মাথা হেলিয়ে বলে—আজ্ঞে, আপনার অনুমান ঠিক। সেজ জ্যেঠীমার ভগ্নী-কন্যা শ্রীমতী শোভা, তিনি কলকাতা দর্শন শেষ করে কালই পিতৃগৃহে চলে যাচ্ছেন। আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। মেয়েটি ভাল, আর তিনি যে এত শীঘ্র চলে যাচ্ছেন সেটা আরও ভাল।

—শুভেন্দু—

—পুরো নাম আর উচ্চারণের স্বর শুনে অবাক হয়ে যায় শুভেন্দু, বলে—

—বল।

—মেয়েদের প্রতি তোমার এরকম অশ্রদ্ধা কেন? অনেক মেয়ের সঙ্গেই তুমি এমন অভিনয় কর।

—অভিনয়, মোটেই না, আমার ভাল লাগে।

—না, ভাল লাগলে এমন অভিনয় করতে পারতে না। তুমি একই সঙ্গে যেমন রমলা মৈত্রকে খুশির সঙ্গে, গাড়ীতে ডেকে তুলে বাড়ী পৌঁছে দাও, শীলা সরকারকে হেল্পবুক যোগাড় করে দিয়ে কৃতার্থ হও, তেমনি মিনতি হালদারকে নিয়ে কলেজ স্কোয়ারে এখানে-সেখানে বেড়াও খুশিতে গদগদ হয়ে।...

—আর বাইরে তো শোভা, স্বপ্না, লতিকার দল আছেই এটাও বল।

—'কিন্তু এ কি ভাল, এই ভাবে মেয়েদের অপমান করা হয়।' পরাগের বক্তৃতা চলে। 'স্ত্রীজাতি কত শ্রদ্ধার পাত্রী। আমাদের শাস্ত্রে কত উচ্চে আসন দেওয়া হয়েছে মেয়েদের। ইয়ং গেহে লক্ষ্মী তারা ইত্যাদি—

জোরে হেসে শুভেন্দু বলে—থামুন, আচার্য্য মশায়, আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য করা যাবে।

—না—তুই আমার কথাটা ঠিক বুঝলি না, মেশাটা অন্যায়, সেকথা আমি বলি নি, মেশা বা, ভাল লাগা...কিন্তু তোর ভাবটা...

—দেখ পরাগ, তোদের মত ওই মেপে মেপে মেশা, ভাব, আমার ধাতে সইবে না। এর সঙ্গে সাধারণ, ওর সঙ্গে অসাধারণ, ভাব আমার নেই। সত্যি কথা বলতে কি, যদি বল কোন রোমান্স, বা তাদের ভাল লাগা, তা বাপু আমি কিছুই পাই নে, কিংবা বুঝি নে, তাই তোর ভাষায় অভিনয়, হ্যাঁ অভিনয়ই করে যাই, ওদের হৃদয় মন জানতে আমার শুধু কৌতূহল হয়, নিছক কৌতূহল।

—তোর এই নিছক কৌতূহলের জন্য কত মেয়ে, আহত হয়, দুঃখ পায় হয় ত তার খবর রাখিস?—এই ত, তুই কদিন যাস নি, শীলা সরকার আমাকে বলছিল...

—বলছিল—আমার অদর্শনে সে কত দুঃখিত। দুঃখিত—মেয়েরা আবার দুঃখিত হয় কারো জন্যে? উচ্চ হাস্যে ভেঙে পড়ে শুভেন্দু।

—এম-এ দিয়ে শুভেন্দু বিলেত যাওয়া স্থির করল। ওদের পরিবারে এখন প্রায় সকলেই বিলাতফেরত। 'ল লাইনে' যাবার কোন বাসনা নেই, শুভেন্দুর মাষ্টারি লাইনেই ঝোঁক বেশী, বাইরের পড়াশোনায় আগ্রহ তার ছোটবেলা থেকে। যাবার আগেও সেই পরিহাস—বিলেত গিয়ে বাঁচব, তুই ত সঙ্গে যাচ্ছিস না, বিদেশিনী-দের সঙ্গে অভিনয়টা কেমন জমাতে পারি, দেখি গে চেষ্টা করে।

—তোকে একটা কথা দিতে হবে কিন্তু।

—বলতে পারিস, সম্ভব হলে রাখা যাবে।

—কোন বিদেশিনীকে বিয়ে করবি নে।

—অপরাধ?

—অপরাধ নয়, অন্যায়। আমার মনে হয় বিবাহ যদি কর, তবে একজন বাঙালী মহিলাকে করবে, অন্ততঃ একজন ভারতীয়কে, দেশে মেয়ের অভাব নেই।

—যাক গে—একটা কাগজ দে।

—কাগজ?

—হ্যাঁ যদিও তোর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, তবু বিবাহের বাসনাই যখন নেই তখন তিন বার লিখে, নামটা সই করে দিই।

শুভেন্দু চলে যাওয়ার পর, ছোটবেলার ছবি আঁকার অভ্যাসটা পরাগকে পেয়ে বসল। একটা স্কুলমাষ্টারি যোগাড় করে, সে শিল্প-সাধনায় মন দিল। ছুটির সময়ে দেখে বেড়াতে লাগল, ভারতীয় নানা চিত্রকলার পাদপীঠ। বন্ধনহীন একা মানুষ, অল্প কিছুকালের একাগ্র সাধনায়, নামও হ'ল সামান্য। এক প্রদর্শনীতে অতি প্রশংসা লাভ করল, "বরদান" নামে একটি ছবি। বাল্মীকিকে বর দিচ্ছেন "দেবী ভারতী"। সামান্য সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে ঋণ করে, শিল্পপিপাসু পরাগ ছুটে গেল গ্রীস, রোম, প্যারিসে।

—ইতিমধ্যে তিন বছর বিলেতে কাটিয়ে, শুভেন্দু যখন ফিরে এল, পরাগ তখন বাইরে। দেশে ফিরে এসেছে, সেই একই পরিহাসপ্রিয় শুভেন্দু, কিন্তু অন্য দিকটা একেবারে উদাসীন ও নিস্পৃহ। তার পক্ষে এটা বিশেষ পরিবর্ত্তন। দেশে আসার পর আরও বদলে গেল সে। যেদিন দেশ ছেড়ে দূর বিদেশে যাত্রা করে, সেদিনও স্থিরভাবে ছেলেকে বিদায় দিয়েছিলেন সুপ্রভা, দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করতে করতে ফোটা ফোটা চোখের জল ফেলেছেন, আর মুছেছেন মহামায়া। শুভেন্দুর চিঠি এলে প্রতি ছত্র, দু'বার করে পড়েছেন মহামায়া, ছেলের কুশলটুকু ছাড়া আর কিছুই শুনতে চান নি সুপ্রভা। কিন্তু প্রবাস থেকে ফিরে যেদিন কাছে এল, প্রণাম করে মাথা তুলবার আগেই ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন সুপ্রভা, মাথাটা গভীর ভাবে চেপে, পিঠের উপর হাত রাখলেন। এই প্রথম, শুভেন্দুর সজ্ঞানে মায়ের বুকে মাথা রাখা, মায়ের আদর পাওয়া। এক মনোবিকারের ফলে, শিশুকালে যাকে দূরে রেখেছিলেন, নিজের যৌবনকালে, জপতপের কঠোরতায় যাকে কাছে টেনে নেন নি, বয়ঃপ্রাপ্তির পর সেই ছেলে যখন চোখের সামনে থেকে চলে গেল, তখন সুপ্রভার সমস্ত মাতৃহৃদয় কি বেদনায় হাহাকার করত? মনে পড়ত বারে বারে কাছে আসা সেই বালক-পুত্রকে, নইলে এত সহজে এত দিন পরে কেমন করে কাছে টেনে নিতে পারলেন। মায়ের জীবনধারার বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা না গেলেও ছেলের মধ্যেকার পরিবর্ত্তন সহজেই ধরা গেল।

এসেই একটা প্রোফেসারি পেয়েছে শুভেন্দু। লাইব্রেরী সাজিয়ে নিয়ে পড়াশোনায় ব্যাপৃত রইল সে। মহামায়া ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বিয়ে দেবার জন্য। তাঁর বয়স হয়েছে। মায়ের যা মতিগতি, তাতে তিনি যদি একে সংসারী না করে যান ত এ সংসার ভেসে যাবে। কত সম্বন্ধ এল, ফটো এল, শুভেন্দু নির্ব্বিকার। মহামায়া বকে যান শুভেন্দু বই নাড়ে, পড়ে আর হাসে। কেমন শান্ত আর উদাস। সে দুরন্ত, আবেগপ্রবণ শুভেন্দুকে আর খুঁজে পান না মহামায়া। বরং তাকে, সকালে বিকালে, সময় পেলেই দেখা যায় দুষ্ট ছেলের মত উঁকি দিচ্ছে মায়ের ঘরে, ওর দিকে চেয়ে একটু হাসবেন, কিংবা কাছে এগিয়ে বলবেন, কি রে কলেজ যাবি না, খুশী হয়ে চলে আসবে ছোট্ট ছেলের মত। মহামায়া কিন্তু স্পষ্ট কথা শুনতে চান।

—তুই বিয়ে করবি কি না বল?

—বারে মেয়ে পছন্দ না হলে কি করব।

—দত্তবাড়ীর মেয়ের ফটোটা দেখেছিস, তোর ছোট পিসীর ভাসুরঝি অনুভা ত খাসা দেখতে।

—ওই আহ্লাদী পুতুল, ওকে ত শো-কেসে রাখাই ভাল।

মা ত আগেই সন্ন্যাসিনী হয়েছেন, তুমিও সন্ন্যাসী হও, আমার ভায়ের বংশটা লোপ পাক, এত বড় বাড়ীঘর, যাও আর চারটি চেলাচামুণ্ডা যোগাড় করে থাক তোমরা। আমি কিন্তু এবার তোর মেজ জ্যেঠার কাছে এলাহাবাদ চলে যাব, বলে রাখছি খোকা।

মহামায়াকে তুষ্ট করতে, ওদের বাড়ীর রীতি অনুযায়ী, নিজেই দু'একটি মেয়েও দেখল, কিন্তু কোন মেয়েকেই পছন্দ হ'ল না তার, সেটা মেয়েদের রূপ গুণ ইত্যাদির জন্য নয়, ভালই লাগল না তার। মনে হচ্ছিল, পরাগ থাকলে এই সময়ে উপকার হ'ত। যে শুভেন্দু একদা মেয়েদের একটু সঙ্গলাভের জন্য নানা কাণ্ড করে বেড়িয়েছে, আজ যৌবনকালে নিস্পৃহ হয়ে গেছে সে। বালক-বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার কালে মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রাথমিক চঞ্চলতা—সেটা তার বঞ্চিত বালকচিত্তের অন্য প্রকাশ মাত্র। অপরিসীম পিপাসা নিয়ে ছুটে গিয়ে কেবলি অতৃপ্ত হয়ে ফিরেছে, অথচ সে মনের খবর ছিল তার নিজের অজ্ঞাত। মায়ের স্নেহের এতটুকু স্পর্শেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে সেই মন। শিশুর মতই হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে ফিরে আসছে মায়ের কাছে, তাই যৌবন যেন ঘুমিয়ে গেছে তার।

আজকাল তেতলার সুপ্রভা নেমে আসেন প্রায়ই দোতলায় শুভেন্দুর কাছে। এখানেও চারিদিকে বই মাসিক পত্র ইত্যাদি, তার মধ্যে শুভেন্দুকে দেখে বিস্মিত হন। এত সব বই পড়ে নাকি সে, নিজের ঘরে বন্দী থেকে বাইরের অনেককিছুই অজানা তাঁর কাছে। ছোট মেয়ের মত তাই প্রশ্ন করেন—এই বইটা তোর পড়া। ওটা কি বিষয় নিয়ে লেখা। বিষয়ের নাম শুনে অবাক বনে যান। কোনদিন ছেলে বলে—

—একটা কবিতা পড়ব, শুনবে মা।

—ইংরিজী?

—তা হোক, শোন, পরে তোমায় বুঝিয়ে দেব।

শুভেন্দু পড়ে যায় খানিকটা, তার পরে মার মুখের দিকে চেয়ে হেসে পড়া বন্ধ করে, অবাক বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠেছে মায়ের চোখ, এমনি জলের মত ইংরিজী পড়তে পারে খোকা।

—ভাল লাগছে?

ছেলেমানুষের মত মাথা হেলিয়ে 'হুঁ' বললেন সুপ্রভা।

এদিকে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের যাতায়াত সুরু হয়েছে বাড়ীতে। অস্থির হয়ে উঠেছেন মহামায়া। এই নিয়ে কথা হয় সুপ্রভার সঙ্গে—তোর ছেলেকে বিয়ে করতে বল ছোটবৌ।

—আমি? আপনার কথাই রাখছে না সে।

বিরক্ত হয়ে উঠেন মহামায়া—রাখছে মা সে, বলেই খালাস। ভগবান তোকে মা করেছিলেন কেন? ও মা বলেছে তবে আর কি—বলি সবাই মিলে বললে তবে ত ওর মনটা ভিজবে। সুর নরম করে বলেন, যতই হোক তুই মা, তোর কথা কি ফেলতে পারবে, আমার কথা না হয় হেসে উড়িয়ে দেয়, তোর কি মায়া হয় না ছেলের জন্যে, শুধুই স্বামীর জন্যে শোক, পুত্তুর কি কেউ নয়।

এত কথার মধ্যে, একটি কথাই সুপ্রভার মনে দাগ কেটেছিল, 'যতই হোক তুই মা'। কলেজ থেকে ফিরে ইজি চেয়ারে বসে বই দেখছিল, সুপ্রভা এসে দাঁড়ালেন ছেলের কাছে। বইটা রেখে, গা এলিয়ে দিল শুভেন্দু। ছাব্বিশ বছরের পরিপূর্ণ যৌবন পুত্রের দিকে অবাক হয়ে দেখলেন সুপ্রভা। কৈ এমন করে ত কোন দিন দেখেন নি তিনি। কাছে এগিয়ে এসে তার ঘন চুলে ভরা মাথায় হাত রাখলেন। বড় হয়ে গেছে ছেলে তাঁর, এই আনন্দের মধ্যেও একটা দুঃখের অনুভূতি হচ্ছিল তাঁর মনে। ছেলের কাছ থেকে সরে গিয়ে, ঘরটার মধ্যে এলোমেলো একটু ঘুরে, আবার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'বস না মা', পাশের চেয়ারটা হাত বাড়িয়ে টেনে দেয় ছেলে।

না বসে, আবার ছেলের মাথার কাছে আসেন, এবার ঘন চুলের মধ্যে আঙুল নেড়ে নেড়ে আদর করার ছলে আস্তে আস্তে বলেন, "তোকে আর একা মানায় না খোকা।"

'খোকা'—একটি ডাক, শিউরে ওঠে শুভেন্দু, হাত বাড়িয়ে নিজের মাথার উপর মায়ের হাতটি চেপে ধরে। একটু থেমে বলে, 'আচ্ছা মা, তোমার কথা রাখব।'

চলে আসছিলেন সুপ্রভা, ছাব্বিশ বছরের ছেলে, ছ'বছরের মত আবদার ধরে—একটু বস না মা। সামনে-বসা মায়ের দিকে তাকিয়ে মাকে ছেলের নতুন মনে হয়। নিরাভরণা শুভ্রবেশা—অকাল বৈধব্যের আড়ালে এক চিরবিষাদের প্রতিমূর্ত্তি। মা যেন একটি ছোট বালিকা, শুভেন্দুর চেয়ে অনেক ছোট। বড় মায়া হয়, সেই বালিকাটির জন্য, মার জন্য। মা চলে যাওয়ার পরও, অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত শুয়ে শুয়ে ভাবছিল মার কথা। অপূর্ব্ব মমতা বোধ হচ্ছিল মার জন্য, কি করলে আনন্দ দেওয়া যায় তাঁকে, এই ভেবে মনে মনে অস্থিরতা বোধ করছিল সে।

এই ঘটনার পর দুটি দিন মাত্র পার হয়েছে। একদিন শুভেন্দু জোর করে মাকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল। আর এক দিন সুপ্রভা অনেক গল্প করেছেন ছেলের সঙ্গে। ননদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। মাকে গল্প করতে দেখাও আশ্চর্য্য, পিসীমার প্রশংসা করা ত ততোধিক, কারণ পিসীমা ত, মাকে গালাগালি না দিয়ে জলগ্রহণ করেন না প্রায়। এই দুটি দিন কেমন কেটে ছিল সুপ্রভার? ছেলের মুখের দিকে ভালভাবে তাকাতে পারেন নি। নিজের নিষ্ঠুরতার কথা যত মনে হয়েছে ততই এক অব্যক্ত যন্ত্রণা বোধ হয়েছে, বারে বারেই তাঁর আশেপাশে এসে দেখা দিয়েছে বালক শুভেন্দুর মুখ। স্পষ্ট ধারণা হয় না, তবু যেন বোঝা যায়। যুবক ছেলের মুখ দেখে মনে হয়েছে, শুভেন্দু নয় ও যেন নবেন্দু, আবার নবেন্দুর ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে করতে দেখেন, শুভেন্দুর ছায়া ছবির সারা মুখে।

তিন দিনের দিন, সকাল সাড়ে আটটা ন'টা হবে, শুভেন্দু দ্বিতীয় বারের চা খেয়ে কাগজ দেখছে, মায়ের দাসী বকুল হাঁপাতে হাঁপাতে আসে—শীগগির আসুন দাদাবাবু, মা যেন কেমন করছেন আসন ছেড়ে উঠতি যাচ্ছেন, পারছেন না, চোখ দেখে ভয় লাগতিছে—আপনি যান, আমি পিসীমাকে নীচ থেকে ডাকি।

শুভেন্দু ছুটে উপরে যায়—শ্যামসুন্দরের সামনে আসনে বসে, ফুল সাজাতে সাজাতে মাথা টলে ওঠে, একটু বেঁকে সামনে গেলেও, সেই অবস্থা থেকে উঠতে পারছেন না, চোখ দুটা কপালে ওঠা নামা করছে, অতি গৌর বর্ণ নীলাভ হয়ে এসেছে, শুভেন্দু যেতে যেতেই আরও বেঁকে পড়েছেন, মুখ দিয়ে অল্প অল্প ফেনা বার হচ্ছে। দুহাত দিয়ে মাকে তুলে ধরে কোলে করে পাশেই শোয়ার ঘরে পালঙ্কে শুইয়ে দিল। মহামায়া এসেছেন, তেত্রিশ বছরের পুরনো চাকর গিরিধারী ডাক্তার আনতে চলে গেল। শুভেন্দু ভেবেছিল, বোধ হয় ফিট হয়েছে, কিন্তু মহামায়া বুঝেছিলেন, তাঁর ডাক এসেছে, আরও ঘণ্টাদশেক বেঁচে ছিলেন, কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারেন নি সুপ্রভা, বড় বড় হয়ে ওঠা অস্থির চোখকে দু'একবার স্থির করতে চেষ্টা করেছেন শুভেন্দুর দিকে। ওইটুকু আদেশ বা অনুরোধ, পিসীমার কথা রেখ। মায়ের মৃতদেহের উপর থেকে অস্থির শুভেন্দুকে জোর করে তুলে নিতে হয়েছিল। মহামায়া ভাবছিলেন মাকে এত ভালো ও কবে থেকে বাসল যে আজ তিনিও শান্ত করতে পারছেন না।

মায়ের শেষ কাজ সারা হ'ল, শুভেন্দুর জীবনেও নূতন অধ্যায় সুরু হ'ল। সমস্ত বাড়ীটা খাঁ খাঁ করে। তেতলার একটি ঘরে থেকে কি করে সারা বাড়ীটাকে ভরে রেখেছিলেন সুপ্রভা। অসহ্য হয়ে উঠল মহামায়ার—যে সুপ্রভার সৃষ্টিছাড়া শোকের জন্যে, জপ-তপের ঠেলায় 'ভগবান নামলেন বলে' ইত্যাদি কটূ মন্তব্য করা তাঁর নিত্যকার কাজ ছিল, সেই সুপ্রভাকে কি তিনি এত ভাল-বাসতেন! এই বাড়ী, এই সংসার যা তাঁর বুকের রক্তের চেয়েও প্রিয়, সে সংসারে অনাসক্তি এসে গেল সুপ্রভার অবর্ত্তমানে। তবে সুপ্রভার জন্যে দুটি কাজ তিনি করেছিলেন, বার-ব্রত, গীতা-ভাগবত পাঠে বাধা দেন নি কখনও, আর পূজা-আর্চ্চায় যতই বেলা হোক তাঁকে সঙ্গে না নিয়ে নিজে খান নি। সুপ্রভার উপর রাগ করে তাঁর পূজার ঘর মাড়াতেন না প্রায়, আজ তার ফেলে-যাওয়া ঠাকুর-দেবতার পূজার ব্যবস্থা করাতে করাতে কেবলই আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন।

'আমি আর টিকতে পারছি না খোকা, এই কালাশৌচ গেলেই, তুই বিয়ে কর'। টিকতে পারছে না যেন কেউ। যাদের সঙ্গে

সুপ্রভার কোন যোগ ছিল না, তারাও ; চাকর গিরিধারী দারোয়ান ভুখালী, ঠাকুর ভৈরব, সরকার মজুমদার মশায়, ড্রাইভার দুর্গাবাবু, দাসী নন্দর মা, বকুল সকলেই যেন এক নীরব শূন্যতা বোধ করে। শুভেন্দু অনেক সময় মায়ের খালি ঘরে গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বাবার ছবিটার দিকে। বুকের মধ্যে টন্‌টন করে ওঠে, মার জীবিতকালেও বুঝি এমন করে ভালোবাসতে পারে নি তাঁকে, এর মধ্যে কেবল মনে হয়েছে পরাগ থাকলে ভালো হ'ত। অন্তরে একাকিত্ববোধ তাকে চঞ্চল করে তুলত, মাঝে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হ'ত কোথাও চলে যায়, কিন্তু মহামায়া ত আছেন। এমন সময়ে এল পরাগ। পরাগের মনে এখন শিল্পসাধনার পিপাসা—তিন-চার মাসের মধ্যেই একটি স্কলারশিপ যোগাড় করে আমেরিকা পাড়ি দিল। যাওয়ার আগে শুভেন্দুকে বিবাহ করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে গেল। তার অল্প কয়েকদিনের সঙ্গ শুভেন্দুকে অনেকটা শান্ত করেছিল।

সপিণ্ডীকরণ সারা হ'ল। মহামায়া আর দেরি করলেন না, শুভেন্দুর বড় মামা একটি সম্বন্ধ পাঠিয়েছেন, মেদিনীপুরের এক সম্ভ্রান্ত জমিদারঘরের মেয়ে, মেয়েটি রূপে গুণে লক্ষ্মী। উনি ওখানে ডেপুটি থাকা কালে অনেকবার গেছেন তাদের বাড়ী, কুটুম্ব ভালই হবে মহামায়ার। বন্ধু বিমানকে সঙ্গে করে মেয়ে দেখতে গেল শুভেন্দু। রূপার ডিবে হাতে করে আসা মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল বিমান। অল্প গৌর আর স্বল্প শ্যামলতায় মেশানো রং, কিন্তু এমন দেহ-সৌষ্ঠবের কাছে রঙের প্রয়োজন হয় না। নিখুত ভাবে গড়ে তোলা স্মিত মুখশ্রী। সেই মুহূর্ত্তেই বিমানের মনে হ'ল, এ মেয়েকে যেন শুভেন্দুর পাশেই মানায় কেবল। শুভেন্দু কিছুই দেখেনি, না রং না গঠন। সবটা মিলিয়ে সে দেখেছিল, নম্রতার ছবি একটি। ফেরার পথে চুপ করে শুনেছে, বিমানের মুখের বিশেষণ যোগ-করা প্রশংসাগুলি, হেসেছে মাত্র। বাড়ী আসতেই অসংখ্য প্রশ্ন করেন মহামায়া—কেমন রং, তোর মার মত হবে ?

উত্তর দেয় না শুভেন্দু। বিমান বলে ওঠে, না—না—রং শুভোর চেয়েও চাপা তবে কালো নয়, একেবারে অজন্তার ছবি পিসীমা। ও আপনি মত পাঠিয়ে দিন, শুভোর খুব পছন্দ হয়েছে—নিজের সাফ মত প্রকাশ করে বিমান। সব কথাগুলি নিয়ে এলোমেলো চিন্তা করে শুভেন্দু। না রং সে রকম নয়, তবু যেন ভাবের সমতা আছে তেমনিধারা, হাঁ বেশ প্রশান্তি আছে, সব চেয়ে ভাল, সাদাসিধে ভাব। অন্য কোথাও নয়, ঐ মেয়েটিকেই বিয়ে করবে সে। মত পাঠাবার পর থেকেই যতই মনে পড়েছে, শান্ত ছবিটিকে, ততই ভালো লেগেছে মনে মনে।

আবার ভরে উঠেছে বাড়ীটা, একটি মানুষের আগমনে, লোয়ার সার্কুলার রোডের এত বড় বাড়ীটার প্রতিটি কোণে আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে। বৌয়ের নাম 'অশ্রুহাসি' সংক্ষেপে হাসি। পরিহাস-প্রিয় শুভেন্দু তাকে বলে, হাসিকান্না, আবার মাঝে মাঝে, একটু বদলে নিয়ে বলে—'হীরে-পান্না'। তবে সেটা তার বিশেষ আদরের ডাক। একটি মানুষ হাসিখুশিতে সবাইকে ভরে দিয়েছে। বকুলই হাসির কাজ করে, হাসির ঠাসা চুলের গোছা ধরে যখন বিনুনি করে দেয় বকুল পাশে বসে, ঢেউতোলা চুলে-ঘেরা মুখখানিকে দেখেন মহামায়া। তাঁর সযত্নে মাখানো কাঁচা হলুদ, বাদামবাটা, সর ময়দা দিয়ে মাজা রং দিনে দিনে ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। সমস্ত একাকিত্ব ঘুচে গেছে শুভেন্দুর। ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেছেন সুপ্রভা। মিলিয়ে গেছেন হাসির মধ্যে, যাওয়ার আগে উদাসীনকে ভালবাসতে, দুরন্তকে শান্ত হতে শিখিয়ে গেছেন সুপ্রভা। তাই শুভেন্দুর ভালবাসা, ধীর গম্ভীর।

আবার দু'বছর পার হয়ে গেল, এর মধ্যে মহামায়ার সঙ্গে এবাড়ী ওবাড়ী বেড়াতে গিয়ে হাসি শুনেছে শুভেন্দুর বিষয়ে অনেক কথা। কোন লিলির জন্যে সে পাগল হয়েছিল, কোন শোভার সঙ্গে রোজ দেখা করত। কোন কোন হিতৈষিণী হাসিকে সাবধান হওয়ার উপদেশও দিয়েছেন। হাসি চুপচাপ, একটি কথাও বলে নি শুভেন্দুকে। হাসি সেই জাতের মেয়ে, যারা নিজেরাই ভালবেসে জয় করে নেয় সব।

সেদিন শুভেন্দু খুব খুশী—পরাগ আসছে, হাসি।

হাসির হাসি পেয়ে গেল—আচ্ছা নাম বাপু তোমার বন্ধুর, আমরা ছোটবেলায় পড়েছি, ফুলের মধ্যে থাকে পরাগকেশর।

—ঠিক বলেছ···কেশর নয়—কুশারী, আমার প্রিয় বন্ধু পরাগ কুশারী তিনি। দু'এক দিনের মধ্যেই আসছেন।

পরাগের বাড়ীর কাছেই বিমানের বাড়ী তাই তার সঙ্গে আগে দেখা হয়—'জানিস শুভো একেবারে বদলে গেছে। আর ওর বউ—চমৎকার চেহারা, ঠিক যেন অজন্তার ছবি, মানুষটা আরও ভাল।' খুব খুশী হয় পরাগ। বিকেলে দুজনেই আসে শুভেন্দুর বাড়ী। হৈ হৈ করে উঠল শুভেন্দু, সকলকে টেনে নিয়ে এল দোতলায়। হাসিকে দেখে অবাক বিমুগ্ধ হয়ে গেল পরাগ, শুভেন্দুকে আবার একনজর দেখে নিয়ে বলল, সত্যি বিমানের উপমা মিথ্যে নয়, শুভোর পাশে আপনাকে অজন্তার ছবিই বলা যায়। শিল্পীর সপ্রশংস দৃষ্টি থেকে লজ্জিত হয়ে সরে যায় হাসি।

শুভেন্দুর বাড়ী বিমান আর পরাগের অবারিত দ্বার, বিমান উকিল মানুষ, দুটি ছেলের বাবা, ঘোর সংসারী প্রয়োজন ভিন্ন আসে না। পরাগ এখন বেকার, কি যে করবে তাই ঠিক করে নি এখনও। ছাত্রজীবনেরই মত সকাল বিকাল শুভোর কাছে আসা তার নিয়মিত কাজ হ'ল। এবারকার আকর্ষণ কিন্তু শুভেন্দু ছাড়াও আর একজন। পরাগের প্রশস্তি-উজ্জ্বল চোখের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝলকে উঠে, অন্য আর একটা দৃষ্টি। হাসির ভাল লাগে না। ওদের গল্পকথার আসরে অনেক পরে উপস্থিত হয়ে বোধ করেছে এক জনের মন তার উপস্থিতির আশায় উদগ্রীব হয়ে ছিল। ভারি বিশ্রী লাগে হাসির। মাঝে মাঝে নিজে না গিয়ে চাকর দিয়ে চা জলখাবার দেওয়াতে লাগল। কিন্তু প্রতিদিনই পরাগ যাওয়ার

আগে শুভেন্দু ডেকে পাঠাবে। এমনি কয়েক দিন কাটার পর, পরাগ চলে যেতেই, শুভেন্দু বলে উঠে—বেচারী পরাগ, তোমাকে দেখে মোহিত হয়ে গেছে, আর শুধু রূপে নয়, গুণেও। রাগ কর কেন ভারি প্রশংসা করে তোমার; আমার মত মানুষকে শান্ত করে ফেলেছ এইটাই ওকে বেশী স্পর্শ করেছে। অকরুণ হয়ো না দেবী, শিল্পীমানুষ দেখলই বা অজন্তার ছবি।

হাসি অবাক হয়ে যায়, তাহলে শুভেন্দুও বুঝেছে, আরও রেগে উঠে সে। 'ওঃ! আমি একটা দেখবার জিনিস হলাম। কাল থেকে আমি কিন্তু তার সামনে যাব না—বলে দিলাম।'

কে শোনে—শুভেন্দু ঠিক ডেকে পাঠায়, আবার পরাগের সামনেই বলে, 'বুঝলি পরাগ "হীরেপান্না" তোর ছবির বেজায় ভক্ত, আমার ভয় হচ্ছে যে, কবে তোর ভক্ত হয়ে পড়বে'। এমন মানুষকে নিয়ে কি করবে হাসি। তার চেয়ে চা জলখাবার দিয়ে দুটো কথা বলে আসা অনেক ভাল।

গ্রীষ্ম-বর্ষা শরৎ-হেমন্ত শীত-বসন্ত আবার ঘুরে গেল। পরাগ কোন কাজই যোগাড় করে নি, ছবি আঁকে, কিছু বাজে কাজ, ডিজাইন নক্সা ইত্যাদি করেই চালাচ্ছে চলছে তার নিত্য যাওয়া, আসা। এই নিয়ে আজকাল হাসি শুভেন্দু দু'জনের মধ্যে কৌতুকও চলে, সহজ হয়ে গেছে হাসির মন। 'আচ্ছা তোমার বন্ধুর জন্যে একটি রাঙা টুকটুকে বৌ যোগাড় করে দাও না, কেমন বন্ধু তুমি।

—সখি, কথাটা কি মনের থেকে বলা হচ্ছে?

—মানে?

—মানে স্ত্রীলোক হয়ে এ রকম ভক্ত হারানো।

—কাল কিন্তু আমি ওঁকে মুখের উপর বলে দেব।

—আহা রাগ কর কেন, ওই না হয় তোমার ভক্ত হয়েছে, তুমি ত আর এ অধমকে ত্যাগ কর নি।

—তোমার রাগ হয় না।

—একটুও না। বরং ভাল লাগে, আমার মত ভাল যদি বাসতে, তা হলে বুঝতে ভালবাসার লোককে যে ভালবাসে, তাকেও কত আপন মনে হয়।

—বৈষ্ণবের অবতার তুমি। ঝাঝিয়ে উঠে হাসি।

—তোমার কি করুণাও হয় না।

—না—না—না।

মুখে না বললেও করুণা কথাটাই ভাবে হাসি। আজকাল তাই অনেক সময় শুভেন্দুর অনুপস্থিতিতে যদি এসে পড়ে, গিয়ে দুটো-একটা বলে হাসি। তার ছবির প্রশংসা করে। ধন্য হয়ে যায় পরাগ, পরাগের গভীর দৃষ্টির সামনে থেকে শান্ত ভাবে সরে যায় হাসি। দিনের পর দিনের নীরব নিবেদন, এত দিনে একটু করুণা আকর্ষণ করে। শুভেন্দুর সঙ্গে এই নিয়ে ঠাট্টা করতে গিয়ে, এত দিনে খচখচ করে যেন একটু বাজে হাসির। আজ চার-পাঁচ দিন পরাগ আসে নি—হাসিই বলল, হ'ল কি ভদ্রলোকের?

—মন কেমন করছে নাকি।

—করছেই তো, সন্ধান কর ভক্তপ্রবরের।

—বেশ অত্তই যাইবে দাস।

হাসি না বললেও শুভেন্দু আজ যেত। জেনে এল বিশেষ কাজে হঠাৎ বোম্বাই গেছে পরাগ, কয়েক দিন পরে কলেজ থেকে ফিরে দেখে, নীচেকার ঘরের টেবিলের পরাগের চিঠি। "ভেবেছিলাম, অপেক্ষা করব, পারলাম না। বেশ জ্বর বোধ করছি, দেখা করিস।"

উপরে এসে জিজ্ঞাসা করল—পরাগ কখন এসেছিল?

—ওমা জানি না ত, এসেছিলেন বুঝি, খবর দেন নি তো। চিঠিটা দেখাল শুভেন্দু। তাই বোধ হয় দাঁড়ায় নি, লিখে রেখে চলে গেছে।

শুভেন্দু দেখে এল পরাগকে। বেশ জ্বর, ক'দিনের যাতায়াতে অসুস্থ হয়েছে বেশী, পেটে একটা ব্যথা। দু'দিন দেখে এসে বলল, অসুখটা ভোগাবে পরাগকে। তুমি ওর খবরের জন্য ব্যস্ত থাক বলায় খুব খুশী। অসুখটা সত্যিই জটিল। জ্বরও ছাড়ছে না, ব্যথাও কমছে না। সেদিন শুভেন্দু বলল, পরাগকে দেখতে যাবে। চল না, ভারি খুশী হবে তুমি গেলে।

—আমি?

—দোষ কি, আজই বিকেলে, কেমন।

হাসিকে দেখে, অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল পরাগ। দিদির বাড়ীতে থাকে সে। দিদিকে ডেকে চা খাবার দিতে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠল। শুভেন্দু মাঝে মাঝে বিমানকে ডেকে আনে, মানে গাড়ী নিয়ে গিয়ে ধরে আনে। সেদিনও হাসিকে রেখে বিমানকে নিয়ে এল। কয়েক ঘণ্টা বেশ কাটল গল্প করে। হাসি দেখল, বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে পরাগ, কিন্তু তার উজ্জ্বল বড় বড় চোখ যেন দপদপ করছে তবু। এর পর, পর পর দু'দিন গিয়েছে হাসি। তিন দিনের দিন, মহামায়ার সঙ্গে কোথায় যেতে হবে অজুহাতে গেল না আর।

কেমন যেন লাগে তার। পরাগ তাকে কিছু বলে না, তবু লাল হয়ে যায় তার মুখ। হাসির দিকে চাইতে যাওয়া চোখ, জোর করে ফেরায় শুভেন্দুর দিকে। শুভেন্দু সব বোঝে, তবু—হাসির সব রাগ গিয়ে পড়ে তার উপর। ওর জন্যেই তো সাহস পায় পরাগ, "অসভ্য"—ভাবতে গিয়েই নিজের অন্যায় বুঝতে পারে। ছিঃ ছিঃ এ কি ভাবছে সে! কি ভদ্র, কি সংযত, তাও তো হাসির অজানা নয়! হাসি ঠিক করল, আর যাবে না সে, দূরে থাকাই ভাল। ভুল ভেঙে যাবে ভদ্রলোকের। ছেলের কথা, নানা ছুতো করেই হাসি গেল না আর। একটু ভাল আছে পরাগ। প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে, হাসি এল না কেন। ছেলের কথা ছুতো, মহামায়াই আছেন—মাণিক, সোনা, কনক, কনকেন্দুকে নিয়ে। সেদিন জোর করেই হাসিকে নিয়ে গেল শুভেন্দু। তার পর ওকে রেখে গেল বিমানকে আনতে। হাসি ভেতরে যাচ্ছিল, পরাগ

বলল, আপনি এখানেই বসুন, আমি দিদিকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আজকাল পরাগ ভাল আছে একটু। দিদি তখন পরাগের জন্য পথ্য তৈরি করছিলেন। আসতে একটু দেরি হবে, বলে পাঠালেন।

হাসিই কথা তোলে—আপনি এখন বেশ ভাল আছেন ?

—হ্যাঁ, ব্যথাটা প্রায় নেই, তবে শেষ রাতে জরটা আসে।

—জর এখন আছে নাকি ?

—না এখন নেই।

—আপনি বেশ রোগা হয়ে গেছেন।

—তা হোক, তবু এ রোগের আমার প্রয়োজন ছিল।

হাসি ভেতরে যাওয়ার জন্য চেয়ার ছেড়ে ওঠে।

—একটু বসুন।

—অদ্ভুত মিনতি-জড়ানো চোখ, হাসিকে বসতেই হ'ল।

প্রয়োজন ছিল বলেছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমার দিক থেকে এইটুকুই রইল যে, "আপনি এসেছিলেন আমায় দেখতে" আর কিছুই বলার নেই। আপনি এসেছিলেন, এই যথেষ্ট।

—পরাগবাবু, আপনি অসুস্থ।

—সেটা দেহে, মনে সম্পূর্ণ সুস্থ। এইবার সেরে উঠেই আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—কেন ? প্রশ্ন করে হাসি।

—তা আমি বলতে পারব না।

—আপনি না বললেও আমি জানি। বেশ উদ্ধতভাবে বলে, আরও কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়—এ রকম কণ্ঠস্বর, হাসি জীবনে শোনে নি, মুখ বন্ধ হয়ে যায় তার আপনা থেকে।

—আপনি শুভেন্দুর স্ত্রী, প্রত্যেক দিন নিজের কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার যে গ্লানি তার জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। তবু আজ মনে হচ্ছে, আপনি যদি একটু এগিয়ে এসে কান পেতে শুনতেন ত অনুভব করতে পারতেন—কার নাম, ওঠা-নামা করছে —রক্তের সঙ্গে বুকের মধ্যে। আমি শুভেন্দুর মত সবল নই। আমি জানি, কত দুর্ব্বল আমি। এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যাব আমি। বোম্বাইয়ে একটা চাকরি পেয়েছি।

মুখের সমস্ত কঠোর কথাগুলো কোথায় হারিয়ে গেল। হাসিও কি দুর্ব্বল হয়ে গেল ? উদ্ধত চোখ নামিয়ে আনল, পরাগের শান্ত চোখের উপর আরও শান্তভাবে। হাসির আলগা ভাবে ঝোলানো হাত দুটির দিকে একবার হাত বাড়াল পরাগ, একটি বারের জন্য নিজের হাতে নিতে। পরক্ষণেই নিজেকে শক্ত করে ফিরিয়ে নিল নিজের হাতকেই। হাসি সামনের জানালার দিকে সরে গেল।

হাসি আর কিছুতেই যায় নি। পরাগের খবরও জিজ্ঞাসা করে নি। শুভেন্দু বুঝতে পেরেছে, খবর ও জানতে চায়। কিন্তু কেন এই সংকোচ, হাসিকে না জিজ্ঞাসা করে মনে মনে প্রশ্ন করেছে নিজেকে।

হাসি কি নিজেকে জানে না, হাসি কি শুভেন্দুকে বোঝে না। না জানুক সে, নিজেকে জানে শুভেন্দু, হাসিকে বোঝে। এর মধ্যে তিন দিন পার হয়ে গেল।

রাত্রিতে কথা হচ্ছে শুয়ে শুয়ে—পরাগ পরশু চলে যাচ্ছে।

—তাই বুঝি। আস্তে বলে হাসি।

—কেন, ও তোমায় বলে নি।

ঢোক গিলে, কোনমতে বলে হাসি—না—না তো, বলেন নি তো।

একটু চুপ দু'জনেই।

—ও তোমায় ভালবাসে, এটা সত্যি।

হাসি চুপ, স্থির। না রাগ না কৌতুক।

একটু মৌন হয়ে যায় শুভেন্দুও—"হীরেপান্না"।

শুভেন্দুর এ ডাকেও নির্ব্বাক হাসি।

—কি ভাবছ।

—কিছু না। কোনমতে বলে হাসি।

—যাই ভাব, আমি জানি, এখন যদি কান পেতে শুনি তা হলে উপরকার ঢেউয়ে যে শব্দই বাজুক না কেন, বুকের অতলে শুনতে পাব আমারই শুভ-ইন্দু নাম।

রোমাঞ্চিত হ'ল হাসি। সজোরে আঁকড়ে ধরল শুভেন্দুর বলিষ্ঠ বাহু, কিন্তু তাকে টেনে আনতে পারল না নাম শোনাবার জন্যে।

শুভেন্দুই টেনে নিল হাসিকে—চল হাসি, বেচারি পরশু চলে যাবে, কাল দেখা করে আসি।

—না।

—দোষ কি হাসি।

—দোষ নয়, আমি যাব না।

—না, তা নয়, ভাবছ যেতে পারবে না। আরও কাছে টেনে নিয়ে বলে, তোমায় সবাই বলে অজন্তার ছবি। সে ছবি আছে পাহাড়ের বুকের মধ্যে। তাকে দেখে লোকে মুগ্ধ হবে এ ত পাহাড়ের আনন্দ। একটা সত্যের জন্যে যদি তোমার মনে বেদনা জেগে থাকে, সে তো তোমার মহত্ত্ব। যা তোমার মনে এসেছে, তা ক্ষণিকের আলোড়ন মাত্র। মিথ্যার সন্দেহ। আমি পাশে থাকতে ভয় কি হাসি।

আবার কি হ'ল হাসির ? কিসের সঙ্কোচ, কিসের দ্বিধা. শুভেন্দু থাকতে। অজন্তার ছবি লুটিয়ে গেল পাহাড়ের গায়ে। নিজের লজ্জার মুখ লুকাল পরমাত্মীয়ের বুকে।

সহজ, মুক্ত হাসি দেখতে গেল পরাগকে।

—সত্যি চলে যাচ্ছেন আপনি ? থাকুন না এখানে।

—তা হয় না।

—কেন হয় না, আমাদের মত বন্ধু ফেলে যাবেন আপনি।

পরাগের মনে হচ্ছিল—ঠিক শুভেন্দুর মত করে কথা কি ভাবে বলছে হাসি।

—ও চাকরি ছেড়ে দে, কোথায় যাবি, ছবি আঁক এখানে বসে।

আবার নিজের পরিহাসসূচক ভঙ্গিমায় শুভেন্দু বলে ওঠে—পরাগ, শিল্পীমনের আবেগ অজস্রতার ছবিকে ক্ষয় করে না, অক্ষয়তাই দান করে।

নিমেষে যেন পরাগের সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল। পরিহাসের আড়ালে কঠিন শুভেন্দুকে সে চেনে, কিন্তু তার এরূপ আলোর মত উদার, এ শুভেন্দু...

—শুভেন্দুর উচ্চ হাসির মধ্যে মিলিয়ে গেল পরাগের নির্মল হাসি। হাসি এসে দাঁড়াল শুভেন্দুর পাশ ঘেঁষে।

সাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ

শ্রীপূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা হইতে মাত্র ছাব্বিশ মাইল দূরে ভাগীরথীতীরে হালিশহর নামক অতি প্রাচীন গ্রামটি অবস্থিত। হাবেলীশহর (যাহা হইতে হালিশহর নামের উৎপত্তি) একটি পরগণার নাম। পূর্ব্বে ইহা নদীয়ার রাজবংশের অন্তর্গত ছিল। এই পরগণার কেন্দ্রস্থল ছিল কুমারহট্ট। কুমারহট্ট কালক্রমে পরগণার নামে হালিশহর বলিয়া পরিচিত হয়। এই গ্রামের শিবের গলি নামক পল্লীতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। তাঁহার দুই বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথমার গর্ভে নিধিরাম নামে এক পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর গর্ভে প্রসাদের সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী অম্বিকা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভবানী দেবীর জন্ম হয়। তৎপর রামপ্রসাদ এবং তদনুজ বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের আদিপুরুষ রাজা শ্রীহর্ষ সেন চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তদানীন্তন নবাব ফকিরুদ্দিন শাহের বেগমের দুরারোগ্য মৃতবৎসা রোগ নিরাময় করিয়া তিনি সেনভূম প্রদেশের জমিদারী ও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি ধন্বন্তরী গোত্রেয় কুলীন বৈদ্য ছিলেন। রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশাবলী এইরূপ—শ্রীহর্ষ সেন—বিমল—বিনায়ক—রোষ—নারায়ণ—সাও—সরণি—কৃত্তিবাস—রত্নাকর—নিত্যানন্দ—জগন্নাথ—যদুনন্দন—রঞ্জন—রাজীবলোচন—জয়কৃষ্ণ—রামেশ্বর—রামরাম—রামপ্রসাদ।

রাজা শ্রীহর্ষ সেন হইতে রামপ্রসাদের প্রপিতামহ জয়কৃষ্ণের সময় পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ তিন শতাধিক বৎসরের মধ্যে এই বংশ ক্রমশঃ বেশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জয়কৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে হালিশহরের জগদীশ দাসের সহিত বিবাহ দেন। সম্ভবতঃ জগদীশ পরলোকগত হওয়ার পর শ্যালক রামেশ্বরের অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য তিনি তাঁহাকে হালিশহরে আনাইয়া বসবাস করান। তিনি এখানে আসার পর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। রামপ্রসাদের পিতা 'মহাকবি গুণধাম' রামরাম বিষয়কর্ম্ম কিছু করিতেন না। পণ্ডিত-অধ্যুষিত গ্রাম হালিশহরে বহু টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল যেথানে সংস্কৃত ভাষার রীতিমত চর্চ্চা হইত।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা শেষ হইলে রামপ্রসাদ স্থানীয় এক চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পুত্রের জাতীয় ব্যবসায় কবিরাজী করিবার ইচ্ছা নাই জানিতে পারিয়া তৎকালীন অর্থকরী বিদ্যা পারস্য ভাষা শিখিবার জন্য এক মৌলবীর নিকট পাঠান। অসাধারণ প্রতিভা ও মেধাশক্তি থাকায় অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ফার্সী, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। পিতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদকে চাকুরির চেষ্টায় কলিকাতায় আসিতে হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই এক জমিদারের অধীনে একটি মুহুরীর পদ লাভ করেন। এই জমিদারটি কে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন ভূকৈলাসের রাজবাড়ীতে, কেহ বা বলেন গরাণহাটার দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ীতে, আবার কেহ-বা বলেন বাগবাজারে দেওয়ান গোকুল মিত্রের নিকট রামপ্রসাদ কাজ করিতেন।

মুহুরীর জমাখরচের হিসাব রাখা কাজ তাঁহার ভাল লাগিত না। প্রতিদিন কার্য্যশেষে খাতার খালি স্থানগুলিতে দেবতাদের নাম ও স্বরচিত সঙ্গীত লিখিয়া রাখিতেন। মনিবের কার্য্যাধ্যক্ষ এই সব দেখিয়া বিরক্ত হইয়া কর্ত্তার নিকট গিয়া তাঁহাকে কার্য্যচ্যুত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। ধর্ম্মপ্রবণ ভাবুক গৃহস্বামী—

আমায় দে মা তবিলদারী
আমি নেমকহারাম নই মা শঙ্করী

এই গানটি খাতায় লিখিত দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং রামপ্রসাদ যে সামান্য ব্যক্তি নহেন এবং তুচ্ছ মুহুরীগিরি যে তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য নহে তাহা বুঝিলেন। প্রসাদকে ডাকাইয়া এই মুহুরীগিরি কাজে জীবন নষ্ট না করিয়া ব্রহ্মময়ীর চিন্তায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে বলিলেন এবং আজীবন মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু পোষ্যবর্গ অধিক হওয়ায় ঐ স্বল্প বৃত্তির দ্বারা কোন রকমেই স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত না। সেজন্য স্ত্রী-পুত্র-পরিজনেরা সর্ব্বদাই উপার্জ্জনের নিমিত্ত তাগিদ দিত, কিন্তু তিনি সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, শুদ্ধ শক্তিভক্তি সার করিয়া ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীতের দ্বারা মাকে স্মরণ করিয়া বলিতেন—

যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে,
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জ্জন নাই, আমায় দেখে সবাই রোষে।

সেকালের সামাজিক রীতি অনুসারে অতি অল্পবয়সেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময় ভাজনঘাট-বাসী লোকনাথ দাশগুপ্তের কন্যা যশোদা (মতান্তরে সর্ব্বাণী) দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মা জগদম্বা একদিন পুণ্য-বতী সতীসাধ্বীকে স্বপ্নে বলিলেন—'তোমার স্বামীকে রামকৃষ্ণ মণ্ডপের সিদ্ধপীঠে সাধন করিতে বল, তাহা হইলে আমি দেখা দিব।' পত্নীর প্রতি মায়ের এই প্রত্যাদেশে প্রসাদের যেমন আনন্দ হইয়াছিল তেমনি আবার অভিমানও হইয়াছিল। তাহার পরিচয় আমরা এই গানটিতে পাই—

ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে। ইত্যাদি

হালিশহরের সাবর্ণ চৌধুরীবংশের রামকৃষ্ণ রায় সন্ন্যাসীভাবাপন্ন কঠোর তন্ত্রসাধক ছিলেন এবং তিনিই এই সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। এই সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা অতি দুরূহ কর্ম্ম। পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করিয়া সেই স্থানে লক্ষ বলি, কোটিবার হোম ও কোটি-বার মহাবিদ্যার নাম জপ হইলে সেই স্থান সিদ্ধপীঠে পরিণত হয়। রামকৃষ্ণ রায় উপরোক্তরূপে সিদ্ধপীঠ স্থাপন করিয়া ঐ স্থানে সাধন করিতেন। পরে রামকৃষ্ণ রায়ের কোন উত্তরাধিকারী রামপ্রসাদকে উক্ত সাধনপীঠ সহিত ৮/০ বিঘা জমিও দান করিয়াছিলেন। প্রবাদ, এই সিদ্ধপীঠেই সাধন করিয়া রামপ্রসাদ সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন।

যাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য আছে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শ্রদ্ধার পাত্র। রামপ্রসাদের তাহাই ছিল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ গৃহীর জীবনযাপন করিয়াও কিরূপ নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করা উচিত তাহা প্রসাদ দেখাইয়া গিয়াছেন। পোষ্যদের প্রতিপালন-জন্য তাঁহাকে বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে কখনও ব্রহ্মময়ীকে ভোলেন নাই। মনিবের খাতায় টাকা জমার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মধনসঞ্চয়ের কথাও তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। আমরা যখন বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকি তখন কেবল পার্থিব প্রভুর মনস্তুষ্টির দিকেই লক্ষ্য রাখি, ভুলিয়াও একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করি না। এখানেই আমাদের হীনতা বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়।

রামপ্রসাদের গানের এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে, লোকের মুখে মুখে বঙ্গের প্রায় পল্লী, নগরে, সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে, শ্রীহট্টে এবং আসাম অঞ্চলেও তাহা প্রচারিত হইয়াছিল। এইভাবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও লোকমুখে তাঁহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হালি-শহরে জমিদারী কার্য্যাদির তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহার একটি কাছারি-বাড়ী ছিল, আর ছিল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুন্দর কারুকার্যখচিত দেবালয় এবং সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ। তিনি সময় সময় রামপ্রসাদকে আনাইয়া তাঁহার নিজমুখের সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। গুণ-গ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন এবং "কবিরঞ্জন" উপাধিতে ভূষিত করেন।

রামপ্রসাদ অত্যন্ত অতিথিবৎসল ছিলেন। কোন দিন কোন অতিথি তাঁহার গৃহ হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না। নিজের ভ্রাতা-স্ত্রী-পুত্রের আহার হোক বা না হোক সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, যে ভাবে হোক অতিথিসেবা করা গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিয়া তিনি তাহাদের সাধ্যমত সৎকার করিতেন। এজন্য তিনি জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেন—

গৃহধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম যদি দু'জন অতিথি আসে,
দু'জনের উপর তিন জন এলে হয় না যেন মুখ লুকাইতে।

রামপ্রসাদ কোন কোন গানে নিজকে "দ্বিজ প্রসাদ" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। উপবীতধারী বলিয়া এই পরিচয় তিনি দিতেই পারেন, কিন্তু রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী নামে আরও দুই জন ছিলেন যাঁহারা কবিরঞ্জনের অনুকরণে গান রচনা করিতেন এবং দ্বিজ রামপ্রসাদ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হালিশহরের সাধক-কবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদের রামদুলাল নামে এক পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা ছিল। তাঁহার রামমোহন নামেও একটি পুত্র হইয়াছিল। এই রামমোহনের বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া রামপ্রসাদের বংশের নাম রক্ষা করিতেছেন। রামপ্রসাদ তাঁহার লেখার মধ্যে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নামের উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। ইহার কারণ বোধ হয় "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর" রচিত হওয়ার পরে রামমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে কবিরঞ্জন-জায়া অন্তঃসত্ত্বা হইলে পল্লী-কবি আজু গোসাই বলিয়াছিলেন—

"তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা ঘুটি।"

কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মের পর রামপ্রসাদের—"এ সংসার ধোঁকার টাটি" এই সঙ্গীতটি রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

রামপ্রসাদের সাধনা ছিল ভক্তিমূলক। তাঁহার মন্ত্র ছিল গান। তাই তিনি গাহিতেন—"সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।" সংসারচিন্তা আবার যখন তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত, ইষ্টচিন্তা ভুলাইয়া দিত তিনি মনকে প্রবোধ দিয়া বলিতেন—

চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।

অল্পবয়সে রামপ্রসাদ কুলগুরু মাধবাচার্য্যের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা ও দীক্ষাদাতা ছিলেন তখনকার বিখ্যাত প্রগাঢ় পণ্ডিত ও তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

রামপ্রসাদ ছিলেন মায়ের স্নেহের দুলাল। সেজন্য মায়ের উপর তাঁহার যত জোর ছিল এত জোর আর কাহারও উপর ছিল না।

মাকে কখন আদর, কখনও আবদার, কখনও বা অভিমান, কখনও আবার তীব্র শ্লেষ করিয়া বলিতেন—

মা হওয়া কি মুখের কথা
এখন ক্ষুধার বেলা শুধালে না—
এল পুত্র গেল কোথা।

অভিমানে বলিতেন—

মা মা বলে আর ডাকব না
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা ধর এলোকেশী,
(না হয়) ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাবো,
মা বলে আর কোলে যাব না।

আবার কখন তীব্র ভাষায় গালি দিয়া গাহিতেন—

বড়াই করো কিসে মাগো।
জানি তোমার আদিমূল বড়াই করো কিসে॥

* * *

মাগী মিন্সে ঝগড়া করে রইতে নারে বাসে।
মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে ফিরে দেশে দেশে॥

তেমনি আবার মার উপর অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতার পরিচয়ও পাই এই গানে:

তিলেক দাঁড়া ওরে, শমন, বদন ভরে মাকে ডাকি,
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, আসেন কিনা আসেন দেখি।

রামপ্রসাদ জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বলিতেন—"কর্মসূত্রে যা আছে মন, কোথা পাবে তার বাড়া"—কিন্তু তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন যে, 'কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনও ত'—অতএব মা দয়া করিবেনই এবং কর্মবন্ধনও কাটিবেন। তিনি অন্তরে, বাহিরে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুতে পরমাণুতে পর্যন্ত মাকে দেখিতেন এবং সেজন্য গাহিয়াছিলেন:

মন তোমার কি ভ্রম গেল না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি
জেনেও কি তা জান না।

রামপ্রসাদ তাঁহার নিজের গানের জন্যে অমর হইয়া থাকিলেও তাঁহার স্বগ্রামবাসীরা পর্যন্ত বহুদিন যাবৎ বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় রামপ্রসাদের বংশধরেরাও যে তাঁহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বা এখনও করেন তা মনে হয় না। রামপ্রসাদ ধনবান ছিলেন না, তাঁহার পুত্রদ্বয় রামদুলাল ও রামমোহনের আর্থিক অবস্থা হয় ত ভাল ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের বংশধরেরা পরে অর্থবান হইয়াছিলেন। প্রথম পুত্র রামদুলাল তিনপুরুষ পরে বংশহীন হন। কনিষ্ঠ রামমোহনের দুই বিবাহ। উভয় স্ত্রী-জাত বংশধরেরাই বিদ্যমান ও বিত্তবান। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পৌত্র গোপালকৃষ্ণ বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকুরি পান এবং হালিশহর ত্যাগ করিয়া কলিকাতা পটলডাঙ্গা স্ট্রীটে বাস করিতে থাকেন। ১৮৯৫ সনের ২০শে এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্র কালীপদ সেন ছিলেন সেকালের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার। ১৯১৩ সনের ২৯শে ডিসেম্বর তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। কালীপদ সেনের প্রথম পুত্র চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় ওকালতী করিতেন। দ্বিতীয় পুত্র মানসরঞ্জন বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং অবসরগ্রহণের পর কলিকাতায় সত্যেন দত্ত রোডে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। ১৯৫২ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। কালীপদবাবুর তৃতীয় পুত্র হৃদয়রঞ্জন বরিশালে বি-আই-এস-এন কোম্পানীর ডাক্তার ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র আশারঞ্জন সরকারী আপিসে ষ্টেনোগ্রাফারের কার্য্য করিতেন। এখন অবসরগ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছেন। মানসরঞ্জনের পুত্রেরাও সকলেই অবস্থাপন্ন ও কলিকাতাবাসী। অপর পক্ষে রামমোহনের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান দুর্গাদাস সেনের বংশধরেরাও কলিকাতার অধিবাসী। যে কারণে মানব-শিশু পিতামাতাকে নিতান্ত আপন বলিয়া ভাবে সেই কারণেই মানুষ জন্মস্থান ও বাস্তুভিটাকে পঞ্জরাস্থি বলিয়া মনে করে এবং তেল, নুন ও লকড়ির হিসাবে লোকসান সহ্য করিয়াও পিতামাতা ও জন্মভূমি তথা বাস্তুভিটার বন্ধন রক্ষা করিতে চায়। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় যে, বাংলাদেশ যাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত, তাঁহার বংশধরদের মধ্যে কেহ রামপ্রসাদের বংশধর বলিয়া গৌরব অনুভব করেন এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। গোপালকৃষ্ণ সেনের জীবদ্দশার মধ্যে ১৮৮৫ সন হইতে রামপ্রসাদের স্মৃতিতে তাঁহার ভিটায় প্রতি বৎসর সাধারণের চেষ্টায় যে কালীপূজা হয় তাহাতে এক আশারঞ্জন ভিন্ন স্মরণকালের মধ্যে আর কাহাকেও যোগদান করিতে দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে গোপালকৃষ্ণ হালিশহর ত্যাগের পর প্রসাদের ভদ্রাসন ও পঞ্চমুণ্ডী আসনসংলগ্ন সমগ্র ভূভাগ তাঁহার তিরোধানের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জঙ্গলাকীর্ণ ও শৃগাল-সর্পের আবাসভূমিতে পরিণত হয়, প্রসাদের জীবনবৃত্তান্ত কেবল গান ও কিংবদন্তীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। পরে সেই ভদ্রাসন হালিশহরের "হিতৈষিণী সভা" উদ্ধার করিয়া রামপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা করেন। গোপালকৃষ্ণ তাঁহার এই বাস্তুভিটা এই "হিতৈষিণী সভা"কে দান করিয়া কর্তব্য শেষ করেন।

রামপ্রসাদ সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায় যেমন, গাব গাছে পদ্মফুল ফোটা, কন্যারূপে ব্রহ্মময়ীর রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধা, রামপ্রসাদের বাড়ীতে কাশীর অন্নপূর্ণার আগমন ও তাঁহার দেয়ালে নাম লিখন, হালিশহর হইতে নৌকাযোগে কলিকাতায় আসার সময় চিৎপুরের চিত্তেশ্বরীর মূর্তির তাঁহার গান শুনিয়া মন্দির-সহিত দক্ষিণ মুখ হইতে পশ্চিম মুখে ঘুরিয়া যাওয়া অনেকেই জানেন—বাহুল্য ভয়ে সেগুলি আর বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিলাম না।

ষাট বৎসর বয়সের কিছু পরেই (কোন পৌত্রের মতে শতাধিক

বর্ষ) প্রসাদ ইহধাম ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করেন। তিনি শ্যামাপ্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় আত্মীয়স্বজন ও পল্লীবাসীদের বলেন, "আজই মায়ের বিসর্জ্জনের সহিত আমার বিসর্জ্জন হইবে, সুতরাং তোমরা সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে এস। আমি পদব্রজে চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি গান করিতে করিতে জাহ্নবীতীরে আসেন এবং গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান হইয়া গান করিবার সময় তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় আত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া যায়। যে কয়টি গান তিনি গাহিয়াছিলেন তাহার শেষ গানটির শেষ লাইন—"মা গো ও মা, আমার দফা, হ'ল রফা, দক্ষিণা হয়েছে।" "দক্ষিণা হয়েছে" এই বাক্য উচ্চারণমাত্রই প্রাণের দক্ষিণা হইল এবং তিনি মহামায়ের ক্রোড়ে চির-আশ্রয় লইলেন। প্রসাদের মৃত্যুসংবাদে হালিশহরের ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। তাঁহার তিরোধানে মর্ত্ত্যের একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন অপসারিত হইল।

তাঁহার সাধ্বী পত্নী রামপ্রসাদের বৃদ্ধ বয়সে অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রেও মতদ্বৈধ আছে।

প্রাণের উন্মেষ

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ বিশ্বের অন্যতম প্রহেলিকা। প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই সেদিন পর্য্যন্ত আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। লুই পাস্তুর শূন্য বোতল জলপূর্ণ করে তার মুখ এঁটে দিয়ে দেখালেন যে, প্রাণ ব্যতীত প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব। তা হলে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হ'ল কি করে?

কেউ কেউ বলেন, অপ্রাণ থেকে প্রাণের বিকাশ হয় নি, অজৈব রাজ্য অপরিবর্ত্তনশীল; জীবজগতে বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন সম্ভাবনাময়। প্রাণের মূল নিদান অন্যত্র। ধরণীতে প্রাণকোষ এসেছে সুদূর তারকা বা গ্রহ থেকে কিংবা বিশ্বজগতের অপর কোন স্থান থেকে। ধারণা করা মুশকিল, প্রাণ-কণিকা পৃথিবীর বাহির হতে এসে পৌঁছল কোন পথে; নিকটতম তারার দূরত্বও যে ৪'৩ আলোকবর্ষ। আলোকের গতি সেকেণ্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল, এক বর্ষে এই সংখ্যার আকার বিপুল। আরিনস, লর্ড কেলভিন, হেলমহোলজ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মত এই যে, প্রাণকোষ উল্কাপিণ্ড বাহনে আরোহণ করে উপস্থিত হয়েছিল আদিম পৃথিবীতে। কিন্তু এ অসম্ভব, উল্কাপৃষ্ঠের প্রচণ্ড উত্তাপ, গতিপথের নিরাবরণ শূন্যতা এসব প্রাণ-দৌত্যের সহায়ক নয় বিন্দুমাত্র। তা ছাড়া প্রাণ বাইরের আমদানী বললেই সমস্যার সমাধান হয় না—সেখানে প্রাণ এল কোথা থেকে? কেউ কেউ বলেন যে, জীবজড়ের সমকালীন অর্থাৎ পৃথিবীর উপরটা যখন জলন্ত অগ্নিকুণ্ড ছিল, প্রাণের অস্তিত্ব তখন থেকেই। এর সপক্ষে প্রমাণের একান্ত অভাব। পণ্ডিতমহলে এ বিষয় নিয়ে মতান্তর রয়েছে বিস্তর, কোন মীমাংসা হয় নি। উইলসন প্রখ্যাত কোষতত্ত্ববিদ্। সারাজীবন কোষ সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি জীব ও জড় রাজ্যের ভিতর কোন সেতুর সন্ধান পান নি। তবে এ জগতেই যে প্রাণের উন্মেষ হয়েছে তা মেনে নেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই। জীব ও জড়জগতে ব্যবধান অধিক বটে, কিন্তু প্রাণ বাইরের আমদানী একথা বলা হয়ত অযৌক্তিক। প্রাণের উন্মেষ এক দিনে হয় নি, লক্ষ কোটি বৎসর ধরে তার জন্য প্রয়াস চলে। শেষে এক শুভ মুহূর্ত্তে এই প্রয়াস সফল হয়েছে।

চাঁদকে আপন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বসুন্ধরা স্থির শীতল জমাট হয়ে আসতে লাগল। হাল্কা বস্তুগুলি সব পড়ে ওপরেই থেকে গেল, অন্তস্থলে চলে গেল ভারী ভারী খনিজগুলি। আর্দ্র ও উষ্ণ বাষ্পভাগ তখন আদিম পৃথিবীর নভোমণ্ডল ঘিরে, সেই ঘনকৃষ্ণ মেঘসমুদ্রকে ভেদ করে সূর্য্যরশ্মি এখানে এসে পৌঁছত কিনা সন্দেহ। বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল অবিরলধারায়। আজকের সাগর মহাসাগর সেই আদিম বৃষ্টির জলরাশি।

স্থলভাগ তখনও দেখা দেয় নি, সূর্য্যের অতি-বেগুনী রশ্মিজাল দিনের পর দিন অকৃপণভাবে জড় পরমাণুর ওপর আপন আলো ঢেলে দিয়ে প্রাণ-সঞ্চারের প্রয়াস করছিল, এই ভাবে প্রাণের অভ্যুদয় হ'ল। জীব জড়েরই শিশু—তার থেকে জাত। জড় তার সমস্ত সত্তার নির্য্যাস দিয়ে পরমাণুকে প্রাণময় কোষে পরিণত করেছিল। কিন্তু সে মাহেন্দ্রক্ষণ আর ফিরল না। সূর্য্যের কিরণ আজও পড়ে উষ্ণমণ্ডলের কাদামাটি ঘোলাজলে, প্রাণের উন্মেষ হয় না।

আদি প্রাণ

আদি প্রাণের সাক্ষাৎ বংশধর আজও বেঁচে আছে—ভাইরাস। ব্যাকটিরিয়ার চেয়ে ক্ষুদ্র এই প্রাণীর অস্তিত্ব সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রে ধরা পড়ে না, ব্যাকটিরিয়ার ন্যায় খাদ্যদ্রব্যের চারিদিকে এসে জমাও হয় না। গবেষণাগারে এদের উৎপাদন বা বৃদ্ধি করতে পারা যায় নি। শক্তিশালী বৈদ্যুতিক অণুবীক্ষণযন্ত্রে গৃহীত ছবিতে জানা যায় এদের অস্তিত্ব, শুধু রোগ-লক্ষণ মিলিয়ে স্বরূপ উপলব্ধি হয়; হাম-বসন্ত, সর্দ্দি-কাশি, হাঁপি, মহামারী, ইনফ্লুয়েঞ্জা, রিকেট

ইত্যাদির মূলে অদৃশ্য ভাইরাসের কর্মচাঞ্চল্য। আদিম প্রাণ-কণা যে এইরূপ সূক্ষ্ম দেহধারী জীব তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত তারা আধুনিক ব্যাকটিরিয়ার মত সবুজহীন ছিল (অর্থাৎ ক্লোরফিলশূন্য)। বাতাস ও লবণাক্ত জলে প্রাণধারণ করত কিংবা প্রথম থেকেই জীবিতাংশ প্রোটোপ্লাজমযুক্ত দেহ অথবা প্রোটোপ্লাজমকণিকার জীব কিছু বাঁচত, কিছু মরে আহারের সংস্থান করে দিত জীবিতদের।

আদি প্রাণ দেহপুষ্টির জন্য নাইট্রোজেন ও কার্বন গ্রহণ করতে লাগল আর ফিরিয়ে দিতে লাগল অক্সিজেন, গতিশীল জীবনের পাথেয়। আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল, বাতাস নির্মল অক্সিজেনে ভরে উঠল, খুলে গেল অগ্রগতির রুদ্ধদ্বার—জীবজীবনের উপযুক্ত আহার পেয়ে প্রবাহিত হ'ল সাবলীল প্রাণধারা—হয়ত ভাইরাস অপেক্ষা ক্ষুদ্র জীবকোষে—যার কোন চিহ্নই আজ পাওয়া সম্ভব নয়। (ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া এদের পরিণত অবস্থা—সে যুগের প্রাণ-লীলার পরিচয় বহন করে এনেছে। অনুমিত হয় যে, প্রথম প্রাণী-দেহে নিউক্লিয়াস আর কোষের পৃথক অস্তিত্ব ছিল না, আলোক-তরঙ্গকণিকার চেয়ে ছোট এই প্রাণ পৃথিবীর আদি প্রাণের প্রকাশ। একাধিক কোষের সমন্বয় জীবের উন্নতির পরিচায়ক। তার পর এল সংঘবদ্ধতা। শ্রম বিভাগ করে দিয়ে সুবিধা হয়েছিল নিশ্চয়ই, নচেৎ জীবজীবন দ্রুতগতিতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হ'ত না। এককোষ-প্রাণী এবং এই সকল জীবের মধ্যবর্তী স্তরের বংশধরেরা আজও বিদ্যমান। এদের নাম ভলভক্স, জুথেমনিয়াম, মেক্সিডিয়াম।

দ্বিধাবিভক্তি

প্রাণবিকাশের উষাকালে জীব ও উদ্ভিদে কোন পার্থক্য ছিল না। কোন্ স্মরণাতীত যুগে প্রাণীজগৎ উদ্ভিদ-জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন পথে যাত্রা করেছিল জানি না, তবে তাতে উভয় পক্ষেরই উন্নতির সোপান প্রশস্ত হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে পৃথিবীর রূপ সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছে। এ সম্বন্ধ উত্তরোত্তর একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কি কি গুণ গাছপালার আছে অথচ প্রাণীদের নেই অথবা গাছপালায় এমন কোন বিষয়ের অভাব যা জীবজগতে কোন-না-কোন রূপে বর্তমান, তার হদিস মেলা ভার। গতিশীলত্ব জীবজগতের মোটেই একচেটে গুণ নয়। উদ্ভিদজগতের সামুদ্রিক এনিমন দুই-এক ইঞ্চি করে আস্তে আস্তে বেশ চলতে পারে, শক্ত পাহাড়-পর্বতের গায় আটকে না যাওয়া অবধি বিশ্রাম নেয় না। তার পর আমিষ ভোজন। কীটভুক লতারা নির্বিচারে কীটপতঙ্গ শিকার করে—ভেনাস-ফ্লাই ট্রাপ, সানডিউ ইত্যাদিকে মাংসাশী বলা চলে। পিঙ্গুকিলা, ডায়োনা, ড্রস অম্লান-বদনে পাতা-ফোঁড়া দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ চেপে ধরে তাদের নাই-ট্রোজেন নির্যাস নিঃশেষে গ্রাস করে নেয়। অপরপক্ষে চলৎশক্তি-হীন প্রাণী আছে অনেক ; গভীর সমুদ্রের নিভৃত তলদেশের প্রাণীরা প্রায় নিথর নিস্পন্দ।

জীববিদ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের পৃথক সংজ্ঞানির্দেশে অসুবিধা হলেও নিশ্চিত প্রভেদ অনেক, আদি প্রাণ হতে ক্রমশঃ দূরাপসরণশীল এরা। প্রসারণ-প্রবণতা প্রাণধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সে প্রভাবে জীবজগৎ দুই স্বতন্ত্র সত্তায় পরিণত হয়েছে। পথের পার্থক্য দেহের সম্বন্ধকে সহজে বিসর্জন দিতে পারে নি, তাই ঘনিষ্ঠতা এদের আজও অটুট ; উদ্ভিদ বাতাস হতে আহরণ করে কার্বন ও অক্সিজেন, মৃত্তিকা যোগায় জীবনধারণোপযোগী খনিজ, উদ্ভিদমূল তরলীকৃত খনিজ ধীরে ধীরে দেহসংলগ্ন করে। সবুজ পাতার নীচে সূর্যালোকে চলতে থাকে অজৈব-জৈব রূপান্তর, ক্লোরোফিল। এই আলোসংশ্লেষণের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চর্বি ও শর্করার ন্যায় অপরিহার্য জৈববস্তুর উদ্ভব হয়। প্রাণীরা ক্লোরোফিল-বিরহিত, অজৈব খনিজ হতে দেহধারণোপযোগী জৈবদ্রব্য প্রস্তুত করবার ক্ষমতা তাদের নেই, যেমন নেই উদ্ভিদজাতীয় ব্যাকটিরিয়া ও ফাঙ্গির দেহে।

সরাসরি প্রকৃতি থেকে আহার্য্য আহরণ করতে না-পারার অক্ষমতা প্রাণীকুলকে পথচারী করেছে, খাদ্যের সন্ধানে তাদের ঘুরে বেড়াতে হয় অহরহ, নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকা চলে না। ভূমি-তলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ও নাইট্রোজেন যথেষ্ট, বৃক্ষলতার ছুটাছুটির প্রয়োজন নেই, নিষ্ক্রিয় স্থির হয়ে বসে থাকলেও নির্ভাবনায় ভরণ-পোষণ চলে। ওদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক-কোষের এমিবাটিও তার শুঁড় বিস্তারে সদাই জৈবসামগ্রীর সন্ধানে তৎপর, উদরপূর্তির নিমিত্ত যদি কিছু পাওয়া যায়। প্রথম যুগ থেকেই এর সূত্রপাত। প্রাণী-বীজের চারিপাশ ঢাকা অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লি দিয়ে, কিন্তু উদ্ভিদবীজের অঙ্গে কঠিন আবরণ ; ক্ষুদ্র প্রাণী-প্রোটোপ্লাজমকে রক্ষা করে পাতলা ত্বক অথচ উদ্ভিদ-প্রোটোপ্লাজমের চতুর্দিকে কৈশিক ঝিল্লি। মনে হয় খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় সর্বাঙ্গীণ নিশ্চেষ্টতার দুরতিক্রম্য পরিবেশ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, ফলে সমস্ত উদ্ভিদজগৎ নিশ্চেষ্টতায় সমাচ্ছন্ন। শ্রমবিমুখ জড়ত্ব আচ্ছন্ন করে রেখেছে এদের স্মরণাতীত কাল থেকে, তাই জৈব অভিব্যক্তি-ধারা বিশেষ অগ্রসর হতে পারে নি, প্রাণীজগতের তুলনায় এরা অনগ্রসর, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিব্যক্তি-সঞ্জাত নব নব রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে নি উদ্ভিদ-জগতে। উদ্যোগ ও সক্রিয়তার সঙ্গে সংবিতের (চৈতন্য) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, একটির অভাব ঘটলে অপরটি অধিকক্ষণ বর্তমান থাকতে পারে না। উদ্ভিদ-জগতে তাই ঘটেছে লক্ষ লক্ষ শতাব্দীব্যাপী অবিচ্ছিন্ন নিস্পৃহতায় সমস্ত উদ্যোগ। পরগাছা পরজীবীদের নার্ভতন্ত্র কয়েক 'জনি' (বংশ) পরে অদৃশ্য হয়। প্রশ্ন উঠবে যে প্রথম অবস্থাতেই উদ্ভিদ-জগৎ ও প্রাণীজগৎ পৃথক পৃথক আবির্ভূত হয়েছিল কিনা। এরা জন্মকালে অর্থাৎ জীবজীবনের আদিযুগে যে মূলতঃ এক ও অভিন্ন ছিল তার সপক্ষে প্রমাণ যথেষ্ট। প্রথমেই বলা হয়েছে, এদের মধ্যে সাদৃশ্য এত অধিক যে বায়োলজির দিক থেকে পৃথক করা বেশ আয়াসসাধ্য। অনেক ছোট ছোট জীবের ত শ্রেণীবিভাগ করাই কঠিন। প্রাণীদের অনেক বৃত্তি উদ্ভিদের মত, আবার উদ্ভিদেরও প্রাণ বৃত্তির প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। যেমন জননবৃত্তি ; বৃক্ষদের দেহে উভয় লিঙ্গ

বর্তমান, এদের যৌনমিলন নিষ্প্রয়োজনের বিলাস, যৌন ও অযৌন উভয় প্রণালীতে জন্ম দিতে পারে এরা। নীচের স্তরের প্রাণীরা জন্ম দেয় অযৌন উপায়ে, ঝিনুক এবং আরও অনেকে উভয়লিঙ্গ, যৌন ও অযৌন দুই প্রণালীই ব্যবহৃত হয়। অনেক প্রাণী সারা শীত ঘুমিয়ে নিস্পন্দভাবে কাটায়। মনে হয় এও উদ্ভিদবৃত্তি। সাধারণতঃ উদ্ভিদ-জগতের স্থায়িত্ব অনপনয়ণীয় হলেও ধ্রুব সত্য নয়। জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কারের পর উদ্ভিদকে বোধশক্তিহীন বলা চলবে না।

সৌরতেজ প্রভাম্বিত আদি জীব যখন ধরাতলে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল, সৌরশক্তি তখন তার অন্তরে লুকানো। খাদ্য গ্রহণ উপলক্ষে তথা অন্যবিধ কারণে নড়াচড়া করতে হবে, তাতে ব্যয় হয়ে গেল সমস্ত সঞ্চিত তেজ। সূর্যশক্তিশূন্য ভাণ্ডার চলে কত দিন? সে কারণে আদি তেজ সৌরশক্তি সঞ্চিত রাখবার জন্য উদ্ভিদ-জগতের অভ্যুদয়। কাছের জলমাটি, আকাশবাতাস দিবা-লোক থেকে সুলভে সংগৃহীত খাদ্য, কার্যকরী শক্তি সন্নিবিষ্ট করে রাখতে এরা বেশ পটু, ক্লোরোফিলের মাধ্যমে সৌরতেজ সংরক্ষণের আধার হয়ে উঠল এরা, উন্নততর জীবজীবনের শরীররক্ষার্থে প্রয়োজনানুরূপ শক্তির সরবরাহ এখান থেকে। এ শ্রমবিভাগ—বৃক্ষ-লতার অণু-পরমাণুর জীবজগতের ব্যবহারার্থে সর্বদা প্রস্তুত রাসা-য়নিক শক্তি ইতস্ততঃ সঞ্চরণ বন্ধ হওয়ায় এ-শক্তি সম্পূর্ণ দেহজাত হয়ে বন্দী এবং বিবর্তন সীমাবদ্ধ। প্রথমাবধি উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের পরিপূরক, উদ্ভিদ অক্সিজেন যোগায় এবং প্রাণী যোগায় প্রশ্বাসজাত কার্বন ও দেহের নাইট্রোজেন; প্রাণীর একান্ত অপরিহার্য সৌরতেজ পুঞ্জীকৃত উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরসঞ্চিত ক্লোরো-ফিলে লতা পল্লবতৃণভোজীরা প্রত্যক্ষভাবেই আহরণ করে, সৌরতেজ মানুষ ও মাংসাশী পশু সংগ্রহ করে ছাগ, মেষ, গাভী, উষ্ট্র, বলদ ইত্যাদির মাংস হতে। প্রাণীর বিষ্ঠা ও দেহাবশেষ নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ, উদ্ভিদ-জীবন অপর্যাপ্তরূপে তা সংগ্রহ করে মৃত্তিকা হতে। প্রাণের এই দুই অংশ নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ, যেখানে উদ্ভিদ-জীবন বর্দ্ধিষ্ণু সেখানে উদ্ভিদভোজীও প্রচুর আবার মাংসাশীদের আস্তানাও এইখানে—তবে সংখ্যাল্প হয়ে আসে এরা ক্রমশঃ, অল্পসংখ্যক প্রাণীর উদরপূর্তির জন্য অধিক গাছপালা দরকার। মাংসাশীরা আরও কম—যে-কোনও স্থানে শশক, কাঠবিড়াল, মূষিক, হংস-কুক্কুটের চেয়ে পেচক, চিল, শৃগাল, নকুল নিশ্চয়ই অল্প। তৃণ ও উদ্ভিদ সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য। পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাণী ঘাস, পাতা শস্যবীজ খেয়ে জীবনধারণ করে, এক দগ্ধতপ্ত উষর মরুভূমি ও হিম-শীতল মেরু ছাড়া সর্বত্র এই নিয়ম। পায়রা, চড়ুই, হাঁস, টিয়া থেকে আরম্ভ করে গৃহপালিত পশু ছুঁচো, বেজী, বীবর, হরিণ, কৃষ্ণসার, হস্তী, উষ্ট্র, বানর প্রত্যেকে ফলমূল শাখাপ্রশাখাভোজী। এদিকে কেঁচো, কেন্নো, শুঁয়াপোকা, ফড়িং, ভ্রমর, পিঁপড়ে উদ্ভিদ-রাজ্যের উপর নির্ভরশীল। জলের উদ্ভিদ স্থল অপেক্ষা কম, এখানকার অধিবাসীবৃন্দের অনেকের শৈবাল ইত্যাদি খেতে আপত্তি নেই। সমুদ্রজলে ও নদীতে জলজ গুল্ম ও উদ্ভিদ যথেষ্ট বলে এরা আমাদের খাদ্যের ফলপ্রদ উৎস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাসমান গুল্মলতা না থাকলে সম্ভবতঃ বিশাল পারাবার বিরাট মরুতে পরিণত হ'ত। যে-সব মৎস্য আমাদের প্রধান খাদ্য তারা জীবনধারণ করে ছোট ছোট পোকা ও কুচোমাছ খেয়ে—যারা শুধু আণুবীক্ষণিক জলজ-পত্রপুষ্পের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদজীবনের সঙ্গে জীবজীবনের যোগ কেবল খাদ্যের ভিতর দিয়ে নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের সাহায্য সুষ্ঠু জীবনযাত্রায় একান্ত অপরিহার্য। গাছপালা সব সময় বাষ্পরূপে জল নিঃসৃত করছে, বৃক্ষসমন্বিত এক একর বনভূমি প্রত্যহ ষোল সহস্র গ্যালন জলীয় বাষ্প ত্যাগ করে। বনভূমির অব্যবহিত উপরের বায়ুস্তর কিরূপ আর্দ্রশীতল তা সহজেই অনুমেয়, মেঘ উপর দিয়ে যাবার কালে বারিধারা বর্ষণ না করে পারে না। সেজন্য বনভূমি এলোমেলো ভাবে ধ্বংস করে ফেললে মরুময় উষর ভূমির প্রসারের সম্ভাবনা থাকে, আঁধি (ধূলিঝঞ্ঝা) প্রতিরোধ অসম্ভাব্য হয়ে ওঠে এবং জমিক্ষয় নিবারণ করা যায় না, যার অবশ্যম্ভাবী ফল বন্যা। উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গ ভূভাগ ক্ষয় করিতে বিশেষ সফলকাম হয় না, তার কারণ মারাম্ ঘাস উপ-কূলবর্তী বালুকাস্তূপকে বেঁধে রাখে কঠিন বন্ধনে। অনেক উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল হতে নাইট্রোজেন তৈরি করে মৃত্তিকা উর্বর করে, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি নাইট্রোজেনের দান। উদ্ভিদ আর একটি প্রধান কাজ করে, তা হচ্ছে উত্তাপ সরবরাহ করা। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে তাকে ভাঙবার সময় যে স্ফুটন-ক্রিয়া চলে, এ উত্তাপ তার। সেজন্য বনভূমিসমন্বিত দেশে শীত প্রবেশ করে সবার শেষে।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ আমেরিকায় অজেটক্ সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল অথচ স্থায়ী হয় নি। পশুপালনের অজ্ঞতা এর অন্যতম কারণ বলা হয়। পশু-বিষ্ঠার নাইট্রোজেন-ক্রিয়া ভূমিকে উর্বর করে তোলে, তার অভাবে ফসল জন্মাবে কেমন করে?

গতি ও স্থিতি

প্রাণ গতিপ্রবণ, তার ধর্ম অনুসারে সে সৃষ্টির পর সৃষ্টি করে চলে, জীবসৃজনের উন্মাদনা তার বিভিন্নমুখী ধারায়। গতিধর্মের যে প্রচণ্ডতা অন্তরে নিয়ে প্রাণকণিকা বিকাশলাভ করেছিল তার অফুরন্ত উদ্যম সমৃদ্ধির পথে জীবজগৎকে এগিয়ে নিয়ে চলবার প্রয়াস করেছে নিরন্তর—মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম দেয় নি জীবন-প্রবাহ স্তব্ধ থাকে নি এতটুকু, ব্যক্তি-জীবনের মত পলে পলে তিলে তিলে সাবলীল প্রাণধারার অনবদ্য রূপ পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়ে সৌন্দর্যে সুষমায় ভরে উঠেছে। নিথর নিস্পন্দ থাকবার প্রলোভন এসেছে বার বার—প্রত্নযুগের লিংগুলে তার সাক্ষ্য, এক জাতের কৃমি-কীটের কোন পরিবর্তন হয় নি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে, ছত্রাক বহু সহস্র বৎসর ধরে প্রচুর পরিমাণে জন্মগ্রহণ করছে, এদের বিবর্তন হয় নি কিছুই। বলা হয় যে, এরা নিকট প্রতিবেশে আপনাদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে সুচারুরূপে, তা হলেও জীবনধারার অপর্যাপ্ত উচ্ছ্বাসে অবিচলিত থাকা কৃতিত্বের নয়, হীনতার কথা; মাঝে মাঝে প্রতিবেশের সমস্তটাই বদল হয়ে আমূল পরিবর্তন সাধিত

হয়েছে—জলবায়ুতে গাছপালায় আহার্য্য দ্রব্যে। ভূমিকম্প জলোচ্ছাস ঝঞ্চাপাত ইত্যাদি প্রায়ই হ'ত সে সময়। নিত্য নূতন উদ্ভাবন-ক্ষমতার অধিকারী না হলে কোন কালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত আদিম-যুগের প্রাণ-কণিকা। কত দিকে কত রূপে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে প্রাণ, বিশালতায় ব্যাপকতায় গভীরতায় তার তুলনা নেই। কবে কোন সুদূর অতীতে পরম গতিশীল প্রাণের বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল, আদিম গতিরূপের সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রাণধারা আজও প্রবহমাণ, উচ্ছলবেগে তরঙ্গাবর্ত্ত সৃষ্টি করে সে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে।

সূর্যরশ্মিজাল কোন এক সুদূর অজ্ঞাত যুগের প্রথম দিকে সোনারকাঠি ছুঁইয়ে ঘুমন্ত পুরীতে সাড়া পেয়েছিল, সেই আদিম প্রাণ কি করে দেহধারণ করল, কেমন করে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলজ কীট ও অন্ধমহীলতার মত প্রাণী কয়েক লক্ষ বংসরে বড় বড় সামুদ্রিক কর্কট ও ৮.৯ ফুট লম্বা মৎস্যাকৃতি প্রাণীতে পরিণত হয়েছিল আজ তা কল্পনা করা কঠিন। অবশ্য অগভীর ও জোয়ারের জলে ভেসে-আসা প্রাণীরা মৎস্য-বংশের কেউ নয়, মেরুদণ্ডীর আবির্ভাব এর বহু পরে। জেলির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণ-কণিকা আকার পরিবর্ত্তন করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল নিজস্ব দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদে। এই দৈহিক প্রয়োজন কি? তার রূপ কিরূপ?

এখানে প্রাণতত্ত্বকে অতিক্রম করে আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে, যেখানে মন ও প্রাণ এই দুই শক্তি মিলে-মিশে একাকার, স্বতন্ত্র সত্তা কিছু নেই, সেখানে সৃষ্টির সেই প্রান্তদেশে আমরা দেখতে পাই জীবের আদিম প্রবৃত্তি দুটি, আত্মরক্ষা ও বংশ-রক্ষা। জীব জন্মালেই বেঁচে থাকবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে এবং পরিণত অবস্থায় সে বংশরক্ষার উপায় খুঁজবে। জৈবিক প্রবৃত্তি বলা যেতে পারে এদের—জন্ম হতে মজ্জায় মজ্জায় মৌরসী-পাট্টা গেড়ে দখল করে থাকে জীবকে। সেজন্য মনোবিদ্‌রা বলেন যে, বংশকামনাবৃত্তি (অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তি) জীবের শরীর-মন সম্পূর্ণ অধিকার করে থাকে; এখন এ তত্ত্বটি স্বীকার করে নিলে আমাদের বক্তব্য আরও সরল হয়ে যায়। জীব জন্মালে আহার চাই। তখনকার পৃথিবীতে আহার্য্য এত সহজপ্রাপ্য ছিল না। প্রথম দুই-এক দল যারা ধরণীতে চেতনার সংবাদ বহন করে এনেছিল তাদের মধ্যে উদ্ভিদের ভাগই অধিক—কারণ মৃত্তিকার অস্তিত্ব না থাকায় খাদ্যের উপকরণ আহরণ করতে হ'ত সূর্য্যালোক হতে। এ কাজে উদ্ভিদের অধিকার একচেটে। এই প্রকার একটা গোলমেলে অবস্থার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল প্রথম জীবদল। হয়ত তারা আদি বাসস্থান অগভীর বালিগোলা জলে ভেসে ভেসে বেড়াত—ঝড়ঝঞ্ঝা-সাইক্লোন-তুফান প্রবল জলস্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে; আত্মরক্ষার জন্যে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরতে শেখাই তাদের প্রথম পাঠ। পরে খাদ্যসংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ হ'ল সেই থেকে দেহাকৃতি গঠনের সূত্রপাত। খাদ্যোপকরণ সন্ধানার্থে চলাফেরা অতি প্রয়োজনীয়, প্রাণকোষ সচল অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল কেবল এই কারণে। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে পরি-চিত হয়ে উঠতে বিশেষ বিলম্ব হয় না, ধীরে ধীরে নানারূপ অবস্থায় যোগসূত্র স্থাপন এবং সেই সঙ্গে সাড়া দেবার শক্তির উন্মেষ হতে থাকে।

অনুভূতিপ্রবণতা

আধুনিক পৃথিবীতে এমিবা (এক-কোষ জীব) স্বয়ংসম্পূর্ণ আণুবীক্ষণিক প্রাণী, এর অনুভূতি, শ্বাসগ্রহণ-ক্ষমতা, চলৎশক্তি, পরি-পাক ও নিঃসরণশক্তি জৈবত্ব দান করেছে একে। এর আভ্যন্তরীণ গঠনে জটিলত্ব যথেষ্ট। কোটি কোটি বৎসরের পুরাতন এরা, মৃত্যুহীন দেহ জৈব অমরত্ব দিয়েছে, তবু পৃথিবীর প্রথম প্রাণী এদের বলা অনুচিত, এর বিবর্ত্তনের ইতিহাস দীর্ঘ। জীব ও উদ্ভিদজীবনের সন্ধিস্থলে অবস্থিত হাইড্রা, উদ্ভিদজাতীয় আলজের কিয়ৎপরিমাণ অংশ আছে এর দেহে, বেশ কয়েকটি অংশে বিভক্ত করলে প্রতি অংশ পরিণত হয় এক একটি স্বতন্ত্র জীবে। সারাজীবন প্রায় স্থাণুর মত যারা কাটিয়ে দেয় সেই নিশ্চল-ভক্ষকদের দলভুক্ত এরা। নিস্তল জলাশয়ের মধ্যে থেকে শিকার ধরবার সময় শরীরকে পূর্ণ-বিস্তারিত করে রাখে, শুঁড়গুলির আকার বহু গুণ বেড়ে যায় দেহ থেকে, তার পর দংশনের জন্য প্রস্তুত। অচলিষ্ণু স্বভাবের প্রাণী কোরাল এবং সামুদ্রিক এনিমনও। খাদ্যসংগ্রহের জন্য চলাফেরা করবে না কিছুতে, নিকটে যা এসে পড়বে শুঁড় বাড়িয়ে করবে গলাধঃকরণ, তবে প্রবাল শৈশবাবস্থায় কিছুদিন চঞ্চল, চলাফেরা করে —পরে সমাধিস্থ; এক শ্রেণীর প্রবাল কলোনি তৈরি করে, বুদ্ধেরা এক স্থানে গিয়ে ভিড় করে, নবাগতেরা তাদের স্কন্ধে আরোহণ করে শ্বাসরোধ করে মারে—প্রবাল কলোনিতে জনতার ভিড় অত্যধিক। সামুদ্রিক এনিমনের মুখ আছে শুধু—বুক, পিঠ, মাথা, দক্ষিণ, বাম, উপর, নীচ আর কিছু না থাকলেও শিক্ষায় পরাঙ্মুখ নয়—ক্ষীণ, অতি সামান্য স্মরণশক্তির অধিকারী—ইঁট, কাঠ, কাগজ খাইয়ে কিছুক্ষণ ধাপ্পা দেওয়া চলে, পরে যা-তা জিনিষ গ্রহণ করতে চায় না। সন্তরণরত জেলী-মাছ দেখতে চমৎকার, ইন্দ্রিয়স্থানের প্রথম উদ্ভব হয়েছে এদেরই দেহে, কারণ এরা অন্ধকার ও আলো চেনবার এবং রাসায়নিক দ্রব্য নিরূপণ ক্ষমতার অধিকারী। স্পর্শের প্রভাব এদের দেহে যথেষ্ট, একটু ছুঁলেই লম্বা লম্বা শুঁয়ার মত শুঁড়গুলি থেকে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষাক্ত হুল বিদীর্ণ হয়ে বাহির হয়ে আসবে একযোগে, শত্রু দুর্ব্বল হলে তৎক্ষণাৎ দফা নিকেশ। স্পঞ্জ জল-তলের অধিবাসী একথা সকলেই জানেন। অথচ এই স্পঞ্জই জৈব বিবর্ত্তনের অন্যতম প্রধান সাক্ষী। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে একে উদ্ভিদদলে ফেলা যায়, না, প্রাণীদের দলে টেনে নেওয়া যায় তা নিয়ে সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল। এর অচলিষ্ণু স্বভাব গাছপালা-গোত্রের, তবে শৈশবে ভ্রমণ করে খানিকটা—দেহ উদ্ভিদকোষের নয় প্রাণীকোষের, আর খায় কঠিন জিনিষ। দেহভাগ ঝাঁঝরা, ক্রমাগত জল গিলছে উগরাচ্ছে, জলস্থিত আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে। এদের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই, নার্ভ নেই, টিসু অর্থাৎ মাংসতন্তুর আরম্ভ এইখান থেকে; অন্যান্য নিম্নস্তরের

প্রাণীর মত প্রায় প্রতি ছিন্ন অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাণী হবার ক্ষমতা রাখে।

অনেক দিন থেকে জীবনের পরিস্ফুরণ নূতনরূপে অভিব্যক্ত হবার চেষ্টা করছিল, আদিম অবয়ব (এমিবা—প্রোটোজোয়া স্তর) পরিত্যাগ করে আসতে সক্ষম হয়েছিল শুধু মেটোজোয়া—স্পঞ্জ; পরবর্ত্তীকালে উন্নতি হয়েছে কেবল পল্লি-এর দিক থেকে, স্পঞ্জ প্রকৃতির একটি অন্ধ গলি থেকে গেছে। মুখমণ্ডলবিহীন—সর্ব্বদেহ দিয়ে আহার্য্য শোষণ করে খায় যারা তাদের অঙ্গসঞ্চালনের প্রয়োজন কম। তাই সমুদ্রের নানা স্থানে বিভিন্ন ভাবে গড়ে উঠলেও সামান্য নার্ভ-গ্রন্থিও নেই এদের দেহে। অপর দিকে বদনসমন্বিত প্রাণীদের খাবার খুঁজবার জন্য নড়াচড়া করতে হয় অনেক—টিসু ও নার্ভ ধীরে ধীরে দেখা দেয়। জীবনের ইতিবৃত্তে নার্ভের অভ্যুত্থান অতি-প্রয়োজনীয় ঘটনা, বহিঃপ্রতিবেশের সঙ্গে আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হয়, বারংবার ঘাত-প্রতিঘাতে জন্ম হয় অনুভূতি-কেন্দ্রগুলির; স্থাবরত্ব ঝেড়ে ফেলে প্রাণী-জীবন হয়ে ওঠে গতিশীল। অঙ্গসংস্থানের ক্ষেত্রে অনুভূতির বিকাশ অপূর্ব্ব ঘটনা, এই সময় হতেই মস্তিষ্কের সূচনা। এই দলে তারামাছ, সামুদ্রিক শজারু, সামুদ্রিক-শশাদের রাখা হয়, ত্বক দেখা দিয়েছে এদের দেহে, সেজন্য পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাণীদের অপেক্ষা এরা উন্নত। খাড়া শৈল ও অনুরূপ বাধা অনায়াসে পার হয়ে যায়. অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরদাঁড়া, সাঁড়াশী, উত্তোলনযন্ত্র এদের পঞ্চভুজাকৃতি দেহকে অনুক্ষণ পরিষ্কার রাখতে ও খাওয়াতে ব্যস্ত।

ইতস্ততঃ যাতায়াত প্রাণী-বিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করে। সঞ্চরণ প্রথম আরম্ভ হয় খাদ্য অন্বেষণে, ভ্রমণের পাল্লা বিক্ষিপ্ত ও প্রসারিত হতে লাগল যত, স্নায়ুতন্ত্র তত সুসংগঠিত হয়ে উঠল এবং দেহে তার সংস্থান প্রতিষ্ঠিত হ'ল দৃঢ়রূপে। প্রোটোপ্লাজমের যুগ থেকে স্পঞ্জ-হাইড্রাযুগ অবধি আলাদা কোন নার্ভ দেখা দেয় নি, বিবর্ত্তন হয়েছে ক্রমশঃ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে। গমনাগমনের যথাযথ উপযোগিতা ঠিক করা ও পথনির্ব্বাচন এই দুইয়ের আনুকূল্যে গড়ে উঠেছে দেহের অন্তঃস্থিত স্নায়ুতন্ত্র ও অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ধরণীপৃষ্ঠে নব নব জীব-জীবনের অভ্যুদয়।

প্রাণরূপের সার্ব্বজনীন পরিবার থেকে সর্ব্বপ্রথম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে গাছপালা ও জীবজন্তু। অতিমাত্রায় কোমল ও নমনীয় সে যুগের প্রাণীদের কয়েকটি ধারা আজও অব্যাহত, তারা কণ্টকচর্ম্মী শামুক, কীট ও মেরুদণ্ডী। এককোষ প্রোটোজোয়া থেকে এনিমনের অভ্যুদয় অল্পসময়ের ভিতর হয়নি, কয়েক লক্ষ বৎসর পার হয়ে গিয়েছিল। এমিবা-প্রোটোজোয়ারা আজও আছে; জলা-পুষ্করিণী, খাল, বিলে আকৃতিবিহীন উদরসর্ব্বস্ব এরা ঘুরে বেড়ায়, মাপে ১/১০০´। স্পঞ্জ ও হাইড্রা, এনিমন, সামুদ্রিক ফার কোরাল জেলিমাছ প্রভৃতির দুটি দল ধরণীপৃষ্ঠে আবির্ভূত হ'ল বটে, কিন্তু বিশেষ কেউ উন্নতি করতে পারল না, স্পঞ্জ ত স্থাবরত্ব গ্রহণ করে বেঁচে রইল, অন্যান্যেরাও কেউ হ'ল অচল, আবার কেউ দেহে চুণ-অঙ্গারের আবরণ তৈরি করে সমুদ্রস্থ শৈলশ্রেণী নির্ম্মাণের কাজে লেগে গেল। ৭০।৮০ কোটি বর্ষ পূর্ব্বের জেলিমাছের শিলীভূত বিচরণ-চিহ্ন-নিদর্শন পাওয়া গেছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে সমুদ্রতল জনাকীর্ণ ছিল, নানা আকারের তারামাছ জেলিমাছ লিলি স্কুইট এনিমন গোষ্ঠীর প্রাণীরা যথেচ্ছ বিচরণ করত, কেউ কেউ আবার আকৃতিতে ১৫ ফুট দীর্ঘ। জীববিবর্ত্তন যদি উত্তোরত্তর উন্নতির পথে আর না অগ্রসর হ'ত তা হলে দুনিয়ায় একাধিপত্য হ'ত এদেরই। কিন্তু এদের পাশাপাশি আরও দুটি দল ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, এক দলের স্পষ্ট দুই পাশ ছিল, অপর দলের ছিল বিভিন্ন দেহাংশ। এক দল দেখা দিল শামুকরূপে, অপর দল অধুনালুপ্ত ত্রিবলী।

ত্রিবলী অপেক্ষাকৃত প্রাচীন প্রাণী, এক সময় জলতল ছেয়ে গিয়েছিল এদের অবাধ ভ্রমণে—আজ আর একটিও নেই, শুধু শিলীভূত দেহাবশেষ একসঙ্গে পাওয়া যায় অনেক, পরস্পর পরস্পরের দেহের কোমল অংশগুলি ঢেকে তালগোল পাকিয়ে থাকত শত্রুর কবল হতে রক্ষালাভার্থে, শেষে আত্মরক্ষার্থ দেহে কাঁটার উদ্ভব হয়। এদেরই গোত্র হতে উদ্ভূত সামুদ্রিক বৃশ্চিক, রাজা কর্কট ও ঝিনুকের গোষ্ঠী শত্রু হয়ে দাঁড়াল এবং নির্ব্বংশ হয়ে গেল ত্রিবলী। নির্ব্বংশ অনেকেই হয়েছে, কণ্টকচর্ম্মীরা প্রাচীন কালে শত শত জাতের ছিল, এখন মাত্র ১০-১১-এর অধিক দেখা যায় না, আদিম অমেরুদণ্ডীরা সহস্র সহস্র মাইল ব্যেপে সমুদ্রতলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এক সময়ে ইংলণ্ডের নিকটস্থ উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিকের তলে যে তরল কর্দ্দম তা ওদের জীবাশ্ম।

সেকালের সমুদ্র যে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল ও সর্ব্বদা অশান্ত থাকত তা বোধ করি না বললেও চলে। আর একটি ভয় উপস্থিত হয়েছিল, গমনাগমনের ক্ষমতা আয়ত্তে আসায় একে অন্যকে সব সময়েই আক্রমণ করে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করত। গতি যতই অবাধ হতে লাগল ততই পেটুক আর রাক্ষস হয়ে উঠল; বিশেষতঃ একটু কর্ম্মঠ শক্তিশালীরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল-শান্তদের দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় খুঁজত। সেজন্য একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল—নরম দেহের চারিদিক কঠিন বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে ফেলল এরা, চারিদিকের সমুদ্রজল থেকে খনিজ আহরণে উপাদান সংগৃহীত হ'ল কঠিন নির্ম্মোকের—আত্মরক্ষা তথা অল্পস্বল্প সংঘর্ষে কাবু না হয়ে পড়বার প্রকৃষ্ট পন্থা। কণ্টকচর্ম্মীর কঠিন ত্বক, শামুক-ঝিনুকের খোলস, আদিম মৎস্যের বুকপ্লেট, কাঁকড়া-চিংড়ির চর্ম্ম নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে উদ্ভূত। আত্মরক্ষা হ'ল বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত হয় নি। উত্তম-অনুত্তম এ কথাগুলি আপেক্ষিক, আজ যারা শ্রেষ্ঠ কাল তারা নিকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারে, কালের গতিতে ভাল জিনিষে ঘুণ ধরা সম্ভব। সুকঠিন বর্ম্মের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণই এক সময় গতিরোধ করে দাঁড়াল সমস্ত সম্ভাব্য উন্নতির উপায়ের—ডাইনসুরদের আমলে এ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। শঙ্খ, শামুক, ঝিনুক, কড়ি, গুগলি, কর্কট, চিংড়ি প্রায় সুদৃঢ় দুর্গে বাস

করে কোন উন্নতি করতে পারে নি লক্ষ লক্ষ বৎসরে। আত্মরক্ষার উপায় ঠিক হয়ে গেলে ঝুঁকি নিতে মন সরে না, দুঃসাহসিক কার্য্য ভীতিপূর্ণ হয়ে উঠে। পৃথিবীতে "শামুক যুগও" একবার এসেছিল, কড়ি, গেঁড়ি, গুগলি থেকে আরম্ভ করে শঙ্খ, ঝিনুক, শুক্তি, বিরাট বিশাল অষ্টপদ অক্টোপাস দশপদী স্কুইড নটিলস ছাড়া প্রাচীন মহাসাগর-গর্ভে অন্য কিছু মেলা দুষ্কর ছিল। অমেরুদণ্ডীবর্গে অক্টোপাস ক্যাটল মাছ যথেষ্ট উন্নত দেহযন্ত্রসমন্বিত। অক্টোপাসের নিবাস সমুদ্র-গর্ভস্থ গুহা অথবা জলশৈলের নির্জ্জন ফাটলে, প্রস্তর ইত্যাদি যোগাড় করে বাসাবাড়ী তৈরি করে আর অতর্কিতে লম্বা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ফেলে অন্যমনা পথচারীকে। এদের (এমোনাইট, অক্টোপাস স্কুইড ক্যাটল মাছ) ভ্রমণও উন্নত ধরনের। নিশ্বাস গ্রহণকালে সাইফন পম্পের ন্যায় জল টেনে নেয়, জল ছাড়বার বেগ ঠেলে দেয় উল্টো দিকে। অক্টোপাসের এরূপ গতি ঘণ্টায় ৪ মাইল।

ক্যাটল মাছ চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে পলায়নে ওস্তাদ, বহুরূপীর চেয়ে অধিক বর্ণপরিবর্ত্তন করতে পারে, তাতে ফল না হলে উল্টো দিকে কৃষ্ণ রঙের সিপিয়া নিক্ষেপ করে—যাতে পশ্চাদ্ধাবনকারী ঐ সিপিয়াকেই অনুসরণ করে চলে, যখন শত্রু নিজের ভ্রম বুঝতে পারে ক্যাটল মাছ ততক্ষণে উধাও। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এদের অনুভূতি বহু প্রকার ও তীব্র। অক্টোপাস-মাতার মনে মাতৃস্নেহের ক্ষীণ অভ্যুদয়, ডিমগুলি জড়িয়ে রাখে বাচ্চা বার না হওয়া পর্য্যন্ত। পলপি গোত্রের প্রাণিকুল এদের অব্যবহিত পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধির দিক থেকে যে অনেক পশ্চাৎপদ তা স্পষ্টই প্রতীয়মান। এরাও বেশী দিন প্রভুত্ব করতে সক্ষম হয় নি, কারণ সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এদের আশানুরূপ উন্নতিসাধন হয় নি। বিবর্ত্তনধারায় যে দল এদের কিছু পরে আবির্ভূত হয়েছিল তারা, কর্কট কিছু কীট-পতঙ্গ—শেষে মৎস্যকুল। মেরুদণ্ডীর মধ্যে মাছ ও অমেরুদণ্ডী কীট ব্যতীত অপর সকলে যা ছিল তাই রয়ে গেছে, অনেকে একেবারে বিলুপ্ত। কীটের অভিব্যক্তি ও মাছের উন্নতি জীবন-ইতিবৃত্তে প্রয়োজনীয় অধ্যায়, আমাদের নিজেদের পুরনো ইতিহাস লুকানো এর ভিতর, আমরা মাছেদের অধস্তন বংশধর। মেরুদণ্ডী-বিবর্ত্তনের প্রথম অধ্যায়ে মাছেদের আগমন, সে বিবর্ত্তন আজও চলেছে অব্যাহত ভাবে, মানুষ তার আধুনিক বংশধর। অভিব্যক্তির যে ধারা জন্ম দিয়েছিল কীটেদের তার চরম প্রকাশ-মৌমাছি, উইপোকা, পিঁপড়ে। দার্শনিকপ্রবর আঁরি বার্গস বলেছেন যে, মানুষকে যদি ধরাপৃষ্ঠের অধিপতি বলে মেনে নেওয়া যায়, পিপীলিকা তা হলে অন্তর্ভূমির একচ্ছত্র সম্রাট। বাস্তবিক, এদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অনুধাবন করলে বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষের চেয়ে এরা হীন বলে বোধ হয় না। এদের সামাজিক সংগঠন, রীতিনীতি, পরিশ্রমসিদ্ধ সুউন্নত বসতি, রাস্তাঘাট, দাসদাসী, এমন-কি পশুপালন মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। মানসিক বিবর্ত্তনের অন্যতম প্রধান শাখায় উদ্ভুত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের সংহতি শৃঙ্খলার অপূর্ব্ব পরিচয়।

বিশাল মহীরুহ যেমন ছোট বড় অগণিত শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে প্রবহমাণ প্রাণসত্তাকে প্রকাশ করে, অনাদিকাল হতে অভিব্যক্তির অসংখ্য ধারা ঠিক সেই মত ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে প্রকাশিত। তবে সাফল্যলাভ করেছে শুধু (১) সন্ধিপদ গোষ্ঠীর কাঁকড়া, চিংড়ি, বিছে, মাকড়সা, মধুপ পিপীলিকা, উই; (২) শামুকগোষ্ঠী এবং (৩) মেরুদণ্ডী। যারা সবিশেষ কৃতকার্য্য হয় নি অথচ একেবারে বিলুপ্ত হয়েও যায় নি তাদের সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। কৃমি এক প্রধান সম্প্রদায়। কেঁচো কেন্নো জোঁক ও নানাবিধ পরজীবী-রূপে এদের অধিষ্ঠান। পৃথিবীর শৈশবকাল হতে কেঁচো কেন্নো ভূমির উর্ব্বরতাবৃদ্ধির জন্য যা করেছে তার তুলনা নেই। এদের বাস অন্তর্ভূমিতে। সুড়ঙ্গ তৈরীর সময় মৃত্তিকা গিলে ফেলে লেজের শেষের দিক দিয়ে নিঃসৃত করে দেয়, কেবল মৃত্তিকামধ্যস্থ খাদ্যভাগ (যেমন পদার্থ) গ্রহণ করে। পরিপাকযন্ত্রের পেষণে এবং পরিপাকরসের মিশ্রণে চূর্ণ-বিচূর্ণ আর্দ্র মৃত্তিকা ধরণীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে চলেছে বহুকাল যাবৎ। ডারউইনের হিসাবমত দেখা গেছে যে, তিন ইঞ্চি পুরু মাটি বদলে দিতে এদের প্রায় ১৫ বৎসর সময় লাগে। নিজেদের উন্নতি হোক বা না হোক পৃথিবীর রূপ-পরিবর্ত্তনে এদের দান স্মরণীয়।

ভারতে নারীজীবনের নূতন গুরুত্ব

শ্রীদুর্গাবাই দেশমুখ

শিল্পবিপ্লব এবং ভারতবর্ষ

পাশ্চাত্যের ন্যায় ভারতেও শিল্পের বিকাশ মানেই কুটীর-শিল্পের ধ্বংস। ভারতে দেশী হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের ধ্বংসের সূচনা হয় গত শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি হইতে। ১৮৫৫ সনে ভারতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল পাটকল। প্রায় এই সময়েই প্রতিষ্ঠা হইল প্রথম কটন মিল বা কাপড়ের কলের। এই সকল প্রাথমিক সূচনা হইতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া বর্তমানে আমরা যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছি তাহা হইতেছে এই যে, এখন আমাদের পাটকল আছে ১১২টি —তন্মধ্যে দশটি ছাড়া আর সবগুলিই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, আর আছে প্রধানতঃ মাদ্রাজ, আহমেদাবাদ এবং বোম্বাইয়ের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত ৩৫০টি বড় কাপড়ের কল।

ক্রমে ক্রমে গ্রামের ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য জগতে আসিয়া পৌঁছিল শহরের কাহিনী এবং কর্মীদিগকে ওখানে যে মজুরি দেওয়া হয় তাহার কথা। ফলে অনেকেই গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিয়া গেল—প্রথম হিড়িকে অনেকেই স্ত্রীপুত্রকে গ্রামে রাখিয়া গিয়াছিল—তাহারা বসবাস করিবার জন্য শহরেই রহিয়া গেল। ইহার দরুন যেমন একদিকে গ্রামীণ জীবনের যৌথ পরিবারের উপর কুফল দেখা দিল, অন্যদিকে তেমনই শহরের নামগোত্রবিহীনতার মধ্যে নোংরা ও জনাকীর্ণ বস্তিগুলিতে সামাজিক সংরক্ষণ-নিরপেক্ষ এক নূতন একাত্মক যৌথ পরিবার গড়িয়া উঠিল—স্ত্রীলোকের শিথিল নাগরিক জীবনের দ্রুততর চলমান গতির সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে এবং কেবলমাত্র তাহাদের শিশুদের প্রতিপালন করিতে।

অনিবার্যরূপেই যেমন নাগরিক পারিপার্শ্বিকে অর্থের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া উঠিল, তেমনি নারীরাও খাটিয়া খাইবার কথা বিবেচনা করিতে লাগিল এবং অচিরেই নারী-শ্রমিকদিগকে কলকারখানার কর্মে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

শিল্পে স্ত্রীলোকদের নিয়োগের প্রগতির ব্যাপারে কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা পরস্পরবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। আপনাদের মনে এই পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে আমি দুইটি বৃহৎ শিল্প হইতে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—ইহাদের প্রবণতা প্রদর্শনের নিমিত্ত—

(ক) পাট—ভারতের সমগ্র নারী-শ্রমিক-সমাজের শতকরা ৫৩ ভাগ কাজ করে পাটকলে। ২,৬০,০০০ হাজার কর্মীর মধ্যে (১৯৫৫ সনের সংখ্যা) প্রায় ২৫,০০০ হইতেছে স্ত্রীলোক। ইহার মানে সাকুল্য শ্রমশক্তির মোটামুটি শতকরা ৯.৭ ভাগ। কয়েক বৎসর আগে নারী-শ্রমিকদের শতকরা হার ছিল ১৪ জন।

(খ) বস্ত্র—১৯৫০ সনে বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের সংখ্যা ছিল ৬২২,৩৩৯, জন তন্মধ্যে ৫২,৬২৮ জন ছিল স্ত্রীলোক—সমগ্র শ্রমশক্তির শতকরা ৮.৫ ভাগ। ১৯২৭ সনে শ্রমশিল্পে নারীদের শতকরা হার ছিল ১৯.৪ এবং কর্মে নিযুক্ত নারীর সংখ্যা ছিল ৬৬,৫৬২ জন—যদিও সমগ্র শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল মাত্র ৩,৪২,৯৪১। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কর্মে নিযুক্ত পুরুষদের সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং নারীদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে প্রভূত পরিমাণে। নারী-কর্মীদের সংখ্যার এই ন্যূনতা সব রাজ্যেই ঘটিয়াছে। বোম্বাই রাজ্যে ১৯২৯ সনে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ১৩.৭ আর ১৯৫০ সালে তাহা হ্রাস পাইয়া হইয়াছে শতকরা ৭.৭।

(Social welfare, vol 1, No 4, পদ্মিনী সেনগুপ্তা)

এই সকল সংখ্যা হইতে, অন্যান্য দেশগুলির প্রবণতার নিরিখে বিচার করিলে হয়ত আমাদের দেশে এই দুইটি

শিল্পেই কর্ম্মরত নারীদের সংখ্যা যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে সেই তথ্যই উদ্‌ঘাটিত হয়।

শ্রম-শিল্পে কর্ম্মে নিয়োগের সংখ্যাহ্রাসের কারণাবলী

যে দুইটি শিল্পে নারীদের সংখ্যাহ্রাসের বিষয় উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার মূলগত উৎস হয়ত নিহিত রহিয়াছে হিতকর শ্রম আইনের সাময়িক কার্য্যকারিতার মধ্যে। স্ত্রীলোক-দিগকে এখন আর 'সস্তা' শ্রমিক' হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে না, অতিরিক্ত পরিশ্রম এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে অতীতের ব্যাপার। ১৯৪৮ সনের ফ্যাক্টরিজ এক্ট অনুসারে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার পর স্ত্রীলোকদিগকে কাজে লাগানো যাইতে পারে না এবং রাত্রির 'শিফ্‌টে' পুরুষ শ্রমিকদিগকে সেই সকল কাজের ভার পর্য্যন্ত লইতে হয়, যাহা নারীদের ঠিকা কাজ (Women's Jobs) বলিয়া পরিচিত। উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য কাজ চলিতেছে বহুসংখ্যক 'শিফটে'।

মজুরির সমানীকরণ, ন্যূনতম মজুরি এবং স্ত্রীলোকেরা যে মাগগি ভাতা পাইয়া থাকে এ সকলেরই তাৎপর্য্য এই যে নারীদের শ্রমের সঙ্গে পুরুষদের শ্রমের তৌল করিতে হইবে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে। নারী-শ্রমিকদিগকে যে এখন 'মেটার্নিটি বেনিফিট' দিতে হয় এবং তাহাদের জন্য যে শিশু-রক্ষণাগারের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহার দরুন কারখানার ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্য একটি তথ্য যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্ম্মরত স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রী এবং বিধবা যাহাদের—পুরুষদের অপেক্ষা অধিক না হইলেও অন্ততঃ তাহারা যা রোজগার করে সেই পরিমাণ রোজগারের প্রয়োজন—এবং প্রায়শঃই তাহারা নিজেদের উপার্জ্জন দ্বারা বৃদ্ধিশীল পরিবারসমূহ প্রতিপালন করিতেছে।

শিল্প-ক্ষেত্রে কর্ম্মনিয়োগ

শিল্পে নারীদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখাইবার উপযোগী সংখ্যাসমূহ একত্রিত করা দুরূহ ব্যাপার। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, নারীদের কর্ম্মে নিয়োগের সুযোগ-সুবিধার সংখ্যা প্রভূতপরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সংখ্যা হইতে কিন্তু দেখা যায় যে, কর্ম্মে নিয়োগের দাবি প্রাপ্তব্য অবস্থাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। যখন আমরা এ বিষয়টা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি যে, ১৯৫৩ সনে সারা ভারতে ৫৫,০০০-এরও অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোক প্রবেশিকোত্তর (Post Matriculation) অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন ইহা আমাদের চোখের সামনে পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে, আগামী বৎসরগুলিতে শ্রমশিল্পের ক্ষেত্র এমন এক বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ শ্রমশক্তির প্লাবনে ভাসিয়া যাইবে যাহাকে তাহার শিক্ষাগত পটভূমিকার দরুন চিকিৎসাবিষয়ক বর্গের (Medical categories) (নার্স, ধাত্রী হেলথ ভিজিটার প্রভৃতি) অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যাইবে না—যদিও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছনোর জন্য ইহাদের প্রয়োজন হইবে বিপুল সংখ্যায়।

স্ত্রীলোকদের শিল্পবিষয়ক নূতন সুযোগ-সুবিধা

আমরা যে সকল বৃহৎ শিল্পের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সেগুলিতে নারীদের কর্ম্মে নিয়োগের সাময়িক বিপর্য্যয় সত্ত্বেও দেশে নূতন নূতন শিল্পে নারীদের শ্রমশক্তি বিনিয়োগের দাবি ক্রমবর্দ্ধমান। খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে কর্ম্মরত কতকগুলি ফার্ম্ম এবং রেডিয়ো যন্ত্র প্রস্তুতি লইয়া যাহারা কাজকারবার করে এমন কয়েকটি ফার্ম্মের কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিতেছেন যে, যে বিশেষ ধরনের কাজ তাঁহারা দিয়া থাকেন তাহার পক্ষে নারীদের শ্রম অত্যুৎকৃষ্ট এবং তদপেক্ষাও অধিকতর-রূপে ইহা তাঁহাদের নিকট পরিস্ফুট হইয়াছে যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সকল মেয়ে আগে শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে আসিত না, অপেক্ষাকৃত উচ্চতর যে মজুরি দেওয়া হয় তাহা বিবেচনা করিয়া তাহারা উক্ত ক্ষেত্রে কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ক্রম-বর্দ্ধমানরূপে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। দক্ষিণের টেলিফোন ফ্যাক্টরিসমূহ এবং উত্তরের উদ্বাস্তু বেতার কারখানাসমূহ—(Refugee radio factories) নারীরা অভিনব দক্ষতা অর্জ্জনে যে সন্তোষজনক কর্ম্মকৌশল প্রয়োগ করিতেছে তাহা বিবেচনা করিয়া ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহ সহকারে নারীদের কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছে। আইনের অধীনে প্রদত্ত কতক-গুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা—যেমন মেটার্নিটি বেনিফিট, 'ক্রেশে' (creches) প্রভৃতি নারীদের কর্ম্মে নিয়োগের পরিমাণকে (volume) যে প্রভাবিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ম্মে নিয়োগে হ্রাস কিন্তু হইয়াছে সামগ্রিকতার চেয়ে বরং আপেক্ষিক এবং নারী কর্ম্মীদের ব্যাপক আকারের ছাঁটাইয়ের কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নাই। কারখানাসমূহে কর্ম্মে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা এবং সামগ্রিক কর্ম্মনিয়োগের শতকরা হার এই সম্পর্কে কৌতূহলের উদ্রেক করিবে।

বৎসর	কারখানাসমূহে কর্ম্মে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা	সামগ্রিক কর্ম্ম-নিয়োগের শতকরা হার
১৯২৭	২,৪২,৬৫৬	১৬.৯৫
১৯৩২	২,১৫,৩৮১	১৬.২০
১৯৩৭	২,৩৭,৯৩৩	১৪.২০
১৯৪২	২,৬৫,৫০৯	১১.৬২

১৯৪৭	২,৬৩৯২৩	১১·৬০
১৯৫২	২,৭৩,৮১৪	১১·২০
১৯৫৪	২,৮০,০৬৯	১১·৩৬

ইহা দেখা যাইবে যে, সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে কারখানায় কর্মে নিযুক্ত নারীদের সামগ্রিক সংখ্যায় কোনও হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে নাই। পক্ষান্তরে তাহা ঈষৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সামগ্রিক চিত্রটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, তুঙ্গভদ্রা বাঁধে ১২,০০০ এর উপর স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়াছে প্রত্যক্ষ এবং চুক্তিবদ্ধ (Direct and contract) শ্রমিকরূপে, হীরাকুঁদ বাঁধ পরিকল্পনায় ৫,০০০এর উপর এবং অন্যান্য জলসেচ পরিকল্পনাসমূহে ১০,০০০এর উপর স্ত্রীলোককে কাজে লাগানো হইয়াছে।

নারীদের উপর শিল্পায়নের সংঘাত

শিল্পময় ভারত তাহার শ্রমশক্তির সরবরাহ আহরণ করে গ্রামসমূহ হইতে এবং এই সম্পর্কে লুইসা হাওয়ার্ড তাহার 'লেবার ইন্ ইণ্ডিয়াস্টার এণ্ড ইন্টারনেশন্যাল ষ্টাডি' নামক পুস্তকে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আমাদের স্মরণীয়।

শহর এবং শিল্পের চৌম্বক আকর্ষণ কেন গ্রামাঞ্চলসমূহ হইতে পুরুষ এবং নারীদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাহা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে ডাঃ বি· রামমূর্তি কৃত Agricultral labour—how they work and live—কৃষি-শ্রমিক—তাহারা কিভাবে কাজ করে এবং থাকে—এতৎসম্পর্কিত সাম্প্রতিক রিপোর্টে। কৃষি-শ্রমিক এবং শিল্প-শ্রমিকের জীবনধারার মধ্যে যে বৈষম্য বিদ্যমান এই রিপোর্ট হইতে তাহা উদ্ঘাটিত হয়। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ১৯৫০-৫১ সনে একটি কৃষি-শ্রমিক পরিবারের মাথাপিছু গড়পড়তা আয়ের সঙ্গে শ্রমশিল্পে নিয়োজিত পরিবারের (১৯৫০) আয়ের তুলনা করা হইয়াছে। দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ ইহা দেখা গিয়াছে যে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ পরিবার মাথাপিছু ১৬০্ টাকা উপার্জন করিয়াছে সেখানে শহরের পরিবারগুলির আয় হইয়াছে ২৬৮্ টাকা। অনুরূপ ভাবে উড়িষ্যায়—যাহা একটি অত্যন্ত দরিদ্র এবং অনগ্রসর রাজ্য, তুলনীয় সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে ৭৯ এবং ১৪৫।

নারীদের উপর এবং পরিবারের উপর সংঘাতকে মোটামুটি দুইটি মুখ্য পর্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর গৃহিণীরা শিশুসন্তান এবং বৃদ্ধ পুরুষ ও বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকগণসহ বাড়ীতে থাকিয়া যায় এবং উপার্জনশীল ব্যক্তির নিকট হইতে মাসিক ভাতা পাইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা চলিয়া আসে শহরের ভাড়াটে বাড়ী বা বস্তিতে বাস করিবার জন্য, অথবা ইহাদের মধ্যে যাহারা অধিকতর ভাগ্যবান তাহাদেরই শুধু আশ্রয় জুটিয়া থাকে কারখানার মালিক কর্তৃক ব্যবস্থিত বাসগৃহে। দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্তদের মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক শিল্পমূলক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতের বিভিন্ন শিল্পে নারী-শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ।

এই সকল নারী-শ্রমিকদের অবস্থার মধ্যে তারতম্য আছে, কিন্তু রাজ্য এখন অত্যন্ত প্রযত্নের সহিত তাহাদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছে। 'এমপ্লয়িজ ষ্টেট ইন্সুরেন্স এক্টে'র অথবা 'দি মেটার্নিটি বেনিফিট এক্টে'র রক্ষণাধীনে সন্তানসম্ভাবিতা নারী-শ্রমিক অর্ধ বেতনে বার সপ্তাহের ছুটি পাইবার এবং কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের পর বৃহত্তর কারখানাগুলিতে (যাহাতে পঞ্চাশ জনের অধিক স্ত্রীলোক কর্মে নিযুক্ত আছে) ক্রেশে বা শিশুর জন্য শিশু-রক্ষণাগারের সুযোগ-সুবিধা লাভের আশা করিতে পারে। সকাল ছয়টা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা এই সময়টুকু ছাড়া তাহাকে কাজ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। ভারী জিনিষ তোলা তাহার পক্ষে বারণ এবং তাহার পৃথক প্রসাধন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। এখন একজন (নারী) পাট-শ্রমিকের মোট ন্যূনতম আয় হইতেছে ৬৩৷৷০ আনা—যুদ্ধকালীন মাসিক ২০্ টাকার স্তর এবং ১৯৩৮ এর মাসিক ১৩্ টাকার স্তরের তুলনায় ইহাকে যথেষ্ট উন্নত স্তরেরই বলিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের সদস্যা পদ্মিনী সেনগুপ্তার কথায়—"আজিকার দিনের বেতনের হার, কাজেই নারী-শ্রমিকদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ আত্মসম্মানবোধ আনিয়া দিয়াছে। কারণ যদিও জীবিকানির্বাহের ব্যয় অত্যধিক, তথাপি সে যে বেতন পায় তাহা একজন সম্মানিতা স্ত্রীলোকের বেতন এবং তাহার প্রেষ্টিজ, কাজেই, স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যদিও স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশই নিরক্ষর—[কারখানা-মালিক সমিতির (Millowners' Association) মতে ১৯৫১ সালে বোম্বাইয়ে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ২·৭৫ এবং এই একই বৎসরে মাদ্রাজে এই হার ছিল ঈষৎ উচ্চতর], তৎসত্ত্বেও তাহারা তাহাদের শ্রেণীর অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় সুখী, প্রফুল্ল এবং সময় সময় তাহাদের জন্য উত্তম বাসগৃহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নারী-শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দিকেও ক্রমবর্ধমানরূপে যত্ন লওয়া হইতেছে এবং অনেকগুলি কারখানায় বিশেষতঃ বোম্বাই এবং দক্ষিণ ভারতে সমাজ শিক্ষা ক্লাসসমূহও (Social Education classes) খোলা হইতেছে। স্ত্রীলোকদের এখন আলাদা বিশ্রামকক্ষ আছে, সময় সময় তাহারা চলচ্চিত্র দেখিয়া থাকে, বেতার শোনে, বুনিতে এবং উত্তমরূপে শিশুদের দেখাশুনা করিতে

শেখে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, কল্যাণব্রতী নাগরিক হওয়ার মানে কি স্ত্রীলোকেরা তাহা উপলব্ধি করিতে সুরু করিয়াছে।

পরিবারের উপর সংঘাত

ভারতে কারখানাসমূহে স্ত্রীলোকদের নিয়োগসম্পর্কিত গোড়াকার দিকের যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, কাজের সময় শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য অনেকে আফিং ব্যবহার করিত এবং তাহাদের সংখ্যাও কম ছিল না যাহারা কারখানার দীর্ঘসময়ব্যাপী দৈনন্দিন কার্য্যকালে চাঙ্গা থাকিবার জন্য টোটকা ঔষধ সেবন করিত। সৌভাগ্যক্রমে আজিকার দিনে এই সকল কাহিনী অতীতের কাহিনীতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে—যদিও একথা সত্য যে, স্ত্রীলোকেরা যে সকল 'লাইনে' বাস করে এবং যে সকল কারখানায় তাহারা কাজ করে এতদুভয় স্থানেরই হাড়ভাঙা খাটুনি প্রায়শঃই তাহাদের স্বাস্থ্যের উপর ক্রিয়া করে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, স্বাধীন ভারতকে উত্তম মাতৃ-নীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাকল্পে এখনও বিস্তর জমি তৈরি করিতে হইবে। একদিকে অনেকগুলি পাটকল এবং কাপড়ের কল অধুনা এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে নিরক্ষরতার জন্য এবং প্রায়শঃই প্রাপ্তব্য সুযোগ সুবিধাসমূহ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকার দরুন অন্যান্যদের আজও পর্য্যন্ত নির্ভর করিতে হয় স্থানীয় দাইদের উপর, ইহার ফল দাঁড়ায় শিশু এবং মাতৃমৃত্যুর উচ্চ হার। এখন সব-কিছুই নির্ভর করিতেছে নারী-শ্রমিকদের মধ্যে অক্ষর জ্ঞান প্রসারের এবং সেই সকল নারীকল্যাণকর্মীদের ঠিকমত কাজে লাগানোর উপর যাহারা ফ্রি হাসপাতাল এবং যে সকল স্বেচ্ছামূলক সমাজ-কল্যাণ সংস্থার সাহায্যপ্রাপ্তি দ্রুত সহজলভ্য হইয়া উঠিতেছে তৎসমুদয়ের সহিত নারী শ্রমিক-দের যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে।

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি লক্ষ্যবস্তু হইবে—বাসগৃহের বিশেষতঃ বস্তি অঞ্চলের উন্নতিবিধান। একথা বিশ্বাস করিবার কিছু কারণ রহিয়াছে যে, শহর অঞ্চলে তরুণদের অপরাধপ্রবণতার একটা মোটা অংশের উদ্ভব হয় বস্তি এলাকায়—বিশেষতঃ মাকে যেখানে অন্যত্র কাজ করিতে হয়। এমনকি সুরুচিসম্পন্না শ্রমোপজীবিনী মায়েরাও, তরুণ বালকেরা শহরের রাস্তা হইতে যে সকল অবাঞ্ছিত সঙ্গী যোগাড় করিয়া লয় তাহাদের হাত হইতে নিজেদের শিশুদের রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু যথোচিত পরিকল্পনায় নির্ম্মিত, কম্যুনিটি কেন্দ্র এবং অবসরবিনোদনের সুযোগ-সুবিধাসমন্বিত বাসগৃহ 'এষ্টেটে'র দ্বারা এই অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারিত। পরিচ্ছন্ন এবং যথোপ-যুক্ত থাকিবার আস্তানাকে বলা যাইতে পারে প্রত্যেক গৃহিণীর জন্মগত অধিকার। এই অধিকার সেই স্ত্রীলোকের আরও কত বেশী যে তাহার স্বামীর মৃত্যু, অসুস্থতা, অথবা কর্ম্মে নিয়োগের অসম্ভাব্যতার মত দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিবশতঃ তার শিশুদের জন্য রোজগার করিতে, তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে বাধ্য হয়।

যুগসন্ধিক্ষণে নারীমন

স্বাধীনতার পর হইতে ভারতের শিক্ষিতা নারীরা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সকল স্তরের ভারতীয় নারীদের মনের উপরেই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সুফল সর্ব্বাধিক লক্ষণীয় হইয়াছে সাক্ষর নিম্নমধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মধ্যে। পর পর পৃথিবীর তিনটি বৃহত্তম শক্তির রাষ্ট্রদূতরূপে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীরূপে গান্ধীজীর সহকর্ম্মিণী রাজকুমারী অমৃত কাউরের নিয়োগ, আর কেন্দ্রে ও রাজ্যসমূহে উপমন্ত্রী এবং সেক্রেটারীরূপে ক্রম-বর্দ্ধমান সহযোগ—তাহাদের নিকট গর্ব্ব এবং প্রেরণার উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একমাত্র নয়া দিল্লীতেই আছেন চল্লিশ জন নারী এম-পি। ১৯৩০ সন হইতে চল্লিশ এবং ১৯৪০ সন হইতে ১৯৫০ সনে যেখানে নারীদের মধ্যে ছিলেন শুধু শিক্ষিকা, নার্স এবং 'লেডি' ডাক্তার আজ সেখানে তাঁহাদের দলপুষ্টি করিয়াছেন, রেডিও অফিসিয়াল, সমাজ-শিক্ষাকর্মী, (Social Education workers) আইনজীবী, ম্যাজিষ্ট্রেট, পেশাদার সমাজ-কল্যাণকর্ম্মী (Professional Social Welfare Workers) টেলিফোন অপারেটার, সাংবাদিক প্রভৃতি। একজন নারী বৈমানিক লাভ করিয়াছেন আন্তর্জ্জাতিক পুরস্কার।

স্ত্রীলোকেরা যেরূপ সাফল্যের সহিত নিখিল ভারত হ্যাণ্ডলুম বোর্ড, নিখিল ভারত হ্যাণ্ড ক্র্যাফটস বোর্ড এবং নিখিল ভারত কুটীরশিল্প এম্পোরিয়ামগুলির জন্য কাজ করি-য়াছে তাহাও লক্ষ্য করিলে কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। কুলগত এবং ব্যবসাগত উভয় দিক দিয়াই স্ত্রীলোকেরা প্রমাণ করি-য়াছে যে, নারীরা পুরুষদের কাজের উৎকর্ষসাধন যদি নাও করিতে পারে, তবে অন্ততঃ তাহাদের সমকক্ষতা করিতে তাহারা অপারগ নহে।

দুইটি বিশেষ পরীক্ষণ

স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সমাজকর্মীরূপে এবং সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের সেক্রেটারীরূপে আমি দুইটি বিশিষ্ট ধরণের কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। বহু বৎসর পূর্ব্বে

অন্যের এক দল সমাজকর্মী-গোষ্ঠী অন্ধ্র মহিলা সভা গঠন করেন। ইহা এখন একটি বড় স্বেচ্ছামূলক নারী কল্যাণ এককে (Voluntary women's welfare unit) পরিণত হইয়াছে—একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুল বা কারিগরি বিদ্যালয়, মাতৃনীতি হাসপাতাল, গ্রন্থাগার এবং মুদ্রাযন্ত্র ইহার অঙ্গীভূত। বহু বালিকা এবং স্ত্রীলোক যাহাতে সমাজের উপার্জনশীল ব্যক্তি হইবার সামর্থ্য অর্জন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পাঠ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইয়াছে এবং এমন ভাবে তৈয়ারি করিয়া এরূপ বহু বালিকাকে আমরা বাহিরে পাঠাইয়াছি যাহারা নিজেদের অন্নসংস্থান এবং তাহাদের পরিবারকে সাহায্য করিবার মত যথেষ্ট অর্থ রোজগার করিতে পারে। এই কর্ম এখন সরকার কর্তৃক সাহায্যাকৃত হইতেছে এবং কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের অর্থসাহায্যও লাভ করিতেছে—এই প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষালাভার্থিনী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালিকাদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। শিল্পায়নের দিক হইতে হয়ত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে—নাগরিক পরিবারসমূহের কল্যাণকল্পে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত "দি পাইলট সোশিও ইকোনমিক প্রোজেক্ট" নামক সামাজিক অর্থনীতিমূলক পরিকল্পনা। নয়া দিল্লীর নিকটবর্তী নাজফগড়ে প্রতিষ্ঠিত দেশলাই কারখানার লক্ষ্য হইতেছে—স্ত্রীলোকেরা যাহাতে নিজেদের বাড়ীতে ও কারখানায় উভয়ত্রই দেশলাই প্রস্তুতি এবং বাক্সবন্দী করার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহাদিগকে তদুপযোগী শিক্ষা প্রদান করা। "দি ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে"র কার্যনির্বাহক সমিতিতে বসেন কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ-পর্ষদ, শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং নয়া দিল্লী সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্টার। কারিগরি শিক্ষণ এবং অর্থের ব্যবস্থা করেন শিল্পবাণিজ্য মন্ত্রণালয়। উক্ত অঞ্চলের ১,৩০০ পরিবারের মধ্যে তথ্যানুসন্ধান কার্য করেন সেই সকল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মী যাঁহারা নারী সংগঠনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জন্য সেবামূলক কল্যাণ-কর্মের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যহ ৫০০ গ্রোস দেশলাইয়ের বাক্স উৎপাদিত হইতেছে এবং প্রথম বৎসরে ক্রমে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা ৫০০ শত। যে উদ্বাস্তু অঞ্চলে ইহা অবস্থিত তাহার পক্ষে ইহাকে বিরাট সাহায্য বলা যাইতে পারে। কর্মীর কুশলতা অনুযায়ী উপার্জনের তারতম্য হয় এবং তাহা দৈনিক এক টাকা হইতে দুই টাকা পর্যন্ত যাহা কিছু হইতে পারে। আমরা আশা করি যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগে ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মীদের তথ্যানুসন্ধানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সরকার কর্তৃক অর্থসাহায্যীকৃত এবং নারী সমবায় সমিতিসমূহ কর্তৃক পরিচালিত এই ধরনের শিল্পসমূহ চালু হইবে। তিনটি সমান্তরাল প্রোজেক্টের কাজ যথারীতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

উপসংহার

উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে, আজ যখন শিল্পে নারীদের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী ভিত্তিতে স্বীকৃতিলাভ করিবার স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন ভারতে এই ক্ষেত্রে নারীদের কর্ম সম্পর্কে আমার মতবাদ উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়া আমি পরম পরিতোষ লাভ করিতেছি এবং আমার এই আস্থা প্রকাশ করিতেছি যে, ভারতীয় নারীদের প্রগতি, অনেকগুলি প্রতিবেশী দেশে এবং সাধারণ ভাবে এশীয় অঞ্চলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের পন্থার উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিবে।

শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের জন্য হোষ্টেল

ডি. পি. সি

রোগবিস্তারের প্রতিরোধ না করিয়া কেবলমাত্র হাসপাতালসমূহ খুলিলেই কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

* * *

"যে সকল হেতু সামাজিক কলুষের উদ্ভবের মূলে সেগুলি দূর করিতে হইবে। আমি একথা স্বীকার করি যে, সকল হেতুই এখনই দূরীভূত করা যাইতে পারে না। এই সকল নির্মূল করিতে সময় লাগিবে।"

১৯৫৫ সনের নবেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত চেয়ারম্যানদের দ্বিতীয় কনফারেন্সে, তাঁহাদের প্রতি প্রদত্ত ভাষণে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু। নিম্নতর আয়কারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের হোষ্টেলসমূহকে সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হইতেছে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ব্যাখ্যাত এই দার্শনিক উপপত্তি। পর্ষদ

কর্তৃক নিযুক্ত সামাজিক এবং নৈতিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কমিটির অনুসন্ধানের ফলে তরুণী স্ত্রীলোকদের শোষিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়টিও যে আংশিক ভাবে দায়ী সেই তথ্য উদ্ঘাটিত হইল। সেই বিষয়টি হইতেছে—নিজেদের শহর ব্যতীত অন্যত্র যাহারা কর্ম্মে নিযুক্ত হয় সেই সকল শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের বাসোপযোগী স্থানের অবিদ্যমানতা। পতিতা স্ত্রীলোকদের সমস্যার সমাধান করা ছাড়াও আমাদিগকে সেই সকল কারণও বিদূরিত করিতে হইবে যাহা এই অধঃপতনের পথে তাহাদিগকে লইয়া যায়। এই ধরনের উপযোগী হোষ্টেলের অনস্তিত্ব, শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদিগকে অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে কাজ লইতে উৎসাহিত করিবার ব্যাপারেও একটি প্রবল প্রতিবন্ধ। ঐ দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের সমস্যার সমাধানকল্পে এবং শ্রমিক-বালিকাদের উপর যে-কোনপ্রকার শোষণ নিবারণার্থে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কেন্দ্রীয় পর্ষদের বেসরকারী সদস্যগণ লইয়া একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করেন। এই সকল সদস্য দেশের শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের হোষ্টেলসমূহ পরিদর্শনান্তে পর্ষদের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করেন, কমিটি সেই ভিত্তির অনুমোদন করেন যাহাতে—হয় চালু হোষ্টেলগুলিকে অর্থসাহায্য দেওয়া যাইতে পারে অধিকতরসংখ্যক শ্রমোপজীবিনী নারীদের প্রতি সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণার্থে, অথবা নূতন হোষ্টেল খুলিবার জন্য। সাব-কমিটি বুঝিতে পারিলেন যে, যেহেতু নিম্নতর আয়কারী গোষ্ঠীর শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের এই সকল হোষ্টেল স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে না, সেইজন্য প্রাথমিক সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যয়ের জন্য তাহাদের অর্থসাহায্যের প্রয়োজন।

অর্থসাহায্যের সর্ত্তাবলী

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ, কাজেই, ১৯৫৬ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায়, ৫০—২০০ টাকা পর্য্যন্ত যাহাদের আয় সেই সকল শ্রমোপজীবিনী মেয়েদের হোষ্টেলে অর্থসাহায্যের আবেদনপত্র সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন—সর্ত্ত রহিল এই দানের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ হইবে ১৫,০০০৲ টাকা। যাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহাদের অধিকাংশই হইতেছে শিক্ষিকা, কেরাণী, নার্স, ধাত্রী, টেলিফোন অপারেটার প্রভৃতি রূপে কর্ম্মে নিযুক্ত স্ত্রীলোক। ছাত্রদের হোষ্টেলে অথবা যে সকল হোষ্টেলে আবাসিকদের বিনা খরচায় অবস্থানের ব্যবস্থা আছে সেগুলিতে অর্থসাহায্য দেওয়া হয় না। সাহায্যপ্রাপ্ত হোষ্টেলের আবাসিকদের সংখ্যা তারতম্য অনুসারে হইবে ১৫ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত। নূতন গৃহ নির্ম্মাণ, মেরামতি, চালু গৃহসমূহের সংযোজন এবং পরিবর্ত্তন, ভাড়া, সাজসরঞ্জাম এবং আবাসিকদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা প্রভৃতির জন্য অর্থসাহায্য প্রাপ্তব্য।

কোন হোষ্টেলের আবাসিকদের খাদ্যবস্তু সংস্থানের জন্য কোন প্রকার অর্থসাহায্য প্রদত্ত হয় না।

এই সকল সাহায্য কতকগুলি বিশেষ সর্ত্তাধীন, যথা: কোন অর্থসাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে আবাসিকদের জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবাসিকদিগের নিকট হইতে যে ভাড়া আদায় করা হয় তাহা কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক বিশেষ ভাবে নির্দ্ধারিত একটি অঙ্ককে ছাড়াইয়া যাইবে না এবং নিম্নতম আয়কারী গোষ্ঠী যাহাতে এই সকল সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে।

কোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ যদি দেখেন যে, আবাসিকদের দেয় যে ভাড়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা হয় খুব বেশী অথবা খুব কম, তাহা হইলে পর্ষদ ভাড়ার হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন।

যদি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের জন্য একটি হোষ্টেল পরিচালিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাকে এই কর্ম্মপ্রচেষ্টা বর্ত্তমান স্তরে চালু রাখিতে এবং যোগ্যতার স্বাভাবিক মানও বজায় রাখিতে হইবে। আর যদি হোষ্টেলটি কেবলমাত্র এখনই খুলিতে হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানকে যাবতীয় অবশিষ্ট ব্যয় নির্বাহার্থে যথেষ্ট অর্থের সংস্থান করিতে হইবে।

শ্রমোপজীবিনী মেয়েদের হোষ্টেলের জন্য সাহায্যপ্রার্থী প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট ফরমে চালু হোষ্টেল এবং (অথবা) যে সকল হোষ্টেল খোলা হইবে সেগুলি সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে এবং অনুলিপিসহ উক্ত ফরম রাজ্যের সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের নিকট দাখিল করিতে হইবে। রাজ্য পর্ষদসমূহ একটি বিশেষ আবেদনপত্র অনুমোদনকালে কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় একটি হোষ্টেল খুলিবার প্রয়োজনীয়তা সুনিশ্চিত রূপে প্রমাণ করিবেন এবং সাহায্যের জন্য আবেদনকারী সংস্থার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র প্রদান করিবেন।

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের গত সভায় অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের শ্রমোপজীবিনী মেয়েদের ১১টি হোষ্টেলকে যে অর্থসাহায্য অনুমোদন করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ ১,০৪,০০০ টাকা পর্য্যন্ত। দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে আরও প্রায় ২০টি দরখাস্ত পাওয়া

গিয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের পরবর্তী সভায় এগুলি সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইবে।

কাজেই ইহা আশা করা যায় যে, এই সকল অর্থসাহায্য কেবল যে শ্রমোপজীবিনী মেয়েদের নিজেদের শহর হইতে অন্যত্র কর্মের সন্ধানে উৎসাহলাভের সহায়ক হইবে তাহা নহে, ইহা তাহাদিগকে নৈতিক বিপদের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া ন্যূনতম ভাড়ায় থাকিবার আরামপ্রদ স্থানপ্রাপ্তি বিষয়েও সহায়তা করিবে।

সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যা

ডা. ডি. এম. বাসা

এদেশে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সমাজগঠনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে সম্প্রতি প্রভূত আলাপ-আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কাজেই ইহা দেখাইয়া দেওয়া সমীচীন যে, যে-কোনও রাজনৈতিক আবহাওয়াতেই সামাজিক চিকিৎসা-বিদ্যার উন্নতিবিধান হইতে পারে, যদিও ইহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে।

কেননা সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যা হইতেছে মূলতঃ কোনও একটি সংস্থার অবস্থা হইতে অধিকতর রূপে মনের অবস্থা। জনগণের তরফ হইতে এবং অধিকতররূপে চিকিৎসাবৃত্তির তরফ হইতে ইহা একটি নির্দিষ্ট মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আগেই স্বীকার করিয়া লয়। ইহা এই বিষয়টির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারে যে, চিকিৎসাবৃত্তির প্রাথমিক লক্ষ্য হইতেছে স্বাস্থ্য—সমাজের সামগ্রিক স্বাস্থ্য—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নয়, অথবা সামাজিক স্তরে ব্যাধিও নয়। অন্য কথায় সুস্থ সমাজ—রুগ্ন সমাজ অথবা ব্যষ্টি অপেক্ষা অধিকতর না হইলেও অন্ততঃ সমান গুরুত্বপূর্ণ ত বটেই। স্বাস্থ্যসংরক্ষণের ব্যবস্থাসমূহ যতটা ব্যক্তিগত স্তরে ততটা সামাজিক স্তরেও অবশ্যপ্রযোজ্য হইবে।

সাধারণতঃ আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ কর্তৃক ডি. ডি. টি তরলবিন্দু নিক্ষেপ (spraying) প্রভৃতি যে সকল রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় সেগুলির সহিত আমরা সকলেই পরিচিত আছি। কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যার আর একটি অধিকতর নিশ্চয়াত্মক (positive) দিক আছে। বারংবার উপদেশদানের ফলে মনে উৎকৃষ্ট জীবনচর্যার বদ্ধমূল সংস্কার জন্মানো ইত্যাদি উপায় অবলম্বন-পূর্বক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ইহার অঙ্গীভূত। ইহার লক্ষ্য হইতেছে, ব্যষ্টির মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল করিয়া দেওয়া যে, সে নিজে তাহার প্রতিবেশীদের সহিত একত্রে তাহার নিজের এবং তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দায়ী। "স্বাস্থ্য, কাজেই একটি ক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্য এবং ইহার মূল্য হইতেছে—যেমন ব্যষ্টির তেমনি সমষ্টির পক্ষেও উৎকৃষ্ট জীবনচর্যার অভ্যাস বজায় রাখা। স্বাস্থ্য এমন কিছু নয় যাহা চিকিৎসাবৃত্তি আমা-দিগকে দান করিতে পারে; বটিকা, ইঞ্জেকশন অথবা টোট্‌কা ঔষধ ইত্যাদি দ্বারা নিশ্চিতই ইহা লাভ করা যাইতে পারে না।

ইহা একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণের বিষয় যে, যে সকল রোগী প্রাইভেট ডাক্তারদের নিকট আসে তাহাদের অন্ততঃ অর্ধেক সেই সকল রোগে ভোগে যাহা সৃষ্টির মুখ্য কারণ হইতেছে মনস্তাত্ত্বিক অসামঞ্জস্য। সাধারণ হাসপাতাল-সমূহের সংখ্যা হইতেছে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ইহার মানে কি? ইহার মানে এই যে, এই সকল রোগী সেই সব রোগে ভুগিতেছে যাহার মূল কারণ—অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে তাহাদের ত্রুটিপূর্ণ অথবা অসন্তোষজনক সম্পর্ক। ইহা দ্বারা বুঝায় সেই সকল পিতামাতা, শিশু, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য লোক যাহাদের সহিত তাহারা বাস করে অথবা যাহাদের সংস্পর্শে তাহারা আসে।

ইহা সত্য যে, আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের অধিকাংশ অসুখই শারীরিক—যদিও তাহাদের কারণসমূহ নিহিত রহিয়াছে মনোজগতের গহন গভীরে। তাই বলিয়া কিন্তু একথা আমরা বলিতেছি না যে, তাহাদের অসুখগুলি কাল্পনিক—বস্তুতঃ তাহারা ক্যান্সার, নিমোনিয়া, করোনারী থ্রম্বসিস প্রভৃতি খাঁটি শারীরিক ব্যাধিসমূহের ন্যায়ই সমান গুরুতর, যন্ত্রণাদায়ক এবং রোগীকে অশক্ত করিয়া ফেলিতে পারে। যে ছোট শিশুর উদরাময় অথবা বমির অসুখ আছে সে মায়ের নিকট তাহার বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারে। আর একটু বেশী ভালোবাসা, আর একটু বেশী তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা—এইটুকু মাত্র প্রয়োজন—তাহা হইলেই দেখা যাইবে যে, শিশুটি আবার সুস্থ হইয়াছে। যে পরিমাণ সালফা ড্রাগ অথবা ইঞ্জেক্শনই দেওয়া যাক না কেন তাহাতে কিছু ফায়দা হইবে না। কাজেই রোগের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরক্ষার গোড়াপত্তন করিতে হইবে শৈশবে। আমি এখন শৈশবকালে উপদেশপ্রদান দ্বারা সদভ্যাস এবং নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে

শিশুদের মনে বদ্ধমূল সংস্কার জন্মাইয়া দিবার কথা ভাবিতেছি না। যদিও এসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ—অধিকাংশ রোগ বিশেষতঃ পরবর্ত্তী জীবনের পুরাতন ব্যাধিসমূহ হইতেছে মুখ্যতঃ পিতা-মাতা এবং শিশুর ক্রটিযুক্ত সম্পর্ক হইতে উদ্ভূত মনস্তাত্ত্বিক অসামঞ্জস্যের ফল। কাজেই সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যার একটি প্রধান স্তম্ভ হইবে, ভালবাসা ও স্বাধীনতায় পূর্ণ এবং সুস্থ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শৈশব। মানসিক স্বাস্থ্যের মোটামুটি মূলনীতিসমূহ এবং তৎসহ শিশুপালন সম্পর্কে পিতামাতার এবং ভাবী পিতামাতাদের প্রতি পথনির্দ্দেশ ঐ ধরনের সুখী শৈশবের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করার পক্ষে বহুল পরিমাণে সহায়ক হইবে।

অপর একটি স্তম্ভ হইতেছে, স্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক ব্যবস্থা-সমূহ—যেমন বুদ্ধি-বিবেচনার সহিত অবসর সময়ের যথোচিত ব্যবহার, পরিবারের লোকেদের এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সন্তোষজনক এবং সন্তোষ-উৎপাদক আচরণ, স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য, উত্তম হাওয়া এবং বাসগৃহ। সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যার একটি প্রোগ্রাম অনুসারে ইনডোর এবং আউটডোর উভয়বিধ গ্রুপ গেম বা ক্রীড়া-কৌতুক সংগঠন এবং তৎসহ ক্লিনিক ও হাসপাতালসমূহের ব্যবস্থার গুরুত্বও সমানই হইত।

স্বাস্থ্যোন্নয়নের আর একটি দিক হইতেছে নিয়মিত ভাবে সুস্থ ব্যক্তিদের বার্ষিক পরীক্ষার দ্বারা জনসাধারণের শিক্ষা। এই উপায়ে প্রয়োজন হইলে জীবনধারণের এবং চিন্তার ক্রটিপূর্ণ অভ্যাসসমূহই যে কেবল শুধরাইতে পারে তাহা নহে, উপরন্তু চিকিৎসক অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরিতে পারিয়া এমন সব অবস্থার আঁচ করিতে পারেন, পরবর্ত্তীকালে যাহার অনিবার্য্য পরিণাম হইতে পারে—ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই প্রভূত যন্ত্রণা এবং অর্থব্যয়। কর্ম্ম হইতে ক্রমাগত এবং দীর্ঘ অনুপস্থিতি এবং তৎসহ তাহার আনু-ষঙ্গিক অর্থনৈতিক অপচয় ও সামাজিক অসামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে নিশ্চিত ব্যবস্থা করা ছাড়াও, হাসপাতালের উপরকার বোঝা প্রভূতপরিমাণে লাঘব করা যাইতে পারে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা এবং উন্নয়নের ব্যাপারে মূল ব্যক্তি হইতেছেন সমাজ-কর্মী অথবা স্বাস্থ্যশিক্ষক (Health Educator)। নিয়মিত ভাবে তিনি রোগী ও স্বাস্থ্যবানদের পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা ও যুক্তিতর্ক আর উপদেশাদির মাধ্যমে পরিবারগুলিকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করেন, ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যনীতিকে তিনি করিয়া তোলেন এক জীবন্ত বাস্তবতা—তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ। স্বাস্থ্যের যে-কোন সামান্য বিচ্যুতি সম্পর্কেও চিকিৎসকের নিকট রিপোর্ট করা হয়। ফলে, ব্যাধিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থাসমূহই যে শুধু অবলম্বিত হইতে পারে তাহা নহে, এই পটভূমিকার জ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়া চিকিৎসক তাঁহার রোগীদিগকে দ্রুত তাহাদের পূর্ব্ব স্বাস্থ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে উৎকৃষ্টতর রূপে সমর্থ হইতে পারেন।

সামাজিক এবং জীববিদ্যাবিষয়ক বিজ্ঞানসমূহের যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, চিকিৎসাবিদ্যায়ও যে তাহার প্রতিক্রিয়া হয় নাই তেমন নহে, যদিও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যা তার অসংখ্য কারণ এবং সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণাবশে, কেবলমাত্র একটি বিষয় (যেমন বীজাণু অথবা খাদ্যে পুষ্টিকর উপাদানের অভাবের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়) রোগের জন্য দায়ী—এই যে আধুনিক কালের অনমনীয় ধারণা তাহা নির্ম্মূল করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহা দেখানো যায় যে, এক কক্ষওয়ালা যে সকল ফ্ল্যাট অথবা ভাড়াবাড়ীতে শিশুরা পিতামাতার সঙ্গে শোয় সেগুলি উত্তম মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। বস্তুতঃ এগুলিতে বাস করার দরুন পিতামাতার সঙ্গে শিশুদের অবনিবনাও হয় এবং পরবর্ত্তী জীবনে তাহাদের বহুবিধ স্নায়ুরোগ ও অসুস্থতার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

চিকিৎসাবিদ্যাকে তাহার গজদন্তপ্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া যদি জীবনের মূল ধারার সহিত মিশিয়া যাইতে হয় তাহা হইলে চিকিৎসকদিগকে গোষ্ঠীগত ভাবে এই সকল তথ্য এমন কার্য্যকরী ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে স্থপতি এবং প্রশাসকগণ একথা উপলব্ধি করিতে পারেন যে, বাসগৃহের বেলায়, অর্থনীতি, সৌন্দর্য্যবোধ এবং আরামই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় নহে।

সংক্ষেপে, সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যা মানুষের সহিত কারবার করে একটি সত্তা রূপে। সমগ্র ব্যষ্টিকে ইহা সামগ্রিক পটভূমিকায় দেখে এবং বিচার করে। ইহা তাহার শারীরিক ব্যথা এবং যন্ত্রণার সহিত যতটা—মানসিক দুঃখ ও হতাশার সহিত ততটাই সংশ্লিষ্ট। ইহার কর্ম্মনীতির মূল-গত ভিত্তি হইতেছে এই জ্ঞান যে, যেমন বীজাণু, দূষিত জল এবং খারাপ স্বাস্থ্যবিধির দরুন তীব্র ব্যাধির সৃষ্টি হয় তেমনি অসুখী এবং অসন্তোষজনক ব্যক্তিগত সম্পর্কসমূহ মানুষের মনের উপর তাহাদের সঙ্ঘাতের দ্বারা স্থায়ী এবং পুরাতন (chronic) রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যে সকল বীজাণু মানুষের ভালোবাসারও বুঝাপড়ার উৎসকে বিষাক্ত করে সে-গুলি, যে সকল জীবাণু আমাদের দেহতন্ত্রকে (system) বিষাক্ত করিয়া থাকে তৎসমুদয়েরই মত ভয়াবহ।

Rexona
BLENDED WITH CADYL
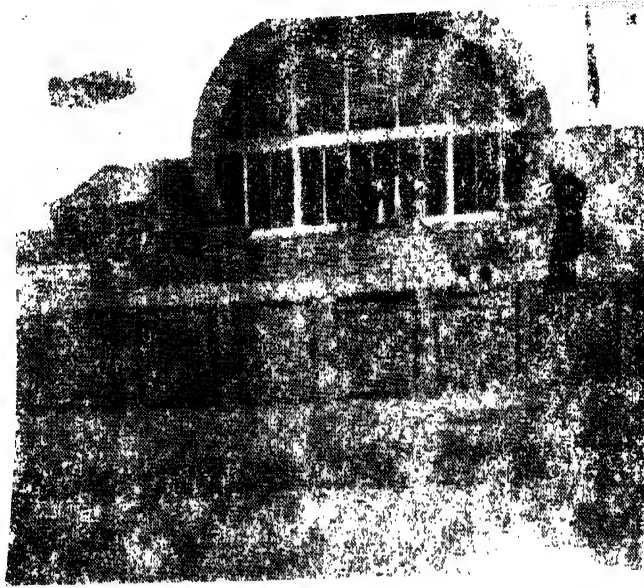
বিজ্ঞান-ভবন নয়া দিল্লী

এশীয় লেখক সম্মেলন

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

"পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা—"

কবির এই আশ্বাসবাণী যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল ১৯৫৬ সনের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীর আশ্চর্য "বিজ্ঞান-ভবনে" এশীয় লেখক সম্মেলনে। আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর মাত্র দশটি বৎসর চলে গেছে, ভারতের মহান রবিও অস্তমিত। তবুও এই ভারতেই এত বড়, এমন সম্ভাবনাপূর্ণ, এমন অভূতপূর্ব একটি ঘটনা ঘটল যার উদাহরণ পৃথিবীর আর কোন মহাদেশের বা উপ-মহাদেশের ইতিহাসে নেই! মানবজাতির ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে ভারতেরই কতকগুলি লেখক প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে এশীয় লেখকবর্গকে একটি সম্মেলনে আহ্বানে উদ্যোগী হন। তাঁদের আশা ছিল, জাতিতে জাতিতে এই পথেও মিলন হোক, সম্প্রীতি বাড়ুক, পরস্পরকে বোঝার সুযোগ ঘটুক, সংস্কৃতির ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হোক। অন্যান্য মহাদেশের বিরোধিতার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল বলে আমার জানা নেই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরোধিতাই বা কি থাকতে পারে? সকল লেখকের জীবন-দর্শন এক নয়, কিন্তু কোন লেখকই সত্য ও শিবকে অস্বীকার করতে পারেন না। জাপান ছাড়া এশিয়ার সকল দেশই দীর্ঘকাল কোন-না-কোন ভাবে ইউরোপের কয়েকটি জাতির অধীন ছিল। মহাচীনের অংশবিশেষে ছিল মার্কিন-ইংরেজ-জাপানী-জার্মান প্রভুত্ব। বর্তমানে এশিয়ার প্রায় সকল দেশই এই ক্লেদমুক্ত, স্বাধীন। এখনও যেটুকু বাকী আছে তারও মুক্তির ক্ষণ আসন্ন। এইরূপ সময়ে এমন সম্মেলন যেমন উপযোগী তেমনি গভীর সম্ভাবনাপূর্ণ।

চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষা সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই চৌদ্দটি ভাষায় যে সাহিত্য সুদীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়ে আসছে সেগুলির প্রতিনিধিবর্গ ত লেখক-সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেনই রাজস্থানী ভাষা স্বীকৃতি লাভ না করলেও এই সাহিত্যের প্রতিনিধিবর্গকেও সম্মেলনে স্বীকৃতি দান করা হয়। কারণ রাজস্থানী দু' কোটিরও বেশী ভারতীয়ের মুখের বুলি। উপরন্তু মীরাবাঈ, দাদু ও পৃথ্বীরাজের মত অমর কবিগণ এই ভাষায় সুমধুর দোঁহা রচনা করে গেছেন। সম্মেলনের প্রথম দিনে ছিল পনেরটি ভারতীয় ভাষার প্রতিনিধি-লেখকবর্গের সম্মেলন। এই দিনে সভার গোড়ার দিকে কিঞ্চিৎ অপ্রীতিকর কতকগুলি প্রশ্নের অবতারণা হয় এবং সেগুলি বাংলার লেখক-প্রতিনিধিবর্গের তরফ থেকেই মূল সভা-

পতিকে করা হয়েছিল। আমাদের মতে প্রশ্নগুলি করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যা হোক, শেষ অবধি সম্মেলনে প্রধানতঃ শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে সম্পন্ন হয়। তবে কি ভারতীয়, কি অভারতীয় সকল ভাষাকে সমমর্যাদা দান করা হলেও পূর্ণ সম্মেলনে বাংলা ও হিন্দীর লেখকবর্গের তিন জন করে লেখককে তাঁদের সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়ায় কয়েকটি ভারতীয় ভাষার লেখক প্রতিনিধি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আপত্তি প্রকাশ করেন।

পূর্ণ অধিবেশনে সুবিশাল ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, স্নিগ্ধ বিজলী আলোকোদ্ভাসিত কক্ষে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য সৃষ্ট হয়।

সম্মেলনে এসেছিলেন মহাচীনের, মধ্য এশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রগুলির, মঙ্গোলিয়ার, উত্তর কোরিয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ও জাপানের লেখক-প্রতিনিধি। এসেছিলেন ব্রহ্মদেশের, ইরানের, সিরিয়ার, সিংহলের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের প্রতিনিধি। আর, আমাদের ভারতের পনেরটি ভাষার লেখক-প্রতিনিধিগণ ত উপস্থিত ছিলেনই। এঁরা ছাড়াও ছিলেন মিশর, অষ্ট্রেলিয়া, কলাম্বিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতির একাধিক লেখক-দর্শক। মূল সভাপতির সঙ্গে বিশাল মঞ্চোপরি দীর্ঘ টেবিলের ধারে বসে-ছিলেন প্রত্যেক ভাষার প্রতিনিধিবর্গের এক একজন মুখ-পাত্র। আর, প্রতিনিধিগণ বসেছিলেন থাকে থাকে সাজান তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে। প্রত্যেক আসনের সামনে টেবিলে একটি করে মাইক্রোফোন, পাশে হেডফোন ও নিয়ামক যন্ত্র। আসনগুলি আরামদায়ক, সমগ্র কক্ষ ও মঞ্চের মেঝে পুরু কার্পেটে মোড়া। চলাফেরায় সামান্যতম শব্দও উত্থিত হয় না। সম্মেলনে প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে বসে, সকলের দিকে তাকিয়ে কবির কথাগুলি ঘুরে ফিরে মনে আসছিল, "পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে।" নানা ভাষা, নানা মুখ, নানা পরিচয়, কিন্তু এমন 'বিবিধের মাঝে' মহামিলন এ ভারতেই সম্ভব!

সম্মেলনে ভারতের পক্ষে মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীহুমায়ুন কবীর। কিন্তু উদ্বোধনকালে তিনি উপস্থিত না থাকায় তাঁর আসনে অস্থায়ী ভাবে মনোনীত হন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর ভাষণের পর শ্রীহুমায়ুন কবির উপস্থিত হন। তার পরেই প্রশ্নাদি আরম্ভ হয়। তবে তিনি ২২শে থেকে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সব কয়টি অধিবেশনেও উপস্থিত থাকেন নি। ২৫শে থেকে পরবর্তী অধিবেশনগুলির মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এরা তিন জনেই বাংলার লোক। এতেই বোঝা যায় বাংলা সাহিত্য এই মহা-সম্মেলনে কতখানি মর্যাদা লাভ করে। সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শ্রীমুল্কুরাজ আনন্দ। বাংলা থেকে আমরা ছিলাম আঠারো জন প্রতিনিধি। দশ টাকা চাঁদা দিলেই কারো প্রতিনিধি হতে বাধা ছিল না। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল বেসরকারি। সেজন্য অর্থকৃচ্ছ তার দুশ্চিন্তা ছিল কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট। এমন একটি সম্মেলনে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। বিদেশী সাহিত্যের প্রতিনিধিগণ তাঁদের নিজ নিজ সরকারের অর্থানুকূল্য লাভ করেছিলেন, সম্মেলন কর্তৃপক্ষও তাঁদের আহার-বাসস্থান ও যানবাহন খরচের সুরাহা করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধিগণ কেবল লাভ করেছিলেন এক পিঠের ভাড়ায় রেলে যাতায়াতের সুবিধাটুকু। সাধারণতঃ ভারতীয় লেখকগণ দরিদ্র। তবুও সেজন্য কেউই অনুযোগ করেন নি। সম্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার মহৎ কামনা ছিল সকলেরই অন্তরে। এই উদ্দেশ্যে বাংলা ও তামিল ভাষার লেখকগণ তাঁদের মধ্যকার দলাদলি পরিহার করে ঐকমত্যের উদাহরণ দেখিয়ে যথেষ্ট প্রশংসা ও মর্যাদা লাভ করেন। অবিশ্যি এই সম্মেলন সরকারী হলে এর কাঠামো ও মূর্তি হ'ত অন্যরূপ এবং তা যে সমালোচনার উর্ধ্বে হ'ত তাই বা বলি কি করে?

বিদেশে বিশেষতঃ সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় কতকগুলি বাংলা, তামিল ও হিন্দী ইত্যাদি গ্রন্থের যে অনু-বাদ প্রকাশিত হয়েছে সোভিয়েট লেখকগণ সেগুলির এক এক খণ্ড কর্তৃপক্ষকে সম্মেলনের অধিবেশন চলা কালেই উপহার দেন। সংখ্যায় সেগুলি হবে অনেক।

সম্মেলনের কার্য-কর্ম, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রস্তাবাদি সবই হয় ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি ছিল? এমন সার্বজনীন রূপ পৃথিবীর আর কোন ভাষার? তবে বিদেশী প্রতিনিধিগণ তাঁদের বক্তব্য স্ব স্ব ভাষাতেই বলেন এবং তা শ্রোতৃবর্গের সুবিধার্থে সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীতে তর্জমা করেন দোভাষী। সম্মেলনে বিবিধ বিষয় আলোচিত ও কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বক্তা-গণের বক্তৃতা থেকে এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের সাহিত্যের বর্তমান গতি-প্রকৃতির একটি ধারণা শ্রোতৃবর্গের করা সম্ভব হয়েছিল। ফলে লাভই হয়েছে। কিন্তু তা প্রচারের প্রয়োজন যা অন্ততঃ আমাদের বাংলাদেশে করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সে সকল রিপোর্টের নকল আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করেছেন।

সম্মেলনে অতি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন শ্রীরাজাগোপাল আচারী। শ্রীরাজাগোপাল আচারী তাঁর অনুপম বক্তৃতায় প্রচুর হাস্যরস বিতরণ করেছিলেন। সাহিত্য ও রাজনীতি এই দুটিকে তিনি পৃথক রাখতে পরামর্শ দেন এবং অনুবাদের চেয়ে নিজস্ব পথে

মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিতেই উৎসাহ দিয়েছিলেন যথেষ্ট। এশীয় লেখক সম্মেলনটি বিশ্ব লেখক সম্মেলন হলে তিনি আরও খুশি হতেন। শেষ দিনে লেখকবর্গের গোল টেবিল সম্মেলনে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন শ্রীজবাহরলাল নেহরু। তিনি নিজে শক্তিশালী ইংরেজী লেখক। কাজেই রচনার যে গুণ প্রয়োজন লেখকবর্গকে সে সম্বন্ধে সচেতন করেন। আর, আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ত তাঁর বিশাল ও সুদৃশ্য ভবনে প্রতিনিধিগণকে নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত ও সম্মানিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় উপস্থিত সকলেই যে যথোচিত মনোযোগী ছিলেন এ কথা বলতে পারলে আনন্দিত হতাম। তিনি অনেকগুলি মূল্যবান কথা বলেছিলেন, বিশেষ করে বিশ্ব-শান্তি সম্বন্ধে।

এই প্রসঙ্গে অন্যান্য অভ্যর্থনার মধ্যে উত্তর ভিয়েৎনামের এমব্যাসিতে ও দিল্লীর পঞ্জাবী কলাকেন্দ্রে প্রতিনিধিগণকে যে অভ্যর্থনা করা হয় সে দুটির উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। কারণ, ভিয়েৎনাম এমব্যাসি তাঁদের দেশের মুক্তি-সংগ্রামের যে ছায়াচিত্রগুলি দেখিয়েছিলেন তা ছায়া-চিত্রের দিক থেকে নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর, কিন্তু সুদীর্ঘকালের পরাধীনতা ও অপরাপর গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য একটি জাতি যে কি ভাবে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, সহিষ্ণু হতে পারে, প্রতিজ্ঞায় অটল ও একতাবদ্ধ থাকতে পারে সে অমর কাহিনী বিচিত্র চিত্রস্রোতে মুখর হয়ে উঠেছিল। সেই ঘটনাপ্রবাহে দেখা গিয়েছিল ডাঃ হো চি মিনকে। সরল, অনাড়ম্বর তাঁর জীবনযাত্রা, লোক-সাধারণ থেকে নিজকে উচ্চস্তরে রাখবার ঈষৎ প্রয়াসও তাঁর মধ্যে নেই। অতি সাধারণ পোশাকে, সামান্য একজন সঙ্গী নিয়ে শ্রদ্ধাস্পদ ও অক্লান্ত কর্মী এই বৃদ্ধ গ্রাম থেকে গ্রামে হেঁটে চলেছেন নবজীবনের আশীর্বাদ নিয়ে। আর, পঞ্জাবী কলাকেন্দ্রে দেখা গেল পঞ্জাবের লোকনৃত্য, শোনা গেল লোকসঙ্গীত। সে সঙ্গীতের ভাষা সকলের বোধগম্য না হলেও তার সুর মর্মস্পর্শ করেছিল। সকল সংস্কৃতিরই মূল লোক-সাধারণের মধ্যে নিহিত।

প্রতিনিধিগণের মধ্যে ছিলেন অনেক নারী ও পুরুষ-কবি। তাঁদের নিয়ে এক সন্ধ্যায় বসেছিল মুশায়েরার আসর। তাঁদের কবিতার বিবিধ ভাষা, বিবিধ ছন্দ, বিবিধ ভাব। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সেই বহু ভাষাভাষী শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই ভাষার বেষ্টনী ভেদ করে সে সকল কবিতার মর্মলোকে প্রবেশ করতে পারেন নি। তবুও তাঁরা প্রতি কবিতার শেষে যথারীতি করতালি দিয়ে সকলে কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন।

এই মহাসম্মেলন কতকটা বিশেষ সামাজিক মেলামেশার রূপও ধারণ করেছিল। এই মহাসম্মেলনে বাংলার যোগ্য প্রতিনিধিত্ব ঘটেছিল কিনা এ প্রশ্নের আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু যাঁরা গিয়েছিলেন ও বাংলার পক্ষে কথা বলে-ছিলেন তাঁরা বাংলার মর্যাদা হানি করেন নি বরং বৃদ্ধিই করেছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সমগ্র পৃথিবীর লেখক-সমাজ, রাজনীতিকেরাও ভারতে এই মহাসম্মেলনের দিকে তাকিয়েছিলেন। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণকে বহু বাধা ও অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। এমন একটি বেসরকারী মহাসম্মেলন ত্রুটিহীন হতে পারে না। তবুও উদ্যোক্তাগণের অক্লান্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এতে আর সন্দেহ নেই। এটি আমাদের ভারতেরও পরম গৌরবের বিষয়। আগামী-বারে মহাচীনে বা ব্রহ্মদেশে, এশিয়ার যে কোন অংশেই আরও সুষ্ঠুভাবে লেখক-সম্মেলন হোক, কিন্তু আমাদের ভারতই এই মহৎ কর্মে অগ্রপথিকের সম্মানের অধিকারী হয়ে রইল। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে, ভারতে বিশ্ব-লেখক সম্মেলনও হতে পারে। সে শুভদিন আসুক।

এসে গেছে! এই ডবল ঢাকনা দেওয়া নতুন টিন
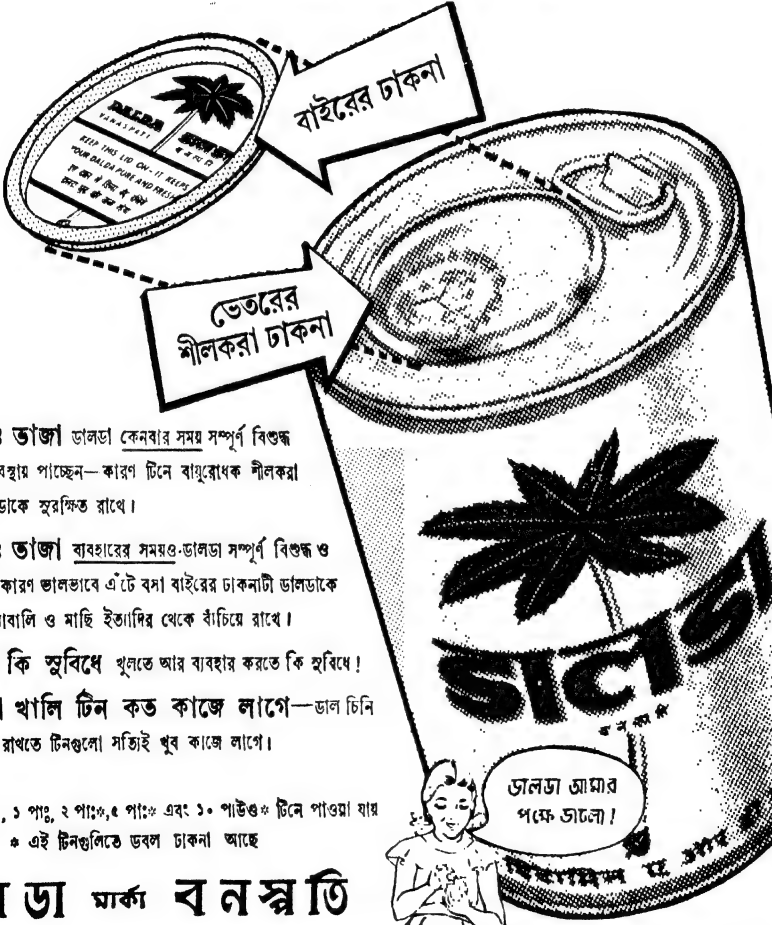
ডালডাকে সম্পূর্ণ খাঁটী ও তাজা রাখে

- **বিশুদ্ধ ও তাজা** ডালডা কেনবার সময় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও তাজা অবস্থায় পাচ্ছেন—কারণ টিনে বায়ুরোধক শীলকরা ঢাকনা ডালডাকে সুরক্ষিত রাখে।
- **বিশুদ্ধ ও তাজা** ব্যবহারের সময়ও ডালডা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও তাজা থাকে কারণ ভালভাবে এঁটে বসা বাইরের ঢাকনাটী ডালডাকে সর্বদাই ধুলোবালি ও মাছি ইত্যাদির থেকে বাঁচিয়ে রাখে।
- **খুলতেও কি সুবিধে** খুলতে আর ব্যবহার করতে কি সুবিধে!
- **পুরোনো খালি টিন কত কাজে লাগে**—ডাল চিনি মশলাপাতি রাখতে টিনগুলো সত্যিই খুব কাজে লাগে।

ডালডা ১/২ পাঃ, ১ পাঃ, ২ পাঃ*, ৫ পাঃ* এবং ১০ পাউণ্ড* টিনে পাওয়া যায়

* এই টিনগুলিতে ডবল ঢাকনা আছে

ডালডা আমার পক্ষে ভালো!

ডালডা মার্কা বনস্পতি

HVM. 287-X52 B

কৃষি ও শিল্প-কথা

শ্রীশরৎচন্দ্র সেন

ধান, গম, কড়াই, সরিষা, আলু, চিনাবাদাম, ইক্ষু, চা ও পাট ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলে দেশবাসী ও কর্মীরা সমৃদ্ধিলাভ করেন এবং সেবাধর্ম্ম পালন করিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজন হয় জমিতে উন্নত ধরনের সার দ্বারা কৃষি-কার্য্য সম্পাদন এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও শিল্প উন্নয়নের জন্য বৃক্ষ-রোপণ।

কৃষি-সার

কৃষি-জমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস হইলে জমিতে কয়েক প্রকার দূষিত বীজাণু ও নানারূপ আগাছা ইত্যাদি জন্মিয়া ধান্য ও অপরাপর শস্যের বিশেষ ক্ষতি করে, ফলে ফসল প্রচুর পরিমাণে জন্মে না। এ কারণ কৃষি-জমিতে চাষের কিছু পূর্ব্বে স্বল্প ব্যয়ে ও পরিশ্রমে সহজলভ্য "বাবলাবৃক্ষের" কাঁচা পাকা পচা বা শুক্‌না পাতা ও ফুল, প্রতি বিঘা জমিতে ন্যূনপক্ষে দশ সের ও শুক্‌না "গোবর গুঁড়া" দশ সের এবং "ফসফরাসযুক্ত ক্যালসিয়াম সার" দশ সের (যাহা স্বল্প ব্যয়ে আধুনিক প্রথায় কেবমাত্র বাংলা দেশেই প্রস্তুত হইতেছে) একত্রে মিশাইয়া জমিতে ছড়াইয়া দিয়া হাল দিয়া রাখিতে হয়। পরে সময়মত চাষ করিলে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং অনিষ্টকারী জীবাণু বা আগাছা ইত্যাদি জন্মাইতে পারে না। ধান্য ও শস্যগাছগুলি সবল, সুস্থ ও পূর্ণ ফলপ্রদ হয় এবং শস্যগুলি পরিপুষ্ট হইয়া সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ হয়। অবশ্য ফসল উপযুক্ত বীজের উপর নির্ভর করে। লেখক বহু পরীক্ষার পর ধান্য ও শস্যচাষের জমিতে উক্ত সার ব্যবহার করিয়া আশাতীত সুফল লাভ করিয়াছেন।

বাবলাবৃক্ষ

কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের জন্য কৃষি-জমির সীমানার ধারে অথবা সুবিধামত স্থানে বাবলাবৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন। ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে প্রতি বৎসরে জমির সার হিসাবে পাতা ও ফুল পাওয়া যায়, গাছের ছাল ও কাঁটা বহু কার্য্যে প্রয়োজন হয় এবং গাছের কচি পাতা দুর্ব্বল গবাদির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাবলাগাছের সরু ডালের দাঁতন (ব্রাশের পরিবর্ত্তে) প্রত্যহ ব্যবহার করিলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় ও মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে পাইওরিয়া রোগে সুফল পাওয়া যায়। বাবলাবৃক্ষের পাতা, ফুল ফল এবং ছাল একত্রে পরিমাণমত জলে নিয়মিত ভাবে সিদ্ধ করিলে একরূপ কালো 'কষ' বাহির হয়, এই কষ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ও সংমিশ্রণে উত্তম স্থায়ী লিখিবার কালি ও ফাউন্টেন পেনের কালি প্রস্তুত হয়। এই কষ রেল লাইনের কাঠের স্লিপার ও অন্যান্য কার্য্যে, নৌকার পাল এবং দাঁড়, পাটাতন, কাছি ইত্যাদিতে এবং মৎস্য ধরিবার জাল, ঘুনী, আটোল, পোলো ইত্যাদিতে ব্যবহার করিলে বহুদিন স্থায়ী হয়। লোনা জলে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে শীঘ্র পচিয়া যায় না এবং উই বা অন্য কোন পোকার দ্বারা নষ্ট হয় না। বাবলাবৃক্ষের পরিপক্ক কাষ্ঠ পরিমাণমত ভারী শক্ত, মজবুত ও মসৃণ হয় এবং ইহা উই বা অন্য কোন পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এ কারণ এই কাষ্ঠে লাঙ্গল, গাড়ীর চাকা, চরকা, তাঁত ও সরঞ্জাম, ববিন, ইত্যাদি এবং কোদাল, কুড়ুল, দা, হাতুড়ি, বাটালি, গাঁইতি ও শোভেল ইত্যাদির বাঁট বা হাতল এমন কি বন্দুকের কুঁদা ইত্যাদি কার্য্যে ব্যবহার করা যায়। এই সহজপ্রাপ্য কাষ্ঠ হইতে কল-কারখানা ও সাধারণের প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার হাতল বাঁট, মুগুর ইত্যাদি তৈয়ারি করিলে বহু বেকার লোকের কার্য্যসংস্থান হয়।

বাবলাবৃক্ষের প্রবল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি থাকায় প্রকৃতির নিয়মে নিকটস্থ জমিতে প্রয়োজনমত বৃষ্টিপাত হয়। এ কারণ এই বৃক্ষ ধান্য ও শস্য-চাষের জমির পক্ষে বিশেষ হিতকারী ও সুফলপ্রদ। জমির নিকটস্থ এই বহু কাঁটাযুক্ত ও বীজাণুনাশক গাছের সাহায্যে ফসল নষ্টকারী পোকা, মাকড় ইত্যাদি, এমনকি পঙ্গপালের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই গাছের পাতার রসের সাহায্যে পুকুর, খানা, ডোবা ইত্যাদির বদ্ধ বীজাণুপূর্ণ দূষিত জল পরিষ্কৃত হয় এবং গাছের নীচস্থ জমির বিষাক্ত জীবাণু নষ্ট হইয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

নদী, খাল, বিল, জলাশয় ও জলধারার বাঁধের ধারে ধারে বাবলাবৃক্ষ রোপণ করিলে উহার পাতা ফুল ও ফল নীচে পড়িয়া পচিয়া যায়। ইহা হইতে যে রস বাহির হয় সেই রসের সাহায্যে বালি বা কাঁকর মিশ্রিত আলগা মাটির বাঁধ বা পাড় দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, বৃক্ষের শক্ত শিকড়গুলি বহুদূরপ্রসারিত হইয়া চারি ধারের মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। এ কারণ প্রবল বর্ষায় বা বন্যায় বাঁধ, পাড় কিংবা গ্রাম্য সরু অথবা বড়

রাস্তা সহজে বিধ্বস্ত হয় না। বৃক্ষগুলি বেশী উচ্চ হয় না, একারণ ভীষণ ঝড়ে বা বজ্রপাতে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। এজন্য হঠাৎ মাঠের মধ্যে প্রয়োজন হইলে পথচারী বা কর্ম্মরত সেবকবৃন্দ সাময়িক আশ্রয়-স্থল রূপে ব্যবহার করিতে পারেন। এ বৎসর প্রবল বর্ষায় ও বন্যায় সুন্দরবন এলাকায় এবং অন্যান্য স্থানে মাটির বাঁধ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ঐ সকল বাঁধের দুই পার্শ্বে ঘনভাবে বাবলাবৃক্ষ রোপণ করিয়া পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এজন্য ব্যয় হয় অতি সামান্য এবং সহজে নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। ভবিষ্যতে গাছ পরিপক্ব হইলে বহু বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ভারতের যে সকল স্থান ক্রমান্বয়ে মরুভূমিতে পরিণত হইয়া আসিতেছে সেই সকল স্থানে বাবলাবৃক্ষ রোপণ করিয়া পরীক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহার পাতা, ফল ও ফুলের সাহায্যে মরুভূমির এবং সাগর ও নদীর তীরস্থ বালি ক্রমান্বয়ে মিশ্রিত মাটিতে পরিণত হইয়া কৃষি-উপযোগী হয়। এরূপ বৃক্ষ ঐ সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে জন্মাইতে দেখা যায়। অদূর ভবিষ্যতে বাবলাবৃক্ষ ভারতীয় মূল্যবান বনজ সম্পদরূপে পরিগণিত হইবে।

দেশবাসীর অবগতির জন্য নিবেদন এই যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলা দেশের হিতৈষী ব্যক্তিগণের যৌথ মূলধনে বাবলা ইণ্ডাষ্ট্রিজ নামীয় প্রতিষ্ঠান—আধুনিক প্রথায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃহৎ বৈদ্যুতিক ও বাষ্পযন্ত্র চালিত কারখানার প্রস্তুতি চলিতেছে। শীঘ্রই গণসেবার জন্য উৎপাদন ও পরিবেশন হইবে বাবলা-নির্য্যাস, বাবলা (মিশ্রিত) তরল রং ও বাবলা (মিশ্রিত) সার, ফসফরাস-যুক্ত ক্যালসিয়াম সার এবং বাবলা কাষ্ঠনির্ম্মিত লাঙ্গল, চরকা, তাঁত, মাকু, ববিন, চাকা হুইল, পুলী, মুগুর হাতল, বাঁট ইত্যাদি দ্বারা বহু লোকের কর্মসংস্থান হইবে।

কেমন আছি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কাটছে দারুণ শীতের রাতি, কষ্টে ছিটে-বেড়ার ঘরে,
'হৃষিকেশের' 'ঝারি'তে সব সাধুর বসত মনে পড়ে।
সাধুর মত মন পেলে তো ? এ পর্ণবাস কাম্য বড়—
মন রে আমার হিমের রাতে 'অমরনাথের' দেউল গাড়ো।
শীত তো শুধু ভোগায় নাকো, আনে কতই ত্যাগের কথা,
'সুরভি আশ্রমের' সুধা, 'ধবাদ্রোণের' পবিত্রতা।
নিশির শেষে ধোঁয়ায় অজয়, সিঁদুর মেখে ওঠেন রবি—
আমি যে এই পল্লীবাসে, কল্পবাসের তৃপ্তি লভি।

২

শুনেছিলাম ভূমণ্ডলের স্থল বেশী নয়, তিন ভাগই জল,
দেখতে পেলাম ন ভাগ সলিল, কোন্ খানেতে দাঁড়াই
মা বল ?
বন্যা নিলে অনেক কিছু-নিত আরও অধিক পেলে,
কিন্তু প্রচুর গান দিয়েছে বিহগগণের কণ্ঠে ঢেলে।
ভোর থেকে জোর জমায় আসর কাঁসর বাজায় লোচন পাটে
যোগ দিয়েছে কোকিল এবং টাকুসোনাও সে কনসাটে।
মাধবীতে ফুলের স্তবক—অজস্রতা চক্ষে পড়ে—
দৈন্য এবং দরিদ্রতা যা দেখি তা নরের ঘরে !

৩

শীত পড়েছে শীত বেড়েছে, তবু দেখি সরিয়ে শীতে—
দিচ্ছে উঁকি শ্যামল শাখায় আমের কনক মঞ্জরীতে।
বাল্যে ডাকা সে চাঁদ সাঁঝে মোর ললাটে পরায় টিকা,
বিরাজ করেন কুটীর ঘিরে বিশাল কেদার বদরিকা।
কুবের শুধান 'রত্নরাজি এলাম দিতে নেবেন কি গো ?'
আমি বলি 'যান ফিরে যান ও সব রাখার ঠাঁই নাহি কো।
পেয়েছি যা তাহাই বেশী—আমি পাবার যোগ্য যাহা,
যুঁয়ের বুকে ডাঁসের মধু কেমন করে ধরবে আহা।

৪

রাজপ্রাসাদে দিন কেটেছে, কেটেছে রাত তরুর তলে,
কোথায় বেশী ভাল ছিলাম ? শেষেই ভাল মন যে বলে।
দেয় না ব্যথা, গ্রীষ্ম আতপ অতি দারুণ বর্ষা শীতে—
ভুলায় মোরে, ভোলে নি যে পাখীর গায়ে পালক দিতে।
দুঃখ আমায় প্রচুর দিলে যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা,
শান্তি এবং সান্ত্বনাও দিয়েছে সেই মহামনা।
অভাব বহু নীরব রহি—চাইতে আমার লজ্জা করে,
মহামায়ার স্তন্যধারা লেগে আছে এই অধরে।

৫

কথাতে আর গরল নাহি—কথার ভয়ে হইলে ভীত,
সকল কথাই আমার কাছে হয়েছে আজ কথামৃত।
নিন্দা যাঁরা করেন আমার—করেন না তা বন্ধু বিনে,
ধুলায় ধুসর যে জন তারে ধুলা দেওয়া স্নেহের চিনে।
যাঁরা করেন সুখ্যাতি মোর—লই না—কারণ বিফল নেওয়া,
ন্যাংটা নাগা-সন্ন্যাসীকে পরিধানের বসন দেওয়া।
গৌরব আমি রাখবো কোথা ? ক্ষুদ্র কণায় আছি টিকে,
রে ভাই ময়ূরপুচ্ছ দিতে এসো না এ টুনটুনিকে।

৬

কাঁপে আমার পর্ণপ্রাসাদ, বৃষ্টি পড়ে, ঝড়ও বহে—
ডাকি কোথায় হে জগদীশ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হে।
সে ডাক তাঁহার কর্ণে পশে সন্দেহ মোর নাইক কোনো
পাই গরুড়ের পাখার হাওয়া—ঘোরে যেন সুদর্শনও।
দর্শনীয়ের দর্শনেতে আনন্দে হই আত্মহারা,
কুশল শুধান যেন এসে যুগের যুগের মহাত্মারা।
পঙ্কজের এ পঙ্কগৃহে, রাত্রে মরি দিনে বাঁচি
আমার মা আনন্দময়ী—দুখেই পরম সুখে আছি।

স্বাস্থ্যবান লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে
চান করে –
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
– এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।

সুভাষিতাবলী

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সংস্কৃত সাহিত্যের সুভাষিত গ্রন্থের আদিকাল নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। তবে এই শ্রেণীর এই পর্যন্ত যত গ্রন্থ পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ হচ্ছে কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়। এই গ্রন্থের লেখক বা সংগ্রাহকের নাম পাওয়া যায় নি। তার পর এই শ্রেণীর বিশিষ্ট গ্রন্থের মধ্যে জহ্লণের সূক্তি-মুক্তাবলী, শার্ঙ্গধরের শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, শ্রীধরদাসের সদুক্তি-কর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী গ্রন্থ অতি উপাদেয়। এ সব গ্রন্থের পরবর্তী যুগের গ্রন্থ হচ্ছে পদ্যবেণী, পদ্যামৃত-তরঙ্গিণী, সূক্তি-সুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থ। এ শেষোক্ত গ্রন্থগুলি মুসলমান রাজত্ব-সময়ে রচিত হয়েছে এবং এই সব গ্রন্থে মুসলমান রাজগণের বিষয়ে বিশেষ উল্লেখাদি দৃষ্ট হয়। কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ের রচনা-সময় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সুভাষিত গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়েছে। তার পরবর্তী রচনাসমূহ বেশীর ভাগ উক্ত গ্রন্থসমূহের কবিতার চয়ন মাত্র—সংগ্রাহকদের কয়েকটি কবিতা ব্যতীত তাতে নবীনতা বিশেষ কিছুই নাই—যেমন পূর্ণচন্দ্র দেব উদ্ভটসাগর। অন্য দিকে—সুভাষিত-সার-সংগ্রহ, সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার, সুভাষিত-সুধা-ভাণ্ডাগার প্রভৃতি অত্যাধুনিক গ্রন্থসমূহ একেবারে নিছক সঙ্কলন মাত্র—এতে নূতনত্ব বা সরসতা কিছুই নেই—যদিও পদ্যসংগ্রহরূপে এই সকল গ্রন্থ সুখপাঠ্য এবং বিশেষ সংরক্ষণযোগ্য।

বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী গ্রন্থ ৩৫২৭টি শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভিক শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে কবি প্রথমটিতে দেবী ভবানীকে জানিয়েছেন স্তুতি—

তাং ভবানী ভবানীত-ক্লেশনাশ-বিশারদাম্।
শারদাং শারদাম্ভোদসিতসিংহাসনাং স্তুঃ॥

এবং দ্বিতীয়টিতে চিন্তাশক্তির উৎকর্ষের জন্য তিনি আকুতি নিবেদন করেছেন—

অনপেক্ষিতগুরুবচনা সর্বান্ গ্রন্থীন্ বিভেদয়তি সম্যক্।
প্রকটয়তি পররহস্যং বিমর্শশক্তিনিজা জয়তি॥

তার পর যথাক্রমে নমস্কার, আশীর্বচন ও বক্রোক্তি—পদ্ধতি। অতঃপর কবি-কাব্য প্রশংসা। এই পদ্ধতিতে ভট্টনারায়ণের একটি শ্লোকে খলজনের কাব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে—

ক দোষোঽত্র ময়া লভ্য ইতি সংচিন্ত্য চেতসা॥
খলঃ কাব্যেষু সাধুনাং শ্রবণায় প্রবর্ততে॥ ৪১

শ্লেষমুখে বাক্যস্ফূর্তির সঙ্গে মনোভিরামা গৃহিণীর তুলনা করেছেন ভট্ট ত্রিবিক্রম—

প্রসন্নাঃ কান্তিহারিণ্যো নানাশ্লেষ-বিচক্ষণাঃ।
ভবন্তু কস্যচিৎ পুণ্যৈ মুখে বাচো গৃহে স্ত্রিয়ঃ॥

দুটি অতি মনোরম শ্লোকে কাশ্মীরক কবি বিহ্লণ কোনও রাজাকে সংবোধন করে বলছেন যে সম্মান অতি নিরহঙ্কার ভাবে জ্ঞাপন করা উচিত রাজাদের কবিগণকে—কারণ, তাঁরাই রাজাদের অমর করে রাখেন যশোগাথার মাধ্যমে—

স্বেচ্ছাভঙ্গুর-ভাগ্য-মেঘতাড়িতঃ শক্যা ন রোদ্ধুং শ্রিয়ঃ
প্রাণানাং সততং প্রয়াণ-পটহ-শ্রদ্ধা ন বিশ্রাম্যতি।
ত্রাণং যেঽত্র যশোময়ে বপুষি বঃ কুর্বন্তি কাব্যামৃতৈ-
স্তানারাধ্যপদে বিধত্ত সুকবীন্ নির্গর্বমুর্বীশ্বরাঃ॥১৬৬

আরও অগ্রসর হয়ে এই অমর কবি রাজাকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন—কবিরাই ত রামকে রাম সাজিয়েছেন, দশানন রাবণকে করে তুলেছেন হাস্যাস্পদ। কাজেই রাজারা কবিদের রুষ্ট করলে তাঁদের সমূহ বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী—

হে রাজানস্ত্যজত সুকবিপ্রেমবন্ধে বিরোধং
শুদ্ধা কীর্তিঃ স্ফুরতি ভবতাং নূনমেতৎপ্রসাদাৎ।
তুষ্টৈর্বদ্ধং তদলঘু রঘুস্বামিনঃ সচ্চরিত্রং
রুষ্টৈর্নীতস্ত্রিভুবনজয়ী হাস্যমার্গং দশাস্যঃ॥
এতৌ ভট্টশ্রীবিহ্লণস্য॥১৬৭

সুজন ও দুর্জন পদ্ধতিতে কবি অনেক মণিরত্ন সংগ্রথিত করেছেন। দুটি শ্লোকে দুর্জনের স্বভাব অতি সুন্দরভাবে উদ্দিষ্ট হয়েছে। একটিতে কবি বলছেন—দুর্জনের স্বভাব ও শ্লেষ্মার স্বভাব এক প্রকারের—মধুরেতে এরা কুপিত হয় এবং কটুতে এদের উপশম ঘটে—

অহো প্রকৃতিসাদৃশ্যং শ্লেষ্মণো দুর্জনস্য চ।
মধুরৈঃ কোপমায়াতি কটুকৈরুপশাম্যতি॥

অন্যটিতে কবি বলছেন—গজেন্দ্র ছায়ালাভের জন্য বৃক্ষের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিশ্রাম গ্রহণের পর গাছটিকে ভেঙে দিয়ে যায়। নীচ জনের স্বভাবই এই—

যথা গজপতিঃ শ্রান্তশ্ছায়ার্থী বৃক্ষমাশ্রিতঃ।
বিশ্রম্য তং ক্রমং হন্তি তথা নীচঃ স্বমাশ্রয়ম্॥৩৫৪

পুনরায় ভট্ট পৃথ্বীধর দুটি শ্লোকে খল লোকের কি অপূর্ব চিত্রই না ফুটিয়ে তুলেছেন—

কা খলো সহ স্পর্ধা সজ্জনস্যাভিমানিনঃ।
ভাষণং ভীষণং সাধুদূষণং যস্য ভূষণম্ ॥
নির্মায় খলজিহ্বাগ্রং সর্বপ্রাণহরং নৃণাম্।
চকার কিং বৃথা শস্ত্রবিষবহ্নীন্ প্রজাপতিঃ ॥৩৭৬

কদর্যপদ্ধতির একটি শ্লোকে কোনও কবি বলছেন—

তে মূর্খতরা লোকে যেষাং ধনমস্তি নাস্তি চ ত্যাগঃ।
কেবল-মর্জন-রক্ষণবিয়োগদুঃখান্যনুভবন্তি ॥৪৮৩

অর্থাৎ কৃপণেরা সত্যি কতই না দুঃখী, যারা অর্থ থাকতেও তা ব্যয় করতে জানে না—তাদের অর্জন, রক্ষণ ও ব্যয়ের কষ্টই মাত্র সম্বল।

অন্যাপদেশ-পদ্ধতিসমূহে কোনও কোনও পশু, পক্ষী প্রভৃতিকে নিয়ে উপদেশবাক্য সংগ্রথিত হয়েছে। ধর্মদেব তাঁর একটি শ্লোকে পদ্মকে সংবোধন করে বলছেন—

পদ্মাদয়ো বহুগুণা অপি যন্নিশাসু
নাশং ন যান্তি বিরহেণ দিবাকরস্য।
তৎপঙ্ক-সঙ্কুল-জলাশয়-জন্ম জাড্য-
জ্যায়ো বিজৃম্ভিতমিদং ত্রিজগৎপ্রতীতম্ ॥৯২৫

অর্থাৎ, ত্রিজগৎ জানে কেন বহুগুণযুক্ত হয়েও পদ্মাদি রাত্রে সূর্যের বিরহে বিনষ্ট হয় না। কবি বলছেন—এর কারণ—পদ্মাদির জন্মস্থান কর্দমপরিপূর্ণ পুকুর এবং তজ্জন্য এদের জন্ম থেকেই অনেকটা জড়তা এদের আশ্রয় করে থাকে।

শৃঙ্গার পদ্ধতিতে নারীকবি মোরিকা কোনও একটি অল্পবয়স্কা প্রিয়ার বিষয়ে প্রিয়কে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে, তার প্রিয়া ও প্রিয়গৃহে আসতে না আসতেই—"প্রাপ্নোতি নিষ্ঠাং পরাম্"। মোরিকার চিত্রণে আর একজন প্রিয়কে দেখতে পাই—যিনি অত্যন্ত দুঃখ করছেন যে, ঝরঝর অশ্রু-বিসর্জনকারিণী প্রিয়াকে ছেড়ে অর্থ অর্জনের জন্য প্রিয়কে যেতে হয় বিদেশে—এর থেকে মর্মন্তুদ আর কিছুই হতে পারে না। প্রাণসমা প্রিয়ার কাছে যে কথা মুখ ফুটে বলা যায় না, সেটি কাজে করতে হয়—প্রিয়াকে ছেড়ে বিদেশে যেতেই হয়—এর চেয়ে চরমতম দুঃখ মানুষের আর কি হতে পারে?—

যামীত্যধ্যবসায় এব হৃদয়ে বধ্নাতু নামাস্পদং
বক্তুং প্রাণসমাসমক্ষমঘৃণেনেত্থং কথং পার্যতে।
উক্তং নাম তথাপি নির্ভরগলদ্‌বাষ্পং প্রিয়ায়া মুখং
দৃষ্টাঽপি প্রবসন্ত্যহো ধনলবপ্রাপ্তিস্পৃহা মাদৃশাম্ ॥১০৫০

প্রিয়ার বিরহিণী অবস্থা বর্ণন করে পুনরায় মোরিকা বলছেন—

লিখতি ন গণয়তি রেখাং নির্ঝরবাষ্পাম্বুধৌত-গণ্ডতটা।
অবধিদিবসাবসানং মা ভূদিতি শঙ্কিতা বালা ॥১০৭২

বিরহিণী প্রিয়া ভূমিতে রেখা অঙ্কিত করে রেখেছে; কিন্তু কত দিন গেল, তা আর গুনে দেখছে না—পাছে ফিরে আসবার দিন আরও দূরে সরে যায়।

বিরহিণী প্রলাপপদ্ধতিতে একটি কবিতায় নারীকবি-কুলশিরোমণি বিজ্জা বা বিজ্জকা বা বিদ্যা বলছেন—

গতে প্রেমাবন্ধে হৃদয়বাহুমানেঽপি গলিতে
নিবৃত্তে সদ্ভাবে জন ইব জনে গচ্ছতি পুরঃ।
তথা চৈবোৎপ্রেক্ষ্য প্রিয়সখি গতাংস্তাংশ্চ দিবসান্
ন জানে কো হেতুর্দলতি শতধা যন্ন হৃদয়ম্ ॥১১৪১

প্রেমবন্ধন নষ্ট হয়ে গেল; হৃদয়ের প্রচণ্ড মান গলে ধুয়ে মুছে গেল; সদ্ভাবের হ'ল নিবৃত্তি। প্রেমাস্পদ সাধারণ লোকের মত সামনে দিয়ে যায় চলে। তথাপি—কি জানি যেন সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়; প্রিয় সখি! কত কথা যে ভাবি। না জানি কেন হৃদয় শত শত টুকরা হয়ে ভেঙ্গে পড়ে যায়।

এই মহীয়সী নারী কবিই একদিন বলেছিলেন—

নীলোৎপলদলশ্যামাং বিজ্জকাং মামজানতা।
বৃথৈব দণ্ডিনা প্রোক্তং সর্বশুক্লা সরস্বতী ॥

আমি নীলোৎপলদলের মত শ্যামবর্ণা সরস্বতী; আমাকে না জেনেই দণ্ডী কবি বৃথা বলেছেন—সরস্বতী সর্বশুক্লা।

দূতি ত্বং তরুণী যুবা স চপলঃ শ্যামাস্তমোভির্দিশঃ
সংদেশঃ সরহস্য এব বিপিনে সংকেতাবাসকঃ।
ভূয়ো ভূয় ইমে বসন্ত-মরুতশ্চেতো হরন্ত্যন্ততো
গচ্ছ ক্ষেমসমাগমমায় নিপুণে রক্ষন্তু তে দেবতাঃ ॥

এই কবিতাটি শীলাভট্টারিকার রচিত এবং বল্লভদেব উদ্ধৃত করেছেন দূতীপ্রেষণ অধ্যায়। এখানে নায়িকার মনের সন্দেহ—এমনকি স্বীয় দূতীর প্রতিও নারী-চিত্তের সন্দিগ্ধ আকুলতা—কবি শীলাভট্টারিকার অঙ্কনে বিশেষ করে ফুটে উঠেছে।

নারীকবি মারুলার একটি সুন্দর শ্লোকে বিরহীর চিত্র সুন্দর অঙ্কিত হয়েছে। প্রিয় প্রিয়াকে বলছেন—তুমি কৃশা হয়ে গেছ কেন? প্রিয়ার উত্তর—কৃশতা আমার শরীরের ধর্ম। তুমি মলপরিবৃতা কেন? গুরুজনের গৃহে পাচকতা করছি বলে। আমাকে কখনও মনে পড়ে কি? না, না, না—এই কথা বলতে বলতে কম্পমানা প্রিয়া আমার বক্ষে পড়ে কাঁদতে লাগল।

"কৃশা কেনাসি ত্বং প্রকৃতিরিয়মঙ্গস্য ননু মে
মলাধূম্রা কস্মাদ্ গুরুজনগৃহে পাচকতয়া।
স্মরস্যস্মাৎ কচ্চিন্নহি নহি নহীত্যেবমগম-
ৎস্মরোৎকম্পং বালা মম হৃদি নিপত্য প্ররুদিতা ॥"

সূর্যাস্ত বর্ণন করতে গিয়ে নারীকবি ইন্দুলেখা বলছেন—

একে বারিনিধৌ প্রবেশমপরে লোকান্তরালোকনং
কেচিৎ পাবকযোগিতাং নিজগদুঃ ক্ষীণেঽহ্নি চণ্ডার্চিষঃ।
মিথ্যা চৈতদসাক্ষিকং প্রিয়সখি প্রত্যক্ষতীব্রাতপং
মন্যেঽহং পুনরধ্বনীনরমণীচেতোঽধিশেতে রবিঃ॥১৯০২

অর্থাৎ, কেউ কেউ বলেন, সূর্য অস্ত গমনের পর সমুদ্রগর্ভে *নিমজ্জিত হন; কেউ বা বলেন তিনি পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে যান; আবার কেউ বা বলেন—সূর্যদেব দিন শেষ হয়ে গেলে* সন্ধ্যাবাতির আগুনের সঙ্গে মিশে যান। কিন্তু হে প্রিয় সখি! এই সমস্ত কথা মিথ্যা। সত্য হচ্ছে এই—সূর্যদেব অস্তগমনের পরে যত বিরহিণীগণের উত্তপ্ত হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন।

এই ভাবে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সুভাষিতাবলীতে জ্ঞানের উদ্দীপ্ত প্রকাশ, কবিত্বের অপূর্ব স্ফুরণ, ভাবের উল্লাস—অনবদ্য মাধুর্য দৃষ্ট হয়। কবি সত্যই বলেছিলেন—

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

সংসার-বিষবৃক্ষের অন্যতম রসবৎফল এই যে কাব্যামৃত রসাস্বাদ, তার প্রকৃষ্ট উপকরণ যিনি আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে গেছেন, সেই বল্লভদেবকে আমরা বিংশ শতাব্দীর ভক্ত-পূজারী দল কোটী কোটী প্রণাম জ্ঞাপন করি।

প্রেমের নব ধারাপাত

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

কে জানে কোন্ তমালতলে মুখর হ'ল কেকা
কোথায় রামগিরি!
এসেছে দূত শ্যামল ছায়ে, কাজল নীল লেখা
তাই ত একা ফিরি।
এইখানে এই বেঞ্চি ভিজে, কৃষ্ণচূড়ার শাখা।
বলাকা-বেলা মেলেছে, বুলু, সুরেলা স্মৃতি-পাখা।
হঠাৎ আমার মনের বনে এলো কুঁড়ির কাল
মুখর বোবা ডাল,
চমকে উঠে স্বপ্নে-দেখা সোনার হরিণপাল
গন্ধে বেসামাল।
ঘরের মানা কেই বা শোনে, রয় কে কাজের ভিড়ে!
তোমার হাতে ধরা দিতে এলেম লেকের তীরে।
আপন মনে কেয়ার কোণে মরছে ওরা বকি'
ফুরায় না সে কথা;
দু'এক ফোঁটা ফুলকি ঝরায় চোখের চকমকি
তাই নিদারুণ ব্যথা
তারুণ্যেরে করলে না যে ঊর্ণনাভের বোনা;
ওরা প্রেমের পাঠশালাতে করছে আনাগোনা।

কোন্ আগুনের বার্তা জানায় বিদ্যুৎ বুক চিরে
বনের মনোহর!
ঢেউয়ের পরে ঢেউ শুধালো ইতিহাসের তীরে
প্রশ্ন নিরুত্তর।
পারের ছায়ার অন্ধকারে ঝিল্লী-কলরোলে
অলক্ষ্য কোন্ যক্ষবধূর বক্ষ-দুয়ার খোলে।
পরশ-পাওয়ার তরাস লাগে মোর কিশলয় আশায়
বইছে কেমন হাওয়া,
এমন সহজ ভেবেছিলেম তোমার চিঠির ভাষায়
তাই ত এ তাপ পাওয়া।
শুনি পায়ের ধ্বনি বাজে কানায় কানায় দুখে
সৌরভে ফুল উঠছে কেঁদে, বাঁধন টুটে বুকে।
এইখানে এই বেঞ্চি ভিজে, কৃষ্ণচূড়ার শাখা
করছে হাহুতাশ।
গুনগুনিয়ে গানের কলি হাতে হৃদয়-রাখা
তৃষার ব্যর্থ আশ।
অতল কালো চোখের চিঠির নীল আলোকের লেখায়
সেই অপরূপ ব্যথা, বুলু, রূপকথা তার শেখায়।

দেখুন! মাত্র অর্দ্ধেক সানলাইট সাবানেই

ফেণার আধিক্যের দরুণই সানলাইট সাবান এত ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র **অর্দ্ধেকটী সানলাইটে** কতগুলি জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুণই প্রতিটী ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে আশ্চর্য্যরকম সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুণই জামাকাপড় বিনা আছাড়ে পরিস্কার হয়। তার মানে আপনার জামাকাপড় টেঁকে আরও অনেক বেশী দিন।

সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

S. 243-X52 BG

আলোচনা

"নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক কে ?"

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

গত মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ "নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক কে ?" নিবন্ধে লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম তাঁর দীনবন্ধু জীবনীতে মাইকেল মধুসূদনকে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক বলেন, অথচ মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কেউই কোথাও এ-কথার উল্লেখ করেন নি। পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র নাকি মন্মথবাবুকে বলেন, মূল পাণ্ডুলিপিতে 'মধুসূদন নীলদর্পণের অনুবাদক' একথা ছিল না। পরে খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ঐ অংশটি বসিয়ে দেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডুলিপিতে মধুসূদনের অনুবাদের কথাটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা, এর সমর্থনে মন্মথবাবু নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে একটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন। নগেনবাবু লিখেছেন, "সঞ্জীবচন্দ্র স্বহস্তে মধুসূদনের অনুবাদের কথা উক্ত গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন।" এখন এ সম্পর্কে বক্তব্য এই—ললিতবাবু মন্মথবাবুর কাছে মুখে যাই বলুন না কেন, তিনি তাঁর "History of Indigo Disturbances in Bengal" নামক গ্রন্থে নিজেই লিখেছেন—"The Reverend James Long took upon himself the task of having the drama translated in English, to open the eyes of the Government and the English community. The actual translation was made by the immortal poet of the 'Meghnadbadh'—Michael Madhusudan Dutt. The translation was hurried through a night.···In spite of all, the translation did not fail to present a glimpse of the original to English readers.'

এখানে দেখা যাচ্ছে, মধুসূদনই যে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক একথা ললিতবাবুও স্বীকার করেছেন। আর শুধু তাই নয়, মধুসূদন কি ভাবে একরাত্রির মধ্যে অনুবাদ করেছিলেন, ললিতবাবু তারও উল্লেখ করেছেন।

নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধু-স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারকনাথ ঘোষের ঝামাপুকুরস্থ বাসভবনে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন একরাত্রির মধ্যে 'নীলদর্পণে'র অনুবাদকার্য্য সমাধান করেন। একজন নীলদর্পণ পাঠ করিয়া যাইতেছেন, আর মধুসূদন চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর অবিরত লেখনী সঞ্চালনে ইংরেজীতে উহা ভাষান্তরিত করিয়া যাইতেছেন।"

মধুসূদন যে তারকনাথ ঘোষের বাড়ীতে বসে নীলদর্পণের অনুবাদ করেছিলেন, একথা নগেনবাবু তারকনাথ ঘোষের বাড়ীতেই শুনেছিলেন। অতএব নগেনবাবুর লেখা থেকেও দেখা যাচ্ছে যে, মধুসূদনই নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক।

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডুলিপিতে সঞ্জীবচন্দ্রের লিখে দেওয়ার কথা। এ সম্পর্কে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার উপর সঞ্জীবচন্দ্র লিখতে যাবেনই বা কেন ? দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রাণতুল্য' বন্ধু ছিলেন, মধুসূদনের সঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের কারও কাছ থেকে জেনে নিজেও ত লিখতে পারেন ! আর সঞ্জীবচন্দ্র যদিও বা লিখে দিয়েই থাকেন, তা হলেও কথাটা সত্য না হলে বঙ্কিমচন্দ্র কখনই তা স্বীকার করে নিতেন না। দীনবন্ধু-জীবনী প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় সতর বৎসর বেঁচেছিলেন। এর মধ্যেও যদি তিনি মাইকেলের অনুবাদের কথা সত্য নয় বলে জানতে পারতেন, তা হলে নিশ্চয়ই তা সংশোধন করে দিতেন।

মন্মথবাবু বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু-জীবনী প্রকাশিত হলে গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি নিশ্চয়ই তা পড়েছিলেন, এবং মধুসূদনের অনুবাদের কথাটা সত্য নয় বলেই, তাঁরা তাঁদের স্মৃতিকথায় এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নি।

কিন্তু এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে—মধুসূদনের বন্ধুরা দীনবন্ধু-জীবনী পড়ে যখন দেখলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন সম্বন্ধে এত বড় একটা অসত্য কথা লিখেছেন, তখন তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে এ সম্পর্কে কিছুই বললেন না ! আর এ কথাও অন্ততঃ বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি যদি বঙ্কিমচন্দ্রকে মধুসূদনের অনুবাদের কথা সত্য নয় বলে জানাতেন তা হলে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই তাঁর লেখায় ও কথার সংশোধন করে দিতেন।

দীনবন্ধু-জীবনী প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র ও গৌরদাস বসাক উভয়ে একই সময়ে হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

LUX
TOILET SOAP
LUX
প্রণতি ঘোষ লাক্স টয়লেট
সাবান পছন্দ করেন তিনি বলেন
"এর শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতা
প্রমাণ করে!"

ছিলেন। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল এবং টিফিনের সময় কোর্টে বসে তাঁরা ইংরেজের শোষণ-ব্যবস্থা, দেশের জনসাধারণের দুরবস্থা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনাও করতেন। মধুসূদনের অন্যতম বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর "আমার দেখা লোক" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে বলেছেন। মুকুন্দদেব বাবুও তখন হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু-জীবনী প্রকাশের পরে বঙ্কিমচন্দ্র ও গৌরদাস বসাক একই সঙ্গে কাজ করছেন এবং দেশে ইংরেজের শোষণ-ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা করছেন। এ অবস্থায় গৌরদাস বসাকের পক্ষে ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের কথাও মনে হওয়া এবং মধুসূদন নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক না হলে বঙ্কিমচন্দ্রকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় মধুসূদন সম্বন্ধে কোন ভুল কথা থাকলে, গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মধুসূদনের বন্ধুরা নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে প্রতিবাদ জানাতেন। মধুসূদন সম্বন্ধে কোন মিথ্যা প্রচার দেখে তাঁরা চুপ করে থাকতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পড়েও যখন তাঁরা বিপরীত কিছু বলেন নি, তখন একথা বলা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই লিখেছেন।

বিশ্ব-প্রিয়া

শ্রীসুধীর গুপ্ত

মহাবিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ মাঝে
যে রূপসী আমারে ভুলালো,
শুনিলাম 'সক্রেটিস'ও তারে
প্রাণ দিয়ে বেসেছিলো ভালো।
'যাজ্ঞবল্ক্য' 'জনক'-সভায়
তারে ধরি' সর্ব্ব-সত্য সার
ব্রহ্ম-তত্ত্ব করেছিল নাকি
  আজীবন ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার!
তারই লাগি, সংসার ছাড়িয়া
'তথাগত' ধরেছে কাষায়;
তারই তরে 'চৈতন্যের' প্রাণ
  সিন্ধু-বুকে প্রেমেতে লুটায়।

২

সে প্রেমিকা চির-মায়াবিনী,
  মুগ্ধ করে সকলেরই হিয়া;
আমি যারে প্রাণ সঁপিয়াছি,
  কি আশ্চর্য্য সেই বিশ্ব-প্রিয়া!
অজন্তার গুহা-চিত্র-পটে
  শিল্পী তারে চেয়েছে ধরিতে;
তারই চিত্র মহাচিত্রকর
  ফুটিয়াছে 'দা ভিঞ্চির'ও চিতে,
'দান্তে' তার সঙ্গীতে বিভোর;
  'রুমী' তারে করে আরাধনা;
'গ্যেটে' তারই কবিতা রচিয়া
  চাহে মাত্র প্রেম এক কণা।

৩

হে প্রেয়সী—হে শ্রেয়সী মোর—
  ওগো মোর মর্ম্ম সহচরী,
তব রূপে—তব প্রেমালোকে
  দাও চিত্ত উদ্ভাসিত করি।
মহাবিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ ভরি'
  হে সুন্দরি, আবির্ভূত হও;
ভাগ্যহত তোমার কবিরে
  একবার বক্ষে তুলে লও।
তব প্রেম-সুধা পান করি'
  ধন্য হব এই নিবেদন;
ভুলি নাই ক্রুশে তব তরে
  'যীশু' দিল নৈবেদ্য জীবন।

ফুলডোরে—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত। অটো প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস, ৪৯ বলদিয়াপাড়া রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

ঔপন্যাসিক এবং গল্পলেখক হিসাবে শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসগুলি পাঠকমহলে সমাদৃত হইয়াছে। বর্তমান পুস্তকখানি বিভিন্ন সময়ে নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট গল্পের সঙ্কলন। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম গল্পটিতে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, বর্তমান পুস্তকে তাহার ক্রমবিকশিত রূপ পাঠকবৃন্দকে বিস্মিত এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত করিয়া তুলিবে। অনুভূতি, অবলম্বন, অসাধারণ, অন্তরালে, কলঙ্কিনী, দাগ, গঙ্গার ইলিশ, ইমারত, বিপরীত, সংঘাত, সামঞ্জস্য, অনুসরণ এই বারোটি গল্প সমালোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি গল্পই উপভোগ্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়—অনুভূতি, অন্তরালে, অসাধারণ, গঙ্গার ইলিশ, ইমারত এই গল্পপঞ্চকের কথা। গল্পরচনায় লেখকের স্বকীয়তা এই গল্পকয়টির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গল্পগুলির মধ্যে যে জিনিসটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইতেছে লেখকের আন্তরিকতা ও দরদ। এই দরদ শুধু মানুষের প্রতি নহে, ইতরপ্রাণীর প্রতিও যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 'অবলম্বন' নামক প্রথম গল্পটিতেই। সুবিমলের গুলিতে নিহত বানরীর সঙ্গীটির চাপা গোঙানির সঙ্গে তপতীর বেদনা মিশ্রিত হইয়া এমনি একটা নিবিড় করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছে যে, গল্প শেষ হইলেও পাঠকের মনে বেদনার রেশ ধ্বনিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় গল্প 'অবলম্বনের'ও উপজীব্য ইতরপ্রাণীর প্রতি আত্মীয়স্বজনের সংসর্গবঞ্চিত সুকুমারের সুগভীর ভালবাসা—যা জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে রচনা করিয়া তোলে এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। সেই প্রীতির ডোর এমনি সুদৃঢ় যে, সুকুমারের মৃত্যুর পরও বন্যপশুরা তাহার আরণ্য কুটীরের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় "তার ভালবাসার সুখস্পর্শের সন্ধানে।"

বিভূতিবাবুর আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—গল্পগুলির ঘরোয়া পরিবেশ। তাঁহার গল্পের পটভূমিকা বহুদূরবিস্তৃত নহে, আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তিনি গল্পের উপকরণের সন্ধান করেন এবং শিল্পীজনসুলভ গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে প্রাত্যহিক জীবনের অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে মানুষের মনোজগতের অতলস্পর্শ রহস্য উপলব্ধি করিয়া তাহাকে এক অনুপম রসশ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তোলেন। প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে মহত্ত্বকে, সাধারণ ঘটনার মধ্যে অসাধারণকে আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা যে তাঁর কতখানি তার পরিচয় পাওয়া যায় 'অসাধারণ' গল্পটিতে। 'গঙ্গার ইলিশ' গল্পটিও তুচ্ছ বিষয়বস্তু অবলম্বনে লিখিত, কিন্তু দরিদ্র বাঙালী পরিবারের ছবিটি ইহার মধ্যে একেবারে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, ভাগ্যবিড়ম্বিত বঞ্চিত জীবনের বেদনার সকরুণ সুর ইহার মধ্যে আগাগোড়া অনুস্যূত—উপসংহারটি এত মর্ম্মস্পর্শী যে, ইহা পাঠকচিত্তে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়। আর মনকে গভীরভাবে অভিভূত করে 'ইমারত' গল্পের বন্ধুর জীবনের শোচনীয় পরিণতি। বঞ্চিত শোষিত সকল মানুষের বেদনা যেন এই গল্পটির মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের ভাষায়—"বন্ধুর চোখের সম্মুখে যেন এই মহানগরীর অট্টালিকাগুলি সহসা নৃত্য জুড়ে দিল। কি বীভৎস তার রূপ, কি কদর্য্য তার আত্মপ্রকাশ। অর্দ্ধভুক্ত, অভুক্তের অভিশাপজর্জ্জরিত এক একটি স্মৃতিসৌধ। যার প্রতিখানি ইঁটের গাঁথুনি, বালির পলস্তারা, চুনের পোঁচ, মেঝের টকটকে লাল রং তাদের দেহের হাড়, মাংস মজ্জা এবং রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে।" মেঝের রঙের সঙ্গে মিশিয়া-

যাওয়া বন্ধুর বুকের "এক ঝলক তাজা টকটকে লাল রক্ত"—পাঠকের মনে একটা অনপনেয় রক্ত-লিখন আঁকি দেয়।

খুঁটিয়া খুঁটিয়া সবগুলি গল্পের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বইয়ের প্রত্যেকটি গল্পই যে গল্পরসিকের মনোরঞ্জন করিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তদুপরি অপূর্ব্ব হইয়াছে বইয়ের প্রচ্ছদপট—ভিতরে বাহিরে সুন্দর এমন একখানি গল্পসঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিভূতিবাবু পাঠকবৃন্দকে অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

টোপর—শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রভাত কলামন্দির। ২৪, করিশ চার্চ্চ লেন। কলিকাতা-৯। মূল্য দুই টাকা।

সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের কয়েকটি গল্প পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 'টোপর' তাহার প্রথম গল্পসঙ্কলন-গ্রন্থ। ইহাতে টোপর, গদাধর, ঠাঁই নাই, মায়ের দয়া ও অমর প্রভৃতি সতেরোটি গল্প স্থান পাইয়াছে। সবগুলি গল্পই সুখপাঠ্য। ঠাঁই নাই, মায়ের দয়া প্রভৃতি কোন কোন গল্পে খানিকটা পাকা হাতের ছাপ পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ গল্পই ছোটও হইয়াছে এবং গল্পও হইয়াছে। লেখকের যেমন আছে নিজস্ব রচনাশৈলী তেমনি আছে তাঁহার স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী। এই দুইটি গুণের সহিত বঞ্চিত, নিপীড়িত দুর্গত মানুষের প্রতি সুগভীর দরদ কতকগুলি গল্পকে রসসৃষ্টি হিসাবে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। ভূমিকায় প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সত্যই বলিয়াছেন—"আর একটি জিনিষ চোখে পড়ল যা হরিশঙ্করের সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত করে তোলে, শিল্প-চেতনার সঙ্গে ওর ব্যাপক সহানুভূতি। ওর দৃষ্টির মধ্যে কৌতূহলের সঙ্গে আছে দরদ, আছে সহানুভূতি।" এই দরদ এবং সিম্প্যাথি মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতিও যে কত গভীর তাহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে 'ঠাঁই নেই' গল্পে। কারখানা ঘরে বাসা-বাঁধা চিল দম্পতির বাচ্চাটির অপমৃত্যুর বাহুল্যবর্জ্জিত বর্ণনা মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। "মানুষ এখানে বাসা পায় না, তা কাকপক্ষী"—এই কথা কয়টি যেন সকল আশ্রয়হীন মানুষ আর ইতরপ্রাণীর বেদনাকে চোখের সামনে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তোলে। মোট কথা, গল্পসঙ্কলনখানি পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, নিষ্ঠার সহিত রচনায় রত থাকিলে বর্ত্তমান পুস্তকে যে সামান্য ছোটখাটো ত্রুটি আছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহা নিরাকৃত হইবে এবং বাংলা গল্প সাহিত্যের আসরে লেখক নিজের স্থান করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি—শ্রীগুরুদাস সরকার। রত্নসাগর গ্রন্থমালা। শ্রীদেবকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে একিমিনিয় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া 'আর্দ্দেশীরের পিতা সাসান-পূর্ব্ব (ফরাসী ঐতিহাসিক রেণোর মতে) যুগ পর্য্যন্ত ইরাণে যে শিল্পকলা ও সংস্কৃতি উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল তাহার ব্যাপক ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন। পারস্যের নিজস্ব সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয় ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে। মহানুভব দ্বিতীয় কুরুষ একিমিনিয় সাম্রাজ্যের পত্তন করেন এবং এই সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে যুনানী বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজাণ্ডারের হস্তে। ইহার প্রামাণিক কাল হইল ৩৩০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ। একিমিনিয় সাম্রাজ্যের পতনোত্তর যুগ ইরাণের ইতিহাসে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' বলিয়া অভিহিত। এই অন্ধ-যুগের আবার অবসান ঘটে সাসানীয় যুগের অভ্যুদয়ে। দ্বিতীয় কুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া সাসানপুত্র আর্দ্দেশীর পাপাকান পর্য্যন্ত ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসবিশ্রুত দ্বিতীয় কুরুষ বা সাইরাস দি গ্রেট কেমন করিয়া এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন সেকথা লেখক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে ইরাণীয় শিল্পের পরিমিতি ও বিস্তারের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই যুগের শিল্পীদের শিল্পধারণা কতদূর উন্নত ছিল তাহা আমরা পসার গড়াইয়ে সম্রাট সাইরাসের যে পক্ষবিশিষ্ট মূর্ত্তি প্রস্তরে উৎকীর্ণ আছে তাহা হইতে জানিতে পারি। তাঁহার মস্তকে মিশরীয় রাজগণের ন্যায় মেহারা মুকুট আর পক্ষদ্বয় আসিরীয় প্রথামতে দেহের সহিত সম্বদ্ধ। সম্রাটের সুঠাম দেহ যেন শিল্পীর কল্পনায় এই মূর্ত্তিতে প্রাণ পাইয়াছে; ইহা প্রকাশের প্রসাদগুণে সমুজ্জ্বল। একথা স্বীকার্য্য যে, একিমিনিয় যুগের বলিষ্ঠ শিল্পে মিশরীয় ঢঙের বাঁধা ছাঁচের ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। মেসোপটেমিয়ার শিল্পশৈলীও ইরাণীয় শিল্পপদ্ধতিকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সে যুগে ইরাণীয় শিল্পীদের মধ্যে যুনানী শিল্পের মৌলিক ধারণাগুলিও অপরিজ্ঞাত ছিল না। পরবর্ত্তী কালের একিমিনিয় শিল্পে আমরা এই সব শিল্প-প্রভাবের লক্ষণ দেখিতে পাই। সম্রাট সাইরাসের পক্ষবিশিষ্ট যে মূর্ত্তির কথা আমরা বলিয়াছি তাহার সৌন্দর্য্য ও সাসানীয় যুগের প্রবর্ত্তক আর্দ্দেশীর পাপাকান ও তাহার প্রণয়িনী গুলনারের প্রথম প্রণয়-চিত্রের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সম্ভারে বিষমতা লক্ষণীয়। এই প্রণয়-চিত্রের বর্ণ-সুষমা ও অলঙ্করণ-রীতি পারস্যের মধ্যযুগের বর্ণসম্পাত-কৌশলের অপূর্ব্ব নিদর্শন।

গ্রন্থকার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ইরাণীয় শিল্পের ক্রম-উদ্বর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে এই শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়ন এবং ইহার প্রকৃতিবিচারের কোন প্রয়াস নাই। পুস্তকখানির এই অপূর্ণতাটুকু দূর করিলে ইহার মর্য্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইত। আজ ভারত-ইরাণ মৈত্রীর বন্ধনকে সুদৃঢ় করিবার জন্য চেষ্টা চলিয়াছে। নব্য পারস্যকে বুঝিতে হইলে প্রাচীন ইরাণের ইতিহাস, শিল্প ও সংস্কৃতিকে বুঝিতে হইবে। শ্রীযুক্ত সরকার লিখিত কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসরের ইরাণীয় শিল্প-সংস্কৃতির ইতিকথা মধ্যযুগীয় পারস্যকে বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভারত-ইরাণ মৈত্রী প্রচেষ্টার সাফল্য এই ধরনের পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার উপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয়—ডক্টর শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত। মডার্ণ এজেন্সি. ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রধান তথ্যগুলির সংগ্রহ। ভূমিকায় লেখক বলেছেন: "রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাহিত্যিক রস ও গুণ-

বিচারে কি ভাবে নূতন পথে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত, সেই সম্বন্ধে অনুশীলন ও বিশ্লেষণের কাজের দিকে এই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।" কি ভাবে তিনি 'নূতন পথে' অগ্রসর হতে চেয়েছেন জানি না, তবে অনুশীলন ও বিশ্লেষণের পথ দেখিয়েছেন বলে মনে হ'ল না ; 'রস ও গুণবিচারের' চেষ্টা না করে বোধ হয় ভালই করেছেন। কবির 'যৌবনকালে'র রচনাবলীর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: "সাধনা' মাসিকপত্রে এই সময়ে কতকগুলি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়, যথা: 'ঘাটের কথা', 'শুভা', 'নষ্টনীড়', 'ধোপার পাট' ইত্যাদি। 'ধোপার পাট' গল্পটি সহিত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সংগৃহীত 'মৈমনসিংহ' গীতিকার অন্তর্গত 'ধোপার পাট' গল্পের সাদৃশ্য রহিয়াছে।" (পৃ. ১২-১৩) এ তথ্য তিনি কোথায় পেলেন কে জানে? এ যে অভূতপূর্ব আবিষ্কার! আবার 'প্রৌঢ় কালের' রচনা-প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি: "রক্তকরবী—বিখ্যাত একটি জার্মান উপন্যাসের ছায়া-অবলম্বনে সঙ্কেতনাট্য।" এ-ও বোধ হয় তাঁর 'নূতন পথে' চলার দৃষ্টান্ত। ভাবের সামান্য সাদৃশ্য আছে—যখনই শুনেছেন, তখনই গ্রন্থকার সে তথ্য পরিবেশনে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। 'গীতাঞ্জলি' প্রসঙ্গে জেক্ কবিগণের এবং সিন্ধুতরঙ্গে' ডন জুয়ানের 'স্পষ্ট ছাপ'-এর উল্লেখ তার উদাহরণ। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের মত 'বাস্তব-রস-সমৃদ্ধ' গল্প নাকি রবীন্দ্রনাথ বেশী লিখতে পারেন নি! (পৃ. ৫৭) অদ্ভুত মন্তব্য!

তথ্যসংবলিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের উপযোগিতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকের কাছ থেকে আমরা যথোচিত যত্ন, সতর্কতা এবং অভিনিবেশ আশা করেছিলাম

রবীন্দ্রনাথ—শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী। বালুরঘাট, পশ্চিম-দিনাজপুর। মূল্য দেড় টাকা।

'রবীন্দ্রনাথ', 'ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথ', 'মৃন্ময় পৃথিবীর কবি', 'শেষের কবিতা', 'রবীন্দ্রকাব্যের শেষযুগ' 'রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্গীত' এবং 'কবিপ্রশস্তি'—সাতটি প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্ন দিক্ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। প্রচলিত অধিকাংশ সমালোচনাই অনুকথন মাত্র; এখানিও তাই। তবু বিষয়গুণে মনকে আকৃষ্ট করে, পূর্বাস্বাদিত রস নতুন করে আস্বাদন করি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দীপায়ন—অনন্তদেব পাল। ১২, হলওয়েল লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

এখানি কবিতার বই। পুস্তকে পঞ্চাশটি গীতিকবিতা আছে। গ্রন্থকার বইখানিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম ভাগ—স্বদেশ, দ্বিতীয় ভাগ—অন্তর্লোক। অধিকাংশ কবিতাই 'স্বদেশে'র অন্তর্গত। 'উৎসর্গে' তিনি বলিতেছেন:

নিজের বুকের অস্থি দিয়া জ্বাললো যারা বজ্রানল,
কালের বুকে আঁকল চরণরেখা;
দীপায়নের অগ্নিশিখায়—মরণজয়ী খ্যাপার দল
তাদের স্মৃতি রইল যে গো লেখা।

ইহাই পুস্তকের পরিচয় এবং এই সুর প্রায় সব কবিতায় বাজিয়াছে। প্রথম কবিতায় আছে:

কোথা দধীচির বীর সন্তান প্রাণের মুক্তিবহ,
বক্ষের তাজা রুধির অর্ঘ্য লহ।

'মহাকবি নবীনচন্দ্রে' পাই:

ভুলি নাই পলাশীরে, ভুলি নাই তোমাকেও কবি,
প্রতি বিন্দু রক্ত মাঝে রাখিয়াছি আঁকি তব ছবি।

'কবি সত্যেন্দ্রনাথে' পাই:

মাতৃভাষা মঞ্জুষায় রত্ন অভিনব,
তোমারে করেছে কবি চির মহীয়ান।

পল্লীর ব্যথায় কবির হৃদয় কাঁদিয়াছে,

পল্লীর ঘাটে পল্লীর মাঠে পল্লীর বুকে মানুষ নাই।

'তরুণ'কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:

ভয় ভাবনা মিছাই ওরে ভাঙ্গি বাধার নিষেধ ডোর,
চল্ ছুটে চল্ মুক্তিখ্যাপার দল।

একটি কবিতায় বলিতেছেন:

আঁধারের কালো ছায়া বালুকার বুকে এল নামি,
ওপারে বাজাও বাঁশী—এপারে যে আমি।

'খেলাঘরে' বলিতেছেন:

আমরা শিশু ভুলের দেশে আছি সকল ভুলে
জীবন ভরি ঝিনুক নিয়ে খেলি।

লেখক স্বদেশপ্রেমিক। তাঁহার আবেগ আছে। ছন্দের উপর আধিপত্য আছে। অনেকগুলি কবিতা মনের উপর রেখাপাত করে। "দীপায়ন" কাব্যামোদীর ভাল লাগিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

প্রেমের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর—শ্রীপ্রমথকুমার সরকার। মহানাম সম্প্রদায় কর্তৃক ৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১, হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬০+১৯। মূল্য এক টাকা।

প্রভু জগদ্বন্ধুর লীলা সম্বন্ধে ভক্তের নিবেদন। ইহা 'জীবন-চরিত' নহে। চৈতন্যদেব প্রভু জগদ্বন্ধুরূপে পুনর্জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহাই ভক্তগণের বিশ্বাস।

তাঁহার আবির্ভাব বৈশাখ ১২৭৮ বঙ্গাব্দ এবং তিরোধান ভাদ্র ১৩২৮। সুতরাং ইহজগতে তিনি মাত্র ৫১ বৎসর ছিলেন। ভগবৎপ্রেমিক এই মহাপুরুষ ফরিদপুরের কুলো অস্পৃশ্যদের কোল দিয়াছেন এবং কলিকাতার রামবাগানের ডোমদিগের মধ্যে হরিসভা স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সদাচারে উন্নীত করিয়াছিলেন। চৈতন্যের মতই তিনি হরিনাম ও প্রেম বিলাইয়া গিয়াছেন।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রভু জগদ্বন্ধুর ভক্তগণের মধ্যে এই পুস্তক সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

শিক্ষা-বিজ্ঞান—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি-এ, বি-টি। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। কলিকাতা-১২। পৃ. ২০৭। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

তরুণের শিক্ষা সকল দেশেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয় লইয়া সকল দেশেই মনীষিগণের মধ্যে গভীরভাবে আলোচনা, অনুসন্ধান এবং গবেষণা চলিতেছে। আমাদের দেশেও স্বাধীনতালাভের পর হইতে শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের জন্য বিরাট আয়োজন চলিতেছে। এই বিষয়ে আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য পুরাতন শিক্ষাবিদ্‌গণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথক। শিক্ষা এখন আর বাহির হইতে চাপাইবার জিনিষ নহে, ভিতরের গুণাবলীকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা। এই জন্যই শিক্ষককে মনোবিজ্ঞান বিশেষভাবে জানিতে হয়। দেশে শিক্ষার অভাব খুবই। কিন্তু দেশকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে যে শিক্ষণ-শিক্ষা দরকার তাহার অভাবও যথেষ্ট। শিক্ষণ-শিক্ষা বিষয়ে পাশ্চাত্যে যেরূপ আলোচনা, গবেষণা ও পুস্তক প্রণয়ন হইয়াছে তাহার তুলনায় আমাদের দেশ খুবই অনগ্রসর। মৌলিক পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য ত বটেই, পাশ্চাত্যের বহু প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির অনুবাদও এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। বর্তমান গ্রন্থে লেখক শিক্ষণ-শিক্ষা বিষয়ে বহু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন—শিক্ষাব্রতী মাত্রেই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন।

আলোচ্য বিষয় পনরটি অধ্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। যথাঃ মনোবিজ্ঞান ও জীবজগৎ, মনের উপাদান, সংস্কার ও বুদ্ধিমত্তা, বংশবিজ্ঞান ও বিবর্তন, ব্যবহারাবৃত্তি ও ক্রীড়াগতি, মনের বিকাশ, চেতন ও অবচেতন, দেহযন্ত্র, বুদ্ধির পরিমাপ, মনঃসংযোগ, স্মৃতি ও বিস্মৃতি, শিক্ষাগ্রহণ ও অবসাদ, চিন্তন ও বিচার, চরিত্রগঠন এবং মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক।

গ্রন্থকার স্থানে স্থানে পুরাতন শাস্ত্রীয় মত উদ্ধৃত করিয়া আধুনিক মতের সহিত উহার সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে একদিকে যেমন তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। শিক্ষক কেবল শিক্ষাবিজ্ঞানী হইলেই চলিবে না তাহাকে চরিত্রবান হইতে হইবে। তাহাকে 'দেখিয়া' শিক্ষার্থীরা শিখিবে, কেবল তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাহাদের শিক্ষালাভ বা চরিত্রগঠন হইবে না।

শিক্ষণ-শিক্ষালয়ে, বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষাব্রতী মহলে এই সুলিখিত পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ঐতিহাসিক শ্যালক—শ্রীশীতাংশু মৈত্র। প্রকাশক: শ্রীপ্রতুলকুমার দত্ত, ১৪৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য পাঁচ সিকা।

খুঁটি, দণ্ডমুণ্ড এবং ঐতিহাসিক শ্যালক এই তিনটি ব্যঙ্গ নাটিকা পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তীব্র শ্লেষের মধ্য দিয়া লেখক এক শ্রেণীর "সামাজিক" জীবদের উপর যে প্রচণ্ড কশাঘাত করিয়াছেন তাহা সার্থক হইতে পারিত যদি লেখায় আর একটু সংযম প্রকাশিত হইত।

ইঙ্গিত—শ্রীশীতাংশু মৈত্র। ডি. এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দেড় টাকা।

দারিদ্র্যপীড়িত মধ্যবিত্ত বাঙালী সামাজিক ভাঙনের মুখে পড়িয়া কি-ভাবে তলাইয়া যাইতেছে এবং ইহাদেরই দারিদ্র্যজনিত দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আর এক শ্রেণী কিভাবে নিজেদের কার্যসিদ্ধ করিয়া লইতেছে, কতকগুলি রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সাহায্যে লেখক তাহা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ধনী শিবনাথ এবং তার ছেলে স্বেচ্ছাচারী লম্পট অবনী, মধ্যবিত্ত অভাবগ্রস্ত মহীতোষ ও তাঁর তরুণী সমাজসেবিকা শিক্ষিতা কন্যা রেবার চরিত্র সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—বিশেষ করিয়া পরিসমাপ্তির দৃশ্যটি অপূর্ব্ব।

মনোমুকুর—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়। বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস, ৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

দশটি ছোট গল্পের সঙ্কলন। জীবনের অত্যন্ত সাধারণ এমন কতকগুলি ঘটনা গল্পগুলির উপজীব্য যাহা আমাদের আশেপাশে হামেশাই ঘটিয়া থাকে। একান্ত ভাবে ঘরোয়া হইলেও এই অতি সাধারণ ঘটনাগুলিও লেখার গুণে কত স্নিগ্ধ এবং সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে তাহার প্রমাণ জয়ন্তীর খোকা, বনলতার বাপের বাড়ী যাওয়া, নিত্যকালের উপেক্ষিতা প্রভৃতি গল্পে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে একটু-আধটু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও চরিত্র-চিত্রণে লেখকের কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

স্তবকুসুমাঞ্জলি (দ্বিতীয় প্রবাহ)—শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত এবং জেলা হুগলী, পোঃ ডুমুরদহ, শ্রীরাম আশ্রম হইতে শ্রীমুকুল দে কর্তৃক প্রকাশিত। (১/০+৩+২৭৬ পৃঃ)। মূল্য চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবাহের আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় প্রবাহও বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সংস্কৃত গদ্যপদ্য রচনায়, অধ্যাপক, কবি, এবং বিভিন্ন লেখক-লেখিকার নিবন্ধে ও কবিতায়, আটটি ইংরেজী প্রবন্ধে বর্ণিত শ্রীমৎ সীতারাম ওঙ্কারনাথের প্রশস্তিতে, তাঁহার লিখিত পঁয়ত্রিশটি পত্রে সম্পূর্ণ এবং বিভিন্ন সময়কার নানাধরণের নয়টি চিত্রে সুশোভিত। গ্রন্থমধ্যে ভাবের উচ্ছ্বাস ও আতিশয্যপূর্ণ অলৌকিক বিভূতিরা বর্ণনা কম। কিন্তু ইহাতে ভাগবত সত্তায় নিত্য বিভোর নামগানে মাতোয়ারা এই মহাপুরুষের জীবনলীলার বিভিন্ন আলেখ্য বেশ সুনিপুণ ভাবে রূপায়িত হওয়ায় এখানি পাঠক-পাঠিকার পক্ষে যুগপৎ বিশেষ প্রীতিকর এবং হিতকর হইয়াছে। সম্পাদকের ভূমিকা এবং নিবন্ধাবলীর অধিকাংশই ভক্তি ও ভাবরাজ্যের খোরাক সম্বলিত বেশ মনোজ্ঞ রচনা। যাঁহারা এই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন নাই তাঁহারাও গ্রন্থপাঠে ইঁহার স্বরূপানুভূতির পরিচয়লাভে উপকৃত হইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নিঃসঙ্গ—শ্রীসতীশচন্দ্র দে। প্রকাশক—শ্রীসলিলকুমার দে, ২৩ডি ফর্ডাইস লেন, কলিকাতা-১৪। পৃ. ২৫৪। মূল্য তিন টাকা।

গ্রন্থকারের আত্মজীবনী। তিনি ছিলেন স্কুল-কলেজে উৎকৃষ্ট ছাত্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ স্নেহপ্রাপ্ত। কৈশোরে তিনি 'বিপিনদা'র 'আত্মোন্নতি' দলে ভর্ত্তি হন। এই দলটিও বিপ্লব-কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়ে। লেখক তেজস্বী, সাহসী এবং স্বাধীনচেতা; প্রেসিডেন্সী কলেজের 'ওটেন' ব্যাপারে লিপ্ত সন্দেহে তাঁহাকে 'রাসটিকেটেড' করা হয়। লেখক বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন; বিপ্লব-কর্ম্মে, টোটা প্রস্তুত বিষয়ে তিনি অগ্রণী ছিলেন। প্রথম মহাসমরকালে তাঁহাকে ভারতরক্ষা আইনে কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি চট্টগ্রামে কুতুবদিয়া দ্বীপে প্রথমে অন্তরিত হন। পরে বাঁকুড়া, দার্জ্জিলিং, হাজারিবাগ, পুনরায় দার্জ্জিলিং এইরূপ বিভিন্ন স্থলে বন্দীজীবন যাপন করিয়া ১৯২০ সনে মুক্তিলাভ করেন। নিজের জীবনকথা-ব্যপদেশে অর্দ্ধশতাব্দীকালের বাঙালীর স্বাধীনতা-প্রয়াসের একটি বিশিষ্ট দিকের উপর লেখক আলোকপাত করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে কয়েকজন বাঙালী মনীষী, সাহিত্যিক ও বিপ্লবীর পুস্তক-সম্পর্কিত প্রশস্তি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা অভিনব বটে, কিন্তু পাঠকের পুস্তক সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত গঠনে ব্যাঘাত জন্মায়। এখানে এসব সন্নিবেশিত না করাই বাঞ্ছনীয়। পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধিও লক্ষিত হইল।

বাংলার ইতিহাস সাধনা—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা ২১৪। মূল্য তিন টাকা।

"বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি"—এইরূপ মন্তব্য কোন কোন মনীষী করিয়াছেন। গত শতাব্দীতে, বাঙালীর ইতিহাস নাই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রও আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজীতে বাংলার প্রথম ইতিহাস ষ্টুয়ার্ট-কৃত "History of Bengal"। বাঙালী জাতির ইতিহাসের উপকরণ এশিয়াটিক সোসাইটির 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এ ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় উইলকিন্স কর্তৃক। কোলব্রুকও কিছু কিছু প্রকাশিত করেন। বাঙালীদের মধ্যে পুরাতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ করেন ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। বাঙালী জাতির ইতিহাস বাংলা ভাষায় সুষ্ঠভাবে আলোচনা সুরু করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শনে তাঁহার প্রবন্ধাবলী বাংলার ইতিহাসচর্চ্চার পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথ এই ইতিহাসচর্চ্চার আবশ্যকতা অনবদ্য ভাষায় গত শতাব্দীর শেষ দশকেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। গত অর্দ্ধশতাব্দীকালের মধ্যে বাংলার ইতিহাসচর্চ্চা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জাতিগঠন, রাজনৈতিক উত্থানপতন প্রভৃতি বাঙালীর জাতীয় জীবনের নানা বিভাগেরই ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত, আলোচিত এবং পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত উপকরণ—মূর্ত্তি, মুদ্রা, খোদিত লিপি, সমসাময়িক মুদ্রিত-অমুদ্রিত বই-পুথি, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির ভিত্তিতে বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এখনও সুধীসমাজে বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার বাঙালীর ইতিহাস-সাধনা প্রসঙ্গে আধুনিক যুগে যে সকল ইতিহাস-পুস্তক রচিত হইয়াছে তাহার এক আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়াছেন। 'বিবরণ দিয়াছেন' বলিলে অবশ্য সবটা বলা হয় না। তিনি প্রতিটি পুস্তক ধরিয়া তাহার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং বাঙালী জীবনের কোন্ কোন্ দিক এতদ্দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। 'ইতিহাস' বলিতে তিনি শুধু রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কথা বলেন নাই—আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস-পুস্তকাদিও আলোচনা করিয়াছেন। বাঙালীর উচ্চ ও নিম্ন শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, লোকশিক্ষা, সমাজ-জীবন প্রভৃতি সম্পর্কেও তথ্যনির্ভর আলোচনা করা হইয়াছে গত কয়েক বৎসরে বিভিন্ন গ্রন্থে। বাঙালীর জাতীয় তথা স্বাধীনতা আন্দোলন সংকীর্ণ 'রাজনৈতিক' ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল না; মানবজীবনের বাধাবন্ধহীন সামগ্রিক উন্নতির দিকে এই প্রচেষ্টা প্রধাবিত হইয়াছিল। বিভিন্ন ইতিহাস-পুস্তকে এ সকল কথাও আলোচিত হইয়াছে। বাঙালী নবজাগরণ বা রেনেসাঁশ এই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিরই দ্যোতক। গ্রন্থকার একস্থলে বাঙালীর ইতিহাস-সাধনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দানে ইতিহাস-আলোচনার ক্ষেত্র সুগম করিয়া দিয়াছেন। বাংলার ইতিহাস-সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও পুস্তকসমূহের একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদানে পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—শ্রীবিমলেন্দু কয়াল। কয়াল পুস্তক-প্রকাশক, ৯.১এম্ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪। পৃ. ১০৪+৪০। মূল্য তিন টাকা। বহুচিত্র সম্বলিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্ত্তি উৎসব সবেমাত্র উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক এবং হইয়াছেও। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ইংরেজীতে একখানি বৃহদাকার 'মূল্যবান' পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি বাংলা ভাষায় সহজ এবং সাধারণবোধ্য করিয়া লিখিত। একারণ আমরা গ্রন্থকারকে সাধুবাদ করি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ব্যপদেশে এদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা হইতে যাবতীয় কৃতির একটি ধারাবাহিক কাহিনী পুস্তকখানিতে আছে। সাধারণ পাঠকপাঠিকা ইহা হইতে বহু অজ্ঞাত, স্বল্পজ্ঞাত এবং নূতন কথা জানিতে পারিবেন। পুস্তকে দুই-একটি তথ্যগত ভুল নজরে পড়িল। প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার (১৮৬৮)। 'স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়' নহেন, ইনি শুধু 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায়'। সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

রামপদ-সংবর্দ্ধনা

গত ২০শে জানুয়ারী হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদে উদ্যোগে প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও এই পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল এই উৎসবের পৌরোহিত্য করেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সম্পাদক ডক্টর শ্রীনিমাইসাধন বসু অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পরিষদ-সভাপতি শ্রীযামিনীকান্ত সোম শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার পর পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীচরণদাস ঘোষের অভিভাষণ পঠিত হয়। রামপদবাবুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া কবি শ্রীসুবোধ রায় ও কবি শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামপদ সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। প্রবাসী পত্রিকার সহঃ-সম্পাদক শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, সভাধ্যক্ষ শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হাওড়া বার্ত্তা সম্পাদক, কুঁড়ি সাহিত্য আসর ও ক্ষণিকা সাহিত্য আসরের প্রতিনিধিরা শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করেন। শ্রীস্বপ্না সেনগুপ্ত, শ্রীরেবা বসু ও শ্রীউৎপল মুখোপাধ্যায় কয়েকটি সময়োপযোগী সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীপ্রফুল্ল রায় সংবর্দ্ধনা লিপি পাঠ করিবার পর তাহার অনুলিপি সভামধ্যে বিতরিত হয়। শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রতিভাষণে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের ইতিহাস বিবৃত করেন এবং সংবর্দ্ধনার জন্য সকলকেই প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরিশেষে সভাপতি শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রামপদবাবুর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য-জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিবৃত করেন এবং হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদের এই প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্য পরিষদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ প্রদান

করেন। পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সমাগত ভদ্রমহোদয়, সভাপতি ও রামপদ-বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভার কার্য্য শেষ হয়। পরিষদের পক্ষ হইতে রামপদবাবুকে কয়েক খণ্ড 'শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ' উপহার দেওয়া হয়। সাহিত্যিক শ্রীরমেশচন্দ্র সেন তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'পূব থেকে পশ্চিমে' বইটি রামপদবাবুকে উপহার দেন।

সেবায়তনে বার্ষিক উৎসব

গত ৯ই পৌষ ঝাড়গ্রাম সেবায়তনের ত্রয়োদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস মহাসমারোহে উদযাপিত হইয়াছে। এই দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বৈতালিকগণের ভজনগীত হইলে আশ্রমাচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের পৌরোহিত্যে প্রত্যুষে মঙ্গলঘট তথা আশ্রম-পতাকা স্থাপন, শাস্ত্রপাঠ ও সদালোচনাদি সহ উৎসবের উদ্বোধন হয়। অপরাহ্নে জেলা বোর্ডের প্রধান শ্রীমহেন্দ্রনাথ মাহাত মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবার পর অধ্যাপক শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সেবায়তন যোগমন্দির-প্রাঙ্গণে, সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশে বার্ষিক মহা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় সঙ্গীতসুধাকর শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভজন ও সঙ্গীত দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। পরদিন সৎসঙ্গ-ভবনে বিভিন্ন স্থান হইতে আগত তিন শতাধিক ক্রিয়াবান্ ভক্ত-সম্মেলনে যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক ভাব ও সাধনার ধারা সম্বন্ধে আলোচনা হইবার পর স্থানীয় কীর্ত্তনীয়া শ্রীঅবনীমোহন মধুর কীর্ত্তনগানে শ্রোতৃবৃন্দকে প্রায় তিন ঘণ্টা মোহিত করিয়া রাখেন। সন্ধ্যায় সেবায়তন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণের পুনর্মিলন সভার অধিবেশনের পর উৎসবানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

শ্রীনলিনী মজুমদার (মাঝখানে উপবিষ্ট) সহ ঝাড়গ্রাম সেবায়তন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিগত ২৪শে জানুয়ারী রাত্রি দুই ঘটিকায় কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত সুরেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম-এ, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন), মহাশয় ছিয়াশী বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা হাতিবাগানস্থ ভবনে সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার আদি নিবাস চব্বিশ পরগণাস্থ হরিনাভি গ্রাম। ইনি সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় মহেশ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা তর্কবাগীশ প্রভৃতি অধ্যাপকগণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সরকারী কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, কটক র‍্যাভেনশ' কলেজ ও হুগলী কলেজে অধ্যাপনার পর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসেন। এখানে সুদীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত অধ্যাপনায় রত থাকিয়া ১৯৩০ সনে অবসরগ্রহণ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ছাত্রগণের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু, অগ্নিযুগের উল্লাসকর দত্ত, অধ্যক্ষ ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক পশুপতিনাথ শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ অনন্ত ব্যানার্জ্জী শাস্ত্রী, ড. সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, ড. আশুতোষ শাস্ত্রী, ড. অমরেশ্বর ঠাকুর, ড. ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ড. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ড. সুকুমার সেন, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ
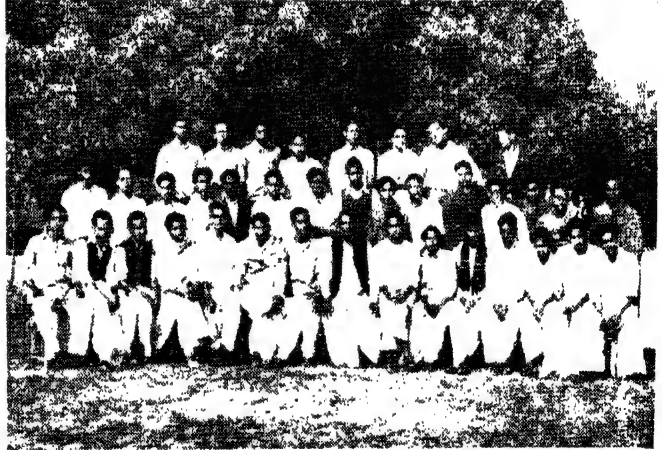
সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সেন, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, অধ্যক্ষ ডঃ প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বধর্ম্মনিরত, জ্ঞানতপস্বী ও আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি ছায়া, চিত্রা, পরিণাম, উপায়ন প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষ রচনা 'জৈন ও হিন্দু' গ্রন্থখানি বিদ্বজ্জনসমাজে বিশেষ প্রশংসা-লাভ করিয়াছে। তিনি পরদুঃখকাতর ও পরোপকারী ছিলেন। সরল এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। নিরহঙ্কার ও অকলঙ্ক চরিত্রের গুণে তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। আত্মপ্রচার ও আত্মশ্লাঘা তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন।

পরলোকে নৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার

গত ২৬শে জানুয়ারী বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী নৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার উনষাট বৎসর বয়সে তাঁহার ৫০নং বণ্ডেল রোডস্থ ভবনে পরলোক গমন করেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি মূক বধিরদিগের শিক্ষাদান ও উন্নয়নকার্য্যে একনিষ্ঠভাবে ব্রতী ছিলেন। ১৯২২ সনে তৎপ্রতিষ্ঠিত 'অল বেঙ্গল এসোসিয়েশন ফর দি ওয়ার্কার্স অব দি ডেফ' নামক সংস্থার ভিত্তিতে পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় মূক-বধির শিক্ষকদের কনভেন্‌শন সংগঠিত হয়। কলিকাতা মূক-বধির

নৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার

বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোহিনীমোহন মজুমদার ছিলেন নৃপেন্দ্রমোহনের পিতা। পিতা এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর আচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরিজীর শিক্ষা ও আদর্শ নৃপেন্দ্রমোহনকে জনকল্যাণকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। সেবা ও সামাজিক কার্য্যাবলীর জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারই প্রযত্নে বণ্ডেল রোড ও ব্রড ষ্ট্রীট "রেট পেয়ার্স এসোসিয়েশন" গঠিত হয়। বালিগঞ্জ সংসদ, বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়, দুর্গাবাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট সংগঠনকারী সদস্য ও কর্ম্মী ছিলেন।

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯।

বাণী প্রেস, কলিকাতা

রাজপুতচিত্র

(যোধপুর পদ্ধতি)

ফুল ও পাতা [ফোটো—শ্রীবিনয়ভূষণ
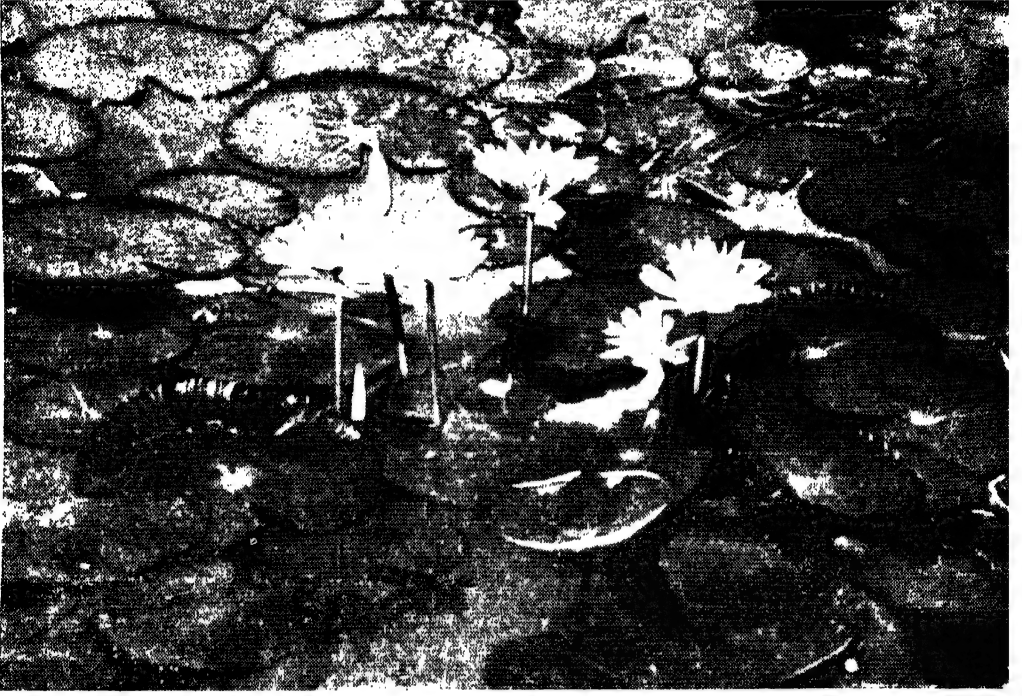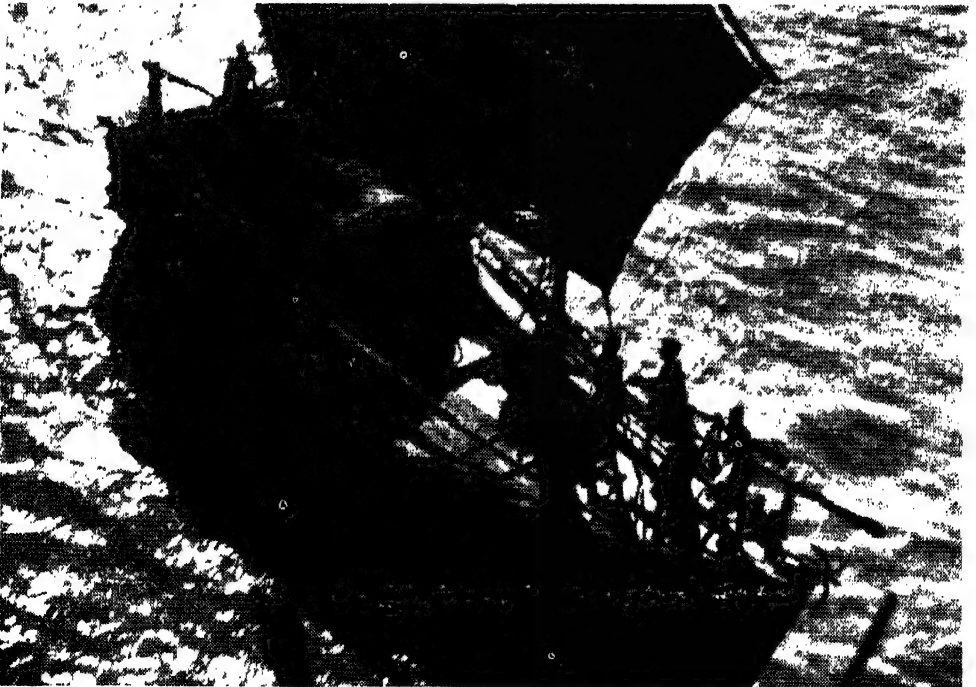
"পালের নাও" [ফোটো—শ্রীবিনয়ভূষণ দাস

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৬৩

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অথ, নির্ব্বাচনী পর্ব্ব
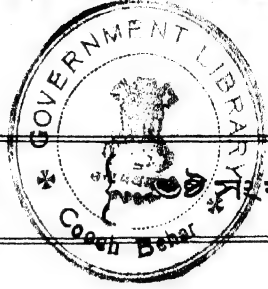
এই বারের নির্ব্বাচনীতে সর্ব্বত্রই এক নূতন ধারা দেখা গিয়াছে। সেটা ভোটারের পক্ষ হইতে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও বিদ্বেষকে সমষ্টিগত ভাবে পরিচালনা করিয়া দলীয় স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা। কেহ-বা বলিয়াছেন, বামপথে চল, সকল দুঃখকষ্টের অবসান হইবে। কেহ-বা বলিয়াছেন, পাকিস্থান জিন্দাবাদ—আমায় জয়যুক্ত কর আমি পাকিস্থান এনে দিচ্ছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাংলায়—বিশেষতঃ কলিকাতায়—সকল বিরোধী দলের বামপন্থী এই পাকিস্থান জিন্দাবাদে যোগ দিয়াছেন এবং ততোধিক আশ্চর্য্য এই যে উদ্বাস্তুর দলও সেই সঙ্গে ছিল। শোনা যায়, আসামে ও মালদহে এইরূপ প্রচ্ছন্ন পাকিস্থানী কংগ্রেসেরও সমর্থনলাভ করিয়াছে। অবশ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে এরূপ দেশদ্রোহীতা নূতন নহে। ভারত বিভাগে তাঁহাদের কীর্ত্তি ইতিহাসে চিরদিন থাকিবে।

ভোটের পালা তো শেষ হইতে চলিল, "বিকল্প সরকার" তো বাংলায় হইল না, কেন্দ্রেও হইল না, এক হইলেও হইতে পারে সুদূর কেরলে, ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্যে। কিন্তু লোকের ভাবগতিকে মনে হয়, দেশের লোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্দের ভাল বলিয়া কংগ্রেসকে ভোট দিয়াছে। যদি তাই হয় তবে এই আগামী পাঁচ বৎসরই কংগ্রেস-রাজের মেয়াদ, তাহার পর দেশে অরাজক।

বস্তুতঃ এবারের কংগ্রেসের জয় অনেক ক্ষেত্রেই বিপক্ষে অতি নিকৃষ্ট লোক দাঁড় করাইবার দরুন। কংগ্রেসের ভাল লোক পরাজিত হইয়াছেন অল্পই এবং তাহাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি অল্প ভোটে। দুই দিকেই অতি নিকৃষ্ট স্বার্থান্বেষী লোকই বেশী নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সুতরাং সেদিক দিয়া বলিবার অধিক কিছু নাই। তবে এইভাবে কত দিন চলিবে?

যে দেশের শতকরা ৮৮ জন নিরক্ষর সেখানে এইরূপ নির্ব্বাচন জুয়াখেলার সামিল। তদুপরি হইয়াছে সংবাদপত্রের ক্লীবত্বপ্রাপ্তি, সুতরাং ভালমন্দ বুঝাইবেই বা কে এবং বুঝিবেই বা কে? এদেশে—বিশেষতঃ আমাদের বুদ্ধিমান বাঙালীর দেশে—"গ্রেশামস ল" (Gresham's Law) পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে। চালে কাঁকড়, আটায় খড়িমাটি, চিনিতে কাদাজল আমরা নিত্যই গিলিতেছি। কাজেই রাজনীতির কালোবাজারে মার্কামারা মেকিতে আপত্তি করার উপায় কোথায়?

দলগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ ত গান্ধীজীর কংগ্রেসকে রসাতলে লইয়া চলিতেছে, কৈ কোথাও ত তাহার সংরক্ষণ বা সংশোধনের কথাও কেহ বলে না। শেষে কি সারা দেশ কেরল বা কলিকাতার মত কাণ্ডজ্ঞান হারাইবে?

কংগ্রেসী সরকারের শিক্ষার প্রয়োজন, একথা খাঁটি সত্য। দেশে যে দুর্নীতি দুরাচারের বন্যা চলিতেছে, তাহার দায়িত্ব তাঁহাদেরই, এবং দেশকে বুদ্ধিহীন ক্লীবত্বের পথে যদি কেহ টানিয়া লইতে পারে তবে তাহাও কংগ্রেসের অকর্ম্মণ্যতা, আত্মম্ভরিত্ব ও স্বগোষ্ঠী পোষণে তৎপরতার কারণে। দেশের দুর্দ্দশা বড় কথায় বা ফেরো-কংক্রীটের বাঁধে যায় না। একথা আমাদের কংগ্রেসী বিদগ্ধচূড়ামণিগণ বুঝিবেন কবে?

'৫২ সনের নির্ব্বাচনে যাঁহাদের কংগ্রেসী প্রার্থীরূপে পাঠানো হইয়াছিল, তাঁহাদের শতকরা ৭৫ জন ছিলেন মেকি। এবার কিছু রদবদল করিয়া শতকরা ৮৫জন মেকিকে পাঠানো হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সাচ্চা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন পার হইতে পারেন নাই। অবশ্য দু'চার জন ভাল লোকও আসিয়া পড়িয়াছেন, সেটাই আমাদের সৌভাগ্য।

পশ্চিম-বাংলায় নির্ব্বাচন এখনও শেষ হয় নাই, সুতরাং বেশী কিছু বলা যায় না। কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যকলাপ সুষ্ঠু হয় নাই, তাহার প্রমাণ কলিকাতায় বসিয়াই দেখা যাইতেছে। ভাগ্যবলেও গান্ধীজীর পুণ্যের জোরে মফস্বলে বামপন্থীদিগের উস্কানীতে কাজ হয় নাই, নহিলে কি হইত বলা যায় না।

এখানে কংগ্রেসী ধুরন্ধরবর্গ ইতিমধ্যেই নানাপ্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতেছেন। কিন্তু আসল কথার কোনও উল্লেখ নাই। মেকি দিয়া চলে কত দিন? যত দিন অন্ত পক্ষে সাচ্চার অভাব সমান বা অধিক থাকে—যেমন এইবার।

ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন

স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে। নির্ব্বাচনের আংশিক ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ফল প্রকাশিত হইবার এখনও বিলম্ব রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু নির্ব্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে মোটামুটি বলা চলে যে, কেন্দ্র এবং প্রায় সকল রাজ্যেই কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবে। ১২ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায় যে, রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্ব্বাচনে কংগ্রেস অপেক্ষা বিরোধী দলগুলি ত্রিশ লক্ষাধিক ভোট বেশী পাইয়াছে। কিন্তু বিরোধী দলগুলির মধ্যে মিলন না থাকায় বিরোধী পক্ষের ভোটগুলি পরস্পরের মধ্যে ভাগ হইয়াছে—ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, অকংগ্রেসীগণ অপেক্ষা ত্রিশ লক্ষ ভোট কম পাইয়াও কংগ্রেস বিরোধীদলগুলির প্রায় দ্বিগুণ আসন লাভ করিয়াছে। ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঘোষিত ফলাফলে বিভিন্ন দলগুলির মোট ভোট ও প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা এইরূপ: কংগ্রেস—২,১৮,৭০,৪৯৮ ভোট (৮৮২টি আসন); প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল—৪৪,৫৪,৫৪০ ভোট (৯২টি আসন); কম্যুনিষ্ট পার্টি—৩৪,৩৬,০৭৫ ভোট (৬২টি আসন); জনসঙ্ঘ—২১,৩১,৫০১ ভোট (২৬টি আসন); অন্যান্য দল—২৪,০৬,৩৮০টি ভোট (৫৪টি আসন) এবং স্বতন্ত্র—১,২৫,৯৩,৭১১টি ভোট (১৮১টি আসন)।

দেশের সর্ব্বত্রই নির্ব্বাচন সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা বিশেষ সুখের কথা। কিন্তু নির্ব্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিবিশেষ যে ধরনের সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাইয়াছেন তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে শঙ্কিত না হইয়া থাকার যায় না। বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল প্রভৃতি দুই-একটি রাজ্যে কথা বাদ দিলে উত্তর এবং দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বত্রই নির্ব্বাচনের প্রধান খুঁটি ছিল ধর্ম্মীয় ও সাম্প্রদায়িক শ্লোগান।

আসামের অন্তর্গত করিমগঞ্জ মহকুমার নির্ব্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" ২৪শে ফাল্গুন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, ঐ অঞ্চলে বহু স্থানে নির্ব্বাচনী প্রচারে এইবার রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতি জলাঞ্জলি দিয়া সাম্প্রদায়িক প্রচার এবং শ্রেণী বিদ্বেষের লাগাম ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। "বিশেষভাবে দক্ষিণ ও উত্তর করিমগঞ্জ এবং বদরপুর নির্ব্বাচনকেন্দ্রে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য মুসলমান ভোটারদের মধ্যে উৎকট সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগাইয়া তোলা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, গ্রামে গ্রামে মুসলমানদের অসংখ্য 'ওয়াজ' মারফতে নির্ব্বাচনী প্রচার উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত 'ওয়াজে' শুধু মুসলমানদেরই যাইবার অধিকার ছিল। অনেক স্থানে নাকি এই সমস্ত জমায়েতে গো-কোরবানী করিয়া সিন্নীও বিতরণ করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত বক্তৃতা করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, একমাত্র মুসলিম লীগের আমলের বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালীন জেহাদী জিগীরের সঙ্গেই তাহার তুলনা করা চলে। আশ্চর্য্যের বিষয় স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভোট লাভ করিবার জন্য এই সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়াছেন।—কংগ্রেসকে ভোট না দিলে সংখ্যালঘুদের এ-দেশে বাস করা মুশকিল হইবে, বামপন্থীদের ভোট দিলে মুসলমানরা কবর দিতে পারিবে না—মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিতে হইবে, আরও উদ্বাস্তু আসিয়া মুসলমানদের তাড়াইয়া দিবে—এইরূপ অপপ্রচার মুসলমান গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্রমাগত ভাবে করা হইয়াছে। কংগ্রেস-মহলও ইহা প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন যে, তাঁহারা এখানে মুসলমানদের (এবং চা-বাগান এলাকার মজদুরদের) ভোটের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন।"

কংগ্রেসের তরফ হইতে এই প্রকারের সাম্প্রদায়িক প্রচার সত্যই বিস্ময়কর এবং অভাবনীয়! কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই সাম্প্রদায়িক প্রচারে কেবল যে ভারতীয়গণই অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে, বহু পাকিস্থানী নাগরিকও প্রকাশ্যভাবে নির্ব্বাচনী প্রচারে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াইতে থাকে। এই সকল প্রচারের ফলে স্থানীয় জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দও প্রমাদ গণিতেছেন।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন:

"স্থানীয় উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী মোল্লা, মৌলবী ছাড়াও বহু পাকিস্থানী ধর্ম্মান্ধ মোল্লা এবং পাকিস্থানী সরকারী কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত আসিয়াও বিভিন্ন "ওয়াজে" সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জ নির্ব্বাচনচক্রের কংগ্রেস-প্রার্থী মৌলবী আবদুল হামিদ চৌধুরীর ভ্রাতা পাকিস্থানী নাগরিক মৌলবী আবদুল আজিজ চৌধুরী নিজে তাঁহার পাকিস্থানী গাড়ী ও সাগরেদগণ লইয়া নির্ব্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত আছেন—ইহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

"পাকিস্থানের সহিত ভারতের আজ যে সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এই সব ব্যাপার অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রকৃত জাতীয়তাবাদী এবং ধর্ম্মভীরু সৎ মুসলমান ব্যক্তিরাও অবস্থা দেখিয়া প্রমাদ গণিতেছেন এবং অনেকে আসিয়া বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দের সহিত প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। সরকারী কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কি বলিতে বা করিতে চাহেন তাহা জনসাধারণ জানিতে পারে কি?"

নির্ব্বাচনে দলীয় স্বার্থসাধনে সাম্প্রদায়িক প্রচারেরও অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে বিদেশীয় নাগরিকদিগের হস্তক্ষেপ কোন দিক হইতেই সমর্থন করা যায় না। অন্যান্য রাষ্ট্রে যদি কোন বিদেশীয় নাগরিক এইরূপে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিত তবে সেই বিদেশীয়কে তৎক্ষণাৎ সেই রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করা হইত। কিন্তু ভারতে আজ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাহাদের হাতে তাঁহারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছেন। রক্ষকই যখন ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায় তখনই রাষ্ট্রের চরম দুর্দ্দিন আসিতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কংগ্রেস দলগত প্রভুত্ব রক্ষার জন্য আজ যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিতেছে, অচিরেই তাহাকে উহার ফলভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক

উদ্বাসির ফলে জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিবে তাহার ফল ব্যাপকতর জনসাধারণকেও স্পর্শ করিবে, সুতরাং এখন হইতেই সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচন

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচন মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক সমস্যাগুলির ভিত্তিতে হইলেও এই রাজ্যেও নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক প্রচার স্থান-বিশেষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের নির্ব্বাচন সম্পর্কে ২৭শে ফাল্গুন "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিশেষ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে :

"আমাদের মুর্শিদাবাদে ভোটের ফাইট কম্যুন্যাল লাইনে চলেছে। বেশীর ভাগ প্রার্থী স্বতন্ত্র। দল বলতে যোলটা কংগ্রেসী, চারটে পি-এস-পি, তিনটে আর-এস-পি এবং একটা সি-পি, এফ-বি আর মহাসভা। এইবার হিসেব করে দেখুন দল ক'জন, দল-ছাড়া ক'জন। সুতরাং এখানে ভোট চলছে নিজের বাতাসে যেমন চলত লীগের আমলে। তবে সুবিধা হচ্ছে মুসলিম প্রার্থী আট জন যারা কংগ্রেসের জোড়া বলদ চালাচ্ছেন, তাঁদের দুনো জোর হয়েছে। মুসলমান হিসাবেও ভোট পাচ্ছেন, কংগ্রেসী হিসাবেও পাচ্ছেন। সুতরাং তাঁদের সিওর সাকসেস। কেবল যেখানে ভাই-ভাই-এ ভোটের লড়াই সেখানকার খবর আলাদা।"

শ্রীনেহরুর ক্ষমাপ্রার্থনা

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগের মুখপত্র পাক্ষিক "এ-আই-সি-সি ইকনমিক রিভিয়ু" পত্রিকার ১লা মার্চ্চ সংখ্যায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহর্ষদেব মালবীয় লিখিত একটি প্রবন্ধে ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সম্পর্কে কোন মন্তব্যে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা ও ব্রিটিশ সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করায় শ্রীনেহরু রাণীর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছেন। লণ্ডনস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও রাণীর নিকট এক পত্রে ঐ প্রবন্ধের জন্য ভারত সরকারের তরফে দুঃখ জানাইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছেন। ভারতস্থিত ডেপুটি ব্রিটিশ হাই-কমিশনারের নিকট এক পত্রে কংগ্রেস-সভাপতি উচ্ছরঙ্গরায় নওলশঙ্কর ডেবরও অনুরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছেন।

একটি সামান্য ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এবংবিধ ব্যবহারে জনসাধারণ সত্যই বিস্মিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে "এ-আই-সি-সি ইকনমিক রিভিয়ু"র মন্তব্য তীক্ষ্ণ বিচারে আংশিকভাবে সুরুচির অনুগামী না হইলেও মোটামুটি ভাবে তাহাতে সত্য কথাই বলা হইয়াছে। গোয়াতে পর্তুগীজ অত্যাচার এবং সাইপ্রাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলার জন্য কোন ভারতবাসীই লজ্জিত হইতে পারেন না। প্রবন্ধটিতে একটি সামান্য ত্রুটি ছিল এই যে, পর্তুগালের প্রেসিডেন্টের একটি বাণী ব্রিটিশ রাণীর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য তাহা সংযত ছিল না।

এই প্রবন্ধটি লইয়া ব্রিটিশ পত্রিকামহলে হৈ-চৈ পড়িয়া যায় এবং যে সকল ব্রিটিশ পত্রিকা কস্মিনকালেও রাজনীতি চর্চ্চা করে না তাহারাও চীৎকার আরম্ভ করে যে, ব্রিটেনের মান-ইজ্জত সব গেল। পত্রিকাটি ভারত সরকারের মুখপত্র নহে এবং মন্তব্যটিও কোন সরকারী কর্ম্মচারী করেন নাই। সে ক্ষেত্রে এ বিষয়ে ভারত সরকারের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার কোন কথাই উঠে না। কিন্তু তথাপি শ্রীনেহরু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত দুঃখপ্রকাশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। ব্যাপারটির সেখানেই সমাপ্তি ঘটা উচিত ছিল; কিন্তু এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কংগ্রেসী নেতৃবর্গ বিশেষ হৈ-চৈ আরম্ভ করিয়াছেন। কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীডেবর ক্ষমাপ্রার্থনা তো করিয়াছেনই, উপরন্তু শ্রীমালবীয়কে আনিয়া ধমকাইয়াছেন। "ইকনমিক রিভিয়ু"র প্রধান সম্পাদক প্রবন্ধটি সম্পর্কে প্রকাশনার সকল দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া যে সাংবাদিক অসৌজন্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দিল্লীর সাংবাদিকসঙ্ঘ বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। উপরন্তু কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ পত্রিকাটির পরিচালনা ব্যাপারেও অধিকতর নিয়ন্ত্রণ চালু করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন।

সত্যই ইহা বিস্ময়কর! ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় ভারত এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কত কি লেখা হয়—কৈ সেই বিষয়ে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কোন প্রতিবাদ তো শোনা যায় না! "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণাবিভাগও নাকি এই প্রবন্ধ প্রকাশে বিরক্ত হইয়াছেন। ভারতের অবমাননাকর প্রবন্ধ প্রকাশে ইঁহাদের বিরক্তির প্রমাণ পাইতে এখনও আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। অপরদিকে যে সকল ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা রাণীর গৌরবহানি হইতে চলিল বলিয়া চীৎকার তুলিয়াছে, মার্কিন পত্র-পত্রিকায় রাণীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশে তাহাদের কলম একটুও তুলিতে তাহারা সাহস পায় নাই।

দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইম্‌স" পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকার "ইনসাফ" লিখিতেছেন, ভারতীয় নেতাদের একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, সর্ব্বদা পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নিকট নতিস্বীকার করিয়া ভারত বিশেষ লাভবান হইতে পারিবে না। "বস্তুতঃ সকলেই একথা মনে করেন যে, ব্রিটিশ রাণীর পর্তুগাল ভ্রমণ-সম্পর্কিত প্রবন্ধের জন্য 'এ-আই-সি-সি ইকনমিক রিভিয়ু' পত্রিকার সম্পাদকের নিন্দা মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ক্ষমাপ্রার্থনার স্রোতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সকল মন্ত্রীই বিশেষ সুখী হইয়াছেন—সেকথা বলা চলে না।" "ইনসাফ" ওয়াকিবহাল ব্যক্তি, তিনি ভারত সরকারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের অনেক খবর রাখেন। সেই দিক হইতে তাঁহার এই মন্তব্যের বিশেষ মূল্য আছে।

একটি সামান্য মন্তব্যের জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আচরণকে

"চায়ের পেয়ালায় তুফান" আখ্যা দিয়া "যুগান্তর" পত্রিকা ২৫শে ফাল্গুন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছেন, বিষয়টির ঔচিত্যানৌচিত্য লইয়া তাই আমরা কোন কথাই লিখি নাই। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির ...নিয়ন্ত্রণের পর স্বভাবতঃই কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠিবে। ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি আমরাও পড়িয়াছি—তাহাতে রাণীর ব্যক্তিগত মর্য্যাদার উপর সত্যই কি কোন আঘাত করা হইয়াছে? শাসনতন্ত্রের অধিনেত্রীরূপে ইংলণ্ডেশ্বরীর ব্যক্তিগত সম্ভ্রম ব্রিটিশ-জাতির কাছে যত বড়ই হউক, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তিনি ব্রিটিশ শাসনের প্রতিভূ ছাড়া অন্য কিছু নন। কাজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ও ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনা-প্রসঙ্গে যদি রাণীর কথা আসিয়াই পড়ে, তাহা রাণী সম্পর্কে ব্যক্তিগত আলোচনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মার্কিন ও অন্যান্য দেশের পত্রিকায় এই শ্রেণীর বা ইহার চেয়েও কঠোর আলোচনা হামেশাই হইয়া থাকে। কৈ; সে সময় ত ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি উঠে না? আসলে ব্রিটিশ রক্ষণশীল মহলে ভারতের বিরুদ্ধে একটি মনোভাব সৃষ্টির আয়োজন চলিতেছে। তাহারই লাগসই একটা ছুতা হিসাবে রাণীর প্রসঙ্গটি খুঁচাইয়া তোলা হইয়াছে। এ কথা মনে করিবার আরও একটি কারণ, পত্রিকাটি প্রকাশিত হইবার দুইদিন পূর্ব্বে মন্তব্যটি ব্রিটেনে পৌঁছিল কি করিয়া?"

"যুগান্তর" লিখিতেছেন, "ইকনমিক রিভিয়ু'র মন্তব্যে রাণীর ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কোন কথাই নাই। ব্রিটিশ ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচার সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সবই সত্য। "কমনওয়েলথী সৌহার্দ্দ্যের খাতিরে এই সত্য গোপন করিতে হইলে আমাদের স্বাধীনতা কি খুব মূল্যবান্ মনে করিতে হইবে?" পত্রিকাটির মতামত নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছেন "যুগান্তর" সর্ব্বৈবরূপে তাহার নিন্দা করিয়াছেন।

সিমেণ্টের চোরাকারবার

সিমেণ্টের বাজারে চোরাকারবার দিন দিন ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে, এবং বাংলা দেশে ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, নিয়মসঙ্গত ভাবে নিয়ন্ত্রিত সিমেণ্ট পাওয়া যায় না, চোরাবাজার হইতে অত্যধিক মূল্যে ইহা ক্রয় করিতে হয়। ভারতবর্ষে সিমেণ্টের বর্ত্তমানে এত অভাব যে, খোলাবাজারে ইহা পাওয়া যায় না, সিমেণ্ট ক্রয় করিতে হইলে সরকারী "পারমিট" বা অনুমতির প্রয়োজন। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, সরকারী অনুমতি স্বাভাবিক নিয়মে পাওয়া যায় না; যাহারা লাইসেন্স প্রাপ্ত সিমেণ্টের ব্যবসাদার তাহাদের মারফতে দরখাস্ত পেশ করিতে হয়, যদিও ইহা বে-আইনী, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা আইনসঙ্গত। কারণ সরাসরি সরকারী বিভাগের নিকট দরখাস্ত করিলে সিমেণ্ট প্রাপ্তির অনুমতি পাওয়া যায় না। ব্যবসাদারদের মারফতে দরখাস্ত করিবার সময় যাহা প্রয়োজন তাহার দ্বিগুণ কিংবা তিন গুণের জন্য আবেদন করিতে হয়, এই অতিরিক্ত পরিমাণ সিমেণ্ট ব্যবসাদাররা কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রয় করে; তাহাদের বক্তব্য এই যে, সরকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বহুল পরিমাণে ঘুষ দিয়া পারমিট বাহির করিতে হয়, এবং সে খরচা তুলিতে হইলে কালোবাজারে চড়াদামে বিক্রয় প্রয়োজন। আর এই মেহনতের জন্য অবশ্য কিছু পারিশ্রমিক প্রয়োজন এবং তাহার নিমিত্ত এই অতিরিক্ত পরিমাণ সিমেণ্ট কালোবাজারে বিক্রয় করিতে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে দ্রব্যনিয়ন্ত্রণ প্রথাদ্বারা অহেতুক ভাবে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করা হইয়াছিল, এই কৃত্রিম অভাবের ফলে কালোবাজারের প্রসার সম্ভবপর হয় এবং সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ইহাতে লাভবান হয়। সিমেণ্ট নিয়ন্ত্রণের প্রহসন অনতিবিলম্বে অপসারণ করা প্রয়োজন, ইহাতে যথাযথ বিতরণ সম্ভবপর না হইয়া কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির দ্বারা কালোবাজার বজায় রাখিতে সাহায্য করা হইতেছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ২৮টি সিমেণ্ট-কারখানা আছে, ইহাদের বাৎসরিক উৎপাদন-ক্ষমতা ৬০ লক্ষ টন। ২৮টি কারখানার মধ্যে একটির মালিক উত্তরপ্রদেশ সরকার ও অন্য একটির মালিক মহীশূর সরকার। বাকি ২৬টি কারখানার মালিকানা বেসরকারী। ইহাদের মধ্যে ৭টি আছে বিহারে, ৪টি বোম্বাইয়ে, ৩টি মাদ্রাজে, ২টি মহীশূরে, ২টি অন্ধ্রপ্রদেশে, ২টি মধ্যপ্রদেশে, ২টি রাজস্থানে, ২টি পঞ্জাবে, ১টি উড়িষ্যায় এবং ১টি কেরলে। সিমেণ্ট-শিল্পের বর্ত্তমান মূলধন ৪০ কোটি টাকা এবং ইহাতে ৩০ হাজার শ্রমিক কার্য্য করে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সিমেণ্ট উৎপাদন আরও ১ কোটি টন বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সনে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টনে; আরও অতিরিক্ত ৫০.৬০ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করিয়া ৩১টি নূতন সিমেণ্ট-কারখানা স্থাপন করা হইবে। নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দেখা উচিত যেন আঞ্চলিক স্থানীয়করণের সাম্য রক্ষিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, কারখানাগুলি তাহাদের উৎপাদনশক্তির সমস্তটাই যেন কার্য্যকরী করে। বর্ত্তমানে বাৎসরিক উৎপাদনশক্তির পরিমাণ যদিও বৎসরে ৬০ লক্ষ টন, তথাপি বাস্তব ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ টনের অধিক উৎপন্ন হয় না।

নূতন কারখানাগুলির মধ্যে ৭টি স্থাপিত হইবে অন্ধ্রপ্রদেশে, ৭টি, বোম্বাই প্রদেশে, ৩টি রাজস্থানে, ৩টি মধ্যপ্রদেশে, ২টি আসামে, ২টি পশ্চিমবঙ্গে, ২টি মাদ্রাজে এবং উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, পণ্ডিচেরী ও মহীশূরে ১টি করিয়া কারখানা স্থাপিত হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে সিমেণ্টের চোরাকারবার বন্ধ করা প্রয়োজন এবং তাহার জন্য সিমেণ্টের আমদানী অবাধ করিয়া দিয়া আভ্যন্তরিক নিয়ন্ত্রণ রহিত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। চিনির যখন নিয়ন্ত্রণ ছিল তখন ইহার সরবরাহে ঘাটতি হইত, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করিয়া

দেওয়ায়ও বিদেশ হইতে আমদানি সুরু করাতে চিনির আভ্যন্তরিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল এবং প্রয়োজনের তুলনায় ইহার উৎপাদন অতিরিক্ত হইতেছে। সেইরূপ সিমেণ্টের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ রহিত করিয়া দিলে ও সরকারী প্রয়োজনের জন্য সমস্ত সিমেণ্ট বাহির হইতে আমদানি করিলে ইহার চোরাকারবার বন্ধ হইয়া যাইবে। চোরাবাজারের অধিকাংশ সিমেণ্ট আসে সরকারী পরিকল্পনাগুলির নিকট হইতে, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে হিসাব দেখাইয়া চোরাবাজারে সরবরাহ দেওয়া হয়।

কৃষিঋণ পরিস্থিতি

কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে, বহুপ্রকার আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও বেসরকারী কৃষিঋণ অনুকুল সর্ত্তেও সহজলভ্য হইতেছে না। গত ১৮৭৯ সন হইতে রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণয়ন করিয়া আসিতেছেন যাহাতে বেসরকারী কৃষিঋণের সর্ত্তগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু আইনগুলি সেরূপভাবে কার্য্যকরী হয় নাই। বেসরকারী কৃষিঋণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, বেসরকারী ঋণদাতা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ঋণদানের বন্দোবস্ত নাই, এবং তৃতীয়তঃ চাষীদের ঋণগ্রহণের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা। এই সকল কারণগুলির জন্য গ্রাম্য মহাজন তাহার পুরাতন প্রথাকেই চালু করিয়া আসিতেছে। তবে নূতন নূতন আইনের দ্বারা মহাজনের ঋণদানের ক্ষমতাকে সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে এবং উৎপাদনের প্রয়োজন ব্যতীত সাংসারিক প্রয়োজনে ঋণগ্রহণকে নিরুৎসাহ করা হয়।

সংস্থাগত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিস্তৃতি এবং সমবায় প্রথার উন্নতি সত্ত্বেও দেখা যায় যে, এখনও পর্য্যন্ত অধিকাংশ কৃষিঋণ আসে গ্রাম্য মহাজনদের নিকট হইতে। ব্যবসায়ী ও কৃষিঋণের মহাজনরা যুক্তভাবে মোট প্রয়োজনীয় কৃষিঋণের প্রায় ৬৯.৭ শতাংশ সরবরাহ করে। জমিদার ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর দাদনের পরিমাণ ধরিলে বেসরকারী কৃষিঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট কৃষিঋণের ৭৭ শতাংশে। ভারতবর্ষে কৃষিঋণের বাৎসরিক পরিমাণ ১,০০০ কোটি টাকা। এই প্রয়োজনীয় অর্থের কেবলমাত্র ৭.৩ শতাংশ আসে সরকারী প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে। সমবায় সমিতির দাদনের পরিমাণ ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ৩ শতাংশ।

ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোতে বেসরকারী গ্রাম্য মহাজনের অস্তিত্ব যদিও অবশ্যম্ভাবী, তথাপি ইহার কুফলই অধিক হইয়াছে। সর্ব্বভারতীয় কৃষিঋণ অনুসন্ধান সমিতি সেই কারণে সমবায় সমিতির বিস্তৃতির জন্য সুপারিশ করেন; এবং ইহার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের কোনও কোনও ধারার পরিবর্ত্তনসাধন করা হয়। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে সমবায় সমিতির মূলধন প্রদানে রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করিবেন; রাষ্ট্র-সহযোগিতা বর্ত্তমান সমবায় ব্যবস্থার নূতন নীতি; কিন্তু ইহাতে সমস্যার সমাধান হয় না। ষ্টেট ব্যাঙ্কের প্রধান দায়িত্ব ৪০০ নূতন শাখা খোলার—যাহাতে কৃষিঋণের বিবর্দ্ধন সম্ভবপর হয়। কিন্তু গত তিন বৎসরে মাত্র ৬৬টি শাখা খোলা হইয়াছে। ৪০০ শাখা খোলা এখনও দশ বৎসরের ব্যাপার; এ সম্বন্ধে সরকারী গতিবিধি অত্যন্ত মন্থর।

পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় কৃষি ব্যাঙ্ক আছে ও তাহার শাখা সর্ব্বত্রই বিস্তৃত। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কংগ্রেসী সরকার এ বিষয়ে প্রথম হইতেই গোঁজামিল দিয়া আসিতেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর কৃষিঋণের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু শীর্ষ ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এত-প্রকার দায়িত্ব আছে যে, কৃষিঋণের ব্যবস্থা তাহাকে জোড়াতালি দিয়াই সম্পন্ন করিতে হইবে। কৃষিঋণ দুইপ্রকার—দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী ঋণের বন্দোবস্ত করিয়াছে; কিন্তু ইহার প্রয়োজন স্বল্পমেয়াদী ঋণের তুলনায় অত্যল্প। স্বল্প-মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন অধিক এবং ইহা গ্রাম্য মহাজনদের নিকট হইতে সহজলভ্য, যদিও এই ঋণের সর্ত্তগুলি পীড়নদায়ক। সহজ-লভ্যতা কৃষিঋণের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং মহাজনদের কঠিন সর্ত্ত সত্ত্বেও চাষীরা মহাজনদের নিকট হইতে ঋণ লইতে বাধ্য হয়, কারণ ইহা সহজলভ্য। সরকার কিংবা সমবায় সমিতির নিকট হইতে ঋণ লইতে হইলে বহুপ্রকার নিয়মকানুন মানিতে হয়—যাহা নিরক্ষর চাষীর পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না।

কৃষিঋণের ব্যাপারে বাংলা একটি অনগ্রসর প্রদেশ। এই বিষয়ে মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্জাব খুব অগ্রণী। বাংলা দেশে প্রায় কুড়িটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই খুব দুরবস্থা। অন্যান্য শাখা-ব্যবসা আছে বলিয়া এই সমিতিগুলি কোনও প্রকারে টিকিয়া আছে। আর প্রাথমিক সমিতিগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়; এই সমিতিগুলির পুরাতন অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ এত অধিক যে, ইহাদের অনেকগুলি ইচ্ছাকৃত লিকুইডেশনে যাইতে বাধ্য হইয়াছে। আর বাকীগুলির কাগজে-কলমে অস্তিত্ব থাকিলেও কার্য্যতঃ ইহারা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সমবায় সমিতিগুলির সুদের হার অত্যধিক এবং এই ব্যাপারে ইহারা গ্রাম্য মহাজনের চেয়ে বেশী ভাল কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের সুদের হার বাৎসরিক শতকরা ৬ হইতে ৭ শতাংশ; এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার বাৎসরিক শতকরা সাড়ে বারো শতাংশ পর্য্যন্ত। অন্যান্য সমবায় সমিতির বাৎসরিক সুদের হার ১০ হইতে ১৫½ শতাংশ পর্য্যন্ত। ইহাতে দেখা যায় যে, সুদের ব্যাপারে সমবায় সমিতিগুলি অনেক মহাজনের চেয়ে কম যায় না। অবশ্য একথাও সত্য যে, ঋণশোধ প্রায়ই হয় না এবং সুদও সময়মত আসে না।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলি আজ অর্থনৈতিক দুরবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা। এই জেলাগুলির অভ্যন্তর ভাগ পরিদর্শন করিলেই এই

উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। ইহাদের ঘরে ঘরে বেকার, কায়ক্লেশে ও অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য্যাবলী শুধু পরিকল্পনার মধ্যে রহিয়া যাইতেছে। যতদিন না কৃষককে পরিশ্রম করিয়া ফললাভ করিতে শেখানো হয় ও তাহার আয়াস-প্রয়াসের বাধা সরানো হয় ততদিন ঋণ দেওয়াও বৃথা এবং কৃষকের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টাও বৃথা।

রাণীগঞ্জের কয়লা-সম্পদ

ভারতবর্ষে অন্যান্য কয়লাখনির মধ্যে ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লা-খনিগুলি হইতে উচ্চশ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। ঝরিয়া বিহারে ও রাণীগঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত; এবং ইহারাই ভারতবর্ষের অধিকাংশ কয়লা উৎপাদন করে। রাণীগঞ্জের কয়লাখনিগুলি ১৮২০ সনে খোলা হয় ও ঝরিয়া খোলা হয় ১৮৯৩ সনে। ১৯০৬ সন পর্য্যন্ত ঝরিয়ার চেয়ে রাণীগঞ্জ অধিক পরিমাণে কয়লা উৎপাদন করিত। কিন্তু তাহার পর হইতে ঝরিয়ার কয়লা উৎপাদন বর্ত্তমানে রাণীগঞ্জ হইতে অধিকতর হইয়েছে। ১৯৩২ সনে ডঃ সিরিল ফক্স সর্বভারতীয় কয়লা সম্পদের হিসাব করেন। তাঁহার হিসাবমতে ভারতের মোট কয়লা সম্পদের পরিমাণ ৬,০০০ কোটি টন। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ২,০০০ কোটি টনের উৎপাদন কার্য্যকরী ভাবে সম্ভবপর। আবার এই ২,০০০ টনের মধ্যে কেবলমাত্র ৫০০ কোটি টন উচ্চশ্রেণীর কয়লা। ওই ৫০০ কোটি টনের মধ্যে রাণীগঞ্জে আছে ১৮০ কোটি টন ও ঝরিয়াতে আছে ১২৫ কোটি টন।

সম্প্রতি ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগ যে অনুসন্ধান করেন তাহাতে দেখা যায় যে, রাণীগঞ্জের কয়লাখনিগুলিতে মোট ১৩০০ কোটি টন কয়লা-সম্পদ আছে। বর্ত্তমান হারে খরচ হইলে ইহা কয়েক শত বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে। ১৯৪৬ সনে যে হিসাব হয় তাহাতে দেখা যায় যে, উচ্চশ্রেণীর গণ্ডোয়ানা কয়লার পরিমাণ ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জে আছে ৪৫২ কোটি টন। ভারতের কয়লা-সম্পদের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, ইহা যে সীমাবদ্ধ এবং ব্রিটেন ও আমেরিকার তুলনায় অত্যল্প, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে ভারতের রেল ইঞ্জিনসমূহে উচ্চশ্রেণীর কয়লার যথেষ্ট অপচয় হইতেছে, তাহা বন্ধ করা প্রয়োজন।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অগ্রগতি

৩রা মার্চ্চ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া মাদ্রাজের ইংরেজী দৈনিক "হিন্দু" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুত কর্ত্তব্যগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে কিনা সে, বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত দিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণে আমলাতান্ত্রিক প্রভুত্ববৃদ্ধির কথা চিন্তা করিয়া যাঁহারা শঙ্কিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সেই আশঙ্কা দূর হইয়াছে। জাতীয়করণের ফলে পরিচালন-ব্যবস্থার ক্ষমতা কমে নাই বা আমানতকারীর সংখ্যাও কমে নাই। জাতীয়করণের পর ডক্টর জন মাথাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম বোর্ড অব ডাইরেক্টর-দের সুযোগ্য পরিচালনায় পরিবর্ত্তনকালীন ব্যবস্থাগুলি বিশেষ সুষ্ঠুরূপেই সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়াছে।

জাতীয়করণের অব্যবহিত পরেই ব্যাঙ্কের আমানত কতকাংশ হ্রাস পায়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই হ্রাস বন্ধ হয় এবং ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গত বৎসর অন্যান্য সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক (যাহারা উচ্চতর হারে সুদ দেয়) অপেক্ষাও দ্রুততর হারে ষ্টেট ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি পায়। দাদন সম্পর্কে ব্যাঙ্ক সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে নাই। জাতীয়করণের পূর্ব্বাবস্থা অনুসরণ করিয়া বেসরকারী বাণিজ্যিক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেও ব্যাঙ্ক পূর্ব্বের ন্যায়ই সাহায্য করিতে থাকে।

কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ঋণ বিতরণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন সম্পর্কিত ব্যাপারে ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারে নাই। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সময় বলা হইয়াছিল যে, ষ্টেট ব্যাঙ্ক কৃষিঋণের সুবিধার জন্য মফস্বল অঞ্চলে ৫০০টি শাখা স্থাপন করিবে। কিন্তু ১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আঠার মাস সময়ে কার্য্যতঃ মাত্র ৬৬টি শাখা খোলা হইয়াছে। ডিরেক্টর বোর্ডের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, মফস্বল অঞ্চলে শাখা স্থাপনের প্রধান অন্তরায় উপযুক্ত স্থানাভাব।

"হিন্দু" লিখিতেছেন, যদি অন্যান্য ব্যবস্থা ঠিক থাকে তবে স্থানাভাবের অজুহাত না দিয়া ষ্টেট ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে অস্থায়ীভাবে যে-কোন বাড়ীতেই শাখা স্থাপন করিতে পারে। পরে ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী তৈয়ার হইলে স্বচ্ছন্দে সেখানে শাখাটিকে সরাইয়া লওয়া চলিবে।

ষ্টেট ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরবর্গ স্থির করিয়াছেন যে, সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে অপেক্ষাকৃত নিম্নহারে ধার দেওয়া হইবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের এই সাহায্য সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি কতদূর পাইয়াছেন তাহা বোঝা যায় না। ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ বজায় রাখিয়া গ্রামাঞ্চলে ঋণদান সংক্রান্ত কর্ম্মধারাটি কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ। বোধ হয় ঋণশোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ব্যবস্থা পরিকল্পিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা হইবে না।

যাহাই হউক, ইতিমধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যের জন্য ব্যাঙ্ক যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অভিনন্দনযোগ্য। যদি যোগ্য লোকের তত্ত্বাবধানে কার্য্যক্রম চলে তবে ইহাতে সুফল হইবে। এইখানে বলা প্রয়োজন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের খদ্দর ও কুটীর-শিল্পের নীতি যদি নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে সুফলের আশা সুদূরপরাহত।

আসানসোলে অপরাধবৃদ্ধি

আসানসোল মহকুমায় অপরাধ-অনুষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধিতে বিচলিত হইয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "বাঙালী" লিখিতেছেন, "ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় মহকুমা হইতে শান্তিশৃঙ্খলা বিদায় লইয়াছে। খুন, ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি, জুয়াখেলা, বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রয়, মহিলাদের প্রতি অশোভন প্রদর্শন যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে।"

"বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন :

"সম্প্রতি রাণীগঞ্জে সিনেমা হইতে ফিরিবার কালে দুই জন মহিলার উপর আক্রমণ—যাহার ফলে একজন মহিলা ও তাহার শিশুপুত্র হত ও একজন মহিলা সাংঘাতিক আহত হইয়াছেন এবং অণ্ডালে একজন সহকারী দারোগার নিখোঁজ হওয়া প্রভৃতি ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সম্প্রতি আসানসোল কোর্ট এলাকার সন্নিকটে বিভিন্ন দিনে ও অবস্থায় দুইটি যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে।

"এই সকল ঘটনা জনসাধারণের সাধারণ নিরাপত্তার মূলে আঘাত হানিতেছে। জনসাধারণ আর নিজেদের নিরাপদ মনে করিতেছে না।"

আসানসোলে অপরাধবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "প্রথমতঃ অপরাধ ধরা পড়িতেছে কম, তাহার উপর নানা যোগাযোগে, আইনের ফাঁকে অপরাধীর সাজা হইতেছে আরও কম।" পুলিসের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু অপরাধের সংখ্যা কমিতেছে না। অবশ্য সকল অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য পুলিসকে দায়ী করা ঠিক হইবে না, কারণ স্থানীয় অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও এই সকল অপরাধ বৃদ্ধির হেতুরূপে কাজ করিতেছে। কিন্তু অপরাধ নিবারণে পুলিসের দায়িত্বই যে সর্ব্বাধিক তাহাও ভুলিতে পারা যায় না।

মহকুমার এই শোচনীয় পরিস্থিতির অবসানের জন্য "বঙ্গবাণী" স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তিনি যেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবৃন্দকে লইয়া, এক গণ-প্রতিনিধি দল গঠন করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের নিকট সমগ্র পরিস্থিতি বুঝাইয়া বলেন এবং এই অবস্থা অবসানের জন্য সাহায্য-প্রার্থনা করেন।

"বঙ্গবাণী"র এই প্রস্তাব বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমরা মনে করি।

স্বাধীন রাষ্ট্র ঘনা

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত গোল্ড কোষ্ট নামক ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলটি গত ৬ই মার্চ স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা-লাভের পর রাষ্ট্রটির নূতন নামকরণ হইয়াছে ঘনা। স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর প্রায় সকল বৃহৎ রাষ্ট্রই ঘনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং নূতন রাষ্ট্রটিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৮১তম সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঘনা কমনওয়েলথের অন্তর্গত রাষ্ট্র হিসাবেই স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। ঘনাই কমনওয়েলথের প্রথম প্রকৃত আফ্রিকান সদস্য। দক্ষিণ আফ্রিকা যদিও পূর্ব্ব হইতেই কমনওয়েলথের সদস্য ছিল তথাপি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে আফ্রিকানদের জাতীয় সরকার বলা চলে না। নবীন ঘনা আফ্রিকার নবজাগরণের প্রতীক। ঘনার স্বাধীনতা দিবসে এক বক্তৃতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহর-লাল নেহরু বলেন : "আফ্রিকায় অনেক 'কৃষ্ণছায়া' আছে, সুতরাং ঘন অন্ধকারের মধ্যে এই আলো বিচ্ছুরণ আনন্দের কথা। আমি আশা করি এই আলো অন্যান্য স্থানেও বিস্তৃতিলাভ করিবে। যাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছে তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ।"

ঘনার আয়তন ৯১,৮৪৩ বর্গমাইল, প্রায় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সমান। মোট ৪৬,২০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ১৩,০০০ জন ব্যতীত আর সকলেই আফ্রিকান। দেশটি তিনটি অংশে বিভক্ত : কলোনী, আশান্তি এবং উত্তরাঞ্চল। উহা ব্যতীত টোগোল্যাণ্ডের অংশবিশেষও নূতন রাষ্ট্রটির অংশরূপে পরিণত হইয়াছে।

ঘনা প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। রাষ্ট্রের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হইল কোকো। কোকো উৎপাদনে প্রায় ১,৮৫,০০০ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। ঘনাই পৃথিবীর বৃহত্তম কোকো উৎপাদক। কোকো ব্যতীত নারিকেল তৈল, কফি এবং অন্যান্য শস্যাদি ঘনার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রপ্তানী-বাণিজ্যে কোকোর পরই কাষ্ঠ ও কাষ্ঠজাত দ্রব্যের স্থান।

রাষ্ট্রটি খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রধান প্রধান খনিজ-উৎপাদনের মধ্যে স্বর্ণ, হীরক, ম্যাঙ্গানিজ এবং বক্সাইট প্রভৃতি সমধিক উল্লেখযোগ্য। কিন্তু খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও ঘনা শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ পশ্চাদ্‌পদ।

আয়ার্লণ্ডের নির্ব্বাচন

সম্প্রতি আয়ার্লণ্ডেও সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। নির্ব্বাচনে আয়ার্লণ্ডের সর্ব্বজনমান্য নেতা ইমন ডি. ভ্যালেরারই জয় হইয়াছে। আয়ার্লণ্ডের ৩৬ বৎসরের স্বাধীনতার ইতিহাসে কুড়ি বৎসরই ডি. ভ্যালেরা রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে ছিলেন।

আয়ার্লণ্ডের ডেল অর্থাৎ পার্লামেণ্টে মোট ১৪৭টি আসনের মধ্যে ডি. ভ্যালেরার ফিয়ানা ফেল দল ৭৮টি আসন লাভ করিয়া নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। এইবারকার নির্ব্বাচনেই সর্ব্বপ্রথম সিনফিন দল নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ইহাতে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, ফিয়ানা ফেলের ভোট ভাগ হইয়া যাইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ এই সকল রাজনৈতিক ভাষ্যকার ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছেন, সিনফিন উনিশটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল—পাইয়াছে মাত্র চারটি আসন, সিনফিন ঘোষণা করিয়াছে যে, যত দিন পর্য্যন্ত

পার্লামেণ্টে তাহারা সংখ্যালঘু থাকিবে তত দিন তাহারা পার্লামেণ্টারী কার্য্যকলাপে অংশগ্রহণ করিবে না। ফলে নূতন পার্লামেণ্টে ডি. ভ্যালেরার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কার্য্যতঃ আরও বৃদ্ধি পাইবে। প্রাক্-নির্ব্বাচন যুগের মন্ত্রীসভার অন্যতম প্রধান দল ফাইন গেল তেমন বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বলা ভাল যে, ফিয়ানা ফেল এবং ফাইন গেলের মধ্যে পূর্ব্বে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে তাহাদের রাজনৈতিক পার্থক্য নিতান্তই সামান্য।

স্বাধীনতার পর ৩৬ বৎসর অতীত হইয়া গেলেও আয়ার্লণ্ডবাসী তাহাদের দেশবিভাগকে মানিয়া লইতে পারেন নাই। দেশবিভাগের প্রশ্নে এখনও তাহাদের অনুভূতি বিশেষ প্রখর। কিছুদিন পূর্ব্বেও গুপ্ত "আইরিশ রিপাবলিকান বাহিনী"র সদস্যগণ গিয়া উত্তর আয়ার্লণ্ডের অঞ্চলবিশেষে হানা দেয়। যদিও সিনফিন ব্যতীত দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডের অপর সকল রাজনৈতিক দলই এই সকল সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের নিন্দা করিয়াছেন তথাপি একথা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে, দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডে এমন একজন নাগরিকও নাই যিনি এই গুপ্ত বাহিনীর আদর্শের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন। আয়ার্লণ্ডের কোন সরকারই দেশবিভাগজনিত সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না—ডি. ভ্যালেরার সরকারকেও এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। কিন্তু রিপাবলিকান বাহিনীর গুপ্ত আক্রমণ দ্বারা দেশের পুনর্মিলন কতদূর সম্ভব সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই তাহা সম্ভব। কিন্তু ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকারের নিকট হইতে এ বিষয়ে কোনরূপ সহযোগিতা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করাও বৃথা।

সম্প্রতি কার্ডিনাল ড আলটন আয়ার্লণ্ডের সংযুক্তির এক নূতন প্রস্তাব দিয়া বলিয়াছেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডকে মিলাইয়া একটি ফেডারেশন রাষ্ট্র গঠন করিয়া আইরিশ নেতৃবর্গ যদি আয়ার্লণ্ড রাষ্ট্রকে কমনওয়েলথের সদস্য করিয়া —তথায় উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সংস্থার সাহায্যার্থ সামরিক ঘাঁটি স্থাপনে অনুমতি দেন তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ সহজতর হইবে এবং আয়ার্লণ্ডের দুরবস্থারও অবসান হইবে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে ডি. ভ্যালেরা রহস্যময় নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন।

আয়ার্লণ্ডের প্রধান সমস্যা—অর্থনৈতিক-দারিদ্র্য ও বেকারসমস্যা। আয়ার্লণ্ডের লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষেরও কম। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এতই শোচনীয় যে, বিগত পাঁচ বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ লোক দেশান্তরী হইয়াছে। জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগ লোকই কর্ম্মহীন দিনযাপন করিতেছে এবং প্রতি সপ্তাহেই এক হাজার লোক দেশত্যাগ করিয়া যাইতেছে। কৃষির অবস্থা শোচনীয়, শিল্পোন্নয়নের জন্য মূলধনের অভাব। দেশের এই অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করিতে না পারিলে আয়ার্লণ্ডের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কিন্তু নির্ব্বাচনী প্রচারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন অভিনব পরিকল্পনাই ডি. ভ্যালেরা দেন নাই।

ইন্দোনেশিয়ার সঙ্কট

আট কোটি লোকের দেশ ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর ষষ্ঠতম বৃহৎ রাষ্ট্র। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হইতে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের অবসান ঘটিল না। বৈদেশিক উস্কানি এবং স্থানীয় বিভেদপন্থীদের কার্য্যকলাপে ইন্দোনেশিয়া আজ এক বিশেষ বিপদের মুখে পড়িয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় সঙ্কটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক ব্যাপারে সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপ।

দেশে প্রায় এক ডজন রাজনৈতিক দল পারস্পারিক কলহে মত্ত। ইহারই অনুষঙ্গরূপে দেশে দুর্নীতি এবং বেআইনী কার্য্যকলাপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। তদুপরি সেনাবাহিনীর একাংশের অবাধ্যতা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আজ বিশেষ বিপন্ন করিয়াছে। যদিও ইন্দোনেশিয়া একটি অবিভাজ্য রাষ্ট্র তথাপি বর্ত্তমানে যবদ্বীপ ব্যতীত ইন্দোনেশিয়ার আর কোন অংশের উপরই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব নাই। ইহার উপর কেন্দ্রীয় সরকারও দ্বিধাবিভক্ত। ইন্দোনেশিয়ার দুই প্রধান নেতা ডক্টর সুকার্ণো এবং ডক্টর হাত্তার পারস্পরিক মিল নাই।

ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতায় বিচলিত হইয়া গত বৎসর অক্টোবর মাসে ড. সুকার্ণো বলেন যে, ইন্দোনেশিয়ার উন্নতি সাধন করিতে হইলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি তুলিয়া দিয়া কিছু দিন "পরিচালিত গণতন্ত্র" (Guided Democracy) ব্যবস্থা চালু করা উচিত। তিনি বলেন, চীন গণতন্ত্রে তিনি যে বিপুল জাতীয় পুনর্গঠন কার্য্য দেখিয়া আসিয়াছেন ইন্দোনেশিয়াতে তাহার অনুকরণ করিতে হইলে রাজনৈতিক দলাদলি নির্ব্বাসন দিতে হইবে।

স্বভাবতঃই প্রেসিডেণ্ট সুকার্ণোর এই মতবাদ অনেকেরই পছন্দ হয় নাই। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ড. মহম্মদ হাত্তা নীতি পার্থক্যের জন্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পদত্যাগ করেন। তাহার পর ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী হইতে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনীগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভুত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সম্মিলিত মন্ত্রীসভার চারিটি দলের সদস্য মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করে। মন্ত্রীসভায় থাকে কেবল ড. সুকার্ণোর জাতীয়তাবাদীর দল।

এই রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসানের জন্য ড. সুকার্ণো গত ২১শে ফেব্রুয়ারী এক নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। জাতির নিকট এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেণ্ট সুকার্ণো ইন্দোনেশিয়ার ভূমিতে পশ্চিম হইতে আমদানীকৃত গণতন্ত্রের অনুপযোগিতার উল্লেখ করিয়া বলেন, ইন্দোনেশিয়াতে এখন একটি নূতন ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলনের সময় আসিয়াছে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র পশ্চিমের দেশগুলির উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু বিগত এগার বৎসরের ইতিহাস হইতে উহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ গণতন্ত্র ইন্দোনেশিয়ার উপযোগী নহে। অতীতে যে সকল সরকারই

সামাজিক উন্নতিবিধানের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই বিরোধী দলগুলিকে দমাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদের শক্তির একাংশ নষ্ট করিতে হইয়াছে। অতএব তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহারা ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করিতেছেন।

ইন্দোনেশীয় সমাজের বিভিন্ন অংশের সম্মিলিত প্রায় নয় শত প্রতিনিধির সম্মুখে তাঁহার প্রস্তাবিত পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করিয়া প্রেসিডেন্ট সুকার্ণো অবিলম্বে একটি সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা এবং একটি জাতীয় পরিষদ গঠনের আহ্বান জানান। জাতীয় পরিষদ মন্ত্রীসভাকে পরামর্শ দান করিবে। এই জাতীয় পরিষদ গঠিত হইবে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের প্রতিনিধিবৃন্দকে লইয়া। শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, প্রোটেষ্টাণ্ট, ক্যাথলিক, মুসলমান, বিদ্বান, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রতিনিধিবর্গ এবং মন্ত্রী-সভার সদস্যগণ প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের সদস্য হইবেন। নূতন পরিকল্পনায় কমিউনিষ্টগণও মন্ত্রীসভায় যোগদানের অধিকারী হইবে। (কমিউনিষ্ট পার্টি ইন্দোনেশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম রাজনৈতিক দল—বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি ষাট লক্ষাধিক ভোট পাইয়াছিল)।

প্রেসিডেন্ট সুকার্ণোর প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে জাতীয়তাবাদী দল সমর্থন করিয়াছে; আর করিয়াছে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার অপরাপর বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি—যথা নাদাতুল উলেমা (গোঁড়া মুসলমান) এবং মসজুমী (মুসলমান)—এই প্রস্তাব অনুমোদন করে নাই।

প্রেসিডেন্ট সুকার্ণোর এই পরিকল্পনায় ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। উপরন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহ আরও ব্যাপকতর অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট সুকার্ণো জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এদিকে ড. শাস্ত্রো আমিদজোজোর মন্ত্রীসভাও পদত্যাগ করিয়াছে।

ভারত-পোলিশ সম্পর্ক

পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ জোসেফ সাইরেনকিউইজ, শীঘ্রই ভারত পরিভ্রমণে আসিতেছেন। তিনি ভারতে দশ দিন অবস্থান করিবেন। সেই সময় ভারত-পোলিশ সম্পর্ক এবং সাধারণভাবে আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক লইয়া শ্রীনেহরু ও মিঃ সাইরেনকিউইজের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিবে।

পোল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনের পর মিঃ সাইরেনকিউইজ পুনরায় পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মধ্যে কিছুদিন ব্যতীত ১৯৪৭ সন হইতে তিনি পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী রূপে কাজ করিতেছেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পোল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট মিঃ সাইরেনকিউইজের নূতন মন্ত্রীসভার অনুমোদন করেন। পার্লামেণ্টের শতকরা ৫১'৭টি আসন কম্যুনিষ্ট পার্টির অধিকৃত; কিন্তু মন্ত্রীসভার ৩২ জন সদস্যের মধ্যে ২৪ জনই কম্যুনিষ্ট। মিঃ সাইরেনকিউইজ কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন বিশিষ্ট নেতা। নূতন মন্ত্রীসভায় তাঁহার তিন জন সহকারী প্রধানমন্ত্রী আছেন, যেমন নোওয়াক (পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টিতে ষ্টালিনপন্থীদের নেতা), পায়তর ইয়ারসজেউইকজ এবং ষ্টেফান ইগনার (সম্মিলিত কৃষকদের নেতা)।

২৬শে ফেব্রুয়ারী পোল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে দুই ঘণ্টাব্যাপী এক বক্তৃতায় মিঃ সাইরেনকিউইজ বলেন, "অক্টোবরের পথ" হইতে আর অন্য পথে যাওয়া হইবে না। (এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে, গত অক্টোবর মাসে ষ্টালিনপন্থীদের বিরুদ্ধে মিঃ গোমুলকার জয়লাভের ফলেই পোল্যাণ্ডে কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থার নানাবিধ অন্যায় অবিচার দূর করিয়া নূতন ব্যবস্থা চালু হয়)। তিনি বলেন, তাঁহার সরকারের লক্ষ্য পোল্যাণ্ডে অধিকতর বাস্তব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

অধিকতর ব্যক্তিস্বাধীনতা মারফত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে নূতন প্রচেষ্টা পোল্যাণ্ডে চলিতেছে সকল ভারতবাসীই তাহা বিশেষ আগ্রহ ও সহানুভূতির সহিত অনুধাবন করিবে। ইউরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া এবং পরে পোল্যাণ্ড জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে কম্যুনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে। পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে ভারত-পোল্যাণ্ড মৈত্রীবন্ধন আরও সুদৃঢ় হইবে বলিয়া আশা করিলে তাহা ভুল হইবে না।

ইতিমধ্যেই ভারত ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৬ সনের ৩রা এপ্রিল যে ভারত-পোল্যাণ্ড বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হয় গত ২রা মার্চ্চ তাহার মেয়াদ ১৯৫৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণও ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৫৬ সনের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ভারত হইতে পোল্যাণ্ডে রপ্তানীকৃত পণ্যদ্রব্যের মূল্য হইল ৭৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। অপরপক্ষে ১৯৫৫-৫৬ সনে ঐরূপ রপ্তানীর মূল্য ছিল মাত্র ৩২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। পোল্যাণ্ড হইতে ভারতে পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে অগ্রগতি আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫-৫৬ সনে পোল্যাণ্ড হইতে ভারতে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য যে স্থলে ছিল মাত্র ৪৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, ১৯৫৬ সনের এপ্রিল-নবেম্বর এই আট মাসের আমদানীর মূল্যই তাঁহার প্রায় পাঁচ গুণের কাছাকাছি। ঐ আট মাসে পোল্যাণ্ড হইতে ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য ভারতে আমদানী করা হয়। ভারত হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে রহিয়াছে অভ্র, লৌহ এবং চামড়া। পোল্যাণ্ড হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে প্রধানগুলি হইতেছে বিভিন্ন ধাতু, লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য এবং কাগজ।

আমরা পোলিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মার্কিনী গণতন্ত্রের নমুনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সকল নাগরিকেরই স্বাধীন রাজনৈতিক ও ধর্ম্মীয় মতামত পোষণ করিবার মৌলিক অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কার্যতঃ এই স্বাধীন মত পোষণের অধিকার বর্তমানে বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্‌গণ তাহাদের মতামতের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, হিটলারের জার্ম্মানী এবং ষ্ট্যালিনের রাশিয়া ব্যতীত আর কোথাও সেরূপ ঘটে নাই। বর্তমানে পুলিটজার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেখকদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক আর্থার মিলারের লাঞ্ছনা আরম্ভ হইয়াছে।

গত গ্রীষ্মকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের অমার্কিন কার্য্য-কলাপ সংক্রান্ত কমিটি "আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট চক্রান্তের সাহায্যকল্পে পাসপোর্টের ব্যবহার" সম্পর্কে এক অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানের অন্যতম প্রধান সাক্ষী ছিলেন আর্থার মিলার। মিলার খোলাখুলিই স্বীকার করেন যে, তিনি বামপন্থীদিগের সহিত মেলামেশা করিতেন। কিন্তু ১৯৪৭ সনে কম্যুনিষ্ট সভাসমিতিতে অন্যান্য যে সকল লেখক-দিগকে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন। অপর একজন সাক্ষী ছিলেন নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডক্টর অটোনাথান। তিনি কখনও কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রকাশ সম্পর্কে তাঁহাকে বাধ্য করা হইলে তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বহির্ভূত কার্য্য হইবে।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি তাঁহাদের বিরুদ্ধে মার্কিন কংগ্রেসের প্রতি অবমাননা প্রদর্শনের অভিযোগ আনা হইয়াছে। মিঃ মিলার এবং ড. নাথান দুই জনেই অবশ্য এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সাহসের সহিত সংগ্রাম চালাইতেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীন চিন্তা সঙ্কোচনের আর একটি দৃষ্টান্ত মিলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনের সময়। "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, যখন কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্মেলন চলিতে থাকে তখন সম্মেলন ভবনের প্রবেশপথে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের এক দল লোক সিনেমার ক্যামেরা লইয়া সম্মেলনে আগত সকল ব্যক্তির ছবি তুলিতে থাকে।

কম্যুনিষ্ট মতবাদ সম্পর্কে যাঁহার মনোভাব যেরূপই হউক না কেন কেবলমাত্র ঐ মতবাদ গ্রহণের জন্ম এইরূপ পুলিসী নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপরন্তু মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টি নূতন যে জাতীয় নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহার পর মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে হিংসা বা ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণের অভিযোগ করা ও এইরূপ কঠোর ব্যবস্থায় দণ্ডিত করা চলিতে পারে কিনা বিচার্য্য। কেবলমাত্র বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদ পোষণের বিরুদ্ধে এই ধরনের পুলিসী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা তর্কসাপেক্ষ। ষ্ট্যালিনের বিদেশী রাষ্ট্র ধ্বংসকারী নীতির বিরুদ্ধে যাহা যুক্তিযুক্ত হইলেও হইতে পারিত, আজকার পরি-স্থিতিতে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

যুগোশ্লাভিয়া ও সোভিয়েট রাষ্ট্র

আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট মহলে পুনরায় যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধ প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষতঃ গত অক্টোবর মাসের হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হইতেই এই বিরোধের উৎপত্তি কিন্তু ইহার গভীরতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও রহিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন যুগোশ্লাভিয়াকে পঁচিশ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অস্বীকার করিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং যুগোশ্লাভ সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক আলোচনা বিফল হইবার পর বেলগ্রেড হইতে খোলাখুলিই সোভিয়েট-যুগোশ্লাভ মতবিরোধের কথা স্বীকার করা হয়।

২৬শে ফেব্রুয়ারী যুগোশ্লাভ পার্লামেণ্টে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে যুগোশ্লাভ পররাষ্ট্র-সচিব কোচা পোপোভিচ (Koca Popovic) অভিযোগ করেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন যুগোশ্লাভিয়াকে কোণ-ঠাসা করিতে চাহিতেছে। মিঃ পোপোভিচ বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন মুখে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি যেরূপ বন্ধুভাব প্রদর্শন করিতেছে যদি যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি সেইরূপ আচরণ করিত তবে যুগোশ্লাভ সরকার সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার বিপরীত আচরণই করা হইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অপর কয়েকটি পূর্ব্ব-ইউরোপীয় রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে যাহাতে যুগোশ্লাভিয়া তাহার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে। কিন্তু সোভিয়েট-যুগোশ্লাভ আলোচনাকালীন সমস্যাগুলির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, গত আগষ্ট মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন মণ্টিনিগ্রোতে জলবিদ্যুৎ এবং এলুমিনিয়াম কারখানা নির্ম্মাণের জন্ম ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের যে অর্থনৈতিক সাহায্য দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল সেই প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকৃত হইয়াছে।

মস্কোর উত্তর আসিতেও বিলম্ব হয় নাই। ১১ই মার্চ্চ সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র "প্রাভদা" পত্রিকায় "পর্য্যবেক্ষক" (Observer) স্বাক্ষরিত এক বিশেষ প্রবন্ধে পেপোভিচের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলা হয়, পেপোভিচের বক্তৃতা মার্কসবাদ লেনিনবাদের পরিপন্থী। সোভিয়েট ইউনিয়নকে সকল ব্যাপারেই অভ্রান্ত বলিতে অস্বীকার করিবার জন্ম যুগোশ্লাভ নেতৃবর্গকে তিরস্কার করিয়া বলা হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি মনোভাবই হইল সমাজতন্ত্রের কষ্টিপাথর। সোভিয়েটকে সমালোচনা করিয়া যুগোশ্লাভিয়া সমাজতন্ত্রবিরোধী কাজ করিয়াছে। ("Attitude to the Soviet Union as the first socialist country

which has amassed the greatest wealth of experience of building socialism in the 40 years of its existence, plays an important part in the relations between socialist states. A nihilistic attitude to this experience...indicatss a definite attitude to the cause of socialism in general.")

পরিশেষে "প্রাভদা"র প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট-যুগোশ্লাভ সম্পর্কের উন্নতির জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন যথাসাধ্য করিয়াছে—আর তাহার করিবার কিছুই নাই। এখন যাহা কিছু করণীয় তাহা যুগোশ্লাভ নেতৃবৃন্দই করিবেন।

সোভিয়েট-যুগোশ্লাভ সম্পর্কের এই নূতন পর্য্যায়ে ইহাই স্পষ্ট হইয়াছে যে, মুখে সমাজতন্ত্র ও সাম্যের বাণী ছড়াইলেও আসলে সোভিয়েট নেতৃবর্গ কোন রাষ্ট্র সমানাধিকার দাবি করিবে তাহা সহ্য করিতে পারেন না।

কেনিয়া সাইপ্রাস ও এলজিরিয়ায় নির্যাতন

কেনিয়া, সাইপ্রাস ও এলজিরিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী নির্যাতন চরমে উঠিয়াছে। ১৯৫২ সনের অক্টোবর হইতে কেনিয়াতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগণ ১০,৫০০ আফ্রিকানকে হত্যা করিয়াছে। সরকারীভাবেই এই তথ্য স্বীকার করা হইয়াছে। আসল সংখ্যা যে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী তাহা বলাই বাহুল্য। এলজিরিয়ার জেলে ফরাসীদের নির্যাতন এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এলজিরিয়ার একজন স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এলজিরিয়া বিপ্লবীদের জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির পঞ্চ সদস্যের অন্যতম বিপ্লবী নেতা বেন মাহিদি লারাব কারাগারের সেলে নিজের জামা ছিঁড়িয়া তাহা দিয়া দড়ি পাকাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ফরাসী নির্যাতন যে কি পর্য্যায়ে উঠিয়াছে একটি ঘটনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। ৫ই মার্চ্চ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফরাসীরা ১৩৭ জন বিপ্লবীকে হত্যা করে এবং ৯ জনকে বন্দী করে। বিপ্লবীদের দমনে ফরাসীরা প্যারাস্যুট সৈন্য ব্যবহার করিতেছে।

কেনিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শ্রমিক নেতা দেদান কিমাতিকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফাঁসি দিয়া হত্যা করিয়াছে।

ব্রিটিশ সংবাদপত্রে রাজনৈতিক সংবাদ

ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিতে কি পরিমাণ রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশিত হয়? ১৯৫৫ সনে ব্রিটিশ সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিতে নির্ব্বাচনী সংবাদ প্রচার সম্পর্কে সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, জাতীয় নির্ব্বাচনের ন্যায় এরূপ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাও ব্রিটেনের তথাকথিত জনপ্রিয় পত্রিকাগুলির দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণরূপে পরিগণিত হয় না। জনপ্রিয় পত্রিকাগুলির মধ্যে "ডেলী মিরর" ও "ডেলী এক্সপ্রেস" পত্রিকারই প্রচার বেশী। অন্যান্য জনপ্রিয় পত্রিকার মোট যত পাঠক আছে এই দুইটি পত্রিকার পাঠকের সংখ্যা তাহার প্রায় দেড় গুণ কিন্তু নির্ব্বাচনের সংবাদ এই দুইটি পত্রিকার মোট সংবাদ পরিবেশন স্থানের যথাক্রমে মাত্র শতকরা ৫·৭ ভাগ ও ৫·৪ ভাগ অধিকার করিয়াছিল। এমন কি শ্রমিকদলের মুখপত্ররূপে পরিচিত "ডেলী হেরাল্ড" পত্রিকাও সংবাদ বিভাগের শতকরা ১২ ভাগের বেশী স্থান সাধারণ নির্ব্বাচনের সংবাদ প্রকাশের জন্য দেয় নাই।

এই ঘটনা হইতে হয় ত এরূপ ধারণা হইতে পারে যে, ব্রিটেনের জনসাধারণ রাজনৈতিক ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহান্বিত নহে। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ জনসাধারণের সুস্থ রাজনৈতিক চেতনার উপরই ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ব্রিটিশ পত্রিকাগুলি এই সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিত। কিন্তু সত্য প্রচার অপেক্ষা মিথ্যা এবং অজ্ঞানতা প্রচারেই এই সকল সংবাদপত্রের উৎসাহ বেশী। কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কে ভারতের নীতি সম্পর্কে ব্রিটিশ জনসাধারণের বিরূপ মনোভাবের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বামপন্থী শ্রমিক নেতা বিভানের মুখপত্র "ট্রিবিউন" লিখিয়াছেন যে, সমস্যাটি সুষ্ঠুরূপে ব্রিটিশ জনসাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরা হয় নাই। কথাটি আংশিক সত্য হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, বহুল প্রচারিত ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহ ভারতের বিবৃতিগুলি প্রকাশ না করিয়া ভারতবিরোধী বক্তব্যগুলিকেই প্রাধান্য দেয়। এই অবস্থায় ব্রিটিশ জনসাধারণ ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইতে পারে না। ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির এইরূপ ব্যবহারের কারণও বুঝা কঠিন নহে। ইহাদের অধিকাংশই রক্ষণশীল পুঁজিপতিদের হাতে, ইহারা কোন কালেই ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নহে; ভারতের সমৃদ্ধি এবং সম্মান এই কুটচক্রীদের চক্ষুশূল। তাই তাহারা সজ্ঞানে ভারতবিরোধী মিথ্যাপ্রচারে এত উৎসাহের সহিত লাগিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি

পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ অনিশ্চয়তার মধ্যে রহিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রধানতঃ তিনটি কারণ। প্রথমতঃ ঐ অঞ্চলের দেশগুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে দেখিতে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অনিচ্ছা; দ্বিতীয়তঃ মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ আধিপত্য দূর করিয়া তথায় মার্কিন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার ফলে ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধ—যাহার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিশেষ জটিলাকার ধারণ করিয়াছে; এবং তৃতীয়তঃ বিশ্বব্যাপী কমিউনিষ্ট বিরোধী অভিযানের অন্যতম ঘাটিরূপে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবহারে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সক্রিয় বিরোধিতা—যাহার ফলে ঐ অঞ্চল বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ক্ষমতার লড়াইয়ের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হইতে

চলিয়াছে। ইহা ব্যতীত ইস্রাইল রাষ্ট্রের প্রতি আরব রাষ্ট্রগুলির অন্ধ বিরোধিতাও পরিস্থিতিকে জটিলতর করিয়াছে।

পাশ্চাত্তা রাষ্ট্রবর্গ মধ্যপ্রাচ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ ফল সুয়েজখাল জাতীয়করণ। কিন্তু সুয়েজখাল জাতীয়করণের পর প্রায় আট মাস অতীত হওয়ার পরও অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। অন্তর্বর্ত্তীকালীন মিশর আক্রমণ এবং সাম্প্রতিক মার্কিন "শূন্যস্থান পূরণ" নীতি তাহার কারণ। তবে গত আট মাসে অবস্থার অন্যবিধ বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুয়েজ যুদ্ধে পরাজয়ের পর ব্রিটেন এবং ফরাসী সরকার মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে দ্বিতীয় স্থানে পড়িয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব-ঘোষিত নীতিতেও তেমন বিশেষ সুবিধা হয় নাই। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে প্রধান অভিনেতা মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের।

বিগত আট মাসে নাসের প্রমাণ করিয়াছেন যে, কূটনীতিতে তিনি শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌দের সমকক্ষ। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে তিনি একের পর এক তাঁহার প্রস্তাব মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছেন। মিশর হইতে সকল বিদেশী সৈন্য অপসারণ করা হইয়াছে, গাজা হইতেও ইস্রাইলী সৈন্য সরাইয়া লইতে হইয়াছে। সুয়েজ খাল পুনরায় জাহাজ চলাচলের উপযোগী হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও নাসের স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন যে, মিশরীয় সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষকে টাকা না দিলে কোন জাহাজকেই খাল দিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীও অবশ্য নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। শেষ পর্যন্ত ইস্রাইল গাজা ও আকাবা অঞ্চল হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু ইস্রাইল সর্ত করিয়াছে যে, গাজা অঞ্চল রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর অধীনে থাকিবে। রাষ্ট্রপুঞ্জ অবশ্য এই প্রস্তাব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু মনে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (প্রধানতঃ যাহার চাপে ইস্রাইল মিশরীয় ভূমি হইতে তাহার সৈন্য সরাইয়া লইতে সম্মত হইয়াছে) ইস্রাইলের এই সর্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের অভিমত হইল এই যে, মধ্য-প্রাচ্যের বর্তমান উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় চিরকালের জন্য না হইলেও অন্ততঃ সাময়িক ভাবে গাজা অঞ্চল আন্তর্জাতিক বাহিনীর অধীনে থাকা উচিত। অনুরূপভাবে আকাবা উপসাগর এবং তিরাণ প্রণালীটিতেও মিশরের সার্ব্বভৌমত্ব খর্ব্ব করিবার জন্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গ বিশেষ প্রচেষ্টা করিতেছে। স্বভাবতঃই মিশর এইরূপে তাহার সার্ব্বভৌমত্ব খর্ব্ব হইতে দিতে স্বীকৃত হইতে পারে না এবং কার্যতঃ হইতেছে না। এই অঞ্চলগুলি যাহাতে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর চক্রান্তে চিরকালের মত হাতছাড়া না হয় সেজন্য মিশর কাজে কাজেই যথাশীঘ্র উক্ত অঞ্চলের কর্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।

মিশর সুয়েজখাল দিয়া ইস্রাইলী জাহাজ চলাচল করিতে দিতে অসম্মত হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্স মিশরের উপর চাপ দিতেছে যাহাতে মিশর ইস্রাইলী জাহাজকে সুয়েজ খাল দিয়া অবাধ যাতায়াতের সুযোগ দেয়। মিশর ইস্রাইল সম্পর্কে এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারে কিনা অথবা আকাবা উপসাগর ও তিরাণ প্রণালী আন্তর্জ্জাতিক জলপথ কিনা তাহা আইনের বিচার্য বিষয়। এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবেন আন্তর্জ্জাতিক আদালত। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠী এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত মিশরের উপর চাপাইয়া দিলে তাহা বিচারসহ অথবা সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না।

সুয়েজ সমস্যা ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের অপর প্রধান সমস্যা আরব-ইস্রাইলী বিরোধ। ইহাতে বিদেশী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর হাত থাকিলেও প্রধানতঃ আরব রাষ্ট্রগুলির অন্ধ ইস্রাইল বিরোধিতাই এই সমস্যাকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। আরব রাষ্ট্রগুলির এই কথা বুঝিবার সময় হইয়াছে যে, অন্ধভাবে ইস্রাইল বিরোধিতার দ্বারা কোন লাভ হইবে না।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট

নিরাপত্তা পরিষদে শ্রীকৃষ্ণ মেননের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সতেজ ভাষণের ফলে বাগদাদী চুক্তিওয়ালাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ার পর, নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যেন এখানে আসিয়া দুই পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালান। উদ্দেশ্য—যদি তাহাতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়। সে বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর মতামত নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :

"এর্ণাকুলম, ২৪শে ফেব্রুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী নেহরু অদ্য এখানে বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট যদি ভারতে আসেন তবে আমরা তাঁহাকে সম্মানিত অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিব।

এখানে এক নির্ব্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নেহরু নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কাশ্মীর সংক্রান্ত নূতন প্রস্তাবের উল্লেখ করেন।

শ্রীমেনন যেরূপ নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের পক্ষে বক্তব্য পেশ করিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী তাহার প্রশংসা করেন। জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করেন।

সামরিক চুক্তির নিন্দা করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাশ্মীর ব্যাপারে বাগদাদ চুক্তির প্রভাব পড়িয়াছে।

মিঃ জারিং-এর ভারত আগমন সম্পর্কে নেহরু বলেন, আমরা ভদ্র ব্যবহার করিব এবং তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইব। আমরা তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিব। কিন্তু আলোচনা কি ধরনের হইবে এবং আমরা কি নীতি অবলম্বন করিব তাহা এখনই নির্দিষ্টভাবে বলা আমার পক্ষে শক্ত। নির্ব্বাচন শেষ হইবার পরে আমরা যতক্ষণ মিলিত হইয়া এ সম্পর্কে বিবেচনা করিতে না পারিতেছি, আমাদের প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ মেননের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ যতক্ষণ না হইতেছে, নিরাপত্তা পরিষদে কি বলা হইয়াছে যতক্ষণ না দেখিতেছি, ততক্ষণ আমরা আমাদের নীতি নির্দ্ধারণ করিতে পারিব না।

পশ্চিম এশিয়াকে সামরিক চুক্তির আওতা হইতে বাহিরে রাখিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছে. উহা বিবেচনা করিবার জন্য শ্রীনেহরু আইসেনহাওয়ারের নিকট আবেদন জানান। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশের মধ্যে এ সম্পর্কে আলোচনা হওয়া কর্তব্য। এই আলোচনায় অংশ গ্রহণের ইচ্ছা ভারতের নাই।

নেহরু বলেন, আইসেনহাওয়ারের প্রস্তাবে সামরিক ব্যবস্থার অন্তরালে অনেক কল্যাণের বিষয় আছে। কিন্তু আমার সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে যে, সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা কোন অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। নেহরু বলেন. আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের দুইটি মাত্র উপায় আছে—একটি যুদ্ধ এবং অন্যটি শান্তি। বিবেচনাশীল কোন ব্যক্তি প্রথমটি চাহে না। কিন্তু শান্তির পথে সমস্যা সমাধান সহজ নয় এবং ইহাতে সময়ও লাগিবে, তবুও শান্তিপূর্ণ আলোচনা দ্বারা সমস্যা সমাধানই একমাত্র পথ।"

পাকিস্থান ও কাশ্মীর

ওদিকে নিরাপত্তা পরিষদে সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় পাকিস্থানে গোল বাধিয়াছে। কেননা পাকিস্থানের কর্ণধারবর্গের অন্য কোনও উপায় নাই নিজেদের বাঁচাবার—এই এক ভারতবর্ষকে পণ্ডবিপণ্ড করা ছাড়া। শুধু মার্কিনী পয়রাতিতে দেশ চলে কি করিয়া? সেই জন্যই নিম্নস্থ সংবাদটির গুরুত্ব আছে:

"করাচী, ২৪শে ফেব্রুয়ারী—পাকিস্থানের অর্থমন্ত্রী মিঃ আমজাদ আলী গতকল্য পাকিস্থান জাতীয় পরিষদে বলেন যে, জারিং মিশন যদি কাশ্মীরের অসামরিকীকরণ এবং তথায় গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে না পারে, তাহা হইলে পাকিস্থান কাশ্মীর সমস্যা রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করিবে।

জাতীয় পরিষদে বৈদেশিক ব্যাপার আলোচনাকালে মিঃ আমজাদ আলী বলেন, কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের প্রশ্নে ভারতবর্ষ যেরূপ মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে, তাহার ফলে জারিং মিশন ব্যর্থ হইবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। যদি জারিং মিশন ব্যর্থ হয় তাহা হইলে পাকিস্থান কাশ্মীর সমস্যা সাধারণ পরিষদে লইয়া যাইবে।

গতকল্য জাতীয় পরিষদের কয়েকজন সদস্য এইরূপ দাবী করেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে ত্রিশক্তির যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া পাকিস্থানের সোজাসুজি ব্যাপারটি সাধারণ পরিষদে লইয়া যাওয়া কর্তব্য।

জাতীয় পরিষদে যাঁহারা গতকল্য বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ বক্তাই নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন।

বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা মির্জা মমতাজ দৌলতানা বলেন যে, পাকিস্থানের পররাষ্ট্র নীতি ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে পাকিস্থান নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীরের ব্যাপারে কার্যতঃ কাহারও সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই।

বৈদেশিক ব্যাপার সংক্রান্ত বিতর্ক গতকল্যই শেষ হইবার কথা ছিল, কিন্তু গতকল্য রাত্রি ১১টা পর্যন্ত বিতর্ক চলে। যাহাতে আরও অধিক সংখ্যক সদস্য বক্তৃতা করিতে পারেন, তজ্জন্য বিতর্ক আগামীকল্য পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

গতকল্য আওয়ামী লীগের কোন সদস্য বিতর্কে যোগ দেন নাই। যে দুইটি দল কেন্দ্রে শাসনকার্য্য পরিচালনা করে, আওয়ামী লীগ তাহার অন্যতম। গতকল্য সরকারবিরোধী দলের সদস্যগণই বক্তৃতা করেন।

মিঃ আমজাদ আলী বক্তৃতা প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, সাধারণ পরিষদ যদি সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু করিতে না পারে কিংবা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব হইতে কোন ফল পাওয়া না যায়, এবং জনসাধারণ যদি ন্যায়বিচার না পায়, তাহা হইলে তাহারা শান্ত এবং সহিষ্ণু হইয়া থাকিবে না।

অতঃপর মিঃ আমজাদ আলী বলেন: আমি আশা করি যে, জগতের বিবেক উদ্বুদ্ধ হইবে। জগতের জনমত একটি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জকে সুস্পষ্ট ভাষায় এই কথা ঘোষণা করিতে হইবে যে, কাশ্মীরের অসামরিকীকরণ হইবে এবং তথায় গণভোট লওয়া হইবে। জনসাধারণের সহিষ্ণুতার শেষ আছে, আমি আশা করি যে, প্রতিবেশী হিসাবে ভারতবর্ষ অবহিত হইবে,...যদি ভারতবাসী অবহিত না হয় তাহা হইলে তাহারাই দোষী হইবে—আমরা নহি।"

কাশ্মীর ও বৈদেশিক চক্রান্ত

কাশ্মীর লইয়া যে চক্রান্ত পাকিস্থানকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে তাহার রূপ নির্ণয় বক্সী গোলাম মহম্মদ যে ভাবে করিয়াছেন তাহা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নীচে দেওয়া হইল:

"কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ শুক্রবার কলিকাতার বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতাকালে ভারতের বিরুদ্ধে যে বৈদেশিক চক্রান্ত চলিতেছে তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া বলেন, সিয়াটো শক্তি জোট কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করিতে চাহেন। কারণ কাশ্মীরের সামরিক গুরুত্ব অসাধারণ। কাশ্মীরকে সিয়াটোর আওতায় আনিতে পারিলে যুদ্ধবাজদের চক্রান্তজাল পরিপূর্ণ হইবে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে যত প্রস্তাবই গৃহীত হউক না কেন, কাশ্মীর তাহার লক্ষ্য-পথ হইতে কখনও বিচ্যুত হইবে না।

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ—কাশ্মীরের জনসাধারণ একবাক্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছে। চন্দ্রসূর্য্য যদি পশ্চিম দিকেও উদিত হয়, তথাপি কাশ্মীরী জন-সাধারণের এই রায় বহাল থাকিবে।'

নিরাপত্তা পরিষদে চতুঃশক্তির যে সংশোধনী প্রস্তাব অতি সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বক্সজী বলেন, 'নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি মিঃ জারিংকে ভারতে পাঠাইবার

প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ভাল কথা, মিঃ জারিং ভারতে আসিতে চাহেন আসুন, আমরা তাঁহাকে অবশ্যই স্বাগত করিব। কিন্তু তিনি যেন আমাদের তিন-টি কথা স্মরণ রাখেন : (১) কাশ্মীর ভারতের অংশ, (২) পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে এবং (৩) রাষ্ট্রপুঞ্জের ফৌজ যে কোন ভেক ধরিয়াই আসুক না কেন, আমরা প্রাণ থাকিতে তাহা বরদাস্ত করিব না।"

নাগা বিদ্রোহ

নাগা বিদ্রোহ এখনও চলিতেছে। এখন ইহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, পুলিশ এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। এমত অবস্থায় নীচের সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য। মনে হয় শুধু সামরিক কার্যক্রমে এই জটিল ব্যাপারের সমাধান হইবে না। কেননা রোগ বহু দিনের ও চিকিৎসা বিভ্রাটও ঘটিয়াছে অনেক। দেখা যাক ফলাফল কি হয় :

"জোড়হাট (আসাম), ২০শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য রাত্রে পুলিশ-মহল হইতে বলা হইয়াছে, সেনাবাহিনী আগামীকল্য হইতে নাগা-পাহাড়ের সীমান্তবর্ত্তী সমগ্র সমতল অঞ্চলে নাগা বিদ্রোহ দমনের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে।

উক্ত এলাকার মধ্যে শিবসাগর জেলার ১৫০ মাইল জঙ্গলাকীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল এবং মিকির পাহাড় জেলার অংশবিশেষ আছে।

জেনারাল থিমায়া এবং রাজ্যপাল মিঃ ফজল আলীসহ উচ্চপদস্থ অসামরিক ও পুলিশ কর্ম্মচারীদের মধ্যে সাম্প্রতিক উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আসাম রাইফেল-এর ইন্সপেক্টর-জেনারাল ব্রিগেডিয়ার হরভন সিংহ অভিযানের নেতৃত্ব করিবেন। নাগা পাহাড়ের জি-ও-সি মেজর-জেনারেল কোছারের সর্ব্বময় কর্তৃত্বাধীনে জোড়হাটে তাঁহার সদর দপ্তর থাকিবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, সীমান্তে নাগা পাহাড় বরাবর পুলিশ ঘাটির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে এবং সৈন্যপ্রেরণ করিয়া ঐগুলিকে শক্তিশালী করা হইবে। চতুর্দ্দিক হইতে সেনাদল কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া বিদ্রোহীরা বিপুল সংখ্যায় শিবসাগরের দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তীর্ণ গভীর অরণ্য ও মিকির পাহাড় জেলায় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে ও ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে তাহাদের তৎপরতা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পুলিশ মহল হইতে বলা হইয়াছে, ১৬ই ফেব্রুয়ারীর পর কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।"

পলতা-টালা মেন পাইপ

এই কণ্ট্রাক্ট ব্যাপার লইয়া একটা এরূপ অদ্ভুত গোলযোগ বাধিয়াছিল যে, তাহা আশ্চর্য্যজনক। এদেশে ঐ জাতীয় বৃহৎ কাজের অভিজ্ঞতা আছে মাত্র বোম্বাইয়ের একটি কোম্পানীর। তাহাদের দামদস্তুর বিষয়ে কোনও প্রশ্নই নাই অথচ কেন উহা একটি বাঙালী কোম্পানীকে দেওয়া হইবে না—যদিও তাহাদের *এরূপ কাজের কোনও অভিজ্ঞতা নাই*—এই লইয়া পৌরসভায় তুমুল তর্ক চলে।

কলিকাতার জল সরবরাহে এত গলদ, এত ত্রুটি রহিয়াছে যে তাহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন এবং এ খাতে টাকার প্রশ্নও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং ভুলভ্রান্তিতে কাজে দেরীর অবসর নাই।

এ বিষয়ে ডেপুটি মেয়র যাহা বলিয়াছেন তাহা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে আমরা নিম্নে তুলিয়া দিলাম :

"বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে কলিকাতার ডেপুটি মেয়র ডাঃ অমরনাথ মুখোপাধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠকে দৃঢ়ভাবে এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, পৌরসভার শেষ অধিবেশনে বোম্বাইয়ের ষ্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনীয়ার্স কোম্পানীকে পলতা-টালা মেন পাইপ নির্ম্মাণ এবং স্থাপনের ভার দান সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা কলিকাতা নগরীর অধিবাসীদের স্বার্থের অনুকূল। কারণ তাঁহার ধারণা 'ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একমাত্র ঐ কোম্পানীরই উপরোক্ত কাজ করিবার অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা রহিয়াছে।'

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, নিয়মের খুঁটিনাটি ব্যাপার এবং সামান্য আর্থিক সস্তা যেন শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত লইবার পরি-পন্থী হইয়া না দাঁড়ায়। তিনি বলেন, বর্ত্তমানে ষাট ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট যে পাইপটির দ্বারা দৈনিক ৬ কোটি গ্যালন জল সরবরাহ হইয়া থাকে সেটির অবস্থা খুবই খারাপ এবং উহার আশু সংস্কার প্রয়োজন। তাহা না করিলে শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা যে কোন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। শহরের পরিস্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, কলেরার বিপদ দূর করিতে হইলে এবং দ্বৈত জল সরবরাহ ব্যবস্থা (ডুয়েল ওয়াটার সাপ্লাই) তুলিয়া দিতে হইলে পরিস্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থার প্রস্তাবিত উন্নতি সাধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ঐ ৭২ ইঞ্চি মেন পাইপ বসান হইলে বর্ত্তমান ৮ কোটি গ্যালনের স্থলে ১৫ কোটি গ্যালন জল সরবরাহ সম্ভব হইবে।

বোম্বাইয়ের উক্ত কোম্পানীকে কণ্ট্রাক্ট দিবার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ঐ প্রতিষ্ঠান ইতঃপূর্ব্বে আরও বৃহৎ এক পরি-কল্পনা নির্দ্দিষ্ট সময়ে যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছে। অপর পক্ষে কলিকাতার মেসার্স স্টুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ঐ জাতীয় কোন অভিজ্ঞতা নাই।

স্টুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স কুলিজান কর্পোরেশন কোম্পানী বোখারো এবং দুর্গাপুরে বৃহৎ পরি-কল্পনার কাজ করিতেছে একথা তিনি জানেন কিনা, একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করিলে ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, ঐ বিষয়ে তিনি শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটি ঠিকমত জানেন না।

তিনি বলেন যে, বোম্বাইয়ের কোম্পানীকে ভার দিবার সিদ্ধান্ত সমর্থনকারীরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অভিজ্ঞতা এবং

ব্যয়ের প্রশ্ন ছাড়াও ঐ কোম্পানী 'বাহির হইতে বিশেষ কোনরূপ সাহায্য' না লইয়াও কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারিবে।

একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, বোম্বাইয়ের কোম্পানী কলিকাতার জমি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দুই জন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ কলিকাতায় আনিয়াছিলেন।

ট্রাকচারাল ইঞ্জিনীয়ার্স কোম্পানীর ক্যাথডিক উৎপাদনে কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, 'এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না আমি জানি না।'

তিনি বলেন যে, বোম্বাইয়ের কোম্পানী ক্যাথডিক উৎপাদনের খরচা সমেত ৭২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পলতা-টালা পাইপ লাইন বসাইবার জন্য ১ কোটি ৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৪৫০ টাকা চাহিয়াছিল। সুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী ক্যাথডিক উৎপাদনের খরচা বাদেই পাইপ লাইন বসাইবার জন্য ১ কোটি ১২ লক্ষ ৯ হাজার ৬২৫ টাকা চাহিয়াছিল। পরে তাহারা নূতন পাইপ লাইন এবং বর্ত্তমান তিনটি পাইপ লাইনের ক্যাথডিক উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য আরও ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা চাহে। ইহার ফলে উক্ত কোম্পানীর খরচের হিসাব দাঁড়ায় মোট ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা।

ঐ কণ্ট্রাক্টে অন্যান্য খরচা বাবদ যে আরও ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা দেখান হইয়াছে তাহার মধ্যে জমির জন্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা এবং তত্ত্বাবধান কাজের জন্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান। এই প্রসঙ্গে ঐ ব্যয়বরাদ্দ যথেষ্ট কি না, এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ মুখোপাধ্যায় জানান যে, কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের মত লইয়াই ঐ ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পাইপ লাইন বসাইবার মূল কণ্টাক্টটি ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার, সোয়া দুই কোটি টাকার নহে।

গম ও আটার কালোবাজার

কলিকাতায় কালোবাজার কি ভাবে চলিতেছে তাহার একটি নিদর্শন আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, এইরূপ কালোবাজারের মূলে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, এক বা একাধিক, বিরাজ করিতেছেন।

ইতিপূর্ব্বে বহুবার এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। গম, চিনি, চাউল, ডাল সকল জিনিষেই দেখা গিয়াছে শুধু সরবরাহ বাড়াইলে দাম কমে না।

আসলে প্রয়োজন কঠোর দণ্ড এবং সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন সরকারী বিভাগে তদন্ত ও কঠোর সাজার ব্যবস্থা :

"সরকার কর্তৃক গম সরবরাহের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কলিকাতার বাজারে আটার সমস্যার কিছুমাত্র সুরাহা হয় নাই। এক্ষণে কলিকাতায় দৈনিক প্রায় ১১০০ টন গম সরবরাহ করা হইতেছে। ইহার পূর্ব্বে দৈনিক সরবরাহের পরিমাণ ছিল ১০০০ টন।

"কিছুদিন পূর্ব্বে বাজারে আটার দর বাড়িলে সরকার গম সরবরাহের পরিমাণ বাড়াইয়া ন্যায্য মূল্যের দোকান এবং চাকীওয়ালার দোকানগুলিতে সাড়ে ছয় আনা সের দরে আটা বিক্রয়ের নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু ঐ দরে আটা সংগ্রহ করা দুষ্কর হয়। দোকানের সম্মুখে দীর্ঘ 'কিউ' পড়িয়া যায় এবং এই অবস্থা দেখিয়া যুদ্ধের সময়ের 'কন্‌ট্রোল' যুগের কথা মনে পড়ে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া লোকে আটা না পাইয়া ফিরিয়া যায়।

"সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রভাবশালী একদল মনে করেন যে, কলিকাতার চাহিদা মিটাইবার ব্যাপারে ১০০০ টন গমই যথেষ্ট। সুতরাং গমের সরবরাহ ১০০ টন বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও যখন অভাব মিটিতেছে না তখন ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উহার একটা বেশ বড় অংশ বেশী দামে চোরাবাজারে বিক্রয় হইতেছে। কিছু পরিমাণ গম চোরা পথে বাহিরে পাচার হইতেছে—এইরূপ বিশ্বাস করার মত কারণ আছে বলিয়াও ব্যবসায়ীমহল মনে করেন।

"বর্ত্তমানে ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে আটা সংগ্রহ করা কষ্টকর হইলেও বাহিরের দোকান হইতে আটা সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধা নাই। ঐ সব দোকানে প্রচুর আটা মিলে। তবে উহার মূল্য সের প্রতি ৯ আনা হইতে ১০ আনা পর্য্যন্ত। ন্যায্য মূল্যে আটা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অনেকে ময়দা ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছেন। ময়দার সের ৯ আনা হইতে ১০ আনা।

"এই অবস্থার জন্যই সম্ভবতঃ রাজ্য সরকার ময়দার কলগুলিকে অধিক পরিমাণ আটা উৎপাদন করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এক্ষণে ময়দা কলগুলি সাধারণতঃ শতকরা দশ হইতে পনের ভাগ আটা উৎপাদন করে। রাজ্য সরকার উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৪০ ভাগ করার জন্য বলিয়াছেন।

"সম্প্রতি চাকীওয়ালা সমিতির পক্ষ হইতে রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে গম বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য অনুরোধ জানান হয়। ঐ স্মারকলিপিতে সমিতির নিকট প্রত্যহ বণ্টনের জন্য অন্ততঃপক্ষে ৩০০ টন করিয়া গম দিতে বলা হয়। ইহা ছাড়া সমিতি কর্তৃক বণ্টনের উদ্দেশ্যে মাসে আরও ৫০০০ টন এতদ্দেশীয় গম সংগ্রহ করার অনুমতিও উহাতে প্রার্থনা করা হয়।

"সমিতির পক্ষ হইতে আরও বলা হয় যে, ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা হ্রাস করিয়া ঐগুলিতে গম সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হউক। সম্ভব হইলে ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে গম সরবরাহ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়া ঐ গম চাকীওয়ালাদের দোকানে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হউক। কারণ, ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে যে গম সরবরাহ করা হয়, উহা সরাসরি অথবা অসঙ্গত পথে শেষ পর্য্যন্ত চাকীওয়ালাদের দোকানেই পৌঁছে।

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার মিলস এসোসিয়েশন এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফ্লাওয়ার মিলস এসোসিয়েশন প্রতিনিধিবৃন্দ বাজারে অধিকতর পরিমাণে আটা সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে আটার উৎপাদন বাড়াইতে সম্মত হইয়াছেন। মিলের এই আটার খুচরা দাম পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি সের।৶৬ পাই থাকিবে।"

পুরুলিয়ায় ইউরেনিয়াম

পুরুলিয়া অঞ্চল বাংলায় ফিরিয়া আসার পর অনেকে মন্তব্য করেন যে কাঁকড় মাটি ও কাঁটাঝোপ লইয়াই আমাদের সন্তুষ্ট হইতে হইল। কথাটা নিতান্ত ভুল নয়, কিন্তু এখন আশা দেখা দিয়াছে যে, হয়ত সবই কাঁকড়মাটি নয়। অন্ততঃ তাহাই জানা যাইতেছে :

"পুরুলিয়ায় ইউরেনিয়াম (আণবিক চুল্লীর প্রধান জ্বালানি) পাওয়া যাইতে পারে, এইরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে। রবিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পুরুলিয়ায় উক্ত সংবাদ পরিবেশন করেন।

ডাঃ রায় আরও বলেন যে, তিনি এরূপ রিপোর্ট পাইয়াছেন। এই জেলায় ইউরেনিয়ামের অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে।

পুরুলিয়ায় কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এক নির্ব্বাচনী সভায় ডাঃ রায় ভাষণদানকালে ইউরেনিয়াম সম্পর্কে উক্ত বিবরণ দান করেন। তিনি আরও বলেন যে, পুরুলিয়া জেলা প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ। ঐ সব সম্পদ ঐ জেলার উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গত ৩।৪ মাসে তিনি যে রিপোর্ট পাইয়াছেন তাহা হইতে তিনি জানিতে পারেন যে, পুরুলিয়া জেলায় কয়লা ও চুণা পাথর পাওয়া যায়।

ডাঃ রায় বলেন, আগামী কয়েক বৎসরে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে পুরুলিয়ার সকল সম্পদের বৃদ্ধি ও উন্নয়নকল্পে সর্ব্বপ্রকারে যত্ন লওয়া হইবে।

নভোমণ্ডল পরিক্রমা

মানুষ শুধু বায়ুমণ্ডলে ঘুরিয়া সন্তুষ্ট নয়, আরও উপরের আকাশে, হয়ত চন্দ্রলোকেও, উড়িবার আকাঙ্ক্ষা তাহার বাড়িয়াই চলিতেছে। নিম্নের সংবাদটি সেই সংক্রান্ত :

"মস্কো, ১৬ই ফেব্রুয়ারী—রুশ বিজ্ঞানীরা রকেট বাহিত কয়েকটি কুকুরকে ১১০ কিলোমিটার (৭০ মাইল) উর্দ্ধাকাশে পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছেন। উহারা নিরাপদে ভূতলে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। ভবিষ্যতে ব্যোম-পথে ভ্রমণের অবস্থা নির্ণয়কল্পে এই পরীক্ষাকার্য্য চালান হয়।

রুশ ট্রেড ইউনিয়ন সংবাদপত্র 'ট্রুড' উপরোক্ত তথ্য প্রচার করা হইয়াছে। উহাতে বলা হয় যে, রকেটের প্রান্তভাগে যুক্ত, তাপ-নিয়ন্ত্রিত বন্ধ করা একটি কেবিনে কুকুরগুলিকে রাখা হয়। কিন্তু উর্দ্ধাকাশে রকেটচ্যুত কেবিনটি প্যারাশুট সাহায্যে নীচে নামিয়া আসে। ইহাতে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। ঐ সময় স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরায় কুকুরগুলির শারীরিক অবস্থার আলোক-চিত্র গৃহীত হয়। উহাতে তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়।

প্যারাশুট হইতে ঝুলানো অক্সিজেন ভর্ত্তি বিশেষ পরিচ্ছদাবৃত কুকুরগুলিকে মাটিতে নামাইয়া দিয়াও ভিন্নভাবে পরীক্ষাকার্য্য চালান হয়।

নন্দলাল বসুকে সম্মান দান

ললিতকলার ক্ষেত্রে বাংলার নাম যাঁহারা জগৎবিখ্যাত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনন্দলাল বসু অন্যতম। তাঁহাকে এই সম্মান যোগ্যভাবেই দেওয়া হইয়াছে :

"বোলপুর, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় কলাভবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসব হয়। এই বৎসরে আচার্য্য নন্দলাল বসুকে ডি-লিট পদবী দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়া হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে যাহাতে সকল অধ্যাপক ও বিদ্যার্থী যোগদান করিতে পারেন তজ্জন্য বিশ্বভারতীর সকল বিভাগ ছুটি দেওয়া হইয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহার প্রতিষ্ঠার পর এই দ্বিতীয় বার কলিকাতার বাহিরে বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসব সম্পন্ন করিলেন। প্রথম বার ১৯৫৬ সালে বাঁকুড়াতে হইয়াছিল এবং স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে এই সম্মান দেওয়া হইয়াছিল। শান্তিনিকেতনেও এই দ্বিতীয় বার বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়াছে। ১৯৪০ সনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি-লিট পদবী দেওয়া হইয়াছিল।

এই বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কলাভবনে আচার্য্য নন্দলাল বসুর চিত্রসমূহের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

আচার্য্য বসু এই তৃতীয় বার ডক্টরেট পদবী লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৫০ সনে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৩ সনে বিশ্বভারতী তাঁহাকে এই পদবী দিয়াছিলেন।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

যাঁহারা সন ১৩৬৩ সালে প্রবাসীর গ্রাহক আছেন আশা করি, আগামী ১৩৬৪ সালেও তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন।

গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী বর্ষের বার্ষিক মূল্য ১২ বারো টাকা মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনি-অর্ডার কুপনে তাঁহাদের স্ব-স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে টাকা জমার পক্ষে অসুবিধা হয় এবং তিনি নূতন বা পুরাতন গ্রাহক ইহা ঠিক করিতে না পারায় ভি-পিও চলিয়া যায়।

অতএব প্রার্থনা যেন তাঁহারা গ্রাহক নম্বরসহ টাকা পাঠান, অন্যথায় পূর্ব্ব গ্রাহক নম্বরে ভি-পি যাইতে পারে; তাহা ফেরত দিবেন।

যাঁহারা আগামী ২৬শে চৈত্রের মধ্যে টাকা পাঠাইবেন না তাঁহাদের নামে বৈশাখ সংখ্যা ভি-পিতে পাঠানো হইবে।

যাঁহারা অতঃপর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে ২০শে চৈত্রের পূর্ব্বেই জানাইয়া দিবেন।

ভি-পিতে টাকা পাইতে কখনো কখনো বিলম্ব ঘটে, সুতরাং প্রবাসী পাইতে গোলমাল হয়। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠানো সুবিধাজনক। ইতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসী-সম্পাদক

ভারতীয় জড়বাদ

শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদের দেশ। এখানকার লোক পরলোকে বাসা বাঁধবার ব্যস্ততায় ইহলোককে এক রাত্রির পান্থশালা ভেবে এসেছে। জড়বাদ ও ইহকাল-সর্বস্বতা পশ্চিমের আমদানী। এসব কথা ত হামেশাই শুনি। কিন্তু, ভারত-বর্ষেও যে জড়বাদ প্রচলিত ছিল, বহু ভারতীয় যে ইহ-কালকেই সর্বস্ব মনে করেছেন, তার পরিচয় আমরা অনেকেই রাখি না। ভারতীয় জড়বাদ হাল আমলের কোন ব্যাপার নয়। এর মূল রয়েছে সুপ্রাচীন বেদে। একথা অবিশ্বাস্য মনে হলেও মিথ্যা নয়। এই প্রবন্ধে সুপ্রাচীন ভারতীয় জড়বাদ ও জড়বাদীদের কথাই বলব।

ভারতীয় জড়বাদের প্রচলিত নাম 'চার্বাক-দর্শন। চার্বাক বলে কোন দার্শনিক ছিলেন কিনা, জানা নেই। চার্বাকবাদীরা বলে, জড়ই চরমসত্য ও সত্তা, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, ইহকাল ছাড়া কিছু নেই, পরকাল স্বার্থান্ধ-দের ভাঁওতা, ঈশ্বর পুরোহিতদের বুজরুকি, ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের একমাত্র কাম্য। তারা আরও বলে, যতকাল বাঁচব সুখে শান্তিতে বাঁচব, ঋণ করে হলেও ঘি খেতে হবে। এমন সব 'চারুবাক্' বা মিষ্টি কথা শোনায় বলেই এদের নাম চার্বাক। প্রাচীন ভারতে যারাই এমন ধারার কথা বলত তাদের সবাইকেই সাধারণভাবে বলা হ'ত চার্বাক। এখানে প্রশ্ন উঠছে—এদের খবর জানা গেল কি করে?

চার্বাক-সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ হারিয়ে গেছে। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে এদের কথা ছড়িয়ে আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকেরা চার্বাক-মত খণ্ডন করেছেন। এই সব দার্শনিক চার্বাক-মতের সত্য পরিচয় দিয়েছেন কিনা বলা মুশকিল। কিন্তু এঁদের কথাই প্রামাণ্য বলে মানতে হবে।

চার্বাক-মতের ঐতিহ্য 'ঋগ্‌বেদ' থেকে সুরু হয়েছে। ঋগ্‌বেদের ঋষি বৃহস্পতি লৌক্য বা ব্রহ্মণস্পতি 'জড়'কে চরম সত্তা বলে ঘোষণা করেছেন। বৃহস্পতির আর এক নাম গণপতি। বৃহস্পতির শিষ্যদের বলা হ'ত বার্হস্পত্য বা লোকায়ত।

বৃহস্পতি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন, তা পরবর্তীকালে বহুদিন পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলেছে। রামায়ণের জাবালি মুনি জড়বাদী ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে যে সব কথা বলেছেন তা ত চার্বাকদেরই কথা। চার্বাকরা বলত, দেশের রাজার চেয়ে বড় কেউ নেই। 'হরিবংশে' রাজা বেন একথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। বেদ-বিরোধী বলে তাঁর কুখ্যাতি ছিল। ব্যাসদেব তাঁকে 'অধার্মিক' বলে নিন্দা করেছেন। অজিত-কেশ-কম্বলিন বুদ্ধদেবের সমকালীন লোক। তিনি চার্বাক-মত প্রচার করেছেন। অজিত-শিষ্য পায়াসি এই মতেরই ধারক। 'মহাভাষ্য' রচয়িতা পতঞ্জলি ভাগুরিকে চার্বাক-দর্শনের মুখর সমর্থক বলে উল্লেখ করে-ছেন। পুরন্দর সুশিক্ষিত চার্বাক-সম্প্রদায়ের লোক। শান্তিরক্ষিত তাঁর 'তত্ত্ব-সংগ্রহ' গ্রন্থে পুরন্দরের নাম করে-ছেন। অবশ্য পুরন্দর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ছাড়া 'অনুমান'কেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রমাণ বলে মানতে রাজী ছিলেন। আরও পরবর্তীকালে চার্বাক-চিন্তায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এতকাল চার্বাকরা ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি উপাদানকে সৃষ্টির আদিম উপাদান বলে মানত। 'ব্যোমে'র অস্তিত্ব এরা স্বীকার করে নি, কারণ, 'ব্যোমে'র কোন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয় না; আর এদের কথাই ছিল—ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ যা জানি না, তা মানি না। কিন্তু হরি-ভদ্র সূরির 'ষড়দর্শন সমুচ্চয়ে' গ্রন্থের ভাষ্যকার গুণরত্ন বলে-ছেন—কোন কোন চার্বাক 'ব্যোম'কেও একটি উপাদান বলে স্বীকার করেছেন। 'অদ্বৈত ব্রহ্ম সিদ্ধি'তে সদানন্দ চার্বাক-মতসিদ্ধ 'আত্মা' সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করেছেন। কোন কোন মতে আত্মাকে ইন্দ্রিয়সমষ্টির সহিত অভিন্ন বলা হয়েছে, কোন কোন মতে প্রাণই আত্মা, আবার কোন কোন মতে মনের সঙ্গে আত্মার অভিন্নতা স্বীকৃত হয়েছে। চার্বাকদের এই সব মতবাদ পরবর্তীকালের সংযোজনা। বুদ্ধের পরবর্তী-যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান হয়েছিল। এই ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্লাবন থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যই বোধ হয় বহুকালের জীর্ণ চার্বাক-মত সংস্কার করা হয়েছিল। আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত-বাদ ও অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার—এই সংস্কারেরই ফল।

চার্বাক-দর্শনের ভিত্তি চার্বাক-প্রমাণবাদ। চার্বাকদের বলা হয়—'প্রত্যক্ষেব প্রমাণবাদী'। প্রত্যক্ষকেই এরা এক-মাত্র প্রমাণ বলে মানে। প্রত্যক্ষ আবার যেমন তেমন হলে হবে না, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। সত্য শুধু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষেই জানা যায়। যা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে পাই না, তা আছে, এমন কথা বলা অর্থহীন। অনুমান বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু কেন? কথাটা খুলে বলি।

ব্যাপ্তি জ্ঞান ছাড়া অনুমান হয় না। 'রাম মরণশীল'

বলতে গেলে 'সমস্ত মানুষ মরণশীল' জানা দরকার। 'সমস্ত মানুষ মরণশীল' এই জ্ঞানই ব্যাপ্তি-জ্ঞান। সোজা কথায় সাধারণ প্রতিজ্ঞা (universal promise) ছাড়া অনুমান হয় না। এই সাধারণ প্রতিজ্ঞাই ব্যাপ্তি। আমরা বিশেষ বিশেষ মানুষের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু সমস্ত মানুষের মৃত্যু কি প্রত্যক্ষ করা যায়? আর তা যদি না করা যায়, তবে ব্যাপ্তি জ্ঞান হবে কি করে? ব্যাপ্তি-জ্ঞান না হলে অনুমান হয় না। সুতরাং চার্বাকরা বলে, সাধারণ প্রতিজ্ঞা বা ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয় না বলে ব্যাপ্তি-নির্ভর অনুমান বিশ্বাসযোগ্য নয়।

শব্দ-প্রমাণ (Testimony) অনুমান-নির্ভর। অনুমান অবিশ্বাস্য বলে—অনুমান-নির্ভর শব্দ প্রমাণও বিশ্বাস্য নয়। বেদ-প্রমাণও বিশ্বাসযোগ্য নয়। বেদের মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ ও বহু অর্থজ্ঞাপক সব কথা আছে। একটি শ্রুতি-বাক্যে যা বলা হয়, প্রায়ই অন্য শ্রুতিবাক্যে তার বিপরীত কথা বলা হয়েছে। এই অবস্থায় কার কথা মানব আর কার কথাই বা ছাড়ব? বিশেষতঃ বেদে এমন সমস্ত কর্মফলের কথা আছে, যা কেউ কখনও পেতে পারে না।

অনুমান সম্পূর্ণ বর্জন করলে বিপদ। আমাদের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ত খুবই কম। জীবনের কাজ-কারবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত অনুমানভিত্তিক হয়ে থাকে। চার্বাকরা একথা বুঝেছিল। তাই তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্বন্ধে অনুমানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। তারা অনুমানকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছে। কতকগুলি অনুমান অতীত বস্তু সম্বন্ধে, আর কতকগুলি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। চার্বাকরা অতীত সম্বন্ধে অনুমানের প্রামাণ্যতা স্বীকার করেছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুমানের উপর তাদের কোন শ্রদ্ধা নেই। কোন কোন চার্বাকপন্থী বলেছেন, জীবনে সম্ভাব্য জ্ঞানেও কাজ চলে। পর্বতে ধূম দেখে আমরা অগ্নির সম্ভাব্য-জ্ঞান পেতে পারি। জীবনের কাজ-কারবারের জন্য এই জ্ঞানই ত যথেষ্ট।

চার্বাকরা কার্য্য-কারণ সম্পর্কের ঋজুবন্ধন স্বীকার করে না। দু'টি জিনিষ পাশাপাশি যাচ্ছে বলেই একটি আর একটির নিয়ত কার্য্য, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ধোঁয়ার সঙ্গে আগুন দেখেছি। কিন্তু তাই বলে আগুনই ধোঁয়ার কারণ, তাও দেখেছি কি? নিশ্চয়ই নয়। আর তা ছাড়া ধোঁয়া থাকলেই চিরকালই আগুন থাকবে, এরই বা প্রমাণ কি? কেউ কেউ হয়ত বলবে—কেন, অনুমানই প্রমাণ। চার্বাকরা উত্তরে বলে—অনুমান ত বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং অনুমান করে কিছুই প্রমাণ করা যায় না।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—ঘটনা তবে ঘটে কেন? চার্বাকরা বলে—ঘটনার কোন সুনির্দিষ্ট কারণ নেই। সবই স্বাভাবিক বা আকস্মিক। ইক্ষুর মিষ্টতা, নিম্বের তিক্ততা, পাখীর পালক আর গোলাপের কণ্টক সবই স্বাভাবিক ভাবে হয়। কেউ যদি বলে যে, এসবই আকস্মিক, তাতেও আপত্তি নেই। ঈশ্বর বলে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা এসব সৃষ্টি করেছেন, একথা বলা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বিশ্ব জুড়ে আকস্মিক ঘটনার খেলা চলেছে। জগতের কোন ছক্ নেই, নিছক খেয়াল-খুশিতেই তার চলা। চার্বাকদের এই মতবাদের নাম 'যদৃচ্ছাবাদ'।

কোন কোন চার্বাক অন্য কথা বলে। তাদের মতে জগতের সবকিছুই স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে। স্বভাব বা প্রকৃতিই সমস্ত ঘটনার নিয়ামক। বিশ্বলীলা স্বভাব-লীলা, এটা কোন অতীন্দ্রিয় চেতন পুরুষের লীলা নয়। এই মত-বাদের নাম 'স্বভাববাদ'।

চার্বাকরা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করে। তাদের মধ্যে 'ব্যোম' প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয় বলে অগ্রাহ্য। এই নিত্য চতুর্ভূতের সমন্বয়েই জগতের বিভিন্ন জটিল বস্তুর সৃষ্টি। প্রশ্ন উপনিষদে কবন্ধি কাত্যায়ন মুনিও অনুরূপ কথাই বলেছেন। চার্বাকরা বলে, প্রাণ ও মন জড় চতুর্ভূত থেকেই এসেছে। জড় থেকে প্রাণ এসেছে, এমন কথা বৃহস্পতি বলেছেন। ঋগ্বেদের পরমেষ্টিবাদ বোধ হয় এই জাতীয় ধারণার উৎস।

চার্বাকদের মতে দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই। দেহ পঙ্গু হলেই ত লোকে বলে 'আমি পঙ্গু', দেহ রুগ্ন হলে বলে 'আমি রুগ্ন'। এসব লোক-ব্যবহার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, 'দেহ' আর 'আমি' অভিন্ন। তার মানে দেহ ও আত্মা একই জিনিষ। মানবদেহ চতুর্ভূতের সৃষ্টি। চৈতন্য মানবদেহেরই একটি গুণ। চতুর্ভূতের বিশেষ সমবায়ে যখন মানবদেহের উৎপত্তি হয়, তখনই এই গুণেরও আবির্ভাব হয়। মানবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই গুণ বিনষ্ট হয়ে যায় ও দেহ চতুর্ভূতে পরিণতিলাভ করে। মৃত্যুই জীবনের শেষ। মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নেই। পরলোক স্বার্থান্ধ পুরোহিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। অমরতা বলে কিছু নেই। সংসারের সবকিছুই মরণশীল ও ভঙ্গুর।

চার্বাকরা বলে, পান, চুন ও সুপুরি কোনটাই লাল নয়, কিন্তু এদের এক সঙ্গে চিবুলে একটা লাল আভা লক্ষ্য করা যায়। তেমনি চতুর্ভূতে চৈতন্য নেই, কিন্তু চতুর্ভূতের বিশেষ সমবায়ে 'চৈতন্য' নামে এক নূতন গুণের আবির্ভাব হয়। আমরা একে 'নবোদ্ভিন্ন গুণ' বলতে পারি। হাল আমলের পাশ্চাত্য দর্শনে 'নবোদ্ভিন্ন অভিব্যক্তি (Emergent Evolution) নামে একটি মতবাদ প্রচলিত আছে। আলেকজেণ্ডার ও মরগান এই মতবাদের প্রবক্তা। এঁরাও

মনে করেন যে, চৈতন্য একটি নবোদ্ভিন্ন গুণ। 'বস্তু'র নবোদ্ভিন্ন গুণ 'প্রাণ', আবার 'প্রাণ' থেকে নবোদ্ভিন্ন গুণ চৈতন্য। আশ্চর্য্য হতে হয় এই ভেবে যে, বহুকাল আগে ভারতীয় জড়বাদীরা এ ধরণের কথাই বলে গেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও জড় থেকে চৈতন্যের আবির্ভাবের বিষয় লক্ষ্য করা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যানে দেহকেই আত্মা বলা হয়েছে।

পরবর্তীকালে অবশ্য চৈতন্যের উৎপত্তি নিয়ে চার্বাকদের মধ্যে অন্যান্য কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল। কেউ কেউ বলত, ইন্দ্রিয় থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি। কেউ আবার বলত—প্রাণই চৈতন্যের উৎস। অন্য কারও কারও মতে মনই চৈতন্যের আধার। অবশ্য এরা কেউই প্রাণ ও মনের স্ব-নির্ভর সত্তা স্বীকার করত না। এদের মতে প্রাণ ও মন দেহ থেকে ভিন্ন হয়েও দেহের উপর নির্ভরশীল।

চার্বাকদের মতে জীবদেহই জীবাত্মা। সুতরাং এদের মতে আত্মোপলব্ধি মানে দেহ-সম্ভোগ। দৈহিক বা ইন্দ্রিয়-সুখই জীবনের পরম পুরুষার্থ। চার্বাকরা ত জোর গলায়ই বলেছে—'কাম এবৈক পুরুষার্থঃ'। সংসারে দুঃখ আছে, বিরহ, মৃত্যু, রোগ, শোক সবই আছে। কিন্তু তা বলে সুখ নেই, এমন কথা বলবে কে? যদি সুখ না থাকত, তবে কি মানুষ বাঁচতে চাইত, তবে কি মানুষ মৃত্যুর নাম শুনলে আতঙ্কে শিউরে উঠত? যেহেতু মানুষ বাঁচতে চায়, যেহেতু মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, সুতরাং সংসারে সুখ যে দুঃখের চেয়ে অনেক বেশী, মিলন যে বিরহের চেয়ে অনেক দীর্ঘস্থায়ী, শোক যে অ-শোকের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী, তা মানতেই হবে। সুখদুঃখের যুক্তবেণী বয়ে চলেছে। বুদ্ধিমানেরা সুখধারায় স্নান করবে, দুঃখ-ধারার কাছে তারা যাবে কেন? আর সুখের সঙ্গে দুঃখ মিলে আছে বলে সুখ কি ছাড়তে আছে? কমলে কণ্টক আছে বলে কমল কি পরিত্যাজ্য? মাছে ত কাঁটা আছে, সেজন্যে কি লোকে মাছ খাবে না? ধানে তুষ আছে বলে ধান কি কেউ ফেলে দেয়? জীবনের পাত্র থেকে সুখামৃত গ্রহণ করতে হবে। সুখই কাম্য, সুখই স্বর্গ। দুঃখই জঞ্জাল, দুঃখই নরক। সুখ-দুঃখ ছাড়া স্বর্গ-নরক বলে অন্যকিছু নেই। বেদে যে স্বর্গ ও নরকের কথা আছে, তা কি কেউ দেখেছে? যা কেউ দেখেনি তা ত কেউ জানেও না। আর যা কেউ জানে না, তা নিয়ে কথা বলাও উচিত নয়। পুরোহিত সম্প্রদায় নিজেদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করার জন্য মানুষকে স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি অস্বাভাবিক বস্তুর কথা শুনিয়ে এসেছে। পুরোহিতেরা স্বার্থ-কথাকেই পরার্থ-কথা বলে চালিয়ে লোকের চোখে ধুলো দিয়েছে। বুদ্ধিমানেরা এসব কথায় বিশ্বাস করবে না।

চার্বাকরা আরও বলে—অন্ধকার না থাকলে কি আলোর রূপ বোঝা যায়? কালোর পাশে থাকলেই ত আলোর ছটা খোলে। তেমনি দুঃখ আছে বলেই ত সুখের এত মাধুর্য্য। মানুষ অনেকক্ষণ অভুক্ত থাকলেই ত অন্নের অমৃত স্বাদ পায়। তৃষ্ণার্ত না হলে কি জলের মর্ম বোঝা যায়? বিরহের মধ্যেই প্রেমের সার্থকতা। বিচ্ছেদের পরে যে মিলন, তাই সবচেয়ে মধুর। সুতরাং দুঃখের মধ্যেই সুখ সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সার্থক ও সবচেয়ে মধুর। সুখের জন্যই দুঃখকে আমরা গ্রহণ করব। পূর্বজন্ম নেই, পরজন্ম নেই। অতীত বিগত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই অবস্থায় বর্তমান জীবনের সুখই আমাদের একমাত্র কাম্য। জীবনের পরিপূর্ণ রসাস্বাদই একমাত্র পুরুষার্থ। তাই চার্বাকেরা বলে—'যতকাল বাঁচবে, সুখে বাঁচ; এই দেহ একবার ধ্বংস হলে আর ত ফিরে আসবে না।'

পরবর্তীকালে সুশিক্ষিত চার্বাকদের হাতে এই মত অনেকটা পরিমার্জিত হয়েছিল। তাদের কাছে কেবলমাত্র নীচ স্তরের ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের আদর্শ ছিল না। তারা চতুঃষষ্টিকলা-চর্চায় যে সুখ তাও জীবনের আদর্শের অঙ্গীভূত করেছিলেন।

চার্বাকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না। আগেই ত বলেছি, তাদের একমাত্র প্রমাণ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে কখনই জানা যায় না। চার্বাকরা বলে—যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকতেন, তবে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় তিনি মানুষের মনে এত সন্দেহ রাখতেন না। দীন-দুনিয়ার মালিক ঈশ্বর বলে কেউ নেই। দেশের রাজাই দেশের একমাত্র মালিক। তিনিই সামাজিক ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করেন। তাঁর আইন ও আদালতই চরম আইন ও আদালত। কিন্তু তা বলে চার্বাকেরা রাজার স্বৈরাচার সমর্থন করত না। তারা দ্বিধাহীন কণ্ঠেই বলেছে—'লোকসিদ্ধো ভবেৎ রাজা...।' রাজাকে প্রজারঞ্জক হতে হবে। যে রাজাকে তাঁর প্রজারা মানে না, সে রাজা রাজাই নয়।

চার্বাকরা মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদ মানত না। তারা বলত—ব্রাহ্মণ চণ্ডালে আবার প্রভেদ কি? সকল মানুষই জীবনের অমৃতের সমান অধিকারী।

চার্বাক-দর্শন ভারতবর্ষের সনাতন ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহবিশেষ। চার্বাক-দর্শনের বিদ্রোহ আসলে বৈদিক-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তির বিদ্রোহ। ভারতীয় সনাতন বিশ্বাস সম্বন্ধে যুক্তিবাদী মানুষের মনে যে সমস্ত সংশয় জাগে,

চার্বাক-দর্শন তাই প্রকাশ করেছে। সাধারণ লোকের সমস্যা ও সন্দেহ চার্বাক-দর্শনের উপজীব্য বলে এর আর এক নাম 'লোকায়ত-দর্শন'। দর্শনের জগতে সমস্যা-সমাধান বড় কথা নয়, সমস্যাসৃষ্টিই বড় কথা। চার্বাকরা নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সেই জন্য পরবর্তীকালের ভারতীয় দর্শনালোচনা এদের খণ্ডন না করে অগ্রসর হতে পারে নি। এই দিক থেকে দেখলে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক-দর্শন যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, তা মানতেই হবে।

এই প্রবন্ধ লিখতে যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি—

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী—A Short History of Indian Materialism

মাধবাচার্য্য—সর্বদর্শন সংগ্রহ

হরিভদ্র—ষড়দর্শন সমুচ্চয়

রাধাকৃষ্ণন—Indian Philosophy, Vol I,

চৈতালী ছন্দ—সাঁওতালী দেশে

শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

১

বল, তবে কোথা যাব—আমলকী-পরাগ-ঝরানো,
মহুয়ার সুগন্ধে মাতাল—এই রাঙা প্রান্তরের
দেশ ছেড়ে? এই চৈত্রদিনে! ঢেউখেলা পাথরের
বাঁকে বাঁকে আলিঙ্গন বসন্তের—শিমুলে পলাশে;
রামধনু-আঁকা-পাখা প্রজাপতি; মৌমাছির গানও
আকুল করে যে মন! কি যে ব্যস্ত আয়োজন, জানো,
নীড়বাঁধা! আঁকাবাঁকা বনপথ। রাঙা দিগন্তের
গায়ে সাঁওতালী গ্রাম। অরণ্যের স্পর্শ ঘাসে ঘাসে।

চিন্তার হ্রদের ছায়া অকস্মাৎ দু'চোখ জুড়ানো
রুক্ষ প্রান্তরের বুকে: সাঁওতালী বন্য অঙ্গনারা
গান গায়। মহুয়ার তাজা মদে আবেগ-উচ্ছল—
শোণিতে আগ্নেয় ছন্দ। ঝিরিঝিরি ঝর্ণার জল
অশোকের ফুলে লাল; জলজলে ওঠে সন্ধ্যাতারা;
এ-দেশ কি ভোলা যায়! ছেড়ে যাওয়া—যৌবন ফুরানো।

২

কুঁদে তোলা কালো পাথরের কিউপিড, ভেনাসের
মূর্ত্তি ত দেখি নি; তবু, তাদের জীবন্ত রূপায়ণ
এখানের গ্রামে, বনে, উপত্যকায়। বাৎস্যায়ন
তোলা থাক; এস—দেখি, ভ্যান গগ্—গগাঁর দৃষ্টিতে—
কি মিষ্টি মহুয়াফুলে উপচানো গন্ধ বাতাসের!
আহা, প্রাণ-শক্তিবেগে গৈরিক পৃথিবী, মানুষের
সবল পেশীতে বাঁধা; কি সরল সাঁওতালী মন!
জীবিকার প্রশ্ন তুচ্ছ, মাতে ওরা আনন্দ-সৃষ্টিতে।

পুরাণের প্রমীলার নারীদেশ—তবু স্বপ্ন আনে,
গ্রীসের পুরুষদেশ 'মাউণ্ট এথস্' মনে হয়—
ব্যর্থ, অন্তত আমার কাছে; জীবনের মূল্যায়ন
করে এরা আদিম হৃদয়াবেগে। অরণ্য-রমণ
চৈত্রের বাতাস কাঁপে শালে ও পলাশে; বনময়
উতল প্রাণের ছন্দ—সাঁওতালী নাচে প্রেমে, গানে।

৩

ডিমি ডিমি নাকাড়া মাদল বাজে গ্রামে; দূর বনে
বাঁশের বাঁশীতে উচ্ছল সুরের লাভা; হাতে-বোনা
আঁটো শাড়ী-পরা মেয়ে উদ্ধত-যৌবন—গায়ে সোনা
রোদ জলে, উৎস যেন,—গাছের ছায়ায় গান গায়,
ফুল তোলে, বাঁকানো খোঁপায় গোঁজে;—পড়ে তার মনে
সহসা নাচের কথা—দল বেঁধে উৎসব-অঙ্গনে—
মাথায় পালক গোঁজা বিচিত্র পাখীর, গান শোনা
পুরুষ বাজায় বাঁশী, শোণিতে কি ঢেউ খেলে যায়।

এখানে আরণ্য দেশে আনন্দের সহজ প্রকাশ—
মাটিতে, পাথরে, গাছে, পাখীদের কলকাকলিতে,
পশুচারণের মাঠে, শিকারের উদ্দাম লীলায়,
ঝর্ণার মঞ্জুল ছন্দে, উৎসবের চত্বরে, টিলায়।
কোথাও পাবে না তুমি শহরের অলিতে-গলিতে।
এ-আনন্দ খুঁজে, আর, জীবনের উজ্জ্বল আশ্বাস।

জীবনবীমার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ—কাহার স্বার্থে?

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

১

ভারতের সমগ্র জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের যে আকস্মিক সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গত বৎসর গ্রহণ করেন ও তদনুরূপ ব্যবস্থা করেন, সে বিষয়ে নানা গুরুতর প্রশ্নের জবাব সরকার-পক্ষ হইতে আজিও, প্রায় বৎসরকালের মধ্যে, পাওয়া যায় নাই। জীবনবীমা ব্যবসায়ের সঙ্গে দেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের স্বার্থ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে। এই কারণে যেমন একদিকে ইহার সুষ্ঠু পরিচালনায় খানিকটা সরকারী দায়িত্ব স্বভাবতঃই থাকা প্রয়োজন ও সমীচীন, তেমনি ইহার পরিচালন-ব্যবস্থায় অভাবিতপূর্ব্ব যে-কোনও সরকারী সিদ্ধান্তের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ব্যাখ্যা সাধারণ্যে পেশ করিবার দায়িত্বও সরকার-পক্ষ হইতে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করা অসমীচীন।

এই অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা অবলম্বনের সপক্ষে সরকার বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষাকল্পে তাঁহাদের দায়িত্বের কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। এই দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই ১৯৩৮ সালের ভারতীয় বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইহারই কারণে পুনর্ব্বার সেই আইন সংশোধন করিয়া ১৯৫০ সালের সংশোধিত আইন প্রবর্ত্তন করা হয়। তবে কি ইহা বুঝিতে হইবে যে, এই পর পর প্রণীত আইনের দ্বারা বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব হইল না, কিংবা এমন কোনও অতিরিক্ত সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া সরকারী মহলে যোগাইল না যাহার দ্বারা বীমাকারীর স্বার্থসংরক্ষণ সম্ভব হইতে পারিত এবং যাহার ফলে একমাত্র সরাসরি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যতীত বীমাকারীর স্বার্থরক্ষা করা চলে এমন কোনও সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা সরকারী মতে সম্ভব ছিল না। এ বড় অদ্ভুত সিদ্ধান্ত!

বীমাকারীর স্বার্থের দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এ কথা বুঝা কঠিন হইবে না যে, তিনটি বিষয়ে বীমাব্যবসায় পরিচালন-ব্যবস্থায় তাহার স্বার্থহানি হইবার আশঙ্কা ঘটিতে পারে। এক যদি লগ্নীকৃত বীমা তহবিল সম্বন্ধে এমনকিছু করা হয় যাহার দ্বারা লগ্নীর নিরাপত্তা নষ্ট হইবার আশঙ্কা ঘটে; দুই, যদি পরিচালন-ব্যয় সম্বন্ধে যথেচ্ছা অপচয় ঘটাইয়া নির্দ্ধারিত ব্যয়-সীমা অনবরত অতিক্রম করা হয় এবং তাহার ফলে বার্ষিক তহবিল বৃদ্ধি নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম গতিতে অগ্রসর হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তিন— যদি আমানতকারী বা বীমাকারীর উচিত পাওনা যথাযথ ভাবে এবং নির্দ্ধারিত পরিমাণে ও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে ফিরিয়া পাইবার পথে কোনও বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা থাকে।

আরও দুই একটি বিষয়ের সঙ্গে যে বীমাকারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিতে না পারে তাহা নহে। যথা—বীমার নির্দ্ধারিত চাঁদার হার (premium rates) বীমাকারীর স্বার্থে গুরুতর আঘাত হানিতে পারে। এই দিক দিয়া বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতাই বীমাকারীর স্বার্থসংরক্ষণের শ্রেষ্ঠতম সহায়ক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঢেউ যখন এদেশে আসিয়া আঘাত করিল, তাহার ফলে দেশে যে অর্থ-প্রাচুর্য্যের বন্যা সুরু হইল, সে সময়ে জীবনবীমা ব্যবসায় অভূতপূর্ব্ব প্রসারলাভ করে। বীমা কোম্পানীগুলির, বিশেষ করিয়া অগ্রণী কোম্পানীগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সাময়িক ভাবে কোনও তাগিদ রহিল না। দেশময় প্রচুর অর্থের অনুপাতে সীমাহীন নূতন বীমা-ব্যবসায়ের সুযোগ উপস্থিত হইল, কেবল দু'হাতে কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র। এই অবসরে বৃহত্তম কয়েকটি বীমা কোম্পানী কয়েক দফায় চাঁদার হার প্রচুর পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহা সাময়িক ভাবে মাত্র। যুদ্ধোত্তরকালে টাকার বাজারে অনিবার্য্য টান ধরিতেই যখন প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নূতন করিয়া সুরু হইল তখন ইহারাই আবার চাঁদার হার কমাইয়া লইতে বাধ্য হইল।

সে যাহা হোক, তিনটি বিষয়ের দিকে কড়া নজর রাখিতে পারিলেই বীমাকারীর মূল স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে নিরাপদ করিয়া রাখা সম্ভব তাহার উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। সমগ্র ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রাক্কালে দেশে যে বীমানিয়ন্ত্রণ আইন (ভারতীয় সংশোধিত বীমা আইন, ১৯৫০), বলবৎ ছিল তাহাতে এই তিনটি বিষয়সংক্রান্ত আইনের কি কি নির্দ্দেশ ছিল তাহার বিচার করিলেই বুঝা যাইবে, বীমাকারীর স্বার্থ কতটা সে ভাবে সংরক্ষিত করিবার আইনানুগ আয়োজন প্রচলিত ছিল।

প্রথমতঃ দেখা যাক বীমাতহবিল লগ্নীকরণ সম্বন্ধে এই আইনে কোনও নির্দ্দেশ ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহার দ্বারা লগ্নীকৃত তহবিলের নিরাপত্তা কতদূর রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ভারতীয় বীমা (সংশোধিত) আইন,

১৯৫০-এর ২৭ হইতে ৩১ সকল ধারাগুলিই জীবনবীমা তহবিলের লগ্নীকরণ-সংশ্লিষ্ট। ২৭ ধারায় জীবনবীমা তহবিলের লগ্নীর উপায় ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ২৭ক (27A) ধারায় তহবিলের কতটুকু অংশ কি কি বিশেষ লগ্নীতে খাটানো হইবে তাহার বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ধারাটির সকল নির্দেশ এমন ভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বীমা কোম্পানী-বিশেষের কর্তৃপক্ষের জীবনবীমা তহবিলের অর্থ লগ্নীকরণে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা বা বিচার প্রয়োগ করিবার অবকাশ সঙ্কীর্ণতম পরিধির মধ্যে সীমিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ২৯ ধারার নির্দ্দেশের দ্বারা জীবনবীমা তহবিল হইতে ব্যক্তিগত ঋণদান নিষেধ করা হইয়াছে। ৩০ ধারার দ্বারা ২৭ হইতে ২৯ ধারার নির্দ্দেশসমূহ অমান্য করিলে পরিচালক গোষ্ঠীর (Board of Directors) সভ্যগণকে সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করিবার এবং কোম্পানীর তহবিলের ক্ষতিপূরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ৩১ ধারায় কিভাবে লগ্নীকৃত তহবিল রক্ষা করিতে হইবে তাহার বিশদ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ২৮ এবং ২৮বি ধারাতে কিভাবে লগ্নীর হিসাব রাখিতে হইবে ও কোন্ কোন্ সময়ে তাহা সরকারী কন্ট্রোলার অফ ইন্স্যুরেন্সের নিকট দাখিল করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জীবনবীমা তহবিল লগ্নী সংক্রান্ত উপরোক্ত আইনের নির্দ্দেশসমূহ হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, জীবনবীমা-ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশে এই ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণকল্পে যে আইন বলবৎ ছিল, তাহার নির্দ্দেশ মানিলে অন্ততঃ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের দোষে আমানতী অর্থের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়া বীমাকারীর স্বার্থহানি হইবার কোনই আশঙ্কা ছিল না। ভাল হউক বা মন্দই হউক, জীবনবীমা তহবিলের লগ্নীকরণের প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব আইনের নির্দ্দিষ্ট ধারাসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার অবকাশ নিতান্তই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই আইনের একচ্ছত্র প্রয়োগকর্ত্তা সরকারী কন্ট্রোলার অফ ইন্স্যুরেন্স, যদি সচেতন ভাবে ইহার নিরপেক্ষ প্রয়োগ সত্যই করিয়া থাকেন, তবে লগ্নীকৃত তহবিল কোম্পানীসমূহের কর্তৃপক্ষের অসমীচীন আচরণের কারণে নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা ঘটিবার বিন্দুমাত্র অবকাশ হইত না। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা বিল আলোচনাকালে সরকার-পক্ষ হইতে পার্লামেণ্টে এরূপ অসম্ভব ঘটনারও উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য এরূপ একটি কি দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছে মাত্র এবং সেই অজুহাতে দেশের সকল বীমা-ব্যবসায়ীই বীমাকারীর স্বার্থ নষ্ট করিবার দুরভিসন্ধি করিয়া বসিয়াছিলেন এরূপ অভিযোগ অন্যায়। কিন্তু আসল কথা তাহাও নহে। আসল কথা এইটুকু যে, সরকারী বীমা আইন প্রয়োগকর্ত্তা কিভাবে এই আইনের প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, ২৭ হইতে ৩১, ঐ আইনের লগ্নী-সম্পর্কীয় সকল ধারাগুলির নির্দ্দেশ সত্ত্বেও কোম্পানী-বিশেষের কর্তৃপক্ষের পক্ষে বৎসরের পর বৎসর বীমাকারীর আমানতী লগ্নীকৃত তহবিলের বে-আইনী অপপ্রয়োগ সম্ভব হইয়াছিল? উপরোক্ত যে-কোনও ধারা অমান্য করার ফলেই ত ৩০ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা তখনই অবলম্বিত হইতে পারিত ও হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তাহা যে হয় নাই ইহার যখন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল তখনই সরকারী সিদ্ধান্ত এই হইল যে, সকল জীবনবীমা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষই বিশ্বাস ও দায়িত্বের অনুপযোগী এবং একমাত্র সমগ্র জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারাই বীমাকারীর উপযুক্ত স্বার্থ সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করা সম্ভব হইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বিষয়টি লইয়া পার্লামেণ্টে বিতর্কের সময় সরকার-বিরোধী দলের কেহই এমন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই যে, যে সকল কোম্পানীর তহবিল কোম্পানী কর্তৃপক্ষের বে-আইনী বা অসমীচীন পরিচালনার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ এই ছিল যে, বীমা আইনের প্রয়োগে সরকারী কন্ট্রোলার মহাশয় নিজের দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করেন নাই। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, এই বিষয়ে আইনের নির্দ্দেশ এমন সর্ব্বতোমুখী ছিল যে, তাহার যথাযথ প্রয়োগ হইলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলির তহবিলের নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের দ্বারা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। তবু যে ক্ষেত্রবিশেষে এরূপ ঘটিতে পারিয়াছিল তাহার একমাত্র কারণ সরকারী বীমা আইন প্রয়োগকর্ত্তার দায়িত্বহীনতা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারিত না। ইহা হইতে এই একমাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, যে সরকারী কন্ট্রোলারের দোষত্রুটি ঢাকিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই সমগ্র ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের উপরে এই আঘাত হানা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সরকার-পক্ষ হইতে ভারতীয় বীমা (সংশোধন) আইন, ১৯৫০-এর প্রয়োগে কন্ট্রোলার মহাশয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে কোনও বিভাগীয় বা অন্য কোনও প্রকার তদন্তের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করা হয় নাই। বরং নবসৃষ্ট ভারতীয় সরকারী জীবনবীমা অধিকরণে (Life Insurance Corporation of India) উক্ত কন্ট্রোলার মহাশয়কে উপরন্তু একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল করিয়া

পুরস্কৃত করা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা কঠিন হইবে না যে, অন্ততঃ লগ্নীকৃত জীবনবীমা তহবিলের নিরাপত্তার দ্বারা বীমাকারীর স্বার্থসংরক্ষণকল্পে সরকারপক্ষ হইতে এই ব্যবসাটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় নাই—ইহা অজুহাত মাত্র। ইহাতে অন্য উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

এই প্রসঙ্গে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগে, যখন দৃশ্যতঃ বীমা আইনের সম্পূর্ণ প্রয়োগ হইলে কোনও জীবনবীমা কোম্পানী-বিশেষের পক্ষে কোনরূপে ইহার নিকট ন্যস্ত আমানতী জীবনবীমা তহবিল তছরূপ হওয়ার বা ইহার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কার কোনই অবকাশ আইনের কাঠামোর মধ্যে ছিল না, তখন একমাত্র এই আইনের প্রয়োগের অভাবেই, যে-কোনও ক্ষেত্রেই হউক, এমনটি ঘটিতে পারিত। যখন সরকারের নিকট প্রমাণ উপস্থিত হইল যে, ক্ষেত্রবিশেষে এমনটিই ঘটিয়াছিল,তখন সরকারের কর্তব্য ছিল, কি কারণে এমনটি ঘটা সম্ভব হইয়াছিল সে বিষয়ে তদন্ত করা এবং ইহার জন্য ব্যক্তিবিশেষের দায়িত্ব নিরূপণ করা। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া সরকার-পক্ষ হইতে ক্ষেত্রবিশেষে আইনের নির্দেশ অমান্য করার দায়িত্ব সমগ্রভাবে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের উপর রাষ্ট্রায়ত্ত-করণের মারফৎ চাপাইয়া দিবার এই যে চেষ্টা ইহা হইতে একমাত্র প্রমাণ হয়, সরকার-পক্ষ হইতে বীমা আইন প্রয়োগকর্তার দায়িত্বহীনতার প্রমাণ এই ভাবে চাপা দিবার চেষ্টায়ই বীমাব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা হইতে আরও প্রমাণ হয়, বীমাকারীর স্বার্থসংরক্ষণ চেষ্টার যে অজুহাত তাহা নিতান্তই ফাঁকা। এভাবে দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টার দ্বারা এইটুকুই প্রমাণ হয় যে, যখন একের দায়িত্বহীনতার দায় এভাবে চাপা দেওয়া হইল তখন নূতন সরকারী জীবনবীমা সংস্থায় অনুরূপ সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দায়িত্ব-হীনতার বিরুদ্ধে বীমাকারী জনসাধারণের কোনই অভিযোগ টিকিবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই!

ভারতীয় পরিচালকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে এদেশে জীবনবীমা ব্যবসায়ের প্রবর্তন হইয়াছে আজ ৮৫ বৎসরের উপরে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নানারূপ ভুলত্রুটি, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে চৌর্য্যাদি সত্ত্বেও সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় জীবনবীমা-ব্যবসায় প্রশংসনীয় প্রগতি লাভ করিয়াছে এবং মোটামুটি বীমাকারীর মূল স্বার্থ যথাযথ ভাবেই রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে যেটুকু ভুলত্রুটী এমনকি চুরীচামারি ঘটিয়া-গিয়াছে তাহা সমগ্রের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। কিন্তু সে সামান্যটুকুও ঘটিবার অবকাশ যাহাতে না পাওয়া যায়, সেই কারণে দেশের জনসাধারণেরই বারংবার দাবির ফলে প্রথমে ১৯১২ সনের ভারতীয় বীমা আইন প্রত্যাহার করিয়া ১৯৩৮ সালের আইন প্রবর্তিত হয়। আবার তাহারই ফলে পুনর্ব্বার ভারতীয় বীমা (সংশোধন) আইন, ১৯৫০-এর প্রবর্তন হয়। এই আইনের দ্বারা বীমাব্যবসায়ের সামগ্রিক পরিচালনার ধারা এমন নিয়মের মধ্যে বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করা হয় যে, ভুলত্রুটি বা চুরি ইত্যাদির অবকাশ যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়। প্রয়োজন হইলে এই আইনের আরও পুনর্ব্বার সংশোধন বিল পাস করাইয়া লওয়াও কিছু-মাত্র কঠিন ছিল না। অন্যান্য ব্যবসায়েও যে এমন ভুলত্রুটি, এমনকি চৌর্য্যাদিও ঘটে নাই এমন নহে। উদাহরণ-স্বরূপ ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন তাঁহারা ভালভাবেই জানেন কিভাবে বারে বারে দেশময় কত ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে এবং তাহার ফলে দেশসুদ্ধ ধনীদরিদ্র এবং বিশেষ করিয়া কত মধ্যবিত্ত আমানতকারী-দের রক্ত-জলকরা অর্থ সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। আজও তাহার জের কাটে নাই এবং এখনও এমন ফেল হওয়া বহু ব্যাঙ্কের সম্পত্তি হাইকোর্ট নিযুক্ত লিকুইডেটারের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। এ সকল বন্ধ করিবার জন্য অবশ্যই উত্তরোত্তর কঠিন নিয়ম-নির্দেশ সম্বলিত আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের পরিচালনা সুষ্ঠু ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জীবনবীমা ব্যবসায়ের উঠতি পড়তির ফলে দেশের যত না লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার অনেক অধিক হইয়াছে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের উঠতি পড়তির দ্বারা। তথাপি সেই অজুহাতে সরকার পক্ষ হইতে দেশের সামগ্রিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কথা তোলা হয় নাই। সম্প্রতি কিছুদিন হইল ভূতপূর্ব্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কটিকে অবশ্য সরকারী ব্যাঙ্কে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার দ্বারা সমগ্র ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ঘটে নাই।

কিন্তু এই প্রসঙ্গের অধিকতর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেখা যাক বীমাকারীর স্বার্থ কি ভাবে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা অধিকতর সুরক্ষিত হওয়া সম্ভব। জীবনবীমা তহবিলের লগ্নী সম্পর্কীয় সবিশেষ আলোচনা পূর্ব্বেই হইয়াছে। এবার পরিচালন-ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ভারতীয় বীমা (সংশোধন) আইনের (১৯৫০) ৪০খ (Sec. 40B) ধারায় এ বিষয়ে বিশদ নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ধারার (২) উপধারায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ১৯৫০ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পর হইতে ভারতবর্ষে কোন জীবনবীমা কোম্পানী প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট হারের অধিক খরচ করিতে পারিবে না। এই হার নির্দ্ধারণ করিবার সময় জীবনবীমা কোম্পানী-বিশেষের (ক) বয়স (খ) শক্তি

অথবা বিস্তৃতি এবং (গ) তাহার নির্দিষ্ট চাঁদার হারের মধ্যে সংরক্ষিত খরচের পরিমাণ, এ সকল বিষয় সবিশেষ বিবেচনা করা হইবে। ঐ উপধারার ব্যাখ্যায় ইহাও নির্দেশ করা হইয়াছে যে,যদি কোনও বীমা কোম্পানী উক্ত নির্দিষ্ট হারের অধিক পরিচালন-ব্যয় করিয়া ফেলেন, তবে যদি সেই অতিরিক্ত ব্যয় প্রতি বৎসর এই আইনের ৬৪চ (Sec- 64F) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ইনস্যুরেন্স এসোসিয়েশনের লাইফ ইন্স্যুরেন্স কাউন্সিলের পরামর্শমত কন্ট্রোলার যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করিয়া দিবেন তাহার বেশী না হয়, তাহা হইলে এই উপধারার নির্দেশ অমান্য করা হয় নাই ইহাই ধরিয়া লওয়া হইবে। এই আইনের নির্দেশমত যে ভারতীয় বীমা নিয়মাবলী (Indian Insurance Rules) প্রবর্তিত হয়, তাহার ১৭ব নং ধারার অনুযায়ী জীবনবীমা সম্পর্কীয় পরিচালন-ব্যয়বরাদ্দ বিভিন্ন কোম্পানীর বয়স এবং ব্যবসায়ের পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সরকারী জীবনবীমা ব্যবসায় বিষয়ক বার্ষিক রিপোর্ট হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৫৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত ১৬৯টি জীবনবীমা কোম্পানীর মধ্যে ৭৫টি নির্দিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দের গড়পড়তা শতকরা ৫৲ টাকা কমে তাঁহাদের পরিচালন-ব্যয়ভার সঙ্কুলান করিয়া লইয়াছিলেন আর ৯৪টি কোম্পানী নির্দিষ্ট হারের উপর গড়পড়তা আরও শতকরা ৬·৮ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত রিপোর্টে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত ৯৪টি কোম্পানীর মধ্যে ১০ বৎসরের অধিক বয়স ও ১০ কোটি টাকার উর্দ্ধাঙ্কের সমগ্র বীমার পরিমাণওয়ালা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ছয়টি এবং ২০ কোটি টাকার উর্দ্ধসংখ্যক বীমার পরিমাণওয়ালা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল নয়টি।

এ সকল কোম্পানীর বয়স এবং ব্যবসায়ের বিস্তৃতির পরিমাণ বিচার করিয়া ভারতীয় বীমা (সংশোধন) আইনের (১৯৫০) ৪০খ ধারার ২ উপধারা অনুযায়ী ভারতীয় বীমা নিয়মাবলীর ১৭ব ধারায় নির্দিষ্ট ব্যয়হারের বেশী অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করিবার সপক্ষে কোনও বিচারসহ কারণ দেখা যায় না। তথাপি তাঁহারা যে অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া চলিয়াছিলেন তাহার জন্য এক সাবধানবাণী প্রচার করা ব্যতীত অন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন আইনের প্রয়োগকর্ত্তা কন্ট্রোলার অফ ইনস্যুরেন্স মহাশয় প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অথচ এই আইনের ১০২(১) ধারা মতে তিনি আইনের কোনও ধারা বা উপধারা বা ইহার বলে প্রবর্ত্তিত কোনও নিয়মাবলী (Rules) বা আদেশনামা (Orders) অমান্য করিলে যে-কোনও কোম্পানীর বা তাহার পরিচালকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন।

বস্তুতঃ ভারতীয় বীমা (সংশোধন) আইনের (১৯৫০) ধারাগুলি এবং তৎসম্পর্কে প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী বা আদেশনামা ইত্যাদি বিচার করিয়া দেখিলে ও তৎসঙ্গে ১৯৫০ সনের পরবর্ত্তী এবং জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ-বিষয়ক সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত কন্ট্রোলার অফ ইনস্যুরেন্স প্রণীত ও প্রকাশিত ভারতে বীমাব্যবসায় সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্টের জীবনবীমা-বিষয়ক তথ্যগুলি বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রমাণ হইবে যে, প্রথম হইতেই বীমা কোম্পানীগুলি যাহাতে আইনের সকল নির্দেশ মানিয়া চলে তাহার পক্ষে কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা জরুরী মনে করিয়া কন্ট্রোলার মহাশয় আইনের বলে তাঁহার উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। অধিকাংশ কোম্পানীই আপনা হইতে আইনের নির্দেশ মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছে। যে সকল কোম্পানী তাহা ঐ সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পারিয়া উঠে নাই বা যাহারা এ বিষয়ে অবহিতই হয় নাই, তাহাদিগকে উপযুক্ত পরামর্শ বা নির্দেশ কিংবা যে সকল স্থলে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে কোনই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। ইহা কাহার দোষ ? জীবনবীমা ব্যবসায়ের, না ইহার সুষ্ঠু পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অপ্রতিহত ক্ষমতায় শক্তিমান কন্ট্রোলার অফ ইনস্যুরেন্সের ?

এইবার বীমাকারীর প্রাপ্য অর্থের যথাযথ প্রত্যর্পণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার আলোচনা করা যাক। আলোচ্য আইনের ৪৫, ৪৬, ৪৭ এবং ৪৭ক ধারায় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ৪৫ ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন জীবনবীমাপত্র (Policy) দুই বৎসরের অধিক চালু থাকিলে কোনও অজুহাতেই, এমনকি সেই বীমাপত্র লইবার সময় বীমাকারী মিথ্যা তথ্যাদি পেশ করিয়াছিলেন কিংবা জ্ঞাতব্য তথ্য পেশ করেন নাই, এমন কোনও অজুহাতেই সেই বীমাপত্র বাতিল হইতে পারিবে না। কেবল বীমা কোম্পানী দুই বৎসর হইয়া গেলেও বীমাকারীর বয়সের প্রমাণ দাবি করিতে পারিবেন এবং দাখিলী প্রমাণ অনুযায়ী প্রয়োজন হইলে বয়সের অনুপাতে বীমার অঙ্ক কম-বেশী করিতে পারিবেন। ৪৬ ধারা অনুযায়ী যদি কোনও বীমাপত্র কোনও ভারতীয় রাজ্যের আইন অনুযায়ী কোনও বীমাকারীর পক্ষে ইস্যু করা হইয়া থাকে, তবে বীমাকারী উক্ত রাজ্যের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বীমার টাকা দাবি করিতে পারিবেন, বা তৎসম্পর্কে আদালতে নালিশ দায়ের করিতে পারিবেন।

আলোচ্য আইনের ৪৭ ধারা অনুযায়ী কোন বীমাপত্রের বিনিময়ে প্রদেয় অর্থের উত্তরাধিকার বিষয়ে যদি পরস্পরের প্রতিকূল একাধিক দাবি পেশ হয় কিংবা উহার উত্তরাধি-

কারীর দাবি যদি সন্দেহজনক বলিয়া কোন বীমা কোম্পানীর মনে হয়, তবে প্রকৃত উত্তরাধিকার প্রমাণসহ দাবি দাখিল সাপক্ষে, সেই বীমাপত্রানুযায়ী অর্থ প্রদেয় হইবার ছয় মাস গত হইবার পর পূর্ণ বিবরণসহ আদালতে জমা দেওয়া যাইবে। ৪৭ক ধারা অনুযায়ী ২০০০ টাকা বা তন্নিম্ন যে-কোনও অঙ্কের বীমার দাবির অর্থসম্বন্ধীয় বীমাকারীর উত্তরাধিকারী এবং বীমা কোম্পানীর মধ্যে কোনও মতান্তরের বিষয় কণ্ট্রোলার অফ ইন্স্যুরেন্সের নিকট বিচারের জন্য পেশ করা চলিবে। বিচারে কণ্ট্রোলারের সিদ্ধান্তই শেষ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং তাঁহার রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ চলিবে না। উপরোক্ত ধারাগুলির নির্দেশ হইতে দেখা যায় যে, বীমার দাবির টাকা পাওয়া সম্বন্ধেও আইনের নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে বীমাকারীর স্বার্থ-সংরক্ষক। কণ্ট্রোলার যদি নিরপেক্ষভাবে এবং বিবেকের সহিত আইনের এই ধারা-গুলির নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে বীমা কোম্পানীগুলিকে মানিতে বাধ্য করিতেন তাহা হইলে বীমাকারীর দাবির টাকা কোনও ক্রমেই মারা যাইবার কোন অবকাশ ঘটিবার আশঙ্কা ছিল না।

বর্তমান আলোচনায় এটুকু প্রমাণ হয় যে, বীমাকারীর স্বার্থরক্ষাকল্পে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রয়োজন হইয়াছিল, সরকার পক্ষের এই যুক্তি একেবারেই অসার ও ভিত্তিহীন। জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সঙ্গে বস্তুতঃ বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার কোনও সম্পর্ক নাই। বরং সরকারী নানা বিষয় ও নানা বিভাগের কাজকর্মের যে মান এবং ধারা আজ দেশের জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত তাহাতে এ আশঙ্কা পোষণ করিবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে যে, এই রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যবস্থার ফলে বীমাকারী জনসাধারণের মূল স্বার্থ নানা ভাবে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সরকারী তত্ত্বাবধানে যখন যে-কোনও ব্যবসা চালানো হইয়াছে, তাহাতেই নানাভাবে নানা দুর্নীতি আসিয়া দেশের জনসাধারণকে বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, এ ঘটনা দশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত নানাভাবে বহুবার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। জীবনবীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রকরতলগত হওয়ার ফলে ইহার বিষয়েও যে অনুরূপ অভিজ্ঞতা হইবে না, এই আশা বীমাকারী সাধারণ কোন ভরসায় পোষণ করিবে? মাত্র কয়েক মাস হইল রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমাধিকরণের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যেই বীমাকারীদের পক্ষে নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার সূচনা সুরু হইয়াছে। সময়মত চাঁদার টাকার রসিদ পাঠানো, চাঁদা দিবার শেষ দিনে তৎপরতার সঙ্গে সেই টাকা জমা লইয়া বীমাপত্রটিকে বাতিল (lapse) হওয়া হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করা ইত্যাদি বীমা কোম্পানীগুলির অতি সাধারণ নিয়মগুলির ইহার মধ্যেই ব্যতিক্রম হইতে সুরু করিয়াছে।

যাহা হোক, বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার অজুহাত যদি ভুয়াই হয়, তবে সরকার পক্ষ হইতে এই ব্যবসায়টিকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে, এ প্রশ্নের আলোচনা এখনও করা হয় নাই। সরকারী রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫৪ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০০ কোটি টাকা এবং বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০ কোটি টাকা। নিয়োক্ত সংখ্যার, সকল খরচ-খরচা বাদ দিয়া এবং বীমাপত্রের উপরে প্রদেয় সব অর্থের হিসাব-নিকাশ করিয়া লইয়া, বার্ষিক প্রায় আরও ৩৫ কোটি টাকা লগ্নী করা হইয়া থাকে। ৪০০ কোটি টাকার পাকা সম্পত্তির ঋণমূল্য এবং বার্ষিক ৩৫ কোটি টাকার নীট লগ্নীর অতিরিক্ত ঋণমূল্য (Credit Value) কতখানি তাহা সহজেই হিসাব করা যায়। ভারত সরকারের বর্ত্তমান আর্থিক প্রয়োজনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিমাণ অর্থের উপরে দ্বিধাহীন অধিকারের কতটা মূল্য তাহাও সহজেই অনুমেয়। তাহা ছাড়া ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, জীবনবীমা ব্যবসায়টি গত ৮৫ বৎসর ধরিয়া এদেশে দ্রুত গতিতে উন্নত হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এমনকি বিশ্ববাণিজ্য সঙ্কটের সময়ও অন্য সব ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও জীবনবীমা ব্যবসায় অপ্রতিহত গতিতে আগাইয়া চলিয়াছিল। এই ব্যবসায়ের অতীত প্রগতি যদি ব্যাহত না হয়, তাহা হইলে যেমন ইহার সঞ্চিত মোট সম্পত্তি প্রগতির গতি অনুযায়ী স্ফীত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তেমনি অন্য দিকে ইহার বার্ষিক আয় ও তদনুপাতে নীট লগ্নীর পরিমাণও বাড়িতে বাধ্য। মনে হয়, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহের একটি অন্যতম সম্ভাব্য উপায় হিসাবেই জীবনবীমা ব্যবসায়কে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনের কথা কেবলমাত্র কথার কথা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে ভাবে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে, তাহাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কোনও আশা আছে কি? এ প্রশ্নের আলোচনা আগামী প্রবন্ধে করা হইবে।
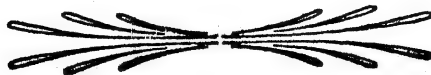
রূপকথা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

রাত তখন সাড়ে দশটার কাছাকাছি। পরেশনাথের আজ আপিস থেকে ফিরতে অনেকটা দেরি হ'ল, বাড়ীর সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। যাক তিনি এসে পড়লেন এবং যথানিয়মে হাতমুখ ধুয়ে এসে খাবারঘরে ঢুকলেন। দুর্গা খাবার প্রস্তুত করেই বসে ছিলেন, স্বামী আসনে বসতেই থালাটা এগিয়ে দিয়েই পাখাটা হাতে তুলে নিলেন। তার পর পরেশনাথ যখন দু'চার গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে একটু দম নেবার অবকাশ পেয়েছেন তখন একটু ব্যাকুল সুরেই জিজ্ঞেস করলেন—তার পর কি হ'ল? পলাশডাঙ্গা হতেই আসছ ত?

এই যে! তবে যে মা বলছিলেন এতক্ষণ কোথায় গেল, কি হ'ল ইত্যাদি—পাশের ঘরে পান সাজতে সাজতে সুলেখা ভাবে।

পরেশবাবু একটু খুশির সুরেই জবাব দেন—প্রায় ঠিকঠাক। এত শীগগির চুকে যাবে ভাবি নি। এখন আর কোন হাঙ্গামা নেই, শুধু আশীর্বাদটা হয়ে গেলেই হ'ল।

এই রে! পান সাজা সুলেখার চুলোয় গেল, মনটা তার অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ভুলেই গেল বাবার পানই সে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে সাজে। পানটাকে সে সবসুদ্ধ জড়িয়ে নিয়ে লবঙ্গটাকে তার মধ্যে কোন রকমে ঠেলে গুঁজে দিয়ে বাটার মধ্যে এক রকম ফেলেই দিল।

এর পরেও মা কৌতূহলী হয়ে আরও যেন কি কি জিজ্ঞেস করছিলেন, কিন্তু সে সবে আপাততঃ সুলেখার প্রয়োজন নেই। সে একদৌড়ে উঠোন ডিঙিয়ে ওপাশে ঠানদির ছোট ঘরটায় চলে গেল।

কৈ গো, ঠানদি কেমন আছ? শরীরটা এখন কেমন মনে হচ্ছে? বলতে বলতে সুলেখা একেবারে হুমড়ি খেয়ে তাঁর বিছানায় এসে পড়ে।

কিন্তু অত সাড়াশব্দ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ঠানদি সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় তারই অপেক্ষায় ছিলেন। কৌতূহলে তার চোখ দুটো যে জলছিল, একটু লক্ষ্য করলেই সুলেখা তা দেখতে পেত।

তিনি শারীরিক কুশলের দিক দিয়েই গেলেন না, ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—কি রে লেখা, কত দুর এগোল বল দেখি?

ওমা, তা হলে ইনিও জানেন! সুলেখা এবার রাগ-প্রকাশের সুযোগ পেয়ে একেবারে দু'হাত দিয়ে তাঁর গলাট চেপে ধরে বলল—ঠানদি পোড়ারমুখী! তুইও যদি জানতি তবে আমাকে বলিস নি কেন?

ঠানদি সহাস্যে গলা হতে তার হাত দুটো ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললেন—ছাড় ছাড়। হতচ্ছাড়ী গলা টিপে মারবি নাকি? তা হলে বল্ আশীর্বাদ পর্যন্ত ঠিকঠাক।

সুলেখা বিস্মিত হয়ে বলে—সে তুই এত দুর থেকে শুনলি কি করে?

ঠানদি হাসতে হাসতে বললেন—এই যে তুই বললি। বরাত যদি তোর না খুলত তবে কি আর এমন করে আমায় শোনাতে আসতিস, করতিস কি খারাপ সংবাদ পেয়ে ওখানেই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে যেতিস—তাই ত আমার কি হ'ল গো—বলে তিনি মড়াকান্নার অনুকরণ করেন।

সুলেখা খিল খিল করে হেসে উঠল।

কিন্তু সহসা থেমে গিয়ে একটু সলজ্জ কণ্ঠে বলল—তুই বিয়ে কর্ রাক্ষুসী, আমি বিয়ে করতে যাব কেন?

ঠানদি মৃদু হাস্যে সুলেখার আননে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা লক্ষ্য করছিলেন। এ কথায় হঠাৎ কি জানি কেন তাঁরও হাসি থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহে লেখার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে নিজের অজ্ঞাতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চমকে উঠলেন—একি! তাড়াতাড়ি হালকা হবার প্রয়াসে একটু হেসে বললেন—সে কি আর তুই দিবি। তোর এত তপিস্যের বর।

এই বরকাড়াকাড়ির কথা এর আগেও বহু বার হয়ে গেছে, কিন্তু আজকের বাস্তবের এই পটভূমিকায় কথাটা দু'জনেরই অন্তর ঘেঁষে গেল। সুলেখা এর উত্তরে অন্যদিন কত কি বলেছে, কিন্তু আজ কিছুই খুজে পেল না। হঠাৎ কানপাতার ভঙ্গিতে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বলল—ওই যা বাবার খাওয়া হয়ে গেল, মা ডাকছে আমি যাই।

সে যেমন হুমড়ি খেয়ে এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই উঠে গেল। ঠানদি টিপ্পনি কাটলেন—আমি বুঝি আর কেউ…।

সুলেখা বারান্দা পার হয়ে গিয়েছিল, এ কথায় একটু লজ্জিত ভাবে পিছন ফিরে দরজার আড়াল-হতে মুখ বাড়িয়ে বলল—একটা গল্প মনে করে রাখিস, ঘুমোস না আমি আসছি।…

ঠান্‌দির জীবনটাই যেন একটা গল্পবিশেষ। এসংসারে তার রক্ত-সম্পর্কের কেউ নেই এবং বাড়ীও তাঁর এ গাঁয়ে নয়। পরেশনাথের মায়ের বাল্যসঙ্গিনী ছিলেন তিনি, বিয়ের সময় ছাড়াছাড়ি হয়ে দু'জনে দু'দিকে চলে যান। ঠান্‌দি কিন্তু অচিরেই বিধবা হয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরে আসেন। সে সময় একবার পরেশনাথের মা তাঁকে নিজের কাছে ডাকেন। সেই থেকে ঠান্‌দি বরাবরই এখানে, বাপের বাড়ীর ও শ্বশুর-বাড়ীর সম্পর্ক তাঁর বহুদিন ধুয়ে মুছে গেছে। এখন তিনি পরেশনাথের মাসী ও সুলেখার ঠান্‌দি। তাঁর পূর্বপরিচয় বহু লোকে জানেও না।

ঠান্‌দি ভুলেই ছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে সুলেখার ওই ছোট্ট কথাটি তাঁকে অনেককিছু মনে করিয়ে দিল। তুই বিয়ে কর রাক্ষুসী!

সত্যিই ত, তাঁরও ত একদিন বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সইল না, সে যে রাক্ষুসীর বিয়ে!

রাজপুত্র তাঁর ঘুম ভাঙাতে সত্যিই একদিন এসেছিল, তার প্রমাণ এই পোড়া কপাল, কিন্তু অন্য রকম প্রমাণও ত থাকতে পারত। থাকল না সে কার দোষে? লোকে বলে তাঁরই এবং তিনিও চিরকাল এক কথাই বলে এসেছেন—আমারই। কিন্তু মুখে যা বলা যায় তাই ত আর জীবন নয়। তাঁর সংস্কারাচ্ছন্ন মনেও তাই মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে—আমি ত তখন অত ছোট!

কিংবা হয়ত পূর্বজন্মের কর্মফল।

কিন্তু যে পাপের ফলে এত বড় ব্যর্থতা আসতে পারে, আজ তাঁর এতখানি বয়সেও ঠিক অত বড় পাপ সংসারে কি হতে পারে সে হদিস ঠানদি পান নি।

এমনি করে এলোমেলো চিন্তার স্রোতে রাত বাড়তে থাকে। বাড়ী এখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

কৈ ছুঁড়ি আসব বলেই গেল, এল না ত!—এই অস্বস্তিকর চিন্তার হাত হতে অব্যাহতি পাবার প্রয়াসে ঠান্‌দি মনে মনে বলে ওঠেন।

কিন্তু ছুঁড়ি যে ওদিকে তখন রাজকন্যে! তার রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে জয়মাল্য নিয়ে এসে পড়ল বলে, হাতে তার নতুন দিনের সোনার বাঁশী। তার এখন ভাবনা কত!

আর ঠান্‌দি ভাবেন, তিনি ত রাজকন্যে নন—রাক্ষুসী! কিন্তু তাঁরও যে সবই হতে পারত! সেই সব-হতে-পারা সোনার সংসার কোথায় কত দূরে, কোন্ তেপান্তরের পারে? ঠান্‌দি একটা নিশ্বাস ফেলে, তাঁর শীর্ণ হাত দু'খানি—যেন এই দূরত্বের পরিমাপ করতেই মাথার উপর দিয়ে এগিয়ে দেন। হাতে ঠেকে কাঁচা দেয়ালের মাটি। এই বুঝি তাঁর সব।

লেখা বলে গেছে তাঁকে একটা গল্প মনে করে রাখতে। কিন্তু সে ত জানে না মনে করাটা কঠিন নয়, বরং সেটা ভোলাই কঠিন।

তার কিছুক্ষণ পরে।

ঠান্‌দি জেগে আছ? দোরগোড়া হতে সুলেখার ফিস্-ফাস্ শব্দ ভেসে আসে।

ঠানদি চকিত হয়ে ওঠেন, বলেন—আয় লেখা বোস। ঘুমোতে আর দিলি কৈ?

সুলেখা ত্বরিত পদে তাঁর পাশে এসে শুয়ে পড়ে তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলে—তা যাই, তুই ঘুমো।

ঠান্‌দি তার এই নৈকট্যজনিত একটি নূতন সম্ভাবনার স্বাদ যেন নিজের সর্বাঙ্গে গ্রহণ করতে করতে বললেন—আমি ঘুমোব আর তুই কোথায় যাবি শুনি? জেগে থাকতে ত?

সুলেখা কৃত্রিম বিদ্রূপের সুরে বলল—তুই ত সবজান্তা। আমি কি আর সাধ করে জেগে আছি? কেন তোর জ্বর, রাত্তিরে তোর যদি কিছু দরকার হয় তখন কে দেখবে শুনি?

ঠানদি আস্তে আস্তে বলেন—তাই ত। আমি ভুলেই গেছলাম কার জ্বর, আমার না তোর। তুই যা, কাঁপছিস।

সুলেখা এবার সত্যিই ঠকে গেল। শীতের রাত্রি নয় যে তার উপর দোষ চাপানো যাবে। সে এবার ঠান্‌দির জ্বরতপ্ত বুকে ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে মুখ লুকিয়ে বলল—যাঃ, কেবল জ্বর হলেই বুঝি কাঁপে?

ঠান্‌দি পরম স্নেহে লেখার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মৃদু কৌতুকহাস্যে বলেন—আর কি হলে কাঁপে শুনি?

সুলেখা কিছু বললে না। ঠান্‌দিও চুপ করে রইলেন।

হঠাৎ একসময় সুলেখা অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে বলল—আমার ভয় করছে ঠানদি।

ভয়। কিসের?—বলতে বলতেই অত্যন্ত বিস্ময়বোধের সঙ্গে ঠানদির আর এক দিকের চোখ খুলে যায়। তাই ত, কি হতে পারে, কি পেতে পারি এ নিয়ে ভয় হবার সময় ত এইটাই। তিনি ভুলেই গেছেন সুলেখা এখন আর শুধু একটি মেয়ে নয়, এবার সে নূতন মানুষ হতে চলেছে।

আর এ ভয় যে কিসের এবং কতখানি, তার সাক্ষী ত তিনি নিজেই।

এর পরে কেউ কিছু বলল না, চুপচাপ পাশাপাশি পড়ে রইল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় আর তাদের মানুষ বলে চেনা যায় না, মনে হয় যেন দুটি ছায়া। দুটিই সমান অস্পষ্ট।

একজন কি হতে পারে, আর একজন কি হতে পারত।

হঠাৎ ঠানদি সুলেখাকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে বলেন—আয় তোকে আজ একটা গল্প বলি শোন্।

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর চিত্রকলা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

জগতের শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখি ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে এক-একটি বিশিষ্ট ধরনের শিল্প-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে আর কোনও এক জন শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে প্রতিভাশালী শিল্পী-গোষ্ঠী। তাঁদের অনুগামীরা কিন্তু নির্বিচারে প্রথাগত ভাবে উক্ত ধারার অনুসরণ করে চলেন। শেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, অধিকাংশ শিল্পীর কাজের মধ্যেই ভাব-সম্পদ মৌলিকত্ব বা স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না, গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তিই হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।

বিংশ শতাব্দীতে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের সাধনায় পুনরুজ্জীবিত হ'ল ভারতীয় চিত্রকলা। ক্রমে ক্রমে তাঁর শিল্প-সাধনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন নন্দলাল, সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র কর, অসিত হালদার, মুকুল দে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পী-গোষ্ঠী। অবনীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তর-সাধক এঁরা, অবনীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত ধারার অনুসরণকারী হলেও এঁদের প্রত্যেকেরই শিল্পকর্ম্মে দেখা গেল অন্তরের ভাবসম্পদের রূপময় প্রকাশ, ফলে বাংলা দেশের চিত্রকলার যে নব অভ্যুদয় হয়েছিল তার বেগবতী ধারা ক্রমে ক্রমে দুকূলপ্লাবিনী হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে পরিপ্লাবিত করল।

নগরীর আলোর আড়ালে

কালক্রমে কিন্তু পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় চিত্রকলার গতিবেগ হ'ল মন্দীভূত, নূতন যে সকল শিল্পী ঐ ধারার অনুবর্ত্তন করে চললেন তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই মৌলিকত্ব বা স্বকীয় শিল্পদৃষ্টি পরিলক্ষিত হ'ল না। ভারতীয় শিল্পের নামে তাঁরা যা সৃষ্টি করতে লাগলেন তা প্রতিভাবান শিল্পীদের ব্যর্থ অনুকৃতি অথবা ভারতীয় শিল্পরীতির বিকৃতিমাত্র।

ওদিকে আর এক দল শিল্পীর মধ্যে দেখা গেল বিদেশী শিল্পরীতির প্রতি অন্ধ মোহ। ভারতীয় শিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁরা হলেন উন্মার্গগামী। এঁদের মধ্যে বৈদেশিক আঙ্গিকের অনুকরণে অনেকে হয়ত নৈপুণ্য অর্জ্জন করেছেন, কিন্তু প্রাণের স্পর্শ নেই বলে তাঁদের আঁকা অধিকাংশ ছবিই শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি।

আজকের দিনে শিল্প-প্রদর্শনীগুলি দেখলে তাই হতাশ হতে হয়। সেগুলিতে দেখি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবির ভিড়, রঙের জলুস, বিভিন্ন আঙ্গিক অনুকরণের বিরক্তিকর একঘেয়েমি এ

মানুষের পশুসত্তা

রেখার কেরামতি দেখানোর প্রাণান্তকর প্রয়াস, কিন্তু সবই মনে হয় কেমন যেন প্রাণহীন। ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার আভাস কৈ বড় একটা ত চোখে পড়ে না। এমনই শোচনীয় দুরবস্থা যখন আমাদের শিল্পকলা—বিশেষতঃ চিত্রকলার, তখন প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে একাগ্র নিষ্ঠায় নীরবে চিত্রকলার সাধনা করে যিনি আজ কলালক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন সেই সাধক-শিল্পী গোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রূপ-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ আমাদের মনকে করে তোলে আশান্বিত।

গোপেশচন্দ্র সাধক-শিল্পী এবং শিল্প-সাধক দুই-ই। প্রথম যৌবনেই তিনি ধর্ম্ম-সাধনার ক্ষুরধার দুর্গম পথে পদক্ষেপ করে-ছিলেন, সম্পদে-বিপদে সুখে-দুঃখে কখনও তিনি বিচ্যুত হন নি তাঁর লক্ষ্য থেকে—ধর্ম্মানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে শিল্পকলার অক্লান্ত সাধনা, জীবনের চলার পথে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে প্রচুর, কিন্তু তা অন্তরকে তাঁর রিক্ত করতে পারে নি। যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জীবনকে তিনি দেখেছেন তাকে কোন কোন ছবিতে রূপায়িত করেছেন অধ্যাত্মক অনুভূতির অনাবিল রসে অভিসিঞ্চিত করে।

"কামিনী ও কাঞ্চন"

গোপেশচন্দ্রের শিল্প-শিক্ষা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে কখনও বিশ্ব-প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নিভৃত নির্জ্জনতায়, কখনও বা জনতার হাটে—শিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর নামমাত্র। সেই জন্যই তাঁকে কোন বিশেষ শিল্পী-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না ; তাঁর রূপসৃষ্টিতে নেই কোন একটা প্রথানির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির ছাপ। তাঁর জীবন-দর্শন যেমন সম্পূর্ণ নিজস্ব, তেমনি কি দৃষ্টিভঙ্গী, কি আঙ্গিক, কি রচনা-শৈলী সব দিক দিয়েই তাঁর রূপসৃষ্টিতে পাওয়া যায় মৌলিকত্ব, স্বাতন্ত্র্য এবং অভিনবত্বের পরিচয়। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্র-নাথকে একবার বিনীত ভাবে তিনি বলেছিলেন যে, কোন শিল্প-বিদ্যালয়ে বেশী দিন শিক্ষালাভের সুযোগ এবং সৌভাগ্য তাঁর

অবাধ গতি

হয় নি। তাঁর কথা শুনে অবনীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন—"সেই জন্যেই তুমি হতে পেরেছ শিল্পী"। এই প্রসঙ্গে শিল্পকলার অনুরাগিণী, গোপেশচন্দ্রের শিল্পচর্চ্চায় উৎসাহ-দাত্রী মিসেস এন্ বেসিল-এর নিম্নোক্ত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য: "Some painters conform to no particular school. Their genius devolopes independently and they are a law to themselves. Such a one is the Bengali artist Gopesh Chandra Chakravarty who, though comparatively unknown to the general public, has been praised by all discerning art critics who have been privileged to view his artistic creations."

অর্থাৎ, কোন কোন শিল্পী কোন বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। তাঁদের প্রতিভার বিকাশ হয় স্বাধীন ভাবে এবং তাঁরা নিজেরাই উদ্ভাবন করেন নিয়ম-পদ্ধতি। এই ধরনের একজন বাঙালী শিল্পী হচ্ছেন গোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সাধারণের নিকট তিনি অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত, কিন্তু তাঁর শিল্পসৃষ্টি দেখবার সুবিধা যে সকল সূক্ষ্মদৃষ্টি শিল্প-সমালোচকের হয়েছে তাঁদের সকলের দ্বারাই তিনি প্রশংসিত হয়েছেন।

১

আজ থেকে সাতান্ন বৎসর পূর্ব্বে, সুরমা উপত্যকার জৈন্তা-পাহাড়ের পাদদেশে শ্রীহট্ট জেলার মদনপুর গ্রামে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবারে গোপেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করতেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই চিত্রাঙ্কনে গোপেশচন্দ্রের সহজাত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—প্রকৃতির ভয়াল এবং সুন্দর উভয় রূপই আকৃষ্ট করে বালকের শিল্পী-মনকে। কালি, কলম, আর কাগজ এই ছিল

ধ্বংসের কবলে

তার শিল্প-সৃষ্টির স্বল্প উপকরণ ; এর সাহায্যে এই শিশুশিল্পী এক দিকে যেমন আঁকত প্রজাপতি আর পতঙ্গ, অন্য দিকে তেমনি সরীসৃপ এবং দৈত্য-দানার ছবিও ফুটে উঠত তাঁর কলমের আঁচড়ে। বালকের এই সকল ছবি মুগ্ধ করত সবাইকে। গোপেশচন্দ্রের বয়স যখন তেরো বৎসর মাত্র তখন তাঁর মাতা ইচ্ছাময়ী দেবী লোকান্তরিতা হন।

গোপেশচন্দ্র মফস্বলে থেকে প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়েছিলেন বটে, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। তখন তিনি পালিয়ে এলেন কলিকাতায়—উদ্দেশ্য, শিল্পকলা শিক্ষা। 'গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টসে' শিল্পী ভর্তি হলেন, কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হ'ল না। মাত্র এক বৎসরেরও অনধিককাল শিক্ষানবিসির পর অর্থাভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিতে তিনি বাধ্য হলেন। তখন তাঁর বয়স ষোল বছর মাত্র। সদ্য-অতিক্রান্ত-কৈশোর এই শিল্পী তখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় এসে দাঁড়ালেন জনাকীর্ণ মহানগরীর রাজপথে। পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি আশ্রয়ের সন্ধানে, কিন্তু "হায় যে রাজধানী পাষাণ কায়া"—এই বিরাট মহানগরীতে মাথা গুঁজবার একটুখানি ঠাঁই মেলে নি সেদিন তাঁর কোথাও, সাধারণ পার্কগুলিতে বেঞ্চের উপর শুয়ে সারা রাত কাটাতে হয়েছে তাঁকে, সেদিন তাঁর রাতের প্রধান আশ্রয় ছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার—দৈনন্দিন আহার্য্য ছিল একমুঠো ছোলা—জলসংযোগে তা গলাধঃকরণ করে তাঁকে প্রাণরক্ষা করতে হ'ত।

যে ধর্ম্মের বীজ শৈশবেই শিল্পীর মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা-ই ছায়াতরুতে পরিণত হয়ে এই অভাব ও দুঃখ-দুর্গতির দাবদাহে তাঁকে আশ্রয়দান করেছিল। সেই চরম দুর্দ্দিনে শক্তি ও প্রেরণা লাভ করতেন তিনি বাংলার পল্লীর নিরক্ষর সাধুসন্তদের রচিত গান গেয়ে এবং তাঁদের উক্তিসমূহ আবৃত্তি করে—পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কথামৃত' এই শিল্পীর দুঃখাভিতপ্ত অন্তরকে সান্ত্বনার প্রলেপে স্নিগ্ধ করে তুলত।

কিন্তু দুঃখের এই নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ ব্যর্থ হয় নি, শিল্পীর জীবনে। অভাবের তাড়নায় পথে এসে দাঁড়াবার পর শিল্পীর দৃষ্টির সমক্ষে নূতন

দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হ'ল, তিনি খুঁজে পেলেন নিজের পথ। গোপেশ-চন্দ্রের গুণমুগ্ধ ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ বলেছেন, "Born artist, he soon discovered his real studio in the streets and pavements, hearths and hovels of the poor and the forgotten of society. Naturally the sombre shades dominated over the shining colours of his palette."

অর্থাৎ, জাত-শিল্পী তিনি, অচিরেই নিজের শিল্পাগার আবিষ্কার করলেন রাস্তায় এবং শান-বাঁধানো পথে আর সমাজের দরিদ্র ও যাদের আমরা বিস্মৃত হয়েছি তাদের গৃহকোণে। স্বভাবতঃই তাঁর রংদানির উজ্জ্বল বর্ণসমূহের উপর প্রাধান্যলাভ করল গাঢ় ছায়া।

এই ভাগ্য-বিপর্যয় কিন্তু তাঁকে সংসারের উপর বীতস্পৃহ বা জীবনের প্রতি তাঁর মনকে বিরূপ করে তোলে নি, বরং ভাগ্য-হত মানুষের জীবনের শোচনীয় অপচয়, সমাজ-সমস্যা সম্বন্ধে তাঁকে করেছে সচেতন। আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তবতার সমন্বয় এই শিল্পীর শিল্পরচনাকে এমনি একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দিয়েছে যার তুলনা সচরাচর মেলে না। একই শিল্পীর তুলিতে "মায়া"র মত গভীর অধ্যাত্ম-ভাবদ্যোতক এবং "দুর্ভিক্ষের" মত বাস্তব অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ ছবি যে এমন অনবদ্য ভাবে ফুটে উঠতে পারে তা পরম বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটার সঙ্গে শিল্পীর আকৈশোর গভীর পরিচয়। নিশীথ নগরীর বিচিত্র আলোকচ্ছটা আমাদের দৃষ্টিকে করে বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত, কিন্তু এই আলোর আড়ালে অন্ধকার অলিতে-গলিতে জীবনের কি ভয়াল বীভৎস বিকৃত রূপ—সেখানে কত রাহাজানি, প্রবঞ্চনা আর নরহত্যার তাণ্ডবলীলা। আলো এবং অন্ধকারের, সু এবং কু এ দুয়ের নিকট-সংস্থিতিকেই শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর "নগরীর আলোর আড়ালে" নামক ছবিতে।

মানুষের মধ্যে আছে দুটি সত্তা—দৈবী সত্তা আর পাশব সত্তা। মানুষের পশুপ্রবৃত্তি প্রবল হয়ে যখন আচ্ছন্ন করে তার দৈবী সত্তাকে তখন তার আকৃতি কি বিকট এবং বীভৎস হয় তা ফুটে উঠেছে—"মানুষের পশু-সত্তা" নামক ছবিটিতে। একটি নরাকার পশু যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর নিপুণ তুলিকায়—এই নরপশুটির মাথার দু' পাশে মোষের শিং-এর মত একজোড়া শিং, চোখে হিংস্র সুতীব্র দৃষ্টি, স্ফীত নাসাগ্রে পাশব প্রবৃত্তির উৎকট অভিব্যক্তি—মুখে হাসি আছে বটে, কি এ যেন নিতান্তই দন্তবিকাশ মাত্র, এতে নেই প্রাণের স্পর্শ। কিন্তু কি অসহায়, কান্নার চেয়েও করুণ এ হাসি—মানুষের দৈবী সত্তার কাছে পাশব সত্তার পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী—এ হাসি তারই দ্যোতক। পশু-প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের অন্তরাত্মার অসহায়তা ফুটে উঠেছে তার নিষ্প্রাণ হাসিতে—মানুষের অন্তরসত্তার পরিচয় যে পাওয়া যায় তার হাসিতেই!

সমাজে আর এক শ্রেণীর নর-পশু আছে, ধর্মের নামে যারা মানুষকে করে প্রতারিত। এই সকল ভণ্ডের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন পরশুরাম তাঁর 'বিরিঞ্চি বাবা' নামক গল্পে। সেই গল্পেরই পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে গোপেশচন্দ্রের "কামিনী ও কাঞ্চন" নামক ছবিটিকে। সমাজে ধর্মধ্বজীদের ভণ্ডামি

রূপকথার রাণী

কোন্ পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, এই ছবিটি সে বিষয়ে আমাদের চোখ ফুটাবার সহায়ক হবে। কণ্ঠে মালা, মুখে মৃদু হাসি, দক্ষিণ হস্ত বরাভয় মুদ্রার ভঙ্গীতে উত্থিত—"শ্রীগুরু মহারাজজী" আসনে উপবিষ্ট। পুরুষ-ভক্তদের মাথায় রেখেছেন ডান পা, ওদিকে নারী-ভক্তেরা আঁকড়ে ধরেছেন—ভব-সমুদ্রের ভেলাস্বরূপ প্রভুর বাম পদ। প্রভু শিষ্যার মাথায় রেখেছেন বাম হস্ত, নারীভক্তেরা লাভ করেছেন তাঁর নিকট-সান্নিধ্য। তার ডান পায়ের কাছে কাঞ্চন-মুদ্রার পরিপূর্ণ থালা—প্রভু 'কামিনী' ও 'কাঞ্চন' এ দুটিকে টেনে নিয়েছেন নিজের কাছে—ওদিকে অন্ধ ভক্তিতে লুণ্ঠিতশির পুরুষ-

ভক্তেরা গুরু মহারাজের এই পুণ্যকৃত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, দৃষ্টি তাদের নিবদ্ধ তাঁর চরণতলে।

আগেই বলেছি যে, জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা গোপেশচন্দ্রকে করে তুলেছে সমাজ-সচেতন শিল্পী। ধর্ম্মের যে নিগূঢ় তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াম' তার রহস্য যে তাঁর শিল্পদৃষ্টির নিকট একেবারে অনুদ্ঘাটিত থাকে নি তা রূপায়িত হয়েছে "মায়া" নামক ছবিটিতে। তাঁর শিল্পানুভূতি এবং অধ্যাত্মসাধনা যে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত, এই ছবি দেখে তা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধ হয়। কিন্তু এটা বাস্তবিকই বিস্ময়কর বলে মনে হয় যে, আধ্যাত্মিক এষণা গোপেশচন্দ্রকে আমাদের আজকের দিনের শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ক সামাজিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে উদাসীন করে তুলতে পারে নি। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার আসল রূপটি প্রকট হয়ে উঠেছে "অবাধ গতি" নামক ছবিটিতে। শিক্ষাক্ষেত্রে এখন যে অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃঙ্খলতা চলছে তার কুফল আমরা সবাই টের পাচ্ছি হাড়ে হাড়ে। এর কারণ উপযুক্ত চালকের অভাব—বলগা চালকের হস্তচ্যুত হয়েছে—তার নিজেরই পতনোন্মুখ অবস্থা। কাজেই শিক্ষারূপী তুরঙ্গম অনির্দ্দেশ্য ভাবে ছুটে চলেছে অবাধ গতিতে।

"তুমি দিয়েছিলে মোরে"

আর আমাদের সংস্কৃতির অবস্থা ত ততোধিক শোচনীয়। আমাদের সংস্কৃতি বর্তমানে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আশু এর প্রতিকারে অবহিত না হলে ভবিষ্যতে হয় ত সংস্কৃতি বলতে নাচ-গান ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সংস্কৃতির এই শোচনীয় দুরবস্থার কারণ কি? কারণ যে, বর্তমান অর্থব্যবস্থা, শিল্পী তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন তাঁর 'ধ্বংসের কবলে' নামক ছবিতে। এতে আমরা দেখি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীর মত বিকটাকৃতি তীক্ষ্ণ নখদন্তযুক্ত একটি হিংস্র প্রাণী মুখব্যাদান করে বিচিত্রাঙ্গ একটি হরিণকে গ্রাস করতে উদ্যত। বিকট আকারের এই জীবটি বর্তমান অর্থব্যবস্থার আর তার কবলিত চারুদেহ হরিণটি বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুমুখী সংস্কৃতির প্রতীক। বর্তমান অর্থব্যবস্থার দরুন সত্যই আজ আমাদের সংস্কৃতি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে—সংস্কৃতিগ্রাসী প্রাণীটির কিন্তু এতেও ক্ষুন্নিবৃত্তি হবার লক্ষণ নেই—কোন নূতন ভক্ষ্যের সন্ধানে তার থাবা দুটি সম্মুখের পানে প্রসারিত কে জানে?

শিল্পী বাস্তবধর্ম্মী যে সকল ছবি এঁকেছেন তন্মধ্যে কতকগুলির পরিচয় এতক্ষণ দেওয়া হ'ল—এতে তাঁর বহুমুখী শিল্পধারার একটি দিকের মাত্র পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে এই প্রতিভাবান শিল্পী কত বিচিত্র ধরনের ছবিই না এঁকেছেন। তন্মধ্যে কোনটি গীতিকাব্যধর্ম্মী, কোনটি আধ্যাত্মিক প্রতীকচিত্র, কোনটি-বা অজন্তা ফ্রেস্কোর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড, ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত মনীষী এবং ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির মত কলাবিদগণ তাঁর আঁকা ছবির উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। শিল্পীর কল্পনার গভীরতা এবং রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য যুগপৎ এ দুয়েরই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর "রূপকথার রাণী" নামক ছবিটিতে। নিভৃতি

রাতে চাঁদ-তারার দেশ থেকে মাটির পৃথিবীতে শিশুদের রহস্যলোকে নেমে আসছেন বিচিত্র মুকুটধারিণী, অনুপম রূপলাবণ্যবতী রূপকথার রাণী--সঙ্গে তাঁর সহচরী। রাণীর বাহন রূপকথার বিহঙ্গম, তার নীচের দৈত্যটির আকৃতি বিকট বটে, কিন্তু হাসিটি শিশুর মত প্রাণ-খোলা। রূপকথার দৈত্যদানা শিশুদের মনে অকারণে ভীতির উদ্রেক করে সত্য, কিন্তু শিশুদের সে ভালোবাসে—শিশুমহলে আনাগোনার দরুন প্রকৃতিটি যে তার শিশুর মতই সরল। এই ছবিটি অবনীন্দ্র-নাথ কর্ত্তৃক বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল।

গোপেশচন্দ্রের জীবনে শুধু যে দুঃখ-দারিদ্র্যের তিক্ততম অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তা নয়, প্রিয়জনের মৃত্যুশোকের তীব্র আঘাতেও বারংবার বিদীর্ণ হয়েছে তাঁর হৃদয়। কিন্তু এই মৃত্যু-শোক তাঁর মর্ম্মস্থলকে মথিত করলেও এরই প্রসাদে যে তাঁর দিব্য-দৃষ্টি খুলে গেছে, এক অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম অনুভূতিতে যে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ হয়েছে সে পরিচয় পাই তাঁর "তুমি দিয়েছিলে মোরে" নামক ছবিটিতে। অকালে—মাত্র এক বছর দশ মাস বয়সে কন্যা শ্যামলীর মৃত্যুতে শোকাভিভূত শিল্পী এই ছবিটি আঁকার জন্যে একটি দিব্য প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। দেবতা এসে শিশুকে নিয়ে যাচ্ছেন চিরতরে। যার কাছে দেবতার প্রসাদরূপে এসেছিল শিশুটি, বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে প্রসারিত করেও সে তাকে ধরে রাখতে পারছে না—তার এই গভীর শোকে সান্ত্বনা কোথায়? দেবতা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে দেখাচ্ছেন—শিশুকে নিয়ে চলেছেন তিনি মৃত্যুহীন চিরভাস্বর আলোকের রাজ্যে।

এমনি ভাবে শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের কোন কোন ঘটনা তাঁকে এমন কতকগুলি চিত্ররচনায় অনুপ্রাণিত করেছে, কলালক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যা স্থায়ী সম্পদ বলে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় তাঁর "মধুর স্মৃতি" নামক ছবিটির কথা। শ্রীহট্ট জেলার সুদূর পল্লীগ্রামে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শিল্পী চলেছেন ষ্টীমারে আরোহণ করে শহরের অভিমুখে। হঠাৎ ষ্টীমার থেকে তাকিয়ে দেখেন নদীতটবর্ত্তী তাদের গৃহপ্রান্তে মা এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ষ্টীমারের পানে উৎকণ্ঠাব্যাকুল দৃষ্টি মেলে, মূর্ত্তিটি অস্পষ্ট—শুধু চোখ দুটি দিয়ে বিশ্বের সকল মমতা, সকল করুণা, সকল ব্যাকুলতা যেন ঝরে পড়ছে—এল শিল্পীর জীবনে এক দিব্য প্রেরণার মুহূর্ত্ত—প্রবাসযাত্রী সকল পুত্রের জন্য মায়েদের অনন্ত ব্যাকুলতা, করুণাঘন দৃষ্টি-মাধুর্য্য মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠল যেন অন্তরের সবটুকু ভক্তি-ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে, নিপুণ তুলিকায় আঁকা 'মধুর স্মৃতি' ছবিটিতে।

কন্যা শ্যামলীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে শিল্পী গড়ে তুললেন 'শ্যামলী' নামক সেবা-প্রতিষ্ঠান। এই সেবা-ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে কন্যার বিয়োগব্যথা কতকটা ভুলে ছিলেন শিল্পী, সহসা এল আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আঘাত। ১৯৫৩ সনে দেওঘরে শিল্পীর সহধর্ম্মিণী সরযূ দেবী লোকান্তরিতা হলেন। এমনি ভাবে একটির পর একটি করে বন্ধন ছিন্ন করে কলালক্ষ্মী তাঁকে মহত্তর জীবনব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে তৈরি করে নিলেন।

শোকজর্জরিত শিল্পীর মনে তখন জাগল শিল্পপ্রচারের প্রচেষ্টায় সমগ্র ভারত-পরিক্রমার সঙ্কল্প। একদিন শুধু রেলের টিকিটের ভাড়াটি সম্বল করে সাত বছরের ছোট ছেলে কচি সহ তিনি রওনা হলেন আসামের ডিব্রুগড়ের অভিমুখে, সঙ্গে করে নিলেন নিজের হাতে আঁকা এক শতখানা ছবি। ১৯৫৪ সনের ১৭ই ডিসেম্বর ডিব্রুগড়ে প্রথম অনুষ্ঠিত হ'ল তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী। তার পর তিন-সুকিয়া, ডিগবয়, কোহিমা, ইম্ফল, গৌহাটি, শিলং, শিলচর প্রভৃতি আসামের বিভিন্ন শহরে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে, সর্ব্বশ্রেণীর দর্শক-মণ্ডলীর সুখ্যাতি অর্জ্জনান্তে সম্প্রতি ফিরে এসেছেন তিনি কলি-কাতায়। শিল্পকলার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায়, বিত্তশালী ব্যক্তিদের মুখাপেক্ষী না হয়ে, একক শিল্পীর এই নিঃসঙ্গ অভিযান এক অভিনব ঘটনা—পূর্ব্বভারতে ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর দর্শকদের নিকট যে অকুণ্ঠ অভিনন্দন তিনি লাভ করেছেন, যে ভাবে সাধারণের মনে শিল্পবোধ জাগ্রত করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। অচিরেই কলিকাতায় এই অভিযাত্রী শিল্পীর একটি শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে—তারই আয়োজন চলছে এখন পূর্ণোদ্যমে। প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের পর আবার সুরু হবে তাঁর পরিক্রমা। এবার যাত্রা করবেন তিনি দক্ষিণ-ভারতের পথে। স্বকীয় শিল্পসত্তার নিয়ে শিল্পীর সমগ্র ভারত-পরি-ক্রমার সঙ্কল্প সার্থক হোক, বাঙালী শিল্পীর প্রতিভা সমগ্র ভারতে সমাদৃত হোক, সকল স্তরের গুণীজনের স্বীকৃতিলাভ করুক—এই কামনাই আমরা করছি একান্ত মনে এবং শিল্পীকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলছি—"শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ"—"তোমার পথ কল্যাণময় হোক"।
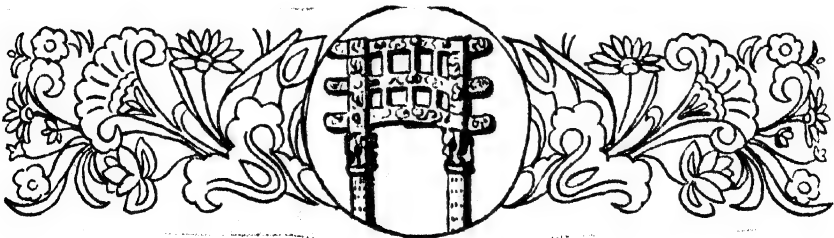
ব্যাঙ্কের পাস বই

শ্রীশিবশঙ্কর দত্ত

যাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখেন তাঁহারা ব্যাঙ্কের পাস বই কি ও তাহাতে কি থাকে অল্পবিস্তর জানেন। 'পাস বই' দেওয়া ব্যাঙ্কের কর্ম্মসূত্রের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করিবার পূর্ব্বে 'পাস বই' কাহাকে বলে তাহা জানা দরকার। ইংরেজী "Oxford Dictionary"তে পাস বই সম্পর্কে এই মর্ম্মে লেখা আছে :

পাস বই হইতেছে—ব্যাঙ্ক তাহার আমানতকারীর নিকট যে জমা ও খরচের (অর্থাৎ আমানতকারী সেই ব্যাঙ্কে যে যে টাকা বা চেক জমা দিয়াছেন ও যে যে টাকা উঠাইয়া লইয়াছেন মায় প্রাপ্য বা দেয় সুদ) হিসাবে নিয়মিতভাবে পাঠায় ও যাহা দেখিয়া আমানতকারী বুঝিতে পারে ব্যাঙ্কে তাহার হিসাবে কত টাকা আছে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের যে কাজ হয় তাহা বিলাতী প্রথায়, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের প্রথায়। সুতরাং পাস বই দেওয়াও বোধহয় ইংরেজী ব্যাঙ্কের অনুকরণে হইয়াছে। কবে হইতে এই পাস বই দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইল বলা কঠিন। এ বিষয়ে "Hoares Bank—a record 1673—1932" হইতে জানা যায়।

বহুকাল আগে ফর্দ কাগজে ব্যাঙ্কের হিসাব দেওয়া হইত। ১৮০২ সনে যে পাস বই দেওয়া হইত তাহাকে 'ধোপার খাতা' বলা হইত।

ইংলণ্ডে ১৭১০ সনেও একপ্রকার হিসাব দেওয়া হইত। কিন্তু এই হিসাবকে 'পাস বই' বলা হইত না।

বিলাতে অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্ব হইতে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক আমানতকারীকে 'পাস বই' দেওয়া হইত। কিন্তু তখন এই 'পাস বই'কে পাস বই বলা হইত না। Gilbert তাঁহার সুবিখ্যাত বইয়ে ইহাকে 'ক্যাশ-বুক' বলিয়াছেন। ১৮১৬ সনের Dwanes vs. Noble মোকদ্দমার রায়ে ইহাকে 'প্যাসেজ-বুক' বলা হইয়াছে। ১৮২৮ সনে পাস বুক কথাটির চল ব্যাপক হয় নাই। লর্ড চোর্লে তাঁহার এক বক্তৃতায় এই মর্ম্মে বলিয়াছেন :

"ব্যাঙ্ক তাহার আমানতকারীর টাকা, নগদে বা কাগজে পাইলে তাহার হিসাব রাখেন এবং আমানতকারীকে বা তাঁহার হুকুমমত যে টাকা দেয় তাহারও হিসাব রাখেন। এই হিসাব ব্যাঙ্কের লেজারে থাকে। ইহারই একটি নকল—ছোট বইয়ে তুলিয়া আমানতকারীকে 'pass' করা বা দেওয়া হইত। এই থেকে ইহাকে পাস বই বলা হয় বা 'প্যাসেজ' বইকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাস বুক বলা হয় কিনা তাহা বলা কঠিন—ইহাকে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্যাসেজ-বই বলা হইত সে বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ নাই।"

আমাদের দেশে টাকা লেন-দেনের বা ব্যক্তিবিশেষের কিংবা গদী বিশেষে সুদে অথবা বিনা সুদে টাকা গচ্ছিত রাখার প্রথা বহুকালের। হুণ্ডীরও প্রচলন বহুদিনের। বাংলার রাজস্ব নবাব-নাজিম জগৎশেঠের গদীতে জমা দিতেন; জগৎশেঠ হুণ্ডী কাটিয়া তাঁহাদের দিল্লীর গদীতে পাঠাইতেন। সেখানকার গদী বাদশাহকে এই টাকা দিতেন। ইহার জন্য নবাব-সরকারে ও বাদশাহী-সরকারে জগৎশেঠের মধ্যে হিসাব-নিকাশ হইত। এই হিসাব-নিকাশ অনেকটা পাস-বইয়ের অনুরূপ। আমাদের দেশের লোকেরা, মহাজনেরা বছরে দুই বার করিয়া 'দো-ফর্দী' দিতেন—ইহাতে কত টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে ও কত টাকা ফেরত দেওয়া বা খরচ করা হইয়াছে তাহারও হিসাব থাকিত। 'দো-ফর্দী' হাত-চিঠার অনুরূপ খাতায় দেওয়া হইত।

পূর্ব্বে ইংরেজী প্রথায় যে পাস বই দেওয়া হইত তাহাতে থাকিত ব্যাঙ্কের খতিয়ানে (লেজারে) ব্যক্তিবিশেষের যে হিসাব থাকিত তাহার অবিকল নকল। এই হিসাবে ব্যাঙ্ক সেই ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার হিসাব বাবদ যে টাকা পাইত তাহা ডান দিকে জমা করিত; আর সেই ব্যক্তি যে টাকা তুলিয়া লইত বা যে টাকার চেক দিত—যাহার দরুন ব্যাঙ্কের টাকা খরচ হইত—তাহা থাকিত বাম দিকে। যেমন

K. P. Basu,
in a/c with
Bengal Bank Ltd. Calcutta

Dr. Cr.

Date	Particulars	Rs.	As.	P.	Date	Particulars	Rs.	As.	P.
1957 Jany. 1	To Subscription of Bangiya Sahitya Parishad	12	—	—	1957 Jany. 1	By Balance b/f	12,500	12	11
2	To Asiatic Society of Bengal	36	—		" 3	By Cash	500		
" 21	To cost of 100 Shares in Sarat Textiles Ltd.	10,000			"	By Bill Collected	3,001	3	1
" 31	To B. C. Sinha cheque No. P/F 001234	2,570		—	" 16	By Cheques	1,000		
	To Balance	10,484	—	—	" 25	By Cash	100		
					" 27	By Cheques	6,000		—
	Rs.	23,102	—	—		Rs.	23,102	—	—

বহুদিন হইল এই প্রথার পরিবর্তন হইয়াছে। আজকাল ব্যাঙ্কের পাস বইতে আমানতকারী নিজের খাতায় বা লেজারে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যদি আলাদা হিসাব রাখেন তবে তাহাতে যে রকম তাঁহার হিসাব থাকিবে সেই রকম হিসাব পাঠান হয়। আগেকার জমা-খরচ উল্টানোভাবে দেখান থাকে—অর্থাৎ ব্যাঙ্কে যে টাকা বা চেক পাঠান হয় তাহা থাকে বাম দিকে; আর যে টাকা তুলিয়া লওয়া হয় বা চেক কাটা হয় তাহা থাকে ডান দিকে। যেমন:

Bengal Bank Ltd.
in a/c with
K. P. Basu

Dr. Cr.

Date	Particulars	Rs.	As.	P.	Date	Particulars	Rs.	As	P.
1957 Jany 1	To Balance	12,500	12	11	1957 Jany. 1	By Subscription of Bangiya Sahitya Parishad	12	—	—
" 3	To Cash	500	—		" 2	By Asiatic Society of Bengal	36	—	—
" "	To Bill Collected	3,001	3	1	" 21	By Cost of 100 Shares in Sarat Textiles Ltd.	10,000	—	—
" 16	To Cheques	1,000			" 31	By B. C. Sinha cheque No. P/F 001234	2,570	—	—
" 25	To Cash	100	—	—		By Balance	10,484	—	—
" 27	To Cheques	6,000	—	—					
	Rs.	23,102	—	—		Rs.	23,102	—	—

'পাস বই' এই নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা একখানি বই। কিন্তু আজকাল অনেক বড় বড় ব্যাঙ্কের পাস বই আর বইয়ের আকারে নাই। উপরি-উক্ত হিসাবের মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক নকল নিয়মিতভাবে মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে বা দিনে দিনে আমানতকারীর নিকট আলাদা আলাদা কাগজে পাঠান হয়। এইগুলিকে ভালভাবে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে ভাল চামড়ার ক্লিপ দেওয়া খাতা পাঠান হয়। তাহাতে এই হিসাবগুলি পর পর সাজাইয়া রাখিলে এই সাজান হিসাবই "পাস বই" হইল। কলিকাতায় অধুনা-লুপ্ত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সর্ব্বপ্রথম এইরূপ পাস বই দিবার প্রথা চালু করেন। এখন অনেক ব্যাঙ্কে এইভাবে পাস বই দেওয়া হয়।

এই প্রকার নূতন পদ্ধতিতে পাস বই চালু হইবার কারণ—অনেক বড় বড় ব্যাঙ্কে 'loose leaf ledger' রাখা হয় ও তাহাতে হিসাব রাখা হয়। যাঁহারা এইভাবে হিসাবপত্র রাখেন তাঁহাদের পক্ষে আলগা কাগজে হিসাব পাঠানই সুবিধাজনক। আমানত-কারীরও সুবিধা—ব্যাঙ্কে পাস বই পাঠাইতে হইল না, পাস বই পাঠান হইলে আমানতকারীর হাতে ব্যাঙ্কের স্বীকৃত টাকার কোন প্রকার হিসাব রহিল না; পাস বই ব্যাঙ্কে পাঠান হইলে ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণ পাস বই পূরণ করিতে যে কয়দিন সময় লন সেই কয়দিন আমানতকারীর নিকট কোন হিসাব থাকে না, পাস বই পাঠান বা আনাইবার ঝঞ্ঝাট ও খরচ কিছু লাগে না বা পাস বই খোয়া যাইবার কোন ঝুঁকি থাকে না।

যাঁহাদের দৈনিক অনেকগুলি চেকের লেন-দেন হয় তাঁহাদের পক্ষে এই পদ্ধতিই সুবিধাজনক। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে ব্যাঙ্ক হইতে জমা-খরচের হিসাব আসিতেছে—তাঁহার নিজের খাতার সহিত মিলাইয়া লইলেই হইল।

বাঁধানো পাস বই ও আলগা আলগা কাগজে লিখিত ও প্রেরিত হিসাব গাঁথিয়া যে পাস বই তৈয়ারি হইল ইহাদের মধ্যে কোনটি বেশী প্রামাণ্য ও আদালত-গ্রাহ্য সে সম্বন্ধে ইংলণ্ডের কোম্পানী আইন অনুসারে Hearts of oak Assurance Co. Ltd. vs. James Flower and Sons [1936] Chancery p, 76 খাতা দ্রষ্টব্য। ঐ মোকদ্দমায় আলগা খাতা প্রমাণে ব্যবহৃত হইবার বিরুদ্ধে জজেদের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ব্যাঙ্ক পাস বই দেয় কেন ?

প্রত্যেক ব্যাঙ্কই আমানতকারীকে পাস বই—তা খাতাই হউক বা আলাদা আলাদা কাগজই হউক দিয়া থাকে। কেন ব্যাঙ্ক খরচা করিয়া, দায়িত্ব লইয়া, ঝুঁকি লইয়া পাস বই দেয়? পাস-বই দিলে যে আমানতকারীর ব্যাঙ্কের সহিত তাহার নিজের হিসাব দেখিবার সুবিধা হয় সে-কথা বলাই বাহুল্য। ব্যাঙ্ক কি খরিদ্দার বা আমানতকারী সংগ্রহ করিবার জন্য বা ভদ্রতা করিয়া এই পাস বই দেয়? না, আইনতঃ ব্যাঙ্ককে এই পাস বই দেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা আছে?

ব্যাঙ্কের সহিত আমানতকারীর সম্পর্ক যে প্রধানতঃ পাওনাদার ও দেনদারের সম্পর্ক—বিলাতের হাউস অব লর্ডসের Foley vs. Hill মোকদ্দমায় ১৮৪৮ সনে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইয়াছে। বহুপ্রকার কাজে পাওনাদার ও দেনদারের সম্পর্ক হয়—যেমন টাকা ধার দিলে বা টাকা ধার লইলে, দোকান হইতে ধারে জিনিষপত্র খরিদ করিলে বা বেচিলে। কিন্তু ব্যাঙ্কের সহিত আমানতকারীর যে দেনদার-পাওনাদার সম্পর্ক ইহা এক বিশেষ প্রকার দেনদার-পাওনাদার সম্পর্ক; এই সম্পর্কের মধ্যে মনিব-কর্ম্মচারীর বা মালিক-ম্যানেজারের 'ল অব এজেন্সী'র বহু অংশ ঢুকিয়া গিয়াছে। বিলাতের টুর্ণিয়ার বনাম নেশনাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কের মামলায় ১৯২৪ সনে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যাঙ্ক আমানতকারীর এজেণ্ট—এই মত প্রবল ছিল। যিনি এজেণ্ট তিনি যে টাকা এজেণ্টরূপে পাইয়াছেন বা যে টাকা এজেণ্টরূপে খরচ করিয়াছেন তাহার নিমিত্ত মালিকের নিকট সন্তোষজনক ভাবে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য ও তাহার জন্য দায়ী। সন্তোষজনভাবে কৈফিয়ত দিতে হইলে তাঁহার এজেণ্টের হিসাব রাখা দরকার। যখনই মালিক চাহিবেন তখনই এই হিসাব দেখাইতে ও দিতে তিনি বাধ্য।

ইহা হইতেই ব্যাঙ্কের পাস বই দেওয়া প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু হিসাব দেওয়া এক জিনিষ, আর হিসাব দাখিল করা আর এক জিনিষ। পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু ইহার বুনিয়াদে ব্যাঙ্কের ও আমানতকারীর পরস্পরের ব্যবহারিক, আইনগত সম্পর্ক নির্ভর করে। আজকাল পাস বই দেওয়ার প্রথা এতই চালু হইয়া গিয়াছে যে, যখনই কোন আমানতকারী কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া হিসাব খোলেন তখনই তাঁহাকে পাস বই দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক যে নূতন আমানতকারীর নিকট হইতে টাকা পাইয়াছেন এই পাস বই তাহার স্বীকৃতি। ফলে পাস বইয়ে সময় সময় ব্যাঙ্কের হিসাব উদ্ধার করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে আমানতকারীর সহিত ব্যাঙ্কের একটি অলিখিত চুক্তি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই চুক্তিমূলে ব্যাঙ্ক পাস বইয়ে হিসাব তুলিয়া দিতে বাধ্য।

ব্যবসায় জগতে কতকগুলি অলিখিত প্রথা আছে। আর এই প্রথা অনেক সময় পরিবর্ত্তিত হয়। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে বড়বাজার অঞ্চলে কোন দোকানদার বা ব্যবসায়ী ঘর ভাড়া লইলে বাঙালী জমিদারকে পূজার সময় ও বর্ষশেষে ১৫ দিনের করিয়া এক মাসের ভাড়া বেশী দিতে হইত। তাহার পর মাড়োয়ারী বিত্তশালী লোকেরা বড়বাজারের অনেক বাড়ী কিনিয়া লইলেন, তখন রেওয়াজ হইল প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর ভাড়াটিয়াকে সেলামী দিতে হইবে—এই সেলামীর পরিমাণ ছয় মাস হইতে এক বৎসরের ভাড়া। তাহার পর এই অনিশ্চয়তা এড়াইবার জন্য রীতিমত

এটর্নী বাড়ী হইতে দিল-দলিল সম্পাদিত হইতে লাগিল। পরে ১৯২০ সনের রেণ্ট এক্ট চালু হইল। এই অলিখিত প্রথা লোপ পাইয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চুক্তিতে পরিণত হইল।

ব্যাঙ্কের পাস বই দেওয়ার প্রথা কলিকাতায় গত সত্তর-আশী বৎসর ধরিয়া এত ব্যাপক ও সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে যে, এখন ইহাকে একটি অলিখিত নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। এবং আমানতকারীকে ব্যাঙ্ক পাস বই দিতে ও মধ্যে মধ্যে পাস বইয়ে হিসাব তুলিয়া দিতে বাধ্য ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ব্যাঙ্ক যে আমানতকারীর নিকট এজেণ্ট হিসাবে পাস বই সম্পর্কে দায়ী আমরা সেকথা বলিয়াছি। ইহার সহিত কিন্তু ব্যাঙ্ক যে আমানতকারীর হইয়া বহুপ্রকারের এজেন্সী সার্ভিসেস করিয়া দেয় তাহার সহিত সম্পর্ক নাই। আজকাল ব্যাঙ্ক জীবন-বীমা, অগ্নি-বীমা প্রভৃতির চাঁদা বা প্রিমিয়াম নিয়মিত ভাবে আদায় করিয়া থাকে। ইহার জন্য আলাদা লিখিত চুক্তি থাকে। ব্যাঙ্ক অনেক সময় কোম্পানীর কাগজ বা শেয়ার খরিদ-বিক্রয় করিয়া দেয়, কিংবা উইলের একজিকিউটাররূপে অথবা দলিলমূলে ট্রাষ্টি-স্বরূপে কার্য্য করে। কখনও কখনও আম-মোক্তার হইয়া কোম্পানীর ডিভিডেণ্ট প্রভৃতি আদায় করে কিংবা চিঠিপত্র তাঁহার নিয়ত পরিবর্তনশীল ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়। এই সব কার্য্য অনেক সময় ভদ্রতা হিসাবে বিনা পারিশ্রমিকে ব্যাঙ্ক করিয়া দেয়; আবার সময় সময় ইহার জন্য কিছু কমিশন কাটিয়া লয়। ব্যাঙ্ক যখন উইলে একজিকিউটাররূপে কার্য্য করে তখন উহা উইলের বিধান-সমূহ মানিয়া চলিতে বাধ্য। এজন্য কোনও প্রকার সন্দেহের কারণ ঘটিলে ব্যাঙ্ক উপযুক্ত আইনজ্ঞ ব্যক্তির মত লইতে পারে বা হাই-কোর্টের আদিম বিভাগে দরখাস্ত করিয়া আদালতের সে সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত তাহা জানিয়া লইতে পারে। ইহার সমস্ত খরচা মৃতের এষ্টেট হইতে সাধারণতঃ পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক যখন ট্রাষ্টিরূপে কার্য্য করে তখন ট্রাষ্ট দলিলের বিধানসমূহ মানিয়া চলিতে বাধ্য। ব্যাঙ্ককে ট্রাষ্টিরূপে নিয়োগ করিবার পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের সম্মতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিনা সম্মতিতে ব্যাঙ্ক ট্রাষ্টিরূপে কার্য্য করিতে বাধ্য নহে।

অনেক সময় মূল্যবান হীরা, জহরৎ, গহনা, দলিলাদি safe custody বা নিরাপদ হেপাজতের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়। ইহার নিমিত্ত ব্যাঙ্ক আলাদা কমিশন লন।

পাস বইয়ের বিষয় বলিতে গেলে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে:

"The Law of banking revolves round the great principle that the relationship of banker and customer is that of debtor and creditor."

কাজেই পাস বই প্রেরণ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের দায়িত্ব নেহাত কম নয়। ব্যাঙ্ক তাহার কাষ্টমার বা আমানতকারীকে পাস বই দিতেছে—এই পাস বইয়ে আঙ্কিক ভুল থাকিতে পারে—এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এ ভুলের জন্য দায়ী কে? সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, আমানতকারীর নিজের হিসাব পরীক্ষা করার কোন কর্ত্তব্য নাই। এখন যদিও ব্যাঙ্কের দায়িত্ব অত্যধিক বলিয়া মনে হইতেছে—কিন্তু আমানতকারী তাহার হিসাবে কত টাকা জমা আছে তাহা না জানিয়া কাহাকেও চেক দিলে তিনি নিজে মুশকিলে পড়িতে পারেন। কাজেই আশা করা সমীচীন যে, "আমানত-কারীর কর্ত্তব্য তাহার নিজের হিসাব পরীক্ষা করা। সাধারণতঃ কাষ্টমার বা আমানতকারীরা আশা করেন:

"That the banker is under a duty to his customer in rendering his account to ensure that the items are set out accurately."

অবশ্য ভুল যে হইবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তবে ইচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সাধারণতঃ ব্যাঙ্কার দায়ী। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য:

"That a false entry deliberately made was binding on the maker"

অনেকেই মনে করেন যে, পাস বইয়ের আঙ্কিক ভুলহেতু আমানতকারী তাহার সুযোগ লইতে পারেন। অথচ এ সম্পর্কে আইন হইতেছে:

"Such entries [*i.e.* in the Pass book] are not conclusive. They are admissions only and as in the case of receipts for payment of money they do not debar the party sought to be bound by them from showing the real nature of the transactions which they are intended to record."

কাজেই দেখা যায় যে, পাস বইয়ে ব্যাঙ্ক ভুলবশতঃ বেশী টাকা জমা দেখাইলেও যখন ব্যাঙ্কার তাহার ভুল ধরিয়াছেন তখন:

"It will then be for the banker to prove affairmatively that the entry was wrong, and if he can do this, his action in rectifying it will be upheld.

ব্যাঙ্কিং আইনে "Estoppel"-এর ব্যবহার প্রায়ই হয়, অবশ্য আইনের ব্যবহার দেশগত কোন প্রভেদ রাখে না। এ ধরনের আইনের প্রয়োগ এদেশে না হইলেও হইতে পারে।

পাস বই সমস্যার সকল দিক বিচার করিলে ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

পাস বইয়ের ভুল ধরা পড়িলে ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য আমানতকারীকে জানানো এবং যতক্ষণ এ বিষয়ের মীমাংসা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক এই ভুলের ভিত্তিতে আমানতকারী যে চেক কাটিয়াছেন তাহার সমস্ত টাকা তাঁহাকে দিয়া দেওয়া।

ফাল্গুনের স্বপ্নছবি

শ্রীকরুণাময় বসু

চিক্কণ সবুজে মোড়া ছায়াস্নিগ্ধ ফাল্গুনের ভোরবেলা
কৃষ্ণচূড়া ঘনবনে ফিরে ফিরে আসে ; ভুলে যাওয়া কবেকার ছেলেখেলা
বকুলের কুসুম-ডালায়, সেই স্মৃতি মনে পড়ে শান্ত অবকাশে :
আশ্চর্য হারানো দিন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে
জীবনের মরা ঘাসে ঘাসে।
গাছে গাছে আলোছায়া রঙ,
পানিহাঁস চোখ বুজে
কি যে খোঁজে কালো জলে শ্যাওলার নতুন সবুজে :
বুলবুল ভুল করে খুঁজে মরে সুরের সারেঙ।
মাঠে মাঠে, শালবনে রৌদ্রছায়া করে ঝিলমিল,
কাঁচপোকা উড়ে আসে, আকাশে ছবির মতো আঁকা গাঙচিল !
বেলা যায়, ঘুঘুডাকা ঘুমঘুম অপরাহ্ণ আসে,
সোনালি পাতায় মোড়া পদ্মকুঁড়ি-দিন
পাখী হয়ে উড়ে গেল গানের আকাশে।

তার পর বেলাশেষে চাঁপাবনে ছলছল চাঁদ,
মনে হ'ল ঘুমচোখে আমার কপালে ছোঁয়
অদেখা কোমল কারো হাত ?
আঙুলে জড়ানো আছে মায়াময় মমতার স্বাদ !
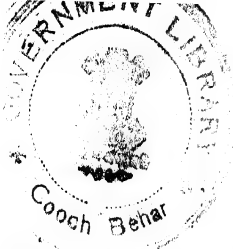
কখনো বা মনে হয় জ্যোৎস্নারাতে এক ঝাঁক পরী
হাওয়ায় এসেছে উড়ে, ফেলে গেছে আনমনে ফুলের পাপড়ি :
ঘন গন্ধে রিমঝিম পরীর নিশ্বাসে
যাদু-লাগে, চোখ বুজে আসে।
দুপুরের শূন্য মাঠ, বেতঝোপ, নীল খড়িবন
আশ্চর্য জ্যোৎস্নারাতে রূপ ধরে চিত্রলেখা পরীর মতন :
চিত্রিত মোমের মুখ, রাঙা ঠোঁট, এলোমেলো চুল,
কখনো কবরী বাঁধে, গুঁজে রাখে চাঁপা, বেলফুল।
অর্ধেক মানুষী রূপ, অর্ধেক নাগিনী,
মাধবী পূর্ণিমা রাতে পদ্মঢাকা কালো জলে চেয়ে দেখো,
মনে হবে যেন চিনি চিনি।
মনে হবে এইখানে পাশাবতী মেয়ে কোন পেতে রাখে ফাঁদ,
ধরেছে রাজার ছেলে, তারাফুল, বনলতা, চাঁদ :
হঠাৎ এসো না কেউ একা একা আপনার ভুলে,
এ বড়ো মায়ার দেশ, মণিমালা চমৎকার
পরীদের কালো এলোচুলে।
ঘুম ঘুম গন্ধমাখা ফাল্গুনের রিমঝিম রাত
মেলেছে রূপালি পাখা, আমার মনের বনে
ফুল হয়, পাখী হয়, পরী হয়ে উড়ে যায় আকাশে হঠাৎ।

ভ্রম সংশোধন

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মাঘ	৪০১	১	১০	সবাহর	সরহের
	৪০১	২	৭	ইন্দ্ৰ	হন্দ্ৰ
	৪০২	১	৪২	হিক্র	হেবজ্র
	৪০৩	২	৩২	বৌদ্ধগণের	বৌদ্ধগানের
	৪০৩	২	৩৪	সরহপাদ ভুসুক	সরহপাদ ও ভুসুকু

প্রবাসী ফাল্গুন সংখ্যার রঙীন ছবির নাম ভ্রমক্রমে 'ধৃতরাষ্ট্রের অরণ্যযাত্রা'
ছাপা হইয়াছে, ইহা হইবে 'একলব্যের গুরুদক্ষিণা'।

শ্রীদীপক চৌধুরী

দুই

গতকল্যের ঘটনাগুলি মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম আমি। বণিক আপিসের বৈচিত্র্যহীন জীবনে হঠাৎ খানিকটা দোলা লেগেছে। সুতপার অনুপস্থিতি বড়বাবুর চোখে পড়েছে।

চারটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। কাজ করতে পারি নি। ঘড়ির দিকে চেয়ে বসে ছিলাম। বড়বাবু আমায় ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "দু'এক দিনের জন্যে ছুটি নেবেন নাকি?"

"না। এক ঘণ্টা আগে ছুটি পেলেই খুশী হব।"

"শরীরটা বোধ হয় আপনার ভাল নেই। আজ ত একটা ফাইলও ক্লিয়ার করতে পারলেন না। কাজের ক্ষতি হচ্ছে।" এই বলে বড়বাবু তাঁর নিজের ফাইলগুলি গুছোতে লাগলেন। এক ঘণ্টার জন্যে ছুটি পেলাম কিনা বুঝতে পারলাম না। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন, "দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু হবে। প্রচুর কাজ বাড়ল আমাদের। স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী।"

"আপনার কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু সুতপা রায়কে দেখতে যাওয়ার দায়িত্ব অনেক।"

"স্বাধীন ভারতবর্ষের চেয়ে সুতপা রায় কি বড় হ'ল?" প্রশ্ন করলেন বড়বাবু।

বললাম, "ঝট করে জবাব দেওয়া মুশকিল। ছাত্রজীবনে স্বাধীনতা কথাটা বহু বার শুনেছি। ওতে এত বেশী নেশা ছিল যে, কথাটার মানে বোঝবার চেষ্টা করি নি। এখন নেশার মাত্রা গেছে কমে। এবার মানে বোঝবার সময় হ'ল।"

"তা হলে গড়িয়া অঞ্চলটা একবার ঘুরেই আসুন। জানাবেন, মিসেস রায় কেমন আছেন।"

"ছোট সাহেব কি তাঁর পুরনো স্টেনোর খোঁজ করেন নি?"

"মাদ্রাজী স্টেনোর কাজ তিনি পছন্দ করেন খুব। তা ছাড়া সুয়েজ খাল বন্ধ। তিনি ত মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।—যাচ্ছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"একটু দাঁড়ান।" বড়বাবু ফাইল হাতড়াতে লাগলেন। সুয়েজ খাল বন্ধ বলে দরকারী মেশিনপত্র আসতে দেরি হচ্ছে আমি জানি। হয়ত দেশের তাতে ক্ষতিও হবে। কিন্তু সুতপার ক্ষতি কি সমাজ কিংবা দেশের ক্ষতি বলে কোন দিনও গণ্য হবে না? তা যদি না হয়, তবে তেমন দেশের নাম যদি ভারতবর্ষও হয় তাতে সুতপার কি যায় আসে? যে পরিকল্পনার জন্যে বড়বাবু আমাদের অল্প মাইনেতে বেশী শ্রমদান করবার অনুরোধ জানাচ্ছেন, সুতপা তার অংশমাত্র নয়। ভারতবর্ষের কোন পরিকল্পনার মানচিত্রে গড়িয়ার খালটিকে আমি দেখতে পাই নি।

আমি চলেই আসছিলাম। বড়বাবু এবার ফাইল থেকে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু বলবেন?"

"মিসেস রায়কে কতদিন থেকে চেনেন?"

"কাল থেকে।"

"ও, হ্যাঁ—আপনিই ত বললেন, কাল তিনি আহত হয়েছেন।"

"আমার একটু ভুল হয়েছে বড়বাবু। তিনি বোধ হয় আহত হয়েছেন অনেক দিন আগে—"

"কত আগে?" ঝুঁকে বসলেন তিনি।

ছোট সাহেব তপন লাহিড়ীর বেয়ারা এসে সামনে দাড়াল। খবর দিল, ছোট সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বড়বাবু উঠে পড়লেন। তাঁর শেষ প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার দরকার হ'ল না। তিনি বললেন, "আচ্ছা, আপনি তা হলে আসুন। খবর দেবেন মিসেস রায় কেমন আছেন। আর ক'দিনের ছুটির দরকার তাও জেনে নেবেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের খবরটা বোধ হয় আপনি রাখেন না মহীতোষ বাবু?"

খবরটা শোনবার জন্যে আমার আগ্রহ হ'ল। তিনি বলতে লাগলেন, "গত পাঁচ বছরের মধ্যে মিসেস রায় এক দিনের জন্যেও ছুটি নেন নি। তাঁর বরাদ্দ ছুটিও নষ্ট হয়ে গেছে। ওই অসুস্থ শরীর নিয়ে কি করে যে তিনি আপিসে আসেন ভেবে অবাক হয়ে যাই। আমি ত গোড়াতেই ঠিক করে রেখেছিলুম, এক সপ্তাহের বেশী টিকবেন না তিনি। দু'শ টাকার চাকরির জন্যে মশাই বালিগঞ্জের সেই সুন্দরী মেয়েটি আজও আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে যায়।

তা ছাড়া আমার ভাইঝিটি আবার শর্টহ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং শিখছে, এবার পরীক্ষা দেবে। কি করি বলুন ত ?”

“আপনি আর কি করবেন বড়বাবু ?”

“না, না—আমার আবার করা-করি কি! আমি ভাবছিলুম সমাজের কথা। কি সাংঘাতিক বিপ্লব মশাই! অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক সব বদলে যাচ্ছে। বালিগঞ্জের সেই মেয়েটি বিয়ে করতে চায় না। গত রবিবারে আমায় নেমন্তন্ন করে খুব খাওয়ালে মশাই। কি একটা হোটেলে নিয়ে গেল। ভেতরে গিয়ে দেখি ছোট ছোট খুপরি, সেখানে গিয়ে বসলুম। বেয়ারা এসে পর্দা ফেলে দিলে। প্রথমেই দেখি ইয়া বড় এক কবিরাজী কাটলেট—বলি হাঁা মশাই মহীতোষবাবু, মিসেস রায়ের কি হাত-পা ভেঙেছে ?”

“না।”

“ভাগ্য ভাল। হাত-পা ভাঙলে ভদ্রমহিলার আর থাকবেই বা কি!” বড়বাবুর নিশ্বাসে সহানুভূতির উত্তাপ। আমি বুঝতে পেরেছিলাম—তাঁর কথা এখনও ফুরোয় নি। গলা-বন্ধ কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে তিনি নীচু সুরে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, “স্বামী-টামি কাউকে দেখলেন সেখানে ?”

“না।”

“জানতুম। আমাদের ছোটসাহেব যে মিসেস রায়ের মধ্যে কি দেখলেন বুঝতে পারি না। শুধু হাত-পা থাকলেই যে স্টেনোগ্রাফার হওয়া যায় না তাও কি আমায় বলে দিতে হবে। এদিকের খবর তো আরও খারাপ।”

“কোন দিকের ?”

“মিসেস লাহিড়ী নাকি খুবই অসুস্থ। শুনছি দিনরাত ভুল বকেন, বোধ হয় রাঁচি পাঠাতে হবে। কি যে মুশকিলে পড়েছি আমি একমাত্র মা কালীই জানেন।”

“আপনার কি মুশকিল হ'ল ?”

“ওই যে বালিগঞ্জের মেয়েটি তাকে কথা দিয়েছি। কোন্ একটা বিস্কুট কোম্পানীতে কাজ করছে, অল্প মাইনে। দেশী কোম্পানীগুলোর কি যে হাল হয়েছে—খবর দেবেন। মিসেস রায়কে বললেন, দু'চার মাসের ছুটি চাইলেও তিনি পাবেন, সাহেবকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে দিতে পারব, পারবই।”

বড়বাবু আর অপেক্ষা করলেন না।

আমিও বেরিয়ে এলাম আপিস থেকে।

হ্যারিসন রোডের সাধারণ একটা হোটেলে আমি থাকি। লম্বা খাঁচের বাড়ীটা, তারই পাঁচ তলায় আমার ঘর। এখান থেকে যে-জগৎটা আমি এযাবৎ দেখে এসেছি তার সঙ্গে গড়িয়ার নব-আবিষ্কৃত জগতের কোন সাদৃশ্য নেই। সাদৃশ্য থাকলে আজ আমি পাঁচ নম্বর বাস ধরে সুতপা রায়কে দেখতে যেতাম না।

বসবার ঘরটা দেখলাম আজ খালি, কেউ সেখানে নেই। কি করব ভাবছিলাম, চার-পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলাম। মনে হ'ল ঘরের দেওয়ালগুলি আমার ওপর সতর্ক নজর রেখেছে। বিপিন চাটুজ্জের গুলি খেয়ে এরা আর কাউকে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করবার মত এদের আর স্বাস্থ্য নেই, পলস্তারা সব খসে পড়েছে। গর্ত দুটো শুধু বিদ্রোহী লালু সরকারের চোখের মত জল জল করছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে লালু সরকার কি আজও পরাধীন ?

বলরাম ঘরে ঢুকল। কাল তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, “মাসীমা কোথায় রে ?”

জবাব দিল না বলরাম। আমি লক্ষ্য করলাম, বলরামের মুখ শুকনো, পা দুটো কাঁপছে। শার্ট দুটো ঘামে চুপ চুপ করছে। দু'পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে রেখেছে। ওপাশের ওই চৌকির ওপর ধপ করে বসে পড়ল বলরাম। আমি এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। গড়িয়ার আকাশ থেকে সূর্য যে বিদায় নিয়েছে। বালিগঞ্জে হয়ত এখনও আলো আছে, কিন্তু সরকার-কুটীর বসবার ঘরে সন্ধ্যা সমাগত। জিজ্ঞাসা করলাম, “কি হয়েছে রে ? জ্বর এল নাকি ?”

জবাব দিল ষষ্ঠী দত্ত। এর পেছনে পেছনে সেও এসে ঘরে ঢুকেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে মেক-আপ ম্যান বলল, “রক্ষিতের মোড়ে ভিরমি খেয়ে রাস্তার ওপর পড়ে গিয়েছিল বলরাম। রিফিউজীর বাচ্চা কিনা তাই পনের টাকাকে এক গাদা টাকা মনে করে।” এই বলে ষষ্ঠী দত্ত পকেট থেকে বিড়ি বার করল। বিড়ি ধরিয়ে সে বলতে লাগল, “ছোঁড়াটা এক সঙ্গে পনর টাকা কখনও দেখে নি। একটু আগে আমার পকেট থেকে পনরটা টাকা খোয়া গেছে। বাস থেকে নেমে দেখি পকেটের তলার দিকটা নেই, সবটাই কাটা। বলরামকে এত করে বোঝালুম যে, কলকাতার শহরে মাত্র পনর টাকা খোয়া গেলে লোকে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসে কিন্তু এই দেখুন ত, খবরটা শোনবার পর থেকে রিফিউজীর বাচ্চা প্রথমে ভিরমি খেয়ে পড়ে গেল, তার পর এখন ত বসে বসে কাঁপছে। ওরে ও বলরাম—” ষষ্ঠী দত্ত চৌকির কাছে এগিয়ে এসে পুনরায় বলল, “দু'চারটে রদ্দা না খেলে তোর কাঁপুনি থামবে না দেখছি। এ হচ্ছে গিয়ে দাদা হোমিওপ্যাথি চিকিচ্ছে, বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয় করা। ওঠ—ফিল্ম-

ষ্টারদের মুখে দু'পোঁচড়া রং মাখালেই ষষ্ঠী দত্ত পনর টাকা রোজগার করতে পারে—"

"কে রে এত লম্বা চওড়া বক্তিমে দিচ্ছে? আমাদের ষষ্ঠী না? বলি হ্যাঁ রে ষষ্ঠী, গেল মাসের পুরো টাকা ত দিস নি? আমি কি তোদের ধার করে খাওয়াব নাকি? মুদির ছেলেটা তাগাদা দিচ্ছে সেই পয়লা তারিখ থেকে। তোরা সবাই যদি বাকিতে খেতে চাস তবে সংসারটা আমি চালাই কি করে? ওখানে কি বাবা?"

"কালকের বাবুটি আবার এসেছেন মাসীমা।" বলল ষষ্ঠী দত্ত।

"কালকের বাবুটি? না ষষ্ঠী, ওকে বলে দাও এখানে আর জায়গা নেই। আমরা আর পেইং গেষ্ট রাখতে পারব না। মাসীমার সংসারে সবাই বিনে পয়সায় খেতে চায়। ওরে ও ষষ্ঠী, বাবুটিকে জিজ্ঞেস কর পয়লা তারিখে আগাম দিতে পারবেন কিনা। আজ সকালে দু'জন প্রফেসর এসেছিলেন —যাদবপুরে নাকি নতুন নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে রে ষষ্ঠী?"

"হ্যাঁ।"

"সেই বাড়ীতে নাকি প্রফেসর দু'জন চাকরি করেন। মা সরস্বতীর কপালে এত দুঃখও ছিল। তাঁরা কিন্তু বাবা আগাম দিয়েই থাকতে চান। বলি ও ষষ্ঠী, আলোটা জাল না রে। বুড়ী হয়ে গেছি কিনা, চোখে ভাল দেখতে পাই না। আমাদের ষষ্ঠী হচ্ছে গিয়ে মেক-আপ ম্যান। ফিল্ম কোম্পানীর মেয়েদের মুখে রং মাখায়। হ্যাঁ রে ষষ্ঠী, আমার মুখে রং মাখিয়ে বয়স কমাতে পারিস?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাসীমাই আবার বললেন, "পারবি নে। পারলেও পঞ্চাশটা বছর লুকোই কি করে! তোর তুলির আঁচড় আমি চিনি।"

ষষ্ঠী দত্ত আলো জালল। আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "কে? মহীতোষ? আমি ভাবলুম, আমার হোটেলে কেউ থাকতে এল বুঝি, বস।" মাসীমার গলার সুর বদলে গেল।

হেসে ফেললাম আমি। অনুরোধের সুরে বললাম, "পয়লা তারিখে সব টাকাই আমি আগাম দেব। দেবেন থাকতে?"

ইত্যবসরে মাসীমা বলরামকে দেখে নিয়েছেন। ওর মুখ দেখে তিনি নিমেষের মধ্যে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ষষ্ঠী দত্তর কাছ থেকে ঘটনাটা শুনলেন তিনি। বলরামের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মাসীমা বললেন, "শক পেয়েছে। কেউ কেউ লাখ পনর গেলে শক পায়। সংসারটা বড় বিচিত্র জায়গা! ষষ্ঠী, রান্নাঘরে গরম দুধ আছে। ওকে নিয়ে যা সেখানে। খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দে।"

বলরামকে নিয়ে ষষ্ঠী দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাসীমা বললেন, "বস বাবা, বস। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে-ছিলুম, আঘাত যত বড়ই হোক, কেউ আর আমায় দুঃখ দিতে পারবে না। মনটাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। ছুঁতে পারলে বুঝতে, আজও সেটা পাথর হ'ল না। বাবা মহীতোষ, এ যুগের সবচেয়ে বড় উন্নতিটা যখন আমার চোখে পড়ল, তখন দৃষ্টিশক্তি আমার সবচেয়ে ক্ষীণ। এমন কি তোমাকে পর্যন্ত আমি চোখে দেখতে পাই নি।" এই বলে মাসীমা বসে পড়লেন চৌকির ওপর, আমারই ঠিক পাশে। ঈষৎ পূর্ববঙ্গ গ্রাম্য সুর আর তাঁর গলায় নেই। যুগের বিশ্লেষণ তাই আমার শুনতে ভালই লাগছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সবচেয়ে বড় উন্নতিটা কি মাসীমা?"

জবাব দিতে দেরি করলেন না তিনি। বললেন, "শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিষ্ঠুরতা আজ চরমে উঠেছে। জান মহীতোষ, এদের মন থেকে ক্রমে ক্রমে দুঃখবোধ পর্যন্ত লোপ পাচ্ছে? তোমায় একটা উদাহরণ দিই শোন।" এই বলে মাসীমা বেশ জড়সড় ভাবে পা গুটিয়ে চৌকির ওপর বসলেন, চোখ বুজে অতীত উদাহরণ অন্বেষণ করতে লাগলেন তিনি। তার পর একটু বাদেই আবার বলতে লাগলেন, "প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই গ্রামে আমি বৌ হয়ে এসেছিলুম। বোধ হয় তখন আমার বয়স ছিল দশ কি বারো। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে ঘটকদের গোয়ালে আগুন লাগে। তেমন কিছু একটা সর্বনেশে ব্যাপার নয়। কিন্তু চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। আমার শ্বশুর ত লাফিয়ে নেমে পড়লেন উঠোনে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তোমার মেসো-মশাইকে ঘুম থেকে তুললেন। আমি দেখলুম, বালতি হাতে নিয়ে বাপব্যাটাতে মিলে ছুটতে লাগলেন ঘটকদের বাড়ীর দিকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চতুর্দিকে তুমুল কাণ্ড সুরু হ'ল। শুধু বোড়াল আর বোষ্টমঘাটা নয়, চারদিকের গ্রাম থেকেও লোক সব ছুটে আসতে লাগল। সে সময় ত বাবা আশী নম্বর আর আটাত্তর নম্বর বাস ছিল না। পরের দিন সকালবেলা শুনলুম, সোনারপুর, গোবিন্দপুর এমনকি বারুই-পুর থেকেও অনেকে এসেছিল আগুন নেভাতে। কাউকেই অবশ্যি আগুন নেভাবার জন্যে এক বালতিও জল ঢালতে হয় নি। ঘটকদের ছেলেরাই নিভিয়ে ফেলেছিল। ক্ষতি ওদের তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু ওরা যখন বালতি হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন তখন আমি দেখলুম বালতিগুলো শূন্য নয়, লাভের জলে তা একেবারে ভরপুর। ঘটকদের লোকসান হতে পারে ভেবে এতগুলো লোক যে ছুটে এল

তার মধ্যে কি সামাজিক লাভ কিছু দেখতে পাচ্ছ না মহীতোষ ?”

বললাম, “পাচ্ছি।”

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাসীমা বললেন, “অথচ বলরামের মত একটা কচি ছেলের সর্বনাশ দেখে কৈ সারা ভারতবর্ষের কেউ ত চোখের পাতাটি পর্যন্ত নাড়ে না ? থাক বাবা থাক, এ সব বড় ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। ভারতবর্ষকে যাঁরা শিক্ষার আলো দিয়ে আলোকিত করবার চেষ্টা করছেন তাঁদের দৃষ্টিতে যেন অন্ধকার না থাকে। মহীতোষ, আমি বাবা বলরামকে নিয়ে বড্ড মুশকিলে পড়ে গেছি। কাজকর্ম কিছু নেই তোমাদের আপিসে—” কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

আমার নিজের কিছু বলবার মত কথা ছিল না। তা ছাড়া সরকার-কুঠীতে ঢুকেছি কথা শুনতে, বলতে নয়। কিন্তু মাসীমা দেখলাম চুপ করে বসে রইলেন। দেওয়ালের গর্ত দুটোর দিকেও তিনি দৃষ্টি দিচ্ছেন না। বুঝলাম, বলরামের কাঁপুনি তাঁকে অস্থির করে তুলেছে।

আলোচনা চালু করলাম আমিই। বললাম, “আজকালকার শাসনবিধি আগেকার দিনের মত নেই। শতকরা একান্ন ভাগ লোককে ভাল করে খাইয়েপরিয়ে রাখতে পারলে রাষ্ট্রনায়কদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে না। একজন বলরামের জন্যে পৃথিবীর কোন মসনদই টলতে পারে না মাসীমা।”

“তোমার খবর হয়ত মিথ্যে নয় বাবা। কিন্তু আমাকেও ত একটা ছোটখাটো সংসার চালাতে হয়। কৈ কাউকে ত এক বেলার জন্যেও না খাইয়ে রাখতে পারি না। শুধু একান্ন ভাগের কথা যদি ভাবতুম, তা হলে তোমার মাসীমার হোটেলে উদ্বৃত্ত দেখতে পেতে। কিন্তু এখন কি দেখছ ? সরকার-কুঠীর সবগুলো দেয়াল থেকে পলস্তারা খসে পড়েছে।” এই বলে মাসীমা শুধু একটা দেওয়ালের ওপরই দৃষ্টি ফেললেন। তার পর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে পুনরায় বলতে লাগলেন, “ষষ্ঠী যেদিন বলরামকে নিয়ে এল সেদিনটা ছিল মাসের শেষ তারিখ। হিসেবের ভাত হাঁড়িতে আর একটাও ছিল না। তবুও কি বলরামকে উপোস করিয়ে রাখতে পারলুম ? না বাবা, তোমাদের রাষ্ট্রনীতি যত ভালই হোক, আমাদের হোটেল-নীতিকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না। এখানে শতকরা এক শ' ভাগ লোকেরই ক্ষিদে পায় এবং তাদের খাওয়াতেও হয়। আমাদের হিসেবে এক পারসেণ্ট লোকও মানুষ। একান্ন আর উনপঞ্চাশ ভাগের মধ্যে এক তিলও পার্থক্য নেই। হ্যাঁ বাবা মহীতোষ, আমাদের হোটেল-নীতির মধ্যে কি অসভ্যতার গন্ধ পাচ্ছ ? আমাদের জংলী ভাবছ, না ? কিন্তু সোঁদরবন ত এখান থেকে অনেক দূর।”

“দূর আর কৈ ? যেখান থেকে নম্বর দেওয়া বাস চালু হয়েছে তার দূরত্ব বোধ হয় আধ মাইলও নয়। আমার মনে হয়, গড়িয়ার খালটা মরা বটে, কিন্তু এটাই বোধ হয় দু' অঞ্চলের সীমানির্দেশ করছে।” এই বলে হেসে ফেললাম আমি।

মাসীমা মুখ নিচু করে বসে রইলেন। খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম সরকার-কুঠীর বাগানে অন্ধকার নেমে এসেছে। কলকাতার রাস্তায় ঠিক এমন অন্ধকার কোন দিনও চোখে পড়ে নি। ঘরে বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগছে। রাত্রির রূপ এখানে স্বাভাবিক। ঘড়ি না দেখেও বলে দেওয়া যায় দিন শেষ হয়েছে। কলকাতার ব্যবস্থা আলাদা। সেখানে অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে রাস্তার দু'ধারে আলোর সারি।

তবুও মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে যেটুকু অন্ধকার আমার চোখে পড়েছে তার কোন রূপ নেই, দেহ নেই। কৃত্রিমতার ঔজ্জ্বল্য কলকাতার অন্ধকারকে কুৎসিত করে রেখেছে।

ঘরের নৈঃশব্দ্য ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠছিল। আমি একটু নড়ে চড়ে বসলাম। মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, “উঠছ নাকি ?”

“না। আসল খবরই ত আমার এখনও জানা হয় নি। মিসেস রায় কেমন আছেন ?”

“কাল বাবা রাত্রির দিকে জ্বর এসেছিল। কিন্তু আজ সকাল থেকে সে ভালই আছে। বুকের বাঁ দিকটাতে একটু জখম হয়েছে।”

কথাটা আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হ'ল না। মাসীমা বোধ হয় সুতপার জখমটাকে ছোট করে দেখাতে চাইছেন। আমি তাই বললাম, “গতকাল তিনি যখন মাটিতে পড়ে গেলেন তখন অনেকগুলো লোকের পা-ই তাঁর গায়ের ওপর পড়েছিল।”

“হ্যাঁ বাবা, তুমি ঠিকই বলেছ। একটা লোকের জুতোর তলায় বোধ হয় নাল বাঁধা ছিল।”

সুতপা রায়ের জন্যে উদ্বেগ অনুভব করলাম। মাসীমা বুঝতে পারলেন তা; তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, “সুতপার আসল জখমটা তুমি দেখ নি ...বলি ও মহীতোষ, তোমাদের ছোটসাহেব ত ওকে একবার দেখতে এলেন না ?”

আমি একটু চমকে উঠলাম। মনের ভাব গোপন রেখেই

মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "লাহিড়ী সাহেবের আসবার কথা আছে নাকি ?"

"না কথা কিছু নেই, এলে ভাল হ'ত। তাঁর কাছেই ত মেয়েটা চাকরি করে।"

"হয়ত আসবেন। সুয়েজ খাল বন্ধ বলে তিনি আপিসের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। খবর দেওয়ার দরকার থাকলে—"

"না, না বাবা, দরকার কিছু নেই।" একটু থেমে মাসীমাই আবার বললেন, "লালু যখন মুখ থুবড়ে গড়িয়ার খালে পড়ে গেল, তখন ওর জন্যে আমি খুব গর্ববোধ করেছিলুম, লালু পেট্রিয়ট আমি তার মা। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যে ছেলে ইংরেজের গুলি খেয়ে মরেছে তার মা হওয়ার মত সৌভাগ্য গড়িয়ার আর কোন মায়েরই হয় নি। কিন্তু—মহীতোষ, তুমি কি মাসীমার হোটেলে এক পেয়ালা চা ও খাবে না ?"

"খাব। একটু পরেই খাব। আপনার আগের কথাটা কিন্তু শেষ হয় নি।"

"কি যেন বলছিলাম ?"

"পেট্রিয়ট লালু সরকারের কথা।"

"ও হ্যা। পেট্রিয়ট কথাটা শুনলে এখন হেসে হেসে মরে যেতে ইচ্ছে করে। ভগবান রক্ষে করেছেন, ও কথাটা এখন আর খুব বেশী শোনা যায় না। নইলে—মহীতোষ, সুয়েজ খালের সম্বন্ধে কি যেন বলছিলে ?"

"ইংরেজ আর ফরাসীরা মিলে খালটা জবরদখল করতে চেয়েছিল। ওঁরা বলছেন, ইংরেজদের সাম্রাজ্যভোগের নেশা এখনও কাটে নি।"

"ওরা কারা ?'

"ভারতবর্ষের যাঁরা মাথাওয়ালা লোক। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন দেশ। অতএব এঁরা যা বলবেন তা মেনে নিতেই হবে। হয়ত ইংরেজরা সত্যিই মানুষের সর্ব্বনাশ করতে চায়।"

"কি জানি বাবা, এঁদের কথা শুনলে আমার ত হাসি পায়। কেন পায় জান ?"

"না।"

হঠাৎ কান খাড়া করে মাসীমা পেছন দিকের জানালার পানে মুখ ঘোরালেন। কি যেন শোনবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। একটু পরে আমিও শুনতে পেলাম, কে যেন দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে। মাসীমা এবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, "না, তপা নয়। ভেবেছিলুম, মেয়েটা বুঝি নিচে নামছে। মহীতোষ, তুমি ত আমাদের হোটেলটা একদিনও ভাল করে দেখলে না। দু'দিনই সন্ধ্যেবেলায় এলে। একদিন দুপুরের দিকে এস বাবা। চার দিকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব। গড়িয়া খালটা সরকারকুঠীর পেছন দিয়ে পুব দিকে চলে গেছে। এপারে আমরা থাকি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এপারের সব ক'টি মানুষই হতভাগ্য। ইংরেজ কিংবা ফরাসীদের সঙ্গে এদের কারো সম্পর্ক নেই। অনেকে ফরাসী কথাটা পর্যন্ত কানে শোনে নি। তবুও এদের জীবনের মাটি সর্বনাশের বারুদ লেগে লেগে নিস্ফলা হয়ে গেল। তোমরা সুয়েজ খাল দেখেছ, গড়িয়া খাল দেখ নি ওপারের প্রতিবেশী রাম আর শ্যামবাবু থেকে সুরু করে সবাই যেন অনবরত চেষ্টা করছে এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্যে। এদের বুকের ওপর দিয়ে প্রতিদিন যে সব পাগুলো পার হয়ে যাচ্ছে সেগুলো সব স্বদেশী পা বাবা। বলরামকে দেখলে না ? সুতপার কতটুকু দেখেছ ? দেখতে হবে ষষ্ঠীকেও। চিরুণীর ভাঙা-দাঁতের মত ভাঙা-মানুষের একটা লম্বা মিছিল রোজই আমার চোখের সামনে দিয়ে গড়িয়ার খালটা পার হয়ে যাচ্ছে। আমি চোখে ভাল দেখতে পাই না, তবুও আমি বুঝতে পেরেছি যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের পাগুলো কি কালো! কে রে? বাইরে কে? ভেতরে আয় না।—ও চণ্ডী! এস, কখন এলে? মহীতোষ, এর নাম হচ্ছে চণ্ডী ভটচাজ, বামুন। আমার বাপের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে এরা থাকত। এখান থেকে মাইল ছয় দক্ষিণে। গোবিন্দপুরের নাম শোন নি ?"

"আজ্ঞে না।"

"সোনারপুর থেকে বেশী দূরে নয়। নেতাজী সুভাষ বোসদের আদিবাড়ী ওই অঞ্চলেই ছিল। যাক গে। চণ্ডী এখন বালিগঞ্জ অঞ্চলে জ্যোতিষী করে, থাকে আমার হোটেলে। বলি হ্যাঁ চণ্ডী, কত রোজগার করলে আজ ?"

"শনির দশা না কাটলে রোজগারের অঙ্ক আর বাড়বে না। মাসীমা আর মাত্র আঠারো মাস বাকী। তার পর—হেঃ, বৃহস্পতির খেলাটা একবার দেখে নিয়ো। তোমার বাকিবকেয়া চুকিয়ে দিতে চণ্ডী ভটচাজ এক মিনিটও দেরি করবে না।"

"আরও আঠারো মাস যদি অপেক্ষা করতে পারি, তা হলে দু'চার মিনিট দেরি হলেও অসুবিধে আমার হবে না। চণ্ডী, এবার বল্, তপার কোষ্ঠীতে কি দেখলি ? বিচার শেষ হয়েছে ত ?"

চণ্ডী ভটচাজ ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকালেন। বিচারের ফলাফল সম্ভবতঃ তিনি পকেটেই রেখেছিলেন। মনোযোগ দিয়ে লোকটিকে দেখছিলাম আমি। ফতুয়ার বাঁ দিকের

পকেটটা নেই, খুলে পড়ে গেছে। বোধ হয় অনেক দিন ধরে তিনি অনেক লোকের ভাগ্যের বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়িয়েছেন বালিগঞ্জের বড় বড় বাড়ীগুলোর সামনে দিয়ে। ভাগ্যবানদের ফলাফল বয়ে বেড়াবার মত ফতুয়ার কাপড়টা শক্ত নয়। ঘাড়ের দু'দিকে দেখলাম ডবল তালি পড়েছে। প্রথম তালিটা ফুটো হওয়ার পরে দ্বিতীয় তালি লাগাতে হয়েছে তাঁকে। মেটে রঙের ফতুয়ার ওপর লাল কাপড়ের তালি। চণ্ডী ভটচাজকে এতটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম বলেই হয়ত মাসীমা গম্ভীর সুরে বললেন, "চণ্ডীর গণনায় বেশী ভুল থাকে না। আর থাকলেই বা কি? ও ত কারো ক্ষতি করছে না! চণ্ডী তার পেট চালাবার জন্যে রোজগার করছে। দু'মুঠো ভাতের জন্যে ওকে বার ঘণ্টার চেয়েও বেশী মেহনত করতে হয়। হ্যাঁ বাবা মহীতোষ, দেশের যাঁরা নেতা তাঁরা ক'ঘণ্টা মেহনত করেন?"

"আমি, মানে—সত্যি কথা বলতে কি, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কোন খবরই রাখি না।"

"ভোট দাও নি?" চেঁচিয়ে উঠলেন মাসীমা।

"না। আপিস সেদিন ছুটি ছিল বলে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলুম। আমাদের হোটেলের পাঁচ তলায় প্রচুর হাওয়া পাওয়া যায়।"

চণ্ডী ভটচাজ এবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাকে আমি বোধ হয় কোথাও দেখে থাকব।"

"অসম্ভব নয়। আপিস কোয়ার্টারে দেখা হতে পারে। সেদিকে যান না?"

"দৈবে সৈবে। ওদিকটায় গেলে হয়ত উপার্জন কিছু বাড়ে, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করে না। নাঃ, উপোস করে থাকলেও যাব না।"

"কেন?"

জবাব দিলেন মাসীমা। তিনি বললেন, "চণ্ডী যেতে চাইলেও আমি যেতে দেব না।" মাসীমা ভাবলেন একটু। তার পর আবার তিনি বললেন, "ও অঞ্চলে বড্ড বেশী শিক্ষিত লোকের ভিড়। চণ্ডীকে সবাই ভিক্ষুক মনে করে। আমার হোটেলে যারা থাকে তারা কেউ ভিক্ষে করে না। এবার বল দিকি বাছা, তপার সময়টা কেমন? আর কতদিন ওকে ভুগতে হবে?"

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করলেন চণ্ডী ভটচাজ। শেষবারের মত ভেবে তিনি ঘোষণা করলেন, "ভাল সময় আসতে বাধ্য।"

"কতদিন বাকী তাই বল্ না রে।" অনুরোধ করলেন মাসীমা।

"বেশী দিন আর অপেক্ষা করতে হবে না। সৌভাগ্যের সুরু তাঁর এখানে থেকেই হবে।"

"বলিস কি চণ্ডী? হিসেব করে বললি, না অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লি?"

"হিসেব করেই বললুম। রাহুর দৃষ্টি ওর পক্ষে ক্ষতিকারক। এবার সেই জায়গা বদল করছে।" এই বলে চণ্ডী ভটচাজ আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে ঘোষণা করলেন, "সৌভাগ্য এমন জিনিষ মাসীমা যে, সময় এলে তার পা গজায়। নিঃশব্দে সে হেঁটে চলে আসে, এসে দাঁড়িয়ে থাকে মাথার কাছে। ডাকবারও দরকার হয় না—" দ্বিতীয় বার আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে তিনি ঘোষণা শেষ করলেন, "সৌভাগ্যকে কেউ নেমন্তন্ন করে আনতে পারে না, সে হঠাৎ আসে।"

চণ্ডী ভটচাজের গণনায় ফাঁকি আছে মনে করে মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "মহীতোষের দিকে অমন করে চেয়ে কি দেখছিস চণ্ডী? তুই বোধ হয় ভেবে নিয়েছিস, মহীতোষ হচ্ছে গিয়ে তপাদের আপিসের ছোটসাহেব?"

"তা কেন ভাবতে যাব? লাহিড়ী সাহেবকে আমি চিনি না বুঝি?"

"চিনিস? তুই যে আমায় অবাক করলি চণ্ডী!"

"সেদিন তাঁর বাড়ী গিয়েছিলুম। দেওদার স্ট্রীটে সাহেবি কায়দায় দেখলুম বাড়ীঘর সাজানো। বললুম, এসব তাঁকে এক দিন ছেড়ে চলে যেতে হবে। লাহিড়ী সাহেব হচ্ছেন গিয়ে আমার বড় মক্কেল। স্ত্রীর খুব অসুখ যাচ্ছে।"

"কি অসুখ?" আগ্রহের আতিশয্যে মাসীমা খাড়া হয়ে বসলেন।

"মাথার অসুখ। তাঁকে বলে এলুম, সেরে যাবে, গোমেদ পরবার জন্যে উপদেশ দিয়ে এসেছি।"

"কই তপার মুখে ত এসব কথা কিছু শুনি নি?"

আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম উঠে পড়ব। হঠাৎ উঠে পড়বার কারণটা খুঁজতে গিয়ে দেখি, তপন লাহিড়ীকে আমি ঈর্ষা করছি। মনের সুস্থতা ফিরিয়ে আনা দরকার। সুতপা রায়কে এখন পর্যন্ত আমি চিনি না। কিন্তু তপন লাহিড়ীই বা ওকে চেনবার সুযোগ পেলেন কি করে? ধৈর্য ধরলাম আমি।

"মাসীমা, মাসীমা কোথায়?" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। মুখটা তাঁর দেখতে পেলাম না। তিনি বাইরে থেকে পাঞ্জাবীটা খুলতে খুলতে এলেন। মাথার দিকটাতে পাঞ্জাবীটা আটকে গেছে।

মাসীমা বললেন, "বোতাম খোল নি, পাঞ্জাবীটা মাথার ওপর দিয়ে গলবে কি করে বিজয় ?"

"ওঃ, তাই ত। আগে বোতামগুলো খুলে নিচ্ছি। সুতপা কেমন আছে মাসীমা ? আমার সেই ডাক্তার বন্ধুটিকে খবর দিয়েছি। বাড়ী ফেরবার মুখে সে একবার এসে দেখে যাবে। আজ আর জ্বর আসে নি ত ?"

"না। তোমার পকেট থেকে টাকা পড়ে গেল যে বিজয়। মহীতোষ, বিজয় হচ্ছে ইস্কুলের মাষ্টার। কাল এর সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি।"

"না।"

"ছাত্র পড়িয়ে ওর ফিরতে একটু রাত হয়। আগে এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিটের মধ্যে চারটে টিউশনি করত—"

বাধা দিয়ে বিজয়বাবু বললেন, "এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট নয়, এক ঘণ্টা পনর মিনিট। মশাই, মাসীমা আমার রোজগার কমিয়ে দিলেন। এখন একটাই করি।"

"তা কি করব বাছা ? মাসীমার হোটেলে যারা থাকবে তাদের নীতি একটা মানতেই হবে। বিজয়ের কীর্তিটা তা হলে শোন।"

"আমি উঠছি মাসীমা। দুটো নতুন কোষ্ঠী তৈরির অর্ডার পেয়েছি।"

এই বলে চণ্ডী ভটচাজ উঠলেন। বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, "মাত্র দুটো ? তা হলে জ্যোতিষসম্রাট হতে আপনার কত দিন লাগবে ভটচাজ মশাই ?"

"সম্রাট হওয়ার দরকার কি ?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিজয়বাবুর দিকে চেয়ে মাসীমা বললেন, "সম্রাটদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। চণ্ডী যা রোজগার করে তার একটি পয়সাও কালো নয়। পয়সা ওরা চেনে। প্রাচীন কালে ভটচাজদের গঙ্গা দিয়ে চাঁদসদাগরের নৌকো চলত। মহীতোষ, তুমি বোধ হয় জান না যে, একসময়ে গড়িয়ার ওপাশ দিয়ে পঞ্চবটীর গা ঘেঁষে গঙ্গার ছিল গতি। শোনা যায়, চাঁদসদাগর পঞ্চবটীর কালীমন্দিরে যাওয়া-আসার সময় পূজো দিয়ে যেতেন। এখন সেই গঙ্গা বহু দূরে সরে গিয়েছে, কিন্তু নামটা রয়ে গেছে। আমার বাপের বাড়ীর সামনের পুকুরটাকে ঘোষেদের গঙ্গা বলে। চণ্ডীদেরটার নাম তো শুনলেই। যারা চাঁদসদাগরের পুণ্যি পেয়েছে তারা পয়সা চেনে। কালো পয়সাতেও ওরা হাত দেবে না। বিজয়, তোমার সেই গল্পটা বলব নাকি ?"

"ও তো শুধু আমার একলার গল্প নয়—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো বলি বিজয় বাঁড়ুয্যে হচ্ছে এ অঞ্চলের একমাত্র আদর্শ শিক্ষক। কিন্তু বাবা প্রথম যখন এখানে থাকতে এলে, তখন কি ছিলে ? বুঝলে মহীতোষ, এক ঘণ্টা পনেরো মিনিটের মধ্যে বিজয় চারটে টিউশন করে বাড়ী ফিরে আসত। ইস্কুলে যা মাইনে পেত তার চেয়ে বেশী রোজগার ছিল বাইরে। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হ'ল, কচি কচি ছেলেগুলোর পরকাল নষ্ট করছে আমাদের বিজয়। বিপ্রদাসবাবু দেখি একদিন সন্ধ্যেবেলা এখানে এসে উপস্থিত। উনি ওই রক্ষিতের মোড়ে থাকেন। তাঁর ছেলেকে বিজয় প্রাইভেটে পড়াত। বিপ্রদাসবাবু বললেন যে, তাঁর মেজো ছেলে প্রথম হয়ে ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছে। পাস করার মত ছেলে সে নয় বলেই তো তিনি বাড়ীতে মাষ্টার রেখেছিলেন। সে প্রথম হ'ল কি করে ? আর তাও মাত্র ছ'মাস মাষ্টার রাখবার পরে! এমন পয়লা নম্বরের সোনারচাঁদ তো বিপ্রদাসবাবুর তিন পুরুষের মধ্যে একটিও জন্মায় নি। ছেলেকে ডেকে নিয়ে এসে তিনি পরীক্ষা করতে বসলেন। তিনটি সরল অঙ্কের মধ্যে তিনটিই সে ভুল করল। এক লাইন বাংলা লেখার মধ্যে পাঁচটা বানান ভুল। তার পর ?"

মাসীমার গল্প বলার ভঙ্গি দেখে চণ্ডী ভটচাজ হাসছিলেন। বিজয়বাবু মাথা নিচু করে বসেছিলেন। আমি শুধু গল্প শুনছিলাম না, সমগ্র সরকার-কুঠীর চরিত্রটা বোঝবার চেষ্টাও করছিলাম। পলস্তারা-খসা ভাঙাচোরা বাড়ীটার মেরুদণ্ড এখনো খুবই মজবুত। বোধ হয় মাসীমা তাঁর নিজের মেরুদণ্ডের বাঁধুনি দিয়ে সরকার-কুঠীর মেরুদণ্ড খাড়া রেখেছেন। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে মাসীমার গল্প শুনতে লাগলাম।

তিনি বিজয়বাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "এতে লজ্জার কিছু নেই বিজয়, বরং অপরাধ স্বীকার করার মধ্যে গৌরব আছে। শুনেছি খ্রীষ্টভক্তরা পুরোহিতের কাছে গিয়ে সদাসর্বদা নিজেদের পাপের কথা কবুল করে আসে। নিয়মটা ভাল। গল্পটা এবার শোন। তার পর বিপ্রদাসবাবু বোধ হয় ছেলেটাকে মারধোর করলেন। ওমা, মার খেয়ে ছেলেটা বলে কি জানো ? বলে যে, পরীক্ষার প্রশ্নগুলো ওর জানাই ছিল। জানিয়েছে বিজয়। মাষ্টারীতে ওর খুব নাম। ওর ছেলেরা সব ভাল নম্বর পেয়ে পাস করে। বিপ্রদাসবাবু যখন এলেন বিজয় তখন বাড়ী ছিল না। তাঁর কথা শুনে আমার তো মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। ওর হয়ে আমি বিপ্রদাসবাবুর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলুম। জানি, এমন অপরাধের ক্ষমা নেই। পৃথিবীর সর্বত্রই তো শিশুবধকে মহাপাপ মনে করে। বিপ্রদাসবাবু যাওয়ার সময় দুঃখ করে বলে গেলেন, একা বিজয়বাবুকে দোষ দিয়েই

বা কি করব ? হয় ত আরও অনেকে এমন কাজই করে বেড়াচ্ছেন। নীতিহীন মানবসমাজের ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি। কাল থেকে বিজয়বাবুর আর পড়াবার দরকার নেই। ওদের ইস্কুলেও আর ছেলেটাকে রাখা চলে না। বললুম, বিজয়কে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কাল থেকে সে শুধু আপনার ছেলেকেই পড়াবে। মাইনে যা আপনি দিচ্ছেন, তাই-ই দেবেন। বিপ্রদাসবাবু তাঁর স্বীকৃতি জানিয়ে ছড়ি দোলাতে দোলাতে এই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মহীতোষ, আমি যেন দেখলুম বিপ্রদাসবাবুর চতুর্দিকে শতাব্দীর অন্ধকার ক্রমশঃই ঘন হয়ে আসছে। তিনি ছড়ির আঘাতে অন্ধকার দূর করবার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু পারছেন না। ছুটে গেলাম পেছন দিকে। গড়িয়ার খালে দেখলাম মাত্র এক ফুট জল! মরতে পারলাম না। লালুও তো ঠিক এইখানেই মরেছে। তার তপ্ত নিঃশ্বাস আমার গায়ে লাগতে লাগল। বসে পড়লুম মাটিতে। কি যেন খুঁজছিলাম আমি। হঠাৎ মনে হ'ল পেলুম বুঝি! কিন্তু আর কি পাওয়া যায় ? লালুর ঘাড়ের রক্ত শুকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। বিপিন চাটুজ্যের হাতে আজ নতুন অস্ত্র। হ্যাঁ রে, তোরা কি কেউ ওর হাত থেকে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নিতে পারিস না ? সুয়েজখালের ওপারের লোকগুলোর জন্যে তোরা কেঁদে মরছিস, লালুর জন্যে একটু কাঁদ। সারা দেশ যে ওকে ভুলে গেল রে।"

আমি বললাম, "মাসীমা, আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন। বিজয়বাবু কাউকে দিয়ে দু' পেয়ালা চা আনানো যায় না ?"

"ঠাকুরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মাসীমা, এ গল্প তুমি আর কোনদিনও কাউকে বলতে পারবে না।"

"না বাবা, আর বলব না। লালু প্রতিশোধ নিয়েছে। কুশিক্ষার বিষ খেয়ে হাজার হাজার লালু আজ আত্মহত্যা করছে। তা করুক, আমি তো তা বন্ধ করতে পারব না। যাচ্ছিস বিজয় ?"

"হ্যাঁ। তোমাদের চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"টাকাগুলো যে মাটিতে পড়ে রইল—"

মাটি থেকে তিনখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে নিয়ে বিজয়বাবু বললেন, "তোমার কাছে রেখে দাও। এ মাসের টাকা তোমার শোধ হয়ে গেল। বিপ্রদাসবাবুর কাছ থেকে আজ মাইনে পেয়েছি। মাসীমা, এই টাকাটা হ'ল আমার নতুন সুরুর প্রথম উপার্জন।"

নোট তিনখানা হাতে নিয়ে মাসীমা বললেন, "এ টাকা কালো নয়।"

চণ্ডী ভটচাজ আগেই চলে গিয়েছিলেন। বিজয়বাবুও গেলেন। মাসীমাকে একলা পেয়ে এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মিসেস রায় কেমন আছেন ?"

"না বাবা তেমন ভাল নেই সে।" মাসীমা উঠে পড়লেন।

"তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"দেখি, সে নিচে নামতে পারে কি না।" মাসীমা এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

পেছনে পেছনে আমিও গেলাম। অনুরোধ করলাম, "তাঁর কাছে আমায় একবার নিয়ে চলুন না। তিনি নিজেই আমায় আসবার জন্যে বলেছিলেন।"

"কিন্তু তা তো হয় না। তপা তো ঘরে একলা থাকে না, অন্য একজনও থাকে।"

"বেশ, বেশ"—মাসীমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাইরে বেরিয়ে এলাম, "আজ থাক, কাল আবার আসব। মিসেস রায়কে বলবেন—"

"তুমি চা খেয়ে যেয়ো মহীতোষ।" এই বলে একতলার অন্ধকারে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়লেন সরকার-কুঠীর মালিক শ্রীবসন্তকুমার সরকার, এখানকার মেসোমশাই। তিনি বললেন, "চলুন একসঙ্গে বসে চা খাওয়া যাক। গড়িয়ার ইতিহাস শুনতে আপনার ভালই লাগবে।" ক্রমশঃ

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু কর্তৃক হীরাকুঁদ বাঁধের উদ্বোধন
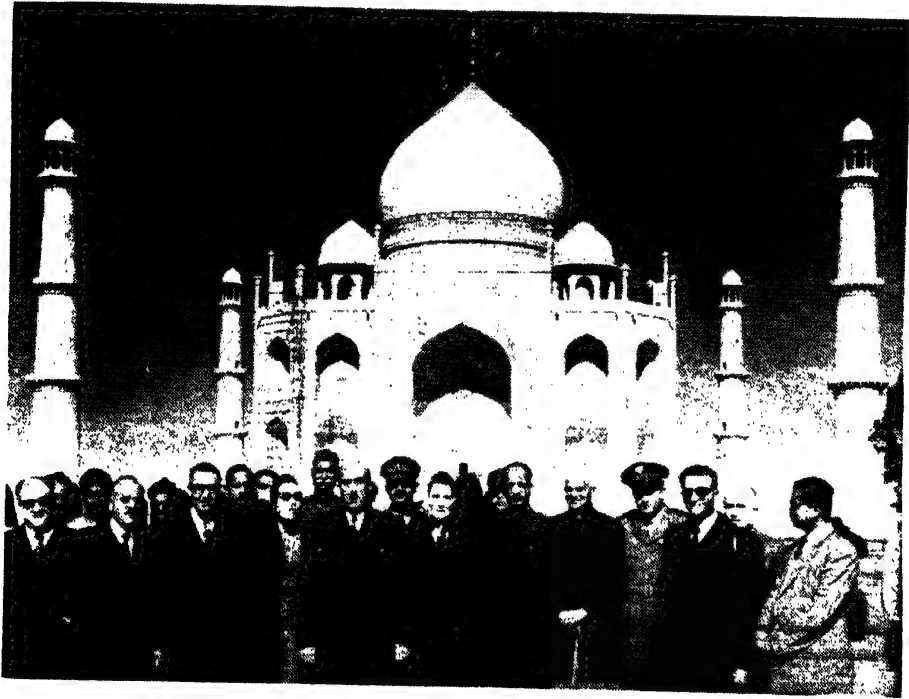
মাদাম কুওয়াটলিসহ সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট এইচ. ই. মিঃ শুকরি আল কুওয়াটলির
আগ্রায় তাজমহল পরিদর্শন

সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল জি. কে. জুকভ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরুকে
দুই ফুট উচ্চ একটি ব্রোঞ্জ-মূর্তি উপহার প্রদান
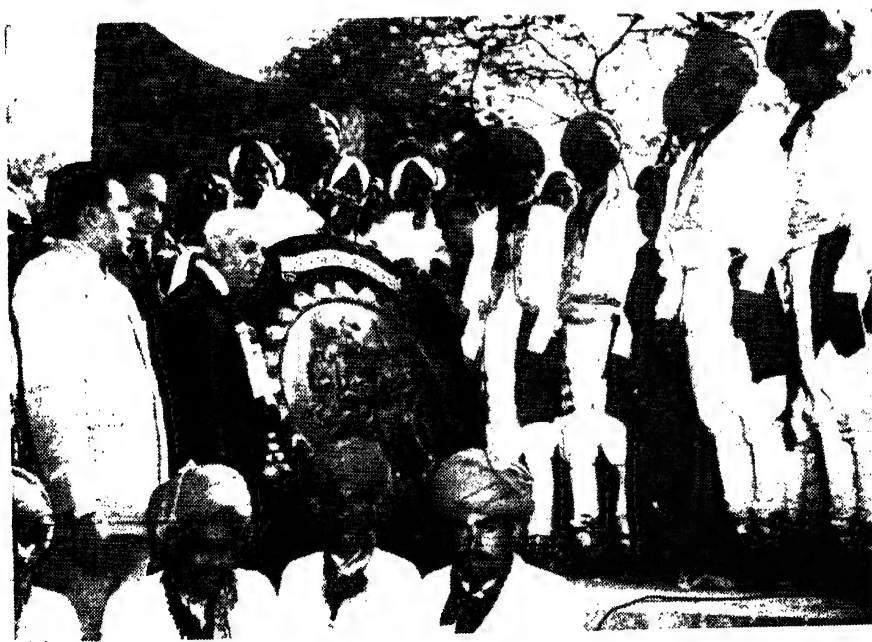
১৯৫৭ সনের প্রজাতন্ত্র দিবসে অংশগ্রহণকারী বোম্বাই রাজ্যের নৃত্যশিল্পীগোষ্ঠীর 'সঙ্গীত-
নাটক আকাদমি শিল্ড' পুরস্কার লাভ

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বাংলাদেশে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সকল দিকপাল মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের জীবন ও কৃতির সহিত আমরা মোটামুটি ভাবে পরিচিত আছি, কিন্তু চিকিৎসাক্ষেত্রে বর্ত্তমান শতাব্দীতে যাঁহাদের কৃতিত্ব একদা সমগ্র দেশবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকের কথাই আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল সমগ্র ভারতবর্ষে চিকিৎসাক্ষেত্রে যিনি ছিলেন নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত, সেই চিকিৎসকাগ্রগণ্য স্যার নীলরতন সরকারকে আমরা ভুলি নাই সত্য, কিন্তু দেশের কল্যাণকল্পে তাঁহার বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার কোন খবর আমরা রাখি না। নীলরতনের আযৌবন অন্তরঙ্গ সুহৃদ, বাংলার অন্যতম মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ও মানব-কল্যাণব্রতে নিজের জীবনটিকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে-কাহিনীও বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছে। নীলরতন ও প্রাণকৃষ্ণ ইঁহারা শুধু যে সমব্যবসায়ী ছিলেন তাহা নহে, ইঁহারা ছিলেন সমানধর্ম্মা এবং সারাজীবন পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। ইঁহাদের এক জনের কথা বলিতে গেলে অপরের কথা আসিয়া পড়ে অনিবার্য্য ভাবে। এই দুই জন শ্রেষ্ঠ কল্যাণকৃৎ মানুষের জীবনাদর্শ বর্ত্তমান যুগের বাঙালীকে মহত্তর জীবনগঠনে অনুপ্রাণিত করিবে।

চিকিৎসক হিসাবে প্রাণকৃষ্ণের খ্যাতি সারা বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি চিকিৎসক হিসাবে যত বড় ছিলেন, মানুষ হিসাবে ছিলেন তাহার চেয়ে অনেক বড়। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাণকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তিনি সততা, বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা মানুষের মত মানুষ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জ্ঞানী সাধুপুরুষের যেসকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি—সমস্তই তাঁহার ছিল।"

হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রে প্রাণকৃষ্ণের ছিল বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন। তাঁহার বাগ্মিতা এবং শাস্ত্র-ব্যাখ্যানকৌশলও ছিল অপূর্ব্ব।

নীলরতনের সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণের গভীর অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠে ছাত্রজীবনে। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উভয়ের সেই অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য তিল পরিমাণও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। দু' জনকেই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া জীবনে অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। এই দুই বন্ধুর প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও ছিল যথেষ্ট। উভয়েই ছিলেন বহুমুখী কর্ম্মপ্রতিভা এবং অতুলনীয় ধীশক্তির অধিকারী, অধ্যয়নপ্রিয়, স্বাবলম্বী, দেশপ্রেমিক, পরমাত্মার প্রতি নির্ভরপরায়ণ। লোকহিতৈষণাই ছিল দু'জনের জীবনের মূলমন্ত্র—পীড়িত মানুষের সেবাকে ইঁহারা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন—চিকিৎসাবৃত্তি ইঁহাদের নিকট পেশামাত্র ছিল না।

২

১৮৬১ সনে, ২৫শে আগষ্ট পাবনার এক অতি দরিদ্র পরিবারে প্রাণকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ আচার্য্য, মাতার নাম বিন্দুবাসিনী দেবী। বিন্দুবাসিনীর বয়স যখন কুড়ি বৎসর মাত্র তখন তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। এই অল্প বয়সে বিধবা হইয়া বিন্দুবাসিনী দুইটি শিশুসন্তান সহ যেন অকূল পাথারে পড়িলেন। কখনো অর্দ্ধাশনে, কখনো বা অনশনে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। প্রতিবেশীরা দয়াপরবশ হইয়া কিছু কিছু অর্থসাহায্য না করিলে তাঁহাদের আর বাঁচোয়া ছিল না। আট-নয় বৎসর বয়সের সময় প্রাণকৃষ্ণ প্রথমে এক বাংলা অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি চার টাকা বৃত্তি পান।

প্রাণকৃষ্ণের পক্ষে বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করা সম্ভবপর হইয়াছিল মুখ্যতঃ তাঁহার মায়ের যত্ন ও চেষ্টায়। শিশু-পুত্রদিগকে লইয়া বিধবা বিন্দুবাসিনীকে যে ভাবে প্রতিকূল অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল তাহা উপন্যাসের কাহিনীর মতই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। প্রাণকৃষ্ণের পিতা সম্পত্তির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিলেন একটি ভগ্ন জীর্ণ কুঁড়েঘর—চেরা বাঁশের তৈরি তার বেড়াগুলি এরূপ নড়বড়ে ছিল যে একটু জোরে ধাক্কা লাগিলেই ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইত। কালের হস্তাবলেপে বেড়ার মধ্যে বড় বড় ফুটার সৃষ্টি হইয়াছিল। কখনও কখনও রাত্রে কুটীরের নিকট বাঘ আসিত। বিন্দুবাসিনী এই বিপদে অবিচলিত থাকিতেন এবং ইহাতে ভয় পাইবার যে কিছু নাই সেকথা বলিয়া ছোট শিশু-দুটিকে আশ্বাস দিতেন।

একজন প্রতিবেশী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করায় বিন্দুবাসিনীর পক্ষে পুত্রকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করানো সম্ভবপর হইল। অর্থাভাবে প্রাণকৃষ্ণের পক্ষে পুস্তক ক্রয় করা সম্ভবপর হইত না, সমপাঠীদের নিকট হইতে পুস্তক ধার করিয়া তাঁহাকে পড়া করিতে হইত। হাই স্কুলে অধ্যয়নকালে গণিতশাস্ত্রে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিদ্যাভ্যাস করা সত্ত্বেও অপূর্ব্ব মেধা এবং ধীশক্তির কল্যাণে তিনি অষ্টম শ্রেণী হইতে প্রত্যেক বৎসর ডবল প্রমোশন পাইতে লাগিলেন এবং মাত্র চার বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন। এন্ট্রান্স পাস করিয়া তিনি এফ-এ পড়িবার জন্ম কলিকাতায় আসেন। পাবনার ছাত্রেরা তাঁহাকে মেসের একতলায় একটি অন্ধকার ঘরে বিনা ভাড়ায় থাকিতে দিলেন। দিনের বেলায়ও নাকি সেই ঘরে আলো জ্বালিয়া পড়িতে হইত।

এফ-এ পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া প্রাণকৃষ্ণ ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান। থার্ড ইয়ারে পড়িবার সময় বিলাতযাত্রার সঙ্কল্প তাঁহার মনে জাগে এবং তিনি গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দেন। তাঁহার বিলাতযাত্রার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু চরিতার্থ হয় নাই।

বি-এ পাস করিবার পর প্রাণকৃষ্ণ এম-এ পড়াই স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার জীবনের স্রোত ভিন্নমুখী হইল। চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নার্থে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। মেডিক্যাল কলেজে প্রতি বৎসর প্রথম হইয়া তিনি বৃত্তি ও পদক ইত্যাদি লাভ করিতে লাগিলেন। শেষ বৎসরে গুডিভ বৃত্তি পাইয়া তিনি ইডেন হাসপাতালের কার্য্যভার প্রাপ্ত হন।

নীলরতনের সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণের প্রথম পরিচয় কখন কি উপলক্ষে হয় তাহা সঠিক বলা যায় না, তবে মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার সময় যে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ইঁহাদের অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ জয়কালী দত্ত মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায়।*

জয়কালী লিখিতেছেন—"১৮৮৩-৮৪ সন হইতে আমি কলিকাতায় ভাই নীলরতনদের (স্যার নীলরতন সরকার) সঙ্গে থেকে পড়াশুনা করিতাম। ১৮৮৭† সনে যখন আমরা সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে ২৭ নং বাড়ীতে থাকিতাম, তখন 'বক্সী' (ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য) এসে আমাদের সঙ্গে জুটিলেন। কেমন করে তিনি এসে জুটিলেন কিছু মনে নাই। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমাদের সকলের বেশ ভাব হয়ে গেল। আমরা তিন জন "বক্সী", "নীলমণি" (নীলরতন) ও আমি প্রায় সমবয়সী। যখন আমরা মিলিত হই তখন আমাদের বয়স ২৫।২৬ বৎসর। তখনও আমাদের পরীক্ষার পালা শেষ হয় নাই।"

মেডিক্যাল কলেজে পাঠকালে প্রাণকৃষ্ণ প্রাণীতত্ত্ববিদ্যায় এম-এ পাস করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল ত্রিশ। কলেজ-জীবনে প্রাণকৃষ্ণ যে গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। প্রাণকৃষ্ণ ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের কন্যা সুবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

প্রাণকৃষ্ণ, জয়কালী এবং নীলরতন এই তিন বন্ধুর মধ্যে তখন একমাত্র নীলরতনই ছিলেন উপার্জ্জনশীল। তিনি যাহা রোজগার করিতেন, প্রধানতঃ তাহার উপরেই তিন বন্ধুকে নির্ভর করিতে হইত। নীলরতনের উপার্জ্জনের পরিমাণও তখন খুব বেশী ছিল না। সেইজন্য সময় সময় সকলের উপবাস থাকিবার উপক্রম হইত। এ সম্বন্ধে প্রাণকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণীর নিকট নিম্নোক্ত কাহিনীটি শুনিয়াছি:

একদিন প্রাণকৃষ্ণ স্নানান্তে আহারের জন্য রান্নাঘরে আসিয়াছেন। রন্ধন এবং পরিবেশনাদি নীলরতনের ভগিনী ক্ষীরোদবাসিনী করিতেন। প্রাণকৃষ্ণ আসনগ্রহণের উপক্রম করিবামাত্র ক্ষীরোদবাসিনী হাসিতে লাগিলেন। প্রাণকৃষ্ণ ত অবাক, বলিলেন, "ব্যাপার কি বল দেখি। এদিকে আমার কলেজের তাড়া, কিন্তু তুমি ত দিব্যি হাত গুটিয়ে বসে রয়েছ, ভাত-টাত বেড়ে দেবার কোন লক্ষণই নেই, তার উপর আবার হাসতে সুরু করে দিয়েছ।" ক্ষীরোদবাসিনী তখন বলিলেন, "খাবেন কি, আজকে যে উনুনই জ্বলে নি। মেজদা (নীলরতন) কিছু ভিজানো ছোলা খেয়েই বেরিয়ে গেলেন।"

শুনিয়া প্রাণকৃষ্ণ তখনই টাকা ধার করিবার জন্য বাহির হইলেন এবং বহু আয়াসে চার টাকা যোগাড় করিয়া আনিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর হাতে দিলেন। তখন সেদিনকার মত উনুনে হাঁড়ি চড়াইবার ব্যবস্থা হইল।

চিকিৎসাবিদ্যার কোর্স শেষ করিয়া প্রাণকৃষ্ণ এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার কয়েক বৎসরের

---

* প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, জয়কালী দত্ত আর নীলরতন সরকার এই তিন জন ছিলেন অভিন্নাত্মা। ইঁহারা একসঙ্গে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। নীলরতন যাহা রোজগার করিতেন, তাহা দ্বারা এই ত্রয়ীর যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। নিতাড়ার নিকটবর্ত্তী উস্থী জয়কালী দত্তের জন্মপল্লী। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই বৎসরে তিনি গণিতশাস্ত্রে এম-এ দেন। তাঁহার জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটিয়াছিল রাঁচিতে। ১৩৪৯ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার লোকান্তরগমনের পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রবাসীতে' লেখেন—"বিগত ১৮ই অক্টোবর তারিখে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মী ও সেবক জয়কালী দত্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। কলেজে পাঠকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শেষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি সমাজের সেবা করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি রাঁচির ব্রাহ্মমন্দিরের দায়িত্ব বহন করিয়াছেন। রাঁচির বালিকা-বিদ্যালয়টিকে অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি বড় স্কুলে পরিণত করেন—বর্ত্তমানে সেটি হাই স্কুল হইয়াছে।"

† ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতন এম-বি পরীক্ষা দেন। সুতরাং এই সময় তিনি ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। প্রাণকৃষ্ণ তাঁহা অপেক্ষা মাস কয়েকের বড় হইলেও তাঁহার নীচে পড়িতেন।

মধ্যে কলিকাতার এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে প্রাণকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। নিজে ঘোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া দরিদ্র ছাত্রদের দুঃখ তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক জন দরিদ্র ছাত্রকে তিনি নিজ গৃহে আশ্রয়দান করিলেন। তাহাদের ভরণপোষণ, পড়াশুনা ইত্যাদির যাবতীয় ব্যয় তিনিই নির্ব্বাহ করিতেন। ব্যবসায়ে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আশ্রিত ছাত্রসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। প্রসিদ্ধ স্থাপত্যশাস্ত্রবিদ্ প্রসন্নকুমার আচার্য্য এম-এ, পিএইচ, ডি, ডি-লিট তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কিছুকাল সিটি কলেজে পড়িয়াছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ গোপনে দান করিতেন বলিয়া কয়শত ছাত্রকে তিনি অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, কত ছাত্র তাঁহার সৎপরামর্শে উপকৃত হইয়াছিল, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কত জনকে তিনি পড়াইতেন সেকথা লোকে জানে না। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহে তাঁহাদের দানের পরিমাণ বড় কম ছিল না। একমাত্র গরীব ছাত্রদিগকেই তিনি দান করিয়াছিলেন সবসুদ্ধ এক লক্ষ টাকা।

যেমন গরীব ছাত্রদের প্রতি তেমনি দরিদ্র রোগীদের প্রতিও প্রাণকৃষ্ণের অপরিসীম দরদ ছিল। এ বিষয়ে প্রাণকৃষ্ণ এবং নীলরতন একই ধরনের মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন। সংক্রামক রোগীকে নিরাময় করিতে গিয়া এই দুই বন্ধু সময় সময় নিজেদের জীবন বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। নিম্নোক্ত ঘটনাটি হইতে যেমন আর্ত্তের প্রতি প্রাণকৃষ্ণের সহৃদয়তার, তেমনি নীলরতনের বন্ধু-প্রীতিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার প্রাণকৃষ্ণের একটি কর্ম্মচারীর প্লেগ হয়। কর্ম্মচারীটি আশ্রিত হিসাবে প্রাণকৃষ্ণের বাড়ীতেই থাকিতেন। সকলে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সেখানে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের অভাবে রোগীটি যে নিজেকে কিরূপ অসহায় মনে করিবে তাহা ভাবিয়া এই উপদেশ তিনি গ্রহণ করিলেন না। পরিবারস্থ সকলকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া কেবলমাত্র পত্নীসহ কলিকাতার বাটীতে থাকিয়া রোগীর চিকিৎসা এবং শুশ্রূষাদি করিতে লাগিলেন। রোগসংক্রমণের ভয়ে সকল বন্ধুবান্ধব তাঁহার সংস্রব পরিহার করিলেন। কিন্তু এই সঙ্কট-সময়ে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার সর্ব্বোত্তম সুহৃদ নীলরতন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে তাঁহার প্রাত্যহিক উপস্থিতি প্রাণকৃষ্ণের অন্তরে প্রেরণা-সঞ্চার করিত, তাঁহাকে সাহস ও বল দিত। প্লেগরোগীর সংস্পর্শে থাকা বিপজ্জনক বলিয়া সুবালা দেবীকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য নীলরতন খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীকে একলা রোগীর নিকটে রাখিয়া অন্যত্র যাইতে সুবালা দেবী রাজী হইলেন না। দিনকতক পরে সুবালা দেবী হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ইহা প্লেগে পরিণত হইতে পারে ভাবিয়া নীলরতন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি আর কোন ওজর-আপত্তি শুনিলেন না। বন্ধুপত্নীকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিলেন। এ-দিকে নীলরতনের বাড়ীটি ছেলেপুলেতে ভরতি। এমন অবস্থায় প্লেগের সময় জ্বরাক্রান্ত বন্ধুপত্নীকে নিজ ভবনে স্থান দিতে নীলরতন কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। বস্তুতঃ পরস্পরের বিপদে-আপদে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া ইঁহারা যেভাবে বন্ধুকৃত্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতেন তাহার তুলনা বিরল।

আর একবার উমেশচন্দ্র দত্তের বাটীতে এক ব্যক্তি প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মারা যান। ব্যাধিসংক্রমণের ভয়ে বাটীস্থ প্রায় সকলেই পলাইয়া গিয়াছিল। লোকাভাবে মৃতদেহ কিরূপে শ্মশানে লইয়া যাওয়া যায় তাহা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। খবর পাইয়া প্রাণকৃষ্ণ বাড়ীতে কিছু না বলিয়া দত্ত মহাশয়ের ভবনে গিয়া হাজির হইলেন এবং স্বয়ং শবদেহ বহনে অগ্রণী হইলেন। তখন তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আরও কয়েকজন আগাইয়া আসিলেন—এবং প্রাণকৃষ্ণ অন্যান্য শববাহকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়া মৃতদেহ বহন করিয়া সৎকারভূমিতে লইয়া গেলেন।

এই সহজাত পরোপকারপ্রবৃত্তি সমগ্র জীবন প্রাণকৃষ্ণকে বিবিধ জনহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রণোদিত করিয়াছিল। তাঁহার লোকান্তর-গমনের পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন,"দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করা জীবনের শেষ সজ্ঞান দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার একটি নিয়মিত কর্ম্ম ছিল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও সিটি কলেজে ষোলটি দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার সাহায্যের বিষয়ে চিন্তা ও সঙ্কল্প করিয়া পুত্রদ্বয়কে তদনুযায়ী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। 'দাসাশ্রম' নামে গত ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতায় অসহায় নিরাশ্রয় আতুরদের বাস গ্রাসাচ্ছদন ও চিকিৎসাদির যে প্রতিষ্ঠান ছিল, আচার্য্য মহাশয় দীর্ঘকাল তাহার স্বেচ্ছাবৃত চিকিৎসক ছিলেন। বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়ের অট্টালিকা নির্ম্মাণ প্রধানতঃ তাঁহার ব্যয়েই নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।"

"যে মহৎ ও বৃহৎ কাজটিতে তাঁহার জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি অনেক সময় দিতেন, তাহা আসাম ও বঙ্গের অনুন্নত শ্রেণী-সমূহের উন্নতি বিধায়িনী সমিতি। তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দরিদ্র গ্রামিক লোকদের পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষাদান ইহার প্রধান কাজ। ইহার তত্ত্বাবধানে নানা জেলায় প্রায় চারি শত বিদ্যালয় আছে। গ্রামিক লোকদিগকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনার্থ তিনি পদব্রজে, পা ক্ষতবিক্ষত করিয়া, বহুবার বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন।"

দুর্গত মানুষের দুঃখমোচনই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসক-জীবনে কদাপি তিনি এই ব্রত হইতে বিচ্যুত হন নাই—কলিকাতা এবং মফস্বলের বহু গরীব রোগীকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিতেন। শত কাজে তাঁহাকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যাইতে হইত, কিন্তু যে উপলক্ষে যেখানেই

যান না রোগীকে নিরাময় করা যে তাঁর বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য তাহা তিনি কখনও বিস্মৃত হইতেন না, এবং সেই জন্যই কি শহরে, কি মফস্বলে কোথাও দরিদ্র রোগী চিকিৎসার আশায় তাঁহার নিকট আসিয়া কখনও বিমুখ হয় নাই। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি বিনা পারিশ্রমিকে সকল রোগীর চিকিৎসা করিতেন—এমনি ভাবে অর্থের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া আর্ত্ত পীড়িতের কল্যাণব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া তিনি দেশবাসীর সমক্ষে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের মণিকোঠায় এক অমূল্য রিকথরূপে চিরকাল সংরক্ষিত হইবার যোগ্য।

প্রাণকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার সুগভীর দেশপ্রেম। বাংলাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হইবার পর, স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত যখন উদ্বেল হইয়া উঠিল, তখন তাহাতে তিনি ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন ইহার অন্যতম নেতা। তাঁহার বাগ্মিতা তখন বহু লোককে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহারের জন্য তিনি আন্তরিক ভাবে সকলকে উৎসাহিত করিতেন।

যৌবনে প্রাণকৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতির পদলাভ করিতে সমর্থ হন, শেষে আচার্য্যের পদে বৃত হইয়াছিলেন। বহু শাস্ত্রবচন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, উপাসনার সময় ভাবগম্ভীর স্বরে সেগুলি তিনি অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। তৎপ্রদত্ত বহু জ্ঞানগর্ভ সরস ভাষণ তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। সেগুলি একত্রে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বাংলা মনন ও অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি করিবে।

আদর্শবাদী প্রাণকৃষ্ণ প্রখর ব্যবসাবুদ্ধিরও অধিকারী ছিলেন। সুদীর্ঘ জীবিতকালের কয়েকটি বৎসর তিনি নানা কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টার্সের চেয়ারম্যান ছিলেন। এতৎসংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাণকৃষ্ণ জীবনে নানা ব্যক্তি দ্বারা নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নাই, এমনকি দুই বন্ধুর দরুন যখন তাঁহার ১,১৭,০০০ হাজার টাকা ক্ষতি হইল, তখনও তিনি নীরবে এবং শান্ত ভাবেই তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। বারংবার নানা ভাবে প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মানুষের কল্যাণসাধনে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। এই লোক-হিতৈষণার প্রবৃত্তি আমৃত্যু সমভাবে তাঁহার মনে জাগরূক ছিল।

নিজের অন্তিম সময় যে ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা প্রাণকৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর সপ্তাহদুই পূর্ব্বে তিনি নাকি কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর মাত্র চৌদ্দ-পনর দিন বাঁচিবেন।

নীলরতন এবং প্রাণকৃষ্ণ যে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, প্রাণকৃষ্ণের অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা ছিন্ন হয় নাই। নিজের অসুস্থ শরীর লইয়াও নীলরতন প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে তাঁহার শেষ রোগ-শয্যাপার্শ্বে গিয়া হাজির হইতেন। প্রিয়তম বন্ধুর সেই প্রীতিপূর্ণ মুখচ্ছবি দেখিবামাত্রই প্রাণকৃষ্ণের ব্যাধিযন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, মনে হইত যেন যাদুমন্ত্রবলে তাঁহার রোগযন্ত্রণার উপশম হইয়াছে। কিন্তু অবস্থা তাঁহার ক্রমে ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল, রক্তের চাপ বাড়িতে বাড়িতে আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে ১৩৪৩ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে, ৭৬ বৎসর বয়সে প্রাণকৃষ্ণ সন্ন্যাসরোগে পরলোকগমন করিলেন।

প্রায় শতবর্ষের কাছাকাছি হইতে চলিল, একই বৎসরে পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের দুইটি অখ্যাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বাংলার দুই জন শ্রেষ্ঠ সন্তান—প্রাণকৃষ্ণ আর নীলরতন। তাঁহাদের আবির্ভাবে কুল পবিত্র হইয়াছিল এবং জননী কৃতার্থা হইয়াছিলেন। বিধাতা ইঁহাদের জীবনকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছিলেন—ইঁহাদের হৃদয় ছিল এক, বৃত্তি ছিল এক এবং আবৃত্তিও ছিল সমান। নীলরতনের ন্যায় প্রাণকৃষ্ণের খ্যাতি তত সুদূরপ্রসারী হয় নাই সত্য, কিন্তু সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, চরিত্রের পবিত্রতা, অফুরন্ত ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় এবং সর্ব্বোপরি স্বাবলম্বন এই কয়টি গুণের সমন্বয়ে মানুষ যে কি অসাধ্যসাধন করিতে পারে প্রাণকৃষ্ণের জীবন ও কৃতিসমূহ তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।
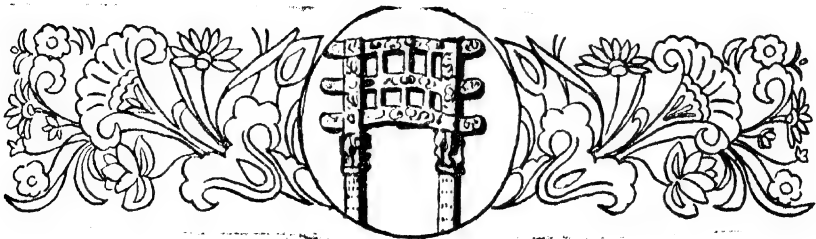
মিথিলায় তিন দিন

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মিথিলা বললে রামায়ণের কথাই মনে পড়ে। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর সাতকাণ্ড রামায়ণে এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যার তুলনা বিশ্বের কোন মহাকাব্যে নাই। যোগ এবং ভোগ একই সঙ্গে নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করে সেই পুণ্যশ্লোক মানুষটি হয়েছেন রাজর্ষি। বিদেহরাজসভায় বিদগ্ধজনপরিবৃত হয়ে শাস্ত্রালোচনা করতে ভালবাসতেন তিনি—এবং সেই সময় থেকেই বিদগ্ধসমাজে মিথিলার খ্যাতি-প্রতিপত্তি। মহাকবি বাল্মিকী আর একটি মহৎ কর্ম্ম করেছিলেন তাঁর মহাকাব্যে, সারা ভারতবর্ষের মেলবন্ধন। কোথায় অযোধ্যা—কোথায় মিথিলা—দণ্ডকারণ্য, দ্রাবিড়ভূমি আর সমুদ্র পারে সৌধকিরীটিনী লঙ্কা। ভিন্ন রাজ্যের অধিকারীরা সংস্কার-সংস্কৃতি, ভাষা ও চরিত্রে বহু প্রভেদ নিয়েও কাহিনীর মৈত্রীবন্ধনে সারা ভারতবর্ষে এক হয়ে গেছে। আধুনিক যুগেও এর কল্যাণ-স্পর্শ আমাদের অভিভূত করে।

যেমন ভারতবর্ষের সঙ্গে মিথিলার—তেমনি মিথিলার সঙ্গে বাংলার যোগাযোগও অটুট ছিল। জনকসভার পাণ্ডিত্যের যশো-ভাতি হাজার হাজার বৎসর পরে ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে এসেও অম্লান ছিল—এই সত্য নব্যন্যায়ের উপাধি আহরণ থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। নব্যন্যায়ে পক্ষধর মিশ্র আর কাব্যে বিদ্যাপতি—বাংলার হৃদয় জয় করেছিলেন। তার প্রমাণ রঘুনন্দনকৃত ন্যায়বিধি—যার প্রভাব বাঙালীসমাজে আজও অনুভূত। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ত বিদ্যাপতির পদাবলী আবৃত্তি করতে করতে ভাবসমাধি লাভ করতেন। যদিও ন্যায়ের বিধি বিধান ও কাব্যের রসাস্বাদন—দুই দেশের মানুষকে অন্তরঙ্গতার পরিমণ্ডলে এনে ফেলেছে, তবু অনেকের কাছে দুই দেশের দূরত্বও ত কম নয়। পণ্ডিতজনেরা ও কাব্য-রসিকরা এ কথায় প্রতিবাদ করবেন, মাইলের মাপেও এটি অস্বীকৃত হবে। কিন্তু মোকামা বা সেমারিয়ার গঙ্গাতীরে পৌঁছে কোন মিথিলাগামী বাঙালী অথবা বঙ্গঅভিমুখী মৈথিলী এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন না। তাঁদের মানতেই হবে দিল্লীর চেয়েও মিথিলার দূরত্ব অনেক—অনেক বেশী। কেমন করে? স্ব-অভিজ্ঞতার কথাই বলা যাক।

সবাই জানেন হাওড়ায় ট্রেনে চেপে মোকামা ঘাট পার হয়ে মিথিলায় পৌঁছতে হয়। এই পথের দূরত্ব বড়জোর সাড়ে তিন শ মাইল। আকাশযানের যুগে এই দূরত্ব পলকপাতের ব্যাপার, বাষ্পযানেও এমন কিছু দীর্ঘ ও দুস্তর পথ অতিক্রমের ভীতি জাগায় না, কিন্তু গঙ্গা? একা নদী দু'শো ক্রোশেরও বেশী। নামেই মোকামা ঘাট—আসলে শীতকালে এ ঘাট সরে যায় হাতীদায়। হাতীদা—যেখানে গঙ্গাকে সেতুবন্ধনে সায়েস্তা করে দু'টি বিহারের যোগসূত্রকে নিবিড় ও যাত্রাপথকে সংক্ষিপ্ত ও সহনীয় করার ব্যবস্থা হচ্ছে। রেলপথে মোকামা জংশন থেকে হাতীদার দূরত্ব ছ'সাত মাইল—বাঁধা সড়ক দিয়ে ঘুরে যেতে হলে আরও দু' এক মাইল 'ফাউ' নিতে হয়। এমনই সুব্যবস্থা—সারাদিন রাত্রিতে একখানি মাত্র ট্রেন ষ্টীমার ঘাটে যায়, ষ্টীমারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। ষ্টীমার কিন্তু একাধিক বার গঙ্গা পারাপার করে। জাতীয় সরকারের রেল বিভাগ—নিরুপায় যাত্রীদের মোকামায় পৌঁছে দিয়ে টম টম একা সাইকেল-রিক্সাওয়ালাদের করকবলিত করে দেন। এরা যাত্রী-দোহন কার্য্যে কেমন পটু সে পরিচয় সেই দিন প্রত্যক্ষ করেছি।

রাত একটা। বেনারস এক্সপ্রেস থেকে উত্তর বিহারগামী বহু যাত্রীর সঙ্গে আমরা মোকামা জংশনে নামলাম। শোনা গেল—ষ্টীমার ছাড়বে দুটো কুড়ি মিনিটে। ট্রেন-যাত্রীদের ষ্টীমার ধরার কি ব্যবস্থা আছে? কিছুমাত্র নয়। সকালের যে ট্রেনখানি ঘাটে যায়—রাত্রিতে সেইখানিই ফিরে আসে—মাঝখানের ব্যবস্থা যাত্রীদেরই করে নিতে হয়। অথচ ষ্টীমার সমেত থ্রু টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে! এ যেন কড়ি ফেলেও তেল মাখার অধিকার না দেওয়া।

অতএব ভরসা ওই টমটম, একা, সাইকেল-রিক্সা। ওদের বেকারত্ব ঘুচাবার জন্যই এমন অপূর্ব্ব পরিকল্পনা! রাত গভীর—পথ দুস্তর—যাত্রী পীড়নে ওরাও পরাঙ্মুখ নয়। শহরের এলাকায় বিজলী আলোর ঝলমলানি, কিন্তু মাঝখানের বেশীর ভাগ পথই অন্ধকার। নিশানাস্বরূপ দূর-দূরান্তে আলো থাকলেও—একটা পোষ্ট থেকে আর একটা পোষ্টের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। মাথার উপর তারায় ঝকঝকে আকাশ যত ঐশ্বর্য্য বিস্তারই করুক, মনকে আশ্বস্ত করতে পারে না। তা ছাড়া শীতের রাতে খোলা টমটমে বসে উত্তরবায়ু সেবন করতে করতে যাওয়া যে কি আরামের!

টমটমচালক অবশ্য অভয় দিয়ে বলল, ভয় নেই বাবু—আমি বেইমান নই, ঠিক পৌঁছে দেব।

ওর অভয়বাক্যে ভয়টাই বেড়ে গেল। তা হলে বেইমানও আছে, পথ আপদশূন্য নয়! ট্রেনে একজন টিকেট চেকারও বলে দিয়েছিলেন, খবরদার, একলা যাবেন না। যদি আরও সঙ্গী পান একা টমটমে উঠবেন।

সঙ্গী ত অনেকই ছিল, ভরসাও জেগেছিল তাঁদের দেখে। কিন্তু আমাদের টমটমখানা আর সমস্ত যাত্রীকে ফেলে যখন অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে ছুটতে লাগল—তখন দু'পাশের নিঝুম

প্রান্তর, উপরের তারাভরা নিঃশব্দ আকাশ, দূরে নিশাচর পাখীর কর্কশ ডাক আর গ্রামপ্রান্তে সারমেয়ের আর্তনাদ একটা অশুভ ইঙ্গিতই যেন বয়ে আনল।

মোকামা ঘাটের কাছে এসে চালক একবার তার সাধুত্বের প্রমাণ দিলে। বলল, দেখুন বাবু, বেইমান লোকদের কাণ্ড! মোকামা ঘাট পর্য্যন্ত এসে যাত্রীদের নামিয়ে দিচ্ছে পথে। বেশী ভাড়া না দিলে ষ্টীমার ঘাট পর্য্যন্ত যাবে না বলে জুলুম করছে। যাত্রীরা ত জানে না আসল ঘাট দু'মাইল দূরে হাতীদায়।

দেখলাম—প্রায় দশ-বারোখানা সাইকেল-রিক্সা দাঁড়িয়ে। চালকদের সঙ্গে যাত্রীদের বচসা তুমুল হয়ে উঠেছে। গভীর রাত্রিতে ঘাট থেকে দু'মাইল দূরে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিরুপায় যাত্রীর অবস্থা কল্পনা করতে পারেন কেউ?

যাহোক, হাতীদায় পৌঁছলাম যথাসময়ে। এখানে দেখলাম অনেক মজুর দাঁড়িয়ে। এরাও মোটা রকম দাঁও মারবার প্রতীক্ষা করছে। রাত দুপুরে ন্যায্য পারিশ্রমিক নিয়ে যাত্রীকে সাহায্য করবে এমন সংবৃত্তিপরায়ণ মানুষ বিরল। মোকামা জংশনে ট্রেন বদল করে মজুরের কবলে প্রথম দফা, টমটমওয়ালার খপ্পরে দ্বিতীয় দফা এবং হাতীদার ঘাটে তৃতীয় দফা—দফায় দফায় যাত্রীদের দফা নিকাশ হওয়ার দাখিল। এর পরেও একটা দফা আছে—সেমারিয়া ঘাটে ষ্টীমার থেকে মাল নামিয়ে ট্রেনজাত করা। যাঁর মাল যত বেশী—মজুরদের কাছে তিনিই তত লোভনীয়।

ষ্টীমারে বসে দেখা গেল গঙ্গার বুকে কয়েকটি আলো-ঝলমলে স্তম্ভ। হাতীদায় সেতুবন্ধন আরম্ভ হয়েছে—তারই কয়েকটি পদক্ষেপ গঙ্গার বুকে। এগারোটি স্তম্ভ তৈরি হয়েছে—অল্প কয়েকটি বাকী। বছর তিনেকের মধ্যেই ট্রেন চালু হলে এই দুঃস্বপ্নের অবসান হবে।

সেমারিয়া ঘাটের ব্যবস্থাও চমৎকার। মাঠ ভর্তি বালি—তার মাঝে লাইন পাতা। একটুখানি আচ্ছাদন কোথাও নাই। শীত-গ্রীষ্মের প্রতাপ না হয় র‍্যাগ-আলোয়ান জড়িয়ে আতপত্র মাথায় দিয়ে কোনরকমে ঠেকান গেল—বর্ষার বিক্রম কল্পনা করা যায় না। আর কল্পনা করা যায় না চৈত্র-বৈশাখের ঝড়ের দাপট। এর উপর ট্রেনের মেজাজ! সময় নিয়ে তার মাথাব্যথা নাই, আপন খেয়াল খুসিমত সে চলে। সকালের ট্রেন সন্ধ্যায় পৌঁছলেও যাত্রীরা নিজেদের ধন্যজ্ঞান করে—তবু ত ঠিকানায় পৌঁছানো গেল।

মিথিলায় পৌঁছে কিন্তু এত সব বিপত্তির কথা মনেই থাকে না। যাঁরা দেশের মানুষ তাঁরা ত ঘরে পৌঁছেই সব রকম দুঃখ-স্মৃতি ভুলে যান, যাঁরা নবাগত তাঁরাও নূতন একটি দেশের নূতন পরিবেশে অচিরাৎ মুগ্ধ হয়ে পড়েন। বারুণি জংশন পর্য্যন্ত যা একটু রুক্ষ জমি, শ্রীহীন গৃহ বা গৃহাঙ্গণ, কিন্তু মিথিলার পুরদ্বারে প্রকৃতি শ্রীময়ী। সমস্তিপুর থেকেই মাটির রূপ বদল সুরু হয়। আকাশ ঘন নীল হয়ে ওঠে—বুড়িগণ্ডকের পোল পেরিয়ে আদি-অন্তহীন শস্যশ্যামল মাঠ দৃষ্টিতে মোহ-অঞ্জন মাখিয়ে দেয়। স্বচ্ছ-সলিল খাল-বিল, শস্যভূষণা মাটি, বাঁশের ঝাড়, লতাগুল্মের ঝোপ, শিশু-শিমুল-মেহগ্নি-আম-অশ্বত্থের বনরচনা—সবুজ আর নীলের অন্তহীন সমারোহ—এ যে বাংলা নয় কেমন করে বিশ্বাস করা যায়! পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়া আর জেগে ওঠার সুযোগ না থাক (ট্রেন-কামরায়, এঞ্জিন আর বাঁশীর মিশ্র শব্দটাই অদ্বিতীয়।) পাখী যে সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে কম নয় তার প্রমাণ ট্রেনে বসেও পাওয়া যায়। মাঠে গরু চরে, রাখাল ছেলে গরু-মহিষের পিঠে চেপে নাচন-বাড়িতে তাল দিয়ে গান গায়—এ দৃশ্যের অভাবও ত নাই। দ্বারভাঙ্গা বাংলা দেশেরই দ্বার এবং মিথিলার মধ্যমণি এ কথা ভোলবার জো কি!

কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে,—আমাদের দেশান্তর যাত্রাও সেই গোত্রের। বাংলা সাহিত্যের একজন দীন-সেবক বলে দ্বারভাঙ্গার সন্ধ্যা-মজলিশের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছি। এটি অবশ্য সংস্কৃতি সম্মেলন। দ্বারভাঙ্গার মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক মিলে এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। এঁরা যে শুধু দুরূহ শারীরবিদ্যার অনুশীলনে দিনযাপন করছেন তা নয়—অবসর কালে নিষ্ঠাভরে দেবী ভারতীর আরাধনাও করে থাকেন। এঁরা সঙ্গীত, কলা, কাব্য ও কথাসাহিত্যের কুসুম চয়ন করে যে মাল্য রচনা করেন সারা বছর ধরে—তারই পরিচয় এমনই একটি মনোজ্ঞ বার্ষিক সারস্বত সভার মাধ্যমে নিবেদন করেন, অতিথিদের কাছ থেকে শোনেন সাহিত্য-সেবার ইতিহাস। শুধু বঙ্গ-ভাষাভাষী সাহিত্যানুরাগীজন নয়—বঙ্গভাষা-অনভিজ্ঞ সুধী-সজ্জনরাও উপস্থিত থেকে এই সারস্বত অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তোলেন।

এই মজলিশের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন—দ্বারভাঙ্গা নিবাসী বিখ্যাত কথাকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। শুধু এই মজলিশ নয়—দ্বারভাঙ্গার বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইনি প্রাণস্বরূপ। বাংলার মানুষ যেমন বিদ্যাপতিকে আপনজন মনে করে—মিথিলার মানুষও তেমনি বাংলাকে ভালবাসে। বেশবাসে, আচার-আচরণে, এমনকি কথাবার্তায় দুই প্রদেশের প্রভেদ যৎসামান্য। মিথিলায় যেমন ব্যাপকভাবে দেবী বীণাপাণির প্রতিমা পূজা হয়—তেমনটি বাংলা ছাড়া আর কোথাও ত দেখি নি। এই অর্চনা শুধুমাত্র বহিরঙ্গ উৎসব-কৌতুক নিয়ে তৃপ্ত নয়—আন্তরনিষ্ঠার প্রকাশটাই বেশী করে চোখে পড়ে। মিথিলার স্কুল-কলেজে, পাঠাগারে, সমিতিগৃহে, গৃহস্থ বাড়ীতে কোথায় না জ্ঞানদায়িনীর অর্চনা হয়? ছেলেমেয়েরা স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরে, দেবীপূজার আয়োজন করে, দেবী চরণে অঞ্জলি দেয়, সাংস্কৃতিক সভা বসায়, শিক্ষাব্রতীর কাছ থেকে শোনে দেবী সাধনার কথা। বিকটধ্বনিময় মাইক বসিয়ে মণ্ডপ ও দেবীর সাজসজ্জার প্রতিযোগিতায় স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, হৈ-হুল্লোড় ও আমোদে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে এবং প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলে অসংস্কৃত মনের পরিচয় দিয়ে মত্ততা প্রকাশ করে না। এমনি মনোজ্ঞ

একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল, সে কথা পরে বলছি।

সন্ধ্যা মজলিশের বয়স বেশী নয়—১৩৫৩ সালে এর জন্ম। চিকিৎসাবিত্তা আয়ত্ত করতে যে সব ছাত্র এখানে সমবেত হন—উপাধি অর্জ্জন করে তাঁরা চলে যান দেশ-দেশান্তরে—পরবর্ত্তীদের হাতে আসে মজলিশ পরিচালনার ভার। এঁরা যে দেবীপূজার যোগ্য অধিকারী তার প্রমাণ প্রতি বৎসরের অনুষ্ঠান-লিপিতে মিলবে। এবারকার সম্পাদক ছিলেন অমৃত আচার্য্য, তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ যাঁরা পাঠ করলেন, তাঁরাও প্রথম থেকে পঞ্চম বার্ষিকের ছাত্র-ছাত্রী। সবগুলি লেখাই সাহিত্য গুণান্বিত। পাঠের ধরণটিও ভাল। রবীন্দ্রনাথের সাজাহান কবিতাটি আবৃত্তি করলেন একটি ছাত্র। সুদীর্ঘ কবিতা—আবৃত্তির গুণে একটুও একঘেয়ে লাগল না। প্রসঙ্গত মনে পড়ল, বাংলায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে যে সমস্ত কবিতা আবৃত্তি হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়—কবিতাটি ভাল করে মুখস্থ না করেই আবৃত্তি-কার বইয়ের পাতা খুলে সভামঞ্চে এগিয়ে আসেন। পাঠ আরম্ভ হলে বোঝা যায় কবিতাটি হয় এই প্রথম পড়ছেন, কিংবা পড়বার আগে অবহেলাভরে দুই-একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন। এদের ভাবটাই 'ষ্টেজে মেরে দেব' গোছের। কবিতার সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার ধৈর্য্য বা শক্তি এদের থাকে না বলে শ্রোতার কানে কতক-গুলি অর্থহীন শব্দঝংকার একটানা আঘাত করে চলে। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর গানও বহুক্ষেত্রে এই গোত্রের। প্রবন্ধপাঠ বিশেষ কিছু হয় না—যা বলেন সভাপতি ও প্রধান অতিথিরা।

যাই হোক, এখানে যাঁরা গল্প-কবিতা ইত্যাদি পড়লেন, যাঁরা আবৃত্তি করলেন এবং সুধীর আসনে বসে রসগ্রহণ করলেন, যাঁরা সকলকার মধ্যেই বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অসীম প্রীতি ও শ্রদ্ধা লক্ষ্য করলাম।

অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের দেশে একজন ভাল ভাগবত কথক বৃন্দাবন-লীলা পাঠ করেছিলেন এক সপ্তাহ ধরে। অপূর্ব্ব তাঁর পাঠ, ব্যাখ্যা ও গল্প বলার ধরণ। মেয়েরা বাড়ীতে এসে শতমুখে প্রশংসা করতেন। তিনি সপ্তাহকাল পাঠ শুনিয়ে চলে গেলে আর একজন কথককে ভাগবৎ-আসরে বসিয়ে বৃন্দাবন-লীলার সবটা শোনার ব্যবস্থা হয়েছিল। মেয়েরা যথারীতি শুনতে যেতেন, কিন্তু বাড়ীতে এসে প্রশংসায় আর পঞ্চমুখ হতেন না।

লোক পরম্পরায় জানা গেল—পরবর্ত্তী কথক তেমন সুকণ্ঠ নন, সবক্তাও নন। পূর্ব্বেকার কথকের সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করতাম—মেয়েরা প্রতিবাদ করে বলতেন, তা হোক, ঠাকুরদেবতার কথা সবই ভাল। যেমন করেই বলা যাক না, ভালই লাগে। অসীম শ্রদ্ধা আর প্রীতি না থাকলে এমন কথা বলা যায় না।

সন্ধ্যা মজলিশের আসরে এমনই প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশ লক্ষ্য করলাম, আশ্চর্য্য এখানকার সাহিত্য-প্রীতি। তরুণ প্রবীণ পণ্ডিত ছাত্র সাহিত্য-অনুরাগী ও সাধারণ মানুষ—সকলেই স্থির চিত্তে শেষ পর্য্যন্ত বসে রইলেন। এমন জমজমাট আসর কদাচিত দেখা যায়।

পাটনা থেকে এসেছিলেন অধ্যাপক রথীন হালদার, ইনি রবীন্দ্র-কাব্যে মানবিকতা নিয়ে আলোচনা করলেন, আমরাও কিছু নিবেদন করলাম। তিন ঘণ্টা ধরে চলল সারস্বত অনুষ্ঠান।

সভাক্ষেত্রের তোরণদ্বার থেকে সভামণ্ডপ পর্য্যন্ত একটি রুচি-রম্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন ছাত্রদল। চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে ললিতকলা ও রস-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কিছু মাত্র অঘটন নয়—এটি এঁরা প্রমাণ করে ছাড়লেন। জানি না, কতজন এঁরা চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করে উত্তর-জীবনে দেবী বীণাপাণির চরণ-তলে অর্ঘ্য নিবেদন করার সুযোগ পাবেন—তবে সেবার সুযোগ এঁদের বৃত্তির মধ্যেই নিহিত। সাহিত্যের অঙ্গণে এসে মানুষের মনোবেদনার রূপটি যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন—কর্ম্মক্ষেত্রে তেমনি দিব্যদৃষ্টি লাভ হলে আশার কথা। সেখানেও দেহ ও মনের বেদনা তো অল্প নয়। যেমন সাহিত্যে—তেমনি জীবিকার সঙ্গে জীবনের যোগসাধন না হলে জীবনযাত্রার স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায় না।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় একটি বিদ্যালয়ে এসে জমল ছাত্রেরা। তারা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু শুনতে চায়। সকালবেলায় একজন ছাত্র প্রশ্ন করেছিল, শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ? জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ধর্ম্ম বলতে কি বোঝ তুমি? ঈশ্বর ভজনা? কতকগুলি আচার নিয়ম পালন? ধর্ম্মের অর্থ তো এত সঙ্কীর্ণ নয়। ব্যাপক অর্থে তা দেহরক্ষা ও সংসার চালনার যতকিছু নিয়মকানুন পালন, মনোবিকাশের যা-কিছু সাধনা, মানুষকে শ্রদ্ধা করা, ভালবাসা, তাকে আনন্দ দেওয়া—তার সঙ্গ পেয়ে আনন্দ লাভ করা, পুত্র-পরিজন প্রতিপালন, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য, দেশপ্রীতি, নীতি, নিয়ম, অনুদ্বেগকর বাক্য, সংকাজ···কোন্‌টা নয়? জানি না—ছেলেটি কি বুঝেছিল, কোন উত্তর করে নি। সন্ধ্যাবেলায় সেই কথাটিই বললাম। সাহিত্য-সৃষ্টিও ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম—নিজেকে ব্যক্ত করার আনন্দ, নিজে সৃষ্টি করে আনন্দ, অপরকে আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার আনন্দ। সৃষ্ট সাহিত্য ধর্ম্ম-বোধান্বিত হলে সমাজকে দুর্ব্বল করবে না, মানুষকে নৈরাশ্যে ডোবাবে না, হিংসা-লোভ-দ্বন্দ্ব সংঘাতে জীবন ক্ষতবিক্ষত হবে না, দেহ-বিলাসের কামনায় উত্তেজনা ও অবসাদ আসবে না—রূপলোক আর রস-লোকের প্রবাহধারাটি নিত্যকালকে আশ্রয় করে সুস্থ ভালবাসার মহিমা প্রকাশ করবে। অসুন্দর সাহিত্য অসুস্থ মনেরই রচনা। জীবজগতে সব বস্তু যদিও সুস্থ নয়, সুন্দর নয়, উদার নয়, বৃহৎ নয়, গ্লানিমুক্ত নয়; মনের চোরাগলিতে অনেক অন্ধকার, অবরুদ্ধ বাসনার নদীতে অনেক পাঁক, কামনার অর্দ্ধশুষ্ক শাখায় রুগ্ন কুসুমও প্রচুর ফোটে—এবং এই সকলকে অস্বীকার করে সুস্থ সুন্দর রূপটিকে প্রকাশ করতে গেলে ছবিটা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। তবু সৎ অসৎ

মিলিয়ে যে একটি পরম প্রকাশ—একটি পরম বার্তা আছে—যা থেকে চরিত্রের বা জীবনের সত্য পরিচয়টি পাওয়া যায়—তাকেই কি অস্বীকার করা চলে? উপনিষদের ঋষি তাই বলেন—আনন্দের প্রকাশ থেকে হ'ল সৃষ্টি—আনন্দে তার স্থিতি—আর আনন্দের মধ্যেই তার লয়। মূলে যদি আনন্দই রইল, সুস্থ জীবন-দর্শন কেন থাকবে না? কেন যা সৃষ্ট হবে তার প্রধান উদ্দেশ্য হবে না আনন্দ দান? অতএব—

অতএব উপদেশ তত্ত্বকথা থাক, জীবনের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে যাও শুধু। তোমার জীবন, আমার জীবন, নানা মানুষের নানা জীবন—স্বাদে, গন্ধে, রূপে, রসে বিচিত্র জীবন—সবের মূলেই রয়েছে একটি সুর। বীণার তার ঠিকমত বাঁধা থাকলে সঙ্গীত যেমন অবলীলায় সুর সৃষ্টি করে, তেমনি জীবনের তারেও চলছে সুরকে ধরা আর সুরকে আশ্রয় দেওয়ার লীলা। চলিত কথা আছে—সব মহৎ চিন্তা একই ধারায় বয়ে যায়। সেটা আর কিছুই নয়, সহযোগিতার আকুতি নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রেম-পরিচয়ের ক্ষেত্রটিতে পৌঁছলে মন যে সুরে গান গেয়ে ওঠে—সেই সুরই সমস্ত মানুষকে আপন আত্মীয় বলে কাছে টানে; একটি মহৎ কল্যাণ-চিন্তার মাধ্যমে হয় হৃদয় বিনিময়, নানা জাতের মানুষ মিলে তৈরী করে এক জগৎ, উপাসক হয় এক জগদীশ্বরের।

আদি মানবরা গুহার গায়ে অপটু হাতে জীবজন্তুর ছবি এঁকে আনন্দকে প্রকাশ করতে চেয়েছে—সেই অপূর্ণাঙ্গ চিত্রই তো চিত্রজগতের শেষ কথা নয়। উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে মিথুনাসক্ত নরনারীর ছবি থাকলেও মন্দির মধ্যে রয়েছেন নিরঞ্জনরূপী দেবতা। উদ্দেশ্যটা, মনের অনিত্য কলুষ-কালিমা একটি গোলা আরশিতে প্রতিবিম্বিত করে কলুষমুক্ত মনকে নিত্য পথে বোধস্বরূপের শ্রীপাদ-পদ্মে পৌঁছে দেওয়া। পথের দু'পাশে ঝোপঝাড়, খানাখন্দ, কণ্টক, শ্বাপদ প্রভৃতি নানা বিঘ্ন থাকলেও অভীষ্ট একটি লক্ষ্যস্থানও তো রয়েছে। সাহিত্য বা শিক্ষা এই লক্ষ্যস্থানটিকেই চিনিয়ে দেয়।

দূরত্বের মাপকাঠিতে রাজ্য ও দেশাচার মানুষকে যে ভাবেই পৃথক করে মাপুক না কেন—মনোবীণার তারে সর্ব্বব্যাপী চেতনার সুরটি এসে লাগলে ঘর-পর ভেদ মুছে যায়, তখন ভেদাভেদজ্ঞানহীন এক পরম ভূমিতে এসে দাঁড়াতেই হয় তাকে। মিথিলার সংস্কৃত-বিদ্যাপীঠ থেকে বাণী-বন্দনা উপলক্ষে একখানি আমন্ত্রণ লিপি পেয়ে এই সত্যটি আর একবার উপলব্ধি করলাম। বাংলার মত এখানেও বাণী-অর্চনার উৎসব হয়—প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে, প্রায় প্রতিটি ঘরে। সুদীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃতির যোগাযোগে স্থানটি বাংলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত—তাতে আর সন্দেহ কি। কি গভীর নিষ্ঠা এঁদের বাণী-পূজায় সে কথা ইতিপূর্ব্বে বলেছি, একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করে তা উপলব্ধি করলাম। মহারাণী লক্ষ্মীশ্বরী পাঠা-গারের অভ্যন্তরে দেবীমূর্ত্তি পূজিতা হয়েছেন—সামনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বসেছে সভা। বেলা তিনটা হলেও সভাক্ষেত্র সুধীজন পরিপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানে দু'টি বিষয় নিয়ে স্কুল-কলেজের ছেলেদের বিতর্ক আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হ'ল বিজ্ঞানের দান। বিজ্ঞান মানুষকে উন্নত করছে না ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে বিতর্ক। বলা বাহুল্য, পরমাণু শক্তি আবিষ্কার ও প্রয়োগ নিয়ে বিশ্ববাসীর মনে সম্প্রতিকালে যে শঙ্কা জেগেছে—এই বিতর্ক-সভা সেই প্রতিক্রিয়ার ফল। প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন আন্তঃকলেজের ছেলেরা। তিনটি বিভিন্ন ভাষায় (হিন্দী, মৈথিলি ও সংস্কৃত) এঁরা বিতর্ক করবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পুরস্কৃত হবেন। দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল—শিক্ষায় ধর্ম্মের স্থান। এই বিষয়টির প্রতিযোগীরা আরও নবীন—ইস্কুলের ছেলে। এদের বক্তব্য হিন্দী ও মৈথিলী ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। সভাপতি হয়েছেন পাটনা নিবাসী প্রবীণ লেখক ও বিধান সভার সদস্য শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহাশয়। মিথিলা ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রীবৈদ্য প্রমুখ বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন। এই সভা-আয়োজনের পিছনে রয়েছেন পাঠাগারের সভাপতি কুমার কল্যাণলাল। মিথিলার প্রতিটি কল্যাণধর্ম্মী প্রতিষ্ঠানের পিছনে এঁর সহযোগিতা থাকেই। এর সম্পাদকও একজন অক্লান্তকর্ম্মী সংস্কৃতি-অনুরাগী যুবক—শ্রীশঙ্কর মিশ্র। এই সভাক্ষেত্রে উত্তর-সপ্ততিতম বর্ষের এক মৈথিলী পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় হ'ল—নাম শ্রীজগদীশ্বরী শর্ম্মা। বাংলা ভাষার উপর এঁর প্রবল অনুরাগ, বাংলা বলেনও চমৎকার। এই কারণে ইনি 'বাঙালীবাবু' নামে খ্যাত।

ছেলেদের বিতর্ক ভাল লাগল। বেশ গুছিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করলে ওরা—ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত ও মৈথিলীতে ভাষণ দিলেন বিশিষ্ট কোবিদ্ জন। সভাপতি আমাদের অনুরোধ করলেন কিছু বলতে।

ইতস্তত করছিলাম—বাংলা কি এঁরা ভাল বুঝবেন?

সভাপতি অভয় দিয়ে বললেন, বাংলাকেই বলুন, আমরা সবাই বুঝতে পারব। আমি আর বিভূতিবাবু বাংলায় কিছু বললাম। বিভূতিবাবু অবশ্য প্রদেশীয় ভাষা ভালই জানেন—তবু মাতৃভাষাতেই বললেন। ওঁরা আনন্দ প্রকাশ করলেন। একটি অকপট প্রীতির আস্বাদ নিয়ে সভাক্ষেত্র থেকে ফিরলাম।

শ্রীমান শঙ্করের বাড়ীতেও বাণী অর্চ্চনা হয়। সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন তিনি। শঙ্করের অশীতিপর পিতাকে দেখলাম পণ্ডিতজনের সঙ্গে বসে শাস্ত্রালোচনা করছেন। মিথিলার একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ইনি। আরও কয়েকটি স্থান ঘুরে মিথিলার বাণী-পূজার সার্থক রূপটি প্রত্যক্ষ করলাম।

গতকাল দুপুরে মিথিলা ইনষ্টিটিউটে আরও কয়েকজন কৃতবিদ্য তরুণকে দেখেছিলাম। এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং জ্ঞানভারতীর সেবায় করেছেন আত্মনিয়োগ। এদের বিনয়-নম্র ব্যবহার ও অতি সাদাসিধা বেশভূষা দেখে একটি

উপমাই বারবার মনে পড়েছে। মিথিলার বিদ্যামন্দিরে এরা ফুলের মত ফুটে আছেন বলতে পারলেই উপমার সার্থক প্রয়োগ হ'ত, কিন্তু এ দের দেখে রসভারে অবনত ফলের কথাই মনে পড়েছিল। বর্ণ-সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধে ফুল মনকে আকৃষ্ট করে—অথচ তারই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে একটু প্রচার অহমিকাও যেন লেগে থাকে। শাখার উপর ঈষৎ উদ্ধতভাবেই সে তার রূপসম্ভার মেলে দ্রষ্টাকে লুব্ধ করে, কিন্তু সেই ফুলই রসভূয়িষ্ঠ ফলে পরিণত হলে—অবনত হয়ে সবুজ পত্রের অন্তরালে আত্মগোপনের চেষ্টা করে। মিথিলা ইনষ্টিটিউটে এ রাও তেমনি মিথিলার গৌরব ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতিকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন আন্তরিকভাবে। সরকারী সাহায্যপুষ্ট এই বাণী-ক্ষেত্রটিতে প্রাচীনকালের সংস্কৃতির রূপটিকে উন্মোচন করে দেখাবার চেষ্টা চলেছে কিছুদিন ধরে। কয়েকজন তরুণ গবেষক এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন—তার মধ্যে বাংলা দেশ থেকে এসেছেন শ্রীঅনন্ত-লাল ঠাকুর। বিদ্যাবিনয়ী এই তরুণদল মিথিলার প্রাচীন কীর্ত্তিকে কিভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন তা প্রাচীন পুঁথিপত্রের সংগ্রহ দেখলেই বেশ বোঝা যায়। কিভাবে এগুলি সংগৃহীত হয়েছে—কিভাবে বা পাঠোদ্ধার হচ্ছে এবং বিনষ্ট শ্লোক বা টীকার অংশটি আদি-অন্তের লিখনরীতি অনুযায়ী কেমন করে পূর্ণাঙ্গ করা হয়, সমস্ত তথ্যই পরিবেশন করলেন এ রা। শুনতে শুনতে কৌতূহল জাগে—বিস্ময় বাড়ে জ্ঞানসমুদ্রের অনন্ত পরিধির কথা ভেবে, চিত্ত পুলক-গৌরবে ভরে ওঠে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি-সুন্দর মূর্ত্তির আভাস পেয়ে।

এই বিদ্যাকেন্দ্র থেকে যে সব প্রাচীন পুঁথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং যেগুলি প্রকাশের জন্য গবেষণা চলছে তার কয়েকটির নাম মাত্র দিলাম।

কাব্যাদর্শ—সিংহলাচার্য্য রত্নশ্রীকৃত টীকা সহ প্রকাশিত হয়েছে, মূল সামীক্ষিক সাম্প্রকাশিত হবে। প্রকাশিত হয়েছে—কবি কর্ণপুর রচিত পারিজাতহরণ। আরও প্রকাশিত হয়েছে—১। ত্রিতলাবচ্ছেদ বা বিচার (নব্যন্যায়—শশিনাথ ঝা), ২। বিম্বগুল বক্র বিচার (জ্যোতিষ—দয়ানন্দ ঝা), ৩। লিঙ্গ বচন বিচার (ব্যাকরণ—দীনবন্ধু ঝা), ৪। History of Mithila (Dr. Upendra Nath Thakur, M.A, D Phil), ৫। বৌদ্ধ ন্যায়গ্রন্থে (ক) রত্নকীর্ত্তি নিবন্ধ ও (খ) জ্ঞানশ্রী নিবন্ধ। শেষোক্ত বই দুখানি শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুরের সম্পাদনায় জয়সোয়াল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশের অপেক্ষায় আছে যেগুলি তার মধ্যে ১। বিষ্ণুপুরাণের সামীক্ষিক সং, ২। তত্ত্ব চিন্তামণি বা স্বদেশের মূল (ক) পক্ষধরের আলোক ও (খ) মহারাজ মহেশ ঠক্কুরের দর্পণ।) ৩। ন্যায়সূত্র—গৌতম, ৪। ন্যায় চতুর্গ্রাহিকা যার মধ্যে আছে (ক) ন্যায়ভাষ্য—বাৎস্যায়ন, (খ) ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক—উদ্দ্যোতকর, (গ) ন্যায়ভাষ্য-বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা—বাচস্পতি মিশ্র ও (ঘ) ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি—উদয়নাচার্য্য, ৫। অলঙ্কার—অভয়তিলক উপাধ্যায় (গুজরাট), ৬। মিথিলায় নব্যন্যায়চর্চ্চা—অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৭। লীলাবতী, ৮। বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থাবলী।

এই বিদ্যামন্দিরে অলঙ্কার, ন্যায়, পুরাণ, স্মৃতিনিবন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য আটটি গবেষকের পদ আছে, এম-এ বিভাগ থেকে আচার্য্য ও গ্রাজুয়েট উপাধি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। আর সর্ব্বোপরি আছে প্রকাশন বিভাগ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কৃতবিদ্য ছেলেরা গবেষণা বা উপাধি লাভের জন্য এখানে আসেন। তাঁদের বসবাসের কোন অসুবিধা নাই, বৃত্তিলাভের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী ছেলেরা এদিকে বড় একটা আসেন না। চাকরির চেয়ে জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রটিকে তাঁরা হয় তো কাম্য মনে করেন না। অথচ জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্রটি অবৈতনিক নহে, জীবনে সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগও এখানে যথেষ্ট।

মিথিলা ইনষ্টিটিউটের গ্রন্থাগারে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দেখেছি, সংরক্ষণের ব্যবস্থাও ভাল। এই মনোরম ভবনটি সারস্বত সাধনার অনুকূল পরিবেশে স্থাপিত। প্রশস্ত প্রান্তর-বেষ্টিত তরুছায়াস্নিগ্ধ প্রাসাদ তুল্য এই ভবনটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দ্বারভাঙ্গার গৌরব প্রকাণ্ড একটি ভূমি, শহরের মধ্যে অথচ জনকোলাহল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এক সময়ে এটি মহারাজের ইউরোপীয়ান সেক্রেটারীর আবাসগৃহ ছিল।

প্রায় দু' ঘণ্টা কেটেছিল বিদগ্ধ সজ্জন সাহচর্য্যে। এই জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্র দেখেই মনে হয়েছে—নবীন-মিথিলা প্রাচীন-মিথিলার যোগ্য উত্তর-সাধক। রাজপাট আজ অস্তমিত, ক্ষমতা-দর্প জাঁকজমক ক্ষণবুদ্বুদের মত কালের হাওয়ায় ফেটে গেছে। এই সমস্ত নিয়ে যদি প্রাচীন মিথিলার গৌরবসম্পদকে লিপিবদ্ধ করতে যেতেন কেউ—কোথায় থাকত সে মিথিলা! 'রাজা রাজ-পাট শূন্যে মিলায় ধূলায় নিশান তুলে।' প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে মিথিলায় নবজাগরণের যে হৃদয়স্পন্দন অনুভব করেছি কয়েকটি মুহূর্ত্তে—তা মিথিলার চিরজীবনেরই বার্ত্তা। রামায়ণের জনক-চরিত্র যেমন, জনকরাজার মিথিলাও তেমনি কালজয়ী।

প্রভু তথাগত

শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদের সন্নিকটস্থ উদ্যান

(নেপথ্যে স্তবগান ও বাদ্যের ঐকতান চলতে থাকাকালে যবনিকা ধীরে ধীরে উঠতে থাকে। একটি মনোরম উদ্যানে স্বল্পালোকে দেখা যাবে কুমার সিদ্ধার্থ অন্যমনস্ক উদাসীন ভাবে উপবিষ্ট। নয়নে তাঁর তাপসের অন্তর্ভেদী জ্ঞানদীপ্ত দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি যেন এক পরম রহস্যলোকে হারিয়ে গেছে। শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি। সহসা রক্তাপ্লুত অবস্থায় আহত একটি রাজহংস কুমার সিদ্ধার্থের ক্রোড়ে পতিত হ'ল। কুমার সচকিত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন)

সিদ্ধার্থ। একি ? কার এই নিষ্ঠুর আচরণ ? কে এই নিরীহ রাজহংসকে এমন করে আঘাত করেছে ? (কণ্ঠস্বর কান্নার আবেগে আপ্লুত হওয়ায় কুমার আর কথা বলতে পারলেন না, উদ্যানস্থিত সরোবর হতে জল নিয়ে এসে অসীম করুণায় সেই ক্ষতস্থান ধৌত করতে করতে বলতে লাগলেন।)

—মানবের জিঘাংসাপ্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করবার কি কোন উপায় নাই ? বিনা প্রয়োজনে প্রাণীহত্যা ! এর কি কোন প্রতিকার নেই ? (রাজহংসের দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে) আহা ! কোন্ পাষণ্ড তোকে এমন করে শরাঘাত করেছে ? তার কি প্রাণে এতটুকু মায়া নেই, দয়া নেই ? (রাজহংস কুমারের শুশ্রূষায় ক্রমশঃ সুস্থ হয়।)

(বেগে দেবদত্তের প্রবেশ)

দেবদত্ত। এই যে কুমার, আমার রাজহংসকে নিয়ে তুমি খেলা করছ এক অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে ওকে আমি উড়ন্ত অবস্থায় হত্যা করেছি। দাও আমাকে আমার রাজহংস।

সিদ্ধার্থ। কে বললে এই রাজহংস তোমার ?

দেবদত্ত। বা রে ! রাজহংস আমার নয় ত কার ? ও আমারই শরে যখন হত হয়েছে তখন ওর উপর আমার পূর্ণ অধিকার। কালবিলম্ব না করে আমার রাজহংস দিয়ে দাও।

সিদ্ধার্থ। রাজহংস মরে নি, আহত হয়েছে মাত্র। তুমি তাকে আঘাত করেছ, আমি শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করেছি, রাজহংসকে যে বাঁচাল তার অধিকারকে তুমি অস্বীকার করছ কোন্ যুক্তিবলে ?

দেবদত্ত। বাজে কথা বলে আমায় ভোলাতে পারবে না কুমার। রাজহংস আমার চাই-ই।

সিদ্ধার্থ। বৃথা তর্ক করো না দেবদত্ত, রাজহংস আমি দেব না। আমি তাকে করুণা দিয়ে, সেবা দিয়ে সুস্থ করেছি, সেই সেবার অধিকারেই ওর ওপর আমার দাবি।

দেবদত্ত। উড়ন্ত অবস্থায় রাজহংসকে আহত করে আমি তোমাকে ওর সেবা করবার সুযোগ দিয়েছি, সুতরাং রাজহংস আমাকে দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য।

সিদ্ধার্থ। অদ্ভুত যুক্তি তোমার। স্পষ্ট ভাষায় আমি তোমায় বলছি এই রাজহংস তোমায় দেব না। আজ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি—ব্যথার কি অপরিসীম দাহ, কি সুতীব্র জ্বালা। সামান্য শরের আঘাতে যন্ত্রণা যদি এতই তীব্র হয়, জানি না পিতার রাজ-অস্ত্রাগারে রক্ষিত শাণিত সমরাস্ত্রগুলির কি মারাত্মক ধ্বংসের ক্ষমতা ? শুনেছি শত শত যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে ঐ সকল অস্ত্র। সহস্র সহস্র সৈনিকের রক্তস্নাত অস্ত্রগুলির ভয়াবহ ধ্বংসলীলা আজ এই মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করেছি···আজও পৃথিবীতে মানুষ মারাত্মক সমরায়োজনে অহরহ লিপ্ত। মূঢ় মানব রাজ্যসুখের লোভে, আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষায় নিয়ত ধ্বংসের ইতিবৃত্ত রচনা করে চলেছে—এর পরিসমাপ্তি নেই। দেবদত্ত, কপিলাবস্তুর সিংহাসন তুমি চাও ? গ্রহণ কর ভাই, ঐ রাজ্য আমি অনায়াসে পরিত্যাগ করতে পারি···তবু ভাই যাকে স্নেহ দিয়ে সেবা দিয়ে বাঁচিয়েছি, তাকে আমি দিতে পারব না···পারব না···

(ভাবাবেগে সিদ্ধার্থের কণ্ঠরোধ হয়ে এল। এক অপরিসীম বেদনায় যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠছে তাঁর চিত্ত। দেবদত্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় অপলক দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চেয়ে রইল।)

(যবনিকা ধীরে ধীরে নামতে থাকে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(স্থান কপিলাবস্তুর রাজ-অন্তঃপুর। রাজা শুদ্ধোধন ও রাজ্ঞী প্রজাবতী এক গভীর উৎকণ্ঠায় কথোপকথনে রত।)

শুদ্ধোধন। বড় দুঃসংবাদ রাণী, সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা স্থির করেছে। ওর মুখ চেয়ে মায়ার শোক আমি ভুলেছি, ওকে সমভাবে পিতার কর্ত্তব্য ও জননীর স্নেহ দিয়ে লালন করেছি, সকল বিষয়ে এক নিদারুণ উপেক্ষা, এক গভীর ঔদাস্য ওর প্রকৃতিগত। এতদিন অপরিসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে দিনপাত করেছি, আজ সেই উৎকণ্ঠার বীজ বাস্তবে মহীরুহ হয়ে দেখা দিয়েছে। এত সতর্কতা, রাজপ্রাসাদের অফুরন্ত প্রলোভন গৌতমকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ হতে

প্রতিনিবৃত্ত করতে পারল না। আমার সকল আশা, সব সুখ, আজ সমূলে উৎপাটিত হতে চলল।

প্রজাবতী। সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা নেবে? সত্য বলছেন আর্য্যপুত্র? তবে কি কুমারের জন্মকালে সেই ঋষিগণের ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হতে চলল! চাঁদের মত পুত্র, সোনার প্রতিমা বধূ গোপা, বিরাট শাক্যরাজ্য—রাজসিংহাসন, অনুরক্ত প্রজাকুল, স্নেহময় বৃদ্ধ পিতা—সবকিছু ফেলে, উপেক্ষা করে সন্ন্যাস নেবে গৌতম? এ কি অঘটন প্রভু? মাতা, পিতা, সুন্দরী বধূ, সদ্যোজাত শিশুপুত্র এদের উপর গৌতমের কি কোন কর্ত্তব্য নেই?

(সহসা সিদ্ধার্থের প্রবেশ)

সিদ্ধার্থ। এক মহান্ কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশে আমি প্রব্রজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প করেছি। সেই কর্ত্তব্য সমগ্র মানবজাতির উপর। মানবের কল্যাণকামনায় আজ আমি মহান্ ব্রত উদযাপনে প্রবৃত্ত হয়েছি। সংসারে মানবজীবনের এক শোচনীয় পরিণাম মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি। জরা-ব্যাধির প্রকোপে মানবকুল অহরহ পীড়িত হচ্ছে। দুঃখের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে মানবসমাজ কত অসহায় তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাই আজ আমি মানবের কল্যাণকামনায় জীবন উৎসর্গ করব বলে সঙ্কল্প করেছি। আমার ব্রত যেন সফল হয়, তুমি আশীর্ব্বাদ কর মা!

প্রজাবতী। বৎস, সন্ন্যাসের পথ বড় কঠোর, তোমার ঐ নবনীতকোমল সুকুমার দেহে সন্ন্যাসের সেই বেশ, সেই অনাহার, কৃচ্ছ সাধন কি সহ্য হবে পুত্র?

সিদ্ধার্থ। কঠোর ব্রত উদযাপনের জন্যই কঠোরতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় মা। কঠোরতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মত ধৈর্য্য আমি যেন লাভ করি—তুমি আশীর্ব্বাদ কর মা! (সিদ্ধার্থ নতজানু হয়ে প্রণাম করেন।)

শুদ্ধোধন। শোন কুমার, মানবজাতির মুক্তি-অন্বেষণে তুমি কেন অহেতুক দুঃখকে বরণ করবে? তোমার কিসের অভাব? স্বর্ণপ্রতিমা বধূমাতা গোপা, নব শশধরসম পুত্র, রাজসিংহাসন সবকিছু কেন পরিত্যাগ করবে? ধর্ম্মাচরণ করতে তোমার যদি একান্ত অভিলাষ হয়—গৃহে বসে তুমি যজ্ঞাদির আয়োজন করতে পার। অক্ষম, অথর্ব্ব বৃদ্ধ পিতার জীবনের স্বপ্নকে, সাধনাকে ব্যর্থ করে দিও না কুমার!

সিদ্ধার্থ। (সিদ্ধার্থের মনে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'ল। কিছুক্ষণ অধোবদনে থেকে বললেন) একটি মাত্র সর্ত্তে আমি সংসারে থাকতে পারি পিতা। আপনি অনুগ্রহ করে আমায় চারটি বর প্রদান করুন।

শুদ্ধোধন। (উৎফুল্ল হয়ে) চাও বৎস, কি তোমার অভিলাষ?

সিদ্ধার্থ। যৌবন যেন আমার জরায় আক্রান্ত না হয়, শরীর যেন আমার ব্যাধিশূন্য হয়, আমি যেন মৃত্যুঞ্জয়ী হই পিতা।

শুদ্ধোধন। (কিছুক্ষণ মৌন থেকে) তোমার অভিলাষ পূর্ণ করা আমার সাধ্যাতীত বৎস! যোগপ্রবিগণ সহস্র বৎসর সাধনা করে, কঠোর তপস্যায় যা লাভ করতে অক্ষম হন, সেই বর আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ তোমায় কিরূপে দিতে পারবে?

সিদ্ধার্থ। (সহসা শুদ্ধোধনের চরণে পতিত হয়ে) তবে পিতা আমায় এই বর দান করুন—আমার বিরহে আপনারা কাতর হবেন না, আমি যেন সাংসারিক ভোগসুখের সকল আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজকে মুক্ত রাখতে পারি!

শুদ্ধোধন। (সিদ্ধার্থের মস্তকে হাত বুলাতে বুলাতে) কঠোর সঙ্কল্প তোমার। আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য নেই এই সঙ্কল্প হতে তোমাকে বিচ্যুত করি। মানুষের দুঃখনিবৃত্তি তোমার সঙ্কল্প। ঈশ্বর তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন! তোমার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

(শিশুকে কোলে নিয়ে প্রবেশ করে গোপা। রাণী প্রজাবতী গোপার কোল থেকে শিশুকে নিজের অঙ্কে গ্রহণ করলেন। স্তব্ধ বিস্ময়ে অপলক নয়নে শিশুকে দেখতে লাগলেন সিদ্ধার্থ। তার পর শিশুকে নিজের ক্রোড়ে নিয়ে একবার তার মুখচুম্বন করে পুনরায় প্রজাবতীর ক্রোড়ে ফিরিয়ে দিলেন। এই বার ধীর পদক্ষেপে রাজপুরীর বহির্দ্দেশে অগ্রসর হতে লাগলেন। গোপা এতক্ষণ অবগুণ্ঠনাবৃতা হয়ে নীরবে কাঁদছিলেন। কুমারকে চলে যেতে দেখে গোপার অবগুণ্ঠন খসে পড়ল। উন্মাদিনীর মত ভূমিলুণ্ঠিতা হয়ে আছড়ে পড়লেন গোপা।)

গোপা। স্বামী, প্রভু!

(নেপথ্যে সারাক্ষণ করুণ বাদ্যধ্বনি, বাদ্যধ্বনি ক্রমে ক্রমে তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠবে। সিদ্ধার্থ একবার পিছনে তাকিয়ে ভূলুণ্ঠিতা গোপাকে দেখলেন, পরে দ্রুত পদে বাইরের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। যবনিকা নামল।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ছন্দক ও সিদ্ধার্থ

সিদ্ধার্থ। এই সেই বন্ধাতীরস্থ বেণুবন? রজনী শেষ হয়ে এল। এই স্থান হতে তোমাকে বিদায় নিতে হবে ছন্দক।

ছন্দক। প্রভু। এ দাস আপনার সঙ্গ ছাড়বে না, আমাকে আজীবন আপনার সেবা করবার অনুমতি দিন প্রভু!

সিদ্ধার্থ। যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করো না ছন্দক। আমাকে নিশ্চিন্তচিত্তে বিদায় নিতে দাও।

ছন্দক। সংসারে অনন্ত সুখের আকর পরিত্যাগ করে কিসের মোহে আপনি ছুটে চলেছেন প্রভু? স্নেহময় পিতা, অনন্ত করুণারূপিণী জননী, পতিব্রতা পত্নী, প্রাণপ্রতিম শিশুপুত্র—কেন আপনি ঐ সব পরিত্যাগ করবেন প্রভু? চিত্ত স্থির করুন।

সিদ্ধার্থ। স্থির চিত্তেই এই কার্য্যে আমি ব্রতী হয়েছি ছন্দক। ঐ দেখ ছন্দক। আজ পৃথিবী শুভ্র জ্যোৎস্নার বিমল হাসিতে

ভরে গেছে···কিন্তু কতটুকু তার স্থায়িত্ব? এই রজতধারা স্নাত নিশার অবসান হবে, তার পর আসবে অন্ধকার রাত্রি। সংসারে সুখের স্থায়িত্বও এইরূপ। আর তর্ক নয় ছন্দক, সময় হয়ে এসেছে। আমায় বিদায় নিতে দাও!

ছন্দক। (কাঁদতে কাঁদতে ঈষৎ অভিমানাহত হয়ে) বেশ, আপনার যা অভিরুচি করুন।

সিদ্ধার্থ। (একটু কঠোর দৃষ্টি হেনে) ছন্দক (শিরের উষ্ণীষ খুলে) এই নাও আমার শিরের আভরণ। এইবার মস্তক আমার বিনয়-নম্রতা শিখবে। এই নাও আমার অঙ্গের আভরণ, ঐ সুপ্ত ব্যাধের সঙ্গে আমি আমার পরিচ্ছদপরিবর্তন করব। আজ আমার অহঙ্কার, আভিজাত্যের, দাম্ভিকতার মুখোশ খসে পড়ুক। (নিজের তরবারির দ্বারা মস্তকের চুল কাটিতে উদ্যত হলে ছন্দক বাধা দিলেন)

ছন্দক। না না প্রভু! অত সুন্দর চিকুররাজি আপনি নষ্ট করবেন না। নিজের উপর অতটা নির্মম আপনি হবেন না।

সিদ্ধার্থ। অতটা অবুঝ হয়ো না ছন্দক, চিকুর নষ্ট করে আমি মিথ্যা শ্রীর আসক্তি হতে মুক্ত হব। (চিকুররাজি নষ্ট করে) এই নাও আমার তরবারি। ক্ষাত্রধর্ম আজ হতে পরিত্যাগ করলাম···

ছন্দক। এ কি করছেন প্রভু! (কাঁদছে ছন্দক)

সিদ্ধার্থ। শোকার্ত হয়ো না ছন্দক। রাজপ্রাসাদে ফিরে যাও তাড়াতাড়ি। পিতা-মাতা, পত্নী—সকলে গভীর শোকে মুহ্যমান। সত্বর ফিরে গিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দাও। ওঁদের ব্যথা উপশমের সহায়তা কর। বিদায় ছন্দক! বিদায় বন্ধু! বিদায়!

(ছন্দক কাঁদতে লাগল। যবনিকা নামে।)

(সহসা স্বর্ণপাত্রে পায়সান্ন সহ সুজাতার প্রবেশ)

সুজাতা। কে ওখানে? কে ঐ নয়নাভিরাম তাপস? উনিই কি তবে বনদেব? সেই স্বপ্নদৃষ্ট তেজোদৃপ্ত ভাস্বর জ্যোতির্ময় পুরুষ। দেবতা সুপ্রসন্ন নিশ্চয়ই, তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। (উৎফুল্ল হয়ে সিদ্ধার্থের সন্নিকটে গিয়ে ভক্তিভরে স্বর্ণপাত্র ওঁকে উৎসর্গ করলেন।)

সুজাতা। বনদেব! দাসী আজ সামান্য পায়সান্নে অর্ঘ্য-উপচার নিবেদন করছে, দাসীর প্রতি করুণা করে এ পায়সান্ন গ্রহণ করুন দেব!

সিদ্ধার্থ। কে তুমি দেবি? তোমার পরিচয়?

সুজাতা। নান্দিকপতির তনয়া আমি, দাসীর নাম সুজাতা। পুত্রকামনায় আজকের এই অর্ঘ্যরচনায় ব্রতী আমি দেব। কৃপা করে এইবার পায়সান্ন গ্রহণ করুন।

সিদ্ধার্থ। ভদ্রে! অতি সামান্য মানব আমি। তোমার সেই পরমারাধ্য বনদেব আমি নই। এই বনেই আমি তপস্যায় নিরত রয়েছি। আজ ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে তপস্যায় ব্যর্থকাম হয়েছি। যদি দ্বিধাহীনচিত্তে সংশয়হীনা হয়ে এক সামান্য বুভুক্ষু মানবকে তোমার ঐ পায়সান্ন নিবেদন করতে অভিরুচি হয়, তবে তুমি তা করতে পার সাধ্বি!

সুজাতা। কৃপা করে দাসীর এই অন্ন গ্রহণ করুন দেব।

সিদ্ধার্থ। আজ পরম তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে তোমার পায়সান্ন গ্রহণ করলাম দেবি! আমার দেহ সঞ্জীবিত হ'ল। আশীর্বাদ করি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক! তোমার কল্যাণ হোক!

(করজোড়ে সুজাতা বসে রইল। ওর নয়নে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। অতীব তৃপ্তিসহকারে অন্নগ্রহণ করতে লাগলেন সিদ্ধার্থ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য। স্থান গয়াধাম।

সুজাতার পায়সান্ন ও ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা সিদ্ধার্থের দেহ সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান সমাপন করে বোধিদ্রুম মহাবৃক্ষকে সাত বার প্রদক্ষিণান্তে পুনরায় যোগাসনে বসবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নিস্তব্ধ উরুবিল্বন। পূর্ণিমার রজতশুভ্র কিরণধারাস্নাত পৃথিবী। জ্যোৎস্নার সেই শুভ্র আলোকে এক কঠোর সঙ্কল্প অভিব্যক্ত হ'ল সিদ্ধার্থের মুখমণ্ডলে!

সিদ্ধার্থ। এই শেষবার। প্রাণপাত করে নিজের সঙ্কল্পে সিদ্ধিলাভ করতে হবে। এক স্থির সত্যকে আজ আবিষ্কার করতে হবে। মানবের নির্বাণের পথ, মুক্তির পথ আজ আমার অনুসন্ধান করতে হবে। সঙ্কল্পসাধনের শুভলগ্ন সমুপস্থিত। এই লগ্নকে আমি ব্যর্থ হতে দেব না। হে আকাশের বিমল শুভ্র পূর্ণচন্দ্র, নিস্তব্ধ উরুবিল্বনের মহীরুহগণ, হে শান্ত সমুন্নত প্রবীণ মহাদ্রুম, অরণ্যচারী হে শ্বাপদকুল, কীট, পতঙ্গ, বিহঙ্গ, হে মূক নীরব প্রকৃতি, আজ তোমরা সাক্ষী হও। সাধনার পথে, সিদ্ধির পথে হে আমার নীরব দর্শকগণ—তোমাদের সাক্ষী করে আজ আমি এই শুভ লগ্নে পরম মুহূর্তে দিব্য প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করছি···

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থি মাংস প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

(প্রতিজ্ঞা শুনে পৃথিবী কম্পিত হ'ল। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। সিদ্ধার্থ সেই মহাবোধিদ্রুমতলে যোগাসনে উপবিষ্ট হলেন। এক বিমল জ্যোতিতে চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠল। যবনিকা ধীরে ধীরে নামতে লাগল।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। স্থান ঋষিপত্তন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সিদ্ধার্থ সম্বোধিলাভ করার পর এখন প্রভু তথাগত নামেই পরিচিত। ঋষিপত্তনের সংঘারাম

শিষ্যগণের সান্ধ্য-মাঙ্গলিক পাঠে মুখরিত। ধূপ-অগুরু-চন্দন-মিশ্রিত ধুনার সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। কাশ্যপ, আনন্দ উপালী, অনাথপিণ্ডদ প্রভৃতি শিষ্যগণ যোগাসনে বসে করজোড়ে সান্ধ্য-মাঙ্গলিক পাঠ করছেন।"

"পঠমং বোধি পল্লকং দুতিয়ং অনিমিসম্পিচ
ততিয়ং চকমন সেট্‌ঠং চতুত্থং রতন ঘরং
পঞ্চমং অজপালশ্চ মুচলিন্দেন ছট্‌ঠমং
সত্তমং রাজায়তনং বন্দেত বোধি পাদকং !!"

(কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি··· ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি···

আনন্দ। প্রভু তথাগতের অনেকদিন কোন কুশলাদি পাই নি। প্রভুর জন্য আজ সহসা চিত্ত আমার বিক্ষিপ্ত হয়েছে।

কাশ্যপ। শ্রাবস্তী, কোশল, বৈশালী, কৌশাম্বী প্রভৃতি রাজ্যগুলি পরিক্রমা সমাপন করে প্রভু ঋষিপত্তনের অভিমুখে যাত্রা সুরু করবেন বলে সংবাদ পেয়েছি, এখন প্রভু মগধরাজ্যে অবস্থান করছেন বলে জানতে পেরেছি ····

(সহসা প্রভু তথাগতের প্রবেশ, সঙ্গে শিষ্য সারিপুত্ত ও মদ্গোল্লায়ণ)

তথাগত। শুভমস্তু। শুভমস্তু। তোমাদের কুশল ত? সংঘারামের মঙ্গল ত? (সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করে—প্রভু তথাগতকে প্রণাম করলেন।)

কাশ্যপ। প্রভুর কুশল ত?

তথাগত। তোমাদের কুশলেই আমার কুশল। মগধ হতেই এখন ফিরে এলাম। বৎসগণ এবারের এই পরিক্রমায় আমি ঐ পবিত্র আধার দুটি আবিষ্কার করেছি। রত্নদুটি ব্রাহ্মণকুমার। দু'জনেই আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। উনি সারিপুত্ত, উনি মদ্গোল্লায়ণ। (সঙ্ঘারামের শিষ্যগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।)

তথাগত। এইবারের পরিক্রমায় আরও তিনটি হৃদয়কে বিজয় করে ফিরেছি।

অনাথপিণ্ডদ। কোন মহান্ সম্রাট কি আমাদের পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন প্রভু?

তথাগত। হ্যাঁ। মগধাধিপতি আমাদের শীলের উপর প্রগাঢ় আস্থা স্থাপন করেছেন। আমি সেকথা বলছি না।

উপালি। প্রভু কি অন্য কোন মহাত্মার সন্ধান পেয়েছেন?

তথাগত। শুদ্ধভক্তি আমি উপঢৌকন পেয়েছি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ঘোর আত্মকেন্দ্রিক কৃষিজীবী ব্রাহ্মণকুমার ভরদ্বাজ সংস্কারমুক্ত হয়ে মানবপ্রেমী হয়েছে, সত্যাশ্রয়ী হয়েছে।

উপালি। অপর দুই জন!

তথাগত। এক দুর্দ্দান্ত দস্যু নরহত্যা, লুণ্ঠন, প্রভৃতি সমুদয় পাপাচার বিসর্জন দিয়ে সাধু গৃহস্থে রূপান্তরিত হয়েছে।

উপালি। শেষেরটি?

তথাগত। একজন নারী।

অনাথপিণ্ডদ। নারী?

তথাগত। হ্যাঁ, নারী। আমাদের ত্রিশরণ ও শীল গ্রহণে নারীর কোন বাধা নাই। বৎস আনন্দের পরামর্শক্রমে আমি এইবার সঙ্ঘারামে নারীদের স্থান দেওয়া স্থির করেছি।

অনাথপিণ্ডদ। নারী যে মায়াময়ী প্রভু! তাদের সাহচর্য্যে মায়াপাশে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা যে আছে প্রভু!

তথাগত। কিন্তু নারীরাও ত দুঃখভোগ করে বৎস! তারাও জরা, ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পায়। নির্ব্বাণলাভের তারাও উপযুক্ত আধার।

উপালী। কে সেই মহীয়সী নারী প্রভু?

তথাগত। পুত্রশোকাভিভূতা কৃষ্ণা গৌতমী। পুত্রশোকের সংস্কার হতে উনি মুক্ত হয়েছেন। সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্লায়ণ ওঁরা শীল সম্পর্কে জ্ঞানলাভে উৎসুক। আমি পুনরায় শীলগুলি বলছি, বৎসগণ শীলগুলির প্রতি যত্নপরায়ণ হও। আর্য্যশ্রাবকেরা প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে শীলগুলি পালন করেন। এই শীলগুলি বিজ্ঞজনের দ্বারা অনুমোদিত।

সারিপুত্ত। নির্ব্বাণ কি?

তথাগত। নির্ব্বাণ অব্যক্ত। নির্ব্বাণ কোন বিবৃতি নয়, নির্ব্বাণ কোন সত্তা নয়—নেতি—অভাব, নির্ব্বাণ একটি নেতিবাচক অবস্থা। শান্তি, আনন্দ, পবিত্রতা, মুক্ত জীবনের এক পরম আস্বাদ নির্ব্বাণের অবস্থা।

মৌদ্গল্লায়ণ। জগৎ কি?

তথাগত। জগৎ শুধু কতগুলি ঘটনার অনন্ত প্রবাহ। জগতে শাশ্বত বলে, স্বয়ম্ভু বলে কিছু নাই। এখানে চলেছে শুধু পরিবর্ত্তনের প্রবাহ। এই পরিবর্ত্তন শুধুমাত্র রূপান্তর নয়, বিপরীত সংঘর্ষের মধ্যে এক নূতনের পরম আবির্ভাব। সমস্তই একটি নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার স্থান জগতে নেই।

কাশ্যপ। জ্ঞান ও সত্য কি?

তথাগত। জগৎ অসীম। সত্যও সীমিত নয়। অনন্ত সত্যের ভাণ্ডার হতে আমরা একটি সত্যকে উপলব্ধি করেছি মাত্র। জ্ঞান—ধন নয়, মান নয়, রাজ্য নয়, শক্তি নয়, কঠোর পুণ্যময় জীবনযাপনের আদর্শই জ্ঞান। জ্ঞানী যিনি তিনি সংস্কারকে জয় করেছেন, কুসংস্কারকে পরিত্যাগ করেছেন। এই জ্ঞান লাভ করতে গেলে অষ্ট আর্য্য পন্থাকে প্রতিপালন করতে হয়। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক জীবন, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক আনন্দ বা সমাধি এই অষ্ট আর্য্য পন্থা! কোন বিষয়কে দেখে নেবার নাম সংখ্যা, জেনে নেবার নাম বিজ্ঞান, আর সঠিকভাবে বুঝে নেবার নাম প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞাও আবার করুণা ও মৈত্রী ব্যতীত সম্ভব নয়। করুণাহীন জ্ঞানের নাম বন্ধ্যা প্রজ্ঞা!···

কাশ্যপ। প্রভু ব্রাহ্মণ কে?

তথাগত। জটা গোত্র, জাতিতে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সত্যে ও ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত তিনি ব্রাহ্মণ।

আনন্দ। সত্য কি উপলব্ধির বস্তু?

তথাগত। সেই সত্যকে নিজের প্রচেষ্টায় আয়ত্ত করতে হয়। তোমাকে যা সত্য বলা হবে তুমি তা সত্য বলে গ্রহণ করতে নাও পার। তুমি নিজেই নিজের প্রদীপ হও, নিজেই নিজের শরণ হও, নিজে যাকে সত্য বলে জেনেছ, বুঝেছ, দেখেছ—তাই সত্য।

অনাথপিণ্ডদ। ঈশ্বর কি?

তথাগত। এই প্রশ্ন যে করে, এবং যে উত্তর দেয় উভয়েই ভ্রান্ত। থাক এ সম্বন্ধে এখন আর কিছু বলতে চাই না। —কে? কে আপনি?

(জনৈক দূতের প্রবেশ।)

দূত। প্রভু! আমি কপিলাবস্তু হতে আসছি। মহারাজ শুদ্ধোধন আপনাকে কপিলাবস্তু যাবার আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন।

তথাগত। কপিলাবস্তু! আজ দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে কপিলাবস্তু পরিত্যাগ করেছি। প্রণাম জন্মভূমি! প্রণাম তোমায়। (দূতের দিকে ফিরে) পথশ্রমে তোমার কোন ক্লেশ হয় নি ত? রাজ্যের সবকিছু মঙ্গল ত? পিতামাতার কুশল ত?

দূত। সবই কুশল প্রভু। তবে আপনার বিরহবেদনায় সকলে ব্যথিত। শ্রাবস্তী, কোশল, মগধ, কৌশাম্বী প্রভৃতি রাজ্যগুলি আপনার পদধূলিতে কৃতার্থ হয়েছে, ধন্য হয়েছে। সকলকেই কৃপাবর্ষণ করেছেন আপনি। শুধু কপিলাবস্তু কি উপেক্ষিত থেকে যাবে? কপিলাবস্তুর উপর এতটা কার্পণ্য কেন প্রভু?

তথাগত। কপিলাবস্তুর আমন্ত্রণ আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গ্রহণ করছি। অবিলম্বে আমরা তথায় উপস্থিত হব। গুরুপদে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বার্ত্তা নিবেদন করো!

(যবনিকা)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[উৎসবমুখর কপিলাবস্তু। রাজকুমার নন্দের বিবাহ-উৎসব। সুসজ্জিত নগরী। দিকে দিকে নৃত্যগীত···নহবতের সুমধুর তান। পুরবাসিগণের গৃহদ্বার সিন্দুরলিপ্ত, মঙ্গলকলস ও আম্রপল্লব দ্বারা সুসজ্জিত। রাজ-অন্তঃপুর হতে মঙ্গলশঙ্খ বাজছে। পুত্রের বিবাহোৎসবে রাজা শুদ্ধোধন কিন্তু ততটা উৎফুল্ল নন। এক গভীর ঔদাস্যে পরিপূর্ণ রাজার অন্তর, মনের মধ্যে অসীম শূন্যতা।]

প্রজাবতী। প্রভু, আজকের দিনে আপনি এত বিষণ্ন কেন? মঙ্গলাচার সম্পূর্ণ হয়েছে। বর-বধূকে আশীর্ব্বাদ করবেন আসুন।

শুদ্ধোধন। তুমি আশীর্ব্বাদ করলেই হবে। সুখ, আনন্দকে আজকাল আমার বড় ভয় হয় রাণী। সুখ আনন্দ আমার জীবনে আশীর্ব্বাদ নয়···এ নিদারুণ অভিশাপ প্রবঞ্চনা। তাই ওদের আমি পরিহার করতে চাই,···সবকিছু হতে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাই। আজ আমার চিত্ত বড়ই বিক্ষিপ্ত রাণী। তুমি—কে—কি সংবাদ সচিব?

(প্রধান সচিবের প্রবেশ)

প্রধান সচিব। মহারাজ, প্রভু তথাগত আজ শিষ্যগণসহ কপিলাবস্তুর উপবনে সমাগত হয়েছেন।

শুদ্ধোধন। সত্য বলছ সচিব? সে এসেছে—এসেছে? এতদিন পরে বৃদ্ধ পিতাকে তার মনে পড়েছে! ওরে—কে কোথায় আছিস, তোরা শঙ্খধ্বনি কর, জয়ধ্বনি কর। (নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি) যাও—যাও সচিব তুমি অবিলম্বে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস। পরিচর্য্যার জন্য দাসদাসীদের পাঠাও। কনকমণ্ডিত রথ, কনক-কিরীট, রাজ-আভরণ কুরুবকের সুগন্ধি মাল্য প্রভৃতি বিবিধ উপচার নিয়ে তাকে বরণ কর। এতটুকু ত্রুটি থাকতে দিও না। যাও।

প্রধান সচিব। সমস্তই পাঠিয়েছিলাম মহারাজ। তিনি সবকিছু বর্জ্জন করেছেন, প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু ভিক্ষাপাত্র ও ধর্ম্মচক্র হস্তে ধারণ করে পদব্রজে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

(প্রধান সচিবের প্রস্থান)

শুদ্ধোধন। (উৎফুল্ল হয়ে) ঐ দেখ রাণী ওরা আসছে। গবাক্ষের পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ ঐ অপূর্ব্ব গৈরিক মেলার মিছিলকে। ঐ দেখ তোমার গৌতমের গৈরিক বাসে আবৃত দেহের হেমময় অপূর্ব্ব আভা।

[নেপথ্যে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি···ধম্মং শরণং গচ্ছামি···সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি···ত্রিশরণ মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে।]

(তথাগতের প্রবেশ)

তথাগত। ভবান্ ভিক্ষাং দেহি!

শুদ্ধোধন। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) তোমার একি বেশ পুত্র! তোমায় এ বেশে আমি দেখতে পারব না, পারব না।

তথাগত। ভবান্ ভিক্ষাং দেহি। ভিক্ষুর এই ত ঐশ্বর্য্য পিতা। (তথাগতের মুখে প্রসন্ন হাসি)

শুদ্ধোধন। ওরে গৌতম···পুত্র! (প্রথমে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন প্রভু তথাগতকে, এক দিব্য আনন্দের আবেশে শুদ্ধোধনের ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল। তিনি করজোড়ে ত্রিশরণ মন্ত্র গাইলেন। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।)

তথাগত। (প্রজাবতীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) মা—মা।

প্রজাবতী। (কম্পিত কণ্ঠে) কে—কে—তুমি পুত্র? তোমার দর্শনে এত সুখ, এত পুলকোচ্ছ্বাস! কে তুমি।

[নেপথ্যে ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে লাগল]

তথাগত। মা—মা।

[নন্দের প্রবেশ]

নন্দ। প্রভু বিবাহবাসর ত্যাগ করে তোমাকে দর্শন করতে

ছুটে এসেছি। তোমার মুখনিঃসৃত অন্তরমন্ত্র আজ সকল মানুষকে সঞ্জীবিত করেছে···এই দীন দাসকেও দাও সেই অমৃতময় মোহন মন্ত্র। আমাকেও দেখাও সেই জ্ঞানের আলোকবর্তিকা।

(নন্দ তথাগতকে প্রণাম করলেন) তার পর সকলে ধীর পদক্ষেপে কক্ষান্তরে চলে গেলেন।)

(নেপথ্যে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি···ধম্মং শরণং গচ্ছামি···সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।)

[গোপার প্রবেশ]

গোপা। কৈ সেই নয়নাভিরাম তেজঃপুঞ্জকলেবর দেবতা? কৈ সেই পরমবাঞ্ছিত বল্লভ? কোথায় তিনি?
—রাজপ্রাসাদের সকলেই পেল তাঁর সান্নিধ্যের স্নিগ্ধ স্পর্শ। শুধু আমিই উপেক্ষিতা থেকে যাব? প্রাণের ব্যাকুলতায় ছুটে এলাম তাঁকে দর্শন করতে, কিন্তু কৈ তিনি? তবে কি প্রভু আমাকে দর্শন দেবেন না?

(নেপথ্যে 'গোপা' 'গোপা' ডাক)

—ঐ আহ্বান কার? শান্ত গম্ভীর উদাত্ত স্বরে ঐ অমৃতক্ষরা আহ্বান কার?—ঐ ঐ ত প্রভু আসছেন। (মুখে হাসি ফুটে উঠল, আবেগপূর্ণ কণ্ঠে) ঐ ত সেই পরমবাঞ্ছিত বল্লভ!

(ধীর পদক্ষেপে তথাগতের প্রবেশ)

—হে পরম পুরুষ তুমি এসেছ? সার্থক হয়েছে আমার দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা। আমাকে তুমি রিক্ত করে পূর্ণ করে দাও! (পবিত্র গঙ্গাবারি দ্বারা তথাগতের পদযুগল ধৌত করে নিজের অলক-গুচ্ছের দ্বারা মার্জ্জনা করলেন সেই দেবদুর্লভ পদযুগল, নেপথ্যে বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ। তথাগত অপলক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন গোপাকে)

গোপা। রাহুল! রাহুল! (শিষ্য সারিপুত্তের সঙ্গে সপ্তম-বর্ষীয় বালক রাহুলের প্রবেশ, তথাগত দেখলেন নিজ আত্মজকে)—আজকে কে এসেছে জানিস! দেখেছিস বাবা! ঐ সন্ন্যাসীকে চিনতে পেরেছিস রাহুল?

রাহুল। কে মা?

গোপা। ওরে তোর পিতা। তোর পরমগুরু। যা চাইবার আজ ওঁর কাছ হতে প্রাণ খুলে চেয়ে নে বাবা। (আনন্দের বিপুল আবেগে যেন গোপার সমস্ত শরীর কঁপছে)

রাহুল। (বিহ্বল দৃষ্টিতে তথাগতকে দেখতে দেখতে হস্ত প্রসারিত করল)—বাবা—বাবা!

তথাগত। বৎস!

রাহুল। বাবা!

তথাগত। সারিপুত্ত, বালককে ওর পিতৃধন দাও,—ভিক্ষাপাত্র!

(সারিপুত্ত বালকের হাতে ভিক্ষাপাত্র দিলেন)

গোপা। (আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে)—আজ সার্থক তুই রাহুল। এই ভিক্ষাপাত্রে কি আছে জানিস? সাত রাজার গুপ্ত ঐশ্বর্য্য ওতে গচ্ছিত আছে। (রাহুল কিছুক্ষণ ভাববিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর সারিপুত্ত বালককে নিয়ে কক্ষান্তরে প্রস্থান করলেন)

তথাগত। গোপা! সার্থক হোক তোমার জীবন। (নেপথ্য হতে ত্রিশরণ মন্ত্রের অল্প রেশ শোনা যাচ্ছে।)

গোপা। (তথাগতের পায়ে মাথা রেখে আবেগকম্পিত কণ্ঠে) প্রভু! প্রভু তথাগত। (নেপথ্যে ত্রিশরণ মন্ত্র তীব্র হয়ে উঠল।···বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল···গান শোনা যায়।)

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান—ঋষিপত্তন সঙ্ঘারাম। মাঘী পূর্ণিমার রাত্রি। যোগাসনে প্রভু তথাগত উপবিষ্ট. মারের প্রবেশ।]

মার। হে তপোধন—আমার শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন গ্রহণ কর দেব। কঠোর তপোবলে—পবিত্র জীবনের এক মহান্ আদর্শে তুমি নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছ। তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করার সাধ্য আমার নেই।—হে মহান্—হে জগজ্জ্যোতি তপোবলে জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করো না। হে মহামহিম, তোমার নমস্কার। হিংসা-জর্জ্জর, কলুষ-কালিমালিপ্ত মানুষ গভীর নৈরাশ্যের মাঝে তোমায় স্মরণ করে পাবে আনন্দ, আশা ও শান্তির অভয় মন্ত্র। দেব আমার অনুরোধ—

তথাগত। (যোগারূঢ়াবস্থায়) তোমায় চিনেছি। উপলব্ধি করতে পেরেছি তোমার অন্তরের অভিলাষ।

মার। প্রভু তথাগত!

তথাগত। তোমার উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই। শঙ্কিত হয়ো না, জগতের কোন নিয়ম ও শৃঙ্খলায় আমি বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাই না। আজকের এই পরম লগ্নে আমি তোমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আজ হতে তিন মাস পরে এই পূর্ণিমা তিথিতেই আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করব।

(প্রতিজ্ঞা শুনে পৃথিবী কম্পিত হ'ল)

মার। প্রভু তথাগত। (মারের অন্তর্দ্ধান) (প্রভাত হয়ে এল। পূর্ব্বদিগন্তে সূর্য্য উঠছে। সঙ্ঘারামের সকল শিষ্য ত্রিশরণ গাইলেন) কাশ্যপের প্রবেশ।

তথাগত। শিষ্য কাশ্যপ। তোমরা এইবার আত্মপ্রতিষ্ঠ হও, আত্মশরণ হও, মুক্তির জন্য আত্মনির্ভরশীল হও। এই সঙ্ঘারামের সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব আজ তোমার উপর অর্পণ করছি।

কাশ্যপ। কেন প্রভু?

তথাগত। আগামী তিন মাসের মধ্যে আমাকে আমার সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। আগামী পূর্ণিমাতিথিতে আমি পরি-নির্ব্বাণ লাভ করতে চাই বৎস! এইবার আমাকে বিদায় নিতে হবে।

কাশ্যপ। না, না, প্রভু। আপনার বিরহ আমরা সহ্য করতে পারব না।

তথাগত। আমার পরিনির্ব্বাণ হলে বৃথা শোক করো না বৎস! এই বিরহ জগতের নিয়ম। শোককে সহ্য করবার জন্য সংস্কারমুক্ত হও। অবিহিংসা-সঙ্কল্পপরায়ণ শীলবান ভিক্ষু কখনও শোক করেন না।

'অহিংসকা যে মনুন যো নিচ্চং কায়েন সংবুতা
তে যন্তি অচ্চ তং ধানং যত্থ গন্ত্বা না সচরে।'

কাশ্যপ। প্রভু, আমরা আপনার উপদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করেছি। কিন্তু—

মৌদ্গাল্লায়ণ। প্রভু আপনি আমাদের প্রাণ হতেও প্রিয় তাই সহসা—

সারিপুত্ত। শীলের প্রতি আমরা আস্থাবান তবুও আপনাকে হারানোর মত নির্ম্মম আঘাত আর কিছু নেই।

উপালী। আরও কিছুদিন জগতকে উপদেশ দান করুন।

তথাগত। বুঝতে পেরেছি, তোমরা শোকার্ত্ত হয়েছ। স্মৃতি, মার্গ, ধ্যান, সমাধি, সমাপত্তি প্রভৃতি সমস্ত পূত ধর্ম্মের আধার শীল। শীলের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যক্তির শোক নেই, শঙ্কা নেই, ভয় নেই, প্রয়োজন নেই। বৎসগণ, তোমরা শোককে পরিহার কর। প্রিয় হতে শোক, ভয় হতে শোক উৎপন্ন হয়। কাজেই তোমরা প্রিয়বিমুক্ত হও, শোকের সংস্কার হতে মুক্ত হও! কিসের শঙ্কা তোমাদের? কিসের ভয়? এই নাও আমার স্মৃতিবিজড়িত দেহবাস। এই দেহবাসের দায়িত্ব, সঙ্ঘারামের দায়িত্ব তোমরা অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ কর। আমি আজই আনন্দ, সারিপুত্ত, মৌদগল্লায়ন এদের নিয়ে পরিক্রমা সুরু করব। অনেক রাজ্য আমায় পরিভ্রমণ করতে হবে…সময় ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। আজ এই সঙ্ঘারাম হতে বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে আমি কি দেখতে পাচ্ছি জান?—তোমাদের এক গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এক পবিত্র ভাস্বর আদর্শের দীপ্ত মহিমা। জম্বুদ্বীপের প্রতিটি দুঃখযন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষই শ্রদ্ধাবনত শিরে গ্রহণ করেছে এই ত্রিশরণ মন্ত্র।…আমি দেখতে পাচ্ছি ত্রিশরণ মন্ত্রের এক মহা-প্লাবন—নিখিল বিশ্ব সেই প্লাবনে পরিস্নাত হয়ে গ্রহণ করেছে তোমাদের আদর্শ। সূর্য্যরশ্মির মত অজ্ঞানের তমসাকে নাশ করে এই মন্ত্র সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, রাজা-প্রজা, দীন-দুঃখী-দরিদ্র সকলে নিঃসঙ্কোচে ত্রিশরণের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে… জগতে তোমরা জয়ী হয়েছ।

(শিষ্য কাশ্যপকে নিজের দেহবাস দান করলেন, প্রভু তথাগত। শিষ্যগণ সকলে প্রভু তথাগতকে প্রণাম করলে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।)

সূত্রধর। (নেপথ্য হতে) ওঁদের যাত্রা হ'ল সুরু। সেই মহাপরিক্রমা। ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন প্রভু তথাগত। সঙ্গে শিষ্য আনন্দ, সারিপুত্ত, মৌদগল্লায়ন উপালী, যশ প্রভৃতি ভিক্ষুগণ। তাঁরা ঐ পবিত্র ভাস্বর আদর্শের দীপ্ত মহিমা প্রচার করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। আম্রপালী হতে বৈশালী, বেলুব গ্রাম ধীরে ধীরে অতিক্রম করলেন ওঁরা। শ্রাবস্তীতে এসে শিষ্য সারিপুত্তের তিরোভাব ঘটল। মৌদগল্লায়নও বিদায় গ্রহণ করলেন নির্ব্বাণ-লাভ করবার জন্য।…এই সময় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন প্রভু তথাগত। রোগে জীর্ণ হয়ে আসছে তাঁর দেহ, তবুও ক্লান্ত পদে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চলেছেন ভণ্ড গ্রামের দিকে। ওঁরা ক্রমশঃ অতিক্রম করলেন হস্তিগ্রাম, আম্রগ্রাম, জম্বুগ্রাম, চম্পানগরী …কৌশাম্বী, কোশল প্রভৃতি। প্রভু তথাগতের পরিনির্ব্বাণের সময় সমাগত জেনে প্রভুকে শেষ দর্শন করবার মানসে দেশ-দেশান্তর হতে সমবেত হতে লাগলেন শিষ্যগণ! ভোগনগর অতিক্রম করে ওরা সমুপস্থিত হলেন আজ পাবাগ্রামে…।

[মঞ্চ আলোকিত হ'ল]

চণ্ড। আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য দেব। পিতৃপুরুষের বহু পুণ্যফলে আজ আমার গৃহ আপনার পদরেণুস্পর্শে পবিত্র হয়েছে। কিন্তু প্রভু, আমি দীন অন্ত্যজ চণ্ডালের পুত্র, অন্ত্যজ কি প্রকারে কোন্ উপচারে আপনার সেবা করবে? আমার স্পর্শ যে দূষিত প্রভু!

তথাগত। তুমি আমার বন্ধু চণ্ড। আজ তোমার সেবায় আমি পরিতৃপ্ত হতে চাই। তুমি অন্ত্যজ নও বন্ধু, তোমার হৃদয় আছে, তোমাতে আমাতে আজ কোন প্রভেদ নেই, তুমি বিনয়ী তাই তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি অতিথিপরায়ণ, তাই তুমি ব্রাহ্মণ হতেও উত্তম।

চণ্ড। প্রভু তথাগত। (চণ্ড চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে থালায় করে শূকরমদ্দব নিয়ে এল) অন্যকিছু সংগ্রহ করতে পারলাম না দেব! অধম অন্ত্যজের নিকৃষ্ট সেবায় পরিতৃপ্ত হোন প্রভু!

তথাগত। হোক এ শূকরমদ্দব। তবু আজ আমি নিঃসঙ্কোচে এই আহার গ্রহণ করছি, দাও—দাও।

(প্রভু তথাগত শূকরমদ্দব আহার করলেন। আর একবার মানবপ্রেমের বিজয়দুন্দুভি বেজে উঠল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল)

সূত্রধর। কিন্তু চণ্ডপ্রদত্ত ঐ শূকরমদ্দব গ্রহণ করে প্রভু তথাগত মারাত্মক রক্তামাশয় পীড়ায় আরও জীর্ণ হতে লাগলেন। সমস্ত শরীর তাঁর বিষাক্ত হয়ে উঠল। ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলেন প্রভু তথাগত। শরীর রোগে ও পথশ্রমে ক্লান্ত।… আর অগ্রসর হতে পারছেন না, তবুও তিনি প্রিয় শিষ্য আনন্দের স্কন্ধে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। পাবাগ্রাম হতে মাত্র বারো মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে অনেক সময় অতিবাহিত হ'ল। পথিমধ্যে বারবার তাঁকে ক্লান্তি অপনোদন করার নিমিত্ত বিশ্রাম নিতে হ'ল। অবশেষে দিবাবসনের রক্তরাগ যখন দিগন্তের অন্তরালে বিলীন হ'ল, তখন কুশীনারা গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন

প্রভু তথাগত। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন প্রভু তথাগত। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল। শিষ্যগণ সান্ধ্যমাঙ্গলিক ও ত্রিশরণ গাইলেন··· বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি··· সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। পূর্ণিমার তিথি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হ'ল। রজতশুভ্র জ্যোৎস্নার প্লাবনে স্নাত হয়ে উঠল সমগ্র চরাচর।

(মঞ্চ আলোকিত হ'ল)

আনন্দ। আমাকে সবকিছু সহ্য করবার ধৈর্য্য দান করুন প্রভু! কোথায় আপনার পরিনির্ব্বাণের ব্যবস্থা করব অনুগ্রহ করে আমায় নির্দ্দেশ দিন। আপনার মনোমত কোন্ স্থানটি নির্ব্বাচন করব বলুন দেব! সেকি চম্পানগরী, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী···না বারাণসী?

তথাগত। এই সেই স্থান! কুশীনারা!

আনন্দ। কুশীনারা? (সহসা আনন্দ কেঁদে উঠল)

তথাগত। আনন্দ শোকের এই সময় নয়, সংস্কার হতে দুঃখের জন্ম, সংস্কার রূপ অজ্ঞানের অন্ধকার নাশের জন্য চাই সংস্কারমুক্ত মন ও মানসিক দৃঢ়তা। পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিগণ শীলগুলিকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। আমি মহাসম্বোধিলাভের সময় সুজাতাপ্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেছি এবং পরিনির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বে পেয়েছি চণ্ড প্রদত্ত শূকরমদ্দব। অতেতুক তোমরা চণ্ডকে দোষারোপ করো না! সে আমার হিতকামী, বন্ধু হতেও প্রিয়। তোমাদের আর কি কোন জানবার বিষয় আছে, আরও কি আছে কোন সংশয়?

(মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল)

সূত্রধর। শুভ্র জ্যোৎস্নাস্নাত ধরণীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রভু তথাগতের মুখনিঃসৃত শেষ উপদেশবাণী শুনল শিষ্যগণ। এই সেই আশ্বাসবাণী, উপদেশাবলী—দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ যে বাণী তিনি জগৎকে শুনিয়েছেন তারই সার মর্ম্ম ···শিষ্যগণের হৃদয় এক দুঃসহ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। প্রভু তথাগত যোগাসনে গিয়ে বসলেন। ধরণী নিস্তব্ধ হ'ল। নিস্তব্ধ হ'ল কুশীনারা, সেই মূক শালবন, বিরাট অরণ্যানী···বিশ্বপ্রকৃতি! এল দূর হতে দিব্যসঙ্গীত ভেসে—

ফুল হতে দল ঝরে একে একে
প্রদীপের শিখা ম্লান।
অস্তাচলের তীরে যান চলে
অমিতাভ ভগবান।
সুন্দর দুটি আয়ত নয়নে
মৃত্যু কুহেলি নামিছে গোপনে।
তবুও আননে মধুর হাসিটি
রয়েছে অনির্ব্বাণ।
কুশীনগরের আকাশ বাতাস
করে শুধু হায় হায়।
মানবের চির কল্যাণকামী
যায়—চলে যায়।
অমৃতবাণী কণ্ঠে না ঝরে
মূক হয়ে হয়ে গেল চরাচরে
নিভিল প্রদীপ মরণের ঝড়
হ'ল সব অবসান।
করুণাসাগর মুক্ত পুরুষ
লভেন নির্ব্বাণ!

(যবনিকা)

বসন্ত না জাগে যদি মনে

শ্রীস্নেহলতা দেবী

বসন্ত না জাগে যদি মনে,
বনেতে বসন্ত তবে, কেবল জানিতে পায়
বৃথা তার আসা অকারণে।
বৃথা তবে বিহগ কূজন, বৃথা বহে দখিনমলয়
বৃথা শোভে পুষ্পগুচ্ছ থরে থরে ওই,
ভ্রমর গুঞ্জন বৃথা বসন্ত সে কই,
বৃথা নব কচি কিশলয়।
মনের বসন্ত যদি নাহি দেয় সাড়া
বনেতে বসন্ত এলে যায় কি তা ধরা?

সে যে বয় দূরে বহু দূরে,
বৃথা তার যত আয়োজন
হৃদয় গুমরি কাঁদিয়া মরে সকরুণ সুরে।
ফুলে ফুলে ছাওয়া তরুতল,
শীতে যেন ঝরে তার জীর্ণ পত্রদল,
রিক্ত শূন্য নিঃস্ব সে বনানী।
বনের বসন্ত শুধু থাকে একা বনে,
বসন্ত না জাগে যদি মনে।

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের হাসপাতাল

ড্রেস্‌ডেনে কয়েক দিন

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা

সুইজারল্যাণ্ডের লুজানে যে বিশ্ব-মাতৃসম্মেলন হয়েছিল ১৯৫৫ সনে জুলাই মাসে, মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রতিনিধি হয়ে সে সম্মেলনে যোগ দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সম্মেলনের শেষে প্রাগ্ হয়ে বার্লিনে গেলাম জার্মান সরকারের আমন্ত্রণ পেয়ে। সেখান থেকে ১৯শে জুলাই প্রাতরাশের পর রিজার্ভ বাসে উঠে ষাট মাইল দূরে ড্রেসডেনে রওনা হলাম। আমাদের সর্ব্বক্ষণের সঙ্গিনী ম্যাডাম থিয়া আর দোভাষী হান্‌সও আমাদের সঙ্গে চললেন। ষাট মাইল রাস্তা বাসে চড়ে যেতে বেশ খানিকটা কষ্ট হলেও দু'দিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল আগেই শুনে এসেছিলাম যে, যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশী বোমা পড়েছিল এই ড্রেসডেনে। দু'দিকের ধ্বংসস্তূপ দেখে সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয় রইল না। নির্ব্বিরোধী স্বামী-স্ত্রী প্রিয় পুত্রকন্যাকে নিয়ে সজ্জিত সুন্দর বাসগৃহে যে সুন্দর সুখের ঘরকন্না পেতে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বাস করছিলেন, অতর্কিতে একদা উচ্চাকাশ হতে নিক্ষিপ্ত মৃত্যুবাণ নেমে এসে এক নিমেষে সেই আশা-আনন্দে সমুজ্জ্বল সংসারটিকে তছনছ করে দিয়েছিল।

ড্রেসডেনে পৌঁছে ওয়াল্‌ড পার্ক হোটেলে উঠলাম। এই ক'দিনেই আমাদের আবুহোসেনী কায়েমী হয়ে এসেছে, তাই হোটেলটি বিশেষ পছন্দ হ'ল না। রাজধানী থেকে দূরে হলেও ড্রেসডেন ছোট শহর নয়। অবশ্য গাছপালার শ্যামলতা জায়গাটাকে পল্লী-পরিবেশসমন্বিত করে তুলেছে। তখন ভোর হতে দেরি নেই। হঠাৎ যেন সুখ-স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে উঠলাম। এ কি শুনলাম? এ কি সত্যি না স্বপ্ন? না, স্বপ্ন নয়, সত্যি পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। আমাদের দেশের পাখীর ডাকের মতই মিষ্টি ডাক। কোন গাছের পাতার নীচে লুকিয়ে কোন্ পাখী ডাকছে। গলার স্বরের মত তার দেহের সৌন্দর্য্যও আমাদের দেশের পাখীর মত কিনা কিছুই জানা গেল না; তা না-ই থাক্—তবু মিষ্টি সুরটুকু কানের মধ্যে মধুবর্ষণ করতে লাগল।

পল্লীর মাধুর্য্য থাকলেও ড্রেসডেন বেশ বড় শহর। বড় বড় দোকান-বাজার, প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার দু'পাশে বিরাট সৌধশ্রেণী, ট্রাম-বাস কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু রাস্তায় ভিড় অল্প, তাই ট্রাম-বাসও চলে কম। এখানে গোলাপের খুব বাহার। ডালের একটি বোঁটায় একটিমাত্র গোলাপ দেখতেই আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু এখানে আমাদের দেশের অতসী-করবীর মত, এক বোঁটায় থোকা থোকা গোলাপ। নানা বর্ণের মখমল দিয়ে যেন ফুলগুলি তৈরী হয়েছে। এমন সুন্দর ফুলে কিন্তু গন্ধ নেই।

এখানকার এলব নদীর এপার-ওপার সর্ব্বদাই লোকভরতি ষ্টীমার চলছে। এখানকার একটি চার্চ আর পিক্‌চার প্যালেস দেখতে গেলাম। কিন্তু পূর্ব্বের খ্যাতিকে এই ধ্বংসস্তূপ যেন এখন পরিহাস করছে। পিক্‌চার প্যালেসে শিল্পীর অপূর্ব্ব সৃষ্টিকে কি নৃশংসভাবেই না ধ্বংস করা হয়েছে। এইসব খণ্ডবিখণ্ড ভাস্কর্য্য মূর্ত্তিকে তাদের পুরাতন চিত্র দেখে আবার সংস্কার করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে অর্থ আর শিল্পী দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন খুব সাহায্য করছে। বড় বড় কৃত্রিম ঝরণাও দেখা গেল। কিন্তু এই সব

শিল্পকলা যে আমাদের দেশের চেয়ে বিশেষ উন্নততর তা মনে হয় না। রাস্তায় একখানা বড় পাথরের উপরে বড় করে 'এন' লেখা আছে, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নাকি এই পাথরের উপরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখান থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের পরিচালিত 'রেলওয়ে পাইওনীয়ার' দেখতে ও চড়তে গেলাম। দরজা-জানালা আর ছাদহীন ছোট ছোট কয়েকখানা বগী দিয়ে ছোট্ট একখানা ট্রেন। গাড়ী চালানো ছাড়া সবই ছোটরা করে। এই ট্রেন থেকে ভানু দাশগুপ্তের নোটবইখানা পড়ে গেল। কত যত্ন করে এই বিদেশের তথ্য সব ঐ নোটবুকে সঞ্চয় করা হয়েছিল। ঝুক ঝুক করে ট্রেনখানা ষ্টেশনে গিয়ে থামলে আমরা টিফিন খেতে হোটেলে গেলাম। ভানুর হারানো নোটবুকখানা সেখানেই এসে উপস্থিত। পাইওনীয়ারের ছেলেরা সেটা পেয়ে ফেরত দিতে এসেছে। তার উপরে জার্ম্মান ভাষায় লেখা আছে, "ড্রেসডেনের ছেলেরা তোমাকে দিল।" পাহাড়ের উপরে একটা রেষ্টরেন্টে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হ'ল দার্জ্জিলিঙে এসেছি। নীচে বয়ে চলেছে নদী, ঢেউ তুলে ষ্টীমার চলেছে, রাস্তাঘাটে মানুষ চলেছে, সবই ছোট ছোট দেখা যায়। এখানকার ছবি আঁকা পোষ্ট কার্ড আমাদের দেওয়া হ'ল, আমরা ওখানে বসেই দেশে চিঠি লিখে পাঠালাম।

পরদিন ২১শে সকালে প্রাতরাশ সেরেই আমরা ষ্টীমারে করে নদীতে বেড়াতে গেলাম। ষ্টীমার চলার শব্দের ছন্দের তালে তালে ব্যাণ্ড বাজতে লাগল। তীরে তীরে দেখা যায় খালি-গায়ে খালি-পায়ে শুধু প্যান্ট পরে বড় বড় বালক ও শিশুরা ঘাসের উপর শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এটা নাকি ওঁদের গ্রীষ্মকালের রৌদ্র উপভোগের প্রণালী। আমাদের দেশে তখন বর্ষাকাল, ওখানেও মাঝে মাঝে মেঘলা হয়ে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও এই সময়টাই ওখানকার গ্রীষ্মকাল। দু'পাশেই সেই সুবিন্যস্ত উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। পর্ব্বতের চূড়ায় পিঁপড়ের সারির মত অনেক মানুষ দেখা যায়। গ্রীষ্মের উত্তাপে ওঁরা ভ্রমণে বেরিয়েছেন। দুরন্ত বরফ-পড়া শীতের দেশে এই রোদটুকু পেয়ে সকলেরই কি যে আনন্দ! যেমন করে পারছে ঋতুর এই প্রসন্নতাটুকু লুটেপুটে নিচ্ছে।

এক ষ্টেশনে নেমে একটা বড় ক্যাসেলে গেলাম। শোনা যায়, হিটলারের সময়ে এটা পাগলাগারদ ছিল, অর্থাৎ বেকার লোকদের পাগল অপবাদ দিয়ে এখানে এনে অত্যাচার করে প[...] ইন্‌জেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হ'ত, দেশে বেকার লোক[...] কথা প্রমাণ করবার জন্য। এখন এখানে সোভিয়েট [...] ইঞ্জিনীয়ারেরা থাকেন।

একটা নূতন জিনিষ দেখা হ'ল—'নাইট সেনেটিয়াম।' শ্রমিক কৃষকেরা সারাদিন কাজ করে প্রয়োজন হলে সন্ধ্যাবেলায় এখানে চলে আসে। এখানে খাদ্য, চিকিৎসা, বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদ সবরকম ব্যবস্থাই আছে। রাত্রিটুকু থেকে একটু চাঙ্গা হয়ে সকালে আবার ওরা কাজে চলে যায়। যাদের অল্পস্বল্প অসুখ, তাদেরই এখানে চিকিৎসা হয়, বেশী হলে নিশ্চয়ই তারা হাসপাতালে যায়। এদের খরচ ষ্টেট আর বড় বড় ফ্যাক্টরী থেকে দেয়।

তার পর যেখানে গেলাম, তাকে আশ্রম বলাই সঙ্গত। কোরিয়া যুদ্ধে মা-বাপকে হারিয়ে যে সব ছেলেমেয়ে অনাথ হয়েছে, তাদের অনেকে এখানে থেকে মানুষ হচ্ছে। তের-চৌদ্দ বছরের বেশী তাদের বয়স নয়, ছোটও আছে। এদের ব্যয়ভার ষ্টেটই বহন করে। তারা ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের কাছে এগিয়ে এল, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আন্তরিকভাবে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। প্রত্যুত্তর দিয়ে আমরাও ওদের অনেক প্রশ্ন করলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা যেন আমাদের নিতান্ত আপন হয়ে উঠল। ওরা আর আমরা একই মহাদেশের বাসিন্দা এই কথা

ড্রেসডেন নগরীর একটি দৃশ্য

বোমা-বিধ্বস্ত ড্রেসডেনের একাংশ

২৩শে—কয়েকটি প্রসূতিসদন দেখতে গেলাম। সন্তান-সম্ভাবিতা হওয়ার পর প্রসূতির প্রাথমিক অবস্থার জন্য যে হাসপাতাল সেখানে প্রসূতি তিন মাস পর্যন্ত থাকেন। তারপর দ্বিতীয় অবস্থায় যান অন্য একটি হাসপাতালে, সেখান থেকে যে হাসপাতালে যান, সেখানেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এর জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নেই, প্রয়োজন অনুসারে প্রসূতি থাকতেও পারেন, বাড়ীতে চলে যেতেও পারেন। এর খরচ ষ্টেটই বহন করে, তবে সাধ্যানুযায়ী কিছু কিছু এরাও দিয়ে থাকেন, তবে সে সম্বন্ধে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

হাসপাতালগুলিতে কত আলো কত বাতাস, প্রসূতিদের প্রসন্ন ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে থাকবার কত ব্যবস্থা! মনে পড়ে আমাদের দেশের দরিদ্র প্রসূতিদের কথা! কি অনাদর, কুণ্ঠা আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই না তাঁদের দিন কাটে! সন্তান ধারণের সূচনাতেই ভয় ভাবনায় তাঁরা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠেন। অনাগত সন্তানের অভিনন্দনের প্রস্তুতি করা দূর থাক, যে বিধাতা তাকে পাঠিয়েছেন মনের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জমে ওঠে।

ভেবেই বুঝি ওরা আমাদের আত্মীয় করে নিতে চেয়েছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে আমাদের জড়িয়ে ধরে, বড়রা সিঁড়িতে ওঠা-নামায় সাহায্য করে, ফুলের তোড়া তুলে দেয় আমাদের হাতে। কয়েকটি ছেলে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে শুয়েছিল, তারাও আমাদের দেখতে চাইল। আমরা গিয়ে ওদের আদর করে আমাদের ফুলের তোড়াগুলি দিয়ে দিলাম। সুস্থ ছেলেরা দল বেঁধে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত এল আমাদের বিদায় দেবার জন্য। ওদের জন্য কোন খাদ্যদ্রব্য আনি নি বলে আমাদের খুব আপসোস হ'ল। ওদের ছেড়ে আসতে অনেকেই কেঁদে ফেলেছেন।

'ছেলেদের হোটেল' আর একটা নূতন জিনিষ। এ হোটেলে ছোটরাই মুখ্য গৌণ তাদের অভিভাবকেরা। অন্যান্য হোটেলে বহুসংখ্যক অভিভাবকের সঙ্গে দু'চারটি ছেলেমেয়ে থাকে, এখানে অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে দু'চারটি বয়স্ক অভিভাবক আছেন এখানে এই রকম নানা ব্যাপারেই বোঝা যায় যে, ছোটদের জন্য তারা ভাবে. ছোটদের জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা করাই এদেশের সবচেয়ে বড় কাজ। ছোটরাই জাতির উৎস, এ কথা তারা মনে-প্রাণে স্বীকার করে। এ হোটেলে আমাদের সরবৎ খেতে দিল।

যে মায়েরা দিনান্তে পেট ভরে দুটি খেতে পায় না, তাদেরই পেটের শিশু দেশের মেরুদণ্ড বলে নেতারা ঘোষণা করেন, আর বছরে একবার দু'বার শিশু-উৎসবের ঢক্কানিনাদ করে তাঁদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত করেন! আমাদের দেশে বর্ত্তমানে দুটি ছেড়ে চারটি ছেলেমেয়ে হয়েছে শুনলেই লোকে আতঙ্কে চমকে ওঠে। আমাদের সঙ্গে শ্রীযুক্তা মুক্তাকুমার নামে একটি মেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দশটি সন্তান শুনে ওদেশের মেয়েরা খুশীতে ডগমগ করতে লাগলেন; মুক্তাকে 'হিরোইন মাদার' খেতাব দিলেন, আর তাঁর বাচ্চা ছেলেমেয়ের জন্য অনেক খেলনা দিলেন। শিশুদের 'ক্রেশ'ও অপূর্ব্ব সৃষ্টি। আমাদের দেশের যে সব মায়েরা বাইরে বেরিয়ে কাজকর্ম্ম করতে বাধ্য হন, (আর আজকাল অনেকেই বাধ্য হয়েছেন) তাঁদের শিশু-সন্তানদের রক্ষা করা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বেশীর ভাগ মায়েরাই অশিক্ষিতা ঝিয়ের কাছে সন্তানদের রেখে যান। সে ঝি শিশুর সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করে।

এখানে প্রতিটি ফ্যাক্টরীর কাছে কাছে আর শহরের নানা স্থানে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এইরকম অনেকগুলি ক্রেশ আছে। সেখানে কুড়িটি শিশুর জন্য একজন করে শিক্ষিতা নার্স আছে। শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার, আমোদ-প্রমোদের প্রচুর আয়োজন আছে সেখানে। শিশুর-জীবনের অঙ্কুর যাতে কোনমতে ক্ষতিগ্রস্ত না

হয় তার সতর্ক ব্যবস্থা আছে। কোন কোন ক্রেশে মা সকালে কাজে যাবার সময় শিশুকে রেখে যান, সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে তাকে কাছে নিয়ে যান। কোন কোন ক্রেশে সোমবার সকালে কাজে যাবার সময় রেখে যান, নিয়ে যান সপ্তাহ-শেষে শনিবারে। ছ' মাস পর্যন্ত শিশুরা মায়ের কাছেই থাকে, কারণ তখন তারা মায়ের স্তনপান করে। এখানকার খরচ প্রধানতঃ ষ্টেট দেয়, মায়েরাও যৎসামান্য দেয়। আমরা সকালে গিয়েছিলাম, দেখলাম রেলিং দেওয়া ছোট ছোট খাটে চুষি মুখে দিয়ে কেউ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, কেউ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কেউ বালিশে মাথা রেখেই পিট পিট করে তাকাচ্ছে, এখনো ভাল করে তার ঘুম ভাঙ্গে নি। আমাদের দেখে কেউ হাসল, কেউ কাঁদল। একটি বছরছয়েকের ছেলে 'পটে' বসেছিল, নার্স তাকে পরিষ্কার করে ইজের পরিয়ে দিলে সে টলতে টলতে আমাদের কাছে এসে হাত বাড়িয়ে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করতে লাগল। সেদিন শনিবারের সকাল, কয়েকজন মা বাড়ী থেকে নিয়ে আসা জামা ইজের পরিয়ে ছেলেদের নিয়ে গেলেন। নার্সের কোল থেকে মায়ের কাছে যেতে ছেলে কাঁদে। এই ক'দিনেই সে তার মাকে ভুলে গেছে।

এদের জামা ইজের সবই দেখলাম মেশিনে কাচা হচ্ছে গরম জলে। বাসন কাপড়-চোপড় সবই এখানে গরম জলে ধোয়া হয়. রোগবীজাণু ছড়াবার পথঘাট এইরূপে বন্ধ করা হয় বলেই ওখানে সংক্রামক রোগ কম হয়। একটা ঘরভরতি ওদের খেলনা। নিজেদের ইচ্ছামত তারা খেলা করছে। ভারতবর্ষ থেকে আমরা একঝুড়ি কাঠের খেলনা নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলো ওদের দেওয়া হ'ল। এখানে শিশুরা তিন বৎসর পর্যন্ত থাকে, তার পর চলে যায় কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে। ২২শে— গেলাম আমরা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল হাউসে। কাউন্সিলার আমাদের আমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলেন। জাঁকজমকপূর্ণ কাউন্সিল হাউসে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ সম্মেলন হ'ল। বহু লোকসমাগম হয়েছিল, প্রচুর আহারেরও আয়োজন হয়েছিল। ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে পরস্পরের করমর্দ্দন হ'ল। ওঁরা আমাদের অভিনন্দন জানালেন, প্রত্যুত্তরে আমরাও ধন্যবাদ জানালাম। খাবার-টেবিলে প্রচুর প্রশ্নোত্তর হ'ল। প্রশ্ন করে আমরা জানলাম যে, সেখানে সরকারের ইনডাষ্ট্রির সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ। এদের সর্ব্বনিম্ন বেতন দুই শত টাকা।

বেসরকারী শিল্পকারখানার সংখ্যা এক-চতুর্থাংশ। ঐ সব ফ্যাক্টরীকে সরকার সাহায্য করেন। এই সব ফ্যাক্টরীতে মহিলারাও কাজ করেন। বস্ত্রশিল্পের কারখানাগুলিতে মহিলাকর্ম্মীর সংখ্যাই বেশী। এই সব মেয়ে কর্ম্মী প্রসবের পূর্ব্বে ছয় সপ্তাহ আর প্রসবের পরে পাঁচ সপ্তাহ পূর্ণ বেতনে মেটারনিটি ছুটি পান। তা ছাড়া শিশু অথবা মা অসুস্থ হলেও তাঁদের পূর্ণ বেতনে ছুটি দেওয়া হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচপত্র ছাড়াও মায়েরা মাসে পঞ্চাশ মার্ক করে সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকেন। তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তানের জন্য যথাক্রমে ১০০ ও ১৫০ মার্ক সাহায্য আসে সরকার থেকে।

যানবাহন বিভাগে আর ডাক্তার অথবা নার্সের কাজে মেয়েরা নাইট ডিউটি করে। কৃষি, মজুরি, চিকিৎসা, সেবা, যানবাহন পরিচালনা সবরকম কাজই মেয়েরা করেন। এখানে ব্যক্তিগতভাবে কেউ চাষ-আবাদ করে না, সমবায় ব্যবস্থায় কাজ হয়। দুই-পঞ্চমাংশ চাষের কাজ মেয়েরাই করেন। চাষে যে শস্য হয়, তার থেকে দশ ভাগের এক ভাগ সরকারকে দিতে হয়। উৎপাদন ভাল না হলে সরকার সাহায্য করেন। চাষী আর শ্রমিককে সরকার কি কি সাহায্য করেন প্রশ্ন করাতে ওরা বললেন, চাষী আর শ্রমিকেরই রাজত্ব, তারাই রাজত্ব চালায়, সরকার তাদের কতটুকু সাহায্য করেন এ প্রশ্নের কোন মানে হয় না। তারা সবরকম সুবিধা আর সাহায্যই পায়। ছেলেদের শতকরা ৮০ ভাগই চাষা। চাষের জন্য বৃহৎ যন্ত্রপাতি সব সরকার দেন, তবে ছোটখাটো মেশিন তারা নিজেরাও কেনে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে জানা গেল যে, এখানে শিশুদের সাধারণ রোগ খুব কম হয়। মহামারী নেই। ড্রেসডেন শহরে কুড়ি লক্ষ লোকের বাস। শিশুদের জন্য এখানে

গীর্জ্জার ধ্বংসাবশেষ

কর্মরত ড্রেসডেনবাসী

চলে যান উপাসনার জন্য। বেচারা থিয়া আর হান্স কিন্তু তাঁদের অপোগণ্ডদের ফেলে যেতে পারতেন না। থিয়া ব্যাগ খুলে প্রাতরাশের জিনিষপত্র বের করতেন, চা করতে যেতেন হিটার জ্বালিয়ে নিজে। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য সকলেই আমরা এগিয়ে যেতাম।

শহরে বাইরে চাষের মাঠ-দেখে আমরা কৃষকের বাড়ী দেখতে গেলাম। এই যদি চাষীর বাড়ী হয়, তবে জন্ম জন্ম চাষী হয়ে থাকতেই বা আপত্তি কিসের? পল্লীটা খুব উচ্চ শ্রেণীর নয়, কিন্তু বাড়ীগুলি বেশ সাজানো। প্রত্যেক বাড়ীতেই রেডিও আছে। কৃষকদের এই বাড়ীঘর দেখে মনে মনে আমাদের দেশের কৃষকদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে তুলনা করে নিলাম। চাষীরা ঝুড়ি ভরে আমাদের পিচফল খেতে দিলেন। চাষীদের শিক্ষা দিবার জন্য ওখানে রীতিমত ক্লাস হয়, আর হাতেকলমে শেখানো হয় মাঠে। সহসা চমকে উঠলাম, দিনেদুপুরে বাঘ ডাকে কোথায়? কিন্তু শুনে আশ্বস্ত হলাম যে, ওগুলো বাঘের ডাক নয় গরুর। এদেশের গরু 'হাম্বা' 'হাম্বা' করে ডাকে না, ডাকে বাঘের মত করে। শহরের ভিতরে গরু রাখবার নিয়ম নেই, শহরের বাইরে বেশ পাকা আর ঢাকা লম্বা ঘরে গরু রাখা হয়। গরুগুলি খুব হৃষ্টপুষ্ট, যত্ন দিয়ে তাদের দুধ দোয়ানো হয়। তবে তাঁরা যে রকম যত্নের সঙ্গে গোপালন করেন, দুধ কিন্তু সে তুলনায় কম হয়। আমাদের দেশের গরু এত যত্ন পেলে এর চেয়ে ঢের বেশী দুধ দিতে পারে। বোম্বাইয়ের ডেলিগেটরাও এই কথা বললেন।

আমাদের দেশে পুলিসকে সাধারণ লোক এখনও এড়িয়েই চলতে চায়। কিন্তু এখানে শ্রমিক-কৃষকের বেশীর ভাগই পুলিসের কাজ অর্থাৎ দেশে শান্তিরক্ষার কাজ করেন। তাঁদের ভিতর থেকেই অফিসার নিযুক্ত করা হয়। হিটলারের সময়ে যাঁরা ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ছিলেন, তাঁরাই সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দশ ভাগের আট ভাগ পুলিসই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য। বাকি দুই ভাগ আসেন যুব-সংগঠন থেকে। পুলিস যা করে সবই জনসাধারণের কল্যাণের জন্য। যোগ্যতা অনুযায়ী এঁদের বেতন বাড়ানো কমানো হয়। পুলিস বিভাগেও মেয়েরা কাজ করেন, তবে তাঁদের অধিকাংশই আপিসের কাজে নিযুক্ত। মেয়ে-পুলিস প্রায় প্রত্যেকেই উক্ত দলের সদস্য। ভাল কাজের জন্য এরা পুরস্কারও পেয়ে থাকেন। ৮ই মার্চ মেয়েদের আন্তর্জাতিক দিবস। ছেলেমেয়ে একত্র হয়েই সে দিবস পালন করেন, তাতেও পুলিস যোগ দেয়। কতদিন আমাদের খাবার-টেবিলে এসে পুলিসেরা আমাদের বাজনা বাজিয়ে, গান গেয়ে শুনিয়েছেন।

বারোটি হাসপাতাল আছে। প্রায় প্রত্যেক হাসপাতালে কুড়ি থেকে দুই শতটি পর্যন্ত 'বেড' আছে। ওখানকার এই প্রথাটাই খুব ভাল লাগল যে, প্রত্যেকের উপার্জ্জনের ন্যূনতম একটা অংশ হাসপাতালের জন্য জমা দিতে হয়। এর ফলে পীড়ার সময় সকলেই সহজে হাসপাতালের সুবিধা পায়।

পাবলিক হেলথ অফিসার হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে মা আর ছেলেকে দেখেন, প্রয়োজন হলে বাড়ীতেও যান। সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য খুবই ভাল। শতকরা চার জন লোক অসুস্থ হয়। যক্ষ্মার হাসপাতাল প্রায় জনশূন্য, দু'চার জন ছাড়া রোগী নেই। রোগবীজাণু ছড়াবার আশঙ্কায় তাঁদেরও প্রায় আড়াল করে রাখা হয় সকলের কাছ থেকে। ড্রেসডেনবাসীদের জন্য শিশু-হাসপাতাল ছাড়াও ১২৫টি হাসপাতাল আছে। এতে সবসুদ্ধ কুড়ি হাজার বেড আছে। ছোট বড় মিলিয়ে ১২০টি মেটারনিটি হাসপাতাল আছে। সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে জানা গেল যে, মেয়েদের ১৮-২০ বছরের মধ্যে এবং ছেলেদের ২০ বছরের পরে বিয়ে হয়। বিয়ের পরে এরা গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন। আমাদের সঙ্গে যে ক'টি মহিলা প্রায় সব সময়েই থাকতেন, তাঁদের দেখে বুঝতাম যে, এঁদের দাম্পত্য জীবন বেশ সুখের।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ও বিরাগের বিষয় অনেক কথা শুনেছি। পূর্ব্ব জার্ম্মানীও এখন সোভিয়েট ইউনিয়নেরই অন্তর্গত, কাজেই তাদেরও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ না থাকা স্বাভাবিক এই ধারণাই আমাদের ছিল। কিন্তু এঁদের ধর্ম্মাচরণ দেখে আমাদের ধারণা বদলে গেল। এঁদের গোঁড়ামি বা পরধর্ম্মে বিদ্বেষ নেই, কিন্তু নিজের ধর্ম্মে অনুরক্তি আছে। রবিবার দিন সকালবেলা সব হোটেল বন্ধ থাকে, সকলেই চার্চে

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কোন বিষয়েই ড্রেসডেনবাসীদের অভাব নেই; এজন্য তারা বর্তমান সময়ে সুখী একথা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই যুদ্ধে নিহত রাশিয়ানদের স্মৃতিরক্ষার জন্য তারা একটা প্রদর্শনী করে রেখেছে। প্রকাণ্ড প্রশস্ত একটা মাঠের মধ্যে দুই ধারে সব পাথরের মূর্তি। রাশিয়ানরা যে কত কষ্ট, কত অত্যাচার সহ্য করেছে, জার্মানদের জন্য কত ত্যাগস্বীকার করেছে, পাথরের বুকে খোদাই করে সে সব স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখা হয়েছে। এখানে অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে দেবমন্দিরের মত একটা মন্দিরে উঠতে হয়। ভিতরে দেবমূর্তি নেই। তথাপি স্থানটি এত পবিত্র মনে হ'ল যে, জুতো পরে আমরা সেখানে ঢুকতে পারলাম না। বিচিত্র বর্ণের পাথর ও কাঁচে মন্দিরটি অপূর্ব ভাবে সজ্জিত। মাঝখানে কালো পাথরের প্রকাণ্ড একটা 'ষ্ট্যাচু'। একটা লোক শিশু কোলে নিয়ে তরোয়াল হাতে হিটলারের স্বস্তিকা অর্থাৎ তাঁর নীতিকে কেটে ফেলছে।

ওখানে একটা পাইয়োনীয়ার ক্যাম্পে অখিলাশঙ্কর আর ভানু দাশগুপ্ত গান গাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গান দু'খানা রেকর্ড হয়ে গেল। আমরা সেখানে থাকতে থাকতেই রেকর্ড দুখানা শুনলাম। অখিলা মীরার ভজন গেয়েছিলেন। ভানু 'আয় রে আয়, লগন বয়ে যায়'—এই গানটি গেয়েছিলেন। একটি স্থায়ী পাইয়োনীয়ার হাউস দেখলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী, বিচিত্র ভাবে সজ্জিত। ওদেশের ছেলেদের খুব দাবা খেলতে দেখলাম, আমিও আমার দশ বছরের নাতীটির জন্য একটা দাবার ছক কিনে নিয়ে এসেছি। একদিন চীনেমাটির কারখানা দেখতে গেলাম।

Toharn Friedrch B·O'TI'Ger নামে একজন বৈজ্ঞানিক সোনা তৈরির মানসে কাজ আরম্ভ করে এই চীনেমাটি আবিষ্কার করেন। তখন এই জিনিষ মাটির রং ছিল, অনেক চেষ্টায় এখন সাদা হয়েছে। সেই কারখানায় সব জিনিষ তৈরী হচ্ছে দেখলাম। কত সূক্ষ্ম কাজ একত্র হয়ে কত বৃহৎ জিনিষ তৈরী হয় দেখে অবাক হতে হ'ল। নানারকম ক্ষুদ্র-বৃহৎ জিনিষ তৈরী হয়েছে, ভাণ্ডারে মজুতও আছে। ওগুলো শুধু দর্শনানন্দ দেয়, একটি জিনিষও কিনবার উপায় নেই, একেবারে অগ্নিমূল্য। চীনেমাটি প্রস্তুতকারীর মেডেলের আকারের প্রতিমূর্তি আমাদের প্রত্যেককে উপহার দেওয়া হ'ল।

এনা নামে একটি ইংরেজ আর দুটি স্থানীয় মহিলা প্রায় সব সময়েই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন আর নানাভাবে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করতেন। তাঁদের মধুর ব্যবহার জীবনে ভুলব না। ইংরেজ মেয়েটি নিজের লেখা একখানা করে ছেলেদের বই আমাদের প্রত্যেককে উপহার দিলেন। আমি আমার লেখা বই একখানা করে ওখানকার লাইব্রেরীতে দিয়ে এলাম। যেখানে যখন গেছি মিষ্টি কথা, ফুলের তোড়া, চা, ফল, ফলের রস দিয়ে সকলেই অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। আজ আমাদের আবার বার্লিনে ফিরে যেতে হবে। এখানকার বন্ধুদের ছেড়ে যেতে হবে বলে সকলেই বিষণ্ণ। মাডাম থিয়ার মেজো মেয়ে এলুথে ডাক্তারী
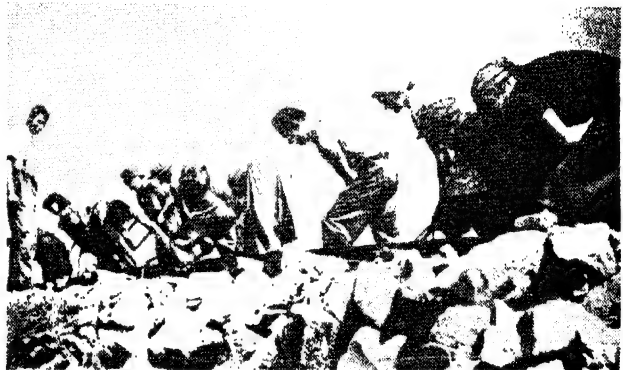
নব-রূপায়ণে ড্রেসডেনবাসী

পরীক্ষা দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকতে এলেন। হাসিখুশী, বেশ মেয়েটি। ইংরেজী কথাও বোঝেন। বললেন, অবসর সময়টা তিনি কোন পাইওনীয়ারে গিয়ে কাজ করবেন।

২৬শে জুলাই সকালে প্রাতরাশ সেরে আমরা বাসে উঠলাম। যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথ দিয়েই বার্লিনে ফিরে চললাম।

আবার বার্লিনে এলাম।

আমাদের দ্রষ্টব্য এখনও অনেক বাকি। অথচ সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। ওঁরা আমাদের যে একমুঠো করে মার্ক দিয়েছিলেন ছেলেমেয়েদের উপহার কিনে নেবার জন্য, সেগুলোও শেষ করতে হবে ওখানেই। নয় ত মুদ্রা এখানে এনে আরেক মুশকিল। তাই আমাদের খুব তাড়াহুড়ো পড়ে গেল।

জেনেভাতে চতুঃশক্তি সম্মেলন আর রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজ শেষ করে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন আর কম্যুনিষ্ট নেতা ক্রুশ্চেভ সেইদিনই বার্লিনে ফিরে এসেছেন। তাঁদের নিয়ে বার্লিনে আজ একটা সভা হবে। স্পেশাল কার্ডে আমাদের কাছে নিমন্ত্রণ এল। তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে আমরা সেখানে চলে গেলাম। প্রকাণ্ড মাঠে গ্যালারি পাতা আছে। জনসমুদ্র বললেও ঠিক হয় না এত লোক জড়ো হয়েছে। নানা রকমের পতাকা নিয়ে

অসংখ্য লোক এসেছে। আমরা গ্যালারিতে গিয়ে বসলে আমাদের হাতে কাস্তে আঁকা কাগজের পতাকা দেওয়া হ'ল। রুশ-নেতারা রুশ ভাষায় বক্তৃতা করলেন। বার্লিনের নেতারাও তাঁদের ভাষায় বললেন। এদের বক্তৃতা খুব সংক্ষিপ্ত, দীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রোতাকে এরা ক্লান্ত করে ফেলেন না। এত বড় সভা, কিন্তু শেষ হয়ে যেতে দেরি হ'ল না। বুলগানিন আর ক্রুশ্চেভ দূর থেকে টুপি খুলে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানালেন। আমরাও জানালাম।

সংগ্রাম ও শান্তি

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

শোষণে নিষ্পেষণে যারা চিরলুণ্ঠিত
উপেক্ষা যাহাদের সজ্জা,
অন্নবস্ত্রহারা যাহারা শান্তিহীন
বয়ে চলে স্বজাতির লজ্জা।
যাদের জীবন ঘিরে অজস্র করভারে
অসহ্য দৈন্যের হাহাকার,
দ্রব্যমূল্য চাপে নিত্য মৃত্যুমুখে
ভেসে যায় যাহাদের সংসার।
তারা যদি হেঁকে কয়—"আমরা শান্তিবাদী
আমরা চাহি না কোনো সংগ্রাম,"
তাহারা জীবন্মৃত মানসপক্ষাঘাতী
তাদের এ বাক্যের নেই দাম।
যাদের নারীরা হায় ঘরে ঘরে লাঞ্ছিতা
পতির জুতার তলে পিষ্ট,
ধনীর বিলাস ভোগ পূজার বলির লাগি'
যাহারা হয়েছে হেথা সৃষ্ট।
লক্ষ দুর্দ্দশাতে জীবনটা তচ্‌নচ্‌
হাঁকে তবু শান্তির ভাষ্য,
স্বয়ং শান্তিদেবী তাদের বাক্য শুনি
নির্ব্বোধ ভাবি করে হাস্য।

দুর্দ্দশা থেকে যারা জাতিকে মুক্ত করি'
স্বদেশকে করিয়াছে স্বর্গ,
জন্মভুমিকে যারা সম্পদময়ী করি'
লভিয়াছে স্বজাতির বর গো;
শান্তির উৎসবে তাহাদেরি অধিকার
তাহারাই শক্তির সন্তান,
গাহিবে পৃথ্বী ঘিরে গর্ব্বে উচ্চ শিরে
তাহারাই শান্তির জয়গান।

ভেজাল খাদ্য খেয়ে দুর্নীতি বহি' তার
নির্ব্বিকারের যারা যাত্রী,
তাদের লাগিয়া নয় শান্তির দিবালোক
তাদের লাগিয়া অমারাত্রি,
অপরাধ করে যারা তাদের চেয়েও পাপী
অপরাধ সহে যারা নিত্য,
সহিয়া অত্যাচার শান্তির গান গাওয়া
জীবন্মৃতেরি তাহা নৃত্য।
আত্ম ফাঁকীর এই মেকী ভুয়া শান্তির
বন্ধ করেছে ভাই জয় গান,
ঐ ছাখ্‌ সম্মুখে আসন্ন মৃত্যুর
ধাক্কায় হবি যে রে খানখান।

দুর্নীতি নাগপাশে দারিদ্র্যে দহে যারা
আগে চাই তাহাদের যুদ্ধ,
দুঃখের মুক্তির মন্ত্রের সিদ্ধিতে
আগে ভাই হওয়া চাই শুদ্ধ।
বন্দুক তোপ নয় আত্মার তেজ দিয়া
দুর্জ্জয় এই অভিযান রে,
ত্যাগের মন্ত্র দিয়ে দুর্নীতি রণজয়
স্বার্থের এ যে বলিদান রে।
শান্তির কথা হেঁকে জীবন্মৃতের মত
শ্মশানে বাঁচার ভাই নেই দাম,
লক্ষ সর্প ফণা উদ্যত সম্মুখে
তার সাথে আগে চাই সংগ্রাম।
জাতির দুর্দ্দশাকে বহি' চলা অপরাধ,
ইহা পাপ—ইহা মহাভ্রান্তি,
আগে চাই সংগ্রাম—বাঁচিবার সংগ্রাম—
তার পর চেয়ো ভাই শান্তি।

বাংলা ভাষায় 'রাগসঙ্গীত'

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় রাগসঙ্গীতের 'বাণী' রচিত হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে ইতঃপূর্বে সামান্য আলোচনা দুই-একজন সঙ্গীতজ্ঞ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সকলে মিলিয়া কোন পরিষদে এই বিষয়টি লইয়া বিশেষ আলোচনা হয় নাই। কাহারও মতে বাংলা ভাষায় রচিত গীত, মাটির ভাঁড়ের মত তাহার কাব্যসম্পদে সঙ্গীতের যাবতীয় রস শুষিয়া লয়, এজন্য সঙ্গীতের রস আশানুরূপ ভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। কাহারও মতে, রাগসঙ্গীতের প্রয়োজনীয় বোল আলাপ এবং বোল-তান ইত্যাদি রচনায় বাংলা ভাষা উপযুক্ত মাধ্যম হইতে পারে না। কিন্তু কেন বাংলা ভাষা রাগসঙ্গীতের উপযুক্ত মাধ্যম রূপে কৃতিত্বের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে না অথবা কোনদিনই পারিবে না, তাহা কেহ বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই।

দশম শতকের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাগুলি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাই পণ্ডিতগণের মত। তৎপূর্বে প্রাকৃত, সংস্কৃত, মাগধী, সৌরসেনী প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে রাগ-সঙ্গীত অথবা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নামে যে সঙ্গীত উত্তর-ভারতে প্রচলিত তাহা প্রাচীন সঙ্গীত নহে এবং তাহার ভাষাও বর্তমানে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা। সাধারণতঃ প্রচলিত রাগসঙ্গীতকে ক্লাসিক্যাল বলিয়া যাঁহারা আখ্যা দিয়া থাকেন—তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নহি। অবশ্য একথাও আমরা অস্বীকার করিব না যে, পুরাতন সঙ্গীত ইহার অবয়বের ভিতরে কিছুমাত্র বর্তমান নাই। বিশেষ বিশেষ নিয়ম-সাহায্যে শব্দ বা তাদের যে রচনা প্রাচীন কালে সৃষ্টি করা হইত—এখনও প্রায় তদ্রূপই করা হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তনে ব্যক্তির পরিবর্তন হয় না সত্য, কিন্তু রূপের পরিবর্তন হয় একথা স্বীকার্য। প্রাচীন কালের রাগ-সঙ্গীত কবে, কেন ও কি ভাবে লুপ্ত হইয়াছিল তাহা গবেষণার বিষয়। বর্তমানে প্রচলিত রাগসঙ্গীত দেশী সঙ্গীত হইতে রাগরূপে পরিবর্তিত বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন সঙ্গীতের কিছু কিছু বাণী-মাত্র এখনও পাওয়া যায়। কতকগুলি প্রাচীন সঙ্গীত শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি নান্যদেবের 'ভরত ভাষ্য' নামক পুঁথি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। নান্য দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা; মিথিলায় আসিয়া তিনি কয়েক বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। তাঁহার স্বরলিপীকৃত সঙ্গীতগুলি প্রাচীন কর্ণাটক পদ্ধতির। এই গীতগুলির ভাষা সংস্কৃত। নান্যদেবের মার্গসঙ্গীতের দুই-একটি বাণী এখানে দেওয়া হইল:

"রক্ষতু বিষমনয়ন দহন তীব্রতর তাপমহু ভবতঃ।
কৃত মদন দেহভঙ্গং তৃতীয় নয়নোৎপলং শম্ভোঃ।
ঝংটুং ঝংটুং
মহাকপাল্ধর কমল সংভব পরমার্থ বিভব
সুক্ষ্মাসুক্ষ্ম সনাতন পরম্।
সকল সুরাসুর মুনিনায়ক কিংপুরুষবৃন্দ
নিরতিশয় বদন সংস্তুত নিজ মহিমানম্॥"

উচ্চারণাদির নানাবিধ নিয়ম পালন করিয়া এই সকল বাণী পূর্বকালে মার্গরাগে গাওয়া হইত। এই জন্য সম্ভবতঃ স্বরগুলির ব্যবহারে অধিক বৈচিত্র্য প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ থাকিত না।

অধুনা-প্রচলিত রাগসঙ্গীতের বাণীগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, তাহাদের অধিকাংশই হিন্দী ভাষায় রচিত। ইহা ব্যতীত উর্দ্দু, পঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষায়ও কিছু কিছু রাগ-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে দেখা যায়। ইহা হইতে এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে, যখন যে প্রদেশে রাগসঙ্গীতের চর্চা হইয়াছে, সেই প্রদেশের ভাষায়ও তখন দুই-চারিটি ঐরূপ সঙ্গীত সৃষ্ট হইয়াছে। লোচন পণ্ডিতের মতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষাতেই মার্গরাগের অনুকরণে অসংখ্য রাগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাই বর্তমানে দেশী সঙ্গীত অথবা রাগসঙ্গীত বলিয়া প্রচলিত।

"দেশ্যশ্চ তত্তদ্রাগাশ্রিতাস্তাস্তাস্তত্তদ্দেশ গীতগতয়ঃ।"

রাঃ তঃ

ইহা হইতে মনে হয় যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাতেই রাগসঙ্গীতের বাণী রচিত হইয়াছিল। বাংলা ভাষাতেও যে হইয়াছিল তাহা 'চর্যাপদ'গুলির উপরে লিখিত রাগের নাম দেখিয়া বুঝা যায়। কতকগুলি টপ্পা বাংলা ভাষায় রচিত হইয়া গুণীসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও প্রায় লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথম গীতরচনা করিবার সময়ে হিন্দী রাগসঙ্গীতের সুরের অনুকরণে অনেকগুলি ধ্রুব-পদ, খেয়াল ইত্যাদি বাংলা ভাষায় রচনা করেন। ইহা ব্যতীত হিন্দী ভাষায় যাঁহারা সঙ্গীতশিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদেরও দুই-এক জন বাংলা ভাষাতেও দুই-চারিটি রাগ-গীতি রচনা করিয়াছেন। আজ যে পরিমাণে রাগসঙ্গীতের

চর্চা বাংলা দেশে হইতেছে, এত অধিক আগ্রহ সহকারে আর কোন প্রদেশেই বোধ হয় রাগসঙ্গীতের চর্চা হয় না অথচ ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাংলা ভাষায় রাগসঙ্গীতের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বাংলা দেশের গুণীগণ কেন যে এখনও এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই তাহা আশ্চর্যের কথা বটে। বোধ হয় নূতন রচনার কথা তাঁহাদের মনেই স্থান পায় না। 'রাগপ্রধান' গান নামে যে নূতন গান রাগের মধ্যে রাখিয়া সৃষ্টি করা হইতেছে, তাহা উন্নত আধুনিক গান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই গানগুলি লক্ষ্য করিলেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বাংলা ভাষায় রাগগীতি রচিত হইতে পারে।

হিন্দী ও বাংলা ভাষায় পার্থক্য কোথায়? হিন্দী ভাষা রাগসঙ্গীতের উপযোগী মাধ্যম কেন হইল? বাংলা ভাষার অনুপযুক্ততা কোথায়? সেই ত্রুটি দূর করা সম্ভব কিনা? একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রত্যেক সঙ্গীতেরই একটা উচ্চারণবৈশিষ্ট্য থাকে। ইহাকে সাঙ্গীতিক উচ্চারণ বলা হয়। কথ্য অথবা পুস্তকের ভাষার উচ্চারণ হইতে ইহা কিঞ্চিৎ পৃথক। রবীন্দ্র-গীতের উচ্চারণে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা বাদ দিলে অর্থাৎ অন্য রকমে উচ্চারণ করিলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মাধুর্য নষ্ট হয় ও সঙ্গীতের উদ্দেশ্য আশানুরূপ সফল হয় না। শ্রোতার মনে যদি সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাবটি দোলা দিতে না পারে তবে ত সঙ্গীতের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ মনে করা যাইতে পারে। এই জন্য একই গান কাহারও কণ্ঠে অতি মধুর এবং কাহারও কণ্ঠে গতানুগতিক বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তিগত ভাবে আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'ও'কার 'ও'কার ও 'উ'কারের মাঝামাঝি একটি নূতন স্বরবর্ণ উচ্চারিত হয়; ঠিক তেমনি 'এ'কারের উচ্চারণে 'এ' ও 'ই'র মাঝামাঝি একটি স্বরবর্ণ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ উচ্চারণে বাণী অতি শ্রুতিমধুর হয় এবং কণ্ঠস্বরেরও সাবলীল গতি বজায় থাকে। এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মাধুর্য অনেকখানি কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। কীর্তনগানে 'অ' ও 'আ'-কারের বাহুল্য দেখা যায়। অবশ্য অন্যান্য স্বরবর্ণগুলিও প্রয়োজনীয় রীতিতে উচ্চারিত হয়। এইরূপে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সর্বপ্রকারের সঙ্গীতেই 'বাণী'র উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য সঙ্গীতের প্রভাব বিস্তারে বিশেষ রূপে সহায়তা করে।

কেবলমাত্র রাগসঙ্গীতেই নহে, পরন্তু সর্ববিধ সঙ্গীতেই স্বরবর্ণগুলির অর্থাৎ অ, আ, ই, উ, ও ইত্যাদির উচ্চারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী হেলমহোলজ দেখাইয়াছেন যে, সঙ্গীতে ব্যবহৃত শব্দ বা নাদগুলি কোন-না-কোন স্বরবর্ণের উচ্চারণজ্ঞাপক হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সঙ্গীতের শাব্দিক স্ফুরণের সম্বন্ধ খুবই কম। তবে রাগসঙ্গীতে স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণ প্রাঞ্জল করিবার জন্য জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উচ্চারিত দন্ত্যবর্ণ ত, দ, ন এবং র প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণ উহার সহিত ব্যবহার করা হয়। তাই উচ্চ-প্রতীকের আলাপে তে, নে, রে, নেতা, তোম্, নোম্, তুম্, সুম্, রিরেনা, তেনেরি, ইত্যাদি শব্দাংশ ব্যবহারে প্রচুর স্ফুরণ ফলিতে দেখা যায়। খেয়াল গানের আলাপে সাধারণতঃ 'আ'কার অথবা গানের বিশেষ বিশেষ শ্রুতিমধুর বাণীগুলিই ব্যবহার করা হয়। উপরে লিখিত বোলগুলি (তে, নে, রি, নোম্ ইত্যাদি) বাংলা ভাষাতেও আছে। কাজেই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে রাগসঙ্গীতে যে উচ্চপ্রতীকের আলাপ অর্থাৎ 'অনিবদ্ধ গান' প্রচলিত আছে তাহা বাংলা ভাষা ব্যবহারে হইতে পারে।

রাগসঙ্গীতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে 'আ' এই স্বরবর্ণটির। এই 'আ'কারটি ঠিক এরূপ ভাবে কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া উচ্চারণ করা প্রয়োজন হয় যাহাতে কণ্ঠস্বরের গতি মুহূর্তমধ্যে ইচ্ছানুরূপ উচ্চ বা নিম্ন দিকে দ্রুত চালনা করা সম্ভব হয়। হঠাৎ একটি তান অতি দ্রুত 'তার'-ষড়জ হইতে মধ্য ষড়জে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে—এইরূপ আবশ্যক। এই 'আ'কারটি কিঞ্চিৎ বক্রভাবে উচ্চারিত না হইলে তাহা সম্ভব হয় না। তখন এই 'আ'কারটির উচ্চারণ 'আয়' এইরূপ শোনায়। দ্বিতীয়তঃ এই 'আ'কার সঠিক ভাবে উচ্চারিত না হইলে গায়কের নিজের কণ্ঠস্বর নিজেরই কানে 'ঝাঁ ঝাঁ' করিতে থাকে, তানপুরার সুর তাঁহার পক্ষে শোনা কঠিন হইয়া পড়ে এবং প্রকাণ্ড হাঁ না করিলে গান করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এই 'আ'কারটি কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া উচ্চারণ করা সমীচীন। তাহা হইলে কণ্ঠস্বরও সর্বদা আবশ্যকমত শব্দ অথবা তান প্রকাশে সক্ষম হইবে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর রাগসঙ্গীতের এই আকারের উচ্চারণ অতি সুন্দর ও মধুর ছিল। বাংলা ভাষায় রচিত কতকগুলি খেয়াল গান তিনি রেকর্ড করিয়াও গিয়াছেন। ইহা হইতেও প্রকৃত উচ্চারণ-ভঙ্গী সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এখন দেখা যাক, হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতে যে বাণীগুলি সাধারণতঃ ব্যবহার হয় তাহার উৎস কোথায় এবং সেরূপ শব্দ বাংলা ভাষায় আছে কিনা। অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রথমে সংস্কৃতে পরে প্রাদেশিক ভাষায় 'শিবের মহিমা' অবলম্বনে ধ্রুবপদাদি রচিত হইত। এই শব্দগুলি বাংলা ভাষাতেও প্রচলিত আছে, যেমন :

"ভস্ম অঙ্গ গৌরী সঙ্গ
জটা মে বিরাজে গঙ্গ।"
ভৈরবী – চৌতাল

"ডমরু হরকর বাজে বাজে
ত্রিশূল ধর অঙ্গ ভস্মভূষণ।"
গুণকেলী— তীব্রা

"ভব রুদ্র উগ্র সর্ব পশুপতি সমসমান
ঈশান ভীম সকল তেরোহী অষ্ট নাম।"
ভূপালী—চৌতাল

ইহার প্রত্যেকটি শব্দই ত বাংলা ভাষাতে আছে। সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, 'কৃষ্ণ কানাইয়া'কে লইয়া অধিকাংশ বাণীই রচিত। রামচন্দ্রের গুণ অবলম্বনেও দুই-চারিটি গান দেখিতে পাওয়া যায়। রামলীলা প্রসঙ্গে প্রচুর ভজনগান প্রচলিত আছে। 'নাদব্রহ্ম' লইয়াও কয়েকটি ধ্রুপদ রচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রিয়তমের বিরহ-মিলন ইত্যাদি লইয়াও প্রচুর বাণী রচিত হইয়াছে। যেমন—

"পিয়া পরদেশ"
"পিয়া মিলন কি বারি"
"এরি আলি পিয়া বিন"
"পিয়রবা তেহারি"। ইত্যাদি

এই সকল শব্দ বাংলা ভাষায় নাই এরূপ নহে, অথচ বাংলা ভাষাতে রাগসঙ্গীত রচিত হইতেছে না কেন? যে শব্দগুলি হিন্দী ভাষা হইতে লইয়া রাগগীতি রচিত হইয়াছে, সেই শব্দগুলি যদি বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলা ভাষাতেও রাগগীতি রচিত হইতে পারে। অবশ্য বাঙালী সঙ্গীতগুণী-দের কাব্যপ্রতিভাও ইহার মূলে থাকা আবশ্যক এবং নূতন বাণীরচনার প্রেরণাও থাকা প্রয়োজন।

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মাত্র কয়েক শব্দই সঙ্গীতে ব্যবহারের বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া কয়েক শতাব্দী হইতে এগুলি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 'সন্ধ্যা' হ'ল কাব্যসঙ্গীতের উপযুক্ত ভাষা, কিন্তু রাগসঙ্গীতে বিশেষতঃ খেয়ালে 'সাঁজ ভই' শব্দের প্রয়োজন। তাহার কারণ ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণ কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃত কণ্ঠস্বর প্রকাশের পরিপন্থী। ধ্রুবপদাদিতে অর্থাৎ গম্ভীর চালের গানে 'সন্ধ্যা হ'ল' প্রভৃতি এই সকল শব্দ অত্যন্ত সুললিত হয়, কিন্তু খেয়ালের বাণী যতদূর সম্ভব সহজ সরল উচ্চারণবিশিষ্ট হইবে, ততই রাগবিস্তারের পক্ষে সহজ ও উপযোগী হইবে। গানের বাণী লইয়া রাগবিস্তার করিতে স্বরবর্ণগুলির সাহায্যের জন্য উপযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োজন হয়। সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলিই সঙ্গীতে ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। অবশ্য সাঙ্গীতিক উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিলে প্রায় প্রত্যেক শব্দই সঙ্গীতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

রাগসঙ্গীতে ('আ', 'এ', 'ই', 'ও', 'উ') প্রত্যেকটি স্বরবর্ণেরই স্পষ্ট ব্যবহার হয়; কিন্তু কেবলমাত্র 'অ'কার উচ্চারণ রাগ সহ্য করিতে পারে না বলিয়া মনে হয়। হিন্দী ভাষায় 'অ'-এর উচ্চারণ কতকটা 'আ'কারের মতই শোনায়। যে স্থানে নিতান্তই 'অ' প্রয়োজন সে স্থানে 'হসন্ত' ব্যবহারে এই 'অ'কারকে এড়াইয়া যাওয়া ঐ ভাষার নিজস্ব স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন: তন্, মন্, ধন্, কৌন্, মীত্, মন্দর্ ইত্যাদি। এই 'অ'কারের স্পষ্ট উচ্চারণ হেতুই কিন্তু বাংলা এবং উড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষা রাগসঙ্গীতের বাণীরচনার উপযুক্ততা অর্জন করিতে পারে নাই। হিন্দী ভাষাতেও যেস্থানে 'অ'কার উচ্চারণ প্রয়োজন হয় তাহা কিঞ্চিৎ বক্র করিয়াই উচ্চারিত হয়। বাংলা ভাষায় রাগ-সঙ্গীতের বাণী রচনা করিতে হইলে রচয়িতার কর্তব্য হইবে সহজ সরল স্বল্পাক্ষরবিশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ। সুরশিল্পীর কর্তব্য হইবে শব্দগুলি ঈষৎ বক্র করিয়া হিন্দী ভাষার মতই উচ্চারণ করা।

প্রত্যেক সঙ্গীতেই বাণীগুলির উচ্চারণে একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। ইহাকে সাঙ্গীতিক উচ্চারণ বলা হয়। এই উচ্চারণ কথ্য ভাষার উচ্চারণ হইতেও পৃথক। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, রাগ, কীর্তন প্রভৃতি সঙ্গীতের শাব্দিক উচ্চারণের একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গী আছে। কণ্ঠস্বরের সাহায্যে শব্দের বা নাদের প্রকাশ-দ্বারা যে ভাবের অনুভূতি শ্রোতৃমনে জাগাইয়া তুলিতে শিল্পী ইচ্ছা করেন, ভাষা যেন তাহার সাহায্যই করে। বাংলা ভাষায় রাগগীতি রচনা ও সুরসংযোজনা করিতে হইলে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শব্দ চয়ন করিতে হইবে, যাহাতে শিল্পীর সেই শব্দগুলি বক্রভাবে উচ্চারণ করিতে অসুবিধা না হয় এবং শ্রোতারও কানে বিসদৃশ না লাগে। কেবলমাত্র একটু বক্র ভাবে বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেই অথবা করিলেই বাংলা ভাষায় এই রাগগীতি সৃষ্টি করা যাইতে পারে। এই উচ্চারণকে যদি কেহ উপহাস করিয়া হিন্দী ভাষার অনুকরণ বলেন, আমরা তাহা স্বীকার করিব না। আমরা বলিব এই বিশেষ উচ্চারণটি বাংলা ভাষায় রচিত বাণীর সাঙ্গীতিক উচ্চারণ। ভাষার উচ্চারণ এইরূপ একটু বিকৃত করিতে না দিলে বাংলা ভাষা রাগসঙ্গীতের মত এত বড় একটি সম্পদ হইতে চিরকাল বঞ্চিত থাকিবে।

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি—তিনি সোমেশ্বরের 'মানসোল্লাস' হইতে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

কাব্যসঙ্গীতে যেরূপ কথ্য ভাষার ব্যবহার শোভন হয়, রাগসঙ্গীতে তাহা নহে। রাগে সাধু ভাষাই ব্যবহার করিতে হয়, তাহা না হইলে যেন একটু 'হাল্কা' প্রকৃতির শব্দরচনা হয়। যেমন পেয়ে, দিয়ে, চলে, এসে ইত্যাদি শব্দের বদলে পাইয়া, দিয়া, চলিয়া, আসিয়া ইত্যাদি সুসঙ্গত হয়। আরও একটি অনুযোগ শোনা যায় যে, 'বাংলা গানগুলি শব্দবহুল', এই কথাটি ভিত্তিহীন। কারণ কবির উপরেই নির্ভর করে— কোন গান শব্দবহুল অথবা অল্প শব্দ বিশিষ্ট হইবে। দুই বা তিন অক্ষরে রচিত প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষায় আছে, সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সাধারণতঃ মুষ্টিমেয় কয়েকটি শব্দ সাহায্যেই গীত রচিত হইয়া থাকে। বাংলা ভাষায় রাগসঙ্গীত রচিত হইলে এবং বিশেষ কৃতিত্বের সহিত যদি গুণিগণ তাহা ব্যবহার করিয়া দেখাইতে পারেন তাহা হইলে হয় ত এমন দিন আসিবে যখন ভারতের সকল স্থানেই বাংলা ভাষার রাগসঙ্গীত শোনা যাইবে। আমি নিজে কয়েক জন হিন্দুস্থানী গায়ক-বন্ধুকে বাংলা খেয়াল শিখাইয়াছি। অবশ্য এইগুলি তাঁহারা বাঙালীসমাজ ব্যতীত প্রায়ই গান করেন না। সুললিত শব্দসম্ভার যে ভাষায় বর্তমান সে ভাষায় রাগসঙ্গীত রচিত হইতে পারে না অথবা বড় একটা হয় নাই ইহা ভাবিতেও দুঃখ হয়। যাঁহারা বাংলা ভাষার বাংলা উচ্চারণের বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকেও আমরা এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিব।

জনগণের একাংশ

শ্রীরথীন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতবর্ষকে বাস্তবিকই বলা চলে উপমহাদেশ। এই উপমহাদেশের প্রথম শহর আর সমগ্র এশিয়াখণ্ডের মিলন-কেন্দ্র এই কলিকাতা শহরের জন-বৈচিত্র্য অপূর্ব্ব। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির লোক ত এখানে আছেই তা ছাড়া পৃথিবীর প্রতিটি দেশের বহু জনের অবিরাম কর্ম্মব্যস্ততা, আনাগোনা এবং পদচারণা চলছে বিরাট এই শহরের বুকে। এখানে দীর্ঘকায়, প্রাণচঞ্চল আমেরিকানের পাশে দেখতে পাই মধ্য-এশিয়ার মরুভূমির পরুষ-প্রকৃতির মানুষকে আর তারই কাছাকাছি দেখা মেলে সুদূর প্রাচ্যের স্বল্পভাষী লোকেদের। এর উপর আছে আবার পশ্চিমবঙ্গের বাইরেকার সব রাজ্যের লোক। তারা এসেছে বিহার থেকে, মাদ্রাজ থেকে, মধ্যপ্রদেশ আর উড়িষ্যা থেকে। এসেছে ওরা কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যের দুর্বার আকর্ষণে নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে, পেছনে রেখে এসেছে নিজের গ্রাম আর জমি-জেরাত। পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য প্রদেশ থেকে যত লোক এসেছে তার মধ্যে নিকট-প্রতিবেশী বিহার থেকে আগত লোকের সংখ্যায়ই সর্ব্বাধিক।

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে পর পর দুই-তিন বৎসর অজন্মা হলেই ওরা চিন্তা করতে সুরু করে বিকল্প জীবিকার কথা। দৈহিক শক্তিই যাদের একমাত্র মূলধন, কায়িক পরিশ্রমসাপেক্ষ জীবিকাই তাদের অবলম্বন। আর তখনই ওদের চিন্তাকে অধিকার করে 'কলকাতা মুলুকে'র নানা সুযোগ-সুবিধা। কলিকাতার ব্যবসায়গত ঐতিহ্য তাদের মনে এমনভাবে রেখাপাত করেছে যে, তাদের ধারণা কলিকাতায় জীবিকা-সমস্যার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজ। ওখানে গেলে মাঠে বীজ বুনে নির্মেঘ আকাশের দিকে জলের প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকতে হবে না এই আশায় তারা কলকাতার দিকে পাড়ি জমায়।

কলকাতায় এরা কদাচিৎ একলা আসে, অধিকাংশই যাত্রা সুরু করে দল বেঁধে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা অনিশ্চিতের উপর ভরসা করেই যাত্রা করে, সঙ্গে নিয়ে আসে জমি-বাঁধা-দেওয়া কয়টি টাকা। শহরে এসে ওরা থাকে স্বজাতের বা স্বগ্রামের লোকের বাসায়।

মোট ব'য়ে বা রিক্সা চালিয়ে কলকাতায় প্রথম তাদের জীবিকা-

নির্ব্বাহের পালা সুরু হয়। কলিকাতার পীচ-ঢালা মসৃণ পথে জড় এবং জীবন্ত উভয় প্রকার বোঝা বয়ে যে কাঁচা টাকার আস্বাদ পায় তাতে এদের শ্রম-জনিত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এদের মধ্যে কেউ পানের দোকান চালায়, কেউ বা মাথায় তুলে নেয় ভাজা চীনে-বাদামের ঝুড়ি। এরা ক্রমশঃ জীবিকা-অর্জ্জনের ক্ষেত্রে উচু ধাপে উঠতে থাকে। যারা মোট বয় বা রিক্সা চালায় তারা বেশীদিন এই কাজে লিপ্ত থাকতে চায় না। কিছু টাকা জমিয়ে তারা ছোটখাটো ব্যবসায় সুরু করতে চেষ্টা করে। করপোরেশন ইলেকট্রিক কোম্পানী বা ট্রাম কোম্পানীতে চাকরির প্রতি এদের প্রবল মোহ লক্ষণীয়। এদের যে আত্মমর্য্যাদা বোধ খানিকটা বাড়ছে তা বুঝা যায়—কোন কঠিন কায়িক পরিশ্রমের কাজের প্রতি প্রবল অনিচ্ছা দেখে। এদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় শ্রেণীভূক্ত তারা দারোয়ানের কাজ পছন্দ করে থাকে।

এদের বাসস্থানের সঙ্কীর্ণতা আর আবেষ্টনের অপরিচ্ছন্নতা না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। যে ঘরে কোনক্রমে দু'জনে থাকা যায় সেখানে ওরা নির্ব্বিকারচিত্তে বাস করে চার-পাঁচ জন। সে ঘরে প্রবেশ করলে পৃথিবীতে যে আলো-হাওয়া আছে তা ভুলে যেতে হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেই অপরিসর (খুপরি) ঘরেই উনুন জেলে তারা রান্নাবান্না ইত্যাদি করে থাকে। বৈশাখের প্রচণ্ড গরমে দেখেছিলাম টিনে-ছাওয়া একটা কোটরে—যেখানে ঢুকতে গেলে মাথা নীচু করতে হয় আর শুলে পা গুটিয়ে নিতে হয়—উনুন জেলে পরমানন্দে রান্না করেছে এক ছাপরাবাসী মুটে। সুবিধা থাকাসত্ত্বেও তারা পয়সা বাঁচাবার জন্যে পাশের ঘরে বিজলী আলো থাকলেও নিজেদের ঘরে তার ব্যবস্থা করবে না। তবে তারা সারাদিন কাজকর্ম্মে বাইরেই থাকে, এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনমানে তাদের বেশীক্ষণ থাকতে হয় না। আর গ্রীষ্ম-কালে রাতটা খাটিয়া পেতে বা গামছা বিছিয়ে ফুটপাথেই কাটিয়ে দেয়। তবে শীত আর বর্ষায় ওরা গাদাগাদি করে ঐ অন্ধকূপেই রাত কাবার করে।

সাধারণতঃ ভাত আর ডাল কলকাতায় তাদের প্রধান খাদ্য। তবে সময় সময় ভাতের পাশে খানিকটা শাক-চচ্চড়ি উঁকি মারতে দেখেছি। বর্ষায় ইলিশ মাছ তাদের আহারের রুচিকে পরিতৃপ্ত করে। তবে যারা সবে এসেছে গ্রাম থেকে আর কাজকর্ম্মও জোটে নি তেমনকিছু তারা শুধু ছোলায় ছাতু জল দিয়ে মেখে তেঁতুলের আচারসংযোগে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

কলকাতায় এসেছে এরা টাকা রোজগার করতে, তাই প্রতিটি ফুটো পয়সার ওপরও এদের গভীর মায়া। অশনে-বসনে বিলাসিতা ত দূরের কথা সাধারণ মানও বজায় রাখে না। টাকা তারা জমায় কোন ব্যাঙ্কে নয়, কারুর কাছেও নয়, প্রত্যেকেরই একটা করে টিনের বাক্স আছে তাতে ভরতি করে রাখে। কিংবা মাঝে মাঝে 'মণিঅর' করে দেয়, আবার বিশ্বাসী কোন 'দেশওয়ালী' দেশে গেলে তার মারফতেও পাঠিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে তারা দেশে গিয়ে জমির ব্যবস্থা করে আসে। ফলে কলিকাতায় খেটে যেমন কাঁচা টাকা রোজগার করে তেমনি নিজের জমি থেকে খোরাকিটার ব্যবস্থা হয়। অবস্থা তাদের ফিরে যায়, কিন্তু তারা নিজেদের ভাগ্যটাকে আর পুরোপুরি জমির হাতে ছেড়ে দেয় না, ফলে কলকাতায় বেড়ে যায় বিহারীদের সংখ্যা।

দেশে তারা যায় বৎসরে অন্ততঃ একবার। অবশ্য দুই-তিন বৎসর পর পরও অনেকে গিয়ে থাকে। একশ্রেণীর লোক আছে এদের মধ্যে যারা ধান কাটা আর ধান রোয়ার সময় দেশে যায়। যেদিন যে বাসা থেকে কেউ দেশে যাবে সেদিন সে বাসার সকলের মধ্যেই যেন সাড়া পড়ে যায়। এদের পারস্পরিক সম্প্রীতি অনুকরণীয়। একসঙ্গে সবাই থাকে 'মেস' প্রথায়, কিন্তু খাতা-পত্রে কোন হিসেব নেই, সব মুখে মুখে—কেবল বাসিন্দাদের নাম-লেখা একটা খাতা আছে।

কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও তারা আনন্দের ব্যবস্থা করে থাকে। কোন দূর গ্রামের প্রান্তে রেখে এসেছে প্রিয় পরিজনদের, তাদের বিচ্ছেদ জনিত বেদনায় ওদেরও মন ভারী হয়ে থাকে। প্রিয়বিচ্ছেদ-কাতর মনকে হাল্কা করবার জন্যে এরা আয়োজন করে নানা অনুষ্ঠানের। "রামলীলা" ওদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। তা ছাড়া সমবেত সঙ্গীত আর হা-ডু-ডু খেলার মধ্যে ওরা প্রচুর আনন্দ পেয়ে থাকে। শহরতলীতে বর্ষাকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে তারা লোকনৃত্যের আয়োজন করে থাকে, সেটা কাজরী নামে অভিহিত।

এই তাদের প্রবাস-জীবনের মোটামুটি চিত্র। এখানে বলা হয়েছে কেবল চাষী মুটে-মজুর প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষদের কথা। সমাজের উচুতলায় যাঁরা আছেন, আর্থিক কৌলিন্যের দৌলতে তাঁদের জীবনের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত।
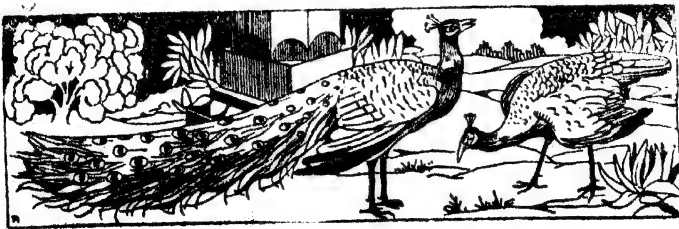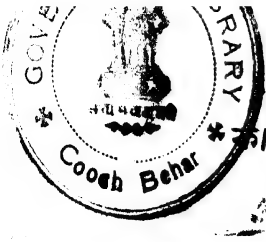
কালিদাস সাহিত্যের কয়েকটি উপমা

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যের যেমন সীমা নাই, তাঁহার রচিত উপমাগুলিরও তেমান সংখ্যা করা যায় না। এই প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্যসমুদ্র হইতে কয়েকটি উপমা-রত্ন আহরণ করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দেওয়া যাইতেছে।

মানুষ যখন তন্ময় হইয়া কোনও কিছুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, তখন তাহার সে দৃষ্টিভঙ্গীটি বর্ণনা করার জন্য মহাকবি রকমারি উপমার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এখানে দেখানো যাইতেছে।

বিদর্ভ নগরের 'স্বয়ংবর' সভায় যখন রাজভগিনী অপূর্ব রূপসী ইন্দুমতী বরণমালাটি হাতে লইয়া মনের মত পতি নির্বাচন করার জন্য প্রবেশ করিলেন, যে সব রাজারা ও রাজপুত্রেরা নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দুমতীকে বিবাহ করিবার আশায় সভায় আসিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজকুমারীর অসামান্য রূপের দিকে কি ভাবে তাকাইয়া রহিলেন, মহাকবি তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে বলিয়াছেন—

'তস্মিন্ বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ
কন্যাময়ে নেত্রশতৈক-লক্ষ্যে।
নিপেতুরন্তঃকরণৈর্নরেন্দ্রাঃ
দেহৈঃ স্থিতাঃ কেবলমাসনেষু।' (রঘু ৬।১১)

শত শত নয়নের একমাত্র লক্ষ্য, বিধাতার সেই অপূর্ব সৃষ্টি তরুণীর কাছে রাজন্যগণ তাঁহাদের অন্তঃকরণের মাধ্যমে চলিয়া গেলেন, দেহগুলি কেবল সিংহাসনের উপর পড়িয়া রহিল।

মহাকবি এখানে বলিতে চাহিতেছেন যে, নৃপতিরা ইন্দুমতীর মনোমুগ্ধকর রূপের দিকে এমন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন যে, সে সময় তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হইত যে, তাঁহাদের অন্তঃকরণগুলি—রাজাদের যাহা প্রকৃত সত্তা—তাঁহাদের চক্ষুর ভিতর দিয়া রাজকুমারীর কাছে চলিয়া গিয়াছে, আর তাঁহাদের স্পন্দহীন সারশূন্য দেহগুলি সিংহাসনের উপর নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেহের যা সারবস্তু মন, অন্তঃকরণ ইত্যাদি সেগুলি ত চক্ষুর ভিতর দিয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া রাজকুমারীর কাছে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং দেহগুলিতে আর আছে কি?

প্রায় এই ধরনের একটি উপমা 'কুমার-সম্ভবে' পাওয়া যায়। বর যাইতেছেন বধূর বাড়ী বিবাহ করিতে, সঙ্গে বরযাত্রী। 'বর আসিতেছে' শুনিয়া পথের দুই পার্শ্বের বাড়ীগুলির কৌতূহলী নারীরা বর দেখিবার জন্য জানালায়, এবং সোনালী 'চিক'-ফেলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া বর দেখিতেছেন, মহাকবি তাঁহাদের সে বর দেখার ভঙ্গীটিকে উপমা দিয়া বর্ণনা করিতেছেন:

'তমেকদৃশ্যং নয়নৈঃ পিবন্ত্যো
নার্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথা হি শেষেন্দ্রিয়-বৃত্তিরাসাং
সর্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা।' কু-৭।৬৪

একমাত্র লক্ষণীয় সেই বরকে নারীরা যেন নয়নের দ্বারা পান করিতে লাগিলেন, অপর আর কোনও বিষয়ে তাঁহাদের মন রহিল না; তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে হইতেছিল তাঁহাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি বুঝি সর্বতোভাবে চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে।

এখানে মহাকবি বলিতেছেন যে, নারীরা এমন তন্ময় হইয়া অপলকনেত্রে বর দেখিতেছিলেন যে, বর ছাড়া অন্য কোনও কিছুর দিকে তাঁহাদের নজর ছিল না, অন্য কোনও বিষয়ে তাঁহাদের মন যাইতেছিল না। তাঁহাদিগকে দেখিয়া লোকের মনে হইতেছিল, যেন তাঁহাদের শ্রবণ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি আপন আপন কর্তব্য ভুলিয়া, যে যাহার কাজকর্ম ছাড়িয়া একমাত্র চক্ষুর মধ্যে সকলে মিলিয়া আসিয়া জড়ো হইয়া রহিয়াছে, আর সেই কারণে নারীদের চক্ষু ছাড়া অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া গিয়াছে। 'রঘুবংশের' ৭ম সর্গেও এই উপমাটি পাওয়া যায়।

নিবিষ্ট মনে কোনও কিছু দেখাকে মহাকবি অপর কয়েকটি স্থানেও চক্ষু দ্বারা পান করার আখ্যা দিয়াছেন।

'পুষ্পক' বিমানে বসিয়া রামসীতা যখন লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আসিতেছিলেন, তখন নীচে পম্পা সরোবর দেখিতে পাইয়া রাম এমন নিবিষ্ট মনে সরোবরের শোভা দেখিতে লাগিলেন যে, মহাকবি তাঁহার সে সময়কার দৃষ্টিভঙ্গীকে চক্ষুদ্বারা পান করিতেছিলেন, বলিয়াছেন:

'দূরাদবতীর্ণা পিবতীব খেদাৎ
অমূনি পম্পা-সলিলানি দৃষ্টিঃ।' রঘু-১৩।৩০

দৃষ্টিকে অত উর্দ্ধ হইতে এত নীচে নামিতে হইল বলিয়া সে যেন পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পম্পা সরোবরের জল পান করিয়া লইতেছে।

মানুষ যখন বহু পথ হাঁটার ফলে অত্যন্ত ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়ে, তখন কোনও জলাশয় দেখিতে পাইলে সে যে ভাবে তাহার জল পান করিতে থাকে, রামের দৃষ্টিকে আকাশ হইতে নীচে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে হইল বলিয়া মহাকবি বলিতেছেন, সে যেন অত বেশী পথ চলার পরিশ্রমে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পম্পা সরোবরের জল সেইরূপ নিবিষ্ট মনে পান করিয়া লইতেছে।

'রঘুবংশের' দ্বিতীয় সর্গে মহাকবি বলিতেছেন, রাজা দিলীপ

যখন সারাদিন ধরিয়া মাঠে মাঠে গুরুদেবের গরু চরাইয়া দিনের শেষে আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন, তাঁহার পত্নী সুদক্ষিণা সে সময় আশ্রমের সীমানার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন, রাজাকে আসিতে দেখিতে পাইলে, তাঁহার দিকে এমন আবেগপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া থাকিতেন যে, মহাকবি বলেন :

'পপৌ নিমেষালস পক্ষ্মপঙ্‌ক্তি
রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্।' রঘু-২৯

তিনি যেন তাঁহার উপবাসী নিমেষহীন নয়ন দুইটি দ্বারা তাঁহাকে পান করিয়া লইতেন।

সারাদিন রাজাকে দেখিতে না পাইয়া সুদক্ষিণার নয়ন দুইটি যেন থাকিত উপবাসী, তার পর সন্ধ্যার সময় রাজার দেখা পাইলে সুদক্ষিণা তাঁহার দিকে যেরূপ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতেন, তাহা দেখিয়া লোকের মনে হইত সারাদিন উপবাসে কাটাইয়া তৃষ্ণার্ত মানুষ সন্ধ্যার সময় পিপাসার জল পাইলে, সে জল সে যে আগ্রহভরে পান করিতে থাকে, সুদক্ষিণারও তেমনি উপবাসী নয়ন দুইটিও দিলীপ রাজার রূপসুধা বুঝি সেইভাবে পান করিয়া লইতেছে।

বিশ্বামিত্র মুনি যখন রামলক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া মিথিলায় রাজার জনকের যজ্ঞ দেখিতে গেলেন, রামলক্ষ্মণের অনুপম রূপ মিথিলাবাসীরা কি ভাবে দেখিতেছেন, মহাকবি তাহা এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

'ময়তেস্ম পিবতাং বিলোচনৈঃ
পক্ষ্মপাতমপি বঞ্চনাং মনঃ॥ রঘু-১১।৩৬

বিদেহ নগরের অধিবাসীরা যেন চক্ষুদ্বারা তাঁহাদিগকে পান করিতে লাগিলেন, এমনকি চোখের পাতার নিমেষপাতও তখন তাঁহাদের দৃষ্টি-প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

শীতল ও সুস্বাদু জল পাইলে মানুষ যে তৃপ্তির সহিত তাহা পান করিতে থাকে, এবং পান করার সময় যেমন কোন প্রতিবন্ধকতা সে সহ্য করিতে পারে না, বিদেহ নগরের অধিবাসীরাও তেমনি রাম ও লক্ষ্মণের রূপমাধুরী এমন পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছিলেন যে চোখের পাতা ফেলার সময়ের দৃষ্টির মুহূর্তের প্রতিবন্ধকতাও তাঁহাদের নিকট অসহ্য বলিয়া মনে হইতেছিল।

প্রেমাতুর নায়কের সম্মুখ হইতে তাঁহার প্রণয়িনী যখন চলিয়া যান, তখন তাঁহার মনে যে ব্যথার সঞ্চার হয়, মনোবেদনার সে ভাবটি বুঝাইবার জন্য মহাকবি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' ও 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে তিনটি উপমা রচনা করিয়াছেন, এখানে সে তিনটি উপমা দেখানো হইতেছে।

অপ্সরা উর্বশী যখন রাজা পুরূরবার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার সখীদের সঙ্গে আকাশপথে উড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন তখন তাঁহার প্রেমপ্রার্থী পুরূরবা হতাশ ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনে বলিতেছেন :

'এষা মনো মে প্রসভং শরীরাৎ
পিতুঃ পদং মধ্যমমুৎপতন্তী।
সুরাঙ্গনা কর্ষতি খণ্ডিতাগ্রাৎ
সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী।' বিক্রম-১ম অঙ্ক

রাজহংসী যে ভাবে পদ্মের মৃণাল খণ্ডিত করিয়া তাহার ভিতর হইতে সূত্র বাহির করিয়া লইয়া যায়, এই অপ্সরাও সেইরূপ আমার শরীর হইতে মনটিকে জোর করিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া আকাশপথে চলিয়া যাইতেছে।

পুরূরবার মনে হইতেছে যে, অপ্সরা তাঁহার মনটি তাঁহার দেহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার মন আর তাঁহাতে নাই, কোনও কাজে আর তিনি মন দিতে পারিবেন না, যতক্ষণ না অপ্সরা আবার তাঁহার কাছে তাঁহার মনটিকে লইয়া ফিরিয়া আসেন।

কতকটা এই ধরনের একটি উপমা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' পাওয়া যায়। রাজা দুষ্মন্তের সম্মুখ হইতে শকুন্তলা ও তাঁহার দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা আশ্রমের কুটীরে ফিরিয়া গেলেন, দুষ্মন্তও নিজের শিবিরে ফিরিয়া যাইবার জন্য তপোবন হইতে বাহির হইলেন, বাহির হইলেন বটে, তবে তাঁহার মন পড়িয়া রহিল শকুন্তলার কাছে—মনের এই ভাবটি জানাইবার জন্য তিনি আপন মনে বলিতেছেন :

'গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।' শকু-১ম অঙ্ক

শরীর আমার সম্মুখে চলিয়াছে বটে, কিন্তু চঞ্চল মন ধাওয়া করিতেছে পিছন দিকে, যেমন পতাকার ধ্বজা সম্মুখ দিকে লইয়া চলিলেও প্রতিকূল বায়ুর প্রভাবে তাহার উপরিস্থিত চীনদেশীয় রেশম-বস্ত্র পশ্চাদ্দিকে উড়িতে থাকে।

পতাকার দণ্ড যেমন সম্মুখ দিকে লইয়া চলিলেও বাতাস যদি বিপরীত দিকে বহিতে থাকে, তাহার উপরকার বস্ত্র পিছন দিকেই ধাবিত হয়, সম্মুখে আসিতে চাহে না, তেমনি দেহ যদিও শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, মনটি পড়িয়া রহিল পিছন দিকে, কণ্বমুনির আশ্রমের সেই কুটীরটির কাছে শকুন্তলা যেখানে বাস করার জন্য চলিয়া গেলেন। রাজার দেহ যাইতেছে সম্মুখে আর মন চলিতেছে পিছনে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের' তৃতীয় অঙ্কেও এই ভাবের উপমা পাওয়া যায়। লতাপকুঞ্জের মধ্যে দুষ্মন্ত গোপনে আসিয়া শকুন্তলাকে প্রেম নিবেদন করিতেছেন, শকুন্তলার কিন্তু কেবলই ভয় হইতেছে, তিনি একাকী থাকিতে পারিতেছেন না রাজার কাছে, তাই যখন তিনি লতাপকুঞ্জ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, আশাহত প্রণয়ী তখন তাঁহাকে শুনাইয়া বলিতেছেন :

'ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিবাবসানে ছায়েব পুরোমূলং বনস্পতেঃ।' শকু-৩য় অঙ্ক।

দূরে তুমি চলিয়া যাইতেছ বটে, আমার হৃদয়কে কিন্তু পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, দিনের শেষে বৃক্ষের ছায়া বৃক্ষ হইতে দূরে চলিয়া গেলেও তাহাকে পরিত্যাগ সে করিতে পারে না।

সূর্যাস্তের পর বৃক্ষের ছায়া যেমন বৃক্ষের নিকট হইতে বহু দূরে চলিয়া গেলেও বৃক্ষের মূলে তাহার একটা দিক লাগিয়া থাকে, বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে সে ছাড়িতে পারে না শকুন্তলাও তেমনি দুষ্যন্তের সম্মুখ হইতে যত দূরে চলিয়া যান না কেন, তাঁহার মন তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না, রাজার মনের মধ্যে তাঁহার চিন্তা থাকিয়াই যাইবে।

সমুদ্রের জল যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তাহার উদ্বেলিত জলরাশি যে সমস্ত নদী সমুদ্রের সহিত মিলিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র তাহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তটভূমি অতিক্রম করিয়া সাগরের জল কখনও জনপদ প্লাবিত করিয়াছে—এ ব্যাপার কেহ দেখে নাই বা শুনে নাই। সমুদ্রের এই মহত্ত্ব উপমা করিয়া মহাকবি বলিতেছেন :

'অপথেন প্রববৃতে ন জাতুপচিতোহপি সঃ।
বৃদ্ধৌ নদীমুখেনৈব প্রস্থানং লবণাম্ভসঃ।' রঘু-১৭।৫৪

তাঁহার (রাজা অতিথির) সমৃদ্ধি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি কখনও বিপথগামী হয়েন নাই, লবণসাগরের জল উদ্বেলিত হইলে একমাত্র নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়।

সাগরের জল যেমন ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া সারা দেশ ভাসাইয়া দিতে পারে, কিন্তু এ অনাচার সমুদ্র যেমন কখনও করে না, রাজা অতিথিরও তেমনি ধনসম্পদ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও বিপথগামী হইয়া সে ধন অসৎ কর্মে নিয়োজিত করেন নাই। সৎপথে থাকিয়া সৎকার্যে তিনি অর্থ ব্যয় করিতেন।

'রঘুবংশের' আর একটি শ্লোকে মহাকবি বলেন, রামচন্দ্রের দুই পুত্র কুশ ও লব, এবং ভরতের ও লক্ষ্মণের পুত্রেরা রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পূর্বে পৈতৃক রাজত্বের কিছু কিছু অংশ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন রাজ্যের রাজা হইলেও নিজ নিজ রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া কখনও অপরের রাজ্যে প্রবেশের বা অনিষ্ট করার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহাদের এই মহত্ত্বকে সমুদ্রের সহিত উপমা দিয়া কালিদাস বলিতেছেন :

'অন্যোন্যদেশ প্রবিভাগ সীমাং
বেলাং সমুদ্রা ইব ন ব্যতীয়ুঃ।' রঘু-১৬।২

বিপুল সম্পদ লাভ করিলেও, সমুদ্রেরা যেমন বেলা অতিক্রম করিয়া যায় না, তাঁহারাও তেমনি নিজ নিজ রাজ্যসীমা অতিক্রম করিতেন না (পররাজ্যে প্রবেশ করিতেন না)।

এখানেও মহাকবি সমুদ্রের মহত্ত্ব লইয়া উপমা রচনা করিয়াছেন। সমুদ্র যেমন পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিজের বেলাভূমির সীমা অতিক্রম করিয়া উত্তাল তরঙ্গ লইয়া অপরের ভূমিতে কখনও অবৈধ প্রবেশ করে না, কুশ লব প্রভৃতি রঘুবংশীয় রাজারাও বিপুল সমৃদ্ধির অধিকারী হইলেও নিজেদের রাজ্য ছাড়িয়া পরের রাজ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিতেন না।

পলাতক

শ্রীসুনীল বসু

ফিরিয়া পাব কি আর সেই তারাময় রাত
ডালিম সূর্যের রশ্মি। কোনো রূপালি প্রভাত ?
বটের বৃক্ষের তলে তৃণের ফরাসে শুয়ে,
গোধূলি বিকেলে কভু ছায়ার অঞ্চল ছুঁয়ে—
হবে কি কখনো আর লক্ষ স্বপ্নজাল বোনা ?
হৃদয়ের রিক্ত তটে ফুরালো সমস্ত সোনা।

হাটে চলা মেঠো পথে কোনো গরুর গাড়ির
পাশে আঁকা একখানি শান্ত গৃহস্থবাড়ীর
সেই নম্র পল্লীচিত্র কোথা আর পাব খুঁজে ?
এখানে প্রকৃতি অন্ধ লক্ষ প্রাসাদে বুরুজে।

আশ্চর্য বিস্ময়ে কোনো মাছরাঙা চেয়ে দেখা,
অস্পষ্ট আঁধারে জ্বলা জোনাকির জ্যোতির্লেখা,
শীতের আখের ক্ষেতে খুশিচক্ষু ঝলমল
হবে কি পিপাসা পূর্ণ মিঠারসে কণ্ঠতল ?

এখানে রাংতামোড়া ব্যর্থ স্থূল কৃত্রিমতা
মুখোশে আবদ্ধ মুখ। শ্বাসরুদ্ধ আকুলতা।
নিত্য তাই পাখী-মন স্বপ্নে,—গ্রামে যায় উড়ে,
সেখানে আকাশে সন্ধ্যা আনে কেয়ারী বাবুড়ে।

চোরা-কাঁটা

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

কয়েক দিন আগে আঙুলে কাঁটা বিঁধেছিল একটা। বার করবার সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়ে সেটি আঙুলাশ্রয়ী হয়ে আছে আজও। বাড়ীর সামনেই বাবার আপন হাতে গড়া মালঞ্চ। যত্নের অভাবে শ্রীহীন হয়ে পড়েছে এখন অনেকটা। তারই এক কোণে আগাছাদের ভিড়ের মধ্যে গোলাপগাছ আছে একটি। তার বিষণ্ণ-ম্লান অস্তিত্ব নজরে পড়ত না বড় একটা। হঠাৎ সেদিন চমকে উঠেছিলাম। কাঁটায়-ভরা অতি নগণ্য একটি প্রশাখা তার ঊর্দ্ধ আকাশের আশীর্ব্বাদের লোভে মাথা উঁচিয়েছিল কবে। তারই শীর্ষদেশে একটিমাত্র ফুল তার প্রাণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিছিয়ে উচ্ছলিত আবেগে হাসছিল যেন। লাবণ্যদীপ্ত অপরূপ সে হাসি। দেখতে দেখতে অভিভূত হয়েছিলাম যেন। ফুলটিকে চয়ন করবার লোভ সামলাতে পারি নি সেদিন। বৃন্তলগ্ন কাঁটা একটি আঙুলে বিঁধে গিয়েই এ অঘটন ঘটেছিল। বার করতে পারি নি সেটিকে কিছুতেই। মাঝে মাঝে খচ্‌খচ্‌ করে এখনও।

আজও খচ করে উঠল আবার কাঁটার ব্যথা। টেবিলের উপর ছাই পড়ে গিয়েছিল—একটু সিগারেটের ছাই। আঙুল দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে গিয়েই অনুভব করলাম ব্যথার অস্তিত্ব। মুখ থেকে বেরিয়ে-আসা বেদনাব্যঞ্জক 'উঃ' শব্দটা অপ্রত্যাশিত একটা ধ্বনি-তরঙ্গ তুলল ঘরের মধ্যে। অদূরেই বসেছিল অতসী। খোকার কাঁথায় নিবিষ্ট মনে সেলাইয়ের ফোঁড় দিচ্ছিল বেচারী। চমকে চোখ ফেরাল। স্বামীর আঙুলের কাঁটার ব্যথাটা ওরও মর্ম্মে সঞ্চারিত হ'ল যেন চকিতের মধ্যে। হঠাৎ আমার কাছে উঠে এল অতসী, অপ্রত্যাশিত তৎপরতার ভাব। অতর্কিতে আমার হাতখানা টেনে নিয়ে নিবিড় অনুরাগভরে বললে—কৈ, দেখি আর একবার চেষ্টা করে—কাঁটাটা বেরোয় কিনা। খচ্‌খচ্‌ করে লাগে বল, অথচ চোখে ত কৈ দেখতে পাই না—ভাল আপদ হয়েছে।

আপদই বটে! কাঁটাটার অস্তিত্বের সন্ধান মেলে না—খচ্‌খচ্‌ করে অথচ। ছুঁচের ডগা দিয়ে তর্জ্জনীর বিশেষ একটি জায়গাকে অতি সন্তর্পণে খোঁচাতে লাগল অতসী। তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি অতসীর। অপরূপ প্রয়াস-ভঙ্গীটুকুও লক্ষ্য করবার মত। এ চেষ্টা যেন ওর ব্যর্থ হবে না কিছুতেই। তবু কৌতুকভরে বললাম—এ চোরা-কাঁটা অতসী। তোমার সাধ্য নয় খুঁজে বার কর একে। কত দিন এখনও এমনি ভাবে খচ্‌খচ্‌ করে বাজবে—কে জানে!

হাতের উত্তপ্ত স্পর্শের সঙ্গে ওর উচ্ছ্বসিত অনুরাগও সঞ্চারিত হচ্ছে আমার দেহে মনে। ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অল্প ভাবাবিষ্ট হতেই খচ্‌ করে উঠল আবার কাঁটাটা। ভাবলাম—অসম্ভব নয়। এ কাঁটার হয় ত হদিস পাবে অতসী। অস্বস্তিরও অবসান হবে হয়ত। কিন্তু মর্ম্মের কোণেও যে আমার এমনি কাঁটা বিঁধে আছে আর একটি। চোরা-কাঁটার মতই খচ্‌খচ্‌ করে ওঠে প্রায়ই তার ব্যথাটা। সারা জীবনেও কি তার সন্ধান পাবে অতসী?

অনন্ত আকাশের কোল থেকে বিপুল সুদূর হঠাৎ হাত-ছানি দিলে যেন। জানালার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম সুদূরের পানে। চোখের সামনে থেকে কালের যবনিকা সরে গেল চকিতের মধ্যে। পনের বছর আগেকার অতীতের পটভূমি। বিয়োগান্ত একটি জীবন-নাটকের কয়েকটি দৃশ্যপট ফুটে উঠল দেখতে দেখতে।—অতসী তখনও গৃহলক্ষ্মী হয়ে আসে নি আমার সংসারে। মহাযুদ্ধ চলছে পুরাদমে, রেঙ্গুনে বোমা পড়েছে; কলকাতা রীতিমত আতঙ্কবিহ্বল। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল কোম্পানির আপিসের চাকরি আমার। বোমার ভয়ে আপিসের কিছু অংশ সরে গেল পাটনায়। হুকুম হ'ল—আমাকেও যেতে হবে পাটনার নতুন আপিসে। গৃহ এবং পল্লীর অবিচ্ছিন্ন প্রীতি-স্নেহে আজন্ম-লালিত আমি। জীবনে এই প্রথম নীড়ভ্রষ্ট হলাম যেন। পাটনায় গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর মিঠাপুর অঞ্চলে বাসা মিলল একটা। নতুন করে আবার কুলায়ে আশ্রয় মিলল যেন। নীড়ে দুটি মাত্র প্রাণী, আমি আর ঘনশ্যাম; ঘনশ্যাম উড়িয়া ঠাকুর আমার, স্থানীয় এক ভদ্রলোক জুটিয়ে দিয়েছিলেন ওকে।

রবিবারের আলস্যমন্থর একটি প্রভাত। ভোরে একবার ঘুম ভাঙবার পর আবার কখন নিদ্রাঘন আবেশে দেহমন আচ্ছন্ন হয়েছিল একটু। দরজায় ঘন ঘন ধাক্কার আওয়াজ হতেই তন্দ্রাবেশ কাটল হঠাৎ।—রাজুর মা এসেছে নিশ্চয়ই। খুব সকালেই ও আসে রোজ। ক'দিন আসতে পারে নি রাজুর মা। খবর নিয়েছে অবশ্য ঘনশ্যাম। সর্দ্দি-

জ্বর নাকি হয়েছে বলছিল। অসুস্থ বলেই একটু দেরি করে এসেছে সম্ভবতঃ। রাজুর মা ঠিকে-ঝি হিসাবে কাজ করছে আমার এখানে—মাসদেড়েক হ'ল। পাটঝাঁট সারবে এখনি। বাসনপত্র ইত্যাদি মাজবে, ধোবে।

আবার ধাক্কা পড়ল দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ঘনশ্যাম—মলা, এমতি ধক্কা লাগাইছ কাঁই! বাবু গোঁসা হই ঘিব পরা?—টিকে রুখ।

অপরিচিত নারীকণ্ঠ খনখন করে বেজে উঠল সমান তালে।—তুই থাম রে উড়িয়ার পো। গোঁসা হবে ত আমার কি রে মুখপোড়া? কেনা দাসী বাঁদী নাকি যে মাথা কেটে ফেলবে! এদিককার সব ধোয়ামোছা হয়ে গেছে কখন। ঠায় দাঁড়িয়ে আছি তখন থেকে। দরজা খোলবার নাম নেই বাবুর, বেলা বাড়ছে এদিকে। ঘাটে পথে, চার রাজ্যে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। এমন নবাবী ঘুম দেখি নি কখনও বাপের জন্মে।

আপিসের পদস্থ কর্ম্মচারী আমি। বংশমর্য্যাদাও আমাদের গগনচুম্বী। আবাল্য ঝি-চাকরদের মুখ থেকে খোশামোদের বুলি শুনতেই কান অভ্যস্ত। 'নবাবী ঘুম'—'কেনা দাসীবাঁদী'—উদ্ধত কথাগুলোর ধাক্কা লেগে আমার আজন্ম-অর্জ্জিত মানসম্ভ্রমের ভিত কেঁপে উঠল যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে। বেশ রুষ্ট মেজাজ নিয়েই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। বাইরের নারীকণ্ঠ খাদে নেমে এল হঠাৎ। অনু-যোগের গুঞ্জন কানে এল।—ওঠবার নাম নেই, বেলা বাড়ছে এদিকে। তিন বাড়ীর কাজ বাকি এখনও আমার, সব সেরে হাসপাতালে ছুটতে হবে আবার ন'টার মধ্যেই। জ্বরে বেহুঁস হয়ে মা ঘরে পড়ে রয়েছে। বুকে-পিঠে সর্দ্দি বসেছে চাপ চাপ। নিমোনিয়ার ভাব—সবাই বলছে।

মুখে চোখে বিপুল বিরক্তির ভাব নিয়ে দরজাটি খুললাম তাড়াতাড়ি। দেখলাম সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে খরভাষিণী প্রগল্ভা একটি মেয়ে। চৌদ্দ কি পনের বছরই বয়স হবে বোধ করি। বয়ঃসন্ধির অনুপম ছন্দ লীলায়িত হয়ে উঠেছে সারা অঙ্গ ব্যেপে। ঘন ময়লা রং, মুখ চোখের শ্রী ছাঁদ নিতান্ত সাদামাটা। চাহনির ভঙ্গীটুকু কিন্তু অপরূপ। আমাকে একনজরে দেখে নিয়েই মেয়েটি হেসে ফেললে ফিক্ করে। উপরন্তু আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় মাথা দুলিয়ে বললে—আহা, সকালের কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম—রাগ হ'ল বুঝি বাবুর?—পরক্ষণেই অতি অন্তরঙ্গের মত বলে উঠল—বলিহারি ঘুম কিন্তু বাবু তোমার! দেখ দিকি একবার ভোরের দিকে তাকিয়ে—কত বেলা হয়েছে! জোয়ান মানুষ তুমি—অত আলিস্যি ভাল নয় বাপু।

আমাকে ঐ ভাবে 'তুমি' সম্বোধন! বিশেষ করে পরিচারিকাশ্রেণীর অল্পবয়সী একটি মেয়ের মুখ থেকে। এমন সম্ভ্রমহানিকর সম্বোধন প্রবাসে এই প্রথম কানে বাজল আমার। আমার স্তম্ভিত হতবাক্ অবস্থা দেখে 'হাঁ হাঁ' করে এগিয়ে এল ঘনশ্যাম, ধমক দিলে মেয়েটাকে। আমার দিকে চেয়ে বললে—ঝিয়ের মেয়ে এটা। টিকে পাগল আছি বাবু।

চকিতের মধ্যে বাজ ফেটে পড়ল যেন কানের কাছে।—আমি পাগল হতে যাব কেন রে মুখপোড়া—পাগল তোর সাতগুষ্টি।

পরক্ষণেই হঠাৎ সজল কোমল হয়ে এল মেয়েটির কণ্ঠস্বর। অপরূপ ভঙ্গীতে আমার দিকে চোখ তুলে বললে—তুমি পেত্যয় যেও না বাবু ও মুখপোড়া'র কথায়। সে বছরে সান্নিপাতিক ধরেছিল ত আমায়! সবাই জানে—সে কি জ্বর! জ্বরের ঘোরে ঘনঘন মাথা চালতুম শুধু। তিন মাস ধরে একনাগাড়ে বিছানায় পড়ে। শুয়ে শুয়ে ঘাড়ে পিঠে ঘা হয়ে গেল শেষটায়. এখন-যাই, তখন-যাই অবস্থা। মা বলে—শরীলটায় হাড় ক'খানা ছাড়া ছিল না আর কিছু। মহাপ্রাণীটুকু ধুকধুক করত শুধু! বেঁচে উঠলুম। পোড়া দেহও পুরল আবার। মাথাটা কিন্তু আর সারল না বাবু! আগুন জ্বলে যেন ভেতরটায়, কাপড় রাখতে পারি নে মাথায়। কি শীত কি গ্রীষ্ম—যখন-তখন জল থাবড়ে দিই। বকা রোগও বেড়েছে, চুপ করে থাকতে পারি না একদণ্ড। মাথা বেশী তাতলে যা-নয়-তাই বলেও ফেলি যাকে তাকে। সবাই তাই বলে—রাজী পাগলী। ওরা বলবে না কেন? আমার যেন কষ্ট হয় না এতে। আচ্ছা, তুমিই বল ত বাবু সত্যি পাগল কিনা আমি?

বাষ্পাকুল চোখদুটিতে আসন্ন বর্ষণের আভাস যেন। মাথায় রাগ চড়া চুলোয় যাক—কথা বলার বিচিত্র ধরন আর মুখ-চোখের অপরূপ ভঙ্গী—সব দেখে শুনে নরম হয়ে গেলাম মুহূর্ত্তের মধ্যে। মেয়েটির জন্যে অল্প একটু মমতা জাগল যেন মনের কোণে। মাথা নেড়ে বললাম—না, না। পাগল হতে যাবে কেন? সবাই ওকথা বলে রাগায় বোধ হয় তোমায়। যাও, কাজ সেরে নাও তাড়াতাড়ি। তোমার মায়ের অসুখ ত আবার বেড়েছে বলছ।

মুহূর্ত্তের মধ্যে খুশীর ঢেউ উঠল ওর সারা মুখের পরি-মণ্ডল ব্যেপে। ঝাঁটা হাতে নিয়ে আমার ঘরের মধ্যে অসঙ্কোচে ঢুকে পড়ল তাড়াতাড়ি। যাবার আগে আর এক বার বঙ্কিমকটাক্ষ হেনে ঘনশ্যামের মেজাজে যেন আগুন

ধারিয়ে দিয়ে গেল। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এই ভাবেই সুরু।

মায়ের বদলে পর পর আরও তিন দিন কাজ করতে এল রাজী পাগলী। অতি অশোভন কথা বলার ভঙ্গী মেয়েটার, ব্যবহারও ততোধিক বিরক্তিকর। তিন দিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল ঘনশ্যাম। দেখে শুনে আমার মনেও পাহাড়প্রমাণ বিরক্তি জমে উঠেছিল। ঘনশ্যামকে ডেকে বলেছিলাম, অন্য লোক একটা দেখ তুমি. ওদের জবাব দিয়ে দেব।

সপ্তাহখানেক আর পাত্তা মিলল না কারও। না রাজুর মায়ের—না তার সেই পাগলী মেয়ের। ঘনশ্যাম ইতিমধ্যে এক বিহারী নোকরকে এনে হাজির করলে কোথা থেকে। জঙ্গলী ভূত একটা বললেই হয়। তা হোক। তাকে দিয়েই ধোয়া-মোছা আর মাজা-ঘষার কাজ চলছে কোন রকমে।

রবিবারের আর একটি আলস্যমন্থর প্রভাত। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছি অবশ্য অনেক আগে। পূবের জানালা দিয়ে শেষ পৌষের একঝলক রোদ সামনের নিম-গাছটার মাথা ছুঁয়ে এগিয়ে এসেছে আমার ঘরের মধ্যে। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপ-ডিশ এগিয়ে দিলাম নতুন চাকরটার হাতে। ক্ষৌরকর্ম্মের সরঞ্জাম নিয়ে বসলাম তাড়াতাড়ি। সকালেই আপিসের দু'জন ভদ্রলোকের আসবার কথা ছিল আমার বাসায়। গালে ক্ষুর ঠেকিয়ে টানতে সুরু করেছি সবে হঠাৎ ঝন্ঝন্ করে কুয়াতলায় কাপ-ডিশ ভাঙ্গার কর্ণভেদী শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে খনখন্ করে বেজে উঠল মেয়েলি গলার আওয়াজ—আ মরণ! এ যম আবার এসে জুটল কোথা থেকে! ভাঙলি—ভাঙলি ত মুখপোড়া দামের জিনিসটা? বেরো—দূর হ' বলছি—হতভাগা।

চিনতে দেরি হ'ল না একটুও, রাজী পাগলীর গলা। কিন্তু বলিহারি ধৃষ্টতা ওর! ঝিয়ের মেয়ে বৈ ত নয়। হোক পাগলীগোছের। তা বলে—আমার বাসায় দাঁড়িয়ে আমারই চাকরকে—'বেরো, দূর হ' বলবে! এ নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা বৈ কি! ঘনশ্যাম বাইরে কোথাও গেছে সম্ভবতঃ। না হলে চড়া পর্দ্দায় কড়া গোছের একটা জবাব দিত নিশ্চয়ই। নতুন চাকরটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। রুষ্ট মেজাজ নিয়েই উঠে গেলাম তাড়াতাড়ি। আমাকে দেখেই আরও জলে উঠল রাজী পাগলী। অগ্ন্যুৎ-পাত সুরু হ'ল যেন। বললে—সর্ব্বস্ব ভেঙে খানখান্ করছে—এখুনি বিদেয় করে দাও মুখপোড়াকে। ভূতটাকে কোন্ চুলো থেকে ধরে আনলে বল ত বাবু? এ নিশ্চয়ই সেই উড়ে বেটার কাজ। গেল কোথায় মুখপোড়া—দেখুক এসে কাজের ছিরিটা!

হোক পাগলী! অতি অশোভন এবং অভদ্র সব উক্তি আর কি বিশ্রী ভঙ্গী ওর মুখের, সত্যিই অসহ্য। রাগের চোটে হঠাৎ বজ্রকঠিন ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল আমার কণ্ঠ দিয়ে—আমি এনেছি ওকে। আমার জিনিস ভাঙে আমি বুঝব। তুমি চেঁচামেচি করছ কেন আমার বাসায় দাঁড়িয়ে?—তোমাদের আর কাজ করতে হবে না আমার এখানে। মাইনে চুকিয়ে দিচ্ছি এখুনি, নিয়ে চলে যাও তাড়াতাড়ি। চেঁচামেচি আমি আদৌ পছন্দ করি না।

মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত অবস্থা হ'ল যেন ওর। তর্জ্জন-গর্জ্জন, দৃপ্ত-উদ্ধত ভঙ্গী—সবকিছু মিলিয়ে গেল চকিতের মধ্যে। 'ঘনশ্যাম, ঘনশ্যাম'—বলে হাঁক পাড়লাম বার দুই, সাড়া মিলল না তার। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নতুন চাকরটা। সকালেই হাঙ্গামা—অবাঞ্ছিত উপসর্গ এসে জুটেছে। গজগজ করতে করতে ঘরে ফিরে এলাম তাড়া-তাড়ি। ওদের পাওনাগণ্ডা আগে চুকিয়ে দিয়ে তার পর অন্য কাজে বসব ঠিক করলাম। পকেটে মনিব্যাগের মধ্যে টাকা ছিল না আর একটাও। তাড়াতাড়ি স্যুটকেসের চাবিটা খুঁজতে লাগলাম। চাবির রিংটা গেল কোথায় ছাই! সপ্তাহখানেকের মধ্যে স্যুটকেসগুলো একবারও খুলেছি বলে ত কৈ মনে পড়ে না। গেল কোথায় চাবির গোছা! বালিশের তলা, দু'তিনটে জামার পকেট, তাকের উপর বইগুলোর পাশটা—চাবি থাকবার সম্ভাব্য সব জায়গা-গুলোই প্রায় দেখলাম দু'তিনবার করে। কিন্তু চাবি কোথায়! আমার পিছু পিছু রাজী পাগলী কখন ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল লক্ষ্য করি নি। থমথমে আবহাওয়াকে চমকে দিয়ে অপ্রত্যাশিত অন্তরঙ্গতার সুর বেরুল তার কণ্ঠ দিয়ে। বললে—চাবি খুঁজছ বুঝি বাবু? বার করে দিচ্ছি আমি—সরো দিকি একটু। তোশকের একপ্রান্তের তলা থেকে চাবির গোছাটিকে বার করলে রাজী পাগলী। চাবি হাতে তুলে দেবার আগে অপরূপ ভঙ্গী সহকারে বললে—এমন বেতাক মানুষ দেখি নি বাপু কখনও! চাবি বুঝি বাইরে অমন করে ফেলে রাখে কেউ! ঠাকুর-চাকরদের আবার বিশ্বাস আছে নাকি! ঘরঝাঁট দিতে গিয়ে সেদিন দেখলুম মেঝেয় পড়ে রয়েছে। ওখানে তুলে রেখে দিয়েছিলুম তাই।

স্যুটকেসটা খুলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ভিতরের সবকিছু দেখে নিলাম একবার। কাপড়-চোপড়, শ'দেড়েক টাকা,

জুনিয়ার পার্কার পেনটা—না, উধাও হয় নি কোনকিছুই। সব জিনিসই রয়েছে যথাস্থানে। বড় সুটকেসটাও খুললাম ওর সামনেই, সন্ধানীদৃষ্টি দিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখলাম সবকিছু। দামী আলোয়ান, গরমের সুট এক-প্রস্ত, হাতঘড়ির সোনার ব্যাণ্ড, সোনার বোতাম—গলার আর হাতের, দামী পাথরবসানো আংটি এক জোড়া—সবই পড়ে আছে ঠিক জায়গায়। নিশ্চিন্ত হয়ে মেয়েটার আপাদমস্তকের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম একবার। পনের দিনের মাইনে হিসাবে পাঁচ টাকা পাওনা হয় ওদের, পাঁচ টাকার একখানা নোট এগিয়ে ধরলাম ওর দিকে। নির্লিপ্তভাবে হাত বাড়িয়ে নোটখানা নিলে রাজী পাগলী। আঁচলের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে বললে—তুমি কেমন মনিষ্যি বাপু—একটু দয়ামায়া থাকতে নেই শরীলে! মা ভুষছিল ক'দিন ধরে, পরশু সকালে মারা গেল। আসতে পারি নি তাই ক'টা দিন। ঠিকে কাজই না হয় করতুম, তা বলে পৌষ মাসের দিনে লোকে কুকুর-বেড়ালও তাড়ায় নাকি ঘর থেকে?

এমন আর্দ্র-কোমল কণ্ঠস্বর জীবনে সেই প্রথম শুনলাম যেন। বাষ্পাকুল দুটি চোখ চকিতের জন্যে আমার দিকে একবার তুলেই চট করে আবার ঘাড় ফিরিয়ে নিলে মেয়েটা। সদ্য-মাতৃহারা আধপাগলী মেয়েটার জন্যে মনের ভিতরটা কেমন করে মোচড় দিয়ে উঠল হঠাৎ। পা বাড়িয়েছিল রাজী পাগলী চলে যাবার জন্যে, নিজের অজ্ঞাতেই যেন অন্তরঙ্গতার সুর বেরুল আমার গলা দিয়ে—একটু দাঁড়াও ত রাজী। পাঁচ টাকার আর একখানা নোট এগিয়ে ধরলাম ওর হাতের কাছে, বললাম—মা মারা গেছে তোমার তা বল নি ত আগে! টাকার দরকার হবে এখন তোমার, ধরো এটা।

চকিতের মধ্যে দৃপ্ত ভঙ্গীতে যেন ফণা ধরে ফিরে দাঁড়াল রাজী পাগলী। বললে—আহা, ভিক্ষে মাঙতে এসেছি যেন ওনার কাছে! গতর খাটাই খাই—তা বলে অপচ্ছেদ্দার দান নেব কেন গা?

বিস্মিতই হলাম না শুধু, করুণাপ্রবণ মন কথার ঘা খেয়ে অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাজী পাগলী। মন সঙ্কুচিত হোক—আপদ গেল ভেবে কিন্তু নিশ্চিন্ত হলাম অনেকটা। সত্যি, মুখ বেয়াড়া রকম আলগা মেয়েটার, মানুষের মানমর্য্যাদা বোঝে না। ক'দিন মাত্র এসেছে, সারাক্ষণেই অস্বস্তিকর ঠেকেছে ওর উপস্থিতি। আপদ গেলই বটে! কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে মাত্র একটি দিন পরেই আবার দেখা মিলল ওর। অতি প্রত্যূষ তখন, পরিচিত কলকণ্ঠের চড়া পর্দ্দার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। কানে এল রাজী পাগলীর মুখের কথা—কথা নয় অগ্নু্যদ্গার যেন।—জবাব দিয়েছে—সে আমি বুঝব আর বাবু বুঝবে। তুই অমন করে চেঁচিয়ে মরছিস কেন রে উড়ের মড়া? পরক্ষণেই হঠাৎ উদারায় নেমে এল কণ্ঠস্বর। বললে—পোষ মাসের দিন। তাড়িয়ে দিলেই যেতে আছে নাকি! গেরস্তের ভালমন্দ ভাবতে হবে না বুঝি? রাগের মাথায় অমন অনেক কথাই বলে ফেলে মানুষে। মাইনে চুকিয়ে দিলেই জবাব দেওয়া হয়ে গেল নাকি! মানুষ একটা খাবে কি, পরবে কি, কোন্ চুলোয় দাঁড়াবে থাকবে, এসব ভাবতে হবে না যেন।

ভালো আপদ জুটেছে ত! শুধু ছিটগ্রস্তই নয়—বিচিত্র পর্য্যায়ের জীব যেন এই মেয়েটা। বয়সের তুলনায় মনটা এর অনেকখানি পরিণত-পরিপক্ব যেন, আর বাচনভঙ্গী—মাথায় আগুন ধরিয়েও দেয় আবার মর্ম্মে মোচড় দিতেও জানে। আমার আটাশ বছরের জীবনে নানা মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, এটি কিন্তু অভূতপূর্ব্ব।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে অল্পপরিসর রোয়াকটার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম, অপ্রীতিকর দৃশ্য। ঘনশ্যামের পুরোপুরি যুযুধান মূর্ত্তি! রাজী পাগলীর হাত থেকে ঝাঁটাটা কেড়ে নেবার জন্যে সে কি প্রাণান্তকর প্রয়াস তার! আমাকে দেখেই নিরস্ত হয়ে সরে এল একটু। বাড়ী ফাটিয়ে একেবারে উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠল রাজী পাগলী—আমায় এখানে কাজ করতে দেবে না হতভাগা। ঝাঁটা কেড়ে নিচ্ছে হাত থেকে। কব্জির কাছটায় কি রকম মুচড়ে দিলে মুখপোড়া, দেখো না বাবু।—বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে মেয়েটা। ছোট মেয়ের মত কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ে ফোঁপাতে সুরু করলে শেষটায়। ধমক দিয়ে সরে যেতে বললাম তখনই ঘনশ্যামকে। বললাম—ছিঃ ছিঃ।

সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে একবার তীব্র কটাক্ষ হেনে অভিমানমিশ্রিত কণ্ঠে মেয়েটি বললে—ওসব লোক-দেখানো সোহাগ বুঝি আমি। মনিবের উস্কানি না থাকলে সাধ্যি কি ও মুখপোড়া আমার গায়ে হাত দেয়।

গাম্ভীর্য্যের আবরণ খসে গেল আমার মুখের উপর থেকে। হেসে ফেললাম মেয়েটার কথা বলার বিচিত্র ধরন দেখে। সত্যিই পাগলী মেয়েটা। কৃত্রিম রাগের ভাব দেখিয়ে বললাম—কাল পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বলে দিলাম ত এস না আর তুমি। আজ সকালেই আবার জালাতে এসেছ—আচ্ছা পাগল ত?

চমকে উঠল যেন রাজী পাগলী আমার কথা শুনে। বললে—তা, তুমিও পাগল বলবে বৈ কি বাবু? তোমার

আর কি দোষ বল ?—উড়ে ব্যাটাই লাগিয়ে ভাড়িয়ে এ সব বলাচ্ছে, করাচ্ছে। পাগলছন্ন হলেও বুঝি সব।

বিরক্তিভরে বললাম—বলেইছি ত কাল, আর কাজ করতে হবে না এখানে তোমায়। আমি অন্য লোক লাগিয়েছি, দেখছ ত ?

আমার কণ্ঠস্বরকে ব্যঙ্গ করে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মেয়েটা—কাজ করতে হবে না—অন্য লোক লাগিয়িছি—তা যাব কোথায় শুনি ? দু'বাড়ীর কাজ ছুটে গেল, 'পাগল' বলে তাড়ালে। তোমারও মতলব, ঐ বলে বিদেয় করা। সাধ করে যেন বকি আর চেঁচিয়ে মরি আমি! মাথার রোগটার কথা ত কেউ ভাবে না ?—বলতে বলতে আবার অশ্রু-আর্দ্র হয়ে এল ওর কণ্ঠস্বর।

সকালের ঝলমলে আলোয় পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালাম রাজী পাগলীর দিকে। বিপুল উৎকণ্ঠায় ভরা মুখ, চোখ দুটিতে একান্ত অসহায়ের দৃষ্টি। কৌতূহল জাগল হঠাৎ মনের কোণে। সহানুভূতির স্বরে বললাম—তোমার আপনার লোক বলতে আর কে কে আছে রাজু ?

ছলছলে চোখজোড়া তুলে তাকালে একবার আমার দিকে। অন্তরের ছোঁয়া পেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল যেন একটু। বললে—যম আছে আমার। সদু পিসী আপনার কেউ নাকি! তার নিজেরই বলে দু'বেলায় জোটে না সব দিন তা আমায় খাওয়াবে কি শুনি ? কেবল বলছে—এবার সোয়ামীর ঘর করগে যা। মারুক, কাটুক মেয়েমানষের সোয়ামীর ঘরই সগ্‌গ।

চমকে উঠলাম। মেয়েটা বিবাহিতা তা হলে। কিন্তু সিঁথিতে ওর সিঁদুর কৈ! বিস্ময়ের ভাব কাটতেই বললাম—সেই ভাল, স্বামীর কাছেই চলে যাও তুমি রাজু—সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে।

দুর আকাশের দিকে একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে রাজী পাগলী। মনটা তার চকিতের জন্যে অতীতমুখী হ'ল যেন। পরক্ষণেই বললে—পোড়াকপাল আমার। সে আবার সোয়ামী নাকি। পাকা দেখা হ'ল না, গায়ে হলুদ হ'ল না। মেড়ো পুরুত একটা ইড়বিড় করে ছাইপাঁশ কি দু'চারটে মন্তর পড়লে—ব্যস, বিয়ে হয়ে গেল অমনি। শুভদৃষ্টি না হলে বিয়ে হয় বুঝি—তুমিই বল না বাবু ? দু'কুড়ির উপর বয়েস মিন্‌সেটার। গজদাঁতের মত তিনটে দাঁত উঁচু হয়ে আছে সামনে। ওপরকার ঠোঁট নেই বললেই হয়, গন্না-কাটার মত দেখতে। মাগো, পাগল বলে আমার পছন্দ থাকতে নেই যেন ?

কৌতূহল বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। চোখেমুখে আমার সে ভাব ফুটেছিল নিশ্চয়ই। রাজী পাগলী তা লক্ষ্য করেছিল সম্ভবতঃ। এমন ধৈর্য্যশীল শ্রোতাও বোধ হয় পায় নি ও এর আগে। চোখেমুখে অপরূপ ভাবের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে বললে—ছত্তরের মেলা দেখতে গেছলুম ত গেল বছরের আগের বছরে। মন্দিরের কাছে মুখপোড়া মিনসের সঙ্গে দেখা। কাকেও বলো না বাবু—মা বর্দ্ধমানের মেয়ে ত পালিয়ে এসেছিল এখানে। অনেক কাল পরে গাঁয়ের চেনা লোক পেয়ে মা মেলার কথা ভুলে গেল যেন। এর কথা তার কথা শোনাতে শোনাতে সেই যে আমাদের সঙ্গ নিলে মুখপোড়া—যেতে আর চায় না। আমাদের বাসায় এসে রইল বেশ দিনকতক। দেশে ঘরদোর আছে, ক্ষেত-খামার আছে, দুখ্যু শুধু ঘরে নাকি বউ নেই মুখপোড়ার—মেয়ে দিতে চায় না কেউ। ভালই করে সবাই, মাথার চুলে পাক ধরেছে, তায় ওই ত চেহারার ছিরি। ক'দিন ধরে গুজগুজ ফিসফিস করে মার মন ভেজালে মুখপোড়া। নগদ আট গণ্ডা টাকাও গুঁজে দিলে মায়ের হাতে, মা জল হয়ে গেল অমনি। পাঁচ জনকে বললে—ওই ত পাগলছন্ন মেয়ে—বর জুটবে কোথায় এর পর, খাবে পরবেই বা কি ? নিজে থেকে যখন মেয়েটার ভার নি'তে চাইছে মানুষটা!—ব্যস, দিলে অমনি বলির পাঠার মত উচ্ছুগ্‌গু করে! আমার জীবনটার কি হ'ল বল ত বাবু ?

আকুল জিজ্ঞাসা নিয়ে মেয়েটা আমার মুখের পানে চাইলে। কৌতূহল কমে গিয়ে বিস্ময়ের ভাব জাগল হঠাৎ আমার মনে। নেহাত পাগলী নয় মেয়েটা! তলে তলে সহজ মানুষের মত জ্ঞানবুদ্ধি রয়েছে দিব্যি। রাজী পাগলী এর পর আপনমনে গজগজ করতে লাগল। ধীরে ধীরে স্ফুটতর হয়ে উঠল আবার ওর কণ্ঠস্বর—আহা, সোয়ামীর ঘর করি নি নাকি কখনও ? দিনকতক ছিলুম ত মিনসের কাছে গিয়ে। নিত্যি রাতে মদ গিলে এসে পিটত আমায়, মুখ বুজে মুখপোড়ার সঙ্গে ঘর করতে হবে। শুধু তাই নয়—ভালবাসতে হবে আবার ওই হতচ্ছাড়াকে। মুখপোড়া কম হেনেস্তা করে নি আমায় বাবু। এই ত্থাখ, মেরে মেরে আষ্টেপিষ্টে কি রকম দাগ করে দিয়েছে আমার!

সত্যি তাই! মাথায়, হাতে, কপালের উপরে কাটা দাগের মতই রয়েছে বটে! পতি পরমগুরু সোহাগের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে অনেকগুলো। হঠাৎ বারুদের মত জ্বলে উঠল রাজী পাগলী। বললে—আমিও তেমনি করিছি। যথাসর্ব্বস্ব জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসিছি বাবু, ও মুখো হচ্ছি না আর এ জন্মে। ঘষে ঘষে মাথার সিঁদুরও তুলে ফেলিছি এখানে এসেই। ও বালাই আমার রেখে লাভ!

কৌতূহলভরে তবু প্রশ্ন করলাম—লোকটা থাকে কোথায় ?—তোমার শ্বশুরবাড়ী কোন্ জায়গায় রাজু ?

আবার জ্বলে উঠল রাজী পাগলী। ঝোঁকে বললে— যমের দক্ষিণ দুয়ারে। ক্ষেত-খামার ঘরদোর না ছাই—সব বাজে কথা বাবু। কোলকাতার ওদিকে যেতে আসানসোল বলে ইষ্টিশান পড়ে ত ? মুখপোড়া চা ফেরি করে শুনেছি সেই ইষ্টিশানে।

হঠাৎ কোমল পর্দায় নেমে এল রাজী পাগলীর কণ্ঠস্বর। বাষ্পাকুল দুটি অসহায় চোখ তুলে চাইলে আবার আমার মুখের পানে। বললে—পাগল বলে সবাই অগেরাহ্যি করে বাবু, দুখ্যু বুঝতে চায় না কেউ। তুমিই যা শুধু আদর করে 'রাজু' বলে ডাক এক-আধবার—কান পেতে শোন সব কথা। না হলে···বলতে বলতে অকস্মাৎ কিসের আবেগে কে জানে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ফেললে মেয়েটা।

মনের মধ্যে হঠাৎ আলোড়ন সুরু হ'ল যেন। উচিত-অনুচিতের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে দেরি হ'ল অনেকখানি। স্বাভাবিক অবস্থায় এল যখন মন, রাজী পাগলী তখন ঝাঁটা হাতে নিয়ে দিব্যি কাজ করতে সুরু করে দিয়েছে। 'না' বলতে পারলাম না আর তাকে। নতুন চাকরটাকেই বিদায় নিতে হ'ল সেদিন।

পুরো একটি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল দেখতে দেখতে। রাজী পাগলী ঘরের মানুষের মত হয়ে গেল যেন। সকালে-বিকালে আসে রোজ, বকবক করে, উদ্ধত মেজাজে চেঁচায়—ঝগড়াও বাধায় এক এক দিন। হাত কিন্তু ওর কাজ করে চলে সর্ব্বক্ষণ। কাজও ওর বড় পরিপাটি। বিরক্তির ভাব জাগে না আর বড় একটা, দৈনন্দিন অভ্যাসের কল্যাণে গা-সওয়া হয়ে এসেছে সব। আমার মত ঘনশ্যামও বুঝেছে মেয়েটা পুরোপুরি পাগলী। পাগলী মেয়েটার বিচিত্র কথাবার্ত্তা কৌতুকভরে উপভোগ করে এখন, রাগে না আর।

শীতান্তের একটি ম্লান অপরাহ্ণ। জ্বরতপ্ত দেহ নিয়ে আপিস থেকে বাসায় ফিরলাম, গায়ে হাতে বেদনা—বিছানায় শুয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি। ঘনশ্যামকে ডেকে শরীরগতিকের কথা জানিয়েও দিলাম তখনই। রাজী পাগলী কড়ামাজা ফেলে রেখে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরি রোজ আপিস থেকে। অসময়ে আমার এমন অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিল ও, অসুখ-বিসুখ একটা কিছু অনুমানও করেছিল সম্ভবতঃ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলে সব। হঠাৎ কাছে এসে আমার মুখের উপর তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে একবার। কাজ সেরে যাবার সময়ে শত উপদেশ দিয়ে গেল ঘনশ্যামকে। কানে এল অনেক কথা—ঠাণ্ডা লাগে না যেন বাবুর। দুধ একটু গরম করে খাওয়াস রাতে। ছটফট করে যদি মাথাটায় হাত বুলিয়ে দিস একটু। চোখমুখ থমথম করছে যেন বাবুর। চণ্ডী ডাক্তারকে একবার ডেকে এনে দেখালে হ'ত না। দিনকাল ভাল নয়, চারদিকে ঘরে ঘরে লোকের মায়ের দয়া হচ্ছে!' উৎকণ্ঠামিশ্রিত কণ্ঠস্বর।

রাজী পাগলীর অনুমান মিথ্যা নয়। পরদিন সকালে দেখলাম গায়ে মুখে বসন্তের গুটি বেরিয়েছে কয়েকটা, জ্বরও বেড়েছে বেশ। প্রবাসে নিঃসঙ্গ একক জীবন। মনটা অনেকখানি দমে গেল যেন। রাজী পাগলী সামনে এসে দাঁড়াল, দারুণ উৎকণ্ঠা আর শঙ্কায় ভরা মুখ চোখ। এমনই ভীতি-বিহ্বল আরও দুটি মুখচ্ছবি স্মরণে জাগল হঠাৎ। টাইফয়েডে আমার যাই-যাই অবস্থা হয়েছিল একবার, বছর পনের হবে বয়স তখন। মা আর মেজদি এমনি মুখের ভাব নিয়েই সারাক্ষণ বসে থাকত আমার পাশটিতে। সে দুটি মুখচ্ছবির সঙ্গে এর মুখভাবের যেন মিল আছে কোথায়!

পাগলী মেয়েটা ঘরদোর সব ধুয়ে মুছে একটি শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। মায়ের দয়া হয়েছে আমার উপর, ঘনশ্যামকে বার বার সাবধান করে দিলে—আঁশ কিছু ঢোকে না যেন বাড়ীর ভেতরে। আর ঘন ঘন পান চিবনো চলবে না তোমার। থাকতে না পার তিন দিন সুপুরি চিবোও শুধু। ওসব অনাচার চলবে না ক'দিন এখন। মা শেতলা ভালয় ভালয় গায়েরগুলো এখন মিলিয়ে দিলে বাঁচি!—এমনি ধরনের কত কি কথা কানে এল। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এল রাজী পাগলী, ধুনো আনালে—গঙ্গাজলও আনালে কোথা থেকে। মেঝেয় জল ছিটিয়ে, ধুনোর ধোঁয়া দিয়ে মন্দিরের মর্য্যাদা দিলে যেন ঘরখানাকে। মা এসেছেন যে! জ্বরের ঝোঁক বেড়েছে তখন অনেকটা। চোখ বুজে পড়ে পড়ে সমস্ত চৈতন্য দিয়ে ওর গতিবিধি অনুভব করছিলাম। কপালে হঠাৎ মৃদু একটু স্পর্শ পেতেই চমকে চোখ মেললাম। কপালে কি একটা ছুঁইয়ে তুলে রাখলে যেন রাজী পাগলী কুলুঙ্গির এক পাশে—পয়সাই সম্ভবতঃ। ছোট বোন মণ্টির একবার বসন্ত হয়েছিল, বেশ মনে পড়ে তিন দিন তিন রাত মায়ের সে কি আকুলতা—কি অস্থিরতা! রাজী পাগলীর ব্যাকুলতাও কতকটা যেন সেই ধরনের। অন্তর বিচলিত হয়েছিল কিনা কে জানে—জ্বরের ঘোরেই সম্ভবতঃ অত্যন্ত অন্তরঙ্গের মত ফস করে বলে ফেললাম—কপালটায় একবার হাত দিয়ে দেখ ত রাজু, জ্বর বোধ হয় বেড়েছে আমার!

ওর চোখমুখের ভাব দেখে বুঝলাম স্বর্গ হাতে পেল যেন হঠাৎ রাজী পাগলী। কপালে মমতাস্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ

দিয়ে বললে—মানত করিছি মায়ের কাছে, ভয় নেই, গা জুড়িয়ে দেবেন মা দু'এক দিনের মধ্যেই।

তিন দিন আর বাসা থেকে নড়ল না রাজী পাগলী। উড়িয়া বামুনটার ওপর বিশ্বাস নেই ওর, অনাচার হতে কতক্ষণ! কাছে কাছে থেকে আমার খবরদারি করলে প্রায় সর্বক্ষণ! অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম ওর মেজাজের। চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাঁটি সব বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ! ঘনশ্যামের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতাও বাড়ল যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে! ভীতিবিহ্বল কণ্ঠের গুঞ্জনধ্বনি কানে এল এক সময়ে—শ্রোতা ঘনশ্যাম। মুশুবিশুটির মত মায়ের দয়া হয়েই নাকি ওর ভাইটা মারা গিয়েছিল। সেও নাকি ফাল্গুন মাসের এমনি দিনে হয়েছিল। অজান্তে অনাচার হয়ে গিয়েছিল একটু। মা ওর মনিববাড়ী থেকে তেল আর আঁশ ছুঁয়ে এসেছিল নাকি! ভুলে সেই কাপড়েই রোগীর ঘরের চৌকাঠ মাড়িয়েছিল কখন! সেদিনই রাতে টকটকে জবার মত লালপেড়ে শাড়ী পরে কে যেন ওর ভাইয়ের মাথার কাছে এসে বসেছিল! স্পষ্ট দেখেছিল ওর ভাই। অন্য কেউ নয়—ওই মা শেতলা। স্বপ্ন হোক, সত্যিই হয়েছিল কিন্তু তা শেষটায়। দশ দিনের দিনই নাকি ভাইটি ওর মারা যায়! এমনি কত কি সব কথা!

তিন দিন পরেই জ্বর ছাড়ল আমার। রাজী পাগলী বড় আপনজনের মত বললে—পূজো দিতে হবে আজ মায়ের। চা-টা কিছু খেয়ো না আজ বাবু। মায়ের পেসাদ একটু মুখে ঠেকাতে হয়।

শীতলার পূজো! সংস্কারমুক্ত মন আমার। যুক্তি দিয়ে যাচাই করে দেখি সবকিছুকেই। পাগলী মেয়েটাকে কিন্তু যুক্তির কথা শুনিয়ে লাভ নেই। পূজোর কথা তুলতেই হেসে শুধু উপহাস করলাম ওর প্রস্তাবকে। বিস্ময়বিস্ফারিত চোখজোড়া তুলে মুহূর্তের জন্যে তাকালে একবার রাজী পাগলী, পরক্ষণেই ক্ষেপে উঠল যেন। গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাসা ছেড়ে চলেও গেল সেই মুহূর্তে।

ঘণ্টাতিনেক পরে দেখি কোথা থেকে ফুল আর প্রসাদ নিয়ে এসে হাজির হয়েছে বেচারী। সে কি সাধাসাধি আমাকে! কপালে ঠেকাতে হবে ফুল, প্রসাদও মুখে দিতে হবে একটু। 'খাব না, ছোঁয়াব না'—এমন নাকি বলতে নেই! অন্তরের সে কি ব্যাকুলতা! পাছে অবজ্ঞা করে ঠাকুরদেবতার অপমান করি সে জন্যে শঙ্কাও কম নয়! যুক্তিনিষ্ঠ মনেরই হার হয়েছিল সেদিন, কেন কে জানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রবাসে এই নিঃসম্পর্কীয়া মমতাময়ীর একান্ত অনুরোধ এড়াতে পারি নি সেদিন!

ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল কোথা দিয়ে। আপিসের কর্তৃপক্ষের হুকুম এল হঠাৎ আমাকে ফিরতে হবে আবার কলকাতায় আপিসে। খবর শুনে ঘনশ্যাম মহা খুশী। হাওড়ার কোন্ চটকলে ওর ভাই কাজ করে, প্রায়ই চিঠি লেখে নাকি ওকে চটকলে কাজ নেবার জন্যে। আঠারো-উনিশ টাকা করে হপ্তা। ঠিক হ'ল ঘনশ্যাম আমার সঙ্গেই রওনা হবে। যাবার দিন দুপুরে বিছানাপত্র ইত্যাদি গুছিয়ে বাঁধছে ঘনশ্যাম, আমি তদারক করছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পোষ্টকার্ড আকারের একখানা ফটো ছিল আমার, সেটার খোঁজ করতে গিয়ে হঠাৎ তার আর পাত্তা মিলল না। বাল্যবন্ধু রঞ্জনের তোলা ফটো, আমার একান্ত প্রিয় বস্তু সেটি। কলেজজীবনের বিশেষ একটি স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে ফটোটির সঙ্গে। কিন্তু যাক সেকথা, ফটোখানা গেল ছাই কোথায়! চকিতের মধ্যে মনে পড়ল রাজী পাগলীর মুখখানা। বিবেক কিন্তু সঙ্কুচিত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তিন বছর ধরে বাসার সব জিনসপত্র নাড়ছে গোছাচ্ছে মেয়েটা, কোন দিন হারায় নি কোন কিছু। না, সন্দেহের সীমার মধ্যে টেনে আনা চলে না তাকে কোনমতেই।

বৈকালে সেদিন পরিচিত কয়েক জনের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরলাম। দেখলাম রোয়াকের ধারে উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে আছে রাজী পাগলী, মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ণের বিষণ্ণ-করুণ ছায়া নেমেছে ওর সারা অঙ্গে। আমার চোখের সঙ্গে চোখ মিলতেই ছোট বালিকার অসঙ্কোচে ব্যগ্রভাবে বলে ফেললে কস্ করে—আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবু, আমাকে নিয়ে চল। ঘনশ্যাম যাবে আর আমি কেউ নই বুঝি?

চমকে উঠলাম। বলে কি মেয়েটা! পাগলী হোক, রূপহীনা হোক, নবযৌবনের ভারে টলমল করছে কিন্তু ওর সর্বাঙ্গ! উপরন্তু ইদানীং ওর কথাবার্তায় আর ব্যবহারে কেমন এক ধরনের অন্তরঙ্গতার ভাব ফুটে ওঠে যেন। সঙ্কুচিত হয়ে উঠি, অস্বস্তি বোধ করি পদে পদে। মেয়েটা নিতান্ত পাগলী বলেই মনকে প্রবোধ দিই, প্রশ্রয়ও দিই এ সবের।

তা বলে এ আবদারকে ত আমল দেওয়া চলে না কোন মতেই। একে পাগল তায় ওই ধরনের অসঙ্কোচ ব্যবহার ওর। ঝি বলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াতেও কম বিপত্তি নয়। উদ্ভিন্নযৌবনা এই মেয়েটিকে দেখে মা-কাকীমা, দাদা-বৌদিদিরা সব ভাববেন কি! দুর্বার লজ্জা আর সঙ্কোচ এসে মনকে অধিকার করে বসল কায়েমী ভাবে।

কঠোর ভাবে বললাম হঠাৎ—আমার সঙ্গে যাবে বলতে লজ্জা করে না তোমার ? কচি খুকী নাকি তুমি ? তুমি এখানে থেকে পাঁচ বাড়ীতে গতর খাটিয়ে পেট চালাতে পার ভালই—না হলে তোমার স্বামী আছে তার কাছেই চলে যেয়ো তুমি।

কথা শুনে আর আমার মুখচোখের ভাব দেখে একটুও চেঁচালে না রাজী পাগলী। মর্ম্মভেদী দৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে। চাউনির ভঙ্গী দেখে মনটা আমার একটু বিচলিত হ'ল, অন্তরও বিগলিত হ'ল যেন আপনার অজ্ঞাতে। ওর পাওনা সব চুকিয়ে দিয়েছিলাম সকালে। তা হোক, বিদায়বেলায় কৃতজ্ঞতার দান হিসাবে কিছু দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি দশ টাকার তিনখানা নোট নিয়ে এসে ওর দিকে এগিয়ে ধরলাম। অসঙ্কোচে নোট ক'খানা হাতে করে নিলে রাজী পাগলী। কৃতার্থ হওয়ার ভাব ফুটল যেন ওর মুখে চোখে। চলেও গেল সঙ্গে সঙ্গে, যাবার আগে অপরূপ ভঙ্গীতে আমার পানে একবার তাকিয়ে আমার অন্তরের শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে চাইল যেন। ভাবলাম—ভালই হ'ল। অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করলাম যেন।

রাত ন'টা নাগাদ ট্রেন। আকাশ মেঘমেদুর, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়েছিল আগে থেকেই। তা হোক, সর্ব্বতীর্থসার জন্মভূমির কোলে ফিরে চলেছি। প্রাণের আনন্দ-উদ্দীপনা বেড়েছে অনেকখানি। ষ্টেশনে এসে কিন্তু চমকে উঠলাম, আনন্দ ম্লান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। রাজী পাগলী আগে-ভাগে এসে দাঁড়িয়ে ছিল কখন ষ্টেশনে—একেবারে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর। রাঙা চেলী পরেছে একখানা—বিয়ের সময়েরই চেলী সম্ভবত। শুধু তাই নয়, ব্রীড়াময়ী নববধূর ধরনে মাথায় কাপড় টেনে দিয়েছে দিব্যি। অভিনব ভাবভঙ্গী ওর, স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে ওর চোখ দুটি। দুর্ব্বার আবেগ-কম্পন জেগেছে যেন ওর সারা দেহে-মনে। হাতে রঙচটা একটা টিনের সুটকেস। আমাকে দেখতে পেয়েই উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল রাজী পাগলী। প্রতীক্ষা-ব্যাকুল চিত্ত ওর হারানিধি খুঁজে পেল যেন—মুখচোখের এমনি ভাব হ'ল চকিতের জন্যে। আমার খুব কাছটিতে এসে কোন রকম ভূমিকা না করেই অতি আপনজনের মত বললে—টিকিট কেটে সন্ধ্যে থেকে ঠায় বসে আছি। আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবু। ঝি-চাকররা বাবুদের সঙ্গে যাবে এতে আবার লজ্জা কি! ওই বলে আমায় ক'টা টাকা দিয়ে ভুলিয়ে এখানে ফেলে রেখে যাবার মতলব। পাগলচ্ছন্ন হলেও আমি বুঝি সব। পরক্ষণেই অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এল ওর কণ্ঠস্বর। বললে—পাগল বলে ফেলে রেখে যাচ্ছ এখানে সদুপিসীর কাছে। পিসী লোক ভাল নাকি! ক'দিন হ'ল কি রকম পেছনে লেগেছে আমার। কোন্ চুলো থেকে ওর এক ফিচেল ভাইপো এসে জুটেছে। কেমন করে যেন তাকায় আমার পানে মুখপোড়া যখন-তখন। পিসীর মতলব মুখপোড়ার সঙ্গে আমার ভালবাসার সম্বন্ধ পাতিয়ে দেয়। উঠতে-বসতে কানে মন্তর পড়ছে কেবল—আমার নাকি হিল্লে হবে, গায়েও নাকি সোনাদানা উঠবে! পাগল বলে মানুষ নই যেন আমি ?—বুঝি না যেন কিছু ?

ছোট ঘরের কদর্য্য কাণ্ড সব। কান পেতে শোনবার মত কথা নয় এসব। আপাদমস্তক জ্বলে উঠল আমার। ভাবলাম, সমাজের যে স্তরের মানুষ এরা সেখানকার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলাই উচিত ছিল ওর। কিন্তু উচিত-অনুচিত বিবেচনা করবার মত সময় ছিল না আর। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করতে সুরু করেছে তখন। মুখ দিয়ে আমার কোন কথা প্রকাশ পাবার আগেই ঘনশ্যামের সঙ্গে পরম উৎসাহে সামনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটায় উঠে পড়ল রাজী পাগলী। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে পাশের ইণ্টারক্লাস কামরাটায় গিয়ে উঠে পড়লাম আমি কোন রকমে। ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ অস্বস্তিকর চিন্তা ভর করল সারা দেহে-মনে। চিন্তাভারে স্নায়ুগুলো বিধ্বস্ত হ'ল সারারাত ধরে। রাতের শেষ প্রহরের দিকে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব এসেছিল যেন। যাত্রীদের হাঁকডাক, ফেরিওয়ালাদের চীৎকার শুনে ঘুম ভাঙল হঠাৎ। ট্রেন থেমেছে বড় একটা ষ্টেশনে, তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম—আসানসোল ষ্টেশন। পাশের কামরাটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম তাড়াতাড়ি, ঘুমোয় নি তখনও রাজী পাগলী। উন্মুক্ত জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার কামরার দিকেই চেয়েছিল সম্ভবতঃ। চকিতে মাথায় আমার সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত খেলে গেল। মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঠেলে রেখে রাজী পাগলীর কাছটিতে এগিয়ে গেলাম। কোমল কণ্ঠে বললাম—তাড়াতাড়ি তোমার সুটকেস নিয়ে নেমে এস রাজু। ট্রেন বদলাতে হবে আমাদের এখানে।

দরজাটা খুলে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। আলগোছ হয়ে বসে ছিল যেন মেয়েটা। গাড়ী থেকে নেমেই ব্যাকুল ভাবে বললে—ঠাকুর যে ঘুমুতে লাগল এখনও, ওকে তাড়াতাড়ি ডাক বাবু!

আশ্বাস দিয়ে তৎক্ষণাৎ বললাম—ভয় নেই, এ গাড়ী

বনশ্যামের দেশের দিকে যাবে। ও নেমে যাবে ঠিক সময়ে।

আমার পিছু পিছু হন্‌হন্‌ করে হেঁটে এল রাজী পাগলী। ওয়েটিং রুমের ভিতরে ওকে এনে বসালাম তাড়াতাড়ি, বললাম—আধ ঘণ্টা দেরি আছে এখনও আমাদের গাড়ী আসতে। তুমি বস এখানে চুপ করে, আমি আসছি এখনই।

উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রাজী পাগলীর সারা মুখখানা। পরম নির্ভরতায় ভরা দুটি চোখ আমার পানে তুলে রাজী পাগলী ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললে—তুমি তাড়াতাড়ি ঘুরে এস বাবু—আমার ভারি ভয় করছে কিন্তু।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস দিয়ে বললাম—ভয় কি, পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরব আমি। কুলি ডেকে আমার স্যুটকেস বিছানা— এসব নামাতে হবে ত গাড়ী থেকে?

তিন মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দিলে ট্রেনখানা। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে উঠে পড়লাম তাড়াতাড়ি। গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্ম ছেড়ে আসতেই মুখ বাড়িয়ে দেখলাম একবার। দূরে —প্ল্যাটফর্ম্মের উপরে—আলোর তলায় লাল চেলী একখানা জলজ্বল করছে যেন। ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে নিশ্চয়ই রাজী পাগলী! মনে হ'ল গতিশীল ট্রেনের দিকে আকুল ভাবে চেয়ে আছে একজোড়া ভীত সন্ত্রস্ত চোখ। গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকুল দুটি চোখের দৃষ্টি ক্রমপ্রসারিত হয়ে এগিয়ে আসছে যেন ট্রেনের পিছু পিছু!

একটু নিশ্চিন্ত হলাম তবু। ভাবলাম, আর মাত্র ঘণ্টা-দেড়েক পরেই ত তিমিরাবরণ সরে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে, সর্ব্বপাপঘ্ন ধ্বান্তারি দেখা দেবেন পূর্ব্বাশার প্রান্তে। দিনের আলো ফুটলেই রাজী পাগলী চারদিকে খুঁজে বেড়াবে নিশ্চয়ই আমাকে। বলেছিল স্বামী ওর চা ফেরি করে—আসানসোল ষ্টেশনে। নিশ্চয়ই আবিষ্কার করবে সে তার একান্ত বাঞ্ছিতাকে। উপায়ান্তর না দেখে রাজী পাগলীও নিশ্চয়ই তার স্বামীর ঘরে আবার আশ্রয় নেবে। নিশ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে সিগারেটে আগুন ধরাবার উদ্যোগ করতে লাগলাম।

মাত্র এক পক্ষ পরের ব্যাপার। অবকাশের মধুময় দ্বিপ্রহর একটি। আলোয় ঝলমল করছে যেন দিগ্‌দিগন্ত। অন্তরের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হয়েছে নির্ম্মল প্রশান্তি আর আনন্দ। আনন্দের কূলছাপা বান ডেকেছে যেন সবদিকে। পিওন চিঠি দিয়ে গেল একটা হাতে। রি-ডাইরেকটেড হয়ে আসছে খামটা পাটনা থেকে। খুলেই চমকে উঠলাম। দেখি খামের মধ্যে আমার সেই পাটনার বাসায় হারিয়ে-যাওয়া ফটোখানা রয়েছে। বিস্ময়-বিহ্বল মন নিয়ে সঙ্গের লিপিখানার উপর চোখ বুলাতে সুরু করলাম তাড়াতাড়ি। রঞ্জন লিখছে আসানসোল থেকে, অবাক হলাম একটু! রেলের কর্ম্মচারী সে—পি ডবলিউ-আই। হালে আসানসোলে বদলি হয়েছে সম্ভবত। কিন্তু আরও পুঞ্জীভূত বিস্ময় অপেক্ষা করছিল চিঠিটার শেষ দিকে। রঞ্জন লিখেছে একটা মেয়েছেলে রেললাইনে কাটা পড়েছে এখানে, পরশু দিন ভোরে। সঙ্গে তার টিনের স্যুটকেস ছিল একটা, সেটার মুখ খুলে গিয়ে কাপড়চোপড়, আয়না চিরুণী যথাসর্ব্বস্ব দেখি ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে লাইনের ধারে। কাটা ধড়টার পাশেই দেখি তোর এই ফটোখানা পড়ে রয়েছে! কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে তোলা সেই ফটোখানা না? আমি স্ন্যাপ নিয়েছিলুম মনে পড়ে? ভেবে অবাক হলাম তোর ফটো এখানে এল কি করে? ফরসা হচ্ছে তখন সবে। ট্রলিতে চেপে ডিউটিতে বেরিয়েছি—দেখি এই কাণ্ড! ফটোখানা কুড়িয়ে নিয়ে এসে ভাল করেছি নিশ্চয়ই, কি বলিস? দেখে ছোট জাতের মেয়েছেলে বলেই মনে হ'ল। আহা বেচারী, লাল চেলী পরে একা কোথায় যাচ্ছিল কে জানে; কোন নগণ্য গৃহকোণের নববধূ হয়ত। কিন্তু যাক, ভেবে অবাক হচ্ছি শুধু তোর ফটোখানা এখানে এল কি করে? ইত্যাদি।

ফটোটার দিকে চাইলাম আর একবার। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল ভীতিবিহ্বল অতি অসহায় আর একজোড়া চোখ আর সেই সে চোখের সেই মৌন, আকুল আবেদন, "তুমি তাড়াতাড়ি ঘুরে এস বাবু—আমার ভারি ভয় করছে কিন্তু"। মর্ম্মের মধ্যে আজ আবার এ কথার আলোড়ন সুরু হ'ল যেন। রক্তের দাগের মতই কি লেগে রয়েছে যেন ফটোখানার গায়ে। হাঁ, সেই রকম অস্পষ্ট একটা দাগই বটে! রাজী পাগলীর হৃদয়ের শোণিত-চিহ্ন হয়ত বা এ! আমার চৈতন্যলোকে হঠাৎ আকাশ ফাটিয়ে বজ্রপাত হ'ল যেন। সকল সত্তা চমকে শতধা হয়ে গেল যেন সঙ্গে সঙ্গে। লাল-চেলীপরা বধূবেশিনী রাজী পাগলীই তা হলে কাটা পড়েছে সেদিন রেললাইনে! চিঠির তারিখটা দেখলাম চট করে, ঠিক তাই। আধপাগলী মেয়েটা তা হলে তলে তলে অন্তরের মধ্যে অনুরাগই পোষণ করে এসেছে এত দিন ধরে। দুর্লভতম একটি আকাঙ্ক্ষাকে লালন করে এসেছে মনে মনে অতি গোপনে। আমার ফটোটায় না হলে কিসের প্রয়োজন ছিল ওর? ফটোখানাকে লুকিয়ে

সরাবার লোভই বা তার মধ্যে জাগবে কেন। বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। চোখের সামনে ছুটির দিনের সব আলো, সব উজ্জ্বলতা, সব আনন্দ, চিত্তের নির্ম্মল প্রশান্তি—সবকিছুই লেপে মুছে একাকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে।

খচ্ করে উঠল আবার আঙুলের কাঁটাটা। অতীত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম বর্ত্তমানের সীমানায়। অনুরাগ-ভরে অতসীর মুখের পানে তাকালাম, চোখে মুখে তার নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের উচ্ছল আনন্দ। দুর্নিরীক্ষ্য কাঁটাটার সূক্ষ্মতম একটি অংশকে ছুঁচের ডগায় রেখে তুলে ধরলে অতসী আমার চোখের সামনে। বার করেছে অতসী কাঁটাটিকে, সার্থক হয়েছে তার ঐকান্তিক চেষ্টা।

আঙুলের অস্বস্তির নিরসন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মর্ম্মের কাঁটাটা কিন্তু খচ করে উঠল আবার আজ দ্বিগুণ ব্যথা জাগিয়ে। ছাঁদনাতলায়, বাসরঘরে, ফুলশয্যার রাতে অস্বস্তি-কর এই কাঁটার ব্যথা অনুভব করেছি বারে বারে। আজও, এত বছর পরে একান্ত অনুরাগের মুহূর্ত্তে অতসী খুব কাছ ঘেঁষে এসে বসলেই ব্যথাটা খচ্ করে ওঠে।

অভিনয়

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

চিরদিন ধরি, একি মরি মরি,
অপরূপ অভিনয়!
সৃষ্টির মাঝে খুঁজিছ স্রষ্টা,
আপনার পরিচয়।
একসাথে জুড়ি' হাসিকান্নায়
গাঁথিয়াছ মালা চুনিপান্নায়;
দুটি সহচর জীবন মরণ
চরণ-শরণে লয়!
প্রিয়া হয়ে থাকো বক্ষোবিলীন
বাসর শয়ন 'পর,
প্রিয়তমরূপে ভুঞ্জিছ মধু—
নিঙাড়ি' বিম্বাধর।
কত যে মুরতি ধর অহরহ,—
তুমি প্রেম আর তুমিই বিরহ;
তুমি বাঁশুরিয়া, তুমি হে বাঁশরী,
বংশীর তুমি স্বর।

নিবিড় ব্যথার আগুনে দহিয়া
ঢালো করুণার ধারা,
ভালোবাসো যারে দুখ দাও তারে,
এ কি এ সৃষ্টিছাড়া!
জননী-জঠরে, শ্মশান-চিতায়
তব অভিনয়মঞ্চ কি হায়?
চাই কি মহান্, ক্ষুদ্রের মাঝে
হইতে আপনহারা?
তাইতো আমারে জ্বালায়ে পুড়ায়ে
এত তব কৌতুক,—
কবিতা উৎস করিছ বাহির—
ভাঙিয়া চুরিয়া বুক।
হানিয়া মৃত্যুজরা ব্যাধিশোক
করিতে আপন লীলাসম্ভোগ—
সৃষ্টির সেই প্রত্যুষ হতে
তাই তুমি উৎসুক।
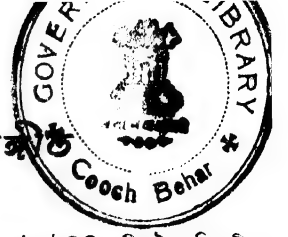
চব্বিশ পরগনার কয়েকটি লোকসঙ্গীত

এ. কে. এম. হাসান উজ্জামান

বাংলার পল্লী-অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর বাউল মারেফতি ফকির' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইসলামের গূঢ় তত্ত্বকে 'মারেফৎ' বলে। সেই মারেফতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে চাই শরিয়ৎ অনুযায়ী কঠোর সাধনা। অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন সাহেব "হারামণি" পুস্তকে যে সম্প্রদায়কে 'বাউল' নামে অভিহিত করিয়াছেন, মনে হয়—তাহারই একটি শ্রেণী হইতেছে "মারেফতি ফকির।" ইহারা বেশরা ফকির নামে অধিকতর পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়—ইহাদের দর্শন বা ফিলজফি। ইসলামিক দর্শন লইয়া ইহারা সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করে। তাহাদের চিন্তাধারা যে উন্নত এবং শাশ্বত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধ বা হিন্দুযুগে "বাউল" সাধনা ছিল, পরে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী "বাউল" সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের সহিত তাহাদের মিলন হয়। তাই মুসলমান ফকিরদের পূর্ণ ইসলামিক ভাব নাই, বৈষ্ণব, শাক্ত বা বৌদ্ধভাব উহাতে প্রবেশ করিয়াছে। নিম্নে কয়েকটি গান প্রদত্ত হইল। গানগুলি চব্বিশ পরগণা জেলার মগরাহাট থানার নীলকুঠি অঞ্চলের কয়েক জন মারেফতি ফকির বা বাউলের নিকট হইতে সংগৃহীত।

১

মোহাম্মদ মোস্তফা নবী আরবের যে ফুল।
ঐ নাম শুনলে বলতে প্রাণ চায় মোহাম্মদ রসুল।
কি মধু সেই নামেতে, রহে না মন ঘরেতে
গওছ কুতুব দিশেহারা, হয়ে ফুলে মাতুয়ারা,
সাহা ফকির হ'ল হায়া পেয়ে ফুলের মূল
আমার মোহাম্মদ মোস্তাফা নবী আরবের সে ফুল।
ফুলটি হল রাসুলাল্লাহ, বাসটি হল গণি আল্লাহ
আমরা কেবল হলুম রে ভাই উম্মতে রসুল
আমার মোহাম্মদ মোস্তফা নবী আরবের সে ফুল।
আমি বান্দা গোনাহগার, শোন মোনাজাত আমার;
একটি বার দেখাও আল্লাহ সেই নূরের পুতুল
আমার মোহাম্মদ মোস্তফা নবী আরবের সে ফুল।

শব্দার্থ—মোস্তফা—পছন্দসই। এখানে হজরত মোহাম্মদের প্রতি সম্মানার্থ ব্যবহার করা হইয়াছে।

নবী—খোদার প্রেরিত পুরুষ।

রসুল—খোদার প্রেরিত পুরুষ।

গওছ, কোতব—একার্থক শব্দ: আধ্যাত্মিক বা তত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বিশিষ্ট পদবী।

সাহা ফকির—পদকর্ত্তা। এই সাহা ফকির কে জানা যায় না। তবে ইনি হারামণির ১৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত শ্রীহট্টের ফকির পীর সাহা কি না কে জানে।

এশকেতে—প্রেমে।

রাসুলল্লাহ—আল্লাহর রসুল।

গণি—বেনিয়াজ, পরমুখাপেক্ষী।

উম্মত—শিষ্য।

গোনাহগার—পাপী।

মোনাজাত—প্রার্থনা।

নূর—জ্যোতি।

২

আমি জেনেছি জেনেছি খোদা মহিমা তোমার
তোমার ভেল্কিবাজীর ব্যাপার
দেখে হই চমৎকার
আমি জেনেছি জেনেছি খোদা মহিমা তোমার।
বানিয়ে খাকের আদমের বেহেস্তে দিলেন আশ্রয়
কি কারণে খেতে গন্দম নিষেধ কর বারে বার
কি কারণে পুনরায় আদম কাছে গন্দম যায়,
তোর বাহানায় খেলে গন্দম আদম গুণাহগার
আমি জেনেছি জেনেছি খোদা মহিমা তোমার।

শব্দার্থ—ভেল্কিবাজীর—এখানে খোদার কুদরত বা সৃষ্টি-কৌশলের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করা অর্থে নিরক্ষর বাউলগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে।

খাকের—খাক ফারসী শব্দ, অর্থ মাটি। তাহা হইতে বাংলায় খাকের হইয়াছে।

আদম—সৃষ্টির প্রথম মানুষ। তাঁহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

গন্দম—ফারসী শব্দ, অর্থ গম। আদম ও তদীয় পত্নী হাওয়াকে জান্নাতে স্থাপন করিয়া খোদা বলিয়াছিলেন, "অলা তাক্‌রাবা হাজিহিশ শাজারাতা কাতাকুনা মিনায যা লিমীন।"

অর্থ—"তোমরা এই বৃক্ষের নিকটে যাইও না, (যদি যাও) তাহা হইলে তোমরা হইয়া যাইবে অত্যাচারীদের মধ্যে।" কোরআন ১ম পারা ছুরা বাকারাহ ৩৫ আয়েত ৪র্থ রুকু। কিন্তু ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এবনে আব্বাসের মতে উহা আঙ্গুর অথবা গমের গাছ বা গন্দম আছে। কিন্তু এখন গন্দমই নিষিদ্ধ বৃক্ষ হিসাবে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

আদম কাছে গন্দম যায়—'গন্দম কাছে আদম যায়' হওয়া উচিত ছিল।

৩

হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমা পড়
ওরে ক্ষেপা মন আমার,
নবীজীর কলেমা পড়ে
দোজখ হতে পাও নিস্তার।
আওল কলেমা শরিয়তে
ইমান খাঁটি রাখ তাতে
মোহাম্মদ মস্তক্কা বিছে
জলছে বাতি দীপ্তাকার।
হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমা পড়
ওরে ক্ষেপা মন আমার।

শব্দার্থ—হক—সত্য।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নাই। ইহা ইসলামের মূলমন্ত্র।

নবীজীর কলেমা—অনেকের ধারণা, কেবল মোহাম্মদ এই মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। তাঁহাকে লইয়া মোট এক লাখ অথবা দুই লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর ইহা প্রচার করিয়াছেন।

আওল—আউয়াল, প্রথম। উক্ত মন্ত্র ইসলামের প্রথম সূত্র।

কলেমা—আরবী শব্দ, অর্থ—শব্দ। এখানে ইসলামের মূলমন্ত্র।

শরিয়ত—ইসলামী বিধানশাস্ত্র। বিছে—উর্দ্দু শব্দ বীচে, অর্থ—মধ্যে।

৪

মন তুমি কোথায় ছিলে, কোথায় এলে,
আর ভি কোথায় যেতে হবে, দেখ না ভেবে;
অখণ্ড গোলক তেজে, লাভ নিতে এসেছ ভবে,
রতি মাষা কমলে পরে, আবার ফিরে আসতে হবে।
আন্তা বোদ্র ক্কান্তা রুহু, খাঁই বলেছে
দেখে বোঝ হামারু।
এখানে না দেখতে পেলে, সেখানে যে দেখতে পাবে।

শব্দার্থ—মন তুমি···না ভেবে—"ইন্নালিল্লাহে অ ইন্না এলায়হে রা জেউন।" অর্থাৎ 'verily we are from God and to God we shall return.'—কোরআন, ২য়, পারা সুরা বাকারাহ ১৫৫ আয়েত ১৯শ রুকু।

ভি—উর্দ্দু শব্দ, 'ও' অর্থে।

আন্তা বোদ্র ক্কান্তা রুহু—কোরআন শরীফের এক বাক্যাংশের অপভ্রংশ। আসল, "আনতায়বুদাল্লাহাকা আন্নাকা তারাহু"—অর্থাৎ, এমন ভাবে তাঁহার এবাদৎ (উপাসনা) কর, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ। হামারু—উর্দ্দু শব্দ, হামারা—আমাদিগের।

৫

আহম্মদ মিমের পরদা উঠয়ে উঠয়ে দেখবে মন
আহাদ সেথায় বিরাজ করে খোদার নুরিতন।
খাদকে যদি চিনতে পারিস চিনবি খোদাকে
চোখ চেয়ে দেখ তোরই চোখে সেই নুরের রৌশন।
যে চিনতে পারে রয় না ঘরে হয় সে উদাসী
আপন মনে ভজেন সদা নবীজীর চরণ।
ঐ রব শুনিয়া হ'ল পাগল মনসুর হাল্লাজ
আয়নাল হক, আয়নাল হক বলে ত্যজিল জীবন।

শব্দার্থ—আহম্মদ—চরম প্রশংসিত। হজরত মোহাম্মদকে বুঝাইতেছে। মিম—আরবী শব্দ।

আহাদ—এক। আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। নুরিতন—নুর।

আহম্মদ মিমের······খোদার নুরিতন। আলিফ, হে, মিম, দাল এই চারটি আরবী অক্ষর লইয়া আহম্মদ শব্দ গঠিত। ইহা হইতে মিম শব্দ সরাইয়া লইলে আহাদ অর্থাৎ খোদার এক নাম অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ, খোদার যে বিশেষ সৃষ্টি আহম্মদ অর্থাৎ মোহাম্মদ তাহাই বুঝানো হইতেছে।

তুলনীয়—

আহমদ নামেতে দেখি
মিম হরফ লেখেন নবি,
মিম গেলে আহাদ বাকী
আহমদ নাম থাকে না।

হারামণি, মনসুর উদ্দিন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮।

শব্দার্থ—খাদকে—অন্য একটি ফকিরের বর্ণনায় খোদকে অর্থাৎ নিজেকে আছে। খোদ হওয়া সম্ভব।

কেননা হাদিস শরীফে আছে—'He who knoweth himself, knoweth God'. [Vide "Sayings of Mohammad", by Sir A. Sahrawardy, p. 53,

ঐ রব শুনিয়া হ'ল পাগল—অন্য একটি বর্ণনায় "ঐরূপ দেখিয়ে পাগল হ'ল।" আছে। তুলনীয়—

ঐরূপ দেখস মনসুর হাল্লাজ, জাহেরাতে হয়েছে ভুল।—হারামণি মনসুর উদ্দিন, পৃ ৫০। মনসুর হাল্লাজ—ইহার প্রকৃত নাম হুসায়েন বিন মনসুর, পৈতৃক ব্যবসায় অনুযায়ী হাল্লাজ উপাধি।

আয়নাল হক্—প্রকৃত উচ্চারণ আনাল হক্—অর্থ, অহং ব্রহ্ম, অর্থাৎ, আমিই খোদা।

৬

মোহাম্মদ নামে একটি ফুলে পাঁচটি রং ধরেছে।
সৌরভে গৌরবে তারই দুনিয়াদার সব মেতেছে।
সেই ফুলের সার সুবাস যিনি, হজরত আলি গুণমণি
ফুলের পাতায় মা জননী ফাতেমা নাম তায় রয়েছে।
সেই ফুলের আতর যে জন, হাসান-হোসেন দুটি রতন
পাঁচ ফুলের পাক পাঞ্জাতন এক রং-এ সব মিশেছে।
সেই ফুলের এক বিন্দু, গওছল আজম দীনবন্ধু
পূর্ণ করে সকল সিন্ধু যে তাঁর প্রেমে মজেছে।

শব্দার্থ—পাঁচটি রং—এখানে পাক পাঞ্জাতনকে বুঝাইতেছে। পাক—পবিত্র।

পাঞ্জাতন—হজরত মোহাম্মদ, তাঁহার জামাতা, হজরত আলী, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা হজরত ফাতেমা, তাঁহার দৌহিত্র এবং ফাতেমার পুত্রদ্বয় হজরত হাসান এবং হজরত হোসেন ইহাদিগকে পাঞ্জাতন বলা হয়। পাঞ্জাতন আরবী শব্দ, অর্থ পঞ্চশক্তি।

গওছল আজম—শ্রেষ্ঠ গওছ। এখানে হজরত আব্দল কাদের জিলানীকে বুঝাইতেছে।

৭

খালেক নে কেয়া বানায়ী
মুরে নজর নামাজ,
মাহবুবে কিবরীয়া হো
হোসেন নজর নামাজ।
নামাজ আলি, কুল মোতায়াল্লী
নামাজ খাতুন জেন্নাত আলী
সাহাদৎ কলেমা উত্তারি
খালেকুল নামাজ।

শব্দার্থ—খালেক—সৃষ্টিকর্তা। নে কেয়া বানায়ী—উর্দু শব্দ। কি সৃষ্টি করিয়াছেন।

মুরে নজর—চোখের মণি, নয়নপুত্তলি, এখানে জ্যোতির্ময়।

নামাজ—ইসলাম ধর্ম্মের উপাসনা। মাহবুব—প্রিয়। কিবরীয়া—মহান। হো—হয়। হোসেন নজর—সুন্দর সৃষ্টি; এখানে জ্যোতির্ম্ময়।

নামাজ আলি—নামাজকে নারীর সহিত তুলনা দেওয়া ইসলাম ধর্ম্ম অনুযায়ী নীতিবিরুদ্ধ। আর উপমা দুইটিও অদ্ভুত; এরূপ উপমা বড় একটা পাওয়া যায় না। মোতাওয়াল্লী—ট্রাষ্টী। জেন্নাত—বেহেশত। বেহেশতকেও পুরুষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

সাহাদৎ কলেমা—ইসলামের দ্বিতীয় মূলমন্ত্র।

উত্তারি—নামাইয়া, এখানে পরে হইবে বোধ হয়।

খালেকুল—সৃষ্টিকর্ত্তা।

সাহাদৎ কলেমা……নামাজ—প্রথমে সাহাদৎ কলেমা দ্বারা বিশ্বাস ঠিক করিয়া পরে নামাজ পড়িতে হইবে এইরূপ ভাব বুঝাইতেছে। কেননা, ইসলামের পঞ্চভিত্তির প্রথম হইতেছে ইমান অর্থাৎ বিশ্বাস। দ্বিতীয় হইতেছে নামাজ।

৮

ও আমার আপন খবর আপনারি হয় না
আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা।
ও সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেঁশের আড়ে পাহাড় লুকায়, দেখ না।
লালন মোল মনের ঘোরে
হয়ে চোখ থাকতে কর না।

উপরের গানটি বিখ্যাত সাধক-কবি লালন ফকিরের রচিত। তিনি নদীয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার বহু গান সংগৃহীত হইয়াছে।

৯

মন তুমি ত কাজ বোঝ না
অভয় অক্ষয় বস্তু ধরে
তারি সঙ্গে প্রেম কর না।
অভয় পদে দিয়ে মতি
শেখরে মন অটল ভক্তি
রবকে করে সঙ্গের সাথী
অমূল্য ধন কুড়িয়ে নে না।
পথে পথে দেখাশুনা
পথের নাহি শেষ গণনা
হক্কের হাকিম সেই রব্বানো
পলে পলে হয় রচনা
একা সেই মনুরায়
সর্ব্বদেহে কেমনে রয়
প্রাণপাখী তোর নাইক রে ক্ষয়
অমৃত ফল ফলিয়ে নে না।

হক্কের হাকিম—ন্যায় বিচারক। রব্বানা—প্রভু।

মনুরায়—দ্রষ্টব্য—'মনুরা উড়িয়া গেল পড়ি রৈল কায়া'। 'পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা'। কিন্তু আসল বোধ হয় মনওয়ারা হইবে। মনওয়ারা—সমুজ্জ্বল, এখানে আত্মাকে বুঝাইতেছে।

১০

হুজুর দেলে পড় নামাজ, শরিয়তের কাজ,
ও আমার মন হও নামাজি,
সে নামাজ হলে কাজা, পাবি সাজা,
বলে গেছেন নুর নবীজী।
সে নামাজ দমে বেদম, পড় হরদম,
যে জন হও সে কাজের কাজী।
এক নামাজ বন্ধ করে, চার অক্ষরে
পড়ে গেল আজগর সাজি।
নামাজের রং চিনিলে, যাবে খুলে,
ছিন ফাটিলে হবে আলি।

শব্দার্থ—হুজুর দেলে পড় নামাজ—কায়মনে নামাজ পড়া।

কাজা—সময়মত যাহা আদায় করা হয় নাই। দমে বেদম—সর্ব্বক্ষণ।

চার অক্ষরে—নামাজের আরবী শব্দ সলাত। সোয়াদ, লাম, ওয়াও, তে এই চারটি অক্ষর লইয়া সলাত গঠিত। নামাজ উর্দ্দু

শব্দ। ইহাও মু, মিম, আলিফ, জে, এই চারটি অক্ষর লইয়া গঠিত।

আজগর সাজি—বোধ হয় পদকর্ত্তা। ছিন ফাটিলে—বক্ষ বিদারিত হইলে।

আলি—বন্ধু।

১১

হক কুল হক বলে গেছে
আমার হজরত নবী পাঞ্জাতন
চক্কের হাকিম আল্লাহ
একিন হ'ল নারে মন।
আলাছত বু করলেন সাঁইজি তিনি
কালু বালা কয় বরকত জননী।

শব্দার্থ—হক কুল হক—ধ্রুব সত্য।

আলাছত বু—আরবী শব্দের অপভ্রংশ—আলাছতু বিরব্বিকুম। ইসলাম শাস্ত্রানুযায়ী আল্লাহ সমস্ত আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, "আলাছতু বিরব্বিকুম" অর্থাৎ আমি কি তোমাদের প্রভু নই? কালু বালা অর্থাৎ তাহারা (আত্মা) বলিল, হাঁ। কোরআন শরীফ।

করলেন—কহিলেন হইবে।

বরকত জননী—বেশরা ফকিরগণ হজরত ফাতেমাকে বরকত জননী বলে। ইসলাম শাস্ত্রানুযায়ী ইহা ভ্রান্ত; তদুপরি এখানে বরকত জননীর প্রয়োগ ঠিক হয় নাই। কারণ, শুধু হজরত ফাতেমা উত্তর দেন নাই, সমস্ত মানুষের আত্মা উত্তর দিয়াছিল।

১২

ও আমার মন কাবা শরীফের নিয়েত করো
রসুলের তন মদিনা, মন মক্কা তাও চেন না
করিয়ে অজুদ ফানা রসুলের দিদার করো।
সে কাবা খলিলের নয়, ও কাবা পরেতে হয়
এখন আদম কাবায় সেজদা রয় বলিল রব্বানা
আদম চিনে সেজদা করো সফল জনম তারো
মক্কা মদিনার ঘরে সেজদা করো জড়ো।

শব্দার্থ—কাবা শরীফ—হজরত ইব্রাহিম নির্ম্মিত মক্কার পবিত্র গৃহ। এই গৃহকে কেন্দ্র করিয়া সারা পৃথিবীর মুসলমান নামাজ পড়ে এবং এখানে তীর্থে আসে। কারণ, "ফা অল্লে অজহাকা শাত-রাল মাসজেদিল হারাম—অ হায়সো মা কুনতুম ফা অল্লু অজুহাকুম" অর্থাৎ "আপনি (মোহাম্মদ) আপনার মুখমণ্ডলকে মসজিদে হারাম (সম্মানযুক্ত মসজিদ) শরীফের দিকে করুন এবং তোমরা সকলে (উম্মতে মোহাম্মদী) যেখানেই থাক না কেন, নিজেদের মুখ-মণ্ডলগুলিকে সেই মসজিদে হারাম শরীফের দিকে কর।" কোর্‌আন শরীফ ২য় পারা সুরা বাকারাহ ১৪৪ আয়েত। ১৭শ রুকু।

শব্দার্থ—নিয়েত করা—মনস্থ করা। তন—দেহ; এখানে স্থান।

ওজুদ—অস্তিত্ব। ফানা—বিলয়।

ওজুদ ফানা—এখানে বোধ হয় আত্মাকে লীন হওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

খলিল—বন্ধু। এখানে হজরত ইব্রাহিমকে বুঝাইতেছে। হজরত ইব্রাহিমকে খলিলুল্লাহ বা আল্লার বন্ধু বলা হইত। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ।" অর্থাৎ, "আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই এবং ইব্রাহিম আল্লার বন্ধু।"

সেজদা—খোদার উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রণতি; এই প্রণতি খোদা ছাড়া আর কাহাকেও করা যায় না। বেশরা ফকিরদের ধর্ম্মচ্যুত হওয়ার ইহা একটি লক্ষণ।

আদম চিনে সেজদা করো—ইহা ইসলামে নাই। ইসলামে খোদা ছাড়া কাহাকেও সেজদা করা হারাম বা কোরআনে নিষিদ্ধ। খোদার হুকুমে ফেরেস্তারা প্রথম মানব হজরত আদমকে সেজদা করেন। "ইজকুলনা লিল মালাই কা তিন জুদু লি আদামা ফাছাজাদু ইল্লা ইবলিস।"—"যখন আমি বলিলাম ফেরেস্তাদিগকে সেজদা কর আদমকে, ইবলিস (শয়তান) ব্যতীত সকলেই সেজদা করিল।" (কোরআন শরীফ ১ম পারা সুরা বা কারাহ ৩৪ আয়েত।)

সরস্বতী পূজা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সরস্বতী পূজার সংখ্যা, আড়ম্বর, জাঁকজমক, দেবীর নূতন নূতন ধরণের মূর্ত্তি প্রভৃতি যদি শিক্ষা বিস্তারের ও উৎকর্ষের অন্যতম মাপ-কাঠি হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে, শিক্ষার প্রভূত বিস্তার ও উৎকর্ষ ঘটিতেছে।

শহরে যে প্রায় প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের বালকবালিকা-গণ সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিল তাহা নহে, প্রায় সকল স্কুল, কলেজ, হোষ্টেল এবং সংস্কৃতি পরিষদ প্রভৃতিতেও পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে শহরের প্রায় সকল মহল্লাতেই অধিকতর আড়ম্বর এবং জাঁকজমকের সহিত সার্ব্বজনীন পূজার আয়োজন করা হইয়াছিল।

ইহাও শুনিয়াছি যে, একই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের একই অট্টালিকার অভ্যন্তরে পৃথক পৃথক বিভাগের (বালিকা বিভাগ, বালক বিভাগ, কলেজ বিভাগ প্রভৃতি) পৃথক পৃথক পূজা হইয়াছিল। স্বচক্ষে এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দেখিয়াছি—বালকদিগের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে একতলায়, এবং বালিকাদিগের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে দ্বিতলের এক ঘরে। এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এমনও ঘটনা ঘটিয়াছে যে, কলেজ বিভাগের ছাত্রগণ কলেজের সন্নিকটে এক প্রাঙ্গণে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রবৃন্দ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পৃথকভাবে পূজার আয়োজন করিয়াছেন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এইরূপ পৃথক পৃথক পূজার মধ্যে কত পরিমাণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল জানি না; তবে পরস্পরের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল—এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবল ও সুস্থ মনের পরিচয় দেয় কিনা তাহাও জানি না, তবে ইহাতে প্রমাণ হয় যে, "মিলে মিশে কোন কাজ করিবার" আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ এখন পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জন্মায় নাই। ইহাও শুনিয়াছি—কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজার ঘটনা লইয়া আইন-আদালতও নাকি করিতে হইয়াছে, এবং রেষারেষির ফলে প্রতিমার উপর বোমাও বর্ষিত হইয়াছে।

সংবাদপত্র হইতে অবগত হইয়াছি যে, নির্ব্বাচনই (ইলেকসান) এই বৎসরকার সরস্বতী পূজার সংখ্যা-বৃদ্ধি, আড়ম্বর, আলোকসজ্জা প্রভৃতির অন্যতম প্রধান কারণ। নির্ব্বাচনে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ কেন্দ্রে পূজার ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহশীল ছিলেন, এবং মুক্ত হস্তে আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজনীতি আদৌ বুঝি না, নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাও নাই, সুতরাং এইরূপ পূজার মাধ্যমে নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের নির্ব্বাচনে সফল হইবার জন্য কি পরিমাণ সহায়তা করে তাহাও বলিতে পারি না।

কিন্তু আমাদের মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পূজার হিড়িকে "প্রাণান্ত-কর পরিচ্ছেদ" হইয়াছে। আমি কলিকাতার যে অঞ্চলে বাস করি—সেই অঞ্চলের ছোট এলাকার মধ্যে পূজার সংখ্যা সঠিকভাবে বলিতে পারিব না, তবে আমাকে উনত্রিশটি পূজার চাঁদা দিতে হইয়াছে, সবগুলি রসিদ এখনও আমার কাছে আছে। একই লেনে বা রাস্তায় ১৫।২০ হাত অন্তর ৫।৬টি পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সাধারণতঃ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রগণ চাঁদার জন্য আসিয়াছিল। প্রত্যেক দলকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহাদের বিদ্যালয়ে পূজা হইতেছে কি না—উত্তরে শুনিয়াছি বিদ্যালয়ে পূজা হইতেছে। প্রশ্ন করিয়াছি বিদ্যালয়ে যখন পূজা হইতেছে পাড়ায় এইরূপ পৃথক পূজার আয়োজন করিবার কারণ কি? কাহারও নিকট হইতে কোন সদুত্তর পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাও প্রশ্ন করিয়াছি—একই লেনে বা রাস্তায় ৩।৪।৫।৬টি পূজা করিবার আবশ্যকতা কি? ইহারও কোন সদুত্তর পাই নাই—তবে সাধারণতঃ অল্প-বয়স্ক বালকগণ বলিয়াছে—বড়রা আমাদের লইয়া পূজা করিতে চাহেন না, যদি বা করিতে চাহেন তবে তাঁহারাই 'মাতব্বরি' করেন, আমাদের কিছু করিতে দেন না। ছোটদের কথা বলিতেছি না, বড়দের কথাই অতি দুঃখ ও বেদনার সহিত বলিতেছি—তাঁহারা যে ভাবে চাঁদা চাহিতে আসেন তাহা মোটেই প্রীতিকর নহে, তাঁহারা এমনভাবে চাঁদা চাহেন যাহাতে মনে হয় গৃহস্থ যেন তাঁহাদের কাছে ঋণী, তাঁহারা পাওনাদার, সাধারণতঃ তাঁহারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলেন "চাঁদাটা দিন", যেন চাঁদাটা দিতে গৃহস্থ বাধ্য, ঘরের মধ্যে গৃহস্থ যদি বাহিরের লোকজনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তায় আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, সেদিকেও 'চাঁদা-আদায়কারি-গণের' ভ্রূক্ষেপ থাকে না। একটি প্রবীণ বন্ধুর জামাতার চায়ের দোকান আছে, জামাতা তখন দোকানে ছিলেন না, শ্বশুর সেই (প্রবীণ বন্ধুটি) দোকানে ছিলেন, কর্ম্মচারিগণ চা বিক্রয় করিতেছিল—এই সময় একদল যুবক চাঁদা চাহিতে আসেন বন্ধুটি তাঁহাদের বলিয়াছিলেন—জামাতা এখন উপস্থিত নাই, পরে চাঁদার জন্য আসিবেন। এই কথায় যুবকগণ উত্তর করিয়াছিলেন—চাঁদা এখনই যদি না দেন, চা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিব। আমাকে এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় নাই বটে, তবে আমি যখন বলিয়াছি চাঁদা এখন দিতে পারিব না, পরে দিব, উত্তরে শুনিয়াছি "Thank you when shall we come again? জানি না এই সব ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষায় কতটা উৎকর্ষ অর্জ্জন করিয়াছেন।

অনেক সময় কি ছোট, কি বড় ছাত্রগণকে বলিয়াছি—এইরূপ

ভাবে বাড়ী বাড়ী চাঁদার জন্ম যাওয়া কি সম্মানজনক ? অনেকে হয় ত রূঢ় কথা বলেন—ইহাতে কি তোমাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে না ? উত্তরে শুনিয়াছি, "দেশের কাজে মান অপমান কিছুই নাই।" খুবই ভাল কথা ! কিন্তু এইরূপ ভাবে সরস্বতী পূজার মধ্য দিয়া দেশের কাজ কতটা অগ্রসর হয় বুঝিতে পারি নাই। অনেক সময়ে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া এই প্রশ্নও করিয়াছি—চাঁদা-আদায়কারীদের মধ্যে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কতজন পুরস্কার অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু উত্তর শুনিয়া নিরাশ হইয়াছি—কোন কোন ক্ষেত্রে অপমানিতও হইয়াছি—শুনিয়াছি "ও সব কথা রাখুন, চাঁদাটা দেবেন কিনা বলুন।" ভয়ে ভয়ে চাঁদা দিয়াছি। এই প্রসঙ্গে কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ লিখিতেছি। একজন সংবাদ-সরবরাহকারী একটি নয় বৎসর বয়স্ক বালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দেবীর নিকট সে কি প্রার্থনা করিয়াছে—বালকটি এই প্রশ্নে প্রথমতঃ একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, পরে স্পষ্ট-ভাবেই উত্তর দিয়াছিল সে দেবীর কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছিল যে, লেখাপড়ার সময় খেলাধুলা করিয়াও সে যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। সংবাদ-সরবরাহকারী বলিতেছেন, বালকটির এই স্পষ্ট উত্তর সাধারণতঃ অনেক বয়স্ক ছাত্রদের উক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তিনি আরও বলিতেছেন—ইহা হইতে বুঝা যায় সরস্বতী দেবীর প্রতি ছাত্র সম্প্রদায় কি মনোভাব পোষণ করেন। এক বন্ধু বলিতেছিলেন, আজকাল পরিসংখ্যানের যুগ, পরিসংখ্যানের সাহায্যে নির্ণয় করা যাইতে পারে, যে সকল ছাত্র প্রত্যক্ষভাবে দেবীর পূজার প্রতি এত বেশী আগ্রহশীল এবং এত বেশী পরিশ্রম করেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা কতজন শিক্ষায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন এবং যাঁহারা পূজায় এত বেশী মাতামাতি করেন না, তাঁহাদের মধ্যেই বা কতজন শিক্ষায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। ছাত্রছাত্রিবৃন্দ কেবল যে তাঁহাদের স্ব স্ব গৃহে দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদান করেন এবং অঞ্জলি দেন তাহা নহে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে বা ক্লাবের পূজাতেও অঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যত বেশী বার অঞ্জলি দেওয়া যাইবে পড়া-শোনার ঘাটতি তদ্দ্বারা পূরণ হইয়া যাইবে। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি এই প্রসঙ্গে বলিলেন—পূজার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রিগণ যে পরিমাণ উৎসাহ, উদ্দীপনা, মনোযোগ প্রদর্শন করেন লেখাপড়ায় যদি তাহার একশত ভাগের এক ভাগও করিতেন তবে পরীক্ষায় তাঁহারা আশ্চর্য্যজনক ফল দেখাইতে পারিতেন।

প্রতিমার মূর্ত্তি সম্বন্ধেও সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি যে, বর্ত্তমান বৎসরের পূজার এক বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রতিমার বিভিন্ন মূর্ত্তি, আকার ইত্যাদি। এই আলোচনাকালে একজন প্রবীণ বন্ধু বলেন, আমাদের কালে দেবীর মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়াছি এবং সেই ধারণাতেই দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিয়াছি কিন্তু বর্ত্তমানের মূর্ত্তি ভিন্ন, ইহার মধ্যে মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাই না—অন্য মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠে।

এই প্রবন্ধ-লেখা যখন শেষ করিতে যাইব, তখন এক সংবাদ-পত্রে দেখিলাম—কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিদ্যালয়ের পূজায় চাঁদা দেয় নাই বলিয়া একজন ছাত্রকে এমন প্রহার করিয়াছেন যাহার ফলে তাহার গলার হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে—হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা গড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য অনাবশ্যক, শুধু বলিতে চাই—কোথায় গিয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি !

যতই লিখি না কেন পূজার হিড়িক বাড়িবে, কমিবে না—কিন্তু কি উপায়ে এই ক্রমবর্দ্ধমান পূজার অনুষ্ঠানের জন্ম আমরা চাঁদা দিব ? না দিলে অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিবে। আর একটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি—প্রত্যেক দলই চাঁদা প্রাপ্তির একখানি রসিদ দিয়া থাকেন—এমন দেখিয়াছি একই দল দুই-তিন বার চাঁদা লইয়া গিয়াছেন।

আর কিছুই ভাবিতেছি না, কেবল ভাবিতেছি—মা সরস্বতীকে কোথায় নামান হইয়াছে ! বাল্যকালে আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দেবীর আরাধনা করিতাম না—পুস্তক পূজা করিয়া দেবীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিতাম। ইহার মধ্যে কোন প্রকার "হৈ-হুল্লোড়" ছিল না। এখন দেখিতেছি পূজা হৈ-হুল্লোড়েই পরিণত হইয়াছে। আমরা সকলেই তাহাতে যোগ দিয়াছি। কে প্রতিরোধ করিবে ?
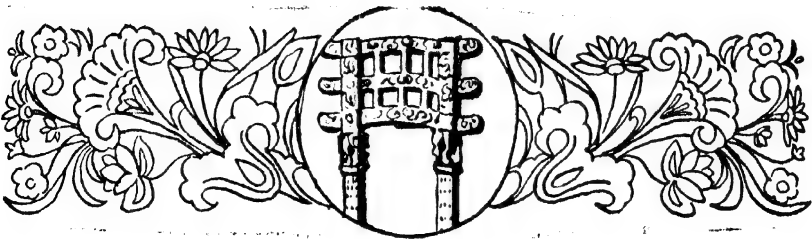
উপজাতীয় লোকেদের কতকগুলি সমস্যা

কাকাসাহেব কালেলকার

ইহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দ হয় যে, সামগ্রিকভাবে দেশের জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের আমাদের ভ্রাতৃগণও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা সত্য যে, উপজাতীয়দের মধ্যে যে জাগরণ হইয়াছে তাহা হরিজনদের তুলনায় অনেক ন্যূন পরিমাণের, কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে উপজাতীয় সমাজে যথেষ্টসংখ্যক এমন লোকেদের আমরা পাইয়াছি যাহারা নিজেদের সমাজের উন্নয়নকল্পে সংগ্রাম করিতেছে। ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয় যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ঠক্কর বাপা যে কাজের সূচনা করেন, দেশের সকল অংশে তাহা উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

আসাম হইতে রাজস্থান এবং হিমাচল প্রদেশ হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হরিজন এবং ভূমিজনদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে, পাঠকদের সমক্ষে তাহা উপস্থাপিত করা সমীচীন বলিয়া আমি মনে করিতেছি।

উপজাতি অধ্যুষিত এবং পাহাড়িয়া অঞ্চলকে প্রকৃতি যে গরিমায় এবং সৌন্দর্যে বিভূষিত করিয়াছেন তাহার সহিত উপজাতীয় লোকেদের প্রকৃত অবস্থার দারুন বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং প্রকৃতির দ্বারা ও প্রাক্তন সরকারের দ্বারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথকীকৃত এবং উপেক্ষিত হইয়া থাকাই এই সকল লোকের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী।

আদিম সারল্য

কেহ কেহ লক্ষ লক্ষ উপজাতীয় লোকেদের রাখিতে চান তাহাদের আদিম সারল্যপূর্ণ জীবনচর্য্যার গণ্ডীর মধ্যে। তাঁহাদের নিকট উপজাতীয়দের জীবন এরূপ কবিত্বপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রতিভাত হয় যে, তাঁহারা তাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে চাহেন না। এই সকল কবিত্বভাবাপন্ন লোক আজিকার দিনের উপজাতীয় লোকেদের জীবনের কঠোরতার কথা স্বল্পই অবগত আছেন। ইহা হয়ত সেই সকল নৃতত্ত্ববিদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারে, যাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, উপজাতীয় লোকেরা থাকুক যাদুঘরে প্রদর্শনযোগ্য মূল্যবান নিদর্শনরূপে। যে সকল নৃতত্ত্ববিদের কৌতূহল মানবিক অপেক্ষা সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ অর্থে অধিকতর বৈজ্ঞানিক —তাঁহাদের নিকট হয়ত মানবজাতির এই সকল 'নমুনা' আলোচনা ও গবেষণার মূল্যবান আধার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু আমরা যাহারা উপজাতীয়দের ভালবাসি এবং আত্মীয়-কুটুম্ব হিসাবে দেখি তাহাদের কাম্য এই যে, জ্ঞানের সকল বিভাগে এবং জীবনচর্য্যার কলাকৌশলে ইহাদের উৎকর্ষ সাধিত হউক। মানবীয় বুদ্ধিকৌশলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের যে-কোন উপায়ই উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহাই এই সকল লোকেদের পক্ষে যাহাতে প্রাপ্তব্য হয় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। অপর লোকেদের ন্যায় আত্মোন্নয়নের এবং অবসরবিনোদনের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তাহাদিগকে দিতে হইবে এবং জনসমষ্টির অন্যান্য অংশের লোকেরা আজ যে সম্মান উপভোগ করিতেছে, উপজাতীয় লোকেরাও যাহাতে সেই একই গৌরবজনক স্থান লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। উপজাতীয়দের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন যে সকল যুবক আছে তাহারা অবশ্যই অন্য যে-কোন ব্যক্তির সমমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার উচ্চাশা পোষণ করিতে পারিবে।

ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, উপজাতীয়দের সমাজের কতিপয় তরুণ-তরুণী কিছুটা শিক্ষালাভের অব্যবহিত পরে

তাহাদের স্ব-সমাজের লোকেদের উন্নয়নের বিষয় চিন্তা করিবে, কিন্তু একথা আমাদিগকে অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন জাতি এবং কোন জনসমাজই উন্নতির শীর্ষতম স্থানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না যদি তাহারা তাহাদের মনোযোগ এবং উচ্চাভিলাষকে সীমাবদ্ধ রাখে কেবল আত্মীয় স্বজনের উন্নয়নের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। পূর্ণতম বিকাশ কেবল তাহাদের পক্ষেই সম্ভবপর যাহারা সকলের উন্নতির কথা অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে দেশের উন্নতির কথা চিন্তা করে। উপজাতীয় সমাজের আমাদের ভ্রাতাভগিনীদের উচ্চাভিলাষের পথে কোন সীমারেখা টানিয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না।

এই সম্পর্কে আরও একটি বিবেচ্য বিষয় আছে যাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। যখনই আমরা হরিজন অথবা ভূমিজনদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করি তখনই আমাদের নিজেদের গড়া কোন আদর্শ তাহাদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া উচিত হইবে না। আমাদের নিজেদের পছন্দ এবং ধারণার ছাঁচে তাহাদিগকে গড়িবার চেষ্টা হইবে অসমীচীন। উপজাতীয় লোকেরা হইতেছে ভগবানের শিল্পসৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন। তাহাদের সমক্ষে আমরা বর্তমান মানুষের উদ্ভাবিত যাবতীয় ভাব আদর্শ এবং সুযোগ সুবিধা উপস্থাপিত করিব এবং বাছিয়া লইবার ভার তাহাদের উপরেই ছাড়িয়া দিব। যাহাই মনে সাড়া জাগাইবে তাহাই তাহারা আত্মসাৎ করিবে, যাহা তাহাদের পছন্দসই নয় তাহা প্রত্যাখ্যান করিবার স্বাধীনতা তাহাদের থাকিবে।

সমগ্র জগৎ আজ দ্রুত প্রগতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। সামগ্রিকভাবে উপজাতীয় লোকেদের বর্তমান অবস্থাসমূহ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা নাই। অদূরদর্শী স্বার্থপর লোকেরা এই সকল লোকের সরলতা এবং নিরীহতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে শোষণ করে। এই ধরনের শোষণের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা হইবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য। উপজাতীয়েরা যাহাতে তাহাদের চারিপাশের দুনিয়া দেখিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। উপজাতীয়দের সমাজের যুবকযুবতীদের শিক্ষার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ভ্রমণ-বৃত্তির (Travelling scholarship) ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে বিভিন্ন রাজ্যের লোকেরা কি ভাবে বাস করে, কথাবার্তা বলে এবং জীবনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য সংগ্রাম করে— তাহা প্রত্যক্ষ করিতে অবশ্যই তাহারা সমর্থ হইবে।

শ্রেষ্ঠ পন্থা

এই সকল লোকেদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ এবং প্রগতির নিরাপত্তাবিধানের প্রকৃষ্ট পন্থা হইয়াছে—প্রকৃত শিক্ষা। যে প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি জীবনের প্রকৃত প্রগতির পরিপন্থী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, জোর করিয়া তাহা যেন আমরা তাহাদের উপর চাপাইয়া না দিই। ইহাই কি যথেষ্ট নয় যে, যে সনাতনী ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি বেকার সমস্যা এবং নিরুপায় অবস্থার সৃষ্টি করে তদ্দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের শিশুদের নষ্ট করিয়াছি। আমাদের অতীতের ভুলভ্রান্তিসমূহ দ্বারা আমাদিগকে লাভবান হইতেই হইবে এবং এই সকল লোকের জন্য এমন শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা সমীচীন যাহা জীবন-চর্য্যায় তাহাদের নিকট সহায়ক হইতে পারে। এবং আমার মতে তাহাই হইতেছে ঐ ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি—মহাত্মা গান্ধী যাহা দেশের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন প্রায় তাঁহার জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়া। এই 'নই তালিম' বা নূতন শিক্ষাকে তিনি জাতির নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই বুনিয়াদী শিক্ষা যেন অন্ধগলি বলিয়া প্রমাণিত না হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা উপজাতীয়দের জন্য অবশ্যই উচ্চতর শিক্ষার এবং উচ্চতম কর্ম্মে নিয়োগের যাবতীয় পথ উন্মুক্ত করিবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক জাতির নিকট অনুমোদিত বুনিয়াদী শিক্ষা উপজাতীয় লোকদের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে সর্ব্বাধিক উপযোগী, কিন্তু এই বুনিয়াদী শিক্ষাকে তাঁহারা সেই পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না যে পর্য্যন্ত না সরকার তাহাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, যখন সরকারী চাকরির জন্য লোক নেওয়া হয় তখন যাহারা বুনিয়াদী শিক্ষা পাইয়াছে তাহাদিগকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে।

এমন আর একটি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে সরকারসমূহ এবং বুনিয়াদী শিক্ষার সমর্থকদিগকে গভীরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। এখন পর্য্যন্ত আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য শিক্ষক সংগ্রহ করিয়াছি নাগরিক অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে। এই সকল লোক সাধারণতঃ তাঁহাদের হাতের সাহায্যে কাজ করিতে পরাঙ্মুখ। অধিকন্তু তাঁহারা মনে করেন যে, হাতের কাজ তাঁহাদের সামাজিক মর্য্যাদা এবং শিক্ষার পক্ষে হীনতাজনক। নিজেরা কাজ করা অপেক্ষা তাঁহারা অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লওয়াতেই বিশ্বাস করেন। এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন তাহারা অপর লোকেদের শোষণ করিয়া কেবলমাত্র নিজেরা লাভবান হইবার কথাই ভাবিতে

পারেন। এই ধরনের লোকেদের হাতে মহাত্মাজীর বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি নিরাপদ হইতে পারে না। এখন আমাদিগকে আমাদের নীতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এবং বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষক নির্ব্বাচন করিতে হইবে গ্রামের কারিগর এবং বৃত্তিজীবী (occupational) সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে।

কি ভাবে কাজের সূচনা করিতে হইবে

জাতীয় দিক দিয়া প্রয়োজনীয় হাতের কাজে সকল লোকের পরীক্ষা দ্বারা আমাদিগকে কাজের সূচনা করিতে হইবে। এইরূপে গার্হস্থ্য হাতের কাজে যাহারা নিজেদের পটুতা প্রমাণ করিতে পারিবে তাহাদের জন্য সাধারণ শিক্ষার এক বর্দ্ধনশীল পাঠক্রমের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং অবশেষে বুনিয়াদী পদ্ধতিতে বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা-প্রণালী সম্পর্কে একটি কোর্স শিক্ষাদান করিতে হইবে। সকল শ্রেণীর লোকের জন্য আমরা যে-সকল বিদ্যালয় খুলিব, তাহাদের আমরা সেগুলির শিক্ষকরূপে কাজে লাগাইব। এই একটি পন্থাবলম্বন দ্বারা আমরা বাঞ্ছিত ধরনের বুনিয়াদী শিক্ষক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব, এবং গ্রামীণ লোকেরা শহরের লোকেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে বাধ্য হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে যে প্রকৃতিগত হীনতাভাবের (Inferiority complex) সৃষ্টি হয় অচিরে তাহার অবসান হইবে। এই সকল নূতন বুনিয়াদী শিক্ষক শীঘ্রই দেখিবেন যে, তাঁহারা সেই সকল কাজ করিতে সমর্থ যাহা আয়ত্ত করা তাহাদের 'সাদা কলারওয়ালা' সম্প্রদায়ের লোকেদের নিকট দুরূহ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল।

গ্রামাঞ্চলে মহাত্মাজীর বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি সম্প্রসারিত হইলে এক নব জীবনের ও এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইবে এবং আপনারা অচিরেই দেশে এক নূতন ধরনের নেতৃত্বলাভ করিবেন। শিক্ষকদের তখন চাকরি-ভিক্ষার্থী হইয়া সরকারের নিকট যাইতে হইবে না। তখন আসিবে সরকারের তাঁহাদের নিকট গিয়া সেবামূলক কর্ম্ম চাওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিবার পালা। সরকার অচিরেই আবিষ্কার করিবেন যে, প্রশাসন পরিচালিত হইবে অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত যদি তাহা এই সকল লোকের—যাহাদিগকে বলা যাইতে পারে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত ফল—নিকট হস্তান্তরিত করা যায়।

জীবনে সাফল্যলাভের জন্য যে সকল প্রবণতা অত্যাবশ্যক, শিক্ষাদ্বারা অবশ্যই সেগুলি বিকাশপ্রাপ্ত হইবে। দেখিবার জন্য চোখের দৃষ্টিশক্তি হইবে তীক্ষ্ণ, শুনিবার জন্য কর্ণদ্বয়কে শিক্ষাদান করিতে হইবে, মস্তিষ্কের বিকাশসাধন করিতে হইবে ইহার ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চস্তরে এবং আঙ্গুলগুলি অনুশীলনের দ্বারা চরমতম নৈপুণ্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে—ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগের দাবি।

কুসংস্কারের কবলে নিপতিত যারা

শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে সম্পন্ন করিতে হইবে—আর একটি কৃত্য। সাধারণ ভাবে গ্রামীণ লোকেরা এবং বিশেষ ভাবে উপজাতীয় লোকেরা কুসংস্কারের কবলে নিপতিত তাহারা যাদুবিদ্যা এবং ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে আস্থাবান।

তাহাদের এলাকায় যদি কোন সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর আকারে দেখা দেয় তাহা হইলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া তাহারা সাহায্যের জন্য ছুটিয়া যায় যাদুকর এবং ঐন্দ্রজালিকের নিকট। তাহাদের গরু-মহিষের পালে যদি মড়ক লাগে তাহা হইলে তাহারা হরিজনদিগকে বেদম মারপিট সুরু করিয়া দেয়, কেননা তাহারা বিশ্বাস করে যে, হরিজনরা তাহাদের যাদুবিদ্যার বলে গরু-মহিষের মধ্যে মড়কের সৃষ্টি করে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিষেধক ব্যবস্থা হইতেছে—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কারসমূহ লোপ পাইয়া যাইবে এবং তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় এবং সুকুমার কলাসমূহের বিকাশসাধন হইবে। নই তালিম অথবা বুনিয়াদী শিক্ষা সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবে—বিজ্ঞান এবং কলাকে।

উপজাতীয়দের—গিরিজন এবং ভূমিজনদের স্বাস্থ্য হওয়া উচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধরনের, কেননা মুক্ত বাতাস এবং কঠোর পরিশ্রমের জীবন তাহাদের। চামড়ার ভিতর দিয়া তাহাদের দেহে প্রচুর সূর্য্যালোক প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং বহু রোগের হাত হইতে তাহাদের মুক্ত থাকা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নানা ব্যাধির কবলে তাহাদিগকে নিপতিত হইতে হয়, মুখ্যতঃ স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতা এবং যে নিকৃষ্ট খাদ্য তাহারা পায় তাহার দরুন। তাহাদের জীবন সম্বন্ধে আমি যাহা পড়িয়াছি তাহা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধেও তাহাদের যথার্থ ধারণার প্রয়োজন।

কেনাবেচা, সঞ্চয়ের গুরুত্ব এবং মূলধনের ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কেও তাহাদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানদানের ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইবে। আইন এবং আইন-আদালত, ভোট এবং ভোটদান, পার্লামেণ্ট বা লোকসভার কাজকর্ম, ন্যায়বিচারলাভের পদ্ধতি এবং নূতন ধরনের পঞ্চায়েতসমূহের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও অল্পস্বল্প তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের অনুষঙ্গী হইবে প্রকৃত ধর্ম্মীয় জ্ঞান—যে ধর্ম্মশিক্ষা আজ তাহারা পাইতেছে তাহা নহে—কিন্তু সকল ধর্ম্মের সার যাহা তাহাই তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি এবং উন্নয়নের জন্য নাচ গান নাট্যাভিনয় প্রভৃতিরও সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আদিবাসীদের নৃত্যগীতকে উৎসাহিত অথবা এগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করাই যথেষ্ট নহে। তাহাদের নাচ-গানে ভাল এবং চিত্তাকর্ষক যাহা-কিছু আছে তৎসমুদয়কে আমাদের নিজেদের জীবনের অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন। যখন তাহারা ইহা দেখিবে এবং বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের এমন কিছু আছে যাহাকে আমরা মূল্য দিই, তখন তাহাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িবে এবং আমাদের সহিত মেশা তাহাদের পক্ষে অধিকতর সহজ হইবে।

প্রকৃত সংস্কৃতি

আদিম জাতীয় লোকেরা অরণ্যবাসী হইলেও কোন দিক দিয়াই তাহাদিগকে সংস্কৃতিহীন বলা চলে না। তাহাদের সামাজিক সংগঠন, তাহাদের অকপটতা এবং সত্যের প্রতি অনুরাগ, এবং যাহারা বিশ্বাস উৎপাদনকারী তাহাদের প্রতি অনড় আনুগত্য এই সকলই হইল তাহাদের প্রকৃত আনুগত্যের নিদর্শন। জীবনের সমস্যাসমূহ সমাধানে তাহাদের যে পন্থা তাহাতেও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কুটীর-শিল্পসমূহে তাহাদের নৈপুণ্য, তাহাদের বাদ্যযন্ত্রসমূহ ও কাজ-কর্ম্মের যন্ত্রপাতি এবং শিকারের হাতিয়ারসমূহেও তাহাদের সংস্কৃতির প্রাণশক্তি পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের নির্ম্মিত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যমণ্ডিত দ্রব্যাদি আমরা শুধু আমাদের যাদুঘর-সমূহেই প্রদর্শন করিব না, আমাদের গৃহে অধিক হইতে অধিকতররূপে গর্ব্বের সঙ্গে সেগুলি ব্যবহার করাই সমীচীন হইবে।

আদিবাসীদের ধর্ম্মীয় ভাবাদর্শসমূহ সম্পর্কে গভীর এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা অত্যাবশ্যক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদিগকে সকল ধর্ম্মের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে।

ধর্ম্মীয় কলহের স্থান দখল করিয়াছে এখন রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ। একে অপরের সঙ্গে সংগ্রামে রত আজ বিভিন্ন 'ইজম্' এবং মতবাদ। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র-বাদ, কমু্যুনিজম ইত্যাদির পারস্পরিক বিতর্ক আজ বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যেকার বাগবিতণ্ডার মতই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সহাবস্থান আমাদিগকে দেখাইয়াছে এই [illegible] তিক্ত কলহসমূহ যখন কাহাকেও সাহায্য করে না তখন কেন আমরা তাহাদের হাত হইতে রেহাই পাইব না এবং যেমন নিজেদের জন্য দাবি করি তেমনি প্রত্যেককে কেন অবস্থান করিবার অধিকার দিব না। ভগবান যখন প্রত্যেককে সহ্য করেন তখন আমরা কেন অন্যান্যদের শান্তিতে বাস করিতে দিব না এবং নিজেরা শান্তিতে থাকিব না।

অসহিষ্ণুতা পরিহার করিয়া কেহ যদি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করে, তাহা হইলে সহাবস্থান অচিরেই পরিণত হইবে সহযোগিতায় এবং সহযোগিতা আমাদিগকে লইয়া যাইবে সংশ্লেষ ও সমন্বয়ের সামঞ্জস্যে।

আসল প্রয়োজন হইতেছে প্রেম, সেবা, সৌভ্রাত্র এবং সহযোগিতার। যদি আমরা প্রেম এবং শ্রদ্ধা সহকারে আমাদের ভ্রাতৃগণের সেবা করি এবং তাহাদের প্রগতিতে সুখী হই তাহা হইলে সকল ঝগড়া-বিবাদ অপসারিত হইয়া যাইবে।

ভাষাগত সমস্যাসমূহ

আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক উপজাতি ইহার নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। কেবল যে সমাজসেবকগণ কর্তৃকই এই সকল বিভিন্ন ভাষা অধীত এবং আলোচিত হইবে তাহা নহে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও এগুলি সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনা করিবেন। 'পুণা, ডেকান কলেজ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে'র ড. কাত্রে এই দিক দিয়া বাস্তবিকই একটি প্রশংসনীয় কাজের সূচনা করিয়াছেন। আদিবাসীদের মধ্যে কর্ম্মরত আমাদের সমাজ-সেবকদের উচিত তাঁহার সংস্পর্শে আসা এবং তাঁহার সহিত সহযোগিতা করা।

আদিবাসীদের ভাষার জন্য ব্যবহৃত হইবে হয় আঞ্চলিক লিপি অথবা নাগরী লিপি। তাহাদের অভিধান, ব্যাকরণ এবং গান মুদ্রিত হওয়া উচিত নাগরী অক্ষরে। ইহা উপ-জাতীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়ন ও আলোচনাকে সহজসাধ্য করিয়া তুলিবে, আদিবাসী যুবকদিগকে অধিকতর সহজ ভাবে হিন্দী এবং সংস্কৃত শিখিতেও ইহা সাহায্য করিবে।

স্বরাজের ভিত্তিকে যাঁহারা দৃঢ়তর করিতে চান এবং জাতীয় সংহতির গুরুত্ব যাঁহারা উপলব্ধি করেন, আদিবাসী-দের জীবন এবং ভাষা সম্বন্ধে—এমন গভীর ভাবে তাঁহা-দিগকে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে হইবে যেন আদিবাসী ভাষাসমূহে তাঁহারা নূতন এবং যথোপযুক্ত শব্দাবলী উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইতে পারেন। এবং আমরা নিজেরাও [illegible] আমাদের

প্রান্তিক ভাষাসমূহের এবং হিন্দীর অঙ্গীভূত করিয়া লইব না? আমাদের উচিত তাহাদের নৃত্য গীতও শিক্ষা করা। তাহাদের সহিত আহার করিতে এবং খেলাধূলা করিতে আমরা সমর্থ হইব। দিল্লীতে আমাদের জাতীয় উৎসবে যোগদান করিতে যেমন আমরা তাহাদিগকে আমন্ত্রণ করি তেমনি আমাদের আঞ্চলিক উৎসবসমূহে অংশ গ্রহণ করিবার জন্যও তাহাদিগকে আমরা আহ্বান করিব এবং আমাদের আনন্দোপভোগে ও অবসরবিনোদনেও আমরা তাঁহাদের সহিত একাত্ম হইয়া যাইব।

প্রকৃতির সন্তান

যেমন আমরা তাহাদের সেবা করি তেমনি তাহাদের সেবাও সানন্দে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সমীচীন হইবে। আদিবাসীরা প্রকৃতির সন্তান; বিভিন্ন প্রকারের ঔষধি এবং গাছ গাছড়া গুণাগুণ তাহারা অনেকেই জানে। আমাদের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক এবং রাসায়নিকগণ তাহাদের নিকট হইতে অনেককিছু শিখিতে পারেন।

উপজাতীয়দিগকে শিক্ষাদানকালে এই বিষয়টিও বিবেচনা করা সমীচীন হইবে যে, অরণ্যচারী প্রাণীকুল, পশুপক্ষী এবং বনের উদ্ভিদ্‌জীবনের সঙ্গে তাহাদের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রাথমিক উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এবং খনিজবিদ্যা শিক্ষা করা তাহাদের নিকট সহজতর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই সকল উপজাতীয় লোকেদের প্রায়শঃই লৌহ এবং কয়লার খনিগুলিতে শ্রমিকরূপে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। উপজাতীয়দের ভিতর হইতে বুদ্ধিমান এবং উপযুক্ত যুবকদিগকে যদি বন-সংরক্ষণবিদ্যা (Forestry) অথবা খনিজবিদ্যা এবং ধাতুবিদ্যায় (Metallurgy) বিশেষজ্ঞ হইবার সুযোগ দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের প্রতি ঠিক ন্যায় বিচারই করা হইবে এবং ইহা তাহাদিগকে জাতির সেবা করিবার সুযোগও প্রদান করিবে। কতিপয় যোগ্য তরুণকে জার্মানী, রাশিয়া এবং আমেরিকায় পাঠানো খুবই সঙ্গত হইবে ইহার দরুন তাহারা আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার (Technology) জ্ঞান আহরণ করিয়া আমাদের দেশে লইয়া আসিতে সমর্থ হইবে।

সমবায় এবং উপজাতিসমূহ

সমবায় সমিতিসমূহ লইয়া এখানে আমি বেশী আলোচনা করিব না। বিশেষজ্ঞগণই এই বিষয় সম্বন্ধে বাদানুবাদ করুন। এই পর্যন্ত আমি জানি যে, 'আদিবাসীদের আরণ্য সমিতি সমূহ' (Forest Co-operative Societies for Adivasis) বোম্বাই রাজ্যে খুব কার্য্যকররূপে এবং সাফল্যের সহিত কাজ করিতেছে। ইহাও আমি জানি যে, উপজাতীয়দের স্বভাবতঃই এই ধরনের সমবায়মূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং উপদেশ দিলে তাহারা নিজেরা নিশ্চিতই কৃতিত্বের সহিত সমবায় সমিতি চালাইতে পারে। ইহ মনে রাখা ভালো যে, বর্ত্তমান নববিধানে সকলের শেষে যাহার স্থান সে হইতে পারে প্রথম।

প্রত্যেক সভ্য সরকারকে যথোচিত মনোযোগ দিতে হয় ইহার বন-সংরক্ষণের ব্যাপারে। সরকারকে এই বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, প্রতি বৎসর যে পরিমাণ গাছ কাট হয় রোপণ করিতে হইবে অন্ততঃ তাহার দশ গুণ অধিক। অরণ্যসমূহ আমাদের মূল্যবান সম্পত্তি এবং সেগুলিকে বিধ্বস্ত হইতে দেওয়া সমীচীন নহে।

কিন্তু ইহাও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, অরণ্যবাসী উপজাতীয় লোকেরা যেন উপদ্রুত এবং দুর্গত না হয়। আদিবাসীদের সংখ্যা এবং শক্তিও আমাদের দেশের পক্ষে মূল্যবান সম্পদ।

বন-সংরক্ষণবিদ্যায় আদিবাসীদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মূলসূত্র শিক্ষা দেওয়ার পর তাহাদিগকে ফরেষ্ট গার্ড এবং ফরেষ্ট অফিসাররূপে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে। তখন বাহির হইতে লোক আমদানী করা হইয়া দাঁড়াইবে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

শিক্ষিত আদিবাসী যুবকদের নিকট আমি কেবলমাত্র এই কথাই বলিব—"সর্ব্বতোভাবে তোমাদের জনগণের, তোমাদের সম্প্রদায়ের সেবা কর। কিন্তু কেবলমাত্র ইহা দ্বারাই তোমরা কখনও তোমাদের লোকেদের উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইবে না। সামগ্রিক ভাবে জাতির পরিপূর্ণ বিকাশের কার্য্যে তোমাদিগকে সহযোগিতা করিতে হইবে অন্যান্য মহান্ নেতাদের সহিত। তোমাদের পূর্ণাঙ্গ এবং সর্ব্বতোমুখী প্রগতির ইহাই একমাত্র পন্থা।"

পুণ্যকৃত্যের অধিকারী তারাই

দেশে এমন অনেক কর্ম্মী আছেন, আদিবাসীদের সেবাকে ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যাহারা তদুদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাজ একটি পুণ্যকৃত্য। যাহাদের আমরা সেবা করি তাহাদের মধ্যে ভগবানকে দেখা আমাদের আদর্শ। ভগবান যখন এই সকল সাদাসিধা আদিবাসীর রূপে আমাদের সেবা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন আসুন, যতখানি আমাদের সাধ্য ততখানি নিষ্ঠা এবং আনুগত্য দ্বারা আমরা ইহাদের সেবা করি—আসুন, তাহাদের আস্থাভাজন হইবার জন্য আমরা চেষ্টিত হই। তাহাদের পক্ষে আমাদের নিকট তাহাদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ ভাবে

উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়া অসম্ভব যদি না তাহাদের ভাষা শিক্ষা করি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। আমরা যেমন তাহাদের সেবা করি তেমনি যদি তাহাদের ভাষারও সেবা করিতে সমর্থ হই তবে তাহা হইবে নূতন সাহিত্যের মাধ্যমে।

জাতিসংক্রান্ত কুসংস্কারসমূহ আমাদিগকে পানভোজন সম্পর্কিত অনেক 'ট্যাবু' বা ধর্মীয় নিষেধের কবলিত করিয়া ফেলে। সৌভ্রাত্রের অনুশীলন কেবল তখনই আমরা করিতে পারি যখন আমরা এই সকল 'ট্যাবু' পরিহার করিতে সমর্থ হই। একথা বলা আদৌ আমার উদ্দেশ্য নয় যে, নিষিদ্ধ দ্রব্যসমূহ আমরা পান অথবা আহার করিব। কিন্তু কিছুই যেন আমাদিগকে যে-কোনও লোকের সহিত বসিয়া আহার করিতে অথবা যে-কোনও লোকের দ্বারা রন্ধিত খাদ্য ভোজনে প্রতিনিবৃত্ত না করিতে পারে।

আদিবাসীদিগকে আমরা যত বেশী একাউণ্টেন্সী বা হিসাবপত্র সংরক্ষণবিদ্যা শিখাইব, তাহাদের প্রগতি হইবে ততই বলবত্তর এবং দ্রুততর। সাফল্যের সহিত তাহাদের সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতিসমূহের (Multipurpose Cooperative Societies) কার্য্যপরিচালনার জন্য বুক কিপিং বা হিসাব-কিতাবের কাজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত জ্ঞানদানেও সমর্থ হওয়া আমাদের উচিত।

প্রকৃত প্রয়োজন হইতেছে—তাহাদের মধ্যে আশ্রমসমূহ প্রতিষ্ঠা যেখানে আদিবাসী এবং অপর সম্প্রদায়ের কতিপয় পরিবার একত্রে অবস্থান করিতে পারে এবং যেখানে বিকশিত হইতে পারে সকল ধর্ম্মের জন্য শ্রদ্ধা। আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত পবিত্রতা এবং জীবনের ঋদ্ধি।

আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের জীবন অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত হওয়ার জন্য লব্ধ হইবে যে অনাবিল আনন্দ—তাহাই আমাদের সত্যিকারের পুরস্কার।

আদিবাসীদের লোকসঙ্গীত

শ্রীপ্রভাকর মাচওয়ে

সরল গ্রামবাসীদের অথবা সমতলে কিংবা শহরের নিকটে যে সকল লোক বাস করে, আদিবাসীদের লোক-সঙ্গীতসমূহ তাদের লোক-সঙ্গীত থেকে ভিন্ন ধরনের। তাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে সমাজতাত্ত্বিক এবং নৃতত্ত্ববিদের, সাহিত্য-বিষয়ক গবেষক-কর্ম্মী এবং ভাষাতত্ত্ববিদের, আদিম সভ্যতা এবং সাংস্কৃতিক রীতি পদ্ধতিসমূহের পারস্পরিক বিপ্রকর্ষণের অনুশীলকের গবেষণার উপকরণ ভাণ্ডার। এই সকল লোকগীতির অধিকাংশই অলিখিত এবং কাজেই তাদের লিপিবদ্ধ রূপের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। মূল ভাষান্তরের প্রামাণ্যতা বজায় রাখবার দিকেও আমাদের দেশে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি। মূলের আর্জ্জব বা সরলতা (Naivete) প্রায়শঃই ব্যাহত হয় অজ্ঞাতসারে মুখে মুখে রচিত কবিতার চরণসমূহ দ্বারা। কখনও কখনও স্বরাঘাতের (accent) একটি পরিবর্ত্তনে অর্থের অদল বদল হয়। এবং যেহেতু আদিবাসীদের শব্দ-ভাণ্ডার এত সীমিত সেইজন্য এগুলি মূলরূপকে অবিকৃত রাখবার জন্যে প্রয়োজন চূড়ান্ত প্রযত্নের। এখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের লোকসঙ্গীতের রচনাংশসমূহ যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থাপিত করা যাচ্ছে :

শবর উপজাতীয়দের ওড়িয়া লোক-সঙ্গীত

উড়িষ্যা যেমন ভাস্কর্য্যের এবং বিভিন্ন রঙের আদ্যক্ষরে অলঙ্কৃত (illuminated) হাতে লেখা পুথির, তেমনি লোক-সঙ্গীতেরও সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এখানে শবর উপজাতির একটি লোক-সঙ্গীতের নিদর্শন দেওয়া যাচ্ছে :

মাদল বাজায় ক্ষেত-ইঁদুরে
নকুল হল যাচকর।
কাঠবিড়ালী মদ বিলায়
ভেরী বাজায় শশকবর।
ময়ূর রাখে মৃদঙ্গ যে
দীর্ঘ তাহার গ্রীবার 'পর।
লম্ব গ্রীবা তাই ত তার—
ক্ষেত-ইন্দুরের পিঠটা দেখি,
মস্ত বড় তার প্রসার।
লাফিয়ে যখন পড়ল সবাই
ময়ূর-গ্রীবার মৃদঙ্গে
'দিনজুব' 'দিনজুব' গান ধরিয়া
ময়ূর মাতে কি রঙ্গে!
"বুম্‌বসার" "বুম্‌বসার"
নকুলভায়া গান ধরে,
কাঠবিড়ালী বলছে ডেকে
মদের গ্লাসটা নাও ভরে।
'টিউডোই' 'টিউডোই'
শশক বুঝি গান করে।

মাদল বাজায় ক্ষেত-ইঁদুরে
নকুল হ'ল যাদুকর
কাঠবিড়ালী মদ বিলায়
ভেরী বাজায় শশকবর।

কন্ধা, পরজা এবং অন্যান্য যে সকল উপজাতীয় লোক ময়ূরভঞ্জের অভ্যন্তর প্রদেশে ও মহানদীর তীরে এবং চিল্কা হ্রদের তীরে বাস করে তাদের মধ্যেও এই ধরনের সঙ্গীত প্রচলিত আছে। এই সকল অঞ্চলের অনেকগুলিতে এখনও ঘা দিয়ে লোক-সঙ্গীতের রস-সম্পদ আহরণের চেষ্টা হয় নি। শান্তিনিকেতনে ডক্টর কুঞ্জবিহারী তাঁর অঞ্চলের লোক-সঙ্গীত সম্বন্ধে সুষ্ঠু ভাবেই আলোচনা করেছেন।

রাজস্থানী লোক-সঙ্গীত

রাজস্থানী হচ্ছে বিভিন্ন উপভাষার—'ডিলি'ও তার অন্তর্ভুক্ত—সাধারণ নাম। রাজস্থানের লোকসঙ্গীতসমূহ অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। ওখানে যে সকল জাতির বাস তারা হচ্ছে তীরন্দাজ ভীল, অপরাধপ্রবণ কাঞ্জার, এবং "দেবী"-উপাসক 'গরিয়া লোহার'—শেষোক্তরা হচ্ছে এক শ্রেণীর বেদে উপজাতির লোক। একটি বিখ্যাত রাজস্থানী (মাড়োয়ারী) বিবাহ সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাচ্ছে :

সাদা কি, ওগো সাদা কি,
জঙ্গলের তুলো সাদা
সাদা প্রভু সূর্য্যদেবের ঘোড়া,
সাদা তাঁর পত্নী রাইনাদের দাঁতগুলো
উদীয়মান সূর্য্য সাদা
ডুবে-যাওয়া রবি কিন্তু সিঁদুররাঙা
গোরুগুলো গিয়েছিল চরতে
পাখীরা চলে গেল সুদূরে
ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যত সব
হ'ল প্রতিপালিত সুচারুরূপে।
ওগো প্রিয় বন্ধু, আমার বাপের বাড়ীতে
বাজে মাদল।

লাল কি, ওগো লাল কি
চুড়িগুলির লাক্ষা লাল,
লাল প্রভু সূর্য্যদেবের অশ্ব
লাল তাঁর পত্নী 'বহু রাইনাকের চক্ষু দুটি'
উদয়ীমান সূর্য্য সাদা
ডুবে যাওয়া সূর্য্য সিঁদুররাঙা
রক্তরাঙা মুদে আসা নলিনী।
গোরুগুলি গিয়েছিল চরতে
পাখীরা উড়ে চলে তাদের পথে
আচার অনুষ্ঠান যত হ'ল প্রতিপালিত
ওগো বন্ধুরা, আমার বাপের বাড়ীতে
বাজে মাদল।

উদয়পুরের হিন্দী বিদ্যাপীঠে মোতীলাল মেনারিয়ার উপযুক্ত পরিচালনাধীনে ফুলাজী মীনা কর্ত্তৃক রেকর্ড করা শত শত ভীল গীত আমি পড়েছি এবং শুনেছি। একটি ভীল লোকসঙ্গীতে পাই তেজা ভীলের কাহিনী—খুব ভোরবেলা সে রওনা হ'ল বাড়ী থেকে—সঙ্গে তার তরুণী বধূ। গাঁয়ের সকল লোকে তাকে যেতে বারণ করল—কেননা সোমা নদীতে সেদিন বান ডেকেছে, কিন্তু কারুর মানা শুনল না সে—ফল হ'ল কি? নদী গ্রাস করে ফেলল তেজা আর তার স্ত্রী দু'জনেই। কবিতাটি ছোট, কিন্তু বড়ই মর্ম্মস্পর্শী এবং শোকাবহ।

ছত্রিশগড়ের গোন্দ-সঙ্গীত

গোন্দ এলাকায় আমি ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছি এবং রাতভোর গান করতে শুনেছি মারিয়া বিয়ের দলকে। শুনেছি রাজগোন্দ সম্প্রদায়ের এক অন্ধ চারণকে এমন সব লোকসঙ্গীত গাইতে—যাতে প্রতিফলিত হয়েছে সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহের রূপ—যেমন রিক্রুটিং অফিসার কর্ত্তৃক শ্রমিকদের চা বাগানে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কিশোরদের "ঘটুল" সঙ্গীত এবং 'দাদারিয়াজ' ও ভজুলি সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। ড. ভেরিয়ার এলউইন এই অঞ্চল সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর বইগুলিতে।

গোন্দরা বাস করে শহরের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং দুইটি যুদ্ধের অন্তর্ব্বর্তীকালে তারা হয়েছিল বিপর্য্যস্ত। অনেক মোচড় খেতে হয়েছে তাদের চিন্তাভাবনাহীন সরল জীবনকে। মারিয়া লোকগীতিসমূহে দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্র্য-পীড়িত লোকেদের উল্লেখ আছে প্রচুর। বিভিন্ন ফসলকাটার উৎসব এবং মহুয়া-সঞ্চয়ন, ব্যাধি নিরাময় করা এবং অতি-প্রাকৃত শক্তিনিচয়ের তোষণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, এমনকি কামনাতুর প্রণয়ের খোলাখুলি প্রকাশ সম্বন্ধে পর্য্যন্ত বহু সঙ্গীত প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে।

আসাম উপজাতীয় লোকে পূর্ণ—যেমন নাগা, আঙ্গামী নাগা, কাছারী, গারো খাসিয়া ইত্যাদি। "তারা তাদের তাঁতে কবিতা বোনে"—গান্ধীজী তাদের সম্বন্ধে বলতেন এই কথাগুলি। তারাও নাচে গায় এবং বিভিন্ন ঋতু-উৎসবে এবং আধা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে ফুর্ত্তি আমোদ করে। প্রাচীন

কামরূপের পেছনের সমাজতাত্ত্বিক বিন্যাসের প্রশংসনীয় আলোচনা পাওয়া যাবে পরলোকগত ড. বাণীকান্ত কাকতির "দি মাদার গডেস অব কামাখ্যা" নামক পুস্তকে। উপ-জাতীয়দের লোকসঙ্গীত লিপিবদ্ধ করার দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই অঞ্চলের অধিকাংশই এখনও রয়ে গেছে অনবেক্ষিত। ভারতীয় বিদ্বানগণ এখনও পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ ভাবে এই ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করেন নি।

এই প্রবন্ধ অন্ততঃ কয়েকজনকে এ বিষয়টি শুধু সখ হিসাবে (যেমন আমার আছে) জীবনের প্রিয়বস্তু রূপে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করুক। এবং মহারাষ্ট্রের ডোঙ্গ, গুজরাটের ভীল, দক্ষিণের টোডা, বিহারের সাঁওতাল এবং হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন পার্ব্বত্য জাতির লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে অধ্যয়ন এবং আলোচনায় তাঁরা প্রবৃত্ত হোন্।

ছত্রিশগড়ের, মারিয়া উপজাতিদের লোকসঙ্গীত

মহাজনের অত্যাচারে জর্জ্জরিত আদিবাসীদের গভীর বেদনা ব্যক্ত হয়েছে এই লোকসঙ্গীতে :—

আমাদের গাঁয়ের মহাজন, সেই মহাজন
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে!
অন্তরে তার অবহেলা, রসনায় তার প্রতারণা
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে!
তার নিক্তিতে ফাঁকি, ওজনেও তার ফাঁকি
ওগো মেয়ে ওগো মেয়ে
দিন রাত সে সব আমাদের নিচ্ছে লুটে,
লুঠ করছে সব —
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে—
ঋণ আমাদের জড়িয়ে ফেলেছে,
ঋণ আমাদের করেছে অভিভূত
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে
বলদগুলো নিয়ে গেছে সেই মহাজন
ওগো মেয়ে ওগো মেয়ে
শূন্য লাঙ্গলগুলো করবে কি,
করবে কি শূন্য লাঙ্গল
ওগো মেয়ে ওগো মেয়ে
এর চেয়ে মৃত্যুই যে ছিল ভালো,
কিই বা হ'ত যদি
মরে যেতাম আমরা
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে।
আমাদের গাঁয়ের সেই মহাজন,
সেই মহাজন
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে।
অন্তরে তার অবহেলা
রসনায় তার প্রতারণা
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে।

টোডা প্রণয়-সঙ্গীত

টোডারা নীলগিরির একটি আদিম জাতি। এখানে তাদের একটি লোকসঙ্গীতের নমুনা দেওয়া হ'ল :—

যদি তুমি আমায় বিয়ে করো—
তবে, একই আকারের এবং রঙের যুগল পত্রের মতো
এক হয়ে যাবো আমরা। তাই এসো।
একই গাছের শাখা থেকে যেমন করে তৈরি
হয় দুটি মোষের মুর্ত্তি
তেমনি করে মিলব আমরা। তাই এসো।
চল আমরা যাই ওখানে ওই পিপার মত
গৃহে। এসো।
এক কুঁড়েঘর ভরতি ছেলেপুলের জন্ম দেবো আমরা
এসো।
খোঁয়াড় ভরা মোষ পালব আমরা। এসো।
বাক্স ভরতি টাকা হবে আমাদের। এসো।
যেভাবে থাকব আমরা সেভাবে বাস করে নি
কখনো কেউ। এসো।
আমাদের বাপঠাকুরদার মত থাকব আমরা। এসো।
পুরনো কালের মত থাকবে আমাদের
মোষের পাল। এসো।
বুভুক্ষু মানুষকে দেবো আমরা খাদ্য এবং
প্রীতি। এসো।
তৃষ্ণার্ত্তকে দেবো আমার দুধ আর ভিক্ষা। এসো।
সবাইকে অনুরোধ করব আমরা মিলিত হতে
আমাদের মন্দিরের কাছে। এসো।
ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরব আমরা। এসো।
নক্সা-তোলা কাপড় পরব আমরা। এসো।
একত্রে, আলাদা ভাবে নয়, আমাদের দিন গুনব আমরা।
এসো।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মৃত্যু-রহস্য

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেহত্যাগ করেন ৩১শে আষাঢ় শক ১৪৫৫, ইং ৯ই জুলাই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র। কিন্তু আজও জনমনে এই প্রশ্ন জাগে যে, তাঁহার দেহাবসান প্রকৃত-পক্ষে কিভাবে ঘটিয়াছিল। এই জড়-জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু যে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহসহ শ্রীজগন্নাথের অথবা শ্রীগোপীনাথের বিগ্রহের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছিলেন, ইহা নির্ভর-যোগ্য ঘটনা কিনা, এ প্রশ্ন আজও সাধারণ ভক্তগণের, বিশেষতঃ ঐতিহাসিকগণের মনে উঁকি মারে। অন্ধ বিশ্বাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া, মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের ঘটনাটির সহিত বাস্তব ও সত্যের কি সমন্বয় থাকিতে পারে তাহা উদ্ঘাটিত হওয়া কর্তব্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও দৈহিক মৃত্যু হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, যদুবংশ ধ্বংস হইবার পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে আসিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করেন। মতান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ শায়িত ছিলেন এবং হৃদবস্থায় এক ব্যাধের শরাঘাতে তাঁহার দেহাবসান ঘটে। এই উভয় প্রকার মৃত্যুই নরদেহধারীর পক্ষে অসম্ভব নহে। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর দ্বারকাতেই তাঁহার শেষকৃত্যাদি নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভুর দেহ অকস্মাৎ বিগ্রহমধ্যে অদৃশ্য হওয়া কি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা?

প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন, "মহাপ্রভুর সঙ্গোপন-লীলা দুঃখময়পূর্ণ হইলেও এক্ষণে শিক্ষিতসমাজের তাহার বিশদ বিবরণ জানিতে প্রবল বাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—স্বয়ং ভগবান। তাঁহার লীলা-কথার যতই আলোচনা হইবে, যতই বিচার বিশ্লেষণ হইবে, ততই জীবের পরম মঙ্গল হইবে।···মহাপ্রভুর সঙ্গোপন-লীলার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলেই বা ক্ষতি কি?"

প্রধানতঃ ঠাকুর লোচন দাস ও জয়ানন্দ তাঁহাদের চৈতন্য-মঙ্গলে, নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এবং মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার অমিয়-নিমাই চরিতে মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রধান প্রধান বৈষ্ণব-গ্রন্থে যথা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অথবা বৃন্দাবন দাস কৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধে কোনকিছুরই উল্লেখ নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহাদের ন্যায় একনিষ্ঠ গৌরাঙ্গ-সাধক মহাপ্রভুর একান্ত হৃদয়বিদারক মৃত্যু-কথা লিপিবদ্ধ করিতেও দ্বিধাবোধ করিয়াছেন। সেই কারণেই দেখা যায় যে, মহাপ্রভুর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ারও অন্তর্ধান বৃত্তান্ত অনুরূপ অস্পষ্ট ভাবেই বৈষ্ণব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, এক দিন তিনি তাঁহার একমাত্র প্রিয় সহচরী কাঞ্চনমালার সহিত নবদ্বীপে স্ব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি দর্শন করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইল, গৌরাঙ্গমূর্তি সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া সেই অতি শুভ মুহূর্তে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তিতে লীন হইলেন।

এখানেও বিষ্ণুপ্রিয়ার নশ্বর দেহের পরিণতি অথবা তাঁহার দেহের শেষকৃত্যাদি সম্বন্ধেও কোন গ্রন্থে কোনরূপ উল্লেখ নাই। অতএব দেখা যায় যে, কোন কোন বৈষ্ণব-কবি শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ও দেবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই মহাপ্রভু ও বিষ্ণু-প্রিয়ার নশ্বর দেহ দুইটির শেষ পরিণতি সম্বন্ধে কোনরূপ তথ্যাদির উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু এই তথ্য গোপন না রাখিলে বা উল্লেখ করিলে যে তাঁহার অবতারত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে এমন নহে। যে সমস্ত বৈষ্ণব-সাধক এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোকপাত করিয়াছেন, তাঁহারাও একনিষ্ঠ গৌরভক্ত। এখন, যে সমস্ত বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতবাদের সমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন (খ্রীঃ ১৪৮৬-১৫৩৩)। তন্মধ্যে চব্বিশ বৎসর তিনি নবদ্বীপে ছিলেন। তৎপরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ছয় বৎসর দক্ষিণ-ভারত, দ্বারকা ও বৃন্দাবন প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থে পদব্রজে ভ্রমণ করেন ও অবশিষ্ট ১৮ বৎসর নীলাচলে বাস করেন।

> "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
> অষ্ট-চল্লিশ বৎসর প্রকট-বিহরি॥
> চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈলা গৃহ-বাস।
> নিরন্তর কৈলা কৃষ্ণ-কীর্তন প্রকাশ॥
> চব্বিশ বৎসর শেষে করিলা সন্ন্যাস।
> চব্বিশ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥
> তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
> কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
> অষ্টাদশ বৎসর রহিল নীলাচলে।
> কৃষ্ণ-প্রেম নামামৃতে ভাসাল সকলে॥"
>
> শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মহাপ্রভুর শেষ কয়েক বৎসর অহরহ প্রেমোন্মাদ অবস্থায়

কাটিয়াছিল। মূর্চ্ছা, উদ্দণ্ড-নৃত্য, আবেশ ও উন্মাদনা এই অবস্থাগুলি তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। এই সময়ে তিনি কখনও বা গম্ভীরার দেয়ালে শ্রীকৃষ্ণচরণভ্রমে নিজ মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করিয়া রক্তাক্তকলেবর হইতেন, কখনও বা চটক পর্বত দর্শনে গিরি-গোবর্দ্ধন ভ্রমে আনন্দ-নৃত্য করিতেন, কখনও বা যমুনাভ্রমে সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত হইতেন, কখনও বা জগন্নাথ-মন্দিরের তিলঙ্গা গাভীগণের সহিত রাখালভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন, আবার কখনও বা শ্রীরাধাভাবে বিভোর হইয়া প্রেম-লীলা কীর্ত্তন করিতেন। তৎকালে তাঁহার দেহবোধ একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল বলিলেই হয়। এই সময়ে স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ও গোবিন্দ দিবারাত্র তাঁহার দেহরক্ষীর কার্য্য করিতেন। তৎকালে তাঁহাকে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকৃত প্রেম-গীতিকাব্য শুনাইলে তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইতেন এবং তাঁহাকে সুস্থ রাখিবার জন্য স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ সর্ব্বদাই উক্ত বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদাবলী শুনাইতেন।

এই সময়ে এক দিন, সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ দিন, (৩১শে আষাঢ় ১৪৫৫ শক, ইং ৯ই জুলাই ১৫৩৩) তিনি কাশী মিশ্রের গৃহে আকুল আবেগে কৃষ্ণ-বিরহ কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ নীরব হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে বিষাদ-কালিমা, বেগে নয়নাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া উন্মাদের ন্যায় জগন্নাথ-দর্শনে চলিলেন।

"হেনকালে মহাপ্রভু কাশী মিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবনকথা কহে বাঢ়িল অন্তরে॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে গিয়া উত্তরিল সিংহদ্বারে॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবস।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাস॥"

—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ঠাকুর শ্রীলোচন দাসের মতে মহাপ্রভু সেদিন উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া জগন্নাথের মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইলেন, কিন্তু তিনি যেন সেদিন মন্দিরস্থ জগন্নাথকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। এ কারণ দেখিতে দেখিতে তিনি গর্ভ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দৈবক্রমে তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দ্বার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল। তখন মন্দিরাভ্যন্তরে মহাপ্রভু মাত্র একা। তিনি দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "হে পতিতপাবন, এই কলিহত জীবকে তোমার মধ্যে আশ্রয় দাও।" এই আকুতি ও আত্মনিবেদনের "পর মুহূর্ত্তেই তিনি দারুব্রহ্ম জগন্নাথের বিগ্রহে লীন হইলেন।"

"এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হৃদয়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইল আপনে॥" —শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ঠাকুর লোচন দাস আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু যখন জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে করিতে জগন্নাথের মধ্যে লীন হইলেন তখন "গুঞ্জাবাড়ী" হইতে এক পাণ্ডাঠাকুর উহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। ইহা কোন ভৌতিক ব্যাপার মনে করিয়া পাণ্ডাঠাকুর ভিতর হইতে সত্রাসে চীৎকার করিতে থাকেন। তাঁহার চীৎকারে বাহিরে অপেক্ষমান ভক্তবৃন্দ দ্বার ঠেলিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে সকলেই হায় হায় করিয়া উঠিলেন। সকলেই দেখিলেন মহাপ্রভু আর নাই। তিনি জনমের মত এই মর্ত্যজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন এমনকি তাঁহার নশ্বর দেহটি পর্য্যন্তও লুপ্ত হইয়াছে।
পাণ্ডাঠাকুর তখন সাশ্রুনয়নে বলিলেন—

"ভক্ত ইচ্ছা দেখি কাছে পড়িলা তখন।
গুঞ্জ বাড়ীর মধ্যে প্রভু হৈলা অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিনু গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥"

—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

আবার নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে অন্যরূপ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মহাপ্রভু বেলা দ্বিপ্রহরে স্নানের জন্য সমুদ্রতীরে গমন করেন। কিন্তু তিনি সমুদ্রজলে না না নামিয়া সোজা সৌজা গোপীনাথের মন্দিরের দিকে চলিয়া যান এবং মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেন। গদাধর পণ্ডিত তখন গোপীনাথের পূজারত ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার কানে কানে কি কথা বলিলেন ও তৎপরে অকস্মাৎ গোপীনাথ বিগ্রহের সহিত লীন হইলেন। এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া গদাধর পণ্ডিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে গোপীনাথ আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের মধ্যে কথোপকথন প্রসঙ্গে এইরূপ বর্ণিত আছে:

"শুন নরোত্তম এইখানে গৌর হরি।
কি জানি কি গদাধরে কহিল ঠারি ঠারি॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয়॥
ন্যাসী চূড়ামণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
অকস্মাৎ পৃথিবী হইল অন্ধকার॥
প্রবেশিয়া এই গোপীনাথ মন্দিরে।
হ'ল অদর্শন পুনঃ না আইল বাহিরে॥
প্রভু সঙ্গোপন সময়েতে হ'ল যাহা।
লক্ষ মুখ হইলেও কহিতে নারি তাহা॥
এইখানে গদাধর হৈল অচেতন।
এথা সব মহান্তের উঠিল ক্রন্দন॥" —ভক্তিরত্নাকর

চৈতন্যমঙ্গলেও এই উক্তির সমর্থন আছে, যথা:

"কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি সরে।
মহাপ্রভু হারাইলাম গোপীনাথ ঘরে॥"

মহাপ্রভুর জগন্নাথ অথবা গোপীনাথের বিগ্রহের সহিত লীন হওয়ার উক্ত দুই প্রকার মতবাদ ব্যতীত ইহাও জনশ্রুতি আছে যে,

তিনি সমুদ্রগর্ভে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। কেননা তিনি বহু বার যমুনা-ভ্রমে সমুদ্রজলে ঝম্প-প্রদান করিয়াছিলেন এবং একবার সারারাত্রি যোগ-মূর্চ্ছায় সমুদ্রজলে ডুবিয়া ছিলেন। পরদিন প্রভাতে জেলের জালের সহিত তাঁহার দেহ সমুদ্রগর্ভ হইতে তীরে উঠিয়া আসিয়াছিল। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :

"শরজ্জ্যোৎস্না সিন্ধোরব কলনয়া জাত যমুনা—
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচী সূনুরিহ নঃ।"

অর্থাৎ, যিনি শরৎকালীন জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত সমুদ্র-দর্শনে যমুনাভ্রমে আকুল আবেগে ধাবিত হইয়া কৃষ্ণ-বিরহ-তাপ রূপ সমুদ্র-মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া তজ্জলে সারারাত্রি বাস করিয়াছিলেন এবং পরদিন প্রভাতে ভক্তগণ কর্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—সেই শচীনন্দন আমাদিগকে রক্ষা করুন।

মহাপ্রভুর এইরূপে বারংবার সমুদ্রে ঝম্প-প্রদানের দৃষ্টান্ত হইতে অনেকের এই ধারণা পোষণ করাও অসঙ্গত নহে যে, তিনি হয়ত সমুদ্রগর্ভেই বিলীন হইয়াছেন।

কিন্তু জয়ানন্দ নিজ চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধে একটি নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেবের রথের পুরোভাগে মহাপ্রভু উদ্দাম নৃত্য করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পদতলে পথের পাথুরে খোয়া বিদ্ধ হইয়া একটি গভীর ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত হইতে অতিরিক্ত রক্তমোক্ষণ হইতে থাকে। কিন্তু মহাপ্রভুর তখন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। কেননা ঐ সময়ে প্রতি বৎসর নবদ্বীপ ও শান্তিপুর হইতে প্রায় তিন শতাধিক ভক্ত আসিতেন। সেই সমস্ত স্বজন ও অন্তরঙ্গগণ সহ তিনি আত্মহারা হইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিতেন। তদুপলক্ষে তিনি প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ এক কীর্তনের শোভাযাত্রা বাহির করিতেন। ঐ দল সাতটি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটির পুরোভাগে অদ্বৈত-প্রভু, নিত্যানন্দ-প্রভু, ঠাকুর হরিদাস, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, রাঘব পণ্ডিত ও গদাধর পণ্ডিতকে রাখিতেন। এই সাতজন বৈষ্ণব-চূড়ামণির নেতৃত্বাধীনে সাত সম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব প্রেম-কীর্তন সারা নীলাচল প্রকম্পিত করিয়া তুলিত। এই কীর্তনকালে মহাপ্রভুর পদের ক্ষতের কি হইল না হইল তাহা তাঁহার নিজের অথবা অপর কাহারও লক্ষ্য হয় নাই।

রথযাত্রার উৎসব সমাপ্তির পর ভক্তবৃন্দ তাঁহার পদের ঐ ক্ষত লক্ষ্য করেন। ঐ ক্ষত বিষাক্ত হইয়া যায় ও তাঁহার জ্বর হইতে থাকে। ঐ ক্ষত-জ্বর হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহা অতি সাধারণ এবং নরদেহধারী অবতারেরও লৌকিক মৃত্যুর নির্ভর-যোগ্য ঘটনা।

চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল ১৬শ শতকের সপ্তম দশক। জয়ানন্দ মহাপ্রভুর নীলাচল বাসকালে জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যু-কালেও যে নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একারণ জয়ানন্দের উক্তি নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরা যায়।

মহাপ্রভুর এই ক্ষত-জ্বরে মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে ড. শ্রীসুশীলকুমার দে জয়ানন্দের উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া এবং মহাপ্রভুর শেষ জীবনের করুণ কাহিনীর কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

"Sree Chaitanya's emotions grew in intensity and became characterised by excess of stupor, trances and frenzied energy, verging upon hysteria and dementia. To the faithful the last twelve years of his life consist of an orgy of devotional passion of an exclusive madness of Divine love (Premonmada). Day by day he became incapable of taking care of himself, but he was watched and tended with loving solicitude by Svarupa Damodara and other intimate disciples. His prolonged emotional experiences of religious rapture must have made extraodinary demands on his highly wrought nervous system, and brought on exhaustion and constant fits of seizure. Under the increasing strain of an impossible emotionalism his physical frame broke down and he passed away in Asadha Saka 1455, June-July 1533 A.D. The piety of his followers has drawn a veil of mystery over the manner of his end; but various legends exist of his disappearance in the temple and in the image of Jagannatha, as well as of his accidental drowning in the sea during one of the frequent fits of ecstasy and even of assassination in the Gundica Temple. One of the less authoritative biographies records perhaps the actual fact of a less sensational but rather common human death by attributing the end to a wound in the left foot, which he received from a stone during one of his usual outbursts of frenzied dancing and

which brought on septic fever resulting in an untimely death."*

ড. দীনেশচন্দ্র সেনও এই কথা সমর্থন করিয়া "শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার যুগ" (পৃ. ২৫৯, পাদটীকা) নামক গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

এখন দেখা যায় যে, ক্ষত-জ্বর হইতেই যে মহাপ্রভুর মৃত্যু হইয়াছিল এ বিষয়ে অনেকেই একমত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জয়ানন্দ এই সাধারণ মৃত্যুর কথা তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে লিপিবদ্ধ করায় বৈষ্ণব-জগতে তাঁহার পুস্তকখানি সমাদৃত হয় নাই। এমনকি তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল পাঠ করাও নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে আমরা নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার মতবাদ পাইয়া থাকি।

১। জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে রথাগ্রে উদ্দণ্ড নৃত্যকালে তাঁহার পদে যে ক্ষত হয় সেই ক্ষত হইতে তাঁহার ক্ষত-জ্বর হয়। এই ক্ষত-জ্বরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

২। জগন্নাথদেবের দারুময় বিগ্রহের মধ্যে তিনি লীন হন।

৩। টোটা গোপীনাথের বিগ্রহমধ্যে তিনি অদৃশ্য হন।

৪। তিনি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হন।

৫। গুণ্ডিচামন্দিরের নিকট তিনি নিহত হন।

আবার এই পাঁচটি মতবাদের মাঝামাঝি আর একটি মতবাদ আছে যাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মতবাদটি এই : নীলাচলে মহাপ্রভুর মৃত্যু হইলে (জয়ানন্দের মতানুসারে) সম্ভবতঃ তাঁহার নশ্বরদেহ গুণ্ডিচামন্দির অথবা টোটা গোপীনাথের মন্দির-সংলগ্ন কোন স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল—অর্থাৎ, যেভাবে মহাপ্রভু স্বহস্তে বড় হরিদাসের সমাধি সমুদ্রতীরে দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এই সমাধির কথা বৈষ্ণব-কবিগণ সরাসরি প্রচার অথবা স্বীকার না করিয়া জগন্নাথ অথবা মতান্তরে গোপীনাথের সহিত তাঁহার লীন হওয়ার ইঙ্গিত মাত্র করিয়া হয়ত বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদের এক সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিকগণ শেষোক্ত মতবাদের মধ্যেও কিছু সত্যের সন্ধান পাইবেন আশা করি।

* Vaisnava Faith and Movement, pp. 76-7.

তারার জগৎ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

অনেক তারার হদিস মিলেছে, এখনো অনেক—অনেক বাকী ;—
তারায় তারায় ফিরিছে নয়ন,—তারায় তারায় ভরিছে আঁখি।
ও-ই যে অথই নিথর ইথরে প্রবাহ তুলিয়া আসিছে দ্যুতি,
এ মনের চোখে অচেনা লোকের ঘনায়ে তুলিছে কি অনুভূতি!
প্রকাশ-প্রয়াস—বিফল কেবল, কণার কণাও পড়ে না ধরা ;—
মনেরে ভুলায়—ভুলায় শুধুই জ্যোতির সাগর তারায় ভরা।
বসুন্ধরার বুকে সে ছোঁয়ায় জ্যোতির্ময়ের প্রীতির শিখা ;
আমার প্রাণের পরতে পরতে লিখিছে প্রেমের অনাদি লিখা।
নিবিড় গভীর গোপন আঁধারে দীপালি জ্বালায়ে ধেয়ায় কারে ?
কোন্ সে প্রিয়ের লীলায় হাসিটি ফোটে শত কোটি তারার ঠারে!

মাটির মানুষ আকাশ-পারের ইশারা পেলেই ভোলে যে মাটি ;—
মাটির বাটির মধু পান করে, আকাশে তবুও কি হাঁটাহাঁটি ?
জীবনের পরে কাটিছে জীবন, তবুও কিছুতে নেশা কি কাটে!—
জানার জগৎ ছাড়ায়ে সে হয় উধাও অজানা আকাশ-বাটে।
তারার আলোর আকুল তিয়াষা করিল তারে যে পাগল-পারা :
সৃষ্টি-ফাঁদের বাঁধন কাটিয়া হয় সে শুধুই সৃষ্টি-ছাড়া।
কায়ার মায়ায় মুগ্ধ এ মন মাটিতে যতই লুটায়ে পড়ে,
লক্ষ তারার আলো বার বার কার উৎসব-মশাল ধরে!
এ মহাজড়ের পাহারা এড়ায়ে জ্যোতির্ময়ের বাসরে ফিরে
আঁখি-তারা তার তারায় তারায় তাই কি হারায় তিমির-তীরে!

চন্দননগরের পুরনো কথা

শ্রীহরিহর শেঠ

সিপাহী-বিদ্রোহের ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে পলাশীর যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা যে ব্রিটিশ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল সেকথা এই ১৯৫৭ সনে অনেকেরই মনে না আসিয়া পারে না। চন্দননগরে বসিয়া ১৯৫৭ সনের ২৩শে মার্চ্চের কথা আজ স্মরণ হইতেছে।

সেকালে নিভৃত সুপ্ত পল্লী চন্দননগরের জাগরণের পর যখন ইহা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত তখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ভারতের অদ্বিতীয় নগরী কলিকাতা একটি সামান্য পল্লীমাত্র ছিল। তখন এই চন্দননগর এ প্রদেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে একটি কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। দুই সহস্রাধিক ইষ্টক-নির্ম্মিত বাসগৃহ-সম্বলিত এক লক্ষ তিন সহস্র লোকের বসতিপূর্ণ গঙ্গাতীরস্থ এই স্থানটি একটি শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হইয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জাতির ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল।

ব্রিটিশ জাতির প্রধান প্রতিনিধিরূপে এখানে তখন লর্ড ক্লাইভ অবস্থান করিতেছিলেন। ভারতীয় সৈন্যের দ্বারা ভারত বিজয়—তদানীন্তন চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা ডুপ্লের পরিকল্পিত এই রাজনীতি তিনি গ্রহণ করেন। তখনই চন্দননগরের উপর প্রথম তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয় এবং আক্রমণের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে থাকেন। এ কথাও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, চন্দননগরেই তাঁহাদের ভাগ্যপরীক্ষা হইবে। অভিযানে বাহির হইবার প্রাক্কালে স্পষ্টভাবে এই কথা বলিয়াই পাদক্ষেপ করেন যে, হয় চন্দননগরেই তাঁহাদের শেষ, আর যদি শেষ না হয় তাহা হইলে সেইখানেই নিরস্ত হওয়া চলিবে না, তথা হইতে পুনরায় আরম্ভ হইবে তাঁহাদের অগ্রগতি।

যথাসময়ে জলপথে ভাগীরথীর উপর দিয়া টাইগার কেণ্ট স্যালিসবারি প্রভৃতি রণতরী লইয়া কর্নেল ওয়াটসন এবং স্থলপথে ক্লাইভ স্বয়ং সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে চন্দননগরে আসিয়া পৌঁছেন। সুপ্রসিদ্ধ অর্লেয়াঁ দুর্গের পাদমূলে ১৭৫৭ সনের ২৩শে মার্চ্চ যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধের কাহিনী ইতিহাস-পাঠকদিগের নিকট অবিদিত নাই। বিশ্বাসঘাতক টেরেণুর সহিত ষড়যন্ত্রের ফলে একপ্রকার বিনাযুদ্ধেই অর্লেয়াঁ দুর্গ অধিকার তথা চন্দননগর-বিজয় ঘটে। আর

"অর্লেয়াঁ দুর্গসমীপে টাইগার, কেণ্ট ও স্যালিসবারি রণতরী"
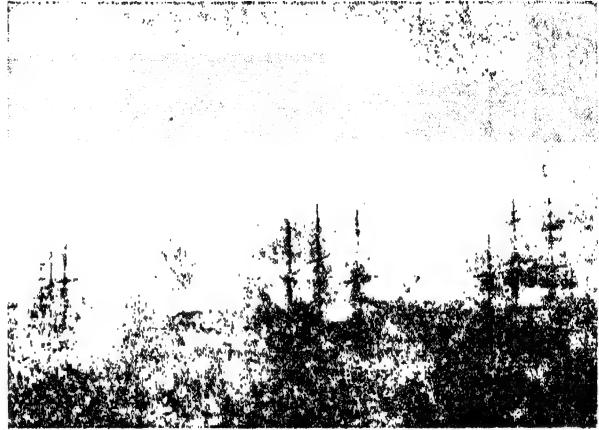
গৌরহাটীস্থ ডুপ্লের পল্লীভবনের নিকট সার্ আয়ার কুটের অধিনায়কত্বে সৈনিকবাহিনীর কিছুদিন অবস্থিতির পর তথা হইতেই পলাশীযাত্রা সুরু হয়।

পলাশীর প্রাঙ্গণেই ইংরেজের ভারত-বিজয়ের প্রথম ও প্রধান সোপান নির্ম্মিত হয়। আর ভারত-বিজয়ের ফলেই জগতে ব্রিটিশ জাতি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

ফ্রান্সের পরাজয়ের পর প্যারিসের সন্ধির সর্ত্তানুসারে ১৭৬৩ সনে চন্দননগর ইংরেজ কর্তৃক ফরাসীদের নিকট প্রত্যর্পিত হইল বটে, কিন্তু সেই দিন হইতেই ভারতে ফরাসীদের অভ্যুত্থানের পথ অবরুদ্ধ হয়। আরও তিন বার অবশ্য ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক বারই চন্দননগর ইংরেজ-কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। শেষবার
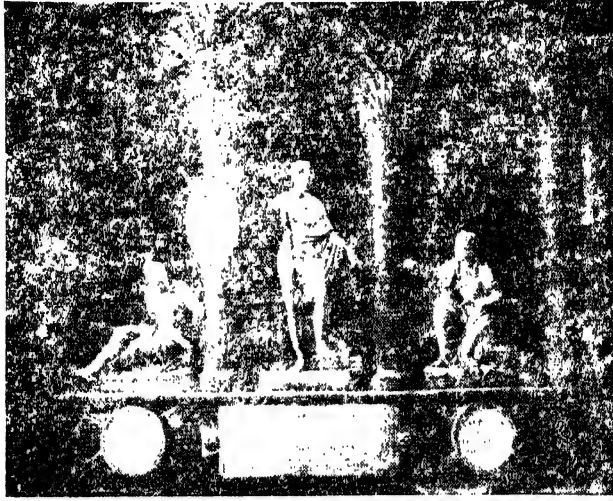
"ওয়াটসনের এক দিকে শৃঙ্খলিত চন্দননগর এবং অন্য দিকে মুক্ত কলিকাতা"

(ওয়েষ্ট মিনষ্টার এবেতে রক্ষিত প্রস্তরমূর্ত্তি)

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ফরাসীদের নিকট পুনরায় প্রত্যর্পিত হয়।

ক্লাইভ একদিন সদম্ভে বলিয়াছিলেন—তাঁহারা বাহুবলে ভারত জয় করিয়াছেন, বাহুবলেই তাহা রক্ষা করিবেন। তাহার পর দেড় শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ ভারতে ইংরেজ কোথায়, ফরাসী কোথায়? কীর্ত্তি এবং অপকীর্ত্তি উভয়ই রাখিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে। আজিও ইংরেজের চন্দননগর বিজয়-স্মৃতি আর্লেয়ী দুর্গ-মাপে টাইগার, কেন্ট ও স্যালিসবারি রণতরীত্রয়ের আলেখ্য গ্রীণউইচের যাদুঘরের কক্ষপ্রাচীরে বিলম্বিত রহিয়াছে, আর পাষাণ-রচিত,—কর্ণেল ওয়াটসন এবং শৃঙ্খলিত চন্দননগর আজও বিলাতের ওয়েষ্টমিনস্টার এবিতে বিরাজিত আছে।

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :—

ফরম্ নং ৪

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশিত হওয়ার স্থান— কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)

২। কিভাবে প্রকাশিত হয়— প্রতি মাসে একবার

৩। মুদ্রাকরের নাম— শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
জাতি ভারতীয়
ঠিকানা ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯

৪। প্রকাশকের নাম ঐ
জাতি ঐ
ঠিকানা ঐ

৫। সম্পাদকের নাম শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
জাতি ভারতীয়
ঠিকানা ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯

৬। (ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
ঠিকানা ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
এবং
(খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারীদের নাম-ঠিকানা—

১। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
২। মিসেস্ অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৩। মিস্ রমা চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৪। মিস্ সুনন্দা চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৫। মিসেস্ ঈপ্সিতা দত্ত
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা-৯
৬। মিসেস্ নন্দিতা সেন
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৭। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৮। মিসেস্ কমলা চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৯। মিস্ রত্না চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
১০। মিস্ অলোকানন্দা চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
১১। মিসেস্ লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা-৯

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ—২৫।২।১৯৭৭ ইং প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—কলিকাতা অধিবেশন

ডক্টর শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস

এবারে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন বসেছিল কলিকাতায় বালীগঞ্জ সারকুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেছিলেন পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু। তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সমবেত বৈজ্ঞানিকগণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। যে ধরনের গবেষণার হিংসাত্মক কার্যের ইন্ধন যোগায়, বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদিগকে তিনি তার প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করেন এবং মানব-সভ্যতার উৎকর্ষসাধন করবার জন্যই যে বিজ্ঞান-সাধনার প্রয়োজন—এই সত্য প্রচার করতে উপদেশ দেন। তাঁর মতে বিজ্ঞানকে কোনক্রমেই ঘৃণা ও হিংসার ভাবধারার সহিত বিজড়িত রাখা সমীচীন নয়। বিজ্ঞানীদের পক্ষে কেবল সত্য আবিষ্কার করে শক্তির সন্ধান দেওয়াই কর্তব্য এটা ঠিক নয়। এই শক্তিতে ধ্বংস আসবে কি মানবজাতির কল্যাণ সাধিত হবে তাও বৈজ্ঞানিকদের অনেকাংশে নিরূপণ করতে হবে। রাজ্যপাল শ্রীপদ্মজা নাইডু উপস্থিত দেশীয় এবং বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে এক প্রারম্ভিক ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, আজ বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের সমবেতভাবে এই প্রতিজ্ঞাই করা উচিত যে, বৈজ্ঞানিক সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা মানব-কল্যাণই যেন সাধিত হয় এবং মারণাস্ত্র প্রস্তুতে উহা ব্যবহৃত না হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত বলেন, মানবজাতির সুখ-সমৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আবশ্যক। বিজ্ঞানী তাঁর আবিষ্কার দিয়ে মানবজাতির ঐশ্বর্য এবং সুখ বৃদ্ধি করেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত শক্তি শান্তির পথে যাতে চালিত হয় তার জন্য এবং যুদ্ধ, গৃহবিবাদ প্রভৃতি বন্ধ করতে রাজনীতিবিদ্‌গণের সাহায্য চাই।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় একটি সুদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। ডাঃ রায় তাঁর ভাষণে বলেন, দেশ আজ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ করেছে। এই নূতন পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হলে বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার এবং কারিগরের প্রয়োজন হবে। বৈদেশিক উপদেষ্টাদের কাছ থেকে সাহায্য পেলেও দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণকে সবকিছু আয়ত্ত করে নিতে হবে। দেশীয় কাঁচামাল প্রভৃতি ব্যবহার করে পরিকল্পনাটি যাতে দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে যায় সে বিষয়ে সকলকে অবহিত হতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিগত চল্লিশ বৎসর ধরে এদেশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা চলছে, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রবিদ্যায়—বিশেষ করে নক্সা তৈরি, যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন, নির্মাণ ও সংস্থাপন প্রভৃতি বিদ্যায় তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। ভারতবর্ষের মত দেশে কেবল যন্ত্রপাতি তৈরি করলেই চলবে না—আমাদের দেশীয় সরঞ্জাম ও উপকরণ প্রভৃতির সাহায্যেই যাতে যতদূর সম্ভব যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা নির্মিত হয় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। ডাঃ রায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রবিদ্‌গণকে অল্প ব্যয়ে কার্যগুলি সম্পন্ন করবার উপায়সমূহ নির্দ্ধারণ করবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। বৈজ্ঞানিক পন্থায় সস্তায় কাঁচামালসমূহ উৎপাদন করতে পারলে সামগ্রিক ব্যয় যথেষ্ট লাঘব করা যেতে পারবে।

অবশেষে ডাঃ রায় বলেন, আমরা এখন এক নূতন যুগে বাস করছি, তাকে আণবিক যুগ বলে। বিজ্ঞান আজ আণবিক বিস্ফোরণের মধ্যে এক অফুরন্ত শক্তির সন্ধান পেয়েছে যার ফল ভাল ও মন্দ উভয়ই হতে পারে। হাইড্রোজেন বোমা মানবজাতির ধ্বংসের কারণ হবে অথবা স্থায়ী শান্তির উপকরণ হবে সে সম্বন্ধে এখনও কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। আণবিক চুল্লি থেকে বহু উপাদান পাওয়া যায় যা গবেষণা, চিকিৎসা, কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান বলে গণ্য হবে। অদূর ভবিষ্যতে আণবিক চুল্লি প্রতিষ্ঠা করে আণবিক শক্তির কারখানাসমূহ গঠিত হবে এবং সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে নূতন শক্তি উৎপন্ন হয়ে মানবসমাজের কল্যাণ সাধন করবে। যেসব দেশে তেল এবং কয়লা সম্পদের ঘাটতি দেখা যাবে সেগুলিতে আণবিক চুল্লির উপযোগী মালমশলা নিয়ে গিয়ে আণবিক শক্তির কারখানা তৈরি করলে বিশেষ সুবিধা হবে।

ডাঃ রায় রাসায়নিক সংশ্লেষণের সাহায্যে যে সমস্ত ঔষধ তৈরী হয়েছে সেগুলির বিষয় উল্লেখ করেন। বীজাণুসমূহের উপর রাসায়নিকের প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য হয়েছে। রাসায়নিক গবেষণার ফলে সিফিলিস, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগের ঔষধ এবং বহুসংখ্যক হরমোণ, ভিটামিন প্রভৃতি ঔষধও আবিষ্কৃত হয়েছে। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করে চিকিৎসা-জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন।

ডাঃ রায়ের মতে কৃষিকর্মীদের অধিকতর ফসল ফলানোর জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপদ্ধতির সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। ভাল সারপ্রয়োগ, বীজসংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার এবং কতকগুলি পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে নূতন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার জন্য কৃষিকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক।

রসায়নশাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন বোম্বাই ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের অধ্যাপক এস. এম. মেটা। অধ্যাপক মেটা তাঁর ভাষণে বলেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে অজৈব রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি দেখা যায় বাংলা দেশেই। এখানে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং তাঁর সহকর্মিগণ বিভিন্ন ধাতুসমূহের নাইট্রাইটস সম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করেন। এর পরে আরও কুড়ি বৎসর বাংলার বাইরে অজৈব রসায়নের প্রসার দেখা যায়। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে অজৈব রাসায়নিকগণের সংখ্যা

নমিতা সিন্‌হা
সর্ব্বদা ব্যবহার করেন
লাক্স টয়লেট সাবান
"এটী যেমন শুভ্র
তেমনিই বিশুদ্ধ"
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্যরক্ষার উপকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। শরীরের লাবণ্য তাঁদের বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করতে হয়। নমিতা সিন্‌হা, বাংলা দেশের উদীয়মানা চিত্রশিল্পী, সর্ব্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করে তাঁর ত্বকের লাবণ্যকে সতেজ সুন্দর রাখেন।
LUX
TOILET SOAP
চিত্র-তারকাদের
সৌন্দর্য্য সাবান
ভারতে প্রস্তুত
LTS. 492-X52 BG
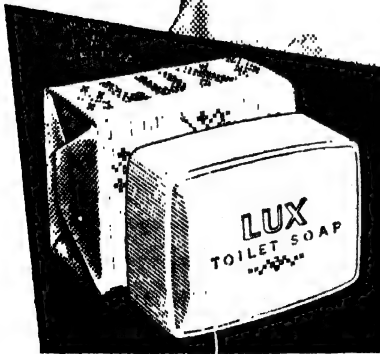
অত্যন্ত কম। ১৯৪৫ সনের আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিত গবেষণার সঙ্গে অজৈব রসায়নে যুগান্তর আসে। আণবিক গবেষণার ফলে রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের নূতন পদ্ধতিসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অজৈব পদার্থসমূহ অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত হয়েছে। পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং ঐ সমস্ত সূক্ষ্মকণার সাহায্যে নূতন পরমাণু সংশ্লেষণেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে—এটাই ছিল একদিন এলকেমিষ্টগণের স্বপ্ন। অধ্যাপক মেটা আরও বলেন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হয়েছে। এখন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের নিকট অনেক সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। অনেকগুলি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। কেবল গবেষণাগার স্থাপিত হলেই চলবে না—যাতে পর্য্যাপ্ত কাজ হয় সেজন্য সরকারকে কয়েক জন সুযোগ্য রাসায়নিকের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে নিযুক্ত করতে হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সর্ আশুতোষের নিকট আমরা ঋণী এবং সর্ জে. সি. ঘোষের নিকটও অনুরূপ সাহায্য আশা করা যায়। উপসংহারে তিনি বলেন, পণ্ডিত জবাহরলালের বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি ও আন্তরিক সহানুভূতির কল্যাণে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সাফল্যলাভ করুক এটাই কাম্য।

পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ কে. আর. দীক্ষিত। তিনি কিউপ্রাস-অক্সাইড রেকটিফায়ারের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি মৌলিক গবেষণামূলক বক্তৃতা দেন।

কৃষি-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর ই. এস. নারায়ণন্। তিনি কীটপতঙ্গকুলের পরজীবী অন্য শ্রেণীয় কীট-পতঙ্গের বিষয় আলোচনা করেন এবং কৃষি-বিজ্ঞানে এদের প্রয়োজনীয়তার বিষয় সমালোচনা করেন।

মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক এস. এম. মহসিন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা দ্বারা মানুষের কর্মক্ষমতা নির্দ্ধারণ করবার যে ব্যবস্থা আছে তা সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ সি. আর. দাশগুপ্ত। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক এবং তাঁদের উপযুক্ত কর্ম্ম-সংস্থান দরকার। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ গবেষণা-কর্ম্মীদের জন্য অনেকগুলি সুবিধার সৃষ্টি করেছে। তিনি গবেষণা-কারীদের জন্য উৎকৃষ্টতর কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সেই সময়ের মধ্যেই আবার শিক্ষণের ব্যবস্থা করারও যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। ডাঃ দাশগুপ্ত ভারতবর্ষের মধ্যে হিম্যাটোলজি সম্বন্ধে প্রথম কর্ম্মীদের অন্যতম এবং এই বিষয়ে মৌলিক গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করেছেন।

শারীর-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সিং। তিনি পেশী সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান যে সব নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছে তার বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, শরীরের বাইরে পেশী সৃষ্টি করা বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হয়েছে, এতে জড় ও জীবনের পার্থক্য ক্রমেই কমে আসবে এবং এই ভাবে এগিয়ে গেলে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে পারবে। তিনি দীর্ঘজীবন লাভের উপায় সম্বন্ধেও কিছু উপদেশ দেন। তিনি বলেন, আধুনিক সভ্যতার চাপে মানব-দেহ অতিরিক্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয় এবং তার ফলে রক্তের আধারসমূহ সঙ্কুচিত হয়ে রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে। পথ্যাদি নির্ব্বাচনের উপরও রক্তাধারসমূহ সক্ষম রাখা বহুলাংশে নির্ভর করে। আধুনিক খাদ্যতালিকার মধ্যে অত্যধিক লবণ এবং কোলেষ্টেরল ঐ সব রক্তাধার সঙ্কুচিত করে। এই রক্তাধারসমূহ সবল ও সক্ষম রাখতে পারলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। ভাত খাওয়া ভাল, কারণ এতে লবণ কম আছে। ডাক্তার, উকীল প্রভৃতির পক্ষে ছুটি উপভোগ করা খুব ভাল, কারণ তাঁদের অত্যন্ত বেশী মানসিক পরিশ্রম করতে হয়।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর এস. এন. দাশগুপ্ত। শিল্পপ্রসারের জন্য বায়ু দূষিত হওয়ায় প্রাণী এবং উদ্ভিদ-জীবনের উপর যে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে সে সম্বন্ধে তিনি একটি মূল্যবান ভাষণ দেন।

ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতু-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর জি. পি. চ্যাটার্জি। তিনি ধাতু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু মৌলিক তথ্যসম্বলিত একটি ভাষণ দেন।

প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর এম. এন. শ্রীনিবাস। তিনি ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার স্বরূপ বর্ণনা করে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন।

ভূ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর বি. সি. রায়। শিল্পোন্নয়নকল্পে ভারতের খনিজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সুব্যবস্থা যাতে হয় সেজন্য খনিজ বিভাগের নিমিত্ত একটি পৃথক মন্ত্রীদপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে তিনি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানান। এ ছাড়া বিভিন্ন বিভাগের সভায় বহু মৌলিক-গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পঠিত ও সমালোচিত হয় এবং দেশীয় ও বৈদেশিকগণ উক্ত আলোচনায় যোগদান করে সভার গৌরব বৃদ্ধি করেন।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে বহু বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক যোগ-দান করে অধিবেশনকে অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরেই বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজের একই প্রাঙ্গণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হয়। এজন্য বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমারোহ এ বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী প্রতীয়মান হয়।

দেখুন! মাত্র অর্দ্ধেক সানলাইট সাবানেই

ফেণার আধিক্যের দরুণই সানলাইট সাবান এত ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র **অর্দ্ধেকটী সানলাইটে** কতগুলি জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুণই প্রতিটী ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে আশ্চর্য্যরকম সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুণই জামাকাপড় বিনা আছাড়ে পরিষ্কার হয়। তার মানে আপনার জামাকাপড় টেঁকে আরও অনেক বেশী দিন।

সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

L. 243-X52 BG

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৫)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়াপত্তনে সংস্কৃত পণ্ডিতদের দান অপরিসীম। স্বতন্ত্রভাবে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফত বিভিন্ন পণ্ডিত নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল—বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তাৎপর্য্য বাংলায় বিবৃত হইয়াছিল। তৎকালীন বাঙালী জনসাধারণ এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রচুর উপকার ও আনন্দলাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থের মূল্য এবং প্রয়োজন এখনও অস্বীকার করা চলে না। তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে আমরা এই সমস্ত পণ্ডিত ও ইহাদের রচিত গ্রন্থের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' প্রকাশ করিয়া ইহাদের বিষয় আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—ইহা খুবই আনন্দের কথা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের কথা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েক জন পণ্ডিতের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের রচিত গ্রন্থ ও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা অবলম্বনে এই কাহিনী রচিত হইয়াছে। ইহাদের কর্ম্মময় জীবনের বিস্তৃত পরিচয় সঙ্কলন করা যথোচিত উপকরণের অভাবে সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় নাই। বাগল মহাশয় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। তথাপি যেটুকু বিবরণ তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া সে যুগের সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি সুন্দর চিত্র আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। আমরা দেখিতে পাই—একাধিক মনীষী ও প্রতিষ্ঠান আমাদের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত বিবিধ রত্ন সাধারণের মধ্যে প্রচারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 'বেদের অনেক প্রধান অংশ অনুবাদ করিয়া আমাদের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন'—'পঞ্চদশী, বেদান্তসার, উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা গ্রন্থ সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশে ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার প্রকৃষ্ট সোপান উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।' আজ হইতে এক শত বৎসর পূর্ব্বে বেদান্তবাগীশ মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ বৃহৎকথা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামায়ণের অনুবাদক হিসাবে প্রসিদ্ধ হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় রঘুবংশ ও কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থেরও সটীক সানুবাদ সংস্করণ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, তিনি আজ হইতে ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও সোমদেবের 'রাগবিবোধ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং রামায়ণের এক সংক্ষিপ্ত কাহিনী স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন;

এই সমস্ত সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি আজ আর তেমন পরিচিত বা সুলভ নয়। বাগল মহাশয় ইঁহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া শিক্ষিত বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তবে এই সব মনীষীর কথা কেবল স্মরণ করিলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হইবে না—ইঁহাদের রচিত কোন কোন গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। তাহা ছাড়া, মনে রাখিতে হইবে—ইঁহারা যে কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—এখনও অনেক করণীয় অবশিষ্ট আছে। সেই কর্তব্যসম্পাদনের প্রথম সোপান প্রাচীন মনীষীদের কৃত কার্য্যের পরিচয় লাভ করা। বাগল মহাশয় সেই সোপান-রচনার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এই কাজে তাঁহার সাফল্য কামনা করি এবং তাঁহাকে অনুরোধ করি, তিনি কালীবর বেদান্তবাগীশ, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এই জাতীয় অপরাপর পণ্ডিতদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যের পথ প্রশস্ত করুন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

য়ুরোপে আধুনিক চিত্রকলার প্রগতি—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। রত্নসাগর গ্রন্থমালা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে আধুনিক য়ুরোপের চিত্রসাধনার রূপটি গ্রন্থকার নিপুণ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। যে প্রকাশ-ইচ্ছা মানুষের আজন্ম সহচর তাহা কেমন করিয়া কোন্ পথে নব্য য়ুরোপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহার সঠিক ধারাবিবরণী গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গীতে পরিবেশন করিয়াছেন। শিল্পী প্রকাশ-সাধনায় তন্ময়, তাঁহার প্রকাশের প্রয়াসটুকু [illegible]-এর ভেনাসমূর্ত্তির মধ্যে যেমন সুপ্রকট তেমনই আবার তাহা জিয়াকোমো বাল্লার 'দ্রুতগামী কুকুরে'র চিত্রটির মধ্যেও সমান ভাবে স্বপ্রকাশ। ফরাসী দেশে এক অখ্যাত পল্লীতে প্রাপ্ত এই ভেনাসমূর্ত্তিটির নির্ম্মাণকাল খ্রীষ্টের জন্মের পঁচিশ হাজার বছর পূর্ব্বেকার ঘটনা বলিয়া পুরাতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন। সভ্যতার সেই অস্ফুট প্রত্যূষে মানুষ প্রকাশের যে দুর্নিবার বাসনায় ভেনাসমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রকলায় নানান্ ভঙ্গী আশ্রয় করিয়া 'চতুষ্কোণবাদ' 'আকৃতিবাদ', 'নব্যতান্ত্রিকবাদ', 'নৈরূপ্যবাদ', 'প্রতিচ্ছায়াবাদ' প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির জন্মদান করিল। মানুষের কল্পনা শিল্পসৃজনে বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া এক পরামুলের রহস্যলোকের দ্বারোদ্ঘাটন করিল। কেমন করিয়া সেই রহস্যলোকের সবটুকু রং, সবটুকু রস, সেই অনির্ব্বচনীয় সুন্দরের সবটুকু সৌন্দর্য্য শিল্পে ধরিয়া দেওয়া যায় তাহাই হইল সর্ব্বযুগের শিল্পীর সাধনার বস্তু। এ যুগের য়ুরোপীয় শিল্পীরা বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া সাদৃশ্য-বিদ্বেষকে তাঁহাদের মূলমন্ত্র করিলেও চয়নবাদীদের শিল্পবাদে বাস্তবকে পুরাপুরি অস্বীকার করা হয় নাই। প্রাচীন শিল্পবাদ মূলতঃ বস্তুপন্থী। আধুনিক চয়নবাদীর সেই প্রাচীন মতবাদের আংশিক সমর্থন করিয়াছেন। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে চয়নবাদীদের সমন্বয়াত্মক শিল্পদর্শনের কথা বলিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের দৃষ্টিকোণ যথার্থ শিল্পসমালোচকের। বহুবিস্তৃত শিল্প-অভিজ্ঞতার আলোক-স্বচ্ছ চতুষ্কোণবাদের সার্থক আলোচনা গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কেমন করিয়া চতুষ্কোণবাদের পরিণতি ঘটিল নৈরূপ্যবাদে, আমরা তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিয়াছি। প্লেটো কথিত শিল্পের বিরুদ্ধ বাদের আর কোন সার্থকতা রহিল না—আধুনিক ইয়োরোপে নৈরূপ্যবাদের অকুণ্ঠ গ্রহণে ও সমর্থনে। শিল্পীমনের বস্তুবিমুখ চিত্রকল্পনা আধুনিককালে নক্সাবাদে আত্মপ্রকাশ করিল। মাতীস এই নক্সাবাদের অগ্রনায়ক। মাতীসের দৃশ্যবাদ প্রাতিভবাদ হইতে স্বতন্ত্র। এত দিন য়ুরোপের চিত্রশিল্পীরা স্থাবর জীবনের প্রকাশ-সাধনা করিলেন। জঙ্গম জীবনের চলমানতা প্রথম মূর্ত্ত হইল 'ভবিষ্য'বাদীদের হস্তে। তাঁহারা গতিকে প্রমূর্ত্ত করিলেন আপনাদের শিল্পকর্ম্মে। শিল্পের প্রাচীন পীঠস্থান ইটালীতে 'ভবিষ্যবাদ' জন্ম নিল আপন আন্তর শক্তির প্রসাদগুণে। গ্রন্থকার ভবিষ্যবাদীদের মূলসূত্রাবলীর বিশদ আলোচনা গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বস্তুর মধ্যে যে গতিচ্ছন্দ মূর্ত্ত তাহার প্রকাশ-সাধনা আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় স্তবকের শেষাংশে গ্রন্থকার বর্ব্বরবাদীদের (Fauvist) শিল্প-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিয়াছেন। শিল্পে বর্ব্বরবাদের ঐতিহাসিক মূল্য

আছে কেবল অত্যাধুনিক এই শিল্পবাদের পটভূমিকায়—ভারতবর্ষের লোক-শিল্প ওসিয়ানিয়ার বর্বরজাতির শিল্পপ্রকর্ষ ও অন্যান্য দেশের লোকশিল্প নূতন অর্থে, নূতন ব্যঞ্জনায় শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে। এই ভাবে বারবার শিল্পজগতে বিভিন্ন পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের ফলে কখনও বা উগ্র অত্যাধুনিক শিল্পবাদ অতীতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছে, আবার কখনওবা তাহার বিরোধী মতবাদ অতীতকে সবিনয়ে স্বীকার করিয়া তাহার সহিত আপোষ করিয়াছে। প্রাচীনকালে ধর্ম্ম ও শিল্প হাতধরাধরি করিয়া চলিয়াছিল। এ যুগের 'Post-impressionist'দের দল ধর্ম্মের পথ পরিহার করিয়া বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করিলাম নৈরূপ্যবাদের অন্যতম প্রধান উদ্গাতা বাসিলি কান্দিনিস্কী বৈজ্ঞানিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিকতার পথেই আপন শিল্প-রথকে চালিত করিলেন। কান্দিনিস্কীর নৈরূপ্যবাদের বিরোধী মতবাদরূপে আবির্ভূত হইল উওমান লিউসের 'আবর্ত-বাদ'। এওয়াড ওয়েডওয়ার্থ ও নেভিনসন এই পথের পথিক। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে নৈরূপ্যবাদের চরম পরিণতি 'স্বেচ্ছাচারবাদ' বা দাদাইজম্ জন্ম নিল। এতদিনকার ক্ষয়িষ্ণু শিল্প-নির্দ্দেশনার দাম্ভ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল সর্ব্বগ্রাসী স্বেচ্ছাচারবাদে। অনেকে একে 'শিশুবাদ' আখ্যাও দিয়াছেন। এই দায়িত্বহীন শিশুবাদের স্বেচ্ছাচার হইতে পাবকশুদ্ধ হইয়া জন্ম নিল 'শুদ্ধিবাদ' বা Purism। 'শুদ্ধিবাদ' 'নিয়ন্ত্রিত নিয়মরক্ষিতা' তত্ত্বের উদ্বর্তন করিল আর এক নূতন পটভূমিকায়। সংযমের পথে, নিয়মের পথে আধুনিক শিল্পধারার প্রবর্তন ঘটিল শুদ্ধিবাদী অজেন ফান্ট, জেনেরেং এবং লীজারের হস্তে। এমনি করিয়াই আধুনিক ইয়োরোপের সৃষ্টিপ্রয়াস রূপ হইতে রূপান্তরে, এক রীতি হইতে অন্য রীতিতে যাওয়া-আসা করিতেছে। প্রখ্যাত শিল্পসমালোচক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইয়োরোপে এই নব্য শিল্পরীতির পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের কাহিনীটুকু সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

পুস্তকখানি শিক্ষিত-সমাজের শিল্পদৃষ্টি উন্মেষের সহায়তা করিবে।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

রাশি-বিজ্ঞানের কথা—শ্রীপুলেন্দুকুমার বসু। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের ১২১নং পুস্তক। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭। মূল্য ॥• আনা।

লেখক একজন রাশি-বিজ্ঞানবিদ্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশি-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ। রাশি-বিজ্ঞান যে কেবল কতকগুলি রাশি-তথ্যের সমষ্টি নয় বা কতকগুলি সূত্রের সমন্বয় নয়, এইটি যে বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যেটি সম্ভাবনার (probability) মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার সাহায্যে সামান্য নমুনা হইতে পরিপূর্ণের অনুমান করা সম্ভব, নমুনা হইতে পূর্ণকে, সমগ্রকে জানা সম্ভব, লেখক তাহা অতি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও মধ্যে রাশি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান ত অল্পই, বরং ভ্রমাত্মক ধারণা আছে। লেখক এই ভ্রম দূর করিবার সাহায্য করিয়া দেশের ও সমাজের উপকার করিয়াছেন। পরিশিষ্টে কলিকাতা রাশি-বিজ্ঞান সমিতি কর্তৃক সঙ্কলিত ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের রাশি-বিজ্ঞান সারস্বত সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুমোদিত রাশি-বিজ্ঞানের পরিভাষা দিয়া, যাঁহারা বাংলায় রাশি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহেন তাঁহাদের উপকার করিয়াছেন।

আমরা আশা করি লেখক রাশি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলায় একখানি বড় পুস্তক লিখিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিবেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

ভগবান তথাগত—শ্রীইন্দিরা দেবী। অরুণালোক প্রকাশনী। সচিত্র। মূল্য দুই টাকা।

বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে লিখিত এই বইটি খুবই সুখপাঠ্য হয়েছে। ইন্দিরা দেবীর লেখা পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। আলোচ্য বইটিতে তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় এত সরল ও সরস ভাবে লেখা সাধারণতঃ খুব কমই দেখা যায়। ছবিও সুন্দর হয়েছে।

বুদ্ধচরিতের পুণ্যকাহিনী বাংলার ঘরে ঘরে জানা প্রয়োজন। জগতে ভারতের সংস্কৃতি-প্রচারের মূল এর মধ্যে নিহিত। সেই জন্য ইন্দিরা দেবীর এই বইখানি সব দিকেই উপযোগী হয়েছে।

প্রেমের গল্প—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। রীডার্স কর্ণার। সচিত্র। মূল্য সাত টাকা আট আনা।

সমকালীন তেইশ জন খ্যাতনামা লেখকের তেইশটি গল্পের সংগ্রহ। গল্প-গুলি লেখকদিগের স্ব-নির্ব্বাচিত।

কবিতা ও গল্পের—বিশেষে প্রেমঘটিত ছোটগল্পের সমালোচনা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কেননা শুধু যে মাপকাঠির বদল যুগে যুগে হচ্ছে তাই নয়, উপরন্তু রসাস্বাদী যাঁরা তাঁদেরও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রসে রুচি-অরুচি আসে। আবার সবশেষে আছে অভিনবত্ব, আধুনিকত্বের উৎকট প্রয়াস ও বিরাট সন্ধান।

বিশুবাবুর সংগ্রহে সব রকমই আছে, অম্লমধুর, তিক্তকষায়, সকল রসেরই পরিবেশন করা হয়েছে। সুতরাং রসিকজন এই প্রেমের বেসাতিতে ইচ্ছামত রসের আস্বাদন পাবেনই। এটা বড় সহজ কথা নয়।

বিখ্যাত লেখকদের বাছাইকরা গল্প, সুতরাং পৃথক ভাবে আলোচনা বৃথা। শুধুমাত্র বলা যায় যে, প্রেম কত বিচিত্ররূপে দেখা দিতে পারে তার তেইশটি সম্পূর্ণ পৃথক পরিচয় এই সংগ্রহে আছে। তাতেই সংগ্রহটি সমষ্টিগত ভাবে সার্থক হয়েছে।

"প্রেমের গল্প" আলোচনা করতে গেলেই প্রথম কথা ওঠে—"প্রেম কি ?" ভূমিকায় সম্পাদক আগেই বলেছেন, "হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম বৃত্তি প্রেম"। একথা অস্বীকার করার দুঃসাহস সমালোচকের নাই। নাই এই কারণে যে, "তার পরই প্রশ্ন আসতে পারে "প্রেমের তুমি কিই-বা জান ?" তবে নির্ভয়ে না হোক ভয়ে ভয়েই বলি, যে সেই প্রেম যাতে "নাহি কাম গন্ধ লেশ"—যথা :

রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম

বড়ু চণ্ডীদাস গাএ।

সম্পাদক মহাশয়ও বোধ হয় সেই জন্যেই পরে বলেছেন, "কামনা বাসনাকে পরিশুদ্ধ করার কথা বলার পরও আমি বলব, যেকথা প্রারম্ভেই বলেছি, প্রেম দেহকে অস্বীকার করে নয় (না ?), অতিক্রম করে। প্রেম কাম নয় কামভিত্তিক। কাম যদি হয় কুসুম, প্রেম তার সৌরভ। 'দেহসম্ভোগ বাসনার উদ্দামতায় যা রিপু, দেহানুগ অথচ সূক্ষ্ম সুন্দর ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ সুকুমার রূপে তাই মানবীয় প্রেম এবং দেহাতিক্রান্ত দিব্য প্রীতিতে তাই-ই ভগবৎ প্রেম।"

অবশ্য দ্রাবিড়ীয় 'লিঙ্গায়েৎ' মহাশয়েরা অন্য কথা বলেন, তবে তাঁদের কথা ও মাথা দুয়েরই উল্টো সোজা বোঝা ভার।

যা হোক পাঠক যেন ভেবে বসবেন না, যে এই গল্পসংগ্রহ বুঝি আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক দর্শনের উদাহরণসমুচ্চয়। কেননা যদি কোনও দার্শনিক মতবাদের ছায়া এই আলোচ্য গল্পগুলির অধিকাংশে পড়ে থাকে তবে সে চার্ব্বাক-দর্শনের। সম্পাদক বলেছেন :

"এই সঙ্কলনগ্রন্থে সমকালীন খ্যাতনামা গল্পকারদের প্রেম, প্রণয়, অনু-রাগ, স্নেহ, প্রীতি সম্পর্কে গল্পের একটি নিদর্শন দেবার চেষ্টা করেছি।"

এখানেই বলি চেষ্টা সফল হয়েছে।

ক. চ.

শরৎ-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)—শ্রীকালিদাস রায়। ১৩ চারুচন্দ্র এভিনিউ, টালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই ছন্দে লিখিত। কিন্তু গদ্য রচনায় তাঁহার নিপুণতা কতটা এই পুস্তকই তাহার প্রমাণ। গ্রন্থখানি শরৎ-সাহিত্য-পরিচিতি। এই খণ্ডে তিনি শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ, বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, পণ্ডিত মশাই, নববিধান, অরক্ষণীয়া, চন্দ্রনাথ, বামুনের মেয়ে, বৈকুণ্ঠের উইল, দত্তা, পথনির্দ্দেশ, পরিণীতা, দেবদাস, দেনাপাওনা, চরিত্রহীন, কাশীনাথ, অনুপমার প্রেম, মেজদিদি প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাসের বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সে বিচারে কৃতিত্ব আছে। কিন্তু প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদে এবং অষ্টম পরিচ্ছেদেও গ্রন্থকার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা যেমনি শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের উপর নানা দিক দিয়া আলোকপাত করে, তেমনিই গ্রন্থকারের মননশীলতা, পাণ্ডিত্য এবং অন্তর্দৃষ্টিরও পরিচয় দেয়। লেখকের মতে শরৎচন্দ্র কোথাও গতানুগতিক নহেন, তিনি ক্রান্তদর্শী, রসশিল্পী, সত্যের আবিষ্কারক। কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র সত্যকে সরস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নারীজাতির ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাকে অসাধ্য-সাধনই বলিতে হয়। সংস্কারকে চূর্ণ করিয়া মানবজীবনকেই তিনি অখণ্ডভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সাধনাবলে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার অপূর্ব্ব-শৃঙ্খলা, পদ্ধতি ও গঠনভঙ্গী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের অনেক কথাসাহিত্যিকের দীক্ষা শরৎচন্দ্রের রচনা পাঠে। তিনি আবাল্য যে-সকল নরনারীকে তাঁহার চারিপাশে দেখিয়া আসিয়াছেন তাহাদেরই জীবনযাত্রা হইয়াছে তাঁহার সাহিত্যের উপজীব্য। জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও জীবনদর্শনের অতি প্রখর গোচর-শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে অফুরন্ত অপরিমেয় সহানুভূতি। সৌভাগ্যক্রমে শরৎচন্দ্র কেবল সত্যদ্রষ্টা ছিলেন না, তিনি অসামান্য রসস্রষ্টাও ছিলেন। তাঁহার রচনার একটি প্রধান টেক্‌নিক হইল অরঞ্জিত বাস্তব চিত্র দিয়া আরম্ভ করিয়া তারপর তিনি ধীরে ধীরে রঙ চড়াইতেন। শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্ত্তক। ঘটনার বিবৃতি বা প্লটের দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য নাই, তিনি অতি সূক্ষ্ম নিপুণতার সহিত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিশ্লেষণ অধিকাংশ স্থলে অন্তরের গভীর সহানুভূতির দ্বারা রঞ্জিত। যেখানে আমরা মনুষ্যত্বের বা মহত্ত্বের কোন প্রত্যাশা করি না, সেখানে তিনি মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের আকস্মিক আবির্ভাব দেখাইয়া আমাদের চিত্তে একটা বিস্ময়ানন্দের সৃষ্টি করেন। শরৎচন্দ্র নূতন যুগের উপযোগী নূতন ভাষায় নূতন আশা দিয়াছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে গ্রন্থকারের দুটি বক্তৃতার অনুলিপি। এ দুটি পরিশিষ্টে দিলে বোধ হয় ভাল হইত। গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির সমালোচনা। গ্রন্থকারের কাব্যের মত তাঁহার গদ্যও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। রচনা পরিচ্ছন্ন, সরল, স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল। "শরৎ-সাহিত্য" পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ই লাভ করিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জলপ্লাবনের ভূগোল, ইতিহাস ও ভূবিদ্যা—শ্রীআদিনাথ সেন। ৩২, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৩, মূল্যের উল্লেখ নাই।

গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গুরুত্ব বিষয় সংক্ষেপে অথচ সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জলপ্লাবনের স্থায়ী প্রতিকার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মতামত ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

পুস্তকখানি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে পনেরটি অধ্যায়ে বাঁধ, জলপ্রবাহ, নদীনিয়ন্ত্রণ, জলাশয়, কৃত্রিম হ্রদ, বহুমুখী পরিকল্পনা, বহ্নিগলা জলে প্লাবন, বৃষ্টিপাতে জলপ্লাবন, সাময়িক প্লাবন, বন্যায় জলপ্লাবন প্রভৃতির কথা আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ও প্রাচীন কালের নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টিকে চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য করা হইয়াছে। প্রথম অংশ পাঠ করিলে সাধারণ পাঠকের মনে জলপ্লাবনের ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

দ্বিতীয় অংশে ষোলটি অধ্যায়ে ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবী, মহাকাশ, সৃষ্টি, পৃথিবীর আবরণ, প্রস্তরস্তর, আলোড়ন, গণ্ডোয়ানা, থেটিস সাগর, প্রাচীন ভূগোল ও ইতিহাস, হিমালয় অঞ্চলে আবহাওয়া ও আয়রণের নমনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ের আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতামত সঙ্কলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে পৃথিবীর বহু কোটি বৎসর লাগিয়াছে। যেখানে আজ হিমালয় পর্ব্বত এককালে সেখানে মহাসমুদ্র ছিল। পর্ব্বত, নদনদী, জলস্থলের অবিরাম পরিবর্ত্তন চলিয়াছে। জড়জগতের এই সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের বর্ণনা তথা বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণা গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থকার স্বল্পপরিসরের মধ্যে এই জটিল বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্র ও বিশ্বরাজনীতি—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ॥০। পৃষ্ঠা ৩৪।

সমবায় ও সমাজতন্ত্র এই দুইটি শব্দের বহুল প্রয়োগ সর্ব্বত্রই করা হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রকডেলের শ্রমিকগণ যে সমবায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল সেই সম্পর্কে লে-অপারেটিভ কমনওয়েলথ কথাটি ব্যবহৃত হয়। লেখক উহার অনুবাদ 'সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্র' করিয়াছেন। জগতের আর্থিক প্রগতি কোন পথে হইয়াছে তাহা লইয়া বহু গবেষণা হইয়াছে। ধনতন্ত্রের পথে এই উন্নতি বহু অবাঞ্ছিত অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ইহার একটি হইতেছে শ্রেণীসংগ্রাম এবং অপরটি দুর্ব্বলের শোষণ। সমবায়-ব্যবস্থা সংগ্রাম ও শোষণ এড়াইয়া আর্থিক উন্নতি কায়েম করিতে চায়। সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন দেশের পরিবেশে ইহার সফলতা দেখা গিয়াছে, সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ ও সফলতা এখন পর্য্যন্ত গবেষণার বিষয়। লেখক বিশ্বরাজনীতির গতিপ্রকৃতি হইতে প্রমাণ করিতে চান যে, জগৎ বিশ্ব-সমবায়ের পথে চলিয়াছে। এই সম্পর্কে ভারতের প্রচেষ্টার উদাহরণগুলি লেখক বিশেষ ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সমবায়ের পথ শান্তির পথ। রাশিয়া, আমেরিকা ও ভারত সকলেই শান্তি তথা বিশ্বশান্তি চায়। কিন্তু শান্তি কথাটি সকলে উচ্চারণ করিলেও ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে সকলে একমত নহে—বর্ত্তমান বিশ্বরাজনীতি আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। "কার্ল মার্কস ও গান্ধী একজন আর একজনের পরিপূরক" লেখকের এই অভিমত গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয় না। 'রাষ্ট্র লোপ পাওয়া' (withering away of the States) সম্পর্কে উভয়ের মতও যে একেবারে অভিন্ন এ-কথা বলা সমীচীন নহে। "রামরাজ্য" এবং "রাষ্ট্রহীন সমাজ" উভয়ই একটি আদর্শের বোধক—লেখক ইহা বলিতে চান। অথচ মার্কসের ধনতান্ত্রিক-ব্যবস্থা-ধ্বংসের উপায় ও গান্ধীর উপায় পরস্পরবিরোধী। এ ব্যবধান আস্তিক ও নাস্তিকের, জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদীর ব্যবধান। যাহা হউক আর্থিকবা

পরমার্থিক কিংবা নৈতিক কারণে পৃথিবীর দেশগুলি আজ মহা মিলনের পথে যাত্রা করিয়াছে এ কথার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। লেখকের চিন্তাধারার সকলেই তারিফ করিবেন। সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমবায়তন্ত্র সকল তন্ত্রই ক্রমবিকাশের পথে প্রতিদিন পরিবর্তিত হইয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। লেখকের আলোচনা-পদ্ধতি সুন্দর। তাঁহার ডায়লেকটিক যুক্তির দ্বারা আদর্শের অনুসরণ স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে। এই সুলিখিত গ্রন্থ পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ঠাকুরাণীর বাঘ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী। দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য দুই টাকা।

শিকারের সন্ধানে উড়িষ্যার বনে-পাহাড়ে দীর্ঘ আঠারো বৎসর ঘোরাঘুরি করিয়া লেখক যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকে পরিবেশিত হইয়াছে। এই কাহিনীগুলি যখন 'যুগান্তর সাময়িকী'তে প্রকাশিত হয় তখনই পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ আগ্রহ এবং কৌতূহলের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার কারণ—প্রচলিত শিকারকাহিনীসমূহ হইতে এগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। পুস্তকটির প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—শিকার সম্বন্ধে লেখকের অকপট স্বীকারোক্তি। সাধারণের ধারণা শিকারীমাত্রেই অসমসাহসী, তাঁহার প্রাণের ভয় লেশমাত্র নাই। যাঁহারা একাকী শিকারের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইয়া শিকার করেন, লেখক তাঁহাদের বাহাদুরি অস্বীকার করেন না। কিন্তু দলবলসহ শিকারে গিয়া গুলি করিয়া হিংস্র জন্তু বধ করার কৃতিত্ব যে শুধু শিকারীর নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ভাগ্যের খেলা' এবং 'নিহত জন্তুটির কৃতিত্ব' একথা বহু স্থানেই তিনি খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের পরিচয় পাওয়া যায় ভদ্রক হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রথম বাঘ শিকারের ঘটনাটিতেই, অথচ গুলিবিদ্ধ বাঘটিকে মোটরে তুলিয়া আনিবার সাহস যে তাঁহার হয় নাই সেকথা তিনি অকপটে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

লেখক এমন অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে ও আন্তরিকতার সহিত তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, সুরু হইতেই পাঠকের মনে তাঁহার কাহিনীগুলির সত্যতা সম্বন্ধে গভীর আস্থার সৃষ্টি হয়। কোথাও কল্পনার রং চড়াইয়া চমক লাগাইবার প্রয়াস নাই, অথচ বর্ণনা এমনি জীবন্ত যে পাঠককে পদে পদে চমকিত হইতে হয়। আমরা যেন মনশ্চক্ষে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই—খাগুড়ি গ্রামের পাঁচ মাইল দূরবর্তী জঙ্গলে বিরাটকায় ভল্লুকটি থাবা মেলিয়া শিকারীদ্বয়কে আক্রমণ করিতে উদ্যত। সহসা মাত্র হাতদশেক দূরের ভাল্লুকের খোলা বুকে যুগপৎ বিদ্ধ হইল চারিটি গুলি—সঙ্গে সঙ্গেই তার মরণাহত কণ্ঠের বিকট চীৎকারে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল নিস্তব্ধ বনভূমি। খুরদার পথে বিক্রান্তমূর্তি ব্যাঘ্রের কবলে নিহত হতভাগ্য গাড়োয়ান বাইধরের অন্তিম দৃশ্যটি কি বীভৎস-করুণ! "সেই ছোট ফাঁকা জমিটায় বাইধর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে—তার বুকের উপর একটি থাবা রেখে বাইধরের ওষ্ঠাধরের দিকে চেয়ে বাঘটি বসে আছে। কি যেন দেখছে সে মাঝে মাঝে, সোজা হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখছে কোন আততায়ী আসছে কিনা! বাইধরের ওষ্ঠাধর তখনও কাঁপছে। সর্বাঙ্গে ক্ষত, প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। বাঁ পাশের চোয়ালের মাংস ঝুলে পড়েছে। কি মর্মান্তিক দৃশ্য!"···"পাহাড়ের অধিত্যকায় বাঘের বিশ্ববিজয়ী মূর্তি আর তার পদতলে পড়ে আছে হতভাগ্য বাইধর।" এই দৃশ্য লেখকের শিকার-সঙ্গী দীনেশবাবু যেমন বহুদিন ভুলিতে পারেন নাই, তেমনি পাঠকের মনেও ইহা ছাপ রাখিয়া যাইবে। আর ভুলিতে পারা যাইবে না—নয়াগড় রাজ্যের জঙ্গলে বুনো ঘাসের ঝোপের ধারে ডোরাকাট ব্যাঘ্র-দম্পতির সমরেখায় জ্বলন্ত দু'জোড়া চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে। সেই 'রাজোচিত মূর্তি শুধু লেখকের নয়, পাঠকদেরও 'ধ্যানের বস্তু' হইয়া থাকিবে।

কিন্তু পাঠকচিত্তকে অপরিসীম বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিবে চাঁদকার জঙ্গলের সিন্দুরলিপ্ত শিলাখণ্ডাধিষ্ঠাত্রী দেবী 'ঠাকুরাণী'র মন্দিরের পাশে অবস্থানকারী শান্ত সমাহিতমূর্তি বিশালকায় চিতাবাঘের কাহিনী। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে জীবহিংসার প্রেরণাশূন্য ঠাকুরাণীর বাঘের স্বচ্ছন্দ বিচরণের কথা পড়িয়া মন শান্ত রসের প্রলেপে স্নিগ্ধ হইয়া যায়। অরণ্যচারী এই পশুটির অহিংস আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজিতে গিয়া বুদ্ধি হার মানে, অলৌকিক ব্যাপারের অতলস্পর্শ রহস্য অনুদ্ঘাটিতই থাকিয়া যায়। লেখকের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও প্রার্থনা করি—শান্ত, ভয়লেশহীন পদক্ষেপে অরণ্যে বিচরণশীল এই বাঘ যেন দীর্ঘজীবী হয়।

লেখকের বর্ণনার মুন্সীয়ানার কল্যাণে "ঠাকুরাণীর বাঘ" পুস্তকখানি শিকার-কাহিনী হইলেও সাহিত্যগুণান্বিত হইয়াছে। আর একটি জিনিষ ইহাকে সমধিক উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে—তাহা ইহার মধ্যে আগাগোড়া অনুস্যূত স্নিগ্ধ অনাবিল স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকরস। এই হিউমার অরণ্যের ভয়াবহ পরিবেশকেও বহুস্থানে হালকা হাসির হাওয়ায় প্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছে। অপরিসীম কৌতূহলোদ্দীপক এবং কৌতুকরসসিক্ত এই শিকার-কাহিনীটি বাংলা শিকার-সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। পৃ ৩০৭। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

প্রকাশকের 'নিবেদন' হইতে জানা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক রচনা, পত্র, কথোপকথন, বক্তৃতাবলী ইত্যাদিতে যে সব মানবকল্যাণকর উক্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, আলোচ্য পুস্তকখানিতে তৎসমুদয় বিষয়ানুযায়ী এক স্থলে সংগৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজীর সুচিন্তিত অভিমত জানিবার সুযোগ করিয়া দিয়া প্রকাশক আধুনিক [illegible] সমাজের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বিবেকানন্দ-সাহিত্য বিরা[illegible] হইতে এই সঙ্কলন খুবই [illegible] এবং বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান-[illegible] উপনিষদ্ বা বেদান্ত [illegible], আত্মা, ঈশ্বর, [illegible]

ও শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধর্ম্ম, ত্যাগ ও বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য, সেবা ও পরোপকার, চরিত্র, হিন্দু, হিন্দুধর্ম্ম, মূর্ত্তিপূজা, সমাজ, জাতি-বিভাগ, বিবাহ, শিক্ষা, নেতা, ভারত —(ক) ভারতের বৈশিষ্ট্য, (খ) ভারতের অবনতির কারণ ও (গ) ভারতের পুনরুত্থানের উপায়, বিবিধ প্রসঙ্গ—এই অধ্যায়গুলিতে স্বামীজীর উক্তিগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ সমুদয় যেমন সুচিন্তিত ও জ্ঞানগর্ভ তেমনি সাবলীল ও সুখপাঠ্য। স্বামীজীর মতামতগুলি এখনও, অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল পরে যুক্তিসহ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। নিষ্ঠাবান্ সমাজসেবী এবং শিক্ষা-নেতাদের এই নিবন্ধগুলি দিগ্‌দর্শন স্বরূপ হইবে। এখানে একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। স্বামীজীর কোন্ কোন্ পুস্তক হইতে মূলে বা অনুবাদে এই নিবন্ধসমূহ সঙ্কলিত তাহার কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। এরূপ নির্দ্দেশ থাকা বিবেকানন্দ-সাহিত্যরসিক এবং গবেষকের পক্ষে ইহা খুবই প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ ত্রুটির সংশোধন হওয়া আবশ্যক। যাহা হউক, পুস্তকখানির বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। পৃ. ৩+১১৯। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

গ্রন্থকার ১৯৫৬ সনের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'নিবেদিতা-লেক্‌চারার' রূপে ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে এই বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার 'নিবেদনে' বলিয়াছেন যে, নিবেদিতা-জীবনের মূল ঘটনাবলী পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে "বিভিন্ন ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ ভারতীয় শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, জাতীয়তা ও জাতির মুক্তি-সংগ্রামে তাঁহার কি অমূল্য অবদান তাহার সম্যক পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।" পুস্তকখানি পাঠে লেখকের শেষোক্ত উক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'সিষ্টার নিবেদিতা' (ভগিনী নিবেদিতা) গুরু স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত নাম। তাঁহার পূর্ব্ব-নাম 'মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল'। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত মিস্ নোবল নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় সবিশেষ সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিক্ষাব্রতী রূপেও তাঁহার অভিজ্ঞতা কম জন্মে নাই। তিনি সুশিক্ষিতা, যুক্তিপন্থী, আত্মপ্রত্যয়শীল আইরিস জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম-স্নেহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই তাঁহাতে পরিস্ফুট হইয়াছিল। এহেন পরিণতবুদ্ধি, মানবসেবাপরায়ণা মিস্ মার্গারেট নোবল স্বামীজীর বক্তৃতা, উপদেশ ও শিক্ষায় তদীয় মানস-কন্যা সিষ্টার নিবেদিতায় পরিণত হইলেন। ভগিনী নিবেদিতার জীবনকথায় আলোচনায় এ কথাটি যেন আমরা না ভুলি। নিবেদিতা ভারত-মাতার সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাই তিনি সত্য সত্যই 'নিবেদিতা'। সে যুগের বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ্, ধর্ম্ম-নেতা—সমুদয়েরই শ্রদ্ধা-প্রীতি তিনি নিজগুণে অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'লোকমাতা'। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের 'বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে'র প্রেরণাদাত্রী তিনি। তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি। তাঁহার জীবনকথা আজকাল যে আলোচিত হইতেছে, জাতির পক্ষে ইহা বড়ই শুভ লক্ষণ। আমরা গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানাই। এই সুলিখিত তথ্যপূর্ণ পুস্তকখানি প্রত্যেক বাঙালীর হস্তে বিরাজ করুক ইহাই কামনা।

কর্ম্মবীর রাসবিহারী—শ্রীবিজনবিহারী বসু। প্রকাশক—শ্রীমতী ইলা বসু, গোমো, মানভূম। পৃ জ+১৪৪। মূল্য পাঁচ টাকা।

বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জীবনকথা প্রত্যেক বাঙালীরই অনুধাবনযোগ্য। আমরা কৈশোরে 'প্রবর্ত্তক' মাসিকে তাঁহার বিপ্লবকর্ম্মের বিবরণ সম্বলিত লেখাগুলি যখন পাঠ করিতাম তখন বিস্ময়ে অভিভূত হইতাম। তাঁহার রচনাশৈলীর উৎকর্ষ হয়ত তেমন বুঝিতাম না, কিন্তু বিভিন্ন লোমহর্ষক ঘটনাপুঞ্জের মাদকতা আমাদের যেন পাইয়া বসিত। রাসবিহারী আইনতঃ জাপানের বাসিন্দা হইলেন, সেথান হইতে ভারতের সপক্ষে রাষ্ট্র-কার্য্য পরিচালনা করিতেন। এ সকল কমবেশী আমরা শুনিতে পাইতাম। কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমরের প্রথমার্দ্ধে তাঁহার কার্য্যকলাপ পুনরায় আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়। তিনি ভারতের স্বাধীনতা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হস্তে নেতৃত্বভার অর্পণ করিয়া রাসবিহারী অবসরগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সনের ২১শে জানুয়ারী তিনি মারা যান।

রাসবিহারী-জীবনের এই কয়েকটি স্থূল কথা মাত্র এ যাবৎ আমাদের বিশেষ জানা ছিল। আমরা এত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর অভাব বোধ করিয়াছি। রাসবিহারীর অনুজ অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী বসু বর্ত্তমান জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া এই অভাব অনেকাংশে নিরাকৃত করিয়াছেন। রাসবিহারীর মত ভারতমাতার একনিষ্ঠ স্বাধীনতাকামীর জীবনকাহিনী ও কার্য্যকলাপ আমাদের এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জানা একান্ত আবশ্যক। অথচ তাঁহার সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই জানি। এই তথ্যবহুল পুস্তকখানি পাঠে আমাদের কৌতূহল অনেকটা চরিতার্থ হইবে, আমরা যথেষ্ট জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিব। স্বাধীনতার নূতন পরিবেশে জাতির কর্ম্মপ্রচেষ্টা নূতন পথে পরিচালিত হইতে বাধ্য, হইবেও তাহাই। কিন্তু ইহার মূলে রহিয়াছে ভারত সন্তানদের। সর্ব্বাত্মকনিষ্ঠা, ত্যাগ ও ধৈর্য্যশীল সেবা-পরায়ণতা। রাসবিহারীর মধ্যে এই সমুদয় গুণই অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হইত। রাসবিহারীর জীবন হইতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সেবার ভাব আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। পুস্তকখানির লিখনভঙ্গী, ঘটনা-সমাবেশ প্রভৃতিতে ত্রুটি আছে বটে, কিন্তু গ্রন্থকার যে একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর মাল-মশলা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন সেজন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

Rexona
Rexona
BLENDED WITH CADYL

দেশ-বিদেশের কথা

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের মহর্ষি চরক জয়ন্তী ও রজত জয়ন্তী

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ও পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদারের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে তিন দিন ব্যাপী (৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৬, ও ১লা জানুয়ারী '৫৭) মহর্ষি চরক জয়ন্তী ও পরিষদের রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ৩০শে ডিসেম্বর, মহর্ষি চরক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। সমবেত সুধীবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ড. শ্রীকালিদাস নাগ, ড. শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি চরক-সংহিতার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ষড়দর্শনতীর্থ এই আলোচনা-সভায় পৌরোহিত্য করেন। ৩১শে ডিসেম্বর রজত জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত. সভাপতির আসনে বৃত হন কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন; রাজস্থানের আয়ুর্বেদ বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীপ্রেমশঙ্কর শর্ম্মা বিশিষ্ট অতিথি রূপে হিসাবে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন, কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাশ শর্ম্মা, কবিরাজ শ্রীমুরারি ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। ১লা জানুয়ারী, আয়ুর্বেদীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডাঃ শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী, সভাপতিত্ব করেন কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। এই উপলক্ষ্যে মিউনিসিপাল-মিউজিয়মে আয়ুর্বেদীয় প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

সন্ধ্যা মজলিসের বার্ষিক অধিবেশন

গত ২০শে মাঘ দ্বারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজের বাংলা সাহিত্য-সংস্থা "সন্ধ্যা মজলিসে"র বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান ও বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে সাহিত্যিক শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীরথীন হালদার। সংস্থার স্থায়ী সভাপতি সৌমীন্দ্রমোহন ঘোষ অতিথিদের পরিচয় দেওয়ার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অতঃপর ছাত্র-সম্পাদক অমৃত আচার্য্য কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা পাঠ করেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন; রবীন্দ্র-সঙ্গীতও পরিবেশিত হয়। রচনা, আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশ-গ্রহণকারীদের গভীর নিষ্ঠার পরিচয় থাকাতে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়। ছোট গল্পে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন অঞ্জলি চন্দ ও গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রবন্ধে প্রথম হন অঞ্জলি পাল। প্রধান অতিথি মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ দেন, বিশিষ্ট অতিথি অধ্যাপক হালদার 'রবীন্দ্র-কাব্যে মানবতা' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন এবং সভাপতি মহাশয় দ্বারভাঙ্গার বঙ্গ-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন।

প্রবাসী ও স্থানীয় ছাত্র এবং অধ্যাপকবৃন্দের মিলিত উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত এই মজলিস মাত্র ১৩৫৩ সালে জন্মলাভ করেছে। বাঙালী সাহিত্যানুরাগী ছাড়াও বহু বিশিষ্ট মিথিলাবাসী ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। প্রাচীনকাল হইতে দুই প্রদেশের সারস্বত ভূমিতে যে আত্মীয়তা-বন্ধন দৃঢ় রহিয়াছে, এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গোষ্ঠবিহারী দে

গত ৫ই জানুয়ারী অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রায়-

গোষ্ঠবিহারী দে

সুস্থ ছেলেমেয়েরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
● যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্তে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
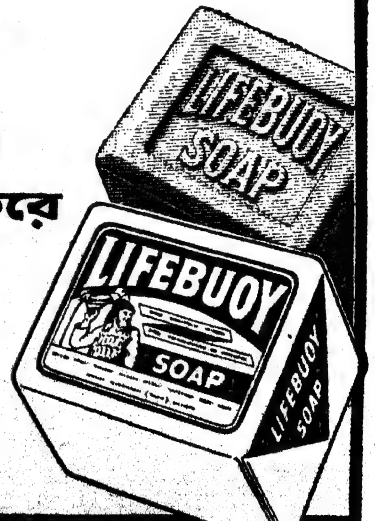
বাহাদুর গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের-ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার নাগপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৮১ সালে বর্দ্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত জাড়গ্রাম নামক পল্লীতে গোষ্ঠবিহারীর জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থায় তাঁহাকে প্রবাসে থাকিতে হয়। পাটনা কলেজ হইতে বি-এ এবং নাগপুর মরিস কলেজ হইতে বি-এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলা আদালতে আইনব্যবসা আরম্ভ করেন। অবশেষে ১৯০৫ সনে মধ্যপ্রদেশে বিচার বিভাগে মুন্সেফ নিযুক্ত হন। ১৯২৮ সনে তিনি যখন মধ্যপ্রদেশে অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা জজ ছিলেন তখন সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া ভারত সরকারের আইন বিভাগে কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং ১৯২৯ সনে নাগপুর হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার পদ লাভ করেন। ১৯৩৫ সনে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কোর্ট ফি বিল প্রণয়ন করিবার কার্য্যে মধ্যপ্রদেশের আইন-সভায় সরকারী প্রতিনিধি মনোনীত হন। ১৯৩১ সন হইতে ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত কৃতিত্বের সহিত জেলা ও দায়রা জজের কার্য্য করেন। এই কাজ হইতে অবসর গ্রহণের পর ১৯৩৭ সনে ধার ষ্টেটের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৩ সনে ঐ পদে ইস্তফা দেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই ভারত সরকার তাঁহাকে এন্টি-করাপশন ট্রাইব্যুনাল—সাদার্ণ কমাণ্ডের চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত করেন। এই ট্রাইব্যুনালের কার্য্য সমাপ্ত করিবার পর তিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক এস কে. ঘোষ, আই-সি-এস প্রভৃতির বিরুদ্ধে আনীত প্রসিদ্ধ মামলার বিচার-ট্রাইব্যুনালের সভ্য নিযুক্ত হন।

গোষ্ঠবিহারী বাবু প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আজীবন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ১৩৪৮ সালের কলিকাতা অধিবেশনে বৃহত্তর বঙ্গ-শাখার সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার লিখিত—C. P. Land alievatton Act-এর টীকা আইন-ব্যবসায়ী ও বিচারকগণের নিকট বিশেষরূপে আদৃত হয়। তিনি গীতার একটি বঙ্গানুবাদ টীকা (ভাষ্য) প্রণয়ন করেন কিন্তু তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি তাঁহার জন্মস্থান জাড়গ্রামের "মাখনলাল পাঠাগার" নামক প্রতিষ্ঠানের গৃহনির্ম্মাণার্থ তিন হাজার টাকা, উক্ত গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের জলকষ্ট নিবারণকল্পে একটি ইঁদারা খননের জন্য এক হাজার টাকা এবং তাঁহার মাতুলালয় পাঁচড়াগ্রামের বুড়া শিব-মন্দিরের সংস্কারের নিমিত্ত দুই হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং বহু দুঃস্থ ও দরিদ্র ছাত্রকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন।

দে মহাশয়ের সাহিত্যানুরাগ প্রবল ছিল। পল্লীর দুঃখ-দুর্দ্দশায় তিনি বিচলিত হইতেন এবং সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। প্রবাসে থাকিলেও তিনি জন্মভূমিকে কখনও ভুলেন নাই।

নর্ম্মদা নদীতে শোচনীয় দুর্ঘটনা

গত ২৬শে জানুয়ারী জব্বলপুর হইতে তের মাইল দূরে নর্ম্মদা তিন পুত্র—ভাস্কর, অমেয় ও অংশুমান—নদীতে মজ্জমানা ভাস্করের নব-বিবাহিতা পত্নী সুস্মিতা (ইভা)-কে বাঁচাইতে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বধূটিও জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন।

অমেয় বসু

অংশুমান বসু

ভাস্কর (বয়স ৩০) ইংলণ্ড ও পশ্চিম জার্ম্মানীতে শিক্ষালাভ করিয়া বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানীতে অফিসারের

অমেয় (বয়স ২০) এবার সাগর ইউনিভারসিটির বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণপদক পাইয়াছিলেন। অংশুমান (বয়স ১৬) স্থানীয় স্কুলে প্রী-ম্যাটি ক ক্লাসে পড়িতেন।

ভাস্কর বসু

সুস্মিতা (ইভা) বসু

ইভা (বয়স ২০) বিহারের ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীঅমিয়কান্ত দত্তের প্রথমা কন্যা। তিনি মহিলা কলেজে বি-এ পড়িতেন, গত ২০শে জানুয়ারী ভাস্করের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইবার পর তাঁহারা উভয়ে ভাস্করের পিতামাতার কাছে আসিয়াছিলেন।

ভাস্করের জননী শ্রীঅমিতাকুমারী বসু 'প্রবাসী'র একজন লেখিকা। বহুকাল যাবৎ 'প্রবাসী'তে তাঁহার প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। বসু-দম্পতি এই গভীর শোকে সান্ত্বনা লাভ করুন, ভগবানের নিকট আমরা ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

সুনির্ম্মল বসু

বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক সুনির্ম্মল বসু গত ১৩ই ফাল্গুন, ঢাকুরিয়া সেলিমপুর রোডস্থ তাঁহার নিজ বাসভবনে করোনারী-থ্রম্বসিস রোগে মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

সুনির্ম্মল বাবুর পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকা জেলার মালখানগরে। তাঁহার পিতা পশুপতি বসু একজন বিখ্যাত অভ্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। পিতার কর্ম্মস্থল গিরিডিতেই তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী ও সাহিত্যিক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার দৌহিত্র।

সুনির্ম্মল বসু

গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর যাবৎ সুনির্ম্মল বাবু অক্লান্ত ভাবে গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা বাংলা শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ছোটদের গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, [illegible] রচনায় তিনি সমান দক্ষতা দে[illegible] ছড়ায় তাঁহার ক্ষমতা ছিল অতুল[illegible]

তাঁহার রচিত গ্রন্থের [illegible] হালাবজা, বেজে মজা, [illegible]

ছবির মধ্যস্থলে উপবিষ্ট শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার ডান দিকে (তৃতীয়) শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

মরণের ডাক, ছন্দের টুংটাং প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। তিনি 'ছোটদের চয়নিকা' এবং 'ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন' নামক সঙ্কলন গ্রন্থ দুইখানিও সম্পাদনা করেন। এই কৃতী সাহিত্যিকের লোকান্তরগমনে বাংলা শিশু-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

সারস্বত সম্মেলন

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২৫৯নং আপার চিৎপুর রোডে বাণী-মন্দির, সাহিত্য-সভা, সঙ্গীত সমাজ ও তরুণ সঙ্ঘের উদ্যোগে, বাণী-অর্চনা উপলক্ষে প্রবাসী সম্পাদক শ্রীকেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে সাহিত্যালোচনা ও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল; সভাপতি মহাশয় সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি মনোরম ভাষণ দেন। ধ্রুপদ গানে গীতা ও অমিতা সান্যাল এবং চাঁপা চাকলাদার অংশ গ্রহণ করেন। অরুণা ঘোষ দুইখানি ভজন গান করেন, খেয়ালে চাঁপা চাকলাদার ও রেখা বন্দ্যোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

দে মহাশয়ের সাহিত্য গ্রহণ করিয়া

তিনি বিচলিত হইতেন এবং করেন।

থাকিলেও তিনি জন্মভূমিকে কথ

নর্ম্মদা নদীতে শো

গত ২৬শে জানুয়ারী জব্বলপুর হইতে

...বাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯।